ব্যোমকেশ
স ম গ্র
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের এক অতি প্রিয় চরিত্র ব্যোমকেশ বক্সী। ধারালো নাক, লম্বা চেহারা, নাতিস্থূল অবয়ব। অসামান্য পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, অনবদ্য বিশ্লেষণী দক্ষতা। শুধু বুদ্ধি দিয়েই যাবতীয় জটিল রহস্যের জট ছাড়ান এই সত্যান্বেষী। তবু কী রোমাঞ্চকর একেকটি ব্যোমকেশ-কাহিনী।

আসলে ব্যোমকেশের গল্প-উপন্যাস নিছক গোয়েন্দা-কাহিনী নয়। বরং সাহিত্যের ভোজে যা ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়, সেই গোয়েন্দা-কাহিনীকে ব্যোমকেশ-কাহিনীর মধ্য দিয়ে চিরায়ত সাহিত্যের স্তরে উত্তীর্ণ করেছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনকে এড়িয়ে ব্যোমকেশ-কাহিনীর সৃষ্টি করেননি তিনি। চেনা জীবনের মধ্যেই ফুটিয়ে তুলেছেন অচেনা চমক।

এহেন ব্যোমকেশ-কাহিনীই এবার এক খণ্ডের দুই মলাটের মধ্যে। ব্যোমকেশের প্রতিটি গল্প-উপন্যাস এই অখণ্ড সংগ্রহে সাজানো হয়েছে কালানুক্রমিক বিন্যাসে। ব্যোমকেশ-জীবনের এক ধারাবাহিক চলচ্ছবি এই গ্রন্থ।

ISBN 81-7215-355-4

জন্ম : ১৭ চৈত্র, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ (৩০ মার্চ, ১৮৯৯) উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর শহরে, মাতুলালয়ে।
পিতা : তারাভূষণ। মাতা : বিজলীপ্রভা। আদি নিবাস উত্তর কলকাতার বরানগর কুঠিঘাট অঞ্চলে।
পড়াশোনা মুঙ্গেরে ও কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে। বি-এ পাশ করে ল কলেজে ভর্তি হন। শেষ পর্যন্ত পাটনা থেকে আইন পাশ করেন।
ছাত্রাবস্থাতেই বিবাহ। স্ত্রী : পারুল।
সাহিত্যরচনার শুরু কবিতা দিয়ে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যৌবনস্মৃতি' (১৩২৫ বঙ্গাব্দ)। এরপর দুটি-একটি গল্প। সাহিত্যকে জীবিকা করে তোলা ১৯২৯ সাল থেকে।
১৯৩৮ সাল থেকে বোম্বাইয়ে। চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্য লেখার কাজে। প্রথমে বোম্বে টকিজ, পরে অন্যত্র ও ফ্রিল্যান্স। সিনেমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৯৫২ সাল থেকে পুণাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস।
মৃত্যু : ১৯৭০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর।
জ্যোতিষচর্চায় আগ্রহ ছিল গভীর।
ছদ্মনাম : চন্দ্রহাস।
পুরস্কার : রবীন্দ্র পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎস্মৃতি পুরস্কার, মতিলাল পুরস্কার ও অন্যান্য।

প্রচ্ছদ □ সুনীল শীল □ সুব্রত চৌধুরী

ব্যোমকেশ সমগ্র

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র কা শ কে র নি বে দ ন

শরদিন্দু অম্‌নিবাস (প্রথম-দ্বাদশ খণ্ড) গ্রন্থে সঙ্কলিত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাসমূহ বিষয় অনুসারে এক একটি পৃথক খণ্ডে বিন্যস্ত করার পরিকল্পনা অনুসারে গোয়েন্দা গল্প ও উপন্যাসগুলি একত্রে 'ব্যোমকেশ সমগ্র' নামে প্রকাশিত হয় (মে ১৯৯৫)। শরদিন্দু অম্‌নিবাস-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা যথাক্রমে সুকুমার সেনের 'ব্যোমকেশ-উপন্যাস' এবং প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের 'ব্যোমকেশ, সত্যবতী, সত্যবতীর গাড়ি' শীর্ষক রচনা দুটিও 'ব্যোমকেশ সমগ্র' গ্রন্থের প্রারম্ভে দেওয়া হয়।

গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণে (অক্টোবর ২০০০) সংযোজিত পরিশিষ্ট অংশে পুনর্মুদ্রিত হল শরদিন্দু অম্‌নিবাস দ্বাদশ তথা শেষ খণ্ডের প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের লেখা ভূমিকা 'ব্যোমকেশ ও সত্যবতীর প্রস্থান' এবং দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে প্রকাশিত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা 'ব্যোমকেশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার'।

বিষয় হিসাবে রচনা বিন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখকের সমুদয় ঐতিহাসিক উপন্যাস ও গল্প (পাঁচটি উপন্যাস: কালের মন্দিরা, গৌড়মল্লার, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, কুমারসম্ভবের কবি ও তুঙ্গভদ্রার তীরে এবং সতেরোটি গল্প) একত্রে 'ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র' নামে প্রকাশিত হয়েছে (জানুয়ারি ১৯৯৮)।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে লেখকের সমুদর রোমান্টিক উপন্যাস (দাদার কীর্তি, বিষের ধোঁয়া, ঝিন্দের বন্দী, ছায়াপথিক, বহু যুগের ওপার হতে, রিমঝিম, রাজদ্রোহী, মনচোরা, অভিজাতক ও শৈলভবন), একত্রে 'দশটি উপন্যাস' নামে (সেপ্টেম্বর ২০০০)।

পরবর্তী পর্যায়ে আরও দুটি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছে। একটি, গোয়েন্দা ও ইতিহাস-আশ্রিত গল্প ছাড়া বাকি সমস্ত ছোট গল্পের সঙ্কলন 'শরদিন্দু গল্পসংগ্রহ'। এই গল্পগুলি বিভিন্ন ধরনের—অলৌকিক, হাস্যকৌতুক, প্রেম এবং সামাজিক।

দ্বিতীয়টি, কিশোরদের জন্য লেখা রচনাগুলি একত্রে 'কিশোর রচনা সমগ্র'।

ব্যো ম কে শ - উ প ন্যা স

সাধারণ গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে ডিটেক্‌টিভ গল্প-উপন্যাসের জাতের তফাত আছে। ডিটেক্‌টিভ গল্প-উপন্যাসকে বলতে পারি একরকম শিকার-কাহিনী। অজানা কোন পশু মানুষের প্রাণহানি অথবা অন্যরকম ক্ষতি করেছে; খোঁজ করে, তাড়া করে, ফাঁদ পেতে, বেড়াজালে ঘিরে, কোণ-ঠেসা করে জব্দ অথবা হত্যা করা হল শিকারীর পেশা। আর, অজানা মানুষ জানা মানুষের প্রাণহানি অথবা অন্যরকম ক্ষতি করেছে; তার পরিচয় উদ্ধার করে, তাকে খুঁজে বার করে, তার অপরাধ প্রমাণযোগ্য করে তাকে বিচারালয়ে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো অথবা তাকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করানো হল ডিটেক্‌টিভের কাজ। আবার, শিকার-কাহিনীর সঙ্গে ডিটেক্‌টিভ কাহিনীর তফাতও আছে, সে তফাত গুরুতর। শিকার-কাহিনী পুরোপুরি শিকারীর ব্যাপার, তার এক-তরফা কাহিনী। যে কাহিনীতে অন্বিষ্ট অপরাধী জন্তুর তরফ একেবারেই নেই। ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী এমন এক-তরফা নয়, তা দো-তরফা—যেন দাবাবোড়ে খেলা। ডিটেক্‌টিভ বুদ্ধি খেলাচ্ছে অপরাধীকে মাত করতে, অপরাধী বুদ্ধি খাটাচ্ছে ডিটেক্‌টিভের চাল এড়িয়ে চলতে। এই দৃষ্টিতে, ডিটেক্‌টিভ কাহিনীতে দেখতে পাই দুটি ভিন্নমুখী স্রোত। তার মধ্যে একটি হল ডিটেক্‌টিভের কর্ম ও চিন্তা, কেন্দ্রস্থানীয় ও ধীরতর; দ্বিতীয়টি হল অপরাধীর কর্ম ও চিন্তা, উৎকেন্দ্রিক ও বিচঞ্চল। ডিটেক্‌টিভ কাহিনীর নায়ক বলতে গেলে একটি নয়, দুটি—অপরাধী এবং ডিটেক্‌টিভ। অপরাধী হল মূল কাহিনীর নায়ক, যে ঘটনাসূত্রের জট পাকিয়েছে। ডিটেক্‌টিভ নায়কের প্রতিপক্ষ নয়, নায়কের শত্রুও নয়, সে নায়কের অভিশাপ, তার কর্মফলের পেয়াদা, যে ঘটনাসূত্রের পাকানো জট খুলছে। অতএব বলা যায়, কাহিনীর পক্ষে ডিটেক্‌টিভ যেন বিধি, অধিনায়ক, যার মধ্যে রচয়িতাও খানিকটা আত্মগোপন করে থাকেন। ডিটেক্‌টিভ গল্পের পাত্রপাত্রীর একজন নয়, গোড়া থেকেই তিনি গল্পের আসরে পরিপূর্ণ স্বরূপে আসন গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁর স্বভাবের ও প্রকৃতির কোন আবর্তন-বিবর্তন বা রাখাঢাকা নেই কাহিনীসূত্রের বয়নে। তবে কোন লেখক যদি একই ডিটেক্‌টিভ নিয়ে কিছুকাল ধরে গল্প রচনা করতে থাকেন তবে কখনো কখনো তাঁর কাহিনীগুলির মধ্যে দিয়ে ডিটেক্‌টিভের জীবনসূত্রের কিছু কিছু টুকরা গাঁথা

পড়ে যায়। এই ভগ্নাংশগুলি থেকে ধারাবাহিক জীবনীকাহিনী না পেলেও ডিটেক্‌টিভের ব্যক্তি-পরিচয়, তার আচার-ব্যবহার ও গৃহজীবনের ইঙ্গিত ইত্যাদি যা পাওয়া যায় তাতে আমরা ডিটেক্‌টিভকে যেন আমাদের পরিচিত সাধারণ মানুষের মেলায় কখনো কখনো দেখতে পাই। তার ফলে মূল কাহিনীতে এমন একটু অতিরিক্ত ভালোলাগার সঞ্চার হয় যার নাম দিতে পারি পরিচয়-রস। তাতে পাঠকের আগ্রহ বাড়ে। ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ সাহিত্যে এর উদাহরণ অপ্রচুর নয়। বিশেষ করে দুটি ডিটেক্‌টিভের নাম করা যায় যাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় কাহিনী-পরম্পরায় গাঁথা হয়ে পাঠকের চিত্তে বাস্তবতা পেয়েছে—শার্লক হোম্‌স আর লর্ড পিটার উইম্‌সি। একদা অগণিত পাঠক-পাঠিকা শার্লক হোম্‌স যে রক্তমাংসের মানুষ নয়, সার আর্থার কোনান্ ডয়েলের কল্পনা-সৃষ্ট, সেকথা মানতে চাইত না। এখনকার ভক্ত পাঠকেরা তা মানলেও হোম্‌সকে সত্যিকার মানুষ ভাবতে ভালোবাসেন। এ ভালোলাগার ভালো পরিচয় তাঁর লন্ডনের বাসা নিয়ে গবেষণা, তাঁর আচার-আচরণ নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা, তাঁর "জীবনীগ্রন্থ" রচনা। মানি এ সবই ছেলেখেলা, তবে বুড়ো মানুষের ছেলেখেলা—এ একরকম "পরীর দেশের বন্ধ দুয়ারে হানা" দেওয়া। এ ছেলেখেলা প্রবীণ সাহিত্য-চিন্তার চেয়ে কম সার্থক নয়।

বাংলায় প্রথম মৌলিক ডিটেক্‌টিভ গল্প-কাহিনী ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন পাঁচকড়ি দে। এঁর অধিকাংশ রচনাই উপন্যাস এবং সেগুলির কয়েকটি বেশ বৃহৎকায়। ডিটেক্‌টিভ গল্প ইনি দু'চারটির বেশি লেখেন নি। পাঁচকড়িবাবু প্রধানভাবে অনুকরণ করেছিলেন ইংরেজ ঔপন্যাসিক উইল্‌কি কলিন্‌সের রচনা এবং ফরাসী ডিটেক্‌টিভ-উপন্যাস লেখক এমিল গাবোরিয়োর ইংরেজী অনুবাদ। পরে কোনান্ ডয়েলের কাহিনী বার হলে তিনি ডয়েলের রচনা থেকেও মালমশলা কিছু কিছু নিয়েছিলেন। তবে পাঁচকড়িবাবু শার্লক হোম্‌সকে ছোঁন নি। এঁর ডিটেক্‌টিভেরা পুলিস কর্মচারী (কর্মনিরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত) কেননা তখনো ডয়েলের হোম্‌সের মতো স্বাধীন-কারবারী ডিটেক্‌টিভের রেওয়াজ হয় নি। তবে, তিনি একটু অগ্রগামীর কাজ করেছিলেন কোন কোন বিষয়ে। তাঁর দুটি প্রধান ডিটেক্‌টিভের ব্যক্তি-পরিচয় পুরোপুরি নেপথ্যে রাখেন নি, এমন কি তাঁদের দু'জনের মধ্যে একরকম প্যারিবারিক সম্বন্ধও স্থাপন করে দিয়েছিলেন। যাঁরা পাঁচকড়িবাবুর উপন্যাস ছেলেবেলায় আগ্রহ করে পড়েছেন তাঁদের হয়ত মনে পড়বে যে অরিন্দম বসু ছিলেন দেবেন্দ্রবিজয় মিত্রের দাদাশ্বশুর-স্থানীয়। নাত-জামাই দাদাশ্বশুরের অনুগত শিষ্য ছিল, দাদাশ্বশুর নাত-জামাইয়ের উন্নতিকামী ছিলেন। তার বেশি খবর কিছু নেই।

পাঁচকড়িবাবু আরও এক বিষয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি প্রবীণ ডিটেক্‌টিভকে নবীনের সমভূমিতে রাখেন নি, ঊর্ধ্বভূমিতে তুলেছেন। অরিন্দম যাকে বলে super-sleuth[১] তাইই। এই super-sleuth আইডিয়াটি তখনো পাশ্চাত্য ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী লেখকদের মাথায় ভালো করে আসে নি। কোনান্ ডয়েলের এসেছিল কিন্তু একটি ছাড়া তাঁর কোন গল্পে super-sleuth নেই। যে গল্পটিতে আছে সেখানেও তা ইঙ্গিতে প্রদর্শিত। ডয়েলের super-sleuth হল শার্লক হোম্‌সের দাদা মাইক্রফ্‌ট হোম্‌স, গভর্নমেন্ট আপিসের কেরানি। (গল্পটি যে পাঁচকড়িবাবুর পড়া ছিল, তার প্রমাণ আছে 'নীলবসনা সুন্দরী'তে। সেখানে

---

১ অতিশায়ী ডিটেক্‌টিভ।

অরিন্দম ঠিক হোম্‌সের দাদার মতোই গোয়েন্দাবাজি করেছিলেন)। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, super-sleuth কল্পনার বীজ আমাদের দেশে অনেক কালের। চোর ছাড়া কেউ চোর ধরতে পারে না,—এই ধারণার বশে আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে ঘাগী চোরকে বশ করে পুলিসের কাজ করানো হত। তাই হাজার বছর আগেকার প্রবাদ ছড়ায় বলেছে, "জো সো চৌর সোউ দুষাধী" অর্থাৎ যে সে চোর, সেই শাস্তিদাতা। চুরি সেকালেও অপরাধ বলে গণ্য হত, এমন কি চুরির সাজায় প্রাণদণ্ড হত, তবুও লোকবিশ্বাসে চুরি বাহাদুরির কাজ বলে লোকে মনে মনে তারিফ করত (অন্তত গল্প-কথায়), এবং চৌর্যবৃত্তি দক্ষ শিল্পীর বিদ্যায় পরিণত হয়েছিল। "চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা।" ছেলেভুলানো গল্পে যে "বড়" চোরের দেখা পাই তিনিই তখনকার দিনের বড় পুলিস এবং এখনকার দিনের শার্লক হোম্‌সের বড় ভাই মাইক্রফ্‌ট হোম্‌সের ভারতীয় পূর্বপুরুষ।

ছেলেভুলানো গল্পের চোর নায়ক super-criminal[২] এবং super-sleuth একাধারে। ঠিক এমনি ভূমিকা সৃষ্টি করেছেন একজন ফরাসী ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী লেখক মরিস ল ব্লাঁ। তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়ক আরস্যান্ লুপ্যাঁ যুগপৎ "চৌর" এবং "দুষাধী"। ল ব্লাঁর কোন কোন কাহিনীতে লুপ্যাঁ হোম্‌সের প্রতিপক্ষও হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এমন চোর-পুলিস গল্পের সৃষ্টি হলে মন্দ হয় না। (শরদিন্দুবাবু কি বলেন?)।

বাংলাভাষায় নবীন ধারায় ডিটেক্‌টিভ গল্প-কাহিনীর সৃষ্টিকর্তা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কোনান্ ডয়েলের অনুসরণে একটিমাত্র ডিটেক্‌টিভ ভূমিকার অবতারণা করেছেন তাঁর দীর্ঘদিনের গল্পমালার নায়করূপে[৩]। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল 'সত্যান্বেষী' গল্পে। ব্যোমকেশ পুলিসের চাকরি করেন না, ডিটেক্‌টিভগিরি তাঁর জীবিকার্থে নয়, সখের, খেয়ালের। সত্য ও তথ্যের অনুসন্ধানে তাঁর স্বভাবসঙ্গত নিঃস্বার্থ জিজ্ঞাসাবৃত্তি ছিল (লর্ড পিটার উইম্‌সির মতো), তা-ই তাঁকে হোম্‌সের মতো দৌঃসাধিক করেছিল। হোম্‌সের সঙ্গে ব্যোমকেশের মিল—নামের মধ্যে অনুপ্রাসের ঝঙ্কারটুকু কানে না তুললে—ওই পর্যন্তই। ব্যোমকেশ হোম্‌সের মতো উৎকেন্দ্রিক প্রকৃতির নয়, বিজ্ঞানদক্ষ নয়, গুণী বেহালাদার নয়, নেশাখোরও নয়, সে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাঙালী যুবক,—শিক্ষিত, মেধাবী, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সংযতবাক্, সহৃদয়। তাঁর চারিত্র্যে মনস্বিতা ও গাম্ভীর্য ছাড়া এমন কিছু নেই যাতে তাঁকে সমান স্তরের সমান বয়সের বাঙালী ছেলের থেকে স্বতন্ত্র মনে করতে হয়। সুতরাং সখের ডিটেক্‌টিভ বাঙালী ছেলে রূপে ব্যোমকেশ বক্সী সম্পূর্ণ সুসঙ্গত ও সার্থক সৃষ্টি। তাঁর চরিত্রের মতো নামটিও বেশ খাপ খেয়েছে। "ব্যোমকেশ" নামের ধ্বনিগুচ্ছে ধোঁয়া, বুঁদ হয়ে থাকা, ধ্যানমগ্ন মহাদেব, ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক শব্দের ইশারা আছে। হয়ত রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চভূত"-পঞ্চায়েতের প্রধানেরও চরিত্রাভাস আছে। ডয়েলের ডিটেক্‌টিভের নামের প্রতিধ্বনির কথা আগে বলেছি। ব্যোমকেশের পদবীও সমান সার্থক। ব্যোমকেশ পুলিসের মতো চাকরি করেন না, উকিলের মতো ফীও নেন না। তবে বক্‌শিশের—প্রশংসা, যশ, আত্মতৃপ্তি ইত্যাদি ফাঁকা দক্ষিণার—প্রত্যাশা অবশ্যই করেন। তাই ব্যোমকেশের পদবী স-বর্জিত বক্‌সী[৪]।

---

২ অভিশায়ী অপরাধী।

৩ 'নায়ক' শব্দটির এক মানে ছিল মধ্যমণি।

৪ তুলনা করতে ইচ্ছা হয় রেক্স স্টাউটের দ্বিতীয় ডিটেক্‌টিভের পদবী (Fox)-এর সঙ্গে।

ডিটেক্‌টিভের সহচর—সহকারী নয়, সুহৃদ্—ভূমিকার সৃষ্টি করেছিলেন কোনান্ ডয়েল। শার্লক হোম্‌সের বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসনও তাঁর সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যে অমরতাপ্রাপ্ত। অজিত কিন্তু ওয়াটসনের বাংলা সংস্করণ নয়। হোম্‌স ও ওয়াটসনের মধ্যে বয়সের বেশ তফাত ছিল, মানসিক বৃত্তিতেও অসমতা ছিল। অজিত ব্যোমকেশের প্রায় সমান বয়সী এবং তাহাদের মনোবৃত্তি সমান ভূমির। অজিতকে সমসাময়িক ভদ্র বাঙালী যুবকের টাইপ বলা যায়। ব্যোমকেশ-অজিতের সহযোগিতায় শরদিন্দুবাবুর গল্প-কাহিনী তর্‌তর্ করে বয়ে যায়। হোম্‌স ওয়াটসনের সহযোগিতা ওদের মতো অত ঘনিষ্ঠ ছিল না। সেই জন্যেই হয়ত তাতে অন্য রসের আমদানি সহজ হয়েছে। পৌরাণিক উপমা টেনে এনে বলা যায় হোম্‌স আর ওয়াটসন যেন কৃষ্ণ আর উদ্ধব, ব্যোমকেশ আর অজিত যেন কৃষ্ণ আর সুবল।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সখের ডিটেক্‌টিভরূপে ব্যোমকেশের প্রথম প্রবেশ ছদ্মবেশে ‘সত্যান্বেষী’ গল্পে। কলকাতার চীনাবাজার (?) অঞ্চলে একদা মাসের পর মাস খুন হচ্ছিল, তাতে পুলিসের কর্তৃপক্ষ বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট, অন্যদিকে খবরের কাগজওয়ালারা পুলিসকে ভিতরে-বাইরে খোঁচা দিয়ে আরও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এমন অবস্থায় একদিন ব্যোমকেশ পুলিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললেন, “আমি একজন বে-সরকারী ডিটেক্‌টিভ, আমার বিশ্বাস আমি এই খুনের কিনারা করতে পারব।” পুলিস কমিশনারের অনুমতি নিয়ে ব্যোমকেশ সেই অঞ্চলে এক মেসে কিছুদিনের জন্যে ঠাঁই নিলেন। মেসের কর্তা ঠাঁই নেই বলাতে একজন মেসবাসী অনুকম্পা পরবশ হয়ে নিজের ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। সে মেসবাসীর নাম অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সূত্রে রুম-মেট দু’জনের বন্ধুত্ব-সংযোগ এবং অভেদ্য বন্ধন। সে ১৩৩১ সালের কথা।

অজিতের মেসে ব্যোমকেশ এসেছিল ছদ্মনাম নিয়ে—অতুলচন্দ্র মিত্র। দেখে অজিত অনুমান করেছিল, “তাহার বয়স বোধকরি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা—মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে।”

অজিতের বয়সও তখন ওই রকম, হয়ত এক আধ বছর কম। সে “বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি শেষ করিয়া সবেমাত্র বাহির” হয়েছে। সংসারে বন্ধন নেই। বাপ ব্যাঙ্কে টাকা রেখে গেছেন, তার সুদে স্বচ্ছন্দে একলা জীবন কাটানো যাবে। অজিত স্থির করেছে “কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সাহিত্যচর্চায় জীবন অতিবাহিত” করবে। তবে তখন পর্যন্ত সাহিত্যসাধনায় আদি-পর্বের উদ্যোগই চলছিল। অতঃপর ব্যোমকেশের তাঁবে এসে সে বান্ধবের চরিত-কথার ব্যাসরূপে একেবারে সভাপর্বে অবতীর্ণ হল।

ব্যোমকেশ থাকত হ্যারিসন রোডের উপর—মনে হয় কলেজ স্ট্রীট ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মাঝামাঝি কোন স্থানে, নম্বর বলা নেই—একটা বাড়ির তিন তলাটা ভাড়া নিয়ে। সবসুদ্ধ চার-পাঁচখানা ঘর। সংসারের দ্বিতীয় ব্যক্তি পরিচারক পুঁটিরাম। ব্যোমকেশের নির্বন্ধে অজিত এসে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে অধিষ্ঠিত হল। পুঁটিরাম সময়মত চা করে দেয়। জলখাবার জোগায়। রান্নাবান্না করে। চৌকস কাজের লোক।

ব্যোমকেশের ফ্ল্যাটের দরজার পাশে পেতলের ফলকে লেখা ছিল দু’ছত্র—শ্রীব্যোমকেশ বক্সী/ সত্যান্বেষী। সত্যান্বেষী মানে কি জিজ্ঞাসা করায় অজিতকে ব্যোমকেশ বলেছিল, “ওটা আমার পরিচয়। ডিটেক্‌টিভ কথা শুনতে

ভাল নয়,[৫] গোয়েন্দা শব্দটা আরও খারাপ। তাই নিজের খেতাব দিয়েছি সত্যান্বেষী।" আর একদিকেও খেতাবটা সার্থক হয়েছিল। ব্যোমকেশ পরে যে মেয়েটিকে বিয়ে করলেন তার নাম সত্যবতী। ডরোথি সেয়ার্সের ডিটেক্‌টিভ লর্ড পিটার উইম্‌সির সঙ্গে হ্যারিয়েট ভেনের বিবাহ ঘটনার সূত্র অনেকটা যেন এমনিই। তবে সত্যবতী নিজে কোন হত্যাকাণ্ডের আসামী ছিল না, তা ছিল তার দাদা। হ্যারিয়েট ভেন নিজেই সন্দিগ্ধ আসামী ছিল।

ব্যোমকেশের ধরন-ধারণ সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোকের মতোই। তাঁর অসামান্যতার পরিচয় সহজে পাওয়া যেত না। "বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া একবারও মনে হয় না যে, তাহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে। কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিয়া, প্রতিবাদ করিয়া, একটু উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে ভিতরকার মানুষটি কচ্ছপের মত বাহির হইয়া আসে। সে স্বভাবত স্বল্পভাষী, কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া একবার তাহাকে চটাইয়া দিতে পারিলে তাহার ছুরির মত শাণিত ঝকঝকে বুদ্ধি সংকোচ ও সংযমের পর্দা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার কথাবার্তা সত্যই শুনিবার মত বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরেও কিছুকাল ব্যোমকেশরা হ্যারিসন রোডের বাসায় ছিল। তখন ব্যোমকেশের খোকা হয়েছে এবং ব্যোমকেশ রীতিমত সংসারী। কিন্তু আগেকার মতোই সে স্বকর্মনিরত ও নির্বিচল। অজিত ব্যোমকেশের কীর্তিগাথা পরের পর লিখে ও ছাপিয়ে চলেছে। তারা বইয়ের দোকান খুলেছে। তাতে অর্থাগম বেড়েছে। হ্যারিসন রোডের বাড়িতে আর চলছে না। ১৯৬৮ সালের দিকে "অজিত আর ব্যোমকেশ মিলে দক্ষিণ কলিকাতায় জমি কিনেছে, নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে ; শিগ্‌গিরই তারা পুরনো বাসা ছেড়ে কেয়াতলায় চলে যাবে। অজিত একদিকে বইয়ের দোকান চালাচ্ছে অন্যদিকে বাড়ির তদারক করছে"। অজিতের এখন সময়ের টানাটানি যাচ্ছে, ধীরে সুস্থে ব্যোমকেশের কাহিনী লেখবার অবসর পাচ্ছে না। তার লেখার ভঙ্গিও ব্যোমকেশের আর পছন্দ হচ্ছে না ; সেকেলে একঘেয়ে বলে মনে হচ্ছে। (সেজন্যে নিশ্চয়ই বইয়ের বিক্রি কমে নি।) হয়ত ব্যোমকেশের সাহিত্যিক হবার বাসনা জেগেছে। যাই হোক, ব্যোমকেশ এখন নিজেই নিজের কীর্তিগাথা লিপিবদ্ধ করবে বলে ঠিক করেছে। তাড়াতাড়ি লিখেও ফেলেছে একটা ('বেণীসংহার')। তবে পাঠকেরা অজিতের লেখনীর অনুপস্থিতি এখনো উপলব্ধি করে পারে নি। এই অবস্থা বর্তমানে চলছে। তবে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে সত্যান্বেষীর দৃষ্টি বুঝি বা অতঃপর কলমের ডগাতেই মাছি হয়ে আটকে যায়। কল্পনাজাল কী সত্যান্বেষীকে সাহিত্যের রসে জারিয়ে দেবে ? ব্যোমকেশ চরিতের ব্যাসরূপে অজিতের পুনরাবির্ভাবে আমরা পাঠকেরা খুশি হব। বোধকরি সত্যবতীও হবেন।

শরদিন্দুবাবুর ডিটেক্‌টিভ কাহিনীর আলোচনায় নেমে তাঁর ডিটেক্‌টিভ সম্বন্ধেই সাতকাহন করলুম। কেন যে তা, কৈফিয়ৎ অনেকে চাইতে পারেন বলে এখানে দিয়ে রাখি। ডিটেক্‌টিভ গল্পের প্রধান আকর্ষণ গল্পের কাহিনীতে—তার ঘটনার অভিনবত্বে, তার প্লটের প্যাঁচে, তার ভূমিকাগুলির স্বভাবসঙ্গতিতে, ঘটনা-পরম্পরার অনপেক্ষিততায় এবং সব মিলিয়ে অনন্যতায় অথচ সম্ভাব্যতায়। গৌণ আকর্ষণ থাকে ডিটেক্‌টিভের ব্যক্তিত্বে—তার আচরণে, বুদ্ধি প্রাখর্যে এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। কোন এক লেখক যদি অনেক ডিটেক্‌টিভ কাহিনী লেখেন তবে

---

৫ রবীন্দ্রনাথের 'ডিটেক্‌টিভ' গল্প পড়ার ফলে কি ?

তিনি সাধারণত ডিটেক্‌টিভ পাল্‌টান না। বড় জোর দু'জন (যেমন আগাথা ক্রিষ্টি) অথবা তিনজন (যেমন রেক্‌স্‌ স্টাউট)। (প্রত্যেক গল্পের জন্য আলাদা করে ডিটেক্‌টিভ সৃষ্টি বোধহয় চতুর্মুখেরও অসাধ্য।) সুতরাং পরপর গল্পে ডিটেক্‌টিভকে নিয়ে পাঠকের ঔৎসুক্য বাড়তে থাকে এবং এমনও হয় যে প্লটের নিপুণতার চেয়ে ডিটেক্‌টিভের চারিত্র্য গল্প-কাহিনীকে বেশি স্বাদু করে। আমার মতো যাঁরা ডিটেক্‌টিভ গল্পের মৌতাতী ভক্ত (fans) তাঁরা একথার মর্ম বুঝবেন। শার্লক হোম্‌স, ডাক্তার থর্নডাইক, ফাদার ব্রাউন, এর্ক্যুল পোয়ারো, মিস পার্‌পল, লর্ড পিটার উইম্‌সি, ইন্‌সপেক্টর ফ্রেঞ্চ, এলবার্ট ক্যাম্পিয়ন, এ্যাপ্‌লবি, নিরো উল্‌ফ, টিকাম্‌সে ফক্‌স, ডাক্তার গিডিয়ন ফেল, এলেরি কুইন, জজ ডী, ইন্‌সপেক্টর চাফিক্‌ ইত্যাদির মেলায় ব্যোমকেশ বক্সীর স্থান। সাহিত্য-লোকের ডিটেক্‌টিভদের মধ্যে এই বিষয়ে ব্যোমকেশের যোগ্যতা কিছু কম নয়। ব্যোমকেশের গল্পগুলির মধ্যে তাঁর নিজের প্রসঙ্গ যেমন ধারাপতিত হয়ে উপস্থাপিত এমন কোন বিদেশী উদাহরণ মনে আসছে না।

গল্প-লেখক এবং ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী লেখকরূপে শরদিন্দুবাবুর দক্ষতা প্রথম গল্পটিতেই প্রকটিত এবং সে দক্ষতা পরে একটুও খর্ব অথবা ম্লান হয় নি। একঘেয়েমি কাটিয়ে ডিটেক্‌টিভ গল্প লেখা বেশ দুরূহ ব্যাপার। এবং তার উপর আরও একটা কথা আছে। যাঁর প্রথম গল্প, কবিতা বা উপন্যাস উৎকৃষ্ট হয়েছে এমন অনেক বাঙালী লেখকের নাম করা যায়। কিন্তু প্রথমবার ভালো লেখার উচ্চমান পরবর্তী রচনা পরম্পরায় অব্যাহত রাখতে পেয়েছেন এমন লেখকের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম। শরদিন্দুবাবু সেই খুব কম লেখকদের একজন।

শরদিন্দুবাবুর গল্পের গুণ বহুগুণিত করেছে তাঁর ভাষা। কাহিনীকে ভাসিয়ে তাঁর ভাষা যেন তর্‌তর্‌ করে বয়ে গেছে সমাপ্তির সাগরসঙ্গমে। সে ভাষা সাধু না চলিত বলা মুশকিল। বলতে পারি সাধু-চলিত কিংবা চলিত-সাধু। শরদিন্দুবাবুর স্টাইল তাঁর নিজেরই—স্বচ্ছ, পরিমিত, অনায়াসসুন্দর ॥

১৩-৬-৭০ শ্রীসুকুমার সেন

ব্যোমকেশ, সত্যবতী, সত্যবতীর গাড়ি

গত চল্লিশ বছরে ইংলণ্ডে গোয়েন্দা কাহিনীর পরিচিত রীতির পরিবর্তন হয়েছে। জনপ্রিয় কাহিনীতে যে পরিচিত গোয়েন্দাদের মুখ ঘন ঘন চোখে পড়ত এখন তাঁদের চেহারার বদল হয়েছে। এই সাম্রাজ্যের যাঁরা পুরনো অধীশ্বর কিম্বা অধিশ্বরী তাঁরা গোয়েন্দা সম্রাটদের পরিত্যাগ না করলেও রহস্য সমাধান করবার জন্য নতুন মুখের আমদানী করেছেন। তাঁরা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অথবা ডীন, কেউ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, কেউ গ্রামের বৃদ্ধা মহিলা, লর্ড অমুক বা লর্ড অমুকের আত্মীয়। যুদ্ধ ফেরৎ প্রায়-বেকার ও তাঁর প্রণয়িনীও গোয়েন্দাগিরির যৌথ কারবার খুলেছেন। আগে লেখকরা প্রায়ই বেসরকারী গোয়েন্দাই পছন্দ করতেন। প্রসঙ্গক্রমে সরকারী গোয়েন্দাদের অকর্মণ্যতার কথা বলে একহাত নেওয়া যেত। এখন উপন্যাস জগতের যাঁরা নামী গোয়েন্দা তাঁদের মধ্যে সরকারী বেসরকারী দু' রকমই আছেন। লেখক বা পাঠকদের পক্ষপাত নেই। আমেরিকান ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসে আরও কিছু রকমফের দেখতে পাওয়া যায়। তবে যাকে নিছক গোয়েন্দা কাহিনী বলে অর্থাৎ রহস্য উন্মোচন যার প্রধান কাজ, সে ধরনের লেখা কমে এসেছে। প্রায়ই বলা হয় গোয়েন্দা কাহিনীর দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখন 'ক্রাইম ফিকশনের' যুগ।

ষাট সত্তর বছর আগে বাংলাদেশে গোয়েন্দা কাহিনীর শৈশব অবস্থা ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তরের নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সে তার সাহিত্যগুণের জন্য নয়, প্রাচীনত্বের জন্য। এক সময় পাঁচকড়ি দে এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বহু গ্রন্থ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। পাঁচকড়ি দে অনেক কাহিনী বিদেশী লেখকদের রচনা থেকে গ্রহণ করেছেন, কিম্বা অনুবাদ করেছেন। এখন তাঁর উপন্যাসের বিজ্ঞাপনও বিরল হয়ে এসেছে। কিছুদিন পূর্বে তাঁর একজন পাঠক সাময়িক পত্রিকায় পাঁচকড়ি দে'র বইয়ের পুনর্মুদ্রণের অনুরোধ করেছিলেন। এক সময় যে-বইয়ের প্রচুর ভক্ত ছিল পরবর্তীকালে তার অনুরাগী পাঠক পাওয়া যায় না। পাঁচকড়িবাবু বিদেশী গোয়েন্দাকে অনেক সময় বাঙালীর বেশে উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। অন্তত একটি গ্রন্থে শার্লক হোমস' বাঙালী পোশাকে অবতীর্ণ

হয়েছেন। কিন্তু যে-লেখক সবচেয়ে বেশি সংখ্যক তরুণ পাঠক আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি দীনেন্দ্রকুমার রায়। তিনিও বিদেশী গ্রন্থ কিম্বা পত্রিকা থেকে আখ্যায়িকা গ্রহণ বা প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। পাঁচকড়িবাবুর সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে তিনি বিদেশীদের দেশী সাজ কিম্বা নাম পরাননি এবং ঘটনাস্থলও অবিকৃত রেখেছেন। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রবার্ট ব্লেক সিরিজের দোষগুণ যাই থাক ছেলেবয়সে লন্ডনের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূগোল শিক্ষার এমন সহজ উপায় আর ছিল না। টেমস নদীর বাঁধ, শহরের দক্ষিণে ফুলহাম পল্লী, ক্রয়ডনের বিমানঘাঁটি, সোহোপাড়া কিম্বা পিকাডেলির সঙ্গে তরুণ বয়সে প্রথম রুদ্ধনিশ্বাস পরিচয় রবার্ট ব্লেকের সৌজন্যে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয়তার ফলে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সাহিত্যকীর্তি 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র্য' তাঁর জীবদ্দশাতেই দেশবাসী বিস্মৃত হয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে পাঠকেরা খুব সহিষ্ণু ছিলেন, সহজে বিচলিত হতেন না। একটি বহু পঠিত উপন্যাসে আছে একজন গোয়েন্দা হাওড়া স্টেশন ছাড়বার এক ঘন্টা পরেই ট্রেন থেকে পর্বতমালা ও ঝরনার শুভ্র রেখা দেখতে পেলেন। অন্য একজন প্রাচীন লেখকের একটি উপন্যাসে আছে একজন গোয়েন্দা "বৃক্ষকোটরে অনুবীক্ষণ লাগাইয়া" দূরবর্তী বাড়িতে ডাকাতদের দুষ্কৃতি দেখতে পেলেন। আজকালকার পাঠকরা হলে মার্জনা করতেন না।

এখনকার বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কয়েকটি অদ্ভুত-রসের এবং রহস্যের গল্প লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে সায়েন্স ফিকশন-এর জন্মদাতা বলতে গেলে তিনিই। তাঁর রহস্যসৃষ্টি করতে অরুচি ছিল না। কিন্তু তিনি গোয়েন্দা কাহিনী লেখেননি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অন্তত একটি, যাকে ক্রাইম স্টোরি বলা হয়, খুব গুছিয়ে লিখেছেন। আর একটি গল্পে একটি রেল স্টেশনের গুদামঘরে একদল বরযাত্রী এবং গোবর্ধন নামে একজন গোয়েন্দা কাহিনীর লেখককে নিয়ে পরিহাস করেছেন; কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনী লিখবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। গোয়েন্দা কাহিনী তখনও অপাংক্তেয়। 'ভারতী'র দল ও 'কল্লোল' গোষ্ঠীর কেউ কেউ ছোটদের জন্য অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনী লিখতেন। সেগুলি খুব জনপ্রিয়ও হয়েছিল। কিন্তু বড়দের কথা তাঁরা ভাবেননি।

রবীন্দ্রনাথ কোনও গল্পে একটি চরিত্রের ডিটেকটিভ বৃত্তির প্রবণতার প্রতি কৌতুক কটাক্ষপাত করেছেন। জানতে ইচ্ছা হয় তিনি ডিটেকটিভ বই কখনও পড়তেন কিনা। কোনান ডয়েলের কোনও কোনও লেখা পড়ে থাকতে পারেন। এডগার এ্যালেন পোর লেখার সঙ্গেও তাঁর নিশ্চয় পরিচয় ছিল। কিন্তু অন্য কিছু? তাঁর চিঠিপত্রেও বোধহয় এর উল্লেখ নেই।

ব্যোমকেশ বক্সীর প্রথমদিকের গল্পগুলি তাঁর বন্ধু অজিতের মুখ থেকে শোনা। সন ১৩৩১ সাল, অর্থাৎ এখন থেকে সাতচল্লিশ বছর আগে ব্যোমকেশের সঙ্গে তার পরিচয়। দু'জনেই হ্যারিসন রোডের একই মেসের বাসিন্দা। পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হতে দেরি হয়নি। অজিতের সাহিত্যচর্চার অভ্যাস বরাবরই ছিল। ব্যোমকেশের কাহিনী প্রথমদিকে আমরা তার কলমের মারফৎ শুনেছি। কিন্তু অজিত ঠিক ডাক্তার ওয়াটসন কিম্বা ক্যাপ্টেন হেস্টিংস নয়। ওয়াটসনের প্রতি শার্লক হোমসের এবং হেস্টিংসের প্রতি পোয়ারোর কিঞ্চিৎ স্নেহমিশ্রিত করুণার ভাব ছিল। ওয়াটসন এবং হেস্টিংস মনে করি শেষ পর্যন্ত কোনান ডয়েল কিম্বা পোয়ারোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। অজিতের সঙ্গেও ব্যোমকেশের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু দুটি কথা বলা দরকার। প্রথমত, কয়েক বছর পরে অজিতকে সরিয়ে

দিয়ে শরদিন্দুবাবু নিজে কথকের আসন গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত অজিতের সাহিত্যচর্চার ফল ব্যোমকেশকে খুশি করতে পারেনি। দ্বিতীয় কথা হচ্চে ব্যোমকেশ বক্সীর জীবনে সহসা একটি মহিলার আবির্ভাব। শার্লক হোমস কোনও মহিলার জন্য উদ্বেলিত-হৃদয় হয়েছেন, কিম্বা পোয়ারোর হৃদয় বিচলিত হয়েছে একথা ভাবা যায় না। কিন্তু সবাই একরকম নন। লর্ড পিটার উইম্‌সিও আছেন। একটি খুনের মামলা তদন্ত করতে গিয়ে একটি কৃশাঙ্গী কালো মেয়ের সঙ্গে ব্যোমকেশের দেখা হয়। মেয়েটির দাদাকে পুলিস একটি মামলায় ভুল করে জড়িয়েছিল। লর্ড পিটার উইম্‌সির সঙ্গে হ্যারিয়েট ডেনের পরিচয়ও একটি খুনের মামলাকে উপলক্ষ্য করে।

বিয়ের পরেও ব্যোমকেশ-সত্যবতী হ্যারিসন রোডের মেসের তিনতলার অংশে কয়েক বছর বসবাস করেছিলেন। সঙ্গে অজিতও। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কলকাতা শহরের চরিত্র বদল গেল। হ্যারিসন রোড অঞ্চল তখন আর সত্যবতীর পছন্দ হবার কথা নয়। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার কয়েক বছর পর ব্যোমকেশ আর অজিত লেকের কাছে কেয়াতলায় এক টুকরো জমি কিনে বাড়ি করেছে। ব্যোমকেশের নামডাক যতই হোক পশার তত সুবিধার হয়নি। তাছাড়া বয়স হচ্চে। অজিত তখন বইয়ের ব্যবসায় মন দিয়েছে। ব্যোমকেশের কাহিনী লিখে তার কি রকম আয় হত জানবার উপায় নেই। শরদিন্দুবাবুর জন্য সে রোজগারের পথও বন্ধ হয়েছে। গল্প বলার ভঙ্গীরও একটু বদল হয়েছে।

১৯৬৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসের শরদিন্দুবাবুর একটি চিঠিতে এই কথার উল্লেখ আছে—"ব্যোমকেশকে এবার একটু নতুন বেশে দেখবেন। আপনাদের হুকুমে কেয়াতলায় ব্যোমকেশের বাড়ি তৈরি হচ্চে, গৃহপ্রবেশও অনতিবিলম্বে হবে। অজিতকে বক্তার আসন থেকে সরিয়ে দিয়েছি এবং চলিত ভাষার প্রবর্তন করেছি।" কিছুদিন পরের আর একটি চিঠিতে আছে—"অজিতকে বক্তার গদি থেকে নামিয়ে দেবার জন্যে কেউ কেউ চটেছেন। তবে ভরসা রাখি নতুন পরিবেশ ক্রমে অভ্যাস হয়ে যাবে।" এ আশঙ্কা অমূলক নয়। অজিতের অপসারণে পাঠকরা যে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন তা মনে হয় না।

গোয়েন্দা কাহিনীর মধ্যে যা সাহিত্যপদবাচ্য তার কোনও কোনও চরিত্র পাঠকদের কাছে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে, তার নজির আছে। সত্যবতী-ব্যোমকেশ নতুন বাড়িতে আসবার পরে তারা কোনও কোনও পাঠকের কাছে কেবল আর গল্পের চরিত্র হয়ে নেই। কেয়াতলা পাড়ার কেউ কেউ তাদের প্রতিবেশী বলে ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন।

কলকাতায় তখন ট্যাক্সির খুব দুর্ভিক্ষ। শরদিন্দুবাবুকে লিখলুম ওদের নিশ্চয় খুব অসুবিধা হচ্চে। আপনি যখন বাড়ি করে দিয়েছেন, এবার সত্যবতীকে একটি গাড়ি কিনে দিন। আমি দেখেছি বিয়ের নিমন্ত্রণে যাবে বলে ওরা দু'জনে গোলপার্কের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার অবহেলা করে চলে যাচ্চে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সত্যবতীর প্রসাধন বাসী হয়ে এসেছে। আর একদিন দেখলুম গড়িয়াহাট থেকে বাজার করে সত্যবতী রিক্সা করে বাড়ি যাচ্চে। গ্রন্থকারের পাষাণ-হৃদয় গলল না। আমাকে লিখলেন—"সত্যবতীর ডিমান্ড ক্রমে বেড়েই যাচ্চে। বাড়ি পেয়েছে তাতেও তৃপ্তি নেই। এখন গাড়ি চাই। বেচারা ব্যোমকেশ কোথা থেকে পায় বলুন দেখি। সত্যবতীকে একটা অটো-রিক্সা কিনে দিলে হয় না ? কথাটা বিবেচনা করে দেখবেন।"

কলকাতা পুণা নয়। এখানে অটো-রিক্সার লাইসেন্স পাওয়া যাবে না। তাছাড়া

কে শুনেছে বিখ্যাত গোয়েন্দা কিম্বা তাঁদের পত্নী রিক্সা চড়ে ঘুরে বেড়ান ? ষাট বছর আগেও গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয় ছ্যাকড়া গাড়ি ছাড়া বের হতেন না। একটা ফর্দও তৈরি করে পাঠিয়েছিলাম বিদেশের নামকরা গোয়েন্দাদের কি ধরনের গাড়ি থাকে। কারুর কারুর এরোপ্লেনও আছে। শরদিন্দুবাবুর হৃদয়ে রেখাপাত হল না। তিনি ফলিত জ্যোতিষের চর্চা করতে ভালবাসতেন। আমাকে লিখলেন—"আমি ব্যোমকেশের হাত দেখেছি। তার বরাতে গাড়ি নেই।"

একটি চিঠিতে শরদিন্দুবাবুকে লিখেছিলাম ব্যোমকেশের আয় ভদ্রমত নয়, ফি বাড়ানো উচিত। তার উত্তরে তিনি লিখেছেন—"'চিড়িয়াখানায়' ব্যোমকেশের ফি আপনার কম মনে হয়েছে ! মনে রাখতে হবে গল্পের ঘটনাকাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ; টাকার মূল্য হ্রাস হয়েছিল বটে, কিন্তু এমন 'হাড়ির হাল' হয়নি। সেই সময়ে একদিনের কাজের জন্য ৫০/৬০ টাকা মন্দ মনে হয় না। এটাও মনে রাখতে হবে যে ব্যোমকেশের অর্থ-ভাগ্য ভাল নয় ; এতদিন পরে অজিতের সহযোগিতায় একটা বাড়ি করেছে বটে, কিন্তু সত্যবতীকে একটা অটো-রিক্সা কিনে দেবার সঙ্গতি তার নেই। সত্যবতীর প্রতি আপনার পক্ষপাত আছে জানি, কিন্তু আমি কি করতে পারি ? ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র।"

বিদেশী ডিটেকটিভদের তুলনায় ব্যোমকেশের আয় নিশ্চয় কিছুই নয়। সত্তর বছর আগে ইয়োরোপের নৃপতিরা গোয়েন্দাদের কাছে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে রাজকোষ প্রায় উন্মোচন করে দিতেন। এখন আর সেরকম হবার উপায় নেই। ইয়োরোপে, বিশেষ করে আমেরিকায় নামী গোয়েন্দাদের টাকার খাঁই কিছু কম নয়। আমাদের দেশে পূর্বকালে দেবেন্দ্রবিজয় কখনও টাকার অভাব বোধ করেছেন বলে মনে হয় না। বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় থাকতেন। তখন গাড়ির রেওয়াজ ছিল না। থাকলেও দেবেন্দ্রবিজয়ের অসুবিধা হত না। শরদিন্দুবাবু বলেছেন ব্যোমকেশের সঙ্গতির অভাব। এই চিঠি ১৯৬৭ সালে লেখা। তারপরে কলকাতায় লোকের ভিড় আরও বেড়েছে। গাড়ির দামও অনেক বেড়েছে। ব্যোমকেশেরও গাড়ি কেনার টাকা হয়নি। ইতিমধ্যে সত্যবতী ও ব্যোমকেশের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, শরদিন্দুবাবুর ভ্রূকুটি সত্ত্বেও। তিনি বলতেন, আমি গাড়ির লোভ দেখিয়ে সত্যবতীর মনের শান্তি নষ্ট করে দিচ্চি এবং ব্যোমকেশের সুখের সংসারে অশান্তি হচ্চে।

কিন্তু শরদিন্দুবাবুর হৃদয় গলতে আরম্ভ করেছিল। আমি জানিয়েছিলাম গাড়ির অভাবে সত্যবতী-ব্যোমকেশ ভাল করে গড়িয়াহাটে বাজার করতে পারছে না, বৌভাতের নিমন্ত্রণে ঠিক সময়ে যেতে পারে না। আমার চিঠিতে সত্যবতীর প্রসাধনের একটু দীর্ঘ বর্ণনা ছিল। শরদিন্দুবাবু এত উৎসাহ পছন্দ করেননি, কিন্তু গাড়ির ব্যাপারে রাজী হয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে ২১শে ডিসেম্বর আমাকে লিখলেন—"অবশ্য আপনি যখন অকলঙ্কচরিত্র মানুষ তখন বিপদের আশঙ্কা বেশি নেই। তবু সাবধানে থাকা ভাল। ব্যোমকেশ যদিও বুড়ো হয়েছে, তবু এখনও সত্যবতীকে ভীষণ ভালবাসে, 'ওসমান'-এর আবির্ভাব সহ্য করবে না।

"আপনি সত্যবতীর মানসিক অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে পাষাণও বিগলিত হয়। আপনি তাকে মোটরকারের লোভ দেখিয়ে তার মানসিক যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। ...একটা মতলব ঠাউরেছি, কিন্তু সেকথা এখন থাক।" কি মতলব পরের কয়েকটি পংক্তি থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে। "...অজিত মোটর ড্রাইভিং শিখছে। পুস্তক ব্যবসায়ের যে-রকম দুরবস্থা চলেছে ট্যাক্সি চালানো ছাড়া ভদ্রসন্তানদের আর কোনও পেশা নেই। বুঝ লোক যে জান সন্ধান।"

বুঝতে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়। মাসখানেক পরে ১৯৬৯ সালে ২৫শে জানুয়ারি আমাকে আবার লিখছেন—"একটা গোপন খবর দিচ্ছি—ওদের বইয়ের দোকান ভাল চলছে না। অজিত লুকিয়ে লুকিয়ে মোটর চালানো শিখছে। সন্দেহ হয় যে সে এবার ট্যাক্সি চালাবে। ভদ্রলোকের ছেলের কি দুরবস্থা বলুন তো। ব্যোমকেশ বোধহয় জানে না। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। হয়তো এই ফাঁকে সত্যবতীর মোটর লাভ হয়ে যাবে।" শরদিন্দুবাবু কিছুদিন পরে মতলবটি পরিত্যাগ করেছিলেন। অজিত ড্রাইভার, সত্যবতী আরোহিণী—এই চিত্র তাঁর মনে বেশি দিন স্থান পায়নি।

ইতিমধ্যে শরদিন্দুবাবুর জন্মদিনের সময় এসে গেল। এই সময় একটি ঘটনা হয়েছিল শরদিন্দুবাবু জানতেন না। সেটি আমার চিঠি থেকে তুলে দিচ্ছি—"দশটার সময় বিশ্ববিদ্যালয় যাবার মুখে যাদবপুর ডাকঘরে গিয়েছি। বক্সী দম্পতির সঙ্গে দেখা। আপনাকে জন্মদিনের টেলিগ্রাম পাঠাতে এসেছে। খসড়াটা আমাকে দেখালেন। আমি তো দেখে স্তম্ভিত। খসড়াটি এই রকম—Byomkesh and Satyabati Send Greetings to Ungrateful Father। বললাম, ছি ছি, এ সব কি কাণ্ড। এ কথা কি কেউ লেখে? কোনান ডয়েলকে কেউ কেউ Ungrateful father বলেছেন। শরদিন্দুবাবু কি সেই রকম? কোনান ডয়েল তো শার্লক হোমসকে মেরেই ফেলেছিলেন। আর শরদিন্দুবাবু তোমাদের বহাল তবিয়তে রেখেছেন। কেয়াতলায় বাড়ি পর্যন্ত করে দিয়েছেন। এই কথা শুনে ব্যোমকেশের মনে কি হল জানি না। কিন্তু সত্যবতীর বড় বড় চোখে জল এলো। মনে হল কাকচক্ষু দীঘি জল, দীঘি ছাপিয়ে পড়ছে। বোধহয় একটু চেঁচিয়ে কথা হচ্ছিল। যাদবপুরের রাস্তায় আপিসের ভিড়। তাছাড়া সুন্দরীর চোখে জল দেখে ভিড় জমে গেল। ব্যোমকেশ এক পা দু পা করে স্ত্রীর হাত ধরে ডাকঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। সে টেলিগ্রাম আপনি পাননি। ওরা বুদ্ধি করে খসড়া বদল করে দিয়েছিল।

"ভাবছি এইবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ি, ঝামেলায় আর কাজ নেই। এমন সময় পেছন থেকে মোটা গলায় কে একজন বললেন, "কি ব্যাপার, মহিলাটি কাঁদছিলেন কেন?" তাকিয়ে দেখি এ রকম চেহারা কখনও দেখিনি। ভদ্রলোকের গায়ে প্লেট দেওয়া শার্ট, শার্টের হাতে শক্ত 'কফ্', তার উপরে চায়না সিল্কের বুক খোলা কোট। কালোপাড় শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি। পায়ে সিল্কের মোজা ও ডার্বি জুতো। এ রকম চেহারা ষাট বছর আগে দেখা যেত। ভদ্রলোক বললেন, "আমাকে চেনেন?" আমার কি রকম চেনাচেনা মনে হতে লাগল। কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে করতে পারলাম না। কি রকম জানেন, খানিকটা সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড, খানিকটা শেখ ফসিউল্লা কৃত গোলাপ নির্যাসের মোড়কে যেমন ছবি থাকত সেই রকম। ভদ্রলোক বললেন, "আমি কে জানেন? আমি বিখ্যাত ডিটেকটিভ দেবেন্দ্রবিজয়বাবু।" তৎক্ষণাৎ সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ছেলেবেলায় পড়া 'হরতনের নওলা', 'মায়াবিনী', 'নীলবসনা সুন্দরী' আর সেই পরিচিত ছবি—দেবেন্দ্রবিজয় সিল্কের কোট, কফ্ দেওয়া সার্ট, শান্তিপুরী ধুতি আর ডার্বি জুতো পরে জলে ভাসছেন। গাছের শিকড় ধরে তীরে উঠবার চেষ্টা করছেন আর সুন্দরী পাপিষ্ঠা জুমেলিয়া ছুরি দিয়ে শিকড় কেটে দিচ্ছে। দেবেন্দ্রবিজয়বাবু অসহায়। আর কিছুক্ষণ জলে থাকলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।

"বললাম, "কিছু মনে করবেন না স্যার, অনেকদিন আগের পরিচয় কিনা চিনতে দেরি হচ্ছিল।" ভদ্রলোক একটু খুশি হলেন মনে হল, কিন্তু সত্যান্বেষীরা কর্তব্য ভোলে না। আমাকে বললেন, "মহিলাটি কাঁদছিলেন কেন বললেন না তো।"

বলে ফেললাম, "আর কিছু নয়, শরদিন্দুবাবু মহিলাটিকে গাড়ি কিনে দেবেন বলে গাড়ি কিনে দেননি। তাই উনি কাঁদছিলেন। কথার খেলাপ করেছেন কিনা।" দেবেন্দ্রবিজয়বাবু দাড়িতে হাত দিয়ে বললেন, "শরদিন্দুবাবু মেয়েছেলেটিকে গাড়ি দেবেন কেন?" বললাম, "ঠিক ওঁকে না স্যার, ওঁর স্বামীকে। তিনি ডিটেকটিভ কিনা—বিখ্যাত ব্যক্তি—ব্যোমকেশ বক্সী।" দেবেন্দ্রবিজয়বাবু বললেন, "নাম শুনিনি।" আপনি শুনলে হয়তো ব্যথা পাবেন। কিন্তু সত্য গোপন করা উচিত নয়। দেবেন্দ্রবাবু বললেন, "ডিটেকটিভের আবার মোটর গাড়ির দরকার কি? এই যে আমি এত চোরডাকাত ধরেছি, আমার গাড়ি ছিল? তবে হ্যাঁ, পাঁচকড়িবাবুর দয়ার শরীর, থার্ড ক্লাশ ছ্যাকড়া গাড়ি হলেও চড়তে দিয়েছেন। আমি সেই গাড়িতে চড়ে বেহালা, বরানগর, কলকাতার দক্ষিণে হাজরা রোডে ঠ্যাঙ্গাড়েদের ধরেছি। আমার গাড়ি ছিল?"...এই সব কথা শুনে হকচকিয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখি দেবেন্দ্রবিজয়বাবু আর সেখানে নেই। কি করে তিনি অন্তর্ধান করলেন ভাবতে ভাবতে ক্লাশের ঘণ্টা পড়ে গেল।

"সেই রাত্রে ভীষণ বিভীষিকার স্বপ্ন দেখলাম। আমি যেন পুণায় বেড়াতে গিয়েছি। সন্ধ্যাবেলায় লাকড়ি ব্রিজের কাছে পা ফস্‌কে জলে পড়ে গেলাম। জোরে হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম। কিন্তু জলে একটুও শব্দ হল না। একটা ঢেউ উঠল না, একটা বুদ্বুদও নয়। মনে হল একটা বড় কাচের টুকরোর মতন জল আমাকে চারদিক থেকে চেপে রেখেছে। যখন একেবারে ডুবে যাচ্ছি, তখন কয়েকটা শিকড়ের সঙ্গে হাত আটকে গেল। কোনও রকমে সেটা ধরে উঠবার চেষ্টা করছি, এমন সময় উপরের দিকে তাকিয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। পরনে কালো শাড়ি পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার মুখ ভাল করে দেখতে পেলাম না। মনে হল ছেলেবেলায় জুমেলিয়ার যে ছবি দেখেছিলাম তার সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে। আমি যতবার শিকড় ধরে উঠবার চেষ্টা করছি মেয়েটি ছুরি বার করে শিকড় কেটে দিচ্ছে। আমি হঠাৎ চীৎকার করে উঠলাম। ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু তার আগে তার মুখের কাপড় সরে গিয়েছিল। এক সেকেন্ডের জন্য দেখতে পেলাম সে মুখ জুমেলিয়ার নয়, সে মুখ সত্যবতীর।"

এই চিঠি পেয়ে শরদিন্দুবাবু আমাকে লিখলেন—"ব্যোমকেশ আমাকে Ungrateful father বলে 'তার' করতে যাচ্ছিল জেনে ভীষণ রাগ হয়েছিল। ভেবেছিলাম ওকে ত্যাজ্যপুত্র করব, নেহাৎ সত্যবতীর কথা ভেবে নিরস্ত হয়েছি। মেয়েটা বড় ভাল। ভাগ্যদোষে অপাত্রে পড়েছে। ওর কান্না আমিও দেখেছি। কাঁদলে ওকে বড় সুন্দর দেখায়। অজিতের কথা ধরি না। ওটা গোল্লায় গেছে; বুড়ো বয়সে ট্যাক্সি চালাবে বলে মোটর ড্রাইভিং শিখছে। কিন্তু আমিও শপথ করেছি ওকে ট্যাক্সি চালাতে দেব না। বই-এর ব্যবসা ছেড়ে ট্যাক্সি চালাবে। ইয়ার্কি পেয়েছে।" দেবেন্দ্রবিজয় বসু সম্বন্ধে এই চিঠিতেই লিখছেন—"আপনি স্বনামধন্য দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। আপনি ধন্য। আমার ধারণা ছিল তিনি বহুকাল দেহরক্ষা করেছেন। বোধহয় কায়কল্প করে বেঁচে আছেন। কিন্তু তাঁর অসামান্য প্রতিভা যে এতটুকু ম্লান হয়নি তা তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায়। ব্যোমকেশের নাম শোনেননি তিনি এ আর বিচিত্র কি। ঈগল পাখি কি টুনটুনি পাখির নাম জানে! আর গাড়ি কেনা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা তাঁর মতন জ্ঞানগরিষ্ঠ লোকেরই উপযুক্ত। নেহাৎ কথা দিয়ে ফেলেছি, নইলে আমি হাত গুটোতাম।"

বোঝা গেল অজিতের ট্যাক্সির ব্যবসা হবে না। বিনা পয়সায় ট্যাক্সি চড়া

সত্যবতীর কপালে নেই। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই দেখছি সত্যবতীর গাড়ি সম্বন্ধে শরদিন্দুবাবুর মত বদলে গিয়েছে। প্রথম অটো-রিক্সায় রাজী হয়েছিলেন, অটো-রিক্সা থেকে অজিতের ট্যাক্সি। পরে আবার একটি সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি দেবার কথাও তাঁর মনে হয়েছিল। ১৯৭০ সালের প্রথমে একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছি—"কি গাড়ি সত্যবতীকে দিচ্ছেন ? সেকেন্ডহ্যান্ড দেবেন না। এখন নতুন গাড়িরই যা অবস্থা। এমন গাড়ি দেবেন যাতে সত্যবতীর মন প্রসন্ন হয় এবং স্বনামধন্য পাঁচকড়িবাবুও খুঁত ধরতে না পারেন। সেবার তিনি আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।" শরদিন্দুবাবু তার উত্তরে আমাকে বলেছিলেন সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়িই দেব, কিন্তু এমনভাবে দেব সত্যবতী ঠিক বুঝতে পারবে না। এইভাবে এই সংগ্রহের শেষ গল্প বিশুপাল বধের সূচনা হয়েছিল।

১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে শরদিন্দুবাবু কলকাতায় এসে মাসখানেক ছিলেন। পুণায় ফিরে গিয়ে তিনি বিশুপাল বধ শুরু করেছিলেন। গল্পটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। পড়লে মনে হয় প্রায় অর্ধেক লেখা বাকি আছে। উত্তর কলকাতার একটি থিয়েটারের স্টেজে একজন অভিনেতার খুনের রহস্যভেদ করবার চেষ্টা কেবল আরম্ভ হয়েছে। এই গল্পে আমার নামের সঙ্গে মিল, শরদিন্দুবাবু হয়তো বলতেন স্বভাবের সঙ্গেও মিল, একটি চরিত্র আছে। সে ব্যোমকেশকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাচ্চে এবং প্রসন্নচিত্তে গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে সত্যবতীর বাজারের ব্যাগ নিজের হাতে বয়ে নিয়ে আসছে। গল্পটির পাণ্ডুলিপি লেখকের জীবদ্দশায় দেখিনি। তবে তাঁর মুখে শুনেছিলাম তিনি আমার নাম ব্যবহার করেছেন। আমার ক্ষীণ আপত্তি টেকেনি। এই গল্পের ঘটনা বা দুর্ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফল সত্যবতীর মোটর গাড়ি প্রাপ্তি সে সম্বন্ধেও আভাস পাওয়া গিয়েছিল। শরদিন্দুবাবু আমাকে শাসিয়ে রেখেছিলেন গল্পটিতে প্রতুলবাবু নামের ব্যক্তিটিকে পুলিসের জেরায় নাজেহাল হতে হবে। কিন্তু গল্পটি ততদূর এগোয়নি। থিয়েটারের প্রম্পটার কালীকিঙ্কর দাসের জবানবন্দী আরম্ভ হয়েছে মাত্র। থিয়েটারের লোকের জবানবন্দী শেষ হলে অন্য সবার পালা আসত। বঙ্কিমচন্দ্র একটি অসমাপ্ত ভূতের গল্প রেখে গিয়েছিলেন। তার নাম নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী। গল্পটির সূত্রপাত কেবল আরম্ভ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক পরে কোনও মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সেটিকে অন্য একজনকে দিয়ে সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। শরদিন্দুবাবুর প্রকাশক সে চেষ্টা করেননি। বোধহয় ভালই করেছেন।

একটি বিষয় হয়তো লক্ষ্য করবার আছে। তাঁর পরিচিতরা জানতেন শরদিন্দুবাবুর ফলিত জ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি বারে বারে বলেছেন ব্যোমকেশের কোষ্ঠী দেখেছি, ওর গাড়ি কেনবার সম্ভাবনা নেই। আমাদের উপরোধে অবশেষে গাড়ি দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু গল্পটি শেষ হয়নি। সত্যবতীর বরাতেও শেষ পর্যন্ত গাড়ি হল না। ফলিত জ্যোতিষে তাঁর গণনা কি রকম অভ্রান্ত হয়, শরদিন্দুবাবু বোধহয় তার প্রমাণ দিয়ে গেলেন।

৩রা আশ্বিন, ১৩৭৮ **প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত**

সূচি

ব্যোমকেশ সমগ্র

সত্যান্বেষী

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সন তেরশ' একত্রিশ সালে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি শেষ করিয়া সবেমাত্র বাহির হইয়াছি। পয়সার বিশেষ টানাটানি ছিল না, পিতৃদেব ব্যাঙ্কে যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সুদে আমার একক জীবনের খরচা কলিকাতার মেসে থাকিয়া বেশ ভদ্রভাবেই চলিয়া যাইত। তাই স্থির করিয়াছিলাম, কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সাহিত্যচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিব। প্রথম যৌবনের উদ্দীপনায় মনে হইয়াছিল, একান্তভাবে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে অচিরাৎ যুগান্তর আনিয়া ফেলিব। এই সময়টাতে বাঙালীর সন্তান অনেক ভাল স্বপ্ন দেখে,—যদিও সে-স্বপ্ন ভাঙিতেও বেশি বিলম্ব হয় না।

কিন্তু ও কথা যাক। ব্যোমকেশের সহিত কি করিয়া পরিচয় হইল এখন তাহাই বলি।

যাঁহারা কলিকাতা শহরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে হয়তো জানেন না যে এই শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি পল্লী আছে, যাহার এক দিকে দুঃস্থ ভাটিয়া-মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বাস, অন্য দিকে খোলার বস্তি এবং তৃতীয় দিকে তির্যক্‌চক্ষু পীতবর্ণ চীনাদের উপনিবেশ। এই ত্রিবেণী সঙ্গমের মধ্যস্থলে যে 'ব'-দ্বীপটি সৃষ্টি হইয়াছে, দিনের কর্ম-কোলাহলে তাহাকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না যে ইহার কোনও অসাধারণত্ব বা অস্বাভাবিক বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু সন্ধ্যার পরেই এই পল্লীতে এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করে। আটটা বাজিতে না বাজিতেই দোকানপাট সমস্ত বন্ধ হইয়া পাড়াটা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়; কেবল দূরে দূরে দু'একটা পান বিড়ির দোকান খোলা থাকে মাত্র। সে সময় যাহারা এ অঞ্চলে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করে, তাহারা অধিকাংশই নিঃশব্দে ছায়ামূর্তির মত সঞ্চরণ করে এবং যদি কোনও অজ্ঞ পথিক অতর্কিতে এ পথে আসিয়া পড়ে, সে-ও দ্রুতপদে যেন সন্ত্রস্তভাবে ইহার এলাকা অতিক্রম করিয়া যায়।

আমি কি করিয়া এই পাড়াতে আসিয়া এক মেসের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বিশদ করিয়া লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দিনের বেলা পাড়াটা দেখিয়া মনে কোনও প্রকার সন্দেহ হয় নাই এবং মেসের দ্বিতলে একটি বেশ বড় হাওয়াদার ঘর খুব সস্তায় পাইয়া বাক্যব্যয় না করিয়া তাহা অধিকার করিয়াছিলাম। পরে যখন জানিতে পারিলাম যে, এই পাড়ায় মাসের মধ্যে দুই তিনটি মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় এবং নানা কারণে সপ্তাহে অন্তত একবার করিয়া পুলিস-রেড্‌ হইয়া থাকে, তখন কিন্তু বাসাটার উপর এমন মমতা জন্মিয়া গিয়াছে যে, আবার তল্পিতল্পা তুলিয়া নূতন বাসায় উঠিয়া যাইবার প্রবৃত্তি নাই। বিশেষত সন্ধ্যার পর আমি নিজের লেখাপড়ার কাজেই নিমগ্ন হইয়া থাকিতাম, বাড়ির বাহির হইবার কোনও উপলক্ষ ছিল না; তাই ব্যক্তিগতভাবে বিপদে পড়িবার আশঙ্কা কখনও হয় নাই।

আমাদের বাসার উপরতলায় সর্বসুদ্ধ পাঁচটি ঘর ছিল, প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহারা সকলেই চাকরিজীবী এবং বয়স্থ; শনিবারে শনিবারে বাড়ি যাইতেন, আবার

সোমবারে ফিরিয়া অফিস যাতায়াত আরম্ভ করিতেন। ইহারা অনেকদিন হইতে এই মেসে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি একজন কাজ হইতে অবসর লইয়া বাড়ি চলিয়া যাওয়াতে তাঁহারই শূন্য ঘরটা আমি দখল করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর তাসের বা পাশার আড্ডা বসিত—সেই সময় মেসের অধিবাসীদের কণ্ঠস্বর ও উত্তেজনা কিছু উগ্রভাব ধারণ করিত। অশ্বিনীবাবু পাকা খেলোয়াড় ছিলেন—তাঁহার স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ঘনশ্যামবাবু। ঘনশ্যামবাবু হারিয়া গেলে চেঁচামেচি করিতেন। তারপর ঠিক নয়টার সময় বামুন ঠাকুর আসিয়া জানাইত যে আহার প্রস্তুত ; তখন আবার ইঁহারা শান্তভাবে উঠিয়া আহার সমাধা করিয়া যে যাঁহার ঘরে শুইয়া পড়িতেন। এইরূপ নিরুদ্‌ঘাত শান্তিতে মেসের বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কাটিতেছিল ; আমিও আসিয়া নির্বিবাদে এই প্রশান্ত জীবনযাত্রা বরণ করিয়া লইয়াছিলাম।

বাসার নীচের তলার ঘরগুলি লইয়া বাড়িওয়ালা নিজে থাকিতেন। ইনি একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার—নাম অনুকূলবাবু। বেশ সরল সদালাপী লোক। বোধ হয় বিবাহ করেন নাই, কারণ, বাড়িতে স্ত্রী পরিবার কেহ ছিল না। তিনি মেসের খাওয়া-দাওয়া ও ভাড়াটেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতেন। এমন পরিপাটীভাবে তিনি সমস্ত কাজ করিতেন যে, কোনও দিক্ দিয়া কাহারও অনুযোগ করিবার অবকাশ থাকিত না, মাসের গোড়ায় বাড়িভাড়া ও খোরাকি বাবদ পঁচিশ্ টাকা তাঁহার হাতে ফেলিয়া দিয়া সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

পাড়ার দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাক্তারের বেশ পসার ছিল। সকালে ও বিকালে তাঁহার বসিবার ঘরে রোগীর ভিড় লাগিয়া থাকিত। তিনি ঘরে বসিয়া সামান্য মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। রোগীর বাড়িতে বড় একটা যাইতেন না, গেলেও ভিজিট লইতেন না। এই জন্য পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত খাতির ও শ্রদ্ধা করিত। আমিও অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার ভারি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বেলা দশটার মধ্যে মেসের অন্যান্য সকলে অফিসে চলিয়া যাইত, বাসায় আমরা দুইজনে পড়িয়া থাকিতাম। স্নানাহার প্রায় একসঙ্গেই হইত, তারপর দুপুরবেলাটাও গল্পে-গুজবে সংবাদপত্রের আলোচনায় কাটিয়া যাইত, ডাক্তার অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ লোক হইলেও ভারি চমৎকার কথা বলিতে পারিতেন। বয়স বছর চল্লিশের ভিতরেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উপাধিও তাঁহার ছিল না, কিন্তু ঘরে বসিয়া এত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান তিনি অর্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে বিস্ময় বোধ হইত। বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি লজ্জিত হইয়া বলিতেন—"আর তো কোনও কাজ নেই, ঘরে বসে বসে কেবল বই পড়ি। আমার যা কিছু সংগ্রহ সব বই থেকে।"

এই বাসায় মাস দুই কাটিয়া যাইবার পর একদিন বেলা আন্দাজ দশটার সময় আমি ডাক্তারবাবুর ঘরে বসিয়া তাঁহার খবরের কাগজখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিলাম। অশ্বিনীবাবু পান চিবাইতে চিবাইতে অফিস চলিয়া গেলেন ; তারপর ঘনশ্যামবাবু বাহির হইলেন, দাঁতের ব্যথার জন্য এক পুরিয়া ঔষধ ডাক্তারবাবুর নিকট হইতে লইয়া তিনিও অফিস যাত্রা করিলেন। বাকী দুইজনও একে একে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সারা দিনের জন্য বাসা খালি হইয়া গেল।

ডাক্তারবাবুর কাছে তখনও দু'একজন রোগী ছিল, তাহারা ঔষধ লইয়া একে একে বিদায় হইলে পর তিনি চশমাটা কপালে তুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাগজে কিছু খবর আছে না কি ?"

"কাল বৈকালে আমাদের পাড়ায় খানাতল্লাসী হয়ে গেছে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—"সে তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোথায় হল ?"

"কাছেই—ছত্রিশ নম্বরে। শেখ আবদুল গফুর বলে একটা লোকের বাড়িতে।"

ডাক্তার বলিলেন—"আরে, লোকটাকে যে আমি চিনি, প্রায়ই আমার কাছে ওষুধ নিতে আসে।—কি জন্যে খানাতল্লাসী হয়েছে, কিছু লিখেছে ?"

"কোকেন। এই পড়ুন না!" বলিয়া আমি 'দৈনিক কালকেতু' তাঁহার দিকে আগাইয়া

দিলাম।

ডাক্তার চশমা-জোড়া পুনশ্চ নাসিকার উপর নামাইয়া পড়িতে লাগিলেন,—

"গতকল্য—অঞ্চলে ছত্রিশ নং—স্ট্রীটে শেখ আবদুল গফুর নামে জনৈক চর্ম-ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুলিসের খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনও বে-আইনী মাল পাওয়া যায় নাই। পুলিসের অনুমান, এই অঞ্চলে কোথাও একটি কোকেনের গুপ্ত আড়ত আছে, সেখান হইতে সর্বত্র কোকেন সরবরাহ হয়। এক দল চতুর অপরাধী পুলিসের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বহুদিন যাবৎ এই আইন-বিগর্হিত ব্যবসা চালাইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই অপরাধীদের নেতা কে এবং ইহাদের গুপ্ত ভাণ্ডার কোথায়, তাহা বহু অনুসন্ধানেও নির্ণয় করা যাইতেছে না।"

ডাক্তার একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—"কথাটা ঠিক। আমারও সন্দেহ হয় কাছে-পিঠে কোথাও কোকেনের একটা মস্ত আড্ডা আছে। দু'একবার তার ইশারা আমি পেয়েছি,—জানেন তো নানা রকম লোক ওযুধ নিতে আমার কাছে আসে। আর যাই করুক, যে কোকেনখোর, সে ডাক্তারের কাছে কখনও আত্মগোপন করতে পারে না।—কিন্তু ঐ আবদুল গফুর লোকটাকে তো আমার কোকেনখোর বলে মনে হয় না। বরং সে যে পাকা আফিংখোর এ কথা জোর করে বলতে পারি। সে নিজেও সে কথা গোপন করে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা, অনুকূলবাবু, এ পাড়ায় যে এত খুন হয়, তার কারণ কি ?"

ডাক্তার বলিলেন —"তার তো খুব সহজ কারণ রয়েছে। যারা গোপনে আইন ভঙ্গ করে একটা বিরাট ব্যবসা চালাচ্ছে, তাদের সর্বদাই ভয়—পাছে ধরা পড়ে। সুতরাং দৈবক্রমে যদি কেউ তাদের গুপ্তকথা জানতে পেরে যায়, তখন তাকে খুন করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। ভেবে দেখুন, আমি যদি কোকেনের ব্যবসা করি আর আপনি যদি দৈবাৎ সে কথা জানতে পেরে যান, তাহলে আপনাকে বাঁচতে দেওয়া আমার পক্ষে আর নিরাপদ হবে কি ? আপনি যদি কথাটি পুলিসের কাছে ফাঁস করে দেন, তাহলে আমি তো জেলে যাবই, সঙ্গে সঙ্গে এতবড় একটা ব্যবসা ভেস্তে যাবে। লক্ষ লক্ষ টাকার মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আমি তা হতে দিতে পারি ?" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—"আপনি অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব বেশ অনুশীলন করেছেন দেখছি !"

"হ্যাঁ। ওদিকে আমার খুব ঝোঁক আছে !" বলিয়া আড়মোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমিও উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময় একটি লোক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বয়স বোধ করি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে, শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা,—মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে। কিন্তু বোধ হয়, সম্প্রতি কোনও কষ্টে পড়িয়াছে ; কারণ, বেশভূষার কোনও যত্ন নাই, চুলগুলি অবিন্যস্ত, গায়ের কামিজটা ময়লা, এমন কি পায়ের জুতাজোড়াও কালির অভাবে রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছে। মুখে একটা উৎকণ্ঠিত আগ্রহের ভাব। আমার দিক হইতে অনুকূলবাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"শুনলুম এটা একটা মেস—জায়গা খালি আছে কি ?"

ঈষৎ বিস্ময়ে আমরা দু'জনেই তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, অনুকূলবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না। মশায়ের কি করা হয় ?"

লোকটি ক্লান্তভাবে রোগীর বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—"উপস্থিত চাকরির জন্য দরখাস্ত দেওয়া হয় আর মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা খোঁজা হয়। কিন্তু এই হতভাগা শহরে একটা মেসও কি খালি পাবার যো নেই—সব কানায় কানায় ভর্তি হয়ে আছে।"

সহানুভূতির স্বরে অনুকূলবাবু বলিলেন—"সীজ্‌নের মাঝখানে মেসে-বাসায় জায়গা পাওয়া বড় মুশকিল। মশায়ের নামটি কি ?"

"অতুলচন্দ্র মিত্র। কলকাতায় এসে পর্যন্ত চাকরির সন্ধানে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেশে ঘটি-বাটি বিক্রি করে যে-ক'টা টাকা এনেছিলুম, তাও প্রায় শেষ হয়ে এল—গুটি

পঁচিশ-ত্রিশ বাকী আছে। কিন্তু দু'বেলা হোটেলে খেলে সেও আর কদ্দিন বলুন ? তাই একটি ভদ্রলোকের মেস খুঁজছি—বেশি দিন নয়, মাসখানেকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে—এই ক'টা দিনের জন্যে দু'বেলা দুটো শাকভাত আর একটু জায়গা পেলেই আর আমার কিছু দরকার নেই।"

অনুকূলবাবু বলিলেন—"বড় দুঃখিত হলাম অতুলবাবু, কিন্তু আমার এখানে সব ঘরই ভর্তি।"

অতুল একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তবে আর উপায় কি বলুন—আবার বেরুই। দেখি যদি ওড়িয়াদের আড্ডায় একটু জায়গা পাই।—আর তো কিছু নয়, ভয় হয়, রাত্তিরে ঘুমুলে হয়তো টাকাগুলো চুরি করে নেবে।—এক গেলাস জল খাওয়াতে পারেন ?"

ডাক্তার জল আনিতে গেলেন। লোকটির অসহায় অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় দয়া হইল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম—"আমার ঘরটা বেশ বড় আছে—দু'জনে থাকলে অসুবিধা হবে না। তা—আপনার যদি আপত্তি না থাকে—"

অতুল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"আপত্তি ? বলেন কি মশায়—স্বর্গ হাতে পাব।" তাড়াতাড়ি ট্যাঁক হইতে কতকগুলো নোট ও টাকা বাহির করিয়া বলিল—"কত দিতে হবে ? টাকাটা আগাম নিয়ে নিলে ভাল হত না ? আমার কাছে আবার—"

তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম—"থাক্, টাকা পরে দেবেন অখন—তাড়াতাড়ি কিছু নেই—" ডাক্তারবাবু জল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে বলিলাম—"ইনি সঙ্কটে পড়েছেন তাই আপাতত আমার ঘরেই থাকুন—আমার কোনও কষ্ট হবে না।"

অতুল কৃতজ্ঞতাগদ্গদ স্বরে বলিল —"আমার ওপর ভারি দয়া করেছেন ইনি ! কিন্তু বেশি দিন আমি কষ্ট দেব না—ইতিমধ্যে যদি অন্য কোথাও জায়গা পেয়ে যাই, তাহলে সেখানেই উঠে যাব।" বলিয়া জলপানান্তে গেলাসটা নামাইয়া রাখিল।

ডাক্তার একটু বিস্মিতভাবে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আপনার ঘরে ? তা—বেশ। আপনার যখন অমত নেই, তখন আমি কি বলব ? আপনার সুবিধাও হবে—ঘরভাড়াটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"সে জন্যে নয়—উনি বিপদে পড়েছেন—"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—"সে তো বটেই। —তা আপনি আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আসুন গে, অতুলবাবু। এইখানেই আপাতত থাকুন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। জিনিসপত্র সামান্যই—একটা বিছানা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ। এক হোটেলের দারোয়ানের কাছে রেখে এসেছি—এখনই নিয়ে আসছি।"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ—স্নানাহার এখানেই করবেন।"

"তাহলে তো ভালই হয়।"—কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া অতুল বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে আমরা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম। অনুকূলবাবু অন্যমনস্কভাবে কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ভাবছেন ডাক্তারবাবু ?"

ডাক্তার চমক ভাঙিয়া বলিলেন—"কিছু না। বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, আপনি ভালই করেছেন। তবে কি জানেন—'অজ্ঞাতকুলশীলস্য'—শাস্ত্রের একটা বচন আছে—। যাক্, আশা করি, কোনও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে না।" বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

অতুল মিত্র আমার ঘরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। অনুকূলবাবুর কাছে একটা বাড়তি তক্তপোশ ছিল, তিনি সেখানা অতুলের ব্যবহারের জন্য উপরে পাঠাইয়া দিলেন।

অতুল দিনের বেলায় বড় একটা বাসায় থাকিত না। সকালে উঠিয়া চাকরির সন্ধানে বাহির হইয়া যাইত, বেলা দশটা এগারোটার সময় ফিরিত : আবার স্নানাহারের পর বাহির হইত। কিন্তু যতটুকু সময় সে বাসায় থাকিত, তাহারই মধ্যে বাসার সকলের সঙ্গে বেশ সম্প্রীতি জমাইয়া

তুলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর খেলার মজলিসে তাহার ডাক পড়িত। কিন্তু সে তাস-পাশা খেলিতে জানিত না, তাই কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গিয়া ডাক্তারের সহিত গল্প-গুজব করিত। আমার সঙ্গেও তাহার বেশ ভাব হইয়া গিয়াছিল। দু'জনের একই বয়স, তার উপর একই ঘরে ওঠা-বসা ; সুতরাং আমাদের সম্বোধন 'আপনি' হইতে 'তুমি'তে নামিতে বেশি বিলম্ব হয় নাই।

অতুল আসিবার পর হপ্তাখানেক বেশ নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। তারপর মেসে নানা রকম বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার পর অতুল ও আমি অনুকূলবাবুর ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। রোগীর ভিড় কমিয়া গিয়াছিল ; দু'একজন মাঝে মাঝে আসিয়া রোগের বিবরণ বলিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছিল, অনুকূলবাবু আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঔষধ দিতেছিলেন ও হাত-বাক্সে পয়সা তুলিয়া রাখিতেছিলেন। গতরাত্রিতে প্রায় আমাদের বাসার সম্মুখে একটা খুন হইয়া গিয়াছিল, আজ সকালে রাস্তার উপর লাস আবিষ্কৃত হইয়া একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা সেই বিষয়েই আলোচনা করিতেছিলাম। বিশেষ উত্তেজনার কারণ এই যে, লাস দেখিয়া লোকটাকে দরিদ্র শ্রেণীর ভাটিয়া বলিয়া মনে হইলেও তাহার কোমরের গেঁজের ভিতর হইতে একশ' টাকার দশকেতা নোট পাওয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বলিতেছিলেন—"এ কোকেন ছাড়া আর কিছু নয়। ভেবে দেখুন, টাকার লোভে যদি খুন করত, তাহলে ওর কোমরে হাজার টাকার নোট পাওয়া যেতো না—আমার মনে হয়, লোকটা কোকেনের খরিদ্দার ছিল ; কোকেন কিনতে এসে কোকেন-ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে কোনও মারাত্মক গুপ্তকথা জানতে পারে। হয়তো তাদের পুলিসের ভয় দেখায়, blackmail করবার চেষ্টা করে। তার পরেই ব্যস,—খতম্।"

অতুল বলিল—"কে জানে মশায়, আমার তো ভারি ভয় করছে। আপনারা এ পাড়ায় আছেন কি করে ? আমি যদি আগে জানতুম, তাহলে—"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—"তাহলে ওড়িয়াদের আড্ডাতেই যেতেন ? আমাদের কিন্তু ভয় করে না। আমি তো দশ-বারো বছর এ পাড়ায় আছি, কিন্তু কারুর কথায় থাকি না বলে কখনও হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি।"

অতুল ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—"ডাক্তারবাবু, আপনি নিশ্চয় কিছু জানেন—না ?"

হঠাৎ পিছনে খুট করিয়া একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, আমাদের মেসের অশ্বিনীবাবু দরজার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতেছেন। তাঁহার মুখের অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা দেখিয়া আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"কি হয়েছে অশ্বিনীবাবু ? আপনি এ সময় নীচে যে ?"

অশ্বিনীবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—"না, কিছু না—অমনি। এক পয়সার বিড়ি কিনতে—" বলিতে বলিতে তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

আমরা পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিলাম। প্রৌঢ় গম্ভীর-প্রকৃতি অশ্বিনীবাবুকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করিতাম—তিনি হঠাৎ নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিয়া আড়ি পাতিয়া আমাদের কথা শুনিতেছিলেন কেন ?

রাত্রিতে আহারে বসিয়া জানিতে পারিলাম অশ্বিনীবাবু পূর্বেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াছেন। আহারান্তে অভ্যাসমত একটা চুরুট শেষ করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, অতুল মেঝের উপর কেবল একটা বালিশ ফেলিয়া শুইয়া আছে। একটু বিস্মিত হইলাম, কারণ, এমন কিছু গরম পড়ে নাই যে মেঝেয় শোয়া প্রয়োজন হইতে পারে। ঘর অন্ধকার ছিল, অতুলও কোনও সাড়া দিল না—তাই ভাবিলাম, সে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমার তখনও ঘুমের কোনও তাগিদ ছিল না, কিন্তু আলো জ্বালিয়া পড়িতে বা লিখিতে বসিলে হয়তো অতুলের ঘুম ভাঙিয়া যাইবে, তাই খালি পায়ে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এইভাবে বেড়াইবার পর হঠাৎ মনে হইল, যাই অশ্বিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তাঁহার কোন অসুখ-বিসুখ করিয়াছে কি না। আমার দু'খানা ঘর পরেই অশ্বিনীবাবুর ঘর ; গিয়া দেখিলাম, তাঁহার দরজা

খোলা, বাহির হইতে ডাক দিয়া সাড়া পাওয়া গেল না। তখন কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিলাম ; দ্বারের পাশেই সুইচ ছিল, আলো জ্বালিয়া দেখিলাম ঘরে কেহ নাই। রাস্তার ধারের জানালাটা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, কিন্তু রাস্তাতেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তাই তো ! এত রাত্রে ভদ্রলোক কোথায় গেলেন ? অকস্মাৎ মনে হইল—হয়তো ডাক্তারের নিকট ঔষধ লইতে গিয়াছেন। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। ডাক্তারের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। এত রাত্রে নিশ্চয় তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন। বন্ধ দরজার সম্মুখে অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় ঘরের ভিতর গলার শব্দ শুনিতে পাইলাম। অত্যন্ত উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে অশ্বিনীবাবু কথা কহিতেছেন।

একবার লোভ হইল, কান পাতিয়া শুনি কি কথা। কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা দমন করিলাম—হয়তো অশ্বিনীবাবু কোনও রোগের কথা বলিতেছেন, আমার শোনা উচিত নয়। পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে ফিরিয়া আসিলাম।

ঘরে আসিয়া দেখিলাম, অতুল পূর্ব্ববৎ মেঝের উপর শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া ঘাড় তুলিয়া বলিল—"কি, অশ্বিনীবাবু ঘরে নেই ?"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"না। তুমি জেগে ছিলে ?"

"হ্যাঁ। অশ্বিনীবাবু নীচে ডাক্তারের ঘরে আছেন।"

"তুমি জানলে কি করে ?"

"কি করে জানলুম, যদি দেখতে চাও, এই বালিশে কান রেখে মাটিতে শোও।"

"কি হে, মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?"

"মাথা ঠিক আছে। শুয়েই দেখ না।"

কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া অতুলের মাথার পাশে মাথা রাখিয়া শুইলাম। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পর অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ কানে আসিতে লাগিল। তারপর পরিষ্কার শুনিতে পাইলাম, অনুকূলবাবু বলিতেছেন—"আপনি বড় উত্তেজিত হয়েছেন। ওটা আপনার দৃষ্টি-বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে অমন হয়। আমি ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে। কাল সকালে উঠে যদি আপনার ঐ বিশ্বাস থাকে, তখন যা হয় করবেন।"

উত্তরে অশ্বিনীবাবু কি বলিলেন, ধরা গেল না। চেয়ার টানার শব্দে বুঝিলাম, দু'জনে উঠিয়া পড়িলেন।

আমি ভূ-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম—"ডাক্তারের ঘরটা যে আমাদের ঘরের নীচেই, তা মনে ছিল না। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো ? অশ্বিনীবাবুর হয়েছে কি ?"

অতুল হাই তুলিয়া বলিল—"ভগবান জানেন। রাত হল, এবার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়া যাক।"

আমি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি মাটিতে শুয়েছিলে কেন ?"

অতুল বলিল—"সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, মেঝেটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হল, তাই শুয়ে পড়লুম। ঘুমও একটু এসেছিল, এমন সময় ওঁদের কথাবার্তায় চটকা ভেঙে গেল।"

সিঁড়িতে অশ্বিনীবাবুর পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘড়িতে দেখিলাম, রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজে। অতুল শুইয়া পড়িয়াছিল, মেসও একেবারে নিশুতি হইয়া গিয়াছে। আমি বিছানায় শুইয়া অশ্বিনীবাবুর কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে অতুলের ঠেলা খাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বেলা সাতটা বাজিয়াছে। অতুল বলিল—"ওহে, ওঠ ওঠ ; গতিক ভাল ঠেকছে না।"

"কেন ? কি হয়েছে ?"

"অশ্বিনীবাবু ঘরের দরজা খুলছেন না। ডাকাডাকিতে সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কি হয়েছে তাঁর ?"

"তা বলা যায় না। তুমি এস"—বলিয়া সে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

আমিও তাহার পশ্চাতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, অশ্বিনীবাবুর দরজার সম্মুখে সকলেই উপস্থিত আছেন। উৎকণ্ঠিত জল্পনা ও দ্বার ঠেলাঠেলি চলিতেছে। নীচে হইতে অনুকূলবাবুও আসিয়াছেন। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ক্রমে বাড়িয়াই চলিল, কারণ, অশ্বিনীবাবু এত বেলা পর্যন্ত কখনও ঘুমান না। তা ছাড়া, যদি ঘুমাইয়া পড়িয়াই থাকেন, তবে এত হাঁকডাকেও জাগিতেছেন না কেন ?

অতুল অনুকূলবাবুর নিকটে গিয়া বলিল—"দেখুন, দরজা ভেঙে ফেলা যাক। আমার তো ভাল বোধ হচ্ছে না।"

অনুকূলবাবু বলিলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আর বল্‌তে ! ভদ্রলোক হয়তো মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন, নইলে জবাব দিচ্ছেন না কেন ? আর দেরি নয়, অতুলবাবু, দরজা ভেঙে ফেলুন।"

দেড় ইঞ্চি পুরু কাঠের দরজা, তাহার উপর ইয়েল্-লক্ লাগানো। কিন্তু অতুল এবং আরও দুই-তিনজন একসঙ্গে সজোরে ধাক্কা দিতেই বিলাতি তালা ভাঙিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে দরজা খুলিয়া গেল। তখন মুক্ত দ্বারপথে যে-বস্তুটি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে ভয়ে কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। স্তম্ভিত হইয়া সকলে দেখিলাম, ঠিক দরজার সম্মুখেই অশ্বিনীবাবু ঊর্ধ্বমুখ হইয়া পড়িয়া আছেন—তাঁহার গলা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কাটা। মাথা ও ঘাড়ের নীচে পুরু হইয়া রক্ত জমিয়া যেন একটা লাল মখমলের গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। আর, তাঁহার প্রক্ষিপ্ত প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে একটা রক্ত-মাখানো ক্ষুর তখনও যেন জিঘাংসাভরে হাসিতেছে।

নিশ্চল জড়পিণ্ডবৎ আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর অতুল ও ডাক্তার একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার বিহ্বলভাবে অশ্বিনীবাবুর বীভৎস মৃতদেহের প্রতি তাকাইয়া থাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন,—"কি ভয়ানক, শেষে অশ্বিনীবাবু আত্মহত্যা করলেন !"

অতুলের দৃষ্টি কিন্তু মৃতদেহের দিকে ছিল না। তাহার দুই চক্ষু তলোয়ারের ফলার মত ঘরের চারিদিকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে একবার বিছানাটা দেখিল, রাস্তার ধারের খোলা জানালা দিয়া উঁকি মারিল, তারপর ফিরিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল—"আত্মহত্যা নয়, ডাক্তারবাবু, এ খুন, নৃশংস নরহত্যা। আমি পুলিস ডাকতে চললুম—আপনারা কেউ কোনও জিনিস ছোঁবেন না।"

অনুকূলবাবু বলিলেন—"বলেন কি, অতুলবাবু—খুন ! কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল—তা ছাড়া ওটা—" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মৃতের হস্তে রক্তাক্ত ক্ষুরটা দেখাইলেন।

অতুল মাথা নাড়িয়া বলিল—"তা হোক্, তবু এ খুন ! আপনারা থাকুন—আমি এখনই পুলিস ডেকে আনছি।"—সে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ডাক্তারবাবু কপালে হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"উঃ, শেষে আমার বাসাতে এই ব্যাপার হল !"

পুলিসের কাছে মেসের চাকর বামুন হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সকলেরই এজাহার হইল। যে যাহা জানি, বলিলাম। কিন্তু কাহারও জবানবন্দীতে এমন কিছু প্রকাশ পাইল না যাহাতে অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুর কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। অশ্বিনীবাবু অত্যন্ত নির্বিরোধ লোক ছিলেন, মেস ও অফিস ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ ছিল বলিয়াও জানা গেল না। তিনি প্রতি শনিবারে বাড়ি যাইতেন। দশ-বারো বৎসর এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। কিছুদিন হইতে তিনি বহুমূত্র-রোগে ভুগিতেছিলেন ; এইরূপ গোটাকয়েক সাধারণ কথাই প্রকাশ পাইল।

ডাক্তার অনুকূলবাবুও এজাহার দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে অশ্বিনীবাবুর মৃত্যু-রহস্য পরিষ্কার না হইয়া যেন আরও জটিল হইয়া উঠিল। তাঁহার জবানবন্দী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত

করিতেছি :

"গত বারো বৎসর যাবৎ অশ্বিনীবাবু আমার বাসায় ছিলেন। তাঁর বাড়ি বর্ধমান জেলায় হরিহরপুর গ্রামে। তিনি সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন, একশ' কুড়ি টাকা আন্দাজ মাইনে পেতেন। এত অল্প মাহিনায় পরিবার নিয়ে কলকাতায় থাকার সুবিধা হয় না, তাই তিনি একলা মেসে থাকতেন। এ মেসের প্রায় সকলেই তাই করে থাকেন।

"অশ্বিনীবাবুকে আমি যতদূর জানি, তিনি সরল-প্রকৃতির কর্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। কখনও কারুর পাওনা ফেলে রাখতেন না, কারুর কাছে এক পয়সা ধার ছিল না। কোন বদখেয়াল কি নেশা ছিল বলেও আমার জানা নেই ; মেসের অন্য সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষী দিতে পারবেন।

"এই বারো বছরের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিনি। তিনি গত কয়েস মাস থেকে ডায়েবিটিসে ভুগছিলেন, আমারই চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু তাঁর মানসিক রোগের কোন লক্ষণ ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি। কাল হঠাৎ তাঁর চাল-চলনে একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব প্রথম লক্ষ্য করলুম।

"কাল বেলা প্রায় পৌনে দশটার সময় আমি আমার ডাক্তারখানায় বসেছিলুম। হঠাৎ অশ্বিনীবাবু এসে বললেন—'ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে।' একটু আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম ; তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হল। জিজ্ঞাসা করলুম—'কি কথা ?' তিনি এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বললেন —'এখন নয়, আর এক সময়।' বলেই তাড়াতাড়ি অফিস চলে গেলেন।

"সন্ধ্যার পর আমি, অজিতবাবু আর অতুলবাবু আমার ঘরে বসে গল্প করছিলুম, হঠাৎ অজিতবাবু দেখতে পেলেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্বিনীবাবু আমাদের কথা শুনছেন। তাঁকে ডাকতেই তিনি কোন গতিকে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমরা সবাই অবাক্ হয়ে রইলুম, ভাবলুম, কি হল অশ্বিনীবাবুর ?

"তারপর রাত্রি দশটার সময় তিনি চোরের মত চুপি চুপি আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। মুখ দেখেই বুঝলুম, তাঁর মানসিক অবস্থা প্রকৃতিস্থ নয়। দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি আবোল-তাবোল নানারকম বলতে লাগলেন। কখনও বলেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভীষণ বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখেছেন, কখনও বলেন, একটা ভয়ানক গুপ্তরহস্য জানতে পেরেছেন। আমি তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তিনি ঝোঁকের মাথায় বকেই চললেন। শেষে আমি তাঁকে এক পুরিয়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে বললুম—'আজ রাত্রে শুয়ে পড়ুন গিয়ে, কাল সকালে আপনার কথা শুনব।' তিনি ওষুধ নিয়ে উপরে উঠে গেলেন।

"সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা,—তারপর আজ সকালে এই কাণ্ড ! তাঁর ভাবগতিক দেখে তাঁর মানসিক প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি যে এই ক্ষণিক উত্তেজনার বশে আত্মঘাতী হবেন, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।"

অনুকুলবাবু নীরব হইলে দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি মনে করেন, এ আত্মহত্যা ?"

অনুকূলবাবু বলিলেন—"তা ছাড়া আর কি হতে পারে ? তবে অতুলবাবু বলছিলেন যে, এ আত্মহত্যা নয়—অন্য কিছু। এ বিষয়ে তিনি হয়তো বেশি জানেন, অতএব তিনিই বলতে পারেন।"

দারোগা অতুলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"আপনিই না অতুলবাবু ? এটা যে আত্মহত্যা নয়, তা মনে করবার কোনও কারণ আছে ?"

"আছে। নিজের হাতে মানুষ অমন ভয়ানকভাবে নিজের গলা কাটতে পারে না। আপনি লাস দেখেছেন—ভেবে দেখুন, এ অসম্ভব।"

দারোগা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"হত্যাকারী কে, আপনার কোনও সন্দেহ হয় কি ?"

"না।"

"হত্যার কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন কি ?"

অতুল রাস্তার দিকের জানলাটা নির্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ জানলাটা হত্যার কারণ।"

দারোগা সচকিত হইয়া বলিলেন—"জানলা হত্যার কারণ ? আপনি বলতে চান, হত্যাকারী ঐ জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল ?"

"না। হত্যাকারী দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল।"

দারোগা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আপনার বোধহয় স্মরণ নেই যে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।"

"স্মরণ আছে।"

দারোগা ঈষৎ পরিহাসের স্বরে বলিলেন—"তবে কি অশ্বিনীবাবু আহত হবার পর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ?"

"না, হত্যাকারী অশ্বিনীবাবুকে হত্যা করবার পর বাইরে থেকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।"

"সে কি করে হতে পারে ?"

অতুল মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"খুব সহজে, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

অনুকূলবাবু এতক্ষণ দরজাটার দিকেই তাকাইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক তো! ঠিক তো! দরজা সহজেই বাইরে থেকে বন্ধ করা যায়, এতক্ষণ আমাদের মাথাতেই ঢোকেনি। দেখছেন না দরজায় যে ইয়েল্ লক্ লাগানো।"

অতুল বলিল—"দরজা বাইরে থেকে টেনে দিলেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর ভিতর থেকে ছাড়া খোলবার উপায় নেই।"

দারোগা প্রবীণ লোক, তিনি গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—"সে ঠিক। কিন্তু একটা জায়গায় খট্‌কা লাগছে। অশ্বিনীবাবু যে রাত্রে দরজা খুলে শুয়েছিলেন তার কি কোন প্রমাণ আছে ?"

অতুল বলিল—"না, বরঞ্চ তার উল্টো প্রমাণই আছে। আমি জানি, তিনি দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলেন।"

আমি বলিলাম—"আমিও জানি। আমি তাঁকে দরজা বন্ধ করতে শুনেছি।"

দারোগা বলিলেন—"তবে ? অশ্বিনীবাবু রাত্রে উঠে হত্যাকারীকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন, এ অনুমানও তো সম্ভব বলে মনে হয় না।"

অতুল বলিল—"না। কিন্তু আপনার বোধহয় স্মরণ নেই যে, অশ্বিনীবাবু গত কয়েক মাস থেকে একটা রোগে ভুগছিলেন।"

"রোগে ভুগছিলেন ? ওঃ! ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন, অতুলবাবু! ও কথাটা আমার খেয়ালই ছিল না।" দারোগা একটু মুরুব্বীয়ানাভাবে বলিলেন—"আপনি দেখছি বেশ intelligent লোক, পুলিসে ঢুকে পড়ুন না! এ পথে আপনি উন্নতি করতে পারবেন। কিন্তু এদিকে ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। যদি সত্যিই এটা হত্যাকাণ্ড হয়, তাহলে হত্যাকারী যে ভয়ানক হুঁশিয়ার লোক, তাতে সন্দেহ নেই। কারুর উপর আপনাদের সন্দেহ হয় ?" বলিয়া উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাহিলেন।

সকলেই নীরবে মাথা নাড়িলেন। অনুকূলবাবু বলিলেন—"দেখুন, এ পাড়ায় প্রায়ই একটা-দুটো খুন হয়, এ খবর অবশ্য আপনার কাছে নূতন নয়। পরশু দিনই আমাদের বাসার প্রায় সামনে একটা খুন হয়ে গেছে। এই সব দেখে আমার মনে হয় যে, সবগুলো হত্যাই এক সুতোয় গাঁথা,—একটার কিনারা হলেই অন্যটার কিনারা হবে। অবশ্য যদি অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলে মেনে নেওয়া হয়!"

দারোগা বলিলেন—"তা হতে পারে। কিন্তু অন্য খুনের কিনারা হবার আশায় বসে থাকলে বোধহয় অনন্তকাল বসেই থাকতে হবে।"

অতুল বলিল—"দারোগাবাবু, যদি এ খুনের কিনারা করতে চান, তাহলে ঐ জানলাটার কথা

ভাল করে ভেবে দেখবেন।"

দারোগা ক্লান্তভাবে কহিলেন—"সব কথাই আমাদের ভাল করে ভেবে দেখতে হবে, অতুলবাবু। এখন আপনাদের প্রত্যেকের ঘর আমি খানাতল্লাস করতে চাই।"

তারপর উপরে নীচে সব ঘরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খানাতল্লাস করা হইল, কিন্তু কোথাও এমন কিছু পাওয়া গেল না যাহার দ্বারা এই মৃত্যু-রহস্যের উপর আলোকপাত হইতে পারে। অশ্বিনীবাবুর ঘরও যথারীতি অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু দু' একটা অতি সাধারণ পারিবারিক চিঠিপত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ক্ষুরের শূন্য খাপটা বিছানার পাশেই পড়িয়াছিল। তিনি নিজে ক্ষৌরকার্য করিতেন এ কথা আমরা সকলেই জানিতাম, খাপটা চিনিতেও কষ্ট হইল না। অশ্বিনীবাবুর মৃতদেহ পূর্বেই স্থানান্তরিত হইয়াছিল, অতঃপর তাঁহার দরজায় তালা লাগাইয়া সীলমোহর করিয়া দারোগা বেলা দেড়টা নাগাদ প্রস্থান করিলেন।

অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে 'তার' পাঠানো হইয়াছিল, বৈকালে তাঁহার পুত্রেরা ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়বর্গ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিস্মিত বিমূঢ় শোকের চিত্রের উপর যবনিকা টানিয়া দিলাম। আমরা অনাত্মীয় হইলেও অশ্বিনীবাবুর এই শোচনীয় মৃত্যুতে প্রত্যেকেই গভীরভাবে আহত হইয়াছিলাম। তা ছাড়া নিজেদের প্রাণ লইয়াও কম আশঙ্কা হয় নাই। যেখানে পাশের ঘরে এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে, সেখানে আমাদের জীবনেরই বা নিশ্চয়তা কি ? মলিন সশঙ্ক অবসন্নতার ভিতর দিয়া এই বিপদভারাক্রান্ত দুর্দিন কাটিয়া গেল।

রাত্রিকালে শয়নের পূর্বে ডাক্তারের ঘরে গিয়া দেখিলাম, তিনি স্তব্ধগম্ভীরমুখে বসিয়া আছেন। এই এক দিনের ঘটনায় তাঁহার শান্ত নিশ্চিহ্ন মুখের উপর কালো কালো রেখা পড়িয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার পাশে বসিয়া বলিলাম—"বাসার সকলেই তো মেস ছেড়ে চলে যাবার যোগাড় করছেন।"

ম্লান হাসিয়া অনুকূলবাবু বলিলেন—"তাঁদের তো দোষ দেওয়া যায় না, অজিতবাবু। এ রকম ব্যাপার যেখানে ঘটে, সেখানে কে থাকতে চায় বলুন !—কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—একে খুন বলা যেতে পারে কি করে ? আর যদি খুনই হয়, তাহলে মেসের বাইরের লোকের দ্বারা তো খুন সম্ভব হতে পারে না। প্রথমত, হত্যাকারী উপরে উঠল কি করে ? সিঁড়ির দরজা রাত্রিকালে বন্ধ থাকে, এ তো আপনারা সকলে জানেন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, লোকটা কোনও কৌশলে উপরে উঠেছিল—কিন্তু সে অশ্বিনীবাবুর ক্ষুর দিয়ে তাঁকে খুন করল কি করে ? এ কি কখনও সম্ভব ? সুতরাং বাইরের লোকের দ্বারা খুন হয়নি এ কথা নিশ্চিত। তা হলে বাকি থাকেন কারা ?—যাঁরা মেসে থাকেন। এঁদের মধ্যে অশ্বিনীবাবুকে খুন করতে পারে, এমন কেউ আছে কি ? অবশ্য অতুলবাবু অল্পদিন হল এসেছেন—তাঁর বিষয়ে আমরা কিছু জানি না—"

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম—"অতুল—?"

ডাক্তারবাবু গলা খাটো করিয়া বলিলেন—"অতুলবাবু লোকটিকে আপনার কি রকম মনে হয় ?"

আমি বলিলাম—"অতুল ? না না, এ কখনও সম্ভব নয়। অতুল কি জন্য অশ্বিনীবাবুকে—"

ডাক্তার বলিলেন—"তবেই দেখুন, আপনার মুখ থেকেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, মেসের কেউ এ কাজ করতে পারেন না। তাহলে বাকি থাকে কি ?—তিনি আত্মহত্যা করেছেন, এই কথাটাই কি বাকি থেকে যাচ্ছে না ?"

"কিন্তু আত্মহত্যা করবারও তো একটা কারণ থাকা চাই।"

"সে কথাও আমি ভেবে দেখেছি। আপনার মনে আছে—কিছুদিন আগে আমি বলেছিলুম যে এ পাড়ায় একটা কোকেনের গুপ্ত সম্প্রদায় আছে।—এই সম্প্রদায়ের সর্দার কে তা কেউ জানে না।"

"হ্যাঁ—মনে আছে।"

ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিলেন—"এখন মনে করুন, অশ্বিনীবাবুই যদি এই সম্প্রদায়ের সর্দার

হন ?”

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম—“সে কি ? তাও কি কখনও সম্ভব ?”

ডাক্তার বলিলেন—“অজিতবাবু, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। বরঞ্চ কাল রাত্রে অশ্বিনীবাবু আমাকে যে-সব কথা বলেছিলেন, তাতে এই সন্দেহই ঘনীভূত হয় —খুব সম্ভব তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। অত্যধিক ভয় পেলে মানুষ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়তে পারে। কে বলতে পারে, হয়তো এই অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন !—ভেবে দেখুন, এ অনুমান কি সঙ্গত মনে হয় না ?”

এই অভিনব থিয়োরি শুনিয়া আমার মাথা একেবারে গুলাইয়া গিয়াছিল, আমি বলিলাম—“কি জানি ডাক্তারবাবু, আমি তো কিছুই ধারণা করতে পারছি না। আপনি বরং আপনার সন্দেহের কথা পুলিসকে খুলে বলুন।”

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—“কাল তাই বলব। এ সমস্যার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।”

দুই তিনটা দিন কোন রকমে কাটিয়া গেল। মনের একান্ত অশান্তির উপর সি-আই-ডি বিভাগের বিবিধ কর্মচারীর নিরন্তর যাতায়াতে ও সওয়াল-জবাবে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মেসের প্রত্যেকেই পালাই পালাই করিতেছিলেন, কিন্তু আবার পালাইতেও সাহস হইতেছিল না। কি জানি, তাড়াতাড়ি বাসা ছাড়িলে যদি পুলিস তাঁহাকেই সন্দেহ করিয়া বসে।

বাসারই কোনও ব্যক্তির চারিধারে যে সন্দেহের জাল ধীরে ধীরে গুটাইয়া আসিতেছে, তাহার ইশারা পাইতেছিলাম। কিন্তু সে ব্যক্তি কে, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছিলাম না। মাঝে মাঝে অজ্ঞাত আতঙ্কে বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিতেছিল—পুলিস আমাকেই সন্দেহ করে না তো ?

সেদিন সকালে অতুল ও আমি ডাক্তারের ঘরে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলাম। একটা মাঝারি গোছের প্যাকিং কেস্-এ ডাক্তারের ঔষধ আসিয়াছিল, তিনি বাক্স খুলিয়া সেগুলি সযত্নে বাহির করিয়া আলমারিতে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। প্যাকিং কেসের উপর আমেরিকার ছাপ মারা ছিল ; ডাক্তারবাবু দেশী ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, দরকার হইলেই আমেরিকা কিংবা জার্মানী হইতে ঔষধ আনাইয়া লইতেন। প্রায় মাসে মাসে তাঁহার এক বাক্স করিয়া ঔষধ আসিত।

অতুল খবরের কাগজের অৰ্দ্ধাংশটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল—“ডাক্তারবাবু, আপনি বিদেশ থেকে ওষুধ আনান কেন ? দেশী ওষুধ কি ভাল হয় না ?”

অতুল একটা বড় সুগার-অফ-মিল্কের শিশি তুলিয়া লইয়া তাহার গায়ে লেখা বিখ্যাত বিক্রেতাদের নাম দেখিয়া বলিল—“এরিক্ এন্ড হ্যাভেল্। এরাই বুঝি সবচেয়ে ভাল ওষুধ তৈরি করে ?”

“হ্যাঁ।

“আচ্ছা, হোমিওপ্যাথিতে সত্যি সত্যি রোগ সারে ? আমার তো বিশ্বাস হয় না। এক ফোঁটা জল খেলে আবার রোগ সারবে কি ?”

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“এত লোক যে ওষুধ নিতে আসে, তারা কি ছেলেখেলা করে ?”

অতুল বলিল—“হয়তো রোগ আপনিই সারে, তারা ভাবে ওষুধের গুণে সারল। বিশ্বাসেও অনেক সময় কাজ হয় কি না।”

ডাক্তার শুধু একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। কিয়ৎকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“খবরের কাগজে আমাদের বাসার কথা কিছু আছে না কি ?”

“আছে” বলিয়া আমি পড়িয়া শুনাইলাম—“হতভাগ্য অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর হত্যার এখনও কোন কিনারা হয় নাই। পুলিসের সি-আই-ডি বিভাগ এই হত্যা-রহস্যের তদন্তভার গ্রহণ

করিয়াছেন। কিছু কিছু তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে, শীঘ্রই আসামী গ্রেপ্তার হইবে।"

"ছাই হবে। ঐ আশা করা পর্যন্ত।" ডাক্তারবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ কি! দারোগাবাবু—"

দারোগা ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে দুইজন কনস্টেবল। ইনি আমাদের সেই পূর্ব-পরিচিত দারোগা; কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া একেবারে অতুলের সম্মুখে গিয়া বলিলেন—"আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে। থানায় যেতে হবে। গোলমাল করবেন না, তাতে কোন ফল হবে না। রামধনী সিং, হ্যান্ডকফ লাগাও।" একজন কনস্টেবল ক্ষিপ্র অভ্যস্ত হস্তে কড়াৎ করিয়া হাতকড়া পরাইয়া দিল।

আমরা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। অতুল বলিয়া উঠিল—"এ কি!"

দারোগা বলিলেন—"এই দেখুন ওয়ারেন্ট। অশ্বিনীকুমার চৌধুরীকে হত্যা করার অপরাধে অতুলচন্দ্র মিত্রকে গ্রেপ্তার করা হল। আপনারা দু'জনে একে অতুলচন্দ্র মিত্র বলে সনাক্ত করছেন?"

নিঃশব্দে অভিভূতের মত আমরা ঘাড় নাড়িলাম।

অতুল মৃদু হাসিয়া বলিল—"শেষ পর্যন্ত আমাকেই ধরলেন। আচ্ছা, চলুন থানায়।—অজিত, কিছু ভেবো না—আমি নির্দোষ।"

একটা ঠিকা গাড়ি ইতিমধ্যে বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অতুলকে তাহাতে তুলিয়া পুলিস সদলবলে চলিয়া গেল।

পাংশুমুখে ডাক্তার বলিলেন—"অতুলবাবুই তাহলে—! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! মানুষের মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই।"

আমার মুখে কথা বাহির হইল না। অতুল হত্যাকারী! এই কয় দিন তাহার সহিত একত্র বাস করিয়া তাহার প্রতি আমার মনে একটা প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার স্বভাবটি এত মধুর যে, আমার হৃদয় এই অল্পকালমধ্যেই সে জয় করিয়া লইয়াছিল। সেই অতুল খুনী! কল্পনার অতীত বিস্ময়ে ক্ষোভে মর্মপীড়ায় আমি যেন দিগভ্রান্ত হইয়া গেলাম।

ডাক্তার বলিলেন—"এই জন্যেই অজ্ঞাত-কুলশীল লোককে আশ্রয় দেওয়া শাস্ত্রে বারণ। কিন্তু তখন কে ভেবেছিল যে লোকটা এতবড় একটা—"

আমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। স্নানাহার করিবারও প্রবৃত্তি হইল না। ঘরের ওপাশে অতুলের জিনিসপত্র ছড়ানো রহিয়াছে—সেই দিকে চাহিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। অতুলকে যে কতখানি ভালবাসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

অতুল যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে—সে নির্দোষ। তবে কি পুলিস ভুল করিল! আমি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। যে রাত্রে অশ্বিনীবাবু হত হন, সে রাত্রির সমস্ত কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলাম। অতুল মেঝেয় বালিশের উপর কান পাতিয়া ডাক্তারের সাইত অশ্বিনীবাবুর কথাবার্তা শুনিতেছিল। কেন শুনিতেছিল? কি উদ্দেশ্যে? তারপর রাত্রি এগারোটার সময় আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম—একেবারে সকালে ঘুম ভাঙিল। ইতিমধ্যে অতুল যদি—

কিন্তু অতুল গোড়া হইতেই বলিতেছে, এ খুন—আত্মহত্যা নয়। যে স্বয়ং হত্যাকারী, সে কি এমন কথা বলিয়া নিজের গলায় ফাঁসি পরাইবার চেষ্টা করিবে? কিংবা, এমনও তো হইতে পারে যে, নিজের উপর হইতে সন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যেই অতুল এ কথা বলিতেছে, যাহাতে পুলিস ভাবে যে, অতুল যখন এত জোর দিয়া বলিতেছে এ হত্যা, তখন সে কখনই হত্যাকারী নহে।

এইরূপ নানা চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত উৎপীড়িত মন লইয়া আমি বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলাম, কখনও উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে লাগিলাম। এমনই করিয়া দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া

গেল।

বেলা তিনটা বাজিল। হঠাৎ মনে হইল, কোনও উকিলের কাছে গিয়া পরামর্শ লইয়া আসি। এরূপ অবস্থায় পড়িলে কি করা উচিত কিছুই জানা ছিল না, উকিলও কাহাকেও চিনি না। যাহা হউক, একটা উকিল খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর হইবে না বুঝিয়া একটা জামা গলাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়িল। দ্বার খুলিয়া দেখি—সম্মুখেই অতুল!

"অ্যাঁ—অতুল!" বলিয়া আমি আনন্দে তাহাকে প্রায় জড়াইয়া ধরিলাম। সে দোষী কি নির্দোষ, এ আন্দোলন মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেল।

রুক্ষ মাথা, শুষ্ক মুখ, অতুল হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ ভাই, আমি। বড্ড ভুগিয়েছে! অনেক কষ্টে একজন জামিন পাওয়া গেল—তাই ছাড়া পেলুম, নইলে আজ হাজত বাস করতে হত। তুমি চলেছ কোথায়?"

একটু অপ্রতিভভাবে বলিলাম—"উকিলের বাড়ি।"

অতুল সস্নেহে আমার একটা হাত চাপিয়া দিয়া বলিল—"আমার জন্যে? তার আর দরকার নেই ভাই। আপাতত কিছু দিনের জন্যে ছাড়ান্ পাওয়া গেছে!"

দু'জনে ঘরের মধ্যে আসিলাম। অতুল ময়লা জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল—"উঃ, মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে! সমস্ত দিন নাওয়া-খাওয়া নেই। তুমিও দেখছি নাওনি খাওনি! বেচারি! চল চল, মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে যাহোক দু'টো মুখে দেওয়া যাক! নাড়ি একেবারে চুঁইয়ে গেছে।"

আমি দ্বিধা ঠেলিয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম—"অতুল—তুমি—তুমি—"

"আমি কি? অশ্বিনীবাবুকে খুন করেছি কি না?" অতুল মৃদুকণ্ঠে হাসিল—"সে আলোচনা পরে হবে। এখন কিছু খাওয়া দরকার। মাথাটা ধরেছে দেখছি। যা হোক, স্নান করলেই সেরে যাবে বোধ হয়।"

ডাক্তারবাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অতুল বলিল—"অনুকূলবাবু, ঘষা দোয়ানীর মত আবার আমি ফিরে এলুম। ইংরাজিতে একটা কথা আছে না— bad penny, আমার অবস্থাও প্রায় সেই রকম—পুলিসেও নিলে না, ফিরিয়ে দিলে।"

ডাক্তার একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"অতুলবাবু, আপনি ফিরে এসেছেন, খুব সুখের বিষয়। আশা করি, পুলিস আপনাকে নির্দোষ বুঝেই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার এখানে আর—আপনার—; বুঝতেই তো পারছেন, পাঁচজনকে নিয়ে মেস। এমনিতেই সকলে পালাই পালাই করছেন, তার উপর যদি আবার—আপনি—আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনার প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই—কিন্তু—"

অতুল বলিল—"না না, সে কি কথা! আমি এখন দাগী আসামী, আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনারা বিপদে পড়বেন কেন? বলা তো যায় না, পুলিস হয়তো শেষে আপনাকেও এডিং অ্যাবেটিং চার্জে ফেলবে! —তা, আজই কি চলে যেতে বলেন?"

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অনিচ্ছাভরে বলিলেন—"না, আজ রাতটা থাকুন; কিন্তু কাল সকালেই—"

অতুল বলিল—"নিশ্চয়। কাল আর আপনাদের বিব্রত করব না। যেখানে হোক একটা আস্তানা খুঁজে নেব—শেষ পর্যন্ত ওড়িয়া হোটেল তো আছেই।" বলিয়া হাসিল।

ডাক্তার তখন থানায় কি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। অতুল ভাসা-ভাসা জবাব দিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। ডাক্তার আমাকে বলিলেন—"অতুলবাবু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন বুঝতে পারছি—কিন্তু উপায় কি বলুন? একে তো মেসের বদনাম হয়ে গেছে—তার উপর যদি পুলিসের গ্রেপ্তারী আসামী রাখি—সেটা কি নিরাপদ হবে, আপনিই বলুন!"

বাস্তবিক এটুকু সাবধানতা ও স্বার্থপরতার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমি বিরসভাবে ঘাড় নাড়িলাম, বলিলাম—"তা আপনার মেস, আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।"

আমি গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নানঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিলাম ; ডাক্তার লজ্জিত বিমর্ষমুখে বসিয়া রহিলেন।

স্নানাহার শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতেছি এমন সময় ঘনশ্যামবাবু অফিস হইতে ফিরিলেন। সম্মুখে অতুলকে দেখিয়া তিনি যেন ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিলেন, পাংশুমুখে বলিলেন—"অতুলবাবু আপনি—আপনি— ?"

অতুল মৃদু হাসিয়া বলিল—"আমিই বটে ঘনশ্যামবাবু। আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

ঘনশ্যামবাবু বলিলেন—"কিন্তু আপনাকে তো পুলিসে—" এই পর্যন্ত বলিয়া একটা ঢোক গিলিয়া তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

অতুলের চক্ষু কৌতুকে নাচিয়া উঠিল, সে মৃদু কণ্ঠে বলিল—"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিস ছুঁলে বোধ হয় আটান্ন। ঘনশ্যামবাবু আমায় দেখে বিশেষ ভয় পেয়েছেন দেখছি।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অতুল বলিল—"ওহে দেখ তো, দরজার তালাটা লাগছে না।"

দেখিলাম, বিলাতি তালায় কি গোলমাল হইয়াছে। গৃহস্বামীকে খবর দিলাম, তিনি আসিয়া দেখিয়া বলিলেন—"বিলিতি তালায় ঐ মুশকিল ; ভাল আছেন তো বেশ আছেন, খারাপ হলে একেবারে এঞ্জিনীয়ার ডাকতে হয়। এর চেয়ে আমাদের দেশী হুড়কো ভাল। যা হোক, কালই মেরামত করিয়ে দেব।" বলিয়া তিনি নামিয়া গেলেন।

রাত্রে শয়নের পূর্বে অতুল বলিল—"অজিত, মাথা ধরাটা ক্রমেই বাড়ছে—কি করি বল তো ?"

আমি বলিলাম—"ডাক্তারের কাছ থেকে এক পুরিয়া ওষুধ নিয়ে খাওনা।"

অতুল বলিল—"হোমিওপ্যাথি ওষুধ ? তাতে সারবে ?—আচ্ছা, দেখা যাক্—হুমো পাখির জোর।"

আমি বলিলাম—"চল, আমার শরীরটাও ভাল ঠেকছে না।"

ডাক্তার তখন দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসুভাবে মুখের দিকে চাহিলেন। অতুল বলিল—"আপনার ওষুধের গুণ পরীক্ষা করতে এলুম। বড্ড মাথা ধরেছে—কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন ?"

ডাক্তার খুশি হইয়া বলিলেন—"বিলক্ষণ ! পারি বৈ কি ! পিত্তি পড়ে মাথা ধরেছে—বসুন, এখনি ওষুধ দিচ্ছি।" বলিয়া আলমারি হইতে নূতন ঔষধ পুরিয়া করিয়া আনিয়া দিলেন—"যান, খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে—কাল সকালে আর কিছু থাকবে না।—অজিতবাবু, আপনার চেহারাটাও ভাল ঠেকছে না—উত্তেজনার পর অবসাদ বোধ হচ্ছে—না ? শরীর টিস্-টিস্ করছে ? বুঝেছি, আপনিও এক দাগ নিন—শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে।"

ঔষধ লইয়া বাহির হইতেছি, অতুল বলিল—"ডাক্তারবাবু ব্যোমকেশ বক্সী বলে কাউকে চেনেন ?"

ডাক্তার ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিলেন—"না। কে তিনি ?"

অতুল বলিল—"জানি না। আজ থানায় তাঁর নাম শুনলুম। তিনি না কি এই হত্যার তদন্ত করছেন।"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না, আমি তাঁকে চিনি না।"

উপরে নিজেদের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আমি বলিলাম— "অতুল, এবার সব কথা আমায় বল।"

"কি বল্‌ব ?"

"তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ। কিন্তু সে হবে না, সব কথা খুলে বলতে হবে।"

অতুল একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর দ্বারের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"আচ্ছা, বলছি। এস, আমার বিছানায় বস। তোমার কাছে যে আর লুকিয়ে রাখা চলবে না, তা বুঝেছিলুম।"

আমি তাহার বিছানায় গিয়া বসিলাম, সে-ও দরজা ভেজাইয়া আমার পাশে বসিল। ঔষধের পুরিয়াটা তখনও আমার হাতে ছিল, ভাবিলাম, সেটা খাইয়া নিশ্চিন্তমনে গল্প শুনিব। মোড়ক খুলিয়া ঔষধ মুখে দিতে যাইতেছি, অতুল আমার হাতটা ধরিয়া বলিল—"এখন থাক, আমার গল্পটা শুনে নিয়ে তারপর খেয়ো।"

সুইচ তুলিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া অতুল আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া তাহার গল্প বলিতে লাগিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া চলিলাম। বিস্ময়ে আতঙ্কে মাঝে মাঝে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল।

পনের মিনিট পরে সংক্ষেপে গল্প সমাপ্ত করিয়া অতুল বলিল—"আজ এই পর্যন্ত থাক, কাল সব খুলে বলব।" রেডিয়ম অঙ্কিত ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—"এখনও সময় আছে। রাত্রি দু'টোর আগে কিছু ঘটছে না, তুমি বরঞ্চ ইতিমধ্যে একটু ঘুমিয়ে নাও, ঠিক সময়ে আমি তোমাকে তুলে দেব।"

রাত্রি তখন বোধ করি দেড়টা হইবে। অন্ধকারে চোখ মেলিয়া বিছানায় শুইয়াছিলাম। শ্রবণেন্দ্রিয় এত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বিছানার উপর দেহের উত্থান-পতনের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম। অতুল যে জিনিসটি দিয়াছিল, সেটি দৃঢ়মুষ্টিতে ডান হাতে ধরিয়াছিলাম।

হঠাৎ অন্ধকারে কোনো শব্দ শুনিলাম না কিন্তু অতুল আমাকে স্পর্শ করিয়া গেল। ইশারাটা আগে হইতেই স্থির করা ছিল, আমি ঘুমন্ত ব্যক্তির মত জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, সময় উপস্থিত হইয়াছে।

তারপর কখন দরজা খুলিল, জানিতে পারিলাম না ; সহসা অতুলের বিছানার উপর ধপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলিয়া উঠিল। লোহার ডান্ডা হস্তে আমি তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে আলোর সুইচ ধরিয়া অতুল এবং তাহারই শয্যার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, মরণাহত বাঘ যেমন করিয়া শিকারীর দিকে ফিরিয়া তাকায়, তেমনি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া—ডাক্তার অনুকূলবাবু!

অতুল বলিল—"বড়ই দুঃখের বিষয় ডাক্তারবাবু, আপনার মত পাকা লোক শেষকালে পাশবালিশ খুন করলে!—ব্যস! নড়বেন না! ছুরি ফেলে দিন। হ্যাঁ, নড়েছেন কি গুলি করেছি। অজিত, রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দাও তো—বাইরেই পুলিস আছে।—খবরদার—"

ডাক্তার বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দরজা দিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতুলের বজ্রমুষ্টি তাহার চোয়ালে হাতুড়ির মত লাগিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল।

মাটিতে উঠিয়া বসিয়া ডাক্তার বলিল—"বেশ, হার মানলুম। কিন্তু আমার অপরাধ কি শুনি!"

"অপরাধ কি একটা, ডাক্তার, যে মুখে মুখে বলব। তার প্রকাণ্ড ফিরিস্তি পুলিস অফিসে তৈরি হয়েছে—ক্রমে প্রকাশ পাবে। আপাতত—"

চার-পাঁচজন কনস্টেবল সঙ্গে করিয়া দারোগা ও ইন্সপেক্টর প্রবেশ করিল।

অতুল বলিল—"আপাতত, ব্যোমকেশ বক্সী সত্যান্বেষীকে আপনি খুন করার চেষ্টা করেছেন, এই অপরাধে পুলিসে সোপর্দ করছি। ইন্সপেক্টরবাবু, ইনিই আসামী।"

ইন্সপেক্টর নিঃশব্দে ডাক্তারের হাতে হাতকড়া লাগাইলেন। ডাক্তার বিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"এ ষড়যন্ত্র! পুলিস আর ঐ ব্যোমকেশ বক্সী মিলে আমাকে মিথ্যে মোকদ্দমায় ফাঁসিয়েছে। কিন্তু আমিও দেখে নেব। দেশে আইন আদালত আছে—আমারও টাকার অভাব নেই।"

ব্যোমকেশ বলিল—"তা তো নেই-ই। এত কোকেন বিক্রির টাকা যাবে কোথায় !"

বিকৃত মুখে ডাক্তার বলিল—"আমি কোকেন বিক্রি করি তার কোনও প্রমাণ আছে ?"

"আছে বৈ কি ডাক্তার ! তোমার সুগার-অফ-মিল্কের শিশিতেই তার প্রমাণ আছে।"

জোঁকের মুখে নুন পড়িলে যেমন হয়, ডাক্তার মুহূর্তমধ্যে তেমনই কুঁকড়াইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, শুধু নির্নিমেষ চক্ষু দু'টা ব্যোমকেশের উপর শক্তিহীন ক্রোধে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার মনে হইল, এ যেন আমার সেই সাদাসিধা নির্বিরোধ অনুকূলবাবু নহে, একটা দুর্দান্ত নরঘাতক গুণ্ডা ভদ্রতার খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহারই সহিত এতদিন পরম বন্ধুভাবে কাল কাটাইয়াছি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কি ওষুধ আমাদের দু'জনকে দিয়েছিলে ঠিক করে বল দেখি ডাক্তার ? মর্ফিয়ার গুঁড়ো—না ? বলবে না ? বেশ, বোলো না—কেমিক্যাল পরীক্ষায় ধরা পড়বেই।" একটা চুরুট ধরাইয়া বিছানায় আরাম করিয়া বসিয়া বলিল—"দারোগাবাবু, এবার আমার এত্তালা লিখুন।"

ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট লিপিবদ্ধ হইলে পর ডাক্তারের ঘর খানাতল্লাস করিয়া দু'টি বড় বড় বোতলে কোকেন বাহির হইল। ডাক্তার সেই যে চুপ করিয়াছিল, আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে নাই। অতঃপর তাহাকে বমাল সমেত থানায় রওনা করিয়া দিতে ভোর হইয়া গেল। তাহাদের চালান করিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"এখানে তো সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। চল আমার বাসায়—সেখানে গিয়ে চা খাওয়া যাবে।"

হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ির তেতলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দ্বারের পাশে পিতলের ফলকে লেখা আছে—

শ্রীব্যোমকেশ বক্সী
সত্যান্বেষী

ব্যোমকেশ বলিল—"স্বাগতম্‌ ! মহাশয় দীনের কুটিরে পদার্পণ করুন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"সত্যান্বেষীটা কি ?"

"ওটা আমার পরিচয়। ডিটেক্‌টিভ কথাটা শুনতে ভাল নয়, গোয়েন্দা শব্দটা আরও খারাপ। তাই নিজের খেতাব দিয়েছি—সত্যান্বেষী। ঠিক হয়নি ?"

সমস্ত তেতলাটা ব্যোমকেশের—গুটি চার-পাঁচ ঘর আছে ; বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জিজ্ঞাসা করিলাম—'একলাই থাক বুঝি ?"

"হ্যাঁ। সঙ্গী কেবল ভৃত্য পুঁটিরাম।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—"দিব্যি বাসাটি। কত দিন এখানে আছ ?"

"প্রায় বছরখানেক—মাঝে কেবল কয়েক দিনের জন্যে তোমাদের বাসায় স্থান পরিবর্তন করেছিলুম।"

ভৃত্য পুঁটিরাম তাড়াতাড়ি স্টোভ্‌ জ্বালিয়া চা তৈয়ার করিয়া আনিল। গরম পেয়ালায় চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"আঃ ! তোমাদের মেসে ছদ্মবেশে ক'দিন মন্দ কাটল না। ডাক্তার কিন্তু শেষের দিকে ধরে ফেলেছিল।—দোষ অবশ্য আমারই !"

"কি রকম ?"

"পুলিসের কাছে জানলার কথাটা বলেই ধরা পড়ে গেলুম—বুঝতে পারছ না ? ঐ জানলা দিয়েই অশ্বিনীবাবু—"

"না না, গোড়া থেকে বল।"

চায়ে আর এক চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"আচ্ছা, তাই বলছি। কতক তো কাল রাত্রেই

শুনেছ—বাকিটা শোন। তোমাদের পাড়ায় যে মাসের পর মাস ক্রমাগত খুন হয়ে চলেছিল, তা দেখে পুলিসের কর্তৃপক্ষ বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। এক দিকে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট, অন্য দিকে কাগজওয়ালারা পুলিসকে ভিতরে-বাইরে খোঁচা দিয়ে দিয়ে আরও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এই রকম যখন অবস্থা, তখন আমি গিয়ে পুলিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলুম, বললুম—'আমি একজন বে-সরকারী ডিটেক্‌টিভ, আমার বিশ্বাস আমি এই সব খুনের কিনারা করতে পারব।' অনেক কথাবার্তার পর কমিশনার সাহেব আমাকে অনুমতি দিলেন ; শর্ত হল, তিনি আর আমি ছাড়া এ কথা আর কেউ জানবে না।

"তারপর তোমাদের বাসায় গিয়ে জুটলুম। কোনও অনুসন্ধান চালাতে গেলে অকুস্থানের কাছেই base of operations থাকা দরকার, তাই তোমাদের মেসটা বেছে নিয়েছিলুম। তখন কে জান্‌ত যে, বিপক্ষ দলেরও base of operations ঐ একই জায়গায়!

"ডাক্তারকে গোড়া থেকেই বড্ড বেশি ভালমানুষ বলে মনে হয়েছিল এবং কোকেনের ব্যবসা চালাতে গেলে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সেজে বসা যে খুব সুবিধাজনক, সে-কথাও মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। কিন্তু ডাক্তারই যে নাটের গুরু, এ সন্দেহ তখনও হয়নি।

"ডাক্তারকে প্রথম সন্দেহ হল অশ্বিনীবাবু মারা যাবার আগের দিন। মনে আছে বোধহয়, সেদিন রাস্তার উপর একজন ভাটিয়ার লাস পাওয়া গিয়েছিল। ডাক্তার যখন শুনলে যে, তার ট্যাঁকের গেঁজে থেকে এক হাজার টাকার নোট বেরিয়েছে, তখন তার মুখে মুহূর্তের জন্য এমন একটা ব্যর্থ লোভের ছবি ফুটে উঠল যে, তা দেখেই আমার সমস্ত সন্দেহ ডাক্তারের ওপর গিয়ে পড়ল।

"তারপর সন্ধ্যাবেলায় অশ্বিনীবাবুর আড়ি পেতে কথা শোনার ঘটনা। আসলে, অশ্বিনীবাবু আমাদের কথা শুনতে আসেননি, তিনি এসেছিলেন ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইতে। কিন্তু আমরা রয়েছি দেখে তাড়াতাড়ি যা হয় একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে চলে গেলেন।

"অশ্বিনীবাবুর ব্যবহারে আমার মনে আবার ধোঁকা লাগল, মনে হল হয়তো তিনিই আসল আসামী। রাত্রিতে মেঝেয় কান পেতে যা শুনলুম, তাতেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হল না। শুধু এইটুকু বুঝলুম যে, তিনি ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখেছেন। তারপর সে-রাত্রে যখন তিনি খুন হলেন, তখন আর কোনও কথাই বুঝতে বাকি রইল না। ডাক্তার যখন সেই ভাটিয়াটাকে রাস্তার ওপর খুন করে, দৈবক্রমে অশ্বিনীবাবু নিজের জানলা থেকে সে দৃশ্য দেখে ফেলেছিলেন। আর সেই কথাই তিনি গোপনে ডাক্তারকে বলতে গিয়েছিলেন।

"এখন ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পারছ ? ডাক্তার কোকেনের ব্যবসা করত, কিন্তু কাউকে জানতে দিত না যে, সে এই কাজের সর্দার! যদি কেউ দৈবাৎ জানতে পেরে যেত, তাকে তৎক্ষণাৎ খুন করত। এইভাবে সে এতদিন নিজেকে বাঁচিয়ে এসেছে।

"ঐ ভাটিয়াটা সম্ভবত ডাক্তারের দালাল ছিল, হয়তো তারই মারফত বাজারে কোকেন সরবরাহ হত। এটা আমার অনুমান, ঠিক না হতেও পারে। সে-দিন রাত্রে সে ডাক্তারের কাছে এসেছিল, কোনও কারণে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। হয়তো লোকটা ডাক্তারকে blackmail করবার চেষ্টা করে—পুলিসের ভয় দেখায়। তার পরেই—যেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, অমনই ডাক্তারও পিছন পিছন গিয়ে তাকে শেষ করে দেয়।

"অশ্বিনীবাবু নিজের জানলা থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেলেন এবং ঘোর নির্বুদ্ধিতার বশে সে-কথা ডাক্তারকেই বলতে গেলেন।

"তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল, জানি না। তিনি ডাক্তারের কাছে উপকৃত ছিলেন, তাই হয়তো তাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন। ফল হল কিন্তু ঠিক তার উল্টো। ডাক্তারের চোখে তাঁর আর বেঁচে থাকবার অধিকার রইল না। সেই রাত্রেই কোনও সময় যখন তিনি ঘর থেকে বেরুবার উপক্রম করলেন, অমনই সাক্ষাৎ যম তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

"আমাকে ডাক্তার গোড়ায় সন্দেহ করেছিল কি না বলতে পারি না, কিন্তু যখন আমি পুলিসকে

বললুম যে, ঐ জানলাটাই অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর কারণ, যখন সে বুঝলে, আমি কিছু-কিছু আন্দাজ করেছি। সুতরাং আমারও ইহলোক ত্যাগ করবার খাঁটি অধিকার জন্মালো। কিন্তু ইহলোক ত্যাগ করবার জন্য আমি একেবারে ব্যগ্র ছিলুম না। তাই অত্যন্ত সাবধানে দিন কাটাতে লাগলুম।

"তারপর পুলিস এক মস্ত বোকামি করে বস্‌ল, আমাকে গ্রেপ্তার করলে। যা হোক, কমিশনার সাহেব এসে আমাকে খালাস করলেন, আমি আবার মেসে ফিরে এলুম। ডাক্তার তখন স্থির বুঝলে যে, আমি গোয়েন্দা ;—কিন্তু সে ভাব গোপন করে আমাকে রাত্রির জন্যে মেসে থাকতে দিয়ে ভারি উদারতা দেখিয়ে দিলে। উদারতার আড়ালে একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—কোনও রকমে আমাকে খুন করা। কারণ, তার বিষয়ে আমি যত কথা জানতুম, এত আর কেউ জানত না।

"ডাক্তারের বিরুদ্ধে তখন পর্যন্ত কিন্তু সত্যিকারের কোনও প্রমাণ ছিল না। অবশ্য তার ঘর খানাতল্লাসী করে কোকেন বার করে তাকে জেলে দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু সে যে একটা নিষ্ঠুর খুনী, এ কথা কোনও আদালতে প্রমাণ হত না। তাই আমিও তাকে প্রলোভন দেখাতে শুরু করলুম। দরজার তালায় পেরেক ফেলে দিয়ে আমিই সেটাকে খারাপ করে দিলুম। ডাক্তার খবর পেয়ে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল—আমরা রাত্রে দরজা বন্ধ করে শুতে পারব না।

"তারপর আমরা যখন ওষুধ নিতে গেলুম, তখন সে সাক্ষাৎ স্বর্গ হাতে পেলে। আমাদের দু'জনকে দু' পুরিয়া গুঁড়ো মর্ফিয়া দিয়ে ভাবলে, আমরা তাই খেয়ে এমন ঘুমই ঘুমুব যে, সে নিদ্রা মহানিদ্রায় পরিণত হলেও জানতে পারব না।

"তার পরেই ব্যাঘ্র এসে ফাঁদে পা দিলেন। আর কি ?"

আমি বলিলাম—"এখন উঠলুম ভাই। তুমি বোধ হয় উপস্থিত ওদিকে যাচ্ছ না ?"

"না। তুমি কি বাসায় যাচ্ছ ?"

'হ্যাঁ।"

"কেন ?"

"বাঃ! কেন আবার! বাসায় যেতে হবে না ?"

"আমি বলছিলুম কি, ও বাসা তো তোমাকে ছাড়তেই হবে, তা আমার এখানে এলে হত না ? এ বাসাটা নেহাৎ মন্দ নয়।"

আমি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—"প্রতিদান দিচ্ছ বুঝি ?"

ব্যোমকেশ আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—"না ভাই, প্রতিদান নয়। মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে এক জায়গায় না থাকলে আর মন টিকবে না। এই ক'দিনেই কেমন একটা বদ-অভ্যাস জন্মে গেছে।"

"সত্যি বল্‌ছ ?"

"সতি বল্‌ছি।"

"তবে তুমি থাকো, আমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসি।"

ব্যোমকেশ প্রফুল্লমুখে বলিল—"সেই সঙ্গে আমার জিনিসগুলো আনতে ভুলো না যেন।"

পথের কাঁটা

ব্যোমকেশ খবরের কাগজখানা সযত্নে পাট করিয়া টেবিলের এক পাশে রাখিয়া দিল। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল।

বাহিরে কুয়াশা-বর্জিত ফাল্গুনের আকাশে সকালবেলার আলো ঝলমল করিতেছিল। বাড়ির তেতলার ঘর কয়টি লইয়া আমাদের বাসা, বসিবার ঘরটির গবাক্ষপথে শহরের ও আকাশের একাংশ বেশ দেখা যায়। নীচে নবোদ্‌বুদ্ধ নগরীর কর্মকোলাহল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, হ্যারিসন রোডের উপর গাড়ি-মোটর-ট্রামের ছুটাছুটি ও ব্যস্ততার অন্ত নাই। আকাশেও এই চাঞ্চল্য কিয়ৎপরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে। চড়াই পাখিগুলো অনাবশ্যক কিচিমিচি করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; তাহাদের অনেক ঊর্ধ্বে একঝাঁক পায়রা কলিকাতা শহরটাকে নীচে ফেলিয়া যেন সূর্যলোক পরিক্রমণ করিবার আশায় ঊর্ধ্ব হইতে আরো ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। বেলা প্রায় আটটা, প্রভাতী চা ও জলখাবার শেষ করিয়া আমরা দুইজন অলসভাবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে বহির্জগতের বার্তা গ্রহণ করিতেছিলাম।

ব্যোমকেশ জানালার দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল—"কিছুদিন থেকে কাগজে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, লক্ষ্য করেছ?"

আমি বলিলাম—"না। বিজ্ঞাপন আমি পড়ি না।"

ভ্রূ তুলিয়া একটু বিস্মিতভাবে ব্যোমকেশ বলিল—"বিজ্ঞাপন পড় না? তবে পড় কি?"

"খবরের কাগজে সবাই যা পড়ে, তাই পড়ি—খবর।"

"অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ায় কার আঙুল কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়েছে আর ব্রেজিলে কার একসঙ্গে তিনটে ছেলে হয়েছে, এই পড়! ওসব পড়ে লাভ কি? সত্যিকারের খাঁটি খবর যদি পেতে চাও, তাহলে বিজ্ঞাপন পড়।"

ব্যোমকেশ অদ্ভুত লোক, কিন্তু সে পরিচয় ক্রমশ প্রকাশ পাইবে। বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া একবারও মনে হয় না যে, তাহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে। কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিয়া, প্রতিবাদ করিয়া, একটু উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে ভিতরকার মানুষটি কচ্ছপের মত বাহির হইয়া আসে। সে স্বভাবত স্বল্পভাষী, কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া একবার তাহাকে চটাইয়া দিতে পারিলে তাহার ছুরির মত শাণিত ঝক্‌ঝকে বুদ্ধি সঙ্কোচ ও সংযমের পর্দা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার কথাবার্তা সত্যই শুনিবার মত বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

আমি খোঁচা দিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না, বলিলাম—"ও, তাই না কি? কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা তাহলে ভারি শয়তান, সমস্ত কাগজখানা বিজ্ঞাপনে ভরে না দিয়ে কতকগুলো বাজে খবর ছাপিয়ে পাতা নষ্ট করে।"

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল—"তাদের দোষ নেই। তোমার মত লোকের চিত্তবিনোদন না করতে পারলে বেচারাদের কাগজ বিক্রি হয় না, তাই বাধ্য হয়ে ঐ সব খবর সৃষ্টি করতে হয়। আসল কাজের খবর থাকে কিন্তু বিজ্ঞাপনে। দেশের কোথায় কি হচ্ছে, কে কি ফিকির বার করে দিন-দুপুরে ডাকাতি করছে, কে চোরাই মাল পাচার করবার নূতন ফন্দি

আঁটিছে—এইসব দরকারী খবর যদি পেতে চাও তো বিজ্ঞাপন পড়তে হবে। রয়টারের টেলিগ্রামে ওসব পাওয়া যায় না।”

আমি হাসিয়া বলিলাম—“তা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু,—থাক—। এবার থেকে না হয় বিজ্ঞাপনই পড়ব। কিন্তু তোমার মজার বিজ্ঞাপনটা কি শুনি ?”

ব্যোমকেশ কাগজখানা আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—“পড়ে দেখ, দাগ দিয়ে রেখেছি।”

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক কোণে একটি অতি ক্ষুদ্র তিন লাইনের বিজ্ঞাপন দৃষ্টিগোচর হইল। লাল পেন্সিল দিয়া দাগ দেওয়া ছিল বলিয়াই চোখে পড়িল, নচেৎ খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত।

“পথের কাঁটা”

“যদি কেহ পথের কাঁটা দূর করিতে চান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল’র দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন।”

দুই-তিনবার পড়িয়াও বিজ্ঞাপনের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“ল্যাম্পপোস্টে হাত রেখে মোড়ের মাথায় দাঁড়ালেই পথের কাঁটা দূর হয়ে যাবে ! এ বিজ্ঞাপনের মানে কি ? আর পথের কাঁটাই বা কি বস্তু ?”

ব্যোমকেশ বলিল—“সেটা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি। বিজ্ঞাপনটা তিন মাস ধরে ফি শুক্রবার বার হচ্ছে, পুরনো কাগজ ঘাঁটলেই দেখতে পাবে।”

আমি বলিলাম—“কিন্তু এ বিজ্ঞাপনের সার্থকতা কি ? কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তো লোকে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে ? এর তো কোন মানেই হয় না !”

ব্যোমকেশ বলিল—“আপাতত কোনও উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না বটে, কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্য নেই বলা চলে না। অকারণে কেউ গাঁটের কড়ি খরচ করে বিজ্ঞাপন দেয় না।—লেখাটা পড়লে একটা জিনিস সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।”

“কি ?”

“যে ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তার আত্মগোপন করবার চেষ্টা। প্রথমত দেখ, বিজ্ঞাপনে কোনও নাম নেই। অনেক সময় বিজ্ঞাপনে নাম থাকে না বটে, কিন্তু খবরের কাগজের অফিসে খোঁজ নিলে নাম-ধাম সব জানতে পারা যায়। সে রকম বিজ্ঞাপনে বক্স-নম্বর দেওয়া থাকে। এতে তা নেই। তারপর দেখ, যে লোক বিজ্ঞাপন দেয়, সে জনসাধারণের সঙ্গে কোনও একটা কারবার চালাতে চায়—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু মজা এই যে, এ লোকটি নিজে অদৃশ্য থেকে কারবার চালাতে চায়।”

“বুঝতে পারলুম না।”

“আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি, শোন। যিনি এই বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, তিনি জনসাধারণকে ডেকে বলছেন—‘ওহে, তোমরা যদি পথের কাঁটা দূর করতে চাও তো অমুক সময় অমুক স্থানে দাঁড়িয়ে থেকো—এমনভাবে দাঁড়িয়ে থেকো—যাতে আমি তোমাকে চিনতে পারি।’—পথের কাঁটা কি পদার্থ, সে তর্ক এখন দরকার নেই, কিন্তু মনে কর তুমি ঐ জিনিসটা চাও। তোমার কর্তব্য কি ? নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। মনে কর, তুমি যথাসময় সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। তারপর কি হল ?”

“কি হল ?”

“শনিবার বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় ঐ জায়গায় কি রকম লোক-সমাগম হয় সেটা বোধ হয় তোমাকে বলে দিতে হবে না। এদিকে হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল, ওদিকে নিউ মার্কেট, চারিদিকে গোটা পাঁচ-ছয় সিনেমা হাউস। তুমি ল্যাম্পপোস্ট ধরে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলে আর লোকের ঠেলা খেতে লাগলে, কিন্তু যে আশায় গিয়েছিলে, তা হল না—কেউ তোমার পথের কাঁটা উদ্ধার

করবার মহৌষধ নিয়ে হাজির হল না। তুমি বিরক্ত হয়ে চলে এলে, ভাবলে, ব্যাপারটা আগাগোড়া ভুয়ো। তারপর হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে, একখানি চিঠি কে ভিড়ের মধ্যে তোমার পকেটে ফেলে দিয়ে গেছে।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি ? চোরে-কামারে দেখা হল না অথচ সিঁধকাটি তৈরি হবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে তোমার লেনদেনের সম্বন্ধ স্থাপিত হল অথচ তিনি কে, কি রকম চেহারা, তুমি কিছুই জানতে পারলে না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—"যদি তোমার যুক্তিধারাকে সত্যি বলেই মেনে নেওয়া যায়, তাহলে কি প্রমাণ হয় ?"

"এই প্রমাণ হয় যে, 'পথের কাঁটা'র সওদাগরটি নিজেকে অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাখতে চান এবং যিনি নিজের পরিচয় দিতে এত সঙ্কুচিত, তিনি বিনয়ী হতে পারেন, কিন্তু সাধু-লোক কখনই নন।"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম—"এ তোমার অনুমান মাত্র, একে প্রমাণ বলতে পার না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে কহিল—"আরে, অনুমানই তো আসল প্রমাণ। যাকে তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে থাকো, তাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো অনুমান বৈ আর কিছুই থাকে না। আইনে যে circumstantial evidence বলে একটা প্রমাণ আছে, সেটা কি ? অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তারই জোরে কত লোক যাবজ্জীবন পুলিপোলাও চলে যাচ্ছে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, মন হইতে সায় দিতে পারিলাম না। অনুমান যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমকক্ষ হইতে পারে, এ কথা সহজে মানিয়া লওয়া যায় না। অথচ ব্যোমকেশের যুক্তি খণ্ডন করাও কঠিন কাজ। সুতরাং নীরব থাকাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম। জানিতাম, এই নীরবতায় সে আরও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে এবং অচিরাৎ আরো জোরালো যুক্তি আনিয়া হাজির করিবে।

একটা চড়াই পাখি কুটা মুখে করিয়া খোলা জানালার উপর আসিয়া বসিল এবং ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া উজ্জ্বল ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া আমাদের পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—"আচ্ছা, ঐ পাখিটা কি চায় বলতে পার ?"

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম—"কি চায় ? ওঃ, বোধহয় বাসা তৈরি করবার একটা জায়গা খুঁজছে।"

"ঠিক জানো ? কোন সন্দেহ নেই ?"

"কোন সন্দেহ নেই।"

দুই হাত পশ্চাতে রাখিয়া মৃদুহাস্যে ব্যোমকেশ বলিল—"কি করে বুঝলে ? প্রমাণ কি ?"

"প্রমাণ আর কি ! ওর মুখে কুটো—"

"কুটো থাকলেই প্রমাণ হয় যে, বাসা বাঁধতে চায় ?"

দেখিলাম ব্যোমকেশের ন্যায়ের প্যাঁচে পড়িয়া গিয়াছি।

কহিলাম, "না—তবে—"

"অনুমান। পথে এস। এতক্ষণ তবে দেয়ালা করছিলে কেন ?"

"দেয়ালা করিনি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, চড়াই পাখি সম্বন্ধে যে অনুমান খাটে, মানুষের বেলাতেও সেই অনুমান খাটবে ?"

"কেন নয় ?"

"তুমি যদি কুটো মুখে করে একজনের জানলায় উঠে বসে থাক, তাহলে কি প্রমাণ হবে যে, তুমি বাসা বাঁধতে চাও ?"

"না। তাহলে প্রমাণ হবে যে, আমি একটা বদ্ধ পাগল।"

"সে প্রমাণের দরকার আছে কি ?"

ব্যোমকেশ হাসিতে লাগিল। বলিল—"চটাতে পারবে না। কিন্তু কথাটা তোমায় মানতেই হবে—প্রত্যক্ষ প্রমাণ বরং অবিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত অনুমান একেবারে অমোঘ। তার ভুল হবার জো নেই।"

আমারও জিদ চড়িয়া গিয়াছিল, বলিলাম—"কিন্তু ঐ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে তুমি যে সব উদ্ভট অনুমান করলে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।"

ব্যোমকেশ বলিল—"সে তোমার মনের দুর্বলতা, বিশ্বাস করবারও ক্ষমতা চাই। যা হোক, তোমার মত লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণই ভাল। কাল শনিবার, বিকেলে কোন কাজও নেই। কালই তোমার বিশ্বাস করিয়ে দেবো।"

"কি ভাবে ?"

আমাদের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনা গেল। ব্যোমকেশ উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া বলিল, —"অপরিচিত ব্যক্তি—প্রৌঢ়—মোটাসোটা, নাদুস-নুদুস বললেও অত্যুক্তি হবে না—হাতে লাঠি আছে—কে ইনি ? নিশ্চয়ই আমাদের সাক্ষাৎ চান, কারণ, তেতলায় আমরা ছাড়া আর কেউ থাকে না।" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। ব্যোমকেশ ডাকিয়া বলিল—"ভেতরে আসুন—দরজা খোলা আছে।"

দ্বার ঠেলিয়া একটি মধ্যবয়সী স্থূলকায় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি মোটা মলক্কা বেতের রূপার মুঠযুক্ত লাঠি, গায়ে কালো আলপাকার গলাবন্ধ কোট, পরিধানে কোঁচানো থান। গৌরবর্ণ সুশ্রী, মুখে দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথার সম্মুখভাগ টাক পড়িয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তেতলার সিঁড়ি ভাঙিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমটা কথা কহিতে পারিলেন না। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে আমাকে শুনাইয়া বলিল—"অনুমান ! অনুমান !"

আমি নীরবে তাহার এই শ্লেষ হজম করিলাম। কারণ, এক্ষেত্রে আগন্তুকের চেহারা সম্বন্ধে তাহার অনুমান যে বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভদ্রলোকটি দম লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডিটেক্‌টিভ ব্যোমকেশবাবু কার নাম ?"

মাথার উপর পাখাটা খুলিয়া দিয়া একখানা চেয়ার নির্দেশ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"বসুন ! আমারই নাম ব্যোমকেশ বক্সী, কিন্তু ঐ ডিটেক্‌টিভ কথাটা আমি পছন্দ করি না ; আমি একজন সত্যান্বেষী। যা হোক, আপনি বড় বিপন্ন হয়েছেন দেখছি। একটু জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিন্, তারপরে আপনার গ্রামোফোন পিনের রহস্য শুনবো।"

ভদ্রলোকটি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। আমারও বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে গ্রামোফোন-পিন রহস্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা একেবারেই আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। ব্যোমকেশের অদ্ভুত ক্ষমতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, কিন্তু এটা যেন ভোজবাজির মত ঠেকিল।

ভদ্রলোক অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"আপনি—আপনি জানলেন কি করে ?"

সহাস্যে ব্যোমকেশ বলিল—"অনুমান মাত্র। প্রথমত, আপনি প্রৌঢ়, দ্বিতীয়ত, আপনি সঙ্গতিপন্ন, তৃতীয়ত, আপনি সম্প্রতি ভীষণ বিপদে পড়েছেন এবং শেষ কথা—আমার সাহায্য নিতে চান। সুতরাং—" কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল যে, ইহার পর তাঁহার আগমনের হেতু আবিষ্কার করা শিশুর পক্ষেও সহজসাধ্য।

এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল যে, কিছুদিন হইতে এই কলিকাতা শহরে যে অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার ঘটিতেছিল এবং যাহাকে 'গ্রামোফোন পিন মিস্ট্রি' নাম দিয়া শহরের দেশী-বিলাতি সংবাদপত্রগুলি বিরাট হুলস্থূল বাধাইয়া দিয়াছিল ; তাহার ফলে কলিকাতাবাসী লোকের মনে কৌতূহল, উত্তেজনা ও আতঙ্কের অবধি ছিল না। সংবাদপত্রের রোমাঞ্চকর ও ভীতিপ্রদ বিবরণ

পাঠ করিবার পর চায়ের দোকানের জল্পনা উত্তেজনায় একেবারে দড়িছেঁড়া হইয়া উঠিয়াছিল এবং গৃহ হইতে পথে বাহির হইবার পূর্বে প্রত্যেক বাঙালী গৃহস্থেরই গায়ে কাঁটা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ব্যাপারটা এই—মাস দেড়েক পূর্বে সুকীয়া স্ট্রীট নিবাসী জয়হরি সান্যাল নামক জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাতঃকালে কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট দিয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন। রাস্তা পার হইয়া অন্য ফুটপাথে যাইবার জন্য যেমনই পথে নামিয়াছেন, অমনই হঠাৎ মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেলেন। সকালবেলা রাস্তায় লোকজনের অভাব ছিল না, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিবার পর দেখিল তাঁহার দেহে প্রাণ নাই। হঠাৎ কিসে মৃত্যু হইল অনুসন্ধান করিতে গিয়া চোখে পড়িল যে, তাঁহার বুকের উপর একবিন্দু রক্ত লাগিয়া আছে—আর কোথাও আঘাতের কোনও চিহ্ন নাই। পুলিস অপমৃত্যু সন্দেহ করিয়া লাস হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল। সেখানে মরণোত্তর পরীক্ষায় ডাক্তার এক অদ্ভুত রিপোর্ট দিলেন। তিনি লিখিলেন, মৃত্যুর কারণ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটি গ্রামোফোনের পিন বিঁধিয়া আছে। কেমন করিয়া এই পিন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার কৈফিয়তে বিশেষজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসক লিখিলেন, বন্দুক অথবা ঐ জাতীয় কোনও যন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই পিন মৃতের সম্মুখ দিক্ হইতে বক্ষের চর্ম ও মাংস ভেদ করিয়া মর্মস্থানে প্রবেশ করিয়াছে এবং মৃত্যুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে।

এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রে বেশ একটু আন্দোলন হইল এবং মৃতব্যক্তির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতও বাহির হইয়া গেল। ইহা হত্যাকাণ্ড কি না এবং যদি তাই হয়, তবে কিরূপে ইহা সঙ্ঘটিত হইল, তাহা লইয়া অনেক গবেষণা প্রকাশিত হইল। কিন্তু একটা কথা কেহই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিলেন না—এই হত্যার উদ্দেশ্য কি এবং যে হত্যা করিয়াছে তাহার ইহাতে কি স্বার্থ! সরকারের পুলিস যে ইহার তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও কাগজে প্রকাশ পাইল। চায়ের দোকানের কাজীরা ফতোয়া দিলেন, ও কিছু নয়, লোকটার হার্টফেল করিয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত ভাল সংবাদের দুর্ভিক্ষ ঘটায় কাগজওয়ালারা এই নূতন ফন্দি বাহির করিয়া তিলকে তাল করিয়া তুলিয়াছে।

ইহার দিন আষ্টেক পরে শহরের সকল সংবাদপত্রে দেড়-ইঞ্চি টাইপে যে সংবাদ বাহির হইল, তাহাতে কলিকাতার ভদ্র বাঙালী সম্প্রদায় উত্তেজনায় খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলেন। চায়ের বৈঠকের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের তৃতীয় নয়ন একবারে বিস্ফারিত হইয়া খুলিয়া গেল। এত প্রকার গুজব, আন্দাজ ও জনশ্রুতি জন্মগ্রহণ করিল, যে, বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতাও বোধ করি এত জন্মায় না।

'দৈনিক কালকেতু' লিখিল—

আবার গ্রামোফোন পিন

অদ্ভুত রোমাঞ্চকর রহস্য

কলিকাতার পথঘাট নিরাপদ নয়

"'কালকেতু'র পাঠকগণ জানেন, কয়েকদিন পূর্বে জয়হরি সান্যাল পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরীক্ষায় তাঁহার হৃৎপিণ্ড হইতে একটি গ্রামোফোন পিন বাহির হয় এবং ডাক্তার উহাই মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমরা তখনি সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, ইহা সাধারণ ব্যাপার নয়, ইহার ভিতরে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত আছে। আমাদের সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে, গতকল্য অনুরূপ আর একটি লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী কৈলাসচন্দ্র মৌলিক কল্য অপরাহ্ণে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় মোটরে চড়িয়া গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। রেড রোডের কাছে গিয়া তিনি মোটর থামাইয়া পদব্রজে বেড়াইবার জন্য যেই গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া কিছুদূর গিয়াছেন, অমনি 'উঃ' শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সোফার ও রাস্তার অন্যান্য

লোক মিলিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে আবার গাড়িতে তুলিল, কিন্তু তিনি আর তখন জীবিত নাই। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পকালমধ্যেই পুলিস আসিয়া পড়িল। কৈলাসবাবুর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি ছিল, পুলিস তাঁহার বুকের কাছে এক বিন্দু রক্তের দাগ দেখিয়া অপঘাত-মৃত্যু সন্দেহ করিয়া তৎক্ষণাৎ লাস হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, কৈলাসবাবুর হৃৎপিণ্ডে একটি গ্রামোফোন পিন আটকাইয়া আছে, এই পিন তাঁহার সম্মুখদিক্ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে।

"স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইহা আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে, একদল ক্রূরকর্মা নরঘাতক কলিকাতা শহরে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে খুন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ইহাদের হত্যা করিবার প্রণালী; কোথা হইতে কোন্ অস্ত্রের সাহায্যে ইহারা হত্যা করিতেছে, তাহা গভীর রহস্যে আবৃত।

"কৈলাসবাবু অতিশয় হৃদয়বান্ অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার সহিত কাহারও শত্রুতা থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র আটচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। কৈলাসবাবু বিপত্নীক ও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যাই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আমরা কৈলাসবাবুর শোকসন্তপ্ত কন্যা ও জামাতাকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

"পুলিস সজোরে তদন্ত চালাইয়াছে। প্রকাশ যে, কৈলাসবাবুর সোফার কালী সিংকে সন্দেহের উপর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

অতঃপর দুই হপ্তা ধরিয়া খবরের কাগজে খুব হৈ চৈ চলিল। পুলিস সবেগে অনুসন্ধান চালাইতে লাগিল এবং অনুসন্ধানের বেগে বোধ করি গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিল। কিন্তু অপরাধী ধরা পড়া দূরের কথা, গ্রামোফোন পিনের জমাট রহস্য-অন্ধকারের ভিতরে আলোকের রশ্মিটুকু পর্যন্ত দেখা গেল না।

পনের দিনের মাথায় আবার গ্রামোফোন পিন দেখা দিল। এবার তাহার শিকার সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের একজন ধনাঢ্য মহাজন—নাম কৃষ্ণদয়াল লাহা। ধর্মতলা ও ওয়েলিংটন স্ট্রীটের চৌমাথা পার হইতে গিয়া ইনি ভূপতিত হইলেন, আর উঠিলেন না। সংবাদপত্রে যে বিরাট রৈ-রৈ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। পুলিসের অক্ষমতা সম্বন্ধেও সম্পাদকীয় মন্তব্য তীব্র ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। কলিকাতার অধিবাসীদিগের বুকের উপর ভূতের ভয়ের মত একটা বিভীষিকা চাপিয়া বসিল। বৈঠকখানায়, চায়ের দোকানে, রেস্তোরাঁ ও ড্রয়িংরুমে অন্য সকল প্রকার আলোচনা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

তারপর দ্রুত অনুক্রমে আরও দুইটি অনুরূপ খুন হইয়া গেল। কলিকাতা শহর বিহ্বল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অসহায়ভাবে পড়িয়া রহিল, এই অচিন্তনীয় বিপৎপাতে কি করিবে, কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে, কিছুই যেন ভাবিয়া পাইল না।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশ এই ব্যাপারে গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। চোর ধরা তাহার পেশা এবং এই কাজে সে বেশ একটু নামও করিয়াছে। 'ডিটেক্‌টিভ' শব্দটার প্রতি তাহার যতই বিরাগ থাক, বস্তুত সে যে একজন বে-সরকারী ডিটেক্‌টিভ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা সে মনে মনে ভাল রকমই জানিত। তাই এই অভিনব হত্যাকাণ্ড তাহার সমস্ত মানসিক শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অকুস্থানগুলি আমরা দুইজনে মিলিয়া দেখিয়াও আসিয়াছিলাম। ইহার ফলে ব্যোমকেশ কোনও নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছিল কি না জানি না; করিয়া থাকিলেও আমাকে কিছু বলে নাই। কিন্তু গ্রামোফোন পিন সম্বন্ধে সে যেখানে যেটুক সংবাদ পাইত, তাহাই সযত্নে নোটবুকে টুকিয়া রাখিত। বোধ হয় তাহার মনে মনে ভরসা ছিল যে, একদিন এই রহস্যের একটা ছিন্নসূত্র তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে।

তাই আজ যখন সত্যসত্যই সূত্রটি তাহার হাতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দেখিলাম, বাহিরে শান্ত সংযত ভাব ধারণ করিলেও ভিতরে ভিতরে সে ভয়ানক উত্তেজিত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"আপনার নাম শুনে এসেছিলাম, দেখছি ঠকিনি। গোড়াতেই যে আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিলেন, তাতে ভরসা হচ্ছে আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন। পুলিসের দ্বারা কিছু হবে না, তাদের কাছে আমি যাইনি, মশায়। দেখুন না, চোখের সামনে দিন-দুপুরে পাঁচ-পাঁচটা খুন হয়ে গেল, পুলিস কিছু করতে পারলে কি ? আমিও তো প্রায় গিয়েছিলাম আর একটু হলেই !" তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া গেল, কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

ব্যোমকেশ সান্ত্বনার স্বরে বলিল—"আপনি বিচলিত হবেন না। পুলিসে না গিয়ে যে আমার কাছে এসেছেন, ভালই করেছেন। এ ব্যাপারে কিনারা যদি কেউ করতে পারে তো সে পুলিস নয়। আমাকে গোড়া থেকে সমস্ত কথা খুলে বলুন, অ-দরকারী বলে কোনও কথা বাদ দেবেন না। আমার কাছে অ-দরকারী কিছু নেই।"

ভদ্রলোক কতকটা সামলাইয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমার নাম শ্রীআশুতোষ মিত্র, কাছেই নেবুতলায় আমি থাকি। আঠারো বছর বয়স থেকে সারা জীবন ব্যবসা উপলক্ষে ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছি—বিয়ে-থা করবার অবকাশ পাইনি। তা ছাড়া, ছেলেপিলে নেন্ডি-গেন্ডি আমি ভালবাসি না, তাই কোনওদিন বিয়ে করবার ইচ্ছাও হয়নি। আমি গোছালো লোক, একলা থাকতে ভালবাসি। বয়সও কম হয়নি—আসছে মাঘে একান্ন বছর পুরবে। প্রায় বছর দুই হল কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছি, সারা জীবনের উপার্জন লাখ দেড়েক টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। তারই সুদে আমার বেশ চলে যায়। বাড়িভাড়াও দিতে হয় না, বাড়িখানা নিজের। সামান্য গান-বাজনার শখ আছে, তাই নিয়ে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—"অবশ্য পোষ্য কেউ আছে ?"

আশুবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না। আত্মীয় বলতে বড় কেউ নেই, তাই ও হাঙ্গামা পোহাতে হয় না। শুধু একটা লক্ষ্মীছাড়া বখাটে ভাইপো আছে, সেই মাঝে মাঝে টাকার জন্যে জ্বালাতন করতে আসত। কিন্তু সে ছোঁড়া একেবারে বেহেড মাতাল আর জুয়াড়ী, ওরকম লোক আমি বরদাস্ত করতে পারি না, মশায়, তাই তাকে আর বাড়ি ঢুকতে দিই না।"

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল— "ভাইপোটি কোথায় থাকেন ?"

আশুবাবু বেশ একটু পরিতৃপ্তির সহিত বলিলেন—"আপাতত শ্রীঘরে। রাস্তায় মাতলামি করার জন্যে এবং পুলিসের সঙ্গে মারামারি করার অপরাধে দু'মাস জেল হয়েছে।"

"তারপর বলে যান।"

"বিনোদ ছোঁড়া—আমার গুণধর ভাইপো, জেলে যাবার পর ক'দিন বেশ আরামে ছিলাম মশায়, কোনও হাঙ্গামা ছিল না। বন্ধু-বান্ধব আমার কেউ নেই, কিন্তু জেনে শুনে কোনও দিন কারও অনিষ্ট করিনি ; সুতরাং আমার যে শত্রু আছে, এ কথাও ভাবতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ কাল বিনামেঘে বজ্রাঘাত হল। এমন ব্যাপার যে ঘটতে পারে, এ আমার কল্পনার অতীত। গ্রামোফোন পিন রহস্যের কথা কাগজে পড়েছি বটে, কিন্তু ও আমার বিশ্বাস হত না, ভাবতাম সব গাঁজাখুরি। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙে গেছে।

"কাল সন্ধ্যাবেলা আমি অভ্যাসমত বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রোজই যাই। জোড়াসাঁকোর দিকে একটা গানবাজনার মজলিস আছে, সেখানে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে ন'টা সাড়ে ন'টার সময় বাড়ি ফিরে আসি। হেঁটেই যাতায়াত করি, আমার যে বয়স, তাতে নিয়মিত হাঁটলে শরীর ভাল থাকে। কাল রাত্রিতে আমি বাড়ি ফিরছি, আমহার্স্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের চৌমাথার ঘড়িতে তখন ঠিক সওয়া ন'টা। রাস্তায় তখনও গাড়ি-মোটরের খুব ভিড়। আমি কিছুক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলাম, দুটো ট্রাম পাস করে গেল। একটু ফাঁক দেখে আমি চৌমাথা পার হতে গেলাম। রাস্তার মাঝামাঝি যখন পৌঁছেছি, তখন হঠাৎ বুকে একটা বিষম ধাক্কা লাগল, সঙ্গে

সঙ্গে বুকের চামড়ার ওপর কাঁটা ফোটার মতন একটা ব্যথা অনুভব করলাম, মনে হল; আমার বুক-পকেটের ঘড়ির ওপর কে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘুষি মারলে। উল্টে পড়েই যাচ্ছিলাম, কিন্তু কোনও রকমে সামলে নিয়ে গাড়ি-ঘোড়া বাঁচিয়ে সামনের ফুটপাথে উঠে পড়লাম।

"মাথাটা যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে বুকে ধাক্কা লাগল, কিছুই ধারণা করতে পারলাম না। পকেট থেকে ঘড়িটা বার করতে গিয়ে দেখি, ঘড়ি বার হচ্ছে না, কিসে আটকে যাচ্ছে। সাবধানে পকেটের কাপড় সরিয়ে যখন ঘড়ি বার করলাম, তখন দেখি, তার কাচখানা গুঁড়ো হয়ে গেছে—আর—আর একটা গ্রামোফোনের পিন ঘড়িটাকে ফুঁড়ে মুখ বার করে আছে।"

আশুবাবু বলিতে বলিতে আবার ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কপালের ঘাম মুছিয়া কম্পিত হস্তে পকেট হইতে একটি ঘড়ির বাক্স বাহির করিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন—"এই দেখুন সেই ঘড়ি—"

ব্যোমকেশ বাক্স খুলিয়া একটি গান-মেটালের পকেট ঘড়ি বাহির করিল। ঘড়ির কাচ নাই, ঠিক নয়টা কুড়ি মিনিটে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার মর্মস্থল ভেদ করিয়া একটি গ্রামোফোন পিনের অগ্রভাগ হিংস্রভাবে পশ্চাদ্দিকে মুখ বাহির করিয়া আছে। ব্যোমকেশ ঘড়িটা কিছুক্ষণ গভীর মনঃসংযোগে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বাক্সে রাখিয়া দিল। বাক্সটা টেবিলের উপর রাখিয়া আশুবাবুকে বলিল—"তারপর ?"

আশুবাবু বলিলেন—"তারপর কি করে যে বাড়ি ফিরে এলাম সে আমি জানি আর ভগবান জানেন। দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা বুজতে পারিনি। ভাগ্যে পকেটে ঘড়িটা ছিল, তাই তো প্রাণ বেঁচে গেল—নইলে আমিও তো এতক্ষণ হাসপাতালে মড়ার টেবিলে শুয়ে থাকতাম—" আশুবাবু শিহরিয়া উঠিলেন—"এক রাত্রিতে আমার দশ বছর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে গেছে, মশায়। প্রাণ নিয়ে কোথায় পালাব, কি করে আত্মরক্ষা করব, সমস্ত রাত এই শুধু ভেবেছি। শেষ রাত্রে আপনার নাম মনে পড়ল, শুনেছিলাম আপনার আশ্চর্য ক্ষমতা, তাই ভোর না হতেই ছুটে এসেছি। বন্ধ গাড়িতে চড়ে এসেছি মশায়, হেঁটে আসতে সাহস হয়নি—কি জানি যদি—"

ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া আশুবাবুর স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল—"আপনি নিশ্চিন্ত হোন ; আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার আর কোন ভয় নেই। কাল আপনার একটা মস্ত ফাঁড়া গেছে সত্যি, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আমার কথা শুনে চলেন, তাহলে আপনার প্রাণের কোন আশঙ্কা থাকবে না।"

আশুবাবু দুই হাতে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন—"ব্যোমকেশবাবু, আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন, প্রাণ বাঁচান, আমি আপনাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেব।"

ব্যোমকেশ নিজের চেয়ারে ফিরিয়া বসিয়া মৃদুহাস্যে বলিল—"এ তো খুব ভাল কথা। সবসুদ্ধ তাহলে তিন হাজার হল—গভর্নমেন্টও দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে না ? কিন্তু সে পরের কথা, এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন। কাল যে সময় আপনার বুকে ধাক্কা লাগল ঠিক সেই সময় আপনি কোনও শব্দ শুনেছিলেন ?"

"কি রকম শব্দ ?"

"মনে করুন, মোটরের টায়ার ফাটার মত শব্দ।"

আশুবাবু নিঃসংশয়ে বলিলেন—"না।"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—"আর কোন রকম শব্দ ?"

"আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না।"

"ভেবে দেখুন।"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া আশুবাবু বলিলেন—"রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া চললে যে শব্দ হয়, সেই শব্দই শুনেছিলাম। আর মনে হচ্ছে যেন—যে সময় ধাক্কাটা লাগে, সেই সময় সাইক্লের ঘন্টির কিড়িং কিড়িং শব্দ শুনেছিলাম।"

"কোন রকম অস্বাভাবিক শব্দ শোনেননি ?"

"না।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ অন্য প্রশ্ন করিল—"আপনার এমন কোনও শত্রু আছে, যে আপনাকে খুন করতে পারে ?"

"না। অন্তত আমি জানি না।"

"আপনি বিবাহ করেননি, সুতরাং ছেলেপুলে নেই। ভাইপোই বোধ হয় আপনার ওয়ারিস ?"

একটু ইতস্তত করিয়া আশুবাবু বলিলেন—"না।"

"উইল করেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কার নামে সম্পত্তি উইল করেছেন ?"

আশুবাবুর গৌরবর্ণ মুখ ধীরে ধীরে রক্তাভ হইয়া উঠিতেছিল, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সঙ্কোচ-জড়িত স্বরে বলিলেন—"আমাকে আর সব কথা জিজ্ঞাসা করুন, শুধু ঐ প্রশ্নটি আমায় করবেন না। ওটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব কথা—প্রাইভেট—" বলিতে বলিতে অপ্রতিভভাবে থামিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আশুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া শেষে বলিল—"আচ্ছা থাক। কিন্তু আপনার ভাবী ওয়ারিস—তিনি যে-ই হোন—আপনার উইলের কথা জনেন কি ?"

"না। আমি আর আমার উকিল ছাড়া আর কেউ জানে না।"

"আপনার ওয়ারিসের সঙ্গে আপনার দেখা হয় ?"

চক্ষু অন্য দিকে ফিরাইয়া আশুবাবু বলিলেন—"হয়।"

"আপনার ভাইপো কতদিন হল জেলে গেছে ?"

আশুবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন—"তা প্রায় তিন হপ্তা হবে।"

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আজ তাহলে আপনি আসুন। আপনার ঠিকানা আর ঘড়িটা রেখে যান ; যদি কিছু জানবার দরকার হয়, আপনাকে খবর দেব।"

আশুবাবু শঙ্কিতভাবে বলিলেন—"কিন্তু আমার সম্বন্ধে তো কোন ব্যবস্থা করলেন না। ইতিমধ্যে যদি আবার—"

ব্যোমকেশ বলিল—"আপনার সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে, পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরুবেন না।"

আশুবাবু পাণ্ডুর মুখে বলিলেন—"বাড়িতে আমি একলা থাকি—যদি—"

ব্যোমকেশ বলিল—"না, বাড়িতে আপনার কোন আশঙ্কা নেই, সেখানে আপনি নিরাপদ। তবে ইচ্ছে হয়, একজন দারোয়ান রাখতে পারেন।"

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়ি থেকে একেবারে বেরুতে পাব না ?"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"একান্তই যদি রাস্তায় বেরুনো দরকার হয়ে পড়ে, ফুটপাথ দিয়ে যাবেন। কিন্তু খবরদার, রাস্তায় নামবেন না। রাস্তায় নামলে আপনার জীবন সম্বন্ধে আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না।"

আশুবাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ ললাট ভ্রূকুটি-কুটিল করিয়া বসিয়া রহিল। চিন্তা করিবার নূতন সূত্র সে অনেক পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আমি তাহার চিন্তায় বাধা দিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা নীরব থাকিবার পর সে মুখ তুলিয়া বলিল—"তুমি ভাবছ, আমি আশুবাবুকে পথে নামতে মানা করলুম কেন এবং বাড়িতে তিনি নিরাপদ, এ কথাই বা জানলুম কি করে ?"

চকিত হইয়া বলিলাম—"হ্যাঁ।"

ব্যোমকেশ বলিল—"গ্রামোফোন-পিন ব্যাপারে একটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ—সব হত্যাই রাস্তায় হয়েছে। ফুটপাথেও নয়। রাস্তার মাঝখানে। এর কারণ কি হতে পারে, ভেবে দেখেছ ?"

"না, কি কারণ ?"

"এর দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত, রাস্তায় খুন করলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম—যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেটা অসম্ভব বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়, রাস্তায় ছাড়া অন্যত্র তাকে ব্যবহার করা চলে না।"

আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এমন কি অস্ত্র হতে পারে ?"

ব্যোমকেশ বলিল—"তা যখন জানতে পারব, গ্রামোফোন-পিন রহস্য তখন আর রহস্য থাকবে না।"

আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসিয়াছিল, বলিলাম—"আচ্ছা, এমন কোন বন্দুক বা পিস্তল যদি কেউ তৈরি করে, যা দিয়ে গ্রামোফোন-পিন ছোঁড়া যায় ?"

সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"বুদ্ধি খেলিয়েছ বটে, কিন্তু তাতে দু' একটা বাধা আছে। যে ব্যক্তি বন্দুক কিম্বা পিস্তল দিয়ে খুন করতে চায়, সে বেছে বেছে রাস্তার মাঝখানে খুন করবে কেন ? সে তো নির্জন স্থানই খুঁজবে। বন্দুকের কথা ছেড়ে দিই, পিস্তল ছুঁড়লে যে আওয়াজ হয়, রাস্তার গোলমালেও সে আওয়াজ ঢাকা পড়ে না। তা ছাড়া বারুদের গন্ধ আছে। কথায় আছে—শব্দে শব্দ ঢাকে, গন্ধ ঢাকে কিসে ?"

আমি বলিলাম—"মনে কর, যদি এয়ার-গান হয় ?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল—"এয়ার-গান ঘাড়ে করে খুন করতে যাওয়ার পরিকল্পনায় নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু সুবুদ্ধির পরিচয় নেই।—না হে না, অত সহজ নয়। এর মধ্যে ভাববার বিষয় হচ্ছে, অস্ত্র যা-ই হোক ছোঁড়বার সময় তার একটা শব্দ হবেই, সে শব্দ ঢাকা পড়ে কি করে ?"

আমি বলিলাম—"তুমিই তো এখনি বলছিলে—শব্দে শব্দ ঢাকে—"

ব্যোমকেশ হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, অস্ফুট স্বরে কহিল—"ঠিক তো—ঠিক তো—"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"কি হল ?"

ব্যোমকেশ নিজের দেহটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া যেন চিন্তার মোহ ভাঙিয়া ফেলিল, বলিল—"কিছু না। এই গ্রামোফোন-পিন রহস্য নিয়ে যতই ভাবা যায়, ততই এই ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় যে, সব হত্যা এক সুতোয় গাঁথা। সবগুলোর মধ্যেই একটা অদ্ভুত মিল আছে, যদিও তা হঠাৎ চোখে পড়ে না।"

"কি রকম ?"

ব্যোমকেশ করাগ্রে গণনা করিতে করিতে বলিল—"প্রথমত দেখ, যাঁরা খুন হয়েছেন, তাঁরা সবাই যৌবনের সীমা অতিক্রম করেছিলেন। আশুবাবু—যিনি ঘড়ির কল্যাণে বেঁচে গেছেন—তিনিও প্রৌঢ়। তারপর দ্বিতীয় কথা, তাঁরা সকলেই অর্থবান লোক ছিলেন—হতে পারে কেউ বেশি ধনী কেউ কম ধনী, কিন্তু গরীব কেউ নয়। তৃতীয় কথা, সকলেই পথের মাঝখানে হাজার লোকের সামনে খুন হয়েছেন এবং শেষ কথা—এইটেই সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য—তাঁরা সবাই অপুত্রক—"

আমি বলিলাম—"তুমি তাহলে অনুমান কর যে—"

ব্যোমকেশ বলিল—"অনুমান এখনও আমি কিছুই করিনি। এগুলো হচ্ছে আমার অনুমানের ভিত্তি, ইংরাজিতে যাকে বলে premise."

আমি বলিলাম—"কিন্তু এই ক'টি premise থেকে অপরাধীদের ধরা—"

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"অপরাধীদের নয় অজিত, অপরাধীর। গৌরবে ছাড়া এখানে বহুবচন একেবারে অনাবশ্যক। খবরের কাগজওয়ালারা 'মার্ডারস্ গ্যাং' বলে যতই চীৎকার করুক, গ্যাং-এর মধ্যে কেবল একটি লোক আছেন। তিনিই এই নরমেধযজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক এবং যজমান। এক কথায়, পরব্রহ্মের মত ইনি, একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

আমি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"এ কথা তুমি কি করে বলতে পারো ? কোন প্রমাণ আছে ?"

ব্যোমকেশ বলিল—"প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু উপস্থিত একটা দিলেই যথেষ্ট হবে। এমন অব্যর্থ লক্ষ্যবেধ করবার শক্তি পাঁচজন লোকের কখনও সমান মাত্রায় থাকতে পারে ? প্রত্যেকটি পিন অব্যর্থভাবে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে—একটু উঁচু কিম্বা নীচু হয়নি। আশুবাবুর কথাই ধর, ঘড়িটি না থাকলে ঐ পিন কোথায় গিয়ে পৌঁছুত বল দেখি ? এমন টিপ কি পাঁচজনের হয় ? এ যেন চক্রছিদ্রপথে মৎস্য-চক্ষু বিদ্ধ করার মত,—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর মনে আছে তো ? ভেবে দেখ, সে কাজ একা অর্জুনই পেরেছিল, মহাভারতের যুগেও এমন অমোঘ নিশানা একজন বৈ দু'জনের ছিল না।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া পড়িল।

আমাদের এই বসিবার ঘরের পাশে আর একটা ঘর ছিল—সেটা ব্যোমকেশের নিজস্ব। এ ঘরে সে সকল সময় আমাকেও ঢুকিতে দিত না। বস্তুত এ ঘরখানা ছিল একাধারে তাহার লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, মিউজিয়ম ও গ্রীনরুম। আশুবাবুর ঘড়িটা তুলিয়া সেই ঘরটায় প্রবেশ করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল—"খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে এটার তত্ত্ব আহরণ করা যাবে। আপাতত স্নানের বেলা হয়ে গেছে।"

বৈকালে প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ব্যোমকেশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। কি কাজে গিয়াছিল, জানি না। যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; আমি তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, চায়ের সরঞ্জামও তৈয়ার ছিল, সে আসিতেই ভৃত্য টেবিলের উপর চা-জলখাবার দিয়া গেল। আমরা নিঃশব্দে জলযোগ সমাধা করিলাম। এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, ঐ কার্যটা একত্র না করিলে মনঃপূত হইত না।

একটা চুরুট ধরাইয়া, চেয়ারে ঠেসান দিয়া বসিয়া ব্যোমকেশ প্রথম কথা কহিল ; বলিল—"আশুবাবু লোকটিকে তোমার কেমন মনে হয় ?"

ঈষৎ বিস্মিতভাবে বলিলাম—"কেন বল দেখি ? আমার তো বেশ ভাল লোক বলেই মনে হয়—নিরীহ ভালমানুষ গোছের—"

ব্যোমকেশ বলিল—"আর নৈতিক চরিত্র ?"

আমি বলিলাম—"মাতাল ভাইপোর উপর যে রকম চটা, তাতে নৈতিক চরিত্র তো ভাল বলেই মনে হয়। তার ওপর বয়স্ক লোক। বিয়ে করেননি, যৌবনে যদি কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা করে থাকেন তো অন্য কথা ; কিন্তু এখন আর ওঁর সে সব করবার বয়স নেই।"

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল—"বয়স না থাকতে পারে, কিন্তু একটি স্ত্রীলোক আছে। জোড়াসাঁকোর যে গানের মজলিসে আশুবাবু নিত্য গানবাজনা করে থাকেন, সেটি ঐ স্ত্রীলোকের বাড়ি। স্ত্রীলোকের বাড়ি বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না, কারণ, বাড়ির ভাড়া আশুবাবুই দিয়ে থাকেন এবং গানের মজলিস বললেও বোধ হয় ভুল বলা হয়, যেহেতু দু'টি প্রাণীর বৈঠককে কোন মতেই মজলিস বলা চলে না।"

"বল কি হে ! বুড়োর প্রাণে তো রস আছে দেখছি।"

"শুধু তাই নয়, গত বারো তের বছর ধরে আশুবাবু এই নাগরিকাটির ভরণ-পোষণ করে আসছেন, সুতরাং তাঁর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। আবার অন্য পক্ষেও একনিষ্ঠতার অভাব নেই, আশুবাবু ছাড়া অন্য কোনও সঙ্গীত-পিপাসুর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই ; দরজায় কড়া পাহারা।"

উৎসুক হইয়া বলিলাম—"তাই না কি ? সঙ্গীত-পিপাসু সেজে ঢোকবার মতলব করেছিলে বুঝি ? নাগরিকাটির দর্শন পেলে ? কি রকম দেখতে শুনতে ?"

ব্যোমকেশ বলিল—"একবার চকিতের ন্যায় দেখা পেয়েছিলুম। কিন্তু রূপবর্ণনা করে তোমার মত কুমার-ব্রহ্মচারীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে চাই না। এক কথায়, অপূর্ব রূপসী। বয়স ছাব্বিশ

সাতাশ, কিন্তু দেখে মনে হয়, বড় জোর উনিশ কুড়ি। আশুবাবুর রুচির প্রশংসা না করে থাকা যায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তুমি হঠাৎ আশুবাবুর গুপ্ত জীবন সম্বন্ধে এত কৌতূহলী হয়ে উঠলে কেন?"

ব্যোমকেশ বলিল—"অপরিমিত কৌতূহল আমার একটা দুর্বলতা। তা ছাড়া, আশুবাবুর উইলের ওয়ারিস সম্বন্ধে মনে একটা খটকা লেগেছিল—"

"ইনিই তাহলে আশুবাবুর উত্তরাধিকারিণী?"

"সেই রকমই অনুমান হচ্ছে। সেখানে একটি ভদ্রলোকের দেখা পেলুম; ফিটফাট বাবু, বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, দ্রুতবেগে এসে দারোয়ানের হাতে একখানা চিঠি গুঁজে দিয়ে দ্রুতবেগে চলে গেলেন। কিন্তু ও কথা যাক্‌। বিষয়টা মুখরোচক বটে, কিন্তু লাভজনক নয়।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল।

বুঝিলাম, অবান্তর আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়া পাছে তাহার মন প্রকৃত অনুসন্ধানের পথ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, পাছে আশুবাবুর জীবনের গোপন ইতিহাস তাঁহার উপস্থিত বিপদ ও বিপন্মুক্তির সমস্যা অপেক্ষা বড় হইয়া উঠে, এই ভয়ে ব্যোমকেশও আলোচনাটা আর বাড়িতে দিল না। এমনিভাবেই যে মানুষের মন নিজের অজ্ঞাতসারে গৌণবস্তুকে মুখ্যবস্তু অপেক্ষা প্রধান করিয়া তুলিয়া শেষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা আমারও অজ্ঞাত ছিল না। আমি তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঘড়িটা থেকে কিছু পেলে?"

ব্যোমকেশ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্যে বলিল—"ঘড়ি থেকে তিনটি তত্ত্ব লাভ করেছি। এক—গ্রামোফোন পিনটি সাধারণ এডিসন্‌-মার্কা পিন, দুই—তার ওজন দু' রতি, তিন—আশুবাবুর ঘড়িটা একেবারে গেছে, আর মেরামত হবে না।"

আমি বলিলাম—"তার মানে দরকারী তথ্য কিছুই পাওনি।"

ব্যোমকেশ চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল—"তা বলতে পারি না। প্রথমত বুঝতে পেরেছি যে, পিন ছোঁড়বার সময় হত্যাকারী আর হত ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান সাত আট গজের বেশি হবে না। একটা গ্রামোফোন পিন এত হাল্‌কা জিনিস যে, সাত আট গজের বেশি দূর থেকে ছুঁড়লে অমন অব্যর্থ-লক্ষ্য হতে পারে না। অথচ হত্যাকারীর টিপ কি রকম অভ্রান্ত, তা তো দেখছ। প্রত্যেকবার তীর একেবারে মর্মস্থানে গিয়ে ঢুকেছে।"

আমি বিস্মিত অবিশ্বাসের সুরে বলিলাম—"সাত আট গজ দূর থেকে মেরেছে, তবু কেউ ধরতে পারলে না?"

ব্যোমকেশ বলিল—"সেইটেই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান প্রহেলিকা। ভেবে দেখ, খুন করবার পর লোকটা হয়তো দর্শকদের মধ্যেই ছিল, হয়তো নিজের হাতে তুলে মৃতদেহ স্থানান্তরিত করেছে; কিন্তু তবু কেউ বুঝতে পারলে না, কি করে সে এমনভাবে আত্মগোপন করলে?"

আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলাম—"আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, হত্যাকারী পকেটের ভিতর এমন একটা যন্ত্র নিয়ে বেড়ায়—যা থেকে গ্রামোফোন পিন ছোঁড়া যায়। তারপর তার শিকারের সামনে এসে পকেট থেকেই যন্ত্রটা ফায়ার করে। পকেটে হাত দিয়ে অনেকেই রাস্তায় চলে, সুতরাং কারু সন্দেহ হয় না।"

ব্যোমকেশ বলিল—"তা যদি হত, তাহলে ফুটপাথের ওপরেই তো কাজ সারতে পারত। রাস্তায় নামতে হয় কেন? তা ছাড়া, এমন কোন যন্ত্র আমার জানা নেই—যা নিঃশব্দে ছোঁড়া যায় অথচ তার নিক্ষিপ্ত গুলি একটা মানুষের শরীর ফুটো করে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছতে পারে। তাতে কতখানি শক্তির দরকার, ভেবে দেখেছ?"

আমি নিরুত্তর হইয়া রহিলাম। ব্যোমকেশ হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া ও করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; শেষে বলিল—"বুঝতে পারছি, এর একটা খুব সহজ সমাধান হাতের কাছেই রয়েছে, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না। যতবার ধরবার চেষ্টা করছি,

পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।”

রাত্রিকালে এ বিষয়ে আর কোনও কথা হইল না। নিদ্রার পূর্ব পর্যন্ত ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক ও বিমনা হইয়া রহিল। সমস্যার যে উত্তরটা হাতের কাছে থাকিয়াও তাহার যুক্তির ফাঁদে ধরা দিতেছে না, তাহারই পশ্চাতে তাহার মন যে ব্যাধের মত ছুটিয়াছে, তাহা বুঝিয়া আমিও তাহার একাগ্র অনুধাবনে বাধা দিলাম না।

পরদিন সকালে চিন্তাক্রান্ত মুখেই সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া এক পেয়ালা চা গলাধঃকরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘণ্টা তিনেক পরে যখন ফিরিল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—“কোথায় গিছলে ?”

ব্যোমকেশ জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে অন্যমনে বলিল—“উকিলের বাড়ি।” তাহাকে উন্মনা দেখিয়া আমি আর প্রশ্ন করিলাম না।

অপরাহ্লের দিকে তাহাকে কিছু প্রফুল্ল দেখিলাম। সমস্ত দুপুর সে নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাজ করিতেছিল ; একবার টেলিফোনে কাহার সহিত কথা কহিল, শুনিতে পাইলাম। প্রায় সাড়ে চারটের সময় সে দরজা খুলিয়া গলা বাড়াইয়া বলিল—“ওহে, কাল কি ঠিক হয়েছিল, ভুলে গেলে ? ‘পথের কাঁটা’র প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার সময় যে উপস্থিত।”

সত্যই ‘পথের কাঁটা’র কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল—“এস এস,.তোমার একটু সাজসজ্জা করে দিই। এমনি গেলে তো চলবে না।”

আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম—“চলবে না কেন ?”

ব্যোমকেশ একটা কাঠের কবাট-যুক্ত আলমারি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি টিনের বাক্স বাহির করিল। বাক্স হইতে ক্রেপ, কাঁচি, স্পিরিট-গাম ইত্যাদি বাছিয়া লইয়া বুরুশ দিয়া আমার মুখে স্পিরিট-গাম লাগাইতে লাগাইতে বলিল—“অজিত বন্দ্যো যে ব্যোমকেশ বক্সীর বন্ধু, এ খবর অনেক মহাত্মাই জানেন কিনা, তাই একটু সতর্কতা।”

মিনিট পনের পরে আমার অঙ্গসজ্জা শেষ করিয়া যখন ব্যোমকেশ ছাড়িয়া দিল, তখন আয়নার সম্মুখে গিয়া দেখি,—কি সর্বনাশ ! এ তো অজিত বন্দ্যো নয়, এ যে সম্পূর্ণ আলাদা লোক। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও ছুঁচোলো গোঁফ যে অজিত বন্দ্যোর কস্মিনকালেও ছিল না। বয়সও প্রায় দশ বছর বাড়িয়া গিয়াছে। রং বেশ একটু ময়লা। আমি ভীত হইয়া বলিলাম—“এই বেশে রাস্তায় বেরুতে হবে। যদি পুলিসে ধরে ?”

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল—“মা ভৈঃ ! পুলিসের বাবার সাধ্য নেই তোমাকে চিনতে পারে। বিশ্বাস না হয়, নীচের তলায় কোনও চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ। জিজ্ঞাসা কর—অজিতবাবু কোথায় থাকেন ?”

আমি আরও ভয় পাইয়া বলিলাম—“না না, তার দরকার নেই, আমি এমনই যাচ্ছি।”

বাহির হইবার সময় ব্যোমকেশ বলিল—“কি করতে হবে, তোমার তো জানাই আছে—শুধু ফেরবার সময় একটু সাবধানে এস, পেছু নিতে পারে।”

“সে সম্ভাবনাও আছে না কি ?”

“অসম্ভব নয়। আমি বাড়িতেই রইলুম, যত শীগ্‌গির পার, ফিরে এস।”

পথে বাহির হইয়া প্রথমটা ভারী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যখন দেখিলাম, আমার ছদ্মবেশ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে না তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম, একটু সাহসও হইল। মোড়ের একটা দোকানে আমি নিয়মিত পান খাইতাম, খোট্টা পানওয়ালা আমাকে দেখিলেই সেলাম করিত, সেখানে গিয়া সদর্পে পান চাহিলাম। লোকটা নির্বিকারচিত্তে পান দিয়া পয়সা কুড়াইয়া লইল, আমার পানে ভাল করিয়া দৃক্‌পাতও করিল না।

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয় বুঝিয়া ট্রামে চড়িলাম। এস্‌প্ল্যানেডে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হইলাম। মনের অবস্থা যদিও ঠিক অভিসারিকার মত নহে, তবু বেশ একটু কৌতুক ও উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিলাম।

কৌতুক কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না। যে পথে জনস্রোত জলস্রোতের মতই ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া থাকা সহজ ব্যাপার নহে। দুই চারিটা কনুই-এর গুঁতা নির্বিকারভাবে হজম করিলাম। অকারণে সঙ-এর মত ল্যাম্পপোস্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকায় অন্য বিপদও আছে। চৌমাথার উপর একটা সার্জেন্ট দাঁড়াইয়াছিল, সে সপ্রশ্নভাবে আমার দিকে দুই তিনবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এখনই হয়তো আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কেন দাঁড়াইয়া আছ ? কি করি, ফুটপাথের ধারেই হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের একটা প্রকাণ্ড কাচ-ঢাকা জানলায় নানাবিধ বিলাতি পণ্য সাজান ছিল, সেই দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। মনে ভাবিলাম, পাড়াগেঁয়ে ভূত মনে করে ক্ষতি নাই, গাঁটকাটা ভাবিয়া হাতে হাতকড়া না পরায় !

ঘড়িতে দেখিলাম, পাঁচটা পঞ্চাশ। কোনক্রমে আর দশটা মিনিট কাটাইতে পারিলে বাঁচা যায়। অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, মনটা নিজের পাঞ্জাবির পকেটের মধ্যে পড়িয়া রহিল। দুই একবার পকেটে হাত দিয়াও দেখিলাম, কিন্তু সেখানে নূতন কিছুই হাতে ঠেকিল না।

অবশেষে ছয়টা বাজিতেই একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ল্যাম্পপোস্ট পরিত্যাগ করিলাম। পকেট দু'টা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম, চিঠিপত্র কিছুই নাই। নিরাশার সঙ্গে সঙ্গে একটা স-মৎসর আনন্দও হইতে লাগিল, যাক্, ব্যোমকেশের অনুমান যে অভ্রান্ত নহে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। এইবার তাহাকে বেশ একটু খোঁচা দিতে হইবে। এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে এস্‌প্ল্যানেডের ট্রাম-ডিপোতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

"ছবি লিবেন, বাবু !"

কানের অত্যন্ত নিকটে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখি, লুঙ্গি-পরা নীচ শ্রেণীর একজন মুসলমান একখানা খাম আমার হাতে গুঁজিয়া দিতেছে। বিস্মিতভাবে খুলিতেই একখানা কুৎসিত ছবি বাহির হইয়া পড়িল। এরূপ ছবির ব্যবসা কলিকাতার রাস্তাঘাটে চলে জানিতাম ; তাই ঘৃণাভরে সেটা ফেরত দিতে গিয়া দেখি লোকটা নাই। সম্মুখে, পশ্চাতে, চারিদিকে চক্ষু ফিরাইলাম ; কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সেই লুঙ্গি-পরা লোকটাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

অবাক্ হইয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় একটি ছোট্ট হাসির শব্দে চমক ভাঙিয়া দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ গোছের ফিরিঙ্গি ভদ্রলোক আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমার দিকে না তাকাইয়াই তিনি পরিষ্কার বাঙলায় একান্ত পরিচিত কণ্ঠে বলিলেন—"চিঠি তো পেয়ে গেছ দেখছি, এবার বাড়ি যাও। একটু ঘুরে যেও। এখান থেকে ট্রামে বৌবাজারের মোড় পর্যন্ত যেও, সেখান থেকে বাসে করে হাওড়ার মোড় পর্যন্ত, তারপর ট্যাক্সিতে করে বাড়ি যাবে।"

সার্কুলার রোড়ের ট্রাম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সাহেব তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

আমি সমস্ত শহর মাড়াইয়া যখন বাড়ি ফিরিলাম, তখন ব্যোমকেশ আরাম-কেদারার উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া সিগার টানিতেছে। আমি তাহার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলাম—"সাহেব কখন এলে ?"

ব্যোমকেশ ধূম উদ্‌গীরণ করিয়া বলিল—"মিনিট কুড়ি।"

আমি বলিলাম—"আমার পেছু নিয়েছিলে কেন ?"

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিয়া বলিল—"যে কারণে নিয়েছিলুম, তা সফল হল না, এক মিনিট দেরি হয়ে গেল। —তুমি যখন ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়েছিলে, আমি তখন ঠিক তোমার পাঁচ হাত দূরে লেড্‌ল'র দোকানের ভিতর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সিল্কের মোজা পছন্দ করছিলুম। 'পথের কাঁটা'র ব্যাপারী বোধ হয় কিছু সন্দেহ করে থাকবে, বিশেষত তুমি যে-রকম ছটফট করছিলে আর দু'মিনিট অন্তর পকেটে হাত দিচ্ছিলে, তাতে সন্দেহ হবারই কথা। তাই সে তখন চিঠিখানা দিলে না। তুমি চলে যাবার পর আমিও দোকান থেকে বেরিয়েছি, মিনিট দুই-তিন দেরি হয়েছিল—তারি মধ্যে লোকটা কাজ হাসিল করে বেরিয়ে গেল। আমি যখন পৌঁছলুম, তখন তুমি খাম হাতে করে ইয়ের মত দাঁড়িয়ে আছ। —কি করে খাম পেলে ?"

কি করিয়া পাইলাম, তাহা বিবৃত করিলে পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—"লোকটাকে ভাল করে দেখেছিলে ? কিছু মনে আছে ?"

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম—"না। শুধু মনে হচ্ছে, তার নাকের পাশে একটা মস্ত আঁচিল ছিল।"

ব্যোমকেশ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—"সেটা আসল নয়—নকল। তোমার গোঁফ-দাড়ির মত। যাক, এখন চিঠিখানা দেখি, তুমি ইতিমধ্যে বাথরুমে গিয়ে তোমার দাড়ি-গোঁফ ধুয়ে এস।"

মুখের রোমবাহুল্য বর্জন করিয়া স্নান সারিয়া যখন ফিরিলাম, তখন ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। দুই হাত পিছনে দিয়া সে দ্রুতপদে ঘরে পায়চারি করিতেছে, তাহার মুখে চোখে এমন একটা প্রদীপ্ত উল্লাসের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা লাফাইয়া উঠিল। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—"চিঠিতে কি দেখলে ? কিছু পেয়েছ না কি ?"

ব্যোমকেশ উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"শুধু একটি কথা অজিত, একটি ছোট্ট কথা। কিন্তু এখন তোমাকে কিছু বলব না। হাওড়ার ব্রিজ কখনও খোলা অবস্থায় দেখেছ ? আমার মনের অবস্থা হয়েছিল ঠিক সেই রকম, দুই দিক্ থেকে পথ এসেছে, কিন্তু মাঝখানটিতে একটুখানি ফাঁক, একটি পনটুন খোলা। আজ সেই ফাঁকটুকু জোড়া লেগে গেছে।"

"কি করে জোড়া লাগল ? চিঠিতে কি আছে ?"

"তুমিই পড়ে দেখ।" বলিয়া ব্যোমকেশ খোলা কাগজখানা আমার হাতে দিল।

খামের মধ্যে কুৎসিত ছবিটা ছাড়া আর একখানা কাগজ ছিল, তাহা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু পড়িবার সুযোগ হয় নাই। এখন দেখিলাম, পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

"আপনার পথের কাঁটা কে ? তাহার নাম ও ঠিকানা কি ? আপনি কি চান, পরিষ্কার করিয়া লিখুন। কোনো কথা লুকাইবেন না। নিজের নাম স্বাক্ষর করিবার দরকার নাই। লিখিত পত্র খামে ভরিয়া আগামী রবিবার ১০ই মার্চ রাত্রি বারোটার সময় খিদিরপুর রেস্‌কোর্সের পাশের রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে যাইবেন। একটি লোক বাইসিক্ল চড়িয়া আপনার সম্মুখ দিক্ হইতে আসিবে, তাহার চোখে মোটর-গগ্‌ল দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আপনার পত্র হাতে লইয়া পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া থাকিবেন। বাইসিক্ল আরোহী আপনার হাত হইতে চিঠি লইয়া যাইবে। অতঃপর যথাসময়ে আপনি সংবাদ পাইবেন।

"পদব্রজে একাকী আসিবেন। সঙ্গী থাকিলে দেখা পাইবেন না।"

দুই তিনবার সাবধানে পড়িলাম। খুব অসাধারণ বটে এবং যৎপরোনাস্তি রোমান্টিক—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে ব্যোমকেশের অসম্বৃত আনন্দের কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ব্যাপার বল দেখি ! আমি তো এমন কিছু দেখছি না—"

"কিছু দেখতে পেলে না ?"

"অবশ্য তুমি কাল যা অনুমান করেছিলে, তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। লোকটার আত্মগোপন করবার চেষ্টার মধ্যে হয়তো কোন বদ মতলব থাকতে পারে। কিন্তু তা ছাড়া আর তো আমি কিছু দেখছি না।"

"হায় অন্ধ ! অতবড় জিনিসটা দেখতে পেলে না ?" ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গেল, বাহিরে সিঁড়িতে পদশব্দ হইল। ব্যোমকেশ ক্ষণকাল একাগ্রমনে শুনিয়া বলিল—"আশুবাবু। এ সব কথা ওঁকে বলবার দরকার নেই—" বলিয়া চিঠিখানা আমার হাত হইতে লইয়া পকেটে পুরিল।

আশুবাবু ঘরে প্রবেশ করিলে তাঁহার চেহারা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। একদিনের মধ্যে মানুষের চেহারা এতখানি পরিবর্তিত হইতে পারে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। মাথার চুল অবিন্যস্ত, জামা-কাপড়ের পারিপাট্য নাই, গালের মাংস ঝুলিয়া গিয়াছে, চোখের কোলে

কালি, যেন অকস্মাৎ কোন মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। কাল সদ্য মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইবার পরও তাঁহাকে এত অবসন্ন ম্রিয়মাণ দেখি নাই। তিনি একখানা চেয়ারে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—"একটা দুঃসংবাদ পেয়ে আপনাকে খবর দিতে এসেছি, ব্যোমকেশবাবু। আমার উকিল বিলাস মল্লিক পালিয়েছে।"

ব্যোমকেশ গম্ভীর অথচ সদয় কণ্ঠে কহিল—"সে পালাবে আমি জানতুম। সেই সঙ্গে আপনার জোড়াসাঁকোর বন্ধুটিও গেছেন, বোধহয় খবর পেয়েছেন ?"

আশুবাবু হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—"আপনি—আপনি সব জানেন ?"

ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে কহিল—"সমস্ত। কাল আমি জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলুম, বিলাস মল্লিককেও দেখেছি। বিলাস মল্লিকের সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকটির অনেক দিন থেকে ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র চলছিল—আপনি কিছুই জানতেন না। আপনার উইল তৈরি করবার পরই বিলাস উকিল আপনার উত্তরাধিকারিণীকে দেখতে যায়। প্রথমটা বোধহয় কৌতূহলবশে গিয়েছিল, তারপর ক্রমে—যা হয়ে থাকে। ওরা এতদিন সুযোগের অভাবেই কিছু করতে পারছিল না। আশুবাবু, আপনি দুঃখিত হবেন না, এ আপনার ভালই হল—অসৎ স্ত্রীলোক এবং কপট বন্ধুর ষড়যন্ত্র থেকে আপনি মুক্তি পেলেন। আর আপনার জীবনের কোনও ভয় নেই—এখন আপনি নির্ভয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন।"

আশুবাবু শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"তার মানে ?"

ব্যোমকেশ বলিল—"তার মানে, আপনি যা মনে মনে সন্দেহ করছেন অথচ বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই ঠিক। ওরাই দু'জনে আপনাকে হত্যা করবার মতলব করেছিল ; তবে নিজের হাতে নয়। এই কলকাতা শহরেই একজন লোক আছে—যাকে কেউ চেনে না, কেউ চোখে দেখেনি—অথচ যার নিষ্ঠুর অস্ত্র পাঁচজন নিরীহ নিরপরাধ লোককে পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে দিলে। আপনাকেও সরাতো, শুধু পরমায়ু ছিল বলেই আপনি বেঁচে গেলেন।"

আশুবাবু বহুক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, শেষে মর্মন্তুদ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"বুড়ো বয়সে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি, কাউকে দোষ দেবার নেই! —আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করেছিলাম, তারপর হঠাৎ পদস্খলন হয়ে গেল। একদিন দেওঘরে তপোবন দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলাম। বিবাহে আমার চিরদিনের অরুচি, কিন্তু তাকে বিবাহ করবার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম। শেষে একদিন জানতে পারলাম, সে বেশ্যার মেয়ে। বিবাহ হল না, কিন্তু তাকে ছাড়তেও পারলাম না। কলকাতায় এনে বাড়ি ভাড়া করে রাখলাম। সেই থেকে এই বারো তের বছর তাকে স্ত্রীর মতই দেখে এসেছি। তাকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলুম, সে তো আপনি জানেন। ভাবতাম, সেও আমাকে স্বামীর মত ভালবাসে—কোনও দিন সন্দেহ হয়নি! বুঝতে পারিনি যে, পাপের রক্তে যার জন্ম, সে কখনও সাধ্বী হতে পারে না!—যাক, বুড়ো বয়সে যে শিক্ষা পেলাম, হয়তো পরজন্মে কাজে লাগবে।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওরা—তারা কোথায় গিয়েছে, আপনি জানেন কি ?"

ব্যোমকেশ বলিল—"না। আর সে জেনেও কোন লাভ নেই। নিয়তি তাদের যে পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে পথে আপনি যেতে পারবেন না। আশুবাবু, আপনার অপরাধ সমাজের কাছে হয়তো নিন্দিত হবে, কিন্তু আমি আপনাকে চিরদিন শ্রদ্ধা করব জানবেন। মনের দিক থেকে আপনি খাঁটি আছেন, কাদা ঘেঁটেও আপনি নির্মল থাকতে পেরেছেন এইটেই আপনার সবচেয়ে বড় প্রশংসার কথা। এখন আপনার খুবই আঘাত লেগেছে, এ রকম বিশ্বাসঘাতকতায় কার না লাগে ? কিন্তু ক্রমে বুঝবেন, এর চেয়ে ইষ্ট আপনার আর কিছু হতে পারত না।"

আশুবাবু আবেগপূর্ণ স্বরে কহিলেন—"ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক

ছোট, কিন্তু আপনার কাছে আমি যে সান্ত্বনা পেলাম, এ আমি কোথাও প্রত্যাশা করিনি। নিজের লজ্জাকর পাপের ফল যে ভোগ করে, তাকে কেউ সহানুভূতি দেখায় না, তাই তার প্রায়শ্চিত্ত এত ভয়ঙ্কর। আপনার সহানুভূতি পেয়ে আমার অর্ধেক বোঝা হালকা হয়ে গেছে। আর বেশি কি বল্‌ব, চিরদিনের জন্য আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।"

আশুবাবু বিদায় লইবার পর তাহার অদ্ভুত ট্র্যাজেডির ছায়ায় মনটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। শয়নের পূর্বে ব্যোমকেশকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম—"আশুবাবুকে খুন করবার চেষ্টার পেছনে যে বিলাস উকিল আর ঐ স্ত্রীলোকটা আছে, এ কথা তুমি কবে জান্‌লে?"

ব্যোমকেশ কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইয়া বলিল—"কাল বিকেলে।"

"তবে পালাবার আগে তাদের ধরলে না কেন?"

"ধরলে কোন লাভ হত না, তাদের অপরাধ কোনও আদালতে প্রমাণ হত না।"

"কিন্তু তাদের কাছ থেকে আসল হত্যাকারী গ্রামোফোন পিনের আসামীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারত।"

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"তা যদি সম্ভব হত, তাহলে আমি নিজে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করতুম না।"

"তুমি তাদের তাড়িয়েছ?"

"হ্যাঁ। আশুবাবু দৈবক্রমে বেঁচে যাওয়াতে তারা উড়ু উড়ু করছিলই, আমি আজ সকালে বিলাস উকিলের বাড়ি গিয়ে ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলুম যে আমি অনেক কথাই জানি, যদি এই বেলা সরে না পড়েন তো হাতে দড়ি পড়বে। বিলাস উকিল বুদ্ধিমান লোক, সন্ধ্যার গাড়িতেই বামাল সমেত নিরুদ্দেশ হলেন।"

"কিন্তু ওদের তাড়িয়ে তোমার লাভ কি হল?"

ব্যোমকেশ একটা হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"লাভ এমন কিছু নয়, কেবল একটু দুষ্টের দমন করা গেল। বিলাস উকিল শুধু-হাতে নিরুদ্দেশ হবার লোক নন, মক্কেলের টাকাকড়ি যা তাঁর কাছে ছিল সমস্তই সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং এতক্ষণে বোধ করি, বর্ধমানের পুলিস তাঁকে হাজতে পুরেছে—আগে থাকতেই তারা খবর জানত কি না! যা হোক, বিলাসচন্দ্রের দু' বচ্ছর সাজা কেউ ঠেকাতে পারবে না। যদিও ফাঁসিই তার উচিত শাস্তি, তবু তা যখন উপস্থিত দেওয়া যাচ্ছে না, তখন দু'বচ্ছরই বা মন্দ কি?"

পরদিন প্রাতঃকালে একজন অপরিচিত আগন্তুক দেখা করিতে আসিল।

সবেমাত্র চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিয়া খবরের কাগজখানা খুলিবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময় দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সচকিত হইয়া বলিল—"কে? ভেতরে আসুন।"

একটি ভদ্রবেশধারী সুশ্রী যুবক প্রবেশ করিল। দাড়ি-গোঁফ কামানো, একহারা ছিপছিপে গড়ন, বয়স ত্রিশের মধ্যেই—চেহারা দেখিলে মনে হয়, একজন অ্যাথ্‌লেট। সম্মুখে আমাদের দেখিয়া স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া বলিল—"কিছু মনে করবেন না, সকালবেলাই বিরক্ত করতে এলাম। আমার নাম প্রফুল্ল রায়—আমি একজন বীমা কোম্পানির এজেন্ট।" বলিয়া অনাহূতভাবেই একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

ব্যোমকেশ বিরস স্বরে বলিল—"আমাদের জীবনবীমা করবার মত পয়সা নেই।"

প্রফুল্ল রায় হাসিয়া উঠিল। এক একজন লোক আছে, যাহাদের মুখ দেখিতে বেশ সুশ্রী, কিন্তু হাসিলেই মুখের চেহারা বদলাইয়া যায়। দেখিলাম, প্রফুল্ল রায়েরও তাহাই হইল। লোকটি বোধ হয় অতিরিক্ত পানখোর, কারণ, দাঁতগুলো পানের রসে রক্তাক্ত হইয়া আছে। সুন্দর মুখ এত সহজে এমন বিকৃত হইতে পারে দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়।

প্রফুল্ল রায় হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি বীমা কোম্পানির লোক বটে, কিন্তু ঠিক বীমার

কাজে আপনাদের কাছে আসিনি। অবশ্য আজকাল আমাদের আসতে দেখলে আত্মীয়-স্বজনরাও দোরে খিল দিতে আরম্ভ করেছেন ; নেহাৎ দোষ দেওয়াও যায় না। কিন্তু আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন, উপস্থিত আমার কোনও দুরভিসন্ধি নেই।—আপনারই নাম তো ব্যোমকেশবাবু !—বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ? আপনার কাছে একটু প্রাইভেট পরামর্শ নিতে এসেছি, মশায়। যদি আপত্তি না থাকে—"

ব্যোমকেশ বেজারভাবে মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল—"পরামর্শ নিতে হলে অগ্রিম কিছু দর্শনী দিতে হয়।"

প্রফুল্ল রায় তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"আমার কথা অবশ্য গোপনীয় কিছু নয়, তবু—" বলিয়া অর্থপূর্ণভাবে আমার পানে চাহিল।

আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া ব্যোমকেশ বেশ একটু কড়া সুরে বলিল—"উনি আমার সহকারী এবং বন্ধু। যা বলবেন, ওঁর সামনেই বলুন।"

প্রফুল্ল রায় বলিল—"বেশ তো, বেশ তো। উনি যখন আপনার সহকারী, তখন আর আপত্তি কিসের ? আপনার নামটি—? মাফ করবেন অজিতবাবু, আপনি যে ব্যোমকেশবাবুর বন্ধু, তা আমি বুঝতে পারিনি। আপনি ভাগ্যবান্ লোক মশায়, সর্বদা এত বড় একজন ডিটেক্‌টিভের সঙ্গে সঙ্গে থাকা, কত রকম বিচিত্র crime-এর মর্মোদ্ঘাটনে সাহায্য করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আপনার জীবনের একটা মুহূর্তও বোধ হয় dull নয় ! আমার এক এক সময় মনে হয়, এই একঘেয়ে বীমার কাজ ছেড়ে আপনার মত জীবন যাপন করতে যদি পারতাম—" বলিয়া পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির করিয়া একটা পান মুখে দিল।

ব্যোমকেশ ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—"এইবার আপনার পরামর্শের বিষয়টা যদি প্রকাশ করে বলেন—তাহলে সব দিক্ দিয়েই সুবিধে হয়।"

প্রফুল্ল রায় তাড়াতাড়ি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—"এই যে বলি।—আমি বীমা কোম্পানির এজেন্ট, তা তো আগেই শুনেছেন। বম্বের জুয়েল ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানির তরফ থেকে আমি কাজ করি। কোম্পানির হয়ে দশ বারো লাখ টাকার কাজ আমি করেছি, তাই কোম্পানি খুশি হয়ে আমাকে কলকাতার অফিসের চার্জ দিয়ে পাঠিয়েছেন। গত আট মাস আমি স্থায়িভাবে কলকাতাতেই আছি।

"প্রথম মাস দুই বেশ কাজ চালিয়েছিলাম মশাই, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এক আপদ এসে জুটল। কারুর নাম করবার দরকার নেই, কিন্তু অন্য বীমা কোম্পানির একটা লোক আমার পেছনে লাগল। চুনোপুঁটির কারবার আমি করি না, দু' চার হাজারের কাজ আমার অধীনস্থ এজেন্টরাই করে, কিন্তু বড় বড় খদ্দেরের বেলা আমি নিজে কাজ করি। এই লোকটা আমার বড় বড় খদ্দের—ভাল ভাল লাইফ—ভাঙাতে আরম্ভ করলে। আমি যেখানে যাই, আমার পেছু পেছু সে-ও সেখানে গিয়ে হাজির হয়—কোম্পানির নামে নানারকম দুর্নাম দিয়ে খদ্দের ভড়কে দেয়। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, বড় বড় লাইফগুলো আমার হাত থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল।

"এইভাবে চার পাঁচ মাস কাটল। কোম্পানি থেকে তাগাদা আসতে লাগল, কিন্তু কি করব, কেমন করে লোকটার হাত থেকে ব্যবসা বাঁচাব, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। মামলা-মোকদ্দমা করাও সহজ নয়—তাতে কোম্পানির ক্ষতি হয়। অথচ ছিনে জোঁক পেছনে লেগেই আছে। আরও মাসখানেক কেটে গেল, লোকটাকে জব্দ করবার কোনও উপায়ই ভেবে পেলাম না।"

প্রফুল্ল রায় মনিব্যাগ হইতে সযত্নে রক্ষিত দু'টি চিরকুট বাহির করিয়া ছোট টুকরাটি ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল—"দিন বারো চোদ্দ আগে এই বিজ্ঞাপনটি হঠাৎ চোখে পড়ল। আপনার নজরে বোধহয় পড়েনি, পড়বার কথাও নয় ! কিন্তু পাঁচ লাইনের বিজ্ঞাপন হলে কি হয় মশাই, পড়বামাত্র আমার প্রাণটা লাফিয়ে উঠল ! পথের কাঁটা আর কাকে বলে ? ভাবলাম, দেখি

তো আমার পথের কাঁটা উদ্ধার হয় কি না ! মনের তখন এমনই অবস্থা যে, স্বপ্নাদ্য মাদুলী হলেও বোধ করি আপত্তি করতাম না ।”

গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, এ সেই পথের কাঁটার বিজ্ঞাপনের কাটিং। প্রফুল্ল রায় বলিল—“পড়লেন তো ? বেশ মজার নয় ? যা হোক, আমি তো নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ গত শনিবারের আগের শনিবার—কদমতলায় কেষ্ট ঠাকুরের মত ল্যাম্পপোস্ট ধরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে অস্বস্তির কথা আর কি বলব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেল, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা—কোথাও কেউ নেই। ডিস্‌গাস্‌টেড হয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখি, পকেটে একখানা চিঠি !”

দ্বিতীয় কাগজখানা ব্যোমকেশকে দিয়া বলিল—“এই দেখুন সে চিঠি।”

ব্যোমকেশ চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল, আমি উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া দেখিলাম—ঠিক আমার পত্রেরই অনুরূপ, কেবল রবিবারের পরিবর্তে আগামী সোমবার ১১ই মার্চ রাত্রি বারোটার সময় সাক্ষাৎ করিবার নির্দেশ আছে।

প্রফুল্ল রায় একটু থামিয়া চিঠিখানা পড়িবার অবকাশ দিয়া বলিতে লাগিল—“একে তো পকেটে চিঠি এল কি করে, ভেবেই পেলাম না, তার ওপর চিঠি পড়ে অজানা আতঙ্কে ভেতরটা কেঁপে উঠল। আমি মিস্ট্রি ভালবাসি না মশাই, কিন্তু এ চিঠির যেন আগাগোড়াই মিস্ট্রি। যেন কি একটা ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি এর মধ্যে লুকোনো রয়েছে। নইলে সব তাতেই এত লুকোচুরি কেন ? লোকটা কে, কি রকম প্রকৃতি, কিছুই জানি না, তার চেহারাও দেখিনি, অথচ সে আমাকে রাত দুপুরে একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে একলা যেতে বলেছে। ভয়ঙ্কর সন্দেহের কথা নয় কি ? আপনিই বলুন তো ?”—বলিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি উত্তর দিবার পূর্বেই ব্যোমকেশ বলিল—“উনি কি মনে করেন সে প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন ! আপনি কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান, তাই বলুন।”

প্রফুল্ল রায় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—“সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি। চিঠির লেখককে চিনি না অথচ তার ভাবগতিক দেখে সন্দেহ হয়, লোক ভাল নয়। এ রকম অবস্থায় চিঠির উত্তর নিয়ে আমার যাওয়া উচিত হবে কি ? আমি নিজে গত দশ বারো দিন ধরে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারিনি ; অথচ যেতে হলে মাঝে আর একটি দিন বাকী। তাই কি করব ঠিক করতে না পেরে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।”

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—“দেখুন, আজ আমি আপনাকে কোনও পরামর্শ দিতে পারলুম না। আপনি এই কাগজ দু'খানা রেখে যান, এখনও যথেষ্ট সময় আছে, কাল সকালে বিবেচনা করে আমি আপনাকে যথাকর্তব্য বলে দেব।”

প্রফুল্ল রায় বলিল—“কিন্তু কাল সকালে তো আমি আসতে পারব না, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। আজ রাত্রে সুবিধে হবে না কি ? মনে করুন, আটটা কি ন'টার সময় যদি আসি ?”

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল—“না, আজ রাত্রে আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকব—আমাকেও এক জায়গায় যেতে হবে—” বলিয়া ফেলিয়াই সচকিতে প্রফুল্ল রায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—“কিন্তু আপনার ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই, কাল বিকেলে চারটে সাড়ে চারটের সময় এলেও যথেষ্ট সময় থাকবে।”

“বেশ, তাই আসব—” পকেট হইতে আবার ডিবা বাহির করিয়া দু'টা পান মুখে পুরিয়া ডিবাটা আমাদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—“পান খান কি ? খান না !—আমরা এক একটা বদ্ অভ্যাস কিছুতেই ছাড়তে পারি না ; ভাত না খেলেও চলে, কিন্তু পানের অভাবে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। আচ্ছা—আজ উঠি তাহলে, নমস্কার।”

আমরা প্রতিনমস্কার করিলাম। দ্বার পর্যন্ত গিয়া রায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“পুলিসে এ বিষয়ে খবর দিলে কেমন হয় ? আমার তো মনে হয়, পুলিস যদি তদন্ত করে লোকটার নামধাম বিবরণ বের করতে পারে।”

ব্যোমকেশ হঠাৎ মহা খাপ্পা হইয়া বলিল—“পুলিসের সাহায্য যদি নিতে চান, তাহলে আমার কাছে কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করবেন না। আমি আজ পর্যন্ত পুলিসের সঙ্গে কাজ করিনি, করবও না।—এই নিয়ে যান আপনার টাকা।” বলিয়া টেবিলের উপর নোটখানা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

“না না, আমি আপনার মতামত জানতে চেয়েছিলাম মাত্র। তা আপনার যখন মত নেই, আচ্ছা, আসি তাহলে—” বলিতে বলিতে প্রফুল্ল রায় দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

প্রফুল্ল রায় চলিয়া গেলে ব্যোমকেশও নোটখানা তুলিয়া লইয়া নিজের লাইব্রেরি ঘরে ঢুকিল, তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সে মাঝে মাঝে অকারণে খিটখিটে হইয়া উঠে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ একাকী থাকিবার পর সেভাব আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়, তাহা আমি জানিতাম। তাই মনটা বহু প্রশ্ন-কন্টকিত হইয়া থাকিলেও অপঠিত সংবাদপত্রখানা তুলিয়া তাহাতে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলাম।

কয়েক মিনিট পরে শুনিতে পাইলাম, ব্যোমকেশ পাশের ঘরে কথা কহিতেছে। বুঝিলাম, কাহাকেও টেলিফোন করিতেছে। দু' একটা ইংরাজি শব্দ কানে আসিল; কিন্তু কাহাকে টেলিফোন করিতেছে, ধরিতে পারিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্তা চলিল, তারপর দরজা খুলিয়া ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। চাহিয়া দেখিলাম, তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—“কাকে ফোন করলে?”

সে-কথার উত্তর না দিয়া ব্যোমকেশ বলিল—“কাল এস্‌প্ল্যানেড থেকে ফেরবার সময় একজন তোমার পিছু নিয়েছিল জানো?”

আমি চকিত হইয়া বলিলাম—“না! নিয়েছিল না কি?”

ব্যোমকেশ বলিল—“নিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটার কি অসীম দুঃসাহস, আমি শুধু তাই ভাবছি।” বলিয়া নিজের মনেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

আমাকে অনুসরণ করার মধ্যে এত বড় দুঃসাহসিকতা কি আছে, তা বুঝিলাম না; কিন্তু ব্যোমকেশের কথা মাঝে মাঝে এমন দুরূহ হেঁয়ালির মত হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহার অর্থবোধের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। অথচ এ বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করাও বৃথা, সময় উপস্থিত না হইলে সে কিছুই বলিবে না। তাই আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্নানাদির জন্য উঠিয়া পড়িলাম।

দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যাবেলাটা ব্যোমকেশ নিষ্কর্মার মত বসিয়াই কাটাইয়া দিল। প্রফুল্ল রায় সম্বন্ধে দু' একটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে শুনিতেই পাইল না, চেয়ারে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল; শেষে চমকিয়া উঠিয়া বলিল—“প্রফুল্ল রায়? ও, আজ সকালে যিনি এসেছিলেন? না, তাঁর সম্বন্ধে এখনও কিছু ভেবে দেখিনি।”

রাত্রিকালে আহারাদির পর নীরবে বসিয়া ধূমপান চলিতেছিল; ঘড়িতে ঠং করিয়া সাড়ে দশটা বাজিতেই ব্যোমকেশ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—“উঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল—এবার সাজসজ্জার আয়োজন আরম্ভ করা যাক, নইলে অভিসারিকাদের সঙ্কেতস্থলে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।”

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—“সে আবার কি?”

ব্যোমকেশ বলিল—“বাঃ, ‘পথের কাঁটা’র নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে, মনে নেই?”

আমি আশঙ্কায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—“মাফ কর। এই রাত্রে একলা আমি সেখানে যেতে পারব না। যেতে হয়, তুমি যাও।”

“আমি তো যাবই, তোমারও যাওয়া চাই।”

“কিন্তু না গেলেই কি নয়? ‘পথের কাঁটা’র সম্বন্ধে এত মিথ্যে কৌতূহল কেন? তার চেয়ে যদি গ্রামোফোন পিনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে, তাহলে যে ঢের কাজ হত।”

“হয়তো হত। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কৌতূহল চরিতার্থ করলেই বা মন্দ কি? গ্রামোফোন

পিন তো আর পালাচ্ছে না। তা ছাড়া কাল প্রফুল্ল রায় পরামর্শ নিতে আসবে, তাকে পরামর্শ দেবার মত কিছু খবর তো চাই।"

"কিন্তু দু'জনে গেলে তো হবে না। চিঠিতে যে মাত্র একজনকে যেতে বলেছে।"

"তার ব্যবস্থা আমি করেছি। এখন ওঘরে চল, সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হয়ে আসছে।"

লাইব্রেরিতে লইয়া গিয়া ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রহস্তে আমার মুখসজ্জা করিয়া দিল। দেয়ালে লম্বিত দীর্ঘ আয়নাটায় উঁকি মারিয়া দেখিলাম, সেই গোঁফ এবং ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ইন্দ্রজাল প্রভাবে ফিরিয়া পাইয়াছি, কোথাও এতটুকু তফাৎ নাই। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যোমকেশ নিজের বেশভূষা আরম্ভ করিল ; মুখের কোনও পরিবর্তন করিল না, দেরাজ হইতে কালো রঙের সাহেবী পোশাক বাহির করিয়া পরিধান করিল, পায়ে কালো রবার-সোল জুতা পরিল। তারপর আমাকে আয়নার সম্মুখে পাঁচ ছয় হাত দূরে দাঁড় করাইয়া নিজে আমার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আয়নায় আমাকে দেখতে পাচ্ছ ?"

"না।"

"বেশ। এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাও—এবার দেখতে পেলে ?"

"না।"

"ব্যস্—কাম ফতে। এখন শুধু একটি পোশাক পরতে বাকী আছে।"

"আবার কি ?"

ঘরে ঢুকিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ব্যোমকেশের টেবিলের উপর দু'টি চীনামাটির প্লেট রাখা আছে—হোটেলে যেরূপ আকৃতির প্লেটে মটন্ চপ খাইতে দেয়, সেইরূপ। সেই প্লেট একখানা ব্যোমকেশ আমার বুকের উপর উপুড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া চওড়া ন্যাকড়ার ফালি দিয়া শক্তভাবে বাঁধিয়া দিল। বলিল—"সাবধান, খসে না যায়। ওর ওপর কোট পরলেই আর কিছু দেখা যাবে না।"

আমি ঘোর বিস্ময়ে বলিলাম—"এ সব কি হচ্ছে ?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল—"কঞ্চুকী না পরলে চলবে কেন। ভয় নেই, আমিও পরছি।"

দ্বিতীয় প্লেটখানা ব্যোমকেশ নিজের ওয়েস্টকোটের ভিতরে পরিয়া বোতাম লাগাইয়া দিল, বাঁধিবার প্রয়োজন হইল না।

এইরূপে বিচিত্র প্রসাধন শেষ করিয়া রাত্রি এগারটা কুড়ি মিনিটের সময় আমরা বাহির হইলাম। দেরাজ হইতে কয়েকটা জিনিস পকেটে পুরিতে পুরিতে ব্যোমকেশ বলিল—"চিঠি নিয়েছ ? কি সর্বনাশ, নাও নাও, শীগ্‌গির একখানা সাদা খামের মধ্যে পুরে নাও—"

শিয়ালদহের মোড়ের উপর একটা খালি ট্যাক্সি পাইয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। পথ জন-বিরল, দোকান-পাট প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের ট্যাক্সি নির্দেশমত হু হু করিয়া চৌরঙ্গীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

কালীঘাট ও খিদিরপুরের ট্রাম-লাইন যেখানে বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানে ট্যাক্সি হইতে নামিলাম। ট্যাক্সি-চালক ভাড়া লইয়া হর্ন বাজাইয়া চলিয়া গেল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, প্রশস্ত রাজপথের উপর কোথাও একটি লোক নাই, চতুর্দিকে অসংখ্য উজ্জ্বল দীপ যেন এই প্রাণহীন নিস্তব্ধতাকে ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। ঘড়িতে তখনও বারোটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী।

কি করিতে হইবে, গাড়িতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া লইয়াছিলাম। সুতরাং কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না। আমি আগে আগে চলিলাম, ব্যোমকেশ ছায়ার মত আমার পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার কালো পরিচ্ছদ ও শব্দহীন জুতা আমার কাছেও যেন তাহাকে কায়াহীন করিয়া তুলিল। আমার পায়ের সঙ্গে পা মিলাইয়া সে আমার ঠিক ছয় ইঞ্চি পশ্চাতে চলিয়াছে, তবু মনে হইল, যেন আমি একাকী। রাস্তার আলো অতি বিস্তৃত পথকে আলোকিত করিয়াছে বটে, কিন্তু সে আলো খুব স্পষ্ট ও তীব্র নহে। পথের দুই পাশে প্রাসাদ থাকিলে আলো

প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বলতর হয়, এখানে তাহা হইতেছে না। দুই দিকের শূন্যতা যেন আলোর অর্ধেক তেজ গ্রাস করিয়া লইতেছে।

এই অবস্থায় সম্মুখ হইতে আসিয়া কাহারও সাধ্য নাই যে বুঝিতে পারে, আমি একা নহি, আমার পশ্চাতে আর একটি অন্ধকার মূর্তি নিঃশব্দে চলিয়াছে।

পাশের ট্রাম-লাইনে ট্রামের যাতায়াত বহু পূর্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এ দিকে রেস্‌কোর্সের সাদা রেলিং একটানা ভাবে চলিয়াছে। আমি রাস্তার মাঝখান ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। দূরে পশ্চাতে একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া মধ্যরাত্রি ঘোষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শহরের অন্য ঘড়িগুলোও বাজিতে আরম্ভ করিল, মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা নানা প্রকার সুমিষ্ট শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

ঘড়ির শব্দ মিলাইয়া যাইবার পর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"এইবার চিঠিখানা হাতে নাও।"

ব্যোমকেশ যে পিছনে আছে, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। চমকিয়া পকেট হইতে খামখানা বাহির করিয়া হাতে লইলাম।

আরও ছয় সাত মিনিট চলিলাম। খিদিরপুর পুল পৌঁছিতে তখনও প্রায় অর্ধেক পথ বাকী আছে, এমন সময় সম্মুখে বহু দূরে একটা ক্ষীণ আলোকবিন্দু দেখিয়া সচকিত হইয়া উঠিলাম। কানের কাছে শব্দ হইল—"আসছে—তৈরি থাকো।"

আলোকবিন্দু উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। মিনিটখানেকের মধ্যে দেখা গেল, পিচঢালা কালো রাস্তার উপর কৃষ্ণতর একটা বস্তু দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বাইসিক্ল-আরোহীর মূর্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমি দাঁড়াইয়া পড়িয়া খামসমেত হাতখানা পাশের দিকে বাড়াইয়া দিলাম। সম্মুখে বাইসিক্লের গতিও মন্থর হইল।

রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বাইসিক্ল পঁচিশ গজের মধ্যে আসিল; তখন দেখিতে পাইলাম, কালো স্যুটপরিহিত আরোহী সম্মুখে ঝুঁকিয়া মোটর-গগ্‌লের ভিতর দিয়া আমাকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখিতেছে।

মধ্যম-গতিতে সাইক্ল যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের মধ্যে যখন আর দশ গজ মাত্র ব্যবধান, তখন কড়াং কড়াং করিয়া সাইক্লের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বুকে দারুণ ধাক্কা খাইয়া আমি প্রায় উল্টাইয়া পড়িয়া গেলাম। আমার বুকে বাঁধা প্লেটটা শত খণ্ডে ভাঙিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিলাম।

তারপর নিমেষের মধ্যে একটা কাণ্ড হইয়া গেল। আমি টলিয়া পড়িতেই ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে সম্মুখদিকে লাফাইয়া পড়িল। বাইসিক্ল-আরোহী আমার পশ্চাতে আর একটা লোকের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তবু সে পাশ কাটাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ব্যোমকেশ তাহাকে এক ঠেলায় বাইসিক্ল সমেত ফেলিয়া দিয়া বাঘের মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল।

আমি মাটি হইতে উঠিয়া ব্যোমকেশের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সে প্রতিপক্ষের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং দুই বজ্রমুষ্টিতে তাহার দুই কব্জি ধরিয়া আছে। বাইসিক্লখানা একধারে পড়িয়া আছে।

আমি পৌঁছিতেই ব্যোমকেশ বলিল—"অজিত, আমার পকেট থেকে সিল্কের দড়ি বার করে এর হাত দুটো বাঁধো—খুব জোরে।"

লিকলিকে সরু রেশমের দড়ি ব্যোমকেশের পকেট হইতে বাহির করিয়া ভূপতিত লোকটার হাত দুটো শক্ত করিয়া বাঁধিলাম। ব্যোমকেশ বলিল—"ব্যস্, হয়েছে। অজিত, ভদ্রলোকটিকে চিন্‌তে পারছ না? ইনি আমাদের সকালবেলার বন্ধু প্রফুল্ল রায়! আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় যদি চাও, ইনিই গ্রামোফোন পিন রহস্যের মেঘনাদ!" বলিয়া তাহার চোখের গগ্‌ল খুলিয়া লইল।

অতঃপর আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু সেই অবস্থাতে

থাকিয়াও প্রফুল্ল রায় হিংস্র দন্তপংক্তি বাহির করিয়া হাসিল, বলিল—"ব্যোমকেশবাবু, এবার আমার বুকের উপর থেকে নেমে বসতে পারেন, আমি পালাব না।"

ব্যোমকেশ বলিল—"অজিত, এর পকেটগুলো ভাল করে দেখে নাও তো অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে কি না।"

এক পকেট হইতে অপেরা গ্লাস ও অন্য পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির হইল, আর কিছুই নাই। ডিবা খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে তখনও গোটা চারেক পান রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বুকের উপর হইতে নামিলে প্রফুল্ল রায় উঠিয়া বসিল, ব্যোমকেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। কারণ, আমি আপনার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু আপনি করেননি। শত্রুর শক্তিকে তুচ্ছ করতে নেই, এ শিক্ষা একটু দেরিতে পেলাম, কাজে লাগাবার ফুরসত হবে না।" বলিয়া ক্লিষ্টভাবে হাসিল।

ব্যোমকেশ নিজের বুক-পকেট হইতে একটা পুলিস হুইস্‌ল বাহির করিয়া তাহাতে ফুঁ দিল, তারপর আমাকে বলিল—"অজিত, বাইসিক্লখানা তুলে সরিয়ে রাখো। কিন্তু সাবধান, ওর ঘন্টিতে হাত দিও না, বড় ভয়ানক জিনিস!"

প্রফুল্ল রায় হাসিল—"সবই জানেন দেখছি, আপনি অসাধারণ লোক। আপনাকেই ভয় ছিল, তাই তো আজ এই ফাঁদ পেতেছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি একলা আসবেন, নিভৃতে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু আপনি সব দিক দিয়েই দাগা দিলেন। ভাল অভিনয় করতে পারি বলে আমার অহঙ্কার ছিল ; কিন্তু আপনি আরও উচ্চশ্রেণীর আর্টিস্ট। আপনি আমার ছদ্মবেশ খুলে আমার মনটাকে উলঙ্গ করে আজ সকালবেলা দেখে নিয়েছিলেন আর আমি শুধু আপনার মুখোশটাই দেখেছিলাম!—যাক, গলাটা বেজায় শুকিয়ে গেছে। একটু জল পাব কি?"

ব্যোমকেশ বলিল—"জল এখানে নেই, থানায় গিয়ে পাবেন।" প্রফুল্ল রায় ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল—"তাও তো বটে, জল এখানে পাওয়া যায় কোথা!" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পানের ডিবাটার দিকে একটা সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"একটা পান পেতে পারি না কি? অবশ্য আসামীকে পান খাওয়াবার রীতি নেই সে আমি জানি, কিন্তু পেলে তৃষ্ণাটা নিবারণ হত।"

ব্যোমকেশ আমাকে ইঙ্গিত করিল, আমি ডিবা হইতে দু'টা পান তাহার মুখে পুরিয়া দিলাম। পান চিবাইতে চিবাইতে প্রফুল্ল রায় বলিল—"ধন্যবাদ ; বাকী দুটো আপনারা ইচ্ছা করলে খেতে পারেন।"

ব্যোমকেশ উৎকর্ণভাবে পুলিসের আগমনশব্দ শুনিতেছিল, অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িল। দূরে মোটর-বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ শুনা গেল। প্রফুল্ল রায় বলিল—"পুলিস তো এসে পড়ল। আমাকে তাহলে ছাড়বেন না?"

ব্যোমকেশ বলিল—"ছাড়ব কি রকম?"

প্রফুল্ল রায় ঘোলাটে রকম হাসিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল—"পুলিসে দেবেনই?"

"দেব বৈকি!"

"ব্যোমকেশবাবু, বুদ্ধিমান লোকেরও ভুল হয়। আপনি আমাকে পুলিসে দিতে পারবেন না—" বলিয়া রাস্তার উপর ঢলিয়া পড়িল।

একটা মোটর-বাইক সশব্দে আসিয়া পাশে থামিল, একজন ইউনিফর্ম-পরা সাহেব তাহার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল— "What's up? Dead?"

প্রফুল্ল রায় নিষ্প্রভ চক্ষু খুলিয়া বলিল—"এ যে খোদ কর্তা দেখছি! টু লেট সাহেব, আমায় ধরতে পারলে না। ব্যোমকেশবাবু, পানটা খেলে ভাল করতেন, একসঙ্গে যাওয়া যেত। আপনার মত লোককে ফেলে যেতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে!" হাসিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া প্রফুল্ল রায় চক্ষু মুদিল। তাহার মুখখানা হঠাৎ শক্ত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে এক লরি পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কমিশনার সাহেব নিজে হাতকড়ি

লইয়া অগ্রসর হইতেই ব্যোমকেশ প্রফুল্ল রায়ের মাথার কাছ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"হাতকড়ার দরকার নেই। আসামী পালিয়েছে।"

আমি আর ব্যোমকেশ আমাদের চিরাভ্যস্ত বসিবার ঘরটিতে মুখোমুখি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। খোলা জানালা দিয়া সকালবেলার আলো ও বাতাস ঘরে ঢুকিতেছিল। ব্যোমকেশ একটি বাইসিক্লের বেল্ হাতে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল। টেবিলের উপর একখানা খাম খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল।

ব্যোমকেশ ঘন্টির মাথাটা খুলিয়া ভিতরের যন্ত্রপাতি সপ্রশংস নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল—"কি অদ্ভুত লোকটার মাথা। এ রকম একটা যন্ত্র তৈরি করা যায়, এ কল্পনাও বোধ করি আজ পর্যন্ত কারুর মাথায় আসেনি। এই যে পাকানো স্প্রিং দেখছ, এটি হচ্ছে এই বন্দুকের বারুদ,—কি নিদারুণ শক্তি এই স্প্রিং-এর ! কি ভয়ঙ্কর অথচ কি সহজ। এই ছোট্ট ফুটোটি হচ্ছে এর নল,—যে পথ দিয়ে গুলি বেরোয়। আর এই ঘোড়া টিপলে দু' কাজ একসঙ্গে হয়, ঘন্টিও বাজে, গুলিও বেরিয়ে যায়। ঘন্টির শব্দে স্প্রিং-এর আওয়াজ চাপা পড়ে। মনে আছে—সেদিন কথা হয়েছিল—শব্দে শব্দ ঢাকে গন্ধ ঢাকে কিসে ? এই লোকটা যে কত বড় বুদ্ধিমান, সেইদিন তার ইঙ্গিত পেয়েছিলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা, পথের কাঁটা আর গ্রামোফোন পিন যে একই লোক, এ তুমি বুঝলে কি করে ?"

ব্যোমকেশ বলিল—"প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু ক্রমশ যেন নিজের অজ্ঞাতসারে ও দুটো মিলে এক হয়ে গেল। দেখ, পথের কাঁটা কি বলছে ? সে খুব পরিষ্কার করেই বলছে যে, যদি তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে কোনও প্রতিবন্ধক থাকে তো সে তা দূর করে দেবে—অবশ্য কাঞ্চন বিনিময়ে। পারিশ্রমিকের কথাটা স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, এটা যে তার অনাহারী পরহিতৈষা নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। তারপর এ দিকে দেখ, যাঁরা গ্রামোফোন পিনের ঘায়ে মরেছেন, তাঁরা সকলেই কারুর না কারুর সুখের পথে কাঁটা হয়ে বেঁচেছিলেন। আমি মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনের ওপর কোনও ইঙ্গিত করতে চাই না, কারণ যে-কথা প্রমাণ করা যাবে না, সে কথা বলে কোনও লাভ নেই। কিন্তু এটাও লক্ষ্য না করে থাকা যায় না, মৃত ব্যক্তিরা সকলেই অপুত্রক ছিলেন, তাঁদের উত্তরাধিকারী কোনও ক্ষেত্রে ভাগ্নে, কোনও ক্ষেত্রে ভাইপো, কোনও ক্ষেত্রে বা জামাই। আশুবাবু এবং তাঁর রক্ষিতার উপাখ্যান থেকে এই ভাইপো-ভাগ্নে-জামাইদের মনোভাব কতক বোঝা যায় না কি ?

"তবেই দেখা যাচ্ছে, পথের কাঁটা আর গ্রামোফোন পিন বাইরে পৃথক হলেও বেশ স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে জোড় লেগে যাচ্ছে—ভাঙা পাথরবাটির দুটো অংশ যেমন সহজে জোড় লেগে যায়। আর একটা জিনিস প্রথম থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—একটার নামের সঙ্গে অন্যটার কাজের সাদৃশ্য। এদিকে 'পথের কাঁটা' নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে আর ওদিকে পথের ওপর কাঁটার মতই একটা পদার্থ দিয়ে মানুষকে খুন করা হচ্ছে। মিলটা সহজেই চোখে পড়ে না কি ?"

আমি বলিলাম—"হয়তো পড়ে, কিন্তু আমার পড়েনি।"

ব্যোমকেশ অধীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"এ সব তো খুব সহজ অনুমানের বিষয়। আশুবাবুর কেস হাতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এগুলো আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছিল—লোকটা কে ? এইখানেই প্রফুল্ল রায়ের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রফুল্ল রায়কে যারা টাকা দিয়েছে খুন করবার জন্যে, তারাও জানতে পারেনি, লোকটা কে এবং কি করে সে খুন করে। আত্মগোপন করবার অসাধারণ ক্ষমতাই ছিল তার প্রধান বর্ম। আমি তাকে কস্মিনকালেও ধরতে পারতুম কিনা জানি না, যদি না সে আমার মন

বোঝবার জন্যে সেদিন নিজে এসে হাজির হত।

"কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। তুমি যেদিন পথের কাঁটার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়েছিলে, সেদিন তোমার ভাবভঙ্গী দেখে তার সন্দেহ হয়। তবু সে তোমাকে চিঠি গছিয়ে দিয়ে গেল, তারপর অলক্ষ্যে তোমার অনুসরণ করলে। তুমি যখন এই বাড়িতে এসে উঠলে তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে, তুমি আমারই দূত। আশুবাবুর কেস আমার হাতে এসেছে, তা সে জানত, কাজেই তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, আমি অনেক কথাই জানতে পেরেছি। অন্য লোক হলে কি করত বলা যায় না—হয়তো এ কাজ ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যেত ; কিন্তু প্রফুল্ল রায়ের অসীম দুঃসাহস—সে আমার মন বুঝতে এল। অর্থাৎ আমি কতটা জানি এবং পথের কাঁটা সম্বন্ধে কি করতে চাই, তাই জানতে এল। এতে তার বিপদের কোন আশঙ্কা ছিল না, কারণ প্রফুল্ল রায়ই যে পথের কাঁটা এবং গ্রামোফোন-পিন, তা জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং জানলেও তা প্রমাণ করতে পারতুম না।—শুধু একটি ভুল প্রফুল্ল রায় করেছিল।"

"কি ভুল ?"

"সেদিন সকালে আমি যে তারই পথ চেয়ে বসেছিলুম, এটা সে বুঝতে পারেনি। সে যে খোঁজ-খবর নিতে আসবেই, এ আমি জানতুম।"

"তুমি জানতে ! তবে আসবামাত্র তাকে গ্রেপ্তার করলে না কেন ?"

"কথাটা নেহাৎ ইয়ের মত বললে, অজিত। তখন তাকে গ্রেপ্তার করলে মানহানির মোকদ্দমায় খেসারৎ দেওয়া ছাড়া আর কোনও লাভ হত না। সে যে খুনী আসামী, তার প্রমাণ কিছু ছিল কি ? তাকে ধরার একমাত্র উপায় ছিল—যাকে বলে in the act, রক্তাক্ত হস্তে ! আর সেই চেষ্টাই আমি করেছিলুম। বুকে প্লেট বেঁধে দু'জনে যে গিয়েছিলুম, সে কি মিছিমিছি ?

"যা হোক, প্রফুল্ল রায় আমার সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলে যে, আমি অনেক কথাই জানি—শুধু বুঝতে পারলে না যে তাকেও চিনতে পেরেছি। সে মনে মনে ঠিক করলে যে, আমার বেঁচে থাকা আর নিরাপদ নয়। তাই সে আমাকে একরকম নিমন্ত্রণ করে গেল—যেন রাত্রে রেস্‌কোর্সের পাশের পথ দিয়ে যাই। সে জানত, একবার তোমাকে পাঠিয়ে ঠকেছি, এবার আমি নিজে যাব। কিন্তু একটা বিষয়ে তার খটকা লাগল, আমি যদি পুলিস সঙ্গে নিয়ে যাই ! তাই সে পুলিসের প্রসঙ্গ তুললে। কিন্তু পুলিসের নামে আমি এমনি চটে উঠলুম যে, প্রফুল্ল রায় খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল ; আমাকে মনে মনে খরচের খাতায় লিখে রাখলে।

"বেচারা ঐ একটা ভুল করে সব মাটি করে ফেললে। শেষকালে তার অনুতাপও হয়েছিল। আমার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করা যে তার উচিত হয়নি, এ কথা সেদিন সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"তোমার মনে আছে, প্রথম যেদিন আশুবাবু আসেন, সেদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বুকে ধাক্কা লাগবার সময় কোনও শব্দ শুনেছিলেন কি না ? তিনি বলেছিলেন, বাইসিক্লের ঘন্টির আওয়াজ শুনেছিলেন। তখন সেটা গ্রাহ্য করিনি। আমার হাওড়া ব্রিজের ঐখানটাই জোড়া লাগছিল না। তারপর 'পথের কাঁটা'র চিঠি যখন পড়লুম এক নিমেষে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলুম—চিঠিতে একটি কথা পেয়েছি। সে কথাটি কি জানো—বাইসিক্ল !

"বাইসিক্লের কথা কেন যে তখন পর্যন্ত মাথায় ঢোকেনি, এটাই আশ্চর্য। বাস্তবিক, এখন ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, বাইসিক্ল ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না। এমন সহজে অনাড়ম্বরভাবে খুন করবার আর দ্বিতীয় উপায় নেই। তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, সামনে একটা বাইসিক্ল পড়ল। বাইসিক্ল-আরোহী তোমাকে সরে যাবার জন্যে ঘন্টি দিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তুমিও মাটিতে পড়ে পটলোৎপাটন করলে। বাইসিক্ল-আরোহীকে কেউ সন্দেহ করতে

পারে না। কারণ, সে দু'হাতে হান্ডেল ধরে আছে—অস্ত্র ছুঁড়বে কি করে? তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

"একবার পুলিস ভারি বুদ্ধি খেলিয়েছিল, তোমার মনে থাকতে পারে। গ্রামোফোন পিনের শেষ শিকার কেদার নন্দী লালবাজারের মোড়ের উপর মরেছিলেন। তিনি পড়বামাত্র পুলিস সমস্ত ট্রাফিক বন্ধ করে দিয়ে প্রত্যেক লোকের কাপড়-চোপড় পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখেছিল। কিন্তু কিছুই পেলে না। আমার বিশ্বাস, প্রফুল্ল রায়ও সেখানে ছিল এবং তাকেও যথারীতি সার্চ করা হয়েছিল। প্রফুল্ল রায় তখন মনে মনে খুব হেসেছিল নিশ্চয়। কারণ, তার বাইসিক্ল বেল্-এর মাথা খুলে দেখবার কথা কোনও পুলিস-দারোগার মাথায় আসেনি।" বলিয়া ব্যোমকেশ সস্নেহে বেল্‌টি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

টেবিলের উপর হইতে সরকারী লম্বা খামখানা হাওয়ায় উড়িয়া আমার পায়ের কাছে পড়িল। সেখানা তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পুলিস কমিশনার সাহেব কি লিখেছেন?"

ব্যোমকেশ বলিল—"অনেক কথা। গোড়াতেই আমাকে পুলিস এবং সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিয়েছেন; তারপর প্রফুল্ল রায় আত্মহত্যা করাতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন; যদিও এতে তাঁর খুশি হওয়াই উচিত ছিল—কারণ, গভর্নমেন্টের অনেক খরচ এবং মেহনত বেঁচে গেল। যা হোক, সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার যে আমি শীঘ্রই পাব, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, পুলিস সাহেব জানিয়েছেন যে, দরখাস্ত করবামাত্র আমার আর্জি মঞ্জুর হবে, তার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। প্রফুল্ল রায়ের লাস কেউ সনাক্ত করতে পারেনি, জুয়েল ইন্সিওরেন্স কোম্পানির লোকেরা লাস দেখে বলেছে যে, এ তাদের প্রফুল্ল রায় নয়, তাদের প্রফুল্ল রায় উপস্থিত কর্ম উপলক্ষে যশোহরে আছেন। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রফুল্ল রায় নামটা ছদ্মনাম। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, আমার কাছে ও চিরকাল প্রফুল্ল রায়ই থাকবে। চিঠির উপসংহারে পুলিস সাহেব একটা নিদারুণ কথা লিখেছেন—এই ঘণ্টিটি ফেরৎ দিতে হবে। এটা না কি এখন গভর্নমেন্টের সম্পত্তি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"ওটার ওপর তোমার ভারি মায়া পড়ে গেছে—না? কিছুতেই ছাড়তে পারছ না?"

ব্যোমকেশও হাসিয়া ফেলিল—"সত্যি, দু'হাজার টাকা পুরস্কারের বদলে সরকার বাহাদুর যদি আমাকে এই ঘণ্টিটা বকশিশ করেন, আমি মোটেই দুঃখিত হই না। যা হোক, প্রফুল্ল রায়ের একটা স্মৃতিচিহ্ন তবু আমার কাছে রইল।"

"কি?"

"ভুলে গেলে? সেই দশ টাকার নোটখানা। সেটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবো ভেবেছি। তার দাম এখন আমার কাছে একশ' টাকারও বেশি।" বলিয়া ব্যোমকেশ ঘণ্টিটা সযত্নে দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল।

সে ফিরিয়া আসিলে আমি তাহাকে একটা প্রশ্ন করিলাম—"আচ্ছা ব্যোমকেশ, সত্যি বল, পানের মধ্যে বিষ আছে তুমি জানতে?"

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"জানা এবং না জানার মাঝখানে একটা অনিশ্চিত স্থান আছে, সেটা সম্ভাবনার রাজ্য।" কিছুক্ষণ পরে আবার বলিয়া উঠিল—"তুমি কি মনে কর প্রফুল্ল রায় যদি সামান্য খুনীর মত ফাঁসি যেত তাহলে ভাল হত? আমার তা মনে হয় না। বরং এমনিভাবে যাওয়াই তার ঠিক হয়েছে, সে যে কতবড় আর্টিস্ট ছিল, ধরা পড়েও হাত পা বাঁধা অবস্থায় সে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে।"

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি কোথা দিয়া যে কোথায় গিয়া পৌঁছাতে পারে তাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

"চিঠি হ্যায়।"

ডাক-পিয়ন একখানা রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়া গেল। ব্যোমকেশ খাম খুলিয়া ভিতর হইতে কেবল একখানা রঙীন কাগজের টুকরা বাহির করিল, তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া সহাস্যে আমার দিকে বাড়াইয়া দিল।

দেখিলাম, শ্রীআশুতোষ মিত্রের দস্তখৎ-সম্বলিত একখানি হাজার টাকার চেক।

সীমন্ত-হীরা

কিছুদিন যাবৎ ব্যোমকেশের হাতে কোনও কাজকর্ম ছিল না।

এদেশের লোকের কেমন বদ্‌ অভ্যাস, ছোটখাটো চুরি-চামারি হইলে বেবাক হজম করিয়া যায়, পুলিসে পর্যন্ত খবর দেয় না। হয়তো তাহারা ভাবে সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। নেহাৎ যখন গুরুতর কিছু ঘটিয়া যায় তখন সংবাদটা পুলিস পর্যন্ত পৌঁছায় বটে কিন্তু গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া বেসরকারী গোয়েন্দা নিযুক্ত করিবার মত উদ্যোগ বা আগ্রহ কাহারও দেখা যায় না। কিছু দিন হা-হুতাশ ও পুলিসকে গালিগালাজ করিয়া অবশেষে তাহারা ক্ষান্ত হয়।

খুন জখম ইত্যাদিও যে আমাদের দেশে হয় না, এমন নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে বুদ্ধি বা চতুরতার লক্ষণ লেশমাত্র দেখা যায় না ; রাগের মাথায় খুন করিয়া হত্যাকারী তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া যায় এবং সরকারের পুলিস তাহাকে হাজৎ-জাত করিয়া অচিরাৎ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়।

সুতরাং সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের পক্ষে সত্য অন্বেষণের সুযোগ যে বিরল হইয়া পড়িবে, ইহা বিচিত্র নহে। ব্যোমকেশের অবশ্য সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না, সে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে শেষ পৃষ্ঠার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়া বাকী সময়টুকু নিজের লাইব্রেরি ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাটাইয়া দিতেছিল। আমার কিন্তু এই একটানা অবকাশ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যদিচ অপরাধীর অনুসন্ধান করা আমার কাজ নহে, গল্প লিখিয়া বাঙালী পাঠকের চিত্তবিনোদনরূপ অবৈতনিক কার্যকেই জীবনের ব্রত করিয়াছি, তবু চোর-ধরার যে একটা অপূর্ব মাদকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নেশার বস্তুর মত এই উত্তেজনার উপাদান যথাসময় উপস্থিত না হইলে মন একেবারে বিকল হইয়া যায় এবং জীবনটাই লবণহীন ব্যঞ্জনের মত বিস্বাদ ঠেকে।

তাই সেদিন সকালবেলা চা-পান করিতে করিতে ব্যোমকেশকে বলিলাম—"কি হে, বাংলাদেশের চোর-ছ্যাঁচড়গুলো কি সব সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে গেল না কি ?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল—"না। তার প্রমাণ তো খবরের কাগজে রোজ পাচ্ছ।"

"তা তো পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের কাছে আসছে কৈ ?"

"আসবে। চারে যখন মাছ আসবার তখনি আসে, তাকে জোর করে ধরে আনা যায় না। তুমি কিছু অধীর হয়ে পড়েছ দেখছি। ধৈর্যং রহু। আসল কথা আমাদের দেশে প্রতিভাবান বদমায়েস—প্যারাডক্স হয়ে যাচ্ছে, কি করব ; দোষ আমার নয়, দোষ তোমাদের দীনাহীনা পিচুঁটি নয়না বঙ্গভাষার—প্রতিভাবান বদমায়েস খুব অল্পই আছে। পুলিস কোর্টের রিপোর্টে যাদের নাম দেখতে পাও, তারা চুনোপুঁটি। যাঁরা গভীর জলের মাছ—তাঁরা কদাচিৎ চারে এসে ঘাই মারেন। আমি তাঁদেরই খেলিয়ে তুলতে চাই। জানো তো যে পুকুরে দু'চারটে বড় বড় রুই কাৎলা আছে সেই পুকুরে ছিপ ফেলেই শিকারীর আনন্দ।"

আমি বলিলাম—"তোমার উপমাগুলো থেকে বেজায় আঁষটে গন্ধ বেরুচ্ছে। মনস্তত্ত্ববিৎ যদি কেউ এখানে থাকতেন, তিনি নির্ভয়ে বলে দিতেন যে তুমি সত্যান্বেষণ ছেড়ে শীঘ্রই মাছের ব্যবসা

আরম্ভ করবে।"

ব্যোমকেশ বলিল—"তাহলে মনস্তত্ত্ববিৎ মহাশয় নিদারুণ ভুল করতেন। যে লোক মাছের সম্বন্ধে গবেষণা করে, সে জলচর জীবের কখনো নাম শোনেনি—এই হচ্ছে আজকালকার নূতন বিধি। তোমরা আধুনিক গল্প-লেখকের দল এই কথাটাই আজকাল প্রমাণ করছ।"

আমি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম—"ভাই, আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই, প্রতিদানের আশা না করে শুধু আনন্দ যোগাই, তবু কি তোমাদের মন ওঠে না ? এর বেশি যদি চাও তাহলে নগদ কিছু ছাড়তে হবে।"

দরজার কড়া নাড়িয়া "চিঠি হ্যায়" বলিয়া ডাক-পিওন প্রবেশ করিল। আমাদের জীবনে ডাক-পিওনের সমাগম এতই অপ্রচুর যে, মুহূর্তমধ্যে সাহিত্যিক জীবনের দুঃখ দীনতা ভুলিয়া গেলাম। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একখানা ইন্সিওর করা খাম ব্যোমকেশের নামে আসিয়াছে।

খাম ছিঁড়িয়া ব্যোমকেশ যখন চিঠি বাহির করিল, তখন কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। ব্রঞ্জ-ব্লু কালিতে ছাপা মনোগ্রাম-যুক্ত পুরু কাগজে লেখা চিঠি এবং সেই সঙ্গে পিন দিয়া আঁটা একটি একশ' টাকার নোট। চিঠিখানি ছোট, ব্যোমকেশ পড়িয়া সহাস্যমুখে আমার হাতে দিয়া বলিল—"এই নাও। গুরুতর ব্যাপার। উত্তরবঙ্গের বনিয়াদী জমিদার-গৃহে রোমাঞ্চকর রহস্যের আবির্ভাব। সেই রহস্য উদ্ঘাটিত করবার জন্য জোর তাগাদা এসেছে—পত্রপাঠ যাওয়া চাই। এমন কি, একশ' টাকা অগ্রিম রাহাখরচ পর্যন্ত এসে হাজির।"

চিঠির শিরোনামায় কোনও এক বিখ্যাত জমিদারী স্টেটের নাম। জমিদার স্বয়ং চিঠি লেখেন নাই, তাঁহার সেক্রেটারি ইংরাজিতে টাইপ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম এই,—

প্রিয় মহাশয়,

কুমার শ্রীত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, তিনি আপনার নাম শুনিয়াছেন। একটি বিশেষ জরুরী কার্যে তিনি আপনার সাহায্য ও পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করেন। অতএব আপনি অবিলম্বে এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব। পথ খরচের জন্য ১০০ ্ টাকার নোট এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

আপনি কোন্ ট্রেনে আসিতেছেন, তার-যোগে জানাইলে স্টেশনে গাড়ি উপস্থিত থাকিবে।

ইতি—

পত্র হইতে আর কোনও তথ্য সংগ্রহ করা গেল না। পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—"তাই তো হে, ব্যাপার সত্যই গুরুতর ঠেকছে। জরুরী কার্যটি কি—চিঠির কাগজ বা ছাপার হরফ থেকে কিছু অনুমান করতে পারলে ? তোমার তো ও-সব বিদ্যে আছে।"

"কিছু না। তবে আমাদের দেশের জমিদার বাবুদের যতদূর জানি, খুব সম্ভব কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন যে, তাঁর পোষা হাতিটি পাশের জমিদার চুরি করে নিয়ে গেছে ; তাই শঙ্কিত হয়ে তিনি গোয়েন্দা তলব করেছেন।"

"না না, অতটা নয়। দেখছ না একেবারে গোড়াতেই এতগুলো টাকা খরচ করে ফেলেছেন। ভেতরে নিশ্চয় কোনা বড় রকম গোলমাল আছে।"

"ঐটে তোমাদের ভুল ; বড় লোক রুগী হলে মনে কর ব্যাধিও বড় রকম হবে। দেখা যায় কিন্তু ঠিক তার উল্টো। বড়লোকের ফুস্কুড়ি হলে ডাক্তার আসে, কিন্তু গরীবের একেবারে নাভিশ্বাস না উঠলে ডাক্তার-বৈদ্যের কথা মনেই পড়ে না।"

"যা হোক, কি ঠিক করলে ? যাবে না কি ?"

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল—"হাতে যখন কোন কাজ নেই, তখন চল দু'দিনের জন্যে ঘুরেই আসা যাক। আর কিছু না হোক, নূতন দেশ দেখা তো হবে। তুমিও বোধ হয় ও-অঞ্চলে কখনো যাওনি।"

যদিচ যাইবার ইচ্ছা ষোল আনা ছিল তবু ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলাম—"আমার যাওয়াটা কি

ঠিক হবে ? তোমাকে ডেকেছে—"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল—"দোষ কি ? একজনের বদলে দু'জন গেলে কুমার বাহাদুর বরঞ্চ খুশিই হবেন। ধনক্ষয় যখন অন্যের হচ্ছে, তখন যাওয়াটা তো একটা কর্তব্যবিশেষ। শাস্ত্রে লিখেছে—সর্বদা পরের পয়সায় তীর্থ-দর্শন করবে।"

কোন শাস্ত্রে এমন জ্ঞানগর্ভ নীতি উপদেশ আছে যদিও স্মরণ করিতে পারিলাম না, তবু সহজেই রাজী হইয়া গেলাম।

সেইদিন সন্ধ্যার গাড়িতে যাত্রা করিলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটিল না, শুধু একটি অত্যন্ত মিশুক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। সেকেন্ড ক্লাস কামরায় আমরা তিনজন ছাড়া আর কেহ ছিল না, একথা সেকথার পর ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশাইদের কদ্দূর যাওয়া হচ্ছে ?"

প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশ মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মশাইয়ের কদ্দূর যাওয়া হবে ?"

পাল্টা প্রশ্নে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হইয়া থাকিয়া ভদ্রলোকটি আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—"আমি—এই পরের স্টেশনেই নামব।"

ব্যোমকেশ পূর্ববৎ মধুর স্বরে বলিল—"আমরাও তার পরের স্টেশনে নেমে যাব।"

অহেতুক মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ব্যোমকেশের কোনও মতলব আছে বুঝিয়া আমি কিছু বলিলাম না। গাড়ি থামিতেই ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন। রাত্রি হইয়াছিল, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে তিনি নিমেষমধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেলেন, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

দুই তিন স্টেশন পরে জানালার কাচ নামাইয়া বাহিরে গলা বাড়াইয়াছি, হঠাৎ দেখিলাম, পাশের একটা ইন্টার ক্লাশের কামরার জানালায় মাথা বাহির করিয়া ভদ্রলোকটি আমাদের গাড়ির দিকেই তাকাইয়া আছেন। চোখাচোখি হইবামাত্র তিনি বিদ্যুদ্বেগে মাথা টানিয়া লইলেন। আমি উত্তেজিতভাবে ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলাম—"ওহে—"

ব্যোমকেশ বলিল—"জানি। ভদ্রলোক পাশের গাড়িতে উঠেছেন। ব্যাপার যতটা তুচ্ছ মনে করেছিলুম, দেখছি তা নয়। ভালই !"

তারপর প্রায় প্রতি স্টেশনেই জানলা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সে ভদ্রলোকের চুলের টিকি পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

পরদিন ভোর হইতে না হইতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম। স্টেশনটি ছোট, সেখান হইতে প্রায় ছয় সাত মাইল মোটরে যাইতে হইবে। একখানি দামী মোটর লইয়া জমিদারের একজন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা মোটরে বসিলাম। অতঃপর নির্জন পথ দিয়া মোটর নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিল।

কর্মচারীটি প্রবীণ এবং বিচক্ষণ ; ব্যোমকেশ কৌশলে তাঁহাকে দু' একটি প্রশ্ন করিতেই তিনি বলিলেন—"আমি কিছুই জানি না, মশাই ! শুধু আপনাদের স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম পেয়েছিলাম, তাই নিয়ে যাচ্ছি।"

আমরা মুখ তাকাতাকি করিলাম, আর কোনো কথা হইল না। পরে জমিদারভবনে পৌঁছিয়া দেখিলাম—সে এক এলাহি কাণ্ড ! মাঠের মাঝখানে যেন ইন্দ্রপুরী বসিয়াছে। প্রকাণ্ড সাবেক পাঁচমহল ইমারৎ—তাহাকে ঘিরিয়া প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বিঘা জমির উপর বাগান, হট হাউস্, পুষ্করিণী, টেনিস্ কোর্ট, কাছারি বাড়ি, অতিথিশালা, পোস্ট-অফিস আরও কত কি। চারিদিকে লস্কর পেয়াদা গোমস্তা সরকার খাতক প্রজার ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের মোটর বাড়ির সম্মুখে থামিতেই জমিদারের প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বয়ং আসিয়া আমাদের সমাদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। একটা আস্ত মহল আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেক্রেটারি বলিলেন—"আপনারা মুখ-হাত ধুয়ে জলযোগ করে নিন। ততক্ষণে কুমার বাহাদুরও আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তৈরি হয়ে যাবেন।"

স্নানাদি সারিয়া বাহির হইতেই প্রচুর প্রাতরাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার যথারীতি

ধ্বংস-সাধন করিয়া তৃপ্তমনে ধূমপান করিতেছি, এমন সময় সেক্রেটারি আসিয়া বলিলেন—"কুমার বাহাদুর লাইব্রেরি ঘরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। যদি আপনাদের অবসর হয়ে থাকে—আমার সঙ্গে আসুন।"

আমরা উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। রাজসকাশে যাইতেছি, এমনি একটা ভাব লইয়া লাইব্রেরি ঘরে প্রবেশ করিলাম। 'কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ' নাম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিষয়ে বিরাট আড়ম্বর দেখিয়া মনের মধ্যে কুমার বাহাদুর সম্বন্ধে একটা গুরুগম্ভীর ধারণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। দেখিলাম, আমাদেরই মত সাধারণ পাঞ্জাবি পরা একটি সহাস্যমুখ যুবাপুরুষ, গৌরবর্ণ সুশ্রী চেহারা—ব্যবহারে তিলমাত্র আড়ম্বর নাই। আমরা যাইতেই চেয়ার হইতে উঠিয়া আগেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। পলকের জন্য একটু দ্বিধা করিয়া ব্যোমকেশকে বলিলেন—"আপনিই ব্যোমকেশবাবু ? আসুন।"

ব্যোমকেশ আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিল—"ইনি আমার বন্ধু সহকারী এবং ভবিষ্যৎ জীবনী লেখক। তাই ওঁকে সহজে কাছ-ছাড়া করিনে।"

কুমার ত্রিদিব হাসিয়া কহিলেন—"আশা করি, আপনার জীবনী লেখার প্রয়োজন এখনও অনেক দূরে। অজিতবাবু এসেছেন, আমি ভারি খুশি হয়েছি। কারণ, প্রধানত ওঁর লেখার ভিতর দিয়েই আপনার নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।"

উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অন্যের মুখে নিজের লেখার অযাচিত উল্লেখ যে কত মধুর, তাহা যিনি ছাপার অক্ষরের কারবার করেন, তিনিই জানেন। বুঝিলাম, ধনী জমিদার হইলেও লোকটি অতিশয় সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। লাইব্রেরি ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম, দেয়াল-সংলগ্ন আলমারিগুলি দেশী বিলাতি নানা প্রকার পুস্তকে ঠাসা। টেবিলের উপরেও অনেকগুলি বই ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে। লাইব্রেরি ঘরটি যে কেবলমাত্র জমিদার-গৃহের শোভাবর্ধনের জন্য নহে, রীতিমত ব্যবহারের জন্য—তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

আরও কিছুক্ষণ শিষ্টতা-বিনিময়ের পর কুমার বাহাদুর বলিলেন—"এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।" সেক্রেটারিকে হুকুম দিলেন, "তুমি এখন যেতে পার। লক্ষ্য রেখো, এ ঘরে যেন কেউ না ঢোকে।"

সেক্রেটারি সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে কুমার ত্রিদিব চেয়ারে ঝুঁকিয়া বসিয়া বলিলেন—"আপনাদের যে কাজের জন্য এত কষ্ট দিয়ে ডেকে আনিয়েছি, সে কাজ যেমন গুরুতর, তেমনি গোপনীয়। তাই সকল কথা প্রকাশ করে বলবার আগে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, এ কথা ঘুণাক্ষরেও তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হবে না। এত সাবধানতার কারণ, এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের বংশের মর্যাদা জড়ানো রয়েছে।"

ব্যোমকেশ বলিল—"প্রতিশ্রুতি দেবার কোনো দরকার আছে মনে করিনে, একজন মক্কেলের গুপ্তকথা অন্য লোককে বলা আমাদের ব্যবসার রীতি নয়। কিন্তু আপনি যখন প্রতিশ্রুতি চান, তখন দিতে কোনো বাধাও নেই। কি ভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বলুন।"

কুমার হাসিয়া বলিলেন—"তামা-তুলসীর দরকার নেই। আপনাদের মুখের কথাই যথেষ্ট।"

আমি একটু দ্বিধায় পড়িলাম, বলিলাম—"গল্পচ্ছলেও কি কোনো কথা প্রকাশ করা চলবে না ?"

কুমার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই চলবে না।"

হয়তো একটা ভাল গল্পের মশলা হাত-ছাড়া হইয়া গেল, এই ভাবিয়া মনে মনে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল—"আপনি নির্ভয়ে বলুন। আমরা কোনো কথা প্রকাশ করব না।"

কুমার ত্রিদিব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, যেন কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবেন তাহাই ভাবিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন—"আমাদের বংশে যে-সব সাবেক কালের হীরা-জহরত আছে, সে সম্বন্ধে বোধহয় আপনি কিছু জানেন না—"

ব্যোমকেশ বলিল—"কিছু কিছু জানি। আপনার বংশে একটি হীরা আছে, যার তুল্য হীরা

বাংলা দেশে আর দ্বিতীয় নেই—তার নাম সীমন্ত-হীরা।"

ত্রিদিব সাগ্রহে বলিলেন—"আপনি জানেন ? তাহলে এ কথাও জানেন বোধহয় যে, গতমাসে কলকাতায় যে রত্ন-প্রদর্শনী হয়েছিল তাতে ঐ হীরা দেখানো হয়েছিল ?"

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"জানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে হীরা চোখে দেখার সুযোগ হয়নি।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কুমার কহিলেন—"সে সুযোগ আর কখনো হবে কি না জানি না। হীরাটা চুরি গেছে।"

ব্যোমকেশ প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল—"চুরি গেছে !"

শান্তকণ্ঠে কুমার বলিলেন—"হ্যাঁ, সেই সম্পর্কেই আপনাকে আনিয়েছি। ঘটনাটা শুরু থেকে বলি শুনুন। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের এই জমিদার বংশ অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। বারো ভূঁইয়ারও আগে পাঠান বাদশা'দের আমলে আমাদের আদি পূর্বপুরুষ এই জমিদারী অর্জন করেন। সাদা কথায় তিনি একজন দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দার ছিলেন, নিজের বাহুবলে সম্পত্তি লাভ করে পরে বাদশা'র কাছ থেকে সনন্দ আদায় করেন। সে বাদশাহী সনন্দ এখনো আমাদের কাছে বর্তমান আছে। এখন আমাদের অনেক অধঃপতন হয়েছে ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে আমাদের 'রাজা' উপাধি ছিল।

"ঐ 'সীমন্ত-হীরা' আমাদের আদি পূর্বপুরুষের সময় থেকে পুরুষানুক্রমে এই বংশে চলে আসছে। একটা প্রবাদ আছে যে, এই হীরা যতদিন আমাদের কাছে থাকবে, ততদিন বংশের কোনো অনিষ্ট হবে না ; কিন্তু হীরা কোনও রকমে হস্তান্তরিত হলেই এক পুরুষের মধ্যে বংশ লোপ হয়ে যাবে।"

একটু থামিয়া কুমার আবার বলিতে লাগিলেন—"জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র জমিদারীর উত্তরাধিকারী হয়—এই হচ্ছে আমাদের বংশের চিরাচরিত লোকাচার। কনিষ্ঠরা কেবল বাবুয়ান্ বা ভরণপোষণ পান। এই সূত্রে দু'বছর আগে আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি জমিদারী পেয়েছি। আমি বাপের একমাত্র সন্তান, উপস্থিত আমার এক কাকা আছেন, তিনি বাবুয়ান্‌স্বরূপ তিন হাজার টাকা মাসিক খোরপোশ জমিদারী থেকে পেয়ে থাকেন।

"এ তো গেল গল্পের ভূমিকা। এবার হীরা চুরির ঘটনাটা বলি। রত্ন-প্রদর্শনীতে আমার হীরা এক্‌জিবিট্ করবার নিমন্ত্রণ যখন এল, তখন আমি নিজে স্পেশাল ট্রেনে করে সেই হীরা নিয়ে কলকাতায় গেলাম ; কলকাতায় পৌঁছে হীরাখানা প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করে দেবার পর তবে নিশ্চিন্ত হলাম। আপনারা জানেন, প্রদর্শনীতে বরোদা, হায়দ্রাবাদ, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজবংশের খানদানি জহরত প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রদর্শনের কর্তা ছিলেন স্বয়ং গভর্নমেন্ট, সুতরাং সেখান থেকে হীরা চুরি যাবার কোনা ভয় ছিল না। তা ছাড়া যে গ্লাসকেসে আমার হীরা রাখা হয়েছিল, তার চাবি কেবল আমারই কাছে ছিল।

"সাত দিন ধরে এক্‌জিবিশন চলল। আট দিনের দিন আমার হীরা নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে এসে জানতে পারলাম যে, আমার হীরা চুরি গেছে, তার বদলে যা ফিরিয়ে এনেছি, তা দু'শ টাকা দামের মেকি পেস্ট।"

কুমার চুপ করিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—"চুরি ধরা পড়বার পর প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে কিংবা পুলিসকে খবর দেননি কেন ?"

কুমার বলিলেন—"খবর দিয়ে কোনও লাভ হত না, কারণ কে চুরি করেছে, চুরি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা জানতে পেরেছিলাম।"

"ওঃ"—ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"তারপর বলে যান।"

কুমার বলিতে লাগিলেন—"এ কথা কাউকে বলবার নয়। পাছে জানাজানি হয়ে পারিবারিক কলঙ্ক বার হয়ে পড়ে, খবরের কাগজে এই নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়ে যায়, এই ভয়ে বাড়ির

লোককে পর্যন্ত এ কথা জানাতে পারিনি। জানি শুধু আমি আর আমার বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয়।

"কথাটা আরও খোলসা করে বলা দরকার। পূর্বে বলেছি, আমার এক কাকা আছেন। তিনি কলকাতায় থাকেন, স্টেট থেকে মাসিক তিন হাজার টাকা খরচা পান। তাঁর নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন—তিনিই বিখ্যাত শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক স্যর দিগিন্দ্রনারায়ণ রায়। তাঁর মত আশ্চর্য মানুষ কম দেখা যায়। বিলেতে জন্মালে তিনি বোধ হয় অদ্বিতীয় মনীষী বলে পরিচিত হতে পারতেন। যেমন তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তেমনই অগাধ পাণ্ডিত্য। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস সম্বন্ধে কি একটা তথ্য আবিষ্কার করে ইংরাজ গভর্নমেন্টকে উপহার দিয়েছিলেন—তার ফলে 'স্যর' উপাধি পান। শিল্পের দিকেও তাঁর কি অসামান্য প্রতিভা, তার পরিচয় সম্ভবত আপনাদের অল্পবিস্তর জানা আছে। প্যারিসের শিল্প-প্রদর্শনীতে মহাদেবের প্রস্তরমূর্তি এক্জিবিট্ করে তিনি যে সম্মান ও প্রশংসা লাভ করেন, তা কারুর অবিদিত নেই। মোটের উপর এমন বহুমুখী প্রতিভা সচরাচর চোখে পড়ে না।" বলিয়া কুমার বাহাদুর একটু হাসিলেন।

আমরা নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। কুমার বলিতে লাগিলেন—"কাকা আমাকে কম স্নেহ করেন না, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ হয়েছিল। ঐ হীরাটা তিনি আমার কাছে চেয়েছিলেন। হীরাটার উপর তাঁর অহেতুক আসক্তি ছিল। তার দামের জন্য নয়, শুধু হীরাটাকে নিজের কাছে রাখবার জন্য তিনি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হীরাটার দাম কত হবে?"

কুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"খুব সম্ভব তিন পয়জার। টাকা দিয়ে সে জিনিস কেনবার মত লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। তা ছাড়া আমরা কখনও তার দাম যাচাই করে দেখিনি। গৃহদেবতার মতই সে হীরাটা অমূল্য ছিল।

"সে যাক্। আমার বাবার কাছেও কাকা ঐ হীরাটা চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবা দেননি। তারপর বাবা মারা যাবার পর কাকা আমার কাছে সেটা চাইলেন। বললেন—'আমার মাসহারা চাই না, তুমি শুধু আমায় হীরাটা দাও।' বাবা মৃত্যুকালে আমাকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাই জোড়হাত করে কাকাকে বললাম—'কাকা, আপনার আর যা-ইচ্ছা নিন, কিন্তু ও হীরাটা দিতে পারব না। বাবার শেষ আদেশ।'—কাকা আর কিছু বললেন না, কিন্তু বুঝলাম, তিনি আমার উপর মর্মান্তিক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারপর থেকে কাকার সঙ্গে আর আমাদের দেখা হয়নি।

"তবে পত্র ব্যবহার হয়েছে। যেদিন হীরা নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এলাম, তার পরদিন কাকার কাছ থেকে এক চিঠি এল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু পড়ে মাথা ঘুরে গেল। এই দেখুন সে চিঠি।"

চাবি দিয়া সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দেরাজ খুলিয়া কুমার বাহাদুর একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিলেন। ছোট ছোট সুছাঁদ অক্ষরে লেখা বাঙলা চিঠি, তাহাতে লেখা আছে—

কল্যাণীয় খোকা,

দুঃখিত হয়ো না। তোমরা দিতে চাওনি, তাই আমি নিজের হাতেই নিলাম।

বংশলোপ হবে বলে যে কুসংস্কার আছে, তাতে বিশ্বাস করো না। ওটা আমার পূর্বপুরুষদের একটা ফন্দি মাত্র, যাতে জিনিসটা হস্তান্তরিত করতে কেউ সাহস না করে। আশীর্বাদ নিও।

ইতি

তোমার কাকা

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ রায়

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চিঠি ফেরৎ দিল। কুমার বলিতে লাগিলেন—"চিঠি পড়েই ছুটলাম তোষাখানায়। লোহার সিন্দুক খুলে হীরার বাক্স বার করে দেখলাম, হীরা ঠিক আছে। দেওয়ান মশায়কে ডাকলাম, তিনি জহরতের একজন ভাল জহুরী, দেখেই বললেন, জাল হীরা। কিন্তু চেহারায় কোথাও এতটুকু তফাৎ নেই, একেবারে অবিকল আসল হীরার জোড়া।"

কুমার দেরাজ খুলিয়া একটি ভেলভেটের বাক্স বাহির করিলেন। ডালা খুলিতেই সুপারির মত গোলাকার একটা পাথর আলোকসম্পাতে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। কুমার বাহাদুর দুই আঙুলে সেটা তুলিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন—"জহুরী ছাড়া কারুর সাধ্য নেই যে বোঝে এটা ঝুটো। আসলে দু'শ টাকার বেশি এর দাম নয়।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা সেই মূল্যহীন কাচখণ্ডটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম ; তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ সেটা ফিরাইয়া দিল, বলিল—"তাহলে আমার কাজ হচ্ছে সেই আসল হীরাটা উদ্ধার করা ?"

স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কুমার বলিলেন—"হাঁ। কেমন করে হীরা চুরি গেল, সে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নেই। আমি শুধু আমার হীরাটা ফেরৎ চাই। যেমন করে হোক, যে উপায়ে হোক, আমার 'সীমন্ত-হীরা' আমাকে ফিরিয়ে এনে দিতে হবে। খরচের জন্য ভাবনা করবেন না, যত টাকা লাগে, যদি বিশ হাজার টাকা দরকার হয়, তাও দিতে আমি পশ্চাৎপদ হব না জানবেন। শুধু একটি শর্ত, কোনও রকমে এ কথা যেন খবরের কাগজে না ওঠে।"

ব্যোমকেশ তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল—"কবে নাগাদ হীরাটা পেলে আপনি খুশি হবেন ?"

উত্তেজনায় কুমার বাহাদুরের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"কবে নাগাদ ? তবে কি,—তবে কি আপনি হীরাটা উদ্ধার করতে পারবেন বলে মনে হয় ?"

ব্যোমকেশ হাসিল, বলিল—"এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এর চেয়ে ঢের বেশি জটিল রহস্য প্রত্যাশা করেছিলুম। যা হোক, আজ শনিবার ; আগামী শনিবারের মধ্যে আপনার হীরা ফেরৎ পাবেন।' বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রথম দিনটা গোলমালে কাটিয়া গেল।

রাত্রে দুইজনে কথা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্ল্যান অফ ক্যাম্পেন কিছু ঠিক করলে ?"

ব্যোমকেশ বলিল—"না। আগে বাড়িটা দেখে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা যাক, তার পর প্ল্যান স্থির করা যাবে।"

"হীরেটা কি বাড়িতেই আছে মনে হয় ?"

"নিশ্চয়। যে জিনিসের মোহে খুড়ো মহাশয় শেষ বয়সে ভাইপোর সম্পত্তি চুরি করেছেন, সে জিনিস তিনি এক দণ্ডের জন্যও কাছ-ছাড়া করবেন না। আমাদের শুধু জানা দরকার, কোথায় তিনি সেটা রেখেছেন। আমার বিশ্বাস—"

"তোমার বিশ্বাস—"

"যাক্, সেটা অনুমান মাত্র। দিগিন্দ্রনারায়ণ খুড়া মহাশয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছুই ঠিক করে বলা যায় না।"

আমি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলাম—"আচ্ছা ব্যোমকেশ, এ কাজের নৈতিক দিকটা ভেবে দেখেছ ?"

"কোন্ কাজের ?"

"যে উপায় অবলম্বন করে তুমি হীরেটা উদ্ধার করতে যাচ্ছ।"

"ভেবে দেখেছি। ডাহা নিছক চুরি, ধরা পড়লে জেলে যেতে হবে। কিন্তু চুরি মাত্রেই নৈতিক অপরাধ নয়। চোরের উপর বাটপাড়ি করা মহা পুণ্যকার্য।"

"তা যেন বুঝলাম, কিন্তু দেশের আইন তো সে কথা শুনবে না।"

"সে ভাবনা আমার নয়। আইনের যাঁরা রক্ষক, তাঁরা পারেন, আমাকে শাস্তি দিন।"

পরদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ একাকী বাহির হইয়া গেল ; যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া জলযোগ করিতে বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাজ কত দূর

হল ?”

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে কচুরিতে কামড় দিয়া বলিল—“বিশেষ সুবিধা হল না। বুড়ো একটি হর্তেল ঘুঘু। আর তার একটি নেপালী চাকর আছে, সে বেটার চোখ দুটো ঠিক শিকারী বেরালের মত। যা হোক, একটা সুরাহা হয়েছে, বুড়ো একজন সেক্রেটারি খুঁজছে—দুটো দরখাস্ত করে দিয়ে এসেছি।”

“সব কথা খুলে বল।”

চায়ে চুমুক দিয়ে বাটি নামাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল—“কুমার বাহাদুর যা বলেছিলেন, তা নেহাৎ মিথ্যে নয়—খুড়ো মহাশয় অতি পাকা লোক। বাড়িটা নানারকম বহুমূল্য জিনিসের একটা মিউজিয়াম বললেই হয়; কর্তা একলা থাকেন বটে, কিন্তু অনুগত এবং বিশ্বাসী লোকলস্করের অভাব নেই। প্রথমত, বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢোকাই মুশকিল—ফটকে চারটে দরোয়ান অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বসে আছে, কেউ ঢুকতে গেলেই হাজার প্রশ্ন। পাঁচিল ডিঙিয়ে যে ঢুকবে, তারও উপায় নেই—আট হাত উঁচু পাঁচিল, তার উপর ছুঁচোলো লোহার শিক বসানো। যা হোক, কোনও রকমে দরোয়ান বাবুদের খুশি করে ফটকের ভিতর যদি ঢুকলে, বাড়ির সদর-দরজায় নেপালী ভৃত্য উজ্বরে সিং থাপা বাঘের মত থাবা গেড়ে বসে আছেন, ভালরকম কৈফিয়ৎ যদি না দিতে পার, বাড়িতে ঢোকবার আশা ঐখানেই ইতি। রাত্রির ব্যবস্থা আরও চমৎকার। দরোয়ান, চৌকিদার তো আছেই, তার উপর চারটে বিলিতি ম্যাস্টিফ্ কুকুর কম্পাউন্ডের মধ্যে ছাড়া থাকে। সুতরাং নিশীথসময়ে নিরিবিলি গিয়ে যে কার্যোদ্ধার করবে, সে পথও বন্ধ।”

“তবে উপায় ?”

“উপায় হয়েছে। বুড়োর একজন সেক্রেটারি চাই—বিজ্ঞাপন দিয়েছে। দেড় শ' টাকা মাইনে—বাড়িতেই থাকতে হবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা চাই এবং শর্টহ্যান্ড টাইপিং ইত্যাদি আরও অনেক রকম সদ্‌গুণের আবশ্যক। তাই দুটো দরখাস্ত করে দিয়ে এসেছি—কাল ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে।”

“দুটো দরখাস্ত কেন ?”

“একটা তোমার, একটা আমার। যদি একটা ফস্কায়, অন্যটা লেগে যাবে।”

পরদিন অর্থাৎ সোমবার সকালবেলা আটটার সময় আমরা স্যর দিগিন্দ্রনারায়ণের ভবনে সেক্রেটারি পদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলাম। শহরের দক্ষিণে অভিজাত-পল্লীতে তাঁহার বাড়ি; দরোয়ানের ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, আমাদের মত আরও কয়েকজন চাকরি অভিলাষী হাজির আছেন। একটা ঘরের মধ্যে সকলে গিয়া বসিলাম এবং বক্রকটাক্ষে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশ ও আমি যে পরস্পরকে চিনি, তাহার আভাসমাত্র দিলাম না। পূর্ব হইতে সেইরূপ স্থির করিয়া গিয়াছিলাম।

বাড়ির কর্তা ভিতরের কোনও একটা ঘরে বসিয়া একে একে উমেদারদিগকে ডাকিতে ছিলেন। মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা জাগিতেছিল, হয়তো আমাদের ডাক পড়িবার পূর্বেই অন্য কেহ বাহাল হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখা গেল, একে একে সকলেই ফিরিয়া আসিলেন এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া শুষ্ক-মুখে প্রস্থান করিলেন। শেষ পর্যন্ত বাকি রহিয়া গেলাম আমি আর ব্যোমকেশ।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশ নাম ভাঁড়াইয়া দরখাস্ত করিয়াছিল; আমার নূতন নামকরণ হইয়াছিল জিতেন্দ্রনাথ এবং ব্যোমকেশের নিখিলেশ। পাছে ভুলিয়া যাই, তাই নিজের নামটা মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিয়া লইতেছিলাম, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, কর্তা আমাদের দুইজনকে একসঙ্গে তলব করিয়াছেন। কিছু বিস্মিত হইলাম। ব্যাপার কি ? এতক্ষণ তো একে একে ডাক পড়িতেছিল, এখন আবার একসঙ্গে কেন ? যাহা হোক, বিনা বাক্যব্যয়ে ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখীন হইলাম।

প্রায় আসবাবশূন্য প্রকাণ্ড একখানা ঘরের মাঝখানে বৃহৎ সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং তাহারই সম্মুখে দরজার দিকে মুখ করিয়া হাতকাটা পিরান-পরিহিত বিশালকায় স্যর দিগিন্দ্র বসিয়া

আছেন। বুলডগের মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ গজাইলে যে রকম দেখিতে হয়, সেই রকম একখানা মুখ—হঠাৎ দেখিলে 'বাপ রে' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়। হাঁড়ির মত মাথা, তাহার মধ্যস্থলে টাক পড়িয়া খানিকটা স্থান চক্‌চকে হইয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড শরীর এবং প্রকাণ্ড মস্তকের মাঝখানে গ্রীবা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। দীর্ঘ রোমশ বাহু দু'টা বনমানুষের মত দৃঢ় এবং ভয়ঙ্কর ; কিন্তু তাহার প্রান্তে আঙুলগুলি 'ভারতীয় চিত্রকলার' মত সরু ও সুদৃশ্য—একেবারে লতাইয়া না গেলেও পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছে। চক্ষু দু'টা ক্ষুদ্র এবং সর্বদাই যেন লড়াই করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজিতেছে। মোটের উপর, আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত এই লোকটিকে দেখিবামাত্র একটা অহেতুক সম্ভ্রম ও ভীতির সঞ্চার হয়, মনে হয়, ইহার ঐ কুদর্শন দেহটার মধ্যে ভাল ও মন্দ করিবার অফুরন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে।

আমরা বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া টেবিলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেই ক্ষুদ্র চক্ষু দু'টি আমার মুখ হইতে ব্যোমকেশের মুখে দ্রুতবেগে কয়েকবার যাতায়াত করিয়া ব্যোমকেশের মুখের উপর স্থির হইল। তারপর সেই প্রকাণ্ড মুখে এক অদ্ভুত হাসি দেখা দিল। বুলডগ হাসিতে পারে কি না জানি না ; কিন্তু পারিলে বোধ করি ঐ রকমই হাসিত। এই হাস্য ক্রমে মিলাইয়া গেলে জলদগম্ভীর শব্দ হইল—"উজ্‌রে, দরজা বন্ধ করে দাও।"

নেপালী ভৃত্য উজ্‌রে সিং দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, নিঃশব্দে বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কর্তা তখন টেবিলের উপর হইতে আমাদের দরখাস্ত দুইটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"কার নাম নিখিলেশ ?"

ব্যোমকেশ বলিল—"আজ্ঞে আমার।"

কর্তা কহিলেন—"হুঁ। তুমি নিখিলেশ। আর তুমি জিতেন্দ্রনাথ ? তোমরা দু'জনে সল্লা করে দরখাস্ত করেছ ?"

ব্যোমকেশ বলিল—"আজ্ঞে, আমি ওঁকে চিনি না।"

কর্তা কহিলেন—"বটে ! চেনো না ? কিন্তু দরখাস্ত পড়ে আমার অন্য রকম মনে হয়েছিল। যা হোক, তুমি এম. এস-সি পাস করেছ ?"

ব্যোমকেশ বলিল—"আজ্ঞে হাঁ।"

"কোন য়ুনিভার্সিটি থেকে ?"

"ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি থেকে।"

"হুঁ। টেবিলের উপর হইতে একখানা মোটা বই তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা খুলিয়া কহিলেন—"কোন সালে পাস করেছ ?"

সভয়ে দেখিলাম, বইখানা য়ুনিভার্সিটি কর্তৃক মুদ্রিত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের তালিকা। আমার কপাল ঘামিয়া উঠিল। এই রে ! এবার বুঝি সব ফাঁসিয়া যায় !

ব্যোমকেশ কিন্তু নিষ্কম্প স্বরে কহিল—"আজ্ঞে, এই বছর। মাসখানেক আগে রেজাল্ট বেরিয়েছে।"

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যাক, একটা ফাঁড়া তো কাটিল, এ বছরের নামের তালিকা এখনও ছাপিয়া বাহির হয় নাই।

কর্তা ব্যর্থ হইয়া বই রাখিয়া দিলেন। তারপর আরও কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের উপর কঠোর জেরা চলিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে টলাইতে পারিলেন না। শর্টহ্যান্ড পরীক্ষাতেও যখন সে উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন কর্তা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বেশ। তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলতে পারে। তুমি বসো।"

ব্যোমকেশ বসিল। কর্তা কিয়ৎকাল ভ্রূকুটি করিয়া টেবিলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর হঠাৎ আমার পানে মুখ তুলিয়া বলিলেন—"অজিতবাবু !"

"আজ্ঞে।"

বোমা ফাটার মত হাসির শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, অদম্য হাসির তোড়ে কর্তার বিশাল

দেহ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। অকস্মাৎ এত আনন্দের কি কারণ ঘটিল বুঝিতে না পারিয়া ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া দেখি, সে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে, তখন বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অনুশোচনায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। হায় হায়, মুহূর্তের অসাবধানতায় সব নষ্ট করিয়া ফেলিলাম !

কর্তার হাসি সহজে থামিল না, কড়ি-বরগা কাঁপাইয়া প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া একাদিক্রমে চলিতে লাগিল। তারপর চক্ষু মুছিয়া আমার ম্রিয়মাণ মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া তিনি বলিলেন—"লজ্জিত হয়ো না। আমার কাছে ধরা পড়া তোমাদের পক্ষে কিছুমাত্র লজ্জার কথা নয়। কিন্তু বালক হয়ে তোমরা আমাকে ঠকাবে মনে করেছিলে, এতেই আমার ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে।"

আমরা নির্বাক হইয়া রহিলাম। কর্তা ব্যোমকেশের মাথার দিকে কিছুক্ষণ চক্ষু রাখিয়া বলিলেন—"ব্যোমকেশবাবু, তোমার কাছ থেকে আমি এতটা নির্বুদ্ধিতা প্রত্যাশা করিনি। তুমি ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তোমার করোটির গঠন থেকে বুঝতে পারছি তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে।" ব্যোমকেশের মুণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—"খুলির মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন আউন্স ব্রেন্-ম্যাটার আছে। তবে ব্রেন্-ম্যাটার থাকলেই শুধু হয় না, কন্‌ভল্যুশনের উপর সব নির্ভর করে।...হনু আর চোয়াল উঁচু, মৃদঙ্গ-মুখ, বাঁকা নাক, হুঁ। ত্বরিতকর্মা, কূটবুদ্ধি, একগুঁয়ে। Intuition খুব বেশি ; reasoning power মন্দ developed নয় কিন্তু এখনো mature করেনি। তবে মোটের উপর বুদ্ধির বেশ শৃঙ্খলা আছে—বুদ্ধিমান বলা চলে।"

আমার মনে হইল, জীবন্ত ব্যোমকেশের শব-ব্যবচ্ছেদ হইতেছে, তাহার মস্তিষ্ককে কাটিয়া চিরিয়া ওজন করিয়া তাহার যথার্থ মূল্য নির্ণয় করা হইতেছে এবং আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছি।

স্বগত-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কর্তা বলিলেন—"আমার মাথায় কতখানি মস্তিষ্ক আছে জানো ? ষাট আউন্স—তোমার চেয়ে পাঁচ আউন্স বেশি। অর্থাৎ বনমানুষে আর সাধারণ মানুষে বুদ্ধির যতখানি তফাৎ তোমার সঙ্গে আমার বুদ্ধির তফাৎ তার চেয়েও বেশি।"

ব্যোমকেশ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার মুখে কোনও বিকার দেখা গেল না। কর্তা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; তারপর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"খোকা তোমাকে পাঠিয়েছে একটা জিনিস চুরি করবার জন্য। কিন্তু তুমি পারবে বলে মনে হয় ?"

এবারও ব্যোমকেশ কোনও উত্তর করিল না। তাহার নির্বিকার নীরবতা লক্ষ্য করিয়া কর্তা শ্লেষ করিয়া কহিলেন—"কি হে ব্যোমকেশবাবু, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যে। বলি, এত বড় একটা কাজ হাতে নিয়েছ, পুরুত সেজে ঠাকুর চুরি করতে ঢুকেছ—তা, কি রকম মনে হচ্ছে ? পারবে চুরি করতে ?"

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে কহিল—"সাত দিনের মধ্যে কুমার বাহাদুরের জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দেব, কথা দিয়ে এসেছি।"

কর্তার ভীষণ মুখ ভীষণতর আকার ধারণ করিল, ঘন রোমশ ভ্রূযুগল কপালের উপর যেন তাল পাকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন—"বটে বটে ! তোমার সাহস তো কম নয় দেখছি ! কিন্তু কি করে কাজ হাসিল করবে শুনি ! এখনই তো তোমাদের ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেব। তারপর ?

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল—"আপনার কথা থেকে একটা সংবাদ পাওয়া গেল—হীরাটা বাড়িতেই আছে।"

আরক্ত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া কর্তা বলিলেন—"হ্যাঁ, আছে। কিন্তু তুমি পারবে খুঁজে নিতে ? তোমার ঘটে সে বুদ্ধি আছে কি ?"

ব্যোমকেশ কেবল একটু হাসিল।

মনে হইল, এইবার বুঝি ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিবে। কর্তার কপালের শিরাগুলো ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল, দুই চক্ষে অন্ধ জিঘাংসা জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। হাতের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছু থাকিলে ব্যোমকেশের একটা রিষ্টি উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। ভাগ্যক্রমে সেরূপ কিছু ছিল না। তাই, সিংহ যেমন করিয়া কেশর নাড়া দেয়, তেমনি ভাবে মাথা নাড়িয়া কর্তা কহিলেন—"দেখ ব্যোমকেশবাবু, তুমি মনে কর তোমার ভারি বুদ্ধি—না ? তোমার মত ডিটেক্‌টিভ দুনিয়ায় আর নেই ? তুমি বাংলাদেশের বার্তিলঁ ? বেশ। তোমাকে তাড়াব না। এই বাড়ির মধ্যে যাতায়াত করবার অবাধ অধিকার তোমায় দিলাম। যদি পার, খুঁজে বার কর সে জিনিস। সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেবে কথা দিয়েছ না ? তোমাকে সাত বচ্ছর সময় দিলাম, বার কর খুঁজে। And be damned !"

কর্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জন ছাড়িলেন—"উজ্‌রে সিং !"

উজ্‌রে সিং তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। কর্তা আমাদের নির্দেশ করিয়া কহিলেন—"এই বাবু দু'টিকে চিনে রাখো। আমি বাড়িতে থাকি বা না থাকি এঁরা এ বাড়িতে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, বাধা দিও না। বুঝলে ? যাও।"

উজ্‌রে সিং তাহার নির্বিকার নেপালী মুখ ও তীর্যক চক্ষু আমাদের দিকে একবার ফিরাইয়া 'যো হুকুম' বলিয়া প্রস্থান করিল।

কর্তা এবার রঘুবংশের কুম্ভোদর নামক সিংহের মত হাস্য করিলেন, বলিলেন—"খুঁজি-খুঁজি নারি, যে পায় তারি—বুঝলে হে ব্যোমকেশ চন্দ্র ?"

"আজ্ঞে শুধু ব্যোমকেশ—চন্দ্র নেই।"

"না থাক। কিন্তু বুড়ো হয়ে মরে যাবে, তবু সে জিনিস পাবে না ; বুঝলে ? দিগিন রায় যে-জিনিস লুকিয়ে রাখে, সে জিনিস খুঁজে বার করা ব্যোমকেশ বক্সীর কর্ম নয়। —ভাল কথা, আমার লোহার সিন্দুক ইত্যাদির চাবি যখন দরকার হবে, চেয়ে নিও। তাতে অবশ্য অনেক দামী জিনিস আছে, কিন্তু তোমার ওপর আমার অবিশ্বাস নেই। আমি এখন আমার স্টুডিওতে চললাম—আমাকে আজ আর বিরক্ত করো না। —আর একটা বিষয়ে তোমাদের সাবধান করে দিই—আমার বাড়িময় অনেক বহুমূল্য ছবি আর প্ল্যাস্টারের মূর্তি ছড়ানো আছে, হীরে খোঁজার আগ্রহে সেগুলো যদি কোনও রকমে ভেঙে নষ্ট কর, তাহলে সেই দণ্ডেই কান ধরে বার করে দেব। যে সুযোগ পেয়েছ, তাও হারাবে।"

এইরূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া স্যর দিগিন্দ্র ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দু'জনে মুখোমুখি কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

বুড়ার সহিত সংঘর্ষে ব্যোমকেশও ভিতরে ভিতরে বেশ কাবু হইয়াছিল, তাই ফ্যাকাসে গোছের একটু হাসিয়া বলিল—"চল, বাসায় ফেরা যাক। আজ আর কিছু হবে না।"

অন্যকে ঠকাইতে গিয়া নিজে ঠকিয়া অপদস্থ হওয়ার মত লজ্জা অল্পই আছে, তাই পরাজয় ও লাঞ্ছনার গ্লানি বহিয়া নীরবে বাসায় পৌঁছিলাম। দু'পেয়ালা করিয়া চা গলাধঃকরণ করিবার পর মন কতকটা চাঙ্গা হইলে বলিলাম—"ব্যোমকেশ, আমার বোকামিতেই সব মাটি হল।"

ব্যোমকেশ বলিল—"বোকামি অবশ্য তোমার হয়েছে, কিন্তু সে জন্য ক্ষতি হয়নি। বুড়ো আগে থাকতেই সব জানতো। মনে আছে—ট্রেনের সেই ভদ্রলোকটি ? যিনি পরের স্টেশনে নেমে যাবেন বলে পাশের গাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন ? তিনি এরই গুপ্তচর। বুড়ো আমাদের নাড়ি-নক্ষত্র সব জানে।"

"খুব বাঁদর বানিয়ে ছেড়ে দিলে যা হোক। এমনটা আর কখনও হয়নি।"

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল ; তারপর বলিল—"বুড়োর ঐ মারাত্মক দুর্বলতাটুকু ছিল বলেই রক্ষে, নইলে হয়তো হাল ছেড়ে দিতে হত।"

আমি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলাম—"কি রকম ? তোমার কি এখনও আশা আছে না কি ?"

"বিলক্ষণ! আশা আছে বৈ কি। তবে বুড়ো যদি সত্যিই ঘাড় ধরে বার করে দিত তাহলে কি হত বলা যায় না। যা হোক, বুড়োর একটা দুর্বলতার সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন ঐ থেকেই কার্যসিদ্ধি করতে হবে।"

"কোন্ দুর্বলতার সন্ধান পেলে শুনি! আমি তো বাবা কোথাও এতটুকু ছিদ্র পেলুম না, একেবারে নিরেট নিভাঁজ—লোহার মত শক্ত।"

"কিন্তু ছিদ্র আছে, বেশ বড় রকম ছিদ্র এবং সেই ছিদ্র-পথেই আমরা বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। কি জানি কেন, বড় বড় লোকের মধ্যেই এই দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। যার যত বেশি বুদ্ধি, বুদ্ধির অহঙ্কার তার চতুর্গুণ। ফলে বুদ্ধি থেকেও কোন লাভ হয় না।"

"হেঁয়ালিতে কথা কইছ। একটু পরিষ্কার করে বল।"

"বুড়োর প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে—বুদ্ধির অহঙ্কার। সেটা গোড়াতে বুঝে নিয়েছিলুম বলেই সেই অহঙ্কারে ঘা দিয়ে কাজ হাসিল করে নিয়েছি। বাড়িতে যখন ঢুকতে পেরেছি, তখন তো আট আনা কাজ হয়ে গেছে। এখন বাকী শুধু হীরেটা খুঁজে বার করা।"

"তুমি কি আবার ও-বাড়িতে মাথা গলাবে না কি?".

"আলবৎ গলাব। বল কি, এত বড় সুযোগ ছেড়ে দেব?"

"এবার গেলেই ঐ বেটা উজ্‌রে সিং পেটের মধ্যে কুক্‌রি পুরে দেবে। যা হয় কর, আমি আর এর মধ্যে নেই।"

হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"তা কি হয়, তোমাকেও চাই। এক যাত্রায় পৃথক ফল কি ভাল?"

পরদিন একটু সকাল সকাল স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিনা টিকিটে রেলে চড়িতে গেলে মনের অবস্থা যেরূপ হয়, সেই রকম ভয়ে ভয়ে বাড়ির সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু দরোয়ানরা কেহ বাধা দিল না; উজ্‌রে সিং আজ আমাদের দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইল না। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ একটা বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, গৃহস্বামী স্টুডিওতে আছেন।

অতঃপর আমাদের রত্ন অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এত বড় বাড়ির মধ্যে সুপারির মত একখণ্ড জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিবার দুঃসাহস এক ব্যোমকেশেরই থাকিতে পারে, অন্য কেহ হইলে কোনকালে নিরুৎসাহ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিত। খড়ের গাদার মধ্য হইতে ছুঁচ খুঁজিয়া বাহির করাও বোধ করি ইহার তুলনায় সহজ। প্রথমত, মূল্যবান জিনিসপত্র লোক যেখানে রাখে অর্থাৎ আলমারি কি সিন্দুকে অনুসন্ধান করা বৃথা। বুড়া অতিশয় ধূর্ত—সে-জিনিস সেখানে রাখিবে না। তবে কোথায় রাখিয়াছে? এড্‌গার অ্যালেন্ পো'র একটা গল্প বহুদিন পূর্বে পড়িয়াছিলাম মনে পড়িল। তাহাতেও এমনই কি একটা দলিল খোঁজাখুঁজির ব্যাপার ছিল। শেষে বুঝি নিতান্ত প্রকাশ্য স্থান হইতে সেটা বাহির হইয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ কিন্তু অলস কল্পনায় সময় কাটাইবার লোক নয়। সে রীতিমত খানাতল্লাস শুরু করিয়া দিল। দেয়ালে টোকা মারিয়া কোথাও ফাঁপা আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। বড় বড় পুস্তকের আলমারি খুলিয়া প্রত্যেকটি বই নামাইয়া পরীক্ষা করিল। স্যর দিগিন্দ্রের বাড়িখানা চিত্র ও মূর্তির একটা কলা-ভবন (gallery) বলিলেই হয়, ঘরে ঘরে নানা প্রকার সুন্দর ছবি ও মূর্তির প্ল্যাস্টার-কাস্ট সাজানো রহিয়াছে, অন্য আসবাব খুব কম। সুতরাং মোটামুটি অনুসন্ধান শেষ করিতে দুই ঘণ্টার বেশি সময় লাগিল না। সর্বত্র বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে আমরা গৃহস্বামীর স্টুডিও ঘরে গিয়া হানা দিলাম।

দরজায় টোকা মারিতেই ভিতর হইতে গম্ভীর গর্জন হইল—"এস।"

ঘরটা বেশ বড়, তাহার এক দিকের সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া লম্বা একটা টেবিল চলিয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর নানা চেহারার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাজানো রহিয়াছে। আমরা প্রবেশ করিতেই স্যর দিগিন্দ্র হুঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"কি হে ব্যোমকেশবাবু, পরশ মাণিক

পেলে ? তোমাদের কবি লিখেছেন না, 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর' ? তোমার দশাও সেই ক্ষ্যাপার মত হবে দেখছি, শেষ পর্যন্ত মাথায় বৃহৎ জটা গজিয়ে যাবে।"

ব্যোমকেশ বলিল—"আপনার লোহার সিন্দুকটা একবার দেখব মনে করছি।"

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন—"বেশ বেশ। এই নাও চাবি। আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম, কিন্তু এই প্ল্যাটার-কাস্টটা ঢালাই করতে একটু সময় লাগবে। যা হোক, অজিতবাবু তোমায় সাহায্য করতে পারবেন। আর যদি দরকার হয়, উজ্‌রে সিং—"

তাঁহার শ্লেষোক্তিতে বাধা দিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—"ওটা আপনি কি করছেন ?"

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন—"আমার তৈরি নটরাজ-মূর্তির নাম শুনেছ তো ? এটা তারই একটা ছোট প্ল্যাস্টার-কাস্ট তৈরি করেছি। আর একটা আমার টেবিলের উপর রাখা আছে, দেখে থাকবে। কাগজ-চাপা হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয়—কি বল ?"

মনে পড়িল, স্যর দিগিন্দ্রের বসিবার ঘরে টেবিলের উপর একটি অতি সুন্দর ছোট নটরাজ মহাদেবের মূর্তি দেখিয়াছিলাম। ওটা তখনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু উহাই যে স্যর দিগিন্দ্রের নির্মিত বিখ্যাত মূর্তির মিনিয়েচার, তাহা তখন কল্পনা করি নাই। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"ঐ মূর্তিটাই আপনি প্যারিসে এক্‌জিবিট্‌ করিয়েছিলেন !"

স্যর দিগিন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন—"হ্যাঁ। আসল মূর্তিটা পাথরে গড়া—সেটা এখনও ল্যুভারে আছে।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। লোকটার সর্বতোমুখী অসামান্যতা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল ; তাই, ব্যোমকেশ যখন সিন্দুক খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল, আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত বড় একটা প্রতিভার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ের আশা কোথায় ?

অনুসন্ধান শেষ করিয়া ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"নাঃ, কিছু নেই। চল, বাইরের ঘরে একটু বসা যাক।"

বসিবার ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম স্যর দিগিন্দ্র ইতিমধ্যে আসিয়া বসিয়াছেন এবং মুখের অনুযায়ী একটি স্থূল চুরুট দাঁতে চাপিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন। আমরা বসিলে তিনি ব্যোমকেশের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—"পেলে না ? আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই। একটু জিরিয়ে নাও, তারপর আবার খুঁজো।" ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চাবির গোছা ফেরৎ দিল ; সেটা পকেটে ফেলিয়া আমার পানে ফিরিয়া স্যর দিগিন্দ্র কহিলেন—"ওহে অজিতবাবু, তুমি তো গল্প-টল্প লিখে থাকো ; সুতরাং একজন বড় দরের আর্টিস্ট ! বল দেখি এ পুতুলটি কেমন ?"—বলিয়া সেই নটরাজ-মূর্তিটি আমার হাতে দিলেন।

ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং ইঞ্চি তিনেক চওড়া মূর্তিটি। কিন্তু ঐটুকু পরিসরের মধ্যে কি অপূর্ব শিল্প-প্রতিভাই না প্রকাশ পাইয়াছে ! নটরাজের প্রলয়ঙ্কর নৃত্যোন্মাদনা যেন ঐ ক্ষুদ্র মূর্তির প্রতি অঙ্গ হইতে মথিত হইয়া উঠিতেছে। কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিবার পর আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইল—"চমৎকার ! এর তুলনা নেই।"

ব্যোমকেশ নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এটাও কি আপনি নিজে মোল্‌ড করেছেন ?"

একরাশি ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন—"হ্যাঁ। আমি ছাড়া আর কে করবে ?"

ব্যোমকেশ মূর্তিটা আমার হাত হইতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, —"এ জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না বোধ হয় ?"

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন—"না। কেন বল দেখি ? পাওয়া গেলে কিনতে না কি ?"

"বোধ হয় কিনতুম। আপনিই এই রকম প্ল্যাস্টার-কাস্ট তৈরি করিয়ে বাজারে বিক্রি করেন না কেন ? আমার বিশ্বাস, এতে পয়সা আছে।"

"পয়সার যদি কখনও অভাব হয় তখন দেখা যাবে। আপাতত জিনিসটাকে বাজারে বিক্রি করে খেলো করতে চাই না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল—"এখন তাহলে উঠি। আবার ও বেলা আসব।" বলিয়া মূর্তিটা ঠিক্ করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

স্যর দিগিন্দ্র চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তুমি তো আচ্ছা বেকুব হে। এখনই ওটা ভেঙেছিলে!" তারপর বাঘের মত ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া রুদ্ধ গর্জনে বলিলেন—"তোমাদের একবার সাবধান করে দিয়েছি, আবার বলছি, আমার কোন ছবি বা মূর্তি যদি ভেঙেছ, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বার করে দেব, আর ঢুকতে দেব না। বুঝেছ?"

ব্যোমকেশ অনুতপ্তভাবে মার্জনা চাহিলে তিনি ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন—"এইসব সুকুমার কলার অযত্ন আমি দেখতে পারি না। যা হোক্, ও বেলা তাহলে আবার আসছ? বেশ কথা, উদ্যোগিনাং পুরুষসিংহ— ; এবার বাড়ির কোন্ দিকটা খুঁজবে মনস্থ করেছ? বাগান কুপিয়ে যদি দেখতে চাও, তারও বন্দোবস্ত করে রাখতে পারি?"

বিদ্রূপবাণ বেবাক হজম করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। রাস্তায় পড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল—"চল, এতক্ষণে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরি খুলেছে, একবার ওদিকটা ঘুরে যাওয়া যাক। একটু দরকার আছে।"

ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়া ব্যোমকেশ বিলাতি বিশ্বকোষ হইতে প্ল্যাস্টার-কাস্টিং অংশটা খুব মন দিয়া পড়িল। তারপর বই ফিরাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। লক্ষ্য করিলাম, কোনও কারণে সে বেশ একটু উত্তেজিত হইয়াছে। বাড়ি পৌঁছিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হে, প্ল্যাস্টার-কাস্টিং সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন?"

ব্যোমকেশ বলিল—"তুমি তো জানো, সকল বিষয়ে কৌতূহল আমার একটা দুর্বলতা।"

"তা তো জানি। কিন্তু কি দেখলে?"

"দেখলুম প্ল্যাস্টার-কাস্টিং খুব সহজ, যে-কেউ করতে পারে। খানিকটা প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস জলে গুলে যখন সেটা দইয়ের মত ঘন হয়ে আসবে, তখন মাটির বা মোমের ছাঁচের মধ্যেই আস্তে আস্তে ঢেলে দাও। মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা জমে শক্ত হয়ে যাবে, তখন ছাঁচ থেকে বার করে নিলেই হয়ে গেল। ওর মধ্যে শক্ত যা-কিছু ঐ ছাঁচটা তৈরি করা।"

"এই! তা এর জন্য এত দুর্ভাবনা কেন?"

"দুর্ভাবনা নেই। ছাঁচে প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস ঢালবার সময় যদি একটা সুপুরি কি ঐ জাতীয় কোনও শক্ত জিনিস সেই সঙ্গে ঢেলে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা মূর্তির মধ্যে রয়ে যাবে।"

"অর্থাৎ?"

কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"অর্থাৎ বুঝ লোক যে জান সন্ধান।"

বৈকালে আবার স্যর দিগিন্দ্রের বাড়িতে গেলাম। এবারও তন্ন তন্ন করিয়া বাড়িখানা খোঁজা হইল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। স্যর দিগিন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে যখন ক্লান্ত হইয়া আমরা বসিবার ঘরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম, তখন তিনি আমাদের ভারি পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া চা ও জলখাবার আনাইয়া দিয়া আমাদের প্রতি আতিথ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দিলেন। আমার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্যোমকেশ একেবারে বেহায়া,—সে অম্লানবদনে সমস্ত ভোজ্যপেয় উদরসাৎ করিতে করিতে অমায়িকভাবে স্যর দিগিন্দ্রের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

স্যর দিগিন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কত দিন চালাবে? এখনও আশ মিটল না?"

ব্যোমকেশ বলিল—"আজ বুধবার। এখনও দু'দিন সময় আছে।"

স্যর দিগিন্দ্র অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া টেবিলের উপর হইতে নটরাজের পুতুলটা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এটা কত দিন হল তৈরি করেছেন?"

ভ্রূকুটি করিয়া স্যর দিগিন্দ্র চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন—"দিন পনের-কুড়ি হবে। কেন?"

"না—অমনি। আচ্ছা, আজ উঠি। কাল আবার আসব। নমস্কার।" বলিয়া ব্যোমকেশ

উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ি ফিরিতেই চাকর পুঁটিরাম একখানা খাম ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল, "একজন তক্‌মা-পরা চাপরাসী দিয়ে গেছে।"

খামের ভিতর শুধু একটি ভিজিটিং কার্ড, তাহার এক পিঠে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে—কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায়। অন্য পিঠে পেন্সিল দিয়া লেখা,—"এইমাত্র কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। গ্র্যান্ড হোটেলে আছি। কত দূর ?"

ব্যোমকেশ কার্ডখানা টেবিলের এক পাশে রাখিয়া দিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল ; কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া চুপ করিয়া রহিল। কুমার বাহাদুর হঠাৎ আসিয়া পড়ায় সে মনে মনে খুশি হয় নাই বুঝিলাম। প্রশ্ন করাতে সে বলিল—"এক পক্ষের উৎকণ্ঠা অনেক সময় অন্য পক্ষে সঞ্চারিত হয়। কুমার বাহাদুরের আসার ফলে বুড়ো যদি ভয় পেয়ে মতলব বদলায়, তা হলেই সব মাটি। আবার নূতন করে কাজ আরম্ভ করতে হবে।"

সমস্ত সন্ধ্যাটা সে একভাবে আরাম-চেয়ারে পড়িয়া রহিল। রাত্রে আমরা দু'জনে একই ঘরে দুইটি পাশাপাশি খাটে শয়ন করিতাম, বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ গল্প চলিত। আজ কিন্তু ব্যোমকেশ একটা কথাও কহিল না। আমি কিছুক্ষণ এক-তরফা কথা কহিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে আমি, ব্যোমকেশ ও স্যর দিগিন্দ্র হীরার মার্বেল দিয়া গুলি খেলিতেছি, মার্বেলগুলি ব্যোমকেশ সমস্ত জিতিয়া লইয়াছে, স্যর দিগিন্দ্র মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময় চমকিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল।

চোখ খুলিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে আমার খাটের পাশে বসিয়া আছে। আমার নিশ্বাসের শব্দে বোধহয় বুঝিতে পারিল আমি জাগিয়াছি, বলিল—"দেখ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হীরাটা বসবার ঘরে টেবিলের উপর কোনোখানে আছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"রাত্রি ক'টা ?"

ব্যোমকেশ বলিল—"আড়াইটে। তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ ? বুড়ো বসবার ঘরে ঢুকেই প্রথমে টেবিলের দিকে তাকায় ?"

আমি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলাম—"তাকাক্, তুমি এখন চোখ বুজে শুয়ে পড় গে।"

ব্যোমকেশ নিজ মনেই বলিতে লাগিল, "টেবিলের দিকে তাকায় কেন ? নিশ্চয়,—দেরাজের মধ্যে ? না। যদি থাকে তো টেবিলের উপরই আছে। কি কি জিনিস আছে টেবিলের উপর ? হাতির দাঁতের দোয়াতদান, টাইমপিস ঘড়ি, গঁদের শিশি, কতকগুলো বই, ব্লটিং প্যাড, সিগারের বাক্স, পিনকুশন, নটরাজ—"

শুনিতে শুনিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রে যতবার ঘুম ভাঙিল, অনুভব করিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

সকালে ব্যোমকেশ কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণকে একখানা চিঠি লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল। সংক্ষেপে জানাইল যে, চিন্তার কোনও কারণ নাই, শনিবার কোনও সময় দেখা হইবে।

তারপর আবার দুইজনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, সারারাত্রি জাগরণের ফলে সে মনে মনে কোনও একটা সঙ্কল্প করিয়াছে।

স্যর দিগিন্দ্র আজ বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া সাড়ম্বরে সম্ভাষণ করিলেন—"এই যে মাণিক-জোড়, এস, এস। আজ ভারি সকাল সকাল ? ওরে কে আছিস, বাবুদের চা দিয়ে যা। ব্যোমকেশবাবুকে আজ বড় শুকনো শুকনো দেখছি ! দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুম হয়নি বুঝি ?"

ব্যোমকেশ টেবিল হইতে নটরাজের মূর্তিটি হাতে লইয়া আস্তে আস্তে বলিল—"এই পুতুলটিকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। কাল সমস্ত রাত্রি এর কথা ভেবেই ঘুমোতে পারিনি।"

পূর্ণ এক মিনিটকাল দু'জনে পরস্পরের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নিঃশব্দে মনে মনে কি যুদ্ধ হইল বলিতে পারি না, এক মিনিট পরে স্যর দিগিন্দ্র

সকৌতুকে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ব্যোমকেশ, তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি, অত সহজে এ বুড়োকে ঠকাতে পারবে না। ওটার জন্যে রাত্রে তোমার ঘুম হয়নি বলছিলে, বেশ, তোমাকে ওটা আমি দান করলাম।"

ব্যোমকেশের হতবুদ্ধি মুখের দিকে ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—"কেমন ? হল তো ? কিন্তু মূর্তিটা দামী জিনিস, ভেঙে নষ্ট করো না।"

মুহূর্তমধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল—"ধন্যবাদ।" বলিয়া মূর্তিটি রুমালে মুড়িয়া পকেটে পুরিল।

তারপর যথারীতি ব্যর্থ অনুসন্ধান করিয়া বেলা দশটা নাগাদ বাসায় ফিরিলাম। চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ব্যোমকেশ সনিশ্বাসে বলিল—"নাঃ, ঠকে গেলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ব্যাপার বল তো ? আমি তো তোমাদের কথাবার্তা ভাবভঙ্গী কিছুই বুঝতে পারলুম না।"

পকেট হইতে পুতুলটা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"নানা কারণে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, এই নটরাজের ভিতরে হীরেটা আছে। ভেবে দেখ, এমন সুন্দর লুকোবার জায়গা আর হতে পারে কি ? হীরেটা চোখের সামনে টেবিলের উপর রয়েছে, অথচ কেউ দেখতে পাচ্ছে না। পুতুলটা স্যর দিগিন্দ্র ছাঁচে ঢালাই করেছেন, সুতরাং প্লাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে হীরেটা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। তাতে স্যর দিগিন্দ্রের মনস্কামনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে হীরেটার প্রতি তাঁর এত ভালবাসা, সেটা সর্বদা কাছে কাছে থাকে, অথচ কারুর সন্দেহ হয় না। যে দিক্ থেকেই দেখ, সমস্ত যুক্তি অনুমান ঐ পুতুলটার দিকে নির্দেশ করছে। তাই আমার নিঃসংশয় ধারণা হয়েছিল যে, হীরেটা আর কোথাও থাকতে পারে না। আজ ঠিক করে বেরিয়েছিলাম যে পুতুলটা চুরি করব। কিন্তু বুড়োর কাছে ঠকে গেলুম। শুধু তাই নয়, বুড়ো আমার মনের ভাব বুঝে বিদ্রূপ করে পুতুলটা আমায় দান করে দিলে ! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে বুড়ো এক নম্বর। মোটের উপর আমার থিয়োরিটাই ভেস্তে গেল। —এখন আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু সময়ও তো আর নেই। মাঝে মাত্র একদিন।"

ব্যোমকেশ পুতুলটার নীচে পেন্সিল দিয়া ক্ষুদ্র অক্ষরে নিজের নামের আদ্যক্ষরটা লিখিতে লিখিতে বলিল—"মাত্র একদিন। বোধ হয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা হল না। এদিকে কুমার বাহাদুর এসে হানা দিয়ে বসে আছেন। নাঃ, বুড়ো সব দিক দিয়েই হাস্যাস্পদ করে দিলে। লাভের মধ্যে দেখছি কেবল এই পুতুলটা !" মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া ব্যোমকেশ মূর্তিটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, তারপর বুকে ঘাড় গুঁজিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বৈকালে নিয়মমত স্যর দিগিন্দ্রের বাড়িতে গেলাম। শুনিলাম কর্তা এইমাত্র বাহিরে গিয়াছেন। ব্যোমকেশ তখন নূতন পথ ধরিল, আমাকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া উজ্‌রে সিং থাপার সহিত ভাব জমাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। আমি একাকী বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম ; ব্যোমকেশ ও উজ্‌রে সিং বারান্দার দুই টুলে বসিয়া অমায়িকভাবে আলাপ করিতেছে, মাঝে মাঝে চোখে পড়িতে লাগিল। ব্যোমকেশ ইচ্ছা করিলে খুব সহজে মানুষের মন ও বিশ্বাস জয় করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু উজ্‌রে সিং থাপার পাহাড়ী হৃদয় গলাইয়া তাহার পেট হইতে কথা বাহির করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে আবার যখন দু'জনে পথে বাহির হইলাম, তখন ব্যোমকেশ বলিল—"কিছু হল না। উজ্‌রে সিং লোকটি হয় নিরেট বোকা, নয় আমার চেয়ে বুদ্ধিমান।"

বাসায় ফিরিয়া আসিলে চাকর খবর দিল একটি লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল, আমাদের আশায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া—আবার আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে বলিল—"কুমার বাহাদুরের পেয়াদা।"

এই ব্যর্থ ঘোরাঘুরি ও অন্বেষণে আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম—"আর কেন

ব্যোমকেশ, ছেড়ে দাও। এ যাত্রা কিছু হল না। কুমার সাহেবকেও জবাব দিয়ে দাও, মিছে তাঁকে সংশয়ের মধ্যে রেখে কোনও লাভ নেই।"

টেবিলের সম্মুখে বসিয়া নটরাজ মূর্তিটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে ম্রিয়মাণ কণ্ঠে ব্যোমকেশ বলিল—"দেখি, কালকের দিনটা এখনও হাতে আছে। যদি কাল সমস্ত দিনে কিছু না করতে পারি—" তাহার মুখের কথা শেষ হইল না। চোখ তুলিয়া দেখি, তাহার মুখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে নিষ্পলক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নটরাজ-মূর্তিটার দিকে তাকাইয়া আছে।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হল ?"

ব্যোমকেশ কম্পিতহস্তে মূর্তিটা আমার চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"দেখ দেখ—নেই! মনে আছে, আজ সকালে পেন্সিল দিয়ে পুতুলটার নীচে একটা 'ব' অক্ষর লিখেছিলুম ? সে অক্ষরটা নেই!"

দেখিলাম সত্যিই অক্ষরটা নাই। কিন্তু সেজন্য এত বিচলিত হইবার কি আছে ? পেন্সিলের লেখা—মুছিয়া যাইতেও তো পারে!

ব্যোমকেশ বলিল—"বুঝতে পারছ না ? বুঝতে পারছ না ?" হঠাৎ সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"উঃ বুড়ো কি ধাপ্পাই দিয়েছে! একেবারে উল্লুক বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল হে! যা হোক, বাঘেরও ঘোগ আছে।—পুঁটিরাম!"

ভৃত্য পুঁটিরাম আসিলে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—"যে লোকটি আজ এসেছিল, তাকে কোথায় বসিয়েছিলে ?"

"আজ্ঞে, এই ঘরে।"

"তুমি বরাবর এ ঘরে ছিলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে মাঝে তিনি এক গেলাস জল চাইলেন, তাই—"

"আচ্ছা—যাও।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া হাসিতে লাগিল, তারপর উঠিয়া পাশের ঘরে যাইতে যাইতে বলিল—"তুমি শুনে হয়তো আশ্চর্য হবে,—হীরেটা আজ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই টেবিলের উপর রাখা ছিল।"

আমি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। বলে কি ? হঠাৎ মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি ?

পাশের ঘর হইতে ব্যোমকেশ ফোন করিতেছে শুনিতে পাইলাম—"কুমার ত্রিদিবেন্দ্র ? হ্যাঁ, আমি ব্যোমকেশ। কাল বেলা দশটার মধ্যে পাবেন! আপনার স্পেশাল ট্রেন যেন ঠিক থাকে। পাবামাত্র রওনা হবেন। না, এখানে থাকা বোধহয় নিরাপদ হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ও সব কথা পরে হবে। ভুলবেন না সাড়ে দশটার মধ্যে কলকাতা ছাড়া চাই। আচ্ছা, আপনার কিছু করে কাজ নেই—স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত আমি করে রাখব। কাউকে কিছু বলবেন না ;—না আপনার সেক্রেটারিকেও নয়—আচ্ছা, নমস্কার।"

তারপর হ্যাটকোট পরিয়া বোধ করি স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইল। 'ফিরতে রাত হবে—তুমি শুয়ে পোড়ো' আমাকে শুধু এইটুকু বলিয়া গেল।

রাত্রে ব্যোমকেশ কখন ফিরিল, জানিতে পারি নাই। সকালে সাড়ে আটটার সময় যথারীতি দু'জনে বাহির হইলাম। বাহির হইবার সময় দেখিলাম, নটরাজ-মূর্তিটা যথাস্থানে নাই। সেদিকে ব্যোমকেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে বলিল—"আছে। সেটাকে সরিয়ে রেখেছি।"

স্যর দিগিন্দ্র তাঁহার বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া বলিলেন—"তোমাদের দৈনিক আক্রমণ আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। এমন কি, যতক্ষণ তোমরা আসনি, একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল।"

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল—"আপনার উপর অনেক জুলুম করেছি, কিন্তু আর করব না, এই কথাটি আজ জানাতে এলুম। জয়-পরাজয় এক পক্ষের আছেই, সে জন্য দুঃখ করা মূঢ়তা। কাল থেকে আর আমাদের দেখতে পাবেন না। আপনি অবশ্য জানেন যে, আপনার ভাইপো

এখানে গ্র্যান্ড হোটেলে এসে আছেন,—তাঁকে কাল একরম জানিয়েই দিয়েছি যে তাঁর এখানে থেকে আর কোনও লাভ নেই। আজ তাঁকে শেষ জবাব দিয়ে যাব।"

স্যর দিগিন্দ্র কিছুক্ষণ কুঞ্চিত-চক্ষে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিলেন ; ক্রমে তাঁহার মুখে সেই বুলডগ-হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন—"তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে খুশি হলাম। খোকাকে বোলো বৃথা চেষ্টা করে যেন সময় নষ্ট না করে।"

"আচ্ছা, বলব।"—টেবিলের উপর আর একটি নটরাজ-মূর্তি রাখা হইয়াছে দেখিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল—"এই যে আর একটা তৈরি করেছেন দেখছি। আপনার উপহারটি আমি যত্ন করে রেখেছি ; শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, আপনার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেও আমার কাছে তার দাম অনেক।—কিন্তু যদি কখনও দৈবাৎ ভেঙে যায়, আর একটা পাব কি ?"

স্যর দিগিন্দ্র প্রসন্নভাবে বলিলেন—"বেশ, যদি ভেঙে যায়, আর একটা পাবে। আমার বাড়িতে ঢুকে তোমার শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে, এটাও কম লাভ নয়।"

গম্ভীর বিনয় সহকারে ব্যোমকেশ বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এত দিন আমার মনের ওদিকটা একেবারে পর্দা ঢাকা ছিল। কিন্তু এই ক'দিন আপনার সংসর্গে এসে ললিত-কলার রস পেতে আরম্ভ করেছি, বুঝেছি, ওর মধ্যে কি অমূল্য রত্ন লুকোনো আছে—ঐ ছবিখানাও আমার বড় ভাল লাগে। ওটা কি আপনারই আঁকা ?"—স্যর দিগিন্দ্রের পশ্চাতে দেয়ালের গায়ে একটা সুন্দর নিসর্গ দৃশ্যের ছবি টাঙানো ছিল, ব্যোমকেশ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

মুহূর্তের জন্য স্যর দিগিন্দ্র ঘাড় ফিরাইলেন। সেই ক্ষণিক অবকাশে ব্যোমকেশ এক অদ্ভুত হাতের কসরৎ দেখাইল। টিকটিকি যেমন করিয়া শিকার ধরে, তেমনি ভাবে তাহার একটা হাত টেবিলের উপর হইতে নটরাজ-মূর্তি তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল এবং অন্য হাতটা সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নটরাজ-মূর্তি তাহার স্থানে বসাইয়া দিল। স্যর দিগিন্দ্র যখন আবার সম্মুখে ফিরিলেন, তখন ব্যোমকেশ পূর্ববৎ মুগ্ধভাবে দেয়ালের ছবিটার দিকে চাহিয়া আছে।

আমার বুকের ভিতরটা এমন অসম্ভব রকম ধড়ফড় করিতে লাগিল যে, স্যর দিগিন্দ্র যখন সহজ কণ্ঠে বলিলেন—"হ্যাঁ, ওটা আমারই আঁকা," তখন কথাগুলো আমার কানে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দূরাগত বলিয়া মনে হইল। ভাগ্যে সে সময় তিনি আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, নতুবা ব্যোমকেশের হাতের কসরৎ হয়তো আমার মুখের উদ্বেগ হইতেই ধরা পড়িয়া যাইত।

ব্যোমকেশ ধীরে সুস্থে উঠিয়া বলিল—"এখন তাহলে আসি। আপনার সংসর্গে এসে আমার লাভই হয়েছে, এ কথা আমি কখনও ভুলব না। আশা করি, আপনিও আমাদের ভুলতে পারবেন না। যদি কখনও দরকার হয়—মনে রাখবেন, আমি একজন সত্যান্বেষী, সত্যের অনুসন্ধান করাই আমার পেশা। চল অজিত। আচ্ছা, চল্লুম তবে—নমস্কার !"

দরজার নিকট হইতে একবার ফিরিয়া দেখিলাম, স্যর দিগিন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া সন্দেহ-প্রখর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন, যেন ব্যোমকেশের কথার কোন একটা অতি গূঢ় ইঙ্গিত বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না।

বাড়ির বাহিরে আসিতেই একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল ; তাহাতে চড়িয়া বসিয়া ব্যোমকেশ হুকুম দিল—"গ্র্যান্ড হোটেল।"

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—"ব্যোমকেশ, এসব কি কাণ্ড ?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল—"এখনও বুঝতে পারছ না, এই আশ্চর্য। আমি যে অনুমান করেছিলুম হীরেটা নটরাজের মধ্যে আছে, তা ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম। বুড়ো বুঝতে পেরে আমাকে ধোঁকা দেবার জন্যে পুতুলটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। তারপর আর একটা ঠিক ঐ রকম মূর্তি তৈরি করে কাল সন্ধ্যাবেলা গিয়ে আসলটার সঙ্গে বদল করে এনেছিল। যদি এই অস্পষ্ট 'ব' অক্ষরটি লেখা না থাকত, তাহলে আমি জানতেও পারতুম না !" বলিয়া পুতুলটা উল্টাইয়া দেখাইল। দেখিলাম, পেন্সিলে লেখা অক্ষরটি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল—"কাল যখন এই 'ব' অক্ষরটি যথাস্থানে দেখতে পেলুম না, তখন এক

নিমেষে সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ প্রথমে গিয়েই বুড়োর টেবিল থেকে নটরাজটি উল্টে দেখলুম—আমার সেই 'ব' মার্কা নটরাজ। অন্য মূর্তিটা পকেটেই ছিল। ব্যস্! তারপর হাত-সাফাই তো দেখতেই পেলে।"

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম—"তুমি ঠিক জানো, হীরেটা ওর মধ্যেই আছে ?"

"হ্যাঁ। ঠিক জানি—কোন সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু যদি না থাকে ?"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল শেষে বলিল—"তাহলে বুঝব, পৃথিবীতে সত্য বলে কোনও জিনিস নেই ; শাস্ত্রের অনুমান-খণ্ডটা একেবারে মিথ্যা।"

গ্র্যান্ড হোটেলে কুমার ত্রিদিবেন্দ্র একটা আস্ত স্যুট ভাড়া করিয়া ছিলেন, আমরা তাঁহার বসিবার ঘরে পদার্পণ করিতেই তিনি দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিলেন—"কি ? কি হল, ব্যোমকেশবাবু ?"

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে নটরাজ-মূর্তিটা টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

হতবুদ্ধিভাবে কুমার বাহাদুর বলিলেন—"এটা তো দেখছি কাকার নটরাজ, কিন্তু আমার সীমন্ত-হীরা—"

"ওর মধ্যে আছে।"

"ওর মধ্যে—"

"হ্যাঁ, ওরি মধ্যে। কিন্তু আপনার যাবার বন্দোবস্ত সব ঠিক আছে তো ? সাড়ে দশটার সময় আপনার স্পেশাল ছাড়বে।"

কুমার বাহাদুর অস্থির হইয়া বলিলেন—"কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। ওর মধ্যে আমার সীমন্ত-হীরা আছে কি বলছেন ?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না ? বেশ, পরীক্ষা করে দেখুন।"

একটা পাথরের কাগজ-চাপা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ মূর্তিটার উপর সজোরে আঘাত করিতেই সেটা বহু খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল।

"এই নিন আপনার সীমন্ত-হীরা।"— ব্যোমকেশ হীরাটা তুলিয়া ধরিল, তাহার গায়ে তখনও প্ল্যাস্টার জুড়িয়া আছে, কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ওটা সত্যই হীরা বটে।

কুমার বাহাদুর ব্যোমকেশের হাত হইতে হীরাটা প্রায় কাড়িয়া লইলেন ; কিছুক্ষণ একাগ্র নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ, এই আমার সীমন্ত-হীরা। এই যে এর ভিতর থেকে নীল আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।—ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব—"

"কিছু বলতে হবে না, আপাতত যত শীঘ্র পারেন বেরিয়ে পড়ুন। খুড়ো মশাই যদি ইতিমধ্যে জানতে পারেন, তাহলে আবার হীরা হারাতে কতক্ষণ ?"

"না না, আমি এখনই বেরুচ্ছি। কিন্তু আপনার—"

"সে পরে হবে। নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে তার ব্যবস্থা করবেন।"

কুমার বাহাদুরকে স্টেশনে রওনা করিয়া দিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। আরাম-কেদারায় অঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া ব্যোমকেশ পরম সার্থকতার হাসি হাসিয়া বলিল—"আমি শুধু ভাবছি, বুড়ো যখন জানতে পারবে, তখন কি করবে ?"

দিন কয়েক পরে কুমার বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি ইন্সিওর-করা খাম আসিল। চিঠির সঙ্গে একখানি চেক পিন দিয়া আঁটা। চেক-এ অঙ্কের হিসাবটা দেখিয়া চক্ষু ঝলসিয়া গেল। পত্রখানি এইরূপ—

প্রিয় ব্যোমকেশবাবু,

আমার চিরন্তন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যাহা পাঠাইলাম, জানি আপনার প্রতিভার তাহা যোগ্য নয়। তবু, আশা করি আপনার অমনোনীত হইবে না। ভবিষ্যতে আপনার সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় রহিলাম। এবার যখন কলিকাতায় যাইব, আপনার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিব।

অজিতবাবুকেও আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। তিনি সাহিত্যিক, সুতরাং টাকার কথা তুলিয়া তাঁহার সারস্বত সাধনার অমর্যাদা করিতে চাই না। [হায় রে পোড়াকপালে সাহিত্যিক !] কিন্তু যদি তিনি নাম-ধাম বদল করিয়া এই হীরা-হরণের গল্পটা লিখিতে পারেন, তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তি নাই জানিবেন। শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

ইতি
প্রতিভামুগ্ধ
শ্রীত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায়

মাকড়সার রস

ব্যোমকেশকে এক রকম জোর করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির করিয়াছিলাম।

গত একমাস ধরিয়া সে একটা জটিল জালিয়াতির তদন্তে মনোনিবেশ করিয়াছিল ; একগাদা দলিলপত্র লইয়া রাতদিন তাহার ভিতর হইতে অপরাধীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল এবং রহস্য যতই ঘনীভূত হইতেছিল ততই তাহার কথাবার্তা কমিয়া আসিতেছিল। লাইব্রেরি ঘরে বসিয়া নিরন্তর এই শুষ্ক কাগজপত্রগুলো ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া তাহার শরীরও খারাপ হইয়া পড়িতেছে দেখিতেছিলাম, কিন্তু সে-কথার উল্লেখ করিলে সে বলিত—"নাঃ, বেশ তো আছি—"

সেদিন বৈকালে বলিলাম—"আর তোমার কথা শোনা হবে না, চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক। দিনের মধ্যে অন্তত দু'ঘণ্টাও তো বিশ্রাম দরকার।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু নয়—চল লেকের দিকে। দু'ঘণ্টায় তোমার জালিয়াৎ পালিয়ে যাবে না।"

"চল—" কাগজপত্র সরাইয়া রাখিয়া সে বাহির হইল বটে কিন্তু তাহার মনটা সেই অজ্ঞাত জালিয়াতের পিছু ছাড়ে নাই বুঝিতে কষ্ট হইল না।

লেকের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একজন বহু পুরাতন কলেজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। অনেকদিন তাহাকে দেখি নাই ; আই. এ. ক্লাশে দু'জনে একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম, তারপর সে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে। সেই অবধি ছাড়াছাড়ি। আমি তাহাকে দেখিয়া বলিলাম—"আরে ! মোহন যে ! তুমি কোত্থেকে ?"

সে আমাকে দেখিয়া সহর্ষে বলিল—"অজিত ! তাই তো হে ! কদ্দিন পরে দেখা ! তারপর খবর কি ?"

কিছুক্ষণ পরস্পরের পিঠ চাপড়া-চাপড়ির পর ব্যোমকেশের সহিত পরিচয় করিয়া দিলাম। মোহন বলিল—"আপনিই ? বড় খুশি হলুম। মাঝে মাঝে সন্দেহ হত বটে, আপনার কীর্তি-প্রচারক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো আমাদের বাল্যবন্ধু অজিত ; কিন্তু বিশ্বাস হত না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি আজকাল কি করছ ?"

মোহন বলিল—"কলকাতাতেই প্র্যাক্‌টিস করছি।"

তারপর বেড়াইতে বেড়াইতে নানা কথায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। লক্ষ্য করিলাম, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে মোহন দু' একবার কি একটা বলিবার জন্য মুখ খুলিয়া আবার থামিয়া গেল। ব্যোমকেশও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাই এক সময় অল্প হাসিয়া বলিল—"কি বলবেন বলুন না।"

মোহন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"একটা কথা বলি-বলি করেও বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে সে নিয়ে আপনাকে বিব্রত করা অন্যায়। অথচ—"

আমি বলিলাম—"তা হোক, বল। আর কিছু না হোক, ব্যোমকেশকে কিছুক্ষণের জন্য জালিয়াতের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া তো হবে।"

"জালিয়াৎ ?"

আমি বুঝাইয়া দিলাম। তখন মোহন বলিল—"ও ! কিন্তু আমার কথা শুনে হয়তো

ব্যোমকেশবাবু হাসবেন—"

ব্যোমকেশ বলিল—"হাসির কথা হলে নিশ্চয় হাসব, কিন্তু আপনার ভাব দেখে তা মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ বোধ হচ্ছে একটা কোনও সমস্যা কিছুদিন থেকে আপনাকে ভাবিত করে রেখেছে—আপনি তারই উত্তর খুঁজছেন।"

মোহন সাগ্রহে কহিল—"আপনি ঠিক ধরেছেন। জিনিসটা হয়তো খুবই সহজ—কিন্তু আমার পক্ষে এটা একটা দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি নেহাত বোকা নই—সাধারণ সহজ-বুদ্ধি আছে বলেই মনে করি ; অথচ একজন রোগে পঙ্গু চলৎশক্তিরহিত লোক আমাকে প্রত্যহ এমনভাবে ঠকাচ্ছে যে শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন ; শুধু আমাকে নয়, তার সমস্ত পরিবারের তীক্ষ্ণ সতর্কতা সে প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।"

কথা কহিতে কহিতে আমরা একটা বেঞ্চিতে আসিয়া বসিয়াছিলাম। মোহন বলিল—"যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলছি—শুনুন। কোনো এক বড় মানুষের বাড়িতে আমি গৃহ-চিকিৎসক। তাঁরা বনেদী বড়মানুষ, কলকাতায় বন কেটে বাস ; অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি ছাড়াও কলকাতায় একটা বাজার আছে—তা থেকে মাসিক হাজার পনের টাকা আয়। সুতরাং আর্থিক অবস্থা কি রকম বুঝতেই পারছেন।

"এই বাড়ির যিনি কর্তা তাঁর নাম নন্দদুলালবাবু। ইনিই বলতে গেলে ও বাড়িতে আমার একমাত্র রুগী। বয়স কালে ইনি এত বেশি বদ-খেয়ালী করেছিলেন যে পঞ্চাশ বছর বয়স হতে না হতেই শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। বাতে পঙ্গু, আরো কত রকম ব্যাধি যে তাঁর শরীরকে আশ্রয় করে আছে তা গুণে শেষ করা যায় না। তাছাড়া পক্ষাঘাতের লক্ষণও ক্রমে দেখা দিচ্ছে। আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে একটা কথা আছে,—মানুষের মৃত্যুতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, মানুষ যে বেঁচে থাকে এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। আমার এই রুগীটিকে দেখলে সেই কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

"এই নন্দদুলালবাবুর চরিত্র আপনাকে কি করে বোঝাব ভেবে পাচ্ছি না। কটুভাষী, সন্দিগ্ধ, কুটিল, হিংসাপরায়ণ—এক কথায় এমন ইতর নীচ স্বভাব আমি আর কখনো দেখিনি। বাড়িতে স্ত্রী পুত্র পরিবার সব আছে কিন্তু কারুর সঙ্গে সদ্ভাব নেই। তাঁর ইচ্ছা যৌবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতা করে বেড়িয়েছেন এখনো তাই করে বেড়ান। কিন্তু প্রকৃতি বাদ সেধেছেন, শরীরে সে সামর্থ্য নেই। এই জন্যে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ওপর দারুণ রাগ আর ঈর্ষা—যেন তাঁর এই অবস্থার জন্যে তারাই দায়ী। সর্বদা ছল খুঁজে বেড়াচ্ছেন কি করে কাকে জব্দ করবেন।

"শরীরের শক্তি নেই, বুকের গোলমালও আছে—তাই ঘর ছেড়ে বেরুতে পারেন না, নিজের ঘরে বসে বসে কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর কদর্য গালাগাল বর্ষণ করছেন, আর দিস্তে দিস্তে কাগজে অনবরত লিখে চলেছেন। তাঁর এক খেয়াল যে তিনি একজন অদ্বিতীয় সাহিত্যিক ; তাই কখনো লাল কালিতে কখনো কালো কালিতে এন্তার লিখে যাচ্ছেন। সম্পাদকের ওপর ভয়ঙ্কর রাগ, তাঁর বিশ্বাস সম্পাদকেরা কেবল শত্রুতা করেই তাঁর লেখা ছাপে না।"

আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি লেখেন ?"

"গল্প। কিম্বা আত্ম-চরিতও হতে পারে। একবার মাত্র সে-লেখার ওপর আমি চোখ বুলিয়েছিলুম, তারপর আর সেদিকে তাকাতে পারিনি। সে-লেখা পড়বার পর গঙ্গাস্নান করলেও মন পবিত্র হয় না। আজকালকার যাঁরা তরুণ লেখক, সে-গল্প পড়লে তাঁদেরও বোধ করি দাঁত কপাটি লেগে যাবে।"

ব্যোমকেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"চরিত্রটি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সমস্যাটি কি ?"

মোহন আমাদের দু'জনকে দুটি সিগারেট দিয়া, একটি নিজে ধরাইয়া বলিল—"আপনারা ভাবছেন এমন গুণবান লোকের আর কোনো গুণ থাকা সম্ভব নয়—কেমন ? কিন্তু তা নয়। এঁর আর একটি মস্ত গুণ আছে, এই শরীরের ওপর ইনি এক অদ্ভুত নেশা করেন।"

সিগারেটে গোটা দুই টান দিয়া বলিল—"ব্যোমকেশবাবু, আপনি তো এই কাজের কাজী, সমাজের

নিকৃষ্ট লোক নিয়েই আপনাকে কার্‌বার করতে হয়, মদ গাঁজা চণ্ডু কোকেন ইত্যাদি অনেক রকম নেশাই মানুষকে করতে দেখে থাকবেন ;—কিন্তু মাকড়সার রস খেয়ে কাউকে নেশা করতে দেখেছেন কি ?”

আমি আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলাম—“মাকড়সার রস ! সে আবার কি ?”

মোহন বলিল—“এক জাতীয় মাকড়সা আছে, যার শরীর থেকে এই বীভৎস বিষাক্ত রস পিষে বার করে নেওয়া হয়—”

ব্যোমকেশ কতকটা আত্মগতভাবে বলিল— “Tarantula dance! স্পেনে আগে ছিল—এই মাকড়সার কামড় খেয়ে লোকে হরদম নাচত ! দারুণ বিষ ! বইয়ে পড়েছি বটে কিন্তু এদেশে কাউকে ব্যবহার করতে দেখিনি ।”

মোহন বলিল—“ঠিক বলেছেন—ট্যারান্টুলা ; সাউথ আমেরিকার স্প্যানিশ সঙ্কর জাতির মধ্যে এই নেশার খুব বেশি চলন আছে। এই ট্যারান্টুলার রস একটা তীব্র বিষ, কিন্তু খুব কম মাত্রায় ব্যবহার করলে শরীরের স্নায়ুমণ্ডলে একটা প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বুঝতেই পারছেন, স্বভাবের দোষে স্নায়বিক উত্তেজনা না হলে যারা থাকতে পারে না তাদের পক্ষে এই মাকড়সার রস কি রকম লোভনীয় বস্তু। কিন্তু নিয়মিত ব্যবহার করলে এর ফল সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। অস্বাভাবিক পক্ষাঘাতে মৃত্যু অনিবার্য ।

“আমাদের নন্দদুলালবাবু বোধহয় যৌবনকালে এই চমৎকার নেশাটি ধরেছিলেন ; তারপর শরীর যখন অকর্মণ্য হয়ে পড়ল তখনো নেশা ছাড়তে পারলেন না। আমি যখন গৃহ-চিকিৎসক হয়ে ওঁদের বাড়িতে ঢুকলুম তখনো উনি প্রকাশ্যে ঐ নেশা চালাচ্ছেন, সে আজ বছরখানেকের কথা। আমি প্রথমেই ওটা বন্ধ করে দিলুম—বললুম, যদি বাঁচতে চান তাহলে ওটা ছাড়তে হবে ।

“এই নিয়ে খুব খানিকটা ধস্তাধস্তি হল, তিনিও খাবেনই আমিও খেতে দেব না। শেষে আমি বললুম—“আপনার বাড়িতে ও জিনিস ঢুকতে দেব না, দেখি আপনি কি করে খান।” তিনিও কুটিল হেসে বললেন—“তাই নাকি ? আচ্ছা, আমিও খাব, দেখি তুমি কি করে আটকাও।” যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল ।

“পরিবারের আর সকলে আমার পক্ষে ছিলেন, সুতরাং সহজেই বাড়ির চারিদিকে কড়া পাহারা বসিয়ে দেওয়া গেল। তাঁর স্ত্রী ছেলেরা পালা করে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলেন, যাতে কোনোক্রমে সে-বিষ তাঁর কাছে পৌঁছতে না পারে। তিনি নিজে একরকম চলৎশক্তিহীন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে সে-জিনিস সংগ্রহ করবেন সে ক্ষমতা নেই। আমি এইভাবে তাঁকে আগ্‌লাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগলুম ।

“কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও বাড়িসুদ্ধ লোকের নজর এড়িয়ে তিনি নেশা করতে লাগলেন ; কোথা থেকে সে জিনিস আমদানি করেছেন কেউ ধরতে পারলুম না।

“প্রথমটা আমার সন্দেহ হল, হয়তো বাড়ির কেউ লুকিয়ে তাঁকে সাহায্য করছে। তাই একদিন আমি নিজে সমস্ত দিন পাহারায় রইলুম। কিন্তু আশ্চর্য মশায়, আমার চোখের সামনে তিন তিনবার সেই বিষ খেলেন। তাঁর নাড়ি দেখে বুঝলুম—অথচ কখন খেলেন ধরতে পারলুম না।

“তারপর তাঁর ঘর আঁতিপাঁতি করেছি, তাঁর সঙ্গে বাইরের লোকের দেখা করা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু তবু তাঁর মৌতাত বন্ধ করতে পারিনি। এখনো সমভাবে সেই ব্যাপার চলছে ।

“এখন আমার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, লোকটা ঐ মাকড়সার রস পায় কোথা থেকে এবং পেলেও সকলের চোখে ধুলো দিয়ে খায় কি করে !”

মোহন চুপ করিল। ব্যোমকেশ শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, মোহন শেষ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“অজিত, বাড়ি চল। একটা কথা হঠাৎ মাথায় এসেছে, যদি তা ঠিক হয় তাহলে—”

বুঝিলাম সেই পুরানো জালিয়াৎ আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। মোহন এতক্ষণ যে বকিয়া গেল তাহার শেষের দিকের কথাগুলো হয়তো তাহার কানেও যায় নাই। আমি একটু অপ্রতিভভাবে বলিলাম—"মোহনের গল্পটা বোধহয় তুমি ভাল করে শোনোনি—"

'বিলক্ষণ! শুনেছি বৈকি। সমস্যাটা খুবই মজার—কৌতূহলও হচ্ছে—কিন্তু এখন কি আমার সময় হবে? আমি একটা বিশেষ শক্ত কাজে—"

মোহন মনে মনে বোধহয় একটু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল—"তবে কাজ নেই—থাক। আপনাকে এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে অনুরোধ করা অবশ্য অনুচিত; কিন্তু—কি জানেন, এর একটা নিষ্পত্তি হলে হয়তো লোকটার প্রাণ বাঁচাতে পারা যেত। একটা লোক—যতবড় পাপিষ্ঠই হোক—বিন্দু বিন্দু বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করছে চোখের সামনে দেখছি অথচ নিবারণ করতে পারছি না, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে?"

ব্যোমকেশ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"আমি করব না বলিনি তো। এ ধাঁধার উত্তর পেতে হলে ঘণ্টা দু'য়েক ভাবতে হবে; আর, একবার লোকটিকে দেখলেও ভাল হয়—কিন্তু আজ বোধহয় তা পেরে উঠব না। নন্দদুলালবাবুর মত অসামান্য লোককে কিছুতেই মরতে দেওয়া যেতে পারে না। সে আমি দেবোও না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু এখনি আমার বাসায় ফিরতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে জালিয়াৎ লোকটাকে ধরে ফেলেছি। কিন্তু একবার কাগজগুলো ভাল করে দেখা দরকার।—সুতরাং আজকের রাতটা নন্দদুলালবাবু নিশ্চিন্ত মনে বিষ পান করে নিন—কাল থেকে আমি তাঁকে জব্দ করে দেব।"

মোহন হাসিয়া বলিল—"বেশ, কালই হবে। কখন আপনার সুবিধা হবে বলুন—আমি 'কার' পাঠিয়ে দেব।"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, তাতে আপনার উৎকণ্ঠাও অনেকটা লাঘব হবে। অজিত আজ আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখেশুনে আসুক; তারপর ওর মুখে সব কথা শুনে আজ রাত্রেই কিম্বা কাল সকালে আমি আপনার ধাঁধার উত্তর দিয়ে দেব।"

ব্যোমকেশের বদলে আমি যাইব, ইহাতে মোহনের মুখে যে নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিল তাহা কাহারো চক্ষু এড়াইবার নয়। ব্যোমকেশ তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল—"আপনার বাল্যবন্ধু বলেই বোধহয় অজিতের ওপর আপনার তেমন—ইয়ে—নেই। কিন্তু হতাশ হবেন না, সৎসঙ্গে পড়ে ওর বুদ্ধি এখন এমনি ভীষণ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে যে তার দু' একটা দৃষ্টান্ত শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।—হয়তো ও নিজেই আপনার এই ব্যাপারে সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে দেবে, আমাকে দরকারও হবে না।"

এতবড় সুপারিশেও মোহন বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হইল না। রুই কাৎলা ধরিবার আশায় ছিপ ফেলিয়া যাহারা সন্ধ্যাকালে পুঁটিমাছ ধরিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তাহাদের মত মুখভাব করিয়া সে বলিল—"অজিতই চলুক তাহলে। কিন্তু ও যদি না পারে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে! তখন তো আমি আছিই।" ব্যোমকেশ আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল—"সব জিনিস ভাল করে লক্ষ্য কোরো, আর চিঠিপত্র কি আসে খোঁজ নিও।"—এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশকে অনেক জটিল রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটন করিতে দেখিয়াছি ও তাহাতে সাহায্য করিয়াছি। তাহার অনুসন্ধান পদ্ধতিও এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া অনেকটা আয়ত্ত হইয়াছে। তাই মনে মনে ভাবিলাম, এই সামান্য ব্যাপারের কিনারা করিতে পারিব না? বিশেষ, আমার প্রতি মোহনের বিশ্বাসের অভাব দেখিয়া ভিতরে ভিতরে একটা জিদও চাপিয়াছিল, যেমন করিয়া পারি এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিব।

মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প আঁটিয়া মোহনের সহিত লেক হইতে বাহির হইলাম। বাস আরোহণে যখন নির্দিষ্ট স্থানের নিকট উপস্থিত হইলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—রাস্তার গ্যাস

জ্বলিয়া উঠিতেছে। মোহন পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সার্কুলার রোড হইতে একটা গলি ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে একটা লোহার রেলিংযুক্ত বড় বাড়ি দেখাইয়া মোহন বলিল—"এই বাড়ি।"

দেখিলাম সেকেলে ধরনের পুরাতন বাড়ি, সম্মুখে লোহার ফটকে টুল পাতিয়া দারোয়ান বসিয়া আছে। মোহনকে দেখিয়া সেলাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু আমার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"বাবুজি, আপকো ভিতর যানা—"

মোহন হাসিয়া বলিল—"ভয় নেই দারোয়ান, উনি আমার বন্ধু।"

"বহুত খুব"—দারোয়ান সরিয়া দাঁড়াইল ; আমরা বাড়ির সম্মুখস্থ অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম।

অঙ্গন পার হইয়া বারান্দায় উঠিতেই ভিতর হইতে একটি বিশ-বাইশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল—"কে, ডাক্তারবাবু ? আসুন।" আমার দিকে সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ইনি— ?"

মোহন তাহাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে কি বলিল, যুবকও উত্তর দিল—"বেশ তো, বেশ তো, উনি আসুন না—"

মোহন তখন পরিচয় করাইয়া দিল—গৃহস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র, নাম অরুণ। তাহার অনুবর্তী হইয়া আমরা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। দুইটা ঘর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় ঘরের বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতেই ভিতর হইতে একটা কলহ-তীক্ষ্ণ ভাঙা কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"কে ? কে তুমি ? এখন আমায় বিরক্ত করো না, আমি লিখছি।"

অরুণ বলিল—"বাবা, ডাক্তারবাবু এসেছেন। অভয়, দোর খোল।" একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের যুবক—বোধহয় গৃহস্বামীর দ্বিতীয় পুত্র—দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা সকলে ঘরে প্রবেশ করিলাম।

অরুণ চুপিচুপি অভয়কে জিজ্ঞাসা করিল—"খেয়েছেন ?"

অভয় ম্লানভাবে ঘাড় নাড়িল।

ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমে দৃষ্টি পড়িল, ঘরের মধ্যস্থলে খাটের উপর বিছানা পাতা রহিয়াছে এবং সেই বিছানায় বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া, ডান হাতে উত্থিত কলম ধরিয়া, অতি শীর্ণকায় নন্দদুলালবাবু ক্রুদ্ধ কষায়িত নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন। মাথার উপর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল, আর একটা টেবিল-ল্যাম্প খাটের ধারে উঁচু টিপাইয়ের উপর রাখা ছিল ; তাই লোকটির সমস্ত অবয়ব ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। তাঁহার বয়স বোধ করি পঞ্চাশের নীচেই কিন্তু মাথার চুল সমস্ত পাকিয়া একটা শ্রীহীন পাঁশুটে বর্ণ ধারণ করিয়াছে। হাড় চওড়া, ধারালো মুখে মাংসের লেশমাত্র নাই, হনুর অস্থি দু'টা যেন চর্ম ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে—পাৎলা দ্বিধা-ভগ্ন নাকটা মুখের উপর গৃধ্রের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখ দু'টা কোনো অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উত্তেজনার অবসানে আবার যে তাহারা মৎস্যচক্ষুর মত ভাবলেশহীন হইয়া পড়িবে তাহার আভাসও সে-চক্ষে লুক্কায়িত আছে। নিম্নের ঠোঁট শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সব মিলিয়া মুখের উপর একটা কদাকার ক্ষুধিত অসন্তোষ যেন রেখায় রেখায় চিহ্নিত হইয়া আছে।

কিছুক্ষণ এই প্রেতাকৃতি লোকটির দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া থাকিয়া দেখিলাম, তাঁহার বাঁ হাতটা থাকিয়া থাকিয়া অকারণে আনর্তিত হইয়া উঠিতেছে, যেন সেটা স্বাধীনভাবে, দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছে। মৃত ব্যাঙের দেহ তড়িৎ সংস্পর্শে চমকাইয়া উঠিতে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই স্নায়ু-নৃত্য কতকটা আন্দাজ করিতে পারিবেন।

নন্দদুলালবাবুও বিষদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া ছিলেন, সেই ভাঙা অথচ তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ডাক্তার! এ আবার কাকে নিয়ে এসেছ এখানে ? কি চায় লোকটা ? যেতে বল—যেতে বল—"

মোহন চোখের একটা ইশারা করিয়া আমাকে জানাইল যে আমি যেন গৃহস্বামীর এরূপ

সম্ভাষণে কিছু মনে না করি ; তারপর শয্যার উপর হইতে বিক্ষিপ্ত কাগজগুলা সরাইয়া শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া রোগীর নাড়ি হাতে লইয়া স্থির হইয়া দেখিতে লাগিল। নন্দদুলালবাবু মুখে একটা বিকৃত হাস্য লইয়া একবার আমার পানে একবার ডাক্তারের পানে তাকাইতে লাগিলেন। বাঁ হাতটা তেমনি নৃত্য করিতে লাগিল।

শেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া মোহন বলিল—"আবার খেয়েছেন ?"

"বেশ করেছি খেয়েছি—কার বাবার কি ?"

মোহন অধর দংশন করিল, তারপর বলিল—"এতে নিজেরই কেবল ক্ষতি করছেন, আর কারু নয়। কিন্তু সে তো আপনি বুঝবেন না, বোঝবার ক্ষমতাই নেই। ঐ বিষ খেয়ে খেয়ে মস্তিষ্কের দফা রফা করে ফেলেছেন।"

নন্দদুলালবাবু মুখের একটা পৈশাচিক বিকৃতি করিয়া বলিলেন—"তাই নাকি এয়ার ? মস্তিষ্কের দফা রফা করে ফেলেছি ? কিন্তু তোমার ঘটে তো অনেক বুদ্ধি আছে ? তবে ধরতে পারছ না কেন ? বলি, চারদিকে তো সেপাই বসিয়ে দিয়েছ—কই, ধরতে পারলে না ?" বলিয়া হি হি করিয়া এক অশ্রাব্য হাসি হাসিতে লাগিলেন।

মোহন বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আপনার সঙ্গে কথা কওয়াই ঝকমারি। যা করছিলেন করুন।"

নন্দদুলালবাবু পূর্ব্ববৎ হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"দুয়ো ডাক্তার, দুয়ো। আমায় ধরতে পারলে না, ধিনতা ধিনা পাকা নোনা—" সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া নাড়িতে লাগিলেন।

নিজের পুত্রদের সম্মুখে এই কদর্য অসভ্যতা আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল ; মোহনেরও বোধ করি ধৈর্যের বন্ধন ছিঁড়িবার উপক্রম করিতেছিল, সে আমাকে বলিল—"নাও অজিত, কি দেখবে দেখেশুনে নাও—আর পারা যায় না।"

হঠাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আস্ফালন থামাইয়া নন্দদুলালবাবু দুই সর্প-চক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া কটুকণ্ঠে কহিলেন—"কে হে তুমি—আমার বাড়িতে কোন্ মতলবে ঢুকেছ ?" আমি কোন জবাব দিলাম না, তখন—"চালাকি করবার আর জায়গা পাওনি ? ওসব ফন্দি ফিকির এখানে চলবে না যাদু—বুঝেছ ? এইবেলা চটপট সরে পড়, নইলে পুলিস ডাকব। যত সব নচ্ছার ছিঁচকে চোরের দল।" বলিয়া মোহনকেও নিজের দৃষ্টির মধ্যে সাপটাইয়া লইলেন। সে আমাকে কি উদ্দেশ্যে আনিয়াছে ঠিক না বুঝিলেও আমার উপর তাঁহার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

অরুণ লজ্জিতভাবে আমার কানে কানে বলিল—"ওঁর কথায় কান দেবেন না। ওটা খেলে ওঁর আর জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না।"

মনে মনে ভাবিলাম, কি ভয়ঙ্কর এই বিষ যাহা মানুষের সমস্ত গোপন দুষ্প্রবৃত্তিকে এমন উগ্র প্রকট করিয়া তোলে! যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ইহা খায় তাহার নৈতিক অধোগতির মাত্রাই বা কে নিরূপণ করিবে ?

ব্যোমকেশ বলিয়াছিল সব দিক ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে, তাই যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘরের চতুর্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া লইলাম। ঘরটা বেশ বড়, আসবাবপত্রও অধিক নাই—একটা খাট, গোটা দুই তিন চেয়ার, একটা আলমারি ও একটা তেপায়া টেবিল। এই টেবিলের উপর ল্যাম্পটা রাখা আছে এবং তাহারি পাশে কয়েক দিস্তা অলিখিত কাগজ ও অন্যান্য লেখার সরঞ্জাম রহিয়াছে। লিখিত কাগজপত্রগুলা অবিন্যস্তভাবে চারিদিকে ছড়ানো। আমি এক তা কাগজ তুলিয়া লইয়া কয়েক ছত্র পড়িয়াই শিহরিয়া রাখিয়া দিলাম ;—মোহন যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য। এ লেখা পড়িলে ফরাসী বস্তুতান্ত্রিক এমিল জোলারও বোধ করি গা ঘিন্ ঘিন্ করিত। শুধু তাই নয়, লেখার বিশেষ রসালো স্থলগুলিতে লাল কালির দাগ দিয়া লেখক মহাশয় সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বস্তুত, এতখানি নোংরা জঘন্য মনের পরিচয় আর কোথাও পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না।

নন্দদুলালবাবুর দিকে একটা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, তিনি আবার লেখায় মন দিয়াছেন। পার্কারের কলম দ্রুতবেগে কাগজের উপর সঞ্চরণ করিয়া চলিয়াছে, পাশের টেবিলে দোয়াতদানিতে আর একটা মেটে লাল রঙের পার্কারের ফাউন্টেন পেন রাখা আছে, লেখা শেষ হইলেই বোধ করি দাগ দেওয়া আরম্ভ হইবে।

হইলও তাই। পাতাটা শেষ হইতেই নন্দদুলালবাবু কালো কলম রাখিয়া লাল কলমটা তুলিয়া লইলেন। আঁচড় কাটিয়া দেখিলেন, কালি ফুরাইয়া গিয়াছে—তখন টেবিলের উপর হইতে লাল কালির চ্যাপ্টা শিশি লইয়া তাহাতে কালি ভরিলেন, তারপর গম্ভীরভাবে নিজের লেখার মণিমুক্তাগুলি চিহ্নিত করিতে লাগিলেন।

আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঘরের অন্যান্য জিনিস দেখিতে লাগিলাম। আলমারিটাতে কিছু ছিল না, শুধু কতকগুলো অর্ধেক ঔষধের শিশি পড়িয়াছিল। মোহন বলিল, সেগুলো তাহারই প্রদত্ত ঔষধ। ঘরে দু'টি জানালা, দু'টি দরজা। একটি দরজা দিয়া আমরা প্রবেশ করিয়াছিলাম, অন্যটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ওদিকে স্নানের ঘর ইত্যাদি আছে। সে ঘরটাও দেখিলাম ; বিশেষ কিছু নাই, কয়েকটা কাচা কাপড় তোয়ালে তেল সাবান মাজন ইত্যাদি রহিয়াছে।

জানালা দু'টা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বাহিরের সহিত উহাদের কোনো যোগ নাই, তাছাড়া অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে।

ব্যোমকেশ থাকিলে কি ভাবে অনুসন্ধান করিত তাহা কল্পনা করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। দেয়ালে টোকা মারিয়া দেখিব কি না ভাবিতেছি—হয়তো কোথাও গুপ্ত দরজা আছে—এমন সময় চোখে পড়িল দেয়ালে একটা তাকের উপর একটি চাঁদির আতরদানি রহিয়াছে। সাগ্রহে সেটাকে পরীক্ষা করিলাম ; তাহার মধ্যে খানিকটা তুলা ও খোপে খোপে আতর রহিয়াছে। চুপি চুপি অরুণকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"উনি আতর মাখেন নাকি ?"

সে অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—"কি জানি। বোধহয় না ; মাখলে গন্ধ পাওয়া যেত।"

"এটা কতদিন এঘরে আছে ?"

"তা বরাবরই আছে। বাবাই ওটা আনিয়ে ঘরে রেখেছিলেন।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, লেখা বন্ধ করিয়া নন্দদুলালবাবু এই দিকেই তাকাইয়া আছেন। মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল ; খানিকটা তুলা আতরে ভিজাইয়া পকেটে পুরিয়া লইলাম।

তারপর ঘরের চারিদিকে একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। নন্দদুলালবাবুর দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করিল ; দেখিলাম তাঁহার মুখে সেই শ্লেষপূর্ণ কদর্য হাসিটা লাগিয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া আমরা বারান্দায় বসিলাম। আমি বলিলাম—"এখন আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, কোনো কথা গোপন না করে উত্তর দেবেন।"

অরুণ বলিল—"বেশ, জিজ্ঞাসা করুন।"

আমি বলিলাম—"আপনারা ওঁকে সর্বদা নজরবন্দীতে রেখেছেন ? কে কে পাহারা দেয় ?"

"আমি, অভয় আর মা পালা করে ওঁর কাছে থাকি। চাকর-বাকর বা অন্য কাউকে কাছে যেতে দিই না।"

"ওঁকে কখনও ও জিনিস খেতে দেখেছেন ?"

"না—মুখে দিতে দেখিনি। তবে খেয়েছেন তা জানতে পেরেছি।"

"জিনিসটার চেহারা কি রকম কেউ দেখেছেন ?"

"যখন প্রকাশ্যে খেতেন তখন দেখেছিলুম—জলের মতন জিনিস, হোমিওপ্যাথিক শিশিতে থাকত ; তাই কয়েক ফোঁটা সরবৎ কিম্বা অন্য কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতেন।"

"সে রকম শিশি ঘরে কোথাও নেই—ঠিক জানেন ?"

"ঠিক জানি। আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।"

"তাহলে নিশ্চয় বাইরে থেকে আসে। কে আনে?"

অরুণ মাথা নাড়িল—"জানি না।"

"আপনারা তিনজন ছাড়া আর কেউ ও-ঘরে ঢোকে না? ভাল করে ভেবে দেখুন।"

"না—কেউ না। এক ডাক্তারবাবু ছাড়া।"

আমার জেরা ফুরাইয়া গেল—আর কি জিজ্ঞাসা করিব? গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে ব্যোমকেশের উপদেশ স্মরণ হইল; পুনশ্চ আরম্ভ করিলাম—"ওঁর কাছে কোনো চিঠিপত্র আসে?"

"না।"

"কোনো পার্সেল কি অন্য রকম কিছু?"

এইবার অরুণ বলিল—"হ্যাঁ—হপ্তায় একখানা করে রেজিস্ট্রি চিঠি আসে।"

আমি উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলাম—"কোত্থেকে আসে? কে পাঠায়?"

লজ্জায় ঘাড় নীচু করিয়া অরুণ আস্তে আস্তে বলিল—"কলকাতা থেকেই আসে—রেবেকা লাইট নামে একজন স্ত্রীলোক পাঠায়।"

আমি বলিলাম—"হুঁ—বুঝেছি। চিঠিতে কি থাকে আপনারা দেখেছেন কি?"

"দেখেছি।" বলিয়া অরুণ মোহনের পানে তাকাইল।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি থাকে?"

"সাদা কাগজ।"

"সাদা কাগজ?"

"হ্যাঁ—খালি কতকগুলো সাদা কাগজ খামের মধ্যে পোরা থাকে—আর কিছু না।"

আমি হতবুদ্ধির মত প্রতিধ্বনি করিলাম—"আর কিছু না?"

"না।"

কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম; শেষে বলিলাম—"ঠিক জানেন খামের ভিতর আর কিছু থাকে না!"

অরুণ একটু হাসিয়া বলিল—"ঠিক জানি। বাবা নিজে পিওনের সামনে রসিদ দস্তখত করে চিঠি নেন বটে কিন্তু আগে আমিই চিঠি খুলি। তাতে সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছুই থাকে না।"

"প্রত্যেক বার আপনিই চিঠি খোলেন? কোথায় খোলেন?"

"বাবার ঘরে। সেইখানেই পিওন চিঠি নিয়ে যায় কিনা।"

"কিন্তু এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! সাদা কাগজ রেজিস্ট্রি করে পাঠাবার মানে কি?"

মাথা নাড়িয়া অরুণ বলিল—"জানি না।"

আরো কিছুক্ষণ বোকার মত বসিয়া থাকিয়া শেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। রেজিস্ট্রি চিঠির কথা শুনিয়া মনে আশা হইয়াছিল যে ফন্দিটা বুঝি ধরিয়া ফেলিয়াছি—কিন্তু না, ওদিকের দরজায় একেবারে তালা লাগানো। বুঝিলাম, আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপার সামান্য ঠেকিলেও, আমার বুদ্ধিতে কুলাইবে না। 'তুলা শুনিতে নরম কিন্তু ধুনিতে লবেজান।' ঐ বিষজর্জরিতদেহ অকালপঙ্গু বুড়া লম্পটকে আঁটিয়া ওঠা আমার কর্ম নয়—এখানে ব্যোমকেশের সেই শাণিত ঝক্‌ঝকে মস্তিষ্কটি দরকার।

মলিন মুখে, ব্যোমকেশকে সকল কথা জানাইব বলিয়া বাহির হইতেছি, একটা কথা স্মরণ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"নন্দদুলালবাবু কাউকে চিঠিপত্র লেখেন?"

অরুণ বলিল—"না, তবে মাসে মাসে মনিঅর্ডার করে টাকা পাঠান।"

"কাকে পাঠান?"

লজ্জাম্লান মুখে অরুণ বলিল—"ঐ ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে।"

মোহন ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—"ঐ স্ত্রীলোকটা আগে নন্দদুলালবাবুর—"

"বুঝেছি। কত টাকা পাঠান?"

"এক শ টাকা। কিন্তু কেন পাঠান তা বলতে পারি না।"

মনে মনে ভাবিলাম—পেনশন। কিন্তু মুখে সে-কথা না বলিয়া একাকী বাহির হইয়া পড়িলাম। মোহন রহিয়া গেল।

বাসায় পৌঁছিতে রাত্রি আটটা বাজিল।

ব্যোমকেশ লাইব্রেরি ঘরে ছিল, দ্বারে ধাক্কা দিতেই কবাট খুলিয়া বলিল—"কি খবর? সমস্যা-ভঞ্জন হল?"

"না"—আমি ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। ইতিপূর্বে ব্যোমকেশ একটা মোটা লেন্স লইয়া একখণ্ড কাগজ পরীক্ষা করিতেছিল, এখন আবার যন্ত্রটা তুলিয়া লইল। তারপর আমার দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল—"ব্যাপার কি? এত শৌখিন হয়ে উঠলে কবে থেকে? আতর মেখেছ যে?"

"মাখিনি। নিয়ে এসেছি।" তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া শুনাইলাম, সে-ও বোধ হইল মন দিয়া শুনিল। উপসংহারে আমি বলিলাম—"আমার দ্বারা তো হল না ভাই—এখন দেখ, তুমি যদি কিছু পার। তবে আমার মনে হয়, এই আতরটা অ্যানালাইজ্ করলে কিছু পাওয়া যেতে পারে—"

"কি পাওয়া যাবে—মাকড়সার রস?" ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে তুলাটা লইয়া তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া বলিল—"আঃ! চমৎকার গন্ধ! খাঁটি অম্বুরি আতর।" তুলাটা হাতের চামড়ার উপর ঘষিতে ঘষিতে বলিল—"হ্যাঁ—কি বলছিলে? কি পাওয়া যেতে পারে?"

আমি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম—"হয়তো নন্দদুলালবাবু আতর মাখবার ছল করে—"

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল—"এক মাইল দূর থেকে যার গন্ধ পাওয়া যায় সে জিনিস কেউ লুকিয়ে ব্যবহার করতে পারে? নন্দদুলালবাবু যে আতর মাখেন তার কোনো প্রমাণ পেয়েছ?"

"তা পাইনি বটে—কিন্তু—"

"না হে না, ওদিকে নয়, অন্যদিকে সন্ধান কর। কি করে জিনিসটা ঘরের মধ্যে আসে, কি করে নন্দদুলালবাবু সকলের চোখের সামনে সেটা মুখে দেন—এইসব কথা ভেবে দেখ। রেজিস্ট্রি করে সাদা কাগজ কেন আসে? ঐ স্ত্রীলোকটাকে টাকা পাঠানো হয় কেন? ভেবে দেখেছ?"

আমি হতাশভাবে বলিলাম—"অনেক ভেবেছি, কিন্তু আমার দ্বারা হল না।"

"আরো ভাবো—কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায়?—গভীরভাবে ভাবো, একাগ্র চিত্তে ভাবো, নাছোড়বান্দা হয়ে ভাবো—" বলিয়া সে আবার লেন্সটা তুলিয়া লইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আর তুমি?"

"আমিও ভাবছি। কিন্তু একাগ্রচিত্তে ভাবা বোধহয় হয়ে উঠবে না। আমার জালিয়াৎ—" বলিয়া সে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আমি ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া আমাদের বসিবার ঘরে আরাম-কেদারাটায় লম্বা হইয়া শুইয়া আবার ভাবিতে আরম্ভ করিলাম। সত্যই তো, কি এমন কঠিন কাজ যে আমি পারিব না। নিশ্চয় পারিব।

প্রথমত, রেজিস্ট্রি করিয়া সাদা কাগজ আসিবার সার্থকতা কি? অদৃশ্য কালি দিয়া তাহাতে কিছু লেখা থাকে? যদি তাই থাকে, তাহাতে নন্দদুলালবাবুর কি সুবিধা হয়? জিনিসটা তো তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে না!

আচ্ছা, ধরিয়া লওয়া যাক, জিনিসটা কোনোক্রমে বাহির হইতে ঘরের ভিতরে আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু সেটা নন্দদুলালবাবু রাখেন কোথায়? হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশিও লুকাইয়া রাখা সহজ কথা নয়। অষ্টপ্রহর সতর্ক চক্ষু তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, তাহার উপর প্রত্যহ খানাতল্লাসী চলিতেছে। তবে?

ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল, পাঁচটা চুরুট পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল—কিন্তু

একটা প্রশ্নেরও উত্তর পাইলাম না। নিরাশ হইয়া প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছি এমন সময় একটা অপূর্ব আইডিয়া মাথায় ধরিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া আরাম-কেদারায় উঠিয়া বসিলাম।

এও কি সম্ভব! কিম্বা—সম্ভব নয়ই বা কেন? শুনিতে একটু অস্বাভাবিক ঠেকিলেও—এ ছাড়া আর কি হইতে পারে? ব্যোমকেশ বলিয়াছে, কোনো বিষয়ের যুক্তিসম্মত প্রমাণ যদি থাকে অথচ তাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবু তাহা সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। এ ক্ষেত্রেও ইহাই তো এ সমস্যার একমাত্র সমাধান।

ব্যোমকেশকে বলিব মনে করিয়া উঠিয়া যাইতেছি, ব্যোমকেশ নিজেই আসিয়া প্রবেশ করিল; আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি? ভেবে বার করলে না কি?"

"বোধহয় করেছি।"

"বেশ বেশ। কি বার করলে শুনি?"

বলিতে গিয়া একটু বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল, তবু জোর করিয়া সঙ্কোচ সরাইয়া বলিলাম—"দেখ, নন্দদুলালবাবুর ঘরের দেওয়ালে কতকগুলো মাকড়সা দেখেছি, এখন মনে পড়ল। আমার বিশ্বাস তিনি সেইগুলোকে—"

"ধরে ধরে খান!"—ব্যোমকেশ হো হো করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল, "অজিত, তুমি একেবারে একটি—জিনিয়াস! তোমার জোড়া নেই। দেয়ালের মাকড়সা ধরে ধরে খেলে নেশা হবে না ভাই, গা-ময় গরলের ঘা ফুটে বেরুবে। বুঝলে?"

আমি উত্তপ্ত হইয়া বলিলাম—"বেশ, তবে তুমিই বল।"

ব্যোমকেশ চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিল। অলসভাবে একটা চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিল—"সাদা কাগজ ডাকে কেন আসে বুঝেছ?"

"না।"

"ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে কেন টাকা পাঠানো হয় বুঝতে পেরেছ?"

"না।"

"নন্দদুলালবাবু দিবারাত্রি অশ্লীল গল্প লেখেন কেন তাও বুঝতে পারনি?"

"না। তুমি বুঝেছ?"

"বোধহয় বুঝেছি," ব্যোমকেশ চুরুটে দীর্ঘ টান দিয়া নিমীলিত নেত্রে কহিল—"কিন্তু একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহভাবে না-জানা পর্যন্ত মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন হবে না।"

"কি বিষয়ে?"

ব্যোমকেশ মুদিতচক্ষে বলিল—"আগে জানা দরকার নন্দদুলালবাবুর জিভ কোন্ রঙের।"

মনে হইল ব্যোমকেশ আমাকে পরিহাস করিতেছে, রুষ্ট মুখে বলিলাম—"ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?"

"ঠাট্টা!" ব্যোমকেশ চোখ খুলিয়া আমার মুখের ভাব দেখিয়া বলিল—"রাগ করলে? সত্যি বলছি ঠাট্টা নয়। নন্দদুলালবাবুর জিভের রঙের ওপরেই সব নির্ভর করছে। যদি তাঁর জিভের রঙ লাল হয় তাহলে বুঝব আমার অনুমান ঠিক, আর যদি না হয়—। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করনি?"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম—"না, জিভ লক্ষ্য করবার কথা আমার মনে হয়নি।"

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল—"অথচ ঐটেই আগে মনে হওয়া উচিত ছিল। যা হোক, এক কাজ কর, ফোন করে নন্দদুলালবাবুর ছেলের কাছ থেকে খবর নাও।"

"রসিকতা করছি মনে করবে না তো?"

ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া কাব্যের ভাষায় বলিল—"ভয় নাই তোর ভয় নাই ওরে ভয় নাই—কিছু নাই তোর ভাবনা—"

পাশের ঘরে গিয়া নম্বর খুঁজিয়া ফোন করিলাম। মোহন তখনো সেখানে ছিল, সে-ই উত্তর দিল—"ও কথাটা দরকারি বলে মনে হয়নি, তাই বলিনি। নন্দদুলালবাবুর জিভের রঙ টকটকে লাল। একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়, কারণ তিনি বেশি পান খান না। কেন বল দেখি?"

ব্যোমকেশকে ডাকিলাম, ব্যোমকেশ আসিয়া বলিল—"লাল তো ? তবে আর কি—হয়ে গেছে।—দেখি।" আমার হাত হইতে ফোন লইয়া বলিল—"ডাক্তারবাবু ? ভালই হল। আপনার ধাঁধার উত্তর পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, অজিতই ভেবে বার করেছে—আমি একটু সাহায্য করেছি মাত্র। জালিয়াৎ নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম তাই—হ্যাঁ, জালিয়াৎকে ধরেছি।...বিশেষ কিছু করতে হবে না, কেবল নন্দদুলালবাবুর ঘর থেকে লাল কালির দোয়াত আর লাল রঙের ফাউন্টেন পেনটা সরিয়ে দেবেন।...হ্যাঁ—ঠিক ধরেছেন। কাল একবার আসবেন তখন সব কথা বলব...আচ্ছা, নমস্কার। অজিতকে আপনাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবো। বলেছিলুম কিনা—যে ওর বুদ্ধি আজকাল ভীষণ ধারালো হয়ে উঠেছে ?" হাসিতে হাসিতে ব্যোমকেশ ফোন রাখিয়া দিল।

বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া লজ্জিত মুখে বলিলাম—"কতক-কতক যেন বুঝতে পারছি ; কিন্তু তুমি সব কথা পরিষ্কার করে বল। কেমন করে বুঝলে ?"

ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"খাবার সময় হল, এখনি পুঁটিরাম ডাকতে আসবে। আচ্ছা, চটপট বলে নিচ্ছি শোনো।—প্রথম থেকেই তুমি ভুল পথে যাচ্ছিলে। দেখতে হবে জিনিসটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কি করে। তার নিজের হাত পা নেই, সুতরাং কেউ তাকে নিশ্চয়ই নিয়ে আসে। কে সে ? ঘরের মধ্যে পাঁচজন লোক ঢুকতে পায়—ডাক্তার, দুই ছেলে, স্ত্রী এবং আর একজন। প্রথম চারজন বিষ খাওয়াবে না এটা নিশ্চিত, অতএব এ পঞ্চম ব্যক্তির কাজ।"

"পঞ্চম ব্যক্তি কে ?"

"পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে—পিওন। সে হপ্তায় একবার সই করবার জন্যে নন্দদুলালবাবুর ঘরে ঢোকে। সুতরাং তার মারফতেই জিনিসটা ঘরে প্রবেশ করে।"

"কিন্তু খামের মধ্যে তো সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছু থাকে না।"

"ঐখানেই ফাঁকি। সবাই মনে করে খামের মধ্যে জিনিসটা আছে, তাই পিওনকে কেউ লক্ষ্য করে না। লোকটা হুঁশিয়ার, সে অনায়াসে লাল কালির দোয়াত বদলে দিয়ে চলে যায়। রেজিস্ট্রি করে সাদা কাগজ পাঠাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো ক্রমে পিওনকে নন্দদুলালবাবুর ঘরে ঢোকবার অবকাশ দেওয়া।"

"তারপর ?"

"তুমি আর একটা ভুল করেছিলে ; ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে টাকা পাঠানো হয়—পেনশন স্বরূপ নয়, ও প্রথা কোথাও প্রচলিত নেই—টাকা ওষুধের দাম, ওই মাগীই পিওনের হাতে ওষুধ সরবরাহ করে।

"তাহলে দেখ, ওষুধ নন্দদুলালবাবুর হাতের কাছে এসে পৌঁছল, কেউ জানতে পারলে না। কিন্তু অষ্টপ্রহর ঘরে লোক থাকে, তিনি খাবেন কি করে ? নন্দদুলালবাবু গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন। সর্বদাই হাতের কাছে লেখার সরঞ্জাম রয়েছে, তাই উঠে গিয়ে খাবারও দরকার নেই—খাটের ওপর বসেই সে কার্য সম্পন্ন করা যায়। তিনি কালো কলম দিয়ে গল্প লিখছেন, লাল কলম দিয়ে তাতে দাগ দিচ্ছেন এবং ফাঁক পেলেই কলমের নিবটি চুষে নিচ্ছেন। কালি ফুরিয়ে গেলে আবার ফাউন্টেন পেন ভরে নিচ্ছেন। জিভের রঙ লাল কেন এখন বুঝতে পারছ ?"

"কিন্তু লালই যে হবে তা বুঝলে কি করে ? কালোও তো হতে পারত ?"

"হায় হায়, এটা বুঝলে না ! কালো কালি যে বেশি খরচ হয়। নন্দদুলালবাবু ঐ অমূল্যনিধি কি বেশি খরচ হতে দিতে পারেন ? তাই লাল কালির ব্যবস্থা।"

"বুঝেছি।—এত সহজ—"

"সহজ তো বটেই। কিন্তু যে-লোকের মাথা থেকে এই সহজ বুদ্ধি বেরিয়েছে তার মাথাটা অবহেলার বস্তু নয়। এত সহজ বলেই তোমরা ধরতে পারছিলে না।"

"তুমি ধরলে কি করে ?"

"খুব সহজে। এই ব্যাপারে দুটো জিনিস সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে মন হয়—এক, রেজিস্ট্রি করে সাদা কাগজ আসা ; দুই, নন্দদুলালবাবুর গল্প লেখা। এই দুটোর সত্যিকার কারণ খুঁজতে গিয়েই আসল কথাটি বেরিয়ে পড়ল।"

পাশের ঘরে ঝন্ ঝন্ করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল, আমরা দু'জনেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম। ব্যোমকেশ ফোন ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে আপনি ? ও—ডাক্তারবাবু, কি খবর ?... নন্দদুলালবাবু চেঁচামেচি করছেন ?... হাত পা ছুঁড়ছেন ? তা হোক, তা হোক, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না।... অ্যাঁ ! কি বললেন ? অজিতকে গালাগাল দিচ্ছেন ? শকার বকার তুলে ? ... ভারি অন্যায়। ভারি অন্যায় কিন্তু—যখন তাঁর মুখ বন্ধ করা যাচ্ছে না তখন আর উপায় কি ?... অজিত অবশ্য ওসব গ্রাহ্য করে না ; অবিমিশ্র প্রশংসা যে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না তা সে জানে। মধু ও হুল—কমলে কন্টক....এই জগতের নিয়ম....আচ্ছা নমস্কার।"

অর্থমনর্থম্

স্নানাহারের জন্য উঠি-উঠি করিতেছিলাম, বেলা সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছিল—এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোনের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল। ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিল।

শুনিতে পাইলাম, সে বলিতেছে, 'হ্যালো, কে আপনি ? বিধুবাবু ? ও..নমস্কার ! নমস্কার ! কি খবর ? অ্যাঁ। বলেন কি ?...আমায় যেতে হবে ? তা বেশ...কত নম্বর ?...ও আচ্ছা...আধঘণ্টার মধ্যেই গিয়ে পৌঁছুব...'

পাঞ্জাবির বোতাম লাগাইতে লাগাইতে ব্যোমকেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, বলিল, 'চল হে, একটু ঘুরে আসা যাক। একটা খুন হয়ে গেছে, বিধুবাবু স্মরণ করেছেন।'

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোন্ বিধুবাবু ? ডেপুটি কমিশনার ?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,'হ্যাঁ—তিনিই। আমার ওপর এত দয়া কেন হল, বুঝতে পারছি না। নিজের ইচ্ছেয় যে ডাকেননি, তা তাঁর কথার ভাবেই বেশ বোঝা গেল। বোধহয় ওপর থেকে হুড়ো এসেছে।'

পুলিসের ডেপুটি কমিশনার বিধুবাবুর সঙ্গে কাজের সূত্রে আমাদের আলাপ হইয়াছিল। তিনি বেশ মুরুব্বীগোছের লোক ছিলেন, দেখা হলেই গ্রাম্ভারিভাবে ব্যোমকেশকে অনেক সদুপদেশ দিতেন ; ব্যোমকেশ যে বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতায় তাঁহার অপেক্ষা সর্বাংশে ছোট, এই কথাটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্যোমকেশ অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁহার লেকচার শুনিত ও মনে মনে হাসিত। বিধুবাবু নিজের গুণ গরিমার বর্ণনা করিতে করিতে অনেক সময় পুলিসের অনেক গূঢ় খবর প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। তাই, পুলিস-সংক্রান্ত কোনও খবর প্রয়োজন হইলেই ব্যোমকেশ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া একদফা লেকচার শুনিয়া আসিত।

যৌবনকালে বোধ করি বিধুবাবু একেবারে নির্বোধ ছিলেন না ; বিশেষত এই বয়স পর্যন্ত তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য ও কর্মোৎসাহ ছিল। কিন্তু পুলিস-আইনের কলে পড়িয়া তাঁহার বুদ্ধিটা যন্ত্রবৎ হইয়া পড়িয়াছিল। সহকর্মীরা আড়ালে তাঁহাকে 'বুদ্ধুবাবু' বলিয়া ডাকিত।

যা হোক, তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া লইয়া আমরা দু'জনে বাহির হইলাম। বাসে যথাস্থানে পৌঁছিতে মিনিট কুড়ি সময় লাগিল। স্থানটা শহরের উত্তরাংশে, ভদ্র বাঙ্গালী পল্লীর কেন্দ্রস্থল। নম্বর খুঁজিতে খুঁজিতে চোখে পড়িল, একটি বাড়ির দরজায় দুইজন লালপাগড়ি দাঁড়াইয়া সতর্কভাবে গোঁফে চাড়া দিতেছে ; বুঝিলাম, এই বাড়িটাই ঘটনাস্থল।

ব্যোমকেশের নাম শুনিয়া কনেস্টবলদ্বয় পথ ছাড়িয়া দিল ; আমরা প্রবেশ করিলাম। বাহির হইতে দেখিলে দোতলা বাড়িটা ছোট বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভিতরে বেশ সুপ্রসর, অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি বলিয়া মনে হয়। বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখের খোলা দালানে বড় বড় টবে বাহারে তালগাছ সাজানো রহিয়াছে চোখে পড়িল। একটা প্রকাণ্ড কাচের পাত্রে লাল মাছ খেলা করিতেছে। দালানের তিন ধারে বারান্দাযুক্ত কয়েকটি ঘর। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দালানের অপর প্রান্তে উপরে উঠিবার দু'মুখো সিঁড়ি।

ডানধারের একটা ঘরে অনেক লোক গিস্‌গিস্ করিতেছে দেখিয়া আমরা সেই দিকেই

গেলাম। দেখিলাম, ঘরের মধ্যস্থলে টেবিলের সম্মুখে স্থূলকায় পক্বগুম্ফ বিধুবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া আছেন ; বাড়ির চাকরের এজেহার হইয়া গিয়াছে—বামুনের এজেহার হইতেছে। লোকটা কাঁদো-কাঁদো মুখে জোড়-হস্তে দাঁড়াইয়া বিধুবাবুর কড়া কড়া প্রশ্নের জবাব দিতেছে ও ধমক খাইয়া চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতেছে। কয়েকজন নিম্নতন পুলিস-কর্মচারী চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আমাদের দেখিয়া বিধুবাবুর মুখ আরও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'আপনারা এসেছেন, বসুন। বিশেষ কিছু নয়—একটা খুন হয়েছে, সামান্য ব্যাপার। কে আসামী, তাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ওয়ারেন্টও ইসু করিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কর্তার হুকুম হল আপনাকে ডাকতে—তাই—' বিধুবাবু সজোরে একটা গলাঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—আপনিও দেখুন, যদিও দেখবার কিছুই নেই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি স্বয়ং যে কাজে রয়েছেন, তাতে আমার থাকা-না-থাকা সমান। যা হোক, কমিশনার সাহেব যখন হুকুম দিয়েছেন, তখন আপনার সহকারী হিসাবে আমি না হয় থাকব। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো ? কে খুন হয়েছে ?'

কৈতববাদের অপার মহিমা ; দেবতা একটু প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন, 'এ বাড়ির কর্তা করালীবাবু গতরাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হয়েছেন। মৃত্যুর ধরনটা একটু নূতন গোছের, তাই সাহেব একেবারে ঘাবড়ে গেছেন। কিন্তু আসলে ব্যাপার খুব সহজ—করালীবাবুর এক ভাগ্নে—মতিলাল, সে-ই এ কাজ করেছে ; আর করেই ফেরার হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল, 'গোড়া থেকেই সমস্ত কথা না বললে আমার মত লোকের বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। দয়া করে একটু খোলসাভাবে বলবেন কি ?'

বিধুবাবুর মুখের মেঘ সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল, তিনি একটু গ্রাম্ভারি হাস্য করিয়া বলিলেন, 'একটু বসুন। এই লোকটার এজেহার শেষ করে নিই, তারপর সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলব।'

পাচক ব্রাহ্মণটা তখনও দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল, বিধুবাবু তাহাকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়া বলিলেন, 'সাবধান হয়ে বুঝে-সম্‌ঝে কথা বলবে। মিথ্যে কথা একটি বলেছ কি সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতকড়া—বুঝলে ?'

বামুনঠাকুর শীর্ণকণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে।'

বিধুবাবু তখন অসমাপ্ত জেরা আরম্ভ করিলেন, 'কাল রাত্রে তুমি মতিলালবাবুকে কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে ?'

"আজ্ঞে, ঘড়ি তো দেখিনি—বোধহয়, একটা দুটো হবে।'

'ঠিক করে বল, একটা না দুটো ?'

'আজ্ঞে, বারোটা একটা হবে।'

বিধুবাবু হুমকি দিয়া উঠিলেন, 'আবার পাঁচরকম কথা ! ঠিক বল, বারোটা, না একটা, না দুটো ?'

পাচক একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, বারোটা।'

দারোগা ক্ষিপ্রহস্তে জবানবন্দী লিখিয়া লইতে লাগিল।

'তিনি চোরের মত পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি প্রায় রোজ রাত্তিরেই বাড়ি থাকেন না।'

'আবার বাজে কথা ! যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দাও। মতিলালবাবুকে তুমি উপর থেকে নেমে আসতে দেখেছিলে ?'

'আজ্ঞে না হুজুর। তিনি যখন সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান, তখন দেখেছিলুম।'

'ওপর থেকে নামতে দেখনি ! তুমি তখন কোথায় ছিলে ?'

'আজ্ঞে আমি—আজ্ঞে আমি—'

'সত্যি কথা বল, তুমি তখন কোথায় ছিলে ?'

পাচক ভয়-কম্পিত স্বরে জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, 'আজ্ঞে ধর্মাবতার, আমার দেশের লোকেরা এ বাড়ির সামনে মেছ্ করে থাকে—তাই রাতের কাজকর্ম শেষ হলে তাদের আড্ডায় গিয়ে একটু বসি।'

'ওঃ—তুমি তখন আড্ডায় বসে গাঁজায় দম দিচ্ছিলে !'

'আজ্ঞে—'

'সদর দরজা তাহলে খোলা ছিল ?'

ভয়ে পাচকটা শুকাইয়া গিয়াছিল, অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

বিধুবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'হুঁ। তাহলে রাত্রে বাড়িতে কারা আসা-যাওয়া করেছিল, তুমি আড্ডায় বসে বসে দেখেছিলে ?'

'আজ্ঞে, আর কেউ বাড়ি থেকে বেরোননি।'

'হুঁ। তুমি কখন বাড়ি ফিরলে ?'

'আজ্ঞে, মতিবাবু চলে যাবার আধঘণ্টা পরেই আমি বাড়িতে এসে দরজা বন্ধ করে দিলুম। সুকুমারবাবু তার আগেই ফিরে এসেছিলেন।'

'অ্যাঁ! সুকুমারবাবু আবার কোথা থেকে ফিরে এসেছিলেন ?'

'তা জানি না, হুজুর।'

''তিনি কখন ফিরেছিলেন ?'

'মতিবাবু বেরিয়ে যাবার কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরে।'

বিধুবাবুর ভ্রূকুটি গভীরতর হইল। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, 'তুমি এখন যেতে পার। দরকার হলে আবার তোমার এজেহার হবে।'

পাচকঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পলায়ন করিল। বিধুবাবু তখন ঘর হইতে অন্য পুলিস-কর্মচারীদের সরিয়া যাইতে বলিলেন। ঘরে কেবল আমি আর ব্যোমকেশ রহিলাম।

বিধুবাবু আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'দেখলেন তো, একজনকে জেরা করেই সব কথা বেরিয়ে পড়ল। ভাল জেরা করতে জানলে—যা হোক, আপনাকে গোড়া থেকে না বোঝালে আপনি বুঝতে পারবেন না। বাড়ির সকলের জবানবন্দী নিয়ে যেসব কথা জানা গেছে, তাই মোটামুটি আপনাকে বলছি—মন দিয়ে শুনুন।'

ব্যোমকেশ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে শুনিতে লাগিল। বিধুবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'এই বাড়ির যিনি কর্তা ছিলেন, তাঁর নাম করালীবাবু। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ছিলেন। বেশ অবস্থাপন্ন লোক, কলকাতায় চার-পাঁচখানা বাড়ি আছে, তা ছাড়া ব্যাঙ্কেও দু'তিন লাখ টাকা জমা আছে।

'স্ত্রী-পুত্র না থাকলেও তাঁর পুষ্যির অভাব নেই। তিনটি ভাগ্নে—মতিলাল, মাখনলাল আর ফণিভূষণ এবং শ্যালীর দুটি ছেলে-মেয়ে—সবসুদ্ধ এই পাঁচটি লোককে করালীবাবু প্রতিপালন করতেন। তারা সবাই এই বাড়িতেই থাকে। তাদের তিন কুলে আর কেউ নেই।

'যতদূর জানা যায়, করালীবাবু ভয়ঙ্কর ক্ষপিশ্ মেজাজের লোক ছিলেন। বাতব্যাধিতে পঙ্গু ছিলেন, বয়সও ষাট-বাষট্টি হয়েছিল—তাই নিজের ঘর থেকে বড় একটা বেরুতেন না। কিন্তু বাড়িসুদ্ধ লোক তাঁকে বাঘের মতন ভয় করত। তাঁর এক অদ্ভুত পাগলামি ছিল—তিনি কেবলই নিজের উইল তৈরি করতেন। তাঁর তিনখানা উইল দেরাজ থেকে বেরিয়েছে। প্রথমটায় তিনি মাখনকে ওয়ারিস করে যান, দ্বিতীয়টার ওয়ারিস মতিলাল, এবং সবশেষটায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সুকুমারকে দিয়ে গেছেন। শেষ উইলটা তৈরি হয়েছে —পরশু। সুকুমারই এখন তাঁর ওয়ারিস।

'করালীবাবুর থেকে থেকে উইল বদলাবার কারণ ছিল এই যে, যখন যার ওপর তিনি চটতেন, তখনই তাকে উইল থেকে খারিজ করে দিতেন।

'এই উইলের ব্যাপার নিয়ে কাল দুপুরবেলা মতিলালের সঙ্গে করালীবাবুর খুব একচোট ঝগড়া

হয়ে যায়। মতিলালের শরীরে অনেক দোষ আছে—সে তাঁকে 'ঘাটের মড়া' 'বাহাত্তুরে বুড়ো' ইত্যাদি গালাগাল দিয়ে চলে আসে।

'তারপর রাত্রি প্রায় বারোটার সময় মতিলাল চুপিচুপি বাড়ি থেকে পালায়—বামুন এবং চাকর দু'জনেই তাকে পালাতে দেখেছে। আজ সকালবেলা দেখা গেল, করালীবাবু তাঁর বিছানায় মরে পড়ে আছেন।

'কি করে মৃত্যু হল, প্রথমটা কেউ বুঝতে পারেনি। আমি এসে বার করলুম—তাঁর ঘাড়ে, ঠিক মেডালা আর ফার্স্ট ভার্টিব্রা'র মাঝখানে একটা ছুঁচ আমূল ফুটিয়ে দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

বিধুবাবু চুপ করিলে ব্যোমকেশ মুখ তুলিল, 'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! মেডালা আর ফার্স্ট সার্ভিক্ল ভার্টিব্রা'র সন্ধিস্থলে ছুঁচ ফুটিয়ে খুন করেছে, এ যে একেবারে Bride of Lammermoor!' কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, 'মতিলালের নামে ওয়ারেন্ট বার করে দিয়েছেন? লোকটা কাজকর্ম কিছু করে কি না, খবর পাওয়া গেছে কি?'

বিধুবাবু বলিলেন, 'কিছু না—কিছু না! থার্ড ক্লাস অবধি বিদ্যে, ঘোর বয়াটে। মামার অন্ন মারত, আর বেলেল্লাগিরি করে বেড়াত।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আর মাখনলাল?'

'তিনিও প্রায় দাদার মত, তবে অতটা নয়। কোকেন, গাঁজা-টাজা খায় বটে, কিন্তু দাদার মত এখনও নাম-কাটা সেপাই হয়ে ওঠেনি।'

'আর ফণিভূষণ?'

'তিনি আবার খোঁড়া। কথায় বলে—কানা-খোঁড়া এক গুণ বাড়া, কিন্তু এ ছোঁড়া বোধহয় অতটা খারাপ নয়। তার কারণ, খোঁড়া বলে বাড়ি থেকে বেরুতে পারে না। তিন ভাইয়ের মধ্যে এই ফণিভূষণই একটু মানুষের মতন বোধ হল।'

'আর সুকুমার?'

'সুকুমার বেশ ভাল ছেলে, মেডিক্যাল কলেজের ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়ে। তার বোন সত্যবতীও কলেজে পড়ে। এরা দুই ভাই-বোনে বুড়োর যা কিছু সেবা-শুশ্রূষা করত।'

'এরা সকলেই বোধহয় অবিবাহিত?'

'হ্যাঁ—মেয়েটিও।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'এবার চলুন, বাড়িটা একবার ঘুরে দেখা যাক। মৃতদেহ বোধহয় এখনও স্থানান্তরিত হয়নি।'

'না।' একটু অপ্রসন্নভাবেই বিধুবাবু উঠিয়া অগ্রবর্তী হইয়া চলিলেন, আমরা তাঁহার অনুসরণ করিলাম। উপরে উঠিবার সিঁড়ি বারান্দার দুই দিক হইতে উঠিয়া মাঝে চওড়া হইয়া দ্বিতলে পৌঁছিয়াছে। সিঁড়ির নীচে একটি ঘরের দরজা দেখা গেল, ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ও ঘরটি কার?'

বিধুবাবু বলিলেন, 'ওটা মতিলালের ঘর। বিশেষ কারণবশত তিনি নীচে শোয়াই পছন্দ করতেন। কর্তা অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক ছিলেন, রাত্রি ন'টার পর কারুর বাইরে থাকবার হুকুম ছিল না। এর ঠিক ওপরের ঘরেই কর্তা শুতেন।'

'ও—আর এ ঘরটি?' বলিয়া ব্যোমকেশ সিঁড়ির পাশে কোণের ঘরটি নির্দেশ করিল।

'ওটায় মাখনলাল থাকে।'

'এরা সবাই যে-যার ঘরেই আছেন বোধহয়? অবশ্য মতিলাল ছাড়া?'

'নিশ্চয়। আমি কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছি, আমার বিনা অনুমতিতে কেউ যেন বাড়ির বাইরে না যায়। দোরের কাছে কনস্টেবল মোতায়েন আছে।'

ব্যোমকেশ অস্ফুট স্বরে প্রশংসা ও অনুমোদনসূচক কি একটা বলিল, শুনা গেল না। দোতলায় উঠিয়া সম্মুখেই একটা বন্ধ দরজা দেখাইয়া বিধুবাবু বলিলেন, 'এই ঘরে করালীবাবু শুতেন।'

দরজার সম্মুখে গিয়া হঠাৎ ব্যোমকেশ নতজানু হইয়া ঝুঁকিয়া বলিল, 'এটা কিসের দাগ ?'

বিধুবাবুও ঝুঁকিয়া একবার দেখিলেন, তারপর সোজা হইয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন, 'ও চায়ের দাগ। প্রত্যহ সকালে ঐ মেয়েটি—সত্যবতী—চা তৈরি করে এনে করালীবাবুকে ডাকত—আজ সকালে সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখল, তিনি মরে পড়ে আছেন। সেই সময় বোধহয় পেয়ালা থেকে চা চল্‌কে পড়েছিল।'

'ও—তিনিই বুঝি সর্বপ্রথম করালীবাবুর মৃত্যুর কথা জানতে পারেন ?'

'হ্যাঁ।'

দ্বারে চাবি লাগানো ছিল, বিধুবাবু তালা খুলিয়া দিলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

ঘরটি মাঝারি আয়তনের, আসবাবপত্র বেশি নাই, কিন্তু যে কয়টি আছে, সেগুলি পরিপাটীভাবে সাজানো। মেঝেয় মৃজাপুরী কার্পেট পাতা; ঘরের মাঝখানে কাজকরা টেবিল-ক্লথে ঢাকা ছোট টিপাই; এক কোণে একটি আলনা—তাতে কোঁচানো থান ও জামা গোছানো রহিয়াছে, জুতাগুলি নীচে বার্ণিশ করা অবস্থায় সারি সারি রাখা আছে। ঘরের বাঁ দিকের কোণে একখানি খাট—খাটের উপর চাদর-ঢাকা একটা বস্তু রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয়, যেন কেহ পাশ ফিরিয়া চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। খাটের পাশে একটি টেবিল, তাহার উপর কয়েকটি ঔষধের শিশি ও মেজার গ্লাস সারি দিয়া সাজানো রহিয়াছে। কাচের গেলাস ঢাকা একটি কুঁজা খাটের শিয়রে মেঝের উপর রাখা আছে। মোটের উপর ঘরটি দেখিলে গৃহকর্তা যে কিরূপ গোছালো লোক ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়, এবং বিছানায় শয়ান ঐ চাদর-ঢাকা লোকটি যে গত রাত্রিতে এই ঘরেই খুন হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

টিপাইয়ের উপর এক পেয়ালা অনাস্বাদিত চা তখনও রাখা ছিল, ব্যোমকেশ প্রথমে সেই পেয়ালাটাই অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিল। শেষে মৃদুস্বরে কতকটা নিজমনেই বলিল, 'পেয়ালার অর্ধেক চা চল্‌কে পিরিচে পড়েছে, পেয়ালাটা অর্ধেক খালি, পিরিচটা ভরা—কেন ?'

বিধুবাবু অধীরভাবে মুখের একটা শব্দ করিয়া বলিলেন, 'সে কথা তো আগেই বলেছি, মেয়েটি—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনেছি। কিন্তু কেন ?'

বিধুবাবু এই অর্থহীন প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না, বিরক্তমুখে জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ সন্তর্পণে চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইল। চায়ের উপর একটা শ্বেতাভ ছালি পড়িয়াছিল, চামচ দিয়া চা নাড়িয়া সে আস্তে আস্তে একটু চা মুখে দিল। তারপর পেয়ালাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া মুখ মুছিয়া খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বিছানার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'মৃতদেহ নাড়াচাড়া হয়নি ? ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে ?'

বিধুবাবু জানালার বাহিরে তাকাইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। কেবল চাদরটা মাথা পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া হয়েছে, আর ছুঁচটা বার করে নিয়েছি।'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে চাদরটি তুলিয়া লইল। শুষ্ক শীর্ণ লোকটি, যেন দেয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতেছে। মাথার চুল সব পাকিয়া যায় নাই, কপালের চামড়া কুঁচকাইয়া কয়েকটা গভীর রেখা পড়িয়াছে। মুখে মৃত্যু-যন্ত্রণার কোনও চিহ্ন নাই।

ব্যোমকেশ লাস না সরাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিল। ঘাড়ের চুল সরাইয়া দেখিল, নাকের কাছে ঝুঁকিয়া অনেকক্ষণ কি নিরীক্ষণ করিল। তারপর বিধুবাবুকে ডাকিয়া বলিল, 'আপনি নিশ্চয় খুব ভাল করেই লাস পরীক্ষা করেছেন, তবু দুটো বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঘাড়ে তিনবার ছুঁচ ফোটানোর দাগ আছে।'

বিধুবাবু পূর্বে তাহা লক্ষ্য করেন নাই, এখন তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ—কিন্তু ও বিশেষ কিছু নয়। মেডালা আর মেরুদণ্ডের সন্ধিস্থলটা খুঁজে পায়নি, তাই কয়েকবার ছুঁচ ফুটিয়েছে। দ্বিতীয়

বিষয়টি কি?'

'নাকটা দেখেছেন?'

'নাক?'

'হ্যাঁ—নাক।'

বিধুবাবু নাক দেখিলেন। আমিও ঝুঁকিয়া দেখিলাম, নাসারন্ধ্রের চারিদিকে কয়েকটা ছোট ছোট কালো দাগ রহিয়াছে, শীতের সময় গায়ের চামড়া ফাটিয়া যেরূপ দাগ হয়, সেইরূপ।

বিধুবাবু বলিলেন, 'বোধহয় সর্দি হয়েছিল। ঘন ঘন নাক মুছলে ওরকম দাগ হয়। এ থেকে আপনি কি অনুমান করলেন?' বিধুবাবুর স্বর বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ।

'কিছু না—কিছু না। চলুন, এবার পাশের ঘরটা দেখা যাক। ওটা বোধহয় করালীবাবুর বসবার ঘর ছিল।'

পাশের ঘরে টেবিল, চেয়ার, টাইপ রাইটার, বইয়ের আলমারি ইত্যাদি ছিল—এই ঘরেই করালীবাবু অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। বিধুবাবু টেবিলের দেরাজ নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'এই দেরাজে তাঁর উইলগুলো পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ এই ঘরটাও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। দেরাজে অন্য কোনও কাগজপত্র ছিল না। ঘরের অপর দিকে ছোট একটি গোসলখানা—ব্যোমকেশ সেটাতে একবার উঁকি মারিয়া ফিরিয়া আসিল, বলিল, 'এখানে আর কিছু দেখবার নেই। এবার চলুন সুকুমারবাবুর ঘরে—তিনি মৃতের উত্তরাধিকারী না? ভাল কথা, ছুঁচটা একবার দেখি।'

বিধুবাবু পকেট হইতে একটা খাম বাহির করিয়া দিলেন। ব্যোমকেশ তাহার ভিতর হইতে একটি ছুঁচ বাহির করিয়া দুই আঙুলে তুলিয়া ধরিল। সাধারণ ছুঁচ অপেক্ষা আকারে একটু বড় ও মোটা—অনেকটা কাঁথা-সেলাইয়ের ছুঁচের মত; তাহার প্রান্ত হইতে একটু সুতো ঝুলিতেছে।

ব্যোমকেশ বিস্ফারিত-নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চাপা-স্বরে কহিল, 'আশ্চর্য! ভারি আশ্চর্য!'

'কি?'

'সুতো। দেখছেন না, ছুঁচে সুতো পরানো রয়েছে—কালো রেশমের সুতো!'

'তা তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ছুঁচে সুতো পরানো থাকাতে আশ্চর্যটা কি?'

ব্যোমকেশ একবার বিধুবাবুর মুখের দিকে তাকাইল, তারপর যেন একটু লজ্জিতভাবে বলিল, 'তাও তো বটে, আশ্চর্য হবার কি আছে। ছুঁচে সুতো পরানো তো হয়েই থাকে, সেই জন্যেই তো ছুঁচের সৃষ্টি!' ছুঁচ খামে ভরিয়া বিধুবাবুকে ফেরত দিল, বলিল, 'চলুন, এবার সুকুমারবাবুকে দেখা যাক।'

বারান্দার বাঁ দিকের মোড় ঘুরিয়া কোণের ঘরটা সুকুমারবাবুর। দ্বার ভেজানো ছিল, বিধুবাবু নিঃসংশয়ে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সুকুমার টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিল, আমরা ঢুকিতেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের এক ধারে খাট, অপর ধারে টেবিল, চেয়ার ও বইয়ের আলমারি। কয়েকটা তোরঙ্গ দেয়ালের এক ধারে উপরি উপরি করিয়া রাখা আছে।

সুকুমারের বয়স বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশ হইবে; চেহারাও বেশ ভাল, ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠগোছের দেহ। কিন্তু বাড়িতে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার ফলে মুখ শুকাইয়া, চোখ বসিয়া গিয়া চেহারা অত্যন্ত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার চোখে একটা ভয়ের ছায়া পড়িল।

বিধুবাবু বলিলেন, 'সুকুমারবাবু, ইনি—ব্যোমকেশ বক্সী—আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান।'

সুকুমার গলা সাফ করিয়া বলিল, 'বসুন।'

ব্যোমকেশ টেবিলের সম্মুখে বসিল। একখানা বই টেবিলের উপর রাখা ছিল, তুলিয়া লইয়া

দেখিল—গ্রে'র অ্যানাটমি। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, 'আপনি কাল রাত বারোটার সময় কোথা থেকে ফিরেছিলেন সুকুমারবাবু?'

সুকুমার চমকিয়া উঠিল, তারপর অস্ফুট স্বরে বলিল, 'সিনেমায় গিয়েছিলুম।'

ব্যোমকেশ মুখ না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ সিনেমায়?'

'চিত্রা।'

বিধুবাবু একটু ধমকের সুরে বলিলেন, 'এ আমাকে আগে বলা উচিত ছিল। বলেননি কেন?'

সুকুমার আমতা-আমতা করিয়া বলিল, 'দরকারী কথা বলে মনে হয়নি, তাই বলিনি—'

বিধুবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, 'দরকারী কি অদরকারী, সে বিচার আমরা করব। আপনি যে চিত্রায় গিয়েছিলেন, তার কোনও প্রমাণ আছে?'

সুকুমার কিছুক্ষণ নতমুখে চিন্তা করিল, তারপর আলনায় টাঙানো পাঞ্জাবির পকেট হইতে একখণ্ড রঙীন কাগজ আনিয়া দেখাইল। কাগজখানা সিনেমা টিকিটের অর্ধাংশ, বিধুবাবু সেটা ভাল করিয়া দেখিয়া নোটবুকের মধ্যে রাখিলেন।

ব্যোমকেশ বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, 'সন্ধ্যের 'শো'তে না গিয়ে সাড়ে ন'টার 'শো'তে গিয়েছিলেন—এর কোনও কারণ ছিল কি?'

সুকুমারের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, সে অনুচ্চ স্বরে বলিল, 'না, কারণ এমন কিছু—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশি রাত্রি পর্যন্ত বাইরে থাকা করালীবাবু পছন্দ করেন না, এ কথা নিশ্চয় আপনার জানা ছিল?'

সুকুমার উত্তর দিতে পারিল না, পাংশুমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'করালীবাবুর সঙ্গে আপনার শেষ দেখা কখন হয়েছিল?'

একটা ঢোক গিলিয়া সুকুমার কহিল, 'সন্ধ্যে পাঁচটার সময়।'

'আপনি তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

সুকুমার জোর করিয়া নিজের কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'মেসোমশাইকে উইল সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়েছিলুম। তিনি মতিদাদাকে বঞ্চিত করে আমার নামে সমস্ত সম্পত্তি উইল করেছিলেন; এই নিয়ে মতিদা'র সঙ্গে দুপুরবেলা তাঁর বচসা হয়। আমি মেসোমশাইকে বলতে গিয়েছিলুম, আমি একা তাঁর সম্পত্তি চাই না, তিনি যেন তাঁর সম্পত্তি সবাইকে সমান ভাগ করে দেন।'

'তারপর?'

'আমার কথা শুনে তিনি আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন।'

'আপনিও বোধ হয় বেরিয়ে গেলেন?'

'হ্যাঁ। সেখান থেকে আমি ফণীর ঘরে গিয়ে বসলুম। ফণীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে রাত হয়ে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাবলুম, বায়স্কোপ দেখে আসি; ফণীও যেতে বললে। তাই রাত্রে চুপি চুপি গিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম মেসোমশাই জানতে পারবেন না।'

সুকুমারের কৈফিয়ৎ শুনিয়া বিধুবাবু সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা গেল। ব্যোমকেশের মুখ কিন্তু নির্বিকার হইয়া রহিল। বিধুবাবু বেশ একটু কঠিন স্বরে বলিলেন, 'আপনার মনের কথা কি বলুন তো ব্যোমকেশবাবু? আপনি কি সুকুমারবাবুকে খুনী বলে সন্দেহ করেন?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'না না, সে কি কথা—চলুন, এবার এঁর ভগিনীর ঘরটা—'

বিধুবাবু অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলিলেন, 'চলুন। কিন্তু অযথা একটি মেয়েকে উত্ত্যক্ত করবার কোনো দরকার ছিল না, সে কিছু জানে না। তাকে যা জিজ্ঞাসা করবার আমি জিজ্ঞাসা করে

নিয়েছি।'

ব্যোমকেশ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, 'সে তো নিশ্চয়। তবু একবার—'

বারান্দা যেখানে মোড় ফিরিয়াছে, সেই কোণের উপর মেয়েটির ঘর ; বিধুবাবু গিয়া দরজায় টোকা মারিলেন। আধ মিনিট পরে একটি সতের-আঠারো বছরের মেয়ে দরজা খুলিয়া আমাদের দেখিয়া কবাটের পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আমরা সঙ্কুচিত-পদে ঘরে প্রবেশ করিলাম। সুকুমারও আমাদের পিছনে পিছনে আসিয়াছিল, সে গিয়া ক্লান্তভাবে বিছানায় বসিয়া পড়িল।

ঘরে ঢুকিবার সময় মেয়েটিকে একবার দেখিয়া লইয়াছিলাম। তাহার গায়ের রঙ ময়লা, লম্বা রোগা গোছের চেহারা, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দু'টি লাল হইয়া উঠিয়াছে, মুখও ঈষৎ ফুলিয়াছে ; সুতরাং সে সুশ্রী কি কুশ্রী, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মাথার চুল রুক্ষ। এই শোকে অবসন্ন মেয়েটিকে জেরা করার নিষ্ঠুরতার জন্য মনে মনে ব্যোমকেশের উপর রাগ হইতেছিল, কিন্তু তাহার কুণ্ঠার আড়ালে যে একটা দৃঢ় সঙ্কল্পিত উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলাম।

ব্যোমকেশ মেয়েটিকে একটি নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিল, 'আপনাকে একটু কষ্ট দেব, কিছু মনে করবেন না। এ রকম একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা যখন বাড়িতে হয়ে যায়, তখন বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত পুলিসের ছোটখাটো উৎপাতও সহ্য করত হয়—'

বিধুবাবু ফোঁস করিয়া উঠিলেন, 'পুলিসের নামে বদনাম দেবেন না, আপনি পুলিস নন।'

ব্যোমকেশ সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, 'বেশি নয়, দু' একটা সাধারণ প্রশ্ন আপনাকে করব। বসুন।' বলিয়া ঘরের একটিমাত্র চেয়ার নির্দেশ করিল।

মেয়েটি বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার ব্যোমকেশের দিকে তাকাইল। তারপর চাপা ভাঙা গলায় বলিল, 'আপনি কি জানতে চান, বলুন। আমি দাঁড়িয়েই জবাব দিচ্ছি।'

'বসবেন না ? আচ্ছা, আমিই তাহলে বসি।' চেয়ারে বসিয়া ব্যোমকেশ একবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। এ ঘরটিও সুকুমারের ঘরের মত অত্যন্ত সাদাসিধা—আসবাবের বাহুল্য নাই। খাট, টেবিল, চেয়ার, বইয়ের আলমারি ; বাড়তির মধ্যে একটা দেরাজযুক্ত ড্রেসিং টেবিল।

কড়িকাঠের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনিই রোজ সকালে চা নিয়ে করালীবাবুকে ডাকতেন ?'

মেয়েটি নীরবে ঘাড় নাড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ তাহলে চা দিতে গিয়েই আপনি প্রথম জানতে পারলেন যে, তিনি মারা গেছেন ?'

মেয়েটি আবার ঘাড় নাড়িল।

'তার আগে আপনি কিছু জানতেন না ?'

বিধুবাবু গলার মধ্যে গজ্‌গজ্‌ করিয়া বলিলেন, 'বাজে প্রশ্ন, বাজে প্রশ্ন। একেবারে foolish!'

ব্যোমকেশ যেন শুনিতে পায় নাই, এমনিভাবে বলিল, 'রাত্রিতে করালীবাবুর দরজা খোলা থাকত ?'

'হ্যাঁ। এ বাড়ির কারুর দরজা বন্ধ করে শোবার হুকুম ছিল না। মেসোমশাই নিজেও রাত্রিতে দরজা খুলে শুতেন।'

'বটে ! তাহলে—'

বিধুবাবু আর যেন সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ঢের হয়েছে, এবার উঠুন। যত সব বাজে প্রশ্ন করে বেচারীকে বিরক্ত করবার দরকার নেই। আপনি ক্রস্ একজামিন করতে জানেন না—'

এতক্ষণে ব্যোমকেশের বিনীতভাবের মুখোশ খসিয়া পড়িল। খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত সে বিধুবাবুর দিকে ফিরিয়া তীব্র অথচ অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, 'যদি বার বার বিরক্ত করেন, তাহলে কমিশনার সাহেবকে জানাতে বাধ্য হব যে, আপনি আমার অনুসন্ধানে বাধা দিচ্ছেন। আপনি

জানেন, এ ধরনের কেস সাধারণ পুলিসের এলাকায় পড়ে না—এটা সি আই ডি'র কেস ?'

গালে চড় খাইলেও বোধ করি বিধুবাবু এত স্তম্ভিত হইতেন না। তিনি আরক্তচক্ষুতে কটমট করিয়া কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর একটা অর্ধোচ্চারিত কথা গিলিয়া ফেলিয়া গট্‌গট্‌ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ মেয়েটির দিকে ফিরিয়া আবার আরম্ভ করিল, 'আপনি করালীবাবুর মৃত্যুর কথা জানতেন না ? ভেবে দেখুন।'

'ভেবে দেখেছি, জানতুম না।' মেয়েটির গলার আওয়াজে একটু জিদের আভাস পাওয়া গেল।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, 'যাক। এখন আর একটা কথা বলুন তো, করালীবাবু চায়ে ক' চামচ চিনি খেতেন ?'

মেয়েটি এবার অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'চিনি ? মেসোমশাই চায়ে চিনি একটু বেশি খেতেন, তিন-চার চামচ দিতে হত—'

বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন হইল, 'তবে আজ তাঁর চায়ে আপনি চিনি দেননি কেন ?'

মেয়েটির মুখ একেবারে ছাইয়ের মত হইয়া গেল, ত্রাস-বিস্ফারিত নয়নে সে একবার চারিদিকে চাহিল। তারপর অধর দংশন করিয়া অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল, 'বোধহয় মনে ছিল না, কাল থেকে আমার শরীরটা ভাল নেই—'

'কাল কলেজে গিয়েছিলেন ?'

অস্পষ্ট অথচ বিদ্রোহপূর্ণ উত্তর হইল, 'হ্যাঁ।'

অলসভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'সব কথা খুলে বললে আমাদের অনেক সুবিধা হয়, আপনাদেরও হয়তো সুবিধা হতে পারে।'

মেয়েটি ঠোঁট টিপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর দিল না।

ব্যোমকেশ আবার বলিল, 'সব কথা বলবেন কি ?'

মেয়েটি আস্তে আস্তে কাটিয়া কাটিয়া বলিল, 'আমি আর কিছু জানি না।'

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ সে টেবিলের উপর রক্ষিত একটা সেলায়ের বাক্সের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছিল, এবার টেবিলের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বাক্সটা নির্দেশ করিয়া বলিল, 'এটা আপনার বোধহয় ?'

'হ্যাঁ।'

বাক্সটা ব্যোমকেশ খুলিল। বাক্সর মধ্যে একটা অসমাপ্ত টেবিল-ক্লথ ও নানা রঙের রেশমী সুতা তাল পাকানো ছিল। সুতার তালটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ নিজমনেই বলিতে লাগিল, 'লাল, বেগুনী, নীল, কালো—হুঁ—কালো—' সুতা রাখিয়া দিয়া বাক্সর মধ্যে কি খুঁজিল, পাট-করা টেবিল-ক্লথটা খুলিয়া দেখিল ; তারপর মেয়েটির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'ছুঁচ কই ?'

মেয়েটি একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—'ছুঁচ ?'

ব্যোমকেশ বলিল—'হ্যাঁ—ছুঁচ। ছুঁচ দিয়েই সেলাই করেন নিশ্চয়। সে ছুঁচ কোথায় ?'

মেয়েটি কি বলিতে গেল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না ; হঠাৎ ফিরিয়া 'দাদা' বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সুকুমার যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানে তাহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চাপা কান্নার আবেগে তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

সুকুমার বিহ্বলের মত তাহার মুখটা তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, 'সত্য—সত্য—?'

সত্যবতী মুখ তুলিল না, কাঁদিতেই লাগিল। ব্যোমকেশ তাহাদের নিকটে গিয়ে খুব নরম সুরে বলিল, 'ভাল করলেন না, আমাকে বললে পারতেন। আমি পুলিস নই—শুনেছেন তো। বললে হয়তো আপনাদের সুবিধা হত—চল অজিত।'

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ সন্তর্পণে দ্বার ভেজাইয়া দিল ; কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল, 'এবার ?—হ্যাঁ—ফণীবাবু। চল, বোধহয় ওদিকের ঘরটা তাঁর।'

করালীবাবুর ঘর পার হইয়া বারান্দার অপর প্রান্তের মোড় ঘুরিয়া পাশেই একটা দরজা পড়ে, ব্যোমকেশ তাহাতে টোকা মারিল।

একটি কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের ছোকরা দরজা খুলিয়া দিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনিই ফণীবাবু ?'

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ—আসুন।'

ফণীর চেহারা দেখিয়াই মনে হয়, তাহার শরীরে কোথাও একটা অসঙ্গতি আছে ; কিন্তু সহসা ধরা যায় না। তাহার দেহ বেশ পুষ্ট, কিন্তু মুখখানা হাড় বাহির করা ; বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনা যেন অল্পবয়সেই তাহার মুখখানাকে রেখা-চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। আমরা ঘরে প্রবেশ করিতেই সে আগে আগে গিয়া একটা চেয়ার নির্দেশ করিয়া বলিল, 'বসুন।' তখন তাহার হাঁটার ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলাম, শারীরিক অসঙ্গতিটা কোন্‌খানে। তাহার বাঁ পা'টা অস্বাভাবিক সরু—চলিত কথায় যাহাকে 'ছিনে-পড়া' বলে, তাই। ফলে, হাঁটিবার সময় সে বেশ একটু খোঁড়াইয়া চলে।

আমি বিছানার এক পাশে বসিলাম, ফণী আমার পাশে বসিল। ব্যোমকেশ প্রথমটা যেন কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, শেষে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'এই ব্যাপারে পুলিস আপনার দাদা মতিলালবাবুকে সন্দেহ করে, আপনি জানেন বোধ হয় ?'

ফণী বলিল, 'জানি ; কিন্তু আমিও জোর করে বলতে পারি যে, দাদা নির্দোষ। দাদা ভয়ানক রাগী আর ঝগড়াটে—কিন্তু সে মামাকে খুন করবে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিষয় থেকে বঞ্চিত হবার রাগে তিনি এ কাজ করতে পারেন না কি ?'

ফণী বলিল, 'সে অজুহাত শুধু দাদার নয়, আমাদের তিন ভায়েরই আছে। তবে শুধু দাদাকেই সন্দেহ করবেন কেন ?'

ব্যোমকেশ প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিল, 'আপনি যা জানেন, সব কথাই বোধহয় পুলিসকে বলেছেন, তবু দু' একটা কথা জানতে চাই—'

ফণী একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'আপনি কি পুলিসের লোক নন ? আমি ভেবেছিলুম, আপনারা সি আই ডি—'

ব্যোমকেশ সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, আমি একজন সামান্য সত্যান্বেষী মাত্র—'

বিস্ফারিত চক্ষে ফণী বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু ? আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী ?'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, 'এখন বলুন তো, করালীবাবুর সঙ্গে বাড়ির আর সকলের সম্বন্ধটা কি রকম ছিল ? অর্থাৎ তিনি কাকে বেশি ভালবাসতেন, কাকে অপছন্দ করতেন—এই সব।'

ফণী কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া রহিল, তারপর একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, 'দেখুন, আমি খোঁড়া মানুষ—ভগবান আমাকে মেরেছেন—তাই আমি ছেলেবেলা থেকে কারুর সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারি না। এই ঘর আর এই বইগুলো আমার জীবনের সঙ্গী (বিছানার পাশে একটা বইয়ের শেল্‌ফ দেখাইল)—মামা যে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কাকে বেশি ভালবাসতেন, তা নির্ভুলভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বড় তিরিক্ষি মেজাজের লোক ছিলেন, তাঁর মনের ভাব মুখের কথায় প্রকাশ পেত না। তবে আঁচে-আন্দাজে যতদূর বোঝা যায়, সত্যবতীকেই মনে মনে ভালবাসতেন।'

'আর আপনাকে ?'

'আমাকে—আমি খোঁড়া অকর্মণ্য বলে হয়তো ভেতরে ভেতরে একটু দয়া করতেন—কিন্তু তার বেশি কিছু—। আমি মৃতের অমর্যাদা করছি না, বিশেষত তিনি আমাদের অন্নদাতা, তিনি না আশ্রয় দিলে আমি না খেতে পেয়ে মরে যেতুম, কিন্তু মামার শরীরে প্রকৃত ভালবাসা বোধহয় ছিল না—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি সুকুমারবাবুকে সব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, জানেন বোধহয় ?'

ফণী একটু হাসিল—'শুনেছি। সুকুমারদা সব দিক থেকেই যোগ্য লোক, কিন্তু ও-থেকে মামার মনের ভাব কিছু বোঝা যায় না। তিনি আশ্চর্য খেয়ালী লোক ছিলেন ; যখনই কারুর ওপর রাগ হত, তখনই টপাটপ টাইপ করে উইল বদলে ফেলতেন। বোধহয়, এ বাড়িতে এমন কেউ নেই—যার নামে একবার মামা উইল তৈরি না করেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শেষ উইল যখন সুকুমারবাবুর নামে, তখন তিনিই সম্পত্তি পাবেন।'

ফণী জিজ্ঞাসা করিল, 'আইনে কি তাই বলে ? আমি ঠিক জানি না।'

'আইনে তাই বলে।' ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ অবস্থায় আপনি কি করবেন, কিছু ঠিক করেছেন কি ?'

ফণী চুলের মধ্যে একবার আঙ্গুল চালাইয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া বলিল, 'কি করব, কোথায় যাব, কিছুই জানি না। লেখাপড়া শিখিনি, উপার্জন করবার যোগ্যতা নেই। সুকুমারদা যদি আশ্রয় দেয়, তবে তার আশ্রয়েই থাকব—না হয়, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।' তাহার চোখের কোলে জল আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে বলিল, 'সুকুমারবাবু কাল রাত্রি বারোটার সময় বাড়ি ফিরেছেন।'

ফণী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—'রাত্রি বারোটার সময়! ওঃ—হ্যাঁ, তিনি বায়স্কোপে গিয়েছিলেন!'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'করালীবাবুকে ক'টার সময় খুন করা হয়েছে, আপনি আন্দাজ করতে পারেন ? কোন রকম শব্দ-টব্দ শুনেছিলেন কি ?'

'কিছু না। হয়তো শেষ রাত্রে—'

'উহুঁ—তিনি রাত্রি বারোটায় খুন হয়েছেন।' ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'উঃ, আড়াইটে বেজে গিয়েছে—আর না, চল হে অজিত। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে—আপনাদেরও তো এখনও খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয়নি—নমস্কার।'

এমন সময় নীচে একটা গণ্ডগোল শোনা গেল ; পরক্ষণেই আমাদের ঘরের দরজা সজোরে ঠেলিয়া একজন লোক উত্তেজিতভাবে বলিতে বলিতে ঢুকিল, 'ফণী, দাদাকে অ্যারেস্ট করে এনেছে—' আমাদের দেখিয়াই সে থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিই মাখনবাবু ?'

মাখন ভয়ে কুঁচকাইয়া গিয়া 'আমি—আমি কিছু জানি না।' বলিয়া সবেগে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

নীচে নামিয়া দেখিলাম, বসিবার ঘরে হুলুস্থুল কাণ্ড। বিধুবাবু ঘরে নাই, থানার ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। একটা পাগলের মত চেহারার হাতকড়া-পরা লোককে দু'জন কনস্টেবল ধরিয়া আছে আর সে হাউমাউ করিয়া বলিতেছে, 'মামা খুন হয়েছেন ? দোহাই মশাই, আমি কিছু জানি না—যে দিব্যি গালতে বলেন গালছি—আমি মাতাল দাঁতাল লোক—ডালিমের বাড়িতে রাত কাটিয়েছি—ডালিম সাক্ষী আছে—'

ইন্‌স্পেক্টরবাবুটি সত্য সত্যই কাজের লোক, এতক্ষণ নিস্পৃহভাবে বসিয়াছিলেন, আমাদের দেখিয়া বলিলেন, 'আসুন ব্যোমকেশবাবু, ইনিই মতিলাল—বিধুবাবুর আসামী। যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান, করতে পারেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কোথায় একে গ্রেপ্তার করা হল ?'

যে সাব-ইন্‌স্পেক্টরটি গ্রেপ্তার করিয়াছিল, সে বলিল, 'হাড়কাটা গলির এক স্ত্রীলোকের বাড়িতে—'

মতিলাল আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'ডালিমের বাড়িতে ঘুমুচ্ছিলুম—কোন্ শালা মিছে কথা বলে—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিল, 'আপনি তো ভোর না হতেই বাড়ি ফিরে আসেন, আজ ফেরেননি কেন ?'

পাগলের মত আরক্ত চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া মতিলাল বলিল, 'কেন ? কেন ? আমি—আমি মদ খেয়েছিলুম—দু' বোতল হুইস্কি টেনেছিলুম—ঘুম ভাঙেনি—'

ব্যোমকেশ ইন্‌স্পেক্টরবাবুর দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল, তিনি বলিলেন, 'নিয়ে যাও—হাজতে রাখো—'

মতিলাল চীৎকার করিতে করিতে স্থানান্তরিত হইলে, ব্যোমকেশ বলিল, 'বিধুবাবু কোথায় ?'

'তিনি মিনিট পনের হল বাড়ি গেছেন—আবার চারটের সময় আসবেন।'

'আচ্ছা, তাহলে আমরাও উঠি, কাল সকালে আবার আসব। ভাল কথা, বাড়ির ঘরগুলো সব খানাতল্লাস হয়েছে ?'

'করালীবাবুর আর মতিলালের ঘর খানাতল্লাস হয়েছে, অন্য ঘরগুলো খানাতল্লাস করা বিধুবাবু দরকার মনে করেননি।'

'মতিলালের ঘর থেকে কিছু পাওয়া গেছে ?'

'কিছু না।'

'উইলগুলো দেখা হল না, সেগুলো বোধহয় বিধুবাবু সীল করে রেখে গেছেন। থাক, কাল দেখলেই হবে। আচ্ছা, চললুম। ইতিমধ্যে যদি নূতন কিছু জানতে পারেন, খবর দেবেন।'

বাসায় ফিরিলাম। রাত্রে করালীবাবুর বাড়ির একটা নক্সা তৈয়ার করিয়া ব্যোমকেশ আমাকে দেখাইল, বলিল, 'করালীবাবুর ঘরের নীচে মতিলালের ঘর ; মাখনের ঘর তার পাশে। ফণীর ঘরের নীচে বৈঠকখানাঘর অর্থাৎ যেখানে পুলিস আড্ডা গেড়েছে। সত্যবতীর ঘরের নীচে রান্নাঘর, আর সুকুমারের ঘরের নীচের ঘরে চাকর বামুন শোয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ প্ল্যান্ কি হবে ?'

'কিছু না।' বলিয়া ব্যোমকেশ নক্সাটা মনোনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'তোমার কি রকম মনে হচ্ছে ? মতিলাল বোধহয় খুন করেনি—না ?'

'না—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'তবে কে ?'

'সেইটে বলাই শক্ত, মতিলালকে বাদ দিলে চারজন বাকী থেকে যায়—ফণী, মাখন, সুকুমার আর সত্যবতী। এদের মধ্যে যে কেউ খুন করতে পারে। সকলের স্বার্থ প্রায় সমান।'

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'সত্যবতীও ?'

'নয় কেন ?'

'কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে—'

'মেয়েমানুষ যাকে ভালবাসে, তার জন্যে করতে পারে না, এমন কাজ নেই।'

'কিন্তু তার স্বার্থ কি ? করালীবাবুর শেষ উইলে তার ভাই-ই তো সব পেয়েছে।'

'বুঝলে না ? যে লোক ঘণ্টায় ঘণ্টায় মত বদলায়, তাকে খুন করলে আর তার মত বদলাবার অবকাশ থাকে না।'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এদিক হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখি নাই। বলিলাম, 'তবে কি তোমার মনে হয়—সত্যবতীই—?'

'আমি তা বলিনি। সুকুমার হতে পারে, সম্পূর্ণ বাইরের লোকও হতে পারে। কিন্তু সত্যবতী মেয়েটি সাধারণ মেয়ে নয়।'

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত প্রকার খাপছাড়া ও পরস্পর-বিরোধী মালমশলা আমাদের হস্তগত হইয়াছিল যে, তাহার ভিতর হইতে সুসংলগ্ন একটা

কিছু বাছিয়া বাহির করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যাপারটা এতই জটিল যে, ভাবিতে গেলে আরও জট পাকাইয়া যায়।

শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মৃতদেহ দেখে তুমি কি বুঝলে ?'

'এই বুঝলাম যে, হত্যা করবার আগে হত্যাকারী করালীবাবুকে ক্লোরোফর্ম করেছিল।'

'কি করে বুঝলে ?'

'তাঁর ঘাড়ে হত্যাকারী তিনবার ছুঁচ ফুটিয়েছিল। ক্লোরোফর্ম না করলে তিনি জেগে উঠতেন। তাঁর নাকে ছোট ছোট দাগ দেখেছিলে মনে আছে ? সেগুলো ক্লোরোফর্মের চিহ্ন।'

'তিনবার ছুঁচ ফোটাবার মানে ?'

'মানে, প্রথম দু'বার মর্মস্থানটা খুঁজে পায়নি। কিন্তু সেটা তেমন জরুরী কথা নয় ; জরুরী কথা হচ্ছে এই যে, ছুঁচটা বিঁধিয়ে রেখে গেল কেন ? কাজ হয়ে গেলে বার করে নিয়ে চলে গেলেই তো আর কোনও প্রমাণ থাকত না।'

'হয়তো তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর একটা কথা—রাত বারোটার সময় খুন হয়েছে, তুমি বুঝলে কি করে ?'

'ওটা আমার অনুমান। কিন্তু সত্যবতী যদি কখনও সত্যি কথা বলে, দেখবে, আমার অনুমানটা ঠিক। ডাক্তারের রিপোর্ট থেকেও জানা যাবে।'

কিছুক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে বসিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সুকুমারের টেবিলের ওপর একখানা বই রাখা ছিল—গ্রে'র অ্যানাটমি। সারা বইয়ের মধ্যে কেবল একটা পাতায় কয়েক লাইন লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া ছিল।'

'সে কয় লাইনের অর্থ ?'

'অর্থ—মেডালা এবং প্রথম কশেরুর সন্ধিস্থলে যদি ছুঁচ বিঁধিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।'

আমি লাফাইয়া উঠিলাম—'বল কি ! তাহলে ?'

'কিন্তু আশ্চর্য ! লাল পেন্সিলটা সুকুমারের টেবিলে দেখলুম না।' বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গভীর চিন্তাক্রান্তমুখে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। আমার মনের মধ্যে অনেকগুলা প্রশ্ন গজগজ করিতেছিল, কিন্তু ব্যোমকেশের চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিতে ভরসা হইল না। জানিতাম, এই সময় প্রশ্ন করিলেই সে খেঁকী হইয়া উঠে।

রাত্রে শয়ন করিয়া সে একটা প্রশ্ন করিল, 'তুমি তো একজন সাহিত্যিক, বল দেখি thimble-এর বাঙলা কি ?'

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, 'Thimble? যা আঙুলে পরে দর্জিরা সেলাই করে ?'

'হ্যাঁ।'

আমি ভাবিতে ভাবিতে বলিলাম, 'অঙ্গুলিত্রাণ হতে পারে—কিম্বা—সূচীবর্ম—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওসব চালাকি চলবে না, খাঁটি বাঙলা প্রতিশব্দ বল।'

স্বীকার করিতে হইল, বাঙলা প্রতিশব্দ নাই, অন্তত আমার জানা নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি জানো ?'

'উঁহু। জানলে আর জিজ্ঞাসা করব কেন ?'

ব্যোমকেশ আর কথা কহিল না। আমিও বাঙলা ভাষার অশেষ দৈন্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, ব্যোমকেশ বাহির হইয়া গিয়াছে। একটু রাগ হইল ; কিন্তু বুঝিলাম, আমাকে না লইয়া যাওয়ার কোনও মতলব আছে—হয়তো আমি গেলে অসুবিধা হইত।

যখন ফিরিল, তখন বেলা প্রায় এগারোটা ; জামা খুলিয়া পাখাটা চালাইয়া দিয়া সিগারেট ধরাইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হল ?'

সে একপেট ধোঁয়া টানিয়া আস্তে আস্তে ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, 'উইলগুলো দেখা গেল। উইলের সাক্ষী বাড়ির বামুন আর চাকর—তাদের টিপ্‌সই রয়েছে।'

'আর ?'

'বাড়ির অন্য ঘরগুলো ভাল করে খানাতল্লাস করতে বললুম। কিন্তু বিধুবাবু গোঁ ধরেছেন, আমি যা বলব, তার উল্টো কাজটি করবেন। শেষ পর্যন্ত ভয় দেখিয়ে এলুম, যদি খানাতল্লাস না করেন, কমিশনার সাহেবকে নালিশ করব।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি ! তিনি এখনও মতিলালকে কামড়ে পড়ে আছেন।' কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মেয়েটা ভয়ানক শক্ত, এমন মুখ টিপে রইল, কিছুতেই মুখ খুললে না ! অথচ এ রহস্যের চাবিকাঠি তার কাছে। যা হোক, দেখা যাক, বিধুবাবু যদি শেষ পর্যন্ত খানাতল্লাস করা মনস্থ করেন হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

'কি পাওয়া যাবে, প্রত্যাশা কর ?'

'কে বলতে পারে ? সামান্য জিনিস, হয়তো একটা ডাক্তারি দোকানের ক্যাশমেমো কিম্বা একটা পেন্সিল, কিম্বা—কিন্তু বৃথা গবেষণা করে লাভ নেই। চল, নাইবার বেলা হল।'

দুপুরবেলাটা ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় চোখ বুজিয়া শুইয়া কাটাইয়া দিল ; মনে হইল, সে যেন কিছুর প্রতীক্ষা করিতেছে। তিনটা বাজিতেই পুঁটিরাম চা দিয়া গেল, নিঃশব্দে পান করিয়া ব্যোমকেশ পূর্ববৎ পড়িয়া রহিল।

সাড়ে চারটা বাজিবার পর পাশের ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। ব্যোমকেশ দ্রুত উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিল, 'কে আপনি ?... ও ইন্‌স্পেক্টরবাবু, কি খবর ? ...সুকুমারবাবুর ঘর সার্চ হয়েছে ! বেশ বেশ, বিধুবাবু তাহলে শেষ পর্যন্ত...তাঁর ঘরে কি পাওয়া গেল ?...অ্যাঁ, সুকুমারবাবুকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ! তারপর—কিছু পাওয়া গেল ? ক্লোরোফর্মের শিশি...আলমারিতে বইয়ের পেছনে ছিল...আর ? উইল ! আর একখানা টাইপ-করা উইল ? বলেন কি ? কোন্ তারিখের ?...যে রাত্রে করালীবাবু মারা যান, সেইদিন তৈরি—হুঁ। কোথায় ছিল ? বাক্সের তলায় ! এ উইলে ওয়ারিস কে ?...ফণীবাবু !

'হ্যাঁ—ঠিক বলেছেন, পর্যায়ক্রমে এবার তারই পালা ছিল বটে।...সুকুমারবাবুর বোনকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?...না..ও বুঝেছি...ঘরে আর কিছু পাওয়া যায়নি ? এই ধরুন—একটা লাল পেন্সিল ? পাননি ? আশ্চর্য ! সেলাইয়ের কোনও উপকরণ পাননি ? তাই তো ! বিধুবাবু আছেন ?.. মতিলালকে খালাস করতে গেছেন...তবু ভাল, বিধুবাবুর সুমতি হয়েছে। সুকুমারবাবুর ঘর ছাড়া আর কোন্ কোন্ ঘর সার্চ হয়েছে ? আর হয়নি ! কি বললেন, বিধুবাবু দরকার মনে করেননি ! বিধুবাবু তো কিছুই দরকার মনে করেন না। আমার আজ যাবার দরকার আছে কি ? নূতন উইলখানা দেখতুম...ও নিয়ে গেছেন...আচ্ছা—কাল সকালেই হবে। লাল পেন্সিল আর ঐ সেলাইয়ের উপকরণটা যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে—ততক্ষণ—কি বলছেন ? সুকুমারের বিরুদ্ধে overwhelming প্রমাণ পাওয়া গেছে ? তা বলতে পারেন—কিন্তু ডাক্তারের রিপোর্ট পাওয়া গেছে ? মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে কি লিখেছেন ? আহারের তিন ঘণ্টা পরে...তার মানে আন্দাজ রাত বারোটা...আচ্ছা, কাল সকালে নিশ্চয় যাব।'

ফোন রাখিয়া ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিয়া বসিল। তাহার চিন্তা-কুঞ্চিত ভ্রূ ও মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সুকুমারই তাহলে ? তুমি তো গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলে—না ?'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এ ব্যাপারে যত কিছু প্রমাণ, সবই সুকুমারের দিকে নির্দেশ করছে। দেখ, করালীবাবুর মৃত্যুর ধরনটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এ ডাক্তারের কাজ। যারা ডাক্তারি কিছু জানে না, তারা ওভাবে খুন করতে পারে না। যে ছুঁচটা ব্যবহার করা হয়েছে, তাও তার বোনের সেলায়ের বাক্স থেকে চুরি করা, এমন কি, সুতোটা পর্যন্ত

এক। সুকুমার বারোটার সময় বাড়ি ফিরল—ঠিক সেই সময় করালীবাবুও মারা গেলেন। সুকুমারের ঘর সার্চ করে বেরিয়েছে ক্লোরোফর্মের শিশি, আর একটা টাইপ-করা উইল—করালীবাবুর শেষ উইল, যাতে তিনি সুকুমারকে বঞ্চিত করে ফণীকে সর্বস্ব দিয়ে গেছেন। সুকুমার নিজের মুখেই স্বীকার করেছে যে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা করালীবাবুর সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল—সুতরাং তিনি যে আবার উইল বদলাবেন, তা সে বেশ বুঝতে পেরেছিল। খুন করার মোটিভ্ পর্যন্ত পরিষ্কার পাওয়া যাচ্ছে।'

'তাহলে সুকুমারই যে আসামী, তাতে আর সন্দেহ নেই ?'

'সন্দেহের অবকাশ কোথায় ?' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, সুকুমারকে দেখে তোমার কি রকম মনে হল ? খুব নির্বোধ বলে মনে হল কি ?'

আমি বলিলাম, 'না। বরঞ্চ বেশ বুদ্ধি আছে বলেই মনে হল।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'সেইখানেই ধোঁকা লাগছে। বুদ্ধিমান বোকার মত কাজ করে কেন ?'

বলিয়াই ব্যোমকেশ সচকিতভাবে সোজা হইয়া বসিল। দ্বারের কাছে অস্পষ্ট পদধ্বনি আমিও শুনিতে পাইয়াছিলাম, ব্যোমকেশ গলা চড়াইয়া ডাকিল, 'কে ? ভিতরে আসুন।'

কিছুক্ষণ কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তারপর আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া গেল। তখন ঘোর বিস্ময়ে দেখিলাম, সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—সত্যবতী!

সত্যবতী ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল ; কিছুকাল শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আমার দাদাকে বাঁচান।'

অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ কিন্তু তড়াক করিয়া সত্যবতীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সত্যবতীর মাথাটা বোধহয় ঘুরিয়া গিয়াছিল, সে অন্ধভাবে একটা হাত বাড়াইয়া দিতেই ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া তাহাকে একখানা চেয়ারে আনিয়া বসাইয়া দিল। আমাকে ইঙ্গিত করিতেই পাখাটা চালাইয়া দিলাম।

প্রথম মিনিট দুই-তিন সত্যবতী চোখে আঁচল দিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল, আমরা নির্বাক লজ্জিত মুখে অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া রহিলাম। আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনেও এমন ব্যাপার পূর্বে কখনও ঘটে নাই।

সত্যবতীকে পূর্বে আমি একবারই দেখিয়াছিলাম ; সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী মেয়ে হইতে সে যে আকারে-প্রকারে একটুও পৃথক, তাহা মনে হয় নাই। সুতরাং ঘোর বিপদের সময় সমস্ত শঙ্কাসঙ্কোচ লঙ্ঘন করিয়া সে যে আমাদের কাছে উপস্থিত হইতে পারে, ইহা যেমন অচিন্তনীয়, তেমনই বিস্ময়কর। বিপদ উপস্থিত হইলে অধিকাংশ বাঙালীর মেয়েই জড়বস্তু হইয়া পড়ে। তাই এই কৃশাঙ্গী কালো মেয়েটি আমার চক্ষে যেন সহসা একটা অপূর্ব অসামান্যতা লইয়া দেখা দিল। তাহার পায়ের মলিন জরির নাগরা হইতে রুক্ষ অযত্নসম্বৃত চুল পর্যন্ত যেন অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতায় ভরপুর হইয়া উঠিল।

ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া সে যখন মুখ তুলিয়া আবার বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আমার দাদাকে আপনি বাঁচান,' তখন দেখিলাম, সে প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার গলার স্বর তখনও কাঁপিতেছে।

ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'আপনার দাদা অ্যারেস্ট হয়েছেন, আমি শুনেছি—কিন্তু—'

সত্যবতী ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, 'দাদা নির্দোষ, তিনি কিছু জানেন না—বিনা অপরাধে তাঁকে—' বলিতে বলিতে আবার সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ব্যোমকেশ ভিতরে ভিতরে বিচলিত হইয়াছে বুঝিলাম, কিন্তু সে শান্তভাবেই বলিল, 'কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে—'

সত্যবতী বলিল, 'সে সব মিথ্যে প্রমাণ। দাদা কখনও টাকার লোভে কাউকে খুন করতে

পারেন না। আপনি জানেন না—তাঁর মতন লোক ; ব্যোমকেশবাবু, আমরা মেসোমশায়ের টাকা চাই না, আপনি শুধু দাদাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন, আমরা আপনার পায়ে কেনা হয়ে থাকব।' তাহার দুই চোখ দিয়া ধারার মত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু সে আর তাহা মুছিবার চেষ্টা করিল না—বোধ করি, জানিতেই পারিল না।

ব্যোমকেশ এবার যখন কথা কহিল, তখন তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অশ্রুতপূর্ব গাঢ়তা লক্ষ্য করিলাম, সে বলিল, 'আপনার দাদা যদি সত্যই নির্দোষ হন, আমি প্রাণপণে তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করব—কিন্তু—'

'দাদা নির্দোষ, আপনি বিশ্বাস করছেন না ? আমি আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, দাদা এ কাজ করতে পারেন না—একটা মাছিকে মারাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—' বলিতে বলিতে সে হঠাৎ নতজানু হইয়া ব্যোমকেশের পায়ের উপর হাত রাখিল।

'ও কি করছেন ? উঠে বসুন—উঠে বসুন ?' বলিয়া ব্যোমকেশ নিজেই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পা সরাইয়া লইল।

'আপনি আগে বলুন, দাদাকে ছেড়ে দেবেন ?'

ব্যোমকেশ দুই হাত ধরিয়া সত্যবতীকে জোর করিয়া তুলিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল, তারপর তাহার সম্মুখে বসিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, 'আপনি ভুল করছেন—সুকুমারবাবুকে ছেড়ে দেবার মালিক আমি নই—পুলিস। তবে আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু চেষ্টা করতে হলে সব কথা আমার জানা দরকার। বুঝছেন না, আমার কাছ থেকে যতক্ষণ আপনি কথা গোপন করবেন, ততক্ষণ কোন সাহায্যই আমি করতে পারব না।'

চক্ষু নত করিয়া সত্যবতী বলিল, 'আমি তো কোনও কথা গোপন্ করিনি।'

'করেছেন। আপনি সেই রাত্রেই করালীবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর মৃত্যুর কথা জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাকে বলেননি।'

ত্রাস-বিস্ফারিত নেত্রে সত্যবতী ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইল, তারপর বুকে মুখ গুঁজিয়া নীরব হইয়া রহিল।

ব্যোমকেশ নরম সুরে বলিল, 'এখন সব কথা বলবেন কি ?'

কাতর চোখ দুটি তুলিয়া সত্যবতী বলিল, 'কিন্তু সে কথা আমি কি করে বলব ? তাতে যে দাদার ওপরেই সব দোষ গিয়ে পড়বে।'

অনুনয়ের কণ্ঠে ব্যোমকেশ বলিল, 'দেখুন, আপনার দাদা যদি নির্দোষ হন, তাহলে সত্যি কথা বললে তাঁর কোনও অনিষ্ট হবে না, আপনি নির্ভয়ে সমস্ত খুলে বলুন, কোনো কথা গোপন করবেন না।'

সত্যবতী অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া ভাবিল, শেষে ভগ্ন স্বরে বলিল, 'আচ্ছা, বলছি। আমার যে আর উপায় নেই—' উদ্গত অশ্রু আঁচল দিয়া মুছিয়া নিজেকে ঈষৎ শান্ত করিয়া সে ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

'সেদিন সন্ধ্যেবেলা মেসোমশায়ের সঙ্গে দাদার একটু বচসা হয়েছিল। মেসোমশাই দাদাকে সব সম্পত্তি উইল করে দিয়েছিলেন, তাই নিয়ে মতিদা'র সঙ্গে দুপুরবেলা তুমুল ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। কলেজ থেকে ফিরে তাই শুনে দাদা মেসোমশাইকে বলতে গিয়েছিলেন যে, তিনি সব সম্পত্তি চান না, সম্পত্তি যেন সকলকে সমান ভাগ করে দেওয়া হয়। মেসোমশাই কোনও রকম তর্ক সইতে পারতেন না, তিনি রেগে উঠে বললেন, 'আমার কথার ওপর কথা ! বেরোও এখান থেকে—তোমাকে এক পয়সা দেব না।'

'মেসোমশাই যে এ কথায় রাগ করবেন, তা দাদা বুঝতে পারেননি ; তিনি সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফণীদা'র ঘরে গিয়ে বসলেন। ফণীদা খোঁড়া মানুষ, বাইরে বেরুতে পারেন না—তাই দাদা রোজ সন্ধ্যেবেলা তাঁর কাছে বসে খানিকক্ষণ গল্প করতেন। ফণীদা'কে আপনারা বোধহয় দেখেছেন ? তিনি ইস্কুল-কলেজে পড়েননি বটে, কিন্তু বেশ ভাল লেখাপড়া জানেন।

তাঁর আলমারির বই দেখেই বুঝতে পারবেন—কত রকম বিষয়ে তাঁর দখল আছে। অনেক সময় আমি তাঁর কাছে পড়া বলে নিয়েছি।

'মেসোমশায়ের সঙ্গে বচসা হওয়াতে দাদার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তিনি রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় আমাকে বললেন, 'সত্য, আমি বায়স্কোপ দেখতে যাচ্ছি, সাড়ে এগারটার সময় ফিরব—সদর দরজা খুলে রাখিস।' এই বলে খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি চুপি চুপি বেরিয়ে গেলেন।

'আমাদের বামুনঠাকুর রাত্রির খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর বাইরে গিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত নিজের দেশের লোকের আড্ডায় গল্পগুজব করে, আমি জানতুম—তাই দাদাকে দোর খুলে দেবার জন্য আমি আর জেগে রইলুম না। রাত্রি দশটার পর হাঁড়ি-হেঁসেল উঠে গেলে আমিও গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, যেন দাদার ঘরে একটা শব্দ শুনতে পেলুম। মেঝের ওপর একটা ভারী জিনিস—টেবিল কি বাক্স সরালে যে রকম শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ। ভাবলুম দাদা বায়স্কোপ দেখে ফিরে এলেন।

'আবার ঘুমবার চেষ্টা করলুম ; কিন্তু কি জানি কেন ঘুম এল না—চোখ চেয়েই শুয়ে রইলুম। দাদার ঘরে থেকে আর কোনও সাড়া পেলুম না ; মনে করলুম তিনি শুয়ে পড়েছেন।

'এইভাবে মিনিট পনের কেটে যাবার পর—বারান্দায় একটা খুব মৃদু শব্দ শুনতে পেলুম, যেন কে পা টিপে টিপে যাচ্ছে। ভারী আশ্চর্য মনে হল ; দাদা তো অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছেন, তবে কে বারান্দা দিয়ে যাচ্ছে ? আমি আস্তে আস্তে উঠলুম ; দরজা একটু ফাঁক করে দেখলুম—দাদা নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। চাঁদের আলো বারান্দায় পড়েছিল, দাদাকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা কথা ; আপনার দাদার পায়ে জুতো ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর হাতে কিছু ছিল ?'

'না।'

'কিছু না ? একটা কাগজ কিম্বা শিশি ?'

'কিছু না।'

'তখন ক'টা বেজেছিল ; দেখেছিলেন কি ?'

সত্যবতী বলিল, 'দেখার দরকার হয়নি, তখন শহরের সব ঘড়িতেই বারোটা বাজছিল।'

ব্যোমকেশের দৃষ্টি চাপা উত্তেজনায় প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল, 'তারপর বলে যান।'

সত্যবতী বলিতে লাগিল, 'প্রথমটা আমি কিছু বুঝতে পারলুম না। দাদা পনের মিনিট আগে ফিরে এসেছেন—তাঁর ঘরে আওয়াজ শুনে জানতে পেরেছি—তবে আবার তিনি কোথায় গিয়েছিলেন ? হঠাৎ মনে হল হয়তো মেসোমশায়ের শরীর খারাপ হয়েছে, তাঁর ঘরেই গিয়েছিলেন। মেসোমশাই কখনও কখনও রাত্রিবেলা বাতের বেদনায় কষ্ট পেতেন—ঘুম হত না। তখন তাঁকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হত। আমি চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে মেসোমশায়ের ঘরের দিকে গেলুম।

'তাঁর ঘরের দোর রাত্রে বরাবরই খোলা থাকে—আমি ঘরে ঢুকলুম। ঘর অন্ধকার—কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও কি রকম একটা গন্ধ নাকে এল। গন্ধটা যে ঠিক কি রকম তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না—তীব্র গন্ধ নয়, অথচ—'

'মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ?'

'হ্যাঁ—ঠিক বলেছেন, মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ।'

'হুঁ—ক্লোরোফর্ম। তারপর !'

'দোরের পাশেই সুইচ্। আলো জ্বেলে দেখলুম, মেসোমশাই খাটে শুয়ে আছেন—ঠিক যেন

ঘুমুচ্ছেন। তাঁর শোবার ভঙ্গী দেখে একবারও মনে হয় না যে তিনি—; কিন্তু তবু কি জানি কেন আমার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে লাগল। সেই গন্ধটা যেন একটা ভিজে ন্যাকড়ার মতন আমার নিশ্বাস বন্ধ করবার উপক্রম করলে।

'কিছুক্ষণ আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, ওটা ওষুধের গন্ধ, মেসোমশাই ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

'পা কাঁপছিল, তবু সন্তর্পণে তাঁর খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঝুঁকে দেখলুম—তাঁর নিশ্বাস পড়ছে না। তখন আমার বুকের মধ্যে যে কি হচ্ছে, তা আমি বোঝাতে পারব না—মনে হচ্ছে এইবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। বোধহয়, মাথাটা ঘুরেও উঠেছিল ; নিজেকে সামলাবার জন্যে আমি মেসোমশায়ের বালিশের ওপর হাত রাখলুম। হাতটা ঠিক তাঁর ঘাড়ের পাশেই পড়েছিল—একটা কাঁটার মত কি জিনিস হাতে ফুটল। দেখলুম, একটা ছুঁচ তাঁর ঘাড়ে আমূল বেঁধানো—ছুঁচে তখনও সুতো পরানো রয়েছে।

'আমি আর সেখানে থাকতে পারলুম না। কিন্তু কি করে যে আলো নিবিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলুম, তাও জানি না। যখন ভাল করে চেতনা ফিরে এল, তখন নিজের বিছানায় বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি আর কাঁদছি।

'তারপর তো সবই আপনি জানেন। দাদাকে আমি সন্দেহ করিনি, আমি জানি, দাদা এ কাজ করতে পারেন না, তবু একথা যে কাউকে বলা চলবে না, তাও বুঝতে দেরি হল না। পরদিন সকালবেলা কোনোরকমে চা তৈরি করে নিয়ে মেসোমশায়ের ঘরে গেলুম—'

সত্যবতীর স্বর ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল। তাহার মুখের অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা, চোখের আতঙ্কিত দৃষ্টি হইতে বুঝিতে পারিলাম, কি অসীম সংশয় ও যন্ত্রণার ভিতর দিয়া সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটা তাহার কাটিয়াছিল। ব্যোমকেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আপনার মত অসাধারণ মেয়ে আমি দেখিনি। অন্য কেউ হলে চেঁচামেচি করে মূর্ছা—হিস্টিরিয়ার ঠেলায় বাড়ি মাথায় করত—আপনি—'

সত্যবতী ভাঙ্গা গলায় বলিল, 'শুধু দাদার জন্যে—'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আপনি এখন তাহলে বাড়ি ফিরে যান। কাল সকালে আমি আপনাদের ওখানে যাব।'

সত্যবতীও উঠিয়া দাঁড়াইল, শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল, 'কিন্তু আপনি তো কিছু বললেন না ?'

ব্যোমকেশ কহিল, 'বলবার কিছু নেই। আপনাকে আশা দিয়ে শেষে যদি কিছু না করতে পারি ? এর মধ্যে বিধুবাবু নামক একটি আস্ত—ইয়ে আছেন কিনা, তাই একটু ভয়। যা হোক, এইটুকু বলতে পারি যে, আপনি যে সব কথা বললেন, তা যদি প্রথমেই বলতেন, তাহলে হয়তো কোনও গোলমাল হত না।'

অশ্রুপূর্ণ চোখে সত্যবতী বলিল, 'আমি যা বললুম তাতে দাদার কোনও অনিষ্ট হবে না ? সত্যি বলছেন ? ব্যোমকেশবাবু, আমার আর কেউ নেই—' তাহার স্বর কান্নায় বুজিয়া গেল।

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি গিয়া সদর দরজাটা খুলিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'আপনি আর দেরি করবেন না—রাত হয়ে গেছে। আমাদের এটা ব্যাচেলর এস্টাব্লিশমেন্ট—বুঝলেন না—'

সত্যবতী একটু ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সে চৌকাঠ পার হইয়াছে, এমন সময় ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে তাহাকে কি বলিল শুনিতে পাইলাম না। সত্যবতী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। ক্ষণকালের জন্য তাহার কৃতজ্ঞতা-নিষিক্ত মিনতিপূর্ণ চোখ দুটি আমি দেখিতে পাইলাম—তারপর সে নিঃশব্দে ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

দরজা ভেজাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিয়া বসিল, ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'সাতটা বেজে গেছে।' তারপর মনে মনে কি হিসাব করিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বলিল, 'এখনও ঢের সময়

আছে।'

আমি সাগ্রহে তাহাকে চাপিয়া ধরিলাম, 'ব্যোমকেশ, কি বুঝলে ? আমি তো এমন কিছু—কিন্তু তোমার ভাব দেখে বোধ হয়, যেন তুমি ভেতরের কথা বুঝতে পেরেছ।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'এখনও সব বুঝিনি।'

আমি বলিলাম, 'যাই বল, সুকুমারের বিরুদ্ধে প্রমাণ যতই গুরুতর হোক, আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস সে খুন করেনি।'

ব্যোমকেশ হাসিল—'তবে কে করেছে ?'

'তা জানি না—কিন্তু সুকুমার নয়।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না, সিগারেট ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিল। বুঝিলাম, এখন কিছু বলিবে না। আমিও বসিয়া এই ব্যাপারে অদ্ভুত জটিলতার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ পরে ব্যোমকেশ একটা প্রশ্ন করিল, 'সত্যবতীকে সুন্দরী বলা বোধ হয় চলে না—না ?'

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'কেন বল দেখি ?'

'না, অম্‌নি জিজ্ঞাসা করছি। সাধারণে বোধহয় কালোই বলবে।'

বর্তমান সমস্যার সঙ্গে সত্যবতীর চেহারার কি সম্বন্ধ আছে, বুঝিলাম না ; কিন্তু ব্যোমকেশের মন কোন্ দুর্গম পথে চলিয়াছে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। আমি বিবেচনা করিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ, লোকে তাকে কালোই বলবে, কিন্তু কুৎসিত বোধহয় বলতে পারবে না।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও—'কালো ? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।'—কেমন ?—ভাল কথা, অজিত, তোমার বয়স কত হল বল দেখি ?'

সবিস্ময়ে বলিলাম, 'আমার বয়স—'

'হ্যাঁ—কত বছর ক'মাস ক'দিন, ঠিক হিসেব করে বল।'

কে জানে—হয়তো আমার বয়সের হিসাবের মধ্যেই করালীবাবুর মৃত্যু-রহস্যটা চাপা পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশের অসাধ্য কার্য নাই ; আমি মনে মনে গণনা করিয়া বলিলাম, 'আমার বয়স হল উনত্রিশ বছর পাঁচ মাস এগারো দিন।—কেন ?'

ব্যোমকেশ একটা ভারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক, তুমি আমার চেয়ে তিন মাসের বড়। বাঁচা গেল। কথাটা কিন্তু মনে রেখো।'

'মানে ?'

'মানে কিছুই নেই। কিন্তু ও কথা থাক। এই ব্যাপার নিয়ে ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে উঠেছে। চল, আজ নাইট-শো'তে বায়স্কোপে দেখে আসি।'

ব্যোমকেশ কখনও বায়স্কোপে যায় না, বায়স্কোপ থিয়েটার সে ভালই বাসে না। তাই বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বলিলাম, 'তোমার আজ হল কি বল দেখি ? একেবারে খেপচুরিয়াস্ মেরে গেলে না কি ?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'অসম্ভব নয়। আমি লগনচাঁদা ছেলে—ভট্টাচায্যিমশাই কুষ্ঠী তৈয়ার করেই বলেছিলেন, এ ছেলে ঘোর উন্মাদ হবে। কিন্তু আর দেরি নয়। চল, খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। 'চিত্রা'য় ক'দিন থেকে একটা খুব ভাল ফিল্ম দেখাচ্ছে।'

আহারাদি করিয়া বায়স্কোপে উপস্থিত হইলাম। রাত্রি সাড়ে নয়টায় চিত্র-প্রদর্শন আরম্ভ হইল। ছবিটা কিছু দীর্ঘ—শেষ হইতে প্রায় পৌনে বারোটা বাজিল।

অনেক দূর যাইতে হইবে—বাসও দু'একখানা ছিল ; আমি একটাতে উঠিবার উপক্রম করিতেছি, ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, হেঁটেই চল না খানিকদূর।' বলিয়া হনহন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ছাড়িয়া সে যখন পাশের একটা সরু রাস্তা ধরিল, তখন বুঝিলাম সে

করালীবাবুর বাড়ির দিকে চলিয়াছে। এত রাত্রে সেখানে কি প্রয়োজন, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল না। যাহা হউক, বিনা আপত্তিতে তাহার সঙ্গে চলিলাম।

স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছু বেশি দ্রুতপদেই আমরা চলিতেছিলাম, তবু করালীবাবুর বাড়ি পৌঁছিতে অনেকটা সময় লাগিল। করালীবাবুর দরজার পাশেই একটা গ্যাস-পোস্ট ছিল, তাহার নীচে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ হাতের আস্তিন সরাইয়া ঘড়ি দেখিল। কিন্তু ঘড়ি দেখিবার প্রয়োজন ছিল না, ঠিক এই সময় অনেকগুলো ঘড়ি চারিদিক হইতে মধ্যরাত্রি ঘোষণা করিয়া দিল।

ব্যোমকেশ উৎফুল্লভাবে আমার পিঠে একটা চাপড় মারিয়া বলিল, 'হয়েছে। চল, এবার একটা ট্যাক্সি ধরা যাক।'

পরদিন বেলা সাড়ে আটটার সময় আমরা করালীবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। কয়েকজন পুলিস-কর্মচারী ও বিধুবাবু হাজির ছিলেন। ব্যোমকেশকে দেখিয়া বিধুবাবু একটু অপ্রস্তুত হইলেন, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি শুনেছেন বোধহয় যে, সুকুমারকে অ্যারেস্ট করেছি। সে-ই আসল আসামী, তা আমি গোড়া থেকেই বুঝেছিলাম—আমি শুধু তাকে ল্যাজে খেলাচ্ছিলুম।'

'বলেন কি ?' ব্যোমকেশ মহা বিস্ময়ের ভান করিয়া এমনভাবে বিধুবাবুর পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, যেন খেলাইবার যন্ত্রটা সত্য সত্যই সেখানে বিদ্যমান আছে। ইন্‌স্পেক্টর সাব-ইন্‌স্পেক্টর হাসি চাপিবার চেষ্টায় উৎকট গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

বিধুবাবু একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, 'আপনি আজ কি মনে করে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু না। শুনলুম, আর একটা নূতন উইল বেরিয়েছে—তাই সেটা দেখতে এলুম।'

উইল ব্যোমকেশকে দেখাইবেন কি না, তাহা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বিধুবাবু অনিচ্ছাভরে ফাইল হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'দেখবেন, ছিঁড়ে ফেলবেন না যেন। এই উইলটাই হচ্ছে সুকুমারের বিরুদ্ধে সেরা প্রমাণ। করালীবাবুকে খুন করবার পর এটা সুকুমার চুরি করে নিজের ঘরে এনে লুকিয়ে রেখেছিল—কোথায় রেখেছিল জানেন ? তার ঘরে যে তিনটে ট্রাঙ্ক উপরো-উপরি করে রাখা আছে, তারই নীচের ট্রাঙ্কটার তলায়।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বাঃ, সবই যে মিলে যাচ্ছে দেখছি ! কিন্তু একটা কথা বলুন তো, সুকুমার উইলখানা ছিঁড়ে ফেললে না কেন ?'

বিধুবাবু নাকের মধ্যে একপ্রকার শব্দ করিয়া বলিলেন, 'হুঁঃ, সে বুদ্ধি থাকলে তো। ভেবেছিল, আমরা তার ঘর সার্চই করব না।'

'সুকুমার কিছু বললে ?'

'কি আর বলবে ! সবাই যা বলে থাকে, যেন ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছে, এমনি ভাব দেখিয়ে বললে, 'আমি কিছু জানি না'।'

ব্যোমকেশ উইলখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া, সমুচিত শ্রদ্ধার সহিত তাহার ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। আমিও গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, সাদা এক-তা ফুলস্ক্যাপ্ কাগজের উপর ছাপার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

'অদ্য ইংরাজী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে এই উইল করিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও নগদ টাকা আমার কনিষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীমান ফণীভূষণ পাইবে। পূর্বে যে সকল উইল করিয়াছিলাম, তাহা অত্র দ্বারা নাকচ করা হইল। স্বাক্ষর—শ্রীকরালীচরণ বসু।'

উইল পড়িয়া ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিল, দেখিলাম, তাহার মুখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, 'বিধুবাবু, এ কি আশ্চর্য ব্যাপার ! উইল যে—' বলিয়া কাগজখানা

বিধুবাবুর সম্মুখে পাতিয়া ধরিল।

বিধুবাবু বিস্মিতভাবে সেটা আগাগোড়া পড়িয়া বলিলেন, 'কি হয়েছে ? আমি তো কিছু—'

'দেখছেন না ?' বলিয়া স্বাক্ষরের নীচেটা আঙুল দিয়া দেখাইল।

তখন বিধুবাবু চক্ষু গোলাকৃতি করিয়া বলিলেন, 'ওঃ, সাক্ষী—'

'চুপ !' ব্যোমকেশ ঠোঁটে আঙুল দিয়া ঘরের ভেজানো দরজার দিকে তাকাইল। কিছুক্ষণ উৎকর্ণভাবে শুনিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া হঠাৎ কবাট খুলিয়া ফেলিল।

মাখনলাল দরজায় কান পাতিয়া শুনিতেছিল, সবেগে পলাইবার চেষ্টা করিল। ব্যোমকেশ তাহাকে কামিজের গলা ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল ; জোর করিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া বলিল, 'ইন্‌স্পেক্টরবাবু, একে ধরে রাখুন—ছাড়বেন না। আর, কথা কইতে দেবেন না।'

মাখন ভয়ে আধমরা হইয়া গিয়াছিল, বলিল, 'আমি—'

'চুপ ! বিধুবাবু একটা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে আনিয়ে নিন। আসামীর নাম দেবার দরকার নেই—নামটা পরে ভর্তি করে নিলেই হবে।' বিধুবাবুর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া খাটো গলায় বলিল, 'ততক্ষণ এই লোকটাকে ল্যাজে খেলান—আমরা আসছি।'

বিধুবাবু বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বলিলেন, 'কিন্তু আমি যে কিছুই—'

'পরে হবে। ইতিমধ্যে আপনি ওয়ারেন্টখানা আনিয়ে রাখুন। এস অজিত।'

দ্রুতপদে ব্যোমকেশ উপরে উঠিয়া গিয়া ফণীর কবাটে টোকা মারিল। ফণী আসিয়া দরজা খুলিয়া সম্মুখে ব্যোমকেশকে দেখিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু !'

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশের ব্যস্তসমস্ত ভাব আর ছিল না, সে সহাস্যমুখে বলিল, 'আপনি শুনে সুখী হবেন, করালীবাবুর প্রকৃত হত্যাকারী কে—তা আমরা জানতে পেরেছি।'

ফণী একটু মলিন হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ—সুকুমারদা গ্রেপ্তার হয়েছেন জানি। কিন্তু এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস না হবারই তো কথা। তাঁর ঘর থেকে আর একটা উইল বেরিয়েছে।—সে উইলের ওয়ারিস আপনি !'

ফণী বলিল, 'তাও শুনেছি। কথাটা শুনে অবধি আমার মনটা যেন তেতো হয়ে গেছে। তুচ্ছ টাকার জন্যে মামার অপঘাতে প্রাণ গেল।' একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'অর্থমনর্থম্‌ ! তিনি আমায় সব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, এতেও আমি খুশি হতে পারছি না ব্যোমকেশবাবু। নাই দিতেন টাকা—তবু তো তিনি বেঁচে থাকতেন।'

ব্যোমকেশ বইয়ের শেল্‌ফটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বইগুলা দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্কভাবে বলিল, 'তা তো বটেই। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ—শঙ্করাচার্য তো আর মিথ্যে বলেননি ! এটা কি বই ? ফিজিওলজি ! সুকুমারবাবুর বই দেখছি।' বইখানা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ নামপত্রটা দেখিল।

ফণী একটু হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ—সুকুমারদা মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর ডাক্তারি বই পড়তে দিতেন। কি আশ্চর্য দেখুন। এ বাড়িতে আমি সুকুমারদাকেই সবচেয়ে আপনার লোক মনে করতুম—এমন কি, দাদাদের চেয়েও—অথচ তিনিই—'

ব্যোমকেশ আরও কতকগুলি বই খুলিয়া দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিল, 'আপনি তো দেখছি একজন পাকা গ্রন্থকীট ! সব বই দাগ দিয়ে পড়েছেন।'

ফণী বলিল, 'হ্যাঁ। পড়া ছাড়া আর তো কোনও অ্যামুজমেন্ট নেই—সঙ্গীও নেই। এক সুকুমারদা রোজ সন্ধ্যাবেলা খানিকক্ষণ আমার কাছে এসে বসতেন। আচ্ছা, ব্যোমকেশবাবু, সত্যিই কি সুকুমারদা এ কাজ করেছেন ? কোন সন্দেহ নেই ?'

ব্যোমকেশ চেয়ারে আসিয়া বসিল, বলিল, 'অপরাধীর বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে সন্দেহের বিশেষ স্থান নেই। বসুন—আপনাকে সব কথা বলছি।'

ফণী বিছানায় উপবেশন করিল, আমি তাহার পাশে বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'দেখুন, হত্যা দু'রকম হয়—এক, রাগের মাথায় হত্যা, যাকে crime of passion বলে ; আর এক, সঙ্কল্প করে হত্যা। রাগের মাথায় যে-লোক খুন করে, তাকে ধরা কঠিন নয়—অধিকাংশ সময় সে নিজেই ধরা দেয়। কিন্তু যে লোক ভেবে-চিন্তে নিজেকে যথাসম্ভব সন্দেহমুক্ত করে খুন করে, তাকে ধরাই কঠিন হয়ে পড়ে। তখন কে আসামী, তার নাম আমরা জানতে পারি না, পাঁচজন লোকের ওপর সন্দেহ হয়। এ রকম ক্ষেত্রে আমরা কোন্ পথে চলব ? তখন আমাদের একমাত্র পথ হচ্ছে—হত্যার প্রণালী থেকে হত্যাকারীর প্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা করা।

'বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি—হত্যাকারী লোকটা একাধারে বোকা এবং চতুর। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত খুন করেছে অথচ নির্বোধের মত খুনের যা-কিছু প্রমাণ নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছে। বলুন দেখি, সত্যবতীর ছুঁচ দিয়ে খুন করবার কি দরকার ছিল ? বাজারে কি ছুঁচ পাওয়া যায় না ? আর উইলখানা যত্ন করে লুকিয়ে রাখবার কোনও আবশ্যকতা ছিল কি ? ছিঁড়ে ফেললেই তো সব ন্যাটা চুকে যেত। এ থেকে কি মনে হয় ?'

ফণী হাতের উপর চিবুক রাখিয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'কি মনে হয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে ব্যক্তি স্বভাবতই নির্বোধ, সে বুদ্ধিমানের মত কাজ করবে—এ সম্ভব নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সে বোকামির ভান করতে পারে। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আসামী যে হোক সে বুদ্ধিমান।

'কিন্তু বুদ্ধিমান লোকও ভুল করে, বোকা সাজবার চেষ্টাও সব সময় সফল হয় না। এ ক্ষেত্রেও আসামী কয়েকটা ছোট ছোট ভুল করেছিল বলে আমি তাকে ধরতে পেরেছি।'

ফণী মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভুল সে করেছিল ?'

'বলছি।' ব্যোমকেশ পকেট হাঁটকাইয়া একটা সাদা কাগজ বাহির করিল—'কিন্তু তার আগে এ বাড়ির একটা নক্সা তৈরি করে দেখাতে চাই। একটা পেন্সিল আছে কি ? যে কোনও পেন্সিল হলেই চলবে।'

ফণীর বিছানায় বালিশের পাশে একটা বই রাখা ছিল, তাহার ভিতর হইতে সে একটা লাল পেন্সিল বাহির করিয়া দিল।

পেন্সিলটা লইয়া ব্যোমকেশ ভাল করিয়া দেখিল, তারপর মৃদু হাস্যে সেটা পকেটে রাখিয়া দিয়া বলিল, 'থাক, প্ল্যান্ আঁকবার দরকার নেই—মুখেই বলছি। অপরাধী প্রধানত তিনটি ভুল করেছিল। প্রথমে—সে গ্রে'র অ্যানাটমির এক জায়গায় লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছিল ; দ্বিতীয়—সে বাক্স টানবার সময় একটু শব্দ করে ফেলেছিল ; আর তৃতীয়—সে আইন ভাল জানত না।'

ফণীর মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানা একেবারে মড়ার মত হইয়া গিয়াছিল, সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল, 'আইন জানত না ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আর সেই জন্যেই তার অতবড় অপরাধটা ব্যর্থ হয়ে গেল।'

শুষ্ক অধর লেহন করিয়া ফণী বলিল, 'আপনি কি বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'সুকুমারবাবুর ঘর থেকে যে উইলটা বেরিয়েছে—উইল হিসেবে সেটা মূল্যহীন। তাতে সাক্ষীর দস্তখত নেই।'

মনে হইল, ফণী এবার মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবে। অনেকক্ষণ কেহ কোনও কথা বলিল না ; দৃষ্টিহীন শুষ্ক চক্ষু মেলিয়া ফণী মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর দুই হাতে মাথার চুল মুঠি করিয়া ধরিয়া অর্ধব্যক্ত স্বরে বলিল, 'সব বৃথা—সব মিছে—; ব্যোমকেশবাবু, আমাকে একটু সময় দিন, আমি বড় অসুস্থ বোধ করছি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়িল, 'আধ ঘণ্টা সময় আপনাকে দিলুম—তৈরি হয়ে নিন।' দ্বার পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'থিম্বলটা অবশ্য ফেলে দিয়েছেন ; সেটা সুকুমারের ঘরে রেখে আসেননি কেন বোঝা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়িতে আঙুল থেকে খুলতে

ভুলে গিয়েছিলেন—না ? তাই হবে। কিন্তু ক্লোরোফর্ম কার হাত দিয়ে আনালেন ? মাখন ?'

ফণী বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'আধ ঘণ্টা পরে আসবেন—'

দ্বার ভেজাইয়া দিয়া আমরা নীচে নামিয়া আসিয়া বসিলাম। মাখন তখনও ইন্‌স্পেক্টর ও সাব্-ইনস্পেক্টরের মধ্যবর্তী হইয়া দারুভূত জগন্নাথের মত বসিয়াছিল, ব্যোমকেশ ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, 'তুমি কবে ফণীকে ক্লোরোফর্ম এনে দিয়েছ ?'

মাখন চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, 'আমি কিছু জানি না—'

'সত্যি কথা বল, নইলে ওয়ারেন্টে তোমার নামই লেখা হবে।'

মাখন কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, 'দোহাই আপনাদের, আমি এ সবের মধ্যে নেই। ফণী বলেছিল রাত্রে তার ঘুম হয় না, একফোঁটা করে ক্লোরোফর্ম খেলে ঘুম হবে—তাই—'

'বুঝেছি। একে এবার ছেড়ে দিতে পারেন, বিধুবাবু।'

মুক্তি পাইয়া মাখন একেবারে বাড়ি ছাড়িয়া দৌড় মারিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'ওয়ারেন্ট এসেছে ?'

বিধুবাবু বলিলেন, 'না, এই এল বলে। কিন্তু কার জন্য ওয়ারেন্ট ?'

'করালীবাবুকে যে খুন করেছে, তার জন্য।'

বিধুবাবু অতিশয় অপ্রসন্নভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, এটা পরিহাসের সময় নয়। কমিশনার সাহেব আপনাকে একটু স্নেহ করেন বলে আপনি আমার ওপর হুকুম চালাচ্ছেন, তাও আমি সহ্য করেছি। কিন্তু তামাশা সহ্য করব না।'

'তামাশা নয়—এ একেবারে নিরেট সত্যি কথা। শুনুন তবে—' বলিয়া ব্যোমকেশ সংক্ষেপে সমস্ত কথা বিধুবাবুকে বলিল। বিধুবাবু কিছুক্ষণ বিস্ময়বিহ্বল হইয়া রহিলেন, তারপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'তাই যদি হয়, তবে তাকে একলা ফেলে এলেন কি বলে ? যদি পালায় ?'

'পালাবে না ; সে নিজের অপরাধ স্বীকার করবে। আর সেইটেই আমাদের একমাত্র ভরসা ; কারণ, তার অপরাধ আদালতে প্রমাণ করা বিশেষ কঠিন হবে। জুরীদের আপনি জানেন তো—তারা 'নট্ গিল্টি' বলেই আছে।'

'তা তো জানি—কিন্তু—' বিধুবাবু আবার বসিয়া পড়িলেন।

ঠিক আধ ঘণ্টা পরে আমরা ফণীর ঘরে এলাম। বিধুবাবু সর্বপ্রথম দরজা খুলিয়া গট্‌গট্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

ফণী বিছানায় শুইয়া আছে, বিছানার পাশে তাহার ডান হাতটা ঝুলিতেছে ; আর ঠিক তাহার নীচে মেঝের উপর পুরু হইয়া রক্ত জমিয়াছে। কব্জির কাটা ধমনী হইতে তখনও ফোঁটা ফোঁটা গাঢ় রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এতটা আমি প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু এ ছাড়া তার উপায়ই বা ছিল কি ?'

ফণীর বুকের উপর একখানা চিঠি রাখা ছিল ; সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ পাঠ করিল। চিঠিতে এই কয়টি কথা লেখা—

'ব্যোমকেশবাবু,

চলিলাম। আমি খোঁড়া অকর্মণ্য, এখানে আমার অন্ন জুটিবে না—দেখি ওখানে জোটে কি না।

আমি জানি, মোকদ্দমা করিয়া আপনারা আমার ফাঁসি দিতে পারিতেন না। কিন্তু আমার বাঁচিয়া কোনও লাভ নাই ; যখন টাকাই পাইলাম না, তখন কিসের সুখে বাঁচিব ?

মামাকে খুন করিয়াছি সেজন্য আমার ক্ষোভ নাই ; তিনি আমাকে ভালবাসিতেন না, খোঁড়া বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। তবে সুকুমারদার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। কিন্তু তিনি ছাড়া দোষ চাপাইবার লোক আর কেহ ছিল না।

তা ছাড়া, তিনি ফাঁসি গেলে আর একটা সুবিধা হইত। কিন্তু যে কথা নিজের বিকলাঙ্গতার লজ্জায় জীবনে কাহাকেও বলিতে পারি নাই আজ আর তাহা প্রকাশ করিব না।

ক্লোরোফর্ম কোথা হইতে পাইয়াছি তাহা বলিব না ; যে আনিয়া দিয়াছিল সে আমার অভিসন্ধি জানিত না। তবে পরে হয়তো সন্দেহ করিয়াছিল।

আপনি আশ্চর্য লোক, থিম্বলের কথাটাও ভুলেন নাই। সেটা সত্যই আঙুল হইতে খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম ; ঘরে ফিরিয়া আসিয়া চোখে পড়িল। সেটা এই ঘরেই আছে—খুঁজিয়া লইবেন। সেদিন রাত্রিতে সত্যবতীর ঘর হইতে থিম্বল আর ছুঁচ চুরি করিয়াছিলাম—সে তখন রান্নাঘরে ছিল।

আপনি ছাড়া আমাকে বোধহয় আর কেহ ধরিতে পারিত না কিন্তু তবু আপনাকে বিদ্বেষ করিতে পারিতেছি না। বিদায়। ইতি—

বহুদূরের যাত্রী
ফণিভূষণ কর

চিঠিখানি বিধুবাবুর হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন সুকুমারবাবুকে ছেড়ে দেবার বোধহয় আর কোনও বাধা নেই। তাঁর ভগিনীকেও জানানো দরকার। তিনি বোধহয় নিজের ঘরেই আছেন।—চল অজিত।'

সপ্তাহখানেক পরে আমরা দুইজনে আমাদের বসিবার ঘরে অধিষ্ঠিত ছিলাম। বৈকালবেলা নীরবে চা-পান চলিতেছিল।

গত কয়দিন অপরাহ্নে ব্যোমকেশ নিয়মিত বাহিরে যাইতেছিল। কোথায় যায়, আমাকে বলে নাই, আমিও জিজ্ঞাসা করি নাই। তাহার কাছে মাঝে মাঝে এমন দু'একটা গোপনীয় কেস আসিত যাহার কথা আমার কাছেও প্রকাশ করিবার তাহার অধিকার ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজও বেরুবে না কি ?'

ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ।'

একটু সঙ্কুচিতভাবে প্রশ্ন করিলাম, 'নূতন কেস হাতে এসেছে, না ?'

'কেস ? হ্যাঁ—কিন্তু কেসটা বড় গোপনীয়।'

আমি আর ও বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিলাম না, বলিলাম, 'সুকুমারের ব্যাপার সব চুকে গেছে ?'

'হ্যাঁ—প্রোবেটের দরখাস্ত করেছে।'

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা ব্যোমকেশ, ঠিক কিভাবে ফণী খুন করলে, আমাকে বুঝিয়ে বল তো ; এখনও ভাল করে জট ছাড়াতে পারছি না।'

চায়ের শূন্য পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা শোন, পর পর ঘটনাগুলো যেমন ঘটেছিল, বলে যাচ্ছি—

'সেদিন দুপুরবেলা করালীবাবুর সঙ্গে মতিলালের ঝগড়া হল। সন্ধ্যেবেলা সুকুমার এসে তাই শুনে করালীবাবুকে বোঝাতে গেল। সেখান থেকে গালাগালি খেয়ে বেরিয়ে ফণীর ঘরে প্রায় সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কাটালে ; তারপর খেয়েদেয়ে বায়স্কোপ দেখতে গেল। এ পর্যন্ত কোনও গোলমাল নেই।'

'না।'

'রাত্রি আটটা থেকে নয়টার মধ্যে—অর্থাৎ সত্যবতী যে সময় রান্নাঘরে ছিল, সেই সময় ফণী তার ঘর থেকে থিম্বল আর ছুঁচ চুরি করলে। সে বুঝতে পেরেছিল, করালীবাবু আবার উইল বদলাবেন এবং এবার সে সম্পত্তি পাবে। সে ঠিক করলে, বুড়োকে আর মত বদলাবার ফুরসৎ দেবে না। বুড়োকে ফণী বিষচক্ষে দেখত ; বিকলাঙ্গ লোকের একটা অদ্ভুত মানসিক দুর্বলতা প্রায়ই দেখা যায়—তারা নিজেদের দৈহিক বিকৃতি সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সইতে পারে না। ফণী

বোধহয় অনেকদিন থেকেই করালীবাবুকে খুন করবার মতলব আঁটছিল।

'বামুনঠাকুরের এজেহার থেকে জানা যায়, রাত্রি আন্দাজ সাড়ে এগারোটার সময় মতিলাল বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। গাঁজাখোরদের সময়ের ধারণা থাকে না, তাই বামুনঠাকুর একটু সময়ের গোলমাল করে ফেলেছিল। আমি হিসাব করে দেখেছি, মতিলাল বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ঠিক এগারোটা বেজে পঁচিশ মিনিটে। তার ও-দোষ বরাবরই ছিল—রাত্রে বাড়ি থাকত না।

'সে বেরিয়ে যাবার পর ফণীও নিজের ঘর থেকে বেরুল। মতিলালের ঘর করালীবাবুর শোবার ঘরের ঠিক নীচেই, পাছে পায়ের শব্দ হয়, তাই ফণী এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। ঘুমন্ত করালীবাবুকে ক্লোরোফর্ম করতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগল ; তারপর সে তাঁর ঘাড়ে অপটু হস্তে ছুঁচ ফোটালে। তিনবার ফোটাবার পর তবে ছুঁচ যথাস্থানে পৌঁছল। সুকুমারের মতন ডাক্তারি ছাত্র যদি এ কাজ করত, তাহলে তিনবার ফোটাবার দরকার হত না।

'করালীবাবুকে শেষ করে ফণী পাশের ঘরের দেরাজ থেকে তাঁর শেষ উইল বার করলে—দেখলে, উইল তার নামেই বটে।

'এখানে একটু সন্দেহের অবকাশ আছে। এমনও হতে পারে যে, ফণী করালীবাবুকে ক্লোরোফর্ম করে পাশের ঘরে গিয়ে উইলটা পড়লে ; যখন দেখলে উইল তারই নামে, তখন ফিরে এসে করালীবাবুকে খুন করলে। সে যাই হোক, এই ব্যাপারে তার দশ-বারো মিনিট সময় লাগল।

'এখন কথা হচ্ছে, উইলখানা নিয়ে সে কি করবে ? যথাস্থানে রেখে দিলেও পারত, কিন্তু তাতে সুকুমারকে ভাল করে ফাঁসানো যায় না। অথচ নিজেকে বাঁচাতে হলে একজনকে ফাঁসানো চাই-ই।

'উইল আর ক্লোরোফর্মের শিশি সে সুকুমারের ঘরে লুকিয়ে রেখে এল। জানত, এত বড় কাণ্ডের পর সব ঘর খানাতল্লাস হবেই—তখন উইলও বেরুবে। এক ঢিলে দুই পাখি মরবে—সুকুমারের ফাঁসি হবে আর সে সম্পত্তি পাবে।

'উইলটা ট্রাঙ্কের তলায় রাখতে গিয়ে একটু শব্দ হয়েছিল—সেই শব্দে সত্যবতীর ঘুম ভেঙে যায়। তখন রাত্রি পৌনে বারোটা। সে ভাবলে, তার দাদা বায়স্কোপ দেখে ফিরে এল। কিন্তু বাস্তবিক সুকুমার তখন ফিরতে পারে না ; সে ফিরেছে—যখন ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে—

'আর কিছু বোঝাবার দরকার আছে কি ?'

'উইলে সাক্ষীর দস্তখত না থাকার কারণ কি ?'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'আমার মনে হয়, খাওয়া-দাওয়ার পর করালীবাবু উইলটা লিখেছিলেন, তাই আর রাত্রে কিছু করেননি। সম্ভবত তাঁর ইচ্ছে ছিল, পরদিন সকালে চাকর-বামুনকে দিয়ে সহি দস্তখত করিয়ে নেবেন।'

নীরবে ধূমপান করিয়া কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সত্যবতীর সঙ্গে তারপর আর দেখা হয়েছিল ? সে কি বললে ? খুব ধন্যবাদ দিলে তো ?'

বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'না। শুধু গলায় আঁচল দিয়ে পেন্নাম করলে।'

'চমৎকার মেয়ে কিন্তু—না ?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, তর্জনী তুলিয়া বলিল, 'তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, সে কথাটা মনে আছে তো ?'

'হ্যাঁ—কেন ?'

উত্তর না দিয়া ব্যোমকেশ পাশের ঘরে প্রবেশ করিল। মিনিট পাঁচেক পরে বিশেষ সাজ-সজ্জা করিয়া বাহির হইয়া আসিল। আমি বলিলাম, 'তোমার গোপনীয় মক্কেল তো ভারী শৌখিন লোক দেখছি, সিল্কের পাঞ্জাবি পরা ডিটেক্‌টিভ না হলে মন ওঠে না।'

এসেন্স-মাখানো রুমালে মুখ মুছিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। সত্য অন্বেষণ তো আর চাট্টিখানি

কথা নয়, অনেক তোড়জোড় দরকার।'

আমি বলিলাম, 'সত্য অন্বেষণ তো অনেকদিন থেকেই করছ, কই, এত সাজ-সজ্জা তো কখনো দেখিনি।'

ব্যোমকেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'সত্য অন্বেষণ আমি অল্পদিন থেকেই আরম্ভ করেছি।'

'তার মানে?'

'তার মানে অতি গভীর। চললুম।' মুচকি হাসিয়া ব্যোমকেশ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

'সত্য—ওঃ।' আমি লাফাইয়া গিয়া তাহার কাঁধ চাপিয়া ধরিলাম—'সত্যবতী! এ ক'দিন ধরে ঐ মহা সত্যটি অন্বেষণ করা হচ্ছে বুঝি? অ্যাঁ—ব্যোমকেশ! শেষে তোমার এই দশা! কবি তাহলে ঠিক বলেছেন—প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খবরদার! তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, অর্থাৎ সম্পর্কে তার ভাশুর। ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলবে না। এবার থেকে আমিও তোমায় দাদা বলে ডাকব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমাকে এত ভয় কেন?'

সে বলিল, 'লেখক জাতটাকেই আমি ঘোর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখি।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, 'বেশ, দাদাই হলুম তাহলে।' ব্যোমকেশের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলাম, 'যাও ভাই, চারটে বাজে, এবার জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়। আশীর্বাদ করি, সত্যের প্রতি যেন তোমার অবিচলিত ভক্তি থাকে।'

ব্যোমকেশ বাহির হইয়া গেল।

চোরাবালি

কুমার ত্রিদিবের বারম্বার সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ আর উপেক্ষা করিতে না পারিয়া একদিন পৌষের শীত-সুতীক্ষ্ণ প্রভাতে ব্যোমকেশ ও আমি তাঁহার জমিদারীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল দিন সাত-আট সেখানে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাইয়া, ফাঁকা জায়গার বিশুদ্ধ হাওয়ায় শরীর চাঙ্গা করিয়া লইয়া আবার কলিকাতায় ফিরিব।

আদর যত্নের অবধি ছিল না। প্রথম দিনটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় অপর্যাপ্ত আহার করিয়া ও কুমার ত্রিদিবের সঙ্গে গল্প করিয়াই কাটিয়া গেল। গল্পের মধ্যে অবশ্য খুড়া মহাশয় স্যর দিগিন্দ্রই বেশি স্থান জুড়িয়া রহিলেন।

রাত্রে আহারাদির পর শয়নঘরের দরজা পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়া কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'কাল ভোরেই শিকারে বেরুনো যাবে। সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি।'

ব্যোমকেশ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, 'এদিকে শিকার পাওয়া যায় নাকি?'

ত্রিদিব বলিলেন, 'যায়। তবে বাঘ-টাঘ নয়। আমার জমিদারীর সীমানায় একটা বড় জঙ্গল আছে, তাতে হরিণ, শুয়োর, খরগোশ পাওয়া যায়; ময়ূর, বনমুরগীও আছে। জঙ্গলটা চোরাবালির জমিদার হিমাংশু রায়ের সম্পত্তি। হিমাংশু আমার বন্ধু; আজ সকালে আমি তাকে চিঠি লিখে শিকার করবার অনুমতি আনিয়ে নিয়েছি। কোনো আপত্তি নেই তো?'

আমরা দু'জনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, 'আপত্তি!'

ব্যোমকেশ যোগ করিয়া দিল, 'তবে বাঘ নেই এই যা দুঃখের কথা।'

ত্রিদিব বলিলেন, 'একেবারে যে নেই তা বলতে পারব না; প্রতি বছরই এই সময় দু' একটা বাঘ ছিটকে এসে পড়ে—তবে বাঘের ভরসা করবেন না। আর বাঘ এলেও হিমাংশু আমাদের মারতে দেবে না, নিজেই ব্যাগ করবে।' কুমার হাসিতে লাগিলেন—'জমিদারী দেখবার ফুরসৎ পায় না, তার এম্‌নি শিকারের নেশা। দিন রাত হয় বন্দুকের ঘরে, নয় তো জঙ্গলে। যাকে বলে শিকার-পাগল। টিপও অসাধারণ—মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারে।'

ব্যোমকেশ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি নাম বললেন জমিদারীর—চোরাবালি? অদ্ভুত নাম তো।'

'হ্যাঁ, শুনছি ওখানে নাকি কোথায় খানিকটা চোরাবালি আছে, কিন্তু কোথায় আছে, কেউ জানে না। সেই থেকে চোরাবালি নামের উৎপত্তি।' হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'আর দেরি নয়, শুয়ে পড়ুন। নইলে সকালে উঠতে কষ্ট হবে।' বলিয়া একটা হাই তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

একই ঘরে পাশাপাশি খাটে আমাদের শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শরীর বেশ একটি আরামদায়ক ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল; সানন্দে বিছানায় লেপের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ঘুমাইয়া পড়িতেও বেশি দেরি হইল না। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম—চোরাবালিতে ডুবিয়া যাইতেছি; ব্যোমকেশ দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ক্রমে ক্রমে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া গেল; যতই বাহির হইবার জন্য হাঁকপাক করিতেছি ততই নিম্নাভিমুখে নামিয়া যাইতেছি। শেষে নাক পর্যন্ত

বালিতে তলাইয়া গেল। নিমেষের জন্য ভয়াবহ মৃত্যু-যন্ত্রণার স্বাদ পাইলাম। তারপর ঘুম ভাঙিয়া গেল।

দেখিলাম, লেপটা কখন অসাবধানে নাকের উপর পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ ঘর্মাক্ত কলেবরে বিছানায় বসিয়া রহিলাম, তারপর ঠাণ্ডা হইয়া আবার শয়ন করিলাম। চিন্তার সংসর্গ ঘুমের মধ্যেও কিরূপ বিচিত্রভাবে সঞ্চারিত হয় তাহা দেখিয়া হাসি পাইল।

ভোর হইতে না হইতে শিকারে বাহির হইবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কোনোমতে হাফ্-প্যান্ট ও গরম হোস্ চড়াইয়া লইয়া, কেক সহযোগে ফুটন্ত চা গলাধঃকরণ করিয়া মোটরে চড়িলাম। মোটরে তিনটা শট-গান্, অজস্র কার্তুজ ও এক বেতের বাক্স-ভরা আহার্য দ্রব্য আগে হইতেই রাখা হইয়াছিল। কুমার ত্রিদিব ও আমরা দুইজন পিছনের সীটে ঠাসাঠাসি হইয়া বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল। কুয়াশায় ঢাকা অস্পষ্ট শীতল ঊষালোকের ভিতর দিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিলাম।

কুমার ওভারকোটের কলারের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'সূর্যোদয়ের আগে না পৌঁছুলে ময়ূর বনমোরগ পাওয়া শক্ত হবে। এই সময় তারা গাছের ডগায় বসে থাকে—চমৎকার টার্গেট।'

ক্রমে দিনের আলো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পথের দু'ধারে সমতল ধানের ক্ষেত ; কোথাও পাকা ধান শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও সোনালী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে আকাশের পটমূলে পুরু কালির দাগের মত বনানী দেখা গেল ; আমাদের রাস্তা তাহার একটা কোণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কুমার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে ঐ বনেই শিকার করিতে চলিয়াছি।

মিনিট কুড়ি পরে আমাদের মোটর জঙ্গলের কিনারায় আসিয়া থামিল। আমরা পকেটে কার্তুজ ভরিয়া লইয়া বন্দুক ঘাড়ে মহা উৎসাহে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। কুমার ত্রিদিব একদিকে গেলেন। আমি আর ব্যোমকেশ এক সঙ্গে আর একদিকে চলিলাম। বন্দুক চালনায় আমার এই প্রথম হাতেখড়ি, তাই একলা যাইতে সাহস হইল না। ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বে স্থির হইল যে বেলা ন'টার সময় বনের পূর্ব সীমান্তে ফাঁকা জায়গায় তিনজনে আবার পুনর্মিলিত হইব। সেইখানেই প্রাতরাশের ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রকাণ্ড বনের মধ্যে বড় বড় গাছ—শাল, মহুয়া, সেগুন, শিমুল, দেওদার—মাথার উপর যেন চাঁদোয়া টানিয়া দিয়াছে ; তাহার মধ্যে অজস্র শিকার। নীচে হরিণ, খরগোশ—উপরে হরিয়াল, বনমোরগ, ময়ূর। প্রথম বন্দুক ধরিবার উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দ—আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষচূড়া হইতে মৃত পাখির পতন-শব্দ, ছর্‌রার আঘাতে উড্ডীয়মান কুক্কুটের আকাশে ডিগ্‌বাজী খাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি—একটা এপিক লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছে। কালিদাস সত্যই লিখিয়াছেন, বিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে—সঞ্চরমান লক্ষ্যকে বিদ্ধ করা—এরূপ বিনোদ আর কোথায় ? কিন্তু যাক্—পাখি শিকারের বহুল বর্ণনা করিয়া প্রবীণ বাঘ-শিকারীদের কাছে আর হাস্যাস্পদ হইব না।

আমাদের থলি ক্রমে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বেলাও অলক্ষিতে বাড়িয়া চলিয়াছিল। আমি একবার এক কার্তুজে—দশ নম্বর—সাতটা হরিয়াল মারিয়া আত্মশ্লাঘার সপ্তমস্বর্গে চড়িয়া গিয়াছিলাম—দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল আমার মত অব্যর্থ সন্ধান সেকালে অর্জুনেরও ছিল না। ব্যোমকেশ দুইবার মাত্র বন্দুক চালাইয়া—একবার একটা খরগোশ ও দ্বিতীয়বার একটা ময়ূর মারিয়াই—থামিয়া গিয়াছিল। তাহার চক্ষু বৃহত্তর শিকারের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। বনে হরিণ আছে ; তা ছাড়া বাঘ না হোক, ভাল্লুকের আশা সে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই যদিও মহুয়া গাছে তখনও ফল পাকে নাই তবু তাহার ভাল্লুক-লুব্ধ মন সেই দিকেই সতর্ক হইয়া ছিল।

কিন্তু বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, জঙ্গলের বাতাসের গুণে পেটের মধ্যে অগ্নিদেব ততই প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আমরা তখন জঙ্গলের পূর্বসীমা লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম।

কুমার ত্রিদিবের বন্দুকের আওয়াজ দূর হইতে বরাবরই শুনিতে পাইতেছিলাম, এখন দেখিলাম তিনিও পূর্বদিকে মোড় লইয়াছেন।

বনভূমির ঘন সন্নিবিষ্ট গাছ ক্রমে পাতলা হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে আমরা রৌদ্রোজ্জ্বল খোলা জায়গায় নীল আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখেই বালুকার একটা বিস্তীর্ণ বলয়—প্রায় সিকি মাইল চওড়া ; দৈর্ঘ্যে কতখানি তাহা আন্দাজ করা গেল না—বনের কোল ঘেঁষিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে পড়িয়া আছে। বালুর উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছে ; শীতের প্রভাতে দেখিতে খুব চমৎকার লাগিল।

এই বালু-বলয় জঙ্গলকে পূর্বদিকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। কোনো সুদূর অতীতে হয়তো ইহা একটি স্রোতস্বিনী ছিল, তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে—হয়তো ভূমিকম্পে—খাত উঁচু হইয়া জল শুকাইয়া গিয়া শুষ্ক বালুপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।

আমরা বালুর কিনারায় বসিয়া সিগারেট ধরাইলাম।

অল্পকাল পরেই কুমার ত্রিদিব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'দিব্যি ক্ষিদে পেয়েছে—না ? ঐ যে দুর্যোধন পৌঁছে গেছে—চলুন।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কুমার ত্রিদিবের ওড়িয়া বাবুর্চি মোটর হইতে বাস্কেট নামাইয়া ইতিমধ্যে হাজির হইয়াছিল। অনতিদূরে একটা গাছের তলায় ঘাসের উপর সাদা তোয়ালে বিছাইয়া খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখিতে ছিল। তাহাকে দেখিয়া কুলায় প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখির মত আমরা সেই দিকে ধাবিত হইলাম।

আহার করিতে করিতে, কে কি পাইয়াছে তাহার হিসাব হইল। দেখা গেল, আমার এক কার্তুজে সাতটা হরিয়াল সত্ত্বেও, কুমার বাহাদুরই জিতিয়া আছেন।

আকণ্ঠ আহার ও অনুপান হিসাবে থার্মোফ্লাস্ক্ হইতে গরম চা নিঃশেষ করিয়া আবার সিগারেট ধরানো গেল। কুমার ত্রিদিব গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া বসিলেন, সিগারেটে সুদীর্ঘ টান দিয়া অর্ধনিমীলিত চক্ষে কহিলেন, 'এই যে বালুবন্ধ দেখছেন এ থেকেই জমিদারীর নাম হয়েছে চোরাবালি। এদিকটা সব হিমাংশুর।' বলিয়া পূর্বদিক নির্দেশ করিয়া হাত নাড়িলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম। এই বালির ফালিটা লম্বায় কতখানি ? সমস্ত বনটাকেই ঘিরে আছে নাকি ?'

কুমার বলিলেন, 'না। মাইল তিনেক লম্বা হবে—তারপর আমার মাঠ আরম্ভ হয়েছে। এরই মধ্যে কোথায় এক জায়গায় খানিকটা চোরাবালি আছে—ঠিক কোন্‌খানটায় আছে কেউ জানে না, কিন্তু ভয়ে কোনো মানুষ বালির উপর দিয়ে হাঁটে না ; এমন কি গরু বাছুর শেয়াল কুকুর পর্যন্ত একে এড়িয়ে চলে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বালিতে কোথাও জল নেই বোধহয় ?'

কুমার অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িলেন, 'বলতে পারি না। শুনেছি ঐদিকে খানিকটা জায়গায় জল আছে, তাও সব সময় পাওয়া যায় না।' বলিয়া দক্ষিণ দিকে যেখানে বালুর রেখা বাঁকিয়া বনের আড়ালে অদৃশ্য হইয়াছে সেই দিকে আঙুল দেখাইলেন।

এই সময় হঠাৎ অতি নিকটে বনের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমরা তিনজনেই এখানে রহিয়াছি, তবে কে আওয়াজ করিল—বিস্মিতভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময় একজন বন্দুকধারী লোক একটা মৃত খরগোশ কান ধরিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরিধানে যোধপুরী ব্রীচেস, মাথায় বয়-স্কাউটের মত খাকি টুপি, চামড়ার কোমরবন্ধে সারি সারি কার্তুজ আঁটা রহিয়াছে।

কুমার ত্রিদিব উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'আরে হিমাংশু, এস এস।'

খরগোশ মাটিতে ফেলিয়া হিমাংশুবাবু আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন ; বলিলেন, 'অভ্যর্থনা আমারই করা উচিত এবং করছিও। বিশেষত এঁদের।' কুমার আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন,

তারপর হাসিয়া হিমাংশুবাবুকে বলিলেন, 'তুমি বুঝি আর লোভ সামলাতে পারলে না ? কিম্বা ভয় হল, পাছে তোমার সব বাঘ আমরা ব্যাগ করে ফেলি ?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আরে বল কেন ? মহা ফ্যাসাদে পড়া গেছে। আজই আমার ত্রিপুরায় যাবার কথা ছিল, সেখান থেকে শিকারের নেমন্তন্ন পেয়েছি। কিন্তু যাওয়া হল না, দেওয়ানজী আটকে দিলেন। বাবার আমলের লোক, একটু ছুতো পেলেই জুলুম জবরদস্তি করেন, কিছু বলতেও পারি না। তাই রাগ করে আজ সকালবেলা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। দুত্তোর ! কিছু না হোক দুটো বনপায়রাও তো মারা যাবে !'

কুমার বলিলেন, 'হায় হায়—কোথায় বাঘ ভাল্লুক আর কোথায় বনপায়রা ! দুঃখ হবার কথা বটে—কিন্তু যাওয়া হল না কেন ?'

হিমাংশুবাবু ইতিমধ্যে খাবার বাক্সটা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া তাহার ভিতর অনুসন্ধান করিতেছিলেন, প্রফুল্লমুখে কয়েকটা ডিম-সিদ্ধ ও কাটলেট বাহির করিয়া চর্বণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি এই অবসরে তাঁহার চেহারাখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। বয়স আমাদেরই সমান হইবে ; বেশ মজবুত পেশীপুষ্ট দেহ। মুখে একজোড়া উগ্র জার্মান গোঁফ মুখখানাকে অনাবশ্যক রকম হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে। চোখের দৃষ্টিতে পুরাতন বাঘ-শিকারীর নিষ্ঠুর সতর্কতা সর্বদাই উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। এক নজর দেখিলে মনে হয় লোকটা ভীষণ দুর্দান্ত। কিন্তু তবু বর্তমানে তাঁহাকে পরম পরিতৃপ্তির সহিত অর্ধমুদিত নেত্রে কাটলেট চিবাইতে দেখিয়া আমার মনে হইল, চেহারাটাই তাঁহার সত্যকার পরিচয় নহে ; বস্তুত লোকটি অত্যন্ত সাদাসিধা অনাড়ম্বর—মনের মধ্যে কোনো মারপ্যাঁচ নাই। সাংসারিক বিষয়ে হয়তো একটু অন্যমনস্ক ; নিদ্রায় জাগরণে নিরন্তর বাঘ ভাল্লুকের কথা চিন্তা করিয়া বোধ করি বুদ্ধিটাও সাংসারিক ব্যাপারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

কাটলেট ও ডিম্ব সমাপনান্তে চায়ের ফ্লাস্কে চুমুক দিয়া হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'কি বললে ? যাওয়া হল না কেন ? নেহাত বাজে কারণ ; কিন্তু দেওয়ানজী ভয়ানক ভাবিত হয়ে পড়েছেন, পুলিসকেও খবর দেওয়া হয়েছে। কাজেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমাকে এখানে ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে হবে।' তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

'হয়েছে কি ?'

'হয়েছে আমার মাথা। জান তো, বাবা মারা যাবার পর থেকে গত পাঁচ বছর ধরে প্রজাদের সঙ্গে অনবরত মামলা মোকদ্দমা চলছে। আদায় তসিলও ভাল হচ্ছে না। এই নিয়ে অষ্টপ্রহর অশান্তি লেগে আছে,—উকিল মোক্তার পরামর্শ, সে সব তো তুমি জানোই। যা হোক, আমমোক্তারনামা দিয়ে এক রকম নিশ্চিন্দি হওয়া গিছল, এমন সময় আবার এক নূতন ফ্যাচাং—। মাস-কয়েক আগে বেবির জন্য একটা মাস্টার রেখেছিলুম, সে হঠাৎ পরশু দিন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে ; যাবার সময় নাকি খানকয়েক পুরনো হিসেবের খাতা নিয়ে গেছে। তাই নিয়ে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড। থানা পুলিস হৈ হৈ রৈ রৈ বেধে গেছে। দেওয়ানজীর বিশ্বাস, এটা আমার মামলাবাজ প্রজাদের একটা মারাত্মক প্যাঁচ।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'লোকটা এখনো ধরা পড়েনি ?'

বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িয়া হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'না। এবং যতক্ষণ না ধরা পড়ছে—' হঠাৎ থামিয়া গিয়া কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আরে ! এটা এতক্ষণ আমার মাথাতেই ঢোকেনি। আপনি তো একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ, চোর-ডাকাতের সাক্ষাৎ যম ! (ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে বলিল, সত্যান্বেষী) তাহলে মশায়, দয়া করে যদি দু'একদিনের মধ্যে লোকটাকে খুঁজে বার করে দিতে পারেন—তাহলে আমার ত্রিপুরার শিকারটা ফস্কায় না। কাল-পরশুর মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলে—'

আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'চোরের মন পুঁই আদাড়ে। তুমি বুঝি কেবল শিকারের কথাই ভাবছ ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাকে কিছু করতে হবে না, পুলিসই খুঁজে বার করবে অখন। এসব জায়গা থেকে একেবারে লোপাট হয়ে যাওয়া সম্ভব নয় ; কলকাতা হলেও বা কথা ছিল।'

হিমাংশুবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'পুলিসের কর্ম নয়। এই তিন দিনে সমস্ত দেশটা তারা তোলপাড় করে ফেলেছে, কাছাকাছি যত রেলওয়ে স্টেশন আছে সব জায়গায় পাহারা বসিয়েছে। কিন্তু এখনো তো কিছু করতে পারলে না। দোহাই ব্যোমকেশবাবু, আপনি কেসটা হাতে নিন ; সামান্য ব্যাপার, আপনার দু'ঘণ্টাও সময় লাগবে না।'

ব্যোমকেশ তাঁহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'আচ্ছা, ঘটনাটা আগাগোড়া বলুন তো শুনি।'

হিমাংশুবাবু সাক্ষাতে হাত উল্টাইয়া বলিলেন, 'আমি কি সব জানি ছাই। তার সঙ্গে বোধহয় সাকুল্যে পাঁচ দিনও দেখা হয়নি। যা হোক, যতটুকু জানি বলছি শুনুন। কিছুদিন আগে—বোধহয় মাস দুই হবে—একদিন সকালবেলা একটা ন্যালাখ্যাপা গোছের ছোকরা আমার কাছে এসে হাজির হল। তাকে আগে কখনো দেখিনি, এ অঞ্চলের লোক বলে বোধ হল না। তার গায়ে একটা ছেঁড়া কামিজ, পায়ে ছেঁড়া চটিজুতা—রোগা বেঁটে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চেহারা ; কিন্তু কথাবার্তা শুনে মনে হয় শিক্ষিত। বললে, চাকরির অভাবে খেতে পাচ্ছে না, যা হোক একটা চাকরি দিতে হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি কাজ করতে পার ? পকেট থেকে বি-এস্‌সি'র ডিগ্রি বার করে দেখিয়ে বললে, যে কাজ দেবেন তাই করব। ছোকরার অবস্থা দেখে আমার একটু দয়া হল, কিন্তু কি কাজ দেব ? সেরেস্তায় তো একটা জায়গাও খালি নেই। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, আমার মেয়ে বেবির জন্যে একজন মাস্টার রাখবার কথা গিন্নি কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, বেবি এই সাতে পড়েছে, সুতরাং তার পড়াশুনোর দিকে এবার একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

'তাকে মাস্টার বাহাল করলুম, কারণ, অবস্থা যাই হোক, ছোকরা শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। বাড়িতেই বাইরের একটা ঘরে তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলুম। ছোকরা কৃতজ্ঞতায় একেবারে কেঁদে ফেললে। তখন কে ভেবেছিল যে—; নাম ? নাম যতদূর মনে পড়ছে, হরিনাথ চৌধুরী—কায়স্থ।

'যা হোক, সে বাড়িতেই রইল। কিন্তু আমার সঙ্গে বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হত না। বেবিকে দু'বেলা পড়াচ্ছে, এই পর্যন্তই জানতুম। হঠাৎ সেদিন শুনলুম, ছোকরা কাউকে না বলে কবে উধাও হয়েছে। উধাও হয়েছে, হয়েছে—আমার কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু মাঝ থেকে কতকগুলো বাজে পুরনো হিসেবের খাতা নিয়ে গিয়েই আমার সর্বনাশ করে গেল। এখন তাকে খুঁজে বার না করা পর্যন্ত আমার নিস্তার নেই।'

হিমাংশুবাবু নীরব হইলেন। ব্যোমকেশ ঘাসের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া শুনিতেছিল, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ছোকরা খেত কোথায় ?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আমার বাড়িতেই খেত। আদর যত্নের ত্রুটি ছিল না, বেবির মাস্টার বলে গিন্নি তাকে নিজে—'

এই সময় পিছনে একটা গাছের মাথায় ফট্ ফট্ শব্দ শুনিয়া আমরা মাথা তুলিয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড বন-মোরগ নানা বর্ণের পুচ্ছ ঝুলাইয়া এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যাইতেছে। গাছ দু'টার মধ্যে ব্যবধান ত্রিশ হাতের বেশি হইবে না। কিন্তু নিমিষের মধ্যে বন্দুকের ব্রীচ্ খুলিয়া টোটা ভরিয়া হিমাংশুবাবু ফায়ার করিলেন। পাখিটা অন্য গাছ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না, মধ্য পথেই ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িল।

আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, 'কি অদ্ভুত টিপ্!'

ব্যোমকেশ সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া বলিল, 'সত্যিই অসাধারণ।'

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'ও আর কি দেখলেন ? ওর চেয়েও ঢের বেশি আশ্চর্য বিদ্যে ওর পেটে আছে !—হিমাংশু, তোমার সেই শব্দভেদী প্যাঁচটা একবার দেখাও না।'

'আরে না না, এখন ওসব থাক। চল—আর একবার জঙ্গলে ঢোকা যাক—'

'সে হচ্ছে না—ওটা দেখাতেই হবে। নাও—চোখে রুমাল বাঁধো।'

হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'কি ছেলেমানুষী দেখুন দেখি। ও একটা বাজে ট্রীক্, আপনারা কতবার দেখেছেন—'

আমরাও কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলাম, বলিলাম, 'তা হোক, আপনাকে দেখাতে হবে।'

তখন হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা—দেখাচ্ছি। কিছুই নয়, চোখ বেঁধে কেবল শব্দ শুনে লক্ষ্যবেধ করা।' বন্দুকে একটা বুলেট ভরিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনিই রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে দিন—কিন্তু দেখবেন কান দুটো যেন খোলা থাকে।'

ব্যোমকেশ রুমাল দিয়া বেশ শক্ত করিয়া তাঁহার চোখ বাঁধিয়া দিল। তখন কুমার ত্রিদিব একটা চায়ের পেয়ালা লইয়া তাহার হাতলে খানিকটা সুতা বাঁধিলেন। তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া—যাহাতে হিমাংশুবাবু বুঝিতে না পারেন তিনি কোনদিকে গিয়াছেন—প্রায় পঁচিশ হাত দূরে একটা গাছের ডালে পেয়ালাটা ঝুলাইয়া দিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হিমাংশুবাবু, এবার শুনুন।'

কুমার ত্রিদিব চামচ দিয়া পেয়ালাটায় আঘাত করিলেন, ঠুং করিয়া শব্দ হইল।

হিমাংশুবাবু বন্দুক কোলে লইয়া যেদিক হইতে শব্দ আসিল সেই দিকে ঘুরিয়া বসিলেন। বন্দুকটা একবার তুলিলেন, তারপর বলিলেন, 'আর একবার বাজাও।'

কুমার ত্রিদিব আর একবার শব্দ করিয়া ক্ষিপ্রপদে সরিয়া আসিলেন।

শব্দের রেশ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবার পূর্বেই বন্দুকের আওয়াজ হইল ; দেখিলাম পেয়ালাটা চূর্ণ হইয়া উড়িয়া গিয়াছে, কেবল তাহার ডাঁটিটা ডাল হইতে ঝুলিতেছে।

মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পেশাদার বাজীকরের সাজানো নাট্যমঞ্চে এরকম খেলা দেখা যায় বটে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক রকম জুয়াচুরি আছে। এ একেবারে নির্জলা খাঁটি জিনিস।

হিমাংশুবাবু চোখের রুমাল খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'হয়েছে ?'

আমাদের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা শুনিয়া তিনি একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'ও কথা থাক, আপনাদের সুখ্যাতি আর বেশিক্ষণ শুনলে আমার গণ্ডদেশ ক্রমে বিলিতি বেগুনের মত লাল হয়ে উঠবে। এখন উঠুন। চলুন, ইতর প্রাণীদের বিরুদ্ধে আর একবার অভিযানে বেরুনো যাক।'

বেলা দেড়টার সময়, শিকার-শ্রান্ত চারিজন মোটরের কাছে ফিরিয়া আসিলাম। হরিনাথ মাস্টারের খাতা চুরির কাহিনী চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। হিমাংশুবাবুরও কি জানি কেন, ব্যোমকেশের সাহায্য লইবার আর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। বোধহয় এরূপ তুচ্ছ ব্যাপারে সদ্য পরিচিত একজন লোককে খাটাইয়া লইতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেছিলেন ; হয়তো তিনি ভাবিতেছিলেন যে পুলিসই শীঘ্র এই ব্যাপারে একটা সমাধান করিয়া ফেলিবে। সে যাহাই হোক, ব্যোমকেশই প্রসঙ্গটা পুনরুত্থাপন করিল, বলিল, 'আপনার হরিনাথ মাস্টারের গল্পটা ভাল করে শোনা হল না।'

হিমাংশুবাবু মোটরের ফুট-বোর্ডে পা তুলিয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি যা জানি সবই প্রায় বলেছি, আর বিশেষ কিছু জানবার আছে বলে মনে হয় না।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না। কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'চল হিমাংশু, তোমাকে মোটরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাই। তুমি বোধ হয় হেঁটেই এসেছ।'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। তবে রাস্তা দিয়ে ঘুর পড়ে বলে ওদিক দিয়ে মাঠে মাঠে এসেছি। ওদিক দিয়ে মাইলখানেক পড়ে।' বলিয়া দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'রাস্তা দিয়ে অন্তত মাইল দুই। চল, তোমাকে পৌঁছে দিই।' তারপর হাসিয়া বলিলেন, 'আর যদি নেমন্তন্ন কর তাহলে না হয় দুপুরের স্নানাহারটা তোমার বাড়িতেই

সারা যাবে। কি বলেন আপনারা ?'

আমাদের কোনো আপত্তিই ছিল না, আমোদ করিতে আসিয়াছি, গৃহস্বামী যেখানে লইয়া যাইবেন সেখানে যাইতেই রাজী ছিলাম। আমরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। হিমাংশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়—সে আর বলতে। তোমরা তো আজ আমারই অতিথি—এতক্ষণ এ প্রস্তাব না করাই আমার অন্যায় হয়েছে। যা হোক, উঠে পড়ুন গাড়িতে, আর দেরি নয় ; খাওয়া দাওয়া করে তবু একটু বিশ্রাম করতে পারেন। তারপর একেবারে বৈকালিক চা সেরে বাড়ি ফিরলেই হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এবং পারি যদি, ইতিমধ্যে আপনার পলাতক মাস্টারের একটা ঠিকানা করা যাবে।'

'হ্যাঁ, সেও একটা কথা বটে। আমার দেওয়ান হয়তো তার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলতে পারবেন।' বলিয়া তিনি নিজে অগ্রবর্তী হইয়া গাড়িতে উঠিলেন।

হিমাংশুবাবু খুবই সমাদর সহকারে আমাদের আহ্বান করিলেন বটে কিন্তু তবু আমার একটা ক্ষীণ সন্দেহ জাগিতে লাগিল যে তিনি মন খুলিয়া খুশি হইতে পারেন নাই।

দশ মিনিট পরে আমাদের গাড়ি তাঁহার প্রকাণ্ড উদ্যানের লোহার ফটক পার হইয়া প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ির শব্দে একটি প্রৌঢ় গোছের ব্যক্তি ভিতর হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন ; তাপর হিমাংশুবাবুকে গাড়ি হইতে নামিতে দেখিয়া তিনি খড়ম পায়ে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বিচলিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা হিমাংশু, যা ভেবেছিলুম তাই। হরিনাথ মাস্টার শুধু খাতাই চুরি করেনি, সঙ্গে সঙ্গে তহবিল থেকে ছ' হাজার টাকাও গেছে।'

বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল। শীতের অপরাহ্ণ ইহারই মধ্যে দিবালোকের উজ্জ্বলতা ম্লান করিয়া আনিয়াছিল।

'এবার ভট্টাচার্যি মশায়ের মুখে ব্যাপারটা শোনা যাক।' বলিয়া ব্যোমকেশ মোটা তাকিয়ার উপর কনুই ভর দিয়া বসিল।

গুরু ভোজনের পর বৈঠকখানায় গদির উপর বিস্তৃত ফরাসের শয্যায় এক একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া আমরা চারিজনে গড়াইতেছিলাম। হিমাংশুবাবুর কন্যা বেবি ব্যোমকেশের কোলের কাছে বসিয়া নিবিষ্ট মনে একটা পুতুলকে কাপড় পরাইতেছিল ; এই দুই ঘণ্টায় তাহাদের মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল। দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য মহাশয় একটু তফাতে ফরাসের উপর মেরুদণ্ড সিধা করিয়া পদ্মাসনে বসিয়াছিলেন—যেন একটু সুবিধা পাইলেই ধ্যানস্থ হইয়া পড়িবেন।

বস্তুত তাঁহাকে দেখিলে জপতপ ধ্যানধারণার কথাই বেশি করিয়া মনে হয়। আমি তো প্রথম দর্শনে তাঁহাকে জমিদার বাড়ির পুরোহিত বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। শীর্ণ গৌরবর্ণ দেহ, মুণ্ডিত মুখ, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে আধুলির মত একটি সিন্দূরের টিকা। মুখে তপঃকৃশ শান্তির ভাব। বৈষয়িকতার কোনো চিহ্নই সেখানে বিদ্যমান নাই। অথচ এক শিকার-পাগল সংসার-উদাসী জমিদারের বৃহৎ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা যে এই লোকটির তীক্ষ্ণ সতর্কতার উপর নির্ভর করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মান্য অতিথির সংবর্ধনা হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারীর সামান্য খুঁটিনাটি পর্যন্ত ইঁহারি কটাক্ষ ইঙ্গিতে সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

ব্যোমকেশের কথায় তিনি নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। ক্ষণকাল মুদিত চক্ষে নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হরিনাথ লোকটা আপাতদৃষ্টিতে এতই সাধারণ আর অকিঞ্চিৎকর যে তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনে হয় বলবার কিছুই নেই। ন্যালা-ক্যাব্‌লা গোছের একটা ছোঁড়া—অথচ তার পেটে যে এতখানি শয়তানী লুকোনো ছিল তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আমি মানুষ চিনতে বড় ভুল করি না, এক নজর দেখেই কে কেমন লোক বুঝতে পারি। কিন্তু সে-ছোঁড়া আমার চোখেও ধুলো দিয়েছে। একবারও সন্দেহ করিনি যে এটা তার ছদ্মবেশ, তার মনে কোনো

কু-অভিপ্রায় আছে।

'প্রথম যেদিন এল সেদিন তার জামাকাপড়ের দুরবস্থা দেখে আমি ভাণ্ডার থেকে দু'জোড়া কাপড় দুটো গেঞ্জি দুটো জামা আর দু'খানা কম্বল বার করে দিলুম। একখানা ঘর হিমাংশু বাবাজী তাকে আগেই দিয়েছিলেন—ঘরটাতে পুরনো খাতাপত্র থাকত, তা ছাড়া বিশেষ কোনো কাজে লাগত না ; সেই ঘরে তক্তপোশ ঢুকিয়ে তার শোবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। ঠিক হল, বেবি দু'বেলা ঐ ঘরেই পড়বে। তার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে আমি স্থির করেছিলুম, অনাদি সরকারের কিম্বা কোনো আমলার বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসবে। আমলারা সবাই কাছেপিঠেই থাকে। কিন্তু আমাদের মা-লক্ষ্মী সে প্রস্তাবে মত দিলেন না। তিনি অন্দর থেকে বলে পাঠালেন যে বেবির মাস্টার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করবে। সেই ব্যবস্থাই ধার্য হল।

'তারপর সে বেবিকে নিয়মিত পড়াতে লাগল। আমি দু'দিন তার পড়ানো লক্ষ্য করলুম—দেখলুম ভালই পড়াচ্ছে। তারপর আর তার দিকে মন দেবার সুযোগ পাইনি। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসত—ধর্ম সম্বন্ধে দু'চার কথা শুনতে চাইত। এমনিভাবে দু'মাস কেটে গেল।

'গত শনিবার আমি সন্ধ্যের পরই বাড়ি চলে যাই। আমি যে-বাড়িতে থাকি দেখেছেন বোধ হয়—ফটকে ঢুকতে ডান দিকে যে হলদে বাড়িখানা পড়ে সেইটে। কয়েক মাস হল আমি আমার স্ত্রীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি।—একলাই থাকি। স্বপাক খাই—আমার কোনো কষ্ট হয় না। শনিবার রাত্রে আমার পুরশ্চরণ করবার কথা ছিল—তাই সকাল সকাল গিয়ে উদ্যোগ আয়োজন করে পুজোয় বসলুম। উঠতে অনেক রাত হয়ে গেল।

'পরদিন সকালে এসে শুনলুম মাস্টারকে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমে বেলা বারোটা বেজে গেল তখনো মাস্টারের দেখা নেই। আমার সন্দেহ হল, তার ঘরে গিয়ে দেখলুম রাত্রে সে বিছানায় শোয়নি। তখন, যে আলমারিতে জমিদারীর পুরনো হিসেবের খাতা থাকে সেটা খুলে দেখলুম—গত চার বছরের হিসেবের খাতা নেই।

'গত চার বছর থেকে অনেক বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা চলছে ; সন্দেহ হল এ তাদেরই কারসাজি। জমিদারীর হিসেবের খাতা শত্রুপক্ষের হাতে পড়লে তাদের অনেক সুবিধা হয় ; বুঝলুম, হরিনাথ তাদেরই গুপ্তচর, মাস্টার সেজে জমিদারীর জরুরী দলিল চুরি করবার জন্যে এসে ঢুকেছিল।

'পুলিসে খবর পাঠালুম। কিন্তু তখনো জানি না যে সিন্দুক থেকে ছ' হাজার টাকাও লোপাট হয়েছে।'

এ পর্যন্ত বলিয়া দেওয়ানজী থামিলেন, তারপর ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'নানা কারণে কিছুদিন থেকে তহবিলে টাকার কিছু টানাটানি পড়েছে। সম্প্রতি মোকদ্দমার খরচ ইত্যাদি বাবদ কিছু টাকার দরকার হয়েছিল, তাই মহাজনের কাছ থেকে ছ' হাজার টাকা হাওলাত নিয়ে সিন্দুকে রাখা হয়েছিল। টাকাটা পুঁটলি বাঁধা অবস্থায় সিন্দুকের এক কোণে রাখা ছিল। ইতিমধ্যে অনেকবার সিন্দুক খুলেছি কিন্তু পুঁটলি খুলে দেখবার কথা একবারও মনে হয়নি। আজ সদর থেকে উকিল টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। পুঁটলি খুলে টাকা বার করতে গেলুম ; দেখি, নোটের তাড়ার বদলে কতকগুলো পুরনো খবরের কাগজ রয়েছে।'

দেওয়ান নীরব হইলেন।

শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশ আবার চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, 'তাহলে সিন্দুকের তালা ঠিকই আছে ? চাবি কার কাছে থাকে ?'

দেওয়ান বলিলেন, 'সিন্দুকের দুটো চাবি ; একটা আমার কাছে থাকে, আর একটা হিমাংশু বাবাজীর কাছে। আমার চাবি ঠিকই আছে, কিন্তু হিমাংশু বাবাজীর চাবিটা শুনছি ক'দিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

হিমাংশুবাবু শুষ্কমুখে বলিলেন, 'আমারই দোষ। চাবি আমার কোনোকালে ঠিক থাকে না,

কোথায় রাখি ভুলে যাই। এবারেও কয়েকদিন থেকে চাবিটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু সেজন্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইনি—ভেবেছিলুম কোথাও না কোথাও আছেই—'

'হুঁ'—ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, হাসিয়া বেবিকে নিজের কোলের উপর বসাইয়া বলিল, 'মা-লক্ষ্মীর মাস্টারটি জুটেছিল ভাল। কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই আশ্চর্য। ভাল করে খোঁজ করা হচ্ছে তো ?'

দেওয়ান কালীগতি বলিলেন, 'যতদূর সাধ্য ভাল করেই খোঁজ করানো হচ্ছে। পুলিস তো আছেই, তার ওপর আমিও লোক লাগিয়েছি। কিন্তু কোনো সংবাদই পাওয়া যাচ্ছে না।'

বেবি পুতুল রাখিয়া ব্যোমকেশের গলা জড়াইয়া ধরিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার মাস্টারমশাই কবে ফিরে আসবেন ?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'জানি না। বোধ হয় আর আসবেন না।'

বেবির চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল ; তাহা দেখিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি মাস্টারমশাইকে খুব ভালবাস—না ?'

বেবি ঘাড় নাড়িল—'হ্যাঁ—খুব ভালবাসি। তিনি আমাকে কত অঙ্ক শেখাতেন।—আচ্ছা, বল তো, সাত-নাম্ কত হয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কত ? চৌষট্টি ?'

বেবি বলিল, 'দ্যুৎ ! তুমি কিচ্ছু জান না। সাত-নাম্ তেষট্টি ! আচ্ছা, তুমি মা কালীর স্তব জানো ?'

ব্যোমকেশ হতাশভাবে বলিল, 'না। মা কালীর স্তবও কি তোমার মাস্টারমশায় শিখিয়েছিলেন নাকি ?'

'হ্যাঁ—শুনবে ?' বলিয়া বেবি সুর করিয়া আরম্ভ করিল—

'নমস্তে কালিকা দেবী করাল বদনী—'

কালীগতি ঈষদ্‌হাস্যে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'বেবি, তোমার কালীস্তব আমরা পরে শুনব, এখন তুমি বাগানে খেলা কর গে যাও।'

বেবি একটু ক্ষুণ্ণভাবে পুতুল লইয়া প্রস্থান করিল। কালীগতি আস্তে আস্তে বলিলেন, 'লোকটা মাস্টার হিসেবে মন্দ ছিল না—বেশ যত্ন করে পড়াত—অথচ—'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'চলুন, মাস্টারের ঘরটা একবার দেখে আসা যাক।'

বাড়ির সম্মুখস্থ লম্বা বারান্দার একপ্রান্তে একটি প্রকোষ্ঠ ; দ্বারে তালা লাগানো ছিল, দেওয়ানজী কষি হইতে চাবির গুচ্ছ বাহির করিয়া তালা খুলিয়া দিলেন। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ঘরটি আয়তনে ছোট। গোটা-দুই কাঠের কবাটযুক্ত আলমারি ; টেবিল চেয়ার তক্তপোশেই এমনভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে যে মনে হয় পা বাড়াইবার স্থান নাই। দ্বারের বিপরীত দিকে একটা ছোট জানালা ছিল, সেটা খুলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইল। তক্তপোশের উপর বিছানাটা অবিন্যস্তভাবে পাট করা রহিয়াছে ; টেবিলের উপর সূক্ষ্ম একপুরু ধূলার প্রলেপ পড়িয়াছে ; ঘরের অন্ধকার একটা কোণে দড়ি টাঙাইয়া কাপড়-চোপড় রাখিবার ব্যবস্থা। একটা আলমারির কবাট ঈষৎ উন্মুক্ত। দেওয়ালে লম্বিত একখানি কালীঘাটের পটের কালীমূর্তি হরিনাথ মাস্টারের কালীপ্রীতির পরিচয় দিতেছে।

ব্যোমকেশ তক্তপোশের নীচে উঁকি মারিয়া একজোড়া জুতা টানিয়া বাহির করিল, বলিল, 'তাই তো জুতোজোড়া যে একেবারে নূতন দেখছি। ও—আপনারাই কিনে দিয়েছিলেন বুঝি ?'

কালীগতি বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য ! আশ্চর্য !' জুতা রাখিয়া দিয়া ব্যোমকেশ দড়ির আলনাটার দিকে গেল। আলনায় কয়েকটা কাচা আকাচা কাপড় জামা ঝুলিতেছিল, সেগুলিকে তুলিয়া তুলিয়া দেখিল, তারপর আবার বলিল, 'ভারি আশ্চর্য !'

হিমাংশুবাবু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে ?'

জবাব দিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া ব্যোমকেশ থামিয়া গেল, তাহার দৃষ্টি ঘরের বিপরীত কোণে একটা কুলুঙ্গির উপর গিয়া পড়িল। সে দ্রুতপদে গিয়া কুলুঙ্গির ভিতর হইতে কি একটা তুলিয়া লইয়া জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সবিস্ময়ে বলিল, 'মাস্টার কি চশমা পরত ?'

কালীগতি বলিলেন, 'ওটা বলতে ভুল হয়ে গেছে—পরত বটে। চশমা কি ফেলে গেছে নাকি ?'

চশমার কাচের ভিতর দিয়া একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া সহাস্যে সেটা আমার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ—আশ্চর্য নয় ?'

কালীগতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আশ্চর্য বটে। কারণ যার চোখ খারাপ তার পক্ষে চশমা ফেলে যাওয়া অস্বাভাবিক। এর কি কারণ হতে পারে আপনার মনে হয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। হয়তো তার সত্যি চোখ খারাপ ছিল না, আপনাদের ঠকাবার জন্যে চশমা পরত।'

ইত্যবসরে আমি আর কুমার ত্রিদিব চশমাটা পরীক্ষা করিতেছিলাম। স্টীল ফ্রেমের নড়বড়ে বাহুযুক্ত চশমা, কাচ পুরু। কাচের ভিতর দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার অনুমান বোধহয় ঠিক নয়। চশমাটা অনেকদিনের ব্যবহারে পুরনো হয়ে গেছে আর কাচের শক্তিও খুব বেশি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার ভুলও হতে পারে। তবে, মাস্টার আর কারুর পুরনো চশমা নিয়ে এসেছিল এটাও তো সম্ভব। যা হোক, এবার আলমারিটা দেখা যাক।'

খোলা আলমারিটার কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে থাকে থাকে খেরো-বাঁধানো স্থূলকায় হিসাবের খাতা সাজানো রহিয়াছে—বোধহয় সবসুদ্ধ পঞ্চাশ-ষাটখানা। ব্যোমকেশ উপরের একটা খাতা নামাইয়া দু'হাতে ওজন করিয়া বলিল, 'বেশ ভারী আছে, সের চারেকের কম হবে না। প্রত্যেক খাতায় বুঝি এক বছরের হিসেব আছে ?'

কালীগতি বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ খাতার গোড়ার পাতা উল্টাইয়া দেখিল, পাঁচ বছর আগেকার খাতা, ইহার পর হইতে শেষ চার বছরের খাতা চুরি গিয়াছে। আরো কয়েকখানা খাতা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ হিসাব রাখিবার প্রণালী মোটামুটি চোখ বুলাইয়া দেখিল। প্রত্যেকটি খাতা দুই অংশে বিভক্ত—অর্থাৎ একাধারে জাব্‌দা ও পাকা খাতা। এক অংশে দৈনন্দিন খুচরা আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখিত হইয়াছে—অন্য অংশে মোট দৈনিক খরচ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণত জমিদারী খাতা এরূপভাবে লিখিত হয় না, কিন্তু এরূপ লেখার সুবিধা এই যে অল্প পরিশ্রমে জাব্‌দা ও পাকা খাতা মিলাইয়া দেখা যায়।

গোড়া হইতে ব্যোমকেশ ব্যাপারটাকে খুব হাল্কাভাবে লইয়াছিল। অতি সাধারণ গতানুগতিক চুরি ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোনো বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বোধহয় সে মনে করে নাই। কিন্তু ঘর পরীক্ষা শেষ করিয়া যখন সে বাহিরে আসিল তখন দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। ও দৃষ্টি আমি চিনি। কোথাও সে একটা গুরুতর কিছুর ইঙ্গিত পাইয়াছে ; হয়তো যত তুচ্ছ মনে করা গিয়াছিল ব্যাপার তত তুচ্ছ নয়। আমিও মনে মনে একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম।

ঘরের বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হিমাংশুবাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি এ ব্যাপারে তদন্ত করি আপনি চান ?'

মুহূর্তকালের জন্য হিমাংশুবাবু যেন একটু দ্বিধা করিলেন, তারপর বলিলেন, 'হ্যাঁ—চাই বই কি। এতগুলো টাকা, তার একটা কিনারা হওয়া তো দরকার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আমাদের দু'জনকে এখানে থাকতে হয়।'

হিমাংশুবাবু বলিল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। সে আর বেশি কথা কি—'

ব্যোমকেশ কুমার ত্রিদিবের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'কিন্তু কুমার বাহাদুর যদি অনুমতি দেন তবেই আমরা থাকতে পারি। আমরা ওঁর অতিথি।'

কুমার ত্রিদিব লজ্জায় পড়িলেন। আমাদের ছাড়িবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না কিন্তু ব্যোমকেশের ইচ্ছাটাও তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন। ব্যোমকেশ হিমাংশুবাবুর কাজ করিয়া কিছু উপার্জন করিতে চায় এরূপ সন্দেহও হয়তো তাঁহার মনে জাগিয়া থাকিবে। তাই তিনি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'বেশ তো, আপনারা থাকলে যদি হিমাংশুর উপকার হয়—'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তা বলতে পারি না। হয়তো কিছুই করে উঠতে পারবো না। হিমাংশুবাবু, আপনার যদি এ বিষয়ে আগ্রহ না থাকে তো বলুন—চক্ষুলজ্জা করবেন না। আমরা কুমার ত্রিদিবের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি, বিষয়চিন্তাও কলকাতায় ফেলে এসেছি। তাই, আপনি যদি আমাদের সাহায্য দরকার না মনে করেন, তাহলে আমি বরঞ্চ খুশিই হব।'

ব্যোমকেশ কুমার বাহাদুরের ভিত্তিহীন সন্দেহটার আভাস পাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি আরো লজ্জিত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'না না ব্যোমকেশবাবু, আপনারা থাকুন। যতদিন দরকার থাকুন। আপনারা থাকলে নিশ্চয় এ ব্যাপারে কিনারা করতে পারবেন। আমি রোজ এসে আপনাদের খবর নিয়ে যাব।'

হিমাংশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন করিলেন। আমাদের থাকাই স্থির হইয়া গেল।

অতঃপর চায়ের ডাক পড়িল ; আমরা বৈঠকখানায় ফিরিয়া গেলাম। প্রায় নীরবেই চা-পান সমাপ্ত হইল। কুমার ত্রিদিব ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'সাড়ে চারটে বাজে। হিমাংশু, আমি তাহলে আজ চলি। কাল আবার কোনো সময় আসব।' বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

কম্পাউন্ডের বাহিরে মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। আমি এবং ব্যোমকেশ কুমারের সঙ্গে ফটক পর্যন্ত গেলাম। কুমার বাহাদুর নিজের জমিদারীতে আমাদের জন্য অনেক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন—পুকুরে মাছ ধরা, খালে নৌ বিহার প্রভৃতি বহুবিধ ব্যসনের আয়োজন হইয়াছিল। সে সব ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় তিনি একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। মোটরের কাছে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কাজটায় আপনার কতদিন লাগবে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছুই এখনো বলতে পারছি না—আপনি আমাকে ঘোর অকৃতজ্ঞ মনে করছেন, মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর—আমোদ-আহ্লাদের অছিলায় একে উপেক্ষা করলে অন্যায় হবে।'

কুমার বাহাদুর সচকিত হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি ! কিন্তু আমার তো অতটা মনে হল না। অবশ্য অনেকগুলো টাকা গেছে—'

'টাকা যাওয়াটা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।'

'তবে ?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমার বিশ্বাস হরিনাথ মাস্টার বেঁচে নেই।'

আমরা দু'জনেই চমকিয়া উঠিলাম। কুমার বলিলেন, 'সে কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই মনে হচ্ছে। আশা করি একথা শোনবার পর আমাকে সহজে ক্ষমা করতে পারবেন।'

কুমার উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন, 'না না, ক্ষমার কোনো কথাই উঠছে না। আপনাকে ছেড়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। একটা লোক যদি খুন হয়ে থাকে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুনই হয়েছে এমন কথা আমি বলছি না। তবে সে বেঁচে নেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যা হোক, ও আলোচনা আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মুলতুবি থাক। আপনি কাল আসবেন তো ? তাহলে আমাদের সুটকেসগুলোও সঙ্গে করে আনবেন। আচ্ছা—আজ বেরিয়ে

পড়ুন—পৌঁছুতে অন্ধকার হয়ে যাবে।'

কুমারের মোটর বাহির হইয়া যাইবার পর আমরা বাড়ির দিকে ফিরিলাম। ফটক হইতে বাড়ির সদর প্রায় একশত গজ দূরে, মধ্যের বিস্তৃত ব্যবধান নানা জাতীয় ছোট বড় গাছপালায় পূর্ণ। মাঝে মাঝে লোহার বেঞ্চি পাতিয়া বিশ্রামের স্থান করা আছে।

দেওয়ানের ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ি দক্ষিণে রাখিয়া আমরা বাগানে প্রবেশ করিলাম। শীতকালের দীর্ঘ গোধূলি তখন নামিয়া আসিতেছে। অবসন্ন দিবার শেষ রক্তিম আভা পশ্চিমে জঙ্গলের মাথায় অলক্ষ্যে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ চিন্তিত নতমুখে পকেটে হাত পুরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছিল ; চিন্তার ধারা তাহার কোন্ সর্পিল পথে চলিয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। হরিনাথ মাস্টারের ঘরে সে এমন কি পাইয়াছে যাহা হইতে তাহার মৃত্যু অনুমান করা যাইতে পারে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমিও একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। নিঃঝুম পাড়াগাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মাঝখানে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, অন্তর হইতে যেন গ্রহণ করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু তবু কিছুই বলা যায় না—গূঢ়নক্র হ্রদের উপরিভাগ বেশ প্রসন্নই দেখায়। ব্যোমকেশের সঙ্গে অনেক রহস্যময় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া একটু বুঝিয়াছিলাম যে, মুখ দেখিয়া মানুষ চেনা যেমন কঠিন, কেবলমাত্র বহিরবয়ব দেখিয়া কোনো ঘটনার গুরুত্ব নির্ণয় করাও তেমনি দুঃসাধ্য।

একটা ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, তারপর ঊর্ধ্বমুখে চাহিয়া কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল, 'জুতো পরে না যাবার একটা কারণ থাকতে পারে, জুতো পরে হাঁটলে শব্দ হয়। যে লোক দুপুর রাত্রে চুপি চুপি করে পালাচ্ছে তার পক্ষে খালি পায়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে জামা পরবে না কেন ? চশমাটাও ফেলে যাবে কেন ?'

আমি বলিলাম, 'চশমা সম্বন্ধে তুমি বলতে পার, কিন্তু জামা পরেনি একথা জানলে কি করে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গুণে দেখলুম সবগুলো জামা রয়েছে। কাজেই প্রমাণ হল যে জামা পরে যায়নি।'

আমি বলিলাম, 'তার কতগুলো জামা ছিল তার হিসাব তুমি পেলে কোত্থেকে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেওয়ানজীর কাছ থেকে। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করনি, ভাণ্ডার থেকে মাস্টারকে দুটো গেঞ্জি আর দুটো জামা দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া সে নিজে একটা ছেঁড়া কামিজ পরে এসেছিল। সেগুলো সব আলনায় টাঙানো রয়েছে।'

আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, 'তাহলে তুমি অনুমান কর যে—'

ব্যোমকেশ পশ্চিম আকাশের ক্ষীণ শশিকলার দিকে তাকাইয়া ছিল, হঠাৎ সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওহে, দেখেছ ? সবে মাত্র শুক্লপক্ষ পড়েছে। সে রাত্রে কি তিথি ছিল বলতে পারো ?'

তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে কোনো দিনই সম্পর্ক নাই, নীরবে মাথা নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'বোধহয়—অমাবস্যা ছিল। না, চল পাঁজি দেখা যাক।' তাহার কণ্ঠস্বরে একটা নূতন উত্তেজনার আভাস পাইলাম।

চাঁদের দিকে চাহিয়া কবি এবং নবপ্রণয়ীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে জানিতাম ; কিন্তু ব্যোমকেশের মধ্যে কবিত্ব বা প্রেমের বাষ্পটুকু পর্যন্ত না থাকা সত্ত্বেও সে চাঁদ দেখিয়া এমন উতলা হইয়া উঠিল কেন বুঝিলাম না। যা হোক, তাহার ব্যবহার অধিকাংশ সময়েই বুঝিতে পারি না—ওটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাই সে যখন ফিরিয়া বাড়ির অভিমুখে চলিল, তখন আমিও নিঃশব্দে তাহার সহগামী হইলাম।

আমরা বাগানের যে অশংটায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, সেখান হইতে বাড়ির ব্যবধান পঞ্চাশ গজের বেশি হইবে না। সিধা যাইলে মাঝে কয়েকটা বড় বড় ঝাউয়ের ঝোপ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়। ঝাউয়ের ঝোপগুলা বাগানের কিয়দংশ ঘিরিয়া যেন পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

ঘাসের উপর দিয়া নিঃশব্দপদে আমরা প্রায় ঝাউ ঝোপের কাছে পৌঁছিয়াছি, এমন সময় ভিতর

হইতে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ পাইয়া আমাদের গতি আপনা হইতেই রুদ্ধ হইয়া গেল। ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া আমাকে নীরব থাকিবার সঙ্কেত জানাইতেছে।

কান্নার ভিতর হইতে একটা ভাঙা গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম—'বাবু, এই অনাদি সরকার আপনাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে—পুরনো চাকর বলে আমাকে দয়া করুন। মা-ঠাকরুণ ভুল বুঝেছেন। আমার মেয়ে অপরাধী—কিন্তু আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, ও মহাপাপ আমরা করিনি।'

কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দ নাই, তারপর হিমাংশুবাবুর কড়া কঠিন স্বর শুনা গেল—'ঠিক বলছ ? তোমরা মারোনি ?'

'ধর্ম জানেন হুজুর। আপনি মালিক—দেবতা, আপনার কাছে যদি মিথ্যে কথা বলি তবে যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়।'

আবার কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ নাই, তারপর হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'কিন্তু রাধাকে আর এখানে রাখা চলবে না। কালই তাকে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা কর। একথা যদি জানাজানি হয় তখন আমি আর দয়া করতে পারব না—এমনিতেই বাড়িতে অশান্তির শেষ নেই।'

অনাদি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে হুজুর, কালই তাকে আমি কাশী পাঠিয়ে দেব ; সেখানে তার এক মাসী থাকে—'

'বেশ—যদি খরচা চালাতে না পারো—'

ব্যোমকেশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। পা টিপিয়া টিপিয়া আমরা সরিয়া গেলাম।

মিনিট পনেরো পরে অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া কালীগতিবাবু একজন নিম্নতন কর্মচারীর সহিত কথা বলিতেছিলেন, বেবি তাঁহার হাত ধরিয়া আব্দারের সুরে কি একটা উপরোধ করিতেছিল—তাহার কথার খানিকটা শুনিতে পাইলাম, 'একবারটি ডাকো না—'

কালীগতি একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন, 'আঃ পাগ্‌লি—এখন নয়।'

বেবি অনুনয় করিয়া বলিল, 'না দেওয়ানদাদু, একবারটি ডাকো, ঐ ওঁরা শুনবেন।' বলিয়া আমাদের নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

কালীগতি আমাদের দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন, যে আমলাটি দাঁড়াইয়া ছিল তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া, প্রশান্ত হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাগানে বেড়াচ্ছিলেন বুঝি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ—বেবি কি বলছে ? কাকে ডাকতে হবে ?'

কালীগতি মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'ওর যত পাগলামি। এখন শেয়াল-ডাক ডাকতে হবে।'

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, 'সে কি রকম ?'

কালীগতি বেবির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'এখন কাজের সময়, এখন বিরক্ত করতে নেই। যাও—মা'র কাছে গিয়ে একটু পড়তে বসো গে।'

বেবি কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে তাঁহার আঙুল মুঠি করিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'না দাদু, একবারটি—'

অগত্যা কালীগতি চুপি চুপি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, 'তুমি যখন ঘুমুতে যাবে তখন শোনাব—কেমন ? এখন যাও লক্ষ্মী দিদি আমার।'

বেশি খুশি হইয়া বলিল, 'নিশ্চয় কিন্তু ! তা না হলে আমি ঘুমুব না।'

'আচ্ছা বেশ।'

বেবি প্রস্থান করিলে কালীগতি বলিলেন, 'এইমাত্র থানা থেকে খবর নিয়ে লোক ফিরে এল—মাস্টারের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি।'

'ও !' ব্যোমকেশ একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'অনাদি বলে কোনো কর্মচারী আছে কি ?'

'আছে। অনাদি জমিদার বাড়ির সরকার।' বলিয়া কালীগতি উৎসুক নেত্রে তাহার পানে চাহিলেন।

ব্যোমকেশ যেন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'তাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। সে কি আমলাদের পাড়াতেই থাকে?'

কালীগতি বলিলেন, 'না। সে বহুকালের পুরনো চাকর। বাড়ির পিছন দিকে আস্তাবলের লাগাও কতকগুলো ঘর আছে, সেই ঘরগুলো নিয়ে সে থাকে।'

'একলা থাকে?'

'না, তার এক বিধবা মেয়ে আর স্ত্রী আছে। মেয়েটি ক'দিন থেকে অসুখে ভুগছে; অনাদিকে বললুম কবিরাজ ডাকো, তা সে রাজী নয়। বললে, আপনি সেরে যাবে। —কেন বলুন দেখি?'

'না—কিছু নয়। কাছে পিঠে কারা থাকে তাই জানতে চাই। অন্যান্য আমলারা বুঝি হাতার বাইরে থাকে?'

'হ্যাঁ, তাদের জন্যে একটু দূরে বাসা তৈরি করিয়া দেওয়া হয়েছে—সবসুদ্ধ সাত-আট ঘর আমলা আছে। শহর থেকে যাতায়াত করলে সুবিধা হয় না, তাই কর্তার আমলেই তাদের জন্যে একটা পাড়া বসানো হয়েছিল।'

'শহর এখান থেকে কতদূর?'

'মাইল পাঁচেক হবে। সামনের রাস্তাটা সিধা পুব দিকে শহরে গিয়েছে।'

এই সময় হিমাংশুবাবু বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, 'আসুন ব্যোমকেশবাবু, আমার অস্ত্রাগার আপনাদের দেখাই।'

আমরা সাগ্রহে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, দেওয়ান আহ্নিক করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া খড়ম পায়ে অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন।

হিমাংশুবাবু একটি মাঝারি আয়তনের ঘরে আমাদের লইয়া গেলেন। ঘরের মধ্যস্থলে টেবিলের উপর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। দেখিলাম, মেঝেয় বাঘ ভাল্লুক ও হরিণের চামড়া বিছানো রহিয়াছে; দেওয়ালের ধারে ধারে কয়েকটি আলমারি সাজানো। হিমাংশুবাবু একে একে আলমারিগুলি খুলিয়া দেখাইলেন, নানাবিধ বন্দুক পিস্তল ও রাইফেলে আলমারিগুলি ঠাসা। এই হিংস্র অস্ত্রগুলির প্রতি লোকটির অদ্ভুত স্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। প্রত্যেকটির গুণাগুণ—কোনটির দ্বারা কবে কোন্ জন্তু বধ করিয়াছেন, কাহার পাল্লা কতখানি, কোন্ রাইফেলের গুলি বামদিকে ঈষৎ প্রক্ষিপ্ত হয়—এ সমস্ত তাঁহার নখদর্পণে। এই অস্ত্রগুলি তিনি প্রাণান্তেও কাহাকেও ছুঁইতে দেন না; পরিষ্কার করা, তেল মাখানো সবই নিজে করেন।

অস্ত্র দেখা শেষ হইলে আমরা সেই ঘরেই বসিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিলাম। নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইল। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একই মানুষকে এত বিভিন্ন রূপে দেখা যায় যে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা অভ্রান্ত ধারণা করিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু ক্বচিৎ স্বভাবছদ্মবেশী মানুষের মন অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আত্মপরিচয় দিয়া ফেলে। এই ঘরে বসিয়া আয়াসহীন অনাড়ম্বর আলোচনার ভিতর দিয়া হিমাংশুবাবুর চিত্তটিও যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধরা দিল। লোকটি যে অতিশয় সরল চিত্ত—মনটিও তাঁহার বন্দুকের গুলির মত একান্ত সিধা পথে চলে, এ বিষয়ে অন্তত আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না।

আমাদের সঞ্চরমান আলোচনা নানা পথ ঘুরিয়া কখন অজ্ঞাতসারে বিষয় সম্পত্তি পরিচালনা, দেশের জমিদারের অবস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল। হিমাংশুবাবু এই সূত্রে নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। প্রজাদের সঙ্গে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া নিয়ত সঙ্ঘর্ষে তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারীর আয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অথচ মামলা মোকদ্দমায় খরচের অন্ত নাই; ফলে, এই কয় বছরে ঋণের মাত্রা প্রায় লক্ষের কোঠায় ঠেকিয়াছে। নিজের বিষয় সম্পত্তির সম্বন্ধে এই সব গুহ্য কথা তিনি অকপটে প্রকাশ করিলেন। দেখিলাম, জমিদারী সংক্রান্ত অশান্তি তাঁহাকে বিষয় সম্পত্তির প্রতি আরো বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। বিপদের গুরুত্ব

অনভিজ্ঞতাবশত ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না, তাই মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট আতঙ্কে মন শঙ্কিত হইয়া উঠে ; তখন সেই শঙ্কাকে তাড়াইবার জন্য প্রিয় ব্যসন শিকারের প্রতি আরো আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়েন। তাঁহার মনের অবস্থা বর্তমানে এইরূপ।

কথায়বার্তায় রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। অতঃপর অন্দর হইতে আহারের ডাক আসিল। এই সময় অনাদি সরকারকে দেখিলাম ; সে আমাদের ডাকিতে আসিয়াছিল। লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশ হইবে ; অত্যন্ত শীর্ণ কোলকুঁজা চেহারা। গালের মাংস চুপসিয়া অভ্যন্তরের কোন অতল গহ্বরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, ঝাঁকড়া গোঁফ ওষ্ঠাধর লঙ্ঘন করিয়া চিবুকের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। চোখে একটা অস্বচ্ছন্দ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি—যেন কোনো দারুণ দুষ্কৃতি করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে সর্বদা সশঙ্ক হইয়া আছে।

ব্যোমকেশ তাহাকে একবার তীক্ষ্মদৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। তারপর আমরা তিনজনে তাহাকে অনুসরণ করিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিলাম।

আহারাদির পর একজন ভৃত্য আমাদের পথ দেখাইয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেল। ভৃত্যটির নাম ভুবন—সেই হিমাংশুবাবুর খাস বেয়ারা। শয়নকক্ষে ইজিচেয়ারে বসিয়া আমরা সিগারেট ধরাইলাম ; ভুবন মশারি ফেলিয়া, জলের কুঁজা হাতের কাছে রাখিয়া, ঘরের এটা ওটা ঝাড়িয়া ঝাড়ন স্কন্ধে প্রস্থান করিতেছিল, ব্যোমকেশ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি তো হরিনাথ মাস্টারকে ছ'মাস ধরে দেখেছ, সে কি সব সময় চশমা পরে থাকত ?'

আমরা যে চুরির তদন্ত করিতে আসিয়াছি তাহা ভুবন বোধকরি জানিত, তাই কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া সে উৎসুকভাবে বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টাই তো চশমা পরে থাকতেন। একদিন চশমা না পরে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। বিনা চশমায় তিনি এক-পা চলতে পারতেন না বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। আচ্ছা, তার জুতো ক'জোড়া ছিল বলতে পার ?'

ভুবন হাসিয়া বলিল, 'জুতো আবার ক'জোড়া থাকবে বাবু, এক জোড়া। তাও সরকার থেকে কিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে-জোড়া পরে তিনি এসেছিলেন সে তো এমন ছেঁড়া যে কুকুরেও খায় না। আমরা সেই দিনই জুতো টান মেরে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছিলুম।'

'বটে। আচ্ছা, মাস্টারের ঘরের দেয়ালে যে একটি মা কালীর ছবি টাঙানো রয়েছে সেটা কি মাস্টার সঙ্গে করে এনেছিল ?'

'আজ্ঞে না হুজুর, মাস্টারবাবু একটি খড়কে কাঠিও সঙ্গে করে আনেননি। ও ছবি দেওয়ানজীর কাছ থেকে মাস্টারবাবু একদিন এনে নিজের ঘরে টাঙিয়েছিলেন।'

'বুঝেছি।' ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।'

ভুবন জিজ্ঞাসা করিল, 'আর কিছু চাই না হুজুর ?'

'না। ভাল কথা, একটা কাজ করতে পার ? বাড়িতে পাঁজি আছে নিশ্চয়, একবার আনতে পার ?'

ভুবন বোধকরি মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। কিন্তু সে জমিদার বাড়ির লেফাফাদুরস্ত চাকর, সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল, 'এখনি কি চাই হুজুর ?'

'এখনি হলে ভাল হয়।'

'যে আজ্ঞে—এনে দিচ্ছি।'

ভুবন বাহির হইয়া গেল। আমরা নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলাম। পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল।

তারপর, হঠাৎ অতি সন্নিকটে একটানা বিকট একটা আর্তনাদ শুনিয়া আমরা ধড়মড় করিয়া সোজা হইয়া বসিলাম। কিন্তু তখনি বুঝিলাম, অনৈসর্গিক কিছু নয়—শেয়াল ডাকিতেছে। পাঁচ-ছয়টা শৃগাল একত্র হইয়া নিকটেরই কোনো স্থান হইতে সম্মিলিত ঊর্ধ্বস্বরে যাম ঘোষণা করিতেছে। এত নিকট হইতে শব্দটা আসিল বলিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াছিলাম।

এই সময় ভুবন পাঁজি হাতে ফিরিয়া আসিল। আমি বলিয়া উঠিলাম, 'ও কি হে ! বাড়ির এত কাছে শেয়াল ডাকছে ?'

শেয়ালের ডাক তখন থামিয়াছে, ভুবন হাসি চাপিয়া বলিল, 'আসল শেয়াল নয় হুজুর। বেবিদিদি আজ সন্ধ্যে থেকে বায়না ধরেছিলেন দেওয়ান ঠাকুরের কাছে শেয়াল ডাক শুনবেন। তাই তিনিই ডাকছেন।'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যেবেলা বেবি বলছিল বটে। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা তো দেওয়ানজীর ! একেবারে অবিকল শেয়ালের ডাক, কিছু বোঝবার জো নেই !'

ভুবন বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। দেওয়ান ঠাকুর চমৎকার জন্তু-জানোয়ারের ডাক ডাকতে পারেন।' বলিয়া পাঁজি ব্যোমকেশের পাশে টেবিলের উপর রাখিল।

ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যেন হঠাৎ পাথরের মূর্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে ; চোখের দৃষ্টি স্থির, সর্বাঙ্গের পেশী টান হইয়া শক্ত হইয়া আছে। আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, 'কি হে ?'

ব্যোমকেশের চমক ভাঙিল। চোখের সম্মুখ দিয়া হাতটা একবার চালাইয়া বলিল, 'কিছু না।—এই যে পাঁজি এনেছ ? বেশ, তুমি এখন যেতে পারো।'

ভুবন প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশ পাঁজিটা তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। খানিক পরে একটা পাতায় আসিয়া তাহার দৃষ্টি রুদ্ধ হইল। সেই পাতাটা পড়িয়া সে পাঁজি আমার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, 'এই দ্যাখ।'

মনে হইল, তাহার গলার স্বর উত্তেজনায় ঈষৎ কাঁপিয়া গেল।

পাঁজির নির্দিষ্ট পাতাটা পড়িলাম। দেখিলাম, যে-রাত্রে মাস্টার নিরুদ্দেশ হইয়া যায় সে-রাত্রিটা ছিল অমাবস্যা।

পরদিন সকাল সাতটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—তখনো সমস্ত বাড়িটা সুপ্ত। একজন ভৃত্য বারান্দা ঝাঁট দিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে শীতকালে বেলা আটটা সাড়ে আটটার পূর্বে কেহ শয্যা ত্যাগ করে না। ইহাই এ বাড়ির রেওয়াজ।

এই দেড় ঘণ্টা সময় কি করিয়া কাটানো যায় ? আকাশে একটু কুয়াশার আভাস ছিল ; সূর্যের আলো ভাল করিয়া ফুটে নাই। আমার মন উসখুস করিয়া উঠিল, বলিলাম, 'চল ব্যোমকেশ, এখন তো তোমার কোনো কাজ হবে না ; জঙ্গলে গিয়ে দু'চারটে পাখি মারা যাক। তারপর এদের ঘুম ভাঙতে ভাঙতে ফিরে আসা যাবে।'

প্রথম বন্দুক চালাইতে শিখিয়া আগ্রহের মাত্রা কিছু বেশি হইয়াছিল, মনে হইতেছিল যাহা পাই তাহারই দিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া দিই। বিশেষত কাল বন্দুক দু'টা কুমার বাহাদুর এখানেই রাখিয়া গিয়াছিলেন, টোটাও কোটের পকেটে কয়েকটা অবশিষ্ট ছিল।

ব্যোমকেশ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, 'চল।'

বন্দুক কাঁধে করিয়া বাহির হইলাম। যে চাকরটা ঝাঁট দিতেছিল তাহাকে প্রশ্ন করায় সে জঙ্গলের যাইবার রাস্তা দেখাইয়া দিল ; বলিল, এই পথে সিধা যাইলে বালির পাশ দিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিতে পারিব। আমরা সবুজ ঘাসে ভরা চারণভূমির উপর দিয়া চলিলাম।

কুয়াশার জন্য ঘাসে শিশির পড়ে নাই, জুতা ভিজিল না। চলিতে চলিতে দেখিলাম, সম্মুখে এক মাইল দূরে বনের গাছগুলি গাঢ় বর্ণে আঁকা রহিয়াছে, তাহার কোলের কাছে বালু-বেলা অর্ধচন্দ্রাকারে পড়িয়া আছে—দূর হইতে অস্পষ্ট আলোকে দেখিয়া মনে হয় যেন একটা লম্বা খাল জঙ্গলের পাদমূল বেষ্টন করিয়া পড়িয়া আছে। আমরা যেদিকে চলিয়াছিলাম সেইদিকে উহার দক্ষিণ প্রান্তটা ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া একটা অনুচ্চ পাড়ের কাছে আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে ;

অতঃপর দক্ষিণ দিকে আর বালি নাই।

মিনিট পনেরো হাঁটিবার পর পূর্বোক্ত পাড়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম ; দেখিলাম পাড় একটা নয়—দুইটা। কোনো কালে হয়তো বালুর দক্ষিণ দিকে জলরোধ করিবার জন্য একটা উঁচু মাটির বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল—বর্তমানে সেটা দ্বিধা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মাঝখানে আন্দাজ পনেরো হাত চওড়া একটা প্রণালী একদিকের সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের সহিত অপর দিকের বালুর চড়ার সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

আমরা নিকটতর ঢিবিটার উপর উঠিলাম। সম্মুখে নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মত একটা ক্ষীণ রেখা ঘাসের সীমানা নির্দেশ করিয়া দিতেছে—তাহার পরেই অনিশ্চিত ভয়সঙ্কুল বালুর এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঠিক কোনখানটায় সেই ভয়ানক চোরাবালি কে বলিতে পারে ?

বাঁধের উপর উঠিয়া যে বস্তুটি প্রথমে চোখে পড়িয়াছিল তাহার কথা এখনো বলি নাই। সেটি একটি অতি জীর্ণ কুঁড়ে ঘর। বাঁধের ভাঙ্গনের দক্ষিণ মুখটি আগুলিয়া এই কুটীর পড়ি পড়ি হইয়া কোনো মতে দাঁড়াইয়া আছে—উচ্চতা এত কম যে পাড়ের আড়াল হইতে তাহার মট্‌কা দেখা যায় না। ছিটা বেড়ার দেওয়াল, মাটি লেপিয়া জলবৃষ্টি নিবারণের চেষ্টা হইয়াছিল ; এখন প্রায় সর্বত্র মাটি খসিয়া গিয়া জীর্ণ উই-ধরা হাড়-পাঁজর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উপরের দু'চালা খড়ের চালটিও প্রায় উলঙ্গ—খড় পচিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, কোথায়ও বা গলিত অবস্থায় ঝুলিতেছে। বোধকরি চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ইহাতে কেহ বাস করে নাই।

বনের ধারে লোকালয় হইতে বহু দূরে এইরূপ নিঃসঙ্গ একটি কুটীর দেখিয়া আমাদের ভারি বিস্ময় বোধ হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই তো ! চল, ঘরটা দেখা যাক।'

আমরা ফিরিয়া বাঁধ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় আকাশে শাঁই শাঁই শব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া দেখি একঝাঁক বন-পায়রা মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রহস্তে বন্দুকে টোটা ভরিয়া ফায়ার করিল। আমার একটু দেরি হইয়া গেল, যখন বন্দুক তুলিলাম তখন পায়রার ঝাঁক পাল্লার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশের আওয়াজে একটা পায়রা নিম্নে বালুর উপর পড়িয়াছিল। সেটাকে উদ্ধার করিবার জন্য সম্মুখ দিয়া নামিতে গিয়া দেখিলাম সে-পথে নামা নিরাপদ নয়—পথ এত বেশি ঢালু যে পা হড়কাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'এত তাড়াতাড়ি কিসের হে ! মরা পাখি তো আর উড়ে পালাবে না। চল, ঐ দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক—কুঁড়ে ঘরটাও দেখা হবে।'

তখন যে পথে উঠিয়াছিলাম সেই পথে নামিয়া বাঁধের ভাঙ্গনের মুখে উপস্থিত হইলাম। কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি দ্বার আছে, যেটা দিয়া প্রবেশ করিলাম তাহার কবাট নাই, কিন্তু যেটা বালুর দিকে সেটাতে এখনো একটা বাখারির আগল লাগিয়া আছে।

ঘরের মধ্যে মনুষ্যের ব্যবহারের উপযোগী কিছুই নাই। মেঝে বোধহয় পূর্বে গোময়লিপ্ত ছিল, এখন তাহার উপর ঘাস গজাইয়াছে—পচা খড় চাল হইতে পড়িয়া স্থানটাকে আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ঘরটি চওড়ায় ছয় হাতের বেশি হইবে না কিন্তু দৈর্ঘ্যে দুই বাঁধের মধ্যবর্তী স্থানটা সমস্ত জুড়িয়া আছে। এদিক হইতে বালুর দিকে যাইতে হইলে ঘরের ভিতর দিয়া যাইতে হয় ; অন্য পথ নাই।

ব্যোমকেশ ঘরের অপরিষ্কার মেঝে ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'সম্প্রতি এ ঘরে কোনো মানুষ এসেছে। এখানে খড়গুলো চেপে গেছে—দেখেছ ? ঐ কোণে কিছু একটা টেনে সরিয়েছে। এ ঘরে মানুষের যাতায়াত আছে।'

মানুষের যাতায়াত থাকা কিছু বিচিত্র নয়। রাখাল বালকেরা এদিকে গরু চরাইতে আসে, হয়তো এই ঘরের মধ্যে খেলা করিয়া তাহারা দ্বিপ্রহর যাপন করে। 'তা হবে' বলিয়া আমি অন্য

দ্বারের আগল খুলিয়া বালির দিকে বাহির হইলাম। মনটা পাখির দিকেই পড়িয়া ছিল।

কিন্তু পাখি কোথায় ? পাখিটা সম্মুখেই পড়িয়াছিল, লক্ষ্য করিয়াছিলাম ; অথচ কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। আমি আশ্চর্য হইয়া ব্যোমকেশকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ওহে, তোমার পাখি কৈ ? সত্যিই কি মরা পাখি উড়ে গেল নাকি ?'

ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। সেও চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু পাখির একটা পালকও কোথাও দেখা গেল না। ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'তাই তো।'

'একটু এগিয়ে দেখা যাক, হয়তো আশেপাশে কোথাও আছে।' বলিয়া আমি বালুর উপর পদার্পণ করিতে যাইব, ব্যোমকেশের একটা হাত বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া আমার কোটের কলার চাপিয়া ধরিল।

'থামো—'

'কি হল ?' আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইলাম।

'বালির ওপর পা বাড়িও না।'

সদ্য-ছোঁড়া কার্তুজের শূন্য খোলটা ব্যোমকেশ পকেটেই রাখিয়াছিল, এখন সেটা বাহির করিল। সম্মুখদিকে প্রায় বিশ হাত দূরে বালুর উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'ভাল করে লক্ষ্য কর।' চাপা উত্তেজনায় তাহার স্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

লাল রঙের খোলটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল, সেইদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। কি সর্বনাশ !

কার্তুজ খোলের ভারী দিকটা নামিয়া গিয়া সেটা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তারপর নিঃশব্দে বালুর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই চোরাবালি ! এবং ইহাতেই আমি গবেটের মত এখনি পদার্পণ করিতে যাইতেছিলাম। ব্যোমকেশ বাধা না দিলে আজ আমার কি হইত ভাবিয়া শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

ব্যোমকেশের চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার ওষ্ঠাধর বিভক্ত হইয়া দাঁতগুলা ক্ষণকালের জন্য দেখা গেল। সে বলিল, 'দেখলে ! উঃ, কি ভয়ানক ! কি ভয়ানক !'

আমি কম্পিতস্বরে বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

আমার কথা যেন শুনিতেই পায় নাই এমনিভাবে সে কেবল অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, 'কি ভয়ানক। কি ভয়ানক !' দেখিলাম, তাহার মুখের রং ফ্যাকাসে হইয়া গেলেও চোখের দৃষ্টি ও চোয়ালের হাড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

অতঃপর ব্যোমকেশ কুটীরের চাল হইতে কয়েক টুকরা বাখারি ভাঙিয়া আনিল, একটি একটি করিয়া সেগুলি বালুর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেখা গেল, ঘাসের সীমানার প্রায় দশ হাত দূর হইতে চোরাবালি আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে তাহা জানা গেল না, কারণ যতদূর পর্যন্ত বাখারি ফেলা হইল সব বাখারিই ডুবিয়া গেল। পুরাতন বাঁধের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাহুবেষ্টন এই চোরাবালিকেই ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতীত যুগের কোনো সদাশয় জমিদার হয়তো প্রজাদের জীবন রক্ষার্থেই এই বাঁধ করাইয়াছিলেন, তারপর কালক্রমে বাঁধও ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যও লোকে ভুলিয়া গিয়াছে।

চোরাবালির পরিধি নির্ণয় যথাসম্ভব শেষ করিয়া আমরা আবার কুটীরের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, আমরা চোরাবালির সন্ধান পেয়েছি, একথা যেন ঘুণাক্ষরে কেউ জানতে না পারে। বুঝলে ?'

আমি ঘাড় নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তখন কুটীরের সম্মুখে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'বাঃ ! ঘরটি কি চমৎকার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখেছ ? পিছনে পনের হাত দূরে চোরাবালি, সামনে বিশ হাত দূরে গভীর বন—দু'ধারে বাঁধ। কে এটি তৈরি করেছিল জানতে ইচ্ছে করে।'

কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল। আমি বনের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, গাছের ছায়ার নীচে দিয়া একজন হাফ্-প্যান্ট পরিহিত লোক, কাঁধে বন্দুক লইয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের

দিকে আসিতেছে। গাছের ছায়ার বাহিরে আসিলে দেখিলাম, হিমাংশুবাবু।

হিমাংশুবাবু দূর হইতে হাঁকিয়া বলিলেন, 'আপনারা কোথায় ছিলেন ? আমি জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

ব্যোমকেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'অজিত, মনে থাকে যেন—চোরাবালি সম্বন্ধে কোনো কথা নয়।' তারপর গলা চড়াইয়া বলিল, 'অজিতের পাল্লায় পড়ে পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়েছিলুম। পাখিরা অবশ্য বেশ অক্ষত শরীরে আছে, কিন্তু আর্মস্ অ্যাক্টের বিরুদ্ধে অজিত যেরকম অভিযান আরম্ভ করেছে, শীগ্‌গির পুলিসের হাতে পড়বে।'

আমি বলিলাম, 'এবার কলকাতায় গিয়েই একটা বন্দুকের লাইসেন্স কিনব।'

হিমাংশুবাবু আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বন্দুক নামাইয়া বলিলেন, 'তারপর, কিছু পেলেন ?'

'কিছু না। আপনি একেবারে রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছেন যে!' বলিয়া ব্যোমকেশ তাঁহার অস্ত্রটির দিকে তাকাইল।

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ—সকালে উঠেই শুনলুম জঙ্গলে নাকি বাঘের ডাক শোনা গেছে। তাই তাড়াতাড়ি রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম ; চাকরটা বললে আপনারা এদিকে এসেছেন—একটু ভাবনা হল। কারণ, হঠাৎ যদি বাঘের মুখে পড়েন তাহলে আপনাদের পাখিমারা বন্দুক আর দশ নম্বরের ছর্‌রা কোনো কাজেই লাগবে না।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাঘ এসেছে কার মুখে শুনলেন ?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'ঠিক যে এসেছেই একথা জোর করে কেউ বলতে পারছে না। আমার গয়লাটা বলছিল যে গরুগুলো সমস্ত রাত খোঁয়াড়ে ছটফট করেছে, তাই তার আন্দাজ যে হয়তো তারা বাঘের গন্ধ পেয়েছে। তা ছাড়া, দেওয়ানজী বলছিলেন তিনি নাকি অনেক রাত্রে বাঘের ডাকের মত একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। যা হোক, চলুন এবার ফেরা যাক। এখনো চা খাওয়া হয়নি।'

হাতের ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সাড়ে আটটা। চলুন। আচ্ছা, এই পোড়ো ঘরটা কার ? এরকম নির্জন স্থানে কে এই ঘর তৈরি করেছিল ? কেনই বা করেছিল ? কিছু জানেন কি ?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'জানি বৈকি। চলুন, যেতে যেতে বলছি।'

তিনজনে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। হিমাংশুবাবু চলিতে চলিতে বলিলেন, 'বছর চার-পাঁচ আগে—ঠিক ক'বছর হল বলতে পারছি না, তবে বাবা মারা যাবার পর—হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে এক বিরাট তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন। ভয়ঙ্কর চেহারা, মাথায় জটার মত চুল, অজস্র গোঁফদাড়ি, পাঁচ হাত লম্বা এক জোয়ান। পরনে স্রেফ একটি নেংটি, চোখ দুটো লাল টক্‌টক্ করছে—আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে 'তুইতোকারি' করে বললেন যে তিনি কিছুদিন আমার আশ্রয়ে থেকে সাধনা করতে চান।

'সাধু-সন্ন্যাসীর উপর আমার বিশেষ ভক্তি নেই—ও সব বুজরুকি আমার সহ্য হয় না ; বিশেষত ভেকধারীদের ঔদ্ধত্য আর স্পর্ধা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে দূর করে দিচ্ছিলুম ; কিন্তু দেওয়ানজী মাঝ থেকে বাধা দিলেন। তাঁর বোধহয় তান্ত্রিক ঠাকুরকে দেখেই খুব ভক্তি হয়েছিল। তিনি আমাকে অনেক করে বোঝাতে লাগলেন, প্রত্যবায় অভিসম্পাত প্রভৃতির ভয়ও দেখালেন। কিন্তু আমি ঐ উলঙ্গ লোকটাকে বাড়িতে থাকতে দিতে কিছুতেই রাজী হলুম না। তখন দেওয়ানজী তান্ত্রিক ঠাকুরের সঙ্গে মোকাবিলা করে ঠিক করলেন যে তিনি আমার জমিদারীর মধ্যে কোথাও কুঁড়ে বেঁধে থাকবেন—আর ভাণ্ডার থেকে তাঁর নিয়মিত সিধে দেওয়া হবে। দেওয়ানজীর আগ্রহ দেখে আমি অগত্যা রাজী হলুম।

'বাবাজী তখন এই জায়গাটি পছন্দ করে কুঁড়ে বাঁধলেন। মাস ছয়েক এখানে ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তবে দেওয়ানজী প্রায়ই যাতায়াত করতেন। শেষ

পর্যন্ত তাঁর ভক্তি এতই বেড়ে গিয়েছিল যে শুনতে পাই তিনি বাবাজীর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছিলেন। অবশ্য উনি আগেও শাক্তই ছিলেন কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না।

'যা হোক, বাবাজী একদিন হঠাৎ সরে পড়লেন। সেই থেকে ও ঘরটা খালি পড়ে আছে।'

গল্প শুনিতে শুনিতে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম। চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল। বারান্দায় টেবিল পাতিয়া তাহার উপরে চা, কচুরি, পাখির মাংসের কাটলেট, ডিমের অমলেট ইত্যাদি বহুবিধ লোভনীয় আহার্য ভুবন খানসামা সাজাইয়া রাখিতেছিল। আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে চেয়ার টানিয়া লইয়া উক্ত আহার্য বস্তুর সৎকারে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৎকার কার্য অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় বারান্দার সম্মুখে মোটর আসিয়া থামিল। কুমার ত্রিদিব অবতরণ করিলেন।

মোটরের পশ্চাতে আমাদের সুটকেট কয়টা বাঁধা ছিল, সেগুলা নামাইবার হুকুম দিয়া কুমার আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন ; ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কদ্দূর ?'

ব্যোমকেশ অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'বেশি দূর নয়। তবে দু'এক দিনের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে আশা করি। আজ একবার শহরে যাওয়া দরকার। পুলিসের কাছ থেকে কিছু খোঁজ খবর নিতে হবে।'

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'বেশ তো, চলুন আমার গাড়িতে ঘুরে আসা যাক। এখন বেরুলে বেলা বারোটার মধ্যে ফেরা যাবে।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'আমার একটু সময় লাগবে ; সন্ধ্যের আগে ফেরা হবে না। একেবারে খাওয়া-দাওয়া করে বেরুলে বোধহয় ভাল হয়।'

কুমার বলিলেন, 'সে কথাও মন্দ নয়। হিমাংশু, তুমি চল না হে, খুব খানিক হৈ হৈ করে আসা যাক। অনেকদিন শহরে যাওয়া হয়নি।'

হিমাংশুবাবু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'না ভাই, আমার আজ আর যাওয়ার সুবিধা হবে না। একটু কাজ—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আপনার গিয়ে কাজ নেই। অজিতও থাকুক। আমরা দু'জনে গেলেই যথেষ্ট হবে।' বলিয়া কুমারের দিকে তাকাইল। তাহার চাহনিতে বোধহয় কোনো ইশারা ছিল, কারণ কুমার বাহাদুর পুনরায় কি একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন।

বেলা এগারোটার সময় ব্যোমকেশ কুমারের গাড়িতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার আগে আমাকে বলিয়া গেল, 'চোখ দুটো বেশ ভাল করে খুলে রেখো। আমার অবর্তমানে যদি কিছু ঘটে লক্ষ্য করো।'

তাহাদের গাড়ি ফটক পার হইয়া যাইবার পর হিমাংশুবাবুর মুখ দেখিয়া বোধ হইল তিনি যেন পরিত্রাণের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা তাঁহার বাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হওয়াতে তিনি যে সুখী হইতে পারেন নাই, এই সন্দেহ আবার আমাকে পীড়া দিতে লাগিল।

দেওয়ান কালীগতিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি ; আমাদের মুখের ভাব হইতে মনের কথা আন্দাজ করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া বারান্দায় চেয়ারে উপবেশন করিয়া নানা বিষয়ে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। হিমাংশুবাবুও কথাবার্তায় যোগ দিলেন। ব্যোমকেশ সম্বন্ধেই আলোচনা বেশি হইল। ব্যোমকেশের কীর্তিকলাপ প্রচার করিতে আমি কোনদিনই পশ্চাৎপদ নই। সে যে কতবড় ডিটেক্টিভ তাহা বহু উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিলাম। তাহার সাহায্য পাওয়া যে কতখানি ভাগ্যের কথা সে ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িলাম না। শেষে বলিলাম, 'হরিনাথ মাস্টার যে বেঁচে নেই একথা আর কেউ এত শীগ্‌গির বার করতে পারত না।'

দু'জনেই চমকিয়া উঠিলেন—'বেঁচে নেই !'

কথাটা বলিয়া ফেলা উচিত হইল কিনা বুঝিতে পারিলাম না ; ব্যোমকেশ অবশ্য বারণ করে নাই, তবু মনে হইল, না বলিলেই বোধহয় ভাল হইত। আমি নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া

রহস্যপূর্ণ শিরঃসঞ্চালন করিলাম, বলিলাম, 'যথাসময় সব কথা জানতে পারবেন।'

অতঃপর বারোটা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমরা উঠিয়া পড়িলাম। কালীগতি ও হিমাংশুবাবু আমার অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া আর কোনো প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু হরিনাথের মৃত্যুসংবাদ যে তাঁহাদের দু'জনকেই বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না।

দুপুরবেলাটা বোধ করি নিঃসঙ্গভাবে ঘরে বসিয়াই কাটাইতে হইত; কারণ হিমাংশুবাবু আহারের পর একটা জরুরী কাজের উল্লেখ করিয়া অন্দরমহলে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু বেবি আসিয়া আমাকে সঙ্গদান করিল। সে আসিয়া প্রথমেই ব্যোমকেশের খোঁজ খবর লইল এবং সকালবেলা মেনির সন্তান প্রসবের জন্য আসিতে পারে নাই বলিয়া যথোচিত দুঃখ জ্ঞাপন করিল। তারপর আমাকে নানাপ্রকার বিচিত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ও নিজেদের পারিবারিক বহু গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া গল্প জমাইয়া তুলিল।

হঠাৎ একসময় বেবি বলিল, 'মা আজ তিনদিন ভাত খাননি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাঁর অসুখ করেছে বুঝি ?'

মাথা নাড়িয়া গম্ভীরমুখে বেবি বলিল, 'না, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।'

এবিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা ভদ্রোচিত হইবে কিনা ভাবিতেছি এমন সময় খোলা জানালা দিয়া দেখিলাম, একটা সবুজ রঙের সিডান বডির মোটর গ্যারাজের দিক হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। গাড়িখানি সাবধানে ফটক পার হইয়া শহরের দিকে মোড় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিলাম, চালক স্বয়ং হিমাংশুবাবু। গাড়ির অভ্যন্তরে কেহ আছে কিনা দেখা গেল না।

বেবি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'আমাদের নতুন গাড়ি।'

ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। হিমাংশুবাবু ঠিক যেন চোরের মত মোটর লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কোথায় গেলেন ? সঙ্গে কেহ ছিল কি ? তিনি গোড়া হইতেই আমাদের কাছে একটা কিছু লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আগমন তাঁহার কোনো কাজে বাধা দিয়াছে; তাই তিনি ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন অথচ বাহিরে কিছু করিতে পারিতেছেন না—এই ধারণা ক্রমেই আমার মনে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তবে কি তিনি হরিনাথের অন্তর্ধানের গূঢ় রহস্য কিছু জানেন ? তিনি কি জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আড়াল করিবার চেষ্টা করিতেছেন ? ভীত-দৃষ্টি রুগ্নকায় অনাদি সরকারের কথা মনে পড়িল। সে কাল প্রভুর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছিল কি জন্য ? 'ও মহাপাপ করিনি'—কোন্ মহাপাপ হইতে নিজেকে ক্ষালন করিবার চেষ্টা করিতেছিল !

বেবি আজ আবার একটা নূতন খবর দিল—হিমাংশুবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলিতেছে। ঝগড়া এতদূর গড়াইয়াছে যে স্ত্রী তিনদিন আহার করেন নাই। কি লইয়া ঝগড়া ? হরিনাথ মাস্টার কি এই কলহ-রহস্যের অন্তরালে লুকাইয়া আছে !

'তুমি ছবি আঁকতে জানো ?' বেবির প্রশ্নে চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল।

অন্যমনস্কভাবে বলিলাম, 'জানি।'

ঝামর চুল উড়াইয়া বেবি ছুটিয়া গেল। কোথায় গেল ভাবিতেছি এমন সময় সে একটা খাতা ও পেন্সিল লইয়া ফিরিয়া আসিল। খাতা ও পেন্সিল আমার হাতে দিয়া বলিল, 'একটা ছবি এঁকে দাও না। খু—ব ভাল ছবি।'

খাতাটি বেবির অঙ্কের খাতা। তাহার প্রথম পাতায় পাকা হাতে লেখা রহিয়াছে, শ্রীমতী বেবিরাণী দেবী।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'একি তোমার মাস্টারমশায়ের হাতের লেখা ?'

বেবি বলিল, 'হ্যাঁ।'

খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বেশির ভাগই উচ্চ গণিতের অঙ্ক; বেবির হাতে লেখা যোগ, বিয়োগ খুব অল্পই আছে। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম 'এসব অঙ্ক কে করেছে ?'

বেবি বলিল, 'মাস্টারমশাই। তিনি খালি আমার খাতায় অঙ্ক করতেন।'

দেখিলাম, মিথ্যা নয়। খাতার অধিকাংশ পাতাই মাস্টারের কঠিন দীর্ঘ অঙ্কের অক্ষরে পূর্ণ হইয়া আছে। কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একটি ছোট মেয়েকে গণিতের গোড়ার কথা শিখাইতে গিয়া কলেজের শিক্ষিতব্য উচ্চ গণিতের অবতারণার সার্থকতা কি ?

খাতার পাতাগুলা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে একস্থানে দৃষ্টি পড়িল—একটা পাতার আধখানা কাগজ কে ছিঁড়িয়া লইয়াছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে মনে হইল যেন পেন্সিল দিয়া খাতার উপর কিছু লিখিয়া পরে কাগজটা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ, খাতার পরের পৃষ্ঠায় পেন্সিলের চাপা-দাগ অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। আলোর সম্মুখে ধরিয়া নখচিহ্নের মত দাগগুলি পড়িবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু পড়িতে পারিলাম না।

বেবি অধীরভাবে বলিল, 'ও কি করছ। ছবি এঁকে দেখাও না !'

ছেলেবেলায় যখন ইস্কুলে পড়িতাম তখন এই ধরনের বর্ণহীন চিহ্ন কাগজের উপর ফুটাইয়া তুলিবার কৌশল শিখিয়াছিলাম, এখন তাহা মনে পড়িয়া গেল।

বেবিকে বলিলাম, 'একটা ম্যাজিক দেখবে ?'

বেবি খুব উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'হ্যাঁ—দেখব।'

তখন খাতা হইতে এক টুকরা কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া তাহার উপর পেন্সিলের শিষ ঘষিতে লাগিলাম ; কাগজটা যখন কালো হইয়া গেল তখন তাহা সন্তর্পণে সেই অদৃশ্য লেখার উপর বুলাইতে লাগিলাম। ফটোগ্রাফের নেগেটিভ্ যেমন রাসায়নিক জলে ধৌত করিতে করিতে তাহার ভিতর হইতে ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে, আমার মৃদু ঘর্ষণের ফলেও তেমনি কাগজের উপর ধীরে ধীরে অক্ষর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সবগুলি অক্ষর ফুটিল না, কেবল পেন্সিলের চাপে যে অক্ষরগুলি কাগজের উপর গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছিল সেইগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ওঁ হ্রীং...ক্লীং...

রাত্রি ১১...৫...অম...পড়িবে।

অসম্পূর্ণ দুর্বোধ অক্ষরগুলার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ওঁ হ্রীং ক্লীং—বোধহয় কোনো মন্ত্র হইবে। কিন্তু সে যাহাই হোক, হস্তাক্ষর যে হরিনাথ মাস্টারের তাহাতে সন্দেহ রহিল না। প্রথম পৃষ্ঠার লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম, অক্ষরের ছাঁদ একই প্রকারের।

বেবি ম্যাজিক দেখিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হয় নাই ; সে ছবি আঁকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন তাহার খাতায় কুকুর বাঘ রাক্ষস প্রভৃতি বিবিধ জন্তুর চিত্তাকর্ষক ছবি আঁকিয়া তাহাকে খুশি করিলাম। মন্ত্র-লেখা কাগজটা আমি ছিঁড়িয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিলাম।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় হিমাংশুবাবু ফিরিয়া আসিলেন। মোটর তেমনি নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া বাড়ির পশ্চাতে গ্যারাজের দিকে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে হিমাংশুবাবুর গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম ; তিনি ভুবন বেয়ারাকে ডাকিয়া চায়ের বন্দোবস্ত করিবার হুকুম দিতেছেন।

ব্যোমকেশ যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। কুমার গাড়ি হইতে নামিলেন না ; ব্যোমকেশকে নামাইয়া দিয়া শরীরটা তেমন ভাল ঠেকিতেছে না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন ব্যোমকেশের অনারে আর একবার চা আসিল। চা পান করিতে করিতে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। দেওয়ানজীও আসিয়া বসিলেন। ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হল ?'

ব্যোমকেশ চায়ে চুমুক দিয়া বলিল, 'বিশেষ কিছু হল না। পুলিসের ধারণা হরিনাথ মাস্টারকে প্রজারা কেউ নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে।'

দেওয়ানজী বলিলেন, 'আপনার তা মনে হয় না ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। আমার ধারণা অন্যরকম।'

'আপনার ধারণা হরিনাথ বেঁচে নেই ?'

ব্যোমকেশ একটু বিস্মিতভাবে বলিল, 'আপনি কি করে বুঝলেন ? ও, অজিত বলেছে। হ্যাঁ—আমার তাই ধারণা বটে। তবে আমি ভুলও করে থাকতে পারি।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না। আমি অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া এমন কিছু বোধ হইল না যে সে আমার উপর চটিয়াছে ; কিন্তু মুখ দেখিয়া সকল সময় তাহার মনের ভাব বোঝা যায় না। কে জানে, হয়তো কথাটা ইহাদের কাছে প্রকাশ করিয়া অন্যায় করিয়াছি, ব্যোমকেশ নির্জনে পাইলেই আমার মুণ্ড চিবাইবে।

কালীগতি হঠাৎ বলিলেন, 'আমার বোধ হয় আপনি ভুলই করেছেন ব্যোমকেশবাবু। হরিনাথ সম্ভবত মরেনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ কালীগতির পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আপনি নতুন কিছু জানতে পেরেছেন ?'

কালীগতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না—তাকে ঠিক জানা বলা চলে না ; তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে ঐ বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।'

ব্যোমকেশ চমকিত হইয়া বলিল, 'বনের মধ্যে ? এই দারুণ শীতে ?'

'হ্যাঁ। বনের মধ্যে কাপালিকের ঘর বলে একটা কুঁড়ে ঘর আছে—রাত্রে বাঘ ভাল্লুকের ভয়ে সম্ভবত সেই ঘরটায় লুকিয়ে থাকে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পেয়েছেন কি ?'

'না। তবে আমার স্থির বিশ্বাস সে ঐখানেই আছে।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না।

রাত্রে শয়ন করিতে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চোরাবালির কথাটাও চারিদিকে রাষ্ট্র করে দিয়েছ তো ?'

'না না—আমি শুধু কথায় কথায় বলেছিলুম যে—'

'বুঝেছি।' বলিয়া সে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি তো ও কথা বলতে বারণ করনি।'

'তোমার মনের ভাব দেখছি রবিবাবুর গানের নায়কের মত—যদি বারণ কর তবে গাহিব না। এবং বারণ না করিলেই তারস্বরে গাহিব। যা হোক, আজ দুপুরবেলা কি করলে বল।'

দেখিলাম, ব্যোমকেশ সত্যসত্যই চটে নাই ; বোধহয় ভিতরে ভিতরে তাহার ইচ্ছা ছিল যে ও কথাটা আমি প্রকাশ করিয়া ফেলি। অন্তত তাহার কাজের যে কোনো ব্যাঘাত হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহ।

আমি তখন দ্বিপ্রহরে যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি সব বলিলাম ; মন্ত্র-লেখা কাগজটাও দেখাইলাম। কাগজটা ব্যোমকেশ মন দিয়া দেখিল, কিন্তু বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। বলিল, 'নূতন কিছুই নয়—এসব আমার জানা কথা। এই লেখাটার দ্বিতীয় লাইন সম্পূর্ণ করলে হবে—

'রাত্রি ১১টা ৪৫মিঃ গতে অমাবস্যা পড়িবে। অর্থাৎ হরিনাথও পাঁজি দেখেছিল !'

হিমাংশুবাবুর বহির্গমনের কথা শুনিয়া ব্যোমকেশ মুচকি হাসিল, কোন মন্তব্য করিল না। আমি তখন বলিলাম, 'দ্যাখ ব্যোমকেশ, আমার মনে হয় হিমাংশুবাবু আমাদের কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন। তুমি লক্ষ্য করেছ কি না জানি না, কিন্তু আমাদের অতিথিরূপে পেয়ে তিনি খুব খুশি হননি।'

ব্যোমকেশ মৃদুভাবে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'ঠিক ধরেছ। হিমাংশুবাবু যে কত উঁচু মেজাজের লোক তা ওঁকে দেখে ধারণা করা যায় না। সত্যি অজিত, ওঁর মতন সহৃদয় প্রকৃত ভদ্রলোক খুব কম দেখা যায়। যেমন করে হোক এ ব্যাপারে একটা রফা করতেই হবে।'

আমাকে বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ না দিয়া ব্যোমকেশ পুনশ্চ বলিল, 'অনাদি সরকারের রাধা নামে একটি বিধবা মেয়ে আছে শুনেছ বোধহয়। তাকে আজ দেখলুম।'

আমি বোকার মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, সে বলিয়া চলিল, 'সতের-আঠার বছরের মেয়েটি—দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের পীড়নে আর লজ্জায় একেবারে নুয়ে পড়েছে।—দেখ অজিত, যৌবনের উন্মাদনার অপরাধকে আমরা বড় কঠিন শাস্তি দিই, বিশেষত অপরাধী যদি স্ত্রীলোক হয়। প্রলোভনের বিরাট শক্তিকে হিসাবের মধ্যে নিই না, যৌবনের স্বাভাবিক অপরিণামদর্শিতাকেও হিসাব থেকে বাদ দিই। ফলে যে বিচার করি সেটা সুবিচার নয়। আইনেই grave and sudden provocation বলে একটা সাফাই আছে। কিন্তু সমাজ কোনো সাফাই মানে না ; আগুনের মত সে নির্মম, যে হাত দেবে তার হাত পুড়বে। আমি সমাজের দোষ দিচ্ছি না—সাধারণের কল্যাণে তাকে কঠিন হতেই হয়। কিন্তু যে-লোক এই কঠিনতার ভিতর থেকে পাথর ফাটিয়ে করুণার উৎস খুলে দেয় তাকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।'

ব্যোমকেশকে কখনো সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে লেকচার দিতে শুনি নাই ; অনাদি সরকারের কন্যাকে দেখিয়া তাহার ভাবের বন্যা উথলিয়া উঠিল কেন তাহাও বোধগম্য হইল না। আমি ফ্যালফ্যাল করিয়া কেবল তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসমোচন করিয়া বলিল, 'আর একটা আশ্চর্য দেখছি, এসব ব্যাপারে মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর শাস্তি দেয়। কেন দেয় কে জানে!'

অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না ; শেষে ব্যোমকেশ উঠিয়া পায়ের মোজা টানিয়া খুলিতে খুলিতে বলিল, 'রাত হল, শোয়া যাক। এ ব্যাপারটা যে কিভাবে শেষ হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। যা কিছু জ্ঞাতব্য সবই জানা হয়ে গেছে—অথচ লোকটাকে ধরবার উপায় নেই।' তারপর গলা নামাইয়া বলিল, 'ফাঁদ পাততে হবে, বুঝেছ অজিত, ফাঁদ পাততে হবে।'

আমি বলিলাম, 'যদি কিছু বলবে ঠিক করে থাকো তাহলে একটু স্পষ্ট করে বল। জ্ঞাতব্য কোনো কথাই আমি এখনো বুঝতে পারিনি।'

'কিছু বোঝোনি ?'

'কিছু না।'

'আশ্চর্য ! আমার মনে যা একটু সংশয় ছিল তা আজ শহরে গিয়ে ঘুচে গেছে। সমস্ত ঘটনাটি বায়স্কোপের ছবির মত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।'

অধর দংশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শহরে সারাদিন কি করলে ?'

ব্যোমকেশ জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, 'মাত্র দু'টি কাজ। ইস্টিশানে অনাদি সরকারের মেয়েকে দেখলুম—তাকে দেখবার জন্যেই সেখানে লুকিয়ে বসেছিলুম। তারপর রেজিস্ট্রি অফিসে কয়েকটি দলিলের সন্ধান করলুম।'

'এইতেই এত দেরি হল ?'

'হ্যাঁ। রেজিস্ট্রি অফিসের খবর সহজে পাওয়া যায় না—অনেক তদ্বির করতে হল।'

'তারপর ?'

'তারপর ফিরে এলুম।' বলিয়া ব্যোমকেশ লেপের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বুঝিলাম, কিছু বলিবে না। তখন আমিও রাগ করিয়া শুইয়া পড়িলাম, আর কোনো কথা কহিলাম না।

ক্রমে তন্দ্রাবেশ হইল। নিদ্রাদেবীর ছায়া-মঞ্জীর মাথার মধ্যে রুমঝুম করিয়া বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় দরজার কড়া খুট্ খুট্ করিয়া নড়িয়া উঠিল। তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

ব্যোমকেশের বোধ করি তখনো ঘুম আসে নাই, সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে ?'

বাহির হইতে মৃদুকণ্ঠে আওয়াজ আসিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একবার দরজা খুলুন।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, দেওয়ান কালীগতি একটি কালো

রঙের কম্বল গায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

কালীগতি বলিলেন, 'আমার সঙ্গে আসুন, একটা জিনিস দেখাতে চাই।—অজিতবাবু, জেগে আছেন নাকি? আপনিও আসুন।'

ব্যোমকেশ ওভারকোট গায়ে দিতে দিতে বলিল, 'এত রাত্রে! ব্যাপার কি?'

কালীগতি উত্তর দিলেন না। আমিও লেপ পরিত্যাগ করিয়া একটা শাল ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইলাম। তারপর দুইজনে কালীগতির অনুসরণ করিয়া বাহির হইলাম।

বাড়ি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমরা বাগানের ফটকের দিকে চলিলাম। অন্ধকার রাত্রি, বহুপূর্বে চন্দ্রাস্ত হইয়াছে। ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ অথচ মন্থর একটা বাতাস যেন অলসভাবে বস্ত্রাচ্ছাদনের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। আমি ভাবিতে লাগিলাম, বৃদ্ধ এহেন রাত্রে আমাদের কোথায় লইয়া চলিল। কতদূর যাইতে হইবে! ব্যোমকেশই বা এমন নির্বিচারে প্রশ্নমাত্র না করিয়া চলিয়াছে কেন?

কিন্তু ফটক পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই বুঝিলাম, আমাদের গন্তব্যস্থান বেশিদূর নয়। কালীগতির বাড়ির সদর দরজায় একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল, সেটিকে তুলিয়া লইয়া তাহার বাতি উস্কাইয়া দিয়া কালীগতি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, 'আসুন।'

কালীগতির বাড়িতে বোধহয় চাকর-বাকর কেহ থাকে না, কারণ বাড়িতে প্রবেশ করিয়া জনমানবের সাড়াশব্দ পাইলাম না। লণ্ঠনের শিখা বাড়ির অংশমাত্র আলোকিত করিল, তাহাতে নিকটস্থ দরজা জানালা ও ঘরের অন্যান্য দু'একটা আসবাব ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িল না। একপ্রস্থ সিঁড়ি ভাঙিয়া আমরা দোতলায় উঠিলাম; তারপর আর এক প্রস্থ সিঁড়ি। এই সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠিয়া কালীগতি লণ্ঠন কমাইয়া রাখিয়া দিলেন। দেখিলাম, আলিসা-ঘেরা খোলা ছাদে উপস্থিত হইয়াছি।

'এদিকে আসুন।' বলিয়া কালীগতি আমাদের আলিসার ধারে লইয়া গেলেন; তারপর বাহিরের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

উচ্চস্থান হইতে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য হইয়াছিল বটে কিন্তু গাঢ় অন্ধকার দৃষ্টির পথরোধ করিয়া দিয়াছিল। তাই চারিদিকে অভেদ্য তমিস্রা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কেবল কালীগতির অঙ্গুলি-নির্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম বহুদূরে একটি মাত্র আলোকের বিন্দু চক্রবালশায়ী মঙ্গলগ্রহের মত আরক্তিমভাবে জ্বলিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা আলো জ্বলছে। কিম্বা আগুনও হতে পারে। কোথায় জ্বলছে?'

কালীগতি বলিলেন, 'জঙ্গলের ধারে যে কুঁড়ে ঘরটা আছে তারই মধ্যে।'

'ও—যাতে সেই কাপালিক মহাপ্রভু ছিলেন। তা—তিনি কি আবার ফিরে এলেন নাকি?' ব্যোমকেশের ব্যঙ্গহাসি শুনা গেল।

'না—আমার বিশ্বাস এ হরিনাথ মাস্টার।'

'ওঃ!' ব্যোমকেশ যেন চমকিয়া উঠিল—'আজ সন্ধ্যেবেলা আপনি বলছিলেন বটে। কিন্তু আলো জ্বেলে সে কি করছে?'

'বোধহয় শীত সহ্য করতে না পেরে আগুন জ্বেলেছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, শেষে মৃদুস্বরে বলিল, 'হতেও পারে—হতেও পারে। যদি সে বেঁচে থাকে—অসম্ভব নয়।'

কালীগতি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, সে বেঁচে আছে—ঐ আগুনই তার প্রমাণ। মনুষ্যসমাজ থেকে যে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে সে ছাড়া এই রাত্রে ওখানে আর কে আগুন জ্বালবে?'

'তা বটে!' ব্যোমকেশ আবার কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'হরিনাথ মাস্টার হোক বা না হোক, লোকটাকে জানা দরকার অজিত, এখন ওখানে যেতে রাজী আছ?'

আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'এখন? কিন্তু—'

কালীগতি বলিলেন, 'সব দিক বিবেচনা করে দেখুন। এখন গেলে যদি তাকে ধরতে পারেন

তাহলে এখনি যাওয়া উচিত। কিন্তু এই অন্ধকারে কোনো রকম শব্দ না করে কুঁড়ে ঘরের কাছে এগুতে পারবেন কি ? আলো নিয়ে যাওয়া চলবে না, কারণ আলো দেখলেই সে পালাবে। আর অন্ধকারে বন-বাদাড় ভেঙে যেতে গেলেই শব্দ হবে। কি করবেন, ভাল করে ভেবে দেখুন।'

তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম। সব দিক ভাবিয়া শেষে স্থির হইল যে আজ রাত্রে যাওয়া হইবে না ; কারণ আসামী যদি একবার টের পায় তাহা হইলে আর ওঘরে আসিবে না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেওয়ানজীর পরামর্শই ঠিক, আজ যাওয়া সমীচীন নয়। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আসামী যদি ভড়কে না যায় তাহলে কালও নিশ্চয় আসবে। কাল আমি আর অজিত আগে থাকতে গিয়ে ঐ ঘরে লুকিয়ে থাকব—বুঝছেন ? তারপর সে যেম্‌নি আসবে—'

কালীগতি বলিলেন, 'এ প্রস্তাব মন্দ নয়। অবশ্য এর চেয়েও ভাল মতলব যদি কিছু থাকে তাও ভেবে দেখা যাবে। আজ তাহলে এই পর্যন্ত থাক।'

ছাদ হইতে নামিয়া আমরা নিজেদের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। দেওয়ানজী আমাদের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। যাইবার সময় ব্যোমকেশের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি তান্ত্রিকধর্মে বিশ্বাস করেন না ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, ওসব বুজরুকি। আমি যত তান্ত্রিক দেখেছি, সব বেটা মাতাল আর লম্পট।'

কালীগতির চোখের দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য কেমন যেন ঘোলাটে হইয়া গেল, তিনি মুখে একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আজ তবে শুয়ে পড়ুন। ভাল কথা, হিমাংশু বাবাজীকে আপাতত এসব কথা না বললেই বোধহয় ভাল হয়।'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ, তাঁকে এখন কিছু বলবার দরকার নেই।'

কালীগতি প্রস্থান করিলেন।

আমরা আবার শয়ন করিলাম। কিয়ৎকাল পরে ব্যোমকেশ বলিল, 'ব্রাহ্মণ আমার ওপর মনে মনে ভয়ঙ্কর চটেছেন।'

আমি বলিলাম, 'যাবার সময় তোমার দিকে যেরকম ভাবে তাকালেন তাতে আমারও তাই মনে হল। তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে ওসব কথা বলবার কি দরকার ছিল ? উনি নিজে তান্ত্রিক—কাজেই ওঁর আঁতে ঘা লেগেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিও কায়মনোবাক্যে তাই আশা করছি।'

তাহার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কাহারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়া কথা কওয়া তাহার অভ্যাস নয়, অথচ এক্ষেত্রে সে জানিয়া বুঝিয়াই আঘাত দিয়াছে। বলিলাম, 'তার মানে ? ব্রাহ্মণকে মিছিমিছি চটিয়ে কোন লাভ হল নাকি ?'

'সেটা কাল বুঝতে পারব। এখন ঘুমিয়ে পড়।' বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

পরদিন সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত ব্যোমকেশ অলসভাবে কাটাইয়া দিল। হিমাংশুবাবুকে আজ বেশ প্রফুল্ল দেখিলাম—নানা কথাবার্তায় হাসি তামাসায় শিকারের গল্পে আমাদের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। আমরা যে একটা গুরুতর রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনের জন্য তাঁহার অতিথি হইয়াছি তাহা যেন তিনি ভুলিয়াই গেলেন ; একবারও সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করিলেন না।

বৈকালে চা-পান সমাপ্ত করিয়া ব্যোমকেশ কালীগতিকে একান্তে লইয়া গিয়া ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কালকের প্ল্যানই ঠিক আছে তো ?'

কালীগতি চিন্তান্বিতভাবে কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আপনি কি বিবেচনা করেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার বিবেচনায় যাওয়াই ঠিক, এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আজ রাত্রি দশটা নাগাদ চন্দ্রাস্ত হবে, তার আগেই আমি আর অজিত গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকব। যদি কেউ আসে তাকে ধরব।'

কালীগতি বলিলেন, 'যদি না আসে ?'

'তাহলে বুঝব আমার আগেকার অনুমানই ঠিক, হরিনাথ মাস্টার বেঁচে নেই।'

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কালীগতি বলিলেন, 'বেশ, কিন্তু ঘরটা এখন গিয়ে একবার দেখে এলে ভাল হত। চলুন, আপনাদের নিয়ে যাই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন। ঘরটা বেলাবেলি দেখে না রাখলে আবার রাত্রে সেখানে যাবার অসুবিধা হবে।'

ঘরটা যে আমরা আগে দেখিয়াছি তাহা ব্যোমকেশ ভাঙিল না।

যথা সময় তিনজন বনের ধারে কুটীরে উপস্থিত হইলাম। কালীগতি আমাদের কুটীরের ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, মেঝের উপর একস্তূপ ছাই পড়িয়া আছে। তা ছাড়া ঘরের আর কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

কালীগতি পিছনের কবাট খুলিয়া বালুর দিকে লইয়া গেলেন। বালুর উপর তখন সন্ধ্যার মলিনতা নামিয়া আসিতেছে। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'বাঃ। এদিকটা তো বেশ, যেন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।'

আমি দেখাদেখি বলিলাম, 'চমৎকার!'

কালীগতি বলিলেন, 'আপনারা আজ রাত্রে এই ঘরে থাকবেন বটে কিন্তু আমার একটু দুর্ভাবনা হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি, একটা বাঘ নাকি সম্প্রতি জঙ্গলে এসেছে।'

আমি বলিলাম, 'তাতে কি, আমরা বন্দুক নিয়ে আসব।'

কালীগতি মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িলেন, 'বাঘ যদি আসে, অন্ধকারে বন্দুক কোনো কাজেই লাগবে না। যা হোক, আশা করি বাঘের গুজবটা মিথ্যে—বন্দুক আনবার দরকার হবে না ; তবে সাবধানের মার নেই, আপনাদের সতর্ক করে দিই। যদি রাত্রে বাঘের ডাক শুনতে পান, ঘরের মধ্যে থাকবেন না, এই দিকে বেরিয়ে এসে আগল লাগিয়ে দেবেন, তারপর ঐ বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন। যদি বা বাঘ ঘরে ঢোকে বালির ওপর যেতে পারবে না।'

ব্যোমকেশ খুশি হইয়া বলিল, 'সেই ভাল—বন্দুকের হাঙ্গামায় দরকার নেই। অজিত আবার নূতন বন্দুক চালাতে শিখেছে, হয়তো বিনা কারণেই আওয়াজ করে বসবে ; ফলে শিকার আর এদিকে ঘেঁষবে না।'

তারপর বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। মনটা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হিমাংশুবাবুর অস্ত্রাগারে বসিয়া গল্পগুজব হইল। এক সময় ব্যোমকেশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা হিমাংশুবাবু, মনে করুন কেউ যদি একটা নিরীহ নির্ভরশীল লোককে জেনেশুনে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেয় তার শাস্তি কি ?'

হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'মৃত্যু। A tooth for a tooth, an eye for an eye!'

ব্যোমকেশ আমার দিকে ফিরিল—'অজিত, তুমি কি বল ?'

'আমিও তাই বলি।'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে উঁকি মারিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। মৃদুস্বরে বলিল, 'হিমাংশুবাবু, আজ রাত্রে আমরা দু'জনে গিয়ে কাপালিকের কুঁড়েয় লুকিয়ে থাকব।'

বিস্মিত হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'সে কি ! কেন ?'

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে কারণ ব্যক্ত করিয়া শেষে কহিল, 'কিন্তু আমাদের একলা যেতে সাহস হয় না। আপনাকেও যেতে হবে।'

হিমাংশুবাবু সোৎসাহে বলিলেন, 'বেশ বেশ, নিশ্চয় যাব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনি যাচ্ছেন একথা যেন আকারে ইঙ্গিতেও কেউ না জানতে পারে। তা হলেই সব ভেস্তে যাবে। শুনুন, আমরা আন্দাজ সাড়ে ন'টার সময় বাড়ি থেকে বেরুব ; আপনি তার আধঘন্টা পরে বেরুবেন, কেউ যেন জানতে না পারে। এমন কি, আমাদের

যাবার কথা আপনি জানেন সে ইঙ্গিতও দেবেন না।'

'বেশ।'

'আর আপনার সবচেয়ে ভাল রাইফেলটা সঙ্গে নেবেন। আমরা শুধু হাতেই যাব।'

রাত্রি ন'টার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া আমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। সাজগোজ করিয়া বাহির হইতে ঠিক সাড়ে ন'টা বাজিল।

বাগান পার হইয়া মাঠে পদার্পণ করিয়াছি এমন সময় চাপা কণ্ঠে কে ডাকিল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

পাশে তাকাইয়া দেখিলাম, একটা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া কালীগতি আসিতেছেন। তিনি বোধহয় এতক্ষণ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কাছে আসিয়া বলিলেন, 'যাচ্ছেন? বন্দুক নেননি দেখছি। বেশ—মনে রাখবেন, যদি বাঘের ডাক শুনতে পান, বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন।'

'হ্যাঁ—মনে আছে।'

চন্দ্র অস্ত যাইতে বিলম্ব নাই, এখনি বনের আড়ালে ঢাকা পড়িবে। কালীগতির মৃদুকথিত 'দুর্গা দুর্গা' শুনিয়া আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম।

কুটীরে পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ পকেট হইতে টর্চ বাহির করিল, নিমেষের জন্য একবার জ্বালিয়া ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইল। তারপর নিজে মাটির উপর উপবেশন করিয়া বলিল, 'বোসো।'

আমি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সিগারেট ধরাতে পারি?'

'পারো। তবে দেশলাইয়ের আলো হাত দিয়ে আড়াল করে রেখো।'

দু'জনে উক্তরূপে দেশলাই জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিলাম।

আধঘন্টা পরে বাহিরে একটু শব্দ হইল। ব্যোমকেশ ডাকিল, 'হিমাংশুবাবু,আসুন।'

হিমাংশুবাবু রাইফেল লইয়া আসিয়া বসিলেন। তখন তিনজনে সেই কুঁড়ে ঘরের মেঝেয় বসিয়া দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরম্ভ করিলাম। মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে দু'একটা কথা হইতে লাগিল। হিমাংশুবাবুর কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির রেডিয়ম-দ্যুতি সময়ের নিঃশব্দ সঞ্চার জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

বারোটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিটের সময় একটা বিকট গম্ভীর শব্দ শুনিয়া তিনজনেই লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বন্য বাঘের ক্ষুধার্ত ডাক আগে কখনো শুনি নাই—বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। হিমাংশুবাবু চাপা গলায় বলিলেন, 'বাঘ।' তাহার রাইফেলে খুট্ করিয়া শব্দ হইল, বুঝিলাম তিনি রাইফেলে টোটা ভরিলেন।

বাঘের ডাকটা বনের দিক হইতে আসিয়াছিল। হিমাংশুবাবু পা টিপিয়া টিপিয়া খোলা দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার গাঢ়তর দেহরেখা অন্ধকারের ভিতর অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইল। আমরা নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

হিমাংশুবাবু ফিসফিস করিয়া বলিলেন, 'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'শব্দভেদী'—ব্যোমকেশের স্বর যেন বাতাসে মিলাইয়া গেল।

হিমাংশুবাবু শুনিতে পাইলেন কি না জানি না, তিনি কুটীরের বাহিরে দুই পদ অগ্রসর হইয়া বন্দুক তুলিলেন।

এই সময় আবার সেই দীর্ঘ হিংস্র আওয়াজ যেন মাটি পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিল। এবার শব্দ আরো কাছে আসিয়াছে, বোধহয় পঞ্চাশ গজের মধ্যে। শব্দের প্রতিধ্বনি মিলাইয়া যাইতে না যাইতে হিমাংশুবাবুর বন্দুকের নল হইতে একটা আগুনের রেখা বাহির হইল। শব্দ হইল—কড়াৎ!

সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা গুরুভার পতনের শব্দ। হিমাংশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'পড়েছে। ব্যোমকেশবাবু, টর্চ বার করুন।'

টর্চ ব্যোমকেশের হাতেই ছিল, সে বোতাম টিপিয়া আলো জ্বালিল; ঘর হইতে বাহির হইয়া আগে আগে যাইতে যাইতে বলিল, 'আসুন।'

আমরা তাহার পশ্চাতে চলিলাম। হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'বেশি কাছে যাবেন না; যদি শুধু

জখম হয়ে থাকে—'

কিন্তু বাঘ কোথায় ? বনের ঠিক কিনারায় একটা কালো কম্বল-ঢাকা কি যেন পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে গিয়া টর্চের পরিপূর্ণ আলো তাহার উপর ফেলিতেই হিমাংশুবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'একি ! এ যে দেওয়ানজী !'

দেওয়ান কালীগতি কাৎ হইয়া ঘাসের উপর পড়িয়া আছেন। তাঁহার রক্তাক্ত নগ্ন বক্ষ হইতে কম্বলটা সরিয়া গিয়াছে। চক্ষু উন্মুক্ত ; মুখের একটা পাশবিক বিকৃতি তাঁহার অন্তিমকালের মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে।

ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া তাঁহার বুকের উপর হাত রাখিল, তারপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'গতাসু। যদি প্রেতলোক বলে কোনো রাজ্য থাকে তাহলে এতক্ষণে হরিনাথ মাস্টারের সঙ্গে দেওয়ানজীর মুলাকাত হয়েছে।'

তাহার মুখে বা কণ্ঠস্বরে মর্মপীড়ার কোনো আভাসই পাওয়া গেল না।

হিসাবের খাতা কয়টা হিমাংশুবাবুর দিকে ঠেলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এগুলো ভাল করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন, এক লক্ষ টাকা দেনা কেন হয়েছে।'

আমরা তিনজনে বৈঠকখানার ফরাসের উপর বসিয়াছিলাম। কালীগতির মৃত্যুর পর দুই দিন অতীত হইয়াছে। তাঁহার লোহার সিন্দুক ভাঙিয়া হিসাবের খাতা চারিটা ও আরও অনেক দলিল ব্যোমকেশ বাহির করিয়াছিল।

হিমাংশুবাবুর চক্ষু হইতে বিভীষিকার ছায়া তখনো সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। তিনি করতলে চিবুক রাখিয়া বসিয়াছিলেন, ব্যোমকেশের কথায় মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'এখনো যেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না—ভাবতে গেলেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থায় গুলিয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আমি টুকরো টুকরো প্রমাণ থেকে এই রহস্য কাহিনীর যে কাঠামো খাড়া করতে পেরেছি তা আপনাকে বলছি, শুনুন। কিন্তু তার আগে এই রেজিস্ট্রি দলিলগুলো নিন।'

'কি এগুলো ?' বলিয়া হিমাংশুবাবু দলিলগুলি হাতে লইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি যে-মহাজনের কাছে তমসুক লিখে টাকা ধার নিয়েছিলেন, সেই মহাজন সেই সব তমসুক রেজিস্ট্রি করে কালীগতিকে বিক্রি করে। এগুলো হচ্ছে সেই সব তমসুক আর তার বিক্রি কবালা।'

'কালীগতি এইসব তমসুক কিনেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, আপনার টাকায় কিনেছিলেন ; যাকে বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা।'

হিমাংশুবাবু উদ্‌ভ্রান্তভাবে দেয়ালের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'ওগুলো এখন ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, কারণ কালীগতি আর আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আসবেন না। তিনি ঋণের দায়ে আপনার আস্ত জমিদারীটাই নিলাম করে নেবেন ভেবেছিলেন—আরো বছর দুই এইভাবে চালাতে পারলে করতেনও তাই। কিন্তু মাঝ থেকে ঐ ন্যালাখ্যাপা অঙ্ক-পাগলা মাস্টারটা এসে সব ভণ্ডুল করে দিলে।'

আমি বলিলাম, 'না না, ব্যোমকেশ, গোড়া থেকে বল।'

ব্যোমকেশ ধীরভাবে একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'গোড়া থেকেই বলছি। হিমাংশুবাবুর বাবা মারা যাবার পর কালীগতি যখন দেখলেন যে নূতন জমিদার বিষয় পরিচালনায় উদাসীন তখন তিনি ভারী সুবিধা পেলেন। হিসাবের খাতা তিনি লেখেন, তাঁর মাথার ওপর পরীক্ষা করবার কেউ নেই—সুতরাং তিনি নির্ভয়ে কিছু কিছু টাকা তছরূপ করতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে কিছুদিন চলল। কিন্তু নাল্পে সুখমস্তি—ও প্রবৃত্তিটা ক্রমশ বেড়েই চলে। এদিকে জমিদারীর আয়-ব্যয়ের একটা বাঁধা হিসেব আছে, বেশি গরমিল হলেই ধরা পড়বার সম্ভাবনা। তিনি তখন এক মস্ত চাল চাললেন, বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মোকদ্দমা বাধিয়ে দিলেন। খরচ আর

বাঁধাবাঁধির মধ্যে রইল না ; আদালতে ন্যায্য এবং ন্যায়-বহির্ভূত দুই রকমই খরচ আছে, সুতরাং স্বচ্ছন্দে গোঁজামিল দেওয়া চলে। কালীগতির চুরির খুব সুবিধা হল।

'প্রথমটা বোধহয় কালীগতি কেবল চুরি করবার মতলবেই ছিলেন, তার বেশি উচ্চাশা করেননি। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক তান্ত্রিক এসে হাজির হল—এবং আপনি প্রথমেই তার বিষ-নজরে পড়ে গেলেন। কালীগতি তার কাছ থেকে মন্ত্র নিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কুমন্ত্রণা গ্রহণ করলেন। আমার বিশ্বাস এই কাপালিকই জমিদারী আত্মসাৎ করবার পরামর্শ কালীগতিকে দেয় ; কারণ হিসেবের খাতা থেকে দেখতে পাচ্ছি, সে আসবার পর থেকেই চুরির মাত্রা বেড়ে গেছে।

'স্বাভাবিক লোভ ছাড়াও একটা ধর্মান্ধতার ভাব কালীগতির মধ্যে ছিল। ধর্মান্ধতা মানুষকে কত নৃশংস করে তুলতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়। কালীগতি গুরুর প্ররোচনায় অন্নদাতার সর্বনাশ করতে উদ্যত হলেন। তিনি যে কৌশলটি বার করলেন সেটি যেমন সহজ তেমনি কার্যকর। প্রথমে আপনার টাকা চুরি করে তহবিল খালি করে দিলেন, পরে খরচের টাকা নেই ওই অজুহাতে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ালেন, এবং শেষে মহাজনের কাছ থেকে আপনারই টাকায় সেই তমসুক কিনে নিলেন। কালীগতি বিনা খরচে আপনার উত্তমর্ণ হয়ে দাঁড়ালেন। আপনি কিছুই জানতে পারলেন না।

'এইভাবে বেশ আনন্দে দিন কাটছে, হঠাৎ একদিন কোথা থেকে হরিনাথ এসে হাজির হল। আপনি তাকে বেবির মাস্টার রাখলেন। বড় ভালুমানুষ বেচারা, দু'চার দিনের মধ্যে কালীগতির ভক্ত হয়ে উঠল ; কালীগতি তাকে তান্ত্রিক ধর্ম-মাহাত্ম্য শেখাতে লাগলেন। কালীমূর্তির এক পট হরিনাথ তাঁর কাছ থেকে এনে নিজের ঘরের দেওয়ালে ভক্তিভরে টাঙিয়ে রাখলে।

'কিন্তু শুধু ধর্মে তার পেট ভরে না—সে অঙ্ক-পাগল। বেবিকে সে যোগ বিয়োগ শেখায়, আর নিজের মনে বেবির খাতায় বড় বড় অঙ্ক কষে। কিন্তু তবু নিজের কল্পিত অঙ্কে সে সুখ পায় না।

'একদিন আলমারি খুলে সে হিসেবের খাতাগুলো দেখতে পেলে। অঙ্কের গন্ধ পেলে সে আর স্থির থাকতে পারে না—মহা আনন্দে সে খাতাগুলো পরীক্ষা করতে আরম্ভ করে দিলে। যতই হিসেবের মধ্যে ঢুকতে লাগল, ততই দেখলে হাজার হাজার টাকার গরমিল। হরিনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'কিন্তু এই আবিষ্কারের কথা সে কাকে বলবে ? আপনার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হয় না, উপরন্তু আপনার সঙ্গে উপযাচক হয়ে দেখা করতে সে সাহস করে না। এ অবস্থায় যা সবচেয়ে স্বাভাবিক সে তাই করলে—কালীগতিকে গিয়ে হিসেব গরমিলের কথা বললে।

'কালীগতি দেখলেন—সর্বনাশ ! তাঁর এতদিনের ধারাবাহিক চুরি ধরা পড়ে যায়। তিনি তখনকার মত হরিনাথকে স্তোকবাক্যে বুঝিয়ে মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে, হরিনাথকে সরাতে হবে, এবং এই সঙ্গে ঐ খাতাগুলো। নইলে তাঁর দুষ্কৃতির প্রমাণ থেকে যাবে। এতদিন যে সেগুলো কোনো ছুতোয় নষ্ট করে ফেলেননি এই অনুতাপ তাঁকে ভীষণ নিষ্ঠুর করে তুলল।

'এইখানে এই কাহিনীর সবচেয়ে ভয়াবহ আর রোমাঞ্চকর ঘটনার আবির্ভাব। হরিনাথকে পৃথিবী থেকে সরাতে হবে, অথচ ছুরি ছোরা চালানো বা বিষ-প্রয়োগ চলবে না। তবে উপায় ?

'যে চোরাবালি থেকে আপনার জমিদারীর নামকরণ হয়েছে সেই চোরাবালির সন্ধান কালীগতি জানতেন। সম্ভবত তাঁর গুরু কাপালিকের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন ; কারণ চোরাবালিটা কাপালিকের কুঁড়ের ঠিক পিছনেই। আমরাও সেদিন সকালে পাখি মারতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই ভয়ঙ্কর চোরাবালির সন্ধান পেয়েছিলুম।

'কালীগতি মাস্টারকে সরাবার এক সম্পূর্ণ নূতন উপায় উদ্ভাবন করলেন। চমৎকার উপায়। হরিনাথ মাস্টার মরবে অথচ কেউ বুঝতেই পারবে না যে সে মরেছে। তাঁর ওপর সন্দেহের ছায়াপাত পর্যন্ত হবে না, বরঞ্চ খাতাগুলো অন্তর্ধানের বেশ একটা স্বাভাবিক কারণ পাওয়া যাবে।

'গত অমবস্যার দিন তিনি হরিনাথকে বললেন, 'তুমি যদি মন্ত্রসিদ্ধ হতে চাও তো আজ রাত্রে ঐ কুঁড়ে ঘরে গিয়ে মন্ত্র সাধনা কর।' হরিনাথ রাজী হল ; সে বেবির খাতায় মন্ত্রটা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখল।

'রাত্রে সবাই ঘুমুলে হরিনাথ নিজের ঘর থেকে বার হল। সে সাধনা করতে যাচ্ছে, তার জামা জুতো পরবার দরকার নেই, এমন কি সে চশমাটাও সঙ্গে নিল না—কারণ অমাবস্যার রাত্রে চশমা থাকা না থাকা সমান।

'কালীগতি তাকে কুটীর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। আসবার সময় বলে এলেন—'যদি বাঘের ডাক শুনতে পাও ভয় পেও না, পিছনের দরজা দিয়ে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়িও ; সেখানে বাঘ যেতে পারবে না।'

'হরিনাথ জপে বসল। তারপর যথাসময়ে বাঘের ডাক শুনতে পেল। সে কি ভয়ঙ্কর ডাক, তা আমরাও সেদিন শুনেছি। হিমাংশুবাবুর মত পাকা শিকারীও বুঝতে পারেননি যে এ নকল ডাক। কালীগতি জন্তু-জানোয়ারের ডাক অদ্ভুত নকল করতে পারতেন। প্রথম দিন এখানে এসেই আমরা তাঁর শেয়াল ডাক শুনেছিলুম।

'বাঘের ডাক শুনে অভাগা হরিনাথ ছুটে গিয়ে বালির ওপর দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোরাবালির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল। একটা চীৎকার হয়তো সে করেছিল কিন্তু তাও অর্ধপথে চাপা পড়ে গেল। তার ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে।'

একটু চুপ করিয়া ব্যোমকেশ আবার বলিতে লাগিল, 'কালীগতি কার্য সুসম্পন্ন করে ফিরে এসে সেই রাত্রেই হরিনাথের ঘর থেকে খাতা সরিয়ে ফেললেন। তার পরদিন যখন হরিনাথকে পাওয়া গেল না তখন রটিয়ে দিলেন যে সে খাতা চুরি করে পালিয়েছে।

'হরিনাথের অন্তর্ধানের কৈফিয়ৎ বেশ ভালই হয়েছিল কিন্তু তবু কালীগতি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কে জানে যদি কেউ সন্দেহ করে যে, হরিনাথ শুধু খাতা নিয়ে পালাবে কেন ? নিশ্চয় এর মধ্যে কোন গূঢ় তত্ত্ব আছে। তখন তিনি সিন্দুক থেকে ছ'হাজার টাকাও সরিয়ে ফেললেন। এই সময়ে আপনার চাবি হারিয়েছিল, সুতরাং সন্দেহটা সহজেই কালীগতির ঘাড় থেকে নেমে গেল—সবাই ভাবলে হারানো চাবির সাহায্যে হরিনাথই টাকা চুরি করেছে। কালীগতির ডবল লাভ হল, টাকাও পেলেন, আবার হরিনাথের অপরাধও বেশ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল।

'তারপর আমি আর অজিত এলুম। এই সময়ে বাড়িতে আর একটা ব্যাপার ঘটছিল যার সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা আমাদের সমাজের একটা চিরন্তন ট্র্যাজেডি—বিধবার পদস্খলন, নূতন কিছু নয়। অনাদি সরকারের বিধবা মেয়ে রাধা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। তারা অনেক যত্ন করে কথাটা লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু শেষে আপনার স্ত্রী জানতে পারেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে এসে বলেন যে, এসব অনাচার এ বাড়িতে চলবে না, ওদের আজই বিদেয় করে দাও—কেমন, ঠিক কি না ?'

শেষের দিকে হিমাংশুবাবু বিস্ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, এখন একবার ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, 'কিন্তু আপনার মনে দয়া হল ; আপনি ঐ অভাগী মেয়েটাকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না। এই নিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু মনোমালিন্যও হয়েছিল। যা হোক, আপনি যখন বুঝলেন যে ওরা ভ্রূণহত্যার অপরাধে অপরাধী নয়, তখন রাধাকে চুপি চুপি তার মাসীর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। পাছে আপনার আমলা বা চাকর-বাকরদের মধ্যেও জানাজানি হয়, এই জন্যে নিজে গাড়ি চালিয়ে তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

'অনাদি সরকারের ভাগ্য ভাল যে আপনার মত মনিব পেয়েছে ; অন্য কোনো মালিক এতটা করত বলে আমার মনে হয় না।

'সে যা হোক, এই ব্যাপারের সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের ঘটনা জড়িয়ে গিয়ে সমস্তটা আমার

কাছে অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। তারপর অতি কষ্টে জট ছাড়ালুম ; রাধাকে দেখবার জন্যে স্টেশনে গিয়ে লুকিয়ে বসে রইলুম। তার চেহারা দেখেই বুঝলুম এ ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই—তার ট্র্যাজেডি অন্য রকম। তখন আর সন্দেহ রইল না যে কালীগতিই হরিনাথকে খুন করেছেন। লোকটি কতবড় নৃশংস আর বিবেকহীন তার জ্বলন্ত প্রমাণ পেলুম রেজিস্ট্রি অফিসে। কিন্তু তাঁকে ধরবার উপায় নেই ; যে খাতাগুলো থেকে তাঁর চুরি-অপরাধ প্রমাণ হতে পারত সেগুলো তিনি আগেই সরিয়েছেন। হয়তো পুড়িয়ে ফেলেছেন, নয়তো হরিনাথের সঙ্গে ঐ চোরাবালিতেই ফেলে দিয়েছেন।

'কালীগতি প্রথমটা বেশ নিশ্চিন্তই ছিলেন। কিন্তু যখন অজিতের মুখে শুনলেন যে হরিনাথের মৃত্যুর কথা আমি বুঝতে পেরেছি তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে হরিনাথ মরেনি, প্রমাণস্বরূপ নিজেই কুঁড়ে ঘরে আগুন জ্বেলে রেখে এসে দুপুর রাত্রে আমাদের দেখালেন। আমি তখন এমন ভাব দেখাতে লাগলুম যেন তাঁর কথা সত্যি হলেও হতে পারে। আমরা ঠিক করলুম রাত্রে গিয়ে কুঁড়ে ঘরে পাহারা দেব। তিনি রাজী হলেন বটে কিন্তু কাউকে একথা বলতে বারণ করে দিলেন।

'আমাদের মারবার ফন্দি প্রথমে কালীগতির ছিল না ; তাঁর প্রথম চেষ্টা ছিল আমাদের বোঝান যে হরিনাথ বেঁচে আছে। কিন্তু যখন দেখলেন যে আমরা হরিনাথের জন্যে কুঁড়ে ঘরে গিয়ে বসে থাকতে চাই, তখন তাঁর ভয় হল যে, এইবার তাঁর সব কল-কৌশল ধরা পড়ে যাবে। কারণ হরিনাথ যে কুঁড়ে ঘরে আসতেই পারে না, একথা তাঁর চেয়ে বেশি কে জানে? তখন তিনি আমাদের চোরাবালিতে পাঠাবার সঙ্কল্প করলেন। আমিও এই সুযোগই খুঁজছিলুম ; আমাদের খুন করবার ইচ্ছাটা যাতে তাঁর পক্ষে সহজ হয় সে চেষ্টারও ত্রুটি করিনি। তান্ত্রিক এবং তন্ত্র-ধর্মকে গালাগালি দেবার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

'পরদিন বিকেলে তিনি আমাদের নিয়ে কুঁড়ে ঘর দেখাতে গেলেন। সেখানে গিয়ে কথাচ্ছলে বললেন, রাত্রে যদি আমরা বাঘের ডাক শুনতে পাই তাহলে যেন বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াই।

'এই হল সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত যা ঘটেছিল তার বিবরণ। তারপর যা যা ঘটেছে সবই আপনি জানেন।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না। তারপর হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আমাকে সে-রাত্রে রাইফেল নিয়ে যেতে কেন বলেছিলেন ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ কোনো উত্তর দিল না। হিমাংশুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি জানতেন আমি বাঘের ডাক শুনে শব্দভেদী গুলি ছুঁড়ব?'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, বলিল, 'সে প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। হিমাংশুবাবু, আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না। মৃত্যুই ছিল কালীগতির একমাত্র শাস্তি। তিনি যে ফাঁসি-কাঠে না ঝুলে বন্দুকের গুলিতে মরেছেন এটা তাঁর ভাগ্য—আপনি নিমিত্ত মাত্র। মনে আছে, সেদিন রাত্রে আপনিই বলেছিলেন—a tooth for a tooth, an eye for an eye?'

এই সময় বাহিরের বারান্দার সম্মুখে মোটর আসিয়া থামিল। পরক্ষণেই ব্যস্তসমস্তভাবে কুমার ত্রিদিব প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে একখানা খবরের কাগজ। তিনি বলিলেন, 'হিমাংশু, এসব কি কাণ্ড! দেওয়ান কালীগতি বন্দুকের গুলিতে মারা গেছেন?' বলিয়া কাগজখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি কিছুই জানতাম না ; ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছিলুম তাই ক'দিন আসতে পারিনি। আজ কাগজ পড়ে দেখি এই ব্যাপার। ছুটতে ছুটতে এলুম। ব্যোমাকেশবাবু, কি হয়েছে বলুন দেখি।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার আগে কাগজখানা হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতে লেখা ছিল—

'চোরাবালি নামক উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদারী হইতে একটি শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। চোরাবালির জমিদার কয়েকজন বন্ধুর সহিত রাত্রিকালে নিকটবর্তী জঙ্গলে বাঘ শিকার

করিতে গিয়াছিলেন। বাঘের ডাক শুনিতে পাইয়া জমিদার হিমাংশুবাবু বন্দুক ফায়ার করেন। কিন্তু মৃতদেহের নিকট গিয়া দেখিলেন যে বাঘের পরিবর্তে জমিদারীর পুরাতন দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য গুলির আঘাতে মরিয়া পড়িয়া আছেন।

'বৃদ্ধ দেওয়ান এই গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে কেন গিয়াছিলেন এ রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারিতেছে না।

'জমিদার হিমাংশুবাবু দেওয়ানের মৃত্যুতে বড়ই মর্মাহত হইয়াছেন, পুলিস-তদন্ত দ্বারা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে এই দুর্ঘটনার জন্য হিমাংশুবাবু কোন অংশে দায়ী নহেন—তিনি যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন।'

কাগজখানা রাখিয়া দিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। আলস্য ভাঙ্গিয়া কুমার ত্রিদিবকে বলিল, 'চলুন, এবার আপনার রাজ্যে ফেরা যাক, এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে। পথে যেতে যেতে কালীগতির শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী আপনাকে শোনাব।'

অগ্নিবাণ

১

খবরের কাগজখানা হতাশ হস্ত-সঞ্চালনে আমার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'নাঃ—কোথাও কিছু নেই, একেবারে ফাঁকা। এর চেয়ে কাগজওয়ালারা সাদা কাগজ বের করলেই পারে। তাতে ছাপার খরচটা অন্তত বেঁচে যায়।'

আমি খোঁচা দিয়া বলিলাম, 'বিজ্ঞাপনেও কিছু পেলে না ? বল কি ? তোমার মতে তো দুনিয়ার যত কিছু খবর সব ঐ বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের মধ্যেই ঠাসা আছে।'

বিমর্ষ-মুখে চুরুট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'না, বিজ্ঞাপনেও কিছু নেই। একটা লোক বিধবা বিয়ে করতে চায় বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কুমারী ছেড়ে বিধবা বিয়ে করবার জন্যেই গোঁ ধরেছে কেন, ঠিক বোঝা গেল না। নিশ্চয় কোনও বদ্ মতলব আছে।'

'তা তো বটেই। আর কিছু ?'

'আর একটা বীমা কোম্পানি মহা ঘটা করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে, তারা স্বামী-স্ত্রীর জীবন একসঙ্গে বীমা করবে, এবং জোড়ার মধ্যে একটাকে কোনও রকমে পটল তোলাতে পারলেই অন্য জন টাকা পাবে। এইসব বীমা কোম্পানি এমন করে তুলেছে যে, মরেও সুখ নেই।'

'কেন, এর মধ্যেও বদ্ মতলব আছে নাকি ?'

'বীমা কোম্পানির নিজের স্বার্থ না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যের মনে দুর্বুদ্ধি জাগিয়ে তোলাও সৎকার্য নয়।'

'অর্থাৎ ? মানে হল কি ?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, হৃদয়ভারাক্রান্ত একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিল, তারপর কড়িকাঠের দিকে অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া নীরবে ধূম উদ্গিরণ করিতে লাগিল।

শীতকাল ; বড়দিনের ছুটি চলিতেছিল। কলিকাতার লোক বাহিরে গিয়া ও বাহিরের লোক কলিকাতায় আসিয়া মহা সমারোহে ছুটি উদ্যাপন করিতেছিল। কয়েক বছর আগেকার কথা, তখন ব্যোমকেশের বিবাহ হয় নাই।

আমরা দুইজনে চিরন্তন অভ্যাসমত সকালে উঠিয়া একত্র চা-পান ও সংবাদপত্রের ব্যবচ্ছেদ করিতেছিলাম। গত তিন মাস একেবারে বেকারভাবে বসিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশের ধৈর্যের লৌহ-শৃঙ্খলও বোধ করি ছিঁড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। দিনের পর দিন সংবাদপত্রের নিষ্প্রাণ ও বৈচিত্র্যহীন পৃষ্ঠা হইতে অপদার্থ খবর সংগ্রহ করিয়া সময় আর কাটিতে চাহিতেছিল না। আমার নিজের মনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিতেছিলাম, ব্যোমকেশের মস্তিষ্কের ক্ষুধা ইন্ধন অভাবে কিরূপ উগ্র ও দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবু সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করি নাই ; বরঞ্চ এই অনীপ্সিত নৈষ্কর্মের জন্য যেন সে-ই মূলতঃ দায়ী, এমনিভাবে তাহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছি।

আজ প্রভাতে তাহার এই হতাশাপূর্ণ ভাব দেখিয়া আমার একটু অনুশোচনা হইল। মস্তিষ্কের খোরাক সহসা বন্ধ হইয়া গেলে সুস্থ বলবান মস্তিষ্কের কিরূপ দুর্দশা হয়, তাহা তো জানিই, উপরন্তু

আবার বন্ধুর খোঁচা খাইতে হইলে ব্যাপারটা নিতান্তই নিষ্করুণ হইয়া পড়ে।

আমি আর তাহাকে প্রশ্ন না করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে খবরের কাগজখানা খুলিলাম।

এই সময়ে চারিদিকে সভা সমিতি ও অধিবেশনের ধুম পড়িয়া যায়, এবারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সংবাদ-ব্যবসায়ীরা সরসতর সংবাদের অভাবে এইসব সভার মামুলি বিবরণ ছাপিয়া পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে। তাহার ফাঁকে ফাঁকে সিনেমা ও থিয়েটার-সার্কাসের বিজ্ঞাপন সচিত্র ও বিচিত্ররূপে আমোদ-লোলুপ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে।

দেখিলাম, কলিকাতাতেই গোটা পাঁচেক বড় বড় সভা চলিতেছে। তা ছাড়া দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার অধিবেশন বসিয়াছে। ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে অনেক হোমরা-চোমরা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত একজোট হইয়াছেন এবং বাক্যধূমে বোধ করি দিল্লীর আকাশ বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সংবাদপত্রের মারফত যতটুকু ধুম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহারই ঠেলায় মস্তিষ্ক কোটরে ঝুল পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

আমি সময় সময় ভাবি, আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা কাজ না করিয়া এত বাগ্‌বিস্তার করেন কেন? দেখিতে পাই, যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি তার চতুর্গুণ বাগ্মী। বেশি কিছু নয়, স্টীম এঞ্জিন বা এরোপ্লেনের মত একটা যন্ত্রও যদি ইহারা আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের বাচালতা ধৈর্য ধরিয়া শুনিতাম। কিন্তু ও সব দূরে থাক, মশা মারিবার একটা বিষও তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বুজরুকি আর কাহাকে বলে!

নিরুৎসুকভাবে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বিবরণ পড়িতে পড়িতে একটা নাম দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইনি কলিকাতার একজন খ্যাতনামা প্রফেসর ও বিজ্ঞান-গবেষক—নাম দেবকুমার সরকার। বিজ্ঞান-সভায় ইনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। অবশ্য ইনি ছাড়া অন্য কোনও বাঙালী যে বক্তৃতা দেন নাই, এমন নয়, অনেকেই দিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ করিয়া দেবকুমারবাবুর নামটা চোখে পড়িবার কারণ, কলিকাতায় তিনি আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের বাসার কয়েকখানা বাড়ির পরে গলির মুখে তাঁহার বাসা। তাঁহার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ আলাপ ছিল না, কিন্তু তাঁহার পুত্র হাবুলের সম্পর্কে আমরা তাঁহার সহিত নেপথ্য হইতেই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

দেবকুমারবাবুর ছেলে হাবুল কিছুদিন হইতে ব্যোমকেশের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ছোকরার বয়স আঠারো-উনিশ, কলেজের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত। ভালমানুষ ছেলে, আমাদের সম্মুখে বেশি কথা বলিতে পারিত না, তদ্গতভাবে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া এই অস্ফুটবাক্‌ ভক্তের পূজা গ্রহণ করিত; কখনও চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিত। হাবুল একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইত।

এই হাবুলের পিতা কিরূপ বক্তৃতা দিয়াছেন, জানিবার জন্য একটু কৌতূহল হইল। পড়িয়া দেখিলাম, দেশী বৈজ্ঞানিকদের অভাব অসুবিধার সম্বন্ধে ভদ্রলোক যাহা বলিয়াছেন, তাহা নেহাত মিথ্যা নয়। ব্যোমকেশকে পড়িয়া শুনাইলে তাহার মনটা বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত হইয়া হয়তো একটু প্রফুল্ল হইতে পারে, তাই বলিলাম, 'ওহে, হাবুলের বাবা দেবকুমারবাবু বক্তৃতা দিয়েছেন, শোনো।'

ব্যোমকেশ কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইল না, বিশেষ ঔৎসুক্যও প্রকাশ করিল না। আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম—

'এ কথা সত্য যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোনও জাতি বড় হইতে পারে নাই। অনেকের ধারণা এইরূপ যে, ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরাঙ্মুখ এবং তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি নাই—এই জন্যই ভারত পরনির্ভর ও পরাধীন হইয়া আছে। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, ভারতের গরিমাময় অতীত তাহার প্রমাণ। নব্য-বিজ্ঞানের যাহা বীজমন্ত্র, তাহা যে ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল ও পরে কাশপুষ্পের বীজের ন্যায় বায়ুতাড়িত হইয়া দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা সুধীসমাজে উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। গণিত, জ্যোতিষ, নিদান, স্থাপত্য—এই চতুস্তম্ভের উপর আধুনিক বিজ্ঞান ও তৎপ্রসূত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, অথচ ঐ চারিটি বিজ্ঞানেরই

জন্মভূমি ভারতবর্ষ।

'কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্তমানে আমাদের এই অসামান্য উদ্ভাবনী প্রতিভা নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি ? আমরা কি মানসিক বলে পূর্বাপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছি ? না—তাহা নহে। আমাদের প্রতিভা অ-ফলপ্রসূ হইবার অন্য কারণ আছে।

'পুরাকালে আচার্য ও ঋষিগণ—যাঁহাদের বর্তমানকালে আমরা savant বলিয়া থাকি—রাজ-অনুগ্রহের আওতায় বসিয়া সাধনা করিতেন। অর্থচিন্তা তাঁহাদের ছিল না, অর্থের প্রয়োজন হইলে রাজা সে অর্থ যোগাইতেন ; সাধনার সাফল্যের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, রাজকোষের অসীম ঐশ্বর্য তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইয়া দিত। আচার্যগণ অভাবমুক্ত হইয়া কুণ্ঠাহীন-চিত্তে সাধনা করিতেন এবং অন্তিমে সিদ্ধি লাভ করিতেন।

'কিন্তু বর্তমান ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অবস্থা কিরূপ ? রাজা বৈজ্ঞানিক-গবেষণার পরিপোষক নহেন—ধনী ব্যক্তিরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমিত আয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া উঞ্ছবৃত্তির সাহায্যে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় ; ফলে আমাদের সিদ্ধিও তদুপযুক্ত হইয়া থাকে। মূষিক যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও হস্তীকে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে না, আমরাও তেমনই বড় বড় আবিষ্ক্রিয়ায় সফল হইতে পারি না ; ক্ষুধাক্ষীণ মস্তিষ্ক বৃহতের ধারণা করিতে পারে না।

'তবু আমি গর্ব করিয়া বলিতে পারি, যদি আমরা অর্থের অভাবে পীড়িত না হইয়া অকুণ্ঠ-চিত্তে সাধনা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা জগতের কোনও জাতির নিকটেই ন্যূন হইয়া থাকিতাম না। কিন্তু হায় ! অর্থ নাই—কমলার কৃপার অভাবে আমাদের বাণীর সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তবু, এই দৈন্য-নির্জিত অবস্থাতেও আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা নিন্দার বিষয় নহে—শ্লাঘার বিষয়। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরিতে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া মাঝে মাঝে অতর্কিতে আবির্ভূত হইয়া আবিষ্কর্তাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে। আবিষ্কারক নিজের গোপন আবিষ্কার সযত্নে বুকে লুকাইয়া নীরবে আরও অধিক জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরিতেছে ; কিন্তু সে একাকী, তাহাকে সাহায্য করিবার কেহ নাই ; বরঞ্চ সর্বদাই ভয়, অন্য কেহ তাহার আবিষ্কার-কণিকার সন্ধান পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা আত্মসাৎ করিবে। লোলুপ, পরস্বগৃধ্নু চোরের দল চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

'তাই বলিতেছি—অর্থ চাই, সহানুভূতি চাই, গবেষণা করিবার অবাধ অফুরন্ত উপকরণ চাই, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে নিষ্কণ্টকে যশোলাভের নিশ্চিন্ত সম্ভাবনা চাই। অর্থ চাই—'

'থামো।'

প্রফেসর মহাশয়ের ভাষাটি বেশ গাল-ভরা, তাই শব্দপ্রবাহে গা ভাসাইয়া পড়িয়া চলিয়াছিলাম। হঠাৎ ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'থামো।'

'কি হল ?'

'চাই—চাই—চাই। আর আস্ফালন ভাল লাগে না। বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর।'

আমি বলিলাম, 'ঐ তো মজা। মানুষ নিজের অক্ষমতার একটা-না-একটা সাফাই সর্বদাই তৈরি করে রাখে। আমাদের দেশের আচার্যরাও যে তার ব্যতিক্রম নয়, দেবকুমারবাবুর লেকচার পড়লেই তা বোঝা যায়।'

ব্যোমকেশের মুখের বিরক্তি ও অবসাদ ভেদ করিয়া একটা ব্যঙ্গ-বঙ্কিম হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'হাবুল ছোকরা দেখতে হাবাগোবা ভালমানুষ হলেও ভেতরে ভেতরে বেশ বুদ্ধিমান। তার বাবা হয়ে দেবকুমারবাবু এমন ইয়ের মত আদি-অন্তহীন বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান কেন, এই আশ্চর্য !'

আমি বলিলাম, 'বুদ্ধিমান ছেলের বাবা হলেই বুদ্ধিমান হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই।

দেবকুমারবাবুকে তুমি দেখেছ ?'

'ঠিক বলতে পারি না। তাঁকে দেখবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কখনও প্রাণে জাগেনি। তবে শুনেছি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেছেন। নির্বুদ্ধিতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে ?' বলিয়া ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে চক্ষু মুদিল।

ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিল। বসিয়া বসিয়া আর কি করিব ভাবিয়া না পাইয়া শেষে পুঁটিরামকে আর এক দফা চা ফরমাস দিব মনে করিতেছি, এমন সময় ব্যোমকেশ হঠাৎ সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।' কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া আবার ঠেসান দিয়া বসিয়া বিরস স্বরে বলিল, 'হাবুল। তার আবার কি হল ? বড্ড তাড়াতাড়ি আসছে।'

মুহূর্ত পরেই হাবুল সজোরে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটা যেন ভয়ে ও অভাবনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনার আঘাতে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এমনিতেই তাহার চেহারাখানা খুব সুদর্শন নয়, একটু মোটাসোটা ধরনের গড়ন, মুখ গোলাকার, চিবুক ও গণ্ডে নবজাত দাড়ির অন্ধকার ছায়া—তাহার উপর এই পাগলের মত আবির্ভাব ; আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, 'কি হে হাবুল ! কি হয়েছে ?'

হাবুলের পাগলের মত দৃষ্টি কিন্তু ব্যোমকেশের উপর নিবদ্ধ ছিল ; আমার প্রশ্ন বোধ করি সে শুনিতেই পাইল না, টলিতে টলিতে ব্যোমকেশের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'ব্যোমকেশদা, সর্বনাশ হয়েছে। আমার বোন রেখা হঠাৎ মরে গেছে।' বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

২

ব্যোমকেশ হাবুলকে হাত ধরিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ তাহাকে শান্ত করা গেল না, সে অসহায়ভাবে কাঁদিতেই লাগিল। বেচারার বয়স বেশি নয়, বালক বলিলেই হয় ; তাহার উপর অকস্মাৎ এই দারুণ ঘটনায় একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

হাবুলের যে বোন আছে, এ খবর আমরা জানিতাম না ; তাহার পারিবারিক খুঁটিনাটি জানিবার কৌতূহল কোনও দিন হয় নাই। শুধু এইটুকু শুনিয়াছিলাম যে, হাবুলের মাতার মৃত্যুর পর দেবকুমারবাবু আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমাতাটি সপত্নী-পুত্রকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন না, ইহাও আঁচে-আন্দাজে বুঝিয়াছিলাম।

মিনিট পাঁচেক পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়া হাবুল ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। দেবকুমারবাবু কয়েক দিন হইল দিল্লী গিয়াছেন ; বাড়িতে হাবুল, তাহার অনূঢ়া ছোট বোন রেখা ও তাহাদের সৎমা আছেন। আজ সকালে উঠিয়া হাবুল যথারীতি নিজের তে-তলার নিভৃত ঘরে পড়িতে বসিয়াছিল ; আটটা বাজিয়া যাইবার পর নীচে হঠাৎ সৎমার কণ্ঠে ভীষণ চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল ; দেখিল, সৎমা রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উর্ধ্বস্বরে প্রলাপ বকিতেছেন। তাঁহার প্রলাপের কোনও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হাবুল রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বোন রেখা উনানের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। কি হইয়াছে জানিবার জন্য হাবুল তাহাকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু রেখা উত্তর দিল না। তখন তাহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিতেই হাবুল বুঝিল, রেখা নাই, তাহার গা বরফের মত ঠাণ্ডা, হাত-পা ক্রমশ শক্ত হইয়া আসিতেছে।

এই পর্যন্ত বলিয়া হাবুল আবার কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমি এখন কি করব, ব্যোমকেশদা ? বাবা বাড়ি নেই, তাই আপনার কাছে ছুটে এলুম। রেখা মরে গিয়েছে—উঃ ! কি করে এমন হল, ব্যোমকেশদা ?'

হাবুলের এই শোক-বিহ্বল ব্যাকুলতা দেখিয়া আমার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। ব্যোমকেশ হাবুলের পিঠে হাত দিয়া বলিল, 'হাবুল, তুমি পুরুষমানুষ, বিপদে অধীর হয়ো না। কি হয়েছিল রেখার, বল দেখি—বুকের ব্যামো ছিল কি ?'

'তা তো জানি না।'

'কত বয়স ?'

'ষোল বছর, আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট।'

'সম্প্রতি কোনও অসুখ-বিসুখ হয়েছিল ? বেরিবেরি বা ঐ রকম কিছু ?'

'না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর বলিল, 'চল তোমার বাড়িতে। নিজের চোখে না দেখলে কিছুই ধারণা করা যাচ্ছে না। তোমার বাবাকে 'তার' করা দরকার, তিনি এসে পড়ুন। কিন্তু সে দু'ঘণ্টা পরে করলেও চলবে। আপাতত একজন ডাক্তার চাই। তোমার বাড়ির কাছেই ডাক্তার রুদ্র থাকেন না ? বেশ—এস অজিত।'

কয়েক মিনিট পরে দেবকুমারবাবুর বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাড়িখানার সম্মুখভাগ সঙ্কীর্ণ, যেন দুই দিকের বাড়ির চাপে চ্যাপ্টা হইয়া ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়া গিয়াছে। নীচের তলায় কেবল একটি বসিবার ঘর, তা ছাড়া ভিতরদিকে কলঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি আছে। আমরা দ্বারে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইতেই অন্দর হইতে একটা তীক্ষ্ণ স্ত্রীকণ্ঠের ছেদ-বিরামহীন আওয়াজ কানে আসিল। কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিহ্ন পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও শোকের লক্ষণ বিশেষ পাওয়া গেল না। বুঝিলাম, বিমাতা বিলাপ করিতেছেন।

একটা বৃদ্ধ গোছের ভৃত্য কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল, 'তুমি এ বাড়ির চাকর ? যাও, ঐ বাড়ি থেকে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এস।'

চাকরটা কিছু একটা করিবার সুযোগ পাইয়া 'যে আজ্ঞে' বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। তখন হাবুলকে অগ্রবর্তী করিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

যাঁহার কণ্ঠস্বর বাহির হইতে শুনিতে পাইয়াছিলাম, তিনি উপরে উঠিবার সিঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া একাকী অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিলেন, আমাদের পদশব্দে তাঁহার চমক ভাঙিল ; তিনি উচ্চকিতভাবে আমাদের পানে চাহিলেন। দুইজন অপরিচিত লোককে হাবুলের সঙ্গে দেখিয়া তিনি মাথার উপর আঁচলটা টানিয়া দিয়া ক্ষিপ্রপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। আমি মুহূর্তের জন্য তাঁহার মুখখানা দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার মনে হইল, তাঁহার আরক্ত চোখের ভিতর একটা ত্রাস-মিশ্রিত বিরক্তির ছায়া দেখা দিয়াই অঞ্চলের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল।

হাবুল অস্ফুটস্বরে বলিল, 'আমার মা—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। রান্নাঘর কোন্‌টা ?'

হাবুল অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিল। অল্প-পরিসর চতুষ্কোণ উঠান ঘিরিয়া ছোট ছোট কয়েকটি কক্ষ ; তাহার মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড়, সেইটি রান্নাঘর। পাশে একটি জলের কল, তাহা হইতে ক্ষীণ ধারায় জল পড়িয়া দ্বারের সম্মুখভাগ পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছে।

জুতা খুলিয়া আমরা রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটা প্রায় অন্ধকার, আলো-প্রবেশের কোনও পথ নাই। হাবুল দরজার পাশে হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিতেই একটা ধোঁয়াটে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব জ্বলিয়া উঠিল। তখন ঘরের অভ্যন্তরভাগ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম।

দ্বারের অপর দিকে দেয়ালে সংলগ্ন পাশাপাশি দু'টি কয়লার উনান, তাহাতে ভাঙা পাথুরে কয়লা স্তূপীকৃত রহিয়াছে ; কিন্তু আগুন নাই। এই অগ্নিহীন চুল্লীর সম্মুখে নতজানু হইয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে—যেন বেদীপ্রান্তে উপাসনারত একটি স্ত্রীমূর্তি। মেয়েটির দেহ সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া আছে, মাথাও বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছে ; হাত দুটি লম্বিত দেখিয়া মনে হয় না যে, সে মৃত। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে গিয়া তাহার নাড়ি টিপিল।

তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম, নাড়ি নাই। ব্যোমকেশ হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে মেয়েটির

চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিল। প্রাণহীন দেহে মৃত্যুকাঠিন্য দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—মুখ অল্প একটু উঠিল।

মেয়েটি বেশ সুশ্রী, হাবুলের মত নয়। রং ফর্সা, মুখের গড়ন ধারালো, নীচের ঠোঁট অভিমানিনীর মত স্বভাবতই ঈষৎ স্ফুরিত। ষোলো বছর বয়সের অনুযায়ী দেহ-সৌষ্ঠবও বেশ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। মাথার দীর্ঘ চুলগুলি বোধ হয় স্নানের পূর্বে বিনুনি খুলিয়া পিঠে ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেই ভাবেই ছড়ানো আছে। পরিধানে একটি অর্ধ-মলিন গঙ্গা-যমুনা ডুরে ; অলঙ্কারের মধ্যে হাতে তিনগাছি করিয়া সোনার চুড়ি, কানে মিনা-করা হাল্কা ঝুমকা, গলায় একটি সরু হার।

ব্যোমকেশ নিকট হইতে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; তার পর দূর হইতে তাহার বসিবার ভঙ্গী ইত্যাদি সমগ্রভাবে দেখিবার জন্য কয়েক পা সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল।

খানিকক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া থাকিয়া সে আবার নিকটে ফিরিয়া আসিল ; মেয়েটির ডান হাতখানি তুলিয়া করতল পরীক্ষা করিয়া দেখিল। করতলে কয়লার কালি লাগিয়া আছে—সে নিজের হাতে উনানে কয়লা দিয়াছে, সহজেই অনুমান করা যায়। অঙ্গুলিগুলি ঈষৎ কুঞ্চিত, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাব পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আছে। ব্যোমকেশ অঙ্গুলি দু'টি সাবধানে পৃথক করিতেই একটি ক্ষুদ্র জিনিস খসিয়া মাটিতে পড়িল। ব্যোমকেশ সেটি মাটি হইতে তুলিয়া নিজের করতলে রাখিয়া আলোর দিকে পরীক্ষা করিল। আমিও ঝুঁকিয়া দেখিলাম—একটি দেশলাইকাঠির অতি ক্ষুদ্র দগ্ধাবশেষ, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া জ্বলিয়া আঙুল পর্যন্ত পৌঁছিলে যেটুকু বাকি থাকে, সেইটুকু।

গভীর মনঃসংযোগে কাঠিটা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ সেটা ফেলিয়া দিল, তারপর মেয়েটির বাঁ হাত তুলিয়া দেখিল। বাঁ হাতটি মুষ্টিবদ্ধ ছিল, মুঠি খুলিতেই একটি দেশলাইয়ের বাক্স দেখা গেল। ব্যোমকেশ বাক্সটি খুলিয়া দেখিল, কয়েকটি কাঠি রহিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'হুঁ। আমিও তাই প্রত্যাশা করেছিলুম। দেশলাই জ্বেলে উনুনে আগুন দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় মৃত্যু হয়েছে।'

অতঃপর ব্যোমকেশ মৃতদেহ ছাড়িয়া ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল ; মেঝের উপর সিক্ত পদচিহ্ন শুকাইয়া অস্পষ্ট দাগ হইয়াছিল, সেগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। শেষে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, মৃত্যুকালে ঘরে আর কেউ ছিল না। পরে একজন স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকেছিলেন, তারপর হাবুল ঢুকেছিল।'

এই সময় বাহিরে শব্দ শুনা গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'বোধ হয় ডাক্তার রুদ্র এলেন। হাবুল, তাঁকে নিয়ে এস।'

হাবুল বাহিরে গেল। আমি এই অবসরে ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যোমকেশ, কিছু বুঝলে?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িল, 'কিছু না। কেবল এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, মেয়েটি মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জানত না যে, মৃত্যু এত নিকট।'

ডাক্তার রুদ্রকে লইয়া হাবুল ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার রুদ্র বয়স্থ লোক ; কলিকাতার একজন নামজাদা চিকিৎসক। কিন্তু অত্যন্ত রূঢ় ও কটুভাষী বলিয়া তাঁহার দুর্নাম ছিল। মেজাজ সর্বদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকিত ; এমন কি মুমূর্ষু রোগীর ঘরেও তিনি এমন ব্যবহার করিতেন যে, তিনি না হইয়া অন্য কোনও ডাক্তার হইলে তাঁহার পেশা চলা কঠিন হইয়া পড়িত। একমাত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি পসার-প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিলেন ; এছাড়া তাঁহার মধ্যে অন্য কোনও গুণ আজ পর্যন্ত কেহ দেখিতে পায় নাই।

ডাক্তার রুদ্রের চেহারা হইতেও তাঁহার চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইত। নিকষ কৃষ্ণ গায়ের রং, ঘোড়ার মত লম্বা কদাকার মুখে রক্তবর্ণ দু'টা চক্ষুর দৃষ্টি দুর্বিনীত আত্মম্ভরিতায় যেন মানুষকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। অধরোষ্ঠের গঠনেও ঐ সার্বজনীন অবজ্ঞা ফুটিয়া উঠিতেছে। তিনি যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন, তখন মনে হইল, মূর্তিমান দম্ভ কোট-প্যান্টালুন ও জুতা সুদ্ধ ঘরের

মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাবুল নীরবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভগিনীর দেহ দেখাইয়া দিল। ডাক্তার রুদ্র স্বভাব-কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে ? মারা গেছে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিই দেখুন।'

ডাক্তার রুদ্র ব্যোমকেশের দিকে দম্ভ-কষায় নেত্র তুলিয়া বলিলেন, 'আপনি কে ?'

'আমি পারিবারিক বন্ধু।'

'ও !'—ব্যোমকেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ডাক্তার রুদ্র হাবুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটি কে—দেবকুমারবাবুর মেয়ে ?'

হাবুল ঘাড় নাড়িল।

ডাক্তার রুদ্রের উত্থিত-ভ্রূ-ললাটে ঈষৎ কৌতূহল প্রকাশ পাইল। তিনি মৃতদেহের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'এরই নাম রেখা ?'

হাবুল আবার ঘাড় নাড়িল।

'কি হয়েছিল ?'

'কিছু না—হঠাৎ—'

ডাক্তার রুদ্র তখন হাঁটু গাড়িয়া রেখার পাশে বসিলেন ; মুহূর্তের জন্য একবার নাড়িতে হাত দিলেন, একবার চোখের পাতা টানিয়া চক্ষু-তারকা দেখিলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'মারা গেছে। প্রায় দু'ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে। Rigor mortis set in করেছে।' কথাগুলি তিনি এমন পরিতৃপ্তির সহিত বলিলেন—যেন অত্যন্ত সুসংবাদ শুনিবামাত্র শ্রোতারা খুশি হইয়া উঠিবে।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কিসে মৃত্যু হয়েছে, বলতে পারেন কি ?'

'সেটা অটপ্সি না করে বলা অসম্ভব। আমি চললুম—আমার ভিজিট বত্রিশ টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। আর, পুলিসে খবর দেওয়া দরকার, মৃত্যু সন্দেহজনক।' বলিয়া ডাক্তার রুদ্র প্রস্থান করিলেন।

৩

রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিসে খবর পাঠানোই উচিত, নইলে আরও অনেক হাঙ্গামা হতে পারে। আমাদের থানার দারোগা বীরেনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।'

এক টুকরা কাগজে তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিয়া ব্যোমকেশ চাকরের হাতে দিয়া থানায় পাঠাইয়া দিল। তারপর বলিল, 'মৃতদেহ এখন নাড়াচাড়া করে কাজ নেই, পুলিস এসে যা হয় করবে।' দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া কহিল, 'হাবুল, একবার রেখার ঘরটা দেখতে গেলে ভাল হত।'

ভারী গলায় 'আসুন' বলিয়া হাবুল আমাদিগকে উপরে লইয়া চলিল। প্রথম খানিকটা কান্নাকাটি করিবার পর সে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিল ; যে যাহা বলিতেছিল, কলের পুতুলের মত তাহাই পালন করিতেছিল।

দ্বিতলে গোটা তিনেক ঘর, তাহার সর্বশেষেরটি রেখার ; বাকী দুইটি বোধ করি দেবকুমারবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর শয়নকক্ষ। রেখার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরটি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও পরিপাটীভাবে গোছানো। আসবাব বেশি নাই, যে কয়টি আছে, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এক ধারে একখানি ছোট খাটের উপর বিছানা ; অপর দিকে জানালার ধারে লিখিবার টেবিল। পাশে ক্ষুদ্র সেল্‌ফে দুই সারি বাঙ্গালা বই সাজানো। দেয়ালে ব্র্যাকেটের উপর একটা আয়না, তাহার

পদমূলে চিরুণী, চুলের ফিতা, কাঁটা ইত্যাদি রহিয়াছে। ঘরটির সর্বত্র গৃহকর্মে সুনিপুণা ও শিক্ষিতা মেয়ের হাতের চিহ্ন যেন আঁকা রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ ঘরের এটা-ওটা নাড়িয়া একবার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, চুলের ফিতা ও কাঁটা লইয়া পরীক্ষা করিল ; তারপর জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। জানালাটা ঠিক গলির উপরেই ; গলির অপর দিকে একটু পাশে ডাক্তার রুদ্রের প্রকাণ্ড বাড়ি ও ডাক্তারখানা। বাড়ির খোলা ছাদ জানালা দিয়া স্পষ্ট দেখা যায়। ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল ; তারপর ফিরিয়া টেবিলের দেরাজ ধরিয়া টানিল।

দেরাজে চাবি ছিল না, টান দিতেই খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহাতে বিশেষ কিছু নাই ; দু' একটা খাতা, চিঠি লেখার প্যাড, গন্ধদ্রব্যের শিশি, ছুঁচ-সুতা ইত্যাদি রহিয়াছে। একটা শিশি তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ দেখিল, ভিতরে কয়েকটা সাদা ট্যাবলয়েড রহিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'অ্যাস্‌পিরিন। রেখা কি অ্যাস্‌পিরিন খেত ?'

হাবুল বলিল, 'হ্যাঁ—মাঝে মাঝে তার মাথা ধরত—'

শিশি রাখিয়া দিয়া আবার ব্যোমকেশ চিন্তিতভাবে ঘরময় পরিভ্রমণ করিল, শেষে বিছানার সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিছানায় শয়নের চিহ্ন বিদ্যমান, লেপটা এলোমেলোভাবে পায়ের দিকে পড়িয়া আছে, মাথার বালিশ মাথার চাপের দাগ। কিছুক্ষণের জন্য শ্মশান-বৈরাগ্যের মত একটা ভাব মনকে বিষণ্ণ করিয়া দিল—এই তো মানুষের জীবন—যাহার শয়নের দাগ এখনও শয্যা হইতে মিলাইয়া যায় নাই, সে প্রভাতে উঠিয়াই কোন্ অনন্তের পথে যাত্রা করিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে মাথার বালিশটা তুলিল ; এক খণ্ড ফিকা সবুজ রঙের কাগজ বালিশের তলায় চাপা ছিল, বালিশ সরাইতেই সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্যোমকেশ সচকিতে কাগজখানা তুলিয়া লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, ভাঁজকরা চিঠির কাগজ। সে একবার একটু ইতস্তত করিল, তারপর চিঠির ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

আমিও গলা বাড়াইয়া চিঠিখানি পড়িলাম। মেয়েলী ছাঁদের অক্ষরে তাহাতে লেখা ছিল—

নন্তুদা,

আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল। তোমার বাবা দশ হাজার টাকা চান, অত টাকা বাবা দিতে পারবেন না।

আর কাউকে আমি বিয়ে করতে পারব না, এ বোধ হয় তুমি জানো। কিন্তু এ বাড়িতে থাকাও আর অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমাকে একটু বিষ দিতে পার ? তোমাদের ডাক্তারখানায় তো অনেক রকম বিষ পাওয়া যায়। দিও ; যদি না দাও, অন্য যে-কোনও উপায়ে আমি মরব। তুমি তো জানো, আমার কথার নড়চড় হয় না। ইতি—

তোমার রেখা

চিঠিখানা পড়িয়া ব্যোমকেশ নীরবে হাবুলের হাতে দিল। হাবুল পড়িয়া আবার ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রু-উদ্‌গলিত কণ্ঠে বলিল, 'আমি জানতুম এই হবে, রেখা আত্মহত্যা করবে—'

'নন্তু কে ?'

'নন্তুদা ডাক্তার রুদ্র'র ছেলে। রেখার সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধও হয়েছিল। নন্তুদা বড় ভাল, কিন্তু ঐ চামারটা দশ হাজার টাকা চেয়ে বাবাকে রাগিয়ে দিলে—'

ব্যোমকেশ নিজের মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল, 'কিন্তু— ; যাক।' তারপর হাবুলের হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া স্নিগ্ধস্বরে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। হাবুল রুদ্ধস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশদা, নিজের বলতে আমার ঐ বোনটি ছাড়া আর কেউ ছিল না। মা নেই—বাবাও আমাদের কথা ভাববার সময় পান না—' বলিয়া সে মুখে কাপড় দিয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

যা হোক, ব্যোমকেশের স্নিগ্ধ সান্ত্বনাবাক্যে কিছুক্ষণ পরে সে অনেকটা শান্ত হইল। তখন

ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, এখনই পুলিস আসবে। তার আগে তোমার মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

হাবুলের বিমাতা নিজের ঘরে ছিলেন। হাবুল গিয়া ব্যোমকেশের আবেদন জানাইল, তিনি আড়ঘোমটা টানিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিপূর্বে তাঁহাকে এক-নজর মাত্র দেখিয়াছিলাম, এখন আরও ভাল করিয়া দেখিলাম।

তাঁহার বয়স বোধ হয় সাতাশ-আটাশ বছর ; রোগা লম্বা ধরনের চেহারা, রং বেশ ফর্সা, মুখের গড়নও সুন্দর। কিন্তু তবু তাঁহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলা তো দূরের কথা, চলনসই বলিতেও দ্বিধা হয়। চোখের দৃষ্টিতে একটা স্থায়ী প্রখরতা ভ্রূযুগলের মধ্যে দুইটি ছেদরেখা টানিয়া দিয়াছে ; পাৎলা সুগঠিত ঠোঁট এমনভাবে ঈষৎ বাঁকা হইয়া আছে, যেন সর্বদাই অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখিয়া শ্লেষ করিতেছে। তাঁহার অসন্তোষ-চিহ্নিত মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, বিবাহের পর হইতে ইনি এক দিনের জন্যও সুখী হন নাই। মানসিক উদারতার অভাবে সপত্নী-সন্তানদের কখনও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, নিজেরও সন্তান হয় নাই ; তাই তাঁহার স্নেহহীন চিত্ত মরুভূমির মত উষর ও শুষ্ক রহিয়া গিয়াছে।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম—তাঁহার বোধহয় শুচিবাই আছে। তিনি যেরূপ ভঙ্গীতে দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাতে মনে হইল, তিনি নিজেকে ও নিজের ঘরটিকে সর্বপ্রকার অশুদ্ধি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাছে আমরা তাঁহার ঘরে পদার্পণ করিয়া ঘরের নিষ্কলুষ পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিই, তিনি দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

আমরা অবশ্য ঘরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম না, বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আজ সকালে রেখার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?'

প্রত্যুত্তরে মহিলাটি একগঙ্গা কথা বলিয়া গেলেন। দেখিলাম, অন্যান্য নারীসুলভ সদ্‌গুণের মধ্যে বাচালতাও বাদ যায় নাই—একবার কথা কহিবার অবকাশ পাইলে আর থামিতে পারেন না। ব্যোমকেশের স্বল্পাক্ষর প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁহার মনের ও সংসারের অধিকাংশ কথাই বলিয়া ফেলিলেন। আজ সকালে ঝি আসে নাই দেখিয়া তিনি রেখাকে রান্নাঘর নিকাইয়া উনানে আগুন দিতে বলিয়াছিলেন। অবশ্য সপত্নী-সন্তানদের তিনি কখনও আঙুল নাড়িয়াও সংসারের কোনও কাজ করিতে বলেন না—নিজের গতর যতদিন আছে, নিজেই সব করেন। কিন্তু তবু সংসারের ঊনকুটি-চৌষট্টি কাজ তো আর একা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তাই তিনি রেখাকে উনান ধরাইতে বলিয়া স্বয়ং নিজের শয়নকক্ষের জঞ্জাল মুক্ত করিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নান সারিয়া উপরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, রান্নাঘরে কি হইতেছে না হইতেছে, দেখেন নাই। তারপর কাপড় ছাড়িয়া চুল মুছিয়া দশবার ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিয়া নীচে গিয়া দেখেন—ঐ কাণ্ড! সপত্নী-সন্তানদের কোনও কথায় তিনি থাকেন না, অথচ এমনই তাঁহার দুর্দৈব যে, যত ঝঞ্ঝাট তাঁহাকেই পোহাইতে হয়। এখন যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে সকলে হয়তো তাঁহাকেই দূষিবে, বিশেষত কর্তা ফিরিয়া আসিয়া যে কি মহামারী কাণ্ড বাধাইবেন, তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। একে তো তিনি কর্তার চক্ষুঃশূল, তিনি মরিলেই কর্তা বাঁচেন।

বাক্যস্রোত কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ সকালে আপনি রেখাকে কি কোনও রূঢ় কথা বলেছিলেন ?'

এবার মহিলাটি একবারে ঝাঁকিয়া উঠিলেন, 'রূঢ় কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না তেমন ভদ্রলোকের মেয়ে আমি নই। এ বাড়িতে ঢুকে অবধি সতীন-পো সতীন-ঝি নিয়ে ঘর করছি, কিন্তু কেউ বলুক দেখি যে, একটা কড়া কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। তবে আজ সকালে রেখাকে উনুন ধরাতে পাঠালুম, সে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বললে, 'দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না।'—বলে ঘরে ঢুকে ব্র্যাকেটের উপর থেকে দেশলাই নিলে। আমি তখন মেঝে মুছছিলুম, বললুম, 'বাসি কাপড় ঘরে ঢুকলে ? এতবড় মেয়ে হয়েছ, এটুকু হুঁস নেই ? দেশলাইয়ের দরকার ছিল, দোকান থেকে একটা আনিয়ে নিলেই পারতে।' এইটুকু বলেছি, এ ছাড়া আর একটি কথাও

আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে তো ঘাট মানছি।'

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল, 'অপরাধের কথা নয় ; কিন্তু দেশলাই নিতে রেখা আপনার ঘরে এল কেন ? আপনার ঘরেই কি দেশলাই থাকে ?'

গৃহিণী বলিলেন, 'হ্যাঁ। রাত্তিরে আমি অন্ধকারে ঘুমতে পারি না, তেলের ল্যাম্প জ্বেলে শুই—তাই ঘরে দেশলাই রাখতে হয়। ঐ ব্র্যাকেটের উপর ল্যাম্প আর দেশলাই থাকে। সবাই জানে, রেখাও জানত।'

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, খাটের শিয়রের দিকে দেয়ালে একটি ক্ষুদ্র কাঠের ব্র্যাকেট, তাহার উপর ছোট একটি ল্যাম্প রহিয়াছে। ঘরের অন্যান্য অংশও এই সুযোগে দেখিয়া লইলাম। পরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে ঘরের আসবাবপত্র যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে। এমন কি দেয়ালে লম্বিত মা কালীর ছবিখানিও যেন ঘরের শুচিতা-ভঙ্গের ভয়ে সন্ত্রস্তভাবে জিভ বাহির করিয়া আছেন।

চিন্তাকুঞ্চিত ললাটে ব্যোমকেশ বলিল, "ও—তাহলে এই সময় রেখাকে আপনি শেষ দেখেন ? তারপর আর তাকে জীবিত দেখেননি ?"

'না'—বলিয়া গৃহিণী বোধ করি আবার একপ্রস্থ বক্তৃতা শুরু করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নীচে হইতে চাকর জানাইল যে, দারোগাবাবু আসিয়াছেন।

আমরা নীচে নামিয়া গেলাম।

দারোগা বীরেনবাবুর সহিত ব্যোমকেশের ঘনিষ্ঠতা ছিল, দু'জনেই দু'জনের কদর বুঝিতেন। বীরেনবাবু মধ্যবয়স্ক লোক, হৃষ্টপুষ্ট মজবুত চেহারা—বিচক্ষণ ও চতুর কর্মচারী বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। বিশেষত তাঁহার মধ্যে পুলিস-সুলভ আত্মম্ভরিতা বা অন্যের কৃতিত্ব লঘু করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া ব্যোমকেশ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। কয়েকটা জটিল ব্যাপারে ব্যোমকেশকে তাঁহার সাহায্য লইতেও দেখিয়াছি। শহরের নিম্নশ্রেণীর গাঁটকাটা ও গুণ্ডাদের চালচলন সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ অভিজ্ঞতা ছিল।

ব্যোমকেশের সহিত মুখোমুখি হইতেই বীরেনবাবু বলিলেন, 'কি খবর, ব্যোমকেশবাবু ! গুরুতর কিছু না কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি নিজেই তার বিচার করুন।' বলিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া চলিল।

৪

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য রওনা করিয়া দিয়া, দেবকুমারবাবুকে 'তার' পাঠাইয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিতে বেলা দু'টা বাজিয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া আমরা যখন আহারাদি সম্পন্ন করিয়া উঠিলাম, তখন শীতের বেলা পড়িয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ বিমনা ও নীরব হইয়া রহিল। আমিও মনের মধ্যে অনুতাপের মত একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। মস্তিষ্কের যে খোরাকের জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা এমন নির্মমভাবে দেখা দিবে, কে ভাবিয়াছিল ? বেচারা হাবুলের কথা বার বার মনে পড়িয়া মনটা ব্যথা-পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল, ব্যোমকেশ দৃষ্টিহীন চক্ষে জানালার বাহিরে তাকাইয়া নীরব হইয়াই রহিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আত্মহত্যা তাহলে ? কি বল ?'

ব্যোমকেশ চমকিয়া উঠিল, 'অ্যাঁ ! ও—রেখার কথা বলছ ? তোমার কি মনে হয় ?'

যদিও মন সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ছিল না, তবু বলিলাম, 'আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে ? চিঠি থেকে তো ওর অভিপ্রায় বেশ বোঝাই যাচ্ছে।'

'তা যাচ্ছে। কি উপায়ে আত্মহত্যা করেছে, তুমি মনে কর ?'

'বিষ খেয়ে। সে কথাও তো চিঠিতে—'

'আছে। কিন্তু বিষ পাবার আগেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কি করে হতে পারে, আমি ভেবে পাচ্ছি না। চিঠিতে রেখা বিষ চেয়েছিল, কিন্তু চিঠি যখন যথাস্থানে পৌঁছায়নি লেখিকার বালিশের তলাতেই থেকে গিয়েছিল, তখন বিষ এল কোত্থেকে ?'

আমি বলিলাম, 'চিঠিতে আছে, সে বিষ না পেলে অন্য যে কোনও উপায়ে—'

'কিন্তু চিঠি পাঠাবার আগেই সে অন্য উপায় অবলম্বন করবে, এটা তুমি সম্ভব মনে কর ?'

আমি নিরুত্তর হইলাম।

কিয়ৎকাল পরে ব্যোমকেশ বলিল, 'তা ছাড়া উনুন জ্বালতে জ্বালতে কেউ আত্মহত্যা করে না। রেখার মৃত্যু এসেছিল অকস্মাৎ—নির্মেঘ আকাশ থেকে বিদ্যুতের মত। এত ক্ষিপ্র এমন অমোঘ এই মৃত্যুবাণ যে, সে একটু নড়বার অবকাশ পায়নি, দেশলাইয়ের কাঠি হাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'কি করে এমন মৃত্যু সম্ভব হল ?'

'সেইটেই বুঝতে পারছি না। জানি তো বিষের মধ্যে এক হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড ছাড়া এত ভয়ঙ্কর শক্তি আর কারুর নেই। কিন্তু—' ব্যোমকেশের অসমাপ্ত কথা চিন্তার মধ্যে নির্বাণ লাভ করিল।

আমি একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, 'আমি ডাক্তারি সম্বন্ধে কিছু জানি না, কিন্তু হঠাৎ হার্টফেল করে মৃত্যু সম্ভব নয় কি ?'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'ঐ সম্ভাবনাটাই দেখেছি ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে। রেখা মাথাধরার জন্যে অ্যাস্‌পিরিন খেত, হয়তো ভেতরে ভেতরে হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল—কিন্তু না, কোথায় যেন বেধে যাচ্ছে, হার্টফেলের সম্ভাবনাটা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে পারছি না, যদিও যুক্তি-প্রমাণ সব ঐ দিকেই নির্দেশ করছে।' ব্যোমকেশ অপ্রতিভভাবে হাসিল—'বুদ্ধির সঙ্গে মনের আপোস করতে পারছি না ; কেবলই মনে হচ্ছে, মৃত্যুটা সহজ নয়, সাধারণ নয়, কোথায় এর একটা মস্ত গলদ আছে। কিন্তু যাক, এখন মিথ্যে মাথা গরম করে লাভ নেই। কাল ডাক্তারের রিপোর্ট পেলেই সব বোঝা যাবে।'

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশ উঠিয়া আলো জ্বালিল। এই সময় বহির্দ্বারে আস্তে আস্তে টোকা মারার শব্দ হইল। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যায় নাই, ব্যোমকেশ বিস্মিতভাবে ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'কে ? ভেতরে এস !'

একটি অপরিচিত যুবক নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, সুশ্রী চেহারা—কিন্তু শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ট্র্যাজেডির ছায়া পড়িয়াছে। পায়ে রবার-সোল জুতা ছিল বলিয়া তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই নাই। সে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, 'আমার নাম মন্মথনাথ রুদ্র—'

ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল, 'আপনিই নন্তুবাবু ? আসুন।'—বলিয়া একটা চেয়ার দেখাইয়া দিল।

চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া যুবক থামিয়া থামিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে চেনেন ?'

ব্যোমকেশ টেবিলের সম্মুখে বসিয়া বলিল, 'সম্প্রতি আপনার নাম জানবার সুযোগ হয়েছে। আপনি রেখার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানতে চান ?'

যুবকের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপিয়া গেল, সে বলিল, 'হ্যাঁ। কি করে তার মৃত্যু হল, ব্যোমকেশবাবু ?'

'তা এখনও জানা যায়নি।'

অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চক্ষু ব্যোমকেশের মুখের উপর রাখিয়া মন্মথ বলিল, 'আপনার কি সন্দেহ সে আত্মহত্যা করেছে ?'

'সম্ভব নয়।'

'তবে কি কেউ তাকে—'

'এখনও জোর করে কিছু বলা যায় না।'

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মন্মথ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল, 'আপনারা হয়তো শুনেছেন, রেখার সঙ্গে আমার—'

'শুনেছি।'

মন্মথ এতক্ষণ জোর করিয়া সংযম রক্ষা করিতেছিল, এবার ভাঙিয়া পড়িল, অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'ছেলেবেলা থেকে ভালবাসতুম ; যখন রেখার ছ'বছর বয়স, আমি ওদের বাড়িতে খেলা করতে যেতুম, তখন থেকে। তারপর যখন বিয়ের সম্বন্ধ হল, তখন বাবা এমন এক শর্ত দিলেন যে, বিয়ে ভেঙে গেল। তবু আমি ঠিক করেছিলুম, বাবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করব। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। বাবা বললেন বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন। তবু আমি—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবার সঙ্গে আপনার কখন ঝগড়া হয়েছিল ?'

'কাল দুপুরবেলা। আমি বলেছিলুম, রেখাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না। তখন কে জানত যে রেখা—কিন্তু কেন এমন হল, ব্যোমকেশবাবু ? রেখাকে প্রাণে মেরে কার কি লাভ হল ?'

ব্যোমকেশ একটা পেন্সিল লইয়া টেবিলের উপর হিজিবিজি কাটিতেছিল, মুখ না তুলিয়া বলিল, 'আপনার বাবার কিছু লাভ হতে পারে।'

মন্মথ চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, 'বাবা ! না না—এ আপনি কি বলছেন ? বাবা—'

ত্রাস-বিস্ফারিত নেত্রে শূন্যের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, মন্মথ আর কোনও কথা না বলিয়া স্খলিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, সে গাঢ় মনঃসংযোগে টেবিলের উপর হিজিবিজি কাটিতেছে।

৫

পরদিন সকালবেলাটা ডাক্তারের রিপোর্টের প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল। কিন্তু রিপোর্ট আসিল না। ব্যোমকেশ ফোন করিয়া থানার খবর লইল, কিন্তু সেখানে কোনও খবর পাওয়া গেল না।

বৈকালে বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটার সময় দেবকুমারবাবু আসিলেন। আলাপ না থাকিলেও তাঁহার সহিত মুখচেনা ছিল ; আমরা খাতির করিয়া তাঁহাকে বসাইলাম। তিনি হাবুলের টেলিগ্রাম পাইবামাত্র দিল্লী ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিলেন, আজ দ্বিপ্রহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

তাঁহার বয়স চল্লিশ কি একচল্লিশ বৎসর ; কিন্তু চেহারা দেখিয়া আরও বর্ষীয়ান মনে হয়। মোটাসোটা দেহ, মাথায় টাক, চোখে পুরু কাচের চশমা। তিনি স্বভাবত একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়—অর্থাৎ বাহিরের জগতের চেয়ে অন্তর্লোকেই বেশি বাস করেন। তাঁহার গলাবন্ধ কোট ও গোল চশমা-পরিহিত পেচকের ন্যায় চেহারা কলিকাতার ছাত্রমহলে কাহারও অপরিচিত ছিল না, প্রতিবেশী বলিয়া আমিও পূর্বে কয়েকবার দেখিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিলাম, তাঁহার চেহারা কেমন যেন শুকাইয়া উঠিয়াছে। চোখের কোলে গভীর কালির দাগ, গালের মাংস চুপসিয়া গিয়াছে, পূর্বের সেই পরিপুষ্ট ভাব আর নাই।

চশমার কাচের ভিতর দিয়া আমার পানে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনিই ব্যোমকেশবাবু ?'

আমি ব্যোমকেশকে দেখাইয়া দিলাম। তিনি ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,

'ও।'—বলিয়া হাতের লাঠিটা টেবিলের উপর রাখিলেন।

ব্যোমকেশ অস্ফুটস্বরে মামুলি দু'একটা সহানুভূতির কথা বলিল ; দেবকুমারবাবু বোধ হয় তাহা শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষু একবার ঘরের চারিদিক পরিভ্রমণ করিল, তারপর তিনি ক্লান্তিশিথিল স্বরে বলিলেন, 'কাল বেলা দশটায় দিল্লী থেকে বেরিয়ে আজ আড়াইটার সময় এসে পৌঁছেছি। প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা ট্রেনে—'

আমরা চুপ করিয়া রহিলাম ; দৈহিক শ্রান্তির পরিচয় তাঁহার প্রতি অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

দেবকুমার অতঃপর ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, 'হাবুলের মুখে আপনার কথা শুনেছি—বিপদের সময় সাহায্য করেছেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সে কি কথা, যদি একটু সাহায্য করতে পেরে থাকি, সে তো প্রতিবেশীর কর্তব্য।'

'তা বটে ; কিন্তু আপনি কাজের লোক—' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছিল মেয়েটার ? কিছু বুঝতে পেরেছেন কি ? বাড়িতে ভাল করে কেউ কিছু বলতে পারলে না।'

ব্যোমকেশ তখন যতখানি দেখিয়াছিল ও বুঝিয়াছিল, দেবকুমারবাবুকে বিবৃত করিল। শুনিতে শুনিতে দেবকুমারবাবু অন্যমনস্কভাবে পকেট হইতে সিগার বাহির করিলেন, সিগার মুখে ধরিয়া তারপর আবার কি মনে করিয়া সেটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলাম, দেখিলাম, ব্যোমকেশের কথা শুনিতে শুনিতে তিনি এত তন্ময় হইয়া গিয়াছেন যে, স্নায়বিক উত্তেজনার বশে তাঁহার অস্থির হাত দু'টা যে কি করিতেছে, সে দিকে লক্ষ্য নাই। একবার তিনি চশমা খুলিয়া বড় বড় চোখ দু'টা নিষ্পলকভাবে প্রায় দু'মিনিট আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন ; তারপর আবার চশমা পরিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশের বিবরণ শেষ হইলে দেবকুমারবাবু অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'হুঁ, ঐ ডাক্তার রুদ্রটা আমার বাড়িতে ঢুকেছিল ! চামার ! চণ্ডাল ! টাকার জন্য ও পারে না, এমন কাজ নেই। একটা জীবন্ত পিশাচ !' উত্তেজনার বশে তিনি লাঠিটা মুঠি করিয়া ধরিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; তাঁহার মুখ হঠাৎ ভীষণ হিংস্রভাব ধারণ করিল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই কিন্তু আবার তাঁহার মুখ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমাদের চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয় মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, 'আমি যাই। ব্যোমকেশবাবু, আর একবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দ্বার পর্যন্ত গিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি চিন্তা করিলেন ; তারপর ফিরিয়া বলিলেন, 'আমার পয়সা থাকলে এ ব্যাপারের অনুসন্ধানে আপনাকে নিযুক্ত করতুম। কিন্তু আমি গরীব—আমার পয়সা নেই।' ব্যোমকেশ কি একটা বলিতে চাহিলে তিনি লাঠি নাড়িয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'বিনা পারিশ্রমিকে আমি কারুর সাহায্য গ্রহণ করতে পারব না। পুলিস অনুসন্ধান করছে, তারাই যা পারে করুক। আর, অনুসন্ধান করবার আছেই বা কি ? হাজার অনুসন্ধান করলেও আমার মেয়ে তো আর আমি ফিরিয়ে পাব না।' বলিয়া কোনও প্রকার অভিবাদন না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই অদ্ভুত মনুষ্যটি চলিয়া যাইবার পর দীর্ঘকাল আমরা হতবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম। শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা ভ্রম সংশোধন হল। আমরা ধারণা হয়েছিল, দেবকুমারবাবু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন না—সেটা ভুল। অন্তত মেয়েকে তিনি খুব বেশি ভালবাসেন।'

সিগারটা দেবকুমারবাবু ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আশ্চর্য অন্যমনস্ক লোক।' বলিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'ডাক্তার রুদ্র'র ওপর ভয়ঙ্কর রাগ দেখলুম।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

সন্ধ্যার পর দারোগা বীরেনবাবু স্বয়ং ডাক্তারের রিপোর্ট লইয়া আসিলেন। বলিলেন, 'রিপোর্ট বড় disappointing, বারবার পরীক্ষা করেও মৃত্যুর কারণ ধরতে পারা যায়নি।'

রিপোর্ট পড়িয়া দেখিলাম, ডাক্তার লিখিয়াছেন, দেহের কোথাও ক্ষতচিহ্ন নাই ; শরীরের অভ্যন্তরেও কোনও বিষ পাওয়া যায় নাই। হৃদযন্ত্র সবল ও স্বাভাবিক, সুতরাং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার জন্য মৃত্যু হয় নাই। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, অকস্মাৎ স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত হওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত ঘটিল, তাহা বলিতে ডাক্তার অক্ষম। এরূপ অদ্ভুত লক্ষণহীন মৃত্যু তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই।

ব্যোমকেশ কাগজখানা হাতে লইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিতমুখে বসিয়া রহিল।

বীরেনবাবু বলিলেন, 'এ কেস অবশ্য করোনারের কোর্টে যাবে ; সেখানে 'অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু' রায় বেরুবে। তারপর আমরা—অর্থাৎ পুলিস—ইচ্ছে করলে অনুসন্ধান চালাতে পারি, আবার না-ও চালাতে পারি। ব্যোমকেশবাবু, আপনি কি বলেন ? এই রিপোর্টের পর অনুসন্ধান করলে কোনও ফল হবে কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ফল হবে কি না বলতে পারি না ; কিন্তু অনুসন্ধান চালানো উচিত।'

বীরেনবাবু উৎসুকভাবে বলিলেন, 'কেন বলুন দেখি ? আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন ?'

'ঠিক যে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সন্দেহ করি, তা নয়। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মধ্যে গোলমাল আছে।'

বীরেনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, দেবকুমারবাবুর স্ত্রীকে আপনার কি রকম মনে হল ?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'দেখুন, আমার মনে হয়, ও-পথে গেলে হবে না। এ মৃত্যু-রহস্যের জট ছাড়াতে হলে সর্বপ্রথম জানতে হবে—কি উপায়ে মৃত্যু হয়েছিল। এটা যতক্ষণ না জানতে পারছেন, ততক্ষণ একে ওকে সন্দেহ করে কোনও ফল হবে না। অবশ্য এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মেয়েটির মৃত্যুর সময় তার সৎমা আর সহোদর ভাই ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল না। কিন্তু তাই বলে আসল জিনিসটিকে দৃষ্টির বাইরে যেতে দিলে চলবে না।'

'কিন্তু ডাক্তার যে-কথা বলতে পারছে না—'

'ডাক্তার কেবল শব পরীক্ষা করেছেন, আমরা শব ছাড়া আরও অনেক কিছু দেখেছি। সুতরাং ডাক্তার যা পারেননি আমরাও তা পারব না, এমন কোনও কথা নেই।'

দ্বিধাপূর্ণস্বরে বীরেনবাবু বলিলেন, 'তা বটে—কিন্তু ; যা হোক, আপনি তো দেবকুমারবাবুর পক্ষ থেকে গোড়া থেকেই আছেন, শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় থাকবেন—দু'জনে পরামর্শ করে চলা যাবে।'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'উঁহু। এই খানিক আগে দেবকুমারবাবু এসেছিলেন—তিনি আমাকে বরখাস্ত করে গেছেন।'

বিস্মিত বীরেনবাবু বলিলেন, 'সে কি ?'

'হ্যাঁ। আমার অবৈতনিক সাহায্য তিনি চান না—আর টাকা দিয়ে আমাকে নিয়োগ করতে তিনি অক্ষম।'

'বটে ! তিনি অক্ষম কিসে ? তিনি তো মোটা মাইনের চাকরি করেন, সাত আটশ' টাকা মাইনে পান শুনেছি।'

'তা হবে।'

বীরেনবাবুর ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'হুঁ, দেবকুমারবাবুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হচ্ছে। কিন্তু আপনার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করবার কি কারণ থাকতে পারে ? তিনি কাউকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন না তো ?'

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। দেবকুমারবাবু অপরাধীকে আড়াল করিবার জন্য কৌশলে

ব্যোমকেশের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এ কথা শুনিতে যেমন অদ্ভুত, তেমনিই হাস্যকর।

বীরেনবাবু ঈষৎ তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, 'হাসছেন যে ?'

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিাম, 'আপনি দেবকুমারবাবুকে দেখেছেন ?'

'না।'

'তাকে দেখলেই বুঝবেন, কেন হাসছি।'

অতঃপর বীরেনবাবু উঠিলেন। বিদায়কালে ব্যোমকেশকে বলিলেন, 'আমি এ ব্যাপারের তল পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখব, যদি কিনারা করতে পারি।—আপনি কিন্তু ছাড়া পাবেন না। দেবকুমারবাবু আপনাকে বরখাস্ত করেছেন বটে, কিন্তু দরকার হলে আমি আপনার কাছে আসব মনে রাখবেন।'

ব্যোমকেশ খুশি হইয়া বলিল, 'সে তো খুব ভাল কথা। আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সাহায্য করব। হাবুলের সম্পর্কে এ ব্যাপারে আমার একটা ব্যক্তিগত আকর্ষণও রয়েছে।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'বেশ বেশ। আচ্ছা, উপস্থিত কোন্ পথে চললে ভাল হয়, কিছু ইঙ্গিত দিতে পারেন কি ? যা হোক একটা সূত্র ধরে কাজ আরম্ভ করতে হবে তো।'

ব্যোমকেশ ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'ডাক্তার রুদ্র'র দিক থেকে কাজ আরম্ভ করুন ; এ গোলক-ধাঁধার সত্যিকার পথ হয়তো ঐ দিকেই আছে।'

বীরেনবাবু চকিতভাবে চাহিলেন, 'ও—আচ্ছা—'

তিনি নতমস্তকে ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন।

৬

ইহার পর পাঁচ ছয় দিন একটানা ঘটনাহীনভাবে কাটিয়া গেল। ব্যোমকেশ আবার যেন ঝিমাইয়া পড়িল। সকালে কাগজ পড়া এবং বৈকালে টেবিলের উপর পা তুলিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষু শূন্যে মেলিয়া থাকা ছাড়া তাহার আর কাজ রহিল না।

বীরেনবাবুও এ কয়দিনের মধ্যে দেখা দিলেন না, তাই তাঁহার তদন্ত কতদূর অগ্রসর হইল, জানিতে পারিলাম না। আগন্তুকের মধ্যে কেবল হাবুল একবার করিয়া আসিত। সে আসিলে ব্যোমকেশ নিজের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া নানাবিধ আলোচনায় তাহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু হাবুলের মনে যেন একটা বিমর্ষ অবসন্নতা স্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে নৈরাশ্যপূর্ণ দীপ্তিহীন চোখে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত, তারপর আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

বাড়িতে কি হইতেছে না হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেও সে ভালরূপ জবাব দিতে পারিত না। বিমাতার রসনা নরম না হইয়া আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথার ভঙ্গীতে ইহার আভাস পাইতাম। শেষদিন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বাবা আজ রাত্রে পাটনা যাচ্ছেন ; সেখানে য়ুনিভার্সিটিতে লেকচার দিতে হবে।' বুঝিলাম, শোকের উপর অহর্নিশি কথার কচকচি সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি পলায়ন করিতেছেন। এই নির্লিপ্তস্বভাব বৈজ্ঞানিকের পারিবারিক অশান্তির কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল।

সেদিন হাবুল প্রস্থান করিবার পর বীরেনবাবু আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। যা হোক, ব্যোমকেশ তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইল।

আমাদের বৈকালিক চায়ের সময় হইয়াছিল, অচিরাৎ চা আসিয়া পৌঁছিল। তখন ব্যোমকেশ বীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তারপর—খবর কিছু আছে ?'

পেয়ালায় চুমুক দিয়া বিমর্ষভাবে বীরেনবাবু বলিলেন, 'কোনও দিকেই কিছু সুবিধা হচ্ছে না। যেদিকে হাত বাড়াচ্ছি কিছু ধরতে ছুঁতে পারছি না, প্রমাণ পাওয়া তো দূরের কথা, একটা সন্দেহের

ইশারা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ, আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, এর ভেতর একটা গভীর রহস্য লুকোনো রয়েছে ; যতই প্রতিপদে ব্যর্থ হচ্ছি, ততই এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নূতন কিছু জানতে পেরেছেন ?'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'আমি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তিনি অবশ্য রিপোর্টের বাইরে যেতে রাজী নন, তবু মনে হল, তাঁর একটা থিয়োরি আছে। তিনি মনে করেন, কোনও অজ্ঞাত বিষের বাষ্প নাকে যাওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে। তিনি খুব অস্পষ্ট আবছায়াভাবে কথাটা বললেন বটে, তবু মনে হল, তাঁর ঐ বিশ্বাস।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'উনুন ধরাবার সময় মৃত্যু হয়েছিল, এ কথা ডাক্তারকে বলেছিলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। আর এ দিকে ? ডাক্তার রুদ্র সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ। যতদূর জানতে পারলুম, লোকটা নির্জলা পাষণ্ড আর অর্থপিশাচ। কয়েকজন ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর উপর নিজের আবিষ্কৃত ইন্‌জেকশান পরীক্ষা করতে গিয়ে তাদের সাবাড় করেছে, এ গুজবও শুনেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান ব্যাপারে তাকে খুনের আসামী করা যায় না। দেবকুমারবাবুর মেয়ের সঙ্গে ওর ছেলের সম্বন্ধ হয়েছিল, এ খবরও ঠিক। লোকটা দশ হাজার টাকা বরপণ দাবি করেছিল। দেবকুমারবাবুর অত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, কাজেই তাঁকে সম্বন্ধ ভেঙে দিতে হল। ডাক্তার রুদ্র'র ছেলেটা কিন্তু ভদ্রলোক। বাপের সঙ্গে এই নিয়ে তার ভীষণ ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এ বাড়িতে এই কাণ্ড—মেয়েটি হঠাৎ মারা গেল। তারপর ছোকরাটি শুনলুম বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে ; তার বিশ্বাস, তার বাপই প্রকারান্তরে মেয়েটির মৃত্যুর কারণ।'

মন্মথ যে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এ সংবাদ নূতন বটে, কিন্তু আর সব কথাই আমরা পূর্ব হইতে জানিতাম। তাই পুরাতন কথা শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। বীরেনবাবু থামিলে সে প্রশ্ন করিল, 'দেবকুমারবাবুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন বলেছিলেন, করেছিলেন না কি ?'

'করেছিলুম। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ধারকর্জ নেই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে দশ-বারো হাজার টাকা খরচ করা তাঁর অসাধ্য। লোকটি বোধ হয় বেহিসাবী, সাংসারিক বুদ্ধি কম। কলেজ থেকে বর্তমানে তিনি আটশ' টাকা মাইনে পান। কিন্তু শুনলে আশ্চর্য হবেন, এই আটশ' টাকার অধিকাংশই যায় তার বীমা কোম্পানির পেটে। পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স করিয়েছেন, তাও এত বেশি বয়সে যে প্রিমিয়াম দিয়ে হাতে বড় কিছু থাকে না।'

ব্যোমকেশ বিস্মিতভাবে বলিল, 'পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স ! নিজের নামে করেছেন ?'

'শুধু নিজের নামে নয়—জয়েন্ট পলিসি, নিজের আর স্ত্রী নামে। মাত্র এক বছর হল পলিসি নিয়েছেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—তিনি মারা গেলে পাছে বিধবাকে পথে দাঁড়াতে হয়, এই জন্যেই বোধ হয় দু'জনে একসঙ্গে বীমা করিয়েছেন। এ টাকায় উত্তরাধিকারীদের দাবি থাকবে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। আর কিছু ?'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'আর কি ? দেবকুমারবাবুর ছেলে হাবুলের পিছনেও লোক লাগিয়েছিলুম—যদি কিছু জানতে পারা যায়। সে ছোকরা কেমন যেন পাগলাটে ধরনের, কলেজে বড় একটা যায় না, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কখনও পার্কে চুপ করে বসে থাকে। আপনার কাছেও রোজ একবার করে আসে, জানতে পেরেছি।'

এই সময় হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশের সে শৈথিল্য আর নাই, সে যেন অন্তরে-বাহিরে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দিন পরে তাহার চোখে সেই চাপা উত্তেজনার প্রখর দৃষ্টি

দেখিতে পাইলাম। কিছু না বুঝিয়াও আমার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ কিন্তু বাহিরে কোনও উত্তেজনা প্রকাশ করিল না, পূর্ববৎ বিরসস্বরে বলিল, 'হাবুলকে বাদ দিতে পারেন। উঠছেন না কি ? থানাতেই থাকবেন তো ? আচ্ছা যদি দরকার হয়, ফোনে খবর নেব।'

বীরেনবাবু একটু অবাক্ হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিবার পর ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ পিছনে হাত দিয়া ঘরময় পায়চারি করিল ; দেখিলাম, তাহার চোখে সেই-পুরাতন আলো জ্বলিতেছে। বীরেনবাবুকে সে হঠাৎ এমনভাবে বিদায় দিল কেন, জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি এমন সময় সে চেয়ারের পিঠ হইতে শালখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, 'চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। বদ্ধ ঘরে বসে মাথাটা গরম বোধ হচ্ছে।'

দু'জনে বাহির হইলাম। অকারণে বাড়ির বাহির হইতে ব্যোমকেশের একটা মজ্জাগত বিমুখতা ছিল ; কাজ না থাকিলে সে ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। আমিও তাহার সঙ্গদোষে কুনো হইয়া পড়িয়াছিলাম, একাকী কোথাও যাইবার অভ্যাসও ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাই আজ তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ফাঁকা জায়গায় বিশুদ্ধ বাতাস কামনা করিতেছে দেখিয়া খুশি হইয়া উঠিলাম।

পথে চলিতে চলিতে কিন্তু খুশির ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না। জনসঙ্কুল পথে ব্যোমকেশ এমনই বাহ্যজ্ঞানহীন উদ্‌ভ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল যে, ভয় হইল এখনই হয়তো একটা কাণ্ড বাধিয়া যাইবে। আমি তাহাকে সামলাইয়া লইয়া চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অপ্রশমিত বেগে ইহাকে উহাকে ধাক্কা দিয়া, একবার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পা মাড়াইয়া দিয়া কয়েক মুহূর্ত পরে পুস্তকহস্তা এক তরুণীকে ঠেলা দিয়া দৃক্‌পাত না করিয়া জগন্নাথের অপ্রতিহত রথের মত অগ্রসর হইয়া চলিল। বাস্তবিক, এতটা আত্মবিস্মৃত তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। তাহার মন যে অকস্মাৎ শিকারের সন্ধান পাইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হারাইয়া ছুটিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতেছিলাম বটে, কিন্তু তাহার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন পথচারী তাহা বুঝিবে কেন ?

ভর্ৎসনা-ভ্রূকুটির স্রোত পিছনে ফেলিয়া কোনক্রমে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। হাস্য-আলাপরত ছাত্রদের আবর্তমান জনতায় স্থানটি ঘূর্ণিচক্রের মত পাক খাইতেছে। আমি আর দ্বিধা না করিয়া ব্যোমকেশের হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। এখানে আর যাহাই হউক, বৃদ্ধ এবং তরুণীকে বিমর্দিত করিবার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং অশিষ্টতা যদি কিছু ঘটিয়া যায়, ফাঁড়াটা সহজেই কাটিয়া যাইবে। আমাদের দেশের ছাত্ররা স্বভাবত কলহপ্রিয় নয়।

পুকুরকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি জনপ্রবাহ বিপরীত মুখে ঘুরিতেছে ; আমরা একটি প্রবাহে মিশিয়া গেলাম, সংঘাতের সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া গেল। ব্যোমকেশ তখনও স্থানকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, তাহার ললাট একাগ্রচিন্তার সঙ্কোচনে ভ্রূকুটিবন্ধুর ; কাঁধের শাল মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, বীরেনবাবুর কথার মধ্যে এমন কি ছিল, যাহা ব্যোমকেশের নিষ্ক্রিয় মনকে অকস্মাৎ পাঞ্জাব মেলের এঞ্জিনের মত সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে ? তবে কি রেখার মৃত্যু-সমস্যার সমাধান আসন্ন ?

সমাধান যে কত আসন্ন, তখনও তাহা বুঝিতে পারি নাই।

আধ ঘণ্টা এইভাবে পরিভ্রমণ করিবার পর ব্যোমকেশের বাহ্য-চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল ; সে সহজ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইল। বলিল, 'আজ দেবকুমারবাবু পাটনা যাবেন—না ?'

আমি ঘাড় নাড়িলাম।

'তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না—' ব্যোমকেশ সম্মুখদিকে তাকাইয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই ক্ষিপ্রচরণে অগ্রসর হইয়া গেল। দেখিলাম, এক কোণে একখানি বেঞ্চি ঘিরিয়া অনেক ছেলে

জড়ো হইয়াছে এবং উত্তেজিতভাবে কথা বলিতেছে। ভিড়ের বাহিরে যাহারা ছিল, তাহারা গলা বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল অসাধারণ কিছু ঘটিয়াছে।

সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্যোমকেশ একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে ?'

ছেলেটি বলিল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধ হয়, কেউ হঠাৎ বেঞ্চে বসে বসে মারা গেছে।'

ব্যোমকেশ ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল, আমিও তাহার পশ্চাতে রহিলাম। বেঞ্চির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি ছোকরা ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে—যেন বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, পা সম্মুখদিকে প্রসারিত। অধরোষ্ঠ হইতে একটি সিগারেট ঝুলিতেছে—সিগারেটে অগ্নিসংযোগ হয় নাই। মুষ্টিবদ্ধ বাঁ হাতের মধ্যে একটি দেশলাইয়ের বাক্স।

একটি মেডিক্যাল ছাত্র নাড়ি ধরিয়া দেখিতেছিল, বলিল, 'নাড়ি নেই—মারা গেছে।'

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, ভিড়ের মধ্যে ভাল দেখা যাইতেছিল না। ব্যোমকেশ চিবুক ধরিয়া মৃতের আনমিত মুখ তুলিয়াই যেন বিদ্যুদাহতের মত ছাড়িয়া দিল!

আমারও বুকে হাতুড়ির মত একটা প্রবল আঘাত লাগিল ; দেখিলাম—আমাদের হাবুল।

৭

পুলিস আসিয়া পৌঁছতে বিলম্ব হইল না। আমরা দেবকুমারবাবুর ঠিকানা পুলিসকে জানাইয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

তখন রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়াছে। দ্রুতপদে বাসার দিকে ফিরিতে ফিরিতে ব্যোমকেশ কয়েকবার যেন ভয়ার্ত শ্বাস-সংহত স্বরে বলিল, 'উঃ! নিয়তির কি নির্মম প্রতিশোধ! কি নিদারুণ পরিহাস!'

আমার মাথার ভিতর বুদ্ধিবৃত্তি যেন স্তম্ভিত নিশ্চল হইয়া গিয়াছিল ; তবু অসীম অনুশোচনার সঙ্গে কেবল এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল—পরলোক যদি থাকে, তবে যাহার মৃত্যুতে হাবুল এত কাতর হইয়াছিল সেই পরম স্নেহাস্পদ ভগিনীর সহিত তাহার এতক্ষণে মিলন হইয়াছে।

বাসায় পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ নিজের লাইব্রেরি-ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। শুনিতে পাইলাম, সে টেলিফোনে কথা বলিতেছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্লান্তস্বরে পুঁটিরামকে চা তৈয়ার করিতে বলিল, তারপর বুকে ঘাড় গুঁজিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। যে ট্র্যাজেডির শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িতে আর দেরি নাই, তাহার সম্বন্ধে বৃথা প্রশ্ন করিয়া আমি আর তাহাকে বিরক্ত করিলাম না।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বীরেনবাবু আসিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওয়ারেন্ট এনেছেন ?'

বীরেনবাবু ঘাড় নাড়িলেন।

তখন আবার আমরা বাহির হইলাম।

দেবকুমারবাবুর বাসায় আসিতে তিন চার মিনিট লাগিল। দেখিলাম, বাড়ি নিস্তব্ধ, উপরের ঘরগুলির জানালায় আলো নাই, কেবল নীচে বসিবার ঘরে বাতি জ্বলিতেছে।

বীরেনবাবু কড়া নাড়িলেন, কিন্তু ভিতর হইতে সাড়া আসিল না। তখন তিনি দ্বার ঠেলিলেন, ভেজানো দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাহিরের ক্ষুদ্র ঘরটিতে তক্তপোশ পাতা, তাহার উপর দেবকুমারবাবু নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। আমরা প্রবেশ করিলে তিনি রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া আমাদের পানে চাহিলেন। কিছুক্ষণ

চাহিয়া থাকিবার পর তাঁহার মুখে একটা তিক্ত হাসি দেখা দিল, তিনি মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'সকলি গরল ভেল—'

বীরেনবাবু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'দেবকুমারবাবু, আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে।'

দেবকুমারবাবুর যেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি দারোগাবাবুর পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'আপনারা এসেছেন—ভালই হল। আমি নিজেই থানায় যাচ্ছিলুম—' দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'হাতকড়া লাগান।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'তার দরকার নেই। কোন্ অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল শুনুন—' বলিয়া অভিযোগ পড়িয়া শুনাইবার উপক্রম করিলেন।

দেবকুমারবাবু কিন্তু ইতিমধ্যে আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন ; পকেটে হাত দিয়া তিনি যেন কি খুঁজিতে খুঁজিতে নিজ মনে বলিলেন, 'নিয়তি! নইলে হাবুলও ঐ বাক্স থেকেই দেশলায়ের কাঠি বার করতে গেল কেন? কি ভেবেছিলুম, কি হল! ভেবেছিলুম, রেখার ভাল বিয়ে দেব, নিজের একটা বড় ল্যাবরেটরি করব, হাবুলকে বিলেত পাঠাব—' পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া তিনি মুখে ধরিলেন।

ব্যোমকেশ নিজের দেশলাই জ্বালিয়া তাঁহার সিগারে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। তারপর বলিল, 'দেবকুমারবাবু, আপনার দেশলাইটা আমাদের দিতে হবে।'

দেবকুমারবাবুর চোখে আবার সচেতন দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল, তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু? আপনিও এসেছেন? ভয় নেই—আমি আত্মহত্যা করব না। ছেলেকে মেরেছি—মেয়েকে মেরেছি, আমি খুনী আসামীর মত ফাঁসিকাঠে ঝুলতে চাই—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেশলাইয়ের বাক্সটা তবে দিন।'

পকেট হইতে বাক্স বাহির করিয়া দেবকুমার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন, 'নিন, কিন্তু সাবধান, বড় ভয়ানক জিনিস। প্রত্যেকটি কাঠি এক-একটি মৃত্যুবাণ। একবার জ্বাললে আর রক্ষে নেই—' ব্যোমকেশ দেশলাইয়ের বাক্সটা বীরেনবাবুর হাতে দিল, তিনি সন্তর্পণে সেটা পকেটে রাখিলেন। দেবকুমারবাবু বলিয়া চলিলেন, 'কি অদ্ভুত আবিষ্কারই করেছিলুম ; পলকের মধ্যে মৃত্যু হবে, কিন্তু কোথাও এতটুকু চিহ্ন থাকবে না। আধুনিক যুদ্ধ-নীতির আমূল পরিবর্তন হয়ে যেত! বিষ নয়—এ মহামারী। কিন্তু সকলি গরল ভেল—' তিনি বুকভাঙা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বীরেনবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, 'দেবকুমারবাবু, এবার যাবার সময় হয়েছে।'

'চলুন'—তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ একটু কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার স্ত্রী কি বাড়িতেই আছেন?'

'স্ত্রী!'—দেবকুমারবাবুর চোখ পাগলের চোখের মত ঘোলা হইয়া গেল। তিনি হা হা করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'স্ত্রী! আমার ফাঁসির পর ইন্সিওরেন্সের সব টাকা সে-ই পাবে! প্রকৃতির পরিহাস নয়? চলুন।'

একটা ট্যাক্সি ডাকা হইল। ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া দেবকুমারবাবুকে তাহাতে তুলিয়া দিল ; বীরেনবাবু তাঁহার পাশে বসিলেন। দুইজন কনস্টেবল ইতিমধ্যে কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহারাও ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিল।

দেবকুমারবাবু গাড়ির ভিতর হইতে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার রেখার মৃত্যুর কিনারা করতে চেয়েছিলেন—আপনাকে ধন্যবাদ—'

আমরা ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিলাম, ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

দিন দুই ব্যোমকেশ এ বিষয়ে কোনও কথা কহিল না। তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

তৃতীয় দিন বৈকালে সে নিজেই বলিতে আরম্ভ করিল ; এলোমেলোভাবে কতকটা যেন নিজ

মনেই বলিতে লাগিল—

'ইংরেজিতে একটা কথা আছে—vengeance coming home to roost, দেবকুমারবাবুর হয়েছিল তাই ! নিজের স্ত্রীকে তিনি মারতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এমনই অদৃষ্টের খেলা, দু'বার তিনি তাঁর অমোঘ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন, দু'বারই সে অগ্নিবাণ লাগল গিয়ে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যার বুকে।

'দেবকুমার অপ্রত্যাশিতভাবে এক আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু টাকার অভাবে সে আবিষ্কারের সদ্ব্যবহার করতে পারছিলেন না। এ এমনই আবিষ্কার যে, তার পেটেন্ট নেওয়া চলে না ; কারণ, সাধারণ ব্যবসায়-জগতে এর ব্যবহার নেই। কিন্তু ঘুণাক্ষরে এর ফরমূলা জানতে পারলে জাপান জার্মানী ফ্রান্স প্রভৃতি যুদ্ধোদ্যত রাজ্যলোলুপ জাতি নিজেদের কারখানায় এই প্রাণঘাতী বিষ তৈরি করতে আরম্ভ করে দেবে। আবিষ্কর্তা কিছুই করতে পারবেন না, এতবড় আবিষ্কার থেকে তাঁর এক কপর্দক লাভ হবে না।

'সুতরাং আবিষ্কারের কথা দেবকুমারবাবু চেপে গেলেন। প্রথমে টাকা চাই, কারণ এ বিষ কি করে ব্যবহার করা যেতে পারে, সে বিষয়ে আরও অনেক এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার। কিন্তু টাকা কোথায় ? এত বড় এক্সপেরিমেন্ট গোপনে চালাতে গেলে নিজের ল্যাবরেটরি চাই—তাতে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু টাকা আসে কোথা থেকে ?

'এ দিকে বাড়িতে দেবকুমারবাবুর স্ত্রী তাঁর জীবন দুর্বহ করে তুলেছিলেন। মানসিক পরিশ্রম যারা করে, তারা চায় সাংসারিক ব্যাপারে শান্তি, অথচ তাঁর জীবনে ঐ জিনিসটির একান্ত অভাব হয়ে উঠেছিল। এক শুচিবায়ুগ্রস্ত মুখরা স্নেহহীনা স্ত্রীর নিত্য সাহচর্য তাঁকে পাগলের মত করে তুলেছিল। এটা অনুমানে বুঝতে পারি ; দেবকুমারবাবু স্বভাবত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক নন, শান্তিতে নিজের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতে পারলে তিনি আর কিছু চান না। তাঁর মনটি যে খুব স্নেহপ্রবণ, তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রতি ভালবাসা দেখেই আন্দাজ করা যায়। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও চেষ্টা করলে এই স্নেহের অংশ পেতে পারতেন ; কিন্তু স্বভাবদোষে তিনি তা পেলেন না ; বরঞ্চ দেবকুমারবাবু তাঁকে বিষবৎ ঘৃণা করতে আরম্ভ করলেন।

'নিজের স্ত্রীকে হত্যা করবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক নয় ; যখন এ প্রবৃত্তি তার হয় তখন বুঝতে হবে—সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। দেবকুমারবাবুরও সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। তারপর তিনি যখন এই ভয়ঙ্কর বিষ আবিষ্কার করলেন, তখন বোধ হয়, প্রথমেই তাঁর মনে হল স্ত্রীর কথা। তিনি মনে মনে আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন।

'তারপর তাঁর সংশয়ের সমাধান করে বীমা কোম্পানির যুগ্মজীবন পলিসির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল—স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বীমা করতে পারে, একজন মরলে অন্য জন টাকা পাবে। এমন সুযোগ তিনি আর কোথায় পাবেন ? যদি এইভাবে জীবনবীমা করে তাঁর আবিষ্কৃত বিষ দিয়ে স্ত্রীকে মারতে পারেন—এক ঢিলে দুই পাখি মরবে ; তিনি তাঁর বাঞ্ছিত টাকা পাবেন, স্ত্রীও মরবে এমনভাবে যে কেউ বুঝতে পারবে না, কি করে মৃত্যু হল।

'দেবকুমারবাবু একেবারে পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবনবীমা করালেন, তারপর অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি করলে চলবে না, বীমা কোম্পানির সন্দেহ হতে পারে। এইভাবে এক বছর কেটে গেল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, এই বড়দিনের ছুটিতে তাঁর মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করবেন।

'তাঁর আবিষ্কৃত বিষের প্রকৃতি অনেকটা বিস্ফোরক বারুদের মত ; এমনিতে সে অতি নিরীহ, কিন্তু একবার আগুনের সংস্পর্শে এলে তার ভয়ঙ্কর শক্তি বাষ্পরূপ ধরে বেরিয়ে আসে। সে-বাষ্প কারুর নাকে কণামাত্র গেলেও আর রক্ষে নেই, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।

'দেবকুমারবাবু তাঁর স্ত্রীর উপর এই বিষ প্রয়োগ করবার এক চমৎকার উপায় বার করলেন। বৈজ্ঞানিক মাথা ছাড়া এমন বুদ্ধি বেরোয় না। তিনি কতকগুলি দেশলাইয়ের কাঠির বারুদের সঙ্গে এই বিষ মাখিয়ে দিলেন। কি উপায়ে মাখালেন, বলতে পারি না, কিন্তু ফল দাঁড়ালো—যিনি সেই

কাঠি জ্বালবেন, তাঁকেই মরতে হবে। এইভাবে বিষাক্ত দেশলাইয়ের কাঠি তৈরি করে তিনি দিল্লীতে বিজ্ঞান-সভার অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ক্রমে দিল্লীতে যাবার সময় উপস্থিত হল ; তখন তিনি সময় বুঝে তাঁর স্ত্রীর দেশলাইয়ের বাক্সতে একটি কাঠি রেখে দিয়ে দিল্লীতে যাত্রা করলেন। তিনি জানতেন, তাঁর স্ত্রী রোজ রাত্রিতে শোবার আগে ঐ দেশলাই দিয়ে ল্যাম্প জ্বালেন—এ দেশলাইয়ের বাক্স অন্যত্র ব্যবহার হয় না। আজ হোক, কাল হোক, গৃহিণী সেই কাঠিটি জ্বালাবেন। দেবকুমারবাবু থাকবেন তখন ন'শ মাইল দূরে—এ যে তাঁর কাজ, এ কথা কেউ মনেও আনতে পারবে না।

'সবই ঠিক হয়েছিল, কিন্তু রাম উল্টো বুঝলেন। স্ত্রীর বদলে রেখা উনুন ধরাতে গিয়ে সেই কাঠিটি জ্বাললে।

'দিল্লী থেকে দেবকুমারবাবু ফিরে এলেন। এই বিপর্যয়ে তাঁর মন স্ত্রীর বিরুদ্ধে আরও বিষিয়ে উঠল। তাঁর জিদ চড়ে গেল, মেয়ে যখন গিয়েছে, তখন ওকেও তিনি শেষ করে ছাড়বেন। কয়েকদিন কেটে গেল, তারপর আবার তিনি স্ত্রীর দেশলাইয়ের বাক্সে একটি কাঠি রেখে পাটনা যাবার জন্য তৈরি হলেন।

'কিন্তু এবার আর তাঁকে যেতে হল না। হাবুল সিগারেট খেত ; বোধহয়, তার দেশলাইয়ের বাক্সটা খালি হয়ে গিয়েছিল, তাই সে সৎমার ঘরের দেশলাইয়ের বাক্স থেকে কয়েকটি কাঠি নিজের বাক্সে পুরে নিয়ে বেড়াতে চলে গেল। তারপর—

'কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশা কালকূট যে দেবকুমারবাবু বিজ্ঞানসাগর মন্থন করে তুলেছিলেন তাঁর জীবনে—সকলি গরল ভেল।'

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

কিয়ৎকাল পরে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, দেবকুমারবাবু যে অপরাধী, এটা তুমি প্রথম বুঝলে কখন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে মুহূর্তে শুনলুম যে, দেবকুমারবাবু পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবনবীমা করিয়েছেন, সেই মুহূর্তে। তার আগে রেখাকে হত্যা করবার একটা সন্তোষজনক উদ্দেশ্যই পাওয়া যাচ্ছিল না। কে তাকে মেরে লাভবান হল, কার স্বার্থে সে ব্যাঘাত দিচ্ছিল—এ কথাটার ভাল রকম জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না। রেখা যে হত্যাকারীর লক্ষ্য নয়, তা তো আমরা জানতুম না।

'কিন্তু আর একদিক থেকে একটি ছোট্ট সূত্র হাতে এসেছিল। রেখার দেহ-পরীক্ষায় যখন বিষ পাওয়া গেল না, তখন কেবল একটা সম্ভাবনাই গ্রহণযোগ্য রইল—অর্থাৎ যে-বিষে তার মৃত্যু হয়েছে, সে-বিষ বৈজ্ঞানিকদের অপরিচিত। মানে, নূতন আবিষ্কার। মনে আছে—দিল্লীতে দেবকুমারবাবুর বক্তৃতা ? আমরা তখন সেটা অক্ষমের বাহ্বাস্ফোট বলে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। কে জানত, তিনি সত্যই এক অদ্ভুত আবিষ্কার করে বসে আছেন ; আর, তারই চাপা ইঙ্গিত তাঁর বক্তৃতায় ফুটে বেরুচ্ছে !

'সে যাক হোক, কথা দাঁড়ালো—এই নূতন আবিষ্কার কোথা থেকে এল ? দু'জন বৈজ্ঞানিক হাতের কাছে রয়েছে—এক, ডাক্তার রুদ্র, দ্বিতীয় দেবকুমারবাবু। এঁদের দু'জনের মধ্যে একজন এই অজ্ঞাত বিষের আবিষ্কর্তা। কিন্তু ডাক্তার রুদ্র'র উপর সন্দেহটা বেশি হয়, কারণ তিনি ডাক্তার, বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া তাঁরই বেশি। তা ছাড়া দেবকুমারবাবু বিষের আবিষ্কর্তা হলে তিনি কি নিজের মেয়ের উপর সে বিষ প্রয়োগ করবেন ?

'কাজেই সব সন্দেহ পড়ল গিয়ে ডাক্তার রুদ্র'র উপর। কিন্তু তবু আমার মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। ডাক্তার রুদ্র লোকটা অতি পাজি, কিন্তু তাই বলে সে এত সামান্য কারণে একটি মেয়েকে খুন করবে ? আর, যদিই বা সে তা করতে চায়, রেখার নাগাল পাবে কি করে ? কোন্ উপায়ে আর একজনের বাড়িতে বিষ পাঠাবে ? রেখার সঙ্গে মন্মথর ছাদের উপর থেকে দেখাদেখি চিঠি-ফেলাফেলি চলত ; কিন্তু রুদ্র'র সঙ্গে তো সে রকম কিছু ছিল না।

'কোনও বিষাক্ত বাষ্পই যে মৃত্যুর কারণ, এ চিন্তাটা গোড়া থেকে আমার মাথায় ধোঁয়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনে করে দেখ, রেখার এক হাতে পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, আর এক হাতে বাক্স ছিল ; অর্থাৎ দেশলাই জ্বালার পরই মৃত্যু হয়েছে। সংযোগটা সম্পূর্ণ আকস্মিক হতে পারে, আবার কার্য-কারণ সম্বন্ধও থাকতে পারে। দেবকুমারবাবু কিন্তু বড় চালাকি করেছিলেন, বাক্সে একটি বৈ বিষাক্ত কাঠি দেননি—যাতে বাক্সের অন্যান্য কাঠি পরীক্ষা করে কোনও হদিস পাওয়া না যায়। আমি সে বাক্সটা এনেছিলুম, পরীক্ষাও করেছিলুম, কিন্তু কিছু পাইনি। হাবুলের বেলাতেও বাক্সে একটি বিষাক্ত কাঠিই ছিল, কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে, সেইটেই হাবুল পকেটে করে নিয়ে এল—আর প্রথমেই জ্বাললে।

'অজিত, তুমি তো লেখক, দেবকুমারবাবুর এই ব্যাপারের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড রূপক দেখতে পাচ্ছ না ? মানুষ যেদিন প্রথম অন্যকে হত্যা করবার অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল, সেদিন সে নিজেরই মৃত্যুবাণ নির্মাণ করেছিল ; আর আজ সারা পৃথিবী জুড়ে গোপনে গোপনে এই যে হিংসার কুটিল বিষ তৈরি হচ্ছে, এও মানুষ জাতটাকে একদিন নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলবে—ব্রহ্মার ধ্যান-উদ্ভূত দৈত্যের মত সে স্রষ্টাকেও রেয়াৎ করবে না। মনে হয় না কি ?'

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশকে ভাল দেখা যাইতেছিল না। আমার মনে হইল, তাহার শেষ কথাগুলো কেবল জল্পনা নয়—ভবিষ্যদ্‌বাণী।

উপসংহার

১

হাইকোর্টে দেবকুমারবাবুর মামলা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

মাঘ মাসের মাঝামঝি। শীতের প্রকোপ অল্পে অল্পে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণা বাতাস গায়ে লাগিয়া অদূর বসন্তের বার্তা জানাইয়া দিলেও, সকালবেলায় সোনালী রৌদ্রটুকু এখনও বেশ মিঠা লাগে।

সেদিন সকালে আমি একাকী জানালার ধারে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতে করিতে সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতে ছিলাম। ব্যোমকেশ প্রাতরাশ শেষ করিয়াই কি একটা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল ; বলিয়া গিয়াছিল, ফিরিতে দশটা বাজিবে।

খবরের কাগজে দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমার শেষ কিস্তির বিবরণ বাহির হইয়াছিল। কাগজে বিবরণ পড়িবার আমার কোনও দরকার ছিল না, কারণ আমি ও ব্যোমকেশ মোকদ্দমার সময় বরাবরই এজলাসে হাজির ছিলাম। তাই অলসভাবে কাগজের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ভাবিতে ছিলাম—দেবকুমারবাবুর অসম্ভব জিদের কথা। তিনি একটু নরম হইলে হয়তো এতবড় খুনের মোকদ্দমা চাপা পড়িয়া যাইত ; কারণ উচ্চ রাজনীতি পিনাল কোডের শাসন মানিয়া চলে না। কিন্তু সেই যে তিনি জিদ ধরিয়া বসিলেন আবিষ্কারের ফরমূলা কাহাকেও বলিবেন না—সে-জিদ হইতে কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। দেশলাই কাঠি বিশ্লেষণ করিয়াও বিষের মূল উপাদান ধরা গেল না। অগত্যা আইনের নাটিকা যথারীতি অভিনীত হইয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িয়া গেল।

চিন্তা ও কাগজ পড়ার মধ্যে মনটা আনাগোনা করিতেছিল, এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিলাম। দারোগা বীরেনবাবু থানা হইতে ফোন করিতেছেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা উত্তেজিত ব্যগ্রতার আভাস পাইলাম।

'ব্যোমকেশবাবু আছেন ?'

'তিনি বেরিয়েছেন। কোনও জরুরী দরকার কি ?'

'হাঁ—তিনি কখন ফিরবেন ?'

'দশটার সময়।'

'আচ্ছা, আমিও দশটার সময় গিয়ে পৌঁছুব। একটা খারাপ খবর আছে।'

খবরটা কি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই বীরেনবাবু ফোন কাটিয়া দিলেন।

ফিরিয়া গিয়া বসিলাম। ঘড়িতে দেখিলাম বেলা ন'টা। মন ছটফট করিতে লাগিল, তবু সংবাদপত্রটা তুলিয়া যথাসম্ভব ধীরভাবে দশটা বাজার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল না, সাড়ে ন'টার পরই ব্যোমকেশ ফিরিল।

বীরেনবাবু ফোন করিয়াছেন শুনিয়া সচকিতভাবে বলিল, 'তাই নাকি ! আবার কি হল ?'

আমি নীরবে মাথা নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তখন পুঁটিরামকে ডাকিয়া চায়ের জল চড়াইতে বলিল ; কারণ, বীরেনবাবুকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে চায়ের আয়োজন চাই ; চা সম্বন্ধে তাঁহার এমন একটা অকুণ্ঠ উদারতা আছে যে তুচ্ছ সময় অসময়ের চিন্তা উহাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে

না।

চায়ের হুকুম দিয়া ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া সিগারেট বাহির করিল ; একটা সিগারেট ঠোঁটে ধরিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিতে করিতে বলিল, 'বীরেনবাবু যখন বলেছেন খারাপ খবর, তার মানে গুরুতর কিছু। হয়তো—'

ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গেল। আমি মুখ তুলিয়া দেখিলাম সে বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে হস্তধৃত দেশলায়ের বাক্সটার দিকে তাকাইয়া আছে।

ব্যোমকেশ মুখ হইতে অ-জ্বালিত সিগারেট নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি ! এ দেশলায়ের বাক্স আমার পকেটে কোথা থেকে এল ?'

'কোন্ দেশলায়ের বাক্স ?'

ব্যোমকেশ বাক্সটা আমার দিকে ফিরাইল। দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না, সাধারণ দেশলায়ের বাক্স যেমন হইয়া থাকে উহাও তেমনি, কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

আমি অবাক্ হইয়া তাকাইয়া আছি দেখিয়া ব্যোমকেশ পূর্ববৎ ধীরস্বরে বলিল 'দেখতে পাচ্ছ বোধহয়, বাক্সটার ওপর যে লেবেল মারা আছে তাতে একজন সত্যাগ্রহী কুড়ুল কাঁধে করে তালগাছ কাটতে যাচ্ছে। অথচ আমাদের বাসায়—'

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'বুঝেছি, ঘোড়া মার্কা ছাড়া অন্য দেশলাই আসে না।'

'ঠিক। সুতরাং আমি যখন বেরিয়েছিলুম তখন আমার পকেটে স্বভাবতই ঘোড়া মার্কা দেশলাই ছিল। ফিরে এসে দেখছি সেটা সত্যাগ্রহীতে পরিণত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আজকালকার এই স্বরাজ-সাধনার যুগেও এতটা পরিবর্তন সম্ভব হয় কি করে ?' তারপর গলা চড়াইয়া ডাকিল, 'পুঁটিরাম !'

পুঁটিরাম আসিল।

'এবার বাজার থেকে কোন্ মার্কা দেশলাই এনেছ ?'

'আজ্ঞে, ঘোড়া মার্কা।'

'কত এনেছ ?'

'আজ্ঞে, এক বাণ্ডিল।'

'সত্যাগ্রহী মার্কা আনোনি ?'

'আজ্ঞে, না।'

'বেশ, যাও।'

পুঁটিরাম প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেশলায়ের বাক্সটার দিকে তাকাইয়া রহিল ; ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'মনে পড়ছে, ট্রামে যেতে যেতে সিগারেট ধরিয়েছিলুম, তখন পাশের ভদ্রলোক দেশলাইটা চেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি সিগারেট ধরিয়ে সেটা ফেরৎ দিলেন, আমি না দেখেই পকেটে ফেললুম ;—অজিত !'

'কি ?'

উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, 'অজিত, সেই লোকটাই দেশলায়ের বাক্স বদলে নিয়েছে।' দেখিলাম, তাহার মুখ হঠাৎ কেমন ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'লোকটা কে ? তার চেহারা মনে আছে ?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'না, ভাল করে দেখিনি। যতদূর মনে পড়ছে মাথায় মঙ্কিক্যাপ ছিল, আর চোখে কালো চশমা—' ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'বীরেনবাবু কখন আসবেন বলেছেন ?'

'দশটায়।'

'তাহলে তিনি এলেন বলে। অজিত, বীরেনবাবু আজ কেন আসছেন জানো ?'

'না—কেন ?'

'আমার মনে হয়—আমার সন্দেহ হয়—'

এই সময় সিঁড়িতে বীরেনবাবুর ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল, ব্যোমকেশ কথাটা শেষ করিল না।

বীরেনবাবু আসিয়া গম্ভীর মুখে উপবেশন করিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে সিগারেট দিয়া বলিল, 'নিজের দেশলাই দিয়ে ধরান। দেবকুমারবাবুর দেশলায়ের বাক্স কবে চুরি গেল ?'

'পরশু'—বলিয়াই বীরেনবাবু বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন—'আপনি জানলেন কোত্থেকে ? একথা তো চাপা আছে, বাইরে বেরুতে দেওয়া হয়নি।'

'স্বয়ং চোর আমাকে খবর পাঠিয়েছে'—বলিয়া ব্যোমকেশ ট্রামে দেশলাই বদলের ব্যাপারটা বিবৃত করিল।

বীরেনবাবু গভীর মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, তারপর দেশলায়ের বাক্সটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সন্তর্পণে সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, 'এর মধ্যে একটা মারাত্মক কাঠি আছে—বাপ্ ! লোকটা কে আপনার কিছু সন্দেহ হয় না ?'

'না। তবে যেই হোক, আমাকে যে মারতে চায়, তাতে সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু কেন ? এত লোক থাকতে আপনাকেই বা মারতে চাইবে কেন ?'

আমি বলিলাম, 'হয়তো সে মনে করে ব্যোমকেশকে মারতে পারলে তাকে ধরা কঠিন হবে তাই আগেভাগেই ব্যোমকেশকে সরাতে চায়।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'আমার তা মনে হয় না। পুলিসের অসংখ্য কর্মচারী রয়েছেন যাঁরা বুদ্ধিতে কর্মদক্ষতায় আমার চেয়ে কোনো অংশ কম নয়। বীরেনবাবুর কথাই ধর না। চোরের যদি সেই উদ্দেশ্যই থাকতে তাহলে সে আমাকে না মেরে বীরেনবাবুকে মারবার চেষ্টা করত।'

প্রশংসাটা কিছু মারাত্মক জাতীয় হইলেও দেখিলাম বীরেনবাবু মনে মনে খুশি হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'না—না—তবে—অন্য কি কারণ থাকতে পারে ?'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'সেইটেই ঠিক ধরতে পারছি না। যতদূর মনে পড়ছে আমার ব্যক্তিগত শত্রু কেউ নেই।'

বীরেনবাবু ঈষৎ বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'বলেন কি মশায় ! আপনি এতদিন ধরে চোর-ছ্যাঁচড় বদ্‌মায়েসের পিছনে লেগে আছেন, আর আপনার শত্রু নেই ! আমাদের পেশাই তো শত্রু তৈরি করা।'

এই সময় পুঁটিরাম চা লইয়া আসিল। একটা পেয়ালা বীরেনবাবুর দিকে আগাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ মৃদুহাস্যে বলিল, 'তা বটে। কিন্তু আমার অধিকাংশ শত্রুই বেঁচে নেই। যা হোক, এবার বলুন তো কি করে জিনিসটা চুরি গেল ?'

বীরেনবাবু চায়ে এক চুমুক দিয়া বলিলেন, 'ঠিক কি করে চুরি গেল তা বলা কঠিন। আপনি তো জানেন দেশলায়ের বাক্সটা দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমায় এক্‌জিবিট্ ছিল, কাজেই সেটা পুলিসের তত্ত্বাবধান থেকে কোর্টের এলাকায় গিয়ে পড়েছিল। পরশু মোকদ্দমা শেষ হয়েছে, তারপর থেকে আর সেটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি ! সন্দেহের ওপর কয়েকজন আর্দালি আর নিম্নতন কর্মচারীকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, আর কিছু হচ্ছে না। এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে মহা হৈচৈ পড়ে গেছে, খোদ গভর্নমেন্টের পর্যন্ত টনক নড়েছে। এখন আপনি একমাত্র ভরসা !'

'আমাকে কি করতে হবে ?'

'খাস ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থেকে হুকুম এসেছে, চোর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, দেশলায়ের বাক্স উদ্ধার করা চাই। এর ওপর নাকি আন্তর্জাতিক শান্তি নির্ভর করছে।'

'বুঝলুম। কিন্তু আমাকে যে আপনি এ কাজে ডাকছেন—এতে কর্তৃপক্ষের মত আছে কি ?'

'আছে। আপনাকে তাহলে সব কথা বলি। দেশলায়ের বাক্স লোপাট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

কেসটা সি আই ডি পুলিসের হাতে যায়। কিন্তু আজ তিন দিন ধরে অনুসন্ধান করেও তারা কোনও হদিস বার করতে পারেনি। এদিকে প্রত্যহ তিন-চার বার গভর্নমেন্টের কড়া তাগাদা আসছে। তাই শেষ পর্যন্ত বড়সাহেব আপনার সাহায্য তলব করেছেন। তাঁর বিশ্বাস এ ব্যাপারে সমাধান যদি কেউ করতে পারে তো সে আপনি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া একবার ঘরময় পায়চারি করিল, তারপর বলিল, 'তাহলে আর কোনও কথা নেই। কিন্তু—আমি একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনি যখন যাবেন তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।'

'বেশ—' একটু চিন্তা করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ আর নয়, কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আজকের দিনটা আমাকে ভাবতে দিতে হবে।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'কিন্তু যতই দেরি হবে—'

'সে আমি বুঝেছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি যাহোক একটা কিছু করলেই তো হবে না। একটা অজ্ঞানা লোককে ধরতে হবে, অথচ এমন সূত্র কোথাও নেই যা ধরে তার কাছে পৌঁছুতে পারা যায়। একটু বিবেচনা করে পন্থা স্থির করতে হবে না?'

'তা বটে—'

'ইতিমধ্যে যে লোকগুলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে যদি কোনও স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেন তার চেষ্টা করুন। যদি—'

বীরেনবাবু গম্ভীর মুখে একটু হাসিলেন—'তিন দিন ধরে অনবরত সে চেষ্টা হচ্ছে, কোনো ফল হয়নি। আপনি যদি চেষ্টা করে দেখতে চান, দেখতে পারেন।'

ব্যোমকেশ বিরসস্বরে বলিল, 'পুলিসের চেষ্টা যখন বিফল হয়েছে তখন আমি কিছু করতে পারব মনে হয় না। তারা হয়তো নির্দোষ। যাক, তাহলে ঐ কথা রইল, কাল আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করব; তারপর যাহোক একটা কিছু করা যাবে। এ ব্যাপারে আমার নিজের যথেষ্ট স্বার্থ রয়েছে, কারণ চোর মহাশয় প্রথমে আমার ওপরেই কৃপা-দৃষ্টিপাত করেছেন।'

অতঃপর আরো কিছুক্ষণ বসিয়া বীরেনবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া দেশলায়ের বাক্সটা নিজের লাইব্রেরি ঘরে রাখিয়া আসিল। তারপর পিছনে হাত রাখিয়া গম্ভীর ভ্রূকুঞ্চিত মুখে ঘরে পায়চারি করিতে লাগিল।

এগারোটা বাজিয়া গেলে পুঁটিরাম আসিয়া স্নানের তাগাদা দিয়া গেল, কিন্তু তাহার কথা ব্যোমকেশের কানে পৌঁছিল না। সে অন্যমনস্কভাবে একটা 'হুঁ' দিয়া পূর্ববৎ ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই সময় ডাকপিওন আসিল। একখানা খাম ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল, 'দেখুন তো এটা আপনার চিঠি কিনা।'

ব্যোমকেশ খামের শিরোনামা দেখিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, আমারই। কেন বল দেখি?'

পিওন কহিল, 'নীচের মেসে এক ভদ্রলোক বলছিলেন এটা তাঁর চিঠি।'

'সে কি। ব্যোমকেশ বক্সী আরো আছে নাকি?'

'তিনি বললেন, তাঁর নাম ব্যোমকেশ বোস।'

ব্যোমকেশ চিঠিখানা আরো ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, 'ও—তা হতেও পারে বাগবাজারের মোহর দেখছি—কলকাতা থেকেই চিঠি আসছে। কিন্তু আমাকে কলকাতা থেকে খামে চিঠি কে লিখবে? যা হোক, খুলে দেখলেই বোঝা যাবে। যদি আমার না হয়—কিন্তু নীচের মেসে ব্যোমকেশ নামে আর একজন আছেন এ খবর তো জানতুম না।'

পিওন প্রস্থান করিল। ব্যোমকেশ কাগজ-কাটা ছুরি দিয়া খাম কাটিয়া চিঠি বাহির করিল, তাহার উপর চোখ বুলাইয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'আমার নয়। কোকনদ গুপ্ত—অদ্ভুত নাম—কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না।'

চিঠিতে লেখা ছিল—

সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

ব্যোমকেশবাবু, অনেকদিন আপনার সহিত দেখা হয় নাই, কিন্তু তবু আপনার কথা ভুলিতে পারি নাই। আবার সাক্ষাতের জন্য উন্মুখ হইয়া আছি। চিনিতে পারিবেন তো? কি জানি, অনেকদিন পরে দেখা, হয়তো অধমকে না চিনিতেও পারেন।

আপনার কাছে আমি অশেষভাবে ঋণী, আপনার কাছে আমার জীবন বিক্রীত হইয়া আছে। কিন্তু কর্মের জন্য বহুকাল স্থানান্তরে ছিলাম বলিয়া সে-ঋণের কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারি নাই। এখন ফিরিয়া আসিয়াছি, সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনার গুণমুগ্ধ
শ্রীকোকনদ গুপ্ত

চিঠিখানা পড়িয়া আমি বলিলাম, 'এ চিঠি আমাদের পড়া উচিত হয়নি। অবশ্য গোপনীয় কিছু নেই, তবু এমন আন্তরিক কথা আছে যা অন্যের পড়া অপরাধ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা তো বুঝছি। প্রেমিক প্রেমিকার চিঠি চুরি করে পড়ার মত এ চিঠিখানা পড়লেও মনটা লজ্জিত হয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় কি বল! চিঠি আমার কিনা যাচাই করা চাই তো। কোকনদ গুপ্ত বলে কাউকে আমি চিনি না, আর চিনলেও তার কোনও মহৎ উপকার করেছি বলে স্মরণ হচ্ছে না।'

'তাহলে যার চিঠি তাকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।'

'হাঁ। পুঁটিরামকে ডাকি।'

কিন্তু পুঁটিরাম আসিবার পূর্বেই চিঠির মালিক নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীচের মেসের সকল অধিবাসীর সঙ্গেই আমাদের মুখ চেনাচিনি ছিল, ইঁহাকে কিন্তু পূর্বে দেখি নাই। লোকটি বেঁটে-খাটো দোহারা, বোধ করি মধ্যবয়স্ক—কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া বয়স অনুমান করিবার উপায় নাই। কপাল হইতে গলা পর্যন্ত মুখখানা পুড়িয়া, চামড়া কুঁচ্‌কাইয়া এমন একটা অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে যে পূর্বে তাঁহার চেহারা কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। হঠাৎ মনে হয় যেন তিনি একটা বিকট মুখোশ পরিয়া আছেন। মুখে গোঁফ দাড়ি নাই, এমন কি চোখের পল্লব পর্যন্ত চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টিতে মৎস্যচক্ষুর ন্যায় অনাবৃত নিষ্পলক ভাব দেখিয়া সহসা চমকিয়া উঠিতে হয়।

ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমাদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সহজ সাধারণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া যেন রূপকথার রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিলাম। তিনি দ্বারের নিকট হইতে ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, 'আমার নাম ব্যোমকেশ বসু। একখানা চিঠি—'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'আসুন। চিঠিখানা আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছিলুম। আপনি এসেছেন—ভালই হল। বসুন। কিছু মনে করবেন না, নিজের মনে করে খাম খুলেছিলুম। এই নিন।'

পত্রটা হাতে লইয়া ভদ্রলোক ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন, তারপর বলিলেন, 'কোকনদ গুপ্ত! কৈ আমার তো—' ব্যোমকেশের দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন, 'আপনার চিঠি নয়? আপনি পড়েছেন নিশ্চয়।'

অপ্রস্তুতভাবে ব্যোমকেশ বলিল, 'পড়েছি, নিজের মনে করে—কিন্তু পড়ে দেখলুম আমার নয়। পিওন বলেছিল বটে কিন্তু খামের ওপর 'বোস' কথাটা এমনভাবে লেখা হয়েছে যে 'বক্সী' বলে ভুল হয়। জানেন বোধহয়, আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী?'

'জানি বৈকি। আপনি এ মেসের গৌরব; এখানে এসেই আপনার নাম শুনেছি। কিন্তু চিঠিটা আমার কি না ঠিক বুঝতে পারছি না। কোকনদ গুপ্ত নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে বটে, তবু—, যা হোক, আপনি যখন বলছেন আপনার নয় তখন আমারই হবে।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'মহৎ লোকের পক্ষে উপকার করে ভুলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক।'

'না না, তা নয়—অনেক দিনের কথা, তাই হঠাৎ মনে পড়ছে না। পরে হয়তো পড়বে। —আচ্ছা, নমস্কার।' বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এ মেসে কত দিন এসেছেন?'

'বেশি দিন নয়। এই তো দিন পাঁচ-সাত।'

'ও'—ব্যোমকেশ হাসিল, 'যা হোক, তবু এতদিনে একজন মিতে পাওয়া গেল। আচ্ছা, নমস্কার। সময় পেলে মাঝে মাঝে আসবেন, গল্প-সল্প করা যাবে।'

ভদ্রলোক আনন্দিতভাবে সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, 'অনেক বেলা হয়ে গেল, চল নেয়ে খেয়ে নেওয়া যাক; তারপর দেশলাই চুরির মামলা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবা যাবে। অনেক ভাববার কথা আছে; যে-বনে শিকার নেই সেই বন থেকে বাঘ মেরে আনতে হবে। আচ্ছা, আমাদের এই দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবুটিকে আগে কোথাও দেখেছ বলে বোধ হচ্ছে কি?'

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, 'না, ও-মুখ কদাচ দেখিনি। তুমি দেখেছ নাকি?'

ব্যোমকেশ ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'উহুঁ। কিন্তু ওঁর চলার ভঙ্গীটা যেন পরিচিত, কোথাও দেখেছি। সম্প্রতি নয়—অনেক দিন। যাক্‌গে, এখন আর বাজে চিন্তা নয়।' বলিয়া মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে স্নানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

২

চিরদিনই লক্ষ্য করিয়াছি, চিন্তা করিবার একটা বড় রকম খোরাক পাইলে ব্যোমকেশ কেমন যেন নিশ্চল সমাহিত হইয়া যায়। তখন তাহার সহিত কথা কহিতে যাওয়া প্রাণান্তকর হইয়া উঠে; হয় কথা শুনিতে পায় না, নয়তো এমন তেরিয়া হইয়া উঠে যে হাতাহাতি না করিয়া আর উপায়ান্তর থাকে না, কিন্তু আজ দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সে যখন বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল এবং সিগারেটের পর সিগারেট পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতে লাগিল, তখন তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলাম—কোনও কারণে তাহার একাগ্র চিন্তার পথে বিঘ্ন হইয়াছে, চেষ্টা করিয়াও সে মনকে ঐকান্তিক চিন্তায় নিয়োজিত করিতে পারিতেছে না। তারপর সে যখন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া এ-ঘর ও-ঘর ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ কি হল তোমার! অমন ফিজেট্‌ করছ কেন?'

ব্যোমকেশ লজ্জিতভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'কি জানি আজ কিছুতেই মন বসাতে পারছি না, কেবলই বাজে কথা মনে আসছে—'

আমি বলিাম, 'গুরুতর কাজ যখন হাতে রয়েছে তখন বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

ঈষৎ বিরক্তভাবে ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি কি ইচ্ছে করে বাজে চিন্তা করছি? আজ সকালের ঐ চিঠিখানা—'

'কোন্ চিঠি?'

'আরে ঐ যে কোকনদ গুপ্ত। ঘুরে ফিরে কেবল ঐ কথাই মনে আসছে।'

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'ও চিঠিতে এমন কি আছে—'

'কিছুই নেই। তবু মনে হচ্ছে চিঠিখানা যদি আমাকেই লিখে থাকে—যদি—'

'ঠিক বুঝলুম না। চিঠির লেখককে তুমি চেনো না, আর একজন লোক সে-চিঠি নিজের বলে দাবি করছেন, তবু চিঠি তোমার হবে কি করে?'

'তা বটে—কিন্তু চিঠির কথাগুলো তোমার মনে আছে?'

'খুব গদ্‌গদভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছাড়া তাতে তো আর কিছু ছিল না। এ নিয়ে এত দুর্ভাবনা

কেন ?

'ঠিক বলেছ'—হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, 'মস্তিষ্ককে বাজে চিন্তা করবার প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়, ক্রমে একটা বদ-অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। নাঃ—এখন কেবল দেশলায়ের বাক্স ধ্যান জ্ঞান করব। আমি লাইব্রেরিতে চললুম, চা তৈরি হলে ডেকো।' বলিয়া লাইব্রেরি ঘরে ঢুকিয়া, যেন বাজে চিন্তাকে বাহিরে রাখিবার জন্যই দৃঢ়ভাবে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তারপর বিকাল কাটিয়া গেল ; রাত্রি হইল। কিন্তু ব্যোমকেশের সেই অস্থির বিক্ষিপ্ত মনের অবস্থা দূর হইল না। বুঝিলাম, সে এখনও কিছু স্থির করিতে পারে নাই।

গভীর রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিলাম, হঠাৎ ব্যোমকেশের ঠেলা খাইয়া জাগিয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'কি হয়েছে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওহে, একটা মতলব মাথায় এসেছে—'

মাথার উপর লেপ চাপা দিয়া বলিলাম, 'এত রাত্রে মতলব ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, শোনো। যে লোক দেশলাই চুরি করেছে, সেই আমাকে মারবার চেষ্টা করছে—কেমন ? এখন মনে কর, আমি যদি সত্যিই—'

আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে প্রাতরাশ করিতে করিতে বলিলাম, 'কাল রাত্রে তুমি কি সব বলছিলে, শেষ পর্যন্ত শুনিনি।'

ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে কাগজ দেখিতে দেখিতে বলিল, 'তা শুনবে কেন ? কাল রাত্রে আমার মৃত্যু-সংবাদ তোমাকে দিলুম, তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলে। এমন না হলে বন্ধু !'

আমি আঁৎকাইয়া উঠিলাম, 'মৃত্যু-সংবাদ ! মানে ?'

'মানে শীঘ্রই আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু তার আগে একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করা দরকার।' ঘড়ির দিকে তাকাইয়া সে বলিল, 'এখন সওয়া আটটা। ন'টার সময় বেরুলেই হবে।'

'কি আবোল-তাবোল বকছ বুঝতে পারছি না।'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া কাগজে মন দিল। বুঝিলাম, কাল গভীর রাত্রে উত্তেজনার ঝোঁকে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিল এখন আর তাহা সহজে বলিবে না। নিশ্চয় কোনও অদ্ভুত ফন্দি বাহির করিয়াছে ; জানিবার জন্য মনটা ছটফট করিতে লাগিল। রাত্রে তাহার কথা শেষ হইবার আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়া ভাল করি নাই।

মিনিট পাঁচেক নীরবে কাটিল। ব্যোমকেশকে খোঁচা দিয়া কথাটা বাহির করা যাইতে পারে কি না ভাবিতেছি, হঠাৎ সে কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, 'এক লাখ টাকা দিয়ে এক বাক্স দেশলাই কিনবে ?'

'সে আবার কি ?'

'একজন ভদ্রলোক বিক্রি করতে চান। এই দ্যাখ।' বলিয়া সে সংবাদপত্র আমার হাতে দিল। দেখিলাম দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মাঝখানে ব্র্যাকেট দিয়া ঘেরা এই বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে—

> এক বাক্স দিয়াশলাই বিক্রি আছে। দাম—এক লক্ষ টাকা। বাক্সে কুড়িটি কাঠি আছে ; প্রত্যেকটির মূল্য পাঁচ হাজার। খুচরা ক্রয় করা যাইতে পারে। ক্রয়ার্থী নিজ নাম ঠিকানা দিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। এই অমূল্য দ্রব্য মাত্র সাতদিন বাজারে থাকিবে, তারপর বিদেশে রপ্তানি হইবে। ক্রেতাগণ তৎপর হৌন।

আমি যতক্ষণ এই বিস্ময়কর বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলাম ততক্ষণ ব্যোমকেশ বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আমি হতভম্ব মুখ তাহার পানে তুলিতেই সে বলিল, 'অতি বিচক্ষণ লোক। দেশলায়ের বাক্স চুরি করে এখন আবার সেইটেই গভর্নমেন্টকে বিক্রি করতে চান। গভর্নমেন্ট না কিনলে, জাপান কিম্বা ইটালিকে বিক্রি করবেন এ ভয়ও দেখিয়েছেন। — চল।'

'কোথায় ?'

'খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে খোঁজ নেওয়া যাক কিছু পাওয়া যায় কি না। যদিও সে সম্ভাবনা কম।'

দ্রুত জুতা জামা পরিয়া ব্যোমকেশের সহিত বাহির হইলাম।

'কালকেতু' অফিসে গিয়া কার্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইতে বিলম্ব হইল না। ব্যোমকেশের প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'বিজ্ঞাপন বিভাগ আমার খাস এলাকায় নয়, তবু এ বিজ্ঞাপনটা সম্বন্ধে আমি জানি। ইন্সিওর-করা খামখানা আমার হাতেই এসেছিল। মনেও আছে, তার কারণ এমন আশ্চর্য বিজ্ঞাপন আমরা কখনও পাইনি।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহলে বিজ্ঞাপনদাতা লোকটিকে আপনি দেখেননি ?'

'না। বললুম তো, ডাকে বিজ্ঞাপনটা এসেছিল। খামের মধ্যে কুড়ি টাকার নোট আর বিজ্ঞাপনের খসড়া ছিল। প্রেরকের নাম ছিল না। খুবই আশ্চর্য হয়েছিলুম ; কিন্তু তখন আমাদের কাজের সময়, তাই বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজারকে ডেকে খসড়া তাঁর জিম্মা করে দিই, তারপর ভুলে গিয়েছি। ব্যাপার কি বলুন তো ? দেশলায়ের বাক্স দেখে সন্দেহ হচ্ছে, গুরুতর কিছু নাকি ?'

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, 'আপনাদের কানে পৌঁছুবার মত এখনও কিছু হয়নি। আচ্ছা, প্রেরক সম্বন্ধে কোনও খবরই দিতে পারেন না ? তার ঠিকানা ?'

কার্যাধ্যক্ষ মাথা নাড়িলেন, 'খামের মধ্যে নোট আর বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু ছিল না।'

'ইন্সিওর-করা খামে বিজ্ঞাপন এসেছিল বলছেন। খামের ওপরেও প্রেরকের নাম ঠিকানা ছিল না ?'

কার্যাধ্যক্ষ সচকিতভাবে বলিলেন, 'ওটা তো খেয়াল করিনি। নিশ্চয় ছিল। অন্তত থাকা উচিত। যতদূর জানি প্রেরকের নাম-ঠিকানা না থাকলে পোস্ট-অফিসে রেজিস্ট্রি চিঠি নেয় না—'

টেবিলের পাশে একটা প্রকাণ্ড ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেট ছিল, অধ্যক্ষ মহাশয় হঠাৎ উঠিয়া তাহার মধ্যে হাতড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিজয়গর্বে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'পেয়েছি—এই, এই নিন।'

সাধারণ সরকারী রেজিস্ট্রি খাম, তাহার কোণে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা রহিয়াছে—

বি কে সিংহ
১৮/১, সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা

ঠিকানা টুকিয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাদের পাড়াতেই দেখছি।—এখন তাহলে উঠলুম, অকারণে বসে থেকে আপনার কাজের ক্ষতি করব না—বহু ধন্যবাদ!'

অধ্যক্ষ বলিলেন, 'ধন্যবাদের দরকার নেই ; যদি নতুন খবর কিছু থাকে, আগে যেন পাই। জানেন তো, দেবকুমারবাবুর কেস আমরাই আগে ছেপেছিলুম।'

'আচ্ছা, তাই হবে' বলিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

'কালকেতু' অফিস হইতে আমরা সোজা সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে ফিরিলাম। ১৮/১ নম্বর বাড়িখানা দ্বিতল ও ক্ষুদ্র, রেলিং-এর উপর লেপ তোষক শুকাইতেছে, ভিতর হইতে কয়েকটি ছেলেমেয়ের পড়ার গুঞ্জন আসিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভুল ঠিকানা। যা হোক, যখন এসেছি তখন খোঁজ নিয়ে যাওয়া যাক।'

ডাকাডাকি করিতে একজন চাকর বাহির হইয়া আসিল—'কাকে চান বাবু ?'

'বাবু বাড়ি আছেন ?'

'না।'

'এ বাড়িতে কে থাকে ?'

'দারোগাবাবু থাকেন।'

'দারোগাবাবু ? নাম কি ?'

'বীরেনবাবু !'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চাকরটার মুখের পানে·হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'ও—বুঝেছি। তোমার বাবু বাড়ি এলে বোলো ব্যোমকেশবাবু দেখা করতে এসেছিলেন।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া চলিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি বড় খুশি হয়েছ দেখছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুশি হওয়া ছাড়া উপায় কি! লোকটি এমন প্রচণ্ড রসিক যে মহাপ্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাঁর রসিকতা করতে বাধে না। এমন লোক যদি আমার সঙ্গে একটু তামাসা করেন তাহলে আমার খুশি না হওয়াই তো ধৃষ্টতা!—তুমি এখন বাসায় যাও, আমি অন্য কাজে চললুম। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে পরামর্শ হবে।'

হ্যারিসন রোডে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, ব্যোমকেশ লাফাইয়া একটা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

৩

সেদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ আমাকে তাঁহার প্ল্যান প্রকাশ করিয়া বলিল।

প্ল্যান শুনিয়া বিশেষ আশাপ্রদ বোধ হইল না; এ যেন অজ্ঞাত পুকুরে মাছের আশায় ছিপ ফেলা, চারে মাছ আসিবে কিনা কোনও স্থিরতা নাই।

আমার মন্তব্য শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সে তো বটেই, অন্ধকারে ঢিল ফেলছি, লাগবে কিনা জানি না। যদি না লাগে তখন অন্য উপায় বার করতে হবে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কমিশনার সাহেবের মত আছে?'

'আছে।'

'আমাকে কিছু করতে হবে?'

'স্রেফ মুখ বুজে থাকতে হবে, আর কিছু নয়। আমি এখনই বেরিয়ে যাব; কারণ মরতে হলে আজই মরতে হয়, একটা দেশলায়ের বাক্স আর ক'দিন চলে? তুমি ইচ্ছে করলে কাল সকালে শ্রীরামপুরে গিয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাস দর্শন করতে পার।'

'ইতিমধ্যে এখানে যদি কেউ তোমার খোঁজ করে, তাকে কি বলব?'

'বলবে, আমি গোপনীয় কাজে কলকাতার বাইরে গিয়েছি, কবে ফিরব ঠিক নেই।'

'বীরেনবাবু আজ বিকেলে আসতে পারেন, তাঁকেও ঐ কথাই বলব?'

কিয়ৎকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হাঁ, তাঁকেও ঐ কথাই বলবে। মোট কথা, এ সম্বন্ধে কোনও কথাই কইবে না।'

'বেশ'—মনে মনে একটু বিস্মিত হইলাম। বীরেনবাবু পুলিসের লোক, বিশেষত এ ব্যাপারে তিনিই এক প্রকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; তবু তাঁহার নিকট হইতেও গোপন করিতে হইবে কেন?

আমার অনুচ্চারিত প্রশ্ন যেন বুঝিতে পারিয়াই ব্যোমকেশ বলিল, 'বীরেনবাবুকে না বলার কোনও বিশেষ কারণ নেই, মামুলি সতর্কতা। বর্তমানে তুমি আমি আর কমিশনার সাহেব ছাড়া এ প্ল্যানের কথা আর কেউ জানে না, অবশ্য কাল আরও কেউ কেউ জানতে পারবে। কিন্তু যতক্ষণ পারা যায় কথাটা চেপে রাখাই বাঞ্ছনীয়। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, মন্ত্রগুপ্তিই হচ্ছে কূটনীতির মুখবন্ধ; অতএব তুমি দৃঢ়ভাবে মুখ বন্ধ করে থাকবে।'

ব্যোমকেশ প্রস্থান করিবার আধঘণ্টা পরে বীরেনবাবু ফোন করিলেন।

'ব্যোমকেশবাবু কোথায়?'

'তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন?'

'জানি না।'

'কখন ফিরবেন ?'

'কিছুই ঠিক নেই। তিন চার দিন দেরি হতে পারে।'

'তিন চার দিন! আজ সকালে আপনারা আমার বাসায় গিয়েছিলেন কেন ?'

ন্যাকা সাজিয়া বলিলাম, 'তা জানি না।'

তারের অপর প্রান্তে বীরেনবাবু একটা অসন্তোষ-সূচক শব্দ করিলেন, 'আপনি যে কিছুই জানেন না দেখছি। ব্যোমকেশবাবু কোন্ কাজে গেছেন তাও জানেন না ?'

'না।'

বীরেনবাবু সশব্দে তার কাটিয়া দিলেন।

ক্রমে চারিটা বাজিল। পুঁটিরামকে চা তৈয়ার করিবার হুকুম দিয়া, এবার কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল।

উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, আমাদের পূর্বদিনের দগ্ধানন ব্যোমকেশবাবু। তাঁহার হাতে একটি সংবাদপত্র।

তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু বেরিয়েছেন নাকি ?'

'হ্যাঁ। আসুন।'

তাঁহার বিশেষ কোনও প্রয়োজন ছিল না, পূর্বদিনের আমন্ত্রণ স্মরণ করিয়া গল্পগুজব করিতে আসিয়াছিলেন। আমিও একলা বৈকালটা কি করিয়া কাটাইব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, বোসজা মহাশয়কে পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

বোসজা আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, 'আজ কাগজে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, সেইটে আপনাদের দেখাতে এনেছিলুম। হয়তো আপনাদের চোখে পড়েনি—' কাগজটা খুলিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'দেখেছেন কি ?'

সেই বিজ্ঞাপন! বড় দ্বিধায় পড়িলাম। মিথ্যা কথা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া বলিতে পারি না, বলিতে গেলেই ধরা পড়িয়া যাই। অথচ ব্যোমকেশ চাণক্য-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া মুখ বন্ধ রাখিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছে। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া কি বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় বোসজা মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, 'পড়েছেন, অথচ ব্যোমকেশবাবু কোনও কথা প্রকাশ করতে মানা করে গেছেন—না ?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন, 'সম্প্রতি দেশলায়ের কাঠি নিয়ে একটা মহা গণ্ডগোল বেধে গেছে। এই সেদিন দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমা শেষ হল, তাতেও দেশলাই; আবার দেখছি দেশলাইয়ের বাক্সের বিজ্ঞাপন—মূল্য এক লক্ষ টাকা। সাধারণ লোকের মধ্যে স্বভাবতই সন্দেহ হয়, দুটোর মধ্যে কোনও যোগ আছে।' বলিয়া সপ্রশ্ন চক্ষে আমার পানে চাহিলেন।

আমি এবারও নীরব হইয়া রহিলাম। কথা কহিতে সাহস হইল না, কি জানি আবার হয়তো বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলিব।

তিনি বলিলেন, 'যাক ও কথা, আপনি হয়তো মনে করবেন আমি আপনাদের গোপনীয় কথা বার করবার চেষ্টা করছি।' বলিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

পুঁটিরাম চা দিয়া গেল। চায়ের সঙ্গে ক্রিকেট, রাজনীতি, সাহিত্য, নানাবিধ আলোচনা হইল। দেখিলাম লোকটি বেশ মিশুক ও সদালাপী—অনেক বিষয়ে খবর রাখেন।

এক সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, আপনার কি করা হয় ? কিছু মনে করবেন না, আমাদের দেশে প্রশ্নটা অশিষ্ট নয়।'

তিনি একটু চুপ করিয়া বলিলেন, 'সরকারী চাকরি করি।'

'সরকারী চাকরি ?'

'হাঁ। তবে সাধারণ চাক্‌রের মত দশটা চারটে অফিস করতে হয় না। চাকরিটা একটু বিচিত্র রকমের।'

'ও—কি করতে হয় ?' প্রশ্নটা ভদ্ররীতিসম্মত নয় বুঝিতেছিলাম, তবে কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না।

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'রাজ্য শাসন করবার জন্যে গভর্নমেন্টকে প্রকাশ্যে ছাড়াও অনেক কাজ করতে হয়, অনেক খবর রাখতে হয় ; নিজের চাকরদের ওপর নজর রাখতে হয়। আমার কাজ অনেকটা ঐ ধরনের।'

বিস্মিতকণ্ঠে বলিলাম, 'সি আই ডি পুলিস ?'

তিনি মৃদু হাসিলেন, 'পুলিসের ওপরও পুলিস থাকতে পারে তো। আপনাদের এই বাসাটি দিব্যি নিরিবিলি, মেসের মধ্যে থেকেও মেসের ঝামেলা ভোগ করতে হয় না। কতদিন এখানে আছেন ?'

কথা পাল্টাইয়া লইলেন দেখিয়া আমিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না ; বলিলাম, 'আমি আছি বছর আষ্টেক, ব্যোমকেশ তার আগে থেকে আছে।'

তারপর আরো কিছুক্ষণ সাধারণভাবে কথাবার্তা হইল। তাঁহার মুখের এরূপ অবস্থা কি করিয়া হইল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কয়েক বছর আগে ল্যাবরেটরিতে কাজ করিতে করিতে হঠাৎ অ্যাসিডের শিশি ভাঙিয়া মুখে পড়িয়া যায়। সেই অবধি মুখের অবস্থা এইরূপ হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর তিনি উঠিলেন। দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দারোগা বীরেনবাবুর সঙ্গে আপনাদের জানাশোনা আছে। কেমন লোক বলতে পারেন ?'

'কেমন লোক ? তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের সূত্রে আলাপ। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে তো কিছু জানি না।'

'তাঁকে খুব লোভী বলে মনে হয় কি ?'

'মাফ করবেন ব্যোমকেশবাবু, তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারি না।'

'ও—আচ্ছা। আজ চললুম।'

তিনি প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথাগুলো আমার মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল। বীরেনবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে ইনি অনুসন্ধিৎসু কেন ? বীরেনবাবু কি লোভী ? পুলিসের কর্মচারী সাধারণত অর্থগৃধ্নু হয় শুনিয়াছি। তবে বীরেনবাবু সম্বন্ধে কখনও কোনো কানাঘুষাও শুনি নাই। তবে এ প্রশ্নের তাৎপর্য কি ? এবং গভর্নমেন্টের এই গোপন ভৃত্যটি কোন্ মতলবে আমাকে এই প্রশ্ন করিলেন ?

পরদিন সকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই খবরের কাগজ খুলিলাম। যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহা বাহির হইয়াছে। বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠার শুরুতেই রহিয়াছে—

"গতকল্য বৈকালে সাড়ে পাঁচটার সময় শ্রীরামপুর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে এক অজ্ঞাত ভদ্রলোক যুবকের লাস পাওয়া গিয়াছে। মৃতদেহে কোথাও ক্ষতচিহ্ন নাই। মৃত্যুর কারণ এখনও অজ্ঞাত। মৃতের বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর, সুশ্রী চেহারা, গোঁফ দাড়ি কামানো। পরিধানে বাদামী রংয়ের গরম পাঞ্জাবি ও সাদা শাল ছিল। যুবক কলিকাতা হইতে ৪-৫৩ মিঃ লোকাল ট্রেনে শ্রীরামপুরে আসিয়াছিল ; পকেটে টিকিট পাওয়া গিয়াছে। যদি কেহ লাস সনাক্ত করিতে পারেন, শ্রীরামপুর হাসপাতালে অনুসন্ধান করুন।"

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া শ্রীরামপুরের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম।

দ্বিতলে নামিয়া একতলার সিঁড়িতে পদার্পণ করিতে যাইব, পিছু ডাক পড়িল, 'অজিতবাবু, সকাল না হতে কোথায় চলেছেন ?'

দেখিলাম, ব্যোমকেশবাবু নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। আজ আর মিথ্যা কথা বলিতে বাধিল না, বেশ সড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া আসিল—'যাচ্ছি ডায়মন্ড হারবারে—এক বন্ধুর বাড়ি। ব্যোমকেশ কবে ফিরবে কিছু তো ঠিক নেই, দু'দিন ঘুরে আসি।'

'তা বেশ। আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন ?'

'কালকেতু'খানা বগলে করিয়া লইয়াছিলাম, বলিলাম, 'না, গাড়িতে পড়তে পড়তে যাব।'

বলিয়া নামিয়া গেলাম।

রাস্তায় নামিয়া শিয়ালদহের দিকে কিছুদূর হাঁটিয়া গেলাম, তারপর সেখান হইতে ট্রাম ধরিয়া হাওড়া অভিমুখে রওনা হইলাম। নূতন মিথ্যা কথা বলিতে আরম্ভ করিলে একটু অসুবিধা এই হয় যে ধরা পড়িবার লজ্জাটা সর্বদা মনে জাগরুক থাকে। ক্রমশ পরিপক্ক হইয়া উঠিলে বোধকরি ও দুর্বলতা কাটিয়া যায়।

যা হোক, হাওড়ায় ট্রেনে চাপিয়া বেলা সাড়ে ন'টা আন্দাজ শ্রীরামপুর পৌঁছিলাম।

হাসপাতালের সম্মুখে একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে লাসের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অদূরে একটি ছোট কুঠরী নির্দেশ করিয়া দিলেন। কুঠরীটি মূল হাসপাতাল হইতে পৃথক, সম্মুখে একজন পুলিস প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে।

কাচ ও তার নির্মিত ক্ষুদ্র ঘরটির সম্মুখে গিয়া আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম ; ভিতরে প্রবেশ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। দেখিলাম, ঘরের মাঝখানে শানের মত লম্বা বেদীর উপরে ব্যোমকেশ শুইয়া আছে—তাহার পা হইতে গলা পর্যন্ত একটা কাপড় দিয়া ঢাকা। মুখখানা মৃত্যুর কাঠিন্যে স্থির।

আমি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিলাম, 'আবুহোসেন জাগো।'

ব্যোমকেশ চক্ষু খুলিল।

'কতক্ষণ এইভাবে অবস্থান করছ ?'

'প্রায় দু'ঘণ্টা। একটা সিগারেট পেলে বড় ভাল হত।'

'অসম্ভব। মৃত ব্যক্তি পিণ্ডি খেতে পারে শুনেছি, কিন্তু সিগারেট খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।'

'ঠিক জানো ? মনুসংহিতায় কোনও বিধান নেই ?'

'না। তারপর, ক'জন লোক দেখতে এল ?'

'মাত্র তিনজন। স্থানীয় লোক, নিতান্তই লোফার ক্লাশের।'

'তবে ?'

'এখনও হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। আজ সারাদিন আছে—কালকেও অন্তত সকালবেলাটা পাওয়া যাবে।'

'দু'দিন ধরে এইখানে পড়ে থাকবে ? মনে কর যদি বিজ্ঞাপনটা তাঁর চোখে না পড়ে ?'

'চোখে পড়তে বাধ্য। তিনি এখন অনবরত বিজ্ঞাপন অন্বেষণ করছেন।'

'তা বটে ! যা হোক, এখন আমি কি করব বল দেখি।'

'তুমি এই ঘরের কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে বসে থাকো, যারা আসছে তাদের ওপরে লক্ষ্য রাখো। অবশ্য পুলিস নজর রেখেছে ; যিনি এই হতভাগ্যকে পরিদর্শন করতে আসছেন তাঁরই পিছনে গুপ্তচর লাগছে। কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়। তুমি যদি কোনো চেনা লোক দেখতে পাও, তখনি এসে আমাকে খবর দেবে। আমার মুশকিল হয়েছে চোখ খুলতে পারছি না, কাজেই যাঁরা এখানে পায়ের ধুলো দিচ্ছেন তাঁদের শ্রীমুখ দর্শন করা হচ্ছে না। মড়া যদি মিটমিট করে তাকাতে আরম্ভ করে তাহলে বিষম হৈ চৈ পড়ে যাবে কিনা।'

'বেশ। আমি কাছাকাছি রইলুম। পুলিস আবার হাঙ্গামা করবে না তো ?'

'দ্বারের প্রহরীকে চুপি চুপি নিজের পরিচয় দিয়ে যেও, তাহলে আর হাঙ্গামা হবে না। তিনি একটি বর্ণচোরা আম ; দেখতে পুলিস কনেস্টবল বটে কিন্তু আসলে একজন সি আই ডি দারোগা।'

বাহিরে আসিয়া ছদ্মবেশী প্রহরীকে আত্মপরিচয় দিলাম ; তিনি অদূরে একটা মেতির ঝাড় দেখাইয়া দিলেন। মেতির ঝাড়টি এমন জায়গায় অবস্থিত যে তাহার আড়ালে লুকাইয়া বসিলে ব্যোমকেশের কুঠরীর দ্বার পরিষ্কার দেখা যায়, অথচ বাহির হইতে ঝোপের ভিতরে কিছু আছে কিনা বোঝা যায় না।

ঝোপের মধ্যে গিয়া বসিলাম। চারিদিক ঘেরা থাকিলেও মাথার উপর খোলা ; দিব্য আরামে

রোদ পোহাইতে পোহাইতে সিগারেট ধরাইলাম।

ক্রমে বেলা যত বাড়িতে লাগিল, দর্শন-অভিলাষী লোকের সংখ্যাও একটি দুইটি করিয়া বাড়িয়া চলিল। উৎসুকভাবে তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। সকলেই অপরিচিত, চেহারা দেখিয়া বোধ হইল, অধিকাংশই বেকার লোক একটা নূতন ধরনের মজা পাইয়াছে।

ক্রমে এগারোটা বাজিল, মাথার উপর সূর্যদেব প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। র‍্যাপারটা মাথায় চাপা দিয়া বসিয়া রহিলাম। একটা নৈরাশ্যের ভাব ধীরে ধীরে মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। যে-ব্যক্তি দেশলাই চুরি করিয়াছে, সে শ্রীরামপুরে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির লাস দেখিতে আসিবে কেন ? আর, যদি বা আসে, এতগুলো লোকের মধ্যে তাহাকে দেশলাই-চোর বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইবে কিরূপে ? সত্য, সকলের পিছনেই পুলিস লাগিবে, কিন্তু তাহাতেই বা কি সুবিধা হইতে পারে ? মনে হইল, ব্যোমকেশ বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া মরিতেছে।

ব্যোমকেশের ঘরের দিকে চাহিয়া এই সব কথা ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ চমক ভাঙিয়া গেল। একটি লোক দ্রুতপদে আসিয়া কুঠরীতে প্রবেশ করিল ; বোধহয় পাঁচ সেকেন্ড পরেই আবার বাহির হইয়া আসিল—প্রহরীর প্রশ্নে একবার মাথা নাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

লোকটি আমাদের মেসের নূতন ব্যোমকেশবাবু। তাঁহাকে দেখিয়া এতই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম যে তিনি চলিয়া যাইবার পরও কিয়ৎকাল বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে বসিয়া রহিলাম তারপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সেই ঘরের অভিমুখে ছুটিলাম।

ব্যোমকেশ বোধকরি আমার পদশব্দ শুনিয়া আবার মড়ার মত পড়িয়া ছিল, আমি তাহার কাছে গিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, 'ওহে, কে এসেছিলেন জানো ? তোমার মিতে—মেসের সেই নূতন ব্যোমকেশবাবু।'

ব্যোমকেশ সটান উঠিয়া বসিয়া আমার পানে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইল। তারপর বেদী হইতে লাফাইয়া নীচে নামিয়া বলিল, 'ঠিক দেখেছ ? কোনও ভুল নেই ?'

'কোনও ভুল নেই।'

'যাঃ, এতক্ষণে হয়তো পালাল।'

ব্যোমকেশের গায়ে জামা কাপড় ছিল বটে কিন্তু জুতা পায়ে ছিল না, সেই অবস্থাতেই সে বাহিরের দিকে ছুটিল। হাসপাতালের সম্মুখে যে ভদ্রলোকটিকে আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তিনিও তখনও সেখানে ছিলেন ; ব্যোমকেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় গেল ? এখনি যে-লোকটা এসেছিল ?'

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, 'সেই নাকি ?'

'হ্যাঁ—তাকেই গ্রেপ্তার করতে হবে।'

ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'সে পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে !'

'সে কলকাতা থেকে ট্যাক্সিতে এসেছিল, আবার ট্যাক্সিতে চড়ে পালিয়েছে। আমাদের মোটর-বাইকের বন্দোবস্ত করা হয়নি, তাই—'

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এর জবাবদিহি আপনি করবেন। —এস অজিত, যদি একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়—হয়তো এখনও—'

কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। অগত্যা বাসে চড়িয়াই কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উনিই তাহলে ?'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, 'হুঁ।'

'কিন্তু বুঝলে কি করে ?'

'সে অনেক কথা—পরে বলব।'

'আচ্ছা, উনি অত তাড়াতাড়ি পালালেন কেন ? তুমি যদি মরে গিয়েই থাকো—'

'উনি শিকারী বেরাল, ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বুঝেছিলেন যে ফাঁদে পা দিয়েছেন। তাই চটপট

সরে পড়লেন।'

সাড়ে বারোটার সময় মেসে পৌঁছিয়া দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলাম সিঁড়ির মুখে মেসের ম্যানেজার দাঁড়াইয়া আছেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যোমকেশবাবু এসেছিলেন ?'

ম্যানেজার সবিস্ময়ে নগ্নপদে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'দু' নম্বর ব্যোমকেশবাবু ? তিনি তো এই খানিকক্ষণ হল চলে গেলেন। বাড়ি থেকে জরুরী খবর পেয়েছেন, তাই তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল। তিনিও আপনার খোঁজ করছিলেন। আপনাকে নমস্কার জানিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আপনি যেন দুঃখ না করেন, শীগ্‌গির আবার দেখা হবে।'

৪

শিষ্টতার এই প্রবল ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তাঁর ঘর কোনটা ?'

'ঐ যে পাঁচ নম্বর ঘর।'

পাঁচ নম্বর ঘরের দ্বারে তালা লাগানো ছিল, ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এর চাবি কোথায় ?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আমার কাছে একটা চাবি আছে, কিন্তু—'

'খুলুন।'

চাবির থোলো পকেট হইতে বাহির করিতে করিতে ম্যানেজার উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, 'কি—কি হয়েছে ব্যোমকেশবাবু ?'

'বিশেষ কিছু নয় ; যে ভদ্রলোকটি এই ঘরে ছিলেন তিনি একজন দাগী আসামী।'

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তিনি তো কিছুই নিয়ে যাননি দেখছি। বাক্স বিছানা সবই রয়েছে।'

ম্যানেজার বলিলেন, 'তিনি কেবল ছোট হ্যান্ডব্যাগ আর জলের কুঁজো নিয়ে গেছেন—আর সবই রেখে গেছেন। বললেন, দু'চার দিনের মধ্যে ফিরবেন, আমিও ভাবলুম—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক কথা। আপনি এবার থানার দারোগা বীরেনবাবুর কাছে খবর পাঠান—তাঁকে জানান যে চোরের সন্ধান পাওয়া গেছে, তিনি যেন শীগ্‌গির আসেন।—আমরা ততক্ষণে এই ঘরটা একবার দেখে নিই।'

ম্যানেজার প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। এই মেসের প্রায় সব ঘরগুলিই বড় বড়, প্রত্যেকটিতে দু' বা তিনজন করিয়া ভদ্রলোক থাকিতেন। কেবল এই পাঁচ নম্বর ঘরটি ছিল ছোট, একজনের বেশি থাকা চলিত না। ভাড়াও কিছু বেশি পড়িত, তাই ঘরটা অধিকাংশ সময় খালি পড়িয়া থাকিত। যিনি মেসে থাকিয়াও স্বাতন্ত্র্য ও নিভৃততা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে ঘরটি চমৎকার।

ঘরে গোটা দুই ট্রাঙ্ক ও বিছানা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। ব্যোমকেশ বিছানাটা পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'শীতের সময়, অথচ লেপ তোষক বালিশ কিছুই নিয়ে যাননি। অর্থাৎ—বুঝেছ ?'

'না। কি ?'

'অন্যত্র আর একসেট বন্দোবস্ত আছে।'

ব্যোমকেশ বিছানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কি আশা করছ দেশলায়ের বাক্সটা তিনি এই ঘরে রেখে গেছেন ?'

'না—তাহলে তিনি ফিরে এলেন কেন ? আমি খুঁজছি তার বর্তমান ঠিকানা ; যদি কোথাও কিছু

পাই যা-থেকে তাঁর প্রকৃত নামধামের কিছু ইশারা পাওয়া যায়। তাঁর সত্যিকারের নাম যে ব্যোমকেশ বসু নয় এটা বোধ হয় তুমিও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ।'

'মানে—কি বলে—হ্যাঁ, পেরেছি বৈকি। কিন্তু 'ব্যোমকেশ' ছদ্মনাম গ্রহণ করবার উদ্দেশ্য কি ?'

বিছানার উপর বসিয়া ব্যোমকেশ ঘরের এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে বলিল, 'উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা সাধন। অজিত, প্রতিহিংসার মনস্তত্ত্বটা বড় আশ্চর্য। তুমি গল্প-লেখক, সুতরাং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সবই জানো। তোমাকে বলাই বাহুল্য যে নেপথ্য থেকে প্রতিহিংসা সাধন করে মানুষ সুখ পায় না ; প্রত্যেকটি আঘাতের সঙ্গে সে জানিয়ে দিতে চায় যে সে প্রতিহিংসা নিচ্ছে। শত্রু যদি জানতে না পারে কোথা থেকে আঘাত আসছে, তাহলে প্রতিহিংসার অর্ধেক আনন্দই ব্যর্থ হয়ে যায়। ইনি তাই একেবারে আমার বুকের ওপর এসে চেপে বসেছিলেন। এটা যদি সুসভ্য বিংশ শতাব্দী না হয়ে প্রস্তর-যুগ হত, তাহলে এত ছল চাতুরীর দরকার হত না, উনি একেবারে পাথরের মুগুর নিয়ে আমার মাথায় বসিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন সেটা চলে না, ফাঁসি যাবার ভয় রয়েছে। মোট কথা, প্রতিহিংসার পদ্ধতিটা বদলেছে বটে কিন্তু মনস্তত্ত্বটা বদলায়নি। আজ যে উনি আমার মৃত মুখখানা দেখবার জন্যে শ্রীরামপুরে ছুটেছিলেন, সেও ওই একই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে।' ব্যোমকেশ খামখেয়ালী গোছের হাসিল—'চিঠিখানার কথা মনে আছে তো, সেটা আমারই উদ্দেশ্যে লেখা এবং উনি নিজেই লিখেছিলেন। তার বাহ্য কৃতজ্ঞতার আড়ালে লুকিয়ে ছিল অতি ক্রূর ইঙ্গিত। তিনি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার ভাবেই লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি ভোলেননি—ঋণ পরিশোধ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন। আমরা অবশ্য তখন চিঠির মানে ভুল বুঝেছিলাম, তবু—আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। তোমার বোধহয় মনে আছে।'

সেই চিঠিতে লিখিত কথাগুলো যেন এখন নূতন চক্ষে দেখিতে পাইলাম। বলিলাম, 'মনে আছে। কিন্তু তখন কে জানত— ; আচ্ছা, লোকটা তোমার কোনও পুরনো শত্রু—না ?'

'তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'লোকটা কে তা কিছু বুঝতে পারছ না ?'

'বোধহয় একটু একটু পারছি। কিন্তু এখন ও কথা যাক, আগে তাঁর বাক্সগুলো দেখি।'

একটা বাক্সের চাবি খোলাই ছিল, তাহাতে দৈনিক ব্যবহার্য কাপড়-চোপড় ছাড়া আর কিছু ছিল না। অন্যটার তালা লইয়া ব্যোমকেশ দু'একবার নাড়াচাড়া করিয়া একটু চাপ দিতেই সেটাও খুলিয়া গেল। ভিতরে কয়েকটা গরম কোট পাঞ্জাবি ইত্যাদি রহিয়াছে। সেগুলা বাহির করিয়া তলায় অনুসন্ধান করিতে এক শিশি স্পিরিট-গাম ও কিছু বিনুনিকরা ক্রেপ চুল বাহির হইয়া পড়িল। সেগুলি তুলিয়া ধরিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, মুখে যার অ্যাসিড ছাপ মেরে দিয়েছে তাকে মাঝে মাঝে গোঁফ দাড়ি পরে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয় বৈকি। এই সব পরে সম্ভবত ইনি ট্রামে আমার দেশলাই বদলে নিয়েছিলেন।'

ক্রেপ ইত্যাদি সরাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ আবার কয়েকটা জিনিস দুই হাতে বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিল, বলিল, 'কিন্তু এগুলো কি ?'

মোমজামার মত খানিকটা কাপড়ে কি কতকগুলা জড়ানো রহিয়াছে। ব্যোমকেশ সাবধানে সেগুলা মেঝের উপর রাখিয়া মোড়ক খুলিল। একটি আধ আউন্সের খালি শিশি, কয়েকখণ্ড সীলমোহর করিবার লাল রংয়ের গালা ও অর্ধ-দগ্ধ একটি মোমবাতি রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ শিশির ছিপি খুলিয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিল, মোমবাতি ও গালা খুব মনোযোগের সহিত দেখিল, শেষে মোমজামাটা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিল। দেখিলাম সাধারণ মোমজামা নয়, খুব ভাল জাতীয় ওয়াটারপ্রুফ কাপড়—ঈষৎ নীলাভ এবং স্বচ্ছ—আয়তনে একটা রুমালের মত। বর্তমানে তাহার একটা কোণের প্রায় সিকি ভাগ কাপড় নাই—মনে হয় কোনও কারণে ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'শিশি, গালা, মোমবাতি এবং ওয়াটারপ্রুফের একত্র সমাবেশ।

মানে বুঝতে পারলে ?'

'না—কি মানে ?'

'ওয়াটারপ্রুফ থেকেও কিছু আন্দাজ করতে পারলে না ?'

হতাশভাবে বলিলাম, 'কিচ্ছু না। তুমি কি বুঝলে ?'

'সবই বুঝেছি, শুধু ভদ্রলোকের বর্তমান ঠিকানা ছাড়া।—চল, এখানকার কাজ আমাদের শেষ হয়েছে।'

এই সময় ম্যানেজারবাবু ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, 'দারোগাবাবুকে খবর দিয়েছি, তিনি এলেন বলে।'

'বেশ।—আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, আমার এই মিতেটি যখন চলে গেলেন তখন আপনি নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে সদর পর্যন্ত গিয়েছিলেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলুম।'

'ট্যাক্সির নম্বরটা আপনার চোখে পড়েনি ?'

মাথা নাড়িয়া ম্যানেজার বলিলেন, 'আজ্ঞে না। নীল রঙের পুরনো ট্যাক্সি—ড্রাইভার একজন শিখ—এইটুকুই লক্ষ্য করেছিলুম।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সে সময় দোরের কাছে আর কেউ ছিল ?'

ম্যানেজার ভাবিয়া বলিলেন, 'ভদ্রলোক কেউ ছিলেন বলে তো মনে পড়ছে না, তবে আপনাদের চাকর পুঁটিরাম দাওয়ায় বসেছিল। আপনারা বাসায় ছিলেন না, তাই সে বোধহয় একটু—'

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'পুঁটিরাম থাকা না-থাকা সমান। সে তো আর ইংরিজি জানে না, কাজেই ট্যাক্সির নম্বর চোখে দেখলেও পড়তে পারবে না।—চল অজিত, দেড়টা বাজল, পেটও বাপান্ত করছে। ম্যানেজারবাবু, এবেলা দু'টি ভাত আমাদের দিতে হবে। অবশ্য যদি অসুবিধা না হয়।'

ম্যানেজার সানন্দে বলিলেন, 'বিলক্ষণ ! অসুবিধে কিসের ! ব্যোমকেশবাবুর—মানে, দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবুর—ভাত হাঁড়িতেই আছে, তিনি তো খাননি। আপনারা স্নান করুনগে, আমি ভাত পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'মন্দ ব্যবস্থা নয়। দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবুর বাড়া ভাত এক নম্বর ব্যোমকেশবাবু খাবেন। দুনিয়াতে এই ব্যাপার তো হরদম চলছে—কি বল অজিত ? এখন দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবু কোথায় বসে কার ভাত খাচ্ছেন সেইটে জানতে পারলে বড় খুশি হতুম।'

আহার তখনো শেষ হয় নাই, বীরেনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোনও রকমে অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিতেই বীরেনবাবু উঠিয়া প্রশ্ন-ব্যাকুল নেত্রে ব্যোমকেশের পানে তাকাইলেন। তাহার সমস্ত দেহ একটা জীবন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্নের আকার ধারণ করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার এখনো খাওয়া হয়নি দেখছি।'

'না। খাবার জন্যে বাড়ি যাচ্ছিলুম এমন সময় আপনার ডাক পেলুম।—কি হল ব্যোমকেশবাবু ? ধরেছেন তাকে ?'

'বলছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে কিছু খাবার আনিয়ে দিই।'

'খাবার দরকার নেই। তবে যদি এক পেয়ালা চা—'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বেশ। এবং সেই সঙ্গে দুটো নিষিদ্ধ ডিম।—পুঁটিরাম।'

পুঁটিরাম হুকুম লইয়া প্রস্থান করিলে পর, ব্যোমকেশ বীরেনবাবুকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল। তাঁহাকে না বলিয়া এত কাজ করা হইয়াছে, ইহাতে বীরেনবাবু একটু আহত হইলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে যথা সম্ভব মিষ্ট করিয়া সান্ত্বনা দিল, তথাপি তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, 'আমি যদি জানতুম তাহলে সে এমন হাত-ফস্‌কে পালাতে পারত না। এখন তাকে ধরা কঠিন হবে।

এতক্ষণে সে হয়তো কলকাতা থেকে বহু দূরে চলে গেছে।'

ব্যোমকেশ মেঝের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'আমার কিন্তু মনে হয় সে কলকাতাতেই আছে। কারণ সে মার্কা-মারা লোক, ওরকম মুখ নিয়ে মানুষ বেশি দূর পালাতে পারে না। কলকাতা শহরই তার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'তাহলে এখন কর্তব্য কি ? তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে ইস্তাহার জারি করা ছাড়া আর তো কোনো পথ দেখছি না।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'ওটা তো হাতেই আছে। কিন্তু তার আগে—যদি ট্যাক্সির নম্বরটা পাওয়া যেত—'

ইতিমধ্যে পুঁটিরাম চা ইত্যাদি আনিয়া বীরেনবাবুর সম্মুখে রাখিতেছিল, ব্যোমকেশ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'পুঁটিরাম, তোমার ইংরিজি শেখা দরকার, আজই একখানা প্যারী সরকারের ফার্স্টবুক কিনে আনবে। অজিত আজ থেকে তোমাকে ইংরিজি শেখাবে।'

অবান্তর কথায় বীরেনবাবু বিস্মিতভাবে ব্যোমকেশের দিকে চাহিলেন, ব্যোমকেশ বলিল, 'ও যদি ইংরিজি জানত তাহলে আজ কোনও হাঙ্গামাই হত না।' পুঁটিরামের দ্বারের কাছে অবস্থিতি ও ট্যাক্সি দর্শনের কথা বলিয়া ব্যোমকেশ বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িল।

পুঁটিরাম মুখের সম্মুখে মুষ্টি তুলিয়া সসম্ভ্রমে একটু কাশিল—

'আজ্ঞে—'

'কি ?'

'আজ্ঞে, টেক্সির লম্বর আমি দেখেছি।'

'তা দেখেছ—কিন্তু পড়তে তো পারোনি।'

'আজ্ঞে, পড়তে পেরেছি। চারের পিঠে দুটো শূন্যি, তারপর আবার একটা চার।'

আমরা তিনজনে অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ বলিল, 'তুই ইংরিজি পড়তে জানিস ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে ?'

'বাংলাতে লেখা ছিল বাবু, সেই জন্যেই তো চোখে পড়ল।'

আমরা চক্ষু গোলাকৃতি করিয়া রহিলাম। তারপর ব্যোমকেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—'বুঝেছি।' পুঁটিরামের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা ! পুঁটিরাম, আজ থেকে তোমার মাইনে এক টাকা বাড়িয়ে দিলুম।'

পুঁটিরাম সহর্ষে এবং সলজ্জে বলিল, 'আজ্ঞে, বাইরের দাওয়ায় বসেছিলুম, টেক্সিতে বাংলা লম্বর দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। তাইতো লম্বরটা মনে আছে হুজুর।'

বীরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি ? ট্যাক্সিতে বাংলা নম্বর এল কোত্থেকে ?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বাংলা নয়—ইংরিজি নম্বরই ছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে সেটা বাংলা হয়ে পড়েছিল। বুঝলেন না ? আসলে নম্বরটা ৮০০৮, পুঁটিরাম তাকে পড়েছে ৪০০৪।'

'ওঃ—' বীরেনবাবুর চক্ষুর্দ্বয় ও অধরোষ্ঠ কিছুক্ষণ বর্তুলাকার হইয়া রহিল।

অবশেষে ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আর দেরি করে লাভ কি ? বীরেনবাবু, এ তো আপনার কাজ। নীল রংয়ের গাড়ি, চালক শিখ, নম্বর ৮০০৮—খুঁজে বার করতে বেশি কষ্ট হবে না। আপনি তাহলে বেরিয়ে পড়ুন, খবরটা যত শীঘ্র পাওয়া যায় ততই ভাল।'

'আমি এখনি যাচ্ছি—' বীরেনবাবু উঠিয়া এক চুমুকে চা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'সন্ধ্যের আগেই আশা করি খবর নিয়ে আসতে পারব।'

'শুধু খবর নয়, একেবারে গাড়ি ড্রাইভার সব নিয়ে হাজির হবেন। ইতিমধ্যে আমি কমিশনার সাহেবকে টেলিফোন যোগে খবরটা জানিয়ে দিই। তিনি নিশ্চয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

গমনোদ্যত বীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আসামীর নাম বা পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে আপনি কোনও খবর দিতে পারেন না ?'

'নির্ভুল খবর এখন দিতে পারি কিনা জানি না, তবু—' এক টুকরা কাগজে একটা নম্বর লিখিয়া তাঁহার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আলিপুর জেলে এই কয়েদীর ইতিহাস খুলে হয়তো কিছু পরিচয় পাবেন।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'লোকটা তাহলে দাগী ?'

'আমার তো তাই মনে হয়। কাল সকালে তার খোঁজ করে নম্বরটা বার করেছিলুম, কিন্তু তার জেলের ইতিহাস পড়বার ফুরসত হয়নি। আপনি সরকারী লোক, এ কাজটা সহজেই পারবেন—অফিসের মারফত। কেমন ?'

'নিশ্চয়।'

বীরেনবাবু কাগজটা সাবধানে ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

৫

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দু'জনে বীরেনবাবুর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ব্যোমকেশ তাহার রিভলবারটা তেল ও ন্যাকড়া দিয়া পরিষ্কার করিতেছিল।

আমি বলিলাম, 'বীরেনবাবু তো এখনো এলেন না।'

'এইবার আসবেন।' ব্যোমকেশ একবার ঘড়ির দিকে চোখ তুলিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা ব্যোমকেশ, লোকটার আসল নাম কি ? তুমি নিশ্চয় জানো ?'

'আমি তো বলেছি, এখনও ঠিক জানি না।'

'তবু আন্দাজ তো করেছ।'

'তা করেছি।'

'কে লোকটা ? আমার চেনা নিশ্চয়—না ?'

'শুধু চেনা নয়, তোমার একজন পুরনো বন্ধু।'

'কি রকম ?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'সেই চিঠিখানাতে কোকনদ গুপ্ত নাম ছিল মনে আছে বোধ হয়। তা থেকে কিছু অনুমান করতে পার না ?'

'কি অনুমান করব। কোকনদ গুপ্ত তো ছদ্মনাম।'

'সেই জন্যই তো তাতে আরো বেশি করে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। মানুষের সত্যিকার নামকরণ হয় সম্পূর্ণ খেয়ালের বশে, অধিকাংশ স্থলেই কানা ছেলের নাম হয় পদ্মলোচন। যেমন তোমার নাম অজিত, আমার নাম ব্যোমকেশ—আমাদের বর্ণনা হিসাবে নাম-দুটোর কোনও সার্থকতা নেই। কিন্তু মানুষ যখন ভেবে চিন্তে ছদ্মনাম গ্রহণ করে তখন তার মধ্যে অনেকখানি ইঙ্গিত পুরে দেবার চেষ্টা করে। কোকনদ শব্দটা তোমাকে কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে না ? কোনও একটা শব্দগত সাদৃশ্য ?'

আমি ভাবিয়া বলিলাম, 'কি জানি, আমি তো এক কোকেন ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই সাদৃশ্য পাচ্ছি না।'

ব্যোমকেশ হাসিল, বলিল, 'কোকনদের সঙ্গে কোকেনের সাদৃশ্য মোটেই কাব্যানুমোদিত নয়, তাই তোমার মন উঠ্ছে না—কেমন ? কিন্তু—ঐ বীরেনবাবু আসছেন, সঙ্গে আর একজন। অজিত, আলোটা জ্বেলে দাও, অন্ধকার হয়ে গেছে।'

বীরেনবাবু প্রবেশ করিলেন ; তাঁহার সঙ্গে একটি দীর্ঘাকৃতি শিখ। শিখের মুখে প্রচুর গোঁফ-দাড়ি—গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা কিঞ্চিৎ সংযত করা হইয়াছে। মাথায় বেণী।

ব্যোমকেশ উভয়কে আদর করিয়া বসাইল।

কালব্যয় না করিয়া ব্যোমকেশ শিখকে প্রশ্ন আরম্ভ করিল। শিখ বলিল, আজ সকালের আরোহীকে তাহার বেশ মনে আছে। তিনি বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটার সময় তাহার ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া শ্রীরামপুরে যান; সেখানে হাসপাতালের অনতিদূরে গাড়ি রাখিয়া তিনি হাসপাতালে প্রবেশ করেন। অল্পক্ষণ পরেই আবার লৌটিয়া আসিয়া দ্রুত কলিকাতায় ফিরিয়ে আসিতে আদেশ করেন। কলিকাতায় পহুঁছিয়া তিনি এই বাসায় নামেন, তারপর সামান্য কিছু সামান্ লইয়া আবার গাড়িতে আরোহণ করেন। এখান হইতে বউবাজারের কাছাকাছি একটা স্থানে গিয়া তিনি শেষবার নামিয়া যান। তিনি ভাড়া চুকাইয়া দিয়া উপরন্তু দুই টাকা বখ্‌শিশ দিয়াছেন; ইহা হইতে শিখের ধারণা জন্মিয়াছে সে লোকটি অতিশয় সাধু ব্যক্তি।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তিনি শেষবার নেমে গিয়ে কি করলেন?'

শিখ বলিল, তাহার যতদূর মনে পড়ে তিনি একজন ঝাঁকামুটের মাথায় তাঁহার বেগ্ ও জলের সোরাহি চড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন; কোনদিকে গিয়াছিলেন তাহা সে লক্ষ্য করে নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি তোমার গাড়ি এনেছ। সেই বাবুটিকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলে আমাদের ঠিক সেইখানে পৌঁছে দিতে পারবে?'

শিখ জানাইল যে বে-শক্ পারিবে।

তখন আমরা দুইজনে তাড়াতাড়ি তৈয়ার হইয়া নীচে নামিলাম। নীল রংয়ের গাড়ি বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, ৮০০৮ নম্বর গাড়িই বটে। আমরা তিনজনে তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। শিখ গাড়ি চালাইয়া লইয়া চলিল।

রাত্রি হইয়াছিল। গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া বীরেনবাবু হঠাৎ বলিলেন, 'আপনার কয়েদীর খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। ইনি তিনিই বটে। মাস ছয়েক হল জেল থেকে বেরিয়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, তাহলে আর সন্দেহ নেই। মুখ পুড়েছিল কি করে?'

'ইনি শিক্ষিত ভদ্রলোক আর বিজ্ঞানবিৎ বলে এঁকে জেল-হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। বছর দুই আগে একটা নাইট্রিক অ্যাসিডের শিশি ভেঙে গিয়ে মুখের ওপর পড়ে। বাঁচবার আশা ছিল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেন।'

আর কোনও কথা হইল না। মিনিট পনেরো পরে আমাদের গাড়ি এমন একটা পাড়ায় গিয়া দাঁড়াইল যে আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ব্যোমকেশ, এ কি! এ যে আমাদের—'। বহুদিনের পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল। এই পাড়ারই একটা মেসে ব্যোমকেশের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। *

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।' চালককে জিজ্ঞাসা করিল, 'এইখানেই তিনি গিয়েছিলেন?'

চালক বলিল, 'হাঁ।'

একটু চিন্তা করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, এবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চল।'

বীরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি, নামবেন না?'

'দরকার নেই। আমাদের শিকার কোথায় আছে আমি জানি।'

'তাহলে তাকে এখনি গ্রেপ্তার করা দরকার।'

ব্যোমকেশ বীরেনবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'শুধু গ্রেপ্তার করলেই হবে? দেশলায়ের বাক্সটা চাই না?'

'না না—তা চাই বৈ কি। তাহলে কি করতে চান?'

'আগে দেশলায়ের বাক্সটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর তাকে ধরতে চাই। চলুন, কি করতে হবে বাসায় গিয়ে বলব।'

* 'সত্যান্বেষী' গল্প দ্রষ্টব্য।

আমরা আবার ফিরিয়া চলিলাম।

রাত্রি আটটার সময় আমি, ব্যোমকেশ ও বীরেনবাবু একটা অন্ধকার গলির মোড়ে এক ভাড়াটে গাড়ির মধ্যে লুকাইয়া বসিলাম। এইখানে একটা গাড়ির স্ট্যান্ড আছে—তাই, আমাদের গাড়িটা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে আমাদের সেই পুরাতন মেস। বাড়িখানা এ কয় বৎসরে কিছুমাত্র বদলায় নাই, যেমন ছিল তেমনই আছে। কেবল দ্বিতলের মেসটা উঠিয়া গিয়াছে; উপরের সারি সারি জানালাগুলিতে কোথাও আলো নাই।

মিনিট কুড়ি-পঁচিশ অপেক্ষা করিবার পর আমি বলিলাম, 'আমরা ধরনা দিচ্ছি, কিন্তু উনি যদি আজ রাত্রে না বেরোন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেরুবেন বৈ কি। রাত্রে আহার করতে হবে তো।'

আরো কুড়ি মিনিট কাটিয়া গেল। ব্যোমকেশ গাড়ির খড়খড়ির ভিতর চক্ষু নিবদ্ধ করিয়াছিল, সহসা চাপা গলায় বলিল, 'এইবার! বেরুচ্ছেন তিনি।'

আমরাও খড়খড়িতে চোখ লাগাইয়া দেখিলাম, একজন লোক আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়া সেই বাড়ির দরজা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তারপর একবার ক্ষিপ্র-দৃষ্টিতে রাস্তার দুইদিকে তাকাইয়া দ্রুতপদে দূরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

রাস্তায় লোক চলাচল ছিল না বলিলেই হয়। সে অদৃশ্য হইয়া গেলে আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ির সম্মুখীন হইলাম।

সম্মুখের দরজায় তালা বন্ধ। ব্যোমকেশ মৃদু স্বরে বলিল, 'এদিকে এস।'

পাশের যে-দরজা দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে, সে দরজাটা খোলা ছিল; আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এইখানে সরু একফালি বারান্দা, তাহাতে একটি দরজা নীচের ঘরগুলিকে উপরের সিঁড়ির সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। ব্যোমকেশ পকেট হইতে একটা টর্চ বাহির করিয়া দরজাটা দেখিল; বহুকাল অব্যবহৃত থাকায় দরজা কীটদষ্ট ও কমজোর হইয়া পড়িয়াছে। ব্যোমকেশ জোরে চাপ দিতেই হুড়কা ভাঙিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ভাঙা দরজা স্বাভাবিক রূপে ভেজাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ টর্চের আলো চারিদিকে ফিরাইল। ঘরটা দীর্ঘকাল অব্যবহৃত, মেঝেয় পুরু হইয়া ধূলা পড়িয়াছে, কোণে ঝুল ও মাকড়সার জাল। ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা নয়, ওদিকে চল।'

ঘরের একটা দ্বার ভিতরের দিকে গিয়াছিল, সেটা দিয়া আমরা অন্য একটা ঘরে উপস্থিত হইলাম। এ ঘরটা আমাদের পরিচিত, বহুবার এখানে বসিয়া আড্ডা দিয়াছি। টর্চের আলোয় দেখিলাম ঘরটি সম্প্রতি পরিষ্কৃত হইয়াছে, একপাশে একটি তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা, মধ্যস্থলে একটি টেবিল ও চেয়ার। ব্যোমকেশ ঘরটার চারিপাশে আলো ফেলিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, 'হুঁ, এই ঘরটা। বীরেনবাবু, এবার আসুন অন্ধকারে বসে গৃহস্বামীর প্রতীক্ষা করা যাক।'

বীরেনবাবু ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন, 'দেশলায়ের বাক্সটা এই বেলা—'

'সেজন্যে ভাবনা নেই। রিভলবার আর হাতকড়া পকেটে আছে তো ?'

'আছে।'

'বেশ। মনে রাখবেন, লোকটি খুব শান্ত-শিষ্ট নয়।'

আমি এবং বীরেনবাবু তক্তপোশের উপর বসিলাম, ব্যোমকেশ চেয়ারটা দখল করিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা আরম্ভ হইল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। আধঘণ্টা তখনও অতীত হয় নাই, বাহিরের দরজায় খুট্ করিয়া শব্দ হইল। আমরা খাড়া হইয়া বসিলাম; নিশ্বাস আপনা হইতে বন্ধ হইয়া গেল।

অতি মৃদু পদক্ষেপ অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তারপর সহসা ঘরের আলো দপ্

করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সহজ স্বরে বলিল, 'আসতে আজ্ঞা হোক অনুকূলবাবু। আমরা আপনার পুরনো বন্ধু, তাই অনুমতি না নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছি। কিছু মনে করবেন না।'

অনুকূল ডাক্তার—অর্থাৎ দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবু—সুইচে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ তিনি কথা কহিলেন না। তাঁহার পক্ষ্মহীন চক্ষু দু'টি একে একে আমাদের তিনজনকে পরিদর্শন করিল। তারপর তাঁহার বিবর্ণ বিকৃত মুখে একটা ভয়ঙ্কর হাসি দেখা দিল; তিনি দাঁতের ভিতর হইতে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু যে! সঙ্গে পুলিস দেখছি। কি চাই? কোকেন?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া হাসিল—'না না, অত দামী জিনিস চেয়ে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করব না। আমরা অতি সামান্য জিনিস চাই—একটা দেশলায়ের বাক্স।'

অনুকূলবাবুর অনাবৃত চক্ষু দু'টা ব্যোমকেশের মুখের উপর স্থির হইয়া রহিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'দেশলায়ের বাক্স! তার মানে?'

'মানে, যে-বাক্স থেকে একটি কাঠি সম্প্রতি ট্রামে যেতে যেতে আপনি আমায় উপহার দিয়েছিলেন, তার বাকি কাঠিগুলি আমার চাই। আপনি তাদের যে মূল্য ধার্য করেছেন অত টাকা তো আমি দিতে পারব না, তবে আশা আছে বন্ধুজ্ঞানে সেগুলি আপনি বিনামূল্যেই আমায় দেবেন।'

'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।'

'পারছেন বৈকি। কিন্তু হাতটা আপনি সুইচ থেকে সরিয়ে নিন। ঘর হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেলে আমাদের চেয়ে আপনারই বিপদ হবে বেশি। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি, দু'টি রিভলবার আপনার বুকের দিকে স্থির লক্ষ্য করে আছে।'

অনুকূলবাবু সুইচ ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার মুখে পাশবিক ক্রোধ এতক্ষণে উলঙ্গ মূর্তি ধরিয়া দেখা দিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, '(ছাপিবার যোগ্য নয়) আমার জীবনটা তুই নষ্ট করে দিয়েছিস! তো...' অনুকূলবাবুর ঠোঁটের কোণে ফেনা গাঁজাইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ডাক্তার, জেলখানায় থেকে তোমার ভাষাটা বড় ইয়ে হয়ে গেছে দেখছি। দেবে না তাহলে দেশলায়ের বাক্সটা?'

'না—দেব না। আমি জানি না কোথায় দেশলায়ের বাক্স আছে। তোর সাধ্য হয় খুঁজে নে,—কোথাকার।'

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল—'খুঁজেই নিই তাহলে।—বীরেনবাবু, আপনি সতর্ক থাকবেন।'

ব্যোমকেশ তক্তপোশের শিয়রে গিয়া দাঁড়াইল। গেলাস-ঢাকা জলের কুঁজাটা সেখানে রাখা ছিল, সেটা দু'হাতে তুলিয়া লইয়া সে মেঝের উপর আছাড় মারিল। কুঁজা সশব্দে ভাঙিয়া গিয়া চারিদিকে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল।

কুঁজার ভগ্নাংশগুলি মধ্য হইতে নীল কাপড়ে মোড়া শিশির মত একটা জিনিস তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ আলোর সম্মুখে আসিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, 'ওয়াটারপ্রুফ, শিশি, সীলমোহর, সব ঠিক আছে—শিশিটা ভাঙেনি দেখছি—বীরেনবাবু, দেশলাই পাওয়া গেছে—এবার চোরকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।'

৬

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'এই কাহিনীর মরাল হচ্ছে—ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং। পুঁটিরাম যদি দাওয়ায় বসে না থাকত এবং ট্যাক্সির নম্বরটা ৮০০৮ না হত, তাহলে আমরা অনুকূলবাবুকে পেতুম কোথায়?'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তা তো বুঝলুম, কিন্তু দেশলাই-চোর যে অনুকূলবাবু এ সন্দেহ তোমার কি

করে হল ?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আমার সত্যান্বেষী জীবনে যতগুলি ভয়ঙ্কর শত্রু তৈরি করেছি, তার মধ্যে কেবল তিনজন বেঁচে আছে। প্রথম—পেশোয়ারী আমীর খাঁ, যে মেয়ে-চুরির ব্যবসাকে সূক্ষ্ম ললিতকলায় পরিণত করেছিল। বিচারে পিনাল কোডের কয়েক ধারায় তার বারো বছর জেল হয়। দ্বিতীয়—পলিটিক্যাল দালাল কুঞ্জলাল সরকার, যে সরকারী অর্থনৈতিক গুপ্ত সংবাদ চুরি করে শেয়ার মার্কেটে বিক্রি করত। বছর দুই আগে তার সাত বছর শ্রীঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। তৃতীয়—আমাদের অনুকূল ডাক্তার। ইনি কোকেনের ব্যবসা এবং আমাকে খুন করবার চেষ্টার অপরাধে দশ বছর জেলে যান। হিসেব করে দেখছি, বর্তমানে কেবল অনুকূলবাবুরই জেল থেকে বেরুবার সময় হয়েছে। সুতরাং অনুকূলবাবু ছাড়া আর কে হতে পারে ?’

‘তা বটে। কিন্তু এই দগ্ধানন ভদ্রলোকটিই যে অনুকূলবাবু এ সন্দেহ তোমার হয়েছিল ?’

‘না। ওঁর হাঁটার ভঙ্গীটা পরিচিত মনে হয়েছিল বটে কিন্তু ওঁকে সন্দেহ করিনি। তারপর সেই কোকনদ গুপ্তর চিঠিখানা—সেটাও মনে ধোঁকা ধরিয়ে দিয়েছিল। কোকনদ নামটা এতই অস্বাভাবিক যে ছদ্মনাম বলে সন্দেহ হয়, উপরন্তু আবার ‘গুপ্ত’। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করেছ, আমাদের দেশের লোক ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হলেই নামের শেষে একটা ‘গুপ্ত’ বসিয়ে দেয়। তাই, দু’নম্বর ব্যোমকেশবাবু যখন চিঠিখানা নিজের বলে স্পষ্টভাবে দাবি করতে না পেরেও নিয়ে চলে গেলেন, তখন আমার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। কোকনদ শব্দটা কোকেনের কথাই মনে করিয়ে দেয়—তুমি ঠিক ধরেছিলে। কিন্তু তখন দু’নম্বর ব্যোমকেশবাবুর ওপর কোনও সন্দেহ হয়নি, তাই মনের সংশয় জোর করে সরিয়ে দিয়েছিলুম। তারপর শ্রীরামপুর হাসপাতালে তুমি বললে, উনি আমাকে দেখতে এসেছেন তখন নিমেষের মধ্যে সংশয়ের সব অন্ধকার কেটে গেল। বুঝলুম উনিই অনুকূলবাবু এবং দেশলাই-চোর।’

‘উনি ব্যোমকেশ নাম গ্রহণ করে এ বাসায় উঠেছিলেন কেন ?’

‘আগেই বলেছি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি বড় অদ্ভুত জিনিস। ঐ চিঠিখানা আমাকে দিয়ে আমি বুঝতে পারি কি না দেখবার জন্যে উনি এত কাণ্ড করেছিলেন ; আর ঐ প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়েই শ্রীরামপুরে আমার মৃত মুখ দেখতে গিয়েছিলেন। উনি জানতেন, ওঁর মুখের চেহারা এমন বদলে গেছে যে আমরা ওঁকে চিনতে পারব না।’

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, ‘আচ্ছা, জলের কুঁজোর মধ্যে দেশলায়ের কাঠি লুকিয়ে রেখেছেন, এটা ধরলে কি করে ?’

ব্যোমকেশ কহিল, ‘এইখানে অনুকূলবাবুর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দেশলায়ের কাঠি জলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হবে এ কেউ কল্পনাই করতে পারে না। কাজেই, যদি কোনও কারণে তাঁর ঘর খানাতল্লাস হয়, জলের কুঁজোর মধ্যে কেউ তা খুঁজতে যাবে না। আমার সন্দেহ হল যখন শুনলুম, তিনি একটি হ্যান্ডব্যাগ আর জলের কুঁজো নিয়ে চলে গেছেন। হ্যান্ডব্যাগ না হয় বুঝলুম, কিন্তু জলের কুঁজো নিয়ে গেলেন কেন ? শীতকালে যে-লোক লেপ বিছানা নিয়ে গেল না, সে জলের কুঁজো নিয়ে যাবে কি জন্যে ? জলের কুঁজো কি এতই দরকারী ? তারপর তাঁর বাক্স থেকে যখন গালা ওয়াটারপ্রুফ ইত্যাদি বেরুল, তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। কাঠিগুলি তিনি শিশিতে পুরে ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ে জড়িয়ে সীলমোহর করে তাকে জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন, যাতে জলের মধ্যে থেকেও নষ্ট না হয়। অনুকূলবাবুর বুদ্ধি ছিল অসামান্য, কিন্তু বিপথগামী হয়ে সব নষ্ট হয়ে গেল !’

পুঁটিরাম চায়ের শূন্য বাটিগুলা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘পুঁটিরাম, ফার্স্টবুক এনেছ ?’

লজ্জিতভাবে পুঁটিরাম বলিল, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘বেশ। অজিত, আজ থেকেই তাহলে পুঁটিরামের হায়ার এডুকেশন আরম্ভ হোক। কারণ প্রত্যেক বারই যে ৮০০৮ নম্বর ট্যাক্সিতে আসামী পালাবে এমন তো কোনো কথাই নেই।’

রক্তমুখী নীলা

টেবিলের উপর পা তুলিয়া ব্যোমকেশ পা নাচাইতেছিল। খোলা সংবাদপত্রটা তাহার কোলের উপর বিস্তৃত। শ্রাবণের কর্মহীন প্রভাতে দু'জনে বাসায় বসিয়া আছি ; গত চারদিন ঠিক এইভাবে কাটিয়াছে। আজিকারও এই ধারাস্রাবি ধূসর দিনটা এইভাবে কাটিবে, ভাবিতে ভাবিতে বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছিলাম।

ব্যোমকেশ কাগজে মগ্ন ; তাহার পা স্বেচ্ছামত নাচিয়া চলিয়াছে। আমি নীরবে সিগারেট টানিয়া চলিয়াছি ; কাহারও মুখে কথা নাই। কথা বলার অভ্যাস যেন ক্রমে ছুটিয়া যাইতেছে।

কিন্তু চুপ করিয়া দু'জনে কাঁহাতক বসিয়া থাকা যায় ? অবশেষে যা হোক একটা কিছু বলিবার উদ্দেশ্যেই বলিলাম, 'খবর কিছু আছে ?'

ব্যোমকেশ চোখ না তুলিয়া বলিল, 'খবর গুরুতর—দু'জন দাগী আসামী সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছে।'

একটু আশান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে তাঁরা ?'

'একজন হচ্ছেন শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন—তিনি মুক্তিলাভ করেছেন বিচিত্রা নামক টকি হাউসে ; আর একজনের নাম শ্রীযুত রমানাথ নিয়োগী—ইনি মুক্তিলাভ করেছেন আলিপুর জেল থেকে। দশ দিনের পুরনো খবর, তাই আজ 'কালকেতু' দয়া করে জানিয়েছেন।' বলিয়া সে ক্রুদ্ধ-হতাশ ভঙ্গীতে কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বুঝিলাম সংবাদের অপ্রাচুর্যে বেচারা ভিতরে ভিতরে ধৈর্য হারাইয়াছে। অবশ্য আমাদের পক্ষে নৈষ্কর্মের অবস্থাই স্বাভাবিক ; কিন্তু তাই বলিয়া এই বর্ষার দিনে তাজা মুড়ি-চালভাজার মত সংবাদপত্রে দু' একটা গরম গরম খবর থাকিবে না—ইহাই বা কেমন কথা। বেকারের দল তবে বাঁচিয়া থাকিবে কিসের আশায় ?

তবু, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।' বলিলাম, 'শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনকে তো চিনি, কিন্তু রমানাথ নিয়োগী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই। তিনি কে ?'

ব্যোমকেশ ঘরময় পায়চারি করিল, জানালা দিয়া বাহিরে বৃষ্টি-ঝাপ্সা আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল; তারপর বলিল, 'নিয়োগী মহাশয় নিতান্ত অপরিচিত নয়। কয়েক বছর আগে তাঁর নাম খবরের কাগজে খুব বড় বড় অক্ষরেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ পাঠকের স্মৃতি এত হ্রস্ব যে দশ বছর আগের কথা মনে থাকে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো পেলুম না। কে তিনি ?'

'তিনি একজন চোর। ছিঁচকে চোর নয়, ঘটিবাটি চুরি করেন না। তাঁর নজর কিছু উঁচু—'মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।' বুদ্ধিও যেমন অসাধারণ সাহসও তেমনি অসীম।'—ব্যোমকেশ স-খেদ দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, 'আজকাল আর এরকম লোক পাওয়া যায় না।'

বলিলাম, 'দেশের দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর নাম বড় বড় অক্ষরে খবরের কাগজে উঠেছিল কেন ?'

'কারণ শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন এবং প্রকাশ্য আদালতে তাঁর বিচার হয়েছিল।' টেবিলের উপর সিগারেটের টিন রাখা ছিল, একটা সিগারেট তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ যত্ন সহকারে ধরাইল ; তারপর আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'দশ বছর হয়ে গেল কিন্তু এখনও ঘটনাগুলো বেশ মনে আছে। তখন আমি সবেমাত্র এ কাজ আরম্ভ করেছি—তোমার সঙ্গে দেখা হবারও আগে—'

দেখিলাম, ঔদাস্যভরে বলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই নিজের স্মৃতিকথায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষার দিনে যখন অন্য কোনও মুখরোচক খাদ্য হাতের কাছে নাই, তখন স্মৃতিকথাই চলুক—এই ভাবিয়া আমি বলিলাম, 'গল্পটা বল শুনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গল্প কিছু নেই। তবে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা কারণে রহস্যময় হয়ে আছে। পুলিস খেটেছিল খুব এবং বাহাদুরিও দেখিয়েছিল অনেক। কিন্তু আসল জিনিসটি উদ্ধার করতে পারেনি।

'আসল জিনিসটি কি ?'

'তবে বলি শোন। সে সময় কলকাতা শহরে হঠাৎ জহরত চুরির খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল ; আজ জহরলাল হীরালালের দোকানে চুরি হচ্ছে, কাল দত্ত কোম্পানির দোকানে চুরি হচ্ছে—এই রকম ব্যাপার। দিন পনেরোর মধ্যে পাঁচখানা বড় বড় দোকান থেকে প্রায় তিন চার লক্ষ টাকার হীরা জহরত লোপাট হয়ে গেল। পুলিস সজোরে তদন্ত লাগিয়ে দিলে।

'তারপর একদিন মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের বাড়িতে চুরি হল। মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের পরিচয় দিয়ে তোমায় অপমান করব না, বাঙালীর মধ্যে তাঁর নাম জানে না এমন লোক কমই আছে। যেমন ধনী তেমনি ধার্মিক। তাঁর মত সহৃদয় দয়ালু লোক আজকালকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না। সম্প্রতি তিনি একটু বিপদে জড়িয়ে পড়েছেন—কিন্তু সে থাক। ভাল ভাল জহরত সংগ্রহ করা তাঁর একটা শখ ছিল ; বাড়িতে দোতলার একটা ঘরে তাঁর সংগৃহীত জহরতগুলি কাচের শো-কেসে সাজান থাকত। সতর্কতার অভাব ছিল না ; সেপাই সান্ত্রী চৌকিদার অষ্টপ্রহর পাহারা দিত। কিন্তু তবু একদিন রাত্রিবেলা চোর ঢুকে দু'জন চৌকিদারকে অজ্ঞান করে তাঁর কয়েকটা দামী জহরত নিয়ে পালাল।

'মহারাজের সংগ্রহে একটা রক্তমুখী নীলা ছিল, সেটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। নীলাটাকে মহারাজ নিজের ভাগ্যলক্ষ্মী মনে করতেন ; সর্বদা আঙুলে পরে থাকতেন। কিন্তু কিছুদিন আগে সেটা আংটিতে আলগা হয়ে গিয়েছিল বলে খুলে রেখেছিলেন। বোধহয় ইচ্ছে ছিল, স্যাকরা ডাকিয়ে মেরামত করে আবার আঙুলে পরবেন। চোর সেই নীলাটাও নিয়ে গিয়েছিল।

'নীলা সম্বন্ধে তুমি কিছু জান কি না বলতে পারি না। নীলা জিনিসটা হীরে, তবে নীল হীরে। অন্যান্য হীরের মত কিন্তু কেবল ওজনের ওপরই এর দাম হয় না ; অধিকাংশ সময়—অন্তত আমাদের দেশে—নীলার দাম ধার্য হয় এর দৈবশক্তির ওপর। নীলা হচ্ছে শনিগ্রহের পাথর। এমন অনেক শোনা গেছে যে পয়মন্ত নীলা ধারণ করে কেউ কোটিপতি হয়ে গেছে, আবার কেউ বা রাজা থেকে ফকির হয়ে গেছে। নীলার প্রভাব কখনও শুভ কখনও বা ঘোর অশুভ।

'একই নীলা যে সকলের কাছে সমান ফল দেবে তার কোনও মানে নেই। একজনের পক্ষে যে নীলা মহা শুভকর, অন্যের পক্ষে সেই নীলাই সর্বনেশে হতে পারে। তাই নীলার দাম তার ওজনের ওপর নয়। বিশেষত রক্তমুখী নীলার। পাঁচ রতি ওজনের একটি নীলার জন্যে আমি একজন মাড়োয়ারীকে এগারো হাজার টাকা দিতে দেখেছি। লোকটা যুদ্ধের বাজারে চিনি আর লোহার ব্যবসা করে ডুবে গিয়েছিল, তারপর— ; কিন্তু সে গল্প আর একদিন বলব। আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া হিন্দু নই, ভূত-প্রেত মারণ-উচাটন বিশ্বাস করি না। কিন্তু রক্তমুখী নীলার অলৌকিক শক্তির উপর আমার অটল বিশ্বাস।

'সে যাক, যা বলছিলুম। মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের নীলা চুরি যাওয়াতে তিনি মহা হৈ চৈ

বাধিয়ে দিলেন। তাঁর প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকার মণি-মুক্তো চুরি গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর কাছে নীলাটা যাওয়াই সবচেয়ে মর্মান্তিক। তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে চোর ধরা পড়ুক আর না পড়ুক, তাঁর নীলা যে ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে, তাকে তিনি দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। পুলিস তো যথাসাধ্য করছিলই, এখন আরও উঠে পড়ে লেগে গেল। পুলিসের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা নির্মলবাবু তদন্তের ভার গ্রহণ করলেন।

'নির্মলবাবুর নাম বোধ হয় তুমি শোননি, সত্যিই বিচক্ষণ লোক। তাঁর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল, এখন তিনি রিটায়ার করেছেন। যা হোক, নির্মলবাবু তদন্ত হাতে নেবার সাত দিনের মধ্যেই জহরত-চোর ধরা পড়ল। চোর আর কেউ নয়—এই রমানাথ নিয়োগী। তার বাড়ি খানাতল্লাস করে সমস্ত চোরাই মাল বেরুল, কেবল সেই রক্তমুখী নীলাটা পাওয়া গেল না।

'তারপর যথাসময়ে বিচার শেষ হয়ে রমানাথ বারো বছরের জন্যে জেলে গেল। কিন্তু নীলার সন্ধান তখনও শেষ হল না। রমানাথ কোনও স্বীকারোক্তি করলে না, শেষ পর্যন্ত মুখ টিপে রইল। ওদিকে মহারাজ রমেন্দ্র সিংহ পুলিসের পিছনে লেগে রইলেন। পুরস্কারের লোভে পুলিস অনুসন্ধান চালিয়ে চলল।

'রমানাথ জেলে যাবার মাস তিনেক পরে নির্মলবাবু খবর পেলেন যে নীলাটা রমানাথের কাছেই আছে, কয়েকজন কয়েদী নাকি দেখেছে। জেলে পুলিসের গুপ্তচর কয়েদীর ছদ্মবেশে থাকে তা তো জান, তারাই খবর দিয়েছে। খবর পেয়ে নির্মলবাবু হঠাৎ একদিন রমানাথের 'সেলে' গিয়ে খানাতল্লাস করলেন, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। রমানাথ তখন আলিপুর জেলে ছিল, কোথায় যে নীলাটা সরিয়ে ফেললে কেউ খুঁজে বার করতে পারলে না।

'সেই থেকে নীলাটা একেবারে লোপাট হয়ে গেছে। পুলিস অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে—'

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; তারপর কতকটা যেন নিজ মনেই বলিল, 'মন্দ প্রবলেম নয়। এলাচের মত একটা নীল রঙের পাথর—একজন জেলের কয়েদী সেটা কোথায় লুকিয়ে রাখলে ! কেসটা যদি আমার হাতে আসত চেষ্টা করে দেখতুম। দু'হাজার টাকা পুরস্কারও ছিল—'

ব্যোমকেশের অর্ধ স্বগতোক্তি ব্যাহত করিয়া সিঁড়ির উপর পদশব্দ শোনা গেল। আমি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, 'লোক আসছে। ব্যোমকেশ, বোধ হয় মক্কেল।'

ব্যোমকেশ কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, 'বুড়ো লোক, দামী জুতো—এই বর্ষাতেও মচমচ করছে ; সম্ভবত গাড়িমোটরে ঘুরে বেড়ান, সুতরাং বড় মানুষ। একটু খুঁড়িয়ে চলেন।'—হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'অজিত, তাও কি সম্ভব ? জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখ তো প্রকাণ্ড একখানা রোল্‌স রয়েস্ সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিনা—আছে। ঠিক ধরেছি তাহলে। কি আশ্চর্য যোগাযোগ, অজিত ! যাঁর কথা হচ্ছিল সেই মহারাজ রমেন্দ্র সিংহ আসছেন—কেন আসছেন জান ?'

আমি সোৎসাহে বলিলাম, 'জানি, খবরের কাগজে পড়েছি। তাঁর সেক্রেটারি হরিপদ রক্ষিত সম্প্রতি খুন হয়েছে—সেই বিষয়ে হয়তো—'

দ্বারে টোকা পড়িল।

দ্বার খুলিয়া ব্যোমকেশ 'আসুন মহারাজ' বলিয়া যে লোকটিকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিল, সাময়িক কাগজ-পত্রে তাঁহার অনেক ছবি দেখিয়া থাকিলেও আসল মানুষটিকে এই প্রথম চাক্ষুষ করিলাম। সঙ্গে লোকলস্করের আড়ম্বর নাই—অত্যন্ত সাদাসিধা ধরনের মানুষ ; ঈষৎ রুগ্ন ক্ষীণ চেহারা—পায়ের একটা দোষ থাকাতে একটু খোঁড়াইয়া চলেন। বয়স বোধ করি ষাট পার হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু বার্ধক্যের লোলচর্ম তাঁহার মুখখানিকে কুৎসিত করিতে পারে নাই—বরং একটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতা মুখের জরাজনিত বিকারকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

মহারাজ একটু হাসিয়া ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ঈষৎ বিস্ময়ও

প্রকাশ পাইল। বলিলেন, 'আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আমার প্রতীক্ষা করছিলেন। আমি আসব সেটা কি আগে থাকতে অনুমান করে রেখেছিলেন নাকি ?'

ব্যোমকেশও হাসিল।

'এত বড় সৌভাগ্য আমি কল্পনা করতেও পারিনি। কিন্তু আপনার সেক্রেটারির মৃত্যুর কোন কিনারাই যখন পুলিস করতে পারল না, তখন আশা হয়েছিল হয়তো মহারাজ স্মরণ করবেন। কিন্তু আসুন, আগে বসুন।'

মহারাজ চেয়ারে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল, পুলিস তো কিছুই করতে পারলে না ; তাই ভাবলুম দেখি যদি আপনি কিছু করতে পারেন। হরিপদর ওপর আমার একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল—তা ছাড়া তার মৃত্যুর ধরণটাও এমন ভয়ঙ্কর—' মহারাজ একটু থামিলেন—'অবশ্য সে সাধু লোক ছিল না ; কিন্তু আপনারা তো জানেন, ঐরকম লোককে সৎপথে আনবার চেষ্টা করা আমার একটা খেয়াল। আর, সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে হরিপদ নেহাত মন্দ লোক ছিল না। কাজকর্ম খুবই ভাল করত ; আর কৃতজ্ঞতাও যে তার অন্তরে ছিল সে প্রমাণও আমি অনেকবার পেয়েছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মাপ করবেন, হরিপদবাবু সাধু লোক ছিলেন না; এ খবর তো জানতুম না। তিনি কোন দুষ্কার্য করেছিলেন ?'

মহারাজ বলিলেন, 'সাধারণে যাকে দাগী আসামী বলে, সে ছিল তাই। অনেকবার জেল খেটেছিল। শেষবার জেল থেকে বেরিয়ে যখন আমার কাছে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দয়া করে সব কথা গোড়া থেকে বলুন। খবরের কাগজের বিবরণ আমি পড়েছি বটে, কিন্তু তা এত অসম্পূর্ণ যে, কিছুই ধারণা করা-যায় না। আপনি মনে করুন, আমরা কিছুই জানি না। সব কথা আপনার মুখে স্পষ্টভাবে শুনলে ব্যাপারটা বোঝবার সুবিধা হবে।'

মহারাজ বলিলেন, 'বেশ, তাই বলছি।' তারপর গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'আন্দাজ মাস ছয়েকের কথা হবে ; ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হরিপদ প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আগের দিন জেল থেকে বেরিয়েছে, আমার কাছে কোন কথাই গোপন করলে না। বললে, আমি যদি তাকে সৎপথে চলবার একটা সুযোগ দিই, তাহলে সে আর বিপথে যাবে না। তাকে দেখে তার কথা শুনে দয়া হল। বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নীচেই, কিন্তু এরি মধ্যে বার চারেক জেল খেটেছে। শেষবারে চুরি, জালিয়াতি, নাম ভাঁড়িয়ে পরের দস্তখতে টাকা নেওয়া ইত্যাদি কয়েকটা গুরুতর অপরাধে লম্বা মেয়াদ খেটেছে। দেখলুম, অনুতাপও হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি কাজ করতে পার ? বললে, লেখাপড়া বেশি শেখবার অবকাশ পাইনি, উনিশ বছর থেকে ক্রমাগত জেলই খাটছি। তবু নিজের চেষ্টায় সর্টহ্যান্ড টাইপিং শিখেছি ; যদি দয়া করে আপনি নিজের কাছে রাখেন, প্রাণ দিয়ে আপনার কাজ করব।

'হরিপদকে প্রথম দেখেই তার ওপর আমার একটা মায়া জন্মেছিল ; কি জানি কেন, ঐ জাতীয় লোকের আবেদন আমি অবহেলা করতে পারি না। তাই যদিও আমার সর্টহ্যান্ড টাইপিস্টের দরকার ছিল না, তবু পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে তাকে নিজের কাছে রাখলুম। তার আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। কাছেই একখানা ছোট বাসা ভাড়া করে থাকতে লাগল।

'কিছুদিনের মধ্যেই দেখলুম, লোকটি অসাধারণ কর্মপটু আর বুদ্ধিমান ; যে কাজ তার নিজের নয় তাও এমন সুচারুভাবে করে রাখে যে কারুর কিছু বলবার থাকে না। এমন কি, ভবিষ্যতে আমার কি দরকার হবে তা আগে থাকতে আন্দাজ্ করে তৈরি করে রাখে। মাস দুই যেতে না যেতেই সে আমার কাছে একেবারে অপরিহার্য হয়ে উঠল। হরিপদ না হলে কোন কাজই চলে না।

'এই সময় আমার প্রাচীন সেক্রেটারি অবিনাশবাবু মারা গেলেন। আমি তাঁর জায়গায় হরিপদকে নিযুক্ত করলুম। এই নিয়ে আমার আমলাদের মধ্যে একটু মন কষাকষিও হয়েছিল—কিন্তু আমি সে সব গ্রাহ্য করিনি। সবচেয়ে উপযুক্ত লোক বুঝেই হরিপদকে

সেক্রেটারির পদ দিয়েছিলুম।

'তারপর গত চার মাস ধরে হরিপদ খুব দক্ষতার সঙ্গেই সেক্রেটারির কাজ করে এসেছে, কখনও কোন ত্রুটি হয়নি। নিম্নতন কর্মচারীরা মাঝে মাঝে আমার কাছে তার নামে নালিশ করত, কিন্তু সে সব নিতান্তই বাজে নালিশ। হরিপদর নামে কলঙ্ক পড়েছিল বটে—জেলের দাগ সহজে মোছে না—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার চরিত্র যে একেবারে বদলে গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় অভাবের তাড়নায় সে অসৎপথে গিয়েছিল, তাই অভাব দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে তার দুষ্প্রবৃত্তিও কেটে গিয়েছিল। আমাদের জেলখানা খুঁজলে এই ধরনের কত লোক যে বেরোয় তার সংখ্যা নেই।

'সে যা হোক, হঠাৎ গত মঙ্গলবারে যে ব্যাপার ঘটল তা একেবারে অভাবনীয়। খবরের কাগজে অল্পবিস্তর বিবরণ আপনারা পড়েছেন, তাতে যোগ করবার আমার বিশেষ কিছু নেই। সকালবেলা খবর পেলুম হরিপদ খুন হয়েছে। পুলিসে খবর পাঠিয়ে নিজে গেলুম তার বাসায়। দেখলুম, শোবার ঘরের মেঝেয় সে মরে পড়ে আছে ; রক্তে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। হত্যাকারী তার গলাটা এমন ভয়ঙ্করভাবে কেটেছে যে ভাবতেও আতঙ্ক হয়। গলার নলী কেটে চিরে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। আপনারা অনেক হত্যাকাণ্ড নিশ্চয় দেখেছেন, কিন্তু এমন পাশবিক নৃশংসতা কখনও দেখেছেন বলে বোধ হয় না।'

এই পর্যন্ত বলিয়া মহারাজ যেন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা পুনরায় প্রত্যক্ষ করিয়া শিহরিয়া চক্ষু মুদিলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তার দেহে আর কোথাও আঘাত ছিল না ?'

মহারাজ বলিলেন, 'ছিল। তার বুকে ছুরির একটা আঘাত ছিল। ডাক্তার বলেন, ঐ আঘাতই মৃত্যুর কারণ। গলার আঘাতগুলো তার পরের। অর্থাৎ, হত্যাকারী প্রথমে তার বুকে ছুরি মেরে তাকে মর্মান্তিক আহত করে, তারপর তার গলা ঐ ভাবে ছিন্নভিন্ন করেছে। কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা, ভাবুন তো ? আমি শুধু ভাবি, কি উন্মত্ত আক্রোশের বশে মানুষ তার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে এমন হিংস্র জন্তুতে পরিণত হয়।'

কিছুক্ষণ আর কোনও কথা হইল না। মহারাজ বোধ করি মনুষ্য নামক অদ্ভুত জীবের অমানুষিক দুষ্কৃতি করিবার অফুরন্ত শক্তির কথাই ভাবিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ ঘাড় হেঁট করিয়া চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল।

সহসা ব্যোমকেশের অর্ধ-মুদিত চোখের দিকে আমার নজর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম—সেই দৃষ্টি ! বহুবার দেখিয়াছি, ভুল হইবার নয়।

ব্যোমকেশ কোথাও একটা সূত্র পাইয়াছে।

মহারাজ অবশেষে মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'আমি যা জানি আপনাকে বললুম। এখন আমার ইচ্ছে, পুলিস যা পারে করুক, সেই সঙ্গে আপনিও আমার পক্ষ থেকে কাজ করুন। এতবড় একটা নৃশংস হত্যাকারী যদি ধরা না পড়ে, তাহলে সমাজের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কথা—আপনার কোন আপত্তি নেই তো ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু না। পুলিসের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই, বরঞ্চ বিশেষ প্রণয় আছে। আপত্তি কিসের ?—আচ্ছা, হরিপদ শেষবার ক'বছর জেল খেটেছিল আপনি জানেন ?'

মহারাজ বলিলেন, 'হরিপদর মুখেই শুনেছিলুম, আইনের কয়েক ধারা মিলিয়ে তার চৌদ্দ বছর জেল হয়েছিল : কিন্তু জেলে শান্তশিষ্ট ভাবে থাকলে কিছু সাজা মাপ হয়ে থাকে, তাই তাকে এগারো বছরের বেশি খাটতে হয়নি।'

ব্যোমকেশ প্রফুল্লভাবে বলিল, 'বেশ চমৎকার ! হরিপদ সম্বন্ধে আপনি আর কিছু বলতে পারেন না ?'

মহারাজ বলিলেন, 'আপনি ঠিক কোন্ ধরনের কথা জানতে চান বলুন, দেখি যদি বলতে পারি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মৃত্যুর দু-চার দিন আগে তার আচার-ব্যবহারে এমন কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কি, যা ঠিক স্বাভাবিক নয় ?'

মহারাজ বলিলেন, 'হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছিলুম। মৃত্যুর তিন-চার দিন আগে একদিন সকালবেলা হরিপদ আমার কাছে বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার ভাব দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, কোন কারণে সে ভারি ভয় পেয়েছে।'

'সে সময় আর কেউ আপনার কাছে ছিল না ?'

মহারাজ একটু ভাবিয়া বলিলেন, 'সে সময় কতকগুলি ভিক্ষার্থীর আবেদন আমি দেখছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, একজন ভিক্ষার্থী তখন সেখানে উপস্থিত ছিল।'

'তার সামনেই হরিপদ অসুস্থ হয়ে পড়ে ?'

'হ্যাঁ।'

একটু নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। আর কিছু ? অন্য সময়ের কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণ করতে পারেন না ?'

মহারাজ প্রায় পাঁচ মিনিট গালে হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, 'একটা সামান্য কথা মনে পড়ছে। নিতান্তই অবান্তর ঘটনা, তবু বলছি আপনার যদি সাহায্য হয়। আপনি বোধ হয় জানেন না, কয়েক বছর আগে আমার বাড়ি থেকে একটা দামী নীলা চুরি যায়—'

'জানি বৈকি।'

'জানেন ? তাহলে এও নিশ্চয় জানেন যে, সেই নীলাটা ফিরে পাবার জন্যে আমি দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলুম ?'

'তাও জানি। তবে সে ঘোষণা এখনও বলবৎ আছে কিনা জানি না।'

মহারাজ বলিলেন, 'ঠিক ঐ প্রশ্নই হরিপদ করেছিল। তখন সে আমার টাইপিস্ট, সবে মাত্র কাজে ঢুকেছে। একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'মহারাজ, আপনার যে নীলাটা চুরি গিয়েছিল, সেটা এখন ফিরে পেলে কি আপনি দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন ?' তার প্রশ্নে কিছু আশ্চর্য হয়েছিলাম ; কারণ এতদিন পরে নীলা ফিরে পাবার আর কোনও আশাই ছিল না, পুলিস আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল।'

'আপনি হরিপদর প্রশ্নের কি উত্তর দিয়েছিলেন ?'

'বলেছিলুম, যদি নীলা ফিরে পাই নিশ্চয়ই দেব।'

ব্যোমকেশ তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি যদি আজ ঐ প্রশ্ন করি, তাহলে কি সেই উত্তরই দেবেন ?'

মহারাজ কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়। কিন্তু—'

ব্যোমকেশ আবার বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'আপনি হরিপদর হত্যাকারীর নাম জানতে চান ?'

মহারাজের হতবুদ্ধি ভাব আরও বর্ধিত হইল, তিনি বলিলেন, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি হরিপদর হত্যাকারীর নাম জানেন নাকি ?'

'জানি, তবে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা আমার কাজ নয়—সে কাজ পুলিস করুক। আমি শুধু তার নাম বলে দেব ; তারপর তার বাড়ি তল্লাস করে প্রমাণ বার করা বোধ হয় শক্ত হবে না।'

অভিভূত কণ্ঠে মহারাজ বলিলেন, 'কিন্তু এ যে ভেল্কিবাজির মত মনে হচ্ছে। সত্যিই আপনি তার নাম জানেন ? কি করে জানলেন ?'

'আপাতত অনুমান মাত্র। তবে অনুমান মিথ্যে হবে না। হত্যাকারীর নাম হচ্ছে—রমানাথ নিয়োগী।'

'রমানাথ নিয়োগী ! কিন্তু—কিন্তু নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে।'

'হবারই তো কথা। বছর দশেক আগে ইনিই আপনার নীলা চুরি করে জেলে গিয়েছিলেন,

সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়েছেন।'

'মনে পড়েছে। কিন্তু সে হরিপদকে খুন করলে কেন ? হরিপদর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ?'

'সম্বন্ধ আছে—পুরনো কয়েকটা নথি ঘাঁটলেই সেটা বেরুবে। কিন্তু মহারাজ, বেলা প্রায় এগারটা বাজে, আর আপনাকে ধরে রাখব না। বিকেলে চারটের সময় যদি দয়া করে আবার পায়ের ধুলো দেন তাহলে সব জানতে পারবেন। আর হয়তো নীলাটাও ফিরে পেতে পারেন। আমি ইতিমধ্যেই সব ব্যবস্থা করে রাখব।'

২

হতভম্ব মহারাজকে বিদায় দিয়া ব্যোমকেশ নিজেও বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত বেলায় তুমি আবার কোথায় চললে ?'

সে বলিল, 'বেরুতে হবে। জেলের কিছু পুরনো কাগজপত্র দেখা দরকার। তাছাড়া অন্য কাজও আছে। কখন ফিরব কিছু ঠিক নেই। যদি সময় পাই, হোটেলে খেয়ে নেব।' বলিয়া ছাতা ও বর্ষাতি লইয়া বিরামহীন বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা তিনটা। জামা, জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল, 'বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়া হয়নি। স্নান করে নিই। পুঁটিরাম, চট্ করে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা কর।—আজ ম্যাটিনি—ঠিক চারটের সময় অভিনয় আরম্ভ হবে।'

বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'সে কি ! কিসের অভিনয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভয় নেই—এই ঘরেই অভিনয় হবে। অজিত, দর্শকের জন্যে আরও গোটাকয়েক চেয়ার এ ঘরে আনিয়া রাখ।' বলিয়া স্নান-ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

স্নানান্তে আহার করিতে বসিলে বলিলাম, 'সমস্ত দিন কি করলে বল।'

ব্যোমকেশ অনেকখানি অমলেট মুখে পুরিয়া দিয়া তৃপ্তির সহিত চিবাইতে চিবাইতে বলিল, 'জেল ডিপার্টমেন্টের অফিসে আমার এক বন্ধু আছেন, প্রথমে তাঁর কাছে গেলুম। সেখানে পুরনো রেকর্ড বার করে দেখা গেল যে, আমার অনুমান ভুল হয়নি।'

'তোমার অনুমানটা কি ?'

প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, 'সেখানকার কাজ শেষ করে বুদ্ধুবাবু—থুড়ি—বিধুবাবুর কাছে গেলুম। হরিপদর খুনটা তাঁরই এলাকায় পড়ে। কেসের ইনচার্জ হচ্ছেন ইন্সপেক্টর পূর্ণবাবু। পূর্ণবাবুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে এবং বিধুবাবুর পদদ্বয়ে যথোচিত তৈল প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার হল।'

'কিন্তু কার্যটা কি তাই যে আমি এখনও জানি না।'

'কার্যটা হচ্ছে প্রথমত রমানাথ নিয়োগীর ঠিকানা বার করা এবং দ্বিতীয়ত তাকে গ্রেপ্তার করে তার বাসা খানাতল্লাস করা। ঠিকানা সহজেই বেরুল, কিন্তু খানাতল্লাসে বিশেষ ফল হল না। অবশ্য রমানাথের ঘর থেকে একটা ভীষণাকৃতি ছোরা বেরিয়েছে ; তাতে মানুষের রক্ত পাওয়া যায় কি না পরীক্ষার জন্যে পাঠান হয়েছে। কিন্তু যে জিনিস পাব আশা করেছিলুম তা পেলুম না। লোকটার লুকিয়ে রাখবার ক্ষমতা অসামান্য।'

'কি জিনিস ?'

'মহারাজের নীলাটা !'

'তারপর ? এখন কি করবে ?'

'এখন অভিনয় করব। রমানাথের কুসংস্কারে ঘা দিয়ে দেখব যদি কিছু ফল পাই—ঐ বোধ হয় মহারাজ এলেন। বাকি অভিনেতারাও এসে পড়ল বলে।' বলিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইল।

'আর কারা আসবে ?'

'রমানাথ এবং তার রক্ষীরা।'

'তারা এখানে আসবে ?'

'হ্যাঁ, বিধুবাবুর সঙ্গে সেই রকম ব্যবস্থাই হয়েছে।—পুঁটিরাম, খাবারের বাসনগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও।'

আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলাম না, মহারাজ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া চারিটা বাজিল। দেখিলাম, মহারাজ রাজোচিত শিষ্টতা রক্ষা করিয়াছেন।

মহারাজকে সমাদর করিয়া বসাইতে না বসাইতে আরও কয়েকজনের পদশব্দ শুনা গেল। পরক্ষণেই বিধুবাবু, পূর্ণবাবু ও আরও দুইজন সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে রমানাথ প্রবেশ করিল।

রমানাথের চেহারায় এমন কোন বিশেষত্ব নাই যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; চুরি বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে বোধহয় চেহারাটি নিতান্ত চলনসই হওয়া দরকার। রমানাথের মাথায় ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, কপাল অপরিসর, চিবুক ছুঁচালো—চোখে সতর্ক চঞ্চলতা। তাহার গায়ে বহু বৎসরের পুরাতন (সম্ভবত জেলে যাইবার আগেকার) চামড়ার বোতাম আঁটা পাঁচ মিশালি রঙের স্পোর্টিং কোট ও পায়ে অপ্রত্যাশিত একজোড়া রবারের বুট জুতা দেখিয়া সহসা হাস্যরসের উদ্রেক হয়। ইনি যে একজন সাংঘাতিক ব্যক্তি সে সন্দেহ কাহারও মনে উদয় হয় না।

ব্যোমকেশ অঙ্গুলি নির্দেশে তাহাকে দেখাইয়া বলিল, 'মহারাজ, লোকটিকে চিনতে পারেন কি ?'

মহারাজ বলিলেন, 'হ্যাঁ, এখন চিনতে পারছি। এই লোকটাই সেদিন ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিল।'

'বেশ। এখন তাহলে আপনারা সকলে আসন গ্রহণ করুন। বিধুবাবু, মহারাজের সঙ্গে নিশ্চয় পরিচয় আছে। আসুন, আপনি মহারাজের পাশে বসুন। রমানাথ, তুমি এইখানে বস।' বলিয়া ব্যোমকেশ রমানাথকে টেবিলের ধারে একটা চেয়ার নির্দেশ করিয়া দিল।

রমানাথ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া উপবেশন করিল। দুই জন সাব-ইন্সপেক্টর তাহার দুই পাশে বসিলেন। বিধুবাবু অভ্রভেদী গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কট্‌মট্‌ করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। এই সম্পূর্ণ আইন-বিগর্হিত ব্যাপার ঘটিতে দিয়া তিনি যে ভিতরে ভিতরে অতিশয় অস্বস্তি বোধ করিতেছেন তাহা তাঁহার ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সকলে উপবিষ্ট হইলে ব্যোমকেশ টেবিলের সম্মুখে বসিল। বলিল, 'আজ আমি আপনাদের একটা গল্প বলব। অজিতের গল্পের মত কাল্পনিক গল্প নয়—সত্য ঘটনা। যতদূর সম্ভব নির্ভুল ভাবেই বলবার চেষ্টা করব ; যদি কোথাও ভুল হয়, রমানাথ সংশোধন করে দিতে পারবে। রমানাথ ছাড়া আর একজন এ কাহিনী জানত, কিন্তু আজ সে বেঁচে নেই।'

এইটুকু ভূমিকা করিয়া ব্যোমকেশ তাহার গল্প আরম্ভ করিল। রমানাথের মুখ কিন্তু নির্বিকার হইয়া রহিল। সে মুখ তুলিল না, একটা কথা বলিল না, নির্লিপ্তভাবে আঙ্গুল দিয়া টেবিলের উপর দাগ কাটিতে লাগিল।

'রমানাথ জেলে যাবার পর থেকেই গল্প আরম্ভ করছি। রমানাথ জেলে গেল, কিন্তু মহারাজের নীলাটা সে কাছছাড়া করলে না, সঙ্গে করে নিয়ে গেল। কি কৌশলে সকলের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নিয়ে গেল—তা আমি জানি না, জানবার চেষ্টাও করিনি। রমানাথ ইচ্ছে করলে বলতে পারে।'

পলকের জন্য রমানাথ ব্যোমকেশের মুখের দিকে চোখ তুলিয়াই আবার নিবিষ্ট মনে টেবিলে দাগ কাটিতে লাগল।

ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, 'রামানাথ অনেক ভাল ভাল দামী জহরত চুরি করেছিল ; কিন্তু তার মধ্যে থেকে কেবল মহারাজের রক্তমুখী নীলাটাই যে কেন সঙ্গে রেখেছিল তা অনুমান করাই দুষ্কর। সম্ভবত পাথরটার একটা সম্মোহন শক্তি ছিল ; জিনিসটা দেখতেও চমৎকার—গাঢ় নীল রঙের একটা হীরা, তার ভেতর থেকে রক্তের মত লাল রঙ ফুটে বেরুচ্ছে। রমানাথ সেটাকে

সঙ্গে নেবার লোভ সামলাতে পারেনি। পাথরটা খুব পয়মন্ত একথাও সম্ভবত রমানাথ শুনেছিল। দুর্নিয়তি যখন মানুষের সঙ্গ নেয়, তখন মানুষ তাকে বন্ধু বলেই ভুল করে।

'যা হোক, রমানাথ আলিপুর জেলে রইল। কিছুদিন পরে পুলিস জানতে পারল যে, নীলাটা তার কাছেই আছে। যথাসময়ে রমানাথের 'সেল' খানাতল্লাস হল। রমানাথের সেলে আর একজন কয়েদী ছিল, তাকেও সার্চ করা হল। কিন্তু নীলা পাওয়া গেল না। কোথায় গেল নীলাটা ?

'রমানাথের সেলে যে দ্বিতীয় কয়েদী ছিল তার নাম হরিপদ রক্ষিত। হরিপদ পুরনো ঘাগী আসামী, ছেলেবেলা থেকে জেল খেটেছে—তার অনেক গুণ ছিল। যাঁরা জেলের কয়েদী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তাঁরাই জানেন, এক জাতীয় কয়েদী আছে যারা নিজেদের গলার মধ্যে পকেট তৈরি করে। ব্যাপারটা শুনতে খুবই আশ্চর্য কিন্তু মিথ্যে নয়। কয়েদীরা টাকাকড়ি জেলে নিয়ে যেতে পারে না ; অথচ তাদের মধ্যে বেশির ভাগই নেশাখোর। তাই, ওয়ার্ডারদের ঘুষ দিয়ে বাইরে থেকে মাদকদ্রব্য আনাবার জন্যে টাকার দরকার হয়। গলায় পকেট তৈরি করবার ফন্দি এই প্রয়োজন থেকেই উৎপন্ন হয়েছে ; যারা কাঁচা বয়স থেকে জেলে আছে তাদের মধ্যেই এ জিনিসটা বেশি দেখা যায়। প্রবীণ পুলিস কর্মচারী মাত্রই এসব কথা জানেন।

'হরিপদ ছেলেবেলা থেকে জেল খাটছে, সে নিজের গলায় পকেট তৈরি করেছিল। রমানাথ যখন তার সেলে গিয়ে রইল তখন দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেল। ক্রমে হরিপদর পকেটের কথা রমানাথ জানতে পারল।

'তারপর একদিন হঠাৎ পুলিস জেলে হানা দিল। সেলের মধ্যে নীলা লুকোবার জায়গা নেই ; রমানাথ নীলাটা হরিপদকে দিয়ে বললে, তুমি এখন গলার মধ্যে লুকিয়ে রাখ। হরিপদকে সে নীলাটা আগেই দেখিয়েছিল এবং হরিপদরও সেটার উপর দারুণ লোভ জন্মেছিল। সে নীলাটা নিয়েই টপ্ করে গিলে ফেলল ; তার কণ্ঠনালীর মধ্যে নীলাটা গিয়ে রইল। বলা বাহুল্য, পুলিস এসে যখন তল্লাস করল তখন কিছুই পেল না।

'এই ঘটনার পরদিনই হরিপদ হঠাৎ অন্য জেলে চালান হয়ে গেল, জেলের রেকর্ডে তার উল্লেখ আছে। হরিপদর ভারি সুবিধা হল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করল—যাবার আগে নীলাটা রমানাথকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল না। রমানাথ কিছু বলতে পারল না—চোরের মা'র কান্না কেউ শুনতে পায় না—সে মন গুমরে রয়ে গেল। মনে মনে তখন থেকেই বোধ করি ভীষণ প্রতিহিংসার সঙ্কল্প আঁটতে লাগল।'

এই সময় লক্ষ্য করিলাম, রমানাথের মুখের কোন বিকার ঘটে নাই বটে, কিন্তু রগ ও গলার শিরা দপ্‌দপ্ করিতেছে, দুই চক্ষু রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিয়া চলিল, 'তারপর একে একে দশটি বছর কেটে গেছে। ছ'মাস আগে হরিপদ জেল থেকে মুক্তি পেল। মুক্তি পেয়েই সে মহারাজের কাছে এল। তার ইচ্ছে ছিল মহারাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ক্রমে নীলাটা তাঁকে ফেরত দেবে। বিনামূল্যে নয়—দু'হাজার টাকা পুরস্কারের কথা সে জানত। ও নীলা অন্যত্র বিক্রি করতে গেলেই ধরা পড়ে যেতে হবে, তাই সে-চেষ্টাও সে করল না।

'কিন্তু প্রথম থেকেই মহারাজ তার প্রতি এমন সদয় ব্যবহার করলেন যে, সে ভারি লজ্জায় পড়ে গেল। তবু সে একবার নীলার কথা মহারাজের কাছে তুলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীলার বদলে মহারাজের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে তার বিবেকে বেধে গেল। মহারাজের দয়ার গুণে হরিপদর মত লোকের মনেও যে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছিল, এটা বড় কম কথা নয়।

'ক্রমে হরিপদর দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল। দশদিন আগে রমানাথ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বেরুল। হরিপদ কোথায় তা সে জানত না, কিন্তু এমনি দৈবের খেলা যে, চারদিন যেতে না যেতেই মহারাজের বাড়িতে রমানাথ তার দেখা পেয়ে গেল। রমানাথকে দেখার ফলেই হরিপদ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়বার তার আর কোনও কারণ ছিল না।

'যে প্রতিহিংসার আগুন দশ বছর ধরে রমানাথের বুকে ধিকি ধিকি জ্বলছিল, তা একেবারে দুর্বার হয়ে উঠল। হরিপদর বাড়ির সন্ধান সে সহজেই বার করল। তারপর সেদিন রাত্রে গিয়ে—'

এ পর্যন্ত ব্যোমকেশ সকলের দিকে ফিরিয়া গল্প বলিতেছিল, এখন বিদ্যুতের মত রমানাথের দিকে ফিরিল। রমানাথও মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত নিষ্পলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া ছিল ; ব্যোমকেশ তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া চাপা তীব্র স্বরে বলিল, 'রমানাথ, সে-রাত্রে হরিপদর গলা ছিঁড়ে তার কণ্ঠনালীর ভেতর থেকে তুমি নীলা বার করে নিয়েছিলে। সে নীলা কোথায় ?'

রমানাথ ব্যোমকেশের চক্ষু হইতে চক্ষু সরাইতে পারিল না। সে একবার জিহ্বা দ্বারা অধর লেহন করিল, একবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, তারপর যেন অসীম বলে নিজেকে ব্যোমকেশের সম্মোহন দৃষ্টির নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আমি, আমি জানি না—হরিপদকে আমি খুন করিনি—হরিপদ কার নাম জানি না। নীলা আমার কাছে নেই—' বলিয়া আরক্ত বিদ্রোহী চক্ষে চাহিয়া সে দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

ব্যোমকেশের অঙ্গুলি তখনও তাহার দিকে নির্দেশ করিয়া ছিল। আমাদের মনে হইতে লাগিল যেন একটা মর্মগ্রাসী নাটকের অভিনয় দেখিতেছি, দুইটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি পরস্পরের সহিত মরণান্তক যুদ্ধ করিতেছে ; শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হইবে তাহা দেখিবার একাগ্র আগ্রহে আমরা চিত্রার্পিতের মত বসিয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বরে একটা ভয়ঙ্কর দৈববাণীর সুর ঘনাইয়া আসিল ; সে রমানাথের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পূর্ববৎ তীব্র অনুচ্চ স্বরে বলিল, 'রমানাথ, তুমি জানো না কী ভয়ানক অভিশপ্ত ওই রক্তমুখী নীলা। তাই ওর মোহ কাটাতে পারছ না। ভেবে দ্যাখ, যতদিন তুমি ঐ নীলা চুরি না করেছিলে, ততদিন তোমাকে কেউ ধরতে পারেনি—নীলা চুরি করেই তুমি জেলে গেলে। তারপর হরিপদর পরিণামটাও একবার ভেবে দ্যাখ। সে গলার মধ্যে নীলা লুকিয়ে রেখেছিল, তার গলার কী অবস্থা হয়েছিল তা তোমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। এখনও যদি নিজের ইষ্ট চাও, ঐ সর্বনাশা নীলা ফেরত দাও। নীলা নয়—ও কেউটে সাপের বিষ। যদি হাতে সে নীলা পর, তোমার হাতে হাতকড়া পড়বে ; যদি গলায় পর, ঐ নীলা ফাঁসির দড়ি হয়ে তোমার গলা চেপে ধরবে।'

অব্যক্ত একটা শব্দ করিয়া রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনের ভিতর কিরূপ প্রবল আবেগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আমরাও সম্যক বুঝিতে পারি নাই। পাগলের মত সে একবার চারিদিকে তাকাইল, তারপর নিজের কোটের চামড়ার বোতামটা সজোরে ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'চাই না—চাই না ! এই নাও নীলা, আমাকে বাঁচাও !' বলিয়া একটা দীর্ঘ শিহরিত নিশ্বাস ফেলিয়া অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ব্যোমকেশ কপাল হইতে ঘাম মুছিল। দেখিলাম তাহার হাত কাঁপিতেছে—ইচ্ছাশক্তির যুদ্ধে সে জয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু অবলীলাক্রমে নয়।

রমানাথের নিক্ষিপ্ত বোতামটা ঘরের কোণে গিয়া পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া তাহার খোলস ছাড়াইতে ছাড়াইতে ব্যোমকেশ স্খলিত-স্বরে বলিল, 'মহারাজ, এই নিন আপনার রক্তমুখী নীলা।'

ব্যোমকেশ ও বরদা

১

বেশি দিনের কথা নয়, ভূতান্বেষী বরদাবাবুর সহিত সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের একবার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। ব্যোমকেশের মনটা স্বভাবত বহির্বিমুখ, ঘরের কোণে মাকড়সার মত জাল পাতিয়া বসিয়া থাকিতেই সে ভালবাসে। কিন্তু সেবার সে পাক্কা তিনশ' মাইলের পাড়ি জমাইয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিয়াছিল।

ব্যোমকেশের এক বাল্যবন্ধু বেহার প্রদেশে ডি.এস.পি'র কাজ করিতেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মুঙ্গেরে বদলি হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ব্যোমকেশকে নিয়মিত পত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণের অন্তরালে বোধ হয় কোনো গরজ প্রচ্ছন্ন ছিল ; নচেৎ পুলিসের ডি.এস.পি. বিনা প্রয়োজনে পুরাতন অর্ধবিস্মৃত বন্ধুত্ব ঝালাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবেন ইহা কল্পনা করিতেও মনটা নারাজ হইয়া উঠে।

ভাদ্র মাসের শেষাশেষি ; আকাশের মেঘগুলা অপব্যয়ের প্রাচুর্যে ফ্যাকাসে হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন ব্যোমকেশ পুলিস-বন্ধুর পত্র পাইয়া এক রকম মরিয়া হইয়াই বলিয়া উঠিল, 'চল, মুঙ্গের ঘুরে আসা যাক।'

আমি পা বাড়াইয়াই ছিলাম। পূজার প্রাক্কালে শরতের বাতাসে এমন একটা কিছু আছে যাহা ঘরবাসী বাঙালীকে পশ্চিমের দিকে ও প্রবাসী বাঙালীকে ঘরের দিকে নিরন্তর ঠেলিতে থাকে। সানন্দে বলিলাম, 'চল।'

যথাসময়ে মুঙ্গের স্টেশনে উতরিয়া দেখিলাম ডি.এস.পি. সাহেব উপস্থিত আছেন। ভদ্রলোকের নাম শশাঙ্কবাবু ; আমাদেরই সমবয়স্ক হইবেন, ত্রিশের কোঠা এখনো পার হয় নাই ; তবু ইহারি মধ্যে মুখে ও চালচলনে একটা বয়স্থ ভারিক্কি ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অধিক দায়িত্ব ঘাড়ে পড়িয়া তাঁহাকে প্রবীণ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি আমাদের সঙ্গে লইয়া কেল্লার মধ্যে তাঁহার সরকারী কোয়ার্টারে আনিয়া তুলিলেন।

মুঙ্গের শহরে 'কেল্লা' নামে যে স্থানটা পরিচিত তাহার কেল্লাত্ব এখন আর কিছু নাই ; তবে এককালে উহা মীরকাশিমের দুর্ধর্ষ দুর্গ ছিল বটে। প্রায় সিকি মাইল পরিমিত বৃত্তাকৃতি স্থান প্রাকার ও গড়খাই দিয়া ঘেরা—পশ্চিম দিকে গঙ্গা। বাহিরে যাইবার তিনটি মাত্র তোরণদ্বার আছে। বর্তমানে এই কেল্লার মধ্যে আদালত ও সরকারী উচ্চ কর্মচারীদের বাসস্থান, জেলখানা, বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ ছাড়া সাধারণ ভদ্রলোকের বাসগৃহও দু'চারিটি আছে। শহর বাজার ও প্রকৃত লোকালয় ইহার বাহিরে ; কেল্লাটা যেন রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য একটু স্বতন্ত্র অভিজাত পল্লী।

শশাঙ্কবাবুর বাসায় পৌঁছিয়া চা ও প্রাতরাশের সহযোগে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। আমাদের আদর অভ্যর্থনা খুবই করিলেন ; কিন্তু দেখিলাম লোকটি ভারি চতুর, কথাবার্তায় অতিশয় পটু। নানা অবান্তর আলোচনার ভিতর দিয়া পুরাতন বন্ধুত্বের স্মৃতির উল্লেখ করিতে করিতে মুঙ্গেরে কি কি দর্শনীয় জিনিস আছে তাহার ফিরিস্তি দিতে দিতে কখন যে অজ্ঞাতসারে তাঁহার মূল বক্তব্যে পৌঁছিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিলে ঠাহর করা যায় না। অত্যন্ত

কাজের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই, বাক্যের মুন্সিয়ানার দ্বারা কাজের কথাটি এমনভাবে উত্থাপন করিতে পারেন যে কাহারো ক্ষোভ বা অসন্তোষের কারণ থাকে না।

বস্তুত আমরা তাঁহার বাসায় পৌঁছিবার আধঘণ্টার মধ্যে তিনি যে কাজের কথাটা পাড়িয়া ফেলিয়াছেন তাহা আমি প্রথমটা ধরিতেই পারি নাই ; কিন্তু ব্যোমকেশের চোখে কৌতুকের একটু আভাস দেখিয়া সচেতন হইয়া উঠিলাম। শশাঙ্কবাবু তখন বলিতেছিলেন, 'শুধু ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ বা গরম জলের প্রস্রবণ দেখিয়েই তোমাদের নিরাশ করব না, অতীন্দ্রিয় ব্যাপার যদি দেখতে চাও দেখাতে পারি। সম্প্রতি শহরে একটি রহস্যময় ভূতের আবির্ভাব হয়েছে—তাঁকে নিয়ে কিছু বিব্রত আছি।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ভূতের পেছনে বিব্রত থাকাও কি তোমাদের একটা কর্তব্য নাকি ?'

শশাঙ্কবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'আরে না না। কিন্তু ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে—। হয়েছে কি, মাস ছয়েক আগে এই কেল্লার মধ্যেই একটি ভদ্রলোকের ভারী রহস্যময়ভাবে মৃত্যু হয়। এখনো সে-মৃত্যুর কিনারা হয়নি, কিন্তু এরি মধ্যে তাঁর প্রেতাত্মা তাঁর পুরনো বাড়িতে হানা দিতে আরম্ভ করেছে।'

ব্যোমকেশ শূন্য চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিল ; দেখিলাম তাহার চোখের ভিতর গভীর কৌতুক ক্রীড়া করিতেছে। সে সযত্নে রুমাল দিয়া মুখ মুছিল, তারপর একটি সিগারেট ধরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'শশাঙ্ক, তোমার কথা বলবার ভঙ্গীটি আগেকার মতই চমৎকার আছে দেখছি, এবং সদা-ব্যবহারে আরো পরিমার্জিত হয়েছে। এখনো এক ঘণ্টা হয়নি মুঙ্গেরে পা দিয়েছি, কিন্তু এরি মধ্যে তোমার কথা শুনে স্থানীয় ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি।—ঘটনাটা কি, খুলে বল।'

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। শশাঙ্কবাবু ব্যোমকেশের ইঙ্গিতটা বুঝিলেন এবং বোধ করি মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া কিছুই ধরা গেল না। সহজভাবে বলিলেন, 'আর এক পেয়ালা চা ? নেবে না ? পান নাও। নিন্ অজিতবাবু। আচ্ছা—ঘটনাটা বলি তাহলে ; যদিও এমন কিছু রোমাঞ্চকর কাহিনী নয়। ছ'মাস আগেকার ঘটনা—'

শশাঙ্কবাবু জর্দা ও পান মুখে দিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'এই কেল্লার মধ্যেই দক্ষিণ ফটকের দিকে একটি বাড়ি আছে। বাড়িটি ছোট হলেও দোতলা, চারিদিকে একটু ফাঁকা জায়গা আছে। কেল্লার মধ্যে সব বাড়িই বেশ ফাঁকা—শহরের মত ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি নেই ; প্রত্যেক বাড়িরই কম্পাউন্ড আছে। এই বাড়িটির মালিক স্থানীয় একজন 'রইস'—তিনি বাড়িটি ভাড়া দিয়ে থাকেন।

'গত পনেরো বছর ধরে এই বাড়িতে যিনি বাস করছিলেন তাঁর নাম—বৈকুণ্ঠ দাস। লোকটির বয়স হয়েছিল—জাতিতে স্বর্ণকার। বাজারে একটি সোনারূপার দোকান ছিল ; কিন্তু দোকানটা নামমাত্র। তাঁর আসল কারবার ছিল জহরতের। হিসাবের খাতাপত্র থেকে দেখা যায়, মৃত্যুকালে তাঁর কাছে একান্নখানা হীরা মুক্তা চুনি পান্না ছিল—যার দাম প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

'এই সব দামী মণি-মুক্তা তিনি বাড়িতেই রাখতেন—দোকানে রাখতেন না। অথচ আশ্চর্য এই যে তাঁর বাড়িতে একটা লোহার সিন্দুক পর্যন্ত ছিল না। কোথায় তিনি তাঁর মূল্যবান মণি-মুক্তা রাখতেন কেউ জানে না। খরিদ্দার এলে তাকে তিনি বাড়িতে নিয়ে আসতেন, তারপর খরিদ্দারকে বাইরের ঘরে বসিয়ে নিজে ওপরে গিয়ে শোবার ঘর থেকে প্রয়োজন মত জিনিস এনে দেখাতেন।

'হীরা জহরতের বহর দেখেই বুঝতে পারছ লোকটি বড় মানুষ। কিন্তু তাঁর চাল-চলন দেখে কেউ তা সন্দেহ করতে পারত না। নিতান্ত নিরীহ গোছের আধবয়সী লোক, দেবদ্বিজে অসাধারণ ভক্তি, গলায় তুলসীকণ্ঠি—সর্বদাই জোড়হস্ত হয়ে থাকতেন। কিন্তু কোন সৎকার্যের জন্য চাঁদা চাইতে গেলে এত বেশি বিমর্ষ এবং কাতর হয়ে পড়তেন যে শহরের ছেলেরা তাঁর কাছে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা ছেড়েই দিয়েছিল। তাঁর নামটাও এই সূত্রে একটু বিকৃত হয়ে

পরিহাসচ্ছলে 'ব্যয়-কুণ্ঠ' আকার ধারণ করেছিল। শহরসুদ্ধ বাঙালী তাঁকে ব্যয়-কুণ্ঠ জহুরী বলেই উল্লেখ করত।

'বাস্তবিক লোকটি অসাধারণ কৃপণ ছিলেন। মাসে সত্তর টাকা তাঁর খরচ ছিল, তার মধ্যে চল্লিশ টাকা বাড়িভাড়া। বাকি ত্রিশ টাকায় নিজের, একটি মেয়ের আর এক হাবাকালা চাকরের গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়ে নিতেন; আমি তাঁর দৈনন্দিন খরচের খাতা দেখেছি, কখনও সত্তরের কোঠা পেরোয়নি। আশ্চর্য নয়?—আমি ভাবি, লোকটি যখন এতবড় কৃপণই ছিলেন তখন এত বেশি ভাড়া দিয়ে কেল্লার মধ্যে থাকবার কারণ কি? কেল্লার বাইরে থাকলে তো ঢের কম ভাড়ায় থাকতে পারতেন।'

ব্যোমকেশ ডেক-চেয়ারে লম্বা হইয়া অদূরের পাষাণ-নির্মিত দুর্গ-তোরণের পানে তাকাইয়া শুনিতেছিল; বলিল, 'কেল্লার ভিতরটা বাইরের চাইতে নিশ্চয় বেশি নিরাপদ, চোর-বদমাসের আনাগোনা কম। সুতরাং যার কাছে আড়াই লক্ষ টাকার জহরত আছে সে তো নিরাপদ স্থান দেখেই বাড়ি নেবে। বৈকুণ্ঠবাবু ব্যয়-কুণ্ঠ ছিলেন বটে কিন্তু অসাবধানী লোক বোধ হয় ছিলেন না।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম। কিন্তু কেল্লার মধ্যে থেকেও বৈকুণ্ঠবাবু যে চোরের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারেননি সেই গল্পই বলছি। সম্ভবত তাঁর বাড়িতে চুরি করবার সঙ্কল্প অনেকদিন থেকেই চলছিল। মুঙ্গের জায়গাটি ছোট বটে, তাই বলে তাকে তুচ্ছ মনে কোরো না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, সে কি কথা!'

'এখানে এমন দু' চারটি মহাপুরুষ আছেন যাঁদের সমকক্ষ চৌকশ চোর দাগাবাজ খুনে তোমাদের কলকাতাতেও পাবে না। বলব কি তোমাকে, গভর্নমেন্টকে পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে হে। এখানে মীরকাশিমের আমলের অনেক দিশী বন্দুকের কারখানা আছে জান তো? কিন্তু সে-সব কথা পরে হবে, আগে বৈকুণ্ঠ জহুরীর গল্পটাই বলি।'

এইভাবে সামান্য অবান্তর কথার ভিতর দিয়া শশাঙ্কবাবু পুলিসের তথা নিজের বিবিধ গুরুতর দায়িত্বের একটা গূঢ় ইঙ্গিত দিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'গত ছাব্বিশে এপ্রিল—অর্থাৎ বাংলার ১২ই বৈশাখ—বৈকুণ্ঠবাবু আটটার সময় তাঁর দোকান থেকে বাড়ি ফিরে এলেন। নিতান্তই সহজ মানুষ, মনে আসন্ন দুর্ঘটনার পূর্বাভাস পর্যন্ত নেই। আহারাদি করে রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় তিনি দোতলার ঘরে শুতে গেলেন। তাঁর মেয়ে নীচের তলায় ঠাকুরঘরে শুতো, সেও বাপকে খাইয়ে দাইয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলে। হাবাকালা চাকরটা রাত্রে দোকান পাহারা দিত, মালিক বাড়ি ফেরবার পরই সে চলে গেল। তারপর বাড়িতে কি ঘটেছে, কেউ কিছু জানে না।

'সকালবেলা যখন দেখা গেল যে বৈকুণ্ঠবাবু ঘরের দোর খুলছেন না, তখন দোর ভেঙে ফেলা হল। পুলিস ঘরে ঢুকে দেখলে বৈকুণ্ঠবাবুর মৃতদেহ দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। কোথাও তাঁর গায়ে আঘাত-চিহ্ন নেই, আততায়ী গলা টিপে তাঁকে মেরেছে; তারপর তাঁর সমস্ত জহরত নিয়ে খোলা জানলা দিয়ে প্রস্থান করেছে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আততায়ী তাহলে জানলা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল?'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'তাই তো মনে হয়। ঘরের একটি মাত্র দরজা বন্ধ ছিল, সুতরাং জানলা ছাড়া ঢোকবার আর পথ কোথায়! আমার বিশ্বাস, বৈকুণ্ঠবাবু রাত্রে জানলা খুলে শুয়েছিলেন; গ্রীষ্মকাল—সে-রাত্রিটা গরমও ছিল খুব। জানলার গরাদ নেই, কাজেই মই লাগিয়ে চোরেরা সহজেই ঘরে ঢুকতে পেরেছিল।'

'বৈকুণ্ঠবাবুর হীরা জহরত সবই চুরি গিয়েছিল?'

'সমস্ত। আড়াই লক্ষ টাকার জহরত একেবারে লোপাট। একটিও পাওয়া যায়নি! এমন কি তাঁর কাঠের হাত-বাক্সে যে টাকা-পয়সা ছিল তাও চোরেরা ফেলে যায়নি—সমস্ত নিয়ে

গিয়েছিল।'

'কাঠের হাত-বাক্সে বৈকুণ্ঠবাবু হীরা জহরত রাখতেন ?'

'তাছাড়া রাখবার জায়গা কৈ ? অবশ্য হাত-বাক্সেই যে রাখতেন তার কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর শোবার ঘরে কারু ঢোকবারই হুকুম ছিল না, মেয়ে পর্যন্ত জানত না তিনি কোথায় কি রাখেন। কিন্তু আগেই বলেছি, তাঁর একটা লোহার সিন্দুক পর্যন্ত ছিল না ; অথচ হীরা মুক্তা যা-কিছু সব শোবার ঘরেই রাখতেন। সুতরাং হাত-বাক্সেই সেগুলো থাকত, ধরে নিতে হবে।'

'ঘরে আর কোনো বাক্স-প্যাঁট্‌রা বা ঐ ধরনের কিছু ছিল না ?'

'কিছু না। শুনলে আশ্চর্য হবে, ঘরে একটা মাদুর, একটা বালিশ, ঐ হাত-বাক্সটা, পানের বাটা আর জলের কলসী ছাড়া কিছু ছিল না। দেয়ালে একটা ছবি পর্যন্ত না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পানের বাটা ! সেটা ভাল করে দেখেছিলে তো !'

শশাঙ্কবাবু ক্ষুব্ধভাবে ঈষৎ হাসিলেন—'ওহে, তোমরা আমাদের যতটা গাধা মনে কর, সত্যিই আমরা ততটা গাধা নই। ঘরের সব জিনিসই আঁতিপাঁতি করে তল্লাস করা হয়েছিল। পানের বাটার মধ্যে ছিল একদলা চুন, খানিকটা করে খয়ের সুপুরি লবঙ্গ—আর পানের পাতা। বাটাটা পিতলের তৈরি, তাতে চুন খয়ের সুপুরির জন্য আলাদা খুবরি কাটা ছিল। বৈকুণ্ঠবাবু খুব বেশি পান খেতেন, অন্যের সাজা পান পছন্দ হত না বলে নিজে সেজে খেতেন।—আর কিছু জানতে চাও এ সম্বন্ধে ?'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'না না, ওই যথেষ্ট। তোমাদের ধৈর্য আর অধ্যবসায় সম্বন্ধে তো কোনো প্রশ্ন নেই ; সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে। সেই সঙ্গে যদি একটু বুদ্ধি—কিন্তু সে যাক। মোট কথা দাঁড়াল এই যে বৈকুণ্ঠবাবুকে খুন করে তাঁর আড়াই লক্ষ টাকার জহরত নিয়ে চোর কিম্বা চোরেরা চম্পট দিয়েছে। তারপর ছ'মাস কেটে গেছে কিন্তু তোমরা কোনো কিনারা করতে পারোনি। জহরতগুলো বাজারে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে কি না—সে খবর পেয়েছ ?'

'এখনো জহরত বাজারে আসেনি। এলে আমরা খবর পেতুম। চারিদিকে গোয়েন্দা আছে।'

'বেশ। তারপর ?'

'তারপর আর কি—ঐ পর্যন্ত। বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তিনি নগদ টাকা কিছুই রেখে যেতে পারেননি ; কোথাও একটি পয়সা পর্যন্ত ছিল না। দোকানের সোনা-রূপা বিক্রি করে যা সামান্য কিছু টাকা পেয়েছে সেইটুকুই সম্বল। বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়ে, বিদেশে পয়সার অভাবে পরের গলগ্রহ হয়ে রয়েছে দেখলেও কষ্ট হয়।'

'কার গলগ্রহ হয়ে আছে ?'

'স্থানীয় একজন প্রবীণ উকিল—নাম তারাশঙ্করবাবু। তিনিই নিজের বাড়িতে রেখেছেন। লোকটি উকিল হলেও ভাল বলতে হবে। বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে প্রণয়ও ছিল, প্রতি রবিবারে দুপুরবেলা দু'জনে দাবা খেলতেন—'

'হুঁ। মেয়েটি বিধবা ?'

'না, সধবা। তবে বিধবা বললেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল, স্বামীটা অল্প বয়সে বয়াটে হয়ে যায়। মাতাল দুশ্চরিত্র—থিয়েটার যাত্রা করে বেড়াত, তারপর হঠাৎ নাকি এক সার্কাস পার্টির সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যায়। সেই থেকে নিরুদ্দেশ। তাই মেয়েকে বৈকুণ্ঠবাবু নিজের কাছেই রেখেছিলেন।'

'মেয়েটির বয়স কত ?'

তেইশ-চব্বিশ হবে।'

'চরিত্র কেমন ?'

'যতদূর জানি, ভাল। চেহারাও ভাল থাকার অনুকূল—অর্থাৎ জলার পেত্নী বললেই হয়। স্বামী বেচারাকে নেহাৎ দোষ দেওয়া যায় না—'

'বুঝেছি। দেশে আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই ?'

'না-থাকারই মধ্যে। নবদ্বীপে খুড়তুতো ভায়েরা আছে, বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে কয়েকজন ছুটে এসেছিল। কিন্তু যখন দেখলে এক ফোঁটাও রস নেই, সব চোরে নিয়ে গেছে, তখন যে-যার খসে পড়ল।'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ব্যাপারটার মধ্যে অনেকখানি অভিনবত্ব রয়েছে। কিন্তু এত বেশি দেরি হয়ে গেছে যে আর কিছু করতে পারা যাবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া আমি বিদেশী, দু'দিনের জন্য এসেছি, তোমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তুমিও বোধ হয় তা পছন্দ করবে না।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'না না, হস্তক্ষেপ করতে যাবে কেন ? আমি অফিসিয়ালি তোমাকে কিছু বলছি না ; তবে তুমিও এই কাজের কাজী, যদি দেখে শুনে তোমার মনে কোনো আইডিয়া আসে তাহলে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতে পার। তুমি বেড়াতে এসেছ, তোমার ওপর কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে তোমাকে বিব্রত করতে আমি চাই না।'

শশাঙ্কবাবুর মনের ভাবটা অজ্ঞাত রহিল না। সাহায্য লইতে তিনি পুরাদস্তুর রাজী, কিন্তু 'অফিসিয়ালি' কাহারো কৃতিত্ব স্বীকার করিয়া যশের ভাগ দিতে নারাজ।

ব্যোমকেশও হাসিল, বলিল, 'বেশ, তাই হবে। দায়িত্ব না নিয়েই তোমাকে সাহায্য করব।—ভাল কথা, ভূতের উপদ্রবের কথা কি বলছিলে ?'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার কিছুদিন পরেই ঐ বাড়িতে আর একজন বাঙালী ভাড়াটে এসেছেন, তিনি আসার পর থেকেই বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। সব কথা অবশ্য বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু যে সব ব্যাপার ঘটছে তাতে রোমাঞ্চ হয়। পনেরো হাত লম্বা একটি প্রেতাত্মা রাত্রে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারে। বাড়ির লোক ছাড়াও আরো কেউ কেউ দেখেছে।'

'বল কি ?'

'হ্যাঁ।—এখানে বরদাবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন—আরে ! নাম করতে না করতেই এসে পড়েছেন যে। অনেকদিন বাঁচবেন। শৈলেনবাবুও আছেন—বেশ বেশ। আসুন। ব্যোমকেশ, বরদাবাবু হচ্ছেন ভূতের একজন বিশেষজ্ঞ। ভূতুড়ে ব্যাপার ওঁর মুখেই শোনো।'

২

প্রাথমিক নমস্কারাদির পর নবাগত দুইজন আসন গ্রহণ করিলেন। বরদাবাবুর চেহারাটি গোলগাল বেঁটে-খাটো, রং ফরসা, দাড়ি গোঁফ কামানো ; সব মিলাইয়া নৈনিতাল আলুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার সঙ্গী শৈলেনবাবু ইহার বিপরীত ; লম্বা একহারা গঠন, অথচ ক্ষীণ বলা চলে না। কথায় বার্তায় উভয়ের পরিচয় জানিতে পারিলাম। বরদাবাবু এখানকার বাসিন্দা, পৈতৃক কিছু জমিজমা ও কয়েকখানা বাড়ির উপস্বত্ব ভোগ করেন এবং অবসরকালে প্রেততত্ত্বের চর্চা করিয়া থাকেন। শৈলেনবাবু ধনী ব্যক্তি—স্বাস্থ্যের জন্য মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু স্থানটি তাঁহার স্বাস্থ্যের সহিত এমন খাপ খাইয়া গিয়াছে যে বাড়ি কিনিয়া এখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বয়স উভয়েরই চল্লিশের নীচে।

আমাদের পরিচয়ও তাঁহাদিগকে দিলাম—কিন্তু দেখা গেল ব্যোমকেশের নাম পর্যন্ত তাঁহারা শোনেন নাই। খ্যাতি এমনই জিনিস !

যা হোক, পরিচয় আদান-প্রদানের পর বরদাবাবু বলিলেন, 'বৈকুণ্ঠ জহুরীর গল্প শুনছিলেন বুঝি ? বড়ই শোচনীয় ব্যাপার—অপঘাত মৃত্যু। আমার বিশ্বাস গয়ায় পিণ্ড না দিলে তাঁর আত্মার সদ্গতি হবে না।'

ব্যোমকেশ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বরদাবাবু বলিলেন, 'আপনি প্রেতযোনি বিশ্বাস করেন না ?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'অবিশ্বাসও করি না। প্রেতযোনি আমার হিসেবের বাইরে।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আপনি হিসেবের বাইরে রাখতে চাইলেও তারা যে থাকতে চায় না। ঐখানেই তো মুশকিল। শৈলেনবাবু, আপনিও তো আগে ভূত বিশ্বাস করতেন না, বুজরুকি বলে হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এখন ?'

বরদাবাবুর সঙ্গী বলিলেন, 'এখন গোঁড়া ভক্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক ব্যোমকেশবাবু, আগে আমিও আপনার মত ছিলুম, ভূত-প্রেত নিয়ে মাথা ঘামাতুম না। কিন্তু এখানে এসে বরদাবাবুর সঙ্গে আলাপ হবার পর যতই এ বিষয়ে আলোচনা করছি ততই আমার ধারণা হচ্ছে যে ভূতকে বাদ দিয়ে এ সংসারে চলা একরকম অসম্ভব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি জানি ! আমাদের তো এখন পর্যন্ত বেশ চলে যাচ্ছে। আর দেখুন, এমনিতেই মানুষের জীবনযাত্রাটা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে তার ওপর আবার—'

শশাঙ্কবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, 'ও সব যাক। বরদাবাবু, আপনি ব্যোমকেশকে বৈকুণ্ঠবাবুর ভূতুড়ে কাহিনীটা শুনিয়ে দিন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, সেই ভাল। তত্ত্ব আলোচনার চেয়ে গল্প শোনা ঢের বেশি আরামের।'

বরদাবাবুর মুখে তৃপ্তির একটা ঝিলিক খেলিয়া গেল। জগতে গল্প বলিবার লোক অনেক আছে—কিন্তু অনুরাগী শ্রোতা সকলের ভাগ্যে জোটে না। অধিকাংশই অবিশ্বাসী ও ছিদ্রান্বেষী, গল্প শোনার চেয়ে তর্ক করিতেই অধিক ভালবাসে। তাই ব্যোমকেশ যখন তত্ত্ব ছাড়িয়া গল্প শুনিতেই সম্মত হইল তখন বরদাবাবু যেন অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বুঝিলাম, শিষ্ট এবং ধৈর্যবান শ্রোতা লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না।

শশাঙ্কবাবুর কৌটা হইতে একটি সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগপূর্বক বরদাবাবু ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সকলের গল্প বলিবার ভঙ্গী এক নয় ; বরদাবাবুর ভঙ্গীটি বেশ চিত্তাকর্ষক। হুড়াহুড়ি তাড়াতাড়ি নাই—ধীরমন্থর তালে চলিয়াছে ; ঘটনার বাহুল্যে গল্প কণ্টকিত নয়, অথচ এরূপ নিপুণভাবে ঘটনাগুলি বিন্যস্ত যে শ্রোতার মনকে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলে। চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভঙ্গিমা এমনভাবে গল্পের সহিত সঙ্গত করিয়া চলে যে সব মিশাইয়া একটি অখণ্ড রসবস্তুর আস্বাদ পাইতেছি বলিয়া ভ্রম হয়।

'বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর কথা আপনারা শুনেছেন। অপঘাত মৃত্যু ; পরলোকের জন্য প্রস্তুত হবার অবকাশ তিনি পাননি। আমাদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, মানুষের আত্মা সহসা অতর্কিতভাবে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার দেহাভিমান দূর হয় না—অর্থাৎ সে বুঝতেই পারে না তার দেহ নেই। আবার কখনো কখনো বুঝতে পারলেও সংসারের মোহ ভুলতে পারে না, ঘুরে ফিরে তার জীবিতকালের কর্মক্ষেত্রে আনাগোনা করতে থাকে।

'এসব থিয়োরি আপনাদের বিশ্বাস করতে বলছি না। কিন্তু যে অলৌকিক কাহিনী আপনাদের শোনাতে যাচ্ছি—এ ছাড়া তার আর কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ঘটনা যে সত্য সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। আমি আষাঢ়ে গল্প বলি এই রকম একটা অপবাদ আছে ; কিন্তু এক্ষেত্রে অতি বড় অবিশ্বাসীকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে আমি একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না। কি বলেন শৈলেনবাবু ?'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। অমূল্যবাবুকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে ঘটনা মিথ্যে নয়।'

বরদাবাবু বলিতে লাগিলেন, 'সুতরাং কারণ যাই হোক, ঘটনাটা নিঃসংশয়। বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার পর কয়েক হপ্তা তাঁর বাড়িখানা পুলিসের কবলে রইল ; ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়েকে তারাশঙ্করবাবু নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। এ কয়দিনের মধ্যে কিছু ঘটেছিল কি না বলতে পারি না, পুলিসের যে দু'জন কনস্টেবল সেখানে পাহারা দেবার জন্য মোতায়েন হয়েছিল তারা

সম্ভবত সন্ধ্যের পর দু'ঘটি ভাঙ চড়িয়ে এমন নিদ্রা দিত যে ভূত-প্রেতের মত অশরীরী জীবের গতিবিধি লক্ষ্য করবার মত অবস্থা তাদের থাকত না। যা হোক, পুলিস সেখান থেকে থানা তুলে নেবার পরই একজন নবাগত ভাড়াটে বাড়িতে এলেন। ভদ্রলোকের নাম কৈলাসচন্দ্র মল্লিক—রোগজীর্ণ বৃদ্ধ—স্বাস্থ্যের অন্বেষণে মুঙ্গেরে এসে কেল্লায় একখানা বাড়ি খালি হয়েছে দেখে খোঁজখবর না নিয়েই বাড়ি দখল করে বসলেন—বাড়ির মালিকও খুনের ইতিহাস তাঁকে জানাবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন না।

'কয়েকদিন নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। দোতলায় একটি মাত্র শোবার ঘর—যে-ঘরে বৈকুণ্ঠবাবু মারা গিয়েছিলেন—সেই ঘরটিতেই কৈলাসবাবু শুতে লাগলেন। নীচের তলায় তাঁর চাকর বামুন সরকার রইল। কৈলাসবাবুর অবস্থা বেশ ভাল, পাড়াগেঁয়ে জমিদার। একমাত্র ছেলের সঙ্গে ঝগড়া চলছে, স্ত্রীও জীবিত নেই—তাই কেবল চাকর বামুনের ওপর নির্ভর করেই হাওয়া বদলাতে এসেছেন।

'ছয় সাত দিন কেটে যাবার পর একদিন ভূতের আবির্ভাব হল। রাত্রি ন'টার সময় ওষুধ খেয়ে তিনি নিদ্রার আয়োজন করছেন, এমন সময় নজর পড়ল জানালার দিকে। গ্রীষ্মকাল, জানালা খোলাই ছিল—দেখলেন, কদাকার একখানা মুখ ঘরের মধ্যে উঁকি মারছে। কৈলাসবাবু চীৎকার করে উঠলেন, চাকর-বাকর নীচে থেকে ছুটে এল। কিন্তু মুখখানা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'তারপর আরো দুই রাত্রি ওই ব্যাপার হল। প্রথম রাত্রির ব্যাপারটা রুগ্ন কৈলাসবাবুর মানসিক ভ্রান্তি বলে সকলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হল না। খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের সঙ্গে তখনো কৈলাসবাবুর আলাপ হয়নি, কিন্তু আমরাও জানতে পারলুম।

'ভূত-প্রেত সম্বন্ধে আমার একটা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আছে। নেই বলে তাকে উড়িয়ে দিতে পারি না, আবার চোখ বুজে তাকে মেনে নিতেও পারি না। তাই, অন্য সকলে যখন ঘটনাটাকে পরিহাসের একটি সরস উপাদান মনে করে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, আমি তখন ভাবলুম—দেখিই না ; অপ্রাকৃত বিষয় বলে মিথ্যেই হতে হবে এমন কি মানে আছে ?

'একদিন আমি এবং আরো কয়েকজন বন্ধু কৈলাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি রোগে পঙ্গু—হার্টের ব্যারাম—নীচে নামা ডাক্তারের নিষেধ ; তাঁর শোবার ঘরেই আমাদের ডেকে পাঠালেন। খিট্‌খিটে স্বভাবের লোক হলেও তাঁর বাহ্য আদব-কায়দা বেশ দুরস্ত, আমাদের ভালভাবেই অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর কাছ থেকে ভৌতিক ব্যাপারের সঠিক বিবরণ পাওয়া গেল।

'তিনি বললেন—গত পনেরো দিনের মধ্যে চারবার প্রেতমূর্তির আবির্ভাব হয়েছে। চারবারই সে জানালার সামনে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরেছে—তারপর মিলিয়ে গেছে। তার আসার সময়ের কিছু ঠিক নেই ; কখনো দুপুর রাত্রে এসেছে, কখনো শেষ রাত্রে এসেছে, আবার কখনো বা সন্ধ্যের সময়েও দেখা দিয়েছে। মূর্তিটা সুশ্রী নয়, চোখে একটা লুব্ধ ক্ষুধিত ভাব। যেন ঘরে ঢুকতে চায়, কিন্তু মানুষ আছে দেখে সাক্ষাতে ফিরে চলে যাচ্ছে।

'কৈলাসবাবুর গল্প শুনে আমরা স্থির করলুম, স্বচক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হবে। কৈলাসবাবুও আমাদের সাগ্রহে আমন্ত্রণ করলেন। পরদিন থেকে আমরা প্রত্যহ তাঁর বাড়িতে পাহারা আরম্ভ করলুম। সন্ধ্যে থেকে রাত্রি দশটা—কখনো বা এগারোটা বেজে যায়। কিন্তু প্রেতযোনির দেখা নেই। যদি বা কদাচিৎ আসে, আমরা চলে যাবার পর আসে ; আমরা দেখতে পাই না।

'দিন দশেক আনাগোনা করবার পর আমার বন্ধুরা একে একে খসে পড়তে লাগলেন ; শৈলেনবাবুও ভগ্নোদ্যম হয়ে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। আমি কেবল একলা লেগে রইলুম। সন্ধ্যের পর যাই ; কৈলাসবাবুর সঙ্গে বসে গল্প-গুজব করি, তারপর সাড়ে-দশটা এগারোটা নাগাদ ফিরে আসি।

'এইভাবে আরো এক হপ্তা কেটে গেল। আমিও ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়তে লাগলুম। এ কি রকম প্রেতাত্মা যে কৈলাসবাবু ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। কৈলাসবাবুর ওপর নানা রকম সন্দেহ হতে লাগল।

'তারপর একদিন হঠাৎ আমার দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পুরস্কার পেলুম। কৈলাসবাবুর ওপরে সন্দেহও ঘুচে গেল।'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ একমনে শুনিতেছিল, বলিল, 'আপনি দেখলেন ?'

গম্ভীর স্বরে বরদাবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ—আমি দেখলুম।'

ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল।—'তাই তো!' তারপর কিয়ৎকাল যেন চিন্তা করিয়া বলিল, 'বৈকুণ্ঠবাবুকে চিনতে পারলেন ?'

বরদাবাবু মাথা নাড়িলেন—'তা ঠিক বলতে পারি না।—একখানা মুখ, খুব স্পষ্ট নয় তবু মানুষের মত তাতে সন্দেহ নেই। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আবছায়া ছবির মত ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভারি আশ্চর্য! প্রত্যক্ষভাবে ভূত দেখা সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না; অধিকাংশ স্থলেই ভৌতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়—হয় শোনা কথা, নয় তো রজ্জুতে সর্পভ্রম।'

ব্যোমকেশের কথার মধ্যে অবিশ্বাসের যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল তাহা বোধ করি শৈলেনবাবুকে বিদ্ধ করিল; তিনি বলিলেন, 'শুধু বরদাবাবু নয়, তারপর আরো অনেকে দেখেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিও দেখেছেন নাকি ?'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। হয়তো বরদাবাবুর মত অত স্পষ্টভাবে দেখিনি, তবু দেখেছি। বরদাবাবু দেখবার পর আমরা কয়েকজন আবার যেতে আরম্ভ করেছিলুম। একদিন আমি নিমেষের জন্য দেখে ফেললুম!'

বরদাবাবু বলিলেন, 'সেদিন শৈলেনবাবু উত্তেজিত হয়ে একটু ভুল করে ফেলেছিলেন বলেই ভাল করে দেখতে পাননি। আমরা কয়েকজন—আমি, অমূল্য আর ডাক্তার শচী রায়—কৈলাসবাবুর সঙ্গে কথা কইছিলুম; তাঁকে বাড়ি ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিতে দিতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম, কিন্তু শৈলেনবাবু শিকারীর মত জানালার দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। হঠাৎ উনি 'ঐ ঐ—' করে চেঁচিয়ে উঠলেন। আমরা ধড়মড় করে ফিরে চাইলুম, কিন্তু তখন আর কিছু দেখা গেল না। শৈলেনবাবু দেখেছিলেন, একটা কুয়াসার মত বাষ্প যেন ক্রমশ আকার পরিগ্রহ করছে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে materialise করবার আগেই উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, তাই সব নষ্ট হয়ে গেল।'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'তবু, কৈলাসবাবুও নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিলেন। মনে নেই, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন ?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, একে তাঁর হার্ট দুর্বল—; ভাগ্যে শচী ডাক্তার উপস্থিত ছিল, তাই তখনি ইন্‌জেকশন দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে। নইলে হয়তো আর একটা ট্র্যাজেডি ঘটে যেত।'

অতঃপর প্রায় পাঁচ মিনিট আমরা সকলে নীরবে বসিয়া রহিলাম। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা, অবিশ্বাস করিবার উপায় নেই। অন্তত দুইটি বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানকে চূড়ান্ত মিথ্যাবাদী বলিয়া ধরিয়া না লইলে বিশ্বাস করিতে হয়। আবার গল্পটা এতই অপ্রাকৃত যে সহসা মানিয়া লইতেও মন সরে না।

অবশেষে ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আপনাদের মতে বৈকুণ্ঠবাবুর প্রেতাত্মাই তাঁর শোবার ঘরের জানালার কাছে দেখা দিচ্ছেন ?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'তাছাড়া আর কি হতে পারে ?'

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের এ বিষয়ে মতামত কি ?'

'তাঁর মতামত ঠিক বোঝা যায় না। গয়ায় পিণ্ড দেবার কথা বলেছিলুম, তা কিছুই করলেন না। বিশেষত তারাশঙ্করবাবু তো এসব কথা কানেই তোলেন না—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেন।' বরদাবাবু একটি ক্ষোভপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বৈকুণ্ঠবাবুর খুনের একটা কিনারা হলে হয়তো তাঁর আত্মার সদ্‌গতি হত। আমি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানি না ; তবু মনে হয়, পরলোক যদি থাকে, তবে প্রেতযোনির পক্ষে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিটা অস্বাভাবিক নয়।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'তা তো নয়ই। প্রেতযোনির কেবল দেহ নেই, আত্মা তো অটুট আছে। গীতায়—নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি—'

বাধা দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন ? তাঁকে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতুম।'

বরদাবাবু ভাবিয়া বলিলেন, 'চেষ্টা করতে পারি। আপনি ডিটেক্‌টিভ শুনলে হয়তো তারাশঙ্করবাবু আপত্তি করবেন না। আজ বার লাইব্রেরিতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব ; যদি তিনি রাজী হন, ওবেলা এসে আপনাকে নিয়ে যাব। তাহলে তাই কথা রইল।'

অতঃপর বরদাবাবু উঠি-উঠি করিতেছেন দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, আমরা ভূত দেখতে পাই না ?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'একদিনেই যে দেখতে পাবেন এমন কথা বলি না ; তবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে লেগে থাকতে পারলে নিশ্চয় দেখবেন। চলুন না, আজই তারাশঙ্করবাবুর বাড়ি হয়ে আপনাদের কৈলাসবাবুর বাড়ি নিয়ে যাই। কি বলেন ব্যোমকেশবাবু ?'

'বেশ কথা। ওটা দেখবার আমারও বিশেষ আগ্রহ আছে। আপনাদের দেশে এসেছি, একটা নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে চাই।'

'তাহলে এখন উঠি। দশটা বাজে। ওবেলা পাঁচটা নাগাদ আবার আসব।'

বরদাবাবু ও শৈলেনবাবু প্রস্থান করিবার পর শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি মনে হল ? আশ্চর্য নয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার খুনের গল্প আর বরদাবাবুর ভূতের গল্প—দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি আজগুবি বুঝতে পারছি না।'

'আমার খুনের গল্পে আজগুবি কোন্‌খানটা পেলে ?'

'ছ'মাসের মধ্যে যে খুনের কিনারা হয় না তাকে আজগুবি ছাড়া আর কি বলব ? বৈকুণ্ঠবাবু খুন হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তো ? হার্টফেল করে মারা যাননি ?'

'কি যে বল— ; ডাক্তারের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট রয়েছে, গলা টিপে দম বন্ধ করে তাঁকে মারা হয়েছে। গলায় sub-cutaneous abrasions—'

'অথচ আততায়ীর কোনো চিহ্ন নেই, একটা আঙুলের দাগ পর্যন্ত না। আজগুবি আর কাকে বলে ? বরদাবাবুর তো তবু একটা প্রত্যক্ষদৃশ্য ভূত আছে, তোমার তাও নেই।'—ব্যোমকেশ উঠিয়া আলস্য ভাঙিতে ভাঙিতে বলিল, 'অজিত, ওঠো—স্নান করে নেওয়া যাক্‌। ট্রেনে ঘুম হয়নি ; দুপুরবেলা দিব্যি একটি নিদ্রা না দিলে শরীর ধাতস্থ হবে না।'

৩

অপরাহ্নে বরদাবাবু আসিলেন। তারাশঙ্করবাবু রাজী হইয়াছেন ; যদিও একটি শোকসন্তপ্তা ভদ্রমহিলার উপর এইসব অযথা উৎপাত তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন।

বরদাবাবুর সঙ্গে দুইজনে বাহির হইলাম। শশাঙ্কবাবু যাইতে পারিলেন না, হঠাৎ কি কারণে উপরওয়ালার নিকট তাঁহার ডাক পড়িয়াছে।

পথে যাইতে যাইতে বরদাবাবু জানাইলেন যে, তারাশঙ্করবাবু লোক নেহাৎ মন্দ নয়, তাঁহার মত আইনজ্ঞ তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকিলও জেলায় আর দ্বিতীয় নাই ; কিন্তু মুখ বড় খারাপ। হাকিমরা পর্যন্ত তাঁহার কটু-তিক্ত ভাষাকে ভয় করিয়া চলেন। হয়তো তিনি আমাদের খুব সাদর সংবর্ধনা করিবেন না ; কিন্তু তাহা যেন আমরা গায়ে না মাখি।

প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশ একটু হাসিল। যেখানে কার্যোদ্ধার করিতে হইবে সেখানে তাহার গায়ে গণ্ডারের চামড়া—কেহই তাহাকে অপমান করিতে পারে না। সংসর্গগুণে আমার ত্বক্‌ও বেশ পুরু হইয়া আসিতেছিল।

কেল্লার দক্ষিণ দুয়ার পার হইয়া বেলুনবাজার নামক পাড়ায় উপস্থিত হইলাম। প্রধানত বাঙালী পাড়া, তাহার মধ্যস্থলে তারাশঙ্করবাবুর প্রকাণ্ড ইমারৎ। তারাশঙ্করবাবু যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকিল তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

তাঁহার বৈঠকখানায় উপনীত হইয়া দেখিলাম তক্তপোশে ফরাস পাতা এবং তাহার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া গৃহস্বামী তাম্রকূট সেবন করিতেছেন। শীর্ণ দীর্ঘাকৃতি লোক, দেহে মাংসের বাহুল্য নাই বরং অভাব ; কিন্তু মুখের গঠন ও চোখের দৃষ্টি অতিশয় ধারালো। বয়স ষাটের কাছাকাছি ; পরিধানে থান ও শুভ্র পিরান। আমাদের আসিতে দেখিয়া তিনি গড়গড়ার নল হাতে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, 'এস বরদা। এঁরাই বুঝি কলকাতার ডিটেক্‌টিভ ?'

ইঁহার কণ্ঠস্বর ও কথা বলিবার ভঙ্গীতে এমন একটা কিছু আছে যাহা শ্রোতার মনে অস্বস্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করে। সম্ভবত বড় উকিলের ইহা একটা লক্ষণ ; বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষী এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া যে রীতিমত বিচলিত হইয়া পড়ে তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হইল না।

বরদাবাবু সঙ্কুচিতভাবে ব্যোমকেশের পরিচয় দিলেন। ব্যোমকেশ বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া বলিল, 'আমি একজন সত্যান্বেষী।'

তারাশঙ্করবাবুর বাম ভ্রূর প্রান্ত ঈষৎ উত্থিত হইল, বলিলেন, 'সত্যান্বেষী ? সেটা কি ?'

ব্যোমকেশ কহিল, 'সত্য অন্বেষণ করাই আমার পেশা—আপনার যেমন ওকালতি।'

তারাশঙ্করবাবুর অধরোষ্ঠ শ্লেষ-হাস্যে বক্র হইয়া উঠিল ; তিনি বলিলেন, 'ও—আজকাল ডিটেক্‌টিভ কথাটার বুঝি আর ফ্যাশন নেই ? তা আপনি কি অন্বেষণ করে থাকেন ?'

'সত্য।'

'তা তো আগেই শুনেছি। কোন্ ধরনের সত্য ?'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'এই ধরুন, বৈকুণ্ঠবাবু আপনার কাছে কত টাকা জমা রেখে গেছেন—এই ধরনের সত্য জানতে পারলেও আপাতত আমার কাজ চলে যাবে।'

নিমেষের মধ্যে শ্লেষ-বিদ্রূপের সমস্ত চিহ্ন তারাশঙ্করবাবুর মুখ হইতে মুছিয়া গেল। তিনি বিস্ফারিত স্থির নেত্রে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপরে মহাবিস্ময়ে বলিলেন, 'বৈকুণ্ঠ আমার কাছে টাকা রেখে গেছে, একথা আপনি জানলেন কি করে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি সত্যান্বেষী।'

এক মিনিট কাল তারাশঙ্করবাবু নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর যখন কথা কহিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে ; সম্ভ্রম-প্রশংসা মিশ্রিত কণ্ঠে কহিলেন, 'ভারি আশ্চর্য ! এরকম ক্ষমতা আমি আজ পর্যন্ত কারুর দেখিনি।—বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?—বোসো বরদা। বলি, ব্যোমকেশবাবুরও কি তোমার মত পোষা ভূত-টুত আছে নাকি ?'

আমরা চৌকিতে উপবেশন করিলে তারাশঙ্করবাবু কয়েকবার গড়গড়ার নলে ঘন ঘন টান দিয়া মুখ তুলিলেন, ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'অবশ্য আন্দাজে ঢিল ফেলেছেন, এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু আন্দাজটা পেলেন কোথায় ? অনুমান করতে হলেও কিছু মাল-মশলা চাই তো।'

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, 'কিছু মাল-মশলা তো ছিল। বৈকুণ্ঠবাবুর মত ধনী ব্যবসায়ী নগদ টাকা কিছু রেখে যাবেন না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? অথচ ব্যাঙ্কে তাঁর টাকা ছিল না। সম্ভবত

ব্যাঙ্ক-জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। তবে কোথায় টাকা রাখতেন ? নিশ্চয় কোনো বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে। বৈকুণ্ঠবাবু প্রতি রবিবারে দুপুরবেলা আপনার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। তিনি মারা যাবার পর তাঁর মেয়েকে আপনি নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন ; সুতরাং বুঝতে হবে, আপনিই তাঁর সবচেয়ে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসভাজন বন্ধু।'

তারাশঙ্করবাবু বলিলেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন। ব্যাঙ্কের ওপর বৈকুণ্ঠের বিশ্বাস ছিল না। তার নগদ টাকা যা-কিছু সব আমার কাছেই থাকত এবং এখনো আছে। টাকা বড় কম নয়, প্রায় সতের হাজার। কিন্তু এ টাকার কথা আমি প্রকাশ করিনি ; তার মৃত্যুর পর কথাটা জানাজানি হয় আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু যখন ধরে ফেলেছেন তখন স্বীকার না করে উপায় নেই। তবু আমি চাই, যেন বাইরে কথাটা প্রকাশ না হয়। আপনারা তিনজন জানলেন ; আর কেউ যেন জানতে না পারে। বুঝলে বরদা ?'

বরদাবাবু দ্বিধা-প্রতিবিম্বিত মুখে ঘাড় নাড়িলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কথাটা গোপন রাখবার কোনো বিশেষ কারণ আছে কি ?'

তারাশঙ্করবাবু পুনরায় বারকয়েক তামাক টানিয়া বলিলেন, 'আছে। আপনারা ভাবতে পারেন আমি বন্ধুর গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কথাটা চেপে রাখবার অন্য কারণ আছে।'

'সেই কারণটি জানতে পারি না কি ?

তারাশঙ্করবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিলেন ; তারপর অন্দরের দিকের পর্দা-ঢাকা দরজার প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া খাটো গলায় বলিলেন, 'আপনারা বোধ হয় জানেন না, বৈকুণ্ঠের একটা বকাটে লক্ষ্মীছাড়া জামাই আছে। মেয়েটাকে নেয় না, সার্কাস পার্টির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। উপস্থিত সে কোথায় আছে জানি না, কিন্তু সে যদি কোন গতিকে খবর পায় যে তার স্ত্রীর হাতে অনেক টাকা এসেছে তাহলে মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে যাবে। দু'দিনে টাকাগুলো উড়িয়ে আবার সরে পড়বে। আমি তা হতে দিতে চাই না—বুঝলেন ?'

ব্যোমকেশ ফরাসের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'বুঝেছি।'

তারাশঙ্করবাবু বলিতে লাগিলেন, 'বৈকুণ্ঠের যথাসর্বস্ব তো চোরে নিয়ে গেছে, বাকি আছে কেবল এই হাজার কয়েক টাকা। এখন জামাই বাবাজী এসে যদি এগুলোকে ফুঁকে দিয়ে যান, তাহলে অভাগিনী মেয়েটা দাঁড়াবে কোথায় ? সারা জীবন ওর চলবে কি করে ? আমি তো আর চিরদিন বেঁচে থাকব না।'

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'ঠিক কথা। তাঁকে গোটাকয়েক কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। তিনি বাড়িতেই আছেন তো ? যদি অসুবিধা না হয়—'

'বেশ। তাকে জেরা করে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আপনি যখন চান, এইখানেই তাকে নিয়ে আসছি।' বলিয়া তারাশঙ্করবাবু অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে আমি চক্ষু এবং ভ্রূর সাহায্যে ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলাম—প্রত্যুত্তরে সে ক্ষীণ হাসিল। বরদাবাবুর সম্মুখে খোলাখুলি বাক্যালাপ হয়তো সে পছন্দ করিবে না, তাই স্পষ্টভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল—তারাশঙ্করবাবু লোকটি কি রকম ?

পাঁচ মিনিট পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন ; তাঁহার পশ্চাতে একটি যুবতী নিঃশব্দে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথায় একটু আধ-ঘোমটা, মুখ দেখিবার পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধক নাই ; পরিধানে অতি সাধারণ সধবার সাজ। চেহারা একেবারে জলার পেত্নী না হইলেও সুশ্রী বলা চলে না। তবু চেহারার সর্বাপেক্ষা বড় দোষ বোধ করি মুখের পরিপূর্ণ ভাবহীনতা। এমন ভাবলেশশূন্য মুখ চীন-জাপানের বাহিরে দেখা যায় কি না সন্দেহ। মুখাবয়বের এই প্রাণহীনতাই রূপের অভাবকে অধিক স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যতক্ষণ সে আমাদের সম্মুখে রহিল, একবারও তাহার মুখের একটি পেশী কম্পিত হইল না, চক্ষু পলকের জন্য মাটি হইতে উঠিল না, ব্যঞ্জনাহীন

নিষ্প্রাণ কণ্ঠে ব্যোমকেশের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া যন্ত্রচালিতের মত পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

যা হোক, সে আসিয়া দাঁড়াইতেই ব্যোমকেশ সেই দিকে ফিরিয়া ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল ; তারপর সহজ স্বরে প্রশ্ন করিল, 'আপনার বাবার মৃত্যুতে আপনি যে একেবারে নিঃস্ব হননি তা বোধ হয় জানেন ?'

'হাঁ।'

'তারাশঙ্করবাবু নিশ্চয় আপনাকে বলেছেন যে আপনার সতের হাজার টাকা তাঁর কাছে জমা আছে ?'

'হাঁ।'

ব্যোমকেশ যেন একটু দমিয়া গেল। একটু ভাবিয়া আবার আরম্ভ করিল, 'আপনার স্বামী কতদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন ?'

'আট বছর।'

'এই আট বছরের মধ্যে আপনি তাঁকে দেখেননি ?'

'না।'

'তাঁর চিঠিপত্রও পাননি ?'

'না।'

'তিনি এখন কোথায় আছেন জানেন না ?'

'না।'

'আপনি পৈতৃক টাকা পেয়েছেন জানাজানি হলে তিনি ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে যেতে চাইবেন—এ সম্ভাবনা আছে কি ?'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর—

'হাঁ।'

'আপনি তাঁর কাছে যেতে চান না ?'

'না।'

লক্ষ্য করিলাম তারাশঙ্করবাবু নিগূঢ় হাস্য করিলেন।

ব্যোমকেশ আবার অন্য পথ ধরিল।

'আপনার শ্বশুরবাড়ি কোথায় ?'

'যশোরে।'

'শ্বশুরবাড়িতে কে আছে ?'

'কেউ না।'

'শ্বশুর-শাশুড়ি ?'

'মারা গেছেন।'

'আপনার বিয়ে হয়েছিল কোথা থেকে ?'

'নবদ্বীপ থেকে।'

'নবদ্বীপে আপনার খুড়তুত জাঠতুত ভায়েরা আছে, তাদের সংসারে গিয়ে থাকেন না কেন ?'

উত্তর নাই।

'তাদের আপনি বিশ্বাস করেন না ?'

'না।'

'তারাশঙ্করবাবুকেই সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করেন ?'

'হাঁ।'

ব্যোমকেশ ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর আবার অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল—

'আপনার বাবার মৃত্যুর পর গয়ায় পিণ্ড দেবার প্রস্তাব বরদাবাবু করেছিলেন। রাজী হননি কেন ?'

নিরুত্তর।

'ওসব আপনি বিশ্বাস করেন না ?'

তথাপি উত্তর নাই।

'যাক। এখন বলুন দেখি, যে-রাত্রে আপনার বাবা মারা যান, সে-রাত্রে আপনি কোনো শব্দ শুনেছিলেন ?'

'না।

'হীরা জহরত তাঁর শোবার ঘরে থাকত ?'

'হাঁ।'

'কোথায় থাকত ?'

'জানি না।'

'আন্দাজ করতেও পারেন না ?'

'না।'

'তাঁর সঙ্গে কোনো লোকের শত্রুতা ছিল ?'

'জানি না।'

'আপনার বাবা আপনার সঙ্গে ব্যবসার কথা কখনো কইতেন না ?'

'না।'

'রাত্রে আপনার শোবার ব্যবস্থা ছিল নীচের তলায়। কোন্ ঘরে শুতেন ?'

'বাবার ঘরের নীচের ঘরে।'

'তাঁর মৃত্যুর রাত্রে আপনার নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত হয়নি ?'

'না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।'

অতঃপর তারাশঙ্করবাবুর বাড়িতে আমাদের প্রয়োজন শেষ হইয়া গেল। আমরা উঠিলাম। বিদায়কালে তারাশঙ্করবাবু সদয়কণ্ঠে ব্যোমকেশকে বলিলেন, 'আমার কথা যে আপনি যাচাই করে নিয়েছেন এতে আমি খুশিই হয়েছি। আপনি হুঁশিয়ার লোক ; হয়তো বৈকুণ্ঠের খুনের কিনারা করতে পারবেন। যদি কখনো সাহায্য দরকার হয় আমার কাছে আসবেন। আর মনে রাখবেন, গচ্ছিত টাকার কথা যেন চাউর না হয়। চাউর করলে বাধ্য হয়ে আমাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে।'

রাস্তায় বাহির হইয়া কেল্লার দিকে ফিরিয়া চলিলাম। দিবালোক তখন মুদিত হইয়া আসিতেছে ; পশ্চিম আকাশ সিন্দূর চিহ্নিত আরশির মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তাহার মাঝখানে বাঁকা চাঁদের রেখা—যেন প্রসাধন-রতা রূপসীর হাসির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে !

ব্যোমকেশের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই, সে বুকে ঘাড় গুঁজিয়া চলিয়াছে। পাঁচ মিনিট নীরবে চলিবার পর আমি তাহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যোমকেশ, তারাশঙ্করবাবুকে কি রকম বুঝলে ?'

ব্যোমকেশ আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিল ; বলিল, 'ভারি বিচক্ষণ লোক।'

৪

কেল্লায় প্রবেশ করিয়া বাঁহাতি যে রাস্তাটা গঙ্গার দিকে গিয়াছে, তাহারি শেষ প্রান্তে

কৈলাসবাবুর বাড়ি। স্থানটি বেশ নির্জন। অনুচ্চ প্রাচীর-ঘেরা বাগানের চারিদিকে কয়েকটি ঝাউ ও দেবদারু গাছ, মাঝখানে ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ি। বৈকুণ্ঠবাবুকে যে ব্যক্তি খুন করিয়াছিল, বাড়িটির অবস্থিতি দেখিয়া মনে হয় ধরা পড়িবার ভয়ে তাহাকে বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় নাই।

বরদাবাবু আমাদের লইয়া একেবারে উপরতলায় কৈলাসবাবুর শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। ঘরটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ ; মধ্যস্থলে একটি লোহার খাট বিরাজ করিতেছে এবং সেই খাটের উপর পিঠে বালিশ দিয়া কৈলাসবাবু বসিয়া আছেন।

একজন ভৃত্য কয়েকটা চেয়ার আনিয়া ঘরের আলো জ্বালিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। ছাদ হইতে ঝুলানো কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় প্রায়ান্ধকার ঘরের ধূসর অবসন্নতা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। মুঙ্গেরে তখনো বিদ্যুৎ-বিভার আবির্ভাব হয় নাই।

কৈলাসবাবুর চেহারা দেখিয়া তিনি রুগ্ন এ বিষয়ে সংশয় থাকে না। তাঁহার রং বেশ ফর্সা, কিন্তু রোগের প্রভাবে মোমের মত একটা অর্ধ-স্বচ্ছ পাণ্ডুরতা মুখের বর্ণকে যেন নিষ্প্রাণ করিয়া দিয়াছে। মুখে সামান্য ছাঁটা দাড়ি আছে, তাহাতে মুখের শীর্ণতা যেন আরো পরিস্ফুট। চোখের দৃষ্টিতে অশান্ত অনুযোগ উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, কণ্ঠস্বরও দীর্ঘ রোগভোগের ফলে একটা অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে।

পরিচয় আদান-প্রদান শেষ হইলে আমরা উপবেশন করিলাম ; ব্যোমকেশ জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ঐ একটিমাত্র জানালা—পশ্চিমমুখী ; নীচে বাগান। দেবদারু গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূরে গঙ্গার স্রোত-রেখা দেখা যায়। এদিকে আর লোকালয় নাই, বাগানের পাঁচিল পার হইয়াই গঙ্গার চড়া আরম্ভ হইয়াছে।

ব্যোমকেশ বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া বলিল, 'জানালাটা মাটি থেকে প্রায় পনের হাত উঁচু। আশ্চর্য বটে !' তারপর ঘরের চারিপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি হানিতে হানিতে চেয়ারে আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ কৈলাসবাবুর সঙ্গে ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা হইল ; নূতন কিছুই প্রকাশ পাইল না। কিন্তু দেখিলাম কৈলাসবাবু লোকটি অসাধারণ একগুঁয়ে। ভৌতিক কাণ্ড তিনি অবিশ্বাস করেন না ; বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছেন তাহাও তাঁহার কথার ভাবে প্রকাশ পাইল। কিন্তু তবু কোনোক্রমেই এই হানাবাড়ি পরিত্যাগ করিবেন না। ডাক্তার তাঁহার হৃদযন্ত্রের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবাড়ি ত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার সহচরেরাও ভীত হইয়া মিনতি করিতেছে, কিন্তু তিনি রুগ্ন শিশুর মত অহেতুক জিদ ধরিয়া এই বাড়ি কামড়াইয়া পড়িয়া আছেন। কিছুতেই এখান হইতে নড়িবেন না।

হঠাৎ কৈলাসবাবু একটা আশ্চর্য কথা বলিয়া আমাদের চমকিত করিয়া দিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ খিট্‌খিটে স্বরে বলিলেন, 'সবাই আমাকে এবাড়ি ছেড়ে দিতে বলছে। আরে বাপু, বাড়ি ছাড়লে কি হবে—আমি যেখানে যাব, সেখানেই যে এই ব্যাপার হবে। এসব অলৌকিক কাণ্ড কেন ঘটছে তা তো আর কেউ জানে না ; সে কেবল আমি জানি। আপনারা ভাবছেন, কোথাকার কোন্ বৈকুণ্ঠবাবুর প্রেতাত্মা এখানে আনাগোনা করছে। মোটেই তা নয়—এর ভেতর অন্য কথা আছে।'

উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি রকম ?'

'বৈকুণ্ঠ-ফৈকুণ্ঠ সব বাজে কথা—এ হচ্ছে পিশাচ। আমার গুণধর পুত্রের কীর্তি।'

'সে কি !'

কৈলাসবাবুর মোমের মত গণ্ডে ঈষৎ রক্ত সঞ্চার হইল, তিনি সোজা হইয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, 'হ্যাঁ, লক্ষ্মীছাড়া একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। ভদ্রলোকের ছেলে, জমিদারের একমাত্র বংশধর—পিশাচসিদ্ধ হতে চায় ! শুনেছেন কখনো ? হতভাগাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছি, তাই আমার ওপর রিষ। তার একটা মহাপাষণ্ড গুরু জুটেছে, শুনেছি, শ্মশানে বসে বসে মড়ার খুলিতে করে মদ খায়। একদিন আমার ভদ্রাসনে চড়াও হয়েছিল ; আমি দরোয়ান দিয়ে চাব্‌কে বার করে দিয়েছিলুম। তাই দু'জনে মিলে ষড় করে আমার পিছনে পিশাচ লেলিয়ে

দিয়েছে।'

'কিন্তু—'

'কুলাঙ্গার সন্তান—তার মতলবটা বুঝতে পারছেন না ? আমার বুকের ব্যামো আছে, পিশাচ দেখে আমি যদি হার্টফেল করে মরি—ব্যস্। মাণিক আমার নিষ্কন্টকে প্রেতসিদ্ধ গুরুকে নিয়ে বিষয় ভোগ করবেন।' কৈলাসবাবু তিক্তকণ্ঠে হাসিলেন ; তারপর সহসা জানালার দিকে তাকাইয়া বিস্ফারিত চক্ষে বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ—ঐ—'

আমরা জানালার দিকে পিছন ফিরিয়া কৈলাসবাবুর কথা শুনিতেছিলাম, বিদ্যুদ্বেগে জানালার দিকে ফিরিলাম। যাহা দেখিলাম—তাহাতে বুকের রক্ত হিম হইয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। বাহিরে তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে ; ঘরের অনুজ্জ্বল কেরোসিন ল্যাম্পের আলোকে দেখিলাম, জানালার কালো ফ্রেমে আঁটা একটা বীভৎস মুখ। অস্থিসার মুখের বর্ণ পাণ্ডুপীত, অধরোষ্ঠের ফাঁকে কয়েকটা পীতবর্ণ দাঁত বাহির হইয়া আছে ; কালিমা-বেষ্টিত চক্ষুকোটর হইতে দুইটা ক্ষুধিত হিংস্র চোখের পৈশাচিক দৃষ্টি যেন ঘরের অভ্যন্তরটাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে।

মুহূর্তের জন্য নিশ্চল পক্ষাহত হইয়া গেলাম। তারপর ব্যোমকেশ দুই লাফে জানালার সম্মুখীন হইল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর মুখ তখন অদৃশ্য হইয়াছে।

আমিও ছুটিয়া ব্যোমকেশের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। বাহিরের অন্ধকারে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া মনে হইল যেন দেবদারু গাছের ঘন ছায়ার ভিতর দিয়া একটা শীর্ণ অতি দীর্ঘ মূর্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ব্যোমকেশ দেশলাই জ্বালিয়া জানালার বাহিরে ধরিল। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম নীচে মই বা তজ্জাতীয় আরোহণী কিছুই নাই। এমন কি, মানুষ দাঁড়াইতে পারে এমন কার্ণিশ পর্যন্ত দেয়ালে নাই।

ব্যোমকেশের কাঠি নিঃশেষ হইয়া নিবিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল।

বরদাবাবু বসিয়াছিলেন, উঠেন নাই। এখন ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'দেখলেন ?'

'দেখলুম।'

বরদাবাবু গম্ভীরভাবে একটু হাসিলেন, তাঁহার চোখে গোপন বিজয়গর্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রকম মনে হল ?'

কৈলাসবাবু জবাব দিলেন। তিনি বালিশে ঠেস দিয়া প্রায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন, হতাশামিশ্রিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'কি আর মনে হবে !—এ পিশাচ। আমাকে না নিয়ে ছাড়বে না। ব্যোমকেশবাবু, আমার যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। পিশাচের হাত থেকে কেউ কখনো উদ্ধার পেয়েছে শুনেছেন কি ?' তাঁহার ভয়বিশীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া আমার মনে হইল, সত্যিই ইঁহার সময় আসন্ন হইয়াছে, দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্রের উপর এরূপ স্নায়বিক ধাক্কা সহ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, 'দেখুন, ভয়টাই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু—প্রেত-পিশাচ নয়। আমি বলি, বাড়িটা না হয় ছেড়েই দিন না।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আমিও তাই বলি। আমার বিশ্বাস, এ বাড়িতে দোষ লেগেছে—পিশাচ-টিশাচ নয়। বৈকুণ্ঠবাবুর অপঘাত মৃত্যুর পর থেকে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পিশাচই হোক আর বৈকুণ্ঠবাবুই হোন্—মোট কথা, কৈলাসবাবুর শরীরের যে রকম অবস্থা তাতে হঠাৎ ভয় পাওয়া ওঁর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। অতএব এ বাড়ি ছাড়াই কর্তব্য।'

'আমি বাড়ি ছাড়ব না।' কৈলাসবাবুর মুখে একটা অন্ধ একগুঁয়েমি দেখা দিল—'কেন বাড়ি ছাড়ব ? কি করেছি আমি যে অপরাধীর মত পালিয়ে বেড়াব ? আমার নিজের ছেলে যদি আমার মৃত্যু চায়—বেশ, আমি মরব। পিতৃহত্যার পাপকে যে কুসন্তানের ভয় নেই, তার বাপ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।'

অভিমান ও জিদের বিরুদ্ধে তর্ক করা বৃথা। রাত্রি হইয়াছিল। আমরা উঠিলাম। পরদিন প্রাতে আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া নীচে নামিয়া গেলাম।

পথে কোনো কথা হইল না। বরদাবাবু দু'-একবার কথা বলিবার উদ্যোগ করিলেন কিন্তু ব্যোমকেশ তাহা শুনিতে পাইল না। বরদাবাবু আমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

শশাঙ্কবাবু ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরিয়াছিলেন, আমরা বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেই বলিলেন, 'কি হে, কি হল ?'

ব্যোমকেশ একটা আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িয়া ঊর্ধ্বমুখে বলিল, 'প্রেতের আবির্ভাব হল।' তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বলিল, 'কিন্তু বরদাবাবুর প্রেত এবং কৈলাসবাবুর পিশাচ মিলে ব্যাপারটা ক্রমেই বড় জটিল করে তুলেছে।'

পরদিন রবিবার ছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্যোমকেশ শশাঙ্কবাবুকে বলিল, 'চল, কৈলাসবাবুর বাড়িটা ঘুরে আসা যাক।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'আবার ভূত দেখতে চাও নাকি ? কিন্তু দিনের বেলা গিয়ে লাভ কি ? রাত্রি ছাড়া তো অশরীরীর দর্শন পাওয়া যায় না।'

'কিন্তু যা অশরীরী নয়—অর্থাৎ বস্তু—তার তো দর্শন পাওয়া যেতে পারে।'

'বেশ, চল।'

সাতটা বাজিতে না বাজিতে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। কৈলাসবাবুর বাড়ি তখনো সম্পূর্ণ জাগে নাই। একটা চাকর নিদ্রালুভাবে নীচের বারান্দা ঝাঁট দিতেছে ; উপরে গৃহস্বামীর কক্ষে দরজা জানালা বন্ধ। ব্যোমকেশ বলিল, 'ক্ষতি নেই। বাগানটা ততক্ষণ ঘুরে ফিরে দেখি এস।'

শিশির ভেজা ঘাসে সমস্ত বাগানটি আস্তীর্ণ। সোনালী রৌদ্রে দেওদারের চুনট-করা পাতা জরির মত ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে শারদ প্রাতের অপূর্ব পরিচ্ছন্নতা। আমরা ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

বাগানটি পরিসরে বিঘা চারেকের কম হইবে না কিন্তু ফুলবাগান বলিয়া কিছু নাই। এখানে সেখানে গোটা-কতক দোপাটি ও করবীর ঝাড় নিতান্ত অনাদৃতভাবে ফুল ফুটাইয়া রহিয়াছে। মালী নাই, বোধকরি বৈকুণ্ঠবাবুর আমলেও ছিল না। আগাছার জঙ্গল বৃদ্ধি পাইলে সম্ভবত বাড়ির চাকরেরাই কাটিয়া ফেলিয়া দেয়।

তাহার পরিচয় বাগানের পশ্চিমদিকে এক প্রান্তে পাইলাম। দেয়ালের কোণ ঘেঁষিয়া আবর্জনা জমা হইয়া আছে। উনানের ছাই, কাঠ-কুটা, ছেঁড়া কাগজ, বাড়ির জঞ্জাল—সমস্তই এইখানে ফেলা হয়। বহুকালের সঞ্চিত জঞ্জাল রৌদ্রে বৃষ্টিতে জমাট বাঁধিয়া স্থানটাকে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে।

এই আবর্জনার গাদার উপর উঠিয়া ব্যোমকেশ অনুসন্ধিৎসুভাবে এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল। জুতা দিয়া ছাই-মাটি সরাইয়া দেখিতে লাগিল। একবার একটা পুরানো টিনের কৌটা তুলিয়া লইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া আবার ফেলিয়া দিল। শশাঙ্কবাবু তাহার রকম দেখিয়া বলিলেন, 'কি হে, ছাইগাদার মধ্যে কি খুঁজছ ?'

ব্যোমকেশ ছাইগাদা হইতে চোখ না তুলিয়াই বলিল, 'আমাদের প্রাচীন কবি বলেছেন—যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার—এটা কি ?'

একটা চিড়ধরা পরিত্যক্ত লণ্ঠনের চিম্‌নি পড়িয়াছিল ; সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ তাহার খোলের ভিতর দেখিতে লাগিল। তারপর সন্তর্পণে তাহার ভিতর আঙুল ঢুকাইয়া একখণ্ড জীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া আনিল। সম্ভবত বায়ুতাড়িত হইয়া কাগজের টুকরাটা চিম্‌নির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল ; তারপর দীর্ঘকাল সেইখানে রহিয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ চিম্‌নি ফেলিয়া দিয়া কাগজখানা নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিল। আমিও উৎসুক হইয়া তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম।

কাগজখানা একটা ছাপা ইস্তাহারের অর্ধাংশ ; তাহাতে কয়েকটা অস্পষ্ট জন্তু জানোয়ারের ছবি

রহিয়াছে মনে হইল। জল-বৃষ্টিতে কাগজের রং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ছাপার কালিও এমন অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে পাঠোদ্ধার দুঃসাধ্য।

শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দেখছ হে? ওতে কি আছে?'

'কিছু না।' ব্যোমকেশ কাগজখানা উল্টাইয়া তারপর চোখের কাছে আনিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, 'হাতের লেখা রয়েছে।—দ্যাখ তো পড়তে পার কিনা।' বলিয়া কাগজ আমার হাতে দিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলাম। হাতের লেখা যে আছে তাহা প্রথমটা ধরাই যায় না। কালির চিহ্ন বিন্দুমাত্র নাই, কেবল মাঝে মাঝে কলমের আঁচড়ের দাগ দেখিয়া দু'একটা শব্দ অনুমান করা যায়—

বিপদে.........হাতে টাক...
বাবা.........নচেৎ........মরীয়া
...তোমার স্বাথী......

ব্যোমকেশকে আমার পাঠ জানাইলাম। সে বলিল, 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কাগজটা থাক।' বলিয়া ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিল।

আমি বলিলাম, 'লেখক বোধ হয় খুব শিক্ষিত নয়—বানান ভুল করেছে। 'স্বাথী' লিখেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শব্দটা 'স্বাথী' নাও হতে পারে।'

শশাঙ্কবাবু ঈষৎ অধীরকণ্ঠে বলিলেন, 'চল চল, আঁস্তাকুড় ঘেঁটে লাভ নেই। এতক্ষণে বোধহয় কৈলাসবাবু উঠেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, ঐ যে তাঁর ভৌতিক জানালা খোলা দেখছি। চল।'

৫

বাড়ির নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, জানালা দিয়া কৈলাসবাবু মুখ বাড়াইয়া আছেন। শীর্ণ ফ্যাকাসে মুখ—প্রাতঃকাল না হইয়া রাত্রি হইলে তাঁহাকে সহসা ঐ জানালার সম্মুখে দেখিয়া প্রেত বলিয়া বিশ্বাস করিতে কাহারো সংশয় হইত না।

তিনি আমাদের উপরে আহ্বান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার জানালার নীচের মাটির উপর ক্ষিপ্রদৃষ্টি বুলাইয়া লইল। সবুজ ঘাসের পুরু গালিচা বাড়ির দেয়াল পর্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে; তাহার উপর কোনো প্রকার চিহ্ন নাই।

উপরে কৈলাসবাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরে চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত। চা যদিও আমাদের একদফা হইয়া গিয়াছিল, তবু দ্বিতীয়বার সেবন করিতে আপত্তি হইল না।

চায়ের সহিত নানাবিধ আলোচনা চলিতে লাগিল। স্থানীয় জল-হাওয়ার ক্রমিক অধঃপতন, ডাক্তারদের চিকিৎসা-প্রণালীর ক্রমিক উর্ধ্বগতি, টোটকা ঔষধের গুণ, মারণ-উচাটন, ভূতের রোজা ইত্যাদি কোনো প্রসঙ্গই বাদ পড়িল না। ব্যোমকেশ তাহার মাঝখানে একবার জিজ্ঞাসা করিল, 'রাত্রে আপনি জানালা বন্ধ করে শুচ্ছেন তো?'

কৈলাসবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ—তিনি দেখা দিতে আরম্ভ করা অবধি জানালা দরজা বন্ধ করেই শুতে হচ্ছে—যদিও সেটা ডাক্তারের বারণ। ডাক্তার চান আমি অপর্যাপ্ত বায়ু সেবন করি—কিন্তু আমার যে হয়েছে উভয় সঙ্কট। কি করি বলুন?'

'জানালা বন্ধ করে কোন ফল পেয়েছেন কি?'

'বড় বেশি নয়। তবে দর্শনটা পাওয়া যায় না, এই পর্যন্ত। নিশুতি রাত্রে যখন তিনি আসেন, জানালায় সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে যান—একলা শুতে পারি না; রাত্রে একজন চাকর ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে শোয়।'

চা সমাপনান্তে ব্যোমকেশ উঠিয়া বলিল, 'এইবার আমি ঘরটা ভাল করে দেখব ! শশাঙ্ক, কিছু মনে কোরো না ; তোমাদের—অর্থাৎ পুলিসের—কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমি কটাক্ষ করছি না ; কিন্তু মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। যদি তোমাদের কিছু বাদ পড়ে থাকে তাই আর একবার দেখে নিচ্ছি।'

শশাঙ্কবাবু একটা বাঁকা-সুরে বলিলেন, 'তা বেশ—নাও। কিন্তু এতদিন পরে যদি বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারীর কোনো চিহ্ন বার করতে পার, তাহলে বুঝব তুমি যাদুকর।'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'তাই বুঝো। কিন্তু সে যাক। বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর দিন এ ঘরে কোন আসবাবই ছিল না ?'

'বলেছি তো মাটিতে-পাতা বিছানা, জলের ঘড়া আর পানের বাটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। —হ্যাঁ, একটা তামার কানখুস্কিও পাওয়া গিয়েছিল।'

'বেশ। আপনারা তাহলে গল্প করুন কৈলাসবাবু, আমি আপনাদের কোন বিঘ্ন করব না। কেবল ঘরময় ঘুরে বেড়াব মাত্র।'

অতঃপর ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। কখনো উর্ধ্বমুখে ছাদের দিকে তাকাইয়া, কখনো হেঁটমুখে মেঝের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চিন্তাক্লান্ত মুখে নিঃশব্দে ঘুরিতে লাগিল। একবার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঠ শার্সি প্রভৃতি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল ; দরজার হুড়কা ও ছিটকিনি লাগাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। তারপর আবার পরিক্রমণ শুরু করিল।

কৈলাস ও শশাঙ্কবাবু স-কৌতূহলে তাহার গতিবিধি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তখন জোর করিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিলাম। কারণ ব্যোমকেশের মন যতই বহির্নিরপেক্ষ হোক, তিন জোড়া কুতূহলী চক্ষু অনুক্ষণ তাহার অনুসরণ করিতে থাকিলে সে যে বিক্ষিপ্তচিত্ত ও আত্মসচেতন হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, যাহোক একটা কথা আরম্ভ করিয়া দিয়া ইহাদের দুইজনের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। তবু, নানা অসংলগ্ন চর্চার মধ্যেও আমাদের মন ও চক্ষু তাহার দিকেই পড়িয়া রহিল।

পনেরো মিনিট এইভাবে কাটিল। তারপর শশাঙ্কবাবুর একটা পুলিস-ঘটিত কাহিনী শুনিতে শুনিতে অলক্ষিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, ব্যোমকেশের দিকে নজর ছিল না ; হঠাৎ ছোট্ট একটা হাসির শব্দে সচকিতে ঘাড় ফিরাইলাম। দেখিলাম, ব্যোমকেশ দক্ষিণ দিকের দেয়ালের খুব কাছে দাঁড়াইয়া দেয়ালের দিকে তাকাইয়া আছে ও মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'কি হল আবার ! হাসছ যে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাদু। দেখে যাও। এটা নিশ্চয় তোমরা আগে দ্যাখনি।' বলিয়া দেয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

আমরা সাগ্রহে উঠিয়া গেলাম। প্রথমটা চুনকাম করা দেয়ালের গায়ে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তারপর ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, মেঝে হইতে আন্দাজ পাঁচ ফুট উচ্চে সাদা চুনের উপর পরিষ্কার অঙ্গুষ্ঠের ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে। যেন কাঁচা চুনের উপর আঙুল টিপিয়া কেহ চিহ্নটি রাখিয়া গিয়াছে।

শশাঙ্কবাবু ভ্রূকুটি সহকারে চিহ্নটি দেখিয়া বলিলেন, 'একটা বুড়ো-আঙুলের ছাপ দেখছি। এর অর্থ কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অর্থ—মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। হত্যাকারীর এই পরিচয় চিহ্নটি তোমরা দেখতে পাওনি।'

বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'হত্যাকারীর ! এ আঙুলের দাগ যে হত্যাকারীর তা তুমি কি করে বুঝলে ? আমরা আগে ওটা লক্ষ্য করিনি বটে কিন্তু তাই বলে ওটা হত্যাকারীর আঙুলের দাগ যে কেন হবে—তাও তো বুঝতে পারছি না। যে রাজমিস্ত্রি ঘর চুনকাম করেছিল তার হতে পারে ; অন্য যে-কোনো লোকের হতে পারে।'

'একেবারে অসম্ভব নয়। তবে কথা হচ্ছে, রাজমিস্ত্রি দেয়ালে নিজের আঙুলের টিপ রেখে

যাবে কেন ?'

'তা যদি বল, হত্যাকারীই বা রেখে যাবে কেন ?'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার শশাঙ্কবাবুর দিকে তাকাইল ; তারপর বলিল, 'তাও তো বটে। তাহলে তোমার মতে ওটা কিছুই নয় ?'

'আমি বলতে চাই, ওটা যে খুব জরুরী তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।'

ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার যুক্তি অকাট্য। প্রমাণের অভাবে কোন জিনিসকেই জরুরী বলে স্বীকার করা যেতে পারে না।—পকেটে ছুরি আছে ? কিম্বা কানখুস্কি ?'

'ছুরি আছে। কেন ?'

অপ্রসন্ন মুখে শশাঙ্কবাবু ছুরি বাহির করিয়া দিলেন। ব্যোমকেশের আবিষ্কারে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই, তাই বোধ হয় সেটাকে তুচ্ছ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁহার মনোভাব নেহাৎ অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল না। দেয়ালের গায়ে একটা আঙুলের চিহ্ন—কবে কাহার দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে কিছুই জানা নাই—হত্যাকাণ্ডের রহস্য-সমাধানে ইহার মূল্য কি ? এবং যদি উহা হত্যাকারীরই হয় তাহা হইলেই বা লাভ কি হইবে ? কে হত্যাকারী তাহাই যখন জানা নাই তখন এই আঙুলের টিপ কোন কাজে লাগিবে তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না।

ব্যোমকেশ কিন্তু ছুরি দিয়া চিহ্নটির চারিধারে দাগ কাটিতে আরম্ভ করিল। অতি সন্তর্পণে চুন-বালি আল্‌গা করিয়া ছুরির নখ দিয়া একটু চাড় দিতেই টিপ-চিহ্ন সমেত খানিকটা প্ল্যাস্টার বাহির হইয়া আসিল। ব্যোমকেশ সেটি সযত্নে রুমালে জড়াইয়া পকেটে রাখিয়া কৈলাসবাবুকে বলিল—'আপনার ঘরের দেয়াল কুশ্রী করে দিলাম। দয়া করে একটু চুন দিয়ে গর্তটা ভরাট করিয়ে নেবেন।' তারপর শশাঙ্কবাবুকে বলিল, 'চল শশাঙ্ক, এখানকার কাজ আপাতত আমাদের শেষ হয়েছে। এদিকে দেখছি ন'টা বাজে ; কৈলাসবাবুকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।—ভাল কথা, কৈলাসবাবু, আপনি বাড়ি থেকে নিয়মিত চিঠিপত্র পান তো ?'

কৈলাসবাবু বলিলেন, 'আমাকে চিঠি দেবে কে ? একমাত্র ছেলে—তার গুণের কথা তো শুনেছেন ; চিঠি দেবার মত আত্মীয় আমার কেউ নেই।'

প্রফুল্লস্বরে ব্যোমকেশ বলিল, 'বড়ই দুঃখের বিষয়। আচ্ছা, আজ তাহলে চললুম ; মাঝে মাঝে আপনাকে বিরক্ত করতে আসব। আর দেখুন, এটার কথা কাউকে বলে দরকার নেই।' বলিয়া দেয়ালের ছিদ্রের দিকে নির্দেশ করিল।

কৈলাসবাবু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। রৌদ্র তখন কড়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিলাম।

হঠাৎ শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যোমকেশ, ওই আঙুলের দাগটা সম্বন্ধে তোমার সত্যিকার ধারণা কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার ধারণা তো বলেছি, ওটা হত্যাকারীর আঙুলের দাগ।'

অধীরভাবে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'কিন্তু এ যে তোমার জবরদস্তি। হত্যাকারী কে তার নামগন্ধও জানা নেই—অথচ তুমি বলে বসলে ওটা হত্যাকারীর। একটা সঙ্গত কারণ দেখান চাই তো।'

'কি রকম সঙ্গত কারণ তুমি দেখতে চাও ?'

শশাঙ্কবাবুর কণ্ঠের বিরক্তি আর চাপা রহিল না, তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি কিছুই দেখতে চাই না। আমার মনে হয় তুমি নিছক ছেলেমানুষী করছ। অবশ্য তোমার দোষ নেই ; তুমি ভাবছ বাংলা দেশে যে প্রথায় অনুসন্ধান চলে এদেশেও বুঝি তাই চলবে। সেটা তোমার ভুল। ও ধরনের ডিটেক্‌টিভগিরিতে এখানে কোন কাজ হবে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাই, আমার ডিটেক্‌টিভ বিদ্যে কাজে লাগাবার জন্য তো আমি তোমার কাছে আসিনি, বরং ওটাকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যই এসেছি। তুমি যদি মনে কর এ ব্যাপারে

আমার হস্তক্ষেপ করবার দরকার নেই তাহলে তো আমি নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে যাই।'

শশাঙ্কবাবু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'না, আমি তা বলছি না। আমার বলার উদ্দেশ্য, ওপথে চললে কস্মিন কালেও কিছু করতে পারবে না—এ ব্যাপার অত সহজ নয়।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'ছ'মাস ধরে আমরা যে-ব্যাপারের একটা হদিস বার করতে পারলুম না, তুমি একটা আঙুলের টিপ দেখেই যদি মনে কর তার সমাধান করে ফেলেছ, তাহলে বুঝতে হবে এ কেসের গুরুত্ব তুমি এখনো ঠিক ধরতে পারনি। আঙুলের দাগ কিম্বা আঁস্তাকুড়ে কুড়িয়ে পাওয়া ছেঁড়া কাগজে দুটো হাতের অক্ষর—এসব দিয়ে লোমহর্ষণ উপন্যাস লেখা চলে, পুলিসের কাজ চলে না। তাই বলছি, ওসব আঙুলের টিপ-ফিপ ছেড়ে—'

'থামো।'

পাশ দিয়া একখানা ফিটন গাড়ি যাইতেছিল, তাহার আরোহী আমাদের দেখিয়া গাড়ি থামাইলেন ; গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ব্যোমকেশবাবু, কদ্দূর ?'

তারাশঙ্করবাবু গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ি ফিরিতেছেন ; কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, গায়ে নামাবলী, মুখে একটা ব্যঙ্গ-হাস্য।

ব্যোমকেশ তাঁহার প্রশ্নে ভালমানুষের মত প্রতিপ্রশ্ন করিল—'কিসের ?'

'কিসের আবার—বৈকুণ্ঠের খুনের। কিছু পেলেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করছেন কেন ? আমার তো কিছু জানবার কথা নয়। বরং শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করুন।'

তারাশঙ্করবাবু বাম ভ্রূ ঈষৎ তুলিয়া বলিলেন, 'কিন্তু শুনেছিলুম যেন, আপনিই নূতন করে এ কেসের তদন্ত করবার ভার পেয়েছেন। তা সে যা হোক, শশাঙ্কবাবু, খবর কি ? নূতন কিছু আবিষ্কার হল ?'

শশাঙ্কবাবু নীরসকণ্ঠে বলিলেন, 'আবিষ্কার হলেও পুলিসের গোপন কথা সাধারণে প্রকাশ করবার আমার অধিকার নেই। আর, ওটা আপনি ভুল শুনেছেন—ব্যোমকেশ আমার বন্ধু, মুঙ্গেরে বেড়াতে এসেছে, তদন্তের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই।'

পুলিসের সহিত উকিলের প্রণয় এ জগতে বড়ই দুর্লভ। দেখিলাম, তারাশঙ্করবাবু ও শশাঙ্কবাবুর মধ্যে ভালবাসা নাই। তারাশঙ্করবাবু কণ্ঠস্বরে অনেকখানি মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, 'বেশ বেশ। তাহলে কিছুই পারেননি। আপনাদের দ্বারা যে এর বেশি হবে না তা আগেই আন্দাজ করেছিলুম।—হাঁকো।'

তারাশঙ্করবাবুর ফিটন বাহির হইয়া গেল।

শশাঙ্কবাবু কটমট চক্ষে সেইদিকে তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে যাহা বলিলেন তাহা প্রিয়সম্ভাষণ নয়। ভিতরে ভিতরে সকলেরই মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। পথে আর কোন কথা হইল না, নীরবে তিনজনে বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম।

৬

দুপুরবেলাটা ব্যোমকেশ অলসভাবে কাটাইয়া দিল। একবার ছেঁড়া কাগজখানা ও আঙুলের টিপ বাহির করিয়া অবহেলাভরে দেখিল ; আবার সরাইয়া রাখিয়া দিল। তাহার মনের ক্রিয়া ঠিক বুঝিলাম না ; কিন্তু বোধ হইল, এই হত্যার ব্যাপারে এতাবৎকাল সে যেটুকু আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল তাহাও যেন নিবিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্নে বরদাবাবু আসিলেন। বলিলেন, 'এখানে আমাদের বাঙালীদের একটা ক্লাব আছে, চলুন আজ আপনাদের সেখানে নিয়ে যাই।'

'চলুন।'

দুইদিন এখানে আসিয়াছি কিন্তু এখনো স্থানীয় দ্রষ্টব্য বস্তু কিছুই দেখি নাই ; তাই বরদাবাবু আমাদের কষ্টহারিণীর ঘাট, পীর-শানফার কবর ইত্যাদি কয়েকটা স্থান ঘুরাইয়া দেখাইলেন। তারপর সূর্যাস্ত হইলে তাঁহাদের ক্লাবে লইয়া চলিলেন।

কেল্লার বাহিরে ক্লাব। পথে যাইতে দেখিলাম—একটা মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড তাঁবু পড়িয়াছে ; তাহার চারিদিকে মানুষের ভিড়—তাঁবুর ভিতর হইতে উজ্জ্বল আলো এবং ইংরাজি বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওটা কি ?'

'একটা সার্কাস পার্টি এসেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে সার্কাস পার্টিও আসে নাকি ?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আসে বৈকি। বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার করে নিয়ে যায়। এই তো গত বছর একদল এসেছিল—না, গত বছর নয়, তার আগের বছর।'

'এরা কতদিন হল এসেছে ?'

'কাল শনিবার ছিল, কাল থেকে এরা খেলা দেখাতে শুরু করেছে।'

প্রসঙ্গত শহরের আমোদ-প্রমোদের অভাব সম্বন্ধে বরদাবাবু অভিযোগ করিলেন। মুষ্টিমেয় বাঙালীর মধ্যে চিরন্তন দলাদলি, তাই থিয়েটারের একটা সখের দল থাকা সত্ত্বেও অভিনয় বড় একটা ঘটিয়া ওঠে না ; বাহির হইতে এক-আধটা কার্ণিভালের দল যাহা আসে তাহাই ভরসা। শুনিয়া খুব বেশি বিস্মিত হইলাম না। বাঙালীর বাস্তব জীবনে যে জাঁকজমক ও বৈচিত্র্যের অসদ্ভাব, তাহা সে থিয়েটারের রাজা বা সেনাপতি সাজিয়া মিটাইয়া লইতে চায়। তাই যেখানে দুইজন বাঙালী আছে সেইখানেই থিয়েটার ক্লাব থাকিতে বাধ্য এবং যেখানে থিয়েটার ক্লাব আছে সেখানে দলাদলি অবশ্যম্ভাবী। আমোদ-প্রমোদের জন্য চালানি মালের উপর নির্ভর করিতে হইবে ইহার আর বিচিত্র কি ?

শুনিতে শুনিতে ক্লাবে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ক্লাবের প্রবেশপথটি সঙ্কীর্ণ হইলেও ভিতরে বেশ সুপ্রসর। খানিকটা খোলা জায়গার উপর কয়েকখানি ঘর। আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি ঘরে ফরাস পাতা, তাহার উপর বসিয়া কয়েকজন সভ্য ব্রিজ খেলিতেছেন ; প্রতি হাত খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিতেছেন, আবার খেলা আরম্ভ হইবামাত্র সকলে গম্ভীর ও স্বল্পবাক্ হইয়া পড়িতেছেন। ক্রীড়াচক্রের বাহিরে তাঁহাদের চিত্ত কোন অবস্থাতেই সঞ্চারিত হইতেছে না ; আমরা দুইজন আগন্তুক আসিলাম তাহা কেহ লক্ষ্যই করিলেন না। ঘরের এক কোণে দুইটি সভ্য দাবার ছক লইয়া তুরীয় সমাধির অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং বাজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের কঠোর তপস্যা অপ্সরার ঝাঁক আসিয়াও ভাঙিতে পারিবে না।

পাশের ঘর হইতে কয়েকজন উত্তেজিত সভ্যের গলার আওয়াজ আসিতেছিল, বরদাবাবু আমাদের সেই ঘরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, একটি টেবিল বেষ্টন করিয়া কয়েকজন যুবক বসিয়া আছেন—তন্মধ্যে আমাদের পূর্বপরিচিত শৈলেনবাবুও বর্তমান। তাঁহাকে বাকি সকলে সপ্তরথীর মত ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন এবং ভূতযোনি সম্বন্ধে নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ ও সন্দেহমূলক বাক্যজালে বিদ্ধ করিয়া প্রায় ধরাশায়ী করিবার উপক্রম করিয়াছেন।

বরদাবাবুকে দেখিয়া শৈলেনবাবুর চোখে পরিত্রাণের আশা ফুটিয়া উঠিল, তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'আসুন বরদাবাবু, এঁরা আমাকে একেবারে— ; এই যে, ব্যোমকেশবাবু, আপনারাও এসেছেন। আসতে আজ্ঞা হোক।'

নবাগত দুইজনকে দেখিয়া তর্ক বন্ধ হইল। বরদাবাবু আমাদের পরিচয় দিয়া, আমরা উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে কেন ? কি হয়েছে ?'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'ওঁরা আমার ভূত দেখার কথা বিশ্বাস করছেন না, বলছেন ওটা আমারই

মস্তিষ্কপ্রসূত একটা বায়বীয় মূর্তি।'

পৃথ্বীশবাবু নামক একটি ভদ্রলোক বলিলেন, 'আমরা বলতে চাই, বরদার আষাঢ়ে গল্প শুনে শুনে ওঁর মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে উনি ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখছেন। বস্তুত যেটাকে উনি ভূত মনে করছেন সেটা হয়তো একটা বাদুড় কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু।'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'আমি স্বীকার করছি যে আমি স্পষ্টভাবে কিছু দেখিনি। তবু বাদুড় যে নয় একথা আমি হলফ্ নিয়ে বলতে পারি। আর বরদাবাবুর গল্প শুনে আমি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি এ অপবাদ যদি দেন—'

বরদাবাবু আমাদের দিকে নির্দেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'এঁরা দু'জন কাল সকালে এখানে এসেছেন। এঁদেরও আমি গল্প শুনিয়ে বশীভূত করে ফেলেছি বলে সন্দেহ হয় কি?'

একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেন, 'না, তা হয় না। তবে সময় পেলে—'

বরদাবাবু বলিলেন, 'ওঁরা কাল রাত্রে দেখেছেন।'

সকলে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। তারপর পৃথ্বীশবাবু ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্যি দেখেছেন?'

ব্যোমকেশ স্বীকার করিল, 'হ্যাঁ।'

'কি দেখেছেন?'

'একটা মুখ।'

প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিতে লাগিলেন। তখন ব্যোমকেশ যে অবস্থায় ঐ মুখ দেখিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া বলিল। শুনিয়া সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। বরদাবাবু ও শৈলেনবাবুর মুখে বিজয়ীর গর্বোল্লাস ফুটিয়া উঠিল।

অমূল্যবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, তর্কে যোগ দেন নাই। তাঁহার মুখমণ্ডলে অনিচ্ছাপীড়িত প্রত্যয় এবং অবরুদ্ধ অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। যাহা বিশ্বাস করিতে চাহি না, তাহাই অনন্যোপায় হইয়া বিশ্বাস করিতে হইলে মানুষের মনের অবস্থা যেরূপ হয় তাঁহার মনের অবস্থাও সেইরূপ—কোন প্রকারে এই অনীপ্সিত বিশ্বাসের মূল ছেদন করিতে পারিলে তিনি বাঁচেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন, বিরুদ্ধতার শ্লেষ কণ্ঠ হইতে যথাসম্ভব অপসারিত করিয়া বলিলেন, 'তা যেন হল, অনেকেই যখন দেখেছেন বলছেন—তখন না হয় ঘটনাটা সত্যি বলেই মেনে নেয়া গেল। কিন্তু কেন? বৈকুণ্ঠ জহুরী যদি ভূতই হয়ে থাকে তাহলে কৈলাসবাবুকে বিরক্ত করে তার কি লাভ হচ্ছে? এই কথাটা আমায় কেউ বুঝিয়ে দিতে পার?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'প্রেতযোনির উদ্দেশ্য সব সময় বোঝা যায় না। তবে আমার মনে হয় বৈকুণ্ঠবাবু কিছু বলতে চান।'

অমূল্যবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, 'বলতে চান তো বলছেন না কেন?'

'সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁকে দেখেই আমরা এত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছি যে তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে। তাছাড়া, প্রেতাত্মার মূর্তি পরিগ্রহ করবার ক্ষমতা থাকলেও কথা কইবার ক্ষমতা সর্বত্র থাকে না। এক্টোপ্লাজ্‌ম্ নামক যে-বস্তুটা মূর্তি-গ্রহণের উপাদান—'

'পাণ্ডিত্য ফলিও না বরদা। Spiritualism-এর বইগুলো যে ঝাড়া মুখস্থ করে রেখেছ তা আমরা জানি। কিন্তু তোমার বৈকুণ্ঠবাবু যদি কথাই না বলতে পারবেন তবে নিরীহ একটি ভদ্রলোককে নাহক জ্বালাতন করছেন কেন?'

'মুখে কথা বলতে না পারলেও তাঁকে কথা বলাবার উপায় আছে।'

'কি উপায়?'

'টেবিল চালা।'

'ও—সেই তেপায়া টেবিল? সে তো জুচ্চুরি।'

'কি করে জানলে? কখনো পরীক্ষা করে দেখেছ?'

অমূল্যবাবুকে নীরব হইতে হইল। তখন বরদাবাবু আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'দেখুন,

আমার দৃঢ় বিশ্বাস বৈকুণ্ঠবাবুর কিছু বক্তব্য আছে ; হয়তো তিনি হত্যাকারীর নাম বলতে চান। আমাদের উচিত তাঁকে সাহায্য করা। টেবিল চেলে তাঁকে ডাকলে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। টেবিল চালিয়ে দেখবেন ?'

ভূত নামানো কখনও দেখি নাই ; ভারি আগ্রহ হইল। বলিলাম, 'বেশ তো, করুন না। এখনি করবেন ?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'দোষ কি ? এইখানেই করা যাক—কি বল তোমরা ? ভূত যদি নামে, তোমাদের সকলেরই সন্দেহ ভঞ্জন হবে।'

সকলেই সোৎসাহে রাজী হইলেন।

একটি ছোট টিপাই তৎক্ষণাৎ আনানো হইল। বরদাবাবু বলিলেন যে, বেশি লোক থাকিলে চক্র হইবে না, তাই পাঁচজনকে বাছিয়া লওয়া হইল। বরদাবাবু, ব্যোমকেশ, শৈলেনবাবু, অমূল্যবাবু ও আমি রহিলাম। বাকি সকলে পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন।

আলো কমাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজন টিপাইয়ের চারিদিকে চেয়ার টানিয়া বসিলাম। কি করিতে হইবে বরদাবাবু সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন টিপাইয়ের উপর আলগোছে হাত রাখিয়া পরস্পর আঙুলে আঙুল ঠেকাইয়া মুদিত চক্ষে বৈকুণ্ঠবাবুর ধ্যান শুরু করিয়া দিলাম। ঘরের মধ্যে আবছায়া অন্ধকার ও অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট এইভাবে কাটিল। ভূতের দেখা নাই। মনে আবোল-তাবোল চিন্তা আসিতে লাগিল ; জোর করিয়া মনকে বৈকুণ্ঠবাবুর ধ্যানে জুড়িয়া দিতে লাগিলাম। এইরূপ টানাটানিতে বেশ অধীর হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময় মনে হইল টিপাইটা যেন একটু নড়িল। হঠাৎ দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম, আঙুলের স্নায়ুগুলা নিরতিশয় সচেতন হইয়া রহিল।

আবার টিপাই একটু নড়িল, যেন ধীরে ধীরে আমার হাতের নীচে ঘুরিয়া যাইতেছে।

বরদাবাবুর গম্ভীর স্বর শুনিলাম—'বৈকুণ্ঠবাবু এসেছেন কি ? যদি এসে থাকেন একবার টোকা দিন।'

কিছুক্ষণ কোন সাড়া নাই। তারপর টিপাইয়ের একটা পায়া ধীরে ধীরে শূন্যে উঠিয়া ঠক্ করিয়া মাটিতে পড়িল।

বরদাবাবু গম্ভীর অথচ অনুচ্চ স্বরে কহিলেন, 'আবির্ভাব হয়েছে !'

স্নায়ুর উত্তেজনা আরো বাড়িয়া গেল ; কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। চক্ষু মেলিয়া কিন্তু একটা বিস্ময়ের ধাক্কা অনুভব করিলাম। কি দেখিব আশা করিয়াছিলাম জানি না, কিন্তু দেখিলাম যেমন পাঁচজন আধা অন্ধকারে বসিয়াছিলাম তেমনি বসিয়া আছি, কোথাও কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইতিমধ্যে যে একটা গুরুতর রকম অবস্থান্তর ঘটিয়াছে—এই ঘরে আমাদেরই আশেপাশে কোথাও অশরীরী আত্মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বরদাবাবু নিম্নস্বরে আমাদের বলিলেন, 'আমিই প্রশ্ন করি—কি বলেন ?'

আমরা শিরঃসঞ্চালনে সম্মতি জানাইলাম। তখন তিনি ধীর গম্ভীরকণ্ঠে প্রেতযোনিকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন—

'আপনি কি চান ?'

কোনো উত্তর নাই। টিপাই অচল হইয়া রহিল।

'আপনি বারবার দেখা দিচ্ছেন কেন ?'

মনে হইল টিপাই একটু নড়িল। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারা গেল না।

'আপনার কিছু বক্তব্য আছে ?'

এবার টিপাইয়ের পায়া স্পষ্টত উঠিতে লাগিল। কয়েকবার ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল—অর্থ কিছু বোধগম্য হইল না।

বরদাবাবু কহিলেন, 'যদি হ্যাঁ বলতে চান একবার টোকা দিন, যদি না বলতে চান দু'বার টোকা

দিন।'

একবার টোকা পড়িল।

দেখিলাম, পরলোকের সহিত ভাব বিনিময়ের প্রণালী খুব সরল নয়। 'হ্যাঁ' বা 'না' কোনোক্রমে বোঝানো যায় ; কিন্তু বিস্তারিতভাবে মনের কথা প্রকাশ করা অশরীরীর পক্ষে বড় কঠিন। কিন্তু তবু মানুষের বুদ্ধি দ্বারা সে বাধাও কিয়ৎপরিমাণে উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে—সংখ্যার দ্বারা অক্ষর বুঝাইবার রীতি আছে। বরদাবাবু সেই রীতি অবলম্বন করিলেন ; প্রেতযোনিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনি যা বলতে চান, অক্ষর গুণে গুণে টোকা দিন, তাহলে আমরা বুঝতে পারব।'

তখন টেলিগ্রাফে কথা আরম্ভ হইল। টিপাইয়ের পায়া ঠক্ করিয়া কয়েকবার নড়ে, আবার স্তব্ধ হয় ; আবার নড়ে—আবার স্তব্ধ হয়। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে কথাগুলি অতি কষ্টে বাহির হইয়া আসিল তাহা এই—

বাড়ি—ছেড়ে—যাও—নচেৎ—অমঙ্গল—

টিপাইয়ের শেষ শব্দ থামিয়া যাইবার পর আমরা কিছুক্ষণ ভয়স্তম্ভিতবৎ বসিয়া রহিলাম। তারপর বরদাবাবু গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন, 'আপনার বাড়ি যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় আমরা তার চেষ্টা করব। আর কিছু বলতে চান কি ?'

টিপাই স্থির।

আমার হঠাৎ একটা কথা মনে হইল, বরদাবাবুকে চুপি চুপি বলিলাম, 'হত্যাকারী কে জিজ্ঞাসা করুন।'

বরদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। খানিকক্ষণ কোন উত্তর আসিল না ; তারপর পায়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

তা—রা—তা—রা—তা—রা—

হঠাৎ টিপাই কয়েকবার সজোরে নড়িয়া উঠিয়া থামিয়া গেল। বরদাবাবু কম্পিতস্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'কি বললেন, বুঝতে পারলুম না। 'তারা'—কি ? কারুর নাম ?'

টিপাইয়ে সাড়া নাই।

আবার প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি আছেন ?'

কোনো উত্তর আসিল না, টিপাই জড় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

তখন বরদাবাবু দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'চলে গেছেন।'

ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিল ; তারপর সকলের হাতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া নেহাৎ অরসিকের মত বলিল, 'মাফ করবেন, এখন কেউ টিপাই থেকে হাত তুলবেন না। আপনাদের হাত আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

বরদাবাবু ঈষৎ হাসিলেন—'আমরা কেউ হাতে আঠা লাগিয়ে রেখেছি কিনা দেখতে চান ? বেশ—দেখুন।'

ব্যোমকেশের ব্যবহারে আমি বড় লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। এমন খোলাখুলিভাবে এতগুলি ভদ্রলোককে প্রবঞ্চক মনে করা নিতান্তই শিষ্টতা-বিগর্হিত। তাহার মনে একটা প্রবল সংশয় জাগিয়াছে সত্য—কিন্তু তাই বলিয়া এমন কঠোরভাবে সত্য পরীক্ষা করিবার তাহার কোন অধিকার নাই। সকলেই হয়তো মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন ; কিন্তু ব্যোমকেশ নির্লজ্জভাবে প্রত্যেকের হাত পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এমন কি আমাকেও বাদ দিল না।

কিন্তু কাহারো হাতেই কিছু পাওয়া গেল না। ব্যোমকেশ তখন দুই করতলে গণ্ড রাখিয়া টিপাইয়ের উপর কনুই স্থাপনপূর্বক শূন্যদৃষ্টিতে আলোর দিকে তাকাইয়া রহিল।

বরদাবাবু খোঁচা দিয়া বলিলেন, 'কিছু পেলেন না ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আশ্চর্য ! এ যেন কল্পনা করাও যায় না।'

বরদাবাবু প্রসন্নস্বরে বলিলেন 'There are more things—'

অমূল্যবাবুর বিরুদ্ধতা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি অসংযতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু—'তারা' 'তারা' কথার মানে কেউ বুঝতে পারলে ?'

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। আমার মাথায় হঠাৎ বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল—তারাশঙ্কর। আমি ঐ নামটাই উচ্চারণ করিতে যাইতেছিলাম, ব্যোমকেশ আমার মুখে থাবা দিয়া বলিল, 'ও আলোচনা না হওয়াই ভাল।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমরা যা জানতে পেরেছি তা আমাদের মনেই থাক।' সকলে তাঁহার কথায় গম্ভীর উদ্বিগ্নমুখে সায় দিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজকের অভিজ্ঞতা বড় অদ্ভুত—এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু না করেও উপায় নেই। বরদাবাবু, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ি ফিরিবার পথে বরদাবাবুর সহিত শৈলেনবাবু এবং অমূল্যবাবু আমাদের সাথী হইলেন। তাঁহাদের বাসা কেল্লার মধ্যে।

আমাদের বাসা নিকটবর্তী হইলে শৈলেনবাবু বলিলেন, 'একলা বাসায় থাকি, আজ রাত্রে দেখছি ভাল ঘুম হবে না।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আপনার আর ভয় কি ? ভয় কৈলাসবাবুর।—আচ্ছা, ওঁকে বাড়ি ছাড়াবার কি করা যায় বলুন তো ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওঁকে ও-বাড়ি ছাড়াতেই হবে। আপনারা তো চেষ্টা করছেনই, আমিও করব। কৈলাসবাবু অবুঝ লোক, তবু ওঁর ভালর জন্যই আমাদের করতে হবে।—কিন্তু বাড়ি পৌঁছে যাওয়া গেছে, আর আপনারা কষ্ট করবেন না। নমস্কার।'

তিনজনে শুভনিশি জ্ঞাপন করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। অমূল্যবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—'শৈলেনবাবু, আপনি বরং আজকের রাতটা আমার বাসাতেই থাকবেন চলুন। আপনিও একলা থাকেন, আমার বাসাতেও উপস্থিত আমি ছাড়া আর কেউ নেই—'

বুঝিলাম টেবিল চালার ব্যাপার সকলের মনের উপরেই আতঙ্কের ছায়া ফেলিয়াছে।

৭

শশাঙ্কবাবু বোধহয় মনে মনে ব্যোমকেশ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তাই সেদিন কৈলাসবাবুর বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে হত্যার প্রসঙ্গ আর ব্যোমকেশের সম্মুখে উত্থাপিত করেন নাই। তাছাড়া হঠাৎ তাঁহার অফিসে কাজের চাপ পড়িয়াছিল, পূজার ছুটির প্রাক্কালে অবকাশেরও অভাব ঘটিয়াছিল।

অতঃপর দুই তিনদিন আমরা শহরে ও শহরের বাহিরে যত্র তত্র পরিভ্রমণ করিয়া কাটাইয়া দিলাম। স্থানটি অতি প্রাচীন, জরাসন্ধের আমল হইতে ক্লাইভের সময় পর্যন্ত বহু কিম্বদন্তী ও ইতিবৃত্ত তাহাকে কেন্দ্র করিয়া জমা হইয়াছে। পুরাবৃত্তের দিকে যাঁহাদের ঝোঁক আছে তাঁহাদের কাছে স্থানটি পরম লোভনীয়।

এই সব দেখিতে দেখিতে ব্যোমকেশ যেন হত্যাকাণ্ডের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। শুধু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সে কৈলাসবাবুর বাসায় গিয়া জুটিত এবং নানাভাবে তাঁহাকে বাড়ি ছাড়িবার জন্য প্ররোচিত করিত। তাহার সুকৌশল বাক্য-বিন্যাসের ফলও ফলিয়াছিল, কৈলাসবাবু নিমরাজী হইয়া আসিয়াছিলেন।

শেষে সপ্তাহখানেক পরে তিনি সম্মত হইয়া গেলেন। কেল্লার বাহিরে একখানা ভাল বাড়ি পাওয়া গিয়াছিল, আগামী রবিবারে তিনি সেখানে উঠিয়া যাইবেন স্থির হইল।

রবিবার প্রভাতে চা খাইতে খাইতে ব্যোমকেশ বলিল, 'শশাঙ্ক, এবার আমাদের তল্পি তুলতে হবে। অনেকদিন হয়ে গেল।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'এরি মধ্যে! আর দু'দিন থেকে যাও না। কলকাতায় তোমার কোনো জরুরী কাজ নেই তো।' তাঁহার কথাগুলি শিষ্টতাসম্মত হইলেও কণ্ঠস্বর নিরুৎসুক হইয়া রহিল।

ব্যোমকেশ উত্তরে বলিল, 'তা হয়তো নেই। কিন্তু তবু কাজের প্রত্যাশায় দোকান সাজিয়ে বসে থাকতে হবে তো।'

'তা বটে। কবে যাবে মনে করছ?'

'আজই। তোমার এখানে ক'দিন ভারি আনন্দে কাটল—অনেকদিন মনে থাকবে।'

'আজই? তা—তোমাদের যাতে সুবিধা হয়—' শশাঙ্কবাবু কিয়ৎকাল বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর একটু বিরসস্বরে কহিলেন, 'সে ব্যাপারটার কিছুই হল না। জটিল ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই; তবু ভেবেছিলুম, তোমার যে রকম নাম-ডাক হয়তো কিছু করতে পারবে।'

'কোন ব্যাপারের কথা বলছ?'

'বৈকুণ্ঠবাবর খুনের ব্যাপার। কথাটা ভুলেই গেলে নাকি?'

'ও—না ভুলিনি। কিন্তু তাতে জানবার কিছু নেই।'

'কিছু নেই! তার মানে? তুমি সব জেনে ফেলেছ নাকি?'

'তা—একরকম জেনেছি বৈ কি।'

'সে কি! তোমার কথা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।' শশাঙ্কবাবু ঘুরিয়া বসিলেন।

ব্যোমকেশ ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, 'কেন—বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে যা কিছু জানবার ছিল তা তো অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছি—তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি?'

শশাঙ্কবাবু স্তম্ভিতভাবে তাকাইয়া রহিলেন—'কিন্তু—অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছ—কি বলছ তুমি? বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী কে তা জানতে পেরেছ?'

'সে তো গত রবিবারই জানা গেছে।'

'তবে—তবে—এতদিন আমায় বলনি কেন?'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল—'ভাই, তোমার ভাবগতিক দেখে আমার মনে হয়েছিল যে পুলিস আমার সাহায্য নিতে চায় না; বাংলাদেশে আমরা যে-প্রথায় কাজ করি সে-প্রথা তোমাদের কাছে একেবারে হাস্যকর, আঙুলের টিপ এবং ছেঁড়া কাগজের প্রতি তোমাদের অশ্রদ্ধার অন্ত নেই। তাই আর আমি উপযাচক হয়ে কিছু বলতে চাইনি। লোমহর্ষণ উপন্যাস মনে করে তোমরা সমস্ত পুলিস-সম্প্রদায় যদি একসঙ্গে অট্টহাস্য শুরু করে দাও—তাহলে আমার পক্ষে সেটা কি রকম সাংঘাতিক হয়ে উঠবে একবার ভেবে দ্যাখো।'

শশাঙ্কবাবু ঢোক গিলিলেন—'কিন্তু—আমাকে তো ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারতে। আমি তো তোমার বন্ধু! সে যাক, এখন কি জানতে পেরেছ শুনি।' বলিয়া তিনি ব্যোমকেশের সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল।

'কে খুন করেছে? তাকে আমরা চিনি?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিল।

তাহার উরুর উপর হাত রাখিয়া প্রায় অনুনয়ের কণ্ঠে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'সত্যি বল ব্যোমকেশ, কে করেছে?'

'ভূত।'

শশাঙ্কবাবু বিমূঢ় হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ঠাট্টা করছ নাকি! ভূতে খুন করেছে?'

'অর্থাৎ—হ্যাঁ, তাই বটে।'

অধীর স্বরে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'যা বলতে চাও পরিষ্কার করে বল ব্যোমকেশ। যদি তোমার

সত্যি সত্যি বিশ্বাস হয়ে থাকে যে ভূতে খুন করেছে—তাহলে—' তিনি হতাশভাবে হাত উল্টাইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিয়া ফেলিল। তারপর উঠিয়া বারান্দায় একবার পায়চারি করিয়া বলিল, 'সব কথা তোমাকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হলে আজ আমার যাওয়া হয় না—রাত্রিটা থাকতে হয়। আসামীকে তোমার হাতে সমর্পণ না করে দিলে তুমি বুঝবে না। আজ কৈলাসবাবু বাড়ি বদল করবেন ; সুতরাং আশা করা যায় আজ রাত্রেই আসামী ধরা পড়বে।' একটু থামিয়া বলিল, 'আর কিছু নয়, বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের জন্যই দুঃখ হয়। —যাক, এখন কি করতে হবে বলি শোনো।'

আশ্বিন মাস, দিন ছোট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ছ'টার মধ্যে সন্ধ্যা হয় এবং নয়টা বাজিতে না বাজিতে কেল্লার অধিবাসিবৃন্দ নিদ্রালু হইয়া শয্যা আশ্রয় করে। গত কয়েকদিনেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

সে-রাত্রে ন'টা বাজিবার কিছু পূর্বে আমরা তিনজনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ একটা টর্চ সঙ্গে লইল, শশাঙ্কবাবু একজোড়া হাতকড়া পকেটে পুরিয়া লইলেন।

পথ নির্জন ; আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া অর্ধচন্দ্রকে ঢাকিয়া দিয়াছে। রাস্তার ধারে বহুদূর ব্যবধানে যে নিষ্প্রভ কেরাসিন-বাতি ল্যাম্পপোস্টের মাথায় জ্বলিতেছিল তাহা রাত্রির ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারকে ঘোলাটে করিয়া দিয়াছে মাত্র। পথে জনমানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না।

কৈলাসবাবুর পরিত্যক্ত বাসার সম্মুখে গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন সরকারী খাজনাখানা হইতে নয়টার ঘণ্টা বাজিতেছে। শশাঙ্কবাবু এদিক ওদিক তাকাইয়া মৃদু শিস দিলেন ; অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা লোক বাহির হইয়া আসিল—তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, অস্পষ্ট পদশব্দে বুঝিলাম। ব্যোমকেশ তাহাকে চুপি চুপি কি বলিল, সে আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আমরা সন্তর্পণে বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। শূন্য বাড়ি, দরজা জানালা সব খোলা—কোথাও একটা আলো জ্বলিতেছে না। প্রাণহীন শবের মত বাড়িখানা যেন নিস্পন্দ হইয়া আছে।

পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। কৈলাসবাবুর ঘরের সম্মুখে ব্যোমকেশ একবার দাঁড়াইল, তারপর ঘরে প্রবেশ করিয়া টর্চ জ্বালিয়া ঘরের চারিদিকে ফিরাইল। ঘর শূন্য—খাট বিছানা যাহা ছিল কৈলাসবাবুর সঙ্গে সমস্তই স্থানান্তরিত হইয়াছে। খোলা জানালা-পথে গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাস নিরাভরণ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

দরজা ভেজাইয়া ব্যোমকেশ টর্চ নিবাইয়া দিল। তারপর মেঝেয় উপবেশন করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, 'বোসো তোমরা। কতক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হবে কিছু ঠিক নেই, হয়তো রাত্রি তিনটে পর্যন্ত এইভাবে বসে থাকতে হবে। —অজিত, আমি টর্চ জ্বাললেই তুমি গিয়ে জানালা আগ্‌লে দাঁড়াবে ; আর শশাঙ্ক, তুমি পুলিসের কর্তব্য করবে—অর্থাৎ প্রেতকে প্রাণপণে চেপে ধরবে।'

অতঃপর অন্ধকারে বসিয়া আমাদের পাহারা আরম্ভ হইল। চুপচাপ তিনজনে বসিয়া আছি, নড়ন-চড়ন নাই ; নড়িলে বা একটু শব্দ করিলে ব্যোমকেশ বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া যে সময়ের অন্ত্যেষ্টি করিব তাহারও উপায় নাই, গন্ধ পাইলে শিকার ভড়কাইয়া যাইবে। বসিয়া বসিয়া আর এক রাত্রির দীর্ঘ প্রতীক্ষা মনে পড়িল, চোরাবালির ভাঙা কুঁড়ে ঘরে অজ্ঞানার উদ্দেশ্যে সেই সংশয়পূর্ণ জাগরণ। আজিকার রাত্রিও কি তেমনি অভাবনীয় পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ?

খাজনাখানার ঘড়ি দুইবার প্রহর জানাইল—এগারোটা বাজিয়া গেল। তিনি কখন আসিবেন তাহার স্থিরতা নাই ; এদিকে চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিতেছে।

এই তো কলির সন্ধ্যা—ভাবিতে ভাবিতে একটা অদম্য হাই তুলিবার জন্য হাঁ করিয়াছি, হঠাৎ ব্যোমকেশ সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়া আমার ঊরু চাপিয়া ধরিল। হাই অর্ধপথে হেঁচকা লাগিয়া থামিয়া গেল।

জানালার কাছে শব্দ। চোখে কিছুই দেখিলাম না, কেবল একটা অস্পষ্ট অতি লঘু শব্দ

শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিয়া গেল। তারপর আর কোনো সাড়া নাই। নিশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলাম, বাহিরে কিছুই শুনিতে পাইলাম না—শুধু নিজের বুকের মধ্যে দুন্দুভির মত একটা আওয়াজ ক্রমে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সহসা আমাদের খুব কাছে, ঘরের মেঝের উপর পা ঘষিয়া চলার মত খসখস শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একজন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের দুই হাত অন্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—অথচ তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। সে কি আমাদের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়াছে ? কে সে ? এবার কি করিবে ? আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া একটা ঠাণ্ডা শিহরণ বহিয়া গেল।

প্রভাতের সূর্যরশ্মি যেমন ছিদ্রপথে বদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি সূক্ষ্ম আলোর রেখা ঘরের মধ্যস্থলে জন্মলাভ করিয়া আমাদের সম্মুখের দেয়াল স্পর্শ করিল। অতি ক্ষীণ আলো কিন্তু তাহাতেই মনে হইল যেন ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম একটা দীর্ঘাকৃতি কালো মূর্তি আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই হস্তস্থিত ক্ষুদ্র টর্চের আলো যেন দেয়ালের গায়ে কি অন্বেষণ করিতেছে।

কৃষ্ণ মূর্তিটা ক্রমে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল ; অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে দেয়ালের সাদা চুনকাম পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার গলা দিয়া একটা অব্যক্ত আওয়াজ বাহির হইল, যেন যাহা খুঁজিতেছিল তাহা সে পাইয়াছে।

এই সময় ব্যোমকেশের হাতের টর্চ জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র আলোকে ক্ষণকালের জন্য চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। তারপর আমি ছুটিয়া গিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলাম।

আগন্তুকও তড়িৎবেগে ফিরিয়া চোখের সম্মুখে হাত তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহার মুখখানা প্রথমে দেখিতে পাইলাম না। তারপর মুহূর্তমধ্যে অনেকগুলা ঘটনা প্রায় একসঙ্গে ঘটিয়া গেল। আগন্তুক বাঘের মত আমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল, শশাঙ্কবাবু তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে জাপটা-জাপটি করিয়া ভূমিসাৎ হইলাম।

ঝুটোপুটি ধস্তাধস্তি কিন্তু থামিল না। শশাঙ্কবাবু আগন্তুককে কুস্তিগিরের মত মাটিতে চিৎ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন ; আগন্তুক তাঁহার স্কন্ধে সজোরে কামড়াইয়া দিয়া এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল। শশাঙ্কবাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি তাহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। আগন্তুক তাঁহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না ; তদবস্থায় টানিতে টানিতে জানালার দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় টর্চের আলোয় তাহার বিকৃত বীভৎস রং-করা মুখখানা দেখিতে পাইলাম। প্রেতাত্মাই বটে।

ব্যোমকেশ শান্ত সহজ সুরে বলিল, 'শৈলেনবাবু, জানালা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাবেন। আপনার রণ-পা ওখানে নেই, তার বদলে জমাদার ভানুপ্রতাপ সিং সদলবলে জানালার নীচে অপেক্ষা করছেন।' তারপর গলা চড়াইয়া হাঁকিল, 'জমাদারসাহেব, উপর আইয়ে।'

সেই বিকট মুখ আবার ঘরের দিকে ফিরিল। শৈলেনবাবু! আমাদের নিরীহ শৈলেনবাবু—এই! বিস্ময়ে মনটা যেন অসাড় হইয়া গেল।

শৈলেনবাবুর বিকৃত মুখের পৈশাচিক ক্ষুধিত চক্ষু দু'টা ব্যোমকেশের দিকে ক্ষণেক বিস্ফারিত হইয়া রহিল, দাঁতগুলা একবার হিংস্র শ্বাপদের মত বাহির করিলেন, যেন কি বলিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু মুখ দিয়া একটা গোঙানির মত শব্দ বাহির হইল মাত্র। তারপর সহসা শিথিল দেহে তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

শশাঙ্কবাবু তাঁহার পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'শশাঙ্ক, শৈলেনবাবুকে তুমি চেনো বটে কিন্তু ওঁর সব পরিচয় বোধহয় জান না। কাঁধ দিয়ে রক্ত পড়ছে দেখছি ; ও কিছু নয়, টিনচার আয়োডিন লাগালেই সেরে যাবে। তাছাড়া, পুলিসের অধিকার যখন গ্রহণ করেছ তখন তার আনুষঙ্গিক ফলভোগ করতে হবে বই কি। সে যাক, শৈলেনবাবুর আসল পরিচয়টা দিই।

উনি হচ্ছেন সার্কাসের একজন নামজাদা জিম্‌নাস্টিক খেলোয়াড় এবং বৈকুণ্ঠবাবুর নিরুদ্দিষ্ট জামাতা। সুতরাং উনি যদি তোমার ঘাড়ে কামড়ে দিয়েই থাকেন তাহলে তুমি সেটাকে জামাইবাবুর রসিকতা বলে ধরে নিতে পার।'

শশাঙ্কবাবু কিন্তু রসিকতা বলিয়া মনে করিলেন না ; গলার মধ্যে একটা নাতি-উচ্চ গর্জন করিয়া জামাইবাবুর প্রকোষ্ঠে হাতকড়া পরাইলেন এবং জমাদার ভানুপ্রতাপ সিং সেই সময়ে তাহার বিরাট গালপাট্টা ও চৌগোঁফা লইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল।

৮

ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'সতেরো মিনিট রয়েছে মাত্র। অতএব চটপট আমার কৈফিয়ৎ দাখিল্ করে স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করব।'

বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারীর অ্যারেস্টের ফলে শহরে বিরাট উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল, বলাই বাহুল্য। ব্যোমকেশই যে এই অঘটন সম্ভব করিয়াছে তাহাও কি জানি কেমন করিয়া চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। শশাঙ্কবাবু প্রীতি ও সন্তোষের ভাব চেষ্টা করিয়াও আর রাখিতে পারিতেছিলেন না। তাই আমরা আর অযথা বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়াই মনস্থ করিয়াছিলাম।

কৈলাসবাবু তাঁহার পূর্বতন বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার শয়নকক্ষে বিদায়ের পূর্বে আমরা সমবেত হইয়াছিলাম। শশাঙ্কবাবু, বরদাবাবু, অমূল্যবাবু উপস্থিত ছিলেন ; কৈলাসবাবু শয্যায় অর্ধশয়ান থাকিয়া মুখে অনভ্যস্ত প্রসন্নতা আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পুত্রের উপর মিথ্যা সন্দেহ করিয়া তিনি যে অনুতপ্ত হইয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল।

তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'এখন বুঝতে পারছি ভূত নয় পিশাচ নয়—শৈলেনবাবু। উঃ—লোকটা কি ধড়িবাজ ! মনে আছে—একবার এই ঘরে বসে 'ঐ—ঐ' করে চেঁচিয়ে উঠেছিল ? আগাগোড়া ধাপ্পাবাজি। কিছুই দেখেনি—শুধু আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা। সে নিজেই যে ভূত এটা যাতে আমরা কোন মতেই না বুঝতে পারি। যা হোক, ব্যোমকেশবাবু, এবার কৈফিয়ৎ পেশ করুন—আপনি বুঝলেন কি করে ?'

সকলে উৎসুক নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া আরম্ভ করিল, 'বরদাবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না, প্রেতযোনি সম্বন্ধে আমার মনটা গোড়া থেকেই নাস্তিক হয়ে ছিল। ভূত পিশাচ আছে কিনা এ প্রশ্ন আমি তুলছি না ; কিন্তু যিনি কৈলাসবাবুকে দেখা দিচ্ছেন তিনি যে ভূত-প্রেত নন—জলজ্যান্ত মানুষ—এ সন্দেহ আমার শুরুতেই হয়েছিল। আমি নেহাৎ বস্তুতান্ত্রিক মানুষ, নিরেট বস্তু নিয়েই আমায় কারবার করতে হয় ; তাই অতীন্দ্রিয় জিনিসকে আমি সচরাচর হিসেবের বাইরে রাখি।

'এখন মনে করুন, যদি ঐ ভূতটা সত্যিই মানুষ হয়, তবে সে কে এবং কেন এমন কাজ করছে—এ প্রশ্নটা স্বতঃই মনে আসে। একটা লোক খামকা ভূত সেজে বাড়ির লোককে ভয় দেখাচ্ছে কেন ? এর একমাত্র উত্তর, সে বাড়ির লোককে বাড়িছাড়া করতে চায়। ভেবে দেখুন, এ ছাড়া আর অন্য কোন সদুত্তর থাকতে পারে না।

'বেশ। এখন প্রশ্ন উঠছে—কেন বাড়িছাড়া করতে চায় ? নিশ্চয় তার কোন স্বার্থ আছে। কি সে স্বার্থ ?

'আপনারা সকলেই জানেন, বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর মূল্যবান হীরা জহরত কিছুই পাওয়া যায়নি। পুলিস সন্দেহ করে যে তিনি একটা কাঠের হাতবাক্সে তাঁর অমূল্য সম্পত্তি রাখতেন এবং তাঁর হত্যাকারী সেগুলো নিয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু এটা এত সহজে বিশ্বাস করতে পারিনি। 'ব্যয়কুণ্ঠ' বৈকুণ্ঠবাবুর চরিত্র যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় তিনি মূল্যবান হীরে-মুক্তো

কাঠের বাক্সে ফেলে রাখবার লোক ছিলেন না। কোথায় যে তিনি সেগুলোকে রাখতেন তাই কেউ জানে না। অথচ এই ঘরেই সেগুলো থাকত।— প্রশ্ন— কোথায় থাকত ?

'কিন্তু এ প্রশ্নটা এখন চাপা থাক। এই ভৌতিক উৎপাতের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ এই হতে পারে যে, বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী তাঁর জহরতগুলো নিয়ে যাবার সুযোগ পায়নি, অথচ কোথায় সেগুলো আছে তা সে জানে। তাই সে এ বাড়ির নূতন বাসিন্দাদের তাড়াবার চেষ্টা করছে ; যাতে সে নিরুপদ্রবে জিনিসগুলো সরাতে পারে।

'সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ভূতই বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী।

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়েকে প্রশ্ন করে আমার দুটো বিষয়ে খট্‌কা লেগেছিল। প্রথম, তিনি সে-রাত্রে কোন শব্দ শুনতে পাননি। এটা আমার অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। তিনি এই ঘরের নীচের ঘরেই শুতেন, অথচ তাঁর বাপকে গলা টিপে মারবার সময় যে ভীষণ ধস্তাধস্তি হয়েছিল তার শব্দ কিছুই শুনতে পাননি। আততায়ী বৈকুণ্ঠবাবুর গলা টিপে কোথায় তিনি হীরে জহরত রাখেন সে-খবর বার করে নিয়েছিল—অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে বাক্য-বিনিময় হয়েছিল। হয়তো বৈকুণ্ঠবাবু চীৎকারও করেছিলেন—অথচ তাঁর মেয়ে কিছুই শুনতে পাননি। এ কি সম্ভব ?

'দ্বিতীয় কথা, বাপের আত্মার সদ্‌গতির জন্য তিনি গয়ায় পিণ্ড দিতে অনিচ্ছুক। আসল কথা তিনি জানেন তাঁর বাপ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়নি, তাই তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেতযোনি যে কে তাও সম্ভবত তিনি জানেন। নচেৎ একজন অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোক জেনেশুনে বাপের পারলৌকিক ক্রিয়া করবে না—এ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে সম্বন্ধে অনেকগুলো সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে—সবগুলো তলিয়ে দেখার দরকার নেই। তার মধ্যে প্রধান এই যে, তিনি জানেন কে হত্যা করেছে এবং তাকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন। স্ত্রীলোকের এমন কে আত্মীয় থাকতে পারে যে বাপের চেয়েও প্রিয় ? উত্তর নিষ্প্রয়োজন। বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে যে সুচরিত্রা সে খবর আমি প্রথম দিনই পেয়েছিলুম। সুতরাং স্বামী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

'বৈকুণ্ঠবাবুর জামাই যে হত্যাকারী তার আর একটা ইঙ্গিত গোড়াগুড়ি পেয়েছিলুম। প্রেতাত্মাটা পনেরো হাত লম্বা, দোতলার জানালা দিয়ে অবলীলাক্রমে উঁকি মারে। সহজ মানুষের পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হয় ? মইও ব্যবহার করে না—মই ঘাড়ে করে অত শীঘ্র অন্তর্ধান সম্ভব নয়। তবে ? এর উত্তর—রণ-পা। নাম শুনেছেন নিশ্চয়। দুটো লম্বা লাঠি, তার ওপর চড়ে সেকালে ডাকাতেরা বিশ-ত্রিশ ক্রোশ দূরে ডাকাতি করে আবার রাতারাতি ফিরে আসত। বর্তমান কালে সার্কাসে রণ-পা চড়ে অনেক খেলোয়াড় খেলা দেখায়। রীতিমত অভ্যাস না থাকলে কেউ রণ-পা চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারে না। কাজেই হত্যাকারী যে সার্কাস-সম্পর্কিত লোক হতে পারে এ অনুমান নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। বৈকুণ্ঠবাবুর বয়াটে জামাই সার্কাসদলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, নিশ্চয় ভাল খেলোয়াড়—সুতরাং অনুমানটা আপনা থেকেই দৃঢ় হয়ে ওঠে।

'কিন্তু সবাই জানে জামাই দেশে নেই—আট বছর নিরুদ্দেশ। সে হঠাৎ এসে জুটল কোথা থেকে ?

'সেদিন এই বাড়ির আঁস্তাকুড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটা কাগজের টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। অনেকদিনের জীর্ণ একটা সার্কাসের ইস্তাহার, তাতে আবার সিংহের ছবি তখনো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। তার উল্টো পিঠে হাতের অক্ষরে কয়েকটা বাংলা শব্দ লেখা ছিল। মনে হয় যেন কেউ চিঠির কাগজের অভাবে এই ইস্তাহারের পিঠে চিঠি লিখেছে। চিঠির কথাগুলো অসংলগ্ন, তবু তা থেকে একটা অর্থ উদ্ধার করা যায় যে স্বামী অর্থাভাবে পড়ে স্ত্রীর কাছে টাকা চাইছে। অজিত, তুমি যে শব্দটা 'স্বার্থী' পড়েছিলে সেটা প্রকৃতপক্ষে 'স্বামী'।

'বোঝা যাচ্ছে, স্বামী সুদূর প্রবাস থেকে অর্থাভাবে মরীয়া হয়ে স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিল। বলা বাহুল্য, অর্থ সাহায্য সে পায়নি। বৈকুণ্ঠবাবু একটা লক্ষ্মীছাড়া পত্নীত্যাগী জামাইকে টাকা দেবেন একথা বিশ্বাস্য নয়।

'এই গেল বছরখানেক আগেকার ঘটনা। দু'বছরের মধ্যে এ শহরে কোনো সার্কাস পার্টি আসেনি ; অতএব বুঝতে হবে যে প্রবাস থেকেই স্বামী এই চিঠি লিখেছিলেন এবং তখনো তিনি সার্কাসের দলে ছিলেন—সাদা কাগজের অভাবে ইস্তাহারের পিঠে চিঠি লিখেছিলেন।

'কয়েকমাস পরে স্বামী একদা মুঙ্গেরে এসে হাজির হলেন। ইতিমধ্যে কোথা থেকে টাকা যোগাড় করেছিলেন জানি না ; তিনি এসে স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকের মত বাস করতে লাগলেন। মুঙ্গেরে কেউ তাঁকে চেনে না—তাঁর বাড়ি যশোরে আর বিয়ে হয়েছিল নবদ্বীপে—তাই বৈকুণ্ঠবাবুর জামাই বলে ধরা পড়বার ভয় তাঁর ছিল না।

'বৈকুণ্ঠবাবু বোধ হয় জামাইয়ের আগমনবার্তা শেষ পর্যন্ত জানতেই পারেননি, তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। জামাইটি কিন্তু আড়ালে থেকে শ্বশুর সম্বন্ধে সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে তৈরি হলেন ; শ্বশুর যখন স্বেচ্ছায় কিছু দেবেন না তখন জোর করেই তাঁর উত্তরাধিকারী হবার সঙ্কল্প করলেন।

'তারপর সেই রাত্রে তিনি রণ-পায়ে চড়ে শ্বশুরবাড়ি গেলেন, জানালা দিয়ে একেবারে শ্বশুরমশায়ের শোবার ঘরে অবতীর্ণ হলেন। এই আকস্মিক আবির্ভাবে শ্বশুর বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন, জামাই কিন্তু নাছোড়বান্দা। কথায় বলে জামাতা দশম গ্রহ। বাবাজী প্রথমে শ্বশুরের গলা টিপে তাঁর হীরা জহরতের গুপ্তস্থান জেনে নিলেন, তারপর তাঁকে নিপাত করে ফেললেন। তিনি বেঁচে থাকলে অনেক ঝঞ্ঝাট, তাই তাঁকে শেষ করে ফেলবার জন্যেই তৈরি হয়ে এসেছিলেন।

'কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে হীরা জহরতগুলো আত্মসাৎ করবার ফুরসৎ হল না। ইতিমধ্যে নীচে স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, তিনি এসে দোর ঠেলাঠেলি করছিলেন।

'তাড়াতাড়ি জামাইবাবু একটিমাত্র জহরত বার করে নিয়ে সে-রাত্রির মত প্রস্থান করলেন। বাকিগুলো যথাস্থানেই রয়ে গেল।

'বৈকুণ্ঠবাবু জহরতগুলি রাখতেন বড় অদ্ভুত জায়গায় অর্থাৎ ঘরের দেয়ালে। দেয়ালের চুন-সুরকি খুঁড়ে সামান্য গর্ত করে, তাতেই মণিটা রেখে, আবার চুন দিয়ে গর্ত ভরাট করে দিতেন। তাঁর পানের বাটায় যথেষ্ট চুন থাকত, কোন হাঙ্গামা ছিল না। বার করবার প্রয়োজন হলে কানখুস্কির সাহায্যে চুন খুঁড়ে বার করে নিতেন।

'জামাইবাবু একটি জহরত দেয়াল থেকে বার করে নিয়ে যাবার আগে গর্তটা তাড়াতাড়ি চুন দিয়ে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে কাজ ভাল হয় না, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ চুনের ওপর আঁকা রয়ে গেল।

'বৈকুণ্ঠবাবু তাঁর মণি-মুক্তা কোথায় রাখেন, এ প্রশ্নটা প্রথমে আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর সেদিন এঘরে পায়চারি করতে করতে যখন ঐ আঙুলের টিপ চোখে পড়ল, তখন এক মুহূর্তে সমস্ত বুঝতে পারলুম। এই ঘরের দেয়ালে যত্রতত্র চুনের প্রলেপের আড়ালে আড়াই লক্ষ টাকার জহরত লুকোনো আছে। এমনভাবে লুকোনো আছে যে খুব ভাল করে দেয়ালে পরীক্ষা না করলে কেউ ধরতে পারবে না। শশাঙ্ক, তোমাকে মেহনৎ করে এই পঞ্চাশটি জহরত বার করতে হবে। আমার আর সময় নেই, নইলে আমিই বার করে দিতুম। তবু পেন্সিল দিয়ে দেয়ালে ঢ্যারা দিয়ে রেখেছি, তোমার কোনো কষ্ট হবে না।

'যাক। তাহলে আমরা জানতে পারলুম যে, জামাই বৈকুণ্ঠবাবুকে খুন করে একটা জহরত নিয়ে গেছে। এবং অন্যগুলো হস্তগত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু জামাই লোকটা কে ? নিশ্চয় সে এই শহরেই থাকে এবং সম্ভবত আমাদের পরিচিত। তার আঙুলের ছাপ আমরা পেয়েছি বটে কিন্তু কেবলমাত্র আঙুলের ছাপ দেখে শহরসুদ্ধ লোকের ভিতর থেকে একজনকে খুঁজে বার করা যায় না। তবে উপায় ?

'সেদিন প্ল্যাঞ্চেট টেবিলে সুযোগ পেলুম। টেবিলে ভূতের আবির্ভাব হল। আমি বুঝলুম আমাদেরই মধ্যে একজন টেবিল নাড়ছেন এবং তিনি হত্যাকারী ; ভূতের কথাগুলোই তার শ্রেষ্ঠ

প্রমাণ। একটা ছুতো করে আমি আপনাদের সকলের হাত পরীক্ষা করে দেখলুম। শৈলেনবাবুর সঙ্গে আঙুলের দাগ মিলে গেল।

'সুতরাং শৈলেনবাবুই যে হত্যাকারী তাতে আর সন্দেহ রইল না। আপনাদেরও বোধহয় আর সন্দেহ নেই। বরদাবাবুর শিষ্য হয়ে শৈলেনবাবুর কাজ হাসিল করবার খুব সুবিধা হয়েছিল। লোকটি বাইরে বেশ নিরীহ আর মিষ্টভাষী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাঘের মত ক্রূর আর নিষ্ঠুর। দয়ামায়ার স্থান ওর হৃদয়ে নেই।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। সকলে কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। তারপর অমূল্যবাবু প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন,'আঃ—বাঁচলুম। ব্যোমকেশবাবু, আর কিছু না হোক বরদার ভূতের হাত থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। যে রকম করে তুলেছিল—আর একটু হলে আমিও ভূতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম আর কি ; আপনি বরদার ভূতের রোজা, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

সকলে হাসিলেন। বরদাবাবু বিড়বিড় করিয়া গলার মধ্যে কি বলিলেন ; শুনিয়া অমূল্যবাবু বলিলেন, 'ওটা কি বললে ? সংস্কৃত বুলি আওড়াচ্ছ মনে হল।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'মৌক্তিকং ন গজে গজে। একটা হাতির মাথায় গজমুক্তা পাওয়া গেল না বলে গজমুক্তা নেই একথা সিদ্ধ হয় না।'

অমূল্যবাবু বলিলেন, 'গজের মাথায় কি আছে কখনো তল্লাস করিনি, কিন্তু তোমার মাথায় যা আছে তা আমরা সবাই জানি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'সতেরো মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এবার তাহলে উঠলুম—নমস্কার। তারাশঙ্করবাবুর কাছে আগেই বিদায় নিয়ে এসেছি—মহাপ্রাণ লোক। তাঁকে আবার আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাবেন। এস অজিত।'

চিত্রচোর

১

কাচের পেয়ালায় ডালিমের রস লইয়া সত্যবতী ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'নাও, এটুকু খেয়ে ফেল।'

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম বেলা ঠিক চারিটা। সত্যবতীর সময়ের নড়চড় হয় না।

ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় বসিয়া বই পড়িতেছিল, কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে পেয়ালার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'রোজ রোজ ডালিমের রস খাব কেন?'

সত্যবতী বলিল, 'ডাক্তারের হুকুম।'

ব্যোমকেশ ভ্রূকুটিকুটিল মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, 'ডাক্তারের নিকুচি করেছে। ও খেতে আমার ভাল লাগে না। কি হবে খেয়ে?'

সত্যবতী বলিল, 'গায়ে রক্ত হবে। লক্ষ্মীটি, খেয়ে ফেল।'

ব্যোমকেশ চকিতে একবার সত্যবতীর মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিল, প্রশ্ন করিল, 'আজ রাত্তিরে কি খেতে দেবে?'

সত্যবতী বলিল, 'মুর্গীর সুরুয়া আর টোস্ট।'

ব্যোমকেশের ভ্রূকুটি গভীর হইল, 'হুঁ, সুরুয়া। —আর মুর্গীটা খাবে কে?'

সত্যবতী মুখ টিপিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো।'

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'শুধু ঠাকুরপো নয়, তোমার অর্ধাঙ্গিনীও ভাগ পাবেন।'

ব্যোমকেশ আমার পানে একবার চোখ পাকাইয়া তাকাইল, তারপর বিকৃত মুখে ডালিমের রসটুকু খাইয়া ফেলিল।

কয়েকদিন হইল ব্যোমকেশকে লইয়া সাঁওতাল পরগণার একটি শহরে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছি। কলিকাতায় ব্যোমকেশ হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিল; দুই মাস যমে-মানুষে টানাটানির পর তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছি। রোগীর সেবা করিয়া সত্যবতী কাঠির মত রোগা হইয়া গিয়াছিল, আমার অবস্থাও কাহিল হইয়াছিল। তাই ডাক্তারের পরামর্শে পৌষের গোড়ার দিকে সাঁওতাল পরগণার প্রাণপ্রদ জলহাওয়ার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখানে আসিয়া ফলও মন্ত্রের মত হইয়াছে। আমার ও সত্যবতীর শরীর তো চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছেই, ব্যোমকেশের শরীরেও দ্রুত রক্তসঞ্চার হইতেছে এবং অসম্ভব রকম ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়াছে। দীর্ঘ রোগভোগের পর তাহার স্বভাব অবুঝ বালকের ন্যায় হইয়া গিয়াছে; সে দিবারাত্র খাই-খাই করিতেছে। আমরা দু'জনে অতি কষ্টে তাহাকে সামলাইয়া রাখিয়াছি।

এখানে আসিয়া অবধি মাত্র দুইজন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছে। এক, অধ্যাপক আদিনাথ সোম; তাঁহার বাড়ির নীচের তলাটা আমরা ভাড়া লইয়াছি। দ্বিতীয়, এখানকার স্থানীয় ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক। রোগী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, তাই সর্বাগ্রে ডাক্তারের সহিত পরিচয় করিয়া রাখা প্রয়োজন মনে হইয়াছে।

শহরে আরও অনেকগুলি বাঙালী আছেন কিন্তু কাহারও সহিত এখনও আলাপের সুযোগ হয় নাই। এ কয়দিন বাড়ির বাহির হইতে পারি নাই, নূতন স্থানে আসিয়া গোছগাছ করিয়া বসিতেই

দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ প্রথম সুযোগ হইয়াছে ; শহরের একটি গণ্যমান্য বাঙালীর বাড়িতে চা-পানের নিমন্ত্রণ আছে। আমরা যদিও এখানে আসিয়া নিজেদের জাহির করিতে চাহি নাই, তবু কাঁঠালী চাঁপার সুগন্ধের মত ব্যোমকেশের আগমন-বার্তা শহরে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে চায়ের নিমন্ত্রণ আসিয়াছে।

ব্যোমকেশকে এত শীঘ্র চায়ের পার্টিতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না ; কিন্তু দীর্ঘকাল ঘরে বন্ধ থাকিয়া সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে ; ডাক্তারও ছাড়পত্র দিয়াছেন। সুতরাং যাওয়াই স্থির হইয়াছে।

আরাম-কেদারায় বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে ব্যোমকেশ উসখুস করিতেছিল এবং বারবার ঘড়ির পানে তাকাইতেছিল। আমি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া অলসভাবে সিগারেট টানিতেছিলাম ; সাঁওতাল পরগণার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। এখানে শুষ্কতার সহিত শ্যামলতার, প্রাচুর্যের সহিত রিক্ততার নিবিড় মিলন ঘটিয়াছে ; মানুষের সংস্পর্শ এখানকার কঙ্করময় মাটিকে গলিত পঙ্কিল করিয়া তুলিতে পারে নাই।

ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'রিক্‌শা কখন আসতে বলেছ ?'

বলিলাম, 'সাড়ে চারটে।'

ব্যোমকেশ আর একবার ঘড়ির পানে তাকাইয়া পুস্তকের দিকে চোখ নামাইল। বুঝিলাম ঘড়ির কাঁটার মন্থর আবর্তন তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। হাসিয়া বলিলাম, 'রাই ধৈর্যং রহু ধৈর্যং—।'

ব্যোমকেশ খিঁচাইয়া উঠিল, 'লজ্জা করে না ! আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট খাচ্ছ।'

অর্ধদগ্ধ সিগারেট জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। ব্যোমকেশ এখনও সিগারেট খাইবার অনুমতি পায় নাই ; সত্যবতী কঠিন দিব্য দিয়াছে—তাহার অনুমতি না পাইয়া সিগারেট খাইলে মাথা খাইবে, মরা মুখ দেখিবে। আমিও ব্যোমকেশের সম্মুখে সিগারেট খাইতাম না ; প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নেশাখোরকে লোভ দেখানোর মত পাপ আর নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যাইত।

২

ঠিক সাড়ে চারিটার সময় বাড়ির সদরে দুইটি সাইকেল-রিক্‌শা আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা প্রস্তুত ছিলাম ; সত্যবতীও ইতিমধ্যে সাজপোশাক করিয়া লইয়াছিল। আমরা বাহির হইলাম।

আমাদের বাড়ির একতলার সহিত দোতলার কোনও যোগ ছিল না, সদরের খোলা বারান্দার ওপাশ হইতে উপরের সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছিল। বাড়ির সম্মুখে খানিকটা মুক্ত স্থান, তারপর ফটক। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম আমাদের গৃহস্বামী অধ্যাপক সোম বিরক্তগম্ভীর মুখে ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।

অধ্যাপক সোমের বয়স বোধ করি চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া ত্রিশের বেশি বয়স মনে হয় না ; তাঁহার আচার-ব্যবহারেও প্রৌঢ়ত্বের ছাপ নাই। সব কাজেই চটপটে উৎসাহশীল। কিন্তু তাঁহার জীবনে একটি কাঁটা ছিল, সেটি তাঁর স্ত্রী ! দাম্পত্য জীবনে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

প্রোফেসর সোম বাহিরে যাইবার উপযোগী সাজগোজ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আমাদের দেখিয়া করুণ হাসিলেন। তিনি চায়ের নিমন্ত্রণে যাইবেন জানিতাম, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাঁড়িয়ে যে ! যাবেন না ?'

প্রোফেসর সোম একবার নিজের বাড়ির দ্বিতলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'যাব ! কিন্তু গিন্নীর এখনও প্রসাধন শেষ হয়নি। আপনারা এগোন।'

আমরা রিক্‌শাতে চড়িয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী একটাতে বসিল, অন্যটাতে আমি একা। ঘণ্টি বাজাইয়া মনুষ্য-চালিত ত্রিচক্র-যান ছাড়িয়া দিল। ব্যোমকেশের মুখে হাসি ফুটিল। সত্যবতী সযত্নে তাহার গায়ে শাল জড়াইয়া দিল। অতর্কিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া না যায়।

কাঁকর-ঢাকা উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়া দুই দিক দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। রাস্তার দু'ধারে ঘরবাড়ির ভিড় নাই, এখানে একটা ওখানে একটা। শহরটি যেন হাত-পা ছড়াইয়া অসমতল পাহাড়তলির উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে, গাদাগাদি ঠেসাঠেসি নাই। আয়তনে বিস্তৃত হইলেও নগরের জনসংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু সমৃদ্ধি আছে। আশেপাশে কয়েকটি অভ্রের খনি এখানকার সমৃদ্ধির প্রধান সূত্র। আদালত আছে, ব্যাঙ্ক আছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা গণ্যমান্য তাঁরা প্রায় সকলেই বাঙালী।

যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহার নাম মহীধর চৌধুরী। অধ্যাপক সোমের কাছে শুনিয়াছি ভদ্রলোক প্রচুর বিত্তশালী ; বয়সে প্রবীণ হইলেও সর্বদাই নানাপ্রকার হুজুগ লইয়া আছেন ; অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত। তাঁহার প্রযোজনায় চড়ুইভাতি, শিকার, খেলাধূলা লাগিয়াই আছে।

মিনিট দশ পনেরোর মধ্যে তাঁহার বাসভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রায় দশ বিঘা জমি পাথরের পাঁচিল দিয়া ঘেরা, হঠাৎ দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। ভিতরে রকমারি গাছপালা, মরসুমী ফুলের কেয়ারি, উঁচু-নীচু পাথুরে জমির উপর কোথাও লাল-মাছের বাঁধানো সরোবর, কোথাও নিভৃত বেতসকুঞ্জ, কোথাও বা কৃত্রিম ক্রীড়াশৈল। সাজানো বাগান দেখিয়া সহসা বনানীর বিভ্রম উপস্থিত হয়। মহীধরবাবু যে ধনবান তাহা তাঁহার বাগান দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না।

বাড়ির সম্মুখে ছাঁটা ঘাসের সমতল টেনিস কোর্ট, তাহার উপর টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সাজাইয়া নিমন্ত্রিতদের বসিবার স্থান হইয়াছে, শীতের বৈকালী রৌদ্র স্থানটিকে আতপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর দোতলা বাড়িটি যেন এই দৃশ্যের পশ্চাৎপট রচনা করিয়াছে। আমরা উপস্থিত হইলে মহীধরবাবু সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ভদ্রলোকের দেহায়তন বিপুল, গৌরবর্ণ দেহ, মাথায় সাদা চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, দাড়ি-গোঁফ কামানো গাল দু'টি চালতার মত, মুখে ফুটিফাটা হাসি। দেখিলেই মনে হয় অমায়িক ও সরল প্রকৃতি লোক।

তিনি তাঁহার মেয়ে রজনীর সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটির বয়স কুড়ি-একুশ, সুশ্রী গৌরাঙ্গী হাস্যমুখী ; ভাসা-ভাসা চোখ দু'টিতে বুদ্ধি ও কৌতুকের খেলা। মহীধরবাবু বিপত্নীক, এই মেয়েটি তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল এবং উত্তরাধিকারিণী।

রজনী মুহূর্তমধ্যে সত্যবতীর সহিত ভাব করিয়া ফেলিল এবং তাহাকে লইয়া দূরের একটা সোফাতে বসাইয়া গল্প জুড়িয়া দিল। আমরাও বসিলাম। অতিথিরা এখনও সকলে আসিয়া উপস্থিত হন নাই, কেবল ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক ও আর একটি ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ডাক্তার ঘটক আমাদের পরিচিত, পূর্বেই বলিয়াছি ; অন্য ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ হইল। এঁর নাম নকুলেশ সরকার ; শহরের একজন মধ্যম শ্রেণীর ব্যবসাদার, তা ছাড়া ফটোগ্রাফির দোকান আছে। ফটোগ্রাফি করেন শখের জন্য, উপরন্তু এই সূত্রে কিছু-কিঞ্চিৎ উপার্জন হয়। শহরে অন্য ফটোগ্রাফার নাই।

সাধারণভাবে কথাবার্তা হইতে লাগিল। মহীধরবাবু এক সময় ডাক্তার ঘটককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ওহে ঘোটক, তুমি অ্যাদ্দিনেও ব্যোমকেশবাবুকে চাঙ্গা করে তুলতে পারলে না! তুমি দেখছি নামেও ঘোটক কাজেও ঘোটক—একেবারে ঘোড়ার ডাক্তার!' বলিয়া নিজের রসিকতায় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নকুলেশবাবু ফোড়ন দিয়া বলিলেন, 'ঘোড়ার ডাক্তার না হয়ে উপায় আছে? একে অশ্বিনী তায় ঘোটক।'

ডাক্তার ইহাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, সে একটু হাসিয়া রসিকতা হজম করিল। ডাক্তারকে লইয়া অনেকেই রঙ্গ-রসিকতা করে দেখিলাম, কিন্তু তাহার চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে সকলেই শ্রদ্ধাশীল। শহরে আরও কয়েকজন প্রবীণ চিকিৎসক আছেন, কিন্তু এই তরুণ সৎস্বভাব

ডাক্তারটি মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে বেশ পসার জমাইয়া তুলিয়াছে।

ক্রমে অন্যান্য অতিথিরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে আসিলেন সস্ত্রীক সপুত্র উষানাথ ঘোষ। ইনি একজন ডেপুটি, এখানকার সরকারী মালখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। লম্বা-চওড়া চেহারা, খসখসে কালো রঙ, চোখে কালো কাচের চশমা। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, গম্ভীরভাবে থামিয়া থামিয়া কথা বলেন, গম্ভীরভাবে হাসেন। তাঁহার স্ত্রীর চেহারা রুগ্ন, মুখে উৎকণ্ঠার ভাব, থাকিয়া থাকিয়া স্বামীর মুখের পানে উদ্বিগ্ন চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন। ছেলেটি বছর পাঁচেকের; তাহাকে দেখিয়াও মনে হয় যেন সর্বদা শঙ্কিত সঙ্কুচিত হইয়া আছে। উষানাথবাবু সম্ভবত নিজের পরিবারবর্গকে কঠিন শাসনে রাখেন, তাঁহার সম্মুখে কেহ মাথা তুলিয়া কথা বলিতে পারে না।

মহীধরবাবু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলে তিনি গম্ভীর মুখে গলার মধ্যে দুই চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন; বোধ হয় তাহা লৌকিক সম্ভাষণ, কিন্তু আমরা কিছু শুনিতে পাইলাম না। তাঁহার চক্ষু দুইটি কালো কাচের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া রহিল। একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। যাহার চোখ দেখিতে পাইতেছি না এমন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ নাই।

তারপর আসিলেন পুলিসের ডি.এস.পি. পুরন্দর পাণ্ডে। ইনি বাঙালী নন, কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলেন; বাঙালীর সহিত মেলামেশা করিতেও ভালবাসেন। লোকটি সুপুরুষ, পুলিসের সাজ-পোশাকে দিব্য মানাইয়াছে। ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'আপনি এসেছেন, কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য একটি জটিল রহস্য দিয়ে যে আপনাকে সংবর্ধনা করব তার উপায় নেই। আমাদের এলাকায় রহস্য জিনিসটার একান্ত অভাব। সব খোলাখুলি। চুরি-বাটপাড়ি যে হয় না তা নয়, কিন্তু তাতে বুদ্ধি খেলাবার অবকাশ নেই।'

ব্যোমকেশও হাসিয়া বলিল, 'সেটা আমার পক্ষে ভালই। জটিল রহস্য এবং আরও অনেক লোভনীয় বস্তু থেকে আমি উপস্থিত বঞ্চিত; ডাক্তারের বারণ।'

এই সময় আর একজন অতিথি দেখা দিলেন। ইনি স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। কৃশ ব্যক্তিত্বহীন চেহারা, তাই বোধ করি মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখিয়া চেহারায় একটু বৈশিষ্ট্য দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বয়স যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি একটা অনির্দিষ্ট স্থানে।

মহীধরবাবু বলিলেন, 'অমরেশবাবু, আপনি ব্যোমকেশবাবুকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন—এই নিন।'

অমরেশবাবু নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'কীর্তিমান পুরুষকে দেখবার ইচ্ছা কার না হয়? আপনারাও কম ব্যস্ত হননি, শুধু আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'কিন্তু আজ আসতে বড় দেরি করেছেন। সকলেই এসে গেছেন, কেবল প্রোফেসর সোম বাকি। তা তাঁর না হয় একটা ওজুহাত আছে। মেয়েদের সাজসজ্জা করতে একটু দেরি হয়। আপনার সে ওজুহাতও নেই। ব্যাঙ্ক তো সাড়ে তিনটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে।'

অমরেশ রাহা বলিলেন, 'তাড়াতাড়ি আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু বড়দিন এসে পড়ল, এখন কাজের চাপ একটু বেশি। বছর ফুরিয়ে আসছে। নূতন বছর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো আপনারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে আরম্ভ করবেন। তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে তো।'

ইতিমধ্যে কয়েকজন ভৃত্য বাড়ির ভিতর হইতে বড় বড় ট্রেতে করিয়া নানাবিধ খাদ্য-পানীয় আনিয়া টেবিলগুলির উপর রাখিতেছিল; চা, কেক্, সন্দেশ, পাঁপরভাজা, ডালমুট ইত্যাদি। রজনী উঠিয়া গিয়া খাবারের প্লেটগুলি পরিবেশন করিতে লাগিল। কেহ কেহ নিজেই গিয়া প্লেট তুলিয়া লইয়া আহার আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসি গল্প আলাপ-আলোচনা চলিল।

রজনী মিষ্টান্নের একটি প্লেট লইয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে দাঁড়াইল, হাসিমুখে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একটু জলযোগ।'

ব্যোমকেশ আড়চোখে একবার সত্যবতীর দিকে তাকাইল, দেখিল সত্যবতী দূর হইতে একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে। ব্যোমকেশ ঘাড় চুলকাইয়া বলিল, 'আমাকে মাপ করতে হবে।

এসব আমার চলবে না।'

মহীধরবাবু ঘুরিয়া ফিরিয়া খাওয়া তদারক করিতেছিলেন, বলিলেন, 'সে কি কথা ! একেবারেই চলবে না ? একটু কিছু— ? ওহে, ডাক্তার, তোমার রোগীর কি কিছুই খাবার হুকুম নেই ?'

ডাক্তার টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া এক মুঠি ডালমুট মুখে ফেলিয়া চিবাইতেছিল, বলিল, 'না খেলেই ভাল।'

ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল, 'শুনলেন তো ! আমাকে শুধু এক পেয়ালা চা দিন। ভাববেন না, আবার আমরা আসব ; আজকের আসাটা মুখবন্ধ মাত্র।'

মহীধরবাবু খুশি হইয়া বলিলেন, 'আমার বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা কেউ না কেউ পায়ের ধুলো দেন। আপনারাও যদি মাঝে মাঝে আসেন সান্ধ্য-বৈঠক জমবে ভাল।'

এতক্ষণে অধ্যাপক সোম সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিলেন। সোমের একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব। বস্তুত লজ্জা না হওয়াই আশ্চর্য। সোম-পত্নী মালতী দেবীর বর্ণনা আমরা এখনও দিই নাই, কিন্তু আর না দিলে নয়। বয়সে তিনি স্বামীর প্রায় সমকক্ষ ; কালো মোটা শরীর, থলথলে গড়ন, ভাঁটার মত চক্ষু সর্বদাই গর্বিতভাবে ঘুরিতেছে ; মুখশ্রী দেখিয়া কেহ মুগ্ধ হইবে সে সম্ভাবনা নাই। উপরন্তু তিনি সাজ-পোশাক করিয়া থাকিতে ভালবাসেন। আজ যেরূপ সর্বালঙ্কার ভূষিতা হইয়া চায়ের জলসায় আসিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরাদেরও চমক লগিবার কথা। পরিধানে ডগ্‌ডগে লাল মাদ্রাজী সিল্কের শাড়ি, তার উপর সর্বাঙ্গে হীরা-জহরতের গহনা। তাঁহার পাশে সোমের কুণ্ঠিত ম্রিয়মাণ মূর্তি দেখিয়া আমাদেরই লজ্জা করিতে লাগিল।

রজনী তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাদের অর্ভ্যথনা করিল, কিন্তু মালতী দেবীর মুখে হাসি ফুটিল না। তিনি বক্রচক্ষে রজনীর মুখ হইতে স্বামীর মুখ পর্যন্ত দৃষ্টির একটি কশাঘাত করিয়া চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

খাওয়া এবং গল্প চলিতে লাগিল। ব্যোমকেশ মুখে শহীদের ন্যায় ভাবব্যঞ্জনা ফুটাইয়া চুমুক দিয়া দিয়া চা খাইতেছে ; আমি নকুলেশবাবুর সহিত আলাপ করিতে করিতে পানাহার করিতেছি ; উষানাথবাবু গম্ভীরমুখে পুরন্দর পাণ্ডের কথা শুনিতে শুনিতে ঘাড় নাড়িতেছেন ; তাঁহার ছেলেটি লুব্ধভাবে খাবারের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইয়া শঙ্কিত-মুখে আবার ফিরিয়া আসিতেছে ; তাহার মা খাবারের একটি প্লেট হাতে ধরিয়া পর্যায়ক্রমে ছেলে ও স্বামীর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এই সময় বাক্যালাপের মিলিত কলস্বরের মধ্যে মহীধরবাবুর ঈষদুচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল, 'মিস্টার পাণ্ডে খানিক আগে বলছিলেন যে আমাদের এলাকায় জটিল রহস্যের একান্ত অভাব। একথা কতদূর সত্য আপনারাই বিচার করুন। কাল রাত্রে আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।'

স্বরগুঞ্জন নীরব হইল ; সকলের দৃষ্টি গিয়া পড়িল মহীধরবাবুর উপর। তিনি হাস্যবিকশিত মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, যেন সংবাদটা ভারি কৌতুকপ্রদ।

অমরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিছু চুরি গেছে নাকি ?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'সেইটেই জটিল রহস্য। ড্রয়িংরুমের দেয়াল থেকে একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ চুরি গেছে। রাত্রে কিছু জানতে পারিনি, সকালবেলা দেখলাম ছবি নেই · আর একটা জানালা খোলা রয়েছে।'

পুরন্দর পাণ্ডে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'ছবি ! কোন্ ছবি ?'

'একটা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ। মাসখানেক আগে আমরা পিক্‌নিকে গিয়েছিলাম, সেই সময় নকুলেশবাবু তুলেছিলেন।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'হুঁ। আর কিছু চুরি করেনি ? ঘরে দামী জিনিস কিছু ছিল ?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'কয়েকটা রূপোর ফুলদানী ছিল ; তা ছাড়া পাশের ঘরে অনেক রূপোর বাসন ছিল। চোর এসব কিছু না নিয়ে শ্রেফ একটি ফটো নিয়ে পালাল। বলুন দেখি জটিল রহস্য কি না ?'

পাণ্ডে তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া বলিলেন, 'জটিল রহস্য মনে করতে চান মনে করতে পারেন। আমার তো মনে হয় কোন জংলী সাঁওতাল জানালা খোলা পেয়ে ঢুকেছিল, তারপর ছবির সোনালী ফ্রেমের লোভে ছবিটা নিয়ে গেছে।'

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার কি মনে হয় ?'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ ইহাদের সওয়াল জবাব শুনিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু অলসভাবে চারিদিকে ঘুরিতেছিল, সে এখন একটু সচেতন হইয়া বলিল, 'মিস্টার পাণ্ডে ঠিকই ধরেছেন মনে হয়। নকুলেশবাবু, আপনি ছবি তুলেছিলেন ?'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। ছবিখানা ভাল হয়েছিল। তিন কপি ছেপেছিলাম। তার মধ্যে এক কপি মহীধরবাবু নিয়েছিলেন—'

ঊষানাথবাবু গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'আমিও একখানা কিনেছিলাম।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার ছবিখানা আছে তো ?'

ঊষানাথবাবু বলিলেন, 'কি জানি। অ্যাল্‌বামে রেখেছিলাম, তারপর আর দেখিনি। আছে নিশ্চয়।'

'আর তৃতীয় ছবিটি কে নিয়েছিলেন নকুলেশবাবু ?'

'প্রোফেসর সোম।'

আমরা সকলে সোমের পানে তাকাইলাম। তিনি এতক্ষণ নির্জীবভাবে স্ত্রীর পাশে বসিয়াছিলেন, নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ; তাঁহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। সোম-গৃহিণীর কিন্তু কোন প্রকার ভাবান্তর দেখা গেল না ; তিনি কষ্টিপাথরের যক্ষিণীমূর্তির ন্যায় অটল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার ছবিটা নিশ্চয় আছে !'

সোম উত্তপ্তমুখে বলিলেন, 'অ্যাঁ—তা—বোধ হয়—ঠিক বলতে পারি না—'

তাঁহার ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয়, তিনি এমন অসম্বৃত হইয়া পড়িলেন কেন ?

তাঁহাকে সঙ্কটাবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন অমরেশবাবু, হাসিয়া বলিলেন, 'তা গিয়ে থাকে যাক গে, আর একখানা নেবেন। নকুলেশবাবু, আমারও কিন্তু একখানা চাই। আমিও গ্রুপে ছিলাম।'

নকুলেশবাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, 'ও ছবিটা আর পাওয়া যাবে না। নেগেটিভও খুঁজে পাচ্ছি না।'

'সে কি ! কোথায় গেল নেগেটিভ ?'

দেখিলাম, ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নকুলেশবাবুর পানে চাহিয়া আছে। তিনি বলিলেন, 'আমার স্টুডিওতে অন্যান্য নেগেটিভের সঙ্গে ছিল। আমি দিন দুয়েকের জন্যে কলকাতা গিয়েছিলাম, স্টুডিও বন্ধ ছিল ; ফিরে এসে আর সেটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'ভাল করে খুঁজে দেখবেন। নিশ্চয়ই কোথাও আছে, যাবে কোথায় !'

এ প্রসঙ্গ লইয়া আর কোনও কথা হইল না। এদিকে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। আমরা গাত্রোত্থানের উদ্যোগ করিলাম, কারণ সূর্যাস্তের পর ব্যোমকেশকে বাহিরে রাখা নিরাপদ নয়।

এই সময় দেখিলাম একটি প্রেতাকৃতি লোক কখন আসিয়া মহীধরবাবুর পাশে দাঁড়াইয়াছে এবং নিম্নস্বরে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। লোকটি যে নিমন্ত্রিত অতিথি নয় তাহা তাহার বেশবাস দেখিয়াই অনুমান করা যায়। দীর্ঘ কঙ্কালসার দেহে আধ-ময়লা ধুতি ও সুতির কামিজ, চক্ষু এবং গণ্ডস্থল কোটরপ্রবিষ্ট, যেন মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ। তবু লোকটি যে ভদ্রশ্রেণীর তাহা বোঝা যায়।

মহীধরবাবু আমার অনতিদূরে উপবিষ্ট ছিলেন, তাই তাঁহাদের কথাবার্তা কানে আসিল। মহীধরবাবু একটু অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, 'আবার কি চাই বাপু ? এই তো পরশু তোমাকে টাকা

দিয়েছি।'

লোকটি ব্যগ্র-বিহ্বল স্বরে বলিল, 'আজ্ঞে, আমি টাকা চাই না। আপনার একটা ছবি এঁকেছি, তাই দেখাতে এনেছিলাম।'

'আমার ছবি !'

লোকটির হাতে এক তা পাকানো কাগজ ছিল, সে তাহা খুলিয়া মহীধরবাবুর চোখের সামনে ধরিল।

মহীধরবাবু সবিস্ময়ে ছবির পানে চাহিয়া রহিলেন। আমারও কৌতূহল হইয়াছিল, উঠিয়া গিয়া মহীধরবাবুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইলাম।

ছবি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সাদা কাগজের উপর ক্রেয়নের আঁকা ছবি, মহীধরবাবুর বুক পর্যন্ত প্রতিকৃতি ; পাকা হাতের নিঃসংশয় কয়েকটি রেখায় মহীধরবাবুর অবিকল চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমার দেখাদেখি রজনীও আসিয়া পিতার পিছনে দাঁড়াইল এবং ছবি দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল, 'বা ! কি সুন্দর ছবি !'

তখন আরও কয়েকজন আসিয়া জুটিলেন। ছবিখানা হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল এবং সকলের মুখেই প্রশংসা গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত চিত্রকর অদূরে দাঁড়াইয়া গদ্‌গদ্‌ মুখে দুই হাত ঘষিতে লাগিল।

মহীধরবাবু তাহাকে বলিলেন, 'তুমি তো খাসা ছবি আঁকতে পার। তোমার নাম কি ?'

চিত্রকর বলিল, 'আজ্ঞে, আমার নাম ফাল্গুনী পাল।'

মহীধরবাবু পকেট হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, 'বেশ বেশ। ছবিখানি আমি নিলাম। এই নাও তোমার পুরস্কার।'

ফাল্গুনী পাল কাঁকড়ার মত হাত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ নোট পকেটস্থ করিল।

পুরন্দর পাণ্ডে ললাট কুঞ্চিত করিয়া ছবিখানা দেখিতেছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলিয়া ফাল্গুনীকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি ওঁর ছবি আঁকলে কি করে ? ফটো থেকে ?'

ফাল্গুনী বলিল, 'আজ্ঞে, না। ওঁকে পরশুদিন একবার দেখেছিলাম—তাই—'

'একবার দেখেছিলে তাতেই ছবি এঁকে ফেললে ?'

ফাল্গুনী আমতা-আমতা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আমি পারি। আপনি যদি হুকুম দেন আপনার ছবি এঁকে দেব।'

পাণ্ডে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, বেশ। তুমি যদি আমার ছবি এঁকে আনতে পার, আমিও তোমাকে দশ টাকা বক্‌শিস দেব।'

ফাল্গুনী পাল সবিনয়ে সকলকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। পাণ্ডে ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'দেখা যাক। আমি ওঁদের পিক্‌নিক গ্রুপে ছিলাম না।'

ব্যোমকেশ অনুমোদনসূচক ঘাড় নাড়িল।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল। মহীধরবাবুর মোটর আমাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল। সোম-দম্পতিও আমাদের সঙ্গে ফিরিলেন।

৩

রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় আমরা তিনজন বসিবার ঘরে দোরতাড়া বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম। নৈশ আহারের এখনও বিলম্ব আছে, ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় বসিয়া বলবর্ধক ডাক্তারি মদ্য চুমুক দিয়া পান করিতেছে ; সত্যবতী তাহার পাশে একটা চেয়ারে র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বসিয়াছে। আমি সম্মুখে বসিয়া মাঝে মাঝে পকেট হইতে সিগারেটের ডিবা বাহির করিতেছি,

আবার রাখিয়া দিতেছি। ব্যোমকেশের গঞ্জনা খাইবার আর ইচ্ছা নাই। চায়ের জলসার আলোচনাই হইতেছে।

আমি বলিলাম, 'আমরা শিল্প-সাহিত্যের কত আদর করি ফাল্গুনী পাল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। লোকটা সত্যিকার গুণী, অথচ পেটের দায়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।'

ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক ছিল, বলিল, 'পেটের দায়ে ভিক্ষে করছে তুমি জানলে কি করে ?'

বলিলাম, 'ওর চেহারা আর কাপড়-চোপড় দেখে পেটের অবস্থা আন্দাজ করা শক্ত নয়।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, 'শক্ত নয় বলেই তুমি ভুল আন্দাজ করেছ। তুমি সাহিত্যিক, শিল্পীর প্রতি তোমার সহানুভূতি স্বাভাবিক। কিন্তু ফাল্গুনী পালের শারীরিক দুর্গতির কারণ অন্নাভাব নয়। আসলে খাদ্যের চেয়ে পানীয়ের প্রতি তার টান বেশি।'

'অর্থাৎ মাতাল ? তুমি কি করে বুঝলে ?'

'প্রথমত, তার ঠোঁট দেখে। মাতালের ঠোঁট যদি লক্ষ্য কর, দেখবে বৈশিষ্ট্য আছে ; একটু ভিজে ভিজে, একটু শিথিল—ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু দেখলে বুঝতে পারি। দ্বিতীয়ত, ফাল্গুনী যদি ক্ষুধার্ত হয় তাহলে খাদ্যদ্রব্যগুলোর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করত, টেবিলের উপর তখনও প্রচুর খাবার ছিল। কিন্তু ফাল্গুনী সেদিকে একবার ফিরেও তাকাল না। তৃতীয়ত, আমার পাশ দিয়ে যখন চলে গেল তখন তার গায়ে মদের গন্ধ পেলাম। খুব স্পষ্ট নয়, তবু মদের গন্ধ।' বলিয়া ব্যোমকেশ নিজের বলবর্ধক ঔষধটি তুলিয়া লইয়া এক চুমুক পান করিল।

সত্যবতী বলিল, 'যাক গে, মাতালের কথা শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু ছবি চুরির এ কি ব্যাপার গা ? আমি তো কিছু বুঝতেই পারলাম না। মিছিমিছি ছবি চুরি করবে কেন ?'

ব্যোমকেশ কতকটা আপন মনেই বলিল, 'হয়তো পাণ্ডেসাহেব ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু—। যদি তা না হয় তাহলে ভাববার কথা।...পিক্‌নিকে গ্রুপ ছবি তোলা হয়েছিল। আজ চায়ের পার্টিতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই পিক্‌নিকে ছিলেন—পাণ্ডে ছাড়া।...ছবির তিনটে কপি ছাপা হয়েছিল ; তার মধ্যে একটা চুরি গেছে, বাকি দুটো আছে কিনা জানা যায়নি—নেগেটিভটাও পাওয়া যাচ্ছে না।—' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ইনি ছবির কথায় এমন ঘাবড়ে গেলেন কেন বোঝা গেল না।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর আমি বলিলাম, 'কেউ যদি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিটা সরিয়ে থাকে তবে সে উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উদ্দেশ্য কি একটা অজ্ঞিত ? কে কোন্ মতলবে ফিরছে তা কি এত সহজে ধরা যায় ? গহনা কর্মণো গতিঃ। সেদিন একটা মার্কিন পত্রিকায় দেখেছিলাম, ওদের চিড়িয়াখানাতে এক বানর-দম্পতি আছে। পুরুষ বাঁদরটা এমনি হিংসুটে, কোনও পুরুষ-দর্শক খাঁচার কাছে এলেই বৌকে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে।'

সত্যবতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'তোমার যত সব আষাঢ়ে গল্প। বাঁদরের কখনও এত বুদ্ধি হয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা বুদ্ধি নয়, হৃদয়াবেগ ; সরল ভাষায় যৌন ঈর্ষা। মানুষের মধ্যেও যে ও-বস্তুটি আছে আশা করি তা অস্বীকার করবে না। পুরুষের মধ্যে তো আছেই, মেয়েদের মধ্যে আরও বেশি আছে। আমি যদি মহীধরবাবুর মেয়ে রজনীর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করি তোমার ভাল লাগবে না।'

সত্যবতী র‍্যাপারের একটা প্রান্ত ঠোঁটের উপর ধরিয়া নত চক্ষে চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'কিন্তু এই ঈর্ষার সঙ্গে ছবি চুরির সম্বন্ধটা কি ?'

'যেখানে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আছে সেখানেই এ ধরনের ঈর্ষা থাকতে পারে।' বলিয়া ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বমুখে ছাদের পানে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম, 'মোটিভ খুব জোরালো মনে হচ্ছে না। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে না কি ?'

'পারে। চিত্রকর ফাল্গুনী পাল চুরি করে থাকতে পারে। একটা মানুষকে একবার মাত্র দেখে সে ছবি আঁকতে পারে, তার এই দাবি সম্ভবত মিথ্যে। ফটো দেখে ছবি সহজেই আঁকা যায়। ফাল্গুনী সকলের চোখে চমক লাগিয়ে দিয়ে বেশি টাকা রোজগার করবার চেষ্টা করছে কিনা কে জানে!'

'হুঁ। আর কিছু?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'ফটোগ্রাফার নকুলেশবাবু স্বয়ং ছবি চুরি করে থাকতে পারেন।'

'নকুলেশবাবুর স্বার্থ কি?'

'তাঁর ছবি আরও বিক্রি হবে এই স্বার্থ।' বলিয়া ব্যোমকেশ মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

'এটা সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?'

'ব্যবসাদারের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। আমেরিকায় ফসলের দাম বাড়াবার জন্য ফসল পুড়িয়ে দেয়।'

'আচ্ছা। আর কেউ?'

'ঐ দলের মধ্যে হয়তো এমন কেউ আছে যে নিশ্চিহ্নভাবে নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চায়—'

'মানে—দাগী আসামী?'

এই সময় ঘরের বন্ধ দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল। আমি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। অধ্যাপক সোম গরম ড্রেসিং-গাউন পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে স্বাগত করিলাম। আমরা আসা অবধি তিনি প্রায় প্রত্যহ এই সময় একবার নামিয়া আসেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব হয়; তারপর আহারের সময় হইলে তিনি চলিয়া যান। তাঁহার গৃহিণী দিনের বেলা দু' একবার আসিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্যবতীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিবার আগ্রহ তাঁহার দেখা যায় নাই। সত্যবতীও মহিলাটির প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে নাই।

সোম আসিয়া বসিলেন। তাঁহাকে একটি সিগারেট দিয়া নিজে একটা ধরাইলাম। ব্যোমকেশের সাক্ষাতে ধূমপান করিবার এই একটা সুযোগ; সে খিঁচাইতে পারিবে না।

সোম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ পার্টি কেমন লাগল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ লাগল। সকলেই বেশ কর্ষিতচিত্ত ভদ্রলোক বলে মনে হল।'

সোম সিগারেটে একটা টান দিয়া বলিলেন, 'বাইরে থেকে সাধারণত তাই মনে হয়। কিন্তু সেকথা আপনার চেয়ে বেশি কে জানে? মিসেস বক্সী, আজ যাঁদের সঙ্গে আলাপ হল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কাকে ভাল লাগল বলুন।'

সত্যবতী নিঃসংশয়ে বলিল, 'রজনীকে। ভারি সুন্দর স্বভাব, আমার বড্ড ভাল লেগেছে।'

সোমের মুখে একটু অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল। সত্যবতী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলিল, 'যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি মিষ্টি কথা; আর ভারি বুদ্ধিমতী।—আচ্ছা, মহীধরবাবু এখনও মেয়ের বিয়ে কেন দিচ্ছেন না? ওঁর তো টাকার অভাব নেই।'

দ্বারের নিকট হইতে একটি তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিলাম—

'বিধবা! বিধবা! বিধবাকে কোন্ হিঁদুর ছেলে বিয়ে করবে?' মালতী দেবী কখন দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন জানিতে পারি নাই। সংবাদটি যেমন অপ্রত্যাশিত, সংবাদ-দাত্রীর আবির্ভাবও তেমনি বিস্ময়কর। হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। মালতী দেবী ঈর্ষাতিক্ত নয়নে আমাদের একে একে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বলিলেন, 'বিশ্বাস হচ্ছে না? উনি জানেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন। এখানে সবাই জানে। অতি বড় বেহায়া না হলে বিধবা মেয়ে আইবুড়ো সেজে বেড়ায় না। কিন্তু দু'কান কাটার কি লজ্জা আছে? অত যে ছলা-কলা ওসব পুরুষ ধরবার ফাঁদ।'

মালতী দেবী যেমন আচম্বিতে আসিয়াছিলেন তেমনি অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন। সিঁড়িতে তাঁর দুম্ দুম্ পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিভূত হইয়াছিলেন অধ্যাপক সোম। তিনি লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। শেষে তিনি বিড়ম্বিত মুখ তুলিয়া দীনকণ্ঠে বলিলেন, 'আমাকে আপনারা মাপ করুন। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় কোথাও পালিয়ে যাই—' তাঁর স্বর বুজিয়া গেল।

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে প্রশ্ন করিল, 'রজনী সত্যিই বিধবা?'

সোম ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হ্যাঁ। চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়। মহীধরবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কৃতী ছাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের দু'দিন পরে প্লেনে চড়ে সে বিলেত যাত্রা করে; মহীধরবাবুই জামাইকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে বিলেত পর্যন্ত পৌঁছল না; পথেই বিমান দুর্ঘটনা হয়ে মারা গেল। রজনীকে কুমারী বলা চলে।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি সোমকে আর একটি সিগারেট দিলাম এবং দেশলাই জ্বালাইয়া ধরিলাম। সিগারেট ধরাইয়া সোম বলিলেন, 'আপনারা আমার পারিবারিক পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছেন। আমার জীবনের ইতিহাসও অনেকটা মহীধরবাবুর জামাইয়ের মত। গরীবের ছেলে ছিলাম এবং ভাল ছাত্র ছিলাম। বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় বিলেত যাই। কিন্তু উপসংহারটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের হল। আমি বিদ্যালাভ করে ফিরে এলাম এবং কলেজের অধ্যাপক হলাম। কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারলাম না। কাজ ছেড়ে দিয়ে আজ সাত বছর এখানে বাস করছি। অন্ন-বস্ত্রের অভাব নেই; আমার স্ত্রীর অনেক টাকা।'

কথাগুলিতে অন্তরের তিক্ততা ফুটিয়া উঠিল। আমি একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাজ ছেড়ে দিলেন কেন?'

সোম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'লজ্জায়। স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে স্ত্রীকে ঘরে বন্ধ করে রাখা যায় না—অথচ—। মাঝে মাঝে ভাবি, বিমান দুর্ঘটনাটা যদি রজনীর স্বামীর না হয়ে আমার হত সব দিক দিয়েই সুরাহা হত।'

সোম দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। ব্যোমকেশ পিছন হইতে বলিল, 'প্রোফেসর সোম, যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করি। যে গ্রুপ ছবিটা কিনেছিলেন সেটা কোথায়?'

সোম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'সেটা আমার স্ত্রী কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তাতে আমি আর রজনী পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম।'

সোম ধীরপদে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে আহারে বসিয়া বেশি কথাবার্তা হইল না। হঠাৎ এক সময় সত্যবতী বলিয়া উঠিল, 'যে যাই বলুক, রজনী ভারি ভাল মেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছে, বাপ যদি সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতে চান তাতে দোষ কি?'

ব্যোমকেশ একবার সত্যবতীর পানে তাকাইল, তারপর নির্লিপ্ত স্বরে বলিল, 'আজ পার্টিতে একটা সামান্য ঘটনা লক্ষ্য করলাম, তোমাদের বোধ হয় চোখে পড়েনি। মহীধরবাবু তখন ছবি চুরির গল্প আরম্ভ করেছেন, সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে। দেখলাম ডাক্তার ঘটক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, রজনী চুপি চুপি তার কাছে গিয়ে তার পকেটে একটা চিঠির মতন ভাঁজ-করা কাগজ ফেলে দিলে। দু'জনের মধ্যে একটা চকিত চাউনি খেলে গেল। তারপর রজনী সেখান থেকে সরে এল। আমার বোধ হয় আমি ছাড়া এ দৃশ্য আর কেউ লক্ষ্য করেনি। মালতী দেবীও না।'

৪

দিন পাঁচ ছয় কাটিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশের শরীর এই কয়দিনে আরও সারিয়াছে। তাহার আহার্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে; সত্যবতী তাহাকে দিনে দুইটা সিগারেট খাইবার অনুমতি দিয়াছে। আমি নিত্য গুরুভোজনের

ফলে দিন দিন খোদার খাসী হইয়া উঠিতেছি, সত্যবতীর গায়েও গত্তি লাগিয়াছে। এখন আমরা প্রত্যহ বৈকালে ব্যোমকেশকে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় পাদচারণ করি, কারণ হাওয়া বদলের ইহা একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সকলেই খুশি।

একদিন আমরা পথ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, অধ্যাপক সোম আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, বলিলেন, 'চলুন, আজ আমিও আপনাদের সহযাত্রী।'

সত্যবতী একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, 'মিসেস সোম কি— ?'

সোম প্রফুল্ল স্বরে বলিলেন, 'তাঁর সর্দি হয়েছে। শুয়ে আছেন।'

সোম মিশুক লোক, কেবল স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে একটু নির্জীব হইয়া পড়েন। আমরা নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ছবি চুরির প্রসঙ্গ আপনা হইতেই উঠিয়া পড়িল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা বলুন দেখি, ঐ ছবিখানা কাগজে বা পত্রিকায় ছাপানোর কোনও প্রস্তাব হয়েছিল কি ?'

সোম চকিতে একবার ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, 'কৈ, আমি তো কিছু জানি না। তবে নকুলেশবাবু মাঝে কলকাতা গিয়েছিলেন বটে। কিন্তু আমাদের না জানিয়ে তিনি ছবি ছাপতে দেবেন কি ? মনে হয় না। বিশেষত ডেপুটি ঊষানাথবাবু জানতে পারলে ভারি অসন্তুষ্ট হবেন।'

'ঊষানাথবাবু অসন্তুষ্ট হবেন কেন ?'

'উনি একটু অদ্ভুত গোছের লোক। বাইরে বেশ গ্রাম্ভারি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীরু প্রকৃতি। বিশেষত ইংরেজ মনিবকে* যমের মত ভয় করেন। সাহেবরা বোধ হয় চান না যে একজন হাকিম সাধারণ লোকের সঙ্গে ফটো তোলাবে, তাই ঊষানাথবাবুর ফটো তোলাতে ঘোর আপত্তি। মনে আছে, পিক্‌নিকের সময় তিনি প্রথমটা ফটোর দলে থাকতে চাননি, অনেক বলে-কয়ে রাজী করাতে হয়েছিল। এ ছবি যদি কাগজে ছাপা হয় নকুলেশবাবুর কপালে দুঃখ আছে।'

ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম সে মনে মনে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঊষানাথবাবু কি সব সময়েই কালো চশমা পরে থাকেন ?'

সোম বলিলেন, 'হ্যাঁ। উনি বছর দেড়েক হল এখানে বদলি হয়ে এসেছেন, তার মধ্যে আমি ওঁকে কখনও বিনা চশমায় দেখিনি। হয়তো চোখের কোনও দুর্বলতা আছে ; আলো সহ্য করতে পারেন না।'

ব্যোমকেশ ঊষানাথবাবু সম্বন্ধে আর কোনও প্রশ্ন করিল না। হঠাৎ বলিল, 'ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার লোকটি কেমন ?'

সোম বলিলেন, 'চতুর ব্যবসাদার, ঘটে বুদ্ধি আছে। মহীধরবাবুকে খোসামোদ করে চলেন, শুনেছি তাঁর কাছে টাকা ধার নিয়েছেন।'

'তাই নাকি ! কত টাকা ?'

'তা ঠিক জানি না। তবে মোটা টাকা।'

এই সময় সামনে ফট্‌ফট্ শব্দ শুনিয়া দেখিলাম একটি মোটর-বাইক আসিতেছে। আরও কাছে আসিলে চেনা গেল, আরোহী ডি.এস.পি. পুরন্দর পাণ্ডে। তিনিও আমাদের চিনিয়াছিলেন, মোটর-বাইক থামাইয়া সহাস্যমুখে অভিবাদন করিলেন।

কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ফাল্গুনী পাল আপনার ছবি এঁকেছে ?'

পাণ্ডে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'তাজ্জব ব্যাপার মশাই, পর দিনই ছবি নিয়ে হাজির। একেবারে হুবহু ছবি এঁকেছে। অথচ আমার ফটো তার হাতে যাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। সত্যি গুণী লোক। দশ টাকা খসাতে হল।'

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, 'কোথায় থাকে সে ?'

* যে সময়ের গল্প তখনও ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয় নাই।

পাণ্ডে বলিলেন, 'আর বলবেন না। অতবড় গুণী কিন্তু একেবারে হতভাগা। পাঁড় নেশাখোর—মদ গাঁজা গুলি কোকেন কিছুই বাদ যায় না। মাসখানেক এখানে এসেছে। এখানে এসে যেখানে সেখানে পড়ে থাকত, কোনও দিন কারুর বারান্দায়, কোনও দিন কারুর খড়ের গাদায় রাত কাটাত। মহীধরবাবু দয়া করে নিজের বাগানে থাকতে দিয়েছেন। ওঁর বাগানের কোণে একটা মেটে ঘর আছে, দু'দিন থেকে সেখানেই আছে।'

হতভাগ্য এবং চরিত্রহীন শিল্পীর যে-দশা হয় ফাল্গুনীরও তাহাই হইয়াছে। তবু কিছুদিনের জন্যও সে একটা আশ্রয় পাইয়াছে জানিয়া মনটা আশ্বস্ত হইল।

পাণ্ডে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিবার উপক্রম করিলে সোম বলিলেন, 'আপনি এদিকে চলেছেন কোথায় ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'মহীধরবাবুর বাড়ির দিকেই যাচ্ছি। নকুলেশবাবুর মুখে শুনলাম তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই বাড়ি যাবার পথে তাঁর খবর নিয়ে যাব।'

'কি অসুখ ?'

'সামান্য সর্দিকাশি। কিন্তু ওঁর হাঁপানির ধাত।'

সোম বলিলেন, 'তাই তো, আমারও দেখতে যাওয়া উচিত। মহীধরবাবু আমাকে বড়ই স্নেহ করেন—'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বেশ তো, আমার গাড়ির পিছনের সীটে উঠে বসুন না, একসঙ্গেই যাওয়া যাক। ফেরবার সময় আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

'তাহলে তো ভালই হয়।' বলিয়া সোম মোটর-বাইকের পিছনে গদি-আঁটা আসনটিতে বসিয়া পাণ্ডের কোমর জড়াইয়া লইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, মহীধরবাবুকে বলে দেবেন আমরা কাল বিকেলে যাব।'

'আচ্ছা। নমস্কার।'

মোটর-বাইক দুইজন আরোহী লইয়া চলিয়া গেল। আমরাও বাড়ির দিকে ফিরিলাম। লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশ আপন মনে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

বাড়ি ফিরিয়া চা পান করিতে বসিলাম। ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। দরজা খোলা ছিল; সিঁড়ির উপর ভারী পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ব্যোমকেশ চকিত হইয়া খাটো গলায় বলিল, 'অধ্যাপক সোম কোথায় গেছেন এ প্রশ্নের যদি জবাব দেবার দরকার হয়, বলো তিনি মিস্টার পাণ্ডের বাড়িতে গেছেন।'

কথাটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। মালতী দেবী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সর্দিতে তাঁহার মুখখানা আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু রক্তাভ; তিনি ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সত্যবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আসুন মিসেস সোম।'

মালতী দেবী ধরা-ধরা গলায় বলিলেন, 'না, আমার শরীর ভাল নয়। উনি আপনাদের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন, কোথায় গেলেন ?'

ব্যোমকেশ দ্বারের কাছে আসিয়া সহজ সুরে বলিল, 'রাস্তায় পাণ্ডে সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি প্রোফেসর সোমকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।'

মালতী দেবী বিস্ময়ভরে বলিলেন, 'পুলিসের পাণ্ডে ? ওঁর সঙ্গে তাঁর কি দরকার ?'

ব্যোমকেশ সরলভাবে বলিল, 'তা তো কিছু শুনলাম না। পাণ্ডে বললেন, চলুন আমার বাড়িতে চা খাবেন। হয়তো কোনও কাজের কথা আছে।'

মালতী দেবী আমাদের তিনজনের মুখ ভাল করিয়া দেখিলেন, একটা গুরুভার নিশ্বাস ফেলিলেন, তারপর আর কোনও কথা না বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম।

ব্যোমকেশ আমাদের পানে চাহিয়া একটু লজ্জিতভাবে হাসিল, বলিল 'ডাহা মিথ্যে কথা বলতে

হল। কিন্তু উপায় কি ? বাড়িতে দাম্পত্য-দাঙ্গা হওয়াটা কি ভাল ?'

সত্যবতী বাঁকা সুরে বলিল, 'তোমাদের সহানুভূতি কেবল পুরুষের দিকে। মিসেস সোম যে সন্দেহ করেন সে নেহাত মিছে নয়।'

ব্যোমকেশেরও স্বর গরম হইয়া উঠিল, 'আর তোমাদের সহানুভূতি কেবল মেয়েদের দিকে। স্বামীর ভালবাসা না পেলে তোমরা হিংসেয় চৌচির হয়ে যাও, কিন্তু স্বামীর ভালবাসা কি করে রাখতে হয় তা জান না। —যাক, অজিত, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই ; বাইরের বারান্দায় পাহারা দিতে হবে। সোম ফিরলেই তাঁকে চেতিয়ে দেওয়া দরকার, নৈলে মিথ্যে কথা যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে সোম তো যাবেই, সেই সঙ্গে আমাদেরও অশেষ দুর্গতি হবে।'

আমার কোনই আপত্তি ছিল না। বাহিরের বারান্দায় একটা চেয়ার পড়িয়া থাকিত, তাহাতে বসিয়া মনের সুখে সিগারেট টানিতে লাগিলাম। বাহিরে একটু ঠাণ্ডা বেশি, কিন্তু আলোয়ান গায়ে থাকিলে কষ্ট হয় না।

সোম ফিরিলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। পাণ্ডের মোটর ফট্ ফট্ শব্দে ফটকের বাহিরে দাঁড়াইল, সোমকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তিনি বারান্দায় উঠিলে আমি বলিলাম, 'শুনে যান। কথা আছে।'

বসিবার ঘরে ব্যোমকেশ একলা ছিল। সোমের মুখ দেখিলাম, গম্ভীর ও কঠিন। ব্যোমকেশ বলিল, 'মহীধরবাবু কেমন আছেন ?'

সোম সংক্ষেপে বলিলেন, 'ভালই।'

'ওখানে আর কেউ ছিল নাকি ?'

'শুধু ডাক্তার ঘটক।'

ব্যোমকেশ তখন মালতী-সংবাদ সোমকে শুনাইল। সোমের গম্ভীর মুখে একটু হাসি ফুটিল। তিনি বলিলেন, 'ধন্যবাদ।'

৫

পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশের সময় লক্ষ্য করিলাম দাম্পত্য কলহ কেবল বাড়ির উপরতলায় আবদ্ধ নাই, নীচের তলায় নামিয়া আসিয়াছে। সত্যবতীর মুখ ভারী, ব্যোমকেশের অধরে বঙ্কিম কঠিনতা। দাম্পত্য কলহ বোধ করি সর্দিকাশির মতই ছোঁয়াচে রোগ।

কি করিয়া দাম্পত্য কলহের উৎপত্তি হয়, কেমন করিয়া তাহার নিবৃত্তি হয়, এসব গূঢ় রহস্য কিছু জানি না। কিন্তু জিনিসটা নূতন নয়, ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। ঋষি-শ্রাদ্ধের ন্যায় মহা ধুমধামের সহিত আরম্ভ হইয়া অচিরাৎ প্রভাতের মেঘ-ডম্বরবৎ শূন্যে মিলাইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, চল আজ সকালবেলা একটু বেরুনো যাক।'

বলিলাম, 'বেশ, চল। সত্যবতী তৈরি হয়ে নিক।'

সত্যবতী বিরসমুখে বলিল, 'আমার বাড়িতে কাজ আছে। সকাল বিকাল টো টো করে বেড়ালে চলে না।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া শালটা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, 'আমরা দু'জনে যাব এই প্রস্তাবই আমি করেছিলাম। চল, মিছে বাড়িতে বসে থেকে লাভ নেই।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের পায়ের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, 'যার রোগা শরীর তার মোজা পায়ে দিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত।' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি হাসি চাপিতে না পারিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম। কয়েক মিনিট পরে ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। তাহার ললাটে গভীর ভ্রূকুটি, কিন্তু পায়ে মোজা।

রাস্তায় বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের যে কোনও বিশেষ গন্তব্য স্থান আছে তাহা বুঝিতে পারি

নাই ! ভাবিয়াছিলাম হাওয়া বদলকারীর স্বাভাবিক পরিব্রজনস্পৃহা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু কিছু দূর যাইবার পর একটা খালি রিক্‌শা দেখিয়া সে তাহাতে উঠিয়া বসিল। আমিও উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'ডেপুটি উষানাথবাবুকা মোকাম চলো।'

রিক্‌শা চলিতে আরম্ভ করিলে আমি বলিলাম, 'হঠাৎ উষানাথবাবু ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ রবিবার, তিনি বাড়ি থাকবেন। তাঁকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।'

আধ মাইল পথ চলিবার পর আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি ছবি চুরির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ মনে হচ্ছে। সত্যিই কি ওতে গুরুতর কিছু আছে ?'

সে বলিল, 'সেইটেই আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।'

আরও আধ মাইল পথ উত্তীর্ণ হইয়া উষানাথবাবুর বাড়িতে পৌঁছান গেল। হাকিম পাড়ায় বাড়ি, পাঁচিল দিয়া ঘেরা। ফটকের কাছে রিক্‌শাওয়ালাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমেই চমক লাগিল, বাড়ির সদরে কয়েকজন পুলিসের লোক দাঁড়াইয়া আছে। তারপর দেখিলাম ডি.এস.পি. পুরন্দর পাণ্ডের মোটর-বাইক রহিয়াছে।

উষানাথ ও পাণ্ডে সদর বারান্দায় ছিলেন। আমাদের দেখিয়া পাণ্ডে সবিস্ময়ে বলিলেন, 'একি, আপনারা !'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ রবিবার, তাই বেড়াতে এসেছিলাম।'

উষানাথ হিমশীতল হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন। কাল রাত্রে বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে।

'তাই নাকি ? কি চুরি গেছে ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সেটা এখনও জানা যায়নি। রাত্রে এঁরা দোতলায় শোন, নীচে কেউ থাকে না। ঘর বন্ধ থাকে। কাল রাত্রে আপিস-ঘরে চোর ঢুকে আলমারি খোলবার চেষ্টা করেছিল। একটা পর-চাবি তালায় ঢুকিয়েছিল, কিন্তু সেটা বের করতে পারেনি।'

'বটে ! আলমারিতে কি ছিল ?'

উষানাথবাবু বলিলেন, 'সরকারী দলিলপত্র ছিল, আর আমার স্ত্রীর গয়নার বাক্স ছিল। স্টিলের আলমারি। লোহার সিন্দুক বলতে পারেন।'

উষানাথবাবুর চোখে কালো চশমা, চোখ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, তিনি ভয় পাইয়াছেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে চোর কিছু নিয়ে যেতে পারেনি ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সেটা আলমারি না খোলা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। একটা চাবিওয়ালা ডাকতে পাঠিয়েছি।'

'হুঁ। চোর ঘরে ঢুকল কি করে ?'

'কাচের জানালার একটা কাচ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলেছে। আসুন না দেখবেন।'

উষানাথবাবুর আপিস-ঘরে প্রবেশ করিলাম। মাঝারি আয়তনের ঘর, একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, স্টিলের আলমারি, দেওয়ালে ভারত-সম্রাটের ছবি—এছাড়া আর কিছু নাই। ব্যোমকেশ কাচ-ভাঙা জানালা পরীক্ষা করিল ; আলমারির চাবি ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চাবি ঘুরিল না। এই চাবিটা ছাড়া চোর নিজের আগমনের আর কোনও নিদর্শন রাখিয়া যায় নাই। আপিস-ঘরের পাশেই ড্রয়িং-রুম, মাঝে দরজা। আমরা সেখানে গিয়া বসিলাম। আলমারিটা খোলা না হওয়া পর্যন্ত কিছু চুরি গিয়াছে কিনা জানা যাইবে না। উষানাথবাবু চায়ের প্রস্তাব করিলেন, আমরা মাথা নাড়িয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম।

ড্রয়িং-রুমটি মামুলিভাবে সাজানো গোছানো। এখানেও দেওয়ালে ভারত-সম্রাটের ছবি। এক কোণে একটি রেডিও যন্ত্র। চেয়ারগুলির পাশে ছোট ছোট নীচু টেবিল ; তাহাদের কোনটার উপর পিতলের ফুলদানী, কোনটার উপর ছবির অ্যাল্‌বাম ; দামী জিনিস কিছু নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চোর বোধ হয় এ ঘরে ঢোকেনি।'

উষানাথবাবু বলিলেন, 'এ ঘরে চুরি করবার মত কিছু নেই।' বলিয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। চোখের কালো চশমা ক্ষণেকের জন্য তুলিয়া কোণের রেডিও-যন্ত্রটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর চশমা নামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমার পরী! পরী কোথায় গেল!'

আমরা সমস্বরে বলিলাম, 'পরী!'

উষানাথবাবু রেডিওর কাছে গিয়া এদিক-ওদিক দেখিতে দেখিতে বলিলেন, 'একটা রূপোলী গিল্‌টি-করা ছোট্ট পরী—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী আমাকে উপহার দিয়েছিলেন— সেটা রেডিওর ওপর রাখা থাকত। নিশ্চয় চোরে নিয়ে গেছে।' আমরাও উঠিয়া গিয়া দেখিলাম। রেডিও যন্ত্রের উপর আধুলির মত একটা স্থান সম্পূর্ণ শূন্য। পরী ঐ স্থানে অবস্থান করিতেন সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চোর হয়তো নেয়নি। আপনার ছেলে খেলা করবার জন্যে নিয়ে থাকতে পারে। একবার খোঁজ করে দেখুন না।'

উষানাথবাবু ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়া বলিলেন, 'খোকা সভ্য ছেলে, সে কখনও কোনও জিনিসে হাত দেয় না। যা হোক, আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ পাণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাউকে সন্দেহ করেন নাকি?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সন্দেহ—না, সে রকম কিছু নয়। তবে একটা আরদালি বলছে, কাল রাত্রি আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় একটা পাগলাটে গোছের লোক ডেপুটিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ডেপুটিবাবু দেখা করেননি, আরদালি বাইরে থেকেই তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। আরদালি লোকটার যে-রকম বর্ণনা দিলে তাতে তো মনে হয়—'

'ফাল্গুনী পাল?'

'হ্যাঁ। একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি।'

উষানাথবাবু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া জানাইলেন তাঁহার স্ত্রী-পুত্র পরীর কোনও খবরই রাখেন না। নিশ্চয় চোর আর কিছু না পাইয়া রৌপ্যভ্রমে পরীকে লইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঁচকাইয়া বসিয়া ছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, 'ভাল কথা, সেই ছবিটা আছে কিনা দেখেছিলেন কি?'

'কোন্ ছবি?'

'সেই যে একটা গ্রুপ-ফটোর কথা মহীধরবাবুর বাড়িতে হয়েছিল?'

'ও—না, দেখা হয়নি। ঐ যে আপনার পাশে অ্যাল্‌বাম রয়েছে, দেখুন না ওতেই আছে।'

ব্যোমকেশ অ্যাল্‌বাম লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহাতে উষানাথবাবুর পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র সকলের ছবি আছে, এমন কি মহীধরবাবু ও রজনীর ছবিও আছে, কেবল উদ্দিষ্ট গ্রুপ-ফটোখানি নাই!

ব্যোমকেশ বলিল, 'কৈ, দেখছি না তো?'

'নেই।' উষানাথবাবু উঠিয়া আসিয়া নিজে অ্যাল্‌বাম দেখিলেন, কিন্তু ফটো পাওয়া গেল না। তিনি তখন বলিলেন, 'কি জানি কোথায় গেল। কিন্তু এটা এমন কিছু দামী জিনিস নয়। আলমারি থেকে যদি দলিলপত্র কিংবা গয়নার বাক্স চুরি গিয়া থাকে—'

ব্যোমকেশ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, 'আপনি চিন্তা করবেন না, চোর কিছুই চুরি করতে পারেনি। গয়নার বাক্স নিরাপদে আছে, এমন কি, আপনার পরীও একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। আজ তাহলে আমরা উঠি। মিস্টার পাণ্ডে, চোরের যদি সন্ধান পান আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

পাণ্ডে হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। আমরা বাহিরে আসিলাম; উষানাথবাবুও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ব্যোমকেশ উষানাথবাবুকে ইশারা করিয়া বারান্দার এক কোণে লইয়া গিয়া চুপিচুপি

কিছুক্ষণ কথা বলিল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ‘চল।’

রিক্শাওয়ালা অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা ফিরিয়া চলিলাম। ব্যোমকেশ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তারপর এক সময় বলিল, ‘অজিত, উষানাথবাবু এক সময় চোখের চশমা তুলেছিলেন, তখন কিছু লক্ষ্য করেছিলে?’

‘কৈ না। কি লক্ষ্য করব?’

‘উষানাথবাবুর বাঁ চোখটা পাথরের।’

‘তাই নাকি? কালো চশমার এই অর্থ?’

‘হ্যাঁ। বছর তিনেক আগে ওঁর চোখের ভেতরে ফোড়া হয়, অস্ত্র করে চোখটা বাদ দিতে হয়েছিল। ওঁর সর্বদা ভয় সাহেবেরা জানতে পারলেই ওঁর চাকরি যাবে।’

‘আচ্ছা ভীতু লোক তো! এই কথাই বুঝি আড়ালে গিয়ে হচ্ছিল?’

‘হ্যাঁ।’

এই তথ্যের গুরুত্ব কতখানি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। উষানাথবাবু যদি কানা-ই হন তাহাতে পৃথিবীর কি ক্ষতিবৃদ্ধি?

রিক্শা ক্রমে বাড়ির নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ বলিল, ‘অজিত, যাবার সময় তুমি প্রশ্ন করেছিলে, ছবি চুরির ব্যাপার গুরুতর কি না। সে প্রশ্নের উত্তর এখন দেওয়া যেতে পারে। ব্যাপার গুরুতর।’

‘সত্যি? কি করে বুঝলে?’

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, একটু মুচকি হাসিল।

৬

অপরাহ্ণে আমরা মহীধরবাবুর বাড়িতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সত্যবতী বলিল, ‘ঠাকুরপো, টর্চ নিয়ে যেও। ফিরতে রাত করবে নিশ্চয়।’

আমি টর্চ পকেটে লইয়া বলিলাম, ‘তুমি এবেলাও তাহলে বেরুচ্ছ না?’

সত্যবতী বলিল, ‘না। ওপরতলায় একটা মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, কথা কইবার লোক নেই। তার কাছে দু’দণ্ড বসে দুটো কথা কইলেও তার মনটা ভাল থাকবে।’

বলিলাম, ‘মালতী দেবীর প্রতি তোমার সহানুভূতি যে ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে।’

‘কেন বাড়বে না? নিশ্চয় বাড়বে।’

‘আর রজনীর প্রতি সহানুভূতি বোধ করি সেই অনুপাতে কমে যাচ্ছে?’

‘মোটেই না, একটুও কমেনি। রজনীর দোষ কি? যত নষ্টের গোড়া এই পুরুষ জাতটা।’

তর্জন করিয়া বলিলাম, ‘দেখ, জাত তুলে কথা বললে ভাল হবে না বলছি।’

সত্যবতী নাক সিঁটকাইয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

মহীধরবাবুর বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন সূর্যাস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু বাগানের মধ্যে ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে। খোলা ফটকে লোক নাই। রাত্রেও বোধ হয় ফটক খোলা থাকে, কিংবা গরু ছাগলের গতিরোধ করিবার জন্য আগড় লাগানো থাকে। মানুষের যাতায়াতে বাধা নাই।

বাড়ির সদর দরজা খোলা; কিন্তু বাড়িতে কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। দুই-তিন বার হ্রেষা-ধ্বনিবৎ গলা খাঁকারি দিবার পর একটি বৃদ্ধগোছের চাকর বাহির হইয়া আসিল। বলিল, ‘কর্তাবাবু ওপরে শুয়ে আছেন। দিদিমণি বাগানে বেড়াচ্ছেন। আপনারা বসুন, আমি ডেকে আনছি।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘দরকার নেই। আমরাই দেখছি।’ বাগানে নামিয়া ব্যোমকেশ বাগানের

একটা কোণ লক্ষ্য করিয়া চলিল। গাছপালা ঝোপঝাড়ে বেশিদূর পর্যন্ত দেখা যায় না, কিন্তু ঘাসে ঢাকা সঙ্কীর্ণ পথগুলি মাকড়সার জালের মত চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম ব্যোমকেশ ফাল্গুনী পালের আস্তানার সন্ধানে চলিয়াছে।

বাগানের কোণে আসিয়া পৌঁছিলাম। একটা মাটির ঘর, মাথায় টালির ছাউনি ; সম্ভবত মালীদের যন্ত্রপাতি রাখিবার স্থান। পাশেই একটা প্রকাণ্ড ইঁদারা।

ঘরের দ্বার খোলা রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে অন্ধকার। আমি টর্চের আলো ভিতরে ফেলিলাম। অন্ধকারে খড়ের বিছানার উপর কেহ শুইয়াছিল, আলো পড়িতেই উঠিয়া বাহিরে আসিল। দেখিলাম ফাল্গুনী পাল।

আজ ফাল্গুনীর মন ভাল নয়, কণ্ঠস্বরে ঔদাসীন্য-ভরা অভিমান। আমাদের দেখিয়া বলিল, 'আপনারাও কি পুলিসের লোক, আমার ঘর খানাতল্লাস করতে এসেছেন ? আসুন—দেখুন, প্রাণ ভরে খানাতল্লাস করুন। কিছু পাবেন না। আমি গরীব বটে, কিন্তু চোর নই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা খানাতল্লাস করতে আসিনি। আপনাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কাল রাত্রে আপনি উষানাথবাবুর বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন ?'

ফাল্গুনী তিক্তস্বরে বলিল, 'তাঁর একটা ছবি এঁকেছিলাম, তাই দেখাতে গিয়েছিলাম। দারোয়ান দেখা করতে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। বেশ কথা, ভাল কথা। কিন্তু সেজন্য পুলিস লেলিয়ে দেবার কি দরকার ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভারি অন্যায়। আমি পুলিসকে বলে দেব, তারা আপনাকে আর বিরক্ত করবে না।'

'ধন্যবাদ' বলিয়া ফাল্গুনী আবার কোটরে প্রবেশ করিল। আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

দিনের আলো প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। আমরা বাগানে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু রজনীকে দেখিতে পাইলাম না।

বাগানের অন্য প্রান্তে বড় বড় পাথরের চ্যাঙড় দিয়া একটা উচ্চ ক্রীড়াশৈল রচিত হইয়াছিল। তাহাকে ঘিরিয়া সবুজ শ্যাওলার বন্ধনী। ক্রীড়াশৈলটি আকারে চারকোণা, দেখিতে অনেকটা পিরামিডের মত। আমরা তাহার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পিরামিডের অপর পার হইতে আবেগোদ্ধত কণ্ঠস্বর কানে আসিল, 'ছবি ছবি ছবি। কি হবে ছবি ! চাই না ছবি !'

'আস্তে ! কেউ শুনতে পাবে।'

কণ্ঠস্বর দুইটি পরিচিত ; প্রথমটি ডাক্তার ঘটকের, দ্বিতীয়টি রজনীর। ডাক্তার ঘটককে আমরা শান্ত সংযতবাক্ মানুষ বলিয়াই জানি ; তাহার কণ্ঠ হইতে যে এমন আর্ত উগ্রতা বাহির হইতে পারে তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। রজনীর কণ্ঠস্বরেও একটা শীৎকার আছে, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক নয়।

ডাক্তার ঘটক আবার যখন কথা কহিল তখন তাহার স্বর অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু আবেগের উন্মাদনা কিছুমাত্র কমে নাই। সে বলিল, 'আমি তোমাকে চাই—তোমাকে। দুধের বদলে জল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না।'

রজনী বলিল, 'আর আমি ! আমি কি চাই না ? কিন্তু উপায় যে নেই।'

ডাক্তার বলিল, 'উপায় আছে, তোমাকে বলছি।'

রজনী বলিল, 'কিন্তু বাবা—'

ডাক্তার বলিল, 'তুমি নাবালিকা নও। তোমার বাবা তোমাকে আটকাতে পারেন না।'

রজনী বলিল, 'তা জানি। কিন্তু।—শোন লক্ষ্মীটি শোন, বাবার শরীর খারাপ যাচ্ছে, তিনি সেরে উঠুন—তারপর—'

ডাক্তার বলিল, 'না। আজই আমি জানতে চাই তুমি রাজী আছ কি না।'

একটু নীরবতা। তারপর রজনী বলিল, 'আচ্ছা, আজই বলব, কিন্তু এখন নয়। আমাকে

একটু সময় দাও। আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তুমি এস, আমি এখানে থাকবো ; তখন কথা হবে। এখন হয়তো বাড়িতে কেউ এসেছে, আমাকে না দেখলে—'

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল।

দু'জনে পা টিপিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, হঠাৎ চোখে পড়িল পিরামিডের অন্য পাশ হইতে আর একটা লোক আমাদেরই মত সন্তর্পণে দূরে চলিয়া যাইতেছে। একবার মনে হইল বুঝি ডাক্তার ঘটক ; কিন্তু ভাল করিয়া চিনিবার আগেই লোকটি অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পিরামিড হইতে অনেকখানি ঘুরিয়া দূরে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, বাড়ি ফেরা যাক। আজ আর দেখা করে কাজ নেই।'

রাস্তায় বাহির হইলাম। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, আকাশে চন্দ্র নাই, পথের পাশে কেরোসিনের আলোগুলি দূরে দূরে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। আমি মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালিয়া পথ নির্ণয় করিতে করিতে চলিলাম।

ব্যোমকেশ চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছে। বিদ্রোহোন্মুখ যুবক-যুবতীর নিয়তি কোন্ কুটিল পথে চলিয়াছে—বোধ করি তাহাই নির্ধারণের চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহার ধ্যানভঙ্গ করিলাম না।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'অন্য লোকটিকে চিনতে পারলে ?'

বলিলাম, 'না। কে তিনি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি হচ্ছেন আমাদের গৃহস্বামী অধ্যাপক আদিনাথ সোম।'

'তাই নাকি ! ব্যোমকেশ, ব্যাপারটা আমার পক্ষে কিছু জটিল হয়ে উঠেছে। ছবি চুরি, পরী চুরি, নেশাখোর চিত্রকর, কানা হাকিম, অবৈধ প্রণয়, অধ্যাপকের আড়িপাতা—কিছু বুঝতে পারছি না।'

'না পারবারই কথা। রবীন্দ্রনাথের গান মনে আছে—'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে, জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে ?'—আমিও সরু-মোটা তারের জট ছাড়াতে পারছি না।'

'আচ্ছা, এই যে ডাক্তার আর রজনীর ব্যাপার, এতে আমাদের কিছু করা উচিত নয় কি ?'

ব্যোমকেশ দৃঢ়স্বরে বলিল, 'কিছু নয়। আমরা ক্রিকেট খেলার দর্শক, হাততালি দিতে পারি, দুয়ো দিতে পারি, কিন্তু খেলার মাঠে নেমে খেলায় বাগড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে ঘোর বেয়াদপি।'

বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম সত্যবতী একাকিনী পশমের গেঞ্জি বুনিতেছে। বলিলাম, 'তোমার রুগীর খবর কি ?'

সত্যবতী উত্তর দিল না, সেলাইয়ের উপর ঝুঁকিয়া দ্রুত কাঁটা চালাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি, মুখে কথা নেই যে ! মালতী দেবীকে দেখতে গিয়েছিলে তো ?'

'গিয়েছিলাম'—সত্যবতী মুখ তুলিল না, কিন্তু তাহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ অদূরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল, হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সত্যবতী সূচীবিদ্ধবৎ চমকিয়া উঠিল, শয়নকক্ষের দ্বারের দিকে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিল, তারপর আবার সম্মুখে ঝুঁকিয়া দ্রুত কাঁটা চালাইতে লাগিল।

আমি তাহার পাশে বসিয়া বলিলাম, 'কি ব্যাপার খুলে বল দেখি।'

'কিছু না। চা খাবে তো ? জল চড়াতে বলে এসেছি। দেখি—' বলিয়া সে উঠিবার উপক্রম করিল।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'আহা, কি হয়েছে আগে বল না ! চা পরে হবে।'

সত্যবতী তখন আবেগভরে বলিয়া উঠিল, 'কি আবার হবে, ঐ লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষটার কাছে আমার যাওয়াই ভুল হয়েছিল। এমন পচা নোংরা মন—আমাকে বলে কিনা—কিন্তু সে আমি বলতে পারব না। যার অমন মন তার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়।'

শয়নকক্ষ হইতে আর এক ধমক হাসির আওয়াজ আসিল। সত্যবতী চলিয়া গেল। ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। রাগে আমার মুখও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধমনা স্ত্রীলোকের সন্দেহ পাত্রপাত্রী বিচার করে না জানি, কিন্তু সত্যবতীকে যে স্ত্রীলোক এরূপ পঙ্কিল দোষারোপ করিতে পারে, তাকে গুলি করিয়া মারা উচিত। ব্যোমকেশ হাসুক, আমার গা রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া ঘুম আসিল না; সারাদিনের নানা ঘটনায় মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঘড়িতে দেখিলাম দশটা; ডিসেম্বর মাসে রাত্রি দশটা এখানে গভীর রাত্রি। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী অনেকক্ষণ শুইয়া পড়িয়াছে।

বিছানায় শুইয়া ঘুম না আসিলে আমার সিগারেটের পিপাসা জাগিয়া ওঠে, সুতরাং শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। গায়ে আলোয়ান দিয়া সিগারেট ধরাইলাম। কিন্তু বদ্ধ ঘরে ধূমপান করিলে ঘরের বাতাস ধোঁয়ায় দূষিত হইয়া উঠিবে; আমি একটা জানলা ঈষৎ খুলিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম।

জানালাটা সদরের দিকে। সামনে ফটক, তাহার পরপারে রাস্তা, রাস্তার ধারে মিউনিসিপ্যালিটির আলোকস্তম্ভ; আলোকস্তম্ভ না বলিয়া ধূমস্তম্ভ বলিলেই ভাল হয়। প্রদীপের তৈল শেষ হইয়া আসিতেছে।

মিনিট দুই তিন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছি, বাহিরে একটা অস্পষ্ট খস্ খস্ শব্দে চকিত হইয়া উঠিলাম। কে যেন বারান্দা হইতে নামিতেছে। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম একটি ছায়ামূর্তি ফটক পার হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আলোকস্তম্ভের পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে চিনিতে পারিলাম—কালো কোট-প্যান্ট-পরা অধ্যাপক সোম।

বিদ্যুৎ চমকের মত বুঝিতে পারিলাম এত রাত্রে তিনি কোথায় যাইতেছেন। আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মহীধরবাবুর বাগানে ডাক্তার ঘটক এবং রজনীর মিলিত হইবার কথা; সঙ্কেত-স্থলে সোম অনাহূত উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু কেন? কি তাঁহার অভিপ্রায়?

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে এই কথা ভাবিতেছি, সহসা অধিক বিস্ময়ের কারণ ঘটিল। আবার খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবার বাহির হইয়া আসিল মালতী দেবী। তাঁহাকে চিনিতে কষ্ট হইল না। একটা চাপা কাশির শব্দ; তারপর সোম যে পথে গিয়াছিলেন তিনিও সেই পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পরিস্থিতি স্পষ্টই বোঝা গেল। স্বামী অভিসারে যাইতেছেন, আর স্ত্রী অসুস্থ শরীর লইয়া এই শীতজর্জর রাত্রে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন। বোধ হয় স্বামীকে হাতে হাতে ধরিতে চান। উঃ, কি দুর্বহ ইহাদের জীবন! প্রেমহীন স্বামী এবং বিশ্বাসহীন পত্নীর দাম্পত্য জীবন কি ভয়ঙ্কর! এর চেয়ে ডাইভোর্স ভাল।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমার কিছু করা উচিত কিনা ভাবিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশকে জাগাইয়া সংবাদটা দিব? না, কাজ নাই, সে ঘুমাইতেছে ঘুমাক। বরং আমার ঘুম যেরূপ চটিয়া গিয়াছে, দু'ঘণ্টার মধ্যে আসিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং আমি জানালার কাছে বসিয়া পাহারা দিব। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

আবার সিগারেট ধরাইলাম।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট। দীপস্তম্ভের আলো ধোঁয়ায় দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গেল।

একটি মূর্তি ফটক দিয়া প্রবেশ করিল। নক্ষত্রের আলোয় মালতী দেবীর ভারী মোটা চেহারা চিনিতে পারিলাম। তিনি পদশব্দ গোপনের চেষ্টা করিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটা অবরুদ্ধ আওয়াজ বাহির হইল, তাহা চাপা কাশি কিংবা চাপা কান্না বুঝিতে পারিলাম না। তিনি উপরে চলিয়া গেলেন।

এত শীঘ্র শ্রীমতী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু শ্রীমানের দেখা নাই। অনুমান করিলাম শ্রীমতী বেশি দূর স্বামীকে অনুসরণ করিতে পারেন নাই, অন্ধকারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তারপর এদিক

ওদিক নিষ্ফল অন্বেষণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

সোম ফিরিলেন সাড়ে এগারটার সময়। বাদুড়ের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে বাড়ির মধ্যে মিলাইয়া গেলেন।

৭

সকালে ব্যোমকেশকে রাত্রির ঘটনা বলিলাম। সে চুপ করিয়া শুনিল, কোনও মন্তব্য করিল না।

একজন কনস্টেবল একটা চিঠি দিয়া গেল। ডি.এস.পি. পাণ্ডের চিঠি, আগের দিন সন্ধ্যা ছ'টার তারিখ। চিঠিতে মাত্র কয়েক ছত্র লেখা ছিল—

প্রিয় ব্যোমকেশবাবু,

ডেপুটি সাহেবের আলমারি খুলিয়া দেখা গেল কিছু চুরি যায় নাই। আপনি বলিয়াছিলেন পরীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, কিন্তু পরী এখনও নিরুদ্দেশ। চোরেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন তাই লিখিলাম। ইতি—

পুরন্দর পাণ্ডে

ব্যোমকেশ চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া বলিল, 'পাণ্ডে লোকটি সত্যিকার সজ্জন।'

এই সময় যিনি সবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার। মহীধরবাবুর পার্টির পর রাস্তায় নকুলেশবাবুর সহিত দু'একবার দেখা হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বলিলেন, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম খবরটা দিয়ে যাই। শোনেননি নিশ্চয়ই ? ফাল্গুনী পাল—সেই যে ছবি আঁকত—সে মহীধরবাবুর বাগানে কুয়োয় ডুবে মরেছে।'

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তারপর ব্যোমকেশ বলিল, 'কখন এ ব্যাপার হল ?'

নকুলেশ বলিলেন, 'বোধ হয় কাল রাত্তিরে, ঠিক জানি না। মাতাল দাঁতাল লোক, অন্ধকারে তাল সামলাতে পারেনি, পড়েছে কুয়োয়। আজ সকালে আমি মহীধরবাবুর খবর নিতে গিয়েছিলাম, দেখি মালীরা কুয়ো থেকে লাস তুলছে।'

আমরা নীরবে পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। কাল রাত্রে মহীধরবাবুর বাগানে বহু বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে।

'আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি ; আমাকে আবার ক্যামেরা নিয়ে ফিরে যেতে হবে—।' বলিয়া নকুলেশবাবু উঠিবার উপক্রম করিলেন।

'বসুন বসুন, চা খেয়ে যান।'

নকুলেশ চায়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, বসিলেন। অচিরাৎ চা আসিয়া পড়িল। দু'চার কথার পর ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সেই গ্রুপ-ফটোর নেগেটিভখানা খুঁজেছিলেন কি ?'

'কোন্ নেগেটিভ ? ও—হ্যাঁ, অনেক খুঁজেছি মশাই, পাওয়া গেল না।—আমার লোকসানের বরাত ; থাকলে আরও পাঁচখানা বিক্রি হত।'

'আচ্ছা, সেই ফটোতে কে কে ছিল বলুন দেখি ?'

'কে কে ছিল ? পিক্‌নিকে গিয়েছিলাম ধরুন—আমি, মহীধরবাবু, তাঁর মেয়ে রজনী, ডাক্তার ঘটক, সস্ত্রীক প্রোফেসর সোম, সপরিবারে ডেপুটি ঊষানাথবাবু আর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। সকলেই ফটোতে ছিলেন। ফটোখানা ভারি উৎরে গিয়েছিল—গ্রুপ-ফটো অত ভাল খুব একটা হয় না। আচ্ছা, চলি তাহলে। আর একদিন আসব।'

নকুলেশবাবু প্রস্থান করিলেন। দু'জনে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। ফাল্গুনীর কথা ভাবিয়া মনটা ভারী হইয়া উঠিল। সে নেশাখোর লক্ষ্মীছাড়া ছিল, কিন্তু ভগবান তাহাকে প্রতিভা দিয়াছিলেন।

এমনভাবে অপঘাত মৃত্যুই যদি তাহার নিয়তি, তবে তাহাকে প্রতিভা দিবার কি প্রয়োজন ছিল ?

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল, 'এ সম্ভাবনা আমার মনেই আসেনি। চল, বেরুনো যাক।'

'কোথায় যাবে ?'

'ব্যাঙ্কে যাব। কিছু টাকা বের করতে হবে।'

এখানে আসিয়া স্থানীয় ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা রাখা হইয়াছিল, সংসার-খরচের প্রয়োজন অনুসারে বাহির করা হইত।

আমরা সদর বারান্দায় বাহির হইয়াছি, দেখিলাম অধ্যাপক সোম ড্রেসিং-গাউন পরিহিত অবস্থায় নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মুখে উদ্বিগ্ন গাম্ভীর্য। ব্যোমকেশ সম্ভাষণ করিল, 'কি খবর ?'

সোম বলিলেন, 'খবর ভাল নয়। স্ত্রীর অসুখ খুব বেড়েছে। বোধহয় নিউমোনিয়া। জ্বর বেড়েছে ; মাঝে মাঝে ভুল বকছেন মনে হল।'

আশ্চর্য নয়। কাল রাত্রে সর্দির উপর ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। কিন্তু সোম বোধ হয় তাহা জানেন না। ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে খবর দিয়েছেন ?'

ডাক্তার ঘটকের নামে সোমের মুখ অন্ধকার হইল। তিনি বলিলেন, 'ঘটককে ডাকব না। আমি অন্য ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ চক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কেন ? ডাক্তার ঘটকের ওপর কি আপনার বিশ্বাস নেই ? আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন কিন্তু আপনি ঘটককেই সুপারিশ করেছিলেন।'

সোম ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন। ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'সে যাক ! এই মাত্র খবর পেলাম ফাল্গুনী পাল কাল রাত্রে মহীধরবাবুর কুয়োয় ডুবে মারা গেছে।'

সোম বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, 'তাই নাকি। হয়তো আত্মহত্যা করেছে। আর্টিস্টরা একটু অব্যবস্থিতচিত্ত হয়—'

ব্যোমকেশ বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করিল, 'প্রোফেসর সোম, কাল রাত্রি এগারোটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন ?'

সোম চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ পাংশু হইয়া গেল। তিনি স্খলিতস্বরে বলিলেন, 'আমি—আমি ! কে বললে আমি কোথাও গিয়েছিলাম ? আমি তো—'

হাত তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মিছে কথা বলে লাভ নেই। প্রোফেসর সোম, আপনার স্ত্রীর যে আজ বাড়াবাড়ি হয়েছে তার জন্যে আপনি দায়ী। তিনি কাল আপনার পেছনে পেছনে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। এই রোগে যদি তাঁর মৃত্যু হয়—'

ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া সোম বলিলেন, 'আমার স্ত্রী—ব্যোমকেশবাবু, বিশ্বাস করুন, আমি জানি না—'

ব্যোমকেশ তর্জনী তুলিয়া ভয়ঙ্কর গম্ভীর স্বরে বলিল, 'কিন্তু আমরা জানি। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনি সাবধানে থাকবেন। এস অজিত।'

সোম স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় কিছু দূর গিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সোমকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছি।' তারপর ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'ব্যাঙ্ক খুলতে এখনও দেরি আছে। চল, ঘটকের ডিস্‌পেন্সারিতে একবার ঢুঁ মেরে যাই।'

বাজারের দিকে ডাক্তারের ঔষধালয়। আমরা ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করিতে যাইব, শুনিলাম সে একজনকে বলিতেছে, 'দেখুন, আপনার ছেলের টাইফয়েড হয়েছে ; লম্বা কেস, সারাতে সময় লাগবে। আমি এখন লম্বা কেস হাতে নিতে পারব না। আপনি বরং শ্রীধরবাবুর কাছে যান—তিনি প্রবীণ ডাক্তার—'

আমরা প্রবেশ করিলাম, অন্য লোকটি চলিয়া গেল। ডাক্তার সানন্দে আমাদের অভ্যর্থনা

করিল। বলিল, 'আসুন আসুন। রোগী যখন সশরীরে ডাক্তারের বাড়িতে আসে তখন বুঝতে হবে রোগ সেরেছে। মহীধরবাবু সেদিন আমাকে ঘোড়ার ডাক্তার বলেছিলেন। এখন আপনিই বলুন, আমি মানুষের ডাক্তার কিংবা আপনি ঘোড়া!'—বলিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিল। ডাক্তারের মন আজ ভারি প্রফুল্ল; চোখে আনন্দের জ্যোতি।

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'আপনি মানুষের ডাক্তার এই কথা স্বীকার করে নেওয়াই আমার পক্ষে সম্মানজনক। মহীধরবাবু কেমন আছেন?'

ডাক্তার বলিল, 'অনেকটা ভাল। প্রায় সেরে উঠেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ফাল্গুনী পাল মারা গেছে শুনেছেন কি?'

ডাক্তার চকিত হইয়া বলিল, 'সেই চিত্রকর! কি হয়েছিল তার?'

'কিছু হয়নি। কাল রাত্রে জলে ডুবে মারা গেছে'—ব্যোমকেশ যতটুকু জানিত সংক্ষেপে বলিল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আমার যাওয়া উচিত। মহীধরবাবুর দুর্বল শরীর—। যাই, একবার চট্ করে ঘুরে আসি।' ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ সহসা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কলকাতা যাচ্ছেন কবে?'

ডাক্তারের মুখের ভাব সহসা পরিবর্তিত হইল; সে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ব্যোমকেশের চোখের মধ্যে চাহিয়া বলিল, 'আমি কলকাতা যাচ্ছি কে বললে আপনাকে?'

ব্যোমকেশ কেবল মৃদু হাসিল। ডাক্তার তখন বলিল, 'হ্যাঁ, শীগ্‌গিরই একবার যাবার ইচ্ছে আছে। আচ্ছা, চললাম। যদি সময় পাই ওবেলা আপনাদের বাড়িতে যাব।'

ডাক্তার ক্ষুদ্র মোটরে চড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা ব্যাঙ্কের দিকে চলিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ডাক্তার কলকাতা যাচ্ছে জানলে কি করে? তুমি কি আজকাল অন্তর্যামী হয়েছ নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। কিন্তু একজন ডাক্তার যখন বলে লম্বা কেস হাতে নেব না, অন্য ডাক্তারের কাছে যাও, তখন আন্দাজ করা যেতে পারে যে সে বাইরে যাবে।'

'কিন্তু কলকাতায়ই যাবে তার নিশ্চয়তা কি?'

'ওটা ডাক্তারের প্রফুল্লতা থেকে অনুমান করলাম।'

৮

ডাক্তারের ঔষধালয় হইতে অনতিদূরে ব্যাঙ্ক। আমরা গিয়া দেখিলাম ব্যাঙ্কের দ্বার খুলিয়াছে। দ্বারের দুই পাশে বন্দুক-কিরিচধারী দুইজন সান্ত্রী পাহারা দিতেছে।

বড় একটি ঘর দুই ভাগে বিভক্ত, মাঝে কাঠ ও কাচের অনুচ্চ বেড়া। বেড়ার গায়ে সারি সারি জানালা। এই জানালা দিয়া জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের লেন-দেন হইয়া থাকে।

ব্যোমকেশ একটি জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া চেক লিখিতেছে, দেখিলাম বেড়ার ভিতর দিকে ম্যানেজার অমরেশ রাহা দাঁড়াইয়া একজন কেরানীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। অমরেশবাবুও আমাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি স্মিতমুখে বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, 'নমস্কার। ভাগ্যে আপনাদের দেখে ফেললাম নইলে তো টাকা নিয়েই চলে যেতেন।'

অমরেশবাবুকে চায়ের পার্টির পর আর দেখি নাই। তিনি সেজন্য লজ্জিত; ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'রোজই মনে করি আপনাদের বাড়িতে যাব, কিন্তু একটা না একটা কাজ পড়ে যায়। ব্যাঙ্কের চাকরি মানে অষ্টপ্রহরের গোলামি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এমন গোলামিতে সুখ আছে। হরদম টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।'

অমরেশবাবু করুণ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'সুখ আর কৈ ব্যোমকেশবাবু। চিনির বলদ চিনির বোঝা বয়ে মরে, কিন্তু দিনের শেষে খায় সেই ঘাস জল।'

ব্যোমকেশ চেকের বদলে টাকা পকেটস্থ করিলে অমরেশবাবু বলিলেন, 'চলুন, আজ যখন পেয়েছি আপনাকে সহজে ছাড়ব না। আমার আপিস-ঘরে বসে খানিক গল্প-সল্প করা যাক। আপনার প্রতিভার যে পরিচয় অজিতবাবুর লেখা থেকে পাওয়া যায়, তাতে আপনাকে পেলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আমাদের দেশে প্রতিভাবান মানুষের বড়ই অভাব।'

ভদ্রলোক শুধু যে ব্যোমকেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাহাই নয়, সাহিত্য-রসিকও বটে। সেদিন তাঁহার সহিত অধিক আলাপ করি নাই বলিয়া অনুতপ্ত হইলাম।

তিনি আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার একটি নিজস্ব আপিস-ঘর আছে, তাহার দ্বার পর্যন্ত গিয়া তিনি বলিলেন, 'না, এখানে নয়। চলুন, ওপরে যাই। এখানে গণ্ডগোল, কাজের হুড়োহুড়ি। ওপরে বেশ নিরিবিলি হবে।'

আপিস-ঘরের দরজা খোলা ছিল; ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, মামুলি টেবিল চেয়ার খাতাপত্র, কয়েকটা বড় বড় লোহার সিন্দুক ছাড়া আর কিছু নাই।

কাছেই সিঁড়ি। উপরে উঠিতে উঠিতে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওপরতলাটা বুঝি আপনার কোয়ার্টার ?'

'হ্যাঁ। ব্যাঙ্কেরও সুবিধে।'

'স্ত্রী-পুত্র পরিবার সব এখানেই থাকেন ?'

'স্ত্রী-পুত্র পরিবার আমার নেই ব্যোমকেশবাবু। ভগবান সুমতি দিয়েছিলেন, বিয়ে করিনি। একলা-মানুষ, তাই ভদ্রভাবে চলে যায়। বিয়ে করলে হাড়ির হাল হত।'

উপরতলাটি একজন লোকের পক্ষে বেশ সুপরিসর। তিন চারটি ঘর, সামনে উন্মুক্ত ছাদ। অমরেশবাবু আমাদের বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন ঘর; দেওয়ালে ছবি নাই, মেঝেয় গালিচা নাই। এক পাশে একটি জাজিম-ঢাকা চৌকি, দুই-তিনটি আরাম-কেদারা, একটি বইয়ের আলমারি। নিতান্তই মামুলি ব্যাপার, কিন্তু বেশ তৃপ্তিদায়ক। গৃহস্বামী যে গোছালো স্বভাবের লোক তাহা বোঝা যায়।

'বসুন, চা তৈরি করতে বলি।' বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

বইয়ের আলমারিটা আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, উঠিয়া গিয়া বইগুলি দেখিলাম। অধিকাংশ বই গল্প উপন্যাস, চলন্তিকা আছে, সঞ্চয়িতা আছে। আমার রচিত ব্যোমকেশের উপন্যাসগুলিও আছে দেখিয়া পুলকিত হইলাম।

ব্যোমকেশও আসিয়া জুটিল। সে একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা খুলিল; দেখিলাম বইখানা বাংলা ভাষায় নয়, ভারতবর্ষেরই অন্য কোনও প্রদেশের লিপি। অনেকটা হিন্দীর মতন, কিন্তু ঠিক হিন্দী নয়।

এই সময় অমরেশবাবু ফিরিয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি গুজরাটী ভাষাও জানেন ?'

অমরেশবাবু মুখে চট্‌কার শব্দ করিয়া বলিলেন, 'জানি আর কৈ ? একসময় শেখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ও আমার দ্বারা হল না। বাঙালীর ছেলে মাতৃভাষা শিখতেই গলদ্‌ঘর্ম হয়, তার ওপর ইংরিজি আছে। উপরন্তু যদি একটা তৃতীয় ভাষা শিখতে হয় তাহলে আর বাঙালীর শক্তিতে কুলোয় না। অথচ শিখতে পারলে আমার উপকার হত। ব্যাঙ্কের কাজে গুজরাটী ভাষা জানা থাকলে অনেক সুবিধা হয়।'

আমরা আবার আসিয়া বসিলাম। দুই-চারিটি একথা সেকথার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'ফাল্গুনী পাল মারা গেছে শুনেছেন বোধ হয় ?'

অমরেশবাবু চেয়ার হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন, 'অ্যাঁ। ফাল্গুনী পাল মারা গেছে! কবে—কোথায়—কি করে মারা গেল ?'

ব্যোমকেশ ফাল্গুনীর মৃত্যু-বিবরণ বলিল। শুনিয়া অমরেশবাবু দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা বেচারা! বড় দুঃখে পড়েছিল। কাল আমার কাছে এসেছিল।'

এবার আমাদের বিস্মিত হইবার পালা। ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'কাল এসেছিল ? কখন ?'

অমরেশবাবু বলিলেন, 'সকালবেলা। কাল রবিবার ছিল, ব্যাঙ্ক বন্ধ ; সবে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে বসেছি, ফাল্গুনী এসে হাজির, আমার ছবি এঁকেছে তাই দেখাতে এসেছিল—'

'ও—'

চাকর তিন পেয়ালা চা দিয়া গেল। তক্‌মা-আঁটা চাকর, বুঝিলাম ব্যাঙ্কের পিওন ; অবসরকালে বাড়ির কাজও করে। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল অমরেশবাবু টাকা-পয়সার ব্যাপারে বিলক্ষণ হিসাবী।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় চামচ ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, 'ছবিখানা কিনলেন নাকি ?'

অমরেশবাবু বিমর্ষ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'কিনতে হল। পাঁচ টাকা দিতে গেলাম কিছুতেই নিলে না, দশ টাকা আদায় করে ছাড়ল। এমন জানলে—'

ব্যোমকেশ চায়ে একটা চুমুক দিয়া বলিল, 'মৃত চিত্রকরের শেষ ছবি দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।'

'দেখুন না। ভালই এঁকেছে বোধ হয়। আমি অবশ্য ছবির কিছু বুঝি না—'

বইয়ের আলমারির নীচের দেরাজ হইতে একখণ্ড পুরু চতুষ্কোণ কাগজ আনিয়া তিনি আমাদের সম্মুখে ধরিলেন।

ফাল্গুনী ভাল ছবি আঁকিয়াছে ; অমরেশবাবুর বিশেষত্বহীন চেহারা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যোমকেশ চিত্রবিদ্যার একজন জহুরী, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ছবিটি দেখিতে লাগিল।

অমরেশবাবু আগে বেশ প্রফুল্লমুখে কথাবার্তা বলিতেছিলেন, কিন্তু ফাল্গুনীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিবার পর কেমন যেন মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন। প্রায় নীরবেই চা-পান শেষ হইল। পেয়ালা রাখিয়া অমরেশবাবু স্তিমিত স্বরে বলিলেন, 'ফাল্গুনীর কথায় মনে পড়ল, সেদিন চায়ের পার্টিতে শুনেছিলাম পিক্‌নিকের ফটোখানা চুরি গেছে। মনে আছে ? তার কোনও হদিস পাওয়া গেল কিনা কে জানে।'

ব্যোমকেশ মগ্ন হইয়া ছবি দেখিতেছিল, উত্তর দিল না। আমিও কিছু বলা উচিত কিনা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত অমরেশবাবুর পানে চাহিয়া রহিলাম। অমরেশবাবু তখন নিজেই বলিলেন, 'সামান্য ব্যাপার, তাই ও নিয়ে বোধ হয় কেউ মাথা ঘামায়নি।'

ব্যোমকেশ ছবি নামাইয়া রাখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, 'চমৎকার ছবি। লোকটা যদি বেঁচে থাকত, আমিও ওকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিতাম। অমরেশবাবু, ছবিখানা যত্ন করে রাখবেন। আজ ফাল্গুনী পালের নাম কেউ জানে না, কিন্তু একদিন আসবে যেদিন ওর আঁকা ছবি সোনার দরে বিক্রি হবে।'

অমরেশবাবু একটু প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি ! তাহলে দশটা টাকা জলে পড়েনি ? ছবিটা বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙানো চলবে ?'

'নিশ্চয়।'

অতঃপর আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। অমরেশবাবু বলিলেন, 'আবার দেখা হবে। বছর শেষ হতে চলল, আমাকে আবার নববর্ষের ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে হেড আপিসের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। এবার নববর্ষে দু'দিন ছুটি।'

'দু'দিন ছুটি কেন ?'

'এবার একত্রিশে ডিসেম্বর রবিবার পড়েছে। শনিবার যদি অর্ধেক দিন ধরেন, তাহলে আড়াই দিন ছুটি পাওয়া যাবে। আপনারা এখনও কিছুদিন আছেন তো ?'

'২রা জানুয়ারি পর্যন্ত আছি বোধ হয়।'

'আচ্ছা, নমস্কার।'

আমরা বাহির হইলাম। ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া নামিতে হইল না, বাড়ির পিছনদিকে একটা খিড়কি-সিঁড়ি ছিল, সেই পথে নামিয়া রাস্তায় আসিলাম। বাজারের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সিগারেট ফুরাইয়াছে। বলিলাম, 'এস, এক টিন সিগারেট কিনতে হবে।'

ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক ছিল, চমকিয়া উঠিল। বলিল, 'আরে তাই তো! আমাকেও একটা জিনিস কিনতে হবে।'

একটা বড় মনিহারীর দোকানে ঢুকিলাম। আমি একদিকে সিগারেট কিনিতে গেলাম, ব্যোমকেশ অন্যদিকে গেল। আমি সিগারেট কিনিতে কিনিতে আড়চোখে দেখিলাম ব্যোমকেশ একটা দামী এসেন্সের শিশি কিনিয়া পকেটে পুরিল।

মনে মনে হাসিলাম। ইহারা কেন যে ঝগড়া করে, কেনই বা ভাব করে কিছু বুঝি না। দাম্পত্য-জীবন আমার কাছে একটা হাস্যকর প্রহেলিকা।

সেদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিবার জন্য বিছানায় লম্বা হইয়াছিলাম, ঘুম ভাঙিয়া দেখি বেলা সাড়ে তিনটা।

ব্যোমকেশের ঘর হইতে মৃদু জল্পনার শব্দ আসিতেছিল; উঁকি মারিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ চেয়ারে বসিয়াছে এবং সত্যবতী তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে কি সব বলিতেছে। দু'জনের মুখেই হাসি।

সরিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, 'ওহে কপোত-কপোতী, তোমাদের কূজন-গুঞ্জন শেষ হতে যদি দেরি থাকে তাহলে না হয় আমিই চায়ের ব্যবস্থা করি।'

সত্যবতী সলজ্জভাবে মুখের খানিকটা আঁচলের আড়াল দিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। খানিক পরে ব্যোমকেশ জ্বলন্ত সিগারেট হইতে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বাহির হইল। অবাক হইয়া বলিলাম, 'ব্যাপার কি! ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়ছ যে।'

ব্যোমকেশ একগাল হাসিয়া বলিল, 'পার্‌মিশান পেয়ে গেছি। আজ থেকে যত ইচ্ছে।'

বুঝিলাম দাম্পত্য-জীবনে কেবল প্রেম থাকিলেই চলে না, কূটবুদ্ধিরও প্রয়োজন।

৯

চা পান করিয়া উপরতলায় রোগিণীর সংবাদ লইতে গেলাম। সামাজিক কর্তব্য পালন না করিলে নয়।

অধ্যাপক সোমের মুখ চিন্তাক্রান্ত। মালতী দেবীর অবস্থা খুবই খারাপ, তবে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার মত নয়। দুটা ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে, অক্সিজেন দেওয়া হইতেছে। জ্বর খুব বেশি, রোগিণী মাঝে মাঝে ভুল বকিতেছেন। একজন নার্সকে সেবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে।

স্বখাত সলিল। সহানুভূতি জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

নীচে নামিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার ঘটক আসিল।

এবেলা ডাক্তারের ভাবভঙ্গী অন্য প্রকার। একটু সতর্ক, একটু সন্দিগ্ধ, একটু অন্তঃপ্রবিষ্ট। ব্যোমকেশের পানে মাঝে মাঝে এমনভাবে তাকাইতেছে যেন ব্যোমকেশ সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

কথাবার্তা সাধারণভাবেই হইল। ডাক্তার সকালে মহীধরবাবুর বাড়িতে গিয়া ফাল্গুনীর লাস দেখিয়াছিল, সেই কথা বলিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দেখলেন? মৃত্যুর কারণ জানা গেল?'

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'অটপ্সি না হওয়া পর্যন্ত জোর করে কিছু বলা যায় না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তবু আপনি ডাক্তার, আপনি কি কিছুই বুঝতে পারলেন না?'

ইতস্তত করিয়া ডাক্তরা বলিল, 'না।'

ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'ও কথা যাক। মহীধরবাবু কেমন আছেন? কাল বিকেলে আমরা

তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম ; কিন্তু ডাকাডাকি করেও কারুর সাড়া পাওয়া গেল না, তাই ফিরে এলাম।'

ডাক্তার সতর্কভাবে প্রশ্ন করিল, 'ক'টার সময় গিয়েছিলেন ?'

'আন্দাজ পাঁচটার সময়।'

ডাক্তার একটু ভাবিয়া বলিল, 'কি জানি। আমিও বিকেলবেলা গিয়েছিলাম, কিন্তু পাঁচটার আগে ফিরে এসেছিলাম। মহীধরবাবু ভালই আছেন। তবে আজকে বাড়িতে এই ব্যাপার হল—একটা শক্ পেয়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আর রজনী দেবী ! তিনি কেমন আছেন ?'

ডাক্তারের মুখের উপর দিয়া একটা রক্তাভা খেলিয়া গেল। কিন্তু সে ধীরে ধীরে বলিল, 'রজনী দেবী ভালই আছেন। তাঁর অসুখ করেছে এমন কথা তো শুনিনি। আচ্ছা, আজ উঠি।'

ডাক্তার উঠিল। আমরাও উঠিলাম। দ্বার পর্যন্ত আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কলকাতা যাওয়া তাহলে স্থির ?'

ডাক্তার ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দু'টা সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি এখানে শরীর সারাতে এসেছেন, গোয়েন্দাগিরি করতে নয়। যা আপনার এলাকার বাইরে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।' বলিয়া গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'ডাক্তার ঘটক এমনিতে খুব ভালমানুষ, কিন্তু ল্যাজে পা পড়লে একেবারে কেউটে সাপ।'

বাইরে মোটর-বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ আসিয়া থামিল। ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'আরে পাণ্ডে সাহেব এসেছেন। ভালই হল।'

পাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। ক্লান্ত হাসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার কথা ফলে গেল। পরী উদ্ধার করেছি।'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে চেয়ার দিয়া বলিল, 'বসুন। কোথা থেকে পরী উদ্ধার করলেন ?'

'মহীধরবাবুর কুয়ো থেকে। ফাল্গুনীর লাস বেরুবার পর কুয়োয় ডুবুরি নামিয়েছিলাম। উষানাথবাবুর পরী বেরিয়েছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আর কিছু ?'

'আর কিছু না।'

'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন ?'

'পেয়েছি। ফাল্গুনী জলে ডুবে মরেনি, মৃত্যুর পর তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।'

'হুঁ। অর্থাৎ কাল রাত্রে তাকে কেউ খুন করেছে। তারপর মৃতদেহটা কুয়োয় ফেলে দিয়েছে। আত্মহত্যা নয়।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু ফাল্গুনীর মতন একটা অপদার্থ লোককে খুন করে কার কি লাভ ?'

'লাভ নিশ্চয় আছে, নইলে খুন করবে কেন ? অপদার্থ লোক যদি কোনও সাংঘাতিক গুপ্তকথা জানতে পারে তাহলে তার বেঁচে থাকা কারুর কারুর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ফাল্গুনী অপদার্থ ছিল বটে, কিন্তু নির্বোধ ছিল না।'

পাণ্ডে বিরস মুখে বলিলেন, 'তা বটে। কিন্তু ভাবছি, পরীটা কুয়োর মধ্যে এল কি করে ? তবে কি ফাল্গুনীই পরী চুরি করেছিল ? খুনীর সঙ্গে ফাল্গুনীর কি পরী নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি হয়েছিল ? তারপর খুনী ফাল্গুনীকে ঠেলে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে ?—কিন্তু পরীটা তো এমন কিছু দামী জিনিস নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাল কথা, ফাল্গুনীর গায়ে কি কোনও আঘাত-চিহ্ন পাওয়া গেছে ?'

'না। কিন্তু তার পেটে অনেকখানি আফিম পাওয়া গেছে। মদের সঙ্গে আফিম মেশান

ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। দেখুন, কি করে ফাল্গুনীর মৃত্যু হল সেটা বড় কথা নয়, কেন মৃত্যু হল সেইটেই আসল কথা।'

পাণ্ডে উৎসুক চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'এ বিষয়ে আপনি কি কিছু বুঝেছেন ব্যোমকেশবাবু ?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'বোধ হয় কিছু কিছু বুঝেছি। আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আপনার শোনবার সময় হবে কি ?'

পাণ্ডে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বলিলেন, 'সময় হবে কিনা দেখাচ্ছি। চলুন আমার বাড়িতে, একেবারে রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরবেন।'

পাণ্ডে ব্যোমকেশকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

আমি আর সত্যবতী রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত তাস লইয়া গোলামচোর খেলিলাম।

ব্যোমকেশ ফিরিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হল এতক্ষণ ধরে ?'

ব্যোমকেশ স্বর্গীয় হাস্য করিয়া বলিল, 'আঃ, মুর্গিটা যা রেঁধেছিল !'

ধমক দিয়া বলিলাম, 'কথা চাপা দিও না। পাঁচ ঘণ্টা ধরে কি কথা হল ?'

ব্যোমকেশ জিভ কাটিল, 'পুলিসের গুপ্তকথা কি বলতে আছে ? তবে এমন কোনও কথা হয়নি যা তুমি জান না।'

'হত্যাকারী কে ?'

'পাঁচকড়ি দে।' বলিয়া ব্যোমকেশ সুট করিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পড়িল।

১০

বড়দিন আসিয়া চলিয়া গিয়াছে ; নববর্ষ সমাগতপ্রায়। এখানে বড়দিন ও নববর্ষের উৎসবে বিশেষ হৈ চৈ হয় না, সাহেব-মেমেরা হুইস্কি খাইয়া একটু নাচানাচি করে এই পর্যন্ত।

এ কয়দিনে নূতন কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। মালতী দেবীর রোগ ভালর দিকেই আসিতেছিল ; কিন্তু তিনি একটু সংবিৎ পাইয়া দেখিলেন ঘরে যুবতী নার্স রহিয়াছে। অমনি তাঁহার ষষ্ঠ রিপু প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি গালাগালি দিয়া নার্সকে তাড়াইয়া দিলেন। ফলে অবস্থা আবার যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে, অধ্যাপক সোম একা হিমসিম খাইতেছেন।

শনিবার ৩০শে ডিসেম্বর সকালবেলা ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, আজ একটু রোঁদে বেরুনো যাক।'

রিক্‌শা চড়িয়া বাহির হইলাম।

প্রথমে উপস্থিত হইলাম নকুলেশবাবুর ফটোগ্রাফির দোকানে। নীচে দোকান, উপরতলায় নকুলেশবাবুর বাসস্থান। তিনি উপরে ছিলেন, আমাদের দেখিয়া যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল তিনি বাঁধাছাঁদা করিতেছিলেন ; কাষ্ঠ হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন—ছবি তোলাবেন নাকি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন নয়। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আপনার দোকানটা দেখে যাই।'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'বেশ বেশ। আমি কিন্তু ভাল ছবি তুলি। এখানকার কেষ্ট-বিষ্টু সকলেই আমাকে দিয়ে ছবি তুলিয়েছেন। এই দেখুন না।'

ঘরের দেয়ালে অনেকগুলি ছবি টাঙানো রহিয়াছে ; তন্মধ্যে চেনা লোক মহীধরবাবু এবং অধ্যাপক সোম। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'বাঃ, বেশ ছবি। আপনি দেখছি একজন সত্যিকারের শিল্পী।'

নকুলেশবাবু খুশি হইয়া বলিলেন, 'হেঁ হেঁ। ওরে লালু, পাশের দোকান থেকে দু' পেয়ালা চা

নিয়ে আয়।'

'চায়ের দরকার নেই, আমরা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি। আপনি কোথাও যাবেন মনে হচ্ছে।'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, দু' দিনের জন্য একবার কলকাতা যাব। বৌ-ছেলে কলকাতায় আছে; তাদের আনতে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, আপনি গোছগাছ করুন।'

রিক্‌শাতে চড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'স্টেশনে চল।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপার কি ? সবাই জোট বেঁধে কলকাতা যাচ্ছে !'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এই সময় কলকাতার একটা নিদারুণ আকর্ষণ আছে।'

রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ব্রাঞ্চ লাইনের প্রান্তীয় স্টেশন, বেশি বড় নয়। এখান হইতে বড় জংশন প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে, সেখানে নামিয়া মেন লাইনের গাড়ি ধরিতে হয়। রেল ছাড়া জংশনে যাইবার মোটর-রাস্তাও আছে ; সাহেব সুবা এবং যাহাদের মোটর আছে তাহারা সেই পথে যায়।

ব্যোমকেশ কিন্তু স্টেশনে নামিল না, রিক্‌শাওয়ালাকে ইশারা করিতেই সে গাড়ি ঘুরাইয়া বাহিরে লইয়া চলিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হল, নামলে না ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করনি, টিকিট-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার ঘটক টিকিট কিনছিল।'

'তাই নাকি ?' আমি ব্যোমকেশকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে যেন শুনিতে পায় নাই এমনি ভান করিয়া উত্তর দিল না।

বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে বড় মনিহারীর দোকানটার সামনে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম। ব্যোমকেশ রিক্‌শা থামাইয়া নামিল, আমিও নামিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবার কি মতলব ? আরও এসেন্স চাই নাকি ?'

সে হাসিয়া বলিল, 'আরে না না—'

'তবে কি কেশতৈল ? তরল আলতা ?'

'এসই না।'

দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ডেপুটি ঊষানাথবাবু রহিয়াছেন। তিনি একটা চামড়ার সুটকেস কিনিতেছেন। আমার মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, 'আপনিও কি কলকাতা যাচ্ছেন নাকি ?'

ঊষানাথবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, 'আমি ! নাঃ, আমি ট্রেজারি অফিসার, আমার কি স্টেশন ছাড়বার জো আছে ? কে বললে আমি কলকাতা যাচ্ছি ?' তাঁহার স্বর কড়া হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সান্ত্বনার সুরে বলিল, 'কেউ বলেনি। আপনি সুটকেস কিনছেন দেখে অজিত্ ভেবেছিল—। যাক, আপনার পরী পেয়েছেন তো ?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।' ঊষানাথবাবু অসন্তুষ্টভাবে মুখ ফিরাইয়া লইয়া দোকানদারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

আমরা ফিরিয়া গিয়া রিক্‌শাতে চড়িলাম। বলিলাম, 'কি হল ? হুজুর হঠাৎ চটলেন কেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি জানি। ওঁর হয়তো মনে মনে কলকাতা যাবার ইচ্ছে, কিন্তু কর্তব্যের দায়ে স্টেশন ছাড়তে পারছেন না, তাই মেজাজ গরম। কিংবা—'

রিক্‌শাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, 'আভি কিধর্ যানা হ্যায় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডি.এস.পি. পাণ্ডে সাহেব।'

পাণ্ডে সাহেবের বাড়িতেই আপিস। তিনি আমাদের স্বাগত করিলেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সব ঠিক ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সব ঠিক।'

'ট্রেন কখন ?'

'রাত্রি সাড়ে দশটায়। সওয়া এগারটায় জংশন পৌঁছবে।'

'কলকাতার ট্রেন কখন ?'

'পৌনে বারটায়।'

'আর পশ্চিমের মেল ?'

'এগারটা পঁয়ত্রিশ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ। তাহলে ওবেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় আমি মহীধরবাবুর বাড়িতে যাব। আপনি সাড়ে পাঁচটার সময় যাবেন। মহীধরবাবু যদি আমার অনুরোধ না রাখেন, পুলিসের অনুরোধ নিশ্চয় অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।'

গম্ভীর হাসিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'আমারও তাই বিশ্বাস।'

ইহাদের টেলিগ্রাফে কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম হইল না। কিন্তু প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই ; জানি প্রশ্ন করিলেই ব্যোমকেশ জিভ কাটিয়া বলিবে—পুলিসের গুপ্তকথা।

পাণ্ডের আপিস হইতে ব্যাঙ্কে গেলাম। কিছু টাকা বাহির করিবার ছিল।

ব্যাঙ্কে খুব ভিড় ; আগামী দুই দিন বন্ধ থাকিবে। তবু ক্ষণেকের জন্য অমরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি বলিলেন, 'এই বেলা যা দরকার টাকা বার করে নিন। কাল পরশু ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি ফিরছেন কবে ?'

'পরশু রাত্রেই ফিরব।'

কাজের সময়, একজন কেরানী তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা টাকা বাহির করিয়া ফিরিতেছি, দেখিলাম ডাক্তার ঘটক ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিল। সে আমাদের দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু যেন দেখিতে পায় নাই এমনিভাবে গিয়া একটা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ আমার দিকে চাহিয়া সহাস্য চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিল। তারপর রিক্‌শাতে চড়িয়া বসিয়া বলিল, 'ঘর চলো।'

১১

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আমি আর ব্যোমকেশ মহীধরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। তিনি বসিবার ঘরে ছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে। মুখের ফুটি-ফাটা হাসিটি ম্রিয়মাণ, চালতার মতন গাল দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

বলিলেন, 'আসুন আসুন। অনেক দিন বাঁচবেন ব্যোমকেশবাবু, এইমাত্র আপনার কথা ভাবছিলাম। শরীর বেশ সেরে উঠেছে দেখছি। বাঃ, বেশ বেশ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনার শরীর তো ভাল দেখছি না।'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'হয়েছিল একটু শরীর খারাপ—এখন ভালই। কিন্তু একটা বড় ভাবনার কারণ হয়েছে ব্যোমকেশবাবু।'

'কি হয়েছে ?'

'রজনী কাল রাত্রে কলকাতা চলে গেছে।'

'সে কি ! একলা গেছেন ? আপনাকে না বলে ?'

'না না, সে সব কিছু নয়। বাড়ির পুরোনো চাকর রামদীনকে তার সঙ্গে দিয়েছি।'

'তবে ভাবনাটা কিসের ?'

মহীধরবাবুর মনে ছল চাতুরী নাই। সোজাসুজি বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'শুনুন, বলি তাহলে। কলকাতায় রজনীর এক মাসী থাকেন, তিনিই ওকে মানুষ করেছেন। কাল বিকেলে ওর মেসোর এক 'তার' এল। তিনি রজনীকে ডেকে পাঠিয়েছেন—মাসীর ভারি অসুখ।

রজনীকে রাত্তিরের গাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। ও এমন প্রায়ই যাতায়াত করে, পাঁচ ছ' ঘণ্টার রাস্তা বৈ তো নয়। রজনী আজ সকালে কলকাতায় পৌঁছে গেছে, 'তার' পেয়েছি।

'এ পর্যন্ত কোনও গোলমাল নেই। তারপর শুনুন। আজ সকালে দু'খানা চিঠি পেলাম; তার মধ্যে একখানা রজনীর মাসীর হাতের লেখা—কালকের রারিখ। তিনি নিতান্ত মামুলি চিঠি লিখেছেন, অসুখ-বিসুখের কোনও কথাই নেই।'

মহীধরবাবু শঙ্কিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'এমনও তো হতে পারে চিঠি লেখবার পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'তা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু অন্য চিঠিখানার কথা এখনও বলিনি। বেনামী চিঠি। এই পড়ে দেখুন।'

তিনি একটি খাম ব্যোমকেশকে দিলেন। খামের উপর ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া বোঝা যায় এই শহরেই ডাকে দেওয়া হইয়াছে। ব্যোমকেশ চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। সাদা এক তক্তা কাগজের উপর মাত্র কয়েকটি কথা লেখা ছিল—

আপনার চোখের আড়ালে একজন ভদ্রবেশী দুষ্ট লোক আপনার কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছে। ইহারা যদি ইলোপ করে, কেলেঙ্কারির একশেষ হইবে। সাবধান! ডাক্তার ঘটককে বিশ্বাস করিবেন না।

ব্যোমকেশ চিঠি পড়িয়া ফেরত দিল। মহীধরবাবু কম্পিত স্বরে বলিলেন, 'কে লিখেছে জানি না। কিন্তু এ যদি সত্যি হয়—'

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে আপনি জানেন। সে এমন কাজ করবে বলে আপনার মনে হয়?'

মহীধরবাবু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'ডাক্তারকে তো ভাল ছেলে বলেই জানি; যখন তখন আসে আমার বাড়িতে। তবে পরচিত্ত অন্ধকার। আচ্ছা, সে কি আছে এখানে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে। আজ সকালেই তাকে দেখেছি।'

মহীধরবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আছে? যাক, তাহলে বোধ হয় কেউ মিথ্যে বেনামী চিঠি দিয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার কিন্তু আজ রাত্রে কলকাতা যাচ্ছে।'

মহীধরবাবু আবার ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ—যাচ্ছে! তবে— ?'

ব্যোমকেশ দৃঢ়স্বরে বলিল, 'মহীধরবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনও কেলেঙ্কারি হবে না। আপনি মিথ্যে ভয় করছেন।'

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'সত্যি বলছেন? কিন্তু আপনি কি করে জানলেন—আপনি তো—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি এমন অনেক কথা জানি যা আপনি জানেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি না। রজনী দেবী দু'দিন পরেই ফিরে আসবেন। তিনি এমন কোনও কাজ করবেন না যাতে আপনার মাথা হেঁট হয়।'

মহীধরবাবু গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, 'ব্যস, তা হলেই হল। ধন্যবাদ ব্যোমকেশবাবু। আপনার কথায় যে কত দূর নিশ্চিন্ত হলাম তা বলতে পারি না। বুড়ো হয়েছি—ভগবান একবার দাগা দিয়েছেন—তাই একটুতেই ভয় হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকথা ভুলে যান। আমি এসেছি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে।'

মহীধরবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'বলুন বলুন।'

'আপনার মোটরখানা আজ রাত্রে একবার দিতে হবে। জংশনে যাব। একটু জরুরী কাজ আছে।'

'এ আর বেশি কথা কি? কখন চাই বলুন?'

'রাত্রি ন'টার সময়।'

'বেশ, ঠিক ন'টার সময় আমার গাড়ি আপনার বাড়ির সামনে হাজির থাকবে। আর কিছু ?'

'আর কিছু না।'

এই সময় পাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া চা ও প্রচুর জলখাবার ধ্বংস করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

ঠিক ন'টার সময় মহীধরবাবুর আট সিলিন্ডার গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে আসিয়া থামিল। আমি, ব্যোমকেশ ও পাণ্ডে সাহেব তাহাতে চাপিয়া বসিলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। একটি কালো রঙের পুলিস ভ্যান আগে হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, সেটি আমাদের পিছু লইল।

শহরের সীমানা অতিক্রম করিয়া আমাদের মোটর জংশনের দীর্ঘ গৃহহীন পথ ধরিল। দুই পাশে কেবল বড় বড় গাছ ; আমাদের গাড়ি তাহার ভিতর আলোর সুড়ঙ্গ রচনা করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

পথে বেশি কথা হইল না। তিনজনে পাশাপাশি বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট টানিয়া চলিয়াছি। একবার ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার আসামী ফার্স্ট ক্লাসের কিকিট কিনবে।'

'হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়। যে ক্লাসেই উঠুক, ইন্সপেক্টর দুবে পাশের কামরায় থাকবে।'

'পুলিস মহলে আসল কথা কে কে জানে ?'

'আমি আর দুবে। পাছে আগে থাকতে বেশি হৈ চৈ হয় তাই চুপিসাড়ে মহীধরবাবুর গাড়ি নিতে হল। পিছনের ভ্যানে যারা আছে তারাও জানে না কি জন্যে কোথায় যাচ্ছি। পুলিসের থানা থেকে যত কথা বেরোয় এত আর কোথাও থেকে নয়। ঘুষখোর পুলিস তো আছেই। তা ছাড়া পুলিসের পেটে কথা থাকে না।'

পুরন্দর পাণ্ডে নির্মলচরিত্র পুরুষ, তাই স্বজাতি সম্বন্ধেও তিনি সত্যবাদী।

দশটার সময় জংশনে পৌঁছিলাম। লাল সবুজ অসংখ্য আকাশ-প্রদীপে স্টেশন ঝলমল করিতেছে।

পুলিসের ভ্যানে দুইজন সাব-ইন্সপেক্টর ও কয়েকটি কনস্টেবল ছিল। পাণ্ডে তাহাদের স্টেশনের ভিতরে বাহিরে নানা স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন ; তারপর স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে দেখা করিলেন। বলিলেন, 'আমার একটা 'লগ' আসবার কথা আছে। এলেই খবর দেবেন। আমরা ওয়েটিং রুমে আছি।'

আমরা তিনজনে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে গিয়া বসিলাম। পাণ্ডে ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখিতে লাগিলেন।

ঠিক সাড়ে দশটার সময় স্টেশন-মাস্টার খবর দিলেন, "লগ' এসেছে। সব ভাল। ফার্স্ট ক্লাস।'

এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় যত দীর্ঘই হোক, প্রাকৃতিক নিয়মে শেষ হইতে বাধ্য। গাড়ি আসার ঘন্টা বাজিল। আমরা প্ল্যাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের সকলের গায়ে ওভারকোট এবং মাথায় পশমের টুপি, সুতরাং সহসা দেখিয়া কেহ যে চিনিয়া ফেলিবে সে সম্ভাবনা নাই।

তারপর বহু প্রতীক্ষিত গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

পাণ্ডে সাহেব নাটকের রঙ্গমঞ্চ ভালই নির্বাচন করিয়াছিলেন। আয়োজনেরও কিছু ত্রুটি রাখেন নাই ; কিন্তু তবু নাটক জমিতে পাইল না, পটোত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িয়া গেল।

গাড়ির প্রথম শ্রেণীর কামরা যেখানে থামে আমরা সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলাম। ঠিক আমাদের সামনে প্রথম শ্রেণীর কামরা দেখা গেল। জানালাগুলির কাঠের কবাট বন্ধ, তাই অভ্যন্তরভাগ দেখা গেল না। অল্পকাল-মধ্যে দরজা খুলিয়া গেল। একজন কুলি ছুটিয়া গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দুইটি বড় বড় চামড়ার সুটকেস নামাইয়া রাখিল।

কামরায় একটি মাত্র যাত্রী ছিলেন, তিনি এবার বাহির হইয়া আসিলেন। কোটপ্যান্ট-পরা সুপরিচিত ভদ্রলোক, গোঁফ-দাড়ি কামানো, চোখে ফিকা নীল চশমা। তিনি সুটকেস দু'টি কুলির

মাথায় তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, পাণ্ডে এবং ব্যোমকেশ তাঁহার দুই পাশে গিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ একটু দুঃখিত স্বরে বলিল, 'অমরেশবাবু, আপনার যাওয়া হল না। ফিরে যেতে হবে।'

অমরেশবাবু! ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা! গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখ দেখিয়া একেবারে চিনিতে পারি নাই।

অমরেশ রাহা একবার দক্ষিণে একবার বামে ঘাড় ফিরাইলেন, তারপর ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া নিজের কপালে ঠেকাইয়া ঘোড়া টানিলেন। চড়াৎ করিয়া শব্দ হইল।

মুহূর্তমধ্যে অমরেশ রাহার ভূপতিত দেহ ঘিরিয়া লোক জমিয়া গেল। পাণ্ডে হুইসল বাজাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের বহু লোক আসিয়া স্থানটা ঘিরিয়া ফেলিল। পাণ্ডে কড়া সুরে বলিলেন, 'ইন্সপেক্টর দুবে, সুটকেস দুটো আপনার জিম্মায়।'

একজন লোক ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। চিনিলাম, ডাক্তার ঘটক। সে বলিল, 'কি হয়েছে? এ কে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'অমরেশ রাহা। দেখুন তো বেঁচে আছে কি না।'

ডাক্তার ঘটক নত হইয়া দেহ পরীক্ষা করিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'মারা গেছে।'

ভিড়ের ভিতর হইতে দন্তবাদ্যসহযোগে একটা বিস্ময়-কুতূহলী স্বর শোনা গেল, 'অমরেশ রাহা মারা গেছে—অ্যাঁ! কি হয়েছিল? তার দাড়ি কোথায়—অ্যাঁ—!'

ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার।

ডাক্তার ঘটক ও নকুলেশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের গাড়িও এসে পড়েছে। এখন বলবার সময় নেই, ফিরে এসে শুনবেন।'

১২

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা সাংঘাতিক ভুল করেছিলুম। অমরেশ রাহা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তার যে পিস্তলের লাইসেন্স থাকতে পারে একথা মনেই আসেনি।'

সত্যবতী বলিল, 'না, গোড়া থেকে বল।'

২রা জানুয়ারি। কলিকাতায় ফিরিয়া চলিয়াছি। ডি.এস.পি. পাণ্ডে, মহীধরবাবু ও রজনী স্টেশনে আসিয়া আমাদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এতক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত মনে একত্র হইতে পারিয়াছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুটো জিনিস জট পাকিয়ে গিয়েছিল—এক, ছবি চুরি; দ্বিতীয়, ডাক্তার আর রজনীর গুপ্ত প্রণয়। ওদের প্রণয় গুপ্ত হলেও তাতে নিন্দের কিছু ছিল না। ওরা কলকাতায় গিয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে। সম্ভবত রজনীর মাসী আর মেসো জানেন, আর কেউ জানে না; মহীধরবাবুও না। তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন কেউ জানবে না। মহীধরবাবু সেকেলে লোক নয়, তবু বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে সাবেক সংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি। তাই ওরা লুকিয়ে বিয়ে করে সব দিক রক্ষা করেছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খবরটা কি ডাক্তারের কাছে পেলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উঁহু। ডাক্তারকে ঘাঁটাইনি, ও যে রকম রুখে ছিল, কিছু বলতে গেলেই কামড়ে দিত। আমি রজনীকে আড়ালে বলেছিলাম, সব জানি। সে জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যোমকেশবাবু, আমরা কি অন্যায় করেছি? আমি বলেছিলাম—না। তোমরা যে বিদ্রোহের ঝোঁকে মহীধরবাবুকে দুঃখ দাওনি, এতেই তোমাদের গৌরব। উগ্র বিদ্রোহে বেশি কাজ হয় না, কেবল বিরুদ্ধ শক্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়। বিদ্রোহের সঙ্গে সহিষ্ণুতা চাই। তোমরা সুখী হবে।'

সত্যবতী বলিল, 'তারপর বল।'

ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল, 'ছবি চুরির ব্যাপারটাকে যদি হাল্কা ভাবে নাও তাহলে তার অনেক রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু যদি গুরুতর ব্যাপার মনে কর, তাহলে তার একটিমাত্র ব্যাখ্যা হয়—ঐ গ্রুপের মধ্যে এমন একজন আছে যে নিজের চেহারা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চায়।

'কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?—একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে ঐ দলে একজন দাগী আসামী আছে যে নিজের ছবির প্রচার চায় না। প্রস্তাবটা কিন্তু টেকসই নয়। ঐ গ্রুপে যারা আছে তারা কেউ লুকিয়ে বেড়ায় না, তাদের সকলেই চেনে। সুতরাং ছবি চুরি করার কোনও মানে হয় না।

'দাগী আসামীর সম্ভাবনা ত্যাগ করতে হচ্ছে। কিন্তু যদি ঐ দলে এমন কেউ থাকে যে ভবিষ্যতে দাগী আসামী হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, অর্থাৎ একটা গুরুতর অপরাধ করে কেটে পড়বার চেষ্টায় আছে, তাহলে সে নিজের ছবি লোপাট করবার চেষ্টা করবে। অজিত, তুমি তো লেখক, শুধু ভাষার দ্বারা একটা লোকের এমন হুবহু বর্ণনা দিতে পার যাতে তাকে দেখলেই চেনা যায়?—পারবে না; বিশেষত তার চেহারা যদি মামুলি হয় তাহলে একেবারেই পারবে না। কিন্তু একটা ফটোগ্রাফ মুহূর্তমধ্যে তার চেহারাখানা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে। তাই দাগী আসামীদের ফটো পুলিসের ফাইলে রাখা থাকে।

'তাহলে পাওয়া গেল, ঐ দলের একটা লোক গুরুতর অপরাধ করে ডুব মারবার ফন্দি আঁটছে। এখন প্রশ্ন এই—সংকল্পিত অপরাধটা কি এবং লোকটা কে?

'গ্রুপের লোকগুলিকে একে একে ধরা যাক।—মহীধরবাবু ডুব মারবেন না; তাঁর বিপুল সম্পত্তি আছে, চেহারাখানাও ডুব মারবার অনুকূল নয়। ডাক্তার ঘটক রজনীকে নিয়ে উধাও হতে পারে কিন্তু রজনী সাবালিকা, তাকে নিয়ে পালানো আইন-ঘটিত অপরাধ নয়। তবে ছবি চুরি করতে যাবে কেন? অধ্যাপক সোমকেও বাদ দিতে পার। সোম যদি শিকল কেটে ওড়বার সঙ্কল্প করতেন তা হলেও স্রেফ ঐ ছবিটা চুরি করার কোনও মানে হত না। সোমের আরও ছবি আছে; নকুলেশবাবুর ঘরে তাঁর ফটো টাঙানো আছে আমরা দেখেছি। তারপর ধর নকুলেশবাবু; তিনি পিক্‌নিকের দলে ছিলেন। তিনি মহীধরবাবুর কাছে মোটা টাকা ধার করেছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে গা-ঢাকা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তিনি ফটো তুলেছিলেন, ফটোতে তাঁর চেহারা ছিল না। অতএব তাঁর পক্ষে ফটো চুরি করতে যাওয়া বোকামি।

'বাকি রয়ে গেলেন ডেপুটি ঊষানাথবাবু এবং ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার অমরেশ রাহা। একজন সরকারী মালখানার মালিক, অন্যজন ব্যাঙ্কের কর্তা। দেখা যাচ্ছে, ফেরার হয়ে যদি কারুর লাভ থাকে তো এঁদের দু'জনের। দু'জনের হাতেই বিস্তর পরের টাকা; দু'জনেই চিনির বলদ।

'প্রথমে ঊষানাথবাবুকে ধর। তাঁর স্ত্রী-পুত্র আছে; চেহারাখানাও এমন যে ফটো না থাকলেও তাঁকে সনাক্ত করা চলে। তিনি চোখে কালো চশমা পরেন, চশমা খুললে দেখা যায় তাঁর একটা চোখ কানা। বেশিদিন পুলিসের সন্ধানী চক্ষু এড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, তাঁর চরিত্রও এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করার প্রতিকূল।

'বাকি রইলেন অমরেশ রাহা। এটা অবশ্য নেতি প্রমাণ। কিন্তু তারপর তাঁকে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। তাঁর চেহারা নিতান্ত সাধারণ, তাঁর মত লক্ষ লক্ষ বৈশিষ্ট্যহীন লোক পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছেন। এ রকম দাড়ি রাখার সুবিধে, দাড়ি কামিয়ে ফেললেই চেহারা বদলে যায়, তখন চেনা লোক আর চিনতে পারে না। নকল দাড়ি পরার চেয়ে তাই আসল দাড়ি কামিয়ে ফেলা ছদ্মবেশ হিসেবে ঢের বেশি নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য।

'অমরেশবাবু অবিবাহিত ছিলেন। তিনি মাইনে ভালই পেতেন, তবু তাঁর মনে দারিদ্র্যের ক্ষোভ ছিল; টাকার প্রতি দুর্দম আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল। আমার মনে হয় তিনি অনেকদিন ধরে এই কু-মতলব আঁটছিলেন। তাঁর আলমারিতে গুজরাটী বই দেখেছিলে মনে আছে? তিনি চেষ্টা করে

গুজরাটী ভাষা শিখেছিলেন ; হয়তো সংকল্প ছিল টাকা নিয়ে বোম্বাই অঞ্চলে গিয়ে বসবেন। বাঙালীদের সঙ্গে গুজরাটীদের চেহারার একটা ধাতুগত ঐক্য আছে, ভাষাটাও রপ্ত থাকলে কেউ তাঁকে সন্দেহ করতে পারবে না।

'সবদিক ভেবে আটঘাট বেঁধে তিনি তৈরি হয়েছিলেন। তারপর যখন সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করবার সময় হল তখন হঠাৎ কতকগুলো অপ্রত্যাশিত বাধা উপস্থিত হল। পিক্‌নিকের দলে গিয়ে তাঁকে ছবি তোলাতে হল। তিনি অনিচ্ছাভরে ছবি তুলিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু না তোলাতে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। ভাবলেন, ছবি চুরি করে সামলে নেবেন।

'যা হোক, তিনি মহীধরবাবুর বাড়ি থেকে ছবি চুরি করলেন। পরদিন চায়ের পার্টিতে আমরা উপস্থিত ছিলাম ; সেখানে যে সব আলোচনা হল তাতে অমরেশবাবু বুঝলেন তিনি একটা ভুল করেছেন। স্রেফ ছবিখানা চুরি করা ঠিক হয়নি। তাই পরের বার যখন তিনি ঊষানাথবাবুর বাড়িতে চুরি করতে গেলেন তখন আর কিছু না পেয়ে পরী চুরি করে আনলেন। আলমারিতে চাবি ঢুকিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন যাতে মনে হয় ছবি চুরি করাটা চোরের মূল উদ্দেশ্য নয়। অধ্যাপক সোমের ছবিটা চুরি করার দরকার হয়নি। আমার বিশ্বাস তিনি কোনও উপায়ে জানতে পেরেছিলেন যে, মালতী দেবী ছবিটা আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে, তিনি ছবি চুরি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু ছবি তার আগেই নষ্ট করা হয়েছিল। হয়তো তিনি ছেঁড়া ছবির টুকরোগুলো পেয়েছিলেন।

'আমার আবির্ভাবে অমরেশবাবু শঙ্কিত হননি। তাঁর মূল অপরাধ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে ; তিনি টাকা নিয়ে উধাও হবার পর সবাই জানতে পারবে, তখন আমি জানলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ফাল্গুনী পালের প্রেতমূর্তি যখন এসে দাঁড়াল, তখন অমরেশবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তাঁর সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যাবার উপক্রম হল। ফাল্গুনী থাকতে ফটো চুরি করে কি লাভ ? সে স্মৃতি থেকে ছবি এঁকে ফটোর অভাব পূরণ করে দেবে।

'কিন্তু পরকীয়া-প্রীতির মত বেআইনী কাজ করার একটা তীব্র উত্তেজনা আছে। অমরেশবাবু তার স্বাদ পেয়েছিলেন। তিনি এতদূর এগিয়ে আর পেছুতে পারছিলেন না। তাই ফাল্গুনী যেদিন তাঁর ছবি এঁকে দেখাতে এল সেদিন তিনি ঠিক করলেন ফাল্গুনীর বেঁচে থাকা চলবে না। সেই রাত্রে তিনি মদের বোতলে বেশ খানিকটা আফিম মিশিয়ে নিয়ে ফাল্গুনীর কুঁড়ে ঘরে গেলেন। ফাল্গুনীকে নেশার জিনিস খাওয়ানো শক্ত হল না। তারপর সে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ল তখন তাকে তুলে কুয়োয় ফেলে দিলেন। আগের রাত্রে চুরি-করা পরীটা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, সেটাও কুয়োর মধ্যে গেল ; যাতে পুলিস ফাল্গুনীকেই চোর বলে মনে করে। এই ব্যাপার ঘটেছিল সম্ভবত রাত্রি এগারোটার পর, যখন বাগানের অন্য কোণে আর একটি মন্ত্রণা-সভা শেষ হয়ে গেছে।

'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট থেকে মনে হয় ফাল্গুনী জলে পড়বার আগেই মরে গিয়েছিল। কিন্তু অমরেশবাবুর বোধ হয় ইচ্ছে ছিল সে বেঁচে থাকতে থাকতেই তাকে জলে ফেলে দেন, যাতে প্রমাণ হয় সে নেশার ঝোঁক অপঘাতে জলে ডুবে মরেছে।

'যা হোক, অমরেশবাবু নিষ্কণ্টক হলেন। যে ছবিটা তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন, রওনা দেবার আগে সেটা পুড়িয়ে ফেললেই নিশ্চিন্ত, আর তাঁকে সনাক্ত করবার কোনও চিহ্ন থাকবে না।

'আমি যখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলাম এ অমরেশবাবুর কাজ, তখন পাণ্ডে সাহেবকে সব কথা বললাম। ভারি বুদ্ধিমান লোক, চট করে ব্যাপার বুঝে নিলেন। সেই থেকে এক মিনিটের জন্যেও অমরেশবাবু পুলিসের চোখের আড়াল হতে পারেননি।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল।

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, অমরেশ রাহা যে ঠিক ঐ দিনই পালাবে, এটা বুঝলে কি করে ? অন্য যে কোনও দিন পালাতে পারত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা কোনও ছুটির আগে পালানোর সুবিধে আছে, দু'দিন সময় পাওয়া যায়। দু'দিন পরে ব্যাঙ্ক খুললে যখন চুরি ধরা পড়বে, চোর তখন অনেক দূরে। অবশ্য বড়দিনের ছুটিতেও পালাতে পারত ; কিন্তু তার দিক থেকে নববর্ষের ছুটিতেই পালানোর দরকার ছিল। অমরেশ রাহা যে-ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল সেটা কলকাতার একটা বড় ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিস। প্রত্যেক মাসের শেষে এখানে হেড আপিস থেকে মোটা টাকা আসত ; কারণ পরের মাসের আরম্ভেই ব্যাঙ্কের টাকায় টান পড়বে। সাধারণ লোক ছাড়াও এখানে কয়েকটা খনি আছে, তাতে অনেক কর্মী কাজ করে, মাসের পয়লা তাদের মাইনে দিতে হয়। এবার সেই মোটা টাকাটা ব্যাঙ্কে এসেছিল বড়দিনের ছুটির পর। বড়দিনের ছুটির আগে পালালে অমরেশ রাহা বেশি টাকা নিয়ে যেতে পারত না। তার দুটি সুটকেশ থেকে এক লাখ আশি হাজার টাকার নোট পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ লম্বা হইয়া শুইল, বলিল, 'আর কোনও প্রশ্ন আছে ?'

'দাড়ি কামালো কখন ? ট্রেনে ?'

'হ্যাঁ। সেইজন্যেই ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছিল। ফার্স্ট ক্লাসে সহযাত্রীর সম্ভাবনা কম।'

সত্যবতী বলিল, 'মহীধরবাবুকে বেনামী চিঠি কে দিয়েছিল ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রোফেসর সোম। কিন্তু বেচারার প্রতি অবিচার কোরো না। লোকটি শিক্ষিত এবং সজ্জন, এক ভয়ঙ্করী স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে তাঁর জীবনটা নষ্ট হতে বসেছে। সোম সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিকেও কিছু হল না, ডাক্তার ঘটকের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হেরে গেলেন। তাই ঈর্ষার জ্বালায়—। ঈর্ষার মতন এমন নীচ প্রবৃত্তি আর নেই। কাম ক্রোধ লোভ—ষড়রিপুর মধ্যে সবচেয়ে অধম হচ্ছে মাৎসর্য।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মালতী দেবীর অসুখের খুবই বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। কারুর মৃত্যু-কামনা করতে নেই, কিন্তু মালতী দেবী যদি সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে এই বেলা স্বর্গারোহণ করেন তাহলে অন্তত আমি অসুখী হব না।'

আমিও মনে মনে সায় দিলাম।

দুর্গরহস্য

পূর্বখণ্ড

১

ব্যোমকেশের শরীর সারাইবার জন্য সাঁওতাল পরগণার যে শহরে হাওয়া বদলাইতে গিয়াছিলাম, বছর না ঘুরিতেই যে আবার সেখানে যাইতে হইবে, তাহা ভাবি নাই। এবার কিন্তু স্বাস্থ্যের অন্বেষণে নয়, পুরন্দর পাণ্ডে মহাশয় যে নূতন শিকারের সন্ধান দিয়াছিলেন তাহারই অন্বেষণে ব্যোমকেশ ও আমি বাহির হইয়াছিলাম।

প্রথমবার যখন এ শহরে যাই, তখন এখানকার অনেকগুলি বাঙালীর সহিত পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু শহরের বাহিরেও যে একটি ধনী বাঙালী পরিবার বাস করেন, তাহা কেহ বলে নাই। এই পরিবারটিকে লইয়া এই বিচিত্র কাহিনী। সুতরাং তাহার কথাই সর্বাগ্রে বলিব। সব কথা অবশ্য একসঙ্গে জানিতে পারি নাই, ছাড়া-ছাড়া ভাবে কয়েকজনের মুখে শুনিলাম। পাঠকের সুবিধার জন্য আরম্ভেই সেগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া দিলাম।

শহরের দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ জংশন হইতে বিপরীত মুখে প্রায় ছয় মাইল পর্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে। রাস্তাটি বহু পুরাতন; বাদশাহী আমলের। বড় বড় চৌকশ পাথর দিয়া আচ্ছাদিত; পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঘাস ও আগাছা জন্মিয়াছে, কিন্তু তবু রাস্তার উপর দিয়া মোটর চালানো যায়। দুই পাশের শিলাকর্কশ বন্ধুরতাকে দ্বিধা ভিন্ন করিয়া পথ এখনও নিজের কঠিন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

এই পথের সর্পিল গতি যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেখানে পাশাপাশি দুটি ক্ষুদ্র গিরিচূড়া। কালিদাসের বর্ণনা মনে পড়ে 'মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ।' বেশি উঁচু নয়, কিন্তু দু'টি চূড়ার মাঝখানে খাঁজ পড়িয়াছে। উপমা কালিদাসস্য বাদ দিলেও দৃশ্যটি লোভনীয়।

চূড়া দু'টি নিরাভরণ নয়। একটির মাথায় প্রাচীন কালের এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ; অন্যটির শীর্ষে আধুনিক কালের চুনকাম করা বাড়ি। বাড়ি এবং দুর্গের মালিক শ্রীরামকিশোর সিংহ সপরিবারে এই স্থানে বাস করেন।

এইখানে প্রাচীন দুর্গ ও তাহার আধুনিক মালিকের কিছু পরিচয় আবশ্যক। নবাব আলিবর্দীর আমলে জানকীরাম নামক জনৈক দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি রাজা জানকীরাম খেতাব পাইয়া কিছুকাল সুবা বিহার শাসন করিয়াছিলেন এবং প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে তখন ক্রান্তিকাল আরম্ভ হইয়াছে; ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল বাদশাহী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; দুর্দম মারাঠা বর্গী বারম্বার বাঙলা বিহারে হানা দিয়া চারিদিক ছারখার করিয়া দিতেছে; ইংরেজ বণিক বাণিজ্যের খোলস ছাড়িয়া রাজদণ্ডের দিকে হাত বাড়াইতেছে। দেশজোড়া অশান্তি; রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র কাহারও চিত্তে সুখ নাই। রাজা জানকীরাম কুশাগ্রবুদ্ধি লোক ছিলেন; তিনি এই দুর্গম গিরি-সঙ্কটের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ তৈয়ার করাইয়া তাঁহার বিপুল ধনসম্পত্তি এবং পরিবারবর্গকে এইখানে রাখিলেন।

তারপর রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল প্লাবনে অনেক কিছুই ভাসিয়া গেল। কিন্তু জানকীরামের এই নিভৃত দুর্গ নিরাপদে রহিল। তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে এখানে বাস করিতে লাগিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর আরও একশত বছর কাটিয়া গেল।

কোম্পানীর শাসনে দেশ অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে। জানকীরামের দুর্গে তাঁহার অধস্তন চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষ বিদ্যমান—রাজারাম ও তৎপুত্র জয়রাম। রাজারাম বয়স্থ ব্যক্তি, পুত্র জয়রাম যুবক। পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থ ও পারিপার্শ্বিক জমিদারীর আয় হইতে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা চলিতেছে। সঞ্চিত অর্থ এই কয় পুরুষে হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া আরও বাড়িয়াছে। জানকীরামের বংশধরদের স্বভাব ছিল টাকা হাতে আসিলেই তাহা স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া রাখা ; এইভাবে রাশি রাশি মোহর আসরফি তৈজস সঞ্চিত হইয়া ছিল। কাহারও কোনও প্রকার বদ্‌খেয়াল ছিল না। এই জঙ্গলের মধ্যে বিলাস-ব্যসনের অবকাশ কোথায় ?

হঠাৎ দেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন কেবল নগরগুলির মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না। দাবানলের মত বনে জঙ্গলেও প্রসারিত হইল।

রাজারাম সংসারের কর্তা, তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। চারিদিকে লুঠতরাজ ; কোথাও ইংরেজ দলের সিপাহীরা লুঠ করিতেছে, কোথাও বিদ্রোহী সিপাহীরা লুঠ করিতেছে। রাজারাম খবর পাইলেন একদল সিপাহী এইদিকে আসিতেছে। তিনি সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু সম্পত্তি রক্ষা করিবেন কী উপায়ে ? শতবর্ষের পুরাতন দুর্গটি সুশিক্ষিত আগ্নেয়াস্ত্রধারী শত্রুর আক্রমণ রোধ করিতে সমর্থ নয়। দুর্গের জীর্ণ তোরণদ্বার একটি গোলার আঘাতেই উড়িয়া যাইবে। দুর্গে একটি বড় কামান আছে বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল অব্যবহারের ফলে উহা মরিচা পড়িয়া অকর্মণ্য হইয়াছে, উহার গোড়ার দিকের লৌহকপাট এমন জাম হইয়া গিয়াছে যে খোলা যায় না। তাছাড়া যে-কয়টি গাদা বন্দুক আছে, তাহার দ্বারা জঙ্গলে হরিণ শিকার বা চোর তাড়ানো চলিতে পারে, লুণ্ঠন-লোলুপ সিপাহীর দলকে ঠেকাইয়া রাখা একেবারেই অসম্ভব।

রাজারাম উপযুক্ত পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিবারস্থ নারী ও শিশুদের স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। দুর্গ হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি সাঁওতাল পল্লী ছিল, স্ত্রী পুত্র-বধূ ও দুই তিনটি নাতি-নাতিনীকে সেইখানে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গের সমস্ত ভৃত্য ও কর্মচারী সেই সঙ্গে গেল ; কেবল পুত্র জয়রাম সহ রাজারাম দুর্গে রহিলেন। বিদায়কালে রাজারাম গৃহিণীর অঞ্চলে কয়েকটি মোহর বাঁধিয়া দিলেন। বেশি মোহর দিতে সাহস হইল না, কি জানি বেশি সোনার লোভে পরিচরেরাই যদি বেইমানি করে। তারপর তাহারা প্রস্থান করিলে পিতাপুত্র মিলিয়া সঞ্চিত সোনা লুকাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিন দিন পরে ফিরিঙ্গী নায়কের অধীনে একদল সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজারামের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল, সোনা দানা লুকাইয়া রাখিয়া নিজেও পুত্রকে লইয়া দুর্গ হইতে অন্তর্হিত হইবেন ; কিন্তু তাঁহারা পলাইতে পারিলেন না। সিপাহীরা অতর্কিতে উপস্থিত হইয়া নির্বিবাদে দুর্গে প্রবেশ করিল।

তারপর দুর্গের মধ্যে কি হইল কেহ জানে না। দুই দিন পরে সিপাহীরা চলিয়া গেল। রাজারাম জয়রামকে কিন্তু ইহলোকে আর কেহ দেখিল না। শূন্য দুর্গ পড়িয়া রহিল।

ক্রমে দেশ শান্ত হইল। কয়েক মাস পরে রাজারামের পরিবার ও অনুচরগণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল দুর্গের পাথরগুলি ছাড়া আর কিছুই নাই ; তুলিয়া লইয়া যাইবার মত যাহা কিছু ছিল সিপাহীরা লইয়া গিয়াছে। দুর্গের স্থানে স্থানে, এমন কি ঘরের মেঝেয় সিপাহীরা পাথর তুলিয়া গর্ত খুঁড়িয়াছে ; বোধকরি ভূ-প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়াছে। কিছু পাইয়াছে কিনা অনুমান করা যায় না, কারণ রাজারাম কোথায় ধনরত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা কেবল তিনি এবং জয়রাম জানিতেন। হয়তো সিপাহীরা সব কিছুই লুটিয়া লইয়া গিয়াছে ; হয়তো কিছুই পায় নাই, তাই পিতাপুত্রকে হত্যা করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অসহায়া দুইটি নারী কয়েকটি শিশুকে লইয়া কিছুকাল দুর্গে রহিল, কিন্তু যে দুর্গ একদিন গৃহ ছিল তাহা এখন শ্মশান হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে ভৃত্য ও কর্মচারীরা একে একে খসিয়া পড়িতে লাগিল ; কারণ সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য শুধু গৃহই যথেষ্ট নয়, অন্নবস্ত্রেরও প্রয়োজন। অবশেষে একদিন দুইটি বিধবা শিশুগুলির হাত ধরিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা কোথায়

গিয়া আশ্রয় পাইল তাহার কোনও ইতিহাস নাই। সম্ভবত বাংলা দেশে কোনও দূর আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় পাইল। পরিত্যক্ত দুর্গ শৃগালের বাসভূমি হইল।

অতঃপর প্রায় ষাট বছর এই বংশের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বংশের দুইটি যুবক আবার মাথা তুলিলেন। রামবিনোদ ও রামকিশোর সিংহ দুই ভাই। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহারা মানুষ হইয়াছিলেন, কিন্তু বংশের ঐতিহ্য ভোলেন নাই। দুই ভাই ব্যবসা আরম্ভ করিলেন, এতদিন পরে কমলা আবার তাঁহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথমে ঘৃতের, পরে লোহার কারবার করিয়া তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিলেন।

বড় ভাই রামবিনোদ কিন্তু বেশিদিন বাঁচিলেন না। যৌবন কালেই হঠাৎ রহস্যময়ভাবে তাঁহার মৃত্যু হইল। রামকিশোর একাই ব্যবসা চালাইলেন এবং আরও অর্থ অর্জন করিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। রামকিশোর বিবাহ করিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যা জন্মিল। তারপর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষে রামকিশোর প্রাচীন কালের পৈতৃক সম্পত্তি পুনরায় ক্রয় করিয়া দুর্গের পাশের দ্বিতীয় চূড়ায় নূতন গৃহ নির্মাণ করাইলেন, আশেপাশে বহু জমিদারী কিনিলেন এবং সপরিবারে শৈল-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। দুর্গটিকেও পূর্ব গৌরবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অল্প-বিস্তর মেরামত করানো হইল ; কিন্তু তাহা আগের মতই অব্যবহৃত পড়িয়া রহিল।

২

পাথরের পাটি বসানো সাবেক পথটি গিরিচূড়ার পাদমূলে আসিয়া শেষ হয় নাই কিছুদূর চড়াই উঠিয়াছে। যেখানে চড়াই আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে পাথরের ধারে একটি বৃহৎ কূপ। কূপের সরসতায় পুষ্ট হইয়া কয়েকটি বড় বড় গাছ তাহার চারিপাশে ব্যূহ রচনা করিয়াছে।

এখান হইতে রাস্তা প্রায় পঞ্চাশ গজ চড়াই উঠিয়া দেউড়ির সম্মুখে শেষ হইয়াছে। তারপর পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি সর্পজিহ্বার মত দুই ভাগ হইয়া দুই দিকে গিয়াছে ; একটি গিয়াছে দুর্গের তোরণদ্বার পর্যন্ত, অন্যটি রামকিশোরের বাসভবনে উপনীত হইয়াছে।

দেউড়িতে মোটর রাখিবার একটি লম্বা ঘর এবং চালকের বাসের জন্য ছোট ছোট দু'টি কুঠুরি। এখানে রামকিশোরের সাবেক মোটর ও তাহার সাবেক চালক বুলাকিলাল থাকে।

এখান হইতে সিঁড়ির যে ধাপগুলি রামকিশোরের বাড়ির দিকে উঠিয়াছে, সেগুলি একেবারে খাড়া ওঠে নাই, একটু ঘুরিয়া পাহাড়ের অঙ্গ বেড়িয়া উঠিয়াছে। চওড়া সিঁড়িগুলি বাড়ির সদর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

পাহাড়ের মাথার উপর জমি চৌরস করিয়া তাহার মাঝখানে বৃহৎ বাড়ি। বাড়ি ঘিরিয়া ফল-ফুলের বাগান, বাগান ঘিরিয়া ফণি-মনসার বেড়া। এখানে দাঁড়াইলে পাশেই শত হস্ত দূরে সর্বোচ্চ শিখরে ধূম্রবর্ণ দুর্গ দেখা যায়, উত্তরদিকে ছয় মাইল দূরে শহরটি অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। দক্ষিণে চড়াইয়ের মূলদেশ হইতে জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে ; যতদূর দৃষ্টি যায় নিবিড় তরুশ্রেণী। এ জঙ্গলটিও রামকিশোরের সম্পত্তি। শাল সেগুন আবলুস কাঠ হইতে বিস্তর আয় হয়।

রামকিশোর যখন প্রথম এই গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স চল্লিশের নীচেই ; শরীরও বেশ মজবুত এবং নীরোগ। তথাপি অর্থোপার্জনের জন্য দৌড়াদৌড়ির আর প্রয়োজন নাই বলিয়াই বোধ করি তিনি স্বেচ্ছায় এই অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন তাঁহার স্ত্রী, দুইটি পুত্র, একটি কন্যা, বহু চাকর-বাকর এবং প্রবীণ নায়েব চাঁদমোহন দত্ত।

ক্রমে রামকিশোরের আর একটি পুত্র ও কন্যা জন্মিল। তারপর তাঁহার স্ত্রী গত হইলেন। পাঁচটি পুত্র-কন্যার লালন-পালনের ভার রামকিশোরের উপর পড়িল।

পুত্র-কন্যারা বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। রামকিশোর কিন্তু পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে পারিলেন না। বড় হইয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-কন্যাগুলির স্বভাব প্রকটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই বন্য স্থানে সকল সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার ফলে হয়তো তাহাদের চরিত্র বিকৃত হইয়াছিল। বড় ছেলে বংশীধর দুর্দান্ত ক্রোধী, রাগ হইলে তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে স্থানীয় স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বহরমপুর কলেজে পড়িতে গেল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই সেখানে কি একটা অতি গর্হিত দুষ্কর্ম করার ফলে তাহাকে কলেজ ছাড়িতে হইল। কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহার দুষ্কৃতির স্বরূপ প্রকাশ করিলেন না ; কলেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন রামকিশোরের বাল্যবন্ধু, তিনি ব্যাপারটাকে চাপা দিলেন। এমন কি রামকিশোরও প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন না। তিনি জানিতে পারিলে হয়তো অনর্থ ঘটিত।

বংশীধর আবার বাড়িতে আসিয়া বসিল। বাপকে বলিল, সে আর লেখাপড়া করিবে না, এখন হইতে জমিদারী দেখাশুনা করিবে। রামকিশোর বিরক্ত হইয়া বকাবকি করিলেন, কিন্তু ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিলেন না। বংশীধর জমিদারী তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। নায়েব চাঁদমোহন দত্ত হাতে ধরিয়া তাহাকে কাজ শিখাইলেন।

যথাসময়ে রামকিশোর বংশীধরের বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরেই বধূর অপঘাত মৃত্যু হইল। বংশীধর গৃহে ছিল না, জমিদারী পরিদর্শনে গিয়াছিল। একদিন সকালে বধূকে গৃহে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দুই চূড়ার মধ্যবর্তী খাঁজের মধ্যে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গেল। বধূ বোধ করি রাত্রে কোনও কারণে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া খাদের কিনারায় গিয়াছিল, তারপর পা ফস্কাইয়া নীচে পড়িয়াছে। মৃত্যু রহস্যজনক। বংশীধর ফিরিয়া আসিয়া বধূর মৃত্যুর সংবাদে একেবারে ফাটিয়া পড়িল ; উন্মত্ত ক্রোধে ভাই বোন কাহাকেও সে দোষারোপ করিতে বিরত হইল না। ইহার পর হইতে তাহার ভীষণ প্রকৃতি যেন ভীষণতর হইয়া উঠিল।

রামকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র মুরলীধর ; বংশীধরের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট। গিরগিটির মত রোগা হাড়-বাহির করা চেহারা, ধূর্তামিভরা ছুঁচালো মুখ ; চোখ এমন সাংঘাতিক ট্যারা যে, কখন কোন্ দিকে তাকাইয়া আছে বুঝিতে পারা যায় না। তার উপর মেরুদণ্ডের ন্যুব্জতা শীর্ণ দেহটাকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিয়াছে। মুরলীধর জন্মাবধি বিকলাঙ্গ। তাহার চরিত্রও বংশীধরের বিপরীত ; সে রাগী নয়, মিটমিটে শয়তান। কিশোর বয়সে দুই ভায়ে একবার ঝগড়া হইয়াছিল, বংশী মুরলীর গালে একটি চড় মারিয়াছিল। মুরলীর গায়ে জোর নাই। সে তখন চড় হজম করিয়াছিল ; কিন্তু কয়েকদিন পরে বংশী হঠাৎ এমন ভেদবমি আরম্ভ করিল যে যায়-যায় অবস্থা। এ ব্যাপারে মুরলীর যে কোনও হাত আছে তাহা ধরা গেল না ; কিন্তু তদবধি বংশী আর কোনও দিন তাহার গায়ে হাত তুলিতে সাহস করে নাই। তর্জন গর্জন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে।

মুরলীধর লেখাপড়া শেখে নাই, তার উপর ওই চেহারা ; বাপ তাহার বিবাহ দিলেন না। সে আপন মনে থাকে এবং দিবারাত্র পান-সুপারি চিবায়। তাহার একটি খাস চাকর আছে, নাম গণপৎ। গণপৎ মুরলীধরেরই সমবয়স্ক ; বেঁটে নিরেট চেহারা, গোল মুখ, চক্ষু দু'টিও গোল, ভ্রূযুগল অর্ধচন্দ্রাকৃতি। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয় সে সর্বদাই শিশুসুলভ বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া আছে। অথচ তাহার মত দুষ্ট খুব কম দেখা যায়। এমন দুষ্কর্ম নাই যাহা গণপতের অসাধ্য ; নারীহরণ হইতে গৃহদাহ পর্যন্ত, প্রভুর আদেশ পাইলে সে সব কিছুই করিতে পারে। প্রভু-ভৃত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শোনা যায়, ইহারা দুইজনে মিলিয়া অনেক দুষ্কৃতি করিয়াছে, কিন্তু কখনও ধরা পড়ে নাই।

রামকিশোরের তৃতীয় সন্তানটি কন্যা, নাম হরিপ্রিয়া। সে মুরলীধর অপেক্ষা বছর চারেকের ছোট ; দেখিতে শুনিতে ভালই, কোনও শারীরিক বিকলতা নাই। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টি যেন বিষমাখানো। মনও ঈর্ষার বিষে ভরা। হরিপ্রিয়া নিজের ভাই-বোনদের দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। সকলের ছিদ্রান্বেষণ, পান হইতে চুন খসিলে তীব্র অসন্তোষ এবং তদুপযোগী বচন-বিন্যাস,

এই ছিল হরিপ্রিয়ার স্বভাব। বংশীধরের বিবাহের পর যখন নববধূ ঘরে আসিল, তখন হরিপ্রিয়ার ঈর্ষার জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। বধূটি ভালমানুষ ও ভীরু স্বভাব ; হরিপ্রিয়া পদে পদে তাহার খুঁৎ ধরিয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়া বাক্যবাণে জর্জর করিয়া তুলিল।

তারপর অকস্মাৎ বধূর মৃত্যু হইল। এই দুর্যোগ কাটিয়া যাইবার কয়েক মাস পরে রামকিশোর কন্যার বিবাহ দিলেন। শ্বশুর-ঘর করিতে পারিবে না বুঝিয়া তিনি দেখিয়া শুনিয়া একটি গরীব ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন। ছেলেটির নাম মণিলাল ; লেখাপড়ায় ভাল, বি. এস-সি. পাস করিয়াছে ; স্বাস্থ্যবান, শান্ত প্রকৃতি, বিবাহের পর মণিলাল শ্বশুরগৃহে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল।

হরিপ্রিয়া ও মণিলালের দাম্পত্য জীবন সুখের হইল কিনা বাহির হইতে বোঝা গেল না। মণিলাল একেই চাপা প্রকৃতির যুবক, তার উপর দরিদ্র ঘরজামাই ; অ-সুখের কারণ ঘটিলেও সে নীরব রহিল। হরিপ্রিয়াও নিজের স্বামীকে অন্যের কাছে লঘু করিল না। বরং তাহার ভ্রাতারা মণিলালকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করিলে সে ফোঁস করিয়া উঠিত।

একটি বিষয়ে নবদম্পতির মধ্যে প্রকাশ্য ঐক্য ছিল। মণিলাল বিবাহের পর শ্বশুরের বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্যালকদের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, কাহারও প্রতি অনুরাগ বিরাগ ছিল না ; কিন্তু শ্বশুরের প্রতি যে তাহার অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে তাহা তাহার প্রতি বাক্যে ও আচরণে প্রকাশ পাইত। হরিপ্রিয়াও পিতাকে ভালবাসিত ; পিতাকে ছাড়া আর কাহাকেও বোধ হয় সে অন্তরের সহিত ভালবাসিত না। ভালবাসিবার শক্তি হরিপ্রিয়ার খুব বেশি ছিল না।

হরিপ্রিয়ার পর দু'টি ভাই বোন ; কিশোর বয়স্ক গদাধর এবং সর্বকনিষ্ঠা তুলসী। গদাধর একটু হাবলা গোছের, বয়সের অনুযায়ী বুদ্ধি পরিণত হয় নাই। কাছা কোঁচার ঠিক থাকে না, অকারণে হি হি করিয়া হাসে। লেখাপড়ায় তাহারও মন নাই ; গুলতি লইয়া বনে পাখি শিকার করিয়া বেড়ানো তাহার একমাত্র কাজ।

এই কাজে ছোট বোন তুলসী তাহার নিত্য সঙ্গিনী। তুলসীর বুদ্ধি কিন্তু গদাধরের মত নয়, বরং বয়সের অনুপাতে একটু বেশি। ছিপছিপে শরীর, সুশ্রী পাৎলা মুখ, অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতি। দুপুরবেলা জঙ্গলের মধ্যে পাখির বাসা বা খরগোশের গর্ত খুঁজিয়া বেড়ানো এবং সকল বিষয়ে গদাধরের অভিভাবকতা করা তাহার কাজ। বাড়িতে কে কোথায় কি করিতেছে কিছুই তুলসীর চক্ষু এড়ায় না। সে কখন কোথায় থাকে তাহাও নির্ণয় করা কাহারও সাধ্য নয়। তবু সব ভাইবোনের মধ্যে তুলসীকেই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রকৃতিস্থ বলা চলে।

রামকিশোরের সংসারে পুত্রকন্যা ছাড়া আর একটি পোষ্য ছিল যাহার পরিচয় আবশ্যক। ছেলেটির নাম রমাপতি। দুঃস্থ স্বজাতি দেখিয়া রামকিশোর তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। রমাপতি ম্যাট্রিক পাস ; সে গদাধর ও তুলসীকে পড়াইবে এই উদ্দেশ্যেই রামকিশোর তাহাকে গৃহে রাখিয়াছিলেন। রমাপতির চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু ছাত্রছাত্রীর সহিত মাস্টারের সাক্ষাৎকার বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না। রমাপতি মুখচোরা ও লাজুক স্বভাবের ছেলে, ছাত্রছাত্রী তাহাকে অগ্রাহ্য করিত ; বাড়ির অন্য সকলে তাহার অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব লক্ষ্যই করিত না। এমনিভাবে দু'বেলা দু'মুঠি অন্ন ও আশ্রয়ের জন্য রমাপতি বাড়ির এক কোণে পড়িয়া থাকিত।

নায়েব চাঁদমোহন দত্তের উল্লেখ পূর্বেই হইয়াছে। তিনি রামকিশোর অপেক্ষা পাঁচ-ছয় বছরের বড় ; রামকিশোরের কর্ম-জীবনের আরম্ভ হইতে তাঁহার সঙ্গে আছেন। বংশীধর জমিদারী পরিচালনার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার পর তাঁহার একপ্রকার ছুটি হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কাজকর্মের দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখিতেন ; আয় ব্যয় হিসাব নিকাশ সমস্তই তাঁহার অনুমোদনের অপেক্ষা রাখিত। লোকটি অতিশয় হুঁশিয়ার ও বিষয়জ্ঞ ; দীর্ঘকাল একত্র থাকিয়া বাড়ির একজন হইয়া গিয়াছিলেন।

রামকিশোর পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু স্নেহের বশে এবং

বয়োধর্মে মানুষের সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। যৌবনকালে তাঁহার প্রকৃতি দুর্জয় ও অসহিষ্ণু ছিল, এখন অনেকটা নরম হইয়াছে। পূর্বে পুরুষকারকেই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতেন, এখন অদৃষ্টকে একেবারে অস্বীকার করেন না। ধর্মকর্মের প্রতি অধিক আসক্তি না থাকিলেও ঠাকুরদেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব বংশের মেয়ে, হয়তো তাঁহার প্রভাব রামকিশোরের জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। অন্তত পুত্রকন্যাদের নামকরণের মধ্যে সে প্রভাবের ছাপ রহিয়া গিয়াছে।

তবু, কদাচিৎ কোনও কারণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলে তাঁহার প্রচণ্ড অন্তঃপ্রকৃতি বাহির হইয়া আসিত, কলসীর মধ্যে আবদ্ধ দৈত্যের মত কঠিন হিংস্র ক্রোধ প্রকাশ হইয়া উঠিত। তখন তাঁহার সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিত না, এমন কি বংশীধর পর্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া যাইত। তাঁহার ক্রোধ কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হইত না, দপ করিয়া জ্বলিয়া আবার দপ করিয়া নিভিয়া যাইত।

৩

হরিপ্রিয়ার বিবাহের আট-নয় মাস পরে শীতের শেষে একদল বেদে-বেদেনী আসিয়া কূয়ার সন্নিকটে আস্তানা গাড়িল। তাহাদের সঙ্গে একপাল গাধা কুকুর মুরগী সাপ প্রভৃতি জন্তুজানোয়ার। তাহারা রাত্রে ধুনি জ্বালিয়া মদ্যপান করিয়া মেয়ে-মদ্দ নাচগান হুল্লোড় করে, দিনের বেলা জঙ্গলে কাঠ কাটে, ফাঁদ পাতিয়া বনমোরগ খরগোশ ধরে, কূপের জল যথেচ্ছা ব্যবহার করে। বেদে জাতির নীতিজ্ঞান কোনও কালেই খুব প্রখর নয়।

রামকিশোর প্রথমটা কিছু বলেন না, কিন্তু ক্রমে উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, গদাধর ও তুলসী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বেদের তাঁবুগুলির আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অনেক শাসন করিয়াও তাহাদের বিনিদ্র কৌতূহল দমন করা গেল না। বাড়ির বয়স্থ লোকেরা অবশ্য প্রকাশ্যে বেদে-পল্লীকে পরিহার করিয়া চলিল ; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে বাড়ির চাকর-বাকর এবং মালিকদের মধ্যে কেহ কেহ যে সেখানে পদার্পণ করিত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বেদেনী যুবতীদের রূপ যত না থাক মোহিনী শক্তি আছে।

হপ্তাখানেক এইভাবে কাটিবার পর একদিন কয়েকজন বেদে-বেদেনী একেবারে রামকিশোরের সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শিলাজিৎ, কস্তুরী মৃগের নাভি, সাপের বিষ, গন্ধকমিশ্র সাবান প্রভৃতির পসরা খুলিয়া বসিল। বংশীধর উপস্থিত ছিল, সে মার-মার করিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিল। রামকিশোর হুকুম দিলেন, আজই যেন তাহারা এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

বেদেরা এই আদেশ পালন করিল বটে, কিন্তু পুরাপুরি নয়। সন্ধ্যার সময় তাহারা ডেরাডাণ্ডা তুলিয়া দুই তিন শত গজ দূরে জঙ্গলের কিনারায় গিয়া আবার আস্তানা গাড়িল। পরদিন সকালে বংশীধর তাহা দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। বন্দুক লইয়া সে তাঁবুতে উপস্থিত হইল, সঙ্গে কয়েকজন চাকর। বংশীধরের হুকুম পাইয়া চাকরেরা বেদেদের পিটাইতে আরম্ভ করিল, বংশীধর বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিল। এবার বেদেরা সত্যই এলাকা ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

আপদ দূর হইল বটে, কিন্তু নায়েব চাঁদমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'কাজটা বোধহয় ভাল হল না। ব্যাটারা ভারি শয়তান, হয়তো অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে।'

বংশীধর উদ্ধতভাবে বলিল, 'কি অনিষ্ট করতে পারে ওরা ?'

চাঁদমোহন বলিলেন, 'তা কি বলা যায়। হয়তো কুয়োয় বিষ ফেলে দিয়ে যাবে, নয়তো জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেবে—'

কিছুদিন সকলে সতর্ক রহিলেন, কিন্তু কোনও বিপদাপদ ঘটিল না। বেদেরা কোনও প্রকার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই, কিম্বা করিলেও তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই।

মাসখানেক পরে রামকিশোর পরিবারবর্গকে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে বনভোজনে গেলেন। ইহা তাঁহার একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান। বনের মধ্যে চাঁদোয়া টাঙানো হয়; ভৃত্যেরা পাঁঠা কাটিয়া রন্ধন করে; ছেলেরা বন্দুক লইয়া জঙ্গলের মধ্যে পশুপক্ষীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কর্তা চাঁদোয়ার তলে বসিয়া চাঁদমোহনের সঙ্গে দু'চার বাজি দাবা খেলেন। তারপর অপরাহ্ণে সকলে গৃহে ফিরিয়া আসেন।

সকালবেলা দলবল লইয়া রামকিশোর উদ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঘন শালবনের মধ্যে একটি স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে; মাটির উপর শতরঞ্চি পাতা, মাথার উপর চন্দ্রাতপ। পাচক উনান জ্বালিতেছে, চাকর-বাকর রান্নার উদ্যোগ করিতেছে। মোটর চালক বুলাকিলাল একরাশ সিদ্ধির পাতা লইয়া হামানদিস্তায় কুটিতে বসিয়াছে, বৈকালে ভাঙের সরবৎ হইবে। আকাশে স্বর্ণাভ রৌদ্র, শালবনের ছায়ায় স্নিগ্ধ হইয়া বাতাস মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও কোনও দুর্লক্ষণের চিহ্নমাত্র নাই।

দুই বৃদ্ধ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া দাবার ছক পাতিলেন; আর সকলে বনের মধ্যে এদিক ওদিক অদৃশ্য হইয়া গেল। বংশীধর বন্দুক কাঁধে ফেলিয়া এক দিকে গেল, মুরলীধর নিত্যসঙ্গী গণপৎকে লইয়া অন্য দিকে শিকার সন্ধানে গেল। দু'জনেই ভাল বন্দুক চালাইতে পারে। গদাধর ও তুলসী একসঙ্গে বাহির হইল; মাস্টার রমাপতি দূরে দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। কারণ ঘন জঙ্গলের মধ্যে বালকবালিকাদের পথ হারানো অসম্ভব নয়। রামকিশোর বলিয়া দিয়াছিলেন, 'ওদের চোখে চোখে রেখো।'

জামাই মণিলাল একখানা বই লইয়া আস্তানা হইতে কিছু দূরে একটা গাছের আড়ালে গিয়া বসিল। রামকিশোর তাহাকে তন্ত্র সম্বন্ধে একটি ইংরেজি বই দিয়াছিলেন, তাহাই সে মনোযোগের সহিত দাগ দিয়া পড়িতেছিল। তাহার শিকারের শখ নাই।

বাকি রহিল কেবল হরিপ্রিয়া। সে কিছুক্ষণ রান্নার আয়োজনের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইল, একবার স্বামীর গাছতলার দিকে গেল, তারপর একাকিনী বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। আজ একদিনের জন্য সকলে স্বাধীন হইয়াছে; একই বাড়িতে এতগুলো লোক একসঙ্গে থাকিয়া যেন পরস্পরের সান্নিধ্যে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তাই বনের মধ্যে ছাড়া পাইয়া একটু নিঃসঙ্গতা উপভোগ করিয়া লইতেছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। দুই বৃদ্ধ খেলায় মগ্ন হইয়া গিয়াছেন, জঙ্গলের অভ্যন্তর হইতে থাকিয়া থাকিয়া বন্দুকের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, রন্ধনের সুগন্ধ বাতাস আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে গিরিচূড়ার চুনকাম করা বাড়ি এবং ভাঙা দুর্গ দেখা যাইতছে। বেশি দূর নয়, বড় জোর আধ মাইল। ভাঙা দুর্গের ছায়া মাঝের খাদ লঙ্ঘন করিয়া সাদা বাড়ির উপর পড়িয়াছে।

হঠাৎ একটা তীব্র একটানা চীৎকার অলস বনমর্মরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। দাবা খেলোয়াড় দুইজন চমকিয়া চোখ তুলিলেন। গাছের তলায় মণিলাল বই ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল, তুলসী শালবনের আলোছায়ার ভিতর দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে এবং তারস্বরে চীৎকার করিতেছে।

তুলসী চাঁদোয়া পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই মণিলাল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, তাহার কাঁধে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া বলিল, 'এই তুলসী! কি হয়েছে! চেঁচাচ্ছিস কেন?'

তুলসী পাগলের মত ঘোলাটে চোখ তুলিয়া ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, তারপর আগের মতই চীৎকার করিয়া বলিল,—'দিদি! গাছতলায় পড়ে আছে—বোধহয় মরে গেছে! শীগ্‌গির এসো—বাবা, জেঠামশাই, শীগ্‌গির এসো।'

তুলসী যেদিক হইতে আসিয়াছিল আবার সেই দিকে ছুটিয়া চলিল; মণিলালও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। দুই বৃদ্ধ আলুথালুভাবে তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

প্রায় দুইশত গজ দূরে ঘন গাছের ঝোপ; তুলসী ঝোপের কাছে আসিয়া একটা গাছের নীচে

অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। হরিপ্রিয়া বাসন্তী রঙের শাড়ি পরিয়া আসিয়াছিল, দেখা গেল সে ছায়াঘন গাছের তলায় পড়িয়া আছে, আর, কে একটা লোক তাহার শরীরের উপর ঝুঁকিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে।

পদশব্দ শুনিয়া রমাপতি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ ভয়ে শীর্ণ, সে স্খলিত স্বরে বলিল, 'সাপ ! সাপে কামড়েছে !'

মণিলাল তাহাকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিল, তারপর দুই বাহু দ্বারা হরিপ্রিয়াকে তুলিয়া লইল। হরিপ্রিয়ার তখন জ্ঞান নাই। বাঁ পায়ের গোড়ালির উপর সাপের দাঁতের দাগ ; পাশাপাশি দু'টি রক্তবর্ণ চিহ্ন।

৪

হরিপ্রিয়া বাঁচিল না, বাড়িতে লইয়া যাইতে যাইতে পথেই তাহার মৃত্যু হইল।

জঙ্গলে ইতিপূর্বে কেহ বিষধর সাপ দেখে নাই। এবারও সাপ চোখে দেখা গেল না বটে, কিন্তু সাপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না ; এবং ইহা যে বেদেদের কাজ, তাহারাই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে জঙ্গলে সাপ কিম্বা সাপের ডিম ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে, তাহাও একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু বেদের দল তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সন্ধান পাওয়া গেল না।

হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর পর কিছুদিন রামকিশোরের বাড়ির উপর অভিশাপের মত একটা থমথমে ছায়া চাপিয়া রহিল। রামকিশোর তাঁহার সকল সন্তানদের মধ্যে হরিপ্রিয়াকেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি ভালবাসিতেন ; তিনি দারুণ আঘাত পাইলেন। মণিলাল অতিশয় সম্বৃতচরিত্র যুবক, কিন্তু সেও এই আকস্মিক বিপর্যয়ে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা হইয়া গেল। অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পে তাহার নবগঠিত জীবনের ভিত্তি একেবারে ধ্বসিয়া গিয়াছিল।

আর একজন এই অনর্থপাতে গুরুতরভাবে অভিভূত হইয়াছিল, সে তুলসী। তুলসী যে তাহার দিদিকে খুব বেশি ভালবাসিত তা নয়, বরং দুই বোনের মধ্যে খিটিমিটি লাগিয়াই থাকিত। হরিপ্রিয়া সুযোগ পাইলেই তুলসীকে শাসন করিত, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিত। তবু, হরিপ্রিয়ার মৃত্যু চোখের সামনে দেখিয়া তুলসী কেমন যেন বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন বনের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সে অদূরে গাছতলায় হলুদবর্ণ শাড়ি দেখিয়া সেই দিকে গিয়াছিল ; তারপর দিদিকে ঐভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ভীতভাবে ডাকাডাকি করিয়াছিল। হরিপ্রিয়া কেবল একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল, কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সেই হইতে তুলসীর ধন্দ লাগিয়া গিয়াছিল। ভূতগ্রস্তের মত শঙ্কিত চক্ষু মেলিয়া সে বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইত ; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিত। তাহার অপরিণত স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যে কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বংশীধর এবং মুরলীধরও ধাক্কা পাইয়াছিল কিন্তু এতটা নয়। বংশীধর গুম হইয়া গিয়াছিল ; মনে মনে সে হয়তো হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দোষী করিতেছিল ; বেদেদের উপর অতটা জুলুম না করিলে বোধ হয় এ ব্যাপার ঘটিত না। মুরলীধরের বাহ্য চালচলনে কোনও পরিবর্তন দেখা যায় নাই বটে কিন্তু সেও কচ্ছপের মত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইয়াছিল। দুই ভ্রাতার মধ্যে কেবল একটি বিষয়ে ঐক্য হইয়াছিল, দুইজনেই মণিলালকে বিষচক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যেন হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর জন্য মণিলালই দায়ী।

হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর একমাস পরে মণিলাল রামকিশোরের কাছে গিয়া বিদায় চাহিল। এ সংসারের সহিত তাহার সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে, এই কথার উল্লেখ করিয়া সে সজল চক্ষে বলিল, 'আপনার স্নেহ কখনও ভুলব না। কিন্তু এ পরিবারে আর তো আমার স্থান নেই।'

রামকিশোরের চক্ষুও সজল হইল। তিনি বলিলেন, 'কেন স্থান নেই ? যে গেছে সে তো গেছেই, আবার তোমাকেও হারাবো ? তা হবে না। তুমি থাকো। যদি ভগবান করেন আবার হয়তো সম্পর্ক হবে।'

বংশীধর ও মুরলীধর উপস্থিত ছিল। বংশীধর মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল ; মুরলীধরের ঠোঁটে অসন্তোষ বাঁকা হইয়া উঠিল। ইঙ্গিতটা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না।

মণিলাল রহিয়া গেল। পূর্বাপেক্ষাও নিস্পৃহ এবং নির্লিপ্তভাবে ভূতপূর্ব শ্বশুরগৃহে বাস করিতে লাগিল।

অতঃপর বছর দুই নিরুপদ্রবে কাটিয়া গিয়াছে। রামকিশোরের সংসার আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কেবল তুলসী পূর্বের মত ঠিক প্রকৃতিস্থ হইল না। তাহার মনে এমন গুরুতর ধাক্কা লাগিয়াছিল, যাহার ফলে তাহার দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দশ বছর বয়সে তাহার দেহ-মন যেরূপ অপরিণত ছিল, তের বছরে পা দিয়াও তেমনি অপরিণত আছে। মোট কথা, যৌবনোদ্‌গমের স্বাভাবিক বয়সে উপনীত হইয়াও সে বালিকাই রহিয়া গিয়াছে।

উপরন্তু তাহার মনে আর একটি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে-মাস্টারের প্রতি পূর্বে তাহার অবহেলার অন্ত ছিল না, অহেতুকভাবে সে সেই মাস্টারের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে মাস্টার রমাপতি যতটা আনন্দিত হইয়াছে, তাহার অধিক সঙ্কোচ ও অশান্তি অনুভব করিতেছে। কারণ অবহেলায় যাহারা অভ্যস্ত, একটু সমাদর পাইলে তাহারা বিব্রত হইয়া ওঠে।

যাহোক, রামকিশোরের সংসার-যন্ত্র আবার সচল হইয়াছে এমন সময় বাড়িতে একজন অতিথি আসিলেন। ইনি রামকিশোরের যৌবনকালের বন্ধু। আসলে রামকিশোরের দাদা রামবিনোদের সহিত ইঁহার গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। রামবিনোদের অকালমৃত্যুর পর রামকিশোরের সহিত তাঁহার সখ্য-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রীতির সূত্র একেবারে ছিন্ন হয় নাই। ইনি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন। নাম ঈশানচন্দ্র মজুমদার। কয়েক বছর আগে বংশীধর যখন কলেজে দুষ্কৃতি করার ফলে বিতাড়িত হইতেছিল, তখন ইনিই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ঈশানচন্দ্রের চেহারা তপঃকৃশ সন্ন্যাসীর ন্যায় শুষ্কশীর্ণ, প্রকৃতি ঈষৎ তিক্তরসাক্ত। অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়াছিল, অর্থেরও বোধকরি অনটন ঘটিয়াছিল। তিনি পূর্ব ঘনিষ্ঠতা স্মরণ করিয়া রামকিশোরকে পত্র লিখিলেন ; তোমাদের অনেকদিন দেখি নাই, কবে আছি কবে নাই, ওখানকার জলহাওয়া নাকি ভাল, ইত্যাদি। রামকিশোর উত্তরে অধ্যাপক মহাশয়কে সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়া পত্র লিখিলেন, এখানকার স্বাস্থ্য খুবই ভাল, তুমি এস, দু'এক মাস থাকিলেই শরীর সারিয়া যাইবে।

যথাসময়ে ঈশানচন্দ্র আসিলেন এবং বাড়িতে অধিষ্ঠিত হইলেন। বংশীধর কিছু জানিত না, সে খাস-আবাদী ধান কাটাইতে গিয়াছিল ; বাড়ি ফিরিয়া ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে তাহার মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। বংশীধর ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিল ; তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়া আবার ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল। সে ঈশানচন্দ্রের কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল, 'আপনি এখানে ?'

ঈশানচন্দ্র কিছুক্ষণ একদৃষ্টে প্রাক্তন শিষ্যের পানে চাহিয়া থাকিয়া শুষ্কস্বরে বলিলেন, 'এসেছি। তোমার আপত্তি আছে নাকি ?'

বংশীধর তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'শুনে যান। একটা কথা আছে।'

আড়ালে গিয়া গুরুশিষ্যের মধ্যে কি কথা হইল, তাহা কেহ জানিল না। কিন্তু বাক্যবিনিময় যে আনন্দদায়ক হয় নাই তাহা প্রমাণ হইল যখন ঈশানচন্দ্র রামকিশোরকে গিয়া বলিলেন যে, তিনি আজই চলিয়া যাইতে চান। রামকিশোর তাঁহার অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন ; শেষ পর্যন্ত রফা হইল অধ্যাপক মহাশয় দুর্গে গিয়া থাকিবেন। দুর্গের দু'একটি ঘর বাসোপযোগী আছে ; অধ্যাপক

মহাশয়ের নির্জনবাসে আপত্তি নাই। তাঁহার খাদ্য দুর্গে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

সেদিন সন্ধ্যায় ঈশানচন্দ্রকে দুর্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামকিশোর ফিরিয়া আসিলেন এবং বংশীধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পিতাপুত্রে সওয়াল জবাব চলিল। হঠাৎ রামকিশোর খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন এবং উগ্রকণ্ঠে পুত্রকে ভর্ৎসনা করিলেন। বংশীধর কিন্তু চেঁচামেচি করিল না, আরক্ত চক্ষে নিস্ফল ক্রোধ ভরিয়া তিরস্কার শুনিল।

যাহোক, ঈশানচন্দ্র দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। রাত্রে তিনি একাকী থাকেন কিন্তু দিনের বেলা বংশীধর ও মুরলীধর ছাড়া বাড়ির আর সকলেই দুর্গে যাতায়াত করে। মুরলীধর অধ্যাপক মহাশয়ের উপর মর্মান্তিক চটিয়াছিল, কারণ তিনি দুর্গ অধিকার করিয়া তাহার গোপন কেলিকুঞ্জটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

অতঃপর একপক্ষ নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় রামকিশোর ঈশানচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন, দেউড়ি পর্যন্ত নামিয়া দুর্গের সিঁড়ি ধরিবেন, দেখিতে পাইলেন কুয়ার কাছে তরুগুচ্ছের ভিতর হইতে ধুঁয়া বাহির হইতেছে। কৌতূহলী হইয়া তিনি সেইদিকে গেলেন। দেখিলেন, বৃক্ষতলে এক সাধু ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া আছেন।

সাধুর অঙ্গ বিভূতিভূষিত, মাথায় জটা, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। রামকিশোর এবং সাধুবাবা অনেকক্ষণ স্থির নেত্রে পরস্পর নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর সাধুবাবার কণ্ঠ হইতে খল্ খল্ হাস্য নির্গত হইল।

রামকিশোরের দুর্গে যাওয়া হইল না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার তাড়স দিয়া জ্বর আসিল। জ্বরের ঘোরে তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন।

ডাক্তার আসিল। প্রলাপ বন্ধ হইল, জ্বরও ছাড়িল। রামকিশোর ক্রমে সুস্থ হইলেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁহার হৃদয়যন্ত্র গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। পূর্বে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র বেশ মজবুত ছিল।

আরও একপক্ষ কাটিল। ঈশানচন্দ্র পূর্ববৎ দুর্গে রহিলেন। সাধুবাবাকে বৃক্ষমূল হইতে কেহ তাড়াইবার চেষ্টা করিল না। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরায়, বেদেদের লইয়া যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তাহার পুনরভিনয় বাঞ্ছনীয় নয়।

উত্তরখণ্ড

১

একদিন কার্তিক মাসের সকালবেলা ব্যোমকেশ ও আমি আমাদের হ্যারিসন রোডের বাসায় ডিম্ব সহযোগে চা-পান শেষ করিয়া খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিলাম। সত্যবতী বাড়ির ভিতর গৃহকর্মে নিযুক্ত ছিল। পুঁটিরাম বাজারে গিয়াছিল।

ব্যোমকেশের বিবাহের পর আমি অন্য বাসা লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম ; কারণ নবদম্পতির জীবন নির্বিঘ্ন করা বন্ধুর কাজ। কিন্তু ব্যোমকেশ ও সত্যবতী আমাকে যাইতে দেয় নাই। সেই অবধি এই চার বছর আমরা একসঙ্গে বাস করিতেছি। ব্যোমকেশকে পাইয়া আমার ভ্রাতার অভাব দূর হইয়াছিল ; সত্যবতীকে পাইয়াছি একাধারে ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূরূপে। উপরন্তু সম্প্রতি ভ্রাতুষ্পুত্র লাভের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়াছে। আশাতীত সুখ ও শান্তির মধ্যে জীবনের দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছে।

ভাগ করিয়া খবরের কাগজ পাঠ চলিতেছিল। সামনের পাতা আমি লইয়াছিলাম, ব্যোমকেশ লইয়াছিল ভিতরের পাতা। সংবাদপত্রের সদরে মোটা অক্ষরে যেসব খবর ছাপা হয়, তাহার প্রতি ব্যোমকেশের আসক্তি নাই, সদরের চেয়ে অলিগলিতেই তাহার মনের যাতায়াত বেশি।

হঠাৎ কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানচন্দ্র মজুমদারের নাম জানো ?'

চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কে তিনি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। বহরমপুরে আমি কিছুদিন তাঁর ছাত্র ছিলাম। ভদ্রলোক মারা গেছেন।'

বলিলাম, 'তা তুমি যখন তাঁর ছাত্র, তখন তাঁর মরবার বয়স হয়েছিল বলতে হবে।'

'তা হয়তো হয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। সর্পাঘাতে মারা গেছেন।'

'ও।'

'গত বছর আমরা যেখানে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে গিয়েছিলাম, তিনি এবছর সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানেই মৃত্যু হয়েছে।'

সাঁওতাল পরগণার সেই পাহাড়-ঘেরা শহরটি! সেখানে কয় হপ্তা বড় আনন্দে ছিলাম, যাহাদের স্মৃতি ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের কথা মনে পড়িয়া গেল। মহীধরবাবু, পুরন্দর পাণ্ডে, ডাক্তার ঘটক, রজনী—

বহির্দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, ডাকপিওন। একখানা খামের চিঠি, ব্যোমকেশের নামে। আমাদের চিঠিপত্র বড় একটা আসে না। ব্যোমকেশকে চিঠি দিয়া উৎসুকভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

চিঠি পড়িয়া সে সহাস্যে মুখ তুলিল, বলিল, 'কার চিঠি বল দেখি ?'

বলিলাম, 'তা কি করে জানব ? আমার তো রেডিও-চক্ষু নেই।'

'ডি. এস. পি. পুরন্দর পাণ্ডের চিঠি।'

সবিস্ময়ে বলিলাম, 'বল কি ! এইমাত্র যে তাঁর কথা ভাবছিলাম !'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আমিও। শুধু তাই নয়, অধ্যাপক মজুমদারের প্রসঙ্গও

আছে।'

'আশ্চর্য !'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এরকম আশ্চর্য ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটে। অনেকদিন যার কথা ভাবিনি তাকে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তারপর সে সশরীরে এসে হাজির হল।—পণ্ডিতেরা বলেন, 'কইনসিডেন্স'—সমাপতন। কিন্তু এর রহস্য আরও গভীর। কোথাও একটা যোগসূত্র আছে, আমরা দেখতে পাই না—'

'সে যাক। পাণ্ডে লিখেছেন কি ?'

'পড়ে দ্যাখো।'

চিঠি পড়িলাম। পাণ্ডে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই :—

সম্প্রতি এখানে একটি রহস্যময় ব্যাপার ঘটিয়াছে। শহর হইতে কিছু দূরে পাহাড়ের উপর এক সমৃদ্ধ পরিবার বাস করেন ; গৃহস্বামীর এক বৃদ্ধ বন্ধু ঈশান মজুমদার বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর কারণ সর্পাঘাত বলিয়াই প্রকাশ, কিন্তু এ বিষয়ে শব-ব্যবচ্ছেদক ডাক্তার এবং পুলিসের মনে সন্দেহ হইয়াছে। ... ব্যোমকেশবাবু রহস্য ভালবাসেন ; তার উপর এখন শীতকাল, এখানকার জলবায়ু অতি মনোরম। তিনি যদি সবান্ধবে আসিয়া কিছু দিনের জন্য দীনের গরীবখানায় আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই হইবে।

চিঠি পড়া শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'কি বল ?'

বলিলাম, 'মন্দ কি। এখানে তোমার কাজকর্মও তো কিছু দেখছি না। কিন্তু সত্যবতী—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকে এ অবস্থায় কোথাও নিয়ে যাওয়া চলে না—'

'তা বটে। কিন্তু ও যদি যেতে চায় ? কিম্বা যদি তোমাকে না ছাড়তে চায় ? এ সময় মেয়েদের মন বড় অবুঝ হয়ে পড়ে, কখন কি চায় বোঝা যায় না—' ভিতর দিকে পায়ের শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেলাম।

সত্যবতী প্রবেশ করিল। অবস্থাবশে তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, দেহাকৃতি ডিম-ভরা কৈ মাছের মত। সে আসিয়া একটা চেয়ারে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। আমরা নীরব রহিলাম। সত্যবতী তখন ক্লান্তিভরে বলিল, 'আমাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দাও। এখানে আর ভাল লাগছে না।'

ব্যোমকেশের সহিত আমার চোখে চোখে বার্তা বিনিময় হইয়া গেল। সে বলিল, 'ভাল লাগছে না ! ভাল লাগছে না কেন ?'

সত্যবতী উত্তাপহীন স্বরে বলিল, 'তোমাদের আর সহ্য হচ্ছে না। দেখছি আর রাগ হচ্ছে।'

ইহা নিশ্চয় এই সময়ের একটা লক্ষণ, নচেৎ আমাদের দেখিয়া রাগ হইবার কোনও কারণ নাই। ব্যোমকেশ একটা ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাও তাহলে, আটকাব না। অজিত তোমাকে সুকুমারের ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসুক।—আর আমরাও না হয় এই ফাঁকে কোথাও ঘুরে আসি।'

টেলিগ্রাম পাইয়া পুরন্দর পাণ্ডে মহাশয় স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, আমাদের নামাইয়া লইলেন। তাঁহার বাসায় পৌঁছিয়া অপর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ করিতে করিতে পরিচিত ব্যক্তিদের খোঁজখবর লইলাম। সকলেই পূর্ববৎ আছেন। কেবল মালতী দেবী আর ইহলোকে নাই ; প্রোফেসর সোম বাড়ি বিক্রি করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর কাজের কথা আরম্ভ হইল। পুরন্দর পাণ্ডে অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুর হাল বয়ান করিলেন। সেই সঙ্গে রামকিশোরের পারিবারিক সংস্থাও অনেকখানি জানা গেল।

অধ্যাপক মজুমদারের মৃত্যুর বিবরণ এইরূপ :—তিনি মাসখানেক দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, শরীর বেশ সারিয়াছিল। কয়েকদিন আগে তিনি রাত্রির আহার সম্পন্ন করিয়া অভ্যাসমত দুর্গের

প্রাঙ্গণে পায়চারি করিলেন ; সে সময় মাস্টার রমাপতি তাঁহার সঙ্গে ছিল। আন্দাজ সাড়ে নয়টার সময় রমাপতি বাড়িতে ফিরিয়া গেল ; অধ্যাপক মহাশয় একাকী রহিলেন। তারপর রাত্রিকালে দুর্গে কি ঘটিল কেহ জানে না। পরদিন প্রাতঃকালেই রমাপতি আবার দুর্গে গেল। গিয়া দেখিল, অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার শয়নঘরের দ্বারের কাছে মরিয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার পায়ের গোড়ালিতে সর্পাঘাতের চিহ্ন, মাথার পিছন দিকে ঘাড়ের কাছে একটা কালশিরার দাগ এবং ডান হাতের মুঠির মধ্যে একটি বাদশাহী আমলের চক্চকে মোহর।

সর্পাঘাতের চিহ্ন প্রথমে কাহারও চোখে পড়ে নাই। রামকিশোর সন্দেহ করিলেন, রাত্রে কোনও দুর্বৃত্ত আসিয়া ঈশানবাবুকে মারিয়া গিয়াছে ; মস্তকের আঘাত-চিহ্ন এই অনুমান সমর্থন করিল। তিনি পুলিসে খবর পাঠাইলেন।

কিন্তু পুলিস আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই সর্প-দংশনের দাগ আবিষ্কৃত হইল। তখন আর উপায় নাই। পুলিস আসিয়া শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য লাস চালান দিল।

শব-ব্যবচ্ছেদের ফলে মৃতের রক্তে সাপের বিষ পাওয়া গিয়াছে, গোখুরা সাপের বিষ। সুতরাং সর্পাঘাতই যে মৃত্যুর কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু পুরন্দর পাণ্ডে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ইহার মধ্যে একটা কারচুপি আছে।

সব শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সাপের বিষে মৃত্যু হয়েছে একথা যখন অস্বীকার করা যায় না, তখন সন্দেহ কিসের ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সন্দেহের অনেকগুলো ছোট কারণ আছে। কোনোটাই স্বতন্ত্রভাবে খুব জোরালো নয় বটে, কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে একটা কিছু পাওয়া যায়। প্রথমত দেখুন, ঈশানবাবু মারা গেছেন সর্পাঘাতে। তবে তাঁর মাথায় চোট লাগল কি করে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এমন হতে পারে, সাপে কামড়াবার পর তিনি ভয় পেয়ে পড়ে যান, মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারপর অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সম্ভব নয় কি ?'

'অসম্ভব নয়। কিন্তু আরও কথা আছে। সাপ এল কোত্থেকে ? আমি তন্নতন্ন করে খোঁজ করিয়েছি, কোথাও বিষাক্ত সাপের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু আপনি যে বললেন, দু'বছর আগে রামকিশোরবাবুর মেয়েও সর্পাঘাতে মারা গিয়েছিল।'

'তাকে সাপে কামড়েছিল জঙ্গলে। সেখানে সাপ থাকতেও পারে। কিন্তু দুর্গে সাপ উঠল কি করে ? পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা অসম্ভব। সিঁড়ি বেয়ে উঠতেও পারে, কিন্তু ওঠবার কোনও কারণ নেই। দুর্গে ইঁদুর, ব্যাং কিচ্ছু নেই, তবে কিসের লোভে সাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠবে ?'

'তাহলে— ?'

'তবে যদি কেউ সাপ নিয়ে গিয়ে দুর্গে ছেড়ে দিয়ে থাকে, তাহলে হতে পারে।'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'হুঁ, আর কিছু ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আর, ভেবে দেখুন, অধ্যাপক মহাশয়ের মুঠির মধ্যে একটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সেটি এল কোত্থেকে ?'

'হয়তো তাঁর নিজের জিনিস।'

'অধ্যাপক মহাশয়ের আর্থিক অবস্থার যে পরিচয় সংগ্রহ করেছি, তাতে তিনি মোহর হাতে নিয়ে সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন বলে মনে হয় না।'

'তবে—কি অনুমান করেন ?'

'কিছুই অনুমান করতে পারছি না ; তাতেই তো সন্দেহ আরও বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এটা মামুলি সর্পাঘাত নয়, এর মধ্যে রহস্য আছে।'

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবুর আত্মীয় পরিজন কেউ নেই ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'এক বিবাহিতা মেয়ে আছে। জামাই নেপালে ডাক্তারি করে। খবর পেলাম, মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে অধ্যাপক মহাশয়ের সদ্ভাব ছিল না।'

ব্যোমকেশ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট কাটিবার পর পাণ্ডে আবার কহিলেন; 'যেসব কথা শুনলেন সেগুলোকে ঠিক প্রমাণ বলা চলে না তা মানি, কিন্তু অবহেলা করাও যায় না। তা ছাড়া, আর একটা কথা আছে। রামকিশোরবাবুর বংশটা ভাল নয়।'

ব্যোমকেশ চকিত হইয়া বলিল, 'সে কি রকম ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বংশের একটা মানুষও সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়। রামকিশোরবাবুকে আপাতদৃষ্টিতে ভালমানুষ বলে মনে হয়, কিন্তু সেটা পোষ-মানা বাঘের নিরীহতা ; সহজাত নয়, মেকি। তাঁর অতীত জীবনে বোধ হয় কোনও গুপ্তরহস্য আছে, নৈলে যৌবন পার না হতেই তিনি এই জঙ্গলে অজ্ঞাতবাস শুরু করলেন কেন তা বোঝা যায় না। তারপর, বড় ছেলে বংশীধর একটি আস্ত কাঠগোঁয়ার ; সে যেভাবে জমিদারী শাসন করে, তাতে মনে হয় সে চেঙ্গিস্ খাঁর ভায়রাভাই। শুনেছি জমিদারীতে দু'একটা খুন-জখমও করেছে, কিন্তু সাক্ষী-সাবুদ নেই—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বয়স কত বংশীধরের ? বিয়ে হয়েছে ?'

'বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই বৌয়ের অপঘাত মৃত্যু হয়। দেখা যাচ্ছে, এ বংশে মাঝে মাঝে অপঘাত মৃত্যু লেগেই আছে।'

'এরও কি সর্পাঘাত ?'

'না। দুপুর রাত্রে ওপর থেকে খাদে লাফিয়ে পড়েছিল কিম্বা কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।'

'চমৎকার বংশটি তো ! তারপর বলুন।'

'মেজ ছেলে মুরলীধর আর একটি গুণধর। ট্যারা এবং কুঁজো ; বাপ বিয়ে দেননি। বাপকে লুকিয়ে লোচ্চামি করে। একটা মজা দেখেছি, দুই ছেলেই বাপকে যমের মতন ভয় করে। বাপ যদি গো-বেচারি ভালমানুষ হতেন, তাহলে ছেলেরা তাঁকে অত বেশি ভয় করত না।'

'হুঁ—তারপর ?'

'মুরলীধরের পরে এক মেয়ে ছিল, হরিপ্রিয়া। সে সর্পাঘাতে মারা গেছে। তার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তবে জামাইটি সহজ মানুষ।'

'জামাই !'

পাণ্ডে জামাই মণিলালের কথা বলিলেন। তারপর গদাধর ও তুলসীর পরিচয় দিয়া বিবরণ শেষ করিলেন, 'গদাধরটা ন্যালা-ক্যাবলা ; তার যেটুকু বুদ্ধি সেটুকু দুষ্টু-বুদ্ধি। আর তুলসী—তুলসী মেয়েটা যে কী তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। নির্বোধ নয়, ন্যাকাবোকা নয়, ইঁচড়ে পাকাও নয় ; তবু যেন কেমন একরকম।'

ব্যোমকেশ ধীরে-সুস্থে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া বলিল, 'আপনি যেভাবে চরিত্রগুলিকে সমীক্ষণ করেছেন, তাতে মনে হয় আপনার বিশ্বাস এদের মধ্যে কেউ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ঈশানবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

পাণ্ডে একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আমার সন্দেহ তাই, কিন্তু সন্দেহটা এখনও বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছয়নি। বৃদ্ধ অধ্যাপককে মেরে কার কি ইষ্টসিদ্ধি হল সেটা বুঝতে পারছি না। যা হোক, আপনার মন্তব্য এখন মুলতুবি থাক। আজ বিকেলবেলা দুর্গে যাওয়া যাবে ; সেখানে সরেজমিন তজবিজ করে আপনার যা মনে হয় বলবেন।'

পাণ্ডে অফিসের কাজ দেখিতে চলিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি মনে হল ?'

বলিলাম, 'সবই যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ধোঁয়া যখন দেখা যাচ্ছে, তখন আগুন আছে। শাস্ত্রে বলে, পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ।'

২

বৈকালে পুলিসের মোটর চড়িয়া তিনজনে বাহির হইলাম। ছয় মাইল পাথুরে পথ অতিক্রম করিতে আধ ঘন্টা লাগিল।

কূয়ার নিকট অবধি পৌঁছিয়া দেখা গেল সেখানে আর একটি মোটর দাঁড়াইয়া আছে। আমরাও এখানে গাড়ি হইতে নামিলাম ; পাণ্ডে বলিলেন, 'ডাক্তার ঘটকের গাড়ি। আবার কারুর অসুখ নাকি !'

প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, আমাদের পরিচিত ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক এ বাড়ির গৃহ-চিকিৎসক। বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছি, দৃষ্টি পড়িল কূয়ার ওপারে তরুগুচ্ছ হইতে মৃদুমন্দ ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা কি ? ওখানে ধোঁয়া কিসের ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'একটা সাধু ওখানে আড্ডা গেড়েছে।'

'সাধু ! এই জঙ্গলের মধ্যে সাধু ! এখানে তো ভিক্ষা পাবার কোনও আশা নেই।'

'তা নেই। কিন্তু রামকিশোরবাবুর বাড়ি থেকে বোধ হয় বাবাজীর সিধে আসে।'

'ও। কতদিন আছেন এখানে বাবাজী ?'

'ঠিক জানি না। তবে অধ্যাপক মহাশয়ের মৃত্যুর আগে থেকেই আছেন।'

'তাই নাকি ? চলুন, একবার সাধু দর্শন করা যাক।'

একটি গাছের তলায় ধুনি জ্বালিয়া কৌপীনধারী বাবাজী বসিয়া আছেন। আমরা কাছে গিয়া দাঁড়াইলে তিনি জবারক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, কিছুক্ষণ অপলকনেত্রে আমাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর শ্মশ্রুসমাকুল মুখে একটি বিচিত্র নীরব হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।

কিছুক্ষণ অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। পথেঘাটে যেসব ভিক্ষাজীবী সাধু-সন্ন্যাসী দেখা যায় ইনি ঠিক সেই জাতীয় নন। কোথায় যেন একটা তফাৎ আছে। কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিক আভিজাত্য কিনা বুঝিতে পারিলাম না।

পাণ্ডে বলিলেন, 'এবার কোথায় যাবেন ? আগে রামকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন, না দুর্গ দেখবেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুর্গটাই আগে দেখা যাক।'

দেউড়ির পাশ দিয়া দুর্গের সিঁড়ি ধরিব, মোটর চালক বুলাকিলাল তাহার কোটর হইতে বাহিরে আসিয়া ডি. এস. পি. সাহেবকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডে বলিলেন, 'বুলাকিলাল, ডাক্তার এসেছে কেন ? কারুর কি অসুখ ?'

বুলাকিলাল বলিল, 'না হুজুর, ডাক্তার সাহেব এসেছে, উকিল সাহেবও এসেছেন। কি জানি কি গুফ্‌ত-গু হচ্ছে।'

'উকিল ? হিমাংশুবাবু ?'

'জী হুজুর। একসঙ্গে এসেছেন। এত্তালা দেব ?'

'থাক, আমরা নিজেরাই যাব।'

বুলাকিলাল তখন হাত জোড় করিয়া বলিল, 'হুজুর, ঠাণ্ডাই তৈরি করছি। যদি হুকুম হয়—'

'ঠাণ্ডাই—ভাঙ ? বেশ তো, তুমি তৈরি কর, আমরা দুর্গ দেখে এখনই ফিরে আসছি।'

'জী সরকার।'

আমরা তখন সিঁড়ি ধরিয়া দুর্গের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। পাণ্ডে হাসিয়া বলিলেন, 'বুড়ো বুলাকিলাল খাসা ভাঙ তৈরি করে। ঐ নিয়েই আছে।'

পঁচাত্তরটি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দুর্গতোরণে উপনীত হইলাম। তোরণের কবাট নাই, বহু পূর্বেই অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু পাথরের খিলান এখনও অটুট আছে। গতাগতির বাধা নাই।

তোরণপথে প্রবেশ করিয়া সর্বাগ্রে যে বস্তুটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহা একটি কামান। প্রথম দেখিয়া মনে হয় তাল গাছের একটা গুঁড়ি মুখ উঁচু করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। দুই শতাব্দীর রৌদ্রবৃষ্টি অনাবৃত কামানের দশ হাত দীর্ঘ দেহটিকে মরিচা ধরাইয়া শঙ্কাবৃত করিয়া তুলিয়াছে। প্রায় নিরেট লৌহস্তম্ভটি জগদ্দল ভারি, বহুকাল কেহ তাহাকে নাড়াচাড়া করে নাই। তাহার ভিতরের গোলা ছুঁড়িবার ছিদ্রটি বেশি ফাঁদালো নয়, কোনও ক্রমে একটি ছোবড়া-ছাড়ানো নারিকেল তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাও বর্তমানে ধূলামাটিতে ভরাট হইয়া গিয়াছে ; মুখের দিকটায় একগুচ্ছ সজীব ঘাস মাথা বাহির করিয়া আছে। অতীতের সাক্ষী ক্ষয়িষ্ণু দুর্গটির তোরণমুখে ভূপতিত কামানটিকে দেখিয়া কেমন যেন মায়া হয় ; মনে হয় যৌবনে সে বলদৃপ্ত যোদ্ধা ছিল, জরার বশে ধরাশায়ী হইয়া সে ঊর্ধ্বমুখে মৃত্যুর দিন গুনিতেছে।

কামান ছাড়া অতীতকালের অস্থাবর বস্তু দুর্গমধ্যে আর কিছু নাই। প্রাকার-ঘেরা দুর্গভূমি আয়তনে দুই বিঘার বেশি নয় ; সমস্তটাই পাথরের পাটি দিয়া বাঁধানো। চক্রাকার প্রাকারের গায়ে ছোট ছোট কুঠুরি ; বোধ হয় পূর্বকালে এগুলিতে দুর্গরক্ষক সিপাহীরা থাকিত। এগুলির অবস্থা ভগ্নপ্রায় ; কোথাও পাথর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও দ্বারের সম্মুখে কাঁটাগাছ জন্মিয়াছে। এই চক্রের মাঝখানে নাভির ন্যায় দুর্গের প্রধান ভবন। নাভি ও নেমির মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের অবকাশ।

গৃহটি চতুষ্কোণ এবং বাহির হইতে দেখিলে মজবুত বলিয়া মনে হয়। পাঁচ ছয়টি ছোট বড় ঘর লইয়া গৃহ ; মামুলিভাবে মেরামত করা সত্ত্বেও সব ঘরগুলি বাসের উপযোগী নয়। কোনও ঘরের দেয়ালে ফাটল ধরিয়াছে, কোনও ঘরের ছাদ ফুটো হইয়া আকাশ দেখা যায়। কেবল পিছন দিকের একটি ছোট ঘর ভাল অবস্থায় আছে। যদিও চুন সুরকি খসিয়া স্থূল পাথরের গাঁথুনি প্রকট হইয়া পড়িয়াছে তবু ঘরটিকে বাসোপযোগী করিবার জন্য তাহার প্রবেশ-পথে নূতন চৌকাঠ ও কবাট লাগানো হইয়াছে।

আমরা অন্যান্য ঘরগুলি দেখিয়া এই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডে চৌকাঠের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, 'অধ্যাপক মহাশয়ের লাস ঐখানে পড়ে ছিল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'সাপে কামড়াবার পর তিনি যদি চৌকাঠে মাথা ঠুকে পড়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে মাথায় চোট লাগা অসম্ভব নয়।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'না, অসম্ভব নয়। কিন্তু সারা বাড়িটা আপনি দেখেছেন ; ভাঙ্গা বটে কিন্তু কোথাও এমন আবর্জনা নেই যেখানে সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে। অধ্যাপক মহাশয় বাস করতে আসার সময় এখানে ভাল করে কার্বলিক অ্যাসিডের জল ছড়ানো হয়েছিল, তারপরও তিনি বেঁচে থাকাকালে বার দুই ছড়ানো হয়েছে—'

'অধ্যাপক মহাশয় আসবার আগে এখানে কেউ বাস করত না ?'

পাণ্ডে মুখ টিপিয়া বলিলেন, 'কেউ কবুল করে না। কিন্তু মুরলীধর—'

'হুঁ—বুঝেছি।' বলিয়া ব্যোমকেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘরটি লম্বায় চওড়ায় আন্দাজ চৌদ্দ ফুট। মেঝে শান বাঁধানো। একপাশে একটি তক্তপোশ এবং একটি আরাম-কেদারা ছাড়া ঘরে অন্য কোনও আসবাব নাই। অধ্যাপক মহাশয়ের ব্যবহারের জন্য যে-সকল তৈজস ছিল তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছে।

এই ঘরে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম যাহা অন্য কোনও ঘরে নাই। তিনটি দেয়ালে মেঝে হইতে প্রায় এক হাত ঊর্ধ্বে সারি সারি লোহার গজাল ঠোকা রহিয়াছে, গজালগুলি দেয়াল হইতে দেড় হাত বাহির হইয়া আছে। সেগুলি আগে বোধ হয় শাবলের মত স্থূল ছিল, এখন মরিচা ধরিয়া যেরূপ ভঙ্গুর আকৃতি ধারণ করিয়াছে তাহাতে মনে হয় সেগুলি জানকীরামের সমসাময়িক।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেয়ালে গোঁজ কেন ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'এ ঘরটা বোধহয় সেকালে দুর্গের দপ্তর কিম্বা খাজনাখানা ছিল। গোঁজের

ওপর তক্তা পেতে দিলে বেশ তাক হয়, তাকের ওপর নানান জিনিসপত্র, বই খাতা, এমন কি টাকার সিন্দুক রাখা চলত। এখনও বিহারের অনেক সাবেক বাড়িতে এইরকম গোঁজ দেখা যায়।'

ব্যোমকেশ ঘরের মেঝে ও দেয়ালের উপর চোখ বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। এক সময় বলিল, 'অধ্যাপক মহাশয় নিশ্চয় বাক্স-বিছানা এনেছিলেন। সেগুলো কোথায়?'

'সেগুলো আমাদের অর্থাৎ পুলিসের জিম্মায় আছে।'

'বাক্সর মধ্যে কি আছে দেখেছেন?'

'গোটাকয়েক জামা কাপড় আর খান-তিন-চার বই খাতা। একটা ন্যাক্‌ড়ায় বাঁধা তিনটে দশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো টাকা পয়সা ছিল।'

'আর তাঁর মুঠির মধ্যে যে মোহর পাওয়া গিয়েছিল সেটা?'

'সেটাও আমাদের জিম্মায় আছে। এ মামলার একটা নিষ্পত্তি হলে সব জিনিস তাঁর ওয়ারিসকে ফেরত দিতে হবে।'

ব্যোমকেশ আরও কিছুক্ষণ ঘর পরীক্ষা করিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না। তখন সে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'চলুন। এখানকার দেখা শেষ হয়েছে।'

দুর্গ প্রাঙ্গণে আসিয়া আমরা তোরণের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, একটি ছোকরা তোরণ দিয়া প্রবেশ করিল। মাস্টার রমাপতিকে এই প্রথম দেখিলাম। ছিপ্‌ছিপে গড়ন, ময়লা রঙ, চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ; কিন্তু সঙ্কুচিত ভাব। বয়স উনিশ-কুড়ি। তাহাকে দেখিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'কি মাস্টার, কি খবর?'

রমাপতি একটু অপ্রতিভ হাসিয়া বলিল, 'বাড়িতে ডাক্তারবাবু আর উকিলবাবু এসেছেন। তাঁদের নিয়ে কর্তার ঘরে কি সব কাজের কথা হচ্ছে। বড়রা সবাই সেখানে আছেন। কিন্তু গদাই আর তুলসীকে দেখতে পেলাম না, তাই ভাবলাম হয়তো তারা এখানে এসেছে।'

'না, তাদের তো এখানে দেখিনি।' পাণ্ডে আমাদের সহিত রমাপতির পরিচয় করাইয়া দিলেন, 'এঁরা আমার বন্ধু, এখানে বেড়াতে এসেছেন।'

রমাপতি একদৃষ্টে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া থাকিয়া সংহত স্বরে বলিল, 'আপনি কি—সত্যান্বেষী ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ! কিন্তু চিনলেন কি করে? আমার ছবি তো কোথাও বেরোয়নি।'

রমাপতি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, স্খলিত স্বরে বলিল, 'আমি—না, ছবি দেখিনি—কিন্তু দেখে মনে হল—আপনার বই পড়েছি—ক'দিন ধরে মনে হচ্ছিল—আপনি যদি আসতেন তাহলে নিশ্চয় এই ব্যাপারের মীমাংসা হত—' সে থতমত খাইয়া চুপ করিল।

ব্যোমকেশ সদয় হাসিয়া বলিল, 'আসুন, আপনার সঙ্গে খানিক গল্প করা যাক।'

নিকটেই কামান পড়িয়াছিল, ব্যোমকেশ রুমাল দিয়া ধুলা ঝাড়িয়া তাহার উপর বসিল, পাশের স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, 'বসুন।' রমাপতি সসঙ্কোচে তাহার পাশে বসিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি বললেন আমি এলে এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে। ঈশানবাবু তো সাপের কামড়ে মারা গেছেন। এর মীমাংসা কী হবে?'

রমাপতি উত্তর দিল না, শঙ্কিত নতমুখে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া অঙ্গুষ্ঠের নখ খুঁটিতে লাগিল। ব্যোমকেশ তাহার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া সহজ স্বরে বলিল, 'যাক ও কথা। ঈশানবাবু যে-রাত্রে মারা যান সে-রাত্রে প্রায় সাড়ে ন'টা পর্যন্ত আপনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কি কথা হচ্ছিল?'

রমাপতি এবার সতর্কভাবে উত্তর দিল, বলিল, 'উনি আমাকে স্নেহ করতেন। আমি ওঁর কাছে এলে আমার সঙ্গে নানারকম গল্প করতেন। সে-রাত্রে—'

'সে-রাত্রে কোন্ গল্প বলছিলেন?'

'এই দুর্গের ইতিহাস বলছিলেন।'

'দুর্গের ইতিহাস! তাই নাকি! কি ইতিহাস শুনলেন বলুন তো, আমরাও শুনি।'

আমি আর পাণ্ডে গিয়া কামানের উপর বসিলাম। রমাপতি যে গল্প শুনিয়াছিল তাহা বলিল। রাজা জানকীরাম হইতে আরম্ভ করিয়া সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাজারাম ও জয়রাম পর্যন্ত কাহিনী বলিয়া গেল।

শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, সত্যি ইতিহাস বলেই মনে হয়। কিন্তু এ ইতিহাস তো পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায় না। ঈশানবাবু জানলেন কি করে?'

রমাপতি বলিল, 'উনি সব জানতেন। কর্তার এক ভাই ছিলেন, কম বয়সে মারা যান, তাঁর নাম ছিল রামবিনোদ সিংহ, অধ্যাপক মশায় তাঁর প্রাণের বন্ধু ছিলেন। তাঁর মুখে উনি এসব কথা শুনেছিলেন; রামবিনোদবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত বংশের সব ইতিহাস এঁর জানা ছিল। একটা খাতায় সব লিখে রেখেছিলেন।'

'খাতায় লিখে রেখেছিলেন? কোথায় খাতা?'

'এখন খাতা কোথায় তা জানি না। কিন্তু আমি দেখেছি। বোধহয় ওঁর তোরঙ্গের মধ্যে আছে।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডের পানে তাকাইল। পাণ্ডে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'পেন্সিলে লেখা একটা খাতা আছে, কিন্তু তাতে কি লেখা আছে তা জানি না। বাংলায় লেখা।'

'দেখতে হবে; যা হোক—' ব্যোমকেশ রমাপতির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আপনার কাছে অনেক খবর পাওয়া গেল।—আচ্ছা, পরদিন সকালে সবার আগে আপনি আবার দুর্গে এসেছিলেন কেন, বলুন তো?'

রমাপতি বলিল, 'উনি আমাকে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন, আজ এই পর্যন্ত থাক, কাল ভোরবেলা এসো, বাকি গল্পটা বলব!'

'বাকি গল্পটা মানে—?'

'তা কিছু খুলে বলেননি। তবে আমার মনে হয়েছিল যে সিপাহী যুদ্ধের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ বংশের ইতিহাস আমাকে শোনাবেন।'

'কিন্তু কেন? আপনাকে এ ইতিহাস শোনাবার কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি—?'

'তা জানি না; তাঁর যখন যা মনে আসত আমাকে বলতেন, আমারও ভাল লাগত তাই শুনতাম। মোগল-পাঠান আমলের অনেক গল্প বলতেন। একদিন বলেছিলেন, যে-বংশে একবার ভ্রাতৃহত্যার বিষ প্রবেশ করেছে সে-বংশের আর রক্ষা নেই; যতবড় বংশই হোক তার ধ্বংস অনিবার্য। এই হচ্ছে ইতিহাসের সাক্ষ্য।'

আমরা পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। পাণ্ডের ললাট ভ্রূকুটি-বন্ধুর হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে। চলুন, এবার ওদিকে যাওয়া যাক।'

খাদের ওপারে বাড়ির আড়ালে সূর্য তখন ঢাকা পড়িয়াছে।

৩

দেউড়ি পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া দেখিলাম, বুলাকিলাল দুইটি বৃহৎ পাত্রে ভাঙের সরবৎ লইয়া ঢালাঢালি করিতেছে; গদাধর এবং তুলসী পরম আগ্রহভরে দাঁড়াইয়া প্রক্রিয়া দেখিতেছে।

আমাদের আগমনে গদাধর বিরাট হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল; তুলসী সংশয়-সঙ্কুল চক্ষু আমাদের উপর স্থাপন করিয়া কোণাচে ভাবে সরিয়া গিয়া মাস্টার রমাপতির হাত চাপিয়া ধরিল। রমাপতি তিরস্কারের সুরে বলিল, 'কোথায় ছিলে তোমরা? আমি চারিদিকে তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

তুলসী জবাব দিল না, অপলক দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া রহিল। গদাধরের গলা হইতে একটি ঘড়ঘড় হাসির শব্দ বাহির হইল। সে বলিল, 'সাধুবাবা গাঁজা খাচ্ছিল তাই দেখছিলাম।'

রমাপতি ধমক দিয়া বলিল, 'সাধুর কাছে যেতে তোমাদের মানা করা হয়নি?'

গদাধর বলিল, 'কাছে তো যাইনি, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।'

'আচ্ছা, হয়েছে—এবার বাড়ি চল।' রমাপতি তাহাদের লইয়া বাড়ির দিকে চলিল। শুনিতে পাইলাম, কয়েক ধাপ উঠিবার পর তুলসী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিতেছে, 'মাস্টারমশাই, ওরা সব কারা?'

বুলাকিলাল গেলাস ভরিয়া আমাদের হাতে দিল। দধি গোলমরিচ শসার বীচি এবং আরও বহুবিধ বকাল সহযোগে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ভাঙের সরবৎ; এমন সরবৎ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ছাড়া আর কোথাও প্রস্তুত হয় না। পাণ্ডে তারিফ করিয়া বলিলেন, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে। কিন্তু বুলাকিলাল, তুমি এত ভাঙ তৈরি করেছ কার জন্যে? আমরা আসব তা তো জানতে না।'

বুলাকিলাল বলিল, 'হুজুর, আমি আছি, সাধুবাবাও এক ঘটি চড়ান্—'

'সাধুবাবার দেখছি কিছুতেই অরুচি নেই। আর—'

'আর—গণপৎ এক ঘটি নিয়ে যায়।'

'গণপৎ—মুরলীধরের খাস চাকর? নিজের জন্যে নিয়ে যায়, না মালিকের জন্যে?'

'তা জানি না হুজুর।'

'আচ্ছা বুলাকিলাল, তুমি তো এ বাড়ির পুরোনো চাকর, বাড়িতে কে কোন্ নেশা করে বলতে পারো?'

বুলাকিলাল একটু চুপ করিয়া বলিল, 'বড়কর্তা সন্ধ্যের পর আফিম খান। আর কারুর কথা জানি না ধর্মাবতার।'

বোঝা গেল, জানিলেও বুলাকিলাল বলিবে না। আমরা সরবৎ শেষ করিয়া, আর এক প্রস্থ তারিফ করিয়া বাড়ির সিঁড়ি ধরিলাম।

এদিকেও সিঁড়ির সংখ্যা সত্তর-আশি। উপরে উঠিয়া দেখা গেল, সূর্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও বেশ আলো আছে। বাড়ির সদরে রমাপতি উপস্থিত ছিল, সে বলিল, 'কর্তার সঙ্গে দেখা করবেন? আসুন।'

রমাপতি আমাদের যে ঘরটিতে লইয়া গেল সেটি বাড়ির বৈঠকখানা।

টেবিল চেয়ার ছাড়াও আর একটি ফরাস-ঢাকা বড় তক্তপোশ আছে। তক্তপোশের মধ্যস্থলে রামকিশোরবাবু আসীন; তাঁহার এক পাশে নায়েব চাঁদমোহন, অপর পাশে জামাই মণিলাল। দুই ছেলে বংশীধর ও মুরলীধর তক্তপোশের দুই কোণে বসিয়াছে। ডাক্তার ঘটক এবং উকিল হিমাংশুবাবু তক্তপোশের কিনারায় চেয়ার টানিয়া উপবিষ্ট আছেন। পশ্চিম দিকের খোলা জানালা দিয়া ঘরে আলো আসিতেছে; তবু ঘরের ভিতরটা ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে।

ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে শুনিতে পাইলাম, মুরলীধর পেঁচালো সুরে বলিতেছে, 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দৈ! মণিলালকে দুর্গ দেওয়া হবে কেন? আমি কি ভেসে এসেছি? দুর্গ আমি নেব।'

বংশীধর অমনি বলিয়া উঠিল, 'তুমি নেবে কেন? আমার দাবি আগে, দুর্গ আমি নেব। আমি ওটা মেরামত করিয়ে ওখানে বাস করব।'

রামকিশোর বারুদের মত ফাটিয়া পড়িলেন, 'খবরদার! আমার মুখের ওপর যে কথা বলবে জুতিয়ে তার মুখ ছিঁড়ে দেব। আমার সম্পত্তি আমি যাকে ইচ্ছে দিয়ে যাব। মণিলালকে আমি সর্বস্ব দিয়ে যাব, তোমাদের তাতে কি! বেয়াদব কোথাকার!'

মণিলাল শান্তস্বরে বলিল, 'আমি তো কিছুই চাইনি—।'

মুরলীধর মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'না কিছুই চাওনি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বাবাকে বশ করেছ। মিট্‌মিটে ডান—'

রামকিশোর আবার ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিলেন, ডাক্তার ঘটক হাত তুলিয়া বলিল,

'রামকিশোরবাবু, আপনি বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, আপনার শরীরের পক্ষে ওটা ভাল নয়। আজ বরং কথাবার্তা বন্ধ থাক্, আর একদিন হবে।'

রামকিশোরবাবু ঈষৎ সংযত হইয়া বলিলেন, 'না ডাক্তার, এ ব্যাপার টাঙিয়ে রাখা চলবে না। আজ আছি কাল নেই, আমি সব হাঙ্গামা চুকিয়ে রাখতে চাই। হিমাংশুবাবু, আমি আমার সম্পত্তির কি রকম ব্যবস্থা করতে চাই আপনি শুনেছেন ; আর বেশি আলোচনার দরকার নেই। আপনি দলিলপত্র তৈরি করতে আরম্ভ করে দিন। যত শীগ্‌গির দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে যায় ততই ভাল।'

'বেশ, তাই হবে। আজ তাহলে ওঠা যাক্।' হিমাংশুবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। এতক্ষণে সকলের নজর পড়িল যে আমরা তিনজন ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি। রামকিশোর ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন, 'কে ?'

পাণ্ডে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, 'আমি। আমার দু'টি কলকাতার বন্ধু বেড়াতে এসেছেন, তাঁদের দুর্গ দেখাতে এনেছিলাম।' বলিয়া ব্যোমকেশের ও আমার নামোল্লেখ করিলেন।

রামকিশোর সমাদর সহকারে বলিলেন, 'আসুন, আসুন। বসতে আজ্ঞা হোক।' কিন্তু তিনি ব্যোমকেশের নাম পূর্বে শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না।

বংশীধর ও মুরলীধর উঠিয়া গেল। ডাক্তার ঘটক আমাদের দেখিয়া একটু বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইল, তারপর হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। ডাক্তারের সঙ্গে দু'একটা কথা হইবার পর সে উকিল হিমাংশুবাবুকে লইয়া প্রস্থান করিল। ঘরের মধ্যে রহিয়া গেলাম আমরা তিনজন এবং ও-পক্ষে রামকিশোরবাবু, নায়েব চাঁদমোহন এবং জামাই মণিলাল।

রামকিশোর হাঁকিলেন, 'ওরে কে আছিস, আলো দিয়ে যা, চা তৈরি কর।'

চাঁদমোহন বলিলেন, 'আমি দেখছি—'

তিনি উঠিয়া গেলেন। চাঁদমোহনের চেহারা কালো এবং চিম্‌শে কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ধূর্ততা ভরা। তিনি যাইবার সময় ব্যোমকেশের প্রতি একটি দীর্ঘ-গভীর অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন।

দুই চারিটি সৌজন্যমূলক বাক্যালাপ হইল। বাহিরের লোকের সহিত রামকিশোরের ব্যবহার বেশ মিষ্ট ও অমায়িক। তারপর ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনলাম ঈশানবাবু এখানে এসে সর্পাঘাতে মারা গেছেন। আমি তাঁকে চিনতাম, একসময় তাঁর ছাত্র ছিলাম।'

'তাই নাকি!' রামকিশোর চকিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, 'আমার বড় ছেলেও—। কি বলে, ঈশান আমার প্রাণের বন্ধু ছিল, ছেলেবেলার বন্ধু। সে আমার বাড়িতে এসে অপঘাতে মারা গেল, এ লজ্জা আমি জীবনে ভুলব না।' তাঁহার কথার ভাবে মনে হইল, সর্পাঘাতে মৃত্যু সম্বন্ধে যে সন্দেহ আছে তাহা তিনি জানেন না।

ব্যোমকেশ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল, 'বড়ই দুঃখের বিষয়। তিনি আপনার দাদারও বন্ধু ছিলেন ?'

রামকিশোর ক্ষণেক নীরব থাকিয়া যেন একটু বেশি ঝোঁক দিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু দাদা প্রায় ত্রিশ বছর হল মারা গেছেন।'

'ও—তাহলে বর্তমানে আপনার সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।—আচ্ছা, তিনি এবার এখানে আসার আগে এ বাড়ির কে কে তাঁকে চিনতেন ? আপনি চিনতেন। আর— ?'

'আর আমার নায়েব চাঁদমোহন চিনতেন।'

'আপনার ড্রাইভার তো পুরোনো লোক, সে চিনত না ?'

'হ্যাঁ, বুলাকিলাল চিনত।'

'আর, আপনার বড় ছেলেও বোধহয় তাঁর ছাত্র ছিলেন ?'

গলাটা পরিষ্কার করিয়া রামকিশোর বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

এই বাক্যালাপ যখন চলিতেছিল তখন জামাই মণিলালকে লক্ষ্য করিলাম। ভোজনরত

মানুষের পাতের কাছে বসিয়া পোষা বিড়াল যেমন একবার পাতের দিকে একবার মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে চক্ষু সঞ্চালন করে, মণিলাল তেমনি কথা বলার পর্যায়ক্রমে ব্যোমকেশ ও রামকিশোরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছে। তাহার মুখের ভাব আধা-অন্ধকারে ভাল ধরা গেল না, কিন্তু সে যে একাগ্রমনে বাক্যালাপ শুনিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবুর মুঠিতে একটি মোহর পাওয়া গিয়েছিল। সেটি কোথা থেকে এল বলতে পারেন ?'

রামকিশোর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। ঈশানের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। অন্তত মোহর নিয়ে বেড়াবার মত ছিল না।'

'দুর্গে কোথাও কুড়িয়ে পাওয়া সম্ভব নয় কি ?'

রামকিশোর বিবেচনা করিয়া বলিলেন, 'সম্ভব। কারণ আমার পূর্বপুরুষদের অনেক সোনা-দানা ঐ দুর্গে সঞ্চিত ছিল। সিপাহীরা যখন লুঠ করতে আসে তখন এক-আধটা মোহর এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়া বিচিত্র নয়। তা যদি হয় তাহলে ও মোহর আমার সম্পত্তি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার সম্পত্তি হলে ঈশানবাবু মোহরটি আপনাকে ফেরত দিতেন না কি ? আমি যতদূর জানি, পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার লোক তিনি ছিলেন না।'

'তা ঠিক। কিন্তু অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। তা ছাড়া, মোহরটা কুড়িয়ে পাবার সময়েই হয়তো তাকে সাপে কামড়েছিল। বেচারা সময় পায়নি।'

এই সময় একজন ভৃত্য কেরোসিনের ল্যাম্প আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল, অন্য একজন ভৃত্য চা এবং জলখাবারের ট্রে লইয়া আমাদের সম্মুখে ধরিল। আমরা সবিনয়ে জলখাবার প্রত্যাখ্যান করিয়া চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইলাম।

চায়ে চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা নেই।' ঈশানবাবুও নিশ্চয় রাত্রে কেরোসিনের লণ্ঠন ব্যাবহার করতেন ?'

রামকিশোর বলিলেন, 'হ্যাঁ। তবে মৃত্যুর হপ্তাখানেক আগে সে একবার আমার কাছ থেকে একটা ইলেকট্রিক টর্চ চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর আর সব জিনিসই পাওয়া গেল কেবল ঐ টর্চটা পাওয়া যায়নি।'

'তাই নাকি ! কোথায় গেল টর্চটা ?'

এতক্ষণে মণিলাল কথা কহিল, গম্ভীর মুখে বলিল, 'আমার বিশ্বাস ঐ ঘটনার পরদিন সকালবেলা গোলমালে কেউ টর্চটা সরিয়েছে।'

পাণ্ডে প্রশ্ন করিলেন, 'কে সরাতে পারে ? কারুর ওপর সন্দেহ হয় ?'

মণিলাল উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিয়াছিল, রামকিশোর মাঝখানে বলিয়া উঠিলেন, 'না না, মণি, ও তোমার ভুল ধারণা। রমাপতি নেয়নি, নিলে স্বীকার করত।'

মণিলাল আর কথা কহিল না, ঠোঁট চাপিয়া বসিয়া রহিল। বুঝিলাম, টর্চ হারানোর প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে এবং মণিলালের সন্দেহ মাস্টার রমাপতির উপর। একটা ক্ষুদ্র পারিবারিক মতান্তর ও অস্বাচ্ছন্দ্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

অতঃপর চা শেষ করিয়া আমরা উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'এই সূত্রে আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হল। বড় সুন্দর জায়গায় বাড়ি করেছেন। এখানে একবার এলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।'

রামকিশোর আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'বেশ তো, দু'দিন না হয় থেকে যান না। দু'দিন পরে কিন্তু প্রাণ পালাই-পালাই করবে। আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে তাই থাকতে পারি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার নিমন্ত্রণ মনে রাখব। কিন্তু যদি আসি, ঐ দুর্গে থাকতে দিতে হবে। ক্ষুধিত পাষাণের মত আপনার দুর্গটা আমাকে চেপে ধরেছে।'

রামকিশোর বিরসমুখে বলিলেন, 'দুর্গে আর কাউকে থাকতে দিতে সাহস হয় না। যা হোক, যদি সত্যিই আসেন তখন দেখা যাবে।'

দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, কালো পর্দার আড়ালে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তুলসী এতক্ষণ পর্দার কাছে দাঁড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতেছিল, এখন সরীসৃপের মত সরিয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর পাণ্ডেজির বাসার খোলা ছাদে তিনটি আরাম-কেদারায় আমরা তিনজনে অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছিলাম। অন্ধকারে ধূমপান চলিতেছিল। এখানে কার্তিক মাসের এই সময়টি বড় মধুর ; দিনে একটু মোলায়েম গরম, রাত্রে মোলায়েম ঠাণ্ডা।

পাণ্ডে বলিলেন, 'এবার বলুন কি মনে হল।'

ব্যোমকেশ সিগারেটে দু' তিনটা টান দিয়া বলিল, 'আপনি ঠিক ধরেছেন, গলদ আছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে যতক্ষণ না চেপে বসা যাচ্ছে ততক্ষণ গলদ ধরা যাবে না।'

'আপনি তো আজ তার গৌরচন্দ্রিকা করে এসেছেন। কিন্তু নিতান্তই কি দরকার— ?'

'দরকার। এতদূর থেকে সুবিধা হবে না। ওদের সঙ্গে ভাল করে মিশতে হবে তবে ওদের পেটের কথা জানা যাবে। আজ লক্ষ্য করলাম, কেউ মন খুলে কথা কইছে না, সকলেই কিছু-না-কিছু চেপে যাচ্ছে।'

'হুঁ। তাহলে আপনার বিশ্বাস হয়েছে যে ঈশানবাবুর মৃত্যুটা স্বাভাবিক সর্পাঘাতে মৃত্যু নয় ?'

'অতটা বলবার এখনও সময় হয়নি। এইটুকু বলতে পারি, আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে তা সত্যি নয়, ভেতরে একটা গূঢ় এবং চমকপ্রদ রহস্য রয়েছে। মোহর কোথা থেকে এল ? টর্চটা কোথায় গেল ? রমাপতি যে-গল্প শোনালে তা কি সত্যি ? সবাই দুর্গটা চায় কেন ? মণিলালকে কর্তা ছাড়া কেউ দেখতে পারে না কেন ?'

আমি বলিলাম, 'মণিলালও রমাপতিকে দেখতে পারে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা স্বাভাবিক। ওরা দু'জনেই রামকিশোরবাবুর আশ্রিত। রমাপতিও বোধহয় মণিলালকে দেখতে পারে না। বাড়ির কেউ কাউকে দেখতে পারে না। সেটা আমাদের পক্ষে সুবিধে।' দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেট ফেলিয়া দিয়া সে বলিল, 'আচ্ছা পাণ্ডেজি, বংশীধর কতদূর লেখাপড়া করেছে জানেন ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'ম্যাট্রিক পাশ করেছে জানি। তারপর বহরমপুরে পড়তে গিয়েছিল, কিন্তু মাস কয়েক পরেই পড়াশুনা বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসে।'

'গোলমাল ঠেকছে। বহরমপুরে ঈশানবাবুর সঙ্গে বংশীধরের জানা-শোনা হয়েছিল—তারপর বংশীধর হঠাৎ লেখাপড়া ছেড়ে দিলে কেন ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'খোঁজ নিতে পারি। বেশি দিনের কথা নয়, যদি গোলমাল থাকে কলেজের সেরেস্তায় হদিস পাওয়া যাবে।'

'খবর নেবেন তো। —আর মুরলীধরের বিদ্যে কতদূর ?'

'ওটা আকাট মুখ্‌খু।'

'হুঁ, বংশটাই চাষাড়ে হয়ে গেছে। তবে রামকিশোরবাবুর ব্যবহারে একটা সাবেক ভদ্রতা আছে।'

'কিন্তু বাল্যবন্ধুর মৃত্যুতে খুব বেশি শোক পেয়েছেন বলে মনে হল না ; বরং মোহরটি বাগাবার মতলব।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, 'এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি। —কাল সকালে ঈশানবাবুর জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করতে হবে, খাতাটা পড়তে হবে। তাতে হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

'তারপর ?'

'তারপর দুর্গে গিয়ে গ্যাঁট্ হয়ে বসব। আপনি ব্যবস্থা করুন।'

'ভাল। কিন্তু একটা কথা ওদের দেওয়া খাবার খাওয়া চলবে না। কি জানি কার মনে কি

আছে—'

'হুঁ, ঠিক বলেছেন। আপনার ইক্‌মিক্ কুকার আছে?'

'আছে।'

'ব্যস্, তাহলেই চলবে।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। ব্যোমকেশ আর একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'অজিত, রামকিশোরবাবুকে দেখে কিছু মনে হল?'

'কি মনে হবে?'

'আজ তাঁকে দেখেই মনে হল, আগে কোথায় দেখেছি। তোমার মনে হল না?'

'কৈ না!'

'আমার কিন্তু এক নজর দেখেই মনে হল চেনা লোক। কিন্তু কবে কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না।'

পাণ্ডে একটা হাই চাপিয়া বলিলেন, 'রামকিশোরবাবুকে আপনার দেখার সম্ভাবনা কম; গত পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি লোকালয়ে পা বাড়িয়েছেন কিনা সন্দেহ। আপনি হয়তো ওই ধরনের চেহারা অন্য কোথাও দেখে থাকবেন।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই হবে বোধ হয়।'

৪

পরদিন প্রাতরাশের সময় পাণ্ডে বলিলেন, 'দুর্গে গিয়ে থাকার সঙ্কল্প ঠিক আছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, আপনি ব্যবস্থা করুন। বড় জোর দু'-তিন দিন থাকব, বেশি নয়।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আমার কিন্তু মন চাইছে না, কি জানি যদি সত্যিই সাপ থাকে।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'থাকলেও আমাদের কিছু করতে পারবে না। আমরা সাপের রোজা।'

'বেশ, আমি তাহলে রামকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব ঠিকঠাক করে আসি।—আচ্ছা, দুর্গের বদলে যদি রামকিশোরবাবুর বাড়িতে থাকেন তাতে ক্ষতি কি?'

'অত ঘেঁষাঘেঁষি সুবিধা হবে না, পরিপ্রেক্ষিত পাব না। দুর্গই ভাল।'

'ভাল। আমি অফিসে বলে যাচ্ছি, আমার মুন্‌শী আতাউল্লাকে খবর দিলে সে ঈশানবাবুর জিনিসপত্র আপনাদের দেখাবে। গুদাম ঘরের চাবি তার কাছে।'

পাণ্ডেজি মোটর-বাইকে চড়িয়া প্রস্থান করিলেন। ঘড়িতে মাত্র ন'টা বাজিয়াছে, পাণ্ডেজির অফিস তাঁহার বাড়িতেই; সুতরাং ঈশানবাবুর মালপত্র পরীক্ষার তাড়া নাই। আমরা সিগারেট ধরাইয়া সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইয়া গড়িমসি করিতেছি, এমন সময় একটি ছোট মোটর আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ জানালা দিয়া দেখিয়া বলিল, 'ডাক্তার ঘটক। ভালই হল।'

ডাক্তার ঘটকের একটু অনুতপ্ত ভাব। আমরা যে তাহার গুপ্তকথা ফাঁস করিয়া দিই নাই এবং ভবিষ্যতে দিব না তাহা সে বুঝিয়াছে। বলিল, 'কাল আপনাদের সঙ্গে ভাল করে কথা বলবার সুযোগ পেলাম না, তাই—'

ব্যোমকেশ পরম সমাদরের সহিত তাহাকে বসাইয়া বলিল, 'আপনি না এলে আমরাই যেতাম। কেমন আছেন বলুন। পুরোনো বন্ধুরা সব কেমন? মহীধরবাবু?'

ডাক্তার বলিল, 'সবাই ভাল আছেন।'

ব্যোমকেশ চক্ষু মিটিমিটি করিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'আর রজনী দেবী?'

ডাক্তারের কান দু'টি রক্তাভ হইল, তারপর সে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'ভাল আছে রজনী। আপনারা এসেছেন শুনে জানতে চাইল মিসেস বক্সী এসেছেন কি না।'

'সত্যবতী এবার আসেনি। সে—' ব্যোমকেশ আমার পানে তাকাইল।

আমি সত্যবতীর অবস্থা জানাইয়া বলিলাম, 'সত্যবতী আমাদের কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরাও প্রতিজ্ঞা করেছি, একটা সুখবর না পাওয়া পর্যন্ত ওমুখো হব না।'

ডাক্তার হাসিয়া ব্যোমকেশকে অভিনন্দন জানাইল, কিন্তু তাহার মুখে হাসি ভাল ফুটিল না। ক্ষুধিত ব্যক্তি অন্যকে আহার করিতে দেখিলে হাসিতে পারে, কিন্তু সে হাসি আনন্দের নয়।

ব্যোমকেশ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মনের ভাব বুঝিল, পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'বন্ধু, মনে ক্ষোভ রাখবেন না। আপনি যা পেয়েছেন তা কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। একসঙ্গে দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য আর পরকীয়াপ্রীতির তীক্ষ্ণ স্বাদ উপভোগ করে নিচ্ছেন।'

আমি যোগ করিয়া দিলাম, 'ভেবে দেখুন, শেলী বলেছেন, হে পবন, শীত যদি আসে বসন্ত রহে কি কভু দূরে ! ফুলের মরসুম শেষ হোক, ফল আপনি আসবে।'

এবার ডাক্তারের মুখে সত্যকার হাসি ফুটিল। আরও কিছুক্ষণ হাসি-তামাসার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার ঘটক, কাল রামকিশোরবাবুর বাড়িতে বিষয়-ঘটিত আলোচনা খানিকটা শুনেছিলাম, বাকিটা শোনবার কৌতূহল আছে। যদি বাধা না থাকে আপনি বলুন।'

ডাক্তার বলিল, 'বাধা কি ? রামকিশোরবাবু তো লুকিয়ে কিছু করছেন না। মাসখানেক আগে ওঁর স্বাস্থ্য হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে ; হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন অনেকটা সামলেছেন ; কিন্তু ওঁর ভয় হয়েছে হঠাৎ যদি মারা যান তাহলে বড় ছেলেরা মামলা-মোকদ্দমায় সম্পত্তি নষ্ট করবে। হয়তো নাবালক ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করবার চেষ্টা করবে। তাই বেঁচে থাকতে থাকতেই উনি সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে চান। সম্পত্তি সমান চার ভাগ হবে ; দু'ভাগ বড় দুই ছেলে পাবে, বাকি দু'ভাগ রামকিশোরের অধিকারে থাকবে। তারপর ওঁর মৃত্যু হলে গদাই আর তুলসী ওয়ারিসান্‌-সূত্রে ওঁর সম্পত্তি পাবে, বড় দুই ছেলে আর কিছু পাবে না।'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'বুঝেছি। দুর্গ নিয়ে কি ঝগড়া হচ্ছিল ?'

'দুর্গটা রামকিশোরবাবু নিজের দখলে রেখেছেন। অথচ দুই ছেলেরই লোভ দুর্গের ওপর।'

'মণিলালকে দুর্গ দেবার কথা উঠল কেন ?'

'ব্যাপার হচ্ছে এই—রামকিশোরবাবু স্থির করেছেন তুলসীর সঙ্গে মণিলালের বিয়ে দেবেন। মণিলাল ওঁর বড় মেয়েকে বিয়ে করেছিল, সে-মেয়ে মারা গেছে, জানেন বোধ হয়। কাল কথায় কথায় রামকিশোরবাবু বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর বসতবাড়িটা পাবে গদাই, আর মণিলাল পাবে দুর্গ। মণিলাল মানেই তুলসী, মণিলালকে আলাদা কিছু দেওয়া হচ্ছে না। তাইতেই বংশী আর মুরলী ঝগড়া শুরু করে দিলে।'

'হুঁ। কিন্তু তুলসীর বিয়ের তো এখনও দেরি আছে। ওর কতই বা বয়স হবে।'

'আধুনিক মতে বিয়ের বয়স না হলেও নেহাৎ ছোট নয়, বছর তের-চোদ্দ হবে। রামকিশোরবাবু বোধহয় শীগ্‌গিরই ওদের বিয়ে দেবেন। যদি হঠাৎ মারা যান, নাবালক ছেলেমেয়েদের একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবক চাই তো ! বড় দুই ছেলের ওপর ওঁর কিছুমাত্র আস্থা নেই।'

'যেটুকু দেখেছি তাতে আস্থা থাকার কথা নয়। মণিলাল মানুষটি কেমন ?'

'মাথা-ঠাণ্ডা লোক। রামকিশোরবাবু তাই ওর ওপরেই ভরসা রাখেন বেশি। তবে যেভাবে শ্বশুরবাড়ি কামড়ে পড়ে আছে তাতে মনে হয় চক্ষুলজ্জা কম।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ শূন্যে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, 'ডাক্তার ঘটক, আপনি রুগী সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকবেন।'

ডাক্তার চকিত হইয়া বলিল, 'রুগী ! কোন্ রুগী ?'

'রামকিশোরবাবু। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র যদি দলিল রেজিস্ট্রি হবার আগেই হঠাৎ থেমে যায় তাহলে কারুর সুবিধা হতে পারে।'

ডাক্তার চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া রহিল।

বেলা দশটা নাগাদ ডাক্তার বিদায় লইলে আমরা মুন্‌শী আতাউল্লাকে খবর পাঠাইলাম।

আতাউল্লা লোকটি অতিশয় কেতাদুরস্ত প্রৌঢ় মুসলমান, বোধহয় খানদানী ব্যক্তি। কৃশ দেহে ছিটের আচকান, দাড়িতে মেহেদির রঙ, চোখে সুর্মা, মুখে পান; তাহার চোস্ত জবানের সঙ্গে মুখ হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় পানের কুচি ছিট্‌কাইয়া পড়িত। লোকটি সজ্জন।

আমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মুন্‌শী আতাউল্লা দুইজন আরদালির সাহায্যে ঈশানবাবুর বিছানা ও তোরঙ্গ আনিয়া আমাদের খিদ্‌মতে পেশ করিলেন। বিছানাটা নামমাত্র। রঙ-ওঠা সতরঞ্চিতে জড়ানো জীর্ণ বাঁদিপোতার তোষক ও তেলচিটে বালিশ। তবু ব্যোমকেশ উহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। তোষকটি ঝাড়িয়া এবং বালিশটি টিপিয়া টুপিয়া দেখিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে গুপ্ত ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব ধরা পড়িল না।

বিছানা স্থানান্তরিত করিবার হুকুম দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মুন্‌শীজি, একটা মোহর ছিল সেটা দেখতে পাওয়া যাবে কি?'

'বেশক্‌, জনাব। আপনার যদি মরজি হয় তাই আমি মোহর সঙ্গে এনেছি।' আতাউল্লা আচ্‌কানের পকেট হইতে একটি কাঠের কৌটা বাহির করিলেন। কৌটার গায়ে নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক অক্ষর ও চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। ভিতরে তুলার মোড়কের মধ্যে মোহর।

পাকা সোনার মোহর; আকারে আয়তনে বর্তমান কালের চাঁদির টাকার মত। ব্যোমকেশ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, 'এতে উর্দুতে কি লেখা রয়েছে পড়তে পারেন?'

আতাউল্লা ঈষৎ আহত-কণ্ঠে বলিলেন, 'উর্দু নয় জনাব, ফারসী। আসরফিতে উর্দু লেখার রেওয়াজ ছিল না। যদি ফরমাস করেন পড়ে দিতে পারি, ফারসী আমার খাস জবান।'

ব্যোমকেশ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'তাই নাকি! তাহলে পড়ে বলুন দেখি কবেকার মোহর।'

আতাউল্লা চশমা আঁটিয়া মোহরের লেখা পড়িলেন, বলিলেন, 'তারিখ নেই। লেখা আছে এই মোহর নবাব আলিবর্দি খাঁ'র আমলে ছাপা হয়েছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে জানকীরামের কালের মোহর, পরের নয়।—আচ্ছা মুন্‌শীজি, আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপনি অফিসে যান, যদি আবার দরকার হয় আপনাকে খবর পাঠাব।'

'মেহেরবানি' বলিয়া আতাউল্লা প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ তখন অধ্যাপক মহাশয়ের তোরঙ্গটি টানিয়া লইয়া বসিল। চটা-ওঠা টিনের তোরঙ্গটির মধ্যে কিন্তু এমন কিছুই পাওয়া গেল না যাহা তাঁহার মৃত্যুর কারণ-নির্দেশে সাহায্য করিতে পারে। বস্ত্রাদি নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলি দেখিলে মনে হয় অধ্যাপক মহাশয় অল্পবিত্ত ছিলেন কিম্বা অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। দুইখানি পুরাতন মলাট-ছেঁড়া বই; একটি শ্যামশাস্ত্রী-সম্পাদিত কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, অন্যটি শয়র্-ই-মুতাক্ষরিনের ইংরেজি অনুবাদ। ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে অধ্যাপক মহাশয়ের জ্ঞানের পরিধি কতখানি বিস্তৃত ছিল, এই বই দু'খানি হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বই দু'খানির সঙ্গে একখানি চামড়া-বাঁধানো প্রাচীন খাতা। খাতাখানি বোধ হয় ত্রিশ বছরের পুরাতন; মলাট ঢলঢলে হইয়া গিয়াছে, বিবর্ণ পাতাগুলিও খসিয়া আসিতেছে। এই খাতায় অত্যন্ত অগোছালভাবে, কোথাও পেন্সিল দিয়া দু'চার পাতা, কোথাও কালি দিয়া দু'চার ছত্র লেখা রহিয়াছে। হস্তাক্ষর সুছাঁদ নয়, কিন্তু একই হাতের লেখা। যাহাদের লেখাপড়া লইয়া কাজ করিতে হয় তাহারা এইরূপ একখানি সর্বংবহা খাতা হাতের কাছে রাখে; যখন যাহা ইচ্ছা ইহাতে টুকিয়া রাখা যায়।

খাতাখানি সযত্নে লইয়া আমরা টেবিলে বসিলাম। ব্যোমকেশ একটি একটি করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল।

প্রথম দুই-তিনটি পাতা খালি। তারপর একটি পাতায় লেখা আছে—

ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

যদি মানুষের ভাষায় কথা বলিতে
পারিতেন তবে তিনি মহরমের
বাজনার ছন্দে বলিতেন—
ধনানর্জয়ধ্বম্ ! ধনানর্জয়ধ্বম্ !

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'মহরমের বাজনার মত শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু মানে কি ?'

বলিলাম, 'মনে হচ্ছে, ধন উপার্জন করহ, ধন উপার্জন করহ। তোমার ঈশানবাবু দেখছি সিনিক্ ছিলেন।'

ব্যোমকেশ লেখাটাকে আরও কিছুক্ষণ দেখিয়া পাতা উল্টাইল। পরপৃষ্ঠায় কেবল কয়েকটি তারিখ নোট করা রহিয়াছে। ঐতিহাসিক তারিখ ; কবে হিজরি অব্দ আরম্ভ হইয়াছিল, শশাঙ্ক দেবের মৃত্যুর তারিখ কি, এইসব। বোধ হয় ছাত্রদের ইতিহাস পড়াইবার জন্য নোট করিয়াছিলেন। এমনি আরও কয়েক পৃষ্ঠায় তারিখ লেখা আছে, সেগুলির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

ইহার পর আরও কয়েক পাতা শূন্য। তারপর সহসা এক দীর্ঘ রচনা শুরু হইয়াছে। তাহার আরম্ভটা এইরূপ—

'রামবিনোদের কাছে তাহার বংশের ইতিহাস শুনিলাম। সিপাহী-যুদ্ধের সময় লুঠেরাগণ বোধ হয় সঞ্চিত ধনরত্ন লইয়া যাইতে পারে নাই ; অন্তত রামবিনোদের তাহাই বিশ্বাস। সে দুর্গ দেখিয়া আসিয়াছে। তাহার উচ্চাশা, যদি কোনও দিন ধনী হয় তখন ঐ দুর্গ কিনিয়া তথায় গিয়া বাস করিবে।'

অতঃপর জানকীরাম হইতে আরম্ভ করিয়া রাজারাম জয়রাম পর্যন্ত রমাপতির মুখে যেমন শুনিয়াছিলাম ঠিক তেমনি লেখা আছে, একচুল এদিক ওদিক নাই। পাঠ শেষ হইলে আমি বলিলাম, 'যাক, একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, রমাপতি মিথ্যে গল্প বলেনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গল্পটা রমাপতি ঠিকই বলেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু গল্পটা ঈশানবাবুর মৃত্যুর রাত্রে শুনেছিল তার প্রমাণ কি ? দু'দিন আগেও শুনে থাকতে পারে।'

'তা—বটে। তাহলে— ?'

'তাহলে কিচ্ছু না। আমি বলতে চাই যে, ও সম্ভাবনাটাকেও বাদ দেওয়া যায় না। অর্থাৎ রমাপতি সে-রাত্রে এই গল্পই শুনেছিল এবং পরদিন ভোরবেলা গল্পের বাকিটা শোনবার জন্যে ঈশানবাবুর কাছে গিয়েছিল তার কোনও প্রমাণ নেই।'

আবার কিছুক্ষণ পাতা উল্টাইবার পর এমন একটি পৃষ্ঠায় আসিয়া পৌঁছিলাম, যেখানে তীব্র কাতরোক্তির মত কয়েকটি শব্দ লেখা রহিয়াছে—

—রামবিনোদ বাঁচিয়া নাই। আমার
একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু চলিয়া গিয়াছে।
সে কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু ! দুঃস্বপ্নের মত
সে-দৃশ্য আমার চোখে লাগিয়া আছে।

ব্যোমকেশ লেখাটার উপর কিছুক্ষণ দৃষ্টি স্থাপিত রাখিয়া বলিল, 'ভয়ঙ্কর মৃত্যু। স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হয় না। খোঁজ করা দরকার।' আমার মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখিয়া মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করিল, 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ ভাই, পাইলে পাইতে পার লুকানো রতন।'

খাতার সামনের দিকের লেখা এইখানেই শেষ। মনে হয় রামবিনোদের মৃত্যুর পর খাতাটি দীর্ঘকাল অব্যবহৃত পড়িয়া ছিল, হয়তো হারাইয়া গিয়াছিল। তারপর আবার যখন লেখা আরম্ভ হইয়াছে, তখন খাতার উল্টা পিঠ হইতে।

প্রথম লেখাটি কালি-কলমের লেখা ; পীতবর্ণ কাগজে কালি চুপ্সিয়া গিয়াছে। পাতার মাথার দিকে লেখা হইয়াছে—

রামকিশোরের বড় ছেলে বংশীধর কলেজে পড়িতে আসিয়াছে।
অনেকদিন পরে উহাদের সঙ্গে আবার সংযোগ ঘটিল। সেই
রামবিনোদের মৃত্যুর পর আর খোঁজ লই নাই।
পাতার নীচের দিকে লেখা আছে—বংশীধর এক মারাত্মক
কেলেঙ্কারি করিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি।
হাজার হোক রামবিনোদের ভ্রাতুষ্পুত্র।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বংশীধরের কেলেঙ্কারির হদিস বোধ হয় দু'চার দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এ কি!'

দেখা গেল বাকি পাতাগুলিতে যে লেখা আছে তাহার সবগুলিই লাল-নীল পেন্সিলে লেখা। ব্যোমকেশ পাতাগুলি কয়েকবার ওলট-পালট করিয়া বলিল, 'অজিত, তোরঙ্গের তলায় দেখ তো লাল-নীল পেন্সিল আছে কি না।'

বেশি খুঁজিতে হইল না, একটি দু'মুখো লাল-নীল পেন্সিল পাওয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, বোঝা গেল। এর পর যা কিছু লেখা আছে ঈশানবাবু দুর্গে আসার পর লিখেছেন। এগুলি তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়।'

প্রথম লেখাটি এইরূপ—

দুর্গে গুপ্তকক্ষ দেখিতে পাইলাম না।
ভারি আশ্চর্য! দুর্গের সোনাদানা কোথায় রক্ষিত হইত?
প্রকাশ্য কক্ষে রক্ষিত হইত বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়
কোথাও গুপ্তকক্ষ আছে। কিন্তু কোথায়? সিপাহীরা
গুপ্তকক্ষের সন্ধান পাইয়া থাকিলে গুপ্তকক্ষ আর গুপ্ত
থাকিত না, তাহার দ্বার ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইত, তখন
উহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইত। তবেই গুপ্তকক্ষের
সন্ধান সিপাহীরা পায় নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অধ্যাপক মহাশয়ের যুক্তিটা খুব বিচারসহ নয়। সিপাহীরা চলে যাবার পর রাজারামের পরিবারবর্গ ফিরে এসেছিল। তারা হয়তো ভাঙা তোষাখানা মেরামত করিয়েছিল, তাই এখন ধরা যাচ্ছে না।'

পাতা উল্টাইয়া ব্যোমকেশ পড়িল—

কেহ আমাকে ভয় দেখাইয়া দুর্গ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা
করিতেছে। বংশীধর? আমি কিন্তু সহজে দুর্গ ছাড়িব
না! ধনানর্জয়ধ্বম্! ধনানর্জয়ধ্বম্!

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবার মহরমের বাজনা কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহরের গন্ধ পেয়ে বোধ হয় তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়েছিল।'

অতঃপর কয়েক পৃষ্ঠা পরে খাতার শেষ লেখা। আমরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। বাংলা ভাষায় লেখা নয়, উর্দু কিংবা ফারসীতে লেখা তিনটি পংক্তি। তাহার নীচে বাংলা অক্ষরে কেবল দুইটি শব্দ—মোহনলাল কে?

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'সত্যিই তো, মোহনলাল কে? এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমাদের কর্ম নয়। ডাকো মুন্‌শী আতাউল্লাকে।'

আতাউল্লা আসিয়া লিপির পাঠোদ্ধার করিলেন। বলিলেন, 'জনাব, মৃত ব্যক্তি ভাল ফারসী জানতেন মনে হচ্ছে। তবে একটু সেকেলে ধরনের। তিনি লিখেছেন, যদি আমি বা জয়রাম বাঁচিয়া না থাকি আমাদের তামাম ধনসম্পত্তি সোনাদানা মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রহিল।'

'মোহনলালের জিম্মায়— !'

'জী জনাব, তাই লেখা আছে।'

'হুঁ। আচ্ছা, মুন্‌শীজি, আপনি এবার জিনিসপত্র সব নিয়ে যান। কেবল এই খাতাটা আমার কাছে রইল।'

দু'জনে সিগারেট ধরাইয়া আরাম-কেদারার কোলে অঙ্গ ছড়াইয়া দিলাম। নীরবে একটা সিগারেট শেষ করিয়া তাহারই চিতাগ্নি হইতে দ্বিতীয় সিগারেট ধরাইয়া বলিলাম, 'খাতা পড়ে কি মনে হচ্ছে ?'

ব্যোমকেশ কেদারার দুই হাতলে তবলা বাজাইতে বাজাইতে বলিল, 'মনে হচ্ছে, ধনানর্জয়ধ্বম্। ধনানর্জয়ধ্বম্।'

'ঠাট্টা নয়, কি বুঝলে বল না।'

'পরিষ্কারভাবে কিছুই বুঝিনি এখনও। তবে ঈশানবাবুকে যদি সত্যিই কেউ হত্যা করে থাকে তাহলে হত্যার মোটিভ দেখতে পাচ্ছি।'

'কি মোটিভ ?'

'সেই চিরন্তন মোটিভ—টাকা।'

'আচ্ছা, ফারসী ভাষায় ঐ কথাগুলো লিখে রাখার তাৎপর্য কি ?'

'ওটা উনি নিজে লেখেননি। অর্থাৎ হস্তাক্ষর ওঁর, কিন্তু রচনা ওঁর নয়, রাজারামের। উনি লেখাটি দুর্গে কোথাও পেয়েছিলেন, তারপর খাতায় টুকে রেখেছিলেন।'

'তারপর ?'

'তারপর মারা গেলেন।'

৫

পাণ্ডেজি ফিরিলেন বেলা বারোটার পর। হেল্‌মেট খুলিয়া ফেলিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন, 'কাজ হল বটে কিন্তু বুড়ো গোড়ায় গোলমাল করেছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গোলমাল কিসের ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বেলা হয়ে গেছে, খেতে বসে সব বলব। আপনি কিছু পেলেন ?'

'খেতে বসে বলব।'

আহারে বসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি আগে বলুন। কাল তো রামকিশোরবাবু নিমরাজী ছিলেন, আজ হঠাৎ বেঁকে বসলেন কেন ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'কাল আমরা চলে আসবার পর কেউ ওঁকে বলেছে যে আপনি একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ। তাতেই উনি ঘাবড়ে গেছেন।'

'এতে ঘাবড়াবার কি আছে ? ওঁর মনে যদি পাপ না থাকে—'

'সেই কথাই শেষ পর্যন্ত আমাকে বলতে হল। বললাম, 'হলই বা ব্যোমকেশবাবু ডিটেক্‌টিভ, আপনার ভয়টা কিসের ? আপনি কি কিছু লুকোবার চেষ্টা করেছেন ?' তখন বুড়ো তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে গেল।'

আমি বললাম, 'রামকিশোরবাবু তাহলে সত্যিই কিছু লুকোবার চেষ্টা করেছেন।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আমার তাই সন্দেহ হল। কিন্তু ঈশানবাবুর মৃত্যুঘটিত কোনো কথা নয়। অন্য কিছু। যা হোক, আমি ঠিক করে এসেছি, আজই ওরা দুর্গটাকে আপনাদের বাসের উপযোগী করে রাখবে। আপনারা ইচ্ছে করলে আজ বিকেলে যেতে পারেন কিম্বা কাল সকালে যেতে পারেন।'

'আজ বিকেলেই যাব।'

'তাই হবে। কিন্তু আমি আর একটা ব্যবস্থা করেছি। আমার খাস আরদালি সীতারাম আপনাদের সঙ্গে থাকবে।'

'না না, কি দরকার ?'

'দরকার আছে। সীতারাম লাল পাগড়ি পরে যাবে না, সাধারণ চাকর সেজে যাবে। লোকটা খুব হুঁশিয়ার ; তাছাড়া, ওর একটা মস্ত বিদ্যে আছে, ও সাপের রোজা। ও সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে হবে। ভেবে দেখুন, আপনাদের জল তোলা কাপড় কাচা বাসন মাজার জন্যেও একজন লোক দরকার। ওদের লোক না নেওয়াই ভাল।'

ব্যোমকেশ সম্মত হইল। পাণ্ডে তখন বলিলেন, 'এবার আপনার হাল বয়ান করুন।'

ব্যোমকেশ সবিস্তারে ঈশানবাবুর খাতার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিল। শুনিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'হুঁ, মোহনলাল লোকটা কে ছিল আমারও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু একশো বছর পরে আর তার ঠিকানা বার করা সম্ভব হবে না। এদিকে হালের খবর ঈশানবাবু লিখছেন, তাঁকে কেউ ভয় দেখিয়ে দুর্গ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে। তাঁর সন্দেহ বংশীধরের ওপর। কিন্তু সত্যি কথাটা কি ? ভয়ই বা দেখালো কী ভাবে ?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ সব প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া যাবে না। দেখা যাক, দুর্গে গিয়ে যদি দুর্গের রহস্য ভেদ করা যায়।'

অপরাহ্ণে পুলিস ভ্যানে চড়িয়া শৈল-দুর্গে উপস্থিত হইলাম। আমরা তিনজন এবং সীতারাম। পাণ্ডেজি আমাদের ঘর-বসত করিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইবেন, সীতারাম থাকিবে। সীতারামের বয়স পঁয়ত্রিশ, লিকলিকে লম্বা গড়ন, তামাটে ফর্সা রঙ, শিকারী বিড়ালের মত গোঁফ। তাহার চেহারার মাহাত্ম্য এই যে, সে ভাল কাপড়চোপড় পরিলে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়, আবার নেংটি পরিয়া থাকিলে বাসন-মাজা ভৃত্য মনে করিতে তিলমাত্র দ্বিধা হয় না। উপস্থিত তাহার পরিধানে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় কাঁধে গামছা। অর্থাৎ, মোটা কাজের চাকর।

আমাদের সঙ্গে লটবহর কম ছিল না, বিছানা বাক্স, চাল ডাল আনাজ প্রভৃতি রসদ, ইক্‌মিক্ কুকার এবং আরও কত কি। সীতারাম এবং বুলাকিলাল মালপত্র দুর্গে ঢোলাই করিতে আরম্ভ করিল। পাণ্ডে বলিলেন, 'চলুন, গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা করে আসবেন।'

গৃহস্বামী বাড়ির সদর বারান্দায় উপবিষ্ট ছিলেন, সঙ্গে জামাই মণিলাল, আমাদের সম্ভাষণ জানাইলেন ; আমরা খাবার ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়াছি বলিয়া অনুযোগ করিলেন ; শহুরে মানুষ পাহাড়ে জঙ্গলে মন বসাইতে পারিব না বলিয়া রসিকতা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু সতর্ক ও সাবধান হইয়া রহিল।

মিষ্টালাপের সময় লক্ষ্য করিলাম, বাড়ির অন্যান্য অধিবাসীরা আমাদের শুভাগমনে বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বংশীধর এবং মুরলীধর চিলের মত চক্রাকারে আমাদের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু কাছে আসিতেছে না। রমাপতি একবার বাড়ির ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া আমাদের দেখিয়া নিঃশব্দে সরিয়া গেল। নায়েব চাঁদমোহন বারান্দার অন্য প্রান্তে থেলো হুঁকোয় তামাক টানিতে টানিতে বক্র দৃষ্টিশলাকায় আমাদের বিদ্ধ করিতেছেন। তুলসী একটা জুঁই ঝাড়ের আড়াল হইতে কৌতূহলী কাঠবিড়ালীর মত আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল ; কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম একটা থামের আড়াল হইতে সে উঁকি মারিতেছে।

ব্যোমকেশ যে একজন খ্যাতনামা গোয়েন্দা এবং কোনও গভীর অভিসন্ধি লইয়া দুর্গে বাস করিতে আসিয়াছে তাহা ইহারা জানিতে পারিয়াছে এবং তদনুযায়ী উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল গদাধরের জড়বুদ্ধি বোধ হয় এতবড় ধাক্কাতেও সক্রিয় হইয়া ওঠে নাই ; তাহাকে দেখিলাম না।

আমরা গাত্রোত্থান করিলে রামকিশোরবাবু বলিলেন, 'শুধু থাকার জন্যেই এসেছেন মনে করবেন

না যেন। আপনারা আমার অতিথি, যখন যা দরকার হবে খবর পাঠাবেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' আমরা গমনোদ্যত হইলাম। গৃহস্বামী ইশারা করিলেন, মণিলাল আমাদের সঙ্গে চলিল ; উদ্দেশ্য দুর্গ পর্যন্ত আমাদের আগাইয়া দিয়া আসিবে।

সিঁড়ি দিয়া নামা ওঠার সময় মণিলালের সঙ্গে দুই-চারিটা কথা হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি যে ডিটেক্‌টিভ একথা রামকিশোরবাবু জানলেন কি করে ?'

মণিলাল বলিল, 'আমি বলেছিলাম। আপনার নাম আমার জানা ছিল ; এঁর লেখা বই পড়েছি। শুনে কর্তা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তারপর আপনারা দুর্গে এসে থাকতে চান শুনে ঘাবড়ে গেলেন।'

'কেন ?'

'এই সেদিন একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল—'

'তাই আপনাদের ভয় আমাদেরও সাপে খাবে। ভালো কথা, আপনার স্ত্রীও না সর্পাঘাতে মারা গিয়েছিলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এ অঞ্চলে দেখছি খুব সাপ আছে।'

'আছে নিশ্চয়। কিন্তু আমি কখনও চোখে দেখিনি।'

দেউড়ি পর্যন্ত নামিয়া আমরা দুর্গের সিঁড়ি ধরিলাম। হঠাৎ মণিলাল জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনারা পুলিসের লোক, তাই জানতে কৌতূহল হচ্ছে—ঈশানবাবু ঠিক সাপের কামড়েই মারা গিয়েছিলেন তো ?'

ব্যোমকেশ ও পাণ্ডের মধ্যে একটা চকিত দৃষ্টি বিনিময় হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'কেন বলুন দেখি ? এ বিষয়ে সন্দেহ আছে নাকি ?'

মণিলাল ইতস্তত করিয়া বলিল, 'না—তবে—কিছুই তো বলা যায় না—'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সাপ ছাড়া আর কি হতে পারে ?'

মণিলাল বলিল, 'সেটা আমিও বুঝতে পারছি না। ঈশানবাবুর পায়ে সাপের দাঁতের দাগ আমি নিজের চোখে দেখেছি। ঠিক যেমন আমার স্ত্রীর পায়ে ছিল।' মণিলাল একটা নিশ্বাস ফেলিল।

দুর্গের তোরণে আসিয়া পৌঁছিলাম। মণিলাল বলিল, 'এবার আমি ফিরে যাব। কর্তার শরীর ভাল নয়, তাঁকে বেশিক্ষণ একলা রাখতে সাহস হয় না। কাল সকালেই আবার আসব।'

মণিলাল নমস্কার করিয়া নামিয়া গেল। সূর্য অস্ত গিয়াছিল। রামকিশোরবাবুর বাড়ির মাথার উপর শুক্লা দ্বিতীয়ার কৃশাঙ্গী চন্দ্রকলা মুচকি হাসিয়া বাড়ির আড়ালে লুকাইয়া পড়িল। আমরাও তোরণ দিয়া দুর্গের অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ সকালে ডাক্তার ঘটককে তার রুগী সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলাম ; এখন দেখছি তার কোনও দরকার ছিল না। সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল রেজিস্ট্রি না হওয়া পর্যন্ত জামাই মণিলাল যক্ষের মত শ্বশুরকে আগলে থাকবে।'

পাণ্ডে একটু হাসিলেন, 'হ্যাঁ—ঈশানবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে এদের খটকা লেগেছে দেখছি। কিন্তু এখন কিছু বলা হবে না।'

'না।'

আমরা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। পাণ্ডেজির হাতে একটি মুষলাকৃতি লম্বা টর্চ ছিল ; সেটির বৈদ্যুতিক আলো যেমন দূরপ্রসারী, প্রয়োজন হইলে সেটিকে মারাত্মক প্রহরণরূপেও ব্যবহার করা চলে। পাণ্ডে টর্চ জ্বালিয়া তাহার আলো সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন, 'এটা আপনাদের কাছে রেখে যাব, দরকার হতে পারে। চলুন, দেখি আপনাদের থাকার কি ব্যবস্থা হয়েছে।'

দেখা গেল সেই গজাল-কণ্টকিত ঘরটিতেই থাকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। দুইটি লোহার খাট,

টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আসবাব দেওয়ালের নিরাভরণ দৈন্য অনেকটা চাপা দিয়াছে। সীতারাম ইতিমধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়াছে, বিছানা পাতিয়াছে, ইক্‌মিক্‌ কুকারে রান্না চড়াইয়াছে এবং স্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল গরম করিতেছে। তাহার কর্মতৎপরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম।

অচিরাৎ ধূমায়মান চা আসিয়া উপস্থিত হইল। চায়ে চুমুক দিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'সীতারাম, কেমন দেখলে?'

সীতারাম বলিল, 'কিল্লা ঘুরে ফিরে দেখে নিয়েছি হুজুর। এখানে সাপ নেই।'

নিঃসংশয় উক্তি। পাণ্ডে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

'আর কিছু?'

'আর, সিঁড়ি ছাড়া কিল্লায় ঢোকবার অন্য রাস্তা নেই। দেয়ালের বাইরে খাড়া পাহাড়।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'এর মানে বুঝতে পারছেন?'

'কি?'

'যদি কোনও আততায়ী দুর্গে ঢুকতে চায় তাকে সিঁড়ি দিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ, দেউড়ির পাশ দিয়ে আসতে হবে। বুলাকিলাল তাকে দেখে ফেলতে পারে।'

'হুঁ, ঠিক বলেছেন। বুলাকিলালকে জেরা করতে হবে। কিন্তু আজ দেরি হয়ে গেছে, আজ আর নয়।—সীতারাম, তোমাকে বেশি বলবার দরকার নেই। এঁদের দেখাশুনা করবে, আর চোখ কান খুলে রাখবে।'

'জী হুজুর।'

পাণ্ডেজি উঠিলেন।

'কাল কোনও সময়ে আসব। আপনারা সাবধানে থাকবেন।'

পাণ্ডেজিকে দুর্গতোরণ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলাম। ব্যোমকেশ টর্চ জ্বালিয়া সিঁড়ির উপর আলো ফেলিল, পাণ্ডেজি নামিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে নীচে হইতে শব্দ পাইলাম পুলিস ভ্যান চলিয়া গেল। ওদিকে রামকিশোরবাবুর বাড়িতে তখন মিটিমিটি আলো জ্বলিয়াছে।

আমরা আবার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আকাশে তারা ফুটিয়াছে, জঙ্গলের দিক হইতে মিষ্ট বাতাস দিতেছে। সীতারাম যেন আমাদের মনের অকথিত অভিলাষ জানিতে পারিয়া দু'টি চেয়ার আনিয়া অঙ্গনে রাখিয়াছে। আমরা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উপবেশন করিলাম।

এই নক্ষত্রবিদ্ধ অন্ধকারে বসিয়া আমার মন নানা বিচিত্র কল্পনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা যেন রূপকথার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। সেই যে রাজপুত্র কোটালপুত্র কি জানি কিসের সন্ধানে বাহির হইয়া ঘুমন্ত রাজকুমারীর মায়াপুরীতে উপনীত হইয়াছিল, আমাদের অবস্থা যেন সেইরূপ। অবশ্য ঘুমন্ত রাজকুমারী নাই, কিন্তু সাপের মাথায় মণি আছে কিনা কে বলিতে পারে? কোন্‌ অদৃশ্য রাক্ষস-রাক্ষসীরা তাহাকে পাহারা দিতেছে তাহাই বা কে জানে? শুক্তির অভ্যন্তরে মুক্তার ন্যায় কোন অপরূপ রহস্য এই প্রাচীন দুর্গের অস্থিপঞ্জরতলে লুক্কায়িত আছে?

ব্যোমকেশ ফস্‌ করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া আমার রোমান্টিক স্বপ্নজাল ভাঙিয়া দিল। সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'ঈশানবাবু ঠিক ধরেছিলেন, দুর্গে নিশ্চয় কোথাও গুপ্ত তোষাখানা আছে।'

বলিলাম, 'কিন্তু কোথায়? এতবড় দুর্গের মাটি খুঁড়ে তার সন্ধান বার করা কি সহজ?'

'সহজ নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস ঈশানবাবু সন্ধান পেয়েছিলেন; তাঁর মুঠির মধ্যে মোহরের আর কোনও মানে হয় না।'

কথাটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিয়া শেষে বলিলাম, 'তা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে আরও অনেক মোহর আছে।'

'সম্ভব। এবং তার চেয়েও বড় কথা, ঈশানবাবু যখন খুঁজে বার করতে পেরেছেন তখন আমরাও পারব।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া অন্ধকারে পায়চারি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পায়চারি করিবার পর সে হঠাৎ 'উ' বলিয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে কোনক্রমে সামলাইয়া লইল। আমি লাফাইয়া

উঠিলাম—'কি হল !'

'কিছু নয়, সামান্য হোঁচট খেয়েছি।' টর্চটা তাহার হাতেই ছিল, সে তাহা জ্বালিয়া মাটিতে আলো ফেলিল।

দিনের আলোতে যাহা চোখে পড়ে নাই, এখন তাহা সহজে চোখে পড়িল। একটা চৌকশ পাথর সম্প্রতি কেহ খুঁড়িয়া তুলিয়াছিল, আবার অপটু হস্তে যথাস্থানে বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। পাথরটা সমানভাবে বসে নাই, একদিকের কানা একটু উঁচু হইয়া আছে। ব্যোমকেশ অন্ধকারে ওই উঁচু কানায় পা লাগিয়া হোঁচট খাইয়াছিল।

আল্‌গা পাথরটা দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম,—'ব্যোমকেশ! পাথরের তলায় তোষাখানার গর্ত নেই তো ?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'উঁহু, পাথরটা বড় জোর চৌদ্দ ইঞ্চি চৌকশ। ওর তলায় যদি গর্ত থাকেও, তা দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারবে না।'

'তবু—'

'না হে, যা ভাবছ তা নয়। খোলা উঠোনে তোষাখানার গুপ্তদ্বার হতে পারে না। যা হোক, কাল সকালে পাথর তুলিয়ে দেখতে হবে।'

ব্যোমকেশ টর্চ ঘুরাইয়া চারিদিকে আলো ফেলিল, কিন্তু অন্য কোথাও পাথরের পাটি নাড়াচাড়া হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। অদূরে কামানটা পড়িয়া আছে, তাহার নীচে অনেক ধূলামাটি জমিয়া কামানকে মেঝের সঙ্গে জাম করিয়া দিয়াছে; সেখানেও আল্‌গা মাটি বা পাথর চোখে পড়িল না।

এই সময় সীতারাম আসিয়া জানাইল, আহার প্রস্তুত। হাতের ঘড়িতে দেখিলাম পৌনে দশটা। কখন যে নিঃসাড়ে সময় কাটিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই।

ঘরে গিয়া আহারে বসিলাম। ইক্‌মিক্ কুকারে রাঁধা খিচুড়ি এবং মাংস যে এমন অমৃততুল্য হইতে পারে তাহা জানা ছিল না। তার উপর সীতারাম অমলেট ভাজিয়াছে। গুরুভোজন হইয়া গেল।

আমাদের ভোজন শেষ হইলে সীতারাম বারান্দায় নিজের আহার সারিয়া লইল। দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'হুজুর, যদি হুকুম হয়, একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ তো। তুমি শোবে কোথায় ?'

সীতারাম বলিল, 'সেজন্যে ভাববেন না হুজুর। আমি দোরের বাইরে বিছানা পেতে শুয়ে থাকব।'

সীতারাম চলিয়া গেল। আমরা আলো কমাইয়া দিয়া বিছানায় লম্বা হইলাম। দ্বার খোলাই রহিল; কারণ ঘরে জানালা নাই, দ্বার বন্ধ করিলে দম বন্ধ হইবার সম্ভাবনা।

শুইয়া শুইয়া বোধহয় তন্দ্রা আসিয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশের গলার আওয়াজে সচেতন হইয়া উঠিলাম, 'দ্যাখো, ঐ গজালগুলো আমার ভাল ঠেকছে না।'

'গজাল! কোন্ গজাল ?'

'দেয়ালে এত গজাল কেন ? পাণ্ডেজি একটা কৈফিয়ত দিলেন বটে, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।'

এত রাত্রে গজালকে সন্দেহ করার কোনও মানে হয় না। ঘড়িতে দেখিলাম এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সীতারাম এখনও এদিক ওদিক দেখিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

'আজ ঘুমোও, কাল গজালের কথা ভেব।' বলিয়া আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

৬

গভীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ মাথার শিয়রে বোমা ফাটার মত শব্দে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মুহূর্তের জন্য কোথায় আছি ঠাহর করিতে পারিলাম না।

স্থানকালের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম ব্যোমকেশ দ্বারের বাহিরে টর্চের আলো ফেলিয়াছে, সেখানে কতকগুলো ভাঙা হাঁড়ি কলসীর মত খোলামকুচি পড়িয়া আছে। তারপর ব্যোমকেশ জ্বলন্ত টর্চ হাতে লইয়া তীরবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 'অজিত, এসো—'

আমিও আলুথালুভাবে উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম; সে কাহারও পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে কিম্বা বিপদের ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার হাতের আলোটা যেদিকে যাইতেছে, আমিও সেইদিকে ছুটিলাম।

তোরণের মুখে পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ সিঁড়ির উপর আলো ফেলিল। আমি তাহার কাছে পৌঁছিয়া দেখিলাম, সিঁড়ি দিয়া একটা লোক ছুটিতে ছুটিতে উপরে আসিতেছে। কাছে আসিলে চিনিলাম—সীতারাম।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'সীতারাম, সিঁড়ি দিয়ে কাউকে নামতে দেখেছ?'

সীতারাম বলিল, 'জী হুজুর, আমি ওপরে আসছিলাম, হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে টক্কর লেগে গেল। আমি তাকে ধরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু লোকটা হাত ছাড়িয়ে পালাল।'

'তাকে চিনতে পারলে?'

'জী না, অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাইনি। কিন্তু টক্কর লাগবার সময় তার মুখ দিয়ে একটা বুরা জবান বেরিয়ে গিয়েছিল, তা শুনে মনে হল লোকটা ছোট জাতের হিন্দুস্থানী।—কিন্তু কী হয়েছে হুজুর?'

'তা এখনও ঠিক জানি না। দেখবে এস।'

ফিরিয়া গেলাম। ঘরের সম্মুখে ভাঙা হাঁড়ির টুকরোগুলা পড়িয়া ছিল, ব্যোমকেশ বলিল, 'ঐ দ্যাখো। আমি জেগেছিলাম, বাইরে খুব হাল্‌কা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভাবলাম, তুমি বুঝি ফিরে এলে। তারপরই দুম্‌ করে শব্দ—'

সীতারাম ভাঙা সরার মত একটা টুকরো তুলিয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিল। বলিল, 'হুজুর, চট্‌ করে খাটের উপর উঠে বসুন।'

'কেন? কি ব্যাপার?'

'সাপ। কেউ সরা-ঢাকা হাঁড়িতে সাপ এনে এইখানে হাঁড়ি আছড়ে ভেঙ্গেছে। আমাকে টর্চ দিন, আমি খুঁজে দেখছি। সাপ কাছেই কোথাও আছে।'

আমরা বিলম্ব না করিয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিলাম, কারণ অন্ধকার রাত্রে সাপের সঙ্গে বীরত্ব চলে না। সীতারাম টর্চ লইয়া বাহিরে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল।

লণ্ঠনটা উস্কাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবুকে কিসের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা হয়েছিল এখন বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু লোকটা কে?'

'তা এখন বলা শক্ত। বুলাকিলাল হতে পারে, গণপৎ হতে পারে, এমন কি সন্নিসি ঠাকুরও হতে পারেন।'

এই সময় সীতারামের আকস্মিক অট্টহাস্য শুনিতে পাইলাম। সীতারাম গলা চড়াইয়া ডাকিল, 'হুজুর, এদিকে দেখবেন আসুন। কোনও ভয় নেই।'

সন্তর্পণে নামিয়া সীতারামের কাছে গেলাম। বাড়ির একটা কোণ আশ্রয় করিয়া বাদামী রঙের সাপ কুণ্ডলী পাকিয়া কিল্‌বিল করিতেছে। সাপটা আহত, তাই পলাইতে পারিতেছে না, তীব্র আলোর তলায় তাল পাকাইতেছে।

সীতারাম হাসিয়া বলিল, 'ঢাম্‌না সাপ, হুজুর, বিষ নেই। মনে হচ্ছে কেউ আমাদের সঙ্গে

দিল্লাগি করছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দিল্লাগিই বটে। কিন্তু এখন সাপটাকে নিয়ে কি করা যাবে ?'

'আমি ব্যবস্থা করছি।' সীতারাম খাবার ঢাকা দিবার ছিদ্রযুক্ত পিতলের ঢাক্‌নি আনিয়া সাপটাকে চাপা দিল, বলিল, 'আজ এমনি থাক, কাল দেখা যাবে।'

আমরা ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। সীতারাম দ্বারের সম্মুখে নিজের বিছানা পাতিতে প্রবৃত্ত হইল। রাত্রি ঠিক দ্বিপ্রহর।

ব্যোমকেশ বলিল, 'সীতারাম, তুমি এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলে, কি করছিলে, এবার বল দেখি।'

সীতারাম বলিল, 'হুজুর, এখান থেকে নেমে দেউড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি, বুলাকিলাল ভাঙ খেয়ে নিজের কুঠুরির মধ্যে ঘুমুচ্ছে। তার কাছ থেকে কিছু খবর বার করবার ইচ্ছে ছিল, সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে দোস্তি করে রেখেছিলাম। ঠেলাঠুলি দিলাম কিন্তু বুলাকিলাল জাগল না। কি করি, ভাবলাম, যাই সাধুবাবার দর্শন করে আসি।

'সাধুবাবা জেগে ছিলেন, আমাকে দেখে খুশি হলেন। আমাকে অনেক সওয়াল করলেন ; আপনারা কে, কি জন্যে এসেছেন, এইসব জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আপনারা হাওয়া বদল করতে এসেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ। আর কি কথা হল ?'

সীতারাম বলিল, 'অনেক আজে-বাজে কথা হল হুজুর। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একেবারে প্রোফেসার সাহেবের মৃত্যুর কথা তুললাম, তাতে সাধুবাবা ভীষণ চটে উঠলেন। দেখলাম বাড়ির মালিক আর নায়েববাবুর ওপর ভারি রাগ। বার বার বলতে লাগলেন, ওদের সর্বনাশ হবে, ওদের সর্বনাশ হবে।'

'তাই নাকি ! ভারি অকৃতজ্ঞ সাধু দেখছি। তারপর ?'

'তারপর সাধুবাবা এক ছিলিম গাঁজা চড়ালেন। আমাকে প্রসাদ দিলেন।'

'তুমি গাঁজা খেলে ?'

'জী হুজুর। সাধুবাবার প্রসাদ তো ফেলে দেওয়া যায় না।'

'তা বটে। তারপর ?'

'তারপর সাধুবাবা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমিও চলে এলাম। ফেরবার সময় সিঁড়িতে ঐ লোকটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, একটা কথা বল তো সীতারাম। তুমি যখন ফিরে আসছিলে তখন বুলাকিলালকে দেখেছিলে ?'

সীতারাম বলিল, 'না হুজুর, চোখে দেখিনি। কিন্তু দেউড়ির পাশ দিয়ে আসবার সময় কুঠুরি থেকে তার নাকডাকার ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনেছিলাম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাপের হাঁড়ি নিয়ে যিনি এসেছিলেন তিনি আর যেই হোন, বুলাকিলাল কিম্বা সাধুবাবা নন। আশা করি, তিনি আজ আর দ্বিতীয়বার এদিকে আসবেন না—এবার ঘুমিয়ে পড়।'

সকালে উঠিয়া দেখা গেল ঢাক্‌নি-চাপা সাপটা রাত্রে মরিয়া গিয়াছে ; বোধহয় হাঁড়ি ভাঙার সময় গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল। সীতারাম সেটাকে লাঠির ডগায় তুলিয়া দুর্গপ্রাকারের বাহিরে ফেলিয়া দিল। আমরাও প্রাকারে উঠিয়া একটা চক্র দিলাম। দেখা গেল, প্রাকার একেবারে অটুট নয় বটে কিন্তু তোরণদ্বার ছাড়া দুর্গে প্রবেশ করিবার অন্য কোনও চোরাপথ নাই। প্রাকারের নীচেই অগাধ গভীরতা।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় সীতারামকে দুর্গে রাখিয়া ব্যোমকেশ ও আমি রামকিশোরবাবুর বাড়িতে গেলাম। রমাপতি সদর বারান্দায় আমাদের অভ্যর্থনা করিল।—'আসুন। কর্তা এখনি

বেরুচ্ছেন, শহরে যাবেন।'

'তাই নাকি!' আমরা ইতস্তত করিতেছি এমন সময় রামকিশোরবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। পরনে গরদের পাঞ্জাবি, গলায় কোঁচানো চাদর ; আমাদের দেখিয়া বলিলেন 'এই যে!—নতুন জায়গা কেমন লাগছে? রাত্রে বেশ আরামে ছিলেন? কোনও রকম অসুবিধে হয়নি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কোন অসুবিধে হয়নি, ভারি আরামে রাত কেটেছে। আপনি বেরুচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, একবার উকিলের বাড়ি যাব, কিছু দলিলপত্তর রেজিস্ট্রি করাতে হবে। তা—আপনারা এসেছেন, আমি না হয় একটু দেরি করেই যাব—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, আপনি কাজে বেরুচ্ছেন বেরিয়ে পড়ুন। আমরা এমনি বেড়াতে এসেছি, কোনও দরকার নেই।'

'তা—আচ্ছা। রমাপতি, এঁদের চা-টা দাও। আমাদের ফিরতে বিকেল হবে।'

রামকিশোর বাহির হইয়া পড়িলেন ; জামাই মণিলাল এক বস্তা কাগজপত্র লইয়া সঙ্গে গেল। আমাদের পাশ দিয়া যাইবার সময় মণিলাল সহাস্যমুখে নমস্কার করিল।

ব্যোমকেশ রমাপতিকে বলিল, 'চায়ের দরকার নেই, আমরা চা খেয়ে বেরিয়েছি। আজই বুঝি সম্পত্তি বাঁটোয়ারার দলিল রেজিস্ট্রি হবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'যাক, একটা দুর্ভাবনা মিট্‌ল। —আচ্ছা, বলুন দেখি—'

রমাপতি হাতজোড় করিয়া বলিল, 'আমাকে 'আপনি' বলবেন না, 'তুমি' বলুন।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বেশ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, কিন্তু সে পরে হবে। এখন বল দেখি গণপৎ কোথায়?'

রমাপতি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'গণপৎ—মুরলীদার চাকর? বাড়িতেই আছে নিশ্চয়। আজ সকালে তাকে দেখিনি। ডেকে আনব?'

এই সময় মুরলীধর বারান্দায় আসিয়া আমাদের দেখিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। তাহার ট্যারা চোখ আরও ট্যারা হইয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিই মুরলীধরবাবু? নমস্কার। আপনার চাকর গণপৎকে একবার ডেকে দেবেন? তার সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

মুরলীধরের মুখ ভয় ও বিদ্রোহের মিশ্রণে অপরূপ ভাব ধারণ করিল। সে চেরা গলায় বলিল, 'গণপতের সঙ্গে কি দরকার?'

'তাকে দু' একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'সে—তাকে ছুটি দিয়েছি। সে বাড়ি গেছে।'

'তাই নাকি! কবে ছুটি দিয়েছেন?'

'কাল—কাল দুপুরে।' মুরলীধর আর প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আমরা পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। রমাপতির মুখে একটা ত্রস্ত উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। সে ব্যোমকেশের কাছে সরিয়া আসিয়া খাটো গলায় বলিল, 'কাল দুপুরে—! কিন্তু কাল সন্ধ্যের পরও আমি গণপৎকে বাড়িতে দেখেছি—'

ঘাড় নাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'খুব সম্ভব। কারণ, রাত বারোটা পর্যন্ত গণপৎ বাড়ি যায়নি। কিন্তু সে যাক। নায়েব চাঁদমোহনবাবু বাড়িতে আছেন নিশ্চয়। আমরা তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

রমাপতি বলিল, 'তিনি নিজের ঘরে আছেন—'

'বেশ, সেখানেই আমাদের নিয়ে চল।'

বাড়ির এক কোণে চাঁদমোহনের ঘর। আমরা দ্বারের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি

দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া সারি সারি কলিকায় তামাক সাজিয়া রাখিতেছেন। বোধ করি সারাদিনের কাজ সকালেই সারিয়া লইতেছেন। ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া রমাপতিকে বিদায় করিল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম, ব্যোমকেশ দরজা ভেজাইয়া দিল।

আমাদের অতর্কিত আবির্ভাবে চাঁদমোহন ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার চতুর চোখে চকিত ভয়ের ছায়া পড়িল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'কে ? অ্যাঁ—ও—আপনারা—!'

ব্যোমকেশ তক্তপোশের কোণে বসিয়া বলিল, 'চাঁদমোহনবাবু, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।' তাহার কণ্ঠস্বর খুব মোলায়েম শুনাইল না।

ত্রাসের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া চাঁদমোহন গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'কি কথা ?'

'অনেক দিনের পুরোনো কথা। রামবিনোদের মৃত্যু হয় কি করে ?'

চাঁদমোহনের মুখ শীর্ণ হইয়া গেল, তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'আমি কিছু বলতে পারি না—আমি এ বাড়ির নায়েব—'

ব্যোমকেশ গম্ভীর স্বরে বলিল, 'চাঁদমোহনবাবু, আপনি আমার নাম জানেন ; আমার কাছে কোনও কথা লুকোবার চেষ্টা করলে তার ফল ভাল হয় না। রামবিনোদের মৃত্যুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। কি করে তাঁর মৃত্যু হল সব কথা খুলে বলুন।'

চাঁদমোহন ব্যোমকেশের দিকে একটা তীক্ষ্ণ চোরা চাহনি হানিয়া ধীরে ধীরে তক্তপোশের একপাশে আসিয়া বসিলেন, শুষ্কস্বরে বলিলেন, 'আপনি যখন জোর করছেন তখন না বলে আমার উপায় নেই। আমি যতটুকু জানি বলছি।'

ভিজা গামছায় মুখ মুছিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'১৯১১ সালের শীতকালে আমরা মুঙ্গেরে ছিলাম। রামবিনোদ আর রামকিশোরের তখন ঘিয়ের ব্যবসা ছিল, কলকাতায় ঘি চালান দিত। মস্ত ঘিয়ের আড়ৎ ছিল। আমি ছিলাম কর্মচারী, আড়তে বসতাম। ওরা দুই ভাই যাওয়া আসা করত।

'হঠাৎ একদিন মুঙ্গেরে প্লেগ দেখা দিল। মানুষ মরে উড়কুড় উঠে যেতে লাগল, যারা বেঁচে রইল তারা ঘর-দোর ফেলে পালাতে লাগল। শহর শূন্য হয়ে গেল। রামবিনোদ আর রামকিশোর তখন মুঙ্গেরে, তারা বড় মুশকিলে পড়ল। আড়তে ষাট-সত্তর হাজার টাকার মাল রয়েছে, ফেলে পালানো যায় না ; হয়তো সব চোরে নিয়ে যাবে। আমরা তিনজনে পরামর্শ করে স্থির করলাম, গঙ্গার বুকে নৌকো ভাড়া করে থাকব, আর পালা করে রোজ একজন এসে আড়ৎ তদারক করে যাব। তারপর কপালে যা আছে তাই হবে। একটা সুবিধে ছিল, আড়ৎ গঙ্গা থেকে বেশি দূরে নয়।

'রামবিনোদের এক ছেলেবেলার বন্ধু মুঙ্গেরে স্কুল মাস্টারি করত—ঈশান মজুমদার। ঈশান সেদিন সর্পাঘাতে মারা গেছে। সেও নৌকোয় এসে জুটল। মাঝি মাল্লা নেই, শুধু আমরা চারজন—নৌকোটা বেশ বড় ছিল ; নৌকোতেই রান্নাবান্না, নৌকোতেই থাকা। গঙ্গার মাঝখানে চড়া পড়েছিল, কখনও সেখানে গিয়ে রাত কাটাতাম। শহরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কেবল দিনে একবার গিয়ে আড়ৎ দেখে আসা।

'এইভাবে দশ বারো দিন কেটে গেল। তারপর একদিন রামবিনোদকে প্লেগে ধরল। শহরে গিয়েছিল জ্বর নিয়ে ফিরে এল। আমরা চড়ায় গিয়ে নৌকো লাগালাম, রামবিনোদকে চড়ায় নামালাম। একে তো প্লেগের কোনও চিকিৎসা নেই, তার ওপর মাঝ-গঙ্গায় কোথায় ওষুধ, কোথায় ডাক্তার। রামবিনোদ পরের দিনই মারা গেল।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'তারপর আপনারা কি করলেন ?'

চাঁদমোহন বলিলেন, 'আর থাকতে সাহস হল না। আড়তের মায়া ত্যাগ করে নৌকো ভাসিয়ে ভাগলপুরে পালিয়ে এলাম।'

'রামবিনোদের দেহ সৎকার করেছিলেন ?'

চাঁদমোহন গামছায় মুখ মুছিয়া বলিলেন, 'দাহ করবার উপকরণ ছিল না ; দেহ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

'চল, এবার ফেরা যাক। এখানকার কাজ আপাতত শেষ হয়েছে।'

সিঁড়ির দিকে যাইতে যাইতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি মনে হল ? চাঁদমোহন সত্যি কথা বলেছে ?'

'একটু মিথ্যে বলেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই।'

সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইব, দেখিলাম তুলসী অদূরে একটি গাছের ছায়ায় খেলাঘর পাতিয়াছে, একাকিনী খেলায় এমন মগ্ন হইয়া গিয়াছে যে আমাদের লক্ষ্যই করিল না। ব্যোমকেশ কাছে গিয়া দাঁড়াইতে সে বিস্ফারিত চক্ষু তুলিয়া চাহিল। ব্যোমকেশ একটু সস্নেহ হাসিয়া বলিল, 'তোমার নাম তুলসী, না ? কি মিষ্টি তোমার মুখখানি।'

তুলসী তেমনি অপলক চক্ষে চাহিয়া রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা দুর্গে আছি, তুমি আসো না কেন ? এসো—অনেক গল্প বলব।'

তুলসী তেমনি তাকাইয়া রহিল, উত্তর দিল না। আমরা চলিয়া আসিলাম।

৭

দুর্গে ফিরিয়া কিছুক্ষণ সিঁড়ি ওঠা-নামার ক্লান্তি দূর করিলাম। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবু দলিল রেজিস্ট্রি করতে গেলেন। যদি হয়ে যায়, তাহলে ওদের বাড়িতে একটা নাড়াচাড়া তোলাপাড়া হবে ; বংশী আর মুরলীধর হয়তো শহরে গিয়ে বাড়ি-ভাড়া করে থাকতে চাইবে। তার আগেই এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার।'

প্রশ্ন করিলাম, 'ব্যোমকেশ, কিছু বুঝছ ? আমি তো যতই দেখছি, ততই জট পাকিয়ে যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা আবছায়া চলচ্চিত্রের ছবি মনের পর্দায় ফুটে উঠছে। ছবিটা ছোট নয় ; অনেক মানুষ অনেক ঘটনা অনেক সংঘাত জড়িয়ে তার রূপ। একশ বছর আগে এই নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছিল, এখনও শেষ হয়নি।—ভাল কথা, কাল রাত্রের আলগা পাথরটার কথা মনে ছিল না। চল, দেখি গিয়ে তার তলায় গর্ত আছে কি না।'

'চল।'

পাথরটার উপর অল্প-অল্প চুন সুরকি জমাট হইয়া আছে, আশেপাশের পাথরগুলির মত মসৃণ নয়। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'মনে হচ্ছে পাথরটাকে তুলে আবার উল্টো করে বসানো হয়েছে। এসো, তুলে দেখা যাক।'

আমরা আঙুল দিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পাথর উঠিল না। তখন সীতারামকে ডাকা হইল। সীতারাম করিতকর্মা লোক, সে একটা খুন্তি আনিয়া চাড়া দিয়া পাথর তুলিয়া ফেলিল।

পাথরের নীচে গর্তটর্ত কিছু নাই, ভরাট চুন সুরকি। ব্যোমকেশ পাথরের উল্টা পিঠ পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'ওহে, এই দ্যাখো, উর্দু-ফারসী লেখা রয়েছে !'

দেখিলাম পাথরের উপর কয়েক পংক্তি বিজাতীয় লিপি খোদাই করা রহিয়াছে। খোদাই খুব গভীর নয়, উপরন্তু লেখার উপর ধূলাবালি জমিয়া প্রায় অলক্ষণীয় হইয়া পড়িয়াছে। ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, 'আমার মনে হচ্ছে—। দাঁড়াও, ঈশানবাবুর খাতাটা নিয়ে আসি।'

ঈশানবাবুর খাতা ব্যোমকেশ নিজের কাছে রাখিয়াছিল। সে তাহা আনিয়া যে-পাতায় ফারসী লেখা ছিল, তাহার সহিত পাথরের উৎকীর্ণ লেখাটা মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। আমিও দেখিলাম। অর্থবোধ হইল না বটে, কিন্তু দু'টি লেখার টান যে একই রকম তাহা সহজেই চোখে পড়ে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়েছে। এবার চল।'

পাথরটি আবার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা ঘরে আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার বুঝলে ?'

'তুমি পরিষ্কার করে বল।'

'একশ বছর আগের কথা স্মরণ কর। সিপাহীরা আসছে শুনে রাজারাম তাঁর পরিবারবর্গকে সরিয়ে দিলেন, দুর্গে রইলেন কেবল তিনি আর জয়রাম। তারপর বাপবেটায় সমস্ত ধনরত্ন লুকিয়ে ফেললেন।

'কিন্তু সোনাদানা লুকিয়ে রাখার পর রাজারামের ভয় হল, সিপাহীদের হাতে তাঁরা যদি মারা পড়েন, তাহলে তাঁদের স্ত্রী-পরিবার সম্পত্তি উদ্ধার করবে কি করে ? তিনি পাথরের উপর সঙ্কেত-লিপি লিখলেন ; এমন ভাষায় লিখলেন যা সকলের আয়ত্ত নয়। তারপর ধুলোকাদা দিয়ে লেখাটা অস্পষ্ট করে দিলেন, যাতে সহজে সিপাহীদের নজরে না পড়ে।

'সিপাহীরা এসে কিছুই খুঁজে পেল না। রাগে তারা বাপবেটাকে হত্যা করে চলে গেল। তারপর রাজারামের পরিবারবর্গ যখন ফিরে এল, তারাও খুঁজে পেল না রাজারাম কোথায় তাঁর ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে গেছেন। পাথরের পাটিতে খোদাই করা ফারসী সঙ্কেত-লিপি কারুর চোখে পড়ল না।'

বলিলাম, 'তাহলে তোমার বিশ্বাস, রাজারামের ধনরত্ন এখনও দুর্গে লুকোনো আছে।'

'তাই মনে হয়। তবে সিপাহীরা যদি রাজারাম আর জয়রামকে যন্ত্রণা দিয়ে গুপ্তস্থানের সন্ধান বার করে নিয়ে থাকে তাহলে কিছুই নেই।'

'তারপর বল।'

'তারপর একশ বছর পরে এলেন অধ্যাপক ঈশান মজুমদার। ইতিহাসের পণ্ডিত ফারসী-জানা লোক ; তার ওপর বন্ধু রামবিনোদের কাছে দুর্গের ইতিবৃত্ত শুনেছিলেন। তিনি সন্ধান করতে আরম্ভ করলেন ; প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। তাঁর এই গুপ্ত অনুসন্ধান কতদূর এগিয়েছিল জানি না, কিন্তু একটা জিনিস তিনি পেয়েছিলেন—ঐ পাথরে খোদাই করা সঙ্কেত-লিপি। তিনি সযত্নে তার নকল খাতায় টুকে রেখেছিলেন, আর পাথরটাকে উল্টে বসিয়েছিলেন, যাতে আর কেউ না দেখতে পায়। তারপর—তারপর যে কী হল সেইটেই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।'

ব্যোমকেশ খাটের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া রহিল। আমিও আপন মনে এলোমেলো চিন্তা করিতে লাগিলাম। পাণ্ডেজি এবেলা বোধহয় আসিলেন না।...কলিকাতায় সত্যবতীর খবর কি...ব্যোমকেশ হঠাৎ তুলসীর সহিত এমন সস্নেহে কথা বলিল কেন ? মেয়েটার চৌদ্দ বছর বয়স, দেখিলে মনে হয় দশ বছরেরটি...

দ্বারের কাছে ছায়া পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, তুলসী আর গদাধর। তুলসীর চোখে শঙ্কা ও আগ্রহ, বোধহয় একা আসিতে সাহস করে নাই, তাই গদাধরকে সঙ্গে আনিয়াছে। গদাধরের কিন্তু লেশমাত্র শঙ্কা-সঙ্কোচ নাই ; তাহার হাতে লাট্টু, মুখে কান-এঁটো-করা হাসি। আমাকে দেখিয়া হাস্য সহকারে বলিল, 'হে হে জামাইবাবুর সঙ্গে তুলসীর বিয়ে হবে—হে হে হে—'

তুলসী বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া তাহার গালে একটি চড় বসাইয়া দিল। গদাধর ক্ষণেক গাল ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর গম্ভীরমুখে লাট্টুতে লেত্তি পাকাইতে পাকাইতে প্রস্থান করিল। বুঝিলাম ছোট বোনের হাতে চড়-চাপড় খাইতে সে অভ্যস্ত।

তুলসীকে ব্যোমকেশ আদর করিয়া ঘরের মধ্যে আহ্বান করিল, তুলসী কিন্তু আসিতে চায় না, দ্বারের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যোমকেশ তখন তাহাকে হাত ধরিয়া আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল।

তবু তুলসীর ভয় ভাঙে না, ব্যাধশঙ্কিতা হরিণীর মত তার ভাবভঙ্গী। ব্যোমকেশ নরম সুরে সমবয়স্কের মত তাহার সহিত গল্প করিতে আরম্ভ করিল। দু'টা হাসি তামাসার কথা, মেয়েদের খেলাধুলা পুতুলের বিয়ে প্রভৃতি মজার কাহিনী,—শুনিতে শুনিতে তুলসীর ভয় ভাঙিল। প্রথমে

দু' একবার 'হুঁ' 'না', তারপর সহজভাবে কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট পনরোর মধ্যে তুলসীর সঙ্গে আমাদের সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। দেখিলাম তাহার মন সরল, বুদ্ধি সতেজ ; কেবল তাহার স্নায়ু সুস্থ নয় ; সামান্য কারণে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া সহজতার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। ব্যোমকেশ তাহার চরিত্র ঠিক ধরিয়াছিল তাই সস্নেহ ব্যবহারে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে।

তুলসীর সহিত আমাদের যে সকল কথা হইল, তাহা আগাগোড়া পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই, তাহাদের পরিবার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানা গেল যাহা পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাকিগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে এসে যিনি ছিলেন, তোমার বাবার বন্ধু ঈশানবাবু, তাঁর সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছিল ?'

তুলসী বলিল, 'হ্যাঁ। তিনি আমাকে কত গল্প বলতেন। রাত্তিরে তাঁর ঘুম হত না ; আমি অনেক বার দুপুর রাত্তিরে এসে তাঁর কাছে গল্প শুনেছি।'

'তাই নাকি ! তিনি যে-রাত্তিরে মারা যান সে-রাত্তিরে তুমি কোথায় ছিলে ?'

'সে-রাত্তিরে আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

'ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল ! সে কি !'

'হ্যাঁ। আমি যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই কিনা, তাই ওরা সুবিধে পেলেই আমাকে বন্ধ করে রাখে।'

'ওরা কারা ?'

'সবাই। বাবা বড়দা মেজদা জামাইবাবু—'

'সে-রাত্তিরে কে তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল ?'

'বাবা।'

'হুঁ। আর কাল রাত্রে বুঝি মেজদা তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল ?'

'হ্যাঁ—তুমি কি করে জানলে ?'

'আমি সব জানতে পারি। আচ্ছা, আর একটা কথা বল দেখি। তোমার বড়দার বিয়ে হয়েছিল, বৌদিদিকে মনে আছে ?'

'কেন থাকবে না ? বৌদিদি খুব সুন্দর ছিল। দিদি তাকে ভারি হিংসে করত।'

'তাই নাকি ! তা তোমার বৌদিদি আত্মহত্যা করল কেন ?'

'তা জানি না। সে-রাত্তিরে দিদি আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

'ও—'

ব্যোমকেশ আমার সহিত একটা দৃষ্টি বিনিময় করিল। কিছুক্ষণ অন্য কথার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা তুলসী, বল দেখি বাড়ির মধ্যে তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসো ?'

তুলসী নিঃসঙ্কোচে অলজ্জিত মুখে বলিল, 'মাস্টার মশাইকে। উনিও আমাকে খুব ভালবাসেন।'

'আর মণিলালকে তুমি ভালবাসো না ?'

তুলসীর চোখ দু'টা যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—'না। ও কেন মাস্টার মশাইকে হিংসে করে ! ও কেন মাস্টার মশাইয়ের নামে বাবার কাছে লাগায় ? ও যদি আমাকে বিয়ে করে আমি ওকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেব !' বলিয়া তুলসী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমরা দুই বন্ধু পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বেচারি !'

আধ ঘন্টা পরে স্নানের জন্য উঠি-উঠি করিতেছি, রমাপতি আসিয়া দ্বারে উঁকি মারিল, কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'তুলসী এদিকে এসেছিল না কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, এই খানিকক্ষণ হল চলে গেছে। এস—বোসো।'

রমাপতি সঙ্কুচিতভাবে আসিয়া বসিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'রমাপতি, প্রথম যেদিন আমরা এখানে আসি, তুমি বলেছিলে এবার ঈশানবাবুর মৃত্যু-সমস্যার সমাধান হবে। অর্থাৎ, তুমি মনে কর ঈশানবাবুর মৃত্যুর একটা সমস্যা আছে। কেমন?'

রমাপতি চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'ধরে নেওয়া যাক ঈশানবাবুর মৃত্যুটা রহস্যময়, কেউ তাকে খুন করেছে। এখন আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, তুমি তার সোজাসুজি উত্তর দাও। সঙ্কোচ কোরো না। মনে কর তুমি আদালতে হলফ্ নিয়ে সাক্ষী দিচ্ছ।'

রমাপতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বাড়ির সকলকেই তুমি ভাল করে চেনো। বল দেখি, ওদের মধ্যে এমন কে মানুষ আছে যে খুন করতে পারে?'

রমাপতি সভয়ে কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'আমার বলা উচিত নয়, আমি ওঁদের আশ্রিত। কিন্তু অবস্থায় পড়লে বোধহয় সবাই মানুষ খুন করতে পারেন।'

'সবাই? রামকিশোরবাবু?'

'হ্যাঁ।'

'বংশীধর?'

'হ্যাঁ।'

'মুরলীধর?'

'হ্যাঁ। ওঁদের প্রকৃতি বড় উগ্র—'

'নায়েব চাঁদমোহন?'

'বোধহয় না। তবে কর্তার হুকুম পেলে লোক লাগিয়ে খুন করাতে পারেন।'

'মণিলাল?'

রমাপতির মুখ অন্ধকার হইল, সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'নিজের হাতে মানুষ খুন করবার সাহস ওঁর নেই। উনি কেবল চুক্‌লি খেয়ে মানুষের অনিষ্ট করতে পারেন।'

'আর তুমি? তুমি মানুষ খুন করতে পার না?'

'আমি— !'

'আচ্ছা, যাক্। —তুমি টর্চ চুরি করেছিলে?'

রমাপতি তিক্তমুখে বলিল, 'আমার বদনাম হয়েছে জানি। কে বদনাম দিয়েছে তাও জানি। কিন্তু আপনিই বলুন, যদি চুরিই করতে হয়, একটা সামান্য টর্চ চুরি করব!'

'অর্থাৎ চুরি করনি। —যাক, মণিলালের সঙ্গে তুলসীর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে তুমি জানো?'

রমাপতির মুখ কঠিন হইয়া উঠিল কিন্তু সে সংযতভাবে বলিল, 'জানি। কর্তার তাই ইচ্ছে।'

'আর কারুর ইচ্ছে নয়?'

'না।'

'তোমারও ইচ্ছে নয়?'

রমাপতি উঠিয়া দাঁড়াইল,—'আমি একটা গলগ্রহ, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় কী আসে যায়। কিন্তু এ বিয়ে যদি হয়, একটা বিশ্রী কাণ্ড হবে।' বলিয়া আমাদের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'ছোকরার সাহস আছে!'

৮

বৈকালে সীতারাম চা লইয়া আসিলে ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল, 'সীতারাম, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। বছর দুই আগে একদল বেদে এসে এখানে তাঁবু ফেলে ছিল। তোমাকে বুলাকিলালের কাছে খবর নিতে হবে, বাড়ির কে কে বেদের তাঁবুতে যাতায়াত করত—এ বিষয়ে যত খবর পাও যোগাড় করবে।'

সীতারাম বলিল, 'জী হুজুর। বুলাকিলাল এখন বাবুদের নিয়ে শহরে গেছে, ফিরে এলে খোঁজ নেব।'

সীতারাম প্রস্থান করিলে বলিলাম, 'বেদে সম্বন্ধে কৌতূহল কেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিষ ! সাপের বিষ কোত্থেকে এল খোঁজ নিতে হবে না ?'

'ও—'

এই সময় পাণ্ডেজি উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কাঁধ হইতে চামড়ার ফিতায় বাইনাকুলার ঝুলিতেছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'একি ; দূরবীন কি হবে ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আনলাম আপনার জন্যে, যদি কাজে লাগে। —সকালে আসতে পারিনি, কাজে আটকে পড়েছিলাম। তাই এবেলা সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় আসতে আসতে দেখি রামকিশোরবাবুও শহর থেকে ফিরছেন। তাঁদের ইঞ্জিন বিগড়েছে, বুলাকিলাল হুইল ধরে বসে আছে, রামকিশোরবাবু গাড়ির মধ্যে বসে আছেন, আর জামাই মণিলাল গাড়ি ঠেলছে।'

'তারপর ?'

'দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়ি টেনে নিয়ে এলাম।'

'ওঁদের আদালতের কাজকর্ম চুকে গেল ?'

'না, একটু বাকি আছে, কাল আবার যাবেন। —তারপর, নতুন খবর কিছু আছে নাকি ?'

'অনেক নতুন খবর আছে।'

খবর শুনিতে শুনিতে পাণ্ডেজি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বিবৃতি শেষ হইলে বলিলেন, 'আর সন্দেহ নেই। ঈশানবাবু তোষাখানা খুঁজে বার করেছিলেন, তাই তাঁকে কেউ খুন করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে খুন করতে পারে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'রামকিশোরবাবু থেকে সন্নিসি ঠাকুর পর্যন্ত সবাই খুন করতে পারে। কিন্তু এটাই একমাত্র প্রশ্ন নয়। আরও প্রশ্ন আছে।'

'যেমন ?'

'যেমন, বিষ এল কোত্থেকে। সাপের বিষ তো যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। তারপর ধরুন, সাপের বিষ শরীরে ঢোকবার জন্যে এমন একটা যন্ত্র চাই যেটা ঠিক সাপের দাঁতের মত দাগ রেখে যায়।'

'হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ—'

'ইন্‌জেকশানের ছুঁচের দাগ খুব ছোট হয়, দু'চার মিনিটের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। আপনি ঈশানবাবুর পায়ে দাগ দেখেছেন, ইন্‌জেকশানের দাগ বলে মনে হয় কি ?'

'উহুঁ। তাছাড়া, দুটো দাগ পাশাপাশি—'

'ওটা কিছু নয়। যেখানে রুগী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে সেখানে পাশাপাশি দু'বার ছুঁচ ফোটানো শক্ত কি ?'

'তা বটে। —আর কি প্রশ্ন ?'

'আর, ঈশানবাবু যদি গুপ্ত তোষাখানা খুঁজে বার করে থাকেন তবে সে তোষাখানা কোথায় ?'

'এই দুর্গের মধ্যেই নিশ্চয় আছে।'

'শুধু দুর্গের মধ্যেই নয়, এই বাড়ির মধ্যেই আছে। মুরলীধর যে সাপের ভয় দেখিয়ে আমাদের

তাড়াবার চেষ্টা করছে, তার কারণ কি ?'

পাণ্ডেজি তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিলেন, 'মুরলীধর ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তার অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মোট কথা, ঈশানবাবু আসবার আগে তোষাখানার সন্ধান কেউ জানত না। তারপর ঈশানবাবু ছাড়া আর একজন জানতে পেরেছে এবং ঈশানবাবুকে খুন করেছে। তবে আমার বিশ্বাস, মাল সরাতে পারেনি।'

'কি করে বুঝলেন ?'

'দেখুন, আমরা দুর্গে আছি, এটা কারুর পছন্দ নয়। এর অর্থ কি ?'

'বুঝেছি। তাহলে আগে তোষাখানা খুঁজে বার করা দরকার। কোথায় তোষাখানা থাকতে পারে ; আপনি কিছু ভেবে দেখেছেন কি ?'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, বলিল, 'কাল থেকে একটা সন্দেহ আমার মনের মধ্যে ঘুরছে—'

আমি বলিলাম, 'গজাল !'

এই সময় সীতারাম চায়ের পাত্রগুলি সরাইয়া লইতে আসিল। ব্যোমকেশ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, 'বুলাকিলাল ফিরে এসেছে !'

সীতারাম মাথা ঝুঁকাইয়া পাত্রগুলি লইয়া চলিয়া গেল। পাণ্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওকে কোথাও পাঠালেন নাকি ?'

'হ্যাঁ, বুলাকিলালের কাছে কিছু দরকার আছে।'

'যাক। এবার আপনার সন্দেহের কথা বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঐ গজালগুলো। কেবল সন্দেহ হচ্ছে ওদের প্রকাশ্য প্রয়োজনটাই একমাত্র প্রয়োজন নয়, যাকে বলে ধোঁকার টাটি, ওরা হচ্ছে তাই।'

পাণ্ডে গজালগুলিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, 'হুঁ। তা কি করা যেতে পারে।'

'আমার ইচ্ছে ওদের একটু নেড়েচেড়ে দেখা। আপনি এসেছেন, আপনার সামনেই যা কিছু করা ভাল। যদি তোষাখানা বেরোয়, আমরা তিনজনে জানব, আর কাউকে আপাতত জানতে দেওয়া হবে না।—অজিত, দরজা বন্ধ কর।'

দরজা বন্ধ করিলে ঘর অন্ধকার হইল। তখন লণ্ঠন জ্বালিয়া এবং টর্চের আলো ফেলিয়া আমরা অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। সর্বসুদ্ধ পনরোটি গজাল। আমরা প্রত্যেকটি টানিয়া ঠেলিয়া উঁচু দিকে আকর্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। গজালগুলি মরিচা-ধরা কিন্তু বজ্রের মত দৃঢ়, একচুলও নড়িল না।

হঠাৎ পাণ্ডে বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে! নড়ছে—একটু একটু নড়ছে— !' আমরা ছুটিয়া তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। দরজার সামনে যে দেয়াল, তাহার মাঝখানে একটা গজাল। পাণ্ডে গজাল ধরিয়া ভিতর দিকে ঠেলা দিতেছেন ; নড়িতেছে কিনা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পাণ্ডে বলিলেন, 'আমার একার কর্ম নয়। ব্যোমকেশবাবু, আপনিও ঠেলুন।'

ব্যোমকেশ হাঁটু গাড়িয়া দুই হাতে পাথরে ঠেলা দিতে শুরু করিল। চতুষ্কোণ পাথর ধীরে ধীরে পিছন দিকে সরিতে লাগিল। তাহার নীচে অন্ধকার গর্ত দেখা গেল।

আমি টর্চের আলো ফেলিলাম। গর্তটি লম্বা-চওড়ায় দুই হাত, ভিতরে একপ্রস্থ সরু সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে।

পাণ্ডে মহা উত্তেজিতভাবে কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন, 'শাবাশ ! পাওয়া গেছে তোষাখানা।—ব্যোমকেশবাবু, আপনি আবিষ্কর্তা, আপনি আগে ঢুকুন।'

টর্চ লইয়া ব্যোমকেশ আগে নামিল, তারপর পাণ্ডেজি, সর্বশেষে লণ্ঠন লইয়া আমি। ঘরটি উপরের ঘরের মতই প্রশস্ত। একটি দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া সারি সারি মাটির কুণ্ডা। কুণ্ডার মুখ ছোট ছোট হাঁড়ি, হাঁড়ির মুখ সরা দিয়া ঢাকা। ঘরের অন্য কোণে একটি বড় উনান, তাহার সহিত একটি হাপরের নল সংযুক্ত রহিয়াছে। হাপরের চামড়া অবশ্য শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কিন্তু কাঠামো দেখিয়া হাপর বলিয়া চেনা যায়। ঘরে আর কিছু নাই।

আমাদের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল, পেট মোটা কুণ্ডাগুলিতে না জানি কোন্ রাজার সম্পত্তি রহিয়াছে। কিন্তু আগে ঘরের অন্যান্য স্থান দেখা দরকার। এদিক-ওদিক আলো ফেলিতে এককোণে একটা চকচকে জিনিস চোখে পড়িল। ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখি—একটি ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ। তুলিয়া লইয়া জ্বালাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু টর্চ জ্বালাই ছিল, জ্বলিয়া জ্বলিয়া সেল্ ফুরাইয়া নিভিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবু যে এ ঘরের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার অকাট্য প্রমাণ।'

তখন আমরা হাঁড়িগুলি খুলিয়া দেখিলাম। সব হাঁড়িই শূন্য, কেবল একটা হাঁড়ির তলায় নুনের মত খানিকটা গুঁড়া পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশ একখামচা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিল, তারপর রুমালে বাঁধিয়া পকেটে রাখিল। বলিল, 'নুন হতে পারে, চুন হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে।'

অতঃপর কুণ্ডাগুলি একে একে পরীক্ষা করা হইল। কিন্তু হায় সাত রাজার ধন মিলিল না। সব কুণ্ডা খালি, কোথাও একটা কপর্দক পর্যন্ত নাই।

আমরা ফ্যাল ফ্যাল চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলাম। তারপর ঘরটিতে আঁতিপাঁতি করা হইল, কিন্তু কিছু মিলিল না।

উপরে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে গুপ্তদ্বার টানিয়া বন্ধ করা হইল। তারপর ঘরের দরজা খুলিলাম। বাহিরে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে ; সীতারাম দ্বারের বাহিরে ঘোরাঘুরি করিতেছে। ব্যোমকেশ ক্লান্তস্বরে বলিল, 'সীতারাম, আর একদফা চা তৈরি কর।'

চেয়ার লইয়া তিনজনে বাহিরে বসিলাম। পাণ্ডে দমিয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন, 'কি হল বলুন দেখি ? মাল গেল কোথায় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনটে সম্ভাবনা রয়েছে। এক, সিপাহীরা সব লুটে নিয়ে গিয়েছে। দুই, ঈশানবাবুকে যে খুন করেছে, সে সেই রাত্রেই মাল সরিয়েছে। তিন, রাজারাম অন্য কোথাও মাল লুকিয়েছেন।'

'কোন্ সম্ভাবনাটা আপনার বেশি মনে লাগে ?'

ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া 'বলাকা' কবিতার শেষ পংক্তি আবৃত্তি করিল, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বুলাকিলালের দেখা পেলে ?'

সীতারাম বলিল, 'জী। গাড়ির ইঞ্জিন মেরামত করছিল, দু'-চারটে কথা হল।'

'কি বললে সে ?'

'হুজুর, বুলাকিলাল একটা আস্ত বুদ্ধু। সন্ধ্যে হলেই ভাঙ খেয়ে বেদম ঘুমোয়, রাত্তিরের কোনও খবরই রাখে না। তবে দিনের বেলা বাড়ির সকলেই বেদের তাঁবুতে যাতায়াত করত। এমনকি, বুলাকিলালও দু'-চারবার গিয়েছিল।'

'বুলাকিলাল গিয়েছিল কেন ?'

'হাত দেখাতে। বেদেনীরা নাকি ভাল হাত দেখতে জানে, ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে। বুলাকিলালকে বলেছে ও শীগ্‌গির লাট সাহেবের মোটর ড্রাইভার হবে।'

'বাড়ির আর কে কে যেতো ?'

'মালিক, মালিকের দুই বড় ছেলে, জামাইবাবু, নায়েববাবু, সবাই যেতো। আর ছোট ছেলেমেয়ে দুটো সর্বদাই ওখানে ঘোরাঘুরি করত।'

'হুঁ, আর কিছু ?'

'আর কিছু নয় হুজুর।'

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া পাণ্ডেজি উঠিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে রুমালে বাঁধা পুঁটুলি দিয়া বলিল, 'এটার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস্ করিয়ে দেখবেন। আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু খবর সংগ্রহ

করেছি তাতে নিরাশ হবার কিছু নেই। অন্তত ঈশানবাবুকে যে হত্যা করা হয়েছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, বাকি খবর ক্রমে পাওয়া যাবে।'

পাণ্ডেজি রুমালের পুঁটুলি পকেটে রাখিতে গিয়া বলিলেন, 'আরে, ডাকে আপনার একটা চিঠি এসেছিল, সেটা এতক্ষণ দিতেই ভুলে গেছি। এই নিন।—আচ্ছা, কাল আবার আসব।'

পাণ্ডেজিকে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ চিঠি খুলিয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সত্যবতীর চিঠি নাকি?'

'না, সুকুমারের চিঠি।'

'কি খবর?'

'নতুন খবর কিছু নেই। তবে সব ভাল।'

৯

রাত্রিটা নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল।

পরদিন সকালে ব্যোমকেশ ঈশানবাবুর খাতা লইয়া বসিল। কখনও খাতাটা পড়িতেছে, কখনও ঊর্ধ্বপানে চোখ তুলিয়া নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়িতেছে, কথাবার্তা বলিতেছে না।

বাইনাকুলার কাল পাণ্ডেজি রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলাম, 'কিসের গবেষণা হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে বলিল, 'মোহনলাল।'

মোহনলালের নামে আজ, কেন জানি না, বহুদিন পূর্বে পঠিত 'পলাশীর যুদ্ধ' মনে পড়িয়া গেল। বলিলাম, 'আবার আবার সেই কামান গর্জন...কাঁপাইয়া গঙ্গাজল—'

ব্যোমকেশ ভর্ৎসনা-ভরা চক্ষু তুলিয়া আমার পানে চাহিল। আমি বলিলাম, 'দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন, গর্জিল মোহনলাল নিকট শমন।'

ব্যোমকেশের চোখের ভর্ৎসনা ক্রমে হিংস্র ভাব ধারণ করিতেছে দেখিয়া আমি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। কেহ যদি বীররসাত্মক কাব্য সহ্য করিতে না পারে, তাহার উপর জুলুম করা উচিত নয়।

বাহিরে স্বর্ণোজ্জ্বল হৈমন্ত প্রভাত। দূরবীনটা হাতেই ছিল, আমি সেটা লইয়া প্রাকারে উঠিলাম। চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। দূরের পর্বতচূড়া কাছে আসিয়াছে, বনানীর মাথার উপর আলোর ঢেউ খেলিতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে রামকিশোরবাবুর বাড়ির সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাড়ির খুঁটিনাটি সমস্ত দেখিতে পাইতেছি। রামকিশোর শহরে যাইবার জন্য বাহির হইলেন, সঙ্গে দুই পুত্র এবং জামাই। তাঁহারা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পরে মোটর চলিয়া গেল।...বাড়িতে রহিল মাস্টার রমাপতি, গদাধর আর তুলসী।

ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ তখনও জলপানরত মুরগীর মত একবার কোলের দিকে ঝুঁকিয়া খাতা পড়িতেছে, আবার উঁচু দিকে মুখ তুলিয়া আপন মনে বিজ্ বিজ্ করিতেছে। বলিলাম, 'ওহে, রামকিশোরবাবুরা শহরে চলে গেলেন।'

ব্যোমকেশ আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মুরগীর মত জল পান করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ বলিল, 'মোহনলাল মস্ত বীর ছিল—না?'

'সেই রকম তো শুনতে পাই।'

ব্যোমকেশ আর কথা কহিল না। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, সে আজ খাতা ছাড়িয়া উঠিবে না। সকালবেলাটা নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটিয়া যাইবে ভাবিয়া বলিলাম, 'চল না, সাধু-দর্শন করা যাক। তিনি হয়তো হাত গুনতে জানেন।'

অন্যমনস্কভাবে চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন নয়, ওবেলা দেখা যাবে।'

দুপুরবেলা শয্যায় শুইয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। রামকিশোরবাবু ঠিক বলিয়াছিলেন ; এই নির্জনে দু'দিন বাস করিলে প্রাণ পালাই-পালাই করে।

পৌনে তিনটা পর্যন্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া আর পারা গেল না, উঠিয়া পড়িলাম। দেখি, ব্যোমকেশ ঘরে নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সে প্রাকারের উপর উঠিয়া পায়চারি করিতেছে। রৌদ্র তেমন কড়া নয় বটে, কিন্তু এ সময় প্রাকারের উপর বায়ু সেবনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল না। তবু হয়তো নূতন কিছু আবিষ্কার করিয়াছে ভাবিয়া আমিও সেই দিকে চলিলাম।

আমাকে দেখিয়া সে যেন নিজের মনের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল, যন্ত্রবৎ বলিল, 'একটা তুরপুন চাই।'

'তুরপুন!' দেখিলাম, তাহার চোখে অধীর বিভ্রান্ত দৃষ্টি। এ-দৃষ্টি আমার অপরিচিত নয়, সে কিছু পাইয়াছে। বলিলাম, 'কি পেলে?'

ব্যোমকেশ এবার সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া আমাকে দেখিতে পাইল, ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, 'না না, কিছু না। তুমি দিব্যি ঘুমুচ্ছিলে, ভাবলাম এখানে এসে দূরবীনের সাহায্যে নিসর্গ-শোভা নিরীক্ষণ করি। তা দেখবার কিছু নেই।—এই নাও, তুমি দ্যাখো।'

প্রাকারের আলিসার উপর দূরবীনটা রাখা ছিল, সেটা আমাকে ধরাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ নামিয়া গেল। আমি একটু অবাক হইলাম। ব্যোমকেশের আজ এ কী ভাব!

চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। আতপ্ত বাতাসে বহিঃপ্রকৃতি ঝিম ঝিম করিতেছে। দূরবীন চোখে দিলাম ; দূরবীন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া রামকিশোরবাবুর বাড়ির উপর স্থির হইল।

দূরবীন দিয়া দেখার সহিত আড়ি পাতার একটা সাদৃশ্য আছে ; এ যেন 'চোখ দিয়া আড়ি পাতা। রামকিশোরবাবুর বাড়িটা দূরবীনের ভিতর দিয়া আমার দশ হাতের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে ; বাড়ির সবই আমি দেখিতে পাইতেছি, অথচ আমাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না।

বাড়ির সদরে কেহ নাই, কিন্তু দরজা খোলা। দূরবীন উপরে উঠিল। হাঁটু পর্যন্ত আলিসা-ঘেরা ছাদ, সিঁড়ি পিছন দিকে। রমাপতি আলিসার উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশের ভাগ দেখিতে পাইতেছি। ছাদে আর কেহ নাই ; রমাপতি কপাল কুঁচকাইয়া কি যেন ভাবিতেছে।

রমাপতি চমকিয়া মুখ তুলিল। সিঁড়ি দিয়া তুলসী উঠিয়া আসিল, তাহার মুখেচোখে গোপনতার উত্তেজনা। লঘু দ্রুতপদে রমাপতির কাছে আসিয়া সে আঁচলের ভিতর হইতে ডান হাত বাহির করিয়া দেখাইল। হাতে কি একটা রহিয়াছে, কালো রঙের পেন্সিল কিম্বা ফাউন্টেন পেন।

দূরবীনের ভিতর দিয়া দেখিতেছি, কিন্তু কিছু শুনিতে পাইতেছি না ; যেন সে-কালের নির্বাক চলচ্চিত্র। রমাপতি উত্তেজিত হইয়া কি বলিতেছে, হাত নাড়িতেছে। তুলসী তাহার গলা জড়াইয়া অনুনয় করিতেছে, কালো জিনিসটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সময় রঙ্গমঞ্চে আরও কয়েকটি অভিনেতার আবির্ভাব হইল। রামকিশোরবাবু সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার পিছনে বংশীধর ও মুরলীধর ; সর্বশেষে মণিলাল।

সকলেই ক্রুদ্ধ ; রমাপতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কাঠ হইয়া রহিল। বংশীধর বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া তুলসীকে তাড়না করিল এবং কালো জিনিসটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। তুলসী কিছুক্ষণ সতেজ তর্ক করিল, তারপর কাঁদো-কাঁদো মুখে নামিয়া গেল। তখন রমাপতিকে ঘিরিয়া বাকি কয়জন তর্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন, কেবল মণিলাল কটমট চক্ষে চাহিয়া অধরোষ্ঠ সম্বদ্ধ করিয়া রাখিল।

বংশীধর সহসা রমাপতির গালে একটা চড় মারিল। রামকিশোর বাধা দিলেন, তারপর আদেশের ভঙ্গীতে সিঁড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। সকলে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

এই বিচিত্র দৃশ্যের অর্থ কি, সংলাপের অভাবে তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব। আমি আরও দশ

মিনিট অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু নাটকীয় ব্যাপার আর কিছু দেখিতে পাইলাম না ; যাহা কিছু ঘটিল বাড়ির মধ্যে আমার চক্ষুর অন্তরালে ঘটিল।

নামিয়া আসিয়া ব্যোমকেশকে বলিলাম। সে গভীর মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবুরা তাহলে সদর থেকে ফিরে এসেছেন।—তুলসীর হাতে জিনিসটা চিনতে পারলে না ?'

'মনে হল ফাউন্টেন পেন।'

'দেখা যাক, হয়তো শীগ্‌গিরই খবর পাওয়া যাবে। রমাপতি আসতে পারে।'

রমাপতি আসিল না, আসিল তুলসী। ঝড়ের আগে শুষ্ক পাতার মত সে যেন উড়িতে উড়িতে আসিয়া আমাদের ঘরের চৌকাঠে আটকাইয়া গেল। তাহার মূর্তি পাগলিনীর মত, দুই চক্ষু রাঙা টকটক করিতেছে। সে খাটের উপর ব্যোমকেশকে উপবিষ্ট দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার কোলের উপর আছড়াইয়া পড়িল, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আমার মাস্টার মশাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তাড়িয়ে দিয়েছে ?'

তুলসীর কান্না থামানো সহজ হইল না। যা হোক, ব্যোমকেশের সস্নেহ সান্ত্বনায় কান্না ক্রমে ফোঁপানিতে নামিল, তখন প্রকৃত তথ্য জানা গেল।

জামাইবাবুর দুইটি ফাউন্টেন পেন আছে ; একটি তাঁহার নিজের, অন্যটি তিনি বিবাহের সময় যৌতুক পাইয়াছিলেন...জামাইবাবু দুইটি কলম লইয়া কি করিবেন ? তাই আজ তুলসী জামাইবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁহার দেরাজ হইতে কলম লইয়া মাস্টার মশাইকে দিতে গিয়াছিল—মাস্টার মশায়ের একটিও কলম নাই—মাস্টার মশাই কিন্তু লইতে চান নাই, রাগ করিয়া কলম যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে হুকুম দিয়াছিলেন, এমন সময় বাড়ির সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মাস্টার মশাইকে চোর বলিয়া ধরিল...তুলসী এত বলিল মাস্টার মশাই চুরি করেন নাই কিন্তু কেহ শুনিল না। শেষ পর্যন্ত মারধর করিয়া মাস্টার মশাইকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে।

আমি দূরবীনের ভিতর দিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহার সহিত তুলসীর কাহিনীর কোথাও গরমিল নাই। আমরা দুইজনে মিলিয়া তুলসীকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম, মাস্টার আবার ফিরিয়া আসিবে, কোনও ভাবনা নাই ; প্রয়োজন হইলে আমরা গিয়া তুলসীর বাবাকে বলিব।

দ্বারের কাছে গলা খাঁকারির শব্দ শুনিয়া চকিতে ফিরিয়া দেখি, জামাই মণিলাল দাঁড়াইয়া আছে। তুলসী তাহাকে দেখিয়া তীরের মত তাহার পাশ কাটাইয়া অদৃশ্য হইল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন মণিবাবু।'

মণিলাল ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'কর্তা পাঠিয়েছিলেন তুলসীর খোঁজ নেবার জন্যে। ও ভারি দুরন্ত, আপনাদের বেশি বিরক্ত করে না তো ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোটেই বিরক্ত করে না। ওর মাস্টারকে নাকি তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই বলতে এসেছিল।'

মণিলাল একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, বলিল, 'হ্যাঁ, রমাপতিকে কর্তা বিদেয় করে দিলেন। আমরা কেউ বাড়িতে ছিলাম না, পরচাবি দিয়ে আমার দেরাজ খুলে একটা কলম চুরি করেছিল। দামী কলম—'

ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া বলিল, 'যে কলমটা আপনার বুক পকেটে রয়েছে ঐটে কি ?'

'হ্যাঁ।' মণিলাল কলম ব্যোমকেশের হাতে দিল।

পার্কারের কলম, দামী জিনিস। ব্যোমকেশ কলম ভালবাসে, সে তাহার মাথার ক্যাপ খুলিয়া দেখিল, পিছন খুলিয়া কালি ভরিবার যন্ত্র দেখিল ; তারপর কলম ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'ভাল কলম। চুরি করতে হলে এই রকম কলমই চুরি করা উচিত। বাড়িতে আর কার ফাউন্টেন পেন আছে ?'

মণিলাল বলিল, 'আর কারুর নেই। বাড়িতে পড়ালেখার বিশেষ রেওয়াজ নেই। কেবল

কর্তা দোয়াত কলমে লেখেন।'

'হুঁ। তুলসী বলছে ও নিজেই আপনার দেরাজ থেকে কলম বার করেছিল—'

মণিলাল দুঃখিতভাবে বলিল, 'তুলসী মিথ্যে কথা বলছে। রমাপতির ও দোষ বরাবরই আছে। এই সেদিন একটা ইলেক্‌ট্রিক টর্চ—'

আমি বলিতে গেলাম, 'ইলেকট্রিক টর্চ তো—'

কিন্তু আমি কথা শেষ করিবার পূর্বে ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'ইলেকট্রিক টর্চ একটা তুচ্ছ জিনিস। রমাপতি হাজার হোক বুদ্ধিমান লোক, সে কি একটা টর্চ চুরি করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে?'

মণিলাল কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনার কথায় আমার ধোঁকা লাগছে, কি জানি যদি সে টর্চ না চুরি করে থাকে। কিন্তু আজ আমার কলমটা—। তবে কি তুলসী সত্যিই—!'

আমি জোর দিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ, তুলসী সত্যি কথা বলেছে। আমি—'

ব্যোমকেশ আবার মুখে থাবা দিয়া বলিল, 'মণিলালবাবু, আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারে আমাদের মাথা গলানো উচিত নয়। আমরা দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি, কি দরকার আমাদের ওসব কথায়! আপনারা যা ভাল বুঝেছেন করেছেন।'

'তাহলেও—কারুর নামে মিথ্যে বদনাম দেওয়া ভাল নয়—' বলিতে বলিতে মণিলাল দ্বারের দিকে পা বাড়াইল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ আপনাদের সদরের কাজ হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, সকাল সকাল কাজ হয়ে গেল। কেবল দস্তখৎ করা বাকি ছিল।'

'যাক, এখন তাহলে নিশ্চিন্ত।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মণিলাল প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ দরজায় উঁকি মারিয়া আসিয়া বলিল, 'আর একটু হলেই দিয়েছিলে সব ফাঁসিয়ে!'

'সে কি! কী ফাঁসিয়ে দিয়েছিলাম!'

'প্রথমে তুমি বলতে যাচ্ছিলে যে হারানো টর্চ পাওয়া গেছে।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর বলতে যাচ্ছিলে যে দূরবীন দিয়ে ছাদের দৃশ্য দেখেছ!'

'হ্যাঁ, তাতে কী ক্ষতি হত?'

'মণিলালকে কোনও কথা বলা মানেই বাড়ির সকলকে বলা। গর্দভচর্মাবৃত যে সিংহটিকে আমরা খুঁজছি সে জানতে পারত যে আমরা তোষাখানার সন্ধান পেয়েছি এবং দূরবীন দিয়ে ওদের ওপর অষ্টপ্রহর নজর রেখেছি। শিকার ভড়কে যেত না?'

এ কথাটা ভাবিয়া দেখি নাই।

এই সময় সীতারাম চা লইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডেজি আসিলেন। তিনি আমাদের জন্য অনেক তাজা খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছেন। সীতারাম সেগুলা মোটর হইতে আনিতে গেল। আমরা চা পান করিতে করিতে সংবাদের আদান-প্রদান করিলাম।

আমাদের সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডেজি বলিলেন, 'জাল থেকে মাছ বেরিয়ে যাচ্ছে। আজ রমাপতি গিয়েছে, কাল বংশীধর আর মুরলীধর যাবে। তাড়াতাড়ি জাল গুটিয়ে ফেলা দরকার।—হ্যাঁ, বংশীধর কলেজ হোস্টেলে যে কুকীর্তি করেছিল তার খবর পাওয়া গেছে।'

'কি কুকীর্তি করেছিল?'

'একটি ছেলের সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়, তারপর মিটমাট হয়ে যায়। বংশীধর কিন্তু মনে মনে রাগ পুষে রেখেছিল; দোলের দিন সিদ্ধির সঙ্গে ছেলেটাকে ধুতরোর বিচি খাইয়ে দিয়েছিল। ছেলেটা মরেই যেত, অতি কষ্টে বেঁচে গেল।'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'হুঁ। তাহলে বিষ প্রয়োগের অভ্যাস বংশীধরের আছে।'

'তা আছে। শুধু গোঁয়ার নয়, রাগ পুষে রাখে।'

পাঁচটা বাজিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন, আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে একটু আলাপ করে আসা যাক।'

১০

দেউড়ি পর্যন্ত নামিবার পর দেখিলাম বাড়ির দিকের সিঁড়ি দিয়া বংশীধর গট্‌গট্‌ করিয়া নামিয়া আসিতেছে। আমাদের দেখিতে পাইয়া তাহার সতেজ গতিভঙ্গী কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গেল; কিন্তু সে থামিল না, যেন শহরের রাস্তা ধরিবে এমনিভাবে আমাদের পিছনে রাখিয়া আগাইয়া গেল।

ব্যোমকেশ চুপি চুপি বলিল, 'বংশীধর সাধুবাবার কাছে যাচ্ছিল, আমাদের দেখে ভড়্‌কে গিয়ে অন্য পথ ধরেছে।'

বংশীধর তখনও বেশি দূর যায় নাই, পাণ্ডেজি হাঁক দিলেন, 'বংশীধরবাবু।'

বংশীধর ফিরিয়া ভ্রূ নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা কাছে গেলাম, পাণ্ডেজি কৌতুকের সুরে বলিলেন, 'কোথায় চলেছেন হন্‌হনিয়ে?'

বংশীধর রুক্ষ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'বেড়াতে যাচ্ছি।'

পাণ্ডেজি হাসিয়া বলিলেন, 'এই তো শহর বেড়িয়ে এলেন। আরও বেড়াবেন?'

বংশীধরের রগের শিরা উঁচু হইয়া উঠিল, সে উদ্ধতস্বরে বলিল, 'হ্যাঁ, বেড়াবো। আপনি পুলিস হতে পারেন, কিন্তু আমার বেড়ানো রুক্‌তে পারেন না।'

পাণ্ডেজিরও মুখ কঠিন হইল। তিনি কড়া সুরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, পারি। কলেজ হোস্টেলে আপনি একজনকে বিষ খাইয়েছিলেন, সে মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। ফৌজদারি মামলার তামাদি হয় না। আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারি।'

ভয়ে বংশীধরের মুখ নীল হইয়া গেল। উগ্রতা এত দ্রুত আতঙ্কে পরিবর্তিত হইতে পারে চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। সে জালবদ্ধ পশুর ন্যায় ক্ষিপ্রচক্ষে এদিক ওদিক চাহিল, তারপরে যে পথে আসিয়াছিল সেই সিঁড়ি দিয়া পলকের মধ্যে বাড়ির দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পাণ্ডেজি মৃদুকণ্ঠে হাসিলেন।

'বংশীধরের বিক্রম বোঝা গেছে।—চলুন।'

সাধুবাবার নিকট উপস্থিত হইলাম। চারিদিকের ঝাঁক্‌ড়া গাছ স্থানটিকে প্রায় অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। জ্বলন্ত ধুনির সম্মুখে বাবাজী বসিয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া নীরব অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ হাস্যে তাঁহার মুখ ভরিয়া উঠিল, তিনি হাতের ইশারায় আমাদের বসিতে বলিলেন।

পাণ্ডেজি তাঁহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, হিন্দীতেই কথাবার্তা হইল। পাণ্ডেজির গায়ে পুলিসের খাকি কামিজ ছিল, সাধুবাবা তাঁহার সহিত সমধিক আগ্রহে কথা বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ সাধারণভাবে কথা হইল। সন্ন্যাস জীবনের মাহাত্ম্য এবং গার্হস্থ্য জীবনের পঙ্কিলতা সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত হইলাম। হৃষ্ট বাবাজী ঝুলি হইতে গাঁজা বাহির করিয়া সাজিবার উপক্রম করিলেন।

পাণ্ডেজি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে গাঁজা কোথায় পান বাবা?'

বাবাজী ঊর্ধ্বে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, 'পরমাৎমা মিলিয়ে দেন বেটা।'

চিমটা দিয়া ধুনি হইতে একখণ্ড অঙ্গার তুলিয়া বাবাজী কলিকার মাথায় রাখিলেন। এই সময়ে

তাঁহার চিমটাটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম। সাধুরা যে নির্ভয়ে বনে-বাদাড়ে বাস করেন তাহা নিতান্ত নিরস্ত্রভাবে নয়। চিম্‌টা ভালভাবে ব্যবহার করিতে জানিলে ইহার দ্বারা বোধ করি বাঘ মারা যায়। আবার তাহার সূচাগ্রতীক্ষ্ণ প্রান্ত দুটির সাহায্যে ক্ষুদ্র অঙ্গার খণ্ডও যে তুলিয়া লওয়া যায় তাহা তো স্বচক্ষেই দেখিলাম। সাধুরা এই একটি মাত্র লৌহাস্ত্র দিয়া নানা কার্য সাধন করিয়া থাকেন।

যা হোক, বাবাজী গাঁজার কলিকায় দম দিলেন। তাঁহার গ্রীবা এবং রগের শিরা-উপশিরা ফুলিয়া উঠিল। দীর্ঘ একমিনিটব্যাপী দম দিয়া বাবাজী নিঃশেষিত কলিকাটি উপুড় করিয়া দিলেন।

তারপর ধোঁয়া ছাড়িবার পালা। এ কার্যটি বাবাজী প্রায় তিন মিনিট ধরিয়া করিলেন; দাড়ি-গোঁফের ভিতর হইতে মন্দ মন্দ ধূম বাহির হইয়া বাতাসকে সুরভিত করিয়া তুলিল।

বাবাজী বলিলেন, 'বম্‌! বম্‌ শঙ্কর!'

এই সময় পায়ের শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, একটি লোক আসিতেছে। লোকটি আমাদের দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন চিনিলাম, রামকিশোরবাবু! তিনি আমাদের চিনিতে পারিয়া স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'ও—আপনারা—!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন।'

রামকিশোর ঈষৎ নিরাশ কণ্ঠে বলিলেন, 'না, আপনারা সাধুজীর সঙ্গে কথা বলছেন বলুন। আমি কেবল দর্শন করতে এসেছিলাম।' জোড়হস্তে সাধুকে প্রণাম করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

সাধুর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম তাঁহার মুখে সেই বিচিত্র হাসি। হাসিটিকে বিশ্লেষণ করিলে কতখানি আধ্যাত্মিকতা এবং কতখানি নষ্টামি পাওয়া যায় তাহা বলা শক্ত। সম্ভবত সমান সমান।

এইবার ব্যোমকেশ বলিল, 'সাধুবাবা, আপনি তো অনেকদিন এখানে আছেন। সেদিন একটি লোক এখানে সর্পাঘাতে মারা গেছে, জানেন কি?'

সাধু বলিলেন, 'জান্‌তা হ্যায়। হম্‌ ক্যা নহি জানতা!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, সে রাত্রে কেউ দুর্গে গিয়েছিল কি না আপনি দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, দেখা।'

বাবাজীর মুখে আবার সেই আধ্যাত্মিক নষ্টামিভরা হাসি দেখা গেল। ব্যোমকেশ সাগ্রহে আবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, আবার পিছন দিকে পায়ের শব্দ হইল। আমরা ঘাড় ফিরাইলাম, বাবাজীও প্রখর চক্ষে সেই দিকে চাহিলেন। কিন্তু আগন্তুক কেহ আসিল না; হয়তো আমাদের উপস্থিতি জানিতে পারিয়া দূর হইতেই ফিরিয়া গেল।

ব্যোমকেশ আবার বাবাজীকে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলে তিনি ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া পরিষ্কার বাঙলায় বলিলেন, 'এখন নয়। রাত বারোটার সময় এস, তখন বলব।'

আমি অবাক হইয়া চাহিলাম। ব্যোমকেশ কিন্তু চট করিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'আচ্ছা বাবা, তাই আসব। ওঠ অজিত।'

বৃক্ষ-বাটিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রাত্রি হইয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ ও পাণ্ডেজি চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু সন্দেহভাজন কাহাকেও দেখা গেল না।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমি আজ এখান থেকেই ফিরি। রাত বারোটা পর্যন্ত থাকতে পারলে হত। কিন্তু উপায় নেই। কাল সকালেই আসব।'

পাণ্ডেজি চলিয়া গেলেন।

দুর্গে ফিরিতে ফিরিতে প্রশ্ন করিলাম, 'সাধুবাবা বাঙালী?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সাক্ষাৎ বাঙালী।'

দুর্গে ফিরিয়া ঘড়ি দেখিলাম, সাতটা বাজিয়াছে। মুক্ত আকাশের তলে চেয়ার পাতিয়া বসিলাম।

সাধুবাবা নিশ্চয় কিছু জানে। কী জানে ? সে রাত্রে ঈশানবাবুর হত্যাকারীকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল ? বৃক্ষ-বাটিকা হইতে দুর্গে উঠিবার সিঁড়ি দেখা যায় না ; বিশেষত অন্ধকার রাত্রে। তবে কি সাধুবাবা গভীর রাত্রে সিঁড়ির আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় ?...তাহার চিমটা কিন্তু সামান্য অস্ত্র নয়—ঐ চিমটার আগায় বিষ মাখাইয়া যদি—

ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; সে কেবল গলার মধ্যে চাপা কাশির মত শব্দ করিল।

রাত্রি দশটার মধ্যে আহার সমাধা করিয়া আমরা আবার বাহিরে গিয়া বসিলাম। এখনও দু'ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে হইবে। সীতারাম আহার সম্পন্ন করিয়া আড়ালে গেল ; বোধ করি দু' একটা বিড়ি টানবে। লণ্ঠনটা ঘরের কোণে কমানো আছে।

ঘড়ির কাঁটা এগারোটার দিকে চলিয়াছে। মনের উত্তেজনা সত্ত্বেও ক্রমাগত হাই উঠিতেছে—

'ব্যোমকেশবাবু !'

চাপা গলার শব্দে চমকিয়া জড়তা কাটিয়া গেল। দেখিলাম, অদূরে ছায়ার মত একটি মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। ব্যোমকেশ উঠিয়া বলিল, 'রমাপতি ! এস।'

রমাপতিকে লইয়া আমরা ঘরের মধ্যে গেলাম। ব্যোমকেশ আলো বাড়াইয়া দিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, 'এবেলা কিছু খাওয়া হয়নি দেখছি। —সীতারাম !'

সীতারাম পাঁচ মিনিটের মধ্যে কয়েকটা ডিম ভাজিয়া আনিয়া রমাপতির সম্মুখে রাখিল। রমাপতি দ্বিরুক্তি না করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মুখ শুষ্ক, চোখ বসিয়া গিয়াছে ; গায়ের হাফ-শার্ট স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, পায়ে জুতা নাই। খাইতে খাইতে বলিল, 'সব শুনেছেন তাহলে ? কার কাছে শুনলেন ?'

'তুলসীর কাছে। এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?'

'জঙ্গলে। তারপর দুর্গের পিছনে।'

'বেশি মারধর করেছে নাকি ?'

রমাপতি পিঠের কামিজ তুলিয়া দেখাইল, দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া লাল দাগ ফুটিয়া আছে। ব্যোমকেশের মুখ শক্ত হইয়া উঠিল।

'বংশীধর ?'

রমাপতি ঘাড় নাড়িল।

'শহরে চলে গেলে না কেন ?'

রমাপতি উত্তর দিল না, নীরবে খাইতে লাগিল।

'এখানে থেকে আর তোমার লাভ কি ?'

রমাপতি অস্ফুট স্বরে বলিল, 'তুলসী—'

'তুলসীকে তুমি ভালবাসো ?'

রমাপতি একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, 'ওকে সবাই যন্ত্রণা দেয়, ঘরে বন্ধ করে রাখে, কেউ ভালবাসে না। আমি না থাকলে ও মরে যাবে।'

আহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ তাহাকে নিজের বিছানা দেখাইয়া বলিল, 'শোও।'

রমাপতি ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করিল। ব্যোমকেশ দীর্ঘকাল তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল, 'রমাপতি, ঈশানবাবুকে কে খুন করেছে তুমি জানো ?'

'না, কে খুন করেছে জানি না। তবে খুন করেছে।'

'হরিপ্রিয়াকে কে খুন করেছিল জানো ?'

'না, দিদি বলবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু বলতে পারেনি।'

'বংশীধরের বৌ কেন পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়েছিল জানো ?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপতি বলিল, 'জানি না, কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল। দিদি তাকে দেখতে পারত না, দিদির মনটা বড় কুচুটে ছিল। বোধ হয় মুখোশ পরে তাকে ভূতের ভয় দেখিয়েছিল—'

'মুখোশ ?'

'দিদির একটা জাপানী মুখোশ ছিল। ঐ ঘটনার পরদিন মুখোশটা জঙ্গলের কিনারায় কুড়িয়ে পেলাম ; বোধ হয় হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়েছিল। আমি সেটা এনে দিদিকে দেখালাম, দিদি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললে।'

'বংশীধর মুখোশের কথা জানে ?'

'আমি কিছু বলিনি।'

'সাধুবাবাকে নিশ্চয় দেখেছ। কি মনে হয় ?'

'আমার ভক্তি হয় না। কিন্তু কর্তা খুব মান্য করেন। বাড়ি থেকে সিধে যায়।'

'ঈশানবাবু কোনদিন সাধুবাবা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেছিলেন ?'

'না। দর্শন করতেও যাননি। উনি সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর চটা ছিলেন।'

ব্যোমকেশ ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'বারোটা বাজে। রমাপতি, তুমি ঘুমোও আমরা একটু বেরুচ্ছি।'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রমাপতি বলিল, 'কোথায় ?'

'বেশি দূর নয়, শীগ্‌গিরই ফিরব। এস অজিত।'

বড় টর্চটা লইয়া আমরা বাহির হইলাম।

রামকিশোরবাবুর বাড়ি নিষ্প্রদীপ। দেউড়ির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে শুনিলাম বুলাকিলাল সগর্জনে নাক ডাকাইতেছে।

বৃক্ষ-বাটিকায় গাঢ় অন্ধকার, কেবল ভস্মাচ্ছাদিত ধুনি হইতে নিরুদ্ধ প্রভা বাহির হইতেছে। সাধুবাবা ধুনির পাশে শুইয়া আছেন ; শয়নের ভঙ্গীটা ঠিক স্বাভাবিক নয়।

ব্যোমকেশ তাঁহার মুখের উপর তীব্র আলো ফেলিল, বাবাজী কিন্তু জাগিলেন না। ব্যোমকেশ তখন তাঁহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিল এবং সশব্দে নিশ্বাস টানিয়া বলিল, 'অ্যাঁ— !'

টর্চের আলো বাবাজীর সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া পায়ের উপর স্থির হইল। দেখা গেল গোড়ালির উপরিভাগে সাপের দাঁতের দুটি দাগ।

১১

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, এতদিনে রামবিনোদ সত্যি সত্যি দেহরক্ষা করলেন।'

'রামবিনোদ !'

'তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে। বুঝতে পারনি ? ধন্য তুমি।'

ধুনিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিয়া বহ্নিমান করিয়া তোলা হইয়াছে। বাবাজীর শব তাহার পাশে শক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। আমরা দুইজনে কিছুদূরে মুখোমুখি উপু হইয়া বসিয়া সিগারেট টানিতেছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'মনে আছে, প্রথম রামকিশোরবাবুকে দেখে চেনা-চেনা মনে হয়েছিল ? আসলে তার কিছুক্ষণ আগে বাবাজীকে দেখেছিলাম। দুই ভায়ের চেহারায় সাদৃশ্য আছে ; তখন ধরতে পারিনি। দ্বিতীয়বার রামকিশোরকে দেখে বুঝলাম।'

'কিন্তু রামবিনোদ যে প্লেগে মারা গিয়েছিল !'

'রামবিনোদের প্লেগ হয়েছিল, কিন্তু সে মরবার আগেই বাকি সকলে তাকে চড়ায় ফেলে পালিয়েছিল। চাঁদমোহনের কথা থেকে আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। তারপর রামবিনোদ বেঁচে গেল। এ যেন কতকটা ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার মত।'

'এতদিন কোথায় ছিল ?'

'তা জানি না। বোধ হয় প্রথমটা বৈরাগ্য এসেছিল, সাধু-সন্ন্যাসীর লে মিশে ঘুরে

বেড়াচ্ছিল। তারপর হঠাৎ রামকিশোরের সন্ধান পেয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু ওকথা যাক, এখন মড়া আগ্‌লাবার ব্যবস্থা করা দরকার। অজিত, আমি এখানে আছি, তুমি টর্চ নিয়ে যাও, সীতারামকে ডেকে নিয়ে এস। আর যদি পারো, বুলাকিলালের ঘুম ভাঙিয়ে তাকেও ডেকে আনো। ওরা দু'জনে মড়া পাহারা দিক।'

বলিলাম, 'তুমি একলা এখানে থাকবে ? সেটি হচ্ছে না। থাকতে হয় দু'জনে থাকব, যেতে হয় দু'জনে যাব।'

'ভয় হচ্ছে আমাকেও সাপে ছোব্‌লাবে ! এ তেমন সাপ নয় হে, জাগা মানুষকে ছোব্‌লায় না। যা হোক, বলছ যখন, চল দু'জনেই যাই।'

দেউড়িতে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'দাঁড়াও, বুলাকিলালকে জাগানো যাক।'

অনেক ঠেলাঠেলির পর বুলাকিলালের ঘুম ভাঙিল। তাহাকে বাবাজীর মৃত্যুসংবাদ দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ সাধুবাবা ভাঙ খেয়েছিলেন ?'

'জী, এক ঘটি খেয়েছিলেন।'

'আর কে কে ভাঙ খেয়েছিল ?'

'আর বাড়ি থেকে চাকর এসে এক ঘটি নিয়ে গিয়েছিল।'

'বেশ, এখন যাও, বাবাজীকে পাহারা দাও গিয়ে। আমি সীতারামকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বুলাকিলাল ঝিমাইতে ঝিমাইতে চলিয়া গেল। মনে হইল, ঘুম ভাঙিলেও তাহার নেশার ঘোর কাটে নাই।

দুর্গে ফিরিয়া দেখিলাম সীতারাম জাগিয়া বসিয়া আছে। খবর শুনিয়া সে কেবল একবার চক্ষু বিস্ফারিত করিল, তারপর নিঃশব্দে নামিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে রমাপতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে জাগাইলাম না, বাহিরে আসিয়া বসিলাম। রাত্রি সাড়ে বারোটা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ আর ঘুমনো চলবে না। অন্তত একজনকে জেগে থাকতে হবে। অজিত, তুমি না হয় ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নাও, তারপর তোমাকে তুলে দিয়ে আমি ঘুমবো।'

উঠিতে মন সরিতেছিল না, মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়াছিল। প্রশ্ন করিলাম, 'ব্যোমকেশ, বাবাজীকে মারলে কে ?'

'ঈশানবাবুকে যে মেরেছে সে।'

'সে কে ?'

'তুমিই বল না। আন্দাজ করতে পারো না ?'

এই কথাটাই মাথায় ঘুরিতেছিল। আস্তে আস্তে বলিলাম, 'বাবাজী যদি রামবিনোদ হন তাহলে কে তাঁকে মারতে পারে ? এক আছেন রামকিশোরবাবু—'

'তিনি ভাইকে খুন করবেন ?'

'তিনি মুমূর্ষু ভাইকে ফেলে পালিয়েছিলেন। সেই ভাই ফিরে এসেছে, হয়তো সম্পত্তির বখরা দাবি করেছে—'

'বেশ, ধরা যাক রামকিশোর ভাইকে খুন করেছেন। কিন্তু ঈশানবাবুকে খুন করলেন কেন ?'

'ঈশানবাবু রামবিনোদের প্রাণের বন্ধু ছিলেন, সন্ন্যাসীকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন। হয়তো রামকিশোরকে শাসিয়েছিলেন, ভালয় ভালয় সম্পত্তির ভাগ না দিলে সব ফাঁস করে দেবেন। সন্ন্যাসীকে রামবিনোদ বলে সনাক্ত করতে পারে দু'জন—চাঁদমোহন আর ঈশানবাবু। চাঁদমোহন মালিকের মুঠোর মধ্যে, ঈশানবাবুকে সরাতে পারলে সব গোল মিটে যায়—'

ব্যোমকেশ হঠাৎ আমার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল, 'অজিত ! ব্যাপার কি হে ? তুমি যে ধারাবাহিক যুক্তিসঙ্গত কথা বলতে আরম্ভ করেছ ! তবে কি এতদিনে সত্যিই বোধোদয় হল ! কিন্তু আর নয়, শুয়ে পড় গিয়ে। ঠিক তিনটের সময় তোমাকে তুলে দেব।'

আমি গমনোদ্যত হইলে সে খাটো গলায় কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'রমাপতি ঘুমোচ্ছে—না

মটকা মেরে পড়ে আছে ?—যাক, ক্ষতি নেই, আমি জেগে আছি।'

বেলা আটটা আন্দাজ পাণ্ডেজি আসিলেন। বাবাজীর মৃত্যুসংবাদ নীচেই পাইয়াছিলেন, বাকি খবরও পাইলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি লাস নিয়ে ফিরে যান। আবার আসবেন কিন্তু—আর শুনুন—'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে একটু দূরে লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কিছুক্ষণ কথা বলিল। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'বেশ, আমি দশটার মধ্যেই ফিরব। রমাপতিকে ঘর থেকে বেরুতে দেবেন না।'

তিনি চলিয়া গেলেন।

সাড়ে ন'টার সময় আমি আর ব্যোমকেশ রামকিশোরবাবুর বাড়িতে গেলাম। বৈঠকখানায় তক্তপোশের উপর রামকিশোর বসিয়া ছিলেন, পাশে মণিলাল। বংশীধর ও মুরলীধর তক্তপোশের সামনে পায়চারি করিতেছিল, আমাদের দেখিয়া নিমেষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। বোধ হয় পারিবারিক মন্ত্রণা-সভা বসিয়াছিল, আমাদের আবির্ভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

রামকিশোরের গাল বসিয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত। কিন্তু তিনি বাহিরে অবিচলিত আছেন। ক্ষীণ হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন—বসুন।'

তক্তপোশের ধারে চেয়ার টানিয়া বসিলাম। রামকিশোর একবার গলা ঝাড়া দিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিলেন, 'সন্ন্যাসী ঠাকুরকেও সাপে কামড়েছে। ক্রমে দেখছি এখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠল। বংশী আর মুরলী দু'একদিনের মধ্যে চলে যাচ্ছে, আমরা বাকী ক'জন এখানেই থাকব ভেবেছিলাম। কিন্তু সাপের উৎপাত যদি এভাবে বাড়তেই থাকে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শীতকালে সাপের উৎপাত—আশ্চর্য!'

রামকিশোর বলিলেন, 'তার ওপর বাড়িতে কাল রাত্রে আর এক উৎপাত। এ বাড়িতে আজ পর্যন্ত চোর ঢোকেনি—'

মণিলাল বলিল, 'এ মামুলি চোর নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি হয়েছিল ?'

রামকিশোর বলিলেন, 'আমার শরীর খারাপ হয়ে অবধি মণিলাল রাত্রে আমার ঘরে শোয়। কাল রাত্রে আন্দাজ বারোটার সময়—। মণিলাল, তুমিই বল। আমার যখন ঘুম ভাঙল চোর তখন পালিয়েছে।'

মণিলাল বলিল, 'আমার খুব সজাগ ঘুম। কাল গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, মনে হল দরজার বাইরে পায়ের শব্দ। এ বাড়ির নিয়ম রাত্রে কেউ দোরে খিল দিয়ে শোয় না, এমন কি সদর দরজাও ভেজানো থাকে। আমার মনে হল আমাদের ঘরের দোর কেউ সন্তর্পণে ঠেলে খোলবার চেষ্টা করছে। আমার খাট দরজা থেকে দূরে ; আমি নিঃশব্দে উঠলাম, পা টিপে টিপে দোরের কাছে গেলাম। ঘরে আলো থাকে না, অন্ধকারে দেখলাম দোরের কপাট আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। এই সময় আমি একটা বোকামি করে ফেললাম। আর একটু অপেক্ষা করলেই চোর ঘরে ঢুকতো, তখন তাকে ধরতে পারতাম। তা না করে আমি দরজা টেনে খুলতে গেলাম। চোর সতর্ক ছিল, সে দুড় দুড় করে পালাল।'

রামকিশোর বলিলেন, 'এই সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাকে চোর মনে করছেন সে তুলসী নয় তো ? তুলসীর শুনেছি রাত্রে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আছে।'

রামকিশোরের মুখের ভাব কড়া হইল, তিনি বলিলেন, 'না, তুলসী নয়। তাকে আমি কাল রাত্রে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলাম।'

ব্যোমকেশ মণিলালকে জিজ্ঞাসা করিল, 'চোরকে আপনি চিনতে পারেননি ?'

'না। কিন্তু—'

'আপনার বিশ্বাস চেনা লোক ?'

'হ্যাঁ।'

রামকিশোর বলিলেন, 'লুকোছাপার দরকার নেই। আপনারা তো জানেন রমাপতিকে কাল আমি তাড়িয়ে দিয়েছি! মণিলালের বিশ্বাস সেই কোন মতলবে এসেছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক ক'টার সময় এই ব্যাপার ঘটেছিল বলতে পারেন কি?'

রামকিশোর বলিলেন, 'ঠিক পৌনে বারোটার সময়। আমার বালিশের তলায় ঘড়ি থাকে, আমি দেখেছি।'

ব্যোমকেশ আমার পানে সঙ্কেতপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল, আমি মুখ টিপিয়া রহিলাম। রমাপতি যে পৌনে বারোটার সময় ব্যোমকেশের খাটে শুইয়া ছিল তাহা বলিলাম না।

রামকিশোর বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'আজ সকালে আর একটা কথা জানা গেল। রমাপতি তার জিনিসপত্র নিয়ে যায়নি, তার ঘরেই পড়ে ছিল। আজ সকালে ঘর তল্লাস করালাম। তার টিনের ভাঙা তোরঙ্গ থেকে এই জিনিসটা পাওয়া গেল।' পকেট হইতে একটি সোনার কাঁটা বাহির করিয়া তিনি ব্যোমকেশের হাতে দিলেন।

মেয়েরা যে-ধরনের লোহার দু'ভাঁজ কাঁটা দিয়া চুল বাঁধেন সেই ধরনের সোনার কাঁটা। আকারে একটু বড় ও স্থূল, দুই প্রান্ত ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ। সেটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া ব্যোমকেশ সপ্রশ্নচক্ষে রামকিশোরের পানে চাহিল; তিনি বলিলেন, 'আমার বড় মেয়ে হরিপ্রিয়ার চুলের কাঁটা। তার মৃত্যুর পর হারিয়ে গিয়েছিল।'

কাঁটা ফেরৎ দিয়া ব্যোমকেশ পূর্ণদৃষ্টিতে রামকিশোরের পানে চাহিয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবু, এবার সোজাসুজি বোঝাপড়ার সময় হয়েছে।'

রামকিশোর যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, 'বোঝাপড়া!'

'হ্যাঁ। আপনার দাদা রামবিনোদবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।'

রামকিশোরের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তিনি কথা বলিবার জন্য মুখ খুলিলেন, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তারপর অতিকষ্টে নিজেকে আয়ত্ত করিতে করিতে অর্ধরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, 'আমার দাদা— ! কার কথা বলছেন আপনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কার কথা বলছি তা আপনি জানেন। মিথ্যে অভিনয় করে লাভ নেই। সর্পাঘাত যে সত্যিকার সর্পাঘাত নয় তাও আমরা জানি। আপনার দাদাকে কাল রাত্রে খুন করা হয়েছে!'

মণিলাল বলিয়া উঠিল, 'খুন করা হয়েছে!'

'হ্যাঁ। আপনি জানেন কি, সন্ন্যাসীঠাকুর হচ্ছেন আপনার শ্বশুরের দাদা, রামবিনোদ সিংহ!'

রামকিশোর এতক্ষণে অনেকটা সামলাইয়াছেন, তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন, 'মিথ্যে কথা! আমার দাদা অনেকদিন আগে প্লেগে মারা গেছেন। এসব রোমান্টিক গল্প কোথা থেকে তৈরি করে আনলেন? সন্ন্যাসী আমার দাদা প্রমাণ করতে পারেন! সাক্ষী আছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একজন সাক্ষী ছিলেন ঈশানবাবু, তাঁকেও খুন করা হয়েছে।'

রামকিশোর এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, উর্ধ্বস্বরে বলিলেন, 'মিথ্যে কথা! মিথ্যে! এসব পুলিসের কারসাজি। যান আপনারা আমার বাড়ি থেকে, এই দণ্ডে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যান। আমার এলাকায় পুলিসের গুপ্তচরের জায়গা নেই।'

এই সময় বাহিরে জানালায় মুরলীধরের ভয়ার্ত মুখ দেখা গেল—'বাবা! পুলিস বাড়ি ঘেরাও করেছে।' বলিয়াই সে অপসৃত হইল।

চমকিয়া দ্বারের দিকে ফিরিয়া দেখি পায়ের বুট হইতে মাথার হেল্‌মেট পর্যন্ত পুলিস পোষাক-পরা পাণ্ডেজি ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহার পিছনে ব্যাগ হাতে ডাঃ ঘটক।

১২

পাণ্ডে বলিলেন, 'তল্লাসী পরোয়ানা আছে, আপনার বাড়ি খানাতল্লাস করব। ওয়ারেন্ট দেখতে চান ?'

রামকিশোর ভীত পাংশুমুখে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ভাঙা গলায় বলিলেন, 'এর মানে ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আপনার এলাকায় দুটো খুন হয়েছে। পুলিসের বিশ্বাস অপরাধী এবং অপরাধের প্রমাণ এই বাড়িতেই আছে। আমরা সার্চ করে দেখতে চাই।'

রামকিশোর আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া 'বেশ, যা ইচ্ছে করুন'—বলিয়া তাকিয়ার উপর এলাইয়া পড়িলেন।

'ডাক্তার !'

ডাক্তার ঘটক প্রস্তুত ছিল, দুই মিনিটের মধ্যে রামকিশোরকে ইন্‌জেকশন দিল। তারপর নাড়ি টিপিয়া বলিল, 'ভয় নেই।'

ইতিমধ্যে আমি জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাহিরে পুলিস গিস্‌গিস্ করিতেছে ; সিঁড়ির মুখে অনেকগুলা কনস্টেবল দাঁড়াইয়া যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর দুবে ঘরে আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল, 'সকলে নিজের নিজের ঘরে আছে, বেরুতে মানা করে দিয়েছি।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বেশ। দু'জন বে-সরকারী সাক্ষী চাই। অজিতবাবু, ব্যোমকেশবাবু, আপনারা সাক্ষী থাকুন। পুলিস কোনও বে-আইনী কাজ করে কি না আপনারা লক্ষ্য রাখবেন।'

মণিলাল এতক্ষণ আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, 'আমিও কি নিজের ঘরে গিয়ে থাকব ?'

পাণ্ডে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'মণিলালবাবু ! না চলুন, আপনার ঘরটাই আগে দেখা যাক।'

'আসুন।'

পাণ্ডে, দুবে, ব্যোমকেশ ও আমি মণিলালের অনুসরণ করিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি বেশ বড়, একপাশে খাট, তাছাড়া আলমারি দেরাজ প্রভৃতি আসবাব আছে।

মণিলাল বলিল, 'কি দেখবেন দেখুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশি কিছু দেখবার নেই। আপনার দুটো ফাউন্টেন পেন আছে, সেই দুটো দেখলেই চলবে।'

মণিলালের মুখ হইতে ক্ষণকালের জন্য যেন একটা মুখোশ সরিয়া গেল। সেই যে ব্যোমকেশ বলিয়াছিল, গর্দভচর্মাবৃত সিংহ, মনে হইল সেই হিংস্র শ্বাপদটা নিরীহ চর্মাবরণ ছাড়িয়া বাহির হইল ; একটা ভয়ঙ্কর মুখ পলকের জন্য দেখিতে পাইলাম। তারপর মণিলাল গিয়া দেরাজ খুলিল ; দেরাজ হইতে পার্কারের কলমটি বাহির করিয়া দ্রুতহস্তে তাহার দু'দিকের ঢাক্‌নি খুলিয়া ফেলিল ; কলমটাকে ছোরার মত মুঠিতে ধরিয়া ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল। সে-চক্ষে যে কী ভীষণ হিংসা ও ক্রোধ ছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। মণিলাল শ্বাদন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল, 'এই যে কলম। নেবে ? এস, নেবে এস।'

আমরা জড়মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাণ্ডে কোমর হইতে রিভলবার বাহির করিলেন।

মণিলাল হায়েনার মত হাসিল। তারপর নিজের বামহাতের কব্জির উপর কলমের নিব বিঁধিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কালিভরা পিচ্‌কারিটা টিপিয়া ধরিল।

ব্যোমকেশ রামকিশোরবাবুকে বলিল, 'দুধ কলা খাইয়ে কালসাপ পুষেছিলেন। ভাগ্যে পুলিসের এই গুপ্তচরটা ছিল তাই বেঁচে গেলেন। কিন্তু এবার আমরা চললাম, আপনার আতিথ্যে আর আমাদের রুচি নেই। কেবল সাপের বিষের শিশিটা নিয়ে যাচ্ছি।'

রামকিশোর বিহ্বল ব্যাকুল চক্ষে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ দ্বার পর্যন্ত গিয়া

ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'আর একটা কথা বলে যাই। আপনার পূর্বপুরুষেরা অনেক সোনা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। সে সোনা কোথায় আছে আমি জানি। কিন্তু যে-জিনিস আমার নয় তা আমি ছুঁতেও চাই না। আপনার পৈতৃক সম্পত্তি আপনি ভোগ করুন। —চলুন পাণ্ডেজি। এস অজিত।'

অপরাহ্ণে পাণ্ডেজির বাসায় আরাম-কেদারায় অর্ধশয়ান হইয়া ব্যোমকেশ গল্প বলিতেছিল। শ্রোতা ছিলাম আমি, পাণ্ডেজি এবং রমাপতি।

'খুব সংক্ষেপে বলছি। যদি কিছু বাদ পড়ে যায়, প্রশ্ন কোরো।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'একটা কথা আগে বলে নিই। সেই যে সাদা গুঁড়ো পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন, কেমিস্টের রিপোর্ট এসেছে। এই দেখুন।'

রিপোর্ট পড়িয়া ব্যোমকেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিল—'Sodium Tetra Borate—Borax, মানে সোহাগা ? সোহাগা কোন্ কাজে লাগে ? এক তো জানি, সোনায় সোহাগা। আর কোনও কাজে লাগে কি ?'

পাণ্ডে বলিল, 'ঠিক জানি না। সেকালে হয়তো ওষুধ-বিষুধ তৈরির কাজে লাগত।'

রিপোর্ট ফিরাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। এবার শোনো। মণিলাল বাইরে বেশ ভাল মানুষটি ছিল, কিন্তু তার স্বভাব রাক্ষসের মত ; যেমন নিষ্ঠুর তেমনি লোভী। বিয়ের পর সে মনে মনে ঠিক করল শ্বশুরের গোটা সম্পত্তিটাই গ্রাস করবে। শালাদের কাছ থেকে সে সদ্ব্যবহার পায়নি, স্ত্রীকেও ভালবাসেনি। কেবল শ্বশুরকে নরম ব্যবহারে বশ করেছিল।

'মণিলালের প্রথম সুযোগ হল যখন একদল বেদে এসে ওখানে তাঁবু ফেলল। সে গোপনে তাদের কাছ থেকে সাপের বিষ সংগ্রহ করল।

'স্ত্রীকে সে প্রথমেই কেন খুন করল আপাতদৃষ্টিতে তা ধরা যায় না। হয়তো দুর্বল মুহূর্তে স্ত্রীর কাছে নিজের মতলব ব্যক্ত করে ফেলেছিল, কিম্বা হয়তো হরিপ্রিয়াই কলমে সাপের বিষ ভরার প্রক্রিয়া দেখে ফেলেছিল। মোট কথা, প্রথমেই হরিপ্রিয়াকে সরানো দরকার হয়েছিল। কিন্তু তাতে একটা মস্ত অসুবিধে, শ্বশুরের সঙ্গে সম্পর্কই ঘুচে যায়। মণিলাল কিন্তু শ্বশুরকে এমন বশ করেছিল যে তার বিশ্বাস ছিল রামকিশোর তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবেন না। তুলসীর দিকে তার নজর ছিল।

'যা হোক, হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর পর কোনও গণ্ডগোল হল না, তুলসীর সঙ্গে কথা পাকা হয়ে রইল। মণিলাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল, সম্পর্কটা একবার পাকা হয়ে গেলেই শালাগুলিকে একে একে সরাবে। দু'বছর কেটে গেল, তুলসী প্রায় বিয়ের যুগ্যি হয়ে এসেছে, এমন সময় এলেন ঈশানবাবু ; তার কিছুদিন পরে এসে জুটলেন সাধুবাবা। এঁদের দু'জনের মধ্যে অবশ্য কোনও সংযোগ ছিল না ; দু'জনে শেষ পর্যন্ত জানতে পারেননি যে বন্ধুর এত কাছে আছেন।

'রামকিশোরবাবু ভাইকে মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়েছেন এ গ্লানি তাঁর মনে ছিল। সন্ন্যাসীকে চিনতে পেরে তাঁর হৃদয়যন্ত্র খারাপ হয়ে গেল, যায়-যায় অবস্থা। একটু সামলে উঠে তিনি ভাইকে বললেন, 'যা হবার হয়েছে, কিন্তু এখন সত্যি প্রকাশ হলে আমার বড় কলঙ্ক হবে। তুমি কোনও তীর্থস্থানে গিয়ে মঠ তৈরি করে থাকো, যত খরচ লাগে আমি দেব।' রামবিনোদ কিন্তু ভাইকে বাগে পেয়েছেন, তিনি নড়লেন না ; গাছতলায় বসে ভাইকে অভিসম্পাত দিতে লাগলেন।

'এটা আমার অনুমান। কিন্তু রামকিশোর যদি কখনও সত্যি কথা বলেন, দেখবে অনুমান মিথ্যে নয়। মণিলাল কিন্তু শ্বশুরের অসুখে বড় মুশকিলে পড়ে গেল ; শ্বশুর যদি হঠাৎ পটল তোলে তার সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে, শালারা তদ্দণ্ডেই তাকে তাড়িয়ে দেবে। সে শ্বশুরকে মন্ত্রণা দিতে লাগল, বড় দুই ছেলেকে পৃথক করে দিতে। তাতে মণিলালের লাভ, রামকিশোর যদি হার্টফেল করে মরেও যান, নাবালকদের অভিভাবকরূপে অর্ধেক সম্পত্তি তার কব্জায় আসবে।

তারপর তুলসীকে সে বিয়ে করবে, আর গদাধর সর্পাঘাতে মরবে।

'মণিলালকে রামকিশোর অগাধ বিশ্বাস করতেন, তাছাড়া তাঁর নিজেরই ভয় ছিল তাঁর মৃত্যুর পর বড় দুই ছেলে নাবালক ভাইবোনকে বঞ্চিত করবে। তিনি রাজী হলেন ; উকিলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

'ওদিকে দুর্গে আর একটি ঘটনা ঘটছিল ; ঈশানবাবু গুপ্তধনের সন্ধানে লেগেছিলেন। প্রথমে তিনি পাটিতে খোদাই করা ফারসী লেখাটা পেলেন। লেখাটা তিনি সযত্নে খাতায় টুকে রাখলেন এবং অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। তারপর নিজের শোবার ঘরে গজাল নাড়তে নাড়তে দেখলেন, একটা পাথর আলগা। বুঝতে বাকি রইল না যে ঐ পাথরের তলায় দুর্গের তোষাখানা আছে।

'কিন্তু পাথরটা জগদ্দল ভারী ; ঈশানবাবু রুগ্ন বৃদ্ধ। পাথর সরিয়ে তোষাখানায় ঢুকবেন কি করে ? ঈশানবাবুর মনে পাপ ছিল, অভাবে তাঁর স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। তিনি রামকিশোরকে খবর দিলেন না, একজন সহকারী খুঁজতে লাগলেন।

'দু'জন পূর্ণবয়স্ক লোক তাঁর কাছে নিত্য যাতায়াত করত, রমাপতি আর মণিলাল। ঈশানবাবু মণিলালকে বেছে নিলেন। কারণ মণিলাল ষণ্ডা বেশি। আর সে শালাদের ওপর খুশি নয় তাও ঈশানবাবু বুঝেছিলেন।

'বোধ হয় আধাআধি বখরা ঠিক হয়েছিল। মণিলাল কিন্তু মনে মনে ঠিক করলে সবটাই সে নেবে, শ্বশুরের জিনিস পরের হাতে যাবে কেন ? নির্দিষ্ট রাত্রে দু'জনে পাথর সরিয়ে তোষাখানায় নামলেন।

'হাঁড়িকলসীগুলো তল্লাস করবার আগেই ঈশানবাবু মেঝের ওপর একটা মোহর কুড়িয়ে পেলেন। মণিলালের ধারণা হল হাঁড়িকলসীতে মোহর ভরা আছে। সে আর দেরি করল না, হাতের টর্চ দিয়ে ঈশানবাবুর ঘাড়ে মারল এক ঘা। ঈশানবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর তাঁর পায়ে কলমের খোঁচা দেওয়া শক্ত হল না।

'কিন্তু খুনীর মনে সর্বদাই একটা ত্বরা জেগে থাকে। মণিলাল ঈশানবাবুর দেহ ওপরে নিয়ে এল। এই সময় আমার মনে হয়, বাইরে থেকে কোনও ব্যাঘাত এসেছিল। মুরলীধর ঈশানবাবুকে তাড়াবার জন্যে ভয় দেখাচ্ছিলই, হয়তো সেই সময় ইট-পাটকেল ফেলেছিল। মণিলাল ভয় পেয়ে গুপ্তদ্বার বন্ধ করে দিল। হাঁড়িগুলো দেখা হল না ; টর্চটাও তোষাখানায় রয়ে গেল।

'তোষাখানায় যে সোনাদানা কিছু নেই একথা বোধ হয় মণিলাল শেষ পর্যন্ত জানতে পারেনি। ঈশানবাবুর মৃত্যুর হাঙ্গামা জুড়োতে না জুড়োতে আমরা গিয়ে বসলাম ; সে আর খোঁজ নিতে পারল না। কিন্তু তার ধৈর্যের অভাব ছিল না ; সে অপেক্ষা করতে লাগল, আর শ্বশুরকে ভজাতে লাগল দুর্গটা যাতে তুলসীর ভাগে পড়ে।

'আমরা স্রেফ হাওয়া বদলাতে যাইনি, এ সন্দেহ তার মনে গোড়া থেকেই ধোঁয়াচ্ছিল, কিন্তু কিছু করবার ছিল না। তারপর কাল বিকেল থেকে এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটল যে মণিলাল ভয় পেয়ে গেল। তুলসী তার কলম চুরি করে রমাপতিকে দিতে গেল। কলমে তখন বিষ ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু কলম সম্বন্ধে তার দুর্বলতা স্বাভাবিক। রমাপতিকে সে দেখতে পারত না—ভাবী পত্নীর প্রেমাস্পদকে কেই বা দেখতে পারে ? এই ছুতো করে সে রমাপতিকে তাড়ালো। যা হোক, এ পর্যন্ত বিশেষ ক্ষতি হয়নি, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা আর এক ব্যাপার ঘটল। আমরা যখন সাধুবাবার কাছে বসে তাঁর লম্বা লম্বা কথা শুনছি 'হ্যম ক্যা নহি জানতা' ইত্যাদি—, সেই সময় মণিলাল বাবাজীর কাছে আসছিল ; দূর থেকে তাঁর আস্ফালন শুনে ভাবল, বাবাজী নিশ্চয় তাকে ঈশানবাবুর মৃত্যুর রাত্রে দুর্গে যেতে দেখেছিলেন, সেই কথা তিনি দুপুর রাত্রে আমাদের কাছে ফাঁস করে দেবেন।

'মণিলাল দেখল, সর্বনাশ ! তার খুনের সাক্ষী আছে। বাবাজী যে ঈশানবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে

কিছুই জানেন না, তা সে ভাবতে পারল না ; ঠিক করল রাত বারোটার আগেই বাবাজীকে সাবাড় করবে।

'আমরা চলে আসার পর বাবাজী এক ঘটি সিদ্ধি চড়ালেন। তারপর বোধ হয় মণিলাল গিয়ে আর এক ঘটি খাইয়ে এল। বাবাজী নির্ভয়ে খেলেন, কারণ মণিলালের ওপর তাঁর সন্দেহ নেই। তারপর তিনি নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন ; এবং যথাসময়ে মণিলাল এসে তাঁকে মহাসুষুপ্তির দেশে পাঠিয়ে দিলে।'

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি কিছু জানতেন না, তবে আমাদের রাত দুপুরে ডেকেছিলেন কেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডেকেছিলেন তাঁর নিজের কাহিনী শোনাবার জন্যে, নিজের আসল পরিচয় দেবার জন্যে।'

'আর একটা কথা। কাল রাত্রে যে রামকিশোরবাবুর ঘরে চোর ঢুকেছিল সে চোরটা কে ?'

'কাল্পনিক চোর। মণিলাল সাধুবাবাকে খুন করে ফিরে আসবার সময় ঘরে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছিল, তাতে রামকিশোরবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। তাই চোরের আবির্ভাব। রামকিশোরবাবু আফিম খান, আফিম-খোরের ঘুম সহজে ভাঙে না, তাই মণিলাল নিশ্চিন্ত ছিল ; কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল তখন মণিলাল চট্ করে একটা গল্প বানিয়ে ফেলল। তাতে রমাপতির ওপর একটা নতুন সন্দেহ জাগানো হল, নিজের ওপর থেকে সন্দেহ সরানো হল। রমাপতির তোরঙ্গতে হরিপ্রিয়ার সোনার কাঁটা লুকিয়ে রেখেও ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। যা শত্রু পরে পরে। যদি কোনও বিষয়ে কারুর ওপর সন্দেহ হয় রমাপতির ওপর সন্দেহ হবে।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল।

প্রশ্ন করিলাম, 'মণিলাল যে আসামী এটা বুঝলে কখন ?'

ব্যোমকেশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'অস্ত্রটা কী তাই প্রথমে ধরতে পারছিলাম না। তুলসী প্রথম যখন ফাউন্টেন পেনের উল্লেখ করল, তখন সন্দেহ হল। তারপর মণিলাল যখন ফাউন্টেন পেন আমার হাতে দিলে তখন এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। মণিলাল নিজেই বললে বাড়িতে আর কারুর ফাউন্টেন পেন নেই। কেমন সহজ অস্ত্র দেখ ? সর্বদা পকেটে বাহার দিয়ে বেড়াও, কেউ সন্দেহ করবে না।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর পাণ্ডেজি বলিলেন, 'গুপ্তধনের রহস্যটা কিন্তু এখনও চাপাই আছে।'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিল।

বাড়ির সদরে একটা মোটর আসিয়া থামিল এবং হর্ন বাজাইল। জানালা দিয়া দেখিলাম, মোটর হইতে নামিলেন রামকিশোরবাবু ও ডাক্তার ঘটক।

ঘরে প্রবেশ করিয়া রামকিশোর জোড়হস্তে বলিলেন, 'আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন। বুদ্ধির দোষে আমি সব ভুল বুঝেছিলাম। রমাপতি, তোকেই আমি সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছি বাবা। তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল।'

রমাপতি সলজ্জে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

১৩

রামকিশোরবাবুকে খাতির করিয়া বসানো হইল। পাণ্ডেজি বোধ করি চায়ের হুকুম দিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

ডাক্তার ঘটক হাসিয়া বলিল, 'আমার রুগীর পক্ষে বেশি উত্তেজনা কিন্তু ভাল নয়। উনি জোর করলেন বলেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি, নইলে ওঁর উচিত বিছানায় শুয়ে থাকা।'

রামকিশোর গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'আর উত্তেজনা ! আজ সকাল থেকে আমার ওপর দিয়ে যা গেছে তাতেও যখন বেঁচে আছি তখন আর ভয় নেই ডাক্তার ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যিই আর ভয় নেই । একে তো সব বিপদ কেটে গেছে, তার ওপর ডাক্তার পেয়েছেন । ডাক্তার ঘটক যে কত ভাল ডাক্তার তা আমি জানি কিনা । কিন্তু একটা কথা বলুন । সন্ন্যাসীকে দাদা বলতে কি আপনি এখনও রাজী নন ?'

রামকিশোর লজ্জায় নতমুখ হইলেন ।

'ব্যোমকেশবাবু, নিজের লজ্জাতে নিজেই মরে আছি, আপনি আর লজ্জা দেবেন না । দাদাকে হাতে পায়ে ধরেছিলাম, দাদা সংসারী হতে রাজী হননি । বলেছিলাম, আমি হরিদ্বারে মন্দির করে দিচ্ছি সেখানে সেবায়েৎ হয়ে রাজার হালে থাকুন । দাদা শুনলেন না । শুনলে হয়তো অপঘাত মৃত্যু হত না ।' তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন ।

পাণ্ডেজি ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার হাতে আমাদের পূর্বদৃষ্ট মোহরটি । সেটি রামকিশোরকে দিয়া বলিলেন, 'আপনার জিনিস আপনি রাখুন ।'

রামকিশোর সাগ্রহে মোহরটি লইয়া দেখিলেন, কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, 'আমার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি । তাঁরা সবই রেখে গিয়েছিলেন, আমাদের কপালের দোষে এতদিন পাইনি । ব্যোমকেশবাবু, সত্যিই কি সন্ধান পেয়েছেন ?'

'পেয়েছি বলেই আমার বিশ্বাস । তবে চোখে দেখিনি ।'

'তাহলে—তাহলে— !' রামকিশোরবাবু ঢোক গিলিলেন ।

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিল ।

'আপনার এলাকার মধ্যেই আছে । খুঁজে নিন না ।'

'খোঁজবার কি ত্রুটি করেছি, ব্যোমকেশবাবু ? কেল্লা কিনে অবধি তার আগাপাস্তলা তন্ন তন্ন করেছি । পাইনি ; হতাশ হয়ে ভেবেছি সিপাহীরা লুটেপুটে নিয়ে গেছে । আপনি যদি জানেন, বলুন । আমি আপনাকে বঞ্চিত করব না, আপনিও বখরা পাবেন । এঁদের সালিশ মানছি, পাণ্ডেজি আর ডাক্তার ঘটক যা ন্যায্য বিবেচনা করবেন তাই দেব । আপনি আমার অশেষ উপকার করেছেন, যদি অর্ধেক বখরাও চান—'

ব্যোমকেশ নীরস স্বরে বলিল, 'বখরা চাই না । কিন্তু দুটো শর্ত আছে ।'

'শর্ত ! কী শর্ত ?'

'প্রথম শর্ত, রমাপতির সঙ্গে তুলসীর বিয়ে দিতে হবে । দ্বিতীয় শর্ত, বিয়ের যৌতুক হিসেবে আপনার দুর্গ রমাপতিকে লেখাপড়া করে দিতে হবে ।'

ব্যোমকেশ যে ভিতরে ভিতরে ঘটকালি করিতেছে তাহা সন্দেহ করি নাই । সকলে উচ্চকিত হইয়া উঠিলাম । রমাপতি লজ্জিত মুখে সরিয়া গেল ।

রামকিশোর কয়েক মিনিট হেঁটমুখে চিন্তা করিয়া মুখ তুলিলেন । বলিলেন, 'তাই হবে । রমাপতিকে আমার অপছন্দ নয় । ওকে চিনি, ও ভাল ছেলে । অন্য কোথাও বিয়ে দিলে আবার হয়তো একটা ভূত-বাঁদর জুটবে । তার দরকার নেই ।'

'আর দুর্গ ?'

'দুর্গ লেখাপড়া করে দেব । আপনি চান পৈতৃক সোনাদানা তুলসী আর রমাপতি পাবে, এই তো ? বেশ তাই হবে ।'

'কথার নড়চড় হবে না ?'

রামকিশোর একটু কড়া সুরে বলিলেন, 'আমি রাজা জানকীরামের সন্তান । কথার নড়চড় কখনও করিনি ।'

'বেশ । আজ তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে । কাল সকালে আমরা যাব ।'

পরদিন প্রভাতে আমরা আবার দুর্গে উপস্থিত হইলাম । আমরা চারজন—আমি, ব্যোমকেশ,

পাণ্ডেজি ও সীতারাম। অন্য পক্ষ হইতে কেবল রামকিশোর ও রমাপতি। বুলাকিলালকে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল দুর্গে যেন আর কেহ না আসে। সে দেউড়িতে পাহারা দিতেছিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনারা অনেক বছর ধরে খুঁজে খুঁজে যা পাননি ঈশানবাবু দু'হপ্তায় তা খুঁজে বার করেছিলেন। তার কারণ তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ ছিলেন, কোথায় খুঁজতে হয় জানতেন। প্রথমে তিনি পেলেন একটা শিলালিপি, তাতে লেখা ছিল,—'যদি আমি বা জয়রাম বাঁচিয়া না থাকি আমাদের তামাম ধনসম্পত্তি সোনাদানা মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রহিল।' এ লিপি রাজারামের লেখা। কিন্তু মোহনলাল কে ? ঈশানবাবু বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারলে মনে হয় কোন গণ্ডগোলই হত না, তিনি চুরি করবার বৃথা চেষ্টা না করে সরাসরি রামকিশোরকে খবর দিতেন।

'তারপর ঈশানবাবু পেলেন গুপ্ত তোষাখানার সন্ধান ; ভাবলেন সব সোনাদানা সেইখানেই আছে। আমরা জানি তোষাখানায় একটি গড়িয়ে পড়া মোহর ছাড়া আর কিছুই ছিল না ; বাকি সব কিছু রাজারাম সরিয়ে ফেলেছিলেন। এইখানে বলে রাখি, সিপাহীরা তোষাখানা খুঁজে পায়নি ; পেলে হাঁড়িকলসীগুলো আস্ত থাকত না।

'সে যাক। প্রশ্ন হচ্ছে, মোহনলাল কে, যার জিম্মায় রাজারাম তামাম ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন ? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় মোহনলাল মানুষ হতে পারে না। দুর্গে সে সময় রাজারাম আর জয়রাম ছাড়া আর কেউ ছিল না ; রাজারাম সকলকে বিদেয় করে দিয়েছিলেন। তবে কার জিম্মায় সোনাদানা গচ্ছিত রাখলেন ? মোহনলাল কেমন জীব ?

'আমিও প্রথমটা কিছু ধরতে পারছিলাম না। তারপর অজিত হঠাৎ একদিন পলাশীর যুদ্ধ আবৃত্তি করল—"আবার আবার সেই কামান গর্জন—গর্জিল মোহনলাল..."। কামান—মোহনলাল। সেকালে বড় বড় বীরের নামে কামানের নামকরণ হত। বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল মোহনলাল কে ! কার জিম্মায় সোনাদানা আছে। ঐ যে মোহনলাল।' ব্যোমকেশ অঙ্গুলি দিয়া ভূমিশয়ান কামানটি দেখাইল।

আমরা সকলেই উত্তেজিত হইয়াছিলাম ; রামকিশোর অস্থির হইয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ ! তাহলে কামানের নীচে সোনা পোঁতা আছে !'

'কামানের নীচে নয়। সেকালে সকলেই মাটিতে সোনা পুঁতে রাখত ; রাজারাম অমন কাঁচা কাজ করেননি। তিনি কামানের নলের মধ্যে সোনা ঢেলে দিয়ে কামানের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঐ যে দেখছেন কামানের মুখ থেকে শুকনো ঘাসের গোছা গলা বাড়িয়ে আছে, একশো বছর আগে সিপাহীরাও অমনি শুকনো ঘাস দেখেছিল ; তারা ভাবতেও পারেনি যে ভাঙা অকর্মণ্য কামানের পেটের মধ্যে সোনা জমাট হয়ে আছে।'

রামকিশোর অধীর কণ্ঠে বলিলেন, 'তবে আর দেরি কেন ? আসুন, মাটি খুঁড়ে মোহর বের করা যাক।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহর ? মোহর কোথায় ? মোহর আর নেই রামকিশোরবাবু। রাজারাম এমন বুদ্ধি খেলিয়েছিলেন যে সিপাহীরা সন্ধান পেলেও সোনা তুলে নিয়ে যেতে পারত না।'

'মানে—মানে—কিছু বুঝতে পারছি না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাণ্ডেজি, তোষাখানায় একটা উনন আর হাপর দেখেছিলেন মনে আছে ? সোহাগাও একটা হাঁড়িতে ছিল। বুঝতে পারলেন ? রাজারাম তাঁর সমস্ত মোহর গলিয়ে ঐ কামানের মুখে ঢেলে দিয়েছিলেন। ওর ভেতরে আছে জমাট সোনার একটা থাম।'

'তাহলে—তাহলে— !'

'ওর মুখ থেকে মাটি খুঁড়ে সোনা দেখতে পাবেন হয়তো। কিন্তু বার করতে পারবেন না।'

'তবে উপায় ?'

'উপায় পরে করবেন। কলকাতা থেকে অক্সি-অ্যাসিটিলিন্ আনিয়ে কামান কাটতে হবে ; তিন ইঞ্চি পুরু লোহা ছেনি বাটালি দিয়ে কাটা যাবে না। আপাতত মাটি খুঁড়ে দেখা যেতে পারে

আমার অনুমান সত্যি কি না—সীতারাম !'

সীতারামের হাতে লোহার তুরপুন প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ছিল। আদেশ পাইয়া সে ঘোড়সওয়ারের মত কামানের পিঠে চড়িয়া বসিল। আমরা নীচে কামানের মুখের কাছে সমবেত হইলাম। সীতারাম মহা উৎসাহে মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

প্রায় এক ফুট কাটিবার পর সীতারাম বলিল, 'হুজুর, আর কাটা যাচ্ছে না। শক্ত লাগছে !'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'লাগাও তুরপুন !'

সীতারাম তখন কামানের মুখের মধ্যে তুরপুন ঢুকাইয়া পাক দিতে আরম্ভ করিল। দু'চারবার ঘুরাইবার পর চাক্‌লা চাক্‌লা সোনার ফালি ছিটকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমরা সকলে উত্তেজনায় দিশাহারা হইয়া কেবল অর্থহীন চীৎকার করিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'ব্যস, সীতারাম, এবার বন্ধ কর। আমার অনুমান যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। রামকিশোরবাবু, দুর্গের মুখে মজবুত দরজা বসান, পাহারা বসান ; যতদিন না সব সোনা বেরোয় ততদিন আপনারা সপরিবারে এসে এখানে বাস করুন। এত সোনা আলগা ফেলে রাখবেন না।'

সেদিন বাসায় ফিরিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম ব্যোমকেশের নামে 'তার' আসিয়াছে। আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। হঠাৎ 'তার' কেন ? কাহার 'তার' ?—সত্যবতী ভাল আছে তো !

তারের খাম ছিঁড়িতে ব্যোমকেশের হাত একটু কাঁপিয়া গেল। আমি অদূরে দাঁড়াইয়া অপলকচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

'তার' পড়িতে পড়িতে তাহার মুখখানা কেমন এক রকম হইয়া গেল ; তারপর সে মুখ তুলিল। গলা ঝাড়া দিয়া বলিল, 'ওদিকেও সোনা।'

'সোনা !'

'হ্যাঁ—ছেলে হয়েছে।'

ছয় মাস পরে বৈশাখের গোড়ার দিকে কলকাতা শহরে গরম পড়ি-পড়ি করিতেছিল। একদিন সকালবেলা আমি এবং ব্যোমকেশ ভাগাভাগি করিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি, সত্যবতী একবাটি দুধ ও ছেলে লইয়া মেঝেয় বসিয়াছে, দুধ খাওয়ানো উপলক্ষে মাতাপুত্রে মল্লযুদ্ধ চলিতেছিল, এমন সময় সদর দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দ হইল। সত্যবতী ছেলে লইয়া পলাইবার উপক্রম করিল। আমি দ্বার খুলিয়া দেখি রমাপতি ও তুলসী। রমাপতির হাতে একটি চৌকশ বাক্স, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, মুখে সলজ্জ হাসি।

তুলসীকে দেখিয়া আর চেনা যায় না। এই কয় মাসে সে রীতিমত একটা যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসে তাহাদের বিবাহ উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু যাইতে পারি নাই। ছয় মাস পরে তাহাদের দেখিলাম।

তুলসী ঘরে আসিয়াই একেবারে ঝড় বহাইয়া দিল। সত্যবতীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার কোল থেকে খোকাকে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে ঘরময় ছুটাছুটি করিল ; তারপর তাহাকে রমাপতির কোলে ফেলিয়া দিয়া সত্যবতীর আঁচল ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে লইয়া গেল। তাহাদের কলকাকলি ও হাসির শব্দ পর্দা ভেদ করিয়া আমাদের কানে আসিতে লাগিল।

তুলসীর চরিত্র যেন পাথরের তলায় চাপা ছিল, এখন মুক্তি পাইয়াছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

ঘর ঠাণ্ডা হইলে ব্যোমকেশ রমাপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাক্স কিসের ? গ্রামোফোন নাকি ?'

'না। আমরা আপনার জন্যে একটা জিনিস তৈরি করিয়ে এনেছি',—বলিয়া রমাপতি বাক্স খুলিয়া যে জিনিসটি বাহির করিল আমরা তাহার পানে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। আগাগোড়া সোনায় গড়া দুর্গের একটি মডেল। ওজন প্রায় দুই সের, অপূর্ব কারুকার্য। আসল দুর্গের সহিত

কোথাও এক তিল তফাত নাই ; এমন কি কামানটি পর্যন্ত যথাস্থানে রহিয়াছে।

আমরা চমৎকৃত স্বরে বলিলাম, 'বাঃ !'

তারপর খাওয়া-দাওয়া গল্পগাছা রঙ্গতামাসায় বেলা কাটিয়া গেল। রামকিশোরবাবুদের খবর জানা গেল, কর্তার শরীর ভালই যাইতেছে, বংশীধর নিজের জমিদারীতে বাড়ি তৈয়ারি করিয়াছে ; মুরলীধর শহরে বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছে ; গদাধর তুলসী ও রমাপতিকে লইয়া কর্তা শৈলগৃহেই আছেন ; চাঁদমোহন আবার জমিদারী দেখাশুনা করিতেছেন। দুর্গটিকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করানো হইতেছে। তুলসী ও রমাপতি সেখানে বাস করিবে।

অপরাহ্ণে তাহারা বিদায় লইল। বিদায়কালে ব্যোমকেশ বলিল, 'তুলসী, তোমার মাস্টার কেমন ?'

মাস্টারের দিকে কপট-কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া তুলসী বলিল, 'বিচ্ছিরি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। একদিন আমার কোলে বসে মাস্টারের জন্যে কেঁদেছিলে মনে আছে ?'

এবার তুলসীর লজ্জা হইল। মুখে আঁচল চাপা দিয়া সে বলিল, 'ধেৎ !'

চিড়িয়াখানা

এক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের ঘটনা। গ্রীষ্মকাল। ব্যোমকেশের শ্যালক সুকুমার সত্যবতীকে ও খোকাকে লইয়া দার্জিলিং গিয়াছে। ব্যোমকেশ ও আমি হ্যারিসন রোডের বাসায় পড়িয়া চিংড়িপোড়া হইতেছি।

ব্যোমকেশের কাজকর্মে মন্দা যাইতেছিল। ইহা তাহার পক্ষে এমন কিছু নূতন কথা নয় ; কিন্তু এবার নৈষ্কর্মের দৈর্ঘ্য ও নিরবচ্ছিন্নতা এতই বেশি যে আমাদের অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। উপরন্তু খোকা ও সত্যবতী গৃহে নাই। মরিয়া হইয়া আমরা শেষ পর্যন্ত দাবা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

আমি মোটামুটি দাবা খেলিতে জানিতাম, ব্যোমকেশকে শিখাইয়াছিলাম। প্রথম প্রথম সে সহজেই হারিয়া যাইত ; ক্রমে তাহাকে মাত করা কঠিন হইল। অবশেষে একদিন আসিল যেদিন সে বড়ের কিস্তিতে আমাকে মাত করিয়া দিল।

পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ে গৌরবের হানি হয় না জানি। কিন্তু যাহাকে মাত্র কয়েকদিন আগে হাতে ধরিয়া দাবার চাল দিতে শিখাইয়াছি, তাহার কাছে হারিয়া গেলে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির উপর সন্দেহ হয়। আমার চিত্তে আর সুখ রহিল না।

তার উপর এবার গরমও পড়িয়াছে প্রচণ্ড। সেই যে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি একদিন গলদ্‌ঘর্ম হইয়া সকালে ঘুম ভাঙিয়াছিল, তারপর এই দেড় মাস ধরিয়া গরম উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। মাঝে দু'-এক পশলা বৃষ্টি যে হয় নাই এমন নয়, কিন্তু তাহা হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব তাপের মাত্রা বর্ধিত করিয়াছিল। দিবারাত্র ফ্যান চালাইয়াও নিষ্কৃতি ছিল না, মনে হইতেছিল সারা গায়ে রসগোল্লার রস মাখিয়া বসিয়া আছি।

দেহমনের এইরূপ নিরাশজনক অবস্থা লইয়া একদিন পূর্বাহ্ণে তক্তপোশের উপর দাবার ছক পাতিয়া বসিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ আমাকে গজ-চক্র করিবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করিয়া আনিয়াছে, আমি অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া অনর্গল ঘর্মত্যাগ করিতেছি, এমন সময় বাধা পড়িল।

দরজায় খুট্‌খুট্‌ কড়া নাড়ার শব্দ। ডাকপিয়ন নয়, তাহার কড়া নাড়ার ভঙ্গীতে একটা বেপরোয়া উগ্রতা আছে। তবে কে ? আমরা ব্যগ্র আগ্রহে পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। এতদিন পরে সত্যই কি নূতন রহস্যের শুভাগমন হইল !

ব্যোমকেশ টপ করিয়া পাঞ্জাবিটা গলাইয়া লইয়া দ্রুত গিয়া দ্বার খুলিল। আমি ইতিমধ্যে নিরাবরণ দেহে একটা উড়ানি চাদর জড়াইয়া ভদ্র হইয়া বসিলাম।

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন মধ্যবয়স্ক একটি ভদ্রলোক। আকৃতি মধ্যম, একটু নিরেট গোছের, চাঁচা-ছোলা ধারালো মুখ, চোখে ফ্রেমহীন ধূমল কাচের চশমা। পরিধানে মরাল-শুভ্র প্যান্টলুন ও সিল্কের হাতকাটা কামিজ। পায়ে মোজা নাই, কেবল বিননি-করা চামড়ার গ্রীসান স্যান্ডাল। ছিমছাম চেহারা।

মার্জিত কণ্ঠে বলিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু— ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমিই। —আসুন!'

সে ভদ্রলোকটিকে আনিয়া চেয়ারে বসাইল, মাথার উপর পাখাটা জোর করিয়া দিল। ভদ্রলোক একটি কার্ড বাহির করিয়া ব্যোমকেশকে দিলেন।

কার্ডে ছাপা ছিল—

নিশানাথ সেন
গোলাপ কলোনী
মোহনপুর, ২৪ পরগনা
বি. এ. আর

কার্ডের অন্য পিঠে টেলিগ্রামের ঠিকানা 'গোলাপ' এবং ফোন নম্বর।

ব্যোমকেশ কার্ড হইতে চোখ তুলিয়া বলিল,—'গোলাপ কলোনী। নামটা নতুন ধরনের মনে হচ্ছে।'

নিশানাথবাবুর মুখে একটু হাসির ভাব দেখা দিল, তিনি বলিলেন,—'গোলাপ কলোনী আমার ফুলের বাগান। আমি ফুলের ব্যবসা করি। শাকসব্‌জিও আছে, ডেয়ারি ফার্মও আছে। নাম দিয়েছি গোলাপ কলোনী।'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে তীক্ষ্ণ চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'ও। —মোহনপুর কলকাতা থেকে কত দূর?'

নিশানাথ বলিলেন,—'শিয়ালদা থেকে ঘন্টাখানেকের পথ—তবে রেলওয়ে লাইনের ওপর পড়ে না। স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে।'

নিশানাথবাবুর কথা বলিবার ভঙ্গীটি ত্বরাহীন, যেন আলস্যভরে কথা বলিতেছেন। কিন্তু এই মন্থরতা যে সত্যই আলস্য বা অবহেলা নয়, বরং তাঁহার সাবধানী মনের বাহ্য আবরণ মাত্র, তাহা তাঁহার সজাগ সতর্ক মুখ দেখিয়া বোঝা যায়। মনে হয় দীর্ঘকাল বাক্‌-সংযমের ফলে তিনি এইরূপ বাচনভঙ্গীতে অভ্যস্ত হইয়াছেন।

ব্যোমকেশের বাক্‌প্রণালীও অতিথির প্রভাবে একটু চিন্তা-মন্থর হইয়া গিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে বলিল,—'আপনি বলছেন ব্যবসা করেন। আপনাকে কিন্তু ব্যবসাদার বলে মনে হয় না, এমন কি বিলিতি সওদাগরি অফিসের ব্যবসাদারও নয়। আপনি কতদিন এই ব্যবসা করছেন?'

নিশানাথ বলিলেন,—'দশ বছরের কিছু বেশি। —আমাকে আপনার কী মনে হয়, বলুন দেখি?'

'মনে হয় আপনি সিভিলিয়ান ছিলেন। জজ কিম্বা ম্যাজিস্ট্রেট।'

ধোঁয়াটে চশমার আড়ালে নিশানাথবাবুর চোখ দুটি একবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি শান্ত-মন্থর কণ্ঠেই বলিলেন,—'কি করে আন্দাজ করলেন জানি না। আমি সত্যিই বোম্বাই প্রদেশের বিচার বিভাগে ছিলাম, সেশন জজ পর্যন্ত হয়েছিলাম। তারপর অবসর নিয়ে এই দশ বছর ফুলের চাষ করছি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মাফ করবেন, আপনার এখন বয়স কত?'

'সাতান্ন চলছে।'

'তার মানে সাতচল্লিশ বছর বয়সে রিটায়ার করেছেন। যতদূর জানি সরকারী চাকরির মেয়াদ পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত।'

নিশানাথবাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'আমার ব্লাড্‌-প্রেসার আছে। দশ বছর আগে তার সূত্রপাত হয়। ডাক্তারেরা বললেন মস্তিষ্কের কাজ বন্ধ করতে হবে, নইলে বাঁচব না। কাজ থেকে অবসর নিলাম। তারপর বাংলা দেশে এসে ফুলের ফসল ফলাচ্ছি। ভাবনা-চিন্তা কিছু নেই, কিন্তু রক্তের চাপ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভাবনা-চিন্তা কিছু নেই বলছেন। কিন্তু সম্প্রতি আপনার ভাবনার বিশেষ

কারণ ঘটেছে। নইলে আমার কাছে আসতেন না।'

নিশানাথ হাসিলেন ; অধর প্রান্তে শুভ্র দন্তরেখা অল্প দেখা গেল। বলিলেন, —'হ্যাঁ— ! এটা অবশ্য অনুমান করা শক্ত নয়। কিছুদিন থেকে আমার কলোনীতে একটা ব্যাপার ঘটছে—' তিনি থামিয়া গিয়া আমার দিকে চোখ ফিরাইলেন,—'আপনি অজিতবাবু ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ, উনি আমার সহকারী। আমার কাছে যা বলবেন ওঁর কাছে তা গোপন থাকবে না।'

নিশানাথ বলিলেন,—'না না, আমার কথা গোপনীয় নয়। উনি সাহিত্যিক, তাই ওঁর কাছে একটা কথা জানবার ছিল। অজিতবাবু, blackmail শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কি ?'

আকস্মিক প্রশ্নে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। বাংলা ভাষা লইয়া অনেকদিন নাড়াচাড়া করিতেছি, জানিতে বাকী নাই যে বঙ্গভারতী আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারেন নাই ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী ভাবকে বিদেশী শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়। আমি আমতা-আমতা করিয়া বলিলাম,—'Blackmail—গুপ্তকথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা। যতদূর জানি এককথায় এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই।'

নিশানাথবাবু একটু অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন,—'আমিও তাই ভেবেছিলাম। যা হোক, ওটা অবান্তর কথা। এবার ঘটনাটা সংক্ষেপে বলি শুনুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সংক্ষেপে বলবার দরকার নেই, বিস্তারিত করেই বলুন। তাতে আমাদের বোঝবার সুবিধে হবে।'

নিশানাথ বলিলেন,—'আমার গোলাপ কলোনীতে যারা আমার অধীনে কাজ করে, মালীদের বাদ দিলে তারা সকলেই ভদ্রশ্রেণীর মানুষ, কিন্তু সকলেই বিচিত্র ধরনের লোক। কাউকেই ঠিক সহজ সাধারণ মানুষ বলা যায় না। স্বাভাবিক পথে জীবিকা অর্জন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তারা আমার কাছে এসে জুটেছে। আমি তাদের থাকবার জায়গা দিয়েছি, খেতে পরতে দিই, মাসে মাসে কিছু হাতখরচ দিই। এই শর্তে তারা কলোনীর কাজ করে। অনেকটা মঠের মত ব্যবস্থা। খুব আরামের জীবন না হতে পারে, কিন্তু না খেয়ে মরবার ভয় নেই।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আর একটু পরিষ্কার করে বলুন। এদের পক্ষে স্বাভাবিক পথে জীবন নির্বাহ সম্ভব নয় কেন ?'

নিশানাথ বলিলেন,—'এদের মধ্যে একদল আছে যারা শরীরের কোনও না কোনও খুঁতের জন্যে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। যেমন, পানুগোপাল। বেশ স্বাস্থ্যবান ছেলে, অথচ সে কানে ভাল শুনতে পায় না, কথা বলাও তার পক্ষে কষ্টকর। অ্যাডেনয়েডের দোষ আছে। লেখাপড়া শেখেনি। তাকে আমি গোশালার ভার দিয়েছি, সে গরু-মোষ নিয়ে আছে।'

'আর অন্য দল ?'

'অন্য দলের অতীত জীবনে দাগ আছে। যেমন ধরুন, ভুজঙ্গধরবাবু। এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক কম দেখা যায়। ডাক্তার ছিলেন, সার্জারিতে অসাধারণ হাত ছিল ; এমন কি প্ল্যাস্টিক সার্জারি পর্যন্ত জানতেন। কিন্তু তিনি এমন একটি দুর্নৈতিক কাজ করেছিলেন যে তাঁর ডাক্তারির লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি এখন কলোনীর ডাক্তারখানার কম্পাউন্ডার হয়ে আছেন।'

'বুঝেছি। তারপর বলুন।'

ব্যোমকেশ অতিথির সম্মুখে সিগারেটের টিন খুলিয়া ধরিল, কিন্তু তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন,—'ব্লাড্‌-প্রেসার বাড়ার পর ছেড়ে দিয়েছি।' তারপর তিনি ধীরে অত্বরিত কণ্ঠে বলিতে শুরু করিলেন,—'কলোনীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনও নূতনত্ব নেই, দিনের পর দিন একই কাজের পুনরভিনয় হয়। ফুল ফোটে, শাকসবৃজি গজায়, মুর্গী ডিম পাড়ে, দুধ থেকে ঘি মাখন তৈরি হয়। কলোনীর একটা ঘোড়া-টানা ভ্যান আছে, তাতে বোঝাই হয়ে রোজ সকালে মাল স্টেশনে যায়। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় আসে। ম্যুনিসিপাল মার্কেটে আমাদের

দুটো স্টল আছে, একটাতে ফুল বিক্রি হয়, অন্যটাতে শাকসব্জি। এই ব্যবসা থেকে যা আয় হয় তাতে ভালভাবেই চলে যায়।

'এইভাবে চলছিল, হঠাৎ মাস ছয়েক আগে একটা ব্যাপার ঘটল। রাত্রে নিজের ঘরে ঘুমচ্ছিলাম, জানালার কাচ ভাঙার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে আলো জ্বেলে দেখি মেঝের ওপর পড়ে আছে—মোটরের একটি স্পার্কিং প্লাগ।'

আমি বলিয়া উঠিলাম,—'স্পার্কিং প্লাগ !'

নিশানাথ বলিলেন,—'হ্যাঁ। বাইরে থেকে কেউ ওটা ছুঁড়ে মেরে জানালার কাচ ভেঙেছে। শীতের অন্ধকার রাত্রি, কে এই দুষ্কার্য করেছে জানা গেল না। ভাবলাম, বাইরের কোনও দুষ্ট লোক নিরর্থক বজ্জাতি করেছে। গোলাপ কলোনীর কম্পাউন্ডের মধ্যে আসা-যাওয়ার কোনও অসুবিধা নেই, গরু-ছাগল আট্‌কাবার জন্যে ফটকে আগড় আছে বটে, কিন্তু মানুষের যাতায়াতের পক্ষে সেটা গুরুতর বাধা নয়।

'এই ঘটনার পর দশ-বারো দিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল। তারপর একদিন সকালবেলা সদর দরজা খুলে দেখি দরজার বাইরে একটা ভাঙা কারবুরেটার পড়ে রয়েছে। তার দু'হপ্তা পরে এল একটা মোটর হর্ন। তারপর ছেঁড়া মোটরের টায়ার। এইভাবে চলেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মনে হচ্ছে টুকরো টুকরো ভাবে কেউ আপনাকে একখানি মোটর উপহার দেবার চেষ্টা করছে। এর মানে কি বুঝতে পেরেছেন ?'

এতক্ষণে নিশানাথবাবুর মুখে একটু দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করিলাম। তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন,—'পাগলের রসিকতা হতে পারে।—কিন্তু আমার এ অনুমান আমার নিজের কাছেও সন্তোষজনক নয়। তাই আপনার কাছে এসেছি।'

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল ঊর্ধ্বমুখ হইয়া ঘুরন্ত পাখার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর প্রশ্ন করিল,—'শেষবার মোটরের ভগ্নাংশ কবে পেয়েছেন ?'

'কাল সকালে। তবে এবার ভগ্নাংশ নয়, একটি আস্ত ছেলেখেলার মোটর।'

'বাঃ ! লোকটি সত্যিই রসিক মনে হচ্ছে। এ ব্যাপার অবশ্য কলোনীর সবাই জানে ?'

'জানে। এটা একটা হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আচ্ছা, আপনার মোটর আছে ?'

'না। আমাদের কোথাও যাতায়াত নেই, মেলামেশা নেই,—সামাজিক জীবন কলোনীর মধ্যেই আবদ্ধ। তাই ইচ্ছে করেই মোটর রাখিনি।'

'কলোনীতে এমন কেউ আছে যার কোনকালে মোটরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ?'

নিশানাথবাবুর অধরপ্রান্ত সস্মিত ব্যঙ্গভরে একটু প্রসারিত হইল,—'আমাদের কোচম্যান মুস্কিল মিঞা আগে মোটর ড্রাইভার ছিল, বারবার র‍্যাশ্‌ ড্রাইভিং-এর জন্যে তার লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে।'

'কি নাম বললেন, মুস্কিল মিঞা ?'

'তার নাম নুরুদ্দিন কিম্বা ঐ রকম কিছু। সকলে ওকে মুস্কিল মিঞা বলে ! মুস্কিল শব্দটা ওর কথার মাত্রা।'

'ও—আর কেউ ?'

'আর আমার ভাইপো বিজয়ের একটা মোটর-বাইক ছিল, কখনও চলত, কখনও চলত না। গত বছর বিজয় সেটা বিক্রি করে দিয়েছে।'

'আপনার ভাইপো। তিনিও কলোনীতে থাকেন ?'

'হ্যাঁ। ম্যুনিসিপাল মার্কেটের ফুলের স্টল সেই দেখে। আমার ছেলেপুলে নেই, বিজয়কেই আমার স্ত্রী পনরো বছর বয়স থেকে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছেন।'

ব্যোমকেশ আবার ফ্যানের দিকে চোখ তুলিয়া বসিয়া রহিল। তারপর বলিল,—'মিস্টার সেন, আপনার জীবনে কখনও—দশ বছর আগে হোক বিশ বছর আগে হোক—এমন কোনও লোকের

সংস্পর্শে এসেছিলেন কি যার মোটর ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্ক আছে ? ধরুন, মোটরের দালাল কিম্বা ঐরকম কিছু ? মোটর মেকানিক— ?'

এবার নিশানাথবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর যখন কথা কহিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর আরও চাপা শুনাইল। বলিলেন,—'বারো বছর আগে আমি যখন সেশন জজ ছিলাম, তখন লাল সিং নামে একজন পাঞ্জাবী খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে আমার এজলাসে এসেছিল। তার একটা ছোট মোটর মেরামতের কারখানা ছিল।'

'তারপর ?'

'লাল সিং ভয়ানক ঝগড়াটে বদ্‌রাগী লোক ছিল, তার কারখানার একটা মিস্ত্রিকে মোটরের স্প্যানার দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছিল। বিচারে আমি তাকে ফাঁসির হুকুম দিই।' একটু হাসিয়া বলিলেন,—'হুকুম শুনে লাল সিং আমাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিল।'

'তারপর ?'

'তারপর আমার রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হল। আপীলে আমার রায় বহাল রইল বটে, কিন্তু ফাঁসি মকুব হয়ে চৌদ্দ বছর জেল হল।'

'চৌদ্দ বছর জেল ! তার মানে লাল সিং এখনও জেলে আছে।'

নিশানাথবাবু বলিলেন,—'জেলের কয়েদীরা শান্তশিষ্ট হয়ে থাকলে তাদের মেয়াদ কিছু মাফ হয়। লাল সিং হয়তো বেরিয়েছে।'

'খোঁজ নিয়েছেন ? জেল-বিভাগের দপ্তরে খোঁজ নিলেই জানা যেতে পারে।'

'আমি খোঁজ নিইনি।'

নিশানাথবাবু উঠিলেন। বলিলেন,—'আর আপনাদের সময় নষ্ট করব না, আজ উঠি। আমার যা বলবার ছিল সবই বলেছি। দেখবেন যদি কিছু হদিস পান। কে এমন অনর্থক উৎপাত করছে জানা দরকার।'

ব্যোমকেশও দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—'অনর্থক উৎপাত নাও হতে পারে।'

নিশানাথ বলিলেন,—'তাহলে উৎপাতের অর্থ কি সেটা আরও বেশি জানা দরকার।' প্যান্টুলুনের পকেট হইতে এক গোছা নোট লইয়া কয়েকটা গণিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন,—'আপনার পারিশ্রমিক পঞ্চাশ টাকা আগাম দিয়ে গেলাম। যদি আরও লাগে পরে দেব।—আচ্ছা।'

নিশানাথবাবু দ্বারের দিকে চলিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'ধন্যবাদ।'

দ্বার পর্যন্ত গিয়া নিশানাথবাবু দ্বিধাভরে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—'আর একটা কথা মনে পড়ল। সামান্য কাজ, ভাবছি সে কাজ আপনাকে করতে বলা উচিত হবে কিনা।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বলুন না।'

নিশানাথ কয়েক পা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'একটি স্ত্রীলোকের সন্ধান করতে হবে। সিনেমার অভিনেত্রী ছিল, নাম সুনয়না। বছর দুই আগে কয়েকটা বাজে ছবিতে ছোট পার্ট করেছিল, তারপর হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। যদি তার সন্ধান পান ভালই, নচেৎ তার সম্বন্ধে যত কিছু খবর সংগ্রহ করা যায় সংগ্রহ করতে হবে। আর যদি সম্ভব হয়, তার একটা ফটোগ্রাফ যোগাড় করতে হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'যখন সিনেমার অভিনেত্রী ছিল তখন ফটো যোগাড় করা শক্ত হবে না। দু'এক দিনের মধ্যেই আমি আপনাকে খবর দেব।'

'ধন্যবাদ।'

নিশানাথবাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ প্রথমেই পাঞ্জাবিটা খুলিয়া ফেলিল, তারপর নোটগুলি টেবিল হইতে তুলিয়া গণিয়া দেখিল। তাহার মুখে সকৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল। নোটগুলি দেরাজের মধ্যে রাখিতে রাখিতে সে বলিল—'নিশানাথবাবু কেতাদুরস্ত সিভিলিয়ান হতে পারেন কিন্তু তিনি বিষয়ী লোক নন।'

আমি উড়ানির খোলস ছাড়িয়া দাবার ঘুঁটিগুলি কৌটোয় তুলিয়া রাখিতেছিলাম, প্রশ্ন করিলাম,—'কেন ?'

সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ তক্তপোশে আসিয়া বসিল, বলিল—'পঞ্চাশ টাকা দিলাম বলে ষাট টাকার নোট রেখে গেছেন। লোকটি বুদ্ধিমান, কিন্তু টাকাকড়ি সম্বন্ধে ঢিলে প্রকৃতির।'

আমি বলিলাম,—'আচ্ছা ব্যোমকেশ, উনি যে সিভিলিয়ান ছিলেন, তুমি এত সহজে বুঝলে কি করে ?'

সে বলিল,—'বোঝা সহজ বলেই সহজে বুঝলাম। উনি যে-বেশে এসেছিলেন, সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক ও-বেশে বেড়ায় না, নিজের পরিচয় দেবার জন্য কার্ডও বের করে না। ওটা বিশেষ ধরনের শিক্ষাদীক্ষার লক্ষণ। ওঁর কথা বলার ভঙ্গীতেও একটা হাকিমী মন্থরতা আছে। —কিন্তু ও কিছু নয়, আসল কথা হচ্ছে উনি কি জন্যে আমার কাছে এসেছিলেন।'

'তার মানে ?'

'উনি দুটো সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন ; এক হচ্ছে মোটরের ভগ্নাংশ লাভ ; আর দ্বিতীয়, চিত্রাভিনেত্রী সুনয়না। —কোন্‌টা প্রধান ?'

'আমার তো মনে হল মোটরের ব্যাপারটাই প্রধান—তোমার কি অন্যরকম মনে হচ্ছে ?'

'বুঝতে পারছি না। নিশানাথবাবু চাপা স্বভাবের লোক, হয়তো আমার কাছেও ওঁর প্রকৃত উদ্বেগের কারণ প্রকাশ করতে চান না।'

কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া বলিলাম,—'কিন্তু যে-বয়সে মানুষ চিত্রাভিনেত্রীর পশ্চাদ্ধাবন করে ওঁর সে বয়স নয়।'

'তার চেয়ে বড় কথা, ওঁর মনোবৃত্তি সে রকম নয় ; নইলে বুড়ো লম্পট আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য নয়। ওঁর পরিমার্জিত বাচনভঙ্গী থেকে মনোবৃত্তির যেটুকু ইঙ্গিত পেলাম তাতে মনে হয় উনি মনুষ্য জাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। ঘৃণাও করেন না ; একটু তিক্ত কৌতুকমিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব। উচ্ছের সঙ্গে তেঁতুল মেশালে যা হয় তাই।'

উচ্ছে ও তেঁতুলের কথায় মনে পড়িয়া গেল আজ পুঁটিরামকে উক্ত দুইটি উপকরণ সহযোগে অম্বল রাঁধিবার ফরমাশ দিয়াছি। আমি স্নানাহারের জন্য উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম,—'তুমি এখন কি করবে ?'

সে বলিল,—'মোটরের ব্যাপারে চিন্তা ছাড়া কিছু করবার নেই। আপাতত পলাতক অভিনেত্রী সুনয়নার পশ্চাদ্ধাবন করাই প্রধান কাজ।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানিল, ভাবিতে ভাবিতে বলিল,—'Blackmail কথাটা সম্বন্ধে নিশানাথবাবুর এত কৌতূহল কেন ? বাংলা ভাষায় blackmail-এর প্রতিশব্দ আছে কিনা তা জেনে ওঁর কি লাভ ?'

আমি মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে বলিলাম,—'আমার বিশ্বাস ওটা অবচেতন মনের ক্রিয়া। হয়তো লাল সিং জেল থেকে বেরিয়েছে, সে-ই মোটরের টুকরো পাঠিয়ে ওঁকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে।'

'লাল সিং যদি জেল থেকে বেরিয়েই থাকে, সে নিশানাথবাবুকে blackmail করবার চেষ্টা করবে কেন ? উনি তো বে-আইনী কিছু করেননি ; আসামীকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া বে-আইনী কাজ নয়। তবে লাল সিং প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে পারে। হয়তো এই বারো বছর ধরে সে রাগ পুষে রেখেছে। কিন্তু নিশানাথবাবুর ভাব দেখে তা মনে হয় না। তিনি যদি লাল সিংকে সন্দেহ করতেন তাহলে অন্তত খোঁজ নিতেন সে জেল থেকে বেরিয়েছে কি না।'

ব্যোমকেশ সিগারেটের দগ্ধাবশেষ ফেলিয়া দিয়া তক্তপোশের উপর চিৎ হইয়া শুইল। নিজ মনেই বলিল,—'নিশানাথবাবুর স্মৃতিশক্তি বোধ হয় খুব প্রখর।'

'এটা জানলে কি করে ?'

'তিনি হাকিম-জীবনে নিশ্চয় হাজার হাজার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করেছেন। সব

আসামীর নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি লাল সিংয়ের নাম ঠিক মনে করে রেখেছেন।'

'লাল সিং তাঁকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিল, হয়তো সেই কারণেই নামটা মনে আছে।'

'তা হতে পারে' বলিয়া সে আবার সিগারেট ধরাইবার উপক্রম করিল।

আমি বলিলাম,—'না না, আর সিগারেট নয়, ওঠো এবার। বেলা একটা বাজে।'

দুই

বৈকালে ব্যোমকেশ বলিল,—'তোমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকেরা তো আজকাল সিনেমার দলে ভিড়ে পড়েছেন। তা তোমার চেনাশোনা কেউ ওদিকে আছেন নাকি?'

অবস্থাগতিকে সাহিত্যিক মহলে আমার বিশেষ মেলামেশা নাই। যাঁহারা উল্ললাট সাহিত্যিক তাঁহারা আমাকে কল্কে দেন না, কারণ আমি গোয়েন্দা কাহিনী লিখি; আর যাঁহারা সাহিত্য-খ্যাতি অর্জন করিবার পর শিং ভাঙিয়া বাছুরের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার আগ্রহ আমার নাই। কেবল চিত্র-নাট্যকার ইন্দু রায়ের সহিত সদ্ভাব ছিল। তিনি সিনেমার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও সহজ মানুষের মত বাক্যালাপ ও আচার-ব্যবহার করিতেন।

ব্যোমকেশকে ইন্দু রায়ের নামোল্লেখ করিলে সে বলিল,—'বেশ তো। ওঁর বোধ হয় টেলিফোন আছে, দেখ না যদি সুনয়নার খবর পাও।'

ডায়রেক্টরি ঘাঁটিয়া ইন্দুবাবুর ফোন নম্বর বাহির করিলাম। তিনি বাড়িতেই ছিলেন, আমার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—'সুনয়না! কৈ, নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না তো। আমি অবশ্য ওদের বড় খবর রাখি না—'

বলিলাম,—'ওদের খবর রাখে এমন কারুর খবর দিতে পারেন?'

ইন্দুবাবু ভাবিয়া বলিলেন,—'এক কাজ করুন। রমেন মল্লিককে চেনেন?'

'না। কে তিনি? সিনেমার লোক?'

'সিনেমার লোক নয় কিন্তু সিনেমার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এমন লোক নেই যার নাড়িনক্ষত্র জানেন না। ঠিকানা দিচ্ছি, তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। অতি অমায়িক লোক, তার শিষ্টতায় মুগ্ধ হবেন।' বলিয়া রমেন মল্লিকের ঠিকানা দিলেন।

সন্ধ্যার পর ব্যোমকেশ ও আমি মল্লিক মহাশয়ের ঠিকানায় উপস্থিত হইলাম। তিনি সাজগোজ করিয়া বাহির হইতেছিলেন, আমাদের লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। দেখিলাম, রমেনবাবু ধনী ও বিনয়ী, তাঁহার বয়স চল্লিশের আশেপাশে, হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘ আকৃতি; মুখখানি পেঁপে ফলের ন্যায় চোয়ালের দিকে ভারি, মাথার দিকে সঙ্কীর্ণ; গোঁফজোড়া সূক্ষ্ম ও যত্নলালিত; পরিধানে শৌখিন দেশী বেশ—কোঁচান কাঁচি ধুতির উপর গিলে-করা স্বচ্ছ পাঞ্জাবি; পায়ে বার্নিশ পাম্প।

ব্যোমকেশের নাম শুনিয়া এবং আমরা ইন্দুবাবুর নির্দেশে আসিয়াছি জানিতে পারিয়া রমেনবাবু যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ বরফ দেওয়া ঘোলের সরবৎ ও সন্দেশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

আদর-আপ্যায়নের ফাঁকে ব্যোমকেশ কাজের কথা পাড়িল, বলিল,—'আপনি শুনলাম চলচ্চিত্রের বিশ্বকোষ, সিনেমা জগতে এমন মানুষ নেই যার নাড়ির খবর জানেন না।'

রমেনবাবু সলজ্জ বিনয়ে বলিলেন,—'ওটা আমার একটা নেশা। কিছু নিয়ে থাকা চাই তো। তা বিশেষ কারুর কথা জানতে চান নাকি?'

'হ্যাঁ, সুনয়না নামে একটি মেয়ে বছর দুই আগে—'

রমেনবাবু চকিত চক্ষে চাহিলেন,—'সুনয়না! মানে—নেত্যকালী?'

'নেত্যকালী!'

'সুনয়নার আসল নাম নৃত্যকালী। তার সম্বন্ধে কোনও নতুন খবর পাওয়া গেছে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সুনয়নার কথা আমরা কিছুই জানি না—নামটা ছাড়া। আপনার কাছে খবর পাব এই আশায় এসেছি।'

রমেনবাবু বলিলেন,—'ও—আমি ভেবেছিলাম আপনি পুলিসের পক্ষ থেকে—। যা হোক, নেত্যকালীর অনেক খবরই আমি জানি, কেবল ল্যাজা মুড়োর খবর পাইনি।'

'সেটা কি রকম ?'

'নেত্যকালী কোথা থেকে এসেছিল জানি না, আবার কোথায় লোপাট হয়ে গেল তাও জানি না।'

'ভারি রহস্যময় ব্যাপার দেখছি। এর মধ্যে পুলিসের গন্ধও আছে !—আপনি যা যা জানেন দয়া করে বলুন।'

রমেনবাবু আমাদের সিগারেট দিলেন এবং দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইয়া দিলেন। তারপর বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'ঘটনাচক্রে নেত্যকালীর সিনেমালীলা প্রস্তাবনা থেকেই তাকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল ; আর যবনিকা পতন পর্যন্ত সেই লীলার খবর যে রেখেছিলাম তার কারণ মুরারি আমার বন্ধু ছিল। মুরারি দত্তর নাম বোধ হয় আপনারা জানেন না। তার কথা পরে আসবে।

'আজ থেকে আন্দাজ আড়াই বছর আগে একদিন সকালের দিকে আমি গৌরাঙ্গ স্টুডিওর মালিক গৌরহরিবাবুর অফিসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। একটি নতুন মেয়ে দেখা করতে এল। গৌরহরিবাবু তখন 'বিষবৃক্ষ' ধরেছেন, প্রধান ভূমিকায় অ্যাক্টর-অ্যাক্ট্রেস্ নেওয়া হয়ে গেছে, কেবল মাইনর পার্টের লোক বাকি।

'সেই নেত্যকালীকে প্রথম দেখলাম। চেহারা এমন কিছু আহা-মরি নয় ; তবে বয়স কম, চটক আছে। গৌরহরিবাবু ট্রাই নিতে রাজী হলেন।

'ট্রাই নিতে গিয়ে গৌরহরিবাবুর তাক্ লেগে গেল। ভেবেছিলেন ঝি চাকরানীর পার্ট দেবেন, কিন্তু অভিনয় দেখার পর বললেন, তুমি কুন্দনন্দিনীর পার্ট কর। নেত্যকালী কিন্তু রাজী হল না, বললে, বিধবার পার্ট করবে না। গৌরহরিবাবু তখন তাকে কমলমণির পার্ট দিলেন। নেত্যকালী নাম সিনেমায় চলে না, তার নতুন নাম হল সুনয়না।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'বিধবার পার্ট করবে না কেন ?'

রমেনবাবু বলিলেন,—'কম বয়সী অভিনেত্রীরা বিধবার পার্ট করতে চায় না। তবে নেত্যকালী অন্য ওজর তুলেছিল ; বলেছিল, সে সধবা, গেরস্ত ঘরের বৌ, টাকার জন্যে সিনেমায় নেমেছে, কিন্তু বিধবা সেজে স্বামীর অকল্যাণ করতে পারবে না। যাকে বলে নাচতে নেমে ঘোমটা !'

'আশ্চর্য বটে ! তারপর ?'

'গৌরহরিবাবু তাকে মাইনে দিয়ে রেখে দিলেন। শুটিং চলল। তারপর যথা সময় ছবি বেরুল। ছবি অবশ্য দাঁড়াল না, কিন্তু কমলমণির অভিনয় দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে আশ্চর্য তার মেক্-আপ। সে নিজে নিজের মেক্-আপ করত ; এত চমৎকার মেক্-আপ করেছিল যে পর্দায় তাকে দেখে নেত্যকালী বলে চেনাই গেল না।'

'তাই নাকি ; আর অন্য যে সব ছবিতে কাজ করেছিল— ?'

'অন্য আর একটা ছবিতেই সে কাজ করেছিল, তারক গাঙ্গুলির 'স্বর্ণলতা'য়। শ্যামা ঝি'র পার্ট করেছিল। সে কী অপূর্ব অভিনয় ! আর শ্যামা ঝি'কে দেখে কার সাধ্য বলে সে-ই বিষবৃক্ষের কমলমণি। একেবারে আলাদা মানুষ !—এখন মনে হয় নেত্যকালীর আসল চেহারাও হয়তো আসল চেহারা নয়, মেক্-আপ।'

'তার আসল চেহারার ফটো বোধ হয় নেই ?'

'না। থাকলে পুলিসের কাজে লাগত।'

'হুঁ। তারপর বলুন।'

রমেনবাবু আর একবার আমাদের সিগারেট পরিবেশন করিয়া আরম্ভ করিলেন—

'এই তো গেল সুনয়নার সিনেমা-জীবনের ইতিহাস। ভেতরে ভেতরে আর একটা ব্যাপার

ঘটতে শুরু করেছিল। সুনয়না সিনেমায় ঢোকবার মাস দুই পরে স্টুডিওতেই মুরারির সঙ্গে তার দেখা হল। মুরারিকে আপনারা চিনবেন না, কিন্তু দত্ত-দাস কোম্পানির নাম নিশ্চয় শুনেছেন—বিখ্যাত জহরতের কারবার ; মুরারি হল গিয়ে দত্তদের বাড়ির ছেলে। অগাধ বড়মানুষ।

'মুরারি আমার বন্ধু ছিল, এক গেলাসের ইয়ার বলতে পারেন। আমাদের মধ্যে, যাকে স্ত্রীদোষ বলে তা একটু আছে, ওটা তেমন দোষের নয়। মুরারিরও ছিল। পালে-পার্বণে একটু-আধটু আমোদ করা, বাঁধাবাঁধি কিছু নয়। কিন্তু মুরারি সুনয়নাকে দেখে একেবারে ঘাড় মুচড়ে পড়ল। সুনয়না এমন কিছু পরী-অপ্সরী নয়, কিন্তু যার সঙ্গে যার মজে মন ! মুরারি সকাল-বিকেল গৌরাঙ্গ স্টুডিওতে ধর্না দিয়ে পড়ল।

'মুরারির বয়স হয়েছিল আমারই মতন। এ বয়সে সে যে এমন ছেলেমানুষী আরম্ভ করবে তা ভাবিনি। সুনয়না কিন্তু সহজে ধরা দেবার মেয়ে নয়। তার বাড়ি কোথায় কেউ জানত না, ট্রামে বাসে আসত, ট্রামে বাসে ফিরে যেত ; কোনও দিন স্টুডিওর গাড়ি ব্যবহার করেনি। মুরারি অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে বার করতে পারেনি তার বাসা কোথায়।

'মুরারি আমাকে মনের কথা বলত। আমি তাকে বোঝাতাম, সুনয়না ভদ্রঘরের বৌ, ভয়ানক পতিব্রতা ; ওদিকে তাকিও না। মুরারি কিন্তু বুঝত না। তাকে তখন কালে ধরেছে, সে বুঝবে কেন ?

'মাস ছয়-সাত কেটে গেল। সুনয়না মুরারিকে আমল দিচ্ছে না, মুরারিও জোঁকের মত লেগে আছে। এইভাবেই চলছে।

"স্বর্ণলতা'য় সুনয়নার কাজ শেষ হয়ে গেল। সে স্টুডিও থেকে দু'মাসের মাইনে আগাম নিয়ে কিছুদিনের ছুটিতে যাবে কাশ্মীর বেড়াতে, এমন সময় একদিন মুরারি এসে আমাকে বললে, সব ঠিক হয়ে গেছে। আশ্চর্য হলাম, আবার হলাম না। স্ত্রীজাতির চরিত্র, বুঝতেই পারছেন। সুনয়না যে অন্য মতলবে ধরা দেবার ভান করছে তা তখন জানব কি করে ?

'দত্ত-দাস কোম্পানির বাগবাজারের দোকানটা মুরারি দেখত। দোকানের পেছনদিকে একটা সাজানো ঘর ছিল। সেটা ছিল মুরারির আড্ডা-ঘর, অনেক সময় সেখানেই রাত কাটাতো।

'পরদিন সকালে হৈ হৈ কাণ্ড। মুরারি তার আড্ডা-ঘরে মরে পড়ে আছে। আর দোকানের শো-কেস থেকে বিশ হাজার টাকার হীরের গয়না গায়েব হয়ে গেছে।

'পুলিস এল, লাস পরীক্ষার জন্যে চালান দিলে। কিন্তু কে মুরারিকে মেরেছে তার হদিস পেলে না। সে-রাত্রে মুরারির ঘরে কে এসেছিল তা বোধ হয় আমি ছাড়া আর কেউ জানত না। মুরারি আর কাউকে বলেনি।

'আমি বড় মুস্কিলে পড়ে গেলাম। খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছে মোটেই ছিল না, অথচ না বললেও নয়। শেষ পর্যন্ত কর্তব্যের খাতিরে পুলিসকে গিয়ে বললাম।

'পুলিস অন্ধকারে হাঁ করে বসে ছিল, এখন তুড়ে তল্লাস শুরু করে দিলে। সুনয়নার নামে ওয়ারেন্ট বেরুল। কিন্তু কোথায় সুনয়না ! সে কর্পূরের মত উবে গেছে। তার যে সব ফটোগ্রাফ ছিল তা থেকে সনাক্ত করা অসম্ভব। তার আসল চেহারা স্টুডিওর সকলকারই চেনা ছিল, কিন্তু এই ব্যাপারের পর আর কেউ সুনয়নাকে চোখে দেখেনি।

'তাই বলেছিলাম সুনয়নার ল্যাজা-মুড়ো দুই-ই আমাদের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে। সে কোথা থেকে এসেছিল, কার মেয়ে কার বৌ কেউ জানে না ; আবার ভোজবাজির মত কোথায় মিলিয়ে গেল তাও কেউ জানে না।'

রমেনবাবু চুপ করিলেন। ব্যোমকেশও কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তারপর বলিল,—'মুরারিবাবুর মৃত্যুর কারণ জানা গিয়েছিল ?'

রমেনবাবু বলিলেন,—'তার পেটে বিষ পাওয়া গিয়েছিল।'

'কোন্ বিষ জানেন ?'

'ঐ যে কি বলে—নামটা মনে পড়ছে না—তামাকের বিষ।'

'তামাকের বিষ! নিকোটিন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিকোটিন। তামাক থেকে যে এমন দুর্দান্ত বিষ তৈরি হয় তা কে জানত?—আসুন।' বলিয়া সিগারেটের টিন খুলিয়া ধরিলেন।

ব্যোমকেশ হাস্যমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'ধন্যবাদ, আর না। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। আপনি কোথাও বেরুচ্ছিলেন—'

'সে কি কথা! বেরুনো তো রোজই আছে, আপনাদের মতো সজ্জনদের সঙ্গ পাওয়া কি সহজ কথা!—আমি যাচ্ছিলাম একটি মেয়ের গান শুনতে। নতুন এসেছে, খাসা গায়। তা এখনও তো রাত বেশি হয়নি, চলুন না আপনারাও দুটো ঠুংরি শুনে আসবেন।'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল,—'আমি তো গানের কিছুই বুঝি না, আমার যাওয়া বৃথা; আর অজিত ধ্রুপদ ছাড়া কোনও গান পছন্দই করে না। সুতরাং আজ থাক। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার যদি খবরের দরকার হয়, আপনার শরণাপন্ন হব।'

'একশ'বার।—যখনই দরকার হবে তলব করবেন।'

'আচ্ছা, আসি তবে। নমস্কার।'

'নমস্কার। নমস্কার।'

তিন

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া শুনিতে পাইলাম, পাশের ঘরে ব্যোমকেশ কাহাকে ফোন করিতেছে। দুই চারিটা ছাড়াছাড়া কথা শুনিয়া বুঝিলাম সে নিশানাথবাবুকে সুনয়নার কাহিনী শুনাইতেছে।

নিশানাথবাবুর আগমনের পর হইতে আমাদের তাপদগ্ধ কর্মহীন জীবনে নূতন সজীবতার সঞ্চার হইয়াছিল। তাই ব্যোমকেশ যখন টেলিফোনের সংলাপ শেষ করিয়া আমার ঘরে আসিয়া ঢুকিল এবং বলিল,—'ওহে ওঠো, মোহনপুর যেতে হবে'—তখন তিলমাত্র আলস্য না করিয়া সটান উঠিয়া বসিলাম।

'কখন যেতে হবে?'

'এখনি। রমেনবাবুকেও নিয়ে যেতে হবে। নিশানাথবাবুর কথার ভাবে মনে হল তাঁর সন্দেহ ভূতপূর্ব অভিনেত্রী সুনয়না দেবী কাছাকাছি কোথাও বিরাজ করছেন। তাঁর সন্দেহ যদি সত্যি হয়, রমেনবাবু গিয়ে আসামীকে সনাক্ত করতে পারেন।'

আটটার মধ্যেই রমেনবাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম। তিনি লুঙ্গি ও হাতকাটা গেঞ্জি পরিয়া বৈঠকখানায় 'আনন্দবাজার' পড়িতেছিলেন, আমাদের সহর্ষে স্বাগত করিলেন।

ব্যোমকেশের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি উল্লাসভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'যাব না? আলবাৎ যাব। আপনারা দয়া করে পাঁচ মিনিট বসুন, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।' বলিয়া তিনি অন্দরের দিকে অন্তর্ধান করিলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি তৈয়ার হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। একেবারে ফিট্‌ফাট বাবু; যেমনটি কাল সন্ধ্যায় দেখিয়াছিলাম।

শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছিয়া তিনি আমাদের টিকিট কিনিতে দিলেন না, নিজেই তিনখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া ট্রেনে অধিষ্ঠিত হইলেন। দেখিলাম আমাদের চেয়ে তাঁরই ব্যগ্রতা ও উৎসাহ বেশি।

ঘন্টাখানেক পরে উদ্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছান গেল। লোকজন বেশি নাই; বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পানের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া একটি লোক পান চিবাইতে চিবাইতে দোকানির

সহিত রসালাপ করিতেছে। ব্যোমকেশ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'গোলাপ কলোনী কোন্ দিকে বলতে পারেন ?'

লোকটি এক চক্ষু মুদিত করিয়া আমাদের ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর এড়ো গলায় বলিল,—'চিড়িয়াখানা দেখতে যাবেন ?'

'চিড়িয়াখানা !'

'ঐ যার নাম চিড়িয়াখানা তারই নাম গোলাপ কলোনী। আজব জায়গা—আজব মানুষগুলি। অমন চিড়িয়াখানা আলিপুরেও নেই। তা—যাবার আর কষ্ট কি ? ঐ যে চিড়িয়াখানার রথ রয়েছে ওতে চড়ে বসুন, গড়গড় করে চলে যাবেন।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, স্টেশন-প্রাঙ্গণের এক পাশে একটি জীর্ণকায় ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েদের স্কুল-কলেজের গাড়ির মত লম্বা ধরনের গাড়ি। তাহার গায়ে এককালে সোনার জলে গোলাপ কলোনী লেখা ছিল, কিন্তু এখন তাহা প্রায় অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। গাড়িতে লোকজন কেহ আছে বলিয়া বোধ হইল না, কেবল ঘোড়াটা একক দাঁড়াইয়া পা ছুঁড়িয়া মাছি তাড়াইতেছে।

কাছে গিয়া দেখিলাম গাড়ির পিছনের পা-দানে বসিয়া একটি লোক নিবিষ্টমনে বিড়ি টানিতেছে। লোকটি মুসলমান, বয়স হইয়াছে। দাড়ির প্রাচুর্য নাই, মুখময় ডুমো ডুমো ব্রণের ন্যায় মাংস উঁচু হইয়া আছে, চোখ দুটিতে ঘোলাটে অভিজ্ঞতা ; পরনে ময়লা পায়জামার উপর ফতুয়া। আমাদের দেখিয়া সে বিড়ি ফেলিয়া উঠিয়া বলিল,—'কলকাতা হতে আসতেছেন ?'

'হ্যাঁ। গোলাপ কলোনী যাব।'

'আসেন। আপনাগোরে লইয়া যাইবার কথা বাবু কইছেন। কিন্তু মুস্কিল হইছে—'

বুঝিলাম ইনিই মুস্কিল মিঞা। ব্যোমকেশ বলিল,—'মুস্কিল কিসের ?'

মুস্কিল বলিল,—'রসিকবাবুরও এই টেরেনে আওনের কথা। তা তিনি আইলেন না। পরের টেরনের জৈন্য সবুর করতি হইব। তা বাবু মশায়রা গাড়ির মধ্যে বসেন।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'রসিকবাবুটি কে ?'

মুস্কিল বলিল,—'কলোনীর বাবু, রোজ দু'বেলা রেলে আয়েন যায়েন, আজ কি কারণে দেরি হইছে। বসেন না, পরের গাড়ি এখনই আইব।'

মুস্কিল গাড়ির দ্বার খুলিয়া দিল। ভিতরে মানুষ বসিবার স্থান তিন চারিটি আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থান স্তূপীকৃত শূন্য চ্যাঙারির দ্বারা পূর্ণ। অনুমান করা যায় প্রত্যহ প্রাতে এইসব চ্যাঙারিতে গোলাপ কলোনী হইতে ফুল শাকসব্জি স্টেশনে আসে এবং কলিকাতার অভিমুখে রওনা হইয়া যায় ; ওদিকে কলিকাতা হইতে পূর্বদিনের শূন্য চ্যাঙারিগুলি ফিরিয়া আসে। কর্মী মানুষগুলিরও যাতায়াত এই ভ্যানের সাহায্যেই সাধিত হয়।

রৌদ্রের তাপ বাড়িতেছিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকার চেয়ে গাড়ির ছায়ান্তরালে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া আমরা গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম।

মুস্কিল মিঞা গাল্পিক লোক, মানুষ পাইলে গল্প করিতে ভালবাসে। সে বলিল,—'বাবু মশায়রা দুই-চারিদিন হেথায় থাকবেন তো ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আজই ফিরব।—তুমি মুস্কিল মিঞা ?'

মুস্কিল মুখ মচ্‌কাইয়া বলিল,—'নাম তো কর্তা সৈয়দ নুরুদ্দিন। কিন্তু মুস্কিল হৈছে বাবুরা আদর কৈরা মুস্কিল মিঞা ডাকেন।'

'এ আর মুস্কিল কি ?—কতদিন আছো গোলাপ কলোনীতে ?'

'আন্দাজ সাত আট বছর হৈতে চলল। তখন বোষ্টম ঠাকুর ছাড়া আর কোনও কর্তাই দেখা দেন নাই। আমি পুরান লোক।'

'হুঁ। তোমার গাড়ি আর ঘোড়াও তো বেশ পুরান মনে হচ্ছে।'

মুস্কিল আক্ষেপ করিয়া বলিল,—'আর কন্ কেন কর্তা। ঘোড়াডার মরবার বয়স হইছে,

নেহাৎ আদত পড়ে গেছে তাই গাড়ি টানে। বড়বিবিরে কতবার কইছি, ও দুটো গাড়ি ঘোড়ারে বাতিল্ কৈরা নূতন মটর-ভ্যান খরিদ কর। তা মুস্কিল হৈছে, বড়বিবি কয় টাকা নাই।'

'বড়বিবি কে? নিশানাথবাবুর স্ত্রী?'

'হ। ভারি লক্ষ্মীমন্তর মেইয়া।'

'তিনিই বুঝি কলোনী দেখাশোনা করেন?'

'দেখাশুনা কর্তাবাবুও করে। কিন্তু টাকাকড়ি হিসাব-নিকাশ বড়বিবির হাতে।'

'তা বড়বিবি টাকা নাই বলে কেন? কলোনীর ব্যবসা কি ভাল চলে না?'

মুস্কিল মিঞার ঘোলাটে চোখে একটা গভীর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল,—'চলে তো ভালই। এত ফুল ফল ঘি মাখন আণ্ডা যায় কোথায়? তবে কি জানেন কর্তা, লাভের গুড় পিপ্ড়া খাইয়া যায়।' ইঙ্গিতপূর্ণ চক্ষে আমাদের তিনজনকে একে একে নিরীক্ষণ করিল।

মুস্কিল মিঞার নিকট হইতে ব্যোমকেশ হয়তো আরও আভ্যন্তরীণ তথ্য সংগ্রহ করিত, কিন্তু এই সময় দক্ষিণ হইতে একটি ট্রেন আসিয়া স্টেশনে থামিল। এবং অল্পকাল পরে একটি ক্ষিপ্রচারী ভদ্রলোক আসিয়া গাড়ির কাছে দাঁড়াইলেন। ইনি বোধ হয় রসিকবাবু।

ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, কিন্তু আকৃতি ম্লান ও শুষ্ক। বৃষকাষ্ঠের মত দেহে লংক্লথের পাঞ্জাবি অত্যন্ত বেমানানভাবে ঝুলিয়া আছে, গাল-বসা খাপ্‌রা-ওঠা মুখ, জোড়া ভুরুর নিচে চোখদুটি ঘন-সন্নিবিষ্ট, মুখে খুঁৎখুঁতে অতৃপ্ত ভাব। গাড়ির মধ্যে আমাদের বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মুখ আরও খুঁৎখুঁতে হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—'আপনারা— ?'

ব্যোমকেশ নিজের পরিচয় দিয়া বলিল,—'নিশানাথবাবু আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন— ।'

রসিকবাবুর ঘন-সন্নিবিষ্ট চোখে একটা ক্ষণস্থায়ী আশঙ্কা পলকের জন্য চমকিয়া উঠিল; মনে হইল তিনি ব্যোমকেশের নাম জানেন। তারপর তিনি চট্ করিয়া গাড়িতে উঠিয়া বলিলেন,—'মুস্কিল, গাড়ি হাঁকাও। দেরি হয়ে গেছে।'

মুস্কিল ইতিমধ্যে সামনে উঠিয়া বসিয়াছিল, ঘোড়ার নিতম্বে দু'চার ঘা খেজুর ছড়ি বসাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

রসিকবাবু তখন আত্ম-পরিচয় দিলেন। তাঁহার নাম রসিকলাল দে, গোলাপ কলোনীর বাসিন্দা, হগ্ সাহেবের বাজারে তরিতরকারির দোকানের ইন্-চার্জ।

এই সময় তাঁহার ডান হাতের দিকে দৃষ্টি পড়িতে চমকিয়া উঠিলাম। হাতের অঙ্গুষ্ঠ ছাড়া বাকি আঙুলগুলা নাই, কে যেন ভোজালির এক কোপে কাটিয়া লইয়াছে।

ব্যোমকেশও হাত লক্ষ্য করিয়াছিল, সে শান্তস্বরে বলিল,—'আপনি কি আগে কোনও কল-কারখানায় কাজ করতেন?'

রসিকবাবু হাতখানি পকেটের মধ্যে লুকাইলেন, ম্লানকণ্ঠে বলিলেন,—'কটন মিলের কারখানায় মিস্ত্রি ছিলাম, ভাল মাইনে পেতাম। তারপর করাত-মেসিনে আঙুলগুলো গেল; কিছু খেসারৎ পেলাম বটে, নাকের বদলে নরুন! কিন্তু আর কাজ জুটল না। বছর দুই থেকে নিশানাথবাবুর পিঁজরাপোলে আছি।' তাঁহার মুখ আরও শীর্ণ-ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল।

আমরা নীরব রহিলাম। গাড়ি ক্ষুদ্র শহরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া খোলা মাঠের রাস্তা ধরিল।

ভাবিতে লাগিলাম, গোলাপ কলোনীর দেখি অনেকগুলি নাম! কেহ বলে চিড়িয়াখানা, কেহ বলে পিঁজরাপোল। না জানি সেখানকার অন্য লোকগুলি কেমন। যে দুইটি নমুনা দেখিলাম তাহাতে মনে হয় চিড়িয়াখানা ও পিঁজরাপোল দুটি নামই সার্থক।

চার

রাস্তাটি ভাল ; পাশ দিয়া টেলিফোনের খুঁটি চলিয়াছে। যুদ্ধের সময় মার্কিন পথিকৃৎ এই পথ ও টেলিফোনের সংযোগ নিজেদের প্রয়োজনে তৈয়ার করিয়াছিল, যুদ্ধের শেষে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পথের শেষে আরও যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন চোখে পড়িল ; একটা স্থানে অগণিত সামরিক মোটর গাড়ি। পাশাপাশি শ্রেণীবদ্ধভাবে গাড়িগুলি সাজানো ; সর্বাঙ্গে মরিচা ধরিয়াছে, রঙ্ চটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের শ্রেণীবিন্যাস ভগ্ন হয় নাই। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় এ যেন যান্ত্রিক সভ্যতার গোরস্থান।

এই সমাধিক্ষেত্র যেখানে শেষ হইয়াছে সেখান হইতে গোলাপ কলোনীর সীমানা আরম্ভ। আন্দাজ পনরো-কুড়ি বিঘা জমি কাঁটা-তার দিয়া ঘেরা, কাঁটা-তারের ধারে ধারে ত্রিশিরা ফণিমনসার ঝাড়। ভিতরে বাগান, বাগানের ফাঁকে ফাঁকে লাল টালি ছাওয়া ছোট ছোট কুঠি। মালীরা রবারের নলে করিয়া বাগানে জল দিতেছে। চারিদিকের ঝলসানো পরিবেশের মাঝখানে গোলাপ কলোনী যেন একটি শ্যামল ওয়েসিস্।

ক্রমে কলোনীর ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ফটকে দ্বার নাই, কেবল আগড় লাগাইবার ব্যবস্থা আছে। দুইদিকের স্তম্ভ হইতে মাধবীলতা উঠিয়া মাথার উপর তোরণমাল্য রচনা করিয়াছে। গাড়ি ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল।

ফটকে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই একটি বাড়ি। টালির ছাদ, বাংলো ধরনের বাড়ি ; নিশানাথবাবু এখানে থাকেন। আমরা গাড়ির মধ্যে বসিয়া দেখিলাম বাড়ির সদর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া একটি মহিলা ঝারিতে করিয়া গাছে জল দিতেছেন। গাড়ির শব্দে তিনি মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন ; ক্ষণেকের জন্য একটি সুন্দরী যুবতীর মুখ দেখিতে পাইলাম। তারপর তিনি ঝারি রাখিয়া দ্রুত বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমরা তিনজনেই যুবতীকে দেখিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ বক্রচক্ষে একবার রমেনবাবুর পানে চাহিল। রমেনবাবু অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িলেন, কথা বলিলেন না। লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কলিকাতার বাহিরে পা দিয়া রমেনবাবু কেমন যেন নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতার যাঁহারা খাস বাসিন্দা তাঁহারা কলিকাতার বাহিরে পদার্পণ করিলে ডাঙায় তোলা মাছের মত একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন।

গাড়ি আসিয়া দ্বারের সম্মুখে থামিলে আমরা একে একে অবতরণ করিলাম। নিশানাথবাবু দ্বারের কাছে আসিয়া আমাদের সম্ভাষণ করিলেন। পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও লিনেনের কুর্তা। হাসিমুখে বলিলেন,—'আসুন ! রোদ্দুরে খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়।'—এই পর্যন্ত বলিয়া রসিক দে'র প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। রসিক দে আমাদের সঙ্গে গাড়ি হইতে নামিয়াছিল এবং অলক্ষিতে নিজের কুঠির দিকে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া নিশানাথবাবুর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, তিনি বলিলেন,—'রসিক, তোমার হিসেব এনেছ ?'

রসিক যেন কুঁচ্‌কাইয়া গেল, ঠোঁট চাটিয়া বলিল,—'আজ্ঞে, আজ হয়ে উঠল না। কাল-পরশুর মধ্যেই—'

নিশানাথবাবু আর কিছু বলিলেন না, আমাদের লইয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

বসিবার ঘরটি মাঝারি আয়তনের ; আসবাবের জাঁকজমক নাই কিন্তু পারিপাট্য আছে। মাঝখানে একটি নিচু গোল টেবিল, তাহাকে ঘিরিয়া কয়েকটা গদিযুক্ত চেয়ার। দেয়ালের গায়ে বইয়ের আলমারি। এক কোণে টিপাইয়ের উপর টেলিফোন, তাহার পাশে রোল্-টপ্ টেবিল। বাহিরের দিকের দেয়ালে দুটি জানালা, উপস্থিত রৌদ্রের ঝাঁঝ নিবারণের জন্য গাঢ় সবুজ রঙের পর্দা দিয়া ঢাকা।

রমেনবাবুর পরিচয় দিয়া আমরা উপবিষ্ট হইলাম। নিশানাথবাবু বলিলেন,—'তেতে পুড়ে

এসেছেন, একটু জিরিয়ে নিন। তারপর বাগান দেখাব। এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গেও পরিচয় হবে।' তিনি সুইচ টিপিয়া বৈদ্যুতিক পাখা চালাইয়া দিলেন।

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—'আপনার বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে দেখছি।'

নিশানাথবাবু বলিলেন,—'হ্যাঁ, আমার নিজের ডায়নামো আছে। বাগানে জল দেবার জন্যে কুয়ো থেকে জল পাম্প করতে হয়। তাছাড়া আলো-বাতাসও পাওয়া যায়।'

আমিও ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া দেখিলাম টালির নিচে সমতল করিয়া তক্তা বসানো, তক্তা ভেদ করিয়া মোটা লোহার ডাণ্ডা বাহির হইয়া আছে, ডাণ্ডার বাঁকা হুক হইতে পাখা ঝুলিতেছে। অনুরূপ আর একটা ডাণ্ডার প্রান্তে আলোর বাল্‌ব।

পাখা চালু হইলে তাহার উপর হইতে কয়েকটি শুষ্ক ঘাসের টুকরা ঝরিয়া টেবিলের উপর পড়িল। নিশানাথ বলিলেন,—'চড়ুই পাখি। কেবলই পাখার ওপর বাসা বাঁধবার চেষ্টা করছে। ক্লান্তি নেই, নৈরাশ্য নেই, যতবার ভেঙে দেওয়া হচ্ছে ততবার বাঁধছে।' তিনি ঘাসের টুকরাগুলি কুড়াইয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন।

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—' ভারি একগুঁয়ে পাখি।'

নিশানাথবাবুর মুখে একটু অম্লরসাক্ত হাসি দেখা দিল, তিনি বলিলেন,—'এই একগুঁয়েমি যদি মানুষের থাকত !'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মানুষের বুদ্ধি বেশি, তাই একগুঁয়েমি কম।'

নিশানাথ বলিলেন,—'তাই কি ? আমার তো মনে হয় মানুষের চরিত্র দুর্বল, তাই একগুঁয়েমি কম।'

ব্যোমকেশ তাঁহার পানে হাস্য-কুঞ্চিত চোখে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'আপনি দেখছি মানুষ জাতটাকে শ্রদ্ধা করেন না।'

নিশানাথ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া হাল্কা সুরে বলিলেন,—'বর্তমান সভ্যতা কি শ্রদ্ধা হারানোর সভ্যতা নয় ? যারা নিজের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়েছে তারা আর কাকে শ্রদ্ধা করবে ?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিয়াছিল এমন সময় ভিতর দিকের পর্দা নড়িয়া উঠিল। যে মহিলাটিকে পূর্বে গাছে জল দিতে দেখিয়াছিলাম তিনি বাহির হইয়া আসিলেন ; তাঁহার হাতে একটি ট্রে'র উপর কয়েকটি সরবতের গেলাস।

মহিলাটিকে দূর হইতে দেখিয়া যতটা অল্পবয়স্কা মনে হইয়াছিল আসলে ততটা নয়। তবে বয়স ত্রিশ বছরের বেশিও নয়। সুগঠিত স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ, সুশ্রী মুখ, টক্‌টকে রঙ ; যৌবনের অপরপ্রান্তে আসিয়াও দেহ যৌবনের লালিত্য হারায় নাই। সবার উপর একটি সংযত আভিজাত্যের ভাব।

তিনি কে তাহা জানি না, তবু আমরা তিনজনেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিশানাথবাবু নীরস কণ্ঠে পরিচয় দিলেন,—'আমার স্ত্রী—দময়ন্তী।'

নিশানাথবাবুর স্ত্রী !

প্রস্তুত ছিলাম না। স্বভাবতই ধারণা জন্মিয়াছিল নিশানাথবাবুর স্ত্রী বয়স্থা মহিলা ; দ্বিতীয় পক্ষের কথা একেবারেই মনে আসে নাই। আমাদের মুখের বোকাটে বিস্ময় বোধ করি অসভ্যতাই প্রকাশ করিল। তারপর আমরা নমস্কার করিলাম। দময়ন্তী দেবী সরবতের ট্রে টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া বুকের কাছে দুই হাত যুক্ত করিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন। নিশানাথ বলিলেন,—'এঁরা আজ এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন।'

দময়ন্তী দেবী একটু হাসিয়া ঘাড় ঝুঁকাইলেন, তারপর ধীরপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আমরা আবার উপবেশন করিলাম। নিশানাথ আমাদের হাতে সরবতের গেলাস দিয়া কথাচ্ছলে বলিলেন,—'এখানে চাকর-বাকর নেই, নিজেদের কাজ আমরা নিজেরাই করি।'

ব্যোমকেশ ঈষৎ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল,—'সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু আমরা এসে

মিসেস সেনের কাজ বাড়িয়ে দিলাম না তো ? আমাদের জন্যে আবার নতুন করে রান্নাবান্না—'

নিশানাথ বলিলেন,—'আপনাদের আসার খবর আগেই দিয়েছি, কোনও অসুবিধা হবে না। মুকুল বলে একটি মেয়ে আছে, রান্নার ভার তারই ; আমার স্ত্রী সাহায্য করেন। এখানে আলাদা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই ; একটা রান্নাঘর আছে, সকলের রান্না একসঙ্গে হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনার এখানকার ব্যবস্থা দেখে সত্যিকার আশ্রম বলে মনে হয়।'

নিশানাথবাবু কেবল একটু অম্লরসাক্ত হাসিলেন। ব্যোমকেশ সরবতে চুমুক দিয়া বলিল,—'বাঃ, চমৎকার ঠাণ্ডা সরবৎ, কিন্তু বরফ দেওয়া নয়। ফ্রিজিডেয়ার আছে !'

নিশানাথ বলিলেন,—'তা আছে।—এবার মোটরের টুকরোগুলো আপনাকে দেখাই। ফ্রিজিডেয়ারের অস্তিত্ব যেমন চট্ করে বলে দিলেন আমার অজ্ঞাত উপহারদাতার নামটাও তেমনি বলে দিন তবে বুঝব।'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল,—'নিশানাথবাবু, পৃথিবীর সব রহস্য যদি আপনার ফ্রিজিডেয়ারের মত স্বয়ংসিদ্ধ হত তাহলে আমার মত যারা বুদ্ধিজীবী তাদের অন্ন জুটত না।—ভাল কথা, কাল আপনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা না দিয়ে ষাট টাকা দিয়ে এসেছিলেন।'

নিশানাথবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—'তাই নাকি ? ভাগ্যে কম টাকা দিইনি। তা ও টাকা আপনার কাছেই থাক, পরে না হয় হিসেব দেবেন।'

হিসাব দেওয়া কিন্তু ঘটিয়া ওঠে নাই।

নিশানাথ রোল্-টপ টেবিল খুলিয়া কয়েকটা মোটরের ভাঙা টুকরা আমাদের সম্মুখে রাখিলেন। স্পার্কিং প্লাগ, ছেঁড়া রবারের মোটর-হর্ন, টিনের লাল রঙ্-করা খেলনা মোটর, সবই রহিয়াছে ; ব্যোমকেশ সেগুলিকে দেখিল, কিন্তু বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। কেবল খেলনা মোটরটিকে সন্তর্পণে ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিল। বলিল,—'এতে কারুর আঙুলের টিপ দেখছি না, একেবারে ঝাড়া মোছা।'

নিশানাথ বলিলেন,—'আঙুলের ছাপ আমিও খুঁজেছিলাম কিন্তু কিছু পাইনি। আমার উপহারদাতা খুব সাবধানী লোক।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হুঁ। মোটরের টুকরোগুলো অবশ্য দাতা মহাশয় পাশের মোটর-ভাগাড় থেকে সংগ্রহ করেছেন। এ থেকে একটা কথা আন্দাজ করা যায়।'

'কী আন্দাজ করা যায় ?'

'দাতা মহাশয় কাছেপিঠের লোক। এখানে আশেপাশে কোনও বসতি আছে নাকি ?'

'না। মাইলখানেক আরও এগিয়ে গেলে মোহনপুর গ্রাম পাওয়া যায়। আমার মালীরা সেখান থেকেই কাজ করতে আসে।'

'মোহনপুরে ভদ্রশ্রেণীর কেউ থাকে ?'

'দু' এক ঘর থাকতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগই চাষাভূষো ! তাদের কাউকে আমি চিনিও না। অবশ্য মালীদের ছাড়া।'

'সুতরাং সেদিক থেকে উপহার পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, কারণ যিনি উপহার পাঠাচ্ছেন তিনি ভদ্রশ্রেণীর লোক। চলুন এবার আপনারা, কলোনী পরিদর্শন করা যাক।'

কলোনী পরিদর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কলোনীর মানুষগুলিকে, বিশেষ নারীগুলিকে চাক্ষুষ করা, একথা আমরা সকলে মনে মনে জানিলেও মুখে কেহই তাহা প্রকাশ করিল না। নিশানাথবাবু আমাদের জন্য তিনটি ছাতা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইলাম। তিনি নিজে একটি সোলা-হ্যাট্ পরিয়া লইলেন। কালো কাচের চশমা তাঁহার চোখেই ছিল।

এইখানে, উদ্যান পরিক্রমা আরম্ভ করিবার আগে, গোলাপ কলোনীর একটি নক্সা পাঠকদের সম্মুখে স্থাপন করিতে চাই। নক্সা থাকিলে দীর্ঘ বর্ণনার প্রয়োজন হইবে না।—
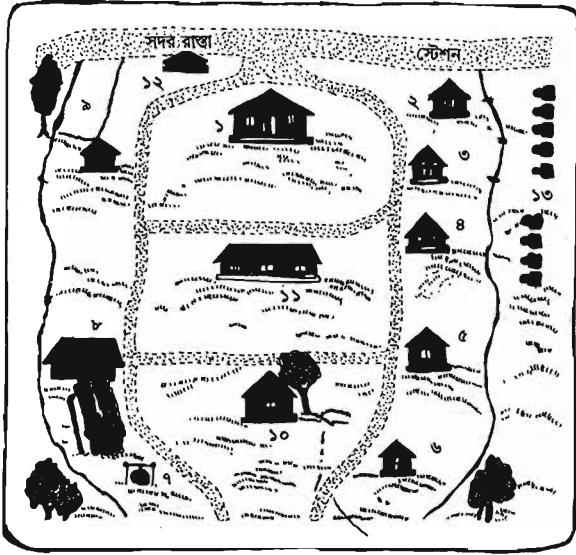
১। নিশানাথ গৃহ ; ২। বিজয়ের ঘর ; ৩। বনলক্ষ্মীর ঘর ; ৪। ভুজঙ্গধরের ঘর ও ঔষধালয় ; ৫। ব্রজদাসের ঘর ; ৬। রসিকের ঘর ; ৭। কূপ ; ৮। আস্তাবল ও মুস্কিলের ঘর ; ৯। গোশালা ও পানুর ঘর ; ১০। মুকুল ও নেপালের ঘর ; ১১। ভোজনকক্ষ ও পাকশালা ; ১২। অব্যবহৃত হট্-হাউস ; ১৩। সামরিক মোটরের সমাধিক্ষেত্র।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আমরা বাঁ দিকের পথ ধরিলাম। সুরকি-ঢাকা পথ সঙ্কীর্ণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন, আঁকিয়া বাঁকিয়া কলোনীর সমস্ত গৃহগুলিকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রথমেই পড়িল ফটকের পাশে লম্বা টানা একটা ঘর। মাথার উপর টালির ফাঁকে ফাঁকে কাচ বসানো, দেওয়ালেও বড় বড় কাচের জানালা। কিন্তু ঘরটি অনাদৃত, কাচগুলি অধিকাংশই ভাঙিয়া গিয়াছে ; অন্ধের চক্ষুর মত ভাঙা ফোকরের ভিতর দিয়া কেবল অন্ধকার দেখা যায়।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'এটা কি ?'

নিশানাথ বলিলেন,—'হট্-হাউস করেছিলাম, এখন পড়ে আছে। বেশি শীত বা গরম পড়লে কচি চারাগাছ এনে রাখা হয়।'

পাশ দিয়া যাইবার সময় ভাঙা দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ভিতরে কয়েকটা ধূলিধূসর বেঞ্চি পড়িয়া আছে। মেঝের উপর কতকগুলি মাটিভরা চ্যাঙারি রহিয়াছে, তাহাতে নবাঙ্কুরিত গাছের চারা।

এখান হইতে সম্মুখের সীমানার সমান্তরাল খানিক দূর অগ্রসর হইবার পর গোহালের কাছে উপস্থিত হইলাম। চেঁচারির বেড়া দিয়া ঘেরা অনেকখানি জমি, তাহার পিছন দিকে লম্বা খড়ের চালা ; চালার মধ্যে অনেকগুলি গরু-বাছুর বাঁধা রহিয়াছে। খোলা বাথানে খড়ের আঁটি ডাঁই করা।

গোহালের ঠিক গায়ে একটি ক্ষুদ্র টালি-ছাওয়া কুঠি। আমরা গোহালের সম্মুখে উপস্থিত হইলে একটি লম্বা-চওড়া যুবক কুঠির ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। গায়ে গেঞ্জি, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় ; দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

যুবকের দেহ বেশ বলিষ্ঠ কিন্তু মুখখানি বোকাটে ধরনের। আমাদের কাছে আসিয়া সে দুই কানের ভিতর হইতে খানিকটা তুলা বাহির করিয়া ফেলিল এবং আমাদের পানে চাহিয়া হাবলার মত হাসিতে লাগিল। হাসি কিন্তু সম্পূর্ণ নীরব হাসি, গলা হইতে কোনও আওয়াজ বাহির হইতে শুনিলাম না।

নিশানাথ বলিলেন,—'এর নাম পানু। গো-পালন করে তাই ওকে পানুগোপাল বলা হয়। কানে কম শোনে।'

পানুগোপাল পূর্ববৎ হাসিতে লাগিল, সে নিশানাথবাবুর কথা শুনিতে পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। নিশানাথবাবু একটু গলা চড়াইয়া বলিলেন,—'পানুগোপাল, তোমার গরু-বাছুরের খবর কি ? সব ভাল তো ?'

প্রত্যুত্তরে পানুগোপালের কণ্ঠ হইতে ছাগলের মত কম্পিত মিহি আওয়াজ বাহির হইল। চমকিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম সে প্রাণপণে কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। নিশানাথবাবু হাত তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন, খাটো গলায় বলিলেন,—'পানু যে একেবারে কথা বলতে পারে না তা নয়, কিন্তু একটু উত্তেজিত হলেই কথা আটকে যায়। ছেলেটা ভাল, কিন্তু ভগবান মেরেছেন।'

অতঃপর আমরা আবার অগ্রসর হইলাম, পানুগোপাল দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু দূর গিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম পানুগোপাল আবার কানে তুলা গুঁজিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'পানুগোপাল কানে তুলো গোঁজে কেন ?'

নিশানাথ বলিলেন,—'কানে পুঁজ হয়।'

কিছুদূর চলিবার পর বাঁ দিকে রাস্তার একটা শাখা গিয়াছে দেখিলাম ; রাস্তাটি নিশানাথবাবুর বাড়ির পিছন দিক দিয়া গিয়াছে, মাঝে পাতা-বাহার ক্রোটন গাছে ভরা জমির ব্যবধান। এই রাস্তার মাঝামাঝি একটি লম্বাটে গোছের বাড়ি। নিশানাথবাবু সেই দিকে মোড় লইয়া বলিলেন,—'চলুন, আমাদের রান্নাঘর খাবারঘর দেখবেন।'

পূর্বে শুনিয়াছি মুকুল নামে একটি মেয়ে কলোনীর রান্নাবান্না করে। অনুমান করিলাম মুকুলকে দেখাইবার জন্যই নিশানাথবাবু আমাদের এদিকে লইয়া যাইতেছেন।

ভোজনালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখা গেল, একটি লম্বা ঘরকে তিন ভাগ করা হইয়াছে ; একপাশে রান্নাঘর, মাঝখানে আহারের ঘর এবং অপর পাশে স্নানাদির ব্যবস্থা। রান্নাঘর হইতে ছ্যাক্‌ছোঁক শব্দ আসিতেছিল, নিশানাথবাবু সে দিকে চলিলেন।

আমাদের সাড়া পাইয়া দময়ন্তী দেবী রান্নাঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; কোমরে আঁচল জড়ানো, হাতে খুন্তি। তাঁহাকে এই নূতন পরিবেশের মধ্যে দেখিয়া মনে হইল, আগে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম ইনি সে-মানুষ নন, সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। প্রথমে দূর হইতে দেখিয়া একরকম মনে হইয়াছিল, তারপর সরবতের ট্রে হাতে তাঁহার অন্যরূপ আকৃতি দেখিয়াছিলাম, এখন আবার আর এক রূপ। কিন্তু তিনটি রূপই প্রীতিকর।

দময়ন্তী দেবী একটু উৎকণ্ঠিতভাবে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। নিশানাথ বলিলেন,—'তুমি রান্না করছ ? মুকুল কোথায় ?'

দময়ন্তী দেবী বলিলেন,—'মুকুলের বড় মাথা ধরেছে, সে রান্না করতে পারবে না। শুয়ে আছে।'

নিশানাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—'তাহলে বনলক্ষ্মীকে ডেকে পাঠাওনি কেন ? সে

তোমাকে যোগান দিতে পারত।'

দময়ন্তী বলিলেন,—'দরকার নেই, আমি একলাই সামলে নেব।'

নিশানাথের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া রহিল, তিনি আর কিছু না বলিয়া ফিরিলেন। এই সময় স্নানঘরের ভিতর হইতে একটি যুবক তোয়ালে দিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল,—'কাকিমা, শীগ্‌গির শীগ্‌গির—এখনি কলকাতা যেতে হবে—' এই পর্যন্ত বলিবার পর সে তোয়ালে হইতে মুখ বাহির করিয়া আমাদের দেখিয়া থামিয়া গেল।

দময়ন্তী বলিলেন,—'আসন পেতে বোসো, ভাত দিচ্ছি। সব রান্না কিন্তু হয়নি এখনও।' তিনি রান্নাঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

আমাদের সম্মুখে যুবক স্নানসিক্ত নগ্নদেহে বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল, সে তোয়ালে গায়ে জড়াইয়া আসন পাতিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার বয়স আন্দাজ ছাব্বিশ-সাতাশ, বলবান সুদর্শন চেহারা। নিশানাথ অপ্রসন্নভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—'বিজয়, তুমি এখনও কাজে যাওনি?'

বিজয় কাঁচুমাচু হইয়া বলিল,—'আজ দেরি হয়ে গেছে কাকা।—হিসেবটা তৈরি করছিলাম—'

নিশানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হিসেব কতদূর?'

'আর দু'তিন দিন লাগবে।'

ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নিশানাথ দ্বারের দিকে চলিলেন, আমরা অনুবর্তী হইলাম। হিসাব লইয়া গোলাপ কলোনীতে একটা গোলযোগ পাকাইয়া উঠিতেছে মনে হইল।

দ্বারের নিকট হইতে পিছন ফিরিয়া দেখি, বিজয় বিস্ময়-কুতূহলী চক্ষে আমাদের পানে তাকাইয়া আছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইতে সে ঘাড় নিচু করিল।

বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ নিশানাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনার ভাইপো? উনিই বুঝি ফুলের দোকান দেখেন?'

'হ্যাঁ।'

পাঁচ

যেদিক দিয়া আসিয়াছিলাম সেই দিক দিয়াই ফিরিয়া চলিলাম। মোড় পর্যন্ত পৌঁছিবার আগেই দেখা গেল সম্মুখের রাস্তা দিয়া একটি যুবতী এক ঝাঁক পাতিহাঁস তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

যুবতী আমাদের দেখিতে পায় নাই। তাহার মাথার কাপড় খোলা, পরনে মোটা তাঁতের লুঙ্গি-ডুরে শাড়ি, দেহে ভরা যৌবন। অন্যমনস্কভাবে যাইতে যাইতে আমাদের দিকে চোখ ফিরাইয়া যুবতী লজ্জায় যেন শিহরিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রহস্তে মাথার উপর ঘোমটা টানিয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি হাঁসগুলিকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল। কলোনীর পিছন দিকে প্রকাণ্ড ইঁদারার পাশে কয়েকটা ঘর রহিয়াছে, সেইখানে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিশানাথ বলিলেন,—'মুস্কিলের বৌ। কলোনীর হাঁস-মুরগীর ইন-চার্জ।'

মনে আবার একটা বিস্ময়ের ধাক্কা লাগিল। এখানে কি প্রভু-ভৃত্য সকলেরই দ্বিতীয় পক্ষ? ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'ওদিকে কোথায় গেল?'

নিশানাথ বলিলেন,—'ওদিকটা আস্তাবল। মুস্কিলও ওখানেই থাকে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভদ্রঘরের মেয়ে বলে মনে হয়।'

'ওদের মধ্যে কে ভদ্র, কে অভদ্র বলা শক্ত। জাতের কড়াকড়ি নেই কিনা।'

'কিন্তু পর্দার কড়াকড়ি আছে।'

'আছে, তবে খুব বেশি নয়। আমাদের দেখে নজর বিবি এখন আর লজ্জা করে না। আপনারা নতুন লোক, তাই বোধহয় লজ্জা পেয়েছে।'

নজর বিবি ! নামটা যেন সুনয়নার কাছ ঘেঁষিয়া যায় ! চকিতে মাথায় আসিল, যে স্ত্রীলোক খুন করিয়া আত্মগোপন করিতে চায়, মুসলমান অন্তঃপুরের চেয়ে আত্মগোপনের প্রকৃষ্টতর স্থান সে কোথায় পাইবে ? আমি রমেনবাবুর দিকে সরিয়া গিয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কেমন দেখলেন ?'

রমেনবাবু দ্বিধাভরে মাথা চুলকাইয়া বলিলেন,—'উহুঁ, নেত্যকালী নয় ;—কিন্তু—কিছু বলা যায় না—'

বুঝিলাম, রমেনবাবু নেত্যকালীর মেক্-আপ করিবার অসামান্য ক্ষমতার কথা ভাবিতেছেন। কিন্তু মুস্কিল মিঞার বৌ দিবারাত্র মেক্-আপ করিয়া থাকে ইহাই বা কি করিয়া সম্ভব ?

ইতিমধ্যে আমরা আর একটি বাড়ির সম্মুখীন হইতেছিলাম। ভোজনালয় যে রাস্তার উপর তাহার পিছনে সমান্তরাল একটি রাস্তা গিয়াছে, এই রাস্তার মাঝামাঝি স্থানে একটি কুঠি। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'এখানে কে থাকে ?'

নিশানাথ বলিলেন,—'এখানে থাকেন প্রফেসার নেপাল গুপ্ত আর তাঁর মেয়ে মুকুল।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'নেপাল গুপ্ত—নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে। বছর তিন-চার আগে এঁর নাম কাগজে দেখেছি মনে হচ্ছে।'

নিশানাথ বলিলেন,—'অসম্ভব নয়। নেপালবাবু এক কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রাত্রে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন। একদিন ল্যাবরেটরিতে বিরাট বিস্ফোরণ হল, নেপালবাবু গুরুতর আহত হলেন। কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করলেন নেপালবাবু লুকিয়ে লুকিয়ে বোমা তৈরি করছিলেন। চাকরি তো গেলই, পুলিসের নজরবন্দী হয়ে রইলেন। যুদ্ধের পর পুলিসের শুভদৃষ্টি থেকে মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু চাকরি আর জুটল না। বিস্ফোরণের ফলে তাঁর চেহারা এবং চরিত্র দুই-ই দাগী হয়ে গিয়েছে।'

'সত্যিই কি উনি বোমা তৈরি করছিলেন ? উনি নিজে কি বলেন ?'

নিশানাথ মুখ টিপিয়া হাসিলেন,—'উনি বলেন গাছের সার তৈরি করছিলেন।'

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। নিশানাথ বলিয়া চলিলেন,—'এখানে এসেও সার তৈরি করা ছাড়েননি। বাড়িতে ল্যাবরেটরি করেছেন, অর্থাৎ গ্যাস-সিলিন্ডার, বুনসেন বার্নার, টেস্ট-টিউব, রেটর্ট ইত্যাদি যোগাড় করেছেন। একবার খানিকটা সার তৈরি করে আমাকে দিলেন, বললেন, পেঁপে গাছের গোড়ায় দিলে ইয়া ইয়া পেঁপে ফলবে। আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু উনি শুনলেন না—'

'শেষ পর্যন্ত কি হল ?'

'পেঁপে গাছগুলি সব মরে গেল।'

নেপালবাবুর কুঠিতে প্রবেশ করিলাম। বাহিরের ঘরে তক্তপোশের উপর একটি অর্ধ-উলঙ্গ বৃদ্ধ থাবা গাড়িয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে দাবার ছক। ছকের উপর কয়েকটি ঘুঁটি সাজানো রহিয়াছে, বৃদ্ধ একাগ্র দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া আছেন। সেই যে ইংরেজি খবরের কাগজে দাবা খেলার ধাঁধা বাহির হয়, সাদা ঘুঁটি প্রথমে চাল দিবে এবং তিন চালে মাত করিবে, বোধহয় সেই জাতীয় ধাঁধার সমাধান করিতেছেন। আমরা দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম ; কিন্তু তিনি জানিতে পারিলেন না।

নিশানাথবাবু আমাদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বুঝিলাম ইনিই বোমারু অধ্যাপক নেপাল গুপ্ত।

নেপালবাবু বয়সে নিশানাথের সমসাময়িক, কিন্তু গুণ্ডার মত চেহারা। গায়ের রঙ তামাটে কালো, মুখের একটা পাশ পুড়িয়া ঝামার মত কর্কশ ও সচ্ছিদ্র হইয়া গিয়াছে, বোধকরি বোমা

বিস্ফোরণের চিহ্ন। তাঁহার মুখখানা স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো এতটা ভয়াবহ ছিল না, কিন্তু এখন দেখিলে বুক গুরগুর করিয়া ওঠে।

নিশানাথ ডাকিলেন,—'কি হচ্ছে প্রফেসর ?'

নেপালবাবু দাবার ছক হইতে চোখ তুলিলেন, তখন তাঁহার চোখ দেখিয়া আরও ভয় পাইয়া গেলাম। চোখ দুটো আকারে হাঁসের ডিমের মত এবং মণির চারিপাশে রক্ত যেন জমাট হইয়া আছে। দৃষ্টি বাঘের মত উগ্র।

তিনি হেঁড়ে গলায় বলিলেন,—'নিশানাথ ! এস। সঙ্গে কারা ?'

দেখিলাম নেপালবাবু আশ্রয়দাতার সঙ্গে সমকক্ষের মত কথা বলেন, এমন কি কণ্ঠস্বরে একটু মুরুব্বিয়ানাও প্রকাশ পায়।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। নেপালবাবু শিষ্টতার নিদর্শন স্বরূপ হাঁটু দুটির উপর কেবল একটু কাপড় টানিয়া দিলেন। নিশানাথ বলিলেন,—'এঁরা কলকাতা থেকে বাগান দেখতে এসেছেন।'

নেপালবাবুর গলায় অবজ্ঞাসূচক একটি শব্দ হইল, তিনি বলিলেন,—'বাগানে দেখবার কি আছে তোমার ? আমার সার যদি লাগাতে তাহলে বটে দেখবার মত হত।'

নিশানাথ বলিলেন,—'তোমার সার লাগালে আমার বাগান মরুভূমি হয়ে যেত।'

নেপালবাবু গরম স্বরে বলিলেন,—'দেখ নিশানাথ, তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে তর্ক কোরো না। সয়েল কেমিস্ট্রির কী জানো তুমি ? পেঁপেগাছগুলো মরে গেল তার কারণ সারের মাত্রা বেশি হয়েছিল—তোমার মালীগুলো সব উল্লুক।' বলিয়া একটা আধপোড়া বর্মা চুরুট তক্তপোশ হইতে তুলিয়া লইয়া বজ্র-দন্তে কামড়াইয়া ধরিলেন।

নিশানাথ বলিলেন,—'সে যাক, এখন নতুন গবেষণা কি হচ্ছে ?'

নেপালবাবু চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন,—'তামাক নিয়ে experiment আরম্ভ করেছি।'

'এবার কি মানুষ মারবে ?'

নেপালবাবু চোখ পাকাইয়া তাকাইলেন,—'মানুষ মারব ! নিশানাথ, তোমার বুদ্ধিটা একেবারে সেকেলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধার দিয়ে যায় না। বিজ্ঞানের কৌশলে বিষও অমৃত হয়, বুঝেছ ?'

ঠোঁটের কোণে গোপন হাসি লইয়া নিশানাথ বলিলেন,—'তামাক থেকে যখন অমৃত বেরুবে তখন তোমাকে কিন্তু প্রথম চেখে দেখতে হবে।—এখন যাই, বেলা বাড়ছে, এঁদের বাকী বাগানটা দেখিয়ে বাড়ি ফিরব। হ্যাঁ, ভাল কথা, মুকুলের নাকি ভারি মাথা ধরেছে ?'

নেপালবাবু উত্তর দিবার পূর্বে ঘনঘন চুরুট টানিয়া ঘরের বাতাস কটু করিয়া তুলিলেন, শেষে বলিলেন,—'মুকুলের মাথা ! কি জানি, ধরেছে বোধহয়।' অবহেলাভরে এই তুচ্ছ প্রসঙ্গ শেষ করিয়া বলিলেন,—'অবৈজ্ঞানিক লে-ম্যান হলেও তোমাদের জানা উচিত যে, নতুন ওষুধ প্রথমে ইতর প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করে দেখতে হয়, যেমন ইঁদুর, গিনিপিগ। তাদের ওপর যখন ফল ভাল হয় তখন মানুষের ওপর পরীক্ষা করতে হয়।'

'কিন্তু মানুষের ওপর ফল যদি মারাত্মক হয় ?'

'এমন মানুষের ওপর পরীক্ষা করতে হয় যারা মরলেও ক্ষতি নেই। অনেক অপদার্থ লোক আছে যারা ম'লেই পৃথিবীর মঙ্গল।'

'তা আছে।' অর্থপূর্ণভাবে এই কথা বলিয়া নিশানাথ দ্বারের দিকে চলিলেন। কিন্তু ব্যোমকেশের বোধহয় এত শীঘ্র যাইবার ইচ্ছা ছিল না, সে নেপালবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি বুঝি ভাল দাবা খেলেন ?'

এতক্ষণে নেপালবাবু ব্যোমকেশকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন, ব্যাঘ্রচক্ষে চাহিয়া বলিলেন,—'আপনি জানেন দাবা খেলতে ?'

ব্যোমকেশ সবিনয়ে বলিল,—'সামান্য জানি।'

নেপালবাবু ছকের উপর ঘুঁটি সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন,—'আসুন, তাহলে এক দান খেলা

যাক।'

নিশানাথ বলিলেন,—'আরে না না, এখন দাবায় বসলে দু'ঘন্টাতেও খেলা শেষ হবে না।'

নেপালবাবু বলিলেন,—'দশ মিনিটেও শেষ হয়ে যেতে পারে।—আসুন।'

ব্যোমকেশ আমাদের দিকে একবার চোখের ইশারা করিয়া খেলায় বসিয়া গেল। মুহূর্তমধ্যে দু'জনের আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না। নিশানাথ খাটো গলায় বলিলেন,—'নেপাল খেলার লোক পায় না, আজ একজনকে পাকড়েছে, সহজে ছাড়বে না,—চলুন, আমরাই ঘুরে আসি।'

বাহির হইলাম। আমরা যে-উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি তাহাতে ব্যোমকেশের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক নয়, রমেনবাবুর উপস্থিতিই আসল।

বাড়ির বাহিরে আসিয়া পিছন দিকে জানালা খোলার শব্দে আমরা তিনজনেই পিছু ফিরিয়া চাহিলাম। বাড়ির পাশের দিকে একটা জানালা খুলিয়া গিয়াছে এবং একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে রুক্ষ উৎকণ্ঠাভরা চক্ষে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। আমরা ফিরিতেই সে দ্রুত জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

এক নজর দেখিয়া মনে হইল মেয়েটি দেখিতে ভাল ; রঙ ফরসা, কোঁকড়া চুল, মুখের গড়ন একটু কঠিন গোছের। রমেনবাবু স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বন্ধ জানালার দিকে তাকাইয়া ছিলেন, বলিলেন,—'ও কে ?'

নিশানাথ বলিলেন,—'মুকুল—নেপালবাবুর মেয়ে।'

রমেনবাবু গভীর নিশ্বাস টানিয়া আবার সশব্দে ত্যাগ করিলেন,—'ওকে আগে দেখেছি—সিনেমার স্টুডিওতে দেখেছি—'

নিশানাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে মৃদুস্বরে বলিলেন,—'কিন্তু ও সুনয়না নয় ?'

রমেনবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন,—'না—বোধ হয়—সুনয়না নয়।'

ছয়

রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে নিশানাথবাবুকে প্রশ্ন করিলাম,—'আচ্ছা, নেপালবাবুরা কতদিন হল এখানে এসেছেন ?'

নিশানাথ বলিলেন,—'প্রায় দু'বছর আগে। এক-আধ মাস কম হতে পারে।'

মনে মনে নোট করিলাম, সুনয়না প্রায় ঐ সময় কলিকাতা হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ঠিক ঠিক সময়টা মনে নেই ?'

নিশানাথ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'দু'বছর আগে, বোধহয় সেটা জুলাই মাস। মনে আছে, আমার স্ত্রী লেখাপড়া ছেড়ে দেবার দু'-তিন দিন পরেই ওরা এসেছিল।'

'আপনার স্ত্রী—লেখাপড়া—'

'আমার স্ত্রীর মাঝে লেখাপড়া আর বিলিতি আদবকায়দা শেখবার শখ হয়েছিল। মাস আষ্টেক-দশ নিয়মিত কলকাতা যাতায়াত করেছিলেন, একটা বিলিতি মেয়ে-স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পোষালো না। উনি স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাড়ি এসে বসবার দু'-তিন দিন পরে নেপালবাবু মুকুলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন।'

সংবাদটি হজম করিয়া পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরিয়া গেলাম,—'নেপালবাবু কলোনীর কোন্ কাজ করেন ?'

নিশানাথ অম্লতিক্ত হাসিলেন,—'বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, দাবা খেলেন, আর সব কাজে আমার খুঁত ধরেন।'

'আপনার খুঁত ধরেন ?'

'হ্যাঁ, আমি যে-ভাবে কলোনীর কাজ চালাই ওঁর পছন্দ হয় না। ওঁর বিশ্বাস, ওঁর হাতে

পরিচালনার ভার দিলে ঢের ভাল চালাতে পারেন।'

'উনি তাহলে কোনও কাজই করেন না?'

একটু নীরব থাকিয়া নিশানাথ বলিলেন,—'মুকুল খুব কাজের মেয়ে।'

মুকুল কাজের মেয়ে হইতে পারে; পিতার নৈষ্কর্ম সে নিজের পরিশ্রম দিয়া পুরাইয়া দেয়। কিন্তু আমরা আসিব শুনিয়া তাহার মাথা ধরিল কেন? এবং জানালা দিয়া লুকাইয়া আমাদের পর্যবেক্ষণ করিবারই বা তাৎপর্য কি?

মোড়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। সামনে পিছনে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, রাস্তার ধারে দূরে দূরে কয়েকটি কুঠি (নক্সা পশ্য)। কুঠিগুলির ব্যবধানস্থল পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে গোলাপ ও অন্যান্য ফুলের গাছ। প্রচুর জলসিঞ্চন সত্ত্বেও ফুলগাছগুলি মুহ্যমান।

মোড়ের উপর দাঁড়াইয়া নিশানাথ পিছনের কুঠির দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন,—'সবশেষের কুঠিতে রসিক থাকে। তার এদিকের কুঠি ব্রজদাসের। ঐ যে ব্রজদাস বারান্দায় বসে কি করছে।'

তিনি সেইদিকে আগাইয়া গেলেন,—'কি হে ব্রজদাস, কি হচ্ছে?'

কুঠির বারান্দায় একটি প্রবীণ ব্যক্তি মাটিতে বসিয়া একটা হামান্‌দিস্তা দুই পায়ে ধরিয়া কিছু কুটিতেছিলেন। বেঁটে গোলগাল লোকটি, মাথায় পাকা চুলের বাব্‌রি, গলায় কণ্ঠি, কপালে হরিচন্দনের তিলক। নিশানাথের গলা শুনিয়া তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাস্যমুখে বলিলেন,—'একটা গরু রুগিয়েছে, তার জন্যে জোলাপ তৈরি করছি,—নিমের পাতা, তিলের খোল আর এণ্ডির বিচি।'

'বেশ বেশ। যদি পারো প্রফেসার গুপ্তকে একটু খাইয়ে দিও, উপকার হবে।' বলিয়া নিশানাথ ফিরিয়া চলিলেন।

বৈষ্ণব ব্রজদাস মিটিমিটি হাসিতে হাসিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু দুটি কিন্তু বৈষ্ণবোচিত ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু নয়, বেশ সজাগ এবং সতর্ক। দুইজন আগন্তুককে দেখিয়া তাঁহার চক্ষে যে জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিল তাহা তিনি মুখে প্রকাশ করিলেন না। নিশানাথও পরিচয় দিলেন না।

ফিরিয়া চলিতে চলিতে নিশানাথ বলিলেন,—'ব্রজদাস চিরকাল বৈষ্ণব ছিল না। ও বৈষ্ণব হয়ে গরু-বাছুরগুলোর ভারী সুখ হয়েছে। বড় যত্ন করে, গো-বদ্যির কাজও শিখেছে। গো-সেবা বৈষ্ণবের ধর্ম কিনা।'

নিশানাথবাবুর কথার মধ্যে একটু শ্লেষের ছিটা ছিল। প্রশ্ন করিলাম,—'উনি বৈষ্ণব হওয়ার আগে কী ছিলেন?'

নিশানাথ বলিলেন,—'জজ-সেরেস্তার কেরানি। ওকে অনেকদিন থেকে জানি। মাইনে বেশি পেত না কিন্তু গান-বাজনা ফুর্তির দিকে ঝোঁক ছিল। সেরেস্তার কেরানিরা উপরি টাকাটা সিকেটা নিয়েই থাকে। কিন্তু ব্রজদাস একবার একটা গুরুতর দুষ্কার্য করে বসল। ঘুষ নিয়ে দপ্তর থেকে একটা জরুরী দলিল সরিয়ে ফেলল।'

'তারপর?'

'তারপর ধরা পড়ে গেল। ঘটনাচক্রে আমিই ওকে ধরে ফেললাম। আদালতে মামলা উঠল, আমাকে সাক্ষী দিতে হল। ছ'বছরের জন্যে ব্রজদাস শ্রীঘর গেল। ইতিমধ্যে আমি চাকরি ছেড়ে কলোনী নিয়ে পড়েছি, জেল থেকে বেরিয়ে ব্রজদাস সটান এখানে এসে উপস্থিত। দেখলাম, একেবারে বদলে গেছে; জেলের লাপ্‌সি খেয়ে খাঁটি বৈষ্ণব হয়ে উঠেছে। আমি সাক্ষী দিয়ে জেলে পাঠিয়েছিলাম সেজন্যে আমার ওপর রাগ নেই বরং কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ। সেই থেকে আছে।'

বলিলাম,—'বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী।'

নিশানাথ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—'ঠিক তাও নয়। ওর মনের একটা পরিবর্তন

হয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলছি না। তবে লক্ষ্য করেছি ও মিথ্যে কথা বলে না।'

কথা বলিতে বলিতে আমরা আর একটা কুঠির সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, শুনিতে পাইলাম কুঠির ভিতর হইতে মৃদু সেতারের আওয়াজ আসিতেছে। আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে নিশানাথ বলিলেন,—'ডাক্তার ভুজঙ্গধর। ওর সেতারের শখ আছে।'

রমেনবাবু একাগ্র মনে শুনিয়া বলিলেন,—'খাসা হাত। গৌড়-সারঙ বাজাচ্ছেন।'

ডাক্তার ভুজঙ্গধর বোধহয় জানালা দিয়া আমাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেতারের বাজনা থামিয়া গেল। তিনি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—'একি মিস্টার সেন, রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে কেন ? রোদ লাগিয়ে ব্লাড্-প্রেসার বাড়াতে চান ?'

ডাক্তার ভুজঙ্গধরের বয়স আন্দাজ চল্লিশ, দৃঢ় শরীর, ধারালো মুখ। মুখের ভাব একটু ব্যঙ্গ-বঙ্কিম ; যেন বুদ্ধির ধার সিধা পথে যাইতে না পাইয়া বিদ্রূপের বাঁকা পথ ধরিয়াছে।

নিশানাথ বলিলেন,—'এঁদের বাগান দেখাচ্ছি।'

ডাক্তার বলিলেন,—'বাগান দেখাবার এই সময় বটে। তিনজনেরই সর্দিগর্মি হবে তখন হ্যাঁপা সামলাতে হবে এই নাম-কাটা ডাক্তারকে।'

'না, আমরা এখনি ফিরব। কেবল বনলক্ষ্মীকে একবার দেখে যাব।'

ডাক্তার বাঁকা হাসিয়া বলিলেন,—'কেন বলুন দেখি ? বনলক্ষ্মী বুঝি আপনার বাগানের একটি দর্শনীয় বস্তু, তাই এঁদের দেখাতে চান ?'

নিশানাথ সংক্ষেপে বলিলেন,—'সেজন্যে নয়, অন্য দরকার আছে।'

'ও—তাই বলুন—তা ওকে ওর ঘরেই পাবেন বোধহয়। এত রোদ্দুরে সে বেরুবে না, ননীর অঙ্গ গলে যেতে পারে।'

'ডাক্তার, তুমি বনলক্ষ্মীকে দেখতে পার না কেন বল দেখি ?'

ডাক্তার একটু জোর করিয়া হাসিলেন,—'আপনারা সকলেই তাকে দেখতে পারেন, আমি দেখতে না পারলেও তার ক্ষতি নেই।—সে যাক, আপনার আবার রক্তদান করবার সময় হল। আজ বিকেলে আসব নাকি ইন্‌জেকশনের পিচ্‌কিরি নিয়ে ?'

'এখনো দরকার বোধ করছি না।' বলিয়া নিশানাথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

সাত

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'রক্তদানের কথা কি বললেন ডাক্তার ?'

নিশানাথ বলিলেন,—'ব্লাড্-প্রেসারের জন্যে আমি ওষুধ-বিষুধ বিশেষ খাই না, চাপ বাড়লে ডাক্তার এসে সিরিঞ্জ দিয়ে খানিকটা রক্ত বার করে দেয়। সেই কথা বলছিলাম। প্রায় মাসখানেক রক্ত বার করা হয়নি।'

এই সময় ব্যোমকেশ পিছন হইতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। নিশানাথ অবাক হইয়া বলিলেন,—'এ কি ! এরি মধ্যে খেলা শেষ হয়ে গেল ?'

ব্যোমকেশের মুখ বিমর্ষ। সে বলিল,—'নেপালবাবু লোকটি অতি ধূর্ত এবং ধড়িবাজ।'

'কী হয়েছে ?'

'কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ করছে কিছু বুঝতেই দিল না। তারপর যখন বুঝলাম তখন উপায় নেই। মাত হয়ে গেলাম।'

আমরা হাসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'হাসি নয়। নেপালাবাবুকে দেখে মনে হয় হোঁৎকা, কিন্তু আসলে একটি বিচ্ছু।'

আমরা আবার হাসিলাম। ব্যোমকেশ তখন এই অরুচিকর প্রসঙ্গ পাল্টাইবার জন্য বলিল,—'পিছনের কুঠির বারান্দায় যাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম উনি কে ?'

'উনি ভূতপূর্ব ডাক্তার ভুজঙ্গধর দাস।'

'উনি এখানে কদ্দিন আছেন ?'

'প্রায় বছর চারেক হতে চলল।'

'বরাবর এইখানেই আছেন ?'

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে দু'চার দিনের জন্যে ডুব মারেন, আবার ফিরে আসেন।'

'কোথায় যান ?'

'তা জানি না। কখনও জিগ্যেস করিনি, উনিও বলেননি।'

এতক্ষণে আমরা বনলক্ষ্মীর কুঠির সামনে উপস্থিত হইলাম। ইহার পর কলোনীর সম্মুখভাগে কেবল একটি কুঠি, সেটি বিজয়ের (নক্সা পশ্য)। আমাদের উদ্যান পরিক্রমা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

নিশানাথবাবু বারান্দার দিকে পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ভিতর হইতে একটি মেয়ে বাহির হইয়া আসিতেছে; তাহার বাম বাহুর উপর কোঁচানো শাড়ি এবং গামছা, মাথার চুল খোলা। সহসা আমাদের দেখিয়া সে জড়সড়ভাবে দাঁড়াইল এবং ডান কাঁধের উপর কাপড় টানিয়া দিল। দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে সে স্নান করিতে যাইতেছে।

নিশানাথবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া সেই কথাই বলিলেন,—'বনলক্ষ্মী, তুমি স্নান করতে যাচ্ছ। আজ এত দেরি যে ?'

বনলক্ষ্মী মুখ নীচু করিয়া বলিল,—'অনেক সেলাই বাকি পড়ে গিছল কাকাবাবু। আজ সব শেষ করলুম।'

নিশানাথ আমাদের বলিলেন,—'বনলক্ষ্মী হচ্ছে আমাদের দর্জিখানার পরিচালিকা, কলোনীর সব কাপড়-জামা ওই সেলাই করে।—আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি বনলক্ষ্মী। তোমাকে শুধু বলতে এসেছিলাম, মুকুলের মাথা ধরেছে সে রাঁধতে পারবে না, দময়ন্তী একা রান্না নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। তুমি সাহায্য করলে ভাল হত।'

'ওমা, এতক্ষণ জানতে পারিনি!' বনলক্ষ্মী কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্রুত আমাদের সামনে দিয়া বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বনলক্ষ্মী চলিয়া গেল কিন্তু আমার মনে একটি রেশ রাখিয়া গেল। পল্লীগ্রামের শীতল তরুচ্ছায়া, পুকুরঘাটের টলমল জল—তাহাকে দেখিলে এই সব মনে পড়িয়া যায়। সে রূপসী নয়, কিন্তু তাহাকে দেখিতে ভাল লাগে; মুখখানিতে একটি কচি স্নিগ্ধতা আছে। বয়স উনিশ-কুড়ি, নিটোল স্বাস্থ্য-মসৃণ দেহ, কিন্তু দেহে যৌবনের উগ্রতা নাই। নিতান্ত ঘরোয়া আটপৌরে গৃহস্থঘরের মেয়ে।

বনলক্ষ্মী দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেলে ব্যোমকেশ বলিল,—'রমেনবাবু, কি বলেন ?'

রমেনবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নিশানাথ বলিলেন,—'মিছে আপনাদের কষ্ট দিলাম। আমারই ভুল, সুনয়না এখানে নেই।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'এখানে আর কোনও মহিলা নেই ?'

'না। চলুন এবার ফেরা যাক। খাবার তৈরি হতে এখনও বোধহয় দেরি আছে। তৈরি হলেই দময়ন্তী খবর পাঠাবে।'

সিধা পথে নিশানাথবাবুর বাড়িতে ফিরিয়া পাখার তলায় বসিলাম। রমেনবাবু হঠাৎ বলিলেন,—'আচ্ছা, নেত্যকালী—মানে সুনয়না যে এখানে আছে এ সন্দেহ আপনার হল কি করে ? কেউ কি আপনাকে খবর দিয়েছিল ?'

নিশানাথ শুষ্কস্বরে বলিলেন,—'এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। It is not my secret. অন্য কিছু জানতে চান তো বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'একটা অবান্তর প্রশ্ন করছি কিছু মনে করবেন না। কেউ কি আপনাকে blackmail করছে ?'

নিশানাথ দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—'না।'

তারপর সাধারণ গল্পগুজবে প্রায় এক ঘন্টা কাটিয়া গেল। পেটের মধ্যে একটু ক্ষুধার কামড় অনুভব করিতেছি এমন সময় ভিতর দিকের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল বনলক্ষ্মী। স্নানের পর বেশ পরিবর্তন করিয়াছে, পিঠে ভিজা চুল ছড়ানো। বলিল,—'কাকাবাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে।'

নিশানাথ উঠিয়া বলিলেন,—'কোথায় ?'

বনলক্ষ্মী বলিল,—'এই পাশের ঘরে। আপনারা আবার কষ্ট করে অতদূরে যাবেন, তাই আমরা খাবার নিয়ে এসেছি।'

নিশানাথ আমাদের বলিলেন,—'চলুন। ওরাই যখন কষ্ট করেছে তখন আমাদের আর কষ্ট করতে হল না। —কিন্তু আর সকলের কি ব্যবস্থা হবে ?'

বনলক্ষ্মী বলিল,—'গোঁসাইদা রান্নাঘরের ভার নিয়েছেন। —আসুন।'

পাশের ঘরে টেবিলের উপর আহারের আয়োজন। তবে ছুরি-কাঁটা নাই, শুধু চামচ। আমরা বসিয়া গেলাম। রান্নার পদ অনেকগুলি : ঘি-ভাত, সোনামুগের ডাল, ইঁচড়ের ডালনা, চিংড়িমাছের কাটলেট, কচি আমের ঝোল, পায়স ও ছানার বরফি। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। দময়ন্তী দেবী ও বনলক্ষ্মীর নিপুণ পরিচর্যায় ভোজনপর্ব পরম পরিতৃপ্তির সহিত সম্পন্ন হইল ; লক্ষ্য করিলাম, দময়ন্তী দেবী অতি সুদক্ষা গৃহিণী, তাঁহার চোখের ইঙ্গিতে বনলক্ষ্মী যন্ত্রের মত কাজ করিয়া গেল।

আহারান্তে আবার বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলাম। পান ও সিগারেট লইয়া বনলক্ষ্মী আসিল, টেবিলের উপর রাখিয়া আমাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন কৌতূহলের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

'তোমরা এবার খেয়ে নাও' বলিয়া নিশানাথও ভিতরে গেলেন।

বনলক্ষ্মীকে এতক্ষণ দেখিয়া তাহার চরিত্র সম্বন্ধে যেন একটা ধারণা করিতে পারিয়াছি। সে স্বভাবতই মুক্ত-প্রাণ extrovert প্রকৃতির মেয়ে, কিন্তু কোনও কারণে নিজেকে চাপিয়া রাখিয়াছে, কাহারও কাছে আপন প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ করিতেছে না।

কিছুকাল ধরিয়া ধূমপান চলিল। নিশানাথ ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন,—'আপনাদের ফিরে যাবার তাড়া নেই তো ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাড়া থাকলেও অসমর্থ। মিসেস সেন যে-রকম খাইয়েছেন, নড়বার ক্ষমতা নেই। আপনি কি বলেন, রমেনবাবু ?'

রমেনবাবু একটি উদ্‌গার তুলিয়া বলিলেন,—'খাওয়ার পর নড়াচড়া আমার গুরুর বারণ।'

নিশানাথ হাসিলেন,—'তবে আসুন, ওঘরে বিছানা পাতিয়ে রেখেছি, একটু গড়িয়ে নিন।'

একটি বড় ঘর। তাহার মেঝেয় তিনজনের উপযোগী বিছানা পাতা হইয়াছে। ঘরের দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি একানে খাট ; খাটের পাশে টুলের উপর টেবিল-ফ্যান। অনুমান করিলাম নিশানাথবাবুর এটি শয়নকক্ষ। ঘরের জানালাগুলি বন্ধ, তাই ঘরটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন। আমরা বিছানায় বসিলাম। নিশানাথবাবু টেবিল-ফ্যানটি মেঝেয় নামাইয়া চালাইয়া দিলেন। বলিলেন,—'এ ঘরের সীলিং-ফ্যানটা সারাতে দিয়েছি তাই টেবিল-ফ্যান চালাতে হচ্ছে। কষ্ট হবে না তো ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিচ্ছু কষ্ট হবে না। আপনি এবার একটু বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

নিশানাথ বলিলেন,—'দিনের বেলা শোয়া আমার অভ্যাস নেই—'

'তাহলে বসুন, খানিক গল্প করা যাক।'

নিশানাথ বসিলেন। রমেনবাবু কিন্তু পাঞ্জাবি খুলিয়া লম্বা হইলেন। গুরুভক্ত লোক, গুরুর আদেশ অমান্য করেন না। আমরা তিনজনে বসিয়া নিম্নস্বরে আলাপ করিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশ বলিল,—'বনলক্ষ্মী কি চলে গেছে ?'

নিশানাথ বলিলেন,—'হ্যাঁ, এই চলে গেল। কেন বলুন দেখি ?'

'ওর ইতিহাস শুনতে চাই। ও যখন গোলাপ কলোনীতে আশ্রয় পেয়েছে তখন ওর নিশ্চয় কোন দাগ আছে।'

'তা আছে। ইতিহাস খুবই সাধারণ। ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, এক লম্পট ওকে ভুলিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে, তারপর কিছুদিন পরে ফেলে পালায়। গাঁয়ে ফিরে যাবার মুখ নেই, কলকাতায় খেতে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত কলোনীতে আশ্রয় পেয়েছে।'

'কতদিন আছে?'

'বছর দেড়েক।'

'ওর গল্প সত্যি কিনা যাচাই করেছিলেন?'

'না। ও নিজের গ্রামের নাম কিছুতেই বলল না।'

'হুঁ। গোলাপ কলোনীর সন্ধান ও পেল কি করে? এটা তো সরকারী অনাথ আশ্রম নয়।'

নিশানাথ একটু মুখ গম্ভীর করিলেন, বলিলেন,—'ও নিজে আসেনি, বিজয় একদিন ওকে নিয়ে এল। কলকাতায় হগ্ মার্কেটের কাছে একটা রেস্তোরাঁ আছে, বিজয় রোজ বিকেলে সেখানে চা খায়। একদিন দেখল একটি মেয়ে কোণের টেবিলে একলা বসে বসে কাঁদছে। বনলক্ষ্মীর তখন হাতে একটি পয়সা নেই, দু'দিন খেতে পায়নি, স্রেফ চা খেয়ে আছে। ওর কাহিনী শুনে বিজয় ওকে নিয়ে এল।'

'ওর চাল-চলন আপনার কেমন মনে হয়?'

'ওর কোনও দোষ আমি কখনও দেখিনি। যদি ওর পদস্খলন হয়ে থাকে সে ওর চরিত্রের দোষ নয়, অদৃষ্টের দোষ।' এই বলিয়া নিশানাথ হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন। 'এবার বিশ্রাম করুন' বলিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার এই হঠাৎ উঠিয়া যাওয়া কেমন যেন বেখাপ্পা লাগিল। পাছে ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে আরও কিছু বলিতে হয় তাই কি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন?

আমরা শয়ন করিলাম। মাথার কাছে গুঞ্জনধ্বনি করিয়া পাখা ঘুরিতেছে। পাশে রমেনবাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার নাক ডাকিতেছে না, চুপি চুপি জল্পনা করিতেছে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, একটি চটক-দম্পতি কোন্ অদৃশ্য ছিদ্রপথে ঘরে প্রবেশ করিয়া ছাদের একটি লোহার আংটায় বাসা বাঁধিতেছে। চোরের মত কুটা মুখে করিয়া আসিতেছে, কুটা রাখিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের পাখার মৃদু শব্দ হইতেছে—ফর্‌র্ ফর্‌র্—

চিৎ হইয়া শুইয়া তাহাদের নিভৃত গৃহ-নির্মাণ দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুদিয়া আসিল।

আট

বৈকালে আবার বাহিরের ঘরে সমবেত হইলাম। দময়ন্তী দেবী চায়ের বদলে শীতল ঘোলের সরবৎ পরিবেশন করিয়া গেলেন। নিশানাথ বলিলেন,—'রোদ একটু পড়ুক, তারপর বেরুবেন। সাড়ে পাঁচটার সময় মুস্কিল গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যায়, সেই গাড়িতে গেলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন পাবেন।'

সরবৎ পান করিতে করিতে আর এক দফা কলোনীর অধিবাসিবৃন্দের সহিত দেখা হইয়া গেল। প্রথমে আসিলেন প্রফেসর নেপাল গুপ্ত, সঙ্গে কন্যা মুকুল। মুকুল অন্দরের দিকে চলিয়া যাইতেছিল, নিশানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এবেলা তোমার মাথা কেমন?'

মুকুল ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইয়া বলিল,—'সেরে গেছে'—বলিয়া যেন একান্ত সন্ত্রস্তভাবে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা, একটু খস্‌খসে; সর্দি-কাশিতে স্বরযন্ত্র বিপন্ন হইলে যেমন আওয়াজ বাহির হয় অনেকটা সেই রকম।

এবেলা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। সে যদি এত বেশি প্রসাধন না

করিত তাহা হইলে বোধহয় তাহাকে আরও ভাল দেখাইত। কিন্তু মুখে পাউডার ও ঠোঁটে রক্তের মত লাল রঙ লাগাইয়া সে যেন তাহার সহজ লাবণ্যকে ঢাকা দিয়াছে। তার উপর চোখের দৃষ্টিতে একটা শুষ্ক কঠিনতা। অল্প বয়সে বারবার আঘাত পাইয়া যাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের চোখেমুখে এইরূপ অকাল কঠিনতা বোধহয় স্বাভাবিক।

এদিকে নেপালবাবুও যেন জাপানী মুখোশ দিয়া মুখের অর্ধেকটা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। ব্যোমকেশকে দেখিয়া তাঁহার চোখে কুটিল কৌতুক নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—'কী, এবেলা আর এক দান হবে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মাফ করবেন।'

নেপালবাবু অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন,—'ভয় কি? না হয় আবার মাত হবেন। ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেললে খেলা শিখতে পারবেন। কথায় বলে, লিখতে লিখতে সরে, আর—'

ভাগ্যক্রমে প্রবাদবাক্য শেষ হইতে পাইল না, বৈষ্ণব ব্রজদাসকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নেপালবাবু তাঁহার দিকে ফিরিলেন—'কি হে ব্রজদাস, তুমি নাকি গরুকে ওষুধ খাওয়াতে আরম্ভ করেছ? গো-চিকিৎসার কী জান তুমি?'

ব্রজদাস মাথা চুলকাইয়া বলিলেন,—'আজ্ঞে—'

'বোষ্টম হয়ে গো-হত্যা করতে চাও! নিশানাথ, তোমারই বা কেমন আক্কেল? হাজার বার বলেছি একটা গো-বদ্যি যোগাড় কর, তা নয়, দুটো হেতুড়ের হাতে গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়েছ।'

নিশানাথবাবু বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিলাম, কিন্তু তিনি নীরব রহিলেন।

নেপালবাবু বলিলেন,—'যার কর্ম তারে সাজে। আমার হাতে ছেড়ে দাও, দেখবে দু'দিনে গরুগুলোর চেহারা ফিরিয়ে দেব। আমি শুধু কেমিস্ট নই, বায়ো-কেমিস্ট, বুঝলে? চল বোষ্টম, তোমার গরু দেখি।'

ব্রজদাস কাতর চক্ষে নিশানাথের পানে চাহিলেন। নিশানাথ এবার একটু কড়া সুরে বলিলেন,—'নেপাল, গরু যত ইচ্ছে দেখ, কিন্তু ওষুধ খাওয়াতে যেও না।'

নেপালবাবু অধীর উপেক্ষাভরে বলিলেন,—'তুমি কিছু বোঝো না, কেবল সর্দারি কর। আমি গরুর চিকিৎসা করব। দেখিয়ে দেব—'

ছুরির মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নিশানাথ বলিলেন,—'নেপাল, আমার হুকুম ডিঙিয়ে যদি এ কাজ কর, তোমাকে কলোনী ছাড়তে হবে।'

নেপালবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার হাঁসের ডিমের মত চোখ হইতে রক্ত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তিনি বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—'আমাকে অপমান করছ তুমি—আমাকে? এত বড় সাহস! ভেবেছ আমি কিছু জানি না?—ভাঙব নাকি হাটে হাঁড়ি!'

নিশানাথ শক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম তাঁহার রগের শিরা ফুলিয়া দপ্ দপ্ করিতেছে। তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—'নেপাল, তুমি যাও—এই দণ্ডে এখান থেকে বিদেয় হও—'

নেপালবাবু হিংস্র মুখবিকৃতি করিয়া আবার গর্জন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভিতর দিক হইতে মুকুল ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। 'বাবা! কি করছ তুমি! চল, এক্ষুনি চল'—বলিয়া নেপালবাবুকে টানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুকুলের ধমক খাইয়া নেপালবাবু নির্বিবাদে তাহার সঙ্গে গেলেন।

পরিণতবয়স্ক দুই ভদ্রলোকের মধ্যে সামান্য সূত্রে এই উগ্র কলহ, আমরা যেন হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম। এতক্ষণে লক্ষ্য করিলাম ব্রজদাস বেগতিক দেখিয়া নিঃসাড়ে সরিয়া পড়িয়াছেন এবং ডাক্তার ভুজঙ্গধর কখন নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। নিশানাথবাবু শিথিল দেহে বসিয়া পড়িলে তিনি সশব্দে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুঃখিতভাবে মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে আসিয়া নিশানাথের পাশের চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন,—'বেশি উত্তেজনা আপনার শরীরের পক্ষে ভাল নয় মিঃ সেন। যদি মাথার একটা ছোট্ট শিরা জখম হয় তাহলে গুপ্তর কোন

ক্ষতি নেই—কিন্তু— । দেখি আপনার নাড়ি ।'

নিশানাথ বলিলেন,—'দরকার নেই, আমি ঠিক আছি ।'

ডাক্তার আর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া আমাদের দিকে ফিরিলেন, একে একে আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—'এঁদের সকালে দেখেছি, কিন্তু পরিচয় পাইনি ।'

নিশানাথ বলিলেন,—'এঁরা বাগান দেখতে এসেছেন ।'

ডাক্তার মুখের একপেশে বাঁকা হাসিলেন,—'তা মোটর রহস্যের কোনও কিনারা হল ?'

আমরা চমকিয়া চাহিলাম । নিশানাথ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন,—'ওঁরা কি জন্যে এসেছেন তুমি জানো ?'

'জানি না । কিন্তু আন্দাজ করা কি এতই শক্ত ? এই কাঠ-ফাটা গরমে কেউ বাগান দেখতে আসে না । তবে অন্য কী উদ্দেশ্যে আসতে পারে ? কলোনীতে সম্প্রতি একটা রহস্যময় ব্যাপার ঘটছে । অতএব দুই আর দুয়ে চার ।' বলিয়া ব্যোমকেশের দিকে সহাস্য দৃষ্টি ফিরাইলেন,—'আপনি ব্যোমকেশবাবু । কেমন, ঠিক ধরেছি কিনা ?'

ব্যোমকেশ অলস কণ্ঠে বলিল,—'ঠিকই ধরেছেন । এখন আপনাকে যদি দু'-একটা প্রশ্ন করি উত্তর দেবেন কি ?'

'নিশ্চয় দেব । কিন্তু আমার কেচ্ছা আপনি বোধহয় সবই শুনেছেন ।'

'সব শুনিনি ।'

'বেশ, প্রশ্ন করুন ।'

ব্যোমকেশ সরবতের গেলাসে ছোট একটি চুমুক দিয়া বলিল,—'আপনি বিবাহিত ?'

ডাক্তার প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি অবাক হইয়া চাহিলেন । তারপর ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ, বিবাহিত ।'

'আপনার স্ত্রী কোথায় ?'

'বিলেতে ।'

'বিলেতে ?'

ডাক্তার তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের ইতিহাস হাসিমুখে প্রকাশ করিলেন,—'ডাক্তারি পড়া উপলক্ষে তিন বছর বিলেতে ছিলাম, একটি শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করেছিলাম । কিন্তু তিনি বেশি দিন কালা আদমিকে সহ্য করতে পারলেন না, একদিন আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন । আমিও দেশের ছেলে দেশে ফিরে এলাম । তারপর থেকে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি ।'

টেবিলের উপর হইতে সিগারেটের টিন লইয়া তিনি নির্বিকার মুখে সিগারেট ধরাইলেন । তাঁহার কথার ভাব-ভঙ্গীতে একটা মার্জিত নিলর্জ্জতা আছে, যাহা একসঙ্গে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করে । ব্যোমকেশ বলিল,—'আর একটা প্রশ্ন করব । —যে অপরাধের জন্যে আপনার ডাক্তারির লাইসেন্স খারিজ করা হয়েছিল সে অপরাধটা কি ?'

ডাক্তার স্মিতমুখে ধোঁয়ার একটি সুদর্শনচক্র ছাড়িয়া বলিলেন,—'একটি কুমারীকে লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছিলাম । কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম । শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি ।'

নয়

মুস্কিল মিঞার ভ্যানে চড়িয়া আমরা স্টেশন যাত্রা করিলাম । নিশানাথবাবু ম্রিয়মাণভাবে আমাদের বিদায় দিলেন । নেপাল গুপ্তর সঙ্গে ওই ব্যাপার ঘটিয়া যাওয়ার পর তিনি যেন কচ্ছপের মত নিজেকে সংহরণ করিয়া লইয়াছিলেন ।

ডাক্তার ভুজঙ্গধর আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন,—'চলুন, খানিকদূর

আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

গাড়ি ফটকের বাহির হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলে ডাক্তার বলিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি, কিন্তু আমার গোড়ার প্রশ্নের জবাব আপনি দিলেন না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কোন্ প্রশ্ন?'

'মোটর রহস্যের কিনারা হল কি না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'না। কিছুই ধরা-ছোঁয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে আপনার কোনও ধারণা আছে না কি?'

'ধারণা একটা আছে বৈ কি। কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছে না। আমার ধারণা যদি ভুল হয়, মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হবে।'

'তবু বলুন না শুনি।'

'আমার বিশ্বাস এ ওই ন্যাপ্‌লা বুড়োর কাজ। ও নিশানাথবাবুকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। লোকটা বাইরে যেমন দাম্ভিক, ভেতরে তেমনি পেঁচালো।'

'কিন্তু নিশানাথবাবুকে ভয় দেখিয়ে ওঁর লাভ কি?'

'তবে বলি শুনুন। নেপালবাবুর ইচ্ছে উনিই গোলাপ কলোনীর হর্তাকর্তা হয়ে বসেন। কিন্তু নিশানাথবাবু তা দেবেন কেন? তাই উনি নিশানাথবাবুর বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধ লাগিয়েছেন, যাকে বলে war of nerves. নিশানাথবাবুর একে রক্তের চাপ বেশি, তার ওপর যদি স্নায়ুপীড়ায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েন, তখন নেপালবাবুই কর্তা হবেন।'

'কিন্তু নিশানাথবাবুর স্ত্রী রয়েছেন, ভাইপো রয়েছেন। তাঁরা থাকতে নেপালবাবু কর্তা হবেন কি করে?'

'অসম্ভব মনে হয় বটে, কিন্তু—অসম্ভব নয়।'

'কেন?'

'মিসেস সেন নেপালবাবুকে ভারি ভক্তি করেন।'

কথাটা ভুজঙ্গধরবাবু এমন একটু শ্লেষ দিয়া বলিলেন যে, ব্যোমকেশ চট্ করিয়া বলিল,—'তাই নাকি! ভক্তির কি বিশেষ কোনও কারণ আছে?'

ভুজঙ্গধরবাবু একপেশে হাসি হাসিয়া বলিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনি বুদ্ধিমান লোক, আমিও একেবারে নির্বোধ নই, বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ কি? হয়তো আমার ধারণা আগাগোড়াই ভুল। আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন, আমার যা ধারণা আমি বললাম। এর বেশি বলা আমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়—আচ্ছা, এবার আমি ফিরব। ওরে মুস্কিল, তোর পক্ষিরাজ একবার থামা।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'একটা কথা। মুকুলও কি বাপের দলে?'

ডাক্তার একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন,—'তা ঠিক বলতে পারি না। তবে মুকুলেরও স্বার্থ আছে।'

গাড়ি থামিয়াছিল, ডাক্তার নামিয়া পড়িলেন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, নমস্কার। আবার দেখা হবে নিশ্চয়।' বলিয়া পিছন ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদের গাড়ি আবার অগ্রসর হইল। ব্যোমকেশ গুম হইয়া রহিল।

ডাক্তার ভুজঙ্গধরের আচরণ একটু রহস্যময়। তিনি নেপালবাবুর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু মুকুল বা দময়ন্তী দেবী সম্বন্ধে প্রশ্ন এড়াইয়া গেলেন কেন?...কী উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের সঙ্গে এতদূর আসিয়াছিলেন?...তাঁহার থিওরি কি সত্য? নেপালবাবু মোটরের টুকরো উপহার দিতেছেন।...সুনয়না তো এখানে নাই। কিম্বা আছে, রমেনবাবু চিনিতে পারেন নাই।...মোটরের টুকরো উপহারের সহিত সুনয়নার অজ্ঞাতবাসের কি কোনও সম্বন্ধ আছে?

স্টেশনে পৌঁছিয়া টিকিট কিনিতে গিয়া জানা গেল ট্রেন আগের স্টেশনে আটকাইয়া গিয়াছে, কতক্ষণে আসিবে ঠিক নাই। ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিয়া ভ্যানের পা-দানে বসিল, নিজে একটি

সিগারেট ধরাইল এবং মুস্কিল মিঞাকে একটি সিগারেট দিয়া তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

'কদ্দিন হল বিয়া করেছ মিঞা ?'

মুস্কিল সিগারেটটিকে গাঁজার কলিকার মত ধরিয়া তাহাতে এক টান দিয়া বলিল,—'কোন্ বিয়া ?'

'তুমি কি অনেকগুলি বিয়ে করেছ নাকি ?'

'অনেকগুলি আর কৈ কর্তা। কেবল দুইটি।'

'তা শেষেরটিকে কবে বিয়ে করলে ?'

'দ্যাড় বছর হৈল।'

'কোথায় বিয়ে করলে ? দ্যাশে ?'

'কলকাত্তায় বিয়া করছি কর্তা। গফুর শেখ চামড়াওয়ালা—কানপুরের লোক, কলকাত্তায় জুতার দোকান আছে—তার বিবির বুন হয়।'

'তবে তো বড় ঘরে বিয়ে করেছ।'

'হ। কিন্তু মুস্কিল হৈছে, উয়ারা সব পচ্চিমা খোট্টা—বাংলা বুঝে না ; অনেক কষ্টে নজর জানেরে বাংলায় তালিম দিয়া লইছি।'

'বেশ বেশ। তা তোমার আগের বৌটি মারা গেছে বুঝি ?'

'মারা আর গেল কৈ ? বাঁজা মনিষ্যি ছিল, মানুষটা মন্দ ছিল না। কিন্তু নতুন বৌটারে যখন ঘরে আনলাম, কর্তাবাবু কইলেন, দুটা বৌ লৈয়া কলোনীতে থাকা চলব না। কি করা ! দিলাম পুরান বৌটারে তালাক দিয়া।'

এই সময় হুড়মুড় শব্দে ট্রেন আসিয়া পড়িল। মুস্কিল মিঞার সহিত রসালাপ অসমাপ্ত রাখিয়া আমরা ট্রেন ধরিলাম।

ট্রেনে উঠিয়া ব্যোমকেশ আর কথা বলিল না, অন্যমনস্কভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু রমেনবাবু, গাড়ি যতই কলিকাতার নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আমরা দু'জনে নানা গল্প করিতে করিতে চলিলাম। একবার সুনয়নার কথা উঠিল। তিনি বলিলেন,—'আদালতে হলফ্ নিয়ে যদি বলতে হয়, তবে বলব সুনয়না ওখানে নেই। কিন্তু তবুও মনের খুঁৎখুঁতুনি যাচ্ছে না।'

আমি বলিলাম,—'কিন্তু সুনয়না ছদ্মবেশে ওখানে আছে এটাই বা কি করে হয় ? রাতদিন মেক্-আপ করে থাকা কি সম্ভব ?'

রমেনবাবু বলিলেন,—'সুনয়না ছদ্মবেশে কলোনীতে আছে একথা আমিও বলছি না। ওখানে স্বাভাবিক বেশেই আছে। কিন্তু সে ছদ্মবেশ ধারণ করে সিনেমা করতে গিয়েছিল, আমি তাকে ছদ্মবেশে দেখেছি, এটা তো সম্ভব ?'

এই সময় ব্যোমকেশ বলিল,—'ঝড় আসছে !'

উৎসুকভাবে বাহিরের দিকে তাকাইলাম। কিন্তু কোথায় ঝড় ! আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। সবিস্ময়ে ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া দেখি সে চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। বলিলাম,—'ঝড়ের স্বপ্ন দেখছ নাকি ?'

সে চোখ খুলিয়া বলিল,—'এ ঝড় সে ঝড় নয়—গোলাপ কলোনীতে ঝড় আসছে। অনেক উত্তাপ জমা হয়েছে, এবার একটা কিছু ঘটবে।'

'কি ঘটবে ?'

'তা যদি জানতাম তাহলে তার প্রতিকার করতে পারতাম।' বলিয়া সে আবার চোখ বুজিল।

শিয়ালদা স্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখন রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। রমেনবাবুর সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বে ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনাকে আর একটু কষ্ট দেব। সুনয়নার দুটো স্টিল-ফটো যোগাড় করতে হবে। একটা কমলমণির ভূমিকায়, একটা শ্যামা-ঝি'র।'

রমেনবাবু বলিলেন,—'কালই পাবেন।'

দশ

পরদিন সকালে সংবাদপত্র পাঠ শেষ হইলে ব্যোমকেশ নিজের ভাগের কাগজ সযত্নে পাট করিতে করিতে বলিল,—'কাল চারটি স্ত্রীলোককে আমরা দেখেছি। তার মধ্যে কোন্‌টিকে সবচেয়ে সুন্দরী বলে মনে হয় ?'

স্ত্রীলোকের রূপ লইয়া আলোচনা করা ব্যোমকেশের স্বভাব নয় ; কিন্তু হয়তো তাহার কোনও উদ্দেশ্য আছে, তাই বলিলাম,—'দময়ন্তী দেবীকেই সবচেয়ে সুন্দরী বলতে হয়—'

'কিন্তু—'

চকিত হইয়া বলিলাম,—'কিন্তু কি ?'

'তোমার মনে কিন্তু আছে।' ব্যোমকেশ সহসা আমার দিকে তর্জনী তুলিয়া বলিল,—'কাল রাত্রে কাকে স্বপ্ন দেখেছ ?'

এবার সত্যিই ঘাবড়াইয়া গেলাম,—'স্বপ্ন ! কৈ না—'

'মিছে কথা বোলো না। কাকে স্বপ্ন দেখেছ ?'

তখন বলিতে হইল। স্বপ্ন দেখার উপর যদিও কাহারও হাত নাই, তবু লজ্জিতভাবেই বলিলাম,—'বনলক্ষ্মীকে।'

'কি স্বপ্ন দেখলে ?'

'দেখলাম, সে যেন হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে, আর হাসছে।—কিন্তু একটা আশ্চর্য দেখলাম, তার দাঁতগুলো যেন ঠিক তার দাঁতের মত নয়। যতদূর মনে পড়ে তার সত্যিকারের দাঁত বেশ পাটি-মেলানো। কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম, কেমন যেন এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো—'

ব্যোমকেশ অবাক হইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—'তোমার স্বপ্নেও দাঁত আছে !'

'তার মানে ? তুমিও স্বপ্ন দেখেছ নাকি ? কাকে ?'

সে হাসিয়া বলিল,—'সত্যবতীকে। কিন্তু তার দাঁত নিজের মত নয়, অন্যরকম। তাকে জিগ্যেস করলাম, তোমার দাঁত অমন কেন ? সত্যবতী জোরে হেসে উঠল, আর তার দাঁতগুলো ঝর্‌ ঝর্‌ করে পড়ে গেল।'

আমিও জোরে হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম,—'এসব মনঃসমীক্ষণের ব্যাপার। চল, গিরীন্দ্রশেখর বসুকে ধরা যাক, তিনি হয়তো স্বপ্ন-মঙ্গলের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।'

এই সময় দ্বারের কড়া নড়িল।

ব্যোমকেশ দ্বার খুলিয়া দিলে ঘরে প্রবেশ করিল বিজয়। ঠোঁট চাটিয়া বলিল,—'আমি নিশানাথবাবুর ভাইপো—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'পরিচয় দিতে হবে না, বিজয়বাবু, কাল আপনাকে দেখেছি। তা কি খবর ?'

বিজয় বলিল,—'কাকা চিঠি দিয়েছেন। আমাকে বললেন চিঠিখানা পৌঁছে দিতে।'

সে পকেট হইতে একটা খাম বাহির করিয়া ব্যোমকেশকে দিল। বিজয়ের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় তাহার মন খুব সুস্থ নয়। সে রুমাল দিয়া গলার ঘাম মুছিল, একটা কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিল, তারপর কিছু না বলিয়াই প্রস্থানোদ্যত হইল।

ব্যোমকেশ চিঠি পকেটে রাখিয়া বলিল,—'বসুন।'

বিজয় ক্ষণকাল ন যযৌ হইয়া রহিল, তারপর চেয়ারে বসিল। অপ্রতিভ হাসিয়া বলিল,—'কাল আমিও আপনাকে দেখেছিলাম, কিন্তু তখন পরিচয় জানতাম না—'

'পরিচয় কার কাছে জানলেন ?'

'কাল সন্ধ্যের পর কলোনীতে ফিরে গিয়ে জানতে পারলাম। কাকা আপনাকে কোনও দরকারে ডেকেছিলেন বুঝি ?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল,—'একথা আপনার কাকাকে জিগ্যেস করলেন না কেন ?'

বিজয়ের মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল,—'কাকা সব কথা আমাদের বলেন না। তবে ঐ মোটরের টুকরো নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন তাই বোধহয়—'

'মোটরের টুকরো সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?'

'আমার তো মনে হয় একেবারে ছেলেমানুষী। মাইলখানেক দূরে গ্রাম আছে, গ্রামের ছোঁড়ারা প্রায়ই ঐ মোটরগুলোর মধ্যে এসে খেলা করে। আমার বিশ্বাস তারাই বজ্জাতি করে মোটরের টুকরো কলোনীতে ফেলে যায়।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হুঁ, আচ্ছা ওকথা যাক। প্রফেসর নেপাল গুপ্তর খবর কি ?'

বিজয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। সে বলিল,—'কাল ফিরে গিয়ে শুনলাম নেপালবাবু কাকাকে অপমান করেছে। কাকা তাই সহ্য করলেন, আমি থাকলে—'

'নেপালবাবু কলোনীতে আছেন এখনও ?'

বিজয় অন্ধকার মুখে বলিল,—'হ্যাঁ। মুকুল এসে কাকিমার হাতে পায়ে ধরেছে। কাকিমা ভালমানুষ, গলে গেছেন, কাকাকে গিয়ে বলেছেন। কাকা কাকিমার কথা ঠেলতে পারেন না—'

'তাহলে নেপালবাবু রয়ে গেলেন। লোকটি ভাল নয়, গেলেই বোধহয় ভাল হত। আচ্ছা বলুন দেখি, ওঁর মেয়েটি কেমন ?'

বিজয় থমকিয়া গেল। একবার বিস্ফারিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিল,—'মুকুল! বাপের মত নয়—ভালই—তবে।—আচ্ছা, আজ উঠি, দেরি হয়ে গেল—দোকানে যেতে হবে। নমস্কার।'

বিজয় ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ তুলিয়া দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ফিরিয়া আসিয়া তক্তপোশে বসিল। ভাবিতে ভাবিতে বলিল,—'বিজয় সুনয়নার ব্যাপার বোধহয় জানে না, কিন্তু মুকুলের কথায় অমন ভড়কে পালাল কেন ?'

আমি বলিলাম,—'কাল ডাক্তার ভুজঙ্গধরও মুকুল সম্বন্ধে খোলসা কথা বললেন না—'

'হুঁ। এখন নিশানাথবাবু কি লিখেছেন দেখা যাক। কিন্তু তিনি চিঠি লিখলেন কেন ? টেলিফোন করলেই পারতেন।'

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িতে পড়িতে ব্যোমকেশের মুখের ভাব ফ্যালফেলে হইয়া গেল। সে বলিল,—'ও—এই জন্য চিঠি!'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি লিখেছেন নিশানাথবাবু ?'

'পড়ে দেখ' বলিয়া সে আমার হাতে চিঠি দিল।

ইংরেজি চিঠি, মাত্র কয়েক ছত্র—

প্রিয় ব্যোমকেশবাবু,

আপনাকে যে কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম সে কার্যে আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। আপনাকে যে টাকা দিয়াছি আপনার পারিশ্রমিক রূপে আশা করি তাহাই যথেষ্ট হইবে। ইতি—

ভবদীয়
নিশানাথ সেন

চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া নিরাশ কণ্ঠে বলিলাম,—'নিশানাথবাবু হঠাৎ মত বদলালেন কেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'পাছে এই প্রশ্ন তুলি তাই তিনি টেলিফোন করেননি, চিঠিতে সব চুকিয়ে দিয়েছেন।'

'কিন্তু কেন ?'

'বোধহয় তাঁর ভয় হয়েছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। নিশানাথবাবুর জীবনে একটা গুপ্ত রহস্য আছে। শুনলে না, কাল রাগের মাথায় নেপাল গুপ্ত বললেন—ভাঙব নাকি হাটে হাঁড়ি ?'

'তাহলে নেপালবাবু ওঁর গুপ্ত রহস্য জানেন ?'

'জানেন বলেই মনে হয়। এবং হাটে হাঁড়ি ভাঙার ভয় দেখিয়ে ওঁকে blackmail করছেন।'

'কিন্তু—কাল নিশানাথবাবু তো বেশ জোর দিয়েই বললেন, কেউ তাঁকে blackmail করছে না।'

'হুঁ—' বলিয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল এবং ধূমপান করিতে করিতে চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সকালবেলাটা মন খারাপের মধ্যে দিয়া কাটিয়া গেল। একটা বিচিত্র রহস্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, অনেকগুলা বিচিত্র প্রকৃতির মানুষের মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে একটা নাটকীয় সংস্থা চোখের সম্মুখে গড়িয়া উঠিতেছিল, নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হইবার পূর্বেই কে যেন আমাদের প্রেক্ষাগৃহ হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল।

বৈকালে দিবানিদ্রা সারিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ একান্তে বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কিছু লিখিতেছে। আমি তাহার পিছন হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ডায়েরির মত একটা ছোট খাতায় ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরে লিখিতেছে। বলিলাম,—'এত লিখছ কি ?'

লেখা শেষ করিয়া ব্যোমকেশ মুখ তুলিল,—'গোলাপ কলোনীর পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র-চিত্র তৈরি করেছি। খুব সংক্ষিপ্ত চিত্র—যাকে বলে thumbnail portrait.'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'কিন্তু গোলাপ কলোনীর সঙ্গে তোমার তো সম্বন্ধ ঘুচে গেছে। এখন চরিত্র-চিত্র এঁকে লাভ কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'লাভ নেই। কেবল নিরাসক্ত কৌতূহল। এখন অবধান কর। যদি কিছু বলবার থাকে পরে বোলো।'

সে খাতা লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

নিশানাথ সেন : বয়স ৫৭। বোম্বাই প্রদেশে জজ ছিলেন, কাজ ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে গোলাপ বাগান করিয়াছেন। চাপা প্রকৃতির লোক। জীবনে কোনও গুপ্ত রহস্য আছে। সুনয়না নামে জনৈকা চিত্রাভিনেত্রী সম্বন্ধে জানিতে চান। সম্প্রতি কেহ তাঁহাকে মোটরের টুকরো উপহার দিতেছে। (কেন ?)

দময়ন্তী সেন : বয়স আন্দাজ ৩০। এখনও সুন্দরী। বোধহয় নিশানাথের দ্বিতীয় পক্ষ। নিপুণা গৃহিণী। কলোনীর সমস্ত টাকা ও হিসাব তাঁহার হাতে। আচার-আচরণ সম্ভ্রম উৎপাদক। দুই বছর আগে বিদ্যাশিক্ষার জন্য নিয়মিত কলিকাতা যাতায়াত করিতেন।

বিজয় : বয়স ২৬-২৭। নিশানাথের পালিত ভ্রাতুষ্পুত্র। ফুলের দোকানের ইন-চার্জ। দোকানের হিসাব দিতে বিলম্ব করিতেছে। আবেগপ্রবণ নার্ভাস প্রকৃতি। কাকাকে ভালবাসে, সম্ভবত কাকিমাকেও। নেপালবাবুকে দেখিতে পারে না। মুকুল সম্বন্ধে মনে জট পাকানো আছে—একটা গুপ্ত রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পানুগোপাল : বয়স ২৪-২৫। কান ও স্বরযন্ত্র বিকল। লেখাপড়া জানে না। নিশানাথের একান্ত অনুগত। চরিত্র বিশেষত্বহীন।

নেপাল গুপ্ত : বয়স ৫৬-৫৭। কুটিল ও কটুভাষী। প্রচণ্ড দাম্ভিক। রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। এখনও এক্সপেরিমেন্ট করেন, ফল কিন্তু বিপরীত হয়। নিশানাথকে ঈর্ষা করেন, বোধহয় নিশানাথের জীবনের কোনও লজ্জাকর গুপ্তকথা জানেন। দময়ন্তী দেবী তাঁহাকে ভক্তি করেন। (ভয়ে ভক্তি ?)

মুকুল : বয়স ১৯-২০। সুন্দরী কিন্তু কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। রুজ পাউডারের সাহায্যে মুখসজ্জা করিতে অভ্যস্ত। বর্তমান অবস্থার জন্য মনে ক্ষোভ আছে কিন্তু পিতার মত হঠকারী নয়। প্রায় দুই বছর পিতার সহিত কলোনীতে বাস করিতেছে।

ব্রজদাস : বয়স ৬০। নিশানাথের সেরেস্তার কেরানি ছিল, চুরির জন্য নিশানাথ তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়া তাহাকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। জেল হইতে বাহির হইয়া ব্রজদাস কলোনীতে

আশ্রয় লইয়াছে। সে নাকি এখন সদা সত্য কথা বলে। লোকটিকে দেখিয়া চতুর ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

ভুজঙ্গধর দাস : বয়স ৩৯-৪০। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অবস্থার শোচনীয় অবনতি সত্ত্বেও মনের ফূর্তি নষ্ট হয় নাই। ধর্মজ্ঞান প্রবল নয়, লজ্জাকর দুর্নৈতিক কর্মে ধরা পড়িয়াও লজ্জা নাই। বনলক্ষ্মীর প্রতি তীব্র বিদ্বেষ। (কেন ?) ভাল সেতার বাজাইতে পারেন। চার বছর কলোনীতে আছেন।

বনলক্ষ্মী : বয়স ২২-২৩। স্নিগ্ধ যৌবনশ্রী ; যৌন আবেদন আছে—(অজিত তাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছে) কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না সে কুলত্যাগিনী। চঞ্চলা নয়, প্রগল্‌ভা নয়। কর্মকুশলা ; একটু গ্রাম্য ভাব আছে। দেড় বছর আগে বিজয় তাহাকে কলোনীতে আনিয়াছে।

মুস্কিল মিঞা : বয়স ৫০। নেশাখোর (বোধহয় আফিম) কিন্তু হুঁশিয়ার লোক। কলোনীর সব খবর রাখে। তাহার বিশ্বাস কলিকাতার দোকানে চুরি হইতেছে। দেড় বছর আগে নূতন বিবি বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছে, পুরাতন বিবিকে তালাক দিয়াছে।

নজর বিবি : বয়স ২০-২১। পশ্চিমের মেয়ে, আগে বাংলা জানিত না, বিবাহের পর শিখিয়াছে। ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়া মনে হয়। কলোনীর অধিবাসীদের লজ্জা করে না, কিন্তু বাহিরের লোক দেখিলে ঘোমটা টানে।

রসিক দে : বয়স ৩৫। নিজের বর্তমান অবস্থায় তুষ্ট নয়। দোকানের হিসাব লইয়া নিশানাথের সহিত গণ্ডগোল চলিতেছে। চেহারা রুগ্ন, চরিত্র বৈশিষ্ট্যহীন। (কালো ঘোড়া ?)

খাতা বন্ধ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'কেমন ?'

ব্যোমকেশ আমাকে বনলক্ষ্মী সম্পর্কে খোঁচা দিয়াছে, আমিও তাহাকে খোঁচা দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—'ঠিক আছে। কেবল একটা কথা বাদ গেছে। নেপালবাবু ভাল দাবা খেলেন উল্লেখ করা উচিত ছিল।'

ব্যোমকেশ আমাকে একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, তারপর হাসিয়া বলিল,—'আচ্ছা, শোধ-বোধ।'

সন্ধ্যার সময় রমেনবাবুর চাকর আসিয়া একটি খাম দিয়া গেল। খামের মধ্যে দুইটি ফটো।

ফটো দুইটি আমরা পরম আগ্রহের সহিত দর্শন করিলাম। কমলমণি সত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের কমলমণি, লাবণ্যে মাধুর্যে ঝলমল করিতেছে। আর শ্যামা ঝি সত্যই জবরদস্ত্ শ্যামা ঝি। দুইটি আকৃতির মধ্যে কোথাও সাদৃশ্য নাই। এবং গোলাপ কলোনীর কোনও মহিলার সঙ্গে ছবি দুইটির তিলমাত্র মিল নাই।

এগারো

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিল টেলিফোনের শব্দে।

টেলিফোনের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারা জানেন, টেলিফোনের কিড়িং কিড়িং শব্দ কখনও কখনও ভয়ঙ্কর ভবিতব্যতার আভাস বহন করিয়া আনে। যেন তারের অপর প্রান্তে যে-ব্যক্তি টেলিফোন ধরিয়াছে, তাহার অব্যক্ত হৃদয়াবেগ বিদ্যুতের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়।

বিছানায় উঠিয়া বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। দুই-তিন মিনিট পরে ব্যোমকেশ টেলিফোন রাখিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখে-চোখে একটা অনভ্যস্ত ধাঁধা-লাগার আভাস ; সে বলিল,—'ঝড় এসে গেছে।'

'ঝড় !'

'নিশানাথবাবু মারা গেছেন। চল, এখনি বেরুতে হবে।'

আমার মাথায় যেন অতর্কিতে লাঠির ঘা পড়িল ! কিছুক্ষণ হতভম্ব থাকিয়া শেষে ক্ষীণকণ্ঠে

বলিলাম,—'নিশানাথবাবু মারা গেছেন ! কি হয়েছিল ?'

'সেটা এখনও বোঝা যায়নি। স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।'

'কিন্তু এ যে বিশ্বাস হচ্ছে না। আজ মারা গেলেন ?'

'কাল রাত্রে। ঘুমন্ত অবস্থায় হয়তো রক্তের চাপ বেড়েছিল, হার্টফেল করে মারা গেছেন। রাত্তিরে কেউ জানতে পারেনি, আজ সকালে দেখা গেল বিছানায় মরে পড়ে আছেন।'

'কে ফোন করেছিল ?'

'বিজয়। ওর সন্দেহ হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। ভয় পেয়েছে মনে হল।—নাও, চটপট উঠে পড়। ট্রেনে গেলে দেরি হবে, ট্যাক্সিতে যাব।'

ট্যাক্সিতে যখন গোলাপ কলোনীর ফটকের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখনও আটটা বাজে নাই, কিন্তু প্রখর সূর্যের তাপ কড়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া দিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাগান নিঝুম ; মালীরা কাজ করিতেছে না। কুঠিগুলিও যেন শূন্য। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম কোথাও জনমানব নাই।

আমরা নিশানাথবাবুর বাড়ির সম্মুখীন হইলে বিজয় বাহির হইয়া আসিল। তাহার চুল এলোমেলো, গায়ে একটা চাদর, পা খালি, চোখ জবাফুলের মত লাল। ভাঙা গলায় বলিল,—'আসুন।'

বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'চলুন, আগে একবার দেখি, তারপর সব কথা শুনব।'

বিজয় আমাদের পাশের ঘরে লইয়া গেল ; যে-ঘরে সেদিন দুপুরবেলা আমরা শয়ন করিয়াছিলাম সেই ঘর। জানালা খোলা রহিয়াছে। ঘরের একপাশে খাট, খাটের উপর সাদা চাদর-ঢাকা মৃতদেহ।

আমরা খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে চাদর তুলিয়া লইল।

নিশানাথবাবু যেন ঘুমাইয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে কেবল সিল্কের ঢিলা পায়জামা, গায়ে জামা নাই। তাঁহার মুখের ভাব একটু ফুলো ফুলো, যেন মুখে অধিক রক্ত সঞ্চার হইয়াছে। এ ছাড়া মৃত্যুর কোনও চিহ্ন শরীরে বিদ্যমান নাই।

নীরবে কিছুক্ষণ মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ হঠাৎ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—'এ কি ? পায়ে মোজা !'

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই—নিশানাথের পায়ের চেটো পায়জামার কাপড়ে প্রায় ঢাকা ছিল—এখন দেখিলাম সত্যিই তাঁহার পায়ে মোজা। ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিল,—'গরম মোজা ! উনি কি মোজা পায়ে দিয়ে শুতেন ?'

বিজয় আচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া ছিল, মাথা নাড়িয়া বলিল,—'না।'

অতঃপর ব্যোমকেশ মৃতদেহের উপর আবার চাদর ঢাকা দিয়া বলিল,—'চলুন, দেখা হয়েছে। ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছেন কি ? ডাক্তারের সার্টিফিকেট তো দরকার হবে।'

বিজয় বলিল,—'মুস্কিল গাড়ি নিয়ে শহরে গেছে, ডাক্তার নগেন পাল এখানকার বড় ডাক্তার—। কি বুঝলেন, ব্যোমকেশবাবু ?'

'ও কথা পরে হবে।—আপনার কাকিমা কোথায় ?'

'কাকিমা অজ্ঞান হয়ে আছেন।' বিজয় আমাদের পাশের ঘরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল। পর্দা সরাইয়া দেখিলাম, ও ঘরটিও শয়নকক্ষ। খাটের উপর দময়ন্তী দেবী বিস্রস্তভাবে পড়িয়া আছেন, ডাক্তার ভুজঙ্গধর পাশে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন ; মাথায় মুখে জল দিতেছেন, নাকের কাছে অ্যামোনিয়ার শিশি ধরিতেছেন।

আমাদের দেখিতে পাইয়া ভুজঙ্গধরবাবু লঘুপদে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ বিষণ্ণগম্ভীর ; স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া চটুলতা সাময়িকভাবে অস্তমিত হইয়াছে। তিনি খাটো

গলায় বলিলেন,—'এখনও জ্ঞান হয়নি, তবে বোধহয় শীগ্‌গিরই হবে।'

ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে আছেন ?'

ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'প্রায় তিন ঘণ্টা। উনিই প্রথমে জানতে পারেন। ঘুম ভাঙার পর বোধহয় স্বামীর ঘরে গিয়েছিলেন, দেখে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এখনও জ্ঞান হয়নি।'

'আপনি মৃতদেহ দেখেছেন ?'

'দেখেছি।'

'আপনার কি মনে হয় ? স্বাভাবিক মৃত্যু ?'

ডাক্তার একবার চোখ বড় করিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। পাকা ডাক্তার আসুন, তিনি যা হয় বলবেন।' বলিয়া ভুজঙ্গধরবাবু আবার দময়ন্তী দেবীর খাটের পাশে গিয়া বসিলেন।

আমরা বাহিরের ঘরে ফিরিয়া গেলাম। ইতিমধ্যে বৈষ্ণব ব্রজদাস বাহিরের ঘরে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, আমাদের দেখিয়া নত হইয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহার মুখে শোকাহত ব্যাকুলতার সহিত তীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠার চিহ্ন মুদ্রিত রহিয়াছে। তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন,—'এ কি হল আমাদের ! এতদিন পর্বতের আড়ালে ছিলাম, এখন কোথায় যাব ?'

আমরা উপবেশন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'কোথাও যাবার দরকার হবে না বোধহয়। কলোনী যেমন চলছে তেমনি চলবে।—বসুন।'

ব্রজদাস বসিলেন না, দ্বিধাগ্রস্ত মুখে জানালায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'কাল নিশানাথবাবুকে আপনি শেষ কখন দেখেছিলেন ?'

'বিকেলবেলা। তখন তো বেশ ভালই ছিলেন।'

'ব্লাড্-প্রেসারের কথা কিছু বলেছিলেন ?'

'কিচ্ছু না।'

বাহিরে মুস্কিলের গাড়ি আসিয়া থামিল। বিজয় বাহিরে গিয়া ডাক্তার নগেন্দ্র পালকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার পালের হাতে ব্যাগ, পকেটে স্টেথস্কোপ, লোকটি প্রবীণ কিন্তু বেশ চট্‌পটে। মৃদু কণ্ঠে আক্ষেপের বাঁধা বুলি আবৃত্তি করিতে করিতে বিজয়ের সঙ্গে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কথার ভগ্নাংশ কানে আসিল,—'সব রোগের ওষুধ আছে, মৃত্যু রোগের ওষুধ নেই...'

তিনি পাশের ঘরে অন্তর্হিত হইলে ব্যোমকেশ ব্রজদাসকে জিজ্ঞাসা করিল,—'ডাক্তার পাল প্রায়ই আসেন বুঝি ?'

ব্রজদাস বলিলেন,—'মাসে দু' মাসে একবার আসেন। কলোনীর বাঁধা ডাক্তার। অবশ্য ভুজঙ্গধরবাবুই এখানকার কাজ চালান। নেহাৎ দরকার হলে এঁকে ডাকা হয়।'

পনেরো মিনিট পরে ডাক্তার পাল বাহিরে আসিলেন। মুখে একটু লৌকিক বিষণ্ণতা। তাঁহার পিছনে বিজয় ও ভুজঙ্গধরবাবুও আসিলেন। ডাক্তার পাল ব্যোমকেশের প্রতি একটি চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মনে হইল তিনি বিজয়ের কাছে ব্যোমকেশের পরিচয় শুনিয়াছেন। তারপর চেয়ারে বসিয়া ব্যাগ হইতে শিরোনামা ছাপা কাগজের প্যাড় বাহির করিয়া লিখিবার উপক্রম করিলেন।

ব্যোমকেশ তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিল,—'মাফ করবেন, আপনি কি ডেথ্ সার্টিফিকেট লিখছেন ?'

ডাক্তার পাল ভ্রূ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন,—'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি তাহলে মনে করেন স্বাভাবিক মৃত্যু ?'

ডাক্তার পাল ঠোঁটের কোণ তুলিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন,—'স্বাভাবিক মৃত্যু বলে কিছু

নেই, সব মৃত্যুই অস্বাভাবিক। শরীরের অবস্থা যখন অস্বাভাবিক হয়, তখনই মৃত্যু হতে পারে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তা ঠিক। কিন্তু শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থা আপনা থেকে ঘটতে পারে, আবার বাইরে থেকে ঘটানো যেতে পারে।'

ডাক্তার পালের ভ্রূ আর একটু উপরে উঠিল। তিনি বলিলেন,—'আপনি ব্যোমকেশবাবু, না? আপনি কী বলতে চান আমি বুঝেছি। কিন্তু আমি নিশানাথবাবুর দেহ ভাল করে পরীক্ষা করেছি, কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই। মৃত্যুর সময় কাল রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে। আমার বিচারে কাল রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় ওঁর মাথার শিরা ছিঁড়ে যায়, তারপর ঘুমন্ত অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে। যারা ব্লাড়-প্রেসারের রুগী তাদের মৃত্যু সাধারণত এইভাবেই হয়ে থাকে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিন্তু ওঁর পায়ে মোজা ছিল লক্ষ্য করেছেন বোধহয়। এই দারুণ গ্রীষ্মে তিনি মোজা পরে শুয়েছিলেন একথা কি বিশ্বাসযোগ্য?'

ডাক্তার পালের মুখে একটু দ্বিধার ভাব দেখা গেল। তিনি বলিলেন,—'ওটা যদিও ডাক্তারি নিদানের এলাকায় পড়ে না, তবু ভাববার কথা। নিশানাথবাবু এই গরমে মোজা পায়ে দিয়ে শুয়েছিলেন বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আর কেউ তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় মোজা পরিয়ে দিয়েছে তাই বা কি করে বিশ্বাস করা যায়? কেউ সে-চেষ্টা করলে তিনি জেগে উঠতেন না? আপনার কি মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আগে একটা কথা বলুন। ব্লাড়-প্রেসারের রুগী পায়ে মোজা পরলে ব্লাড়-প্রেসার বেড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে কি?'

ডাক্তার পাল বলিলেন,—'তা আছে। কিন্তু মাথার শিরা ছিঁড়ে মারা যাবেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বিশেষ ক্ষেত্রে মারা যেতে পারে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ডাক্তারবাবু, আপনি স্বাভাবিক মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেবেন না। নিশানাথবাবুর শরীরের মধ্যে কী ঘটেছে বাইরে থেকে হয়তো সব বোঝা যাচ্ছে না। পোস্ট-মর্টেম হওয়া উচিত।'

ডাক্তার তীক্ষ্ণ চক্ষে কিছুক্ষণ ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর কলমের মাথা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন,—'আপনি ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন। বেশ, তাই ভালো, ক্ষতি তো আর কিছু হবে না।' ব্যাগ হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—'আমি চললাম। থানায় খবর পাঠাব, আর অটপ্সির ব্যবস্থা করব।'

ডাক্তারকে বিদায় দিয়া বিজয় ফিরিয়া আসিল, ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

ভুজঙ্গধরবাবু তখনও ভিতর দিকের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সদয় কণ্ঠে বলিলেন,—'বিজয়বাবু, আপনি নিজের কুঠিতে গিয়ে শুয়ে থাকুন। আমি না হয় একটা সেডেটিভ্ দিচ্ছি। এ সময় ভেঙে পড়লে তো চলবে না।'

বিজয় হাতের ভিতর হইতে মুখ তুলিল না, রুদ্ধস্বরে বলিল,—'আমি ঠিক আছি।'

ভুজঙ্গধরবাবুর মুখে একটু ক্ষুব্ধ অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—'নিশানাথবাবুও ঐ কথা বলতেন। শরীরে রোগ পুষে রেখেছিলেন, ওষুধ খেতেন না। আমি রক্ত বার করবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, দরকার নেই, আমি ঠিক আছি। তার ফল দেখছেন তো?'

ব্যোমকেশ চট্ করিয়া তাঁহার দিকে ঘাড় ফিরাইল,—'তাহলে আপনিও বিশ্বাস করেন এটা স্বাভাবিক মৃত্যু?'

ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'আমার বিশ্বাসের কোনও মূল্য নেই। আপনাদের সন্দেহ হয়েছে পরীক্ষা করিয়ে দেখুন। কিন্তু কিছু পাওয়া যাবে না।'

'পাওয়া যাবে না কি করে জানলেন?'

ভুজঙ্গধরবাবু একটু মলিন হাসিলেন। 'আমিও ডাক্তার ছিলাম একদিন।' বলিয়া ধীরে ধীরে ভিতর দিকে প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ বিজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল,—'ভুজঙ্গধরবাবু ঠিক বলেছেন, আপনার বিশ্রাম দরকার—'

বিজয় কাতর মুখ তুলিয়া বলিল,—'আমি এখন শুয়ে থাকতে পারব না, ব্যোমকেশবাবু। কাকা—' তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

'তা বটে। আচ্ছা, তাহলে বলুন কাল থেকে কি কি ঘটেছে। কাল সকালে আপনি আমাকে চিঠি দিয়ে দোকানে গেলেন। ভাল কথা, আপনার কাকা আমাকে কি লিখেছিলেন আপনি জানেন ?'

'না। কি লিখেছিলেন ?'

'লিখেছিলেন আমার সাহায্য আর তাঁর দরকার নেই। কিন্তু ওকথা যাক। আপনি কলকাতা থেকে ফিরলেন কখন ?'

'পাঁচটার গাড়িতে।'

'কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?'

'কাকা বাগানে বেড়াচ্ছেন দেখেছিলাম। কথা হয়নি।'

'শেষ তাঁকে কখন দেখেছিলেন ?'

'সেই শেষ, আর দেখিনি। সন্ধ্যের পর আমি এখানে আসছিলাম কাকার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে কিন্তু বাইরে থেকে শুনতে পেলাম রসিকবাবুর সঙ্গে কাকার বচসা হচ্ছে—'

'রসিকবাবু ? যিনি শাকসব্জির দোকান দেখেন ? তাঁর সঙ্গে কী নিয়ে বচসা হচ্ছিল ?'

'সব কথা শুনতে পাইনি। কেবল কাকা বলছিলেন শুনতে পেলাম—তোমাকে পুলিসে দেব। আমি আর ভেতরে এলাম না, ফিরে গেলাম।'

'হুঁ। রাত্রে খাবার সময় কাকার সঙ্গে দেখা হয়নি ?'

'না। আমি—সকাল সকাল খেয়ে আবার আটটার ট্রেনে কলকাতায় গিয়েছিলাম।'

'আবার কলকাতায় গিয়েছিলেন ?' ব্যোমকেশ স্থির নেত্রে বিজয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

বিজয়ের শুষ্ক মুখ যেন আরও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। সে একটু বিদ্রোহের সুরে বলিল,—'হ্যাঁ। আমার দরকার ছিল।'

কী দরকার ছিল এ প্রশ্ন ব্যোমকেশ করিল না। শান্তস্বরে বলিল,—'কখন ফিরলেন ?'

'বারোটার পর। নিজের কুঠিতে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। আজ সকালে মুকুল এসে—'

'মুকুল ?'

'মুকুল ভোরবেলা এদিক দিয়ে যাচ্ছিল, কাকিমার চীৎকার শুনতে পেয়ে ছুটে এসে দেখল কাকিমা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন আর কাকা মারা গেছেন। তখন মুকুল দৌড়ে গিয়ে আমাকে তুলল।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট মুখে দিতে গিয়া থামিয়া গেল, সিগারেট আবার কৌটায় রাখিতে রাখিতে বলিল,—'রসিকবাবু কোথায় ?'

বিজয় বলিল,—'রসিকবাবুকে আজ সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর কুঠি খালি পড়ে আছে।'

'তাই নাকি ?'

এই সময় ব্রজদাস কথা বলিলেন। তিনি এতক্ষণ জানালায় ঠেস দিয়া নীরবে সমস্ত শুনিতেছিলেন, এখন গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন,—'রসিকবাবু বোধহয় কাল রাত্রেই চলে গেছেন। ওঁর কুঠি আমার পাশেই, রাত্রে ওঁর ঘরে আলো জ্বলতে দেখিনি।'

বিজয় বলিল,—'তা হবে। হয়তো কাকার সঙ্গে বকাবকির পর—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হয়তো ফিরে আসবেন। কলোনীর আর সবাই যথাস্থানে আছে তো ? নেপালবাবু—'

'আর সকলেই আছে।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তারপর ব্যোমকেশ বলিল,—'বিজয়বাবু, এবার বলুন দেখি, নিশানাথবাবুর মৃত্যু যে স্বাভাবিক নয় এ সন্দেহ আপনার হল কেন ?'

বিজয় বলিল,—'প্রথমে ওঁর পায়ে মোজা দেখে। কাকা শীতকালেও মোজা পরতেন না, মোজা তাঁর ছিলই না। দ্বিতীয়ত, আমি ঘরে ঢুকে দেখলাম জানালা বন্ধ রয়েছে।'

'বন্ধ রয়েছে !'

'হ্যাঁ, ছিটকিনি লাগানো। কাকা কখনই রাত্রে জানালা বন্ধ করে শোননি। তবে কে জানালা বন্ধ করলে ?'

'তা বটে। —বিজয়বাবু, আপনাকে একটা ঘরের কথা জিগ্যেস করছি, কিছু মনে করবেন না। আপনার কাকার জীবনে কি কোনও গোপন কথা ছিল ?'

বিজয়ের চোখের মধ্যে যেন ভয়ের ছায়া পড়িল, সে অস্পষ্ট স্বরে বলিল,—'গোপন কথা ! না, আমি কিছু জানি না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'না জানা আশ্চর্য নয়। হয়তো তাঁর যৌবনকালে কিছু ঘটেছিল। কিন্তু কোনও দিন সন্দেহও কি হয়নি ?'

'না।' বলিয়া বিজয় ক্লান্তভাবে দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

এই সময় দেখিলাম বৈষ্ণব ব্রজদাস কখন নিঃসাড়ে ঘর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। আমাদের মনোযোগ বিজয়ের দিকে আকৃষ্ট ছিল বলিয়াই বোধহয় তাঁহার নিষ্ক্রমণ লক্ষ্য করি নাই।

ভিতর দিকের দ্বার দিয়া ভুজঙ্গধরবাবু আসিয়া আমাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন, খাটো গলায় বলিলেন,—'মিসেস সেনের জ্ঞান হয়েছে।'

বিজয় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া গমনোদ্যত হইল। ভুজঙ্গধরবাবু তাহাকে ক্ষণেকের জন্য আট্‌কাইলেন, বলিলেন,—'পোস্ট-মর্টেমের কথা এখন মিসেস সেনকে না বলাই ভাল।'

বিজয় চলিয়া গেল। কয়েক সেকেন্ড পরেই দময়ন্তী দেবীর ঘর হইতে মর্মান্তিক কান্নার আওয়াজ আসিল।

'কাকিমা—।'

'বাবা বিজয়—।'

ভুজঙ্গধরবাবু একটা অর্ধোচ্ছ্বসিত নিশ্বাস চাপিয়া যে-পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে ফিরিয়া গেলেন। আমরা নেপথ্য হইতে দুইটি শোকার্ত মানুষের বিলাপ শুনিতে লাগিলাম।

বারো

হাতের ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সাড়ে ন'টা। এখনও পুলিস আসতে অনেক দেরি। চল একটু ঘুরে আসা যাক।'

'কোথায় ঘুরবে ?'

'কলোনীর মধ্যেই এদিক ওদিক। এস।'

দু'জনে বাহির হইলাম। দময়ন্তী দেবীর কান্নাকাটির শব্দ এখনও থামে নাই। বিজয় কাকিমার কাছেই আছে। ভুজঙ্গধরবাবুরাও বোধহয় উপস্থিত আছেন।

আমরা সদর দরজা দিয়া বাহির হইলাম। বাঁ-হাতি পথ ধরিয়াছি, কয়েক পা যাইবার পর একটা দৃশ্য দেখিয়া থমকিয়া গেলাম। বাড়ির এ-পাশে কয়েকটা কামিনী ফুলের ঝাড় বাড়ির দুটি জানালাকে আংশিকভাবে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দুটি জানালার আগেরটি নিশানাথবাবুর ঘরের জানালা, পিছনেরটি দময়ন্তী দেবীর ঘরের। দেখিলাম, দময়ন্তী দেবীর জানালার ঠিক নীচে একটি স্ত্রীলোক সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া একাগ্র ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে চকিতে মুখ তুলিল এবং সরীসৃপের মত ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া বাড়ির পিছনে অদৃশ্য হইল।

মুস্কিলের বৌ নজর বিবি।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া ছিল। বলিলাম,—'দেখলে ?'

ব্যোমকেশ আবার চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল,—'জানালায় আড়ি পেতে শুনছিল।'

'কি মতলবে ?'

'নিছক কৌতূহল হতে পারে। মেয়েমানুষ তো ! নিশানাথবাবু মারা গেছেন অথচ ওরা বিশেষ কোনও খবর পায়নি। সরাসরি জিজ্ঞেস করবারও সাহস নেই। তাই হয়তো—'

আমার মনঃপূত হইল না। মেয়েরা কৌতূহলের বশে আড়ি পাতিয়া থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে কি শুধুই কৌতূহল ?

গোহালের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম পানুগোপাল নিজের কুঠির পৈঠায় বসিয়া হতাশা-ভরা চক্ষে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, দু' হাতে নিজের চুলের মুঠি ধরিয়া কিছু বলিতে চাহিল। তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বাহির হইল না। তারপর সে আবার বসিয়া পড়িল। এই অসহায় মানুষটি নিশানাথবাবুর মৃত্যুতে কতখানি কাতর হইয়াছে একটি কথা না বলিয়াও তাহা প্রকাশ করিল।

আমরা দাঁড়াইলাম না, আগাইয়া চলিলাম। সামনের একটা মোড় ছাড়িয়া দ্বিতীয় মোড় ঘুরিয়া নেপালবাবুর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

নেপালবাবু অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় তক্তপোশে বসিয়া একটা বাঁধানো খাতায় কিছু লিখিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া দ্রুত খাতা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। চোখ পাকাইয়া আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন,—'আপনারা !'

ব্যোমকেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া তক্তপোশের পাশে বসিল, দুঃখিত মুখে মিথ্যা কথা বলিল,—'নিশানাথবাবু চিঠি লিখে নেমন্তন্ন করেছিলেন। আজ এসে দেখি—এই ব্যাপার।'

নেপালবাবু সতর্ক চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া গলার মধ্যে একটা শব্দ করিলেন এবং অর্ধদগ্ধ সিগার ধরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমরা তো একেবারে ঘাবড়ে গেছি। নিশানাথবাবু এমন হঠাৎ মারা যাবেন ভাবতেই পারিনি।'

নেপালবাবু ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন,—'ব্লাড্‌প্রেসারের রুগী ঐভাবেই মরে। নিশানাথ বড় একগুঁয়ে ছিল, কারুর কথা শুনতো না। কতবার বলেছি—'

'আপনার সঙ্গে তো তাঁর খুবই সদ্ভাব ছিল !'

নেপালবাবু একটু দম লইয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ, সদ্ভাব ছিল বৈকি। তবে ওর একগুঁয়েমির জন্যে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হত।'

'কথা কাটাকাটির কথায় মনে পড়ল। সেদিন আমাদের সামনে আপনি ওঁকে বলেছিলেন, ভাঙব নাকি হাঁটে হাঁড়ি ! তা থেকে আমার মনে হয়েছিল, আপনি ওঁর জীবনের কোনও গুপ্তকথা জানেন।'

নেপালবাবুর এবার আর একটু ভাব-পরিবর্তন হইল, তিনি সৌহৃদ্যসূচক হাসিলেন। বলিলেন,—'গুপ্তকথা ! আরে না, ও আপনার কল্পনা। রাগের মাথায় যা মুখে এসেছিল বলেছিলাম, ওর কোনও মানে হয় না।—তা আপনারা এসেছেন, আজ তো এখানে খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থাই নেই, হবে বলেও মনে হয় না। মুকুল—আমার মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হবারই কথা। উনিই তো প্রথম জানতে পারেন। খুবই শক লেগেছে।—আচ্ছা নেপালবাবু, কিছু মনে করবেন না, একটা প্রশ্ন করি। আপনার মেয়ের সঙ্গে কি বিজয়বাবুর কোনও রকম—'

নেপালবাবুর সুর আবার কড়া হইয়া উঠিল,—'কোনও রকম কী ?'

'কোনও রকম ঘনিষ্ঠতা— ?'

'কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার মেয়ে আমার নয়। তবে—প্রথম এখানে আসার কয়েকমাস পরে বিজয়ের সঙ্গে মুকুলের বিয়ের কথা তুলেছিলাম। বিজয় প্রথমটা রাজী ছিল, তারপর উল্‌টে গেল।' কিছুক্ষণ গুম হইয়া থাকিয়া বলিলেন,—'বিজয়টা ঘোর নির্লজ্জ।'

ব্যোমকেশ সঙ্কুচিতভাবে প্রশ্ন করিল,—'বিজয়বাবুর কি চরিত্রের দোষ আছে ?'

নেপালবাবু বলিলেন,—'দোষ ছাড়া আর কি। স্বভাবের দোষ। ভাল মেয়ে ছেড়ে যারা নষ্ট-কুলটার পেছনে ঘুরে বেড়ায় তাদের কি সচ্চরিত্র বলব ?'

বিজয়-মুকুলঘটিত রহস্যটি পরিষ্কার হইবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। ভুজঙ্গধরবাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—'মুকুল এখন কেমন আছে ?'

নেপালবাবু বলিলেন,—'যেমন ছিল তেমনি। নেতিয়ে পড়েছে মেয়েটা। তুমি একবার দেখবে ?'

'চলুন। কোথায় সে ?'

'শুয়ে আছে।' বলিয়া নেপালবাবু তক্তপোশ হইতে উঠিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আচ্ছা, আমরাও তাহলে উঠি !'

নেপালবাবু উত্তর দিলেন না, ভুজঙ্গধরবাবুকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

খাতাটা তক্তপোশের উপর পড়িয়া ছিল। ব্যোমকেশ টপ্‌ করিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া দ্রুত পাতা উল্টাইল, তারপর খাতা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল,—'চল।'

বাহিরে রাস্তায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'খাতায় কী দেখলে ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বিশেষ কিছু নয়। কলোনীর সকলের নামের ফিরিস্তি। তার মধ্যে পানুগোপাল আর বনলক্ষ্মীর নামের পাশে ঢ্যারা।'

'তার মানে ?'

নেপালবাবু বোধহয় কালনেমির লঙ্কাভাগ শুরু করে দিয়েছেন। ওঁর ধারণা হয়েছে উনিই এবার কলোনীর শূন্য সিংহাসনে বসবেন। পানুগোপাল আর বনলক্ষ্মীকে কলোনী থেকে তাড়াবেন, তাই তাদের নামে ঢ্যারা পড়েছে। কিন্তু ওকথা যাক, মুকুল আর বিজয়ের ব্যাপার বুঝলে ?'

'খুব স্পষ্টভাবে বুঝিনি। কী ব্যাপার ?'

'নেপালবাবুরা কলোনীতে আসার পর মুকুলের সঙ্গে বিজয়ের মাখামাখি হয়েছিল, বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। তারপর এল বনলক্ষ্মী। বনলক্ষ্মীকে দেখে বিজয় তার দিকে ঝুঁকল, মুকুলের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিলে।'

'ও—তাই নষ্ট-কুলটার কথা। কিন্তু বিজয়ও তো বনলক্ষ্মীর ইতিহাস জানে। প্রেম হলেও বিয়ে হবে কি করে ?'

'বিজয় যদি জেনেশুনে বিয়ে করতে চায় কে বাধা দেবে ?'

'নিশানাথবাবু নিশ্চয় বাধা দিয়েছিলেন।'

'সম্ভব। তিনি বনলক্ষ্মীকে স্নেহ করতেন কিন্তু তার সঙ্গে ভাইপোর বিয়ে দিতে বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না।—বড় জটিল ব্যাপার অজিত, যত দেখছি ততই বেশি জটিল মনে হচ্ছে। নিশানাথবাবুর মৃত্যুতে অনেকেরই সুবিধা হবে।'

'নিশানাথবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক নয় এ বিষয়ে তুমি নিঃসংশয় ?'

'নিঃসংশয়। তাঁর ব্লাড্‌-প্রেসার তাঁকে পাহাড়ের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছিল, তারপর পিছন থেকে কেউ ঠেলা দিয়েছে।'

নিশানাথবাবুর বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে বিজয় বলিল,—'কাকিমাকে ভুজঙ্গধরবাবু মরফিয়া ইন্‌জেকশন দিয়েছেন। কাকিমা ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভাল। ঘুম ভাঙলে অনেকটা শান্ত হবেন। ইতিমধ্যে মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা যাবে।'

তেরো

এগারোটার সময় পুলিস ভ্যান আসিল। তাহাতে কয়েকজন কনস্টেবল ও স্থানীয় থানার দারোগা প্রমোদ বরাট।

প্রমোদ বরাটের বয়স বেশি নয়। কালো রঙ, কাটালো মুখ, শালপ্রাংশু দেহ। পুলিসের ছাঁচে পড়িয়াও তাহার মনটা এখনও শক্ত হইয়া ওঠে নাই ; মুখে একটু ছেলেমানুষী ভাব এখনও লাগিয়া আছে। করজোড়ে ব্যোমকেশকে নমস্কার করিয়া তদ্‌গত মুখে বলিল,—'আপনিই ব্যোমকেশবাবু ?'

বুঝিলাম পুলিসের লোক হইলেও সে ব্যোমকেশের ভক্ত। ব্যোমকেশ হাসিমুখে তাহাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া নিশানাথবাবুর মৃত্যুর সন্দেহজনক হাল বয়ান করিল। প্রমোদ বরাট একাগ্রমনে শুনিল। তারপর ব্যোমকেশ তাহাকে লইয়া মৃতের কক্ষে প্রবেশ করিল। বিজয় ও আমি সঙ্গে গেলাম।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বরাট দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল এবং চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। এই সময় মেঝের উপর একটা লঘু গোলক বাতাসে গড়াইতে গড়াইতে যাইতেছে দেখিয়া বরাট নত হইয়া সেটা কুড়াইয়া লইল। খড়, শুকনা ঘাস, শণের সুতো মিশ্রিত একটি গুচ্ছ। বরাট বলিল,—'এটা কি ? কোত্থেকে এল ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'চড়াই পাখির বাসা। ঐ দেখুন, ওখান থেকে খসে পড়েছে।' বলিয়া উর্ধ্বে পাখা ঝুলাইবার আংটার দিকে দেখাইল। দেখা গেল চড়াই পাখিরা নির্বিকার, শূন্য আংটায় আবার বাসা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

খড়ের গোলাটা ফেলিয়া দিয়া বরাট মৃতদেহের কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং চাদর সরাইয়া মৃতদেহের উপর চোখ বুলাইল। ব্যোমকেশ বলিল,—'পায়ে মোজা দেখছেন ? ঐটেই সন্দেহের মূল কারণ। আমি মৃতদেহ ছুঁইনি, পুলিসের আগে মৃতদেহ স্পর্শ করা অনুচিত হত। কিন্তু মোজার তলায় কী আছে, পায়ে কোনও চিহ্ন আছে কি না জানা দরকার।'

'বেশ তো, এখনই দেখা যেতে পারে' বলিয়া বরাট মোজা খুলিয়া লইল। ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া পায়ের গোছ পর্যবেক্ষণ করিল। আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায় না, কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় পায়ের গোছের কাছে অল্প দাগ রহিয়াছে ; মোজার উপর ইল্যাস্টিক গার্টার পরিলে যে-রকম দাগ হয় সেই রকম।

দাগ দেখিয়া ব্যোমকেশের চোখ জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ; সে বরাটকে বলিল,—'দেখলেন ?'

বরাট বলিল,—'হ্যাঁ। বাঁধনের দাগ মনে হয়। কিন্তু এ থেকে কী অনুমান করা যেতে পারে ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'অন্তত এটুকু অনুমান করা যেতে পারে যে, নিশানাথবাবু মৃত্যুর পূর্বে নিজে মোজা পরেননি, আর কেউ পরিয়েছে।'

বরাট বলিল,—'কিন্তু কেন ? এর থেকে কি মনে হয় ? আপনি বুঝতে পেরেছেন ?'

'বোধহয় পেরেছি। কিন্তু যতক্ষণ শব পরীক্ষা না হচ্ছে ততক্ষণ কিছু না বলাই ভাল। আপনি মৃতদেহ নিয়ে যান। ডাক্তারকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে বলবেন গায়ে কোথাও হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের চিহ্ন আছে কি না।'

'বেশ।'

আমরা আবার বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। বরাট কনস্টেবলদের ডাকিয়া মৃতদেহ ভ্যানে

তুলিবার হুকুম দিল। বিজয় এতক্ষণ কোনও মতে নিজেকে শক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ কোমল স্বরে বলিল,—'আপনার আজ আর সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই, আমরা যাচ্ছি। আপনি বরং কাল সকালে যাবেন। —কি বলেন, ইন্সপেক্টর বরাট ?'

বরাট বলিল,—'সেই ভাল। কাল সকালের আগে রিপোর্ট পাওয়া যাবে না। আমি কাল সকালে ওঁকে নিয়ে আপনার বাসায় যাব।'

'বেশ। চলুন তাহলে। আপনার ভ্যানে আমাদের জায়গা হবে তো ?'

'হবে। আসুন।'

ব্যোমকেশ বিজয়ের পিঠে হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে আশ্বাস দিল, তারপর আমরা দ্বারের দিকে পা বাড়াইলাম। এই সময় ভিতরের দরজার সম্মুখে বনলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ শুষ্ক শ্রীহীন, পরনের ময়লা শাড়ির আঁচলে কালি ও হলুদের ছোপ। আমাদের সহিত চোখাচোখি হইতে সে বলিল,—'রান্না হয়েছে। আপনারা খেয়ে যাবেন না ?'

ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল,—'রান্না! কে রাঁধলে ?'

বনলক্ষ্মী চোখ নামাইয়া সঙ্কুচিত স্বরে বলিল,—'আমি।'

তাহার আঁচলে কালি ও হলুদের দাগ, অনভ্যস্ত রন্ধনক্রিয়ার চিহ্ন। যাক, তবু কলোনীর একজন মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়াছে, যত মর্মান্তিক ঘটনাই ঘটুক এতগুলো লোকের আহার চাই তাহা সে ভোলে নাই। দেখিলাম, বিজয় মুখ তুলিয়া একদৃষ্টে বনলক্ষ্মীর পানে চাহিয়া আছে, যেন তাহাকে এই নূতন দেখিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি। খাওয়া থাক। এমনিতেই আপনাদের কষ্টের শেষ নেই, আমরা আর হাঙ্গামা বাড়াব না। আপনি বরং এঁদের ব্যবস্থা করুন।' বলিয়া বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করিল।

বনলক্ষ্মী বিজয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, ভারী গলায় বলিল,—'চলুন, স্নান করে নেবেন।'

আমরা বাহির হইলাম।

পুলিস ভ্যান একটি শবদেহ ও কয়েকটি জীবন্ত মানুষ লইয়া কলিকাতার অভিমুখে চলিল।

পথে বেশি কথা হইল না। এক সময় ব্যোমকেশ বলিল,—'রসিক দে নামে একটি লোক কলোনীতে থাকত, কাল থেকে সে নিরুদ্দেশ। খুব সম্ভব দোকানের টাকা চুরি করেছে। তার খোঁজ নেবেন। তার হাতের আঙুল কাটা। খুঁজে বার করা কঠিন হবে না।'

বরাট নোটবুকে লিখিয়া লইল।

ঘণ্টাখানেক পরে বাসার সম্মুখে আমাদের নামাইয়া দিয়া পুলিস ভ্যান চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন মনটা বিভ্রান্ত হইয়া রহিল। নিশানাথবাবুর ছায়ামূর্তি মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বিকালবেলা তিনটার সময় দেখিলাম ব্যোমকেশ ছাতা লইয়া বাহির হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কোথায় ?'

সে বলিল,—'একটু খোঁজ-খবর নিতে বেরুচ্ছি।'

'কার খোঁজ-খবর ?'

'কারুর ওপর আমার পক্ষপাত নেই, কলোনীর অধিবাসীদের যার খবর পাব যোগাড় করব। আপাতত দেখি ডাক্তার ভুজঙ্গধর আর লাল সিং সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ করতে পারি কিনা।'

'লাল সিংকে ভোলোনি ?'

'কাউকে ভুলিনি।' বলিয়া ব্যোমকেশ নিষ্ক্রান্ত হইল।

সে বাহির হইবার আধ ঘন্টা পরে টেলিফোন আসিল। বিজয় কলোনী হইতে টেলিফোন করিতেছে। ওদিকের খবর ভালই, দময়ন্তী দেবী এখনও জাগেন নাই। অন্য খবরের মধ্যে ব্রজদাস গোঁসাইকে পাওয়া যাইতেছে না, দ্বিপ্রহরে আহারের পূর্বেই তিনি অন্তর্ধান করিয়াছেন।

অভিনব সংবাদ। প্রথম রসিক দে, তারপর বৈষ্ণব বাবাজী ! ইনিও কি কলোনীর টাকা হাত সাফাই করিতেছিলেন ?

ব্যোমকেশ ফিরিলে সংবাদ দিব বলিয়া টেলিফোন ছাড়িয়া দিলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি নামিল। যেন অনেকদিন একজ্বরী ভোগ করিবার পর ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। ব্যোমকেশ রৌদ্রের জন্য ছাতা লইয়া বাহির হইয়াছে, বৃষ্টিতেও ছাতা কাজে আসিবে।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় ব্যোমকেশ ফিরিল। জামা ভিজিয়া গোবর হইয়াছে, ছাতাটার অবস্থা ঝোড়ো কাকের মত ; সেই অবস্থায় চেয়ারে বসিয়া পরম তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল। তারপর গলা চড়াইয়া হাঁকিল,—'পুঁটিরাম, চা নিয়ে এস।'

তাহাকে বিজয়ের বার্তা শুনাইলাম। সে কিছুক্ষণ অন্যমনে রহিল, শেষে বলিল,—'একে একে নিভিছে দেউটি। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত মুস্কিল মিঞা ছাড়া আর কেউ থাকবে না। কিন্তু বাবাজী এত দেরিতে পালালেন কেন ? পোস্ট-মর্টেমের নাম শুনে ঘাবড়ে গেছেন ?'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তারপর তোমার কি হল ? ভুজঙ্গধরবাবুর খবর পেলে ?'

'নতুন খবর বড় কিছু নেই। তিনি যা যা বলেছিলেন সবই সত্যি। চীনেপটিতে তাঁর ডিসপেন্সারি আর নার্সিং হোম ছিল। অনেক রোজগার করতেন ! তারপরই দুর্মতি হল।'

'আর লাল সিং ?'

ব্যোমকেশ ভিজা জামা খুলিয়া মাটিতে ফেলিল,—'লাল সিং বছর দুই আগে জেলে মারা গেছে। তার স্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু চিঠি ফিরে এসেছে। স্ত্রীর পাত্তা কেউ জানে না।'

বাহিরে বৃষ্টি চলিতেছে ; চারিদিক ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। পুঁটিরাম চা আনিয়া দিল। ব্যোমকেশ চায়ে একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া বলিল,—'এই বৃষ্টিটা যদি কাল রাত্তিরে হত তাহলে নিশানাথবাবুর মোজা পরার একটা মানে পাওয়া যেত, মনে হত উনি নিজেই মোজা পরেছেন। অন্তত সম্ভাবনাটা বাদ দেওয়া যেত না। ভাগ্যিস কাল বৃষ্টি হয়নি !'

চৌদ্দ

পরদিন সকালবেলা বরাট ও বিজয় আসিল। বিজয়ের পা খালি, অশৌচের বেশ। ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসিল।

ব্যোমকেশ বরাটের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল,—'কৈ, পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট দেখি।'

বোতাম-আঁটা পকেট খুলিতে খুলিতে বরাট বলিল,—'পরিষ্কার রিপোর্ট ; সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। রক্তে কোনও বিষ বা ওষুধের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মাথার মধ্যে হেমারেজ হয়ে মারা গেছেন !'

'হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের দাগ নেই ?'

'কনুইয়ের কাছে শিরের ওপর ছুঁচ ফোটানোর কয়েকটা দাগ আছে কিন্তু সেগুলো দু'তিন মাসের পুরানো।'

'আর পায়ের দাগ ?'

'ডাক্তার বলেন ও-দাগের সঙ্গে মৃত্যুর কোনও সম্বন্ধ নেই।'

বরাট রিপোর্ট বাহির করিয়া দিল। ব্যোমকেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা পড়িল। নিশ্বাস ফেলিয়া রিপোর্ট বরাটকে ফেরত দিয়া বলিল,—'দেহে কিছু পাওয়া যাবে আমার মনে করাই অন্যায় হয়েছিল।'

বরাট বলিল,—'তাহলে কি সোজাসুজি ব্লাড্-প্রেসার থেকে মৃত্যু বলেই ধরতে হবে ?'

'কখনই না। হত্যাকারী ব্লাড্-প্রেসারের সুযোগ নিয়েছে, তাই হত্যার কোনও চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কিন্তু—কিভাবে সুযোগ নিয়েছে বুঝতে পারছি না। আমাকে যদি তদন্ত চালাতে হয় তাহলে ধরা-ছোঁয়া যায় এমন একটা কিছু চাই তো। আপনি কাল বলেছিলেন মোজা পরার কারণ বুঝতে পেরেছেন। কী বুঝতে পেরেছেন আমায় বলুন।'

বিজয় এতক্ষণ আঙ্গুল দিয়া কপালের দুই পাশ টিপিয়া নির্জীবভাবে বসিয়াছিল, এখন চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিল। ব্যোমকেশও তাহার পানে চাহিয়া একটু যেন ইতস্তত করিল। তারপর বলিল,—'সব প্রমাণ আপনাদের চোখের সামনে রয়েছে। কিছু অনুমান করতে পারছেন না ?'

বরাট বলিল,—'না, আপনি বলুন !'

'চড়াই পাখির বাসা মেঝেয় পড়েছিল, তা থেকে কিছু ধরতে পারলেন না ?'

'না।'

ব্যোমকেশ আবার একটু ইতস্তত করিল। 'বড় বীভৎস মৃত্যু' বলিয়া সে বিজয়ের দিকে সসঙ্কোচে দৃষ্টিপাত করিল।

বিজয় চাপা গলায় বলিল,—'তবু আপনি বলুন।'

ব্যোমকেশ তখন ধীরে ধীরে বলিল,—'আপনাদের বলছি, কিন্তু কথাটা যেন চাপা থাকে।—নিশানাথবাবুর পায়ে দড়ি বেঁধে কড়িকাঠের আংটা থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। ব্লাড্-প্রেসার ছিলই, তার ওপর শরীরের সমস্ত রক্ত নেমে গিয়ে মাথায় চাপ দিয়েছিল। মাথার শিরা ছিঁড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হল। তারপর তাঁকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যবশে মোজা খুলে নিয়ে যেতে ভুলে গেল। চতুর অপরাধীরাও ভুল করে, নইলে তাদের ধরবার উপায় থাকত না।'

আমরা স্তম্ভিত হতবাক্ হইয়া রহিলাম। বিজয়ের গলা দিয়া একটা বিকৃত আওয়াজ বাহির হইল। দেখিলাম, তাহার মুখ ছাইবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বরাট প্রথম কথা কহিল,—'কী ভয়ানক ! এখন বুঝতে পারছি, পাছে পায়ে দড়ির দাগ হয় তাই মোজা পরিয়েছিল। আংটায় দড়ি পরাবার সময় চড়াই পাখির বাসা খসে পড়েছিল—ঘরে একটা টুল আছে, তাতে উঠে আংটায় দড়ি পরাবার কোনই অসুবিধা নেই। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু, একটা কথা। এত ব্যাপারেও নিশানাথবাবুর ঘুম ভাঙল না ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'নিশানাথবাবু বোধহয় জেগেই ছিলেন। রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে এই ব্যাপার হয়েছিল। কাল ডাক্তার পাল তাই বলেছিলেন, রিপোর্ট থেকেও তাই পাওয়া যাচ্ছে।'

'তবে ?'

'জানা লোক নিশানাথবাবুকে খুন করেছে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম হত্যাকারী ইন্জেকশন দিয়ে প্রথমে তাঁকে অজ্ঞান করে তারপর ঝুলিয়ে দিয়েছে। আজকাল এমন অনেক ইন্জেকশন বেরিয়েছে যাতে দু' মিনিটের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যায় অথচ রক্তের মধ্যে ওষুধের কোনও চিহ্ন থাকে না—যেমন Sodium Pentothal. কিন্তু শরীরে যখন ছুঁচ ফোটানোর দাগ পাওয়া যায়নি তখন বুঝতে হবে সাবেক প্রথা অনুসারেই নিশানাথবাবুকে অজ্ঞান করা হয়েছিল।'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ স্যান্ড ব্যাগ্। ঘাড়ের উপর মোলায়েম হাতে এক ঘা দিলেই অজ্ঞান হয়ে যাবে, অথচ ঘাড়ে দাগ থাকবে না।'

কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিলাম। তারপর বিজয় পাংশু মুখ তুলিয়া বলিল,—'কিন্তু কে ?

কেন ?'

তাহার প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝিয়া ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'তা এখনও জানি না। আর একটা কথা বুঝতে পারছি না, মিসেস সেন রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে নিশ্চয় পাশের ঘরে ছিলেন। তিনি কিছু জানতে পারলেন না ?'

বিজয় নিজের অজ্ঞাতসারে উঠিয়া দাঁড়াইল, স্খলিতকণ্ঠে বলিল,—'কাকিমা ! না না, তিনি কিছু জানেন না—তিনি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—'

আমরা অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া আছি দেখিয়া সে আবার বসিয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ওকথা যাক। যথা-সময়ে সব প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যাবে। আপাতত একটা কথা বলুন তো, নিশানাথবাবুর উত্তরাধিকারী কে ?'

বিজয় উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিল,—'আমি আর কাকিমা—সমান ভাগ।'

ব্যোমকেশ ও বরাটের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল। বরাট উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল,—'আজ তাহলে ওঠা যাক। বিজয়বাবুর এখনও অনেক কাজ, মৃতদেহ সৎকার করতে হবে—'

সকলে উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'ওবেলা আমরা একবার কলোনীতে যাব। ভাল কথা, রসিক দে'র খবর পাওয়া গেল ?'

বরাট বলিল,—'আমি লোক লাগিয়েছি। এখনও কোনও খবর পাওয়া যায়নি।'

ব্যোমকেশ বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—'ব্রজদাস বাবাজী ফিরে আসেনি ?'

বিজয় মাথা নাড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ইন্সপেক্টর বরাট, আপনার একজন খদ্দের বাড়ল। ব্রজদাসেরও খোঁজ নেবেন।'

বরাট লিখিয়া লইতে লইতে বলিল,—'ওদিকে যখন যাবেন থানায় একবার আসবেন নাকি ?'

'যাব।'

তাহারা প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ প্রায় আধ ঘন্টা ঘাড় গুঁজিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিল। আমি দুটা সিগারেট শেষ করিবার পর নীরবতার মৌন উৎপীড়ন আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম,—'বিজয়কে কী মনে হয় ? অভিনয় করছে নাকি ?'

ব্যোমকেশ ঘাড় তুলিয়া বলিল,—'এ যদি ওর অভিনয় হয়, তাহলে ওর মত অভিনেতা বাংলা দেশে নেই।'

'তাহলে কাকার মৃত্যুতে সত্যি শোক পেয়েছে। কাকিমাকেও ভালবাসে মনে হল।'

'হুঁ। এবং সেজন্যেই ওর ভয় হয়েছে।'

কিছুক্ষণ কাটিবার পর আবার প্রশ্ন করিলাম,—'আচ্ছা, মোটরের টুকরো পাঠানোর সঙ্গে নিশানাথবাবুর মৃত্যুর কি কোনও সম্বন্ধ আছে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে।'

'লাল সিং তো দু' বছর আগে মরে গেছে। নিশানাথবাবুকে তবে মোটরের টুকরো পাঠাচ্ছিল কে ?'

'তা জানি না। কিন্তু একটা ভুল কোরো না। মোটরের টুকরোগুলো যে নিশানাথবাবুর উদ্দেশ্যেই পাঠানো হচ্ছিল তার কোনও প্রমাণ নেই। তিনি নিজে তাই মনে করেছিলেন বটে, কিন্তু তা না হতেও পারে।'

'তবে কার উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছিল ?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না। দুই-তিন মিনিট অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলাম উত্তর দিবে না, তখন অন্য প্রশ্ন করিলাম,—'সুনয়না-উপাখ্যানের সঙ্গে নিশানাথবাবুর মৃত্যুর যোগাযোগ আছে নাকি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'থাকলেও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মুরারি দত্তকে মেরেছিল সুনয়না

নিকোটিন বিষ খাইয়ে। নিশানাথবাবুকে মেরেছে পুরুষ।'

'পুরুষ ?'

'হ্যাঁ। নিশানাথবাবু লম্বা-চওড়া লোক ছিলেন না, তবু তাঁকে দড়ি দিয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া একজন স্ত্রীলোকের কর্ম নয়।'

'তা বটে। কিন্তু মোটিভ কি হতে পারে ?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া আলস্য ভাঙিল।

'আমাকে নিশানাথবাবু ডেকেছিলেন, এইটেই হয়তো সবচেয়ে বড় মোটিভ!' বলিয়া সে সিগারেট ধরাইয়া স্নানঘরের দিকে চলিয়া গেল।

পনেরো

সায়াহ্নে মোহনপুরের স্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখনও গ্রীষ্মের বেলা অনেকখানি বাকি আছে। স্টেশনের প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া দেখি কলোনীর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে, মুস্কিল মিঞা পা-দানে বসিয়া বিড়ি টানিতেছে।

মুস্কিলকে এ কয়দিন দেখি নাই, সে যেন আর একটু বুড়ো হইয়া গিয়াছে, আরও ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। সেলাম করিয়া বলিল,—'বিজয়বাবু আপনাগোর জৈন্য গাড়ি পাঠাইছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ওরা ঘাট থেকে ফিরেছে তাহলে ?'

মুস্কিল বলিল,—'হ—ফিরছেন।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'নতুন খবর কিছু আছে নাকি ?'

মুস্কিল নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'আর নূতন খবর কী কর্তা। সব তো শেষ হইয়া গিছে।'

'তা বটে। চল—কিন্তু একবার থানা হয়ে যেতে হবে।'

'চলেন।—কর্তাবাবুর নাকি ময়না তদন্ত হৈছে ?'

'হ্যাঁ। তুমি খবর পেলে কোত্থেকে ?'

'শুন্ গুন্ কানে আইল। তা ময়না তদন্তে কী জানা গেল ? সহজ মৃত্যু নয় ?'

ব্যোমকেশ প্রশ্নটা পাশ কাটাইয়া গেল। বলিল,—'সে কথা ডাক্তার জানেন। মুস্কিল মিঞা, তুমি তো আফিম খেয়ে ঝিমোও, তুমি এত খবর পাও কি করে ?'

মুস্কিলের মুখে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, সে বলিল—'আমি ঝিমাইলে কি হৈব কর্তা, আমার বিবিজানডার চারটা চোখ চারটা কান। তার চোখ কান এড়ায়া কিছু হৈবার যো নাই। আমি সব খবর পাই। একটা কিছু যে ঘটবো তা আগেই বুঝছিলাম।'

'কি করে বুঝলে ?'

মুস্কিল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ আক্ষেপভরে হস্তসঞ্চালন করিয়া বলিল,—'মেইয়া মানুষ লইয়া লট্‌খট্। রাতের আঁধারে এ উয়ার ঘরে যায়, ও ইয়ার ঘরে যায়—ই সব নষ্টামিতে কি ভাল হয় কর্তা ? হয় না।'

বিস্মিতস্বরে ব্যোমকেশ বলিল,—'কে কার ঘরে যায় ?'

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া মুস্কিল একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, বলিল,—'কারে বাদ দিমু কর্তা ? মেইয়া লোকগুলাই দুষ্ট হয় বেশি, মরদের সর্বনাশের জৈন্যই তো খোদা উয়াদের বানাইছেন।'

'মানে...তুমি বলতে চাও রাত্রে কলোনীর মেয়েরা লুকিয়ে পুরুষদের ঘরে যায়। কে কার ঘরে যায় বলতে পার ?'

'তা কেমনে কৈব কর্তা ? আঁধারে কি কারো মুখ দেখা যায়। তবে ভিতর ভিতর নষ্টামি চলছে। এখন কর্তাবাবু নাই, বড়বিবিও সাদাসিদা মেইয়া, এখন তো হদ্দ বাড়াবাড়ি হৈব।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মেয়েরা কারা তা না হয় বলতে পারলে না, কিন্তু কার ঘরে যায় সেটা

তো বলতে পার।'

মুস্কিল একটু অধীরস্বরে বলিল,—'কি মুস্কিল, সেটা আন্দাজ কৈরা লন না। মেইয়া লোক জোয়ান মরদের ঘরে যাইব না তো কি বুড়ার ঘরে যাইব ?'

মুস্কিল মিঞার জীবন-দর্শনে মার-প্যাচ নাই। মনে মনে হিসাব করিলাম, জোয়ান মরদের মধ্যে আছে বিজয়, রসিক, পানুগোপাল। ডাক্তার ভুজঙ্গধরকেও ধরা যাইতে পারে।

ব্যোমকেশ আর প্রশ্ন করিল না, গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—'চল, এবার যাওয়া যাক। থানা কতদূর ?'

'কাছেই, রাস্তায় পড়ে।' মুস্কিল চালকের আসনে উঠিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিল।

থানায় উপস্থিত হইলে প্রমোদ বরাট আমাদের খাতির করিয়া নিজের কুঠুরিতে বসাইল এবং সিগারেটের টিন খুলিয়া ধরিল। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—'নিশানাথবাবুকে কেউ খুন করেছে এ প্রত্যয় আপনার হয়েছে ?'

বরাট বলিল,—'আমার হয়েছে, কিন্তু কর্তারা তানানানা করছেন। তাঁরা বলেন, পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে যখন কিছু পাওয়া যায়নি তখন ঘাঁটাঘাঁটি করে কাজ কি ! আমি কিন্তু ছাড়ছি না, লেগে থাকব।—আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সন্দেহ এখনও কারুর ওপর পড়েনি। কিন্তু এই ঘটনার একটা পটভূমিকা আছে, সেটা আপনার জানা দরকার। বলি শুনুন।' বলিয়া সুনয়না ও মোটরের টুকরো সংক্রান্ত সমস্ত কথা বিবৃত করিল।

শুনিয়া বরাট উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল,—'ঘোরালো ব্যাপার দেখছি।—আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপাতত দুটো কাজ করা দরকার। এক, কলোনীর সকলের হাতের টিপ নিতে হবে—'

'তাতে কী লাভ ?'

'ওটা থাকা ভাল। কখন কি কাজে লাগবে বলা যায় না।'

বরাট একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—'কাজটা ঠিক আইনসঙ্গত হবে কিনা বলতে পারি না, তবু আমি করব। দ্বিতীয় কাজ কী ?'

'দ্বিতীয় কাজ, আমরা কলোনীতে যাচ্ছি, আপনিও চলুন। আপনার সামনে আমি কলোনীর প্রত্যেককে প্রশ্ন করব, আপনি শুনবেন এবং দরকার হলে নোট করবেন।'

'কী ধরনের প্রশ্ন করবেন ?'

'আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হবে, সে-রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে কে কোথায় ছিল, কার অ্যালিবাই আছে কার নেই, এই নির্ণয় করা।'

'বেশ, চলুন তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক, কাজ সেরে ফিরতে হবে।'

টিপ লইবার সরঞ্জামসহ একজন হেড্ কনস্টেবল আমাদের সঙ্গে চলিল।

সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় কলোনীতে পৌঁছিলাম। গত রাত্রির বর্ষণ এখানেও মাটি ভিজাইয়া দিয়া গিয়াছে। বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভুজঙ্গধরবাবু বিজয়ের সহিত কথা বলিতেছিলেন। বিজয়ের মুখে এখনও শ্মশানবৈরাগ্যের ছায়া লাগিয়া আছে। ভুজঙ্গধরবাবুর মুখ কিন্তু প্রফুল্ল, তাঁহার মুখে অম্লরসাক্ত একপেশে হাসি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমাদের সঙ্গে প্রমোদ বরাট ও কনস্টেবলকে দেখিয়া বিজয়ের চোখে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল। ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'আসুন। বিজয়বাবুকে মোহমুদ্গর শোনাচ্ছি—কা তব কান্তা—নলিনীদলগত-জলমতিতরলং—'

তাঁহার লঘুতা সময়োচিত নয় ; মনে হইল বিজয়ের মন প্রফুল্ল করিবার জন্য তিনি আধিক্য দেখাইতেছেন।

বরাট পুলিসী গাম্ভীর্যের সহিত বলিল,—'আপনাদের সকলের হাতের টিপ দিতে হবে।'

বিজয়ের চোখের প্রশ্ন আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, ভুজঙ্গধরবাবুও চকিতভাবে চাহিলেন। ব্যোমকেশ ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিল,—'কলোনী থেকে যে-ভাবে একে একে লোক খসে পড়ছে, বাকিগুলি কতদিন টিকে থাকবে বলা যায় না। তাই সতর্কতা।'

বিজয় বুঝিল,—'বেশ তো—নিন।' তাহার চোখের দৃষ্টি নীরবে প্রশ্ন করিতে লাগিল,—কেন ? নতুন কিছু পাওয়া গেছে কি ?

ব্যোমকেশ বলিল,—'আশা করি কারুর আপত্তি হবে না। কারণ যিনি আপত্তি করবেন স্বভাবতই তাঁর উপর সন্দেহ হবে। ভুজঙ্গধরবাবু, আপনার আপত্তি নেই তো ?'

'বিন্দুমাত্র না। আসুন—' বলিয়া তিনি অঙ্গুষ্ঠ বাড়াইয়া দিলেন।

বরাট কনস্টেবলকে ইঙ্গিত করিল, কনস্টেবল অঙ্গুষ্ঠের ছাপ তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। ভুজঙ্গধরববাবু বাঁকা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'দেখছি আমি ভুল করেছিলাম। আঙুলের ছাপ যখন নেওয়া হচ্ছে তখন লাস পরীক্ষায় কিছু পাওয়া গেছে।'

তাঁহার এই অর্ধ-প্রশ্নের জবাব কেহ দিল না। কাগজের উপর তাঁহার ও বিজয়ের নাম ও ছাপ লিখিত হইলে ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'আর কার কার ছাপ নিতে হবে বলুন, আমি কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

বরাট বলিল,—'সকলের ছাপই নিতে হবে। মেয়ে পুরুষ কেউ বাদ যাবে না।'

'মিসেস সেনেরও ?'

'হ্যাঁ, মিসেস সেনেরও ?'

'বেশ—আও সিপাহী।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আর একটা কথা। টিপ নেবার সময় সকলকে বলে দেবেন যেন আধ ঘন্টা পরে এই বাড়িতে আসেন। দু'চারটে প্রশ্ন করব।'

ভুজঙ্গধরবাবু কনস্টেবলকে লইয়া চলিয়া গেলেন। আমরা বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। বিজয় আলো জ্বালিয়া দিল। ব্যোমকেশ বলিল,—'এ ঘরটা হোক ওয়েটিং রুম—যাঁরা সাক্ষী দিতে আসবেন তাঁরা এ ঘরে বসবেন। আর পাশের ঘরে আমরা বসব, প্রত্যেককে আলাদা ডেকে প্রশ্ন করা হবে। কি বলেন ইন্সপেক্টর বরাট ?'

বরাট বলিল,—'সেই ঠিক হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাহলে বিজয়বাবু, ও ঘরে একটা টেবিল আর গোটাকয়েক চেয়ার আনিয়ে দিন। আর কিছুর দরকার হবে না।'

বিজয় চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করিতে গেল। পনেরো মিনিট পরে ভুজঙ্গধরবাবু কনস্টেবলসহ ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন—'এই নিন ; টিপ সই হয়ে গেছে। ন্যাপ্‌লা একটু গোলমাল করবার তালে ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল।—সকলকে বলে দিয়েছি, আধ ঘন্টার মধ্যে আসবে। আমিও আসছি হাত-মুখ ধুয়ে।' বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

ষোল

নিশানাথ যে-কক্ষে শয়ন করিতেন সেই কক্ষে টেবিল পাতা হইয়াছে। টেবিলের দুই পাশে দুইটি চেয়ারে ব্যোমকেশ ও বরাট, মাঝে একটি খালি চেয়ার। আমি দ্বারের কাছে টুল লইয়া বসিয়াছি, দুই ঘরের দিকেই আমার দৃষ্টি আছে। মাথার উপর উজ্জ্বল বিদ্যুৎবাতি জ্বলিতেছে।

প্রথমে দময়ন্তী দেবীকে ডাকা হইল। বিজয় তাঁহার হাত ধরিয়া ভিতরের ঘর হইতে লইয়া আসিল, তিনি শূন্য চেয়ারটিতে বসিলেন। বিধবার বেশ, দেহে অলঙ্কার নাই, মাথায় সিঁদুর নাই, সুন্দর মুখখানিতে মোমের মত ঈষদচ্ছ পাণ্ডুরতা। তিনি নতনেত্রে স্থির হইয়া রহিলেন।

বিজয় চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার দুই কাঁধের উপর হাত রাখিল, বলিল,—'আমি যদি

এখানে থাকি আপনাদের আপত্তি হবে কি ?'

ব্যোমকেশ একটু অনিচ্ছাভরে বলিল,—'থাকুন।' তারপর কোমলকণ্ঠে দময়ন্তী দেবীকে দুই-চারিটি সহানুভূতির কথা বলিয়া শেষে বলিল,—'আমরা আপনাকে বেশি কষ্ট দেব না, শুধু দু'চারটে প্রশ্ন করব যার আপনি ছাড়া আর কেউ উত্তর দিতে পারবে না—আপনাদের বিয়ে হয়েছিল কতদিন আগে ?'

দময়ন্তী দেবীর নত চক্ষু ব্যোমকেশের মুখ পর্যন্ত উঠিয়া আবার নামিয়া পড়িল। করুণ মিনতিভরা দৃষ্টি, তবু যেন তাহার মধ্যে একটা সংকল্প রহিয়াছে। অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—'দশ বছর আগে।'

অতঃপর নিম্নরূপ সওয়াল জবাব হইল। দময়ন্তী দেবী আর দ্বিতীয়বার চক্ষু তুলিলেন না, নিম্নস্বরে সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

ব্যোমকেশ : আপনাদের যখন বিয়ে হয় নিশানাথবাবু তখন চাকরিতে ছিলেন ?

দময়ন্তী : না, তার পরে।

ব্যোমকেশ : কিন্তু কলোনী তৈরি হবার আগে ?

দময়ন্তী : হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ : তাহলে বিয়ের সময় নিশানাথবাবুর বয়স ছিল সাতচল্লিশ বছর ?

দময়ন্তী : হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ : মাফ করবেন, আপনার এখন বয়স কত ?

দময়ন্তী : উনত্রিশ।

ব্যোমকেশ : বিজয়বাবু কবে থেকে আপনাদের কাছে আছেন ?

বিজয় এই প্রশ্নের জবাব দিল, বলিল,—'আমার দশ বছর বয়সে মা-বাবা মারা যান, সেই থেকে আমি কাকার কাছে আছি।'

ব্যোমকেশ : আপনার এখন বয়স কত ?

বিজয় : পঁচিশ।

লক্ষ্য করিলাম বিজয়ের চোয়ালের হাড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাত দুটাও দময়ন্তী দেবীর কাঁধের উপর আড়ষ্টভাবে শক্ত হইয়া আছে। সে যেন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রাণপণে চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। ব্যোমকেশ নিশ্চয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল কিন্তু সে নির্লিপ্তভাবে আবার প্রশ্ন করিল।

ব্যোমকেশ : বছর দুই আগে আপনি কলকাতার একটি মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কি নাম স্কুলটির ?

দময়ন্তী : সেন্ট মার্থা গার্লস্ স্কুল।

ব্যোমকেশ : হঠাৎ স্কুলে ভর্তি হবার কি কারণ ?

দময়ন্তী : ইংরেজি শেখবার ইচ্ছে হয়েছিল।

ব্যোমকেশ : মাস আষ্টেক পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন ?

দময়ন্তী : হ্যাঁ, আর ভালো লাগল না।

বরাট এতক্ষণ খাতা পেন্সিল লইয়া মাঝে মাঝে নোট করিতেছিল। ব্যোমকেশ আবার আরম্ভ করিল—

ব্যোমকেশ : পরশু রাত্রে আপনি খাওয়া সেরে রান্নাঘর থেকে কখন ফিরে এসেছিলেন ?

দময়ন্তী : প্রায় দশটা।

ব্যোমকেশ : নিশানাথবাবু তখন কোথায় ছিলেন ?

দময়ন্তী : (একটু নীরব থাকিয়া) শুয়ে পড়েছিলেন।

ব্যোমকেশ : ঘর অন্ধকার ছিল ?

দময়ন্তী : হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ : জানালা খোলা ছিল ?

দময়ন্তী : বোধহয় ছিল। লক্ষ্য করিনি।

ব্যোমকেশ : সদর দরজা তখন নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ?

দময়ন্তী : (বিলম্বে) হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ : আপনি বাড়িতে এলেন কি করে ?

দময়ন্তী : পিছনের দরজা দিয়ে।

ব্যোমকেশ : সে-রাত্রে—তারপর আপনি কি করলেন ?

দময়ন্তী : শুয়ে পড়লাম।

ব্যোমকেশ : নিশানাথবাবু তখন ঘুমোচ্ছিলেন ? অর্থাৎ বেঁচে ছিলেন ?

দময়ন্তী : (বিলম্বে) হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ : আপনি তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখেননি ? কি করে বুঝলেন ?

দময়ন্তী : নিশ্বাস পড়ছিল।

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল,—'সুনয়না নামের কোনও মেয়েকে আপনি চেনেন ?'

দময়ন্তী : না।

ব্যোমকেশ : কিছুদিন থেকে আপনার বাড়িতে কেউ মোটরের টুকরো ফেলে দিয়ে যায়—এ বিষয়ে কিছু জানেন ?

দময়ন্তী : যা সকলে জানে তাই জানি।

ব্যোমকেশ : আপনার জীবনে কোনও গুপ্তকথা আছে ?

দময়ন্তী : না।

ব্যোমকেশ : নিশানাথবাবুর জীবনে কোনও গুপ্তকথা ছিল ?

দময়ন্তী : জানি না।

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল,—'উপস্থিত আর কোনও প্রশ্ন নেই। বিজয়বাবু, এবার ওঁকে নিয়ে যান।'

বিজয় সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলিল, তারপর দময়ন্তী দেবীর হাত ধরিয়া তুলিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল। দেখিলাম তাঁহার পা কাঁপিতেছে। তাঁহার বর্তমান মানসিক অবস্থায় তীক্ষ্ণ প্রশ্নের আঘাত না করিলেই বোধহয় ভাল হইত।

ইতিমধ্যে বসিবার ঘরে জনসমাগম হইতেছিল, আমি দ্বারের কাছে বসিয়া দেখিতেছিলাম। প্রথমে আসিল পানুগোপাল, ঘরের এক কোণে গিয়া যথাসম্ভব অদৃশ্য হইয়া বসিল। তারপর আসিলেন সকন্যা নেপালবাবু; তাঁহারা সামনের চেয়ারে বসিলেন; নেপালবাবুর পোড়া মুখের দিকটা আমার দিকে রহিয়াছে তাই তাঁহার মুখভাব দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু মুকুলের মুখে শঙ্কিত উদ্বেগ। সে একবার এদিক ওদিক চাহিল, তারপর নিম্নকণ্ঠে পিতাকে কিছু বলিল।

সর্বশেষে আসিল বনলক্ষ্মী। তাহার মুখ শুষ্ক, যেন চুপসিয়া গিয়াছে; রান্নার কাজ সম্ভবত তাহাকেই চালাইতে হইতেছে। তাহাকে দেখিয়া মুকুল গভীর বিতৃষ্ণাভরে ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। বনলক্ষ্মী একবার একটু দ্বিধা করিল, তারপর ধীরপদে খোলা জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, গরাদের উপর হাত রাখিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

এদিকে বিজয় ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তী দেবীর পরিত্যক্ত চেয়ারে বসিয়াছিল, চাদরে কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল,—'এবার আমার এজেহারও না হয় সেরে নিন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ তো। আপনাকে সামান্যই জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

লক্ষ্য করিলাম, দময়ন্তী দেবীকে জেরা করার সময় বিজয় যতটা তটস্থ হইয়াছিল, তাহার তুলনায় এখন অনেকটা সুস্থ। কিন্তু ব্যোমকেশের প্রথম প্রশ্নেই সে থতমত খাইয়া গেল।

ব্যোমকেশ : কিছুদিন আগে নেপালবাবুর মেয়ে মুকুলের সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ

হয়েছিল। আপনি প্রথমে রাজী ছিলেন। তারপর হঠাৎ মত বদলালেন কেন ?

বিজয় : আমি—আমার—ওটা আমার ব্যক্তিগত কথা। ওর সঙ্গে কাকার মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই।

ব্যোমকেশ তাহাকে একটি নাতিদীর্ঘ নেত্রপাতে অভিষিক্ত করিয়া অন্য প্রশ্ন করিল। বলিল,—'পরশু বিকেলবেলা আপনি কলকাতা থেকে ফিরে এসে রাত্রে আবার কলকাতা গিয়েছিলেন কেন ?'

বিজয় : আমার দরকার ছিল।

ব্যোমকেশ : কী দরকার বলতে চান না ?

বিজয় : এটাও আমার ব্যক্তিগত কথা।

ব্যোমকেশ : বিজয়বাবু, আপনার ব্যক্তিগত কথা জানবার কৌতূহল আমার নেই। আপনার কাকার মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে আপনি আমাদের ডেকেছেন। এখন আপনিই যদি আমাদের কাছে কথা গোপন করেন তাহলে আমাদের অনুসন্ধান করে লাভ কি ?

বিজয় : আমি বলছি এর সঙ্গে কাকার মৃত্যুর কোনও সম্বন্ধ নেই।

ব্যোমকেশ : সে বিচার আমাদের হাতে ছেড়ে দিলে ভাল হয় না ?

দেখিলাম বিজয়ের মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। তারপর সে পরাভব স্বীকার করিল। অপ্রসন্ন স্বরে বলিল,—'বেশ শুনুন। পরশু বিকেলে কলকাতা থেকে ফিরে এসে একটা চিঠি পেলাম। বেনামী চিঠি। তাতে লেখা ছিল—আপনি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন। যদি বিপদে পড়তে না চান আজ রাত্রি দশটার সময় হগ্ সাহেবের বাজারে চায়ের দোকানে থাকবেন, একজনের সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবেন।—এই চিঠি পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যে চিঠি লিখেছিল সে এল না। এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফিরে এলাম।'

ব্যোমকেশ : চিঠি আপনার কাছে আছে ?

বিজয় : না, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

ব্যোমকেশ : আপনি যে পরশু রাত্রে কলকাতায় গিয়েছিলেন তার কোনও সাক্ষী আছে ?

বিজয় : না, সাক্ষী রেখে যাইনি, চুপি চুপি গিয়েছিলাম।

ব্যোমকেশ : স্টেশনে গেলেন কিসে—পায়ে হেঁটে ?

বিজয় : না, কলোনীর একটা সাইকেল আছে, তাইতে।

ব্যোমকেশ : যাক।—আপনি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন, তার মানে কি ?

বিজয় : জানি না।

ব্যোমকেশ : বেনামী চিঠিতে ছিল, একজনের সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবেন। এই একজনটি কে ? কারুর নাম ছিল না ?

বিজয় : (ঢোক গিলিয়া) নাম ছিল না। একজনটি কে তা জানি না।

ব্যোমকেশ : তবে গেলেন কেন ?

বিজয় : কে বেনামী চিঠি লিখেছে দেখবার জন্যে।

ব্যোমকেশ : ও।—কিছু মনে করবেন না, আপনি যে-দোকান দেখাশুনা করেন তার টাকার হিসেব কি গরমিল হয়েছে ?

বিজয় : (একটু উদ্ধতভাবে) হ্যাঁ হয়েছে। আমার কাকার টাকা আমার টাকা। আমি নিয়েছি।

ব্যোমকেশ : কত টাকা ?

বিজয় : হিসেব করে নিইনি। দু'তিন হাজার হবে।

ব্যোমকেশ : টাকা নিয়ে কি করলেন ?

বিজয় : টাকা নিয়ে মানুষ কী করে ? মনে করুন রেস্ খেলে উড়িয়েছি।

ব্যোমকেশ তির্যক হাসিল, বলিল,—'রেস্ খেলে ওড়াননি। যা হোক, আর কিছু জানবার

নেই—অজিত, বনলক্ষ্মীকে আসতে বল। আর যদি ভুজঙ্গধরবাবু এসে থাকেন তাঁকেও।'

ভুজঙ্গধরবাবু আসিয়াছেন কিনা দেখি নাই। আমি উঠিয়া বাহিরের ঘরে গেলাম। সকলে উচ্চকিত হইয়া চাহিল। দেখিলাম, ভুজঙ্গধরবাবু আসিয়াছেন, দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখের ভাব স্বপ্নালু, আমাকে দেখিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—'দন্তরুচি কৌমুদী!'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'সে আবার কি?'

ভুজঙ্গধরবাবুর স্বপ্নালুতা কাটিয়া গেল, তিনি বলিলেন,—'ওটা মোহমুদ্গরের অ্যান্টিডোট।—আমার ডাক পড়েছে? চলুন।'

'আসুন' বলিয়া আমি বনলক্ষ্মীর দিকে ফিরিয়াছি এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটিল। বনলক্ষ্মী জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। আমি ছুটিয়া গেলাম, পাশের ঘর হইতে ব্যোমকেশ, বরাট ও বিজয় বাহির হইয়া আসিল।

বনলক্ষ্মীর কপালের ডানদিকে কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে। ব্যোমকেশ তাহাকে তুলিতে গিয়া ঘাড় তুলিয়া চাহিল।

'ডাক্তার, আপনি আসুন। মূর্ছা গিয়েছে।'

ভুজঙ্গধরবাবু আসিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার মুখে বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন,—'সামান্য জখম, মূর্ছা যাবার মত নয়।'

'কিন্তু জখম হল কি করে?'

'তা কি করে জানব? বোধহয় জানালার বাইরে থেকে কেউ ইট পাটকেল ছুঁড়েছিল, তাই লেগেছে।'

বরাট পকেট হইতে টর্চ লইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। ব্যোমকেশ ভুজঙ্গধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—'এখন একে নিয়ে কি করা যায়?'

ভুজঙ্গধরবাবু একটা মুখভঙ্গী করিলেন, তারপর বনলক্ষ্মীকে দুই বাহুর দ্বারা তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—'আমি ওকে ওর কুঠিতে নিয়ে যাচ্ছি, বিছানায় শুইয়ে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিলেই জ্ঞান হবে। যেখানটা কেটে গেছে সেখানে টিঞ্চার আয়োডিন দিয়ে বেঁধে দিলেই চলবে। আপনারা কাজ চালান, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

বিজয় এতক্ষণ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া ছিল, বলিল—'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।'

'আসুন' বলিয়া ভুজঙ্গধরবাবু বনলক্ষ্মীকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। দ্বার দিয়া বাহির হইতে হইতে তিনি বিজয়কে বলিতেছেন শুনিতে পাইলাম—'আপনি বরং এক কাজ করুন, আমার কুঠি থেকে টিঞ্চার আয়োডিনের শিশি আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসুন—'

ব্যোমকেশ আর পাশের ঘরে ফিরিয়া না গিয়া এই ঘরেই বসিল, বলিল,—'কি বিপত্তি! অজিত, তুমি তো উপস্থিত ছিলে, কি হয়েছিল বল দেখি?'

যাহা যাহা ঘটিয়াছিল বলিলাম, দন্তরুচি কৌমুদীও বাদ দিলাম না। শুনিয়া ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল।

বরাট ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—'কাউকে দেখতে পেলাম না। জানালার বাইরে মানুষের পায়ের দাগ রয়েছে কিন্তু কাঁচা দাগ বলে মনে হল না। ইট পাটকেল অবশ্য অনেক পড়ে রয়েছে।'

যেখানে বনলক্ষ্মী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল সেখানে একটা বাঁকা কালো জিনিস আলোয় চিকমিক করিতেছিল। ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া সেটা তুলিয়া লইল, আলোয় ধরিয়া বলিল,—'ভাঙা কাচের চুড়ি। বোধহয় বনলক্ষ্মী পড়ে যাবার সময় চুড়ি ভেঙেছে।'

চুড়ির টুকরো বরাটকে দিয়া ব্যোমকেশ আবার আসিয়া বসিল, নেপালবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—'আপনারা বোধহয় জানেন, পুলিসের সন্দেহ নিশানাথবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তাই একটু খোঁজ খবর নিতে হচ্ছে।—নেপালবাবু, যে-রাত্রে নিশানাথবাবু মারা যান সে-রাত্রে দশটা

থেকে এগারোটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন ?'

সোজাসুজি প্রশ্ন, প্রশ্নের অন্তর্নিহিত সন্দেহটিও খুব অস্পষ্ট নয়। নেপালবাবুর গলার শির উঁচু হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি বরাটের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া কষ্ট-সংযত কণ্ঠে বলিলেন,—'দাবা খেলছিলাম।'

এই সময় ঘরের কোণে পানুগোপালের উপর চোখ পড়িল। সে কানের তুলা খুলিয়া ফেলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া একাগ্রভাবে শুনিবার চেষ্টা করিতেছে।

ব্যোমকেশ : দাবা খেলছিলেন ? কার সঙ্গে ?

নেপাল : মুকুলের সঙ্গে।

ব্যোমকেশ : উনি দাবা খেলতে জানেন ?

নেপাল : জানে কিনা একবার খেলে দেখুন না !

ব্যোমকেশ : না না, তার দরকার নেই। তা আপনারা যখন খেলছিলেন, সেখানে কেউ উপস্থিত ছিল ?

নেপাল : কেউ না। নিশানাথ যে সেই সময় মারা যাবে তা জানতাম না, জানলে সাক্ষী যোগাড় করে রাখতাম।

ব্যোমকেশ : সে-রাত্রে আপনারা এদিকে আসেননি ?

নেপাল : এদিকে আসব কি জন্যে ? গরমে রাত্রে ঘুম আসে না তাই দাবা খেলছিলাম।

ব্যোমকেশ : তাহলে—সে-রাত্রে এ বাড়িতে কেউ এসেছিল কিনা তা আপনারা বলতে পারেন না ?

নেপাল : না।

এই সময় ঘরের কোণে পানুগোপাল হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুটা জ্বলজ্বল করিতেছে। সে প্রাণপণে একটা কিছু বলিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইল না। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি কি কিছু বলবেন ?' পানু সবেগে ঘাড় নাড়িয়া আবার কথা বলিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু এবারও কৃতকার্য হইল না।

নেপালবাবু মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন,—'যত সব হাবা কালার কাণ্ড।'

দ্বারের কাছে একটা শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ভুজঙ্গধরবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তীক্ষ্ণচক্ষে পানুগোপালকে দেখিতেছেন। তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন,—'পানু বোধহয় কিছু বলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ও এখন উত্তেজিত হয়েছে, কিছু বলতে পারবে না। পরে ঠাণ্ডা হলে হয়তো—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'ওদিকের খবর কি ?'

'বনলক্ষ্মীর জ্ঞান হয়েছে। কপাল ড্রেস করে দিয়েছি।'

'বিজয়বাবু কোথায় ?'

'তিনি বনলক্ষ্মীর কাছে আছেন।' ভুজঙ্গধরবাবুর অধরপ্রান্ত একটু প্রসারিত হইল।

নেপালবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কর্কশস্বরে বলিলেন,—'আপনাদের জেরা আশা করি শেষ হয়েছে। আমরা এবার যেতে পারি ?'

ব্যোমকেশ : একটু দাঁড়ান। (মুকুলকে) আপনি কখনও সিনেমায় অভিনয় করেছেন ?

মুকুলের মুখ শুকাইয়া গেল, সে ত্রস্ত-চোখে চারিদিকে চাহিয়া স্খলিতস্বরে বলিল,—'আমি—না, আমি কখনও সিনেমায় অভিনয় করিনি।'

নেপালবাবু গর্জন করিয়া উঠিলেন,—'মিথ্যে কথা। কে বলে আমার মেয়ে সিনেমা করে ! যত সব মিথ্যুক ছোটলোকের দল।'

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল,—'আপনার মেয়েকে সিনেমা স্টুডিওতে যাতায়াত করতে দেখেছে এমন সাক্ষীর অভাব নেই।'

নেপাল আবার গর্জন ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছিলেন, মুকুল পিতাকে থামাইয়া দিয়া

বলিল,—'সিনেমা স্টুডিওতে আমি কয়েকবার গিয়েছি সত্যি, কিন্তু অভিনয় করিনি। চল বাবা।' বলিয়া মুকুল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নেপালবাবু বাঘের মত এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে তাহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'রমেনবাবু ঠিকই ধরেছিলেন। যাক, ভুজঙ্গধরবাবু, আপনাকেও একটি মাত্র প্রশ্ন করব। সে-রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন ?'

ভুজঙ্গধরবাবু একপেশে হাসি হাসিয়া বলিলেন,—'সে-রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি নিজের ঘরে আলো নিভিয়ে বসে অনেকক্ষণ সেতার বাজিয়েছিলাম। সাক্ষী সাবুদ আছে কিনা জানি না।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল, তারপর উঠিয়া বরাটকে বলিল,—'চলুন, বনলক্ষ্মীকে দেখে আসি।'

সতের

বরাট, ব্যোমকেশ ও আমি বনলক্ষ্মীর কুঠিতে উপস্থিত হইলাম। ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় পাশের খোলা জানালা দিয়া একটি নিভৃত দৃশ্য চোখে পড়িল। ঘরটি বোধহয় বনলক্ষ্মীর শয়নঘর ; আলো জ্বলিতেছিল, বনলক্ষ্মী শয্যায় শুইয়া আছে, আর বিজয় শয্যার পাশে বসিয়া মৃদুস্বরে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছে।

আমাদের পদশব্দে বিজয় বাহির হইয়া আসিল। বলিল,—'বনলক্ষ্মী এখনও বড় দুর্বল। মাথার চোট গুরুতর নয়, কিন্তু স্নায়ুতে শক্ লেগেছে। তাকে এখন জেরা করা ঠিক হবে কি ?'

ব্যোমকেশ স্নিগ্ধস্বরে বলিল,—'জেরা করব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা শুধু তাকে দেখতে এসেছি, দেখেই চলে যাব।'

'তা—আসুন।'

ব্যোমকেশ ঘনিষ্ঠভাবে বিজয়ের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল,—'আপনাকে কিন্তু আর একটি কাজ করতে হবে বিজয়বাবু। একাজ আপনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা হবে না।'

'কি করতে হবে বলুন।'

'পানুগোপাল কিছু জানে, আপনার কাকার মৃত্যুর রাত্রে বোধহয় কিছু দেখেছিল। কিন্তু সে উত্তেজিত হয়েছে, কিছু বলতে পারছে না। আপনি তাকে ঠাণ্ডা করে কথাটা বার করে নিতে পারেন ? আমরা পারব না, আমাদের দেখলেই সে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠবে।'

বিজয় উৎসুক হইয়া বলিল,—'আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে।' বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আমরা বনলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিলাম।

লোহার সরু খাটের উপর বিছানা। বনলক্ষ্মী খাটের ধারে উঠিয়া বসিয়াছে, তাহার কপালে পটি বাঁধা। আমাদের দেখিয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'উঠবেন না, উঠবেন না, আপনি শুয়ে থাকুন।'

বনলক্ষ্মী লজ্জিতমুখে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—'কোথায় যে বসতে দেব আপনাদের !'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সে ভাবনা ভাবতে হবে না আপনাকে। আপনি শুয়ে পড়ুন তো আগে।'

বনলক্ষ্মী গুটিসুটি হইয়া শুইল। ব্যোমকেশ তখন খাটের পাশে বসিল, আমরা দু'জনে খাটের পায়ের কাছে দাঁড়াইলাম। ক্ষুদ্র নিরাভরণ ঘর ; লোহার খাটটি ছাড়া বলিতে গেলে আর কিছুই নাই।

ব্যোমকেশ হাল্কা গল্প করার ভঙ্গীতে বলিল,—'কী হয়েছিল বলুন দেখি ? বাইরে থেকে কেউ ঢিল ছুঁড়েছিল ?'

বনলক্ষ্মী দুর্বল কণ্ঠে বলিল,—'কিছু জানি না। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলুম, তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হল ডাক্তারবাবুর টিঞ্চার আয়োডিনের জ্বলুনিতে।'

'কপালে ছাড়া আর কোথাও লেগেছে নাকি?'

বনলক্ষ্মী ডান হাত তুলিয়া দেখাইল,—'হাতে কাচের চুড়ি ছিল, ভেঙে গেছে। হাতে একটু আঁচড় লেগেছে। বোধহয় হাতটা মাথার কাছে ছিল, একসঙ্গে লেগেছে—'

'তা হতে পারে।' ব্যোমকেশ হাত পরীক্ষা করিয়া বলিল,—'প্রথমে বোধহয় ইট আপনার হাতে লেগেছিল, তাই মাথায় বেশি চোট লাগেনি। আচ্ছা, কে ইট ছুঁড়তে পারে? কলোনীতে এমন কেউ আছে কি, যে আপনার প্রতি প্রসন্ন নয়?'

বনলক্ষ্মী ব্যথিত স্বরে বলিল,—'মুকুল আর নেপালবাবু আমাকে—পছন্দ করেন না। তা ছাড়া—তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া ভুজঙ্গধরবাবুও আপনার ওপর সন্তুষ্ট নন।'

বনলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভুজঙ্গধরবাবু হয়তো আপনাকে দেখতে পারেন না, কিন্তু সেজন্য ওঁর কর্তব্যে ত্রুটি হয় না।'

বনলক্ষ্মীর অধরে একটু তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল,—'না, তা হয় না। আমার কপালে খুব টিঞ্চার আয়োডিন ঢেলেছেন।'

ব্যোমকেশ হাসিল,—'যাক।—ব্রজদাস বাবাজী আর রসিকবাবুর সঙ্গে আপনার কোনও রকম অসদ্ভাব— ?'

বনলক্ষ্মী বলিল,—'ব্রজদাস ঠাকুর খুব ভাল লোক ছিলেন, আমাকে স্নেহ করতেন। কেন যে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন—'

'আর রসিকবাবু?'

'রসিকবাবুকে আমি দেখেছি, এই পর্যন্ত। কখনও কথা হয়নি।—তিনি মিশুকে লোক ছিলেন না, নিজের কাজ নিয়ে থাকতেন।'

'ওকথা যাক। আপনি এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন তো?'

বনলক্ষ্মী একটু হাসিল,—'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাহলে বাঁধা বুলিটা আউড়ে নিই। সে-রাত্রে দশটা এগারোটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?'

বনলক্ষ্মীর চোখে অন্ধকার জমিয়া উঠিল। অতি অস্ফুট স্বরে সে বলিল,—'কাকাবাবুর মৃত্যু তাহলে —?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাই মনে হচ্ছে।' বনলক্ষ্মী ক্ষণকাল চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'সে-রাত্রে রান্নাঘর থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসার পর আমি অনেকক্ষণ কলে সেলাই করেছিলুম।'

বাহিরের ঘরে একটি পায়ে-চালানো সেলাইয়ের মেশিন দেখিয়াছি; পূর্বে নিশানাথবাবু বনলক্ষ্মীকে দর্জিখানার পরিচারিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন মনে পড়িল।

ব্যোমকেশ নরম সুরে বলিল,—'আপনি তো কলোনীর সকলের জামা-কাপড় সেলাই করেন। অনেক কাজ জমা হয়ে গিয়েছিল বুঝি?'

'না, কাজ বেশি জমা হয়নি। কাকাবাবুর জন্যে সিল্কের একটা ড্রেসিং গাউন তৈরি করছিলুম।' বনলক্ষ্মীর চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি সে-রাত্রে যখন সেলাইয়ের কল চালাচ্ছিলেন, তখন ভুজঙ্গধরবাবুকে সেতার বাজাতে শুনেছিলেন? ওঁর কুঠি তো আপনার পাশেই?'

বনলক্ষ্মী চোখ মুছিয়া মাথা নাড়িল,—'না, আমি কিছু শুনিনি। কানের কাছে কল চলছিল,

শুনব কি করে !' তাহার যেন একটু রাগ-রাগ ভাব।

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিল,—'শুধু যে ভুজঙ্গধরবাবু আপনাকে দেখতে পারেন না তা নয়, আপনিও তাঁকে দেখতে পারেন না। ভুজঙ্গধরবাবু সে-রাত্রে নিজের ঘরে বসে সেতার বাজাচ্ছিলেন, অন্তত তাই বললেন। আপনি যদি না শুনে থাকেন, তাহলে বলতে হবে উনি মিথ্যে কথা বলেছেন।'

এবার বনলক্ষ্মীর মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল। লজ্জা ও অনুতাপভরা মুখে সে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া আবেগভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—'না ! উনি সেতার বাজাচ্ছিলেন। আমি কল চালাবার ফাঁকে ফাঁকে শুনেছিলাম !'

ব্যোমকেশ তাহার হাতটি দুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিল,—'তবে যে আগে বললেন শোনেননি !'

বনলক্ষ্মীর অধর স্ফুরিত হইল, অনুতাপের সহিত অভিমান মিশ্রিত হইল। সে বলিল,—'উনি আমার সঙ্গে যেরকম ব্যাভার করেন—'

'কিন্তু কেন ও রকম ব্যবহার করেন ? কোনও কারণ আছে কি ?'

বনলক্ষ্মী হাত ছাড়াইয়া লইয়া একবার কপালের উপর আঙ্গুল বুলাইয়া অর্ধস্ফুট স্বরে বলিল,—'সে আপনার শুনে কাজ নেই।'

'কিন্তু আমার যে জানা দরকার।'

বনলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ আবার অনুরোধ করিল। তখন বনলক্ষ্মী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—

'আমার কথা বোধহয় শুনেছেন, নিজের দোষে ইহকাল পরকাল নষ্ট করেছি। কাকাবাবু আশ্রয় দিয়েছিলেন তাই—নইলে—

'আমি এখানে আশ্রয় পাবার পর ডাক্তারবাবু আমার সঙ্গে খুব সদয় ব্যাভার করেছিলেন। উনি খুব মিশুকে, ওঁকে আমার খুব ভাল লাগত। উনি চমৎকার সেতার বাজাতে পারেন। আমার ছেলেবেলা থেকে গান-বাজনার দিকে ঝোঁক, কিন্তু কিচ্ছু শিখতে পারিনি। একদিন ওঁর কাছে গিয়ে বললুম, আমি সেতার শিখব, আমাকে শেখাবেন ?—'

'তারপর ?'

বনলক্ষ্মীর চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া গেল,—'উনি যে প্রস্তাব করলেন তাতে ছুটে পালিয়ে এলুম...আমি জীবনে একবার ভুল করেছি তাই উনি মনে করেন আমি—' তাহার স্বর বুজিয়া গেল।

ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'ভুজঙ্গবাবু তো খাসা মানুষ। একথা কেউ জানে ?'

বনলক্ষ্মী জিভ কাটিল,—'আমি কাউকে কিছু বলিনি। একথা কি বলবার ? বললে কেউ বিশ্বাস করত না...যে-মেয়ের একবার বদনাম হয়েছে—'

বাহিরে পায়ের শব্দ হইল। বনলক্ষ্মী চমকিয়া ত্রস্তস্বরে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—'উনি—বিজয়বাবু আসছেন ! ওঁকে যেন কিছু বলবেন না। উনি রাগী মানুষ—'

'ভয় নেই' বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারের কাছে বিজয়ের সঙ্গে দেখা হইল। ব্যোমকেশ বলিল,—'কি হল ? পানুগোপালের কাছ থেকে কিছু বার করতে পারলেন ?'

বিজয় বিষণ্ণ বিরক্তির সহিত বলিল,—'কিছু না। পানুটা ইডিয়ট ; হয়তো ওর কিছুই বলবার নেই, যখন বলতে পারবে তখন দেখা যাবে অতি তুচ্ছ কথা। আপনাদের কোনই কাজে লাগবে না।'

'তা হতে পারে। তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই। কাজের কথাও বেরিয়ে পড়তে পারে।'

'কাল সকালে আর একবার চেষ্টা করে দেখব।'

'আচ্ছা। আজ চলি তাহলে।'

'আসুন। দরকার হলে কাল টেলিফোন করব।'

বিজয় রহিয়া গেল, আমরা বাহিরে আসিলাম। কুঠি হইতে নামিবার স্থানটি অন্ধকার। বরাট টর্চ জ্বালিল।

পাশের যে জানালা দিয়া বনলক্ষ্মীর শয়নঘর দেখা যায়, তাহার নীচে একটা কালো কাপড়-ঢাকা মূর্তি লুকাইয়া ছিল, টর্চের প্রভা সেদিকে পড়িতেই প্রেত-মূর্তির মত একটা ছায়া সট্ করিয়া সরিয়া গেল, তারপর গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হইল। ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে বরাটের হাত হইতে টর্চ কাড়িয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমরা বোকার মত ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর অন্ধকারে হোঁচট খাইতে খাইতে তাহার অনুসরণ করিলাম।

কিছুদূর যাইবার পর দেখা গেল ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিতেছে। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল,—'ধরতে পারলাম না। নেপালবাবুর কুঠির পিছন পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে গেল।'

বরাট বলিল,—'লোকটা কে আন্দাজ করতে পারলেন?'

'উঁহু। তবে মেয়েমানুষ। দৌড়ুবার সময় মনে হল বাতাসে গোলাপী আতরের গন্ধ পেলাম। একবার চুড়ি কিম্বা চাবির আওয়াজও যেন কানে এল।'

'মেয়েমানুষ—কে হতে পারে?'

'মুকুল হতে পারে, মুস্কিলের বিবি হতে পারে, আবার দময়ন্তী দেবীও হতে পারেন।—চলুন, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।'

বরাট স্টেশন পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাইয়া দিতে আসিল—ট্রেন তখনও আসে নাই। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনাকে আর একটা কাজ করতে হবে। ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি মনে করবেন না আমি আপনার ওপর সর্দারি করছি। এ কাজে আমরা সহযোগী। আপনার পেছনে পুলিসের অফুরন্ত এক্তিয়ার রয়েছে, আপনি যে-কাজটা পাঁচ মিনিটে করতে পারবেন আমি করতে গেলে সেটা পাঁচ দিন লাগবে। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি—'

বরাট হাসিয়া বলিল,—'কি কাজ করতে হবে বলুন না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'গুপ্তচর লাগাতে হবে। কলোনী থেকে কে কখন কলকাতায় যাচ্ছে তার খবর আমার দরকার। যেই খবর পাবেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টেলিফোন করবেন।'

'তাই হবে। কলোনীতে আর স্টেশনে লোক রাখব।—বনলক্ষ্মীর ভাঙা চুড়িটা আমায় দিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে কী করা যাবে?'

'ওটা ফেলে দিতে পারেন। ভেবেছিলাম পরীক্ষা করাতে হবে, কিন্তু তার দরকার নেই।'

'আর কিছু?'

'আপাতত আর কিছু নয়। আজ যা দেখলেন শুনলেন তা থেকে কি মনে হল? কাউকে সন্দেহ হচ্ছে?'

'দময়ন্তীকে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হচ্ছে।'

'কিন্তু এ স্ত্রীলোকের কাজ নয়।'

'স্ত্রীলোকের সহকারী থাকতে পারে তো।'

ব্যোমকেশ চকিতে বরাটের পানে চোখ তুলিল।

'সহকারী কে হতে পারে?'

'সেটা বলা শক্ত। যে-কেউ হতে পারে। বিজয় হতে বাধা কি? ও যেভাবে কাকীমাকে আগলে বেড়াচ্ছে দেখলাম—'

'হ্যাঁ—ভাববার কথা বটে। ওদিকে নেপালবাবুর সঙ্গেও দময়ন্তী দেবীর একটা প্রচ্ছন্ন সংযোগ রয়েছে।'

'আচ্ছা, দময়ন্তীর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানা গেছে ?'

'দুর্নাম কিছু শুনিনি, বরং ভালই শুনেছি।'

'আপনার গাড়ি এসে পড়েছে। হ্যাঁ, রসিক দে'র সব্‌জি-দোকানের হিসেব-পত্র দেখবার ব্যবস্থা করেছি। যদি সত্যিই চুরি করে থাকে, ওর নামে ওয়ারেন্ট বের করব।'

ট্রেনের শূন্য কামরায় ব্যোমকেশ একটা বেঞ্চিতে চিৎ হইয়া আলোর দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল,—'চিড়িয়াখানাই বটে।'

উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'হঠাৎ একথা কেন ?'

ব্যোমকেশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল,—'চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কি ? নাম-কাটা ডাক্তার সংস্কৃত শ্লোক আওড়ায়, মুখপোড়া প্রফেসর রাত দুপুরে মেয়ের সঙ্গে দাবা খেলে, কর্তাকে দোর-বন্ধ বাড়িতে ঢুকে কেউ খুন করে যায় কিন্তু পাশের ঘরে গৃহিণী কিছু জানতে পারেন না, কর্তার ভাইপো খুড়োর তহবিল ভেঙ্গে সগর্বে সেকথা প্রচার করে, বোষ্টম ফেরারী হয়, গাড়োয়ানের বৌ আড়ি পাতে—। চিড়িয়াখানা আর কাকে বলে ?'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আজকের অনুসন্ধানে কিছু পেলে ?'

'এইটুকু পেলাম যে সবাই মিথ্যে কথা বলছে। নির্জলা মিথ্যে বলছে না। সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে এমনভাবে বলছে যে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে ধরা যায় না।'

'বনলক্ষ্মীও মিথ্যে বলছে ?'

'অন্তত বলবার তালে ছিল। নেহাৎ বিবেকের দংশনে সত্যি কথা বলে ফেলল।'

'আচ্ছা, অ্যালিবাই সম্বন্ধে কি মনে হল ?'

'কারুর অ্যালিবাই পাকা নয়। বিজয় বলছে, ঠিক যে-সময় খুন হয় সে-সময় সে কলকাতায় ছিল, অথচ তার কোনোও সাক্ষী-প্রমাণ নেই, বেনামী চিঠিখানা পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। নেপালবাবু মেয়ের সঙ্গে দাবা খেলছিলেন, কেউ তাঁদের খেলতে দেখেনি। ডাক্তার অন্ধকারে সেতার বাজাচ্ছিলেন, একজন কানে শুনেছে কিন্তু চোখে দেখেনি। বনলক্ষ্মী কলে সেলাই করছিল, সাক্ষী নেই। দময়ন্তীর কথা ছেড়েই দাও। এর নাম কি অ্যালিবাই ?'

ব্যোমকেশ খানিকক্ষণ বাহিরের অপসৃয়মান আলো-আঁধারের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার ললাটে চিন্তার ভ্রূকুটি। সে বলিল,—'বনলক্ষ্মী একবার আমার হাত ধরেছিল, লক্ষ্য করেছিলে ?'

বলিলাম,—'লক্ষ্য আবার করিনি! তুমিও দু'হাতে তার হাত ধরে কত আদর করলে দেখলাম।'

ব্যোমকেশ ফিকা হাসিল,—'আদর করিনি, সহানুভূতি জানাচ্ছিলাম।—কিন্তু আশ্চর্য, বনলক্ষ্মীর বাঁ হাতের তর্জনীর ডগায় কড়া পড়েছে।'

বলিলাম,—'এ আর আশ্চর্য কি ? যারা সেলাই করে তাদের আঙুলে কড়া পড়েই থাকে।'

ব্যোমকেশ চিন্তাক্রান্ত মুখে সিগারেটে একটা সুখ-টান দিয়া সেটা বাহিরে ফেলিয়া দিল। তারপর আবার লম্বা হইয়া শুইল।

সে-রাত্রে বাসায় ফিরিতে সাড়ে এগারোটা বাজিল। আর কোনও কথা হইল না, তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আঠারো

ঘুম ভাঙিল মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ শব্দে। তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, মনে হইল কানের কাছে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কয়েকদিন আগে ঘুমের মধ্যে এমনি আর্ত আহ্বান আসিয়াছিল।

আজ আর বিছানায় থাকিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ ইতিমধ্যে আসিয়া টেলিফোন ধরিয়াছে। আমি তক্তপোশের পাশে বসিয়া একতরফা সংলাপ শুনিলাম—'হ্যালো...বিজয়বাবু...কী ? মারা গেছে ! কখন ?...কি হয়েছিল...আমি যেতে পারি, কিন্তু এখন গিয়ে লাভ কি ?...আপনি বরং ইন্সপেক্টর বরাটকে ফোন করুন, তিনি ব্যবস্থা করবেন...হ্যাঁ, পোস্ট-মর্টেম হওয়া চাই, আর ওষুধের শিশিটা পরীক্ষা হওয়া চাই...আচ্ছা—'

টেলিফোন রাখিয়া ব্যোমকেশ একটা আরাম-চেয়ারে বসিল। আমার ঠোঁটের কাছে যে প্রশ্নটা ধড়ফড় করিতেছিল তাহা বাহির হইয়া আসিল,—'কে ? কে গেল ?'

ব্যোমকেশের চোখে-মুখে যেন দুঃস্বপ্নের জড়তা লাগিয়া ছিল, সে মুখের উপর হাত চালাইয়া তাহা সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। বলিল,—'পানুগোপাল। কিছুক্ষণ আগে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। বোধহয় কানে ওষুধ দিয়েছিল ; ওষুধের শিশিটা ছিপিখোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে। ওষুধে বিষ মেশানো ছিল, বিষের জ্বালায় সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে, বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যায়। সেইখানেই মৃত্যু হয়েছে।—আমার দোষ। আমার ভাবা উচিত ছিল, পানু যদি সত্যিই কোনও গুরুতর কথা জানতে পেরে থাকে, তাহলে তার প্রাণের আশঙ্কা আছে। কেন সাবধান হইনি ! কেন তাকে সঙ্গে নিয়ে আসিনি ! কিন্তু কাল বিজয় বললে, ওটা একটা ইডিয়ট, হয়তো কিছুই বলবার নেই। আমার মনও সেই কথায় ভিজে গেল—'

ব্যোমকেশ হঠাৎ চুপ করিল। তাহার তীব্র আত্মগ্লানির মধ্যে আবার কোন নূতন সংশয় মাথা তুলিয়াছে, সে মুখের উপর একটা হাত ঢাকা দিয়া নীরব হইয়া রহিল।

তারপর সকাল হইল ; পুঁটিরাম চা দিয়া গেল। ব্যোমকেশ কিন্তু চা স্পর্শ করিল না, একটা সিগারেট পর্যন্ত ধরাইল না, মোহগ্রস্তের মত মুখের উপর হাত চাপা দিয়া আরাম-চেয়ারে পড়িয়া রহিল।

আমার মনটা বিকল হইয়া গিয়াছিল। পানুগোপাল ছেলেটা প্রকৃতির কৃপণতায় অসুস্থ দেহ লইয়া জন্মিয়াছিল, কিন্তু সে নির্বোধ ছিল না। তাহার হৃদয় ছিল, হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা ছিল। নিশানাথবাবু তাহাকে ভালবাসিতেন, আমারও তাহাকে ভাল লাগিয়া গিয়াছিল। তাহার এই যন্ত্রণাময় মৃত্যুর সংবাদ কাঁটার মত মনের মধ্যে বিঁধিয়া রহিল।

বেলা বারোটার সময় ব্যোমকেশ নিঃশব্দে উঠিয়া স্নানাহার করিল, তারপর পাখা চালাইয়া শয্যায় শয়ন করিল। সে যে দিবানিদ্রা দিবার জন্য শয়ন করিল না তাহা বুঝিলাম। পানুগোপালের মৃত্যুর জন্য সে নিজেকে দোষী মনে করিতেছে, একান্ত নিভৃতে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে চায়। এবং যে অদৃশ্য নরঘাতক পর-পর দুইটি মানুষকে নিঃশব্দে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিল তাহার ছদ্মবেশ অপসারিত করিয়া তাহাকে ফাঁসিকাঠে লট্‌কাইবার পন্থা আবিষ্কার করিতে চায়।

অপরাহ্ণে দুইজনে নীরবে বসিয়া চা-পান করিলাম। ব্যোমকেশের মুখখানা শাণ দেওয়া ক্ষুরের মত হিংস্র এবং কঠিন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট লইয়া প্রমোদ বরাট আসিল। ব্যোমকেশের হাতে রিপোর্ট দিয়া বলিল,—'নিকোটিন বিষে মৃত্যু হয়েছে। ওষুধের শিশিতেও নিকোটিন পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ বরাটের সম্মুখে সিগারেটের টিন রাখিয়া পুঁটিরামকে আর এক দফা চায়ের হুকুম দিল ; রিপোর্ট পড়িয়া কোনও মন্তব্য না করিয়া আমার হাতে দিল।

রাত্রি দশটা হইতে এগারোটার মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে। পানুর কানের মধ্যে ক্ষত ছিল, রাত্রে শয়নের পূর্বে শিশির ঔষধে তুলা ভিজাইয়া কানে দিয়াছিল। ইহা তাহার প্রাত্যহিক কর্ম। কিন্তু কাল কেহ অলক্ষিতে তাহার ঔষধে বিষ মিশাইয়া দিয়া গিয়াছিল। বিষ রক্তের সহিত মিশিবার অল্পকাল মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে। তাহার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।—পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট ও বরাটের মুখের কথা হইতে এই তথ্যগুলি প্রকাশ পাইল।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'মৃতদেহ কে প্রথম আবিষ্কার করে ?'

বরাট বলিল,—'নেপালবাবুর মেয়ে মুকুল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বরাটের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'এবারেও মুকুল! আশ্চর্য।'

বরাট বলিল,—'যা শুনলাম, ভোর রাত্রে উঠে বাগানে ঘুরে বেড়ানো মেয়েটার অভ্যেস।'

'হুঁ।—আপনি খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন?'

'সকলকেই সওয়াল করেছিলাম কিন্তু কাজের কথা কিছু পেলাম না।'

'পানু যে-ওষুধ কানে দিত সেটা কি ভুজঙ্গধরবাবুর দেওয়া ওষুধ?'

'হ্যাঁ। ওষুধে ছিল স্রেফ গ্লিসারিন আর বোরিক পাউডার। ভুজঙ্গধরবাবু বললেন, তিনি মাসে এক শিশি পানুকে তৈরি করে দিতেন, পানু তাই কানে দিত। কাল রাত্রি দশটার আগে কোনও সময় হত্যাকারী এসে তার শিশিতে নিকোটিন মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত পানু তখন খেতে গিয়েছিল।'

'কে কখন খেতে গিয়েছিল খবর নিয়েছেন?'

'সকলে একসঙ্গে খেতে যায়নি, কেউ আগে কেউ পরে। পানু খেতে গিয়েছিল আন্দাজ পৌনে দশটার সময়, অর্থাৎ আমরা চলে আসবার পরই।'

'কাল রান্না করেছিল কে?'

'দময়ন্তী আর মুকুল। দু'জনেই সারাক্ষণ রান্নাঘরে ছিল।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। পুঁটিরাম চা ও জলখাবার দিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'নিকোটিন। অজিত, লক্ষ্য করেছ, দ্বিতীয়বার নিকোটিনের আবির্ভাব হল।'

বলিলাম,—'হ্যাঁ। তার মানে—সুনয়না।'

বরাট বলিল,—'কিন্তু সুনয়না বা অন্য কোনও স্ত্রীলোক নিশানাথবাবুকে কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দিতে পারে এ প্রস্তাব আমরা আগেই খারিজ করেছি। ধরে নিতে হবে সুনয়নার একজন সহকর্মী আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সহকর্মী কিম্বা সহকর্মিণী। একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে যে কাজ অসম্ভব, দু'জন স্ত্রীলোক মিলে সে কাজ সহজেই করতে পারে। কিন্তু আসল কথা নিকোটিন। এ বিষ এল কোত্থেকে? ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি নিকোটিন সম্বন্ধে কিছু জানেন?'

বরাট বলিল,—'ওটা ভয়ঙ্কর বিষ এই জানি। আপনার মুখে সুনয়নার কথা শোনবার পর খোঁজখবর নিয়েছিলাম, দেখলাম ওষুধের দোকানে ও-মাল পাওয়া যায় না; কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এক যদি কোনও বড় ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় তো বলতে পারি না।'

'এক হতে পারে যে-ব্যক্তি বিষ ব্যবহার করেছে সে নিজে একজন কেমিস্ট কিংবা কোনও কেমিস্টকে দিয়ে বিষ তৈরি করিয়েছে।'

'তা হতে পারে। কেমিস্ট তো একজন হাতের কাছেই রয়েছে—নেপাল গুপ্ত।'

'যদি নেপাল গুপ্ত হয়, সুনয়নার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি?'

'বাপ-বেটি হতে বাধা কি?'

আমি বলিলাম,—'নেপালবাবুর সঙ্গে দময়ন্তী দেবীরও যোগাযোগ আছে—তাঁরা দুজনে হতে পারেন।'

ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল,—'দময়ন্তী দেবী আর বিজয় হতে পারে, বিজয় আর বনলক্ষ্মী হতে পারে, বনলক্ষ্মী আর দময়ন্তী হতে পারে, দময়ন্তী আর ভুজঙ্গধর হতে পারে, বনলক্ষ্মী আর ব্রজদাস হতে পারে, এমন কি মুস্কিল মিঞা আর নজর বিবি হতে পারে। সম্ভাবনা অনেকগুলো রয়েছে, কিন্তু কেবল সম্ভাবনার কথা গবেষণা করে কোনও লাভ হবে না। পাকাপাকি জানতে হবে।'

বরাট জলযোগ শেষ করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—'বেশ তো, পাকাপাকি জানার একটা

উপায় বলুন না। পুলিসের দিক থেকে আর কোনও বাধা নেই, পানুকে যে খুন করা হয়েছে—আমার কর্তারা তা স্বীকার করবেন ; সুতরাং পুলিসের যা-কিছু কর্তব্য সবই আমি করতে পারি। এখন কি করতে হবে বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'এক, কলোনীর সকলের কুঠি খানাতল্লাস করে দেখতে পারেন, কিন্তু নিকোটিন পাবেন না। আমার মনে হয়, রুটিন-মাফিক কাজে কোনও ফল হবে না। বরং আপাতত কিছুদিন বসে থাকা ভাল।'

'চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকব ?'

'একেবারে হাত গুটোবার দরকার নেই। ব্রজদাস আর রসিকের তল্লাস যেমন চলছে চলুক। রসিকের দোকানের খাতাপত্র পরীক্ষা করুন। আর কলোনীতে গুপ্তচর বসান। কে কখন বাইরে যাচ্ছে সেটা জানা বিশেষ দরকার।'

বরাট গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—'আজ থেকেই লোক লাগাবো ঠিক করেছিলাম কিন্তু পানুর ব্যাপারে সব গোলমাল হয়ে গেছে। কাল থেকে হবে।—কলোনীতে আর কারুর হঠাৎ মৃত্যুর যোগ নেই তো ?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'বোধহয় না। থাকলেও আমরা ঠেকাতে পারব না।'

উনিশ

দুইদিন গোলাপ কলোনীর দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসিল না ; প্রমোদ বরাটও খবর দিল না। মৃত্যু-ছায়াচ্ছন্ন কলোনীর কথা যেন সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ টেলিফোনের দিকে চোখ রাখিয়া অতৃপ্ত প্রেতাত্মার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দু'একবার আমরা দাবার ছক সাজাইয়া বসিলাম। কিন্তু ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক হইয়া রহিল, খেলা জমিল না।

তৃতীয় দিন বিকালবেলা চা-পানের পর ব্যোমকেশ বলিল,—'আমি একটু বেরুব।'

আমারও মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিলাম,—'কোথায় যাবে ?'

'সেন্ট মার্থার স্কুলে খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। তুমি কিন্তু বাড়িতেই থাকবে। যদি টেলিফোন আসে।'

ব্যোমকেশ চলিয়া গেল। তারপর দু'ঘন্টা কড়িকাঠ গুনিয়া কাটাইয়া দিলাম।

ছ'টা বাজিতে পাঁচ মিনিটে টেলিফোন বাজিল। বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

বরাট টেলিফোন করিতেছে। বলিল,—'বেরিয়েছেন ?—তাঁকে বলে দেবেন ভুজঙ্গধরবাবু কোট-প্যান্ট পরে পৌনে ছ'টার ট্রেনে কলকাতা গেছেন।—আর একটা খবর আছে, রসিক দে'র খাতাপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে তিন হাজার টাকার গরমিল। রসিকের নামে ওয়ারেন্ট বার করেছি।'

'কলোনীর খবর কী ?'

'নতুন খবর কিছু নেই।'

বরাট টেলিফোন ছাড়িয়া দিবার পর মনটা আরও অস্থির হইয়া উঠিল। ভুজঙ্গধরবাবু কলিকাতায় আসিতেছেন এ সংবাদের গুরুত্ব কতখানি কিছুই জানি না। ব্যোমকেশ কখন ফিরিবে ?

ব্যোমকেশ ফিরিল সওয়া ছ'টার সময়। ভুজঙ্গধরবাবুর সংবাদ দিতেই তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল,—'ট্রেন এসে পৌঁছতে এখনও আধ ঘন্টা। অনেক সময় আছে।' বলিয়া নিজের শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

আমি দ্বারের নিকট হইতে বলিলাম,—'রসিক দে দোকানের তিন হাজার টাকা মেরেছে।'

ওপার হইতে আওয়াজ আসিল,—'বেশ বেশ।'

পাঁচ মিনিট পরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল একটি আধাবয়সী ফিরিঙ্গী। পরিধানে ময়লা জিনের প্যান্টুলুন ও রঙচটা আলপাকার কোট, মাথায় তেল-চিটে নাইট ক্যাপ, ছাঁটা গোঁফের ভিতর হইতে আধ-পোড়া একটা চুরুট বাহির হইয়া আছে।

বলিলাম,—'এ কি গোয়াঞ্চি পিদ্রু সেজে কোথায় চললে ?'

সাহেব কড়া সুরে বলিল,—'None of your business, young man.' বলিয়া পা ঘষিয়া বাহির হইয়া গেল।

তারপর সাড়ে দশটার আগে আর তাহার দেখা পাইলাম না। একেবারে স্নান সারিয়া গরম চায়ের পেয়ালা হাতে বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

আমি বলিলাম,—'কোট-প্যান্টুলুনের আর একটা মহৎ গুণ, পরলেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। আশা করি মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কোট-প্যান্টুলুনের আর একটা মহৎ গুণ, বেশি ছদ্মবেশ দরকার হয় না। —তুমি বোধহয় খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছ ?'

'তা উঠেছি। এবার তোমার হৃদয়ভার লাঘব কর।'

'কোনটা আগে বলব ? ভুজঙ্গধরবাবুর বৃত্তান্ত ?'

'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ চায়ে চুমুক দিয়া বলিল,—'বুঝতেই পেরেছ ফিরিঙ্গী সেজে শিয়ালদা স্টেশনে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল ভুজঙ্গধরবাবু কোথায় যান দেখা। স্টেশনে তাঁকে আবিষ্কার করে তাঁর পিছু নিলাম। তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। তাঁকে অনুসরণ করা শক্ত হল না। তিনি ট্রামে চড়লেন, আমিও ট্রামে চড়লাম। মৌলালির মোড়ে এসে তিনি নামলেন, আমিও নামলাম। তারপর ধর্মতলা দিয়ে কিছুদূর গিয়ে তিনি একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। গলির পর গলি, তস্য গলি। দেখলাম ফিরিঙ্গী পাড়ায় এসে পৌঁছেছি। ভালই হল। পাড়ার সঙ্গে আমার ছদ্মবেশ খাপ খেয়ে গেল। কোট-প্যান্টুলুনের ওই মাহাত্ম্য, যে পাড়াতেই যাও বেমানান হয় না।'

'তারপর ?'

'একটা এদোঁপড়া বাড়ির দরজার পাশে দুটো স্ত্রীলোক দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভুজঙ্গধরবাবু গিয়ে তাদের সঙ্গে খাটো গলায় কথা বললেন, তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। স্ত্রীলোক দুটো দাঁড়িয়ে রইল।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তাদের কি রকম মনে হল ?'

ব্যোমকেশের মুখে বিতৃষ্ণা ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল—

'দেবতা ঘুমালে তাহাদের দিন
দেবতা জাগিলে তাদের রাতি
ধরার নরক সিংহদুয়ারে
জ্বালায় তাহারা সন্ধ্যাবাতি !'

'তারপর বল।'

'আমি বড় মুস্কিলে পড়ে গেলাম। ভুজঙ্গধরবাবুর চরিত্র আমরা যতটা জানতে পেরেছি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। কিন্তু এই এঁদোপড়া বাড়িটাই তাঁর একমাত্র গন্তব্যস্থল কিনা তা না জেনে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমি বাড়ির সামনে দিয়ে একবার হেঁটে গেলাম, দেখে নিলাম বাড়ির নম্বর উনিশ। তারপর একটা অন্ধকার কোণে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মেয়ে দুটো দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

'প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে ভুজঙ্গধরবাবু বেরুলেন। আশেপাশে দৃক্‌পাত না করে যে-পথে

এসেছিলেন সেই পথে ফিরে চললেন। আমি চললাম। তারপর সটান শেয়ালদা স্টেশনে তাঁকে ন'টা পঞ্চান্নর গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি।'

চায়ের পেয়ালা এক চুমুকে শেষ করিয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল। আমি বলিলাম, 'তাহলে ভুজঙ্গধরবাবুর কার্যকলাপ থেকে কিছু ধরা গেল না ?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'কেমন যেন ধোঁকা লাগল। ভুজঙ্গধরবাবু যখন দরজা থেকে বেরুলেন তখন তাঁর পকেট থেকে কি একটা জিনিস মাটিতে পড়ল। ঝিনিৎ করে শব্দ হল। তিনি দেশলাই জ্বেলে সেটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলেন। দেখলাম একটা চাবির রিঙ, তাতে গোটা তিনেক বড়-বড় চাবি রয়েছে।'

'এতে ধোঁকা লাগবার কি আছে ?'

'হয়তো কিছু নেই, তবু ধোঁকা লাগছে।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর বলিলাম,—'ওদিকে কী হল ? সেন্ট মার্থা স্কুল ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'দময়ন্তী দেবী মাস আষ্টেক স্কুলে যাতায়াত করেছিলেন। রোজ যেতেন না, ইংরেজি শেখার দিকেও খুব বেশি চাড় ছিল না। স্কুলে দু' তিনটি পাঞ্জাবী মেয়ে পড়ত, তাদের সঙ্গে গল্প করতেন—'

'পাঞ্জাবী মেয়েদের সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ। দময়ন্তী দেবী পাঞ্জাবী ভাষা জানেন।'

এই সময়ে টেলিফোন বাজিল। ব্যোমকেশ টপ্ করিয়া ফোন তুলিয়া লইল,—'হ্যালো...ইন্সপেক্টর বরাট ! এত রাত্রে কী খবর ?...রসিক দে ধরা পড়েছে ! কোথায় ছিল...অ্যাঁ। শিয়ালদার কাছে 'বঙ্গ বিলাস' হোটেলে ! সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু ছিল ?...মাত্র ত্রিশ টাকা !...আজ তাকে আপনাদের লক্-আপে রাখুন, কাল সকালেই আমি গিয়ে হাজির হব। ...আর কি ! হ্যাঁ দেখুন, একটা ঠিকানা দিচ্ছি, আপনার একজন লোক পাঠিয়ে সেখানকার হালচাল সব সংগ্রহ করতে হবে...১৯ নম্বর মির্জা লেন...হ্যাঁ, স্থানটা খুব পবিত্র নয়...কিন্তু সেখানে গিয়ে আলাপ জমাবার মতন লোক আপনাদের বিভাগে নিশ্চয় আছে...হাঃ হাঃ হাঃ...আচ্ছা, কাল সকালেই যাচ্ছি...নমস্কার।'

ফোন রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'চল, আজ খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া যাক, কাল ভোরে উঠতে হবে।'

কুড়ি

গোলাপ কলোনীর ঘটনাবলী ধাবমান মোটরের মত হঠাৎ বানচাল হইয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, তিন দিন পরে মেরামত হইয়া আবার প্রচণ্ড বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

পরদিন সকালে আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় মোহনপুরের স্টেশনে অবতীর্ণ হইলাম। আকাশে শেষরাত্রি হইতে মেঘ জমিতেছিল, সূর্য ছাই-ঢাকা আগুনের মত কেবল অন্তর্দাহ বিকীর্ণ করিতেছিলেন। আমরা পদব্রজে থানার দিকে চলিলাম।

থানার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছি এমন সময় নেপালবাবু বন্য বরাহের ন্যায় থানার ফটক দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। আমাদের দিকে মোড় ঘুরিয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ আমাদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তারপর আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া ছুটিয়া চলিলেন।

ব্যোমকেশ ডাকিল,—'নেপালবাবু, শুনুন—শুনুন।'

নেপালবাবু যুযুৎসু ভঙ্গীতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহার কাছে গিয়া বলিল,—'এ কি, আপনি থানায় গিয়েছিলেন ! কী হয়েছে ?'

নেপালবাবু ফাটিয়া পড়িলেন,—'ঝকমারি হয়েছে ! পুলিসকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম,

আমার ঘাট হয়েছে। পুলিসের খুরে দণ্ডবৎ।' বলিয়া আবার উল্টামুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্যোমকেশ আবার গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল,—'কিন্তু ব্যাপারটা কি? পুলিসকে কোন্ বিষয়ে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন?'

ঊর্ধ্বে হাত তুলিয়া নাড়িতে নাড়িতে নেপালবাবু বলিলেন,—'না না, আর না, যথেষ্ট হয়েছে। কোন্ শালা আর পুলিসের কাজে মাথা গলায়। আমার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, তাই— !'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিন্তু আমাকে বলতে দোষ কি? আমি তো আর পুলিস নই।'

নেপালবাবু কিন্তু বাগ মানিতে চান না। অনেক কষ্টে পিঠে অনেক হাত বুলাইয়া ব্যোমকেশ তাঁহাকে কতকটা ঠাণ্ডা করিল। একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কথা হইল। নেপালবাবু বলিলেন,—'কলোনীতে দুটো খুন হয়ে গেল, পুলিস চুপ করে বসে থাকতে পারে কিন্তু আমি চুপ করে থাকি কি করে? আমার তো একটা দায়িত্ব আছে! আমি জানি কে খুন করেছে, তাই পুলিসকে বলতে গিয়েছিলাম। তা পুলিস উল্টে আমার ওপরই চাপ দিতে লাগল। ভাল রে ভাল—যেন আমিই খুন করেছি!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি জানেন কে খুন করেছে?'

'এর আর জানাজানি কি? কলোনীর সবাই জানে, কিন্তু মুখ ফুটে বলবার সাহস কারুর নেই।'

'কে খুন করেছে?'

'বিজয়! বিজয়! আর কে খুন করবে? খুড়ীর সঙ্গে ষড় করে আগে খুড়োকে সরিয়েছে, তারপর পানুকে সরিয়েছে। পানুটাও দলে ছিল কিনা।'

'কিন্তু—পানু কিসে মারা গেছে আপনি জানেন?'

'নিকোটিন। আমি সব খবর রাখি।'

'কিন্তু বিজয় নিকোটিন পাবে কোথায়? নিকোটিন কি বাজারে পাওয়া যায়?'

'বাজারে সিগারেট তো পাওয়া যায়। যার ঘটে এতটুকু বুদ্ধি আছে সে এক প্যাকেট সিগারেট থেকে এত নিকোটিন বার করতে পারে যে কলোনী সুদ্ধ লোককে তা দিয়ে সাবাড় করা যায়।'

'তাই নাকি? নিকোটিন তৈরি করা এত সহজ?'

'সহজ নয় তো কী! একটা বকযন্ত্র যোগাড় করতে পারলেই হল।' এই পর্যন্ত বলিয়া নেপালবাবু হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিলেন, তারপর আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্টেশনের দিকে পা চালাইলেন।

আমরাও সঙ্গে চলিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি বৈজ্ঞানিক, আপনার কথাই ঠিক। আমি জানতাম না নিকোটিন তৈরি করা এত সোজা।—তা আপনি এদিকে কোথায় চলেছেন? কলোনীতে ফিরবেন না?'

'কলকাতা যাচ্ছি একটা বাসা ঠিক করতে—কলোনীতে ভদ্দরলোক থাকে না—' বলিয়া তিনি হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমরা থানার দিকে ফিরিলাম। ব্যোমকেশের ঠোঁটের কোণে একটা বিচিত্র হাসি খেলা করিতে লাগিল।

থানায় প্রমোদ বরাটের ঘরে আসন গ্রহণ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'রাস্তায় নেপাল গুপ্তর সঙ্গে দেখা হল।'

বরাট বলিল,—'আর বলবেন না, লোকটা বদ্ধ পাগল। সকাল থেকে আমার হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে। ওর বিশ্বাস বিজয় খুন করেছে, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ কিছু নেই, শুধু আক্রোশ। আমি বললাম, আপনি যদি বিজয়ের নামে পুলিসে ডায়েরি করতে চান আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পরে যদি বিজয় মানহানির মামলা করে তখন আপনি কি করবেন? এই শুনে নেপাল গুপ্ত উঠে পালাল। আসল কথা বিজয় ওকে নোটিস দিয়েছে; বলেছে চুপটি করে কলোনীতে থাকতে পারেন তো থাকুন, নইলে রাস্তা দেখুন, সর্দারি করা এখানে চলবে না। তাই এত রাগ।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমারও তাই আন্দাজ হয়েছিল। —যাক, এবার আপনার রসিককে বার করুন।'

রসিক আনীত হইল। হাজতে রাত্রিবাসের ফলে তাহার চেহারার শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। খুঁতখুঁতে মুখে নিপীড়িত একগুঁয়েমির ভাব। আমাদের দেখিয়া একবার ঢোক গিলিল, কণ্ঠার হাড় সবেগে নড়িয়া উঠিল।

কিন্তু তাহাকে জেরা করিয়া ব্যোমকেশ কোনও কথাই বাহির করিতে পারিল না। বস্তুত রসিক প্রায় সারাক্ষণই নির্বাক হইয়া রহিল। সে চুরি করিয়াছে কি না এ প্রশ্নের জবাব নাই, টাকা লইয়া কী করিল এ বিষয়েও নিরুত্তর। কেবল একবার সে কথা কহিল, তাহাও প্রায় অজ্ঞাতসারে।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'যে-রাত্রে নিশানাথবাবু মারা যান সেদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর সঙ্গে আপনার ঝগড়া হয়েছিল ?'

রসিক চোখ মেলিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, বলিল,—'নিশানাথবাবু মারা গেছেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ। পানুগোপালও মারা গেছে। আপনি জানেন না ?'

রসিক কেবল মাথা নাড়িল।

তারপর ব্যোমকেশ আরও প্রশ্ন করিল কিন্তু উত্তর পাইল না। শেষে বলিল,—'দেখুন, আপনি চুরির টাকা নষ্ট করেননি, কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। আপনি যদি আমাদের জানিয়ে দেন কোথায় টাকা রেখেছেন তাহলে আমি বিজয়বাবুকে বলে আপনার বিরুদ্ধে মামলা তুলিয়ে নেব, আপনাকে জেলে যেতে হবে না। —কোথায় কার কাছে টাকা রেখেছেন বলবেন কি ?'

রসিক পূর্ববৎ নির্বাক হইয়া রহিল।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ব্যোমকেশ হাল ছাড়িয়া দিল। বলিল,—'আপনি ভাল করলেন না। আপনি যে-কথা লুকোবার চেষ্টা করছেন তা আমরা শেষ পর্যন্ত জানতে পারবই। মাঝ থেকে আপনি পাঁচ বছর জেল খাটবেন।'

রসিকের কণ্ঠার হাড় আর একবার নড়িয়া উঠিল, সে যেন কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিল। তারপর আবার দৃঢ়ভাবে ওষ্ঠাধর সম্বদ্ধ করিল।

রসিককে স্থানান্তরিত করিবার পর ব্যোমকেশ শুষ্কস্বরে বলিল,—'এদিকে তো কিছু হল না—কিন্তু আর দেরি নয়, সব যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। একটা প্ল্যান আমার মাথায় এসেছে—'

বরাট বলিল,—'কী প্ল্যান ?'

প্ল্যান কিন্তু শোনা হইল না। এই সময় একটি বকাটে ছোকরা গোছের চেহারা দরজা দিয়া মুণ্ড বাড়াইয়া বলিল,—'ব্রজদাস বোষ্টমকে পাক্‌ড়েছি স্যার।'

বরাট বলিল,—'বিকাশ! এস। কোথায় পাক্‌ড়ালে বোষ্টমকে ?'

বিকাশ ঘরে প্রবেশ করিয়া দন্তবিকাশ করিল,—'নবদ্বীপের এক আখড়ায় বসে খঞ্জনি বাজাচ্ছিল। কোনও গোলমাল করেনি। যেই বললাম, আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে, অমনি সুস্‌সুড় করে চলে এল।'

'বাঃ বেশ। এই ঘরেই পাঠিয়ে দাও তাকে।'

ব্রজদাস বৈষ্ণব ঘরে প্রবেশ করিলেন। গায়ে নামাবলী, মুখে কয়েক দিনের অক্ষৌরিত দাড়ি-গোঁফ মুখখানিকে ধুতরা-ফলের মত কন্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, চোখে লজ্জিত অপ্রস্তুত ভাব। তিনি বিনয়াবনত হইয়া জোড়হস্তে আমাদের নমস্কার করিলেন।

বরাট ব্যোমকেশকে চোখের ইশারা করিল, ব্যোমকেশ ব্রজদাসের দিকে মুচকি হাসিয়া বলিল,—'বসুন।'

ব্রজদাস যেন আরও লজ্জিত হইয়া একটি টুলের উপর বসিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি হঠাৎ ডুব মেরেছিলেন কেন বলুন তো ? যতদূর জানি কলোনীর টাকাকড়ি কিছু আপনার কাছে ছিল না।'

ব্রজদাস বলিলেন,—'আজ্ঞে না।'

'তবে পালালেন কেন ?'

ব্রজদাস কাঁচুমাচু মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, নিশানাথ বলিয়াছিলেন ব্রজদাস মিথ্যা কথা বলে না। ইহাও কি সম্ভব ? পাছে সত্য কথা বলিতে হয় এই ভয়ে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন ! কিন্তু কী এমন মারাত্মক সত্য কথা ?

ব্যোমকেশ বলিল,—'আচ্ছা, ওকথা পরে হবে। এখন বলুন দেখি, নিশানাথবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানেন ?'

ব্রজদাস বলিলেন,—'না, কিছু জানি না।'

'কাউকে সন্দেহ করেন ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে—' ব্যোমকেশ থামিয়া গিয়া বলিল,—'নিশানাথবাবুর মৃত্যুর রাত্রে আপনি কলোনীতেই ছিলেন তো ?'

'আজ্ঞে কলোনীতেই ছিলাম।'

লক্ষ্য করিলাম ব্রজদাস এতক্ষণে যেন বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়াছেন, কাঁচুমাচু ভাব আর নাই। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন ?'

ব্রজদাস বলিলেন,—'আমি আর ডাক্তারবাবু একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে এলাম, উনি নিজের কুঠিতে গিয়ে সেতার বাজাতে লাগলেন, আমি নিজের দাওয়ায় শুয়ে তাঁর বাজনা শুনলাম।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'ও।—ভুজঙ্গধরবাবু সেতার বাজাচ্ছিলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মালকোষের আলাপ করছিলেন।'

'কতক্ষণ আলাপ করেছিলেন ?'

'তা প্রায় সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। চমৎকার হাত ওঁর।'

'হুঁ। একটানা আলাপ করেছিলেন ? একবারও থামেননি ?'

'আজ্ঞে না, একবারও থামেননি।'

'পাঁচ মিনিটের জন্যেও নয় ?'

'আজ্ঞে না। সেতারের কান মোচ্‌ড়াববার জন্য দু'একবার থেমেছিলেন, তা সে পাঁচ-দশ সেকেন্ডের জন্য, তার বেশি নয়।'

'কিন্তু আপনি তাঁকে বাজাতে দেখেননি ?'

'দেখব কি করে ? উনি অন্ধকারে বসে বাজাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি ওঁর আলাপ চিনি, উনি ছাড়া আর কেউ নয়।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া রহিল, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল।—

'আপনি কলোনীতে আসবার আগে থেকেই নিশানাথবাবুকে চিনতেন ?'

আবার ব্রজদাসের মুখ শুকাইল। তিনি উস্‌খুস করিয়া বলিলেন,—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি ওঁর সেরেস্তায় কাজ করতেন, উনি সাক্ষী দিয়ে আপনাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি চুরি করেছিলাম।'

'বিজয় তখন নিশানাথবাবুর কাছে থাকত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দময়ন্তী দেবীর তখন বিয়ে হয়েছিল ?'

ব্রজদাসের মুখ কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল, তিনি ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'উত্তর দিচ্ছেন না যে ? দময়ন্তী দেবীকে তখন থেকেই চেনেন তো ?'

ব্রজদাস অস্পষ্টভাবে হ্যাঁ বলিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'তার মানে নিশানাথ আর দময়ন্তীর

বিয়ে তার আগেই হয়েছিল—কেমন ?'

ব্রজদাস এবার ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—'এই জন্যেই আমি পালিয়েছিলাম। আমি জানতাম আপনারা এই কথা তুলবেন। দোহাই ব্যোমকেশবাবু, আমাকে ও প্রশ্ন করবেন না। আমি সাত বছর ওঁদের অন্ন খেয়েছি। আমাকে নিমকহারামি করতে বলবেন না।' বলিয়া তিনি কাতরভাবে হাত জোড় করিলেন।

ব্যোমকেশ সোজা হইয়া বসিল, তাহার চোখের দৃষ্টি বিস্ময়ে প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল,—'এ সব কী ব্যাপার ?'

ব্রজদাস ভগ্নস্বরে বলিলেন,—'আমি জীবনে অনেক মিথ্যে কথা বলেছি, আর মিথ্যে কথা বলব না। জেল থেকে বেরিয়ে আমি বৈষ্ণব হয়েছি, কণ্ঠি নিয়েছি ; কিন্তু শুধু কণ্ঠি নিলেই তো হয় না, প্রাণে ভক্তি কোথায়, প্রেম কোথায় ? তাই প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে আর মিথ্যে কথা বলব না, তাতে যদি ঠাকুরের কৃপা হয়।—আপনারা আমায় দয়া করুন, ওঁদের কথা জিগ্যেস করবেন না। ওঁরা আমার মা বাপ।'

ব্যোমকেশ ধীরস্বরে বলিল,—'আপনার কথা শুনে এইটুকু বুঝলাম যে আপনি মিথ্যে কথা বলেন না, কিন্তু নিশানাথ সম্বন্ধে সত্যি কথা বলতেও আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে। মিথ্যে কথা না বলা খুবই প্রশংসার কথা, কিন্তু সত্যি কথা গোপন করায় কোনও পুণ্য নেই। ভেবে দেখুন, সত্যি কথা না জানলে আমরা নিশানাথবাবুর খুনের কিনারা করব কি করে ? আপনি কি চান না যে নিশানাথবাবুর খুনের কিনারা হয় ?'

ব্রজদাস নতমুখে রহিলেন। তারপর আমরা সকলে মিলিয়া নির্বন্ধ করিলে তিনি অসহায়ভাবে বলিলেন,—'কি জানতে চান বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'নিশানাথ ও দময়ন্তীর বিয়ের ব্যাপারে কিছু গোলমাল আছে। কী গোলমাল ?'

'ওঁদের বিয়ে হয়নি।'

বোকার মত সকলে চাহিয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশ প্রথমে সামলাইয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে একটি একটি প্রশ্ন করিয়া ব্রজদাস বাবাজীর নিকট হইতে যে কাহিনী উদ্ধার করিল তাহা এই—

নিশানাথবাবু পুণায় জজ ছিলেন, ব্রজদাস ছিলেন তাঁর সেরেস্তার কেরানি। লাল সিং নামে একজন পাঞ্জাবী খুনের অপরাধে দায়রা-সোপর্দ হইয়া নিশানাথবাবুর আদালতে বিচারার্থ আসে। দময়ন্তী এই লাল সিং-এর স্ত্রী।

নিশানাথের কোর্টে যখন দায়রা মোকদ্দমা চলিতেছে তখন দময়ন্তী নিশানাথের বাংলোতে আসিয়া সকাল-সন্ধ্যা বসিয়া থাকিত, কান্নাকাটি করিত। নিশানাথ তাহাকে তাড়াইয়া দিতেন, সে আবার আসিত। বলিত, আমি অনাথা, আমার স্বামীর সাজা হইলে আমি কোথায় যাইব ?

দময়ন্তীর বয়স তখন উনিশ-কুড়ি ; অপরূপ সুন্দরী। বিজয়ের বয়স তখন তেরো-চৌদ্দ, সে দময়ন্তীর অতিশয় অনুগত হইয়া পড়িল। কাকার কাছে দময়ন্তীর জন্য দরবার করিত। নিশানাথ কিন্তু প্রশ্রয় দিতেন না। বিজয় যে দময়ন্তীকে চুপি চুপি খাইতে দিতেছে এবং রাত্রে বাংলোতে লুকাইয়া রাখিতেছে তাহা তিনি জানিতে পারিতেন না।

লাল সিং-এর ফাঁসির হুকুম হইয়া যাইবার পর নিশানাথ জানিতে পারিলেন। খুব খানিকটা বকাবকি করিলেন এবং দময়ন্তীকে অনাথ আশ্রমে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। দময়ন্তী কিন্তু তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, বালক বিজয়ও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া নিশানাথ দময়ন্তীকে বাংলোয় থাকিতে দিলেন। বাড়ির চাকর-বাকরের কাছে ব্রজদাস এই সকল সংবাদ পাইয়াছিলেন।

হাইকোর্টের আপীলে লাল সিং-এর ফাঁসির হুকুম রদ হইয়া যাবজ্জীবন কারাবাস হইল। দময়ন্তী নিশানাথের আশ্রয়ে রহিয়া গেল। হাকিম-হুকুম মহলে এই লইয়া একটু কানাঘুষা হইল।

কিন্তু নিশানাথের চরিত্র-খ্যাতি এতই মজবুত ছিল যে, প্রকাশ্যে কেহ তাঁহাকে অপবাদ দিতে সাহস করিল না।

ইহার দু'এক মাস পরে ব্রজদাসের চুরি ধরা পড়িল ; নিশানাথ সাক্ষী দিয়া তাঁহাকে জেলে পাঠাইলেন। তারপর কয়েক বৎসর কী হইল ব্রজদাস তাহা জানেন না।

ব্রজদাস জেল হইতে বাহির হইয়া শুনিলেন নিশানাথ কর্ম হইতে অবসর লইয়াছেন, তিনি নিশানাথের সন্ধান লইতে লাগিলেন। জেলে থাকাকালে ব্রজদাসের মতিগতি পরিবর্তিত হইয়াছিল, তিনি বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। সন্ধান করিতে করিতে তিনি গোলাপ কলোনীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এখানে আসিয়া ব্রজদাস দেখিলেন নিশানাথ ও দময়ন্তী স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিতেছেন। নিশানাথ তাঁহাকে কলোনীতে থাকিতে দিলেন, কিন্তু সাবধান করিয়া দিলেন, দময়ন্তীঘটিত কোনও কথা যেন প্রকাশ না পায়। দময়ন্তী ও বিজয় পূর্বে ব্রজদাসকে এক-আধবার দেখিয়াছিল, এতদিন পরে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তদবধি ব্রজদাস কলোনীতে আছেন। নিশানাথ ও দময়ন্তীর মত মানুষ সংসারে দেখা যায় না। তাঁহারা যদি কোনও পাপ করিয়া থাকেন ভগবান তাহার বিচার করিবেন।

ব্যোমকেশ সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'ইন্সপেক্টর বরাট, চলুন একবার কলোনীতে যাওয়া যাক। অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে।'

ব্রজদাস করুণ স্বরে বলিলেন,—'আমার এখন কী হবে ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনিও কলোনীতে চলুন। যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন।'

একুশ

প্রমোদ বরাটের ঘর হইতে যখন বাহিরে আসিলাম বেলা তখন প্রায় বারোটা। পাশের ঘরে থানার কয়েকজন কর্মচারী খাতা-পত্র লইয়া কাজ করিতেছিল, বরাট বাহিরে আসিলে হেড-ক্লার্ক উঠিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বরাটকে কিছু বলিল।

বরাট ব্যোমকেশকে বলিল,—'একটু অসুবিধা হয়েছে। আমাকে এখনি আর একটা কাজে বেরুতে হবে। তা আপনারা না হয় এগোন, আমি বিকেলের দিকে কলোনীতে হাজির হব।'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—'তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, সন্ধ্যের সময় সকলে একসঙ্গে গেলেই চলবে। আপনি কাজে যান, সন্ধ্যে ছ'টার সময় স্টেশনে ওয়েটিং রুমে আমাদের খোঁজ করবেন।'

বরাট বলিল,—'বেশ, সেই ভাল।'

ব্রজদাস বলিলেন,—'কিন্তু আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি এখন কলোনীতে ফিরে যেতে পারেন, কিন্তু যে-সব কথা হল তা কাউকে বলবার দরকার নেই।'

'যে আজ্ঞে।'

ব্রজদাস কলোনীর রাস্তা ধরিলেন, আমরা স্টেশনে ফিরিয়া চলিলাম। চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ বলিল,—'আমাদের চোখে ঠুলি আঁটা ছিল। দময়ন্তী নামটা প্রচলিত বাংলা নাম নয় এটাও চোখে পড়েনি। অমন রঙ এবং রূপ যে বাঙালীর ঘরে চোখে পড়ে না এ কথাও একবার ভেবে দেখিনি। দময়ন্তী এবং নিশানাথের বয়সের পার্থক্য থেকে কেবল দ্বিতীয় পক্ষই আন্দাজ করলাম, অন্য সম্ভাবনা যে থাকতে পারে তা ভাবলাম না। দময়ন্তী স্কুলে গিয়ে পাঞ্জাবী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করেন এ থেকেও কিছু সন্দেহ হল না। অথচ সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। নিশানাথবাবু বোম্বাই প্রদেশে সাতচল্লিশ বছর বয়সে একটি উনিশ-কুড়ি বছরের বাঙালী তরুণীকে বিয়ে

করলেন এটা এক কথায় মেনে নেবার মত নয়।—অজিত, মাথার মধ্যে ধূসর পদার্থ ক্রমেই ফ্যাকাসে হয়ে আসছে, এবার অবসর নেওয়া উচিত। সত্যান্বেষণ ছেড়ে ছাগল চরানো কিম্বা অনুরূপ কোনও কাজ করার সময় উপস্থিত হয়েছে।'

তাহার ক্ষোভ দেখিয়া হাসি আসিল। বলিলাম,—'ছাগল না হয় পরে চরিও, আপাতত এ ব্যাপারের তো একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। দময়ন্তী নিশানাথবাবুর স্ত্রী নয় এ থেকে কী বুঝলে?'

ক্ষুব্ধ ব্যোমকেশ কিন্তু উত্তর দিল না।

স্টেশনে ওয়েটিং রুমে তালা লাগানো ছিল, তালা খোলাইয়া ভিতরে গিয়া বসিলাম। একটা কুলিকে দিয়া বাজার হইতে কিছু হিঙের কচুরি ও মিষ্টান্ন আনাইয়া পিত্ত রক্ষা করা গেল।

আকাশে মেঘ আরও ঘন হইয়াছে, মাঝে মাঝে চড়বড় করিয়া দু'চার ফোঁটা ছাগল-তাড়ানো বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িতেছে। সন্ধ্যা নাগাদ বেশ চাপিয়া বৃষ্টি নামিবে মনে হইল।

দুইটি দীর্ঘবাহু আরাম-কেদারায় আমরা লম্বা হইলাম। বাহিরে থাকিয়া থাকিয়া ট্রেন আসিতেছে যাইতেছে। আমি মাঝে মাঝে ঝিমাইয়া পড়িতেছি, মনের মধ্যে সূক্ষ্ম চিন্তার ধারা বহিতেছে—দময়ন্তী দেবী নিশানাথের স্ত্রী নয়, লাল সিং-এর স্ত্রী...মানসিক অবস্থার কিরূপ বিবর্তনের ফলে একজন সচ্চরিত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এরূপ কর্ম করিতে পারেন?...দময়ন্তী প্রকৃতপক্ষে কিরূপ স্ত্রীলোক? স্বৈরিণী? কুহকিনী? কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তাহা মনে হয় না...

সাড়ে পাঁচটার সময় পুলিস ভ্যান লইয়া বরাট আসিল। আকাশের তখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, মনে হয় রাত্রি হইতে আর দেরি নাই। মেঘগুলা ভিজা ভোট-কম্বলের মত আকাশ আবৃত করিয়া দিনের আলো মুছিয়া দিয়াছে।

বরাট বলিল,—'বিকাশকে আপনার উনিশ নম্বর মির্জা লেনে পাঠিয়ে দিলাম। কাল খবর পাওয়া যাবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বিকাশ। ও—বেশ বেশ। ছোকরা কি আপনাদের দলের লোক, অর্থাৎ পুলিসে কাজ করে?'

বরাট বলিল,—'কাজ করে বটে কিন্তু ইউনিফর্ম পরতে হয় না। ভারী খলিফা ছেলে। চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

স্টেশনের স্টলে এক পেয়ালা করিয়া চা গলাধঃকরণ করিয়া আমরা বাহির হইতেছি, একটা ট্রেন কলিকাতার দিক হইতে আসিল। দেখিলাম নেপালবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন, হন্‌হন্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমাদের দেখিতে পাইলেন না।

ব্যোমকেশ বলিল,—'উনি এগিয়ে যান। আমরা আধ ঘণ্টা পরে বেরুব।'

আমরা আবার ওয়েটিং রুমে গিয়া বসিলাম। একথা-সেকথায় আধ ঘণ্টা কাটাইয়া মোটর ভ্যানে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

কলোনীর ফটক পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই ব্যোমকেশ বলিল,—'এখানেই গাড়ি থামাতে বলুন, গাড়ি ভেতরে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। অনর্থক সকলকে সচকিত করে তোলা হবে।'

গাড়ি থামিল, আমরা নামিয়া পড়িলাম। অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়াছে। আমরা কলোনীর ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম নিশানাথবাবুর ঘরের পাশের জানালা দিয়া আলো আসিতেছে।

ব্যোমকেশ সদর দরজার কড়া নাড়িল। বিজয় দরজা খুলিয়া দিল এবং আমাদের দেখিয়া চমকিয়া বলিয়া উঠিল,—'আপনারা!'

ভিতরে দময়ন্তী চেয়ারে বসিয়া আছেন দেখা গেল। ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলিল,—'দময়ন্তী দেবীকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

আমাদের ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দময়ন্তী ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল,—'উঠবেন না। বিজয়বাবু, আপনিও বসুন।'

দময়ন্তী ধীরে ধীরে আবার বসিয়া পড়িলেন। বিজয় চোখে শঙ্কিত সন্দেহ ভরিয়া তাঁহার চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

আমরা উপবিষ্ট হইলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'বাড়িতে আর কেউ নেই ?'

বিজয় নীরবে মাথা নাড়িল। ব্যোমকেশ যেন তাহা লক্ষ্য না করিয়াই নিজের ডান হাতের নখগুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল,—'দময়ন্তী দেবী, সেদিন আপনাকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম তখন সব কথা আপনি বলেননি। এখন বলবেন কি ?'

দময়ন্তী ভয়ার্ত চোখ তুলিলেন,—'কি কথা ?'

ব্যোমকেশ নির্লিপ্তভাবে বলিল,—'সেদিন আপনি বলেছিলেন দশ বছর আগে আপনাদের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি বিয়ে হওয়া সম্ভব ছিল না। নিশানাথবাবু আপনার স্বামী নন—'

মৃত্যুশরাহতের মত দময়ন্তী কাঁদিয়া উঠিলেন,—'না না, উনিই আমার স্বামী—উনিই আমার স্বামী—' বলিয়া নিজের কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখ ঢাকিলেন।

বিজয় গর্জিয়া উঠিল,—'ব্যোমকেশবাবু !'

বিজয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ব্যোমকেশ বলিয়া চলিল,—'আপনার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয় কথায় আমাদের দরকার ছিল না। অন্য সময় হয়তো চুপ করে থাকতাম, কিন্তু এখন তো চুপ করে থাকবার উপায় নেই। সব কথাই জানতে হবে—'

বিজয় বিকৃত স্বরে বলিল,—'আর কী কথা জানতে চান আপনি ?'

ব্যোমকেশ চকিতে বিজয়ের পানে চোখ তুলিয়া করাতের মত অমসৃণ কণ্ঠে বলিল,—'আপনাকেও অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে, বিজয়বাবু ; অনেক মিছে কথা বলেছেন আপনি। কিন্তু সে পরের কথা। এখন দময়ন্তী দেবীর কাছ থেকে জানতে চাই, যে-রাত্রে নিশানাথবাবুর মৃত্যু হয় সে-রাত্রে কী ঘটেছিল ?'

দময়ন্তী গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিজয় তাঁহার পাশে নতজানু হইয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে ডাকিতে লাগিল,—'কাকিমা—কাকিমা— !'

প্রায় দশ মিনিট পরে দময়ন্তী অনেকটা শান্ত হইলেন, অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া আঁচলে চোখ মুছিলেন। ব্যোমকেশ শুষ্কস্বরে বলিল,—'সত্য কথা গোপন করার অনেক বিপদ। হয়তো এই সত্য গোপনের ফলেই পানুগোপাল বেচারা মারা গেছে। এর পর আর মিথ্যে কথা বলে ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুলবেন না।'

দময়ন্তী ভগ্নস্বরে বলিলেন,—'আমি মিথ্যে কথা বলিনি, সে-রাত্রির কথা যা জানি সব বলেছি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'দেখুন, কী ভয়ঙ্করভাবে নিশানাথবাবুর মৃত্যু হয়েছিল তা বিজয়বাবু জানেন। আপনি পাশের ঘরে থেকেও কিছু জানতে পারেননি, এ অসম্ভব। হয় আপনি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে বাড়িতে ছিলেন না, কিংবা আপনার চোখের সামনে নিশানাথবাবুর মৃত্যু হয়েছে।'

পূর্ণ এক মিনিট ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর বিজয় ব্যগ্রস্বরে বলিল,—'কাকিমা, আর লুকিয়ে রেখে লাভ কি। আমাকে যা বলেছ এঁদেরও তা বল। হয় তো—'

আরও খানিকক্ষণ মূক থাকিয়া দময়ন্তী অতি অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—'আমি বাড়িতে ছিলাম না।'

'কোথায় গিয়েছিলেন ? কি জন্যে গিয়েছিলেন ?'

অতঃপর দময়ন্তী স্খলিতস্বরে এলোমেলোভাবে তাঁহার বাহিরে যাওয়ার ইতিহাস বলিলেন। দীর্ঘ আট মাসের ইতিহাস ; তাঁহার ভাষায় বলিলে অনাবশ্যক জটিল ও জবড়জং হইয়া পড়িবে। সংক্ষেপে তাহা এইরূপ—

আট নয় মাস পূর্বে দময়ন্তী ডাকে একটি চিঠি পাইলেন। লাল সিং-এর চিঠি। লাল সিং

লিখিয়াছে—জেল হইতে বাহির হইয়া আমি তোমাদের সন্ধান পাইয়াছি। ছদ্মবেশে গোলাপ কলোনী দেখিয়া আসিয়াছি, তোমাদের সব কীর্তি জানিতে পারিয়াছি। আমি ভীষণ প্রতিহিংসা লইতে পারিতাম কিন্তু তাহা লইব না। আমার টাকা চাই। কাল রাত্রি দশটা হইতে এগারোটার মধ্যে কলোনীর ফটকের পাশে যে কাচের ঘর আছে সেই ঘরে বেঞ্চির উপর ৫০০ ্টাকা রাখিয়া আসিবে। কাহাকেও কিছু বলিবে না, বলিলে তোমাদের দু'জনকেই খুন করিব। এর পর আমি তোমাকে চিঠি লিখিব না (জেলে বাংলা শিখিয়াছি কিন্তু লিখিতে চাই না), টাকার দরকার হইলে মোটরের একটি ভাঙা অংশ বাড়ির কাছে ফেলিয়া দিয়া যাইব। তুমি সেই রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে ৫০০ ্টাকা কাচের ঘরে রাখিয়া আসিবে।—

চিঠি পাইয়া দময়ন্তী ভয়ে দিশাহারা হইয়া গেলেন। কিন্তু নিশানাথকে কিছু বলিলেন না। রাত্রে ৫০০ ্টাকার নোট কাচের ঘরে রাখিয়া আসিলেন। কলোনীর টাকাকড়ি দময়ন্তীর হাতেই থাকিত। কেহ জানিতে পারিল না।

তারপর মাসের পর মাস শোষণ চলিতে লাগিল। মাসে দুই-তিন বার মোটরের ভগ্নাংশ আসে, দময়ন্তী কাচের ঘরে টাকা রাখিয়া আসেন। কলোনীর আয় ছিল মাসে প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার, কিন্তু এই সময় হইতে আয় কমিতে লাগিল। তাহার উপর এইভাবে দেড় হাজার টাকা বাহির হইয়া যায়। আগে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইত, এখন টায়ে টায়ে খরচ চলিতে লাগিল।

নিশানাথ টাকার হিসাব রাখিতেন না, কিন্তু তিনিও লক্ষ্য করিলেন। তিনি দময়ন্তীকে প্রশ্ন করিলেন, দময়ন্তী মিথ্যা বলিয়া তাঁহাকে স্তোক দিলেন ; আয় কমিয়া যাওয়ার কথা বলিলেন, খরচ বাড়ার কথা বলিলেন না।

এইভাবে আট মাস কাটিয়াছে। নিশানাথের মৃত্যুর দিন সকালে দময়ন্তী আবার একখানি চিঠি পাইলেন। লাল সিং লিখিয়াছে—আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, যাইবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে চাই। তুমি রাত্রি দশটার সময় কাচের ঘরে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। যদি এগারোটার মধ্যে না যাইতে পারি তখন ফিরিয়া যাইও। আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলে কিম্বা আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিলে খুন করিব।

সে-রাত্রে আহারের পর বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তী দেখিলেন, নিশানাথ আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। দময়ন্তী নিঃশব্দে পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু লাল সিং আসিল না। দময়ন্তী এগারোটা পর্যন্ত কাচের ঘরে অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন নিশানাথ পূর্ববৎ ঘুমাইতেছেন। তখন তিনিও নিজের ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া নিশানাথের গায়ে হাত দিয়া দময়ন্তী দেখিলেন নিশানাথ বাঁচিয়া নাই। তিনি চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

ব্যোমকেশ নত মুখে সমস্ত শুনিল, তারপর বিজয়ের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল,—'বিজয়বাবু, আপনি এ কাহিনী কবে জানতে পারলেন ?'

বিজয় বলিল,—'তিন-চার দিন আগে। আমি আগে জানতে পারলে—'

ব্যোমকেশ কড়া সুরে বলিল,—'অন্য কথাটা অর্থাৎ আপনার কাকার সঙ্গে দময়ন্তী দেবীর প্রকৃত সম্পর্কের কথা আপনি গোড়া থেকেই জানেন। কোনও সময় কাউকে একথা বলেছেন ?'

বিজয় চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখ ধীরে ধীরে রক্তাভ হইয়া উঠিল। সে বলিল,—'না, কাউকে না।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বরাটকে বলিল,—'চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'একটা খবর দিয়ে যাই। লাল সিং দু'বছর আগে জেলে মারা গেছে।'

বাইশ

পুলিস ভ্যানে ফিরিয়া যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল,—'দময়ন্তী দেবীর কথা সত্যি বলেই মনে হয় নিশানাথবাবুর সন্দেহ হয়েছিল কেউ দময়ন্তীকে blackmail করছে ; তাই যেদিন তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যান সেদিন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন। কথাটা তাঁর মনের মধ্যে ছিল তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।'

বরাট বলিল,—'এখন কথা হচ্ছে, কে blackmail করছে ? নিশ্চয় এমন লোক যে দময়ন্তীর গুপ্তকথা জানে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমাদের জ্ঞানত তিনজন এই গুপ্তকথা জানে—বিজয়, ব্রজদাস বাবাজী আর নেপালবাবু। নেপালবাবু জানলে মুকুল জানবে। সব মিলিয়ে চারজন ; আরও কেউ কেউ থাকতে পারে, যাদের আমরা নাম জানি না। আর কিছু না হোক হত্যার একটা স্পষ্ট পরিষ্কার মোটিভ পাওয়া গেল।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'স্পষ্ট পরিষ্কার মোটিভটা কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ধরা যাক নেপালবাবু blackmail করছিলেন। আট মাস ধরে তিনি বেশ কিছু দোহন করেছেন, আরও অনেক দিন পেন্সন ভোগ করবার ইচ্ছে আছে, এমন সময় দেখলেন নিশানাথবাবুর সন্দেহ হয়েছে, তিনি আমাকে ডেকে এনেছেন। নেপালবাবুর ভয় হল এমন লাভের ব্যবসাটা বুঝি ফেঁসে যায়। শুধু তাই নয়, তিনি যদি ধরা পড়েন তাহলে ইতিপূর্বে তাঁর কন্যার সাহায্যে যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছেন তাও প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাঁর কন্যাটিও যে চিত্রাভিনেত্রী সুনয়না ওরফে নৃত্যকালী তাও আর গোপন থাকবে না। রমেন মল্লিককে আমাদের সঙ্গে দেখে তাঁর এ রকম সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি তখন কী করবেন ? নিশানাথকে মারতে গেলে সব সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, নির্ভয়ে blackmail চালানো যায়। কিন্তু নিশানাথের মৃত্যুটা স্বাভাবিক হওয়া চাই। সুতরাং নিশানাথ যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে মারা গেলেন। কিন্তু তবু খুঁত রয়ে গেল। পুলিসের যাতায়াত শুরু হল। তার ওপর পানুগোপালটা কিছু দেখে ফেলেছিল। অতএব তাকেও সরানো দরকার হল। মোটামুটি এই মোটিভ।'

বরাট বলিল,—'তাহলে কর্তব্য কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'একটা প্ল্যান আমার মাথায় ঘুরছে, কিন্তু সে বিষয়ে পরে ব্যবস্থা হবে। আজ রাত্রেই একটা কাজ করা দরকার, আবার আমাদের কলোনীতে ফিরে যেতে হবে। লুকিয়ে লুকিয়ে কলোনীর লোকগুলির ওপর নজর রাখতে হবে।'

'কী উদ্দেশ্য ?'

'আজ মেঘৈর্মেদুরমম্বরং—অভিসারের উপযুক্ত রাত্রি। দেখতে হবে কেউ কারুর ঘরে যায় কিনা। আপনি রাজী ?'

'নিশ্চয় রাজী। কিন্তু আগে চলুন আমার বাসায় খাওয়া-দাওয়া করবেন।'

বরাটের বাসায় আহার শেষ করিয়া আমরা যখন বাহির হইলাম রাত্রি তখন সওয়া ন'টা। একটু আগে যাওয়া ভাল, পালা শেষ হইবার পর প্রেক্ষাগৃহে রাত জাগিয়া বসিয়া থাকার মানে হয় না। বরাট আমাদের জন্য দুইটা বর্ষাতি যোগাড় করিয়া লইল।

কলোনী হইতে আধ মাইল দূরে গাড়ি থামানো হইল। ড্রাইভারকে এইখানে গাড়ি রাখিতে বলিয়া আমরা পদব্রজে অগ্রসর হইলাম। আকাশ তেমনি থমথমে হইয়া আছে, প্রত্যাশিত বৃষ্টি নামে নাই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা অবগুণ্ঠিতা বধূর মুচকি হাসির মত লজ্জিত ; তাহার পিছনে গুরু গুরু ডাকও নাই।

কলোনীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম একটিও কুঠিতে আলো জ্বলিতেছে না, কেবল ভোজনগৃহে আলো। সকলেই আহার করিতে গিয়াছে। ব্যোমকেশ চুপি চুপি আমাদের নির্দেশ দিল,—'অজিত, তুমি বিজয়ের কুঠির আনাচে কানাচে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বোসো, বিজয়

ছাড়া আর কেউ আসে কিনা লক্ষ্য করবে। —ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি দময়ন্তীর খিড়কি দরজার ওপর নজর রাখবেন।'

'আর আপনি?'

'আমি নেপালবাবুর সদর আর অন্দর দু'দিকেই চোখ রাখব। একটা করবীর ঝাড় দেখে রেখেছি, সেখান থেকে দু'দিকেই দৃষ্টি রাখা চলবে।'

বরাট ও ব্যোমকেশের বর্ষাতি-পরা মূর্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। আমি বিজয়ের কুঠির এক কোণে একটা ঝোপের মধ্যে আড্ডা গাড়িলাম।

পনরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে ভোজনকারীরা একে একে ফিরিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে ডাক্তার ভুজঙ্গধরের ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল। তারপর বিজয়ের পায়ের শব্দ শুনিলাম; সে নিজের কুঠিতে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিল। বনলক্ষ্মীর ঘর অন্ধকার, সে বোধহয় এখনও রান্নাঘরে আছে।

বসিয়া বসিয়া দময়ন্তী ও নিশানাথের চিন্তাই মনে আসিল; যে-কঙ্কালটুকু পাইয়াছিলাম তাহাতে কল্পনার রক্ত-মাংস সংযোগ করিয়া মানুষের মত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম। —দময়ন্তী বোধহয় লাল সিং-এর মত দুর্দান্ত নিষ্ঠুর স্বামীকে ভালবাসিত না, কিন্তু স্বামী খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হইলে অশিক্ষিত রমণীর স্বাভাবিক কর্তব্যবোধে বিচারকের করুণা-ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল; তারপর বিজয় ও নিশানাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, দাম্পত্য জীবনের যে-কোমলতা পায় নাই তাহার আশায় লুব্ধ হইয়াছিল। নিশানাথও ক্রমশ নিজের বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধে এই সুন্দরী অনাথার মায়াজালে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছিল, বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি নীতি লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। চাকরি ছাড়িয়া দিয়া এই একান্ত অপরিচিত স্থানে আসিয়া দময়ন্তীর সহিত বাস করিতেছিলেন।...দোষ কাহার, কে কাহাকে অধিক প্রলুব্ধ করিয়াছিল, এ প্রশ্নের অবতারণা এখন নিরর্থক; কিন্তু এ জগতে কর্মফলের হাত এড়ানো যায় না, বিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না। নিশানাথ কঠিন মূল্য দিয়াছেন, দময়ন্তীও লজ্জা ভয় ও শোকের মাশুল দিয়া জীবনের ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যে ছিদ্রান্বেষী শত্রু তাহাদের দুর্বলতার ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া কৃমিকীটের ন্যায় আত্মপুষ্টি করিতে চায় সে নিমিত্ত মাত্র। আবার তাহাকেও একদিন মাশুল দিতে হইবে—

বিজয়ের ঘরে আলো নিভিয়া গেল; পাশের কুঠিতে বনলক্ষ্মীর আলো জ্বলিল। কিছুক্ষণ পরে বনলক্ষ্মীর ওপাশের কুঠিতে ভুজঙ্গধরবাবুর সেতার বাজিয়া উঠিল! কী সুর ঠিক জানি না, কিন্তু দ্রুত তাহার ছন্দ তাল, অসন্দিগ্ধ তাহার ভঙ্গী; যেন বহিঃপ্রকৃতির রসালতায় নূতন উদ্দীপনা প্রয়োগ করিবার প্রয়াস পাইতেছে, বিরহী প্রিয়তমাকে আহ্বান করিতেছে—

কাজর রুচিহর রয়নী বিশালা,
তছুপর অভিসার করু নববালা—

দশ মিনিট পরে সেতার থামিল, ভুজঙ্গধরবাবু আলো নিভাইলেন। কয়েক মিনিট পরে বনলক্ষ্মীর আলোও নিভিয়া গেল। সব কুঠিগুলি অন্ধকার।

আপন আপন নিভৃত কক্ষে ইহারা কি করিতেছে—কী ভাবিতেছে? এই কলোনীর তিমিরাবৃত বুকে কোন্ মানুষটির মনের মধ্যে কোন্ চিন্তার ক্রিয়া চলিতেছে? বনলক্ষ্মী এখন তাহার সঙ্কীর্ণ বিছানায় শুইয়া কি ভাবিতেছে? কাহার কথা ভাবিতেছে?—যদি অন্তর্যামী হইতাম...

অলস ও অসংলগ্ন চিন্তায় বোধ করি ঘন্টাখানেক কাটিয়া গেল। হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিলাম। পায়ের শব্দ। দ্রুত অথচ সতর্ক। আমি যে ঝোপে লুকাইয়া ছিলাম তাহার পাশ দিয়া বিজয়ের কুঠির দিকে যাইতেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

যেখানে লুকাইয়া আছি সেখান হইতে বিজয়ের সদর দরজা দশ-বারো হাত দূরে। শুনিতে পাইলাম খুট্‌খুট্ শব্দে দরজায় টোকা পড়িল; তারপর দ্বার খোলার শব্দ পাইলাম। তারপর

নিস্তব্ধ।

এই সময় আকাশের অবগুণ্ঠিতা বধূ একবার মুচকি হাসিল। আর আধ মিনিট আগে হাসিলে বিজয়ের নৈশ অতিথিকে দেখিতে পাইতাম।

পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট। কুঠির আরও কাছে গেলে হয়তো কিছু শুনিতে পাইতাম, কিন্তু সাহস হইল না। অন্ধকারে হোঁচট কিম্বা আছাড় খাইলে নিজেই ধরা পড়িয়া যাইব।

দ্বার খোলার মৃদু শব্দ! আবার আমার পাশ দিয়া অদৃশ্যচারী চলিয়া যাইতেছে। আকাশ-বধূ হাসিল না। কাহাকেও দেখা গেল না, কেবল একটা চাপা কান্নার নিগৃহীত আওয়াজ কানে আসিল। কে?—কান্নার শব্দ হইতে চিনিতে পারিলাম না, কিন্তু যেই হোক সে স্ত্রীলোক!

তারপর আরও এক ঘন্টা হাত পা শক্ত করিয়া বসিয়া রহিলাম কিন্তু আর কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইবে ভাবিতেছি, কানের কাছে ব্যোমকেশের ফিস্‌ফিস্ গলা শুনিলাম—'চলে এস। যা দেখবার দেখা হয়েছে।'

ফটকের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ছায়ামূর্তির মত বরাট দাঁড়াইয়া আছে। তিনজনে ফিরিয়া চলিলাম।

ব্যোমকেশ বলিল,—'কে কি দেখলে বল।—অজিত, তুমি?'

আমি যাহা শুনিয়াছিলাম বলিলাম।

ব্যোমকেশ নিজের রিপোর্ট দিল,—'আমি একজনকে নেপালবাবুর খিড়কি দিয়ে বেরুতে শুনেছি। নেপালবাবু নয়, কারণ পায়ের শব্দ হাল্কা। পনরো-কুড়ি মিনিট পরে তাকে আবার ফিরে আসতে শুনেছি।—ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি?'

বরাট বলিল,—'আমি দময়ন্তীর বাড়ি থেকে কাউকে বেরুতে শুনিনি। কিন্তু অন্য কিছু দেখেছি!'

'কী?'

'বনলক্ষ্মীকে তার ঘর থেকে বেরুতে দেখেছি। আমি ছিলাম দময়ন্তীর বাড়ির পিছনের কোণে; বনলক্ষ্মীর ঘরের আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। তারপর আলো নিভে গেল, আমি সেই দিকেই তাকিয়ে রইলাম। একবার একটু বিদ্যুৎ চমকালো। দেখলাম বনলক্ষ্মী নিজের কুঠি থেকে বেরুচ্ছে।'

'কোন্ দিকে গেল?'

'তা জানি না। আর বিদ্যুৎ চমকায়নি।'

কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'মুস্কিল মিঞার বৌ মিথ্যা বলেনি। এখন কথা হচ্ছে, বিজয়ের ঘরে যে গিয়েছিল সে কে? মুকুল, না বনলক্ষ্মী? যদি বনলক্ষ্মী বিজয়ের ঘরে গিয়ে থাকে তবে মুকুল কোথায় গিয়েছিল?'

তেইশ

শেষ রাত্রির দিকে কলকাতায় ফিরিয়া পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতে দেরি হইল। শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিলাম আকাশ জলভারাক্রান্ত হইয়া আছে, আজও মেঘ কাটে নাই। বসিবার ঘরে গিয়া দেখি তক্তপোশের উপর ব্যোমকেশ ও আর একজন চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিয়াছে। আমার আগমনে লোকটি ঘাড় ফিরাইয়া দন্ত বাহির করিল। দেখিলাম—বিকাশ।

আমিও তক্তপোশে গিয়া বসিলাম। বিকাশের মুখখানা বকাটে ধরনের কিন্তু তাহার দাঁত-খিঁচানো হাসিতে একটা আপন-করা ভাব আছে। তাহার বাচনভঙ্গীও অত্যন্ত সিধা ও বস্তুনিষ্ঠ। সে বলিল,—'উনিশ নম্বরে গিয়ে জান্ কয়লা হয়ে গিয়েছে স্যার।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কী দেখলেন শুনলেন বলুন।'

বিকাশ সক্ষোভে বলিল,—'কি আর দেখব শুনব স্যার, একেবারে লঝ্‌ঝড় মাল, নাইন্‌টীন-ফিফটীন্ মডেল—'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিল,—'হ্যাঁ হ্যাঁ। বুঝেছি। ওখানে কি কি খবর পেলেন তাই বলুন।'

বিকাশ বলিল,—'খবর কিস্‌সু নেই। ও বাড়িতে দুটো বস্তাপচা ইস্ত্রীলোক থাকে—'

'দুটো!' ব্যোমকেশের স্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

'আজ্ঞে। বাড়িতে তিনটে ঘর আছে, কিন্তু ইস্ত্রীলোক থাকে দুটোই।'

'ঠিক দেখেছেন, দুটোর বেশি নেই?'

বিকাশের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল,—'দুটোর জায়গায় যদি আড়াইটে বেরোয় স্যার, আমার কান কেটে নেবেন। অমন ভুল বিকাশ দত্ত করবে না।'

'না না, আপনি ঠিকই দেখেছেন। কিন্তু তৃতীয় ঘরে কি কেউ থাকে না, ঘরটা খোলা পড়ে থাকে?'

'খোলা পড়ে থাকবে কেন স্যার, বাড়িওয়ালা ও-ঘরটা নিজের দখলে রেখেছে। মাঝে মাঝে আসে, তখন থাকে।'

'ও—' ব্যোমকেশ আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

তারপর বিকাশ আরও কয়েকটা খুচরা খবর দিল, কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক এবং ছাপার অযোগ্য বলিয়া উহ্য রাখিলাম।

বিকাশ চলিয়া যাইবার পর প্রায় পনরো মিনিট ব্যোমকেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—'ব্যস্, প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। অজিত, তুমি নীচের ডাক্তারখানা থেকে কিছু ব্যান্ডেজ, কিছু তুলো আর একশিশি টিঞ্চার আয়োডিন কিনে আনো দেখি।'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'কি হবে ওসব?'

'দরকার আছে। যাও, আমি ইতিমধ্যে কলোনীতে টেলিফোন করি।—হ্যাঁ, গোটা দুই বেশ পুরু খাম মনিহারী দোকান থেকে কিনে এনো।' বলিয়া সে টেলিফোন তুলিয়া লইল।

আমি জামা পরিতে পরিতে শুনিলাম সে বলিতেছে,—'হ্যালো,.....কে, বিজয়বাবু? একবার নেপালবাবুকে ফোনে ডেকে দেবেন? বিশেষ দরকার।...'

সওদা করিয়া ফিরিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ টেলিফোনে বাক্যালাপ শেষ করিয়াছে, টেবিলে ঝুঁকিয়া বসিয়া দুইটি ফটোগ্রাফ দেখিতেছে।

ফটোগ্রাফ দুইটি সুনয়নার, রমেনবাবু যাহা দিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া সে বলিল,—'এবার মন দিয়ে শোনো।'—

দুটি খামে ফটো দুইটি পুরিয়া সযত্নে আঠা জুড়িতে জুড়িতে ব্যোমকেশ বলিল,—'আমি কিছুদিন থেকে একটা দুর্দান্ত গুণ্ডাকে ধরবার চেষ্টা করছি। গুণ্ডা কাল রাত্রে বাদুড়বাগানের মোড়ে আমাকে ছুরি মেরে পালিয়েছে। আঘাত গুরুতর নয়, কিন্তু গুণ্ডা আমাকে ছাড়বে না, আবার চেষ্টা করবে। আমি তাকে আগে ধরব, কিম্বা সে আমাকে আগে মারবে, তা বলা যায় না। যদি সে আমাকে মারে তাহলে গোলাপ কলোনীর রহস্যটা রহস্যই থেকে যাবে। তাই আমি এক উপায় বার করেছি। এই দুটি খামে দুটি ফটো রেখে যাচ্ছি। একটি খাম নেপালবাবুকে দেব, অন্যটি ভুজঙ্গধরবাবুকে। আমি যদি দু'চার দিনের মধ্যে গুণ্ডার ছুরিতে মারা যাই তাহলে তাঁরা খাম খুলে দেখবেন আমি কাকে কলোনীর হত্যা সম্পর্কে সন্দেহ করি। আর যদি গুণ্ডাকে ধরতে পারি তখন আমার অপঘাত-মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে; তখন আমি খাম দুটি ওঁদের কাছ থেকে ফেরত নেব এবং গোলাপ কলোনীর অনুসন্ধান যেমন চালাচ্ছি তেমনি চালাতে থাকব। বুঝতে পারলে?'

বলিলাম,—'কিছু কিছু বুঝেছি। কিন্তু এই অভিনয়ের ফল কি হবে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ফল কিছুই হবে কি না এখনও জানি না। মা ফলেষু। নেপালবাবু

বারোটার আগেই আসছেন। তুমি এই বেলা আমার হাতে ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দাও। আর, তোমাকে কি করতে হবে শোনো।'—

আমি তাহার বাঁ হাতের প্রগণ্ডে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে আরম্ভ করিলাম ; টিঞ্চার আয়োডিনে তুলা ভিজাইয়া বেশ মোটা করিয়া তাগার মত পটি বাঁধিলাম ; কামিজের আস্তিনে ব্যান্ডেজ ঢাকা দিয়া একফালি ন্যাকড়া দিয়া হাতটা গলা হইতে ঝুলাইয়া দিলাম। এই সঙ্গে ব্যোমকেশ আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিল-—

বেলা এগারোটার সময় দ্বারের কড়া নড়িল। আমি দ্বারের কাছে গিয়া সশঙ্ককণ্ঠে বলিলাম,—'কে ? আগে নাম বল তবে দোর খুলব।'

ওপার হইতে আওয়াজ আসিল,—'আমি নেপাল গুপ্ত।' সন্তর্পণে দ্বার একটু খুলিলাম ; নেপালবাবু প্রবেশ করিলে আবার হুড়কা লাগাইয়া দিলাম।

নেপালবাবুর মুখ ভয় ও সংশয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'এ কি ! মতলব কি আপনাদের ?'

ব্যোমকেশ তক্তপোশের উপর বালিসে পিঠ দিয়া অর্ধশয়ান ছিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—'ভয় নেই, নেপালবাবু। এদিকে আসুন, সব বলছি।'

নেপালবাবু দ্বিধাজড়িত পদে ব্যোমকেশের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যোমকেশ ফ্যাকাসে হাসি হাসিয়া বলিল,—'বসুন। টেলিফোনে সব কথা বলিনি, পাছে জানাজানি হয়। আমাকে গুণ্ডারা ছুরি মেরেছে—' কাল্পনিক গুণ্ডার নামে অজস্র মিথ্যা কথা বলিয়া শেষে কহিল,—'আপনিই কলোনীর মধ্যে একমাত্র লোক, যার বুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। যদি আমার ভালমন্দ কিছু হয়, তাই এই খামখানা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। আমার মৃত্যু-সংবাদ যদি পান, তখন খামখানা খুলে দেখবেন, কার ওপর আমার সন্দেহ বুঝতে পারবেন। তারপর যদি অনুসন্ধান চালান, অপরাধীকে ধরা শক্ত হবে না। আমি পুলিসকে আমার সন্দেহ জানিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু পুলিসের ওপর আমার বিশ্বাস নেই। ওরা সব ভণ্ডুল করে ফেলবে।'

শুনিতে শুনিতে নেপালবাবুর সংশয় শঙ্কা কাটিয়া গিয়াছিল, মুখে সদম্ভ প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি খামখানা সযত্নে পকেটে রাখিয়া বলিলেন,—'ভাববেন না, যদি আপনি মারা যান, আমি আছি। পুলিসকে দেখিয়ে দেব বৈজ্ঞানিক প্রথায় অনুসন্ধান কাকে বলে।'

দেখা গেল ইতিপূর্বে তিনি যে বিজয়কে আসামী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহা আর তাঁহার মনে নাই। বোধহয় বিজয়ের সহিত একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল,—'কিন্তু একটা কথা, আমার মৃত্যু-সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত খাম খুলবেন না। গুণ্ডাটাকে যদি জেলে পুরতে পারি, তাহলে আর আমার প্রাণহানির ভয় থাকবে না ; তখন কিন্তু খামখানি যেমন আছে তেমনি অবস্থায় আমাকে ফেরত দিতে হবে।'

নেপালবাবু একটু দুঃখিতভাবে শর্ত স্বীকার করিয়া লইলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, বলিল,—'অজিত, পুঁটিরামকে বলে দাও এ বেলা কিছু খাব না।'

'খাবে না কেন ?'

'ক্ষিদে নেই।' বলিয়া সে একটু হাসিল।

আমি বেলা একটা নাগাদ আহারাদি শেষ করিয়া আসিলে ব্যোমকেশ বলিল,—'এবার তুমি টেলিফোন কর।'

আমি কলোনীতে টেলিফোন করিলাম। বিজয় ফোন ধরিল। বলিলাম,—'ভুজঙ্গধরবাবুকে একবারটি ডেকে দেবেন ?' ভুজঙ্গধরবাবু আসিলে বলিলাম,—'ব্যোমকেশ অসুস্থ, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। আপনি আসতে পারবেন ?'

মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন,—'নিশ্চয়। কখন আসব বলুন।'

'চারটের সময় এলেই চলবে। কিন্তু কাউকে কোনও কথা বলবেন না। গোপনীয় ব্যাপার।'

'আচ্ছা।'

চারটের কিছু আগেই ভুজঙ্গধরবাবু আসিলেন। দ্বারের সম্মুখে আগের মতই অভিনয় হইল। ভুজঙ্গধরবাবু চমকিত হইলেন, তারপর ব্যোমকেশের আহ্বানে তাহার পাশে গিয়া বসিলেন।

সমস্ত দিনের অনাহারে ব্যোমকেশের মুখ শুষ্ক। সে ভুজঙ্গধরবাবুকে গুণ্ডা কাহিনী শুনাইল। ভুজঙ্গধরবাবু তাহার নাড়ি দেখিলেন, বলিলেন,—'একটু দুর্বল হয়েছেন। ও কিছু নয়।'

ব্যোমকেশ কেন সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছে বুঝিলাম। ডাক্তারের চোখে ধরা পড়িতে চায় না।

ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'যাক, আসল কথাটা কি বলুন।' আজ তাঁহার আচার আচরণে চপলতা নাই ; একটু গম্ভীর।

ব্যোমকেশ আসল কথা বলিল। ভুজঙ্গধর সমস্ত শুনিয়া এবং খামখানি একটু সন্দিগ্ধভাবে পকেটে রাখিয়া বলিলেন,—'এ সব দিকে আমার মাথা খ্যালে না। যা হোক, যদি আপনার ভালমন্দ কিছু ঘটে—আশা করি সে রকম কিছু ঘটবে না—তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনি বোধহয় এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেননি, তাই ঝেড়ে কাশছেন না। কেমন ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ। নিঃসন্দেহ হতে পারলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না, সটান পুলিসকে বলতাম—ঐ তোমার আসামী।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর চা ও সিগারেট সেবন করিয়া ভুজঙ্গধরবাবু বিদায় লইলেন।

আমি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, তিনি ট্রাম ধরিয়া শিয়ালদার দিকে চলিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ এবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল,—'ম্যায় ভুখা হুঁ। —পুঁটিরাম !'

চব্বিশ

ভুজঙ্গধরবাবু চলিয়া যাইবার ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রথমে রিম্‌ঝিম্ তারপর ঝম্‌ঝম্। দীর্ঘ আয়োজনের পর বেশ জুত করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, শীঘ্র থামিবে বলিয়া বোধ হয় না।

ব্যোমকেশের ভাবভঙ্গী হইতে অনুমান হইল, তাহার উদ্যোগ আয়োজনও চরম পরিণতির মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে, ক্রমাগত সিগারেট টানিতেছে। এ সব লক্ষণ আমি চিনি। জাল গুটাইয়া আসিতেছে।

মেঘের অন্তরপথে দিন শেষ হইয়া রাত্রি আসিল। আটটার সময় ব্যোমকেশ প্রমোদ বরাটকে ফোন করিল ; অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোনের মধ্যে গুজগুজ করিল। তাহার সংলাপের ছিন্নাংশ হইতে এইটুকু শুধু বুঝিলাম যে, গোলাপ কলোনীর উপর কড়া পাহারা রাখা দরকার, কেহ না পালায়।

রাত্রে ঘুমের মধ্যেও অনুভব করিলাম, ব্যোমকেশ জাগিয়া আছে এবং বাড়িময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি হইল। সকালে দেখিলাম, মেঘগুলো ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে ; বৃষ্টির তেজ কমিয়াছে, কিন্তু থামে নাই। এগারোটার সময় বৃষ্টি বন্ধ হইয়া পাণ্ডাস সূর্যালোক দেখা দিল।

ব্যোমকেশ ছাতা লইয়া গুটি গুটি বাহির হইতেছে দেখিয়া বলিলাম,—'এ কি ! চললে কোথায় ?'

উত্তর না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ফিরিল বিকাল সাড়ে তিনটার সময়। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আজও কি একাদশী ?'

সে বলিল,—'উহুঁ, কাফে সাজাহানে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছের ডিম দিয়ে দিব্যি চর্ব-চোষ্য হয়েছে।'

'যদি নেপাল গুপ্ত কিম্বা ভুজঙ্গ ডাক্তার দেখে ফেলত !'

'সে সম্ভাবনা কম। তাঁরা কেউ কলোনী থেকে বেরুবার চেষ্টা করলে গ্রেপ্তার হতেন।'

'যাক, ওদিকে তাহলে পাকা বন্দোবস্ত করেছ। এদিকের খবর কি, গিছলে কোথায় ?'

'প্রথমত কর্পোরেশন অফিস। ১৯ নং মির্জা লেন বাড়িটির মালিক কে জানবার কৌতূহল হয়েছিল।'

'মালিক কে—ভুজঙ্গধরবাবু ?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল,—'না, একজন স্ত্রীলোক।'

'আর কোথায় গিছলে ?'

'রমেনবাবুর কাছে। সুনয়নার আরও দুটো ফটো যোগাড় করেছি।'

'আর কি করলে ?'

'আর, একবার চীনেপটিতে গিয়েছিলাম দাঁতের সন্ধানে।'

'দাঁতের সন্ধানে ?'

'হ্যাঁ। চীনেরা খুব ভাল দাঁতের ডাক্তার হয় জানো ?' বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে স্নান-ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—নাটকের পঞ্চম অঙ্কে যবনিকা পড়িতে আর দেরি নাই, অথচ নাটকের নায়ক-নায়িকাকে চিনিতে পারিতেছি না কেন ?

পরদিন সকালে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হইয়া ঝল্‌মলে রোদ উঠিয়াছে, ব্যোমকেশ খবরের কাগজ রাখিয়া বলিল,—'আটটা বাজল। এস, এবার আমাকে কাটা সৈনিক সাজিয়ে দাও। কলোনীতে যেতে হবে।'

'একলা যাবে ?'

'না, তুমিও যাবে। গুণ্ডা ধরা পড়েছে। কিন্তু তবু সাবধানের মার নেই। একজন সঙ্গী থাকা দরকার।'

'গুণ্ডা কবে ধরা পড়ল ?'

'কাল রাত্তিরে।'

'আজ কলোনীতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি ?'

'ছবির খাম ফেরত নিতে হবে। আজ এস্পার কি ওস্পার।'

তাহার ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম। বাহির হইবার পূর্বে সে প্রমোদ বরাটকে ফোন করিল। আমি একটা মোটা লাঠি হাতে লইলাম।

মোহনপুরের স্টেশনে বরাট উপস্থিত ছিল। ব্যোমকেশের রূপসজ্জা দেখিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'হাসছেন কি, ভেক না হলে ভিক পাওয়া যায় না। আমার গুন্ডার নাম জানেন তো ? সজ্জনদাস মিরজাপুরী। যদি দরকার হয়, মনে রাখবেন। আজ কাগজে ঐ নামটা পেয়েছি, কাল রাত্রে বেলগাছিয়া পুলিস তাকে ধরেছে।'

'বাঃ ! জুতসই একটা গুণ্ডাও পেয়ে গেছেন।'

'অমন একটা-আধটা গুণ্ডার খবর প্রায় রোজই কাগজে থাকে !'

কলোনীতে উপস্থিত হইলাম। ফটকের কাছে পুলিসের থানা বসিয়াছে, তাছাড়া তারের বেড়া ঘিরিয়া কয়েকজন পাহারাওয়ালা রোঁদ দিতেছে। বেশ একটা থমথমে ভাব।

ফটকের বাহিরে গাড়ি রাখিয়া আমরা প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই চোখে পড়িল, নিশানাথবাবুর বারান্দায় বিজয় ও ভুজঙ্গধরবাবু বসিয়া আছেন। ভুজঙ্গধরবাবু খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া কাগজ মুড়িয়া রাখিলেন। বিজয় ভ্রূকুটি করিয়া চাহিল। আমরা নিকটস্থ হইলে সে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল,—'এর মানে কি, ব্যোমকেশবাবু ? অপরাধীকে ধরবার ক্ষমতা নেই, মাঝ থেকে কলোনীর ওপর চৌকি বসিয়ে দিয়েছেন। পরশু থেকে আমরা কলোনীর সীমানার মধ্যে বন্দী হয়ে আছি।'

ব্যোমকেশ তাহার রুক্ষতা গায়ে মাখিল না, হাসিমুখে বলিল,—'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। যেখানে খুন হয়েছে সেখানে একটু-আধটু অসুবিধে হবে বৈকি। দেখুন না আমার অবস্থা।'

ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'আজ তো আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। গুণ্ডা কি ধরা পড়েছে নাকি ?'

'হ্যাঁ, সজ্জনদাস ধরা পড়েছে।'

'সজ্জনদাস! নামটা যেন কোথায় দেখেছি!—ও—আজকের কাগজে আছে। তা—এই সজ্জনদাসই আপনার দুর্জনদাস ?'

'হ্যাঁ, পুলিস কাল রাত্রে তাকে ধরেছে! তাই অনেকটা নির্ভয়ে বেরুতে পেরেছি।'

'তাহলে— ?' ভুজঙ্গধরবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ। আসুন, আপনার সঙ্গে কাজ আছে।'

ভুজঙ্গধরবাবুকে লইয়া আমরা তাঁহার কুঠির দিকে চলিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'খামখানা ফেরত নিতে এসেছি।'

ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'বাঁচালেন মশাই, ঘাড় থেকে বোঝা নামল। ভয় হয়েছিল শেষ পর্যন্ত বুঝি আমাকেই গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। —একটু দাঁড়ান।'

নিজের কুঠিতে প্রবেশ করিয়া তিনি মিনিটখানেক পরে খাম হাতে বাহির হইয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ খাম লইয়া বলিল,—'খোলেননি তো ?'

'না, খুলিনি। লোভ যে একেবারে হয়নি তা বলতে পারি না কিন্তু সামলে নিলাম। হাজার হোক, কথা দিয়েছি। —আচ্ছা ব্যোমকেশবাবু, সত্যি কি কিছু জানতে পেরেছেন ?'

'এইটুকু জানতে পেরেছি যে স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার।'

'তাই নাকি!' কৌতূহলী চক্ষে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি মস্তকের পশ্চাৎভাগ চুলকাইতে লাগিলেন।

'ধন্যবাদ। —আবার বোধহয় ওবেলা আসব।' বলিয়া ব্যোমকেশ নেপালবাবুর কুঠির দিকে পা বাড়াইল।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?' ভুজঙ্গধরবাবু প্রশ্ন করিলেন।

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—'নেপালবাবুর সঙ্গে কিছু গোপনীয় কথা আছে।'

ভুজঙ্গধরবাবুর চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না, মুখে অর্ধ-হাস্য লইয়া মস্তকের পশ্চাৎভাগে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

নেপালবাবু নিজের ঘরে বসিয়া দাবার ধাঁধা ভাঙিতেছিলেন, ব্যোমকেশকে দেখিয়া এমন কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন যে মনে হইল, জীবন্ত ব্যোমকেশকে চোখের সামনে দেখিয়া তিনি মোটেই প্রসন্ন হন নাই। তারপর যখন সে খামটি ফেরত চাহিল তখন তিনি নিঃশব্দে খাম আনিয়া ব্যোমকেশের সামনে ফেলিয়া দিয়া আবার দাবার ধাঁধায় মন দিলেন।

আমরা সুড়সুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। নেপালবাবু আগে হইতেই পুলিসের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন, তাহার উপর ব্যোমকেশের ব্যবহারে যে মর্মান্তিক চটিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

পঁচিশ

কলোনী হইতে আমরা সিধা থানায় ফিরিলাম। বরাটের ঘরে বসিয়া ব্যোমকেশ খাম দুটি সযত্নে পকেট হইতে বাহির করিল। বলিল,—'এইবার প্রমাণ।'

খাম দুটির উপরে কিছু লেখা ছিল না, দেখিতেও সম্পূর্ণ একপ্রকার। তবু কোনও দুর্লক্ষ্য চিহ্ন দেখিয়া সে একটি খাম বাছিয়া লইল; খামের আঠা লাগানো স্থানটা ভাল করিয়া দেখিয়া

বলিল,—'খোলা হয়নি বলেই মনে হচ্ছে।'

অতঃপর খাম কাটিয়া সে ভিতর হইতে অতি সাবধানে ফটো বাহির করিল ; ঝক্‌ঝকে পালিশ করা কাগজের উপর শ্যামা-ঝি'র ভূমিকায় সুনয়নার ছবি। বরাট এবং আমি ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছবিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলাম, তারপর বরাট নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—'কৈ, কিছু তো দেখছি না।'

ছবিটি খামে পুরিয়া ব্যোমকেশ সরাইয়া রাখিল। দ্বিতীয় খামটি লইয়া আগের মতই সমীক্ষার পর খাম খুলিতে খুলিতে বলিল,—'এটিও মনে হচ্ছে গোয়ালিনী মার্কা দুগ্ধের মত হস্তদ্বারা অস্পৃষ্ট।'

খামের ভিতর হইতে ছবি বাহির করিয়া সে আলগোছে ছবির দুই পাশ ধরিয়া তুলিয়া ধরিল। তারপর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—'আছে—আছে ? বাঘ ফাঁদে পা দিয়েছে !'

বরাট ছবিখানা ব্যোমকেশের হাত হইতে প্রায় কাড়িয়া লইয়া একাগ্রচক্ষে নিরীক্ষণ করিল, তারপর দ্বিধাভরে বলিল,—'আছে। কিন্তু—'

ব্যোমকেশের মুখে চোখে উত্তেজনা ফাটিয়া পড়িতেছিল, সে একটু শান্ত হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'আপনার 'কিন্তু'র জবাব আমি দিতে পারব না, কিন্তু আমার বিশ্বাস বাঘ এবং বাঘিনীকে এক জায়গাতেই পাওয়া যাবে।—চলুন আর দেরি নয়, খাতাপত্র নিয়ে নিন। আপনাদের বিশেষজ্ঞদের অফিস বোধহয় কলকাতায় ?'

'হ্যাঁ। চলুন।'

বিশেষজ্ঞ মহাশয়ের মন্তব্য লইয়া আমরা যখন বাহির হইলাম তখন বেলা দুটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা কাহারও মনে ছিল না ; ব্যোমকেশ বরাটের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল,—'আসুন, আমাদের বাসাতেই শাক-ভাত খাবেন।'

বরাট বলিল,—'কিন্তু—ও কাজটা যে এখনও বাকী— ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ও কাজটা পরে হবে। আগে খাওয়া, তারপর খানাতল্লাস—তারপর আবার গোলাপ কলোনী। গোলাপ কলোনীর বিয়োগাদ্য নাটকে আজই যবনিকা পতন হবে।'

গোলাপ কলোনীতে নিশানাথবাবুর বহিঃকক্ষে সভা বসিয়াছিল। ঘরের মধ্যে ছিলাম আমরা তিনজন এবং দময়ন্তী দেবী ছাড়া কলোনীর সকলে। রসিক দে'কেও হাজত হইতে আনা হইয়াছিল। দময়ন্তী দেবীর প্রবল মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে সভার অধিবেশন হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছিল। দুইজন সশস্ত্র পুলিস কর্মচারী দ্বারের কাছে পাহারা দিতেছিল।

রাত্রি প্রায় আটটা। মাথার উপর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। সামনের দেয়ালে নিশানাথবাবুর একটি বিশদীকৃত ফটোগ্রাফ টাঙানো হইয়াছিল। নিশানাথের ঠোঁটের কোণে একটু নৈর্ব্যক্তিক হাসি, তিনি যেন হাকিমের উচ্চ আসনে বসিয়া নিরাসক্তভাবে বিচার-সভার কার্যবিধি পরিচালনা করিতেছেন।

ব্যোমকেশের মুখে আতপ্ত চাপা উত্তেজনা। সে একে একে সকলের মুখের উপর চোখ বুলাইয়া ধীরকণ্ঠে বলিল,—'আপনারা শুনে সুখী হবেন নিশানাথবাবু এবং পানুগোপালকে কারা হত্যা করেছিল তা আমরা জানতে পেরেছি।'

কেহ কথা কহিল না। নেপালবাবু ফস্ করিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া নির্বাপিত চুরুট ধরাইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'শুধু যে জানতে পেরেছি তা নয়, অকাট্য প্রমাণও পেয়েছি। অপরাধীরা এই ঘরেই আছে। অন্নদাতা নিশানাথবাবুকে যারা বীভৎসভাবে হত্যা করেছে, অসহায় নিরীহ পানুগোপালকে যারা বিষ দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে, আইন তাদের ক্ষমা করবে না। তাদের প্রাণদণ্ড নিশ্চিত। তাই আমি আহ্বান করছি, মনুষ্যত্বের কণামাত্র যদি অপরাধীদের প্রাণে থাকে তারা অপরাধ স্বীকার করুক।'

এবারও সকলে নীরব। ভুজঙ্গধরবাবুর মুখের মধ্যে যেন সুপারি-লবঙ্গের মত একটা কিছু ছিল, তিনি সেটা এ গাল হইতে ও গালে লইলেন। বিজয় একদৃষ্টে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল।

মুকুলকে দেখিয়া মনে হয়, সে যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হইয়াছে। আজ তাহার মুখে রুজ পাউডার নাই ; রক্তহীন সুন্দর মুখে অজ্ঞানিতের বিভীষিকা।

ঘরের অন্য কোণে বনলক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তাহার মুখে প্রবল উদ্বেগের ব্যঞ্জনা নাই। সে কোলের উপর হাত রাখিয়া আঙুলগুলা লইয়া খেলা করিতেছে, যেন অদৃশ্য কাঁটা দিয়া অদৃশ্য পশমের জামা বুনিতেছে।

আধ মিনিট পরে ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ, তাহলে আমিই বলছি।—নেপালবাবু, আপনি নিশানাথবাবুর সম্বন্ধে একটা গুপ্তকথা জানেন। আমি যখন জানতে চেয়েছিলাম তখন আপনি অস্বীকার করেছিলেন কেন ?'

নেপালবাবুর চোখের মধ্যে চকিত আশঙ্কার ছায়া পড়িল, তিনি স্খলিতস্বরে বলিলেন,—'আমি—আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'যাক, কেন অস্বীকার করেছিলেন তার কৈফিয়ৎ দরকার নেই। কিন্তু কার কাছে এই গুপ্তকথা শুনেছিলেন ? কে আপনাকে বলেছিল ?—আপনার মেয়ে মুকুল ?' ব্যোমকেশের তর্জনী মুকুলের দিকে নির্দিষ্ট হইল।

নেপালবাবু ঘোর শব্দ করিয়া গলা পরিষ্কার করিলেন। বলিলেন,—'হ্যাঁ—মানে—মুকুল জানতে পেরেছিল—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কার কাছে জানতে পেরেছিল ?—আপনার কাছে ?' ব্যোমকেশের তর্জনী দিগদর্শন যন্ত্রের কাঁটার মত বিজয়ের দিকে ফিরিল।

বিজয়ের মুখ সাদা হইয়া গেল, সে মুখ তুলিতে পারিল না। অধোমুখে বলিল,—'হ্যাঁ—আমি বলেছিলাম। কিন্তু—'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করিল,—'আর কাউকে বলেছিলেন ?'

বিজয়ের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। সে ব্যাকুল চোখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিল, তারপর আবার অধোবদন হইল। উত্তর দিল না।

ব্যোমকেশ বলিল,—'যাক, আর একটা কথা বলুন। আপনি দোকান থেকে যে টাকা সরিয়েছিলেন সে টাকা কার কাছে রেখেছেন ?'

বিজয় হেঁটমুখে নিরুত্তর রহিল।

'বলবেন না ?' ব্যোমকেশ ঘরের অন্যদিকে যেখানে রসিক দে বৃষকাষ্ঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়াছিল সেইদিকে ফিরিল,—'রসিকবাবু, আপনিও দোকানের টাকা চুরি করে একজনের কাছে রেখেছিলেন, তার নাম বলবেন না ?'

রসিকের কণ্ঠের হাড় একবার লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু সে নীরব রহিল ; আঙুলকাটা হাতটা একবার চোখের উপর বুলাইল।

ব্যোমকেশের অধরে শুষ্ক ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল,—'ধন্য আপনারা! ধন্য আপনাদের একনিষ্ঠা! কিন্তু একটা কথা বোধহয় আপনারা জানেন না। বিজয়বাবু, আপনি যার কাছে টাকা জমা রাখছেন, রসিকবাবুও ঠিক তার কাছেই টাকা গচ্ছিত রাখছিলেন। এবং দু'জনেই আশা করেছিলেন যে, একদিন শুভ মুহূর্তে বামাল সমেত গোলাপ কলোনী থেকে অদৃশ্য হয়ে কোথাও এক নিভৃত স্থানে রোমান্সের নন্দন-কানন রচনা করবেন! বলিহারি!'

রসিক এবং বিজয় দু'জনেই একদৃষ্টে একজনের দিকে তাকাইয়া একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল,—'বসুন, বসুন, আমি যা জানতে চাই তা জানতে পেরেছি, আর আপনাদের কিছু বলবার দরকার নেই।—ইন্সপেক্টর বরাট, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনি বনলক্ষ্মী দেবীর বাঁ হাতের আঙুলগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখুন।'

বরাট উঠিয়া গিয়া বনলক্ষ্মীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বনলক্ষ্মী ক্ষণেক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বাঁ হাতখানা সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল।

ভুজঙ্গধরবাবু এইবার কথা কহিলেন। একটু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন,—'কী ধরনের

অভিনয় হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না—নাটক, না প্রহসন, না কমিক অপেরা !'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার পূর্বেই বরাট বলিল,—'এঁর তর্জনীর আগায় কড়া পড়েছে, মনে হয় ইনি তারের যন্ত্র বাজাতে জানেন।'

বরাট স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। ভুজঙ্গধরবাবু অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—'তাহলে কমিক অপেরা !'

ব্যোমকেশ ভুজঙ্গধরবাবুকে হিম-কঠিন দৃষ্টি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বলিল,—'এটা কমিক অপেরা নয় তা আপনি ভাল করেই জানেন ; আপনি নিপুণ যন্ত্রী, সুদক্ষ অভিনেতা।—কিন্তু আপাতত আর্ট ছেড়ে বৈষয়িক প্রসঙ্গে আসা যাক। ভুজঙ্গধরবাবু, ১৯ নম্বর মির্জা লেনের বাড়িটা বোধহয় আপনার, কারণ আপনি ভাড়া আদায় করেন। কেমন ?'

ভুজঙ্গধর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার গলার একটা শির দপ্‌দপ করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ পুনশ্চ বলিল,—'কিন্তু কর্পোরেশের খাতায় দেখলাম বাড়িটা শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসের নামে রয়েছে। নৃত্যকালী দাস কি আপনার স্ত্রীর নাম ?'

ভুজঙ্গধরবাবুর মুখের উপর দিয়া যেন একটা রোমাঞ্চকর নাটকের অভিনয় হইয়া গেল ; মানুষের অন্তরে যতপ্রকার আবেগ উৎপন্ন হইতে পারে, সবগুলি দ্রুত পরম্পরায় তাঁহার মুখে প্রতিফলিত হইল। তারপর তিনি আত্মস্থ হইলেন। সহজ স্বরে বলিলেন,—'হ্যাঁ, নৃত্যকালী আমার স্ত্রীর নাম, ১৯ নম্বর বাড়িটা আমার স্ত্রীর নামে।'

'কিন্তু—কয়েকদিন আগে আপনি বলেছিলেন, বিলেতে থাকা কালে আপনি এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন !'

'হ্যাঁ। তাঁরই স্বদেশী নাম নৃত্যকালী—বিলিতি নাম ছিল নিটা।'

'ও।—নিটা-নৃত্যকালী-সুনয়না, আপনার স্ত্রীর দেখছি অনেক নাম। তা—তিনি এখন বিলেতে আছেন ?'

'হ্যাঁ।—যদি না জার্মান বোমায় মারা গিয়ে থাকেন।'

ব্যোমকেশ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—'তিনি মারা যাননি। তিনি বিলিতি মেয়ে নন, খাঁটি দেশী মেয়ে ; যদিও আপনাদের বিয়ে বিলেতেই হয়েছিল। আপনার স্ত্রী এই দেশেই আছেন, এমনকি এই ঘরেই আছেন।'

'ভারি আশ্চর্য কথা।'

'ভুজঙ্গধরবাবু, আর অভিনয় করে লাভ কি ? আপনারা দু'জনেই উঁচুদরের আর্টিস্ট, আপনাদের অভিনয়ে এতটুকু খুঁত নেই। কিন্তু অভিনয় যতই উচ্চাঙ্গের হোক, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। অসতর্ক মুহূর্তে আপনি ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন।'

'ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। বুঝলাম না।'

'আপনি বুদ্ধিমান, কিন্তু ভয় পেয়ে একটু নির্বুদ্ধিতা করে ফেলেছেন। খামটা আপনার খোলা উচিত হয়নি। খামের মধ্যে যে ছবিটা ছিল, সেটা আপনি নিজে দেখেছেন, স্ত্রীকেও দেখিয়েছেন, ছবির ওপর আপনাদের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। নৃত্যকালী ওরফে সুনয়না ওরফে বনলক্ষ্মী যে আপনার সহধর্মিণী এবং সহকর্মিণী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

ভুজঙ্গধর চকিত বিস্ফারিত চক্ষে বনলক্ষ্মীর পানে চাহিলেন, বনলক্ষ্মীও বিস্ময়ে তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল। ভুজঙ্গধর মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনার হাসির অর্থ সুনয়নার সঙ্গে বনলক্ষ্মীর চেহারার একটুও মিল নেই, এই তো ? কিন্তু যে-কথাটা সকলে ভুলে গেছে আমি তা ভুলিনি, ডাক্তার দাস। আপনি বিলেতে গিয়ে প্ল্যাস্টিক সার্জারি শিখেছিলেন। এবং বনলক্ষ্মীর মুখের ওপর শিল্পীর হাতের যে অস্ত্রোপচার হয়েছে একটু ভাল করে পরীক্ষা করলেই তা ধরা পড়বে। এবং তাঁর সব দাঁতগুলিও যে নিজস্ব নয়, তাও বেশি পরীক্ষার অপেক্ষা রাখে না।'

বনলক্ষ্মীর মুখ-ভাবের কোনও পরিবর্তন হইল না, বিস্ময়বিমূঢ় ফ্যালফেলে মুখ লইয়া সে

এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। ভুজঙ্গধর কয়েক মুহূর্ত নতনেত্রে চাহিয়া যখন চোখ তুলিলেন, তখন মনে হইল অপরিসীম ক্লান্তিতে তাঁহার মন ভরিয়া গিয়াছে। তবু তিনি শান্ত স্বরেই বলিলেন,—'যদি ধরে নেওয়া যায় যে বনলক্ষ্মী আমার স্ত্রী, তাতে কী প্রমাণ হয় ? আমি নিশানাথবাবুকে খুন করেছি প্রমাণ হয় কি ? যে-সময় নিশানাথবাবুর মৃত্যু হয়, সে-সময় আমি নিজের বারান্দায় বসে সেতার বাজাচ্ছিলাম। তার সাক্ষী আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি যে অ্যালিবাই তৈরি করেছিলেন, তা সত্যিই অদ্ভুত, কিন্তু ধোপে টিকলো না। সে-রাত্রে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে আপনি মিনিট পাঁচেক সেতার বাজিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বাকী সময়টা বাজিয়েছিলেন আপনার স্ত্রী। বনলক্ষ্মী দেবী অস্বীকার করলেও তিনি সেতার বাজাতে জানেন, তাঁর আঙুলে কড়া আছে।'

'এটা কি প্রমাণ ? না জোড়াতাড়া দেওয়া একটা থিওরি !'

'বেশ, এটা থিওরি। আপনি নিশানাথবাবুকে খুন করেছেন এটা যদি আদালতে প্রমাণ নাও হয়, তবু আপনাদের নিষ্কৃতি নেই ডাক্তার। আপনার ১৯ নম্বর মির্জা লেনের বাড়ি আজ বিকেলে পুলিস খানাতল্লাস করেছে ; আপনার বন্ধ ঘরটিতে কি কি আছে আমরা জানতে পেরেছি। আছে একটি অপারেটিং টেবিল এবং একটি স্টিলের আলমারি। আলমারিও আমরা খুলে দেখেছি। তার মধ্যে পাওয়া গেছে—অপারেশনের অস্ত্রশস্ত্র, আপনাদের বিয়ের সার্টিফিকেট, আন্দাজ বিশ হাজার টাকার নোট, তামাক থেকে নিকোটিন চোলাই করবার যন্ত্রপাতি, আর—'

'আর— ?'

'মনে করতে পারছেন না ? আলমারির চোরা-কুঠুরির মধ্যে যে হীরের নেকলেসটি রেখেছিলেন তার কথা ভুলে গেছেন ? মুরারি দত্তর মৃত্যুর সময় ওই নেকলেসটা দোকান থেকে লোপাট হয়ে যায়।—নিশানাথ এবং পানুকে খুন করার অপরাধে যদি বা নিষ্কৃতি পান, মুরারি দত্তকে বিষ খাওয়াবার দায় থেকে উদ্ধার পাবেন কি করে ?'

ভুজঙ্গধরবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বরাট রিভলবার বাহির করিল। কিন্তু রিভলবার দরকার হইল না। ভুজঙ্গধর বনলক্ষ্মীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর যে অভিনয় হইল তাহা বাংলা দেশের মঞ্চাভিনয় নয়, হলিউডের সিনেমা। বনলক্ষ্মী উঠিয়া ভুজঙ্গধরের কণ্ঠলগ্না হইল। ভুজঙ্গধর তাহাকে বিপুল আবেগে জড়াইয়া লইয়া তাহার উন্মুক্ত অধরে দীর্ঘ চুম্বন করিলেন। তারপর তাহার মুখখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া স্নেহক্ষরিত স্বরে বলিলেন,—'চল, এবার যাওয়া যাক।'

মৃত্যু আসিল অকস্মাৎ, বজ্রপাতের মত। দু'জনের মুখের মধ্যে কাচ চিবানোর মত একটা শব্দ হইল ; দু'জনে একসঙ্গে পড়িয়া গেল। যেখানে দেয়ালের গায়ে নিশানাথের ছবি ঝুলিতেছিল, তাহারই পদমূলে ভূ-লুণ্ঠিত হইল।

আমরা ছুটিয়া গিয়া যখন তাহাদের পাশে উপস্থিত হইলাম, তখন তাহাদের দেহে প্রাণ নাই, কেবল মুখের কাছে একটু মৃদু বাদাম-তেলের গন্ধ লাগিয়া আছে।

বিজয় দাঁড়াইয়া দুঃস্বপ্নভরা চোখে চাহিয়া ছিল। তাহার চোয়ালের হাড় রোমন্থনের ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে নড়িতেছিল। মুকুল তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, চাপা গলায় বলিল,—'এস—চলে এস এখান থেকে—'

বিজয় দাঁড়াইয়া রহিল, বোধহয় শুনিতে পাইল না। মুকুল তখন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

ছাব্বিশ

পরদিন সকালবেলা হ্যারিসন রোডের বাসায় বসিয়া ব্যোমকেশ গভীর মনঃসংযোগে হিসাব কষিতেছিল। হিসাব শেষ হইলে সে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—'জমা ষাট টাকা, খরচ ঊনষাট টাকা সাড়ে ছয় আনা। নিশানাথবাবু খরচ বাবদ যে ষাট টাকা দিয়েছিলেন, তা থেকে সাড়ে নয় আনা বেঁচেছে।—যথেষ্ট, কি বল ?'

আমি নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'সত্যান্বেষণের ব্যবসা যে রকম লাভের ব্যবসা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে শেষ পর্যন্ত আমাকেও গোলাপ কলোনীতে ঢুকে পড়তে হবে দেখছি।'

বলিলাম,—'ছাগল চরানোর প্রস্তাবটা ভুলো না।'

সে বলিল,—'খুব মনে করিয়ে দিয়েছ। ছাগলের ব্যবসায় পয়সা আছে। একটা ছাগলের ফার্ম খোলা যাক্, নাম দেওয়া যাবে—ছাগল কলোনী। কেমন হবে ?'

'চমৎকার। কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই।'

'নেই কেন ? বিদ্যাসাগর মশাই থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে-কাজ করতে পারেন, সে-কাজ তুমি পারবে না ! তোমার এত গুমর কিসের ?'

বিপজ্জনক প্রসঙ্গ এড়াইয়া গিয়া বলিলাম,—'ব্যোমকেশ, কাল সমস্ত রাত কেবল স্বপ্ন দেখেছি।'

সে চকিত হইয়া বলিল,—'কি স্বপ্ন দেখলে ?'

'দেখলাম বনলক্ষ্মী দাঁত বার করে হাসছে। যতবার দেখলাম, ঐ এক স্বপ্ন।'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'অজিত, মনে আছে আর একবার বনলক্ষ্মীকে স্বপ্ন দেখেছিলে। আমি সত্যবতীকে স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু আসলে একই কথা। মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় কথা। বনলক্ষ্মীর দাঁত যে বাঁধানো তা আমাদের চর্মচক্ষে ধরা পড়েনি বটে, কিন্তু আমাদের অবচেতন মন জানতে পেরেছিল—তাই বারবার স্বপ্ন দেখিয়ে আমাদের জানাবার চেষ্টা করেছিল। এখন আমরা জানি বনলক্ষ্মীর ওপর পাটির দু'পাশের দুটি দাঁত বাঁধানো, তাতে তার মুখের গড়ন হাসি সব বদলে গেছে। সেদিন ভুজঙ্গধর 'দন্তরুচি কৌমুদী' বলেছিলেন তার ইঙ্গিত তখন হৃদয়ঙ্গম হয়নি।'

'দন্তরুচির মধ্যে ইঙ্গিত ছিল নাকি ?'

'তা এখনও বোঝোনি ? সেদিন সকলের সাক্ষী নেওয়া হচ্ছিল। বাইরের ঘরে বনলক্ষ্মী জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। যেই তার সাক্ষী দেবার ডাক পড়ল ঠিক সেই সময় ভুজঙ্গধরবাবু ঘরে ঢুকলেন। বনলক্ষ্মীকে এক নজর দেখেই বুঝলেন সে তাড়াতাড়িতে দাঁত পরে আসতে ভুলে গেছে। যারা বাঁধানো দাঁত পরে, তাদের এরকম ভুল মাঝে মাঝে হয়। ভুজঙ্গধরবাবু দেখলেন,—সর্বনাশ। বনলক্ষ্মী যদি বিরল-দন্ত অবস্থায় আমার সামনে আসে, তখনি আমার সন্দেহ হবে ! তিনি ইশারা দিলেন—দন্তরুচি কৌমুদী। বনলক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পারল এবং তৎক্ষণাৎ নিজের কপালে চুড়ি-সুদ্ধ হাত ঠুকে দিলে। কাচের চুড়ি ভেঙে কপাল কেটে গেল, বনলক্ষ্মী অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বনলক্ষ্মীকে তুলে নিয়ে ভুজঙ্গধর তার কুঠিতে চললেন। বিজয় যখন তার সঙ্গ নিলে তখন তিনি তাকে বললেন—ডাক্তারখানা থেকে টিঞ্চার আয়োডিন ইত্যাদি নিয়ে আসতে। যতক্ষণে বিজয় টিঞ্চার আয়োডিন নিয়ে বনলক্ষ্মীর ঘরে গিয়ে পৌঁছল, ততক্ষণ বনলক্ষ্মী দাঁত পরে নিয়েছে।'—

দ্বারে টোকা পড়িল।

ইন্সপেক্টর বরাট এবং বিজয়। বিজয়ের ভাবভঙ্গী ভিজা বিড়ালের মত। বরাট চেয়ারে বসিয়া দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু, চা খাওয়ান। কাল সমস্ত রাত ঘুমুতে পারিনি। তার ওপর সকাল হতে না হতে বিজয়বাবু এসে উপস্থিত, উনিও ঘুমোননি।'

পুঁটিরামকে চায়ের হুকুম দেওয়া হইল। বরাট বলিল,—'ব্যাপারটা সবই জানি, তবু মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে ফাঁক রয়েছে। আপনি বলুন—আমরা শুনব।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বিজয়বাবু, আপনিও শুনবেন? গল্পটা আপানার পক্ষে খুব গৌরবজনক নয়।'

বিজয় ম্রিয়মাণ স্বরে বলিল,—'শুনব।'

'বেশ, তাহলে বলছি।' অতিথিদের সিগারেটের টিন বাড়াইয়া দিয়া ব্যোমকেশ আরম্ভ করিল,—'যা বলব তাকে আপনারা গল্প বলেই মনে করবেন, কারণ তার মধ্যে খানিকটা অনুমান, খানিকটা কল্পনা আছে। গল্পের নায়ক নায়িকা অবশ্য ভুজঙ্গধর ডাক্তার আর নৃত্যকালী।

'ভুজঙ্গধর আর নৃত্যকালী স্বামী-স্ত্রী। বাঘ আর বাঘিনী যেমন পরস্পরকে ভালবাসে, কিন্তু বনের অন্য জন্তুদের ভালবাসে না, ওরাও ছিল তেমনি সমাজবিরোধী, জন্মদুষ্ট অপরাধী। পরস্পরের মধ্যে ওরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সন্ধান পেয়েছিল। ওদের ভালবাসা ছিল যেমন গাঢ় তেমনি তীব্র। বাঘ আর বাঘিনীর ভালবাসা।

'লন্ডনের একটি রেজিস্ট্রি অফিসে ওদের বিয়ে হয়। ডাক্তার তখন প্ল্যাস্টিক সার্জারি শিখতে বিলেত গিয়েছিল, নৃত্যকালী বোধহয় গিয়েছিল কোনও নৃত্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে। দু'জনের দেখা হল, রতনে রতন চিনে নিলে। ওদের প্রেমের মূল ভিত্তি বোধহয় ওদের অভিনয় এবং সঙ্গীতের প্রতিভা। দু'জনেই অসামান্য আর্টিস্ট; সেতারে এমন হাত পাকিয়েছিল যে বাজনা শুনে ধরা যেত না কে বাজাচ্ছে, বড় বড় সমজদারেরা ধরতে পারত না।

'দু'জনে মিলে ওরা কত নীতিগর্হিত কাজ করেছিল তার হিসেব আমার জানা নেই—স্টিলের আলমারিতে যে ডায়েরিগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো ভাল করে পড়লে হয়তো সন্ধান পাওয়া যাবে—কিন্তু ডাক্তারের বৈধ এবং অবৈধ ডাক্তারি থেকে বেশ আয় হচ্ছিল; অন্তত উনিশ নম্বর বাড়িটা কেনবার মত টাকা তারা সংগ্রহ করেছিল।

'কিন্তু ও-ধাতুর লোক অল্পে সন্তুষ্ট থাকে না, অপরাধ করার দিকে ওদের একটা অহেতুক প্রবণতা আছে। বছর চারেক আগে ডাক্তার ধরা পড়ল, তার নাম কাটা গেল। ডাক্তার কলকাতার পরিচিত পরিবেশ থেকে ডুব মেরে গোলাপ কলোনীতে গিয়ে বাসা বাঁধল। নিজের সত্যিকার পরিচয় গোপন করল না। কলোনীতে একজন ডাক্তার থাকলে ভাল হয়, তা হোক নাম-কাটা। নিশানাথবাবু তাকে রেখে দিলেন।

'নৃত্যকালী কলকাতায় রয়ে গেল। কোথায় থাকত জানি না, সম্ভবত ১৯ নম্বরে। বাড়ির ভাড়া আদায় করত, তাতেই চালাত। ডাক্তার মাসে একবার দু'বার যেত; হয়তো অবৈধ অপারেশন করত।

'নৃত্যকালী সতীসাধ্বী একনিষ্ঠ স্ত্রীলোক ছিল। কিন্তু নিজের রূপ-যৌবন ছলাকলার ফাঁদ পেতে শিকার ধরা সম্বন্ধে তার মনে কোনও সঙ্কোচ ছিল না। ডাক্তারেরও অগাধ বিশ্বাস ছিল স্ত্রীর ওপর, সে জানত নৃত্যকালী চিরদিনের জন্য তারই, কখনও আর কারুর হতে পারে না।

'বছর আড়াই আগে ওরা মতলব করল নৃত্যকালী সিনেমায় যোগ দেবে। সিনেমায় টাকা আছে, টাকাওয়ালা লোকও আছে। নৃত্যকালী সিনেমায় ঢুকল। তার অভিনয় দেখে সকলে মুগ্ধ। নৃত্যকালী যদি সিধে পথে চলত, তাহলে সিনেমা থেকে অনেক পয়সা রোজগার করতে পারত। কিন্তু অবৈধ উপায়ে টাকা মারবার একটা সুযোগ যখন হাতের কাছে এসে গেল তখন নৃত্যকালী লোভ সামলাতে পারল না।

'মুরারি দত্ত অতি সাধারণ লম্পট, কিন্তু সে জহরতের দোকানের মালিক। ডাক্তার আর নৃত্যকালী মতলব ঠিক করল। ডাক্তার নিকোটিন তৈরি করল। তারপর নির্দিষ্ট রাত্রে মুরারি দত্তর মৃত্যু হল; তার দোকান থেকে হীরের নেকলেস অদৃশ্য হয়ে গেল।

'প্রথমটা পুলিস জানতে পারেনি সে-রাত্রে মুরারির ঘরে কে এসেছিল। তারপর রমেনবাবু ফাঁস করে দিলেন। নৃত্যকালীর নামে ওয়ারেন্ট বেরুল।

'নৃত্যকালীর আসল চেহারার ফটোগ্রাফ ছিল না বটে, কিন্তু সিনেমা স্টুডিওর সকলেই তাকে দেখেছিল। কোথায় কার চোখে পড়ে যাবে ঠিক নেই, নৃত্যকালীর বাইরে বেরুনো বন্ধ হল। কিন্তু এভাবে তো সারা জীবন চলে না। ডাক্তার নৃত্যকালীর মুখের ওপর প্ল্যাস্টিক অপারেশন করল। কিন্তু শুধু সার্জারি যথেষ্ট নয়, দাঁত দেখে অনেক সময় মানুষ চেনা যায়। নৃত্যকালীর দুটো দাঁত তুলিয়ে ফেলে নকল দাঁত পরিয়ে দেওয়া হল। তার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল। তখন কার সাধ্য তাকে চেনে।

'তারপর ওরা ঠিক করল নৃত্যকালীরও কলোনীতে থাকা দরকার। স্বামী-স্ত্রীর এক জায়গায় থাকা হবে, তাছাড়া টোপ গেলবার মত মাছও এখানে আছে।

'চায়ের দোকানে বিজয়বাবুর সঙ্গে নৃত্যকালীর দেখা হল ; তার করুণ কাহিনী শুনে বিজয়বাবু গলে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে নৃত্যকালী কলোনীতে গিয়ে বসল। ডাক্তারের সঙ্গে নৃত্যকালীর পরিচয় আছে কেউ জানল না, পরে যখন পরিচয় হল তখন পরিচয় ঝগড়ায় দাঁড়াল। সকলে জানল ডাক্তারের সঙ্গে নৃত্যকালীর আদায়-কাঁচকলায়।

'নিশানাথ এবং দময়ন্তীর জীবনে গুপ্তকথা ছিল। প্রথমে সে কথা জানতেন বিজয়বাবু আর ব্রজদাস বাবাজী। কিন্তু নেপালবাবু তাঁর মেয়ে মুকুলকে নিয়ে কলোনীতে আসবার পর বিজয়বাবু মুকুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। আবেগের মুখে তিনি একদিন পারিবারিক রহস্য মুকুলের কাছে প্রকাশ করে ফেলেলেন।—বিজয়বাবু, যদি ভুল করে থাকি, আমাকে সংশোধন করে দেবেন।'

বিজয় নতমুখে নির্বাক রহিল।

ব্যোমকেশ আবার বলিতে লাগিল—

'মুকুল ভাল মেয়ে। বাপ যতদিন চাকরি করতেন সে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়েছে, তারপর হঠাৎ ভাগ্য-বিপর্যয় হল ; কচি বয়সে তাকে অন্ন-চিন্তা করতে হল। সে সিনেমায় কাজ যোগাড় করবার চেষ্টা করল, কিন্তু হল না। তার গলার আওয়াজ বোধহয় 'মাইকে' ভাল আসে না। তিক্ত মন নিয়ে শেষ পর্যন্ত সে কলোনীতে এল এবং বারোয়ারী রাঁধুনীর কাজ করতে লাগল।

'তারপর জীবনে এল ক্ষণ-বসন্ত, বিজয়বাবুর ভালবাসা পেয়ে তার জীবনের রঙ বদলে গেল। বিয়ের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছে, হঠাৎ আবার ভাগ্য-বিপর্যয় হল। বনলক্ষ্মীকে দেখে বিজয়বাবু মুকুলের ভালবাসা ভুলে গেলেন। বনলক্ষ্মী মুকুলের মত রূপসী নয়, কিন্তু তার একটা দুর্নিবার চৌম্বক শক্তি ছিল। বিজয়বাবু সেই চুম্বকের আকর্ষণে পড়ে গেলেন। মুকুলের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

'প্রাণের জ্বালায় মুকুল নিশানাথবাবুর গুপ্তকথা বাপকে বলল। নেপালবাবুর উচ্চাশা ছিল তিনি কলোনীর কর্ণধার হবেন, তিনি তড়পাতে লাগলেন। কিন্তু হাজার হলেও অন্তরে তিনি ভদ্রলোক, blackmail-এর চিন্তা তাঁর মনেও এল না।

'এদিকে বিজয়বাবু বনলক্ষ্মীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তার অতীত জীবনের কলঙ্ক-কাহিনী জেনেও তাকে বিয়ে করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। নিশানাথ কিন্তু বেঁকে দাঁড়ালেন, কুলত্যাগিনীর সঙ্গে তিনি ভাইপোর বিয়ে দেবেন না। বংশে একটা কেলেঙ্কারিই যথেষ্ট।

'কাকার হুকুম ডিঙিয়ে বিয়ে করবার সাহস বিজয়বাবুর ছিল না, কাকা যদি তাড়িয়ে দেন তাহলে না খেয়ে মরতে হবে। দুই প্রেমিক প্রেমিকা মিলে পরামর্শ হল ; দোকান থেকে কিছু কিছু টাকা সরিয়ে বিজয়বাবু বনলক্ষ্মীর কাছে জমা করবেন, তারপর যথেষ্ট টাকা জমলে দু'জনে কলোনী ছেড়ে চলে যাবেন। ওদিকে রসিক দে'র সঙ্গে বনলক্ষ্মী ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা করেছিল। রসিক কপর্দকহীন যুবক, সেও বনলক্ষ্মীকে দেখে মজেছিল ; বনলক্ষ্মীর কলঙ্ক ছিল বলেই বোধহয় তার দিকে হাত বাড়াতে সাহস করেছিল। বনলক্ষ্মীও তাকে নিরাশ করেনি, ভরসা দিয়েছিল কিছু টাকা জমাতে পারলেই দু'জনে পালিয়ে গিয়ে কোথাও বাসা বাঁধবে। এইভাবে রসিক এবং বিজয়বাবুর টাকা ১৯ নম্বর মির্জা লেনের লোহার আলমারিতে জমা হচ্ছিল।

'তারপর একদিন বিজয়বাবু বনলক্ষ্মীর কাছেও পারিবারিক গুপ্তকথাটি বলে ফেললেন। ভাবপ্রবণ প্রকৃতির ঐ এক বিপদ, যখন আবেগ উপস্থিত হয় তখন অতিবড় গুপ্তকথাও চেপে রাখতে পারেন না।

'গুপ্তকথা জানতে পেরে বনলক্ষ্মী সেই রাত্রেই ডাক্তারকে গিয়ে বলল ; আনন্দে ডাক্তারের বুক নেচে উঠল। অতি যত্নে দু'জনে ফাঁদ পাতল। নিশানাথকে হুমকি দিতে গেলে বিপরীত ফল ফলতে পারে, কিন্তু দময়ন্তী স্ত্রীলোক, কলঙ্কের ভয় তাঁরই বেশি। সুতরাং তিনি blackmail-এর উপযুক্ত পাত্রী।

'দময়ন্তী দেবীর শোষণ শুরু হল ; আট মাস ধরে চলতে লাগল। কিন্তু শেষের দিকে নিশানাথবাবুর সন্দেহ হল, তিনি আমার কাছে এলেন।

'সুনয়না কলোনীতে আছে এ সন্দেহ নিশানাথের কেমন করে হয়েছিল তা আমি জানি না, অনুমান করাও কঠিন। মানুষের জীবনে অতর্কিতে অভাবিত ঘটনা ঘটে, তেমনি কোনও ঘটনার ফলে হয়তো নিশানাথের সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে গবেষণা নিষ্ফল।

'নিশানাথের নিমন্ত্রণ পেয়ে আমরা রমেন মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে কলোনীতে গেলাম। রমেনবাবুকে ডাক্তার চিনত না কিন্তু সুনয়না চিনত ; স্টুডিওতে অনেকবার দেখেছে, মুরারি দত্তর বন্ধু। তাই রমেনবাবুকে দেখে সুনয়না ভয় পেয়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না, সুনয়নার খোঁজেই আমরা কলোনীতে এসেছি।

'দাস-দম্পতি বড় দ্বিধায় পড়ল। এ অবস্থায় কী করা যেতে পারে ? বনলক্ষ্মী যদি কলোনী ছেড়ে পালায় তাহলে খুঁচিয়ে সন্দেহ জাগানো হবে, পুলিস বনলক্ষ্মীকে খুঁজতে আরম্ভ করবে। বনলক্ষ্মী যদি ধরা পড়ে, তার মুখে অপারেশনের সূক্ষ্ম চিহ্ন বিশেষজ্ঞের চোখে ধরা পড়ে যাবে, বনলক্ষ্মীই যে সুনয়না তা আর গোপন থাকবে না। তবে উপায় ?

'নিশানাথবাবু যত নষ্টের গোড়া, তিনিই ব্যোমকেশ বক্সীকে ডেকে এনেছেন। তাঁর যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় তাহলে সুনয়নার তল্লাস বন্ধ হয়ে যাবে, নিষ্কণ্টকে দময়ন্তী দেবীর রুধির শোষণ করা চলবে।

'কিন্তু নিশানাথবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু বলে প্রতিপন্ন হওয়া চাই। তাঁর ব্লাড্-প্রেসার আছে, ব্লাড্-প্রেসারের রুগী বেশির ভাগই হঠাৎ মরে—হার্টফেল হয় কিম্বা মাথার শিরা ছিঁড়ে যায়। সুতরাং কাজটা সাবধানে করতে পারলে কারুর সন্দেহ হবার কথা নয়।

'ভুজঙ্গধর ডাক্তার খুব সহজেই নিশানাথকে মারতে পারত। সে প্রায়ই নিশানাথের রক্ত-মোক্ষণ করে দিত। এখন রক্ত-মোক্ষণ ছুতোয় যদি একটু হাওয়া তাঁর ধমনীতে ঢুকিয়ে দিতে পারত, তাহলে তিন মিনিটের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হত। অ্যাড্রেনালিন ইন্‌জেকশন দিলেও একই ফল হত ; তাঁর পায়ে দড়ি বেঁধে কড়িকাঠে ঝোলাবার দরকার হত না। কিন্তু তাতে একটা বিপদ ছিল। ইন্‌জেকশন দিলে চামড়ার ওপর দাগ থাক না থাক, শিরার ওপর দাগ থেকে যায়, পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষায় ধরা পড়ে। নিশানাথের গায়ে ইন্‌জেকশনের চিহ্ন পাওয়া গেলে প্রথমেই সন্দেহ হত ডাক্তার ভুজঙ্গধরের ওপর। সুতরাং ভুজঙ্গধর সে রাস্তা দিয়ে গেল না ; অত্যন্ত স্থূল প্রথায় নিশানাথবাবুকে মারলে।

'ব্যবস্থা খুব ভাল করেছিল। বেনামী চিঠি পেয়ে বিজয়বাবু কলকাতায় এলেন। ওদিকে লাল সিং-এর চিঠি পেয়ে রাত্রি দশটার সময় দময়ন্তী পিছনের দরজা দিয়ে কাচ-ঘরে চলে গেলেন। রাস্তা সাফ, ডাক্তার সেতার বাজাচ্ছিল, বনলক্ষ্মীর হাতে সেতার দিয়ে নিশানাথের ঘরে ঢুকল। সম্ভবত নিশানাথ তখন জেগে ছিলেন। ডাক্তার আলো জ্বেলেই জানালা বন্ধ করে দিলে। তারপর—

'দুটো ভুল ডাক্তার করেছিল। কাজ শেষ করে জানালাটা খুলে দিতে ভুলে গিয়েছিল, আর তাড়াতাড়িতে মোজা জোড়া খুলে নিয়ে যায়নি। এ দুটো ভুল যদি সে না করত তাহলে নিশানাথবাবুর মৃত্যু অস্বাভাবিক বলে কারুর সন্দেহ হত না।

'পানুগোপাল কিছু দেখেছিল। কী দেখেছিল তা চিরদিনের জন্যে অজ্ঞাত থেকে যাবে। আমার বিশ্বাস সে বাইরে থেকে ডাক্তারকে জানালা বন্ধ করতে দেখেছিল। নিশানাথের মৃত্যুটা যতক্ষণ স্বাভাবিক মৃত্যু মনে হয়েছিল ততক্ষণ সে কিছু বলেনি, কিন্তু যখন বুঝতে পারল মৃত্যু স্বাভাবিক নয় তখন সে উত্তেজিত হয়ে যা দেখেছিল তা বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার কপাল খারাপ, সে কিছু বলতে পারল না। ডাক্তার বুঝলে পানু কিছু দেখেছে। সে আর দেরি করল না, পানুর অবর্তমানে তার কানের ওষুধে নিকোটিন মিশিয়ে রেখে এল।

'তারপর যা যা ঘটেছে সবই আপনাদের জানা, নতুন করে বলবার কিছু নেই।—কাল ডাক্তার আর বনলক্ষ্মীর আত্মহত্যা আপনাদের হয়তো আকস্মিক মনে হয়েছিল। আসলে ওরা তৈরি হয়ে এসেছিল।'

বরাট বলিল,—'কিন্তু সায়েনাইডের অ্যাম্পুল কখন মুখে দিলে জানতে পারিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'দুটো সায়েনাইডের অ্যাম্পুল ডাক্তারের মুখে ছিল, মুখে করেই এসেছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম তার কথা মাঝে মাঝে জড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তখন প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিনি। তারপর ডাক্তার যখন দেখল আর নিস্তার নেই, তখন সে উঠে বনলক্ষ্মীকে চুমো খেল। এ শুধু প্রণয়ীদের বিদায় চুম্বন নয়, মৃত্যু চুম্বন। চুমু খাবার সময় ডাক্তার একটা অ্যাম্পুল স্ত্রীর মুখে দিয়েছিল।'—

দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ব্যোমকেশই আবার কথা কহিল,—'যাক, এবার আপনারা দু'একটা খবর দিন। রসিকের কি ব্যবস্থা হল?'

বরাট বলিল,—'রসিকের ওপর থেকে বিজয়বাবু অভিযোগ তুলে নিয়েছেন। তাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

'ভাল। বিজয়বাবু, পরশু রাত্রে আন্দাজ এগারোটার সময় যে-মেয়েটি আপনার ঘরে গিয়েছিল সে কে? মুকুল?'

বিজয় চমকিয়া মুখ তুলিল, লজ্জালাঞ্ছিত মুখে বলিল,—'হ্যাঁ।'

'তাহলে বনলক্ষ্মী গিয়েছিল স্বামীর কাছে। ডাক্তার সেতার বাজিয়ে তাকে ডেকেছিল। মুকুল আপনার কাছে গিয়েছিল কেন? আপনি ওদের কলোনী থেকে চলে যাবার হুকুম দিয়েছিলেন, তাই সে আপনার কৃপা ভিক্ষা করতে গিয়েছিল?'

বিজয় অধোবদনে রহিল।

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—'বিজয়বাবু, আশা করি আপনি মুকুলকে বিয়ে করবেন। সে আপনাকে ভালবাসে। এত ভালবাসা উপেক্ষার বস্তু নয়।'

বিজয় মৌন রহিল, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। মুকুলের সঙ্গে হয়তো ইতিমধ্যেই পুনর্মিলন হইয়া গিয়াছে।

বিদায়কালে বিজয় আমতা-আমতা করিয়া বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন তা শোধ দেবার নয়। কিন্তু কাকিমা বলেছেন আপনাকে আমাদের কাছ থেকে একটা উপহার নিতে হবে।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল,—'কি উপহার?'

বিজয় বলিল,—'কাকার পাঁচ হাজার টাকার জীবনবীমা ছিল, দু'চার দিনের মধ্যেই কাকিমা সে টাকা পাবেন। ওটা আপনাকে নিতে হবে।'

ব্যোমকেশ আমার পানে কটাক্ষপাত করিয়া হাসিল। বলিল,—'বেশ, নেব। আপনার কাকিমাকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাবেন।'

প্রশ্ন করিলাম,—'ছাগল কলোনীর প্রস্তাব কি তাহলে মুলতুবি রইল?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তা বলা যায় না। এই মূলধন দিয়েই ছাগল কলোনীর পত্তন হতে পারে। বিজয়বাবু প্রস্তুত থাকবেন, গোলাপ কলোনীর পাশে হয়তো শীগ্‌গির ছাগল কলোনীর আবির্ভাব হবে।'

আদিম রিপু

এক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাংলা দেশে, বিশেষত কলিকাতা শহরে, মানুষের জীবনের মূল্য খুবই কমিয়া গিয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমরা জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তারপর জিন্না সাহেবের সম্মুখ সমর যখন আরম্ভ হইল, তখন আমরা মৃত্যুদেবতাকে একেবারে ভালবাসিয়া ফেলিলাম। জাতি হিসাবে আমরা যে টিকিয়া আছি, সে কেবল মৃত্যুর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করিতে পারি বলিয়াই। বাঘ ও সাপের সঙ্গে আমরা আবহমানকাল বাস করিতেছি, আমাদের মারে কে ?

সম্মুখ সমরের প্রথম অনলোদ্‌গার প্রশমিত হইয়াছে ; কিন্তু তলে তলে অঙ্গার জ্বলিতেছে, এখানে ওখানে হঠাৎ দপ করিয়া জ্বলিয়া আবার ভস্মের অন্তরালে লুকাইতেছে। কলিকাতার সাধারণ জীবনযাত্রায় কিন্তু কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। রাস্তায় ট্রাম-বাস তেমনি চলিতেছে, মানুষের কর্মতৎপরতার বিরাম নাই। দুই সম্প্রদায়ের সীমান্ত ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে হৈ হৈ দুমদাম শব্দ ওঠে, চকিতে দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়, রাস্তায় দুই চারিটা রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। সুরাবর্দি সাহেবের পুলিস আসিয়া হিন্দুদের শাসন করে, মৃতদেহের সংখ্যা দুই চারিটা বাড়িয়া যায়। কোথা হইতে মোটর ভ্যান আসিয়া মৃতদেহগুলিকে কুড়াইয়া লইয়া অন্তর্ধান করে। তারপর আবার নগরীর জীবনযাত্রা পূর্ববৎ চলিতে থাকে।

ব্যোমকেশ ও আমি কলিকাতাতেই ছিলাম। আমাদের হ্যারিসন রোডের বাসাটা যদিও ঠিক সমর সীমানার উপর পড়ে না, তবু যথাসাধ্য সাবধানে ছিলাম। ভাগ্যক্রমে কয়েক মাস আগে ব্যোমকেশের শ্যালক সুকুমার খোকাকে ও সত্যবতীকে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল, তাই সম্মুখ সমর যখন আরম্ভ হইল তখন ব্যোমকেশ 'তার' করিয়া তাহাদের কলিকাতায় ফিরিতে বারণ করিয়া দিল। তদবধি তাহারা পাটনায় আছে। ইতিমধ্যে সত্যবতীর প্রবল পত্রাঘাতে আমরা বার দুই পাটনা ঘুরিয়া আসিয়াছি ; কারণ আমরা যে বাঁচিয়া আছি, তাহা মাঝে মাঝে স্বচক্ষে না দেখিয়া সত্যবতী বিশ্বাস করিতে চাহে নাই।

যাহোক, খোকা ও সত্যবতী নিরাপদে আছে, ইহাতেই আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় নিজের প্রাণ রক্ষার চেয়ে প্রিয়জনের নিরাপত্তাই অধিক বাঞ্ছনীয় হইয়া ওঠে।

যেদিনের ঘটনা লইয়া এই কাহিনীর সূত্রপাত সেদিনটা ছিল দুর্গাপূজা এবং কালীপূজার মাঝামাঝি একটা দিন। দুর্গাপূজা অন্যান্য বারের মত যথারীতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে এবং কালীপূজাও যথাবিধি সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। আমরা দু'জনে সকালবেলা খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিলাম, এমন সময় বাঁটুল সর্দার আসিল। তাহাকে সেলামী দিলাম। বাঁটুল এই এলাকার গুণ্ডার সর্দার ; বেঁটে নিটোল চেহারা, তৈলাক্ত ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা। সম্মুখ সমর আরম্ভ হইবার পর হইতে বাঁটুলের প্রতাপ বাড়িয়াছে, পাড়ার সজ্জনদের গুণ্ডার হাত হইতে রক্ষা করিবার ওজুহাতে সে সকলের নিকট সেলামী আদায় করে। সেলামী না দিলে হয়তো কোনদিন বাঁটুলের হাতেই প্রাণটা যাইবে এই ভয়ে সকলেই সেলামী দিত।

সেলামীর জুলুম সত্ত্বেও ব্যোমকেশের সহিত বাঁটুলের বিশেষ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল।

আদায়তসিল উপলক্ষে বাঁটুল আসিয়া উপস্থিত হইলে ব্যোমকেশ তাহাকে চা সিগারেট দিত, তাহার সহিত গল্প জমাইত ; শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষের কূটনীতি সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যাইত। বাঁটুল এই ফাঁকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসঙ্গ তুলিত। যুদ্ধের পর মার্কিন সৈনিকেরা অনেক আগ্নেয়াস্ত্র জলের দরে বিক্রি করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, বাঁটুল সেই অস্ত্র কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে তাহা আমাদের বিক্রি করিবার চেষ্টা করিত। বলিত, 'একটা রাইফেল কিনে ঘরে রাখুন কর্তা। আমরা তো আর সব সময় সব দিকে নজর রাখতে পারি না। ডামাডোলের সময় হাতে হাতিয়ার থাকা ভাল।'

আমি বলিতাম, 'না, বাঁটুল, রাইফেল দরকার নেই। অত বড় জিনিস লুকিয়ে রাখা যাবে না, কোন্ দিন পুলিস খবর পাবে আর হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে একটা পিস্তল কি রিভলবার যদি যোগাড় করতে পার—'

বাঁটুল বলিত, 'পিস্তল যোগাড় করাই শক্ত বাবু। আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব—'

বাঁটুল মাসে একবার আসিত।

সেদিন যথারীতি সেলামী লইয়া বাঁটুল আমাদের অভয় প্রদানপূর্বক প্রস্থান করিলে আমরা কিছুক্ষণ ম্রিয়মাণভাবে সাময়িক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিলাম। এভাবে আর কতদিন চলিবে? মাথার উপর খাঁড়া ঝুলাইয়া কতকাল বসিয়া থাকা যায়? স্বাধীনতা হয়তো আসিতেছে, কিন্তু তাহা ভোগ করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিব কি? সম্মুখ সমরে যদি বা প্রাণ বাঁচে, কাঁকর ও তেঁতুল বিচির গুঁড়া খাইয়া কত দিন বাঁচিব? ব্যোমকেশের হাতে কাজকর্ম কোনও কালেই বেশি থাকে না, এখন একেবারে বন্ধ হইয়াছে। যেখানে প্রকাশ্য হত্যার পাইকারি কারবার চলিতেছে, সেখানে ব্যোমকেশের রহস্যভেদী বুদ্ধি কাহার কাজে লাগিবে?

আমি বলিলাম, 'ভারতীরে ছেড়ে ধর এইবেলা লক্ষ্মীর উপাসনা।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ রাত দুপুরে ছোরা বগলে নিয়ে বেরোও, যদি দু'চারটে কালাবাজারের মক্কেলকে সাবাড় করতে পার, তাহলে আর ভাবতে হবে না। যে সময়-কাল পড়েছে, বাঁটুল সর্দারই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'কথাটা মন্দ বলোনি, যুগধর্মই ধর্ম। কিন্তু কি জানো, ও জিনিসটা রক্তে থাকা চাই। খুনই বল আর কালাবাজারই বল, পূর্বপুরুষদের রক্তের জোর না থাকলে হয় না। আমার বাবা ছিলেন স্কুল মাস্টার, স্কুলে অঙ্ক শেখাতেন আর বাড়িতে সাংখ্য পড়তেন। মা ছিলেন বৈষ্ণব বংশের মেয়ে, নন্দগোপাল নিয়েই থাকতেন। সুতরাং ওসব আমার কর্ম নয়।'

ব্যোমকেশের বাল্য ইতিহাস আমার জানা ছিল। তাহার যখন সতেরো বছর বয়স, তখন তাহার পিতার যক্ষ্মা হয়, মাতাও সেই রোগে মারা যান। আত্মীয়স্বজন কেহ উঁকি মারেন নাই। তারপর ব্যোমকেশ জলপানির জোরে বিশ্ববিদ্যা সমুদ্র পার হইয়াছে, নিজের চেষ্টায় নূতন জীবন-পথ গড়িয়া তুলিয়াছে। আত্মীয়স্বজন এখনও হয়তো আছেন, কিন্তু ব্যোমকেশ তাঁহাদের খোঁজ রাখে না।

কিছুক্ষণ বিমনাভাবে কাটিয়া গেল। আজ সত্যবতীর একখানা চিঠি আসিতে পারে, মনে মনে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।

খট্ খট্ খট্ খট্ কড়া নড়িয়া উঠিল। আমি উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিলাম।

ডাকপিওন নয়। তৎপরিবর্তে যিনি দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, বেশবাস দেখিয়া তাঁহাকে স্ত্রীলোকই বলিতে হয়। কিন্তু সে কী স্ত্রীলোক! পাঁচ হাত লম্বা, তদনুপাতে চওড়া, শালপ্রাংশু আকৃতি ; পালিশ করা আবলুশ কাঠের মত গায়ের রঙ ; ঘটোধ্নী, নিবিড়নিতম্বিনী, স্পষ্ট একজোড়া গোঁফ আছে ; বয়স পঞ্চাশের ওপারে। তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন ; মনে হইল

হারমোনিয়ামের ঢাকনা খুলিয়া গেল।

তিনি রামায়ণ মহাভারত হইতে বিনির্গতা কোনও অতি-মানবী কিনা ভাবিতেছি। হারমোনিয়াম হইতে খাদের গভীর আওয়াজ বাহির হইল, 'আপনি কি ব্যোমকেশবাবু?'

আমি অতি দ্রুত মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিলাম। ব্যোমকেশের সহিত মহিলাটির কি প্রয়োজন জানি না, কিন্তু আমি যে ব্যোমকেশ নই তাহা অকপটে ব্যক্ত করাই সমীচীন। ব্যোমকেশ ঘরের ভিতর হইতে মহিলাটিকে দেখিতে পায় নাই, আমার অবস্থা দেখিয়া উঠিয়া আসিল। সেও অভ্যাগতকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য থতমত খাইয়া গেল, তারপর সৎসাহস দেখাইয়া বলিল, 'আমি ব্যোমকেশ।'

মহিলাটি আবার হারমোনিয়ামের ঢাকনা খুলিলেন, বলিলেন, 'নমস্কার। আমার নাম মিস্ ননীবালা রায়। আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।'

'আসুন।'

খট্ খট্ জুতার শব্দ করিয়া মিস্ ননীবালা রায় ঘরে প্রবেশ করিলেন; ব্যোমকেশ তাঁহাকে চেয়ারে বসাইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এরূপ আকৃতি লইয়া ইনি কখনই ঘরের ঘরণী হইতে পারেন না, স্বামীপুত্র ঘরকন্না গৃহস্থালী ইঁহার জন্য নয়। বিশেষ নামের অগ্রে 'মিস্' খেতাবটি দাম্পত্য সৌভাগ্যের বিপরীত সাক্ষ্য দিতেছে। তবে ইনি কি? জেনানা ফাটকের জমাদারণী? উহুঁ, অতটা নয়। শিক্ষয়িত্রী? বোধ হয় না। লেডি ডাক্তার? হইতেও পারে—

পরক্ষণেই ননীবালা নিজের পরিচয় দিলেন। দেখিলাম বেশি ভুল করি নাই। তিনি বলিলেন, 'আমি পাটনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ধাত্রী ছিলাম, এখন রিটায়ার করে কলকাতায় আছি। একজনের কাছে আপনার নাম শুনলাম, ঠিকানাও পেলাম। তাই এসেছি।'

ব্যোমকেশ গম্ভীরমুখে বলিল, 'কি দরকার বলুন।'

মিস্ ননীবালার চেহারা যেরূপ জবরদস্ত, আচার আচরণ কিন্তু সেরূপ নয়। তাঁহার হাতে একটা কালো রঙের হ্যান্ডব্যাগ ছিল, তিনি সেটা খুলিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন, 'আমি গরীব মানুষ, ব্যোমকেশবাবু। টাকাকড়ি বেশি আপনাকে দিতে পারব না—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'টাকাকড়ির কথা পরে হবে। কি দরকার আগে বলুন।'

ননীবালা ব্যাগ বন্ধ করিলেন, তারপর সহসা কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'আমার ছেলের বড় বিপদ, তাকে আপনি রক্ষে করুন, ব্যোমকেশবাবু—।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনার—ছেলে!'

ননীবালা একটু অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন, 'আমার ছেলে—মানে—আমি মানুষ করেছি। অনাদিবাবু তাকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছেন—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বড় প্যাঁচালো ব্যাপার দেখছি। আপনি গোড়া থেকে সব কথা বলুন।'

ননীবালা তখন নিজের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গল্প বলার শৈলী ভাল নয়, কখনও দশ বছর পিছাইয়া কখনও বিশ বছর আগাইয়া বহু অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার জট ছাড়াইলে এইরূপ দাঁড়ায়—

বাইশ তেইশ বছর আগে মিস্ ননীবালা রায় পাটনা হাসপাতালের ধাত্রী ছিলেন। একদিন একটি যুবতী হাসপাতালে ভর্তি হইল; অবস্থা খুবই খারাপ, প্লুরিসির সহিত নানা উপসর্গ, তার উপর পূর্ণগর্ভা। যে পুরুষটি তাহাকে আনিয়াছিল, সে ভর্তি করিয়া দিয়াই অদৃশ্য হইল।

যুবতী হিন্দু নয়, বোধ হয় আদিম জাতীয় দেশী খ্রীষ্টান। দুই দিন পরে সে একটি পুত্র প্রসব করিয়া মারা গেল। পুরুষটা সেই যে উধাও হইয়াছিল, আর ফিরিয়া আসিল না।

এইরূপ অবস্থায় শিশুর লালন-পালনের ব্যবস্থা রাজ সরকার করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ননীবালা শিশুটির ভার লইলেন। ননীবালা অবিবাহিতা, সন্তানাদি নাই, শিশুটি বড় হইয়া তাঁহার পুত্রের স্থান অধিকার করিবে এই আশায় তিনি শিশুকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। শিশুর নাম হইল প্রভাত রায়।

প্রভাতের বয়স তখন তিন-চার, তখন ননীবালা হঠাৎ একটি ইন্সিওর চিঠি পাইলেন। চিঠির সঙ্গে দুই শত টাকার নোট। চিঠিতে লেখা আছে, আমি জানিতে পারিয়াছি আমার ছেলে তোমার কাছে আছে। তাহাকে পালন করিও। উপস্থিত কিছু টাকা পাঠাইলাম, সুবিধা হইলে আরও পাঠাইব। —চিঠিতে নাম দস্তখত নাই।

তারপর প্রভাতের বাপের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লোকটা সম্ভবত মরিয়া গিয়াছিল। ননীবালা বিশেষ দুঃখিত হইলেন না। বাপ কোনও দিন আসিয়া ছেলেকে লইয়া যাইবে এ আশঙ্কা তাঁহার ছিল। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

প্রভাত বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। ননীবালা নিজের ডিউটি লইয়া থাকেন, ছেলের দেখাশুনা ভাল করিতে পারেন না ; প্রভাত পাড়ার হিন্দুস্থানী ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায় খেলা করিয়া বেড়ায়। তাহার লেখাপড়া হইল না।

পাড়ায় এক মুসলমান দপ্তরীর দোকান ছিল। প্রভাতের যখন ষোল-সতেরো বছর বয়স, তখন সে দপ্তরীর দোকানে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। প্রভাত লেখাপড়া শেখে নাই বটে, কিন্তু বয়াটে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গেল না। মন দিয়া নিজের কাজ করিত, ধাত্রীমাতাকে গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

এইভাবে তিন চার বছর কাটিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে অনাদি হালদার নামে এক ভদ্রলোক পাটনায় আসিলেন। অনাদিবাবু ধনী ব্যবসাদার। তাঁহার ব্যবসায়ের বহু খাতা বহি বাঁধাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তিনি দপ্তরীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দপ্তরী প্রভাতকে তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দিল। অনেক খাতা পত্র, দপ্তরীর দোকানে সব বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক নয়। প্রভাত নিজের যন্ত্রপাতি লইয়া অনাদিবাবুর বাসায় আসিল এবং কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহার খাতা বহির মলাট বাঁধিয়া দিল।

অনাদিবাবু অকৃতদার ছিলেন। প্রভাতকে দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার ভাল লাগিয়া গিয়াছিল, তিনি একদিন ননীবালার বাসায় আসিয়া প্রস্তাব করিলেন তিনি প্রভাতকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে চান।

এতবড় ধনী ব্যক্তির পোষ্যপুত্র হওয়া ভাগ্যের কথা ; কিন্তু ননীবালা এক কথায় প্রভাতকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। প্রভাতও মাকে ছাড়িতে চাহিল না। তখন রফা হইল, প্রভাতের সঙ্গে ননীবালাও অনাদিবাবুর সংসারে থাকিবেন, নারীবর্জিত সংসারে ননীবালাই সংসার পরিচালনা করিবেন।

ননীবালা হাসপাতালের চাকরি হইতে অবসর লইলেন। অনাদি হালদারও কর্মজীবন হইতে প্রায় অবসর লইয়াছিলেন, তিনজনে কলিকাতায় আসিলেন। সে আজ প্রায় দেড় বছর আগেকার কথা। সেই অবধি তাঁহারা বহুবাজারের একটি ভাড়াটে বাড়ির দ্বিতলে বাস করিতেছেন। যুদ্ধের বাজারে ভাল বাসা পাওয়া যায় না। কিন্তু অনাদিবাবু তাঁহার বাসার পাশেই একটি পুরাতন বাড়ি কিনিয়াছেন এবং তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন বাড়ি তৈরি করাইতেছেন। বাড়ি তৈরি হইলেই তাঁহার নূতন বাড়িতে উঠিয়া যাইবেন।

অনাদিবাবুর এক বড় ভাই ছিলেন, তিনি কলিকাতায় সাবেক বাড়িতে বাস করিতেন। ভায়ের সহিত অনাদিবাবুর সদ্ভাব ছিল না, কোনও সম্পর্কই ছিল না। ভাই প্রায় দশ বছর পূর্বে মারা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দুই পুত্র আছে—নিমাই ও নিতাই। অনাদিবাবু কলিকাতায় আসিয়া বাসা লইলে তাহারা কোথা হইতে সন্ধান পাইল এবং তাঁহার কাছে যাতায়াত শুরু করিল।

ননীবালার মতে নিমাই ও নিতাই পাকা শয়তান, মিটমিটে ডান, ছেলে খাওয়ার রাক্ষস। কাকা পোষ্যপুত্র লইলে কাকার অতুল সম্পত্তি বেহাত হইয়া যাইবে, তাই তাহারা কাকাকে বশ করিয়া দত্তক গ্রহণ নাকচ করাইতে চায়। অনাদিবাবু ভ্রাতুষ্পুত্রদের মতলব বুঝিয়া কিছুদিন আমোদ অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে তিনি উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। মাস কয়েক আগে তিনি ভাইপোদের বলিয়া দিলেন তাহারা যেন তাঁহার গৃহে পদার্পণ না করে।

নিমাই ও নিতাই কাকার বাসায় আসা বন্ধ করিল বটে, কিন্তু আশা ছাড়িল না। অনাদিবাবু প্রভাতকে একটি বইয়ের দোকান করিয়া দিয়াছিলেন ; কলেজ স্ট্রীটের এক কোণে ছোট্ট একটি দোকান। প্রভাত লেখাপড়া শেখে নাই বটে, কিন্তু সে বই ভালবাসে ; এই দোকানটি তাহার প্রাণ। সে প্রত্যহ দোকানে যায়, নিজের হাতে বই বিক্রি করে। নিতাই ও নিমাই তাহার দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করিল। বই কিনিত না, কেবল চক্ষু মেলিয়া প্রভাতের পানে চাহিয়া থাকিত ; তারপর নীরবে দোকান হইতে বাহির হইয়া যাইত।

তাহাদের চোখের দৃষ্টি বাঘের দৃষ্টির মত ভয়ানক। তাহারা মুখে কিছু বলিত না, কিন্তু তাহাদের মনের অভিপ্রায় প্রভাতের জানিতে বাকী থাকিত না। প্রভাত ভালমানুষ ছেলে, সে ভয় পাইয়া ননীবালাকে আসিয়া বলিল ; ননীবালা অনাদিবাবুকে বলিলেন। অনাদিবাবু এক গুর্খা নিয়োগ করিলেন, যতক্ষণ দোকান খোলা থাকিবে ততক্ষণ গুর্খা কুকরি লইয়া দোকান পাহারা দিবে।

ভ্রাতুষ্পুত্র যুগলের দোকানে আসা বন্ধ হইল। কিন্তু তবু প্রভাত ও ননীবালার ভয় দূর হইল না। সর্বদাই যেন দু'জোড়া অদৃশ্য চক্ষু তাঁহাদের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে, তাঁহাদের গতিবিধি অনুসরণ করিতেছে।

তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার লইয়া বাড়িতে অশান্তি দেখা দিয়াছে। একটি মেয়েকে দেখিয়া প্রভাতের ভাল লাগিয়াছিল ; মেয়েটি পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু একটি পরিবারের মেয়ে, খুব ভাল গান বাজনা জানে, দেখিতে সুন্দরী। কোন এক সভায় প্রভাত মেয়েটিকে গান গাহিতে শুনিয়াছিল এবং তাহার কথা ননীবালাকে বলিয়াছিল। অনাদিবাবু প্রভাতের জন্য পাত্রী খুঁজিতেছিলেন, ননীবালার মুখে এই মেয়েটির কথা শুনিয়া বলিলেন, তিনি নিজে মেয়ে দেখিয়া আসিবেন এবং পছন্দ হইলে বিবাহ দিবেন।

অনাদিবাবু মেয়ে দেখিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, এ মেয়ের সঙ্গে প্রভাতের বিবাহ হইতে পারে না। তিনি কোনও কারণ প্রদর্শন করিলেন না, কিন্তু ননীবালার বিশ্বাস এ ব্যাপারে নিমাই ও নিতাইয়ের হাত আছে। সে যাই হোক, ইহার পর হইতে ভিতরে ভিতরে যেন একটা নূতন গণ্ডগোল শুরু হইয়াছে। ননীবালা ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। বর্তমান ডামাডোলের সময় প্রভাতের যদি কোনও দুর্ঘটনা হয় ? যদি গুণ্ডা ছুরি মারে ? নিমাই ও নিতাইয়ের অসাধ্য কাজ নাই। এখন ব্যোমকেশবাবু কোনও প্রকারে প্রভাতের জীবনরক্ষা করুন।

দুই

ব্যোমকেশ চোখ বুজিয়া ননীবালার অসংবদ্ধ বাক্যবহুল উপাখ্যান শুনিতেছিল, উপাখ্যান শেষ হইলে চোখ মেলিল। বিরক্তি চাপিয়া যথাসম্ভব শিষ্টভাবে বলিল, 'মিস্ রায়, এ ধরনের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি ? আপনার সন্দেহ যদি সত্যিও হয়, আমি তো আপনার ছেলের পেছনে সশস্ত্র প্রহরীর মত ঘুরে বেড়াতে পারি না। আমার মনে হয় এ অবস্থায় পুলিসের কাছে যাওয়াই ভালো।'

ননীবালা বলিলেন, 'পুলিসের কথা অনাদিবাবুকে বলেছিলুম, তিনি ভীষণ রেগে উঠলেন ; বললেন—এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির দরকার নেই, তোমাদের যদি এতই প্রাণের ভয় হয়ে থাকে পাটনায় ফিরে যাও।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আর কি করা যেতে পারে আপনিই বলুন।'

ননীবালার স্বর কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল, 'আমি কি বলব, ব্যোমকেশবাবু। আপনি একটা উপায় করুন। প্রভাত ছাড়া আমার আর কেউ নেই—আমি অবলা স্ত্রীলোক—' বলিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন।

ননীবালার চেহারা দেখিয়া যদিও কেহই তাঁহাকে অবলা বলিয়া সন্দেহ করিবে না, তবু তাঁহার

হৃদয়টি যে অসহায়া রমণীর হৃদয় তাহা স্বীকার করিতে হয়। পালিত পুত্রকে তিনি গর্ভের সন্তানের মতই ভালবাসেন এবং তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অতিমাত্রায় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। আশঙ্কা হয়তো অমূলক, কিন্তু তবু তাহা উপেক্ষা করা যায় না।

কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে ননীবালার অশ্রু-বিসর্জন নিরীক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলিল, 'ভাইপো দুটো থাকে কোথায় ?'

ননীবালা আঁচল হইতে আশান্বিত চোখ বাহির করিলেন, 'তারা নেবুতলায় থাকে। আপনি কি— ?'

'ঠিকানা কি ? কত নম্বর ?'

'তা তো আমি জানি না, প্রভাত জানে। আপনি কি তাদের কাছে যাবেন, ব্যোমকেশবাবু ? যদি আপনি ওদের খুব করে ধমকে দেন তাহলে ওরা ভয় পাবে—'

'আমি তাদের ধমকাতে গেলে তারাই হয়তো উল্টে আমাকে ধমকে দেবে। আমি তাদের একবার দেখব। দেখলে আন্দাজ করতে পারব তাদের মনে কিছু আছে কিনা। তাদের ঠিকানা প্রভাত জানে ? প্রভাতের ঠিকানা, অর্থাৎ আপনাদের বাড়ির ঠিকানা কি ?'

'বাড়ির নম্বর ১৭২/২, বৌবাজার স্ট্রীট। কিন্তু সেখানে—বাড়িতে আপনি না গেলেই ভাল হয়। অনাদিবাবু—'

'অনাদিবাবু পছন্দ না করতে পারেন। বেশ, তাহলে। প্রভাতের দোকানের ঠিকানা বলুন।'

'প্রভাতের দোকান—ঠিকানা জানি না—কিন্তু নাম জীবন-প্রভাত। ওই যে গোলদীঘির কাছে, দোরের ওপর মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো আছে—'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্লান্ত শুষ্ক স্বরে বলিল, 'বুঝেছি। আপনি এখন আসুন তাহলে। যদি কিছু খবর থাকে জানতে পারবেন।'

ননীবালা বোধ করি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী !'

সেদিন সায়ংকালে ব্যোমকেশ একটি শারদীয়া পত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, হঠাৎ পত্রিকা ফেলিয়া বলিল, 'চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।'

সম্মুখ সমর আরম্ভ হইবার পর হইতে আমরা সন্ধ্যার পর বাড়ির বাহির হওয়া বন্ধ করিয়াছিলাম, নেহাৎ দায়ে না ঠেকিলে বাহির হইতাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় বেড়াতে যাবে ?'

সে বলিল, 'জীবন-প্রভাতের সন্ধানে।'

দুটি মোটা লাঠি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলাম, হাতে লইয়া দু'জনে বাহির হইলাম। ননীবালার উপর ব্যোমকেশের মন যতই অপ্রসন্ন হোক তাঁহার কাহিনী ভিতরে ভিতরে তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে।

গোলদীঘি আমাদের বাসা হইতে বেশি দূর নয়, সেখানে পৌঁছিয়া ফুটপাথের উপর এক পাক দিতেই মস্ত সাইনবোর্ড চোখে পড়িল। দোকানটি কিন্তু সাইনবোর্ডের অনুপাতে ছোটই বলিতে হইবে, সাইনবোর্ডের তলায় প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। রাস্তার ধারে একটি ঘর, তাহার পিছনে একটি কুঠুরি। সদরে দ্বারের পাশে বেঁটে এবং বঙ্কিমচক্ষু গুর্খা দণ্ডায়মান।

দোকানে প্রবেশ করিলাম ; গুর্খা একবার তির্যক নেত্রপাত করিল, কিছু বলিল না, দেখিলাম ঘরের দেয়ালগুলি কড়িকাঠ পর্যন্ত বই দিয়া ঠাসা ; তাহাতে ঘরের আয়তন আরও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। তাকের উপর একই বই দশ বারোটা করিয়া পাশাপাশি সাজানো। বিভিন্ন প্রকাশকের বই, নিজের প্রকাশন বোধ হয় কিছু নাই। আমার বইও দুই তিনখানা রহিয়াছে।

কিন্তু দোকানদারকে ঘরে দেখিতে পাইলাম না, কাউণ্টারে কেহ নাই।

কাউণ্টারের পিছনে কুঠুরির দরজা ঈষৎ ফাঁক হইয়া আছে। ফাঁক দিয়া যতটুকু দেখা যায়

দেখিলাম, তাহার মধ্যে একটি ছোট তক্তপোশ পাতা রহিয়াছে এবং তক্তপোশের উপর বসিয়া একটি যুবক হেঁটমুখে বইয়ের মলাট বাঁধিতেছে। মাথার উপর আবরণহীন বৈদ্যুতিক বাল্‌ব, চারিদিকে কাগজ পিজবোর্ড লেইয়ের মালসা কাগজ কাটিবার ভীষণদর্শন ছোরা প্রভৃতি ছড়ানো। তাহার মধ্যে বসিয়া যুবক তন্ময়চিত্তে মলাট বাঁধিতেছে।

ব্যোমকেশ একটু জোরে গলা খাঁকারি দিল। যুবক ঘাড় তুলিল, ছেঁড়া ন্যাকড়ায় আঙুলের লেই মুছিতে মুছিতে আসিয়া কাউন্টারের পিছনে দাঁড়াইল ; কোনও প্রশ্ন করিল না, জিজ্ঞাসু নেত্রে আমাদের পানে চাহিয়া রহিল।

এইবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। বাংলা দেশের শত সহস্র সাধারণ যুবক হইতে তাহার চেহারায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। দেহের দৈর্ঘ্য আন্দাজ সাড়ে পাঁচ ফুট, গায়ের রঙ তামাটে ময়লা ; মুখ ও দেহের কাঠামো একটু শীর্ণ। ঠোঁটের উপর গোঁফের রেখা এখনও পুষ্ট হয় নাই ; দাঁতগুলি দেখিতে ভাল কিন্তু তাহাদের গঠন যেন একটু বন্য ধরনের, হয়তো আদিম মাতৃরক্তের নিদর্শন। চোখের দৃষ্টিতে সামান্য একটু অন্যমনস্কতার আভাস, কিন্তু ইহা মনের অভিব্যক্তি নয়, চোখের একটা বিশেষ গঠনভঙ্গী। মাথার চুল ঈষৎ রুক্ষ ও ঝাঁকড়া, চুলের যত্ন নাই। পরিধানে গলার বোতামখোলা ঢিলা আস্তিনের পাঞ্জাবি। সব মিলিয়া যে চিত্রটি তৈয়ারি হইয়াছে তাহা নিতান্ত মামুলী এবং বিশেষত্বহীন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি জীবন-প্রভাতের মালিক প্রভাত কুমার রায় ?'

যুবক বলিল, 'আমার নাম প্রভাত হালদার।'

'ও—হ্যাঁ—ঠিক কথা। আপনি যখন অনাদিবাবুর—' ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করিল।

'পুষ্যিপুত্তুর।' প্রভাত নির্লিপ্তকণ্ঠে ব্যোমকেশের অসমাপ্ত কথা পূরণ করিয়া দিল, তারপর ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিল, 'আপনি কে ?'

'আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।'

প্রভাত এতক্ষণে একটু সজীব হইয়া ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিল, তারপর আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

'আপনি তাহলে অজিতবাবু ?'

'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রভাত আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সসম্ভ্রম আগ্রহে বলিল, 'নমস্কার। আমি আপনার কাছে একবার যাব।'

'আমার কাছে !'

'হ্যাঁ। আমার একটু দরকার আছে। আপনার ঠিকানা— ?'

ঠিকানা দিয়া বলিলাম, 'আসবেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কী দরকার থাকতে পারে ভেবে পাচ্ছি না।'

'সে কথা তখন বলব।—তা এখন কি চাই বলুন। আমার কাছে নতুন বই ছাড়াও ভালো ভালো পুরনো বই আছে ; পুরনো বই বাঁধিয়ে বিক্রি করি। সে সব বই অন্য দোকানে পাবেন না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপাতত আপনার কাছে নিমাই আর নিতাইয়ের ঠিকানা নিতে এসেছি।'

প্রভাত ব্যোমকেশের দিকে ফিরিল, কয়েকবার চক্ষু মিটিমিটি করিয়া যেন এই নূতন প্রসঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল ; তারপর বলিল, 'নিমাই নিতাইয়ের ঠিকানা ? তারা থাকে—' প্রভাত ঠিকানা দিল, মধু বড়াল লেনের একটা নম্বর। কিন্তু আমরা কেন নিতাই ও নিমাইয়ের ঠিকানা চাই সে বিষয়ে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করিল না।

'ধন্যবাদ।'

'আসুন। আমি কিন্তু একদিন যাব।'

'আসবেন।'

দোকান হইতে বাহির হইলাম। তখনও বেশ বেলা আছে ; শীতের সন্ধ্যা নারিকেল ছোবড়ার আগুনের মত ধীরে ধীরে জ্বলে, সহজে নেভে না। ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, নিমাই নিতাইকে দেখে যাই। কাছেই তো।' কিছুক্ষণ চলিবার পর বলিল, 'প্রভাত নিজেই বই বাঁধে, পুরনো বিদ্যে ছাড়তে পারেনি। ছেলেটা কেমন যেন মেদামারা—কিছুতেই চাড় নেই।'

বলিলাম, 'আমার সঙ্গে কী দরকার কে জানে ?'

ব্যোমকেশ চোখ বাঁকাইয়া আমার পানে চাহিল, বলিল, 'তা এখনও বোঝোনি ? তোমার বই ছাপতে চায়। বোধ হয় প্রোথিতযশা কোন লেখক ওকে বই দেননি। এখন তুমি ভরসা।'

বলিলাম, 'প্রোথিতযশা নয়—প্রথিতযশা।'

সে মুখ টিপিয়া হাসিল ; বুঝিলাম ভুলটা ইচ্ছাকৃত। বলিলাম, 'যাহোক, তবু ওর বই ছাপার দিকে ঝোঁক আছে। লেখাপড়া না জানলেও সাহিত্যের কদর বোঝে। সেটা কম কথা নয়।'

ব্যোমকেশ খানিক চুপ করিয়া রহিল, তারপর যেন বিমনাভাবে বলিল, 'প্যাঁচা কয় প্যাঁচানী, খাসা তোর চ্যাঁচানি।'

আজকাল ব্যোমকেশ আচমকা এমন অসংলগ্ন কথা বলে যে তাহার কোনও মানে হয় না।

মধু বড়ালের গলিতে উপস্থিত হইলাম। গলিটি আজিকার নয়, বোধ করি জব চার্নকের সমসাময়িক। দু' পাশের বাড়িগুলি ইষ্টক-দন্তুর, পরস্পরের গায়ে ঠেস দিয়া কোনওক্রমে খাড়া আছে।

একটি বাড়ির দরজার মাথায় নম্বর দেখিয়া বুঝিলাম এই বাড়ি। জীর্ণ বটে কিন্তু বাঁধানো-দাঁত চুলে-কলপ-দেওয়া বৃদ্ধের মত বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা আছে। সদর দরজা একটু ফাঁক হইয়া ছিল, তাহার ভিতর দিয়া সরু গলির মত একটা স্থান দেখা গেল। লোকজন কেহ নাই।

আমাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া ব্যোমকেশ ভিতরে প্রবেশ করিল। সুড়ঙ্গের মত পথটি যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেখানে ডান দিকে একটি ঘরের দরজা। আমরা দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

আবছায়া একটি ঘর। তাহাতে অসংখ্য আসবাব ঠাসা, আলমারি টেবিল চেয়ার সোফা তক্তপোশ, নড়িবার ঠাঁই নাই। সমস্ত আসবাব পুরনো, একটিরও বয়স পঞ্চাশের কম নয় ; দেখিলে মনে হয় ঘরটি পুরাতন আসবাবের গুদাম। তাহার মাঝখানে রঙ-চটা জাজিম-পাতা তক্তপোশের উপর বসিয়া দুইটি মানুষ বন্দুক পরিষ্কার করিতেছে। দু'নলা ছর্‌রা বন্দুক, কুঁদার গায়ে নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র আঁকা দেখিয়া মনে হয় বন্দুকটিও সাবেক আমলের। একজন তাহার যন্ত্রে তেল লাগাইতেছে, অন্য ব্যক্তি নলের ভিতর গজ চালাইয়া পরিষ্কার করিতেছে।

মানুষ দুটির চেহারা একরকম, বয়স একরকম, ভাবভঙ্গী একরকম ; একজনের বর্ণনা করিলে দু'জনের বর্ণনা করা হইয়া যায়। বয়স ত্রিশের আশে পাশে, দোহারা ভারী গড়নের নাড়ুগোপাল চেহারা, মেটে মেটে রঙ, চোখের চারিপাশে চর্বির বেষ্টনী মুখে একটা মোঙ্গলীয় ভাব আনিয়া দিয়াছে, মাথার চুল ছোট এবং সমান করিয়া ছাঁটা। পরিধানে লুঙ্গি ও ফতুয়া। তফাত যে একেবারে নাই তা নয়, কিন্তু যৎসামান্য। ইহারাই যে নিমাই নিতাই তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

আমরা দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিতেই তাহারা একসঙ্গে চোখ তুলিয়া চাহিল। দুই জোড়া ভয়ঙ্কর চোখের দৃষ্টি আমাদের যেন ধাক্কা দিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল। তারপর যুগপৎ প্রশ্ন হইল, 'কি চাই ?'

কড়া সুর, শিষ্টতার লেশমাত্র তাহাতে নাই। আমি অসহায়ভাবে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিলাম। ব্যোমকেশ সহজ সৌজন্যের সহিত বলিল, 'এটা কি অনাদি হালদারের বাড়ি ?'

ক্ষণকালের জন্য দুই ভাই যেন বিমূঢ় হইয়া গেল। পরস্পরের প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'না।'

ব্যোমকেশ আবার প্রশ্ন করিল, 'অনাদিবাবু এখানে থাকেন না ?'

কড়া উত্তর—'না।'

ব্যোমকেশ যেন লজ্জিত হইয়া বলিল, 'দেখছি ভুল ঠিকানা পেয়েছি। এ বাড়িতে কি অনাদিবাবুর কোনও আত্মীয় থাকেন ? আপনারা কি—'

দুই ভাই আবার দৃষ্টি বিনিময় করিল। একজন বলিল, 'সে খবরে কী দরকার ?'

'দরকার এই যে, আপনারা যদি তাঁর আত্মীয় হন তাহলে তাঁর ঠিকানা দিতে পারবেন।'

উত্তর হইল, 'এখানে কিছু হবে না। যেতে পারেন।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর একটু বাঁকা সুরে বলিল, 'আপনাদের বন্দুক আছে দেখছি। আশা করি লাইসেন্স আছে।'

আমরা ফিরিয়া চলিলাম। দুই ভ্রাতার নির্নিমেষ দৃষ্টি আমাদের অনুসরণ করিল।

বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম—'কি অসভ্য লোক দুটো।'

বাসার দিকে ফিরিয়া চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'অসভ্য নয়, সাবধানী। এখানে এক জাতের লোক আছে তারা কলকাতার পুরনো বাসিন্দা ; আগে বড় মানুষ ছিল, এখন অবস্থা পড়ে গেছে ; নিজেদের উপার্জনের ক্ষমতা নেই, পূর্বপুরুষেরা যা রেখে গিয়েছিল তাই আঁকড়ে বেঁচে আছে। পচা বাড়ি ভাঙা আসবাব ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে সাবেক চাল বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। তাদের সাবধানতার অন্ত নেই ; বাইরের লোকের সঙ্গে মেশে না, পাশে ছেঁড়া কাঁথাখানি কেউ ফাঁকি দিয়ে নেয়। দু'-চারটি সাবেক বন্ধু ও আত্মীয় ছাড়া কারুর সঙ্গে ওরা সম্পর্ক রাখে না ; কেউ যদি যেচে আলাপ করতে যায়, তাকে সন্দেহ করে, ভাবে বুঝি কোনও কু-মতলব আছে। তাই অপরিচিত লোকের প্রতি ওদের ব্যবহার স্বভাবতই রূঢ়। ওরা একসঙ্গে ভীরু এবং কটুভাষী, লোভী এবং সংযমী। ওরা অদ্ভুত জীব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ দুটি ভাইকে কেমন দেখলে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ননীবালা দেবী মিথ্যা বলেননি। এক জোড়া বেড়াল ; তবে শুকনো বেড়াল নয়, ভিজে বেড়াল।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওদের দ্বারা প্রভাতের অনিষ্ট হতে পারে তোমার মনে হয় ?'

ব্যোমকশ বলিল, 'ঘরের বেড়াল বনে গেলে বন-বেড়াল হয়। স্বার্থে ঘা লাগলে ওরাও নিজ মূর্তি ধারণ করতে পারে।'

সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিতেছে, রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। আমরা দ্রুত বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম।

তিন

পরদিন সকালবেলা ব্যোমকেশ সংবাদপত্র পাঠ শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া বেড়াইল, তারপর বলিল, 'নেই কাজ তো খৈ ভাজ। চল, অনাদি হালদারকে দর্শন করে আসা যাক। ভাইপোদের দর্শন পেলাম, আর খুড়োকে দর্শন করলাম না, সেটা ভাল দেখায় না।'

বলিলাম, 'ভাইপোদের কাছে তো খুড়োর ঠিকানা চেয়েছিল। খুড়োর কাছে কি চাইবে ?'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'একটা কিছু মাথায় এসেই যাবে।'

বেলা সাড়ে ন'টা নাগাদ বাহির হইলাম। বৌবাজারের নম্বরের ধারা কোন্‌দিক হইতে কোন্‌দিকে গিয়াছে জানা ছিল না, নম্বর দেখিতে দেখিতে শিয়ালদহের দিকে চলিয়াছি। কিছুদূর চলিবার পর ফুটপাথে বাঁটুল সর্দারের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কি বাঁটুল, এ পাড়াটাও কি তোমার এলাকা ?'

বাঁটুল তৈলাক্ত মুখে কেবল হাসিল, তারপর পাল্টা প্রশ্ন করিল, 'আপনারা এ পাড়ায় এলেন যে

কর্তা ? কিছু দরকার আছে নাকি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। —১৭২/২ নম্বরটা কোন্‌দিকে বলতে পার ?'

বাঁটুলের চোখে চকিত সতর্কতা দেখা দিল। তারপর সে সামলাইয়া লইয়া বলিল, '১৭২/২ নম্বর ? ওই যে নতুন বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, ওর পাশেই।'

আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া দেখি বাঁটুল তখনও ফুটপাথে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে, আমাকে ফিরিতে দেখিয়া সে উল্টা মুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

আমি বলিলাম, 'ওহে ব্যোমকেশ, বাঁটুল—'

সে বলিল, 'লক্ষ্য করেছি। বোধ হয় ওদের চেনে।'

আরও খানিকদূর অগ্রসর হইবার পর নূতন বাড়ির সম্মুখীন হইলাম। চারিদিকে ভারা বাঁধা, মিস্ত্রীরা গাঁথুনির কাজ করিতেছে। একতলার ছাদ ঢালা হইয়া গিয়াছে, দোতলার দেয়াল গাঁথা হইতেছে। সম্মুখে কন্‌ট্রাকটরের নাম লেখা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। কন্‌ট্রাকটরের নাম গুরুদত্ত সিং। সম্ভবত শিখ।

বাড়ি পার হইয়া একটি সঙ্কীর্ণ ইট-বাঁধানো গলি, গলির ওপারে ১৭২/২ নম্বর বাড়ি। দোতলা বাড়ি, সদর দরজার পাশে সরু এক ফালি দাওয়া ; তাহার উপরে তাহারই অনুরূপ রেলিং-ঘেরা ব্যালকনি। নীচের দাওয়ায় বসিয়া এক জীর্ণকায় পলিতকেশ বৃদ্ধ থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি হুঁকা হইতে ওষ্ঠাধর বিমুক্ত না করিয়াই চোখ বাঁকাইয়া চাহিলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা কি অনাদি হালদারের বাসা ?'

বৃদ্ধ হুঁকার ছিদ্র হইতে অধর বিচ্ছিন্ন করিয়া খিঁচাইয়া উঠিলেন, 'কে অনাদি হালদার আমি কি জানি! এ আমার বাসা—নীচের তলায় আমি থাকি।'

ব্যোমকেশ বিনীত স্বরে বলিল, 'আর ওপরতলায় ?'

বৃদ্ধ পূর্ববৎ খিঁচাইয়া বলিলেন, 'আমি কি জানি! খুঁজে নাও গে। অনাদি হালদার! যত সব—' বৃদ্ধ আবার হুঁকায় অধরোষ্ঠ জুড়িয়া দিলেন।

বৃদ্ধ হঠাৎ এমন তেরিয়া হইয়া উঠিলেন কেন বোঝা গেল না। আমরা আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। লম্বাটে গোছের একটি ঘর, তাহার একপাশে একটি দরজা, বোধ হয় নীচের তলার প্রবেশদ্বার ; অন্য দিকে এক প্রস্থ সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিব কিনা ইতস্তত করিতেছি, এমন সময় সিঁড়িতে দুম্ দুম্ শব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া দেখি, ইয়া-লম্বা-চওড়া এক সর্দারজী বাঁকের মোড় ঘুরিয়া নামিয়া আসিতেছেন। অনাদি হালদারের বাসা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কারণ ইনি নিশ্চয় কন্‌ট্রাকটর গুরুদত্ত সিং। তাঁহার পরিধানে মখ্‌মলী করডুরয়ের পাৎলুন ও গ্যাবারডিনের কোট, দাড়ি বিনুনি করা, মাথায় কান-চাপা পাগ্‌ড়ি। দুই বাহু মুগুরের মত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি নামিতেছেন, চক্ষু দুটিও ঘুরিতেছে। আরও কাছে আসিলে তাঁহার দাড়ি-গোঁফে অবরুদ্ধ বাক্যগুলিও আমাদের কর্ণগোচর হইল। বাক্যগুলি বাঙলা নয়, কিন্তু তাহার ভাবার্থ বুঝিতে কষ্ট হইল—'বাংগালী আমার টাকা দেবে না! দেখে নেব কত বড় অনাদি হালদার, গলা টিপে টাকা আদায় করব। আমিও পাঞ্জাবী, আমার সঙ্গে লারে-লাপ্পা চলবে না—' সর্দারজী সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্যোমকেশ আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিল, নিম্নস্বরে বলিল, 'অনাদিবাবু দেখছি জনপ্রিয় লোক নয়। এস, দেখা যাক।'

সিঁড়ির ঊর্ধপ্রান্তে একটি দরজা, ভিতর দিকে অর্গলবদ্ধ। ব্যোমকেশ কড়া নাড়িল।

অল্পকাল পরে দরজা একটু ফাঁক হইল, ফাঁকের ভিতর দিয়া একটি মুখ বাহির হইয়া আসিল। ভেট্‌কি মাছের মত মুখ, রাঙা রাঙা চোখ, চোখের নীচের পাতা শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

শিথিল অধরের ফাঁকে নীচের পাটির দাঁতগুলি দেখা যাইতেছে।

রাত্রিকালে এরূপ অবস্থায় এই মুখখানি দেখিলে কি করিতাম বলা যায় না, কিন্তু এখন একবার চমকিয়া স্থির হইলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদিবাবু— ?'

মুখটিতে হাসি ফুটিল, চোয়ালের অসংখ্য দাঁত আরও প্রকটিত হইল। ভাঙা ভাঙা গলায় ভেট্‌কি মাছ বলিল, 'না, আমি অনাদিবাবু নই, আমি কেষ্টবাবু। আপনারাও পাওনাদার নাকি ?'

'না, অনাদিবাবুর সঙ্গে আমাদের একটু কাজ আছে।'

এই সময় ভেট্‌কি মাছের পশ্চাতে আর একটি দ্রুত কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—'কেষ্টবাবু, সরুন সরুন—'

কেষ্টবাবুর মুণ্ড অপসৃত হইল, তৎপরিবর্তে দ্বারের সম্মুখে একটি যুবককে দেখা গেল। ডিগ্‌ডিগে রোগা চেহারা, লম্বা ছুঁচালো চিবুক, মাথার কড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলি মাথার দুই পাশে যেন পাখা মেলিয়া আছে। মুখে একটা চট্‌পটে ভাব।

'কি চান আপনারা ?'

'অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কিছু দরকার আছে কি ? অনাদিবাবু বিনা দরকারে কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।'

'দরকার আছে বৈ কি। পাশে যে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে সেটা বোধ হয় তাঁরই। ওই বাড়ি সম্বন্ধে কিছু জানবার আছে। আপনি— ?'

'আমি অনাদিবাবুর সেক্রেটারি। আপনারা একটু বসুন, আমি খবর দিচ্ছি। এই যে, ভেতরে বসুন।'

আমরা সিঁড়ি হইতে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। যুবক চলিয়া গেল।

ঘরটি নিরাভরণ, কেবল একটি কেঠো বেঞ্চি আছে। আমরা বেঞ্চিতে বসিয়া চারিদিকে চাহিলাম। সিঁড়ির দরজা ছাড়া ঘরে আরও গুটিতিনেক দরজা আছে, একটি দিয়া সদরের ব্যালকনি দেখা যাইতেছে, অন্য দুইটি ভিতর দিকে গিয়াছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর দেখিলাম ভিতর দিকের একটি দরজা একটু ফাঁক করিয়া একটি স্ত্রীলোক উঁকি মারিল। চিনিতে কষ্ট হইল না—ননীবালা দেবী। তিনি বোধ হয় রান্না করিতেছিলেন, বাহিরে লোক আসার সাড়া পাইয়া খুন্তি হাতে তদারক করিতে আসিয়াছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি সভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন। ব্যোমকেশ নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া তাঁহাকে অভয় দিল। ননীবালা ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন।

অন্য দরজা দিয়া যুবক বাহির হইয়া আসিল।

'আসুন।'

যুবকের অনুগামী হইয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটি ঘরের দরজা ঠেলিয়া যুবক বলিল, 'এই ঘরে অনাদিবাবু আছেন, আপনারা ভিতরে যান।'

ঘরে ঢুকিয়া প্রথমটা কিছু ঠাহর হইল না। ঘরে আলো কম, আসবাব কিছু নাই, কেবল এক কোণে গদির উপর ফরাস পাতা। ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া একটি লোক আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। আধা অন্ধকারে মনে হইল একটা ময়াল সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া অনিমেষ চক্ষে শিকারকে লক্ষ্য করিতেছে।

চক্ষু অভ্যস্ত হইলে বুঝিলাম, ইনিই অনাদি হালদার বটে ; ভাইপোদের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ ; বেঁটে মজবুত চেহারা, চোখে মেদমণ্ডিত মোঙ্গলীয় বক্রতা। গায়ে বেগুনি রঙের বালাপোশ জড়ানো।

আমরা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনাদিবাবু স্তিমিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর ব্যোমকেশ নিজেই কথা কহিল, 'আমরা একটু কাজে এসেছি। ইনি অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ববঙ্গ থেকে সম্প্রতি এসেছেন, কলকাতায় বাড়ি কিনে বাস করতে চান।'

অনাদিবাবু এবার কথা বলিলেন। আমাদের বসিতে বলিলেন না, স্বভাব-রুক্ষ স্বরে

ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কে ?'

ব্যোমকেশের চক্ষু প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু সে সহজভাবে বলিল, 'আমি এঁর এজেন্ট। জানতে পারলাম আপনি পাশেই বাড়ি তৈরি করাচ্ছেন, ভাবলাম হয়তো বিক্রি করতে পারেন। তাই—'

অনাদিবাবু বলিলেন, 'আমি নিজে বাস করব বলে বাড়ি তৈরি করাচ্ছি, বিক্রি করবার জন্যে নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা তো বটেই। তবে আপনি ব্যবসাদার লোক, ভেবেছিলাম লাভ পেলে ছেড়ে দিতে পারেন।'

'আমি দালালের মারফতে ব্যবসা করি না।'

'বেশ তো, আপনি অজিতবাবুর সঙ্গে কথা বলুন, আমি সরে যাচ্ছি।'

'না, কারুর সঙ্গে বাড়ির আলোচনা করতে চাই না। আমি বাড়ি বিক্রি করব না। তোমরা যেতে পারো।'

অতঃপর আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। এই অত্যন্ত অশিষ্ট লোকটার সঙ্গ আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল, কিন্তু ব্যোমকেশ নির্বিকার মুখে বলিল, 'কিছু মনে করবেন না, বাড়িটা তৈরি করাতে আপনার কত খরচ হবে বলতে বাধা আছে কি ?'

অনাদিবাবুর রুক্ষ স্বর আরও কর্কশ হইয়া উঠিল, 'বাধা আছে। —ন্যাপা ! ন্যাপা ! বিদেয় কর, এদের বিদেয় কর—'

সেক্রেটারি যুবকের নাম বোধ করি ন্যাপা, সে দ্বারের বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিল, মুণ্ড বাড়াইয়া ত্বরান্বিত স্বরে বলিল, 'আসুন, চলে আসুন—'

মানসিক গলা-ধাক্কা খাইয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। যুবক সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত আমাদের আগাইয়া দিল, একটু লজ্জিত হ্রস্বকণ্ঠে বলিল, 'কিছু মনে করবেন না, কর্তার আজ মেজাজ ভাল নেই।'

ব্যোমকেশ তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'কিছু না। —এস অজিত।'

রাস্তায় বাহির হইয়া আসিলাম। ব্যোমকেশ মুখে যতই তাচ্ছিল্য দেখাক, ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর সে আমার দিকে চাহিয়া ক্লিষ্ট হাসিল, বলিল, 'দু'রকম ছোটলোক আছে—অসভ্য ছোটলোক আর বজ্জাত ছোটলোক। যারা বজ্জাত ছোটলোক তারা শুধু পরের অনিষ্ট করে ; আর অসভ্য ছোটলোক নিজের অনিষ্ট করে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'অনাদি হালদার কোন্ শ্রেণীর ছোটলোক ?'

'অসভ্য এবং বজ্জাত দুইই—।'

সেদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু দিবানিদ্রা দিব কিনা ভাবিতেছি, দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখি ননীবালা দেবী।

ননীবালা শঙ্কিত মুখ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ ইজিচেয়ারে ঝিমাইতেছিল, উঠিয়া বসিল। ননীবালা বলিলেন, 'আজ আপনাদের ও-বাড়িতে দেখে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছল, অনাদিবাবু যদি জানতে পারেন যে আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বসুন। অনাদিবাবুর জানবার কোনও সম্ভাবনা নেই। আমরা গিয়েছিলাম তাঁর নতুন বাড়ির খরিদ্দার সেজে। সে যাক, আপনি এখন একটা কথা বলুন তো, অনাদি হালদার কি রকম লোক ? সোজা স্পষ্ট কথা বলবেন, লুকোছাপার দরকার নেই।'

ননীবালা কিছুক্ষণ ড্যাবডেবে চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মত শব্দের স্রোত তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল,—'কি বলব আপনাকে, ব্যোমকেশবাবু—চামার ! চামার ! চোখের চামড়া নেই, মুখের রাশ নেই। একটা মিষ্টি কথা ওর

মুখ দিয়ে বেরোয় না, একটা পয়সা ওর ট্যাঁক থেকে বেরোয় না। টাকার আন্ডিল, কিন্তু আঙুল দিয়ে জল গলে না। এদিকে উন থেকে চুন খস্‌লে আর রক্ষে নেই, দাঁতে ফেলে চিবোবে। আগে একটা বামুন ছিল, আমি আসবার পর সেটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে; এই দেড় বছর হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে আমার গতরে আর কিছু নেই। কি কুক্ষণে যে প্রভাতকে ওর পুষ্যিপুত্তুর হতে দিয়েছিলুম! যদি উপায় থাকত হতচ্ছাড়া মিন্‌সের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে পাটনায় ফিরে যেতুম।' এই পর্যন্ত বলিয়া ননীবালা রণক্লান্ত যোদ্ধার মত হাঁপাইতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'কতকটা এইরকমই আন্দাজ করেছিলাম। প্রভাতের সঙ্গে ওর ব্যবহার কেমন?'

ননীবালা একটু থমকিয়া বলিলেন, 'প্রভাতকে বেশি ঘাঁটায় না। তাছাড়া প্রভাত বাড়িতে থাকেই বা কতক্ষণ। সকাল আটটায় দোকানে বেরিয়ে যায়, দুপুরবেলা আধঘন্টার জন্য একবারটি খেতে আসে, তারপর বাড়ি ফেরে একেবারে রাত ন'টায়। বুড়োর সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না।'

'বুড়ো দোকানের হিসেবপত্র দেখতে চায় না?'

'না, হিসেব চাইবার কি মুখ আছে, দোকান যে প্রভাতের নামে। বুড়ো প্রথম প্রথম খুব ভালমানুষী দেখিয়েছিল। প্রভাতকে জিজ্ঞেস করল—কী কাজ করবে? প্রভাত বলল—বইয়ের দোকান করব। বুড়ো অমনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দোকান করে দিলে।'

'হুঁ। ন্যাপা কে? বুড়োর সেক্রেটারি?'

ননীবালা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, 'সেক্রেটারি না আরও কিছু—বাজার সরকার। ফড়্‌ফড়্ করে ইংরিজি বলতে পারে তাই বুড়ো ওকে রেখেছে। বুড়ো নিজে একবর্ণ ইংরিজি জানে না, ব্যবসার কথাবার্তা ওকে দিয়ে করায়, চিঠিপত্র লেখায়। তাছাড়া বাজার করায়, হাত-পা টেপায়। সব করে ন্যাপা।'

'ভারি কাজের লোক দেখছি।'

'ভারি ধূর্ত লোক, নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। দু'পাতা ইংরিজি পড়েছে কিনা।'

বুঝিলাম, প্রভাত ইংরিজি জানে না, ন্যাপা ইংরিজি জানে তাই ননীবালা তাহার প্রতি প্রসন্ন নয়।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আর কেষ্টবাবু? তিনি কে?'

'তিনি কে তা কেউ জানে না। বুড়োর আত্মীয় কুটুম্ব নয়, জাত আলাদা। আমরা আসবার আগে থাকতে আছে। মাতাল, মদ খায়।'

'তাই নাকি? নিজের পয়সাকড়ি আছে বুঝি?'

'কিচ্ছু নেই। বুড়ো জুতো জামা দেয় তবে পরে।'

'তবে মদ পায় কোথা থেকে?'

'মদের পয়সাও বুড়ো দেয়।'

'আশ্চর্য! এদিকে বলছেন আঙুল দিয়ে জল গলে না—'

'কি জানি, ব্যোমকেশবাবু, আমি কিছু বুঝতে পারি না। মনে হয় বুড়ো ভয় করে। কেষ্টবাবু মাঝে মাঝে মদ খেয়ে মেজাজ দেখায়, বুড়ো কিন্তু কিছু বলে না।'

'বটে।' ব্যোমকেশ চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

ননীবালা তখন সাগ্রহে বলিলেন, 'কিন্তু ওদিকের কি হল, ব্যোমকেশবাবু? নিমাই নিতাইকে দেখতে গিছলেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গিয়েছিলাম। ওরা লোক ভাল নয়। খুড়ো আর ভাইপোদের এ বলে আমায় দ্যাখ ও বলে আমায় দ্যাখ। উচ্ছের ঝাড়, ঝাড়ে মূলে তেতো।'

ননীবালা ভীতকণ্ঠে বলিলেন, 'তবে কি হবে? ওরা যদি প্রভাতকে—।'

ব্যোমকেশ ধীরস্বরে বলিল, 'ওরা প্রভাতকে ভালবাসে না, তার অনিষ্ট চিন্তাও করতে পারে। কিন্তু আজকালকার এই অরাজকতার দিনেও একটা মানুষকে খুন করা সহজ কথা নয়, নেহাৎ

মাথায় খুন না চাপলে কেউ খুন করে না। নিমাই আর নিতাইকে দেখে মনে হয় ওরা সাবধানী লোক, খুন করে ফাঁসির দড়ি গলায় জড়াবে এমন লোক তারা নয়। আর একটা কথা ভেবে দেখুন। অনাদি হালদার যদি পুষ্যিপুত্তুর নেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে তাহলে একটা পুষ্যিপুত্তুরকে মেরে লাভ কি ? একটা গেলে অনাদি হালদার আর একটা পুষ্যিপুত্তুর নিতে পারে, নিজের সম্পত্তি উইল করে বিলিয়ে দিতে পারে। এ অবস্থায় খুন-খারাপি করতে যাওয়া তো ঘোর বোকামি। বরং—'

ননীবালা বিস্ফারিত চক্ষে প্রশ্ন করিলেন, 'বরং কী ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বরং অনাদিবাবুর ভালমন্দ কিছু হলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়।'

ননীবালা কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন, মনে হইল এই সম্ভাবনার কথা তিনি পূর্বে চিন্তা করেন নাই। তারপর তিনি উৎসুক মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'তাহলে প্রভাতের কোনও ভয় নেই ?'

'আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, এ ধরনের বোকামি নিমাই নিতাই করবে না। তবু সাবধানের মার নেই। আমি একটা প্ল্যান ঠিক করেছি, এমনভাবে ওদের কড়কে দেব যে ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে সাহস করবে না।

'কি—কি প্ল্যান ঠিক করেছেন, ব্যোমকেশবাবু ?'

'সে আপনার শুনে কি হবে। আপনি আজ বাড়ি যান। যদি বিশেষ খবর কিছু থাকে আমাকে জানাবেন।'

ননীবালা তখন গদগদ মুখে ব্যোমকেশকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাইয়া প্রস্থান করিলেন। অনাদি হালদারের দ্বিপ্রহরে দিবানিদ্রা দিবার অভ্যাস আছে, সেই ফাঁকে ননীবালা বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছেন ; বুড়া যদি জাগিয়া উঠিয়া দেখে তিনি বহির্গমন করিয়াছিলেন তাহা হইলে কৈফিয়তের ঠেলায় ননীবালাকে অন্ধকার দেখিতে হইবে।

অতঃপর আমি ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী প্ল্যান ঠিক করেছ ? আমাকে তো কিছু বলনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বাড়িতে পোস্টকার্ড আছে ?'

'আছে।'

'বেশ, পোস্টকার্ড নাও, একখানা চিঠি লেখ। শ্রীহরিঃ শরণং লিখতে হবে না, সম্বোধনেরও দরকার নেই। লেখ—'আমি তোমাদের উপর নজর রাখিয়াছি।'—ব্যাস্, আর কিছু না। এবার নিমাই কিংবা নিতাই হালদারের ঠিকানা লিখে চিঠিখানা পাঠিয়ে দাও।'

চার

কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে।

ননীবালা আর আসেন নাই। প্রভাত ঘটিত ব্যাপার অঙ্কুরেই শুকাইয়া গিয়াছে মনে হয়। কেবল বাঁটুল সর্দারের সঙ্গে একবার দেখা হইয়াছিল। বাঁটুল আসিয়াছিল একটি রিভলবার আমাদের গছাইবার জন্য। উচিত মূল্যে পাইলে হয়তো কিনিতাম, কিন্তু ছয়শত টাকা দিয়া ফ্যাসাদ কিনিবার শখ আমাদের ছিল না। ব্যোমকেশ বাঁটুলকে সিগারেট দিয়া অন্য কথা পাড়িয়াছিল।

'১৭২/২ বৌবাজার স্ট্রীটের কাউকে চেনো নাকি বাঁটুল ?'

'আজ্ঞে চিনি।'

'অনাদি হালদারকে জানো ?'

'আজ্ঞে।'

'সেও কি তোমার—মানে—খাতক নাকি ?'

বাঁটুল একটু হাসিয়াছিল, অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি নিভাইয়া সযত্নে পকেটে রাখিয়া একটু গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিল, 'অনাদি হালদার আগে চাঁদা দিত, কয়েক মাস থেকে বন্ধ করে দিয়েছে ; এখন যদি ওর ভাল-মন্দ কিছু হয় আমাদের দায়-দোষ নেই। —কিন্তু আপনারা ওকে চিনলেন কি করে ? আগে থাকতে জানা শোনা আছে নাকি ?'

'না, সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে।'

বাঁটুল অতঃপর আর কৌতূহল প্রকাশ করে নাই, কেবল অপ্রাসঙ্গিকভাবে একটি প্রবাদ-বাক্য আমাদের শুনাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিয়াছিল—'জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করলে ভাল হয় না কর্তা।'

কালীপূজার দিন আসিয়া পড়িল। সকাল হইতেই চারিদিকে দুম্‌দাম্ শব্দ শোনা যাইতেছে। সেগুলি উৎসবের বাদ্যোদ্যম কিংবা সম্মুখ সমরের রণদামামা তাহা নিঃসংশয়ে ঠাহর করিতে না পারিয়া আমরা বাড়িতেই রহিলাম।

সন্ধ্যার পর দীপমালায় নগর শোভিত হইল। রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে বাজি পোড়ানো আরম্ভ হইল ; তুবড়ি আতস বাজি ফানুস রঙমশাল, সঙ্গে সঙ্গে চীনে পট্‌কা দোদমা। পথে পথে অসংখ্য মানুষ নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়াছে ; কেহ পদব্রজে, কেহ গাড়ি মোটরে। মাথার উপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খাঁড়া ঝুলিতেছে, কিন্তু কে তাহা গ্রাহ্য করে ! হেসে নাও দু'দিন বৈ তো নয়।

আমরা বাড়ির বাহির হইলাম না, জানালা দিয়া উৎসব শোভা নিরীক্ষণ করিলাম। এজন্য যদি কেহ আমাদের কাপুরুষ বলিয়া বিদ্রূপ করেন আপত্তি করিব না, কিন্তু বলির ছাগশিশুর ন্যায় গলায় ফুলের মালা পরিয়া নির্বোধ আনন্দে নৃত্য করিতে আমাদের ঘোর আপত্তি।

রাত্রি গভীর হইতে লাগিল। মধ্য-রাত্রে কালীপূজা, উৎসব পুরাদমে চলিয়াছে। আমরা যদিও শক্তির উপাসক নই, বুদ্ধির উপাসক, তবু মা কালীকে অসন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। রাত্রে পলান্ন সহযোগে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া শয়ন করিলাম।

রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই যে প্রভাত ঘটিত ব্যাপার সাপের মত আবার মাথা তুলিবে তাহা তখনও জানিতাম না।

একেবারে ঘুম ভাঙিল রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়। চারিদিক নিস্তব্ধ, জানালা দিয়া বেশ ঠাণ্ডা আসিতেছে। আমি পায়ের তলা হইতে চাদরটা গায়ে জুত করিয়া জড়াইয়া আর এক ঘুম দিবার ব্যবস্থা করিতেছি এমন সময় উৎকট শব্দে ঘুমের নেশা ছুটিয়া গেল।

কে দুদ্দাড় শব্দে দরজা ঠেঙাইতেছে। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ভাবিলাম, সম্মুখ সমরের সীমানা আমাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, আজ আর রক্ষা নাই। মোটা লাঠিটা ঘরের কোণে দণ্ডায়মান ছিল, সেটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইলাম। যদি মরিতেই হয় লড়িয়া মরিব।

ওদিকে ব্যোমকেশও লাঠি হাতে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। সদর দরজা মজবুত বটে কিন্তু আর বেশিক্ষণ নয়, এখনই ভাঙিয়া পড়িবে। আমরা দরজার দু'পাশে লাঠি বাগাইয়া দাঁড়াইলাম।

দুদ্দাড় শব্দ ক্ষণেকের জন্য একবার থামিল, সেই অবকাশে একটি ব্যগ্র কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—'ও ব্যোমকেশবাবু—একবারটি দরজা খুলুন—'

আমরা বিস্ফারিত চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলাম। পুরুষের গলা, কেমন যেন চেনা-চেনা। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কে তুমি ? নাম বল।'

উত্তর হইল—'আমি—আমি কেষ্ট দাস—শীগ্‌গির দরজা খুলুন—'

কেষ্ট দাস ! সহসা স্মরণ হইল না, তারপর মনে পড়িয়া গেল। অনাদি হালদারের বাড়ির কেষ্টবাবু !

ব্যোমকেশ বলিল, 'এত রাত্রে কী চান ? সঙ্গে কে আছে ?'

'সঙ্গে কেউ নেই, আমি একা—।'

মাত্র একটা লোক এত শব্দ করিতেছিল ! সন্দেহ দূর হইল না। ব্যোমকেশ আবার প্রশ্ন করিল, 'এত রাত্রে কী দরকার ?'

'অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে। দয়া করে দরজা খুলুন। আমার বড় বিপদ।'

হতভম্ব হইয়া আবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। অনাদি হালদার— !

ব্যোমকেশ আর দ্বিধা করিল না, দ্বার খুলিয়া দিল। কেষ্টবাবু টলিতে টলিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। কেষ্টবাবুর চেহারা আলুথালু, ভেটকি মাছের মত মুখে ব্যাকুলতা। তদুপরি মুখ দিয়া তীব্র মদের গন্ধ বাহির হইতেছে। তিনি থপ্‌ করিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, 'অনাদিকে কেউ গুলি করে মেরেছে। সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না। আমি বাড়িতে ছিলাম না—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'ওকথা পরে হবে। আগে আমার একটা কথার জবাব দিন। আমাকে আপনি চিনলেন কি করে ? ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে ?'

কেষ্টবাবু কিছুক্ষণ জবুথবু হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার ভাবভঙ্গীতে একটু ভিজা-বিড়াল ভাব প্রকাশ পাইল। অবশেষে তিনি জড়িত স্বরে বলিলেন, 'সেদিন আপনারা আমাদের বাসায় গিছলেন, আপনাদের দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। তাই আপনারা যখন ফিরে চললেন তখন আমি আপনাদের পিছু নিয়েছিলাম। এখানে এসে নীচের হোটেলে আপনার পরিচয় পেলাম।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'হুঁ, আপনি দেখছি ভারি হুঁশিয়ার লোক। অনাদি হালদারের কাঁধে চেপে থাকেন কেন ?'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'আমি অনাদির ছেলেবেলার বন্ধু—দুরবস্থায় পড়েছি—তাই—'

'তাই অনাদি হালদার আপনাকে খেতে পরতে দিচ্ছিল, এমন কি মদের পয়সা পর্যন্ত যোগাচ্ছিল। খুব গাঢ় বন্ধুত্ব বলতে হবে।—যাক, এবার আজকের ঘটনা বলুন। গোড়া থেকে বলুন।'

কেষ্টবাবু অপলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ঈষৎ করুণ স্বরে বলিলেন, 'আপনি দেখছি সবই জানেন। কিন্তু সত্যি বলছি আমি অনাদিকে খুন করিনি। আজ বিকেলবেলা—মানে কাল বিকেলবেলা অনাদির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল। আমি বলেছিলুম, আজ কালীপুজো, আজ আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে। এই নিয়ে তুমুল ঝগড়া। অনাদি আমাকে দশটা টাকা দিয়ে বলেছিল—এই নিয়ে বেরিয়ে যাও, আর আমার বাড়িতে মাথা গলিও না।'

'কে কে আপনাদের ঝগড়া শুনেছিল ?'

'বাড়িতে ননীবালা আর ন্যাপা ছিল। নীচের তলার ষষ্ঠীবাবুও ঝগড়া শুনেছিল। বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছিল, আমি নেমে আসতে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল—মাথার ওপর দিনরাত শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ চলেছে—কবে যে পাপ বিদেয় হবে জানি না।'

'তারপর বলুন।'

'তারপর রাত্রি আন্দাজ একটার সময় আমি ফিরে এলাম। এসে দেখি—'

'রাত্রি একটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন ?'

'আপনার কাছে লুকোব না, শুঁড়ির দোকানে বসে মদ খেয়েছিলাম—জুয়ার আড্ডায় জুয়া খেলে তিরিশ টাকা জিতেছিলাম—তারপর একটু এদিক ওদিক—'

'হুঁ। বাসায় ফিরে কী দেখলেন ?'

'বাসায় ফিরে প্রথমেই দেখি নীচের তলায় ষষ্ঠীবাবু হুঁকো হাতে সিঁড়ির ঘরে পায়চারি করছে। আমাকে দেখে বলে উঠল—ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। কিছু বুঝতে পারলাম না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি—সিঁড়ির দরজা ভাঙা !

'ঘরে ঢুকে দেখলাম বেঞ্চির ওপর প্রভাত আর ন্যাপা বসে আছে, ননীবালা দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝেয় বসেছে। আমাকে দেখে তিনজনে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল, যেন আগে কখনও

দেখেনি। আমি তো অবাক। বললাম—একি, তোমরা বসে আছ কেন ? কারুর মুখে কথা নেই। তারপর ন্যাপা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল—কেষ্টবাবু, এ আপনার কাজ। আপনি কর্তাকে খুন করেছেন।

'খুন ! আমার তো মাথা ঘুরে গেল। জিজ্ঞেস করলাম—কে ? কোথায় ? কেন ? কেউ উত্তর দিল না। শেষে প্রভাত বলল—ঐ ব্যালকনিতে গিয়ে দেখুন।

'রাস্তার ধারের ব্যালকনিতে উঁকি মারলাম। অনাদি পড়ে আছে, রক্তারক্তি কাণ্ড। বুকে বন্দুকের গুলি লেগেছে। দেখে আমার ভির্মি যাওয়ার মত অবস্থা, মেঝেয় বসে পড়লাম। মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যেতে লাগল।

'তারপর কতক্ষণ কেটে গেল জানি না। ওরা তিনজনে চাপা গলায় কথা কইছে, কি করা উচিত তাই নিয়ে তর্ক করছে। ওদের কথা থেকে বুঝতে পারলাম, সন্ধ্যের পর ওরা কেউ বাড়ি ছিল না, একা অনাদি বাড়িতে ছিল। রাত্রি বারোটা নাগাদ ওরা ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া পেল না। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর ওদের ভয় হল, হয়তো কিছু ঘটেছে। ওরা তখন দরজা ভেঙে বাসায় ঢুকে দেখল ব্যালকনিতে অনাদি মরে পড়ে আছে।

'আমার মাথাটা একটু পরিষ্কার হলে আমি বললাম—তোমরা আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন—আমি অনাদিকে খুন করব কেন ? অনাদি আমার অন্নদাতা বন্ধু—। ন্যাপা লাফিয়ে উঠে বলল—ন্যাকামি করবেন না। আমি যাচ্ছি পুলিসে খবর দিতে। এই বলে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

'আমার ভয় হল। পুলিস এসে আমাকেই ধরবে। ওরা সাক্ষী দেবে আমার সঙ্গে অনাদির ঝগড়া হয়েছিল। আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না, উঠে পালিয়ে এলাম। কোথায় যাব কিছুই জানি না ; রাস্তায় নেমে আপনার কথা মনে পড়ল।'—

কিছুক্ষণ কথা হইল না, কেষ্টবাবু যেন ঝিমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম ঝিমানোর মধ্যে তাঁহার অর্ধনিমীলিত চক্ষু দুটি বার বার ব্যোমকেশের মুখের উপর যাতায়াত করিতেছে।

ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, 'আপনি তাহলে অনাদি হালদারকে খুন করেননি।'

কেষ্টবাবু চমকিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন, 'অ্যাঁ ! না, ব্যোমকেশবাবু, আমি খুন করিনি। আপনিই ভেবে দেখুন, অনাদিকে খুন করে আমার লাভ কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদি হালদার আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'সে ওর মুখের কথা, রাগের মুখে বলেছিল। আমাকে সত্যি সত্যি তাড়িয়ে দেবার সাহস অনাদির ছিল না।'

'সাহস ছিল না ! অর্থাৎ আপনি অনাদি হালদারের জীবনের কোনও গুরুতর গুপ্তকথা জানেন।'

কেষ্টবাবু কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'অনাদির সব গুপ্তকথা আমি জানি, তাকে আমি ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারতাম। কিন্তু ওকথা এখন থাক, যদি দরকার হয় পরে বলব, ব্যোমকেশবাবু। এখন আমাকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা করুন।'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'আপনাকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে কে সত্যি খুন করেছে সেটা জানা দরকার। ঘটনাস্থলে যেতে হবে।'

কেষ্টবাবু শঙ্কিত হইলেন, স্খলিতস্বরে বলিলেন, 'আমাকেও যেতে হবে ?'

'তা যেতে হবে বৈ কি। আপনি না গেলে আমি কোন্ সূত্রে যাব ?'

'কিন্তু, সেখানে পুলিস বোধহয় এতক্ষণ এসে পড়েছে—'

ব্যোমকেশ কড়া সুরে বলিল, 'আপনি যদি খুন না করে থাকেন আপনার ভয়টা কিসের ?—অজিত, তৈরি হয়ে নাও, আমরা তিনজনেই যাব।'

কেষ্টবাবু বিহ্বলভাবে বসিয়া রহিলেন, আমরা বেশবাস পরিধান করিয়া তৈয়ার হইলাম। বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলে কেষ্টবাবু চেয়ার হইতে কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,

'ব্যোমকেশবাবু, আপনার বাড়িতে একটু—হে হে, মদ পাওয়া যাবে ? একটু হুইস্কি কিম্বা ব্র্যান্ডি. হাতে পায়ে যেন বল পাচ্ছি না।'

ব্যোমকেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, 'আমি বাড়িতে মদ রাখি না। আসুন।'

পাঁচ

অনাদি হালদারের বাসায় যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি সাড়ে চারটা। কলিকাতা শহর দুপুর রাত্রি পর্যন্ত মাতামাতি করিয়া শেষ রাত্রির গভীর ঘুম ঘুমাইতেছে।

নীচের তলায় সদর দরজা খোলা। সিঁড়ির ঘরে কেহ নাই। ষষ্ঠীবাবু বোধ করি ক্লান্ত হইয়া শুইতে গিয়াছেন। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, দরজার হুড়কা ভাঙা ; কবাট ভাঙে নাই, হুড়কাটা ভাঙিয়া একদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। আমরা ব্যোমকেশকে অগ্রে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম।

আমরা প্রবেশ করিতেই ঘরে যেন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ঘরে কিন্তু মাত্র তিনটি লোক ছিল ; ননীবালা, প্রভাত ও ন্যাপা। তাহারা একসঙ্গে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ন্যাপা বলিয়া উঠিল, 'কে ? কে ? কি চাই ?' বলিয়াই আমাদের পশ্চাতে কেষ্টবাবুকে দেখিয়া থামিয়া গেল। ননীবালা থলথলে মুখে প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই উচ্চকণ্ঠে স্বগতোক্তি করিলেন, 'অ্যাঁ, ব্যোমকেশবাবু!' তিনি আমাদের দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছেন মনে হইল না। প্রভাত বুদ্ধিহীনের মত চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া ননীবালার উদ্দেশে বলিল, 'কেষ্টবাবু আমাকে ডেকে এনেছেন। পুলিস এখনও আসেনি ?'

ননীবালা মাথা নাড়িলেন। ব্যোমকেশ ন্যাপার দিকে চক্ষু ফিরাইলে সে বিহ্বলভাবে বলিয়া উঠিল, 'আপনি—ব্যোমকেশবাবু, মানে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। ইনি আমার বন্ধু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন আমরা এসেছিলাম মনে আছে বোধহয়। আপনি পুলিস ডাকতে গিয়েছিলেন না ? কী হল ?'

ন্যাপা কেমন যেন বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'পুলিস—হ্যাঁ, থানায় গিয়েছিলাম। থানায় কেউ ছিল না, একটা জমাদার টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমার কথা শুনে রেগে উঠল, বললে, যাও যাও, একটা হিন্দু মরেছে তার আবার এত হৈ-চৈ কিসের। লাশ রাস্তায় ফেলে দাওগে। আমি চলে আসছিলাম, তখন আমাকে ডেকে বললে—ঠিকানা রেখে যাও, সকালবেলা দারোগা সাহেব এলে জানাবো। আমি অনাদিবাবুর নাম আর ঠিকানা দিয়ে চলে এলাম।'

ক্ষেত্রবিশেষে পুলিসের অবজ্ঞাপূর্ণ নির্লিপ্ততা এবং ক্ষেত্রান্তরে অতিরিক্ত কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে কোনও নূতনত্ব ছিল না ; বস্তুত অভ্যাসবশেই আশা করিয়াছিলাম যে, পুলিস সংবাদ পাইবামাত্র ছুটিয়া আসিবে। ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল, 'কেষ্টবাবুকে আপনারা অনাদিবাবুর হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে এই ব্যাপারের তদন্ত করতে চাই। কারুর আপত্তি আছে ?'

কেহ উত্তর দিল না, ব্যোমকেশের চক্ষু এড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তখন ব্যোমকেশ বলিল, 'লাশ ব্যালকনিতে আছে, আপনারা কেউ ছুঁয়েছেন কি ?'

সকলে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

আমরা তখন ব্যালকনিতে প্রবেশ করিলাম। দেয়ালের গায়ে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছিল, তাহার নির্নিমেষ আলোতে দেখিলাম অনাদি হালদারের মৃতদেহ কাত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া আছে, মুখ রাস্তার দিকে। গায়ে শাদা রঙের গরম গেঞ্জি, তাহার উপর বালাপোশ। বুকের উপর

হইতে বালাপোশ সরিয়া গিয়োছে, গেঞ্জিতে একটি ছিদ্র ; সেই ছিদ্রপথে গাঢ় রক্ত নির্গত হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়াছে। মৃতের মুখের উপর পৈশাচিক হাসির মত একটা বিকৃতি জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ নত হইয়া পিঠের দিক হইতে বালাপোশ সরাইয়া দিল। দেখিলাম এদিকেও গেঞ্জির উপর একটি সুগোল ছিদ্র। এদিকে রক্ত বেশি গড়ায় নাই, কেবল ছিদ্রের চারিদিকে ভিজিয়া উঠিয়াছে। বন্দুকের গুলি দেহ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

মৃতদেহ ছাড়িয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, অন্যমনস্কভাবে বাহিরে রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি হ্রস্বকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, 'কি মনে হচ্ছে ?'

ব্যোমকেশ অন্যমনে বলিল, 'এই লোকটাই সেদিন আমার সঙ্গে অসভ্যতা করেছিল, আশ্চর্য নয় ?......মৃতদেহ শক্ত হতে আরম্ভ করেছে......বোধহয় অনাদি হালদার রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তায় বাজি পোড়ানো দেখছিল—' ব্যোমকেশ রাস্তার পরপারে বড় বাড়িটার দিকে তাকাইল, 'কিন্তু গুলিটা গেল কোথায় ? শরীরের মধ্যে নেই, শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে—'

ব্যোমকেশের অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে গুলিটা ব্যালকনির দেয়ালে বিঁধিয়া থাকিবার কথা। কিন্তু ব্যালকনির দেয়াল ছাদ মেঝে কোথাও গুলি বা গুলির দাগ দেখিতে পাইলাম না। বন্দুকের গুলি ভেদ করিয়া বাহির হইবার সময় কখনও কখনও তেরছা পথে বাহির হয় ; কিম্বা অনাদি হালদার হয়তো তেরছাভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, গুলি ব্যালকনির পাশের ফাঁক দিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লাশ যেভাবে পড়িয়া আছে, তাহাতে মনে হয়, অনাদি হালদার রাস্তার দিকে সুমুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বুকে গুলি খাইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িয়াছে, তারপর পাশের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

সামনে রাস্তার ওপারে ওই বাড়িটা। মাঝে ৭০/৮০ ফুটের ব্যবধান। হয়তো ওই বাড়ির দ্বিতল বা ত্রিতলের কোনও জানালা হইতে গুলি আসিয়াছে।

ব্যালকনিতে গুলির কোনও চিহ্ন না পাইয়া ব্যোমকেশ আর একবার নত হইয়া মৃতদেহ পরীক্ষা করিল। বালাপোশ সরাইয়া লইলে দেখিলাম, নিম্নাঙ্গে ধুতির কষি আল্‌গা হইয়া গিয়াছে, কোমরে ঘুন্‌সির মত একটি মোটা কালো সুতা দেখা যাইতেছে। ঘুন্‌সিতে ফাঁস লাগানো একটি চাবি। ব্যোমকেশ চাবিটি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল, তারপর সন্তর্পণে খুলিয়া লইয়া মৃতদেহের উপর আবার বালাপোশ ঢাকা দিয়া বলিল, 'চল, দেখা হয়েছে।'

বাহিরে তখনও রাত্রির অন্ধকার কাটে নাই। রাস্তা দিয়া শাকসব্জি বোঝাই লরি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতা শহরের বিরাট ক্ষুধা মিটাইবার আয়োজন চলিতেছে।

ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম, যে চারিজন লোক ঘরের মধ্যে ছিল তাহারা আগের মতই দাঁড়াইয়া আছে, কেহ নড়ে নাই। ব্যোমকেশ হাতের চাবি দেখাইয়া বলিল, 'মৃতদেহের কোমরে ছিল। কোথাকার চাবি ?'

একে একে চারিজনের মুখ দেখিলাম। সকলেই একদৃষ্টে চাবির পানে চাহিয়া আছে, কেবল ন্যাপার মুখে ভয়ের ছায়া। অবশেষে ননীবালা বলিলেন, 'অনাদিবাবুর শোবার ঘরে লোহার আলমারি আছে, তারই চাবি।'

'লোহার আলমারিতে কি আছে ? টাকাকড়ি ?'

সকলেই মাথা নাড়িল, কেহ জানে না। ননীবালা বলিলেন, 'কি করে জানব। অনাদিবাবু কি কাউকে আলমারি ছুঁতে দিত ? কাছে গেলেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠত—' প্রভাতের চোখের দিকে চাহিয়া ননীবালা থামিয়া গেলেন।

ন্যাপা অধর লেহন করিয়া বলিল, 'আলমারিতে টাকাকড়ি বোধহয় থাকত না। কর্তা ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন।'

ব্যোমকেশ চাবি পকেটে রাখিয়া বলিল, 'আলমারিতে কি আছে পরে দেখা যাবে। এখন আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। —বাড়িতে ঢোকবার বেরুবার রাস্তা ক'টা ?

সকলে ভাঙা দ্বারের দিকে নির্দেশ করিল, 'মাত্র ওই একটা।'

'অন্য দরজা নেই?'

'না।'

ব্যোমকেশ বেঞ্চির একপাশে বসিয়া বলিল, 'বেশ। তার মানে অনাদিবাবুর যখন মৃত্যু হয় তখন বাড়িতে কেহ ছিল না, বাইরে থেকে গুলি এসেছে। প্রভাতবাবু, আপনি বলুন দেখি, আপনি কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন?'

প্রভাত মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কিছুক্ষণ তাহার অগোছালো চুলে হাত বুলাইল, তারপর চোখ তুলিয়া বলিল, 'আমি মাকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম আন্দাজ সাড়ে আটটার সময়।'

'ও, আপনারা দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, মা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি?' বলিয়া ব্যোমকেশ ননীবালার পানে চাহিল।

ননীবালা বলিলেন, 'আমার তো আর সিনেমা দেখা হয়ে ওঠে না, ন'মাসে ছ' মাসে একবার। কাল ঐ যে কি বলে শেয়ালদার কাছে সিনেমা আছে সেখানে 'জয় মা কালী' দেখাচ্ছিল, তাই দেখতে গিছলুম। এ বাড়ির রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া আটটার মধ্যেই চুকে যায়, তাই রাত্তিরের শো'তে গিয়েছিলুম। প্রভাত বলল—'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, 'আপনারা যখন বেরিয়েছিলেন তখন বাড়িতে কে কে ছিল?'

প্রভাত বলিল, 'কেবল অনাদিবাবু ছিলেন। নৃপেনবাবু আটটার পরই বেরিয়ে গিয়েছিলেন।'

ব্যোমকেশ ন্যাপার দিকে ফিরিল, কিন্তু কোথায় ন্যাপা। সে এতক্ষণ ভিতর দিকের একটা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, কখন অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে ননীবালার দিকে ফিরিয়া হাত উল্টাইয়া প্রশ্ন করিল, ননীবালা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নীরবে দেখাইয়া দিলেন—ন্যাপা ওই দ্বার দিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্যোমকেশ তখন বিড়াল-পদক্ষেপে সেই দিকে চলিল; আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

খানিকটা সরু গলির মত, তারপর একটা ঘর। আলো জ্বলিতেছে। আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের দেরাজ খুলিয়া ন্যাপা ভিতরে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে এবং অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কিছু খুঁজিতেছে। আমাদের দ্বারের কাছে দেখিয়া সে তড়িদ্বেগে খাড়া হইল এবং দেরাজ বন্ধ করিয়া দিল।

আমরা প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশ অপ্রসন্ন স্বরে বলিল, 'এটা আপনার ঘর?'

ন্যাপা কিছুক্ষণ বোকার মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, আমার ঘর।'

'আপনি না বলে চলে এলেন কেন? কি করছেন?'

ন্যাপা পাংশুমুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'কিছু না—এই—একটা সিগারেট খাব বলে ঘরে এসেছিলাম—তা খুঁজে পাচ্ছি না—'

খুঁজিয়া না পাওয়ার কথা নয়, সিগারেটের প্যাকেট টেবিলের এক কোণে রাখা রহিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা কি? সিগারেটের প্যাকেট বলেই মনে হচ্ছে।'

ন্যাপা যেন আঁতকাইয়া উঠিল—'অ্যাঁ—। ও—হ্যাঁ—দেশলাই—দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না—'

ব্যোমকেশ একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নিজের পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া দিল—'এই নিন।' ন্যাপা কম্পিত হস্তে দেশলাই জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইল।

আমি ঘরের চারিদিকে একবার তাকাইলাম। ক্ষুদ্র ঘর, আসবাবের মধ্যে তক্তপোশের উপর বিছানা, একটি দেরাজযুক্ত টেবিল ও তৎসংলগ্ন চেয়ার। ঘরে একটি গরাদ লাগানো জানালা আছে।

জানালাটা খোলা রহিয়াছে। ব্যোমকেশ তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল, আমিও গেলাম। আকাশ ফরসা হইয়া আসিতেছে। জানালা দিয়া অর্ধ-সমাপ্ত নূতন বাড়িটা দেখা গেল। মাঝখানে

গভীর খাদের মত গলি গিয়াছে।

'নৃপেনবাবু, আপনার বাড়ি কোথায় ?'

ব্যোমকেশের এই আকস্মিক প্রশ্নে নৃপেন প্রায় লাফাইয়া উঠিল। সে টেবিলের কিনারায় ঠেস দিয়া সিগারেটে লম্বা টান দিতেছিল, বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'বাড়ি— ?'

'হ্যাঁ, দেশ। নিবাস কোথায় ? কোন জেলায় ?'

নৃপেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া বলিল, 'নিবাস ? চব্বিশ পরগণা, ডায়মন্ডহারবার লাইনের খেজুরহাটে।'

ব্যোমকেশ জানালার দিক হইতে ফিরিয়া নৃপেনের পানে চাহিয়া রহিল, বলিল, 'খেজুরহাট ! আপনি খেজুরহাটের রমেশ মল্লিককে চেনেন ?'

নৃপেন দগ্ধাবশেষ সিগারেট ফেলিয়া যেন ধূমরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'চিনি। আমাদের পাড়ায় থাকেন।'

'খেজুরহাটে আপনার কে আছেন ?'

'খুড়ো।'

'বাপ নেই ?'

'না।'

'ভাল কথা, আপনার পুরো নামটা কী ?'

'নৃপেন দত্ত।'

ব্যোমকেশ নৃপেনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, একটু ঘনিষ্ঠতার সুরে বলিল, 'নৃপেনবাবু, আপনাকে দেখে কাজের লোক বলে মনে হয়। আপনি কতদিন অনাদিবাবুর সেক্রেটারির কাজ করছেন ?'

নৃপেন একটু ভাবিয়া বলিল, 'প্রায় চার বছর।'

'চার বছর ? এতদিন টিকে ছিলেন ?'

নৃপেন চুপ করিয়া রহিল।

'অনাদিবাবুর কেউ শত্রু ছিল কিনা আপনি নিশ্চয় জানেন ?'

নৃপেন অসহায় মুখ তুলিল, 'কার নাম করব ? যার সঙ্গে কর্তার পরিচয় ছিল তার সঙ্গেই শত্রুতা ছিল। ঝগড়া করা ছিল ওঁর স্বভাব।'

'বাড়ির সকলের সঙ্গেই ঝগড়া চলত ?'

'সকলকেই উনি গালমন্দ করতেন। কিন্তু আমরা ওঁর অধীন, আমাদের চুপ করে থাকতে হত। কেবল কেষ্টবাবু মাঝে মাঝে—'

'প্রভাতকে অনাদিবাবু গালমন্দ করতেন ?'

'ঠিক গালমন্দ নয়, সুবিধে পেলেই খোঁচা দিতেন। প্রভাতবাবু কিন্তু গায়ে মাখতেন না।'

'আচ্ছা, ওকথা থাক। বলুন দেখি কাল রাত্রে আপনি কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ?'

'আটটার পরই বেরিয়েছিলাম।'

'ফিরলেন কখন ?'

'আন্দাজ একটায়। ফিরে দেখলাম, ননীবালা দেবী আর প্রভাতবাবু দোর ঠেলাঠেলি করছেন।'

'আপনি আটটা থেকে একটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন ?'

'সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।'

'আপনিও 'জয় মা কালী' দেখতে গিয়েছিলেন ?'

'না, আমি একটা ইংরিজি ছবি দেখতে গিছলাম।'

'ও ! অত রাত্রে ফিরলেন কি করে ?'

'হেঁটে।'

লক্ষ্য করলাম ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নৃপেন অনেকটা ধাতস্থ হইয়াছে, আগের মত ভীত বিচলিত ভাব আর নাই। ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন, এবার ওঘরে যাওয়া যাক।'

ছয়

তিনজনে ওঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, কেষ্টবাবু এবং প্রভাত বেঞ্চির দুই কোণে উপবিষ্ট। কেষ্টবাবু হাই তুলিতেছেন এবং আড়চক্ষে প্রভাতকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। প্রভাত করতলে চিবুক রাখিয়া চিন্তামগ্ন। ননীবালা মেঝেয় পা ছড়াইয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দেখিয়া সকলে সিধা হইলেন। প্রভাত বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, 'বসুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বসব না। ভোর হয়ে এল, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। এখনি হয়তো পুলিস এসে পড়বে। আমাদের দেখলে পুলিসের মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে। আপনাদের একটা কথা বলে রাখি মনে রাখবেন। কারুর ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করবেন না, তাতে নিজেরই অনিষ্ট হবে, পুলিস হয়তো সকলকেই ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরবে।'

সকলে চুপ করিয়া রহিল।

'প্রভাতবাবু, এবার আপনার কথা বলুন। কাল আপনি আপনার মাকে সিনেমায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, নিজে সিনেমা দেখেননি?'

প্রভাত বলিল, 'না। আমি টিকিট কিনে মাকে সিনেমায় বসিয়ে দিয়ে নিজের দোকানে গিয়েছিলাম।'

'ও। রাত্রি সাড়ে আটটার পর দোকানে গেলেন?'

'হ্যাঁ। দেয়ালির রাত্রে দোকান আলো দিয়ে সাজিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর পৌনে বারোটার সময় দোকান বন্ধ করে আবার সিনেমায় গেলাম, সেখান থেকে মাকে নিয়ে ফিরে এলাম।'

'তাহলে আন্দাজ ন'টা থেকে পৌনে বারোটা পর্যন্ত আপনি দোকানেই ছিলেন। দোকানে আর কেউ ছিল?'

'গুরুং ছিল, দোরের সামনে পাহারা দিচ্ছিল।'

'গুরুং—মানে গুর্খা দরোয়ান। খদ্দের কেউ আসেননি?'

'না।'

'সারাক্ষণ দোকানে বসে কি করলেন?'

'কিছু না। পিছনে কুঠরিতে বসে বই বাঁধলাম।'

'আচ্ছা, ওকথা যাক।—অনাদিবাবুর সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল?'

প্রভাত ক্ষুব্ধ চোখ তুলিল, 'না। উনি আমাকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিলেন, প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহার করতেন। তারপর—ক্রমশ—'

'ক্রমশ ওঁর মন বদলে গেল?' আচ্ছা, উনি আপনাকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিলেন কেন?'

'তা জানি না।'

'প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহার করতেন, তারপর মন-মেজাজ বদলে গেল; এর কোনও কারণ হয়েছিল কি?'

'হয়তো হয়েছিল। আমি জ্ঞানত কোনও দোষ করিনি।'

প্রভাত ক্লান্তভাবে আবার বেঞ্চিতে বসিল। ব্যোমকেশ তাহাকে সদয়-চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনি বরং কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন গিয়ে। পুলিস একবার এসে পড়লে আর বিশ্রাম

পাবেন কি না সন্দেহ।'

প্রভাত কিন্তু কেবল মাথা নাড়িল। ব্যোমকেশ তখন ননীবালার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আপনার সঙ্গেও তো অনাদিবাবুর সদ্ভাব ছিল না।'

ননীবালা যুগপৎ মুখ এবং গো-চক্ষু ব্যাদিত করিয়া প্রায় কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিলেন, 'আপনাকে তো সবই বলেছি, ব্যোমকেশবাবু। আমি ছিলুম বুড়োর চক্ষুশূল। প্রভাতকে বুড়ো ভালবাসত, কিন্তু আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। রাতদিন ছুতো খুঁজে বেড়াতো ; একটা কিছু পেলেই শুরু করে দিত দাঁতের বাদ্যি। এমন নীচ অন্তঃকরণ—' ননীবালা থামিয়া গেলেন। অনাদি হালদার মরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মৃতদেহ অদূরেই পড়িয়া আছে, এই কথা সহসা স্মরণ করিয়াই বোধ করি আত্মসংবরণ করিলেন। অধিকন্তু অনাদিবাবুর সহিত তাঁহার অসদ্ভাবের প্রসঙ্গ অপ্রকাশ থাকাই বাঞ্ছনীয়, তাহা কিঞ্চিৎ বিলম্বে উপলব্ধি করিলেন।

কেষ্টবাবুও সেই ইঙ্গিত করিলেন, হেঁচকি তোলার মত একটা হাসির শব্দ করিয়া বলিলেন, 'তাহলে শুধু আমার সঙ্গেই অনাদির ঝগড়া ছিল না!'

প্রভাত একবার ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'ও কথার কোনও মানে হয় না। দেখা যাচ্ছে সকলের সঙ্গেই অনাদি হালদারের ঝগড়া ছিল ; তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। খুন করতে হলে যেমন খুন করার ইচ্ছে থাকা চাই, তেমনি খুন করার সুযোগও দরকার।' ব্যোমকেশ ননীবালার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'কাল সিনেমা কেমন দেখলেন?'

ননীবালা আবার হাঁ করিয়া চাহিলেন।

'অ্যাঁ—সিনেমা—!'

'ছবিটা শেষ পর্যন্ত দেখেছিলেন?'

এতক্ষণে ননীবালা বোধহয় প্রশ্নের মর্মার্থ অনুধান করিলেন, বলিলেন, 'ওমা, তা আবার দেখিনি! গোড়া থেকে শেষ অবধি দেখেছি, ছবি শেষ হয়েছে তবে বাইরে এসেছি। আমিও বাইরে এসে দাঁড়ালাম, আর প্রভাত এল। ওর সঙ্গে বাসায় চলে এলুম। এসে দেখি—'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'জানি। এবার চলুন, অনাদি হালদারের শোবার ঘরে যাওয়া যাক। লোহার আলমারিটা দেখা দরকার।'

আমরা ছয়জন একজোট হইয়া অনাদি হালদারের শয়নকক্ষের দিকে চলিলাম। কয়েকদিন আগে যে ঘরে অনাদি হালদারের সহিত দেখা হইয়াছিল, তাহারই পাশের ঘর। নৃপেন দ্বারের পাশে সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল।

ঘরটি আকারে প্রকারে নৃপেনের ঘরের মতই, তবে বাড়ির অন্য প্রান্তে। একটি গরাদযুক্ত জানালা খোলা রহিয়াছে। ঘরে একটি খাট এবং তাহার শিয়রে একটি স্টীলের আলমারি ছাড়া আর কিছু নাই।

আমরা সকলে ঘরে প্রবেশ করিলে ঘরে স্থানাভাব ঘটিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের সকলকে এ-ঘরে দরকার নেই। কেষ্টবাবু, আপনি বরং ও-ঘরে থাকুন গিয়ে। সিঁড়ির দরজা ভাঙা, এখুনি হয়তো পুলিস এসে পড়বে।'

আলমারির ভিতর কি আছে, তাহা জানিবার কৌতূহল অন্যান্য সকলের মত কেষ্টবাবুরও নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'কুছ পরোয়া নেই, আমিই মড়া আগ্‌লাবো। কিন্তু, এই সময় অন্তত এক পেয়ালা গরম চা পাওয়া যেত।' বলিয়া তিনি সস্পৃহভাবে হাত ঘষিতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চা হলে মন্দ হত না', সে ননীবালার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফিরাইল।

ননীবালা অনিচ্ছাভরে বলিলেন, 'চা আমি করতে পারি। কিন্তু দুধ নেই যে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুধের বদলে লেবুর রস চলতে পারে।'

কেষ্টবাবু গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'আদা! আদা! আদার রস দিয়ে চা খান, শরীর চাঙ্গা হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আদার রসও চলবে।'

ননীবালা ও কেষ্টবাবু প্রস্থান করিলে নৃপেন একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'আমাকে দরকার হবে

কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকেই দরকার। প্রভাতবাবু বরং নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন।'

প্রভাত একবার যেন দ্বিধা করিল, তারপর কোনও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। ঘরে রহিলাম আমরা দু'জন ও নৃপেন।

ঘরে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নাই। খাটের উপর বিছানা পাতা ; পরিষ্কার বিছানা, গত রাত্রে ব্যবহৃত হয় নাই। দেয়ালে আলনায় একটি কাচা ধুতি পাকানো রহিয়াছে। এক কোণে গেলাস-ঢাকা জলের কুঁজা। ব্যোমকেশ এদিকে ওদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া পকেট হইতে চাবি বাহির করিল।

আলমারিটা নূতন। বার্নিশ করা কাঠের মত রঙ, লম্বা সরু আকৃতি, অত্যন্ত মজবুত। ব্যোমকেশ চাবি ঘুরাইয়া জোড়া কবাট খুলিয়া ফেলিল। আমি এবং নৃপেন সাগ্রহে ভিতরে উঁকি মারিলাম।

ভিতরে চারিটি থাক। সর্বোচ্চ থাকের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক সারি বই ; মাঝে মাঝে ভাঙা দাঁতের মত ফাঁক পড়িয়াছে। কয়েকটি বইয়ের পিঠে সোনার জলে নাম লেখা, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মহাজন পদাবলী। ব্যোমকেশ আরও কয়েকখানি বই বাহির করিয়া দেখিল, অধিকাংশই বটতলার বই, কিন্তু বাঁধাই ভাল। হয়তো প্রভাত বাঁধিয়া দিয়াছে।

ব্যোমকেশ নৃপেনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'অনাদি হালদার কি খুব বই পড়ত ?'

নৃপেন শুষ্কস্বরে বলিল, 'কোন দিন পড়তে দেখিনি।'

'বাড়িতে আর কেউ বই পড়ে ?'

'প্রভাতবাবু পড়েন। আমিও পেলে পড়ি। কিন্তু কর্তার আলমারিতে যে বই আছে, তা আমি কখনও চোখে দেখিনি।'

'অথচ বইয়ের সারিতে ফাঁক দেখে মনে হচ্ছে কয়েকখানা বই বার করা হয়েছে। কোথায় গেল বইগুলো ?'

নৃপেন ঘরের এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তা তো বলতে পারি না। এ-ঘরে দেখছি না। প্রভাতবাবুকে জিজ্ঞেস করব ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন থাক, এমন কিছু জরুরী কথা নয়।—আচ্ছা, বাইরে অনাদি হালদারের কোথায় বেশি যাতায়াত ছিল ?'

নৃপেন বলিল, 'কর্তা বাড়ি থেকে বড় একটা বেরুতেন না। যখন বেরুতেন, হয় সলিসিটারের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, নয়তো ব্যাঙ্কে যেতেন। এ ছাড়া আর বড় কোথাও যাতায়াত ছিল না।'

ব্যোমকেশ দ্বিতীয় থাকের প্রতি দৃষ্টি নামাইল।

দ্বিতীয় থাকে অনেকগুলি শিশি-বোতল রহিয়াছে। শিশিগুলি পেটেন্ট ঔষধের, বোতলগুলি বিলাতি মদ্যের। একটি বোতলের মদ্য প্রায় তলায় গিয়া ঠেকিয়াছে, অন্যগুলি সীল করা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদি হালদার মদ খেত ?'

নৃপেন বলিল, 'মাতাল ছিলেন না। তবে খেতেন। মাঝে মধ্যে গন্ধ পেয়েছি।'

ঔষধের শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল অধিকাংশই টনিক জাতীয় ঔষধ, অতীত যৌবনকে পুনরুদ্ধার করিবার বিলাতি মুষ্টিযোগ। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সন্ধ্যের পর বেড়াতে বেরুনোর অভ্যেস অনাদি হালদারের ছিল না ?'

নৃপেন বলিল, 'খুব বেশি নয়, মাসে দু'-তিন দিন বেরুতেন।'

'বাঃ! অনাদি হালদারের গোটা চরিত্রটি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। খাসা চরিত্র!' ব্যোমকেশ আলমারির তৃতীয় থাকে মন দিল।

তৃতীয় থাকে অনেকগুলি মোটা মোটা খাতা এবং কয়েকটি ফাইল। খাতাগুলি কার্ডবোর্ড দিয়া

মজবুত করিয়া বাঁধানো। খুলিয়া দেখা গেল ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাবের খাতা। ব্যবসায়ের রীতি প্রকৃতি জানিতে হইলে খাতাগুলি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করা প্রয়োজন ; কিন্তু তাহার সময় নাই। ব্যোমকেশ নৃপেনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'অনাদি হালদার কিসের ব্যবসা করত আপনি জানেন ?'

নৃপেন বলিল, 'আগে কি ব্যবসা করতেন জানি না, উনি নিজের কথা কাউকে বলতেন না। তবে যুদ্ধের গোড়ার দিকে জাপানী মাল কিনেছিলেন। কটন মিলে যেসব কলকব্জা লাগে, তাই। সস্তায় কিনেছিলেন—'

'তারপর কালাবাজারের দরে বিক্রি করেছিলেন। বুঝেছি।' ব্যোমকেশ একখানা ফাইল তুলিয়া লইয়া মলাট খুলিয়া ধরিল।

ফাইলে নানা জাতীয় দলিলপত্র রহিয়াছে। নূতন বাড়ির ইষ্টাম্বর দস্তাবেজ, সলিসিটারের চিঠি, বাড়িভাড়ার রসিদ ইত্যাদি। কাগজপত্রের উপর লঘুভাবে চোখ বুলাইতে বুলাইতে ব্যোমকেশ পাতা উল্টাইতে লাগিল, তারপর এক জায়গায় আসিয়া থামিল। একটি রুলটানা কাগজে কয়েক ছত্র লেখা, নীচে স্ট্যাম্পের উপর দস্তখত।

কাগজখানা ব্যোমকেশ ফাইল হইতে বাহির করিয়া লইল, মুখের কাছে তুলিয়া মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিল। আমি গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একটি হ্যান্ডনোট। অনাদি হালদার হাতচিঠির উপর দয়ালহরি মজুমদার নামক এক ব্যক্তিকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়াছে।

ব্যোমকেশ হ্যান্ডনোট হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, 'দয়ালহরি মজুমদার কে ?'

নৃপেন কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'দয়ালহরি—ও, মনে পড়েছে—' একটু কাছে সরিয়া আসিয়া খাটো গলায় বলিল, 'দয়ালহরিবাবুর মেয়েকে প্রভাতবাবু বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তারপর কর্তা মেয়ে দেখে অপছন্দ করেন—'

'মেয়ে বুঝি কুচ্ছিৎ ?'

'আমরা কেউ দেখিনি।'

'কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা ধার দেওয়ার মানে কি ?'

'জানি না ; হয়তো ওই জন্যেই—'

'ওই জন্যে কী ?'

'হয়তো, যাকে টাকা ধার দিয়েছেন, তার মেয়ের সঙ্গে কর্তা প্রভাতবাবুর বিয়ে দিতে চাননি।'

'হতে পারে। অনাদি হালদার কি তেজারতির কারবার করত ?'

'না। তাঁকে কখনও টাকা ধার দিতে দেখিনি।'

'হ্যান্ডনোটে তারিখ দেখছি ১১/৯/১৯৪৬, অর্থাৎ মাসখানেক আগেকার। অনাদি হালদার মেয়ে দেখতে গিয়েছিল কবে ?'

'প্রায় ওই সময়। তারিখ মনে নেই।'

'দয়ালহরি মজুমদার সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন ?'

'কিচ্ছু না। বাইরে শুনেছি মেয়েটি নাকি খুব ভাল গাইতে পারে, এরি মধ্যে খুব নাম করেছে। ওরা পূর্ববঙ্গের লোক, সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে।'

'তাই নাকি ! অজিত, দয়ালহরি মজুমদারের ঠিকানাটা মনে করে রাখ তো—' হাতচিঠি দেখিয়া পড়িল— '১৩/৩, রামতনু লেন, শ্যামবাজার।'

মনে মনে ঠিকানাটা কয়েকবার আবৃত্তি করিয়া লইলাম। ব্যোমকেশ আলমারির নিম্নতম থাকটি তদারক করিতে আরম্ভ করিল।

নীচের থাকে কেবল একটি কাঠের হাত-বাক্স আছে, আর কিছু নাই। হাত-বাক্সের গায় চাবি লাগানো। ব্যোমকেশ চাবি ঘুরাইয়া ডালা তুলিল। ভিতরে একগোছা দশ টাকার নোট, কিছু খুচরা টাকা-পয়সা এবং একটি চেক বহি।

ব্যোমকেশ নোটগুলি গণিয়া দেখিল। দুইশত ষাট টাকা। চেক বহিখানি বেশ পুরু, একশত চেকের বহি ; তাহার মধ্যে অর্ধেকের অধিক খরচ হইয়াছে। ব্যোমকেশ ব্যবহৃত চেকের

অর্ধাংশগুলি উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে প্রশ্ন করিল, 'ভারত ব্যাঙ্ক ছাড়া আর কোনও ব্যাঙ্কে অনাদি হালদার টাকা রাখত ?'

নৃপেন বলিল, 'তিনি কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন তা আমি জানি না।'

'আশ্চর্য ! নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, কন্‌ট্রাকটরকে টাকা দিত কি করে ?'

'ক্যাশ দিতেন। আমি জানি, কারণ আমি রসিদের খসড়া তৈরি করে কন্‌ট্রাকটরকে দিয়ে সই করিয়ে নিতাম। যেদিন টাকা দেবার কথা, সেদিন বেলা ন'টার সময় কর্তা বেরিয়ে যেতেন, এগারটার সময় ফিরে আসতেন। তারপর কন্‌ট্রাকটরকে টাকা দিতেন।'

'অর্থাৎ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে যেতেন ?'

'আমার তাই মনে হয়।'

'হুঁ। বাড়ির দরুন কন্‌ট্রাকটরকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে, আপনি জানেন ?'

নৃপেন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, 'প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রসিদগুলো বোধহয় ফাইলে আছে। যদি জানতে চান—'

ব্যোমকেশ চেক বহি রাখিয়া অর্ধ-স্বগত বলিল, 'ভারি আশ্চর্য !—না, চুলচেরা হিসেব দরকার নেই। চল অজিত, এ ঘরে দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখা হয়েছে।' বলিয়া সযত্নে আলমারি বন্ধ করিল।

এই সময় ননীবালা একটি বড় থালার উপর চার পেয়ালা চা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, 'এই নিন।—প্রভাত নিজের ঘরে শুয়ে আছে ; তার চা দিয়ে এসেছি।'

নৃপেন আলো নিভাইয়া দিল। জানালা দিয়া দেখা গেল বাহিরে বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

আমরা তিনজনে চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া বাহিরের ঘরে আসিলাম, কেষ্টবাবুর চায়ের পেয়ালা থালার উপর লইয়া ননীবালা আমাদের সঙ্গে আসিলেন।

বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া কেষ্টবাবু ঘুমাইতেছেন। ঘর্ঘর শব্দে তাঁহার নাক ডাকিতেছে।

ব্যালকনিতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, অনাদি হালদারের মৃত মুখের উপর সকালের আলো পড়িয়াছে। মাছিরা গন্ধ পাইয়া আসিয়া জুটিয়াছে।

সাত

চা শেষ করিয়া পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়াছি, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের সমবেত শব্দ শোনা গেল। এতক্ষণে বুঝি পুলিস আসিতেছে।

কিন্তু আমার অনুমান ভুল, পুলিসের এখনও ঘুম ভাঙে নাই। যাঁহারা প্রবেশ করিলেন তাঁহারা সংখ্যায় তিনজন ; একটি অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সঙ্গে নিমাই ও নিতাই। ভাগাড়ে মড়া পড়িলে বহু দূরে থাকিয়াও যেমন শকুনির টনক নড়ে, নিমাই ও নিতাই তেমনি খুল্লতাতের মহাপ্রস্থানের গন্ধ পাইয়াছে।

পায়ের শব্দে কেষ্টবাবুর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, তিনি চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিলেন। ভিতর দিক হইতে প্রভাতও প্রবেশ করিল।

প্রথমে দুই পক্ষ নির্বাকভাবে দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। নিমাই ও নিতাই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দুই পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের চক্ষু একে একে আমাদের পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া থামিয়া গেল ; দৃষ্টি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। বোধহয় তাহারা ব্যোমকেশকে চিনিতে পারিয়াছে।

প্রথমে ব্যোমকেশ কথা বলিল, 'আপনারা কি চান ?'

নিমাই ও নিতাই অমনি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দুই কানে ফুসফুস করিয়া কথা বলিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের অক্ষৌরিত মুখে কাঁচা-পাকা দাড়িগোঁফ কণ্টকিত হইয়াছিল ; অসময়ে ঘুম ভাঙানোর ফলে মেজাজও বোধকরি প্রসন্ন ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিয়া বিকৃতস্বরে বলিলেন, 'আপনি কে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পারিবারিক বন্ধু বলতে পারেন। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।'

তিনজনের চোখেই চকিত সতর্কতা দেখা দিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটু দম লইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'ডিটেক্‌টিভ ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যান্বেষী।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক গলার মধ্যে অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিলেন, তারপর প্রভাতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমরা খবর পেয়েছি অনাদি হালদার মশায়ের মৃত্যু হয়েছে। এরা দুই ভাই নিমাই এবং নিতাই হালদার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। এঁরা মৃতের সম্পত্তি দখল নিতে এসেছেন। এ বাড়ি আপনাদের ছেড়ে দিতে হবে।'

প্রভাত কিছুক্ষণ অবুঝের মত চাহিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই নাকি ? বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে ! কিন্তু আপনি কে তা তো জানা গেল না।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, 'আমি এদের উকিল কামিনীকান্ত মুস্তফী।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উকিল। তাহলে আপনার জানা উচিত যে অনাদি হালদারের ভাইপোরা তাঁর উত্তরাধিকারী নয়। তিনি পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন।'

উকিল কামিনীকান্ত নাকের মধ্যে একটি শব্দ করিলেন, ব্যোমকেশকে নিরতিশয় অবজ্ঞার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'আপনি যখন পারিবারিক বন্ধু আপনার জানা উচিত যে অনাদি হালদার মশায় পোষ্যপুত্র নেননি। মুখের কথায় পোষ্যপুত্র নেওয়া যায় না। দলিল রেজিস্ট্রি করতে হয়, যাগযজ্ঞ করতে হয়। অনাদি হালদার মশায় এসব কিছুই করেননি।—আপনাদের এক বস্ত্রে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, একটা কুটা নিয়ে যেতে পাবেন না। এখানে যা-কিছু আছে সমস্ত আমার মক্কেলদের সম্পত্তি।'

ব্যোমকেশ ক্ষণকালের জন্য যেন হতভম্ব হইয়া প্রভাতের পানে তাকাইল ; তারপর সে সামলাইয়া লইল। মুখে একটা বঙ্কিম হাসি আনিয়া বলিল, 'বটে ? ভেবেছেন হুমকি দিয়ে অনাদি হালদারের সম্পত্তিটা দখল করবেন। অত সহজে সম্পত্তি দখল করা যায় না উকিলবাবু। পোষ্যপুত্র নেয়া যে আইনসঙ্গত নয় সেটা আদালতে প্রমাণ করতে হবে, সাক্‌সেশন সার্টিফিকেট নিতে হবে, তবে দখল পাবেন। বুঝেছেন ?'

উকিলবাবু বলিলেন, 'আপনারা যদি এই দণ্ডে বাড়ি ছেড়ে না যান, আমি পুলিস ডাকব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিস ডাকবার দরকার নেই, পুলিস নিজেই এল বলে।—ভাল কথা, অনাদিবাবু যে মারা গেছেন এটা আপনারা এত শীগ্‌গির জানলেন কি করে ? এখনও দু'ঘন্টা হয়নি—'

হঠাৎ নিমাই নিতাইয়ের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, 'দু'ঘন্টা। কাকা মারা গেছেন রাত্তির এগারোটার সময়—' বলিয়াই অর্ধপথে থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ মধুর স্বরে বলিল, 'এগারোটার সময় মারা গেছেন। আপনি জানলেন কি করে ? মৃত্যুকালে আপনি উপস্থিত ছিলেন বুঝি ? হাতে বন্দুক ছিল ?'

নিমাই নিতাই একেবারে নীল হইয়া গেল। উকিলবাবু নিমাই (কিম্বা নিতাই)-কে ধমক দিয়া বলিলেন, 'তোমরা চুপ করে থাকো, বলাকওয়া আমি করব। আপনারা তাহলে দখল ছাড়বেন না। আচ্ছা, আদালত থেকেই ব্যবস্থা হবে।' বলিয়া তিনি মক্কেলদের বাহু ধরিয়া সিঁড়ির দিকে ফিরিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চললেন ? আর একটু সবুর করবেন না ? পুলিস এসে ভাইপোদের বয়ান নিশ্চয় শুনতে চাইবে। আপনারা কাল রাত্রি এগারোটার সময় কোথায় ছিলেন—'

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইবার পূর্বেই ভ্রাতুষ্পুত্রযুগল উকিলকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুতপদে

সিঁড়ি দিয়া অন্তর্হিত হইল। উকিল কামিনীকান্ত মুস্তফী ব্যোমকেশের প্রতি একটি গরল-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের অনুগমন করিলেন।

তাহাদের পদশব্দ নীচে মিলাইয়া যাইবার পর ব্যোমকেশ প্রভাতের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনি যে আইনত অনাদিবাবুর পোষ্যপুত্তুর নন একথা আগে আমাকে বলেননি কেন ?'

প্রভাত ক্ষুব্ধ মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় চুলকাইতে লাগিল। এইবার ননীবালা দেবী সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, তাঁহার মুখ শুকাইয়া যেন চুপ্‌সিয়া গিয়াছে, চোখে ড্যাবড্যাবে ব্যাকুলতা। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, ওরা যা বলে গেল তা কি সত্যি ? প্রভাত অনাদিবাবুর পুষ্যিপুত্তুর নয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সেই কথাই তো জানতে চাইছি ?—প্রভাতবাবু— ?'

প্রভাত ঠোঁট চাটিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল, 'আমি—আইন জানি না। প্রথমে কলকাতায় আসবার পর অনাদিবাবু আমাকে নিয়ে সলিসিটারের অফিসে গিয়েছিলেন। সেখানে শুনেছিলাম পুষ্যিপুত্তুর নিতে হলে দলিল রেজিস্ট্রি করতে হয়, হোম-যজ্ঞ করতে হয়। কিন্তু সে সব কিছু হয়নি।'

'তাহলে আপনি জানতেন যে আপনি অনাদিবাবুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নন ?'

'হ্যাঁ, জানতাম। কিন্তু ভেবেছিলাম—'

'ভেবেছিলেন মৃত্যুর আগে অনাদিবাবু দলিল রেজিস্ট্রি করে আপনাকে পুষ্যিপুত্তুর করে যাবেন ?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর ননীবালা দীর্ঘকম্পিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'তাহলে—তাহলে—প্রভাত কিছুই পাবে না। সব ওই নিমাই নিতাই পাবে !' ননীবালার বিপুল দেহ যেন সহসা শিথিল হইয়া গেল, তিনি মেঝেয় বসিয়া পড়িলেন।

প্রভাত ত্বরিতে গিয়া ননীবালার পাশে বসিল, গাঢ় হ্রস্ব স্বরে বলিল, 'তুমি ভাবছ কেন মা ! দোকান তো আছে। তাতেই আমাদের দু'জনের চলে যাবে।'

ননীবালা প্রভাতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। যাহোক, তবু অনাদি হালদারের মৃত্যুর পর একজনকে কাঁদিতে দেখা গেল।

ব্যোমকেশ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া তাহাদের নিরীক্ষণ করিল, তারপর ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'নৃপেনবাবু কোথায় ?'

এতক্ষণ নৃপেনের দিকে কাহারও নজর ছিল না, সে আবার নিঃসাড়ে অদৃশ্য হইয়াছে।

ব্যোমকেশ আমাকে চোখের ইশারা করিল। আমি নৃপেনের ঘরের দিকে পা বাড়াইয়াছি এমন সময় সে নিজেই ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'এই যে আমি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কোথায় গিয়েছিলেন ?'

'আমি—একবার ছাদে গিয়েছিলাম।' নৃপেনের মুখ দেখিয়া মনে হয় সে কোনও কারণে নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ছাদে ! তেতলার ছাদে ?'

'না, দোতলাতেই ছাদ আছে।'

'তাই নাকি ? চলুন তো, দেখি কেমন ছাদ।'

যে গলি দিয়া নৃপেনের ঘরে যাইবার রাস্তা তাহারই শেষ প্রান্তে একটি দ্বার ; দ্বারের ওপারে ছাদ। আলিসা দিয়া ঘেরা দাবার ছকের মত একটু স্থান। পিছন দিকে অন্য একটি বাড়ির দেয়াল, পাশে গলির পরপারে অনাদি হালদারের নূতন বাড়ি।

ছাদে দাঁড়াইয়া নূতন বাড়ির কাঠামো স্পষ্ট দেখা যায়, এমন কি দীর্ঘলম্ফের অভ্যাস থাকিলে এ-বাড়ি হইতে ও-বাড়িতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। নূতন বাড়ির দেয়াল দোতলার ছাদ পর্যন্ত উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গে ভারা বাঁধা।

আলিসার ধারে ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'ছাদের দরজা রাত্তিরে খোলা থাকে ?'

নৃপেন বলিল, 'খোলা থাকবার কথা নয়, কর্তা রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করতেন।'

'কাল রাত্রে বন্ধ ছিল ?'

'তা জানি না।'

'আপনি খানিক আগে যখন এসেছিলেন তখন খোলা ছিল, না, বন্ধ ছিল ?'

নৃপেন আকাশের দিকে তাকাইয়া গলা চুলকাইল, শেষে বলিল, 'কি জানি, মনে করতে পারছি না। মনটা অন্যদিকে ছিল—'

'হুঁ।'

আমরা ঘরে ফিরিয়া গেলাম। ননীবালা দেবী তখনও সর্বহারা ভঙ্গীতে মেঝেয় পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, প্রভাত মৃদুকণ্ঠে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছে। কেষ্টবাবু বিলম্বিত চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া নামাইয়া রাখিতেছেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিসের এখনও দেখা নেই। আমরা এবার যাই।—এস অজিত, যাবার আগে চাবিটা যথাস্থানে রেখে দেওয়া দরকার, নইলে পুলিস এসে হাঙ্গামা করতে পারে।'

ব্যালকনিতে গেলাম। মাছিরা দেহটাকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। ব্যোমকেশ নত হইয়া চাবিটা মৃতের কোমরে ঘুনসিতে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'ওহে অজিত, দ্যাখো।'

আমি ঝুঁকিয়া দেখিলাম কোমরের সুতার কাছে একটা দাগ, আধুলির মত আয়তনের লাল্‌চে একটা দাগ, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিসের দাগ ?'

ব্যোমকেশ দাগের উপর আঙুল বুলাইয়া বলিল, 'রক্তের দাগ মনে হয় কিন্তু রক্ত নয়। জড়ুল।'

মৃতদেহ ঢাকা দিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা চললাম। পুলিস এসে যা-যা প্রশ্ন করবে তার উত্তর দেবেন, বেশি কিছু বলতে যাবেন না। আমি যে আলমারি খুলে দেখেছি তা বলবার দরকার নেই। নিমাই নিতাই যদি আসে তাদের বাড়ি ঢুকতে দেবেন না।—কেষ্টবাবু, ওবেলা একবার আমাদের বাসায় যাবেন।'

কেষ্টবাবু ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জানাইলেন। আমরা নীচে নামিয়া চলিলাম। সূর্য উঠিয়াছে, শহরের সোরগোল শুরু হইয়া গিয়াছে।

আট

নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম সিঁড়ির ঘরে বৃদ্ধ ষষ্ঠীবাবু থেলো হুঁকা হাতে বিচরণ করিতেছেন, আমাদের দেখিয়া বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিলেন। প্রথমদিন যে উগ্রমূর্তি দেখিয়াছিলাম এখন আর তাহা নাই, বরং বেশ একটু সাগ্রহ কৌতূহলের ব্যঞ্জনা তাঁহার তোব্‌ড়ানো মুখখানিকে প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ব্যোমকেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনার নাম ষষ্ঠীবাবু ?'

তিনি সতর্কভাবে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিলেন, 'হ্যাঁ। আপনি—আপনারা— ?'

ব্যোমকেশ আত্ম-পরিচয় দিল না, সংক্ষেপে বলিল, 'আর বলবেন না মশায়। অনাদি হালদারের কাছে টাকা পাওনা ছিল, তা দেখছি টাকাটা ডুবল। লোকটা মারা গেছে শুনেছেন বোধহয়।'

ষষ্ঠীবাবুর সন্দিগ্ধ সতর্কতা দূর হইল। তিনি পরম তৃপ্তমুখে বলিলেন, 'শুনেছি। কাল রাত্তির

থেকেই শুনছি।—কিসে মারা গেল ?' শেষোক্ত প্রশ্ন তিনি গলা বাড়াইয়া প্রায় ব্যোমকেশের কানে কানে করিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'শোনেননি ? কেউ তাকে খুন করেছে।—আপনি তো কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় বসে ছিলেন শুনলাম—'

মুখে বিরক্তিসূচক চুমকুড়ি দিয়া ষষ্ঠীবাবু বলিলেন, 'কি করি, পাড়ার ছোঁড়াগুলো ঠিক বাড়ির সামনেই বাজি পোড়াতে শুরু করল। ওই দেখুন না, কত তুবড়ির খোল পড়ে রয়েছে। শুধু কি তুবড়ি ! চীনে পটকা দোদমার আওয়াজে কান ঝালাপালা। ভাবলাম ঘুম তো আর হবে না, বাজি পোড়ানোই দেখি।—তা কি করে খুন হল ? ছোরা-ছুরি মেরেছে নাকি ?'

ব্যোমকেশ প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিল, 'তাহলে আপনি সন্ধ্যের পর থেকে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় বসে ছিলেন। সে সময়ে কেউ অনাদি হালদারের কাছে এসেছিল ?'

'কেউ না। একেবারে রাত বারোটার পর ওই ছেলেটা আর তার মা এল, এসেই দোর ঠ্যাঙাতে শুরু করল। তারপর এল ন্যাপা। তারপর কেষ্ট দাস।'

'ইতিমধ্যে আর কেউ আসেনি ?'

'বাড়িতে কেউ ঢোকেনি। তবে—অনাদি হালদারের একটা ভাইপোকে একবার ওদিকে ফুটপাথের হোটেলের সামনে ঘুর-ঘুর করতে দেখেছি।'

'তাই নাকি ? তারপর ?'

'তারপর আর দেখিনি। অন্তত এ বাড়িতে ঢোকেনি।'

'ক'টার সময় তাকে দেখেছিলেন ?'

'তা কি খেয়াল করেছি। তবে গোড়ার দিকে তখনও হোটেলের দোতলায় বাবুরা জানলার ধারে বসে পাশা খেলছিল। দশটা কি সাড়ে দশটা হবে।—আচ্ছা, কে মেরেছে কিছু জানা গেছে নাকি ?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ হেঁটমুখে চিন্তা করিল, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'অনাদি হালদারের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল ?'

ষষ্ঠীবাবু চমকিয়া উঠিলেন, 'অ্যাঁ ! সদ্ভাব, মানে, অসদ্ভাবও ছিল না।'

'আপনি কাল রাত্রে ওপরে যাননি ?'

'আমি ! আমি ওপরে যাব ! বেশ লোক তো আপনি ? মতলব কি আপনার ?' ষষ্ঠীবাবু ক্রমশ তেরিয়া হইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

'অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে আপনি জানেন না ?'

'আমি কি জানি ! যে খুন করেছে সে জানে, আমি কি জানি। আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই ! আমি বুড়ো মানুষ, কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই, আমাকে ফাঁসাতে চান ?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া ফেলিল, 'আমি আপনাকে ফাঁসাতে চাই না, আপনি নিজেই নিজেকে ফাঁসাচ্ছেন। অনাদি হালদারের মৃত্যুতে এত খুশি হয়েছেন যে চেপে রাখতে পারছেন না।—চল অজিত, ওই হোটেলটাতে গিয়ে আর এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক।'

ষষ্ঠীবাবু থ হইয়া রহিলেন, আমরা ফুটপাথে নামিয়া আসিলাম। রাস্তার ওপারে হোটেলের মাথার উপর মস্ত পরিচয়-ফলক শ্রীকান্ত পান্থনিবাস। শ্রীকান্ত বোধহয় হোটেলের মালিকের নাম। নীচের তলায় রেস্তোরাঁয় চা-পিয়াসীর দল বসিয়া গিয়াছে, দ্বিতলে জানালার সারি, কয়েকটা খোলা। ব্যোমকেশ পথ পার হইবার জন্য পা বাড়াইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল, 'দাঁড়াও, গলির মধ্যেটা একবার দেখে যাই।'

'গলির মধ্যে কী দেখবে ?'

'এসই না।'

অনাদি হালদারের বাসা ও নূতন বাড়ির মাঝখান দিয়া গলিতে প্রবেশ করিলাম। একেই গলিটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত, তার উপর নূতন বাড়ির স্খলিত বিক্ষিপ্ত ইটসুরকি এবং ভারা বাঁধার খুঁটি

মিলিয়া তাহাকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। ব্যোমকেশ মাটির দিকে নজর রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

গলিটি কানা গলি, বেশি দূর যায় নাই। তাহার শেষ পর্যন্ত গিয়া ব্যোমকেশ ফিরিল, আবার মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চলিতে লাগিল। তারপর অনাদি হালদারের বাসার পাশে পৌঁছিয়া হঠাৎ অবনত হইয়া একটা কিছু তুলিয়া লইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি পেলে ?'

সে মুঠি খুলিয়া দেখাইল, একটি চকচকে নূতন চাবি। বলিলাম, 'চাবি ! কোথাকার চাবি ?'

ব্যোমকেশ একবার ঊর্ধ্বে জানালার দিকে চাহিল, চাবিটি পকেটে রাখিয়া বলিল, 'হলফ নিয়ে বলতে পারি না, তবে সন্দেহ হয় অনাদি হালদারের আলমারির চাবি।'

'কিন্তু—'

'আন্দাজ করেছিলাম গলির মধ্যে কিছু পাওয়া যাবে। এখন চল, চা খাওয়া যাক।'

'কিন্তু, আলমারির চাবি তো—'

'অনাদি হালদারের কোমরে আছে। তা আছে। কিন্তু আর একটা চাবি থাকতে বাধা কি ?'

'কিন্তু, গলিতে চাবি এল কি করে ?'

'জানলা দিয়ে। —এস।' ব্যোমকেশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

শ্রীকান্ত পান্থনিবাসে প্রবেশ করিয়া একটি টেবিলে বসিলাম। ভৃত্য চা ও বিস্কুট দিয়া গেল। ভৃত্যকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল হোটেলের মালিক শ্রীকান্ত গোস্বামী পাশেই একটি ঘরে আছেন। চা বিস্কুট সমাপ্ত করিয়া আমরা নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকিলাম।

ঘরটি শ্রীকান্তবাবুর অফিস ; মাঝখানে টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার। শ্রীকান্তবাবু মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, চেহারা গোলগাল, মুণ্ডিত মুখ ; বৈষ্ণবোচিত প্রশান্ত ভাব। তিনি গত রাত্রির বাসি ফাউল কাটলেট সহযোগে চা খাইতেছিলেন, আমাদের আকস্মিক আবির্ভাবে একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

ব্যোমকেশ সবিনয়ে বলিল, 'মাফ করবেন, আপনিই কি হোটেলের মালিক শ্রীকান্ত গোস্বামী মশায় ?'

গোস্বামী মহাশয়ের মুখ ফাউল কাটলেটে ভরা ছিল, তিনি এক চুমুক চা খাইয়া কোনও মতে তাহা গলাধঃকরণ করিলেন, বলিলেন, 'আসুন। আপনারা— ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটু দরকারে এসেছি। সামনের বাড়িতে কাল রাত্রে খুন হয়ে গেছে শুনেছেন বোধহয় ?'

'খুন !' শ্রীকান্তবাবু ফাউল কাটলেটের প্লেট পাশে সরাইয়া দিলেন, 'কে খুন হয়েছে ?'

'১৭২/২ নম্বর বাড়িতে থাকত—অনাদি হালদার।'

শ্রীকান্তবাবু চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, 'অনাদি হালদার খুন হয়েছে ! বলেন কি !'

'তাকে আপনি চিনতেন ?'

'চিনতাম বৈকি। সামনের বাড়ির দোতলায় থাকত, নতুন বাড়ি তুলছিল। প্রায় আমার হোটেলে এসে চপ কাটলেট খেত। —কাল রাত্তিরেও যে তাকে দেখেছি।'

'তাই নাকি ! কোথায় দেখলেন ?'

'ওর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রাস্তায় বাজি পোড়ানো দেখছিল। যখনই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছি তখনই দেখেছি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কখন কোথা থেকে কি দেখলেন সব কথা দয়া করে বলুন। আমি অনাদি হালদারের খুনের তদন্ত করছি। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।'

শ্রীকান্তবাবু বিস্ময়াপ্লুত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আপনি ব্যোমকেশবাবু ! কি সৌভাগ্য।' তিনি ভৃত্য ডাকিয়া আমাদের জন্য চা ও ফাউল কাটলেট হুকুম দিলেন। আমরা

এইমাত্র চা বিস্কুট খাইয়াছি বলিয়াও পরিত্রাণ পাওয়া গেল না।

তারপর শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'আমার হোটেলের দোতলায় দুটো ঘর নিয়ে আমি থাকি, বাকি তিনটে ঘরে কয়েকজন ভদ্রলোক মেস করে আছেন। সবসুদ্ধ এগারজন। তার মধ্যে তিনজন কালীপুজোর ছুটিতে দেশে গেছেন, বাকি আটজন বাসাতেই আছেন। কাল সন্ধ্যের পর ১ নম্বর আর ৩ নম্বর ঘরের বাবুরা ঘরে তালা দিয়ে শহরে আলো দেখতে বেরুলেন। ২ নম্বর ঘরের যামিনীবাবুরা তিনজন বাসাতেই রইলেন। ওঁদের খুব পাশা খেলার শখ। আমিও খেলি। কাল সন্ধ্যে সাতটার পর ওঁরা আমাকে ডাকলেন, আমরা চারজন যামিনীবাবুর তক্তপোশে পাশা খেলতে বসলাম। যামিনীবাবুর তক্তপোশ ঠিক রাস্তার ধারে জানলার সামনে। সেখানে বসে খেলতে খেলতে যখনই বাইরের দিকে চোখ গেছে তখনই দেখেছি অনাদি হালদার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাজি পোড়ানো দেখছে। আমরা তিন দান খেলেছিলাম, প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত খেলা চলেছিল।'

'তারপর আর অনাদি হালদারকে দেখেননি ?'

'না, তারপর আমরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম, অনাদি হালদারকে আর দেখিনি।'

'যে বাবুরা আলো দেখতে বেরিয়েছিলেন তাঁরা কখন ফিরলেন ?'

'তাঁদের মধ্যে দু'জন ফিরেছিলেন রাত বারোটার সময়, বাকি বাবুরা এখনও ফেরেননি।'

'এখনও আলো দেখছেন ।'

শ্রীকান্তবাবু অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; মনুষ্য জাতির ধাতুগত দুর্বলতা সম্বন্ধে বোধকরি নীরবে খেদ প্রকাশ করিলেন।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে কাটলেট চিবাইল, তারপর বলিল, 'দেখুন, অনাদি হালদারের লাশ পাওয়া গেছে ওই ব্যালকনিতেই, বুকে বন্দুকের গুলি লেগে পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। তা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে আপনার হোটেল থেকে কেউ বন্দুক ছুঁড়ে অনাদি হালদারকে মেরেছে—'

শ্রীকান্তবাবু আবার চক্ষু কপালে তুলিলেন—'আমার হোটেল থেকে! সে কি কথা! কে মারবে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা আন্দাজ মাত্র। আপনি বলছেন সন্ধ্যে সাতটা থেকে আপনারা চারজন ছাড়া দোতলায় আর কেউ ছিল না। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ?'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'মেসের বাসিন্দা আর কেউ ছিল না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তবে—দাঁড়ান। একটা চাকর দোতলার কাজকর্ম করে, সে বলতে পারবে। হরিশ! ওরে কে আছিস হরিশকে ডেকে দে।'

কিছুক্ষণ পরে হরিশ আসিল, ছিটের ফতুয়া পরা আধ-বয়সী লোক। শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'কাল সন্ধ্যে থেকে তুই কোথায় ছিলি ?'

হরিশ বলিল, 'আজ্ঞে, ওপরেই তো ছিলুম বাবু, সারাক্ষণ সিঁড়ির গোড়ায় বসেছিলুম। আপনারা শতরঞ্চি খেলতে বসলেন—'

'কতক্ষণ পর্যন্ত ছিলি ?'

'আজ্ঞে, রাত দুপুরে ধীরুবাবু আর মানিকবাবু ফিরলেন, তখন আমি সিঁড়ির পাশেই কম্বল পেতে শুয়ে পড়লুম। কোথাও তো যাইনি বাবু।'

শ্রীকান্তবাবু ব্যোমকেশের দিকে তাকাইলেন, ব্যোমকেশ হরিশকে প্রশ্ন করিল, 'বাবুরা পাশা খেলতে আরম্ভ করবার পর থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তুমি সারাক্ষণ সিঁড়ির কাছে বসেছিলে, একবারও কোথাও যাওনি ?'

হরিশ বলিল, 'একবারটি পাঁচ মিনিটের জন্যে নীচে গেছলুম যামিনীরাবুর জন্যে দোক্তা আনতে।'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যানিমনীবাবু ওকে একবার দোক্তা আনতে পাঠিয়েছিলেন

বটে।'

'সে কখন ? ক'টার সময় ?'

'আজ্ঞে, রাত্তির তখন ন'টা হবে।'

'হুঁ। রাত্রি ন'টা থেকে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত দোতলায় কেউ আসেনি ?'

'দোতলায় কেউ আসেনি বাবু। দশটা নাগাদ তেতলার ভাড়াটে বাবু এসেছিলেন, কিন্তু তিনি দোতলায় দাঁড়াননি, সটান তেতলায় উঠে গেছলেন।'

ব্যোমকেশ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্রীকান্তবাবুর পানে চাহিল। তিনি বলিলেন, 'ওহো, তেতলার ভাড়াটের কথা বলা হয়নি। তেতলায় একটা ছোট ঘর আছে, চিলেকোঠা বলতে পারেন। এক ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছেন। ঘরে পাকাপাকি থাকেন না, খাওয়া-দাওয়া করেন না। তবে রোজ সকাল-বিকেল আসেন, ঘরের মধ্যে দোর বন্ধ করে কি করেন জানি না, তারপর আবার তালা লাগিয়ে চলে যান। একটু অদ্ভুত ধরনের লোক।'

'নাম কি ভদ্রলোকের ?'

'নাম ? দাঁড়ান বলছি—' শ্রীকান্তবাবু একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া দেখিলেন—'নিত্যানন্দ ঘোষাল।'

'নিত্যানন্দ ঘোষাল !' ব্যোমকেশ একবার আড়চোখে আমার পানে চাহিল—'রোজ দু'বেলা যখন আসেন তখন কলকাতার লোক বলেই মনে হচ্ছে। কতদিন আছেন এখানে ?'

'প্রায় ছ' মাস। নিয়মিত ভাড়া দেন, কোনও হাঙ্গামা নেই।'

'কি রকম চেহারা বলুন তো ?'

'মোটাসোটা গোলগাল।'

ব্যোমকেশ আবার আমার পানে কটাক্ষপাত করিয়া মুচকি হাসিল—'চেনা-চেনা ঠেকছে—' হরিশকে বলিল, 'নিত্যানন্দবাবু দশটা নাগাদ এসেছিলেন ? তোমার সঙ্গে কোনও কথা হয়েছিল ?'

হরিশ বলিল, 'আজ্ঞে না, উনি কথাবার্তা বলেন না। ব্যাগ হাতে সটান তেতলায় উঠে গেলেন।'

'ব্যাগ !'

'আজ্ঞে। উনি যখনই আসেন সঙ্গে চামড়ার ব্যাগ থাকে।'

'তাই নাকি ! কত বড় ব্যাগ ?'

'আজ্ঞে, লম্বা গোছের ব্যাগ ; সানাই বাঁশী রাখার ব্যাগের মত।'

'ক্ল্যারিওনেট রাখার ব্যাগের মত ? ভদ্রলোক তেতলার ঘরে নিরিবিলি বাঁশী বাজানো অভ্যেস করতে আসেন নাকি ?'

'আজ্ঞে, কোনও দিন বাজাতে শুনিনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল। তারপর মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, 'কাল রাত্রে উনি কখন ফিরে গেলেন ?'

'ঘণ্টাখানেক পরেই। খুব ব্যস্তসমস্তভাবে তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।'

'ও !—আচ্ছা, তুমি এবার যেতে পারো।' হরিশ শূন্য পেয়ালা প্লেট প্রভৃতি লইয়া প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ শ্রীকান্তবাবুকে বলিল, 'ওপরতলাগুলো একবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপত্তি আছে কি ?'

'বিলক্ষণ, আপত্তি কিসের ? আসুন।' শ্রীকান্তবাবু আমাদের উপরতলায় লইয়া চলিলেন।

দ্বিতলে পাশাপাশি পাঁচটি বড় বড় ঘর, সামনে টানা বারান্দা। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই প্রথম দুটি ঘর শ্রীকান্তবাবুর। দ্বারে তালা লাগানো ছিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি একলা থাকেন ?'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'আপাতত একলা। স্ত্রীকে ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। যা দিনকাল।'

'বেশ করেছেন।'

এক নম্বর ঘরে তালা লাগানো, বাবুরা এখনও ফেরেন নাই। দু' নম্বর ঘরে তিনটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রহিয়াছেন। একজন মেঝেয় বসিয়া জুতা পালিশ করিতেছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দাড়ি কামাইতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি খোলা জানালার ধারে বিছানায় কাত হইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। জানালা দিয়া রাস্তার ওপারে অনাদি হালদারের বাসা সোজাসুজি দেখা যাইতেছে। ব্যালকনির ভিতর দৃষ্টি প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঢালাই লোহার ঘন রেলিং-এর ভিতর দিয়া কিছু দেখা গেল না।

তিন নম্বর ঘরে ধীরুবাবু ও মানিকবাবু সবেমাত্র বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন এবং তুড়ি দিয়া হাই তুলিতেছেন। শ্রীকান্তবাবু সহাস্যে বলিলেন, 'কী, ঘুম ভাঙল ?'

দু'জনে বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া আড়মোড়া ভাঙিলেন।

ব্যোমকেশ কাহাকেও কোনও প্রশ্ন করিল না, দ্বিতল পরিদর্শন করিয়া সিঁড়ির দিকে ফিরিয়া চলিল। একই সিঁড়ি ত্রিতলে গিয়াছে, তাহা দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। শ্রীকান্তবাবু ও আমি পিছনে রহিলাম।

ত্রিতলে একটি ঘর, বাকি ছাদ খোলা। ঘরের দরজায় তালা লাগানো।

ব্যোমকেশ শ্রীকান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার কাছে চাবি আছে নাকি ?'

'না। তবে—' তিনি পকেট হইতে চাবির একটা গোছা বাহির করিয়া বলিলেন, 'দেখুন যদি কোন চাবি লাগে। ভাড়াটের অবর্তমানে তার ঘর খোলা বোধহয় উচিত নয়, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়—'

চাবির গোছা লইয়া ব্যোমকেশ কয়েকটা চাবি লাগাইয়া দেখিল। সস্তা তালা, বেশি চেষ্টা করিতে হইল না, খুট করিয়া খুলিয়া গেল।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের একটিমাত্র জানালা রাস্তার দিকে খোলা রহিয়াছে। আসবাবের মধ্যে একটি উলঙ্গ তক্তপোশ ও একটি লোহার চেয়ার। আর কিছু নাই।

ব্যোমকেশ কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া প্রথমেই জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। নীচে প্রশস্ত রাস্তার উপর মানুষ ও যানবাহনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। ওপারে অন্যান্য বাড়ির সারির মধ্যে অনাদি হালদারের ব্যালকনি।

ব্যোমকেশ সেই দিকে চাহিয়া কতকটা আপন মনেই বলিল, 'কাল রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময়...রাস্তায় ছেলেরা বাজি পোড়াচ্ছে...চারিদিকে দুমদাম শব্দ—অনাদি হালদার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাজি পোড়ানো দেখছে...সেই সময় জানলা থেকে তাকে গুলি করা কি খুব শক্ত ? গুলির আওয়াজ শোনা গেলেও বোমা ফাটার আওয়াজ বলেই মনে হবে।'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'তা বটে। কিন্তু হোটেলে এত লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বন্দুক আনা কি সহজ ?'

'আপনার ভাড়াটে হাতে ব্যাগ নিয়ে হোটেলে আসে। ব্যাগের মধ্যে একটা পিস্তল কিম্বা রিভলবার সহজেই আনা যায়।'

'কিন্তু রাইফেল কিম্বা বন্দুক আনা যায় কি ? আমাকে মাফ করবেন, আমি অদ্বৈত বংশের সন্তান, গোলাগুলি বন্দুক পিস্তলের ব্যাপার কিছুই বুঝি না। তবু মনে হয়, পিস্তল কিংবা রিভলবার দিয়ে এতদূর থেকে মানুষ মারা সহজ কাজ নয়।'

উত্তরে ব্যোমকেশ কেবল গলার মধ্যে একটা শব্দ করিল। তারপর নিরাভরণ ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, 'চলুন, যাওয়া যাক, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—' বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। দেখিলাম তাহার দৃষ্টি দেয়ালের একটা স্থানে আটকাইয়া গিয়াছে।

জানালার ঠিক উল্টা পিঠে দেয়ালের ছাদের কাছে খানিকটা চুন বালি খসিয়া গিয়াছে। তাহার নীচে মেঝের উপর খসিয়া-পড়া চুন বালি পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশ ত্বরিতে গিয়া চুন বালি পরীক্ষা করিল, বলিল, 'নতুন খসেছে মনে হচ্ছে। শ্রীকান্তবাবু, এ ঘর রোজ ঝাঁটপাট দেওয়া

হয় ?'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'না। ঘর খোলা থাকে না—'

ব্যোমকেশ দু' পা সরিয়া আসিয়া ঊর্ধ্বমুখে চাহিয়া রহিল।

'দেয়ালের এই চুন-বালি কবে খসেছে আপনি বলতে পারেন না ?'

'না। এইটুকু বলতে পারি ছ' মাস আগে যখন ঘর ভাড়া দিয়েছিলাম তখন প্ল্যাস্টার ঠিক ছিল।'

'হুঁ। অজিত, চৌকিটা ধরতো, একবার দেখি—'

দু'জনে চৌকি ধরিয়া দেয়ালে ঘেঁষিয়া রাখিলাম ; তাহার উপর লোহার চেয়ার রাখিয়া ব্যোমকেশ তদুপরি আরোহণ করিল। সেখান হইতে হাত বাড়াইয়া দেয়ালের ক্ষতস্থানটার নাগাল পাওয়া যায়। ব্যোমকেশ আঙুল দিয়া স্থানটা হাতড়াইল, তারপর একটি ক্ষুদ্র বস্তু হাতে লইয়া নামিয়া আসিল। পেন্সিলের ক্যাপের মত লম্বাটে আকৃতির একটি ধাতব পদার্থ, তাহার গায়ে রাইফেলের পেঁচানো রেখাচিহ্ন।

রাইফেলের টোটা। ব্যোমকেশ সেটি ঘুরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, 'এ বস্তু এখানে এল কি করে ? কবে এল ?—ঘরের মধ্যে কেউ রাইফেল ছুঁড়েছিল ? কিম্বা—' ব্যোমকেশ জানালার দিকে চাহিল, 'অনাদি হালদার যদি ব্যালকনি থেকে জানালা লক্ষ্য করে রাইফেল ছুঁড়ে থাকে তাহলে গুলিটা দেয়ালের ওই জায়গায় লাগা সম্ভব। অথবা—'

নয়

বাসায় ফিরিতে দেরি হইল। রাত্রি সাড়ে তিনটা হইতে বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই।

ফিরিয়া আসিয়াই ব্যোমকেশ খবরের কাগজ লইয়া বসিয়া গেল। আমি কয়েকবার অনাদি-প্রসঙ্গ আলোচনার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে গায়ে মাখিল না। একবার অন্যমনস্কভাবে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, 'আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ ?'

আমি রাগ করিয়া নিরুত্তর হইলাম। কুক্ষণে খোকাকে একখানি আবোল-তাবোল কিনিয়া দিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ বইখানি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে এবং সময়ে অসময়ে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছে।

গত রাত্রে নিদ্রায় ঘাটতি পড়িয়াছিল, দুপুরবেলা তাহা পূরণ করিয়া লইলাম। বৈকালের চা পান করিতে বসিয়া ব্যোমকেশ নিজেই কথা পাড়িল, 'কেষ্টবাবুর এখনও দেখা নেই। মনে হচ্ছে সবাই গা এলিয়ে দিয়েছে।'

বলিলাম, 'কেষ্টবাবুর যখন গলায় কাঁটা বিঁধেছিল, তখন ছুটে এসেছিল। এখন বোধহয় কাঁটা বেরিয়ে গেছে তাই গা-ঢাকা দিয়েছে।'

'তাই হবে। কিন্তু ওরা যদি না আসে, আমিই বা কি করতে পারি। কেসটা বেশ রহস্যময়—'

'কে খুন করেছে এখনও বুঝতে পারনি ?'

'উঁহু। কিন্তু যেই করুক, খুব ভেবেচিন্তে আটঘাট বেঁধে করেছে। কালীপুজোর রাত্তির, চতুর্দিকে বোমা ফাটার শব্দ, তার মধ্যে একটি বন্দুকের আওয়াজ। প্ল্যান করে খুন না করলে এমন যোগাযোগ হয় না।'

'কে এমন প্ল্যান করতে পারে ?'

'কে না করতে পারে। সকলেরই স্বার্থ রয়েছে, সকলেরই সুযোগ রয়েছে।'

'সকলে কারা ?'

'একে একে ধর। প্রথমে ধর নিমাই নিতাই। খুড়ো পুষ্যিপুত্তুর নিলেই খুড়োর সম্পত্তি বেহাত

হয়ে যায়, অতএব খুড়োকে পুষ্যিপুত্তুর নেবার আগেই সরানো দরকার। নিমাই নিতাইয়ের মধ্যে একজন শ্রীকান্ত হোটেলের চূড়োয় আড্ডা গাড়ল, বন্দুক নিয়ে ওৎ পেতে রইল। কালীপুজোর রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে বন্দুকের গুলি ছুটল। খুড়ো কুপোকাৎ। কাম ফতে।'

'তাহলে ভাইপোরাই খুন করেছে, অন্য কারুর ওপর সন্দেহের কারণ নেই।'

'কারণ যথেষ্ট আছে। শ্রীকান্ত হোটেলের তেতলার ঘরে রাইফেলের গুলি এল কোথা থেকে ? ওই ঘর থেকে বন্দুক ছোঁড়া হয়েছিল এটা একটা অনুমান বটে, কিন্তু অনিবার্য অনুমান নয়। ভেবে দেখ, অনাদি হালদার ব্যালকনিতে যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তার পেছনেই দরজা। পিছন থেকে গুড়ি মেরে এসে কেউ যদি তাকে গুলি করে, তাহলে গুলিটা তার শরীর ফুঁড়ে শ্রীকান্ত হোটেলের তেতলার ঘরের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকবে এবং দেয়ালে আটকে যাবে।'

'সম্ভব বটে। কিন্তু গোড়াতেই তো গলদ। অনাদি হালদারের বাসায় সে ছাড়া আর কেউ ছিল না, দরজা ভিতর দিক থেকে বন্ধ ছিল। তাছাড়া আর একটা কথা, গুলিটা অনাদি হালদারের বুকের দিক দিয়ে ঢুকে পিঠের দিক দিয়ে বেরিয়েছিল, না পিঠের দিক দিয়ে ঢুকে বুকের দিক দিয়ে বেরিয়েছিল ?'

'সেটা পোস্ট-মর্টেম না হওয়া পর্যন্ত জানা যাবে না। কিন্তু যেদিক দিয়েই গুলি ঢুকুক, ব্যালকনিতে গুলিটা পাওয়া যায়নি। তা থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, বাসার ভিতর দিক থেকেই অনাদি হালদারকে গুলি করা হয়েছে।'

'আচ্ছা, তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক যে, বাসার ভিতর থেকেই কেউ গুলি চালিয়েছে। কিন্তু লোকটা কে ?'

'সেইটেই আসল প্রশ্ন। দেখা যাক কার স্বার্থ আছে। কেষ্ট দাসের কোনও স্বার্থ আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। কিন্তু লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত এবং পাজি, হয়তো দোষ কাটাবার জন্যেই শেষ রাত্রে আমার কাছে ছুটে এসেছিল। সুতরাং তাকেও বাদ দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় হল ননীবালা দেবী।'

'ননীবালা !'

'ননীবালা দেবীটি জবরদস্ত মহিলা। পালিত পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ খাঁটি মাতৃস্নেহের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তিনি জানতেন না যে প্রভাতের পোষ্যপুত্র গ্রহণের ব্যাপারে আইনঘটিত খুঁত আছে। সুতরাং তিনি ভাবতে পারেন যে অনাদি হালদারকে সরাতে পারলেই প্রভাত সম্পত্তি পাবে। এবং তাকে মারবার চেষ্টা আর কেউ করবে না। তোমার মনে আছে কিনা জানি না, ননীবালা যেদিন দ্বিতীয়বার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, সেদিন আমি বলেছিলাম, অনাদি হালদারের মৃত্যুতে অনেকের সুবিধে হতে পারে। হয়তো সেই কথাটাই ননীবালার প্রাণে গেঁথে গিয়েছিল।'

'কিন্তু—মেয়েমানুষ বন্দুক চালাবে ?'

'কেন চালাবে না ? বন্দুক চালানোর মধ্যে শক্তটা কোন্খানে ? হারমোনিয়াম যেমন টিপলেই সুর বেরোয়, বন্দুক তেমনি টিপলেই গুলি বেরোয়। ওর চেয়ে কুমড়ো-ছেঁচকি রাঁধা ঢের বেশি কঠিন কাজ।'

'কিন্তু ননীবালা তো 'জয় মা কালী' দেখছিলেন।'

'তিনি 'জয় মা কালী' দেখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সারাক্ষণ প্রেক্ষাগৃহে ছিলেন, তার প্রমাণ কৈ ? তাঁর সঙ্গে পরিচিত কেউ ছিল না, হয়তো ছবি আরম্ভ হবার পর তিনি অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়েছিলেন, তারপর কাজকর্ম সেরে আবার গিয়ে বসেছিলেন।'

'তিনি বন্দুক কোথায় পেলেন ?'

'হায় মূর্খ ! বাঁটুল সর্দারের মত গণ্ডাগণ্ডা গুণ্ডা যেখানে চোরাই বন্দুক পাচার করবার জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, সেখানে বন্দুকের অভাব ? পাঁচ টাকা খরচ করলে বন্দুক ভাড়া পাওয়া যায়।'

'হুঁ। তারপর ?'

'তারপর প্রভাত। প্রভাত অবশ্য জানত যে সে অনাদি হালদারের পুষ্যিপুত্তুর নয়, কিন্তু তার অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তার নিজস্ব দোকান আছে, অনাদি হালদার মরে গেলেও তার মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। সে ভাবতে পারে অনাদি হালদারের মৃত্যুর পর তার ভাইপো'রা আর তার কোনও অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে না। ভাইপোদের হাত থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই হয়তো সে অনাদি হালদারকে মেরেছে।'

'এটা খুব জোরালো মোটিভ তুমি মনে কর ?'

'খুব জোরালো মোটিভ না হতে পারে, কিন্তু তিল কুড়িয়ে তাল হয়। প্রভাত একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, অনাদি হালদার সে সম্বন্ধ ভেঙে দেয়। এটাও সামান্য মোটিভ নয়।'

আমি হাসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'হেসো না। তোমার কাছে যা তুচ্ছ, অন্যের কাছে তা পর্বতপ্রমাণ হতে পারে। কখনও প্রেমে পড়নি, প্রেম কি বস্তু জান না। প্রেমের জন্যে মানুষ খুন করতে পারে, ফাঁসি যেতে পারে, সর্বস্ব খোয়াতে পারে—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, মেনে নিলাম প্রভাতও খুন করতে পারে।'

'তবে একটা কথা আছে। প্রভাত সারাক্ষণ তার দোকানে ছিল, দোকানের দরজায় গুর্খা দরোয়ান ছিল। তার এই অ্যালিবাই যদি পাকা হয়—'

'পাকা হওয়াই সম্ভব। প্রভাত এমন মিথ্যে কথা বলবে না যা সহজেই ধরা যায়। তারপর বল।'

'তারপর ন্যাপা।' ব্যোমকেশ পকেট হইতে কুড়াইয়া পাওয়া চাবিটি বাহির করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল, 'দুটো খবর নিশ্চয়ভাবে জানা দরকার : এটা অনাদি হালদারের চাবি কিনা এবং এটা গলিতে কে ফেলেছিল।'

বলিলাম, 'ন্যাপার ওপরই তোমার সন্দেহ, কেমন ? মনে করা যাক, এটা অনাদি হালদারের আলমারির চাবি এবং ন্যাপা এটা গলিতে ফেলেছিল। তাতে কী প্রমাণ হয় ?'

'প্রমাণ হয়তো কিছুই হয় না, কিন্তু ন্যাপার ওপর সন্দেহ হয়। আলমারিতে হয়তো অনেক নগদ টাকা ছিল—'

এ আবার এক নূতন সম্ভাবনা। প্রশ্ন করিলাম, 'দাঁড়ালো কি ? আসামী কে ? নিমাই নিতাই ? কেষ্টবাবু ? ননীবালা ? প্রভাত ? ন্যাপা ? না আর কেউ ?'

'আর একজন হতে পারে।'

'আবার কে ?'

'বাঁটুল সর্দার।'

'বাঁটুল ! সে কেন অনাদি হালদারকে খুব করবে ?'

'প্রাণরক্ষার ওজুহাতে চাঁদা আদায় করা বাঁটুলের পেশা। অনাদি হালদার চাঁদা দেওয়া বন্ধ করেছিল। তার দেখাদেখি যদি অন্য সকলে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে ? তাই অনাদি হালদারকে শাস্তি দেওয়া দরকার, তার পরিণাম দেখে আর সকলে শায়েস্তা থাকবে।'

পুঁটিরাম আসিয়া চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া গেল। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'বাঁশ বনে ডোম কানা। শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী কারে রেখে কারে ফেলি।'

দুইজনে নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলাম। ঘড়িতে যখন সওয়া চারটে, তখন দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল।

দ্বার খুলিয়া দেখিলাম কেষ্টবাবু। শেষ পর্যন্ত কেষ্টবাবু আসিয়াছেন। কিন্তু এ কেষ্টবাবু সকালবেলার ভয়বিমূঢ় মদ্যবিহ্বল কেষ্টবাবু নয়, চটপটে স্মার্ট কেষ্টবাবু। গায়ে ধোপদুরস্ত জামাকাপড়, দস্তুর মুখে আত্মপ্রসন্ন মৃদুমন্দ হাসি। মানুষটা যেন আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে।

তিনি ব্যোমকেশের সম্মুখের চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন। ব্যোমকেশ চাবিটি হাতে তুলিয়া ধরিয়া নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করিতেছিল, চোখ তুলিয়া বলিল, 'খবর কি ? পুলিস এসেছিল ?'

কেষ্টবাবু চাবিটি দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে-চোখে কোনও প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ পাইল না। প্রশ্নের উত্তরে তিনি মুখে চটকার শব্দ করিয়া বলিলেন, 'এগারোটার সময় এসেছিল। কী রামরাজত্বে বাস করছি আমরা।'

চাবি পকেটে রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তারপর কি হল ?'

'কি আর হবে। দারোগা সকলকে হুমকি দিলে, অনাদির আলমারিটা খুলে দেখলে, একগোছা নোট ছিল পকেটে পুরলে, তারপর লাশ তুলে নিয়ে চলে গেল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনাদের কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে না ?'

'কাল রাত্রে কে কোথায় ছিলাম জিজ্ঞেস করেছিল, আর কিছু নয়। একছত্র লিখেও নিলে না। দুম দুম করে এল, দুম দুম করে চলে গেল।'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক, অনাদি হালদারের বেশ সদ্গতি হল। কে মেরেছে তা জানা যাবে না, পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ভালই হল, আপনাদের ভুগতে হবে না।'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'ভাল যাদের হবার তাদের হল, আমার আর কি ভাল হল, ব্যোমকেশবাবু ? আমাকে বেশিদিন ওখানে টিকতে হবে না।'

'কেন ?'

'ননীবালা পেছনে লেগেছে, আমাকে তাড়াতে চায়। এখন তো আর অনাদি নেই, মাগীর বিক্রম বেড়েছে। দেখুন না, বেরুবার সময় বললাম, এক পেয়ালা চা করে দেবে ? তা মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল, চা-টা এখন হবে না, দোকানে গিয়ে চা খাওগে।'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আপনি এখন কি করবেন মনে করেছেন ?'

'কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কাজকর্ম তো আর এ-বয়সে পোষাবে না।' বলিয়া কেষ্টবাবু দুই সারি দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার বয়স এমন কী বেশি হয়েছে—কাজ করবার বয়স যায়নি।'

'কাজ করার অভ্যেস ছেড়ে গেছে, ব্যোমকেশবাবু। হ্যা হ্যা, আচ্ছা, আজ উঠি তাহলে।' বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।

'বসুন, বসুন, চা খেয়ে যান।'

কেষ্টবাবু আবার বসিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে ডাকিয়া চা ও জলখাবার আনিতে বলিল।

কেষ্টবাবু হৃষ্টমুখে বলিলেন, 'আপনি ভদ্রলোক, তাই দরদ বুঝলেন। সবাই কি বোঝে ? দুনিয়া স্বার্থপর, গলা টিপে না ধরলে কেউ কিছু দেয় না। অনাদি যে আমাকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে—' তিনি ব্যোমকেশের পানে আড়নয়নে চাহিলেন, 'চা খুবই ভাল জিনিস, তবে কি জানেন, আমার একটা বদ্অভ্যেস হয়ে গেছে, বিকেলবেলার দিকে শুধু চায়ে আর মৌতাত জমে না।' বলিয়া হ্যা হ্যা করিয়া হাসিলেন।

ইঙ্গিতটা ব্যোমকেশ এড়াইয়া গেল। বলিল, 'পুলিস ছাড়া আর কেউ এসেছিল নাকি ? নিমাই নিতাই ?'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'নিমাই নিতাই আর আসেনি। তবে গুরুদত্ত সিং এসে খানিকটা চেঁচামেচি করে গেল।'

'গুরুদত্ত সিং, কন্ট্রাকটর—'

'হ্যাঁ। পুলিস চলে যাবার পরই সে এসে হাজির। চেঁচাতে লাগল, আমি পঞ্চাশ হাজার টাকার কাজ করেছি, মোটে ত্রিশ হাজার পেয়েছি, আজ অনাদি হালদার দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল, সে মরে গেছে, এখন কে দেবে টাকা। আমি বললাম, বাপু, কে টাকা দেবে তা আমরা কি জানি। অনাদির ওয়ারিশের কাছে যাও, থানায় যাও, আদালতে যাও, এখান থেকে বিদেয়

হও। যেতে কি চায় ? অনেক কষ্টে বিদেয় করলাম।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'অনাদি হালদার কন্‌ট্রাক্টরকে আজ দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল...কাল ছিল ব্যাঙ্ক-হলিডে, তার মানে পরশু ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এনে রেখেছিল, অর্থাৎ—'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'ব্যাঙ্ক থেকে ?'

'হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক থেকে ছাড়া অত টাকা কোথা থেকে আসবে ?'

কেষ্টবাবু সুর পাল্টাইয়া বলিলেন, 'তা তো বটেই। আমি ওসব কিছু জানি না। আদার ব্যাপারী, হ্যা হ্যা—'

ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'ওকথা থাক। আপনি ওদের ঘরের লোক, নাড়ির খবর রাখেন, কে খুন করেছে আন্দাজ করতে পারেন না ?'

কেষ্টবাবু কিয়ৎকাল নতনেত্রে থাকিয়া চোখ তুলিলেন, 'আপনাকে ধম্মকথা বলব, বাড়ির কেউ এ-কাজ করেনি।'

'কারুর ওপর আপনার সন্দেহ হয় না ?'

'সন্দেহ সকলের ওপরেই হয়, কিন্তু বিশ্বাস হয় না। এ ওই ভাইপো দুটোর কাজ। ভেবে দেখুন, বাড়ির লোকের অনাদিকে মেরে লাভ কি ? সকলেই ছিল অনাদির অন্নদাস। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, দু'দিন বাদে হাঁড়ি চড়বে না।'

'হাঁড়ি চড়বে না কেন ? নৃপেন মাইনের চাকর ছিল, সে অন্যত্র চাকরি খুঁজে নেবে। আর প্রভাত ? তার তো দোকান রয়েছে।'

'দোকান থাকবে কি ? ভাইপোরা মোকদ্দমা করে কেড়ে নেবে।'

'যদি কেড়েও নেয়, তবু ওদের অন্নাভাব হবে না। প্রভাত আর কিছু না পারুক, দপ্তরীর কাজ করে নিজের পেট চালাতে পারবে।'

'দপ্তরীর কাজ !' কেষ্টবাবু চকিতে চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন।

'আপনি জানেন না ? প্রভাত দপ্তরীর কাজ জানে, ছেলেবেলায় দপ্তরীর দোকানে কাজ শিখেছে।'

পুঁটিরাম চা ও জলখাবার লইয়া আসিল। কেষ্টবাবু জলখাবারের রেকাবি তুলিয়া লইয়া আহারে মন দিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুটি অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিল। একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'কি আশ্চর্য ! আমি জানতাম না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না-জানা আর আশ্চর্য কী ! দপ্তরীর কাজ এমন কিছু মহৎ কাজ নয় যে কেউ ঢাক পেটাবে।'

কেষ্টবাবু একবার ধূর্ত চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, 'তা বটে।'

পানাহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ তাঁহাকে সিগারেট দিয়া বলিল, 'আজ সকালে আপনি বলেছিলেন, অনাদি হালদারের সব গুপ্তকথা আপনি জানেন, ইচ্ছে করলে তাঁকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারেন—'

কেষ্টবাবু ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'গুপ্তকথা ! না না, আমি অনাদির গুপ্তকথা কোত্থেকে জানব ? মদের মুখে কি বলেছিলাম তার কি কোনও মানে হয় ? আচ্ছা, আজ চললাম, অসংখ্য ধন্যবাদ।' তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, 'শুনুন, কেষ্টবাবু'—তিনি দ্বারের কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, 'গুপ্তকথা না বলতে চান না বলবেন, আমার বেশি আগ্রহ নেই। কিন্তু আজ রাত্তিরে এখানে খাওয়া-দাওয়া করতে তো দোষ নেই। ওখানে হয়তো আজ আপনার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে—'

কেষ্টবাবু সাগ্রহে দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিলেন, 'খাওয়া-দাওয়া— !'

'হ্যাঁ। আপনার খাতিরে আজ না-হয় একটু তরল পদার্থের ব্যবস্থা করা যাবে।'

'সত্যি বলছেন। আপনারও তাহলে অভ্যেস আছে। মোদ্দা দিদিমণি না জানতে পারে,

কেমন ? হ্যা হ্যা। ক'টার সময় আসব বলুন।'

'সন্ধ্যের পরই আসবেন। আমাকে বোধহয় একবার বেরুতে হবে। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যদি ফিরতে দেরি হয় চাকর আপনাকে বসাবে।'

'বেশ বেশ, আমি সন্ধ্যার পরই আসব।' দ্রংষ্ট্রাবিকট হাস্য করিতে করিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ আমার প্রতি চোখ নাচাইয়া বলিল, 'সাদা চোখে কেষ্ট দাস কিছু বলবে না। —অজিত, তুমি শুঁড়ি বাড়ি যাও, একটি পাঁট বোতল কিনে নিয়ে এস। নাসিক হুইস্কি হলেই চলবে। এদিকে আমি পুঁটিরামকে তালিম দিয়ে রাখছি।'

দশ

পাঁচটার সময় দুইজনে বাহির হইলাম।

পুঁটিরামকে তালিম দেওয়া হইয়াছে। বসিবার ঘরে টেবিলের উপর বোতল কর্ক-স্ক্রু ও কাচের গেলাস রাখা হইয়াছে। বাহিরের দ্বারে কড়া নাড়িলে পুঁটিরাম আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিবে এবং ভেট্‌কি মাছের মত মুখ দেখিলে বলিবে—'আসুন বাবু, কর্তারা বেরিয়েছেন, এখুনি ফিরবেন।' ভেট্‌কি মাছকে টেবিলের নিকট বসাইয়া পুঁটিরাম ডিম ভাজিয়া আনিয়া দিবে এবং নিজে গা-ঢাকা দিবে। তারপর—

ফুটপাথে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় চলেছি আমরা ?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থান নেই। কেষ্ট দাস এসে বোতল সাবাড় করবে তারপর আমরা ফিরব।'

'তা বুঝেছি। কিন্তু ততক্ষণ করব কী ?'

'ততক্ষণ চল গোলদীঘিতে বায়ু সেবন করা যাক।'

গোলদীঘিতে গিয়া পাক খাইতে লাগিলাম। বেশি কথাবার্তা হইল না ; ব্যোমকেশ একবার বলিল, 'কেষ্ট দাস গলিতে চাবি ফেলেনি।'

এক সময় চোখে পড়িল য়্যুনিভারসিটি ইনস্টিট্যুটে অনেক লোক প্রবেশ করিতেছে, বোধহয় কোনও অনুষ্ঠান আছে। ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ব্যোমকেশকে বলিলাম, 'চল না, দেখা যাক ওখানে কি হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চল। সম্ভবত কোনও বিখ্যাত লোকের মৃত্যু উপলক্ষে উৎসবসভা বসেছে।'

য়্যুনিভারসিটি ইনস্টিট্যুটে প্রবেশ করিতে গিয়া ইন্দুবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি সিনেমার লোক, তার উপর সঙ্গীতজ্ঞ, অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়াছেন। ব্যোমকেশের অনুমান মিথ্যা নয়, সিনেমার এক দিক্‌পালের মৃত্যুবাসরে তাঁহার সহধর্মীরা নৃত্য গীত দ্বারা শোক প্রকাশ করিতেছেন। ইন্দুবাবুর সহিত ব্যোমকেশের পরিচয় করাইয়া দিলাম। তিনি আমাদের লইয়া গিয়া সামনের দিকের একটা সারিতে বসাইয়া দিলেন, নিজেও পাশে বসিলেন।

মঞ্চের উপর কয়েকটা পর্দায়-দেখা মুখ চোখে পড়িল, অন্য মুখও আছে। সভাপতি একজন পলিতকেশ চিত্রাভিনেতা।

মঞ্চস্থ লোকগুলির মধ্যে একটি মেয়ের মুখ বিশেষ করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অপরিচিত মুখ ; সুন্দর নয়, কিন্তু চিত্তাকর্ষক। তন্বী নয়, পূর্ণাঙ্গী, রঙ ফর্সা বলা চলে, একরাশ চুল ঘাড়ের কাছে কুণ্ডলিত হইয়া লুটাইতেছে। যাহাকে যৌন আবেদন বলা হয়, যুবতীর তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। একটি ষণ্ডা গোছের যুবক তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে তাহার কানে কানে কথা বলিতেছে।

যে গানটা চলিতেছিল তাহা শেষ হইল। সভাপতি একটি চিরকুট হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'এবার কুমারী শিউলী মজুমদার গাইবেন—কোথা যাও ফিরে চাও দূরের পথিক।'

যে যুবতীকে আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহারই নাম শিউলী মজুমদার। সে সংযত মন্থরপদে সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিল, ষণ্ডা যুবক বাঁয়াতবলা লইয়া বসিল। গান আরম্ভ হইল।

গলাটি মিষ্ট, নিটোল, কুহক-কলিত। চোখ বুজিয়া শুনিতে লাগিলাম। তারপর ব্যোমকেশের কনুইয়ের গুঁতা খাইয়া চমক ভাঙিল। ব্যোমকেশ কানে কানে বলিল, 'ওহে বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখ।'

বাঁ দিকে সন্তর্পণে চক্ষু ফিরাইলাম। কয়েকখানা চেয়ার বাদে প্রথম সারিতে প্রভাত বসিয়া আছে। তন্ময় সমাহিত মুখের ভাব, একাগ্র দৃষ্টি গায়িকার উপর বিন্যস্ত। প্রভাত বোধহয় আমাদের দেখিতে পায় নাই, পাইলে এতটা একাগ্র হইতে পারিত না। ব্যোমকেশের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম মুখে একটু বাঁকা হাসি লইয়া সে গান শুনিতেছে।

আমার মাথার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। শিউলী মজুমদার, যাহাকে প্রভাত বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, এ কি সেই ?...

শিউলী মজুমদারের গান শেষ হইল। তারপর আরও কয়েকজন গাহিলেন। লক্ষ্য করিলাম, শিউলী মজুমদারের গান শেষ হইবার পর প্রভাত অলক্ষিতে উঠিয়া গেল।

সভা শেষ হইবার পূর্বে আমরাও উঠিলাম। ইন্দুবাবু আমাদের সঙ্গে দ্বার পর্যন্ত আসিলেন।

ব্যোমকেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওই শিউলী মজুমদার নামে মেয়েটি—খাসা গায়। ও কি সিনেমার মেয়ে ?'

ইন্দুবাবু বলিলেন, 'না, এখনও ঢোকেনি। তবে গদানন্দ যখন জুটেছে তখন আর দেরি নেই।

'গদানন্দ ?'

'ওই যে তবলা বাজাচ্ছিল। লোকটা সিনেমার দালাল। ভদ্রঘরের মেয়েদের গান বাজনা শেখানো ওর পেশা, কিন্তু জুৎসই মেয়ে পেলে সিনেমায় টেনে নিয়ে যায়।'

'তাই নাকি ! ওর সত্যি নাম গদানন্দ ?'

'নাম জগদানন্দ। সিনেমায় সবাই গদানন্দ বলে। অনেক মেয়ের মাথা খেয়েছে।'

'শিউলীর বাপের নাম আপনি জানেন ?'

'নামট যেন শুনেছিলাম, হ্যাঁ, দয়ালহরি মজুমদার। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে।'

বাসায় ফিরিলাম সাতটার সময়।

দরজা ভেজানো ছিল, প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কেষ্টবাবু তক্তপোশের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছেন, ডান হাতের তর্জনীকে বন্দুকে পরিণত করিয়া ঘরের কোণে লক্ষ্য স্থির করিতেছেন। মদের বোতলটা শূন্য উদরে এক পাশে পড়িয়া আছে। কেষ্টবাবু আমাদের প্রবেশ জানিতে পারিলেন না, ঘরের ঊর্ধ কোণ তাক করিয়া বন্দুক ছুঁড়িলেন—'গুড়ুম—ফিস্।'

আওয়াজটা অবশ্য তিনি মুখেই উচ্চারণ করিলেন।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কেষ্টবাবু, কি হচ্ছে ?'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'চুপ, পাখি উড়ে যাবে।—গুড়ুম—ফিস্।'

ব্যোমকেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'ও, পাখি শিকার করছেন। তা ক'টা পাখি মারলেন ?'

কেষ্টবাবু বন্দুক নামাইয়া সহজভাবে বলিলেন, 'তিনটে হর্তেল ঘুঘু মেরেছি।' তাঁহার শিথিল মুখগুলে একটু তৃপ্তির হাসি খেলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ। কিন্তু গুড়ুম—ফিস্ কেন ? গুড়ুম না হয় বুঝলাম, ফিস্ কী ?'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'ফিস্ বুঝলেন না ? গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল, আর ফিস্ করে পাখির প্রাণ বেরিয়ে গেল।'

কেষ্টবাবু শয়ন করিলেন। দেখিলাম তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

ঘণ্টা দেড়েক পরে তাঁহার ঘুম ভাঙাইলাম, তারপর আহার শেষ করিয়া আবার তক্তপোশে আসিয়া বসিলাম। কেষ্টবাবুর অবস্থা এখন অনেকটা ধাতস্থ, পক্ষী শিকারের আগ্রহ আর নাই।

কেষ্টবাবুকে সিগারেট দিয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, 'কেষ্টবাবু, আপনাকে দেখে মনে হয় বয়সকালে আপনি ভারি জোয়ান ছিলেন।'

কেষ্টবাবু মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, 'কী শরীর যে ছিল ব্যোমকেশবাবু, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ইয়া ছাতি, ইয়া হাতের গুলি ; একটা আস্ত পাঁঠা একলা খেয়ে ফেলতে পারতাম। লোকে ডাকতো—ভীম কেষ্ট।'

'নিশ্চয় খুব মারামারি করতেন ? অনেক স্নায়েব ঠেঙিয়েছেন ?'

'সায়েব কি বলছেন, জাহাজী গোরা পর্যন্ত ঠেঙিয়েছি। ব্যাটারা মদ খাবার জন্যে জাহাজ থেকে নামত। গলিঘুঁজিতে ঘুরে বেড়াত। আমি ওৎ পেতে থাকতাম, কাউকে একলা পেলে দু' চার ঘা দিয়েই লম্বা। হ্যা হ্যা।'

'আপনি দেখছি আমার মনের মতন মানুষ।—আচ্ছা, কখনও মানুষ খুন করেছেন ?' ব্যোমকেশ অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার পাশ ঘেঁষিয়া বসিল।

'মানুষ খুন— !' কেষ্টবাবু ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে তাকাইলেন।

'আরে মশাই, ভয় কিসের ? ইয়ার বন্ধুর কাছে বলতে দোষ কি ? এই তো আমি তিনটে মানুষ খুন করেছি। অজিত জানে, ওকে জিজ্ঞেস করুন।'

কেষ্টবাবু আশ্বস্ত হইলেন—'ঠিক নিজের হাতে খুন করিনি, তবে দলে ছিলাম। ওই অনাদিটা—'

'অনাদি হালদারের সঙ্গে বুঝি আপনার অনেক দিনের পরিচয় ?'

'ইস্কুল থেকে। অনাদিটা ছিল পগেয়া শয়তান। কিন্তু গায়ে জোর ছিল না, তাই আমাকে দলে টানত। আমি ইস্কুলে ভাল ছেলে ছিলাম মশাই, ওই অনাদির পাল্লায় পড়ে বিগড়ে গেলাম।'

'তারপর ?'

'একটা ডেপুটির ছেলে সাইকেল চড়ে ইস্কুলে আসত। একদিন আমি আর অনাদি সাইকেল নিয়ে সটকান্ দিলাম, চোরাবাজারে দিলাম বেচে। কিন্তু ডেপুটির ছেলের সাইকেল, পুলিস লাগল। ধরা পড়ে গেলাম। হেডমাস্টার দু'জনকে রাস্টিকেট করে দিলে।'

'ঐ তো। হেডমাস্টারগুলো বড় পাজি হয়।—তারপর কি হল ?'

'তারপর আর কি ! নাম কাটা সেপাই ! বছর দুই পরে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। আর আমাদের পায় কে ? একেবারে মেসোপটেমিয়া। বাসরা...কুট্ এল্-আমারা—ভারি ফূর্তিতে কেটেছিল ক'টা বছর !'

'সেই সময় বুঝি রাইফেল চালাতে শিখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। অব্যর্থ টিপ্ ছিল। কুট-এল্-আমারায় যখন আটকা পড়েছিলাম তখন আমাদের রসদে টান পড়েছিল, ঘোড়ার মাংস খেতে হয়েছিল। তখন আমি রাইফেল দিয়ে উড়ন্ত পাখি শিকার করতাম। ক্যাপ্টেন আমার নাম দিয়েছিল—উইলিয়াম টেল্। সে একদিন ছিল।' নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'যুদ্ধের পর দেশে ফিরে এলাম। আবার পুনর্মূষিক...তার কিছুদিন পরে অনাদি এক কাণ্ড করে বসল। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাপকে ঠেঙিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাল। এমন ঠেঙিয়েছিল যে বাপটা পরের দিনই টেঁসে গেল। বাড়ির লোকেরা অবশ্য ব্যাপারটা চাপাচুপি দিয়ে দিল কিন্তু অনাদি সেই যে পালাল, পাঁচ বছর আর তার দেখা নেই।

'পাঁচ বছর পরে একদিন গভীর রাত্রে অনাদি চুপিচুপি আমার কাছে এসে হাজির। বললে—ব্যবসা করবি তো চল্ আমার সঙ্গে, খুব লাভের ব্যবসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিসের ব্যবসা ? কোথায় যেতে হবে ? সে বললে—বেহারের একটা ছোট্ট শহরে।

মারোয়াড়ীর সঙ্গে ব্যবসা। একলা সে ব্যবসা হয় না তাই তোকে নিতে এসেছি। রাতারাতি বরাত ফিরে যাবে। যাবি তো চল্। —আমার তখন সময়টা খারাপ যাচ্ছে, রাজী হয়ে গেলাম।

'বেহারের নগণ্য একটা জায়গা, নাম লালনিয়া। সামনে দিয়ে রেলের লাইন গেছে। পিছনদিকে পাহাড় আর জঙ্গল্। আমরা ইস্টিশানে নেমে শহরে গেলাম না, দিনের বেলায় জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। সেখানে অনাদি আসল কথা খুলে বলল—শহরের একটেরে জঙ্গলের গা ঘেঁষে এক মারোয়াড়ীর গদি আছে, বুড়ো মারোয়াড়ীটা রাত্তিরে একলা থাকে। বুড়োর অনেক টাকা, গদিতে ডাকাতি করতে হবে।

'দুপুর রাত্রে মারোয়াড়ীর গদিতে গেলাম। আমার হাতে লোহার ডাণ্ডা; অনাদির হাতে ইলেকট্রিক টর্চ, কোমরে ভোজালি। মারোয়াড়ীটা চোরাই মালের কারবার করত, রাত্রে চোরেরা তার কাছে আসত। অনাদি দরজায় টোকা দিতেই সে দরজা খুলে দিলে, আমি লাগালাম তার মাথায় এক ডাণ্ডা। বুড়োটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

'গদি লুঠ করলাম। বেশি কিছু পাওয়া গেল না, হাজার তিনেক নগদ আর কিছু সোনার গয়না। তাই নিয়ে বেরুচ্ছি, মারোয়াড়ীটা দোরগোড়ায় পড়েছিল, হঠাৎ অনাদির ঠ্যাং জড়িয়ে ধরল। অনেক ধস্তাধস্তি করেও অনাদি ঠ্যাং ছাড়াতে পারল না, মারোয়াড়ী মরণকামড়ে কামড়ে ধরেছে। তখন সে কোমর থেকে ভোজালি বার করে মারল বুড়োর ঘাড়ে এক কোপ। বুড়োটা ক্যাঁক্ করে মরে গেল।

'রক্তমাখা ভোজালি সেইখানে ফেলে আমরা পালালাম। শেষরাত্রে ইস্টিশানে গিয়ে ট্রেন ধরলাম। লুঠের মাল অনাদির কাছে ছিল; সে বলল—তুই এক গাড়িতে ওঠ, আমি অন্য গাড়িতে উঠি। দু'জনে এক কামরায় উঠলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। উঠে পড়, উঠে পড়, পরের স্টেশনে আবার দেখা হবে। আমি একটা কামরায় উঠে পড়লাম, অনাদি পাশের কামরায় উঠল।

'ব্যাস্, সেই যে অনাদি লোপাট হল, বিশ বছরের মধ্যে আর তার টিকি দেখতে পেলাম না—বেইমান! বিশ্বাসঘাতক!'

পুরাতন টাকার শোকে কেষ্টবাবু ফুঁসিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে আর একটি সিগারেট দিয়া বলিল, 'অনাদি হালদার বেইমান ছিল তাই তো তার আজ এই দুরবস্থা। কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন ইচ্ছে করলে অনাদিকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারেন তার মানে কি? তাকে ফাঁসাতে গেলে আপনি নিজেও যে ফেঁসে যেতেন।'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'মারোয়াড়ী-খুনের ব্যাপারে খুব হৈ চৈ হয়েছিল, কাগজে লেখালেখি হয়েছিল। পুলিস ভোজালির গায়ে অনাদির আঙুলের ছাপ পেয়েছিল কিন্তু অনাদিকে তো তারা চেনে না, তাকে ধরবে কি করে? একমাত্র আমি জানতাম। আমি যদি পুলিসকে একটি বেনামী চিঠি ছাড়তাম—লালনিয়ার খুনীর নাম অনাদি হালদার, সে অমুক ঠিকানায় থাকে, আঙুলের ছাপ মিলিয়ে নাও—তাহলে কী হত?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। তারপর আবার কবে অনাদি হালদারকে পেলেন?'

কেষ্টবাবু দন্তপংক্তি কোষমুক্ত করিলেন—'বছর দুই আগে, এই কলকাতা শহরে। ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি অনাদি বৌবাজারের বাসায় ঢুকেছে। আর যাবে কোথায়? খোঁজখবর নিয়ে জানলাম অনাদি পয়সা করেছে, দুধে-ভাতে আছে। একবার ভাবলাম, দিই পুলিসকে বেনামী চিঠি। কিন্তু আমার সময়টা তখন খারাপ যাচ্ছে—একদিন গিয়ে দেখা করলাম। অনাদি ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠল। আমি বললাম—আজ থেকে আমাকেও দুধে-ভাতে রাখতে হবে, নইলে লালনিয়ার মারোয়াড়ীকে কে খুন করেছে পুলিস জানতে পারবে। খুনের মামলা তামাদি হয় না।'...

রাত হইয়া গিয়াছিল, কেষ্টবাবু আমাদের তক্তপোশেই রাত্রি কাটাইলেন।

এগার

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতে দেরি হইল। তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে গিয়া দেখি, ব্যোমকেশ বসিয়া চিঠি লিখিতেছে, কেষ্টবাবু নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শিকারী কোথায় ?'

ব্যোমকেশ সহাস্য চোখ তুলিয়া বলিল, 'রাত না পোয়াতে কখন উঠে পালিয়েছে।'

কাল রাত্রে মদের মুখে যে-সব কথা প্রকাশ পাইয়াছে আজ সকালে তাহা স্মরণ করিয়াই বোধহয় কেষ্ট দাস সরিয়াছে।

তক্তপোশে বসিলাম—'সাত সকালে কাকে চিঠি লিখতে বসলে ?'

ব্যোমকেশ চিঠিখানা আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া আর একখানা চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। চিঠি পড়িয়া দেখিলাম—

ভাই রমেশ, এতদিন পরে আমাকে কি তোমার মনে আছে। একসঙ্গে বহরমপুরে পড়েছি। প্রফেসারেরা আমাকে bomb-case বলে ডাকতেন। মনে পড়ছে ?

নৃপেন দত্ত নামে একজনের মুখে খবর পেলাম, তুমি তোমার গ্রামেই আছ। নৃপেনকে তুমি চেনো, তোমার পাড়ার ছেলে। তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

কলকাতায় তোমার আসা যাওয়া নিশ্চয় আছে। একবার এসো না আমার বাসায়। ঠিকানা দিলাম।

কবে আসছ ? ভালবাসা নিও।

ইতি
তোমার পুরনো বন্ধু
ব্যোমকেশ বক্সী

দ্বিতীয় পত্রখানি নিমাই-নিতাইকে লেখা—

নিমাইবাবু, নিতাইবাবু, শ্রীকান্ত পান্থনিবাসের তেতলার ঘরের কথা জানিতে পারিয়াছি। আমার সঙ্গে অবিলম্বে আসিয়া দেখা করুন, নচেৎ খবরটি পুলিস জানিতে পারিবে।

ব্যোমকেশ বক্সী

চিঠি দু'খানি খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে ডাকিল, পুঁটিরাম বাজারে যাইবার জন্য বাহির হইতেছিল, তাহার হাতে চিঠি দুইখানি ডাকে দিবার জন্য দিয়া ব্যোমকেশ আমাকে বলিল, 'চল, আজ সকালেই বেরুতে হবে।'

'কোথায় ?'

'দয়ালহরি মজুমদারের বাসার ঠিকানা মনে আছে তো ?

'১৩/৩, রামতনু লেন, শ্যামবাজার।'

আধ ঘণ্টা পরে আমরা বাহির হইলাম। শ্যামবাজারে গিয়া রামতনু লেন খুঁজিয়া বাহির করিতে সময় লাগিল। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে গলিটি ক্ষুদ্র, দুই ধারের দুইটি বড় রাস্তার মধ্যে যোগসাধন করিয়াছে। আমরা একদিক হইতে নম্বর দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম।

গলির প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছিয়াছি হঠাৎ ও-প্রান্তের একটা বাড়ি হইতে একজন লোক বাহির হইয়া আসিল, ঝড়ের মত আমাদের দিকে অগ্রসর হইল। চিনিলাম প্রভাত। সে আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, আমাদের দেখিতে পাইল না। উষ্কখুষ্ক চুল, আরক্ত মুখ-চোখ ; আগুনের হল্কার মত সে আমাদের পাশ দিয়া বহিয়া গেল।

আমরা ভ্রূ তুলিয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলাম, তারপর যে দ্বার দিয়া প্রভাত বাহির হইয়াছিল সেই দিকে চলিলাম। নম্বর খুঁজিবার আর প্রয়োজন নাই। ব্যোমকেশ মৃদুগুঞ্জনে বলিল, 'অনাদি হালদার সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছিল...এখন সে নেই, তাই প্রভাত আবার এসেছিল...কিন্তু সুবিধে হল না...'

১৩/৩ নম্বর বাড়ির দরজা বন্ধ। আমরা ক্ষণেক দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছি, বাড়ির ভিতর

হইতে মেয়েলী গলার গান আরম্ভ হইল। মিষ্ট নিটোল কুহক-কলিত কণ্ঠস্বর, সঙ্গে তবলার সঙ্গত।

ব্যোমকেশ দ্বারে ধাক্কা দিল। ভিতরে গান বন্ধ হইল। একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি দ্বার খুলিলেন। একজোড়া কঠিন চক্ষু আমাদের আপাদমস্তক পরিদর্শন করিল।

'কি চাই ?' লোকটির আকৃতি যেমন বেউড় বাঁশের মত পাকানো, কণ্ঠস্বরও তেমনি শুষ্ক রুক্ষ। একটু পূর্ববঙ্গের টান আছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার নাম কি দয়ালহরি মজুমদার ?'

'হাঁ। কি দরকার ?' ভিতরে প্রবেশ করিবার আহ্বান আসিল না, বরং গৃহস্বামী দুই কবাট ধরিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদি হালদার মারা গেছে, শুনেছেন বোধহয়। তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই—'

'কে অনাদি হালদার ! আমি জানি না।' দয়ালহরিবাবুর শুষ্ক স্বর উগ্র হইয়া উঠিল।

'জানেন না ? তার আলমারিতে আপনার হ্যান্ডনোট পাওয়া গেছে। আপনি পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছেন।'

'কে বলে আমি ধার নিয়েছি ! মিথ্যা কথা। কারুর এক পয়সা আমি ধারি না।'

'হ্যান্ডনোটে আপনার দস্তখত আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'জাল দস্তখত।' দড়াম্ শব্দে দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

আমরা কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর ফিরিয়া চলিলাম। পিছনে গান ও সঙ্গত আবার আরম্ভ হইল। ভৈরবী একতালা।

ট্রামরাস্তার দিকে চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল, 'দয়ালহরি মজুমদার লোকটি সামান্য লোক নয়। অনাদি হালদার মরেছে শুনে ভাবছে পাঁচ হাজার টাকা হজম করবে। হ্যান্ডনোটে যে দস্তখত করেছে সেটা হয়তো ওর আসল দস্তখত নয়, বেঁকিয়ে চুরিয়ে দস্তখত করেছে, মামলা যদি আদালতে যায় তখন অস্বীকার করবে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয় ; প্রশ্ন হচ্ছে, অনাদি হালদার ওকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিলে কেন ?'

বলিলাম, 'অনাদি হালদারের তেজারতির ব্যবসা ছিল হয়তো।'

'তাই বলে বিনা জামিনে শুধু হাতে পাঁচ হাজার টাকা ধার দেবে ! অনাদি হালদার কি এতই কাঁচা ছেলে ছিল ? বানরে সঙ্গীত গায় শিলা জলে ভেসে যায় দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'

'তবে কি হতে পারে ?'

'জানি না। কিন্তু জানতে হবে।—আমার কি সন্দেহ হয় জানো ?'

'কী ?'

বলিবার জন্য মুখ খুলিয়া ব্যোমকেশ থামিয়া গেল। তারপর আকাশের পানে চোখ তুলিয়া বলিল, 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম !'

অতঃপর আমি আর প্রশ্ন করিলাম না।

সেদিন বৈকালে আবার আমরা বাহির হইলাম। এবার গন্তব্যস্থান প্রভাতের দোকান।

দোকানের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছি, দেখি আর পাঁচজন লোকের মধ্যে বাঁটুল সর্দার আমাদের আগে আগে চলিয়াছে। প্রভাতের দোকানের সামনে আসিয়া বাঁটুলের গতি হ্রাস হইল, মনে হইল সে দোকানে প্রবেশ করিবে। কিন্তু প্রবেশ করিবার পূর্বে সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া পিছন দিকে চাহিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। অমনি বাঁটুল আবার সিধা পথে চলিতে আরম্ভ করিল।

আমি আড়চোখে ব্যোমকেশের পানে তাকাইলাম। তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত, চোয়ালের হাড় শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, 'বাঁটুল কি এবার প্রভাতকে খদ্দের পাকড়াতে চায়

নাকি ?'

ব্যোমকেশ গলার মধ্যে শুধু আওয়াজ করিল।

দোকানে প্রবেশ করিলাম।

খরিদ্দার নাই, কেবল প্রভাত কাউণ্টারে কনুই রাখিয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, তাহার মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না। আমাদের পদশব্দে সে চোখ তুলিল। চোখ দুইটি জবাফুলের মত লাল। ক্ষণকাল অচেনা চোখে চাহিয়া থাকিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আসুন।'

আমরা কাউণ্টারের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুস্তকালয়ের রাশি রাশি বই আমার মনে মোহ বিস্তার করে, আমি চারিদিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশের ওসব বালাই নাই। সে বলিল, 'সামান্য একটা কাজে এসেছিলাম। দেখুন তো, এই চাবিটা চিনতে পারেন ?'

প্রভাত ব্যোমকেশের হাত হইতে চাবি লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। বলিল, 'না। কোথাকার চাবি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা আমি জানি না। আপনাদের বাসার পাশে গলিতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।'

'কি জানি, আমি কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। নতুন চাবি দেখছি। হয়তো রাস্তার কোনও লোকের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

প্রভাত চাবি ফেরত দিল। ব্যোমকেশ তাহা পকেটে রাখিয়া বলিল, 'কেষ্টবাবুর খবর কি ? তিনি আজ সকালবেলা আপনার বাসায় ফিরে গিয়েছিলেন।'

প্রভাত ক্ষীণ হাসিল—'হ্যাঁ। কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন।'

কোথায় গিয়েছিলেন ব্যোমকেশ তাহা বলিল না, জিজ্ঞাসা করিল, 'কেষ্টবাবু তাহলে আপনার স্কন্ধেই রইলেন ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কি করা যায় ? গলাধাক্কা তো দেয়া যায় না।'

'তা বটে। নৃপেনবাবু কোথায় ? চলে গেছেন ?'

'না, এখনও যায়নি। তার দু'মাসের মাইনে বাকি...গরীব মানুষ...ভাবছি তাকে রেখে দেব। দোকানে একজন লোক রাখলে ভাল হয়, ওকেই রেখে দেব ভাবছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মন্দ কি। আচ্ছা, নিমাই নিতাই বোধহয় আর আসেনি ? আলমারি কি পুলিসের পক্ষ থেকে সীল করে দিয়ে গেছে ?'

'না, পুলিস আর আসেনি। তবে অনাদিবাবুর কোমরে যে চাবি ছিল সেটা তারা নিয়ে গেছে। আলমারির বোধহয় ঐ একটাই চাবি ছিল।'

'তা হবে। আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দয়ালহরি মজুমদার নামে একজনকে অনাদি হালদার পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিল আপনি জানেন ?'

প্রভাত কিছুক্ষণ অবিশ্বাস-ভরা বিহ্বল চক্ষে চাহিয়া রহিল—'পাঁচ হাজার টাকা! আপনি ঠিক জানেন ?'

'অনাদি হালদারের আলমারিতে আমি হ্যান্ডনোট দেখেছি। তাতে দয়ালহরি মজুমদারের সই আছে।'

প্রভাতের শীর্ণ মুখ যেন আরও শুষ্ক ক্লান্ত হইয়া উঠিল, সে অর্ধস্ফুট স্বরে বলিল, 'আমি জানতাম না। কখনও শুনিনি।' সে টুলের উপর বসিতে গিয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া টপ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

'প্রভাতবাবু! আপনার জ্বর হয়েছে—গা গরম।'

'জ্বর! না—ও কিছু নয়। ঠাণ্ডা লেগেছে—'

'হয়তো বুকে ঠাণ্ডা বসেছে। আপনি দোকানে এলেন কেন ? যান, বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকুন। ডাক্তার ডাকান—'

'ডাক্তার !' প্রভাত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—'না না, ওসব হাঙ্গামায় দরকার নেই। আপনিই সেরে যাবে।'

'আমার কথা শুনুন, কাছেই আমার চেনা একজন ডাক্তার আছেন, তাঁর কাছে চলুন। রোগকে অবহেলা করা ভাল নয়। আসুন।'

প্রভাত আরও কয়েকবার আপত্তি করিয়া শেষে রাজী হইল। দোকানে তালা লাগাইয়া বাহির হইবার সময় ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার গুর্খা দরোয়ানটিকে দেখছি না। তাকে কি ছাড়িয়ে দিয়েছেন ?'

প্রভাত বলিল, 'হ্যাঁ। অনেকদিন দেশে যায়নি, কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমারও আর পাহারাওলার দরকার নেই—' বলিয়া ফিকা হাসিল।

দুই তিন মিনিটে ডাক্তার তালুকদারের ডাক্তারখানায় পৌঁছিলাম। তিনি ডাক্তারখানায় উপস্থিত ছিলেন ; ব্যোমকেশ তাঁহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কথাবার্তা বলিল। তারপর তিনি প্রভাতকে ঘরে লইয়া গিয়া টেবিলের উপর শোয়াইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। আমরা সরিয়া আসিলাম।

পরীক্ষার শেষে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, 'বুকে পিঠে কিছু পেলাম না। তবে স্নায়ুতে গুরুতর শক্ লেগেছে। একটা ওষুধ দিচ্ছি, এক শিশি খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

ডাক্তার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিতে গেলেন, ব্যোমকেশও তাঁহার সঙ্গে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঔষধের শিশি হাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চলুন। ডাক্তারের প্রাপ্য আমি চুকিয়ে দিয়েছি।'

প্রভাত বিব্রত হইয়া বলিল, 'সে কি, আপনি কেন দিলেন ? আমার কাছে টাকা রয়েছে—'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে। এখন চলুন, আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

প্রভাতের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল—'আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করছেন—'

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল, 'সংসারে থাকতে গেলে পরস্পরের জন্যে একটু কষ্ট করতে হয়। আসুন।'

ভাড়াটে গাড়িতে প্রভাতকে লইয়া আমরা তাহার বাসার উদ্দেশ্যে চলিলাম। ব্যোমকেশের এই পরহিতব্রতের অন্তরালে কোনও অভিসন্ধি আছে কিনা, এই প্রশ্নটা বার বার মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগিল।

বাসায় পৌঁছিলে ননীবালা দেবী প্রভাতের জ্বরের সংবাদ শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। তিনি অভিজ্ঞ ধাত্রী। ঔষধ-পথ্য সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু বলিতে হইল না। আমরা বিদায় লইলাম।

বাহিরের ঘরে আসিয়া ব্যোমকেশ দাঁড়াইয়া পড়িল। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, তাহার যাইবার ইচ্ছা নাই। আমি ভ্রূ তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, উত্তরে সে বাম চক্ষু কুঞ্চিত করিল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। নৃপেন প্রবেশ করিল ; আমাদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, 'আপনারা ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রভাতবাবুর শরীর খারাপ হয়েছিল, তাই তাঁকে পৌঁছে দিতে এসেছি।'

'প্রভাতবাবুর শরীর খারাপ !' নৃপেন ভিতর দিকে পা বাড়াইল।

'একটা কথা', ব্যোমকেশ চাবি বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল, 'এ চাবিটা চিনতে পারেন ?'

নৃপেনের চোখের চাহনি এতক্ষণ সহজ ও সিধা ছিল, মুহূর্তে তাহা চোরা চাহনিতে পরিণত হইল। একবার ঢোক গিলিয়া সে স্বরযন্ত্র সংযত করিয়া লইল, তারপর বলিল, 'চাবি ? কার চাবি আমি কি করে চিনব ? মাফ করবেন, প্রভাতবাবুর জ্বর'—কথা শেষ না করিয়াই সে প্রভাতের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ আমার কানে কানে বলিল, 'অজিত, তুমি দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি।' সে লঘুপদে অনাদি হালদারের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

একলা দাঁড়াইয়া আছি ; ভাবিতেছি কেহ যদি আসিয়া পড়ে এবং ব্যোমকেশ সম্বন্ধে সওয়াল আরম্ভ করে, তখন কি বলিব ! কিন্তু মিনিটখানেক পরে ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিল, বলিল, 'চল,

এবার যাওয়া যাক।'

নীচে দাওয়ায় বসিয়া ষষ্ঠীবাবু হুঁকা চুষিতেছিলেন, আমাদের পানে কট্‌মট করিয়া তাকাইলেন রাস্তায় আলো জ্বলিয়াছে। আমরা দ্রুত বাসার দিকে পা চালাইলাম। চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদি হালদারের আলমারির চাবিই বটে এবং কে গলিতে ফেলেছিল, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।'

বার

হপ্তাখানেক কাটিয়া গেল। কোনও দিক হইতে আর কোনও সাড়া শব্দ নাই নিমাই-নিতাইকে ব্যোমকেশ অবিলম্বে আসিয়া দেখা করিতে বলিয়াছিল, তাহারাও নিশ্চুপ আবার যেন সব ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। ইস্টিশন হইতে ট্রেন ছাড়িয়া গেলে যেমন হয়, এ যেন অনেকটা সেইরকম অবস্থা।

তারপর ট্রেন আসিল। একটার পর একটা ট্রেন আসিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত এত ট্রেন আসিল যে নিশ্বাস ফেলিবার সময় রহিল না।

সকালবেলা ডাকে দুটি চিঠি আসিল। একটি চিঠি সত্যবতীর। সে দীর্ঘকাল আমাদের না দেখিয়া আমাদের বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে দর্শন চায়। দ্বিতীয় চিঠিখানি খেজুরহাটের রমেশ মল্লিকের। তিনি লিখিয়াছেন—

ভাই ব্যোমকেশ, তুমি তাহলে আমাকে ভোলনি? তোমার চিঠি পেয়ে কী আনন্দ যে হল বলতে পারি না। সেই পুরনো ভুলে যাওয়া কলেজ-জীবনের কথা আবার মনে পড়ে যাচ্ছে।

ভাই, আমি তোমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে যেতাম, কিন্তু কিছুদিন থেকে বাতে শয্যাশায়ী হয়ে আছি, নড়বার ক্ষমতা নেই। তোমার কীর্তিকলাপ বইয়ে পড়েছি, তুমি কলকাতায় থাকো তাও জানি। কিন্তু ঠিকানা জানা ছিল না বলে এতদিন যেতে পারিনি। এবার সেরে উঠেই যাব।

তুমি যার কথা জানতে চেয়েছ তার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানি, দেখা হলে সব বলব। ভারি গুণী লোক। একবার জেল খেটেছে। ওর প্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে, যে-কোনও তালার চাবি একবার দেখলে অবিকল নকল চাবি তৈরি করতে পারে। গুণধর ছেলে, খুড়ো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। খুড়োর সিন্দুকের চাবি তৈরি করেছিল, মাঝে মাঝে পাঁশ দশ টাকা সরাতো। খুড়ো তাড়িয়ে দেবার পর কলকাতায় গিয়ে চাকরি করত, সেখানেও ক্যাশ-বাক্সর চাবি তৈরি করেছিল। ধরা পড়ে জেলে গেল। সে আজ চার পাঁচ বছরের কথা। তুমি কোন্ সূত্রে তার সম্পর্কে এসেছ জানি না, কিন্তু সাবধানে থেকো।

তোমাকে দেখার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করছে। আজ এই পর্যন্ত। ভালবাসা নিও। ইতি—তোমার রমেশ।

ব্যোমকেশ বলিল, 'গুণী লোক তাতে সন্দেহ কি। এমন গুণী লোক পৃথিবীতে অল্পই আছে। যাহোক, ন্যাপার কার্য-পদ্ধতি এবার বেশ বোঝা যাচ্ছে। অনাদি হালদার আলমারির চাবি কোমরে রাখত, দেখার সুবিধে ছিল না। কোনও সময় ন্যাপা একবার চাবিটা দেখে ফেলেছিল, সে চাবি তৈরি করল। আলমারিতে মাল আছে সে জানত, সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর কালীপুজোর রাত্রে—' বলিয়া ব্যোমকেশ থামিল।

'কালীপুজোর রাত্রে কী?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার পূর্বেই দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখি, অপূর্ব দৃশ্য। উকিল কামিনীকান্ত মুস্তফী দুই পাশে দুই মক্কেল লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কামিনীকান্তর মুখে সুধাবিগলিত হাসি। নিমাই ও নিতাইকে দেখিয়া মানুষ বলিয়া চেনা যায় না, সত্য সত্যই দুটি

ভিজা বিড়াল। খালি পা, গায়ে গরদের দোছোট, মুখে অক্ষৌরিত দাড়ি, অশৌচের বেশ।

তিনজনে ঘরে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ আরাম-কেদারা হইতে একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তাহার মুখের তাচ্ছিল্য-ভাব ক্রমে ব্যঙ্গহাস্যে পরিণত হইল। সে বলিল, 'আপনারা শেষ পর্যন্ত এলেন তাহলে ?—বসুন।'

তিনজনে তক্তপোশের কিনারায় বসিলেন। কামিনীকান্ত বলিলেন, 'একটু দেরি হয়ে গেল। আপনি চিঠিতে যে-রকম ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, ওরা একলা আসতে সাহস করেনি, আমার কাছে ছুটে গিয়েছিল। তা আমি হলাম গিয়ে উকিল, একটু খোঁজ-খবর না নিয়ে তো আসতে পারি না। তাই—'

'কোথায় খোঁজ-খবর নিলেন ? শ্রীকান্ত পান্থনিবাসে ? সেখানে বুঝি সুবিধে হল না ? সাক্ষী ভাঙাতে পারলেন না ? শ্রীকান্তবাবু সত্যের অপলাপ করতে রাজী হলেন না ?'

কামিনীকান্তবাবু আহত স্বরে বলিলেন, 'ছি ছি, এ আপনি কি বলছেন, ব্যোমকেশবাবু ! সাক্ষী ভাঙানো আমার পেশা নয়, মক্কেলের পক্ষ থেকে সত্য আবিষ্কার করাই আমার কাজ।'

'সত্য আবিষ্কার করবার জন্যে শ্রীকান্ত হোটেলে যাবার দরকার ছিল না, মক্কেল দুটিকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতেন।'

'ওরা ছেলেমানুষ, তার ওপর অশৌচ চলছে। যাহোক, আপনি কি জানতে চান বলুন, কোনও কথাই ওরা আপনার কাছে লুকোবে না। ওদের বয়ান শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, ওরা সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

ব্যোমকেশ নিতাই ও নিমাইকে পর্যায়ক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'এঁদের মধ্যে শ্রীকান্ত হোটেলে যাতায়াত করতেন কে ?'

কামিনীকান্ত বলিলেন, 'ওরা দু'জনেই যেত। তবে ওদের চেহারা অনেকটা একরকম, তাই বোধহয় হোটেলের লোকেরা বুঝতে পারেনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। শ্রীকান্ত হোটেলের তেতলার ঘর ভাড়া নেবার উদ্দেশ্য কি ?'

কামিনীকান্ত বলিলেন, 'তাহলে গোড়া থেকেই সব খুলে বলি—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওঁদের কথা ওঁরা নিজের মুখে বললেই ভাল হত না ?'

'হেঁ হেঁ, সে তো ঠিক কথা। তবে কি জানেন, ওরা ছেলেমানুষ, তার ওপর ব্যাপারস্যাপার দেখে খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছে। হয়তো বলতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলবে—আপনি সন্দেহ করবেন ওরা মিছে কথা বলছে—'

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ আপনিই বলুন তাহলে। বুঝতে পারছি আপনার বলা আর ওদের বলায় কোনও তফাৎ হবে না। মিছে সময় নষ্ট করে লাভ কি ?'

ছেলেমানুষ দুটি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, কামিনীকান্ত তাদের জবানীতে কাহিনী বিবৃত করিলেন। মোটামুটি কাহিনীটি এই—

বছর দুই আগে অনাদি হালদার মহাশয় যখন কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন তখন নিমাই নিতাই খবর পাইয়া কাকার কাছে ছুটিয়া আসে। তাহারা পিতৃহীন, কাকাই তাহাদের একমাত্র অভিভাবক, কাকাকে তাহারা সাবেক বাড়িতে লইয়া যাইবার জন্য নির্বন্ধ করে।

অনাদি হালদার অতিশয় সজ্জন এবং ভালো মানুষ ছিলেন, ভাইপোদের প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমা ছিল না। কিন্তু একদল দুষ্ট লোক তাঁহার ভালমানুষীর সুযোগ লইয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছিল, তাঁহার কানে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল, ভাইপোদের উপর তাঁহার মন বিরূপ করিয়া তুলিল। তিনি নিতাই-নিমাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

নিমাই নিতাই ন্যায়তঃ ধর্মতঃ অনাদিবাবুর উত্তরাধিকারী। তাহাদের ভয় হইল, এই দুষ্ট লোকগুলো কাকাকে ঠকাইয়া সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে, হয়তো তাঁহাকে খুন করিতেও পারে। নিমাই নিতাই তখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া শ্রীকান্ত হোটেলে ঘর ভাড়া করিল এবং জানালা দিয়া অনাদিবাবুর বাসার উপর নজর রাখিতে লাগিল। তাহাদের বাড়িতে একটা

পুরনো আমলের দূরবীন আছে, সেই দূরবীন চোখে লাগাইয়া অনাদিবাবুর বাসার ভিতরকার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিত। এই দেখুন সেই দূরবীন।

—নিমাই-নিতাইয়ের একজন চাদরের ভিতর হইতে দূরবীন বাহির করিয়া দেখাইল। চামড়ার খাপের মধ্যে চোঙের মত দূরবীন, টানিলে লম্বা হয় ; ব্যোমকেশ নাড়িয়া চাড়িয়া ফেরত দিল। কামিনীকান্ত আবার আরম্ভ করিলেন।—

নিমাই নিতাই পালা করিয়া হোটেলে যাইত এবং চোখে দূরবীন লাগাইয়া জানালার কাছে বসিয়া থাকিত। অবশ্য ইহা নিতান্তই ছেলেমানুষী কাণ্ড। কামিনীকান্ত কিছু জানিতেন না, জানিলে এমন হাস্যকর ব্যাপার ঘটিতে দিতেন না। যাহোক, এইভাবে কয়েকমাস কাটিবার পর কালীপূজার রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রি দশটা আন্দাজ নিমাই হোটেলে গিয়া দূরবীন লাগাইয়া বসিল। অনাদিবাবু ব্যালকনিতে দাঁড়াইয়া বাজি পোড়ানো দেখিতেছিলেন। এগারোটার সময় এক ব্যাপার ঘটিল। অনাদিবাবু হঠাৎ পিছনের দরজার দিকে ফিরিলেন, যেন পিছনে কাহারও সাড়া পাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ হইল এবং বন্দুকের গুলি নিমাইয়ের কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। ওদিকে ব্যালকনিতে অনাদিবাবু ধরাশায়ী হইলেন। কিন্তু ঘরের অন্ধকার হইতে কে গুলি চালাইয়াছে নিমাই তাহা দেখিতে পাইল না।

নিমাই ব্যাপার বুঝিতে পারিল। বন্দুকের গুলি অনাদিবাবুর শরীর ভেদ করিয়া আর একটু হইলে নিমাইকেও বধ করিত ; ভাগ্যক্রমে গুলিটা তাহার রগ ঘেঁষিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরিয়া গেল এবং দুই ভাইয়ে পরামর্শ করিয়া সেই রাত্রেই কামিনীকান্তর কাছে উপস্থিত হইল। তারপর যাহা যাহা ঘটিয়াছে ব্যোমকেশবাবু তাহা ভালভাবেই জানেন।

ইহাই সত্য পরিস্থিতি, ইহাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নাই। ব্যোমকেশবাবু বিবেচক ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে পূজ্যপাদ খুল্লতাতকে বধ করা কোনও ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তিনি যেন পুলিসে খবর না দেন। পুলিস—বিশেষত বর্তমানকালের পুলিস—যদি এমন একটা ছুতা পায় তাহা হইলে নিতাই-নিমাইকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িবে, নিরাপরাধের প্রতি জুলুম করিবে। ইহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নয়। একেই তো অবিচার অত্যাচারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে।

কামিনীকান্ত শেষ করিলে ব্যোমকেশ আড়মোড়া ভাঙিয়া হাই তুলিল, অলসকণ্ঠে বলিল, 'এঁরা succession certificate-এর জন্য দরখাস্ত করেছেন নিশ্চয় ? তার কি হল ?'

কামিনীকান্ত বলিলেন, 'দরখাস্ত করা হয়েছে। তবে আদালতের ব্যাপার, সময় লাগবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার বিশ্বাস প্রভাত কোনও আপত্তি তুলবে না। তবে বইয়ের দোকানটা তার নিজের নামে ; আপনারা যদি সেদিকে হাত বাড়ান তাহলে সে লড়বে।'

'না না, অনাদিবাবু যা দান করে গেছেন তার ওপর ওদের লোভ নেই।—তাহলে ব্যোমকেশবাবু, আপনি শ্রীকান্ত হোটেলের কথাটা প্রকাশ করবেন না আশা করতে পারি কি ?'

'এ বিষয়ে আমি বিবেচনা করে দেখব। নিমাইবাবু নিতাইবাবু যদি নির্দোষ হন তাহলে নির্ভয়ে থাকতে পারেন। আচ্ছা, আজ আসুন তাহলে।'

তিনজনে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন, চোখে চোখে কথা হইল। তারপর কামিনীকান্ত একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, 'আজ আমরা আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। ক্ষতিপূরণস্বরূপ সামান্য কিছু—' বলিয়া পকেট হইতে পাঁচটি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বাড়াইয়া ধরিলেন।

ব্যোমকেশের অধর ব্যঙ্গ-বঙ্কিম হইয়া উঠিল—'আমার সময়ের দাম অত বেশি নয়। তাছাড়া, আমি ঘুষ নিই না।'

কামিনীকান্ত তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'না না, সে কি কথা। আপনি অনাদিবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করছেন, তার তো একটা খরচ আছে। সে খরচ এদেরই দেবার কথা। আচ্ছা, আর আপনার সময় নষ্ট করব না। নমস্কার।' নোটগুলি টেবিলে রাখিয়া তিনি মক্কেল সহ ক্ষিপ্রবেগে

নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্যোমকেশ নোটগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিল, 'ঘুষ কি করে দিতে হয় শিখলাম।' তারপর ভ্রূ বাঁকাইয়া আমার পানে চাহিল—'কেমন গল্প শুনলে ?'

বলিলাম, 'আমার তো নেহাৎ অসম্ভব মনে হল না।'

'এরকম গল্প তুমি লিখতে পারো ? সাহস আছে ?'

'এমন অনেক সত্য ঘটনা আছে যা গল্পের আকারে লেখা যায় না, লিখলে বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তবু যা সত্য তা সত্যই। Truth is stranger than fiction.'

তর্ক বেশ জমিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় দ্বারে আবার অতিথি সমাগম হইল। দরজা ভেজানো ছিল ; একজন দরজার ফাঁকে মুণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া বলিল, 'আসতে পারি স্যার ?' বলিয়া দাঁত খিঁচাইয়া হাসিল।

অবাক হইয়া দেখিলাম, বিকাশ দত্ত ! বছরখানেক আগে চিড়িয়াখানা প্রসঙ্গে তাহার সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাহার হাসিটি অটুট আছে। কিন্তু বেশভূষা দেখিয়া মনে হয় ধন-ভাগ্যে ভাঙন ধরিয়াছে।

ব্যোমকেশ সমাদর করিয়া বিকাশকে বসাইল, হাসিয়া বলিল, 'তারপর, খবর কি ?'

বিকাশ বলিল, 'খবর ভাল নয় স্যার। চাকরি গেছে, এখন ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছি।'

ব্যোমকেশের মুখ গম্ভীর হইল—'চাকরি গেল কোন্ অপরাধে ?'

বিকাশ বলিল, 'অপরাধ করলে তো ফাঁসি যেতাম স্যার। অপরাধ করিনি তাই চাকরি গেছে।'

'হুঁ। তা এখন কি করছেন ?'

'কাজের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনার হাতে যদি কিছু থাকে তাই খবর নিতে এলাম।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'কাজ— ? আচ্ছা, কাজের কথা পরে হবে, আজ বেলা হয়ে গেছে, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করুন।'

বিকাশের মুখে কৃতজ্ঞতার একটি ক্লিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল—'না স্যার, আমাকে দুপুরবেলা বাসায় ফিরতে হবে। যদি কিছু কাজ থাকে, ওবেলা আবার আসব।'

বিকাশের মুখ দেখিয়া মনে হইল তাহার বাসায় কোনও অভুক্ত প্রিয়জন তাহার পথ চাহিয়া আছে।

ব্যোমকেশ আবার একটু ভাবিয়া বলিল, 'আমার হাতে একটা কাজ আছে সে কাজে আপনার মতন হুঁশিয়ার লোক চাই। একটি লোকের হাঁড়ির খবর যোগাড় করতে হবে ?'

বিকাশ পকেট হইতে ডায়েরির মত একটা খাতা ও পেন্সিল বাহির করিল—'নাম ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শিউলী মজুমদারের নাম শুনেছেন ?'

'শিউলী মজুমদার ? গান গায় ?'

'হ্যাঁ। তার বাপের নাম দয়ালহরি মজুমদার, ঠিকানা ১৩/৩, রামতনু লেন, শ্যামবাজার। এদের বাড়ির সব খবর সংগ্রহ করতে হবে।'

লিখিয়া লইয়া বিকাশ বলিল, 'কবে খবর চান ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একদিনের কাজ নয়। অনেকদিন ধরে একটু একটু করে খবর যোগাড় করতে হবে। অতীতের খবর, বর্তমানের খবর, বাড়িতে কারা আসে যায়, কী কথা বলে সব খবর চাই। অনাদি হালদার আর প্রভাত—এই দুটো নাম মনে রাখবেন। যখনই কিছু খবর পাবেন আমাকে এসে জানাবেন।'

'বেশ, আজ তাহলে উঠি।' খাতা পেন্সিল পকেটে পুরিয়া বিকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ একটি একশত টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'আজ একশো টাকা রাখুন। কাজ হয়ে গেলে আরও পাবেন।'

নোট হাতে লইয়া বিকাশ কিছুক্ষণ অপলক চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিল, তারপর চোখ

তুলিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, পেটে ভাত না থাকলে মুখ দেখে ধরা যায়—না ? আপনি ঠিক ধরেছেন ?' খপ করিয়া ব্যোমকেশের পায়ের ধূলা লইয়া বিকাশ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশ দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া খামখেয়ালী গোছের হাসিল—'কিছু টাকার সদ্‌গতি হল। চল, আর দেরি নয়, নেয়ে খেয়ে নেওয়া যাক। নৈলে এখনি হয়তো আবার নতুন অতিথি এসে হাজির হবে।'

তের

অপরাহ্নে পুঁটিরাম যখন চা লইয়া আসিল তখন লক্ষ্য করিলাম, তাহার মুখখানা শীর্ণ ও বেদনাক্লিষ্ট। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি রে, কি হয়েছে ?'

পুঁটিরাম বলিল, 'আবার অম্বলের ব্যথা ধরেছে বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি ওষুধ দিচ্ছি, তুই শুয়ে থাকগে যা। এ বেলা আর তোকে রাঁধতে হবে না।'

কিছুদিন হইতে পুঁটিরামকে অম্লশূলে ধরিয়াছে ; বিশুদ্ধ কাঁকর এবং তেঁতুল বিচির গুঁড়া তাহার সহ্য হইতেছে না। ব্যোমকেশ তাহাকে যোয়ানের জল দিয়া ফিরিয়া আসিলে বলিলাম, 'নীচে খবর পাঠাই, মেসেই আজ আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হোক।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'না, চল আজ কোনও হোটেলে খেয়ে আসি। আজ পাঁচশো টাকা হাতে এসেছে, বর্বরস্য ধনক্ষয়ং হওয়া দরকার।'

আমি তাহার এই লঘুতায় সায় দিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, কিছু মনে করো না। ওই পাঁচশো টাকা যে ঘুষ যখন বুঝতে পেরেছ তখন ও টাকা নেওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ প্রশ্নের উত্তরে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে পারি কিন্তু তা করব না। টাকা আমার চাই তাই নিয়েছি, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।'

'কিন্তু ধরো—যদি শেষ পর্যন্ত জানা যায় যে, নিমাই নিতাই খুন করেছে, তখন কি করবে ? ঘুষ খেয়ে কথাটা চেপে যাবে ?'

'না, চেপে যাব না, ওদেরই ধরিয়ে দেব। অবশ্য যদি পুলিস ধরতে চায়। মনে রেখো, অনাদি হালদারের খুনের তদন্ত করবার জন্যই ওরা আমাকে টাকা দিয়েছে, ঘুষ বলে দেয়নি।'

'তা যদি হয় তাহলে স্বতন্ত্র কথা।'

'তোমার ভয় নেই, ঘুষ খেয়ে আমি অধর্ম করব না। অধর্ম করার মতলব যদি থাকত তাহলে পাঁচশো টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট হতাম না, রীতিমত আখেরের রেস্ত করে নিতাম।' বলিয়া ব্যোমকেশ হাসিল।

চা শেষ করিয়া সিগারেট ধরাইলাম। এ বেলা বোধহয় আর অতিথি অভ্যাগতের শুভাগমন হইবে না ভাবিতেছি, প্রভাত আসিয়া উপস্থিত। তাহার হাতে একটি বোঁচ্‌কা, চেহারা দেখিয়া বোঝা যায়, সম্প্রতি রোগ হইতে উঠিয়াছে, চোখের মধ্যে দুর্বলতার চিহ্ন এখনও লুপ্ত হয় নাই। ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন। এখন শরীর কেমন ?'

লজ্জিত হাসিয়া প্রভাত বলিল, 'সেরে গেছে। সেদিন অনেক কষ্ট দিলাম আপনাদের।'

'কিছু না। হাতে ওটা কি ?'

'একটু মিষ্টি। ভীম নাগের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম কিছু নিয়ে যাই।'

বোঁচ্‌কা খুলিলে দেখা গেল, মিষ্টি অল্প নয়, প্রায় কুড়ি পঁচিশ টাকার কড়া পাকের সন্দেশ। সেদিন ব্যোমকেশ তাহার উপকার করিয়াছিল, ডাক্তার গাড়ি-ভাড়া প্রভৃতির খরচ লয় নাই, তাই প্রভাত অত্যন্ত শিষ্টভাবে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে চায়। ব্যোমকেশ উল্লসিত হইয়া বলিল, 'আরে আরে, এ যে স্বর্গীয় ব্যাপার। অজিত, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম বল তো ?'

বলিলাম, 'যতদূর মনে পড়ে তুমি আমার মুখ দেখেছিলে এবং আমি তোমার মুখ দেখেছিলাম।'

'তবেই বোঝো, আমাদের মুখ দুটো সামান্য নয়। যাহোক, খাবারগুলো সরিয়ে রাখা ভাল, বাইরে ফেলে রাখা কিছু নয়।' ব্যোমকেশ সন্দেশগুলি ভিতরে রাখিয়া আসিয়া বলিল, 'প্রভাতবাবু, চা খাবেন নাকি ?'

'আজ্ঞে না, আমি চা খেয়ে এসেছি।' সে ঘরের এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, 'এখানে কেবল আপনারা দু'জনে থাকেন বুঝি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উপস্থিত দু'জনেই আছি। আমার স্ত্রী এবং ছেলে এখন পাটনায়।'

প্রভাতের চোখ দুইটি যেন নৃত্য করিয়া উঠিল—'পাটনায় !'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, যা হাঙ্গামা চলেছে, তাদের বাইরে রেখেছি। আপনি বুঝি পাটনা এখনও ভুলতে পারেননি।'

'পাটনা ভুলব !' প্রভাতের স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল—'জন্মে অব্দি পাটনাতেই কাটিয়েছি। কত বন্ধু আছে সেখানে। ইশাক সাহেব আছেন।'

'ইশাক সাহেব ?'

'আমার ওস্তাদ। তাঁর দোকানে চাকরি করতাম, তিনি হাতে ধরে আমাকে দপ্তরীর কাজ শিখিয়েছিলেন। এমন ভাল লোক হয় না, দেবতুল্য লোক। এখন বুড়ো হয়েছেন...কে তাঁর দোকানে কাজ করছে কে জানে...হয়তো তিনি একাই কাজ করেছেন।' প্রভাত নিশ্বাস ফেলিল।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'পাটনায় কোন্ পাড়ায় থাকেন তিনি ?'

'সিটিতে থাকেন। সেখানে সকলেই তাঁকে চেনে। আমার আর ওদিকে যাওয়া হয়নি, সেই যে পাটনা থেকে এসেছি, আর যাইনি। ব্যোমকেশবাবু, আপনি নিশ্চয় মাঝে মাঝে পাটনা যান ? এবার যখন যাবেন ইশাক সাহেবকে দেখে আসবেন ? কেমন আছেন তিনি—বড় দেখতে ইচ্ছে করে।'

'নিশ্চয় দেখা করব। তারপর এদিকের খবর কি ? কেষ্টবাবু কেমন আছেন ?'

প্রভাত বলিল, 'কেষ্টবাবু চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন ?'

'হ্যাঁ। আমার বাসায় ওঁর পোষাল না। মা'র সঙ্গে দিনরাত খিটিমিটি লাগত। তারপর একদিন নিজেই চলে গেলেন।'

'যাক, আপনার ঘাড় থেকে একটা বোঝা নামল। আর নৃপেনবাবু ? তিনি কি আপনার দোকানে কাজ করছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কি কাজ করেন ?'

'বইয়ের দেকানে অনেক ছুটোছুটির কাজ আছে। অন্য দোকান থেকে বই আনতে হয়, ভি পি পাঠাবার জন্যে পোস্ট অফিসে যেতে হয়। এসব কাজ আগে আমাকেই করতে হত। এখন নৃপেনবাবু করেন।'

'ভাল।'

প্রভাত এতক্ষণ ব্যোমকেশের সঙ্গে কথা বলিতেছিল, মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাইতেছিল ; এখন সে আমার দিকে ফিরিয়া বসিয়া বলিল, 'অজিতবাবু, আমি আপনার কাছে আসব বলেছিলাম মনে আছে বোধহয়। এইসব গণ্ডগোলে আসতে পারিনি। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।'

'কি অনুরোধ বলুন।'

'আপনার একখানি উপন্যাস আমাকে দিতে হবে। আমি গরীব প্রকাশক, নতুন দোকান করেছি। তবু অন্য প্রকাশকের কাছ থেকে আপনি যা পান আমিও তাই দেব।'

নূতন প্রকাশককে বই দেওয়ায় বিপদ আছে, কখন লালবাতি জ্বালিবে বলা যায় না। একবার এক অর্বাচীনকে বই দিয়া ঠকিয়াছি। আমি ইতস্তত করিয়া বলিলাম, 'তা, এখন তো আমার হাতে কিছু নেই—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কেন, যে উপন্যাসটা ধরেছ সেটা দিতে পারো। প্রভাতবাবু, আপনি ভাববেন না, অজিতের বই আপনি পাবেন।'

প্রভাত উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'যখন আপনার বই শেষ হবে তখন দেবেন। এখন আমার দোকান ভাল চলছে না, পরের বই কমিশনে বিক্রি করে কতটুকুই বা লাভ থাকে। আপনাদের আশীর্বাদ পেলে আমি দোকান বড় করে তুলব ; প্রাণপণে খাটব, কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এই তো চাই। আপনাদের বয়সে কাজে উৎসাহ থাকা চাই। তবে উন্নতি করতে পারবেন।'

প্রভাত গদ্‌গদ মুখে পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া তাহা হইতে দুইটি নোট লইয়া আমার সম্মুখে রাখিল। দেখিলাম দুইশত টাকা। সত্যই আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম !

প্রভাত বলিল, 'অগ্রিম প্রণামী দিলাম। বই লেখা শেষ হলেই বাকি টাকা দিয়ে যাব।' সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম, 'রসিদ নিয়ে যান।'

সে বলিল, 'না, না, এখন রসিদ থাক, সব টাকা দিয়ে রসিদ নেব। আজ যাই, সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখনও দোকান খোলা হয়নি।'

প্রভাত প্রস্থান করিলে আমরা কিছুক্ষণ বিস্ময়-পুলকিত নেত্রে পরস্পর চাহিয়া রহিলাম। তারপর নোট দু'টি সস্নেহে পকেটে রাখিয়া বলিলাম, 'কাণ্ডখানা কি ! এ যে শ্রাবণের ধারার মত ক্রমাগত একশো টাকার নোট বৃষ্টি হচ্ছে !'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। এত সুখ সইলে হয় !'

এই সময় দ্বারদেশে বাঁটুলের আবির্ভাব হইল। তাহার আবার চাঁদা আদায়ের সময় হইয়াছে। সে ভক্তিভরে আমাদের প্রণাম করিয়া বলিল, 'চাঁদাটা নিতে এলাম কর্তা।'

ব্যোমকেশ আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির অর্থ : জীবন-ব্যবসায়ে শুধু আমদানি নয়, রপ্তানিও আছে।

বাঁটুলকে বসাইয়া ব্যোমকেশ টাকা আনিতে গেল। কামিনীকান্তর দেওয়া নোটগুলি হইতে একটি আনিয়া বাঁটুলকে দিল—'ভাঙানি আছে বাঁটুল ?'

'আজ্ঞে, আছে।'

বাঁটুল কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিল। বেশ পরিপুষ্ট গেঁজে ; তাহাতে খুচরা রেজগি হইতে নানা অঙ্কের নোট পর্যন্ত রহিয়াছে। কয়েকটি একশত টাকার নোটও চোখে পড়িল। বাঁটুল হিসাব করিয়া ভাঙানি ফেরত দিল, তারপর গেঁজে আবার কোমরে বাঁধিল। বাঁটুলের ব্যবসা যে লাভের ব্যবসা তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বাঁটুলকে সিগারেট দিল—'বাঁটুল, অনাদি হালদার মারা গেছে শুনেছ বোধহয় ?'

বাঁটুল চোখ তুলিল না, সযত্নে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'আজ্ঞে, শুনেছি।'

'কেউ তাকে গুলি করে মেরেছে।'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। তাই তো গুজব।'

'তুমি তো অনেক খবর-টবর রাখো, কে মেরেছে আন্দাজ করতে পারো না ?'

'কলকাতায় লাখ লাখ লোক আছে কর্তা, তার মধ্যে কে মেরেছে কি করে আন্দাজ করব। তবে এ কথাও বলতে হয়, উনি চুল্‌কে ঘা করলেন। আমার চাঁদা বন্ধ না করলে বেঘোরে প্রাণটা যেত না। আমি রক্ষে করতাম।'

'বটেই তো ! জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা কি উচিত ! অনাদি হাল্‌দারের দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। সে যাক। বাঁটুল, তোমরা রাইফেল ভাড়া দাও ?'

'আজ্ঞে, দিই।'

'কি রকম শর্তে ভাড়া দাও ?'

'আজ্ঞে, ভাড়া একদিনের জন্যে কুল্লে পঁচিশ টাকা ; রাইফেল আর দুটি টোটা পাবেন। তবে ভাড়া নেবার সময় তিনশো টাকা জমা দিতে হয়, রাইফেল ফেরত দিলে ভাড়া কেটে নিয়ে টাকা ফেরত দিই। আপনাদের চাই নাকি কর্তা ?'

'না, উপস্থিত দরকার নেই, দরটা জেনে রাখলাম। আচ্ছা বাঁটুল, যে-রাত্রে অনাদি হালদার খুন হয় সে-রাত্রে কাউকে রাইফেল ভাড়া দিয়েছিলে ?'

বাঁটুল উঠিয়া দাঁড়াইল, 'আজ্ঞে কর্তা, সে কথা বলতে পারব না। একজন খদ্দেরের কথা আর একজনকে বললে বেইমানী হয়, আমাদের ব্যবসা চলে না। আচ্ছা, আজ আসি। পেন্নাম হই।'

বাঁটুল চলিয়া গেল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় লম্বা হইয়া বোধকরি ঝিমাইয়া পড়িল। আমার মনটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া দুইশত টাকার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। টাকা যখন লইয়াছি তখন উপন্যাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হইবে। অথচ তাড়াহুড়া করিয়া আমার লেখা হয় না ; মনটা যখন নিশ্চিন্ত নিস্তরঙ্গ হয় তখনই কলম চলে। উপন্যাসের কথাই ভাবিতে লাগিলাম ; তাহার মধ্যে নিমাই নিতাই প্রভাত বাঁটুল সকলেই মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে পেটে ক্ষুধার উদয় হইলে বলিলাম, 'চল, এবার বেরুনো যাক। হোটেলের খরচ আজ না হয় আমিই দেব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সাধু সাধু।'

আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি হোটেল আছে। দোতলার উপর হোটেল, সরু সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয় ; সিঁড়ির মাথায় স্থূলকায় ম্যানেজার টেবিলের উপর ক্যাশ-বাক্স লইয়া বসিয়া থাকেন। আশেপাশে ছোট ছোট কুঠুরিতে টেবিল পাতা। বিশেষ জাঁকজমক নাই, কিন্তু রান্না ভাল।

হোটেলে উপস্থিত হইলে ম্যানেজার বলিলেন, 'পাঁচ নম্বর।' অমনি একজন ভৃত্য আসিয়া আমাদের পাঁচ নম্বর কুঠুরির দিকে লইয়া চলিল। একটি গলির দুই পাশে সারি সারি কুঠুরি ; যাইতে যাইতে একটি কুঠুরির সম্মুখে গিয়া পা আপনি থামিয়া গেল। আমি ব্যোমকেশের গা টিপিলাম। পর্দার ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে, কেষ্টবাবু একাকী বসিয়া আহার করিতেছেন। তাঁহার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবির উপর পাট করা শাল, মুখে ধনগর্বের গাম্ভীর্য। তাঁহার সামনে শ্বেতবস্ত্রাবৃত টেবিলের উপর অনেকগুলি প্লেটে রাজসিক খাদ্যদ্রব্য সাজানো ; একটি প্লেটে আস্ত রোস্ট্ মুরগি উত্তানপাদ অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। পাশে একটি বোতল।

কেষ্টবাবু পানাহারে মগ্ন, দরজার বাহিরে আমাদের লক্ষ্য করিলেন না। আমরা পাশের প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলাম।

ভৃত্যকে অর্ডার দিলে সে খাবার লইয়া আসিল ; আমরা খাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশের প্রাক্তন প্রসন্নতা আর নাই, সে যেন ভাল ভাল খাদ্যগুলি উপভোগ করিতেছে না।

আধ ঘণ্টা পরে ভোজন শেষ করিয়া কোটর হইতে নির্গত হইলাম। ম্যানেজারের টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেষ্টবাবু হোটেলের ঋণ শোধ করিতেছেন। রাজকীয় ভঙ্গীতে পকেট হইতে একশত টাকার নোট লইয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

এই লইয়া আজ চারবার একশত টাকার নোট দেখিলাম। দেশটা সম্ভবত রাতারাতি বড়মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, ইংরেজ বিদায় লইবার পূর্বেই আমাদের কপাল ফিরিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের আর দেরি নাই।

ম্যানেজার ভাঙানি ফেরত দিলেন, কেষ্টবাবু তাহা অবজ্ঞাভরে পকেটে ফেলিয়া পিছন ফিরিলেন। আমরা পিছনেই ছিলাম।

চোখাচোখি হইল। কেষ্টবাবুর চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল। তারপর তিনি পাকশাট্ খাইয়া ঝটিতি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

আমরা যখন হোটেলের প্রাপ্য চুকাইয়া পথে নামিলাম কেষ্টবাবু তখন অদৃশ্য হইয়াছেন।

বাসার দিকে চলিতে চলিতে বলিলাম, 'আজকের দিনটা ঘটনাবহুল বলা চলে, এমন কি টাকাবহুল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ যেন চারিদিকে একশো টাকার নোটের হরির লুট হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

আরও খানিক দূর চলিবার পর বলিলাম, 'কী ভাবছ এত ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চল অজিত, পাটনা যাই। সকালে একটা ট্রেন আছে।'

আমি ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িলাম—'পাটনা যাবে ! আর এদিকে ?'

'এদিকে আর কিছু করবার নেই।'

'তার মানে অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে তা বুঝতে পেরেছ !'

'বোধহয় পেরেছি। কিন্তু তাকে ধরবার উপায় নেই।'

আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম—'কে খুন করেছে ?'

ব্যোমকেশ আকাশের দিকে চোখ তুলিল ; বুঝিলাম আবোল-তাবোল আবৃত্তি করিবার উদ্যোগ করিতেছে। বলিলাম, 'বলতে না চাও বোলো না। কিন্তু বিকাশ দত্তকে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে টাকা দিয়েছ তার কি হবে ?'

'বিকাশ ওস্তাদ ছেলে, জানাবার মত খবর থাকলে সে ঠিক আমাকে জানাবে।'

'কিন্তু আসল খবর যখন জানতেই পেরেছ তখন আর খবরে দরকার কি ?'

'দরকার হয়তো নেই, কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়। সুন্দরী যুবতীরা প্রসাধন করেন কেন ? বল্কল পরে থাকলেই পারেন ! থাকেন না তার কারণ, অধিকন্তু ন দোষায়।'

'তুমি কি সুন্দরী যুবতী ?'

'না, আমি সুন্দর যুবক। আমার জন্যে আমার বউয়ের মন কেমন করছে। সুতরাং আর দেরি নয়। কাল সকালেই—পাটনা।'

চৌদ্দ

আমাদের পাটনা যাত্রার পর হইতে স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত এই কয় মাস আমাদের জীবনের ধারাবাহিকতা অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে পড়িয়া অনাদি হালদার ঘটিত ব্যাপারের খেই হারাইয়া গিয়াছিল। এই কাহিনীতে সে সকল অবান্তর ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি অনাবশ্যক, কেবল সংক্ষেপে এই আট-নয় মাস কি করিয়া কাটিল তাহার আন্দাজ দিয়া নির্দিষ্ট বিষয়ে ফিরিয়া যাইব।

পাটনায় পৌঁছিয়া দশ-বারো দিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল ; তারপর একদিন পুরন্দর পাণ্ডের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। পাণ্ডেজি বছরখানেক হইল বদলি হইয়া পাটনায় আসিয়াছেন। সেই যে দুর্গরহস্য সম্পর্কে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, তারপর দেখা হয় নাই। পাণ্ডেজি খুশি হইলেন, আমরাও কম খুশি হইলাম না। পাণ্ডেজি মৃত্যু-রহস্যের অগ্রদূত। আমাদের সহিত দেখা হইবার দু' একদিন পরেই একটি রহস্যময় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শেষ পর্যন্ত ব্যোমকেশকেই সে রহস্য ভেদ করিতে হইল। একদিন সে কাহিনী বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শুধু যে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইতেছিল তাহা নয়, সারা ভারতবর্ষের জীবনে এক মহা সন্ধিক্ষণ দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। স্বাধীনতা আসিতেছে, রক্তাক্ত দেহে বিক্ষত চরণে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ভেদ করিয়া আসিতেছে। স্বাধীনতা যখন আসিবে হয়তো মুমূর্ষু

রক্তহীন দেহে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে হৃদয়রক্ত নিঙড়াইয়া দিতে হইবে। তবু স্বাধীনতা আসিতেছে ; স্বার্থ-নিষ্ঠুর বিদেশী শাসকের খড়্গে দ্বিখণ্ডিত হইয়াও হয়তো বাঁচিয়া থাকিবে। আশা আশঙ্কায় কম্পমান সেই দিনগুলির কথা স্মরণ হইলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

একদিন বৈকালে ময়দানে বেড়াইতে বেড়াইতে কৈশোরের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। পরিধানে শেরওয়ানী পায়জামা সত্ত্বেও চিনিতে পারিলাম—স্কুলে যাহার সহিত প্রাণের বন্ধুত্ব ছিল সেই ফজ্লুর রহমান। দু'জনে প্রায় একসঙ্গেই পরস্পরকে চিনিতে পারিলাম এবং সবেগে অলিঙ্গনবদ্ধ হইলাম।

'ফজ্লু !'

'অজিত !'

কিছুক্ষণ পরে বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমি দুই পা পিছাইয়া আসিলাম, ফজ্লুর দিকে গলা বাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, 'নে ফজ্লু, ছুরি বার কর্। এই গলা বাড়িয়ে রয়েছি।'

ফজ্লু নিজের হাতের মোটা লাঠিটা আমার হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিল, 'এই নে লাঠি, বসিয়ে দে আমার মাথায়। তোদের অসাধ্য কাজ নেই।'

তারপর আমরা ঘাসের উপর বসিলাম, ব্যোমকেশের সহিত ফজ্লুর পরিচয় করাইয়া দিলাম। ফজ্লু এখন পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছে, প্রচণ্ড পাকিস্তানী। সুতরাং তুমুল তর্ক বাধিয়া উঠিল, কেহই কাহাকেও রেয়াৎ করিলাম না। শেষে ফজ্লু বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, অজিতের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, ওর ঘটে কিচ্ছু নেই। কিন্তু আপনি তো বুদ্ধিজীবী মানুষ, আপনি বলুন দেখি দোষ কার—হিন্দুর, না, মুসলমানের ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।'

সেদিন বেড়াইয়া ফিরিতে দেরি হইয়া গেল। তারপর আরও কয়েকদিন ফজ্লুর সহিত দেখা হইয়াছিল। সে নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদের খাওয়াইয়াছিল। তারপর—

উন্মত্ত হিংসার পিশাচ-নৃত্য আবার শুরু হইয়া গেল। প্রথমে নোয়াখালি, তারপর বিহার। এ লইয়া বাক্-বিস্তারের প্রয়োজন নাই। ফজ্লু এই হিংসা-যজ্ঞে প্রাণ দিল। সে সত্যনিষ্ঠ সাহসী পুরুষ ছিল, যাহা বিশ্বাস করিত তাহা গলা ছাড়িয়া প্রচার করিত ; তাই বোধহয় তাহাকে প্রাণ দিতে হইল। কিছুদিন পরে বাতাস একটু ঠাণ্ডা হইলে আমরা পাটনা সিটিতে ইশাক সাহেবের খোঁজ লইতে গিয়াছিলাম। তিনিও গিয়াছেন ; কেবল তাঁহার দোকানটা অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে। এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।

কিন্তু যাক। এবার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে বিকাশ দত্তর চিঠি আসিয়াছিল ; বিকাশ লিখিয়াছিল—

'প্রণাম শতকোটি, পুঁটিরামের কাছে আপনার ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি লিখছি। আশা করি আপনি শীঘ্রই ফিরবেন।

আমি এখন মাস্টারি করছি। দয়ালহরি মজুমদারের একটা আট-নয় বছরের অকালপক্ক ছেলে আছে, তাকে পড়াই। মাইনে পাঁচ টাকা, সকাল বিকেল পড়াতে যাই। ছেলেটা হাড় বজ্জাত ; এমন ইঁচড়ে পাকা মিট্‌মিটে শয়তান আমিও আজ পর্যন্ত দেখিনি। বাড়িতে কে কি করছে, কোথায় কি ঘটছে, সব খবর সে রাখে।

দয়ালহরি মজুমদার ঢাকার লোক ; সেখানে বীমার দালালি এবং আরও কি কি করত। বছরখানেক আগে রাজনৈতিক গণ্ডগোলের আঁচ পেয়ে আগে ভাগেই কলকাতা পালিয়ে এসেছিল। মেয়ে এবং ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। লোকটা সন্দিগ্ধ এবং ধড়িবাজ।

মেয়ে শিউলী শান্ত এবং ভালমানুষ গোছের। বাইরে থেকে মনে হয় বিদ্যেধরী, কিন্তু আসলে তা নয়। ভাল গাইতে পারে, রাতদিন গান বাজনা নিয়ে আছে। গ্রামোফোনে গান দিয়েছে, তা ছাড়া টাকা নিয়ে সভাসমিতিতে গাইতে যায়। শিউলীর উপার্জন থেকে বোধহয় সংসার চলে।

বুড়োটা কিছু কাজকর্ম করে না।

আপনি অনাদি হালদার আর প্রভাত—এই দুটো নাম মনে রাখতে বলেছিলেন। অনাদি হালদারের খবর পাইনি, প্রভাতের খবর পেয়েছি। কয়েক মাস আগে প্রভাতের সঙ্গে শিউলীর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, তারপর সম্বন্ধ ভেঙে যায়। কেন ভেঙে যায় তা জানতে পারিনি, তবে সন্দেহ হয় কোনও গুপ্তকথা আছে। বিয়ে ভেঙে যাবার আগে প্রভাত ঘন ঘন আসত, বিয়ে ভেঙে যাবার পরও একবার এসেছিল। দয়ালহরি মজুমদার তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়।

উপস্থিত বাড়িতে একজন লোকের খুব যাতায়াত আছে, তার নাম জগদানন্দ অধিকারী। শিউলীকে গান শেখাবার ছুতো করে আসে। লোকটার মতলব ভাল নয়। গান শেখানো ছাড়া অন্যভাবে ঘনিষ্ঠতা করতে চায়।

আপাতত এই পর্যন্ত। নতুন খবর পেলে জানাবো। আপনি কবে ফিরবেন ? আমার ঠিকানা নীচে দিলাম।

প্রণামান্তে বিকাশ দত্ত।'

বিকাশের চিঠিতে নূতন কথা বিশেষ কিছু নাই। আমাদের জানা কথাই পরিকীর্ণ হইয়াছে।

এদিকে পাটনায় আমাদের অনেকদিন হইয়া গেল। কলিকাতায় ফিরিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় দিল্লী হইতে ব্যোমকেশের নামে 'তার' আসিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাহার সহিত দেখা করিতে চান।

সর্দার বল্লবভাই কি করিয়া ব্যোমকেশের নাম জানিলেন, কেন তাহার সাক্ষাৎ চান, কিছুই জানা গেল না। রাজনৈতিক আকাশে তখন ঘনঘটা, অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে বজ্রবিদ্যুৎ। ব্যোমকেশ আমাকে পাটনায় ফেলিয়া একাকী দিল্লী চলিয়া গেল।

দিল্লী গিয়া ব্যোমকেশ কি করিয়াছিল তাহা পুরোপুরি জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সে ফিরিয়া আসিবার পর ইশারা ইঙ্গিতে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করার এ স্থান নয়। দেশ তখনও নিজের হাতে আসে নাই, ইহারই মধ্যে গুপ্ত ঘরভেদীরা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, কে দেশের শত্রু কে মিত্র নিশ্চয়ভাবে জানার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ব্যোমকেশ চলিয়া গেলে আমি একলা পড়িয়া গেলাম। দূরে রণবাদ্য শুনিয়া আস্তাবলে বাঁধা লড়ায়ে-ঘোড়ার যে অবস্থা হয় আমার অবস্থাও কতকটা সেই রকম দাঁড়াইল। এইভাবে পাটনায় যখন আর মন টিকিল না তখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু কলিকাতার বাসা শূন্য। ভাবিয়াছিলাম, নিরিবিলিতে উপন্যাসে মন বসাইতে পারিব, কিন্তু মন বসিতে চাহিল না। প্রভাতের নিকট হইতে টাকা লইয়াছি, একটা কিছু করা দরকার, এই সঙ্কল্পটাই মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল।

একদিন প্রভাতের দোকানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া সে গলা উঁচু করিয়া বলিল, 'পাটনা থেকে কবে ফিরলেন ? আমি মাঝে আপনাদের বাসায় গিয়েছিলাম। ইশাক সাহেবের খবর নিয়েছিলেন ?'

ইশাক সাহেবের খবর বলিলাম। প্রভাত কিছুক্ষণ অচল হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে লাগিল। আমি সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম না, আবার দেখা হইবে বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রভাতের চিঠি লইয়া নৃপেন আসিল। চিঠিতে দু' ছত্র লেখা—

মাননীয়েষু, কাল কোনও কথা হইল না, সেজন্য লজ্জিত। ব্যোমকেশবাবু কি ফিরিয়াছেন ?

উপন্যাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আশা করি অগ্রসর হইতেছে। ইতি নিবেদক প্রভাত রায়।

নৃপেনকে বলিলাম, 'ব্যোমকেশ এখনও ফেরেনি।—আপনি এখনও প্রভাতবাবুর দোকানেই কাজ করছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আছেন কোথায় ?'

'পুরানো বাসাতেই আছি। প্রভাতবাবু থাকতে দিয়েছেন।'

'ননীবালা দেবীর সঙ্গে বেশ বনিবনাও হচ্ছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

'ওদিকের খবর কি ? নিমাই নিতাই ?'

'ওরা আদালতের হুকুম পেয়েছে। আমাদের বাসায় অনাদিবাবুর যেসব জিনিস ছিল সব তুলে নিয়ে গেছে। আলমারিও নিয়ে গেছে।'

'পুলিসের দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ পেয়েছেন ?'

'কিছু না।'

'কেষ্টবাবুর খবর কি ?'

'জানি না। সেই যে বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তারপর আর দেখিনি।'

নৃপেন চলিয়া গেল।

উপন্যাস লইয়া বসিলাম। কিন্তু মন বিক্ষিপ্ত, তাহাকে কলমের ডগায় ফিরাইয়া আনিতে পারিলাম না। আরও কয়েকদিন ছটফট করিয়া পাটনায় ফিরিয়া গেলাম।

ব্যোমকেশ দিল্লী হইতে ফিরে নাই। গোটা দুই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পোস্টকার্ড আসিয়াছে, ভাল আছি, ভাবনা করিও না। কবে ফিরিব স্থিরতা নাই।

এদিকে স্বাধীনতা দিবস অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সমস্ত দেশ অভাবনীয় সম্ভাবনার আশায় যেন দিশাহারা হইয়া গিয়াছে।

আগস্ট মাসের দশ তারিখে হঠাৎ ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিল।

রোগা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শুষ্ক মুখে বিজয়ীর হাসি। বলিল, 'আর না, চল, কলকাতায় ফেরা যাক। পুঁটিরামকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দাও।'

পনেরো

ইচ্ছা ছিল সত্যবতী ও খোকাকে লইয়া একসঙ্গে কলিকাতায় ফিরিব, সত্যবতীও এতদিন বাহিরে বাহিরে থাকিয়া ঘরে ফিরিবার জন্য দড়িছেঁড়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। পাটনায় দীর্ঘকাল থাকার ফলে বেশ একটি সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা গুটাইয়া লইবার ভার একা সুকুমারের ঘাড়ে চাপাইয়া চলিয়া যাইতে পারিলাম না। কথা হইল হপ্তাখানেক পরে সুকুমার সত্যবতীদের লইয়া ফিরিবে, আমরা আগে গিয়া বাসাটা সাজাইয়া গুছাইয়া সত্যবতীর উপযোগী করিয়া রাখিব।

১৩ আগস্ট প্রত্যূষে আমি ও ব্যোমকেশ কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

তখনও সূর্যোদয় হয় নাই। বাসার সম্মুখে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া দেখি আমাদের সদর দরজার সামনে ভিড় জমিয়াছে। ভিড়ের মধ্যে পুঁটিরামকে দেখা গেল। ব্যাপার কি! আমরা ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটি মৃতদেহ ফুটপাথে পড়িয়া আছে, পিঠের বাঁ দিকে রক্তের দাগ শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। দৃষ্টিহীন চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া খোলা।

চিনিতে কষ্ট হইল না, কেষ্টবাবু।

এখনও পুলিস আসিয়া পৌঁছে নাই। আমরা ভিড়ের বাহিরে আসিলাম, পুঁটিরামকে ডাকিয়া লইয়া উপরে চলিলাম। ব্যোমকেশের মুখ লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চোখে চাপা আগুন।

নিজেদের বসিবার ঘরে গিয়া দু'জনে উপবিষ্ট হইলাম। কেষ্টবাবুর হঠাৎ ভাগ্যোন্নতি যে এইরূপ পরিণতি লাভ করিবে তাহা কে ভাবিয়াছিল। আমি বলিলাম, 'আমার ধারণা হয়েছিল

কলকাতায় সম্মুখ-সমর বন্ধ হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা সম্মুখ-সমর নয়, কেষ্ট দাসকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছে। পুঁটিরাম, তুই চিনতে পারলি ?'

পুঁটিরাম বলিল, 'আজ্ঞে চিনেছি, উনি সেই ভেট্‌কিমাছবাবু। কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিলেন, আপনার কথা জিজ্ঞেস করলেন।'

'কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিল ?'

'আজ্ঞে। আমি বললাম, চিঠি পেয়েছি, বাবুরা কাল সকালে আসবেন। তখন তিনি চলে গেলেন।'

'হুঁ। আচ্ছা পুঁটিরাম, তুই চা তৈরি কর গিয়ে।'

ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় পা ছড়াইয়া কড়িকাঠের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া রহিল। আমি জানালায় গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম ফুটপাথে পুলিসের আবির্ভাব হইয়াছে, ভিড় সরিয়া গিয়াছে। কেষ্টবাবুকে একটা মোটর ভ্যানে তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। পুলিস কেষ্টবাবুর নাম ধাম জানিতে পারিল কিনা বোঝা গেল না। তাহারা লাশ লইয়া চলিয়া গেল।

চা আসিল। ব্যোমকেশ চায়ে চুমুক দিয়া বলিল, 'লাশ দেখে মনে হয় শেষরাত্রির দিকে—রাত্রি তিনটে-চারটের সময়, কেষ্ট দাস খুন হয়েছে। প্রথম যেদিন কেষ্টবাবু আমার কাছে আসে সেও রাত্রি তিনটে-চারটের সময়। কিন্তু তখন একটা কারণ ছিল, আজ এতরাত্রে কি জন্যে আসছিল ?'

বলিলাম, 'তোমার কাছেই আসছিল তার প্রমাণ কি ? মাতাল দাঁতাল মানুষ—হয়তো এই দিক দিয়ে যাচ্ছিল, গুণ্ডা ছুরি মেরেছে—'

'না, এতবড় সমাপতন সম্ভব নয়, কেষ্ট দাস আমার কাছেই আসছিল। কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিল, আমি নেই শুনে ফিরে গিয়েছিল। তারপর রাত্রে এমন কিছু ঘটল যে সে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না—' ব্যোমকেশ হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'ভেবেছিলাম অনাদি হালদারের ব্যাপারটা ভুলে যাব, কিন্তু এরা ভুলতে দিলে না।'

'অনাদি হালদারের সঙ্গে কেষ্টবাবুর মৃত্যুর সম্বন্ধ আছে নাকি ?'

ব্যোমকেশ আমার প্রতি একটি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর আরাম-কেদারায় লম্বা হইল।

বেলা আটটা নাগাদ বিকাশ দত্ত আসিল। তাহার আর সেই অন্তঃশূন্য চুপসানো ভাব নাই ; আমাদের দেখিয়া দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, 'এই যে আপনারা এসে গেছেন স্যার ! আমি পাটনায় চিঠি লিখতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখে যাই। কিছু নতুন খবর আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বসুন, খবর শুনব। নিজের কথা আগে বলুন। আট-নয় মাস বাইরে ছিলাম, আপনার অসুবিধে হয়নি তো ?'

বিকাশ বলিল, 'অসুবিধে হয়েছিল স্যার। কিন্তু সে কিছু নয়। এখন সামলে নিয়েছি। তিন মাইল ঘাস কিনেছি, তাতেই চলে যাচ্ছে।'

'তিন মাইল ঘাস !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

বিকাশ তিন মাইল ঘাসের রহস্য প্রকাশ করিল। রেল লাইনের দু'ধারে যে ঘাস জন্মায়, রেলের কর্তৃপক্ষ নাকি তাহা প্রতি বৎসর জমা দিয়া থাকেন। বিকাশ তিন মাইল ঘাস জমা লইয়াছে এবং গোয়ালাদের সেই ঘাস বিক্রয় করিতেছে। বিকাশের কোন কষ্ট নাই, গোয়ালারা অগ্রিম পয়সা দিয়া গরু মোষ চরায় ; বিকাশের কিছু লাভ থাকে।

বিকাশ বলিল, 'তাছাড়া চাকরিটা বোধহয় এবার ফিরে পাব স্যার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ, এবার কি নতুন খবর আছে বলুন। আপনার ছাত্রকে আজ সকালে পড়াতে যাননি ?'

বিকাশ বলিল, 'পড়াব কাকে স্যার ? পাখি উড়েছে।'

'সে কি !'

'সেই খবরই তো দিতে এলাম। গোড়ার দিক থেকে বলব, না শেষের দিক থেকে ?

'গোড়ার দিক থেকে বলুন।'

বিকাশ তখন তক্তপোশের উপর ভব্যিযুক্ত হইয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, 'চিঠিতে আপনাকে যে সব খবর দিয়েছিলাম তারপর আর নতুন খবর কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। ঢিমে-তেতালায় চলছিল, তবু লেগে রইলাম। বসে না থাকি বেগার খাটি। মাসখানে আগে জানতে পারলাম দয়ালহরি মজুমদারের নামে একজন পাঁচ হাজার টাকার মামলা ঠুকে দিয়েছে। দয়ালহরি বুড়োর ভাবগতিক দেখে মনে হল সে কেটে পড়বার মতলবে আছে। দিন কয়েক পরে হঠাৎ একদিন প্রভাত এসে উপস্থিত। প্রভাতকে আগে দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। বুড়ো তাকে ঢুকতেই দিচ্ছিল না, তারপর ঘরে এনে বসালো। দোর বন্ধ করে কথাবার্তা হল, আমি জানলায় কান লাগিয়ে শুনলাম। প্রভাত বলছে, আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি, দোকান বাঁধা রেখে যেখান থেকে হোক পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করব, আপনি হ্যান্ডনোটের টাকা শোধ করে দিন। বুড়ো পাঁচ হাজার টাকার বদলে প্রভাতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হল।

'এদিকে গদানন্দর সঙ্গে—ভাল কথা, জগদানন্দ অধিকারীর ডাক-নাম গদানন্দ—শিউলীর ভেতরে ভেতরে কিছু চলছিল। গদানন্দ সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি, মেয়ে ধরা ওর পেশা, বেটা দালাল। সে যাহোক, হপ্তাখানেক পরে প্রভাত একটা ছোট্ট অ্যাটাচি-কেস্ হাতে নিয়ে এল ; বুঝলাম টাকা এনেছে। তারপর জানালায় কান লাগিয়ে শুনলাম, বুড়ো বলছে, তুমি ভাল ছেলে, অনাদি হালদার তোমার নামে মিছে কথা বলেছিল। আমি তোমার সঙ্গে শিউলীর বিয়ে দেব। কিন্তু শ্রাবণ মাসে আর বিয়ের দিন নেই, অঘ্রাণ মাসে বিয়ে হবে। প্রভাত খুশি হয়ে চলে গেল।

'তারপর কি ব্যাপার হল জানি না, গত ৭ই আগস্ট পড়াতে গিয়ে শুনলাম গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে উধাও হয়েছে। বুড়োর সাজিশ ছিল কিনা বলতে পারি না, আমার বিশ্বাস বুড়োই নাটের গুরু। যাহোক, সেদিন সন্ধ্যেবেলা প্রভাত এল। খুব খানিকটা চেঁচামেচি হল। প্রভাত টাকা ফেরত চাইল, বুড়ো হাত উল্টে বলল, টাকা কোথায় পাব, শিউলী আর গদানন্দ টাকা নিয়ে পালিয়েছে। প্রভাত রাগে ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে গেল। বেচারার জাতও গেল পেটও ভরল না।

'কাল সকালবেলা পড়াতে গিয়ে দেখি বাড়ির দরজা খোলা, বাড়িতে কেউ নেই। বুড়ো ছেলেটাকে নিয়ে কেটে পড়েছে।'

গল্প শেষ করিয়া বিকাশ একটা বিড়ি ধরাইয়া ফেলিল, বলিল, 'এসব খবর আপনার কাজে লাগবে কিনা জানি না স্যার, কিন্তু এর বেশি আর কিছু যোগাড় করা গেল না।'

'সব খবর কাজের খবর'—ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর চোখ খুলিয়া বলিল, 'গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে কোথায় গেছে আপনি জানেন না বোধহয় ?'

'না। যদি বলেন খুঁজে বার করতে পারি।'

ব্যোমকেশ একটু মৌন থাকিয়া বলিল, 'আর একটা কাজ আপনাকে করতে হবে।'

এই সময় দরজায় টোকা পড়িল।

দ্বার খুলিয়া দেখি প্রভাত। তাহার চুল উষ্কখুষ্ক, মুখ শীর্ণ, চোখভরা ক্লান্তি। তাহাকে দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন, প্রভাতবাবু, আমরা ফিরেছি খবর পেলেন কোত্থেকে ?'

প্রভাত চেয়ারে বসিল। বিকাশকে সে লক্ষ্যই করিল না ; বিকাশও তক্তপোশের এক কোণে এমনভাবে গুটিসুটি হইয়া বসিল যে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রভাত বলিল, 'খবর পাইনি, দেখতে এলাম যদি এসে থাকেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ। কেষ্টবাবু মারা গেছেন আপনি শোনেননি বোধহয়।'

প্রভাত কিছুক্ষণ নির্লিপ্ত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল, যেন কেষ্টবাবুর মরা-বাঁচা সম্বন্ধে তাহার তিলমাত্র কৌতূহল নাই।

'না, শুনিনি। কি হয়েছিল ?'

'কাল রাত্রে কেউ তাকে ছুরি মেরেছিল।'

উদাসীনকণ্ঠে প্রভাত বলিল, 'ও—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক ওকথা। দয়ালহরিবাবুর নামে নিমাই নিতাই পাঁচ হাজার টাকার হ্যান্ডনোটের উপর নালিশ করেছে জানেন নিশ্চয়।'

প্রভাতের মুখ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, 'জানি। কিন্তু ওকথাও যেতে দিন, ব্যোমকেশবাবু। মানুষের অ-মনুষ্যত্ব দেখে দেখে আমার মন বিষিয়ে গেছে। আমি আপনাকে জানাতে এসেছিলাম যে, আর আমার এখানে মন টিকছে না, আমি শীগ্গিরই চলে যাব।'

'সে কি, কোথায় যাবেন ?'

'তা এখনও ঠিক করিনি। পাটনায় ফিরে যেতে পারি। যেখানেই যাই দু' মুঠো জুটে যাবে। কলকাতায় আর নয়।'

'কিন্তু—আপনার দোকান ?'

'দোকান বিক্রি করে দেব—' প্রভাতের মুখ ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল, সে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'অজিতবাবু, আপনার জানাশোনা কেউ আছে, যে বইয়ের দোকান কিনতে পারে ? বেশি দাম আমি চাই না। তিন হাজার—আড়াই হাজার পেলেও আমি বিক্রি করে দেব।'

ভাবিতে লাগিলাম, জানাশোনার মধ্যে এমন কে আছে যে, বইয়ের দোকান কিনিতে পারে। হঠাৎ ব্যোমকেশ এক অদ্ভুত কথা বলিয়া বসিল, 'আমরা কিনতে পারি। আমি আর অজিত কিছুদিন থেকে পরামর্শ করছি একটা বইয়ের দোকান খুলব। অজিত নিজে লেখক, ও চালাতে পারবে। আপনার দোকানটা যদি পাওয়া যায় তাহলে তো ভালোই হয়।'

প্রভাতের মুখে একটু সজীবতা দেখা দিল, সে বলিল, 'আপনারা নেবেন ? তার চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে ? আপনার নিলে দোকান বিক্রি করেও আমার দুঃখ হবে না। তাহলে—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কত টাকার বই আছে আপনার দোকানে ?'

প্রভাত বলিল, 'হিসেব না দেখে কিছু বলতে পারি না, কিন্তু চার হাজার টাকার কম হবে না।'

'বেশ, কাল সকালে গিয়ে আমরা আপনার হিসেবপত্র দেখব। দোকানের ওপর মর্টগেজ নেই তো ?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে কথা রইল, কাল আমরা আপনার কাগজপত্র দেখব, স্টক মিলিয়ে নেব। যা ন্যায্য দাম তাই আপনি পাবেন। কিন্তু একটা কথা। ১৫ই আগস্ট সকালে আমাদের দখল দিতে হবে। স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে ব্যবসা আরম্ভ করতে চাই।'

'তাই হবে। যখন দখল চাইবেন তখনই দেব। আজ উঠি, হিসেবের কাগজপত্র ঠিক করে রাখতে হবে।'

'আচ্ছা। ভাল কথা, নৃপেনবাবু এখনও আছেন ?'

'আছেন। তাঁকে অবশ্য বলে দিয়েছি যে আমি দোকান রাখব না। তিনি অন্য চাকরি খুঁজছেন, পেলেই চলে যাবেন।—আপনারা কি তাঁকে রাখবেন ?'

'রাখতেও পারি। তাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দেবেন।'

'দোকানে গিয়েই পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা, নমস্কার।'

প্রভাত দ্বারের বাহিরে যাইবামাত্র ব্যোমকেশ এক লাফ দিয়া বিকাশকে ধরিল, দ্রুত-হ্রস্ব কণ্ঠে তাহার কানে কানে কথা বলিয়া তাহার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজিয়া দিল। আমি কেবল তাহার শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইলাম, 'মনে থাকে যেন, কাল রাত্রি বারোটা পর্যন্ত এক মিনিট আপনার ছুটি নেই।'

বিকাশ একবার দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িল, তারপর জ্যা-মুক্ত তীরের মত সাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘর খালি হইয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাণ্ডকারখানা কি ?'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া চেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিল, ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'একটা মস্ত সুযোগ হাতে এসেছে, অজিত, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।'

'কোন্ সুযোগের কথা বলছ ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এই ধরো বইয়ের দোকানটা। যদি পাওয়া যায়, ছাড়া উচিত কি ? বইয়ের ব্যবসা খুব লাভের ব্যবসা ; তুমিও মনের মত একটা কাজ পাবে। শুধু বই লিখে আজকাল কিছু হয় না। দেখছ তো, তোমাদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান সাহিত্যিক তাঁরা গুটি গুটি ব্যবসায়ে ঢুকে পড়েছেন এবং বেশ দুধে-ভাতে আছেন।'

কথাটা সত্য। বইয়ের ব্যবসায় পয়সা আছে, বিশেষত যদি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের বাজার কোণ-ঠাসা করা যায়। তবু মৌখিক আপত্তি তুলিয়া বলিলাম, 'কিন্তু এই দুঃসময়ে হঠাৎ এতগুলো টাকা বার করা কি ভাল ?'

সে বলিল, 'দু'জনে ভাগাভাগি করে দিলে গায়ে লাগবে না। তুমি হবে খাটিয়ে অংশীদার, আর আমি—ঘুমন্ত অংশীদার।'

আধ ঘণ্টা পরে নৃপেন আসিল। বলিল, 'প্রভাতবাবু পাঠালেন। আপনি আমায় ডেকেছেন ?'

'হ্যাঁ, বসুন ঐ চেয়ারে।' ব্যোমকেশ কঠিন চক্ষে কিয়ৎকাল তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনার সব কীর্তিই আমি জানতে পেরেছি। রমেশ মল্লিক আমার বন্ধু।'

ন্যাপা চমকিয়া কাষ্ঠমূর্তিতে পরিণত হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদি হালদারের আলমারির চাবি আপনি তৈরি করেছিলেন। আলমারিতে অনেক টাকা ছিল, সে টাকা কোথায় গেল ? আমি যদি পুলিসকে খবর দিই তারা জানতে চাইবে। আপনি কী উত্তর দেবেন ?'

ন্যাপা অধর লেহন করিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি কথাটা পুলিসের কানে না তুলতে পারি, যদি আপনি আমার একটা কাজ করেন।'

ন্যাপার কণ্ঠ হইতে ভাঙা-ভাঙা আওয়াজ বাহির হইল, 'কি কাজ ?'

'আর একটা চাবি তৈরি করে দিতে হবে।'

ষোলো

কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, পোহায় আগস্ট নিশি একত্রিশা বাসরে। তারপর কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, প্রথম পৌর স্বয়ংপ্রভুতার সেই দিনটিকে স্মরণ করিয়া রাখে এমন কেহ বাঁচিয়া নাই। আবার আর একটি আগস্ট নিশি পোহাইল। এবারও পর্ব ঘরে ঘরে, এবারও বাসাড়ে বাসিন্দা বেওয়া বেশ্যা করে সোর। কেবল পটভূমিকা আরও বিস্তৃত হইয়াছে, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সকালে ঘুম ভাঙিয়া চিন্তা করিতে বসিলাম। এই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল ইহাতে আমার কৃতিত্ব কতটুকু ? একটা পতাকা নাড়িয়াও তো সাহায্য করি নাই। (ব্যোমকেশ দিল্লীতে গিয়া সাত মাস ধরিয়া কিছু কাজ করিয়াছে।) আমার মত শত সহস্র মানুষ আছে যাহারা কিছুই করে নাই, অথচ তাহারা স্বাধীনতার ফল উপভোগ করিবে। একজন নৌকার দড়ি টানে, দশজন নদী পার হয়। ইহাই যদি সংসারের রীতি, তবে কর্ম ও কর্মফলের যোগাযোগ কোথায় ?

ব্যোমকেশকে আমার আধ্যাত্মিক সমস্যার কথা বলিলাম। সে বলিল, 'স্বাধীনতা পরের চেষ্টায় পেয়েছি, কিন্তু নিজের চেষ্টায় তাকে সার্থক করে তুলতে হবে। কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

বেলা সাড়ে ন'টার সময় ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, এবার বেরুনো যাক্। প্রভাতের বাসা হয়ে তার দোকানে যাব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'প্রভাতের বাসায় কী দরকার ?'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ননীবালা দেবীকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

বৌবাজারের বাসার নিম্নতলে অনিবার্য ষষ্ঠীবাবু হুঁকা-হাতে বিরাজমান। আমাদের দেখিয়া চকিতভাবে হুঁকা হইতে মুখ সরাইলেন। ব্যোমকেশ মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওপরতলার সঙ্গে এখন আর কোনও গণ্ডগোল নেই তো?'

ষষ্ঠীবাবু উদ্বেগপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'না—হ্যাঁ—না, গণ্ডগোল আমার কোনও কালেই ছিল না, আমি বুড়ো মানুষ, কারুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—'

ব্যোমকেশ হাসিল, আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম।

সিঁড়ির দরজা খুলিয়া দিল একটি দাসী। অপরিচিত দু'জন লোক দেখিয়া সে সরিয়া গেল, আমরা প্রবেশ করিলাম। যে ঘরটিতে পূর্বে একটি কেঠো বেঞ্চি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সেই ঘরটিকে কয়েকটি আরামপ্রদ চেয়ার দিয়া সাজানো হইয়াছে, দেয়ালে রবি বর্মার ছবি। ননীবালা দেবী বৃহৎ একটি চেয়ারে বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একটি প্রখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখিতেছেন; তাঁহার হাতে পেন্সিল।

ননীবালা দেবীর বেশভূষা দেখিয়া তাক্ লাগিয়া যায়। চক্চকে পাটের শাড়ির উপর লতা-পাতা কাটা ব্লাউজ, দুই বাহুতে মোটা মোটা তাগা ও চুড়ি; সোনার হইতে পারে, গিল্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। মুখে গৃহিণী-সুলভ গাম্ভীর্য। ননীবালা যে অনাদি হালদারের রাহু গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া নিজ মূর্তি ধারণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ননীবালা আমাদের দেখিয়া একটু থতমত হইলেন, তারপর হারমোনিয়ামের ঢাকনি খুলিয়া সম্ভাষণ করিলেন, 'আসুন আসুন। কেমন আছেন?—ওরে চিনিবাস, দু' পেয়ালা চা নিয়ে আয়। ব্যোমকেশবাবু, একটু মিষ্টিমুখ— ?'

'না না, ওসব কিছু দরকার নেই। আমরা প্রভাতবাবুর খোঁজে এসেছিলাম।'

'প্রভাত! সে তো আটটার সময় দোকানে চলে গেছে।—একটু বসবেন না?'

চেয়ারে নিতম্ব ঠেকাইয়া বসিলাম। শুধু ঝি নয়, চিনিবাস নামধারী ভৃত্যও আছে, সম্ভবত রাঁধুনীও নিযুক্ত হইয়াছে। শুক্রের মহাদশা না পড়িলে হঠাৎ এতটা বাড়্-বাড়ন্ত দেখা যায় না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা কি করছেন?'

ননীবালা বলিলেন, 'ক্রস্ওয়ার্ড পাজ্‌ল্ ভাঙছি। জানেন, আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি, একুশ হাজার টাকা।' তাঁহার কণ্ঠে হারমোনিয়ামের সপ্তসুর গিট্‌কিরি খেলিয়া গেল।

গয়নাগুলা তবে গিল্টির নয়। আমরাও কিছুদিন ক্রস্ওয়ার্ডের ধাঁধা ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু আমাদের ভাঙা কপাল, ধাঁধা ভাঙিতে পারি নাই।

অভিনন্দন জানাইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ তাহলে উঠি। নৃপেনবাবুও কি দোকানে গেছেন?'

ননীবালা অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, 'না। কাল থেকে ওর কি হয়েছে, ঘরে দোর বন্ধ করে আছে। কী যে করছে ওই জানে, খাওয়া-দাওয়ার সময় নেই, দোকানে যাওয়া নেই—ওকে দিয়ে আর দেখছি আমাদের চলবে না।'

আমরা বিদায় লইলাম। পথে যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রভাত যে দোকান বিক্রি করে দিচ্ছে এ খবর বোধহয় ননীবালা জানেন না।'

দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ব্যোমকেশ একবার এদিক ওদিক চাহিল তারপর বলিল, 'তুমি দোকানে যাও, আমি আসছি। জুতোয় একটা পেরেক উঠেছে।'

দোকানের সামনা-সামনি রাস্তার অপর পারে গোলদীঘির দেয়াল ঘেঁষিয়া এক ছোকরা জুতা মেরামত করার সরঞ্জাম লইয়া বসিয়াছিল, ব্যোমকেশ তাহার কাছে গিয়া জুতা মেরামত করাইতে লাগিল। আমি দোকানে প্রবেশ করিলাম।

প্রভাত হিসাবের খাতাপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, বলিল, 'এই যে! ব্যোমকেশবাবু এলেন না?'

'আসছে। আপনার হিসেব তৈরি?'

'হ্যাঁ। এই দেখুন না।'

আমি হিসাবে দেখিতে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে ব্যোমকেশ আসিয়া যোগ দিল; হিসাব পরীক্ষা শেষ করিতে বেলা দুপুর হইয়া গেল। আমরা উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা তিন হাজার টাকাই দেব। কাল সকাল আটটার সময় চেক পাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দখল দিতে হবে।'

'যে আজ্ঞে।'

সেদিন অপরাহ্লে ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্দুবাবুকে টেলিফোন কর না, গদানন্দর সাম্প্রতিক খবর যদি কিছু পাওয়া যায়।'

বলিলাম, 'গদানন্দ তো পালিয়েছে, তাকে ইন্দুবাবু কোথায় পাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে পালিয়েছে, কিন্তু ফেরারী হয়নি। শিউলী সাবালিকা, সে যদি কারুর সঙ্গে বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে, তাতে ফৌজদারি হয় না। গদানন্দ খুব সম্ভব তাকে নিজের বাসায় তুলেছে।'

'আচ্ছা, দেখি—'

ইন্দুবাবুকে ফোন করিলাম। তিনি আমার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, 'গদানন্দর খবর জানি বৈকি। তাকে নিয়ে সিনেমা-মহল এখন সরগরম। সেদিন আপনাদের বলেছিলাম কিনা। গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে ভেগেছে, তারপর তাকে রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে করেছে। এই নিয়ে গদানন্দর তিনবার হল।'

'তিনবার! তিনবার কী?'

'তিনবার বিয়ে।'

'বলেন কি, আরও দুটো বউ আছে?'

'এখন আর নেই। প্রথম বউটা দেখতে খুব সুন্দরী ছিল, কিন্তু সিনেমায় সুবিধে হল না; ক্যামেরায় তার চেহারা ভাল এল না। সে হঠাৎ একদিন হার্ট ফেল করে মারা গেল। তারপর গদানন্দ আর একটা মেয়েকে ফুস্‌লে এনে বিয়ে করল। এ মেয়েটা অভিনয় ভালই করত কিন্তু personality ছিল না, দেখা গেল তাকে দিয়ে হিরোইনের পার্ট চলবে না। সেটাও বেশিদিন টিকল না।'

'কি সর্বনাশ! আপনার কি মনে হয় গদানন্দ বৌ দুটোকে—অ্যাঁ!'

'ভগবান জানেন। শিউলীর অবশ্য মাইকের গলা ভাল এই যা ভরসা।'

ব্যোমকেশকে বার্তা শুনাইলাম। সে আপন মনে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, তারপর বলিল, 'গদানন্দের বংশপরিচয় জানতে ইচ্ছে করে। এক পুরুষে এতটা হয় না।'

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। নগর দীপাবলীতে সজ্জিত হইয়া আর একটি দীপান্বিতা রাত্রিকে স্মরণ করাইয়া দিল। ঘরে ঘরে দোকানে দোকানে রেডিওর জলদমন্দ্র স্বর অন্য সব শব্দকে ডুবাইয়া দিল। সকলেরই কান পড়িয়া আছে দিল্লীর পানে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে স্বাধীনতার উদ্বোধন হইবে।

সাতটার সময় চকিতের ন্যায় নৃপেন আসিল, দ্বারের নিকট হইতে ব্যোমকেশের হাতে একটি চক্‌চকে চাবি দিয়া আলাদীনের জিনের মত অদৃশ্য হইল।

দশটার সময় আমরা আহার শেষ করিলাম।

সাড়ে এগারটার সময় ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে বলিল, 'আমরা এখনি বেরুব, কখন ফিরব ঠিক নেই। তুই জেগে থাকিস। আর একটা আংটায় কাঠকয়লা দিয়ে আগুন করবার যোগাড় করে রাখিস। আমরা ফিরে এলে আগুন জ্বালবি।'

পুঁটিরাম 'যে আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাঠকয়লার আগুন কি

হবে ?'

সে বলিল, 'অতীতকে ভস্মীভূত করে ফেলতে হবে।'

মধ্যরাত্রির কিছু আগে আমরা বাহির হইলাম। ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজিতেছে—

গোলদীঘির চারি পাশের দোকানগুলি কিন্তু বন্ধ। দোকানদারেরা বোধকরি নিজ নিজ ঘরে গিয়া রেডিও যন্ত্র আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন। এত রাত্রে এদিকের রাস্তাগুলিও জনবিরল হইয়া আসিয়াছে।

একটি ল্যাম্পপোস্টের ছায়াতলে একজন লোক দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল, আমরা নিকটবর্তী হইলে বাহির হইয়া আসিল। দেখিলাম বিকাশ।

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু খবর আছে নাকি ?'

বিকাশ বলিল, 'না। প্রভাতবাবু সাড়ে ন'টার সময় দোকান বন্ধ করে চলে গেছেন।'

'হাতে কিছু ছিল ?'

'না।'

'তারপর আর কেউ আসেনি ?'

'না।'

'আচ্ছা, আসুন তাহলে।'

তিনজনে রাস্তা পার হইয়া প্রভাতের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ব্যোমকেশ চাবি দিয়া দ্বারের তালা খুলিল ; বেশ অনায়াসে তালা খুলিয়া গেল। তারপর চাবি বিকাশের হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা দু'জনে ভেতরে যাচ্ছি, আপনি তালা বন্ধ করে দিন। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলা যায় না। আপনি যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন। যদি কেউ দোর খুলে ভেতরে ঢোকে, আপনার কিছু করবার দরকার নেই।'

'আচ্ছা, স্যার।'

আমরা অন্ধকার দোকানে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশের পকেটে বৈদ্যুতিক টর্চ ছিল, সে তাহা জ্বলিয়া ঘরের চারিদিকে ফিরাইল। সারি সারি বইগুলা যেন দাঁত বাহির করিয়া নীরবে হাসিল। আমরা পিছনের কুঠুরিতে প্রবেশ করিয়া তক্তপোশের কিনারায় বসিলাম, মাঝের দরজা একপাট খোলা রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'এ ঘরে বই নেই, এ ঘরে বোধহয় আসবে না।'

আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, রাতদুপুরে আমরা প্রভাতের দোকানে কি করছি জানতে পারি কি ?'

ব্যোমকেশ আমার কানে কানে বলিল, 'গুড় গুড় গুড় গুড়িয়ে হামা, খাপ পেতেছেন গোষ্টমামা।'

বইয়ের দোকানের একটা গন্ধ আছে, নূতন বইয়ের গন্ধ। এই গন্ধ সাধারণত টের পাওয়া যায় না, কিন্তু গভীর রাত্রে দোকানের মধ্যে বন্ধ থাকিলে ধীরে ধীরে অনুভব হয়। একটু ঝাঁজালো, নাক সুড় সুড় করে, হাঁচি আসে।

তার উপর নিজেদের নিশ্বাসের কার্বন-ডায়ক্সাইড আছে। ঘণ্টাখানেক প্রতীক্ষা করিবার পর অনুভব করিলাম, ঘরের বাতাস ভারী হইয়া আসিতেছে। গরমে প্রাণ আনচান করিয়া উঠিল। বলিলাম, 'ব্যোমকেশ—'

ব্যোমকেশ বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিল, তাহার গলা হইতে চাপা শীৎকার বাহির হইল, 'স্ স্ স্—।'

আর একটি শব্দ কানে আসিল, কেহ চাবি দিয়া দ্বারের তালা খুলিতেছে। দরজা একটু ফাঁক হইল, বাহিরের আলো অচ্ছাভ পর্দার মত ধীরে ধীরে প্রসারিত হইল। একটি ছায়ামূর্তি প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। আমরা রুদ্ধশ্বাসে কুঠুরির ভিতর হইতে দেখিতে লাগিলাম।

হঠাৎ দোকানঘরের মাঝখানে দপ্ করিয়া টর্চের আলো জ্বলিয়া উঠিল। আলোর দৃষ্টি ঊর্ধ্ব

দিকে, সার্চ-লাইটের মত দেয়ালের উপর দিকে পড়িয়াছে। টর্চের পিছনে মানুষটিকে দেখা গেল না।

টর্চ হাতে লইয়া মানুষটি কাউন্টারের উপর লাফাইয়া উঠিল। আমরা পা টিপিয়া টিপিয়া কুঠুরির দ্বারের নিকট হইতে উঁকি মারিলাম। টর্চের আলো বইয়ের সর্বোচ্চ তাকের উপর পড়িয়াছে। মানুষটি হাত বাড়াইয়া একটি বই বাহির করিয়া লইল ; আকারে আয়তনে অনেকটা 'চলন্তিকা'র মত। তারপর আর একটি বই বাহির করিল, তারপর আর একটি। এমনিভাবে পাঁচখানি বই লইয়া মানুষটি লাফাইয়া নীচে নামিল ; কাউন্টারের উপর জ্বলন্ত টর্চ রাখিয়া একটি বাজার-করা থলিতে বইগুলি ভরিতে লাগিল।

থলিতে বইগুলি ভরা হইয়াছে, এমন সময় ব্যোমকেশ গিয়া মানুষটির কাঁধে হাত রাখিল, বলিল, 'থলিটা আমায় দিন।'

মানুষটির গলায় করাতের মত দ্রুত নিশ্বাস টানার শব্দ হইল। তারপর ব্যোমকেশ তাহার মুখের উপর নিজের টর্চের আলো ফেলিল।

মুখখানা ভয়ে ও বিস্ময়ে বিকৃত হইলেও চেনা শক্ত নয়, প্রভাতের মুখ।

তাহার চোখের শাদা অংশই অধিক দেখা যাইতেছে। সে মিনিটখানেক চাহিয়া থাকিয়া অভিভূত স্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু !'

'হ্যাঁ, আমি আর অজিত। থলিটা দিন।'

প্রভাত একটু ইতস্তত করিল, তারপর থলি ব্যোমকেশের হাতে দিল।

ব্যোমকেশ থলিটা আমার হাতে দিয়া বলিল, 'অজিত, এটা রাখ। বইগুলো ভারি দামী। —প্রভাতবাবু, এবার চলুন।'

প্রভাত আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'কোথায় যেতে হবে ? থানায় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আপাতত আমার বাসায়। আগে বইগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

তিনজনে দোকানের বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশের ইঙ্গিতে প্রভাত দ্বারে তালা লাগাইল। ফিরিয়া দেখি বিকাশ অলক্ষিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'বিকাশবাবু, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আপনার ছুটি। কাল সকালে একবার বাসায় আসবেন।'

'যে আজ্ঞে, স্যার—' বিকাশ অন্তর্হিত হইল। আমি ও ব্যোমকেশ প্রভাতকে মাঝখানে লইয়া বাসার দিকে চলিলাম।

সতেরো

তিনজনে আসিয়া আমাদের বসিবার ঘরে উপবিষ্ট হইয়াছি। প্রভাত ও আমি দুইটি চেয়ারে বসিয়াছি, ব্যোমকেশ তক্তপোশের উপর বইয়ের থলিটি লইয়া বসিয়াছে। রাত্রি প্রায় দুইটা ; বাহিরে নগর-গুঞ্জন শান্ত হইয়াছে।

ব্যোমকেশের মুখ গম্ভীর, একটু বিষণ্ণ। সে চোখ তুলিয়া একবার প্রভাতের পানে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ; প্রভাতের মুখে কিন্তু অপরাধের গ্লানি নাই, ধরা পড়িবার সময় যে চকিত ভয় ও বিস্ময় তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহা তিরোহিত হইয়াছে। সে এখন সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ, সকল প্রকার সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত।

ব্যোমকেশ একে একে বইগুলি থলি হইতে বাহির করিল। বোর্ডে বাঁধাই বাদামী রঙের বইগুলি, বাহির হইতে দৃষ্টি-আকর্ষক নয়। কিন্তু ব্যোমকেশ যখন তাহাদের পাতা মেলিয়া ধরিল, তখন উত্তেজনায় হঠাৎ দম আটকাইবার উপক্রম হইল। প্রত্যেক বইয়ের প্রত্যেকটি পাতা এক একটি একশত টাকার নোট।

ব্যোমকেশ বইগুলি একে একে পর্যবেক্ষণ করিয়া পাশে রাখিল, প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল,

'সবসুদ্ধ কত আছে বইগুলোতে ?'

প্রভাত বলিল, 'প্রায় দু' লাখ। কিছু আমি খরচ করেছি।'

'দয়ালহরি মজুমদারকে যে টাকা দিয়েছেন তা ছাড়া আর কিছু খরচ হয়েছে ?'

প্রভাতের চোখের দৃষ্টি চকিত হইল ; ব্যোমকেশ এত কথা কোথা হইতে জানিল এই প্রশ্নটাই যেন তাহার চক্ষু হইতে উঁকি মারিল। কিন্তু সে কোনও প্রশ্ন না করিয়া বলিল, 'আরও কিছু খরচ হয়েছে, সব মিলিয়ে চৌদ্দ পনেরো হাজার।'

ব্যোমকেশ তখন বইগুলির উপর হাত রাখিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, 'প্রভাতবাবু, এইগুলোর জন্যেই কি আপনি অনাদি হালদারকে খুন করেছিলেন ?'

প্রভাত দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল, 'না, ব্যোমকেশবাবু।'

'তবে কি জন্যে একাজ করলেন বলবেন কি ?'

প্রভাত একবার যেন বলিবার জন্য মুখ খুলিল, তারপর কিছু না বলিয়া মুখ বন্ধ করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি যদি না বলেন, আমিই বলছি।—শিউলীর সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে অনাদি হালদার নিজে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। এইজন্যে—কেমন ?'

প্রভাত কিছুক্ষণ বুকে ঘাড় গুঁজিয়া যখন মুখ তুলিল, তখন তাহার রগের শিরাগুলো উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দাঁতের গড়নে যে হিংস্রতা আগে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কথা বলিবার সময় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল ; সে অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'হ্যাঁ। অনাদি হালদার শিউলীর বাপকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে রাজী করিয়েছিল—' এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিয়া গেল, নীরবে বসিয়া যেন অন্তরের আগুনে ফুলিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম তাহলে।—কিন্তু আপনি কেষ্টবাবুকে মারতে গেলেন কেন ?'

ক্রোধ ভুলিয়া প্রভাত সবিস্ময়ে ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল। বলিল, 'সে কি! কেষ্টবাবুর কথা আমি তো কিছু জানি না!'

ব্যোমকেশ সন্দেহ-কণ্টকিত দৃষ্টিতে প্রভাতকে বিদ্ধ করিল—'আপনি কেষ্ট দাসকে খুন করেননি ?'

প্রভাত বলিল, 'না, ব্যোমকেশবাবু। কেষ্টবাবু গত আট মাসে আমার কাছ থেকে আট হাজার টাকা নিয়েছে। তার মরার খবর পেয়ে আমি খুশি হয়েছিলাম ; কিন্তু আমি তাকে খুন করিনি। বিশ্বাস করুন, আমি যদি খুন করতাম, আজ আপনার কাছে অস্বীকার করতাম না।'

ব্যোমকেশের মুখখানা ধীরে ধীরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল, যে বিষণ্ণতা কুয়াশার মত তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন কাটিয়া গেল। সে বলিল, 'কিন্তু, কেষ্ট দাসকে তাহলে খুন করলে কে ?'

'তা জানি না। তবে—' প্রভাত ইতস্তত করিল।

'তবে ?'

প্রভাত একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, 'দশ-বারো দিন আগে বাঁটুল সর্দার আমার কাছে এসেছিল। বাঁটুলকে আপনারা বোধহয় চেনেন না—'

'খুব চিনি। এমন কি আপনার সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ তাও জানি। তারপর বলুন।'

'বাঁটুল আমাকে কেষ্টবাবুর কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল ; কেষ্টবাবু কে, অনাদিবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কী জানে, এই সব। আমি বাঁটুলকে সব কথাই বললাম। তারপর—'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'যাক, এবার বুঝেছি। আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে কেষ্ট দাসের টাকার ক্ষিদে মেটেনি, সে গিয়েছিল বাঁটুলকে ব্ল্যাকমেল করতে। অতিলোভে তাঁতী নষ্ট।'—ব্যোমকেশ হাঁক দিল, 'পুঁটিরাম!'

পুঁটিরাম ভিতর দিকের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'পুঁটিরাম, তিন পেয়ালা চা হবে ?'

পুঁটিরাম বলিল, 'আজ্ঞে, দুধ নেই বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কুছ পরোয়া নেই, আদা দিয়ে চা তৈরি কর। আর কয়লার আংটা ঠিক করে রেখেছ ?'

'আজ্ঞে।'

'বেশ, এবার তাতে আগুন দিতে পার।'

পুঁটিরাম প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রভাতবাবু, আপনার মা—ননীবালা দেবী বোধহয় কিছু জানেন না ?'

'আজ্ঞে না।' প্রভাত কিছুক্ষণ বিস্ময়-সম্ভ্রমভরা চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনি কি সবই জানতে পেরেছেন, ব্যোমকেশবাবু ?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বোধহয় পেরেছি। তবে বলা যায় না, কিছু ভুলচুক থাকতে পারে। যেমন কেষ্ট দাসের মৃত্যুটা আপনার ঘাড়ে চাপিয়েছিলাম। আমার বোঝা উচিত ছিল, ছুরি আপনার অস্ত্র নয়।'

আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, কি করে সব বুঝলে বল না, আমি তো এখনও কিছু বুঝিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, বলছি। অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে, তা আমি পাটনা যাবার আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তখন ভেবেছিলাম অনাদি হালদারের মৃত্যু সম্বন্ধে কারুরই যখন কোনও গরজ নেই, তখন আমারই বা কিসের মাথা ব্যথা। কিন্তু ফিরে এসে যখন দেখলাম কেষ্ট দাসও খুন হয়েছে, তখন আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। যে লোক মানুষ খুন করে নিজের জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চায়, তাকে শাসন করা দরকার। যাহোক, এখন দেখছি আমি ভুল করেছিলাম, প্রভাতবাবু কেষ্ট দাসকে খুন করেননি। আমি একটা কঠোর কর্তব্যের হাত থেকে মুক্তি পেলাম।—এবার গল্পটা শোনো। প্রভাতবাবু, যদি কোথাও ভুলচুক হয় আপনি বলে দেবেন।'

ব্যোমকেশ অনাদি হালদারের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিলাম, আজিকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নূতন। ব্যোমকেশ হত্যাকারীকে বন্ধুর মত ঘরে বসাইয়া হত্যার কাহিনী শুনাইতেছে; এরূপ ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটে নাই।

—'অনাদি হালদার গত যুদ্ধের সময় কালাবাজারে অনেক টাকা রোজগার করেছিল। বোধহয় আড়াই লাখ কি তিন লাখ। প্রভাতবাবু, আপনি ক'খানা বই বেঁধেছিলেন ?'

প্রভাত বলিল, 'ছ'খানা। প্রত্যেকটাতে চারশো নোট ছিল।'

'অর্থাৎ দু'লাখ চল্লিশ হাজার।—বেশ, ধরা যাক অনাদি হালদার পৌনে তিন লাখ কালো টাকা রোজগার করেছিল। প্রশ্ন উঠল, এ টাকা সে রাখবে কোথায় ? ব্যাঙ্কে রাখা চলবে না, তাহলে ইন্‌কাম ট্যাক্সের ডালকুত্তারা এসে টুঁটি টিপে ধরবে। অনাদি হালদার এক মতলব বার করল।

'অনাদি হালদার যেমন পাজি ছিল, তেমনি ছিল তার কুচুটে বুদ্ধি। আজ পর্যন্ত ইন্‌কাম ট্যাক্সের পেয়াদাকে ফাঁকি দেবার অনেক ফন্দি-ফিকির বেরিয়েছে, সব আমার জানা নেই। কিন্তু অনাদি হালদার যে ফন্দি বার করল, সেটাও মন্দ নয়। প্রথমে সে টাকাগুলো একশো টাকার নোটে পরিণত করল। সব এক জায়গায় করল না ; কিছু কলকাতায়, কিছু দিল্লীতে, কিছু পাটনায় ; যাতে কারুর মনে সন্দেহ না হয়।

'পাটনায় যাবার হয়তো অন্য কোনও উদ্দেশ্যও ছিল। যাহোক, সেখানে সে দপ্তরীর খোঁজ নিল ; প্রভাতবাবু তার বাসায় এলেন বই বাঁধতে। বিদেশে বাঙালীর ছেলে প্রভাতবাবুকে দেখে অনাদি হালদারের পছন্দ হল। এই ধরনের দপ্তরী সে খুঁজছিল, সে প্রভাতবাবুকে আসল কথা বলল ; এও বলল যে, সে তাঁকে পুষ্যিপুত্তুর নিতে চায়। পুষ্যিপুত্তুর নেবার কারণ, এত বড় গুপ্তকথা জানবার পর প্রভাতবাবু চোখের আড়াল না হয়ে যান।

'প্রভাতবাবু বই বেঁধে দিলেন। পুষ্যিপুত্তুর নেবার প্রস্তাব পাকাপাকি হল। অনাদি হালদার

প্রভাতকে আর ননীবালা দেবীকে নিয়ে কলকাতায় এল। নোটের বইগুলো অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে আলমারিতে উঠল। স্টীলের আলমারি, তার একমাত্র চাবি থাকে অনাদি হালদারের কোমরে। সুতরাং কেউ যে আলমারি খুলবে, সে সম্ভাবনা নেই। যদি-বা কোনও উপায়ে কেউ আলমারি খোলে, সে কী দেখবে ? কতকগুলো বই রয়েছে, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি। টাকাকড়ি সামান্যই আছে। বই খুলে বইয়ের পাতা পরীক্ষা করার কথা কারুর মনে আসবে না। এছাড়া বাইরের লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ব্যাঙ্কেও কয়েক হাজার টাকা রইল।

'অনাদি হালদারের কলকাতার বাসায় আরও দু'জন লোক ছিল—কেষ্ট দাস আর নৃপেন। নৃপেন ছিল তার সেক্রেটারি। অনাদি হালদার ভাল লেখাপড়া জানত না, তাই ব্যবসার কাজ চালাবার জন্যে নৃপেনকে রেখেছিল। আর কেষ্ট দাস জোর করে তার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। কেষ্ট দাস ছিল অনাদি হালদারের ছেলেবেলার বন্ধু, অনাদির অনেক কুকীর্তির খবর জানত, নিজেও তার অনেক কুকীর্তির সঙ্গী ছিল।

'অনাদি হালদার সতেরো-আঠারো বছর বয়সে নিজের বাপকে এমন প্রহার করেছিল যে, পরদিনই বাপটা মরে গেল। পিতৃহত্যার বীজ ছিল অনাদির রক্তে। জীবজগতে বাপ আর ছেলের সম্পর্ক হচ্ছে আদিম শত্রুতার সম্পর্ক ; সেই আদিম পাশবিকতার বীজ ছিল অনাদি হালদারের রক্তে। বাপকে খুন করে সে নিরুদ্দেশ হল। আত্মীয়স্বজনেরা অবশ্য কেলেঙ্কারির ভয়ে ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিলে।

'অনেকদিন পরে অনাদির সঙ্গে কেষ্ট দাসের আবার দেখা ; দু'জনে মিলে এক মারোয়াড়ীর ঘরে ডাকাতি করতে গেল। অনাদি মারোয়াড়ীকে খুন করে টাকাকড়ি নিয়ে ফেরারী হল, কেষ্ট দাস লুটের বখরা কিছুই পেল না।

'এবার কুড়ি বছর পরে অনাদির সঙ্গে আবার কেষ্ট দাসের কথা। অনাদি তখন বৌবাজারের বাসা নিয়ে বসেছে ; কেষ্ট দাস তাকে বলল, তুমি খুন করেছ, যদি আমাকে ভরণপোষণ না কর, তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেব। নিরুপায় হয়ে অনাদি কেষ্ট দাসকে ভরণপোষণ করতে লাগল।

'এদিকে অনাদি হালদারের দুই ভাইপো নিমাই আর নিতাই খবর পেয়েছিল যে, খুড়ো অনেক টাকার মালিক হয়ে কলকাতায় এসে বসেছে। তারা অনাদির কাছে যাতায়াত শুরু করল। অনাদি ভারি ধূর্ত, সে তাদের মতলব বুঝে কিছুদিন তাদের ল্যাজে খেলালো, তারপর একদিন তাড়িয়ে দিলে। নিমাই নিতাই দেখল, খুড়োর সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায়, তারা খুড়োর ভাবী পুষ্যিপুত্তুরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না। গুর্খা দরোয়ান দেখে তারা প্রভাতবাবুর দোকানে যাওয়া বন্ধ করল।

'কিন্তু এত টাকার লোভ তারা ছাড়তে পারছিল না। কোনও দিকে কিছু না পেয়ে তারা অনাদি হালদারের বাসার সামনে হোটেলে ঘর ভাড়া করল, অষ্টপ্রহর বাড়ির ওপর নজর রাখতে লাগল। এতে অবশ্য কোনও লাভ ছিল না, কিন্তু মানুষ যখন কোনও দিকেই রাস্তা খুঁজে না পায়, তখন যা হোক একটা করেই মনকে ঠাণ্ডা রাখে। নিমাই নিতাই পালা করে হোটেলে আসত, আর চোখে দূরবীন লাগিয়ে জানালায় বসে থাকত। অজিত, তোমার মনে আছে বোধহয়, ননীবালা যেদিন প্রথম এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, সর্বদাই যেন অদৃশ্য চক্ষু তাঁদের লক্ষ্য করছে। সে অদৃশ্য চক্ষু নিমাই-নিতাইয়ের।

'যাহোক, দিন কাটছে। অনাদি হালদার জমি কিনে বাড়ি ফেঁদেছে। প্রভাতবাবুকে সে পুষ্যিপুত্তুর নেবার আশ্বাস দিয়ে এনেছিল, প্রথমটা তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করল। তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দোকান করে দিলে ; অ্যাটর্নীর কাছে গিয়ে পুষ্যিপুত্তুর নেবার বিধি-বিধান জেনে এল। কিন্তু বাঁধা-বাঁধির মধ্যে পড়বার খুব বেশি আগ্রহ তার ছিল না, সে পাকাপাকি লেখাপড়া করতে দেরি করতে লাগল। প্রভাতবাবু দোকান নিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন, ননীবালা দেবী জানেন না যে পুষ্যিপুত্তুর নিতে হলে লেখাপড়ার দরকার। তাই এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করল না।

'তারপর এক ব্যাপার ঘটল। প্রভাতবাবু শিউলী মজুমদারকে দেখে এবং তার গান শুনে মুগ্ধ

হলেন। তিনি শিউলীদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলেন। দয়ালহরি মজুমদার ঘুঘু লোক, সে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারল যে প্রভাতবাবু বড়লোকের পুষ্যিপুত্তুর ; প্রভাতবাবুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তার আপত্তি হল না। দয়ালহরি মজুমদারের চাল্‌চুলো নেই, সে ভাবল ফাঁকতালে যদি মেয়ের বিয়েটা হয়ে যায়, মন্দ কি !

'প্রভাতবাবু ননীবালা দেবীকে শিউলীর কথা বললেন। ননীবালা অনাদি হালদারকে বললেন। প্রভাতবাবুর বিয়ে দিতে অনাদি হালদারের আপত্তি ছিল না, সে বলল, মেয়ে দেখে যদি পছন্দ হয় তো বিয়ে দেব।

'তখন পর্যন্ত অনাদি হালদারের মনে কোনও বদ্‌-মতলব ছিল না, নেহাৎ বরকর্তা সেজেই সে মেয়ে দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু শিউলীকে দেখে সে মাথা ঠিক রাখতে পারল না। মানুষের চরিত্রে যতরকম দোষ থাকতে পারে, কোনটাই অনাদি হালদারের বাদ ছিল না। সে ঠিক করল, শিউলীকে নিজে বিয়ে করবে।

'বাসায় ফিরে এসে সে বলল, মেয়ে পছন্দ হয়নি। তারপর তলে তলে নিজে ঘটকালি আরম্ভ করল। দয়ালহরি মজুমদার দেখল, দাঁও মারবার এই সুযোগ ; সে ঝোপ বুঝে কোপ মারল। অনাদি হালদারকে বলল, তুমি বুড়ো, তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব কেন ? তবে যদি তুমি দশ হাজার টাকা দাও—

'এইভাবে কিছুদিন দর-কষাকষি চলল, তারপর রফা হল, অনাদি হালদার পাঁচ হাজার টাকা হ্যান্ডনোটের ওপর ধার দেবে। বিয়ের পর হ্যান্ডনোট ছিঁড়ে ফেলা হবে।

'বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে নিয়ে অনাদি হালদার ভাবতে বসল, কি করে প্রভাতবাবুকে তাড়ানো যায়। পুষ্যিপুত্তুর নেবার আগ্রহ কোনওকালেই তার বেশি ছিল না, এখন তো তার পক্ষে প্রভাতবাবুকে বাড়িতে রাখাই অসম্ভব। প্রভাতবাবুর প্রতি তার ব্যবহার রূঢ় হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ সে তাঁকে তাড়িয়ে দিতেও পারল না। প্রভাতবাবু বইবাঁধানো নোটের কথা যদি পুলিসের কাছে ফাঁস করে দেন, অনাদি হালদারকে ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে জেলে যেতে হবে।

'প্রভাতবাবু ভিতরের কথা কিছুই জানতেন না। সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়াতে তিনি খুবই মুষ্‌ড়ে পড়লেন, তারপর ঠিক করলেন অনাদিবাবুর অমতেই শিউলীকে বিয়ে করবেন, যা হবার হবে। তিনি দয়ালহরির বাসায় গেলেন। দয়ালহরি তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে এবং জানিয়ে দিলে যে, অনাদি হালদারের সঙ্গে শিউলীর বিয়ে ঠিক হয়েছে।'

এই পর্যন্ত বলিয়া ব্যোমকেশ থামিল। টিন হইতে সিগারেট বাহির করিতে করিতে বলিল, 'এই হচ্ছে অনাদি হালদারের মৃত্যুর পটভূমিকা। এর মধ্যে খানিকটা অনুমান আছে, কিন্তু ভুল বোধহয় নেই। প্রভাতবাবু কি বলেন ?'

প্রভাত বলিল, 'ভুল নেই। অন্তত যতটুকু আমার জ্ঞানের মধ্যে, তাতে ভুল নেই।'

পুঁটিরাম চা লইয়া প্রবেশ করিল।

আঠারো

তিনজনে নীরবে বসিয়া আদা-গন্ধী চা সেবন করিলাম। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'ননীবালা দেবী যখন প্রথম আমার কাছে এলেন তখন সমস্ত ব্যাপারটা আমি উল্টো দিক থেকে দেখলাম। প্রভাতবাবুর জীবনের কোনও আশঙ্কা আছে কিনা এইটেই হল প্রশ্ন। ননীবালা যা বললেন তা থেকে ভয়ের কারণ আমি কিছু দেখতে পেলাম না। তবু বলা যায় না। দিনকাল খারাপ, নরহত্যা সম্বন্ধে মানুষের মন থেকে অনেক দ্বিধাসঙ্কোচ সরে গেছে ; একটা আদিম বর্বরতার মনোভাব আমাদের চেপে

ধরেছে। আমি তদারক করতে বেরুলাম।

'প্রভাতবাবুকে দেখলাম ; নিমাই নিতাই, অনাদি হালদার, নৃপেন, কেষ্ট দাস, সকলকেই দেখলাম। ননীবালা আবার এলেন, তাঁকে বললাম, প্রভাতবাবুকে মেরে কারুর কোনও লাভ নেই, বরং অনাদি হালদারকে মেরে লাভ আছে। তারপর কালীপুজোর রাত্রে সত্যিই অনাদি হালদার খুন হল।

'শেষ রাত্রে কেষ্ট দাস এসে আমাকে নিয়ে গেল। সকলের বিশ্বাস কেষ্ট দাসই খুন করেছে। আমি গিয়ে সব দেখেশুনে বুঝলাম, এ রাগের মাথায় খুন নয়, প্ল্যান করে খুন ; কেষ্ট দাস যদি খুন করত তাহলে খুন করবার আগেই অনাদি হালদারের সঙ্গে ঝগড়া করত না। তাছাড়া, যত ঝগড়াই হোক, যে-হংস স্বর্ণ-ডিম্ব প্রসব করে তাকে খুন করবে এমন আহাম্মক কেষ্ট দাস নয়।

'তবে একটা কথা আছে। কেষ্ট দাস যদি অনাদি হালদারকে খুন করে একসঙ্গে মোটা টাকা হাতাতে পারে তাহলে সে খুন করবে। কিন্তু এ যুক্তি বাড়ির অন্য লোকগুলির সম্বন্ধেও খাটে। এ যুক্তি মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে অনাদি হালদারের বাড়িতে অনেক নগদ টাকা ছিল।

'অনাদি হালদার বাড়িতে মোটা টাকা রাখলে স্টীলের আলমারিতেই রাখত। আলমারির চাবি সর্বদা তার কোমরে থাকত। আমি যখন আলমারি খুললাম তখন তাতে মাত্র শ' আড়াই টাকা পাওয়া গেল। তবে কি এই সামান্য টাকা রাখবার জন্যে অনাদি হালদার স্টীলের আলমারি কিনেছিল ?

'আলমারিতে টাকা পাওয়া গেল না বটে কিন্তু দেখা গেল বইয়ের থাক্ থেকে কয়েকটা বই অদৃশ্য হয়েছে। বাকি বইগুলো রামায়ণ মহাভারত জাতীয়। প্রশ্ন : স্টীলের আলমারিতে এই জাতীয় নিতান্ত সাধারণ বই রাখার মানে কি ?

'আলমারিতে ব্যাঙ্কের চেক্ বই ছিল, তা থেকে জানা গেল যে ব্যাঙ্ক থেকে যে-পরিমাণ টাকা বার করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি টাকা অনাদি হালদার তার নতুন বাড়ির কন্ট্রাক্টর গুরুদত্ত সিংকে দিয়েছে। বাকি টাকা এল কোথা থেকে ? অনাদি হালদার নিশ্চয় কালো টাকা রোজগার করেছিল এবং তা আলমারিতে রেখেছিল। বর্তমানে টাকা যখন আলমারিতে নেই তখন হত্যাকারীই তা সরিয়েছে।

'হত্যার মোটিভ পাওয়া গেল। কিন্তু হত্যাকারী লোকটা কে ? এবং কেমন করে সে বাড়িতে ঢুকল ? মৃত্যুর সময় অনাদি হালদার বাড়িতে একলা ছিল এবং বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

'অনাদি হালদার গুলি খেয়েছিল সদরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। শ্রীকান্ত হোটেলের জানলা থেকে তাকে সহজেই গুলি করে মারা যায় কিন্তু তার আলমারি থেকে টাকা সরানো যায় না। সুতরাং শ্রীকান্ত হোটেল থেকে মেরে কোনও লাভ নেই।

'নিমাই নিতাই যখন উকিল নিয়ে হাজির হল এবং দাবি করল যে তারাই অনাদি হালদারের ওয়ারিশ, প্রভাতবাবু আইনত পুষ্যিপুত্তুর নয়, তখন আর একটা মোটিভ পাওয়া গেল। অনাদি হালদার পাকাপাকি পুষ্যি নেবার আগে যদি তাকে সরানো যায় তাহলে সব সম্পত্তি ভাইপোদের অর্শাবে। অনাদি হালদার নিশ্চয় উইল করেনি। এ দেশের অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত লোকেরা উইল করে না।

'নিমাই নিতাইয়ের পক্ষে খুড়োর গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করা নেহাৎ অবিশ্বাস্য নয়। এখন দেখা যাক তাদের কার্যকলাপ। হত্যার ছ'মাস আগে তারা শ্রীকান্ত হোটেলের ঘর ভাড়া নিয়েছিল এবং নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করত। হোটেলের চাকরদের সঙ্গে তাদের মুখ চেনাচেনি হয়েছিল। যারা খুড়োকে খুন করতে উদ্যত হয়েছে তাদের পক্ষে এতটা খোলাখুলি ভাব কি স্বাভাবিক ? আগেই বলেছি, এ প্ল্যান করে খুন ; খুনী ঠিক করেছিল, কালীপুজোর রাত্রে খুন করবে, বাজি পোড়ানোর শব্দে যাতে বন্দুকের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়। তাই যদি হয় তবে ছ' মাস আগে থেকে ঘর ভাড়া নেবার অর্থ কি ? তাছাড়া কালীপুজোর রাত্রে খুড়ো যে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াবে

তার নিশ্চয়তা কি ? এ রকম অনিশ্চিতের ওপর নির্ভর করে কেউ প্ল্যান করে না। আবার গুলিটা অনাদি হালদারের শরীর ভেদ করে গিয়েছিল, অথচ সেটা ব্যালকনিতে পাওয়া গেল না। এও ভাববার কথা।

'সুতরাং শ্রীকান্ত হোটেলের জানলা থেকে নিমাই নিতাই খুড়োকে মেরেছিল এ প্রস্তাব টেঁকসই নয়। যেই মারুক বাড়ির ভেতর থেকে মেরেছে। দেখা যাক, বাড়ির ভেতর থেকে মারা সম্ভব কিনা।

'সদর দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু বাড়ির পিছন দিকে ছাদে যাবার দরজাটা খোলা থাকত, অনাদি হালদার রাত্রে শুতে যাবার আগে নিজের হাতে সেটা বন্ধ করত। তাছাড়া দরজার ছিট্‌কিনি খুব শক্ত ছিল না, দু' চারবার দরজায় নাড়া দিলে ছিট্‌কিনি খুলে পড়ত। মনে করা যাক, সেদিন রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময় একজন চুপিচুপি এসে অনাদি হালদারের নতুন বাড়িতে ঢুকল। নতুন বাড়ির একতলার ছাদ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, চারিদিকে ভারা বাঁধা। হত্যাকারী ছাদে উঠল ; দুই বাড়ির মাঝখানে সরু গলি আছে, হত্যাকারী ভারা থেকে একটা লম্বা তক্তা নিয়ে দুই বাড়ির মাঝখানে পুল বাঁধল, তারপর সেই পুল দিয়ে পুরনো বাড়িতে পেরিয়ে এল। ছাদের দরজা খোলা থাকবার কথা, কারণ অনাদি হালদার তখনও শুতে যায়নি।

'দেখা যাচ্ছে, একজন চট্‌পটে লোকের পক্ষে বাড়িতে ঢোকা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কে সেই চট্‌পটে লোকটি ? নিমাই নিতাই নয়, কারণ আলমারিতে অনেক কালো টাকা আছে একথা তাদের জানবার কথা নয় ; একথা কেবল বাড়ির লোকই জানতে পারে কিম্বা আন্দাজ করতে পারে।

'বাড়িতে চারজন লোক আছে—ননীবালা, কেষ্ট দাস, নৃপেন আর প্রভাতবাবু। এদের মধ্যেই কেউ অনাদি হালদারকে খুন করেছে। যদি বল, নিমাই নিতাই বাড়িতে ঢুকে খুন করেছে এবং আলমারি থেকে মাল নিয়ে সট্‌কেছে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, তারা সাত-সকালে এসে বাড়ি দখল করতে চেয়েছিল কেন ? চুপ করে বসে থাকাই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যথাসময়ে আদালতের মারফত দখল তারা পেতই। তারা খুন করেনি বলেই তাড়াতাড়ি এসে বাসার দখল নিতে চেয়েছিল, যাতে আলমারির জিনিসপত্র এরা সরিয়ে ফেলতে না পারে।

'যাহোক, রইল বাড়ির চারজন। এরা সকলেই অবশ্য বাইরে ছিল, কিন্তু কারুর পাকা অ্যালিবাই নেই। ননীবালা দেবীকে বাদ দেওয়া যেতে পারে, কারণ তিনি মোটা মানুষ, তাঁকে চট্‌পটেও বলা চলে না। তক্তার ওপর দিয়ে গলি পার হওয়া তাঁর সাধ্য নয়।

'বাকি রইল কেষ্ট দাস প্রভাতবাবু আর নৃপেন। গোড়ার দিকে নৃপেনের ওপরেই সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয়, চালচলন খুবই সন্দেহজনক। আলমারিতে যে অনেক টাকা আছে এটা তার পক্ষে জানা সবচেয়ে বেশি সম্ভব, কারণ সে অনাদি হালদারের সেক্রেটারি, টাকাকড়ির হিসেব রাখে। কিন্তু যখন জানতে পারলাম সে আলমারির চাবি তৈরি করেছিল তখন তাকেও বাদ দিতে হল। অনাদি হালদারকে খুন করবার মতলব যদি তার থাকত তবে সে চাবি তৈরি করতে যাবে কেন ? অনাদি হালদারের কোমরেই তো চাবি রয়েছে।

'ভেবে দেখ। নৃপেনের স্বভাবটা ছিঁচকে চোরের মত। সে চাবি তৈরি করেছিল, মতলব ছিল অনাদি হালদার যখন বাড়ি থাকবে না তখন আলমারি খুলে দু'চার টাকা সরাবে। কিন্তু সরাবার সুযোগ বোধহয় তার হয়নি। চাবিটা তার টেবিলের দেরাজে রেখেছিল। সে-রাত্রে সিনেমা থেকে ফিরে এসে যখন দেখল অনাদি হালদার খুন হয়েছে তখন সে চাবির কথা সাফ ভুলে গেল। তারপর আমি অনাদি হালদারের কোমর থেকে চাবি নিয়ে সবাইকে দেখালাম, তখন নৃপেনের মনে পড়ে গেল। সর্বনাশ ! পুলিস এসে যদি তার দেরাজে চাবি পায় তাহলে তাকেই খুনী বলে ধরবে। সে কোনও মতে চাবিটাকে বিদেয় করবার চেষ্টা করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত এক ফাঁকে চাবিটা জানলা দিয়ে গলিতে ফেলে দিলে।

'চাবিটা আমি সকালবেলা গলিতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তখনই বুঝেছিলাম নৃপেন খুন করেনি। তারপর আমার বন্ধু রমেশ মল্লিকের চিঠি পেয়ে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। নৃপেন

ছিঁচকে চোর, মানুষ খুন করবার সাহস তার নেই।

'বাকি রইল কেষ্ট দাস আর প্রভাতবাবু।

'সেদিন সন্ধ্যেবেলা কেষ্ট দাস এখানে এল। রাত্রে তাকে মদ খাইয়ে অনাদি হালদারের পুরনো ইতিহাস জেনে নিলাম। কেষ্ট দাসও সেদিন আমার কাছে একটা কথা জানতে পেরেছিল। আমি তাকে কথায় কথায় বলেছিলাম যে প্রভাতবাবু দপ্তরীর কাজ জানেন। কথাটা সে আগে জানত না।

'যাহোক, তারপর কয়েকদিন কেটে গেল। দেখলাম নৃপেন আর কেষ্ট দাস পুরনো বাসাতেই রয়েছে। তারা যদি টাকা মেরে থাকে তাহলে পুরনো বাসা কামড়ে পড়ে আছে কেন ? তাদের চলে যাবার যথেষ্ট ওজুহাত রয়েছে, অনাদি হালদার মরে যাবার পর ওদের বাড়িতে থাকার আর কোনও ছুতো নেই। টাকাগুলোই বা রাখল কোথায় ? ব্যাঙ্কে নিশ্চয় রাখবে না, অন্য কোনও লোকের হাতেও দেবে না। তবে ?

'কলকাতায় ওদের অন্য কোনও আস্তানা নেই, যেখানে টাকা লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু প্রভাতবাবুর একটা আস্তানা আছে—দোকান। তিনি যদি খুন করে টাকা সরিয়ে থাকেন তাহলে টাকা লুকিয়ে রাখার কোনও অসুবিধা নেই।

'দোকান—বইয়ের দোকান। বিদ্যুৎ চমকের মত সমস্ত ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে জ্বলজ্বল করে উঠল, প্রভাতবাবু পাটনায় হিসেবের খাতা বাঁধেননি, বেঁধেছিলেন একশো টাকার নোট—অনাদি হালদার তাঁর বাঁধানো বইগুলোকে রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে মিশিয়ে আলমারিতে রেখেছিল—প্রভাতবাবু অনাদি হালদারকে মারবার পর তার কোমর থেকে চাবি নিয়ে আলমারি থেকে নোটের বইগুলো বার করে নিজের দোকানে এনেছিলেন—দোকানের হাজারখানা বইয়ের মধ্যে নোটের বইগুলো প্রকাশ্যে সাজানো আছে—বাইরে থেকে বই দেখে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না—

'আগাগোড়া প্ল্যানটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'কিন্তু—

'প্রভাতবাবু টাকার লোভে এমন কাজ করবেন ? প্রভাতবাবুর চরিত্র যতখানি বুঝেছিলাম তাতে তাঁকে অর্থলোভী বলে মনে হয়নি। উপরন্তু অনাদি হালদারের মৃত্যুতে প্রভাতবাবুর ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি ; সে বেঁচে থাকলে তাঁকে পুষ্যিপুত্তুর নেবে, সমস্ত সম্পত্তি পাবার সম্ভাবনা। নগদ টাকার লোভে সেই সম্ভাবনা তিনি নষ্ট করবেন ?

'তবে কি টাকাটা গৌণ, তার চেয়ে বড় কারণ কিছু ছিল ? অনাদি হালদার শিউলীর সঙ্গে প্রভাতবাবুর বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল ; কিন্তু সেটা কি এতবড় অপরাধ যে তাকে খুন করতে হবে ? এ প্রশ্নের উত্তর দেরিতে পেয়েছিলাম। দয়ালহরি মজুমদারের বাসা থেকে ফেরবার সময় হঠাৎ আসল কথাটা মাথায় খেলে গিয়েছিল।

'অনাদি হালদার এমন কাজ করেছিল যাতে নিতান্ত নিরীহ লোকেরও মাথায় খুন চেপে যায়। সে দয়ালহরিকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে নিজে শিউলীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। প্রভাতবাবুর রক্তে আগুন ধরে গেল। আগুন ধরা বিচিত্র নয়, আগুনের ফুলকি তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল।

'আবার একটা বরফের মত ঠাণ্ডা কূট বুদ্ধি তাঁর ছিল, সেটাও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তিনি অনাদি হালদারকে ধনেপ্রাণে মারবার প্ল্যান ঠিক করলেন। বাঁটুল সর্দারকে তিনি আগে থাকতেই চিনতেন, রাইফেল ভাড়া করা কঠিন হল না। কালীপুজোর রাত্রে বুড়ো পাঁঠাকে বলি দেবার ব্যবস্থা হল।

'সে-রাত্রে প্রভাতবাবু ননীবালা দেবীকে সিনেমায় পৌঁছে দিয়ে দোকানে গেলেন। দোকান আলো দিয়ে সাজিয়ে সাড়ে দশটার সময় আবার বেরুলেন, এবার একটা কাপড়ের থলি পকেটে নিলেন। দোকান খোলাই রইল, গুর্খা দরোয়ান দরজায় পাহারায় রইল।

'বাসার কাছে এসে প্রভাতবাবু দেখলেন বাসার সামনে বাজি পোড়ানো হচ্ছে। কেউ তাঁকে লক্ষ্য করল না, তিনি নতুন বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। নতুন বাড়ির মধ্যে বাঁটুল সর্দার রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। বাঁটুল অনাদি হালদারের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, সুতরাং তার এ ব্যাপারে উৎসাহ থাকাই স্বাভাবিক।

'ছাদের ওপর তক্তা ফেলে প্রভাতবাবু বাসায় ঢুকলেন। ছাদের দরজা সম্ভবত খোলাই ছিল ; না থাকলেও ক্ষতি নেই, তিনি দু'চারবার দরজায় নাড়া দিয়ে ছিট্‌কিনি খুলে ফেললেন। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অনাদি হালদার বাজি পোড়ানো দেখছিল, পিছন দিকে শব্দ শুনে সে ফিরে দাঁড়াল। প্রভাতবাবু সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলেন। গুলিটা অনাদি হালদারের শরীর ভেদ করে রাস্তার ওপারে শ্রীকান্ত হোটেলের জানলা দিয়ে ঢুকে দেয়ালে আটকালো। হাই ভেলসিটি মিলিটারি রাইফেল, তার গুলি যদি নিমাই কিম্বা নিতাইকে সামনে পেতো তাকেও ফুটো করে যেত।

'তারপর প্রভাতবাবু মৃতের কোমর থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুললেন। নোটের বইগুলো থলিতে পুরে, চাবি আবার যথাস্থানে রেখে যে পথে এসেছিলেন সেই পথে ফিরে গেলেন। বাঁটুল অপেক্ষা করছিল, রাইফেল নিয়ে অদৃশ্য হল। প্রভাতবাবু দোকানে ফিরে গিয়ে বইগুলো উঁচু একটা তাকে সাজিয়ে রেখে দিলেন। তারপর যথাসময়ে সিনেমায় গিয়ে মা'কে সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফিরলেন।

'গুর্খা দরোয়ানটা জানত যে প্রভাতবাবু সে-রাত্রে সারাক্ষণ দোকানে ছিলেন না। আমি যখন গুর্খার খোঁজ নিলাম তখন সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেছে।

'সেদিন আমি আর অজিত প্রভাতবাবুর দোকানে যাচ্ছিলাম, দেখলাম বাঁটুল আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। সে প্রভাতবাবুর দোকানে ঢুকতে গিয়ে পিছনে আমাদের দেখে দোকানে ঢুকল না, সোজা চলে গেল। আমরা দোকানে গিয়ে দেখলাম প্রভাতবাবুর জ্বর হয়েছে, তাড়সের জ্বর। তাঁকে নিয়ে আমার জানা এক ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার প্রভাতবাবুকে পরীক্ষা করলেন এবং পরীক্ষার ফল আমাকে আড়ালে জানালেন। তখন আর সন্দেহ রইল না।

'প্রভাতবাবু যে অনাদি হালদারকে খুন করেছেন একথা আমার আগে আর একজন বুঝতে পেরেছিল—সে কেষ্ট দাস। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, কেষ্ট দাস জানত যে অনাদি হালদারের আলমারিতে কালো টাকা আছে ; তাই সে যখন আমার মুখে শুনল যে প্রভাতবাবু দপ্তরীর কাজ জানেন তখন চট্ করে সমস্ত ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলে। সে প্রভাতবাবুকে শোষণ করতে আরম্ভ করল। অজিত, তোমার মনে আছে কি, একদিন ক্রমাগত একশো টাকার নোট দেখে দেখে আমাদের চোখ ঠিকরে গিয়েছিল ? এমন কি রাত্রে হোটেলে খেতে গিয়েও নিস্তার ছিল না, সেখানে কেষ্ট দাস একশো টাকার নোট বার করল। সেই নোটগুলির বেশির ভাগই এসেছিল অনাদি হালদারের বাঁধানো নোটের বই থেকে।

'যাহোক, পাটনা যাবার আগে অনাদি হালদার ঘটিত ব্যাপার মন থেকে একরকম মুছে ফেলেই চলে গেলাম। কেবল বিকাশ দত্তকে বলে গেলাম দয়ালহরি মজুমদার সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে।

'তারপর পাটনা থেকে ফিরে এসে দেখি—এক নতুন পরিস্থিতি। কেষ্ট দাস খুন হয়েছে। কেষ্ট দাস প্রভাতবাবুকে দোহন করছিল, তাই বিশ্বাস হল তিনিই তাকে খুন করছেন। তখন আবার আসামীকে ধরবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু শুধু অপরাধীকে ধরলেই চলবে না, টাকাগুলোও উদ্ধার করা চাই।

'টাকাগুলো সহজে উদ্ধার করবার জন্যে একটু চাতুরীর আশ্রয় নিতে হল, নইলে সারা দোকান হাতড়ে নোটের বইগুলো বার করা কষ্টকর হত। হয়তো প্রভাতবাবু তল্লাশী করতে দিতেন না, পুলিস ডাকতে হত ; আমার হাত থেকে সব বেরিয়ে যেত। তাই প্রভাতবাবু যখন দোকান বিক্রি করার কথা বললেন তখন ভারি সুবিধে হয়ে গেল। আমি বললাম, আমরা দোকান কিনব। সঙ্গে

সঙ্গে বিকাশকে পাঠালাম নজর রাখবার জন্যে, প্রভাতবাবু দোকান থেকে কোনও জিনিস সরান কিনা।

'দোকান কেনার ব্যবস্থা পাকা হল, স্বাধীনতা দিবসের সকালে দখল দিতে হবে। জানতাম দখল দেবার আগে কোনও সময় বইগুলো প্রভাতবাবু সরাবেন। বিকাশ খবর দিলে, দিনের বেলা তিনি কিছু সরাননি। রাত্রে আমরা দোকানে ঢুকে প্রতীক্ষা করে রইলাম। ন্যাপা চাবি তৈরি করে দিয়েছিল—'

হঠাৎ বাহির হইতে বিপুল শব্দতরঙ্গ আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করিল—রেডিও যন্ত্রের ঘুম ভাঙার আওয়াজ। আমরা চমকিয়া জানালার দিকে তাকাইলাম। বাহিরে দিনের আলো ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

উনিশ

ব্যোমকেশ নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

'পুঁটিরাম!'

পুঁটিরাম দরজা দিয়া মুণ্ড বাড়াইল।

'আগুনের আংটা নিয়ে এস।'

আমি বলিলাম, 'অনেকক্ষণ ধরে আংটার কথা শুনছি, কিন্তু আংটা কি হবে এখনও জানতে পারিনি।—হোম-টোম করবে নাকি?'

'ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, হোম করব। এই নোটগুলো আগুনে আহুতি দেব?'

'মানে!'

'মানে নোটগুলো পুড়িয়ে ফেলব।'

আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম—'অ্যাঁ! দু'লাখ টাকা পুড়িয়ে ফেলবে!'

'হ্যাঁ। এই নোটগুলো কালো টাকা, অভিশপ্ত টাকা ; এর ন্যায্য মালিক কেউ নেই। আজকের পুণ্য দিনে দেশমাতৃকার চরণে এই হবে আমাদের অঞ্জলি।'

'কিন্তু—কিন্তু, পুড়িয়ে ফেললে দেশমাতৃকা পাবেন কি? তার চেয়ে যদি ওই টাকা আমাদের নতুন গভর্নমেণ্টকে দেওয়া যায়—'

'একই কথা, অজিত। পুড়িয়ে ফেললেও রাষ্ট্রকেই দেওয়া হবে। ভেবে দেখ, নোটগুলো তো সত্যিকারের টাকা নয়, গভর্নমেণ্টের হ্যান্ডনোট মাত্র। হ্যান্ডনোট পুড়িয়ে ফেললে গভর্নমেন্টকে আর টাকা শোধ দিতে হবে না, দু'লাখ টাকা তার লাভ হবে। কিন্তু এখন যদি নোটগুলো ফেরত দিতে যাও, অনেক হাঙ্গামা বাধবে। গভর্নমেণ্ট জানতে চাইবে কোথা থেকে টাকা এল, তখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। তার দরকার কি! এই ভাল, আগুনে যা আহুতি দেব তা দেবতার কাছে পৌঁছবে।—প্রভাতবাবু, আপনি কি বলেন?'

প্রভাত বুদ্ধিভ্রষ্টের মত ফ্যালফ্যাল চক্ষে চাহিয়া বসিয়া ছিল, কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, 'আমার কিছু বলবার নেই, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।'

পুঁটিরাম গন্‌গনে আগুনের আংটা আনিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে রাখিল। ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল, 'তুই এবার ঘুমোগে যা।'

পুঁটিরাম চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ আমাদের মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। তারপর বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া আগুনে ফেলিতে লাগিল। মন্দ্রস্বরে বলিল, 'স্বাহা, স্বাহা, স্বাহা—'

আমি আর বসিয়া দেখিতে পারিলাম না, উঠিয়া গিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ আমার বন্ধু, তাহাকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি ; কিন্তু আজ তাহার চরিত্রের একটা নূতন দিক দেখিতে পাইলাম। সে যাহা করিল আমি তাহা পারিতাম না, নিজের হাতে দুই লক্ষ

টাকা পুড়াইয়া ফেলিতে পারিতাম না।

'স্বাহা, স্বাহা—'

ঘণ্টাখানেক পরে ব্যোমকেশ ও প্রভাত আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্য উঠিয়াছে, চারিদিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম আংটার চারিপাশে কাগজ-পোড়া ছাই স্তূপীভূত হইয়াছে। কালো টাকার কালো ছাই।

তিনজনে জানালার ধারে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রভাত প্রথমে কথা কহিল, কম্পিত স্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আমি—আমার সম্বন্ধে—আপনি যদি আমাকে খুনের অপরাধে ধরিয়ে দেন আমি অস্বীকার করব না।'

ব্যোমকেশ তাহার দিকে ফিরিল, অনুকম্পা-দ্রবিত স্বরে বলিল, 'আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব না। সব সভ্য দেশেই প্রথা আছে পর্ব দিনে বন্দীরা মুক্তি পায়, আপনিও মুক্তি পেলেন। আপনার দোকান আমরা কিনব বলেছিলাম, যদি আপনি বিক্রি করে চলে যেতে চান আমরা দোকান নেব। কিম্বা যদি আমাদের কাছে দোকানের অর্ধাংশ বিক্রি করে অংশীদার করে নিতে চান তাতেও আপত্তি নেই।'

প্রভাত ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। শেষে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, এ আমার কল্পনার অতীত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা যে কালে বাস করছি সেটাই যে কল্পনার অতীত। আমরা বেঁচে থেকে ভারতের স্বাধীনতা দেখে যাব এ কি কেউ কল্পনা করেছিল? কিন্তু ওকথা যাক। আপনি প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু একেবারে মুক্তি পাবেন না। কিছু দণ্ড আপনাকে ভোগ করতে হবে। এ সংসারে কর্মফল একেবারে এড়ানো যায় না।'

প্রভাত বলিল, 'কি দণ্ড বলুন, আপনি যে দণ্ড দেবেন আমি মাথা পেতে নেব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকে নিজের পরিচয় জানতে হবে।'

প্রভাত চক্ষু বিস্ফারিত করিল—'নিজের পরিচয়!'

'হ্যাঁ। নিজের পরিচয় আপনি জানেন কি?—পিতৃনাম?'

প্রভাত মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না। মা'র কাছে শুনেছি, হাসপাতালে আমার জন্ম হয়েছিল। আর কিছু জানি না।'

'আমি জানি। আপনার পিতৃনাম, অনাদি হালদার।'

প্রভাতের উপর এই সংবাদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব না, কারণ আমি নিজেই হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম। অবশেষে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, 'ব্যোমকেশ! এ কী বলছ তুমি! এর কোনও প্রমাণ আছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে বৈকি। প্রভাতবাবুর গায়েই প্রমাণ আছে।'

'গায়ে!'

'হ্যাঁ। প্রভাতবাবুর কোমরে একটা আধুলির মত লাল জড়ুল আছে। প্রভাতবাবু, জড়ুলটা দেখতে পারি কি?'

যন্ত্রের মত প্রভাত কামিজ তুলিল। ডান দিকে কাপড়ের কষির কাছে জড়ুল দেখা গেল। ব্যোমকেশ আমাকে বলিল, 'ঠিক এইরকম আর কোথায় দেখেছ মনে আছে বোধহয়।'

মনে ছিল। মৃত অনাদি হালদারের কোমরে চাবি পরাইবার সময় ব্যোমকেশ দেখাইয়াছিল। কিন্তু বিস্ময় ঘুচিল না, অভিভূতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিন্তু তুমি জানলে কি করে যে প্রভাতবাবুর কোমরে জড়ুল আছে?'

'প্রভাতবাবুকে যেদিন ডাক্তার তালুকদারের কাছে নিয়ে যাই সেদিন ডাক্তারকে ওঁর কোমরটা দেখতে বলেছিলাম।'

তবু মন দ্বিধাক্রান্ত হইয়া রহিল। বলিলাম, 'কিন্তু, একে কি প্রমাণ বলা চলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রমাণ না বলতে চাও বলো না, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত অনুমান, legitimate

inference বলতেই হবে। অনাদি হালদার খামকা পাটনায় গিয়েছিল কেন ? দপ্তরীর সহকারীকে পুষ্যিপুত্তুর নিতে গেল কেন ? প্রভাতবাবুকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দোকান করে দেবার কি দরকার ছিল ? সব মিলিয়ে দেখো, সন্দেহ থাকবে না।'

প্রভাত টলিতে টলিতে গিয়া আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িল, অনেকক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, সমস্তই ঠিক-ঠিক মিলিয়া যাইতেছে বটে। অনাদি হালদার জানিত প্রভাত তাহার ছেলে, ননীবালা তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। কালাবাজারে অনেক টাকা রোজগার করিয়া সে গোপনে ছেলেকে দেখিতে গিয়াছিল। যখন দেখিল ছেলে দপ্তরীর কাজ করে তখনই হয়তো নোটগুলোকে বই বাঁধাইয়া রাখিবার আইডিয়া তাহার মাথায় আসে। ছেলেকে ছেলে বলিয়া স্বীকার করার চেয়ে পোষ্যপুত্র নেওয়াই অনাদি হালদারের কুটিল বুদ্ধিতে বেশি সমীচীন মনে হইয়াছিল।...তাহার দুরন্ত প্রবৃত্তি মাঝখানে পড়িয়া সমস্ত ছারখার না করিয়া দিলে প্রভাতের জন্মরহস্য হয়তো চিরদিন অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। —

প্রভাত মড়ার মত মুখ তুলিয়া উঠিয়া বসিল, ভগ্নস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, এর চেয়ে আমার ফাঁসি দিলেন না কেন ? রক্তের এ কলঙ্কের চেয়ে সে যে ঢের ভাল ছিল।'

ব্যোমকেশ তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, 'সাহস আনুন, প্রভাতবাবু। রক্তের কলঙ্ক কার নেই ? ভুলে যাবেন না যে মানুষ জাতটার দেহে পশুর রক্ত রয়েছে। মানুষ দীর্ঘ তপস্যার ফলে তার রক্তের বাঁদরামি কতকটা কাটিয়ে উঠেছে ; সভ্য হয়েছে, ভদ্র হয়েছে, মানুষ হয়েছে। চেষ্টা করলে রক্তের প্রভাব জয় করা অসাধ্য কাজ নয়। অতীত ভুলে যান, অতীতের বন্ধন ছিঁড়ে গেছে। আজ নতুন ভারতবর্ষের নতুন মানুষ আপনি, অন্তরে বাহিরে আপনি স্বাধীন।'

প্রভাত অন্ধভাবে হাত বাড়াইয়া ব্যোমকেশের পদস্পর্শ করিল—'আশীর্বাদ করুন।'

বহ্নি-পতঙ্গ

এক

'পাটনায় পৌঁছিয়া দশ-বারো দিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল। তারপর একদিন পুরন্দর পাণ্ডের সহিত দেখা হইয়া গেল। পাণ্ডেজি বছরখানেক হইল বদলি হইয়া পাটনায় আসিয়াছেন। সেই যে দুর্গরহস্য সম্পর্কে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, তারপর আর দেখা হয় নাই। পাণ্ডেজি খুশি হইলেন, আমরাও কম খুশি হইলাম না। পাণ্ডেজি মৃত্যু-রহস্যের অগ্রদূত, আমাদের সহিত দেখা হইবার দু' একদিন পরেই একটি রহস্যময় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং—'

আদিম রিপুতে যে মৃত্যু-রহস্যের উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহাই এখন সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

একদিন সন্ধ্যার পর পাণ্ডেজির বাসায় আড্ডা বসিয়াছিল। বাহিরের লোক কেহ ছিল না, কেবল ব্যোমকেশ, পাণ্ডেজি ও আমি। চা, কাবুলী মটরের ঘুগ্‌নি, মনেরে'র লাড্ডু এবং গয়ার তামাক—এই চতুর্বর্গের সহযোগে পুরাতন স্মৃতিকথার রোমন্থন চলিতেছিল। ভৃত্য মাঝে মাঝে আসিয়া গড়গড়ার কলিকা বদলাইয়া দিয়া যাইতেছিল।

পাণ্ডেজির সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে প্রায় রোজই আমাদের আড্ডা জমিতেছে, কখনও আমাদের বাসায়, কখনও পাণ্ডেজির বাসায়। আজ পাণ্ডেজির বাসায় আড্ডা জমিয়াছে। তিনি আগামীকল্য আমাদের নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, মুর্গীর কাশ্মীরী কোর্মা খাওয়াইবেন। আমাদের কর্মহীন পাটনা প্রবাস মধুময় হইয়া উঠিয়াছে।

পাটনায় বদ্‌লি হইয়া পাণ্ডেজির পদোন্নতি হইয়াছে বটে কিন্তু দেখিলাম তাঁহার চিত্তে সুখ নাই। মহাযুদ্ধের চিতা নিভিলেও আকাশ বাতাস চিতাভস্মে আচ্ছন্ন, তদুপরি স্বাধীনতার প্রসব যন্ত্রণা। আমাদের স্মৃতি-রোমন্থন ঐতিহাসিক রীতিতে বর্তমান কালে নামিয়া আসিল। পাণ্ডেজি সাম্প্রতিক কয়েকটি লোমহর্ষণ সত্যঘটনা আমাদের শুনাইলেন। অবশেষে বলিলেন,—

'এই মহাযুদ্ধের সময় থেকে পৃথিবীতে ঠগ-জোচ্চোর-খুন-বদমায়েসের সংখ্যা বেড়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিসেরও কাজ বেড়েছে। আগে যে-সব অপরাধ আমরা কল্পনা করতাম না সেইসব অপরাধ নিত্য-নিয়ত ঘটছে। বিদেশী সিপাহীরা এসে নানা রকম বিজাতীয় বজ্জাতি শিখিয়ে গেছে। কত রকম নেশার জিনিস, কত রকম বিষ যে দেশে ঢুকেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এই সেদিন পাটনার এক অতি সাধারণ ছিঁচকে চোরের কাছ থেকে এক শিশি ওষুধ বেরুল, পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা একটা সাংঘাতিক বিষ, দক্ষিণ আমেরিকায় তার জন্মস্থান।'

ব্যোমকেশ গড়গড়ার নল মুখের নিকট হইতে সরাইয়া অলস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী বিষ? কিউরারি?'

'হ্যাঁ। আপনি নাম জানেন দেখছি। এমন সাংঘাতিক বিষ যে রক্তের সঙ্গে এক বিন্দু মিশলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। যে শিশিটা পাওয়া গেছে তা দিয়ে সমস্ত পাটনা শহরটাকে শেষ করে দেওয়া যাবে। ভেবে দেখুন এই রকম কত শিশি আমদানি হয়েছে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ও বিষটা কোথাও ব্যবহার হয়েছে তার প্রমাণ পেয়েছেন নাকি?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমাদের দেশে কোথায় কাকে বিষ খাইয়ে মারা হচ্ছে সব খবর কি পুলিসের কানে পৌঁছয় ? মড়া পোড়াবার জন্য একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট পর্যন্ত দরকার হয় না। নেহাৎ যারা গণ্যমান্য লোক তাদের বিষ খাওয়ালে হয়তো হৈ-চৈ হয়। তাও আত্মীয়-স্বজনেরা চাপা দিয়ে দেয়। অথচ আমার বিশ্বাস এ দেশে বিষ খাইয়ে মারার সংখ্যা খুব কম নয়।'

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ গড়গড়া টানিয়া বলিল, 'আচ্ছা, আপনারা যে এই সব বিষ আর মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেন কোথায় যায় বলুন তো ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কোথায় আর যাবে ? কিছুদিন আমাদের কাছে থাকে, তারপর হেড অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাঁরা ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সে কতটুকু ? বেশির ভাগই তো চোরাবাজারে চারিয়ে আছে। যার দরকার সে কিনে ব্যবহার করছে।' পাণ্ডেজি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন—'যুদ্ধ আর রাষ্ট্রবিপ্লব সভ্য মানুষকে অসভ্য করে তোলে। তখন বিবেক বুদ্ধির মুখোশ পড়ে খসে, কাঁচা-খেকো জানোয়ারটি বেরিয়ে আসে। কী ঠুনকো আমাদের সভ্যতা ! আসলে আমরা বর্বর।'

ব্যোমকেশ কথাটা যেন একটু তলাইয়া দেখিয়া বলিল, 'আসলে আমরা বর্বরই বটে। কিন্তু যখন সভ্যতা থেকে বর্বরতায় ফিরে যাই তখন সভ্যতার একটা গুণ সঙ্গে নিয়ে যাই। মুখোশ অত সহজে খসে না পাণ্ডেজি, কাঁচা-খেকো জন্তুটিকে খুঁজে বার করতে সময় লাগে। বাইরে শান্ত শিষ্ট নিরীহ জীব আর ভিতরে তীক্ষ্ণ নখ দন্ত—এইটেই সবচেয়ে ভয়াবহ।'

ঘড়িতে আটটা বাজিল। শীতের রাত্রি, কিন্তু আমাদের গৃহে ফিরিবার বিশেষ তাড়া ছিল না ; তাই পাণ্ডেজি যখন আর এক কিস্তি চায়ের প্রস্তাব করিলেন তখন আমরা আপত্তি করিলাম না। এই সময় ভৃত্য প্রবেশ করিয়া বলিল, 'ইন্সপেক্টর চৌধুরী এসেছেন।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কে রতিকান্ত ? নিয়ে এস।—আর চার পেয়ালা চা তৈরি কর।'

ভৃত্য চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে পুলিসের পোশাক পরা একটি যুবক প্রবেশ করিল। দীর্ঘ-দৃঢ় আকৃতি, টক্‌টকে রঙ, কাটালো মুখ, নীল চোখ, হঠাৎ সাহেব বলিয়া ভ্রম হয়। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। সে আসিয়া স্যালুটের ভঙ্গীতে ডান হাতটা একবার তুলিয়া পাণ্ডেজির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কি খবর, রতিকান্ত ?'

রতিকান্ত বলিল, 'হুজুর, একটা নেমন্তন্ন চিঠি আছে।' বলিয়া ওভারকোটের পকেট হইতে একটি খাম বাহির করিল। রতিকান্তর ভাষা উত্তর ভারতের বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষা, বিহারের ভেজাল হিন্দী নয়।

পাণ্ডেজি স্মিতমুখে বলিলেন, 'কিসের নেমন্তন্ন ? তোমার বিয়ে নাকি ?'

রতিকান্ত করুণ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, 'আমার বিয়ে কে দেবে হুজুর ? দীপানারায়ণ সিং নেমন্তন্ন করেছেন।'

পাণ্ডেজি খামখানা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, 'কিন্তু দীপানারায়ণ সিং-এর নেমন্তন্ন চিঠি তুমি নিয়ে এলে যে ?'

রতিকান্ত কৌতুকচ্ছলে মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'কি করি স্যার, বড়মানুষ কুটুম্ব, কোনদিন মিনিস্টার হয়ে যাবেন, তাই খাতির রাখতে হয়। মাঝে মাঝে যাই সেলাম বাজাতে। আজ গিয়েছিলাম, তা পুলিস অফিসারদের নেমন্তন্ন চিঠিগুলো আমাকেই বিলি করতে দিলেন।'

পাণ্ডেজি খাম হইতে সোনালী জলে ছাপা তক্‌তকে কার্ড বাহির করিয়া পড়িলেন, বলিলেন, 'হুঁ, গুরুতর ব্যাপার দেখছি। রীতিমত ডিনার।—কিন্তু উপলক্ষটা কি ?'

রতিকান্ত বলিল, 'অনেকদিন রোগভোগ করে সেরে উঠেছেন তাই বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াচ্ছেন। শহরের গণ্যমান্য সকলকেই নেমন্তন্ন করেছেন।'

পাণ্ডেজি কার্ডখানা আবার খামে পুরিতে পুরিতে বলিলেন, 'কাল রাত্তিরে নেমন্তন্ন। কিন্তু

আমি তো যেতে পারব না, রতিকান্ত।'

'কেন স্যার, কাল কি আপনি ইন্‌সপেকশনে বেরুচ্ছেন ?'

'না। আমার এই বন্ধুদুটি কলকাতা থেকে এসেছেন, কাল রাত্তিরে ওঁদের খেতে বলেছি।'

ব্যোমকেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'মুর্গীর কাশ্মীরী কোর্মা।'

রতিকান্ত চকিত হাস্যে আমাদের পানে চাহিল। এতক্ষণ সে থাকিয়া থাকিয়া আমাদের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল ; আমরা তাহার অপরিচিত অথচ পাণ্ডেজির সহিত বসিয়া গড়গড়া টানিতেছি দেখিয়া বোধহয় কৌতূহলী হইয়াছিল, কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ করে নাই। এখন হাসিমুখে ডান হাতখানা কপালের কাছে লইয়া গিয়া স্যালুট করিল। তারপর পাণ্ডেজিকে বলিল, 'হুজুর, কাশ্মীরী কোর্মার খবর আগে জানলে আমিও কাল এসে আপনার বাড়িতে আড্ডা গাড়তাম। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। আচ্ছা, আজ চলি।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'বোসো, চা খেয়ে যাও।'

রতিকান্ত বলিল, 'চা আর একদিন হবে হুজুর। আর, যদি কাশ্মীরী কোর্মা খাওয়ান তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু আজ আর বসতে পারব না। এখনও দু'তিনখানা চিঠি বিলি করতে বাকি আছে। তাছাড়া দীপনারায়ণজিকে গিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে। নিমন্ত্রণপত্রে আর এস ভি পি লেখা আছে দেখেছেন তো।'

'আচ্ছা, তাহলে এস।'

রতিকান্ত স্মিতমুখে আমাদের সকলকে একসঙ্গে স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'বাঃ, খাসা চেহারা ছোকরার ! যেন রাজপুত্তুর !'

পাণ্ডেজি কহিলেন, 'নেহাৎ মিথ্যে বলেননি। ওর পূর্বপুরুষেরা প্রতাপগড়ের মস্ত তালুকদার ছিল। প্রায় রাজারাজড়ার সামিল। এখন অবস্থা একেবারে পড়ে গেছে, তাই রতিকান্তকে চাকরি নিতে হয়েছে। ভারি বুদ্ধিমান ছেলে ; নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে, বি. এস-সি পাস করেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজকাল বড় ঘরের ছেলেরা পুলিসে ঢুকছে এটা সুলক্ষণ বলতে হবে।'

চা আসিল। কিছুক্ষণ অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনার পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'দীপনারায়ণ সিং কে ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'দীপনারায়ণ সিং-এর নাম শোনেননি ? বিহারের একজন প্রচণ্ড জমিদার, সালিয়ানা আয় দশ লাখ টাকা, তার ওপর তেজারতির কারবার আছে। লোকটি কিন্তু ভাল। রাজনৈতিক আন্দোলনে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এখন বয়স হয়েছে, পঞ্চাশের কাছাকাছি—' গড়গড়ায় কয়েকটি টান দিয়া বলিলেন, 'বুড়ো বয়সে একটি ভুল করে ফেলেছেন, তরুণী ভার্যা গ্রহণ করেছেন।'

'সাবেক গৃহিণী বিদ্যমান ?'

'না, অতটা নয়। সাবেক গৃহিণী বছর কয়েক হল গত হয়েছেন, তারপর তরুণী ভার্যাটি এসেছেন। ভদ্রলোককে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, ছেলেপুলে নেই, এক ভাইপো আছে জমিদারীর শরিক, কিন্তু সেটা ঘোর অপদার্থ। এই রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করবার একটা লোক চাই তো।'

'তাহলে দীপনারায়ণ সিং আবার বিয়ে করে ভুলটা কী করেছেন ? বংশরক্ষা তো হবে।'

'বংশরক্ষা এখনও হয়নি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা দীপনারায়ণ সিং রূপে মুগ্ধ হয়ে জাতের বাইরে বিয়ে করেছেন। সিভিল ম্যারেজ।'

'তরুণীটি বুঝি সুন্দরী ?'

'সুন্দরী এবং বিদুষী। কলানিপুণা, নাচতে গাইতে জানেন, ছবি আঁকতে জানেন, তার ওপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তেজস্বিনী ছাত্রী, বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।'

'দীপনারায়ণ সিং দেখছি ভাগ্যবান এবং প্রগতিশীলও বটে।'

'আগে এতটা প্রগতিশীল ছিলেন না। এতদিন ওঁর বাড়িতে মেয়েদের পর্দা ছিল। এখন একেবারে পর্দা ফাঁক।'

'ভালই তো। তাতে দোষটা কি?'

'দোষ নেই। কিন্তু অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চড় চড় করে। বিহারের লোক এখনও মন থেকে পর্দা প্রথা ত্যাগ করতে পারেনি, তাই মেয়েদের একটু স্বাধীনতা দেখলেই কানাঘুষো করে, চোখ ঠারাঠারি করে—'

অতঃপর আমাদের আলোচনা স্ত্রী-স্বাধীনতার পথ ধরিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে উপনীত হইল; ঘড়ির কাঁটাও ক্রমশ ন'টার দিকে যাইতেছে। রাত্রে বাড়ি ফিরিতে বেশি দেরি করিলে সত্যবতী হাঙ্গামা করে। তাই আমরা অনিচ্ছাভরে উঠিবার উপক্রম করিলাম।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'চলুন, আপনাদের মোটরে করে পৌঁছে দিয়ে আসি।' পাণ্ডেজির আগে মোটর সাইকেল ছিল, এখন একটি ছোট মোটর কিনিয়াছেন।

আমরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় ঘরের কোণে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। পাণ্ডেজি গিয়া ফোন ধরিলেন—'হ্যালো...হ্যাঁ, আমি পুরন্দর পাণ্ডে...দীপনারায়ণ সিং কথা বলতে চান?...নমস্তে নমস্তে...আপনার পার্টিতে যাবার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু...বন্ধুদেরও নিয়ে যাব?...তা—ওঁরা এখনও এখানেই আছেন, ওঁদের জিগ্যেস করে বলছি—'

টেলিফোনের মুখে হাত চাপা দিয়া পাণ্ডেজি আমাদের দিকে ফিরিলেন, 'দীপনারায়ণ সিং আপনাদেরও পার্টিতে নিয়ে যেতে বলছেন। কি বলেন?'

ব্যোমকেশ একবার আমার দিকে তাকাইল, বলিল, 'মন্দ কি! একটা নূতনত্ব হবে। আপনার কাশ্মীরী কোর্মা না হয় আপাতত ধামাচাপা রইল।'

পাণ্ডেজি হাসিয়া টেলিফোনের মধ্যে বলিলেন, 'বেশ, ওঁরা যাবেন...ওঁদের কার্ড আমার কাছেই পাঠিয়ে দেবেন...আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে। নমস্তে।'

পাণ্ডেজি টেলিফোন রাখিয়া বলিলেন, 'চলুন, এবার আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

দুই

পরদিন সন্ধ্যা আন্দাজ সাতটার সময় পাণ্ডেজি আসিয়া আমাদের মোটরে তুলিয়া দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়িতে লইয়া গেলেন।

দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ি শহরের প্রাচীন অংশে। সাবেক কালের বিরাট দ্বিতল বাড়ি, জেলখানার মত উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা। আমরা উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বাড়ি ও বাগানে জাপানী ফানুসের ঝাড় জ্বলিতেছে, অতি মৃদু শানাই বাজিতেছে, বহু অতিথির সমাগম হইয়াছে। একতলার বড় হল-ঘরটিতেই সমাগম বেশি, আশেপাশের ঘরগুলিতেও অতিথিরা বসিয়াছেন। কোনও ঘরে ব্রিজের আড্ডা বসিয়াছে, কোনও ঘরে বয়স্থ হাকিম শ্রেণীর অতিথিরা নিজেদের মধ্যে একটু স্বতন্ত্র গণ্ডী রচনা করিয়া গল্পগুজব করিতেছেন। তক্‌মা আঁটা ভৃত্যেরা চা, কফি ও বলবস্তুর পানীয় লইয়া ঘোরাঘুরি করিতেছে।

হল-ঘরটি বৃহৎ, বিলাতি প্রথায় স্থানে স্থানে সোফা-সেট দিয়া সজ্জিত। প্রত্যেক সোফা-সেটে একটি দল বসিয়াছে। ঘরের মধ্যস্থলে সদর দরজার সম্মুখে একটি পালঙ্কের মত আসন। তাহার উপর তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, ইনিই গৃহস্বামী দীপনারায়ণ সিং। গায়ে লম্বা গরম কোট, গলায় পশমের গলাবন্ধ। চেহারা ভাল, পঞ্চাশ বছর বয়সে এমন কিছু স্থবির হইয়া পড়েন নাই, কিন্তু মুখের পাণ্ডুর শীর্ণতা হইতে অনুমান করা যায় দীর্ঘ রোগ-ভোগ করিয়া সম্প্রতি আরোগ্যের পথে পদার্পণ করিয়াছেন। পরম সমাদরে দুই হাতে আমাদের করমর্দন করিলেন।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আপনার রোগমুক্তির জন্য অভিনন্দন জানাই।'

দীপনারায়ণ শীর্ণ মুখে মিষ্ট হাসিলেন, 'বহুৎ ধন্যবাদ। বাঁচবার আশা ছিল না পাণ্ডেজি, নেহাৎ ডাক্তার পালিত ছিলেন তাই এ যাত্রা বেঁচে গেছি।' বলিয়া ঘরের কোণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

ঘরের কোণে একটি সোফায় কোট-প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক একাকী বসিয়া ছিলেন ; দোহারা গড়ন, বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য নাই, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। অঙ্গুলি নির্দেশ লক্ষ্য করিয়া তিনি আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরিচয় হইল। দীপনারায়ণ সিং বলিলেন, 'এঁরই গুণে আমার পুনর্জন্ম হয়েছে।'

ডাক্তার পালিত যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ডাক্তারের যা কর্তব্য তার বেশি তো কিছুই করিনি।—তাছাড়া, চিকিৎসা আমি করলেও শহরের বড় বড় ডাক্তার সকলেই দেখেছেন। ত্রিদিববাবু—'

পাণ্ডেজি প্রশ্ন করিলেন, 'রোগটা কি হয়েছিল ?'

ডাক্তার পালিত বিলাতি নিদানশাস্ত্র সম্মত রোগের যে সকল লক্ষণ বলিলেন তাহা হইতে অনুমান করিলাম, নানা জাতীয় দুষ্ট বীজাণু লিভারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া রক্তাল্পতা ঘটাইয়াছিল এবং হৃদ্‌পিণ্ডকে জখম করিবার তালে ছিল, ইন্‌জেকশন প্রভৃতি আসুরিক চিকিৎসার দ্বারা তাহাদের বশে আনিতে হইয়াছে। এখন অবশ্য রোগীর অবস্থা খুবই ভাল, তবু তাঁহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে।

এই সময় পিছন দিকে নাক ঝাড়ার মত একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখি, একটি যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং নাকের মধ্যে শব্দ করিয়া বোধকরি উপেক্ষা জ্ঞাপন করিতেছে। যুবকের চেহারা কৃকলাসের মত, অঙ্গে ফ্যাশন-দুরস্ত বিলাতি সাজপোশাক, মুখে ব্যঙ্গ দম্ভ। দীপনারায়ণ পরিচয় করাইয়া দিলেন—'ইনি ডাক্তার জগন্নাথ প্রসাদ, একজন নবীন বিহারী ডাক্তার।' ডাক্তার অবজ্ঞাভরে আমাদের দিকে ঘাড় নাড়িলেন এবং যে কয়টি কথা বলিলেন তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, প্রবীণ ডাক্তারদের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধার অন্ত নাই, বিশেষত যদি তাঁহারা বাঙালী ডাক্তার হন। দীপনারায়ণ সিং-এর চিকিৎসার ভার কয়েকজন বুড়া বাঙালী ডাক্তারকে না দিয়া তাঁহার হাতে অর্পণ করিলে তিনি পাঁচ দিনে রোগ আরাম করিয়া দিতেন। তাঁহার কথা শুনিয়া দীপনারায়ণ সিং মুখ বাঁকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ডাক্তার পালিত বিরক্ত হইয়া আবার পূর্বস্থানে গিয়া বসিলেন। ডাক্তার জগন্নাথ আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিয়া, অদূরে পানীয়বাহী একজন ভৃত্যকে দেখিয়া হ্রেষাধ্বনি করিতে করিতে সেইদিকে ধাবিত হইলেন।

দীপনারায়ণ সিং লজ্জা ও ক্ষোভ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, 'এরাই হচ্ছে নতুন যুগের বিহারী। এদের কাছে গুণের আদর নেই, সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে এরা শুধু নিজের সুবিধা করে নিতে চায়। আজ বিহারে বাঙালীর কদর কমে যাচ্ছে, এরাই তার জন্যে দায়ী।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়তো বাঙালীরও দোষ আছে।'

দীপনারায়ণ বলিলেন, 'হয়তো আছে। কিন্তু পরিহাস এই যে, এরা যখন রোগে পড়ে, যখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়, তখন এরাই ছুটে যায় বাঙালী ডাক্তারের কাছে।'

এই অপ্রীতিকর প্রাদেশিক প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় আমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িতেছিলাম, কিন্তু পাণ্ডেজি তাহা সরল করিয়া দিলেন, দুই চারিটা অন্য কথা বলিয়া আমাদের লইয়া গিয়া যেখানে ডাক্তার পালিত বসিয়া ছিলেন সেইখানে বসাইলেন।

আমরা উপবিষ্ট হইলে ডাক্তার পালিত একটু অল্প হাসিয়া বলিলেন, 'ঘোড়া জগন্নাথ আর কি কি বললে ?'

পাণ্ডেজি হাসিয়া উঠিলেন, 'ওর নাম বুঝি ঘোড়া জগন্নাথ ? খাসা নাম, ভারি লাগ-সৈ হয়েছে। কিন্তু ওদের কথায় আপনি কান দেবেন না ডাক্তার। ওদের কথা কে গ্রাহ্য করে ?'

পালিত বলিলেন, 'কান না দিয়ে উপায় কি ? ওরা যে দল বেঁধে প্রচার কার্য করে বেড়াচ্ছে।

যারা বুদ্ধিমান তারা হয়তো গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সাধারণ লোকে ওদের কথাই শোনে।'

আমাদের আলোচনা হয়তো আর কিছুক্ষণ চলিত কিন্তু হঠাৎ পাশের দিকে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসির শব্দে তাহাতে বাধা পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, অদূরে অন্য একটি সোফা-সেটে তিনটি লোক আসিয়া বসিয়াছে; তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিতেছে তাহার দেহায়তন এতই বিপুল যে সে একাই সমস্ত সোফাটি জুড়িয়া বসিয়াছে। ব্যূঢ়োরস্ক গজস্কন্ধ যুবক, চিবুক হইতে নিতম্ব পর্যন্ত থরে থরে চর্বির তরঙ্গ নামিয়াছে। তাহার কণ্ঠ হইতে যে বিচিত্র হাস্যধ্বনি নির্গত হইতেছে তাহা যে একই কালে একই মানুষের কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করা কঠিন। একসঙ্গে যদি গোটা দশেক শৃগাল হুক্কাহুয়া করিয়া ডাকিয়া ওঠে এবং সেই সঙ্গে কয়েকটা পেঁচোয় পাওয়া আঁতুড়ে ছেলে কান্না জুড়িয়া দেয় তাহা হইলে বোধহয় এই শব্দ-সংগ্রামের কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

অন্য লোক দুটি নীরবে বসিয়া মুচকি হাসিতেছিল। আশ্চর্য এই যে মোটা যুবকটি যে-পরিমাণে মোটা, তাহার সঙ্গী দুটি ঠিক সেই পরিমাণে রোগা। ইহাদের তিনজনের দেহের মেদ মাংস সমানভাবে বাঁটিয়া দিলে বোধকরি তিনটি হৃষ্টপুষ্ট সাধারণ মানুষ পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য হাসির এই অট্টরোলে ঘরসুদ্ধ লোকের সচকিত দৃষ্টি সেইদিকে ফিরিয়াছিল। একটি রেশমী পাগড়ি-পরা কৃশকায় বৃদ্ধ কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়া দ্রুত সেইদিকে অগ্রসর হইলেন।

ব্যোমকেশ ডাক্তার পালিতকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'গজকচ্ছপটি কে?'

ডাক্তার পালিত মুখ টিপিয়া বলিলেন, 'দীপনারায়ণবাবুর ভাইপো দেবনারায়ণ। একটি আস্ত—' কথাটা ডাক্তার শেষ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার অনুচ্চারিত বিশেষ্যটি স্পষ্টই বোঝা গেল। ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া কাল পাণ্ডেজি বলিয়াছিলেন—ঘোর অপদার্থ। শুধু অপদার্থই নয়, বুদ্ধিসুদ্ধিও শরীরের অনুরূপ। পাগড়ি-পরা বৃদ্ধটি আসিয়া রোগা যুবক দুটিকে কানে কানে কিছু বলিলেন, মনে হইল তিনি তাহাদের মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন। রোগা লোক দুটিও যেন অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছে এইভাবে ভিজা বিড়ালের মত চক্ষু নত করিয়া রহিল। গজকচ্ছপের হাসি তখনও থামে নাই, তবে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কানের কাছে নত হইয়া কিছু বলিলেন। হঠাৎ ব্রেককষা গাড়ির মত গজকচ্ছপের হাসি হেঁচকা দিয়া থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ পূর্ববৎ ডাক্তার পালিতকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রোগা লোক দুটি কে?'

পালিত বলিলেন, 'ওই যেটির কোঁকড়া চুল কাঁকড়া গোঁফ ও হচ্ছে দেবনারায়ণের বিদূষক, মানে ইয়ার। নাম বেণীপ্রসাদ। অন্যটির নাম লীলাধর বংশী—দীপনারায়ণবাবুর স্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং দেবনারায়ণের অ্যাসিস্ট্যান্ট বিদূষক।'

'আর বৃদ্ধটি?'

'বৃদ্ধটি লীলাধরের বাবা গঙ্গাধর বংশী, স্টেটের বড় কর্তা, অর্থাৎ ম্যানেজার। গভীর জলের মাছ।'

গভীর জলের মাছটি একবার চক্ষু তুলিয়া আমাদের পানে চাহিলেন এবং মন্দমধুর হাস্যে আমাদের অভিসিঞ্চিত করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। দেবনারায়ণ নিজ ঝকমকে শার্কস্কিনের গলাবন্ধ কোটের পকেট হইতে একটি সুবৃহৎ পানের ডিবা বাহির করিয়া কয়েকটা পান গালে পুরিয়া গুরু গম্ভীর মুখে চিবাইতে লাগিল। এই লোকটাই কিছুক্ষণ পূর্বে হট্টগোল করিয়া হাসিতেছিল তাহা আর বোঝা যায় না।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'হাসির কারণটা কী কিছু বুঝতে পারলেন?'

পালিত বলিলেন, 'বোধহয় বিদূষকেরা রসের কথা কিছু বলেছিল তাই এত হাসি।'

একজন ভৃত্য রূপার থালায় সোনালী তবক মোড়া পান ও সিগারেট লইয়া উপস্থিত হইল। আমরা সিগারেট ধরাইলাম। ব্যোমকেশ এদিকে ওদিকে চাহিয়া পাণ্ডেজিকে বলিল, 'ইন্সপেক্টর

রতিকান্তকে দেখছি না।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'হয়তো অন্য ঘরে আছে। কিম্বা হয়তো থানায় আটকে গেছে। আসবে নিশ্চয়। আপনারা বসুন, আমি একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি।'

পাণ্ডেজি উঠিয়া গেলেন। আমরা তিনজনে বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে ঘরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অতিথিগুলিকে দর্শন করিতে লাগিলাম। অতিথিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি, দু' একটি স্ত্রীলোক আছেন।

এই সময় ঘরের অন্য প্রান্তের একটি দ্বার দিয়া এক মহিলা প্রবেশ করিলেন। ঘরে বেশ উজ্জ্বল আলো ছিল, এখন মনে হইল কেবলমাত্র এই মহিলাটির আবির্ভাবে ঘরটি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তিনি কোন্ রঙের শাড়ি পরিয়াছেন, কী কী গহনা পরিয়াছেন কিছুই চোখে পড়িল না, কেবল দেখিলাম, আলোকের একটি সঞ্চরমাণ উৎস ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ঘরের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলেন, কেহ কেহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন। মহিলাটি হাসিমুখে লীলায়িত ভঙ্গিমায় সকলকে অভ্যর্থনা করিতে করিতে আমাদের দিকেই আসিতে লাগিলেন।

ডাক্তার পালিত অ্যাশ-ট্রের উপর সিগারেট ঘসিয়া নিভাইলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, 'মিসেস দীপনারায়ণ—শকুন্তলা।'

রূপসী বটে। বয়স চব্বিশ-পঁচিশের কম হইবে না, কিন্তু সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের মদোদ্ধত লাবণ্য যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এইরূপ লাবণ্যবতী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা রমণী হয়তো দুই চারিটি দেখা যায়, কিন্তু এদিকে বেশি দেখা যায় না। শকুন্তলা নামটিও যেন রূপের সঙ্গে ছন্দ রক্ষা করিয়াছে। শকুন্তলা—অপ্সরাকন্যা শকুন্তলা—যাহাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত ভুলিয়াছিলেন। দীপনারায়ণ সিং প্রৌঢ় বয়সে কেন অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না।

শকুন্তলা আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমরা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলাম। ডাক্তার পালিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। শকুন্তলা অতি মিষ্ট স্বরে দুই চারিটি সাদর সম্ভাষণের কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার গৃহিণীসুলভ সৌজন্য এবং তরুণীসুলভ শালীনতা দুইই প্রকাশ পাইল। তারপর তিনি অন্যদিকে ফিরিলেন।

এই সময় লক্ষ্য করিলাম শকুন্তলা একা নয়, তাঁহার পিছনে আর একটি যুবতী রহিয়াছেন। সূর্যের প্রভায় যেমন শুকতারা ঢাকা পড়িয়া যায়, এতক্ষণ এই যুবতী তেমনি ঢাকা পড়িয়া ছিলেন ; এখন দেখিলাম তাঁহার কোলে একটি বছর দেড়েকের ছেলে। বস্তুত এই ছেলেটি হঠাৎ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াই যুবতীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যুবতী শকুন্তলার চেয়ে বোধহয় দু' এক বছরের ছোটই হইবেন ; সুশ্রী গৌরাঙ্গী, মোটাসোটা ঢিলাঢালা গড়ন, মহার্ঘ বস্ত্র ও গহনার ভারে যেন নড়িতে পারিতেছেন না। তাঁহার বেশবাসের মধ্যে প্রাচুর্য আছে কিন্তু নিপুণতা নাই। তাছাড়া মনে হয় প্রকাশ্যভাবে পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করিতে তিনি অভ্যস্ত নন, পর্দার ঘোর এখনও কাটে নাই।

শিশু কাঁদিয়া উঠিতেই শকুন্তলা পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার মুখে একটু অপ্রসন্নতার ছায়া পড়িল, তিনি বলিলেন, 'চাঁদনী, খোকাকে এখানে এনেছ কেন ? যাও, ওকে নার্সের কাছে রেখে এস।'

প্রভুভক্ত কুকুর প্রভুর ধমক খাইয়া যেভাবে তাকায়, যুবতীও সেইভাবে শকুন্তলার মুখের পানে চাহিলেন, তারপর নম্রভাবে ঘাড় হেলাইয়া শিশুকে লইয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন।

দীপনারায়ণ দূর হইতে স্ত্রীকে আহ্বান করিলেন—'শকুন্তলা !' কয়েকজন হোমরাচোমরা অতিথি আসিয়াছেন।

শকুন্তলা সেই দিকে গেলেন। পাশের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া দেখিলাম, দেবনারায়ণ কোলা

ব্যাঙের মত ড্যাবডেবে চোখ মেলিয়া শকুন্তলার পানে চাহিয়া আছে।

আমরা আবার সিগারেট ধরাইলাম। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'দ্বিতীয় মহিলাটি কে?'

ডাক্তার পালিত অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, 'দেবনারায়ণের স্ত্রী। ছেলেটিও দেবনারায়ণের।'

লক্ষ্য করিলাম ডাক্তার পালিতের কপালে একটু ভ্রূকুটির চিহ্ন। তাঁহার চক্ষুও শকুন্তলাকে অনুসরণ করিতেছে।

তারপর আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে সময় কাটাইলাম। ডাক্তার পালিত অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন এবং তাঁহার চক্ষু দুটি ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে শকুন্তলাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

সাড়ে আটটার সময় আহারের আহ্বান আসিল।

অন্য একটি হল-ঘরে টেবিল পাতিয়া আহারের ব্যবস্থা। রাজকীয় আয়োজন। কলিকাতার কোন বিলাতি হোটেল হইতে পাচক ও পরিবেশক আসিয়াছে। আহার শেষ করিয়া উঠিতে পৌনে দশটা বাজিল।

বাহিরের হল-ঘরে আসিয়া পান সিগারেট সেবনে যত্নবান হইলাম। ডাক্তার পালিত একটি পরিতৃপ্ত উদ্গার তুলিয়া বলিলেন, 'মন্দ হল না।—আচ্ছা, আজ চলি, রাত্তিরে বোধহয় একবার রুগী দেখতে বেরুতে হবে। আবার কাল সকালেই দীপনারায়ণবাবুকে ইন্‌জেকশন দিতে আসব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখনও ইন্‌জেকশন চলছে নাকি?'

পালিত বলিলেন, 'হ্যাঁ, এখনও হপ্তায় একটা করে লিভার দিচ্ছি। আর গোটা দুই দিয়ে বন্ধ করে দেব। আচ্ছা—নমস্কার। আপনারা তো এখনও আছেন, দেখা হবে নিশ্চয়—'

তিনি প্রস্থানের জন্য পা বাড়াইয়াছেন এমন সময় দেখিলাম সদর দরজা দিয়া ইন্সপেক্টর রতিকান্ত চৌধুরী প্রবেশ করিতেছে। তাহার পরিধানে পুলিসের বেশ, কেবল মাথায় টুপি নাই। একটু ব্যস্তসমস্ত ভাব। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সে একবার ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল, তারপর ডাক্তার পালিতকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'ডাক্তার পালিত, একটা খারাপ খবর আছে। আপনার ডিস্‌পেনসারিতে চুরি হয়েছে।'

'চুরি!'

রতিকান্ত বলিল, 'হ্যাঁ। আন্দাজ ন'টার সময় আমি থানা থেকে বেরিয়ে এখানে আসছিলাম, পথে নজর পড়ল ডিস্‌পেনসারির দরজা খোলা রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি দরজার তালা ভাঙা। ভেতরে গিয়ে দেখলাম আপনার টেবিলের দেরাজ খোলা, চোর দেরাজ ভেঙে টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছে। আমি একজন কন্সেটবলকে বসিয়ে এসেছি। আপনি যান। দেরাজে কি টাকা ছিল?'

পালিত হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, 'টাকা! রাত্রে বেশি টাকা তো থাকে না, বড় জোর দু'চার টাকা ছিল।'

'তবু আপনি যান। টাকা ছাড়া যদি আর কিছু চুরি গিয়ে থাকে আপনি বুঝতে পারবেন।'

'আমি এখনি যাচ্ছি।'

'আর, টাকা ছাড়া যদি অন্য কিছু চুরি গিয়ে থাকে আজ রাত্রেই থানায় এত্তালা পাঠিয়ে দেবেন।'

শকুন্তলা ও পাণ্ডেজি দূরে দাঁড়াইয়া বাক্যালাপ করিতেছিলেন, আমাদের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পাণ্ডেজি প্রশ্ন করিলেন, 'কি হয়েছে?'

ডাক্তার পালিত দাঁড়াইলেন না, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। রতিকান্ত চুরির কথা বলিল। তারপর শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আমার বড় দেরি হয়ে গেল—খেতে পাবো তো?'

শকুন্তলা একটু হাসিয়া বলিলেন, 'পাবেন। আসুন আমার সঙ্গে।'

গৃহস্বামী পূর্বেই বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করিয়াছিলেন, আমরা শকুন্তলার নিকট বিদায় লইয়া গৃহে

ফিরিলাম।

তিন

পরদিন সকাল আন্দাজ ন'টার সময় একখানা মোটর আসিয়া আমাদের বাসার সম্মুখে থামিল। ব্যোমকেশ খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, 'পাণ্ডেজি—এত সকালে!'

পরক্ষণেই পাণ্ডেজি আমাদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। পরিধানে পুলিস ইউনিফর্ম, মুখ গম্ভীর। ব্যোমকেশের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বলিলেন, 'দীপনারায়ণ সিং মারা গেছেন।'

আমরা ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম, কথাটা ঠিক যেন হৃদয়ঙ্গম হইল না।

'মারা গেছেন!'

'এইমাত্র রতিকান্ত টেলিফোন করেছিল। সকালবেলা ডাক্তার পালিত এসেছিলেন দীপনারায়ণ সিংকে ইন্‌জেকশন দিতে। ইন্‌জেকশন দেবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। আমি সেখানেই যাচ্ছি। আপনারা যাবেন?'

ব্যোমকেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া আলোয়ানাখানা কাঁধে ফেলিল। আমিও উঠিলাম।

'চলুন।'

মোটরে যাইতে যাইতে কাল রাত্রির দৃশ্যগুলি মনে পড়িতে লাগিল। দীপনারায়ণ সিংকে একবারই দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে ভাল লাগিয়াছিল; শিষ্ট সহাস্য ভদ্রলোক, রোগ হইতে সারিয়া উঠিতেছিলেন। হঠাৎ কী হইল? আর শকুন্তলা—

শকুন্তলা বিধবা হইয়াছেন...অন্তর হইতে যেন এই নিষ্ঠুর সত্য স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। ফটকের কাছে গোটা তিনেক মোটর দাঁড়াইয়া আছে। পাণ্ডেজি গাড়ি থামাইয়া অবতরণ করিলেন। দেউড়ি পার হইয়া আমরা বাড়ির সদর দরজায় উপস্থিত হইলাম। বাগানে কেহ নাই, চারিদিক যেন থমথম করিতেছে।

সদর দরজার সম্মুখে ইন্সপেক্টর রতিকান্ত গম্ভীর মুখে পাণ্ডেজিকে স্যালুট করিল। আমাদের দেখিয়া তাহার ভ্রূ ঈষৎ উত্থিত হইল, কিন্তু সে কিছু না বলিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

হল-ঘরের দ্বারের সম্মুখে পালঙ্কের মত আসনটি পূর্ববৎ রহিয়াছে, তাহার উপর দীপনারায়ণ সিং-এর মৃতদেহ। মৃতদেহের পাশে বসিয়া ডাক্তার পালিত এক দৃষ্টে মৃতের মুখের পানে চাহিয়া আছেন। ঘরে আর কেহ নাই, কেবল আসবাবগুলি গত রাত্রির মতই সাজানো রহিয়াছে।

আমরা পা টিপিয়া টিপিয়া পালঙ্কের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। দীপনারায়ণ সিংকে কাল রাত্রে যেমন দেখিয়াছিলাম, আজ মৃত্যুর স্পর্শে তাঁহার আকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় নাই। চক্ষু মুদিত, মুখের স্নায়ু পেশী শিথিল; যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

ডাক্তার পালিত এমন তন্ময় হইয়া মৃতের মুখের পানে চাহিয়া ছিলেন যে আমাদের আগমন বোধহয় জানিতে পারেন নাই। পাণ্ডেজির লঘু করস্পর্শে তাঁহার চমক ভাঙিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একে একে আমাদের মুখের পানে চাহিলেন, তারপর বলিলেন, 'পোস্ট-মর্টেম হওয়া দরকার। আর—এই শিশিটা রাখুন।' তাঁহার হাতের কাছে একটি রবারের স্টপার দেওয়া ক্ষুদ্র বাদামী রঙের শিশি ছিল, সেটি পাণ্ডেজিকে দিলেন। পাণ্ডেজি শিশি চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া দেখিলেন তখনও তাহাতে প্রায় আধ শিশি তরল পদার্থ রহিয়াছে। তিনি শিশিটি রতিকান্তের হাতে দিয়া শান্তকণ্ঠে ডাক্তারকে বলিলেন, 'আসুন, ওদিকে গিয়ে বসা যাক।'

ডাক্তার পালিত তাঁহার হ্যান্ডব্যাগটি পালঙ্কের উপর হইতে তুলিয়া লইলেন। আমরা সকলে অদূরে একটি সোফা-সেটে গিয়া বসিলাম। রতিকান্ত দাঁড়াইয়া রহিল। পাণ্ডেজি জিজ্ঞাসা

করিলেন, 'বাড়ির আর সকলে কোথায় ?'

রতিকান্ত বলিল, 'তাদের সব ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। মিস্ মান্না শকুন্তলা দেবীর কাছে আছেন।'

'মিস্ মান্না কে ? লেডি ডাক্তার ?'

পালিত বলিলেন, 'হ্যাঁ। তিনিও এ বাড়ির বাঁধা ডাক্তার। শকুন্তলার অবস্থা দেখে তাঁকে টেলিফোন করে আনিয়ে নিয়েছি।'

'বেশ করেছেন। দেবনারায়ণের খবর কি ?'

'দেবনারায়ণটা ইডিয়ট—ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কাঁদছে। দেওয়ান গঙ্গাধর বংশী তার কাছে আছে। বেচারী চাঁদনীরই বিপদ, নিজে কাঁদছে, একবার স্বামীর কাছে ছুটে আসছে, একবার শকুন্তলার কাছে ছুটে যাচ্ছে।' তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন।

পাণ্ডেজি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'ডাক্তার পালিত, এবার গোড়া থেকে সব কথা বলুন।'

ডাক্তার তাঁহার ব্যাগটি কোলের উপর হইতে নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, 'বলবার বেশি কিছু নেই। আন্দাজ আটটার সময় আমি এসে দেখলাম দীপনারায়ণবাবু ওই পালঙ্কে বসে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন—এই শীতে আপনি এত শীগ্গির আসবেন ভাবিনি, চা খান। আমি বললাম—আচ্ছা, আগে ইন্‌জেকশনটা দিই। চাঁদনী উপস্থিত ছিলেন, শকুন্তলা আজ উপস্থিত ছিলেন না। আমি দীপনারায়ণবাবুর নাড়ি দেখলাম, নাড়ি বেশ ভাল। তখন সিরিঞ্জে লিভার এক্সট্র্যাক্ট ভরে তাঁর বাহুতে ইন্‌জেকশন দিলাম। ইন্‌ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন, হাঙ্গামা কিছু নেই, কিন্তু দীপনারায়ণবাবু আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন। দেখলাম তাঁর চোখের পাতা ভারী হয়ে বুজে আসছে ; তিনি কথা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু বলতে পারলেন না। আমি তখনই তাঁকে এড্রেনালিন্ দিলাম, তারপর আর্টিফিসিয়াল রেস্‌পিরিশন দিতে লাগলাম। কিন্তু কোনও ফল হল না, তিন-চার মিনিটের মধ্যে তাঁর ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল।'

ডাক্তার একবার নিজের বুকের উপর আঙুল বুলাইয়া নীরব রহিলেন। তিনি প্রবীণ ডাক্তার, আকস্মিক মৃত্যু তাঁহার কাছে নূতন নয়। কিন্তু তিনি যে ভিতরে ভিতরে কত বড় ধাক্কা খাইয়াছেন তাহা তাঁহার কঠিন সংযম ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'মৃত্যুর কারণ কী তা আপনি বুঝতে পারেননি ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'লক্ষণ দেখে মনে হয়েছিল—এনাফিলেকটিক শক্। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়।'

'তবে কী হতে পারে ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো কোনও বিষ।'

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, ব্যোমকেশ বলিল, 'কিউরারি বিষ হতে পারে কি ?'

ডাক্তার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপর কতকটা নিজ মনেই বলিলেন, 'কিউরারি ! হতে পারে। তবে পোস্ট-মর্টেম না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয় বলা যায় না।'

'যদি কিউরারি বিষে মৃত্যু হয়ে থাকে পোস্ট-মর্টেমে কিউরারি পাওয়া যাবে ?'

'যাবে। কিডনীতে পাওয়া যাবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তারবাবু, আপনি যে শিশিটা এখনি পাণ্ডেজিকে দিলেন ওটা কি ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'ওটা লিভার এক্সট্র্যাক্টের ভায়াল। ওতে দশ শিশি ওষুধ থাকে, ভায়ালের মুখ রবার দিয়ে সীল করা থাকে। সিরিঞ্জের ছুঁচ রবারে ঢুকিয়ে ভায়াল থেকে দরকার মতো ওষুধ বের করে নেওয়া যায়। আজ আমি ওই ভায়াল থেকেই ওষুধ বের করে ইন্‌জেকশন দিয়েছিলাম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্‌জেকশন দেবার সঙ্গে সঙ্গে যখন মৃত্যু হয়েছে তখন অনুমান করা যেতে

পারে যে ইন্‌জেকশনই মৃত্যুর কারণ। তাহলে ওই ভায়ালে বিষ আছে?'

ডাক্তার বলিলেন, 'তাছাড়া আর কি হতে পারে? অথচ—কাল সন্ধ্যেবেলা ওই ভায়াল থেকেই একজন রুগীকে ইন্‌জেকশন দিয়েছি, সে দিব্যি বেঁচে আছে।'

'ভায়ালটা আপনার ব্যাগের মধ্যেই থাকে?'

'হ্যাঁ। ফুরিয়ে গেলে একটা নতুন ভায়াল রাখি।'

'আচ্ছা, বলুন দেখি, কাল রাত্তিরে আপনার ব্যাগ কোথায় ছিল?'

'ডিস্‌পেনসারিতে ছিল।'

'রাত্তিরে যখন কল আসে তখন কি করেন, ডিস্‌পেনসারি থেকে ব্যাগ নিয়ে রুগী দেখতে যান?'

'না, আমার বাড়িতে আর একটা ব্যাগ থাকে, রাত্তিরে কল এলে সেটা নিয়ে বেরুই।'

'বুঝেছি। কাল রাত্তিরে যখন আপনার ডিস্‌পেনসারিতে চোর ঢুকেছিল তখন এ ব্যাগটা সেখানেই ছিল?'

'হ্যাঁ।' ডাক্তার চকিত হইয়া উঠিলেন—'কাল রাত্রি আন্দাজ সাতটার সময় আমি রুগী দেখে ডিস্‌পেনসারিতে ফিরে আসি। তখন আর বাড়ি ফেরবার সময় ছিল না, ব্যাগ রেখে কম্পাউণ্ডারকে বন্ধ করতে বলে সটান এখানে চলে এসেছিলাম।'

'ও'—ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিল, 'কম্পাউণ্ডার কখন ডিস্‌পেনসারি বন্ধ করে চলে গিয়েছিল আপনি জানেন?'

'জানি বৈকি। কাল রাত্রে চুরির খবর পেয়ে এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি কম্পাউণ্ডারকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, সাতটার পরই সে ডাক্তারখানা বন্ধ করে নিজের বাড়ি চলে গিয়েছিল।'

'ভাল কথা, ডিস্‌পেনসারি থেকে আর কিছু চুরি গিয়েছিল কিনা জানতে পেরেছেন?'

'আর কিছু চুরি যায়নি। শুধু টেবিলের দেরাজ থেকে কয়েকটা টাকা আর সিকি আধুলি গিয়েছিল।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডেজির দিক হইতে রতিকান্তের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, 'তাহলে চুরির আসল উদ্দেশ্য বোঝা গেল।'

রতিকান্ত এতক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া ব্যোমকেশের সওয়াল জবাব শুনিতেছিল। যে প্রশ্ন পুলিসের করা উচিত তাহা একজন বাহিরের লোক করিতেছে ইহা বোধহয় তাহার ভাল লাগে নাই। কিন্তু ব্যোমকেশ পাণ্ডেজির বন্ধু, তাই সে নীরব ছিল। এখন সে একটু নীরস স্বরে বলিল, 'কী বোঝা গেল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝতে পারলেন না? চোর টাকা চুরি করতে আসেনি। সে লিভার এক্সট্র্যাক্টের ভায়ালটা বদলে দিয়ে গেছে।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'বদলে দিয়ে গেছে?'

'কিম্বা ডাক্তারবাবুর ভায়ালে কয়েক ফোঁটা তরল কিউরারি সিরিঞ্জের সাহায্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। ফল একই। চোর জানত আজ সকালবেলা দীপনারায়ণ সিংকে ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে।—এবার ব্যাপারটা বুঝেছেন?'

কিছুক্ষণ সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তারপর পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আজ সকালে ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে কে কে জানত?'

ডাক্তার বলিলেন, 'বাড়ির সকলেই জানত রবিবার সকালে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়, আমি প্রথমে ওঁকে ইন্‌জেকশন দিয়ে তারপর রুগী দেখতে বেরুই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল রাত্তিরে আমিও জানতে পেরেছিলাম, ডাক্তারবাবু বলেছিলেন। সুতরাং ওদিক থেকে কাউকে ধরা যাবে না।'

ইন্সপেক্টর রতিকান্ত কথা বলিল, পিছন হইতে পাণ্ডেজির চেয়ারের উপর ঝুঁকিয়া বলিল, 'স্যার,

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো অপঘাত মৃত্যু, ডাক্তার পালিত ভুল করে অন্য ওষুধ ইন্‌জেকশন দিয়েছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—। আমি এ কেসের চার্জ নিতে চাই।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'নিশ্চয়, তোমারই তো এলাকা। তুমি চার্জ নাও। এখনি লাশ পোস্ট-মর্টেমের জন্য পাঠাও। আর ওই ওষুধের ভায়ালটা পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দাও। এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হওয়া চাই।'

রতিকান্তের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার, নিষ্পত্তি আমি করব। দীপনারায়ণবাবু আমার মুরুব্বি ছিলেন, কুটুম্ব ছিলেন, তাঁকে যে খুন করেছে সে আমার হাতে ছাড়া পাবে না।'

তাহার কথাগুলা একটু নাটুকে ধরনের হইলেও ভিতরে খাঁটি হৃদয়াবেগ ছিল। সে স্যালুট করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, পাণ্ডেজি বলিলেন, 'রতিকান্ত, আমার বন্ধু শ্রীব্যোমকেশ বক্সীকে তুমি বোধহয় চেনো না। উনি বিখ্যাত ব্যক্তি, আমাদের লাইনের লোক। উনিও তোমাকে সাহায্য করবেন।'

রতিকান্ত ব্যোমকেশের পানে চাহিল। ব্যোমকেশ সম্বন্ধে তাহার মনে খানিকটা বিস্ময়ের ভাব ছিল, এখন সত্য পরিচয় পাইয়া সে সুখী হইতে পারে নাই তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল, 'আপনি বিখ্যাত ব্যোমকেশ বক্সী? আপনার কয়েকটি কাহিনী আমি পড়েছি, হিন্দীতে অনুবাদ হয়েছে। তা আপনি যদি অনুসন্ধানের ভার নেন—'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিল, 'না না, তদন্ত আপনি করবেন। আমার পরামর্শ যদি দরকার হয় আমি সাধ্যমত সাহায্য করব—এর বেশি কিছু নয়।'

রতিকান্ত বলিল, 'ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য পাওয়া তো ভাগ্যের কথা।—আচ্ছা স্যার, আমি এবার যাই, লাশের ব্যবস্থা করতে হবে।' স্যালুট করিয়া রতিকান্ত চলিয়া গেল।

আমরাও উঠিলাম। এখানে বসিয়া থাকিয়া আর লাভ নাই। ডাক্তার পালিত ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'আমি শকুন্তলাকে একবার দেখে যাই। অবশ্য, তার কাছে মিস্ মান্না আছেন—'

এই সময় বাড়ির ভিতর দিক হইতে একটি মহিলা প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘাঙ্গী, আঁট-সাঁট শাড়ি পরা, চোখে চশমা, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, ভাবভঙ্গীতে চরিত্রের দৃঢ়তা পরিস্ফুট। তাঁহাকে দেখিয়া ডাক্তার পালিত সেই দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। দুইজনে নিম্ন স্বরে কথা হইতে লাগিল।

ব্যোমকেশ পাণ্ডেজির পানে চাহিয়া ভ্রূ তুলিল, পাণ্ডেজি হ্রস্বকণ্ঠে বলিলেন, 'মিস্ মান্না।'

মিস্ মান্না কিছুক্ষণ কথা বলিয়া আবার ভিতর দিকে চলিয়া গেলেন, ডাক্তার পালিত আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলাম তাঁহার কপালে গভীর ভ্রূকুটি।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'নতুন খবর কিছু আছে নাকি?'

ডাক্তার বলিলেন, 'খবর আছে, কিন্তু নতুন নয়। কাল রাত্রেই সন্দেহ করেছিলাম।'

'কি সন্দেহ করেছিলেন?'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ডাক্তার বলিলেন, 'শকুন্তলা অন্তঃসত্ত্বা।'

চার

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ফটকের দিকে যাইতে যাইতে গত রাত্রির কথা মনে পড়িল। ডাক্তার পালিতের উদ্বিগ্ন অনুসন্ধিৎসু চক্ষু শকুন্তলাকে অনুসরণ করিয়াছিল। তিনি অভিজ্ঞ ডাক্তার, অন্যের কাছে যাহা লক্ষণীয় নয়, তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চোখে উদ্বেগ ও সংশয়ের ছায়া দেখিলাম কেন? কিসের উদ্বেগ?

ফটকের বাহিরে আসিয়া ডাক্তার নিজের মোটরে উঠিবার উপক্রম করিলেন, তারপর কি

ভাবিয়া আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডেজিকে বলিলেন, 'আমার হাতেই দীপনারায়ণবাবুর মৃত্যু হয়েছে। আমাকে যদি আপনারা অ্যারেস্ট করতে চান আমার কিছু বলবার নেই। এখন আমি রুগী দেখতে চললাম। যখনই তলব করবেন থানায় হাজির হব।'

পাণ্ডেজি কিছু বলিলেন না, কেবল একটু হাসিলেন। ডাক্তার নড করিয়া মোটরে উঠিলেন এবং মোটর হাঁকাইয়া প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডেজি হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, 'এখনও সাড়ে দশটা বাজেনি। চলুন আমার বাসায়।'

আমরা মোটরে উঠিতে যাইতেছি এমন সময় আর একটি মোটর আসিয়া থামিল। পুরানো হাড়-নড়বড়ে মরিস গাড়ি, তাহা হইতে অবতরণ করিল নবীন ডাক্তার জগন্নাথ প্রসাদ। আমাদের দেখিয়া সে নাক-ঝাড়ার শব্দ করিল, তারপর পাণ্ডেজির দিকে ভ্রূভঙ্গ করিয়া বলিল, 'সকালবেলা আপনি এখানে?'

জগন্নাথকে দেখিয়া পাণ্ডেজির মুখ গম্ভীর হইয়াছিল, তিনি পালটা প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি এখানে?'

জগন্নাথ হাল্কা সুরে বলিল, 'এদিক দিয়ে রুগী দেখতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দীপনারায়ণজিকে দেখে যাই। কেমন আছেন তিনি?'

পাণ্ডেজি হিম-কঠিন কণ্ঠে বলিলেন, 'কেমন আছেন তিনি তা আপনি ভালভাবেই জানেন। ন্যাকামি করবার দরকার কি?'

ক্ষণেকের জন্য জগন্নাথ ডাক্তার থতমত খাইয়া গেল, তারপর অসভ্যের মত দাঁত বাহির করিয়া বলিল, 'তাহলে যা শুনেছি তা সত্যি—পান্নালাল পালিত দীপবাবুকে ইন্‌জেকশন দিয়ে মেরেছে।'

পাণ্ডেজি অতি কষ্টে ধৈর্য রক্ষা করিয়া ধীর স্বরে কহিলেন, 'দীপনারায়ণবাবু মারা গেছেন। কী করে মারা গেছেন তা আপনার জানবার দরকার নেই, আপনি এ বাড়ির ডাক্তার নন। এ বাড়ি এখন পুলিসের দখলে, আপনি ইন্সপেক্টর রতিকান্ত চৌধুরীর অনুমতি না নিয়ে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।'

জগন্নাথ একবার আমাদের দিকে ধৃষ্ট নেত্রপাত করিল, বলিল, 'আপনিও দেখছি বাঙালীদের দলে ভিড়েছেন। তা ভিড়ুন, কিন্তু অসুখে পড়লে বাঙালী ডাক্তারের কাছে যাবেন না। দীপবাবুর দৃষ্টান্তটা মনে রাখবেন।'

পাণ্ডেজি উত্তর দিবার আগেই জগন্নাথ নিজের মোটরে গিয়া উঠিল এবং ঝড়্‌ঝড়্ শব্দ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

পাণ্ডেজিকে আগে কখনও রাগিতে দেখি নাই, এখন দেখিলাম তাঁহার গৌরবর্ণ মুখ রাগে রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি গলার মধ্যে একটা অবরুদ্ধ শব্দ করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। আমরাও উঠিলাম।

মিনিট দশেকের মধ্যে পাণ্ডেজির বাসায় পৌঁছানো গেল। পাণ্ডেজি চায়ের হুকুম দিলেন, কারণ পশ্চিমের শীতে চা-পানের কোনও নির্ধারিত সময় নাই। তারপর আমরা বসিবার ঘরে গিয়া অধিষ্ঠিত হইলাম। পাণ্ডেজি প্রশ্ন করিলেন, 'কী মনে হল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুনই বটে, আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। যিনি এই কার্যটি করেছেন তিনি অতি কৌশলী ব্যক্তি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দীপনারায়ণ সিংকে খুন করে কার লাভ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'লাভ একমাত্র দেবনারায়ণের। দীপনারায়ণ অপুত্রক মারা গেছেন, সুতরাং সব সম্পত্তিই এখন তার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অপুত্রক কিনা এখনও ঠিক বলা যায় না, শকুন্তলা দেবীর ছেলে হতে পারে। কিন্তু দেবনারায়ণ হয়তো খবরটা জানত না।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'না জানাই সম্ভব। মৃত্যুর পূর্বে কেবল দীপনারায়ণ সিং বোধহয় খবরটা জানতে পেরেছিলেন।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তিনি জানতে পারলে কি চুপ করে থাকতেন ? যাহোক, ধরা যাক তিনি জানতেন না, শকুন্তলা স্বামীকে বলেননি। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে কী ? দেবনারায়ণ সমস্ত সম্পত্তির লোভে খুড়োকে খুন করিয়েছে। নিজের হাতে এ কাজ করেনি, করবার মত বুদ্ধি তার নেই।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কাল রাত্রি সওয়া সাতটার সময় আমরা যখন দীপনারায়ণের বাড়িতে গিয়েছি তখন দেবনারায়ণ বাড়িতেই ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অত বড় হাতির শরীর নিয়ে সে নিজে ডাক্তারখানায় যায়নি নিশ্চয়। কিন্তু অন্য কেউ যেতে পারে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তার মোসাহেবরা—'

চা আসিল। ব্যোমকেশ পেয়ালায় একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া সিগারেট ধরাইল, কতকটা মানসিক জল্পনার সুরে বলিল, 'কিন্তু দেবনারায়ণ যদি খুড়োর গঙ্গাযাত্রা না করিয়ে থাকে, তাহলে আর কে করতে পারে ? কার লাভ ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আর কারুর লাভ আছে বলে তো মনে হয় না। তবে ওই ব্যাটা ঘোড়া জগন্নাথের অসাধ্য কাজ নেই। বাঙালী ডাক্তারদের অপদস্থ করবার জন্যে ওরা সব পারে।'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'ঘোড়া জগন্নাথের ওপর আপনি ভীষণ চটে গেছেন। ওরা সব ছুঁচো-প্যাঁচা, খুন করার সাহস ওদের নেই। যে খুন করেছে তার চরিত্র অন্য রকম ; সে মহা দুঃসাহসী অথচ কূটবুদ্ধি, শিক্ষিত অথচ নৃশংস ; বিজ্ঞান জানে, ডাক্তারি বিদ্যেও আছে—'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'ঘোড়া জগন্নাথের সঙ্গে আপনার বর্ণনা খাসা মিলে যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঘোড়া জগন্নাথের মোটিভ খুব জোরালো নয়। অবশ্য তার যদি অন্য কোনও মোটিভ থাকে তাহলে আলাদা কথা। আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস করি কিছু মনে করবেন না। শকুন্তলা দেবী সুন্দরী এবং আধুনিকা, পাটনা শহরে তাঁর অনুরাগী এডমায়ারার নিশ্চয় আছে ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'তা আছে। শুনেছি রোজ সন্ধ্যেবেলা দু'চারজন পয়সাওয়ালা আধুনিক ছোকরা দীপনারায়ণের বাড়িতে আড্ডা জমাতো। ব্রিজ খেলা, চা-কেক খাওয়া, হাসি গল্প গান—এই সব চলত। ঘোড়া জগন্নাথ বড়মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে, সেও ওদের দলে থাকত। তবে মাস ছয়েক আগে দীপনারায়ণ যখন অসুখে পড়লেন তখন ওদের আড্ডা ভেঙে গেল। দু'এক জন মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিতে যেত। নর্মদাশঙ্কর—'

'নর্মদাশঙ্কর কে ?'

'বড়মানুষের অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে। এলাহাবাদের লোক। বিহারে জমিদারী আছে। শুধু অকালকুষ্মাণ্ড নয়—পাজি। পুলিসের খাতায় নাম আছে। একবার শিকার করতে গিয়ে একটা দেহাতি মেয়েকে নিয়ে লোপাট হয়েছিল। ব্যাপার খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিল, তারপর মেয়ের বাপকে টাকাকড়ি দিয়ে মোকদ্দমা ফাঁসিয়ে দিলে—'

'নর্মদাশঙ্কর দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়িতে যাতায়াত করত ?'

'হ্যাঁ, নর্মদাশঙ্কর বাইরে খুব চোস্ত কেতা-দুরস্ত লোক, চেহারা ভাল, মিষ্টি কথা। কিন্তু আসলে পাজির পাঝাড়া।'—পাণ্ডেজি মুখের অরুচি-সূচক একটা ভঙ্গী করিলেন—'স্ত্রী-স্বাধীনতা খুবই বাঞ্ছনীয় বস্তু, অসুবিধা এই যে ভদ্রবেশী লুচ্চাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না।'

'হুঁ। শকুন্তলা দেবী কি এদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করতেন ?'

'তা করতেন। কিন্তু তাঁর সত্যিকার বদনাম কখনও শুনিনি। যারা অত উঁচুতে নাগাল পেত না তারা নিজেদের মধ্যে হাসি-মস্করা করত, টিটকিরি দিত—এই পর্যন্ত।'

'ওটা আমাদের স্বভাব—দ্রাক্ষাফল অতি বিস্বাদ ও অম্লরসে পরিপূর্ণ।' ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—'এখন তাহলে ওঠা যাক। আপনি কি আর ওদিকে যাবেন ?'

'বিকেলবেলা যাব। আপনারাও যদি আসেন—'

'নিশ্চয় যাব। বাড়ির লোকগুলিকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখা দরকার।'

পাঁচ

বৈকাল চারটে বাজিবার পূর্বেই পাণ্ডেজি গাড়ি লইয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'চলুন, একবার থানা হয়ে যাব। হয়তো পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এসেছে।'

তিনজনে থানায় উপস্থিত হইলাম। শহরের মাঝখানে থানা। রতিকান্ত উপস্থিত ছিল, আমাদের সসম্ভ্রমে লইয়া গিয়া নিজের অফিস ঘরে বসাইল। বলিল, 'এইমাত্র পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পেলাম, কিউরারি পাওয়া গেছে। মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।'

পাণ্ডেজি রিপোর্টের উপর একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, 'আর ওষুধ পরীক্ষার রিপোর্ট ?'

'সেটা এখনও আসেনি। আমি জরুরী তাগাদা দিয়ে এসেছি। বোধহয় আজ রাত্রেই পাওয়া যাবে। ওষুধের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত ভালভাবে তদন্ত আরম্ভ করা যাচ্ছে না। তবে লোক লাগিয়েছি, কিউরারি নিয়ে কেউ চোরাকারবার করে কিনা খবর নিতে।'

পাণ্ডেজি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'ঠিক করেছ। যে চোরটার কাছে কিউরারির শিশি পাওয়া গিয়েছিল সে তো এখন জেলেই আছে। তাকে দম দিলে হয়তো খবর পাওয়া যেতে পারে কারা কিউরারির চোরাকারবার করে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খবর নিয়েছি সে কয়েদীটা এখন পাটনা জেলে নেই, বক্সার জেলে আছে। তার সঙ্গে মুলাকাতের ব্যবস্থা করছি। ইতিধ্যে ডাক্তার পালিতের কম্পাউণ্ডারকে জেরা করেছি।'

'কিছু পেলে ?'

'কিছু না।—ওদিকে দীপনারায়ণজির বাড়ির সকলকে বাড়িতেই থাকতে বলেছি। বাইরের লোকের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি, কেবল ম্যানেজার গঙ্গাধর আর তার ছেলে লীলাধর ছাড়া।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমরা এখন সেখানেই যাচ্ছি। তুমি আসবে নাকি ?'

রতিকান্ত একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'আপনারা এগোন, আমি একটা জরুরী কাজ সেরে যাচ্ছি।' তারপর হাসিয়া ব্যোমকেশকে বলিল,—'আপনি কিছু ঠাহর করতে পারলেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উঁহু। কিন্তু মনে হচ্ছে বাড়ির কাউকেই সন্দেহ থেকে বাদ দেওয়া যায় না।'

রতিকান্ত বলিল, 'শুধু বাড়ির লোক নয় স্টেটের কর্মচারীদেরও বাদ দেওয়া যায় না। সকলকেই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ফেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।'

ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে বলিল, 'ডাক্তার পালিতকে আপনার কেমন মনে হয় ?'

রতিকান্ত চকিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, 'ডাক্তার পালিত ! কিন্তু তিনি—যদি তাঁর কোনও মোটিভ থাকত, তিনি নিজের হাতে একাজ করতেন কি ?'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিল, 'তিনি নিজের হাতে একাজ করেছেন বলেই তাঁর ওপর সন্দেহ কম হবে।—'

মোটরে ফিরিয়া গিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তার পালিতের ডিস্‌পেনসারি কি কাছেই ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'এই তো খানিক দূর, রাস্তাতেই পড়বে। যাবেন নাকি সেখানে ?'

'চলুন, আসল অকুস্থলটা দেখে যাওয়া যাক।'

দু'তিন মিনিটের মধ্যে ডাক্তার পালিতের ডাক্তারখানায় পৌঁছিলাম। এটিও বড় রাস্তার উপর, চারিদিকে দোকানপাট, বসতবাড়ি নেই। শীতের রাত্রে আটটার মধ্যে দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়, তখন চোরের তালা ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার কোনই অসুবিধা নাই।

ডাক্তারখানাটি নিতান্তই মামুলী। সামনে পিছনে দুটি ঘর, সামনের ঘরে রুগী আসিয়া বসে, ভিতরের ঘরে ডাক্তার বসেন। কম্পাউণ্ডার ভিতরের ঘরেই ঔষধ তৈয়ার করে।

কম্পাউণ্ডার ও ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, বাহিরের ঘরে কয়েকটি রুগীও বসিয়াছিল। আমরা গিয়া দেখিলাম, ভিতরের ঘরে ডাক্তার একটি রুগীকে লম্বা সরু টেবিলের উপর শোয়াইয়া তাহার পেট টিপিতেছেন। ঘাড় ফিরাইয়া আমাদের দেখিয়া একটু হাসিলেন, 'কী, অ্যারেস্ট করতে এসেছেন নাকি?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'না না, দেখতে এলাম।'

'বসুন।'

আমরা ডাক্তারের টেবিল ঘিরিয়া বসিলাম। ডাক্তার রুগীর পরীক্ষা শেষ করিয়া টেবিলে আসিয়া বসিলেন, ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া কম্পাউণ্ডারকে দিলেন। ইতিমধ্যে আমরা কম্পাউণ্ডারটিকে দেখিলাম। রোগা গাল-বসা বিহারী ছোকরা, নাম যদিও খুবলাল, কিন্তু গায়ের রঙ খুব কালো। ইউনিফর্ম পরা পাণ্ডেজিকে দেখিয়া তাহার মুখের কৃষ্ণতা আরও গাঢ় হইয়াছে।

ডাক্তার বলিলেন, 'কি দেখবেন বলুন।'

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের দিকে চাহিলেন, ব্যোমকেশ বলিল, 'যে তালা ভেঙে চোর ঢুকেছিল সেটা কোথায়?'

ডাক্তার বলিলেন, 'খুবলাল, তালা নিয়ে এস।'

খুবলাল ঘরের একপ্রান্তে শিশি-বোতল-ভরা শেলফের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঔষধ তৈয়ার করিতেছিল, আমরা তাহার পশ্চাদভাগ দেখিতে পাইতেছিলাম। কিন্তু মুখ দেখিতে না পাইলেও সে যে উৎকর্ণ হইয়া আমাদের কথা শুনিতেছে তাহা তাহার দেহের ভঙ্গী হইতে ধরা যাইতেছিল। ডাক্তারের আদেশে সে আসিয়া কম্পিত-হস্তে তালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া আবার ফিরিয়া গিয়া ঔষধ তৈয়ার করিতে লাগিল।

তালাটা সস্তা এবং মামুলী, তাহাতে একটা লোহার শিক ঢুকাইয়া মোচড় দিলে তৎক্ষণাৎ ভাঙিয়া যাইবে, বেশি গায়ের জোরের দরকার নাই। হইয়াছেও তাই, তালার কব্জাটা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ তালা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, তারপর রাখিয়া দিল।

'আপনার দেরাজের চাবিও তো ভেঙেছে।'

'দেরাজ ভাঙবার দরকার হয়নি, ওটা খোলাই থাকে। চাবি অনেকদিন হারিয়ে গেছে।'

পালিত দেরাজ খুলিয়া দেখাইলেন, তাহাতে দুই চারিটা কাগজপত্র ছাড়া কিছুই নাই। পালিত বলিলেন, 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। সাবধান হয়েছি, আজ থেকে একজন লোক রাত্তিরে এখানে শোবে। পুরনো ওষুধগুলো সব ফেলে দিয়ে নতুন ওষুধ আনিয়েছি। বলা তো যায় না।'

পাণ্ডেজি অনুমোদনসূচক ঘাড় নাড়িলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার খুবলালকে দু' একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

ডাক্তার বলিলেন, 'করুন না। ওর অবশ্য একবার হয়ে গেছে, ইন্সপেক্টর চৌধুরী এক দফা জেরা করেছেন। খুবলাল!'

খুবলাল নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অধর লেহন করিয়া ভাঙা গলায় বলিল, 'হুজুর, আমার কোনও কসুর নেই।'

ব্যোমকেশ আশ্বাসের সুরে বলিল, 'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? যদি দোষ না করে থাকো ভয় কিসের? কেউ তোমার অনিষ্ট করবে না।'

খুবলাল বলিল, 'জি, আমি গরীব মানুষ—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি কত টাকা মাইনে পাও?'

খুবলাল ডাক্তারের দিকে চোরা চাহনি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'জি, ষাট টাকা। আর দশ টাকা ভাতা।'

'উপরি কিছু নেই?'

খুবলাল সভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিল, 'জি—না।'
'তোমার বাড়িতে কে কে আছে ?'
'স্ত্রী আর একটা বাচ্ছা।'
'কত টাকা বাড়িভাড়া দাও ?'
'সাড়ে বারো টাকা।'
'সত্তর টাকায় তোমার চলে ?'
খুবলাল আবার ডাক্তারের পানে গুপ্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—'পেট চলে যায় হুজুর। ডাক্তারবাবু বলেছেন জানুয়ারি মাস থেকে পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেবেন।'
ব্যোমকেশ ডাক্তারের পানে চাহিল, ডাক্তার ঘাড় নাড়িলেন। ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'আচ্ছা, ও-কথা থাক। কাল রাত্রে ক'টার সময় তুমি ডাক্তারখানা বন্ধ করেছিলে ?'
'জি, ঘড়ি দেখিনি। ডাক্তারবাবু রুগী দেখে ফিরে এলেন, ব্যাগ রেখে তখনি বেরিয়ে গেলেন। তখন বোধহয় সাতটা। তার পাঁচ-দশ মিনিট পরে আমিও ডাক্তারখানা বন্ধ করে বাড়ি গেলাম।'
'তখন এখানে কোনও রুগী ছিল ?'
'না হুজুর!'
'আচ্ছা, কাল রাত্রে দেরাজে কত টাকা পয়সা ছিল তুমি জানো ?'
খুবলালের মুখে আবার আশঙ্কার ছায়া পড়িল। সে বলিল, 'গুনিনি হুজুর, বোধহয় তিন টাকা কয়েক আনা ছিল। ডাক্তারবাবুর অনুপস্থিতিতে কয়েকটা পুরনো প্রেসক্রিপশন নিয়ে রুগী এসেছিল, তাদের ওষুধ দিয়েছিলাম আর পয়সা নিয়ে দেরাজে রেখেছিলাম।'
'দোর বেশ ভাল করে বন্ধ করেছিলে ?'
'জি, হাঁ।'
'রাত্রে চাবি তোমার কাছে থাকে ?'
'জি, হাঁ। সকালে আমি আগে এসে ডাক্তারখানা খুলি।'
'তুমি ডাক্তার জগন্নাথ প্রসাদকে চেনো ?'
খুবলাল থতমত খাইয়া গেল, শেষে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, 'জি।'
ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, 'জগন্নাথের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে ?'
খুবলাল ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'জি, না। আমি গরীব মানুষ, তিনি ডাক্তার। তবে—তবে—'
'তবে কি ?'
'তিনি কিছুদিন আগে আমাকে তাঁর বাসায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন—'
'তারপর ?'
'তিনি—তিনি আমাকে এখানকার চাকরি ছেড়ে দিতে বললেন।'
ডাক্তার বিস্মিতভাবে বলিলেন, 'এটা তো নতুন শুনছি।—তুমি আমাকে বলনি কেন ?'
খুবলাল অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল।
ব্যোমকেশ বলিল, 'তা তুমি চাকরি ছাড়লে না কেন ? জগন্নাথ ডাক্তার তোমাকে অন্য চাকরি দিত।'
খুবলাল বলিল, 'তিনি আমাকে অন্য চাকরি দেবেন বলেননি, খালি এ চাকরি ছেড়ে দেবার কথা বলেছিলেন। আমি রাজী হলাম না, তখন আমাকে ধমক-চমক করলেন, বললেন—চাকরি না ছাড়লে বিপদে পড়বে।'
'তবু তুমি চাকরি ছাড়লে না ?'
খুবলাল ছলছল চক্ষে অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'হুজুর, ডাক্তার পালিত আমার মা-বাপ, উনি যতদিন আমায় রাখবেন ততদিন আমি ওঁকে ছাড়ব না। ওঁর মত দয়ালু লোক—' খুবলাল চোখ

মুছিতে লাগিল। ব্যোমকেশ সদয় কণ্ঠে বলিল, 'আচ্ছা, এবার তুমি যাও, কাজ কর গিয়ে।'

আমরা উঠিলাম। ডাক্তার পালিত আমাদের সঙ্গে মোটর পর্যন্ত আসিলেন, বলিতে বলিতে আসিলেন, 'খুবলাল ছেলেটা ভাল। তবে—মাঝে মাঝে দু'চার পয়সা চুরি করে, দুটো ভিটামিনের বড়ি কি দু'পুরিয়া কুইনিন পকেটে পুরে বাড়ি নিয়ে যায়; ওটা ধর্তব্য নয়, সব কম্পাউণ্ডারই করে। এসব গুরুতর ব্যাপারে ও আছে বলে মনে হয় না।'

ব্যোমকেশ গাড়িতে বসিয়া হঠাৎ গলা বাড়াইয়া বলিল, 'ডাক্তারবাবু, শকুন্তলা দেবী ক'মাস অন্তঃসত্ত্বা?'

ডাক্তার পালিত পূর্ণদৃষ্টিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'তিন মাস।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি খুবই আশ্চর্য হয়েছেন।'

'আশ্চর্য হবারই কথা।'—বলিয়া তিনি ফিরিয়া চলিলেন।

ছয়

ডাক্তারখানা হইতে দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ি মোটরে পাঁচ মিনিটের রাস্তা। এই পাঁচ মিনিট আমাদের মধ্যে একটিও কথা হইল না। সকলেই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিলাম।

ফটকের বাহিরে গাড়ি থামাইয়া অবতরণ করিলাম। দেউড়িতে টুলের উপর একটা কনস্টেবল বসিয়া ছিল, তড়াক করিয়া উঠিয়া পাণ্ডেজিকে স্যালুট করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন, কম্পাউণ্ডের বাইরেটা ঘুরে দেখা যাক।'

পূর্বে বলিয়াছি বাড়ির চারিদিকে জেলখানার মত উঁচু পাঁচিল। আমরা পাঁচিলে ধার ঘেঁষিয়া একবার প্রদক্ষিণ করিলাম। সামনের দিকে সদর রাস্তা; দুই পাশে ও পিছনে আম-কাঁঠালের বাগান। এই অঞ্চলে আম-কাঁঠালের বাগানই বেশি এবং সব বাগানই দীপনারায়ণের সম্পত্তি। পূর্বকালে এদিকে বোধহয় লোকবসতি ছিল, কিন্তু দীপনারায়ণের পূর্বপুরুষেরা সমস্ত পাড়াটা ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিয়া ফলের বাগানে পরিণত করিয়াছেন। পাড়ায় এখন একমাত্র বাড়ি দীপনারায়ণের বাড়ি। তবু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সুখ-সুবিধার ত্রুটি নাই; ইলেকট্রিক ও টেলিফোনের তার পাঁচিল ডিঙাইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি একটি ডাক-বাক্স লাল কুর্তা-পরা সিপাহীর মত পাঁচিলের এক কোণে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। চিঠিপত্র ডাকে দিতে হইলে বেশি দূরে যাইতে হইবে না।

প্রাচীর প্রদক্ষিণ করিয়া ব্যোমকেশ কী দেখিল জানি না; দ্রষ্টব্য বস্তু কিছুই নাই। পাশে ও পিছনে আম-কাঁঠালের গাছ দেয়াল পর্যন্ত ভিড় করিয়া আসিয়াছে, দেয়াল ঘেঁষিয়া মাঠের উপর একটি পায়ে-হাঁটা সরু রাস্তা। ডাক-বাক্সের দিক হইতে পাশের দিকে যাইলে একটি খিড়কি দরজা পড়ে, বোধকরি চাকর-বাকরদের যাতায়াতের পথ। এটি ছাড়া পাশের বা পিছনের দেয়ালে যাতায়াতের অন্য পথ নাই।

খিড়কি দরজা খোলা ছিল, আমরা সেই পথেই ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশ প্রবেশ করিবার সময় দরজাটিকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। সেকেল ধরনের খর্বকায় মজবুত কবাট, কবাটের পুরু তক্তার উপর মোটা মোটা পেরেক দিয়া গুল বসানো; কিন্তু তা সত্ত্বেও কবাট দুটি নড়বড়ে হইয়া গিয়াছে। কবাটের মাথার কাছে শিকল ঝুলিতেছে, বোধহয় রাত্রিকালে শিকল লাগাইয়া দ্বার বন্ধ করা হয়।

খিড়কি দরজা সম্বন্ধে ব্যোমকেশের অনুসন্ধিৎসা একটু আশ্চর্য মনে হইল; তাহার মন কোন্ পথে চলিয়াছে ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। যাহোক, ভিতরে প্রবেশ করিয়া পাশেই পাঁচিলের লাগাও একসারি ঘর চোখে পড়িল। ঘরগুলি দপ্তরখানা, জমিদারীর কেরানিরা এখানে বসিয়া সেরেস্তার কাজকর্ম করে। আমাদের দেখিতে পাইয়া একটি লোক সেখান হইতে বাহির হইয়া

আসিলেন। লোকটিকে কাল রাত্রে দেখিয়াছি, মাথায় পাগড়ি-বাঁধা ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী।

তিনি ত্বরিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, খিড়কি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আলাপ হইল। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখছি।'

ম্যানেজারের অভিজ্ঞ চোখে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিলেও তিনি মুখে বলিলেন, 'বেশ তো, বেশ তো, আসুন না আমি দেখাচ্ছি।'

ব্যোমকেশ খিড়কি দরজার দিকে আঙুল দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, এ দরজাটা কি সব সময়েই খোলা থাকে?'

ম্যানেজার একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, ঘাড় চুলকাইয়া বলিলেন, 'এঁ—ঠিক বলতে পারছি না, বোধহয় রাত্রে বন্ধ থাকে। কেন বলুন দেখি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'নিছক কৌতূহল।'

এই সময় একজন ভৃত্যকে বাড়ির পিছন দিকে দেখা গেল। ম্যানেজার হাত তুলিয়া তাহাকে ডাকিলেন। ভৃত্য আসিলে বলিলেন, 'বিষুণ, রাত্রে খিড়কি দরজা বন্ধ থাকে?'

বিষুণও ঘাড় চুলকাইল, 'তা তো ঠিক জানি না হুজুর। বোধহয় শিকল তোলা থাকে। চৌকিদার বলতে পারবে।'

'ডাক চৌকিদারকে।' বিষুণ চৌকিদারকে ডাকিতে গেল।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'রাত্রে চৌকিদার বাড়ি পাহারা দেয়?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। দেউড়িতে দারোয়ান থাকে, আর দু'জন চৌকিদার পালা করে পাহারা দেয়।'

অল্পক্ষণ মধ্যে বিষুণ একটি চৌকিদারকে আনিয়া উপস্থিত করিল। চৌকিদার দেখিতে তালপাতার সেপাই, কিন্তু বিপুল গোঁফ ও গালপাট্টার দ্বারা কঙ্কালসার মুখে চৌকিদার সুলভ ভীষণতা আরোপ করিবার চেষ্টা আছে, চোখ দুটি রাত্রিজাগরণ কিম্বা গঞ্জিকার প্রসাদে করমচার মত লাল। ম্যানেজার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'গজাধর সিং, রাত্রে খিড়কির দরজা খোলা থাকে, না বন্ধ থাকে?'

গজাধর ভাঙা গলায় বলিল, 'ধর্মাবতার, কখনও খোলা থাকে, কখনও জিঞ্জির লাগানো থাকে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তালা লাগানো থাকে না?'

গজাধর বলিল, 'না হুজুর, অনেকদিন আগে তালা ছিল, এখন ভুৎলা গিয়া। কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই, আমরা দু'ভাই এমন পাহার দিই যে, একটা চুহা পর্যন্ত হাতায় ঢুকতে পারে না।'

'বটে! কি ভাবে পাহারা দাও?'

'রাত্রি দশটা থেকে পাহারা শুরু হয় হুজুর। দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত একজন পাহারা দিই, আর দুটো থেকে ছ'টা পর্যন্ত আর একজন। দেউড়িতে ঘণ্টা বাজে আর আমরা উঠে একবার চক্কর দিই, আবার ঘণ্টা বাজে আবার চক্কর দিই। এইভাবে সারা রাত চক্কর লাগাই ধর্মাবতার।'

'তাহলে ঘণ্টা বাজার মাঝখানে কেউ যদি ভিতর থেকে বাইরে যায় কিম্বা বাইরে থেকে ভিতরে আসে তোমরা জানতে পার না?'

'বাইরে থেকে কে আসবে হুজুর, কার ঘাড়ে দশটা মাথা?'

'বুঝেছি। তুমি এখন যেতে পার।'

গজাধর প্রস্থান করিলে ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী সাফাইয়ের সুরে বলিলেন, 'এ বাড়িতে খুব কড়া পাহারার দরকার হয় না; চোর-ছ্যাঁচড়েরা জানে এখানে দারোয়ান চৌকিদার আছে, ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। তাই তারা এদিকে আসে না। আমি আঠারো বছর এই এস্টেটে আছি, কখনো একটা কুটো চুরি যায়নি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি চুরির কথা ভাবছিলাম না। যাহোক, আসুন এবার ওদিকটা দেখা যাক।'

অতঃপর গঙ্গাধর বংশী আমাদের লইয়া চারিদিক ঘুরিয়া দেখাইলেন। দেখানোর ফাঁকে ফাঁকে মৃত প্রভুর উদ্দেশে শোক প্রকাশ করিলেন; প্রশ্ন না করিয়া মৃত্যুর কারণ জানিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার কৌতূহলের প্রশ্রয় দিলাম না, গভীর মনঃসংযোগে সরেজমিনে তদারক করিলাম।

বাড়ির সামনের দিকে ফুলের বাগান, পিছনে শাকসব্জীর ক্ষেত। বাড়িটি দ্বিতল এবং চক্-মেলানো, প্রায় সাত-আট কাঠা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাড়ির দুই পাশে দ্বিতলে উঠিবার দুইটি লোহার পাকানো সিঁড়ি আছে। এই পথে মেথর ঝাড়ুদার উপরতলা পরিষ্কার রাখে, কারণ পাটনায় এখনও ড্রেনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

পরিদর্শন শেষ করিয়া সদরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টর রতিকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্যোমকেশের পানে একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, 'বাগানে কী দেখছিলেন ? কিছু পেলেন নাকি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিশেষ কিছু না। কেবল এইটুকু জানা গেল যে রাত্তিরে বাড়ির যে-কেউ খিড়কির দরজা খুলে বাইরের লোককে ভিতরে আনতে পারে।'

রতিকান্ত কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, 'কিন্তু—বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক আছে কি ?'

'থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। চলুন, এবার বাড়ির লোকগুলির সঙ্গে আলাপ করা যাক—'

বাড়িতে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছি, ফট্‌ফট্ শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি ফটকের দিক হইতে একটি মোটর বাইক আসিতেছে। আরূঢ় ব্যক্তিটি অপরিচিত; চেহারাটা সুশ্রী, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। পরিধানে সাদা ফ্ল্যানেলের প্যান্ট, গাঢ় নীল রঙের গরম ক্রিকেট কোট, গলায় লাল পশমের মাফলার, মাথায় রঙচটা ক্রিকেট ক্যাপ। পুরাদস্তুর খেলোয়াড়ের সাজ, দেখিলে মনে হয় এই মাত্র ক্রিকেটের মাঠ হইতে ফিরিতেছেন।

ঝকঝকে নূতন 'সান-বীম্' আমাদের কাছে আসিয়া থামিল, আরোহী আস্তে-ব্যস্তে অবতরণ করিলেন। পাণ্ডেজি ও রতিকান্তের ললাটে গভীর ভ্রূকুটি দেখিয়া অনুমান করিলাম, ইনি যতবড় খেলোয়াড়ই হোন, পুলিসের প্রীতিভাজন নন। পরক্ষণেই পাণ্ডেজির সম্ভাষণ শুনিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে এই ব্যক্তিই কুখ্যাত নারীহরণকারী নর্মদাশঙ্কর।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'নর্মদাশঙ্করবাবু, আপনার এখানে কী দরকার ?'

নর্মদাশঙ্কর সবিনয়ে নমস্কার করিয়া বলিল, 'ক্রিকেটের মাঠে খবর পেলাম দীপনারায়ণবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। শুনলাম নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। শুনে আর থাকতে পারলাম না। ছুটে এলাম। কী হয়েছিল, মিঃ পাণ্ডে ?'

পাণ্ডেজি নীরস কণ্ঠে বলিলেন, 'মাফ করবেন, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কোন আলোচনা হতে পারে না। কিন্তু আপনার কি দরকার তা তো বললেন না ?'

নর্মদাশঙ্কর মুখখানিকে বিষণ্ণ করিয়া বলিল, 'দরকার আর কি, বন্ধুর বিপদে আপদে খোঁজ-খবর নিতে হয়। শকুন্তলা যে কী দারুণ শোক পেয়েছেন তা তো বুঝতেই পারছি। কাল রাত্রে তাঁকে দেখেছিলাম আনন্দের প্রতিমূর্তি! তখন কে ভেবেছিল যে—তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হবে কি ?'

'দেখা করতে চান কেন ?'

'তাঁকে সহানুভূতি জানানো, দুটো সান্ত্বনার কথা বলা, এছাড়া আর কি ? আপনারা নিশ্চয় জানেন শকুন্তলার সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে।' শকুন্তলার নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে নর্মদাশঙ্করের চোখে যে ঝিলিক খেলিয়া যাইতে লাগিল তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না।

পাণ্ডেজি চাপা বিরক্তির স্বরে বলিলেন, 'মাফ করবেন, শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে কারুর দেখা সাক্ষাৎ হবে না, এখন ওসব লৌকিকতার সময় নয়।—রতিকান্ত, ফটকের কনস্টেবলকে বলে দাও, আমাদের অনুমতি না নিয়ে যেন কাউকে ভেতরে আসতে না দেয়।'

পাণ্ডেজির ইঙ্গিতটা এতই স্পষ্ট যে নর্মদাশঙ্করের চোখে আর এক ধরনের ঝিলিক খেলিয়া গেল, কুটিল ক্রোধের ঝিলিক। কিন্তু সে বিনীতভাবেই বলিল, 'বেশ, আপনারাই তাহলে শকুন্তলাকে আমার সমবেদনা জানিয়ে দেবেন। আচ্ছা, আজ চলি। নমস্তে।'

নর্মদাশঙ্করের মোটর বাইক ফট্‌ফট্‌ করিয়া চলিয়া গেল। রতিকান্ত তাহার বিলীয়মান পৃষ্ঠের দিকে বিরাগপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া গলার মধ্যে বলিল—'মিটমিটে শয়তান!' তারপর ফটকের কনস্টেবলকে হুকুম দিতে গেল।

ব্যোমকেশ ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাল রাত্রে নর্মদাশঙ্করবাবু কখন নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন আপনি লক্ষ্য করেছিলেন কি?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'উনি কখন এসেছিলেন তা ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু সাড়ে ছ'টার সময় এসে দেখলাম, উনি শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে বসে গল্প করছেন। তখনও অন্য কোনও অতিথি আসেননি।'

'মাফ করবেন, আপনি কোথায় থাকেন?'

ম্যানেজার সম্মুখে রাস্তার ওপারে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন, 'ওই আমবাগানের মধ্যে একটা বাড়ি আছে, এস্টেটের বাড়ি, আমি তাতেই থাকি।'

'আশেপাশের আমবাগানে আরও বাড়ি আছে নাকি?'

'আজ্ঞে না। এ তল্লাটে আর বাড়ি নেই।'

'আচ্ছা, আজ সকালে মৃত্যুর পূর্বে দীপনারায়ণবাবুকে আপনি দেখেছিলেন কি?'

ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়িলেন—'আজ্ঞে না, ডাক্তারবাবু আমার আগেই এসেছিলেন। রবিবারে সেরেস্তা বন্ধ থাকে, আমি একটু দেরি করে আসি। এসে দেখি সব শেষ হয়ে গেছে।'

সাত

রতিকান্ত ফিরিয়া আসিলে আমরা সকলে মিলিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। হল-ঘরের মধ্যে ছায়ান্ধকার, মানুষ কেহ নাই। আমরা পাঁচজনে প্রবেশ করিয়া পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ম্যানেজারবাবু, আপনাকে আমরা অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। আপনার নিশ্চয় অন্য কাজ আছে—'

ম্যানেজার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আমার আজ কোনই কাজ নেই। আজ রবিবার, সেরেস্তা বন্ধ। নেহাৎ অভ্যাসবশেই এসেছিলাম।'

বোঝা গেল তিনি আমাদের সঙ্গ ছাড়িবেন না। তিনি গভীর মনঃসংযোগে আমাদের কথা শুনিতেছেন এবং তাহার তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু দুটি মধুসঞ্চয়ী ভ্রমরের মত আমাদের মুখের উপর পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু তিনি নিজে বাক্যব্যয় করিতেছেন না। গভীর জলের মাছ।

পান্ডেজি ব্যোমকেশের পানে একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'ভাল কথা বংশীজি, আপনার সেরেস্তায় টাকাকড়ির হিসেব সব ঠিক আছে তো? হয়তো আমাদের পরীক্ষা করে দেখবার দরকার হতে পারে।'

বংশীজি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'সব হিসেব ঠিক আছে, আপনারা যখন ইচ্ছে দেখতে পারেন।' তারপর একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'কেবল একটা হিসেবের চুক্তি হয়নি—'

'কোন্ হিসেব?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আট-দশ দিন আগে দীপনারায়ণজি আমাকে ডেকে হুকুম দিয়েছিলেন ডাক্তার পালিতকে বারো হাজার টাকা দিতে। টাকাটা ডাক্তারবাবুকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু রসিদ

নেওয়া হয়নি।'

'রসিদ নেওয়া হয়নি কেন ?'

'ডাক্তারবাবু টাকাটা ধার হিসেবেই চেয়েছিলেন, কিন্তু দীপনারায়ণজি ঠিক করেছিলেন টাকাটা ডাক্তারবাবুকে পুরস্কার দেবেন, তাই রসিদ নিতে মানা করেছিলেন।'

'ও—' ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নীরব রহিল, তারপর রতিকান্তকে বলিল, 'এবার তাহলে বাড়ির সকলকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক। তাঁরা কোথায় ?'

রতিকান্ত বলিল, 'তাঁরা সবাই উপরতলায়। শোবার ঘর সব ওপরে। আপনারা বসুন, আমি একে একে ওঁদের ডেকে নিয়ে আসি। কাকে আগে ডাকব—শকুন্তলা দেবীকে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শকুন্তলা দেবীকে কষ্ট দেবার দরকার নেই, আমরাই ওপরে যাচ্ছি। দু'চারটে মামুলী কথা জিজ্ঞাসা করা বৈ তো নয়। দেবনারায়ণবাবুও বোধহয় ওপরে আছেন ?'

'হ্যাঁ। চাঁদনী দেবীও আছেন।'

'তবে চলুন।' পাশের একটি ছোট ঘর হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম।

সিঁড়ির উপরে একটি ঘর, তাহার দুইদিকে দুইটি দরজা। উপরতলাটি দুই ভাগে বিভক্ত। আমরা উপরে উঠিলে রতিকান্ত বলিল, 'কোন্‌দিকে যাবেন ? এদিকটা দেবনারায়ণবাবুর মহল, ওদিকটা দীপনারায়ণবাবুর।'

ব্যোমকেশ কোন্‌দিকে যাইবে ইতস্তত করিতেছে এমন সময় দেবনারায়ণের দিকের দ্বার দিয়া চাঁদনী বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে এক বাটি দুধ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেখিয়া সে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া পড়িল, স্বভাববশত মাথার কাপড় টানিতে গেল, তারপর বাড়ির সাম্প্রতিক কায়দা স্মরণ করিয়া থামিয়া গেল। আমাদের মধ্যে ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া জড়িতস্বরে বলিল, 'চাচিজি আজ সারাদিন এক ফোঁটা জল মুখে দেননি...তাই যাচ্ছি আর একবার চেষ্টা করতে যদি একটু দুধ খাওয়াতে পারি। চাচাজি তো গেছেন, উনিও যদি না খেয়ে প্রাণটা দেন কি হবে বলুন দেখি ?' বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমরা থতমত খাইয়া গেলাম। এই একান্ত ঘরোয়া সেবার মূর্তিটিকে দেখিবার জন্য কেহই যেন প্রস্তুত ছিলাম না। গঙ্গাধর বংশী বিচলিতভাবে গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'যাও বেটি, ওঁকে আগে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা কর। কিছু না খেলে কি করে চলবে।'

চাঁদনী দুধ লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন, দেবনারায়ণবাবুর কাছে আগে যাওয়া যাক।'

আমরা দেবনারায়ণের মহলে প্রবেশ করিলাম, ম্যানেজার আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন।

ঘরের পর ঘর, সবগুলিই দেশী বিদেশী আসবাবে ঠাসা ; কিন্তু কিছুরই তেমন ছিরি-ছাঁদ নাই, সবই এলোমেলো বিশৃঙ্খল। অবশেষে বাড়ির শেষ প্রান্তে একটি পর্দা-ঢাকা দরজার সম্মুখীন হইলাম।

ঘরের ভিতর কে আছে তখনও দেখি নাই, আমাদের সমবেত পদশব্দে আকৃষ্ট হইয়া একটি লোক পর্দা সরাইয়া উঁকি মারিল, তারপর চকিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি বেশ বড়, তিনদিকে জানালা। মেঝের অর্ধেক জুড়িয়া পুরু গদির উপর ফরাস পাতা, তাহার উপর কয়েকটা মোটা মোটা তাকিয়া। দেবনারায়ণ মাঝখানে তাকিয়া পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশে একটু পিছনে কোঁকড়া-চুল কোঁকড়া-গোঁফ বিদূষক বেণীপ্রসাদ। আমাদের দেখিয়া বেণীপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ম্যানেজার দেবনারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' দেবনারায়ণ কোনও কথা না বলিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যাঙের মত চাহিয়া রহিল।

ম্যানেজার আমাদের বসিতে বলিলেন। আমি ও ব্যোমকেশ বিছানার পাশে বসিলাম। আর সকলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, 'ঘরে আর একজন ছিলেন—যিনি পর্দা ফাঁক করে উঁকি মেরেছিলেন—তিনি কোথায় গেলেন ?'

বেণীপ্রসাদ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, 'তিনি—মানে লীলাধর'—ম্যানেজারের দিকে একটি ক্ষিপ্র চকিত চাহনি হানিয়া সে কথা শেষ করিল—'সে পাশের ঘরে গেছে।'

ব্যোমকেশ ভাল মানুষের মত জিজ্ঞাসা করিল, 'পাশের ঘরে কী আছে ?'

বেণীপ্রসাদ বলিল, 'মানে—গোসলখানা !'

ব্যোমকেশ ফিক্ করিয়া হাসিল, 'বুঝেছি। গোসলখানার লাগাও পাকানো লোহার সিঁড়ি আছে, লীলাধরবাবু সেই দিক দিয়ে বাড়ি গেছেন। কেমন ?'

বেণীপ্রসাদ উত্তর দিল না, নিতম্ব চুলকাইতে চুলকাইতে ম্যানেজারের দিকে আড় চোখে চাহিতে লাগিল।

লীলাধর যে ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীর পুত্র এবং দেবনারায়ণের সহকারী বিদূষক তাহা আমরা কাল রাত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম। দেখিলাম, গঙ্গাধর বংশীর মুখ কালো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি উদ্গত হৃদয়াবেগ যথাসাধ্য সংযত করিয়া বেণীপ্রসাদকে প্রশ্ন করিলেন, 'তোমরা এখানে কি করছ ?'

নিতম্ব ছাড়িয়া বেণীপ্রসাদ এক হাত তুলিয়া বগল চুল্কাইতে আরম্ভ করিল, বলিল, 'আজ্ঞে—ছোট-মালিকের মন খারাপ হয়েছে তাই আমরা ওঁকে একটু—'

মন খারাপের উল্লেখে দেবনারায়ণের বোধহয় খুড়ার মৃত্যুর কথা মনে পড়িয়া গেল, সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আকাশ-পাতাল হাঁ করিয়া হাতির মত লোকটা কাঁদিতে লাগিল।

কাল দেবনারায়ণের হাসি শুনিয়াছিলাম, আজ কান্না শুনিলাম। আওয়াজ প্রায় একই রকম, যেন এক পাল শেয়াল ডাকিতেছে।

পাঁচ মিনিট চলিবার পর হঠাৎ কান্না আপনিই থামিয়া গেল। দেবনারায়ণ রুমালে চোখ মুছিয়া পানের ডাবা হইতে এক খাম্‌চা পান মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল। ব্যোমকেশ এতক্ষণ নির্বিকারভাবে দেয়ালে টাঙানো রবি বর্মার ছবি দেখিতেছিল, কান্না থামিলে সহজ স্বরে বলিল, 'দেবনারায়ণবাবু, আপনি মদ খান ?'

দেবনারায়ণবাবু বলিল, 'নাঃ। আমি ভাঙ্ খাই।'

'তবে তাকিয়ার তলায় ওটা কি ?' বলিয়া ব্যোমকেশ অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

বেণীপ্রসাদ ইতিমধ্যে তেরছাভাবে গোসলখানার দ্বারের দিকে যাইতেছিল, এখন সুট করিয়া অন্তর্হিত হইল। আমি নির্দিষ্ট তাকিয়া উল্টাইয়া দেখিলাম, তলায় একটি ছিপি-আঁটা বোতল রহিয়াছে ; বোতলের মধ্যে শ্বেতবর্ণ তরল দ্রব্য।

দেবনারায়ণ বোকাটে মুখে বোতলের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, 'ও তো তাড়ি। লীলাধর আর বেণীপ্রসাদ খাচ্ছিল।'

বোতলে তাড়ি ! এই প্রথম দেখিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'ও—আপনার মন প্রফুল্ল করবার জন্য ওঁরা তাড়ি খাচ্ছিলেন ! তা সে যাক। বলুন তো, আপনি ভাঙ্ ছাড়া আর কি কি নেশা করেন ?'

দেবনারায়ণ খানিকটা জর্দা মুখে দিয়া বলিল, 'আর কিছু না।'

'কোকেন ?'

'বুকনি ? নাঃ।'

'গাঁজা ?'

'নাঃ। গঙ্গাধর গাঁজা খায়।'

'আচ্ছা, যেতে দিন। —আপনার বোধহয় অনেক বন্ধু আছে?'

'বন্ধু—আছে। লাখো লাখো বন্ধু আছে।'

'তাই নাকি? তাদের দু'চারটে নাম করুন তো।'

'নাম? লীলাধর—বেণীপ্রসাদ—গজাধর সিং—'

'কোন্ গজাধর সিং?'

'চৌকিদার। খুব ভাল ভাঙ্ ঘুঁটতে পারে।'

'আর কে?'

'আর বদ্রিলাল। রোজ আমার পা টিপে দেয়।'

দেবনারায়ণের বন্ধুরা কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝলাম। ডাক্তার পালিতের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব নেই?'

দেবনারায়ণের বিপুল শরীর একবার ঝাঁকানি দিয়া উঠিল; সে বিহ্বলকণ্ঠে বলিল, 'ডাক্তার পালিত। ওকে আমি রাখব না, তাড়িয়ে দেব। চাচাকে ও খুন করেছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকাইয়া মুদিত চক্ষে বসিয়া রহিল, তারপর চোখ খুলিয়া বলিল, 'আপনার কাকার মৃত্যুর পর আপনি ষোল আনা সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। এখন কি করবেন?'

'কি করব?'—দেবনারায়ণ যেন পূর্বে একথা চিন্তাই করে নাই এমনিভাবে ইতি-উতি তাকাইতে লাগিল। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম, দেবনারায়ণ কি সত্যই এতবড় গবেট?

ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'চলুন, এর কাছে আর কিছু জানবার নেই।'

দরজার দিকে ফিরিতেই দেখিলাম, চাঁদনী কখন পর্দার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কার ব্যঞ্জনা। আমাদের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িতেই সে চকিতে সরিয়া গেল।

আমরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। রতিকান্ত পাণ্ডেজিকে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, 'চাঁদনী দেবীকে সওয়াল করা হবে নাকি?'

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের দিকে চাহিলেন। ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'পরে দেখা যাবে। এখন চলুন, শকুন্তলা দেবীর মহলে।'

আট

দেবনারায়ণের মহল হইতে শকুন্তলার মহলে যাইবার পথে ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী হঠাৎ আমাদের নিকট বিদায় লইলেন। পুত্র লীলাধর সম্পর্কে তাঁহার মন বোধহয় বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, নহিলে এত সহজে আমাদের ছাড়িয়া যাইতেন না। বলিলেন, 'আমার সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হল, আমি এবার যাই। আপনারা কাজ করুন।'

তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন। আমরা শকুন্তলা দেবীর মহলে প্রবেশ করিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, রতিকান্ত সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিতে জ্বালিতে আমাদের আগে আগে চলিল।

প্রথমে একটি মাঝারি গোছের ঘর। দেশী প্রথায় চৌকির উপর ফরাসের বিছানা, কয়েকটি গদি-মোড়া নীচু কেদারা, ঘরের কোণে উঁচু টিপাইয়ের মাথায় রূপার পাত্রে ফুল সাজানো। দেয়ালে যামিনী রায়ের আঁকা একটি ছবি। এখানে বাড়ির লোকেরা বসিয়া গল্প-গুজবে সন্ধ্যা কাটাইতে পারে, আবার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব আসিলেও বসানো যায়।

ঘরে কেহ নাই। আমরা এ-ঘর উত্তীর্ণ হইয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিলাম। এটি বেশ বড় ঘর, দুটি পালঙ্ক দু'পাশের দেয়ালে সংলগ্ন হইয়া আছে। একটি বড় ওআর্ডরোব রহিয়াছে, একটি আয়না-দার টেবিলে কয়েকটি ওষুধের শিশি। মনে হয় এটি দীপনারায়ণের শয়নকক্ষ ছিল। বর্তমানে শয্যা দুটির উপর সুজনি ঢাকা রহিয়াছে। এ ঘরটিও শূন্য। ব্যোমকেশ মৃদুকণ্ঠে

বলিল,—'এটি বোধ হচ্ছে দীপনারায়ণবাবুর শোবার ঘর ছিল। দুটো খাট কেন ?'

রতিকান্ত একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—'দীপনারায়ণজির অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছিল তখন একজন নার্স রাত্রে থাকত।'

'ঠিক ঠিক, আমার বোঝা উচিত ছিল।'

অতঃপর আমরা তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করিলাম এবং চারিদিকে চাহিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলাম। এ ঘরটি আরও বড় এবং নীলাভ নিওন-লাইট দ্বারা আলোকিত। পিছনের দিকের দেয়ালে সম-ব্যবধানে তিনটি জানালা, জানালার ব্যবধানস্থলে সুচিত্রিত মহার্ঘ মিশরী গালিচা ঝুলিতেছে। ঘরের এক পাশে একটি অর্গান এবং তাহার আশেপাশে দেয়ালে টাঙানো নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র। ঘরের অপর পাশে ছবি আঁকার বিবিধ সরঞ্জাম, দেয়ালের গায়ে আঁকা একটি প্রশস্ত তৈলচিত্র। মেঝের উপর পুরু মখমলের আস্তরণ বিছানো, তাহার মাঝখানে গুরু নিতম্বিনী রাজকন্যার মত একটি তানপুরা শুইয়া আছে। বুঝিতে বিলম্ব হয় না কলা-কুশলী শকুন্তলার এটি শিল্পনিকেতন। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। একই বাড়ির দুই অংশে রুচিনৈপুণ্য ও সৌন্দর্য-বোধের কতখানি তফাৎ, চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রথমেই দেয়ালে আঁকা তৈলচিত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে কোনও দিকে না চাহিয়া ছবির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ছবিটির খাড়াই তিন ফুট, পাশাপাশি পাঁচ ফুট। বিষয়বস্তু নূতন নয়, বল্কলধারিণী শকুন্তলা তরুআলবালে জল-সেচন করিতেছে এবং দুষ্মন্ত পিছনের একটি বৃক্ষকাণ্ডের আড়াল হইতে চুরি করিয়া শকুন্তলাকে দেখিতেছেন। ছবিখানির অঙ্কন-শৈলী ভাল, শকুন্তলার হাত পা খ্যাংরা কাটির মত নয়, দুষ্মন্তকে দেখিয়াও যাত্রাদলের দুঃশাসন বলিয়া ভ্রম হয় না। চিত্রের বাতাবরণ পুরাতন, কিন্তু মানুষ দুটি সর্বকালের। ছবি দেখিয়া মন তৃপ্ত হয়।

ব্যোমকেশের দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখিলাম সে তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছে। তাহার দেখাদেখি রতিকান্ত ও পাণ্ডেজি আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যোমকেশ তখন তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া উৎসাহ ভরে বলিল, 'চমৎকার ছবি। কে এঁকেছে ?'

পাণ্ডেজি রতিকান্তের দিকে চাহিলেন, রতিকান্ত দ্বিধাভরে বলিল, 'বোধহয় শকুন্তলা দেবীর আঁকা। ঠিক বলতে পারি না।'

ব্যোমকেশ আবার ছবির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তাই হবে। একালের শকুন্তলা সেকালের শকুন্তলার ছবি এঁকেছেন। দেখেছ অজিত, তপোবনকন্যা শকুন্তলার মুখে কী শান্ত সরলতা, দুষ্মন্তের চোখে কী মোহাচ্ছন্ন অনুরাগ, সহকার তরুগুলির কী সজীব শ্যামলতা। সব মিলিয়ে সংসার ও আশ্রমের একটি অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে।—যদি সম্ভব হত ছবিটি তুলে নিয়ে যেতাম।'

একটু অবাক হইলাম। ব্যোমকেশের মনে শিল্পরস বোধ থাকিতে পারে কিন্তু তাহা কোনও কালেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে দেখি নাই। আমি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছি দেখিয়া সে সামলাইয়া লইল ; ছবির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া ঘরের চারিদিকে চোখ বুলাইল। শকুন্তলা দেবীর বর্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া একটু ব্যথিত স্বরে বলিল, 'এটা দেখছি শকুন্তলা দেবীর গান-বাজনা ছবি-আঁকার ঘর...সাজানো বাগান...ভুলে থাকার উপকরণ—' একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'চলুন।'

অতঃপর আমরা আরও একটা শূন্য ঘর এবং একটা বারান্দা পার হইয়া শকুন্তলার শয়নকক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দরজা ভেজানো ছিল, রতিকান্ত টোকা দিলে একটি মধ্যবয়স্কা দাসী দ্বার খুলিয়া দিল। রতিকান্ত ঘরের ভিতর গলা বাড়াইয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'আমরা পুলিসের পক্ষ থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।'

কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতর হইতে অস্ফুট আওয়াজ আসিল—'আসুন।'

আমরা সসঙ্কোচে ঘরে প্রবেশ করিলাম। রতিকান্ত দাসীকে মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিত করিল, দাসী বাহিরে গেল।

শকুন্তলা দেবীর শয়নকক্ষের বর্ণনা দিব না। অনবদ্য রুচির সহিত অপরিমিত অর্থবল সংযুক্ত হইলে যাহা সৃষ্টি হয় এ ঘরটি তাহাই। শকুন্তলা পালঙ্কের উপর বসিয়া ছিলেন, আমরা প্রবেশ করিলে একটি ক্রীম রঙের কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়াইয়া লইলেন। কেবল তাঁহার মুখখানি খোলা রহিল। মোমের মত অচ্ছাভ বর্ণ, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে। চুলগুলি শিথিল ও অবিন্যস্ত। যেন হিম-ক্লিন্ন ঝরা শেফালি।

'বসুন'—শকুন্তলা ক্লান্তি-বিনত চক্ষু দুটি একবার আমাদের পানে তুলিলেন।

ঘরে কয়েকটি চামড়ার গদি-মোড়া নীচু চৌকি ছিল, আমি ও ব্যোমকেশ দুটি চৌকি খাটের কাছে টানিয়া লইয়া বসিলাম। রতিকান্ত ও পাণ্ডেজি খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ পাণ্ডেজির দিকে দৃষ্টি তুলিয়া নীরবে অনুমতি চাহিল, পাণ্ডেজি একটু ঘাড় নাড়িলেন। ব্যোমকেশ তখন অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে শকুন্তলাকে বলিল, 'আপনাকে এ সময়ে বিরক্ত করতে এসেছি, আমাদের ক্ষমা করবেন। মানুষের জীবনে কখন যে কী দুর্দৈব ঘটবে কেউ জানে না, তাই আগে থাকতে প্রস্তুত থাকবার উপায় নেই। আপনার স্বামীকে আমি একবার মাত্র দেখেছি, কিন্তু তিনি যে কি রকম সজ্জন ছিলেন তা জানতে বাকি নেই। তাঁর মৃত্যুর জন্যে যে দায়ী সে নিষ্কৃতি পাবে না এ আশ্বাস আপনাকে আমরা দিচ্ছি।' শকুন্তলা উত্তর দিলেন না, কাতর চোখ দুটি তুলিয়া নীরবে ব্যোমকেশকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন করব। নেহাত প্রয়োজন বলেই করব, আপনাকে উত্যক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। —কিন্তু আসল প্রশ্ন করার আগে একটা অবান্তর কথা জেনে নিই, ও ঘরের দেয়ালে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ছবিটি কি আপনার আঁকা?'

শকুন্তলার চোখে চকিত বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল, তিনি কেবল ঘাড় হেলাইয়া জানাইলেন—হ্যাঁ, ছবি তাঁহারই রচনা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চমৎকার ছবি, আপনার সত্যিকার শিল্পপ্রতিভা আছে। কিন্তু ওকথা যাক। দীপনারায়ণবাবু উইল করে গেছেন কিনা আপনি জানেন?'

এবার শকুন্তলা অবুঝের মত চক্ষু তুলিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপর স্তিমিত স্বরে বলিলেন, 'এসব আমি কিছু জানি না। উনি আমার কাছে বিষয় সম্পত্তির কথা কখনও বলতেন না।'

'আপনার নিজস্ব কোনও সম্পত্তি আছে কি?'

'তাও জানি না। তবে—'

'তবে কি?'

'বিয়ের পর আমার স্বামী আমার নামে পাঁচ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি! সে টাকা এখন কোথায়?'

'ব্যাঙ্কেই আছে। আমি কোনও দিন সে টাকায় হাত দিইনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল।

'তাহলে এই পাঁচ লাখ টাকা আপনার নিজস্ব স্ত্রীধন। তারপর যদি আপনার পুত্রসন্তান জন্মায় তাহলে সে এজমালি সম্পত্তির অর্ধেক ভাগ পাবে।'

শকুন্তলা চোখ তুলিলেন না, নতনেত্রে রহিলেন। মনে হইল তাঁহার মুখখানা আরও পাণ্ডুর রক্তহীন হইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাল কথা, আপনি যে সন্তান-সম্ভবা একথা আপনার স্বামী জানতেন?'

নতনয়না শকুন্তলার ঠোঁট দুটি একটু নড়িল, 'জানতেন। কাল রাত্রে তাঁকে বলেছিলাম।'

'কাল রাত্রে! খাওয়া-দাওয়ার আগে, না পরে?'

'পরে। উনি তখন শুয়ে পড়েছিলেন।'

'খবর শুনে উনি নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছিলেন!'

'খুব খুশি হয়েছিলেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন—'

এই পর্যন্ত বলিয়া শকুন্তলার ভাব হঠাৎ পরিবর্তিত হইল। এতক্ষণ তিনি ক্লান্ত ম্রিয়মাণভাবে কথা বলিতেছিলেন, এখন ভয়ার্ত বিহ্বলতায় একে একে আমাদের মুখের পানে চাহিলেন, তারপর একটি অবরুদ্ধ কাতরোক্তি করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

আমরা ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, দ্বারের কাছে চাঁদনী কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন সে ছুটিয়া আসিয়া শকুন্তলার মাথা কোলে লইয়া বসিল, আমাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'আপনারা কি রকম মানুষ, মেরে ফেলতে চান ওঁকে ? যান, শীগ্‌গির যান এ ঘর থেকে। শরীরে একটু দয়ামায়া কি নেই আপনাদের ? এখুনি মিস্ মান্নাকে খবর পাঠান।'

আমরা পালাইবার পথ পাইলাম না। নীচে নামিতে নামিতে শুনিতে পাইলাম চাঁদনী উচ্চকণ্ঠে দাসীকে ডাকিতেছে—'সোমরিয়া, কোথায় গেলি তুই—শীগ্‌গির জল আন—'

নীচে নামিয়া পাণ্ডেজি প্রথমেই মিস্ মান্নাকে টেলিফোন করিলেন—'শীগ্‌গির চলে আসুন, আপনি না আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।'

তারপর আমরা হল-ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রাত্রি হইয়া গিয়াছে, ঘড়িতে সাতটা বাজিয়া গেল।

পাণ্ডেজি বিললেন, 'রতিকান্ত, দেখে এস শকুন্তলা দেবীর জ্ঞান হল কিনা।'

রতিকান্ত চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ বিমর্ষ মুখে বসিয়াছিল, চোখ তুলিয়া বলিল, 'পাণ্ডেজি, মিস্ মান্নাকে এখন কিছুদিন শকুন্তলা দেবীর কাছে রাখা দরকার, তার ব্যবস্থা করুন। তিনি সর্বদা শকুন্তলার কাছে থাকবেন, একদণ্ডও তাঁর কাছ-ছাড়া হবেন না।'

'বেশ।'

ম্যানেজার গঙ্গাধর এই সময় ফিরিয়া আসিলেন এবং শকুন্তলার মূর্ছার কথা শুনিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'মিস্ মান্নাকে এখানে কিছুদিন রাখার ব্যবস্থা করুন। শকুন্তলা দেবী অন্তঃসত্ত্বা, তার ওপর এই দুর্দৈব। ওঁর কাছে অষ্টপ্রহর ডাক্তার থাকা দরকার।'

ম্যানেজারের মুখখানা কেমন একরকম হইয়া গেল। তারপর তিনি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

মিস্ মান্না আসিলেন, হাতে ওষুধের ব্যাগ। তাঁহাকে সংক্ষেপে সব কথা বলা হইলে তিনি বলিলেন, 'বেশ, আমি থাকব। আমার কিছু জিনিসপত্র আনিয়ে নিলেই হবে।'

তিনি দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেলেন।

দশ মিনিট পরে রতিকান্ত নামিয়া আসিয়া বলিল, 'জ্ঞান হয়েছে। ডাক্তার মান্না বললেন ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

পাণ্ডেজি গাত্রোত্থান করিলেন।

'আমরা এখন উঠলাম। রতিকান্ত, তুমি এখানকার কাজ সেরে একবার আমার বাসায় যেও।' আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'চলুন, আমার ওখানে চা খাবেন।'

নয়

মোটরে যাইতে যাইতে শকুন্তলার শয়নকক্ষের দৃশ্যটাই চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। মনে হইল যেন একটি মর্মস্পর্শী নাটকের নিগূঢ় দৃশ্যাভিনয় প্রত্যক্ষ করিলাম। শকুন্তলা যদি মূর্ছিত হইয়া না পড়িতেন এবং চাঁদনী আসিয়া যদি রসভঙ্গ না করিত—

শকুন্তলা হঠাৎ মূর্ছিত হইলেন কেন ? অবশ্য এরূপ অবস্থায় যে-কোনও মুহূর্তে মূর্ছা যাওয়া বিচিত্র নয়, তবু শোকের প্রাবল্যই কি তাহার একমাত্র কারণ ?

ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে চিন্তার অতলে তলাইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,

'শকুন্তলার মূর্ছার কথা ভাবছ নাকি ?'

সে সচেতন হইয়া বলিল, 'মূর্ছা ! না—আমি ভাবছিলাম ডাক-বাক্সর কথা।'

অবাক হইয়া বলিলাম, 'ডাক-বাক্সর কথা ভাবছিলে !'

সে বলিল, 'হ্যাঁ, দীপনারায়ণের বাড়ির কোণে যে ডাক-বাক্স আছে তারই কথা। ভারি লাগসৈ জায়গায় সেটা আছে। দেখলে মনে হয় লাল কুর্তা-পরা গোলগাল একটি সেপাই রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়।'

'আসলে তবে কি ?'

'আসলে শ্রীরাধিকার দূতী।'

'বুঝলাম না। ব্যাসকূট ছেড়ে সিধে কথা বল।'

ব্যোমকেশ কিন্তু সিধা কথা বলিল না, মুখে একটা একপেশে হাসি আনিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'অভিসারের আইডিয়াটি ভারি মিষ্টি, অবশ্য যদি অভিসারিকা পরস্ত্রী হয়। নিজের স্ত্রী অভিসার করলে বোধহয় তত মিষ্টি লাগে না।'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ 'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্'।'

'কি আবোল-তাবোল বকছ !'

ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলিল, 'আবোল-তাবোল নয়, এটা গীতগোবিন্দ। যদি আবোল-তাবোল শুনতে চাও শোনাতে পারি, ছন্দ একই। বাবুরাম সাপুড়ে কোথা যাস বাপুরে—'

পাণ্ডেজি মোটর চালাইতে চালাইতে হাসিয়া উঠিলেন। আমি হতাশ হইয়া আপাতত আমার কৌতূহল সম্বরণ করিলাম।

পাণ্ডেজির বাসায় পৌঁছিয়া দেখা গেল চা প্রস্তুত। তার সঙ্গে গরম গরম বেগুনি, পকৌড়ি, ডালের ঝালবড়া। ব্যোমকেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া বসিয়া গেল। আমরাও যোগ দিলাম।

বেশ খানিকটা রসদ আত্মসাৎ করিবার পর ব্যোমকেশ তৃপ্তস্বরে বলিল, 'এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, আমার অন্তরাত্মা এই জিনিসগুলির পথ চেয়ে ছিল।'

পাণ্ডেজি হাসিয়া বলিলেন, 'এখন তো পথ চাওয়া শেষ হল, এবার বলুন কি দেখলেন শুনলেন।'

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় লম্বা একটি চুমুক দিয়া সযত্নে পেয়ালা নামাইয়া রাখিল, গড়গড়ার নলে কয়েকটা বুনিয়াদি টান দিল, তারপর চিন্তা-মন্থর কণ্ঠে বলিল, 'দেখলাম শুনলাম অনেক কিছু, কিন্তু এখনও শেষ দেখা যাচ্ছে না।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'তবু ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুটো মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। এক—টাকা, দুই—স্মরগরল। কোন্‌দিকের পাল্লা ভারী এখনও বুঝতে পারছি না। হতে পারে, দুটো মোটিভ জড়াজড়ি হয়ে গেছে।'

আমি বলিলাম, 'মোটিভ যেমনই হোক, লোকটা কে ?'

ব্যোমকেশ একটু অধীরভাবে বলিল, 'তা কি করে বলব ? যে-ব্যক্তি ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়েছিল সে ভাড়াটে লোক হতে পারে। যে তাকে নিয়োগ করেছিল তাকেই আমরা খুঁজছি।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমরা যাদের চিনি তাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিয়োগ করতে পারে। এক আছে দেবনারায়ণ। কিন্তু সে কি—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, প্রথমে দেবনারায়ণকে ধরুন। দেবারায়ণকে দেখলে মনে হয় নিরেট আহাম্মক ; কিন্তু এটা তার ছদ্মবেশ হতে পারে। সেই হয়তো লোক লাগিয়ে খুড়োকে মেরেছে। তার আজ্ঞাবহ মোসাহেবের অভাব নেই, লীলাধর বংশী বা বেণীপ্রসাদ যে-কেউ পুরস্কারের আশ্বাস পেলে খুন করবে। এখানে মোটিভ হল, সম্পত্তির একাধিপত্য।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া আমাকে নিবারণ করিল—'তারপর ধরা যাক—চাঁদনী।'

'চাঁদনী !'

'হ্যাঁ, চাঁদনী। শকুন্তলার প্রতি তার এত দরদ স্বাভাবিক মনে হয় না, যেন একটু বাড়াবাড়ি। সে হয়তো মনে মনে তাঁকে হিংসে করে, তাঁর প্রাধান্য খর্ব করতে চায়। দীপনারায়ণের মৃত্যুর পর শকুন্তলা আর সংসারের কর্ত্রী থাকবেন না, কর্ত্রী হবে চাঁদনী। দেবনারায়ণ যদি সত্যি সত্যিই ন্যালা-ক্যাবলা হয়, সে চাঁদনীর মুঠোর মধ্যে থাকবে, চাঁদনী হবে বিপুল সম্পত্তির একচ্ছত্র অধীশ্বরী—'

'কিন্তু—'

ব্যোমকেশ আবার হাত তুলিয়া আমাকে নিবৃত্ত করিল।

'তারপর ধরুন—ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী। ডাক্তার পালিতের মতে ইনি গভীর জলের মাছ। সেটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়, গভীর জলের মাছ না হলে এতবড় স্টেটের ম্যানেজার হওয়া যায় না। কিন্তু উনি যদি কুমীর হন তবেই ভাবনার কথা। ভেবে দেখুন দীপনারায়ণ সিং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, বিষয় সম্পত্তির ওপর নজর রাখতেন। তিনি বেঁচে থাক্‌তে পুকুর চুরি সম্ভব নয়, অল্পসল্প চুরি হয়তো চলে। কিন্তু তিনি যদি মারা যান তাহলে সমস্ত সম্পত্তি অর্শাবে দেবানারায়ণকে। তখন দু'হাতে চুরি করা চলবে। সুতরাং ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীরও মোটিভ স্বীকার করতে হবে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গড়গড়া টানিল, আমরা নীরব রহিলাম। তারপর সে গড়গড়ার নল আমার হাতে দিয়া বলিল, 'সর্বশেষে ধরুন—শকুন্তলা দেবী।'

এইটুকু বলিয়া সে চুপ করিল। আমরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। সে একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল, 'কোনও মহিলার চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা ভদ্রলোকের কাজ নয়, কিন্তু যেখানে একটা খুন হয়ে গেছে, সেখানে আলোচনা না করেও উপায় নেই। শকুন্তলা দেবী তিন মাস অন্তঃস্বত্ত্বা, অথচ তিন মাস আগে দীপনারায়ণ সিং শয্যাগত ছিলেন, সে সময়ে তাঁর দীর্ঘ রোগের একটা ক্রাইসিস যাচ্ছিল।...শকুন্তলা আজ আমাদের বললেন, কাল রাত্রে তিনি স্বামীকে সন্তান সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, শুনে দীপনারায়ণ সিং আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন।...কথাটা বোধহয় সত্যি নয়।'

প্রশ্ন করিলাম, 'সত্যি নয় কেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দীপনারায়ণ সিং যদি আনন্দে আত্মহারা হয়েই পড়েছিলেন তবে এই মহা আনন্দের সংবাদ কাউকে দিলেন না কেন ? রাত্রে না হোক, সকালবেলা ডাক্তার পালিতকে তো বলতে পারতেন, শুভসংবাদ পাকা কিনা জানবার জন্য মিস্ মান্নাকে ডাকতে পারতেন।...শকুন্তলা স্বামীকে বলেননি, কারণ স্বামীকে বলবার মত কথা নয়। দীপনারায়ণ সিং জানতে পারলে শকুন্তলাকে খুন করতেন, নচেৎ বাড়ি থেকে দূর করে দিতেন। তাই জানাজানি হবার আগেই দীপনারায়ণ সিংকে সরানো দরকার হয়েছিল।'

বলিলাম, 'কিন্তু ধরো, ডাক্তার পালিত যদি ভুল করে থাকেন ?'

ব্যোমকেশ শুষ্ক স্বরে বলিল, 'ডাক্তার পালিত এবং মিস্ মান্না দু'জনেই যদি ভুল করে থাকেন, যদি শকুন্তলা নিষ্কলঙ্ক হন, তাহলে দীপনারায়ণকে খুন করার তাঁর কোনও মোটিভ নেই। কিন্তু ডাক্তার পালিত বা মিস্ মান্না দায়িত্বহীন ছেলেমানুষ নয়, তাঁরা ভুল করেননি। ইচ্ছে করেও মিছে কথাও বলেননি, যে মিছে কথা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে তেমন মিথ্যে কথা বলবার লোক ওঁরা নন।'

বলিলাম, 'আমি ওকথা বলছি না। শকুন্তলা যে অন্তঃস্বত্ত্বা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দীপনারায়ণ যে—'

'তুমি যা বলতে চাও আমি বুঝেছি। কিন্তু সে দিকেও বাড়িসুদ্ধ লোক সাক্ষী আছে, ডাক্তার

পালিত মিছে কথা বলে পার পাবেন না।' ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে গড়গড়ার নল লইয়া আবার টানিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'বেশ, তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক যে শকুন্তলার একটি দুষ্মন্ত আছে। কিন্তু সে লোকটা কে?'

ব্যোমকেশ একটু চকিতভাবে আমার পানে চাহিল, অর্ধব্যক্ত স্বরে বলিল, 'শকুন্তলার দুষ্মন্ত! বেশ বলেছ। —ওই দুষ্মন্তকেই আমরা খুঁজছি। ডাক্তার পালিতের ব্যাগে যে ওষুধের বদলে বিষ রেখে গিয়েছিল সে ওই দুষ্মন্ত ছাড়া আর কে হতে পারে?'

'দুষ্মন্তটি তবে কে?'

'সেটা শকুন্তলার রুচির ওপর নির্ভর করে। তিনি মার্জিত রুচির আধুনিকা মহিলা, সুতরাং দুষ্মন্তও আধুনিক শিক্ষিত লোক হওয়া সম্ভব। নর্মদাশঙ্কর বা তাদের দলের কেউ হতে পারে। আবার এমন লোক হতে পারে যার প্রকাশ্যভাবে ও বাড়িতে যাতায়াত নেই।'

পাণ্ডেজি কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, বলিলেন, 'কিম্বা মনে করুন, যদি এমন কেউ হয় যে শকুন্তলাকে বিপদে ফেলে সরে পড়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুষ্মন্তদের পক্ষে সেটা খুবই স্বাভাবিক। তখন শকুন্তলাকে অন্য চেষ্টা করতে হবে, অর্থাৎ অন্য সহকারী যোগাড় করতে হবে।'

'সে-রকম সহকারী তিনি পাবেন কোথায়?'

'কেন সহকারীর অভাব কিসের? স্বয়ং গঙ্গাধর বংশী রয়েছেন, তস্য পুত্র লীলাধর আছে, বেণীপ্রসাদ আছে, উপযুক্ত দক্ষিণা পেলে সকলেই রাজী হবে। এমন কি ডাক্তার পালিত আর মিস্ মান্নাকেও বাদ দেওয়া যায় না। ঠক বাছতে গাঁ উজোড়।' আমরা নির্বাক হইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের গড়গড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নাই। তারপর সে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলিল, 'দেয়ালে আঁকা ছবিটার কথা বার বার মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে ওটা শুধু ছবি নয়, ওর মধ্যে শিল্পীর অন্তরতম কথাটি লুকিয়ে আছে। ছবিটি দিনের আলোয় আর একবার ভাল করে দেখতে হবে।'

ভৃত্য আসিয়া জানাইল, ইন্সপেক্টর চৌধুরী আসিয়াছেন।

দশ

রতিকান্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'এই মাত্র কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট দিয়ে গেল। ওষুধে বিষ পাওয়া যায়নি।'

আমরা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। লিভারের ভায়ালে কিউরারি পাওয়া যাইবে এ বিষয়ে আমরা এতই নিশ্চিন্ত ছিলাম যে কথাটা হঠাৎ বোধগম্য হইল না।

'বিষ পাওয়া যায়নি?'

'না। এই দেখুন রিপোর্ট।' রতিকান্ত ব্যোমকেশের হাতে এক টুকরা কাগজ দিল।

রিপোর্টে কোন বিষের নামগন্ধ নাই, নিতান্ত সহজ স্বাভাবিক লিভারের আরক। ব্যোমকেশ কুঞ্চিতচক্ষে পাণ্ডেজি ও রতিকান্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

'ভারি আশ্চর্য।'

রতিকান্ত একবার গলা ঝাড়া দিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, এ থেকে আপনার কি মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আগে আপনি বলুন আপনার কি মনে হয়?'

বোধ হইল রতিকান্ত মনে মনে খুশি হইয়াছে। সে একটি চেয়ারের কিনারায় বসিল, কিছুক্ষণ একাগ্রভাবে একদিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'দীপনারায়ণজি কিউরারি বিষে মারা গেছেন তাতে সন্দেহ নেই। পোস্ট-মর্টেমে বিষ পাওয়া গেছে। তাঁর শরীরে বিষ প্রবেশ

করল কি করে ? ইন্‌জেকশন ছাড়া অন্য উপায়ে প্রবেশ করতে পারে না। অথচ যে ভায়াল থেকে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়েছিল তাতে বিষ পাওয়া গেল না—' রতিকান্ত একটু ইতস্তত করিল—'এ থেকে একমাত্র অনুমান করা যায়, ডাক্তার পালিত যে ভায়াল থেকে ইন্‌জেকশন দিয়েছিলেন সে ভায়াল আমাদের দেন্‌নি, অন্য ভায়াল দিয়েছিলেন।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কিন্তু কেন ? তাতে ওঁর লাভ কি ?'

রতিকান্ত একটু উদ্বিগ্নভাবে বলিল, 'লাভ এই হতে পারে যে, আমরা মনে করব ইন্‌জেকশনের জন্য মৃত্যু হয়নি।'

'ডাক্তার ছাড়া আর কেউ হতে পারে না কি ? দীপনারায়ণের মৃত্যুর পর ঘরে অনেক লোক এসেছিল, গোলমালের মধ্যে হয়তো কেউ ভায়ালটা সরিয়েছে।'

'অসম্ভব নয়, কিন্তু—'

ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'আপনি মনে করেন ডাক্তার পালিতই প্রকৃত অপরাধী ?'

রতিকান্ত একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আজ থানায় আপনি ডাক্তার পালিত সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করলেন সেটা আমার মাথায় ঘুরছিল, তারপর অ্যানালিসিসের রিপোর্ট পেয়ে মনে হল ডাক্তার পালিত যদি নির্দোষ হন তবে সিধা পথে চলছেন না কেন ? এ অবস্থায় তাঁর ওপর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য দীপনারায়ণজির মৃত্যুতে ওঁর ব্যক্তিগত কোনও লাভ নেই। কিন্তু যাদের লাভ আছে তারা ওঁকে টাকা খাইয়ে নিজেদের কাজ উদ্ধার করিয়ে নিতে পারে। হয়তো ওঁকে পঞ্চাশ হাজার কি এক লাখ টাকা খাইয়েছে। টাকার জন্যে মানুষ কি না করে।'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল, 'ঠিক কথা, টাকার জন্যে মানুষ কি না করে। ডাক্তার পালিত যদি টাকা খেয়ে একাজ করে থাকেন তাহলে শুধু ডাক্তার পালিতকে ধরলেই চলবে না, যে টাকা খাইয়েছে তাকেও ধরতে হবে। কে তাঁকে টাকা খাইয়েছে আপনি কিছু আন্দাজ করেছেন ?'

'আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দেবানারায়ণ ছাড়া আর কে হতে পারে।'

'আপাতত তাই মনে হয় বটে, কিন্তু প্রমাণ কৈ ? প্রমাণ কিছু পাওয়া গেছে কি ?'

'প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায়নি।'

রতিকান্ত পাণ্ডেজির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আজ রাত্রি একটার ট্রেনে আমি বক্সার যাচ্ছি। কয়েদীটাকে জেরা করে যদি জানতে পারা যায় যে ডাক্তার পালিত কিউরারি কিনেছেন—'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'তাহলে অনেকটা সুরাহা হতে পারে। তুমি ফিরবে কবে ?'

'কাল সন্ধ্যে নাগাদ ফিরতে পারব বোধহয়।—সাব-ইন্সপেক্টর তিওয়ারীকে থানার চার্জে রেখে যাচ্ছি।'

'বেশ।—এদিকের কি ব্যবস্থা করলে ?'

'দীপনারায়ণজির বাড়িতে একজন হেড কন্‌স্টেবলের অধীনে চারজন কন্‌স্টেবল বসিয়ে যাচ্ছি, তারা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় থাকবে। আপনি তো মিস্ মান্নাকে শকুন্তলা দেবীর কাছে রাত্রে থাকতে বলে এসেছেন।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'হ্যাঁ, মিস্ মান্না এখন কিছুদিন শকুন্তলার কাছেই থাকবেন। তুমি তো শুনেছ শকুন্তলা অন্তঃস্বত্ত্বা।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রতিকান্ত ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলিল, 'শুনেছি। দীপনারায়ণজি সন্তানের জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছিলেন। তিনি দেখে যেতে পেলেন না।'

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া আটটা বাজিল। রতিকান্ত উঠিয়া পড়িল, 'যাই, আমাকে আবার তৈরি হতে হবে। আপনারা এদিকে একটু নজর রাখবেন।' হাসিমুখে স্যালুট করিয়া রতিকান্ত চলিয়া গেল।

দেখিলাম রতিকান্তের ব্যবহার এবেলা অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে। সে প্রথমটা একটু আড়ষ্ট হইয়াছিল। তাহার এলাকার মধ্যে ব্যোমকেশের আবির্ভাব মনে মনে পছন্দ করে

নাই ; এখন বোধহয় সে বুঝিয়াছে ব্যোমকেশ তাহার কৃতিত্বে ভাগ বসাইতে চায় না, তাই নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার পালিতের ব্যবহারে সঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে না। তিনিই প্রথম বলেছিলেন, মৃত্যুর কারণ কিউরারি এবং তাঁর ইন্‌জেকশনের ফলেই মৃত্যু হয়েছে। তবে আবার তিনি ওষুধের ভায়াল বদলে দিলেন কেন ?' ব্যোমকেশ আবার চক্ষু মুদিত করিল।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, ডাক্তার পালিত আসিয়াছেন। ব্যোমকেশের চট্ করিয়া সমাধিভঙ্গ হইল, সে মৃদুকণ্ঠে পাণ্ডেজিকে বলিল, 'ডাক্তারকে এসব বলে কাজ নেই।'

ডাক্তার পালিত আসিলে পাণ্ডেজি তাঁহাকে সমুচিত শিষ্টতা সহকারে বসাইলেন।

ডাক্তার ক্লান্তভাবে বলিলেন, 'প্রাণে শান্তি নেই, পাণ্ডেজি। ডিস্‌পেনসারি বন্ধ করবার পর ভাবলাম খোঁজ নিয়ে যাই যদি কিছু খবর থাকে।'

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের পানে কটাক্ষপাত করিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'খবর তো আমরাও খুঁজে বেড়াচ্ছি, ডাক্তারবাবু, কিন্তু পাচ্ছি কৈ ? আপনি শকুন্তলা দেবী সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছিলেন তা যদি সত্য হয়—'

ডাক্তারের মুখ একটু অপ্রসন্ন হইল, 'সত্যি কিনা অন্য যে-কোনও ডাক্তার শকুন্তলাকে পরীক্ষা করলেই জানতে পারবেন।'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিল, 'না না, সেকথা আমি বল্‌ছি না, সেকথা শকুন্তলা নিজেই স্বীকার করেছেন। আমরা ভাবছি দীপনারায়ণ সিং সে সময়ে মরণাপন্ন ছিলেন—'

ডাক্তার বলিলেন, 'তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তিন মাস আগে দীপনারায়ণ সিং-এর অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল, শহরের অনেক ডাক্তার তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁরা বলতে পারবেন। তাছাড়া একজন নার্স তখন অষ্টপ্রহর তাঁর কাছে থাকত। সে বলতে পারবে।'

'তাই নাকি ! কি নাম নার্সের ?'

'মিস্ ল্যাম্বার্ট। মেডিকেল কলেজের কাছে থাকে।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডেজিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি চেনেন ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'চিনি না, কিন্তু বাসাটা দেখেছি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া কি ভাবিল, তারপর ডাক্তার পালিতের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'ডাক্তারবাবু, এবার আপনাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, কিছু মনে করবেন না। আপনি দীপনারায়ণ সিং-এর স্টেট থেকে বারো হাজার টাকা ধার নিয়েছেন কেন ?'

ডাক্তার পালিত আকাশ হইতে পড়িলেন, চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, 'টাকা ধার নিয়েছি ! সে কি, কে বললে আপনাকে ?'

'ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীর মুখে শুনলাম। তবে কি একথা সত্যি নয় ?'

'সর্বৈব মিথ্যে। বারো হাজার টাকা ! গঙ্গাধর বংশী তো দেখছি সাংঘাতিক লোক। দীপনারায়ণবাবু মারা গেছেন এই ফাঁকে বারো হাজার টাকা হজম করতে চায়। দাঁড়ান ব্যাটাকে আমি দেখাচ্ছি, এখনি গিয়ে টুঁটি টিপে ধরব। আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দেবে, এত বড় আস্পর্ধা।'

ডাক্তার পালিত উঠিবার উপক্রম করিতেই ব্যোমকেশ বলিল, 'বসুন বসুন, ম্যানেজারের সঙ্গে বোঝাপড়া পরে করবেন। —কিন্তু কিছু সত্যি যদি না থাকে একথা উঠলো কি করে ?'

ডাক্তার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'কি করে উঠলো তা বুঝতে পেরেছি। হপ্তা দুই আগে একদিন সকালে দীপনারায়ণবাবুকে ইন্‌জেকশন দিতে গেছি, তিনি আমার মোটর দেখে বললেন—ডাক্তার, তোমার গাড়িটা ঝড়ঝড়ে হয়ে গেছে, ওটা বদলে ফ্যালো। আমি বললাম, আজকাল নতুন গাড়ি কিনতে গেলে দশ-বারো হাজার টাকা খরচ, অত টাকা আমি কোথায় পাব !

আমি এক পয়সা বাঁচাতে পারিনি, যা রোজগার করি সব খেয়ে ফেলি। শুনে তিনি আর কিছু বললেন না, একটু হাসলেন। আমার বিশ্বাস তিনি ওই টাকাটা আমায় দেবেন ঠিক করেছিলেন, হয়তো ম্যানেজারকে বলেও ছিলেন। তারপর তিনি যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন ম্যানেজারের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, বারো হাজার টাকা পকেটস্থ করার এই সুযোগ। দাঁড়ান না আমি ওর ভুতুড়ি বার করে ছেড়ে দেব, আমার সঙ্গে চালাকি।'

ডাক্তার পালিত শান্তশিষ্ট গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু দেখিলাম তিনি চটিয়া আগুন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আর বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখা গেল না ; তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং আজ রাত্রেই একটা হেস্তনেস্ত করিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ কান পাতিয়া শুনিল, ডাক্তার পালিতের মোটর চলিয়া গেল। তখন সে লাফাইয়া উঠিয়া পাণ্ডেজিকে বলিল, 'চলুন, এখনি মিস্ ল্যাম্বার্টের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

বিস্মিত পাণ্ডেজি বলিলেন, 'এখন—এই রাত্রে !'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যেতে হলে আজ রাত্রেই যেতে হয়। ডাক্তার পালিত যে-রকম তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, মিস্ ল্যাম্বার্টকে তালিম দিতে গেলেন কিনা বুঝতে পারছি না। চলুন।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'চলুন।'

মিস্ ল্যাম্বার্ট ইঙ্গ-ভারতীয় মহিলা। বয়স হইয়াছে। তাঁহার চেহারায় ইঙ্গ ভাবই প্রবল, চোখ কটা, রঙ ফর্সা। কিন্তু মনটি বোধহয় ভারতীয়। ডিনারের পর পান খাইয়া ঠোঁট দুটি লাল করিয়া বসিয়া রেডিও শুনিতেছিলেন, আমাদের পরিচয় পাইয়া সমাদর সহকারে ড্রয়িংরুমে বসাইলেন। ছোট্ট বাড়ির ছোট্ট ড্রয়িংরুম, বেশ ছিমছাম। মানুষটিও ছিমছাম। ডাক্তার পালিত এদিকে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইল না।

মিস্ ল্যাম্বার্ট হাসিয়া বলিলেন, 'এত রাত্রে আপনাদের কি দিয়ে অতিথি সৎকার করব ? পান খান।' বলিয়া পানের বাটা আমাদের সামনে খুলিয়া ধরিলেন। আমরা পান লইলাম। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আপনার রাত্রে কোথাও যাবার নেই তো ?'

মিস্ ল্যাম্বার্ট বলিলেন, 'না, আজ আমি ফ্রী আছি।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমরা আপনার কাছ থেকে একটা কথা জানতে এসেছি। দীপনারায়ণ সিং মারা গেছেন শুনেছেন কি ?'

মিস্ ল্যাম্বার্টের মুখ গম্ভীর হইল, 'শুনেছি। ডক্টর পালিতের হাতে এরকম ব্যাপার ঘটবে কল্পনা করাও যায় না।'

'আপনি কার কাছে শুনলেন ?'

'ডক্টর জগন্নাথ প্রসাদের কাছে। তারপর অন্য ডক্টরদের মুখেও শুনলাম। সো স্যাড। বলুন আমি কি করতে পারি।'

পাণ্ডেজি তখন আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়টি প্রাঞ্জল করিয়া বলিলেন। মিস্ ল্যাম্বার্ট গভীর মনোযোগের সহিত শুনিয়া দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িলেন, 'ইম্‌পসিবল। আমি দেড় মাস মিস্টার দীপনারায়ণের শুশ্রূষা করেছিলাম, তার মধ্যে কখনও দশ মিনিটের জন্যেও রুগীকে চোখের আড়াল করিনি।'

'আপনি একাই তাঁর শুশ্রূষা করতেন ?'

'না, আমার একজন সহকারিণী ছিলেন—মিস্ দস্তুর। তিনি দিনের বেলা থাকতেন, আর রাত্রিতে আমি। আমাদের অনুপস্থিতি কালে কাউকে রুগীর কাছে যেতে দেওয়া হত না, এমন কি ঝি চাকরকে পর্যন্ত না।'

'হুঁ। কবে থেকে কবে পর্যন্ত আপনারা শুশ্রূষা করেছিলেন ?'

'এক মিনিট, আমার ডায়েরি আপনাকে দেখাচ্ছি।'

মিস্ ল্যাম্বার্ট পাশের ঘর হইতে ডায়েরি আনিয়া পাণ্ডেজির হাতে দিলেন। ডায়েরিতে দিনের পর দিন মিস্ ল্যাম্বার্টের কর্মসূচী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে দেড় মাস দীপনারায়ণ সিং-এর জীবন

লইয়া যমে মানুষে টানাটানি চলিয়াছিল তাহার বিবরণ রহিয়াছে।

রোগীর অবস্থার বর্ণনা পড়িয়া সন্দেহ থাকে না যে ওই দেড় মাস অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন ছিল। তাঁহার জীবন-শক্তি এতই হ্রাস হইয়াছিল যে বিছানায় উঠিয়া বসিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। তারিখ মিলাইয়া দেখা গেল, মিস্ ল্যাম্বার্টের শুশ্রূষার কাল চার মাস আগে আরম্ভ হইয়া আজ হইতে আড়াই মাস আগে শেষ হইয়াছে। তার পরেও দীপনারায়ণ সিং অসুস্থ ছিলেন কিন্তু জীবনের আশঙ্কা তখন আর ছিল না।

ডায়েরি মিস্ ল্যাম্বার্টকে ফেরত দিয়া এবং তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া আমরা বিদায় লইলাম।

রাত্রি সাড়ে ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। বাজারের দোকানপাট বন্ধ। আজ বাড়ি ফিরিয়া সত্যবতীর কাছে বকুনি খাইতে হইবে ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি ফিরিলাম। পাণ্ডেজি আমাদের নামাইয়া দিয়া গেলেন।

এগার

পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে জানা গেল, রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন ; সূর্যদেব কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। সুতরাং আমাদেরও শয্যাত্যাগ করিয়া লাভ নাই।

সাড়ে আটটার সময় সত্যবতী চা দিতে আসিয়া বলিল, 'আজ আবার অমাবস্যা। আজ কেউ বাড়ির বার হতে পাবে না।'

এমন দিনে কে বাহির হইতে চায় ? কিন্তু পাণ্ডেজি শুনলেন না, ঠিক ন'টার সময় পুলিস-বেশে সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা কম্পিত কলেবরে লেপের ভিতর হইতে নির্গত হইলাম। পাণ্ডেজি আমাদের অবস্থা দেখিয়া হাসিলেন। বলিলেন, 'কাল রাত্রে একটা ব্যাপার ঘটেছে।'

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে ব্যোমকেশ জানিতে চাহিল, পাণ্ডেজি সংক্ষেপে ঘটনা বলিলেন—

কাল রাত্রি বারোটা হইতে আকাশে কুয়াশা জমিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তারপর টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি শুরু হয়। পাণ্ডেজির দেরিতে ঘুমানো অভ্যাস ; রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় তিনি শয়নের উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। দীপনারায়ণের বাড়ি হইতে টেলিফোন, যে জমাদারকে রতিকান্ত চারজন কনস্টেবল সঙ্গে পাহারায় রাখিয়াছিল সে টেলিফোন করিতেছে। জমাদার জানাইল—কিছুক্ষণ আগে দুইজন লোক খিড়কির দরজা দিয়া হাতায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু সিপাহীরা সতর্ক ছিল, তাই প্রবেশ করিতে গিয়া সিপাহীদের দেখিয়া পলায়ন করিয়াছে। একজন সিপাহী দূর হইতে তাহাদের উপর টর্চের আলো ফেলিয়াছিল, দু'জনেই কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রশ্রেণীর লোক, কিন্তু তাহাদের সনাক্ত করা যায় নাই। মনে হয় তাহারা মোটর বাইকে চড়িয়া আসিয়াছিল, কারণ কিছুক্ষণ পরে দূরে মোটর বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ শুনা গিয়াছিল।

পাণ্ডেজি রাত্রে আর কিছু করেন নাই, জমাদারকে সতর্কভাবে পাহারা দিবার উপদেশ দিয়া টেলিফোন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তারপর আজ সকালে খোঁজ লইয়া জানিয়াছেন যে রাত্রে আর কোনও উপদ্রব হয় নাই।

ব্যোমকশে ভ্রূ তুলিয়া কিছুক্ষণ পাণ্ডেজির পানে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'নর্মদাশঙ্কর।'

ব্যোমকেশ আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'আমি ভাবছি অন্য লোকটা কে ? নর্মদাশঙ্করই যদি দুষ্মন্ত হয় তাহলে সে কি একজন বয়স্যকে সঙ্গে নিয়ে শকুন্তলার কুঞ্জে যাবে ?—পাণ্ডেজি, আপনার কি মনে হয় ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না। আমি দুটো ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছি, ওয়ারেন্টে আসামীর নাম নেই, দরকার হলে বসিয়ে দেওয়া যাবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে চলুন, নর্মদাশঙ্করের বাড়িতে হানা দেওয়া যাক। হঠাৎ আমাদের দেখলে ঘাবড়ে গিয়ে সত্যি কথা বলে ফেলতে পারে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা তৈরি হইয়া বাহির হইলাম। সত্যবতী কিছু বলিল না, কেবল কটমট করিয়া তাকাইল।

মোটরে উঠিতে গিয়া দেখিলাম ভিতরে একজন পুষ্টকায় সাব-ইন্সপেক্টর বসিয়া আছে। পাণ্ডেজি পরিচয় করাইয়া দিলেন—সাব-ইন্সপেক্টর তিওয়ারী।

তিওয়ারীর চেহারা সাবেক আমলের দারোগার মত। সে পোকা-ধরা দাঁত বাহির করিয়া স্যালুট করিল। বুঝিলাম রতিকান্ত তাহাকেই থানার চার্জে রাখিয়া গিয়াছে।

এদিকে আকাশের অশ্রুবাষ্প ক্রমশ অপসৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সদ্য-জাগ্রত সূর্যদেব শাণিত খড়্গ দিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছিলেন। এতক্ষণ যাহা ভারী মেঘের মত আকাশের বুকে চাপিয়া ছিল তাহা ধূমকুণ্ডলীর মত মিলাইয়া যাইতে লাগিল। আমরা নর্মদাশঙ্করের বাড়িতে পৌঁছিতে পৌঁছিতে কাঁচা সোনালী রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করিয়া উঠিল।

নর্মদাশঙ্করের বাড়ি শহরের নূতন অংশে। ঢালাই লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা, সামনে টেনিস কোর্ট। আমরা বাহিরে মোটর রাখিয়া যথাসম্ভব নিঃশব্দে প্রবেশ করিলাম। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল এখনও এ বাড়ির ভাল করিয়া ঘুম ভাঙে নাই। সম্মুখের বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া একটা নিদ্রালু চাকর কয়েক জোড়া জুতা বুরুশ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া কিছুক্ষণ মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ তাহার কাছে গিয়া টপ করিয়া এক জোড়া জুতা তুলিয়া লইল এবং উল্টাইয়া দেখিল। চাকরকে প্রশ্ন করিল, 'এ জুতো কার?'

চাকরটা হাঁ-করা অবস্থায় বলিল, 'মালিকের।'

ব্যোমকেশ জুতা জোড়ার তলদেশ আমাদের দেখাইল। তলায় কাদা লাগিয়া আছে। রাত্রি বারোটার পর যে এই জুতা ব্যবহার হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সময় বাড়ির ভিতর দিক হইতে একজন উচ্চশ্রেণীর উর্দিপরা বেয়ারা বাহির হইয়া আসিল। সেও দু'জন পুলিস অফিসারকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। পাণ্ডেজি কড়া সুরে তাহাকে বলিলেন, 'নর্মদাশঙ্করবাবু কোথায়?'

বেয়ারা ভয় পাইয়া বলিল, 'আজ্ঞে, তিনি বাড়িতেই আছেন।'

'নিয়ে চল আমাদের তাঁর কাছে।'

বেয়ারা একবার একটু ইতস্তত করিল, তারপর পথ দেখাইয়া আমাদের লইয়া চলিল। বাড়ির অভ্যন্তর যতদূর দেখিলাম সুরুচির সহিত সজ্জিত। বেয়ারা আমাদের একটি দরজার সম্মুখে আনিয়া পর্দা সরাইয়া দাঁড়াইল। আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ঘরের জানালা দরজা বন্ধ, বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। ঘরটিকে শিকারের ঘর বলা চলে। মেঝেয় বাঘ ও হরিণের চামড়া ছড়ানো, দেয়ালে বাঘ ও হরিণের মুণ্ড। একটি কাচের আলমারিতে রাইফেল বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি সাজানো রহিয়াছে। ঘরের মাঝখানে একটি গোল টেবিল, তাহাকে ঘিরিয়া কয়েকটি গদি-মোড়া আরাম-কেদারা।

আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দুটি লোক মুখোমুখি দুটি কেদারায় বসিয়া আছে; তাহাদের হাতে কাচের গেলাসে রঙীন তরল পদার্থ। পাশের টেবিলে সোডা ও হুইস্কির বোতল। সুতরাং গেলাসের তরল পদার্থ যে কী বস্তু তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। বোধহয় মধ্য রাত্রে যে সোমযাগ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখনও চলিতেছে।

আমাদের দিকে মুখ করিয়া যে লোকটি বসিয়া ছিল সে ঘোড়া জগন্নাথ। ঘোলাটে চোখে আমাদের দেখিতে পাইয়া তাহার সমস্ত শরীর বিদ্যুৎপৃষ্টের মত ঝাঁকানি দিয়া উঠিল; হাতের

গেলাস হইতে তরল পদার্থ চল্‌কাইয়া পড়িল। তখন নর্মদাশঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল। তাহার আরক্ত মুখে ভ্রূকুটি দেখা দিল। সে রূঢ় স্বরে বলিল, 'কি চাই ?'

মদের বিচিত্র প্রভাব ; পেটে মদ পড়িলে মানুষের চরিত্র বদলাইয়া যায়। কেহ কাঁদে, কেহ গান গায়, কেহ বা যুযুৎসু হইয়া ওঠে। নর্মদাশঙ্করের বিনীত বশংবদ ভাব আর নাই, সে উগ্র স্পর্ধিত চক্ষে আমাদের পানে চাহিয়া রহিল।

পাণ্ডেজি তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে পুলিসী কঠোরতা ফুটিয়া উঠিল, 'আপনাদের দু'জনের নামে ওয়ারেন্ট আছে।'

নর্মদাশঙ্কর মদের গেলাস হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল, উদ্ধত বিস্ময়ে বলিল, 'ওয়ারেন্ট ! আমার নামে ? কিসের ওয়ারেন্ট ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আপনারা দু'জনে কাল রাত্রি একটার সময় দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়িতে ট্রেস্‌পাস করেছিলেন।'

'প্রমাণ আছে ?'

পাণ্ডেজি অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, 'আছে। পুলিসের লোকে আপনাকে দেখেছে।'

নর্মদাশঙ্করের রক্ত-রাঙা চোখে কুটিল বজ্জাতি খেলিয়া গেল, সে ঠোঁটের একটা তেরছা ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'যদি বলি শকুন্তলা আমাকে ডেকেছিল তাহলেও কি ট্রেস্‌পাস হবে ?'

'সেকথা আদালতে বলবেন।—সাব-ইন্সপেক্টর তিওয়ারী—' পাণ্ডেজি তিওয়ারীকে ইঙ্গিত করিলেন, তিওয়ারী পকেট হইতে দুই জোড়া হাতকড়া বাহির করিল।

হাতকড়া দেখিয়া ঘোড়া জগন্নাথ হাউমাউ করিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে চুপটি করিয়া ছিল, নাক ঝাড়ার শব্দ পর্যন্ত করে নাই। এখন মদের গেলাস টেবিলে রাখিয়া দু'হাতে পাণ্ডেজির হাত চাপিয়া ধরিল, ব্যগ্র মিনতির কণ্ঠে বলিল, 'পাণ্ডেজি, দোহাই আপনার, হাতে হাতকড়া পরাবেন না। আমরা সত্যিকারের দোষ কিছু করিনি, আপনাকে সব কথা বলছি—না না, নর্মদাশঙ্কর, তুমি চুপ কর, গোঁয়ার্তুমি কোরো না—এসব কেচ্ছা জারি হয়ে পড়লে শহরে আর মুখ দেখানো যাবে না। পাণ্ডেজি, আমার বয়ান শুনুন—'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আপনি যদি সত্যি কথা বলেন শুনতে রাজী আছি।'

'সত্যি কথা বলব, কোনও কথা লুকোব না।'

'বেশ, শুনে যদি মনে হয় আপনাদের কোনও মন্দ অভিপ্রায় ছিল না, তাহলে অ্যারেস্ট নাও করতে পারি।—নর্মদাশঙ্করবাবু, আপনি যান, অনেক মদ খেয়েছেন, বিছানায় শুয়ে থাকুন গিয়ে। দরকার হলে ডাকব।'

এতক্ষণে নর্মদাশঙ্করেরও কতকটা হুঁশ হইয়াছিল ; সে আমাদের দিকে একটি ব্যর্থ ক্রোধের জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মদের বোতলটা তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

আমরা তখন উপবেশন করিলাম। ঘোড়া জগন্নাথ কোঁৎ কোঁৎ করিয়া গেলাসের বাকি মদ গলাধঃকরণ করিয়া যে ঘটনা বিবৃত করিল তাহার মর্মার্থ এইরূপ—

নর্মদাশঙ্করের সঙ্গে ঘোড়া জগন্নাথের বন্ধুত্ব খুব গাঢ় নয় ; তবে নর্মদাশঙ্করের বাড়িতে আসিলে বিনা পয়সায় বিলাতি মদ পাওয়া যায়, তাই জগন্নাথ তাহার সহিত একটা বাহ্যিক সৌহৃদ্য রাখিয়াছে। কাল রাত্রে জগন্নাথ আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল, তারপর এখানেই আহারাদি সম্পন্ন করে। অন্যান্য বন্ধুরা প্রস্থান করিলে জগন্নাথ ও নর্মদাশঙ্কর এই ঘরে আসিয়া মদ্য পান করিতে আরম্ভ করে। নর্মদাশঙ্করকে কাল সন্ধ্যাকালে পুলিস শকুন্তলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেয় নাই, সেজন্য তাহার মনে গভীর ক্ষোভ ছিল ; মদ খাইতে খাইতে এই প্রসঙ্গই আলোচনা হয়। ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ নর্মদাশঙ্কর বলিল, আজ রাত্রে যেমন করিয়া হোক শকুন্তলার সহিত দেখা করিবে। জগন্নাথ তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে শুনিল না। তখন দুইজনে মোটর বাইকে চড়িয়া বাহির হইল, জগন্নাথ মোটর বাইকের পিছনের আসনে বসিল। দীপনারায়ণের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছিয়া তাহারা

আমবাগানের মধ্যে মোটর বাইক লুকাইয়া রাখিল, তারপর খিড়কির দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কিন্তু পুলিস পাহারায় ছিল, খিড়কির দরজা পার হইতে না হইতে তাহারা বৈদ্যুতিক টর্চের আলো ফেলিয়া আগন্তুক দুটিকে দেখিতে পাইল। দু'জনে তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া পলায়ন করিল এবং মোটর বাইকে চাপিয়া ফিরিয়া আসিল। তারপর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত তাহারা এখানে বসিয়া মদ্য পান করিয়াছে। তাহাদের কোনও বে-আইনী অভিসন্ধি ছিল না, মদের ঝোঁকে একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। এখন এই সব বিবেচনা করিয়া পাণ্ডেজি নিজ গুণে তাহাদের ক্ষমা করুন।

ঘোড়া জগন্নাথের অনুনয়াক্ত বিবৃতি শেষ হইবার পর পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের দিকে ভ্রূভঙ্গ করিলেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে নর্মদাশঙ্করবাবুর সম্বন্ধটা ঠিক কোন ধরনের ?'

জগন্নাথ সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, 'দেখুন, ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। মানে—'

'মানে—আপনি বলবেন না ?'

জগন্নাথ আরও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, 'না না, বলব না কেন ? তবে ওসব কথায় আমি থাকি না—আমি একজন রেস্‌পেক্টেবল ডাক্তার—কাজ কি আমার পরের হাঁড়িতে কাঠি দিয়ে।'

'বটে! আপনি পরের হাঁড়িতে কাঠি দেন না! কেবল ডাক্তার পালিতের কম্পাউন্ডার খুবলালকে চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য ভয় দেখিয়েছিলেন।'

খুবলালের উল্লেখে ঘোড়া জগন্নাথ একবারে কেঁচো হইয়া গেল—'আমি—মানে আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকথা যাক। শকুন্তলার সঙ্গে নর্মদাশঙ্করের ঘনিষ্ঠতা কতদূর গড়িয়েছে তা আপনি জানেন না ?'

'সত্যি বলছি নটঘটের কথা আমি কিছু জানি না।'

'কাল রাত্রে নর্মদাশঙ্কর কিছু বলেনি ?'

'নর্মদাশঙ্কর ভারি মিথ্যেবাদী। ও মনে করে দুনিয়ার সব মেয়ে ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ওর কথা বিশ্বাস করা যায় না।'

'অর্থাৎ বলেছিল। কী বলেছিল ?'

'বলেছিল শকুন্তলার সঙ্গে অনেক দিন ধরে ওর প্রেম চলছে। এলাহাবাদে ওরা এক কলেজে পড়ত, তখন থেকে প্রেম।'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, নীরসকণ্ঠে বলিল, 'হুঁ! আজ আপনি ছাড়া পেলেন। কিন্তু পরে হয়তো আদালতে সাক্ষী দিতে হবে। শহর ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করবেন না, তাহলেই হাতে হাতকড়া পড়বে। চলুন, পাণ্ডেজি।'

বার

দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়িতে পৌঁছিয়া পাণ্ডেজি তিওয়ারীকে বলিলেন, 'তুমি এবার থানায় ফিরে যাও, তোমাকে এখানে আর দরকার নেই।' তিওয়ারী প্রস্থান করিলে তিনি ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন, 'অতঃ কিম্‌ ?'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল, 'আসুন, সেরেস্তার দিকে যাওয়া যাক। মনে হল যেন ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে সুট করে দপ্তরখানায় ঢুকে পড়লেন।'

ফটক অতিক্রম করিয়া আমরা সেরেস্তার দিকে চলিলাম। পথে জমাদারের সঙ্গে দেখা হইল ; সে পাণ্ডেজিকে স্যালুট করিয়া জানাইল, সব ঠিক আছে।

সেরেস্তার ঘরগুলি কাল আমরা বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম। এক সারিতে গুটি তিনেক ঘর ;

প্রত্যেক ঘরে তক্তপোশের উপর জাজিম পাতা। কয়েকজন কেরানি বসিয়া কাজ করিতেছে। ম্যানেজার গঙ্গাধর যখন দেখিলেন আমাদের এড়াইতে পারিবেন না, তখন তিনি সেরেস্তা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে এক তাড়া বহির্গামী চিঠি। আমাদের যেন এই মাত্র দেখিতে পাইয়াছেন এমনিভাবে মুখে একটি সচেষ্ট হাসি আনিয়া বলিলেন, 'এই যে !'

ব্যোমকেশ চিঠিগুলি লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'দেওয়ানজি, আপনার সেরেস্তা থেকে রোজ কত চিঠি ডাকে যায় ?'

দেওয়ানজি চিঠিগুলি একজন পিওনের হাতে দিলেন, পিওন সেগুলি লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল ; বাড়ির কোণে যে ডাক-বাক্স আছে তাহাতেই ফেলিতে গেল সন্দেহ নাই। দেওয়ানজি বলিলেন, 'তা কুড়ি-পঁচিশখানা যায়। অনেক লোককে চিঠি দিতে হয়—উকিল মোক্তার খাতক প্রজা—'

ব্যোমকেশ বলিল,'বাড়ির কোণে যে ডাক-বাক্সটা আছে তাতেই সব চিঠিপত্র ফেলা হয় ?'

গঙ্গাধর বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। ও ডাক-বাক্সটা আমরা ডাক বিভাগের সঙ্গে লেখালেখি করে ওখানে বসিয়েছি। হাতের কাছে একটা ডাক-বাক্স থাকলে সুবিধা হয়।'

'তা তো বটেই। ক'বার ক্লিয়ারেন্স হয় ?'

'একবার ভোর সাতটায়, একবার বিকেল চারটেয়। কিন্তু কেন বলুন দেখি ? ডাক-বাক্সের সঙ্গে আপনাদের তদন্তের কোনও সম্পর্ক আছে নাকি ?'

'থাকতেও পারে। দেওয়ানজি, আমাদের ভাষায় এক বয়েৎ আছে—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার লুকানো রতন। কিন্তু যাক ওকথা। এদিকের খবর কি ?'

গঙ্গাধর হাত উল্টাইয়া বলিলেন, 'খবর আমি তো কিছুই জানি না। এমন কি মালিকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ পর্যন্ত এখনও জানতে পারিনি। সত্যিই কি ইনজেকশনে বিষ ছিল ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তারেরা তো তাই বলেছেন। ভাল কথা, ডাক্তার পালিতের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?'

গঙ্গাধর বংশীর মুখখানি হঠাৎ যেন চুপসিয়া গেল, চক্ষু দুটি কোটরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ঈষৎ স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'দেখা হয়েছিল। তিনি টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করছেন।'

'আপনি কি নিজের হাতে টাকা দিয়েছিলেন ?'

গঙ্গাধর আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'না, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার টাকা দিয়েছিল।'

'অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মানে—আপনার ছেলে লীলাধর বংশী ?'

গঙ্গাধর বুজিয়া যাওয়া কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। মুশকিল হয়েছে, রসিদ নেওয়া হয়নি। ডাক্তার পালিত যে এ রকম করবেন—'

'সত্যিই তো—ভাবাও যায় না।—তা লীলাধরবাবু এখন কোথায় ?'

'সে—সে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে।'

'তাই নাকি ! কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে ছিলেন, দেবনারায়ণের ঘরে বসে তাড়ি খাচ্ছিলেন, আজ একেবারে শ্বশুরবাড়ি।'

গঙ্গাধর অস্পষ্ট জড়িতস্বরে বলিলেন, 'তার স্ত্রীর অসুখ...হঠাৎ খবর পেয়ে চলে গেছে।'

'হুঁ'—ব্যোমকেশের চোখে দুষ্ট-বুদ্ধি নাচিয়া উঠিল, সে তখন চিন্তা-মন্থর ভঙ্গীতে বলিল, 'টাকা তো কম নয়—বারো হাজার। স্টেটের এতগুলো টাকা মারা যাবে, দেওয়ানজি, আপনার উচিত পুলিসে এত্তেলা দেওয়া। রসিদ না দিলেও টাকা যে ডাক্তার পালিত নিয়েছেন তা পুলিস অনুসন্ধান করে বার করতে পারবে।—কি বলেন পাণ্ডেজি ?'

পাণ্ডেজি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'নিশ্চয়। ম্যানেজার সাহেব বলুন, আমরা এখনি তদন্ত আরম্ভ

করছি। দপ্তরের সমস্ত কাগজপত্র আমরা পরীক্ষা করে দেখব ; যদি কোথাও গরমিল থাকে ধরা পড়বেই। ডাক্তার পালিত এবং লীলাধরকেও জেরা করব, তাঁদের তল্লাসী নেব—'

ব্যোমকেশ ও পাণ্ডেজি মিলিয়া ম্যানেজার সাহেবকে কোন অতট প্রপাতের কিনারায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন তাহা অনুমান করা তাঁহার মত গভীর জলের মাছের পক্ষে কঠিন নয়। তিনি উদাসভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না, ডাক্তার পালিত যখন অস্বীকার করছেন তখন আমিই ও-টাকা পুরিয়ে দেব। আমার লোকসানের বরাত, গচ্ছা দিতে দিতেই জন্ম কেটে গেল।' বলিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিল। পাণ্ডেজি গলার মধ্যে একটা আওয়াজ করিলেন, কিন্তু আওয়াজটা সহানুভূতিসূচক নয়।

দেওয়ানজিকে সেরেস্তায় রাখিয়া আমরা বাড়ির সদরে উপস্থিত হইলাম। বাহিরের হল-ঘরে একজন সিপাহী পাহারায় ছিল ; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, বাড়ির সবাই উপরতলায় আছে। আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া আছে চাঁদনী ; চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ, মাথার চুল এলোমেলো। তাহার চেহারা যদি স্বভাবতই মিষ্ট এবং নরম না হইত তাহা হইলে বলিতাম, রণরঙ্গিনী মূর্তি। সে আমাদের দেখিবামাত্র কোনও প্রকার ভূমিকা না করিয়া আরম্ভ করিল, 'আপনারা নাকি চাচিজির কাছে আমার যাওয়া বারণ করে দিয়েছেন। কী ভেবেছেন আপনারা ? আমি চাচিজিকে বিষ খাওয়াব ?'

অতর্কিত আক্রমণে আমরা বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। ব্যোমকেশ অসহায়ভাবে পাণ্ডেজির পানে চাহিল, পাণ্ডেজি মাথা চুলকাইয়া অপ্রস্তুতভাবে বলিলেন, 'দেখুন, শুধু আপনাকেই বারণ করা হয়নি, ওঁর কাছে এখন কারুরই যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আর দু'চার দিনের মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার আপনারা ওঁর কাছে যেতে পারবেন।'

চাঁদনী আবেগভরে বলিল, 'কিন্তু কেন ? আমি ওঁর যেমন সেবা করতে পারব আর কেউ কি তেমন পারবে ? তবে কেন আমাকে ওঁর কাছে যেতে দেওয়া হবে না ? উনি অসুস্থ, এতবড় শোক পেয়েছেন—'

চাঁদনীর চোখ দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল। এবার পাণ্ডেজি অসহায়ভাবে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন।

ব্যোমকেশ এতক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে, সে শান্তকণ্ঠে বলিল, 'আপনি বোধহয় জানেন না, শকুন্তলা দেবী অন্তঃসত্ত্বা। তার ওপর এতবড় আঘাত পেয়েছেন। ওঁর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ, তাই মিস্ মান্নাকে ওঁর কাছে রাখা হয়েছে। আপনারা ওঁর নিজের লোক, আপনারা ওঁর কাছে বেশি যাওয়া-আসা করলে ওঁর মন আরও বিক্ষিপ্ত হবে, তাতে ওঁর শরীরের অনিষ্ট হতে পারে। তাই ওঁর কাছ থেকে কিছুদিন আপনাদের দূরে থাকাই ভাল।'

ব্যোমকেশ কথা বলিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদনী সম্মোহিতের ন্যায় স্থির চক্ষু হইয়া গিয়াছিল। ব্যোমকেশ থামিলে সে তন্দ্রাহতের মত অস্ফুট স্বরে বলিল, 'অন্তঃসত্ত্বা—' তারপর তেমনই মোহাচ্ছন্নভাবে নিজের মহলের দিকে ফিরিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনুন। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে—' চাঁদনী ফিরিয়া দাঁড়াইল—'দীপনারায়ণবাবুকে যখন ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় তখন আপনি উপস্থিত ছিলেন ?'

প্রশ্নটা চাঁদনী পুরা শুনিতে পাইল কিনা বলা যায় না, অস্পষ্টভাবে বলিল, 'ছিলাম।'

'সেখানে আর কেউ ছিল ?'

'জানি না। লক্ষ্য করিনি।'

'মন দিয়ে আমার প্রশ্ন শুনুন। ডাক্তারবাবু কি কি করলেন মনে করবার চেষ্টা করুন।'

'ডাক্তারবাবু ইন্‌জেকশন দিতেই চাচাজি এলিয়ে পড়লেন। তখন ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি আর একটা ইন্‌জেকশন দিলেন। আমি ছুটে গেলাম চাচিজিকে খবর দিতে। ফিরে এসে দেখি সব

শেষ হয়ে গেছে।'

'ফিরে এসে সেখানে আর কাউকে দেখেছিলেন ?'

'মনে নেই। বোধহয় দেওয়ানজি ছিলেন, আর কাউকে লক্ষ্য করিনি।'—চাঁদনী আর প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া নিজের মহলে চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ মাটির দিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে মুখ তুলিয়া বলিল, 'চলুন, এবার শকুন্তলা দেবীর ঘরে যাওয়া যাক।'

আগে আগে ব্যোমকেশ, পিছনে আমরা চলিলাম। বসিবার ঘর শূন্য, আসবাবগুলির উপর সূক্ষ্ম ধূলার আস্তরণ পড়িয়াছে। পরের ঘরটিও তাই। তৃতীয় কক্ষে, অর্থাৎ শকুন্তলার গানবাজনার ঘরের সম্মুখে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'দাঁড়ান, ছবিটা আর একবার দেখে নিই।'

ব্যোমকেশ ঘরে প্রবেশ করিল। আমরা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম, ছবি দেখিবার বিশেষ আগ্রহ আমাদের ছিল না।

যে দেয়ালে দুষ্মন্ত শকুন্তলার পূর্বরাগ চিত্রটি আঁকা ছিল ব্যোমকেশ সেইদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। পাঁচ মিনিট আর তাহার দেখা নাই। আমি দরজা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলাম সে মগ্ন-সমাহিত হইয়া ছবি দেখিতেছে। আমি একটু শ্লেষ করিয়া বলিলাম, 'কি হে, একেবারে তন্ময় হয়ে গেলে যে ! কী দেখছ এত ?'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে ফিরিল। দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে, যেন একটা অভিভূত বিস্ময়াহত ভাব। সে আমার কথার উত্তর দিল না, মখমলের বিছানায় আসিয়া বসিল, উত্থিত হাঁটু দুটাকে বাহু দিয়া জড়াইয়া শূন্য পানে চাহিয়া রহিল।

তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া পাণ্ডেজি ও আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। পাণ্ডেজি ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, কি হয়েছে ? ছবিতে কি দেখলেন ?' ব্যোমকেশ এবারও উত্তর দিল না ; পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া অতি যত্নে ধরাইল, তারপর সুদীর্ঘ টান দিয়া আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

আমি পাণ্ডেজির সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিলাম, তারপর দু'জনে একসঙ্গে গিয়া ছবির সম্মুখে দাঁড়াইলাম। ছবি কাল যেমন দেখিয়াছিলাম, আজ দিনের আলোয় তাহার কোনও তফাৎ দেখিলাম না। শকুন্তলা তেমনি তরু-আলবালে জল সেচন করিতেছেন, দুষ্মন্ত তেমনি গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছেন। তবে ব্যোমকেশ হঠাৎ এমন বোবা হইয়া গেল কেন ?

আমরা ফিরিয়া গিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে বসিলাম এবং একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। সে সিগারেট সম্পূর্ণ শেষ করিয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল, তারপর পাণ্ডেজির হাত ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, 'একটি অনুরোধ রাখতে হবে।'

'কি অনুরোধ ?'

'আমি একা শকুন্তলার ঘরে গিয়ে তাঁকে জেরা করব, সেখানে আর কেউ থাকবে না।'

'বেশ তো। কিন্তু কী পেলেন ?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, 'সব পেয়েছি। আপনারাও তো ছবি দেখলেন, কিছু পেলেন না ?'

পাণ্ডেজি ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'কৈ আর পেলাম। কাল রাত্রেও ছবি দেখেছি, আজও দেখলাম, কিন্তু রহস্যের চাবি তো পেলাম না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল রাত্রে নিওন-লাইটের নীল আলোতে দেখেছিলেন, কিন্তু আজ দিনের আলোয় দেখেছেন। আজ দেখতে না পাওয়ার কোনও কারণ নেই। যাহোক, আপনারা সামনের ঘরে গিয়ে বসুন, আমি আধঘন্টার মধ্যে আসছি।'

ব্যোমকেশ গিয়া শকুন্তলার দ্বারে টোকা দিল, দ্বার খুলিয়া মিস্ মান্না বাহিরে আসিলেন। ব্যোমকেশ নিম্নস্বরে তাঁহাকে কিছু বলিল, তিনি ঘাড় নাড়িয়া আমাদের কাছে চলিয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ শকুন্তলার ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

তের

আমরা তিনজনে সামনের ঘরে গিয়া বসিলাম। মিস্ মান্না উৎসুক চোখে আমাদের পানে চাহিলেন। আমরা আর কী বলিব, নিজেরাই কিছু জানি না, মুখ ফিরাইয়া যামিনী রায়ের ছবি দেখিতে লাগিলাম।

পঁচিশ মিনিট পরে ব্যোমকেশ আসিল। তাহার মুখে চোখে কঠিন ক্লান্তি, যেন বুদ্ধির যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অতি কষ্টে জয়ী হইয়াছে। সে মিস্ মান্নার পাশে বসিয়া নিম্ন কণ্ঠে তাঁহাকে নির্দেশ দিল। নির্দেশের মর্মার্থ: আজ রাত্রি সওয়া দশটা পর্যন্ত এক লহমার জন্য তিনি শকুন্তলাকে চোখের আড়াল করিবেন না, বা অন্য কাহারও সহিত জনান্তিকে কথা বলিতে দিবেন না। সওয়া দশটার পর মিস্ মান্নার ছুটি, তিনি তখন নিজের বাসায় ফিরিয়া যাইবেন। মিস্ মান্না নির্দেশ শুনিয়া পাণ্ডেজির প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, প্রত্যুত্তরে পাণ্ডেজি ঘাড় হেলাইয়া সায় দিলেন। মিস্ মান্না তখন শকুন্তলার ঘরে চলিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ পর্যায়ক্রমে আমার ও পাণ্ডেজির মুখের পানে চাহিয়া শুষ্ক হাসিল, 'চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কিন্তু—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'এখানে নয়। বাড়ি যেতে যেতে সব বলব।'

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ি হইতে বাহির হইবার পূর্বে জলযোগ করিতে করিতে ব্যোমকেশ আড় চোখে সত্যবতীর পানে চাহিয়া বলিল, 'আজ আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে।'

সত্যবতী মুখ ভার করিয়া বলিল, 'তা তো হবেই। আজ অমাবস্যা, তার ওপর আমি বেরুতে মানা করেছি, আজ দেরি হবে না তো কবে হবে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ অমাবস্যা নাকি! আরে, খুব লাগসৈ হয়েছে তো।'

সত্যবতী বলিল, 'হয়েছে বুঝি? ভাল।'

ব্যোমকেশ বলিল 'অজিত কবি মানুষ, ওকে জিগ্যেস কর, অভিসার করবার জন্যে অমাবস্যার রাত্রিই প্রশস্ত।'

'তা সারা রাত্রি ধরেই কি অভিসার চলবে?'

'আরে না না, বারোটা-একটার মধ্যেই ফিরব।'

সত্যবতী চকিত উদ্বেগ ভরে চাহিল, 'বারোটা-একটা?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে লঘুস্বরে বলিল, 'তুমি ভেবো না। ফিরে এসে তোমাকে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যান শোনাব।—চল, অজিত।'

সত্যবতী শঙ্কিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, আমরা বাহির হইলাম।

আমরা পাণ্ডেজির বাসায় না গিয়া সটান দীপনারায়ণের বাড়িতে গেলাম; সেই রূপই কথা ছিল। পাণ্ডেজি বাহিরের হল-ঘরে গদি-মোড়া চেয়ারে বসিয়া দুই পা সম্মুখ দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন, আমাদের দেখিয়া খাড়া হইয়া বসিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'রতিকান্ত বক্সার থেকে এখনও ফেরেননি?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'না। থানায় খবর দেওয়া আছে। ফিরেই এখানে আসবে।'

অতঃপর আমরা তিনজনে বসিয়া নীরবে সিগারেট টানিতে লাগিলাম। অন্ধকার হইলে পাণ্ডেজি উঠিয়া একটা আলো জ্বালিয়া দিলেন, তাহাতে ঘরের কিয়দংশ আলোকিত হইল মাত্র।...ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী একবার বাহির হইতে উঁকি মারিয়া নিঃসাড়ে অপসৃত হইলেন। চাঁদনী নীচে নামিয়া আসিয়া আমাদের দেখিয়া চুপি চুপি আবার উপরে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা চাকর আসিয়া তিন পেয়ালা চা দিয়া গেল। আমরা চা পান করিলাম।...বাড়িটা যেন ভুতুড়ে বাড়ি; শব্দ নাই, ঘরের আনাচে কানাচে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা তিনটি প্রতীক্ষমান প্রেতাত্মার মত বসিয়া আছি; কেন বসিয়া আছি তাহা গভীর রহস্যে আবৃত।

পৌনে আটটার সময় রতিকান্ত আসিল। পরিধানে আগাগোড়া পুলিস বেশ, চোখে চাপা উত্তেজনা। সে পাণ্ডেজিকে স্যালুট করিয়া তাঁহার পাশের চেয়ারের কিনারায় বসিল, পাণ্ডেজির দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, 'প্রমাণ পেয়েছি—ডাক্তার পালিতের কাজ।'

পাণ্ডেজি তীক্ষ্ণ নেত্রে রতিকান্তের পানে চাহিয়া রহিলেন, বলিলেন, 'প্রমাণ পেয়েছ ? কি প্রমাণ—'

রতিকান্ত বলিল, 'কয়েদীটা স্বীকার করেছে। প্রথমে কিছুই বলতে চায় না, অনেক জেরা করার পর স্বীকার করল যে, পালিত তার কাছে কিউরারি কিনেছে।'

'তাই নাকি ?' পাণ্ডেজি যেন আত্ম-সমাহিত হইয়া পড়িলেন।

রতিকান্ত উৎসুকভাবে বলিল, 'তাহলে এবার বোধহয় পালিতকে অ্যারেস্ট করা যেতে পারে ?'

'দাঁড়াও, অত তাড়াতাড়ি নয়। একটা ছিঁচকে চোরের সাক্ষীর ওপর ডাক্তার পালিতের মত লোককে অ্যারেস্ট করা নিরাপদ নয়। এদিকে আমরাও কিছু খবর সংগ্রহ করেছি—' বলিয়া পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। রতিকান্ত উচ্চকিত হইয়া ব্যোমকেশের পানে চোখে ফিরাইল, 'কি খবর ?'

'বলছি'—ব্যোমকেশ একবার সতর্কভাবে বৃহৎ কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল, তারপর চেয়ার টানিয়া রতিকান্তের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। আবছায়া আলোয় চারিটি মাথা একত্রিত হইল। চুপি চুপি কথা হইতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ সকালবেলা শকুন্তলা দেবীকে জেরা করেছিলাম। প্রথমটা তিনি চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়লেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে অপরাধীকে তিনি চেনেন, অপরাধী তাঁর—গুপ্ত-প্রণয়ী। ...' ব্যোমকেশ চুপ করিল। রতিকান্ত নির্নিমেষ চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল, 'কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কিছুতেই অপরাধীর নাম বলছেন না।'

রতিকান্ত বলিয়া উঠিল, 'নাম বলছেন না।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'না। শকুন্তলা স্ত্রীলোক, তাঁর লজ্জা সঙ্কোচ আছে, কলঙ্কের ভয় আছে, তাই তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা করেও অপরাধীর নাম তাঁর মুখ থেকে বার করতে পারলাম না।'

রতিকান্ত সোজা হইয়া বসিল, ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, 'আমি একবার চেষ্টা করে দেখব ? আমি যদি একলা গিয়ে তাঁকে জেরা করি, তিনি হয়তো নামটা বলতে পারেন।'

পাণ্ডেজি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'এখন আর হবে না, তিনি মুখ ফুটে কিছু বলবেন না। তবে অন্য একটা উপায় হয়েছে—'

'কি উপায় হয়েছে ?' রতিকান্ত পাণ্ডেজির দিক হইতে ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইল।

ব্যোমকেশ গলা আরও খাটো করিয়া বলিল, 'অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর শকুন্তলা রাজী হয়েছেন, চিঠি লিখে পাণ্ডেজিকে অপরাধীর নাম জানাবেন। ব্যবস্থা হয়েছে, এখানে যে-সব পুলিস মোতায়েন আছে তাদের সরিয়ে নেওয়া হবে। শকুন্তলার কাছে থাকবেন শুধু মিস্ মান্না। আর কাউকে তাঁর কাছে যেতে দেওয়া হবে না। রাত্রি সওয়া দশটার মধ্যে মিস্ মান্না শকুন্তলাকে একলা রেখে নিজের বাসায় ফিরে যাবেন। তখন শকুন্তলা চিঠি লিখে নিজের হাতে ডাক-বাক্সে ফেলে আসবেন। লোকাল চিঠি, কাল বেলা দশটা-এগারোটার সময় আমরা সে চিঠি পাব।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না, চারটি মুণ্ড একত্রিত হইয়া রহিল। শেষে রতিকান্ত বলিল, 'তাহলে আপনাদের মতে ডাক্তার পালিত অপরাধী নয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার পালিতও হতে পারে, এখনও কিছু বলা যায় না। আবার নর্মদাশঙ্করও হতে পারে। কাল নিশ্চয় জানা যাবে।' বলিয়া সকালবেলা নর্মদাশঙ্করের বাড়িতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত করিল।

শুনিয়া রতিকান্ত চুপ করিয়া রহিল। পাণ্ডেজি হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, 'আজ তাহলে ওঠা যাক। ব্যোমকেশবাবু, আপনারাও চলুন আমার বাসায়। রতিকান্ত, তুমিও চল, সবাই মিলে কেসটা আলোচনা করা যাবে। তুমি আজ সারাদিন ছিলে না, ইতিমধ্যে অনেক ব্যাপার ঘটেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা কিন্তু আজ সকাল সকাল বাড়ি ফিরব। গিন্নী ভীষণ রেগে আছেন।'

আমরা বাহিরে আসিলাম। রতিকান্ত জমাদারকে ডাকিয়া পাহারা তুলিয়া লইতে বলিল। তারপর চারজনে পাণ্ডেজির মোটরে চড়িয়া বাহির হইলাম।

বহ্নি ও পতঙ্গের কাহিনী শেষ হইয়া আসিতেছে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, এ কাহিনীর শেষ নাই, সারা সংসার জুড়িয়া আবহমান কাল এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। কখনও পতঙ্গ তিল তিল করিয়া পুড়িয়া মরে, কখনও মুহূর্তমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

বক্ষ্যমান বহ্নি ও পতঙ্গের খেলা শেষ হইয়া যাইবার পর আমি ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আচ্ছা ব্যোমকেশ, এখানে পতঙ্গ কে ? বহ্নিই বা কে ?'

ব্যোমকেশ বলিয়াছিল, 'দু'জনেই বহ্নি, দু'জনেই পতঙ্গ।'

কিন্তু থাক। পরের কথা আগে বলিয়া রসভঙ্গ করিব না। সে-রাত্রে আটটা বাজিতেই ব্যোমকেশ ও আমি পাণ্ডেজির বাড়ি হইতে বাহির হইলাম ; পাণ্ডেজি ও রতিকান্ত বসিয়া কেস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। বক্সার হইতে রতিকান্ত কয়েদীর যে জবানবন্দী লিখিয়া আনিয়াছিল তাহারই আলোচনা।

বাহিরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তার ধারে আলো দু' একটা আছে বটে কিন্তু তাহা রাত্রির তিমির হরিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পাটনার পথঘাট ভাল চিনি না, এই অমাবস্যার রাত্রে চেষ্টা করিয়া কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব এ আশা সুদূরপরাহত। আমরা মনে মনে একটা দিক আন্দাজ করিয়া লইয়া হোঁচট খাইতে খাইতে চলিলাম। মনের এমন অগোছালো অবস্থা যে একটা বৈদ্যুতিক টর্চ আনিবার কাথাও মনে ছিল না। ভাগ্যক্রমে কিছুদূর যাইতে না যাইতে ঠুন্‌ঠুন ঝুন্‌ঝুন্ আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। একটা ধোঁয়াটে আলো মন্থর গতিতে আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কাছে আসিলে একটি এক্কার আকৃতি অস্পষ্টভাবে রূপ পরিগ্রহ করিল। ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া হাঁকিল—'দাঁড়া। ভাড়া যাবি ?'

এক্কা দাঁড়াইল। আপাদমস্তক কম্বলে মোড়া এক্কাওয়ালার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, 'না বাবু, আমার ঘোড়া থকে আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশি দূর নয়, দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ি। যাবি তো চল, বকশিস পাবি।'

এক্কাওয়ালা বলিল, 'আসুন বাবু, আমার আস্তাবল ওই দিকেই।'

আমরা এক্কার দুই পাশে পা ঝুলাইয়া বসিলাম। এক্কাওয়ালা চাবুক ঘুরাইয়া মুখে টকাস টকাস শব্দ করিল। ঘোড়া ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

চোদ্দ

দশ মিনিট পরে ব্যোমকেশ এক্কা থামাইতে বলিল। আমি এক্কা হইতে নামিয়া ধোঁয়াটে আলোয় ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ির কোণে ডাক-বাক্সের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। ব্যোমকেশ এক্কাওয়ালাকে ভাড়া ও বকশিস দিল।

'সালাম বাবুজি।'

অন্ধকার-সমুদ্রে ভাসমান ধোঁয়াটে আলোর একটা বুদ্বুদ ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ করিতে করিতে দূরে

মিশাইয়া গেল। আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরে নিমজ্জিত হইলাম।

'এবার কী? দেশলাই জ্বালব?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার পূর্বেই চোখের উপর তীব্র আলো জ্বলিয়া উঠিল; হাত দিয়া চোখ আড়াল করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'কে—সাব-ইন্সপেক্টর তিওয়ারী?'

'জি।' তিওয়ারী টর্চের আলো মাটির দিকে নামাইয়া আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাটি হইতে উত্থিত আলোর ক্ষীণ প্রতিভাস আমাদের তিনজনের মুখে পড়িল। সকলের গায়ে কালো পোশাক, তিওয়ারীর কালো কোটের পিত্তলের বোতামগুলি চিক্‌মিক্ করিতেছে।

'আপনার সঙ্গে ক'জন আছে?'

'দু'জন।' বলিয়া তিওয়ারী আলো একটু পিছন দিকে ফিরাইল। দুইটি লিকলিকে প্রেতাকৃতি পুলিস জমাদার তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, দু'জনই যথেষ্ট। কি করতে হবে ওদের বলে দিয়েছেন?'

'জি।'

'তাহলে এবার একে একে গাছে ওঠা যাক। অজিত, তুমি সামনের গাছটাতে ওঠো। চুপটি করে গাছের ডালে বসে থাকবে, সিগারেট খাবে না। বাঁশীর আওয়াজ যতক্ষণ না শুনতে পাও ততক্ষণ গাছ থেকে নামবে না।—তিওয়ারীজি, টর্চটা আমাকে দিন।'

টর্চ লইয়া ব্যোমকেশ একটা আম গাছের উপর আলো ফেলিল। ডাক-বাক্স হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বেশ বড় আম গাছ, গুঁড়ির স্কন্ধ হইতে মোটা ডাল বাহির হইয়াছে। গাছে পিঁপড়ের বাসা আছে কিনা জল্পনা করিতে করিতে আমি গাছে উঠিয়া পড়িলাম।

'ব্যস্, আর উঁচুতে উঠো না।'

আমি দুইটা ডালের সন্ধিস্থলে সাবধানে বসিলাম। গাছে চড়িয়া লাফালাফি করার বয়স অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, একটু ভয়-ভয় করিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা। সব কথা মনে আছে তো?'

'আছে। বাঁশী শুনলেই বিরহিণী রাধার মত ছুটব।'

ব্যোমকেশ তখন অন্য তিনজনকে লইয়া পাঁচিলের সমান্তরালে ভিতর দিকে চলিল। দুই তিনটা গাছ বাদ দিয়া আর একটা গাছে একজন জমাদার উঠিল। তারপর তাহারা আরও দূরে চলিয়া গেল, কে কোন্ গাছে উঠিল দেখিতে পাইলাম না। ঘন পত্রান্তরাল হইতে কেবল সঞ্চরমান বৈদ্যুতিক টর্চের প্রভা চোখের সামনে খেলা করিতে লাগিল।

তারপর বৈদ্যুতিক টর্চও নিভিয়া গেল।

হাতের ঘড়ি চোখের কাছে আনিয়া রেডিয়াম-নির্দেশ লক্ষ্য করিলাম—ন'টা বাজিয়া দশ মিনিট। অন্তত এক ঘণ্টার আগে কিছু ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না।

বসিয়া আছি। ভাগ্যে বাতাস নাই, শীতের দাঁত তাই মর্মান্তিক কামড় দিতে পারিতেছে না। তবু থাকিয়া থাকিয়া হাড়-পাঁজরা কাঁপিয়া উঠিতেছে, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছে।

আমবাগান সম্পূর্ণ নিঃশব্দ নয়। গাছের পাতাগুলো যেন উসখুস করিতেছে, ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে, অন্ধকারে শ্রবণ শক্তি তীক্ষ্ণ হইয়াছে তাই শুনিতে পাইতেছি। একবার মাথার উপর একটা পাখি—বোধহয় প্যাঁচা—চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল, সম্ভবত গাছের মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইয়াছে। চকিতে চোখ তুলিয়া দেখি গাছপালার ফাঁক দিয়া দুই চারিটি তারা দেখা যাইতেছে।

বসিয়া আছি। পৌনে দশটা বাজিল। সহসা সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হইয়া উঠিল। চোখে কিছু দেখিলাম না, কানেও কোনও শব্দ আসিল না, কেবল অনুভব করিলাম, আমার গাছের পাশ দিয়া কে যেন ভিতর দিকে চলিয়া গেল। কে চলিয়া গেল! পাণ্ডেজি! কিম্বা—!

একটা ভিজা-ভিজা বাতাস আসিয়া মুখে লাগিল। ঊর্ধ্বে চাহিয়া দেখিলাম, তারাগুলি নিষ্প্রভ হইয়া আবার উজ্জ্বল হইল। বোধহয় কাল রাত্রির মত আকাশে কুয়াশা জমিতে আরম্ভ

করিয়াছে।

হ্যাঁ, কুয়াশাই বটে। তারাগুলিকে আর দেখা যাইতেছে না। গাছের পাতায় কুয়াশা জমিয়া জল হইয়া নীচে টোপাইতেছে—চারিদিক হইতে মৃদু শব্দ উঠিল—টপ্ টপ্ টপ্ টপ্!

প্রবল ইচ্ছা হইল ধূমপান করি। দাঁতে দাঁত চাপিয়া ইচ্ছা দমন করিলাম...

ঘড়িতে সওয়া দশটা। আমি গাছের ডালের উপর খাড়া হইয়া বসিলাম। দীপনারায়ণের হাতার ভিতর যেন একটা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। তারপর একটা মোটর হাতা হইতে বাহির হইয়া বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। গাড়ির হেডলাইটের ছটা কুয়াশার গায়ে ক্ষণেক তাল পাকাইল, তারপর আবার অন্ধকার।

বোধহয় মিস্ মান্না নিজের বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

এইবার! দশ মিনিট স্নায়ু-পেশী শক্ত করিয়া বসিয়া রহিলাম, কিছুই ঘটিল না। তারপর হঠাৎ—খিড়কির দরজার দিকে দপ্ করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পরম্পরায় তিন-চারবার পিস্তলের আওয়াজ হইল। পিস্তলের আওয়াজের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, আমি মুহূর্তকাল নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া গেলাম।

চমক ভাঙিল পুলিস হুইসলের তীব্র শব্দে। আমি গাছের ডাল হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলাম। মাটি কত দূরে তাহা ঠাহর করিতে পারি নাই, সারা গায়ে প্রবল ঝাঁকানি লাগিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম খিড়কির কাছে গোটা তিনেক টর্চ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আমি সেই দিকে ছুটিলাম।

ছুটিতে ছুটিতে আর একবার পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তারপর পায়ে শিকড় লাগিয়া আছাড় খাইলাম। উঠিয়া আবার ছুটিলাম। হাত-পা অক্ষত আছে কিনা অনুভব করিবার সময় নাই। যেখানে আর সকলেই দাঁড়াইয়াছিল হুড়মুড় করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম।

খিড়কি দরজার কাছে একটা স্থান ঘিরিয়া পাঁচজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাণ্ডেজির হাতে রিভলবার, তিওয়ারী ও দুইজন জমাদারের হাতে টর্চ, ব্যোমকেশ কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া। তিনটি টর্চের আলো একই স্থানে পড়িয়াছে। পাঁচ জোড়া চক্ষুও সেই স্থানে নিবদ্ধ।

দুইটি মৃতদেহ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে; একজন স্ত্রীলোক, অন্যটি পুরুষ। স্ত্রীলোকটি শকুন্তলা, আর পুরুষ—রতিকান্ত।

রতিকান্তের নীল চক্ষু দুটা বিস্ময় বিস্ফারিত; ডান হাতের কাছে একটা পিস্তল পড়িয়া আছে, বাঁ হাতের আঙুলগুলা একটা সাদা রঙের খাম আঁকড়াইয়া আছে। শকুন্তলার মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না। গায়ে কালো রঙের শাল জড়ানো। বুকের কাছে থোলো থোলো রক্ত-করবীর মত কাঁচা রক্ত।

ব্যোমকেশ নত হইয়া রতিকান্তের আঙুলের ভিতর হইতে খামটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের পকেটে পুরিল।

পনের

পাণ্ডেজির বাড়িতে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ। অতিথির সংখ্যা বাড়িয়াছে; ডাক্তার পালিত, মিস্ মান্না, ব্যোমকেশ ও আমি। টেবিল ঘিরিয়া খাইতে বসিয়াছি। আহার্য দ্রব্যের মধ্যে প্রধান—মুর্গীর কাশ্মীরী কোর্মা।

ব্যোমকেশ এক টুকরা মাংস মুখে দিয়া অর্ধ-নিমীলিত চক্ষে আস্বাদ গ্রহণ করিল, তারপর গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল, 'পাণ্ডেজি, আমি চুরি করব।'

পাণ্ডেজি হাসিমুখে ভ্রূ তুলিলেন, 'কী চুরি করবেন?'

'আপনার বাবুর্চিকে।'

পাণ্ডেজি হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, 'অসম্ভব।'

'অসম্ভব কেন?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমার বাবুর্চি আমি নিজেই।'

'অ্যাঁ—এই অমৃত আপনি রেঁধেছেন! তবে আর আপনার পুলিসের চাকরি করার কি দরকার? একটি হোটেল খুলে বসুন, তিন দিনে লাল হয়ে যাবেন।'

কিছুক্ষণ হাস্য-পরিহাস চলিবার পর মিস্ মান্না বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমাকে কিন্তু আপনারা ফাঁকি দিয়েছেন। সে হবে না, সব কথা আগাগোড়া বলতে হবে। কি করে কি হল সব বলুন, আমি শুনব।'

ডাক্তার পালিত বলিলেন, 'আমিও শুনব। এ ক'দিন আমি আসামী কিনা এই ভাবনাতেই আধমরা হয়ে ছিলাম। এবার বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন মুখ চলছে। খাওয়ার পর বলব।'

আকণ্ঠ আহার করিয়া আমরা বাহিরে আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ গড়গড়ার নল হাতে লইল, ডাক্তার পালিত একটি মোটা চুরুট ধরাইলেন।

মিস্ মান্না জর্দা মুখে দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, 'এবার আরম্ভ করুন।'

ব্যোমকেশ গড়গড়ার নলে কয়েকটি মন্দ-মন্থর টান দিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল।

'এই ঘরেই রতিকান্তকে প্রথম দেখেছিলাম। পাণ্ডেজিকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। সুন্দর চেহারা, নীল চোখ। দীপনারায়ণ সিং-এর উদ্দেশ্যে হাল্কা ব্যঙ্গ করে বলেছিল—বড় মানুষ কুটুম্ব। তখন জানতাম না ওই হাল্কা ব্যঙ্গের আড়ালে কতখানি বিষ লুকিয়ে আছে। তখন কিছুই জানতাম না, তাই 'কুটুম্ব' কথাটাও কানে খোঁচা দিয়ে যায়নি। এখন অবশ্য জানতে পেরেছি শকুন্তলা আর রতিকান্তের মধ্যে একটা দূর সম্পর্ক ছিল; দু'জনেরই বাড়ি প্রতাপগড়ে, দু'জনেই পড়ে-যাওয়া ঘরানা ঘরের ছেলে মেয়ে, দু'জনে বাল্য প্রণয়ী।

'রতিকান্ত সে-রাত্রে আমার পরিচয় জানতে পারেনি, পাণ্ডেজি কেবল বলেছিলেন,—আমার কলকাতার বন্ধু। তাতে তার মনে কোনও সন্দেহ হয়নি। যদি সে-রাত্রে সে জানতে পারত যে অধমের নাম ব্যোমকেশ বক্সী তাহলে সে কি করত বলা যায় না, হয়তো প্ল্যান বদলে ফেলত। কিন্তু তার পক্ষে মুশকিল হয়েছিল এই যে, পেছুবার আর সময় ছিল না, একেবারে শিরে সংক্রান্তি এসে পড়েছিল।

'শকুন্তলা আর রতিকান্তর গুপ্ত-প্রণয়ের অতীত ইতিহাস যত দূর আন্দাজ করা যায় তা এই। ওদের বিয়ের পথে সামাজিক বাধা ছিল, তাই ওদের দুরন্ত প্রবৃত্তি সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে গুপ্ত-প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছিল; ওদের উগ্র অসংযত মন আধুনিক স্বৈরাচারের সুযোগ নিয়েছিল পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু তবু সবই চুপি চুপি। নৈতিক লজ্জা না থাক, লোকলজ্জার ভয় ছিল; তার উপর 'চোরি পিরিতি লাখগুণ রঙ্গ'। লুকিয়ে প্রেম করার মধ্যে একটা তীব্র মাধুর্য আছে।

'তারপর একদিন দীপনারায়ণ শকুন্তলাকে দেখে তার রূপ-যৌবনের ফাঁদে পড়ে গেলেন। শকুন্তলা দীপনারায়ণের বিপুল ঐশ্বর্য দেখল, সে লোভ সামলাতে পারল না। তাঁকে বিয়ে করল। কিন্তু রতিকান্তকেও ছাড়ল না। রতিকান্তর বিয়েতে মত ছিল কিনা আমরা জানি না। হয়তো পুরোপুরি ছিল না, কিন্তু শকুন্তলাকে ত্যাগ করাও তার অসাধ্য। শকুন্তলা বিয়ের পর যখন পাটনায় এল তখন রতিকান্তও যোগাড়যন্ত্র করে পাটনায় এসে বসল, বোধহয় মোহান্ধ দীপনারায়ণ সাহায্য করেছিলেন। ফলে ভিতরে ভিতরে আবার রতিকান্তর আর শকুন্তলার আগের সম্বন্ধ বজায় রইল। বিয়েটা হয়ে রইল ধোঁকার টাটি।

'কুটুম্ব হিসাবে রতিকান্ত দীপনারায়ণের বাড়িতে যাতায়াত করত, কিন্তু প্রকাশ্যে শকুন্তলার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা দেখাত না। তাদের সত্যিকারের দেখা সাক্ষাৎ হত সকলের চোখের আড়ালে। শকুন্তলা চিঠি লিখে গভীর রাত্রে নিজের হাতে ডাক-বাক্সে ফেলে আসত; রতিকান্ত নির্দিষ্ট রাত্রে আসত, খিড়কির দরজা দিয়ে হাতায় ঢুকত, তারপর লোহার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেত।

শকুন্তলা দোর খুলে প্রতীক্ষা করে থাকত—

'এইভাবে চলছিল, হঠাৎ প্রকৃতিদেবী বাদ সাধলেন। দীপনারায়ণের যখন গুরুতর অসুখ ঠিক সেই সময় শকুন্তলা জানতে পারল সে অন্তঃসত্ত্বা। এখন উপায় ? অন্য সকলের চোখে যদি বা ধুলো দেওয়া যায়, দীপনারায়ণের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। দু'জনে মিলে পরামর্শ করল তাড়াতাড়ি দীপনারায়ণকে সরাতে হবে ; নইলে মান-ইজ্জত রাজ-ঐশ্বর্য কিছুই থাকবে না, গালে চুন কালি মেখে ভদ্রসমাজ থেকে বিদায় নিতে হবে।

'মৃত্যু ঘটাবার এই চোস্ত ফন্দিটা রতিকান্তের মাথা থেকে বেরিয়েছিল সন্দেহ নেই। দৈব যোগাযোগও ছিল ; এক শিশি কিউরারি একটা ছিঁচকে চোরের কাছে পাওয়া গিয়েছিল। সেটা যখন রতিকান্তর হাতে এল, রতিকান্ত প্রথমেই খানিকটা কিউরারি সরিয়ে ফেলল। তারপর যথাসময়—রতিকান্ত নিজেই ডাক্তারবাবুর ডিস্‌পেনসারির তালা ভেঙে লিভারের ভায়াল বদলে রেখে এল, তারপর নিমন্ত্রণ-বাড়িতে গিয়ে খবর দিলে। সকলেই ভাবলে ছিঁচকে চোরের কাজ।

'সেই রাত্রেই রতিকান্ত আমার নাম জানতে পারল। অনুবাদের কল্যাণে হিন্দী শিক্ষিত সমাজে আমার নামটা অপরিচিত নয়। রতিকান্ত ঘাবড়ে গেল। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, হাত থেকে তীর বেরিয়ে গেছে।

'পরদিন সকালে ডাক্তারবাবু ইন্‌জেকশন দিলেন, দীপনারায়ণের মৃত্যু হল। রতিকান্ত ভেবেছিল, কিউরারি বিষের কথা কারুর মনে আসবে না, সবাই ভাববে লিভার ইন্‌জেকশনের শকে মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তারবাবুও প্রথমে তাই ভেবেছিলেন, কিন্তু যখন কিউরারির কথা উঠল তখন তাঁর খটকা লাগল। তিনি বললেন,—হতেও পারে।

'রতিকান্ত আগে থাকতে ঘাবড়ে ছিল, এখন সে আরও ঘাবড়ে গিয়ে একটা ভুল করে ফেললে। এই বোধহয় তার একমাত্র ভুল। সে ভাবল, দীপনারায়ণের শরীরে নিশ্চয় কিউরারি পাওয়া যাবে ; এখন যদি লিভারের ভায়ালে কিউরারি না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের সন্দেহ হবে ডাক্তার পালিতই ভায়াল বদলে দিয়েছেন। রতিকান্তের কাছে একটা নির্বিষ লিভারের ভায়াল ছিল, যেটা সে ডাক্তার পালিতের ব্যাগ থেকে বদলে নিয়েছিল। সে অ্যানালিসিসের জন্যে সেই নির্বিষ ভায়ালটা পাঠিয়ে দিলে।

'যখন জানা গেল ভায়ালে বিষ নেই তখন ভারি ধোঁকা লাগল। শরীরে বিষ পাওয়া গেছে অথচ ওষুধে বিষ পাওয়া গেল না, এ কি রকম ? দীপনারায়ণের মৃত্যুর পর কেবল তিনজনের হাতে ভায়ালটা গিয়েছিল—ডাক্তার পালিত, পাণ্ডেজি আর রতিকান্ত। পাণ্ডেজি আর রতিকান্ত পুলিসের লোক ; সুতরাং ডাক্তারবাবুরই কাজ, তিনি এই রকম একটা গোলমেলে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে পুলিসের মাথা গুলিয়ে দিতে চান। কিন্তু ডাক্তার পালিতের মোটিভ কি ?

'ইতিমধ্যে দুটো মোটিভ পাওয়া গিয়েছিল—টাকা আর গুপ্ত-প্রেম। গুপ্ত-প্রেমের সন্দেহটা ডাক্তার পালিতই আমাদের মনে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। যদি গুপ্ত-প্রেমই আসল মোটিভ হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে, শকুন্তলার দুষ্মন্ত কে ? আর যদি টাকা মোটিভ হয় তাহলে তিনজনের ওপর সন্দেহ—দেবনারায়ণ, চাঁদনী আর গঙ্গাধর বংশী। শকুন্তলাও কলঙ্ক এড়াবার জন্যে লোক লাগিয়ে স্বামীকে খুন করতে পারে। এদের মধ্যে যে-কেউ ডাক্তার পালিতকে মোটা টাকা খাইয়ে নিজের কাজ হাসিল করে থাকতে পারে। একুনে সন্দেহভাজনের সংখ্যা খুব কম হল না ; দেবানারায়ণ থেকে নর্মদাশঙ্কর, ঘোড়া জগন্নাথ সকলেরই কিছু না কিছু স্বার্থ আছে।

'রতিকান্ত কিন্তু উঠে-পড়ে লেগেছিল দোষটা ডাক্তার পালিতের ঘাড়ে চাপাবে। সে বক্সারে গিয়ে কয়েদীর কাছ থেকে জবানবন্দী লিখিয়ে নিয়ে এল। আমরা জানি এ-ধরনের কয়েদীকে হুম্‌কি দিয়ে বা লোভ দেখিয়ে পুলিস যে-কোনও জবানবন্দী আদায় করতে পারে। তাই আমরা রতিকান্তের মতলব বুঝে মনে মনে হাসলাম। রতিকান্তই যে অপরাধী তা আমরা তখন জানতে পেরেছি।

'অন্যদিকে ছোটখাটো দু' একটা ব্যাপার ঘটছিল। পিতা-পুত্র গঙ্গাধর আর লীলাধর মিলে

বারো হাজার টাকা হজম করবার তালে ছিল। ওদিকে নর্মদাশঙ্কর দীপনারায়ণের মৃত্যুতে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল, ভেবেছিল শকুন্তলার হৃদয়ের শূন্য সিংহাসন সেই এবার দখল করবে। সে জানত না যে শকুন্তলার হৃদয়-সিংহাসন কোনওকালেই শূন্য হয়নি।

'হঠাৎ সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, শকুন্তলার দুষ্মন্ত কে তা জানতে পারলাম। শকুন্তলা দেয়ালে একটা ছবি এঁকেছিল। সেকালে শকুন্তলার পূর্বরাগের ছবি। প্রথম যে-রাত্রে ছবিটা দেখি সে-রাত্রে কিছু বুঝতে পারিনি, নীল আলোয় ছবির নীল-রঙ চাপা পড়ে গিয়েছিল। পরদিন দিনের আলোয় যখন ছবিটা দেখলাম এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। যেন কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা হয়ে ছিল, হঠাৎ কুয়াশা ফুঁড়ে সূর্য বেরিয়ে এল। ছবিতে দুষ্মন্তের চোখের মণি নীল।

'প্রেম বড় মারাত্মক জিনিস। প্রেমের স্বভাব হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা, সকলকে ডেকে জানানো—আমি ওকে ভালবাসি। অবৈধ প্রেম তাই আরও মারাত্মক। যেখানে পাঁচজনের কাছে প্রেম ব্যক্ত করবার উপায় নেই সেখানে মনের কথা বিচিত্র ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। শকুন্তলা ছবি এঁকে নিজের প্রেমকে ব্যক্ত করতে চেয়েছিল। ছবিতে দুষ্মন্তের চেহারা মোটেই রতিকান্তের মত নয়, কিন্তু তার চোখের মণি নীল। 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান!' অজিত আর পাণ্ডেজিও ছবি দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা নীলচোখের ইশারা ধরতে পারেননি।

'এই ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত লোক আছে তাদের মধ্যে কেবল রতিকান্তরই নীল চোখ। সুতরাং রতিকান্তই শকুন্তলার প্রচ্ছন্ন প্রেমিক। মোটিভ এবং সুযোগ, বুদ্ধি এবং কর্ম-তৎপরতা সব দিক দিয়েই সে ছাড়া আর কেউ দীপনারায়ণের মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়।

'কিন্তু তাকে ধরব কি করে? শুধু নীল-চোখের প্রমাণ যথেষ্ট নয়। একমাত্র উপায়, যদি ওরা নিভৃতে পরস্পর দেখা করে, যদি ওদের এমন অবস্থায় ধরতে পারি যে অস্বীকার করবার পথ না থাকে।

'ফাঁদ পাতলাম। আমি একা শকুন্তলার সঙ্গে দেখা করে স্পষ্ট ভাষায় বললাম—তোমার দুষ্মন্ত কে তা আমি জানতে পেরেছি এবং সে কি করে দীপনারায়ণকে খুন করেছে তাও প্রমাণ দিতে পারি। কিন্তু আমি পুলিস নয়; তুমি যদি আমাকে এক লাখ টাকা দাও তাহলে আমি তোমাদের পুলিসে ধরিয়ে দেব না। আর যদি না দাও পুলিসে সব কথা জানতে পারবে। বিচারে তোমাদের দু'জনেরই ফাঁসি হবে। শকুন্তলা কিছুতেই স্বীকার করে না কিন্তু দেখলাম ভয় পেয়েছে। তখন বললাম—তোমাকে আজকের দিনটা ভেবে দেখবার সময় দিলাম। যদি এক লাখ টাকা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে রাজী থাকো, তাহলে আজ রাত্রে আমার নামে একটা চিঠি লিখে, নিজের হাতে ডাক-বাক্সে দিয়ে আসবে। চিঠিতে শ্রেফ একটি কথা লেখা থাকবে—হ্যাঁ। রাত্রি দশটার পর মিস্ মান্নাকে এখান থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা আমি করব, রাত্রে হাতায় পুলিস পাহারাও থাকবে না। যদি কাল তোমার চিঠি না পাই, আমার সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাণ্ডেজির হাতে সমর্পণ করব।

'ভয়-বিবর্ণ শকুন্তলাকে রেখে আমি চলে এলাম, মিস্ মান্না তার ভার নিলেন। এখন শুধু নজর রাখতে হবে শকুন্তলা আড়ালে রতিকান্তের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ না পায়। তারপর আমি পাণ্ডেজির সঙ্গে পরামর্শ করে বাকি ব্যবস্থা ঠিক করলাম। রাত্রে রতিকান্ত বক্সার থেকে ফিরলে তাকে এক নতুন গল্প শোনালাম, তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডেজির এখানে এলাম।

'আমি আর অজিত সকাল সকাল এখান থেকে বেরিয়ে দীপনারায়ণের বাড়ির পাশে আমবাগানে গেলাম; তিওয়ারী দু'জন লোক নিয়ে উপস্থিত ছিল, সবাই আম গাছে উঠে লুকিয়ে রইলাম। এদিকে পাণ্ডেজি রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত রতিকান্তকে আটকে রেখে ছেড়ে দিলেন, আর নিজে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। অন্ধকারে গাছের ডালে বসে শিকারের প্রতীক্ষা আরম্ভ হল।

'আমি ছিলাম খিড়কির দরজার কাছেই একটা গাছে। পাণ্ডেজি এসে আমার পাশের গাছে

উঠেছিলেন। নিঃশব্দ অন্ধকারে ছয়টি প্রাণী বসে আছি। দশটা বাজল। আকাশে কুয়াশা জমতে আরম্ভ করেছিল ; গাছের পাতা থেকে টপ্ টপ্ শব্দে জল পড়তে লাগল। তারপর মিস্ মান্না মোটরে বাড়ি চলে গেলেন।

'রতিকান্ত কখন এসেছিল আমরা জানতে পারিনি। সে বোধ হয় একটু দেরি করে এসেছিল ; পাণ্ডেজির কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সে নিজের বাসায় গিয়েছিল, সেখান থেকে পিস্তল নিয়ে আমবাগানে এসেছিল।

'রতিকান্তের চরিত্র আমরা একটু ভুল বুঝেছিলাম—যেখানেই দেখা যায় দু'জন বা পাঁচজন একজোট হয়ে কাজ করছে সেখানেই একজন সর্দার থাকে, বাকি সকলে তার সহকারী। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ভেবেছিলাম শকুন্তলাই নাটের গুরু, রতিকান্ত সহকারী। আসলে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। রতিকান্তের মনটা ছিল হিংস্র শ্বাপদের মত, নিজের প্রয়োজনের সামনে কোনও বাধাই সে মানত না। সে যখন শুনল যে শকুন্তলা চিঠি লিখে অপরাধীর নাম প্রকাশ করে দিতে রাজী হয়েছে তখনই সে স্থির করল শকুন্তলাকে শেষ করবে। তার কাছে নিজের প্রাণের চেয়ে প্রেম বড় নয়।

'আমরা ভেবেছিলাম রতিকান্ত শকুন্তলাকে বোঝাতে আসবে যে শকুন্তলা যদি অপরাধীর নাম প্রকাশ না করে তাহলে কেউ তাদের ধরতে পারবে না, শাস্তি দিতেও পারবে না। আমাদের প্ল্যান ছিল, যে-সময় ওরা এই সব কথা বলাবলি করবে ঠিক সেই সময় ওদের ধরব।

'রতিকান্ত কিন্তু সে-ধার দিয়ে গেল না। সে মনে মনে সঙ্কল্প করেছিল অনিষ্টের জড় রাখবে না, সমূলে নির্মূল করে দেবে।

'শকুন্তলা কখন চিঠি হাতে নিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরুল আমরা জানতে পারিনি, চারিদিকের টপ্ টপ্ শব্দের মধ্যে তার পায়ের আওয়াজ ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু রতিকান্ত বোধহয় দোরের পাশেই ওৎ পেতে ছিল, সে ঠিক শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে দপ্ করে টর্চ জ্বলে উঠল, সেই আলোতে শকুন্তলার ভয়ার্ত মুখ দেখতে পেলাম। ওদের মধ্যে কথা হল না, কেবল কয়েকবার পিস্তলের আওয়াজ হল। শকুন্তলা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

'আমার কাছে পুলিস হুইস্‌ল ছিল, আমি সেটা সজোরে বাজিয়ে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। পাণ্ডেজিও গাছ থেকে লাফিয়ে নামলেন। তাঁর বাঁ হাতে টর্চ, ডান হাতে রিভলবার।

'রতিকান্ত নিজের টর্চ নিভিয়ে দিয়েছিল। পাণ্ডেজির টর্চের আলো যখন তার গায়ে পড়ল তখন সে পিস্তল পকেটে রেখে হাঁটু গেড়ে শকুন্তলার হাত থেকে চিঠিখানা নিচ্ছে। আহত বাঘের মত সে ফিরে তাকাল, তারপর বিদ্যুৎবেগে পকেট থেকে পিস্তল বার করল।

'কিন্তু পিস্তল ফায়ার করবার অবকাশ তার হল না ; পাণ্ডেজির রিভলবারে একবার আওয়াজ হল—'

ব্যোমকেশ থামিলে ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ডাক্তার পালিতের চুরুট নিভিয়া গিয়াছিল, তিনি সেটা আবার ধরাইলেন। মিস্ মান্না একটা কম্পিত নিশ্বাস ফেলিলেন।

'শকুন্তলা ভাল মেয়ে ছিল না। কিন্তু—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। সে সম্মোহন মন্ত্র জানত।—চাঁদনী এখনও বিশ্বাস করে না যে শকুন্তলা দোষী।—'

আমি বলিলাম, 'ওদের জীবিত ধরতে পারলেই বোধহয় ভাল হত—'

পাণ্ডেজি মাথা নাড়িলেন, 'না, এই ভাল।'

রক্তের দাগ

এক

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম বসন্তঋতু আসিয়াছে। দক্ষিণ হইতে ঝিরঝির বাতাস দিতে আরম্ভ করিয়াছে, কলিকাতা শহরের এখানে-ওখানে যে দুই চারিটা শহুরে গাছ আছে তাহাদের অঙ্গেও আরক্তিম নব-কিশলয়ের রোমাঞ্চ ফুটিয়াছে। শুনিয়াছি এই সময় মনুষ্যদেহের গ্রন্থিগুলিতেও নূতন করিয়া রসসঞ্চার হয়।

ব্যোমকেশ তক্তপোশের উপর কাত হইয়া শুইয়া কবিতার বই পড়িতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এল। আজকাল বসন্তকালের সমাগম হইলেই মনটা কেমন উদাস হইয়া যায়। বয়স বাড়িতেছে।

সন্ধ্যার মুখে সত্যবতী আমাদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম সে চুল বাঁধিয়াছে, খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়াইয়াছে, পরনে বাসন্তী রঙের হাল্কা শাড়ি। অনেক দিন তাহাকে সাজগোজ করিতে দেখি নাই। সে তক্তপোশের পাশে বসিয়া হাসি-হাসি মুখে ব্যোমকেশকে বলিল, 'কী রাতদিন বই মুখে করে পড়ে আছ। চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি গিয়ে।'

ব্যোমকেশ সাড়া দিল না। আমি প্রশ্ন করিলাম, 'কোথায় বেড়াতে যাবে? গড়ের মাঠে?'

সত্যবতী বলিল, 'না না, কলকাতার বাইরে। এই ধরো—কাশ্মীর—কিম্বা—'

ব্যোমকেশ বই মুড়িয়া আস্তে-আস্তে উঠিয়া বসিল, থিয়েটারী ভঙ্গীতে ডান হাত প্রসারিত করিয়া বিশুদ্ধ মন্দাক্রান্তা ছন্দে আবৃত্তি করিল—

'ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণ গমনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্‌লি মন উড়ুউড়ু
একি দৈবের শাস্তি।'

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম, 'এটা কোত্থেকে পেলে?'

'হুঁ হুঁ—বলব কেন?' ব্যোমকেশ আবার কাত হইয়া বই খুলিল।

হাতে কাজ না থাকিলে লোকে জ্যাঠার গঙ্গাযাত্রা করে, ব্যোমকেশ বাংলা সাহিত্যের পুরানো কবিদের লইয়া পড়িয়াছিল; ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কবিকে একে একে শেষ করিতেছিল। ভয় দেখাইয়াছিল, অতি আধুনিক কবিদেরও সে ছাড়িবে না। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কোন দিন হয়তো নিজেই কবিতা লিখিতে শুরু করিয়া দিবে। আজকাল ছন্দ ও মিলের বালাই ঘুচিয়া যাওয়ায় কবিতা লেখার আর কোনও অন্তরায় নেই। কিন্তু সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ কবিতা লিখিলে তাহা যে কিরূপ মারাত্মক বস্তু দাঁড়াইবে ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়। সেই যে খোকাকে একখানা 'আবোল তাবোল' কিনিয়া দিয়াছিলাম, ব্যোমকেশের কাব্যিক প্রেরণার মূল সেইখানে। তারপর বইয়ের দোকানের অংশীদার হইয়া গোদের উপর বিষফোড়া হইয়াছে।

সত্যবতী ব্যোমকেশের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে একটি মোচড় দিয়া বলিল, 'ওঠ না। আবার শুলে কেন?'

ব্যোমকেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'কাশ্মীর যেতে কত খরচ জান ?'

'কত ?'

'অন্তত এক হাজার টাকা। অত টাকা পাব কোথায় ?'

সত্যবতী রাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'জানি না আমি ওসব। যাবে কি না বল।'

'বললাম তো টাকা নেই।'

এই সময় বহির্দ্বারে টোকা পড়িল। বেশ একটি উপভোগ্য দাম্পত্য কলহের সূত্রপাত হইতেছিল, বাধা পড়িয়া গেল। সত্যবতী ব্যোমকেশকে কোপ-কটাক্ষে আধপোড়া করিয়া দিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরের আলো জ্বালিয়া দ্বার খুলিলাম। যে লোকটি দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া সহসা কিশোরবয়স্ক মনে হয়। বেশি লম্বা নয়, ছিপছিপে পাতলা গড়ন, গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখে অল্প গোঁফের রেখা। বেশবাস পরিপাটি, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতা হইতে গায়ে স্বচ্ছ মলমলের পাঞ্জাবি সমস্তই অনবদ্য।

'কাকে চান ?'

'সত্যান্বেষী ব্যোমকেশবাবুকে।'

'আসুন।' দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম।

লোকটি ঘরে প্রবেশ করিয়া উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর সম্মুখে দাঁড়াইলে তাহার চেহারাখানা ভাল করিয়া দেখিলাম। যতটা কিশোর মনে করিয়াছিলাম ততটা নয়; বর্ণচোরা আম। চোখের দৃষ্টিতে দুনিয়াদারির ছাপ পড়িয়াছে, চোখের কোলে সূক্ষ্ম কালির আঁচড়, মুখের বাহ্য সৌকুমার্যের অন্তরালে হাড়ে পাক ধরিয়াছে। তবু বয়স বোধ করি পঁচিশের বেশি নয়।

ব্যোমকেশ তক্তপোশের পাশে বসিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। সামনের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, 'বসুন। কী দরকার আমার সঙ্গে ?'

লোকটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না, চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, 'আপনাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিল, 'তাই নাকি ! কাজটা কী ?'

যুবক পাশের পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিল, ব্যোমকেশের সম্মুখে অবহেলাভরে সেগুলি ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'আমার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, আপনি আমার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করবেন। এই কাজ। পরে আপনার পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হবে না, তাই আগাম দিয়ে যাচ্ছি। এক হাজার টাকা গুনে নিন।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ কুঞ্চিত চক্ষে যুবকের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর নোটের তাড়া গুনিয়া দেখিল। একশত টাকার দশ কেতা নোট। নোটগুলিকে টেবিলের এক পাশে রাখিয়া ব্যোমকেশ অলসভাবে একবার আমার পানে চোখ তুলিল; তাহার চোখের মধ্যে একটু হাসির ঝিলিক খেলিয়া গেল। তারপর সে যুবকের মুখের উপর গম্ভীর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনার কাজ নেব কিনা তা নির্ভর করবে আপনার উত্তরের ওপর।'

যুবক সোনার সিগারেট কেস খুলিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে ধরিল, ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া প্রত্যাখ্যান করিল। যুবক তখন নিজে সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, 'প্রশ্ন করুন। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর না দিতেও পারি।'

ব্যোমকেশ একটু নীরব রহিল, তারপর অলসকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'আপনার নাম কী ?'

যুবকের মুখে চকিত হাসি খেলিয়া গেল। হাসিটি বেশ চিত্তাকর্ষক। সে বলিল, 'নামটা এখনও বলা হয়নি। আমার নাম সত্যকাম দাস।'

'সত্যকাম ?'

'হ্যাঁ ! আপনি যেমন সত্যান্বেষী, আমি তেমনি সত্যকাম।'

'এ-নাম আগে শুনিনি। সত্যকাম ছদ্মনাম নয় তো ?'

'না, আসল নাম।'

'হুঁ। আপনি কোথায় থাকেন ? ঠিকানা কি ?'

'কলকাতায় থাকি। ৩৩/৩৪ আমহার্স্ট স্ট্রীট।'

'কী কাজ করেন।'

'কাজ ? বিশেষ কিছু করি না। দাস-চৌধুরী কোম্পানির সুচিত্রা এম্পোরিয়মের নাম শুনেছেন ?'

'শুনেছি। ধর্মতলা স্ট্রীটের বড় মনিহারী দোকান।'

'আমি সুচিত্রা এম্পোরিয়মের অংশীদার।'

'অংশীদার। —অন্য অংশীদার কে ?'

সত্যকাম একবার দম লইয়া বলিল, 'আমার বাবা—উষাপতি দাস।'

ব্যোমকেশ সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিয়া রহিল। সত্যকাম তখন ক্ষণেকের জন্য ইতস্তত করিয়া অনিচ্ছাভরে বলিল, 'আমার মাতামহ সুচিত্রা এম্পোরিয়মের পত্তন করেছিলেন, পরে আমার বাবা তাঁর পার্টনার হন। এখন দাদামশাই মারা গেছেন, তাঁর অংশ আমাকে দিয়ে গেছেন। আমার মা দাদামশায়ের একমাত্র সন্তান। আমিও মায়ের একমাত্র সন্তান।'

'বুঝেছি।' ব্যোমকেশ ক্ষণকাল যেন অন্যমনস্ক হইয়া রহিল, তারপর নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি মদ খান ?'

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া সত্যকাম বলিল, 'খাই। গন্ধ পেলেন বুঝি ?'

'আপনার বয়স কত ?'

'একুশ চলছে। জন্ম-তারিখ জানতে চান ? ৭ই জুলাই, ১৯২৭।' সত্যকাম ব্যঙ্গবঙ্কিম হাসিল।

'কতদিন মদ খাচ্ছেন ?'

'চৌদ্দ বছর বয়সে মদ ধরেছি।' সত্যকাম নিঃশেষিত সিগারেটের প্রান্ত হইতে নূতন সিগারেট ধরাইল।

'সব সময় মদ খান ?'

'যখন ইচ্ছে হয় তখনই খাই।' বলিয়া সে পকেট হইতে চার আউন্সের একটি ফ্ল্যাস্‌ক বাহির করিয়া দেখাইল।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। আমিও নির্বাকভাবে এই একুশ বছরের ছোকরাকে দেখিতে লাগিলাম। যাহারা সর্বাং লজ্জাং পরিত্যজ্য ত্রিভুবন বিজয়ী হইতে চায়, তাহারা বোধকরি খুব অল্প বয়স হইতেই সাধনা আরম্ভ করে।

ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া পূর্ববৎ নির্বিকার স্বরে বলিল, 'আপনার আনুষঙ্গিক দোষও আছে ?'

সত্যকাম মুচকি হাসিল, 'দোষ কেন বলছেন, ব্যোমকেশবাবু ? এমন সর্বজনীন কাজ কি দোষের হতে পারে ?'

আমার গা রি-রি করিয়া উঠিল। ব্যোমকেশ কিন্তু নির্বিকার মুখেই বলিল, 'দার্শনিক আলোচনা থাক। ভদ্রঘরের মেয়েদের উপরেও নজর দিয়েছেন ?'

'তা দিয়েছি।' সত্যকামের কণ্ঠস্বরে বেশ একটু তৃপ্তির আভাস পাওয়া গেল।

'কত মেয়ের সর্বনাশ করেছেন ?'

'হিসাব রাখিনি, ব্যোমকেশবাবু।' বলিয়া সত্যকাম নির্লজ্জ হাসিল।

ব্যোমকেশ মুখের একটা অরুচিসূচক ভঙ্গী করিল, 'আপনি বলছেন হঠাৎ আপনার মৃত্যু হতে পারে। কেউ আপনাকে খুন করবে, এই কি আপনার আশঙ্কা ?'

'হ্যাঁ।'

'কে খুন করতে পারে ? যে-মেয়েদের অনিষ্ট করেছেন তাদেরই আত্মীয়স্বজন ? কাউকে সন্দেহ

করেন ?'

'সন্দেহ করি। কিন্তু কারুর নাম করব না।'

'প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টাও করবেন না ?'

সত্যকাম মুখের একটা বিমর্ষ ভঙ্গী করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল, 'চেষ্টা করে লাভ নেই, ব্যোমকেশবাবু। আচ্ছা আজ উঠি, আর বোধহয় আপনার কোন প্রশ্ন নেই। রাত্তিরে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে ব্যবসায়ঘটিত নয় তাহা তাহার বাঁকা হাসি হইতে প্রমাণ হইল।

সে দ্বারের কাছে পৌঁছিলে ব্যোমকেশ পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাকে যদি কেউ খুন করে আমি জানব কী করে ?'

সত্যকাম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'খবরের কাগজে পাবেন। তা ছাড়া আপনি খোঁজ খবর নিতে পারেন। বেশি দিন বোধ হয় অপেক্ষা করতে হবে না।'

সত্যকাম প্রস্থান করিলে আমি দরজা বন্ধ করিয়া তক্তপোশে আসিয়া বসিলাম। সত্যবতী হাসি-ভরা মুখে পুনঃপ্রবেশ করিল। মনে হইল সে দরজার আড়ালেই ছিল।

'এক হাজার টাকার জন্যে ভাবছিলে, পেলে তো এক হাজার টাকা !'

ব্যোমকেশ বিরস মুখে নোটগুলি সত্যবতীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'পিপীলিকা খায় চিনি, চিনি যোগান্ চিন্তামণি। আর কি, এবার কাশ্মীর যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে দাও।' আমাকে বলিল, 'কেমন দেখলে ছোকরাকে ?'

বলিলাম, 'এত কম বয়সে এমন দু'-কানকাটা বেহায়া আগে দেখিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিও না। কিন্তু আশ্চর্য, নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায় না, মরার পর অনুসন্ধান করাতে চায় !'

দুই

পরদিন সকালবেলা সত্যবতী বলিল, 'কাশ্মীর যে যাবে, লেপ বিছানা কৈ ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কেন, গত বছর পাটনায় তো ছিল !'

সত্যবতী বলিল, 'সে তো সব দাদার। আমাদের কি কিছু আছে! নেহাত কলকাতার শীত, তাই চলে যায়। কাশ্মীর যেতে হলে অন্তত দুটো বিলিতি কম্বল চাই আর আমার জন্যে একটা বীভার-কোট।'

'হুঁ। চল অজিত, বেরুনো যাক।'

প্রশ্ন করিলাম, 'কোথায় যাবে ?'

সে বলিল, 'চল, সুচিত্রা এম্পোরিয়মে যাই। রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে।'

বলিলাম, 'সত্যবতীও চলুক না, নিজে পছন্দ করে কেনাকাটা করতে পারবে।'

ব্যোমকেশ সত্যবতীর পানে তাকাইল, সত্যবতী করুণ স্বরে বলিল, 'যেতে তো ইচ্ছে করছে, কিন্তু যাই কী করে ? খোকার ইস্কুলের গাড়ি আসবে যে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার যাবার দরকার নেই। আমি তোমার জিনিস পছন্দ করে নিয়ে আসব। দেখো, অপছন্দ হবে না।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের পানে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল, ব্যোমকেশের পছন্দের উপর তাহার যে অটল বিশ্বাস আছে তাহাই জানাইয়া গেল। সত্যবতীর শৌখিন জিনিসের কেনাকাটা অবশ্য চিরকাল আমিই করিয়া থাকি। কিন্তু এখন বসন্তকাল পড়িয়াছে, ফাল্গুন মাস চলিতেছে—

দু'জনে বাহির হইলাম। সাড়ে ন'টার সময় ধর্মতলা স্ট্রীটে পৌঁছিয়া দেখিলাম এম্পোরিয়মের

দ্বার খুলিয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আস্ত কাচের জানালা হইতে পর্দা সরিয়া গিয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বিশাল ঘর, মোজেয়িক মেঝের উপর ইতস্তত নানা শৌখিন পণ্যের শো-কেস সাজানো রহিয়াছে। দুই চারিজন গ্রাহক ইতিমধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মহিলা। কর্মচারীরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া ক্রেতাদের মন যোগাইতেছে। একটি প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক ঘরের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পদচারণ করিতে করিতে সর্বত্র নজর রাখিয়াছেন।

আমরা প্রবেশ করিলে প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাদের কাছে আসিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন, 'আস্তে আজ্ঞা হোক। কী চাই বলুন?'

ব্যোমকেশ ঘরের এদিক ওদিক তাকাইয়া কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, 'সামান্য জিনিস—গোটা দুই বিলিতি কম্বল। পাওয়া যাবে কি?'

'নিশ্চয়। আসুন আমার সঙ্গে।' ভদ্রলোক আমাদের একদিকে লইয়া চলিলেন, 'আর কিছু?'

'আর একটা মেয়েদের বীভার-কোট।'

'পাবেন। এই যে লিফ্‌ট—ওপরে কম্বল বীভার-কোট দুইই পাবেন।'

ঘরের কোণে একটি ছোট লিফ্‌ট ওঠা-নামা করিতেছে, আমরা তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই পিছন হইতে কে বলিল, 'আমি এঁদের দেখছি।'

পরিচিত কণ্ঠস্বরে পিছু ফিরিয়া দেখিলাম—সত্যকাম। সিল্কের স্যুট পরা ছিমছাম চেহারা, এতক্ষণ সে বোধহয় এই ঘরেই ছিল, বিজাতীয় পোশাকের জন্য লক্ষ্য করি নাই। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'ও—আচ্ছা। তুমি এঁদের ওপরে নিয়ে যাও, এঁরা বিলিতি কম্বল আর বীভার-কোট কিনবেন।' বলিয়া আমাদের দিকে একটু হাসিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ চকিতে একবার সত্যকামের দিকে একবার প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'ইনি আপনার—'

সত্যকাম মুখ টিপিয়া হাসিল, 'পার্টনার।'

'অর্থাৎ—বাবা!'

সত্যকাম ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

এতক্ষণ প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়াও লক্ষ্য করি নাই, এখন ভাল করিয়া দেখিলাম। তিনি অদূরে দাঁড়াইয়া অন্য একজন গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে অস্বচ্ছন্দভাবে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছিলেন। শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি চওড়া কাঠামোর মানুষ, চিবুকের হাড় দৃঢ়। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, রগের চুলে ঈষৎ পাক ধরিয়াছে। দোকানদারির লৌকিক শিষ্টতা সত্ত্বেও মুখে একটা তপঃকৃশ রুক্ষতার ভাব। দোকানদারির অবকাশে ভদ্রলোকের মেজাজ বোধ করি একটু কড়া।

এই সময় লিফ্‌ট নামিয়া আসিল, আমরা খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া দ্বিতলে উপস্থিত হইলাম।

সত্যকাম ব্যোমকেশের দিকে চটুল ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, 'সত্যি কিছু কিনবেন? না সরেজমিন তদারকে বেরিয়েছেন?'

'সত্যি কিনব।'

উপরতলাটি নীচের মত সাজান নয়, অনেকটা গুদামের মত। তবু এখানেও গুটিকয়েক ক্রেতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সত্যকাম আমাদের যে-দিকে লইয়া গেল সে-দিকটা গরম কাপড়-চোপড়ের বিভাগ। সত্যকামের ইঙ্গিতে কর্মচারী অনেক রকম বিলিতি কম্বল বাহির করিয়া দেখাইল। এ-সব ব্যাপারে ব্যোমকেশ চিটা ও চিনির প্রভেদ বোঝে না, আমিই দুইটি কম্বল বাছিয়া লইলাম। দাম বিলক্ষণ চড়া, কিন্তু জিনিস ভাল।

অতঃপর বীভার-কোট। নানা রঙের—নানা মাপের কোট—সবগুলিই অগ্নিমূল্য। আমরা সেগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি দেখিয়া সত্যকাম বলিল, 'মাপের কথা ভাবছেন?

বীভার-কোট একটু ঢিলেঢালা হলেও ক্ষতি হয় না। যেটা পছন্দ হয় আপনার নিয়ে যান, যদি নেহাত বেমানান হয় বদলে দেব।'

একটি গাঢ় বেগুনি রঙের কোট আমার পছন্দ হইল, কিন্তু দামের টিকিট দেখিয়া ইতস্তত করিতে লাগিলাম। সত্যকাম অবস্থা বুঝিয়া বলিল, 'দামের জন্যে ভাববেন না। ওটা সাধারণ খরিদ্দারের জন্যে। আপনারা খরিদ দামে পাবেন। —আসুন।'

আমাদের ক্যাশিয়ারের কাছে লইয়া গিয়া সত্যকাম বলিল, 'এই জিনিসগুলো খরিদ দরে দেওয়া হচ্ছে। ক্যাশমেমো কেটে দিন।'

'যে আজ্ঞা।' বলিয়া বৃদ্ধ ক্যাশিয়ার ক্যাশমেমো লিখিয়া দিল। দেখিলাম টিকিটের দামের চেয়ে প্রায় পঞ্চাশ টাকা কম হইয়াছে। মন খুশি হইয়া উঠিল ; গত রাত্রে সত্যকাম সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছিল তাহাও বেশ খানিকটা পরিবর্তিত হইল। নাঃ, আর যাই হোক, ছোকরা একেবারে চুষুণ্ডি চামার নয়।

এই সময় উপরতলায় একটি তরুণীর আবির্ভাব হইল। বরবর্ণিনী যুবতী, সাজ পোশাকে লীলা-লালিত্যের পরিচয় আছে। সত্যকাম একবার ঘাড় ফিরাইয়া তরুণীকে দেখিল ; তাহার মুখের চেহারা বদলাইয়া গেল। সে এক চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া আমাদের বলিল, 'আপনাদের বোধহয় আর কিছু কেনার নেই ? আমি তাহলে—নতুন গ্রাহক এসেছে—আচ্ছা নমস্কার।'

মধুগন্ধে আকৃষ্ট মৌমাছির মত সত্যকাম সিধা যুবতীর দিকে উড়িয়া গেল। আমরা জিনিসপত্র প্যাক করাইয়া যখন নীচে নামিবার উপক্রম করিতেছি, দেখিলাম সত্যকাম যুবতীকে সম্পূর্ণ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, যুবতী সত্যকামের বচনামৃত পান করিতে করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে।

বাসায় ফিরিয়া সত্যবতীকে আমাদের খরিদ দেখাইলাম। সত্যবতী খুবই আহ্লাদিত হইল এবং নির্বাচন-নৈপুণ্যের সমস্ত প্রশংসা নির্বিচারে ব্যোমকেশকে অর্পণ করিল। বসন্তকালের এমনই মহিমা !

আমি যখন জিনিসগুলির মূল্য হ্রাসের কথা বলিলাম তখন সত্যবতী বিগলিত হইয়া বলিল, 'অ্যাঁ—সত্যি। ভারী ভাল ছেলে তো সত্যকাম !'

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বদিকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'ভারী ভাল ছেলে ! সোনার চাঁদ ছেলে ! যদি কেউ ওকে খুন না করে, দোকান শীগ্গিরই লাটে উঠবে।'

সন্ধ্যাবেলা ব্যোমকেশ আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। এবার গতি আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে। ৩৩/৩৪ নম্বর বাড়ির সম্মুখে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে। প্রদোষের এই সময়টিতে কলিকাতার ফুটপাথেও ক্ষণকালের জন্য লোক-চলাচল কমিয়া যায়, বোধ করি রাস্তার আলো জ্বলার প্রতীক্ষা করে। আমরা উদ্দিষ্ট বাড়ির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। বেশি পথিক নাই, কেবল গায়ে চাদর-জড়ানো একটি লোক ফুটপাথে ঘোরাফেরা করিতেছিল, আমাদের দেখিয়া একটু দূরে সরিয়া গেল।

৩৩/৩৪ নম্বর বাড়ি একেবারে ফুটপাথের উপর নয়। প্রথমে একটি ছোট লোহার ফটক, ফটক হইতে গলির মত সরু ইট-বাঁধানো রাস্তা কুড়ি-পঁচিশ ফুট গিয়া বাড়ির সদরে ঠেকিয়াছে। দোতলা বাড়ি, সম্মুখ হইতে খুব বড় মনে হয় না। সদর দরজার দুই পাশে দুইটি জানালা, জানালার মাথার উপর দোতলায় দুইটি গোলাকৃতি ব্যালকনি। বাড়ির ভিতরে এখনও আলো জ্বলে নাই। ফুটপাথে দাঁড়াইয়া মনে হইল একটি স্ত্রীলোক দোতলার একটি ব্যালকনিতে বসিয়া বই পড়িতেছে কিংবা সেলাই করিতেছে। ব্যালকনির ঢালাই লোহার রেলিঙের ভিতর দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখা গেল।

'ব্যোমকেশবাবু !'

পিছন হইতে অতর্কিত আহ্বানে দু'জনেই ফিরিলাম। গায়ে চাদর-জড়ানো যে লোকটিকে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছিলাম, সে আমাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পুষ্টকায় যুবক,

মাথায় চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখখানা যেন চেনা-চেনা মনে হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'কে ?'

যুবক বলিল, 'আমাকে চিনতে পারলেন না স্যার ? সেদিন সরস্বতী পুজোর চাঁদা নিতে গিয়েছিলাম। আমার নাম নন্দ ঘোষ, আপনার পাড়াতেই থাকি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মনে পড়েছে। তা তুমি ও-পাড়ার ছেলে, ভর সন্ধ্যেবেলা এখানে ঘোরাঘুরি করছ কেন ?'

'আজ্ঞে—' নন্দ ঘোষের একটা হাত চাদরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আবার তৎক্ষণাৎ চাদরের মধ্যে লুকাইল। তবু দেখিয়া ফেলিলাম, হাতে একটি ভিন্দিপাল। অর্থাৎ দেড় হেতে খেঁটে। বস্তুটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বলবান ব্যক্তির হাতে মারাত্মক অস্ত্র। ব্যোমকেশ সন্দিগ্ধ নেত্রে নন্দ ঘোষকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কী মতলব বল দেখি ?'

'মতলব—আজ্ঞে' নন্দ একটু কাছে ঘেঁষিয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'আপনাকে বলছি স্যার, এ-বাড়িতে একটা ছোঁড়া থাকে, তাকে ঠ্যাঙাব।'

'তাই নাকি ! ঠ্যাঙাবে কেন ?'

'কারণ আছে স্যার। কিন্তু আপনারা এখানে কী করছেন ? এ-বাড়ির কাউকে চেনেন নাকি ?'

'সত্যকামকে চিনি। তাকেই ঠ্যাঙাতে চাও—কেমন ?'

'আজ্ঞে—' নন্দ একটু বিচলিত হইয়া পড়িল, 'আপনার সঙ্গে কি ওর খুব ঘনিষ্ঠতা আছে নাকি ?'

'ঘনিষ্ঠতা নেই। কিন্তু জানতে চাই ওকে কেন ঠ্যাঙাতে চাও। ও কি তোমার কোনও অনিষ্ট করেছে ?'

'অনিষ্ট—সে অনেক কথা স্যার। যদি শুনতে চান, আমার সঙ্গে আসুন ; কাছেই ভূতেশ্বরের আখড়া, সেখানে সব শুনবেন।'

'ভূতেশ্বরের আখড়া !'

'আজ্ঞে আমাদের ব্যায়াম সমিতি। কাছেই গলির মধ্যে। চলুন।'

'চল।'

ইতিমধ্যে রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। আমরা নন্দকে অনুসরণ করিয়া একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিছু দূর গিয়া একটি পাঁচিলঘেরা উঠানের মত স্থানে পৌঁছিলাম। উঠানের পাশে গোটা দুই নোনাধরা জীর্ণ ঘরে আলো জ্বলিতেছে। উঠান প্রায় অন্ধকার, সেখানে কয়েকজন কপনিপরা যুবক ডন-বৈঠক দিতেছে, মুগুর ঘুরাইতেছে এবং আরও নানা প্রকারে দেহযন্ত্রকে মজবুত করিতেছে। নন্দ পাশ কাটাইয়া আমাদের ঘরে লইয়া গেল।

ঘরের মেঝেয় সতরঞ্চি পাতা ; একটি অতিকায় ব্যক্তি বসিয়া আছেন। নন্দ পরিচয় করাইয়া দিল, ইনি ব্যায়াম সমিতির ওস্তাদ, নাম ভূতেশ্বর বাগ। সার্থকনামা ব্যক্তি, কারণ তাঁহার গায়ের রঙ ভূতের মতন এবং মুখখানা বাঘের মতন ; উপরন্তু দেহায়তন হাতির মতন। মাথায় একগাছিও চুল নাই, বয়স ষাটের কাছাকাছি। ইনি বোধহয় যৌবনকালে গুণ্ডা ছিলেন অথবা কুস্তিগির ছিলেন, বয়োগতে ব্যায়াম সমিতি খুলিয়া বসিয়াছেন।

নন্দ বলিল, 'ভূতেশ্বরদা, ব্যোমকেশবাবু মস্ত ডিটেক্‌টিভ, সত্যকামকে চেনেন।'

ভূতেশ্বর ব্যোমকেশের দিকে বাঘা চোখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'আপনি পুলিসের লোক ? ঐ ছোঁড়ার মুরুব্বি ?'

ব্যোমকেশ সবিনয়ে জানাইল, সে পুলিসের লোক নয়, সত্যকামের সহিত তাহার আলাপও মাত্র একদিনের। সত্যকামকে প্রহার করিবার প্রয়োজন কেন হইয়াছে তাহাই শুধু জানিতে চায়, অন্য কোনও দুরভিসন্ধি নাই। ভূতেশ্বর একটু নরম হইয়া বলিলেন, 'ছোঁড়া পগেয়া পাজি। পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের কাছে নালিশ করেছেন। ছোঁড়া মেয়েদের বিরক্ত করে। এটা ভদ্দরলোকের পাড়া, এ-পাড়ায় ও-সব চলবে না।'

এই সময় আরও কয়েকজন গলদঘর্ম মল্লবীর ঘরে প্রবেশ করিল এবং আমাদের ঘিরিয়া বসিয়া

কটমট চক্ষে আমাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । স্পষ্টই বোঝা গেল, সত্যকামকে ঠ্যাঙাইবার সঙ্কল্প একজনের নয়, সমস্ত ব্যায়াম সমিতির অনুমোদন ইহার পশ্চাতে আছে। নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। গতিক সুবিধার নয়, সত্যকামের ফাঁড়াটা আমাদের উপর দিয়া বুঝি যায়।

ব্যোমকেশ কিন্তু সামলাইয়া লইল। শান্তস্বরে বলিল, 'পাড়ার কোনও লোক যদি বজ্জাতি করে তাকে শাসন করা পাড়ার লোকেরই কাজ, এ-কাজ অন্য কাউকে দিয়ে হয় না। আপনারা সত্যকামকে শায়েস্তা করতে চান তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই। তাকে যতটুকু জানি দু' ঘা পিঠে পড়লে তার উপকারই হবে। শুধু একটা কথা, খুনোখুনি করবেন না। আর, কাজটা সাবধানে করবেন, যাতে ধরা না পড়েন।'

নন্দ এক মুখ হাসিয়া বলিল, 'সেইজন্যেই তো কাজটা আমি হাতে নিয়েছি স্যার। দু'-চার ঘা দিয়ে কেটে পড়ব। আমি এ-পাড়ার ছেলে নই, চিনতে পারলেও সনাক্ত করতে পারবে না।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া গাত্রোত্থান করিল, 'তবু, যদি কোনও গণ্ডগোল বাধে আমাকে খবর দিও। আজ তাহলে উঠি। নমস্কার, ভূতেশ্বরবাবু।'

বড় রাস্তায় আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়া নন্দ আখড়ায় ফিরিয়া গেল। ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'বাপ, একেবারে বাঘের গুহায় গলা বাড়িয়েছিলাম !'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু সত্যকামকে মারধর করার উৎসাহ দেওয়া কি তোমার উচিত ? তুমি ওর টাকা নিয়েছ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দু'-চার ঘা খেয়ে যদি ওর প্রাণটা বেঁচে যায় সেটা কি ভাল নয় ?'

তিন

যদিও আমি কোনও দিন অফিস-কাছারি করি নাই, তবু কেন জানি না রবিবার সকালে ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হয়। পূর্বপুরুষেরা চাকুরে ছিলেন, রক্তের মধ্যে বোধ হয় দাসত্বের দাগ রহিয়া গিয়াছে।

পরদিনটা রবিবার ছিল, বেলা সাড়ে সাতটার সময় চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখি ব্যোমকেশ দু'হাতে খবরের কাগজটা খুলিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। আমার আগমনে সে চক্ষু ফিরাইল না, সংবাদপত্রটাকেই যেন সম্বোধন করিয়া বলিল, 'নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দূত !'

তাহার ভাবগতিক ভাল ঠেকিল না, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী হয়েছে ?'

সে কাগজ নামাইয়া রাখিয়া বলিল, 'সত্যকাম কাল রাত্রে মারা গেছে।'

'অ্যাঁ ! কিসে মারা গেল ?'

'তা জানি না। —তৈরি হয়ে নাও, আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরুতে হবে।'

আমি কাগজখানা তুলিয়া লইলাম। মধ্য পৃষ্ঠার তলার দিকে পাঁচ লাইনের খবর—

—অদ্য শেষ রাত্রে ধর্মতলার প্রসিদ্ধ সুচিত্রা এম্পোরিয়মের মালিক সত্যকাম দাসের সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়াছে। পুলিস তদন্তের ভার লইয়াছে।

সত্যকাম তবে ঠিকই বুঝিয়াছিল, মৃত্যুর পূর্বাভাস পাইয়াছিল। কিন্তু এত শীঘ্র ! প্রথমেই স্মরণ হইল, কাল সন্ধ্যার সময় নন্দ ঘোষ চাদরের মধ্যে খেঁটে লুকাইয়া বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করিতেছিল—

বেলা সাড়ে আটটার সময় ব্যোমকেশ ও আমি আমহার্স্ট স্ট্রীটে উপস্থিত হইলাম। ফটকের বাহিরে ফুটপাথের উপর একজন কনস্টেবল দাঁড়াইয়া আছে ; একটু খুঁতখুঁত করিয়া আমাদের ভিতরে যাইবার অনুমতি দিল।

ইট-বাঁধানো রাস্তা দিয়া সদরে উপস্থিত হইলাম। সদর দরজা খোলা রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে কেহ নাই। বাড়ির ভিতর হইতে কান্নাকাটির আওয়াজও পাওয়া যাইতেছে না। ব্যোমকেশ দরজার সম্মুখে পৌঁছিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, নীরবে মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। দেখিলাম দরজার ঠিক সামনে ইট-বাঁধানো রাস্তা যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে খানিকটা রক্তের দাগ। কাঁচা রক্ত নয়, বিঘতপ্রমাণ স্থানের রক্ত শুকাইয়া চাপড়া বাঁধিয়া গিয়াছে।

আমরা একবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম ; ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল। তারপর আমরা রক্ত-লিপ্ত স্থানটাকে পাশ কাটাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

একটি চওড়া বারান্দা, তাহার দুই পাশে দুইটি দরজা। একটি দরজায় তালা লাগানো, অন্যটি খোলা ; খোলা দরজা দিয়া মাঝারি আয়তনের অফিস-ঘর দেখা যাইতেছে। ঘরের মাঝখানে একটি বড় টেবিল, টেবিলের সম্মুখে উষাপতিবাবু একাকী বসিয়া আছেন।

উষাপতিবাবু টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া দুই করতলের মধ্যে চিবুক আবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। আমরা প্রবেশ করিলে দুঃস্বপ্নভরা চোখ তুলিয়া চাহিলেন, শুষ্ক নিষ্প্রাণ স্বরে বলিলেন, 'কী চাই ?'

ব্যোমকেশ টেবিলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল, সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, 'এ-সময় আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম, মাফ করবেন। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী—'

উষাপতিবাবু ঈষৎ সজাগ হইয়া পর্যায়ক্রমে আমাদের দিকে চোখ ফিরাইলেন, তারপর বলিলেন, 'আপনাদের আগে কোথায় দেখেছি। বোধহয় সুচিত্রায়।—কী নাম বললেন ?'

'ব্যোমকেশ বক্সী। ইনি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।—কাল আমরা আপনার দোকানে গিয়েছিলাম—'

উষাপতিবাবু আমাদের নাম পূর্বে শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না, কিন্তু খদ্দেরের প্রতি দোকানদারের স্বাভাবিক শিষ্টতা বোধ হয় তাঁহার অস্থিমজ্জাগত, তাই কোনও প্রকার অধীরতা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, 'কিছু দরকার আছে কি ? আমি আজ একটু—বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'জানি। সেই জন্যেই এসেছি। সত্যকামবাবু—'

'আপনি সত্যকামকে চিনতেন ?'

'মাত্র পরশু দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি আমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন—'

'কী প্রস্তাব ?'

'তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, হঠাৎ যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে আমি তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করব।'

উষাপতিবাবু এবার খাড়া হইয়া বসিলেন, কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া যেন প্রবল হৃদয়াবেগ দমন করিয়া লইলেন, তারপর সংযত স্বরে বলিলেন, 'আপনারা বসুন।—সত্যকাম তাহলে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মাফ করবেন, আপনার কাছে সত্যকাম কেন গিয়েছিল বুঝতে পারছি না। আপনি—আপনার পরিচয়—মানে আপনি কি পুলিসের লোক ? কিন্তু পুলিস তো কাল রাত্রেই এসেছিল, তারা—'

'না, আমি পুলিসের লোক নই। আমি সত্যান্বেষী। বেসরকারী ডিটেক্‌টিভ বলতে পারেন।'

'ও—'উষাপতিবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'সত্যকাম কাকে সন্দেহ করে, আপনাকে বলেছিল কি ?'

'না, কারুর নাম করেননি।—এখন আপনি যদি অনুমতি করেন আমি অনুসন্ধান করতে পারি।'

'কিন্তু—পুলিস তো অনুসন্ধানের ভার নিয়েছে, তার চেয়ে বেশি আপনি কী করতে পারবেন ?'

'কিছু করতে পারব কিনা তা এখনও জানি না তবে চেষ্টা করতে পারি।'

এত বড় শোকের মধ্যেও উষাপতিবাবু যে বিষয়বুদ্ধি হারান নাই তাই তাহার পরিচয় এবার পাইলাম।

তিনি বলিলেন, 'আপনি প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ, আপনাকে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছুই দিতে হবে না। আমার পারিশ্রমিক সত্যকামবাবু দিয়ে গেছেন।'

উষাপতিবাবু প্রখর চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর চোখ নামাইয়া বলিলেন, 'ও। তা আপনি অনুসন্ধান করতে চান করুন। কিন্তু কোনও লাভ নেই, ব্যোমকেশবাবু।'

'লাভ নেই কেন ?'

'সত্যকাম তো আর ফিরে আসবে না, শুধু জল ঘোলা করে লাভ কী ?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে উষাপতিবাবুর পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরস্বরে বলিল, 'আপনার মনের ভাব আমি বুঝেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জল ঘোলা হতে আমি দেব না। আমার উদ্দেশ্য শুধু সত্য আবিষ্কার করা।'

উষাপতিবাবু একটি ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিলেন, 'বেশ। আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল কখন কীভাবে সত্যকামবাবুর মৃত্যু হয়েছিল আমি কিছুই জানি না। আপনি বলতে পারবেন কি ?'

উষাপতিবাবুর মুখখানা যেন আরও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল, তিনি বুকের উপর একবার হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'আমিই বলি—আর কে বলবে ? কাল রাত্রি একটার সময় আমি নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দুম্ করে একটা আওয়াজ। মনে হল যেন সদরের দিক থেকে এল—'

'মাফ করবেন, আপনার শোবার ঘর কোথায় ?'

উষাপতিবাবু ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'এর ওপরের ঘর। আমি একাই শুই, পাশের ঘরে স্ত্রী শোন।'

'আর সত্যকামবাবু কোন্ ঘরে শুতেন ?'

'সত্যকাম নীচে শুত। ঐ যে বারান্দার ওপারে ঘরের দোরে তালা লাগানো রয়েছে ওটা তার শোবার ঘর ছিল। আমার স্ত্রীর শোবার ঘর ওর ওপরে।'

'সত্যকামবাবু নীচে শুতেন কেন ?'

উষাপতিবাবু উত্তর দিলেন না, উদাসচক্ষে বাহিরের জানালার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী হইতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, রাত্রিকালে নির্বিঘ্নে বহির্গমন ও প্রত্যাবর্তনের সুবিধার জন্যই সত্যকাম নীচের ঘরে শয়ন করিত। তাহার রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময়েরও ঠিক ছিল না।

এই সময় ভিতর দিকের দরজার পর্দা সরাইয়া একটি মেয়ে হাতে সরবতের গেলাস লইয়া প্রবেশ করিল এবং আমাদের দেখিয়া থমকিয়া গেল, অনিশ্চিত স্বরে একবার 'মামা—' বলিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিল। মেয়েটির বয়স সতেরো-আঠারো, সুন্দরী নয় কিন্তু পুরন্ত গড়ন, চটক আছে। বর্তমানে তাহার মুখে-চোখে শঙ্কার কালো ছায়া পড়িয়াছে।

উষাপতিবাবু তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'দরকার নেই।' মেয়েটি চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার বাড়িতে কে কে থাকে ?'

উষাপতিবাবু বলিলেন, 'আমরা ছাড়া আমার দুই ভাগনে ভাগনী থাকে।

'এটি আপনার ভাগনী ?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন এরা আপনার কাছে আছে ?'

'বছরখানেক আগে ওদের বাপ মারা যায়। মা আগেই গিয়েছিল। সেই থেকে আমি ওদের প্রতিপালন করছি। বাড়িতে আমরা ক'জন ছাড়া আর কেউ নেই।'

'চাকর-বাকর ?'

'পুরনো চাকর সহদেব বাড়িতেই থাকে। সে ছাড়া ঝি আর বাম্নী আছে, তারা রাত্রে থাকে না।'

'বুঝেছি। তারপর কাল রাত্রির ঘটনা বলুন।'

ঊষাপতিবাবু চোখের উপর দিয়া একবার করতল চালাইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। আওয়াজ শুনে আমি ব্যালকনির দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে অন্ধকার, কিছু দেখতে পেলাম না। তারপরই সদর দরজার কাছ থেকে সহদেব চীৎকার করে উঠল...ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে এলাম, দেখি সহদেব দরজা খুলেছে, আর—সত্যকাম দরজার সামনে পড়ে আছে। প্রাণ নেই, পিঠের দিক থেকে গুলি ঢুকেছে।'

'গুলি ! বন্দুকের গুলি ?'

'হ্যাঁ। সত্যকাম রোজই দেরি করে বাড়ি ফিরত। সহদেব বারান্দায় শুয়ে থাকত, দরজায় টোকা পড়লে উঠে দোর খুলে দিত। কাল সে টোকা শুনে দোর খোলবার আগেই কেউ পিছন দিক থেকে সত্যকামকে গুলি করেছে।'

'গুলি। আমি ভেবেছিলাম—' ব্যোমকেশ থামিয়া বলিল, 'তারপর বলুন।'

ঊষাপতিবাবু একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিলেন, 'তারপর আর কী ? পুলিসে টেলিফোন করলাম।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নতমুখে চিন্তা করিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল, 'সত্যকামবাবুর ঘরে তালা কে লাগিয়েছে ?'

ঊষাপতি বলিলেন, 'সত্যকাম যখনই বাড়ি বেরুত, নিজের ঘরে তালা দিয়ে যেত। কালও বোধহয় তালা দিয়েই বেরিয়েছিল, তারপর—'

'বুঝেছি। ঘরের চাবি তাহলে পুলিসের কাছে ?'

'খুব সম্ভব।'

'পুলিস ঘর খুলে দেখেনি ?'

'না।'

'যাক, আপনার কাছে আর বিশেষ কিছু জানবার নেই। এবার বাড়ির অন্য সকলকে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

'কাকে ডাকব বলুন।'

'সহদেব বাড়িতে আছে ?'

'আছে নিশ্চয়। ডাকছি।'

ঊষাপতিবাবু উঠিয়া গিয়া অন্দরের দ্বারের নিকট হইতে সহদেবকে ডাকিলেন, তারপর আবার আসিয়া বসিলেন।

সহদেব প্রবেশ করিল। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, শরীরে কেবল হাড় ক'খানা আছে। মাথায় ঝাঁকড়া পাকা চুল, ভ্রূ পাকা, এমন কি চোখের মণি পর্যন্ত ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। লোলচর্ম শিথিলপেশী মুখে হাবলার মত ভাব।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার নাম সহদেব ? তুমি কত বছর এ-বাড়িতে কাজ করছ ?'

সহদেব উত্তর দিল না, ফ্যালফ্যাল করিয়া একবার আমাদের দিকে একবার ঊষাপতিবাবুর দিকে তাকাইতে লাগিল। ঊষাপতিবাবু বলিলেন, 'ও আমার শ্বশুরের সময় থেকে এ-বাড়িতে আছে—প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর।'

ব্যোমকেশ সহদেবকে বলিল, 'তুমি কাল রাত্রে—'

ব্যোমকেশ কথা শেষ করিবার আগেই সহদেব হাত জোড় করিয়া বলিল, 'আমি কিছু জানিনে বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার কথাটা শুনে উত্তর দাও। কাল রাত্রে সত্যকামবাবু যখন দোরে টোকা দিয়েছিলেন তখন তুমি জেগে ছিলে ?'

সহদেব পূর্ববৎ জোড়হস্তে বলিল, 'আমি কিছু জানিনে বাবু।'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'মনে করবার চেষ্টা কর। সে-সময় দুম্ করে একটা আওয়াজ শুনেছিলে?'

'আমি কিচ্ছু জানিনে বাবু।'

অতঃপর ব্যোমকেশ যত প্রশ্ন করিল সহদেব তাহার একটিমাত্র উত্তর দিল—আমি কিচ্ছু জানিনে বাবু। এই সর্বাঙ্গীন অজ্ঞতা কতখানি সত্য অনুমান করা কঠিন; মোট কথা সহদেব কিছু জানিলেও বলিবে না। ব্যোমকেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তুমি যেতে পার। উষাপতিবাবু, এবার আপনার ভাগনীকে ডেকে পাঠান।'

উষাপতিবাবু সহদেবকে বলিলেন, 'চুমকিকে ডেকে দে।'

সহদেব চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে চুমকি প্রবেশ করিল, চেষ্টাকৃত দৃঢ়তার সহিত টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম তাহার মুখে আশঙ্কার ছায়া আরও গাঢ় হইয়াছে, আমাদের দিকে চোখ তুলিয়াই আবার নত করিল।

ব্যোমকেশ সহজ সুরে বলিল, 'তোমার মামার কাছে শুনলাম তুমি বছরখানেক হল এ-বাড়িতে এসেছ। আগে কোথায় থাকতে?'

চুমকি ধরা-ধরা গলায় বলিল, 'মানিকতলায়।'

'লেখাপড়া কর?'

'কলেজে পড়ি।'

'আর তোমার ভাই?'

'দাদাও কলেজে পড়ে।'

'আচ্ছা, কাল রাত্তিরে তুমি কখন জানতে পারলে?'

চুমকি একটু দম লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'আমি ঘুমোচ্ছিলুম। দাদা এসে দোরে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল, তখন ঘুম ভাঙল।'

'ও—তুমি রাত্তিরে ঘরের দরজা বন্ধ করে শোও?'

চুমকি যেন থতমত খাইয়া গেল, বলিল, 'হ্যাঁ।'

'তোমার শোবার ঘর নীচে না ওপরে?'

'নীচে পিছন দিকে। আমার ঘরের পাশে দাদার ঘর।'

'তাহলে বন্দুকের আওয়াজ তুমি শুনতে পাওনি?'

'না।'

'ঘুম ভাঙার পর তুমি কী করলে?'

'দাদা আর আমি এই ঘরে এলুম। মামা পুলিসকে ফোন করেছিলেন।'

'আর তোমার মামীমা?'

'তাঁকে তখন দেখিনি। এখান থেকে ওপরে গিয়ে দেখলুম তিনি নিজের ঘরের মেঝেয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।' চুমকির চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সদয় কণ্ঠে বলিল, 'আচ্ছা, তুমি এখন যাও। তোমার দাদাকে পাঠিয়ে দিও।'

চুমকি ঘরের বাহিরে যাইতে না যাইতে তাহার দাদা ঘরে প্রবেশ করিল; মনে হইল সে দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিয়া ছিল। ভাই বোনের চেহারায় খানিকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ছেলেটির চোখের দৃষ্টি একটু অদ্ভুত ধরনের। প্যাঁচার চোখের মত তাহার চোখেও একটা নির্নিমেষ অচঞ্চল একাগ্রতা। সে অত্যন্ত সংযতভাবে টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নিষ্পলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল।

সওয়াল জবাব আরম্ভ হইল।

'তোমার নাম কী?'

'শীতাংশু দত্ত।'

'বয়স কত ?'
'কুড়ি।'
'কাল রাত্রে তুমি জেগে ছিলে ?'
'হ্যাঁ।'
'কী করছিলে ?'
'পড়ছিলাম।'
'কী পড়ছিলে ? পরীক্ষার পড়া ?'
'না। গোর্কির 'লোয়র ডেপ্‌থস' পড়ছিলাম। রাত্রে পড়া আমার অভ্যাস।'
'ও...বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলে ?'
'পেয়েছিলাম। কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ বলে বুঝতে পারিনি।'
'তারপর ?'
'সহদেবের চীৎকার শুনে গিয়ে দেখলাম।'
'তারপর ফিরে এসে তোমার বোনকে জাগালে ?'
'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চিবুকের তলায় করতল রাখিয়া বসিয়া রহিল। দেখিলাম উষাপতিবাবুও নির্লিপ্তভাবে বসিয়া আছেন, প্রশ্নোত্তরের সব কথা তাঁহার কানে যাইতেছে কিনা সন্দেহ। মনের অন্ধকার অতলে তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন।

ব্যোমকেশ আবার সওয়াল আরম্ভ করিল।
'তুমি রাত্রে শোবার সময় দরজা বন্ধ করে শোও ?'
'না, খোলা থাকে।'
'চুমকির দোর বন্ধ থাকে ?'
'হ্যা। ও মেয়ে, তাই।'
'যাক।—কাল রাত্রে সকলে শুয়ে পড়বার পর তুমি বাড়ির বাইরে গিয়েছিলে ?'
'না।'
'সদর দরজা ছাড়া বাড়ি থেকে বেরুবার অন্য কোনও রাস্তা আছে ?'
'আছে। খিড়কির দরজা।'
'কাল রাত্রে খিড়কির দরজা দিয়ে কেউ বেরিয়েছিল ?'
'না। বেরুলে আমি জানতে পারতাম। খিড়কির দরজা আমার ঘরের পাশেই। দোর খুললে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হয়। তাছাড়া রাত্রে খিড়কির দরজায় তালা লাগানো থাকে।'
'তাই নাকি ! তার চাবি কার কাছে থাকে ?'
'সহদেবের কাছে।'
'হুঁ। সত্যকামবাবু রাত্রে দেরি করে বাড়ি ফিরতেন তুমি জান ?'
'জানি।'
'রোজ জানতে পারতে কখন তিনি বাড়ি ফেরেন ?'
'রোজ নয়, মাঝে মাঝে পারতাম।'
'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।'

শীতাংশু আরও কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পানে নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ উষাপতিবাবুর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত স্বরে বলিল, 'উষাপতিবাবু, এবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে কি ?'

উষাপতিবাবু চমকিয়া উঠিলেন, 'আমার স্ত্রী ! কিন্তু তিনি—তাঁর অবস্থা—'

'তাঁর অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তাঁকে এখানে আসতে হবে না, আমিই তাঁর ঘরে গিয়ে

দু'-একটা কথা—'

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইল না, একটি মহিলা অধীর হস্তে পর্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে ঊষাপতিবাবুর স্ত্রী, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ব্যোমকেশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি তীব্র স্বরে বলিলেন, 'কেন আপনি আমার স্বামীকে এমনভাবে বিরক্ত করছেন ? কী চান আপনি ? কেন এখানে এসেছেন ?'

আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মহিলাটির বয়স বোধকরি চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু চেহারা দেখিয়া আরও কম বয়স মনে হয়। রঙ ফরসা, মুখে সৌন্দর্যের চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। বর্তমানে তাঁহার মুখে পুত্রশোক অপেক্ষা ক্রোধই অধিক ফুটিয়াছে। ব্যোমকেশ অত্যন্ত মোলায়েম সুরে বলিল, 'আমাকে মাফ করবেন, নেহাত কর্তব্যের দায়ে আপনাদের বিরক্ত করতে এসেছি—'

মহিলাটি বলিলেন, 'কে ডেকেছে আপনাকে ? এখানে আপনার কোনও কর্তব্য নেই। যান আপনি, আমাদের বিরক্ত করবেন না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি কি চান না যে সত্যকামবাবুর মৃত্যুর একটা কিনারা হয় ?'

'না, চাই না। যা হবার হয়েছে। আপনি যান, আমাদের রেহাই দিন।'

'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

আমরা ঊষাপতিবাবুর পানে চাহিলাম। তিনি বিস্ময়াহতভাবে স্ত্রীর পানে চাহিয়া আছেন, যেন নিজের চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। মহিলাটিও একবার স্বামীর প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলেন, তারপর দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

চার

আমরা সদর দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ঊষাপতিবাবুও আমাদের পিছন পিছন আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখের বিস্ময়াহত ভাব সম্পূর্ণ কাটে নাই। তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন, 'আমাদের মানসিক অবস্থা বুঝে ক্ষমা করবেন। নমস্কার।'

দরজা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা কী ?'

আসিবার সময় চোখে পড়ে নাই, কবাটের বাহিরের দিকে নীচের চৌকাঠ হইতে হাতখানেক উঁচুতে একটি সোনালী চাকতি চক্‌চক্‌ করিতেছে। ঊষাপতিবাবু দ্বার বন্ধ করিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। চাকতিটা আয়তনে চাঁদির টাকার চেয়ে কিছু বড়। ব্যোমকেশ নত হইয়া সেটা দেখিল, আঙুল দিয়া সেটা পরীক্ষা করিল। বলিল, 'রাংতার চাকতি, গঁদ দিয়ে কবাটে জোড়া রয়েছে।' সে সোজা হইয়া ঊষাপতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা কী ?'

ঊষাপতিবাবু দ্বিধাভরে বলিলেন, 'কী জানি, আগে লক্ষ্য করেছি বলে মনে হচ্ছে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সম্প্রতি কেউ সেঁটেছে। বাড়িতে ছোট ছেলেপিলে থাকলে বোঝা যেত। কিন্তু—আপনি একবার খোঁজ নেবেন ?'

ঊষাপতিবাবু সহদেবকে ডাকিলেন, সে যথারীতি বলিল, 'আমি কিছু জানিনে বাবু।' চুমকিও কিছু বলিতে পারিল না। শীতাংশু বলিল, 'আমি কাল সন্ধ্যের সময় যখন বাড়ি এসেছি তখন ওটা ছিল না।'

আমার মাথায় নানা চিন্তা আসিতে লাগিল। সত্যকামকে যে খুন করিয়াছে সে কি নিজের পরিচয়ের ইঙ্গিত এইভাবে রাখিয়া গিয়াছে ? হরতনের টেক্কা ! লোমহর্ষণ উপন্যাসে এই ধরনের জিনিস দেখা যায় বটে। কিন্তু—

কোনও হদিস পাওয়া গেল না। আমরা চলিয়া আসিলাম।

রাস্তায় বাহির হইয়া ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'এখনও দশটা বাজেনি। চল,

থানাটা ঘুরে যাওয়া যাক।'

থানার দিকে চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়ির লোকের এজেহার শুনলে। কী মনে হল ?'

এই কথাটাই আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছিল। বলিলাম, 'কাউকেই খুব বেশি শোকার্ত মনে হল না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রবাদ আছে, অল্প শোকে কাতর, বেশি শোকে পাথর।'

বলিলাম, 'প্রবাদ থাকতে পারে, কিন্তু উষাপতিবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর আচরণ খুব স্বাভাবিক নয়। সত্যকাম ভাল ছেলে ছিল না, নিজের উচ্ছৃঙ্খলতায় বাপমা'কে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, সবই সত্যি হতে পারে। তবু ছেলে তো। একমাত্র ছেলে। আমার বিশ্বাস এই পরিবারের মধ্যে কোথাও একটা মস্ত গলদ আছে।'

'অবশ্য। সত্যকামই তো একটা মস্ত গলদ। সে যাক, দরজায় রাংতার চাকতির অর্থ কিছু বুঝলে ?'

'না। তুমি বুঝেছ ?'

'সম্পূর্ণ আকস্মিক হতে পারে। কিন্তু তা যদি না হয়—'

থানায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, দারোগা ভবানীবাবু আমাদের পরিচিত লোক। বয়স্থ ব্যক্তি ; ক্রশ-বের্ল্ট টেবিলের উপর খুলিয়া রাখিয়া কাজ করিতেছেন। আমাদের দেখিয়া খুব খুশি হইয়াছেন মনে হইল না। তবু যথোচিত শিষ্টতা দেখাইয়া শেষে খাটো গলায় বলিলেন, 'আপনি আবার এর মধ্যে কেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়েছি।'

ভবানীবাবু পূর্ববৎ নিম্নস্বরে বলিলেন, 'ছোঁড়া পাকা শয়তান ছিল। যে তাকে খুন করেছে সে সংসারের উপকার করেছে। এমন লোককে মেডেল দেওয়া উচিত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। আপনারা যা করছেন করুন, আমি তার মধ্যে নাক গলাতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই—'

ভবানীবাবু তাহাকে দৃষ্টি-শলাকায় বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'সত্যান্বেষণ ? কী জানতে চান বলুন।'

'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এখনও বোধহয় আসেনি ?'

'না। সন্ধ্যে নাগাদ পাওয়া যেতে পারে।'

'সন্ধ্যের পর আমি আপনাকে ফোন করব—বন্দুকের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে ?'

'বড় বন্দুক নয়, পিস্তল কিম্বা রিভলবার। গুলিটা পিঠের বাঁ দিকে ঢুকেছে, সামনে কিন্তু বেরোয়নি। শরীরের ভিতরেই আছে। পিঠে যে ফুটো হয়েছে সেটা খুব ছোট, তাই মনে হয় পিস্তল কিম্বা রিভলবার।'

'পিঠের দিকে ফুটো হয়েছে, তার মানে যে গুলি করেছে সে সত্যকামের পিছনে ছিল।'

'হ্যাঁ। হয়তো ফটকের ভিতর দিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিল, যেই সত্যকাম সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অমনি গুলি করেছে, তারপর ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

'হুঁ। এ-পাড়ায় একটা ব্যায়াম সমিতি আছে আপনি জানেন ?'

'জানি। তাদের কাজ নয়। তারা দু'-চার ঘা প্রহার দিতে পারে, খুন করবে না, সবাই ভদ্রলোকের ছেলে।'

ভদ্রলোকের ছেলে খুন করে না, পুলিসের মুখে একথা নূতন বটে। কিন্তু ব্যোমকেশ সেদিক দিয়া গেল না, বলিল 'ভদ্রলোকের ছেলের কথায় মনে পড়ল। সত্যকামের এক পিসতুতো ভাই বাড়িতে থাকে, তাকে দেখেছেন ?'

ভবানীবাবু একটু হাসিলেন, 'দেখেছি। পুলিসে তার নাম আছে।'

'তাই নাকি ! কী করেছে সে ?'

'ছেলেটা ভালই ছিল, তারপর গত দাঙ্গার সময় ওর বাপকে মুসলমানেরা খুন করে। সেই থেকে ওর স্বভাব বদলে গেছে। আমাদের সন্দেহ ও কম-সে-কম গোটা তিনেক খুন করেছে। অবশ্য পাকা প্রমাণ কিছু নেই।'

'ওর চোখের চাউনি দেখে আমারও সেই রকম সন্দেহ হয়েছিল। আপনার কি মনে হয় এ-ব্যাপারে তার হাত আছে?'

'কিছুই বলা যায় না, ব্যোমকেশবাবু। সত্যকামের মত পাঁঠা যেখানে আছে সেখানে সবই সম্ভব। তবে যতদূর জানতে পারলাম যখন খুন হয় তখন সে বাড়ির মধ্যে ছিল। সহদেবের চীৎকার শুনে ওর মামা আর ও একসঙ্গে সদর দরজায় পৌঁচেছিল। সত্যকামকে পিছন থেকে যে গুলি করেছে তার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'ছাতের ওপর থেকে গুলি করা কি সম্ভব?'

ভবানীবাবু বলিলেন, 'ছাতের ওপর গুলি করলে গুলিটা শরীরের ওপর দিক থেকে নীচের দিকে যেত। গুলিটা গেছে পিছন দিক থেকে সামনের দিকে। সুতরাং—'

এই সময় টেলিফোন বাজিল। ভবানীবাবু টেলিফোনের মধ্যে দু'চার কথা বলিয়া আমাদের কহিলেন, 'আমাকে এখনি বেরুতে হবে। জোর তলব—'

'আমরাও উঠি।' ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ভাল কথা, মৃত্যুকালে সত্যকামের সঙ্গে কী কী জিনিস ছিল—'

'ঐ যে পাশের ঘরে রয়েছে, দেখুন না গিয়ে।' বলিয়া ভবানীবাবু কোমরে বেল্ট বাঁধিতে লাগিলেন।

পাশের ঘরে একটি টেবিলের উপর কয়েকটি জিনিস রাখা রহিয়াছে। সোনার সিগারেট-কেসটি দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। তাছাড়া হুইস্কির ফ্ল্যাস্ক, চামড়ার মনিব্যাগ, একটি ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ প্রভৃতি রহিয়াছে। ব্যোমকেশ সেগুলির উপর একবার চোখ বুলাইয়া ফিরিয়া আসিল। ভবানীবাবু এতক্ষণে বেল্ট বাঁধা শেষ করিয়াছেন, দেরাজ হইতে পিস্তল লইয়া কোমরের খাপে পুরিতেছেন। বলিলেন, 'দেখলেন? আর কিছু দেখবার নেই তো? আচ্ছা, চলি।'

ভবানীবাবু চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, তিনি আসামীকে ধরিবার কোনও চেষ্টাই করিবেন না। শেষ পর্যন্ত সত্যকামের মৃত্যু-রহস্য অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে।

আমরাও বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'এতদূর যখন এসেছি, চল বাগের আখড়া দেখে যাই।'

'এখন কি কারুর দেখা পাবে?'

'দেখাই যাক না। আর কেউ না থাক বাগ মশাই নিশ্চয় গুহায় আছেন।'

বাঘ কিন্তু গুহায় নাই। গিয়া দেখিলাম দরজায় তালা লাগানো। একজন ভৃত্য শ্রেণীর লোক দাওয়ায় বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল, সে বলিল, 'ভুতু সর্দারকে খুঁজতেছেন? আজ্ঞে তিনি আজ সকালের গাড়িতে কাশী গেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বল কি! একেবারে কাশী!—তুমি কে?'

লোকটি বলিল, 'আজ্ঞে আমি তেনার চাকর। ঘর ঝাঁট দি, কাপড় কাচি, কলসীতে জল ভরি। আজ সকালে ঘর ঝাঁট দিতে এসে দেখনু সর্দার খবরের কাগজ পড়তেছেন। কলসীতে জল ভরে নিয়ে এনু, সর্দার সেজেগুজে তৈরি। কইলেন, আমি কাশী চন্নু, সন্ধ্যেবেলা ছেলেরা এলে কয়ে দিও।'

বুঝিতে বাকী রহিল না, ভূতেশ্বর বাগ খবরের কাগজের সংবাদ পড়িয়াছেন এবং বিলম্ব না করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।

বাসায় ফিরিলাম প্রায় সওয়া এগারোটায়। দেখি বন্ধ দরজার সামনে নন্দ ঘোষ প্রতীক্ষমাণভাবে পায়চারি করিতেছে। তাহার মুখ শুষ্ক, চোখে শঙ্কিত অস্বাচ্ছন্দ্য। ব্যোমকেশ দ্বারের কড়া নাড়িয়া স্মিতমুখে নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী খবর?'

'আজ্ঞে স্যার...' বলিয়া নন্দ ঠোঁট চাটিতে লাগিল।

পুঁটিরাম আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, আমরা নন্দকে লইয়া ভিতরে আসিয়া বসিলাম। নন্দ আরও দু'চার বার ঠোঁট চাটিয়া বলিল, 'সত্যকামের খবর শুনেছেন ?'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'শুনেছি। তুমি কোথায় শুনলে ?'

নন্দ বলিল, 'সকালবেলায় ও-পাড়ায় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, খবর পেলাম কাল রাত্তিরে কেউ সত্যকামকে গুলি করে মেরেছে। আমি কিন্তু কিচ্ছু জানি না স্যার। কাল সন্ধ্যেবেলা সেই যে আপনারা আখড়া থেকে চলে এলেন, তারপর আমি আরও ওদিকে যাইনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বোস, তোমাকে দু'-চারটে কথা জিজ্ঞেস করি। ও-পাড়ায় তোমার জানাশোনার মধ্যে কারুর পিস্তল কিম্বা রিভলবার আছে ?'

'না স্যার। থাকলেও আমি জানি না।'

'তোমাদের আখড়ায় কারুর নেই ?'

'জানি না। তবে একটা লোক ভূতেশ্বরের কাছে চোরাই পিস্তল বিক্রি করতে এসেছিল।'

'চোরাই পিস্তল !'

'হ্যাঁ স্যার। শুনেছি যুদ্ধের পর অনেক চোরাই পিস্তল কিনতে পাওয়া যেত।'

'ভূতেশ্বর কিনেছিল ?'

'তা জানি না। আমাদের সামনে কেনেনি।'

'আচ্ছ, ও-কথা যাক।—সত্যকাম ভদ্রঘরের মেয়েদের পিছনে লাগত। কীভাবে পিছনে লাগত বলতে পার ?'

নন্দ কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'স্যার, সত্যকাম জাদুমন্ত্র জানত, দুটো কথা বলেই মেয়েগুলোকে বশ করে ফেলত। তারপর নিজের দোকানে নিয়ে যেত, ভাল ভাল জিনিস উপহার দিত, হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত—' কুণ্ঠিতভাবে সে চুপ করিল।

'বুঝেছি। মেয়েরাও নেহাত নির্দোষ নয়।' গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ সিগারেট টানিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'স্ত্রী-স্বাধীনতাও বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। যাক, কোন্ কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে সত্যকামের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তুমি বলতে পার ?'

নন্দ আরও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, 'সকলের কথা জানি না স্যার, তবে ৭৩ নম্বরের অখিলবাবু আমাদের ব্যায়াম সমিতিতে নালিশ করেছিলেন, তাঁর মেয়ে শোভনা—। তারপর রামেশ্বরবাবুর নাতনী—সেও কিছু দিন সত্যকামের ফাঁদে পড়েছিল, ভীষণ কেলেঙ্কারি হবার যোগাড় হয়েছিল। যাহোক, তার বিয়ে হয়ে গেছে—'

'আর কেউ ?'

'আর—ভবানীবাবুর মেয়ে সলিলা—'

'কোন ভবানীবাবু ?'

'ও-পাড়ার থানার দারোগা ভবানীবাবু। তিনি মেয়েকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন। তারপর এখন মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

ব্যোমকেশের সহিত আমার একবার চকিত দৃষ্টি-বিনিময় হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আড়মোড়া ভাঙিল, নন্দকে বলিল, 'আচ্ছা নন্দ, তুমি আজ এস। অন্য সময় তোমার সঙ্গে আবার কথা হবে। ভাল কথা, তোমাদের ওস্তাদ পালিয়েছে। তুমি এখন কিছুদিন আর ওদিকে যেও না।'

নন্দ আবার ঠোঁট চাটিয়া বলিল, 'আচ্ছা স্যার।'

পাঁচ

সমস্ত দিন ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। বৈকালে সত্যবতী দু'-একবার কাশ্মীর যাত্রার প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ব্যোমকেশ শুনিতে পাইল না, ইজি-চেয়ারে শুইয়া কড়িকাঠের পানে তাকাইয়া রহিল।

আমি বলিলাম, 'তাড়া কিসের ? এ-ব্যাপারের আগে নিষ্পত্তি হোক।'

সত্যবতী বলিল, 'নিষ্পত্তি হতে বেশি দেরি নেই। মুখ দেখে বুঝতে পারছ না !'

ব্যোমকেশ সত্যবতীর কথা শুনিতে পাইল কিনা বলা যায় না, আপন মনে 'রাংতার চাকতি' বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

সত্যবতী আমার পানে অর্থপূর্ণ ঘাড় নাড়িয়া মুচকি হাসিল।

সন্ধ্যার পর থানায় ফোন করিবার কথা। আমি স্মরণ করাইয়া দিলে ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমিই ফোন কর অজিত।'

থানার নম্বর বাহির করিয়া ফোন করিলাম। ভবানীবাবু উপস্থিত ছিলেন, বলিলেন, 'এইমাত্র রিপোর্ট এসেছে, মৃত্যুর সময় রাত্রি বারটা থেকে দুটোর মধ্যে। গুলিটা ·৪৫ রিভলবারের, বাঁ দিকে স্ক্যাপিউলার নীচে দিয়ে ঢুকে হৃদ্‌যন্ত্র ভেদ করে ডান দিকের তৃতীয় পঞ্জরে আটকেছে। গুলির গতি নীচের দিক থেকে একটু ওপর দিকে, পাশের দিক থেকে মাঝের দিকে।—অন্য কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।—আর কি ! পেটের মধ্যে খানিকটা মদ পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশকে বলিলাম। সে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল, 'গুলির গতি—কী বললে ?'

'নীচের দিক থেকে একটু ওপর দিকে, পাশের দিক থেকে মাঝের দিকে। অর্থাৎ যে গুলি করেছে সে রাস্তার বাঁ দিকে ঝোপের মধ্যে বসে ছিল, বসে বসেই গুলি করেছে।'

ব্যোমকেশ আরও কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, 'উবু হয়ে বসে গুলি করেছে ! কেন ?'

'তা জানি না। আমার সঙ্গে পরামর্শ করে গুলি করেনি।'

ব্যোমকেশ আবার ইজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'ব্যাপারটা ভেবে দেখ। তোমাদের ধারণা আততায়ী আগে থেকে ফটকের ভিতর দিকে লুকিয়ে ছিল, সত্যকাম ফটক দিয়ে ঢুকে কুড়ি-পঁচিশ ফুট রাস্তা পার হয়ে সদর দরজার সামনে এসে কড়া নাড়ল, তখন আততায়ী তাকে গুলি করল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে—কেন ? সত্যকাম যেই ফটক দিয়ে ঢুকল আততায়ী তখনই তাকে গুলি করল না কেন। তাতেই তো তার সুবিধে, গুলি করেই চট্ করে ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার ভয়ও থাকত না।'

'প্রশ্নের উত্তর কী—তুমিই বল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত এই যে, আততায়ী ওদিক থেকে গুলি করেনি। কিন্তু তার চেয়েও ভাবনার কথা, রাংতার চাকতিটা কে লাগিয়েছিল, কখন লাগিয়েছিল, এবং কেন লাগিয়েছিল।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওটা তাহলে আকস্মিক নয় ?'

'যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে ওটা আকস্মিক নয়, তার একটা গূঢ় অর্থ আছে। সেই অর্থ জানতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে।'

আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম রাংতার চাকতির তাৎপর্য কী ? যদি ধরা যায় আততায়ী ওটা লাগাইয়াছিল তবে তাহার উদ্দেশ্য কী ছিল ? যদি আততায়ী না লাগাইয়া থাকে তবে কে লাগাইল ? বাড়ির কেহ যদি না হয় তবে কে ? সত্যকাম কি ? কিন্তু কেন ?

ব্যোমকেশ হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, 'অজিত, সত্যকামের সঙ্গে কী কী জিনিস ছিল—থানায় টেবিলের ওপর দেখেছিলে—মনে আছে ?'

বলিলাম, 'সিগারেট-কেস ছিল, রিস্টওয়াচ ছিল, মনিব্যাগ ছিল, মদের ফ্ল্যাস্ক ছিল আর—একটা ইলেকট্রিক টর্চ ছিল।'

ব্যোমকেশ আবার আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িল, 'ইলেকট্রিক টর্চ— ! কলকাতায় পথ চলবার জন্যে ইলেকট্রিক টর্চ দরকার হয় না।"

'না। কিন্তু ফটক থেকে সদর দরজা পর্যন্ত যেতে হলে দরকার হয়।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, 'তাহলে সত্যকাম টর্চের আলোয় আততায়ীকে দেখতে পায়নি কেন ?'

সহসা এ-প্রশ্নের উত্তর যোগাইল না। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, তারপর ব্যোমকেশ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলিল, 'কাল সকালে শীতাংশুর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলা দরকার।'

আমি উচ্চকিতভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম, কিন্তু সে আর কিছু বলিল না ; বোধ করি কড়িকাঠ গুনিতে লাগিল। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, তাহার মুখের বিরস অন্যমনস্কতা আর নাই, যেন সে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখি ব্যোমকেশ কাহাকে ফোন করিতেছে। আমি চায়ের পেয়ালা লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলে সেও আসিয়া বসিল। তাহার মুখ গম্ভীর।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাকে ফোন করছিলে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঊষাপতিবাবুকে।'

'হঠাৎ ঊষাপতিবাবুকে ?'

'শীতাংশুকে পাঠিয়ে দিতে বললাম।'

'ও। —ওদের বাড়ির খবর কী ?'

'খবর—পুলিস কাল সন্ধ্যেবেলা লাশ ফেরত দিয়েছিল—ওঁরা শেষ রাত্রে শ্মশান থেকে ফিরেছেন।' ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল যদি পুলিস খানাতল্লাসি করত তাহলে রিভলভারটা বোধ হয় বাড়িতেই পাওয়া যেত। এখন আর পাওয়া যাবে না।'

'তার মানে বাড়ির লোকের কাজ।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

আধ ঘণ্টা পরে শীতাংশু আসিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'এস—বোস। কাল তোমার মামার সামনে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।'

শীতাংশু ব্যোমকেশের সামনের চেয়ারে বসিল এবং অপলক নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ আরম্ভ করিল, 'কাল থানায় খবর পেলুম তুমি নাকি দাঙ্গার সময় গোটা দুত্তিন খুন করেছ। কথাটা সত্যি ?'

শীতাংশু উত্তর দিল না, কিন্তু ভয় পাইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না ; নির্ভীক একাগ্র চোখে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাকে স্বচ্ছন্দে বলতে পার, আমি পুলিসের লোক নই।'

শীতাংশুর গলাটা যেন ফুলিয়া উঠিল, সে চাপা গলায় বলিল, 'হ্যাঁ। ওরা আমার বাবাকে—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'জানি। কী দিয়ে খুন করেছিলে ?'

'ছোরা দিয়ে।'

'তুমি কখনও রিভলভার ব্যবহার করেছ ?'

'না।'

'সত্যকামের রিভলভার ছিল ?'

'জানি না। বোধহয় ছিল না।'

'বাড়িতে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল কিনা জান ?'

'জানি না।'

'সত্যকামের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব ছিল ?'

'না। দু'জনে দু'জনকে এড়িয়ে চলতাম।'

'সত্যকাম লম্পট ছিল তুমি জানতে ?'

'জানতাম।'

'তোমার বাবাকে তুমি ভালবাসতে। তোমার বোন চুমকিকেও নিশ্চয় ভালবাস ?'

শীতাংশু উত্তর দিল না, কেবল চাহিয়া রহিল। ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'সত্যকামকে খুন করবার ইচ্ছে তোমার কোনদিন হয়েছিল ?'

শীতাংশু এবারও উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার নীরবতার অর্থ স্পষ্টই বোঝা গেল। ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল 'বলতে হবে না, আমি বুঝেছি। সত্যকামকে তুমি বোধহয় শাসিয়ে দিয়েছিলে ?'

শীতাংশু সহজভাবে বলিল, 'হ্যাঁ। তাকে বলে দিয়েছিলাম, বাড়িতে বেচাল দেখলেই খুন করব।'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল; তীক্ষ্ণ চক্ষে নয়, যেন একটু অন্যমনস্কভাবে। তারপর বলিল, 'সে-রাত্রে সহদেবের চীৎকার শুনে তুমি সদরে গিয়ে কি দেখলে ?'

'দেখলাম সত্যকাম দরজার বাইরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।'

'কী করে দেখলে ? সেখানে আলো ছিল ?'

'সত্যকামের হাতে একটা জ্বলন্ত টর্চ ছিল, তারই আলোতে দেখলাম। তারপর মামা এসে সদরের আলো জ্বেলে দিলেন।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল। দুই-তিনটা লম্বা টান দিয়া বলিল, 'ও-কথা যাক। সত্যকামকে নিয়ে তোমার মামা আর মামীর মধ্যে খুবই অশান্তি ছিল বোধহয় ?'

'অশান্তি— ?'

'হ্যাঁ। ঝগড়া বকাবকি—এ-রকম অবস্থায় যা হয়ে থাকে।'

শীতাংশু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'না, ঝগড়া বকাবকি হত না।'

'একেবারেই না ?'

'না। মামা আর মামীমার মধ্যে কথা নেই।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিল, 'কথা নেই ! তার মানে ?'

'মামা মামীমার সঙ্গে কথা বলেন না, মামীমাও মামার সঙ্গে কথা বলেন না।'

'সে কি, কবে থেকে ?'

'আমি যবে থেকে দেখছি। আগে যখন মানিকতলায় ছিলাম, প্রায়ই মামার বাড়ি আসতাম। তখনও মামা-মামীমাকে কথা বলতে শুনিনি।'

'তোমার মামীমা কেমন মানুষ ? ঝগড়াটে ?'

'মোটেই না। খুব ভাল মানুষ।'

ব্যোমকেশ আর প্রশ্ন করিল না, চোখ বুজিয়া যেন ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল। আমার মনে পড়িয়া গেল, কাল সকালবেলা উষাপতিবাবুর স্ত্রী সহসা ঘরে প্রবেশ করিলে তিনি বিস্ময়াহত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন। তখন তাঁহার সেই চাহনির অর্থ বুঝিতে পারি নাই।...স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘ মনান্তর কি পুত্রের মৃত্যুতে জোড়া লাগিয়াছে ?

শীতাংশু চলিয়া যাইবার পরও ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া বসিয়া রহিল, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল, 'বড় ট্র্যাজিক ব্যাপার।—শীতাংশুকে কেমন মনে হল ?'

'মনে হল সত্যি কথা বলছে।'

'ছেলেটা বুদ্ধিমান—ভারী বুদ্ধিমান।' বলিয়া সে আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল।

আধ ঘণ্টা পরে তাহার ধ্যান ভাঙিল বহির্দ্বারের কড়া নাড়ার শব্দে। আমি উঠিয়া গিয়া দ্বার

খুলিলাম। দেখি—উষাপতিবাবু।

ছয়

ব্যোমকেশের আহ্বানে উষাপতিবাবু চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। ক্লান্ত অবসন্ন মূর্তি, চক্ষু দুটি ঈষৎ রক্তাভ ; শরীর যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

ব্যোমকেশ সিগারেটের কৌটা তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিল। দুইজনে কিছুক্ষণ অনুসন্ধিৎসু চক্ষে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তারপর উষাপতিবাবু বলিলেন, 'থাক, আমি এখনি উঠব। আপনার ফোন পাবার পর থানায় গিয়েছিলাম, তা ওরা তো কোনও খবরই রাখে না। তাই ভাবলাম দেখি যদি আপনি কোনও খবর পেয়ে থাকেন।'

উষাপতিবাবুর কথায় যে প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন ছিল ব্যোমকেশ সরাসরি তাহার উত্তর দিল না, বলিল, 'একদিনের কাজ নয়, সময় লাগবে। আপনার ওপর দিয়ে খুবই ধকল যাচ্ছে, আপনি আজ বাড়ি থেকে না বেরুলেই পারতেন। আপনার স্ত্রীকেও দেখা শোনা করা দরকার।'

উষাপতিবাবুর মুখ লক্ষ্য করিলাম, স্ত্রীর প্রসঙ্গে তাঁহার মুখের কোনও ভাবান্তর হইল না ; স্ত্রীর সহিত তাঁহার যে দীর্ঘকালের বিপ্রয়োগ তাহার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। বলিলেন, 'আমার স্ত্রীর জন্যেই ভাবনা। তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন।' একটু থামিয়া বলিলেন, 'ভাবছি কিছুদিনের জন্যে ওঁকে নিয়ে বাইরে ঘুরে এলে কেমন হয়। কলকাতার বাইরে গেলে হয়তো ওঁর মনটা—'

'তা ঠিক। কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেছেন ?'

'না। কলকাতা ছেড়ে যেখানে হোক গেলেই বোধহয় কাজ হবে। কাশী বৃন্দাবন আগ্রা দিল্লী—। কিন্তু পুলিস আপত্তি করবে না তো ?'

'পুলিসকে বলে যাবেন। আমার বোধ হয় আপত্তি করবে না।'

'যদি আপত্তি না করে, কাল পরশুর মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। কলকাতা যেন বিষবৎ মনে হচ্ছে।—আচ্ছা নমস্কার।' বলিয়া উষাপতিবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার দোকান কি বন্ধ রাখবেন ?'

'দোকান—সুচিত্রা ? না, বন্ধ রাখব কেন ? দোকানের পুরনো খাজাঞ্চি ধনঞ্জয়বাবু আছেন। বিশ্বাসী লোক ; তিনি চালাবেন। আমার ভাগনে শীতুকেও ভাবছি দোকানে ঢুকিয়ে নেব, পড়াশুনো করে আর কী হবে, দোকানটাই দেখুক ! আর তো আমার কেউ নেই।' নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি দ্বারের পানে চলিলেন।

'আপনি কি এখন দোকানের দিকে যাচ্ছেন ?'

'না, দোকানে এখন আর যাব না। ধনঞ্জয়বাবুকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি।'

'আসুন তাহলে—নমস্কার।'

উষাপতিবাবু প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ পর পর তিনটা সিগারেট নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, 'আমি একবার বেরুচ্ছি। তুমি বাড়িতেই থাক।'

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'সুচিত্রা এম্পোরিয়মে। খাজাঞ্চি ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে আলাপ করা দরকার।'

ব্যোমকেশ যখন ফিরিল তখন দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি স্নান সারিয়া অপেক্ষা করিতেছি, সত্যবতী অস্থিরভাবে ভিতর-বাহির করিতেছে। ব্যোমকেশ পাঞ্জাবিটা খুলিয়া ফেলিল, পাখা চালাইয়া দিয়া তক্তপোশের উপর লম্বা হইল। বসন্তকাল হইলেও দুপুরবেলার রৌদ্র বেশ কড়া।

বলিলাম, 'খাজাঞ্চি মশায়ের সঙ্গে আলাপ বেশ জমে উঠেছিল দেখছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। লোকটি কে জান ? পরশু সুচিত্রার দোতলায় যে ক্যাশিয়ার আমাদের

ক্যানমেমো কেটেছিল সেই।'

'তাই নাকি ? তা কী পেলে তার কাছ থেকে ?'

'পেলাম—' ব্যোমকেশ ঘুরন্ত পাখার পানে চাহিয়া হাসিল, 'একটা প্রীতি-উপহার।'

'প্রীতি-উপহার !'

'হ্যাঁ। কুড়ি পঁচিশ বছর আগে বিয়ের সময় প্রীতি-উপহার ছাপার খুব চলন ছিল, এখন কমে গেছে। ঘুড়ির কাগজের মত পিতপিতে কাগজের রুমালে লাল কালিতে ছাপা কবিতা, মাথার ওপর ডানা-মেলে-দেওয়া প্রজাপতির ছবি। দেখেছ নিশ্চয়।'

'দেখেছি। খাজাঞ্চি মশায় এই প্রীতি-উপহার তোমাকে দিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ। ওই যে পাঞ্জাবির পকেটে রয়েছে, বার করে দেখ না।'

'কিন্তু—কার বিয়ের প্রীতি-উপহার ?'

'পড়েই দেখ না।'

পাঞ্জাবির পকেট হইতে প্রীতি-উপহার বাহির করিলাম। পিতপিতে কাগজে লাল কালিতে ছাপা কবিতা, উপরে মুক্তপক্ষ প্রজাপতি, এবং তাহাকে ঘিরিয়া রামধনুর আকারে লেখা আছে—কুমারী সুচিত্রার সঙ্গে ঊষাপতির শুভ পরিণয়। তারপর কবিতা। এ-কবিতা পড়িয়া মানে বুঝিতে পারে এমন দিগ্‌গজ পণ্ডিত পৃথিবীতে নাই। সর্বশেষে কাব্য-রচয়িতার নাম, শ্রীধনঞ্জয় মণ্ডল ও সুচিত্রা এম্পোরিয়মের কর্মিবৃন্দ।

বলিলাম, 'এই কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে। এ ছাড়া আর কিছু পেলে না ?'

'আর কিছুর দরকার নেই। এই প্রীতি-উপহারের মধ্যে সব কিছু আছে।'

'কি আছে ? আমি তো কিছু দেখছি না।'

'হায় অন্ধ ! ভাল করে দেখ।'

কবিতা আবার পড়িলাম। পড়িতে খুবই কষ্ট হইল, তবু পড়িলাম। তারপর বলিলাম, 'এ-কবিতার মধ্যে যদি কোনও ইশারা ইঙ্গিত থাকে তার মানে বোঝা আমার কম্ম নয়। সুচিত্রা নিশ্চয় ঊষাপতিবাবুর স্ত্রীর নাম, তার সঙ্গে ঊষাপতিবাবুর বিয়ে হওয়াতে ধনঞ্জয় মণ্ডল এবং সুচিত্রা এম্পোরিয়মের কর্মিবৃন্দ খুব আহ্লাদিত হয়েছিলেন, এইটুকুই আন্দাজ করছি।'

'কবিতা নয়, তারিখ—তারিখ ! বিয়ের তারিখটা দেখ।'

নীচের দিকে বাঁ কোণে লেখা ছিল :

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭।

বলিলাম, 'তারিখ দেখলাম, কিন্তু অজ্ঞানমসী দূর হল না।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, 'সত্যকাম তার জন্ম-তারিখ বলেছিল, মনে আছে ?'

'বলেছিল মনে আছে, কিন্তু তারিখটা মনে নেই।'

'আমার মনে আছে।'

অধীর হইয়া উঠিলাম, 'এ-সব সন-তারিখের মানে কী ? সত্যকামের খুনের সঙ্গেই বা তার সম্পর্ক কী ?'

'ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, ভেবে দেখ।'

'ভেবে দেখতে পারি না। তুমি যদি বুঝে থাক কে খুন করেছে পষ্টাপষ্টি বল।'

'তুমি বুঝতে পারছ না ?'

'না। কে খুন করেছে সত্যকামকে ?'

'ঊষাপতিবাবু।'

'বাপ ছেলেকে খুন করেছে ?'

'করলেও অন্যায় হত না, কিন্তু সত্যকাম ঊষাপতিবাবুর ছেলে নয়।'

মাথা গুলাইয়া গেল, কিছুক্ষণ জবুথবু হইয়া রহিলাম। তারপর সত্যবতী ভিতরের দরজা হইতে গলা বাড়াইয়া বলিল, 'হ্যাঁগা, আজ কি তোমাদের উপোস ?

অপরাহ্ণে চারটের সময় আবার উষাপতিবাবু আসিলেন। এবারও অনাহূত আসিয়াছেন। সকালবেলার ক্লান্ত বিষণ্ণতা আর নাই, চক্ষে সতর্ক তীক্ষ্ণতা। তিনি আসিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে বসিলেন, কিছুক্ষণ শ্যেনদৃষ্টিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'আপনি ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?'

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

'কী জানতে গিয়েছিলেন?'

'যা জানতে গিয়েছিলাম তা জানতে পেরেছি।'

'কী জানতে গিয়েছিলেন?'

'সবই জানতে পেরেছি, উষাপতিবাবু। এমন কি দোরে আঁটা রাংতার চাকতির তত্ত্বও অজানা নেই।'

উষাপতিবাবুর প্রশ্নের তীব্রতা যেন ধাক্কা খাইয়া থামিয়া গেল। তিনি আবার খানিকক্ষণ ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর সংবৃত স্বরে বলিলেন, 'যা জানতে পেরেছেন তা আদালতে প্রমাণ করতে পারবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার বিয়ের তারিখ আর সত্যকামের জন্মের তারিখ ছাড়া আর কিছু প্রমাণ করা যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাইনি, উষাপতিবাবু। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম। সত্যকাম আমাকে বলেছিল তার মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে, আসামীকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার কোনও দায়িত্ব আমার নেই।'

উষাপতিবাবু স্থিরনেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহার মুখভাবের পরিবর্তন হইল। এতক্ষণ তিনি যে যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, এখন সহসা অস্ত্র নামাইলেন। অবিশ্বাস-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, 'আপনি যা জানতে পেরেছেন পুলিসকে তা বলবেন না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, পুলিস আমার সাহায্য চায় না, আমি কেন গায়ে পড়ে তাদের সাহায্য করতে যাব?'

উষাপতিবাবু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া দুই হাতে রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার শরীর দুই তিনবার অবরুদ্ধ আবেগে ঝাঁকানি দিয়া উঠিল। তারপর তিনি যখন মুখ খুলিলেন, তখন দেখিলাম তাঁহার মুখের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর মরণাপন্ন রোগী প্রথম আরোগ্যের আশ্বাস পাইলে তাহার মুখে যে ভাব ফুটিয়া ওঠে উষাপতিবাবুর মুখেও সেই ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি আরও কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, তারপর ভাঙা ভাঙা স্বরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, সত্যকামের মৃত্যু কেন দরকার হয়েছিল আপনি শুনবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনব। আপনি সব কথা বলুন।'

উষাপতিবাবু একবার কাতর চক্ষে আমার পানে চাহিলেন। তাঁহার চাহনির অর্থ: ব্যোমকেশের কাছে তিনি নিজের মর্ম-কথা বলিতে রাজী থাকিলেও আর কাহারও সম্মুখে বলিতে অনিচ্ছুক। ব্যোমকেশ তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া আমাকে বলিল, 'অজিত, তুমি একবার হাওড়া স্টেশনে যাও, এন্‌কোয়ারি অফিস থেকে জেনে এস কাশ্মীর যাওয়ার ব্যবস্থা কী রকম। কাশ্মীরে গণ্ডগোল চলছে, আগে থাকতে খবরাখবর নিয়ে রাখা ভাল।'

মনে মনে একটু নিরাশ হইলাম, তারপর জামা কাপড় বদলাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

সাত

হাওড়া স্টেশনের কাজ সারিয়া যখন ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। সদর দরজা ভেজানো ছিল, প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উষাপতিবাবু চলিয়া গিয়াছেন, ছায়াচ্ছন্ন ঘরের অপর প্রান্তে জানালার সামনে চেয়ার টানিয়া সত্যবতী ও ব্যোমকেশ ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া আছে। জানালা দিয়া ফুরফুরে দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। আমাকে দেখিয়া সত্যবতী একটু সরিয়া বসিল।

আমি কাছে আসিয়া বলিলাম, 'বেশ তো কপোত-কপোতীর মত বসে মলয় মারুত সেবন করছ। —খোকা কোথায় ?'

সত্যবতী একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, 'পুঁটিরাম খোকাকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে গেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেখ অজিত, কবিদের কথা মিছে নয়। তাঁরা যে বসন্তঋতুর সমাগমে ক্ষেপে ওঠেন, তার যথেষ্ট কারণ আছে। মলয় মারুতে যুবক যুবতীরাই বেশি ঘায়েল হয় বটে কিন্তু বয়স্থ ব্যক্তিরাও বাদ পড়েন না। আমার বিশ্বাস, এটা যদি বসন্তকাল না হত তাহলে উষাপতিবাবু সত্যকামকে খুন করতেন কিনা সন্দেহ।'

বলিলাম, 'বল কি ! বসন্তকালের এমন মারাত্মক শক্তির কথা কবিরা তো কিছু লেখেননি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পষ্ট না লিখলেও ইশারায় বলেছেন। শক্তিমাত্রেই মারাত্মক ; যে আগুন আলো দেয় সেই আগুনই পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। —কিন্তু যাক, কাশ্মীরের খবর কী বল।'

বলিলাম, 'কাশ্মীরে লড়াই বেধেছে, সাধারণ লোককে যেতে দিচ্ছে না। যেতে হলে ভারত সরকারের পারমিট চাই।'

আমি একটা চেয়ার আনিয়া ব্যোমকেশের অন্য পাশে বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'পারমিট যোগাড় করা শক্ত হবে না। ভারত সরকারের সঙ্গে এখন আমার গভীর প্রণয়, অন্তত যতদিন বল্লভভাই প্যাটেল বেঁচে আছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, সবাই মিলে কাশ্মীর যাওয়া কি ঠিক হবে ? খোকা সবেমাত্র স্কুলে ঢুকেছে, গরমের ছুটিরও দেরি আছে। ওকে স্কুল কামাই করিয়ে নিয়ে যাওয়া আমার উচিত মনে হচ্ছে না।'

সত্যবতী বলিল, 'খোকা যাবে কেন ? খোকা বাড়িতে থাকবে। ঠাকুরপো, তুমি খোকার দেখাশুনা করতে পারবে না ?'

আমি কিছুক্ষণ সত্যবতীর পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, 'ও—এই মতলব। তোমরা দুটিতে হংস-মিথুনের মত কাশ্মীরে উড়ে যাবে, আর আমি খোকাকে নিয়ে বাসায় পড়ে থাকব। ভাই ব্যোমকেশ, তুমি ঠিক বলেছ, বসন্তঋতু বড় মারাত্মক ঋতু। কিন্তু কুছ পরোয়া নেই। যাও তোমরা টো টো করে বেড়াও গে, আমি খোকাকে নিয়ে মনের আনন্দে থাকব। সত্যি কথা বলতে কি, কাশ্মীর যাবার ইচ্ছে আমার একটুও ছিল না। বাংলাদেশই আমার ভূ-স্বর্গ—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিলাম।

সত্যবতী ঠোঁটের উপর আঁচল চাপা দিয়া হাসি গোপন করিল। ব্যোমকেশ মৃদু গুঞ্জনে কবিতা আবৃত্তি করিল, 'যৌবন মধুর কাল, আও বিনাশিবে কাল, কালে পিও প্রেম-মধু করিয়া যতন। —একটা সিগারেট দাও।'

সিগারেট দিয়া বলিলাম, 'কবিতা পড়ে পড়ে তোমার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ও-কথা এখন থাক, উষাপতি যে নিজের চরিতামৃত শুনিয়ে গেলেন তা বলতে বাধা আছে কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছুমাত্র না। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করেছিলাম। তোমাদের দু'জনকেই শোনাতে চাই। বড় মর্মান্তিক কাহিনী।'

সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল—

'সত্যকাম আমার কাছে এসেছিল এক আশ্চর্য প্রস্তাব নিয়ে—আমার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় আপনি অনুসন্ধান করবেন। সে জানত কে তাকে খুন করতে চায়, কিন্তু তার নাম আমাকে বলল

না। তখনই আমার মনে প্রশ্ন জাগল—নাম বলতে চায় না কেন ? এখন জানতে পেরেছি, নাম না বলার গুরুতর কারণ ছিল, পারিবারিক কেচ্ছা বেরিয়ে পড়ত। সে যে জারজ, তার মা যে কলঙ্কিনী, এ-কথা সে প্রকাশ করতে পারেনি ; নিজের মুখে নিজের কলঙ্ক-কথা কটা লোক প্রকাশ করতে পারে ? সবাই তো আর সত্যযুগের সত্যকাম নয়।

'তবু একটা ইঙ্গিত সে আমাকে দিয়ে গিয়েছিল—তার জন্ম-তারিখ। কিন্তু এমনভাবে দিয়েছিল যে, একবারও সন্দেহ হয়নি তার জন্ম-তারিখের মধ্যেই তার মৃত্যু-রহস্যের চাবি আছে। সে জানত, আমি যদি অনুসন্ধান আরম্ভ করি তাহলে জন্ম-তারিখটা আমার কাজে লাগবে। সত্যকাম বিবেকহীন লম্পট ছিল, কিন্তু তার বুদ্ধির অভাব ছিল না।

'এবার গোড়া থেকে গল্পটা বলি। সত্যকামের জন্মের আগে থেকে সে-গল্পের সূত্রপাত। ঊষাপতিবাবুর মুখেই এ-গল্পের বেশির ভাগ শুনেছি, তবু গল্পটা যে সত্যি তাতে সন্দেহ নেই। তিনি নিজেকে রেয়াত করেননি, নিজের দোষ দুর্বলতা অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রমাকান্ত চৌধুরী সুচিত্রা এম্পোরিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। রমাকান্ত চৌধুরীর একমাত্র মেয়ের নাম সুচিত্রা, মেয়ের নামেই দোকানের নাম। চৌধুরী মশায় ভারী চতুর ব্যবসাদার ছিলেন, দু'-চার বছরের মধ্যেই তাঁর দোকান ফেঁপে উঠল। ধর্মতলায় নতুন বাড়ি তৈরি হল, জমজমাট ব্যাপার। চৌধুরী মশায়ের সুচিত্রা এম্পোরিয়ম বিলাতি দোকানের সঙ্গে টেক্কা দিতে লাগল।

'ঊষাপতি দাস ১৯২৫ সনে সামান্য শপ-অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি নিয়ে সুচিত্রা এম্পোরিয়মে ঢোকেন। তখন তাঁর বয়স একুশ বাইশ ; গরীবের ঘরের বাপ-মা-মরা ছেলে, লেখাপড়া বেশি শেখেননি। কিন্তু চেহারা ভাল, বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। দু'-চার দিনের মধ্যেই তিনি দোকানের মাল বিক্রি করার কায়দাকানুন শিখে নিলেন, খদ্দেরকে কী করে খুশি রাখতে হয় তার কৌশল আয়ত্ত করে ফেললেন। সহকর্মীদের মধ্যে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ক্রমে স্বয়ং কর্তার সুনজর পড়ল তাঁর ওপর। দু'-চার টাকা করে মাইনে বাড়তে লাগল।

'দু'-বছর কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন ঊষাপতিবাবুর চরম ভাগ্যোদয় হল। রমাকান্ত চৌধুরী তাঁকে নিজের অফিস-ঘরে ডেকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাই।' এ-প্রস্তাব ঊষাপতির কল্পনার অতীত, তিনি যেন চাঁদ হাতে পেলেন। সেই যে রূপকথা আছে, পথের ভিখিরির সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে, এ যেন তাই। সুচিত্রাকে ঊষাপতি আগে অনেকবার দেখেছেন, সুচিত্রা প্রায়ই দোকানে আসতেন। ভারী মিষ্টি নরম চেহারা। ঊষাপতির মন রোমান্সের গন্ধে ভরে উঠল।

'মাসখানেকের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। খুব ধুমধাম হল। ঊষাপতির সহকর্মীরা প্রীতি-উপহার ছেপে বন্ধুকে অভিনন্দন জানালেন। ঊষাপতিবাবু এতদিন তাঁর বিবাহিতা বোনের বাড়িতে থাকতেন, এখন শ্বশুরবাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ি। রমাকান্ত চৌধুরী বড়মানুষ, তায় বিপত্নীক ; তিনি মেয়েকে কাছ-ছাড়া করতে চান না।

'টোপের মধ্যে বঁড়শি আছে ঊষাপতি তা টের পেলেন ফুলশয্যার রাত্রে। রূপকথার স্বপ্ন-ইমারত ভেঙে পড়ল ; বুঝতে পারলেন সুচিত্রা এম্পোরিয়মের কর্তা কেন দীনদরিদ্র কর্মচারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ফুলের বিছানায় শয়ন করা হল না, ঊষাপতিবাবু সারা রাত্রি একটা চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলেন। সকালবেলা শ্বশুরকে গিয়ে বললেন—আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এবার আমাকে বিদায় দিন।

'রমাকান্ত চৌধুরী ঘড়েল ব্যবসাদার, তিনি বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন ; মোলায়েম সুরে জামাইকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন—সুচিত্রা ছেলেমানুষ, মা-মরা মেয়ে ; তার ওপর আজকাল দেশে যে হাওয়া বইতে শুরু করেছে তাতে মেয়েদের সামলে রাখাই দায়। সুচিত্রা খুবই ভাল মেয়ে, কেবল বর্তমান আবহাওয়ার দোষে একটু ভুল করে ফেলেছে। আজকাল ঘরে ঘরে এই ব্যাপার হচ্ছে, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়, কিন্তু বাইরের লোক কি জানতে পারে ? সবাই বৌ নিয়ে মনের সুখে

ঘরকন্না করে। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে নিজের মুখেই চুন-কালি পড়বে। অতএব—

'উষাপতি কিন্তু কথায় ভুললেন না, বললেন, 'আমায় মাপ করুন, আমি গরীব বটে কিন্তু সদ্‌বংশের ছেলে। আমি পারব না।'

'কথায় চিঁড়ে ভিজল না দেখে রমাকান্ত চৌধুরী ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। দেরাজ থেকে ইস্টাম্বরি কাগজে লেখা দলিল বার করে বললেন, 'আজ থেকে সুচিত্রা এম্পোরিয়মের তুমি আট আনা অংশীদার। এই দেখ দলিল। আমি মরে গেলে আমার যা কিছু সব তোমরাই পাবে, আমার তো আর কেউ নেই। কিন্তু আজ থেকে তুমি আমার পার্টনার হলে। দোকানে আমার হুকুম যেমন চলে তোমার হুকুমও তেমনি চলবে।'

'উষাপতির মাথা ঘুরে গেল। রাজকন্যাটি দাগী বটে কিন্তু হাতে হাতে অর্ধেক রাজত্ব। মোট কথা উষাপতি শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন, সদ্য সদ্য অত টাকার লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি শ্বশুরবাড়িতে থাকতে রাজী হলেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক রইল না। সেই যে ফুলশয্যার রাত্রে দু'-চারটে কথা হয়েছিল, তারপর থেকে কথা বন্ধ ; শোবার ব্যবস্থাও আলাদা। বাইরের লোকে অবশ্য কিছু জানল না, ধোঁকার টাটি বজায় রইল।

'রমাকান্ত যে বলেছিলেন সুচিত্রা ভাল মেয়ে, সে-কথা নেহাত মিথ্যে নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঁধন ভাঙার একটা ঢেউ এসেছিল, উচ্চবিত্ত সমাজের অবাধ মেলা-মেশা সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুচিত্রা আলোর নেশায় বিভ্রান্ত হয়ে একটু বেশি মাতামাতি করেছিলেন। অভিভাবিকার অভাবে গণ্ডীর বাইরে যে পা দিচ্ছেন তা বুঝতে পারেননি। কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে তাঁর হুঁশ হল। বিয়ের পর তিনি বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন, শান্ত সংযতভাবে বাড়িতে রইলেন। রমাকান্তের বাড়িতে লোক কম, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, কেবল রমাকান্ত, সুচিত্রা আর উষাপতি। স্থায়ী চাকরের মধ্যে সহদেব, আর বাকী ঝি-চাকর শুকো। সহদেব চাকরটার বুদ্ধিসুদ্ধি বেশি নেই, কিন্তু অটল তার প্রভু-পরিবারের প্রতি ভক্তি। তাই ঘরের কথা বাইরে চাউর হতে পেল না।

'বিয়ের মাস দেড়েক পরে রমাকান্ত মেয়েকে নিয়ে বিলেত গেলেন। ওজুহাত দেখালেন, মেয়ের শরীর খারাপ, তাই চিকিৎসার জন্যে বিলেতে নিয়ে যাচ্ছেন। উষাপতি দোকানের সর্বময় কর্তা হয়ে কাজ চালাতে লাগলেন।

'প্রায় এক বছর পরে রমাকান্ত বিলেত থেকে ফিরলেন। সুচিত্রার কোলে ছেলে। ছেলে দেখে বোঝা যায় না তার বয়স দু'-মাস কি পাঁচ মাস...

'তারপর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে উষাপতিবাবুর নীরস প্রাণহীন জীবনযাত্রা আরম্ভ হল। স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, শ্বশুরের সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ। দোকানটিকে উষাপতি প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেন। তবু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে ? অন্তরের মধ্যে ক্ষুধিত যৌবন হাহাকার করতে লাগল। ওদিকে সুচিত্রা সঙ্কুচিত হয়ে নিজেকে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়েছেন। মাঝে মাঝে উষাপতি তাঁকে দেখতে পান, মনে হয় সুচিত্রা যেন কঠোর তপস্বিনী। তাঁর মনটা কোমল হয়ে আসে, তিনি জোর করে নিজেকে শক্ত রাখেন।

'একটি একটি ঘরে বছর কাটতে থাকে। সত্যকাম বড় হয়ে উঠতে লাগল। লম্পট বাপের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত তার শরীরে, তার যত বয়স বাড়তে লাগল রক্তের দাগও তত ফুটে উঠতে লাগল। সব রকম রক্তের দাগ মুছে যায়, এ-রক্তের দাগ কখনও মোছে না। সত্যকাম কারুর শাসন মানে না, নিজের যা ইচ্ছে তাই করে ; কিন্তু ভয়ানক ধূর্ত সে, কুটিল তার বুদ্ধি। দাদামশায়কে সে এমন বশ করেছে যে সব জেনেশুনেও তিনি কিছু বলতে পারেন না। সুচিত্রা শাসন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। উষাপতি সত্যকামের কোনও কথায় থাকেন না, সব সময় নিজেকে আলাদা করে রাখেন...স্ত্রীর কানীন পুত্রকে কোনও পুরুষই স্নেহের চক্ষে দেখতে পারে না। সত্যকামের স্বভাব চরিত্র যদি ভাল হত তাহলে উষাপতি হয়তো তাকে সহ্য করতে পারতেন, কিন্তু এখন তাঁর মন একেবারে বিষিয়ে গেল। সুচিত্রার সঙ্গে উষাপতির একটা ব্যবহারিক

সংযোগের যদি বা কোনও সম্ভাবনা থাকত তা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। উষাপতি আর সুচিত্রার মাঝখানে সত্যকাম ফণি-মনসার কাঁটা-বেড়ার মত দাঁড়িয়ে রইল।

'সত্যকামের যখন উনিশ বছর বয়স, তখন রমাকান্ত মারা গেলেন, সত্যকামকে নিজের অংশ উইল করে দিয়ে গেলেন। এই সময় সত্যকাম নিজের জন্ম-রহস্য জানতে পারল। বিলেতে তার জন্ম হয়েছিল, সুতরাং বার্থ-সার্টিফিকেট ছিল। দাদামশায়ের কাগজপত্রের মধ্যে সেই বার্থ-সার্টিফিকেট বোধহয় সে পেয়েছিল, তারপর পারিবারিক পরিস্থিতি দেখে আসল ব্যাপার বুঝে নিয়েছিল। সে বাইরে ভারী কেতাদুরস্ত ছেলে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীষণ কুটিল আর হিংসুক। উষাপতি আর সুচিত্রার প্রতি তার ব্যবহার হিংস্র হয়ে উঠল। একদিন সে নিজের মাকে স্পষ্টই বলল, 'তুমি আমাকে শাসন করতে আস কোন লজ্জায়! আমি সব জানি।' উষাপতিকে বলল, 'আপনি আমার বাপ নন, আপনাকে খাতির করব কিসের জন্যে?'

'বাড়িতে উষাপতি আর সুচিত্রার জীবন দুর্বহ হয়ে উঠল। ওদিকে দোকানে গিয়ে সত্যকাম আর-একরকম খেলা দেখাতে আরম্ভ করল। সে এখন দোকানের অংশীদার, উষাপতির সঙ্গে তার অধিকার সমান। সে নিজের অধিকার পুরোদস্তুর জারি করতে শুরু করল। সুচিত্রার মত শৌখিন দোকানে পুরুষের চেয়ে মেয়ে খদ্দেরেরই ভিড় বেশি; সত্যকাম তাদের মধ্যে থেকে কমবয়সী সুন্দর মেয়ে বেছে নিত, তাদের সঙ্গে ভাব করত, দোকানের দামী জিনিস সস্তায় তাদের বিক্রি করত, হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়াত। দোকানের তহবিল থেকে যখন যত টাকা ইচ্ছে বার করে দু'-হাতে ওড়াত। মদ, ঘোড়দৌড়, বড় বড় ক্লাবে গিয়ে জুয়া খেলা তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবসা হয়ে উঠল।

'রমাকান্তর মৃত্যুর পর বছরখানেক যেতে না যেতেই দেখা গেল দোকানের অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে, আর বেশি দিন এভাবে চলবে না। উষাপতিবাবু বাধা দিতে গেলে সত্যকাম বলে, 'আমার টাকা আমি ওড়াচ্ছি, আপনার কী?' উপরন্তু দোকানের একটা বদনাম রটে গেল, মেয়েদের ও-দোকানে যাওয়া নিরাপদ নয়। খদ্দের কমে যেতে লাগল। বিভ্রান্ত উষাপতিবাবু কী করবেন ভেবে পেলেন না।

'পরিস্থিতি যখন অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তখন একটি ব্যাপার ঘটল। একদিন সন্ধ্যার পর কী একটা কাজে উষাপতি বাড়িতে এসেছেন, ওপরে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে শুনতে পেলেন পাশের ঘর থেকে একটা অবরুদ্ধ কাতরানি আসছে। পাশের ঘরটা তাঁর স্ত্রীর ঘর। পা টিপে টিপে উষাপতি দোরের কাছে গেলেন। দেখলেন, তাঁর স্ত্রী একলা মেঝেয় মাথা কুটছেন আর বলছেন, 'এখনো কি আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি? আর যে আমি পারি না!'

'উষাপতি চুপি চুপি নীচে নেমে গেলেন। সহদেবকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, সন্ধ্যার আগে পাড়ার একটি বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, তিনি সুচিত্রাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে গেছেন। মহিলাটির মেয়েকে নাকি সত্যকাম সিনেমা দেখাচ্ছে আর বিলিতি হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াচ্ছে।

'সেই দিন উষাপতি সংকল্প করলেন, সত্যকামকে সরাতে হবে। তাকে খুন না করলে কোনও দিক দিয়েই নিস্তার নেই। এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

'উষাপতি তৈরি হলেন। তাঁর একটা সুবিধে ছিল, সত্যকাম যদি খুন হয় তাঁকে কেউ সন্দেহ করবে না। বাইরে সবাই জানে সত্যকাম তাঁর ছেলে, বাপ ছেলেকে খুন করেছে এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সত্যকামের অনেক শত্রু, সন্দেহটা তাদের উপর পড়বে। তবু এমনভাবে কাজ করা দরকার, যাতে কোনও মতেই তাঁর পানে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়।

'উষাপতি একটি চমৎকার মতলব বার করলেন। একজন চেনা গুণ্ডার কাছ থেকে একটি রিভলভার যোগাড় করলেন। ছেলেবেলায় কিছুদিন তিনি সন্ত্রাসবাদীদের দলে মিশেছিলেন, রিভলভার চালানোর অভ্যাস ছিল; তিনি কয়েকবার বেলঘরিয়ার একটা আম-বাগানে গিয়ে অভ্যাসটা ঝালিয়ে নিলেন। তারপর সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'সত্যকাম ঝানু ছেলে, সে উষাপতির মতলব বুঝতে পারল ; কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার কোনও উপায় খুঁজে পেল না। পুলিসের কাছে গেলে নিজের জন্ম-রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে হতাশ হয়ে আমার কাছে এসেছিল। উষাপতিবাবু অবশ্য সে-খবর জানতেন না।

'যে-রাত্রে সত্যকাম খুন হয়, সে-রাত্রিটা ছিল শনিবার। শনিবারে সত্যকাম অন্য রাত্রির চেয়ে দেরি করে বাড়ি ফেরে, সুতরাং শনিবারই প্রশস্ত। উষাপতিবাবু একটি রাংতার চাকতি তৈরি করে রেখেছিলেন ; রাত্রি সাড়ে দশটার সময় যখন সহদেব রান্নাঘরে খেতে গিয়েছে, তখন তিনি চুপি চুপি নেমে এসে সেটি দরজার কপাটে জুড়ে দিয়ে আবার নিঃশব্দে উপরে উঠে গেলেন। সদর দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ রইল, বাহিরে যে রাংতার চাকতি সাঁটা হয়েছে তা কেউ জানতে পারল না। শুকো ঝি আর রাঁধুনি তার অনেক আগেই বাড়ি চলে গেছে।

'সহদেব খাওয়া-দাওয়া শেষ করে খিড়কির দরজায় তালা লাগাল, তারপর সদর বারান্দায় গিয়ে বিছানা পেতে শুল। ওপরে উষাপতিবাবু নিজের ঘরে আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন, সামনের দিকের ব্যালকনির দরজা খুলে রাখলেন।

'দু'-ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ফটকের কাছে শব্দ হল, সত্যকাম আসছে। উষাপতি ব্যালকনিতে বেরিয়ে এসে ঘাপটি মেরে রইলেন। ফটক থেকে সদর দরজা পর্যন্ত রাস্তা অন্ধকার, সত্যকাম টর্চ জ্বেলে দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে। সদর দরজায় টোকা মেরে হঠাৎ তার নজরে পড়ল দরজার নীচের দিকে টাকার মত একটা চাকতি টর্চের আলোয় চক্‌চক্ করছে। সে সামনের দিকে ঝুঁকে সেটা দেখতে গেল। অমনি উষাপতিবাবু ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে গুলি করলেন। রিভলভারের গুলি সত্যকামের পিঠ ফুটো করে বুকের হাড়ে গিয়ে আটকাল। সত্যকাম সেইখানেই মুখ থুবড়ে পড়ল, হাতের জ্বলন্ত টর্চটা জ্বলতেই রইল।

'এই হল সত্যকামের মৃত্যুর প্রকৃত ইতিহাস। উষাপতিবাবু এমন কৌশল করেছিলেন যে, লাশ পরীক্ষা করে মনে হবে পিছন দিক থেকে কেউ তাকে গুলি করেছে, ওপর দিক থেকে গুলি করা হয়েছে তা কিছুতেই বোঝা যাবে না। রাংতার চাকতিটা যদি না থাকত আমিও বুঝতে পারতাম না।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। আমরাও অনেকক্ষণ নীরব রহিলাম। তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সত্যবতী বলিল, 'তুমি প্রথম কখন উষাপতিবাবুকে সন্দেহ করলে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, বাড়ির লোকের কাজ। যদি বাইরের লোকের কাজ হবে, তাহলে সত্যকাম হত্যাকারীর নাম বলবে না কেন ? তখনই আমার মনে হয়েছিল এই সংকল্পিত হত্যার পিছনে এক অতি গুহ্য পারিবারিক কলঙ্ক-কাহিনী লুকিয়ে আছে।

'তারপর জানতে পারলাম, উষাপতি আর সুচিত্রার দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক নয়। দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ, শোবার ঘরও আলাদা। মনে খটকা লাগল। খাজাঞ্চি মশায়ের সঙ্গে আলাপ জমালাম। লোকটি উষাপতিবাবুর দরদী বন্ধু ; তিনিই একুশ বছর আগে বন্ধুর বিয়েতে প্রীতি-উপহার লিখেছিলেন। প্রীতি-উপহারটি খাজাঞ্চি মশাই খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, কারণ এটি তাঁর প্রথম এবং একমাত্র কবি-কীর্তি। আমি যখন প্রীতি-উপহারটি হাতে পেলাম, তখন আর কোনও সংশয় রইল না। সত্যকামের জন্ম-তারিখ মনে ছিল—৭ই জুলাই, ১৯২৭। আর বিয়ের তারিখ ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭। অর্থাৎ বিয়ের পর পাঁচ পাস পূর্ণ হবার আগেই ছেলে হয়েছে। ধূর্ত রমাকান্ত কেন দরিদ্র কর্মচারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বুঝতে কষ্ট হয় না।

'সত্যকাম উষাপতির ছেলে নয়, সুতরাং তাকে খুন করার পক্ষে উষাপতির কোনও বাধা নেই। কিন্তু তিনি খুন করলেন কী করে ? যখন জানতে পারলাম মৃত্যুকালে সত্যকামের হাতে জ্বলন্ত টর্চ ছিল, তখন এক মুহূর্তে রাংতার চাকতির উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল। সত্যকামের টর্চের আলো দোরের ওপর পড়েছিল, রাংতার চাকতিটা চক্‌মক্ করে উঠেছিল, সত্যকাম সামনে

ঝুঁকে দেখতে গিয়েছিল ওটা কি চক্‌মক্‌ করছে। ব্যস্‌— !'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। আমি ব্যোমকেশকে সিগারেট দিয়া নিজে একটা লইলাম, দু'জনে টানিতে লাগিলাম। ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, দখিনা বাতাস চুপি চুপি আমাদের ঘিরিয়া খেলা করিতেছে।

হঠাৎ ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ ঊষাপতিবাবু যাবার সময় আমার হাত ধরে বললেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমি আর আমার স্ত্রী জীবনে বড় দুঃখ পেয়েছি, একুশ বছর ধরে শ্মশানে বাস করেছি। আজ আমরা অতীতকে ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে চাই, একটু সুখী হতে চাই। আপনি আর জল ঘোলা করবেন না।' আমি ঊষাপতিবাবুকে কথা দিয়েছি, জল ঘোলা করব না। কাজটা হয়তো আইনসঙ্গত হচ্ছে না। কিন্তু আইনের চেয়েও বড় জিনিস আছে—ন্যায়ধর্ম। তোমাদের কী মনে হয় ? আমি অন্যায় করেছি ?'

সত্যবতী ও আমি সমস্বরে বলিলাম, 'না।'

মণিমণ্ডন

প্রসিদ্ধ মণিকার রসময় সরকারের বাড়ি হইতে একটি বহুমূল্য জড়োয়ার নেকলেস চুরি গিয়াছে। সকালবেলা খবরের কাগজ পড়িবার সময় বিলম্বিত সংবাদের স্তম্ভে খবরটা দেখিয়াছিলাম। বেলা আন্দাজ আটটার সময় টেলিফোন আসিল।

অপরিচিত ব্যগ্র কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো। ব্যোমকেশবাবু ?'

বলিলাম, 'না, আমি অজিত। আপনি কে ?'

টেলিফোন বলিল, 'আমার নাম রসময় সরকার। ব্যোমকেশবাবুকে একবার ডেকে দেবেন ?'

নাম শুনিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে, চোর ধরিবার জন্য ব্যোমকেশের ডাক আসিয়াছে। বলিলাম, 'সে বাথরুমে গিয়েছে, বেরুতে দেরি হবে। কাগজে দেখলাম আপনার দোকান থেকে নেকলেস চুরি গেছে।'

উত্তর হইল, 'দোকান থেকে নয়, বাড়ি থেকে।—আপনি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশবাবুর বন্ধু ?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ। ব্যোমকেশকে যা বলতে চান, আমাকে বলতে পারেন।'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া রসময় বলিলেন, 'দেখুন, যে নেকলেসটা চুরি গেছে, তার দাম সাতান্ন হাজার টাকা। সন্দেহ হচ্ছে বাড়ির একটা চাকর চুরি করেছে, কিন্তু কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিসে অবশ্য খবর দিয়েছি, কিন্তু আমি ব্যোমকেশবাবুকে চাই। তিনি ছাড়া নেকলেস কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।'

বলিলাম, 'বেশ তো, আপনি আসুন না। আপনি আসতে আসতে ব্যোমকেশও বাথরুম থেকে বেরুবে।'

রসময় একটু কাতরভাবে বলিলেন, 'দেখুন, আমি বেতো রুগী, বেশি নড়াচড়া করতে পারি না। তার চেয়ে যদি আপনারা আসেন তো বড় ভাল হয়।'

যাহারা বিপদে পড়ে তাহারাই ব্যোমকেশের কাছে আসে, সে আগে কাহারও কাছে যায় না। আমি বলিলাম, 'বেশ, ব্যোমকেশকে বলব।'

রসময়ের মিনতি আরও নির্বন্ধপূর্ণ হইয়া উঠিল, 'না না, বলাবলি নয়, নিশ্চয় আসবেন। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের কোনও অসুবিধা হবে না।'

'বেশ।'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এখনি গাড়ি পাঠাচ্ছি।'

মিনিট কয়েক পর একটি ক্যাডিলাক্ গাড়ি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ বাথরুম হইতে বাহির হইলে সকল কথা বলিলাম এবং জানালা দিয়া গাড়ি দেখাইলাম। দেখিয়া শুনিয়া সে আপত্তি করিল না। আমরা ক্যাডিলাকে চড়িয়া যাত্রা করিলাম।

কলিকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে রসময় সরকারের গোটা পাঁচেক সোনাদানা হীরা-জহরতের দোকান আছে, কিন্তু তাঁর বসতবাড়ি বৌবাজারে। অল্পকাল মধ্যে গাড়ি তাঁহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

রসময় সরকারের বাড়িটি সাবেক ধরনের, একেবারে ফুটপাথের কিনারা হইতে তিনতলা উঠিয়া গিয়াছে। মাঝখানে উপরতলায় উঠিবার দ্বারমুক্ত সিঁড়ি, দুই পাশে দোকানের সারি। গৃহস্বামী উপরের দুইতলা লইয়া থাকেন।

সিঁড়ির দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, গাড়ি গিয়া থামিতেই দ্বার খুলিয়া একটি যুবক বাহির হইয়া আসিল। শৌখিন সুদর্শন চেহারা, বয়স সাতাশ আটাশ। নমস্কার করিয়া বলিল, 'আমার নাম মণিময় সরকার। বাবা ওপরে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আসুন।'

আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। দ্বিতলে আছে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, চাকরদের থাকিবার স্থান এবং তক্তপোশপাতা একটি বসিবার ঘর। আমরা দ্বিতল ছাড়াইয়া ত্রিতলে উঠিয়া গেলাম। এই ত্রিতলে গৃহস্বামী সপরিবারে বাস করেন।

তৃতীয় তলে উঠিলে গৃহস্বামীর বিত্তবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতি তালা লাগানো ভারী দরজায় রেশমী পর্দা, মেঝেয় পুরু গালিচা ; ড্রয়িংরুমটি দামী আসবাব দিয়া সাজানো, গদি-মোড়া সোফা সেটের মাঝখানে কাশ্মীরী কাঠের নিচু টেবিল, দুই জানালার মাঝখানে বইয়ের আলমারি, দেয়ালে পারসিক ছবি-আঁকা ট্যাপেস্ট্রি ইত্যাদি। উপস্থিত ঘরটি একটু অবিন্যস্ত। মণিময় আমাদের ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, 'বাবা, ব্যোমকেশবাবু এসেছেন।'

দেখিলাম রসময় সরকার একটি চেয়ারে বসিয়া ডান পা সম্মুখদিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন এবং একটি বিবাহিতা যুবতী তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার আঙ্গুলে সেঁক দিতেছে। রসময়বাবুর বয়স অনুমান পঞ্চাশ, ভারী গড়নের শরীর, মাংসল মুখ এখনও বেশ দৃঢ় আছে। আমাদের দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন, আমার ও ব্যোমকেশের পানে পর্যায়ক্রমে চক্ষু ফিরাইয়া দুই করতল যুক্ত করিয়া ব্যোমকেশকে বলিলেন, 'আসুন ব্যোমকেশবাবু। আমি সব দিক দিয়েই বড় কাবু হয়ে পড়েছি। আপনি—আপনারা এসেছেন, আমি বাঁচলাম। বসুন, বসুন অজিতবাবু।'

আমাদের মধ্যে কে ব্যোমকেশ তাহা প্রশ্ন না করিয়াও তিনি বুঝিয়াছেন। রসময় সরকার বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা সোফায় পাশাপাশি বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'পায়ে বাত ধরেছে দেখছি। বাত রোগটা মারাত্মক নয়, কিন্তু বড় কষ্টদায়ক।'

রসময় বলিলেন, 'আর বলবেন না। আমার শরীর বেশ ভালই, কিন্তু এই বাতে আমাকে পঙ্গু করে ফেলেছে। ছেলেবেলায় ফুটবল খেলতাম, ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা ভেঙে গিয়েছিল। এখন এমন দাঁড়িয়েছে, আকাশের এক কোণে রুমালের মত একট টুকরো মেঘ উঠলে বুড়ো আঙুলে চিড়িক্ মারতে থাকে।—কিন্তু সে যাক, বৌমা এঁদের জন্যে চা নিয়ে এস।'

বধূটি এতক্ষণ হেঁটমুখে বসিয়া শ্বশুরের পায়ে সেঁক দিতেছিল। সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু তাঁহার মুখে পারিবারিক বিপদের ছায়া পড়িয়াছে। সে উঠিবার উপক্রম করিতেই ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, চায়ের দরকার নেই, আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি। উনি শ্বশুরের পদসেবা করছেন করুন।'

রসময় একটু হাসিলেন, বধূ আবার বসিয়া পড়িল। রসময় বলিলেন, 'আচ্ছা, তবে থাক। মণি, সিগারেট নিয়ে এস।'

মণিময় এতক্ষণ একটা চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, সে চলিয়া গেলে রসময় বধূর পানে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'বড় লক্ষ্মী বৌমা আমার। গিন্নী ছোট ছেলেকে নিয়ে তীর্থদর্শনে বেরিয়েছেন, এখন ওর হাতেই সংসার। অবশ্য ওকে দিয়ে পদসেবা আমি করাই না, কিন্তু চাকরটা—'

এই পর্যন্ত বলিয়া রসময় থামিয়া গেলেন, তারপর গলার স্বর পাল্টাইয়া বলিলেন, 'বাজে কথা থাক, কাজের কথা বলি। আপনি অনুগ্রহ করে এসেছেন, আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করব না। ব্যোমকেশবাবু, কাল রাত্রে আমার বাড়িতে অঘটন ঘটে গেছে, যা কখনও হয়নি তাই হয়েছে। একটা হীরের নেকলেস—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সব গোড়া থেকে বলুন। সংক্ষেপ করবেন না। মনে করুন আমি কিছু জানি না।'

মণিময় একটি ৫৫৫ মার্কা সিগারেটের টিন ঢাকনি ঘুরাইয়া খুলিতে খুলিতে ঘরে প্রবেশ করিল, টিন আমাদের সম্মুখে রাখিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আমরা সিগারেট ধরাইলাম।

রসময় বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'কলকাতা শহরে আমার পাঁচটা জুয়েলারির দোকান আছে। বড় কারবার, বছরে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার কেনা-বেচা। অনেক বিশ্বাসী প্রবীণ কর্মচারী আছেন। আমার যখন শরীর ভাল থাকে আমি দেখাশোনা করি। দু'বছর থেকে মণিও যাতায়াত শুরু করেছে।

'কলকাতার বাইরে, ভারতের সর্বত্র আমাদের কাজ কারবার আছে। বোম্বাই মাদ্রাজ নয়াদিল্লী, যেখানে যত বড় জহুরী, সকলের সঙ্গে আমাদের লেন-দেন। কখনও আমাদের কাছ থেকে তারা হীরে জহরত কেনে, কখনও আমরা তাদের কাছ থেকে কিনি। জহুরী ছাড়া সাধারণ খরিদ্দার তো আছেই। রাজারাজড়া থেকে ছাপোষা গৃহস্থ, সবই আমাদের খদ্দের।

'মাসখানেক আগে দিল্লী থেকে রামদাস চোক্‌সী নামে একজন বড় জহুরী আমার কাছে এল। রাজস্থানের কোন্ রাজবাড়িতে মেয়ের বিয়ে, দশ লাখ টাকার গয়নার ফরমাশ পেয়েছে। কিন্তু সব গয়না সে নিজে গড়তে পারবে না, আমাকে দিয়ে একটা হীরের নেকলেস গড়িয়ে নিতে চায়। ডিজাইন দেখে, হীরে বাছাই করে দাম কষা হল। সাতান্ন হাজার টাকা। এক মাসের মধ্যে গয়না গড়ে দিল্লীতে রামদাসের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

'গয়না তৈরি হল। আমার ইচ্ছে ছিল আমি নিজেই গিয়ে গয়নাটা দিল্লীতে পৌঁছে দিয়ে আসব, কিন্তু গত মঙ্গলবার থেকে আমার বাতের ব্যথা চাগাড় দিল। কী উপায়! অত দামী গয়না কর্মচারীদের হাতে পাঠাতে সাহস হয় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল মণিময় যাবে আমার বদলে। আজ ওর যাবার কথা।

'আমি এ ক'দিন বাড়ি থেকে বেরুতে পারিনি, মণিই কাজকর্ম দেখছে। নেকলেসটা তৈরি হবার পর বড় দোকানের সিন্দুকে রাখা ছিল, কাল বিকেলবেলা মণি সেটা বাড়িতে নিয়ে এল।

'এখন আমার বাড়ির কথা বলি। আমার স্ত্রী ছোট ছেলে হিরণ্ময়কে নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়েছেন, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য বেড়াতে গেছেন। বাড়িতে আছি আমি, মণিময় আর বৌমা। দোতলায় থাকে দু'জন চাকর, বামুন, ড্রাইভার, আর আমার খাস চাকর ভোলা। এই ক'জন নিয়ে বর্তমানে আমার সংসার।

'কাল বিকেলে মণি যখন নেকলেস নিয়ে বাড়ি এল, আমি তখন এই চেয়ারে বসে ছিলাম, আমার খাস চাকর ভোলা পায়ে মালিশ করে দিচ্ছিল। মণি নেকলেসের কেস্ আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নাও বাবা।'

'আমি ভোলাকে ছুটি দিলাম, সে চলে গেল। তখন আমি কেস্ খুলে গয়নাটা পরীক্ষা করলাম। সব ঠিক আছে। তারপর বৌমাকে ডেকে বললাম, 'বৌমা, কাপড় দিয়ে এটাকে বেশ ভাল করে সেলাই করে দাও।' বৌমা এক টুকরো কাপড় এনে এখানে বসে বসে ছুঁচ-সুতো দিয়ে সেলাই করে দিলেন।'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল, এখন মুখ তুলিয়া বলিল, 'মাফ্ করবেন, গয়নার বাক্সটা আকারে আয়তনে কত বড়?'

রসময়বাবু দ্বিধাভরে এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, 'কত বড়? মোটেই বড় নয়। এই ধরুন—'

পিতা ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া মণিময় বইয়ের শেল্‌ফ হইতে একটি বই আনিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিল, বলিল, 'এই সাইজের বাক্স।'

রসময় বলিলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক ওই সাইজের। অবশ্য বাক্সটা কুমিরের চামড়ার, তার ভেতরে মখমলের খাঁজ-কাটা ঘর।'

বইখানা ষোলপেজী ক্রাউন সাইজের, পৃষ্ঠা-সংখ্যা আন্দাজ তিনশত। ব্যোমকেশ বইখানা মণিময়কে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'বুঝেছি, তারপর বলুন।'

রসময় আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'তারপর মণি চা খেয়ে ক্লাবে চলে গেল। আমি গয়নার কেস্‌টা হাতে করে আবার অফিস-ঘরে গেলাম। পাশেই আমার অফিস-ঘর। বাড়িতে বসে কাজকর্ম করার দরকার হলে ওখানে বসেই করি। একটা সেক্রেটারিয়েট্ টেবিল আছে, তার দেরাজে দরকারী কাগজপত্র থাকে। আমি গয়নার কেস্ দেরাজে রেখে দিলাম। বাড়িতে একটা লোহার সিন্দুক আছে বটে, কিন্তু গিন্নী তার চাবি নিয়ে চলে গেছেন।

'আমার অন্যায় হয়েছিল, অত বেশি দামী জিনিস খোলা-দেরাজে রাখা উচিত হয়নি। কিন্তু আমার বাড়ির যে-রকম ব্যবস্থা, তাতে আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। চাকর-বাকর দোতলায় থাকে, ডেকে না পাঠালে ওপরে আসে না; অন্য লোকেরও যাতায়াত নেই। তাই এখান থেকে গয়না চুরি যেতে পারে এ-সম্ভাবনা মনেই আসেনি।

'রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য দোতলায়, কিন্তু এই বাতের ব্যথাটা হয়ে অবধি বৌমা ওপরেই আমার খাবার এনে দেন। খাওয়া সেরে আমি একটা বই নিয়ে বসলাম, বৌমাও খেয়ে নিলেন। মণির ক্লাব থেকে ফিরতে প্রায়ই দেরি হয়, তাই তার খাবার বৌমা শোবার ঘরে ঢাকা দিয়ে রাখলেন।

'দশটার সময় আমি ভোলাকে ডাকবার জন্যে ঘণ্টি বাজালাম, তারপর শুতে গেলাম। আমার বেতো শরীর, শোবার পর হাত-পা টিপে না দিলে ঘুম আসে না। ভোলাই রোজ টিপে দেয়, তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লে চলে যায়।

'ভোলা খুব কাজের চাকর। বছর দেড়েক আমার কাছে আছে; জুতো বুরুশ করা, কাপড়-জামা গিলে করা, ফাই-ফরমাশ খাটা, হাত-পা টেপা, সব কাজ ও করে। কাল বৌমা সদর দোর খুলে দিলেন, ভোলা এসে আমার হাত-পা টিপে দিতে লাগল। আমি ক্রমে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর সে কখন চলে গেছে জানতে পারিনি।

'হঠাৎ ঘুম ভাঙল মণির ডাকে। ও আমার বিছানার ওপর ঝুঁকে ডাকছে, 'বাবা! বাবা!' আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বললাম, 'কী রে? মণি বলল, 'নেকলেসটা কোথায় রেখেছেন?' আমি বললাম, 'টেবিলের দেরাজে। কেন?' ও বলল, 'কই, সেখানে তো নেই!'

'আমি ছুটে গিয়ে দেরাজ খুললাম। নেকলেসের বাক্স নেই। সব দেরাজ হাঁটকালাম। কোথাও নেই। মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। মণিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই এত রাত্রে কী করে জানলি?' সে বলল—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া রসময়কে নিবারণ করিল, মণিময়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'রাত্রি তখন ক'টা?

মণিময় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, 'প্রায় বারটা। বারটা বাজতে পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'রাত বারটার সময় কোনও কারণে আপনার সন্দেহ হয়েছিল যে, নেকলেস চুরি গেছে। কী করে সন্দেহ হল সব কথা খুলে বলুন।'

মণিময় যেন আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, পিতার প্রতি একটি গুপ্ত কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ স্খলিত স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, 'কাল আমার ক্লাব থেকে ফিরতে একটু বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিল। ক্লাবে ব্রিজ-ড্রাইভ্ চলছে, আমি—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় ক্লাব? নাম কী?'

'ক্লাবের নাম—খেলাধুলো। খুব কাছেই, আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের রাস্তা। সব রকম ঘরোয়া খেলার ব্যবস্থা আছে, তাস পাশা পিং‌পং বিলিয়ার্ড। কাল ব্রিজ-ড্রাইভ্ শেষ হতে রাত হয়ে গেল—'

'আপনি হেঁটে ক্লাবে যান ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব কাছে, তাই হেঁটেই যাই। কাল যখন ক্লাব থেকে বেরুলাম তখন পৌনে বারটা। রাত নিষুতি। আমাদের বাড়ির সদর দরজার ঠিক সামনে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে। আমি যখন বাড়ির প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ গজের মধ্যে এসেছি তখন দেখলাম, আশেপাশের দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু একটা লোক ঠিক আমাদের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বোধ হয় আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, তারপর চট্ করে বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

'দূর থেকে দেখে মনে হল, ভোলা চাকর। কাছে এসে দেখলাম দরজা ভেজানো রয়েছে। অন্যদিন আমি দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরি, কিন্তু সদর দরজা তার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। আজ খোলা রয়েছে। আমার খট্‌কা লাগল। সদর দরজায় হুড়কো লাগিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। দোতলায় চাকরেরা ঘুমোচ্ছে, কারুর সাড়া শব্দ নেই।

'তেতলায় উঠতেই স্ত্রী এসে দরজা খুলে দিলেন। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন, তেতলার দরজায় বিলাতি গা-তালা লাগানো ; ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে বিনা চাবিতে বাইরে থেকে খোলা যায় না। আমি স্ত্রীকে বললাম, বাড়ির সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। উনি বললেন, উনিও দেখেছেন—'

'উনিও দেখেছেন ?' ব্যোমকেশ বধূর পানে চোখ ফিরাইল।

বধূ লজ্জা পাইল, তাহার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রসময় তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'লজ্জা কী বৌমা ? যা দেখেছ ব্যোমকেশকে বল।'

বধূ তখন লজ্জা-স্তিমিত কণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিল, 'কাল রাত্তিরে—আমি—ওঁর ক্লাব থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছিল—আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর—হঠাৎ দেখলুম, ঠিক আমাদের দরজার সামনে ফুটপাথের ওপর কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু ভাল দেখতে পেলুম না। তারপরেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হল দরজায় ঢুকে পড়ল। সেই সময় দেখতে পেলুম উনি আসছেন, লোকটা যেন ওঁকে দেখেই ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর আমি গিয়ে তেতলার দরজা খুলে দিলুম। উনি এলেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'লোকটাকে চিনতে পেরেছিলেন ?'

বধূ মাথা নাড়িল, 'না, ওপর থেকে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তবে মনে হয়েছিল, চাকরদের মধ্যেই কেউ হবে।'

'হুঁ', ব্যোমকেশ মণিময়কে বলিল, 'তারপর কী হল ?'

মণিময় বলিল, 'স্ত্রীর কথা শুনে সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। নেকলেসটা বিকেলবেলা এনেছি, সেটা বাবা নিশ্চয় টেবিলের দেরাজে রেখেছেন, কারণ সিন্দুকের চাবি নিয়ে মা চলে গেছেন। আমি চুপি চুপি বাবার অফিস-ঘরে গেলাম। আলো জ্বেলে দেরাজগুলো খুলে দেখলাম। নেকলেসের কেস্ নেই। আরও যেখানে যেখানে রাখা সম্ভব সব জায়গায় খুঁজলাম। কোথাও নেই। ভীষণ ভয় হল। তখন বাবাকে ডেকে তুললাম।'

মণিময় চুপ করিলে ব্যোমকেশ নিবিষ্ট মনে আর একটি সিগারেট ধরাইল, তারপর সপ্রশ্ন চক্ষে রসময়ের পানে চাহিল। রসময় আবার কাহিনীর সূত্র তুলিয়া লইলেন—

'যখন নিঃসংশয়ে বুঝলাম নেকলেস চুরি গেছে তখন সব সন্দেহ পড়ল ভোলার ওপর। ভেবে দেখুন, আমার তেতলার সদর দরজায় ইয়েল লক লাগানো ; ভেতর থেকে বাইরে যাওয়া সহজ, কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরে আসা সহজ নয়। রাত্রি দশটার পর চাকরদের মধ্যে একমাত্র ভোলাই ভেতরে ছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ভোলা কখন উঠে গেছে জানি না। হয়তো সে পৌনে বারটার সময় উঠে গেছে, দেরাজ থেকে নেকলেস নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেছে। নিচে হয়তো তার ষড়ের লোক ছিল—'

ব্যোমকেশ মণিময়কে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি একটা লোকই দেখেছিলেন ?'

মণিময় বলিল, 'হ্যাঁ। দ্বিতীয় জনপ্রাণী সেখানে ছিল না।'

ব্যোমকেশ বধূর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আপনি ?'

বধূ বলিল, 'আমিও একজনকেই দেখেছিলুম। আমি সারাক্ষণ নিচের দিকেই তাকিয়ে ছিলুম, আর কেউ থাকলে দেখতে পেতুম।'

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল সিগারেট টানিল, শেষে রসময়কে বলিল, 'তারপর আপনি কী করলেন ?'

রসময় বলিলেন, 'তখন বারটা বেজে গেছে। বাপ-বেটায় পরামর্শ করে থানায় টেলিফোন করলাম। মণি নিচে নেমে গিয়ে সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল, যাতে বাড়ি থেকে কেউ বেরুতে না পারে। থানার বড় দারোগা অমরেশবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ভাগ্যক্রমে তিনি থানায় উপস্থিত ছিলেন, ফোন পেয়ে তক্ষুনি তিন-চারজন লোক নিয়ে এসে পড়লেন।

'প্রথমে দোতলার ঘরগুলো খানাতল্লাশ হল। চাকরেরা সকলেই ঘুমোচ্ছিল ভোলাও ছিল। পুলিস তন্নতন্ন করে তল্লাশ করল, কিন্তু নেকলেস পাওয়া গেল না।

'অমরেশবাবু তখন তেতলা খানাতল্লাশ করলেন। বলা যায় না, চোর হয়তো নেকলেস চুরি করে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। পরে তাক বুঝে সরাবে। কিন্তু এখানেও নেকলেস পাওয়া গেল না।

'অমরেশবাবু তারপর ভোলাকে জেরা আরম্ভ করলেন। ভোলা স্বীকার করল, সে নিচে নেমে গিয়েছিল। সে বলল, আন্দাজ এগারটার সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছি দেখে সে দোতলায় নেমে যায়। অন্য চাকরেরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোলাও শুয়ে পড়ল, কিন্তু তার ঘুম এল না। তখন সে খোলা হাওয়ার খোঁজে নিচে গিয়ে ফুটপাথে দাঁড়াল। মণিময় যে ক্লাব থেকে ফেরেনি তা সে জানত না। সে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল মণি আসছে। তখন সে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল কারণ রাত্তিরে চাকর-বাকরের বাইরে যাওয়ার কড়া বারণ আছে। এই তার বয়ান। নেকলেসের কথা সে জানে না।

'অমরেশবাবুর জেরায় আরও জানা গেল, ভোলার দুই ভাই কলকাতায় থাকে, মেছুয়াবাজারে তাদের বাসা। ভায়েদের সঙ্গে ভোলার বিশেষ দহরম-মহরম নেই, তবে হাতে কাজ না থাকলে মাঝে মাঝে তাদের বাসায় দেখা করতে যায়।

'অমরেশবাবু যতক্ষণ ভোলাকে সওয়াল জবাব করছিলেন ততক্ষণ তাঁর সঙ্গীরা রাস্তার দু' পাশে তল্লাশ করছিল ; আনাচ কানাচ ডাস্টবিন সব খুঁজে দেখছিল। মণিও তাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। এইসব ব্যাপারে ভোর হয়ে গেল, অমরেশবাবু দোতলায় একজন লোক রেখে চলে গেলেন। ভোলাকে বলে গেলেন, এ-বাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা করলেই গ্রেপ্তার করা হবে।

'তারপর—তারপর যত বেলা বাড়তে লাগল ততই আমার মন অস্থির হয়ে উঠল'। অমরেশবাবু কাজের লোক, চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। কিন্তু আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না ব্যোমকেশবাবু। আপনাকে ফোন করলাম। আপনি আমার নেকলেস উদ্ধার করে দিন। আপনি ছাড়া এ-কাজ আর কেউ পারবে না।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, 'আমার ওপর আপনার এত বিশ্বাস, আশা করি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারব। —ভোলা চাকর তো বাড়িতেই আছে ?'

'হ্যাঁ, দোতলার ঘরে আছে।'

'তাকে একবার ডেকে পাঠালে দু-চারটে প্রশ্ন করে দেখতাম।'

'বেশ তো।' রসময় পুত্রের দিকে চাহিলেন।

মণিময় চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ভোলাকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

ভোলা চাকরের চেহারা সাধারণ ভৃত্য শ্রেণীর লোকের চেহারা হইতে পৃথক নয়। একজাতীয় মুখ আছে যাহা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীর্ণ ও অস্থিসার হইয়া পড়ে, উঁচু নাক ও ছুঁচলো চিবুক প্রাধান্য লাভ করে। ভোলার মুখ সেই জাতীয়। দেহও বেউড় বাঁশের মত পাকানো ; বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তাহার চোখের দৃষ্টিতে ভয়ের চিহ্ন নাই, কিন্তু সংযত সতর্কতা আছে।

ব্যোমকেশ তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'তোমাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

ভোলা সহজভাবে বলিল, 'আজ্ঞে।'

'নাম কী ?'

'ভোলানাথ দাস।'

'দেশ কোথায় ?'

'মেদিনীপুর জেলায়।'

'কলকাতায় কতদিন আছ ?'

'তা পনর বছর হবে।'

'তোমার দুই ভাই কলকাতায় থাকে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মেছোবাজারে বাসা নিয়ে একসঙ্গে থাকে।'

'তুমি ভায়েদের সঙ্গে থাক না ?'

'আজ্ঞে, আমি যেখানে চাকরি করি সেখানেই থাকি।'

'ভায়েদের সঙ্গে বনিবনাও আছে ?'

'আজ্ঞে, বে-বনিবনাও নেই। তবে দাদারা লেখাপড়া জানা লোক। আমি মুখ্‌খু—'

'তোমার দাদারা কী কাজ করে ?'

'বড়দা পোস্ট-অফিসে কাজ করে, মেজদা কর্পোরেশনের জমাদার।'

'তুমি বিয়ে করনি ?'

'করেছিলাম, বৌ মরে গেছে।'

'এ-বাড়িতে কতদিন কাজ করছ ?'

'দেড় বছর।'

'তার আগে কোথায় কাজ করেছ ?'

'অনেক জায়গায় কাজ করেছি।'

'কী কাজ ?'

'আজ্ঞে, পা-টেপা চাকরের কাজ। অন্য কাজ করবার বিদ্যে আমার নেই।'

বিদ্যা না থাক, বুদ্ধি যথেষ্ট আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে-বুদ্ধি নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে, সেই বুদ্ধি। ব্যোমকেশ আবার আরম্ভ করিল, 'সকলে সন্দেহ করেন তুমিই হীরের নেকলেস চুরি করেছ।'

ভোলা চেঁচামেচি করিল না, শান্তভাবে অস্বীকার করিল, 'আজ্ঞে, হীরের নেকলেস আমি চোখে দেখিনি।'

'কাল যখন মণিময়বাবু নেকলেসের বাক্স এনে রসময়বাবুকে দেন, তখন তুমি তাঁর পায়ে মালিশ করে দিচ্ছিলে।'

'একটা বাক্স এনে দিয়েছিলেন। বাক্সে কী আছে আমি জানতাম না।'

'কিছু আন্দাজ করতে পারনি ? রসময়বাবু যখন বাক্স খোলবার আগে তোমাকে চলে যেতে বললেন তখনও কিছু আন্দাজ করনি ?'

'আজ্ঞে না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণেক ভ্রূকুটি করিয়া নীরব রহিল, তারপর সহসা চক্ষু তুলিয়া বলিল, 'কাল সন্ধ্যের পর তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলে ?'

এতক্ষণে ভোলার চোখে একটু উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু সে সহজ সুরেই বলিল, 'আজ্ঞে, বেরিয়েছিলাম। একটা গামছা কেনবার ছিল, তাই বৌদিদির কাছে ছুটি নিয়ে বেরিয়েছিলাম।'

ব্যোমকেশ বধূর দিকে চাহিল, বধূ ঘাড় হেলাইয়া সায় দিল। রসময়বাবুর মুখ দেখিয়া মনে হইল, তিনি এ-খবর জানিতেন না। মণিময়ও জানিত না, কারণ সে তৎপূর্বেই ক্লাবে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্যোমকেশ জানিল কী করিয়া ? অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়াছে ?

সে ভোলাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কতক্ষণ বাইরে ছিলে ?'

'ঘণ্টাখানেক।'

'গামছা কিনতে এক ঘণ্টা লাগল ?'

'আজ্ঞে, গামছা কিনে খানিক এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।'

'কারুর সঙ্গে দেখা করনি ?'

'আজ্ঞে, না।'

'তোমার বন্ধুবান্ধব কেউ নেই ?'

'চেনাশোনা দু-চারজন আছে, বন্ধু নেই।'

'যাক। —কাল রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তুমি রসময়বাবুর পা টিপে দিয়েছিলে ?'

'আজ্ঞে। রোজ টিপে দিই।'

'কাল ক'টা অবধি পা টিপে দিয়েছিলে ?'

'ঘড়ি দেখিনি। আন্দাজ এগারটা হবে।'

'তুমি যখন দোতলায় নেমে গেলে, অন্য চাকরেরা জেগে ছিল ?'

'আজ্ঞে না, ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

'কেউ জেগে ছিল না ?'

'কেউ না।'

'ভারী আশ্চর্য। যাহোক, তুমি তারপর কী করলে ? শুয়ে পড়লে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে রাত বারটার সময় রাস্তায় বেরিয়েছিলে কেন ?'

'অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে ঘুম এল না, তখন নিচে নেমে গেলাম। ভেবেছিলাম, খোলা জায়গায় খানিক দাঁড়ালে ঘুম আসবে।'

'কতক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিলে ?'

'দু-তিন মিনিটের বেশি নয়। দাদাবাবু যে কেলাব থেকে ফেরেননি তা জানতাম না। দেখলাম তিনি আসছেন, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।'

'সিঁড়ির দরজা বন্ধ করেছিলে ?'

'আজ্ঞে, দাদাবাবু আসছেন, তাই বন্ধ করিনি।'

ব্যোমকেশ আর একবার ভোলার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, বোধ করি মনে মনে তাহার স্থিরবুদ্ধির প্রশংসা করিল, তারপর শুষ্কস্বরে বলিল, 'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।'

ভোলা চলিয়া গেল। সদর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ আসিলে রসময় জিজ্ঞাসুনেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, 'কী মনে হল ?'

ব্যোমকেশ বিমর্ষভাবে বলিল, 'ভারী হুঁশিয়ার লোক। তবে কাল সন্ধ্যেবেলা যে বেরিয়েছিল, তা স্বীকার করেছে।'

'তাতে কী প্রমাণ হয় ?'

'প্রমাণ কিছুই হয় না। তবে ওর যদি কেউ ষড়ের লোক থাকে, চুরির আগে তার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করেছিলে। নইলে নেকলেসটা লোপাট হয়ে গেল কী করে ?'

'তা বটে।'

ভোলা সম্বন্ধে আর বেশি আলোচনা হইতে পাইল না, দ্বারে টোকা পড়ায় মণিময় চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে পুলিস দারোগার পোশাক-পরা এক ভদ্রলোককে লইয়া উপস্থিত হইল। লম্বা চওড়া চেহারা, ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। দারোগা অমরেশবাবু সন্দেহ নাই।

রসময় উঠিবার উপক্রম করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, 'এ কী অমরেশবাবু, কী খবর! আপনি আবার এলেন যে!'

অমরেশবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, 'মেছোবাজারে গিয়েছিলাম ভোলার ভায়েদের বাসা খানাতল্লাশ করতে। কিন্তু—' এই সময় আমাদের উপর নজর পড়ায় তিনি থামিয়া গেলেন।

রসময়বাবু অপ্রতিভভাবে পরিচয় করাইয়া দিলেন, 'ইন্সপেক্টর মণ্ডল, ইনি— ইয়ে— ব্যোমকেশ বক্সী। বোধ হয় নাম শুনেছেন।'

অমরেশবাবু খাড়া হইয়া বসিলেন, বিস্ময়োৎফুল্ল স্বরে বলিলেন, 'বিলক্ষণ! ব্যোমকেশ বক্সীর নাম কে না শুনেছে? আপনিই! আপনার নাম প্রমোদ বরাটের কাছেও শুনেছি মশাই। প্রমোদকে মনে আছে? গোলাপ কলোনীর ব্যাপারে তদন্ত করেছিল। প্রমোদ আমার বন্ধু।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'প্রমোদবাবুকে খুব মনে আছে। ভারী বুদ্ধিমান লোক।'

অমরেশবাবু বলিলেন, 'সে আপনার পরম ভক্ত। তার আছে আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার গল্প শুনেছি।—তা আপনিও এই নেকলেস চুরির ব্যাপারে আছেন নাকি? বেশ বেশ, আপনাকে পাওয়া তো ভাগ্যের কথা; প্রমোদের মুখে শুনেছি আপনার খ্যাতির লোভ নেই, কেবল সত্যান্বেষণ করেই আপনি সন্তুষ্ট। হা হা।'

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিল, 'ইন্সপেক্টর মণ্ডল, যার যা আছে সে তা চায় না, এই প্রকৃতির নিয়ম। এ-ব্যাপারে খ্যাতি যদি কিছু প্রাপ্য হয় আপনিই পাবেন। আমি মজুরি পেলেই সন্তুষ্ট হব।'

রসময়বাবু গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'মজুরি বলবেন না, ব্যোমকেশবাবু, সম্মান-দক্ষিণা। যদি আমার নেকলেস ফিরে পাই, আপনার সম্মান রাখতে আমি ত্রুটি করব না।'

'সে যাক,' ব্যোমকেশ অমরেশবাবুর দিকে ফিরিল, 'আপনি ভোলার ভায়েদের বাসা সার্চ করেছেন, কিন্তু কিছু পেলেন না?'

অমরেশবাবু বলিলেন, 'কিচ্ছু পেলাম না। ওর ভায়েরা কাজে বেরিয়েছিল। দুই বৌ ঘরে ছিল। কিন্তু আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও কিছু পাওয়া পাওয়া গেল না।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল, 'তাহলে আপনার সন্দেহ ভোলা তার ভায়েদের সঙ্গে ষড় করে একাজ করেছে।'

অমরেশবাবু বলিলেন, 'ভায়েদের বদলে অন্য কেউ হতে পারে, কিন্তু ষড়ের লোক আছে। নইলে নেকলেসটা লোপাট হয়ে গেল কী করে?'

'মণিময়বাবু এবং তাঁর স্ত্রী কিন্তু অন্য লোক দেখেননি।'

'ওঁরা যখন ভোলাকে দেখেছেন, তার আগেই হয়তো ষড়ের লোক মাল নিয়ে সরে পড়েছে।'

'মণিময়বাবুর স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ষড়ের লোক এলে উনি তাকে দেখতে পেতেন না কি?'

দুইজনে কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর অমরেশবাবু দ্বিধাভরে প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার কি মনে হয় ভোলার কাজ নয়?'

'এখন কিছু মনে হচ্ছে না। তত্ত্বতল্লাশ যা করবার সবই আপনি করেছেন, কিছুই বাকী রাখেননি। এখন শুধু ভেবে দেখতে হবে।' সে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'এখন উঠি। যদি ভেবে কিছু পাওয়া যায় আপনাদের জানাব।'

বাসায় ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার সন্দেহটা কার ওপর?'

ব্যোমকেশ পাঞ্জাবি খুলিতে খুলিতে বলিল, 'তিনজনের ওপর।'

চমকিয়া বলিলাম, 'তিনজন কারা ?'

'ভোলা, মণিময় এবং মণিময়ের স্ত্রী—' বলিয়া ব্যোমকেশ স্নান করিতে চলিয়া গেল।

বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সুযোগের দিক দিয়া তিনজনকেই সন্দেহ করা যায়। রসময়ের দেরাজ হইতে নেকলেস সরানো তিনজনের পক্ষেই সম্ভব। আর মোটিভ ? বড়মানুষের ছেলেদের সর্বদাই টাকার দরকার। মণিময় ক্লাবে গিয়া তাস-পাশা খেলে, নিশ্চয় বাজি রাখিয়া খেলে। হয়তো অনেক টাকা দেনা হইয়াছে, ভয়ে বাপের কাছে বলিতে পারিতেছে না—'

আর মণিময়ের স্ত্রী ? মেয়েটি দেখিতে শান্ত শিষ্ট, কিন্তু তাহার মুখের উদ্বেগের ব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। গহনার প্রতি স্ত্রীজাতির লোভ অবস্থা বিশেষে দুর্নিবার হইয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু যে-ই চুরি করুক, চোরাই মাল বেমালুম সরাইয়া ফেলিল কী করিয়া ?

সেদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় লম্বা হইয়া সারাক্ষণ কড়িকাঠের শোভা নিরীক্ষণ করিল, কথাবার্তা বলিল না। আপরাহ্ণিক চা পানের পর হঠাৎ বলিল, 'চল, একবার ঘুরে আসা যাক।'

'কোথায় ঘুরবে ?'

'রসময়বাবুর বাড়ির সামনে ফুটপাথে। জায়গাটা ভাল করে দেখা হয়নি।'

পদব্রজে আমাদের বাসা হইতে রসময়বাবুর বাড়ির সামনে ফুটপাথে পৌঁছিতে কুড়ি মিনিট লাগিল। কাছাকাছি গিয়া ব্যোমকেশ এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। বাড়ির দরজার দুই পাশে দোকানগুলি খোলা রহিয়াছে। একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান, একটি ঘড়ির দোকান, দুইটি বস্ত্রালয়। সব দোকানেই খরিদ্দারের যাতায়াত। ফুটপাথে পথচারীর ভিড়।

রসময়ের বাড়ির তেতলায় গোটা চারেক জানালা ; উহাদেরই একটা হইতে মণিময়ের বৌ পথের পানে চাহিয়া ছিল। চোখ নামাইয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে এবং একদৃষ্টে রসময়ের সদর দরজার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, দরজা খুলিয়া মণিময় বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরিধানে ধুতি, গেঞ্জি, হাতে একখানা খামের চিঠি। সে দরজার বাহিরে আসিয়াই পাশে দেয়ালে-গাঁথা পোস্ট-বক্সে চিঠি ফেলিয়া দিয়া আবার ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

'এই যে মণিময়বাবু ! কাকে চিঠি লিখলেন ?'

ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বরে মণিময় চমকিয়া চাহিল। আমাদের দেখিয়া সবিনয়ে বলিল, 'এ কী, আপনারা ! কিছু খবর আছে নাকি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার খবর পরে দেব। আপনি কাকে চিঠি লিখলেন ?'

মণিময় একটু বিষণ্ণ স্বরে বলিল, 'মাকে খবরটা দিলাম। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে লিখলাম। কিন্তু আজ আর চিঠিখানা যাবে না, ডাক বেরিয়ে গেছে। সেই কাল ভোরের ক্লিয়ারেন্সে যাবে। —কিন্তু আপনি নিশ্চয় কিছু ভাল খবর পেয়েছেন। সত্যি বলুন না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছিলাম তখনও কিছু খবর পাইনি, কিন্তু এখন পেয়েছি।'

'কী খবর ? নেকলেসের সন্ধান পেয়েছেন ?'

'পেয়েছি। সব কথা পরে বলব, এখন আমাকে একটা জরুরী কাজে যেতে হবে।'

'একবারটি ওপরে আসবেন না ? বাবা আপনার কাছ থেকে খবর পাবার জন্যে অস্থির হয়ে রয়েছেন।'

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'না, জরুরী কাজটা আগে সারতে হবে। অজিত, তুমি বরঞ্চ ওপরে যাও। রসময়বাবুকে আমার পক্ষ থেকে বলে দিও, কাল সকালে তিনি নেকলেস ফিরে পাবেন।' বলিয়া সে হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

আমি মণিময়ের সঙ্গে উপরে গেলাম। রসময়বাবু বিলক্ষণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, ব্যোমকেশের বার্তা শুনিয়া বার বার উদ্বেগভরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'সত্যি পাব

তো ? ঠিক পাব তো ?'

আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশকে কখনও মিথ্যে আশ্বাস দিতে শুনিনি। সে যখন বলেছে পাবেন তখন নিশ্চয় পাবেন।' অতঃপর চা, কেক ও ৫৫৫ নম্বর সিগারেট সেবন করিয়া ক্যাডিল্যাকে চড়িয়া গৃহে ফিরিলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ব্যোমকেশ তখনও ফেরে নাই। আরও ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গিয়েছিলে কোথায় ?'

সে বলিল, 'থানায়। দারোগা অমরেশবাবুর সঙ্গে দরকার ছিল।'

'কী দরকার ?'

'ভীষণ দরকার। তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়, কাল সকাল সকাল উঠতে হবে।'

আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা তাহার নাই দেখিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আহারে বসিলে সত্যবতী আমার মুখ লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'মুখ গোমড়া কেন ?'

বলিলাম, 'তোমার পতিদেবতাটি একটি কচ্ছপ।'

সত্যবতী মুখ টিপিয়া হাসিল, 'এত জন্তু থাকতে কচ্ছপ কেন ?'

'কচ্ছপ কথা কয় না।'

ব্যাপার বুঝিয়া সত্যবতীর মুখ সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে বলিল, 'সত্যি বাপু। কী রাগ যে হয়। আচ্ছা, আমাদের না হয় বুদ্ধি একটু কম। তাই বলে কৌতূহল তো কম নয়।'

তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙিল রাত্রিশেষে, ব্যোমকেশ ঠেলা দিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিল, 'অজিত, ওঠ ওঠ, এখনি বেরুতে হবে।'

চা প্রস্তুত ছিল, তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিয়া ব্যোমকেশের সহিত বাহির হইলাম। রাস্তার আলো তখনও নেভে নাই, ঘুমন্ত নগরকে সহস্রচক্ষু মেলিয়া পাহারা দিতেছে।

কোথায় চলিয়াছি তখনও জানি না ; কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর বুঝিলাম, রসময়বাবুর বাড়ির দিকে যাইতেছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শেষরাত্রে রসময়বাবুর সঙ্গে কী দরকার ?'

সে বলিল, 'রসময়বাবুর সঙ্গে দরকার নেই।'

'তবে ? শেষরাত্রে বেরুবার দরকার ছিল কী ?'

'ছিল। জানই তো, ওস্তাদের মার শেষরাত্রে ?'

'সোজা কথা বলবে, না কেবল হেঁয়ালি করবে ?'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিয়া, 'রসময়বাবুর বাড়ির দেয়ালে যে ডাক-বাক্স আছে, তার প্রথম ক্লিয়ারেন্সের সময় হচ্ছে পাঁচটা। আজ যখন ডাক-বাক্স খোলা হবে তখন সেখানে উপস্থিত থাকতে চাই।'

মাথার মধ্যে দপদপ করিয়া কয়েকটা বাতি জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হইল না। বলিলাম, 'তাহলে— ?'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'ধৈর্য মানো, সখা, ধৈর্য মানো।'

কয়েকটা গলিঘুঁজির ভিতর দিয়া চলিবার পর রসময়বাবুর বাড়ির সম্মুখীন হইলাম। গলি যেখানে বড় রাস্তায় মিলিয়াছে সেখানে দুটা লোক প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ব্যোমকেশ তাহাদের সহিত ফিসফিস করিয়া কথা বলিল। তারপর আমরাও গলির মুখে প্রচ্ছন্ন হইয়া দাঁড়াইলাম।

হাতঘড়িতে দেখিলাম, পাঁচটা বাজিতে দশ মিনিট। এখনও রাস্তায় লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই, মাঝে মাঝে সব্জি-বোঝাই ট্রাক গুরুগম্ভীর শব্দে চলিয়া যাইতেছে। রসময়বাবুর বাড়ির অভ্যন্তর অন্ধকার, সম্মুখস্থ ল্যাম্পপোস্ট বন্ধ সদর-দরজার উপর আলো ফেলিয়াছে। দরজার পাশে দেয়ালে-গাঁথা ডাক-বাক্সর লাল রঙ অসংখ্য ইস্তাহারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ওটা যে ডাক-বাক্স, তাহা সহজে নজরে পড়ে না।

একটি একটি করিয়া মিনিট কাটিতেছে। সঞ্চরমাণ মিনিটগুলির লঘু পদধ্বনি নিজের বক্ষ-স্পন্দনে শুনিতে পাইতেছি।...পাঁচটা বাজিল ; শরীরের স্নায়ুপেশী শক্ত হইয়া উঠিল।

লোকটা কখন নিঃশব্দে ডাক-বাক্সের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন ভৌতিক আবির্ভাব। গায়ে খাকি পোশাক, কাঁধে দুটা বড় বড় ঝোলা। ঝোলা দুটা ফুটপাথে নামাইয়া সে পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিল, তারপর ডাক-বাক্সের তালা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া ইশারা করিল, আমরা শিকারীর মত অগ্রসর হইলাম। গলির মুখ হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, রাস্তার দুই দিক হইতে আরও দুই জোড়া লোক আমাদেরই মত ডাক-বাক্সের দিকে অগ্রসর হইতেছে। নিঃসন্দেহে পুলিসের লোক, কিন্তু গায়ে ইউনিফর্ম নাই।

লোকটা ডাক-বাক্সের কবাট খুলিয়াছে, আমরা গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিলাম। সে ভয়চকিতভাবে ঘাড় ফিরাইয়া আমাদের আটজনকে দেখিয়া ত্বরিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, ডাক-বাক্সের খোলা কবাট পিঠ দিয়া আড়াল করিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, 'কে, কী চাই ?'

ব্যোমকেশ কড়া সুরে বলিল, 'তোমার নাম ভূতনাথ দাস। তুমি ভোলার বড় ভাই !'

ভূতনাথ দাসের মুখখানা ভয়ে শীর্ণ-বিকৃত হইয়া গেল, চক্ষু দুটা ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে থরথর কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'কে—কে আপনারা ?'

অমরেশবাবু হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, 'আমরা পুলিস।'

অমরেশবাবু যে দলের মধ্যে আছেন তাহা প্রথম লক্ষ্য করিলাম। তিনি সামনে আসিয়া দৃঢ়ভাবে ভূতনাথের কাঁধে হাত রাখিলেন। অনুভব করিলাম, একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে ভূতনাথকে ভয় পাওয়াইবার চেষ্টা হইতেছে। চেষ্টা ফলপ্রসূ হইল। ভূতনাথ একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল, হঠাৎ উগ্র তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, 'ওরে ভোলা, তুই আমার এ কী সর্বনাশ করলি রে ! আমার চাকরি যাবে—আমি যে জেলে যাব রে !'

সে থামিতেই অমরেশবাবু তাহার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন, 'কোথায় রেখেছ চোরাই মাল, বের কর।'

ভূতনাথ অমরেশবাবুর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, 'হুজুর, ও পাপ জিনিস আমি ছুঁইনি। ডাক-বাক্সর মধ্যেই আছে।'

ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। পরশু মধ্যরাত্রি হইতে আজ সকাল পর্যন্ত নেকলেস রসময়বাবুর বাড়ির দেয়ালে-গাঁথা ডাক-বাক্সের মধ্যেই আছে।

অমরেশবাবু বলিলেন, 'বের কর।'

ভূতনাথ উঠিয়া ডাক-বাক্সের দিকে ফিরিল। ডাক-বাক্সে অনেক চিঠি জমা হইয়াছিল, তাহার হাত ঢুকাইয়া বাক্সের পিছন দিকের কোণ হইতে একটি পার্সেল বাহির করিয়া আনিল। সাদা কাপড়ে সেলাই করা ব্রাউন যোলপেজী বইয়ের মত আকার আয়তন। ভূতনাথ সেটি অমরেশবাবুর হাতে দিয়া কাতরস্বরে বলিল, 'এই নিন বাবু। ধর্ম জানে এর ভেতর কী আছে, আমি চোখে দেখিনি।'

এই সময় রসময়ের সদর দরজা খুলিয়া গেল। লাঠিতে ভর দিয়া রসময় এবং তাঁহার পিছনে মণিময় ও বধূ। সকলের সদ্য-ঘুম-ভাঙা চোখে সবিস্ময় উদ্বেগ। রসময় বলিলেন, 'অমরেশবাবু ! ব্যোমকেশবাবু ? কী হয়েছে ? আমার নেকলেস— ?'

ব্যোমকেশ অমরেশবাবুর হাত হইতে প্যাকেট লইয়া রসময়ের হাতে দিল, 'এই নিন আপনার নেকলেস। খুলে দেখুন।'

বেলা আন্দাজ সাড়ে ন'টার সময় আমরা দু'জনে আমাদের বসিবার ঘরে চৌকির উপর মুখোমুখি উপবিষ্ট ছিলাম। সত্যবতীকে আর এক প্রস্থ চায়ের ফরমাশ দেওয়া হইয়াছে। নেকলেস-পর্বের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনর্থক হয়রানি। ডাক-বাক্সটা দোরের পাশেই আছে এটা যদি প্রথমে

নজরে পড়ত তাহলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব নিষ্পত্তি হয়ে যেত। কলকাতা শহরে দেয়ালে-গাঁথা অসংখ্য ডাক-বাক্স আছে, কিন্তু হঠাৎ চোখে পড়ে না। ডাক-বাক্সের রাঙা গায়ে ইস্তাহারের কাগজ জুড়ে তাকে প্রায় অদৃশ্য করে তুলেছে। যারা জানে তাদের কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু যারা জানে না তাদের পক্ষে খুঁজে বার করা মুশকিল।

'প্রথম যখন নেকলেস চুরির বয়ান শুনলাম, তখন তিনজনের ওপর সন্দেহ হল। ভোলা, মণিময় এবং মণিময়ের স্ত্রী, এদের মধ্যে একজন চোর। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এই তিনজনের মধ্যে দু'জন ষড় করে চুরি করেছে। মণিময় এবং ভোলার মধ্যে ষড় থাকতে পারে, আবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ষড় থাকতে পারে। ভোলা এবং মণিময়ের স্ত্রীর মধ্যে সাজশ থাকার সম্ভাবনাটা বাদ দেওয়া যায়।

'কিন্তু চুরি যে-ই করুক, চোরাই মাল গেল কোথায়? চুরি জানাজানি হবার একঘণ্টার মধ্যে পুলিস এসে বাড়ির দোতলা তেতলা খানাতল্লাশ করেছিল, কিন্তু বাড়িতে মাল পাওয়া গেল না। একমাত্র ভোলাই দুপুর রাত্রে রাস্তায় নেমেছিল। কিন্তু সে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, দূরে যায়নি। অন্য কোনও লোকের সঙ্গে তার দেখাও হয়নি। ভোলা যদি চুরি করে থাকে, তবে সে নেকলেস নিয়ে করল কী? মণিময় এবং তার স্ত্রীর সম্বন্ধে ওই একই প্রশ্ন—তারা গয়নাটা কোথায় লুকিয়ে রাখল?

'তিনজনের ওপর সন্দেহ হলেও প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি অবশ্য ভোলা। মণিময় যখন নেকলেস এনে বাবাকে দিল তখন সে উপস্থিত ছিল। কেসের মধ্যে দামী গয়না আছে তা অনুমান করা তার পক্ষে শক্ত নয়। সন্ধ্যের সময় সে গামছা কেনার ছুতো করে বাইরে গিয়েছিল; এইটেই তার সবচেয়ে সন্দেহজনক কাজ। সে যদি বাইরের লোকের সঙ্গে সাজশ করে চুরির মতলব করে থাকে তবে সহকারীকে খবর দিতে যাওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সে গয়না চুরি করে সহকারীকে দিল কী করে?

'তারপর ধর মণিময়ের কথা। মনে কর, মণিময় আর তার স্ত্রীর মধ্যে সাজশ ছিল। মনে কর, রাত্রি এগারটার সময় মণিময় ক্লাব থেকে বাড়ি এসেছিল, বাপের দেরাজ থেকে গয়না চুরি করে আবার বেরিয়ে গিয়েছিল; তারপর গয়নাটা কোথাও লুকিয়ে রেখে পৌনে বারটার সময় বাড়ি ফিরে এসেছিল। অসম্ভব নয়; কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে ভোলা কি জানতে পারত না? জানতে পারলে সে কি চুপ করে থাকত?'

এই সময় সত্যবতী চা লইয়া প্রবেশ করিল এবং আমাদের সামনে পেয়ালা রাখিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল, 'এই যে, কচ্ছপের মুখে বুলি ফুটেছে দেখছি।'

ব্যোমকেশ কটমট করিয়া চাহিল। কিন্তু সত্যবতী তাহার রোষদৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, 'বলছ বল, এখন আমার হাত জোড়া। পরে কিন্তু আবার বলতে হবে।' বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আমরা কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া চা পান করিলাম। কচ্ছপের উপমাটা ব্যোমকেশের পছন্দ হয় নাই, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। মনে আমোদ অনুভব করিলাম। এবার সুবিধা পাইলেই তাহাকে কচ্ছপ বলিব।

যাহোক, কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'মণিময় আর বৌয়ের ওপর যে সন্দেহ হয়েছিল, সেটা স্রেফ সুযোগের কথা ভেবে। মোটিভের কথা তখনও ভাবিনি। মণিময়ের মোটা টাকার দরকার হতে পারে, তার বৌয়ের গয়নার প্রতি লোভ থাকতে পারে; কিন্তু ওদের পারিবারিক জীবন যতটা দেখলাম তাতে চুরি করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। রসময়বাবু স্নেহময় পিতা, স্নেহময় শ্বশুর। ছেলে এবং পুত্রবধূকে তাঁর অদেয় কিছুই নেই। যা চাইলেই পাওয়া যায় তা কেউ চুরি করে না।

'ভোলার কথা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। সুযোগ এবং মোটিভ, দুই-ই তার পুরোমাত্রায় আছে। লোকটা ভারী ধূর্ত আর স্থিরবুদ্ধি। হয়তো চাকরিতে ঢুকে অবধি সে চুরির মতলব আঁটছিল এবং

মনে মনে প্ল্যান ঠিক করে রেখেছিল। কাল বিকালবেলা মস্ত দাঁও মারবার সুযোগ জুটে গেল। বাড়িতে দামী গয়না এসেছে, কিন্তু গিন্নী সিন্দুকের চাবি নিয়ে তীর্থ করতে চলে গেছেন।

'ভোলার সাজশ ছিল তার বড় ভাই ভূতনাথের সঙ্গে। ভেবে দেখ, কেমন যোগাযোগ। ভূতনাথ পোস্ট-অফিসে কাজ করে ; তার কাজ হচ্ছে রাস্তার ধারের ডাক-বাক্স থেকে চিঠি নিয়ে ঝোলায় ভরে পোস্ট-অফিসে পৌঁছে দেওয়া। হালফিল বৌবাজার এলাকায় তার কাজ ; সকাল বিকেল দুপুরে তিনবার এসে সে ডাক-বাক্স পরিষ্কার করে নিয়ে যায়।

'ভোলা গামছা কেনার ছুতো করে ভূতনাথের কাছে গেল। তাকে বলে এল, সকালবেলা ডাক পরিষ্কার করতে গিয়ে সে ওই ডাক-বাক্সটার মধ্যে একটা প্যাকেট পাবে, সেটা যেন সে নিয়ে না যায়, ডাক-বাক্সতেই রেখে দেয়। তারপর পুলিসের হাঙ্গামা কেটে যাবার পর সেটা বাড়ি নিয়ে যাবে। সাধারণ ডাক-বাক্সে প্যাকেট কেউ ফেলে না, তাই প্যাকেট চিনতে কোনও কষ্ট নেই। বিশেষত এই প্যাকেটে সম্ভবত ঠিকানা লেখা থাকবে না।

'ভূতনাথ লোকটা ভালমানুষ গোছের। কিন্তু সে লোভে পড়ে গেল। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। চাকরি তো যাবেই, সম্ভবত শ্রীঘর বাসও হবে।

'কাল বিকেল পর্যন্ত আমি অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলাম। তারপর যেই দেখলাম মণিময় ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলছে অমনি সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ভোলা বলেছিল তার এক ভাই পোস্ট-অফিসে চাকরি করে। কে চোর, কী চুরি করেছে, চোরাই মাল কোথায় আছে, কিছু অজানা রইল না। ভোলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে টুক করে প্যাকেটটা ডাক-বাক্সে ফেলে আবার উপরে উঠে গিয়েছিল। হয়তো দরজার সামনে মিনিটখানেক দাঁড়িয়েছিল হাঁফ নেবার জন্যে। মণিময় যে ক্লাব থেকে ফেরেনি এবং মণিময়ের বৌ যে জানালায় দাঁড়িয়ে স্বামীর পথ চেয়ে আছে তা সে জানত না।

'আমি যখন ব্যাপার বুঝতে পারলাম, তখন সটান অমরেশবাবুর কাছে গেলাম। ভোলার দাদা ভূতনাথ কী কাজ করে, পোস্ট-অফিসে খবর নিয়ে জানা গেল। তখন বাকী রইল শুধু আসামীদের ফাঁদ পেতে ধরা এবং স্বীকারোক্তি আদায় করা।'

দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিয়া দ্বার খুলিলাম। মণিময় দাঁড়াইয়া আছে। হাসিমুখে বলিল, 'বাবা পাঠালেন।'

ব্যোমকেশ ভিতর হইতে বলিল, 'আসুন মণিময়বাবু।'

মণিময় ভিতরে আসিয়া বসিল, পকেট হইতে একটি ছোট্ট নীল মখমলের কৌটা লইয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে রাখিল, 'বাবা এটি আপনার জন্যে পাঠালেন। তিনি নিজেই আসতেন, কিন্তু তাঁর পা—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, উপযুক্ত ছেলে থাকতে তিনি বুড়োমানুষ আসবেন কেন ? তা—নেকলেস পেয়ে তিনি খুশি হয়েছেন ?'

মণিময় হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, 'সে আর বলতে ! তিনি আমাকে বলতে বলেছেন, এই সামান্য জিনিসটা আপনার প্রতিভার উপযুক্ত নয়, তবু আপনাকে নিতে হবে।'

'কী সামান্য জিনিস ?' ব্যোমকেশ কৌটা লইয়া খুলিল ; একটা মটরের মত হীরা ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। হীরার আংটি ? ব্যোমকেশ আংটিটা সসম্ভ্রম চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ। আপনার বাবাকে বলবেন আংটি আমি নিলাম। এটাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি এর উপযুক্ত নই। চললেন না কি ? চা খেয়ে যাবেন না ?'

মণিময় বলিল, 'আজ একটু তাড়া আছে। দুপুরের প্লেনে দিল্লী যেতে হবে। ফিরে এসে আর একদিন আসব, তখন চা খাব।'

মণিময় চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতর দিক হইতে সত্যবতী প্রবেশ করিল। বোধ হয় পর্দার আড়ালে ছিল। ললিতকণ্ঠে বলিল, 'দেখি দেখি, কী পেলে ?'

ব্যোমকেশ আংটির কৌটা লুকাইয়া ফেলিবার তালে ছিল, আমি কাড়িয়া লইয়া সত্যবতীকে দিলাম। বলিলাম, 'এই নাও। এটা ব্যোমকেশের প্রতিভার উপযুক্ত নয়, এবং ব্যোমকেশ এর উপযুক্ত নয়। সুতরাং এটা তোমার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আরে আরে, এ কী!'

আংটি দেখিয়া সত্যবতীর চক্ষু আনন্দে বিস্ফারিত হইল, 'ও মা, হীরের আংটি, ভীষণ দামী আংটি! হীরেটারই দাম হাজার খানেক।' আংটি নিজের আঙুলে পরিয়া সত্যবতী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, 'কেমন মানিয়েছে বল দেখি!—ঐ যাঃ, মাছের ঝোল চড়িয়ে এসেছি, এতক্ষণে বোধহয় পুড়েঝুড়ে শেষ হয়ে গেল।' সত্যবতী আংটি পরিয়া চকিতে অন্তর্হিতা হইল।

ব্যোমকেশ তক্তপোশে এলাইয়া পড়িয়া গভীর নিশ্বাস মোচন করিল, বলিল, 'গহ্না কর্মণো গতিঃ।'

বলিলাম, 'ঠিক কথা। এবং গহ্নার গতি গৃহিণীর দিকে।'

অমৃতের মৃত্যু

গ্রামের নাম বাঘমারি। রেল-লাইনের ধারেই গ্রাম, কিন্তু গ্রাম হইতে স্টেশনে যাইতে হইলে মাইলখানেক হাঁটিতে হয়। মাঝখানে ঘন জঙ্গল। গ্রামের লোক স্টেশন যাইবার সময় বড় একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়া যায় না, রেল-লাইনের তারের বেড়া টপ্‌কাইয়া লাইনের ধার দিয়া যায়।

স্টেশনের নাম সান্তালগোলা। বেশ বড় স্টেশন, স্টেশন ঘিরিয়া একটি গঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে। অঞ্চলটা ধান্য-প্রধান। এখান হইতে ধান-চাল রপ্তানি হয়। গোটা দুই চালের কলও আছে।

যুদ্ধের সময় একদল মার্কিন সৈন্য সান্তালগোলা ও বাঘমারির মধ্যস্থিত জঙ্গলের মধ্যে কিছুকাল ছিল ; তাহারা খালি গায়ে প্যান্ট পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, চাষীদের সঙ্গে বসিয়া ডাবা-হুঁকায় তামাক খাইত। তারপর যুদ্ধের শেষে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল, রাখিয়া গেল কিছু অবৈধ সন্তানসন্ততি এবং কিছু ক্ষুদ্রায়তন অস্ত্রশস্ত্র।

ব্যোমকেশ ও আমি যে-কর্ম উপলক্ষে সান্তালগোলায় গিয়া কিছুকাল ছিলাম তাহার সহিত উক্ত অস্ত্রশস্ত্রের সম্পর্ক আছে, তাহার বিশদ উল্লেখ যথাসময়ে করিব। উপস্থিত যে কাহিনী লিখিতেছি তাহার ঘটনাকেন্দ্র ছিল বাঘমারি গ্রাম, এবং যাহাদের মুখে কাহিনীর গোড়ার দিকটা শুনিয়াছিলাম তাহারা এই গ্রামেরই ছেলে। বাক্‌বাহুল্য বর্জনের জন্য তাহাদের মুখের কথাগুলি সংহত আকারে লিখিতেছি।

বাঘমারি গ্রামে যে কয়টি কোঠাবাড়ি আছে তন্মধ্যে সদানন্দ সুরের বাড়িটা সবচেয়ে পুরাতন। গুটিতিনেক ঘর, সামনে শান-বাঁধানো চাতাল, পিছনে পাঁচিল-ঘেরা উঠান। বাড়ির ঠিক পিছন হইতে জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে।

সদানন্দ সুর বয়স্থ ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী স্ত্রী-পুত্র কেহ নাই, একলাই পৈতৃক ভিটায় থাকেন। তাঁহার একটি বিবাহিতা ভগিনী আছে বটে, স্বামী রেলের চাকরি করে, কিন্তু তাহারা শহুরে লোক, তাহাদের সহিত সদানন্দবাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। গ্রামের লোকের সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক খুব গাঢ় নয়, কাহারও সহিত অসদ্ভাব না থাকিলেও বেশি মাখামাখিও নাই। বেশির ভাগ দিন সকালবেলা উঠিয়া তিনি স্টেশনের গঞ্জে চলিয়া যান, সন্ধ্যার সময় গ্রামে ফিরিয়া আসেন। তিনি কী কাজ করেন সে সম্বন্ধে কাহারও মনে খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। কেহ বলে ধান-চালের দালালি করেন ; কেহ বলে বন্ধকী কারবার আছে। মোটের উপর লোকটি অত্যন্ত সংবৃতমন্ত্র ও মিতব্যয়ী, ইহার অধিক তাঁহার বিষয়ে বড় কেহ কিছু জানে না।

একদিন চৈত্র মাসের ভোরবেলা সদানন্দ বাড়ি হইতে বাহির হইলেন ; একটি মাঝারি আয়তনের ট্রাঙ্ক ও একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ বাহিরে রাখিয়া দরজায় তালা লাগাইলেন। তারপর ব্যাগ ও ট্রাঙ্ক দুই হাতে ঝুলাইয়া যাত্রা করিলেন।

বাড়ির সামনে মাঠের মতো খানিকটা খোলা জায়গা। সদানন্দ মাঠ পার হইয়া রেল-লাইনের দিকে চলিয়াছেন, গ্রামের বৃদ্ধ হীরু মোড়লের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। হীরু বলিল, 'কী গো

কত্তা, সকালবেলা বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে কোথায় চলেছেন ?'

সদানন্দ থামিলেন, 'দিন কয়েকের জন্য বাইরে যাচ্ছি।'

হীরু বলিল, 'অ। তিত্থিধম্ম করতে চললেন নাকি ?'

সদানন্দ শুধু হাসিলেন। হীরু বলিল, 'ইরির মধ্যে তিত্থিধম্ম ? বয়স কত হল কত্তা ?'

'পঁয়তাল্লিশ।' সদানন্দ আবার চলিলেন।

হীরু পিছন হইতে ডাক দিয়া প্রশ্ন করিল, 'ফিরছেন কদ্দিনে ?'

'দিন ছ'সাতের মধ্যেই ফিরব।'

সদানন্দ চলিয়া গেলেন।

তাঁহার আকস্মিক তীর্থযাত্রা লইয়া গ্রামে একটু আলোচনা হইল। তাঁহার প্রাণে যে ধর্মকর্মের প্রতি আসক্তি আছে এ সন্দেহ কাহারও ছিল না। গত দশ বৎসরের মধ্যে এক রাত্রির জন্যও তিনি বাহিরে থাকেন নাই। সকলে আন্দাজ করিল নীরব-কর্মা সদানন্দ সুর কোনও মতলবে বাহিরে গিয়াছেন।

ইহার দিন তিন চার পরে সদানন্দের বাড়ির সামনের মাঠে গ্রামের ছেলে-ছোকরারা বসিয়া জটলা করিতেছিল। গ্রামে পঁচিশ-ত্রিশ ঘর ভদ্রশ্রেণীর লোক বাস করে; সন্ধ্যার পর তরুণ-বয়স্কেরা এই মাঠে আসিয়া বসে, গল্প গুজব করে, কেহ গান গায়, কেহ বিড়ি-সিগারেট টানে। শীত এবং বর্ষাকাল ছাড়া এই স্থানটাই তাহাদের আড্ডাঘর।

আজ অমৃত নামধারী জনৈক যুবককে সকলে মিলিয়া ক্ষেপাইতেছিল। অমৃত গাঁয়ের একটি ভদ্রলোকের অনাথ ভাগিনেয়, একটু আধ-পাগলা গোছের ছেলে। রোগা তালপাতার সেপাইয়ের মত চেহারা, তড়বড় করিয়া কথা বলে, নিজের সাহস ও বুদ্ধিমত্তা প্রমাণের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। তাই সুযোগ পাইলে সকলেই তাহাকে লইয়া একটু রঙ্গ-তামাশা করে।

সকালের দিকে একটা ব্যাপার ঘটিয়াছিল।—নাদু নামক এক যুবকের সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে; তাহার বৌয়ের নাম পাপিয়া। বৌটি সকালবেলা কলসী লইয়া পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিল, ঘাটে অন্য মেয়েরাও ছিল। অমৃত পুকুরপাড়ে বসিয়া খোলামকুচি দিয়া জলের উপর ব্যাঙ-লাফানো খেলিতেছিল; নাদুর বৌকে দেখিয়া তাহার কি মনে হইল, সে পাপিয়ার স্বর অনুসরণ করিয়া ডাকিয়া উঠিল—'পিউ পিউ—পিয়া পিয়া পাপিয়া—'

মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। বৌটি অপমান বোধ করিয়া তখনই গৃহে ফিরিয়া গেল এবং স্বামীকে জানাইল। নাদু অগ্নিশর্মা হইয়া লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া অমৃত পুকুরপাড়ের একটা নারিকেল গাছে উঠিয়া পড়িল। তারপর গাঁয়ের মাতব্বর ব্যক্তিরা আসিয়া শান্তিরক্ষা করিলেন। অমৃতের মনে যে কু-অভিপ্রায় ছিল না তাহা সকলেই জানিত, গোঁয়ার-গোবিন্দ নাদুও বুঝিল। ব্যাপার বেশিদূর গড়াইতে পাইল না।

কিন্তু অমৃত তাহার সমবয়স্কদের শ্লেষ-বিদ্রূপ হইতে নিস্তার পাইল না। সন্ধ্যার সময় সে মাঠের আড্ডায় উপস্থিত হইলেই সকলে তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল।

পটল বলিল, 'হ্যাঁরে অমর্ত, তুই এতবড় বীর, নাদুর সঙ্গে লড়ে যেতে পারলি না ? নারকেল গাছে উঠলি !'

অমৃত বলিল, 'হুঁঃ, আমি তো ডাব পাড়তে উঠেছিলাম। নেদোকে আমি ডরাই না, ওর হাতে যদি লাঠি না থাকত অ্যায়সা লেঙ্গি মারতাম যে বাছাধনকে বিছানায় পড়ে কোঁ-কোঁ করতে হত !'

গোপাল বলিল, 'শাবাশ ! বাড়ি গিয়ে মামার কাছে খুব ঠেঙানি খেয়েছিলি তো ?'

অমৃত হাত মুখ নাড়িয়া বলিল, 'মামা মারেনি, মামা আমাকে ভালবাসে। শুধু মামী কান মলে দিয়ে বলেছিল—তুই একটা গো-ভূত।'

সকলে হি-হি করিয়া হাসিল। পটল বলিল 'ছি ছি, তুই এমন কাপুরুষ ! মেয়েমানুষের হাতের কানমলা খেলি ?'

অমৃত বলিল, 'মামী গুরুজন, তাই বেঁচে গেল, নইলে দেখে নিতাম। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।'

দাশু বলিল, 'আচ্ছা অম্‌রা, তুই তো মানুষকে ভয় করিস না। সত্যি বল দেখি, ভূত দেখলে কি করিস ?'

একজন নিম্নস্বরে বলিল, 'কাপড়ে-চোপড়ে—'

অমৃত চোখ পাকাইয়া বলিল, 'ভূত আমি দেখেছি কিন্তু মোটেই ভয় পাইনি।'

সকলে কলরব করিয়া উঠিল, 'ভূত দেখেছিস ? কবে দেখলি ? কোথায় দেখলি ?'

অমৃত সগর্বে জঙ্গলের দিকে শীর্ণ বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল, 'ঐখানে।'

'কবে দেখেছিস ? কী দেখেছিস ?'

অমৃত গম্ভীর স্বরে বলিল, 'ঘোড়া-ভূত দেখেছি।'

দু'একজন হাসিল। গোপাল বলিল, 'তুই গো-ভূত কিনা, তাই ঘোড়া-ভূত দেখেছিস। কবে দেখলি ?'

'পরশু রাত্তিরে।' অমৃত পরশু রাত্রের ঘটনা বলিল, 'আমাদের কৈলে বাছুরটা দড়ি খুলে গোয়ালঘর থেকে পালিয়েছিল। মামা বললে, যা অম্‌রা, জঙ্গলের ধারে দেখে আয়। রাত্তির তখন দশটা ; কিন্তু আমার তো ভয়-ডর নেই, গেলাম জঙ্গলে। এদিক ওদিক খুঁজলাম, কিন্তু কোথায় বাছুর ! চাঁদের আলোয় জঙ্গলের ভেতরটা হিলি-বিলি দেখাচ্ছে—হঠাৎ দেখি একটা ঘোড়া। খুরের শব্দ শুনে ভেবেছিলাম বুঝি বাছুরটা ; ঘাড় ফিরিয়ে দেখি একটা ঘোড়া বনের ভেতর দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। কালো কুচকুচে ঘোড়া, নাক দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। আমি রামনাম করতে করতে ফিরে এলাম। রামনাম জপ্‌লে ভূত আর কিছু বলতে পারে না।'

দাশু জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে গেল ঘোড়া-ভূত ?'

'গাঁয়ের দিক থেকে ইস্টিশানের দিকে।'

'ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিল ?'

'অত দেখিনি।'

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভূতের গল্প বানাইয়া বলিতে পারে এত কল্পনাশক্তি অমৃতের নাই। নিশ্চয় সে জ্যান্ত ঘোড়া দেখিয়াছিল। কিন্তু জঙ্গলে ঘোড়া আসিল কোথা হইতে ? গ্রামে কাহারও ঘোড়া নাই। যুদ্ধের সময় যে মার্কিন সৈন্য জঙ্গলে ছিল তাহাদের সঙ্গেও ঘোড়া ছিল না। ইস্টিশানের গঞ্জে দুই-চারিটা ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়া আছে বটে। কিন্তু ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়া রাত্রিবেলা জঙ্গলে ছুটাছুটি করিবে কেন ? তবে কি অমৃত পলাতক বাছুরটাকেই ঘোড়া বলিয়া ভুল করিয়াছিল ?

অবশেষে পটল বলিল, 'বুঝেছি, তুই বাছুর দেখে ঘোড়া-ভূত ভেবেছিলি।'

অমৃত সজোরে মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, 'না না, ঘোড়া। জলজ্যান্ত ঘোড়া-ভূত আমি দেখেছি।'

'তুই বলতে চাস্ ঘোড়া-ভূত দেখেও তোর দাঁত-কপাটি লাগেনি ?'

'দাঁত-কপাটি লাগবে কেন ? আমি রামনাম করেছিলাম।'

'রামনাম করেছিলি বেশ করেছিলি। কিন্তু ভয় পেয়েছিলি বলেই না রামনাম করেছিলি ?'

'মোটেই না, মোটেই না'—অমৃত আস্ফালন করিতে লাগিল, 'কে বলে আমি ভয় পেয়েছিলাম ! ভয় পাবার ছেলে আমি নয়।'

দাশু বলিল, 'দ্যাখ অম্‌রা, বেশি বড়াই করিসনি। তুই এখন জঙ্গলে যেতে পারিস ?'

'কেন পারব না !' অমৃত ঈষৎ শঙ্কিতভাবে জঙ্গলের দিকে তাকাইল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া চাঁদের আলো ফুটিয়াছে, জঙ্গলের গাছগুলা ঘনকৃষ্ণ ছায়া রচনা করিয়াছে ; অমৃত একটু থামিয়া গিয়া বলিল, 'ইচ্ছে করলেই যেতে পারি, কিন্তু যাব কেন ? এখন তো আর বাছুর হারায়নি।'

গোপাল বলিল, 'বাছুর না হয় হারায়নি। কিন্তু তুই গুল মারছিস কিনা বুঝব কি করে ?'

অমৃত লাফাইয়া উঠিল, 'গুল মারছি ! আমি গুল মারছি ! দ্যাখ্ গোপ্‌লা, তুই আমাকে চিনিস না—'

'বেশ তো, চিনিয়ে দে। যা দেখি একলা জঙ্গলের মধ্যে। তবে বুঝব তুই বাহাদুর।'

অমৃত আর পারিল না, সদর্পে বলিল, 'যাচ্ছি—এক্ষুনি যাচ্ছি। আমি কি ভয় করি নাকি ?' সে জঙ্গলের দিকে পা বাড়াইল।

পটল তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'শোন্, এই খড়ি নে। বেশি দূর তোকে যেতে হবে না, সদানন্দদা'র বাড়ির পিছনে যে বড় শিমুলগাছটা আছে তার গায়ে খড়ি দিয়ে ঢ্যারা মেরে আসবি। তবে বুঝব তুই সত্যি গিয়েছিলি।'

খড়ি লইয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে অমৃত বলিল, 'তোরা এখানে থাকবি তো ?'

'থাকব।'

অমৃত জঙ্গলের দিকে পা বাড়াইল। যতই অগ্রসর হইল ততই তাহার গতিবেগ হ্রাস হইতে লাগিল। তবু শেষ পর্যন্ত সে সদানন্দ সুরের বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাঠে উপবিষ্ট ছোকরার দল পাণ্ডুর জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়া নীরবে জঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিল। একজন বিড়ি ধরাইল। একজন হাসিল, 'অম্‌রা হয়তো সদানন্দদা'র বাড়ির পাশে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে।'

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। সকলের দৃষ্টি জঙ্গলের দিকে।

হঠাৎ জঙ্গল হইতে চড়াৎ করিয়া একটা শব্দ আসিল। শুক্‌নো গাছের ডাল ভাঙ্গিলে যেরূপ শব্দ হয় অনেকটা সেইরূপ। সকলে চকিত হইয়া পরস্পরের পানে চাহিল।

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু অমৃত ফিরিয়া আসিল না। অমৃত যেখানে গিয়াছে, ছোকরাদের দল হইতে সেই শিমুলগাছ বড়জোর পঞ্চাশ-ষাট গজ। তবে সে ফিরিতে এত দেরি করিতেছে কেন !

আরও তিন-চার মিনিট অপেক্ষা করিবার পর পটল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'চল্ দেখি গিয়ে। এত দেরি করছে কেন অম্‌রা !

সকলে দল বাঁধিয়া যে-পথে অমৃত গিয়াছিল সেই পথে চলিল। একজন রহস্য করিয়া বলিল, 'অম্‌রা ঘোড়া-ভূতের পিঠে চড়ে পালাল নাকি ?'

অম্‌রা কিন্তু পালায় নাই। সদানন্দ সুরের বাড়ির খিড়কি হইতে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে শিমুলগাছ। সেখানে জ্যোৎস্না-বিদ্ধ অন্ধকারে সাদা রঙের কি একটা পড়িয়া আছে। সকলে কাছে গিয়া দেখিল—অমৃত।

একজন দেশলাই জ্বালিল। অমৃত চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার বুকের জামা রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে।

অমৃত ভূতের ভয়ে মরে নাই, বন্দুকের গুলিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

দুই

ব্যোমকেশ আমাকে লইয়া সান্তালগোলায় আসিয়াছিল একটা সরকারী তদন্ত উপলক্ষে। সরকারের বেতনভুক পুলিস-কর্মচারীরা ব্যোমকেশকে স্নেহের চোখে দেখেন না বটে, কিন্তু মন্ত্রিমহলে তাহার খাতির আছে। পুলিসের জবাব দেওয়া কেস্ মাঝে মাঝে তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে।

গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক বিদেশী সৈন্য আসিয়া এদেশের নানা স্থানে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিল ; তারপর যুদ্ধের শেষে বিদেশীরা চলিয়া গেল, দেশে স্বদেশী শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত

হইল। স্বাধীনতার রক্ত-স্নান শেষ করিয়া দেশ যখন মাথা তুলিল তখন দেখিল হ্রদের উপরিভাগ শান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তলদেশে হিংসুক নক্রকুল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিদেশী সৈন্যদলের ফেলিয়া-যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই নক্রকুলের নখদন্ত। রেলের দুর্ঘটনা, আকস্মিক বোমা বিস্ফোরণ, সশস্ত্র ডাকাতি—নূতন শাসনতন্ত্রকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

পুলিস তদন্তে দু'চারজন দুর্বৃত্ত ধরা পড়িলেও, বোমা পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র কোথা হইতে সরবরাহ হইতেছে তাহার হদিস মিলিল না। বিদেশী সিপাহীরা যেখানে ঘাঁটি গাড়িয়াছিল, অস্ত্রগুলি যে তাহার কাছেপিঠেই সঞ্চিত হইয়াছে তাহা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল অস্ত্র-সরবরাহকারী লোকগুলাকে ধরা। যাহারা অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের কালাবাজার চালাইতেছে তাহাদের ধরিতে না পারিলে এ উৎপাতের মূলোচ্ছেদ হইবে না।

সরকারী দপ্তরের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যোমকেশ প্রথমে সাস্তালগোলায় আসিয়াছে। স্থানটি ছোট, কোন অবস্থাতেই তাহাকে শহর বলা চলে না। স্টেশনের কাছে রেল-কর্মচারীদের একসারি কোয়ার্টার। একটা পাকা রাস্তা স্টেশনকে স্পর্শ করিয়া দুই দিকে মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে এবং কুড়ি পঁচিশ বিঘা জমিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে; এই স্থানটুকুর মধ্যে কয়েকটা বড় বড় আড়ত, পুলিস থানা, পোস্ট-অফিস, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, সরকারী বিশ্রান্তিগৃহ ইত্যাদি আছে। যে দু'টি চাল-কলের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি সে দু'টি এই রাস্তা-ঘেরা স্থানের দুই প্রান্তে অবস্থিত। স্থানীয় লোক অধিকাংশ বাঙালী হইলেও, মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী যথেষ্ট আছে।

আমরা সরকারী বিশ্রান্তিগৃহে আড্ডা গাড়িয়াছিলাম। ব্যোমকেশের এখানে আত্মপরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল না, এ ধরনের তদন্তে যতটা প্রচ্ছন্ন থাকা যায় ততই সুবিধা; কিন্তু আসিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য কাহারও অবিদিত নাই। স্থানীয় পুলিসের দারোগা সুখময় সামন্ত পুলিস বিভাগ হইতে ব্যোমকেশ সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাঁহার কৃপায় ব্যোমকেশের খ্যাতি দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

দারোগা সুখময়বাবুর মুখ ভারি মিষ্ট, কিন্তু মস্তিষ্কটি দুষ্টবুদ্ধিতে ভরা। তিনি প্রকাশ্যে ব্যোমকেশকে সাহায্য করিতেছিলেন এবং অপ্রকাশ্যে যত ভাবে সম্ভব বাগড়া দিতেছিলেন। পুলিস যেখানে ব্যর্থ হইয়াছে, একজন বাহিরের লোক আসিয়া সেখানে কৃতকার্য হইবে, ইহা বোধ হয় তাঁহার মনঃপুত হয় নাই।

যাহোক, বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ব্যোমকেশ কাজ আরম্ভ করিল। পরিচয় গোপন রাখা সম্ভব নয় দেখিয়া প্রকাশ্যভাবেই অনুসন্ধান শুরু করিল। খোলাখুলি থানায় গিয়া দারোগা সুখময়বাবুর নিকট হইতে স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামের তালিকা সংগ্রহ করিল। স্টেশনে গিয়া মাস্টার, মালবাবু, টিকিট-বাবু, চেকার প্রভৃতির সহিত ভাব জমাইল; কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে গিয়া ম্যানেজারের নিকট হইতে স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিদের খোঁজখবর লইল। সকলেই জানিতে পারিয়াছিল ব্যোমকেশ কি জন্য আসিয়াছে, তাই সকলে সহযোগিতা করিলেও বিশেষ কোনও ফল হইল না।

চার পাঁচ দিন বৃথা ঘোরাঘুরির পর ব্যোমকেশ এক মতলব বাহির করিল। স্থানীয় যে-কয়জন বর্ধিষ্ণু লোককে সন্দেহ করা যাইতে পারে তাহাদের বেনামী চিঠি লিখিল। চিঠির মর্ম: আমি তোমার গোপন কার্যকলাপ জানিতে পারিয়াছি, শীঘ্রই দেখা হইবে।—চিঠিগুলি আমি দুই-তিন স্টেশন দূরে জংশনে গিয়া ডাকে দিয়া আসিলাম।

চার ফেলিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু মাছের দেখা নাই। এইভাবে আরও দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। নিষ্কর্মার মতো দিন রাত্রে ঘুমাইয়া ও সকাল সন্ধ্যা ভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু কাজের সুরাহা হইল না।

তারপর একদিন সকালবেলা বাঘমারি গ্রাম হইতে তিনটি ছেলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় গরম জিলাপী সহযোগে গরম দুগ্ধ সেবন করিয়া অভ্যন্তরভাগে বেশ একটি তৃপ্তিকর পরিপূর্ণতা অনুভব করিতেছি, এমন সময় দ্বারের কাছে কয়েকটি মুণ্ড

উঁকিঝুঁকি মারিতেছে দেখিয়া ব্যোমকেশ বাহিরে আসিল, 'কি চাই ?'

বিশ্রান্তিগৃহে পাশাপাশি দু'টি ঘর, সামনে ঢাকা বারান্দা। তিনটি যুবক বারান্দায় উঠিয়া ইতস্তত করিতেছিল, ব্যোমকেশকে দেখিয়া যুগপৎ দন্তবিকাশ করিল। একজন সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনিই ব্যোমকেশবাবু ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ।'

যুবকদের দন্তবিকাশ কর্ণচুম্বী হইয়া উঠিল। একজন বলিল, 'আমরা বাঘমারি গ্রাম থেকে আসছি।'

'বাঘমারি গ্রাম ! সে কোথায় ?'

'আজ্ঞে, বেশি দূর নয়, এখান থেকে মাইলখানেক।'

'আসুন'—বলিয়া ব্যোমকেশ তাহাদের ঘরে লইয়া আসিল। বিশ্রান্তিগৃহের বাঁধা বরাদ্দ আসবাব—একটি চেয়ার, একটি টেবিল, একটি আরাম-কেদারা, দু'টি খাট, মেঝেয় নারিকেল-ছোবড়ার চাটাই পাতা। যুবকেরা দু'জন মেঝেয় বসিল, একজন টেবিলে উঠিয়া বসিল। ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় অর্ধশয়ান হইয়া বলিল, 'কী ব্যাপার বলুন দেখি ?'

যে ছোকরা অগ্রণী হইয়া কথা বলিতেছিল তাহার নাম পটল। অন্য দু'জনের নাম দাশু ও গোপাল। পটল বলিল, 'আপনি শোনেননি ! আমাদের গ্রামে একটা ভীষণ হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে।'

'বলেন কি ! কবে ?' ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় উঠিয়া বসিল।

দাশু ও গোপাল একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'পরশু সন্ধ্যের পর।'

পটল বলিল, 'পুলিসে তক্ষুনি খবর দেওয়া হয়েছিল। কাল সকালবেলা ন'টার সময় দারোগা সুখময় সামন্ত গিয়েছিল। লাশ নিয়ে চলে এসেছিল, তারপর আর কোনও খবর নেই। আজ আমরা আপনার কাছে আসবার আগে থানায় গিয়েছিলাম, সুখময় দারোগা আমাদের হাঁকিয়ে দিলে। লাশ নাকি সদরে পাঠানো হয়েছে, হাসপাতালে চেরা-ফাঁড়া হবে। আপনি এসব কিছুই জানেন না ? তবে যে শুনেছিলাম আপনি পুলিসকে সাহায্য করবার জন্য এখানে এসেছেন !'

ব্যোমকেশ শুষ্কস্বরে বলিল, 'দারোগাবাবু বোধ হয় এ খবর আমাকে দেওয়া দরকার মনে করেননি। সে যাক। কে কাকে খুন করেছে ? কী দিয়ে খুন করেছে ?'

পটল বলিল, 'বন্দুক দিয়ে। খুন হয়েছে আমাদের এক বন্ধু—অমৃত। কে খুন করেছে তা কেউ জানে না। ব্যোমকেশবাবু, অমরার মৃত্যুর জন্য আমরাও খানিকটা দায়ী, ঠাট্টা-তামাশা করতে গিয়ে এই সর্বনাশ হয়েছে। তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি। সুখময় দারোগার দ্বারা কিছু হবে না, আপনি দয়া করে খুঁজে বার করুন কে খুন করেছে। আমরা আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বন্দুক দিয়ে খুন হয়েছে। আশ্চর্য !—সব কথা খুলে বলুন।'

অতঃপর পটল, দাশু ও গোপাল মিলিয়া কখনও একসঙ্গে কখনও পর্যায়ক্রমে যে কাহিনী বলিল তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। অমৃতের মৃত্যুতে তাহারা খুব কাতর হইয়াছে এমন মনে হইল না, কিন্তু অমৃতের রহস্যময় মৃত্যু তাহাদের উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। এবং ব্যোমকেশকে হাতের কাছে পাইয়া এই উত্তেজনা নাটকীয় রূপ ধারণ করিয়াছে।

অমৃতের মৃত্যু-বিবরণ শেষ হইতে আন্দাজ দু'ঘণ্টা লাগিল ; ব্যোমকেশ মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিয়া অস্পষ্ট স্থান পরিষ্কার করিয়া লইল। শেষে বলিল, 'ঘটনা রহস্যময় বটে, তার ওপর বন্দুক।—কিন্তু শুধু গল্প শুনলে কাজ হবে না, জায়গাটা দেখতে হবে।'

তিনজনেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পটল বলিল, 'বেশ তো, এখুনি চলুন না, ব্যোমকেশবাবু। আপনি আমাদের গ্রামে যাবেন সে তো ভাগ্যের কথা।'

ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'এ-বেলা থাক। দু'দিন যখন কেটে গেছে তখন একবেলায় বিশেষ ক্ষতি হবে না। আমরা ও-বেলা পাঁচটা নাগাদ যাব।'

'বেশ, আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

তাহারা চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দারোগা সুখময়বাবু আসিলেন। চেয়ারে নিজের সুবিপুল বপুখানি ঠাসিয়া দিয়া বলিলেন, 'বাঘমারির ছোঁড়াগুলো এসেছিল তো ? আমার কাছেও গিয়েছিল। বাঙালীর ছেলে, একটা হুজুগ পেয়েছে, আর কি রক্ষে আছে ! আপনি ওদের আমল দেবেন না মশাই, আপনার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, আমল দেব কেন ? আপনি তো ওদের আগে থাকতেই চেনেন, কেমন ছেলে ওরা ?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'পাড়াগাঁয়ের বকাটে নিষ্কর্মা ছেলে আর কি। বাপের দু'বিঘে ধান-জমি আছে, কি তিনটে নারকেল গাছ আছে, ব্যস্, ঘরে বসে-বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে ছেলেটা মারা গেছে সেও তো ওদেরই দলেরই ছেলে।'

'হ্যাঁ, সে ছিল আবার এককাটি বাড়া। মামার ভাতে ছিল, বকামি করে বেড়াতো।'

'বন্দুকের গুলিতে মরেছে শুনলাম।'

'তাই মনে হয়, তবে তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না।'

'হুঁ। কে মেরেছে কিছু সন্দেহ করেন ?'

'কি করে সন্দেহ করব বলুন দেখি ? কেউ কিছু দেখেনি, সবাই একজোট হয়ে মাঠে আড্ডা দিচ্ছিল। তবে একটা ব্যাপারের জন্যে একজনের ওপর সন্দেহ হচ্ছে। সেদিন সকালবেলা অমৃত নাদুর বৌকে অপমান করেছিল। নাদু একরোখা গোঁয়ার মানুষ, লাঠি নিয়ে অমৃতকে মারতে ছুটেছিল। সন্ধ্যেবেলা মাঠের আড্ডাতেও সে ছিল না। তাকে একবার থানায় আনিয়ে ভালো করে নেড়ে-চেড়ে দেখতে হবে।—কিন্তু এসব বাজে কথা এখন থাক। একটা জরুরী খবর আপনাকে দিতে এলাম।' সহসা গলা খাটো করিয়া বলিলেন, 'যমুনাদাস গঙ্গারামের নাম জানেন তো, এখানকার মস্তবড় আড়তদার। সে একটা বেনামী চিঠি পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ গাঢ় ঔৎসুক্য দেখাইয়া বলিল, 'বেনামী চিঠি ! কি আছে তাতে ?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'যমুনাদাস চুপিচুপি আমাকে চিঠি দেখিয়ে গেছে। খামের চিঠি, তাতে স্রেফ লেখা আছে : আমি সব জানতে পেরেছি, শীগ্‌গিরই দেখা হবে।'

'তাই নাকি ! তাহলে তো যমুনাদাসের ওপর নজর রাখতে হয়।'

'সে-কথা আর বলতে ! আমি একজন লোক লাগিয়ে দিয়েছি যমুনাদাসের পেছনে। সে অষ্টপ্রহর যমুনাদাসের ওপর নজর রেখেছে।'

'ভালো, ভালো ! আপনি পাকা লোক, ঠিক কাজই করেছেন। এবার হয়তো একটা সুরাহা হবে।'

সুখময়বাবুর মুখে একটু বিনীত আত্মপ্রসন্নতা খেলিয়া গেল, 'হে-হে—এই কাজ করে চুল পেকে গেল, ব্যোমকেশবাবু। তা সে যাক। এখন আপনার কি খবর বলুন। কিছু পেলেন ?'

ব্যোমকেশ হতাশ স্বরে বলিল, 'কৈ আর পেলাম ! যতদূর চাই, নাই নাই সে-পথিক নাই।'

সুখময়বাবু উদ্ধৃতিটা ধরিতে পারিলেন না, কিন্তু যেন বুঝিয়াছেন এমনিভাবে হে-হে করিলেন। তিনি চেয়ারে একেবারে জাম হইয়া বসিয়াছিলেন, এখন টানা-হেঁচড়া করিয়া নিজেকে চেয়ারের বাহুমুক্ত করিলেন। বলিলেন, 'আজ উঠি, থানায় অনেক কাজ পড়ে আছে।'

ব্যোমকেশও উঠিয়া দাঁড়াইল, 'ভালো কথা, অমৃতের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন নাকি ?'

সুখময়বাবু একটু ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন, 'এখনও পাইনি। কাল পরশু পাব বোধ হয়। কেন বলুন দেখি ?'

'পেলে একবার আমাকে দেখাবেন।'

সুখময়বাবু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'দেখতে চান, দেখাব। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু, আপনি

রুই-কাতলা ধরতে এসেছেন, আপনি যদি চুনোপুঁটির দিকে নজর দেন তাহলে আমরা বাঁচি কি করে ?'

'না না, নজর দিইনি। নিতান্তই অহেতুক কৌতূহল। কথায় বলে—নেই কাজ তো খই ভাজ।'

সুখময়বাবুর মুখে আবার হাসি ফুটিল, তিনি দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে প্রথম আমাকে লক্ষ্য করিলেন ; বলিলেন, 'এই-যে অজিতবাবু, কেমন আছেন ? গল্প-টপ্প লেখা হচ্ছে ? আপনার আজগুবি গল্পগুলো পড়তে মন্দ লাগে না—হে-হে। তবে রবার্ট ব্লেকের মতো নয়। আচ্ছা, আসি।'

তিনি শ্রুতিবহির্ভূত হইয়া গেলে ব্যোমকেশ আমার দিকে ফিরিয়া চোখ টিপিল ; বলিল, 'হে-হে।'

তিন

বৈকালবেলা ছেলেরা আসিয়া আমাদের গ্রামে লইয়া গেল। রেল-লাইনের ধার দিয়া যখন গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলাম তখন গ্রামের সমস্ত পুরুষ অধিবাসী আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য লাইনের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ছেলে-বুড়া কেহ বাদ যায় নাই। সকলের চোখে বিস্ফারিত কৌতূহল। ব্যোমকেশ বক্সী কীদৃশ জীব তাহার স্বচক্ষে দেখিতে চায়।

মিছিল করিয়া আমরা গ্রামে প্রবেশ করিলাম। পটল অগ্রবর্তী হইয়া আমাদের একটি বাড়িতে লইয়া গেল। কাঁচা-পাকা বাড়ি, সামনের দিকে দু'টি পাকা-ঘর, পিছনে খড়ের চাল। মৃত অমৃতের মামার বাড়ি।

অমৃতের মামা বলরামবাবু বাড়ির সামনের চাতালে টেবিল-চেয়ার পাতিয়া চায়ের আয়োজন করিয়াছিলেন, জোড়হস্তে আমাদের সংবর্ধনা করিলেন। লোকটিকে ভালোমানুষ বলিয়া মনে হয়, কথাবলার ভঙ্গীতে সঙ্কুচিত জড়তা। তিনি ভাগিনার মৃত্যুতে খুব বেশি শোকাভিভূত না হইলেও একটু যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

চায়ের সরঞ্জাম দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এসব আবার কেন ?'

বলরামবাবু অপ্রতিভভাবে জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, 'একটু চা—সামান্য—'

পটল বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমাদের গ্রামের পায়ের ধুলো দিয়েছেন আমাদের ভাগ্যি। চা খেতেই হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, সে পরে হবে, আগে জঙ্গলটা দেখে আসি।'

'চলুন।'

পটল আবার আমাদের লইয়া চলিল। আরও কয়েকজন ছোকরা সঙ্গে চলিল। বলরামবাবুর বাড়ির সম্মুখ দিয়া যে কাঁচা-রাস্তাটি গিয়াছে তাহাই গ্রামের প্রধান রাস্তা। এই রাস্তা একটি অসমতল শিলাকঙ্করপূর্ণ আগাছাভরা মাঠের কিনারায় আসিয়া শেষ হইয়াছে। মাঠের পরপারে একটিমাত্র পাকা বাড়ি ; সদানন্দ সুরের বাড়ি। তাহার পিছনে জঙ্গলের গাছপালা। আমরা মাঠে অবতরণ করিলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এই মাঠে বসে তোমরা সেদিন গল্প করছিলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ঠিক কোন্ জায়গায় বসেছিলে ?'

'এই যে—' আরও কিছুদূর গিয়া পটল দেখাইয়া বলিল, 'এইখানে।'

স্থানটি অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন, আগাছা নাই। ব্যোমকেশ বলিল, 'এখান থেকে অমৃত যে-পথে জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল সেই পথে নিয়ে চল।'

'আসুন।'

সদানন্দ সুরের দরজায় তালা ঝুলিতেছে, জানালাগুলি বন্ধ। আমরা বাড়ির পাশ দিয়া পিছন দিকে চলিলাম। পিছনে পাঁচিল-ঘেরা উঠান, পাঁচিল প্রায় এক মানুষ উঁচু, তাহার গায়ে একটি খিড়কি-দরজা। জঙ্গলের গাছপালা খিড়কি-দরজা পর্যন্ত ভিড় করিয়া আসিয়াছে।

বাড়ি অতিক্রম করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। জঙ্গলে পাতা-ঝরা আরম্ভ হইয়াছে, গাছগুলি পত্রবিরল, মাটিতে স্বয়ংবিশীর্ণ পীতপত্রের আস্তরণ। বাড়ির খিড়কি হইতে পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড শিমুলগাছ, স্তম্ভের মতো স্থূল গুঁড়ি দশ-বারো হাত উঁচুতে উঠিয়া শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পটল আমাদের শিমুলতলায় লইয়া গিয়া একটা স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, 'এইখানে অমৃত মরে পড়ে ছিল।'

স্থানটি ঝরা-পাতা ও শিমুল-ফুলে আকীর্ণ, অপঘাত মৃত্যুর কোনও চিহ্ন নাই। তবু ব্যোমকেশ স্থানটি ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। কঠিন মাটির উপর কোনও দাগ নাই, কেবল শুক্‌না পাতার নিচে একখণ্ড খড়ি পাওয়া গেল। ব্যোমকেশ খড়িটি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'এই খড়ি দিয়ে অমৃত গাছের গায়ে ঢেরা কাটতে এসেছিল। কিন্তু গাছের গায়ে খড়ির দাগ নেই। সুতরাং—'

পটল বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, দাগ কাটবার আগেই—'

এখানে দ্রষ্টব্য আর কিছু ছিল না। আমরা ফিরিয়া চলিলাম। ফিরিবার পথে ব্যোমকেশ বলিল, 'সদানন্দ সুরের খিড়কির দরজা বন্ধ আছে কিনা একবার দেখে যাই।'

খিড়কির দরজা ঠেলিয়া দেখা গেল ভিতর হইতে হুড়কা লাগানো। প্রাচীন দরজার তক্তায় ছিদ্র আছে, তাহাতে চোখ লাগাইয়া দেখিলাম, উঠানের মাঝখানে একটি তুলসী-মঞ্চ, বাকী উঠান আগাছায় ভরা। একটা পেয়ারাগাছ এককোণে পাঁচিলের পাশে দাঁড়াইয়া আছে, আর কিছু চোখে পড়িল না।

অতঃপর ব্যোমকেশ পাঁচিলের ধার দিয়া ফিরিয়া চলিল। তাহার দৃষ্টি মাটির দিকে। পাঁচিলের কোণ পর্যন্ত আসিয়া সে হঠাৎ আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'ও কি ?'

অনাবৃত শুষ্ক মাটির উপর পরিষ্কার অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন ; তাহার আশেপাশে আরও কয়েকটা অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা চিহ্ন রহিয়াছে। ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া চিহ্নটা পরীক্ষা করিল, আমরাও দেখিলাম। তারপর সে ঘাড় তুলিয়া দেখিল পাঁচিলের পরপারে পেয়ারাগাছের ডালপালা দেখা যাইতেছে।

বলিলাম, 'কি দেখছ ? কিসের চিহ্ন ওগুলো ?'

ব্যোমকেশ পটলের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি মনে হয় ?'

পটলের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে ; সে ওষ্ঠ লেহন করিয়া বলিল, 'ঘোড়ার খুরের দাগ মনে হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, ঘোড়া-ভূতের খুরের দাগ। অমৃত তাহলে মিছেকথা বলেনি।'

ফিরিয়া চলিলাম। ব্যোমকেশের ভ্রূ সংশয়ভরে কুঞ্চিত হইয়া রহিল। তাহার মনে ধোঁকা লাগিয়াছে, ঘোড়ার খুরের তাৎপর্য সে পরিষ্কার বুঝিতে পারে নাই। চলিতে চলিতে মাত্র দু'একটা কথা হইল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সদানন্দ সুর কতদিন হল বাইরে গেছেন ?'

পটল বলিল, 'সাত-আট দিন হল।'

'কবে ফিরবেন বলে যাননি ?'

'না।'

'কোথায় গেছেন তাও কেউ জানে না ?'

'না।'

বলরামবাবুর বাড়িতে পৌঁছিয়া চেয়ারে বসিলাম। দর্শকের ভিড় কমিয়া গিয়াছে, তবু দু'চারজন অতি-উৎসাহী ব্যক্তি ব্যোমকেশকে দেখিবার আশায় আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বলরামবাবু আমাদের চা ও জলখাবার আনিয়া দিলেন। পটল দাশু গোপাল প্রভৃতি ছোকরা কাছে দাঁড়াইয়া আমাদের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলরামবাবুকে সওয়াল আরম্ভ করিল—

'অমৃত আপনার আপন ভাগ্‌নে ছিল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওর মা-বাপ কেউ ছিল না ?'

'না। আমার বোন অমর্তকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। আমার কাছে থাকত। তারপর সেও মারা গেল। অমর্তর বয়স তখন পাঁচ বছর।'

'আপনার নিজের ছেলেপুলে নেই ?

'একটি মেয়ে আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'অমৃতের কত বয়স হয়েছিল ?'

'একুশ।'

'তার বিয়ে দেননি ?'

'না। বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন ছিল না, ন্যালাক্ষ্যাপা ছিল, তাই বিয়ে দিইনি।'

'কাজকর্ম কিছু করত ?'

'মাঝে মাঝে করত, কিন্তু বেশিদিন চাকরি রাখতে পারত না। সান্তালগোলার বড় আড়তদার ভগবতীবাবুর গদিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, কিছুদিন কাজ করেছিল। তারপর বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর চালের কলে মাসখানেক ছিল, তা বদ্রিদাসও রাখল না। কিছুদিন থেকে বিশু মল্লিকের চালের কলে ঘোরাঘুরি করছিল, কিন্তু কাজ পায়নি।'

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল নীরবে নারিকেল-লাড়ু চিবাইল, তারপর এক ঢোক চা খাইয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'গ্রামে কারুর ঘোড়া আছে ?'

বলরামবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন,—ছোকরারাও মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। শেষে বলরামবাবু বলিলেন, 'গাঁয়ে তো কারুর ঘোড়া নেই।'

'কারুর বন্দুকের লাইসেন্স আছে ?'

'আজ্ঞে না।'

'নাদু নামে এক ছোকরার কথা শুনেছি, তার ভালো নাম জানি না। তাকে পেলে দু'একটা প্রশ্ন করতাম।'

বলরামবাবু ছোকরাদের পানে তাকাইলেন, তাহারা আর একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল ; তারপর পটল বিলল, 'নাদু কাল বৌকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।'

'শ্বশুরবাড়ি কোথায় ?'

'কৈলেসপুরে। ট্রেনে যেতে হয়, সান্তালগোলা থেকে তিন-চার স্টেশন দূরে।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে চায়ের পেয়ালা শেষ করিল। নাদু হয়তো নিরপরাধ, কিন্তু সে পলাইবে কেন ? ভয় পাইয়াছে ? আশ্চর্য নয় ; এরূপ একটা খুনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলে কে না শঙ্কিত হয় ?

এই সময়ে একটি ছোকরা বলিয়া উঠিল, 'ওই সদানন্দদা আসছে !'

সকলে একসঙ্গে ঘাড় ফিরাইলাম। রাস্তা দিয়া একটি ভদ্রলোক আসিতেছেন। চেহারা গ্রাম্য হইলেও সাজ-পোশাক গ্রাম্য নয় ; গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি এবং গরদের চাদর, পায়ে কালো বার্নিশ অ্যালবার্ট, হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

একটি ছোকরা চুপিচুপি অন্য এক ছোকরাকে বলিল, 'সদানন্দদার জামাকাপড়ের বাহার দেখেছিস ! নিশ্চয় কলকাতায় গেছল।'

সদানন্দবাবু সামনা-সামনি আসিলে পটল হাঁক দিয়া বলিল, 'সদানন্দদা, গাঁয়ের খবর শুনেছেন ?'

সদানন্দবাবু দাঁড়াইলেন, আমাকে এবং ব্যোমকেশকে লক্ষ্য করিলেন, তারপর বলিলেন, 'কী খবর ?'

পটল বলিল, 'অম্‌রা মারা গেছে।'

সদানন্দবাবুর চোখে অকপট বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল, 'মারা গেছে! কী হয়েছিল?'

পটল বলিল, 'হয়নি কিছু। বন্দুকের গুলিতে মারা গেছে। কে মেরেছে কেউ জানে না।'

সদানন্দবাবুর মুখখানা ধীরে ধীরে পাথরের মত নিশ্চল হইয়া গেল, তিনি নিস্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। পটল বলিল, 'আপনি এই এলেন, এখন বাড়ি যান। পরে সব শুনবেন।'

সদানন্দবাবু ক্ষণেক দ্বিধা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে প্রস্থান করিলেন।

তিনি দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া যাইবার পর ব্যোমকেশ পটলকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সদানন্দবাবু যখন গ্রাম থেকে গিয়েছিলেন তখন তাঁর হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ আর স্টীলের ট্রাঙ্ক ছিল না?'

পটল বলিল, 'ঠিক তো, হীরু মোড়ল তাই বলেছিল বটে। সদানন্দদা তোরঙ্গ কোথায় রেখে এলেন!'

এ প্রশ্নের সদুত্তর কাহারও জানা ছিল না। ব্যোমকেশ এদিক ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, 'সন্ধ্যে হয়ে এল, আজ উঠি। সদানন্দবাবুর সঙ্গে দু' একটা কথা বলতে পারলে ভালো হত। কিন্তু তিনি এইমাত্র ফিরেছেন—'

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইতে পাইল না, বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে আমরা ক্ষণকালের জন্য হতচকিত হইয়া গেলাম। তারপর ব্যোমকেশ একলাফে রাস্তায় নামিয়া সদানন্দ সুরের বাড়ির দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহার পিছনে ছুটিলাম। শব্দটা ওই দিক হইতেই আসিয়াছে।

সদানন্দ সুরের বাড়ির সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিলাম, বাড়ির সদর দরজার কবাট সামনের চাতালের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সদানন্দ সুর রক্তাক্ত দেহে তাহার মধ্যে পড়িয়া আছেন। খানিকটা কটুগন্ধ ধূম সন্ধ্যার বাতাস লাগিয়া ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িতেছে।

চার

ব্যোমকেশ ও আমি চাতালের উপর উঠিলাম, আর যাহারা আমাদের পিছনে আসিয়াছিল তাহার চাতালের কিনারায় দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে চক্ষু গোল করিয়া দেখিতে লাগিল।

সদানন্দ সুর যে বাঁচিয়া নাই তাহা একবার দেখিয়াই বোঝা যায়। তাহার শরীর অপেক্ষাকৃত অক্ষত বটে; ডান হাতে তালা ও বাঁ হাতে চাবি দৃঢ়ভাবে ধরা রহিয়াছে; কিন্তু মাথাটা প্রায় ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উল্টা দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে, রক্ত ও মগজ মাখামাখি হইয়া চূর্ণ খুলি হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে; মুখের একপাশটা নাই। বীভৎস দৃশ্য। তিন মিনিট আগে যে-লোকটাকে জলজ্যান্ত দেখিয়াছি, তাহাকে এই অবস্থায় দেখিলে স্নায়বিক ত্রাসে শরীর কাঁপিয়া ওঠে, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

গ্রামবাসীদের এতক্ষণ বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। পটল প্রথম কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইল; কম্পিতস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, এসব কী হচ্ছে আমাদের গ্রামে!'

ব্যোমকেশ ভাঙা দরজার নিকট হইতে ঢালাই লোহার একটা টুকরা কুড়াইয়া লইয়া পরীক্ষা করিতেছিল, পটলের কথা বোধ হয় শুনতে পাইল না। লোহার টুকরা ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'হ্যান্ড-গ্রিনেড! ক্যাম্বিসের ব্যাগটা কোথায় গেল?'

ব্যাগটা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় একপাশে ছিটকাইয়া পড়িয়া ছিল। ব্যোমকেশ গিয়া সেটার অভ্যন্তরভাগে পরীক্ষা করিল। নূতন ও পুরাতন কয়েকটা জামাকাপড় রহিয়াছে। একটা নূতন টাইম-পীস ঘড়ি বিস্ফোরণের ধাক্কায় চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে, একটা কেশতৈলের বোতল ভাঙিয়া কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে। আর কিছু নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, তুমি বাইরে থাকো, আমি চট্‌ করে বাড়ির ভিতরটা দেখে আসি।'

শুধু যে দরজার কবাট ভাঙিয়া পড়িয়াছিল তাহাই নয়, দরজার উপরের খিলান খানিকটা উড়িয়া গিয়াছিল, কয়েকটা ইট বিপজ্জনকভাবে ঝুলিয়া ছিল। ব্যোমকেশ যখন লঘুপদে এই রন্ধ্র পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। এই অভিশপ্ত বাড়ির মধ্যে কোথায় কোন্ ভয়াবহ মৃত্যু ওৎ পাতিয়া আছে কে জানে! ব্যোমকেশের যদি কিছু ঘটে, সত্যবতীর সামনে গিয়া দাঁড়াইব কোন্ মুখে ?

'দাঁড়াও, আমিও আসছি'—বলিয়া আমি প্রাণ হাতে করিয়া বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িলাম।

ব্যোমকেশ ঘাড় ফিরাইয়া একটু হাসিল ; বলিল, 'ভয়ের কিছু নেই। বিপদ যা ছিল তা সদানন্দ সুরের ওপর দিয়েই কেটে গিয়েছে।'

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, বাড়ির ভিতরে আলো অতি অল্প। বলিলাম, 'কি দেখবে চটপট দেখে নাও। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে।'

বাড়ির সামনের দিকে দু'টি ঘর, পিছনে রান্নাঘর। কোনও ঘরেই লোভনীয় কিছু নাই। যে ঘরের দরজা ভাঙিয়াছিল সে-ঘরে কেবল একটি কোমর-ভাঙা তক্তপোশ আছে ; পাশের ঘরে আর একটি তক্তপোশের উপর বালিশ-বিছানা দেখিয়া বোঝা যায় ইহা গৃহস্বামীর শয়নকক্ষ। একটা খোলা দেওয়াল-আলমারিতে কয়েকটা ময়লা জামাকাপড় ছাড়া আর কিছুই নাই।

রান্নাঘরও তথৈবচ। খানকয়েক থালা-বাটি, ঘটি-কলসী, হাঁড়িকুড়ি। উনুনটা অপরিষ্কার, তাহার গর্ভে ছাই জমিয়া আছে। সব দেখিয়া শুনিয়া বলিলাম, 'সদানন্দ সুরের অবস্থা ভালো ছিল না মনে হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। ওই দরজাটা দেখেছ ?' বলিয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

কাছে গিয়া দেখিলাম। রান্নাঘরের এই দরজা দিয়া উঠানে যাইবার পথ। দরজা ভেজানো রহিয়াছে, টান দিতেই খুলিয়া গেল। বলিলাম, 'একি ? দরজা খোলা ছিল !'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সদানন্দ সুর খুলে রেখে যাননি। হুড়কো লাগিয়ে গিয়েছিলেন। ভালো করে দ্যাখো।'

ভালো করিয়া দেখিলাম, দ্বারের পাশে হুড়কো ঝুলিতেছে, কিন্তু তাহার দৈর্ঘ্য বড়জোর হাতখানেক। বলিলাম, 'একি, এতটুকু হুড়কো !'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝতে পারলে না ? হুড়কোটা প্রমাণ মাপেরই ছিল এবং লাগানো ছিল। তারপর কেউ বাইরে থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে করাত ঢুকিয়ে ওটাকে কেটেছে, তারপর ঘরে ঢুকেছে। ওই দ্যাখো হুড়কোর বাকী অংশটা।' ব্যোমকেশ দেখাইল, উনানের পাশে জ্বালানী কাঠের সঙ্গে হুড়কোর বাকী অংশটা পড়িয়া আছে।

ব্যাপার কতক আন্দাজ করিতে পারিলেও সমগ্র পরিস্থিতি ধোঁয়াটে হইয়া রহিল। সদানন্দ সুরের কোনও শত্রু তাঁহার অনুপস্থিতিকালে হুড়কো কাটিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর ? আজ বোমা ফাটিল কি করিয়া ? কে বোমা ফাটাইল ?

খোলা দরজা দিয়া আমরা উঠানে নামিলাম। পাঁচিল-ঘেরা উঠানের এককোণে কুয়া, অন্য কোণে পেয়ারাগাছ। ব্যোমকেশ সিধা পেয়ারাগাছের কাছে গিয়া মাটি দেখিল। মাটিতে যে অস্পষ্ট দাগ রহিয়াছে তাহা হইতে আমি কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না, কিন্তু ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ, যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। যিনি এসেছিলেন তিনি এইখানেই পাঁচিল টপ্‌কেছিলেন।'

বলিলাম, 'তাই নাকি ! কিন্তু পাঁচিল টপ্‌কাবার কী দরকার ছিল ? করাত দিয়ে খিড়কি-দোরের হুড়কো কাটল না কেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খিড়কির হুড়কো করাত দিয়ে কাটলে খিড়কি-দরজা খোলা থাকত, কারুর চোখে পড়তে পারত। তাতে আগন্তুক মহাশয়ের অসুবিধা ছিল। আমি গোড়াতেই ভুল বুঝেছিলাম, নইলে সদানন্দ সুর মরতেন না।'

'কী ভুল বুঝেছিলে ?'

'আমি সন্দেহ করেছিলাম, যাঁকে ধরতে এখানে এসেছি তিনি সদানন্দ সুর। কিন্তু তা নয়। —চল, এখন যাওয়া যাক। বাঘমারি গ্রামে আর কিছু দেখবার নেই।'

রান্নাঘরের ভিতর দিয়া আবার সদরে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া জড়ো হইয়াছে এবং চাতালের নিচে ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে মৃতদেহের পানে চাহিয়া আছে। মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নাই।

ভিড়ের মধ্য হইতে পটল বলিয়া উঠিল, 'ব্যোমকেশবাবু, বাড়ির মধ্যে কী দেখলেন ? কাউকে পেলেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। পুলিসে খবর পাঠিয়েছ ?'

পটল বলিল, 'না। আপনি আছেন তাই—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি কেউ নয়, পুলিসকে খবর দিতে হবে। আচ্ছা, তোমাদের যেতে হবে না ; আমরা তো যাচ্ছি, সুখময়বাবুকে খবর দিয়ে যাব।'

'আপনারা যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ। যতক্ষণ পুলিস না আসে ততক্ষণ তোমরা কয়েকজন এখানে থেকো।'

'পুলিস কি আজ রাত্রে আসবে ?'

'আসবে।'

আমরা আবার রেল-লাইনের ধার দিয়া চলিয়াছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া চাঁদের আলো ফুটি-ফুটি করিতেছে। একটা মালগাড়ি দীর্ঘ দেহভার টানিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি এ-ব্যাপারের কিছু কিছু বুঝেছ মনে হচ্ছে। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ উত্তর দিল না, তারপর বলিল, 'অমৃতের মৃত্যুর সঙ্গে সদানন্দ সুরের মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ ?'

'সম্বন্ধ আছে নাকি ? কী সম্বন্ধ ?'

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'অমৃত বেচারা বেঘোরে মারা গেল। সে-রাত্রে যদি সে জঙ্গলে না যেত তাহলে মরত না। যে তাকে মেরেছে সে তাকে মারতে আসেনি।'

'তবে কাকে মারতে এসেছিল ?'

'সদানন্দ সুরকে।'

'কিন্তু—সদানন্দ সুর তো তখন বাড়ি ছিলেন না।'

'ছিলেন না বলেই আততায়ী এসেছিল তাঁকে মারতে।'

'বড্ড বেশি রহস্যময় শোনাচ্ছে। অনেকটা কালিদাসের হেঁয়ালির মত—নেই তাই খাচ্ছ তুমি, থাকলে কোথায় পেতে !—কিন্তু যাক, আজ বোমা ফাটল কি করে ?'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'বুবি-ট্র্যাপ্ কাকে বলে জানো ?'

বলিলাম, 'কথাটা শুনেছি। ফাঁদ পাতা ?'

'হ্যাঁ। সদানন্দ সুরকে একজন মারতে চেয়েছিল। সে যখন জানতে পারল সদানন্দ সুর বাইরে গেছেন, তখন একদিন সন্ধ্যের পর এসে পাঁচিল ডিঙিয়ে উঠোনে ঢুকল, দরজার হুড়কো করাত দিয়ে কেটে বাড়িতে ঢুকল, তারপর বন্ধ সদর-দরজার মাথায় এমনভাবে একটা বোমা সাজিয়ে রেখে গেল যে, দরজা খুললেই বোমা ফাটবে। আজ সদানন্দ সুর ফিরে এসে দরজা খুললেন, অমনি বোমা ফাটল। এবার বুঝতে পেরেছ ?'

'বুঝেছি। কিন্তু লোকটা কে ?'

'এখনও নাম জানি না। কিন্তু তিনি অস্ত্রশস্ত্রের চোরাকারবার করেন এবং কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাত্রিবেলা যুদ্ধযাত্রা করেন। লোকটির নামধাম জানবার জন্যে আমার মনটাও বড় ব্যগ্র হয়েছে।'

সাঁওতালগোলায় পৌঁছিয়া দেখিলাম দিনের কর্ম-কোলাহল শান্ত হইয়াছে, বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ। থানা খোলা আছে, সুখময়বাবু টেবিলে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছেন। আমাদের পদশব্দে তিনি চোখ তুলিলেন, 'কী খবর ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খবর গুরুতর। বাঘমারিতে আর একটা খুন হয়েছে।'

'খুন !' সুখময়বাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'হ্যাঁ। সদানন্দ সুরকে আপনি চেনেন ?'

সুখময়বাবু ভ্রূকুটি করিয়া মাথা নাড়িলেন, 'হয়তো দেখেছি, মনে পড়ছে না। সদানন্দ সুর খুন হয়েছে ? কিন্তু আপনি সকলের আগে এ-খবর পেলেন কোথা থেকে ?'

'আমি বাঘমারিতে ছিলাম।'

সুখময়বাবুর মুখ হইতে ক্ষণেকের জন্য মিষ্টতার মুখোশ খসিয়া পড়িল, তিনি রূঢ়চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনি বাঘমারিতে গিয়েছিলেন। আমি মানা করা সত্ত্বেও গিয়েছিলেন !'

ব্যোমকেশের দৃষ্টিও প্রখর হইয়া উঠিল, 'আপনি আমাকে মানা করবার কে ?'

সুখময়বাবু কড়া সুরে বলিলেন, 'আমি এ এলাকার বড় দারোগা, পুলিসের কর্তা।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি পুলিসের হর্তাকর্তা বিধাতা হতে পারেন, কিন্তু আমাকে হুকুম দেবার মালিক আপনি নন। ইন্সপেক্টর সামন্ত, আমি সরকারের কাজে এখানে এসেছি। আপনার ওপর হুকুম আছে সবরকমে আমাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু সাহায্য করা দূরের কথা, আপনি পদে পদে বাগড়া দেবার চেষ্টা করছেন। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি আপনার এতটুকু বেচাল দেখি, আপনাকে এ-এলাকা ছাড়তে হবে। এমন কি চাকরি ছাড়াও বিচিত্র নয়।'

সুখময়বাবু বোধ করি ব্যোমকেশকে গোবেচারী মনে করিয়া এতটা দাপট দেখাইয়াছিলেন, এখন তাহাকে নিজমূর্তি ধারণ করিতে দেখিয়া একেবারে কেঁচো হইয়া গেলেন। তাঁহার মিষ্টতার মুখোশ পলকের মধ্যে আবার মুখে ফিরিয়া আসিল। তিনি কণ্ঠস্বরে বশংবদ দীনতা ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি কি-যে বলছি তার ঠিক নেই ! আমাকে মাপ করুন, ব্যোমকেশবাবু। আজ বিকেল থেকে পেটে একটা ব্যথা ধরেছে, তাই মাথার ঠিক নেই। আপনাকে হুকুম করব আমি ! ছি-ছি, কী বলেন আপনি ! আমি আপনার হুকুমের গোলাম। হে-হে।—তা সদানন্দ সুর খুন হয়েছে ?'

ব্যোমকেশের তখনও মেজাজ ঠাণ্ডা হয় নাই ; সে বলিল, 'অমৃতের মৃত্যুর খবর পেয়ে আপনি সে-রাত্রে তদন্ত করতে যাননি, পরদিন সকালবেলা গিয়েছিলেন। এ খবরটা আপনার ওপরওয়ালার কানে পৌঁছুলে তিনি কি করবেন তা বোধ হয় আপনার জানা আছে ?'

সুখময়বাবু কাকুতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'কি বলব ব্যোমকেশবাবু, সেদিনও কলিকের ব্যথা ধরেছিল, হে-হে, একেবারে পেড়ে ফেলেছিল। নইলে খুনের খবর পেয়ে যাব না, এ কি সম্ভব ! তা যাক্‌গে ও-কথা। এখন এই সদানন্দ সুর—। আমি এখনি বেরুচ্ছি। এই জমাদার, জল্‌দি ইধার আও ! হমারা ঘোড়া'পর জিন চড়ানে বোলো। তুম্ ভি তৈয়ার হো লেও। ভারী খুন হুয়া হ্যায়। আভি যানা পড়েগা।'

অতঃপর সুখময়বাবু রণসাজে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। পাড়াগাঁয়ে পুলিসকে তদন্ত উপলক্ষে পথহীন মাঠে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাই বোধ করি তাহাদের ঘোড়ার ব্যবস্থা।

পাঁচ

পরদিন সকালবেলা প্রাতরাশের পর ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, স্টেশনে বেড়িয়ে আসা যাক।'

সকাল সাতটায় একটা ট্রেন চলিয়া গিয়াছে, আর একটা ট্রেন আসিবে ঘণ্টা দুই পরে।

স্টেশনে ভিড় নাই, প্রবেশদ্বারে টিকিট-চেকার নাই। স্টেশনমাস্টার হরিবিলাসবাবু ছাড়া আর সকলেই বোধ করি এই অবকাশে নিজ নিজ কোয়ার্টারে চা খাইতে গিয়াছে।

হরিবিলাসবাবুর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক, অজীর্ণ-জীর্ণ শরীর। ওজন করিয়া কথা বলেন, একটি কথা বলিবার আগে পাঁচবার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন। আমাদের সহিত পরিচয় হইলেও অধিক বাক্য-বিনিময় হয় নাই। আমরা আসিয়া যখন শূন্য প্ল্যাটফর্মের উপর অলসভাবে পায়চারি করিতে লাগিলাম, তখন তিনি অফিস-ঘর হইতে চশমার উপর দিয়া আমাদের লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু উচ্চবাচ্য করিলেন না।

ব্যোমকেশ অবশ্য প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিবার জন্য আসে নাই, সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল ; কিন্তু সে হরিবিলাসবাবুর কাছে গেল না। তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করা এবং খনির গর্ভ হইতে মণিমাণিক্য আহরণ সমান শ্রমসাপেক্ষ। তার চেয়ে অন্য কেহ যদি আসিয়া পড়ে—

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, টিকিট-চেকার মনোতোষ বোধ হয় নিজের কোয়ার্টার হইতে আমাদের দেখিতে পাইয়াছিল, মুখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভারি তোখড় ছেলে, কথাবার্তায় চটপটে। বলিল, 'কী কাণ্ড, দাদা ! আপনার চোখের সামনে এই ব্যাপার হল—অ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খবর পৌঁছে গেছে দেখছি !'

মনোতোষ বলিল, 'খবর পৌঁছবে না ! কাল রাত্রে দশটা সতরোর প্যাসেঞ্জার তখনও ইন্ হয়নি, খবর এসে হাজির। তা কী দেখলেন, দাদা ! দুম্ করে আপনার চোখের সামনে বোমা ফাটল ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক চোখের সামনে বোমা ফাটেনি, তবে কানের সামনে বটে। আপনি সদানন্দ সুরকে চিনতেন ?'

'চিনতাম না ! চারটে তিপান্নর গাড়ি থেকে নামলেন, আমাকে টিকিট দিয়ে ব্যাগ হাতে করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি শুধোলাম—কি দাদা, কলকাতা গেছলেন দেখছি, কেমন বেড়ালেন চেড়ালেন ? উনি হেসে বললেন—কলকাতা কি বেড়াবার জায়গা, সেখানে গিয়ে চেড়ালাম। এই বলে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তখন কে জানতো আধঘণ্টাও কাটবে না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, সদানন্দ সুর যখন বাইরে গিয়েছিলেন তখন আপনি তাঁকে দেখেছিলেন ?'

মনোতোষ বলিল, 'দেখিনি ? আমার চোখ এড়িয়ে এ-ইস্টিশান থেকে কি কারুর বেরুবার জো আছে, দাদা। দিন আষ্টেক-দশ আগেকার কথা ; সকালবেলা আমাকে টিকিট দেখিয়ে ইস্টিশানে ঢুকলেন, সাতটা তিনের ডাউন প্যাসেঞ্জারে চলে গেলেন।'

'কলকাতার টিকিট ছিল ?'

'অ্যাঁ—তা তো ঠিক মনে পড়ছে না, দাদা। তবে কলকাতা ছাড়া আর কি হতে পারে !'

'কলকাতার দিকে অন্য স্টেশন হতে পারে। —সে যাক। তাঁর সঙ্গে কী কী মাল ছিল বলুন তো।'

'মাল !'—মনোতোষ একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল, 'যতদূর মনে পড়ছে, এক হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, অন্য হাতে স্টীল-ট্রাঙ্ক ছিল। কেন বলুন তো ?'

'স্টীল-ট্রাঙ্কটা সদানন্দবাবু ফিরিয়ে আনেননি। তার মানে কোথাও রেখে এসেছিলেন। যাক্, আপনি তো দেখছি লোকটিকে ভালোভাবেই চিনতেন। কেমন মানুষ ছিলেন তিনি ?'

'ঐটি বলতে পারব না, দাদা। পরচিত্ত অন্ধকার। তবে কথাবার্তায় ভালো ছিলেন। কারুর সাতে-পাঁচে থাকতেন না, নিজের ধান্দায় ঘুরতেন। মাসখানেক আগে আমাদের মাস্টারমশায়ের কাছে খুব যাতায়াত ছিল।'—বলিয়া স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে আঙুল দেখাইল।

'তাই নাকি ! কিসের জন্যে যাতায়াত ?'

'তা জানিনে, দাদা। দু'জনে মুখোমুখি বসে কী গুজ-গুজ ফুস্-ফুস্ করতেন ওঁরাই জানেন।

আপনি মাস্টারমশাইকে শুধোন না।'

'হুঁ, তাই করি।'

হরিবিলাসবাবুর ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'মাস্টারমশাই, আসতে পারি ?'

হরিবিলাসবাবু এমনভাবে ভ্রূ তুলিয়া চাহিলেন যেন আমাদের চিনিতেই পারেন নাই। তারপর, কাজে বিঘ্ন করার জন্য বিরক্ত হইয়াছেন এমনিভাবে হাতের কলম রাখিয়া বলিলেন, 'আসুন।'

আমরা ঘরে গিয়া বসিলাম। বহু খাতাপত্রে ভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড টেবিলের ওপারে তিনি, এপারে আমরা। ব্যোমকেশ বলিল, 'সদানন্দ সুর মারা গেছেন শুনেছেন বোধ হয় ?'

হরিবিলাসবাবু প্রশ্নটাকে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'শুনেছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাঁর সঙ্গে আপনার জানাশোনা ছিল ?'

যেন এই কথার উত্তরের উপর জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে এমনিভাবে গভীর বিবেচনার পর হরিবিলাসবাবু বলিলেন, 'সামান্য জানাশোনা ছিল।'

ব্যোমকেশ ঈষৎ অধীর কণ্ঠে বলিল, 'দেখুন, আপনি মনে করবেন না, নাহক কৌতূহলের বশেই আপনাকে প্রশ্ন করছি। অত্যন্ত ভয়াবহভাবে সদানন্দবাবুর মৃত্যু হয়েছে, আমি পুলিসের পক্ষ থেকে তারই তদন্ত করতে এসেছি।—এখন বলুন, কোন্ সূত্রে সদানন্দবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল।'

হরিবিলাসবাবুর চোপ্‌সানো মুখ যেন আরও চুপ্‌সিয়া গেল। তিনি দু'চার বার গলা-ঝাড়া দিয়া অত্যন্ত দ্বিধাসঙ্কুল কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি প্রাণকেষ্ট পাল রেলের লাইন-ইন্সপেক্টর, তাঁর সঙ্গে আমার আগে থাকতে পরিচয় আছে। মাসকয়েক হল প্রাণকেষ্টবাবু এ-লাইনে এসেছেন ; রামডিহি জংশনে তাঁর হেড-কোয়ার্টার। ট্রলিতে চড়ে রেলের লাইন পরিদর্শন করে বেড়ানো তাঁর কাজ। কাজের উপলক্ষে সাস্তালগোলা দিয়ে তিনি প্রায় যাতায়াত করেন, আমার সঙ্গে দেখা হয়। একদিন প্রাণকেষ্টবাবু এসেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কথা কইছি, এমন সময় সদানন্দবাবু প্ল্যাটফর্মে এলেন। প্রাণকেষ্টবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন ; বললেন—আমার সম্বন্ধী। সেই থেকে আমি সদানন্দবাবুকে চিনি।'

শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল ; সে বলিল, 'কতদিন আগের কথা ?'

'দু'-তিন মাস হবে।'

'প্রাণকেষ্টবাবু প্রায়ই এ-লাইনে যাতায়াত করেন ! শেষ কবে এসেছিলেন ?'

'চার-পাঁচ দিন আগে। স্টেশনে বেশিক্ষণ ছিলেন না, ট্রলিতে চড়ে লাইন দেখতে চলে গেলেন।'

'শালা-ভগিনীপতির মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল ?'

'ভেতরে কি ছিল জানি না, বাইরে সদ্ভাব ছিল।'

'যাক। তারপর থেকে সদানন্দ সুর আপনার কাছে যাতায়াত করতেন ? কী উপলক্ষে যাতায়াত করতেন ?'

হরিবিলাসবাবু আবার কিছুক্ষণ নীরবে চিত্ত মন্থন করিয়া বলিলেন, 'সদানন্দবাবু দালাল ছিলেন, ছোটখাট জিনিসের দালালি করতেন। আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আছে দেখে তিনি আমাকে কবিরাজী চিকিৎসা করাবার জন্য ভজাচ্ছিলেন। দু'এক শিশি গছিয়েছিলেন ; হত্তুকী আর বিট্‌নুন। তাতে কিছু হল না।'

হরি হরি, শেষে হরীতকী আর বিট্‌নুন ! ব্যোমকেশ তবু প্রশ্ন করিল, 'এ ছাড়া সদানন্দ সুরের সঙ্গে আপনার আর কোনও সম্বন্ধ ছিল না ?'

'না।'

নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, 'আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম। প্রাণকেষ্টবাবু এখন রামডিহি জংশনেই আছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'নমস্কার। —চল, অজিত।'

স্টেশনের বাহিরে আসিয়া বলিলাম, 'এবার কী?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওবেলা রামডিহিতে গিয়ে প্রাণকেষ্ট পাল মহাশয়কে দর্শন করে আসতে হবে। তিনি শ্যালকের মৃত্যু-সংবাদ যদি বা এখনও না পেয়ে থাকেন, বিকেল নাগাদ নিশ্চয় পাবেন। —হরিবিলাসবাবুকে কেমন মনে হল?'

বলিলাম, 'আকার-সদৃশী প্রজ্ঞা। যেমন ঘুণ-ধরা চেহারা, তেমনি মরচে-ধরা বুদ্ধি। শূন্য সিন্দুকে ডবল তালা। তুমি যদি সন্দেহ করে থাকো যে উনি লুকিয়ে লুকিয়ে গোলা-বারুদের কালাবাজার করছেন, তাহলে ও-সন্দেহ ত্যাগ করতে পার। হরিবিলাসবাবুর একমাত্র গোলা হচ্ছে হরীতকী-খণ্ড, আর বারুদ—বিটনুন।'

ব্যোমকেশ হাসিল; বলিল, 'চল, বাজারটা ঘুরে আসা যাক।'

'বাজারে কী দরকার?'

'এসই না।'

গঞ্জের কর্মব্যস্ততা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক আড়তের সামনে মুক্তস্থানে বহু গরুর গাড়ির ঠেলাঠেলি, দুই-চারিটা ঘোড়ায়-টানা খোলা ট্রাক-জাতীয় গাড়িও আছে। প্রত্যেক গোলা হইতে 'রামে রাম দুইয়ে দুই' শব্দ উঠিতেছে। ডাঁই-করা কাঁচা-মাল পাঁচসেরি বাটখারায় ওজন হইতেছে।

একটি গোলায় এক বাঙালী যুবক দাঁড়াইয়া কাজকর্ম তদারক করিতেছিলেন, ব্যোমকেশ গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা নফর কুণ্ডু মশায়ের গোলা না?'

ছোকরা বোধ হয় ব্যোমকেশের মুখ চিনিত, সসম্ভ্রমে বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাঁর ভাইপো।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ। কুণ্ডুমশাই কোথায়?'

ছোকরা বলিল, 'আজ্ঞে, কাকা এখানে নেই, বাইরে গেছেন। কিছু দরকার আছে কি?'

'দরকার এমন কিছু নয়। কোথায় গেছেন?'

'আজ্ঞে, তা কিছু বলে যাননি।'

'তাই নাকি! কবে গেছেন?'

'গত মঙ্গলবার বিকেলবেলা।'

ব্যোমকেশ আড়চোখে আমার পানে চাহিল। আমার মনে পড়িয়া গেল, গত সোমবারে আমি রামডিহি স্টেশনে গিয়া বেনামী চিঠি ডাকে দিয়া আসিয়াছিলাম। স্বাভাবিক নিয়মে চিঠি মঙ্গলবারে এখানে পৌঁছিয়াছে। নফর কুণ্ডুর নামেও একটি বেনামী চিঠি ছিল। তবে কি চিঠি পাইয়া পাখি উড়িয়াছে? নফর কুণ্ডুই আমাদের অচিন পাখি? কিন্তু সে যাই হোক, ভাইপো ছোকরা কিছু জানে বলিয়া মনে হয় না; সরলভাবে সব কথার উত্তর দিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি কবে ফিরবেন তাও বোধ হয় জানা নেই?'

'আজ্ঞে না, কিছু বলে যাননি।'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, যেদিন নফরবাবু চলে যান সেদিন সকালে কি কোনও চিঠিপত্র পেয়েছিলেন?'

ছোকরা বলিল, 'চিঠি রোজই দু'চারখানা আসে, সেদিনও এসেছিল।'

'হুঁ।'

প্রস্থানোদ্যত হইয়া ব্যোমকেশ আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল, 'তোমাদের ক'টা ঘোড়া আছে?'

ছোকরা অবাক্ হইয়া চাহিল, 'ঘোড়া!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোড়া। ওই যে ট্রাক টানে।' ব্যোমকেশ আঙ্গুল দিয়া পাশের গোলা দেখাইল।

যুবক বুঝিয়া বলিল, 'ও—না, আমাদের ঘোড়া-টানা ট্রাক নেই, গরুর গাড়িতে চলে যায়।'

এই সময় এক ইউনিফর্ম-পরা কনস্টেবল আসিয়া জোড়পায়ে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশকে স্যালুট করিল, 'হুজুর, দারোগাসাহেব সেলাম দিয়া হ্যায়।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিল ; বলিল, 'চল, যাচ্ছি।'

ছয়

কাছেই থানা। সেই দিকে যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল, 'সুখময় দারোগা কি রকম ফিচেল দেখেছ ? হাটের মাঝখানে কনস্টেবল পাঠিয়েছে, যাতে কারুর জানতে বাকি না থাকে যে পুলিসের সঙ্গে আমার ভারি দহরম মহরম।'

'হুঁ। কিন্তু তলব কিসের জন্যে ?'

'বোধ হয় অমৃতের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এসেছে।'

থানায় পদার্পণ করিতেই সুখময় দারোগা মুখে মধুর রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিলেন, 'আসুন, আসুন ব্যোমকেশবাবু, আসুন অজিতবাবু, বসুন বসুন। ব্যোমকেশবাবু, আপনি এই চেয়ারটাতে বসুন। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল আপনারা এদিকে আসছেন। হে-হে, এই নিন অমৃতের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট। বুদ্ধি বটে আপনার ; ঠিক ধরেছিলেন, বন্দুকের গুলিতেই মরেছে।' বলিয়া ডাক্তারের রিপোর্ট ব্যোমকেশের হাতে দিলেন।

বিচিত্র জীব এই সুখময়বাবু। এইরূপ চরিত্র আমরা সকলেই দেখিয়াছি এবং মনে মনে সহিংস তারিফ করিয়াছি। কিন্তু ভালবাসিতে পারি নাই। ইহারা কেবল পুলিস-বিভাগে নয়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই ছড়াইয়া আছেন।

রিপোর্ট পড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'গুলিটা শরীরের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে দেখছি। কোথায় সেটা ?'

'এই যে!' একটা নম্বর-আঁটা টিনের কৌটা হইতে মাষকলাইয়ের মত একটি সীসার টুকরা লইয়া সুখময়বাবু তাহার হাতে দিলেন।

করতলে গুলিটি রাখিয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ সেটিকে সমীক্ষণ করিল, তারপর সুখময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ থেকে কিছু বুঝলেন ?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে, গুলি দেখে বোঝা যাচ্ছে পিস্তল কিংবা রিভলবারের গুলি। এ ছাড়া বোঝবার আর কিছু আছে কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে বৈকি। গুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে ·৩৮ অটোম্যাটিক থেকে গুলি বেরিয়েছে, যে ৩৮ অটোম্যাটিক যুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্য ব্যবহার করত। অর্থাৎ—' ব্যোমকেশ থামিল।

সুখময়বাবু বলিলেন, 'অর্থাৎ অমৃতকে যে খুন করেছে এবং আপনি যাকে খুঁজতে এসেছেন তাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে, এমন কি তারা একই লোক হতে পারে। কেমন ?'

ব্যোমকেশ গুলিটি তাঁহাকে ফেরত দিয়া বলিল, 'এ বিষয়ে আমার কিছু না বলাই ভালো। আপনার কাজ অমৃতের হত্যাকারীকে ধরা, সে-কাজ আপনি করবেন। আমার কাজ অন্য।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। হ্যাঁ ভালো কথা, সদানন্দ সুরের লাশ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি, রিপোর্ট এলেই আপনাকে দেখাব।'

'আমাকে সদানন্দ সুরের রিপোর্ট দেখানোর দরকার নেই। এটাও আপনারই কেস্, আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমি রুই-কাতলা ধরতে এসেছি, চুনোপুঁটিতে আমার দরকার কি বলুন।'

সুখময়বাবুর চক্ষু দুটি ধূর্ত কৌতুকে ভরিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'সে-কথা একশো বার।

কিন্তু ব্যোমকেশবাবু, আপনার জালে যখন রুই-কাতলা উঠবে তখন আমার চুনোপুঁটিও সেই জালেই উঠবে ; আমাকে আলাদা জাল ফেলতে হবে না। হে হে হে হে। চললেন নাকি ? আচ্ছা, নমস্কার।'

বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশ আমার পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। লোকটার দুষ্টবুদ্ধির শেষ নাই, অথচ তাহার কার্যকলাপে না হাসিয়াও থাকা যায় না। ব্যোমকেশ বলিল, 'এখনও রোদ চড়েনি, চলো চালের কল দুটো দেখে যাই।'

রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া বিশ্বনাথ রাইস মিল-এর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পাঁচ মিনিট লাগিল। বেশ বড় চালের কল, পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর প্রসারিত ; কাঁটা-তারের বেড়া দিয়া ঘেরা। গুর্খা-রক্ষিত ফটক দিয়া প্রবেশ করিলে প্রথমেই সামনে প্রকাণ্ড শান-বাঁধানো চাতাল চোখে পড়ে। চাতালের ওপারে একটি পুকুর, বাঁ পাশে ইঞ্জিন-ঘর ও ধান-ভানার করোগেটের ছাউনি ; ডান পাশে গুদাম, দপ্তর ও মালিকের থাকিবার জন্য একসারি কক্ষ। সকালবেলা কাজ চালু আছে, ধান-ভানার ছাউনি হইতে ছড় ছড় ছর্‌র্‌র শব্দ আসিতেছে। কুলি-মজুরেরা কাজে ব্যস্ত, গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার ট্রাক হইতে বস্তা ওঠা-নামা হইতেছে।

চাল কলের মালিকের নাম বিশ্বনাথ মল্লিক। থানা হইতে তাঁহার নাম সংগ্রহ করিলেও এবং বেনামী চিঠি পাঠাইলেও চাক্ষুষ পরিচয় এখনও হয় নাই। আমরা গুর্খার মারফত এত্তালা পাঠাইয়া মিল-এ প্রবেশ করিলাম। দপ্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বিশ্বনাথবাবু সেখানে নাই, একজন মুহুরী গোছের লোক গদিতে বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে।

'কী চান ?'

'বিশ্বনাথবাবু আছেন ? আমরা পুলিসের পক্ষ থেকে আসছি।'

লোকটি তটস্থ হইয়া উঠিল, 'আসুন আসুন, বসতে আজ্ঞা হোক। কর্তা মিল-এর কাজ তদারক করতে গেছেন, এখনি আসবেন। তাঁকে খবর পাঠাব কি ?'

ঘরের অর্ধেক মেঝে জুড়িয়া গদির বিছানা, আমরা গদির উপর উপবেশন করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আধুনিক চেয়ার-সোফার চেয়ে সাবেক গদি-ফরাশ ঢের বেশি আরামের। ব্যোমকেশ একটি সুপুষ্ট তাকিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, 'না না, তাঁকে ডেকে পাঠানোর দরকার নেই। সামান্য দু'-চারটে কথা জিজ্ঞেস করার আছে, তা সে আপনিই বলতে পারবেন। আপনি বুঝি মিল-এর হিসেব রাখেন ?'

লোকটি সবিনয়ে হস্তঘর্ষণ করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আমি মিল-এর নায়েব-সরকার। অধীনের নাম নীলকণ্ঠ অধিকারী। আপনি কি ব্যোমকেশ বক্সী মশাই ?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। নীলকণ্ঠ অধিকারী ভক্তি-তদ্‌গত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। এমন লোক আছে পুলিসের নাম শুনিলে যাহাদের হৃদয় বিগলিত হয়। উপরন্তু তাহারা যদি ব্যোমকেশ বক্সীর নাম শুনিতে পায় তাহা হইলে তাহাদের হৃদয়াবেগ বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত দু'কূল ছাপাইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন আর তাহাদের ঠেকাইয়া রাখা যায় না। নীলকণ্ঠ অধিকারী সেই জাতীয় লোক। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, ব্যোমকেশকে অদেয় তাহার কিছুই নাই ; প্রশ্নের উত্তর সে দিবেই, এমন কি, প্রশ্ন না করিলেও সে উত্তর দিবে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকে দেখে কাজের লোক মনে হচ্ছে। মিল-এর সব কাজ আপনিই দেখেন ?'

নীলকণ্ঠ সহর্ষে হস্তঘর্ষণ করিল, 'আজ্ঞে, কর্তাও দেখেন। উনি যখন থাকেন না তখন আমার ওপরেই সব ভার পড়ে।'

'কর্তা—মানে বিশ্বনাথবাবু—এখানে থাকেন না ?'

'আজ্ঞে, এখানেই থাকেন। তবে মিল-এর কাজকর্ম যখন কম থাকে তখন দু'চার দিনের জন্য কলকাতা যান। কলকাতায় কর্তার ফ্যামিলি থাকেন।'

'বুঝেছি। তা কর্তা কতদিন কলকাতা যাননি ?'

'মাসখানেক হবে। এখন কাজের চাপ বেশি—'

'আচ্ছা, ও-কথা থাক। অমৃত নামে বাঘমারি গ্রামের একটি ছোকরা সম্প্রতি মারা গেছে তাকে আপনি চিনতেন ?'

নীলকণ্ঠ উৎসুক স্বরে বলিল, 'চিনতাম বৈকি। অমৃত প্রায়ই কর্তার কাছে চাকরির জন্য দরবার করতে আসত। কিন্তু—'

'সদানন্দ সুরকেও আপনি চিনতেন ?'

নীলকণ্ঠ সংহত স্বরে বলিল, 'সদানন্দবাবু কাল রাত্রে বোমা ফেটে মারা গেছেন, আজ সকালে খবর পেয়েছি। সদানন্দবাবুকে ভালোরকম চিনতাম। আমাদের এখানে তাঁর খুব যাতায়াত ছিল।'

'কী উপলক্ষে যাতায়াত ছিল ?'

'উপলক্ষ—কর্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। মাঝে মাঝে গদিতে এসে বসতেন, তামাক খেতেন, কর্তার সঙ্গে দু'দণ্ড বসে গল্পগাছা করতেন। এর বেশি উপলক্ষ কিছু ছিল না। তবে—' বলিয়া নীলকণ্ঠ থামিল।

'অর্থাৎ মোসায়েবি করতেন। তবে কি ?'

'দিন দশেক আগে তিনি কর্তার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন।'

'তাই নাকি ! কত টাকা ?'

'পাঁচশো।'

'হ্যান্ডনোট লিখে টাকা ধার নিয়েছিলেন ?'

'আজ্ঞে না। কর্তা সদানন্দবাবুকে বিশ্বাস করতেন, বহিখাতায় সদানন্দবাবুর নামে পাঁচশো টাকা কর্জ লিখে টাকা দেওয়া হয়েছিল। টাকাটা বোধহয় ডুবল।' বলিয়া নীলকণ্ঠ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িল।

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। কি ভাবিল জানি না, কিন্তু খানিক পরে বাহির হইতে ঘোড়ার চিঁহি-চিঁহি শব্দ শুনিয়া তাহার চমক ভাঙিল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, 'ভালো কথা, অনেকগুলো ঘোড়া দেখলাম। সবগুলোই কি আপনাদের ?'

নীলকণ্ঠ সোৎসাহে বলিল, 'আজ্ঞে, সব আমাদের। কর্তার খুব ঘোড়ার শখ। ন'টা ঘোড়া আছে।'

'তাই নাকি ! এতগুলো ঘোড়া কি করে ? ট্রাক টানে ?'

'ট্রাক তো টানেই। তা ছাড়া কর্তা নিজে ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসেন। উনি কমবয়সে জকি ছিলেন কিনা—'

'নীলকণ্ঠ !—'

শব্দটা আমাদের পিছন দিক হইতে চাবুকের মত আসিয়া নীলকণ্ঠের মুখে পড়িল। নীলকণ্ঠ ভীতমুখে চুপ করিল, আমরা একসঙ্গে পিছনে ঘাড় ফিরাইলাম।

দ্বারের সম্মুখে একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে। বয়স আন্দাজ চল্লিশ, ক্ষীণ-খর্ব চেহারা, অস্থিসার মুখে বড় বড় চোখ, হাফ-প্যান্ট ও হাফ-শার্ট পরা শরীরে বিকলতা কিছু না থাকিলেও, জঙ্ঘার হাড়-দু'টি ধনুকের মতো বাঁকা। ইনিই যে মিল-এর মালিক ভূতপূর্ব জকি বিশ্বনাথ মল্লিক তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম।

বিশ্বনাথ মল্লিক নীলকণ্ঠের দিকেই চাহিয়া ছিলেন, পলকের জন্যও আমাদের দিকে চক্ষু ফিরান নাই। এখন তিনি ঘরের মধ্যে দুই পা অগ্রসর হইয়া আগের মতই শাণিত কণ্ঠে নীলকণ্ঠকে বলিলেন, 'ইস্টিশানে মাল চালান যাচ্ছে, তুমি তদারক করো গিয়ে।'

নীলকণ্ঠ কশাহত ঘোড়ার মত ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এইবার বিশ্বনাথ মল্লিক আমাদের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। তাঁহার মুখ হইতে মালিক-সুলভ কঠোরতা অপগত হইয়া একটু হাসির আভাস দেখা দিল। তিনি সহজ সুরে বলিলেন, 'নীলকণ্ঠ

বড় বেশি কথা কয়। আমি আগে জকি ছিলাম, সেই খবর আপনাদের শোনাচ্ছিল বুঝি?'

ব্যোমকেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'ঘোড়ার কথা থেকে জকির কথা উঠে পড়ল।'

বিশ্বনাথবাবু মুখে সহাস্য ভঙ্গী করিলেন, 'নিজের লজ্জাকর অতীতের কথা সবাই চাপা দিতে চায়, আমার কিন্তু লজ্জা নেই। ববং দুঃখ আছে, যদি জকির কাজ ছেড়ে না দিতাম, এতদিনে হয়তো খীম সিং কি খাদে হয়ে দাঁড়াতাম। কিন্তু ও-কথা যাক। আপনি ব্যোমকেশবাবু—না? সদানন্দ সুরের মৃত্যু সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে এসেছেন? আসুন, আমার বসবার ঘরে যাওয়া যাক।'

সাত

বিশু মল্লিকের খাস কামরাটি আধুনিক প্রথায় টেবিল চেয়ার দিয়া সাজানো, বেশ ফিটফাট আমরা উপবেশন করিলে তিনি টেবিলের দেরাজ হইতে সিগারেটের টিন বাহির করিয়া দিলেন।

বিশু মল্লিকের চেহারাটি অকিঞ্চিৎকর বটে, কিন্তু তাঁহার আচার-ব্যবহারে বেশ একটি আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, চোখ দু'টির অন্তরালে সজাগ শক্তিশালী মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলিতেছে তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমাদের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া তিনি নিজে সিগারেট ধরাইলেন। টেবিলের সামনের দিকে বসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি কি জন্যে সাঁওতালগোলায় এসেছেন তা আমি জানি। বোধহয় এখানকার সকলেই জানে। এখন বলুন আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। অবশ্য নীলকণ্ঠের কাছে আমার সম্বন্ধে সব কথাই শুনেছেন। যদি আমাকেই গোলাবারুদের আসামী বলে সন্দেহ করেন তাহলে আমার মিল খুঁজে দেখতে পারেন, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'খোঁজাখুঁজির কথা পরে হবে। এখন আমার একটি ব্যক্তিগত কৌতূহল চরিতার্থ করুন। জকির কাজ ছেড়ে চালের কল করলেন কেন? যতদূর জানি জকির কাজে পয়সা আছে।'

বিশুবাবু বলিলেন, 'পয়সা অবশ্য আছে কিন্তু বড় কড়াকড়ির জীবন, ব্যোমকেশবাবু। কখন ওজন বেড়ে যাবে এই ভয়ে আধ-পেটা খেয়ে জীবন কাটাতে হয়। আরও অনেক বায়নাক্কা আছে। আমার পোষাল না। কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, তাই দিয়ে যুদ্ধের আগে এই মিল খুলে বসলাম। তা, বলতে নেই, মন্দ চলছে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু ঘোড়ার মোহ ছাড়তে পারলেন না। এখানেও অনেকগুলি ঘোড়া পুষেছেন দেখলাম।'

বিশুবাবু ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ। আমি ঘোড়া ভালবাসি। অমন বুদ্ধিমান প্রভুভক্ত জানোয়ার আর নেই। মানুষের প্রকৃত বন্ধু যদি কেউ থাকে সে কুকুর নয়, ঘোড়া।'

'তা বটে।' ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'আমারও কুকুরের চেয়ে ঘোড়া ভাল লাগে। কত রঙের ঘোড়াই আছে; লাল সাদা কালো। তবে এদেশে লাল ঘোড়াই বেশি দেখা যায়, সাদা কালো তত বেশি নয়। এই দেখুন না, সাঁওতালগোলাতেই কত ঘোড়া চোখে পড়ল, কিন্তু সাদা বা কালো ঘোড়া একটাও দেখলাম না।'

বিশুবাবু বলিলেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন। সাদা ঘোড়া এখানে একটাও নেই। তবে একটা কালো ঘোড়া আছে। বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর।'

'বদ্রিদাস—সে কে?'

'এখানে আর-একটা চালের কল আছে, তার মালিক বদ্রিদাস গিরধরলাল। তার কয়েকটা ঘোড়া আছে, তাদের মধ্যে একটা ঘোড়া কালো।'

ব্যোমকেশ সিগারেটের শেষাংশ অ্যাশ-ট্রেতে ঘসিয়া নিভাইয়া দিল। ঘোড়া সম্বন্ধে তাহার

কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়াছে এমনি নিরুৎসুক স্বরে বলিল, 'কালো ঘোড়া আছে তাহলে। —যাক, এবার কাজের কথা বলি। আপনার কর্মচারীর কাছে কিছু খবর পেয়েছি, সে-সব কথা আবার জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করব না। সদানন্দ সুরের মৃত্যু-সংবাদ আপনি পেয়েছেন। ঘটনাক্রমে আমি তখন বাঘমারি গ্রামে ছিলাম। ভয়াবহ মৃত্যু।'

বিশুবাবু বলিলেন, 'শুনেছি বোমা ফেটে মৃত্যু হয়েছে। আপনি দেখেছিলেন?'

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে মৃত্যুর বিবরণ দিয়া বলিল, 'এখন শুধু সদানন্দ সুরের মৃত্যুর কিনারা নয়, বোমারও কিনারা করতে হবে। আপনি বুদ্ধিমান লোক, এবিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।'

'কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন।'

'আপনি এখানে অনেক দিন আছেন, এখানকার ঘাঁৎঘোঁৎ জানা আছে। মার্কিন সিপাহীর দল যখন এখানে ছিল, তখন আপনিও ছিলেন। আপনি বলতে পারেন কারা মার্কিন সিপাহীদের ছাউনিতে যাতায়াত করত?'

বিশুবাবু কিছুক্ষণ নতনেত্রে চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'মার্কিন সিপাহীদের ছাউনিতে কারুর যাতায়াত ছিল কিনা আমি বলতে পারি না, কিন্তু তাদের সর্বত্র যাতায়াত ছিল। ভারি মিশুক লোক ছিল তারা, আমার মিল-এও অনেকবার এসেছে।'

'হুঁ। তারা আপনার কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিল কি?'

বিশুবাবু একটু গম্ভীর হাসিলেন, 'করেছিল। একজন সার্জেণ্ট একটা পিস্তল বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিল। আমি কিনিনি।'

'আপনি কেনেননি, আর কেউ কিনেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কে। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

'কিছু না। আন্দাজ করতে পারলে অনেক আগেই আপনাদের খবর দিতাম, ব্যোমকেশবাবু।'

ব্যোমকেশ আর একটা সিগারেট ধরাইয়া কিছুক্ষণ নীরবে টানিল, 'আচ্ছা, আর একটা কথা। সান্তালগোলা ছোট জায়গা, এখানে মারণাস্ত্রগুলো যদি কেউ লুকিয়ে রাখতে চায় তাহলে কোথায় লুকিয়ে রাখবে আপনি অনুমান করতে পারেন?'

বিশুবাবু আবার কিছুক্ষণ চক্ষু নত করিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন, 'আপনার বিশ্বাস মারণাস্ত্রগুলো সান্তালগোলাতেই আছে। কিন্তু তা নাও হতে পারে।'

'মনে করুন সান্তালগোলাতেই আছে।'

'বেশ, মনে করলাম। কিন্তু অস্ত্রগুলোর আয়তন কতখানি, ক'টা বন্দুক ক'টা বোমা, এসব তো কিছুই জানি না। কি করে অনুমান করব? আমার মনে হয় পুলিস যদি সান্তালগোলার সমস্ত বাড়ি, সমস্ত গোলা আর চালের কল একসঙ্গে খানাতল্লাশ করে তাহলে হয়তো অস্ত্রগুলো বেরুতে পারে।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'তা কি সম্ভব! আর যদি সম্ভব হত তাহলেও একটা কথা ভেবে দেখুন। যে-ব্যক্তি এই কাজ করছে সে নির্বোধ নয়, সে কি এমন জায়গায় মাল রাখবে যেখানে পুলিস সহজেই খুঁজে বার করতে পারে? আমার তা মনে হয় না। লোকটি যদি এত নির্বোধ হত তাহলে অনেক আগেই ধরা পড়ে যেত।'

বিশুবাবু উৎসুক স্বরে বলিলেন, 'তাহলে আপনার কী মনে হয়? কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে?'

ব্যোমকেশ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'এমন জায়গায় রেখেছে যেখানে কারুর যেতে মানা নেই, অথচ কেউ যায় না, যেখানে দৈবাৎ মাল পাওয়া গেলেও প্রমাণ করা যাবে না কে রেখেছে?'

বিশুবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'অর্থাৎ— ?'

ব্যোমকেশ পিছনের খোলা জানলা দিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিল, 'অর্থাৎ ওই জঙ্গল। ওখানে

ঝোপঝাড়ের মধ্যে কয়েকটা পিস্তল আর হ্যান্ড-গ্রিনেড পুঁতে রাখা খুব শক্ত কাজ নয়, কিন্তু খুঁজে বার করা অসম্ভব। যদি বা খুঁজে বার করলেন, কে পুঁতেছে কি করে প্রমাণ করবেন ?'

বিশুবাবু উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক, ঠিক। জঙ্গলের কথাটা আমার মাথায় আসেনি। নিশ্চয় জঙ্গলে কোথাও পোঁতা আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। কিন্তু ভুল হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

বিশুবাবু বলিলেন, 'না ব্যোমকেশবাবু, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার বিশ্বাস আর দেরি না করে জঙ্গলটা খুঁজে দেখা দরকার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই করতে হবে। তবে জঙ্গল তো একটুখানি জায়গা নয়, খুঁজতে সময় লাগবে। অনেক লোকও লাগবে। আজ আর হবে না, কাল—'

এই পর্যন্ত বলিয়া ব্যোমকেশ থামিয়া গেল। এতক্ষণ সে অসতর্কভাবে কথা বলিতেছিল, এখন যেন রাশ টানিয়া নিজেকে সংযত করিল ; বিশুবাবুর পানে তীক্ষ্ণভাবে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'বিশ্বনাথবাবু, আজ আপনাকে বিশ্বাস করে এমন কথা কিছু বললাম যা বাইরের লোকের কাছে বক্তব্য নয়। আপনি বিশ্বাসযোগ্য লোক বলেই বলেছি। আশা করি আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।'

বিশ্বনাথবাবু বলিলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার মুখ থেকে কোনো কথা বেরুবে না। উঠছেন নাকি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, আজ উঠি। একবার ঐ মাড়োয়ারী—কি নাম ?—বদ্রিদাসের মিল-এ যাব। দেখি যদি ওর কাছে কিছু খবর পাওয়া যায়। বিকেলে আবার রামডিহি যেতে হবে, সেখানে সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি থাকেন।—আচ্ছা, সদানন্দবাবু যে আপনার কাছে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিলেন, কি জন্যে ধার চান কিছু বলেছিলেন কি ?'

বিশুবাবু বলিলেন, 'তাঁর ইচ্ছে ছিল এখানে কবিরাজী ওষুধের একটা দোকান খোলা। কিন্তু তাঁর মূলধন ছিল না, আমার কাছে ধার চেয়েছিলেন। লোকটি গরীব হলেও সজ্জন ছিলেন, আমি টাকা দিয়েছিলাম। তিনি বেঁচে থাকলে নিশ্চয় টাকা শোধ দিতেন, কিন্তু— ! যাকগে, ও-ক'টা টাকার জন্যে আমার দুঃখ নেই। আমি শুধু ভাবছি, সদানন্দবাবুর মতো নিরীহ লোককে কে খুন করল ? কেন খুন করল ? তবে কি তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন জীবন ছিল ? বাইরে থেকে যা দেখা যেত সেটা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ নয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়তো তাই। এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আজ বিকেলে তাঁর ভগিনীপতির সঙ্গে দেখা হলে হয়তো তাঁর প্রকৃত চরিত্র বোঝা যাবে। আচ্ছা, আজ চলি, আবার দেখা হবে।'

দ্বার পর্যন্ত আসিয়া ব্যোমকেশ ফিরিয়া গেল, বিশুবাবুর পাশে দাঁড়াইয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল, 'একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি। আপনি কি সম্প্রতি কোনো বেনামী চিঠি পেয়েছেন ?'

বিশুবাবু চকিতে মুখ তুলিলেন, 'পেয়েছি। আপনি কি করে জানলেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আরও দু'একজন পেয়েছে, তাই মনে হল হয়তো আপনিও পেয়েছেন। কী আছে বেনামী চিঠিতে ? ভয় দেখানো ?'

'এই-যে দেখুন না'—বলিয়া বিশুবাবু দেরাজ হইতে আমাদেরই লেখা চিঠি বাহির করিয়া দিলেন।

ব্যোমকেশ মনোযোগ দিয়া চিঠি পড়িল, তারপর চিঠি ফেরত দিয়া বলিল, 'হুঁ। কে লিখেছে কিছু আন্দাজ করতে পারেন না ?'

বিশুবাবু বলিলেন, 'কিছু না। আমার জীবনে এমন কোনও গুপ্তকথা নেই যা ভাঙিয়ে কেউ লাভ করতে পারে ?'

'আপনার শত্রু কেউ আছে ?'

'অনেক। ব্যবসাদারের সবাই শত্রু।'

'তাহলে তারাই কেউ হয়তো নিছক mischief করবার জন্যে চিঠি দিয়েছে।—চলি এবার। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

বিশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'আমার মিল তাহলে সার্চ করছেন না ?'

ব্যোমকেশও হাসিল, 'অনর্থক পণ্ডশ্রম করে লাভ কি, বিশ্বনাথবাবু ?'

'আর জঙ্গল ?'

'সেটাও আজ নয়—জঙ্গল আপাদমস্তক খুঁজতে অনেক কাঠ-খড় চাই। এস অজিত, রোদ ক্রমেই কড়া হচ্ছে। বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর সঙ্গে দুটো কথা বলে চট্‌পট আস্তানায় ফিরতে হবে।'

আট

বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর সঙ্গে আলাপ করিয়া কিন্তু সুখ হইল না।

মাড়োয়ারীদের মধ্যে প্রধানত দুই শ্রেণীর চেহারা দেখা যায় ; এক, পাতিহাঁসের মত মোটা আর বেঁটে ; দুই, বকের মত সরু আর লম্বা। বদ্রিদাসের আকৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাঁহার চালের কলটি আকারে প্রকারে বিশুবাবুর মিল-এর অনুরূপ ; সেই ধান শুকাইবার মেঝে, সেই পুকুর, সেই ইঞ্জিন-ঘর, সেই ফটকের সামনে গুর্খা দারোয়ান। পৃথিবীর সমস্ত চাল কলের মধ্যে বোধ করি আকৃতিগত ভ্রাতৃসম্বন্ধ আছে।

বদ্রিদাসের বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে। নিজের গদিতে বসিয়া খবরের কাগজ হইতে তেজি-মন্দার হাল জানিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া এবং পরিচয় শুনিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি গলা উঁচু করিয়া ঘরের আনাচে-কানাচে চকিত ক্ষিপ্র নেত্রপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে পলকের তরেও দৃষ্টি বিনিময় করিলেন না। ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন তাহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং নেতিবাচক। পুরা সওয়াল জবাব উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই, নমুনাস্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।—

'আপনি অমৃতকে চিনতেন ?'

'নেহি।'

'সদানন্দ সুরকে চিনতেন ?'

'নেহি।'

'বেনামী চিঠি পেয়েছেন ?'

'নেহি।'

'আপনার কলো রঙের ঘোড়া আছে ?'

'নেহি।'

আরও কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পর ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, কঠিন দৃষ্টিতে বদ্রিদাসকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'আজ চললাম, কিন্তু আবার আসব। এবার ওয়ারেন্ট নিয়ে আসব, আপনার মিল সার্চ করব।'

বদ্রিদাস এককথার মানুষ, দু'রকম কথা বলেন না। বলিলেন, 'নেহি, নেহি।'

উত্ত্যক্ত হইয়া চলিয়া আসিলাম। ফটকের বাহিরে পা দিয়াছি, একটি শীর্ণকায় বাঙালী আসিয়া আমাদের ধরিয়া ফেলিল ; পানের রসে আরক্ত দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল, 'আপনি ব্যোমকেশবাবু ? বদ্রিদাসকে সওয়াল করছিলেন ?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'আপনি জানলেন কি করে ? ঘরে তো কেউ ছিল না।'

রক্তদন্ত আরও প্রকট করিয়া লোকটি বলিল, 'আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। বদ্রিদাস

আগাগোড়া মিছে কথা বলেছে। সে অমৃতকে চিনত, সদানন্দ সুরকে চিনত, বেনামী চিঠি পেয়েছে, ওর কালো রঙের একটা ঘোড়া আছে। ভারি ধূর্ত মাড়োয়ারী, পেটেপেটে শয়তানি।'

ব্যোমকেশ লোকটিকে কিছুক্ষণ শান্তচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনি কে ?'

'আমার নাম রাখাল দাস। মাড়োয়ারীর গদিতে কাজ করি।'

'আপনার চাকরি যাবার ভয় নেই ?'

'চাকরি গিয়েছে। বদ্রিদাস নৃটিস্ দিয়েছে, এই মাসের শেষেই চাকরি খালাস।'

'নোটিস দিয়েছে কেন ?'

'মুলুক থেকে ওর জাতভাই এসেছে, তাকেই আমার জায়গায় বসাবে। বাঙালী রাখবে না।'

আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। লোকটা আমাদের পিছন পিছন আসিতে লাগিল, 'মনে রাখবেন ব্যোমকেশবাবু, পাজির পা-ঝাড়া ওই বদ্রিদাস। ওর অসাধ্যি কম্ম নেই। জাল জুচ্চুরি কালাবাজার—'

ব্যোমকেশ পিছন ফিরিয়া চাহিল না, হাত নাড়িয়া তাহাকে বিদায় করিল।

বিশ্রান্তিগৃহে ফিরিয়া ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় লম্বা হইল, ঊর্ধ্বে চাহিয়া বোধকরি ভগবানের উদ্দেশে বলিল, 'কত অজানারে জানাইলে তুমি !'

আমি জামা খুলিয়া বিছানার পাশে বসিলাম ; বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, অনেক লোকের সঙ্গেই তো মুলাকাৎ করলে। কিছু বুঝলে ?'

সে বলিল, 'বুঝেছি সবই। কিন্তু লোকটিকে যতক্ষণ নিঃসংশয়ে চিনতে না পারছি ততক্ষণ বোঝাবুঝির কোনও মানে হয় না।'

'কালো ঘোড়ার ব্যাপারটা কি ? বদ্রিদাসের যদি কালো ঘোড়া থাকেই তাতে কী ?'

ব্যোমকেশ কতক নিজ মনে বলিল, 'খট্‌কা লাগছে। বদ্রিদাসের কালো ঘোড়া—খট্‌কা লাগছে !'

'তোমার ধারণা হত্যাকারী কালো ঘোড়ায় চড়ে সদানন্দ সুরকে খুন করতে গিয়েছিল। কিন্তু কেন ? ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে লাভ কি ?'

'লাভ আছে, কিন্তু লোকসানও আছে। তাই ভাবছি—। যাক।' সে আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'বিশ্বনাথ মল্লিককে কেমন দেখলে ?'

বলিলাম, 'জকি ছিলেন, কুকুরের চেয়ে ঘোড়া ভালবাসেন ; এ থেকে ভালোমন্দ কিছু বুঝলাম না। কিন্তু ওঁকে হাঁড়ির খবর দেওয়া কি উচিত হয়েছে ? মনে করো, জঙ্গল সার্চ করার কথাটা যদি বেরিয়ে যায় ! আসামী সাবধান হবে না ?'

ব্যোমকেশ একটু বিমনাভাবে বলিল, 'হুঁ। কিন্তু আমি তাঁকে চেতিয়ে দিয়েছি, আমার বিশ্বাস তিনি কাউকে বলবেন না।'

'কিন্তু যদি মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায় !'

'তাহলে ভাবনার কথা বটে।—যাক, নীলকণ্ঠ অধিকারীকেও বেশ সরল প্রকৃতির লোক বলে মনে হয়। ভারি প্রভুভক্ত, কী বলো ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু রাখাল দাস ?'

'ও একটা ছুঁচো। বদ্রিদাস তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই গায়ের ঝাল মেটাতে এসেছিল।'

'কিন্তু ওর কথাগুলো কি মিথ্যে ?'

'না, সব সত্যি।'

দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া লইলাম। ব্যোমকেশের মুখখানা সারাক্ষণ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল। উদ্বেগের হেতুটা কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

বেলা সাড়ে চারটের সময় রামডিহি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলাম।

পৌনে-পাঁচটায় গাড়ি, পাঁচটা বাজিয়া দশ মিনিটে রামডিহি পৌঁছিবে। প্রাণকেষ্ট পালের সহিত সদালাপ করিয়া ফিরিতে বেশি রাত হইবে না।

টিকিট কিনিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিলাম। ফটকে মনোতোষ টিকিট চেক্ করিয়া মিটিমিটি হাসিল, 'ফিরছেন কখন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ন'টা-দশটা হবে।'

প্ল্যাটফর্মে কিছু যাত্রী সমাগম হইয়াছে। ট্রেন আসিতে মিনিট পাঁচেক দেরি আছে। এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাইতে চোখে পড়িল ক্ষীণাঙ্গ স্টেশনমাস্টার হরিবিলাসবাবুর অফিসের সামনে পীনাঙ্গ দারোগা সুখময়বাবু তাঁহার সহিত সতর্কভাবে কথা বলিতেছেন। সুখময়বাবু আমাদের দেখিতে পাইয়া হাত নাড়িলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহার চোখে অনুসন্ধিৎসার ঝিলিক।

'কোথাও যাচ্ছেন নাকি ?'

'রামডিহি যাব, একটু কাজ আছে। আপনি ?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'আমি কোথাও যাব না। একজনকে এগিয়ে নিতে এসেছি। এই ট্রেনেই তিনি আসছেন। হে-হে।' বলিয়া ভ্রূ নাচাইলেন।

ব্যোমকেশ একটু বিস্মিতস্বরে বলিল, 'কে তিনি ?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'তাঁর নাম নফর কুণ্ডু। তাঁর কয়েক বস্তা চাল রেলে চালান যাচ্ছিল, একটা বস্তা ট্রেনের ঝাঁকানিতে ফেটে গিয়ে ভেতর থেকে দু'সের আফিম বেরিয়েছে। নফর কুণ্ডুও ধরা পড়েছেন। এই ট্রেনে তিনি আসছেন।' বলিয়া ভ্রূ নাচাইতে নাচাইতে স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ ললাট কুঞ্চিত করিয়া চৌকা-পাথর-ঢাকা প্ল্যাটফর্মের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'ওহে, বদ্রিদাস মাড়োয়ারীও এসেছেন।'

ব্যোমকেশ চকিতে চোখ তুলিল। মালগুদামের দিক হইতে বকের মত পা ফেলিয়া শনৈঃ শনৈঃ বদ্রিদাস আসিতেছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি আমাদের দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন না, ধীর মন্থর পদে প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ব্যোমকেশের ভ্রূ-কুঞ্চন আরও গভীর হইল।

মিনিটখানেক পরে আমি বলিলাম, 'ওহে, বিশুবাবুও উপস্থিত। কী ব্যাপার বলো দেখি ?'

যোধপুরী ব্রিচেস্ পরা বিশুবাবু ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেন, আমাদের দেখিতে পাইয়া স্মিতমুখে আগাইয়া আসিলেন।

'নমস্কার। কোথাও যাচ্ছেন ?'

'রামডিহি যাচ্ছি।'

'ওহো—সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি।'

'হ্যাঁ। দশটার মধ্যেই ফিরব। আপনি ?'

'একটা চালান আসবার কথা আছে, তারই খোঁজ নিতে এসেছি। দেখি যদি এসে থাকে।' অস্থিসার মুখে একটু হাসিয়া তিনি মাল-অফিসের দিকে চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে ট্রেনের ধোঁয়া দেখা দিয়াছিল। অবিলম্বে প্যাসেঞ্জার গাড়ি আসিয়া পড়িল। গাড়িতে উঠিবার আগে লক্ষ্য করিলাম, একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে পুলিস-পরিবৃত একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি অবতরণ করিলেন। অনুমান করিলাম ইনি আফিম-বিলাসী নফর কুণ্ডু। মনে পাপ ছিল বলিয়াই বোধহয় বেনামী চিঠি পাইয়া গা-ঢাকা দিয়াছিলেন।

দুই তিন মিনিট পরে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। ব্যোমকেশের মুখে সংশয়ের ভ্রূকুটি গাঢ়তর হইয়াছে, যেন সে হঠাৎ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মনস্থির করিতে পারিতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হল কি ? ঠেকায় পড়েছ মনে হচ্ছে।'

সে উত্তর দিবার আগেই ঘ্যাঁচ করিয়া গাড়ি থামিয়া গেল। জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলাম ডিস্টান্ট সিগনাল না পাইয়া গাড়ি থামিয়াছে। তারের বেড়ার ওপারে বাঘমারি গ্রাম দেখা যাইতেছে।

যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়াছে এমনিভাবে লাফাইয়া উঠিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ভালোই হল। অজিত, আমি এখানে নেমে যাচ্ছি, তুমি একাই রামডিহি যাও। প্রাণকেষ্টবাবুকে সব কথা জিগ্যেস করবে। সদানন্দবাবু তাঁর কাছে তোরঙ্গ রেখে গিয়েছিলেন কিনা এ-কথাটা জানতে ভুলো না।—আচ্ছা।'

গাড়ি সিটি মারিয়া আবার গুটিগুটি চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ব্যোমকেশ নামিয়া পড়িল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিলাম। সে তারের বেড়া পার হইয়া আমার উদ্দেশে একবার হাত নাড়িল, তারপর বাঘমারি গ্রামের দিকে চলিল।

নয়

ইতিপূর্বে ব্যোমকেশ কখনও আমাকে এমনভাবে ফেলিয়া পালায় নাই। মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। প্রাণকেষ্টবাবুকে কী জেরা করিব? ব্যোমকেশ যখন জেরা করে তখন তাহার প্রয়োগনৈপুণ্য উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু নিজে এ-কাজ কখনও করি নাই। শেষে কি ধাষ্টামো করিয়া বসিব! ব্যোমকেশ আমাকে একি আতান্তরে ফেলিয়া গেল!

প্যাসেঞ্জার গাড়ি দুল্‌কি চালে চলিয়াছে; দু'তিন মাইল অন্তর ছোট ছোট স্টেশন, তবু অবিলম্বে গাড়ি রামডিহি পৌঁছিবে। সুতরাং এইবেলা মাথা ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিয়া লওয়া দরকার। প্রথমেই ভাবিতে হইবে, প্রাণকেষ্টবাবুকে ব্যোমকেশ জেরা করিতে চায় কেন? প্রাণকেষ্টবাবু সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি, সম্ভবত প্রাণকেষ্টবাবুর স্ত্রী সদানন্দবাবুর উত্তরাধিকারিণী, কারণ সদানন্দবাবুর নিকট আত্মীয় আর কেহ নাই।...সদানন্দবাবু কলিকাতা যাইবার পথে কি ভগিনীপতির কাছে লোহার তোরঙ্গ রাখিয়া গিয়াছিলেন? তোরঙ্গে কি কোনও মহামূল্য দ্রব্য ছিল? প্রাণকেষ্টবাবু কর্মসূত্রে এই পথ দিয়া ট্রলি চড়িয়া যাতায়াত করিতেন; তাঁহার পক্ষে ট্রলি হইতে নামিয়া বাঘমারি গ্রামে উপস্থিত হওয়া মোটেই শক্ত নয়। তবে কি ব্যোমকেশের সন্দেহ প্রাণকেষ্টবাবুই শ্যালককে সংহার করিয়াছেন?...

রামডিহি জংশনে পৌঁছিয়া প্রাণকেষ্ট পালের ঠিকানা পাইতে বিলম্ব হইল না। স্টেশনের সন্নিকটে তারের বেড়া দিয়া ঘেরা কয়েকটি ছোট ছোট কুঠি, তাহারই একটাতে প্রাণকেষ্টবাবু বাস করেন। কুঠির সামনে ছোট্ট বাগান; প্যান্টুলুন ও হাত-কাটা গেঞ্জি পরা একটি পুষ্টকায় ব্যক্তি হাতে খুরপি লইয়া বাগানের পরিচর্যা করিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া ফ্যালফ্যাল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনিই কি প্রাণকেষ্ট পাল?'

তাঁহার হাত হইতে খুরপি পড়িয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া থাকিয়া বিহ্বলভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। বলিলাম, 'আমি পুলিসের পক্ষ থেকে আসছি। খবর পেয়েছেন বোধহয় আপনার শালা সদানন্দ সুর মারা গেছেন।'

এই প্রশ্নে ভদ্রলোক এমন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন যে, মনে হইল তাঁহার প্যান্টুলুন এখনি খসিয়া পড়িবে। তারপর তিনি চমকিয়া উঠিয়া 'সুশীলা! সুশীলা!' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

আমিও কম স্তম্ভিত হই নাই। মনে-মনে যাহাকে দুর্দান্ত শ্যালক-হন্তা বলিয়া আঁচ করিয়াছি, তাঁহার এইরূপ আচার-আচরণ! পুলিসের নাম শুনিয়াই শিথিলাঙ্গ হইয়া পড়িলেন! কিংবা—এটা একটা ভান মাত্র। ঘাগী অপরাধীরা পুলিসের চোখে ধূলা দিবার জন্য নানাপ্রকার ছলচাতুরি

অবলম্বন করে—প্রাণকেষ্টবাবু কি তাহাই করিতেছেন ? সুশীলাই বা কে ? তাঁহার স্ত্রী ?

পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল, বাড়ির ভিতর হইতে সাড়াশব্দ নাই। অতঃপর কি করিব, ডাকাডাকি করিব কি ফিরিয়া যাইব, এইসব ভাবিতেছি, এমন সময় দ্বারের কাছে প্রাণকেষ্টবাবুকে দেখা গেল। তিনি যেন কতকটা ধাতস্থ হইয়াছেন, প্যান্টুলুন যথাস্থানে আছে বটে, কিন্তু হাত-কাটা গেঞ্জির উপর বুশ-কোট চড়াইয়াছেন। মুখে মুমূর্ষ হাসি আনিয়া বলিলেন, 'আসুন।'

সামনের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি ছোট, কয়েকটি সস্তা বেতের চেয়ার ও টেবিল দিয়া সাজানো, অন্দরে যাইবার দরজায় পর্দা; বিলিতি অনুকৃতির মধ্যেও একটু পরিচ্ছন্নতা আছে। আমি অন্দরে যাইবার দরজার দিকে পিছন করিয়া বসিলাম, প্রাণকেষ্টবাবু আমার মুখোমুখি বসিলেন।

শুরু করিলাম, 'আপনার শালা সদানন্দবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছেন তাহলে ?'

প্রাণকেষ্ট চমকিয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ—হ্যাঁ।'

'কখন খবর পেলেন ?'

'অ্যাঁ—সকালবেলা।'

'কার মুখে খবর পেলেন ?'

'অ্যাঁ—সান্তালগোলা থেকে হরিবিলাসবাবু টেলিফোন করেছিলেন।'

'মাফ করবেন, আপনার স্ত্রী, মানে সদানন্দবাবুর ভগ্নী কি এখানে আছেন ?'

দেখিলাম আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে প্রাণকেষ্টবাবুর চক্ষু দু'টি আমার মুখ ছাড়িয়া আমার পিছন দিকে চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল।

'হ্যাঁ—আছেন।'

আমি পিছনে ঘাড় ফিরাইলাম। অন্দরের পর্দা একটু ফাঁক হইয়া ছিল, চকিতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। বুঝিতে বাকি রহিল না, পর্দার আড়ালে আছেন পত্নী সুশীলা এবং নেপথ্য হইতে প্রাণকেষ্টবাবুকে পরিচালিত করিতেছেন।

'আপনার স্ত্রী নিশ্চয় খুব শোক পেয়েছেন ?'

আবার প্রাণকেষ্টবাবুর চকিতচক্ষু পিছন দিকে গিয়া ফিরিয়া আসিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, খুব শোক পেয়েছেন।'

'আপনার স্ত্রী সদানন্দবাবুর উত্তরাধিকারিণী ?'

'তা—তা তো জানি না। মানে—'

'সদানন্দবাবুর সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব সদ্ভাব ছিল।'

'যাওয়া-আসা ছিল ?'

'তা ছিল বৈকি। মানে—'

তাঁহার চক্ষু আবার পর্দার পানে ধাবিত হইল, 'অ্যাঁ—মানে—বেশি যাওয়া-আসা ছিল না। কালেভদ্রে—'

'শেষ কবে দেখা হয়েছে ?'

'শেষ ? অ্যাঁ—ঠিক মনে পড়ছে না—'

'দশ-বারো দিন আগে তিনি আপনার বাসায় আসেননি ?'

প্রাণকেষ্টবাবুর চক্ষু দু'টি ভয়ার্ত হইয়া উঠিল, 'কৈ না তো!'

'তিনি কলকাতা যাবার আগে আপনার কাছে একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক রেখে যাননি ?'

প্রাণকেষ্টবাবুর দেহ কাঁপিয়া উঠিল, 'না, না, স্টীলের ট্রাঙ্ক—না না, কৈ আমি তো কিছু—'

আমি কড়া সুরে বলিলাম, 'আপনি এত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন কেন ?'

'নার্ভাস! না না—'

পর্দা সরাইয়া প্রাণকেষ্টবাবুর স্ত্রী প্রবেশ করিলেন। স্বামীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে

বলিলেন, 'আমার স্বামী নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ, অচেনা লোক দেখলে আরও নার্ভাস হয়ে পড়েন। আপনি কি জানতে চান আমাকে বলুন।'

মহিলাকে দেখিলাম। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, দৃঢ়গঠিত দেহ, চোয়ালের হাড় মজবুত, চোখের দৃষ্টি প্রখর। মুখমণ্ডলে ভ্রাতৃশোকের কোনও চিহ্নই নাই। তিনি যে অতি জবরদস্ত মহিলা তাহা বুঝিতে তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। আমি উঠিয়া পড়িলাম, 'আমার যা জানবার ছিল জেনেছি, আর কিছু জানবার নেই। নমস্কার।' শ্রীমতী সুশীলাকে জেরা করা আমার কর্ম নয়।

স্টেশনে গিয়া জানিতে পারিলাম, ন'টার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা কাটাইবার জন্য স্টেশনের স্টলে চা খাইলাম, অসংখ্য সিগারেট পোড়াইয়া প্ল্যাটফর্মে পাদচারণ করিলাম, এবং সস্ত্রীক প্রাণকেষ্টবাবুর কথা চিন্তা করিলাম।

প্রাণকেষ্ট পাল নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ হইতে পারেন ; কিন্তু তিনি যে আমাকে দেখিয়া এত বেশি নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা কেবল ধাতুগত স্নায়বিক দুর্বলতা নয়, অন্য কারণও আছে। কী সে কারণ ? প্রাণকেষ্ট পত্নীর ইশারায় আমার কাছে অনেকগুলা মিথ্যাকথা বলিয়াছিলেন। কী সে মিথ্যাকথা ? সদানন্দ সুরের সহিত বেশি সম্প্রীতি না থাক, সদানন্দ সুর তাঁহার বাড়িতে যাতায়াত করিতেন। দশ-বারো দিন আগে কলিকাতায় যাইবার মুখে তিনি স্টীলের ট্রাঙ্কটি নিশ্চয় ভগিনীপতির গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ট্রাঙ্কে নিশ্চয় কোনও মূল্যবান দ্রব্য ছিল। কী মূল্যবান দ্রব্য ছিল ? টাকাকড়ি ? গহনা ? বোমাবারুদ ? আন্দাজ করা শক্ত। কিন্তু শ্রীমতী সুশীলা বাক্সে কী আছে জানিবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারেন নাই, হয়তো তালা ভাঙিয়াছিলেন। তাঁহার মত জবরদস্ত মহিলার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু তারপর ? তারপর হয়তো ট্রাঙ্কে এমন কিছু পাওয়া গেল যে সদানন্দ সুরকে খুন করা প্রয়োজন হইল। হয়তো ট্রাঙ্কে হ্যান্ড-গ্রিনেড ছিল, সেই হ্যান্ড-গ্রিনেড দিয়াই সদানন্দকে—

কিন্তু না। শ্রীমতী সুশীলা যত দুর্ধর্ষ মহিলাই হোন, নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে খুন করিবেন ? আর প্রাণকেষ্ট পালের পক্ষে এরূপ দুঃসাহসিক কার্যে লিপ্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।...কিন্তু স্টেশনমাস্টার হরিবিলাসবাবু বন্ধুকে অশুভ সংবাদটা সাত-তাড়াতাড়ি দিতে গেলেন কেন ? বন্ধুসুলভ সহানুভূতি ?...

সাড়ে ন'টার সময় সাঁওতালগোলায় ফিরিলাম। আকাশে চাঁদ আছে, শহর-বাজার নিষুতি হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম বিশ্রান্তিগৃহে আসিয়া দেখিব ব্যোমকেশ ফিরিয়াছে। কিন্তু তাহার দেখা নাই। কোথায় গেল সে ?

বিশ্রান্তিগৃহের চাকরটা রন্ধন শেষ করিয়া বারান্দায় বসিয়া ঢুলিতেছিল, তাহাকে খাবার ঢাকা দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। সে চলিয়া গেল।

কেরোসিনের বাতি কমাইয়া দিয়া বিছানায় অঙ্গ প্রসারিত করিলাম। পিছনের জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিতেছে।...কোথায় গেল ব্যোমকেশ ? বলা নাই কহা নাই ট্রেন হইতে নামিয়া চলিয়া গেল। বাঘামারি গ্রামে তার কী কাজ ? এতক্ষণ সেখানে কী করিতেছে ?

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ; ঘুম ভাঙিল কানের কাছে ব্যোমকেশের ফিসফিস গলার শব্দে, 'অজিত, ওঠো, একটা জিনিস দেখবে এস।'

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, 'কী— ?'

'চুপ ! আস্তে !' ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া আমাকে বিছানা হইতে নামাইল, তারপর পিছনের জানালার দিকে টানিয়া লইয়া গেল ; বাহিরের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'দেখছ ?'

ঘুমের ঘোর তখনও ভালো করিয়া কাটে নাই, ব্যোমকেশের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইয়াছিল না জানি কী দেখিব। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে বোকার মত চাহিয়া রহিলাম। জানালা হইতে পনেরো-কুড়ি হাত দূরে ঝোপঝাড় আগাছার মাঝখানে খানিকটা মুক্ত স্থান, সেইখানে ছয়-সাতটা

কৃষ্ণবর্ণ জন্তু অর্ধবৃত্তাকারে বসিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া চাঁদের পানে চাহিয়া আছে। প্রথম দর্শনে মনে হইল কৃষ্ণকায় কয়েকটা কুকুর। বলিলাম, 'কালো কুকুর।' কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাহারা সমস্বরে হুক্কা-হুয়া করিয়া উঠিল, তখন আর সংশয় রহিল না। স্থানীয় শৃগালের দল চন্দ্রালোকে সঙ্গীত-সভা আহ্বান করিয়াছে।

আমার মুখের ভাব দেখিয়া ব্যোমকেশ হো-হো শব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। শৃগালের দল চমকিয়া পলায়ন করিল। আমি বলিলাম, 'এর মানে? দুপুর রাত্রে আমাকে শেয়াল দেখাবার কী দরকার ছিল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আগে কখনও চাঁদের আলোয় শেয়াল দেখেছ?'

'চাঁদের আলোয় শেয়াল দেখলে কী হয়?'

'পুণ্য হয়, অজ্ঞানতিমির নাশ হয়! আমার মনে যেটুকু সংশয় ছিল তা এবার দূর হয়েছে। চলো এখন খাওয়া যাক, পেট চুঁই-চুঁই করছে।'

আলো বাড়াইয়া দিয়া টেবিলে খাইতে বসিলাম। লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশ ক্ষুধার্তভাবে অন্নগ্রাস মুখে পুরিতেছে বটে, কিন্তু তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত ফূর্তি কিসের? দুপুর রাত পর্যন্ত ছিলে কোথায়? বাঘমারিতে?'

সে বলিল, 'বাঘমারির কাজ ন'টার মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর—'

'বাঘমারিতে কী কাজ ছিল?'

'পটল, দাশু আর গোপালের সঙ্গে কাজ ছিল।'

'হুঁ, কী কাজ ছিল বলবে না। যাক, তারপর?'

'তারপর সাঁওতালগোলায় ফিরে এসে সুখময় দারোগার কাছে গেলাম। সেখানে একঘণ্টা কাটল। তারপর গেলাম স্টেশনে। হরিবিলাসবাবু ছিলেন না, তাঁকে বিছানা থেকে ধরে নিয়ে এলাম। লম্বা টেলিফোন করতে হল। এখানকার থানায় পাঁচটি বৈ লোক নেই। কাল সকালে বাইরে থেকে দশজন আসবে। সব ব্যবস্থা করে ফিরে এলাম।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'প্রাণকেষ্ট পালের কথা জানবার দরকার নেই তাহলে?'

'আছে বৈকি। কি হল সেখানে?'

সব কথা মাছিমারা ভাবে বয়ান করিলাম। সে মন দিয়া শুনিল, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ দেখাইল না। আহারান্তে মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, 'জোড়ার একটা যদি হয় গবেট, অন্যটা হয় বিচ্ছু। প্রকৃতির এই বিধান।'

অতঃপর সিগারেট ধরানো হইলে বলিলাম, 'তোমার পকেটে ওটা কি?'

ব্যোমকেশ একটু চকিত হইল, একটু লজ্জিত হইল। বলিল, 'বন্দুক—মানে, পিস্তল।'

'কোথায় পেলে?'

'থানায়। সুখময় দারোগার পিস্তল।'

'হুঁ। কোনও কথাই পষ্ট করে বলতে চাও না। বেশ, তাহলে এবার শুয়ে পড়া যাক।'

'তুমি শুয়ে পড়, আমাকে রাতটা জেগেই কাটাতে হবে।'

'কেন?'

'যাঁর হাতে হ্যান্ড-গ্রিনেড আছে তিনি যদি ভয় পেয়ে থাকেন তাহলে সাবধান থাকা ভালো।'

'তবে আমিও জেগে থাকি।'

রাত্রিটা জাগিয়া কাটিল। সুখের বিষয় কোনও উৎপাত হয় নাই। শেষরাত্রে চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ মুখের বন্ধন একটু আলগা করিল, আমাদের অচিন পাখির নাম জানিতে পারিলাম।

দশ

সকাল সাতটার সময় দুইজনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ গায়ে একটা উড়ানিচাদর জড়াইয়া লইল, যাহাতে পকেটের পিস্তলটা দৃষ্টি আকর্ষণ না করে।

গঞ্জ-গোলার কর্মতৎপরতা এখনও পুরাদমে আরম্ভ হয় নাই, দুই-চারিটা গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার ট্রাক চলিতে শুরু করিয়াছে। আমরা বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর মিল-এ প্রবেশ করিলাম।

বদ্রিদাস দাওয়ায় উবু হইয়া বসিয়া দাঁতন করিতেছিলেন, পাশে জলভরা ঘটি। আমাদের প্রথমটা দেখিতে পান নাই, একেবারে কাছে পৌঁছিলে দেখিতে পাইয়া তাঁহার চক্ষু দু'টি খাঁচার পাখির মত ঝট্‌পট করিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল, হাত হইতে দাঁতন পড়িয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'শেঠজি, আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

বদ্রিদাস উবু অবস্থা হইতে অর্ধোত্থিত হইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন, 'ক্যা—ক্যা!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা এক জায়গায় খানাতল্লাশ করতে যাচ্ছি, আপনি এখানকার গণ্যমান্য লোক, আপনাকে সাক্ষী মানতে চাই।'

'নেহি, নেহি'—বলিতে বলিতে তিনি জলভরা ঘটিটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বিশেষ একটি স্থানের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

আমরা আবার বাহির হইলাম। বিশ্বনাথ মল্লিকের মিল-এ পৌঁছিতে পাঁচ মিনিট লাগিল।

ফটকের কাছে নায়েব-সরকার নীলকণ্ঠ অধিকারীর সঙ্গে দেখা হইল। নীলকণ্ঠ ভক্তিভরে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল, 'এত সকালে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কর্তা কোথায় ?'

'নিজের ঘরে আছেন। চা খাচ্ছেন।'

'চলুন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'আসুন।'

বিশ্বনাথ মল্লিক নিজের ঘরে টেবিলে বসিয়া পাউরুটি, মাখন ও অর্ধসিদ্ধ ডিম্ব সহযোগে প্রাতরাশ সম্পন্ন করিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া তাঁহার চোয়ালের চর্বণক্রিয়া বন্ধ হইল। গলা হইতে অস্বাভাবিক স্বর নির্গত হইল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সকালবেলাই আসতে হল। কিন্তু তাড়া নেই, আপনি খাওয়া শেষ করে নিন।'

বিশুবাবু ডিমের প্লেট সরাইয়া দিয়া জড়িতস্বরে বলিলেন, 'কি দরকার ?' দেখিলাম তাঁহার অস্থিসার মুখখানা ধীরে ধীরে বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল ভেবেছিলাম আপনার মিল খানাতল্লাশ করে কোনও লাভ নেই। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে লাভ থাকতেও পারে।'

বিশুবাবুর রগের শিরা ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল, মনে হইল তিনি বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িবেন। কিন্তু তিনি অতি যত্নে নিজেকে সংবরণ করিলেন, তাঁহার ঠোঁটে হাসির মত একটা ভঙ্গিমা দেখা দিল। তিনি বলিলেন, 'হঠাৎ মত বদলে ফেললেন কেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কারণ ঘটেছে। কাল বিকেলে আমি রামডিহি যাইনি, আপনাদের ওই জঙ্গলে শিমুলগাছের কাছে লুকিয়ে ছিলাম। আমার সঙ্গে গাঁয়ের তিনটি ছেলে ছিল। আমরা কাল রাত্রে যা দেখেছি তার ফলে মত বদলাতে হয়েছে, বিশ্বনাথবাবু।'

বিশ্বনাথবাবুর চোখদু'টা একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই নিভিয়া গেল। তিনি কম্পিতহস্তে একটা সিগারেট ধরাইলেন, অলসভাবে বুক-পকেট হইতে একটা চাবির রিঙ বাহির করিয়া আঙুলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন, 'আমি যদি আমার মিল খানাতল্লাশ করতে না দিই ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার ইচ্ছের ওপর কিছুই নির্ভর করছে না। আমি তল্লাশী পরোয়ানা

এনেছি।'

'কৈ, দেখি পরোয়ানা।'

ব্যোমকেশ পকেটে হাত দিল, বিশুবাবু বিদ্যুৎবেগে চাবি দিয়া দেরাজ খুলিবার উপক্রম করিলেন। ব্যোমকেশ পকেট হইতে হাত বাহির করিল, হাতে পিস্তল। সে বলিল, 'দেরাজ খুলবেন না।'

কোণ-ঠাসা বনবিড়ালের মত বিশু মল্লিক ঘাড় ফিরাইলেন ; ব্যোমকেশের হাতে পিস্তল দেখিয়া তিনি দেরাজ খোলার চেষ্টা ত্যাগ করিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া শীৎকারের মত একটা তর্জন-শ্বাস বাহির হইল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, বাঁশী বাজাও।'

পুলিসের বাঁশী পকেটে লইয়া আমি প্রস্তুত ছিলাম, এখন সবেগে তাহাতে ফুৎকার দিলাম।

মিনিটখানেকের মধ্যে দারোগা সুখময় সামন্ত ও তাঁহার অনুচরবর্গে ঘর ভরিয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্সপেক্টর সামন্ত, বিশ্বনাথ মল্লিককে অ্যারেস্ট করুন, হাতে হাতকড়া পরান। ওঁর হাতে চাবি আছে, চাবি দিয়ে দেরাজ খুলুন। সাবধানে খুলবেন, অস্ত্রগুলো দেরাজের মধ্যেই আছে।'

বিশ্বনাথ মল্লিককে সহজে গ্রেপ্তার করা গেল না, তিনি বনবিড়ালের মতই আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া লড়াই করিলেন। অবশেষে পাঁচ-ছয় জন মিলিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া হাতে হাতকড়া পরাইল। তারপর টেবিলের দেরাজ খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে ছাব্বিশটি ·৩৮ অটোম্যাটিক, অসংখ্য কার্তুজ এবং চৌদ্দটি হ্যান্ড-গ্রিনেড আছে। কালাবাজারে এগুলির দাম অন্তত বিশ হাজার টাকা।

বিশ্বনাথ মল্লিক পুলিস পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া নিষ্ফল ক্রোধে ফুলিতেছিলেন, হঠাৎ উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'বেশ, আমি চোরা-হাতিয়ারের কারবার করি। কিন্তু অমৃতকে আর সদানন্দ সুরকে খুন করেছি তার কোনো প্রমাণ আছে?'

ব্যোমকেশ শান্তকণ্ঠে বলিল, 'প্রমাণ আছে কিনা সে-বিচার আদালত করবেন। কিন্তু মোটিভ যথেষ্ট ছিল। আর আপনি যে-পিস্তল দিয়ে অমৃতকে মেরেছিলেন সে-পিস্তলটা এর মধ্যেই আছে। গুলিটা অমৃতের শরীরের মধ্যে পাওয়া গেছে। Ballistic পরীক্ষায় সেটা প্রমাণ করা শক্ত হবে না।'

বিশ্বনাথ মল্লিকের চোখদু'টা ঘোলা হইয়া গেল, তিনি হাতকড়াসুদ্ধ দুই হাত দিয়া নিজের কপালে সজোরে আঘাত করিয়া এলাইয়া পড়িলেন।

এগারো

সেদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে মধ্যাহ্ন-ভোজন সম্পন্ন করিয়া আমরা বিশ্রান্তিগৃহের দুইটি খাটে লম্বমান হইয়াছিলাম। পটল, দাশু ও গোপাল বারংবার ব্যোমকেশের পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। দারোগা সুখময় সামন্ত আসামীকে সদরে চালান দিয়া স্তূপীকৃত হাঁসের ডিমের বড়া খাইতে খাইতে থানার অন্যান্য কর্মচারীদের নিকট ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, আসামীর গ্রেপ্তারের ব্যাপারে তাঁহার কৃতিত্বও কম নয়। গঞ্জের কর্মতৎপরতা ক্ষণকালের জন্য মন্দীভূত হইলেও আবার পুরাদমে চালু হইয়াছে : রামে রাম দুয়ে দুই। অমৃত এবং সদানন্দ সুর নামক দুটি অখ্যাত ব্যক্তির অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে জীবনের নিত্যস্রোত ব্যাহত হয় নাই। এবং তাহাদের আততায়ী ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলেও ব্যাহত হইবে না। রামে রাম দুয়ে দুই।...রাম নাম সত্য হ্যায়।...

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বদিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল ; বলিল, 'সদানন্দ সুরের মৃত্যুতে আমার

দুঃখ নেই। কিন্তু অমৃত ছেলেটা নেহাত অকারণেই মারা গেল।'

আমি একটা নূতন সিগারেট ধরাইয়া বলিলাম, 'গোড়া থেকে বলো।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ কাহিনীর গোড়া হচ্ছেন সদানন্দ সুর। তিনি না থাকলে আমরা চোরাকারবারী আসামীকে ধরতে পারতাম না। তাঁকে দিয়েই কাহিনী শুরু করা যেতে পারে।

সদানন্দ সুরের চরিত্র যতটুকু বুঝেছি, তিনি ছিলেন কৃপণ এবং সংবৃতমন্ত্র। নিজের হাঁড়ির খবর কাউকে দিতে ভালবাসতেন না। অবস্থাও ছিল অত্যন্ত সাধারণ। বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে বিয়ে করেননি। পৈতৃক ভিটে এবং দু'চার বিঘে জমি ; সাঁওতালগোলার বাজারে দু'চার মণ ধান-চালের দালালি ; কবিরাজী ওষুধ বিক্রি করে দু'চার পয়সা লাভ ;—এই ছিল তাঁর অবলম্বন। একলা মানুষ, তাই কোনও রকমে চলে যেত।

কিন্তু তাঁর মনে ভোগতৃষ্ণা ছিল। কৃপণেরা গাঁটের পয়সা খরচা করে ভোগতৃষ্ণা মেটাতে চায় না বটে, তাই বলে তাদের ভোগতৃষ্ণা নেই এ-কথা কেউ বলবে না। সদানন্দবাবুর সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না। হয়তো তিনি তাঁর ক্ষুদ্র রোজগার থেকে দু'চার পয়সা বাঁচাতেন, কিন্তু তা নিয়ে ফুর্তি করার মত চরিত্র তাঁর নয়। এইভাবে জীবন কাটছিল। বয়স বাড়ছে, শক্তি-সামর্থ্য ফুরিয়ে আসছে। হয়তো এমনি বুভুক্ষু অবস্থাতেই তাঁর জীবন শেষ হত। হঠাৎ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে একটা মস্ত সুযোগ জুটে গেল।

বিশ্বনাথ মল্লিকের কাছে সদানন্দবাবুর যাতায়াত ছিল। বিশ্বনাথ মল্লিকের দেরাজে কবিরাজী মোদকের শিশি পাওয়া গেছে, নিশ্চয় সদানন্দবাবু যোগান দিতেন। এই সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা। তারপর হঠাৎ একদিন সদানন্দবাবু বিশু মল্লিকের জীবনের গোপনতম কথাটি জানতে পারলেন। বিশু মল্লিক চোরা-অস্ত্রশস্ত্রের কারবারী। কি করে জানতে পারলেন বলা যায় না, সম্ভবত তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন কোথায় বিশু মল্লিক তার অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখে। শিমুলগাছটা তাঁর বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়, হয়তো হঠাৎ বিশু মল্লিককে সেখানে দেখে ফেলেছিলেন।

সদানন্দবাবু গুপ্তস্থান থেকে বোমা-বন্দুক চুরি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সে-পথ দিয়ে গেলেন না। বোমা-বন্দুক কি করে কালাবাজারে চালাতে হয়, পাড়াগেঁয়ে মানুষ সদানন্দ সুর তা জানতেন না। তিনি অন্য রাস্তা ধরলেন। বিশু মল্লিককে বললেন, টাকা দাও, নইলে সব ফাঁস করে দেব। অর্থাৎ সোজাসুজি ব্ল্যাকমেল।

বিশু মল্লিক নিরুপায়। পাঁচশো টাকা বার করতে হল। সেই টাকা নিয়ে সদানন্দবাবু বাড়ি ফিরে এলেন। ফুর্তির বয়স শেষ হয়ে আসছে, আর দেরি করা চলে না। তিনি স্থির করলেন কলকাতা যাবেন।

কিন্তু তিনি ভারি হিসেবী লোক, সব টাকা নিয়ে কলকাতা যাওয়া তাঁর মনোমত নয়। অথচ বাঘমারির শূন্যবাড়িতে টাকা রেখে গেলেও ভয় আছে, চোর এসে সর্বস্ব নিয়ে যেতে পারে। তিনি একটি কাজ করলেন।

আমি তোমাকে যে বলছি অধিকাংশই আন্দাজ, কিন্তু এলোমেলো আন্দাজ নয়। সদানন্দ সুর একটি স্টীলের ট্রাঙ্কে বেশির ভাগ টাকা রাখলেন, সঞ্চিত যা ছিল তা রাখলেন, হয়তো সাবেক কালের কিছু গয়নাগাঁটি ছিল তাও রাখলেন। তারপর একহাতে স্টীল-ট্রাঙ্ক এবং অন্যহাতে নিজের ব্যবহারের ক্যাম্বিস-ব্যাগ নিয়ে যাত্রা করলেন। রামডিহি স্টেশনে তাঁর বোন-ভগিনীপতি আছে, তাদের জিম্মায় ট্রাঙ্ক রেখে কলকাতায় যাবেন ফুর্তি করতে।

সদানন্দ সুর তো চলে গেলেন, এদিকে ফাঁপরে পড়েছে বিশু মল্লিক। এতদিন সে বেশ নিরুপদ্রবেই ব্যবসা চালাচ্ছিল, এখন দেখল সে বিষম ফাঁদে ধরা পড়েছে। সদানন্দ সুর যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তার উদ্ধার নেই, সদানন্দ সুর তাকে শোষণ করবে। সে ঠিক করল সদানন্দ সুরকে সরাতে হবে ; তার মাথায় বুদ্ধি আছে, হাতে আছে মারাত্মক অস্ত্র। সদানন্দকে সরানো শক্ত কাজ নয়।

সদানন্দ ভগিনীপতির বাসায় তোরঙ্গ রেখে কলকাতায় গিয়ে বোধকরি ফুর্তিই করছেন, এদিকে

বিশু মল্লিক একদিন সন্ধ্যের পর ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে ঢুকল, শিমুলগাছ থেকে একটি হ্যান্ড-গ্রিনেড নিয়ে সদানন্দর বাড়িতে বুবি-ট্র্যাপ পেতে এল। সদানন্দ কলকাতা থেকে যেই বাড়িতে ঢুকতে যাবেন অমনি বোমা ফাটবে।

কিন্তু সদানন্দ সুর কলকাতা থেকে ফিরে আসবার আগেই কিছু কিছু ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছিল। বিশু মল্লিকের যখনই অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রি করবার দরকার হত তখনই সে ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে যেত। একদিন রাত্রি দশটার সময় অমৃত বাছুর খুঁজতে এসে ঘোড়াটাকে দেখে ফেলল। সে ভাবল ঘোড়া-ভূত। তারপর যখন সে বন্ধুদের খোঁচায় আবার জঙ্গলে ঢুকল তখন শুধু ঘোড়া নয়, শিমুলতলায় ঘোড়ার সওয়ারের সঙ্গেও তার দেখা হয়ে গেল।

বিশু মল্লিক সেদিন বোধহয় সদানন্দ সুরের বুবি-ট্র্যাপ পেতে ফিরে যাচ্ছিল। দু'জনেই দু'জনকে চেনে ; অমৃত চাকরির জন্য বিশু মল্লিকের কাছে দরবার করছিল। বিশু মল্লিক দেখল, এর পর যখন বুবি-ট্র্যাপ ফাটবে তখন অমৃত সাক্ষী দেবে যে, সে বিশু মল্লিককে রাত্তিরে সদানন্দ সুরের বাড়ির পিছনে দেখেছে ; হয়তো বিশু মল্লিক যখন সদানন্দ সুরের পাঁচিল টপ্‌কে বেরুচ্ছিল তখন দেখেছে। অতএব অমৃতের বেঁচে থাকা নিরাপদ নয়। বিশু মল্লিকের কাছে অটোম্যাটিক পিস্তল ছিল, সে অমৃতকে খুন করে ঘোড়ার পিঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি যখন প্রথম অকুস্থলে এসে তদন্ত আরম্ভ করলাম তখন সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হল—ঘোড়া। অমৃত ঘোড়া-ভূত দেখেছিল, আমি দেখলাম জলজ্যান্ত ঘোড়ার খুরের দাগ। একটা ঘোড়া এই মামলার সঙ্গে জড়িত আছে। তখনও আমরা আসামীকে চিনি না, কিন্তু সে যেই হোক, ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে আসে। কেন ?

ঘোড়ায় চড়ে শীগ্‌গির যাতায়াত করা যায়, কিন্তু আবার সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে-লোক দুষ্কার্য করতে বেরিয়েছে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না ; তবে এ-ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে আসে কেন ? নিশ্চয় কোনও বিশেষ সুবিধে আছে। কী সুবিধে ? সদানন্দ সুরের পাঁচিল টপ্‌কানো ? ঘোড়ার পিঠ থেকে পাঁচিল টপ্‌কানোর সুবিধে হয়, ওদিকে নামবার জন্যে পেয়ারাগাছ আছে। কিন্তু শুধু কি এই ? না, অন্য কিছুও আছে ? এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম কাল রাত্রে। কিন্তু সে পরের কথা।

যথাসময়ে সদানন্দ সুর ফিরে এলেন। তোরঙ্গটা তিনি ফিরিয়ে আনেননি, বোধহয় ইচ্ছে ছিল বাড়িতে দু'দিন বিশ্রাম করে ভগিনীপতির বাসা থেকে তোরঙ্গ নিয়ে আসবেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হল না। নিজের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে প্রায় আমাদের চোখের সামনে তিনি মারা গেলেন।

সদানন্দ সুরের মৃত্যুর পর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। আমি যাকে ধরতে এসেছি সে-ই মেরেছে অমৃত আর সদানন্দ সুরকে। যারা আগ্নেয়াস্ত্র কেনে তারা বাইরের লোক, হত্যাকারী বাইরের লোক নয় ; অমৃত আর সদানন্দ সুরের চেনা লোক। অমৃত তাকে দেখে ফেলেছিল এবং সদানন্দ সুর তাকে দোহন করতে শুরু করেছিল। কেবল দুটো কথা তখনও অজ্ঞাত ছিল—লোকটা কে ? এবং কালো ঘোড়ায় চড়ে আসে কেন ?

অমৃত বলেছিল, কালো ঘোড়া-ভূত, নাক দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। সবটাই তার উত্তপ্ত কল্পনা হতে পারে। আবার খানিকটা সত্যি হতে পারে। সুতরাং কালো ঘোড়ার খোঁজ নেওয়া দরকার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল সাঁওতালগোলায় কেবল একটি কালো ঘোড়া আছে, তার মালিক বদ্রিদাস মাড়োয়ারী। তবে কি বদ্রিদাস-ই আমার আসামী ? বদ্রিদাস লোকটি পাঁকাল মাছের মত পিছল ; তিনি ধান-চালে প্রচুর কাঁকর মেশাতে পারেন, স্বজাতির প্রতি তাঁর অসীম পক্ষপাত থাকতে পারে ; কিন্তু তিনি দু-দুটো মানুষকে খুন করতে পারেন এত সাহস নেই। তাছাড়া তাঁকে ঘোড়সওয়ার রূপে কল্পনা করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

আমি বেনামী চিঠি পাঠানোর ফলে একটা কাজ হয়েছিল, সন্দেহভাজনদের দল থেকে জনকতক লোককে বাদ দেওয়া গিয়েছিল। যমুনাদাস গঙ্গারাম বেনামী চিঠি পুলিসকে

দেখিয়েছিল, সুতরাং সে নয়। নফর কুণ্ডুর ওপর প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল তার ঘোড়া নেই। পরের ঘোড়া ধার করে কেউ খুন করতে যায় না। প্রাণকেষ্ট পালকে অবশ্য আমি গোড়া থেকে বাদ দিয়েছিলাম। ট্রলিতে চড়ে বাঘমারি গ্রামের কাছাকাছি যাওয়া যায় বটে, কিন্তু ট্রলিতে কুলি থাকে, তাদের চোখ এড়িয়ে খুন করার সুবিধে নেই। আমার শুধু জানবার কৌতূহল ছিল, সদানন্দ সুরের ট্রাঙ্কে কী আছে।

যাহোক, সন্দেহভাজনের দলকে ছাঁটাই করে মাত্র তিনজন দাঁড়াল—বদ্রিদাস মাড়োয়ারী, বিশু মল্লিক আর সুখময় দারোগা। সুখময় দারোগাকে বাদ দিতে পারিনি ; তার একটা ঘোড়া আছে, যদিও সেটা কালো নয়। এবং তার পক্ষে এইজাতীয় কারবার চালানো যত সহজ এমন আর কারুর পক্ষে নয়। প্রদীপের নিচেই অন্ধকার বেশি।

অবশ্যি যখন জানতে পারলাম বিশু মল্লিক একসময় জকি ছিল, তখন সব সন্দেহই তার ওপর গিয়ে পড়ল। উপরন্তু জানা গেল, বিশু মল্লিক সদানন্দ সুরকে পাঁচশো টাকা ধার দিয়েছে। আসলে ওটা ধার নয়—ঘুষ। সদানন্দ সুরের মত নিঃস্ব লোককে কোনও ব্যবসাদার শুধু-হাতে ধার দেবে না।

আমি বিশু মল্লিকের জন্যে টোপ ফেললাম, আমার মনের প্রাণের কথা সব তাকে বলে ফেললাম। জঙ্গলে যে অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখা সম্ভব এ-চিন্তা আমার গোড়া থেকেই ছিল। আমি ভেবেছিলাম শিমুলগাছের কাছাকাছি কোথাও মাটিতে পোঁতা আছে। বিশু মল্লিক যখন শুনল আমরা জঙ্গল খানাতল্লাশ করবার মতলব করেছি, তখন সে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। অস্ত্রগুলো অবশ্য খুবই যত্ন করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ; কিন্তু বলা যায় না, পুলিস খুঁজে বার করতে পারে। তখন বিশু মল্লিককে অবশ্য ধরা যাবে না, কিন্তু অনেক টাকার মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। বিশু মল্লিক লোভে পড়ে গেল।

কাল বিকেলে আমি যখন রামডিহি যাবার জন্যে ট্রেনে চড়লাম তখন বিশু মল্লিক এসে দেখে গেল আমি সত্যি যাচ্ছি কিনা। আমার অবশ্য রামডিহি পর্যন্ত যাবার প্ল্যান ছিল না, স্থির করেছিলাম পরের স্টেশনে নেমে বাঘমারিতে ফিরে আসব। কিন্তু দৈব অনুকূল, ঠিক বাঘমারি গ্রামের গায়ে ট্রেন থেমে গেল।

গ্রামে গিয়ে পটল, দাশু আর গোপালকে যোগাড় করলাম ; তাদের নিয়ে জঙ্গলে গেলাম। সারা জঙ্গল তল্লাশ করা অসম্ভব ; কিন্তু সদানন্দ সুরের পাঁচিলের পাশে যেখানে ঘোড়ার খুরের দাগ পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে শিমুলগাছের গোড়া পর্যন্ত খুঁজে দেখলাম, যদি কোথাও সদ্য-খোঁড়া মাটি দেখতে পাই। কিন্তু সেরকম কিছুই চোখে পড়ল না।

এখন কি করা যায়! সূর্যাস্তের বেশি দেরি নেই। জঙ্গলে বসে সিগারেট টানতে টানতে মতলব ঠিক করে নিলাম। পটলদের বললাম, 'চলো, সাস্তালগোলার দিকে যাওয়া যাক।'

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সাস্তালগোলার কিনারায় পৌঁছলাম। এখানে জঙ্গল প্রায় দেড়শো গজ চওড়া ; একপ্রান্তে স্টেশন, অন্যপ্রান্তে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, মাঝামাঝি বিশু মল্লিকের মিল। মিল-এর এটা পিছন দিক্, কাঁটা-তারের বেড়ায় ছোট খিড়কির ফটক আছে। আমি পটলদের আমার প্ল্যান বুঝিয়ে দিলাম। তারা জঙ্গলের কিনারায় সম-ব্যবধানে গাছে উঠে লুকিয়ে থাকবে এবং লক্ষ্য করবে ঘোড়ায় চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে কেউ জঙ্গলে ঢোকে কিনা। লোকটাকে চেনবার চেষ্টা করবে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ধরবার চেষ্টা করবে না।

পটল উঠল বিশু মল্লিকের মিল-এর সরাসরি একটা গাছে, দাশু গেল স্টেশনের দিকে, আর গোপাল ব্যাঙ্কের দিকে। আকাশে আজও চাঁদ আছে ; রাত হলেও, এদের চোখ এড়িয়ে কেউ জঙ্গলে ঢুকতে পারবে না।

ওদের গাছে তুলে দিয়ে আমি ফিরে চললাম শিমুলগাছের কাছে। ওই গাছটা আমার মনে ঘোর সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল। অমৃতের মৃত্যু হয় ঐ গাছের তলায়। এ-রহস্যের চাবিকাঠি যদি জঙ্গলের মধ্যে থাকে তবে নিশ্চয় ঐ শিমুলগাছের কাছাকাছি কোথাও আছে।

যখন শিমুলতলায় ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে, চাঁদের আলো ফুটেছে। শিমুলগাছ থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে একটা ঝাঁকড়া গোছের গাছ ছিল, আমি তাতে উঠে পড়লাম। এইখানে বসে বাঘ-শিকারীর মত অপেক্ষা করব। আমার সঙ্গে অস্ত্র নেই, আমি এসেছি শুধু ব্যাঘ্র-মশাইকে দেখতে। তিনি আসবেন কিনা জানি না, কিন্তু যদি আসেন, ন'টার আগেই আসবেন।

শিমুলগাছের সব পাতাই প্রায় ঝরে গেছে, গাছের তলায় ছায়া নেই। চাঁদ যত উঁচুতে উঠছে আলো তত পরিষ্কার হচ্ছে। হঠাৎ কাছের একটা গাছ থেকে কোকিল ডেকে উঠল। বিচিত্র পরিস্থিতি। আমি বসে আছি একটা নৃশংস নরহন্তাকে দেখব বলে, আর—কোকিল ডাকছে! আজব দুনিয়া!

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। চোখের কাছে হাত এনে ঘড়ি দেখলাম, পৌনে আটটা। সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে একটা আওয়াজ কানে এল, শুক্‌নো পাতার ওপর পায়ের মচমচ শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, ঘন ছায়ার ভিতর থেকে ধীর-মন্থর গমনে একটা ঘোড়া বেরিয়ে আসছে। কালো ঘোড়া। তার পিঠে বসে আছে কালো-পোশাক পরা একটা মানুষ। মানুষটার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সে জকির মত সামনে ঝুঁকে বসেছে আর সতর্কভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

ঘোড়াটা সোজা গিয়ে শিমুলগাছের বিরাট গুঁড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়াল, পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যা দেখলাম তা একেবারে সার্কাসের খেলা। ঘোড়ার সওয়ার টপ্ করে ঘোড়ার পিঠে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাত বাড়িয়ে শিমুলগাছের গুঁড়িতে একটা ফোকরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে। মাটি থেকে দশ হাত উঁচুতে যেখানে ডালপালা বেরিয়েছে সেখানে একটা খোপের মত ফুটো আছে। অচিন পাখির বাসা!

ঘোড়ার পিঠে আসামী কেন জঙ্গলে আসে এখন বুঝতে পারছ? অস্ত্রগুলো মাটিতে পোঁতা নেই, আছে গাছের ফোকরের মধ্যে, মাটি থেকে দশ হাত উঁচুতে। শিমুলগাছের গায়ে শক্ত-শক্ত মোটা মোটা কাঁটা থাকে; শিমুলগাছে মানুষ ওঠে না, এমন কি কাঠবেরালি পর্যন্ত ওঠে না। এমন নিরাপদ গুপ্তস্থান আর নেই। অবশ্য মই লাগিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু কে মই লাগাবে? আর যিনি জানেন তিনি যদি মই ঘাড়ে করে জঙ্গলে আসেন তাহলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তার চেয়ে ঘোড়া ঢের নিরাপদ; বিশেষত যদি জকির হাতের শিক্ষিত ঘোড়া হয়।

যাহোক, ঘোড়সওয়ারের বাঁ হাতে একটা থলি আছে; সে খোপের মধ্যে ডান হাত ঢুকিয়ে একটি একটি করে অস্ত্রগুলি বার করছে আর থলিতে রাখছে। এতক্ষণে ঘোড়সওয়ারকে চিনতে পেরেছি—বিশু মল্লিক। মুখ চিনতে না পারলেও, ঐ রোগা বেঁটে শরীর আর ধনুকের মত বাঁকা ঠ্যাং ভুল হবার নয়। আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু একটা ধোঁকা তখনও কাটেনি; বিশু মল্লিক কালো ঘোড়া পেল কোত্থেকে? সে ভারি হুঁশিয়ার লোক, তার যদি কালো ঘোড়া থাকত সে কখনই আমার কাছে মিথ্যেকথা বলত না। আসলে আমি যখন তাকে কালো ঘোড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম তখন সে আমার প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। এ-মামলার সঙ্গে কালো ঘোড়ার যে কোনও সম্বন্ধ আছে তা সে কল্পনা করতেই পারেনি। আমি কালো ঘোড়ার রহস্য বুঝলাম কাল দুপুর-রাত্রে, বাসায় ফিরে এসে।

সে যাক, বিশু মল্লিক থলি ভরে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে নেমে বসল, তারপর মন্দমন্থর চালে ফিরে চলল। সে জঙ্গলের ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আমি গাছ থেকে থেকে নামলাম। ঘড়িতে তখন সওয়া আটটা। আমি আবার পটলদের উদ্দেশে ফিরে চললাম। আমার প্ল্যান ঠিকই ফলেছে; পুলিস কাল জঙ্গল তল্লাশ করবে, তাই আজ বিশু মল্লিক অস্ত্রগুলো জঙ্গল থেকে সরিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অস্ত্রগুলোকে সে রাখবে কোথায়? কারণ, কেবল মানুষটাকে ধরলে চলবে না, অস্ত্রগুলোও চাই। বস্তুত, অস্ত্রগুলো না পেলে মানুষটাকে ধরে কোনও লাভ নেই।

আমি যখন জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছলাম তখনও পটলেরা গাছ থেকে নামেনি, আমাকে দেখে নেমে এল। তিনজনেই ভীষণ উত্তেজিত; তারা ঘোড়সওয়ারকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখেছে এবং

চিনতে পেরেছে। বিশু মল্লিক তার রাইস্ মিল-এর খিড়কি-ফটক দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে এল, পটলের গাছের প্রায় পাশ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। চল্লিশ মিনিট পরে আবার ফিরে ফটক দিয়ে মিল-এ চলে গেল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'ঠিক দেখেছ নিজের ফটকে ঢুকেছে ? অন্য কোথাও যায়নি ?'

পটল বলল, 'আজ্ঞে না, অন্য কোথাও যায়নি।'

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। অস্ত্রগুলো বিশু মল্লিক মিলেই রাখবে, অন্তত যতদিন না পুলিস জঙ্গল-তল্লাশ শেষ করে। আমি সকালবেলা তাকে বলেছিলাম মিল খানাতল্লাশ করব না, আমার কথায় সে বিশ্বাস করেছে। আমাকে বিশু মল্লিক বোধ হয় খুবই সরলপ্রকৃতির লোক বলে মনে করেছিল।

আমি তখন পটল, দাশু আর গোপালের পিঠ ঠুকে দিয়ে বললাম, 'তোমাদের জন্যে অমৃতের মৃত্যুর কিনারা করতে পারলাম। কিন্তু আজ আর বেশি কৌতূহল প্রকাশ কোরো না ; কাল সকাল ন'টার সময় এসো, তখন সব জানতে পারবে। কিন্তু সাবধান, কাউকে একটি কথা বলবে না।'

তারা গ্রামে ফিরে গেল। আমি থানায় গেলাম। সুখময় দারোগার কাছে পিস্তলটা যোগাড় করে স্টেশনে গেলাম। স্টেশন থেকে কাজকর্ম সেরে যখন ফিরে এলাম তখন রাত দুপুর, তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছ।

তোমাকে জাগালাম না, পিছনের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি, জানালার বাইরে কয়েকটা জন্তু বসে আছে। প্রথমটা আমিও ভেবেছিলাম কালো কুকুর, তারপর লক্ষ্য করে দেখলাম, কুকুর নয়—শেয়াল। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে কালো ঘোড়ার রহস্য ভেদ হয়ে গেল। বুঝতে পারলে না ? অত্যন্ত সহজ, এমন কি, হাস্যকর। কেন যে কথাটা মাথায় আসেনি জানি না।—শেয়ালের গায়ের রঙ কালো নয়, পাটকিলে। অথচ আমরা দেখলাম কালো। ঘোড়াটাও কালো ছিল না, ছিল গাঢ় বাদামী রঙের ; ইংরেজিতে যাকে বলে চেস্ট্নাট। চাঁদের আলোয় সব গাঢ় রঙই দূর থেকে কালো দেখায়। তাই অমৃত কালো ঘোড়া-ভূত দেখেছিল, আমিও কালো ঘোড়া দেখেছিলাম। এই হল কালো ঘোড়ার রহস্য। রহস্য না বলে যদি পরিহাস বলতে চাও তাতেও আপত্তি নেই।

রাত্রে খেতে বসে তুমি সস্ত্রীক প্রাণকেষ্ট পালের উপাখ্যান বললে। ওদের গলদ কোথায় বুঝতে বেশি কষ্ট হয় না। প্রাণকেষ্ট পাল নিজের কাজে বেশ দক্ষ, কিন্তু ঘরে জারিজুরি চলে না, স্ত্রীর কাছে কেঁচো। সদানন্দ সুর বোনের কাছে তোরঙ্গ রেখে গিয়েছিলেন ঠিকই। তোরঙ্গ গোড়ায় ভাঙ্গা হয়নি ; কিন্তু যখন তাঁর মৃত্যু-সংবাদ এল, তখন ভগিনী সুশীলা আর দ্বিধা করলেন না, তোরঙ্গের তালা ভাঙলেন এবং যা পেলেন আত্মসাৎ করলেন। হয়তো দাদার বিষয়সম্পত্তি সবই তিনি শেষ পর্যন্ত পাবেন, কিন্তু আইনের কথা কিছু বলা যায় না। হাতে যা পাওয়া গেছে তা হজম করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই হচ্ছে ভগিনী সুশীলার মনস্তত্ত্ব। প্রাণকেষ্ট পাল কিন্তু পুরুষমানুষ, হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান আছে, তাই তোমাকে দেখে তিনি বেজায় নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন।—

তারপর আর কি ? এবার বেদব্যাসের বিশ্রাম। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বিশু মল্লিকের মত আরও কত মহাজন নীরবে তপস্যা করছেন কে তার খবর রাখে !'

ব্যোমকেশ প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া পাশ ফিরিল ; বলিল, 'জাগি পোহাল বিভাবরী। এইবেলা একটুকু ঘুমিয়ে নাও, আজ রাত্রেই কলকাতা ফিরব। হে হে।'

শৈলরহস্য

সহ্যাদ্রি হোটেল
মহাবলেশ্বর—পুণা
৩রা জানুআরি

ভাই অজিত,

বোম্বাই এসে অবধি তোমাদের চিঠি দিতে পারিনি। আমার পক্ষে চিঠি লেখা কি রকম কষ্টকর কাজ তা তোমরা জানো। বাঙালীর ছেলে চিঠি লিখতে শেখে বিয়ের পর। কিন্তু আমি বিয়ের পর দু'দিনের জন্যেও বৌ ছেড়ে রইলাম না, চিঠি লিখতে শিখব কোত্থেকে? তুমি সাহিত্যিক মানুষ, বিয়ে না করেও লম্বা চিঠি লিখতে পার। কিন্তু তোমার কল্পনাশক্তি আমি কোথায় পাব ভাই। কাঠখোট্টা মানুষ, স্রেফ সত্য নিয়ে কারবার করি।

তবু আজ তোমাকে এই লম্বা চিঠি লিখতে বসেছি। কেন লিখতে বসেছি তা চিঠি শেষ পর্যন্ত পড়লেই বুঝতে পারবে। মহাবলেশ্বর নামক শৈলপুরীর সহ্যাদ্রি হোটেলে রাত্রি দশটার পর মোমবাতি জ্বেলে এই চিঠি লিখছি। বাইরে শীতজর্জর অন্ধকার; আমি ঘরের দোর-জানালা বন্ধ করে লিখছি, তবু শীত আর অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। মোমবাতির শিখাটি থেকে থেকে নড়ে উঠছে; দেয়ালের গায়ে নিঃশব্দ ছায়া পা টিপে টিপে আনাগোনা করছে। ভৌতিক পরিবেশ। আমি অতিপ্রাকৃতকে সারা জীবন দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি, কিন্তু—

অনেক দিন আগে একবার মুঙ্গেরে গিয়ে বরদাবাবু নামক একটি ভূতত্ত্ব ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মনে আছে? আমি তাঁকে বলেছিলাম—ভূত প্রেত থাকে থাক, আমি তাদের হিসেবের বাইরে রাখতে চাই। এখানে এসে কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেছি, ওদের আর হিসেবের বাইরে রাখা যাচ্ছে না।

কিন্তু থাক। গল্প বলার আর্ট জানা নেই বলেই বোধ হয় পরের কথা আগে বলে ফেললাম। এবার গোড়া থেকে শুরু করি—

যে-কাজে বোম্বাই এসেছিলাম সে কাজটা শেষ করতে দিন চারেক লাগল। ভেবেছিলাম কাজ সেরেই ফিরব, কিন্তু ফেরা হল না। কর্মসূত্রে একজন উচ্চ পুলিস কর্মচারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, মারাঠী ভদ্রলোক, নাম বিষ্ণু বিনায়ক আপ্টে। তিনি বললেন, 'বম্বে এসেছেন, পুণা না দেখেই ফিরে যাবেন?'

প্রশ্ন করলাম, 'পুণায় দেখবার কী আছে?'

তিনি বললেন, 'পুণা শিবাজী মহারাজের পীঠস্থান, সেখানে দেখবার জিনিসের অভাব? সিংহগড়, শনিবার দুর্গ, ভবানী মন্দির—'

ভাবলাম এদিকে আর কখনও আসব কি না কে জানে, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। বললাম, 'বেশ, যাব।'

আপ্টের মোটরে চড়ে বেরুলাম। বোম্বাই থেকে পুণা যাবার পাকা মোটর-রাস্তা আছে, সহ্যাদ্রির গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে গিয়েছে। এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য বর্ণনা

করা আমার কর্ম নয়। এক পাশে উত্তুঙ্গ শিখর, অন্য পাশে অতলস্পর্শ খাদের কোলে সবুজ উপত্যকা। তুমি যদি দেখতে, একটা চম্পূকাব্য লিখে ফেলতে।

পুণায় আপ্টের বাড়িতে উঠলাম। সাহেবী কাণ্ডকারখানা, আদর যত্নের সীমা নেই। আমাকে আপ্টে যে এত খাতির করছেন তার পিছনে আপ্টের স্বাভাবিক সহৃদয়তা তো আছেই, বোধ হয় বোম্বাই প্রাদেশিক সরকারের ইশারাও আছে। সে যাক। পুণায় বোম্বাই-এর চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা ; কারণ বোম্বাই শহর সমুদ্রের সমতলে, আর পুণা সমুদ্র থেকে প্রায় দু'হাজার ফুট উঁচুতে। পুণার ঠাণ্ডায় কিন্তু বেশ একটি চনমনে ভাব আছে ; শরীর-মনকে চাঙ্গা করে তোলে, জড়ভরত করে ফেলে না।

পুণায় তিন দিন থেকে দর্শনীয় যা-কিছু আছে সব দেখলাম। তারপর আপ্টে বললেন, 'পুণায় এসে মহাবলেশ্বর না দেখে চলে যাবেন ?'

আমি বললাম, 'মহাবলেশ্বর ! সে কাকে বলে ?'

আপ্টে হেসে বললেন, 'একটা জায়গার নাম। বম্বে প্রদেশের সেরা হিল-স্টেশন। আপনাদের যেমন দার্জিলিং আমাদের তেমনি মহাবলেশ্বর। পুণা থেকে আরও দু'হাজার ফুট উঁচু। গরমের সময় বম্বের সবাই মহাবলেশ্বর যায়।'

'কিন্তু শীতকালে তো যায় না। এখন ঠাণ্ডা কেমন ?'

'একেবারে হোম ওয়েদার। চলুন চলুন, মজা পাবেন।'

অতএব মহাবলেশ্বরে এসেছি এবং বেশ মজা টের পাচ্ছি।

পুণা থেকে মহাবলেশ্বর বাহাত্তর মাইল ; মোটরে আসতে হয়। আমরা পুণা থেকে বেরুলাম দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর, মহাবলেশ্বরে পৌঁছুলাম আন্দাজ চারটের সময়। পৌঁছে দেখি শহর শূন্য, দু'চারজন স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া সবাই পালিয়েছে। সত্যিই হোম ওয়েদার ; দিনের বেলায় হি হি কম্প, রাত্রে হি হি কম্প। ভাগ্যিস আপ্টে আমার জন্যে একটা মোটা ওভারকোট এনেছিলেন, নইলে শীত ভাঙতো না।

শহরের বর্ণনা দেব না, মনে কর দার্জিলিঙের ছোট ভাই। আপ্টে আমাকে নিয়ে সহ্যাদ্রি হোটেলে উঠলেন। হোটেলে একটিও অতিথি নেই, কেবল হোটেলের মালিক দু'তিন জন চাকর নিয়ে বাস করছেন।

হোটেলের মালিক জাতে পার্সী, নাম সোরাব হোমজি। আপ্টের পুরনো বন্ধু। বয়স্ক লোক, মোটাসোটা, টকটকে রঙ। বিষয়বুদ্ধি নিশ্চয় আছে, নইলে হোটেল চালানো যায় না ; কিন্তু ভারি অমায়িক প্রকৃতি। আপ্টে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ; তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে খুব সমাদর করে নিজের বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। অবিলম্বে কফি এসে পড়ল, তার সঙ্গে নানারকম প্যাস্ট্রি। ভাল কথা, তুমি বোধ হয় জান না, গোঁড়া পার্সীরা ধূমপান করে না, কিন্তু মদ খায়। মদ না খেলে তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে।

কফি-পর্ব শেষ না হতে হতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। অতঃপর আপ্টে আমাকে হোটেলে রেখে মোটর নিয়ে বেরুলেন ; এখানে তাঁর কে একজন আত্মীয় আছে তার সঙ্গে দেখা করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবেন। তিনি চলে যাবার পর হোমজি মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি বাঙালী। শুনে আশ্চর্য হবেন, মাস দেড়েক আগে পর্যন্ত এই হোটেলের মালিক ছিলেন একজন বাঙালী।'

আশ্চর্য হলাম। বললাম, 'বলেন কি ! বাঙালী এতদূরে এসে হোটেল খুলে বসেছিল !'

হোমজি বললেন, 'হ্যাঁ। তবে একলা নয়। তাঁর একজন গুজরাতী অংশীদার ছিল।'

এই সময় একটা চাকর এসে অবোধ্য ভাষায় তাঁকে কি বলল, তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি স্নান করবেন ? যদি করেন, গরম জল তৈরি আছে।'

বললাম, 'রক্ষে করুন, এই শীতে স্নান ! একেবারে বোম্বাই গিয়ে স্নান করব।'

চাকর চলে গেল। তখন আমি হোমজিকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, আপনি তো বম্বের লোক ?

তাহলে এই শীতে এখানে রয়েছেন কেন ? এখানে তো কাজকর্ম এখন কিছু নেই।'

হোমজি বললেন, 'কাজকর্ম আছে বৈকি। মার্চ মাস থেকে হোটেল খুলবে, অতিথিরা আসতে শুরু করবে। তার আগেই বাড়িটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ফিট্‌ফাট করে তুলতে হবে। তাছাড়া বাড়ির পিছন দিকে গোলাপের বাগান করেছি। চলুন না দেখবেন। এখনও দিনের আলো আছে।'

বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে বাগান দেখলাম। বাগান এখনও তৈরি হয়নি, তবে মাসখানেকের মধ্যে ফুল ফুটতে আরম্ভ করবে। হোমজির ভারি বাগানের শখ।

এইখানে সহ্যাদ্রি হোটেলের একটা বর্ণনা দিয়ে রাখি। চুনকাম করা পাথরের দোতলা বাড়ি, সবসুদ্ধ বারো-চৌদ্দটা বড় বড় ঘর আছে। সামনে দিয়ে গেরুমাটি ঢাকা রাস্তা গিয়েছে ; পিছন দিকে গোলাপ বাগানের জমি, লম্বায় চওড়ায় কাঠা চারেক হবে। তারপরই গভীর খাদ ; শুধু গভীর নয়, খাড়া নেমে গিয়েছে। পাথরের মোটা আলসের উপর ঝুঁকে উঁকি মারলে দেখা যায়, অনেক নিচে ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে একটা সরু ঝরনার ধারা বয়ে গেছে।

আমরা বাগান দেখে ফিরছি এমন সময় খাদের নিচে থেকে একটা গভীর আওয়াজ উঠে এল। অনেকটা মোষের ডাকের মত। নিচে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, ওপরে একটু আলো আছে ; আমি জিগ্যেস করলাম, 'ও কিসের আওয়াজ ?'

হোমজি বললেন, 'বাঘের ডাক। আসুন, ভেতরে যাওয়া যাক।'

ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে ; চাকর একটা গনগনে কয়লার আংটা মেঝের উপর রেখে গেছে। আমরা আংটার কাছে চেয়ার টেনে বসলাম। ঠাণ্ডা আঙুলগুলোকে আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এদিকে বড় বাঘ আছে ?'

হোমজি বললেন, 'আছে। তাছাড়া চিতা আছে, হায়েনা আছে, নেকড়ে আছে। যে বাঘটার ডাক আজ শুনলেন সেটা মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে কিনা, তাই এ তল্লাট ছেড়ে যেতে পারছে না।'

'মানুষখেকো বাঘ ! কত মানুষ খেয়েছে ?'

'আমি একটার কথাই জানি। ভারি লোমহর্ষণ কাণ্ড ! শুনবেন ?'

এই সময় আপ্টে ফিরে এলেন, লোমহর্ষণ কাণ্ড চাপা পড়ে গেল। আপ্টে বললেন, তাঁর আত্মীয় ছাড়ছেন না, আজ রাত্রে তাঁকে সেখানেই ভোজন এবং শয়ন করতে হবে। কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে তিনি উঠলেন, আমাকে বললেন, 'কাল সকাল ন'টার মধ্যে আমি আসব। আপনি ব্রেক্‌ফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে থাকবেন, দু'জনে বেরুব। এখানে অনেক দেখবার জায়গা আছে ; বম্বে পয়েন্ট, আর্থার্স সীট, প্রতাপগড় দুর্গ—'

তিনি চলে গেলেন। আমরা আরও খানিকক্ষণ বসে এটা-সেটা গল্প করলাম। এখানে এখন শাকসব্জি-দুধ-ডিম-মুর্গী খুব সস্তা, আবার গরমের সময় দাম চড়বে।

কথায় কথায় হোমজি বললেন, 'আপনার ভূতের ভয় নেই তো ?'

আমি হেসে উঠলাম। তিনি বললেন, 'কারুর কারুর থাকে। একলা ঘরে ঘুমোতে পারে না। তাহলে আপনার শোবার ব্যবস্থা যদি দোতলায় করি আপনার অসুবিধা হবে না ?'

বললাম, 'বিন্দুমাত্র না। আপনি কোথায় শোন ?'

তিনি বললেন, 'আমি নিচেয় শুই। আমার বসবার ঘরের পাশে শোবার ঘর। আপনাকে ওপরে দিচ্ছি তার কারণ, এখন সব ঘরের বিছানাপত্র তুলে গুদামে রাখা হয়েছে। অতিথি তো নেই। কেবল দোতলার একটা ঘর সাজানো আছে। তাতে হোটেলের ভূতপূর্ব মালিক সস্ত্রীক থাকতেন। ঘরটা যেমন ছিল তেমনি আছে।'

বললাম, 'বেশ তো, সেই ঘরেই শোব।'

হোমজি চাকরকে ডেকে হুকুম দিলেন, চাকর চলে গেল, তারপর আটটা বাজলে আমরা খেতে বসলাম। এরি মধ্যে মনে হল যেন কত রাত হয়ে গেছে, চারদিক নিষুতি। বাড়িতে যদি ডাকাত

পড়ে, মা বলতেও নেই, বাপ বলতেও নেই। গল্প শোনার এই উপযুক্ত সময়। বললাম, 'আপনার লোমহর্ষণ কাণ্ড কৈ বললেন না ?'

হোমজি বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভারি রোমাঞ্চকর ব্যাপার। এই বাড়িতেই ঘটেছিল আগেকার দুই মালিকের মধ্যে। বলি শুনুন।'

হোমজি বলতে আরম্ভ করলেন। খাওয়া এবং গল্প একসঙ্গে চলতে লাগল। হোমজি বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে পারেন, তাড়াহুড়ো নেই। তাঁর মাতৃভাষা অবশ্য গুজরাতী, কিন্তু ইংরেজিতেই বরাবর কথাবার্তা চলছিল। গল্পটাও ইংরেজিতেই বললেন। আমি তোমার জন্যে বাংলায় সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করে দিলাম। —

বছর ছয়েক আগে মানেকভাই মেহতা নামে একজন গুজরাতী আর বিজয় বিশ্বাস নামে একজন বাঙালী মহাবলেশ্বরে এই সহ্যাদ্রি হোটেল খুলেছিল। দু'জনে সমান অংশীদার ; মেহতার টাকা আর বিজয় বিশ্বাসের মেহনত। এই নিয়ে হোটেল আরম্ভ হয়।

মানেক মেহতার অনেক কাজ-কারবার, সে মহাবলেশ্বরে থাকত না ; তবে মাঝে মাঝে আসত। বিজয় বিশ্বাসই হোটেলের সর্বেসর্বা ছিলেন। কিন্তু আসলে হোটেলের দেখাশোনা করতেন বিজয় বিশ্বাসের স্ত্রী হৈমবতী। বিজয় বিশ্বাস কেবল ঘরে বসে সিগারেট টানতেন আর হিসেব-নিকেশ করতেন।

মানেক মেহতা লোকটা ছিল প্রচণ্ড পাজি। অবশ্য তখন তার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না, তাকে ভাল করে কেউ চোখে দেখেনি। পরে সব জানা গেল। তার তিনটে বৌ ছিল, একটা গোয়ায়, একটা বম্বেতে, আর একটা আমেদাবাদে। এই তিন জায়গায় বেশির ভাগ সময় সে থাকত। যত রকম বে-আইনী দুষ্কার্য করাই ছিল তার পেশা। বোম্বাই প্রদেশে মদ্যপান নিষিদ্ধ, লোকটি বুটলেগিং করত। বিদেশ থেকে লুকিয়ে সোনা আমদানি করত। অনেকবার তার মাল বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কিন্তু লোকটাকে কেউ ধরতে পারেনি।

বিজয় বিশ্বাসের সঙ্গে মানেক মেহতার জোটপাট কি করে হল বলা যায় না। বিজয় বিশ্বাস লোকটি ও রকম ছিলেন না। যতদূর জানা যায়, বিজয় বিশ্বাস আগে থেকেই হোটেল চালানোর কাজ জানতেন ; হয়তো পুণায় কিম্বা বোম্বাই-এ কিংবা আমেদাবাদে ছোটখাটো হোটেল চালাতেন। তারপর তিনি মানেক মেহতার নজরে পড়ে যান। মানেক মেহতা যে ধরনের ব্যবসা করে তাতে কখনও হাতে অঢেল পয়সা, কখনও ভাঁড়ে মা ভবানী। সে বোধ হয় মতলব করেছিল হোটেল কিনে কিছু টাকা আলাদা করে রাখবে, যাতে সঙ্কটকালে হাতে একটা রেস্ত থাকে। বিজয় বিশ্বাস তার প্রকৃত চরিত্র জানতেন না, সরল মনেই তার অংশীদার হয়েছিলেন।

বিজয় বিশ্বাস আর তাঁর স্ত্রীর ম্যানেজমেন্টে সহ্যাদ্রি হোটেল অল্পকালের মধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে উঠল। মহাবলেশ্বরে হোটেলের মরশুম হচ্ছে আড়াই মাস, টেনেটুনে তিন মাস। কিন্তু এই কয় মাসের মধ্যেই হোটেলের আয় হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ; খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা লাভ থাকে ; মানেক মেহতা মরশুমের শেষে এসে কখনও নিজের ভাগের টাকা নিয়ে যেত, কখনও বা টাকা ব্যাঙ্কেই জমা থাকত।

সোরাব হোমজি প্রতি বছরই গরমের সময় মহাবলেশ্বরে আসতেন এবং সহ্যাদ্রি হোটেলে উঠতেন। হোটেলটি তাঁর খুব পছন্দ। মনে মনে ইচ্ছে ছিল এই রকম একটি হোটেল পেলে নিজে চালাবেন। তিনি পয়সাওয়ালা লোক, জীবিকার জন্য কাজ করবার দরকার নেই। কিন্তু ব্যবসা করার প্রবৃত্তি পার্সীদের মজ্জাগত।

গত বছর মে মাসে হোমজি যথারীতি এসেছেন। পুরনো খদ্দের হিসেবে হোটেলে তাঁর খুব খাতির, স্বয়ং হৈমবতী তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করতেন। হোমজিও হৈমবতীর নিপুণ গৃহস্থালীর জন্যে তাঁকে খুব সম্মান করতেন। একদিন হৈমবতী বিমর্ষভাবে হোমজিকে বললেন, 'শেঠজি, আসছে বছর আপনি যখন আসবেন তখন আমাদের আর দেখতে পাবেন না।'

হোমজি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কি, দেখতে পাব না কেন ?'

হৈমবতী বললেন, 'হোটেল বিক্রি করার কথা হচ্ছে। যিনি আমাদের পার্টনার তিনি হোটেল রাখবেন না। আমরাও চলে যাব। আমার স্বামীর এত ঠাণ্ডা সহ্য হচ্ছে না, আমরা দেশে ফিরে যাব।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলা হোমজি অফিস-ঘরে গিয়ে বিজয় বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করলেন, বললেন, 'আপনারা নাকি হোটেল বিক্রি করছেন ?'

বিজয় বিশ্বাসের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, স্ত্রীর চেয়ে অনেক বড়। একটু কাহিল গোছের চেহারা ; আপাদমস্তক গরম জামাকাপড় পরে, গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে বসে সিগারেট টানছিলেন, হোমজিকে খাতির করে বসালেন। বললেন, 'হ্যাঁ শেঠজি ! আপনি কিনবেন ?'

হোমজি বললেন, 'ভাল দর পেলে কিনতে পারি। আপনার পার্টনার কোথায় ?'

বিশ্বাস বললেন, 'আমার পার্টনার এখন বিদেশে আছেন, তাই আমাকে আমমোক্তারনামা দিয়েছেন। এই দেখুন।' তিনি দেরাজ থেকে পাওয়ার অফ্ অ্যাটর্নি বার করে দেখালেন।

তারপর দর-কষাকষি আরম্ভ হল ; বিজয় বিশ্বাস হাঁকলেন দেড় লাখ, হোমজি বললেন, পঞ্চাশ হাজার। শেষ পর্যন্ত চুরাশি হাজারে রফা হল। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি কেনা তো দু'চার দিনের কাজ নয় ; দলিল দস্তাবেজ তদারক করা, উকিল, অ্যাটর্নির সঙ্গে পরামর্শ করা, রেজিস্ট্রি অফিসে খোঁজ খবর নেওয়া ; এইসব করতে কয়েক মাস কেটে গেল। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হোমজি আর বিজয় বিশ্বাস পুণায় গেলেন ; রেজিস্ট্রারের সামনে হোমজি নগদ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রি করালেন। কথা হল, পয়লা ডিসেম্বর তিনি হোটেলের দখল নেবেন। তারপর হোমজি বোম্বাই গেলেন, বিজয় বিশ্বাস মহাবলেশ্বরে ফিরে এলেন।

হোটেলে তখন অতিথি নেই, একটা চাকরানী ছাড়া চাকরবাকরও বিদেয় হয়েছে। তাই এরপর যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তা কেবল হৈমবতীর জবানবন্দী থেকেই জানা যায়। মানেক মেহতা নিশ্চয় নিজে আড়ালে থাকবার মতলব করেই বিজয় বিশ্বাসকে মোক্তারনামা দিয়েছিল। যেদিন কবালা রেজিস্ট্রি হল, তার পরদিন রাত্রি ন'টার সময় সে সহ্যাদ্রি হোটেলে এসে হাজির। পরে পুলিসের তদন্তে জানা গিয়েছিল মানেক মেহতা মহাবলেশ্বরের বাইরে দু'মাইল দূরে মোটর রেখে পায়ে হেঁটে মহাবলেশ্বরে ঢুকেছিল।

সে যখন পৌঁছল তখন বিজয় বিশ্বাস আর হৈমবতী রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিস-ঘরে বসে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। চাকরানীটা শুতে গিয়েছিল। তখন বেশ শীত পড়ে গেছে। মানেক মেহতার গায়ে মোটা ওভারকোট, মাথায় পশমের মঙ্কি-ক্যাপ। তার ব্যবহার বরাবরই খুব মিষ্টি। সে এসে বলল, 'হৈমাবেন, আমি আজ রাত্রে এখানেই থাকব, আর খাব। সামান্য কিছু হলেই চলবে।'

হৈমবতী খাবারের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরে চলে গেলেন, চাকরানীকে আর জাগালেন না। মানেক মেহতা আর বিজয় বিশ্বাস কাজকর্মের কথা শুরু করলেন। অফিস-ঘরে একটা মজবুত লোহার সিন্দুক ছিল, হোটেল বিক্রির টাকা এবং ব্যাঙ্কের জমা টাকা, সব এই সিন্দুকেই রাখা হয়েছিল। বিজয় বিশ্বাস জানতেন দু'এক দিনের মধ্যেই মেহতা টাকা নিতে আসবে।

হৈমবতী রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভ জ্বেলে ভাজাভুজি তৈরি করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর কান পড়ে রইল অফিস-ঘরের দিকে। রান্নাঘর অফিস-ঘর থেকে বেশি দূর নয়, তার ওপর নিস্তব্ধ রাত্রি। কিছুক্ষণ পরে তিনি শুনতে পেলেন, ওঁরা দু'জন অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে কথা বলতে বলতে হোটেলের পিছন দিকের জমিতে চলে গেলেন। হৈমবতীর একটু আশ্চর্য লাগল ; কারণ তাঁর স্বামী শীত-কাতুরে মানুষ, এত শীতে খোলা হাওয়ায় যাওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু হৈমবতীর মনে কোনও আশঙ্কাই ছিল না, তিনি রান্নাঘর থেকে বেরুলেন না, যেমন রান্না করছিলেন করতে লাগলেন।

তারপর হোটেলের পিছন দিক থেকে একটা চাপা চীৎকারের শব্দ শুনে তিনি একেবারে কাঠ হয়ে গেলেন। তাঁর স্বামীর গলার চীৎকার। ক্ষণকাল স্তম্ভিত অবস্থায় থেকে তিনি ছুটে গেলেন

হোটেলের পিছন দিকে। পিছনের জমিতে যাবার একটা দরজা আছে, হৈমবতী দরজার কাছে পৌঁচেছেন, এমন সময় মানেক মেহতা ওদিক থেকে ঝড়ের মত এসে ঢুকল। হৈমবতীকে সজোরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে সদরের দিকে চলে গেল।

'কি হল ! কি হল !' বলে হৈমবতী পিছনের জমিতে ছুটে গেলেন। সেখানে কেউ নেই। হৈমবতী তখন স্বামীর খোঁজে অফিস-ঘরের দিকে ছুটলেন। সেখানে দেখলেন লোহার সিন্দুকের কবাট খোলা রয়েছে, তার ভিতর থেকে নোটের বাণ্ডিল সব অন্তর্হিত হয়েছে। প্রায় দেড় লাখ টাকার নোট।

এতক্ষণে হৈমবতী প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারলেন ; মানেক মেহতা তাঁর স্বামীকে ঠেলে খাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে আর সমস্ত টাকা নিয়ে পালিয়েছে ! তিনি চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।—

ভাই অজিত, আজ এইখানেই থামতে হল। ঘরের মধ্যে অশরীরীর উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। কাল বাকি চিঠি শেষ করব।

৪ঠা জানুআরি। কাল চিঠি শেষ করতে পারিনি, আজ রাত্রি দশটার পর মোমবাতি জ্বালিয়ে আবার আরম্ভ করেছি। হোমজি খেতে বসে গল্প বলছিলেন। গল্প শেষ হবার আগেই খাওয়া শেষ হল, আমরা বসবার ঘরে উঠে গেলাম। চাকর কফি দিয়ে গেল।

হোমজি আবার বলতে শুরু করলেন। আমি আজ আরও সংক্ষেপে তার পুনরাবৃত্তি করছি।—

হৈমবতীর যখন জ্ঞান হল তখন দশটা বেজে গেছে, ইলেকট্রিক বাতি নিভে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার। হৈমবতী চাকরানীকে জাগালেন, কিন্তু সে রাত্রে বাইরে থেকে কোনও সাহায্যই পাওয়া গেল না। পুলিস এল পরদিন সকালে।

পুলিসের অনুসন্ধানে বোঝা গেল হৈমবতীর অনুমান ঠিক। হোটেলের পিছনে খাদের ধারে মানুষের ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে। দু'চার দিন অনুসন্ধান চালাবার পর আরও অনেক খবর বেরুল। মানেক মেহতা ডুব মেরেছে। সে পাকিস্তান থেকে তিন লক্ষ টাকার সোনা আমদানি করেছিল, কাস্টম্‌সের কাছে ধরা পড়ে যায়। মানেক মেহতা ধরা না পড়লেও একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তাই অংশীদারকে খুন করে সে প্রায় দেড় লাখ টাকা হাতিয়েছে।

এদিকে খাদের তলা থেকে বিজয় বিশ্বাসের লাশ উদ্ধার করা দরকার। কিন্তু এমন দুর্গম এই খাদ যে, সেখানে পৌঁছুনো অতি কষ্টকর ব্যাপার। উপরন্তু সম্প্রতি একজোড়া বাঘ এসে খাদের মধ্যে আড্ডা গেড়েছে। গভীর রাত্রে তাদের হাঁকার শোনা যায়। যাহোক, কয়েকজন পাহাড়ীকে নিয়ে তিনদিন পরে পুলিস খাদে নেমে দেখল বিজয় বিশ্বাসের দেহের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই ; কয়েকটা হাড়গোড় আর রক্তমাখা কাপড়জামা, গলাবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে তারা ফিরে এল। পুলিসের মনে আর কোনও সংশয় রইল না, মানেক মেহতার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া জারি করল।

ক্রমে ১লা ডিসেম্বর এসে পড়ল। নিঃস্ব বিধবার অবস্থা বুঝতেই পারছো। হোমজি দয়ালু লোক, হৈমবতীকে কিছু টাকা দিলেন। হৈমবতী চোখের জল মুছতে মুছতে মহাবলেশ্বর থেকে চিরবিদায় নিলেন।

তারপর মাসখানেক কেটে গেছে। পুলিস এখনও মানেক মেহতার সন্ধান পায়নি। বাঘ আর বাঘিনী কিন্তু এখনও খাদের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের রক্তের স্বাদ তারা পেয়েছে, এ স্থান ছেড়ে যেতে পারছে না।

হোমজির গল্প শুনে মনটা একটু খারাপ হল। বাঙালীর সন্তান সুদূর বিদেশে এসে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তা কপালে সইল না। হৈমবতীর অবস্থা আরও শোচনীয়। মানেক মেহতাকে পুলিস ধরতে পারবে কিনা কে জানে ; ভারতবর্ষের বিশাল জনসমুদ্র থেকে একটি পুঁটিমাছকে ধরা

সহজ নয়।

এই সব ভাবছি এমন সময় ইলেকট্রিক বাতি নিভে গেল। বললাম, 'এ কি!'

হোমজি বললেন, 'দশটা বেজেছে। এখানে রাত্রি দশটার সময় ইলেকট্রিক বন্ধ হয়ে যায়, আবার শেষ রাত্রে কিছুক্ষণের জন্যে জ্বলে!—চলুন, আপনাকে আপনার শোবার ঘরে পৌঁছে দিই।'

হোমজির একটা লম্বা গদার মত ইলেকট্রিক টর্চ আছে, সেটা হাতে নিয়ে তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। দোতলায় এক সারি ঘর, সামনে টানা বারান্দা। সব ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে, কেবল কোণের ঘরের দরজা খোলা। চাকর ঘরে মোমবাতি জ্বেলে রেখে গেছে। (ভাল কথা, এদেশে মোমবাতিকে মেমবাতি বলে; ভারি কবিত্বপূর্ণ নাম, নয়?)

বেশ বড় ঘর; সামনে বারান্দা, পাশে ব্যাল্‌কনি। ঘরের দু'পাশে দু'টো খাট রয়েছে; একটাতে বিছানা পাতা, অন্যটা উলঙ্গ পড়ে আছে। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল আর দু'টো চেয়ার, দেয়ালের গায়ে ঠেকানো ওয়ার্ডরোব। টেবিলের উপর একটি অ্যালার্ম টাইমপীস্। এক বাণ্ডিল মোমবাতি, দেশলাই, একটা থার্মোফ্লাস্কে গরম কফি; রাত্রে যদি তেষ্টা পায়, খাব। হোমজি অতিথি সৎকারের ত্রুটি রাখেননি।

হোমজি বললেন, 'এই ঘরে বিজয় বিশ্বাস স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। হৈমবতী চলে যাবার পর ঘরটা যেমন ছিল তেমনি আছে। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না তো?'

বললাম, 'অসুবিধে কিসের। খুব আরামে থাকব। আপনি যান, এবার শুয়ে পড়ুন গিয়ে। এখানে বোধ হয় সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়াই রেওয়াজ।'

হোমজি হেসে বললেন, 'শীতকালে তাই বটে। কিন্তু সকাল আটটা ন'টার আগে কেউ বিছানা ছাড়ে না। আপনি যদি আগে উঠতে চান, ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখবেন। এই টর্চটা রাখুন, রাত্রে যদি দরকার হয়।'

'ধন্যবাদ।'

হোমজি নেমে গেলেন। আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। মোমবাতির আলোয় ঘরটা অবছায়া দেখাচ্ছে। আমি টর্চটা জ্বালিয়ে ঘরময় একবার ঘুরে বেড়ালাম। আমার সুটকেস চাকর ওয়ার্ডরোবের পাশে রেখে গেছে। ওয়ার্ডরোব খুলে দেখলাম সেটা খালি। এসেন্স-কর্পূর-ন্যাপথলিন মেশা একটা গন্ধ নাকে এল। হৈমবতী এই ওয়ার্ডরোবেই নিজের কাপড়-চোপড় রাখতেন। ঘরের পিছন দিকে একটা সরু দরজা রয়েছে, খুলে দেখলাম গোসলখানা। আবার বন্ধ করে দিলাম। তারপর চেয়ারে এসে বসে সিগারেট ধরালাম।

ঘরের দরজা-জানালা সবই বন্ধ, তবু যেন একটা বরফজমানো ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশিক্ষণ বসে থাকা চলবে না; তাড়াতাড়ি সিগারেট শেষ করে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিলাম, সাড়ে সাতটার সময় ঘুম ভাঙলেই যথেষ্ট। আপ্টে আসবেন ন'টার সময়।

টর্চটা বালিশের পাশে নিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে বিছানায় ঢুকলাম। বিছানায় দু'টো মোটা মোটা গদি, গোটা চারেক বিলিতি কম্বল; একেবারে রাজশয্যা। ক্রমশ কম্বলের মধ্যে শরীর গরম হতে লাগল। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

আশ্চর্য এই যে, প্রথম রাত্রে ঘুমোবার আগে পর্যন্ত অতিপ্রাকৃত কোনও ইশারা-ইঙ্গিত পাইনি।

ঘুম ভাঙল ঝন্‌ঝন্ অ্যালার্মের শব্দে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। ঘর অন্ধকার; কোথায় আছি মনে করতে কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। তারপর মনে পড়ল। কিন্তু—এত শীগ্‌গির সাড়ে সাতটা বেজে গেল! কৈ জানালার শার্সি দিয়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে না তো!

টর্চ জ্বেলে ঘড়ির উপর আলো ফেললাম। চোখে ঘুমের জড়তা রয়েছে, মনে হল ঘড়িতে দু'টো বেজেছে। কিন্তু অ্যালার্ম ঝন্‌ঝন্ শব্দে বেজে চলেছে।

কি রকম হল! আমি কম্বল ছেড়ে উঠলাম, টেবিলের কাছে গিয়ে ঘড়ির উপর আলো ফেলে

দেখলাম—সত্যি দু'টো। তবে অ্যালার্ম বাজল কি করে ? অ্যালার্মের কাঁটা ঘোরাতে কি ভুল করেছি ?

ঘড়িটা হাতে তুলে নিতেই বাজনা থেমে গেল। দেখলাম অ্যালার্মের কাঁটা ঠিকই সাড়ে সাতটার উপর আছে।

হয়তো ঘড়িটাতে গলদ আছে, অসময়ে অ্যালার্ম বাজে। আমি ঘড়ি রেখে আবার বিছানায় ঢুকলাম। অনেকক্ষণ ঘুম এল না। তারপর আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

এই হল প্রথম রাত্রির ঘটনা।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে হোমজিকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনার টাইমপীসে কি অসময়ে অ্যালার্ম বাজে ?'

তিনি ভুরু তুলে বলেন, 'কৈ না ! কেন বলুন তো ?'

বললাম। তিনি শুনে উদ্বিগ্ন মুখে একটু চুপ করে রইলেন ; তারপর বললেন, 'হয়তো সম্প্রতি খারাপ হয়েছে। আমার অন্য একটা অ্যালার্ম ঘড়ি আছে, সেটা আজ রাত্রে আপনাকে দেব।'

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় চাকর একটি চিঠি এনে আমার হাতে দিল।

আপ্টের চিঠি। তিনি লিখেছেন, কাল রাত্রে হঠাৎ পা পিছলে গিয়ে তাঁর পায়ের গোছ মচ্‌কে গেছে, নড়ার ক্ষমতা নেই ; আমরা যদি দয়া করে আসি।

চিঠি হোমজিকে দেখালাম। তিনি মুখে চুক্‌চুক্ শব্দ করে বলেন, 'চলুন, দেখে আসি।'

জিগ্যেস করলাম, 'কতদূর ?'

'মাইল দুই হবে। বাজারের মধ্যে। এখানে মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্কের একটা ব্রাঞ্চ আছে, আপ্টের আত্মীয় তার ম্যানেজার। ব্যাঙ্কের উপরতলায় থাকেন।'

ব্রেকফাস্ট সেরে বেরুলাম। হোমজির একটি ছোটখাটো স্ট্যান্ডার্ড মোটর আছে, তাইতে চড়ে গেলাম ; ব্যাঙ্কের বাড়িটা দোতলা, বাড়ির পাশ থেকে খোলা সিঁড়ি ওপরে উঠেছে। আমরা ওপরে উঠে গেলাম।

আপ্টে বালিশের ওপর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পা তুলে দিয়ে খাটে শুয়ে আছেন, আমাদের দেখে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, 'কী কাণ্ড দেখুন দেখি ! কোথায় আপনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াব, তা নয় একেবারে শয্যাশায়ী।'

আমরা খাটের পাশে চেয়ারে বসলাম, 'কি হয়েছিল ?'

আপ্টে বললেন, 'রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনলাম, দরজায় কে খুট্‌খুট্ করে টোকা মারছে। বিছানা ছেড়ে উঠলাম, কিন্তু দোর খুলে দেখি কেউ নেই। আবার দোর বন্ধ করে ফিরছি, পা মুচড়ে পড়ে গেলাম। বাঁ পা-টা স্প্রেন্ হয়ে গেল।'

'আর কোথাও লাগেনি তো ?'

'না, আর কোথাও লাগেনি। কিন্তু—' আপ্টে একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আশ্চর্য ! আমি হোঁচট খাইনি, পায়ে কাপড়ও জড়িয়ে যায়নি। ঠিক মনে হল কেউ আমাকে পিছন থেকে ঠেলে দিলে।'

আমার কি মনে হল, জিগ্যেস করলাম, 'রাত্রি তখন ক'টা ?'

'ঠিক দু'টো।'

এ বিষয়ে আর কথা হল না, গৃহস্বামী এসে পড়লেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হলেও অনন্তরাও দেশপাণ্ডে বেশ ফূর্তিবাজ লোক। আজকাল ব্যাঙ্কের কাজকর্ম নেই বললেই হয়। তিনি আমাদের সঙ্গে আড্ডা জমালেন। আপ্টের পা ভাঙা নিয়ে খানিকটা ঠাট্টা-তামাশা হল, গরম গরম চিঁড়েভাজা আর পোট্যাটো-চিপ্‌স্ দিয়ে আর এক প্রস্থ কফি হল। তারপর আমরা উঠলাম। আপ্টে কাতরভাবে বললেন, 'ভেবেছিলাম মিস্টার বক্সীকে মহাবলেশ্বর ঘুরিয়ে দেখাব, তা আর হল না। দু'তিন দিন মাটিতে পা রাখতেই পারব না।'

হোমজি বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, আমি ওঁকে মহাবলেশ্বর দেখিয়ে দেব। আমার তো

এখন ছুটি।'

কাল আবার আসব বলে আমরা চলে এলাম। দুপুরবেলা লাঞ্চ খেয়ে হোমজির সঙ্গে বেরুলাম। কাছাকাছি কয়েকটা দর্শনীয় স্থান আছে। একটি হ্রদ আছে, তাতে মোটর-লঞ্চ চড়ে বেড়ালাম। মহাবলেশ্বরের মধু বিখ্যাত, কয়েকটি মধুর কারখানা দেখলাম ; মৌমাছি মধু তৈরি করছে আর মানুষ তাই বিক্রি করে পয়সা রোজগার করছে। মৌমাছিদের খেতে দিতে হয় না, মজুরি দিতে হয় না, একটি ফুলের বাগান থাকলেই হল।

কিন্তু যাক, বাজে কথা লিখে চিঠি বড় করব না। এখনও আসল কথা সবই বাকি। হোমজির কাছ থেকে একটা চিঠির প্যাড় যোগাড় করেছি, তা প্রায় ফুরিয়ে এল।

সে রাত্রে দশটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে শুতে গেলাম। চাকর সব ঠিকঠাক করে রেখে গিয়েছে। দেখলাম পুরনো ঘড়ির বদলে একটা নতুন অ্যালার্ম ঘড়ি রেখে গেছে। আমি এতে আর দম দিলাম না, অ্যালার্মের চাবিটা এঁটে বন্ধ করে দিলাম। অ্যালার্মের দরকার নেই, যখন ঘুম ভাঙবে তখন উঠব।

আলো নেভার আগেই শুয়ে পড়লাম।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, শুয়ে শুয়ে দেখছি একটা চামচিকে ঘরে ঢুকেছে। দরজা-জানালা সব বন্ধ, তাই পালাতে পারেছ না, নিঃশব্দ পাখায় ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। দরজা খুলে তাকে তাড়ানো যায় কিনা ভাবছি, এমন সময় ইলেকট্রিক বাতি নিভে গেল। আর উপায় নেই। জন্তুটা সারারাত্রি পালাবার রাস্তা খুঁজে উড়ে বেড়াবে, হয়তো ক্লান্ত হয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকবে। —

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, ঘুম আসছে না। কাল রাত্রি দু'টোর সময় আমার ঘরে অকারণে অ্যালার্ম ঘড়ি বাজল, আর ঠিক সেই সময় দু'মাইল দূরে আপ্টের পা মচ্‌কালো, দু'টো ঘটনার মধ্যে নৈসর্গিক সম্পর্ক কিছুই নেই। সমাপতন ছাড়া আর কি হতে পারে ? অথচ, আপ্টের পা যদি না মচকাতো, তিনি আজ এই ঘরে অন্য খাটে শুতেন। —চামচিকেটা কি এখনও উড়ে বেড়াচ্ছে ? আমার গায়ে এসে পড়বে না তো ! পড়ে পড়ুক। ইতর প্রাণীকে আমার ভয় নেই। সত্যবতী আরশোলা আর ইঁদুরকে ভয় করে...খোকা ভয় করে টিক্‌টিকিকে...

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কানের কাছে কড় কড় শব্দে কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল। কম্বলের মধ্যে লাফিয়ে উঠলাম। নতুন ঘড়ির অ্যালার্ম বাজছে। এর আওয়াজ আরও উগ্র। কিন্তু অ্যালার্ম বাজার তো কথা নয়, আমি দম দিইনি, চাবি বন্ধ করে দিয়েছি। তবে ?

টর্চ জ্বেলে বিছানা থেকে উঠলাম। ঘড়িতে দু'টো বেজেছে। (অ্যালার্মের চাবি যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ, তবু বাজনা বেজে চলেছে।)

ঘড়ি হাতে তুলে নিতেই বাজনা থেমে গেল। যেমন ঘড়ি তেমনি ঘড়ি, অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক।

অজিত, তুমি জানো, আমি রহস্য ভালবাসি না ; রহস্য দেখলেই আমার মন তাকে ভেঙে চুরে তার অন্তর্নিহিত সত্যটি আবিষ্কার করতে লেগে যায়। কিন্তু এ কী রকম রহস্য ? অলৌকিক ঘটনার প্রতি আমার বুদ্ধি স্বভাবতই বিমুখ, যা প্রমাণ কথা যায় না তা বিশ্বাস করতে আমার বিবেকে বাধে। কিন্তু এ কী ? চক্ষু কর্ণ দিয়ে যাকে প্রত্যক্ষ করছি তার সঙ্গে ঐহিক কিছুরই কোনও সংস্রব নেই। অমূলক কারণহীন ঘটনা চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে।

এর মূল পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। মোমবাতি জ্বাললাম। তোমাকে আগে লিখেছি ঘরে দু'টো চেয়ার আছে। তার মধ্যে একটা সাধারণ খাড়া চেয়ার, অন্যটা দোলনা চেয়ার। আমি গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে নিয়ে দোলনা চেয়ারে বসলাম, সিগারেট ধরিয়ে মৃদু মৃদু দোল খেতে লাগলাম।

দোরের দিকে মুখ করে বসেছি। ডান পাশে টেবিল, বাঁ পাশে দেয়ালে লাগানো ওয়ার্ডরোব, পিছনে আমার খাট। আমি সিগারেট টানতে টানতে দুলছি আর ভাবছি। চামচিকেটা কোথায়

ছিল জানি না, বাতি জ্বলতে দেখে আবার উড়তে আরম্ভ করেছে ; আমার মাথা ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। পাখার শব্দ নেই, কেবল এক টুক্‌রো জমাট অন্ধকার শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সিগারেট শেষ করে চোখ বুজে আছি, ভাবছি কী হতে পারে ? দু'টো ঘড়িতেই বেতালা অ্যালার্ম বাজে ? তবে কি হোমজি আমার সঙ্গে practical joke করছেন। আমি কাল ভূতের কথায় হেসেছিলাম, তাই তিনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। তা যদি হয় তাহলে ঘড়িটার যন্ত্রপাতি খুলে পরীক্ষা করলেই ধরা যাবে। কিন্তু হোমজি বয়স্থ ব্যক্তি, এমন বাঁদুরে রসিকতা করবেন ?

কতক্ষণ চোখ বুজে বসে দোল খাচ্ছিলাম বলতে পারি না, মিনিট পনরোর বেশি নয় ; চোখ খুলে চমকে গেলাম। দোলনা চেয়ারটা দুলতে দুলতে ঘুরে গেছে ; আমি দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলাম, এখন ওয়ার্ডরোবের দিকে মুখ করে বসে আছি। শুধু তাই নয়, ওয়ার্ডরোবের খুব খাছে এসে পড়েছি।

চেয়ার ঘুরে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কিন্তু রাত দু'টোর সময় একলা ঘরে এরকম ব্যাপার ঘটলে স্নায়ুমণ্ডলে ধাক্কা লাগে। আমারও লেগেছিল। তার ওপর ঘড়িটা আবার পিছন দিক্ থেকে ঝন্‌ঝন্ শব্দে বেজে উঠল। আমি লাফিয়ে উঠে ঘড়িটা বন্ধ করতে গেলাম, মোমবাতি নিভে গেল।

বোঝো ব্যাপার ! আমার স্নায়ু যদি দুর্বল হত, তাহলে কি করতাম বলা যায় না। কিন্তু আমি দেহটাকে শক্ত করে স্নায়ুর উৎকণ্ঠা দমন করলাম। আমার গায়ের কম্বলের বাতাস লেগে হয়তো মোমবাতি নিভেছে। আমি আবার মোমবাতি জ্বাললাম। ঘড়িটা হাতে নিতেই তার বাজনা থেমে গেল।

কিন্তু ঘড়িকে আর বিশ্বাস নেই। আমি সেটাকে হাতে নিয়ে ওয়ার্ডরোবের কাছে গেলাম। ওয়ার্ডরোবে আমার কাপড়-চোপড় রেখেছি, তার মধ্যে ঘড়ি চাপা দিয়ে রাখব। তারপর ঘড়ি যত বাজে বাজুক।

ওয়ার্ডরোবের কপাট খুলতেই সেন্ট-কর্পূর-ন্যাপথলিন মেশা গন্ধটা নাকে এল। আমি ঘড়িটাকে আমার জামা-কাপড়ের তলায় গুঁজে দিয়ে কপাট বন্ধ করে দিলাম।

আড়াইটে বেজেছে, এখনও অর্ধেক রাত বাকি। আমি আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

মস্তিষ্ক গরম হয়েছে ; তন্দ্রা আসছে, আবার ছুটে যাচ্ছে। ঘড়িটা ওআর্ডরোবের মধ্যে বাজছে কিনা শুনতে পাচ্ছি না। তারপর ক্রমে বোধ হয় ঘুম এসে গিয়েছিল। —

বিকট চীৎকার করে জেগে উঠলাম। কম্বলের মধ্যে আমার পেটের কাছে একটা কিছু কিল্‌বিল করছে। টিকটিকি কিংবা ব্যাঙ কিংবা চামচিকে। একটানে কম্বল সরিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলাম ; টর্চ জ্বাললাম, মোমবাতি জ্বাললাম। বিছানায় কোনও জন্তু-জানোয়ার নেই। চামচিকেটাও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। হাতঘড়িতে দেখলাম রাত্রি সাড়ে তিনটে।

বাকি রাত্রিটা টেবিলের সামনে খাড়া চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলাম। আর ঘুমোবার চেষ্টা বৃথা।

চিঠি ভীষণ লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ভৌতিক অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। এবার চটপট শেষ করব।

পাঁচটার সময় ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠলো।

আমি ওয়ার্ডরোব খুলে ঘড়ি বার করলাম। ঘড়ির সঙ্গে একটা বাদামী কাগজের চিল্‌তে বেরিয়ে এল। তাতে বাংলা হরফে একটা ঠিকানা লেখা আছে। কলকাতার দক্ষিণ সীমানার একটা ঠিকানা। ঠিকানাটা নকল করে পাঠালাম, তোমার দরকার হবে।

আমার স্কাউট-ছুরি দিয়ে ঘড়িটা খুললাম। যন্ত্রপাতির কোনও গণ্ডগোল নেই। সহজ ঘড়ি।

আমি সত্যান্বেষী। সত্যকে স্বীকার করতে আমি বাধ্য, তা সে লৌকিক সত্যই হোক, আর অলৌকিক সত্যই হোক। কায়াহীনকে সম্বোধন করে বললাম, 'তুমি কী চাও ?'

উত্তর এল না, কেবল টেবিলটা নড়ে উঠল। আমি টেবিলের ওপর হাত রেখে বসেছিলাম।

বললাম, 'তুমি কি চাও আমি তোমার মৃত্যুর তদন্ত করি ?'

এবার টেবিল তো নড়লই, আমি যে চেয়ারে বসেছিলাম তার পিছনে পায়াদু'টো উঁচু হয়ে উঠল। আমি প্রায় টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

বললাম, 'বুঝেছি। কিন্তু পুলিস তো তদন্ত করছেই। আমি করলে কী সুবিধে হবে ? আমি কোথায় তদন্ত করব ?'

ঘড়িটা চড়াং করে একবার বেজেই থেমে গেল। ঠিকানা লেখা বাদামী কাগজের চিল্‌তেটো টেবিলের একপাশে রাখা ছিল, সেটা যেন হাওয়া লেগে আমার সামনে সরে এল।

আমার মাথায় একটা আইডিয়া এল। মানেক মেহ্‌তা কি বাংলাদেশে গিয়ে লুকিয়ে আছে ? আশ্চর্য নয়। একলা লুকিয়ে আছে ? কিংবা—

বললাম, 'হুঁ, আচ্ছা, চেষ্টা করব।'

এই সময় ইলেকট্রিক বাতি নিভে গেল ; দেখলাম জানালার শার্সি দিয়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে।

হোমজিকে কিছু বললাম না। ন'টার সময় দু'জনে আপ্টেকে দেখতে গেলাম। মোটরে যেতে যেতে হোমজিকে জিগ্যেস করলাম, 'হৈমবতীর চেহারা কেমন ?'

হোমজি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন, বললেন, 'ভাল চেহারা। রঙ খুব ফরসা নয়, কিন্তু ভারি চটকদার চেহারা।'

'বয়স ?'

'হয়তো ত্রিশের কিছু বেশি। কিন্তু দীর্ঘযৌবনা, শরীরের বাঁধুনি ঢিলে হয়নি।'—

আপ্টের পা কালকের চেয়ে ভাল, কিন্তু এখনও হাঁটতে পারেন না। গৃহস্বামী অনন্তরাও দেশপাণ্ডের সঙ্গেও দেখা হল। তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম—

'আপনি বিজয় বিশ্বাসকে চিনতেন ?'

'চিনতাম বৈকি। সহ্যাদ্রি হোটেলের সব টাকাই আমার ব্যাঙ্কে ছিল।'

'কত টাকা ?'

'সীজনের শেষে প্রায় পঁতাল্লিশ হাজার দাঁড়িয়েছিল।'

'বিজয় বিশ্বাসের নিজের আলাদা কোনও অ্যাকাউন্ট ছিল ?'

'ছিল। আন্দাজ দু'হাজার টাকা। কিন্তু মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি প্রায় সব টাকা বার করে নিয়েছিলেন। শ'খানেক টাকা পড়ে আছে।'

'তাঁর স্ত্রী যাবার আগে সে টাকা বার করে নেননি ?'

'স্ত্রী যতক্ষণ কোর্ট থেকে ওয়ারিশ সাব্যস্ত না হচ্ছেন, ততক্ষণ তো তাঁকে টাকা দিতে পারি না।'

'হৈমবতী এখন কোথায় ? তাঁর ঠিকানা জানেন ?'

'না।'

'আর কেউ জানে ?'

হোমজি বললেন, 'বোধ হয় না। যাবার সময় তিনি নিজেই জানতেন না কোথায় যাবেন।'

আমি আপ্টেকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি নিশ্চয় এ মামলার খবর রাখেন। মানেক মেহ্‌তার কোনও সন্ধান পাওয়া গেছে ?'

তিনি বললেন, 'না। সন্ধান পাওয়া গেলে আমি জানতে পারতাম।'

'মানেক মেহ্‌তার ফটোগ্রাফ আছে ?'

'একটা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ ছিল। সহ্যাদ্রি হোটেল যখন আরম্ভ হয় তখন মানেক মেহ্‌তা, বিজয় বিশ্বাস আর হৈমবতী একসঙ্গে ছবি তুলিয়েছিল। কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি।'

হোটেলে ফিরে এসে দুপুরবেলা খুব ঘুমোলাম। রাত্রে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম,

কিন্তু বার বার বাধা পেয়ে শেষ করতে পারিনি। বিদেহাত্মা আমার এই চিঠি লেখাতে সন্তুষ্ট নয়, অথচ সে কী চায় বোঝাতে পারছে না। যাহোক, আজ চিঠি শেষ করব।

এতখানি ভণিতার কারণ বোধ হয় বুঝতে পেরেছ। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের যে ঠিকানা দিলাম তুমি সেখানে যাবে। যদি সেখানে হৈমবতী বিশ্বাসের দেখা না পাও তাহলে কিছু করবার নেই। কিন্তু যদি দেখা পাও, তাহলে তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করবে : মানেক মেহ্‌তার সঙ্গে তাঁদের যে গ্রুপ-ফটো তোলা হয়েছিল সেটা কোথায় ? মানেক মেহ্‌তার সঙ্গে হৈমবতীর বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা জানবার চেষ্টা করবে। কবে কোথায় বিশ্বাসদের সঙ্গে মেহ্‌তার পরিচয় হয়েছিল ? হৈমবতীর আর্থিক অবস্থা এখন কেমন ? বাড়িতে কে কে আছে—সব খবর নেবে। যে প্রশ্নই তোমার মনে আসুক জিগ্যেস করবে। তারপর সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাকে লিখে জানাবে ; কোনও কথা তুচ্ছ বলে বাদ দেবে না। যদি সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে টেলিগ্রাম করে আমাকে জানাবে।

তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকব। এখানে এই দারুণ শীতে বেশিদিন থাকার ইচ্ছে নেই, কিন্তু এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যেতেও পারছি না।

আশা করি খোকা ও সত্যবতী ভাল আছে এবং তুমি ইনফ্লুয়েঞ্জা ঝেড়ে ফেলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছ।

ভালবাসা নিও।

—তোমার ব্যোমকেশ

কলিকাতা
৮ই জানুআরি

ভাই ব্যোমকেশ,

তোমার চিঠি আজ সকালে পেয়েছি এবং রাত্রে বসে জবাব লিখছি। হায় নাস্তিক, তুমি শেষে ভূতের খপ্পরে পড়ে গেলে ! সত্যবতী জানতে চাইছে, ভূত বটে তো ? পেত্নী নয় ? ওদিকের পেত্নীরা নাকি ভারি জাঁহাবাজ হয়।

যাক, বাজে কথা লিখে পুঁথি বাড়াব না। তোমার নির্দেশ অনুযায়ী আজ বেলা তিনটে নাগাদ বাসা থেকে বেরুচ্ছি, বিকাশ দত্ত এল। আমি কোথায় যাচ্ছি শুনে সে বলল, 'আরে সর্বনাশ, সে যে ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুর। পথ চিনে যেতে পারবেন ?'

বললাম, 'তুমি চল না।' বিকাশ রাজী হল। তাকে সব বললাম না, মোটামুটি একটা আন্দাজ দিলাম।

দু'জনে চললাম। সত্যি ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুর। ট্রামে বাসে কলকাতার দক্ষিণ সীমানা ছাড়িয়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম সেখানে কেবল একটি লম্বা রাস্তা চলে গিয়েছে। রাস্তায় দু'তিন শো গজ অন্তর একটা বাড়ি। শেষ পর্যন্ত বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটের সময় নির্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হলাম। রাস্তা থেকে খানিক পিছিয়ে ছোট একতলা বাড়ি ; চারিদিকে খোলা মাঠ। বিকাশকে বললাম, 'তুমি রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে বিড়ি খাও। আমি এখনি ফিরতে পারি, আবার ঘণ্টাখানেক দেরি হতে পারে।'

বাড়ির সদর দরজা বন্ধ, আমি গিয়ে কড়া নাড়লাম। একটা চাকর এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। বলল, 'কাকে চান ?'

বললাম, 'শ্রীমতী হৈমবতী বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনার নাম ?'

'অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'কী দরকার ?'

'সেটা শ্রীমতী বিশ্বাসকেই বলব। তুমি তাঁকে বোলো মহাবলেশ্বর থেকে চিঠি পেয়ে

এসেছি।'

'আজ্ঞে। একটু দাঁড়ান।' বলে চাকরটা দরজা বন্ধ করে দিল।

দশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি ; সাড়াশব্দ নেই। তারপর দরজা খুলল। চাকরটা বলল, 'আসুন।'

বাড়িতে ঢুকেই ঘর। আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই, দু'টো চেয়ার, একটা টেবিল। চাকর বলল, 'আজ্ঞে বসুন। গিন্নী ঠাকরুন চান করছেন, এখনি আসবেন।'

একটা চেয়ারে বসলাম। বসে আছি তো বসেই আছি। চাকরটা এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করছে, বোধহয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আজকাল কলকাতার যা ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, অচেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দিতে ভয় হয়। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা যা-কিছু হতে পারে।

বসে বসে ভাবলাম, গিন্নী ঠাকরুনের স্নান যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ চাকরটাকে নিয়েই একটু নাড়াচাড়া করি। বললাম, 'তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ ?'

চাকরটা অন্দরের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞে, এই তো একমাসও এখনও হয়নি।'

দেখলাম লোকটির কথায় একটু পূর্ববঙ্গের টান আছে।

'তোমার দেশ কোথায় ?'

'ফরিদপুর জেলায়'—বলে সে চৌকাঠের ওপর উবু হয়ে বসল। আধবয়সী লোক, মাথায় কদমছাঁট চুল, গায়ে একটা ছেঁড়া ময়লা রঙের সোয়েটার।

'কতদিন কলকাতায় আছ ?'

'তা তিন বছর হতে চলল।'

'এখানে—মানে এই বাড়িতে—ক'জন মানুষ থাকে ?'

'গিন্নী ঠাকরুন একলা থাকেন।'

'স্ত্রীলোক—একলা থাকেন। পুরুষ কেউ নেই ?'

'আজ্ঞে না। আমি বুড়োমানুষ, দেখাশুনা করি।'

'এখানে কারুর যাওয়া-আসা আছে ?'

'আজ্ঞে না, আপনিই পেরথম এলেন।'

এই সময় হৈমবতীকে দোরের কাছে দেখা গেল। চাকরটা উঠে দাঁড়াল, আমিও দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে দিনের আলো কমে গিয়েছিল, তিনি চাকরকে বললেন, 'মহেশ, আলো জ্বেলে নিয়ে এস।'

চাকর চলে গেল। অল্প আলোতেও মহিলাটিকে দেখার অসুবিধা ছিল না। দীঘল চেহারা, সুশ্রী মুখ, পার্সীদের চোখে খুব ফরসা না লাগলেও আমার চোখে বেশ ফরসা। মুখে একটি চিত্তাকর্ষক সৌকুমার্য আছে। যৌবনের চৌকাঠ পার হতে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পরনে সাদা থান, গায়ে একটিও অলঙ্কার নেই। কবিত্ব করছি না, কিন্তু তাঁর সদ্যস্নাত চেহারাটি দেখে বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যার রজনীগন্ধার কথা মনে পড়ে যায়।

আমি হাতজোড় করে নমস্কার করলাম ; তিনি প্রতিনমস্কার করে বললেন, 'আপনি মহাবলেশ্বর থেকে আসছেন ?'

আমি বললাম, 'না, আমার বন্ধু ব্যোমকেশ বক্সী মহাবলেশ্বরে আছেন, তাঁর চিঠি পেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'তবে কি মানেক মেহতা ধরা পড়েছে ?' তাঁর কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ফুটে উঠল।

বললাম, 'না, এখনও ধরা পড়েনি।'

হৈমবতী আস্তে আস্তে চেয়ারে বসলেন, নিরাশ স্বরে বললেন, 'বসুন। আমার কাছে এসেছেন কেন ?'

আমি বসলাম, বললাম, 'আমার বন্ধু ব্যোমকেশ বক্সী—'

তিনি বললেন, 'ব্যোমকেশ বক্সী কে ? পুলিসের লোক ?'

'না। ব্যোমকেশ বক্সীর নাম শোনেননি'—এই বলে তোমার পরিচয় দিলাম। তাঁর মুখ

নিরুৎসুক হয়ে রইল। দেখা যাচ্ছে তুমি নিজেকে যতটা বিখ্যাত মনে কর, ততটা বিখ্যাত নও।
সব শুনে হৈমবতী বললেন, 'আমি জানতুম না। সারা জীবন বিদেশে কেটেছে—'

এই সময় মহেশ চাকর একটা লণ্ঠন এনে টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। বলা বাহুল্য, বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই।

লণ্ঠনের আলোয় হৈমবতীর মুখ আরও স্পষ্টভাবে দেখলাম। ব্যথিত আশাহত মুখ ক্লান্তিভরে থমথম করছে, দু'একগাছি ভিজে চুল কপালে গালে জুড়ে রয়েছে। আমার মন লজ্জিত হয়ে উঠল ; এই শোক-নিষিক্তা মহিলাকে বেশি কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, তাড়াতাড়ি প্রশ্নগুলো শেষ করে চলে যাওয়াই কর্তব্য। বললাম, 'আমাকে মাফ করবেন। মানেক মেহতাকে ধরবার উদ্দেশ্যেই ব্যোমকেশ আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে পাঠিয়েছে।—মানেক মেহতার সঙ্গে আপনাদের প্রথম পরিচয় কবে হয় ?'

হৈমবতী বললেন, 'ছয় বছর আগে। আমাদের তখন আমেদাবাদে ছোট্ট একটি হোটেল ছিল। কি কুক্ষণেই যে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল !'

'মানেক মেহতার সঙ্গে আপনার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল ?'

'আমার সঙ্গে তার সর্বসাকুল্যে পাঁচ-ছয় বারের বেশি দেখা হয়নি। বছরের মধ্যে একবার কি দু'বার আসত ; চুপিচুপি আসত, নিজের ভাগের টাকা নিয়ে চুপিচুপি যেত।'

'তার এই চুপিচুপি আসা-যাওয়া দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে আপনাদের কোন সন্দেহ হয়নি ?'

'না। আমরা ভাবতাম তার স্বভাবই ওই রকম, নিজেকে জাহির করতে চায় না।'

'তার কোনও ফটোগ্রাফ আছে কি ?'

'একটা গ্রুপ-ফটো ছিল, সহ্যাদ্রি হোটেলের অফিসে টাঙানো থাকত। সে রাত্রে আমি মূর্ছা ভেঙে দেখলুম দেয়ালে ছবিটা নেই।'

'সে রাত্রে হোটেলের লোহার সিন্দুকে কত টাকা ছিল ?'

'ঠিক জানি না। আন্দাজ দেড় লাখ !'

অতঃপর আর কি প্রশ্ন করব ভেবে পেলাম না। আমি উঠি-উঠি করছি, হৈমবতী আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আমি এখানে আছি আপনার বন্ধু জানলেন কি করে ? আমি তো কাউকে জানাইনি।'

উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। মহিলাটির বর্তমান মানসিক অবস্থায় ভূতপ্রেতের অবতারণা না করাই ভাল। বললাম, 'তা জানি না, ব্যোমকেশ কিছু লেখেনি। আপনি উপস্থিত এখানেই আছেন তো ?'

হৈমবতী বললেন, 'বোধ হয় আছি। আমার স্বামীর এক বন্ধু তাঁর এই বাড়িতে দয়া করে থাকতে দিয়েছেন।—আসুন, নমস্কার।'

বাইরে এসে দেখলাম অন্ধকার হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে গাছের তলায় বিড়ির মুখে আগুন জ্বলছে, তাই দেখে বিকাশের কাছে গেলাম। তারপর দু'জনে ফিরে চললাম। ভাগ্যক্রমে খানিক দূর যাবার পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বিকাশ বলল, 'কাজ হল ?'

এই কথা আমিও ভাবছিলাম। হৈমবতীর দেখা পেয়েছি বটে, তাঁকে প্রশ্নও করেছি ; কিন্তু কাজ হল কি ? মানেক মেহতা এখন কোথায় তার কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া গেল কি ? বললাম, 'কতকটা হল।'

বিকাশ খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি যখন ব্যোমকেশবাবুকে চিঠি লিখবেন, তখন তাঁকে জানাবেন যে, শোবার ঘরে দু'টো খাট আছে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি জানলে কি করে ?'

বিকাশ বলল, 'আপনি যখন মহিলাটির সঙ্গে কথা বলছিলেন আমি তখন বাড়ির সব জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি।'

'তাই নাকি ! আর কি দেখলে ?'

'যা কিছু দেখলাম, শোবার ঘরেই দেখলাম। অন্য ঘরে কিছু নেই।'

'কী দেখলে ?'

'একটা মাঝারি গোছের লোহার সিন্দুক আছে। আমি যখন কাচের ভেতর দিয়ে উঁকি মারলাম, তখন চাকরটা সিন্দুকের হাতল ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করছিল।'

'চাকরটা ! ঠিক দেখেছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সে যখন সদর দরজা খুলেছিল তখন আমি তাকে দেখেছিলাম। সে ছাড়া বাড়িতে অন্য পুরুষ নেই।'—

তারপর লেকের কাছাকাছি এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। বিকাশ নিজের রাস্তা ধরল, আমি বাসায় ফিরে এলাম। রাত্রে বসে চিঠি লিখছি, কাল সকালে ডাকে দেব।

তুমি কেমন আছ ? সত্যবতী আর খোকা ভাল আছে। আমি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছি।

—তোমার অজিত

* * *

আমি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনীর শেষাংশ লিখিতেছি। ব্যোমকেশের নামে সহ্যাদ্রি হোটেলের ঠিকানায় চিঠি লিখিয়া ডাকে দিয়াছিলাম ৯ তারিখের সকালে। ১২ তারিখের বিকালবেলা অনুমান তিনটার সময় ব্যোমকেশ আসিয়া উপস্থিত। সবিস্ময়ে বলিলাম, 'একি ! আমার চিঠি পেয়েছিলে ?'

'চিঠি পেয়েই এলাম। প্লেনে এসেছি।—তুমি চটপট তৈরি হয়ে নাও, এখুনি বেরুতে হবে।'—বলিয়া ব্যোমকেশ ভিতর দিকে চলিয়া গেল।

আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় বাড়ির সামনে পুলিসের ভ্যান দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে একজন ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন কন্‌স্টেবল। আমরাও ভ্যানে উঠিয়া বসিলাম।

কয়েকদিন আগে যে সময় হৈমবতীর নির্জন গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম, প্রায় সেই সময় আবার গিয়া পৌঁছিলাম। আজ কিন্তু ভৃত্য মহেশ দরজা খুলিয়া দিতে আসিল না। দরজা খোলাই ছিল। আমরা সদলবলে প্রবেশ করিলাম।

বাড়িতে কেহ নাই ; হৈমবতী নাই, মহেশ নাই। কেবল আসবাবগুলি পড়িয়া আছে ; বাহিরের ঘরে চেয়ার-টেবিল, শয়নকক্ষে দু'টি খাট ও লোহার সিন্দুক, রান্নাঘরে হাঁড়ি কলসী। লোহার সিন্দুকের কপাট খোলা, তাহার অভ্যন্তর শূন্য। ব্যোমকেশ করুণ হাসিয়া ইন্সপেক্টরের পানে চাহিল,—'চিড়িয়া উড়েছে।'—

সে রাত্রে নৈশ ভোজন সম্পন্ন করিয়া ব্যোমকেশ ও আমি তক্তপোশের উপর গায়ে আলোয়ান জড়াইয়া বসিয়াছিলাম। সত্যবতী খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া আসিয়া ব্যোমকেশের গা ঘেঁষিয়া বসিল। একটা শীতের হাওয়া উঠিয়াছে, হাওয়ার জোর ক্রমেই বাড়িতেছে। আমাদের ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ, তবু কোন্ অদৃশ্য ছিদ্রপথে ছুঁচের মত বাতাস প্রবেশ করিয়া গায়ে বিঁধিতেছে।

বলিলাম, 'মহাবলেশ্বরের শীত তুমি খানিকটা সঙ্গে এনেছ দেখছি। আশা করি বিজয় বিশ্বাসের প্রেতটিকেও সঙ্গে আনোনি।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের কাছে আর একটু ঘেঁষিয়া বসিল। ব্যোমকেশ আমার পানে একটি সকৌতুক দৃষ্টি হানিয়া বলিল, 'প্রেত সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা এখনও যায়নি।'

বলিলাম, 'প্রেত সম্বন্ধে আমার ভুল ধারণা থাকা বিচিত্র নয়, কারণ প্রেতের সঙ্গে আমি কখনও রাত্রিবাস করিনি। আচ্ছা ব্যোমকেশ, সত্যিই তুমি ভূত বিশ্বাস কর ?'

'যা প্রত্যক্ষ করেছি তা বিশ্বাস করা-না-করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তুমি ব্যোমকেশ বক্সীর অস্তিত্বে বিশ্বাস কর ?'

'ব্যোমকেশ বক্সীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি কারণ তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু

ভূত তো চোখে দেখিনি, বিশ্বাস করি কি করে ?'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না। কিন্তু আমি যদি বিশ্বাস করি, তুমি আপত্তি করবে কেন ?'

কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করিলাম।

'আচ্ছা, ওকথা যাক। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর। কিন্তু তোমার ভূতের এত চেষ্টা সত্ত্বেও কার্যসিদ্ধি হল না।'

'কে বলে কার্যসিদ্ধি হয়নি ? ভূত চেয়েছিল মস্ত একটা ধোঁকার টাটি ভেঙে দিতে। তা সে দিয়েছে।'

'তার মানে ?'

'মানে কি এখনও কিছুই বোঝোনি ?'

'কেন বুঝব না ? প্রথমে অবশ্য আমি হৈমবতীর চরিত্র ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝেছি হৈমবতী আর মানেক মেহতা মিলে বিজয় বিশ্বাসকে খুন করেছিল। হৈমবতী একটি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ।'

'হৈমবতীর চরিত্র ঠিকই বুঝেছ। কিন্তু ভূতকে এখনও চেনোনি। ভূতের রহস্য আরও সাংঘাতিক।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের আরও কাছে সরিয়া গেল, হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমার শীত করছে।'

'শীত করছে, না ভয় করছে।' ব্যোমকেশ হাসিয়া নিজের আলোয়ানের অর্ধেকটা তাহার গায়ে জড়াইয়া দিল।

বলিলাম, 'এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বসো। বুড়ো বয়সে লজ্জা করে না !'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমাকে আবার লজ্জা কি ! তুমি তো অবোধ শিশু।'

সত্যবতী সায় দিয়া বলিল, 'নয়তো কি ! যার বিয়ে হয়নি সে তো দুধের ছেলে।'

বলিলাম, 'আচ্ছা আচ্ছা, এখন ভূতের কথা হোক। আমি কিছুই বুঝিনি, তুমি সব খোলসা করে বল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আগে তোমাকে দু' একটা প্রশ্ন করি। মানেক মেহতা বিজয় বিশ্বাসকে খুন করবার জন্যে খাদের ধারে নিয়ে গেল কেন ? বিজয় বিশ্বাস বা গেল কেন ?'

চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'জানি না।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন। বিজয় বিশ্বাসের নামে ব্যাঙ্কে হাজার দুই টাকা ছিল। হোটেল বিক্রি হবার আগেই সে টাকা বার করে নিয়েছিল কেন ?'

'জানি না।'

'তৃতীয় প্রশ্ন। তুমি যখন হৈমবতীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে, তখন শীতের সন্ধ্যে হয়-হয়। চাকর যখন বলল হৈমবতী স্নান করছেন, তখন তোমার খট্‌কা লাগল না ?'

'না। মানে—খেয়াল করিনি।'

'চতুর্থ প্রশ্ন। চাকরটাকে সন্দেহ হয়নি ?'

'না। চাকরটাকে সন্দেহ করার কোনও কারণ হয়নি। সে পূর্ববঙ্গের লোক, মাত্র কয়েকদিন হৈমবতীর চাকরিতে ঢুকেছিল। অবশ্য একথা যদি সত্যিই হয় যে সে লোহার সিন্দুক খোলবার চেষ্টা করছিল—'

'অজিত, তোমার সরলতা সত্যিই মর্মস্পর্শী। চাকরটা সিন্দুক খোলবার উদ্যোগ করেছিল বটে, কিন্তু চুরি করবার জন্যে নয়।—মহাবলেশ্বরে দু'জন লোক খুন করবার ষড়যন্ত্র করেছিল, তার মধ্যে একজন হচ্ছে হৈমবতী। অন্য লোকটি কে ?'

'মানেক মেহতা ছাড়া আর কে হতে পারে ?'

ব্যোমকেশ কুটিল হাসিয়া বলিল, 'ঐখানেই ধাপ্পা—প্রচণ্ড ধাপ্পা। হৈমবতী ষড়যন্ত্র করেছিল

তার স্বামীর সঙ্গে, মানেক মেহতার সঙ্গে নয়। হৈমবতীর আর যে দোষই থাক, সে পতিব্রতা নারী, তাতে সন্দেহ নেই।'

হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম, 'কী বলছ তুমি!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যা বলছি মন দিয়ে শোনো।—হোমজি যখন আমাকে গল্পটা বললেন তখন আমার মনে বিশেষ দাগ কাটেনি। তবু একটা খট্‌কা লেগেছিল : মানেক মেহতা বিজয় বিশ্বাসকে খুন করবার জন্যে খাদের ধারে নিয়ে গেল কেন? বিজয় শীত-কাতুরে লোক ছিল, সে-ই বা গেল কেন?

'তারপর ভূতের উৎপাত শুরু হল। দায়ে পড়ে অনুসন্ধান শুরু করলাম। খট্‌কা ক্রমে সন্দেহে পরিণত হতে লাগল। তারপর ওয়ার্ডরোবের মধ্যে পেলাম একটুকরো বাদামী কাগজে একটা ঠিকানা; বাংলা অক্ষরে লেখা কলকাতার উপকণ্ঠের একটা ঠিকানা। আমার মনের অন্ধকার একটু একটু করে দূর হতে লাগল।

'তোমাকে লম্বা চিঠি লিখলাম। তারপর তোমার উত্তর যখন পেলাম তখন আর কোনও সংশয় রইল না। আপ্টে সাহেবকে সব কথা বললাম। তিনি তখনও ঠ্যাং নিয়ে পড়ে আছেন, কিন্তু তখনই কলকাতার পুলিসকে টেলিগ্রাম করলেন এবং আমার প্লেনে আসার ব্যবস্থা করে দিলেন।

'হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাসকে ধরা গেল না বটে, কিন্তু প্রেতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, আসল অপরাধী কারা তা জানা গেছে। বলা বাহুল্য, যে প্রেতটা নাছোড়বান্দা হয়ে আমাকে ধরেছিল সে মানেক মেহতা।'

সত্যবতী বলিল, 'সত্যি কি হয়েছিল বল না গো!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যি কি হয়েছিল তা জানে কেবল হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস। আমি মোটামুটি যা আন্দাজ করেছি, তাই তোমাদের বলছি।'

সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল।—'মানেক মেহতা ছিল নামকাটা বদমাশ, আর বিজয় বিশ্বাস ছিল ভিজে বেড়াল। একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে। দু'জনে মিলে হোটেল খুলল। মেহতার টাকা, বিশ্বাসদের মেহনত।

'স্ত্রী-পুরুষে হোটেল চালাচ্ছে, হোটেল বেশ জাঁকিয়ে উঠল। প্রতি বছর ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হয়। মেহতা মাঝে মাঝে এসে নিজের ভাগের টাকা নিয়ে যায়। বিজয় বিশ্বাস নিজের ভাগের টাকা মহাবলেশ্বরের ব্যাঙ্কে বেশি রাখে না, বোধ হয় স্ত্রীর নামে অন্য কোথাও রাখে। হয়তো কলকাতারই কোনও ব্যাঙ্কে হৈমবতীর নামে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা জমা আছে, ওরা দু'জনে ছাড়া আর কেউ তার সন্ধান জানে না।

'এইভাবে বেশ চলছিল, গত বছর মানেক মেহতা বিপদে পড়ে গেল। তার বে-আইনী সোনার চালান ধরা পড়ে গেল। তাকে পুলিস জড়াতে পারল না বটে, কিন্তু অত সোনা মারা যাওয়ায় সে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। তখন তার একমাত্র মূলধন—হোটেল; মানেক মেহতা ঠিক করল সে হোটেল বিক্রি করবে। তার নগদ টাকা চাই।

'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হোটেল বিক্রির টাকা কে পাবে। একলা মেহতা পাবে, না, বিজয় বিশ্বাসেরও বখরা আছে? ওদের পার্টনারশিপের দলিল আমি দেখিনি। অনুমান করা যেতে পারে যে মানেক মেহতা যখন হোটেল কেনার টাকা দিয়েছিল, তখন হোটেল বিক্রির টাকাটাও পুরোপুরি তারই প্রাপ্য। আমার বিশ্বাস, মেহতা সব টাকাই দাবি করেছিল।

'হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস ঠিক করল সব টাকা ওরাই নেবে। ওদের পূর্ব ইতিহাস কিছু জানা যায় না, কিন্তু ওদের প্রকৃতি যে স্বভাবতই অপরাধপ্রবণ তাতে আর সন্দেহ নেই। দু'জনে মিলে পরামর্শ করল। মানেক মেহতা পুলিসের নজরলাগা দাগী লোক, তার ঘাড়ে অপরাধের ভার চাপিয়ে দেওয়া সহজ। স্বামী-স্ত্রী মিলে নিপুণভাবে প্ল্যান গড়ে তুলল।

'কলকাতার উপকণ্ঠে তখন কি ভাবে ওরা বাসা ঠিক করেছিল, আমি জানি না। হয়তো কলকাতার কোনও পরিচিত লোকের মারফত বাসা ঠিক করেছিল। হৈমবতী বাসার ঠিকানা কাগজে লিখে ওয়ার্ডরোবের মধ্যে গুঁজে রেখেছিল, পাছে ঠিকানা ভুলে যায়। পরে অবশ্য ঠিকানা তাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, তাই হৈমবতী যাবার সময় বাদামী কাগজের টুকরোটা ওয়ার্ডরোবেই ফেলে যায়। কাঠের ওয়ার্ডরোবে বাদামী কাগজের টুকরোটা বোধহয় চোখে পড়েনি। ঐ একটি মারাত্মক ভুল হৈমবতী করেছিল।

'যাহোক, নির্দিষ্ট রাত্রে মানেক মেহতা চুপিচুপি এসে হাজির। হোটেলে একটিও অতিথি নেই। চাকরানীটাকে হৈমবতী নিশ্চয় ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল। হোটেলে ছিল কেবল হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস।

'মানেক মেহ্‌তাকে ওরা হোটেলের অফিস-ঘরেই খুন করেছিল। এমনভাবে খুন করেছিল যাতে রক্তপাত না হয়। তারপর ছদ্মবেশ ধারণের পালা। বিজয় বিশ্বাস মানেক মেহতার গা থেকে জামা কাপড় খুলে নিজে পরল, নিজের জামা কাপড় গলাবন্ধ মানেক মেহতাকে পরিয়ে দিল। তারপর দু'জনে লাশ নিয়ে গিয়ে খাদের মধ্যে ফেলে দিল। কিছুদিন থেকে এক ব্যাঘ্র-দম্পতি এসে খাদে বাসা নিয়েছিল, সুতরাং লাশের যে কিছুই থাকবে না তা বিশ্বাস-দম্পতি জানত। ব্যাঘ্র-দম্পতির কথা বিবেচনা করেই তারা প্ল্যান করেছিল।

'আসল কাজ শেষ হলে বিজয় বিশ্বাস সমস্ত টাকাকড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নিষুতি শীতের রাত্রি, কেউ তাকে দেখল না। মানেক মেহতা শহরের বাইরে রাস্তার ধারে মোটর রেখে এসেছিল, সেই মোটরে চড়ে বিজয় বিশ্বাস উধাও হয়ে গেল।

'হৈমবতী ঘাঁটি আগলে রইল। বুকের পাটা আছে ওই মেয়েমানুষটির। তারপর যা যা ঘটেছিল সবই প্রকাশ্য ব্যাপার। একমাত্র সাক্ষী হৈমবতী, সে যা বলল পুলিস তাই বিশ্বাস করল। বিশ্বাস না করার কোনও ছিল না, মানেক মেহতার চরিত্র পুলিস জানত।

'কয়েকদিন পরে সহ্যাদ্রি হোটেল হোমজির হাতে তুলে দিয়ে শোকসন্তপ্তা বিধবা হৈমবতী মহাবলেশ্বর থেকে চলে গেল। ইতিমধ্যে বিজয় বিশ্বাস কলকাতার বাসায় এসে আড্ডা গেড়েছিল, হৈমবতীও এসে জুটল।

'কিন্তু তারা ভারি হুঁশিয়ার লোক, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়নি, সাবধানে ছিল ; তাই মহাবলেশ্বরের চিঠি পেয়ে অজিত যখন দেখা করতে গেল তখন হৈমবতী চমকে উঠল বটে কিন্তু ঘাবড়ালো না। হৈমবতীর তখন বোধ হয় বিধবার সাজ ছিল না, সে বিধবা সাজতে গেল। চাকর অজিতকে বাইরের ঘরে বসাল। অজিত যদি এত সরল না হত, তাহলে ওর খট্‌কা লাগত ; শীতের সন্ধ্যাবেলা মেয়েরা গা ধুতে পারে, চুল ভিজিয়ে স্নান করে না।

'যাহোক, হৈমবতী যখন এল তখন তার সদ্যস্নাত চেহারা দেখে অজিত মুগ্ধ হয়ে গেল। সে হৈমবতীকে আমার নাম বলল ; হৈমবতীর ব্যাপার বুঝতে তিলার্ধ দেরি হল না। অজিত আমার নামটাকে যতখানি অখ্যাত মনে করে, ততখানি অখ্যাত নয় আমার নাম, অজিতের কল্যাণেই নামটা সকলের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু সে যাক। বিকাশ ওদিকে জানালা দিয়ে শোবার ঘরে দু'টো খাট আর লোহার সিন্দুক দেখে নিয়েছিল। অজিতের চিঠিতে ওটাই ছিল সবচেয়ে জরুরী কথা। চিঠি পড়ে কিছুই আর জানতে বাকি রইল না।

'কিন্তু ওদের ধরা গেল না। সে রাত্রে অজিত পিছন ফিরবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় হৈমবতী লোহার সিন্দুক থেকে টাকাকড়ি নিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল। এখন তারা কোথায়, কোন্ ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে বলতে পারে। হয়তো তারা কোনও দিনই ধরা পড়বে না, হয়তো ধরা পড়বে। না পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। পঁয়ত্রিশ কোটি নর-নারীর বাসভূমি এই ভারতবর্ষ—'

কিছুক্ষণ তিনজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বাহিরে যে হাওয়া উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া গিয়াছে। ঘড়িতে দশটা বাজিল।

আমি বলিলাম, 'সব সমস্যার তো সমাধান হল, কিন্তু একটা কথা বুঝলুম না। বিজয় বিশ্বাস ও বাড়িতে থাকতো না কেন ? কোথায় থাকত ? চাকরটা ওদের সম্বন্ধে কি কিছুই সন্দেহ করেনি ?'

ব্যোমকেশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'হা ভগবান, তাও বোঝোনি ? চাকরটাই বিজয় বিশ্বাস।'

অচিন পাখি

ব্যোমকেশ ও আমি গত ফাল্গুন মাসে বীরেনবাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে দু'দিনের জন্য কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। শহরটি প্রাচীন এবং নোংরা। কলিকাতা হইতে মাত্র তিন ঘণ্টার পথ। ট্রেন বদল করিতে না হইলে আরও কম সময়ে যাওয়া যাইত।

বীরেনবাবুর সহিত আমাদের দীর্ঘকালে ঘনিষ্ঠতা। তিনি কলিকাতায় পুলিস কর্মচারী ছিলেন। বহুবার বহু সূত্রে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছি। অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। বছর দুই আগে অবসর লইয়া এই শহরে বাস্তুভিটায় বাস করিতেছেন। কন্যার বিবাহে আমাদের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ব্যোমকেশেরও হাতে কাজ ছিল না। তাই বিবাহের দিন পূর্বাহ্ণে আমরা বীরেনবাবুর গৃহে অবতীর্ণ হইলাম।

বিয়ে-বাড়িতে যথাবিহিত কর্মতৎপরতা ও হৈ হৈ চলিতেছে, সানাই বাজিতেছে। বীরেনবাবু ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সম্বর্ধনা করিলেন এবং একটি ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। ঘরের মেঝেয় ফরাস পাতা; বরযাত্রীদের জন্য যথারীতি সাজানো। কিন্তু বর ও বরযাত্রীরা স্থানীয় ব্যক্তি, তাহারা সন্ধ্যার পর আসিবে। উপস্থিত ঘরটি খালি রহিয়াছে।

আমরা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলাম। চা জলখাবার আসিল। বীরেনবাবু আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে একটু উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি কন্যাকর্তা, আজকের দিনে আপনি বসে আড্ডা মারলে চলবে কি করে? যান, কাজকর্ম করুন গিয়ে।'

বীরেনবাবু একটু অপ্রতিভভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছেন এমন সময় ঘরের বাহিরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কই হে বীরেন, মেয়ের বিয়ের কি ব্যবস্থা করলে দেখতে এলাম।'

'এই যে দাদা!' বীরেনবাবু তাড়াতাড়ি গিয়া একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন—'ভালই হল আপনি এসে পড়েছেন। এঁরা আমার দুই বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছেন। নাম জানেন নিশ্চয়, আমাদেরই দলের লোক। ইনি হলেন স্বনামধন্য ব্যোমকেশ বক্সী, আর উনি সুলেখক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'নাম শুনেছি বৈকি।' বলিয়া ভদ্রলোক আমাদের প্রতি তীক্ষ্ণায়ত দৃষ্টিপাত করিলেন।

বীরেনবাবু বলিলেন, 'ইনি হচ্ছেন নীলমণি মজুমদার। পুলিসের নামজাদা অফিসার ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন।'

আমরাও ভদ্রলোককে দেখিলাম। গৌরবর্ণ লম্বা চেহারা; বয়স বোধ করি ষাটের ঊর্ধ্বে কিন্তু শরীর বেশ দৃঢ় আছে; পিঠের শিরদাঁড়া তাঁহার হাতের লাঠির মতই শক্ত এবং ঋজু। মুখ দেখিয়া মনে হয় জবরদস্ত রাশভারী লোক। গলার স্বর গম্ভীর।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বসতে আজ্ঞা হোক।'

নীলমণি মজুমদার লাঠিসুদ্ধ হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন এবং আমাদের মুখোমুখি হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বীরেনবাবু বলিলেন, 'নীলমণিদা, আপনারা তাহলে গল্পসল্প করুন, আমি একটু—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি প্রস্থান করুন। কেবল চাকরকে বলে দেবেন যেন তামাক দিয়ে যায়। গড়গড়া দুটো নিষ্কর্মার মত হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে।'

বীরেনবাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ নীলমণিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনারও কি আদি নিবাস এই শহরে ?'

নীলমণিবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না। আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে। কিন্তু সে-সব গেছে! রিটায়ার করে বুড়ো বয়সে কোথায় যাব, তাই এখানেই আছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে আপনার আত্মীয়-স্বজন আছেন বুঝি ?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আত্মীয়-স্বজন আমার কেউ নেই। বিবাহ করিনি, সারা জীবন কেবল কাজই করেছি। পুলিসের কাজে একটা মোহ আছে ; আমি আমার কাজে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম। তারপর যখন রিটায়ার করলাম, তখন এই শহরেই রয়ে গেলাম। এই শহরটার সঙ্গে আমার একটা নাড়ির যোগ আছে ; প্রথম যখন সাব-ইন্সপেক্টর হয়ে পুলিসে ঢুকেছিলাম, তখন এই শহরেই পোস্টেড হয়েছিলাম। আবার রিটায়ার করলাম এই শহর থেকেই।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'শহরটার ওপর মায়া পড়ে গেছে আর কি। কতদিন রিটায়ার করেছেন ?'

'সাত বছর।'

এই সময় ভৃত্য আসিয়া দুই ছিলিম তামাক দু'টি গড়গড়ার মাথার উপর বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

নীলমণিবাবু একটি গড়গড়ার নল হাতে লইলেন, অন্যটি লইল ব্যোমকেশ। কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান চলিল। উৎকৃষ্ট তামাক ; ধূম-গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশকে প্রথমে দেখিয়া এবং তাহার পরিচয় পাইয়া অনেকেই তাহাকে পরম কৌতূহলের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। নীলমণিবাবুও তামাক টানিতে টানিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিরীক্ষণের মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। ভক্ত-সুলভ পুলক-বিহ্বলতা একেবারেই ছিল না ; বরং তিনি যেন চক্ষু দিয়া ব্যোমকেশকে তৌল করিতেছিলেন, ব্যোমকেশের খ্যাতি ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য আছে তাহাই ওজন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নীলমণিবাবু বুদ্ধিজীবী পুলিস কর্মচারী ছিলেন, স্বচক্ষে দেখিয়া মানুষের চরিত্র নির্ণয় করা তাঁহার কাজ ছিল ; পরের মুখে ঝাল খাইবার লোক তিনি নন। তাই ব্যোমকেশকে তিনি নিজের বুদ্ধির নিকষে যাচাই করিয়া লইতে চান।

অবশেষে গড়গড়ার নলটি মুখ হইতে সরাইয়া তিনি যখন কথা বলিলেন, তখন তাঁহার কথার মধ্যেও এই প্রচ্ছন্ন অনুসন্ধিৎসা বক্রভাবে প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে নিয়ে লেখা রহস্য কাহিনীগুলি সবই আমি পড়েছি। লক্ষ্য করেছি, সব সমস্যাই আপনি সমাধান করেছেন। তাই জানতে ইচ্ছে হয়, আপনি কি কখনো কোনো রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটনে অকৃতকার্য হননি ? কখনো কি ভুল করেননি ?'

ব্যোমকেশ গড়গড়ার নল আমার হাতে দিয়া সবিনয়ে হাসিল। বলিল, 'কখনো ভুল করিনি এত বড় কথা বলার স্পর্ধা আমার নেই। নীলমণিবাবু, আমি সত্যান্বেষী। ভুল-ভ্রান্তি অনেক করেছি ; এমনও অনেকবার হয়েছে যে অপরাধীকে ধরতে পারিনি। কিন্তু সত্যের সন্ধান পাইনি এমন বোধ হয় কখনো হয়নি। অবশ্য বলতে পারেন আমি ক'টা রহস্যই বা পেয়েছি। আমার চেয়ে হাজার গুণ বেশি রহস্য ঘটনা নিয়ে কাজ করেছেন আপনি। আপনি যতদিন চাকরিতে ছিলেন প্রত্যহ দু'চারটে ছোট-বড় কেস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। আমাকে যদি তাই করতে হত, আমারও অসংখ্য কেস অমীমাংসিত থেকে যেত সন্দেহ নেই।'

ব্যোমকেশের উত্তর শুনিয়া নীলমণিবাবু মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন মনে হইল। তিনি যখন আবার কথা বলিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটু ঘনিষ্ঠতার সুর ধ্বনিত হইল। তিনি বলিলেন, 'দেখুন ব্যোমকেশবাবু, পুলিসের কাজে অনেক ঝামেলা। চুনোপুঁটির কারবারই বেশি, রুই-কাৎলা

কদাচিৎ মেলে। আবার মজা জানেন, ওই চুনোপুঁটিগুলোকেই ধরতে প্রাণ বেরিয়ে যায়, রুই-কাৎলা ধরা খুব শক্ত নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। ডাক্তারেরা বলেন শক্ত রোগের ওষুধ আছে, সর্দি-কাশি সারানোই কঠিন। তা—আপনার চারে যে-ক'টি রুই-কাৎলা এসেছে তাদের সকলকেই আপনি খেলিয়ে ডাঙায় তুলেছেন নিশ্চয়।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ উত্তর দিলেন না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হাতের নলটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। তারপর ব্যোমকেশের দিকে একটি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন, 'সব মাছই ডাঙায় তুলেছি ব্যোমকেশবাবু, কেবল একটি বাদে। আমার পুলিস-জীবনের শেষ বড় কেস। এই শহরেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। কিন্তু কিনারা করতে পারলাম না।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আসামী কে তা জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রমাণ পেলেন না?'

নীলমণিবাবু ঈষৎ দ্বিধাভরে বলিলেন, 'একটা লোককে পাকা রকম সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তার অ্যালিবাই ভাঙতে পারলাম না। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটল যে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সত্যিকার আসামী যে কে সে সম্বন্ধে ধোঁকা আর কাটল না।'

'হুঁ,' বলিয়া ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে নল লইল এবং তাকিয়ায় ঠেস দিয়া টানিতে লাগিল। নীলমণিবাবু ব্যোমকেশের উপর চক্ষু স্থির রাখিয়া গড়গড়ায় একটি লম্বা টান দিলেন, তারপর নল রাখিয়া দিয়া বলিলেন, 'আপনি গল্পটা শুনবেন?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, বলিল, 'বেশ তো, বলুন না। ভারি চমকপ্রদ গল্প হবে মনে হচ্ছে।'

'চমকপ্রদ কিনা আপনি বিচার করবেন। আমি যা-যা জানি সব আপনাকে বলছি। হয়তো আপনি আসামীকে সনাক্ত করতে পারবেন।' বলিয়া নীলমণিবাবু একটু হাসিলেন।

ইহা শুধু গল্প শুনাইবার প্রস্তাব নয়, ইহার অন্তরালে একটি চ্যালেঞ্জ রহিয়াছে। নীলমণিবাবু যেন ব্যোমকেশকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—এস দেখি, তোমার কত বুদ্ধি প্রমাণ কর।

ব্যোমকেশ কিন্তু রণাহ্বান গায়ে মাখিল না, হাসিয়া বলিল, 'আরে না না, আপনার মত অভিজ্ঞ পুলিস কর্মচারী যার কিনারা করতে পারেনি, আমার দ্বারা কি তা হবে? তবে গল্প শোনার কৌতূহল আছে। আপনি বলুন।'

আমরা নীলমণিবাবুর কাছে সরিয়া আসিয়া বসিলাম। তিনি পকেট হইতে একটা কৌটা বাহির করিয়া এক চিমটি জর্দা মুখে দিলেন। পান নয়, শুধু জর্দা। ইহাই বোধ হয় তাঁহার আসল নেশা।

তিনি গলা ঝাড়া দিয়া গল্প আরম্ভ করিবার উপক্রম করিতেছেন, বীরেনবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'আর এক দফা চা হবে নাকি? মধ্যাহ্ন ভোজনের এখনো বিস্তর দেরি। বিয়ে-বাড়ির ব্যাপার—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুক চা। এবং সেই সঙ্গে আর এক প্রস্থ তামাক।'

সম্মুখে চায়ের পেয়ালা এবং বাঁ হাতে গড়গড়ার নল লইয়া আমরা বসিলাম। নীলমণি মজুমদার তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর গলায় গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

রিটায়ার করিবার বছর তিনেক আগে নীলমণিবাবু এই জেলার সদর থানার কর্তা হইয়া আসেন। তাঁহার তিনটি প্রধান গুণ ছিল: যে-বুদ্ধি থাকিলে তদন্তকর্মে কৃতকার্য হওয়া যায় সে-বুদ্ধি তাঁহার প্রচুর পরিমাণে ছিল; তিনি অতিশয় কর্মঠ ছিলেন; এবং তিনি ঘুষ লইতেন না। শহরটা পুলিস সেরেস্তায় দাগী শহর বলিয়া পরিচিত ছিল; খুন-জখম এবং আরও নানা প্রকার অবৈধ ক্রিয়াকলাপ এখানে লাগিয়া থাকিত। নীলমণিবাবু পূর্ব হইতে এ শহরের সহিত পরিচিত ছিলেন, শহরের ধাত জানিতেন। তিনি আসিয়া দৃঢ় হস্তে শাসনের ভার তুলিয়া লইলেন।

বছর দেড়েক কাটিয়া গেল। নীলমণিবাবুর সতর্ক শাসনে শহর অনেকটা শান্ত-শিষ্ট ভাবে

আছে। নীলমণিবাবুর অভ্যাস ছিল হপ্তায় দু'একবার কাহাকেও কিছু না বলিয়া গভীর রাত্রে সাইকেলে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেন। শহরের একটা অংশ ছিল বিশেষভাবে অপরাধপ্রবণ ; তাহারই অন্ধকার অলিগলিতে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; পাহারাওয়ালারা নিয়মিত রোঁদ দিতেছে কিনা লক্ষ্য করিতেন। তাঁহার সাইকেলে আলো থাকিত না ; সঙ্গে থাকিত পিস্তল এবং একটি বৈদ্যুতিক টর্চ। প্রয়োজন হইলে টর্চ জ্বালিতেন।

যে-রাত্রির ঘটনাটা লইয়া এই কাহিনীর আরম্ভ সে-রাত্রে নীলমণিবাবু সাইকেল চড়িয়া যথারীতি বাহির হইয়াছেন। নিষুতি রাত, কোথাও জনমানব নাই, রাস্তার আলোগুলো দূরে দূরে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। ভদ্র পাড়া যেখানে অভদ্র পাড়ার সঙ্গে মিশিয়াছে সেইখানে আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা কয়েকটা পুরাতন বাড়ি আছে। বাড়িগুলি জীর্ণ, আম-কাঁঠালের গাছগুলি বর্ষীয়ান। পূর্বে বোধ হয় এই স্থান ভদ্রপল্লীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন ভদ্রপল্লী ঘৃণাভরে দূরে সরিয়া গিয়াছে ; ক্ষয়িষ্ণু বাড়িগুলি দুই পক্ষের মাঝখানে সীমানা রক্ষা করিতেছে। এখানে যাহারা বাস করে তাহাদের সামাজিক অবস্থাও ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী।

মন্থর গতিতে সাইকেল চালাইয়া এই পাড়ার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে নীলমণিবাবু দেখিলেন, সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে কয়েকজন লোক একটি মাচার মত বস্তু কাঁধে লইয়া একটি বাড়ির ফটক হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহাদের ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক।

নীলমণিবাবু জোরে সাইকেল চালাইলেন ; কাছাকাছি আসিয়া বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বালিয়া লোকগুলার মুখে ফেলিলেন, উচ্চকণ্ঠে হুকুম দিলেন, 'দাঁড়াও।'

চারজন লোক ছিল ; তাহার একসঙ্গে কাঁধ হইতে মাচা ফেলিয়া পলায়ন করিল, মুহূর্তমধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু অদৃশ্য হইবার পূর্বে একজনের মুখ নীলমণিবাবু অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন ; সে ওই বাড়ির মালিক সুরেশ্বর ঘোষ।

পলাতকেরা বিভিন্ন দিকে গিয়াছে, নীলমণিবাবু তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি মাচার নিকট গিয়া সাইকেল হইতে নামিলেন, এবং মাচার উপর টর্চের আলো ফেলিলেন।

মাচা নয়, মড়া বহিবার চালি। তাহাতে বাঁধা-ছাঁদা অবস্থায় পড়িয়া আছে একটি স্ত্রীলোকের দেহ। স্বাস্থ্যবতী সধবা যুবতী, দেহে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নাই ; কিন্তু মৃত।

নীলমণিবাবু হুইসল্ বাজাইলেন। একজন পাহারাওয়ালা কনস্টেবল কাছেপিঠে ছিল, দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিল। প্রতিবেশীরাও ঘুম ভাঙিয়া নিজ নিজ গৃহ হইতে বাহির হইল।

প্রতিবেশীরা সকলেই মৃতদেহ সনাক্ত করিল ; সুরেশ্বরের স্ত্রী হাসি। বাড়িতে অন্য কেহ থাকে না, কেবল সুরেশ্বর ও তাহার স্ত্রী হাসি।

নীলমণিবাবু কনস্টেবলকে থানায় রওনা করিয়া দিলেন, তারপর দু'জন প্রতিবেশীকে লইয়া বাড়ি অনুসন্ধান করিলেন। বাড়িটি একতলা হইলেও আকারে ছোট নয়, ছয়খানি ঘর। কিন্তু অধিকাংশ ঘরই ব্যবহার হয় না। দুইটি ঘরে ব্যবহারের চিহ্ন পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে একটি শয়নের ঘর। এই ঘরটি বেশ বড়, তাহার দুই পাশে দুইটি খাট। দুইটি খাটেই বিছানা পাতা ; একটিতে কেহ শয়ন করে নাই, অপরটি দেখিয়া মনে হয় ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বাড়িতে কেহ নাই।

বাগানেও কেহ নাই ; বড় বড় আম-কাঁঠালের গাছগুলা সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নীলমণিবাবু প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেয়েটির অসুখ করেছিল কিনা আপনারা জানেন?'

একজন প্রতিবেশী বলিল, 'অসুখ করেনি। আজই বিকেলবেলা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বিনোদবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল?'

'তাই নাকি! বিনোদবাবু কে?'

'বিনোদ সরকার, সোনারূপোর দোকান আছে।'

ফটকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া নীলমণিবাবু দেখিলেন, থানা হইতে দুইজন সাব-ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন জমাদার কনস্টেবল প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি অল্প কথায় ব্যাপার

বুঝাইয়া দিয়া একজন সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে মৃতদেহ হাসপাতালে রওনা করিয়া দিলেন, চারজন কনস্টেবল চালি বহিয়া লইয়া গেল।

প্রতিবেশীরা তখনও কেহ চলিয়া যায় নাই, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করিয়া জল্পনা করিতেছিল। নীলমণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেয়েটির স্বামীর পুরো নাম কি ?'

একজন বলিল, 'সুরেশ্বর ঘোষ।'

'সে কোথায় ?'

প্রতিবেশীরা কিছু বলিতে চায় না ; শেষে একজন অনিচ্ছাভরে বলিল, 'সুরেশ্বর সন্ধ্যের পর খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যায়, রাত্রি একটা-দেড়টার আগে বাড়ি ফেরে না।'

'কোথায় যায় ?'

'শুনেছি কালীকিঙ্কর দাসের দোকানে তাসের আড্ডা বসে, সেখানে যায়।'

'কালীকিঙ্কর দাসের দোকান কোথায় ?'

প্রতিবেশীরা ঠিকানা দিল। নীলমণিবাবু তখন জমাদারকে অকুস্থলে বসাইয়া সাব-ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে লইয়া কালীকিঙ্কর দাসের দোকানের উদ্দেশ্যে চলিলেন। প্রতিবেশীদের বলিয়া গেলেন, 'কাল সকালে আসব, আপনাদের এজেহার নেব।'

কালীকিঙ্করের দোকান সুরেশ্বরের বাড়ি হইতে আধ মাইল দূরে, শহরের নিকৃষ্ট অংশ পার হইয়া যেখানে বাজার-হাট আরম্ভ হইয়াছে সেইখানে। লোহা-লক্কড়ের দোকান। বাজারের এই অংশটির নাম লোহাপটি।

নিষুতি বাজারের ভিতর দিয়া নীলমণিবাবু কালীকিঙ্করের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দোকানের সামনে রাস্তার পাশে ভারী ভারী লোহার ছড় গুচ্ছাকারে পড়িয়া আছে। কিন্তু দোকানের দ্বার বন্ধ। নীলমণিবাবু নিঃশব্দ পদে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া দেখিলেন, পাশের একটি জানালার ফুটা দিয়া শীর্ণ আলোকরশ্মি বাহিরে আসিতেছে। তিনি সন্তর্পণে জানালার কাছে গিয়া ফুটার মধ্যে চক্ষু নিবিষ্ট করিলেন।

তক্তপোশের উপর ফরাস পাতা ; চারজন লোক বসিয়া নিবিষ্টমনে তাস খেলিতেছে। তাহাদের মাঝখানে ফরাসের উপর কিছু টাকা ও নোট জমা হইয়াছে। বাজি রাখিয়া খেলা চলিতেছে। তিন তাসের খেলা।

সাব-ইন্সপেক্টর সাইকেল লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিল। নীলমণিবাবু হাত নাড়িয়া তাহাকে ইশারা করিলেন, সে সাইকেল রাস্তায় শোয়াইয়া দিয়া দ্বারের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। নীলমণিবাবু তখন জানালায় টোকা দিলেন।

চারজন খেলোয়াড় একসঙ্গে জানালার দিকে ঘাড় ফিরাইল, চারজোড়া চোখ শঙ্কিত উৎকণ্ঠায় চাহিয়া রহিল ; তারপর একজন এক খামচায় সম্মুখের টাকাকড়ি তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল।

নীলমণিবাবু কড়া সুরে বলিলেন, 'দোর খোল।'

চারজন মুখ তাকাতাকি করিল, তারপর একজন গলা উঁচু করিয়া বলিল, 'কে ?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'পুলিস। দোর খোল।'

আবার খেলোয়াড়দের মধ্যে মুখ তাকাতাকি। তারপর একজন, বোধ হয় দোকানের মালিক কালীকিঙ্কর দাস, উঠিয়া গেল। নীলমণিবাবু জানালা হইতে সরিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দ্বার খুলিল। রোগা অস্থিসার লোকটা দুইজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিস কর্মচারীকে দেখিয়া এক পা পিছাইয়া গেল, 'কে ! কি চাই ?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'তুমি কালীকিঙ্কর দাস ?'

'হ্যাঁ। কি চাই ?'

'এখানে আর কে কে আছে ?'

কালীকিঙ্কর ঢোক গিলিয়া বলিল, 'আমার তিনজন বন্ধু আছে।'

নীলমণিবাবু আর বাক্যব্যয় করিলেন না, ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে লইয়া দোকানে প্রবেশ করিলেন।

পাশে অফিস-ঘরের দরজা ; অফিস-ঘরে গিয়া তিনি দেখিলেন, তিনজন খেলোয়াড় তখনও ফরাসের উপর বসিয়া আছে, একজন তাস ভাঁজিতেছে। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সকলকে নিরীক্ষণ করিলেন। সকলেরই বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, চেহারায় কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। কেবল এক ব্যক্তি, যে-ব্যক্তি তাস ভাঁজিতেছিল, হাড়ে-মাসে মজবুত গোছের লোক। দেখিয়া মনে হয় এই লোকটাই পালের গোদা।

নীলমণিবাবু প্রশ্ন করিলেন, 'সুরেশ্বর ঘোষ কার নাম ?'

মজবুত লোকটি ভুরু তুলিয়া চাহিল, তারপর তাস রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, 'আমি সুরেশ্বর ঘোষ। কি দরকার ?' তার স্বর শান্ত ও সংযত।

নীলমণিবাবু একে একে চারজনের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, 'তোমরা দুপুর রাত্রে মড়া নিয়ে ঘাটে পোড়াতে যাচ্ছিলে। ভেবেছিলে একবার পুড়িয়ে ফেলতে পারলে আর কোনো ভয় নেই।'

চারজনের মুখেই অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সুরেশ্বর বলিল, 'মড়া ! কি বলছেন ! কার মড়া ?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'ন্যাকামি করে পার পাবে না। আমি দেখেছি তোমাকে। যে-চারজন মড়া নিয়ে যাচ্ছিল, তুমি তাদের একজন।'

সুরেশ্বর বলিল, 'কবেকার কথা বলছেন ?'

'আজকের কথা বলছি। আজ রাত্রি বারোটার কথা।'

'বাজে কথা বলছেন। আজ রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমরা এখানে তাস খেলতে বসেছি, এক মিনিটের জন্যে কেউ বাইরে যাইনি।'

'বটে ! সারাক্ষণ তাস খেলেছ ! জুয়া ?'

তিনজনে ঘাড় চুলকাইতে লাগিল। সুরেশ্বর কিন্তু তিলমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, 'হ্যাঁ, জুয়া খেলছিলাম। আমরা চার বন্ধু মিলে মাঝে মাঝে খেলি।'

নীলমণিবাবু দেখিলেন এখানে ইহাদের কাবু করা যাইবে না, থানায় লইয়া যাইতে হইবে। বলিলেন, 'আপাতত জুয়া খেলার অপরাধে আমি তোমাদের অ্যারেস্ট করছি। থানায় চল।'

অতঃপর কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটি চলিল, শেষ পর্যন্ত তাহারা থানায় যাইতে রাজী হইল। নীলমণিবাবু বলিলেন, 'যদি জামিন যোগাড় করতে পার, আজ রাত্তিরেই ছেড়ে দেব।'

রাস্তায় কিছুদূর যাইবার পর সুরেশ্বর বলিল, 'মড়ার কথা কী বলছিলেন ? কার মড়া ?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'তোমার স্ত্রীর।'

সুরেশ্বর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল, 'অ্যাঁ ! আমার স্ত্রী ! কি বলছেন আপনি ?'

'বলছি, তোমার স্ত্রী খুন হয়েছে।'

'না না ! এসব কি রকম কথা ! আমি বিশ্বাস করি না। হাসি !—না, আমি বাড়ি চললাম।'

'বাড়ি গিয়ে কোন লাভ নেই। মৃতদেহ হাসপাতালে চালান দেওয়া হয়েছে।'

থানায় পৌঁছিয়া নীলমণিবাবু চারজনকে হাজতে পুরিলেন। তারপর অফিসে বসিয়া একে একে তাহাদের জেরা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ডাকিলেন সুরেশ্বরকে। সে টেবিলের পাশের একটি চেয়ারে উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি কাজ কর ?'

সুরেশ্বর বলিল, 'অনেক রকম ব্যবসা আছে। পাইকিরি ব্যবসা। আমি পয়সাওয়ালা লোক, পুঁচকে দোকানদার নই।'

'বাড়িটা তোমার ?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন কিনেছ ?'

'পাঁচ-ছয় বছর হবে। উনিশ হাজার টাকায় কিনেছিলাম।'

নীলমণিবাবুকে টাকার কথা শুনাইয়া লাভ হইল না, তিনি অটলভাবে প্রশ্ন করিয়া চলিলেন,

'কতদিন আগে বিয়ে করেছিলে ?'

'সাত বছর আগে।'

'শ্বশুরবাড়ি কোথায় ?'

'এই শহরে।'

'শ্বশুরের নাম কি ?'

'দিনমণি হালদার।'

'সে এখন কোথায় ?'

'জানি না। সম্ভবত জেলে।'

'জেলে ?'

'হ্যাঁ। জেল আমার শ্বশুরের ঘর-বাড়ি।'

'হুঁ। শ্বশুরের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব আছে ?'

'মুখ দেখাদেখি নেই।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, 'বৌয়ের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব ছিল ?'

একটু দ্বিধা করিয়া সুরেশ্বর বলিল, 'বিয়ের সাত বছর পরে যতটা সদ্ভাব থাকা সম্ভব ততটা ছিল।'

'ছেলে-পিলে নেই ?'

'না। বৌ বাঁজা।'

নীলমণিবাবু আঙুল তুলিয়া বলিলেন, 'আজ রাত্রি বারোটার সময় তুমি আর তোমার বন্ধুরা মিলে তোমার স্ত্রীর মৃতদেহ বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাচ্ছিলে, আমি টর্চের আলো ফেলে তোমাকে দেখেছি।'

সুরেশ্বর নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলিল, 'আপনি ভুল দেখেছেন। রাত্রি বারোটার সময় আমি আর আমার বন্ধুরা কালীকিঙ্করের দোকানে বসে তাস খেলছিলাম।'

'হুঁ। তোমার স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল ?'

'মেয়েমানুষের স্বভাব-চরিত্রের কথা কে বলতে পারে ? তবে পাড়া-পড়শীরা বদনাম দিত।'

'কি বদনাম দিত ?'

'আমি রাত্রি করে বাড়ি ফিরি। কয়েক মাস থেকে কে একজন নাকি বাগানে এসে হাসির সঙ্গে দেখা করত।'

'স্ত্রীকে এ বিষয়ে কিছু জিগ্যেস করেছিলে ?'

'করেছিলাম। সে বলেছিল সব মিথ্যে কথা।'

'আর কিছু ?'

'আর কি ! একবার হাসির আলমারি খুলে তার মধ্যে এমন কয়েকটা গয়না দেখেছিলাম যা আমি তাকে দিইনি।'

'কোথা থেকে গয়না এল বৌয়ের কাছে খোঁজ নিয়েছিলে ?'

'কি হবে খোঁজ নিয়ে ? মেয়েমানুষ যদি নষ্ট হতে চায় কেউ তাকে আটকাতে পারে না।'

'কিন্তু খুন করতে পারে।'

'আমি হাসিকে খুন করিনি।'

নীলমণিবাবু আরও অনেকক্ষণ নানাভাবে জেরা করিলেন, কিন্তু সুরেশ্বরকে টলাইতে পারিলেন না। বরং তাহার ঠোঁট-কাটা স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া মনে হয় সে সত্য কথা বলিতেছে।

সুরেশ্বরকে হাজতে ফেরৎ পাঠাইয়া নীলমণিবাবু কালীকিঙ্করকে ডাকিয়া আনিলেন। কালীকিঙ্করের হাড়-বাহির-করা শরীরের মধ্যে লৌহ-কঠিন একটি মন ছিল, নীলমণি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা বাঁকাইতে পারিলেন না। চার বন্ধু রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তাহার দোকানে তাস

খেলিতে বসিয়াছিল, নীলমণিবাবু আসা পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও কেহ বাহিরে যায় নাই, এ কথার নড়চড় হইল না।

অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু কালীকিঙ্কর সোজাসুজি উত্তর দিল। সুরেশ্বর তাহার আজীবনের বন্ধু, তাহার ঘরের খবর সবই কালীকিঙ্কর জানে। সুরেশ্বরের অবস্থা আগে ভাল ছিল না, যুদ্ধের বাজারে সে পয়সা করিয়াছে। হাসিকে সে বিবাহ করিয়াছিল গরীব অবস্থায়। হাসির বাপটা ছিল একাধারে চোর এবং বোকা ; চুরি করিয়া ধরা পড়িয়া যাইত এবং জেলে যাইত। হাসির মায়েরও বদনাম ছিল। বস্তিতে বাস করিলে ভদ্রলোকের মেয়েরও চালচলন খারাপ হইয়া যায় ; যেমন দেখিবে তেমনি তো শিখিবে। হাসির বাপ যখন জেলে থাকিত তখন নাকি হাসির মায়ের ঘরে লোক আসিত। সুরেশ্বর যখন হাসিকে বিবাহ করিতে উদ্যত হয়, তখন বন্ধুরা সকলেই মানা করিয়াছিল ; কিন্তু সুরেশ্বর কাহারও কথা শুনিল না। তারপর যুদ্ধের বাজারে সুরেশ্বর টাকা করিয়াছে, বাড়ি কিনিয়াছে ; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তেমন বনিবনাও নাই। সুরেশ্বর বাড়িতে বেশি থাকে না, বাহিরে বাহিরে দিন কাটায়। কিন্তু তাই বলিয়া সে স্ত্রীকে খুন করিয়াছে একথা একেবারেই সত্য নয়। সুরেশ্বর তেমন লোকই নয়। সে ভদ্র সন্তান ; জীবনের আরম্ভে অনেক দুঃখ-কষ্ট পাইয়া বস্তিতে থাকিয়া বড় হইয়াছে বটে, কিন্তু তার মনটা খুব উঁচু।

কালীকিঙ্করের বন্ধু-প্রশস্তি শেষ হইলে নীলমণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুরেশ্বরের শ্বশুর দিনমণি হালদার এখন কোথায় ?'

কালীকিঙ্কর বলিল, 'বছর দুই আগে দিনু হালদার জেল থেকে বেরিয়ে এখানে এসেছিল। হাসির মা তখন মরে গেছে। দিনু হালদার দু'তিন দিন মেয়ে-জামাইয়ের কাছে ছিল। একদিন সুরেশ্বরের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। দিনু হালদার কোথায় চলে গেল। তারপর থেকে আর তাকে দেখিনি। বয়স হয়েছিল, জেল খেটে শরীরও ভেঙে পড়েছিল। হয়তো মরে গেছে।'

অতঃপর নীলমণিবাবু কালীকিঙ্করকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেবু মণ্ডলকে আনাইলেন। দেবু মণ্ডল কয়লা ও জ্বালানি কাঠের ব্যবসা করে ; বিত্তবান ব্যক্তি। সুরেশ্বরের বাল্যবন্ধু, সুখে-দুঃখে নিত্য-সহচর। সুরেশ্বরের স্ত্রীকে খুন করিয়া তাহারা পোড়াইতে লইয়া যাইতেছিল একথা সর্বৈব মিথ্যা। তাহারা তাস খেলিতেছিল। বন্ধু-পত্নীর চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে সে অক্ষম ; তবে হাসি সদ্‌বংশের মেয়ে ছিল না একথা যথার্থ।

দেবু মণ্ডলকে নীলমণিবাবু ভাঙিতে পারিলেন না, নূতন কোনও তথ্যও আবিষ্কৃত হইল না। তিনি অবশেষে বলিলেন, 'শ্মশান ঘাটে তোমার কাঠের আড়ৎ আছে ?'

দেবু মণ্ডল থতমত খাইয়া বলিল, 'আছে। শহরে দুটো আড়ৎ আছে, আর শ্মশানে একটা।'

নীলমণিবাবু কুঞ্চিত চক্ষে কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'এবার সত্যি কথা বলবে ?'

দেবু মণ্ডল বলিল, 'সত্যি কথাই বলছি।'

চতুর্থ ব্যক্তির নাম বিলাস দত্ত। ঠিকাদারদের কাজ করে, বিল্‌ডিং কন্‌ট্র্যাক্টর ; অতিশয় মিষ্টভাষী ও রসিক। নীলমণিবাবুকে একটি অশ্লীল রসিকতা শুনাইয়া ঘাড় নিচু করিয়া জিভ কাটিল। তাস খেলার ব্যাপার সম্বন্ধে কিন্তু তাহার মনে লেশমাত্র সংশয় নাই। নীলমণিবাবু দেখিলেন বিলাস দত্ত যে শ্রেণীর লোক, সে অজস্র মিথ্যা কথা বলিবে কিন্তু কাজের কথা একটিও বলিবে না। তিনি হতাশ হইয়া বলিলেন, 'তুমি ঠিকাদার, তোমার অনেক বাঁশ আছে ?'

বিলাস দত্ত বলিল, 'বাঁশ ! আছে বৈকি, এন্তার বাঁশ আছে। ভারা বাঁধবার জন্যে দরকার হয় কিনা।'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'হুঁ, মড়ার চালি বাঁধবার জন্যেও দরকার হয়।'

বন্ধু চতুষ্টয়ের জেরা শেষ করিতে রাত কাবার হইয়া গেল।

পরদিন কিন্তু তাহাদের আর হাজতে আটকাইয়া রাখা গেল না। তাহাদের উকিল জামিন দিয়া তাহাদের খালাস করিয়া লইয়া গেলেন। নীলমণিবাবুর মনে অভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে,

সুরেশ্বর ঘোষ স্ত্রীকে খুন করিয়াছে এবং বাকি তিনজন এই ব্যাপারে লিপ্ত আছে। কিন্তু প্রমাণ নাই ; তিনি যাহা চোখে দেখিয়াছেন তাহার কোন সমর্থক নাই ; তাঁহার সাক্ষ্য উকিলের জেরায় উড়িয়া যাইবে। তাই বর্তমানে তিনি তাহাদের নামে খুনের অভিযোগ আনিতে পারিলেন না। কেবল জুয়া খেলার অভিযোগেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

তিনি কিন্তু খুনের তদন্তে বিরতি দিলেন না। তিনি দুইজন সহকারী লইয়া সুরেশ্বরের প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করিলেন, তাহাদের বয়ান শুনিলেন। শেষে বেলা প্রায় একটার সময় সুরেশ্বরের বাড়িতে গেলেন। ফটকে একজন কনস্টেবল পাহারায় ছিল, সে বলিল, সুরেশ্বর বেলা এগারোটা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বাড়িতে আছে।

নীলমণিবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুরেশ্বর শয়নকক্ষের একটা খাটে শুইয়া ঘুমাইতেছে। পুলিসের জুতার শব্দে সে রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিল, জড়িত স্বরে বলিল, 'আবার কী চাই ?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আমরা বাড়ি তল্লাশ করতে এসেছি।'

'করুন তল্লাশ। যা ইচ্ছে করুন।' বলিয়া সে আবার শয়নের উপক্রম করিল। তাহার বোধ হয় বেলা পর্যন্ত ঘুমানো অভ্যাস, তার উপর কাল সারা রাত্রি জাগরণে গিয়াছে, আজ বোধ হয় সারা দিন ঘুমাইবে। কিন্তু—স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার মনে কি একটুও দাগ পড়ে নাই ? খুন করুক বা না করুক, এমন নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছে কি করিয়া !

যাহোক, নীলমণিবাবু তাহাকে ঘুমাইতে দিলেন না। বলিলেন, 'তোমার স্ত্রীর গয়নাগুলো দেখতে চাই।'

সুরেশ্বর বিরক্ত মুখে উঠিয়া একটা দেয়াল-আলমারির কপাট খুলিল, তাহার একটা তাকে কাপড়-চোপড়ের পেছন হইতে এক থাবা সোনার গহনা বাহির করিল। আটপৌরে গহনা কিছু আছে, তাছাড়া তোলা গহনা। নীলমণিবাবু বলিলেন, 'এর মধ্যে কোন্ গয়না তুমি দাওনি ?'

সুরেশ্বর একটা আংটি, এক জোড়া কানের দুল, একটা চুলের কাঁটা বাছিয়া তাঁহার হাতে দিল। এ গহনাগুলি নূতন, ব্যবহৃত হয় নাই।

নীলমণিবাবু সেগুলি নিজের পকেটে রাখিয়া বলিলেন, 'এগুলো আমি রাখছি। পরে ফেরৎ দেব।'

তারপর তাহার সমস্ত বাড়ি ও বাগান তন্ন তন্ন করিলেন, কিন্তু এমন কিছুই পাওয়া গেল না যাহা হইতে হাসির মৃত্যুর কোন হদিস পাওয়া যায়।

বৈকালে সাড়ে তিনটার সময় নীলমণিবাবু সুরেশ্বরের বাড়ির তদন্ত শেষ করিলেন এবং সহকারীদের ফেরৎ পাঠাইয়া নিজে বিনোদ সরকারের দোকানের দিকে চলিলেন। বাজারের মধ্যে বিনোদ সরকারের সোনা-রূপার দোকানটা তাঁহার দেখা ছিল, বেশ বড় দোকান, দোকানের মধ্যে কারিগরদের কাজ করিবার কারখানা।

বিনোদবাবু দোকানে ছিলেন, একটি সুসজ্জিত কক্ষে টেবিলের সামনে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন। লোকটির বয়স অনুমান পঞ্চাশ, কিন্তু ভারি শৌখিন মানুষ। গায়ে তসরের পাঞ্জাবি, গিলে করা ফরাসডাঙার ধুতি, গোঁফের উপর-নিচে কামাইয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম করিয়া তোলা হইয়াছে, মাথার সম্মুখ ভাগে এক গোছা চুল তিনদিক হইতে টাকের আক্রমণ কোনমতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। আকৃতি একটু খর্ব, কিন্তু তদনুপাতে বেশ গোলগাল।

পুলিস দেখিয়া তিনি একটু বিব্রত হইলেন, বলিলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো ? আমার দোকানে কি কোন গণ্ডগোল হয়েছে ?'

নীলমণিবাবু সামনের চেয়ারে বসিলেন, বলিলেন, 'না। আপনার কাছে কিছু খবর জানতে এসেছি।'

বিনোদবাবু ধাতস্থ হইলেন, নীলমণিবাবুর দিকে পানের ডিবা ও জর্দার কৌটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'কি খবর ?'

নীলমণিবাবু পান লইলেন না, জর্দার কৌটা হইতে এক চিম্‌টি জর্দা লইয়া মুখে দিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, 'সুরেশ্বর ঘোষের স্ত্রী মারা গেছে আপনি জানেন ?'

বিনোদবাবু চেয়ার হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন, 'হাসি মারা গেছে ! সে কি ! কাল বিকেলে যে আমি তাকে দেখেছি।'

'কাল রাত্রে মারা গেছে।'

'রাত্রে ! কিন্তু বিকেলবেলা সে তো ভালই ছিল। কিসে মারা গেল ? কী হয়েছিল তার ?'

'আমার বিশ্বাস কাল রাত্রে তাকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন !' বিনোদবাবু আস্তে আস্তে চেয়ারে বসিলেন, কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ টেবিলের উপর প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া বলিলেন, 'সুরেশ্বর খুন করেছে। ও ছাড়া আর কেউ নয়।'

'সুরেশ্বরের কিন্তু অকাট্য অ্যালিবাই আছে।'

'থাক অ্যালিবাই, এ সুরেশ্বরের কাজ। সুরেশ্বর আর ওর ওই তিনটে বন্ধু মহা ধূর্ত আর পাজি। ওদের অসাধ্য কাজ নেই।'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আপনি হাসিকে অনেক দিন থেকে চেনেন ?'

'ওকে তিন-চার বছর বয়স থেকে দেখে আসছি।' তিনি নলটি মুখ হইতে লইয়া কিছুক্ষণ তাহার অগ্রভাগ পরিদর্শন করিলেন, একবার নীলমণিবাবুর দিকে চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন ; তারপর হ্রস্ব স্বরে বলিলেন, 'আপনি পুলিস, আপনার কাছে লুকোব না, কম বয়সে আমি একটু—ইয়ে—হাসির মায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে আজ বিশ-বাইশ বছর আগেকার কথা। হাসির বাপটা ছিল হতভাগা চোর, নেশাখোর, জালিয়াৎ। স্ত্রী-কন্যাকে খেতে দিতে পারত না। হাসির মা পেটের দায়ে—কিন্তু সে যাক। বছর কয়েক আগে হাসির মা মারা গেল। মৃত্যুকালে আমাকে ডেকে মিনতি করে বলে গিয়েছিল, হাসিকে তুমি দেখো, জামাইয়ের মন ভাল নয়।—তার মৃত্যু-শয্যার অনুরোধ আমি এড়াতে পারিনি ; হাসিকে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতাম। হাসির মা সতীসাধ্বী ছিল না, কিন্তু তার প্রকৃতি ছিল বড় মধুর।'

কিছুক্ষণ আর কোন কথা হইল না। তারপর নীলমণিবাবু বলিলেন, 'তাহলে আপনার সন্দেহ সুরেশ্বরবাবু হাসিকে খুন করেছে ?'

বিনোদবাবু যেন স্মৃতি-সমুদ্রের তলদেশ হইতে উঠিয়া আসিলেন, 'অ্যাঁ ! হ্যাঁ, আমার তাই বিশ্বাস।'

'কিন্তু কেন ? মোটিভ কি ?'

'দেখুন, সুরেশ্বর যখন হাসিকে বিয়ে করেছিল, তখন তার চালচুলো কিছু ছিল না। তারপর যুদ্ধের বাজারে সে বড়লোক হল। তখন তার উচ্চাশা হল সে ভদ্রসমাজে মিশবে, দশজনের একজন বলে গণ্য হবে। কিন্তু হাসি বেঁচে থাকতে সে-সম্ভাবনা নেই ; হাসির মা-বাপের কেচ্ছা শহরে কে না জানে ? তাই সুরেশ্বর হাসিকে মেরেছে। এবার নতুন বিয়ে করে ভদ্রলোক হয়ে বসবে।'

'হাসির স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল ?'

'হেলাগোলা মেয়ে ছিল, মনে ছল-কপট ছিল না। একটু হয়তো পুরুষ-ঘেঁষা ছিল, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত, রাস্তা দিয়ে লোক গেলে ডেকে কথা কইত। কিন্তু তাতেও তাকে দোষ দেওয়া যায় না। পাড়ার মেয়েরা ওর সঙ্গে ভাল করে কথা বলত না, কেউ বা বাঁকা কথা বলত। হাসিও তো মানুষ, তারও তো কথা কইবার দুটো লোক দরকার। আমি জোর করে বলতে পারি, অন্য দোষ তার যতই থাক, মন্দ সে ছিল না।'

নীলমণিবাবু কৌটা হইতে আর এক টিপ জর্দা মুখে দিলেন, তারপর পকেট হইতে গহনাগুলি বাহির করিয়া বিনোদবাবুর সম্মুখে রাখিলেন, 'দেখুন তো, এগুলো চিনতে পারেন ?'

'হাসির গয়না নাকি ?' বলিয়া বিনোদবাবু সেগুলি হাতে তুলিয়া লইলেন, তারপর মাথা নাড়িয়া

বলিলেন, 'এ গয়না আমি হাসিকে কখনো পরতে দেখিনি।'

'আপনি কখনো তাকে গয়না উপহার দেননি ?'

বিনোদবাবু মাথা নাড়িলেন, 'না। আমি তাকে পুজো আর দোলের সময় একখানা করে শাড়ি দিতাম। গয়না কখনো দিইনি।'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'এ গয়না কি আপনার দোকানে তৈরি ?'

বিনোদবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গহ্নাগুলি আবার পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন, 'না, এ গয়না আমার কারিগরের তৈরি নয়। কিন্তু, দাঁড়ান—' তিনি ঘণ্টি টিপিয়া চাকরকে ডাকিলেন—'রামদয়ালকে পাঠিয়ে দাও।'

চশমা চোখে বয়স্থ কারিগর রামদয়াল আসিলে, তাহার হাতে গহ্নাগুলি দিয়া বলিলেন, 'দেখ তো, এ গয়না কি আমাদের তৈরি ?'

রামদয়াল ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, 'আজ্ঞে না, এ গয়না কলকাতার কারিগরের তৈরি।'

'আচ্ছা, যাও।'

নীলমণিবাবুও উঠিলেন, গহ্নাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিলেন, 'আজ তবে উঠি, যদি দরকার হয় আবার আসব।'

'যখন ইচ্ছে আসবেন।'

সেদিন সন্ধ্যাকালে নীলমণিবাবু সিভিল সার্জন মেজর বর্মণের বাংলোতে গেলেন। বাংলোতেই অফিস। মেজর বর্মণ দিনের কাজ শেষ করিয়া উঠি-উঠি করিতেছেন, নীলমণিবাবু বলিলেন, 'খবর নিতে এলাম।'

মেজর বর্মণ বলিলেন, 'বসুন। পি এম্ করেছি। রিপোর্ট কাল পাবেন।'

'কি দেখলেন ? মৃত্যুর সময় ?'

'আন্দাজ রাত্রি দশটা।'

'মৃত্যুর কারণ ?'

'যতদূর দেখেছি গায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল না।'

'বিষ-টিষ নাকি ?'

মেজর বর্মণ একটি সিগার ধরাইয়া তাহাতে মন্দ-মন্থর টান দিলেন, 'বিষ নয়। বড় আশ্চর্য উপায়ে মেরেছে। আপনার সন্দেহভাজনের মধ্যে মিলিটারি-ম্যান কেউ আছে নাকি ?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'মিলিটারি-ম্যান কেউ নেই। কিন্তু মেয়েটির স্বামী যুদ্ধের সময় মিলিটারি কন্ট্র্যাক্টর ছিল, গোরাদের সংস্পর্শে এসেছে। কী ব্যাপার বলুন ?'

মেজর বর্মণ বলিলেন, 'মেয়েটির গায়ে আঘাতের চিহ্ন বাইরে থেকে দেখা যায় না, কিন্তু তার গলার তরুণাস্থি, যাকে thyroid cartilage বলে, সেটা একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে।'

নীলমণিবাবু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'মানে গলা টিপে মেরেছে !'

'না। গলা টিপে মারলে চামড়ার ওপর আঙুলের দাগ থাকত। আর, গলা টিপে মারার মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু নেই।'

'তবে ?'

মেজর বর্মণ কয়েকবার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, 'গত মহাযুদ্ধে সৈনিকদের অস্ত্রহীন যুদ্ধের কৌশল শেখানো হয়েছিল, আপনি জানেন ?'

'না। সে কি রকম ?'

'মনে করুন বনে-জঙ্গলে যুদ্ধ হচ্ছে। আপনি নিরস্ত্র অবস্থায় একজন সশস্ত্র শত্রুর হাতে ধরা পড়লেন। পালাবার উপায় নেই, পালাবার চেষ্টা করলে সে আপনাকে গুলি করে মারবে। এ অবস্থায় আত্মরক্ষার উপায় কি ?—আপনি কৌশলে শত্রুর ডান পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর হঠাৎ তার দিকে ঘুরে ডান হাতের পোঁচা দিয়ে সজোরে মারলেন তার গলায়। Thyroid cartilage ভেঙে গেল, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল।'

'তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ?'

'হ্যাঁ। গলা টিপে মারতে গেলে আক্রান্ত ব্যক্তি যুদ্ধ করে মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এতে ওসব বালাই নেই, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আশ্চর্য। মেয়েটির মৃত্যু এইভাবে হয়েছে এতে আপনার সন্দেহ নেই ?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'আচ্ছা, আজ উঠি। কাল সকালে লোক পাঠাব রিপোর্টের জন্যে।'

নীলমণিবাবু থানায় ফিরিয়া আসিলেন। সুরেশ্বর যে হাসিকে খুন করিয়াছে ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা ধোঁকা রহিয়াছে। যে লোকটা রাত্রে আসিয়া হাসির সঙ্গে দেখা করিত, সে কে ? সে-ই কি হাসিকে গহনাগুলো উপহার দিয়াছিল ? হাসির সহিত লোকটার কিরূপ সম্বন্ধ ? সে যদি হাসির 'বন্ধু' হয় তবে হাসিকে খুন করিবে কেন ?

সে-রাত্রে আর কিছু হইল না। পরদিন সকালে একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও একজন রাইটার জমাদারকে সঙ্গে লইয়া নীলমণিবাবু আবার সুরেশ্বরের বাড়িতে গেলেন। আজ যেমন করিয়া হোক সুরেশ্বরের নিকট হইতে তিনি স্বীকারোক্তি আদায় করিবেন।

সুরেশ্বরের বাড়ির সদর দরজা খোলা, বাড়িতে কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। দু'চার বার ডাকাডাকি করিয়া নীলমণিবাবু সঙ্গীদের লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শয়নকক্ষের খোলা দরজার সামনে গিয়া তাঁহাদের গতি রুদ্ধ হইল। মেঝের উপর সুরেশ্বর মরিয়া পড়িয়া আছে।

গত রাত্রে সুরেশ্বর যথা-নিয়ত কালীকিঙ্করের দোকানে তাস খেলিতে গিয়াছিল। রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময় গৃহে ফিরিয়া আসে। তারপর কি হইয়াছে কেহ জানে না।

সিভিল সার্জেন মেজর বর্মণ সুরেশ্বরের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া রিপোর্ট দিলেন, গলার thyroid cartilage ভাঙিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ যে উপায়ে হাসির মৃত্যু হইয়াছিল ঠিক সেই উপায়ে সুরেশ্বরেরও মৃত্যু হইয়াছে।

গল্প শেষ করিয়া নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ হেঁট মুখে বসিয়া রহিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'এই হচ্ছে ঘটনা। তদন্তের সূত্রে আমি যা-যা জানতে পেরেছিলাম সব আপনাকে বলেছি। আমি প্রথমে সুরেশ্বরকে সন্দেহ করেছিলাম, পরে দেখলাম, হাসি আর সুরেশ্বরকে একই লোক একই উপায়ে খুন করেছে। আমি আসামীকে ধরতে পারিনি, আসামী কে তাও জানতে পারিনি। আপনি বলতে পারেন কে আসামী ?'

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'আরো কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন ?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'উত্তর যদি জানা থাকে নিশ্চয় দেব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সুরেশ্বরের ওয়ারিস্ কে ?'

'সুরেশ্বরের এক খুড়তুতো বোন। সুরেশ্বর উইল করেনি। খুড়তুতো বোনটি অনাথা বিধবা, কলকাতায় কোথায় রাঁধুনি-বৃত্তি করত ; সে-ই সব পেয়েছে।'

'যাক। —যে-রাত্রে সুরেশ্বরের মৃত্যু হয়, সে-রাত্রে ওর তিন বন্ধু কালীকিঙ্কর, দেবু মণ্ডল আর বিলাস দত্ত কোথায় ছিল ?'

'সুরেশ্বরের বাড়ি যাবার পর ওরা তিনজন প্রায় সারা রাত কালীকিঙ্করের দোকানে বসে তাস খেলেছিল। আমি ওদের প্রত্যেকের পিছনে চর লাগিয়েছিলাম, তাদের কাছেই খবর পেয়েছি। ওরা সুরেশ্বরকে খুন করেনি।'

'হুঁ। বিনোদ সরকারের পিছনে চর লাগিয়েছিলেন ?'

'না। বিনোদ সরকারের ওপর আমার সন্দেহ হয়নি। তার কোনো মোটিভ ছিল না। সুরেশ্বরকে হয়তো মারতে পারতো, কিন্তু হাসিকে মারবে কেন ?'

'তা বটে। দিনমণি হালদার তখন কোথায় ছিল খোঁজ নিয়েছিলেন ?'

'নিয়েছিলাম। সে তখন পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা গ্রামে ছিল। আমাশায় ভুগছিল। নড়বার ক্ষমতা ছিল না। তাছাড়া ওভাবে খুন করবার কৌশল সে জানবে কোত্থেকে ?'

'হুঁ। আচ্ছা, একটা কথা বলুন। আপনার কি মনে হয় হাসির স্বভাব-চরিত্র মন্দ ছিল ?'

'না। আমার বিশ্বাস সে ভাল মেয়ে ছিল।'

ব্যোমকেশ নতমুখে ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'কিন্তু তার রক্তে দোষ ছিল। তার মা—কি নাম হাসির মায়ের ?'

'অমলা।'

ব্যোমকেশ চোখ তুলিয়া নীলমণিবাবুর পানে চাহিল ; তিনিও প্রখর চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার শরীর ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দুইজনের চোখে চোখ আবদ্ধ হইয়া রহিল ; তারপর ব্যোমকেশ তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিল, নির্বাপিত গড়গড়ার নলটা হাতে তুলিয়া লইল।

নীলমণিবাবু আত্মসংবরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, 'আর কিছু জানতে চান ?'

ব্যোমকেশ নিরুৎসুকভাবে মাথা নাড়িল, 'আর কিছু জানবার নেই।'

নীলমণিবাবু একটু বাঁকা সুরে বলিলেন, 'কিছু বুঝলেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সবই বুঝেছি, নীলমণিবাবু।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'সবই বুঝেছেন ! হাসিকে কে খুন করেছিল আপনি বুঝেছেন ?'

'বুঝেছি বৈকি। হাসিকে খুন করেছিল সুরেশ্বর।'

'তাই নাকি ! তাহলে সুরেশ্বরকে মারল কে ?'

'সুরেশ্বরকে মেরেছিল—হাসির বাপ।'

'হাসির বাপ ! কিন্তু দিনমণি হালদার সে-সময় পঞ্চাশ মাইল দূরে ছিল—'

'আমি দিনমণি হালদারের কথা বলিনি, হাসির বাপের কথা বলেছি। হাসির জন্মদাতা পিতা।'

নীলমণিবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। দেখিতে লাগিলাম তাঁহার মুখ হইতে পরতে পরতে রক্ত নামিয়া যাইতেছে। অবশেষে তিনি যখন কথা বলিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য আর নাই, ক্ষীণ স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'জন্মদাতা পিতা—কার কথা বলছেন ?'

ব্যোমকেশ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কার কথা বলছি আপনি জানেন, নীলমণিবাবু। গল্পটা আমাকে না বললেই ভাল করতেন।'

অতঃপর নীলমণিবাবু কী বলিতেন তাহা আর শোনা হইল না। বীরেনবাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, রান্না তৈরি। আপনারা স্নান করে নিন। নীলমণিদা, আপনিও মধ্যাহ্ন ভোজনটা এখানেই সেরে নিন না ?'

নীলমণিবাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'না না, আমি চললাম। অনেক দেরি হয়ে গেল।' বলিয়া তিনি দ্রুত প্রস্থান করিলেন। আমাদের প্রতি দৃক্‌পাত করিলেন না।

আহারাদি সম্পন্ন করিয়া দুইজনে তাকিয়া মাথায় দিয়া লম্বা হইয়াছিলাম। গড়াগড়া চলিতেছিল।

বলিলাম, 'কি করে বুঝলে বল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'নীলমণিবাবুর গল্প শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল হাসির প্রতি তাঁর পক্ষপাত আছে। অথচ তাঁর গল্প অনুযায়ী, হাসিকে জীবিত অবস্থায় তিনি দেখেননি। তার চরিত্র সম্বন্ধে যে সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে তাকে পতিগতপ্রাণা সতীসাধ্বী মনে করবার কারণ নেই। সে প্রগল্‌ভা ছিল, তার স্বামী তাকে সন্দেহ করত, একজন অজ্ঞাত লোক রাত্রে তার সঙ্গে দেখা করত। তবে তার প্রতি নীলমণিবাবুর পক্ষপাত কেন ?

'হাসির মা অমলাও সীতা-সাবিত্রী ছিল না। অমলার স্বামী দিনমণি হালদার জেলখানার

পোষা পাখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; মাঝে মাঝে ছাড়া পেত, আবার জেলে গিয়ে ঢুকত। দিনমণি হালদার হাসির বাপ নাও হতে পারে।

'বিনোদ সরকারও হাসির বাপ নয়। হাসির মায়ের সঙ্গে যখন তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তখন হাসির বয়স তিন-চার বছর। তবে কে ?

'নীলমণিবাবু গল্প বলবার আগে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, পুলিসের চাকরিতে ঢুকে প্রথম তিনি এই শহরে পোস্টেড হয়েছিলেন। দিনমণি পেশাদার চোর, তাকে ধরতে কিংবা তার ঘর-দোর খানাতল্লাশ করবার জন্যে হয়তো নীলমণিবাবু গিয়েছিলেন। তিনি তখন যুবক, হয়তো দিনমণির কুহকময়ী স্ত্রীর ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলেন ; দিনমণি জেলে যাবার পর গোপনে দু'জনের মেলামেশা হয়েছিল।

'দু-তিন বছর পরে নীলমণিবাবু এ জেলা থেকে বদলি হয়ে গেলেন ; যাবার আগে জেনে গেলেন তাঁর একটি মেয়ে আছে। মেয়ের নাম হাসি। দূরে গিয়েও তিনি হাসি ও হাসির মায়ের খবর রাখতেন। তিনি বিয়ে করেননি, তাই সংসারের বন্ধন হাসিকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি। সংসারে হাসিই তাঁর একমাত্র রক্তের বন্ধন।

'কর্মজীবনের শেষের দিকে তিনি আবার এই শহরে ফিরে এলেন। হাসির মা তখন মরে গেছে, হাসির বিয়ে হয়েছে। নীলমণিবাবুর অভ্যাস ছিল তিনি গভীর রাত্রে সাইকেল চড়ে শহর তদারক করতে বেরুতেন। সেই সময় তিনি হাসির সঙ্গে দেখা করতেন, তাকে ছোটখাটো দু'-একখানা গয়না উপহার দিতেন। হাসিকে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন কিনা বলা যায় না। তবে হাসি হয়তো আন্দাজ করেছিল।

'যে-রাত্রে সুরেশ্বর হাসিকে খুন করে সে-রাত্রে নীলমণিবাবু হাসির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। তারপর যা-যা হয়েছিল সবই আমরা নীলমণিবাবুর মুখে শুনেছি। আমার বিশ্বাস সুরেশ্বর তাস খেলতে খেলতে উঠে এসে হাসিকে খুন করেছিল, তারপর ফিরে গিয়ে বন্ধুদের বলেছিল—বৌকে খুন করেছি, এখন তোরা আমাকে বাঁচা। চারজনের মধ্যে অটুট বন্ধুত্ব। তারা পরামর্শ করে স্থির করল, মড়া পুড়িয়ে ফেলা যাক, তারপর রটিয়ে দিলেই হবে, হাসি কুলত্যাগ করেছে।

'নীলমণিবাবু চার বন্ধুকে থানায় ধরে আনলেন, কিন্তু তাদের অ্যালিবাই ভাঙতে পারলেন না। তিনি যখন দেখলেন তাঁর মেয়ের হত্যাকারীকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারবেন না তখন ঠিক করলেন নিজেই তাঁকে খুন করবেন। তিনি আর বিলম্ব করলেন না, হাসির মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সুরেশ্বরকে খুন করলেন।

'কিন্তু ভেবে দেখ, আমি যেভাবে গল্পটাকে খাড়া করেছি, তার আগাগোড়াই অনুমান। এই অনুমান কেবল তখনি সত্যে পরিণত হতে পারে যদি নিশ্চয়ভাবে জানা যায় যে, নীলমণিবাবু হাসির বাপ। আমি তাঁর জন্যে ফাঁদ পাতলাম, আচমকা জিগ্যেস করলাম—হাসির মায়ের নাম কি ? তিনি না ভেবেচিন্তে বলে ফেললেন—অমলা !

'হাসির মায়ের নাম তিনি জানলেন কি করে ? দশ বছর আগে সে মরে গেছে, এই মামলায় তার নাম একবারও কেউ উচ্চারণ করেনি। তবে নীলমণিবাবু জানলেন কি করে ? আর সন্দেহ রইল না।

'আমার সামনেই হাসির মায়ের নাম উচ্চারণ করেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অসাবধানে তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন, আমিও তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম আমার ফাঁদ পাতা ব্যর্থ হয়নি। নীলমণিবাবুর অজানা আসামী স্বয়ং নীলমণিবাবু।'

ব্যোমকেশের যুক্তিজালে ছিদ্র পাইলাম না। বলিলাম, 'নীলমণিবাবু তাহলে নিরস্ত্র যুদ্ধের কায়দা আগে থাকতে জানতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। বিদ্যেটা তিনি সিভিল সার্জন মেজর বর্মণের কথা শুনে শিখে নিয়েছিলেন।'

কহেন কবি কালিদাস

যে শহরে আমি ও ব্যোমকেশ হপ্তাখানেকের জন্য প্রবাসযাত্রা করিয়াছিলাম তাহাকে কয়লা-শহর বলিলে অন্যায় হইবে না। শহরকে কেন্দ্র করিয়া তিন-চার মাইল দূরে দূরে গোটা চারেক কয়লার খনি। শহরটি যেন মাকড়সার মত জাল পাতিয়া মাঝখানে বসিয়া আছে, চারিদিক হইতে কয়লা আসিয়া রেলওয়ে স্টেশনে জমা হইতেছে এবং মালগাড়িতে চড়িয়া দিগবিদিকে যাত্রা করিতেছে। কর্মব্যস্ত সমৃদ্ধ শহর ; ধনী ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে, কয়েকটি বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে, উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দালাল মহাজনের ছড়াছড়ি। পথে মোটর ট্যাক্সি বাস ট্রাকের ছুটাছুটি। কাঁচা মালের সহিত কাঁচা পয়সার অবিরাম বিনিময়। শহরটিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—কয়লা। চারিদিকে কয়লার কীর্তন, কয়লার কলকোলাহল। শহরটি মোটেই প্রাচীন নয়, কিন্তু দেখিয়া মনে হয় অদৃশ্য কয়লার গুঁড়া ইহার সর্বাঙ্গে অকালবার্ধক্যের ছায়া ফেলিয়াছে।

যাঁহার আহ্বানে আমরা এই শহরে আসিয়াছি তিনি ফুলঝুরি নামক একটি কয়লাখনির মালিক, নাম মণীশ চক্রবর্তী। কয়েক মাস যাবৎ তাঁহার খনিতে নানা প্রকার প্রচ্ছন্ন উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল। খনির গর্ভে আগুন লাগা, মূল্যবান যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া নষ্ট হওয়া ইত্যাদি দুর্ঘটনা ঘটিতেছিল ; কুলি-কাবাড়িদের মধ্যেও অহেতুক অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। একদল লোক তাঁহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই ; এরূপ অবস্থায় যাহা মনে করা স্বাভাবিক তাহাই মনে করিয়া মণীশবাবু পুলিস ডাকিয়াছিলেন। অনেক নূতন লোককে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। শেষ পর্যন্ত গোপনে ব্যোমকেশকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

একটি চৈত্রের সন্ধ্যায় আমরা মণীশবাবুর গৃহে উপনীত হইলাম। শহরের অভিজাত অঞ্চলে প্রশস্ত বাগান-ঘেরা দোতলা বাড়ি। মণীশবাবু সবেমাত্র খনি হইতে ফিরিয়াছেন, আমাদের সাদর সম্ভাষণ করিলেন। মণীশবাবুর বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, গৌরবর্ণ সুপুরুষ, এখনও শরীর বেশ সমর্থ আছে। চোয়ালের হাড়ের কঠিনতা দেখিয়া মনে হয় একটু কড়া মেজাজের লোক।

ড্রয়িং-রুমে বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মণীশবাবু বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, এখানে কিন্তু আপনাদের ছদ্মনামে থাকতে হবে। আপনার নাম গগনবাবু, আর অজিতবাবুর নাম সুজিতবাবু। আপনাদের আসল নাম শুনলে সকলেই বুঝতে পারবে আপনারা কী উদ্দেশ্যে এসেছেন। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বেশ তো, এখানে যতদিন থাকব গগনবাবু সেজেই থাকব। অজিতেরও সুজিত সাজতে আপত্তি নেই।'

দ্বারের কাছে একটি যুবক দাঁড়াইয়া অস্বচ্ছন্দভাবে ছট্‌ফট করিতেছিল, বোধহয় ব্যোমকেশের সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মণীশবাবু ডাকিলেন, 'ফণী।'

যুবক উদ্‌গ্রীবভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। মণীশবাবু আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমার ছেলে ফণীশ।—ফণী, তুমি জানো এঁরা কে, কিন্তু বাড়ির বাইরে আর কেউ যেন জানতে না পারে।'

ফণীশ বলিল, 'আজ্ঞে না।'

'তুমি এবার এঁদের গেস্ট-রুমে নিয়ে যাও। দেখো যেন ওঁদের কোনো অসুবিধা না হয়।—আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, চা তৈরি হচ্ছে।'

ড্রয়িং-রুমের লাগাও গেস্ট-রুম। বড় ঘর, দু'টি খাট। টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি উপযোগী আসবাবে সাজানো, সংলগ্ন বাথরুম। ফণীশ আমাদের ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

ছেলেটিকে বেশ শান্তশিষ্ট এবং ভালমানুষ বলিয়া মনে হয়। বাপের মতই সুপুরুষ, কিন্তু দেহ-মনের পূর্ণ পরিণতি ঘটিতে এখনও বিলম্ব আছে ; ভাবভঙ্গীতে একটু ছেলেমানুষীর রেশ রহিয়া গিয়াছে। বয়স আন্দাজ তেইশ-চব্বিশ।

বেশবাস পরিবর্তন করিতে করিতে দুই-চারিটা কথা হইল ; ফণীশ লাজুকভাবে ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তর দিল। সে পিতার একমাত্র সন্তান, এক বছর আগে তাহার বিবাহ হইয়াছে। সে প্রত্যহ পিতার সঙ্গে কয়লাখনিতে গিয়া কাজকর্ম দেখাশুনা করে। লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশের কথার উত্তর দিতে দিতে সে যেন একটা অন্য কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বলিতে গিয়া সংকোচবশে থামিয়া যাইতেছে।

ফণীশ কী বলিতে চায় শোনা হইল না, আমরা বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে চা ও জলখাবার উপস্থিত হইয়াছে ; আমরা বসিয়া গেলাম।

চায়ের আসরে কিন্তু মেয়েদের দেখিলাম না, কেবল আমরা চারজন। অথচ বাড়িতে অন্তত দুইটি স্ত্রীলোক নিশ্চয় আছেন। মণীশবাবু বোধকরি পুরাপুরি স্বদেশীবর্জন করেন নাই। তা আজকালকার সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার যুগে একটু অন্তরাল থাকা মন্দ কি ?

পানাহার শেষ করিয়া সিগারেট ধরাইয়াছি, একটি প্রকাণ্ড গাড়ি আসিয়া বাড়ির সামনে থামিল। গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। গোরিলার মত চেহারা, কালিমাবেষ্টিত চোখ দুটিতে মন্থর কুটিলতা। মুখ দেখিয়া চরিত্র অধ্যয়ন যদি সম্ভব হইত বলিতাম লোকটি মহাপাপিষ্ঠ।

মণীশবাবু খুব খাতির করিয়া আগন্তুককে ঘরে আনিলেন, আমাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন, 'ইনি শ্রীগোবিন্দ হালদার, এখানকার একটি কয়লাখনির মালিক। আর এঁরা হচ্ছেন শ্রীগগন মিত্র এবং সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ; আমার বন্ধু, কলকাতায় থাকেন। বেড়াতে এসেছেন।'

গোবিন্দবাবু তাঁহার শনৈশ্চর চক্ষু দিয়া আমাদের সমীক্ষণ করিতে করিতে মণীশবাবুকে বলিলেন, 'খবর নিতে এলাম। খনিতে আর কোনো গণ্ডগোল হয়েছে নাকি ?'

মণীশবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, 'গণ্ডগোল তো লেগেই আছে। পরশু রাত্রে এক কাণ্ড। হঠাৎ পাঁচ নম্বর পিট্-এর পাম্প বন্ধ হয়ে গেল। ভাগ্যে পাহারাওয়ালারা সজাগ ছিল তাই বিশেষ অনিষ্ট হয়নি। নইলে—'

গোবিন্দবাবু মুখে চুক্‌চুক শব্দ করিলেন। মণীশবাবু বলিলেন, 'আপনারা তো বেশ আছেন, যত উৎপাত আমার খনিতে। কেন যে হতভাগাদের আমার দিকেই নজর তা বুঝতে পারি না।'

গোবিন্দবাবু বলিলেন, 'আমার খনিতেও মাস ছয়েক আগে গোলমাল শুরু হয়েছিল। আমি জানি পুলিসের দ্বারা কিছু হবে না, আমি সরাসরি চর লাগালাম। আটজন লোককে গুপ্তচর লাগিয়েছিলাম, দিন আষ্টেকের মধ্যে তারা খবর এনে দিল কারা শয়তানি করছে। পাঁচটা লোক ছিল পালের গোদা, তাদের একদিন ধরে এনে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিলাম। তাদের বরখাস্ত করতে হল না, নিজে থেকেই পালিয়ে গেল। সেই থেকে সব ঠাণ্ডা আছে।' বলিয়া তিনি দস্তুর গোরিলা-হাস্য হাসিলেন।

মণীশবাবু বলিলেন, 'আমিও গুপ্তচর লাগিয়েছিলাম কিন্তু কিছু হল না। যাকগে—' তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। সাধারণভাবে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। গোবিন্দবাবুর জন্য চা-জলখাবার আসিল, তিনি তাহা সেবন করিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি কিন্তু আমাদের আশেপাশেই ঘুরিতে

লাগিল। আমরা নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি একথা বোধহয় তিনি বিশ্বাস করেন নাই।

ঘণ্টাখানেক পরে তিনি উঠিলেন। মণীশবাবু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত গেলেন, আমরাও গেলাম। ড্রাইভার মোটরের দরজা খুলিয়া দিল। গোবিন্দবাবু মোটরে উঠিবার উপক্রম করিয়া ব্যোমকেশের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া হাসি-হাসি মুখে বলিলেন, 'দেখুন চেষ্টা করে।'

তিনি মোটরে উঠিয়া বসিলেন, মোটর চলিয়া গেল।

মণীশবাবু এবং আমরা কিছুক্ষণ দৃষ্টি-বিনিময় করিলাম, তারপর তিনি বিষণ্ণ সুরে বলিলেন, 'গোবিন্দ হালদার লোকটা ভারি সেয়ানা, ওর চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়।'

রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শয়ন করিতে এগারোটা বাজিল। শরীরে ট্রেনের ক্লান্তি ছিল, মাথার উপর পাখা চালাইয়া দিয়া শয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে ডুবিয়া গেলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

একজন ভৃত্য জানাইল, বড়কর্তা এবং ছোটকর্তা ভোরবেলা কোলিয়ারিতে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখি আমাদের চা ও জলখাবার টেবিলের উপর সাজাইয়া একটি যুবতী দাঁড়াইয়া আছে।

ইতিপূর্বে বাড়ির মেয়েদের দেখি নাই, আমরা একটু থতমত খাইয়া গেলাম। ব্যোমকেশের সুস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে মেয়েটি নীচু হইয়া ঈষৎ জড়িতস্বরে বলিল, 'আমি ইন্দিরা, এবাড়ির বৌ। আপনারা খেতে বসুন।'

ফণীশের বৌ। শ্যামবর্ণা, তনুদীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, মুখখানি তর্‌তরে ; বয়স আঠারো-উনিশ। দেখিলেই বোঝা যায় ইন্দিরা লাজুক মেয়ে, অপরিচিত বয়স্থ ব্যক্তির সহিত সহজভাবে আলাপ করার অভ্যাসও তাহার নাই। নেহাত বাড়িতে পুরুষ নাই, তাই বেচারী বাধ্য হইয়া অতিথি সৎকার করিতে আসিয়াছে।

আমরা আহারে বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'বোসো না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?'

ইন্দিরা একটি সোফার কিনারায় বসিল।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় একটু চুমুক দিয়া গলা ভিজাইয়া লইল, তারপর জলখাবারের রেকাবি টানিয়া লইল, 'আজ আমাদের উঠতে দেরি হয়ে গেল। কর্তা কি ভোরবেলাই কাজে বেরিয়ে যান ?'

'হ্যাঁ, বাবা সাতটার সময় বেরিয়ে যান।'

'আর তোমার কর্তা ?'

ইন্দিরার ঘাড় অমনি নত হইয়া পড়িল। সে চোখ না তুলিয়াই অস্ফুটস্বরে বলিল, 'উনিও।' তারপর জোর করিয়া লজ্জা সরাইয়া বলিল, 'ওঁরা বারোটার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া করেন, আবার তিনটের সময় যান।'

ব্যোমকেশ তাহার পানে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিল, আর কিছু বলিল না। আহার করিতে করিতে আমি ইন্দিরাকে লক্ষ্য করিলাম। সে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে ব্যোমকেশের প্রতি চকিত কটাক্ষপাত করিতেছে। মনে হইল অতিথি সৎকার ছাড়াও অন্য কোনও অভিসন্ধি আছে। ব্যোমকেশ কে তাহা সে জানে, ফণীশ স্ত্রীকে নিশ্চয় বলিয়াছে, তাই ব্যোমকেশকে কিছু বলিতে চায়। সে মনে মনে কিছু সংকল্প করিয়াছে কিন্তু সংকোচবশত বলিতে পারিতেছে না। কাল রাত্রে ফণীশের মুখেও এইরূপ দ্বিধার ভাব দেখিয়াছিলাম।

প্রাতরাশ শেষ করিয়া চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ রুমালে মুখ মুছিল, তারপর প্রসন্নস্বরে বলিল, 'কি বলবে এবার বল।'

আমি ইন্দিরার মুখে সংকল্প ও সংকোচের টানাটানি লক্ষ্য করিতেছিলাম, দেখিলাম সে চমকিয়া উঠিল, বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর তাহার সব

উদ্বেগ এক নিশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আমার স্বামীকে রক্ষে করুন। তাঁর বড় বিপদ।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া সোফায় বসিল, ইন্দিরাকে পাশে বসিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিল, 'বোসো। কি বিপদ তোমার স্বামীর আমাকে বলো।'

ইন্দিরা তেরছাভাবে সোফার কিনারায় বসিল, শীর্ণ সংহত স্বরে বলিল, 'আমি—আমি সব কথা গুছিয়ে বলতে পারব না। আপনি যদি সাহায্য করেন, উনি নিজেই বলবেন।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'খনি সম্বন্ধে কোনো কথা কি?'

ইন্দিরা বলিল, 'না, অন্য কথা। আপনারা বাবাকে যেন কিছু বলবেন না। বাবা কিছু জানেন না।'

ব্যোমকেশ শান্ত আশ্বাসের সুরে বলিল, 'আমি কাউকে কিছু বলব না, তুমি ভয় পেও না।'

'ওঁকে সাহায্য করবেন?'

'কি হয়েছে কিছুই জানি না। তবু তোমার স্বামী যদি নির্দোষ হন নিশ্চয় সাহায্য করব।'

'আমার স্বামী নির্দোষ।'

'তবে নির্ভয়ে থাকো।'

বাড়ির পাশের দিকে বাগানের কিনারায় একসারি ঘর। ইন্দিরার মুখে হাসি ফুটিবার পর আমরা সিগারেট টানিতে টানিতে সেইদিকে গেলাম।

সামনের ঘর হইতে একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। পরিধানে ফরাসডাঙ্গার ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি, ফিটফাট চেহারা। চুলে নিশ্চয় কলপ লাগাইয়া থাকেন, কালো চুলের নীচে শ্বেতবর্ণ অঙ্কুর মাথা তুলিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার নাম গগন মিত্র, ইনি সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। মণীশবাবুর অতিথি।'

ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমাদের সংবর্ধনা করিলেন, 'আসুন, আসুন। আপনারা আসবেন কর্তার মুখে শুনেছিলাম। আমি সুরপতি ঘটক, এই অফিসের দেখাশোনা করি।'

সুরপতিবাবু আমাদের প্রকৃত নাম জানেন না। ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা বুঝি কয়লাখনির অফিস। আপনি অফিস-মাস্টার।'

সুরপতিবাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে। কয়লাখনিতে একটা ছোট অফিস আছে, এটা বড় অফিস। আসুন না দেখবেন।'

ঘরগুলি একে একে দেখিলাম। বিভিন্ন ঘরে কেরানিরা খাতাপত্র লইয়া কাজ করিতেছে, টাইপরাইটারের খটাখট শব্দ হইতেছে, দর্শনীয় কিছু নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে আমরা সুরপতিবাবুর অফিসে বসিলাম।

সাধারণভাবে কিছুক্ষণ বাক্যালাপ চালাইবার পর ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'আপনাকে বলি, আমরা দুই বন্ধু মিলে একটা ছোটখাটো কয়লাখনি কেনবার মতলব করেছি। এখানে নয়, অন্য জেলায়। সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কি করে কয়লাখনি চালাতে হয় আমরা কিছুই জানি না; তাই মণীশবাবুর খনি দেখতে এসেছি। অফিসের কাজ, খনির কাজ, সব বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই।'

সুরপতিবাবু মহা উৎসাহে বলিলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। এ আর বেশি কথা কি? অফিসের কাজ দু'দিনে শিখে যাবেন; আর খনির কাজও এমন কিছু শক্ত নয়। তাছাড়া যদি দরকার হয় আমি আপনাকে খুব ভাল লোক দিতে পারি।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রকম লোক?'

সুরপতিবাবু বলিলেন, 'অফিসের কাজ জানে, কোলিয়ারির কাজ জানে এমন লোক। আমার নিজের হাতে তৈরি করা লোক।'

ব্যোমকেশ আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, 'তাই নাকি! তা কাজ-জানা ভাল লোক পেলে আমরা

নেব। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা হবে। অফিসের কাজকর্মও দেখব। আমরা এখন কিছুদিন আছি।'

অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলাম।

বারোটার সময় ফণীশ ও মণীশবাবু খনি হইতে ফিরিলেন। স্নানাহার সারিতে একটা বাজিয়া গেল। তারপর খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা চারজন মোটরে চড়িয়া কয়লাখনিতে চলিলাম।

মস্ত বড় মোটর। ফণীশ চালাইয়া লইয়া চলিল, আমরা তিনজন পিছনে বসিলাম।

মোটর শহর ছাড়াইয়া নির্জন রাস্তা ধরিল। মাইল তিনেক দূরে কয়লাখনি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'সকালে সুরপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। উনি কতদিন আপনার কাজ করছেন?'

মণীশবাবু বলিলেন, 'প্রায় কুড়ি বছর। পাকা লোক।'

ব্যোমকেশ কহিল, 'ওঁকে বলেছি আমরা একটা কয়লাখনি কিনব। তাই খোঁজ খবর নিতে এসেছি। আমাদের সত্যিকার পরিচয় দিইনি।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'ভালই করেছেন। সুরপতি অবশ্য বিশ্বাসী লোক, দোষের মধ্যে বছর দুই আগে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেছে।'

সুরপতিবাবুর চুলের কলপ এবং শৌখিন জামা-কাপড়ের অর্থ পাওয়া গেল। প্রৌঢ় বয়সে তরুণী ভার্যার চোখে যৌবনের বিভ্রম সৃষ্টি করার চেষ্টা স্বাভাবিক।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সম্প্রতি কেউ আপনার খনি কেনবার প্রস্তাব করেছিল?'

মণীশবাবু বলিলেন, 'সম্প্রতি নয়, কয়েক বছর আগে। একজন মাড়োয়ারী। ভাল দাম দিতে চেয়েছিল, আমি বেচিনি।'

ব্যোমকেশ দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল, 'এখানে অন্য যেসব খনির মালিক আছেন তাঁদের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব আছে?'

মণীশবাবু বলিলেন, 'গাঢ় প্রণয় আছে এমন কথা বলতে পারি না, তবে মুখোমুখি ঝগড়া কারুর সঙ্গে নেই।'

'এমন কেউ আছেন যিনি বাইরে ভদ্রতার মুখোশ পরে ভিতরে ভিতরে আপনার অনিষ্ট চিন্তা করছেন?'

'থাকতে পারে, কিন্তু তাকে চিনব কি করে?'

'তা বটে। কাল রাত্রে যিনি এসেছিলেন—গোবিন্দ হালদার—তিনি কি রকম লোক?'

মণীশবাবু চিন্তা-মন্থর কণ্ঠে বলিলেন, 'গোবিন্দ হালদারকে চেনা শক্ত। পাঁকাল মাছের মত চরিত্র, ধরা-ছোঁয়া যায় না। তবে গোবিন্দবাবুর ছোট ভাই এবং অংশীদার অরবিন্দ অতি বদ লোক। মাতাল, জুয়াড়ী, দুশ্চরিত্র। বছর কয়েক আগে স্ত্রীটা আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে। তারপর থেকে অরবিন্দ একেবারে নামকাটা সেপাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

আর কোনও কথা হইল না, আমরা কয়লাখনির এলাকায় প্রবেশ করিলাম।

কয়লাখনির বিস্তারিত বর্ণনা দিবার ইচ্ছা নাই। যাঁহারা স্বচক্ষে কয়লাখনি দেখেন নাই তাঁহারা নিশ্চয় রঙ্গমঞ্চে বা চিত্রপটে দেখিয়াছেন, এমন কিছু নয়নাভিরাম দৃশ্য নয়। বিশেষত এই কাহিনীতে কয়লাখনির স্থান খুবই অল্প; কয়লাখনিকে এই কাহিনীর কালো পশ্চাৎপট বলাই সঙ্গত। পশ্চাৎপট না থাকিলে কাহিনী উলঙ্গ হইয়া পড়ে, তাই রাখিতে হইয়াছে।

কয়লা! যাহার জোরে যন্ত্র চলিতেছে তাহাকে যন্ত্রের সাহায্যে মৃত্তিকার গভীর গর্ভ হইতে টানিয়া আনা হইতেছে; সভ্যতার চাকা ঘুরিতেছে। নমো যন্ত্র। তব খনি-খনিত্র নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র! নমো যন্ত্র। অলমিতি।

খনির ম্যানেজার তারাপদবাবুর সঙ্গে পরিচয় হইল। বয়স্ক লোক, খনির সীমানার মধ্যে তাঁহার

বাসস্থান ; রাশভারী জবরদস্ত লোক বলিয়া মনে হয়। তিনি আমাদের লইয়া খনির বিভিন্ন অংশের কার্যকলাপ দেখাইলেন। খনির গর্ভে অবতরণ করিবার প্রস্তাবও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা রাজী হইলাম না। সীতা পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল ; আমাদের সেরূপ কোনও কারণ নাই।

অপরাহ্ণে আমরা তারাপদবাবুর অফিসে চা খাইলাম। সেখানে খনির ডাক্তার যতীন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য উচ্চ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা হইল। কাজের কথা কিছু হইল না, সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, আমরা ছদ্মনামেই রহিলাম। এক সময় লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশ ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে বেশ ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে, ঘরের এক কোণে বসিয়া নিবিষ্ট মনে তাঁহার সহিত গল্প করিতেছে। ডাক্তার ঘোষ আমাদের সমবয়স্ক, তিনিও খনিতেই ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল লইয়া থাকেন। তাঁহার কোট-প্যান্টুলুন-পরা চেহারায় জীবন-ক্লান্তির একটু আভাস পাওয়া যায়।

তারপর সন্ধ্যা হইলে আমরা আবার মোটরে চড়িয়া বাড়ির দিকে যাত্রা করিলাম।

রাত্রে আহারাদির পর মণীশবাবু উপরে শয়ন করিতে গেলেন, আমরা নিজের ঘরে আসিলাম। ফণীশ আমাদের সঙ্গে আসিল।

ব্যোমকেশ পাখা চালাইয়া দিয়া নিজের শয্যায় লম্বা হইল, সিগারেট ধরাইয়া ফণীশকে বলিল, 'বোসো। কী কাণ্ড বাধিয়েছ ? বৌমাকে এত উদ্বিগ্ন করে তুলেছ কেন ?'

ফণীশ চেয়ারে বসিয়া হাত কচ্‌লাইতে লাগিল, তারপর কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'ইন্দিরাকে রাজী করিয়েছিলাম আপনাকে বলতে, নিজে বলতে সাহস হয়নি—'

'কিন্তু কথাটা কী ? তোমাদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে ভারি গুরুতর ব্যাপার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুতর ব্যাপার। একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছি ঘটনাচক্রে। বাবা যদি জানতে পারেন—'

ব্যোমকেশ বিছানায় উঠিয়া বসিল, 'খুনের মামলা !'

ফণীশ শীর্ণকণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে, বিশ্রী ব্যাপার। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে, তারা জানতে পেরেছে যে আমরা—'

'কি হয়েছিল সব কথা গুছিয়ে বল।'

ফণীশ অবশ্য সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারিল না। তাহার জট-পাকানো কাহিনীকে আমি যথাসম্ভব সিধা করিয়া লিখিতেছি।—

এই শহরে একটি ক্লাব আছে। কৌতুকবশে তাহার নামকরণ হইয়াছে—কয়লা ক্লাব। ক্লাবের চাঁদার হার খুব উঁচু, তাই বড় মানুষ ছাড়া অন্য কেহ ইহার সভ্য হইতে পারে না। ফণীশ এই ক্লাবের সভ্য। আরও অনেক গণ্যমান্য সভ্য আছে ; তন্মধ্যে উলুডাঙ্গা কয়লাখনির মালিক মৃগেন্দ্র মৌলিক, ধুবিপোতা খনির মধুময় সুর এবং শিমুলিয়া খনির অরবিন্দ ও গোবিন্দ হালদার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্লাবে অপরাহ্ণে টেনিস খেলা, ব্যাডমিন্টন খেলা হয় ; সন্ধ্যার পর বিলিয়ার্ড, পিংপং, তাস-পাশা চলে। বাজি রাখিয়া তাস খেলা হয়। কিন্তু ক্লাবের নিয়মানুযায়ী বেশি টাকা বাজি রাখা যায় না ; তাই যাহাদের রক্তে জুয়ার নেশা আছে তাহাদের মন ভরে না। অরবিন্দ হালদার এই অতৃপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। কিন্তু উপায় কি ? শহরে ভদ্রভাবে জুয়া খেলার অন্য কোনও আস্তানা নাই।

বছরখানেক আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ক্লাবের সভ্য হইয়াছিলেন। পয়সাওয়ালা লোক, মহাজনী কারবার খুলিয়াছিলেন, শহরে নবাগত। বাজার অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র অফিস আছে, কিন্তু থাকেন শহরের বাহিরে নির্জন রাস্তার ধারে এক বাড়িতে। শকুনি-মার্কা চেহারা, নাম প্রাণহরি পোদ্দার।

পোদ্দার মহাশয় ক্লাবে আসিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার সমবয়স্ক বৃদ্ধ ক্লাবে কেহ নাই, বেশির ভাগই ছেলে-ছোকরা, দু'চারজন মধ্যবয়স্ক আছেন। ক্রমে দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় হইল। কিন্তু বয়সের পার্থক্যবশত কাহারও সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল না।

ফণীশ, মৃগেন মৌলিক, মধুময় সুর এবং অরবিন্দ হালদার এই চারজন মিলিয়া ক্লাবে একটি গোষ্ঠী রচনা করিয়াছিল। ফণীশ ছিল এই চারজনের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে ছোট, আর অরবিন্দ হালদার ছিল সবচেয়ে বয়সে বড়। তাহার বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ ; দলের মধ্যে সে-ই ছিল অগ্রণী।

একদিন সন্ধ্যার পর ইহারা ক্লাবের একটা ঘরে বসিয়া ব্রিজ খেলিতেছিল, পোদ্দার মহাশয় আসিয়া তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন। টেবিলের চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কে কেমন হাত পাইয়াছে দেখিলেন। অরবিন্দ অলসকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কন্ট্রাক্ট ব্রিজ জানেন ?'

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন, 'জানি।'

'খেলবেন ?'

'খেলব। কি রকম বাজি ?'

'এক টাকা পয়েন্ট। চলবে ?'

'চলবে।'

যে রাবার খেলা হইতেছিল তাহা শেষ হইলে তাস কাটিয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন বাহির হইয়া গেল। প্রাণহরি পোদ্দার খেলিতে বসিলেন।

দেখা গেল পোদ্দার মহাশয় অতি নিপুণ খেলোয়াড়। কিন্তু সেদিন তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না, ভাল হাত পাইলেন না। খেলার শেষে হিসাব করিয়া দেখা গেল তিনি একুশ টাকা হারিয়াছেন। তিনি টাকা শোধ করিয়া দিলেন।

তারপর হইতে প্রাণহরিবাবু প্রায় প্রত্যহই ফণীশদের দলে খেলিতে বসেন। কখনও হারেন, কখনও জেতেন ; সকল অবস্থাতেই তিনি নির্বিকার। এইভাবে তিনি ফণীশদের দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলেন।

কয়েকমাস এইভাবে কাটিল।

গত ফাল্গুন মাসে একদিন খেলিতে বসিয়া প্রাণহরিবাবু বলিলেন, 'আপনারা ব্রিজ ছাড়া অন্য কোনো খেলা খেলেন না ?'

মধুময় সুর প্রশ্ন করিল, 'কি রকম খেলা ?'

প্রাণহরি বলিলেন, 'এই ধরুন, পোকার কিংবা রানিং ফ্লাশ।'

মৃগেন মৌলিক বলিল, 'আমরা সব খেলাই খেলতে জানি। কিন্তু ক্লাবে জুয়া খেলার নিয়ম নেই। ব্রিজ তো আর জুয়া নয়, game of skill.' বলিয়া নাকের মধ্যে ব্যঙ্গ-হাস্য করিল।

প্রাণহরি তখন কিছু বলিলেন না। খেলা শেষ হইলে বলিলেন, 'একদিন আসুন না আমার বাসায়, নতুন খেলা খেলবেন।'

কাহারও আপত্তি হইল না। অরবিন্দ বলিল, 'মন্দ কি। আপনি কোথায় থাকেন ?'

প্রাণহরি বলিলেন, 'শহরের বাইরে উলুডাঙা খনির রাস্তায় আমার বাসা। একলা থাকি, আপনারা যদি আসেন বেশ জমজমাট হবে। কালই আসুন না।'

সকলে রাজী হইল। প্রাণহরি ট্যাক্সি ধরিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিজের গাড়ি নাই, ট্যাক্সির সহিত বাঁধা ব্যবস্থা আছে, ট্যাক্সিতেই যাতায়াত করেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর চারজন অরবিন্দের মোটরে চড়িয়া প্রাণহরির গৃহে উপস্থিত হইল। শহরের সীমানা হইতে মাইল দেড়েক দূরে নির্জন রাস্তার উপর দোতলা বাড়ি, আশেপাশে দু'-তিনশত গজের মধ্যে অন্য বাড়ি নাই।

প্রাণহরিবাবু পরম সমাদরের সহিত তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, নীচের তলার একটি সুসজ্জিত ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। কিছুক্ষণ সাধারণভাবে বাক্যালাপ হইল। প্রাণহরিবাবু

বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ; পূর্বে তিনি উড়িষ্যার কটক শহরে থাকিতেন। কিন্তু সেখানে মন টিকিল না তাই এখানে চলিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে একটি দাসী আছে, সেই তাঁহার রন্ধন ও পরিচর্যা করে।

এই সময় দাসী চায়ের ট্রে হাতে লইয়া প্রবেশ করিল, ট্রে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল, আবার এক থালা কাটলেট লইয়া ফিরিয়া আসিল। দিব্য-গঠনা যুবতী। বয়স কুড়ি-বাইশ ; রং ময়লা, কিন্তু মুখখানি সুন্দর, হরিণের মত চোখ দু'টিতে কুহক ভরা। দেখিলে ঝি-চাকরানী শ্রেণীর মেয়ে বলিয়া মনে হয় না। সে অতিথিদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল।

গরম গরম কাটলেট সহযোগে চা পান করিতে করিতে অরবিন্দ বলিল, 'খাসা কাটলেট ভেজেছে। এটি আপনার ঝি ?'

প্রাণহরিবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। মোহিনীকে উড়িষ্যা থেকে এনেছি। রান্না ভাল করে।'

পানাহারের পর খেলা বসিল। সর্বসম্মতিক্রমে তিন তাসের খেলা রানিং ফ্লাশ আরম্ভ হইল। সকলেই বেশি করিয়া টাকা আনিয়াছিল, প্রাণহরিবাবু পাঁচশো টাকা লইয়া দেখিতে বসিলেন।

দুই ঘণ্টা খেলা হইল। বেশি হার-জিত কিন্তু হইল না ; কেহ পঞ্চাশ টাকা জিতিল, কেহ একশো টাকা হারিল। প্রাণহরিবাবু মোটের উপর হারিয়া রহিলেন। স্থির হইল তিন দিন পরে আবার এখানে খেলা বসিবে।

ফণীশের মনে কিন্তু সুখ নাই। সে তাস খেলিতে ভালবাসে বটে, কিন্তু জুয়াড়ী নয়। তাহার মাথার উপর কড়া প্রকৃতির বাপ আছেন, টাকাকড়ি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। দলে পড়িয়া তাহাকে এই জুয়ার ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু দল ছাড়িবার চেষ্টা করিলে তাহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। ফণীশ নিতান্ত অনিচ্ছাভরে জুয়ার দলে সংযুক্ত হইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দিন খেলা খুব জমিয়া গেল। মোহিনী মুর্গীর ফ্রাই তৈরি করিয়াছিল। চা সহযোগে তাহাই খাইতে খাইতে খেলা আরম্ভ হইল ; তারপর মধ্যপথে প্রাণহরিবাবু বিলাতি হুইস্কির একটি বোতল বাহির করিলেন। ফণীশের মদ সহ্য হয় না, খাইলেই বমি আসে, সে খাইল না। অন্য সকলে খাইল। অরবিন্দ সবচেয়ে বেশি খাইল। খেলার বাজি উত্তরোত্তর চড়িতে লাগিল। সকলেই উত্তেজিত, কেবল প্রাণহরিবাবু নির্বিকার।

খেলার শেষে হিসাব হইল : অরবিন্দ প্রায় হাজার টাকা জিতিয়াছে, আর সকলে হারিয়াছে। প্রাণহরিবাবু দুইশত টাকা জিতিয়াছেন।

অতঃপর প্রতি হপ্তায় একদিন-দুইদিন খেলা বসে। খেলায় কোনও দিন একজন হারে, কোনও দিন অন্য কেহ হারে, বাকি সকলে জেতে। প্রাণহরিবাবু কোনও দিনই বেশি হারেন না, মোটের উপর লাভ থাকে।

খেলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পার্শ্বাভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল ; তাহা মোহিনীকে লইয়া। মধুময় এবং মৃগেন্দ্র হয়তো ভিতরে ভিতরে মোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু অরবিন্দ একেবারে নির্লজ্জভাবে তাহার পিছনে লাগিল। খেলার দিন সে সকলের আগে প্রাণহরিবাবুর বাড়িতে যাইত এবং রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া মোহিনীর সহিত রসালাপ করিত। এমন কি দিনের বেলা প্রাণহরিবাবুর অনুপস্থিতি কালে সে তাঁহার বাড়িতে যাইত এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। মোহিনীর সহিত অরবিন্দের ঘনিষ্ঠতা কতদূর হইয়াছিল বলা যায় না, তবে মোহিনী যে স্তরের মেয়ে তাহাতে সে বড়মানুষের কৃপাদৃষ্টি উপেক্ষা করিবে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

যাহোক, এইভাবে পাঁচ-ছয় হপ্তা কাটিল। ফণীশের মনে শান্তি নাই, সে বন্ধুদের এড়াইবার চেষ্টা করে কিন্তু এড়াইতে পারে না ; অরবিন্দ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। তারপর একদিন সকলের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তাহারা জানিতে পারিল প্রাণহরিবাবু পাকা জুয়াচোর, তাক বুঝিয়া হাত সাফাই করেন। খুব খানিকটা বচসা হইল, তারপর অতিথিরা খেলা ছাড়িয়া চলিয়া আসিল।

হিসাবে জানা গেল অতিথিরা প্রত্যেকেই তিন-চার হাজার টাকা হারিয়াছে এবং সব টাকাই প্রাণহরির গর্ভে গিয়াছে। সবচেয়ে বেশি হারিয়াছে অরবিন্দ ; প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।

অরবিন্দ ক্লাবে বসিয়া আফ্‌সাইতে লাগিল, 'আসুক না হাড়গিলে বুড়ো, ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়ো করব।' মধুময়, মৃগেন্দ্র মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল প্রাণহরিকে হাতে পাইলে তাহারাও ছাড়িয়া দিবে না।

প্রাণহরিবাবু কিন্তু হুঁশিয়ার লোক, তিনি আর ক্লাবে মাথা গলাইলেন না।

দিন সাতেক পরে অরবিন্দ বলিল, 'ব্যাটা গা-ঢাকা দিয়েছে। চল, ওর বাড়িতে গিয়ে উত্তম-মধ্যম দিয়ে আসি।'

ফণীশ আপত্তি করিল, 'কি দরকার। টাকা যা যাবার সে তো গেছেই—'

অরবিন্দ বলিল, 'টাকা আমাদের হাতের ময়লা। কিন্তু ব্যাটা ঠকিয়ে দিয়ে যাবে? তুমি কি বলো মৃগেন?'

মৃগেন বলিল, 'শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

মধুময় বলিল, 'ওর বাড়িতে একটা মেয়েলোক ছাড়া আর কেউ থাকে না, ভয়ের কিছু নেই।'

রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় চারজনে বাহির হইল। ক্লাবের অনতিদূরে ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড হইতে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া প্রাণহরির বাড়ির দিকে চলিল। নিজেদের মোটরে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয় ; ঐ রাস্তাটা নির্জন হইলেও, রাত্রিকালে উলুডাঙা কোলিয়ারি হইতে বহু যানবাহন যাতায়াত করে। তাহারা প্রাণহরির বাড়ির কাছে চেনা মোটর দেখিতে পাইবে ; তাছাড়া অভিযাত্রীদের মোটর-চালকেরা মূক-বধির নয়, তাহারা গল্প করিবে। কাহাকেও উত্তম-মধ্যম দিতে হইলে সাক্ষীসাবুদ যথাসম্ভব কম থাকিলেই ভাল।

প্রাণহরির বাড়ি হইতে একশো গজ দূরে ট্যাক্সি থামাইয়া চারজনে অবতরণ করিল। রাস্তা নিরালোক, মধুময়ের হাতে একটা বড় বৈদ্যুতিক টর্চ ছিল, তাহাই মাঝে মাঝে জ্বালিয়া জ্বালিয়া তাহারা বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল, ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরাইয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেল।

দ্বিতলের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। নীচে সদর দরজা খোলা। রান্নাঘর হইতে ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ আসিতেছে, মোহিনী রান্না করিতেছে। সকলে শিকারীর মত নিঃশব্দে প্রবেশ করিল।

সদরে একটা লম্বা গোছের ঘর, তাহার বাঁ পাশ দিয়া দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। এইখানে দাঁড়াইয়া চারজনে নিম্নস্বরে পরামর্শ করিল, তারপর অরবিন্দ মধুময়ের হাত হইতে টর্চ লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'সিঁড়ির মাথায় দরজা আছে, মজবুত দরজা। ভিতর থেকে বন্ধ কি বাইরে থেকে বন্ধ বোঝা গেল না। ইয়েল-লক্ লাগানো।'

আবার পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, নীচের তলাটা ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখা দরকার। বুড়ো ভারি ধূর্ত, হয়তো উপরের ঘরে আলো জ্বালিয়া নীচে অন্ধকারে কোথাও লুকাইয়া আছে। অরবিন্দ রান্নাঘরের দ্বারে উঁকি মারিয়া আসিল, সেখানে মোহিনী দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া একা রান্না করিতেছে, অন্য কেহ নাই।

অতঃপর চারজনে পৃথকভাবে বাড়ির ঘরগুলি ও পিছনের খোলা জমি তল্লাশ করিতে বাহির হইল।

পনেরো মিনিট পরে সকলে সিঁড়ির নীচে ফিরিয়া আসিল। কেহই প্রাণহরিকে খুঁজিয়া পায় নাই। সুতরাং বুড়ো নিশ্চয় উপরেই আছে। অরবিন্দ বলিল, 'চল, আর একবার দোর ঠেলে দেখা যাক।'

এবার চারজনেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। বন্ধ কপাটে চাপ দিতেই কপাট খুলিয়া গেল। ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর প্রাণহরি পোদ্দার কাত হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার বিরলকেশ মাথার ডান পাশে লম্বা রক্তাক্ত একটা দাগ, তিনি যেন মাথার

ডান দিকে সিঁথি কাটিয়া সিঁথির উপর সিঁদুর পরিয়াছেন। মুখ বিকৃত, দন্ত নিষ্ক্রান্ত ; প্রাণহরি অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভেংচি কাটিতেছেন।

ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া চারজনে হুড়মুড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। তারপর একেবারে রাস্তায়।

ট্যাক্সির কাছে গিয়া দেখিল ট্যাক্সি-ড্রাইভার স্টীয়ারিং হুইলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। সকলে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া পরস্পরকে সাবধান করিয়া দিল, তারপর গাড়িতে উঠিয়া বসিল। ড্রাইভার জাগিয়া উঠিয়া গাড়ি চালাইয়া দিল।

চারজনে যখন ক্লাবে ফিরিল তখন মাত্র ন'টা বাজিয়াছে। তাহারা একান্তে বসিয়া পরমার্শ করিল, কাহাকেও কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রাণহরির অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ অবশ্য প্রকাশ পাইবে, কিন্তু তাহারা চারজন যে প্রাণহরির বাড়িতে গিয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা একশো গজ দূরে ছিল। সে তাহাদের প্রাণহরির বাড়িতে প্রবেশ করিতে দেখে নাই। সুতরাং অভিযানের কথা বেবাক চাপিয়া যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

সেদিন সাড়ে দশটা পর্যন্ত ক্লাবে তাস খেলিয়া তাহারা গৃহে ফিরিল। যেন কিছুই হয় নাই।

পরদিন প্রাণহরির মৃত্যু-সংবাদ শহরে রাষ্ট্র হইল বটে, কিন্তু ইহাদের চারজনের নাম হত্যার সহিত জড়িত হইল না। তৃতীয় দিন পুলিস অরবিন্দের বাড়িতে হানা দিল। পুলিস কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছে।

কিন্তু ইহারা চারজনই শহরের মহাপরাক্রান্ত ব্যক্তি, তাই এখনও কাহারও হাতে দড়ি পড়ে নাই। বাহিরেও জানাজানি হয় নাই। পুলিস জোর তদন্ত চালাইয়াছে, সকলকেই একবার করিয়া ছুঁইয়া গিয়াছে। কখন কী ঘটে বলা যায় না। ফণীশের অবস্থা শোচনীয়। একদিকে খুনের দায়, অন্যদিকে কড়া-প্রকৃতি পিতৃদেব যদি জানিতে পারেন সে জুয়া খেলিতেছে এবং খুনের মামলায় জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে তিনি যে কী করিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফণীশের কাহিনী শেষ হইতে বারোটা বাজিয়া গেল। তাহাকে আশ্বাস দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'বৌমাকে বোলো ভাবনার কিছু নেই, আমি সত্য উদ্‌ঘাটনের ভার নিলাম। কাল আমরা শহরে বেড়াতে যাব, একটা গাড়ি চাই।'

ফণীশ বলিল, 'ড্রাইভারকে বলে দেব ছোট গাড়িটা আপনাদের জন্যেই মোতায়েন থাকবে।'

ফণীশ চলিয়া গেল। আমরা আলো নিভাইয়া শয়ন করিলাম। নিজের খাটে শুইয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, মৃদুমন্দ টানিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি বুঝলে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাঁচজন আসামীর মধ্যে মাত্র একজনকে দেখেছি। বাকি চারজনকে না দেখা পর্যন্ত কিছু বলা শক্ত।'

'পাঁচজন আসামী !'

'হ্যাঁ। চাকরানীটাকে বাদ দেওয়া যায় না।'

আর কথা হইল না। প্রাণহরি পোদ্দারের জীবন-লীলার বিচিত্র পরিসমাপ্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখি ব্যোমকেশ টেবিলে বসিয়া পরম মনোযোগের সহিত চিঠি লিখিতেছে। গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলাম, আড়মোড়া ভাঙিয়া বলিলাম, 'কাকে চিঠি লিখছ ? সত্যবতীকে ? দু'দিন যেতে না যেতেই বিরহ চাগাড় দিল নাকি ?'

ব্যোমকেশ লিখিতে লিখিতে বলিল, 'বিরহ্ নয়—বিকাশ।'

'বিকাশ !'

'বিকাশ দত্ত।'

'ও—বিকাশ। তাকে চিঠি লিখছ কেন ?'

'বিকাশের জন্যে একটা চাকরি যোগাড় করেছি। কয়লাখনির ডাক্তারখানায় আর্দালির চাকরি। তাই তাকে আসতে লিখছি।'

'বুঝেছি।'

ব্যোমকেশ আবার চিঠি লেখায় মন দিল। সে বিকাশকে আনিয়া কয়লাখনিতে বসাইতে চায়, নিজে দূরে থাকিয়া কয়লাখনির তত্ত্ব সংগ্রহ করিবে। আপনি রইলেন ডরপানিতে পোলারে পাঠাইলেন চর।

প্রাতরাশের সময় লক্ষ্য করিলাম আজ ইন্দিরার মুখ অনেকটা প্রফুল্ল; দ্বিধা সংশয়ের মেঘ ফুঁড়িয়া সূর্যের আলো ঝিকমিক করিতেছে। ফণীশ তাহাকে ব্যোমকেশের আশ্বাসের কথা বলিয়াছে।

আজও আমরা দু'জনে প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেছি, দুই কর্তা বহু পূর্বেই কর্মস্থলে চলিয়া গিয়াছেন। ব্যোমকেশ টোস্ট্ চিবাইতে চিবাইতে ইন্দিরার প্রতি কটাক্ষপাত করিল, বলিল, 'তোমার কর্তাটি একেবারে ছেলেমানুষ।'

ইন্দিরা লজ্জিতভাবে চক্ষু নত করিল; তারপর তাহার চোখে আবার উদ্বেগ ও শঙ্কা ফিরিয়া আসিল। এই মেয়েটির মনে স্বামী সম্বন্ধে আশঙ্কার অন্ত নাই; ব্যোমকেশ তাহাকে ভরসা দিয়া বলিল, 'ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা এখন বেরুচ্ছি।'

ইন্দিরা চোখ তুলিয়া বলিল, 'কোথায় যাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এই এদিক ওদিক। ফিরতে বোধ হয় দুপুর হবে। কর্তা যদি জিগ্যেস করেন, বোলো শহর দেখতে বেরিয়েছি।'

আহার শেষ হইলে আমরা উঠিলাম। মোটর-ড্রাইভার আসিয়া জানাইল, দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।

গাড়িতে উঠিয়া ব্যোমকেশ ড্রাইভারকে হুকুম দিল, 'আগে পোস্ট-অফিসে চল।'

পোস্ট-অফিসে গিয়া চিঠিখানাতে এক্সপ্রেস ডেলিভারি টিকিট সাঁটিয়া ডাকে দিল, তারপর ফিরিয়া আসিয়া ড্রাইভারকে বলিল, 'এবার থানায় চল। সদর থানা।'

থানার সিংহদ্বারে কনস্টেবলের পাহারা। ব্যোমকেশ বড় দারোগাবাবুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে সে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া বলিল, 'নাম আর দরকার লিখে দিন,—এত্তালা পাঠাচ্ছি।'

ব্যোমকেশ কাগজে লিখিল, 'গগন মিত্র। মণীশ চক্রবর্তীর কয়লাখনি সম্পর্কে।'

অল্পক্ষণ পরে কনস্টেবল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'আসুন।'

ভিতরের একটি ঘরে ইউনিফর্ম-পরা দারোগাবাবু টেবিলের সামনে বসিয়া আছেন, আমরা প্রবেশ করিলে মুখ তুলিলেন, তারপর লাফাইয়া আসিয়া ব্যোমকেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'এ কি কাণ্ড! আপনি গগন মিত্র হলেন কবে থেকে!'

গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিলাম—প্রমোদ বরাট। কয়েক বছর আগে গোলাপ কলোনী সম্পর্কে কিছুদিনের জন্য ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পুলিসের চাকরি ভবঘুরের চাকরি, তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে এই শহরের সদর থানার দারোগাবাবু হইয়া আসিয়াছেন। নিকষকৃষ্ণ চেহারা এই কয় বছরে একটু ভারী হইয়াছে; মুখের ধার কিন্তু লেশমাত্র ভোঁতা হয় নাই।

সমাদর করিয়া আমাদের বসাইলেন। কিছুক্ষণ অতীত-চর্বণ চলিল, তারপর ব্যোমকেশ আমাদের এই শহরে আসার কারণ বলিল। শুনিয়া প্রমোদবাবু বলিলেন, 'হুঁ, ফুলঝুরি কয়লাখনির কেসটা আমাদের ফাইলে আছে, কিন্তু কিছু করা গেল না। এসব কাজ পুলিসের দ্বারা ভাল হয় না; আমাদের অনেক লোক নিয়ে কাজ করতে হয়, মন্ত্রগুপ্তি থাকে না। আপনি পারবেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিকাশ দত্তকে মনে আছে? তাকে ডেকে পাঠালাম, সে কয়লাখনিতে থেকে সুলুক-সন্ধান নেবে।'

প্রমোদবাবু বলিলেন, 'বিকাশকে খুব মনে আছে। চৌকশ ছেলে। তা আমাকে দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কাছে ও-কাজের জন্যে আমি আসিনি, প্রমোদবাবু। সম্প্রতি এখানে একটা খুন হয়েছে, প্রাণহরি পোদ্দার নামে এক বৃদ্ধ—'

'আপনি তার খবরও পেয়েছেন ?'

'না পেয়ে উপায় কি ! আমরা যাঁর বাড়িতে অতিথি তাঁর ছেলেই তো আপনার একজন আসামী।'

প্রমোদ বরাট মুখের একটি করুণ ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'বড় মুশকিলে পড়েছি, ব্যোমকেশবাবু। যে চারজনের ওপর সন্দেহ তারা সবাই এ শহরের হর্তাকর্তা, প্রচণ্ড দাপট। তাই ভারি সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। সাক্ষী-সাবুদ নেই, সবই circumstantial evidence. এদের কাউকে যদি ভুল করে গ্রেপ্তার করি, আমারই গর্দান যাবে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এই চারজনের মধ্যে কার ওপর আপনার সন্দেহ ?'

প্রমোদবাবু ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, 'চারজনেরই মোটিভ সমান, চারজনেরই সুযোগ সমান। তবু মনে হয় এ অরবিন্দ হালদারের কাজ।'

'চারজনে এক জোট হয়ে খুন করতে গিয়েছিল এমন মনে হয় না ?'

'না।'

'বাড়িতে একটা দাসী ছিল, তার কথা ভেবে দেখেছেন ?'

'দেখেছি। তার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি কিন্তু মোটিভ খুঁজে পাইনি।'

'হুঁ। আপনি যা জানেন সব আমাকে বলুন, হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'সাহায্য করবেন আপনি ? ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য পাওয়া তো ভাগ্যের কথা, ব্যোমকেশবাবু।'

অতঃপর প্রমোদ বরাট যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ এই—

যে-রাত্রে প্রাণহরি পোদ্দার মারা যান সে-রাত্রে দশটার সময় উলুডাঙা কোলিয়ারির দিক হইতে একটা ট্রাক আসিতেছিল। ট্রাক-ড্রাইভার হঠাৎ গাড়ি থামাইল, কারণ একটা স্ত্রীলোক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে থামিতে বলিতেছে। গাড়ি থামিলে স্ত্রীলোকটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'শীগ্‌গির পুলিসে খবর দাও, এ বাড়ির মালিককে কারা খুন করেছে।'

ট্রাক-ড্রাইভার আসিয়া থানায় খবর দিল। আধঘণ্টার মধ্যে ইন্সপেক্টর বরাট সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া অকুস্থলে উপস্থিত হইলেন। মেয়েটা তখনও ব্যাকুল চক্ষে রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নাম মোহিনী, প্রাণহরির গৃহে সেই একমাত্র দাসী, অন্য কোনও ভৃত্য নাই।

ইন্সপেক্টর বরাট বাড়ির দ্বিতলে উঠিয়া লাশ দেখিলেন ; তাঁহার অনুচরেরা বাড়ি খানাতল্লাশ করিল। বাড়িতে অন্য কোনও লোক নাই। মোহিনীকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল সে নীচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি কুঠুরিতে শয়ন করে ; কর্তাবাবু শয়ন করেন উপরের ঘরে। আজ সন্ধ্যার সময় শহর হইতে ফিরিয়া তিনি নীচের ঘরে বসিয়া চা পান করিয়াছিলেন, তারপর উপরে উঠিয়া গিয়াছিলেন। মোহিনী রান্না আরম্ভ করিয়াছিল। বাবু ন'টার পর নীচে নামিয়া আসিয়া আহার করেন, আজ কিন্তু তিনি নামিলেন না। আধঘণ্টা পরে মোহিনী উপরে ডাকিতে গিয়া দেখিল ঘরের মেঝেয় কর্তাবাবু মরিয়া পড়িয়া আছেন।

লাশ চালান দিয়া বরাট মোহিনীকে আবার জেরা করিলেন। জেরার উত্তরে সে বলিল, সন্ধ্যার পর বাড়িতে কেহ আসে না ; কিছুদিন যাবৎ চারজন বাবু রাত্রে তাস খেলিতে আসিতেন ; যেদিন তাঁহাদের আসিবার কথা সেদিন বাবু শহর হইতে মাছ মাংস কিমা ইত্যাদি কিনিয়া আনিতেন, মোহিনী তাহা রাঁধিয়া বাবুদের খাইতে দিত। আজ বাবুরা আসেন নাই, রন্ধনের আয়োজন ছিল না। বাবুরা চারজনই যুবাপুরুষ, কর্তাবাবুর মত বুড়ো নয়। তাঁহারা মোটরে চড়িয়া আসিতেন ; সাজপোশাক হইতে তাঁহাদের ধনী বলিয়া মনে হয়। মোহিনী তাঁহাদের নাম জানে না। আজ সে যখন রান্না করিতেছিল তখন কেহ বাড়িতে আসিয়াছিল কিনা তাহা সে বলিতে পারে না। বাড়িতে লোক আসিলে প্রাণহরি নীচের তলায় তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতেন, উপরের ঘরে

কাহাকেও লইয়া যাইতেন না। কর্তাবাবু আজ নীচে নামেন নাই, নামিলে মোহিনী কথাবার্তার আওয়াজ শুনিতে পাইত।

জেরা শেষ করিয়া বরাট বলিলেন, 'তুমি এখন কি করবে ? শহরে তোমার জানাশোনা লোক আছে ?'

মোহিনী বলিল, 'না, এখানে আমি কাউকে চিনি না।'

বরাট বলিলেন, 'তাহলে তুমি আমার সঙ্গে চল, রাত্তিরটা থানায় থাকবে, কাল একটা ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি মেয়েমানুষ, একলা এ বাড়িতে থাকতে পারবে কেন ?'

মোহিনী বলিল, 'আমি পারব। নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে থাকব। আমার ভয় করবে না।'

সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। বরাট একজন কনস্টেবলকে পাহারায় রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রাণহরি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া প্রমোদবাবু জানিতে পারিলেন, প্রাণহরি কয়লা ক্লাবের মেম্বর ছিলেন। সেখানে গিয়া খবর পাইলেন, প্রাণহরি চারজন মেম্বরের সঙ্গে নিয়মিত তাস খেলিতেন। ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হইল ; এই চারজন যে প্রাণহরির বাড়িতে তাস খেলিতে যাইতেন তাহা অনুমান করা গেল।

প্রমোদবাবু চারজনকে পৃথকভাবে জেরা করিলেন। তাহারা স্বীকার করিল যে মাঝে মাঝে প্রাণহরির বাড়িতে তাস খেলিতে যাইত, কিন্তু প্রাণহরির মৃত্যুর রাত্রে তাহার বাড়িতে গিয়াছিল একথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিল।

তাহাদের চারজন মোটর-ড্রাইভারকে প্রমোদ বরাট প্রশ্ন করিলেন। তিনজন ড্রাইভার বলিল সে-রাত্রে বাবুরা মোটরে চড়িয়া প্রাণহরির বাড়িতে যান নাই। কেবল একজন বলিল, বাবুরা রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় একসঙ্গে ক্লাব হইতে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু মোটরে না গিয়া পদব্রজে গিয়াছিলেন, এবং ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার একসঙ্গে কোথায় গিয়াছিলেন তাহা সে জানে না।

বরাট তখন ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের মধ্যে খোঁজ-খবর লইলেন, শহরে গোটা পঞ্চাশ ট্যাক্সি আছে ; শেষ পর্যন্ত একজন ড্রাইভার অন্য একজন ড্রাইভারকে দেখাইয়া বলিল—ও সে-রাত্রে ভাড়ায় গিয়াছিল, ওকে জিজ্ঞাসা করুন। দ্বিতীয় ড্রাইভার তখন বলিল—উক্ত রাত্রে চারজন আরোহী লইয়া সে উলুডাঙা কয়লাখনির রাস্তায় গিয়াছিল। বরাট ড্রাইভারকে কয়লা ক্লাবে আনিয়া চুপিচুপি চারজনকে দেখাইলেন। ড্রাইভার চারজনকে সনাক্ত করিল।

তারপর বরাট চারজনকে বার বার জেরা করিয়াছেন কিন্তু তাহারা অটলভাবে সমস্ত কথা অস্বীকার করিয়াছে। পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে এই যে, একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভার ছাড়া অন্য সাক্ষী নাই ; এ অবস্থায় শহরের চারজন গণ্যমান্য লোককে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা যায় না।

বয়ান শেষ করিয়া বরাট বলিলেন, 'আমি যতটুকু জানতে পেরেছি আপনাকে জানালাম। তবে একটা অবান্তর কথা বোধ হয় আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল। অন্যতম আসামীর দাদা গোবিন্দ হালদার আমাকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিতে এসেছিলেন।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। ভারী কৌশলী লোক। আমাকে আড়ালে ডেকে ইশারায় জানিয়েছিলেন যে, কেস্‌টা যদি চাপা দিই তাহলে পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ পাব।'

ঘড়িতে দেখিলাম বেলা সাড়ে ন'টা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার এখন কোনো জরুরী কাজ আছে কি ? অকুস্থলটা দেখবার ইচ্ছে আছে।'

বরাট বলিলেন, 'বেশ তো, চলুন না।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'মেয়েটা এখনো ওখানেই আছে নাকি ?'

বরাট বলিলেন, 'আছে বৈকি। তার কোথাও যাবার নেই, ঐ বাড়িতেই পড়ে আছে।'

তিনজনে বাহির হইলাম ; প্রমোদবাবু আমাদের গাড়িতেই আসিলেন। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে ব্যোমকেশ ড্রাইভারকে বলিল, 'যে-বাড়িতে বাবুরা তাস খেলতে যেতেন সেই বাড়িতে নিয়ে চল।'

ড্রাইভারের নির্বিকার মুখে ভাবান্তর দেখা গেল না, সে নির্দেশ মত গাড়ি চালাইল।

দশ মিনিট পরে প্রাণহরি পোদ্দারের বাড়ির সামনে মোটর থামিল। বাড়ির সদরে কেহ নাই। বাড়িটা দেখিতে একটু উলঙ্গ গোছের ; চারিপাশে পাঁচিলের বেড়া নাই, রাস্তা হইতে কয়েক হাত পিছাইয়া আব্রুহীনভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সদর দরজা খোলা।

বরাট ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, 'হতভাগা কন্সেটবলটা গেল কোথায় ?'

বরাট আগে আগে, আমরা তাঁহার পিছনে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। রান্নাঘরের দিক হইতে হেঁড়ে গলার আওয়াজ আসিতেছে। সেইদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম উর্দি-পরা পাহারাওলা গোঁফে চাড়া দিতে দিতে রান্নাঘরের দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া অন্তর্বর্তিনীর সহিত রসালাপ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

বরাট আরক্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিলেন, সে কলের পুতুলের মত স্যালুট করিল। বরাট বলিলেন, 'বাইরে যাও। সদর দরজা খোলা রেখে তুমি এখানে কি করছ ?'

বরাটের প্রশ্নটা সম্পূর্ণ আলঙ্কারিক। অতি বড় নিরেট ব্যক্তিও বুঝিতে পারে পাহারাওলা এখানে কি করিতেছিল। মক্ষিকা মধু ভাণ্ডের কাছে কী করে ?

পাহারাওলা আবার স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল। বরাট তখন রান্নাঘরের ভিতরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। মোহিনী মেঝেয় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল, ত্বরিতে উঠিয়া বরাটের পানে সপ্রশ্ননেত্রে চাহিল।

কালো মেয়েটার সারা গায়ে—মুখে চোখে অঙ্গসঞ্চালনে—কুহকভরা ইন্দ্রজাল, ভরা যৌবনের দুর্নিবার আকর্ষণ। যদি রঙ ফরসা হইত তাহাকে অপূর্ব সুন্দরী বলা চলিত। তবু, তাহার কালো রঙের মধ্যেও এমন একটি নিশীথ-শীতল মাদকতা আছে যে মনকে আবিষ্ট করিয়া ফেলে।

কিন্তু প্রমোদ বরাট কাঠখোট্টা মানুষ, তিনি বলিলেন, 'তুমি তাজা তরকারি পেলে কোথায় ?'

মোহিনী বলিল, 'পাহারাওলাবাবু এনে দিয়েছেন। উনি নিজের সিধে তরিতরকারি আমাকে এনে দেন, আমি রেঁধে দিই। আমারও হয়ে যায়।'

বরাট গলার মধ্যে শব্দ করিয়া বলিলেন, 'হুঁ, ভারি দয়ার শরীর দেখছি পাহারাওলাবাবুর।'

মোহিনী বক্রোক্তি বুঝিল কিনা বলা যায় না, প্রশ্ন করিল, 'আমাকে কি দরকার আছে, দারোগাবাবু ?'

প্রমোদবাবু বলিলেন, 'তুমি এখানেই থাকো। আমরা খানিক পরে তোমাকে ডাকব।'

'আচ্ছা।'

আমরা সদর দরজার দিকে ফিরিয়া চলিলাম। চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ স্মিতমুখে বলিল, 'আপনি একটু ভুল করেছেন, ইন্সপেক্টর বরাট। আপনার উচিত ছিল একজন বুড়ো পাহারাওলাকে এখানে বসানো।'

বরাট বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি ওদের চেনেন না। পাহারাওলারা যত বুড়ো হয় তাদের রস তত বাড়ে।'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আর সুদখোর মহাজনেরা ?'

বরাট চকিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর নিম্নস্বরে বলিলেন, 'সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না, ব্যোমকেশবাবু। কিন্তু পরিস্থিতি সন্দেহজনক। আপনি মেয়েটাকে জেরা করে দেখুন না, বুড়োর সঙ্গে ওর কোনো রকম ইয়ে ছিল কিনা।'

'দেখব।'

সদর দরজার পাশে উপরে উঠিবার সিঁড়ি দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। সিঁড়ির মাথায়

মজবুত ভারী দরজা, তাহাতে ইয়েল-লক্ লাগানো। বাড়ির অন্যান্য দরজার তুলনায় এ দরজা নূতন বলিয়া মনে হয়। হয়তো প্রাণহরি পোদ্দার বাড়ি ভাড়া লইবার পর এই ঘরে নূতন দরজা লাগাইয়াছিলেন।

বরাট পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দ্বার খুলিলেন। আমরা অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলাম। তারপর বরাট একটা জানালা খুলিয়া দিতেই রৌদ্রোজ্জ্বল আলো ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরে দু'টি জানালা দু'টি দ্বার। একটি দ্বার সিঁড়ির মুখে, অন্যটি পিছনের দেয়ালে। ঘরটি লম্বায় চওড়ায় আন্দাজ পনেরো ফুট চৌকশ। ঘরে আসবাব বিশেষ কিছু নাই; একটা তক্তপোশের উপর বিছানা, তাহার শিয়রের দিকে দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি জগদ্দল লোহার সিন্দুক। একটা দেয়াল-আল্না হইতে প্রাণহরির ব্যবহৃত জামা কাপড় ঝুলিতেছে। প্রাণহরির টাকার অভাব ছিল না, কিন্তু জীবন যাপনের পদ্ধতি ছিল নিতান্ত মামুলী। মাথার কাছে লোহার সিন্দুক লইয়া দরজায় ইয়েল-লক্ লাগাইয়া তিনি তক্তপোশের মলিন শয্যায় শয়ন করিতেন।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু চক্ষু বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'লাশ কোথায় ছিল?'

সিঁড়ির দরজা হইতে হাত চারেক দূরে মেঝের দিকে আঙুল দেখাইয়া বরাট বলিলেন, 'এইখানে।'

ব্যোমকেশ নত হইয়া স্থানটা পরীক্ষা করিল, বলিল, 'রক্তের দাগ তো বিশেষ দেখছি না। সামান্য ছিটেফোঁটা।'

বরাট বলিলেন, 'বুড়োর গায়ে কি রক্ত ছিল! চেহারাটা ছিল বেউড় বাঁশের মত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অবশ্য মাথার খুলি ভাঙলে বেশি রক্তপাত হয় না।—মারণাস্ত্রটা পাওয়া গেছে?'

'না। ঘরে কোন অস্ত্র ছিল না। বাড়িতেও এমন কিছু পাওয়া যায়নি যাকে মারণাস্ত্র মনে করা যেতে পারে। বাড়ির চারিপাশে বহু দূর পর্যন্ত খুঁজে দেখা হয়েছে, মারণাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

'যাক। সিন্দুক খুলে দেখেছিলেন নিশ্চয়। কি পেলেন?'

'সিন্দুকের চাবি পোদ্দারের কোমরে ছিল। সিন্দুক খুলে পেলাম হিসেবের খেরো-বাঁধানো খাতা আর নগদ দশ হাজার টাকা।'

'দশ হাজার টাকা!'

'হ্যাঁ। বুড়োর মহাজনী কারবার ছিল তাই বোধহয় নগদ টাকা কাছে রাখতো।'

'হুঁ। ব্যাঙ্কে টাকা ছিল?'

'ছিল। এবং এখনো আছে। কে পাবে জানি না। টাকা কম নয়, প্রায় দেড় লাখ।'

'তাই নাকি! আত্মীয়-স্বজনরা খবর পেয়েছে?'

'বোধহয় কেউ নেই। থাকলে শকুনির পালের মত এসে জুটত।'

'শহরে বুড়োর একটা অফিস ছিল শুনেছি। সেখানে তল্লাশ করে কিছু পেয়েছিলেন?'

'অফিস মানে চোর-কুটুরির মত একটা ঘর।—দু' চারটে খাতাপত্তর ছিল, তা থেকে মনে হয় মহাজনী কারবার ভাল চলত না।'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে কতকটা নিজমনেই বলিল, 'মহাজনী কারবার ভাল চলত না, অথচ ব্যাঙ্কে দেড় লাখ এবং সিন্দুকে দশ হাজার'—চিন্তা হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে বলিল, 'ওই অন্য দরজাটার বাইরে কি আছে?'

বরাট বলিলেন, 'স্নানের ঘর ইত্যাদি।'

এ দরজাটাও নূতন মজবুত দরজা। প্রাণহরি পোদ্দার ঘরটিকে দুর্গের মত সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, কারণ সিন্দুকে মাল আছে।

ব্যোমকেশ দরজা খুলিল। সঙ্কীর্ণ ঘরে পিছনের দেয়ালে একটি ঘুলঘুলি দিয়া আলো আসিতেছে, ঘুলঘুলির নীচে সরু একটি দরজা। ঘরে একটি শূন্য বালতি ও টিনের মগ ছাড়া আর

কিছু নাই।

সরু দরজার উপরে-নীচে ছিট্‌কিনি লাগানো। ব্যোমকেশ ছিট্‌কিনি খুলিয়া কপাট ফাঁক করিল। উঁকি মারিয়া দেখিলাম, দ্বারের মুখ হইতে শীর্ণ লোহার মই মাটি পর্যন্ত গিয়াছে। মেথরখাটা রাস্তা ; প্রাণহরির দুর্গে প্রবেশ করিবার দ্বিতীয় পথ।

ব্যোমকেশ বরাটকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি সে-রাত্রে যখন প্রথম এসেছিলেন, এ দরজা দুটো বন্ধ ছিল ?'

বরাট বলিলেন, 'হ্যাঁ, দুটোই বন্ধ ছিল। কেবল সামনে সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন, এবার নীচে যাওয়া যাক। মেয়েটাকে দু'চারটে প্রশ্ন করে দেখি।'

ড্রয়িং-রুমের মত সাজানো নীচের তলার যে-ঘরটাতে তাস খেলা হইত সেই ঘরে আমরা বসিয়াছি। মোহিনী একটা চেয়ারের পিঠে হাত রাখিয়া আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্ন নাই, ভাবভঙ্গী বেশ সংযত এবং সংবৃত।

মনে মনে প্রাণহরির নিরাভরণ শয়নকক্ষের সহিত সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমের তুলনা করিতেছি, ব্যোমকেশ মোহিনীকে প্রশ্ন করিল, 'তুমি প্রাণহরিবাবুর কাছে কতদিন চাকরি করছ ?'

মোহিনী বলিল, 'দু'বছরের বেশি।'

'প্রাণহরিবাবু যখন কটকে ছিলেন তখন থেকে তুমি ওঁর কাছে আছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'প্রাণহরিবাবুর আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে ?'

'জানি না। কখনো দেখিনি।'

'তুমি কত মাইনে পাও ?'

'কটকে ছিল দশ টাকা মাইনে আর খাওয়া-পরা। এখানে আসার পর পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

'প্রাণহরিবাবু কেমন লোক ছিলেন ?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মোহিনী বলিল, 'তিনি আমার মালিক ছিলেন, ভাল লোকই ছিলেন।' অর্থাৎ, তিনি আমার মালিক ছিলেন তাঁহার নিন্দা করিব না, তোমরা বুঝিয়া লও।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি কৃপণ ছিলেন ?'

মোহিনী চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ স্থিরনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, 'তোমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি রকম ছিল ?'

মোহিনী একটু বিস্ময়ভরে ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল, তাহার ঠোঁটের কোণে যেন একটু চটুলতার ঝিলিক খেলিয়া গেল। তারপর সে শান্তস্বরে বলিল, 'ভালই ছিল। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। তাঁর স্ত্রীলোক-ঘটিত কোনো দোষ ছিল ?'

'আজ্ঞে না। বুড়োমানুষ ছিলেন, ওসব দোষ ছিল না। কেবল তাস খেলার নেশা ছিল। একলা বসে বসে তাস খেলতেন।'

'যাক্। তুমি এখন নিজের কথা বল। প্রাণহরিবাবু খুন হয়েছেন, তা সত্ত্বেও তুমি একলা এ বাড়িতে পড়ে আছ কেন ?'

'কোথায় যাব ? এ শহরে তো আমার কেউ নেই।'

'দেশে ফিরে যাচ্ছ না কেন ?'

'তাই যাব। কিন্তু দারোগাবাবু হুকুম দিয়েছেন যতদিন না খুনের কিনারা হয় ততদিন কোথাও যেতে পাব না।'

'দেশে তোমার কে আছে।'

'বুড়ো মা-বাপ আছে।'

'আর স্বামী ?'

মোহিনী চকিতে চোখ তুলিয়া আবার চোখ নীচু করিয়া ফেলিল, প্রশ্নের উত্তর দিল না।

'বিয়ে হয়েছে নিশ্চয় ?'

মোহিনী নীরবে ঘাড় নাড়িল।

'স্বামী কোথায় ?'

মোহিনী ঘাড় তুলিয়াই ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'স্বামী ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে, আর ফিরে আসেনি।'

ব্যোমকেশ তাহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সিগারেট ধরাইল, 'কতদিন হল স্বামী ঘরছাড়া হয়েছে ?'

'তিন বছর।'

'স্বামী কী কাজ করত ?'

'কল-কারখানায় কাজ করত।'

'বিবাগী হয়ে গেল কেন ?'

মোহিনীর অধরোষ্ঠ একটু প্রসারিত হইল, সে ব্যোমকেশের প্রতি একটি চকিত চপল কটাক্ষ হানিয়া বলিল, 'জানি না।'

ইহাদের প্রশ্নোত্তর শুনিতে শুনিতে এবং মোহিনীকে দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছি, মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র কেমন ? সচ্চরিত্রা, না স্বৈরিণী ? সে যে-শ্রেণীর মেয়ে তাহাদের মধ্যে একনিষ্ঠা ও পাতিব্রত্যের স্থান খুব উচ্চ নয়। ঐহিক প্রয়োজনের তাড়নায় তাহাদের জীবন বিপথে-কুপথে সঞ্চরণ করে। অথচ মোহিনীকে দেখিয়া ঠিক সেই জাতীয় সাধারণ ঝি-চাকরানী শ্রেণীর মেয়ে বলিয়া মনে হয় না। কোথায় যেন একটু তফাৎ আছে। তাহার যৌবন-সুলভ চপলতা চটুলতার সঙ্গে চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাহস আছে। এ মেয়ে যদি নষ্ট-দুষ্ট হয়, সজ্ঞানে জানিয়া বুঝিয়া নষ্ট-দুষ্ট হইবে, বাহ্য প্রয়োজনের তাগিদে নয়।

ব্যোমকেশ সিগারেটে দু'টা লম্বা টান দিয়া বলিল, 'যে চারজন বাবু এখানে তাস খেলতে আসতেন তাঁদের তুমি কয়েকবার দেখেছ—কেমন ?'

মোহিনীর চক্ষু দু'টি একবার দক্ষিণে-বামে সঞ্চরণ করিল, অধরোষ্ঠ ক্ষণকাল বিভক্ত হইয়া রহিল, যেন সে হাসিতে গিয়া থামিয়া গেল। তারপর বলিল, 'হ্যাঁ, কয়েকবার দেখেছি।' সে বুঝিয়াছে ব্যোমকেশের প্রশ্ন কোন দিকে যাইতেছে।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওদের মধ্যে কে কেমন লোক তুমি বলতে পার ?'

অব্যক্ত হাসি এবার পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মোহিনী একটু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, 'কে কেমন মানুষ তা কি মুখ দেখে বলা যায় বাবু ? তবে একজন ছিলেন সবচেয়ে ছেলেমানুষ আর সবচেয়ে ভালোমানুষ। বাকি তিনজন—' সে থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, বাকি তিনজন কেমন লোক ?'

হাসিমুখে জিভ কাটিয়া মোহিনী বলিল, 'আমি জানি না বাবু।'

মোহিনীর একটা ক্ষমতা আছে, সে 'জানি না' বলিয়া অনেক কথা জানাইয়া দিতে পারে।

ব্যোমকেশ সিগারেটের দগ্ধাংশ জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'এঁরা তাস খেলার সময় ছাড়াও অন্য সময়ে আসতেন কি ?'

মোহিনী কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, 'একজন আসতেন। কর্তাবাবু সকালবেলা আপিস চলে যাবার পর আসতেন।'

'কে তিনি ?'

'নাম জানি না বাবু। কালো মোটা মত চেহারা, খুব ছেঁদো কথা বলতে পারেন।'

বরাট অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'অরবিন্দ হালদার।'

ব্যোমকেশ মোহিনীকে বলিল, 'তাহলে তোমার সঙ্গেই তিনি দেখা করতে আসতেন ?'

মোহিনী কেবল ঘাড় নাড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'কোনো প্রস্তাব করেছিলেন ?'

মোহিনীর দৃষ্টি হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল, সে তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, 'সোনার আংটি দিতে এসেছিলেন, সিল্কের শাড়ি দিতে এসেছিলেন।'

'তুমি নিয়েছিলে ?'

'না। আমার ইজ্জৎ অত সস্তা নয়।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ তাহাকে নিবিষ্টচক্ষে নিরীক্ষণ করিল, তারপর বলিল, 'আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। পরে যদি দরকার হয় আবার সওয়াল করব।—তুমি উড়িষ্যার মেয়ে, কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলতে পারো দেখছি।'

মোহিনীর সুর এবার নরম হইল। সে বলিল, 'বাবু, আমি ছেলেবেলা থেকে বাঙালীর বাড়িতে কাজ করেছি।'

ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিলাম, মোহিনী-বর্ণিত ছেলেমানুষ এবং ভালোমানুষ লোকটি অবশ্য ফণীশ। অন্য তিনজনের মধ্যে অরবিন্দ হালদার দু'কান-কাটা লম্পট। আর বাকি দু'জন ? বোধ হয় অতটা বেহায়া নয়, কিন্তু মনে লোভ আছে; ডুবিয়া ডুবিয়া জল পান করেন। মোহিনী বলিয়াছিল, তাহার ইজ্জৎ অত সস্তা নয়। তাহার ইজ্জতের দাম কত ? রূপযৌবনের অনুপাতেই কি ইজ্জতের দাম বাড়ে এবং কমে ? কিংবা অন্য কোনও নিরিখ আছে ? এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই দিতে পারেন।

থানার সামনে বরাট নামিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওবেলা আবার আসব। সিভিল সার্জন—যিনি অটপ্সি করেছেন—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

বরাট বলিলেন, 'আসবেন। আমি সিভিল সার্জনের সঙ্গে সময় ঠিক করে রাখব। পি এম রিপোর্ট অবশ্য তৈরি আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পি এম রিপোর্টও দেখব।'

বরাট বলিলেন, 'আচ্ছা। চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখব।'

বাড়ি ফিরিলাম তখন বারোটা বাজিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে মণীশবাবুরা ফিরিলেন। মণীশবাবু ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলে সে বলিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যা করবার আমি করছি। পুলিসের সঙ্গে দেখা করেছি। একটা ব্যবস্থা হয়েছে, পরে আপনাকে সব জানাবো।'

মণীশবাবু সন্তুষ্ট হইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। ফণীশ উৎসুকভাবে আমাদের আশেপাশে ঘুর ঘুর করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'তুমিও নিশ্চিন্ত থাকো, কাজ খানিকটা এগিয়েছে। বিকেলে আবার বেরুব।'

বেলা তিনটের সময় পিতাপুত্র আবার কাজে বাহির হইলেন। আমরা সুরপতি ঘটকের দপ্তরে গেলাম। সুরপতিবাবু আমাদের অফিস-ঘরে বসাইয়া কয়লাখনি চালানো সম্বন্ধে নানা তথ্য শুনাইতে লাগিলেন। তারপর দ্বারদেশে দুইটি যুবকের আবির্ভাব ঘটিল। খদ্দর-পরা শান্তশিষ্ট চেহারা, মুখে বুদ্ধিমত্তার সহিত বিনীত ভাব। সুরপতিবাবু বলিলেন, 'এই যে তোমরা এসেছ ! গগনবাবু, এদেরই কথা আপনাকে বলেছিলাম। ওরা দুই ভাই, নাম বিশ্বনাথ আর জগন্নাথ। ওদের আমি নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছি। বয়স কম বটে, কিন্তু কাজকর্মে একেবারে পোক্ত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ। এখানকার কাজ ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে আপনাদের আপত্তি নেই তো ?'

বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ মাথা নাড়িয়া জানাইল, আপত্তি নাই। সুরপতিবাবু বলিলেন, 'ওদের দু'জনকে কিন্তু একসঙ্গে ছাড়তে পারব না, তাহলে আমার কাজের ক্ষতি হবে। ওদের মধ্যে একজনকে আপনারা নিন, যাকে আপনাদের পছন্দ।'

'তাই সই' বলিয়া ব্যোমকেশ পকেট হইতে নোটবুক বাহির করিয়া দু'জনের নাম-ধাম লিখিয়া

লইল, বলিল, 'যথাসময় আমি আপনাকে চিঠি দেব।'

বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ সুরপতিবাবুকে বলিল, 'দু'জনকেই আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি যাকে দিতে চান তাকেই নেব।'

সুরপতিবাবু খুশি হইয়া বলিলেন, 'ওরা দুই ভাই সমান কাজের লোক, আপনারা যাকেই নিন ঠকবেন না।'

চারটে বাজিতে আর দেরি নাই দেখিয়া আমরা উঠিলাম।

বরাট অফিসে ছিলেন, বলিলেন, 'সিভিল সার্জন সাড়ে চারটার সময় দেখা করবেন। এই নিন পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট।'

ব্যোমকেশ রিপোর্টে চোখ বুলাইয়া ফেরৎ দিল। তারপর আমরা হাসপাতালের দিকে রওনা হইলাম। সিভিল সার্জন মহাশয়ের অফিস হাসপাতালে।

সিভিল সার্জন বিরাজমোহন ঘোষাল অফিসে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন। বয়স্থ ব্যক্তি, স্থূল গৌরবর্ণ সুদর্শন চেহারা, আমাদের দেখিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'আপনার আসল নাম আমি জেনে ফেলেছি, ব্যোমকেশবাবু। ইন্সপেক্টর বরাট ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ধাপ্পা টিক্‌ল না।' বলিয়া আবার অট্টহাস্য করিলেন।

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল, 'বে-কায়দায় পড়ে পঞ্চ পাণ্ডবকে ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছিল, আমি তো সামান্য লোক। একটা গোপনীয় কাজে এখানে এসেছি, তাই গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে।'

'ভয় নেই, আমার পেট থেকে কথা বেরুবে না। বসুন।'

কিছুক্ষণ সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা হাস্য-পরিহাস চলিল। ডাক্তার ঘোষাল আনন্দময় পুরুষ, সারা জীবন মড়া ঘাঁটিয়াও তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত অট্টহাস্য প্রশমিত হয় নাই।

অবশেষে কাজের কথা আরম্ভ হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রাণহরি পোদ্দারের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট আমি দেখেছি। আপনার মুখে অতিরিক্ত কিছু শুনতে চাই। লোকটি বুড়ো হয়েছিল, রোগা-পটকা ছিল, তার দৈহিক শক্তি কি কিছুই অবশিষ্ট ছিল না?'

বিরাজবাবু বলিলেন, 'দৈহিক শক্তি—'

'মানে—যৌবন। পুরুষের যৌবন অনেক বয়স পর্যন্ত থাকতে পারে; একশো বছর বয়সে ছেলের বাপ হয়েছে এমন নজিরও পাওয়া যায়। প্রাণহরি পোদ্দারের দেহ-যন্ত্রটা সেদিক দিয়ে কি সক্ষম ছিল?'

বিরাজবাবু আবার অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, 'ও—এই কথা জানতে চান? তা ডাক্তারের কাছে এত লজ্জা কিসের? না, প্রাণহরি পোদ্দারের শরীরে রস-কষ কিছু ছিল না, একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং।' দু'বার গড়গড়ায় টান দিয়া বলিলেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি যারা রাতদিন টাকার ভাবনা ভাবে তাদের ওসব বেশি দিন থাকে না। প্রাণহরি পোদ্দার তো সুদখোর মহাজন ছিল।'

মনে হইল ব্যোমকেশ একটু নিরাশ হইয়াছে। ক্ষণেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া সে বলিল, 'আচ্ছা, ওকথা যাক। এখন মারণাস্ত্রের কথা বলুন। খুলির ওপর ওই একটা চোট্ ছাড়া আর কোথাও আঘাতের দাগ ছিল না?'

'না।'

'এক আঘাতেই মৃত্যু ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'অস্ত্রটা কী ধরনের ছিল?'

বিরাজবাবু কিছুক্ষণ গড়গড়া টানিলেন, 'কী রকম অস্ত্র ছিল বলা শক্ত। অস্ত্রটা লম্বা গোছের, লম্বা এবং ভারী। কাটারির মত ধারালো নয়, আবার পুলিসের রুলের মত ভোঁতাও নয়—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ইলেকট্রিক টর্চ হতে পারে কি?'

'ইলেকট্রিক টর্চ!' বিরাজবাবু মাথা নাড়িলেন, 'না, তাতে এমন পরিষ্কার কাটা দাগ হবে না।

এই ধরুন, কাটারির ফলার উল্টো পিঠ দিয়ে, অর্থাৎ শিরদাঁড়ার দিক দিয়ে যদি সজোরে মাথায় মারা যায় তাহলে ওইভাবে খুলির হাড় ভাঙতে পারে।'

'রান্নাঘরের হাতা বেড়ি খুন্তি— ?'

'না, তার চেয়ে ভারী জিনিস।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'অস্ত্রটাই ভাবিয়ে তুলেছে। যাদের ওপর সন্দেহ তারা দা-কাটারি জাতীয় অস্ত্র নিয়ে খুন করতে গিয়েছিল ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে একেবারে অসম্ভব নয়। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আততায়ী সামনের দিক্ থেকে অস্ত্র চালিয়েছিল, না পিছন দিক থেকে ?'

বিরাজবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'সামনের দিক থেকে। কপাল থেকে মাথার মাঝখান পর্যন্ত হাড় ভেঙেছে, পিছন দিকের হাড় ভাঙেনি।'

'পিছন দিক থেকে মারা একেবারেই সম্ভব নয় ?'

বিরাজবাবু ভাবিয়া বলিলেন, 'পোদ্দার যদি চেয়ারে বসে থাকত তাহলে ওভাবে মারা সম্ভব হত, দাঁড়িয়ে থাকলে সম্ভব নয়। তবে যদি আততায়ী দশ ফুট লম্বা হয়—'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'দশ ফুট দ্রাঘিমার লোক এখানে থাকলে নজরে পড়ত। আচ্ছা, আজ চলি। নমস্কার।'

থানায় ফিরিয়া বরাট বলিলেন, 'অতঃপর ? বাকি তিনজন আসামীকে দর্শন করতে চান ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চাই বৈকি। এখন তাদের বাড়িতে পাওয়া যাবে ?'

বরাট বলিলেন, 'না, এসময় তারা খেলাধুলো করতে ক্লাবে আসে।'

'তাহলে এখন থাক। আপনার সঙ্গে ক্লাবে গেলে শিকার ভড়কে যাবে। ভাল কথা, পোদ্দারের হিসেবের খাতাটা দিতে পারেন ? ওটা নেড়েচেড়ে দেখতে চাই, যদি কিছু পাওয়া যায়।'

'অফিসেই আছে, নিয়ে যান। আর কিছু ?'

'আর—একটা কাজ করলে ভাল হয়। প্রাণহরি পোদ্দারের অতীত সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। বছর দেড়েক আগে বুড়ো কটকে ছিল। কটকের পুলিস দপ্তর থেকে কিছু খবর পাওয়া যায় না-কি ?'

বরাট বলিলেন, 'কটকের পুলিস দপ্তরে খোঁজ নিয়েছিলাম, প্রাণহরি পোদ্দারের পুলিস-রেকর্ড নেই। তবে তার সম্বন্ধে সাধারণভাবে যদি জানতে চান, আমার একজন চেনা অফিসার কয়েক বছর কটকে আছেন—ইন্সপেক্টর পট্টনায়ক। তাঁকে লিখতে পারি।'

'তাই করুন। ইন্সপেক্টর পট্টনায়ককে টেলিগ্রাম করে দিন, যত শীগ্‌গির খবর পাওয়া যায়। আজ উঠলাম, কাল সকালেই আবার আসছি।'

নৈশ ভোজনের পর মণীশবাবু উপরে চলিয়া গেলেন, আমরা নিজেদের ঘরে আসিলাম। মাথার উপর পাখা খুলিয়া দিয়া আমি শয়নের উপক্রম করিলাম, ব্যোমকেশ কিন্তু শুইল না, প্রাণহরির হিসাবের খাতা লইয়া টেবিলের সামনে বসিল। খেরো-বাঁধানো দু'ভাঁজ করা লম্বা খাতা, তাহাতে দেশী পদ্ধতিতে হিসাব লেখা।

ব্যোমকেশ হিসাবের খাতার গোড়া হইতে ধীরে ধীরে পাতা উল্টাইতেছে, আমি খাটের ধারে বসিয়া সিগারেট প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি, এমন সময় ফণীশ আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিল, তারপর এক অদ্ভুত কাজ করিল। তাহার সামনে টেবিলের উপর একটি কাচের কাগজ-চাপা গোলক ছিল, সে চকিতে তাহা তুলিয়া লইয়া ফণীশের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

ফণীশ টপ করিয়া সেটা ধরিয়া ফেলিল, নচেৎ মেঝেয় পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইত। ব্যোমকেশ হাসিয়া ডাকিল, 'এস ফণীশ।'

ফণীশ বিস্মিত হতবুদ্ধি মুখ লইয়া কাছে আসিল, ব্যোমকেশ কাচের গোলাটা তাহার হাত হইতে লইয়া বলিল, 'অবাক হয়ে গেছ দেখছি। ও কিছু নয়, তোমার রিফ্লেক্স পরীক্ষা করছিলাম। বোসো, কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

ফণীশ সামনের চেয়ারে বসিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি আজকাল ক্লাবে যাও না ?'

ফণীশ বলিল, 'ওই ব্যাপারের পর আর যাইনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাওনি কেন ? হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'

ফণীশ বলিল, 'আচ্ছা, কাল থেকে যাব।'

'আমরাও যাব। অতিথি নিয়ে যেতে বাধা নেই তো ?'

'না। কিন্তু—ক্লাবে আপনার কিছু দরকার আছে কি ?'

'তোমার তিন বন্ধুকে আড়াল থেকে দেখতে চাই।—আচ্ছা, একটা কথা বল দেখি, সেদিন তোমরা যে প্রাণহরি পোদ্দারকে ঠেঙাতে গিয়েছিলে তোমাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছু ছিল ?'

'অস্ত্র ছিল না। তবে মধুময়বাবুর হাতে একটা লম্বা টর্চ ছিল, মুগুওয়ালা টর্চ। আর মৃগাঙ্কবাবুর হাতে ছিল বেতের ছড়ি।'

'কি রকম ছড়ি ? মোটা, না লচপচে ?'

'লচপচে। যাকে swagger cane বলে।'

'হুঁ, তোমার হাতে কিছু ছিল না ?'

'না।'

'অরবিন্দ হালদারের হাতে ?'

'না।'

'কাপড়-চোপড়ের মধ্যে লোহার ডাণ্ডা কি ঐরকম কিছু লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল ?'

'না। গরমের সময়, সকলের গায়েই হাল্কা জামা-কাপড় ছিল, ধুতি আর পাঞ্জাবি। কারুর সঙ্গে ওরকম কিছু থাকলে নজরে পড়ত।'

'হুঁ'—ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া কিছুক্ষণ টানিল, শেষে বলিল, কোথা দিশা খুঁজে পাই না। তুমি যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে।—কবিতা আওড়াতে পারো ? বৌমাকে বোলো—নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।'

ফণীশ লজ্জিত মুখে চলিয়া গেল। আমি শয়ন করিলাম। ব্যোমকেশ আরও কিছুক্ষণ খাতা দেখিল, তারপর আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

অন্ধকারে প্রশ্ন করিলাম, 'খুব তো কবিতা আওড়াচ্ছ, আজ সারাদিনে কিছু পেলে ?'

উত্তর আসিল, 'তিনটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। এক—প্রাণহরি পোদ্দারকে যিনি খুন করেছেন তাঁর টাকার লোভ নেই ; দুই—তিনি সব্যসাচী ; তিন—মোহিনীর মত মেয়ের জন্য যে-কেউ খুন করতে পারে।—এবার ঘুমিয়ে পড়।'

সকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ আবার হিসেবের খাতা লইয়া বসিয়াছে।

তারপর যথাসময়ে প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ হিসাবের খাতাটি সঙ্গে লইল।

থানায় পৌঁছিলে ইন্সপেক্টর বরাট হাসিয়া বলিলেন, 'এরই মধ্যে হিসেবের খাতা শেষ করে ফেললেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ খাতায় মাত্র দেড় বছরের হিসেব আছে, অর্থাৎ এখানে আসার পর প্রাণহরি নতুন খাতা আরম্ভ করেছিল।'

বরাট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিছু পেলেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুনের ওপর আলোকপাত করে এমন কিছু পাইনি। কিন্তু একটা সামান্য বিষয়ে খট্‌কা লেগেছে।'

'কী বিষয় ?'

'একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে প্রাণহরির ব্যবস্থা ছিল, সে রোজ তাকে ট্যাক্সিতে বাড়ি থেকে নিয়ে আসত, আবার বাড়ি পৌঁছে দিত। মাসিক ভাড়া দেবার ব্যবস্থা ছিল নিশ্চয়। কিন্তু হিসেবের খাতায় দেখছি ঠিক উল্টো। এই দেখুন খাতা।' ব্যোমকেশ খাতা খুলিয়া দেখাইল। খাতার প্রতি পৃষ্ঠায় পাশাপাশি জমা ও খরচের স্তম্ভ। খরচের স্তম্ভে এক পয়সা দুই পয়সার খরচ পর্যন্ত লেখা আছে, কিন্তু জমার স্তম্ভ অধিকাংশ দিনই শূন্য। মাঝে মাঝে কোনও খাতক সুদ জমা দিয়াছে তাহার উল্লেখ আছে। ব্যোমকেশ আঙুল দিয়া দেখাইল, 'এই দেখুন, ৩রা মাঘ জমার কলমে লেখা আছে, ট্যাক্সি-ড্রাইভার ৩৫ ্টাকা। এমনি প্রত্যেক মাসেই আছে। কিন্তু খরচের কলমে ট্যাক্সি বাবদ কোনো খরচের উল্লেখ নেই।'

'হয়তো ভুল করে খরচটা জমার কলমে লেখা হয়েছিল।'

'প্রত্যেক মাসেই কি ভুল হবে ?'

'হুঁ। আপনার কি মনে হয় ?'

'বুঝতে পারছি না। খাতায় জুয়া খেলার লাভ-লোকসানের হিসেবও নেই। একটু রহস্যময় মনে হয় না কি ?'

'তা মনে হয় বৈকি। এ বিষয়ে কি করা যেতে পারে ?'

ব্যোমকেশ ভাবিয়া বলিল, 'প্রাণহরি যার ট্যাক্সিতে যাতায়াত করত তাকে পেলে সওয়াল জবাব করা যায়। তাকে চেনেন নাকি ?'

বরাট বলিলেন, 'না, তার খোঁজ করা দরকার মনে হয়নি। এক কাজ করা যাক, ভুবন দাসকে ডেকে পাঠাই, সে নিশ্চয় সন্ধান দিতে পারবে।'

'ভুবন দাস ?'

'সে-রাত্রে ওদের চারজনকে যে ট্যাক্সি-ড্রাইভার প্রাণহরির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল তার নাম ভুবনেশ্বর দাস।'

'ও—তাকে কি পাওয়া যাবে ?'

'কাছেই ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড। আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।'

পনেরো মিনিট পরে ভুবনেশ্বর দাস আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল। দোহারা চেহারা, খাকি প্যাণ্টুলুন ও শার্ট, মাথায় গার্ডসাহেবের মত টুপি। বয়স আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ, চোখ দু'টি অরুণাভ, মুখ গম্ভীর। সন্দেহ হইল লোকটি নেশাভাঙ করিয়া থাকে।

বরাট ঘাড় নাড়িয়া ব্যোমকেশকে ইঙ্গিত করিলেন, ব্যোমকেশ ভুবন দাসকে একবার আগাপাস্তলা দেখিয়া লইয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিল, 'তোমার নাম ভুবন দাস। মিলিটারিতে ছিলে ?'

ভুবন দাস বলিল, 'আজ্ঞে।'

'সিপাহী ছিলে ?'

'আজ্ঞে না, ট্রাক-ড্রাইভার।'

'ট্যাক্সি চালাচ্ছ কত দিন ?'

'তিন-চার বছর।'

'তিন-চার বছর এখানেই ট্যাক্সি চালাচ্ছ ?'

'আজ্ঞে না, এখানে বছর দেড়েক আছি, তার আগে কলকাতায় ছিলাম।'

'বাড়ি কোথায় ?'

'মেদিনীপুর জেলা, ভগবানপুর গ্রাম।'

'তুমি সেদিন চারজনকে নিয়ে প্রাণহরি পোদ্দারের বাড়িতে গিয়েছিলে ?'

'আজ্ঞে বাড়িতে নয়, বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে।'

'বেশ। তোমার ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেছিল ?'

ভুবন দাস একটু নীরব থাকিয়া বলিল, 'বলেছিল। আমি সব কথায় কান করিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল,'কিছু মনে আছে ?'

ভুবন দাস আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বোধ হয় কোনো মেয়েলোকের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। চাপা গলায় কথা হচ্ছিল, ভাল শুনতে পাইনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা যাক। বল দেখি, তোমার চারজন যাত্রীর কারুর হাতে কোনো অস্ত্র ছিল ?'

'একজনের হাতে ছড়ি ছিল।'

'আর কারুর হাতে কিছু ছিল না ?'

'লক্ষ্য করিনি।'

'তুমি নেশা কর ?'

'আজ্ঞে না' বলিয়া ভুবন দাস ইন্সপেক্টর বরাটের দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিল।

'শহরে তোমার বাসা কোথায় ?'

'বাসা নেই। রাত্তিরে গাড়িতেই শুয়ে থাকি।'

'গাড়ি তোমার নিজের ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শহরের অন্য ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে তোমার নিশ্চয় জানাশোনা আছে।'

'জানাশোনা আছে, বেশি মেলামেশা নেই।'

'বলতে পারো, কার ট্যাক্সিতে চড়ে প্রাণহরি পোদ্দার শহরে যাওয়া-আসা করতেন ?

মনে হইল ভুবন দাসের রক্তাভ চোখে একটু কৌতুকের ঝিলিক খেলিয়া গেল। সে কিন্তু গম্ভীর স্বরেই বলিল, 'আজ্ঞে স্যার, আমার ট্যাক্সিতে।'

আমরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তারপর বরাট কড়া সুরে বলিলেন, 'একথা আগে আমাকে বলনি কেন ?'

ভুবন বলিল, 'আপনি তো সুধোননি স্যার।'

ব্যোমকেশ হাসি চাপিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল। ট্যাক্সি-ড্রাইভার সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা খুব বিস্তীর্ণ নয়, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি তাহারা অতিশয় স্বল্পভাষী জীব, অকারণে বাক্য ব্যয় করে না। অবশ্য ভাড়া লইয়া ঝগড়া বাধিলে স্বতন্ত্র কথা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি তাহলে প্রাণহরি পোদ্দারকে আগে থাকতেই চিনতে ?'

ভুবন বলিল, 'আজ্ঞে।'

'তিনি কি রকম লোক ছিলেন ?'

'ভাল লোক ছিলেন স্যার, কখনো ভাড়ার টাকা ফেলে রাখতেন না।' ভুবনের কাছে ইহাই সাধুতার চরম নিদর্শন।

'রোজ নগদ ভাড়া দিতেন ?'

'আজ্ঞে না, মাস-মাইনের ব্যবস্থা ছিল।'

'কত টাকা মাস-মাইনে ?'

'পঁয়ত্রিশ টাকা।'

বরাটের সহিত ব্যোমকেশ মুখ-তাকাতাকি করিল, তারপর ভুবনকে বলিল, 'প্রাণহরি পোদ্দারের সম্বন্ধে তুমি কী জানো সব আমায় বল।'

ভুবন বলিল, 'বেশি কিছু জানি না স্যার। শহরে ওঁর একটা অফিস আছে। বছরখানেক আগে উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে মাস-মাইনেতে ট্যাক্সি ভাড়া করার কথা তোলেন, আমি রাজী হই। তারপর থেকে আমি ওঁকে সকালে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতাম, আবার বিকেলবেলা পৌঁছে দিতাম। বাংলা মাসের গোড়ার দিকে উনি আমাকে অফিসে ডেকে ভাড়া চুকিয়ে দিতেন। এর বেশি ওঁর বিষয়ে আমি কিছু জানি না।'

'তুমি মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা মাস-মাইনেতে রাজী হয়েছিলে ? লাভ থাকতো ?'

'সামান্য লাভ থাকতো। বাঁধা ভাড়াটে তাই রাজী হয়েছিলাম।'

ব্যোমকেশ খানিক চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল, তারপর প্রশ্ন করিল, 'অন্য কোনো ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে প্রাণহরিবাবুর কারবার ছিল কিনা জানো?'

ভুবন বলিল, 'আজ্ঞে, আমি জানি না।'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তুমি এখন যাও। যদি প্রাণহরি সম্বন্ধে কোনো কথা মনে পড়ে দারোগাবাবুকে জানিও।'

'আজ্ঞে।' ভুবন দাস স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল।

তিনজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিলাম। তারপর বরাট বলিলেন, 'কিছুই তো পাওয়া গেল না। হিসেবের খাতায় হয়তো ভুল করেই খরচের জায়গায় জমা লেখা হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিংবা সাংকেতিক জমা-খরচ।'

ভ্রূ তুলিয়া বরাট বলিলেন, 'সাংকেতিক জমা-খরচ কি রকম?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মনে করুন প্রাণহরি পোদ্দার কাউকে ব্ল্যাক্‌মেল করছিল। ভুবন দাস তাকে যত ভাল লোকই মনে করুক আমরা জানি সে প্যাঁচালো লোক ছিল। মনে করুন সে মাসিক সত্তর টাকা হিসেবে ব্ল্যাক্‌মেল আদায় করছে, কিন্তু সে-টাকা তো সে হিসেবের খাতায় দেখাতে পারে না। এদিকে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে দিতে হয় মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা। প্রাণহরি খাতায় সাংকেতিক হিসেব লিখল, সত্তর টাকা থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা বাদ দিয়ে পঁয়ত্রিশ টাকা জমা করল। যাকে ব্ল্যাক্‌মেল করছে তার নাম লিখতে পারে না, তাই ট্যাক্সি-ড্রাইভারের নাম লিখল। বুঝেছেন?'

বরাট বলিলেন, 'বুঝেছি। অসম্ভব নয়। প্রাণহরির মনটা খুবই প্যাঁচালো ছিল, কিন্তু আপনার মন আরো প্যাঁচালো।'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'আচ্ছা, আজ উঠি। প্রাণহরি কাকে ব্ল্যাক্‌মেল করছিল জানতে পারলে হয়তো খুনের একটা সূত্র পাওয়া যেত। কিন্তু ওর দলিল-পত্রে ওরকম কিছু বোধহয় পাওয়া যায়নি?'

'না। যে দু'চারটে কাগজপত্র পাওয়া গেছে তাতে বে-আইনী কার্যকলাপের কোনো ইঙ্গিত নেই।—আজ ওবেলা আসছেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওবেলা আপনাকে আর বিরক্ত করব না। ফণীশের সঙ্গে কয়লা ক্লাবে যাচ্ছি।'

কয়লা ক্লাবের বাড়িটি সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত। সামনে বাগান ও মোটর রাখিবার পার্কিং লন্, দুই পাশে ব্যাডমিণ্টন টেনিস প্রভৃতি খেলিবার স্থান। বাড়িটি একতলা হইলেও অনেকগুলি বড় বড় ঘর আছে। মাঝখানের হলঘরে বিলিয়ার্ড খেলার টেবিল; অন্য ঘরের কোনোটিতে পিংপং টেবিল, কোনোটিতে চার পাঁচটা তাস খেলার টেবিল ও চেয়ার। আবার একটা ঘরের মেঝেয় ফরাস পাতা, এখানে দাবা ও পাশা খেলার আসর। বাড়ির পিছন ভাগে দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর; একটিতে ম্যানেজারের অফিস, অন্যটিতে পানাহারের ব্যবস্থা, টুকিটাকি খাবার, নরম ও গরম নানা জাতীয় পানীয় এখানে সভ্যদের জন্য প্রস্তুত থাকে।

আমরা যখন ক্লাবে গিয়া পৌঁছিলাম তখনও যথেষ্ট দিনের আলো আছে। অনেক সভ্য সমবেত হইয়াছেন। বাহিরে টেনিস কোর্টে খেলা চলিতেছে; চারজন খেলিতেছে, বাকি সকলে কোর্টের পাশে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া খেলা দেখিতেছেন। ফণীশ আমাদের সেই দিকে লইয়া চলিল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া খেলা দেখিবার পর ব্যোমকেশ ফণীশের কানে কানে বলিল, 'তোমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ আছে নাকি?'

ফণীশ বলিল, 'ঐ যে খেলছেন, তোয়ালের নীল গেঞ্জি আর শাদা প্যান্টুলুন, উনি মৃগেন

মৌলিক।'

একটু রোগা ধরনের শরীর হইলেও মৃগেন মৌলিকের চেহারা বেশ খেলোয়াড়ের মত। খেলার ভঙ্গীতে একটু চালিয়াতি ভাব আছে, কিন্তু সে ভালই টেনিস খেলে। ব্যাক্‌হ্যান্ড বেশ জোরালো ; নেটের খেলাও ভাল।

ব্যোমকেশ খেলা দেখিতে দেখিতে বলিল, 'বাকি দু'জন এখানে নেই ?'

ফণীশ বলিল, 'না। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।'

এই সময় পিছন হইতে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ব্যোমকেশবাবু—থুড়ি—গগনবাবু যে !'

ফিরিয়া দেখিলাম, আমাদের পূর্ব-পরিচিত গোবিন্দ হালদার ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া মধুর গোরিলা-হাস্য হাসিতেছেন।

ব্যোমকেশ কিন্তু হাসিল না, স্থির-দৃষ্টিতে গোবিন্দবাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আসল নামটা জানতে পেরেছেন দেখছি। কি করে জানলেন ?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন, 'প্রথম দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর দুই আর দুয়ে মিলিয়ে দেখলাম ঠিক মিলে গেল। গগন—ব্যোমকেশ, সুজিত—অজিত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাদের নামকরণ ভাল হয়নি, কাঁচা কাজ হয়েছিল। কিন্তু আসল নামের বহুল প্রচার কি বাঞ্ছনীয় ?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন, 'আমি প্রচার করছি না। নামটা আল্‌টপ্‌কা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। যা হোক, আমাদের ক্লাবে পদার্পণ করেছেন খুবই আনন্দের কথা। উদ্দেশ্য কিছু আছে নাকি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কি মনে হয় ?'

গোবিন্দবাবুর মন্থর চক্ষু দু'টি একবার ফণীশের দিকে গিয়া আবার ব্যোমকেশের মুখে ফিরিয়া আসিল, 'আপনি কাজের লোক, অকারণে আমোদ করে বেড়াবেন বিশ্বাস হয় না। কাজেই এসেছেন। কিন্তু কোন্ কাজ ? কয়লাখনির রহস্য উদ্‌ঘাটন ?'

ব্যোমকেশ আবার বলিল, 'আপনার কি মনে হয় ?'

গোবিন্দবাবুর চক্ষু দু'টি কুঞ্চিত হইয়া ক্রমে দুইটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হইল, 'তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছি। দেখুন, আপনি হুঁশিয়ার লোক, তবু সাবধান করে দিচ্ছি। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করবেন না।' তাঁহার কুঞ্চিত চক্ষুযুগল একবার ফণীশের দিকে সঞ্চারিত হইল, তারপর তিনি টেনিস কোর্টের কিনারায় গিয়া চেয়ারে বসিলেন।

ফণীশের মুখে শঙ্কার ছায়া পড়িয়াছিল, সে স্খলিত স্বরে বলিল, 'গোবিন্দবাবু অরবিন্দবাবুর বড় ভাই। উনি যদি বাবাকে বলে দেন—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভয় নেই, গোবিন্দবাবু কাউকে কিছু বলবেন না। উনি নিজের দুর্বৃত্ত ছোট ভাইটিকে ভালবাসেন।—চল, ভিতরে যাই।'

বাড়ির সামনের বারান্দায় একটি টেবিলে দৈনিক সংবাদপত্র সাপ্তাহিক প্রভৃতি সাজানো রহিয়াছে, আমরা সেইখানে গিয়া বসিলাম। ফণীশ একজন তকমাধারী ভৃত্যকে ডাকিয়া তিন গেলাস ঘোলের সরবৎ হুকুম করিল।

বরফ-শীতল সরবৎ চাখিতে চাখিতে দেখিতেছি, ঘোর ঘোর হইয়া আসিতেছে। বাহিরে টেনিস খেলা শেষ হইল। সভ্যেরা ভিতরে আসিতেছেন, নানা কথার ছিন্নাংশ কানে আসিতেছে। বাড়ির ভিতরে ঘরে ঘরে উজ্জ্বল বিদ্যুৎবাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। টেবিল-টেনিসের ঘর হইতে খটাখট শব্দ আসিতেছে। হঠাৎ কোনও সভ্য উচ্চকণ্ঠে হাঁকিতেছেন—এই বেয়ারা !

সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার একটি চলমান চিত্র।

সরবৎ নিঃশেষ হইলে আমরা সিগারেট ধরাইয়া বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। মাঝের হলঘরে দুইজন নিঃশব্দ খেলোয়াড় নিরুদ্বেগ মন্থরতায় বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন ; প্রকাণ্ড টেবিলের উপর তিনটা বল তিনটি শিশুর মত লুকোচুরি খেলিতেছে।—এখানে আমাদের দ্রষ্টব্য কেহ

নাই। এখান হইতে টেবিল-টেনিসের ঘরে গেলাম ; দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, হাফ্-ভলির খেলা চলিতেছে ; খটাখট শব্দে বল টেবিলের এপার হইতে ওপারে ছুটাছুটি করিতেছে ; ব্যস্ত-সমস্ত একটি শুভ্র বুদ্বুদ। এ ঘরেও আমাদের দর্শনীয় কেহ নাই।

ফরাস-পাতা ঘর হইতে মাঝে মাঝে হল্লার আওয়াজ আসিতেছিল। সেখানে পাশা বসিয়াছে, চারজন খেলোয়াড় ছক ঘিরিয়া চতুষ্কোণভাবে বসিয়াছেন। একজন দু'হাতে হাড় ঘষিতে ঘষিতে আদুরে সুরে পাশাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'পাশা! বারো-পাঞ্জা-সতেরো! একবারটি বারো-পাঞ্জা-সতেরো দেখাও! এমন মার মারব, পেটের ছানা বেরিয়ে যাবে।' তিনি পাশা ফেলিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষ হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠিল—'তিন কড়া! তিন কড়া!'

আমরা দ্বারের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া তাসের ঘরে উপনীত হইলাম।

তাসের ঘরে সব টেবিল এখনও ভর্তি হয় নাই ; কোনও টেবিলে একজন বসিয়া পেশেন্স খেলিতেছেন, কোনও টেবিলে তিনজন খেলোয়াড় চতুর্থ ব্যক্তির অভাবে গলা-কাটা খেলা খেলিয়া সময় কাটাইতেছেন। একটি টেবিলে চতুরঙ্গ খেলা বসিয়াছে ; চারজন খেলোয়াড় গভীর মনঃসংযোগে নিজ নিজ তাস দেখিতেছেন। একজন বলিলেন, 'থ্রি হার্ট্‌স্।' কন্ট্র্যাক্ট্ খেলা।

ফণীশ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'যিনি ডাক দিলেন মধুময় সুর, আর তাঁর পার্টনার অরবিন্দ হালদার।'

ব্যোমকেশ টেবিলের কাছে গেল না, দূর হইতে সেইদিক পানে চাহিয়া রহিল। অরবিন্দ হালদার যে গোবিন্দ হালদারের ছোট ভাই, তাহা পরিচয় না দিলেও বোঝা যায়। সেই গোরিলাগঞ্জন রূপ, কেবল বয়স কম। মধুময় সুর ফিট্‌ফাট শৌখিন লোক, চেহারায় ব্যক্তিত্বের অভাব গিলে-করা পাঞ্জাবি ও হীরার বোতাম প্রভৃতি দিয়া পূর্ণ করিবার চেষ্টা দেখা যায়।

খেলা আরম্ভ হইয়াছে, ডামি হইয়াছেন বিপক্ষ দলের একজন। স্ল্যামের খেলা, কাহারও অন্য দিকে মন নাই।

পাঁচ মিনিট খেলা দেখিয়া ব্যোমকেশ ইশারা করিল, আমরা বাহিরে আসিলাম। সে সম্ভাব্য আসামীদের দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, শুষ্ক স্বরে বলিল, 'যা দেখবার দেখা হয়েছে, চল এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

মোটরে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী দেখলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনটে মানুষকে দেখলাম, তাদের পরিবেশ দেখলাম, হাত-পা নাড়া দেখলাম। —ফণীশ, কাল সকালে আমরা ওদের বাড়িতে যাব। আলাপ-পরিচয় করা দরকার। আজ যা পেয়েছি তার চেয়ে বেশি কিছু পাব আশা করি না, তবু—'

'আজ কিছু পেয়েছ তাহলে?'

'পেয়েছি। যদিও সেটা নেতিবাচক।'

পরদিন সকালে ফণীশ বাপের সঙ্গে কয়লাখনিতে গেল না, মণীশবাবু একাই গেলেন। ফণীশ আমাদের গাড়ি চালাইয়া লইয়া চলিল। গাড়িতে স্টার্ট দিয়া বলিল, 'আগে কোথায় যাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার কারুর প্রতি পক্ষপাত নেই, যার বাড়ি কাছে তার বাড়িতে আগে চল।'

'তাহলে মৃগেনবাবুর বাড়িতে চলুন।'

মৃগেন মৌলিকের বাড়িটি অতিশয় সুশ্রী, গৃহস্বামীর শৌখিন রুচির পরিচয় দিতেছে। আমাদের মোটর বাগান পার হইয়া গাড়ি-বারান্দায় উপস্থিত হইলে দেখিলাম মৃগেন মৌলিক বাড়ির সম্মুখে ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে, তাহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও সিল্কের ড্রেসিং গাউন। আমরা গাড়ি হইতে নামিলে সে কাগজ মুড়িয়া আমাদের পানে চোখ তুলিল। স্বাগত সম্ভাষণের হাসি তাহার মুখে ফুটিল না, বরঞ্চ মুখ অন্ধকার হইল। আমরা তাহার নিকটবর্তী হইলে সে রূঢ় স্বরে বলিল, 'কি চাই?'

আমরা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ফণীশ বলিল, 'মৃগেনবাবু, এঁরা আমার বাবার বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছেন—'

ফণীশের প্রতি তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃগেন বলিল, 'জানি। ব্যোমকেশ বক্সী কার নাম ?'

ফণীশ থতমত খাইয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি ব্যোমকেশ বক্সী। আপনার সঙ্গে দুটো কথা ছিল।'

মৃগেন মুখ বিকৃত করিয়া অসীম অবজ্ঞার স্বরে বলিল, 'এখানে কিছু হবে না, আপনারা যেতে পারেন।' বলিয়া নিজেই কাগজখানা বগলে লইয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

আমরা পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। ফণীশের মুখ অপমানে সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিয়াছে, ব্যোমকেশের অধরে লাঞ্ছিত হাসি। সে বলিল, 'গোবিন্দ হালদার দেখছি আসামীদের সতর্ক করে দিয়েছেন।'

ফণীশ বলিল, 'চলুন, বাড়ি ফিরে যাই।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, যখন বেরিয়েছি তখন কাজ সেরে বাড়ি ফিরব। ফণীশ, তুমি লজ্জা পেও না। সত্যান্বেষণ যাদের কাজ তাদের লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করতে হয়। চল, এবার মধুময় সুরের বাড়িতে।'

মোটরে যাইতে যাইতে আমি বলিলাম, 'কিন্তু কেন ? এরকম ব্যবহারের মানে কি ? মৃগেন মৌলিক যদি নির্দোষ হয় তাহলে তার ভয় কিসের ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওদের ধারণা হয়েছে আমি ফণীশের দলের লোক, ফণীশকে বাঁচিয়ে ওদের ফাঁসিয়ে দিতে চাই।'

মধুময় সুরের বাড়িটি সেকেলে ধরনের, বাগানের কোনও শোভা নাই। বাড়ির সদর বারান্দায় মধুময় সুর গামছা পরিয়া মাদুরের উপর শুইয়া ছিল এবং একটা মুস্কো জোয়ান চাকর তৈল দিয়া তাহার দেহ ডলাই-মলাই করিতেছিল। মধুময়ের শরীর খুব মাংসল নয়, কিন্তু একটি নিরেট গোছের ক্ষুদ্র ভুঁড়ি আছে। আমাদের দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল।

ফণীশ ক্ষীণ কুণ্ঠিত স্বরে আরম্ভ করিল, 'মধুময়বাবু, মাফ করবেন, এটা আপনার স্নানের সময়—'

মধুময় তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদের দিকে কয়েকবার চক্ষু মিটিমিটি করিল, তারপর পাখি-পড়া সুরে বলিল, 'আপনারা আমার কাছে কেন এসেছেন, আমি প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানি না। যদি কেউ বলে থাকে আমি তার মৃত্যুর রাত্রে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম তবে তা মিথ্যে কথা। অন্য কেউ গিয়েছিল কিনা আমি জানি না, আমি যাইনি।' বলিয়া মধুময় সুর আবার শয়নের উপক্রম করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ট্যাক্সি-ড্রাইভার কিন্তু আপনাকে সনাক্ত করেছে।'

মধুময় বলিল, 'ট্যাক্সি-ড্রাইভার মিথ্যাবাদী। —আসুন, নমস্কার।'

ব্যোমকেশ চট্‌ করিয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনার একটা টর্চ আছে ?'

মধুময় বলিল, 'আমার পাঁচটা টর্চ আছে। আসুন, নমস্কার।'

মধুময় শয়ন করিল, ভৃত্য আবার তেল-মর্দন আরম্ভ করিল। আমরা চলিয়া আসিলাম।

অরবিন্দ হালদারের বাড়ির দিকে যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা আসব মধুময় জানতো, আমাদের কী বলবে মুখস্থ করে রেখেছিল। যাই বল, মৃগেন মৌলিকের চেয়ে মধুময় সুর ভদ্র। কেমন মিষ্টি সুরে বলল—আসুন, নমস্কার। নিমচাঁদ দত্তের ভাষায়—ছেলেটি বে-তরিবৎ নয়।'

অরবিন্দ হালদার ও গোবিন্দ হালদার একই বাড়িতে বাস করেন, কিন্তু মহল আলাদা। অরবিন্দ নিজের বৈঠকখানায় ফরাস-ঢাকা তক্তপোশের উপর মোটা তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া সিগারেট টানিতেছিল, আমাদের দেখিয়া কনুই-এ ভর দিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, কালো

মুখে অক্ষৌরিত দাড়ির কর্কশতা। সে আমাদের পর্যায়ক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, 'এস ফণীশ।'

ফণীশ পাংশুমুখে বলিল, 'এঁরা—'

অরবিন্দ বলিল, 'জানি। বসুন আপনারা।' বলিয়া সিগারেটের কৌটা আগাইয়া দিল।

শিষ্টতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তাই একটু থতমত হইলাম। ব্যোমকেশ তক্তপোশের কিনারায় বসিল, আমরাও বসিলাম। অরবিন্দ সহজ সুরে বলিল, 'কাল রাত্রে মাত্রা বেশি হয়ে গিয়েছিল। এখনো খোঁয়ারি ভাঙেনি।—ওরে গদাধর।'

একটি ভৃত্য কাচের গেলাসে পানীয় আনিয়া দিল, অরবিন্দ এক চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিয়া গেলাস ফেরৎ দিয়া বলিল, 'আপনাদের জন্যে কী আনাব বলুন। চা? সরবৎ? বীয়ার?'

ব্যোমকেশ বিনীত কণ্ঠে বলিল, 'ধন্যবাদ। ওসব কিছু চাই না, অরবিন্দবাবু; আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলবার সুযোগ পেলেই কৃতার্থ হয়ে যাব।'

অরবিন্দ বলিল, 'বিলক্ষণ! কি বলবেন বলুন। তবে একটা কথা গোড়ায় জানিয়ে রাখি। ফণীশ আপনাকে কী বলেছে জানি না, কিন্তু প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যুর রাত্রে আমি তার বাড়িতে যাইনি।'

ব্যোমকেশ একটু নীরব থাকিয়া বলিল, 'অরবিন্দবাবু, আমার কোনো কু-মতলব নেই। নির্দোষ ব্যক্তিকে খুনের মামলায় ফাঁসানো আমার কাজ নয়, আমি সত্যান্বেষী। অবশ্য আপনি যদি অপরাধী হন—'

অরবিন্দ বলিল, 'আমি নিরপরাধ। প্রাণহরির মৃত্যুর রাত্রে আমি তার বাড়ির ত্রিসীমানায় যাইনি। এই কথাটা বুঝে নিয়ে যা প্রশ্ন করবেন করুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, ও প্রসঙ্গ না হয় বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু প্রাণহরির মৃত্যুর আগে আপনি কয়েকবার তার বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

অরবিন্দ বলিল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। আমরা চারজনে জুয়া খেলতে যেতাম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'জুয়া খেলার সময় ছাড়াও আপনি কয়েকবার একলা তার বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

অরবিন্দের মুখে একটা বিশ্রী লুচ্চামির হাসি খেলিয়া গেল, সে বলিল, 'তা গিয়েছিলাম।'

'কি জন্যে গিয়েছিলেন?'

নির্লজ্জভাবে দন্ত বিকাশ করিয়া অরবিন্দ বলিল, 'মোহিনীকে দেখতে। তার সঙ্গে ভাব জমাতে।'

ব্যোমকেশ বাঁকা সুরে বলিল, 'কিন্তু সুবিধে হল না?'

অরবিন্দের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে বড় বড় চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, 'সুবিধে হল না—তার মানে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মানে বুঝতেই পারছেন। আপনি কি বলতে চান যে—?'

অরবিন্দ হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর হাসি থামাইয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি মস্ত একজন ডিটেক্টিভ হতে পারেন কিন্তু দুনিয়াদারির কিছুই জানেন না। মোহিনী তো তুচ্ছ মেয়েমানুষ, দাসীবাঁদী। টাকা ফেললে এমন জিনিস নেই যা পাওয়া যায় না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কত টাকা ফেলেছিলেন?'

অরবিন্দ দুই আঙুল তুলিয়া বলিল, 'দু'হাজার টাকা।'

'মোহিনীকে দু'হাজার টাকা দিয়েছিলেন? দাসীবাঁদীর পক্ষে দাম একটু বেশি নয় কি?'

'মোহিনীকে দিইনি। মোহিনীর দালালকে দিয়েছিলাম। প্রাণহরি পোদ্দারকে।' অরবিন্দের কথাগুলো বিষমাখানো।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আচ্ছা, ও কথা যাক। প্রাণহরি পোদ্দার লোকটা কেমন ছিল?'

অরবিন্দ নীরসকণ্ঠে বলিল, 'চামার ছিল, অর্থ-পিশাচ ছিল। সাধারণ মানুষ যেমন হয় তেমনি ছিল।'

সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে অরবিন্দের ধারণা খুব উচ্চ নয়। ব্যোমকেশ বলিল, 'জুয়াতে প্রাণহরি পোদ্দার আপনাদের অনেক টাকা ঠকিয়েছিল ?'

অরবিন্দ তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'সে জিতেছিল আমরা হেরেছিলাম। ঠকিয়েছিল কিনা বলতে পারি না।'

'তবে তাকে ঠেঙাতে গিয়েছিলেন কেন ?'

অরবিন্দ উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিয়া থামিয়া গেল, ব্যোমকেশকে একবার ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কে বললে ঠেঙাতে গিয়েছিলাম ? যারা গিয়েছিল তারা নিজের কথা বলুক, আমি কাউকে ঠেঙাতে যাইনি।'

আমি ফণীশের দিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সে হেঁটমুখে শুনিতেছিল, একবার চোখ তুলিয়া অরবিন্দের পানে চাহিল, তারপর আবার মাথা হেঁট করিল।

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে বলিল, 'আপনি যেটুকু বললেন, তাতেও গরমিল আছে, মোহিনীর কথার সঙ্গে আপনার কথা মিলছে না। হয়তো আপনার কথাই সত্যি। আচ্ছা, নমস্কার। আপনার দাদাকে বলবেন, পুলিসকে ঘুষ দিতে যাওয়া নিরাপদ নয়, তাতে সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। সব পুলিস অফিসার ঘুষখোর নয়।'

অতঃপর তিনদিন আমরা প্রায় নিষ্কর্মার মত কাটাইয়া দিলাম, প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যুরহস্য ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলিয়া রহিল। নূতন তথ্য আর কিছু পাওয়া যায় নাই, পূর্বে সামান্য যেটুকু পাওয়া গিয়াছিল তাহাই সম্বল। কটক হইতে ইন্সপেক্টর বরাটের বন্ধু পট্টনায়ক প্রাণহরির অতীত সম্বন্ধে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার দ্বারাও খুনের উপর আলোকপাত হয় নাই। প্রাণহরি পোদ্দার পেশাদার জুয়াড়ী ছিল, কিন্তু কোনও দিন পুলিসের হাতে পড়ে নাই। সে বছর-দুই কটকে ছিল, কোথা হইতে কটকে আসিয়াছিল তাহা জানা যায় না। তাহার পোষ্য কেহ ছিল না, কাজকর্মও ছিল না। নিজের বাড়িতে কয়েকজন বড়মানুষের অবচীন পুত্রকে লইয়া জুয়ার আড্ডা বসাইত। ক্রমে অবচীনেরা বুঝিল প্রাণহরি জুয়াচুরি করিয়া তাহাদের রুধির শোষণ করিতেছে, তখন তাহারা প্রাণহরিকে উত্তম-মধ্যম দিবার পরামর্শ করিল। কিন্তু পরামর্শ কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই একদিন প্রাণহরি পোদ্দার নিরুদ্দেশ হইল। তাহার বাড়িতে একটি যুবতী দাসী কাজ করিত, সেও লোপাট হইল। অনুমান হয় বৃদ্ধ প্রাণহরির সহিত দাসীটার অবৈধ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

পট্টনায়কের চিঠি হইতে শুধু এইটুকুই পরিস্ফুট হয় যে প্রাণহরির কর্মজীবনে একটা বিশিষ্ট প্যাটার্ন ছিল।

ব্যোমকেশের চিত্তে সুখ নাই। ইন্দিরার চোখে অবার উদ্বেগ ও আশঙ্কা ঘনীভূত হইতেছে। ফণীশ ছট্‌ফট করিতেছে। মণীশবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কিন্তু তিনিও যেন একটু অধীর হইয়া উঠিতেছেন। কয়লাখনির অনামা দুর্বৃত্তেরা এখনও ধরা পড়ে নাই।

বিকাশ দত্ত আসিয়াছে এবং কয়লাখনির হাসপাতালে যোগ দিয়াছে। আমরা একদিন বিকালে মণীশবাবুর সঙ্গে কয়লাখনিতে গিয়াছিলাম, ব্যোমকেশ হাসাপাতাল পরিদর্শনের ছুতায় বিকাশের সঙ্গে দেখা করিয়াছে এবং উপদেশ দিয়া আসিয়াছে।

এই তিন দিনের মধ্যে কেবল একটিমাত্র বিশিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার উল্লেখ করা যায়। ব্যোমকেশ ক্রমান্বয়ে বিছানায় শুইয়া, ঘরে পায়চারি করিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই কাল সন্ধ্যার পর আমাকে বলিল, 'চল, রাস্তায় একটু বেড়ানো যাক।'

রাস্তাটা নির্জন, আলো খুব উজ্জ্বল নয়, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে দু' একজন পদচারী, দু' একটি মোটর যাতায়াত করিতেছে। ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, 'প্রাণহরি পোদ্দারের মত একটা থার্ড ক্লাস লোকের হত্যারহস্য তদন্ত করার কী দরকার ? যে মেরেছে বেশ করেছে, তাকে সোনার

মেডেল দেওয়া উচিত।'

বলিলাম, 'সোনার মেডেল দিতে হলেও তো লোকটাকে চেনা দরকার।'

আরও কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহিনীর কাছে আর একবার যেতে হবে। তাকে একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি।'

এই সময় বাই-সাইকেল প্রথম লক্ষ্য করিলাম। আমরা রাস্তার একটু পাশ ঘেঁষিয়া পায়চারি করিতেছিলাম, দেখিলাম সামনের দিকে আন্দাজ পঞ্চাশ গজ দূরে একটা সাইকেল আসিতেছে। সাইকেলে আলো নাই, রাস্তার আলোতে আরোহীকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়; তাহার মাথায় সোলার টুপি মুখখানাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সাইকেল আমাদের কাছে আসিয়া পড়িল, তারপর আরোহী আমাদের পায়ের কাছে একটা সাদাগোছের বস্তু ফেলিয়া দিয়া দ্রুত পেডাল ঘুরাইয়া অদৃশ্য হইল।

ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। দশ হাত দূরে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে শ্বেতাভ বস্তুটার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু কিছু ঘটিল না, টেনিস বলের মত বস্তুটা জড়বৎ পড়িয়া রহিল। উহা যে বোমা হইতে পারে একথা আমার মাথায় আসে নাই; তখন ব্যোমকেশের ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার বুক ঢিব্‌ঢিব্‌ করিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, চট্‌ করে বাড়ি থেকে একটা টর্চ নিয়ে এস তো।'

সে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি পিছু হটিয়া বাড়িতে গেলাম। ফণীশ ও মণীশবাবু দু'জনেই খবর শুনিয়া আমার সঙ্গে আসিলেন।

'কি ব্যাপার?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাছে আসবেন না। হয়তো কিছুই নয়, তবু সাবধান হওয়া ভাল। অজিত, টর্চ আমাকে দাও।'

টর্চ লইয়া সে ভূ-পতিত বস্তুটার উপর আলো ফেলিল। আমি গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, কাগজের একটা মোড়ক ধীরে ধীরে খুলিয়া যাইতেছে। ব্যোমকেশ কাছে গিয়া আরও কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া বস্তুটা তুলিয়া লইল। হাসিয়া বলিল, 'কাগজে মোড়া এক টুকরো পাথুরে কয়লা।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'কয়লা— !

ব্যোমকেশ বলিল, 'কয়লা মুখ্য নয়, কাগজটাই আসল। চলুন, বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক।'

ড্রয়িং-রুমে উজ্জ্বল আলোর নীচে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ সন্তর্পণে মোড়ক খুলিল। পাথুরে কয়লার টুকরো টেবিলে রাখিয়া কুঞ্চিত কাগজটির দুই পাশ ধরিয়া আলোর দিকে তুলিয়া ধরিল। কাগজটা আকারে সাধারণ চিঠির কাগজের মত, তাহাতে কালি দিয়া বড় বড় অক্ষরে দু'ছত্র লেখা—'ব্যোমকেশ বক্সী, যদি অবিলম্বে শহর ছাড়িয়া না যাও তোমাকে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না।'

'কী ভয়ানক, আপনার নাম জানতে পেরেছে।' মণীশবাবু হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'দেখি কাগজখানা।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, আপনার ছুঁয়ে কাজ নেই। কাগজে হয়তো আঙুলের ছাপ আছে।'

কাগজখানি সাবধানে ধরিয়া ব্যোমকেশ শয়নকক্ষে আসিল। আমিও সঙ্গে আসিলাম। টেবিলের উপর একটি সচিত্র বিলাতি মাসিকপত্র ছিল, তাহার পাতা খুলিয়া সে কাগজখানি সযত্নে তাহার মধ্যে রাখিয়া দিল। আমি বলিলাম, 'কোন পক্ষের চিঠি। অবশ্য কয়লা দেখে মনে হয় কয়লাখনির আসামীরা জানতে পেরেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা ধাপ্পা হতে পারে। গোবিন্দ হালদার জানেন আমি কয়লাখনি সম্পর্কে এখানে এসেছি।'

ড্রয়িং-রুমে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম অফিসের বড়বাবু সুরপতি ঘটক আসিয়াছেন, কর্তার সঙ্গে

বোধকরি অফিসঘটিত কোনও পরামর্শ করিতেছেন। আমাদের দেখিয়া সবিনয়ে নমস্কার করিলেন।

তিনি বাক্যালাপ করিয়া প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ মণীশবাবুকে বলিল, 'আপনি সুরপতিবাবুকে কিছু বলেননি তো?'

মণীশবাবু বলিলেন, 'না। —পাজি ব্যাটারা কিন্তু ভয় পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভয় না পেলে আমাকে ভয় দেখাতো না।'

মণীশবাবু খুশি হইয়া বলিলেন, 'আপনি তলে তলে কি করছেন আমি জানি না কিন্তু নিশ্চয় কিছু করছেন, যাতে পাজি ব্যাটারা ঘাবড়ে গেছে। —যাহোক, চিঠি পেয়ে আপনি ভয় পাননি তো?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ভয় বেশি পাইনি। তবু আজ রাত্তিরে দোর বন্ধ করে শোব।'

সকালবেলা ফণীশ আমাদের থানায় নামাইয়া দিয়া বলিল, 'আমাকে একবার বাজারে যেতে হবে, ইন্দিরার একটা জিনিস চাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। অসুবিধা হবে না তো?'

'না। আমরা এখানে ঘণ্টাখানেক আছি।'

ফণীশ মোটর লইয়া চলিয়া গেল, আমরা থানায় প্রবেশ করিলাম।

প্রমোদবাবু টেবিলের সামনে বসিয়া কাগজপত্র লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, ব্যোমকেশ সচিত্র বিলাতি মাসিকপত্রটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, 'এর মধ্যে এক টুকরো কাগজ আছে, তাতে আঙুলের ছাপ থাকতে পারে। আপনার finger-print expert আছে?'

পত্রিকার পাতা তুলিয়া দেখিয়া বরাট বলিলেন, 'আছে বৈকি। কি ব্যাপার?'

ব্যোমকেশ গত রাত্রির ঘটনা বলিল। শুনিয়া বরাট বলিলেন, 'কয়লাখনির ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। এখনি ব্যবস্থা করছি। আজ বিকেলবেলাই রিপোর্ট পাবেন।'

তিনি লোক ডাকিয়া পত্রিকাসমেত কাগজখানা করাঙ্ক বিশেষজ্ঞগণের কাছে পাঠাইয়া দিলেন, তারপর বলিলেন, 'তিনদিন আপনি আসেননি, ওদিকের খবর কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যথা পূর্বং তথা পরং, নতুন কোনো খবর নেই। কিন্তু একটা খট্‌কা লাগছে?'

'কিসের খট্‌কা?'

'মোহিনীকে প্রাণহরি পনরো টাকা মাইনে দিত। হিসেবের খাতা কিন্তু মোহিনীর মাইনের উল্লেখ নেই।'

বরাট চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'হুঁ। প্রাণহরির হিসেবের খাতায় দেখছি বিস্তর গলদ। এখন কি করবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহিনীকে প্রশ্ন করে দেখতাম। সে এখনো আছে তো?'

বরাট বলিলেন, 'দিব্যি আছে, নড়বার নামটি নেই। আমিও ছাড়তে পারছি না, যতক্ষণ না এ মামলার একটা হেস্তনেস্ত হয়—'

'তাহলে আমরা একবার ঘুরে আসি।'

'চলুন।'

'না না, আপনার অন্য কাজ রয়েছে, আপনি থাকুন। আমি আর অজিত যাচ্ছি। আপনার সেই তরুণ কনস্টেবলটিকে সেখানে পাব তো?'

বরাট হাসিলেন, 'আলবৎ পাবেন।'

থানা হইতে বাহির হইলাম। ফণীশের এখনও ফিরিবার সময় হয় নাই, আমরা ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে চলিলাম।

থানার অনতিদূরে রাস্তার ধারে একটি বিপুল পাকুড় গাছের ছায়ায় ট্যাক্সি দাঁড়াইবার স্থান। সেইদিকে যাইতে যাইতে আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, প্রাণহরির সঙ্গে কয়লাখনির ব্যাপারের কি

কোনো সম্বন্ধ আছে ?'

সে বলিল, 'কিছু না। একমাত্র আমি হচ্ছি যোগসূত্র।'

ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের কাছাকাছি গিয়া দেখিলাম। গাছতলায় মাত্র একটি ট্যাক্সি আছে এবং রাস্তার ধার ঘেঁষিয়া একটা প্রকাণ্ড কালো-রঙের মোটর আমাদের দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার ভুবন দাস কালো মোটরের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া চালকের সহিত কথা বলিতেছে। আমরা আর একটু নিকটবর্তী হইতেই কালো মোটরটা চলিয়া গেল। ভুবন দাস নিজের ট্যাক্সির কাছে ফিরিয়া চলিল।

ব্যোমকেশ গভীর ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, 'কার মোটর চিনতে পারলে ? গোবিন্দ হালদারের মোটর। প্রথমদিন নম্বরটা দেখেছিলাম।'

'গোবিন্দ হালদার ট্যাক্সিওয়ালার কাছে কী চায় ?'

'বোধ হয় সাক্ষী ভাঙাতে চায়। এস দেখি।'

আমরা যখন ট্যাক্সির কাছে পৌঁছিলাম তখন ভুবন গাড়ির বুট্ হইতে জ্যাক্ বাহির করিয়া চাকার নীচে বসাইবার উদ্যোগ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া স্যালুট করিল, বলিল, 'ট্যাক্সি চাই স্যার ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, একবার প্রাণহরিবাবুর বাড়িতে যেতে হবে। সেখানে একজন মেয়েলোক থাকে তার সঙ্গে দরকার আছে।'

ভুবন আড়চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, মাথা চুলকাইয়া বলিল, 'আমার তো একটু দেরি হবে স্যার। টায়ার পাঞ্চার হয়েছে, চাকাটা বদলাতে হবে।'

ব্যোমকেশ অতর্কিতে প্রশ্ন করিল, 'গোবিন্দ হালদার তোমার সঙ্গে কী কথা বলছিলেন ?'

ভুবন চমকিয়া উঠিল, 'আজ্ঞে ?—উনি—উনি আমাকে চেনেন, তাই দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলছিলেন। ভারি ভাল লোক।' বলিয়া জ্যাকের যন্ত্র প্রবলবেগে ঘুরাইয়া গাড়ির চাকা শূন্যে তুলিতে লাগিল।

ব্যোমকেশের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া দেখি সে তন্দ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চক্ষু ভুবনের উপর নিবদ্ধ কিন্তু সে মনশ্চক্ষে অন্য কিছু দেখিতেছে। আমি ডাকিলাম, 'ব্যোমকেশ !'

সে আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বিড়বিড় করিয়া বলিল, 'অজিত, পনরোর সঙ্গে পঁয়ত্রিশ যোগ দিলে কত হয়'

বলিলাম, 'পঞ্চাশ। কী আবোল-তাবোল বকছ ?'

সে বলিল, 'এস।' বলিয়া থানার দিকে ফিরিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া আমি ফিরিয়া চাহিলাম, ভুবন একাগ্র দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকাইয়া আছে।

থানায় উপস্থিত হইলে বরাট মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'এ কি, গেলেন না ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রমোদবাবু, আপনার থানায় কোনও নিরিবিলি জায়গা আছে ? আমি নির্জনে বসে একটু ভাবতে চাই।'

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। বরাট তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

থানার পিছন দিকে একটি ঢাকা বারান্দা, লোকজন নেই, কয়েকটা চেয়ার পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশ একটি ইজি-চেয়ারে লম্বা হইয়া সিগারেট ধরাইল। বরাট মৃদু হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে গোটা পাঁচেক সিগারেট নিঃশেষ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, হয়েছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী হয়েছে ?'

সে বলিল, 'দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, সত্যদর্শন হয়েছে। এস।'

বরাটের ঘরে গিয়া তাঁহার টেবিলের পাশে দাঁড়াইতেই তিনি উৎসুক মুখ তুলিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রমোদবাবু, কোন্ ব্যাঙ্কে প্রাণহরির টাকা আছে ?'

বরাট বলিলেন, 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে। কেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সেখানে সেফ্-ডিপজিট ভল্ট আছে কিনা জানেন ?'

'আছে বোধ হয়।'

হাতের ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এতক্ষণ ব্যাঙ্ক খুলেছে।—চলুন।'

বরাট আর প্রশ্ন না করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ফণীশ ফিরিয়াছে এবং গাড়ি হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'নেমো না, আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিতে হবে।'

শহরের মাঝখানে ব্যাঙ্কের বাড়ি, দ্বারে বন্দুকধারী শাস্ত্রীর পাহারা। গাড়ি হইতে নামিবার পূর্বে ব্যোমকেশ ফণীশকে বলিল, 'ফণীশ, তুমি বাড়ি যাও, আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে।—ভালো কথা, বৌমার বাপের বাড়ি কোথায় ?'

ফণীশ সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'নবদ্বীপে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। তাহলে নিশ্চয় মাল্‌পো তৈরি করতে জানেন। তাঁকে বলে দিও আজ বিকেলে আমরা মাল্‌পো খাব।'

আমরা নামিয়া গেলাম, ফণীশ একটু নিরাশভাবে গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল। সে বুঝিয়াছিল, প্রাণহরির মৃত্যুরহস্য সমাধানের উপান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বরাট আমাদের ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ঘরে লইয়া গেলেন ; ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁহার আগে হইতেই আলাপ ছিল। বলিলেন, 'প্রাণহরি পোদ্দারের ব্যাপারে এসেছি। আপনার ব্যাঙ্কে সেফ্-ডিপজিট ভল্ট আছে ?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আছে।'

বরাট ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রাণহরি পোদ্দার ভল্ট ভাড়া নিয়েছিলেন নাকি ?'

ম্যানেজার একজন কর্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল, 'হ্যাঁ, নিয়েছিলেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তার সেফ্-ডিপজিটে কী আছে আমরা দেখতে চাই।'

ম্যানেজার কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, 'কিন্তু ব্যাঙ্কের নিয়ম নেই। অবশ্য যদি পরোয়ানা থাকে—'

বরাট বলিলেন, 'প্রাণহরি পোদ্দারকে খুন করা হয়েছে। তার সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র অনুসন্ধান করবার পরোয়ানা পুলিসের আছে।'

ম্যানেজার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'বেশ। চাবি এনেছেন ?'

'চাবি ?'

'সেফ্-ডিপজিটের প্রত্যেকটি বাক্সের দু'টো চাবি ; একটা থাকে যিনি ভাড়া নিয়েছেন তাঁর কাছে, অন্যটা থাকে ব্যাঙ্কের জিম্মায়। দুটো চাবি না পেলে বাক্স খোলা যায় না।'

ব্যোমকেশ বরাটের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিল। বরাট বলিলেন, 'ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয় আছে ?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারদের হুকুম না পেলে আপনাদের দিতে পারি না। হুকুম পেতে চার-পাঁচ দিন সময় লাগবে।'

ব্যোমকেশ বরাটকে বলিল, 'চলুন, আর একবার প্রাণহরির সিন্দুক খুঁজে দেখা যাক। নিশ্চয় ওই ঘরেই কোথাও আছে।'

বরাট উঠিলেন, ম্যানেজারকে বলিলেন, 'আমরা আবার আসছি। যদি চাবি খুঁজে না পাই, দরখাস্ত করব।'

আমরা থানায় ফিরিয়া গেলাম, সেখান হইতে আরও দুইজন লোক লইয়া পুলিস-কারে প্রাণহরির বাড়িতে উপনীত হইলাম।

আজ তরুণ কনস্টেবলটি বাড়ির সামনে টুল পাতিয়া বসিয়া ছিল, আমাদের দেখিয়া সাড়ম্বরে

স্যালুট করিল।

দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ বরাটকে বলিল, 'আমি মোহিনীকে দু'-একটা প্রশ্ন করি, ততক্ষণ আপনারা ওপরের ঘর তল্লাশ করুন গিয়ে। আমার বিশ্বাস চাবি খুঁজে বার করা শক্ত হবে না। হয়তো সিন্দুকেই আছে, আপনারা লুকোনো জিনিস খোঁজেননি, তাই পাননি। তখন তো আপনারা জানতেন না যে প্রাণহরির সেফ-ডিপজিট আছে।'

পুলিসের দল সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ব্যোমকেশ ও আমি রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

মোহিনী দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া রান্না করিতেছিল, আমাদের পদশব্দে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। আমাদের দেখিয়া চকিত ত্রাসে তাহার চক্ষু একবার বিস্ফারিত হইল, তারপর সে উনান হইতে কড়া নামাইয়া আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'কিছু দরকার আছে বাবু ?' তাহার ক্ষণিক ত্রাস কাটিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি এখনো আছ দেখছি। দেশে ফিরে যাচ্ছ না কেন ?'

মোহিনী বলিল, 'কি করব বাবু, পুলিস ছেড়ে না দিলে যাই কি করে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার বাপ-মা'কে কিংবা স্বামীকে খবর দিয়েছ ?'

মোহিনী ক্ষণকাল চক্ষু নত করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'স্বামী কোথায় জানি না। বাপ-মা'কে খবর দিইনি। তারা বুড়ো মানুষ, কি হবে তাদের খবর দিয়ে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। আচ্ছা, একটা কথা বল দেখি, যে-রাত্রে প্রাণহরিবাবু খুন হয়েছিলেন, সে-রাত্রে তিনি যখন খেতে নামলেন না, তখন তুমি তাঁর ঘরে গিয়েছিলে ?'

মোহিনী সায় দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ বাবু।'

'ঘরে আলো জ্বলছিল ?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'ঘরের পিছন দিকের দরজা, অর্থাৎ স্নানের ঘরের দরজা খোলা দেখেছিলে ?'

'না বাবু।' মোহিনীর চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

'দরজা বন্ধ ছিল ?'

পলকের জন্য মোহিনী দ্বিধা করিল, তারপর বলিল, 'আমি কিছুই দেখিনি বাবু। কর্তাবাবু মরে পড়ে আছেন দেখে ছুটে পালিয়ে এসেছিলুম।'

'তুমি স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করে দাওনি ?'

'আজ্ঞে না।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল, 'প্রাণহরিবাবু তোমাকে পনরো টাকা মাইনে দিতেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'প্রতি মাসে ঠিক সময়ে মাইনে দিতেন ?'

মানুষ যখন মনে মনে এক কথা ভাবে এবং মুখে অন্য কথা বলে তখন তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা যায়, তেমনি অন্যমনস্কভাবে মোহিনী বলিল, 'আমার মাইনে কর্তাবাবুর কাছে জমা থাকত, দরকার হলে দু'এক টাকা চেয়ে নিতুম।'

ব্যোমকেশের পানে কটাক্ষপাত করিয়া দেখিলাম সে মৃদু হাসিতেছে। সে বলিল, 'তোমার মাইনের টাকা বোধহয় মারা গেল। আচ্ছা, এবার আমার শেষ প্রশ্ন : তুমি কোনো ন্যাটা লোককে চেন ?'

মোহিনী অবাক হইয়া বলিল, 'ন্যাটা লোক ! সে কাকে বলে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ন্যাটা জান না ? যে ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাত বেশি চালায় তাকে ন্যাটা বলে।'

মোহিনী সহসা বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল, 'না বাবু, সে রকম কাউকে আমি চিনি না।'

মোহিনী দাঁড়াইয়া রহিল, আমরা উপরে প্রাণহরির শয়নকক্ষে উঠিয়া গেলাম।

চাবি পাওয়া গিয়াছে। বেশি খোঁজাখুঁজি করিতে হয় নাই ; সিন্দুক ও দেয়ালের মাঝখানে যে স্বল্প-পরিসর স্থান ছিল সেই স্থানে সিন্দুকের পিঠে চাবিটা মোম দিয়া আট্‌কানো ছিল। বরাট বলিল, 'এই নিন।'

নম্বর খোদাই-করা লম্বা একটি চাবি। ব্যোমকেশ তাহা পরিদর্শন করিয়া বলিল, 'চলুন আবার ব্যাঙ্কে।'

ব্যাঙ্কে গিয়া ম্যানেজারের নিকট চাবি পেশ করা হইল। তিনি এবার আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, স্বয়ং উঠিয়া আমাদের ভল্টে লইয়া গেলেন। ব্যাঙ্কের বাড়ির নীচে মাটির তলায় ঘর, তাহার তিনটি দেয়াল জুড়িয়া কাতারে কাতারে দ্বারযুক্ত স্টীলের খোপ শোভা পাইতেছে।

দুইটি চাবি মিলাইয়া প্রাণহরির খোপের কবাট খোলা হইল। খোপের মধ্যে টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি কিছু নাই, কেবল কয়েকটি পুরাতন চিঠি এবং এক বাণ্ডিল বন্ধকী তমসুক।

চিঠিগুলি প্রাণহরিকে লেখা নয়, প্রাণহরির দ্বারাও লিখিত নয়। অজ্ঞাতনামা পুরুষ বা নারীর দ্বারা অজ্ঞাতনামা লোকের নামে লেখা। সম্ভবত এই পত্রগুলিকে অস্ত্র করিয়া প্রাণহরি লেখক ও লেখিকাদের রুধির শোষণ করিতেন।

চিঠিগুলিতে ব্যোমকেশের প্রয়োজন ছিল না, সে তমসুকগুলি লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ম্যানেজারের ঘরে বসিয়া সে একে একে তমসুকগুলিতে চোখ বুলাইল। তারপর একটি তমসুক তুলিয়া ধরিয়া বরাটকে বলিল, 'এই নিন আপনার আসামী।'

তমসুকে আইনসঙ্গত ভাষায় লেখা ছিল, মহাজন প্রাণহরি পোদ্দার ভগবানপুর নিবাসী ভুবনেশ্বর দাসকে ক্রেতব্য মাটরগাড়ি বন্ধক রাখিয়া আড়াই হাজার টাকা কর্জ দিয়াছেন। কীভাবে ভুবনেশ্বর দাস এই ঋণ শোধ করিবে তাহার শর্তও দলিলে লেখা আছে : পঞ্চাশ টাকা নগদ ; প্রাণহরি মোটর ব্যবহার করিবেন তাহার মাসিক ভাড়া পঁচিশ টাকা ; একুনে পঁচাত্তর টাকা হিসাবে মাসে শোধ হইবে।

বরাট ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার যা করবার আপনি করবেন।'

বরাট বলিলেন, 'কিন্তু খুনের প্রমাণ ?'

'প্রমাণ আছে। তবে আদালতে দাঁড়াবে কিনা বলতে পারি না। এবার আমরা বাড়ি ফিরব, বেলা দেড়টা বেজে গেছে।'

'চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

পুলিস-কারে যাইতে যাইতে বেশি কথা হইল না। একবার বরাট বলিলেন, 'ভুবনকে অ্যারেস্ট করি তাহলে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'করুন। সে যদি স্বীকার করে তাহলে সব ন্যাটা চুকে যাবে।'

বাড়ির ফটকের সামনে আমাদের নামাইয়া দিয়া গাড়ি চলিয়া গেল, বরাট বলিয়া গেলেন, 'বিকেলবেলা আসব।'

অপরাহ্ণে আন্দাজ পাঁচটার সময় আমরা ক্ষীরের মালপোয়া লইয়া বসিয়াছি এমন সময় প্রমোদ বরাট আসিলেন।

মণীশবাবু কয়লাখনিতে গিয়াছেন, ফণীশ বাড়িতে আছে। ইন্দিরা এতক্ষণ আমাদের কাছেই ছিল, এখন বরাটকে দেখিয়া ভিতরে গিয়াছে। আসামী কে তাহা শুনিবার পর আমার মাথাটা হিজিবিজি হইয়া গিয়াছিল, এখন কতকটা ধাতে আসিয়াছে।

ইন্সপেক্টর বরাটের মুখখানা শুষ্ক, মন বিক্ষিপ্ত ; সকালবেলা যে ইউনিফর্ম পরিয়া ছিলেন, এখনও তাহাই পরিয়া আছেন মনে হয়। তিনি আসিয়া হাস্যহীন মুখে পকেট হইতে একটি খাম

বাহির করিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিলেন ; বলিলেন, 'এই নিন আঙুলের ছাপের ফটো আর রিপোর্ট। তিনজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ খামটি না খুলিয়াই পকেটে রাখিল, বরাটের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, 'আজ দুপুরে আপনার খাওয়া হয়নি দেখছি।'

বরাট মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'খাওয়া হবে কোত্থেকে। আপনার আসামী পালিয়েছে।'

ব্যোমকেশ এমনভাবে ঘাড় নাড়িল যেন ইহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল। তারপর বরাটকে বসিতে বলিয়া সে ফণীশের পানে চাহিল। ফণীশ দ্রুত অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। বরাট হেলান দিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিলেন, 'শুধু আসামী নয়, মোহিনীও পালিয়েছে। দু'জনে ট্যাক্সিতে চড়ে হাওয়া হয়েছে। কনস্টেবলটা প্রাণহরির বাড়িতে পাহারায় ছিল, কিন্তু মোহিনীকে আটক করবার হুকুম তার ছিল না। ভুবন দাস ট্যাক্সিতে এসে রাস্তা থেকে হর্ন বাজালো, মোহিনী বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে চড়ে বসল। দু'জনে চলে গেল।'

ফণীশ এক থালা খাবার আনিয়া বরাটের সম্মুখে রাখিল, বরাট বিমর্ষভাবে আহার করিতে লাগিলেন। আমরাও মালপোয়াতে মন দিলাম। নীরবে আহার চলিতে লাগিল।

বৈষ্ণবীয় জলযোগ সমাধা করিয়া সিগারেট ধরাইবার উপক্রম করিতেছি, বাহিরের দিক হইতে আর্দালি জাতীয় একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিল। মাথায় গান্ধী-টুপি, পরিধানে খদ্দরের চাপকান ও পায়জামা ; তাই হঠাৎ তাহাকে চিনিতে পারি নাই। সে মাথার টুপি খুলিয়া মেঝেয় আছাড় মারিল। তারপর বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলিল, 'শালাদের ধরেছি স্যার।'

বিকাশ দত্ত। টুপি খুলিতেই তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে। ব্যোমকেশ সমাদর করিয়া বলিল, 'এস এস বিকাশ। কাজ সেরে ফেলেছ তাহলে ?'

'সেরেছি স্যার। আমার মাথা ফাটাবার তালে ছিল, তাতেই ধরা পড়ে গেল।' বিকাশ হাত-পা ছড়াইয়া একটা সোফায় বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, 'দু'জনেই শালা।'

'দু'জনেই শালা—কাদের কথা বলছ ?'

বিকাশ উত্তর দিবার পূর্বেই সুরপতি ঘটক প্রবেশ করিলেন। শৌখিন বেশবাস সত্ত্বেও একটু ভিজাবিড়াল ভাব, চোখে সতর্ক বিড়ালদৃষ্টি। তিনি ঘরের পরিস্থিতি ক্ষিপ্র-মসৃণ চক্ষে দেখিয়া লইয়া বিনীত স্বরে বলিলেন, 'কর্তা আছেন কি ? তাঁর সঙ্গে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন সুরপতিবাবু।'

বিকাশ সহসা খাড়া হইয়া বসিল, একাগ্র চক্ষে সুরপতিবাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'এঁর নাম সুরপতি ঘটক ? বড় অফিসের বড়বাবু ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। কেন বল দেখি ?'

বিকাশ সুরপতিবাবুর দিকে তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিল, 'এঁর দুই শালার কথা বলছিলাম স্যার। বিশ্বনাথ আর জগন্নাথ রায়। তারাই কয়লাখনিতে বজ্জাতি করছে।'

সুরপতির চোখে ভয় উছলিয়া উঠিল, তিনি শীর্ণকণ্ঠে বলিলেন, 'কী ? কী ? আমি তো কিছু—'

বরাট তাঁহার দিকে ধীরে ধীরে চক্ষু ফিরাইয়া নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'সুরপতিবাবু, যে দু'টি ছোকরাকে আপনি আমাদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টায় ছিলেন, তারা আপনার শালা ?'

সুরপতিবাবু বলিলেন, 'মানে—তাতে কি হয়েছে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়নি কিছু। কাল রাত্রে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে তিনজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আমরা মিলিয়ে দেখতে চাই, তিনজনের মধ্যে আপনি আছেন কিনা—ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি সুরপতিবাবুর আঙুলের ছাপ নিন। মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে উনি এই ষড়যন্ত্রে কতদূর আছেন। ফণীশ, বাড়িতে রবারস্ট্যাম্প-কালির প্যাড আছে ?'

সুরপতিবাবু এক-পা এক-পা করিয়া পিছু হটিতেছিলেন, দ্বারের কাছাকাছি গিয়া তিনি পাক খাইয়া পালাইবার চেষ্টা করিলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় মণীশবাবু ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন, দু'জনেই পড়িতে পড়িতে তাল সামলাইয়া লইলেন, তারপর সুরপতি ঘটক তুরঙ্গ গতিতে পলায়ন করিলেন।

মণীশবাবু এইমাত্র কয়লাখনি হইতে ফিরিয়াছেন, ঘরে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ব্যাকুল চক্ষে চারিদিকে চাহিলেন। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, 'কী হচ্ছে এখানে ?—ইন্সপেক্টর বরাট—সুরপতি অমন লাফ মেরে পালালো কেন ?'

বরাট বলিলেন, 'আপনি বসুন। আপনার খনিতে যারা অনিষ্ট করছিল তারা ধরা পড়েছে।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'ধরা পড়েছে !'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই ছেলেটির নাম বিকাশ দত্ত, ও আমার সহকারী। ইন্সপেক্টর বরাটের সঙ্গে পরামর্শ করে বিকাশকে হাসপাতালের আর্দালি সাজিয়ে খনিতে পাঠিয়েছিলাম। ও ধরেছে।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'কে—কারা— ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সুরপতি ঘটক ও তার দুই শালা।'

'অ্যাঁ ! সুরপতি !' মণীশবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, 'কিন্তু—সুরপতি ! সে যে আমার অফিসে বিশ বছর কাজ করছে ! তার এই কাজ !'

আমরা আবার উপবেশন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'মণীশবাবু, দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করলে মানুষ স্ত্রীর বশীভূত হয়, সুরপতিবাবু শালাদের বশীভূত হয়েছেন। খুব বেশি তফাৎ নেই।'

মনীশবাবু বলিলেন, 'কিন্তু কেন ? ওরা আমার অনিষ্ট করতে চায় কেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সেটা এখনো আবিষ্কার করা যায়নি। তবে আবিষ্কার করা শক্ত হবে না। আমার মনে হয়, যে মাড়োয়ারি আপনার খনি কিনতে চেয়েছিল সেই আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে। কিংবা অন্য কেউ হতে পারে। সুরপতিবাবুকে চাপ দিলেই বেরিয়ে পড়বে।'

'কিন্তু—সুরপতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু পেয়েছেন ?'

'এখনো পাইনি। কিন্তু আঙুলের ছাপ নেবার নামে উনি যেরকম লাফ মেরে পালালেন, ওঁর মনে পাপ আছে।'

মণীশবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, তিনি যত না বিস্মিত হইয়াছেন, ততোধিক দুঃখ পাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'আপনারা বসুন। ফণী, তুমি আমার সঙ্গে এস। অফিসের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আর সুরপতির—' তিনি সপ্রশ্ন নেত্রে বরাটের পানে চাহিলেন।

বরাট বলিলেন, 'সুরপতির ব্যবস্থা আমি করব।'

মণীশবাবু পুত্রকে লইয়া অফিসের দিকে চলিয়া গেলেন।

আমরা চারজন কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ অলসকণ্ঠে বলিল, 'ভুবনের নামে হুলিয়া জারি করেছেন নিশ্চয় ?'

বরাট বলিলেন, 'সারাদিন তাতেই কেটেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আশাপ্রদ কোনো খবর নেই ?'

বরাট বলিলেন, 'চল্লিশ মাইল দূরে একটা রেলওয়ে স্টেশন থেকে খবর পেয়েছি, একটা চালকহীন নম্বরহীন ট্যাক্সি সেখানে পড়ে আছে। লোক পাঠিয়েছি। হয়তো ভুবনের ট্যাক্সি, সে ওখানে ট্যাক্সি ছেড়ে ট্রেন ধরেছে।'

'বোম্বাই গেছে কি মাদ্রাজ গেছে কে জানে !'

'হুঁ। আজ উঠি।'

'আচ্ছা, আসুন। আসামীকে ধরা আপনার কর্তব্য, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন জানি। তবু, যদি ওদের ধরতে না পারেন আমি খুশি হব।'

ইন্সপেক্টর বরাট একটু হাসিলেন।

নৈশ আহারের পর মণীশবাবু শয়ন করিতে গিয়াছিলেন ; ফণীশ চুপি চুপি আসিয়া আমাদের ঘরে ঢুকিল। আজ আমাদের ঘরে তিনজনের শয়নের ব্যবস্থা, বিকাশের জন্য একটি ক্যাম্প খাট পাতা হইয়াছে।

ঘরে তিনজনেই উপস্থিত ছিলাম, বিছানায় শুইয়া সিগারেট টানিতেছিলাম ; বিকাশ কি করিয়া শালাদের ধরিল তাহারই গল্প বলিতেছিল। ফণীশকে দেখিয়া ব্যোমকেশ বালিশে কনুই দিয়া উঁচু হইয়া বসিল।

'এস ফণীশ।'

ফণীশ ব্যোমকেশের খাটের পাশে চেয়ার টানিয়া বসিল, অনুযোগের সুরে বলিল, 'কালই চলে যাবেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, শালাবাবুরা যে রকম শাসিয়েছে তাড়াতাড়ি কেটে পড়াই ভাল। তুমি যদি বৌমাকে নিয়ে কলকাতায় আসো নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। বৌমাকে সত্যবতীর খুব পছন্দ হবে।' বলিয়া যেন পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া একটু হাসিল।

ফণীশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'গল্পটা শুনব।'

ব্যোমকেশ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, মাথার বালিশটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, 'গল্প শুনবে—প্রাণহরির গল্প ? বেশ, বলছি ; কিন্তু গল্পটা গল্পই হবে, আগাগোড়া সত্য ঘটনা হবে না। অনেকটা ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত।'

ফণীশ ভ্রূ তুলিয়া প্রশ্ন করিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝলে না ? যাঁরা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন তাঁরা সরাসরি ইতিহাস লেখেন না, ইতিহাস থেকে গোটা-কয়েক চরিত্র এবং ঘটনা তুলে নিয়ে সেই কাঠামোর ওপর নিজের গল্প গড়ে তোলেন। আমি তোমাকে যে গল্প বলব সেটাও অনেকটা সেই ধরনের হবে। সব ঘটনা জানি না, যেটুকু জানি তা থেকে পুরো গল্পটা গড়ে তুলেছি ; কল্পনা আর সত্য এ গল্পে সমান অংশীদার।—শুনতে চাও ?'

ফণীশ বলিল, 'বলুন।'

ব্যোমকেশ নূতন সিগারেট ধরাইয়া গল্প আরম্ভ করিল—।

ভুবনেশ্বর দাসকে দিয়েই গল্প আরম্ভ করি। তার নাম শুনেও আমার সন্দেহ হয়নি যে সে বাঙালী নয়, ওড়িয়া। বাংলাদেশ আর উড়িষ্যার সঙ্গমস্থলে যারা থাকে তারা দুটো ভাষাই পরিষ্কার বলতে পারে, বোঝবার উপায় নেই বাঙালী কি ওড়িয়া। যদি বুঝতে পারতাম, সমস্যাটা অনেক আগেই সমাধান হয়ে যেত। কারণ মোহিনী উড়িষ্যার মেয়ে। দুই আর দু'য়ে চার।

মোহিনী ভুবনেশ্বরের বৌ। যারা মেয়ে-মরদে গতর খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করে ওরা সেই শ্রেণীর লোক। ভুবন কাজ করত কটকের একটা মোটর মেরামতির কারখানায়। মোহিনী বাঙালী গৃহস্থের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করত। আর দু'জনে দু'জনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। এই ভালবাসাই হচ্ছে এ গল্পের মূল সূত্র।

ভুবনের মনে উচ্চাশা ছিল, মোহিনীর দাসীবৃত্তি তার পছন্দ ছিল না। মোটর কারখানায় কাজ করতে করতে মিলিটারিতে ট্রাক-ড্রাইভারের চাকরি যোগাড় করে সে চলে গেল ; মোহিনীকে বলে গেল—টাকা রোজগার করে ট্যাক্সি কিনব, তোকে আর চাকরি করতে হবে না।

বছর দুই ভুবনের আর দেখা নেই। ইতিমধ্যে মোহিনী কটকে প্রাণহরি পোদ্দারের বাড়িতে চাকরি করছে ; দিনের বেলা কাজকর্ম করে, রাত্তিরে বাপ-মায়ের কাছে ফিরে যায়।

প্রাণহরি লোকটা অতিবড় অর্থপিশাচ। যেমন কৃপণ তেমনি লোভী। সারা জীবন টাকা-টাকা করে বুড়ো হয়ে গেছে, জুচ্চুরি দাগাবাজি ব্ল্যাক্‌মেল করে অনেক টাকা জমা করেছে, তবু তার টাকার ক্ষিদে মেটেনি। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তার মনে লোভ নেই, কিংবা বুড়ো বয়সে সে লোভ

কেটে গিয়েছিল। কিন্তু মোহিনী যখন তার বাড়িতে চাকরি করতে এল তখন তাকে দেখে প্রাণহরির মাথায় এক কুবুদ্ধি গজালো, সে টাকা রোজগারের নতুন একটা রাস্তা দেখতে পেল। বড় মানুষের উচ্ছৃঙ্খল ছেলেরা তার বাড়িতে জুয়া খেলতে আসে, তাদের চোখের সামনে মোহিনীর মত মেয়েকে যদি ধরা যায়—

মোহিনীর দেহে যে প্রচণ্ড যৌন আকর্ষণ আছে তাই দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে প্রাণহরির মনে ভুল ধারণা জন্মেছিল। সে বড়মানুষের ছেলেদের ধাপ্পা দিয়ে মোহিনীর নাম করে টাকা নিত। কিন্তু মোহিনী ধরা-ছোঁয়া দিত না। কিছুদিন এইভাবে চলবার পর বড়মানুষের ছেলেরা বিগ্‌ড়ে গেল, তারা টাকা ঢেলেছে, ছাড়বে কেন ? তারা প্রাণহরিকে প্রহার দেবার মতলব করল।

প্রাণহরি দেখল কটক থেকে কেটে না পড়লে মার খেতে হবে। কিন্তু মোহিনীকেও তার দরকার, এমন মুখরোচক টোপ সে আর কোথায় পাবে ? সে মোহিনীর কাছে প্রস্তাব করল তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। মোহিনীর আপত্তি নেই ; তার স্বামী বিদেশে, তাকে দাসীবৃত্তি করে খেতে হবে, তার কাছে কটকও যা অন্য জায়গাও তাই। সে দেড়া মাইনেতে প্রাণহরির সঙ্গে যেতে রাজী হল।

কিন্তু তারা কটক ছাড়বার আগেই ভুবন ফিরে এল। ভুবন চাকরি করে কিছু টাকা সঞ্চয় করেছে, কিন্তু ট্যাক্সি কেনার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। স্বামী-স্ত্রী মিলে পরামর্শ করল, তারপর ভুবন প্রাণহরির কাছে গেল।

ভুবন প্রাণহরিকে টাকার কথা বলল ; তার কিছু টাকা আছে, আরও আড়াই হাজার টাকা পেলেই সে নিজের ট্যাক্সি কিনতে পারবে। প্রাণহরি ভেবে দেখল, টাকা ধার দিলে ভুবন আর মোহিনী দু'জনেই তার মুঠোর মধ্যে থাকবে ; মোহিনীকে তখন হুকুম মেনে চলবে হবে। সে রাজী হল। রেজিস্ট্রি দলিল তৈরি হল, তাতে ধার-শোধের শর্ত রইল—মোহিনীর মাইনের পনরো টাকা কাটা যাবে, ভুবন তার ট্যাক্সির রোজগার থেকে মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা দেবে, আর প্রাণহরি নিজের দরকারে ট্যাক্সি ব্যবহার করবে তার জন্য পঁচিশ টাকা দেবে ; এইভাবে প্রতিমাসে পঁচাত্তর টাকা শোধ হবে।

সকলেই খুশি। ভুবন ট্যাক্সি কিনল। তিনজনে কয়লা শহরে এল। তারপর প্রাণহরি শহরের হালচাল বুঝে নিয়ে তার অভ্যস্ত লীলাখেলা আরম্ভ করল।

কয়লা ক্লাব হচ্ছে বড়লোকের আস্তানা, প্রাণহরি সেখানে গিয়ে ছিপ ফেলল। চারটি বড় বড় রুই-কাৎলা তার ছিপে উঠল। সে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল।

জুয়া খেলার সময় মোহিনীকেও সকলে দেখল। বিশেষভাবে একজনের নজর পড়ল তার ওপর ; অরবিন্দ হালদার চরিত্রহীন লম্পট, সে লোভে উন্মত্ত হয়ে উঠল। প্রাণহরি জুয়ায় চারজনকেই শোষণ করছিল, অরবিন্দ হালদারকে বেশি করে শোষণ করতে লাগল। অরবিন্দকে সে জানিয়ে দিয়েছিল যে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া যায় না।

প্রাণহরির কাছে ছাড়পত্র পেয়ে অরবিন্দ হালদার সময়ে অসময়ে মোহিনীর কাছে আসতে লাগল। কিন্তু মোহিনী শক্ত মেয়ে, তাকে চোখে দেখে যা মনে হয় সে তা নয়। অরবিন্দের মতলব সে বুঝেছে, কিন্তু স্পষ্ট কথা বলে তাকে তাড়িয়ে দেয় না। সে তার সঙ্গে খাতির করে কথা বলে, হয়তো হাসি-মস্করাতেও যোগ দেয়, কিন্তু তার দেওয়া উপহার নেয় না। প্রাণহরি মোহিনীকে বোধ হয় ইশারা দিয়েছিল ; ইশারায় যতখানি স্বীকার করা সম্ভব মোহিনী ততখানি স্বীকার করে চলত। প্রাণহরি ঘুঘু লোক, স্পষ্টভাবে মোহিনীকে কিছু বলেনি ; ভেবেছিল ইশারাতেই কাজ হবে। হাজার হোক, মোহিনী নিম্নশ্রেণীর মেয়ে।

কিছুদিন চেষ্টা-চরিত্র করে অরবিন্দ বুঝল, এ বড় কঠিন ঠাঁই। ওদিকে জুয়াতেও তারা অনেক টাকা হেরেছে। তারপর একদিন প্রাণহরির বেইমানি ধরা পড়ে গেল। জুয়া খেলা বন্ধ হল।

জুয়াতে যারা হেরেছিল তাদের সকলেরই রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অরবিন্দের রাগ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ সে জুয়াতেই ঠকেনি, অন্য বিষয়েও ঠকেছিল। ঠকেছিল এবং

অপমানিত হয়েছিল। তাই সে একদিন তার তিন সঙ্গীকে নিয়ে প্রাণহরিকে ঠেঙাতে গেল।

দৈবক্রমে যে ট্যাক্সিতে চড়ে তারা প্রাণহরিকে ঠেঙাতে গেল সে ট্যাক্সিটা ভুবন দাসের। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে অরবিন্দ বোধ হয় মোহিনীর সম্বন্ধে তার মনের আফ্‌সানি প্রকাশ করেছিল, ভুবন তার কথা শুনে বুঝল, প্রাণহরি দু'হাজার টাকা নিয়ে তার বৌকে বিক্রি করেছে।

কয়লা শহরে ভুবনের বাসা ছিল না ; প্রাণহরিও তার বাড়িতে ভুবনকে থাকতে দেয়নি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ভুবন ফুরসৎ পেলেই চুপিচুপি এসে মোহিনীর কাছে রাত কাটিয়ে যেত। স্বামী-স্ত্রীতে কথা হত ; হয়তো মোহিনী স্বামীকে ইশারা দিয়েছিল—বুড়োটা লোক ভাল নয়। ভুবন মনে মনে প্রাণহরিকে ঘৃণা করত। খাতকের সঙ্গে মহাজনের ভালবাসা বড়ই বিরল। কিন্তু ভুবন সাবধানী লোক, সে বলত—ধারটা শোধ হলে ট্যাক্সি পুরোপুরি তার নিজের হয়ে যাবে, তখন তারা গাড়ি নিয়ে চলে যাবে, বুড়োর সঙ্গে তাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

প্রাণহরি যে এতবড় শয়তান তা ভুবন কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু যখন সে শুনল যে প্রাণহরি দু'হাজার টাকা নিয়ে তার বৌকে বিক্রি করেছে তখন তার মাথায় খুন চেপে গেল। দুনিয়ায় পয়সাওয়ালা লম্পট অনেক আছে পরস্ত্রীর ওপর তারা নজর দেয় ; তাদের ওপর ভুবনের রাগ নেই। কিন্তু ওই বুড়ো শয়তানটাকে সে খুন করবে।

খুন করবার সুযোগও হাতে হাতে এসে গেল। প্রাণহরির বাড়ির কাছাকাছি এসে চারজন আরোহী নেমে গেল। ভুবন ট্যাক্সির মুখ ঘুরিয়ে রাখল ; তারপর সেও বেরুলো। তার হাতে মোটরের স্প্যানার।

ভুবন প্রাণহরির বাড়িতে প্রত্যহ দিনে রাত্রে দু'বার তিনবার এসেছে, সে জানতো বাড়ির পিছন দিকে ওপরে ওঠবার মেথরখাটা সিঁড়ি আছে। সে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে গেল, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দোরে টোকা মারল।

দু'দিকের দোর বন্ধ করে প্রাণহরি নিজের ঘরে ছিল ; সে বোধহয় জানতে পারেনি যে, তাকে চারজনে ঠেঙাতে এসেছে। কিন্তু সে হুঁশিয়ার লোক ; টোকা শুনে স্নানের ঘরে গেল। তারপর যখন জানতে পারল যে ভুবন এসেছে তখন সে দোর খুলে দিল। কারণ ভুবনের ওপর তার কোনো সন্দেহ নেই।

দু'জনে শোবার ঘরে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল।

তাদের মধ্যে কোনো কথা হয়েছিল কিনা জানি না। ভুবনের বাঁ হাতে ছিল স্প্যানার, সে আচমকা স্প্যানার তুলে মারলো প্রাণহরির মাথায় এক কোপ। প্রাণহরি মুখ খোলবার সময় পেল না ; তৎক্ষণাৎ পতন ও মৃত্যু।

ভুবন তখন সাবধানে সামনের দরজা খুলল। তার বোধ হয় মতলব ছিল সামনের দিকে সাড়াশব্দ না পেলে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে, পিছনের দরজা বন্ধ থাকবে। কিন্তু সামনে বোধহয় তখন এরা চারজন সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছিল। তাই ভুবন সামনের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যে-পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে গেল। স্প্যানারটা সঙ্গে নিয়ে গেল। এখন পরিস্থিতি দাঁড়াল, সামনের দরজাও খোলা, পিছনের দরজাও খোলা। প্রাণহরির আততায়ী কোন্ দিক দিয়ে ঢুকেছে অনুমান করা শক্ত।

অরবিন্দ প্রথম বার প্রাণহরির দরজা বন্ধ পেয়েছিল ; দ্বিতীয় বার চারজনে উঠে দেখল দরজা খোলা এবং প্রাণহরি পোদ্দার ইহলীলা সম্বরণ করেছে। তারা দুদ্দাড় শব্দে পালালো। ট্যাক্সির কাছে ফিরে গিয়ে দেখল ট্যাক্সি-ড্রাইভার স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। তারা ড্রাইভারকে জাগিয়ে শহরে ফিরে গেল।

ওদিকে মোহিনী রান্না করছিল, সে কিছুই জানতে পারেনি। রান্নার ছ্যাঁকছোঁক শব্দে দূরের শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল। রান্না শেষ হবার পর সে যখন দেখল বুড়ো খেতে নামছে না, তখন সে ওপরে গেল। সে দেখল প্রাণহরি মরে পড়ে আছে, সামনের এবং পিছনের দরজা খোলা। অরবিন্দের কথা তার মনে এল না। তার মনে এল ভুবনের কথা। যেখানে ভালোবাসা সেখানেই

শঙ্কা। ভুবনকে সে ইশারা দিয়েছিল, বুড়ো লোক ভাল নয়। ভুবন বাইরে বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু তার ভিতরে আছে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের উগ্রতা। স্ত্রীর অমর্যাদা সে সহ্য করবে না।

মোহিনী মেয়েটা ভারি বুদ্ধিমতী। মড়া দেখেও তার মাথা খারাপ হল না, সে চট্ করে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। খুন যেই করুক, তাকে যেন পুলিস ধরতে না পারে। হত্যাকারী স্নানঘরের দোর দিয়ে ঢুকেছে এবং সেই দিক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছে, মোহিনীর তাতে সন্দেহ নেই। সে পিছন দিকের দরজা দুটো ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল, তারপর ট্রাক-ড্রাইভার মারফত পুলিসে খবর পাঠালো। কী সাংঘাতিক মেয়ে দ্যাখো, একটুকু বাড়াবাড়ি করেনি। পুলিসকে ভুল রাস্তায় চালাবার জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু করেছে।

মোহিনী আমাদের আছে অনেক মিথ্যে কথা বলেছে, কিন্তু কখনো অনাবশ্যক মিথ্যে কথা বলেনি। ভুবনও তাই। আমার বিশ্বাস যে-রাত্রে খুন হয় সেই রাত্রেই কোনো সময় ভুবন ফিরে গিয়ে মোহিনীকে সব কথা বলেছিল এবং তারপর থেকে প্রায়ই গিয়ে দেখা করত। এই জন্যেই মোহিনী খুনের পর বাড়ি ছেড়ে যেতে চায়নি। ভুবনের সঙ্গে তার যোগাযোগ রাখা নিতান্ত দরকার।

যাহোক, আমি যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলাম তখন পুলিসের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়েছে চারজন আসামীর ওপর। মোটিভ এবং সুযোগ এদের পুরোদস্তুর বিদ্যমান। হয় এরা চারজনে একজোট হয়ে খুন করেছে, নয়তো ওদের মধ্যে একজন খুন করেছে অন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে।

পুলিসের সঙ্গে আমার মতভেদের কোনো কারণ ছিল না ; তবু একজোট হয়ে খুন করার প্রস্তাবটা হজম করা শক্ত। সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা মধ্যভারতের ডাকাত নয়, তারা সমাজবাসী তথাকথিত সভ্য মানুষ। তারা দল বেঁধে খুন করবে না।

কিন্তু ওদের মধ্যে একজন অন্য তিনজনের চোখে ধুলো দিয়ে খুন করে থাকতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কে ? সবচেয়ে বেশি সন্দেহ অরবিন্দ হালদারের ওপর। সে শুধু জুয়াতেই ঠকেনি, আর এক বিষয়ে ঠকেছে ; যার জন্যে তার লজ্জার অবধি নেই ; যে কথা সে কারুর কাছে স্বীকার করতে পারে না। লম্পটের লজ্জা এক বিচিত্র বস্তু ; সে কেবল তখনি লজ্জা পায় যখন দু'হাজার টাকা খরচ করেও সে তার নির্লজ্জ কামনার বস্তু পায় না।

অনুসন্ধান আরম্ভ করে আমার খট্‌কা লাগল। প্রথমেই যে প্রশ্নটি আমার মনে মাথা তুলল সেটি হচ্ছে—মারণাস্ত্রটা গেল কোথায় ? ডাক্তার ঘোষাল যে ধরনের বর্ণনা দিলেন সে রকম কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি ; অরবিন্দের দলের কেউ যদি অস্ত্র আনতো তাহলে ফণীশ আর ভুবনের চোখ এড়াতে পারতো না। সুতরাং ওরা অস্ত্রটা আনেনি, নিয়েও যায়নি। তবে সেটা এল কোত্থেকে এবং গেল কোথায় ?

দ্বিতীয় কথা, ডাক্তার ঘোষালের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, হত্যাকারী লোকটা ন্যাটা। ভেবে দ্যাখো, প্রাণহরির শোবার ঘরে একটা চেয়ার পর্যন্ত নেই ; সে আততায়ীর দিকে পিছন ফিরে তক্তপোশের কিনারায় বসেছিল একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আততায়ী তাকে মেরেছে, আঘাত লেগেছে মাথার ডানদিকে সিঁথির মত। সুতরাং আততায়ী ন্যাটা, তার বাঁ হাত বেশি চলে।

চারজন আসামীর মধ্যে কে ন্যাটা খোঁজ করলাম। কয়লা ক্লাবে গিয়ে দেখলাম, মৃগেন মৌলিক ডান হাতে টেনিস খেলছে, মধুময় সুর আর অরবিন্দ হালদার ডান হাতে তাস ভেঁজে তাস বাঁটছে এবং খেলছে। তখন ফণীশের দিকে কাচের কাগজচাপা গোলা ফেলে দেখলাম সেও ডান হাতে গোলা ধরল। ওরা কেউ ন্যাটা নয়।

কিন্তু ন্যাটা না হোক, ওদের মধ্যে কেউ সব্যসাচী হতে পারে। কাজেই ওদের একেবারে ত্যাগ করতে পারলাম না। ওরা ছাড়া সন্দেহভাজন আর কেউ নেই। মোহিনী খুন করেনি, তার খুন করবার ইচ্ছে থাকলে সে প্রাণহরিকে বিষ খাওয়াতো ; তার মোটিভও কিছু নেই।

আমি কোনো দিকে দিশা খুঁজে পাচ্ছি না, এমন সময় এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল ;

যেন মেঘে ঢাকা অন্ধকার রাত্রে বিদ্যুৎ চমকালো। দেখলাম ভুবন তার ট্যাক্সির চাকার তলায় জ্যাক্ বসিয়ে বাঁ হাতে ঘোরাচ্ছে!

খুনের রাত্রে ট্যাক্সি-ড্রাইভার ভুবনেশ্বর দাস যে অকুস্থলে উপস্থিত ছিল তা আমরা সকলেই জানতাম, অথচ তার কথা একবারও মনে আসেনি। একেই জি. কে. চেস্টারটন বলেছেন, অদৃশ্য মানুষ—Invisible Man.

অস্ত্রের সমস্যা এক মুহূর্তে সমাধান হয়ে গেল। স্প্যানার দিয়ে ভুবন প্রাণহরিকে মেরেছিল ; ডাক্তার ঘোষাল মারণাস্ত্রের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছে।

ভুবন বৌকে নিয়ে পালিয়েছে। ভারি বুদ্ধিমান লোক, আমি তাকে চিনেছি তা বুঝতে পেরেছিল। কোথায় গিয়ে তারা আস্তানা গাড়বে জানি না ; মাদ্রাজ বোম্বাই কত জায়গা আছে। আশা করি প্রমোদবাবু ভুবনকে খুঁজে পাবেন না। কারণ, যদি খুঁজে পান নিশ্চয় তাকে সোনার মেডেল দেবেন না।

আর কিছু বলবার নেই। যদি কোনো কথা বাদ পড়ে থাকে তোমরা আন্দাজ করে নিতে পারবে। ভুবন আর মোহিনী চিরজীবন ফেরারী হয়ে থাকবে, যদি না ধরা পড়ে। প্রাণহরি পোদ্দারের নিষ্ঠুর লোভ দুটো মানুষের জীবন নষ্ট করে দিল, এ কাহিনীর মধ্যে এইটেই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

অদৃশ্য ত্রিকোণ

গল্পটি শুনিয়াছিলাম পুলিস ইন্সপেক্টর রমণীমোহন সান্যালের মুখে। ব্যোমকেশ এবং আমি পশ্চিমের একটি বড় শহরে গিয়াছিলাম গোপনীয় সরকারী কাজে, সেখানে রমণীবাবুর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। সরকারী কাজে লাল ফিতার জট ছাড়াইতে বিলম্ব হইতেছিল, তাই আমরাও নিষ্কর্মার মত ডাকবাংলোতে বসিয়া ছিলাম। রমণীবাবু প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমাদের আস্তানায় আসিতেন, গল্পসল্প হইত। তাঁহার চেহারাটাও ছিল রমণীমোহন গোছের, ভারি মিষ্ট এবং কমনীয়। কিন্তু সেটা তাঁহার ছদ্মবেশ। আসলে তিনি পুলিস বিভাগের একজন অতি চতুর এবং বিচক্ষণ কর্মচারী। তাঁহার বয়স আমাদের চেয়ে কমই ছিল, বছর চল্লিশের বেশি নয়। কিন্তু প্রকৃতিগত সমধর্মিতার জন্য তিনি আসিলে আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিত।

আমাদের কাছে তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত যে নিঃস্বার্থ সহৃদয়তা না হইতে পারে একথা অবশ্যই আমাদের মনে উদয় হইয়াছিল ; উদ্দেশ্যটা যথাসময়ে প্রকাশ পাইবে এই আশায় প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

তারপর একদিন তিনি আমাদের গল্পটি শুনাইলেন। ঠিক গল্প নয়, একটি খুনের মামলার কয়েকটি ঘটনার পরম্পরা। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে জোড়া দিয়া একটি সুসংবদ্ধ গল্প খাড়া করা যায়।

বিবৃতি শেষ করিয়া রমণীবাবু বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, কে খুন করেছে আমি জানি, কেন খুন করেছে জানি ; কিন্তু তবু লোকটাকে ফাঁসি-কাঠে ঝোলাতে পারছি না। প্রমাণ নেই। একমাত্র উপায় কনফেশান, আসামীকে নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করানো। আপনার মাথায় অনেক ফন্দি-ফিকির আসে, লোকটাকে ফাঁদে ফেলবার একটা মতলব বার করতে পারেন না ?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'ভেবে দেখব।'

গল্পটি আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল ; বোধ হয় ব্যোমকেশের মনেও রেখাপাত করিয়া থাকিবে। সে-রাত্রে রমণীবাবু প্রস্থান করিবার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'রমণীবাবু যে মালমসলা দিয়ে গেলেন তা দিয়ে তুমি একটা গল্প লিখতে পার না ?'

বলিলাম, 'পারি। মালমসলা ভাল। কেবল চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব জুড়ে দিতে পারলেই গল্প হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তবে লেখ। কিন্তু একটা শর্ত আছে ; গল্প জমাবার অছিলায় ঘটনা বদলাতে পারবে না।'

'বদলাবার দরকার হবে না।'

গল্প লিখিতে দু'দিন লাগিল। লেখা শেষ করিয়া ব্যোমকেশকে দিলাম, সে পড়িয়া বলিল, 'ঠিকই হয়েছে মনে হচ্ছে। রমণীবাবুকে পড়িয়ে দেখা যাক, তিনি কি বলেন।'

রাত্রে রমণীবাবু আসিলে তাঁহাকে গল্প পড়িতে দিলাম। তিনি পড়িয়া উৎফুল্ল চক্ষে আমার পানে চাহিলেন—'এই তো ! ঘটনার সঙ্গে মনস্তত্ত্ব বেমালুম জোড় খেয়ে গেছে। কিন্তু—'

গল্পটি নিম্নে দিলাম—

শিবপ্রসাদ সরকার এই শহরে মদের ব্যবসা করিয়া বড়মানুষ হইয়াছিলেন। টাকার প্রতি তাঁহার যথার্থ অনুরাগ ছিল, তাই প্রকাণ্ড বাড়ি, দামী মোটর ছাড়াও তিনি প্রচুর টাকা জমা করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে কৃপণ বলিত, তিনি নিজেকে বলিতেন হিসাবী। এই দুই মনোভাবের মধ্যে সীমারেখা অতিশয় সূক্ষ্ম, আমরা তাহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব না।

কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে একটা ভারসাম্য আছে। শিবপ্রসাদ সরকারের একমাত্র মাতৃহীন পুত্র যখন সাবালক হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল তাহার চরিত্র পিতার ঠিক বিপরীত। সে অকৃপণ এবং বেহিসাবী, টাকার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই ; কিন্তু টাকার বিনিময়ে যে সকল বৈধ এবং অবৈধ ভোগ্যবস্তু পাওয়া যায় তাহার প্রতি গভীর অনুরাগ আছে। সে দু'হাতে টাকা উড়াইতে আরম্ভ করিল।

পিতা শিবপ্রসাদ ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে যথেষ্ট অপত্যস্নেহ ছিল। পুত্রের চালচলন লক্ষ্য করিয়া তিনি একটি সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ফল হইল না। সুনীল কিছুকাল স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া রহিল, তারপর আবার নিজ মূর্তি ধারণ করিল।

বধূর নাম রেবা ; সে সুন্দরী হইলেও বুদ্ধিমতী, অন্তত তাহার সংসারবুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। উপরন্তু সে শিক্ষিতা এবং কালধর্মে আধুনিকাও বটে। সে স্বামীর স্বৈরাচার অগ্রাহ্য করিয়া একান্তমনে বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবায় নিযুক্ত হইল। শিবপ্রসাদ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত নিজেই ব্যবসাঘটিত কাজ-কর্ম দেখিতেন ; কারণ পুত্র অপদার্থ এবং কর্মচারীদের শিবপ্রসাদ বিশ্বাস করিতেন না। রেবা তাঁহার অধিকাংশ কাজের ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইল। মোটর চালাইয়া শ্বশুরকে কর্মস্থলে লইয়া যাইত, সেখানে নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিত, তারপর আবার মোটর চালাইয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিত। এইভাবে রেবা শিবপ্রসাদের পুত্রের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

তারপর, রেবা ও সুনীলের বিবাহের চার বছর পরে শিবপ্রসাদের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশ পাইল তিনি সমস্ত সম্পত্তি পুত্রবধূর নামে উইল করিয়া গিয়াছেন।

সম্পত্তি হাতে পাইয়া রেবা প্রথমেই মদের দোকানের বারো আনা অংশ বিক্রয় করিয়া দিল, চার আনা হাতে রাখিল। বড় বাড়িটা বিক্রয় করিয়া শহরের নির্জন প্রান্তে একটি সুদৃশ্য ছোট বাড়ি কিনিল, বড় মোটর বদল করিয়া একটি ছোট্ট ফিয়েট গাড়ি লইল। স্বামীকে বলিল, 'তুমি মাসে তিনশো টাকা হাত-খরচ পাবে। যদি বাজারে ধার কর তার জন্য আমি দায়ী হব না। খবরের কাগজে ইস্তাহার ছাপিয়ে দিয়েছি।'

তারপর তাহারা ছোট বাড়িতে উঠিয়া গিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই।

এই গেল গল্পের ভূমিকা।

সুনীলের বয়স আন্দাজ ত্রিশ বছর, আঁটসাঁট মোটা শরীর, গোল মুখখানা প্যাঁচার মুখের মত থ্যাব্ড়া, মুখ দেখিয়া মনে হয় না বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে। বস্তুত যাহারা বাপের পয়সা উড়াইয়া ফূর্তি করে, তাহাদের বুদ্ধির চেয়ে প্রবৃত্তিরই জোর বেশি, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সুনীলকেও সকলে অমিতাচারী অপরিণামদর্শী নির্বোধ বলিয়া জানিত।

সুনীল কিন্তু নির্বোধ ছিল না। সদ্‌বুদ্ধি না থাক, দুষ্টবুদ্ধি তাহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। পিতার মৃত্যুর পর সে যখন দেখিল সম্পত্তি বেহাত হইয়া গিয়াছে তখন সে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিল না, টাকার জন্য হম্বিতম্বি করিল না, কেমন যেন জবুথবু হইয়া গেল। শিবপ্রসাদ যতদিন জীবিত ছিলেন সুনীলের বাজার-দেনা তিনিই শোধ করিতেন। কিন্তু রেবা খবরের কাগজে ইস্তাহার ছাপিয়া দিয়াছে, এখন বাজারে কেহ তাহাকে ধার দিবে না। দৈনিক দশ টাকায় কত ফূর্তি করা যায় ? সুতরাং সুনীল সুবোধ বালকের ন্যায় ঘরেই দিন যাপন করিতে লাগিল। হপ্তায় একদিন কি

দুইদিন বৈকালে বাহির হইত, বাকি দিনগুলি বাড়িতে রোমাঞ্চকর বিলাতি উপন্যাস পড়িয়া কাটাইত। রেবার সহিত তাহার সম্পর্কটা নিতান্তই ব্যবহারিক সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইল ; বাহ্যত এক বাড়িতে থাকার ঘনিষ্ঠতা, অন্তরে দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব। তাহাদের শয়নের ব্যবস্থাও পৃথক ঘরে।

রেবা সকালবেলা মোটর চালাইয়া বাহির হয় ; মদের ব্যবসায় সে চার-আনা অংশীদার, প্রত্যহ নিজে হিসাব পরীক্ষা করে ; সেখান হইতে দুপুরবেলা ফিরিয়া আসে। অপরাহ্ণে আবার বাহির হয়। এবার কিন্তু ব্যবসা নয় ; মেয়েদের একটা ক্ষুদ্র ক্লাব আছে, সেখানে গিয়া গল্পগুজব খেলাধূলা করে, কখনও সিনেমা দেখিতে যায় ; তারপর গৃহে ফিরিয়া আসে। সুনীল সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকে।

একটা বুড়ি গোছের ঝি আছে, তাহার নাম আন্না ; বাড়ির কাজ, রান্নাবান্না সব সে-ই করে, অন্য চাকর নাই। রেবা সব দিক দিয়া খরচ কমাইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার পর সুনীল বসিবার ঘরে রহস্য উপন্যাস পড়িতেছিল, রাত্রি আটটার সময় রেবা ফিরিয়া আসিল। গাড়ি গ্যারাজে বন্ধ করিয়া বেশবাস পরিবর্তন করিয়া একখানা বাংলা বই হাতে লইয়া বসিবার ঘরে একটি সোফায় আসিয়া বসিল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনও কথা হইল না। নৈশ আহারের বিলম্ব আছে ; রেবা বই খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বইখানার নাম—ব্যোমকেশের কাহিনী।

সুনীলের ভোঁতা মুখ ভাবলেশহীন। সে একবার চোখ তুলিয়া রেবার পানে চাহিল, আবার পুস্তকে চক্ষু ন্যস্ত করিল, তারপর একটু গলা খাঁকারি দিল।

'রেবা—'

রেবা ভ্রূ তুলিয়া চাহিল।

সুনীল ইতস্তত করিয়া বলিল, 'তুমি কোন দিন বাড়ির সামনে একটা লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ ?'

রেবা বই মুড়িয়া কিছুক্ষণ সুনীলের পানে চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'না। কেন ?'

সুনীল ধীরে ধীরে বলিল, 'কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি, সন্ধ্যের পর একটা লোক বাড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে রাস্তা দিয়ে যায়, আবার খানিক পরে তাকাতে তাকাতে ফিরে যায়।'

রেবা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, 'কি রকম চেহারা লোকটার ?'

সুনীল বলিল, 'গুণ্ডার মত চেহারা। কালো মুস্কো জোয়ান, মাথায় পাগড়ি।'

অনেকক্ষণ আর কথা হইল না ; তারপর রেবা মনস্থির করিয়া বলিল, 'কাল সকালে তুমি থানায় গিয়ে এত্তেলা দিয়ে এস। নির্জন জায়গা, যদি সত্যিই চোর-ছ্যাঁচড় হয় পুলিসকে জানিয়ে রাখা ভাল।'

সুনীল কিছুক্ষণ থতমত হইয়া রহিল, শেষে সঙ্কুচিত স্বরে বলিল, 'তুমি বাড়ির মালিক, তুমি পুলিসে খবর দিলেই ভাল হত না ?'

রেবা বলিল, 'কিন্তু আমি তো মুস্কো জোয়ান লোকটাকে দেখিনি।—তা না হয় দু'জনেই যাব।'

পরদিন সকালে তাহারা থানায় গেল ; নিজেদের এলাকার ছোট থানায় না গিয়া একেবারে সদর থানায় উপস্থিত হইল। সেখানে বড় দারোগা রমণীবাবু বাঙালী, তাঁহার সহিত সামান্য জানাশোনা আছে।

রমণীবাবু তাহাদের খাতির করিয়া বসাইলেন। সুনীলের বাক্যালাপের ভঙ্গীটা একটু মন্থর ও এলোমেলো, তাই রেবাই ঘটনা বিবৃত করিল। এত্তেলা লিখিত হইবার পর রমণীবাবু বলিলেন, 'আপনাদের বাড়িটা একেবারে শহরের এক টেরে। যাহোক, ভয় পাবেন না। আমি ব্যবস্থা করছি, রাত্রে টহলদার পাহারাওলা বাড়ির ওপর নজর রাখবে।'

থানা হইতে রেবা কাজে চলিয়া গেল, সুনীল পদব্রজে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

সেদিন বৈকালে রেবা বলিল, 'এ-বেলা আমি বেরুব না, শরীরটা তেমন ভাল ঠেকছে না।'

সুনীল বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'তাহলে আমি একটু ঘুরে আসি।

রেবার মুখে অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল, 'তুমি বেরুবে! কিন্তু দেরি কোরো না বেশি, সকাল সকাল ফিরে এস। না হয় গাড়িটা নিয়ে যাও—'

সুনীল বলিল, 'দরকার নেই, হেঁটেই যাব। মাঝে মাঝে হাঁটলে শরীর ভাল থাকে।'

উৎকণ্ঠার মধ্যেও রেবার মন একটু প্রসন্ন হইল। নিজের ছোট্ট গাড়িখানাকে সে ভালবাসে, নিজের হাতে তাহার পরিচর্যা করে; সুনীলের হাতে গাড়ি ছাড়িয়া দিতে তাহার মন সরে না।

সুনীল গায়ে একটা ধূসর রঙের শাল জড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। শীতের আরম্ভ, পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়।

সুনীল শহরের কেন্দ্রস্থিত গলিঘুঁজির মধ্যে যখন পৌঁছিল তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে। সে একটা জীর্ণ বাড়ির দরজায় টোকা মারিল; একজন মুস্কো জোয়ান লোক বাহির হইয়া আসিল। সুনীল খাটো গলায় বলিল, 'হুকুম সিং, তোমাকে দরকার আছে।'

হুকুম সিং সেলাম করিল। মুকুন্দ সিং এবং হুকুম সিং দুই ভাই শহরের নামকরা পালোয়ান ও গুণ্ডা; সুনীলের সঙ্গে তাহাদের অনেক দিনের পরিচয়। বড় মানুষের উচ্ছৃঙ্খল ছেলে এবং গুণ্ডাদের মধ্যে এমন একটি আত্মিক যোগ আছে যে, আপনা হইতেই হৃদ্যতা জমিয়া ওঠে।

সুনীল দ্রুত-হ্রস্ব কণ্ঠে হুকুম সিংকে কিছু উপদেশ দিল, তারপর তাহার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে ধূসর শাল গায়ে লোকটিকে কেহ লক্ষ্য করিল না; লক্ষ্য করিলেও সুনীল সরকার বলিয়া চিনিতে পারিত না। এই বস্তিতে সুনীলকে চিনিবে এমন লোক ক'টাই বা আছে!

সুনীল বাড়ি ফিরিতেই রেবা বলিল, 'এলে? এত দেরি হল যে!' সুনীল ফিরিয়া আসায় সে মনে স্বস্তি পাইয়াছে তাহা বেশ বোঝা যায়। রেবার মনে সুনীলের প্রতি তিলমাত্র স্নেহ নাই, স্বামীকে ভালবাসিতেই হইবে এরূপ সংস্কারও নাই; তাহার হৃদয় এখন সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত ও স্বাধীন। কিন্তু মেয়েমানুষ যতই স্বাধীন হোক, পুরুষের বাহুবলের ভরসা তাহারা ছাড়িতে পারে না।

সুনীল ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'এখনো এক ঘণ্টা হয়নি। খানিকটা ঘুরে বেড়িয়েছি বৈ তো নয়।'

আর কোনও কথা হইল না। চা পান করিয়া দু'জনে বই লইয়া বসিল।

রেবা কিন্তু স্থির হইতে পারিল না। সদর দরজা বন্ধ ছিল, সে মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া জানালা দিয়া রাস্তার দিকে উঁকি মারিতে লাগিল। রাস্তাটা শহরের দিক হইতে আসিয়া রেবার বাড়ি অতিক্রম করিয়া কিছুদূর যাইবার পর মাঠ-ময়দান ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। রাস্তার শেষ দীপস্তম্ভটা বাড়ির প্রায় সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ম্রিয়মাণ আলো বিতরণ করিতেছে।

একবার জানালায় উঁকি মারিয়া আসিয়া রেবা সোফায় বসিল, হাতের বইখানা খুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল; তারপর যেন নিরাসক্ত কৌতূহলবশেই প্রশ্ন করিল, 'পুলিসের টহলদার রাত্রে কখন রোঁদ দিতে বেরোয়?'

সুনীল বই হইতে বোকাটে মুখ তুলিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'তা তো জানি না। রাত্রি দশটা এগারোটা হবে বোধ হয়।'

রেবা বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিল, আর কিছু বলিল না। দু'জনে নিজ নিজ পাঠে মন দিল।

রাত্রি ঠিক আটটার সময় রেবা চমকিয়া মুখ তুলিল। রাস্তা হইতে যেন একটা শব্দ আসিল। রেবা উঠিয়া গিয়া আবার জানালার পর্দা সরাইয়া উঁকি মারিল। শহরের দিক হইতে একটা লোক আসিতেছে। রাস্তার নিস্তেজ আলোয় তাহাকে অস্পষ্ট দেখা গেল; গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা, মাথায় বৃহৎ পাগড়ি মুখের উপর ছায়া ফেলিয়াছে, হাতে লম্বা লাঠি। লোকটা বাড়ির দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।

রেবা সশব্দে নিশ্বাস টানিল। সুনীল সেই দিকে ফিরিয়া দেখিল রেবার মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে; সে নীরবে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সুনীল উঠিয়া গিয়া রেবার পাশে

দাঁড়াইল।

রেবা ফিস্‌ফিস করিয়া বলিল, 'বোধ হয় সেই লোকটা, তুমি যাকে দেখেছিলে।'

সুনীল ঘাড় নাড়িল। দু'জনে পাশাপাশি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে আবার নাগরা জুতার আওয়াজ শোনা গেল ; লোকটা ফিরিয়া আসিতেছে। রেবা নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিল।

লোকটা বাড়ির পানে চাহিতে চাহিতে শহরের দিকে ফিরিয়া গেল। তাহার পদধ্বনি মিলাইয়া যাইবার পর রেবা প্রশ্ন-বিস্ফারিত চক্ষে সুনীলের পানে চাহিল। সুনীলের মনে নিগূঢ় সন্তোষ, কিন্তু সে মুখে দ্বিধার ভাব আনিয়া বলিল, 'সেই লোকটাই মনে হচ্ছে।'

দু'জনে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। রেবার মুখ শঙ্কাবিশীর্ণ হইয়া রহিল। সুনীল তাহার প্রতি একটা চোরা কটাক্ষ হানিয়া বই খুলিল।

ঝি আসিয়া প্রশ্ন করিল—খাবার দিবে কি না। অতঃপর দু'জনে খাইতে গেল।

আহার করিতে করিতে সুনীল বলিল, 'বোধ হয় ভয়ের কিছু নেই। পুলিস যখন দেখাশোনা করবে বলেছে—'

প্রত্যুত্তরে রেবার অন্তরের উষ্মা ঝন্ ঝন্ শব্দে বাহির হইয়া আসিল, 'পুলিস তো আর সারা রাত্রি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে না, মাঝে মাঝে টহল দিয়ে যাবে। তার ফাঁকে যদি পাঁচটা ডাকাত দোর ভেঙে বাড়িতে ঢোকে, তখন কি করব!'

সুনীল মুখ হেঁট করিয়া আহার করিতে লাগিল, শেষে বলিল, 'বাড়িতে লাঠি-সোঁটা কিছু আছে?'

রেবা গভীর বিরক্তিভরে স্বামীর পানে একবার চাহিল, এই বালকোচিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না। লাঠি-সোঁটা থাকিলেও চালাইবে কে?

রাত্রে রেবা নিজ শয়নকক্ষের দ্বারে উপরে-নীচে ছিট্‌কিনি লাগাইয়া শয়ন করিল। এত সতর্কতার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না, রমণীবাবু তাহার বাড়ি পাহারার ভাল ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। কিন্তু রেবার মনের অশান্তি দূর হইল না ; বিছানায় শুইয়া সে অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল।

শহরের একান্তে বাড়িটা না কিনিলেই হইত...কিন্তু তখন কে জানিত? এখন চোর-ছ্যাঁচড়ের ভয়ে বাড়ি ছাড়িয়া গেলে মান থাকিবে না...স্বামী বিষয়বুদ্ধিহীন অপদার্থ...কি করা যায়? দুটো শক্ত-সমর্থ গোছের চাকর রাখিবে? কিন্তু চাকরের উপর ভরসা কি? যে রক্ষক সেই ভক্ষক হইয়া উঠিতে পারে। ডাকাতেরা ঘুষ খাওয়াইয়া যদি চাকরদের বশ করে, তাহারাই রাত্রে দ্বার খুলিয়া ডাকাতদের ঘরে ডাকিয়া আনিবে...তার চেয়ে বুড়ি আন্না ভাল...শয়নঘরের লোহার সিন্দুকে দামী গহনা আছে, কিন্তু আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র নাই।...

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় রেবা উত্তেজিতভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিল।

তাহার শ্বশুরের একটা পিস্তল ছিল। ছয় মাস পূর্বে তিনি যখন মারা যান, তখন পিস্তলটা থানায় জমা দেওয়া হইয়াছিল। সেই পিস্তলটা কি ফেরত পাওয়া যায় না? কাল সকালেই সে থানায় গিয়া রমণীবাবুর সঙ্গে দেখা করিবে। একটা পিস্তল বাড়িতে থাকিলে আর ভয় কি?

অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রেবা ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে রেবা সুনীলকে লইয়া আবার থানায় চলিল। পথে সুনীলের অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে রেবা বলিল, 'বাবার পিস্তলটা থানায় জমা আছে, সেটা ফেরত নিলে ভাল হয় না?'

যেন কথাটা সুনীলের মাথায় আসে নাই, এমনিভাবে চোখ বড় করিয়া সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'ভাল হবে।'

থানায় রমণীবাবু প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ তো, একটা দরখাস্ত করে দিন, হয়ে যাবে। কার নামে লাইসেন্স নেবেন?'

এ কথাটা রেবা চিন্তা করে নাই। সে স্ত্রীলোক, পূর্বে কখনও পিস্তল ছোঁড়ে নাই ; আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে তাহার মনে একটা সন্ত্রস্ত শঙ্কার ভাব আছে। কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিতে চায় না, চট্

করিয়া বলিল, 'কেন, এঁর নামে।'

রমণীবাবু বলিলেন, 'তাই হবে। আপনি এখনি দরখাস্ত করে দিন ; আমি একবার আপনাদের বাড়িতে গিয়ে নিয়ম-রক্ষা রকমের তদারক করে আসব। কালই পিস্তল পেয়ে যাবেন।'

রেবা দরখাস্ত লিখিল, সুনীল তাহাতে সহি করিল। রমণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুনীলবাবু, আপনি আগে কখনো বন্দুক-পিস্তল ছুঁড়েছেন ?'

সুনীল আম্‌তা আম্‌তা ভাবে বলিল, 'এঁ—না—হ্যাঁ—অনেক দিন আগে লুকিয়ে বাবার পিস্তল নিয়ে কয়েকবার ছুঁড়েছিলাম—তখন ছেলেমানুষ ছিলাম—এঁ—'

রমণীবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'কাজটা বে-আইনী হয়েছিল। যার নামে লাইসেন্স সে ছাড়া আর কারুর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার হুকুম নেই। অবশ্য আতুরে নিয়মো নাস্তি, বিপদে পড়লে সকলেই সব রকম অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।'

সেদিন বৈকালে রমণীবাবু এন্‌কোয়ারি করিতে আসিলেন এবং চা-জলখাবার খাইয়া ঘণ্টাখানেক গল্প করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ধারণা জন্মিল সুনীল হাবাগোবা জড়-প্রকৃতির লোক, রেবা তাহাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে। হাবাগোবা লোকেরা হাতে টাকা পাইলে উচ্ছৃঙ্খল হয়, সুনীলও তাহাই হইয়াছিল, এখন শুধরাইয়া গিয়াছে। সুনীলের প্রকৃত স্বরূপ তিনি তখনও চেনেন নাই।

পরদিন সুনীল গিয়া থানা হইতে লাইসেন্স ও পিস্তল লইয়া আসিল। বন্দুকের দোকান হইতে এক বাক্স কার্তুজও কিনিয়া আনিল।

দুপুরবেলা রেবা বাড়ি ফিরিলে সুনীল পিস্তল ও কার্তুজের বাক্স তাহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, 'এই নাও।'

রেবা সশঙ্ক চক্ষে আগ্নেয়াস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আমি কি করব ? তুমি রাখো, দরকার হলে তুমিই তো ব্যবহার করবে।'

সুনীল ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিল, সে পিস্তল ও কার্তুজ লইয়া নিজের ঘরে রাখিয়া আসিল।

ইহার দুইদিন পরে পাগড়িধারী দুর্বৃত্তটাকে আর একবার রাস্তা দিয়া যাইতে দেখা গেল। তারপর তাহার যাতায়াত বন্ধ হইল।

এক হপ্তা নিরুপদ্রবে কাটিয়া যাইবার পর রেবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ওরা বোধ হয় জানতে পেরেছে বাড়িতে বন্দুক আছে, তাই আশা ছেড়ে দিয়েছে।'

সুনীল বিজ্ঞের মত মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'হুঁ।'

তারপর যত দিন কাটিতে লাগিল, রেবার মন ততই নিরুদ্বেগ হইতে লাগিল। সংসারে স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিল। রেবা সকালে কাজে বাহির হয়, বিকালে বেড়াইতে যায়। সুনীল বাড়িতে বসিয়া রহস্য-রোমাঞ্চ পড়ে ; কদাচিৎ সন্ধ্যার সময় ঘণ্টাখানেকের জন্য বাড়ি হইতে বাহির হয়। তাহার বন্ধুবান্ধব নাই ; সে কখনও রেলওয়ে স্টেশনে গিয়া বইয়ের স্টল হইতে বই কেনে ; কখনও শহরের এঁদোপড়া গলিতে হুকুম সিং-এর সঙ্গে দেখা করে। হুকুম সিং-এর সঙ্গে তাহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

এইভাবে দুই মাস কাটিয়া গেল, শীত শেষ হইয়া আসিল। রেবার মন হইতে গুণ্ডার সম্ভাবিত আক্রমণের কথা সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যাকালে রেবার দু'টি বান্ধবী বাড়িতে আসিয়াছিল ; রেবা তাহাদের লইয়া খাওয়াদাওয়া হাসিগল্পে ব্যস্ত ছিল। রেবার বান্ধবীরা বাড়িতে আসিলে সুনীলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া চলে, চাকরের মর্যাদাও সে তাহাদের কাছে পায় না। তাই তাহারা কেহ আসিলে সুনীল নিজের ঘরে বসিয়া থাকে কিংবা বেড়াইতে যায়। আজও সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল, তারপর চুপি চুপি পিছনের দরজা দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইল। অনেক দিন হইতে সে এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সুনীল শহরে গিয়া গলির মধ্যে হুকুম সিং-এর সঙ্গে দেখা করিল। দশ মিনিট ধরিয়া হুকুম সিং

তাহার নির্দেশ শুনিয়া শেষে বলিল, 'খবর পেয়েছি বাড়িতে পিস্তল আছে।'

সুনীল পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইল, পিস্তল খুলিয়া দেখাইল, তাহার মধ্যে টোটা নাই। বলিল, 'তুমি নির্ভয়ে বাড়িতে ঢুকতে পার।'

হুকুম সিং হাত পাতিয়া বলিল, 'আমার ইনাম?'

সুনীল দুই মাসে ছয়শত টাকা জমাইয়াছিল। তাহাই হুকুম সিং-এর হাতে দিয়া বলিল, 'এই নাও। এর বেশি এখন আমার কাছে নেই। তুমি কাজ সেরে ওর গায়ের গয়নাগুলো নিও। তারপর সম্পত্তি যখন আমার হাতে আসবে তুমি দশ হাজার টাকা পাবে। আমি এখন রেলওয়ে স্টেশনে যাচ্ছি, রাত্রি আটটার পর বাড়ি ফিরব।'

হুকুম সিং বলিল, 'বহুৎ খুব।'

'যা যা বলেছি মনে থাকবে?'

'জি। আপনি বে-ফিকির থাকুন, আমি সাজসজ্জা করে এখুনি বেরুচ্ছি।'

হুকুম সিং কালিঝুলি মাখিয়া ছদ্মবেশ ধারণের জন্য নিজের কোটরে প্রবেশ করিল। সুনীল স্টেশনে গেল না, দ্রুতপদে গৃহের পানে ফিরিয়া চলিল।

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছিয়া সুনীল দেখিল বান্ধবীরা এখনও আছে। সে আশ্বস্ত হইয়া রাস্তার ধারে একটা বড় গাছের পিছনে লুকাইয়া রহিল। সেখানে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল; অন্য পকেটে কার্তুজ ছিল, তাহা পিস্তলে ভরিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রেবার বান্ধবীরা চলিয়া গেল। রেবা ভিতর হইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

রাত্রি সাড়ে সাতটা। রেবা আন্নাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, 'বাবু কোথায় রে?"

আন্না বলিল, 'বাবু বেরিয়েছে। সদর দিয়ে তোমার ওনারা এলেন, বাবু খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'ও। আচ্ছা, তুই রান্না চড়াগে যা।'

রেবা উদ্বিগ্ন হইল না। চোর-ডাকাতের ভয় আর তাহার নাই। সে অন্য কথা ভাবিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। এইভাবে যদি জীবন চলিতে থাকে, মন্দ কি?

বাহিরে গাছের আড়ালে সুনীল ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। শহরের দিক হইতে হুকুম সিংকে আসিতে দেখা গেল। সে নিঃশব্দে আসিতেছে, নাগরা জুতার আওয়াজ নাই।

দ্বারের সামনাসামনি আসিয়া সে আগে পিছে তাকাইল, তারপর দ্বারে মৃদু টোকা দিল।

সুনীল আসিয়াছে মনে করিয়া রেবা দ্বার খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করিয়া হুকুম সিং ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং দু'হাতে রেবার গলা টিপিয়া ধরিল।

একটি অর্ধোচ্চারিত চীৎকার রেবার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, তারপর আর শব্দ নাই। আন্না রান্নাঘর হইতে চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল, সবিস্ময়ে বাহিরের ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল যখের মত কালো দুর্দান্ত একটা লোক রেবার গলা টিপিতেছে। আন্না বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া দ্বারে হুড়কা আঁটিয়া দিল।

হুকুম সিং যখন দেখিল রেবার দেহে প্রাণ নাই তখন সে তাহাকে মেঝেয় শোয়াইয়া দিল; রেবার হাতের কানের গলার গহনাগুলা খুলিয়া লইয়া নিজের পকেটে রাখিল, তারপর সদর দরজা দিয়া বাহির হইল।

গাছের আড়ালে সুনীল এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করিতেছিল। 'কে? কে?' বলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। হুকুম সিং হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, সুনীল ছুটিয়া আসিয়া পিস্তল তুলিল, হুকুম সিং-এর বুক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের সমস্ত কার্তুজ উজাড় করিয়া দিল। হুকুম সিং মুখ থুবড়াইয়া সেইখানেই পড়িল, আর নড়িল না।

সুনীল তখন চীৎকার করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল—'কী হয়েছে! অ্যাঁ—রেবা—!'

রান্নাঘরে আন্না সুনীলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিল। সুনীল ব্যাকুলস্বরে বলিল, 'আন্না, এ কী হল! রেবা মরে গেছে! গুণ্ডাটা রেবাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু আমিও গুণ্ডাকে মেরেছি!' সে লাফাইয়া উঠিল—'পুলিস! আমি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছি।' বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

যথাসময়ে স্থানীয় থানা হইতে পুলিস আসিল। আন্না যাহা দেখিয়াছিল পুলিসকে বলিল।

খবর পাইয়া রমণীবাবু আসিলেন। সুনীল হাব্‌লার মত তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল, 'আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, ফিরে এসে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুতেই একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। ছুটে এসে দেখি ওই লোকটা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। আমার মাথা গোলমাল হয়ে গেল। আমি পিস্তল দিয়ে ওকে মেরেছি। তারপর ঘরে ঢুকে দেখি—' তাহার ব্যায়ত চক্ষু রেবার মৃতদেহের দিকে ফিরিল; সে দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

রমণীবাবু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি পিস্তল নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন?'

সুনীল মুখ খুলিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ। আমার নামে পিস্তল, আমি সর্বদা পিস্তল আমার কাছে রাখি।'

রমণীবাবু বলিলেন, 'পিস্তল দিন। ওটা আমি বাজেয়াপ্ত করলাম।'

সুনীল বিনা আপত্তিতে পিস্তল রমণীবাবু হাতে সমর্পণ করিল। পিস্তলে আর তাহার প্রয়োজন ছিল না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'সুনীল সরকার বোকা বটে, কিন্তু বুদ্ধি আছে।'

রমণীবাবু করুণ হাসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমার ধারণা ছিল আমি বুদ্ধিমান, কিন্তু সুনীল সরকার আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। তার মতলব কিচ্ছু বুঝতে পারিনি। হুকুম সিংকে খুন করার অপরাধে তাকে যে ধরব সে উপায় নেই। স্পষ্টতই হুকুম সিং তার বাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রীকে খুন করে গায়ের গয়না কেড়ে নিয়েছিল, সুতরাং তাকে খুন করার অধিকার সুনীলের ছিল। সে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে; পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেছে এবং নিজের দুষ্কৃতির একমাত্র শরিককে সরিয়েছে! স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে-ই এখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কারণ সে-ই নিকটতম আত্মীয়। রেবার উইল ছিল না, সুনীল আদালতের হুকুম নিয়ে গদীয়ান হয়ে বসেছে।'

'হুঁ' বলিয়া ব্যোমকেশ চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

রমণীবাবু বলিলেন, 'একটা রাস্তা বার করুন, ব্যোমকেশবাবু। যখন ভাবি একজন অতি বড় শয়তান আইনকে কলা দেখিয়ে চিরজীবন মজা লুটবে তখন অসহ্য মনে হয়।'

ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া বলিল, 'রেবা অজিতের লেখা বইগুলো ভালবাসতো?'

রমণীবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, ব্যোমকেশবাবু। ওদের বাড়ি আমি আগাপাস্তলা সার্চ করেছিলাম; আমার কাজে লাগে এমন তথ্য কিছু পাইনি, কিন্তু দেখলাম অজিতবাবুর লেখা আপনার কীর্তিকাহিনী সবগুলিই আছে, সবগুলিতে রেবার নাম লেখা। তা থেকে মনে হয় রেবা আপনার গল্প পড়তে ভালবাসতো।'

ব্যোমকেশ আবার চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িল। আমরা সিগারেট ধরাইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। দেখা যাক ব্যোমকেশের মস্তিষ্ক-রূপ গন্ধমাদন হইতে কোন্ বিশল্যকরণী দাবাই বাহির হয়।

দশ মিনিট পরে ব্যোমকেশ নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। আমরা সাগ্রহে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

সে বলিল, 'রমণীবাবু, রেবার হাতের লেখা যোগাড় করতে পারেন?'

'হাতের লেখা!' রমণীবাবু ভ্রূ তুলিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ধরুন, তার হিসেবের খাতা, কিংবা চিঠির ছেঁড়া টুকরো। যাতে বাংলা

লেখার ছাঁদটা পাওয়া যায়।'

রমণীবাবু গালে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন, 'চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু মতলবটা কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মতলবটা এই।—রেবা আমার রহস্য-কাহিনী পড়তে ভালবাসতো। সুতরাং অটোগ্রাফের জন্যে আমাকে চিঠি লেখা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। মেয়েদের যে ও দুর্বলতা আছে তার পরিচয় আমরা হামেশাই পেয়ে থাকি। মনে করুন ছ'মাস আগে রেবা আমাকে চিঠি লিখেছিল; আমার অটোগ্রাফ চেয়েছিল, তারপর আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তার স্বামী তাকে খুন করবার ফন্দি আঁটছে, আমি যদি তার অপঘাত মৃত্যুর খবর পাই তাহলে যেন তদন্ত করি।'

রমণীবাবু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'বুঝেছি। জাল চিঠি তৈরি করবেন, তারপর সেই চিঠি সুনীলকে দেখিয়ে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করবেন!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করব। সুনীল যদি ভয় পেয়ে সত্য কথা বলে ফেলে তবেই তাকে ধরা যেতে পারে।'

রমণীবাবু বলিলেন, 'আমি রেবার হাতের লেখার নমুনা যোগাড় করব। আর কিছু?'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'রেবার নাম-ছাপা চিঠির কাগজ ছিল কি?'

'ছিল। তাও পাবেন। আর কিছু?'

'আর—একটা টেপ্ রেকর্ডিং মেশিন। যদি সুনীল কন্‌ফেস্ করে, তার পাকাপাকি রেকর্ড থাকা ভাল।'

'বেশ। কাল সকালেই আমি আবার আসব।' বলিয়া রমণীবাবু বিশেষ উত্তেজিতভাবে বিদায় লইলেন।

পরদিন সকালে আমরা সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়াছি, রমণীবাবু আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার হাতে একটি চামড়ার স্যাচেল। হাসিয়া বলিলেন, 'যোগাড় করেছি।'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে সিগারেট দিয়া বলিল, 'কি কি যোগাড় করলেন?'

রমণীবাবু স্যাচেল খুলিয়া সন্তর্পণে একটি কাগজের টুক্‌রা বাহির করিয়া আমাদের সামনে ধরিলেন, বলিলেন, 'এই নিন রেবার হাতের লেখা।'

চিঠির কাগজের ছিন্নাংশ, তাহাতে বাংলায় কয়েক ছত্র লেখা আছে—'...স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যদি কর্তব্য না থাকে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য থাকবে কেন? আমরা আধুনিক যুগের মানুষ, সেকেলে সংস্কার আঁকড়ে থাকার মানে হয় না...'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'এই রেবার হাতের লেখা! দস্তখত নেই দেখছি। কোথায় পেলেন?'

রমণীবাবু স্যাচেল হইতে এক তা সাদা চিঠির কাগজ লইয়া বলিলেন, 'আর এই নিন রেবার নাম-ছাপা সাদা চিঠির কাগজ। কাল রাত্রে এখান থেকে বেরিয়ে সটান সুনীলের বাড়িতে গিয়েছিলাম; তাকে সোজাসুজি বললাম, তোমার বাড়ি আর একবার খুঁজে দেখব। সে আপত্তি করল না।—কেমন, যা যোগাড় করেছি তাতে চলবে তো?'

ব্যোমকেশ ছেঁড়া চিঠির টুক্‌রা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিল, 'চলবে। রেবার হাতের লেখা নকল করা শক্ত হবে না। যারা রবীন্দ্রীয় ছাঁদের নকল করে তাদের লেখা নকল করা সহজ।—টেপ্-রেকর্ডার পেয়েছেন?'

রমণীবাবু বলিলেন, 'পেয়েছি। যখন বলবেন তখনই এনে হাজির করব।—তাহলে শুভকর্মের দিন স্থির কবে করছেন?'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'আজই হোক না, শুভস্য শীঘ্রম্। আমি সুনীলকে একটা চিঠি দিচ্ছি, সেটা আপনি কারুর হাতে পাঠিয়ে দেবেন।'

একটা সাধারণ প্যাডের কাগজে ব্যোমকেশ চিঠি লিখিল—

শ্রীসুনীল সরকার বরাবরেষু—

আপনার স্ত্রীর সহিত পত্রযোগে আমার পরিচয় হইয়াছিল ; তিনি মৎ-সংক্রান্ত কাহিনী পড়িতে ভালবাসিতেন। শুনিলাম তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

আমি কয়েকদিন যাবৎ এখানে আসিয়া ডাকবাংলোতে আছি। আপনি যদি আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় ডাকবাংলোতে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন, আপনার স্ত্রী আমাকে যে শেষ চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা আপনাকে দেখাইতে পারি। চিঠিখানি আপনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

নিবেদন ইতি—ব্যোমকেশ বক্সী।

চিঠি খামে ভরিয়া ব্যোমকেশ রমণীবাবুর হাতে দিল। তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, এখন উঠি। চিঠিখানি এমনভাবে পাঠাব যাতে সুনীল বুঝতে না পারে যে, পুলিসের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে। দুপুরবেলা টেপ্-রেকর্ডার নিয়ে আসছি।'

তিনি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ রেবার চিঠি লইয়া বসিল ; নানাভাবে তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে লাগিল ; আলোর সামনে তুলিয়া ধরিয়া কাগজ দেখিল, ছিন্ন অংশের কিনারা পর্যবেক্ষণ করিল। তারপর সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

বলিলাম, 'কি দেখলে ?'

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'চিঠিখানা আস্ত ছিল, সম্প্রতি ছেঁড়া হয়েছে। চিঠির ল্যাজা-মুড়ো কোথায় গেল তাই ভাবছি।'

আমিও ভাবিলাম। তারপর বলিলাম, 'রেবা হয়তো নিজের কোন বান্ধবীকে চিঠিখানা লিখেছিল, রমণীবাবু তার কাছ থেকে আদায় করেছেন। বান্ধবী হয়তো নিজের নাম গোপন রাখতে চায়—'

'হতে পারে, অসম্ভব নয়। রেবার বান্ধবী হয়তো রমণীবাবুকে শর্ত করিয়ে নিয়েছে যে, তার নাম প্রকাশ পাবে না। তাই রমণীবাবু আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন—যাক, এবার জালিয়াতির হাতে-খড়ি হোক। অজিত, কাগজ-কলম দাও।'

অতঃপর দু'ঘণ্টা ধরিয়া ব্যোমকেশ রেবার হাতের লেখা মক্স করিল। শেষে আসল ও নকল আমাকে দিয়া বলিল, 'দেখ দেখি কেমন হয়েছে। অবশ্য নাম-দস্তখতটা আন্দাজে করতে হল, একটা নমুনা পেলে ভাল হত। কিন্তু এতেই চলবে বোধ হয়।'

রেবার চিঠি ও ব্যোমকেশের খসড়া পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলাম, লেখার ছাঁদে তফাত নাই ; সাধারণ লোকের কাছে ব্যোমকেশের লেখা স্বচ্ছন্দে রেবার লেখা বলিয়া চালানো যায়। বলিলাম, 'চলবে।'

ব্যোমকেশ তখন সযত্নে চিঠি লিখিতে বসিল। রেবার নাম-ছাপা কাগজে ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া লিখিল। চিঠি এইরূপ—

মাননীয়েষু,

ব্যোমকেশবাবু, আপনার চিঠি আর অটোগ্রাফ পেয়ে কত আনন্দ হয়েছে বলতে পারি না। আমার মত গুণগ্রাহী পাঠক আপনার অনেক আছে, নিশ্চয় আপনাকে অটোগ্রাফের জন্য বিরক্ত করে। তবু আপনি যে আমাকে দু'ছত্র চিঠিও লিখেছেন সেজন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার অটোগ্রাফ আমি সযত্নে আমার খাতায় গেঁথে রাখলুম।

আপনার সহৃদয়তায় সাহস পেয়ে আমি নিজের কথা কিছু লিখছি।—

আমার স্বামী বিষয়বুদ্ধিহীন এবং মন্দ চরিত্রের লোক, তাই আমার শ্বশুর মৃত্যুকালে তাঁর বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আমার নামে উইল করে গিয়েছেন। সম্পত্তি প্রচুর, এবং আমি তাতে আমার স্বামীকে হাত দিতে দিই না। আমার সন্দেহ হয় আমার স্বামী আমাকে খুন করবার মতলব আঁটছেন ; বোধ হয় গুণ্ডা লাগিয়েছেন। কি হবে জানি না। কিন্তু আপনি যদি হঠাৎ আমার অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ পান তাহলে দয়া করে একটু খোঁজখবর নেবেন। আপনি সত্যান্বেষী, অসহায়া নারীর মৃত্যুতে কখনই চুপ করে থাকতে পারবেন না।

আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—বিনীতা
রেবা সরকার

চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া ব্যোমকেশ একটি পুরানো খামের মধ্যে ভরিয়া রাখিল।

বেলা তিনটার সময় রমণীবাবু আসিলেন, সঙ্গে একজন ছোকরা পুলিস। সে রেডিও মিস্ত্রী; তাহার হাতে টেপ্-রেকর্ডারের বাক্স এবং মাইক ইত্যাদি যন্ত্রপাতি।

রমণীবাবু ব্যোমকেশের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মিস্ত্রীকে বলিলেন, 'বীরেন, তাহলে তুমি লেগে যাও।'

'আজ্ঞে স্যার' বলিয়া বীরেন লাগিয়া গেল।

বসিবার ঘরে টেবিলের মাথায় যে ঝোলানো বৈদ্যুতিক আলোটা ছিল তাহার তারে মাইক লাগানো হইল, টেপ্-রেকর্ডার যন্ত্রটা বসানো হইল ব্যোমকেশের শয়ন ঘরে। রেকর্ডার চালু হইলে একটু শব্দ হয়, যন্ত্রটা অন্য ঘরে থাকিলে যন্ত্রের শব্দ বসিবার ঘরে শোনা যাইবে না।

সব ঠিকঠাক হইলে বীরেন পাশের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল। আমরা বসিবার ঘরে টেবিলের পাশে বসিয়া সহজ গলায় কথাবার্তা বলিলাম; তারপর পাশের ঘরে গেলাম। বীরেন যন্ত্রের ফিতা উল্টাদিকে ঘুরাইয়া আবার চালু করিল, তখন আমরা নিজেদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। বেশ স্পষ্ট আওয়াজ, কোন্‌টা কাহার গলা চিনিতে কষ্ট হয় না।

ব্যোমকেশ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'চলবে। —চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

রমণীবাবু বলিলেন, 'দিয়েছি। আসবে নিশ্চয়। যার মনে পাপ আছে, ও চিঠি পাবার পর তাকে আসতেই হবে। আপনি তাকে ব্ল্যাকমেল করতে চান কিনা সেটা সে জানতে চাইবে। আচ্ছা, আমরা এখন যাই, আবার সন্ধ্যের পর আসব।'

ঠিক ছ'টার সময় বীরেনকে লইয়া রমণীবাবু আসিলেন; পুলিসের গাড়ি তাঁহাদের নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

রমণীবাবু বলিলেন, 'একটু আগেই এলাম। কি জানি সুনীল যদি সাতটার আগে এসে উপস্থিত হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ করেছেন। প্রথমে আপনারা পাশের ঘরে থাকবেন, যাতে সুনীল জানতে না পারে যে, পুলিসের সঙ্গে আমার যোগ আছে। আমি আর অজিত বসবার ঘরে থাকব; সুনীল আসার পর আপনি তাক্ বুঝে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।'

'সে ভাল কথা।' রমণীবাবু বীরেনকে লইয়া পাশের ঘরে গেলেন এবং দরজা ভেজাইয়া দিলেন। আমরা দু'জনে আসর সাজাইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ক্রমে অন্ধকার হইল। আমি আলো জ্বালিয়া দিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ সকালবেলার সংবাদপত্রটা তুলিয়া লইয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। আমি সিগারেট ধরাইলাম। কান দু'টা অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া রহিল।

সাতটা বাজিবার কয়েক মিনিট আগেই ডাকবাংলোর সদরে একটি মোটর আসিয়া থামার শব্দ শোনা গেল; আমরা দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। মিনিট দুই-তিন পরে সুনীল সরকার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রমণীবাবু যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহার সহিত বিশেষ গরমিল নাই; উপরন্তু লক্ষ্য করিলাম, তাহার বিভক্ত ওষ্ঠাধরের ফাঁকে দাঁতগুলা কুমীরের দাঁতের মত হিংস্র। ভোঁতা মুখে ধারালো দাঁত। সব মিলাইয়া চেহারাটি নয়নরঞ্জন নয়। তার উপর দুশ্চরিত্র। পতিভক্তিতে রেবা হয়তো সীতা-সাবিত্রীর সমতুল্য ছিল না, কিন্তু সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। সুনীল সরকার স্পষ্টতই রাম কিংবা সত্যবানের সমকক্ষ নয়।

সুনীল বোকার মত কিছুক্ষণ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু—'

ব্যোমকেশ খবরের কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল, ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'সুনীলবাবু ? আসুন।'

ন্যালা-ক্যাব্‌লার মত ফ্যাল্‌ফেলে মুখের ভাব লইয়া সুনীল টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ; কে বলিবে তাহার ঘটে গোবর ছাড়া আর কিছু আছে ! ব্যোমকেশ শুষ্ক কঠিন দৃষ্টিতে তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনার অভিনয় ভালই হচ্ছে, কিন্তু যতটা অভিনয় করছেন ততটা নির্বোধ আপনি নন। —বসুন।'

সুনীল থপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল, সুবর্তুল চক্ষে ব্যোমকেশকে পরিদর্শন করিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, 'কী—কী বলছেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু না। আপনি যখন বোকামির অভিনয় করবেনই তখন ও আলোচনায় লাভ নেই।—সুনীলবাবু, পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্যে আপনি দু'টো মানুষকে খুন করেছেন ; এক, আপনার স্ত্রী ; দুই, হুকুম সিং। এখানে এসে আমি সব খবর নিয়েছি। আপনি হুকুম সিংকে দিয়ে স্ত্রীকে খুন করিয়েছিলেন, তারপর নিজের হাতে হুকুম সিংকে মেরেছিলেন। হুকুম সিং ছিল আপনার ষড়যন্ত্রের অংশীদার, তাই তাকে সরানো দরকার ছিল ; সে বেঁচে থাকলে সারা জীবন ধরে আপনাকে দোহন করত। আপনি এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন।'

সুনীল হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, হাউমাউ করিয়া উঠিল, 'এ কি বলছেন আপনি ! রেবাকে আমি মেরেছি ! এ কি বলছেন ! একটা গুণ্ডা—যার নাম হুকুম সিং—সে আমার স্ত্রীকে গলা টিপে মেরেছিল। আন্না দেখেছে—আন্না নিজের চোখে দেখেছে হুকুম সিং রেবাকে গলা টিপে মারছে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুকুম সিং ভাড়াটে গুণ্ডা; তাকে আপনি টাকা খাইয়েছিলেন।'

'না না, এসব মিথ্যে কথা। রেবাকে আমি খুন করাইনি ; সে আমার স্ত্রী, আমি তাকে ভালবাসতাম—'

'আপনি রেবাকে কি রকম ভালবাসতেন, তার প্রমাণ আমার পকেটে আছে—' বলিয়া ব্যোমকেশ নিজের বুক-পকেটে আঙুলের টোকা মারিল।

'কী ? রেবার চিঠি ? দেখি কি চিঠি রেবা আপনাকে লিখেছিল !'

ব্যোমকেশ চিঠি বাহির করিয়া সুনীলের হাতে দিতে দিতে বলিল, 'চিঠি ছিঁড়বেন না। ওর ফটো-স্ট্যাট্ নকল আছে।'

সুনীল তাহার সতর্ক-বাণী শুনিতে পাইল না, চিঠি খুলিয়া দু'হাতে ধরিয়া একাগ্রচক্ষে পড়িতে লাগিল।

এই সময় নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া রমণীবাবু ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হইল ; ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া সুনীল যখন চোখ তুলিল তখন প্রথমেই তাহার দৃষ্টি পড়িল রমণীবাবুর উপর। পলকের মধ্যে তাহার মুখ হইতে নির্বুদ্ধিতার মুখোস খসিয়া পড়িল। ভোঁতা মুখে ধারালো দাঁত নিষ্ক্রান্ত করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'ও—এই ব্যাপার ! পুলিসের ষড়যন্ত্র ! আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা। —ব্যোমকেশবাবু, রেবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে জানেন ? ঐ রমণী দারোগা !' বলিয়া রমণীবাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

আমরা সুনীলের দিক হইতে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'রমণীবাবু দায়ী ! তার মানে ?'

সুনীল বলিল, 'মানে বুঝলেন না ? রমণী দারোগা রেবার প্রাণের বন্ধু ছিল, যাকে বলে বঁধু। তাই তো আমার ওপর রমণী দারোগার এত আক্রোশ !'

ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। আমি রমণীবাবুর মুখের পানে তাকাইলাম। তিনি একদৃষ্টে সুনীলের পানে চাহিয়া আছেন ; মনে হয় তাঁহার সমস্ত দেহ তপ্ত লোহার মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভয় হইল এখনি বুঝি একটা অগ্নিকাণ্ড হইয়া যাইবে।

ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে বলিল, 'তাহলে এই কারণেই আপনি স্ত্রীকে খুন করিয়েছেন ?'

সুনীল বলিল, 'আমি খুন করাইনি। এই জাল চিঠি দিয়ে আমাকে ধরবেন ভেবেছিলেন !' সুনীল চিঠিখানা মুঠির মধ্যে গোলা পাকাইয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল—'সুনীল সরকারকে ধরা অত সহজ নয়। চললাম। যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে গ্রেপ্তার করুন, তারপর আমি দেখে নেব।'

আমরা নির্বাক বসিয়া রহিলাম, সুনীল ময়াল সাপের মত সর্পিল গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই কয়েক মুহূর্তে সুনীলের চরিত্র যেন চোখের সামনে মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইল। সাপের মত খল কপট নৃশংস, হঠাৎ ফণা তুলিয়া ছোবল মারে, আবার গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। সাংঘাতিক মানুষ।

রমণীবাবু একটা অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ কতকটা নিজমনেই বলিল, 'ধরা গেল না।'

সহসা বাহির হইতে একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ আসিল। সকলে চমকিয়া উঠিলাম। সর্বাগ্রে ব্যোমকেশ উঠিয়া দ্বারের পানে চলিল, আমরা তাহার পিছন পিছন চলিলাম।

ডাকবাংলোর সামনে সুনীলের মোটর দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার সামনের চাকার পাশে মাটির উপর যে মূর্তিটা পড়িয়া আছে তাহা সুনীলের। তাহার পিঠের উপর হইতে একটা ছুরির মুঠ উঁচু হইয়া আছে।

মৃত্যুযন্ত্রণায় সুনীল কাৎ হইবার চেষ্টা করিল ; আমি ও ব্যোমকেশ তাহাকে সাহায্য করিলাম বটে, কিন্তু অন্তিমকালে আমাদের সাহায্য কোনও কাজে আসিল না। সুনীল একবার চোখ মেলিল ; আমাদের চিনিতে প্যারিল কিনা বলা যায় না, কেবল অস্ফুট স্বরে বলিল, 'মুকুন্দ সিং—'

তারপর তাহার হৃৎস্পন্দন থামিয়া গেল।

পথের সামনে ও পিছন দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না ; পথ জনশূন্য। আমার বিবশ মস্তিষ্কে একটা প্রশ্ন ঘুরিতে লাগিল—মুকুন্দ সিং কে ? নামটা চেনা-চেনা। তারপর মনে পড়িয়া গেল, হুকুম সিং-এর ভাইয়ের নাম মুকুন্দ সিং। মুকুন্দ সিং ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছে।

লাশ চালান দেওয়া এবং আইনঘটিত অন্যান্য কর্তব্য শেষ করিতে সাড়ে ন'টা বাজিয়া গেল। আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। রমণীবাবুও ক্লান্তমুখে আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসিলেন। বীরেন তখনও পাশের ঘরে যন্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, রমণীবাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি যাও, যন্ত্রটা থাক। আমি নিয়ে যাব।'

বীরেন চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ তিনজনে সিগারেট টানিলাম। তারপর ব্যোমকেশ বলিল, 'সুনীল আইনকে ফাঁকি দিয়েছিল বটে কিন্তু নিয়তির হাত এড়াতে পারল না। আশ্চর্য ! মাঝে মাঝে গুণ্ডারাও অনেক নৈতিক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে !'

রমণীবাবু বলিলেন, 'একটা সমস্যার সমাধান হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সমস্যা তৈরি হল। এখন মুকুন্দ সিংকে ধরতে হবে। আমার কাজ শেষ হল না, ব্যোমকেশবাবু।'

কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানিবার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'সুনীলের অভিযোগ সত্যি—কেমন ?'

রমণীবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। আমার আর রেবার বাড়ি এক শহরে, এক পাড়ায়। ওকে ছেলেবেলা থেকে চিনতাম, কিন্তু ভালবাসা-বাসি ছিল না...তারপর রেবার যখন ওই রাক্ষসটার সঙ্গে বিয়ে হল তখন এই শহরেই ওর সঙ্গে আবার দেখা হল...রেবা মন্দ ছিল না, কিন্তু কি জানি কেমন করে কী হয়ে গেল...সুনীল যে জানতে পেরেছে তা একবারও সন্দেহ

হয়নি...সুনীলকে আহাম্মক ভেবেছিলাম, তারপর রেবা যখন মারা গেল তখন বুঝলাম সুনীল কেউটে সাপ...তারপর ফাঁসাবার চেষ্টা করেছিলাম...শেষে আপনি এলেন, আপনার সাহায্যে শেষ চেষ্টা করলাম—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে চিঠির ছেঁড়া অংশটা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন সেটা রেবা আপনাকে লিখেছিল ?'

রমণীবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। আমাদের দেখাশোনা বেশি হত না। রেবা আমাকে চিঠি লিখত, মনের-প্রাণের কথা লিখত। অনেক চিঠি লিখেছিল।—কিন্তু রেবার কথা আর নয়, ব্যোমকেশবাবু। এখন বলুন টেপ্-রেকর্ডের কী হবে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি আর হবে, ওটা মুছে ফেলা যাক।—আসুন।'

পাশের ঘরে গিয়া আমরা রেকর্ডার চালাইলাম। সদ্যমৃত সুনীলের জীবন্ত কণ্ঠস্বর শুনিলাম। তারপর ফিতা মুছিয়া ফেলা হইল।

খুঁজি খুঁজি নারি

রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে ব্যোমকেশের পরিচয় প্রায় পনেরো বছরের। কিন্তু এই পনেরো বছরের মধ্যে তাঁহাকে পনেরো বার দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। শেষের পাঁচ-ছয় বছর একেবারেই দেখি নাই। কিন্তু তিনি যে আমাদের ভোলেন নাই তাহার প্রমাণ বছরে দুইবার পাইতাম। প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ ও বিজয়ার দিন তিনি ব্যোমকেশকে নিয়মিত পত্রাঘাত করিতেন।

রামেশ্বরবাবু বড়মানুষ ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার আট-দশখানা বাড়ি ছিল, তাছাড়া নগদ টাকাও ছিল অপর্যাপ্ত; বাড়িগুলির ভাড়া হইতে যে আয় হইত তাহার অধিকাংশই জমা হইত। সংসারে তাঁহার আপনার জন ছিল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কুমুদিনী, প্রথম পক্ষের পুত্র কুশেশ্বর ও কন্যা নলিনী। সর্বোপরি ছিল তাঁহার অফুরন্ত হাস্যরসের প্রবাহ।

রামেশ্বরবাবু হাস্যরসিক ছিলেন। তিনি যেমন প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন তেমনি হাসাইতেও পারিতেন। আমি জীবনব্যাপী বহুদর্শনের ফলে একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলাম যে, যাহাদের প্রাণে হাস্যরস আছে তাহারা কখনও বড়লোক হইতে পারে না, মা লক্ষ্মী কেবল প্যাঁচাদেরই ভালোবাসেন। রামেশ্বরবাবু আমার আবিষ্কৃত এই নিয়মটিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। অন্তত নিয়মটি যে সার্বজনীন নয় তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।

রামেশ্বরবাবুর আর একটি মহৎ গুণ ছিল, তিনি একবার যাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতেন তাহাকে কখনও মন হইতে সরাইয়া দিতেন না। ব্যোমকেশের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল তাঁহার বাড়িতে চৌর্য-ঘটিত সামান্য একটি ব্যাপার লইয়া। ব্যাপারটি কৌতুকপ্রদ প্রহসনে সমাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তদবধি তিনি ব্যোমকেশকে সস্নেহে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কয়েকবার তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণও খাইয়াছি। তিনি আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন, শেষ বরাবর তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু হাস্যরস যে তিলমাত্র প্রশমিত হয় নাই তাহা তাঁহার ষাণ্মাসিক পত্র হইতে জানিতে পারিতাম।

আজ রামেশ্বরবাবুর অন্তিম রসিকতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল কয়েক বছর আগে; তখন আইন করিয়া পিতৃ-সম্পত্তিতে কন্যার সমান অধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

সেবার পয়লা বৈশাখ অপরাহ্ণের ডাকে রামেশ্বরবাবুর চিঠি আসিল। পুরু অ্যান্টিক কাগজের খাম, পরিচ্ছন্ন অক্ষরে নাম-ধাম লেখা; খামটি হাতে লইতেই ব্যোমকেশের মুখে হাসি ফুটিল। লক্ষ্য করিয়াছি রামেশ্বরবাবুকে মনে পড়িলেই মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে। ব্যোমকেশ সস্নেহে খামটি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'অজিত, রামেশ্বরবাবুর বয়স কত আন্দাজ করতে পারো?'

বলিলাম, 'নব্বুই হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অত না হলেও আশি নিশ্চয়। এখনো কিন্তু ভীমরতি ধরেনি। হাতের লেখাও বেশ স্পষ্ট আছে।'

সন্তর্পণে খাম কাটিয়া সে চিঠি বাহির করিল। দু'-ভাঁজ করা তকতকে দামী কাগজ, মাথায় মনোগ্রাম ছাপা। গোটা গোটা অক্ষরে জরার চিহ্ন নাই। রামেশ্বরবাবু লিখিয়াছেন—

বুদ্ধিসাগরেষু,

ব্যোমকেশবাবু, আপনি ও অজিতবাবু আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। আপনার বুদ্ধি দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় পরিবর্ধিত হোক ; অজিতবাবুর লেখনী ময়ূরপুচ্ছে পরিণত হোক !

আমি এবার চলিলাম। যমরাজের সমন আসিয়াছে, শীঘ্রই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আসিবে। কিন্তু 'থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় ?' যমদূতেরা আমাকে ধরিবার পূর্বেই আমি বৈকুণ্ঠে গিয়া পৌঁছিব। কেবল এই দুঃখ আগামী বিজয়ার দিন আপনাদের স্নেহাশিস জানাইতে পারিব না।

মৃত্যুর পূর্বে বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি দেখিবেন, আমার শেষ ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। আপনার বুদ্ধির উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে।

বিদায়। আমার এই চিঠিখানির প্রতি অবজ্ঞা দেখাইবেন না। আপনি পাঁচ হাজার টাকা পাইলেন কিনা তাহা আমি বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্য করিব।

পুনরাগমনায় চ। শ্রীরামেশ্বর রায়

চিঠি পড়িয়া ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। আমিও চিঠি পড়িলাম। নিজের মৃত্যু লইয়া পরিহাস হয়তো তাঁহার চরিত্রানুগ, কিন্তু চিঠির শেষের দিকে যে-সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অর্থবোধ হইল না।...আমার শেষ ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়...কোন্ ইচ্ছা ? আমরা তো তাঁহার কোনও শেষ ইচ্ছার কথা জানি না, চিঠিতে কিছু লেখা নাই। তারপর—পাঁচ হাজার টাকা পাইলেন কিনা...কোন্ পাঁচ হাজার টাকা ? ইহা কি রামেশ্বরবাবুর নূতন ধরনের রসিকতা, কিংবা এতদিনে সত্যই তাঁহার ভীমরতি ধরিয়াছে।

ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, 'চল, কাল সকালে রামেশ্বরবাবুকে দেখে আসা যাক। কোন্‌দিন আছেন কোন্‌দিন নেই।'

বলিলাম, 'বেশ, চল। চিঠি পড়ে তোমার কি মনে হয় না যে, রামেশ্বরবাবুর ভীমরতি ধরেছে ?'

ব্যোমকেশ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'পিতামহ ভীষ্মের কি ভীমরতি ধরেছিল ?'

সম্প্রতি ব্যোমকেশ রামায়ণ মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, হাতে কাজ না থাকিলেই মহাকাব্য লইয়া বসে। ইহা তাহার বয়সোচিত ধর্মভাব অথবা কাব্য সাহিত্যের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা বলিতে পারি না। অন্য মতলবও থাকিতে পারে। তবে মাঝে মাঝে তাহার কথাবার্তায় রামায়ণ মহাভারতের গন্ধ পাওয়া যায়।

বলিলাম, 'রামেশ্বরবাবু কি পিতামহ ভীষ্ম ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খানিকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রামায়ণের দশরথের সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশি।'

বলিলাম, 'দশরথের তো ভীমরতি ধরেছিল।'

সে বলিল, 'হয়তো ধরেছিল। সেটা বয়সের দোষে নয়, স্বভাবের দোষে। কিন্তু রামেশ্বরবাবু যদি একশো বছর বেঁচে থাকেন ওঁর ভীমরতি ধরবে না।'

রামেশ্বরবাবুর পারিবারিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সংক্ষিপ্ত। কলিকাতার উত্তরাংশে নিজের একটি বাড়িতে থাকেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কুমুদিনীর বয়স এখন বোধ করি পঞ্চাশোর্ধে, তিনি নিঃসন্তান। প্রথম পক্ষের পুত্রের নাম সম্ভবত রামেশ্বরবাবু নিজের নামের সহিত মিলাইয়া কুশেশ্বর রাখিয়াছিলেন। কুশেশ্বরের বয়সও পঞ্চাশের কম নয়, মাথার কিয়দংশে পাকা চুল, কিয়দংশে টাক। সে বিবাহিত, কিন্তু সন্তান-সন্ততি আছে কিনা বলিতে পারি না। তাহাকে দেখিলে মেরুদণ্ডহীন অসহায় গোছের মানুষ বলিয়া মনে হয়। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী নলিনী শুনিয়াছি প্রেমে পড়িয়া একজনকে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার সহিত রামেশ্বরবাবুর কোনও সম্পর্ক নাই। মোট কথা তাঁহার পরিবার খুব বড় নয়, সুতরাং অশান্তির অবকাশ কম। তাঁহার অগাধ টাকা, প্রাণে অফুরন্ত হাস্যরস। তবু সন্দেহ হয় তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখের নয়।

পরদিন বেলা ন'টার সময় রামেশ্বরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম।

বাড়িটা সরু লম্বা গোছের ; দ্বারের সামনে মোটর দাঁড়াইয়া আছে। আমরা বন্ধ দ্বারের কড়া নাড়িলাম।

অল্পক্ষণ পরে দ্বার খুলিলেন একটা মহিলা। তিনি বোধ হয় অন্য কাহাকেও প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাই আমাদের দেখিয়া তাঁহার কলহোদ্যত প্রখর দৃষ্টি নরম হইল ; মাথায় একটু আঁচল টানিয়া দিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, 'কাকে চান ?'

রামেশ্বরবাবুর বাড়ির দু'টি স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ না থাকিলেও তাঁহাদের দেখিয়াছি। ইনি কুশেশ্বরের স্ত্রী ; দৃঢ়গঠিত বেঁটে মজবুত চেহারা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী, রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

মহিলার চোয়ালের হাড় শক্ত হইল ; তিনি বোধ করি দ্বার হইতেই আমাদের বিদায় বাণী শুনাইবার জন্য মুখ খুলিয়াছিলেন, এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল। মহিলাটি একবার চোখ তুলিয়া সিঁড়ির দিকে চাহিলেন, তারপর দ্বার হইতে অপসৃত হইয়া পিছনের একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরটি নিশ্চয় রান্নাঘর, কারণ সেখান হইতে হাতা-বেড়ির শব্দ আসিতেছে।

সিঁড়ি দিয়া দু'টি লোক নামিয়া আসিলেন ; একজন কুশেশ্বর, দ্বিতীয় ব্যক্তি বিলাতি বেশধারী প্রবীণ ডাক্তার। দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ডাক্তার বলিলেন, 'উপস্থিত ভয়ের কিছু দেখছি না। যদি দরকার মনে কর, ফোন কোরো।'

ডাক্তার মোটরে গিয়া উঠিলেন, মোটর চলিয়া গেল। আমরা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি, কুশেশ্বর এতক্ষণ তাহা লক্ষ্য করে নাই ; এখন ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইল। তাহার টাক একটু বিস্তীর্ণ হইয়াছে, অবশিষ্ট চুল আর একটু পাকিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাদের বোধ হয় চিনতে পারছেন না, আমি ব্যোমকেশ বক্সী। আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

কুশেশ্বর বিহ্বল হইয়া বলিল, 'ব্যোমকেশ বক্সী ! ও—তা—হ্যাঁ, চিনেছি বৈকি। বাবার শরীর ভাল নয়—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি হয়েছে ?'

কুশেশ্বর বলিল, 'কাল রাত্রে হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল। এখন সামলেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ? তা—তিনি তেতলার ঘরে আছেন—'

এই সময় রান্নাঘরের দিক হইতে উচ্চ ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। কড়া আওয়াজ ; আমরা তিনজনেই সেইদিকে তাকাইলাম ; রান্নাঘরের ভিতর হইতে একটি অদৃশ্য হস্ত কপাটের উপর সাঁড়াশি দিয়া আঘাত করিতেছে। কুশেশ্বরের দিকে চাহিয়া দেখি তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। সে কাশিয়া গলা সাফ করিয়া বলিল, 'বাবার সঙ্গে তো দেখা হতে পারে না, তাঁর শরীর খুব খারাপ—ডাক্তার এসেছিলেন—'

ওদিকে ঠক্‌ঠক্ শব্দ তখন থামিয়াছে। ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল, 'বুঝেছি। ডাক্তারবাবুর নাম কি ?'

কুশেশ্বর আবার উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'ডাক্তার অসীম সেন। চেনেন না ? মস্ত হার্ট স্পেশালিস্ট।'

'চিনি না, কিন্তু নাম জানি। বিবেকানন্দ রোডে ডিসপেন্সারি।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না ?'

'মানে—ডাক্তারের হুকুম নেই—' কুশেশ্বর একবার আড়চোখে রান্নাঘরের পানে তাকাইল।

'কত দিন থেকে ওঁর শরীর খারাপ যাচ্ছে ?'

'শরীর তো একরকম ভালই ছিল ; তবে অনেক বয়স হয়েছে, বেশি নড়াচড়া করতে পারেন না, নিজের ঘরেই থাকেন। কাল সকালে অনেকগুলো চিঠি লিখলেন, তারপর রাত্তিরে হঠাৎ—'

রান্নাঘরের দ্বারে অধীর সাঁড়াশির শব্দ হইল ; কুশেশ্বর অর্ধপথে থামিয়া গেল। ব্যোমকেশ

বলিল, 'টরে-টক্কা ! আপনার স্ত্রী বোধ হয় রাগ করছেন । — চললাম, নমস্কার ।'

ফুটপাথে নামিয়া পিছন ফিরিয়া দেখি সদর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে ।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বিমনাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, 'ডাক্তার অসীম সেনের ডিসপেন্সারি বেশি দূর নয় । চল, তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই ।'

ভাগ্যক্রমে ডাক্তার সেন ডিসপেন্সারিতে ছিলেন, তিন-চারটি রোগীও ছিল । ব্যোমকেশ চিরকুটে নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিল । ডাক্তার সেন বলিয়া পাঠাইলেন—একটু অপেক্ষা করিতে হইবে ।

আধ ঘণ্টা পরে রোগীদের বিদায় করিয়া ডাক্তার সেন আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন । আমরা তাঁহার খাস কামরায় উপনীত হইলাম । ডাক্তারি যন্ত্রপাতি দিয়া সাজানো বড় ঘরের মাঝখানে বড় একটি টেবিলের সামনে ডাক্তার বসিয়া আছেন, ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনিই ব্যোমকেশবাবু ? আজ রামেশ্বরবাবুর বাড়ির সদরে আপনাদের দেখেছি না ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ । আমরা কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করাবার জন্য আসিনি, অন্য একটু কাজ আছে । আমার পরিচয়—'

ডাক্তার সেন হাসিয়া বলিলেন, 'পরিচয় দিতে হবে না । বসুন । কি দরকার বলুন ।'

আমরা ডাক্তার সেনের মুখোমুখি চেয়ারে বসিলাম । ব্যোমকেশ বলিল, 'রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয় । কাল তাঁর নববর্ষের শুভেচ্ছাপত্র পেলাম, তাতে তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না এমনি একটা সংশয় জানিয়েছিলেন ; তাই আজ সকালে তাঁকে দেখতে এসেছিলাম । এসে শুনলাম, রাত্রে তাঁর হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল । তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পেলাম না, তাই আপনার কাছে এসেছি তাঁর খবর জানতে । আপনি কি রামেশ্বরবাবুর ফ্যামিলি ডাক্তার ?'

ডাক্তার সেন বলিলেন, 'পারিবারিক বন্ধু বলতে পারেন । ত্রিশ বছর ধরে আমি ওঁকে দেখছি । ওঁর হৃদ্‌যন্ত্র সবল নয়, বয়সও হয়েছে প্রচুর । মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প কষ্ট পাচ্ছিলেন ; তারপর কাল হঠাৎ গুরুতর রকমের বাড়াবাড়ি হল । যাহোক, এখন সামলে গেছেন ।'

'উপস্থিত তাহলে মৃত্যুর আশঙ্কা নেই ?'

'তা বলতে পারি না । এ ধরনের রুগীর কথা কিছুই বলা যায় না ; দু' বছর বেঁচে থাকতে পারেন, আবার আজই দ্বিতীয় অ্যাটাক হতে পারে । তখন বাঁচা শক্ত ।'

'ডাক্তারবাবু, আপনার কি মনে হয় রামেশ্বরবাবুর যথারীতি সেবা-শুশ্রূষা হচ্ছে ?'

ডাক্তার কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আপনি যা ইঙ্গিত করছেন তা আমি বুঝেছি । এরকম ইঙ্গিতের সঙ্গত কারণ আছে কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি রামেশ্বরবাবুকেই চিনি, ওঁর পরিবারের অন্য কাউকে সেভাবে চিনি না । কিন্তু আজ দেখেশুনে আমার সন্দেহ হল, ওঁরা বাইরের লোককে রামেশ্বরবাবুর কাছে ঘেঁষতে দিতে চান না ।'

ডাক্তার বলিলেন, 'তা ঠিক । আপনি রামেশ্বরবাবুর ফ্যামিলিকে ভালভাবে চেনেন না । কিন্তু আমি চিনি । আশ্চর্য ফ্যামিলি । কারুর মাথার ঠিক নেই । রামেশ্বরবাবুর স্ত্রী কুমুদিনীর বয়স ষাট, অথর্ব মোটা হয়ে পড়েছেন ; কিন্তু এখনো পুতুল নিয়ে খেলা করেন, সংসারের কিছু দেখেন না । কুশেশ্বরটা ক্যাবলা, স্ত্রীর কথায় ওঠেবসে । একমাত্র কুশেশ্বরের স্ত্রী লাবণ্যর হুঁশ-পর্ব আছে, কাজেই অবস্থাগতিকে সে সংসারের কর্ণধার হয়ে দাঁড়িয়েছে ।'

'কিন্তু বাড়িতে চাকর-বামুন নেই কেন ?'

'লাবণ্য চাকর-বাকর সহ্য করতে পারে না, তাই সবাইকে তাড়িয়েছে । নিজে রাঁধতে পারে না, তাই একটা হাবা-কালা বাম্‌নী রেখেছে, বাকি সব কাজ নিজে করে । কুশেশ্বরকে বাজারে পাঠায় ।'

'কিন্তু কেন ? এসবের একটা মানে থাকা চাই তো ।'

ডাক্তার চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আমার বিশ্বাস, এসবের মূলে আছে নলিনী ।'

'নলিনী। রামেশ্বরবাবুর মেয়ে ?'

'হ্যাঁ। অনেক দিনের কথা, আপনি হয়তো শোনেননি। নলিনী বাড়ির সকলের মতের বিরুদ্ধে এক ছোকরাকে বিয়ে করেছিল, সেই থেকে তার ওপর সকলের আক্রোশ। সবচেয়ে বেশি আক্রোশ লাবণ্যর। রামেশ্বরবাবু প্রথমটা খুবই চটেছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁর রাগ পড়ে গেল। লাবণ্যর কিন্তু রাগ পড়ল না। সে নলিনীকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে চায় না, বাপের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। পাছে রামেশ্বরবাবু চাকর-বাকরকে দিয়ে মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন তাই তাদের সরিয়েছে। রামেশ্বরবাবু বলতে গেলে নিজের বাড়িতে নজরবন্দী হয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর সেবাশুশ্রূষার কোন ত্রুটি হয় না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, 'হুঁ, পরিস্থিতি কতকটা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, রামেশ্বরবাবু উইল করেছেন কিনা আপনি বলতে পারেন ?'

ডাক্তার সেন সচকিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, 'করেছেন। আমার বিশ্বাস তিনি উইল করে নলিনীকে সম্পত্তির অংশ দিয়ে গেছেন। আমি জানতাম না, কাল রাত্রে জানতে পেরেছি।'

'কি রকম ?'

'কাল রাত্রি দশটার সময় রামেশ্বরবাবুর হার্ট-অ্যাটাক হয় ; আমাকে ফোন করল, আমি গেলাম। ঘন্টাখানেক পরে রামেশ্বরবাবু সামলে উঠলেন। তখন আমি সকলকে খেতে পাঠিয়ে দিলাম। রামেশ্বরবাবু চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকালেন, তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'ডাক্তার, আমি উইল করেছি। যদি পটল তুলি, নলিনীকে খবর দিও।' এই সময়ে লাবণ্য আবার ঘরে ঢুকল আর কোন কথা হল না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'স্পষ্টই বোঝা যায় ওরা রামেশ্বরবাবুকে উইল করতে দিচ্ছে না, পাছে তিনি নলিনীকে সম্পত্তির অংশ লিখে দেন। উনি যদি উইল না করে মারা যান তাহলে সাধারণ উত্তরাধিকারের নিয়মে ছেলে আর স্ত্রী সম্পত্তি পাবে, মেয়ে কিছুই পাবে না—রামেশ্বরবাবুর বাঁধা উকিল কে ?'

ডাক্তার সেন বলিলেন, 'বাঁধা উকিল কেউ আছে বলে তো শুনিনি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। ভাল কথা, নলিনীর সাংসারিক অবস্থা কেমন ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'নেহাত ছা-পোষা গেরস্ত। ওর স্বামী দেবনাথ সামান্য চাকরি করে, তিন-চারশো টাকা মাইনে পায়। কিন্তু অনেকগুলি ছেলেপুলে—'

অতঃপর আমরা ডাক্তার সেনকে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া আসিলাম। রামেশ্বরবাবুর পারিবারিক জীবনের চিত্রটা আরও পূর্ণাঙ্গ হইল বটে, কিন্তু আনন্দদায়ক হইল না। বৃদ্ধ হাস্যরসিক, অন্তিমকালে সত্যই বিপাকে পড়িয়াছেন, অথচ তাঁহাকে সাহায্য করিবার উপায় নাই। ঘরের ঢেঁকি যদি কুমীর হয়, সে কি করিতে পারে ?

দিন আষ্টেক পরে একদিন দেখিলাম, সংবাদপত্রের পিছন দিকের পাতার এক কোণে রামেশ্বরবাবুর মৃত্যু-সংবাদ বাহির হইয়াছে। তিনি খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার টাকা ছিল, তাই বোধ হয় তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ দৈনিক পত্রের পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ব্যোমকেশ খবরের কাগজে কেবল বিজ্ঞাপন পড়ে, তাই তাহাকে খবরটা দেখাইলাম। আজ রমেশ্বরবাবুর নামোল্লেখে তাহার মুখে হাসি ফুটিল না, সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর পাশের ঘরে গিয়া টেলিফোনে কাহার সহিত কথা বলিল।

সে ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাকে ?'

সে বলিল, 'ডাক্তার অসীম সেনকে, পরশু রাত্রে রামেশ্বরবাবুর মৃত্যু হয়েছে। আবার হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল, ডাক্তার সেন উপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। ডাক্তার স্বাভাবিক মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়েছেন।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার কি সন্দেহ ছিল যে— ?'

সে বলিল, 'ঠিক সন্দেহ নয়। তবে কি জানো, এ রকম অবস্থায় একটু অসাবধানতা, একটু ইচ্ছাকৃত অবহেলা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। রামেশ্বরবাবু মারা গেলে ওদের কারুরই লোকসান নেই, বরং সকলেরই লাভ। এখন কথা হচ্ছে, তিনি যদি উইল করে গিয়ে থাকেন এবং তাতে নলিনীকে ভাগ দিয়ে থাকেন, তাহলে সে-উইল কি ওরা রাখবে ? পেলেই ছিঁড়ে ফেলে দেবে।'

সেদিন অপরাহ্ণে নলিনী ও তাহার স্বামী দেবনাথ দেখা করিতে আসিল।

নলিনীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি ; সন্তান-সৌভাগ্যের আধিক্যে শরীর কিছু কৃশ, কিন্তু যৌবনের অস্তলীলা দেহ হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। দেবনাথের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ ; এককালে সুশ্রী ছিল, হাত তুলিয়া আমাদের নমস্কার করিল।

নলিনী সজলচক্ষে বলিল, 'বাবা মারা গেছেন। তাঁর শেষ আদেশ আপনার সঙ্গে যেন দেখা করি। তাই এসেছি।'

ব্যোমকেশ তাহাদের সমাদর করিয়া বসাইল। সকলে উপবিষ্ট হইলে বলিল, 'রামেশ্বরবাবুর শেষ আদেশ কবে পেয়েছেন ?'

নলিনী বলিল, 'পয়লা বৈশাখ। এই দেখুন চিঠি।'

খামের উপর কলিকাতার অপেক্ষাকৃত দুর্গত অঞ্চলের ঠিকানা লেখা। চিঠিখানি ব্যোমকেশকে লিখিত চিঠির অনুরূপ সেই মনোগ্রাম করা কাগজ । চিঠি কিন্তু আরও সংক্ষিপ্ত—

কল্যাণীয়াষু,

তোমরা সকলে আমার নববর্ষের আশীর্বাদ লইও। যদি ভালোমন্দ কিছু হয়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বক্সী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
বাবা

পত্র রচনায় মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। কুশেশ্বর ও লাবণ্য যদি চিঠি খুলিয়া পড়িয়া থাকে, সন্দেহজনক কিছু পায় নাই। 'ভালোমন্দ কিছু হয়'—ইহার নিগূঢ় অর্থ যে নিজের মৃত্যু সম্ভাবনা তাহা সহসা ধরা যায় না, সাধারণ বিপদ-আপদও হইতে পারে। তাই তাহারা চিঠি আটকায় নাই।

চিঠি ফেরত দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'শেষবার কবে রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?'

নলিনী বলিল, 'ছ'-মাস আগে। পুজোর পর বাবাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলুম, সেই শেষ দেখা। তা বৌদি সারাক্ষণ কাছে দাঁড়িয়ে রইল, আড়ালে বাবার সঙ্গে একটা কথাও কইতে দিলে না।'

'বৌদির সঙ্গে আপনার সদ্ভাব নেই ?'

'সদ্ভাব ! বৌদি আমাকে পাঁশ পেড়ে কাটে।'

'কোন কারণ আছে কি ?'

'কারণ আর কি ! ননদ-ভাজ, এই কারণ। বৌদি বাঁজা, আমার মা ষষ্ঠীর কৃপায় ছেলেপুলে হয়েছে, এই কারণ।'

'ডাক্তার সেনের সঙ্গে সম্প্রতি আপনাদের দেখা হয়েছে ?'

'সেন-কাকা কাল সকালে আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, বাবা নাকি উইল করে গিয়েছেন।'

'সেই উইল কোথায় আপনারা জানেন ?'

'কি করে জানব ? বাবাকে ওরা একরকম বন্দী করে রেখেছিল। বাবা অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন, তেতলায় নিজের ঘর ছেড়ে বেরুতে পারতেন না ; ওরা যক্ষির মত বাবাকে আগলে থাকত।

বাবা যেসব চিঠি লিখতেন ওরা খুলে দেখত, যে-চিঠি ওদের পছন্দ নয় তা ছিঁড়ে ফেলে দিত। বাবা যদি উইল করেও থাকেন তা কি আর আছে ? বৌদি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'রামেশ্বরবাবু বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি যদি উইল করে গিয়ে থাকেন, নিশ্চয় এমন কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছেন যে সহজে কেউ খুঁজে পাবে না। এখন কাজ হচ্ছে ওরা সেটা খুঁজে পাবার আগে আমাদের খুঁজে বার করা।'

নলিনী সাগ্রহে বলিল, 'হ্যাঁ ব্যোমকেশবাবু। বাবা যদি উইল করে থাকেন নিশ্চয় আমাদের কিছু দিয়ে গেছেন, নইলে উইল করার কোন মানে হয় না। কিন্তু এ অবস্থায় কি করতে হয় আমরা কিছুই জানি না—' নলিনী কাতর নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিল।

এই সময় দেবনাথ গলা খাঁকারি দিয়া সর্বপ্রথম কিছু বলিবার উপক্রম করিল। ব্যোমকেশ তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইলে সে একটু অপ্রতিভভাবে বলিল, 'একটা কথা মনে হল। শুনেছি উইল করলে দু'জন সাক্ষীর দস্তখত দরকার হয়। কিন্তু আমার শ্বশুর দু'জন সাক্ষী কোথায় পাবেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কথা যথার্থ ; কিন্তু একটা ব্যতিক্রম আছে। যিনি উইল করেছেন তিনি যদি নিজের হাতে আগাগোড়া উইল লেখেন তাহলে সাক্ষীর দরকার হয় না।'

নলিনী উজ্জ্বল চোখে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, 'শুনলে ? এই জন্যে বাবা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। —ব্যোমকেশবাবু, আপনি একটা উপায় করুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চেষ্টা করব। উইল বাড়িতেই আছে, বাড়ি সার্চ করতে হবে। কিন্তু ওরা যাকে-তাকে বাড়ি সার্চ করতে দেবে কেন ? পুলিসের সাহায্য নিতে হবে। ডাক্তার অসীম সেনকেও দরকার হবে। দু'-চার দিন সময় লাগবে। আপনারা বাড়ি যান, যা করবার আমি করছি। উইলের অস্তিত্ব যদি থাকে, আমি খুঁজে বার করব।'

ব্যোমকেশ যখন সরকারী মহলে দেখাশুনা করিতে যাইত, আমাকে সঙ্গে লইত না। আমারও সরকারী অফিসের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালো লাগিত না।

দুই দিন ব্যোমকেশ কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইল জানি না। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'সব ঠিক হয়ে গেছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী ঠিক হয়ে গেছে ?'

সে বলিল, 'খানাতল্লাশের পরোয়ানা পাওয়া গেছে। কাল সকালে পুলিস সঙ্গে নিয়ে আমরা রামেশ্বরবাবুর বাড়ি সার্চ করতে যাব।'

পরদিন সকালবেলা আমরা রামেশ্বরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে পাঁচ-ছয় জন পুলিসের লোক এবং ইন্সপেক্টর হালদার নামক জনৈক অফিসার।

কুশেশ্বর প্রথমটা একটু লম্ফঝম্প করিল, তাহার স্ত্রী লাবণ্য আমাদের নয়নবহ্নিতে ভস্ম করিবার নিস্ফল চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ইন্সপেক্টর হালদার তাহাদের এবং বিধবা কুমুদিনীকে একজন পুলিসের জিম্মায় রান্নাঘরে বসাইয়া তল্লাশ আরম্ভ করিলেন। ত্রিতল বাড়ির কোনও তলই বাদ দেওয়া হইল না ; দুইজন নীচের তলা তল্লাশ করিল, দুইজন দ্বিতলে কুশেশ্বর ও লাবণ্যর ঘরগুলি অনুসন্ধানের ভার লইল, ব্যোমকেশ, ইন্সপেক্টর হালদার ও আমি তিনতলায় গেলাম। রামেশ্বরবাবু তিনতলায় থাকিতেন, সুতরাং সেখানেই উইল পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশি।

দুইটি ঘর লইয়া তিনতলা। ছোট ঘরটি গৃহিণীর শয়নকক্ষ, বড় ঘরটি একাধারে রামেশ্বরবাবুর শয়নকক্ষ এবং অফিস-ঘর। এক পাশে তাঁহাদের শয়নের পালঙ্ক, অন্য পাশে টেবিল চেয়ার বইয়ের আলমারি প্রভৃতি। এই ঘর হইতে একটি সরু দরজা দিয়া স্নানের ঘরে যাইবার রাস্তা।

আমরা তল্লাশ আরম্ভ করিলাম। তল্লাশের বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন নাই। দুইটি ঘরের বহু আসবাব, খাট বিছানা টেবিল চেয়ার আলমারির ভিতর হইতে এক টুকরা কাগজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, সুতরাং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই তল্লাশ করা হইল। তল্লাশ করিতে করিতে একটি তথ্য

আবিষ্কার করিলাম ; আমাদের পূর্বে আর একদফা তল্লাশ হইয়া গিয়াছে। কুশেশ্বর এবং তাহার স্ত্রী উইলের খোঁজ করিয়াছে।

ব্যোমকেশ আমার কথা শুনিয়া বলিল, 'হুঁ। এখন কথা হচ্ছে ওরা খুঁজে পেয়েছে কিনা।'

আড়াই ঘণ্টা পরে আমরা ক্লান্তভাবে টেবিলের কাছে আসিয়া বসিলাম। টেবিলের এক পাশে একটি পিতলের ছোট্ট হামানদিস্তা ছিল, রামেশ্বরবাবু তাহাতে পান ছেঁচিয়া খাইতেন ; ব্যোমকেশবাবু সেটা সামনে টানিয়া আনিয়া অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। ইতিপূর্বে, নিম্নতলে যাহারা তল্লাশ করিতেছিল তাহারা জানাইয়া গিয়াছে যে সেখানে কিছু পাওয়া যায় নাই।

ইন্সপেক্টর হালদার বলিল, 'তেতলায় নেই। তার মানে রামেশ্বরবাবু উইল করেননি, কিংবা ওরা আগেই উইল খুঁজে পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উইল করা সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু—'

এই সময় ইন্সপেক্টর হালদার অলস হস্তে গঁদের শিশির ঢাকনা তুলিলেন।

টেবিলের উপর কাগজ কলম লেফাফা পিন-কুশন গঁদের শিশি প্রভৃতি সাজানো ছিল, আমরা পূর্বেই টেবিল ও তাহার দেরাজগুলি খুঁজিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু গঁদের শিশির ঢাকনা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিল।

কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ !

ব্যোমকেশ খাড়া হইয়া বসিল, 'কিসের গন্ধ ! কাঁচা পেঁয়াজ ! দেখি।'

গঁদের শিশি কাছে টানিয়া লইয়া সে গভীরভাবে তাহার ঘ্রাণ লইল। শিশি কাত করিয়া দেখিল, ভিতরে গাঢ় শ্বেতাভ পদার্থ দেখিয়া গঁদের আঠা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহাতে পেঁয়াজের গন্ধ কেন ? কোথা হইতে পেঁয়াজ আসিল ?

গঁদের শিশি হাতে লইয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিশ্চল বসিয়া রহিল। নিশ্চলতার অন্তরালে প্রচণ্ড মানসিক ক্রিয়া চলিতেছে তাহা তাহার চোখের তীব্র-প্রখর দৃষ্টি হইতে অনুমান করা হয়। আমি ইন্সপেক্টর হালদারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। পেঁয়াজ-গন্ধী গঁদের শিশির মধ্যে ব্যোমকেশ কোন্ রহস্যের সন্ধান পাইল !

'ইন্সপেক্টর হালদার, দয়া করে একবার কুশেশ্বরের স্ত্রীকে ডেকে আনবেন ?'

অল্পক্ষণ পরে লাবণ্য প্রতি পদক্ষেপে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিল। ব্যোমকেশ উঠিয়া নিজের চেয়ার নির্দেশ করিয়া বলিল, 'বসুন। আপনাকে একটা প্রশ্ন করব।'

লাবণ্য উপবেশন করিল। তাহার চোয়ালের হাড় শক্ত, চক্ষে কঠিন সন্দিগ্ধতা। তিনজন অপরিচিত পুরুষ দেখিয়াও তাহার দৃষ্টি নরম হইল না।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আপনার শ্বশুরমশায় কি কাঁচা পেঁয়াজ খেতে ভালোবাসতেন ?'

লাবণ্য চকিতভাবে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, তাহার মুখের বিদ্রোহ অনেকটা প্রশমিত হইল। সে বলিল, 'ভালোবাসতেন না, কিন্তু যাবার কিছুদিন আগে কাঁচা পেঁয়াজের ওপর লোভ হয়েছিল। ভীমরতি অবস্থা হয়েছিল, তার ওপর একটিও দাঁত ছিল না ; হামানদিস্তায় পেঁয়াজ ছেঁচে তাই খেতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ও। মৃত্যুর কতদিন আগে পেঁয়াজের বাতিক হয়েছিল ?'

লাবণ্য ভাবিয়া বলিল, 'দশ-বারো দিন আগে। চৈত্র মাসের শেষের দিকে।'

ব্যোমকেশ সহাস্যে হাত জোড় করিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ। আপনাদের মিছে কষ্ট দিলাম, সেজন্য ক্ষমা করবেন। চল অজিত, চলুন ইন্সপেক্টর হালদার। এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে।'

কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাজ শেষ হইল কিছুই বুঝিলাম না, আমরা গুটি গুটি বাহির হইয়া আসিলাম। ফুটপাথে নামিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্সপেক্টর হালদার, আপনি চলুন আমাদের বাসায়। আপনার সঙ্গীদের আর দরকার হবে না।'

বাসায় পৌঁছিয়া সে আমাকে প্রশ্ন করিল, 'অজিত, নববর্ষে রামেশ্বরবাবু আমাকে যে চিঠি

লিখেছিলেন, সেটা কোথায় ?'

এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলাম, 'আমি তো সে-চিঠি আর দেখিনি। এইখানেই কোথাও আছে, যাবে কোথায়।'

আমাদের ব্যক্তিগত চিঠির কোনও ফাইল নাই, চিঠি পড়া হইয়া গেলে কিছু দিন যত্রতত্র পড়িয়া থাকে, তারপর পুঁটিরাম ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দেয়।

ব্যোমকেশ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিল, 'দ্যাখো—খুঁজে দ্যাখো, চিঠিখানা ভীষণ জরুরী। রামেশ্বরবাবু তাতে লিখেছিলেন—আমার এই চিঠিখানির প্রতি অবজ্ঞা দেখাইবেন না। তখন ও-কথায় মানে বুঝিনি—'

ইন্সপেক্টর হালদার বলিলেন, 'কিন্তু কথাটা কি ? ও-চিঠিখানা হঠাৎ এত জরুরী হয়ে উঠল কি করে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝতে পারলেন না ! ওই চিঠিখানাই রামেশ্বরবাবুর উইল।'

'অ্যাঁ ! সেকি !'

'হ্যাঁ। আজ গঁদের শিশিতে পেঁয়াজের রস দেখে বুঝতে পারলাম। রামেশ্বরবাবু অদৃশ্য কালি দিয়ে উইল লিখে আমাকে পাঠিয়েছিলেন।'

'কিন্তু—অদৃশ্য কালি—'

'পরে বলব। অজিত, চারিদিকে খুঁজে দ্যাখো, পুঁটিরামকে ডাকো। ও-চিঠি যদি না পাওয়া যায়, নলিনী আর দেবনাথের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

পুঁটিরামকে ডাকা হইল, সে কিছু বলিতে পারিল না। ব্যোমকেশ মাথায় হাত দিয়া বসিল, তারপর পাংশু মুখ তুলিয়া বলিলল 'থামো, থামো। বাইরে খুঁজলে হবে না, মনের মধ্যে খুঁজতে হবে।'

ইজি-চেয়ারে পা ছড়াইয়া শুইয়া সে সিগারেট ধরাইল, কড়িকাঠের পানে চোখ তুলিয়া ঘন ঘন ধূম উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল।

আমরাও সিগারেট ধরাইলাম।

পনরো মিনিট পরে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,'সেদিন আমি কোন্ বই পড়ছিলাম মনে আছে ?'

বলিলাম, 'কবে ? কোন্ দিন ?'

'যেদিন রামেশ্বরবাবুর চিঠিখানা এল। পয়লা বৈশাখ, বিকেলবেলা। মনে নেই ?'

মনের পটে সেদিনের দৃশ্যটি আঁকিবার চেষ্টা করিলাম। পোস্টম্যান দ্বারে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিল ; ব্যোমকেশ তক্তপোশে পদ্মাসনে বসিয়া একটা মোটা বই পড়িতেছিল ; কালী সিংহের মহাভারত, না হেমচন্দ্র-কৃত রামায়ণ ?

ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড ! পিতামহ ভীষ্মের কথা উঠল মনে নেই ?'

ছুটিয়া গিয়া শেলফ হইতে মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিলাম। পাতা খুলিতেই খামসমেত রামেশ্বরবাবুর চিঠি বাহির হইয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'পাওয়া গেছে ! পাওয়া গেছে !—পুঁটিরাম, একটা আংটায় কয়লার আগুন তৈরি করে নিয়ে এস।'

ব্যোমকেশের টেলিফোন পাইয়া ডাক্তার অসীম সেন আসিয়াছেন নলিনী ও দেবনাথকে সঙ্গে লইয়া। ঘরের মেঝেয় আগুনের আংটা ঘরের বাতাবরণকে আরও উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ব্যোমকেশ চিঠিখানি সযত্নে হাতে ধরিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

'রামেশ্বরবাবু হাস্যরসিক ছিলেন, উপরন্তু মহা বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর শরীর অসমর্থ হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, তিনি ছেলে আর পুত্রবধূর হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিলেন।

'তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছে, তখন তাঁর ইচ্ছা হল মেয়েকেও কিছু ভাগ দিয়ে যাবেন। কিন্তু মেয়েকে সম্পত্তির ভাগ দিতে গেলে উইল করতে হয়, বর্তমান আইন অনুসারে মেয়ের পিতৃ-সম্পত্তির ওপর কোনো স্বাভাবিক দাবি নেই। রামেশ্বরবাবু স্থির করলেন তিনি উইল করবেন।

'কিন্তু শুধু উইল করলেই তো হয় না ; তাঁর মৃত্যুর পর উইল যে বিদ্যমান থাকবে তার স্থিরতা কি ? কুশেশ্বর আর লাবণ্য সম্পত্তির ভাগ নলিনীকে দেবে না, তারা নলিনীকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তারা নলিনীকে বাপের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না, সর্বদা রামেশ্বরবাবুকে আগলে থাকে ; তিনি যে-সব চিঠি লেখেন তা খুলে তদারক করে, চিঠিতে সন্দেহজনক কোনো কথা থাকলে, চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

'তবে উপায় ? রামেশ্বরবাবু বুদ্ধি খেলিয়ে উপায় বার করলেন। সকলে জানে না, পেঁয়াজের রস দিয়ে চিঠি লিখলে কাগজের ওপর দাগ পড়ে না, লেখা অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু ওই অদৃশ্য লেখা ফুটিয়ে তোলবার উপায় আছে, খুব সহজ উপায়। কাগজটা আগুনে তাতালেই অদৃশ্য লেখা ফুটে ওঠে। আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন ম্যাজিক দেখানোর শখ ছিল ; অনেকবার সহপাঠীদের এই ম্যাজিক দেখিয়েছি।

'রামেশ্বরবাবু এই ম্যাজিক জানতেন। তিনি আবদার ধরলেন, কাঁচা পেঁয়াজ খাবেন। তাঁর ছেলে-বৌ ভাবল ভীমরতির খেয়াল ; তারা আপত্তি করল না। রামেশ্বরবাবু হামানদিস্তায় পান ছেঁচে খেতেন ; তাঁর পান খাওয়ার শখ ছিল, কিন্তু দাঁত ছিল না। পেঁয়াজ হাতে পেয়ে তিনি হামানদিস্তায় থেঁতো করলেন ; গঁদের শিশি থেকে গঁদ ফেলে দিয়ে তাতে পেঁয়াজের রস সঞ্চয় করে রাখলেন। কেউ জানতে পারল না। তাঁর প্রাণে হাস্যরস ছিল ; এই কাজ করবার সময় তিনি নিশ্চয় মনে মনে খুব হেসেছিলেন।

'পয়লা বৈশাখ তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখতেন। এবার নববর্ষ সমাগত দেখে তিনি চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। আমাকে প্রতি বছর চিঠি লেখেন, এবারও লিখলেন ; তারপর চিঠির পিঠে অদৃশ্য পেঁয়াজের রস দিয়ে উইল লিখলেন। এই সেই চিঠি আর উইল।'

ব্যোমকেশ খাম খুলিয়া সাবধানে চিঠি বাহির করিল, চিঠির ভাঁজ খুলিয়া দুই হাতে তাহার দুই প্রান্ত ধরিয়া আংটার আগুনের উপর ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। আমরা শ্বাস রুদ্ধ করিয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিলাম।

এক মিনিট রুদ্ধশ্বাসে থাকিবার পর আমাদের সমবেত নাসিকা হইতে সশব্দ নিশ্বাস বাহির হইল। কাগজের পিঠে বাদামী রঙের অক্ষর ফুটিয়া উঠিতেছে।

পাঁচ মিনিট পরে কাগজখানি আগুনের উপর হইতে সরাইয়া ব্যোমকেশ একবার তাহার উপর চোখ বুলাইল, তারপর তাহা ডাক্তার সেনের দিকে বাড়াইয়া বলিল, 'ডাক্তার সেন, রামেশ্বরবাবু আপনাকে যে উইলের কথা বলেছিলেন, এই সেই উইল।—পড়ুন, আমরা সবাই শুনব।'

ডাক্তার সেন একবার উইলটা মনে মনে পড়িলেন, তাঁহার মুখে স্মরণাত্মক হাসি ফুটিয়া উঠিল। তারপর তিনি গলা পরিষ্কার করিয়া মন্দ্রকণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

নমো ভগবতে বাসুদেবায়। আমি শ্রীরামেশ্বর রায়, সাকিম ১৭ নং শ্যামধন মিত্রের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, অদ্য সুস্থ শরীরে এবং বাহাল তবিয়তে আমার শেষ উইল লিখিতেছি। অবস্থাগতিকে উইলের সাক্ষী যোগাড় করা সম্ভব হইল না, তাই নিজ হস্তে আগাগোড়া উইল লিখিতেছি। আমার বুদ্ধিভ্রংশ বা মস্তিষ্ক বিকার হয় নাই, ডাক্তার অসীম সেন তাহার সাক্ষী। এখন আমার শেষ ইচ্ছা অর্থাৎ Last will and testament লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কলিকাতায় আমার যে আটটি বাড়ি আছে এবং ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে, তন্মধ্যে হ্যারিসন রোডের বাড়ি এবং নগদ পঁচাত্তর হাজার টাকা আমার কন্যা শ্রীমতী নলিনী পাইবে। আমার স্ত্রী শ্রীমতী কুমুদিনী যাবজ্জীবন আমার শ্যামপুকুরের বাড়ির উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। তাঁহার মৃত্যুর

পর ওই বাড়ি আমার কন্যা নলিনীকে অর্সিবে। আমার বাকী যাবতীয় সম্পত্তি, ছয়টি বাড়ি এবং ব্যাঙ্কের টাকা পাইবে আমার পুত্র শ্রীকুশেশ্বর রায়। স্বনামধন্য সত্যান্বেষী শ্রীব্যোমকেশ বক্সী ও বিখ্যাত ডাক্তার অসীম সেনকে আমার উইলের এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিয়া যাইতেছি ; তাঁহারা যথানির্দেশ ব্যবস্থা করিবেন এবং আমার এস্টেট হইতে প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন।

তারিখ পয়লা বৈশাখ স্বাক্ষর বকলম খাস
১৩৬০ শ্রীরামেশ্বর রায়

উইল পড়া শেষ হইলে কেহ কিছুক্ষণ কথা কহিল না, তারপর আমরা সকলে একসঙ্গে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলাম। নলিনী গলদশ্রু নেত্রে ছুটিয়া আসিয়া ব্যোমকেশের পদধূলি লইল। গদগদ স্বরে বলিল, 'আপনি আমাদের নতুন জীবন দিলেন।'

ব্যোমকেশ করুণ হাসিয়া বলিল, 'তা তো দিলাম। কিন্তু এ উইল কোর্টে মঞ্জুর করানো যাবে কি ?'

ইন্সপেক্টর হালদার আসিয়া সবেগে ব্যোমকেশের করমর্দন করিলেন, বলিলেন, 'আপনি ভাববেন না। ওরা উইল contest করতে সাহস করবে না। যদি করে আমি সাক্ষী দেব।'

ডাক্তার অসীম সেন বলিলেন, 'আমিও।'

অদ্বিতীয়

এক

প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধানে ব্যোমকেশের সহিত যখন সত্যবতীর দাম্পত্য কলহ বাধিয়া যাইত, তখন আমি নিরপেক্ষভাবে বসিয়া তাহা উপভোগ করিতাম। কিন্তু দাম্পত্য কলহে যখন স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতির আপেক্ষিক উৎকর্ষের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িত তখন বাধ্য হইয়া আমাকে ব্যোমকেশের পক্ষ অবলম্বন করিতে হইত। তবু দুই বন্ধু একজোট হইয়াও সব সময় সত্যবতীর সহিত আঁটিয়া উঠিতাম না। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে পুরুষজাতির দুষ্কৃতির নজির এত অপর্যাপ্ত লিপিবদ্ধ হইয়া আছে যে, তাহা খণ্ডন করা এক প্রকার অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত আমাদের রণে ভঙ্গ দিতে হইত।

কিছুকাল হইতে কলিকাতা শহরে এক নূতন উৎপাতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, একদিন শীতের সকালবেলা সংবাদপত্র সহযোগে চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ ও আমি তাহাই আলোচনা করিতেছিলাম। যে ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রক্রিয়া মোটামুটি এইরূপ : কখনও একটি, কখনও বা একাধিক ভদ্রশ্রেণীর যুবতী তাক্ বুঝিয়া দুপুরবেলা বাহির হয়। পুরুষেরা তখন কাজে গিয়াছে, বাড়িতে মেয়েরা আহারাদি সম্পন্ন করিয়া দিবানিদ্রার উদ্যোগ করিতেছে। এই সময় যুবতীরা গিয়া দরজায় টোকা মারে। বাড়ির গৃহিণী যদি সতর্ক হন, তিনি দ্বার না খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করেন, 'কে ?' একটি যুবতী বাহির হইতে বলে, 'চিকনের কাজ করা ভাল সায়া-ব্লাউজ এনেছি, দাম খুব সস্তা—কিনবেন ?' গৃহিণী ভাবেন ফেরিওয়ালী, তিনি দ্বার খুলিয়া দেন। অমনি যুবতীরা ঘরে ঢুকিয়া পড়ে, ছুরি বা পিস্তল দেখাইয়া টাকাকড়ি গহনাপত্র কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে।

এই ধরনের ঘটনা পূর্বে কয়েকবার ঘটিয়া গিয়াছে, আসামীরা ধরা পড়ে নাই। সেদিন কাগজ খুলিয়া দেখি অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে আগের দিন দুপুরবেলা কাশীপুরের একটি গৃহস্থের বাড়িতে। ব্যোমকেশকে খবরটি পড়িয়া শুনাইলাম। সে একটু বঙ্কিম হাসিয়া বলিল, 'এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ! মেয়েরা তো দুপুরে ডাকাতি করেই থাকে।'

এই সময় সত্যবতী ঘরে প্রবেশ করিল। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশের পানে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'আহা ! মেয়েরা দুপুরে ডাকাতি করে, আর তোমরা সব সাধুপুরুষ।'

ব্যোমকেশ সত্যবতীকে শুনাইবার জন্য কথাটা বলে নাই ; কিন্তু সত্যবতী যখন শুনিয়া ফেলিয়াছে এবং জবাব দিয়াছে তখন আর পশ্চাৎপদ হওয়া চলে না। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা সবাই সাধুপুরুষ এমন কথা বলিনি। কিন্তু তোমরাও কম যাও না।'

সুতরাং তর্ক আরম্ভ হইয়া গেল। সত্যবতী তক্তপোশের কিনারায় বসিল, বলিল, 'মেয়েদের নিন্দে করা তোমাদের স্বভাব। মেয়েরা কী করেছে শুনি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশি কিছু নয়, দুপুরে ডাকাতি।'

আমি খবরের কাগজ হইতে দুপুরে ডাকাতির অংশটা পড়িয়া শুনাইলাম। সত্যবতী বলিল, বেশ, মেনে নিলাম, ওরা দোষ করেছে, পেটের দায়ে অন্যায় করেছে। কিন্তু তোমরা যে খুন-জখম করছ, যুদ্ধ বাধিয়ে হাজার হাজার লোক মারছ, তার বেলা কিছু নয় ? তোমাদের

তুলনায় মেয়েরা ক'টা খুন করেছে !'

বেগতিক দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমরা এতদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ ছিলে তাই বিশেষ সুবিধে করতে পারনি ; এখন স্বাধীনতা পেয়ে তোমাদের বিক্রম বেড়েছে, ক্রমে আরো বাড়বে। বঙ্কিমচন্দ্র কতকাল আগে দেবী চৌধুরানীর কথা লিখে গেছেন। দেবী চৌধুরানী সেকেলে মেয়ে ছিল, তাতেই এই। যদি একালের মেয়ে হত তাহলে কী কাণ্ডটা হত ভেবে দেখ অজিত !'

সত্যবতী হাত নাড়িয়া বলিল, 'ওসব বাজে কথা বলে আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। সত্যিকার ক'টা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারো যেখানে মেয়েমানুষ খুন করেছে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যিকারের দৃষ্টান্ত চাও ! আরে এই তো সেদিন—বড়জোর মাস দুই হবে—জেনানা ফাটকের এক বন্দিনী জেলখানার গার্ডকে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়েছে।'

সত্যবতী হাসিয়া উঠিল, 'দু'মাস আগে একটা মেয়ে একটা খুন করেছিল। এই দু' মাসের মধ্যে তোমরা ক'টা খুন করেছ তার হিসেব দাও দেখি।'

আজিকার কাগজেও একটা পুরুষ-কৃত খুনের খবর ছিল কিন্তু আমি তাহা চাপিয়া গেলাম : তৎপরিবর্তে বলিলাম, 'আজকের কাগজে স্ত্রীজাতির নৃশংতার একটা গুরুতর দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটা ধোপা এক মহিলার দামী সিল্কের শাড়িতে খোঁচ লাগিয়েছিল, মহিলাটি বঁটি দিয়ে তার নাক কেটে নিয়েছেন। ধোপার অবস্থা শোচনীয়, হাসপাতালে আছে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ।'

সত্যবতী নির্দয় হাসিয়া বলিল,'মিছে কথা বলতেও তোমাদের জোড়া নেই। তোমরা সবাই মিথ্যেবাদী চোর ডাকাত খুনী—'

আমাদের তর্ক কতদূর গড়াইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় বহির্দ্বারের কড়া খটখট শব্দে নড়িয়া উঠিল। সত্যবতী বিজয়িনীর ন্যায় উন্নত মস্তকে ভিতরে চলিয়া গেল। আমি দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, ডাকপিওন ; একটা পুরুষ্টুগোছের লম্বা খাম দিয়া চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশের নামে খাম, প্রেরকের উল্লেখ নাই। তাহাকে খাম আনিয়া দিলে সে শঙ্কিতভাবে উহা টিপিয়া-টুপিয়া বলিল, 'নবীন লেখকের পাণ্ডুলিপি মনে হচ্ছে। প্রভাতের কাছে পাঠিয়ে দাও।'

আমরা পুস্তক প্রকাশকের ব্যবসায় শরিক হইয়া পড়িবার পর হইতে উৎসাহশীল নবীন লেখকেরা প্রায়ই আমাদের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া থাকেন, তাই ব্যোমকেশ মোটা খামের চিঠি দেখিলেই তটস্থ হইয়া ওঠে।

বলিলাম, 'পাণ্ডুলিপি নাও হতে পারে। খুলেই দেখ না।'

সে বলিল, 'তুমি খুলে দেখ।'

খাম খুলিলাম। পাণ্ডুলিপি নয় বটে, কিন্তু ব্যোমকেশকে কেহ লম্বা চিঠি লিখিয়াছে ; প্রায় একটা ছোটগল্পের শামিল। ব্যোমকেশ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া তক্তপোশের উপর লম্বা হইল, বলিল, 'প্রেমপত্র নয় নিশ্চয়। সুতরাং তুমি পড়, আমি শুনি।'

তক্তপোশের পাশে চেয়ার টানিয়া আমি চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। হাতের লেখা খুব স্পষ্ট নয়, একটু কষ্ট করিয়া পড়িতে হয় ; কিন্তু ভাষা বেশ ঝরঝরে—

শ্রীব্যোমকেশ বক্সী মহাশয় সমীপে

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

আমার নাম শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডু। পুলিস আমাকে খুনের মামলায় জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, তাই নিরুপায় হইয়া আপনার শরণ লইয়াছি। শক্তি থাকিলে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতাম, আমার বক্তব্য মুখে বলিলে আরও পরিষ্কার হইত। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ আমি পক্ষাঘাত রোগে পঙ্গু হইয়াছি, আমার বাম অঙ্গ অচল হইয়া পড়িয়াছে ; ঘরের মধ্যে অল্প চলা ফেরা করিতে পারি মাত্র। তাই বাধ্য হইয়া পত্র লিখিতেছি।

যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা বিবৃত করিবার পূর্বে আমার নিজের পরিচয় কিছু জানাইতে

ইচ্ছা করি। আমার বয়স এখন সাতান্ন বৎসর ; স্ত্রী-পুত্র নাই, কেবল তিনটি বাড়ি আছে। বাড়িগুলি ভাড়া দিয়াছি, তন্মধ্যে একটি বাড়ির দ্বিতলে দুইটি ঘর লইয়া আমি থাকি। ভৃত্য রামাধীন আমার পরিচর্যা করে।

শিরোনামায় ঠিকানা দেখিয়া বুঝিবেন আমি কলিকাতার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে থাকি। রাস্তাটি বেশ চওড়া ; যে-বাড়িতে আমি থাকি সেটি রাস্তার এক দিকে, আমার অন্য বাড়ি দু'টি প্রায় তাহার সামনাসামনি, রাস্তার অপর দিকে। এই বাড়ি দু'টি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং একতলা ; ইহাদের যমজ বাড়ি বলিতে পারেন। দু'টি বাড়ির মাঝখান দিয়া খিড়কির দিকে যাইবার সরু গলি আছে।

আমি রোগে পঙ্গু; দু'টি ঘরের মধ্যেই আমার জীবন। পক্ষাঘাত হওয়ার আগে আমি দালালি করিতাম, অনেক ছুটাছুটি করিয়াছি ; ছুটাছুটি করিতেই আমি অভ্যস্ত। তাই এখন সারা বেলা জানালার সামনে বসিয়া থাকি, রাস্তার লোক চলাচল দেখি। একটি বাইনোকুলার কিনিয়াছি, তাহাই চোখে দিয়া দূরের দৃশ্য দেখি। বাইনোকুলার দিয়া অনেক বাড়ির ভিতরের দৃশ্যও দেখা যায় ; আমার যমজ বাড়ির ভাড়াটেদের উপর নজর রাখিতে পারি। যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা সিনেমা থিয়েটার দেখে ; আমি জানালায় বসিয়া সাদা চোখে প্রবহমান জীবনস্রোত দেখি এবং চোখে দূরবীন লাগাইয়া নেপথ্যদৃশ্য দেখি। কত বিচিত্র দৃশ্য যে দেখিয়াছি শুনিলে আশ্চর্য হইয়া যাইবেন। কিন্তু সে-কথা যাক।

মাস দেড়েক আগে পৌষ মাসের মাঝামাঝি একটি ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। বেঁটে-খাটো চেহারা, ঘাড়ে-ছাঁটা তামাটে রঙের চুল, তরতরে মুখ, নাকের নীচে ছোট্ট একটি প্রজাপতি-গোঁফ আছে। পরিধানে দামী বিলাতি পোশাক, তাহার উপর ক্যামেলহেয়ার কাপড়ের ওভারকোট। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে বলিল, 'আমার নাম তপন সেন। আসতে পারি ?'

আমি তখন জানালার কাছে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, মুখ তুলিয়া বলিলাম; 'আসুন।'

তপন সেন আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া আমার সম্মুখে বসিল। আমি বলিলাম, 'কি দরকার বলুন তো ?'

সে জানালার বাহিরে আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'আপনার জোড়া-বাড়ির একটা বাড়ি খালি হয়েছে। তাই এলাম, যদি আমাকে ভাড়া দেন।'

বাড়িটা কিছুদিন হইতে খালি পড়িয়া ছিল। আগের ভাড়াটে বাড়ি তছনছ করিয়া দিয়াছিল, আবার তাহা মেরামত ও চুনকাম করাইয়া রাখিয়াছিলাম ; ঠিক করিয়াছিলাম ভাল ভাড়াটে না পাইলে ভাড়া দিব না। ছোকরাকে দেখিয়া শুনিয়া ভালই মনে হইল, সাজপোশাক হইতে অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার কি করা হয় ?'

সে ওভারকোটের পকেট হইতে সিগারেটের কৌটা বাহির করিয়া আবার রাখিয়া দিল ; বোধ হয় আমার ন্যায় বয়োবৃদ্ধের প্রতি সম্ভ্রমবশতই সিগারেট ধরাইল না। বলিল, 'খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করি। নাইট এডিটার। সারা রাত কাজ করি আর সারা দিন ঘুমোই।' বলিয়া একটু হাসিল।

প্রশ্ন করিলাম, 'সংসারে কে কে আছে ?'

সে স্মিতমুখে বলিল, 'সবেমাত্র সংসার আরম্ভ করেছি। আমি আর আমার স্ত্রী। আর কেউ নেই।'

মনে মনে খুশি হইলাম। ছেলেপিলে থাকিলে বাড়ি নষ্ট করে, দেয়ালে কালি দিয়া ছবি আঁকে। বলিলাম, 'বেশ, আপনাকে ভাড়া দেব। দেড় শো টাকা ভাড়া।'

সে ইতস্তত করিয়া বলিল, 'আমার পক্ষে একটু বেশি হয়ে যায়—'

বলিলাম, 'সাজানো বাড়ি। খাট-বিছানা টেবিল-চেয়ার কাবার্ড সব পাবেন।'

'আচ্ছা, তাহলে রাজী। বাড়িটা একবার দেখতে পারি কি ?'

চাবি দিলাম, তপন সেন গিয়া বাড়ি দেখিয়া আসিল। তারপর দেড় শো টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, 'এই নিন এক মাসের ভাড়া।'

আমি টাকার রসিদ লিখিয়া দিয়া বলিলাম, 'কবে থেকে বাড়িতে আসবেন ?'

সে বলিল, 'কাল ইংরেজি মাসের পয়লা। বাড়ি তো খালিই পড়ে আছে, যদি অনুমতি দেন আজই কোনো সময় আসতে পারি।'

বলিলাম, 'বেশ, যখন ইচ্ছে আসবেন।'

তপন সেন চাবি লইয়া চলিয়া গেল। ভাল ভাড়াটে পাইয়াছি ভাবিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইলাম।

সেদিন সারা বিকালবেলা জানালায় বসিয়া বাড়ির দিকে তাকাইয়া রহিলাম, কিন্তু তপন তাহার স্ত্রীকে লইয়া আসিল না।

সকালবেলা জানালা খুলিয়া দেখি উহারা আসিয়াছে। সদর দরজা খোলা। নিশ্চয় রাত্রে কোনো সময় মালপত্র লইয়া আসিয়াছে।

আমার কৌতূহলী চক্ষু ওই দিকেই যাতায়াত করিতে লাগিল। বেলা সাড়ে ন'টার সময় একটি যুবতী আসিয়া ভিতর দিক হইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর কয়েক মিনিট গত হইলে খিড়কি দরজার গলি দিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

তখন তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। লম্বা ছিমছাম চেহারা, মাথায় একমাথা চুল এলো খোঁপার আকারে ঘাড়ের উপর বিন্যস্ত, হাতে একটি ছোট অ্যাটাচি-কেস। ভাবিলাম, সারা রাত কাজ করিয়া তখন ঘুমাইতেছে, তাই তার বউ বাজার করিতে চলিয়াছে।

কিন্তু দুপুর কাটিয়া গেল সে ফিরিয়া আসিল না। একেবারে ফিরিল অপরাহ্ণে আন্দাজ চারটার সময়। সদর দরজার কড়া নাড়িল না, গলি দিয়া খিড়কির দিকে চলিয়া গেল। বোধ হয় স্বামী মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ করিতে চায় না।

কিছুক্ষণ পরে আমি রামাধীনকে পাঠাইলাম। নূতন ভাড়াটে, তাহাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ-খবর লওয়া দরকার। জানালায় বসিয়া দেখিলাম রামাধীন গিয়া দ্বারের কড়া নাড়িল। মেয়েটি দ্বার খুলিয়া দিল। রামাধীনের সহিত কথা বলিয়া মেয়েটি একবার চোখ তুলিয়া আমার জানালার পানে চাহিল, তারপর রামাধীনের সঙ্গে দ্বিতলে আমার কাছে উঠিয়া আসিল।

দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, এখন কাছে হইতে দেখিলাম। ভারী সুশ্রী চেহারা, লম্বা একহারা, মেদ-গ্রন্থির বাহুল্য নাই ; বাঁ গালের উপর মসুরের মত একটি লাল তিল, তাহাতে মুখের লালিত্য আরও বাড়িয়াছে। একটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম, স্বামী-স্ত্রীর বয়স প্রায় একই রকম—তেইশ-চব্বিশ। হয়তো প্রেমে পড়িয়া বিবাহ করিয়াছে। আজকাল তো কতই এমন দেখা যায়।

ছোট্ট নমস্কার করিয়া বলিল, 'আমার নাম শান্তা। আমাদের কোনো অসুবিধে নেই ; খুব সুন্দর বাড়ি পেয়েছি।' তাহার কথা বলিবার ভঙ্গী যেমন মিষ্ট, গলার স্বরও তেমনি নরম।

বলিলাম, 'বসুন। আপনি—'

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি আপনার মেয়ের বয়সী।'

বলিাম, 'তা—আচ্ছা। তোমাদের ঝি-চাকর যদি দরকার থাকে, নতুন পাড়ায় এসেছ—'

সে বলিল, 'ঝি-চাকরের দরকার নেই। দু'জনের সংসার, আমি একাই সব কাজ সামলে নিতে পারব।'

বলিলাম, 'বেশ বেশ। তা—আজ তুমি সকালবেলা বেরিয়েছিলে, এখন ফিরলে। সারা দিন কোথায় ছিলে ?'

সে বলিল, 'আমি স্কুলে পড়াই। চেতলার দিকে একটা ছোট মেয়েদের স্কুল আছে, সেখানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করি।—আচ্ছা, আজ যাই, ওর খাবার তৈরি করতে হবে। সন্ধ্যার পর ও কাজে বেরুবে।' শান্তা একটু হাসিয়া ঘাড় হেলাইয়া চলিয়া গেল।

ইহাদের দু'জনকেই আমার ভাল লাগিয়াছে। বর্তমানে ভাড়াটেদের লইয়াই আমার জীবন। তাহারা আমার বাড়িতে বাস করে, ভাড়া দেয়, নিজের ধান্দায় থাকে ; মেলামেশা নাই। জোড়া-বাড়ির অন্য অংশে একটি মাদ্রাজী পরিবার থাকে ; তাহারা আমার ভাষা বোঝে না, কেবল মাসান্তে ভাড়া দিয়া রসিদ লইয়া যায়। ইহাদের সহিত আমার হৃদয়ের কোনও যোগ নাই। কিন্তু এই নবীন বাঙালী দম্পতি আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে।

জানালায় বসিয়া দেখিলাম, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পর তপন কোট প্যান্ট ও ওভারকোট চড়াইয়া খিড়কির গলি দিয়া বাহির হইল, বাড়ির সামনে ল্যাম্পের নীচে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইল, তারপর বাস্-রাস্তার দিকে চলিয়া গেল। সারা রাত বাহিরে থাকিবে, ভোরের দিকে কাজ শেষ করিয়া ফিরিবে।

অতঃপর উহাদের নিয়ম-বাঁধা জীবনযাত্রা চলিতে লাগিল। সকালে সাড়ে ন'টার সময় শান্তা স্কুলে পড়াইতে চলিয়া যায়, বিকালে ফিরিয়া আসে। তপন সন্ধ্যার পর বাহির হয়, রাত্রে কখন ফেরে জানি না। উহাদের জীবনযাত্রা অতি শান্ত ; বাড়িতে অতিথি আসে না, হয়তো বন্ধুবান্ধব চেনা-পরিচিত কেহ কাছাকাছি নাই। তপন বাড়ি হইতে রাত্রে বাহির হইবার পর বাড়ির ইলেকট্রিক বাতি নিবিয়া যায়, কেবল সামনের ঘরে মৃদু মোমবাতি জ্বলে। তাহাও আটটা বাজিতে না বাজিতে নিবিয়া যায়। শান্তা বোধ হয় সারা দিনের ক্লান্তির পর তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়ে।

উহাদের বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট কৌতূহল আছে, তাই যখন তখন চোখে দূরবীন লাগাইয়া বাড়িটা দেখি। কিন্তু বাহির হইতে বাড়ির অভ্যন্তর কিছুই দেখা যায় না ; সদর দরজা যেমন বন্ধ থাকে, সদরের জানালায় তেমনি পর্দা টানা থাকে। কেবল রাত্রিকালে পর্দার ভিতর দিয়া মোমবাতির মোলায়েম আলো দেখা যায়।

একদিন রবিবার সকালবেলা শান্তা আসিয়া খানিকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্পসল্প করিল। আমি রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার কর্তাটি এখনো ঘুমোচ্ছেন বুঝি ?'

সে সলজ্জভাবে বলিল, 'হ্যাঁ, সারা রাত ঘুমোতে পায় না, তাই—'

আমি বলিলাম, 'তুমি রাত্রে ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাও না দেখেছি। কেন বল দেখি ?'

শান্তা সচকিত হইয়া বলিল, 'আমার চোখ ভাল নয়, উজ্জ্বল আলো বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। ও আবার কম আলোয় দেখতে পায় না। তাই ও চলে গেলেই ইলেকট্রিক নিবিয়ে পিদ্দিম জ্বালি। আপনি লক্ষ্য করেছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ। আমি তো সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই জানালার ধারেই বসে থাকি।'

শান্তা সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, 'সত্যি, আপনার তো কোথাও যাবার উপায় নেই। তা আমি মাঝে মাঝে আসব, ওকেও পাঠিয়ে দেব।'

এইভাবে চলিতেছে। একদিন সন্ধ্যার পর তপনও কাজে যাইবার পথে আমার কাছে আসিয়া দুই চারিটা কথা বলিয়া গেল।

তারপর একদিন গভীর রাত্রে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম।

আমি সাধারণত রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় শয়ন করি। কিন্তু আমার অনিদ্রা রোগ আছে, মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুম হয় না, তখন প্রায় সারা রাত জাগিয়া থাকি। দুই হপ্তা আগে রাত্রে যথাসময় শয়ন করিলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। বারোটা পর্যন্ত সাধ্যসাধনা করিয়া উঠিয়া পড়িলাম ; ভাবিলাম এক পেয়ালা গরম কোকো পান করিলে ঘুম আসিতে পারে। স্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিলাম। রামাধীন আমার ঘরের বাহির দ্বারের সম্মুখে শয়ন করে, তাহাকে আর জাগাইলাম না।

শীতের রাত্রি, জানালা বন্ধ আছে। হঠাৎ কি মনে হইল, জানালার খড়খড়ি তুলিয়া বাহিরে তাকাইলাম। নিষুতি রাত্রে রাস্তায় জনমানব নাই ; জোড়া-বাড়ির সামনে রাস্তার আলোটা জ্বলিতেছে। বাড়ি দু'টার ভিতরে অন্ধকার।

একটা লোক ওদিকের ফুটপাথ দিয়া আসিতেছে। তাহার মাথা হইতে হাঁটু পর্যন্ত কালো

র‍্যাপারে ঢাকা ; জোড়া-বাড়ির বরাবর আসিয়া সে থামিল, ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে ও আশেপাশে দেখিল, তারপর সুট্‌ করিয়া দুই বাড়ির মাঝখানে গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তপনের ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল।

কোকো প্রস্তুত করিয়া পান করিতে করিতে চিন্তা করিলাম। কে লোকটা ? তাহার ভাবভঙ্গীতে যেন সতর্ক সাবধানতা রহিয়াছে। ওই গলি গিয়া মাদ্রাজীদের খিড়কি দরজাতেও যাওয়া যায়। কিন্তু মাদ্রাজীরা সংখ্যায় অনেকগুলি, সন্ধ্যার পর দোর তালাবন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে ; এই লোকটা নিঃসন্দেহে তপনের ঘরে গিয়াছে। তপন রাত্রে বাড়ি থাকে না, শান্তা একলা থাকে ; এই সময় লোকটা চুপিচুপি আসিয়াছে। কী ব্যাপার !

গভীর রাত্রি, স্বামী অনুপস্থিত, বাড়িতে একটি যুবতী ছাড়া অন্য কেহ নাই ; এই সময় র‍্যাপার মুড়ি দিয়া লোক আসে। অর্থাৎ— ?

মনটা খারাপ হইয়া গেল। শান্তাকে ভাল মেয়ে বলিয়াই মনে হইয়াছিল ; কিন্তু আজকাল মুখ দেখিয়া স্ত্রী-চরিত্র বোঝা দুষ্কর। —মরুক গে, আমার কি ! ভাড়াটেদের স্ত্রী কী করিতেছে তাহার খোঁজে আমার প্রয়োজন কি ? আমার যথাসময়ে ভাড়া পাইলেই হইল।

একবার ভাবিলাম জানালায় দাঁড়াইয়া দেখি লোকটা কতক্ষণে বাহির হয়। কিন্তু কোকো পান করিয়া একটু ঘুমের আমেজ আসিতেছিল, আমি শুইয়া পড়িলাম। আসন্ন ঘুমকে খোঁচা দিয়া তাড়াইলে হয়তো সারা রাত জাগিয়া থাকিতে হইবে।

এই ঘটনার পর দুই হপ্তা কাটিয়া গিয়াছে। গত রবিবার তপন আসিয়া বাড়িভাড়া দিয়া গিয়াছে, উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটে নাই। তপনকে নৈশ আগন্তুকের কথা বলি নাই। কী দরকার আমার ?

তারপর হঠাৎ পরশু রাত্রির ব্যাপার !

পরশু রাত্রেও আমাকে অনিদ্রা রাগে ধরিয়াছিল। বারোটা পর্যন্ত বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম ; স্টোভে কোকোর জল চড়াইয়া দিয়া জানলার খড়খড়ি তুলিয়া উঁকি মারিলাম। লোকটা যেন আমার উঁকি মারার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল—সেই র‍্যাপার-ঢাকা লোকটা। সে ফুটপাথ দিয়া দ্রুতপদে আসিয়া গলির ঠিক মুখের কাছে একটু ভিতর দিকে লুকাইয়া পড়িল। তারপর একই দিক হইতে আর একটা লোক আসিতেছে দেখিলাম ; গলায় কম্ফর্টার-জড়ানো লোকটা গলির মুখ পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, অনিশ্চিতভাবে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। মনে হইল সে র‍্যাপার-ঢাকা লোকটাকে অনুসরণ করিয়াছিল, এখন আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

এই সময় র‍্যাপার-ঢাকা লোকটা মুখ হইতে র‍্যাপার সরাইল। সবিস্ময়ে চিনিলাম—তপন ! তারপর মুহূর্তে মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। তপনের হাতে একটি ছুরি ঝলকাইয়া উঠিল, সে এক লাফে সামনে আসিয়া কম্ফর্টার-জড়ানো লোকটার বুকে ছুরি বিঁধিয়া দিল। লোকটা ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেল। তপন বিদ্যুৎবেগে আবার গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আমি হতভম্বভাবে চাহিয়া রহিলাম। লোকটা ফুটপাথের উপর নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে, একটা কাকুতি পর্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে না। নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে—

আমার ঘরে টেলিফোন আছে। এই ঘটনার ধাক্কা সামালাইয়া আমি থানায় ফোন করিলাম। আমাদের থানা কাছেই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিস আসিয়া পড়িল। দারোগাবাবু আমার বয়ান শুনিয়া তপনের বাসা ঘেরাও করিলেন।

তপনকে কিন্তু বাড়িতে পাওয়া গেল না। শান্তা ঘুমাইতেছিল, সে কিছু জানিতে পারে নাই। তপন খিড়কির দরজা খুলিয়া বাড়িতে আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ; সে বাসায় বস্ত্রাদি বদল করিয়া শান্তাকে না জাগাইয়া চুপিচুপি পলায়ন করিয়াছে।

সে-রাত্রে মৃতদেহ সনাক্ত হয় নাই ; পরে জানা গিয়াছে মৃত ব্যক্তির নাম বিধুভূষণ আইচ,

বর্ধমানের পুলিসের কর্মচারী ছিল, সম্প্রতি ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল।

তপনের বাসায় পুলিসের পাহারা কায়েম আছে। তপন এখনও ধরা পড়ে নাই। দারোগাবাবু ক্রমাগত শান্তাকে জেরা করিয়া চলিয়াছেন। অথচ সে বেচারী নির্দোষ। আমি তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম সেজন্য লজ্জিত আছি। এখন বুঝিয়াছি তপনই মধ্যরাত্রে র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিত।

এদিকে আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তপন কেন খুন করিয়াছে আমি কিছুই জানি না, অথচ ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন পুলিস অফিসার আসিয়া আমাকে জেরা করিয়া যাইতেছেন। আমি চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গু মানুষ কিন্তু পুলিস বোধ হয় সন্দেহ করে যে খুনের জন্য আমি দায়ী। আমার অপরাধ এই যে, তপন আমার ভাড়াটে এবং আমি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এখন আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ; আমার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। পুলিস হয়তো সন্দেহের উপর আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া হাজতে পুরিবে ; তাহা হইলে আমি মরিয়া যাইব। আমার টাকা আছে ; আপনি যদি আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন আমি আপনাকে খুশি করিয়া দিব।

আর অধিক কি। যত শীঘ্র পাবেন আমাকে পুলিসের ঝামেলা হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

বশংবদ
শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডু

দুই

চিঠি পড়া শেষ হইলে ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে চিঠি লইয়া মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিল। আমি আর এক পেয়ালা চা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রান্নাঘরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সত্যবতী হয়তো রাগিয়া আছে, তাহাকে ঠাণ্ডা করাও দরকার।

আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি ব্যোমকেশ চিঠি কোলে লইয়া বসিয়া আছে এবং আপন মনে হাসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাসি কিসের ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ব্যাপারটাই হাসির। চিন্তামণি কুণ্ডু মশায় কিন্তু একটি বিষয়ে ভুল করেছেন, তপনের বাড়িতে বিদ্যুৎবাতি নিবে যাওয়ার সময়টা তিনি ভাল করে লক্ষ্য করেননি।'

'তুমি কি করে তা জানলে ?'

'আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে তিনি নিশ্চয় ভুল করেছেন। আর একটা ভুল করেছেন, সেটা অবশ্য স্বাভাবিক।' ব্যোমকেশ আবার মৃদু বঙ্কিম হাসিতে লাগিল। তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, 'অজিত, চিন্তামণিবাবুর ঘরে টেলিফোন আছে, তুমি তাঁর নম্বর খুঁজে তাঁকে ফোন কর। একটা জরুরী প্রশ্নের উত্তর দরকার। তাঁকে জিজ্ঞেস কর তপনের গলার আওয়াজ কি রকম।'

'নিশ্চয় খুব জরুরী প্রশ্ন। আর কিছু জানতে চাও ?'

'আর কিছু না। তাঁকে বোলো, ভাবনার কিছু নেই, আমি অবিলম্বে যাচ্ছি।'

চিন্তামণিবাবুকে ফোন করিলাম, তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, 'তপনের গলার আওয়াজ চেরা-চেরা।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চেরা-চেরা ! তাহলে ঠিক ধরেছি, আর কোন সন্দেহ নেই।'

বলিলাম, 'কি ধরেছ তুমিই জান। কিন্তু চিন্তামণিবাবুর গলাও চেরা-চেরা মনে হল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাতে আর আশ্চর্য কি। একে পক্ষাঘাত, তার ওপর পুলিসের আতঙ্ক—চল, বেরিয়ে পড়া যাক। কাজ সেরে ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন করা যাবে।'

চিন্তামণিবাবুর বাড়ির রাস্তাটা বেশ চওড়া নূতন রাস্তা ; শহরের অন্তিম প্রান্তে বলিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন। তপন সেনের বাসা পুলিসের পাহারা দেখিয়া সহজেই সনাক্ত করা গেল। তাহার উল্টোদিকে চিন্তামণিবাবুর দ্বিতল বাড়ি। আমরা উপরে উঠিয়া গেলাম।

আমরা দ্বারের কড়া নাড়িবার পূর্বেই হিন্দুস্থানী ভৃত্য রামাধীন দ্বার খুলিয়া পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আমরা প্রবেশ করিলাম। খোলা জানালার পাশে চিন্তামণিবাবু চেয়ারে বসিয়া ছিলেন, সাগ্রহে গলা বাড়াইয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু। রাস্তায় আসতে দেখেই চিনেছি।. আসুন।'

রামাধীন দু'টি চেয়ার আগাইয়া দিল, আমরা বসিলাম। টেলিফোনে গলার আওয়াজ শুনিয়া চিন্তামণিবাবুর চেহারা যেমন আন্দাজ করিয়াছিলাম আসলে তেমন নয় ; কৃষ্ণবর্ণ মোটাসোটা মানুষ, উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পাশে টিপাই-এর উপর একটি দামী বাইনোকুলার রাখা রহিয়াছে।

চিন্তামণিবাবু বলিলেন, 'আগে কি খাবেন বলুন।—চা—কোকো—ওভাল্‌টিন—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন কিছু দরকার নেই।—পুলিস আজ আপনার কাছে এসেছিল নাকি ?'

চিন্তামণিবাবু বলিলেন, 'আসেনি আবার! দারোগা একবার আমার দিকে তেড়ে আসছে, একবার ও বাড়িতে শান্তার দিকে তেড়ে যাচ্ছে। কী যে চায় ওরা বুঝি না। একই প্রশ্ন পঞ্চাশবার! আমার পক্ষাঘাত হয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে পারি কিনা, বাইনোকুলার রেখেছি কেন, তপন সেনকে বাড়ি ভাড়া দিয়েছি কেন ? বলুন দেখি ব্যোমকেশবাবু, এ সব প্রশ্নের কী জবাব দেব ? জবাব দিতে দিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। এখন আপনি আমাকে বাঁচান!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন দারোগাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তিনি কি—'

বলিতে বলিতে দারোগাবাবু দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দশ বারো বছর আগে বিজয় ভাদুড়ী যখন ছোট দারোগা ছিলেন তখন তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। রোগা লম্বা বেউড় বাঁশের মত চেহারা, কিন্তু অত্যন্ত কর্মতৎপর ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি। দশ বছরে তিনি বড় দারোগা হইয়াছেন কিন্তু চেহারার তিলমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। এবং মনও যে পূর্ববৎ সন্দেহপরায়ণ আছে তাহা তাঁহার চোখের দৃষ্টি হইতে অনুমান করা যায়।

দ্বারের নিকট হইতে প্রখর চক্ষে আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন, শুষ্কস্বরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু যে!'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'চিনতে পেরেছেন দেখছি। তা—আপনার আসামী, মানে, তপন সেন ধরা পড়ল ?'

বিজয় ভাদুড়ী একবার চিন্তামণিবাবুকে বক্রদৃষ্টিতে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'ধরা পড়েনি এখনো, কিন্তু যাবে কোথায় ? আপনি হঠাৎ এখানে কী উদ্দেশ্যে, ব্যোমকেশবাবু ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চিন্তামণিবাবু আমার মক্কেল। ওঁর বাড়িতে খুন হয়েছে, ওঁর ভাড়াটে খুন করেছে, আপনারা ওঁকে বিরক্ত করছেন। তাই নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যে উনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন।'

বিজয় ভাদুড়ী কুটিল-কুঞ্চিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, বোধ করি মনে মনে বিবেচনা করিলেন ব্যোমকেশকে গলা-ধাক্কা দিবেন কি না। তারপর তিনি যখন কথা বলিলেন তখন তাঁহার সুর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি ব্যোমকেশের দিকে ঝুঁকিয়া ঈষৎ হ্রস্বকণ্ঠে বলিলেন, 'একবার বাইরে আসবেন ? দুটো কথা আছে।'

'চলুন।'

আমরা ঘরের বাহিরে লম্বা বারান্দার এক কোণে গিয়া দাঁড়াইলাম। বিজয়বাবু মুখে একটা জোর করা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, 'দেখুন ব্যোমকেশবাবু, উঁচু মহলে আপনার প্রতিপত্তি আছে, আপনি যদি এ মামলায় মাথা গলাতে চান আমি আপনাকে আটকাতে পারব না। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি আপনি চিন্তামণি কুণ্ডুকে সাহায্য করবেন না। আমার বিশ্বাস, ও আর ঐ

খোট্টা চাকরটা তলে তলে এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছে।'

ব্যোমকেশ স্থির হইয়া বিজয়বাবুর কথা শুনিল, তারপর বলিল, 'কে খুন করেছে আপনি জানেন ?'

বিজয়বাবু বলিলেন, 'অবশ্য খুন করেছে তপন সেন, কিন্তু বুড়োটাও এর মধ্যে আছে।'

'বুড়োটাও যদি এর মধ্যে থাকতো তাহলে তপনের নামে খুনের অভিযোগ আনতো কি ?'

'ঐখানেই চালাকি। তপনকে ধরিয়ে দিয়ে বুড়ো নিজেকে বাঁচাতে চায়।'

ব্যোমকেশ বিরক্ত স্বরে বলিল, 'মাপ করবেন বিজয়বাবু, আপনি এ মামলার কিছুই বুঝতে পারেননি।'

ভ্রূকুটি করিয়া বিজয়বাবু বলিলেন, 'তার মানে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মানে পরে বলব। আগে আপনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন দেখি। —যে ছুরি দিয়ে খুন হয়েছিল সেটা পাওয়া গেছে কি ?'

'না। তপন সেটা নিয়ে পালিয়েছে।'

'তপনের বাড়ি তল্লাশ করে কিছু পেয়েছেন ?'

'না, এমন কিছু পাইনি যাতে হদিস পাওয়া যায়। তবে সিন্দুকটা এখনো খোলা হয়নি, তার চাবি তপনের কাছে।'

'শান্তাকে জেরা করে কিছু পেয়েছেন ?'

'কাজের কথা কিছু পাইনি। মাস চারেক আগে ওদের বিয়ে হয়েছে ; স্বামীর কাজকর্মের কথা শান্তা কিছুই জানে না।'

'হুঁ। আমি কিন্তু সব জানি। কে খুন করেছে জানি, এমন কি আসামী কোথায় আছে তাও জানি—'

বিজয়বাবু লাফাইয়া উঠিলেন, 'জানেন তবে এতক্ষণ বলেননি কেন ?'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'সময় হলেই বলব। তার আগে আমি তপনের বাসাটা একবার ঘুরে ফিরে দেখতে চাই। আর শান্তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি অবশ্য তাকে যথেষ্ট জেরা করেছেন এবং সন্তোষজনক উত্তরও পেয়েছেন। আমি কেবল দু'চারটে প্রশ্ন করব।'

বিজয়বাবু বলিলেন, 'তা বেশ। কিন্তু আসামী—'

'আসামীকেও পাবেন।'

'কোথায় ? ওই বাড়িতে ? আপনি কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন। আগে চলুন ওই বাড়িতে। আসামীকে ধরার জন্যে প্রস্তুত থাকবেন।'

'তার মানে—আপনি বলতে চান তপন সেন বাসায় ফিরে আসবে, কিম্বা বাসাতেই লুকিয়ে আছে— ?'

'আসুন আসুন—' ব্যোমকেশ অগ্রগামী হইয়া সিঁড়ির দিকে চলিল, চিন্তামণিবাবুর দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, 'চিন্তামণিবাবু, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমরা একবার ও বাড়িতে যাচ্ছি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খুনের কিনারা হয়ে যাবে।'

তারপর আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামিয়া গেলাম।

তপনের বাসার বুকে-পিঠে পুলিস পাহারা। একটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি, চোর পালাইলে পুলিসের বুদ্ধি বাড়ে। অপরাধী যখন অপরাধ করিয়া চম্পট দিয়াছে তখন অকুস্থলের চারিপাশে কড়া পাহারা বসাইয়া কী লাভ হয় আমি আজ পর্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ব্যোমকেশ গলি দিয়া খিড়কির দরজার দিকে যাইতে বলিল, 'সদর আর খিড়কির দরজা ছাড়া বাড়ি থেকে পালাবার আর কোনো রাস্তা নেই ? পাঁচিল ডিঙিয়ে পালানো যায় না ?'

দারোগা বিজয়বাবু বলিলেন, 'না।'

খিড়কির দরজায় একজন পাহারাওলা দাঁড়াইয়া আছে, উপরন্তু দরজায় তালা লাগানো। বিজয়বাবুর হুকুমে পাহারাওলা তালা খুলিয়া দিল, আমরা ভিতরে গেলাম।

ছোট্ট এক টুকরা উঠানের গায়ে দু'টি ঘর, পাশে রান্নাঘর ও স্নানের ঘর। ব্যোমকেশ বলিল, 'বিজয়বাবু, আপনি আর অজিত শান্তার কাছে গিয়ে বসুন, আমি স্নানের ঘর আর রান্নাঘর এক নজর দেখে যাই।' বলিয়া সে পাশের দিকে চলিল।

আমরা সামনের ঘরে প্রবেশ করিলাম। এটি বসিবার ঘর। বেতের আসবাব দিয়া সাজানো। একটি বেতের চেয়ারে শান্তা উদাস অসহায়ভাবে বসিয়া আছে। চিন্তামণি কুণ্ডু তাহার চেহারার যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা সত্য; বর্তমানে তাহার মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত; চোখ দুটিও ফুলোফুলো। বোধহয় কান্নাকাটি করিয়াছে।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলে সে মুখ তুলিল। আমাকে লক্ষ্যই করিল না, বিজয়বাবুর দিকে সপ্রশ্ন চক্ষে চাহিল। বিজয়বাবু কিছু বলিলেন না, একটা চেয়ারে উপবেশন করিলেন। আমিও বসিলাম।

তিনজনে নির্বাক বসিয়া আছি। আমি চিন্তা করিতেছি—পুলিসের জেরা শুনিয়া শুনিয়া মেয়েটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে যদি নির্দোষ হয়, স্বামীর অপরাধের সহিত তাহার যদি কোনও সংযোগ না থাকে, তবু তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু তপন ওই লোকটাকে খুন করিল কেন? যৌন ঈর্ষা? শান্তার সঙ্গে ঐ লোকটার কি—?

ব্যোমকেশ শয়নকক্ষ হইতে প্রবেশ করিল; তাহার মুখ হাসি হাসি। সে শান্তার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিয়া স্মিতমুখে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

শান্তাও ক্লান্তভাবে তাহার পানে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে তাহার চোখে শঙ্কা ও সতর্কতা ফুটিয়া উঠিল। সে সোজা হইয়া বসিয়া একটু বিহ্বলভাবে বলিল, 'কী—কী—?'

ব্যোমকেশ প্রফুল্ল স্বরে বলিল, 'আপনার শোবার ঘরে একটা ছোট লোহার সিন্দুক রয়েছে দেখলাম। ওতে কী আছে?'

শান্তা বলিল, 'দারোগাবাবুকে তো বলেছি, কি আছে আমি জানি না। আমার স্বামী সিন্দুকের চাবি নিজের কাছে রাখতেন।'

বিজয়বাবু বলিলেন, 'সিন্দুকের তালা ভাঙবার ব্যবস্থা করেছি।'

'বেশ বেশ, ওতে অনেক মাল পাবেন; চোরাই মাল, দুপুরে ডাকাতির গয়নাপত্র।'—ব্যোমকেশ শান্তার দিকে ফিরিল, 'আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনার স্বামী কি দাড়ি কামাতেন না? বাড়িতে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নেই।'

শান্তার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল, সে অস্পষ্ট স্বরে বলিল, 'তিনি সেলুনে দাড়ি কামাতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ও। আপনার স্বামী দেখছি অসামান্য লোক ছিলেন। তিনি সেলুনে দাড়ি কামাতেন, কিন্তু বাড়িতে চটি জুতো পরতেন না। কোনো কারণ ছিল কি?'

শান্তা চক্ষু নত করিয়া বলিল, 'ওঁর চটি ছিঁড়ে গিয়েছিল, নতুন চটি কেনা হয়নি। যখন বাড়িতে থাকতেন আমার চটি পরতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই নাকি। আপনাদের দু'জনের পায়ের মাপ তাহলে সমান?'

শান্তা বলিল, 'প্রায় সমান।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বাঃ! কত সুবিধে! আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর দেখছি প্রায় সবই সমান, কেবল চুলের রঙ আলাদা। চিন্তামণিবাবু জানিয়েছিলেন তপনের চুলের রঙ তামাটে। ঠিক তো?'

শান্তা ঢোক গিলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

বিজয়বাবু এতক্ষণ চোখ বাহির করিয়া প্রশ্নোত্তর শুনিতেছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র উত্তেজনার কণ্ঠে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু—!'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'দাঁড়ান। তৈরি থাকুন, এবার আমার শেষ প্রশ্ন।—শান্তা দেবি, চিন্তামণিবাবু দেখেছিলেন আপনার গালে মসুরের মত লাল তিল আছে, সে তিলটা গেল কোথায়?'

শান্তা চকিতে নিজের বাঁ গালে হাত দিল, তারপর সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'তিল ! আমার গালে তো তিল নেই, চিন্তামণিবাবু ভুল দেখেছেন। হয়তো লাল কালির ছিটে লেগেছিল—'

ব্যোমকেশের মুখে হিংস্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, 'সব প্রশ্নেরই জবাব তৈরি করে রেখেছেন দেখছি। কিন্তু এ প্রশ্নের কি জবাব দেবেন !' ক্ষিপ্রহস্তে সে শান্তার চুল ধরিয়া টান দিল, সঙ্গে সঙ্গে পরচুলা খসিয়া আসিল, ভিতর হইতে ঘাড়ে-ছাঁটা তামাটে রঙের চুল বাহির হইয়া পড়িল।

শান্তাও বিদ্যুৎবেগে জবাব দিল। একটু অবনত হইয়া সে নিজের ডান পা হইতে শাড়ির প্রান্ত তুলিল। পায়ের সঙ্গে রবারের গার্টার দিয়া আটকানো ছিল একটা লিকলিকে ছুরি। ক্ষিপ্রহস্তে ছুরি মুষ্টিতে লইয়া শান্তা ব্যোমকেশের কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া ছুরি চালাইল। আমি ভয়ার্ত সম্মোহিতভাবে শুধু চাহিয়া রহিলাম ; একটি স্ত্রীলোকের সুশ্রী কোমল মুখ যে চক্ষের নিমেষে এমন কুশ্রী ও কঠিন হইয়া উঠিতে পারে তাহা কল্পনা করা যায় না।

দারোগা বিজয়বাবু যদি প্রস্তুত না থাকিতেন তাহা হইলে ব্যোমকেশের প্রাণ বাঁচিত কিনা সন্দেহ। তিনি বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া শান্তার কব্জি ধরিয়া ফেলিলেন ; ছুরি শান্তার মুষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িল। সে বিষাক্ত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া সর্প-তর্জনের মত নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'বিজয়বাবু, এই নিন আপনার খুনী আসামী, আর এই নিন খুনের অস্ত্র !'

বিজয়বাবু একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলিলেন, 'কিন্তু চিন্তামণিবাবু বলেছিলেন তপন সেন—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তপন সেনের অস্তিত্ব নেই, বিজয়বাবু। আছেন কেবল অদ্বিতীয় শান্তা সেন ; ইনিই রাত্রে তপন সেন, দিনে শান্তা সেন—সাক্ষাৎ অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি। মহীয়সী মহিলা ইনি। ভাববেন না যে, বিধুভূষণ আইচকে খুন করাই এঁর একমাত্র কীর্তি। মাস দুই আগে ইনি বর্ধমান জেলের এক গার্ডকে খুন করে জেল থেকে পালিয়েছিলেন। এঁর আসল নাম আমার জানা নেই ; আপনি পুলিসের লোক, ফেরারী কয়েদীর নাম জানতে পারেন।'

বিজয়বাবু শান্তার হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া সুবর্তুল চোখে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন, 'প্রমীলা পাল। এবার সব বুঝেছি। স্বামীকে বিষ খাওয়ানোর জন্যে তোমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। দু'বছর জেল খাটবার পর তুমি জেলের গার্ডকে খুন করে পালিয়েছিলে। পালিয়ে এখানে এসে একাই স্বামী-স্ত্রী সেজে লুকিয়েছিলে। তারপর সে-রাত্রে বিধুভূষণ তোমাকে দেখতে পায়। বিধুভূষণ তোমাকে চিনতে পেরে তোমার পিছু নিয়েছিল। এইখানে বাড়ির সামনে এসে তুমি তাকে খুন করেছ।' ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বিজয়বাবু বলিলেন, 'কেমন—এই তো ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোট কথা এই বটে।'

বিজয়বাবু হুঙ্কার ছাড়িলেন, 'জমাদার।'

জমাদার ঘরের বাহিরেই ছিল, প্রবেশ করিল। বিজয়বাবু বলিলেন, 'হাতকড়া লাগাও।'

চিন্তামণিবাবুর ঘরে বসিয়া চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার চিঠি পড়ে খটকা লেগেছিল, চিন্তামণিবাবু। আপনি ওদের দু'জনকে একসঙ্গে কখনো দেখেননি, দূরবীন লাগিয়েও ওদের ব্যূহ ভেদ করতে পারেননি। কেন ? পুরুষটা বেঁটে, মেয়েটা লম্বা ; হরে দরে হাঁটু জল। ওরা সদর দরজা দিয়ে যাতায়াত করে না, খিড়কি দিয়ে আসে যায় ; পুরুষটা চেরা-চেরা গলায় কথা বলে। কেন ? সন্দেহ হয় যে কোথাও লুকোচুরি চলছে।

'কিন্তু বেশি ফলাও করে সব কথা বলবার দরকার নেই। স্থূলভাবে ব্যাপারটা এই—জেল ভেঙে পালাবার পর প্রমীলা পালের দুটো জিনিস দরকার হয়েছিল ; ছদ্মবেশ আর রোজগার। তার মাথার চুল তামাটে রঙের, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; তাই তাকে চুল ছেঁটে পুরুষ সাজতে

হল। কিন্তু দুপুরে ডাকাতি করে রোজগার করার জন্য তার মেয়েমানুষ সাজা দরকার, তাই সে একটি সুন্দর বিলিতি পরচুলো যোগাড় করল। কোথায় চুল ছেঁটেছিল, কোথা থেকে পরচুলো যোগাড় করল আমি জানি না ; কিন্তু তার দ্বৈত-জীবন আরম্ভ হল। এখন শীতকাল চলছে, স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ সাজার খুব সুবিধা। সে নাকের নীচে একটি ছোট্ট প্রজাপতি-গোঁফ লাগালো, গায়ে কোট-প্যান্টের ওপর ওভারকোট চড়ালো, তারপর আপনার কাছে বাড়ি ভাড়া নিতে এল ; পাছে মেয়েলি গলা ধরা পড়ে তাই আপনার সঙ্গে চেরা-চেরা গলায় কথা কইল। কলকাতা শহরে ছদ্মবেশে থাকার খুব সুবিধা, পাড়াপড়শী কেউ কারুর খবর রাখে না। কিন্তু সে লক্ষ্য করল আপনি সারাক্ষণ জানালার কাছে বসে থাকেন, আপনার বাইনোকুলার আছে। তাকে সাবধান থাকতে হবে।

'সে-রাত্রে আপনি শুয়ে পড়বার পর সে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি দখল করতে এল। কেউ জানতে পারল না যে মাত্র একজন লোক এসেছে, দু'জন নয়। তার সঙ্গে একটা ছোট্ট লোহার সিন্দুক ছিল, সেটা সে শোবার ঘরে রাখল।

'তারপর তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আরম্ভ হল। সকালবেলা সে স্কুলে পড়াবার নাম করে বেরিয়ে যায়, দুপুরবেলা 'দুপুর ডাকাতি' করার মতলবে ঘুরে বেড়ায়, বিকেলবেলা ফিরে আসে। আবার সন্ধ্যের পর পুরুষ সেজে বেরোয় আপনাকে ধাপ্পা দেবার জন্যে। ঘরের বিদ্যুৎবাতি নিবিয়ে পিদ্দিম জ্বেলে রেখে বেরোয় ; তেল ফুরোলে পিদ্দিম নিবে যায়, আপনি ভাবেন শান্তা আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। আপনি কেবল একটা ভুল করেছিলেন ; ইলেকট্রিক বাতি যে তপন বাড়ি থেকে বেরুবার আগে নেবে সেটা লক্ষ্য করেননি। আপনার মনে সন্দেহ ছিল না তাই লক্ষ্য করেননি।

'যাক, আপনি শুয়ে পড়বার পর সে আবার বাড়িতে ফিরে আসে এবং ঘুমোয়। একটা আলোয়ান সে সম্ভবত ওভারকোটের নীচে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বেরুতো, ফেরবার সময় সেটা গায়ে জড়িয়ে নিত। তাই প্রথম যে-রাত্রে আপনি খড়খড়ি তুলে তাকে ফিরতে দেখলেন, আপনি ভাবলেন সে শান্তার গুপ্ত প্রণয়ী।

'এইভাবে চলছিল। তারপর প্রমীলার হঠাৎ ভীষণ বিপদ উপস্থিত হল। বিধুভূষণ আইচ পুলিসের কর্মচারী, প্রমীলাকে আগে দেখেছিল, ছুটিতে কলকাতায় এসে সে প্রমীলাকে দেখতে পেল এবং পুরুষের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও চিনতে পারল। সে প্রমীলার পিছু নিল। হয়তো কোনো হোটেলে দু'জনের দেখা হয়েছিল। প্রমীলা নিশ্চয় তাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন পারল না, তখন—'

বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া ব্যোমকেশ থামিল, সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল।

আমি বলিলাম, 'একটা কথা। বিধুভূষণকে খুন করে প্রমীলা বাড়ি ছেড়ে পালাল না কেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পালাবার সময় পেল না। সে তো জানত না যে চিন্তামণিবাবু খড়খড়ি তুলে হত্যাকাণ্ডটা দেখে নিয়েছেন। তাই তার বিশেষ তাড়া ছিল না ; ভেবেছিল দামী জিনিসপত্র গয়নাগাঁটি নিয়ে ধীরে সুস্থে পালাবে। কারণ ও বাড়িতে থাকা আর তার পক্ষে নিরাপদ নয় ; বাড়ির সামনে লাশ পড়ে আছে, পুলিস নিশ্চয় তাকে জেরা করতে আসবে। প্রমীলা পাল জেল-ভাঙা খুনী আসামী, যদি পুলিসের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পারে ? সুতরাং নিশ্চয় সে পালাতো। কিন্তু হঠাৎ পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিস এসে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। তখন আর পালাবার রাস্তা নেই, প্রমীলা তাড়াতাড়ি পরচুলোটা পরে নিয়ে মেয়ে সাজল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে গালের তিলটা আঁকতে ভুলে গেল।'

'গালে তিল আঁকতো কেন ?'

'দুটো চেহারায় রকমফের আনবার জন্যে। পুরুষবেশে নাকের নীচে গোঁফ লাগাতো, আর স্ত্রীবেশে পরচুলো ছাড়াও গালে তিল আঁকত। বুঝেছ ?—আজ তাহলে উঠি, চিন্তামণিবাবু।'

চিন্তামণিবাবু গদগদ ধন্যবাদ সহ একটি দুইশত টাকার চেক লিখিয়া দিলেন। আমরা ফিরিয়া

চলিলাম।

বেলা দু'টা বাজিতে বিলম্ব নাই। পুলিস আসামীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। এখানে তাহাদের আর প্রয়োজন নাই। শ্রীযুক্ত বিজয় ভাদুড়ী মহাশয় খুনী আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া নিশ্চয় প্রচুর প্রশংসা অর্জন করিবেন।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখি সত্যবতী দরজার কাছে উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে, আমাদের দেখিয়া ভ্রূ তুলিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিল। অর্থাৎ—এত দেরি যে!

ব্যোমকেশ হঠাৎ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তারপর হাত বাড়াইয়া সত্যবতীর চিবুক একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল, 'তোমরাও কম যাও না।'

মগ্নমৈনাক

স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বছর অতীত হইয়াছে। সনাতন ভারতীয় আইন অনুসারে আমাদের স্বাধীনতা দেবী সাবালিকা হইয়াছেন, পলায়নী মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কঠিন সত্যের সম্মুখীন হওয়ার সময় উপস্থিত। সুতরাং এ কাহিনী বলা যাইতে পারে।

নেংটি দত্ত নামধারী অকালপক্ক বালককে লইয়া কাহিনী আরম্ভ করিতেছি, কারণ সে না থাকিলে এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটিত না। নেংটি একরকম জোর করিয়াই আমাদের বাসায় আসিয়া ব্যোমকেশের সহিত আলাপ জমাইয়াছিল। অত্যন্ত সপ্রতিভ ছেলে, নাকে-মুখে কথা, বয়স সতেরো কি আঠারো, কিন্তু চেহারা রোগা-পটকা বলিয়া আরো কম বয়স মনে হইত। এই বয়সে সে যথেষ্ট বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়াছিল, অথচ সেই সঙ্গে একটু ন্যাকা-বোকাও ছিল ; একাধারে ছেলেমানুষ এবং এঁচড়ে-পাকা। অল্প পরিচয়ে অত্যন্ত ফাজিল ও ডেঁপো মনে হইলেও আসলে সে যে মন্দ ছিল না তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম। ব্যোমকেশকে সে মনে মনে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিত, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া মনে হইত ব্যোমকেশের সমস্ত চালাকি সে ধরিয়া ফেলিয়াছে, ব্যোমকেশের চেয়ে তাহার বুদ্ধি অনেক বেশি।

যখনই সে আমাদের বাসায় আসিত, ব্যোমকেশের সঙ্গে অপরাধ-বিজ্ঞান লইয়া পরম বিজ্ঞের মত আলোচনা করিত। ছেলেটা লেখাপড়ায় বহুদিন ইস্তফা দিয়াছে কিন্তু একেবারে অজ্ঞ নয়, ব্যোমকেশ হাসি মুখে তাহাকে আস্কারা দিত। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে প্রীতি-কৌতুক মিশ্রিত একটা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।

দু'চার দিন আনাগোনা করার পর নেংটি হঠাৎ একদিন হাত বাড়াইয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একটা সিগারেট দিন না।'

ব্যোমকেশ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল, তারপর ধমক দিয়া বলিল, 'এতটুকু ছেলে, তুমি সিগারেট খাও।'

নেংটি বলিল, 'পাব কোথায় যে খাব ? মাসিমা একটি পয়সা উপুড়-হস্ত করে না, মাঝে-মধ্যে মেসোমশাইয়ের টিন থেকে দু'একটা চুরি করে খাই। তাছাড়া বাড়িতে কি সিগারেট খাওয়ার জো আছে ? ধোঁয়ার গন্ধ পেলেই মাসিমা মারমার করে তেড়ে আসে। দিন না একটা।'

ব্যোমকেশ তাহাকে একটা সিগারেট দিল, সে তাহা পরম যত্নে সেবন করিয়া শীঘ্র আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিল।

অতঃপর সে যখনই আসিত তাহাকে একটা সিগারেট দিতে হইত।

একদিন নেংটি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে আসিয়া বলিল, 'জানেন ব্যোমকেশদা, আমাদের বাড়িতে একটা মেয়ে এসেছে, ঠিক বিলিতি মেমের মত দেখতে।'

ব্যোমকেশ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, 'তাই নাকি !'

নেংটি বলিল, 'হ্যাঁ, এত সুন্দর মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি। আপনি যদি দেখেন ট্যারা হয়ে যাবেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে দেখব না। কে তিনি ?'

নেংটি বলিল, 'মেসোমশাইয়ের বন্ধুর মেয়ে। পূর্ববঙ্গে থাকত, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় বাপ-মা মরে গেছে ; মেয়েটা কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। মেসোমশাই তাকে আশ্রয় দিয়েছেন, বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন। আমারই মত অবস্থা।'

মনে মনে নেংটির মেসোমশাই সন্তোষ সমাদ্দারকে সাধুবাদ করিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও নেংটির মারফৎ তাঁহার কথা জানিতাম। তিনি খ্যাতিমান ব্যক্তি, তাঁহার রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কীর্তিকলাপ বাংলাদেশে কাহারও অবিদিত নয়। আমরা তাঁহার পারিবারিক পরিস্থিতির কথাও জানিতাম। বস্তুত, যে কাহিনী লিখিতেছি তাহা সন্তোষবাবুরই পারিবারিক ঘটনা।

ঘটনার পূর্বকালে ও উত্তরকালে এই পরিবারের মানুষগুলি সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা স্থূলভাবে এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আকস্মিক মৃত্যু আসিয়া এই সমৃদ্ধ পরিবারের সহিত আমাদের সংযোগ ঘটাইয়াছিল। আবার আকস্মিক মৃত্যুই নাটকের শেষ অঙ্কে যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল। অনেক দিন নেংটিকে দেখি নাই—। কিন্তু যাক।

সন্তোষ সমাদ্দার ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। চৌরঙ্গী হইতে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর যাইলে একটি উপ-রাস্তার উপর তাঁহার প্রকাণ্ড দ্বিতল বাগান-ঘেরা বাড়ি। সন্তোষবাবু কিন্তু বাড়িতে কমই থাকিতেন ; সারা দিন ব্যবসা-ঘটিত কাজে-কর্মে এবং রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে কাটাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাও শনিবার সন্ধ্যার পর তাঁহাকে বাড়ি পাওয়া যাইত না, অফিসের কাজ-কর্ম সারিয়া তিনি এক কীর্তন-গায়িকার গৃহে গান শুনিতে যাইতেন ; তারপর একেবারে সোমবার সকালে সেখান হইতে অফিসে যাইতেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল আন্দাজ আটচল্লিশ বছর।

তাঁর স্ত্রী চামেলি সমাদ্দার বয়সে তাঁর চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট। শীর্ণ লম্বা স্নায়বিক প্রকৃতির স্ত্রীলোক, যৌবনকালে সন্ত্রাসবাদীদের সহিত যুক্ত ছিলেন। সন্তোষবাবুর সহিত বিবাহের পর কয়েক বছর শান্তভাবে সংসার-ধর্ম পালন করিয়া ছিলেন, দু'টি যমজ পুত্রসন্তানও জন্মিয়াছিল। ক্রমে তাঁহার চরিত্রে শুচিবাই দেখা দিল, স্বভাব তীক্ষ্ণ ও ছিদ্রান্বেষী হইয়া উঠিল। বাড়িতে মাছ-মাংস রহিত হইল, স্বামীর সহিত এক বাড়িতে থাকা ছাড়া আর অন্য কোন সম্পর্ক রহিল না। এইভাবে গত দশ-বারো বছর কাটিয়াছে।

ইঁহাদের দুই যমজ পুত্র যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। বয়স কুড়ি বছর, দু'জনেই কলেজে পড়ে। যমজ হইলেও দুই ভাইয়ের চেহারা ও চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত ; যুগলচাঁদের ছিপছিপে চেহারা, তরতরে মুখ ; উদয়চাঁদ একটু গ্যাঁটা-গোঁটা ষণ্ডা-গুণ্ডা ধরনের। যুগলচাঁদ ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে ; লেখাপড়ায় ভাল, লুকাইয়া কবিতা লেখে। উদয় দাম্ভিক ও দুর্দান্ত, সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে, মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হোটেলে গিয়া মুর্গী খায়। শ্রীমতী চামেলি তাহাকে শাসন করিতে পারেন না, কিন্তু মনে মনে বোধহয় দুই ছেলের মধ্যে তাহাকেই একটু বেশি ভালবাসেন।

এই চারজন ছাড়া আরো তিনটি মানুষ বাড়িতে থাকে। প্রথমত, নেংটি ও তাহার ছোট বোন চিংড়ি। বছর দুই আগে তাহাদের মাতা পিতা একসঙ্গে কলেরা রোগে মারা গিয়াছিলেন, নেংটি ও চিংড়ি অনাথ হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীমতী চামেলি তাহাদের সাক্ষাৎ মাসি নন, কিন্তু তিনি তাহাদের নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন ; সেই অবধি তাহারা এখানেই আছে। নেংটির পরিচয় আগেই দিয়াছি, চিংড়ি তাহার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট। তাহার চেহারাটি ছোটখাটো, মোটের উপর সুশ্রী ; এই বয়সেই সে ভারি বুদ্ধিমতী ও গৃহকর্মনিপুণা হইয়া উঠিয়াছে। মাসিমা শুচিবাই-এর জন্য অধিকাংশ সময় কল-ঘরে থাকেন, চিংড়িই সংসার চালায়। যুগলচাঁদ তাহার নাম দিয়াছে কুচোচিংড়ি।

তৃতীয় যে ব্যক্তিটি বাড়িতে থাকেন তাঁহার নাম রবিবর্মা। পুরা নাম বোধকরি রবীন্দ্রনাথ বর্মণ ; কিন্তু তিনি রবিবর্মা নামেই সমধিক পরিচিত। দীর্ঘ কঙ্কালসার আকৃতি ; মুখের ডৌল, চোখের বক্রতা এবং গোঁফ-দাড়ির অপ্রতুলতা দেখিয়া ত্রিপুরা অঞ্চলের সাবেক অধিবাসী বলিয়া

সন্দেহ হয় ; বয়স আন্দাজ চল্লিশ। ইনি সন্তোষবাবুর একজন কর্মচারী, তাঁহার রাজনীতি-ঘটিত ক্রিয়াকলাপের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি। নিজের সংসার না থাকায় তিনি সন্তোষবাবুর গৃহেই থাকেন, বাড়ির একজন হইয়া গিয়াছেন ; প্রয়োজন হইলে বাড়ির কাজকর্মও দেখাশোনা করেন।

এই সাতটি মানুষের সংসারে হঠাৎ যেদিন একটি অপরূপ সুন্দরী যুবতীর আবির্ভাব ঘটিল, সেদিন মৃত্যু-দেবতার মুখে যে কুটিল হাসি ফুটিয়াছিল তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। নেংটি প্রথম দিনই আসিয়া যুবতীর আবির্ভাবের খবর দিয়াছিল ; তারপর যতবারই আসিয়াছে মশগুল হইয়া যুবতীর প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছে, পরিবারের মধ্যে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রবল আবহ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছে। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইয়াছে নেংটিদের সংসারে একটি দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহা যে এমন মারাত্মক আকার ধারণ করিবে তাহা কল্পনা করি নাই।

যুবতীর আবির্ভাবের মাস ছয়েক পরের কথা। দুর্গাপূজা শেষ হইয়া কালীপূজার তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে, এই সময় একদিন সন্ধ্যার পর ব্যোমকেশ আমাদের বসিবার ঘরে আলো জ্বালিয়া একমনে রামায়ণ পড়িতেছিল। রাজশেখর বসু মহাশয় মূল বাল্মীকি রামায়ণের চুল ছাঁটিয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া তরতরে ঝরঝরে করিয়া দিয়াছেন, ব্যোমকেশ কর্মহীন দিবসের আলুনি প্রহরগুলি তাহারই সাহায্যে গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি তক্তপোশে চিৎ হইয়া অলসভাবে এলোমেলো চিন্তা করিতেছিলাম। সাম্প্রতিক শারদীয়া পত্রিকায় যে কয়টি রচনা পড়িয়াছি, তাহা হইতে মনে হয় বাঙালী লেখক বাংলা ভাষা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন ; রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা যেমন স্বাধীনতা পাইয়াছি, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি—শাসনহীন অবাধ স্বৈরাচার...মানুষের মন আজ উন্মার্গগামী, জলে-স্থলে-আকাশে সর্বত্র সে ধৃষ্টতা করিয়া বেড়াইতেছে...আজ সকালে সংবাদপত্রে দেখিলাম একটা এরোপ্লেন চাটগাঁ হইতে কলকাতা আসিতেছিল, বানচাল হইয়া সমুদ্রে ডুবিয়াছে...পাকিস্তান এয়ার লাইনসের প্লেন—একটি লোকও বাঁচে নাই, মৃতদেহের দীর্ঘ ফিরিস্তি বাহির হইয়াছে...আমরা আকাশচারী হইয়া উঠিয়াছি, মাটিতে আর পা পড়ে না...কবি সত্যেন দত্ত এরোপ্লেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'উদ্‌গত-পাখা জাঁদরেল পিপীলিকা'—উপমাটা ভারি চমকপ্রদ।

'পার্বতীর দাদার নাম জানো ?'

তক্তপোশে উঠিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ রামায়ণ রাখিয়া সিগারেট ধরাইতেছে। বলিলাম, 'পার্বতীর দাদা ! কোন্ পার্বতী ?'

ব্যোমকেশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'মহাদেবের পার্বতী, হিমালয়-কন্যা পার্বতী।'

'ও, বুঝেছি। পার্বতীর দাদা ছিল নাকি ?'

'ছিল।' ব্যোমকেশ তর্জনি তুলিয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলিতে আরম্ভ করিল, 'তার নাম মৈনাক পর্বত। সেকালে পাহাড়দের পাখনা ছিল, উড়ে উড়ে বেড়াতো, যখন ইচ্ছে নগর-জনপদ প্রভৃতি লোকালয়ের ওপর গিয়ে বসতো। নগর-জনপদের কী অবস্থা হত বুঝতেই পারছ। দেখে-শুনে দেবরাজ ইন্দ্র চটে গেলেন, বজ্র নিয়ে বেরুলেন। পৃথিবীর যেখানে যত পাহাড় পর্বত আছে, বজ্র দিয়ে সকলের পাখনা পুড়িয়ে দিলেন। কেবল হিমালয়-পুত্র মৈনাক পালালো, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে রইল। সেই থেকে মৈনাক সমুদ্রের তলায় আছে, মাঝে মাঝে নাক বার করে, আবার ডুব মারে। অনেকটা ফেরারী আসামীর মত অবস্থা।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইন্দ্র এত বড় দেবতা, তিনি মৈনাককে ধরতে পারলেন না ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্দ্র দেবরাজ ছিলেন বটে, কিন্তু সত্যান্বেষী ছিলেন না। তাছাড়া, তিনি প্রচণ্ড মাতাল এবং লম্পট ছিলেন।'

প্রচণ্ড মাতাল এবং লম্পট হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র দেবতাদের রাজা হইলেন কি করিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় পাশের ঘরে কিড়িং কিড়িং শব্দে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। অনেকদিন এমন মধুর আওয়াজ শুনি নাই ; মনটা নিমেষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নিশ্চয় কেহ বিপদে পড়িয়া

ব্যোমকেশের শরণাপন্ন হইয়াছে। ব্যোমকেশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার আগেই আমি তড়াক করিয়া গিয়া ফোন ধরিলাম। বিপন্ন শরণার্থীকে দাঁড় করাইয়া রাখা ঠিক নয়।

ফোনে নেংটির গলা শুনিয়া একটু দমিয়া গিয়াছিলাম, তারপর তাহার বার্তা শুনিয়া আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। নেংটি বলিল, 'অজিতবাবু, শীগ্‌গির ব্যোমকেশদাকে নিয়ে আসুন। হেনা মল্লিক মরে গেছে।'

হেনা মল্লিক, অর্থাৎ সেই অপূর্ব সুন্দরী যুবতী। উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, 'মরে গেছে! কী হয়েছিল?'

নেংটি বলিল, 'তেতলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মরে গেছে। পুলিস এসেছে। মেসোমশাই বাড়ি নেই—আজ শনিবার—আপনারা শীগ্‌গির আসুন।'

ব্যোমকেশ আসিয়া আমার হাত হইতে টেলিফোন লইল, বলিল, 'কে, নেংটি! কী হয়েছে?'

সে কিছুক্ষণ ধরিয়া শুনিল, তারপর—'আচ্ছা—দেখি—' বলিয়া টেলিফোন রাখিয়া দিল। আমরা বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ঘড়িতে তখন সাতটা বাজিয়া পঁয়ত্রিশ মিনিট হইয়াছে।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। আমি কিছুক্ষণ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম, 'যাবে কি না ভাবছ?'

সে বলিল, 'যাওয়া উচিত কি না ভাবছি। গৃহস্বামী ডাকেননি, হয়তো ব্যাপারটা অপঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়; এ অবস্থায় নেংটির ডাক শুনে যাওয়া উচিত হবে কি?'

আমি বিবেচনা করিয়া বলিলাম, 'গৃহস্বামী বাড়ি নেই। আর যারা আছে তারা ছেলেমানুষ। বাড়িতে পুলিস এসেছে। নেংটিকে হয়তো তার মাসিমা আমাদের কাছে খবর পাঠাতে বলেছেন। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধু হিসেবে আমরা যদি যাই, খুব অন্যায় হবে কি?'

ব্যোমকেশ আরো কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তা বটে। চল তবে বেরুনো যাক।'

সন্তোষবাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম সাড়ে আটটা নাগাদ। ফটকের দেউড়িতে কেহ নাই। বাড়িটা অন্ধকারে দেখা গেল না, কেবল বাড়ির বহির্ভাগে দেওয়ালের গায়ে ভারা বাঁধা হইয়াছে চোখে পড়িল। বোধহয় দেওয়ালির আগে মেরামত ও চুনকামের কাজ চলিতেছে।

বাড়িতে প্রবেশ করিলেই বড় একটি সাজানো হল-ঘর, মাথার উপর চার-পাঁচটা তীব্র বৈদ্যুতিক বাল্‌ব ঘরটিকে দিনের মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। ঘরের মাঝামাঝি স্থানে একটু নীচু গোল টেবিল, তাহাকে ঘিরিয়া কয়েকটা চেয়ার এবং সোফা। আমরা ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সেখানে আট-দশ জন পুরুষ রহিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইউনিফর্ম-পরা পুলিস।

আমরা প্রবেশ করিলাম কেহ লক্ষ্য করিল না। একজন ইন্সপেক্টর টেবিলের সামনে বসিয়া নত হইয়া ডায়েরিতে কিছু লিখিতেছিলেন, বাকি সকলে টেবিল ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সকলের দৃষ্টি ইন্সপেক্টরের দিকে। পুলিসের লোক বাদ দিলে কেবল চারজন লোক চোখে পড়িল, তাহাদের মধ্যে নেংটিকে চিনিতে পারিলাম। বাকি তিনজনের মধ্যে একজন যে সেক্রেটারি রবিবর্মা তাহা তাহার মঙ্গোলীয় মুখ দেখিয়া সহজেই বোঝা যায়। অবশিষ্ট দুইজন অল্পবয়স্ক যুবক, সুতরাং নিশ্চয় যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। দু'জনের মুখেই শক্‌-খাওয়া জবুথবু ভাব, এখনো প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই।

আমরা প্রবেশ করিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ একবার ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল। বাঁ দিকে আসবাব কিছু নাই, কেবল দূরের কোণে উঁচু টিপয়ের উপর টেলিফোন, মাঝখানে গোল টেবিল ঘিরিয়া কয়েকজন লোক, ডান দিকে প্রায় দেওয়ালের কাছে সাদা কাপড়-ঢাকা একটি মূর্তি মেঝেয় পড়িয়া আছে; তাহার ওপারে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে দুইটি স্ত্রীলোক ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া বসিয়া আছে; নিশ্চয় শ্রীমতী চামেলি ও চিংড়ি। তাঁহাদের চোখে অবিমিশ্র বিভীষিকা; তাঁহারা চাদর-ঢাকা মৃতদেহের পানে চাহিতেছেন না, একদৃষ্টে ঘরের মাঝখানে সমবেত মানুষগুলির পানে চাহিয়া আছেন।

ব্যোমকেশও এক নজরে সব দেখিয়া লইয়া সেইদিকেই অগ্রসর হইল, টেবিলের সম্মুখস্থ হইয়া

বলিয়া উঠিল, 'আরে ! এ কে রে !'

ইন্সপেক্টর ডায়েরি হইতে মুখ তুলিলেন ; অন্য সকলে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। ইন্সপেক্টর ডায়েরি বন্ধ করিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশ ! তুমি কোত্থেকে ?'

ব্যোমকেশ তাঁহার হাতে হাত মিলাইল, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিল না ; আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। জানিতে পারিলাম, ইঁহার নাম অতুলকৃষ্ণ রায়, সংক্ষেপে এ কে রে। কলেজে ব্যোমকেশের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এখন কলিকাতায় আছেন। আমার সহিত ইতিপূর্বে দেখা না হইলেও ব্যোমকেশের সহিত কালে-ভদ্রে দেখাশোনা হয়। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, খুব আমুদে লোক, কিন্তু কাজের সময় গম্ভীর ও মিতভাষী।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ব্যাপার কি ? শুনলাম একটি মেয়ের মৃত্যু হয়েছে !'

'হ্যাঁ।' কিছুক্ষণ নত-চক্ষে চিন্তা করিয়া এ কে রে বলিলেন, 'এস, তোমাকে বলছি।'

আমরা দল হইতে একটু দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম, এ কে রে অল্প কথায় ঘটনা বিবৃত করিলেন। —তিনি এখন এই এলাকার থানার দারোগা। আজ সন্ধ্যা সাতটা বাজিতে দশ মিনিটে তিনি টেলিফোনে খবর পান যে, সন্তোষবাবুর বাড়িতে একটি অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে ; ফোন করিয়াছিলেন সেক্রেটারি রবিবর্মা। এ কে রে তৎক্ষণাৎ লোকজন লইয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ির পশ্চিমদিকে, যেদিকে ভারা বাঁধা হয় নাই, সেইদিকে বাড়ির ঠিক ভিতের কাছে মৃতা যুবতীর দেহ পাওয়া গিয়াছে। এ কে রে পুলিস ডাক্তারকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, উচ্চ স্থান হইতে পতনের ফলে ঘাড়ের কশেরু ভাঙিয়া মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যুর কাল অনুমান একঘন্টা আগে, অর্থাৎ সাড়ে ছ'টার সময়। এ কে রে তখন তিনতলার খোলা ছাদে গিয়া দেখিলেন, ছাদের মাঝখানে একটি ছোট মাদুরের আসন পাতা রহিয়াছে, তার পাশে এক জোড়া মেয়েলি চপ্পল। খবর লইয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, মেয়েটি প্রত্যহ সূর্যাস্তের সময় ছাদে আসিয়া বসিত। সন্দেহ রহিল না যে আজও মেয়েটি ছাদে গিয়াছিল এবং ছাদ হইতে পড়িয়া মরিয়াছে।

বিবৃতি শেষ করিয়া এ কে রে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু তোমাকে খবর দিল কে ?'

ব্যোমকেশ নেংটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ওই ছেলেটি। ওর নাম নেংটি দত্ত। ও আমার কাছে যাতায়াত করে। বোধহয় ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে ফোন করেছিল।'

নেংটি কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকেই তাকাইয়াছিল, এ কে রে কিছুক্ষণ তাহাকে নিবিষ্ট চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'হুঁ। তা, তুমি এখন কি করতে চাও ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি আর করব। নেহাৎ পারিবারিক বন্ধু হিসেবেই এসেছি, সত্যান্বেষী হিসেবে নয়। তোমার কী মনে হচ্ছে ? অপঘাত মৃত্যু ?'

এ কে রে বলিলেন, 'অ্যাক্সিডেন্টই মনে হচ্ছে। তবে—' তিনি বাক্যটি অসমাপ্ত রাখিয়া দিলেন, তাঁহার চোখে একটু হাসির আভাস দেখা দিল।

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'বাড়ির সকলের জবানবন্দী নিয়েছ ?'

এ কে রে বলিলেন, 'হ্যাঁ। কেবল গৃহস্বামীকে এখনো পাইনি। তিনি কোথায় তাও কেউ বলতে পারছে না। শুনলাম, উইক-এন্ডএ তিনি বাড়ি থাকেন না।' আবার তাঁহার চোখের মধ্যে হাসি ফুটিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'জবানবন্দীর নকল তৈরি হলে আমাকে এক কপি দেবে ?'

এ কে রে বলিলেন, 'দেব। কাল বিকেলে পাবে। লাশ দেখতে চাও ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেখতে পারি। ক্ষতি কি ?'

যেখানে চাদর-ঢাকা মৃতদেহ পড়িয়াছিল এ কে রে আমাদের সেখানে লইয়া গেলেন, চাদরের খুঁট ধরিয়া চাদর সরাইয়া দিলেন। অত্যুজ্জ্বল আলোকে মৃতা হেনা মল্লিককে দেখিলাম।

সে রূপসী ছিল বটে, নেংটি মিথ্যা বলে নাই। গায়ের রঙ দুধে আলতা, ঘন সুকৃষ্ণ চুল

অবিন্যস্ত হইয়া যেন মুখখানিকে আরো ঘনিষ্ঠ কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে, ভুরু দু'টি তুলি দিয়া আঁকা। চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত, গাঢ়-নীল চোখের তারা অর্ধেক দেখা যাইতেছে, দেহে ভরা যৌবনের উচ্ছলিত প্রগল্‌ভতা। মৃত্যু তাহার প্রাণটুকুই হরণ করিয়া লইয়াছে, দেহে কোথাও আঘাতচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই, যৌবনের লাবণ্য তিলমাত্র চুরি করিতে পারে নাই। এই দেহ দু'দিনের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে ভাবিতেও কষ্ট হয়।

আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দেখিতেছি, হঠাৎ পিছন দিকে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। যুগল ও উদয় আমাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উদয়ের চক্ষু রক্তবর্ণ, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, সে যুগলের দিকে ফিরিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, 'যুগল, তুই হেনাকে মেরেছিস।'

যুগল আগুন-ভরা চোখ তুলিয়া উদয়ের পানে চাহিল, শীর্ণ-কঠিন স্বরে বলিল, 'আমি—হেনাকে—মেরেছি! মিথ্যেবাদী! তুই মেরেছিস।'

এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে বোধকরি দুই ভাইয়ের মধ্যে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। কিন্তু সিঁড়ির উপর উপবিষ্ট দু'টি স্ত্রীলোকই তাহা হইতে দিল না। শ্রীমতী চামেলি এবং চিংড়ি একসঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইলেন। চামেলি উদয়ের বুকে দু'হাত রাখিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিতে দিতে তীক্ষ্ণ ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিলেন, 'হতভাগা! এসব কী বলছিস তুই! চলে যা এখান থেকে, নিজের ঘরে যা। হেনাকে কেউ মারেনি, ও নিজে ছাদ থেকে পড়ে মরেছে।'

ওদিকে চিংড়ি যুগলের হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্র-হ্রস্ব কণ্ঠে বলিতেছে, 'দাদা, দু'টি পায়ে পড়ি, চলে এস, এখানে থেকো না। চল তোমার শোবার ঘরে—লক্ষ্মীটি!'

যুদ্ধ থামিল বটে, কিন্তু দু'জনের কেহই ঘর ছাড়িয়া গেল না, রক্তিম চক্ষে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বা পুলিসের লোকেরা কেহই এই সহসা-স্ফুরিত কলহ নিবারণের চেষ্টা করে নাই, সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় তাহারা প্রতীক্ষা করিতেছে এই ঝগড়ার সূত্রে যদি কোন গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু ঝগড়া যখন অর্ধপথে বন্ধ হইয়া গেল তখন এ কে রে উদয়ের কাছে গিয়া বলিলেন, 'আপনি এখনি অভিযোগ করলেন যে, আপনার ভাই হেনাকে মেরেছে। এ অভিযোগের কোন ভিত্তি আছে কি?'

উদয় উত্তর দিল না, গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শ্রীমতী চামেলি তীব্রদৃষ্টিতে ইন্সপেক্টরের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্বেই হঠাৎ ঘরের আবহাওয়া যেন মন্ত্রবলে পরিবর্তিত হইল।

সদর দরজার সামনে একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মধ্যমাকৃতি মানুষ, একটু ভারী গোছের গড়ন, কিন্তু মোটা নয়; মুখে লালিত্য না থাক, দৃঢ়তা আছে। বেশভূষা একটু শৌখিন ধরনের, গিলেকরা পাঞ্জাবি ও কোঁচানো থান-ধুতির নীচে সাদা চামড়ার বিদ্যাসাগরী চটি। খবরের কাগজে তাঁহার অজস্র ছবি দেখিয়াছি; সুতরাং সন্তোষ সমাদ্দারকে চিনিতে কষ্ট হইল না। কিন্তু ছবিতে যাহা পাই নাই তাহা এখন পাইলাম, লোকটির একটি প্রবল ব্যক্তিত্ব আছে, তিনি যেখানে উপস্থিত আছেন সেখানে তিনিই প্রধান, অন্য কেহ সেখানে কল্‌কে পায় না।

তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীমতী চামেলি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না, দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেলেন; ক্ষণেক পরে উদয়ও উপরে চলিয়া গেল। বাকি সকলে যেমন ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি যখন সন্তোষবাবুকে দেখিলাম তখন তিনি দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ চক্ষে ভূমি-শায়িত মৃতদেহের পানে চাহিয়া আছেন। কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি মৃতের পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মুখের পেশীগুলি কঠিন হইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি একবার বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আবার পরিষ্কার হইল। তিনি কাহাকেও সম্বোধন না করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'যাক, বাপ-মা-মেয়ে সবাই অপঘাতে গেল! আশ্চর্য ভবিতব্য।'

আশ্রিতা বন্ধুকন্যার মৃত্যুতে তিনি শোকে অভিভূত হইবেন কেহ প্রত্যাশা করে নাই, তবু তাঁহার এই অটল সংযমের জন্যও প্রস্তুত ছিলাম না ; একটু বেশি নীরস ও কঠিন মনে হইল। যাহোক, তিনি মৃতদেহ হইতে চক্ষু তুলিয়া একে একে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

ব্যোমকেশ একটু অপ্রস্তুতভাবে গলা-ঝাড়া দিয়া বলিল, 'অনাহূত অতিথি বলতে পারেন। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী, ইনি আমার বন্ধু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের আপনি চেনেন না, কিন্তু নেংটি—'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'না চিনলেও নাম জানি। নেংটি আপনাদের ডেকে এনেছে ?' তিনি নেংটির দিকে চক্ষু ফিরাইলেন।

নেংটি পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল, 'আমি—মাসিমা খুব ভয় পেয়েছিলেন—'

'বেশ করেছ তুমি ব্যোমকেশবাবুকে খবর দিয়েছ। বিপদের সময় বন্ধুর কথাই আগে মনে পড়ে।' তাঁহার কণ্ঠস্বরে প্রসন্নতার আভাস পাওয়া গেল, তিনি ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'নেংটি বুঝি আপনার বন্ধু ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বলতে পারেন।'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'ভাল ভাল।' এ কে রে'কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনার কাজ কি শেষ হয়েছে ?'

এ কে রে বলিলেন, 'আর সব কাজই শেষ হয়েছে, লাশ চালান দিয়েই আমরা চলে যাব।'

কথাটা বোধহয় সন্তোষবাবুর মনে আসে নাই, তিনি থমকিয়া বলিলেন, 'ঠিক তো। পোস্ট-মর্টেম করতে হবে।' তিনি একবার চকিতের জন্য মৃতদেহের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, 'আমার কিছু বলবার নেই, আপনার যা কর্তব্য তাই করুন।'

তিনি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইলে এ কে রে বলিলেন, 'যদি আপত্তি না থাকে, আপনাকে দু'চারটে প্রশ্ন করতে চাই।'

সন্তোষবাবু থামিয়া গিয়া বলিলেন, 'আপত্তি কিসের ? আপনারা বসুন, আমি এখনি আসছি। রবি, এঁদের খাবার-ঘরে বসাও। আর চিংড়ি, তুমি এঁদের জন্যে চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কর।'

তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। রবিবর্মা সামনে আসিয়া বলিল, 'আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।'

এ কে রে একজন অফিসারকে মৃতদেহের কাছে দাঁড় করাইয়া রবিবর্মার অনুসরণ করিলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম।

পাঠকের সুবিধার জন্য এইখানে বাড়ির একটি প্ল্যান দেওয়া হইল।

সন্তোষবাবুর ভোজন-কক্ষটি বেশ বড়, লম্বা টেবিলে বারো-চৌদ্দ জন একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারে। আমরা গিয়া চেয়ারগুলিতে উপবিষ্ট হইলাম। লক্ষ্য করিলাম, যুগলচাঁদ, নেংটি ও চিংড়ি আমাদের সঙ্গে আসে নাই। রবিবর্মা বসিল না, কর্তার আগমনের প্রতীক্ষায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

এ কে রে'র পাশের চেয়ারে ব্যোমকেশ বসিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'হেনা মল্লিকের ঘরটা দেখেছ নাকি ?'

এ কে রে বলিলেন, 'মোটামুটি দেখেছি ! অতি সাধারণ একটা শোবার ঘর। আসবাবপত্রও বেশি কিছু নেই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চিঠিপত্র ?'

এ কে রে বলিলেন, 'এখনও ভাল করে দেখা হয়নি। যাবার আগে আর একবার দেখে যাব। তুমি দেখবে ?'

'দেখব।'

এই সময় যে অফিসারটি লাশ পাহারা দিতেছিল, সে আসিয়া এ কে রে'র কানের কাছে খাটো
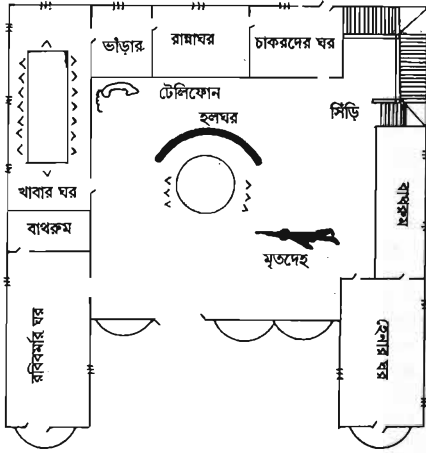
গলায় বলিল, 'ভ্যান এসেছে, লাশ রওনা করে দেব ?'

এ কে রে বলিলেন, 'দাও।'

অফিসার চলিয়া গেল। আমরা নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলাম। খোলা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রবিবর্মা হল-ঘরের দিকে অপলক চাহিয়া ছিল, আমরা তাহার চক্ষু দিয়াই যেন মৃতদেহ স্থানান্তরণের কার্যটা দেখিতে পাইলাম। ক্ষণেকের জন্য তাহার মঙ্গোলীয় চোখে একটা ক্ষুধিত অতৃপ্ত লালসা দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। এই পলকের দৃষ্টি জানাইয়া দিয়া গেল, সেক্রেটারি রবিবর্মার মন হেনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ছিল না।

তারপর সন্তোষবাবু আসিয়া টেবিলের শীর্ষস্থিত চেয়ারে বসিলেন। তিনি শৌখিন বেশ-বাস ত্যাগ করিয়া মামুলি আটপৌরে জামা-কাপড় পরিয়াছেন। উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'রবি, সিগারেট নিয়ে এস।'

রবিবর্মা তাড়াতাড়ি সিগারেট আনিতে গেল, সন্তোষবাবু এ কে রে'র পানে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনি বোধহয় হেনা সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করতে চান ? দুঃখের বিষয়, তার কথা আমি বিশেষ কিছু জানি না। মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু তাকে ভাল করে জানবার সুযোগ হয়নি। একে তো আমি বাড়িতে কম থাকি, তাছাড়া হেনাও খুব মিশুকে মেয়ে ছিল না। যাহোক—'

রবিবর্মা সিগারেটের কৌটা ও দেশলাই আনিয়া সন্তোষবাবুর সম্মুখে রাখিল, তিনি কৌটার ঢাকা খুলিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিলেন—'আসুন।' সিগারেট লইতে লইতে ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল, 'শুনেছিলাম এ বাড়িতে ধূমপান নিষিদ্ধ।'

সন্তোষবাবু ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, 'আপনাদের জন্যে নিষিদ্ধ নয়।' তিনি নিজে একটা সিগারেট মুখে দিলেন, দেশলাই জ্বালিয়া আমাদের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

'এবার কি প্রশ্ন করবেন করুন।'

এ কে রে রাইটার জমাদারকে ইশারা করিলেন, সে খাতা-পেন্সিল বাহির করিল। তখন প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল।

প্রশ্ন : হেনার বাবার নাম কি ?

উত্তর : কমল মল্লিক।

প্রশ্ন : কমল মল্লিক আপনার বন্ধু ছিলেন ?

উত্তর : হ্যাঁ। তাঁকে প্রায় পনেরো বছর ধরে চিনতাম। ব্যবসার সূত্রে আমাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হত, এখনো হয়। কমল মল্লিকের সঙ্গে ঢাকায় জানাশোনা হয়েছিল, তারপর ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হয়।

প্রশ্ন : তাহলে হেনা কলকাতায় আসবার আগেও তাকে দেখেছেন ?

উত্তর : অনেক বার। ওর তিন-চার বছর বয়স থেকে ওকে দেখছি।

প্রশ্ন : ওকে আশ্রয় দেবার ফলে বাড়িতে কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল কি ?

একটু থমকিয়া গিয়া সন্তোষবাবু বলিলেন, 'আমার স্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর শুচিবাই আছে ; হেনা পাকিস্তানের মেয়ে, তার আচার-বিচার নেই, এই অছিলায় তিনি হেনাকে নিজের হাঁড়ি-হেঁশেল থেকে খেতে দিতে অসম্মত হয়েছিলেন। কাছেই একটা হোটেল আছে, সেখান থেকে হেনার খাবার আনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।'

প্রশ্ন : আর কেউ আপত্তি করেনি ?

উত্তর : আর কারুর আপত্তি করার সাহস নেই।

প্রশ্ন : বাড়িতে কারুর সঙ্গে হেনার মেলামেশা ছিল না ?

উত্তর : মেলামেশার বাধা ছিল না। তবে হেনা মিশুকে মেয়ে ছিল না, বাপ-মায়ের মৃত্যুর শকটাও বোধহয় সামলে উঠতে পারেনি। তাই সে একা-একাই থাকতো, নিজের ঘর ছেড়ে বড় একটা বেরতো না।

প্রশ্ন : সে রোজ সন্ধ্যেবেলা তেতলার ছাদে উঠে বেড়াতো আপনি জানেন ?

উত্তর : আগে জানতাম না, আজ জানতে পেরেছি।

প্রশ্ন : কার কাছে জানতে পারলেন ?

উত্তর : যে আমাকে টেলিফোনে মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছিল তার কাছে।

প্রশ্ন: কে মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছিল ?

সন্তোষবাবু কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া রহিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'তাই তো, কে খবর দিয়েছিল তা তো লক্ষ্য করিনি। আমি যেখানে ছিলাম সেখানকার ঠিকানাও তো কেউ জানে না।' তিনি হঠাৎ রবিবর্মার দিকে তীব্র চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, 'রবি।'

রবিবর্মা গাঢ়স্বরে বলিল, 'আজ্ঞে না, আমি ফোন করিনি।'

আমরা একবার মুখ তাকাতাকি করিলাম। এ কে রে বলিলেন, 'টেলিফোনে গলার আওয়াজ শুনে চিনতে পারেননি ?'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'খবরটা পাবার পর অন্য কোন প্রশ্ন মনেই আসেনি। কিন্তু—'

এ কে রে এবার অনিবার্য প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কোথায় ছিলেন ?'

সন্তোষবাবুর মুখে ঈষৎ রক্তসঞ্চার হইল, তিনি একে একে আমাদের সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন, 'একথা জানা কি নিতান্তই দরকার ?'

এ কে রে একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছেন, তাহা তাঁহার ভাবভঙ্গী হইতে প্রকাশ পাইল ; তিনি অপ্রতিভভাবে বলিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু হেনা মল্লিকের মৃত্যু সম্বন্ধে আমি এখনো নিঃসংশয় হতে পারিনি। খুব সম্ভব সে অসাবধানে ছাদ থেকে নিজেই পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কেউ তাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল—এ সম্ভাবনাও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। তাই সব কথা আমাদের জানা দরকার।'

সন্তোষবাবু ভ্রূ তুলিয়া কিছুক্ষণ এ কে রে'র পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'হেনাকে

কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল এ সম্ভাবনাও আছে ?'

এ কে রে বলিলেন, 'আজ্ঞে আছে।'

সন্তোষবাবু ঈষৎ গলা চড়াইয়া বলিলেন, 'কিন্তু কে তাকে মারবে ? কেন মারবে ?'

এ কে রে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'তা এখনো জানি না। কিন্তু সব সম্ভাবনাই আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।'

সন্তোষবাবু আবার কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর সহসা খাড়া হইয়া বসিলেন ; কড়া চোখে আমাদের সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া কড়া সুরে বলিলেন, 'বেশ, কোথায় ছিলাম বলছি। কিন্তু এটা আমার জীবনের একটা গুপ্তকথা, এ নিয়ে যেন কথা-চালাচালি না হয়।'

'কথা-চালাচালি হবে না। আপনি যা বলবেন, অফ্-রেকর্ড থাকবে।' এ কে রে অন্য পুলিস কর্মচারীদের ইশারা করিলেন, তাহারা উঠিয়া হল-ঘরে গেল, রাইটার জমাদারও খাতা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। ব্যোমকেশ উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, 'আমরাও তাহলে পাশের ঘরে গিয়ে বসি।'

সন্তোষবাবু হাত তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'না, আপনারা বসুন। আপনি উপস্থিত আছেন ভালই হল, আমি আপনাকে আমার পারিবারিক স্বার্থরক্ষার কাজে নিযুক্ত করলাম।'

ব্যোমকেশ আবার বসিয়া পড়িল। সন্তোষবাবু আর-একটা সিগারেট ধরাইয়া মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিলেন, আমরা অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

চিংড়ি দ্বারের নিকট হইতে গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'চা নিয়ে আসব ?'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'এস।'

চিংড়ি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে খাবার ও চায়ের ট্রে লইয়া দুইজন ভৃত্য। চিংড়ি আমাদের সামনে চা ও জলখাবারের রেকাবি রাখিতে রাখিতে একবার বিস্ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিল। নেংটির নিকট নিশ্চয় ব্যোমকেশের পরিচয় শুনিয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে কৌতূহল ছাড়াও এমন কিছু ছিল, যাহা নির্ণয় করা কঠিন। বোধহয় সে মনে মনে ভয় পাইয়াছে।

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদেরও দাও।'

চিংড়ি চাকরদের লইয়া হল-ঘরে গেল, রবিবর্মা বাহিরে গিয়া নিঃশব্দে দ্বার ভেজাইয়া দিল।

আমরা পানাহারে মনোনিবেশ করিলাম। সন্তোষবাবু কেবল এক পেয়ালা চা লইয়াছিলেন, তিনি তাহাতে একটু মৃদু চুমুক দিয়া আমাদের দিকে না চাহিয়াই বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'আমি অকলঙ্ক চরিত্রের লোক নই, কিন্তু সেজন্যে নিজেকে ছাড়া কাউকে দোষ দিই না। আমার অসংখ্য দোষের মধ্যে একটা দোষ, আমি কীর্তন শুনতে ভালবাসি।'

আমরা মুখ তুলিয়া চাহিলাম। রাজনীতির ক্ষেত্রে সন্তোষবাবু বিখ্যাত বক্তা, তিনি যে তাঁহার গুপ্তকথা মর্মস্পর্শী ভঙ্গীতে বলিবেন তাহাতে সন্দেহ রহিল না। বস্তুত তাঁহার প্রস্তাবনার বৈচিত্র্যে তিনি আমাদের অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

আর-এক চুমুক চা পান করিয়া তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিলেন, তারপর পেয়ালার মধ্যে সিগারেটের দগ্ধাংশ ফেলিয়া এক পাশে সরাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

'কীর্তন-গাইয়ে সুকুমারীর নাম বোধহয় আপনারা শুনেছেন। গান গাওয়া তার ব্যবসা, টাকা নিয়ে সভায়-মজলিশে গান গায়। দশ বছর আগে তার গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার দাম্পত্য-জীবন সুখের নয়, আমি সুকুমারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তখন সুকুমারীর বয়স বাইশ-তেইশ বছর। কিছুদিন লুকিয়ে তার বাড়িতে যাতায়াত করেছিলাম, তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কিন্তু তার বাড়িতে নানা রকম লোক আসত, কেউ গান শুনতে আসত, কেউ বায়না দিতে আসত। দেখলাম, এখানে যাতায়াত করা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

'আপনারা জানেন, আমার জীবন রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। স্বাধীনতার যুদ্ধে

লড়েছি, জেলে গিয়েছি, পুলিসের লাঠি খেয়েছি, সন্ত্রাসবাদীদের অজস্র টাকা দিয়েছি, দেশ-বিভাগের সময় দুই পক্ষের মধ্যে দূতের কাজ করেছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার খ্যাতি আছে, প্রতিপত্তি আছে। তেমনি আবার শত্রুও আছে। শত্রুপক্ষ যদি আমার নামে কলঙ্ক রটাবার সুযোগ পায়, তাহলে আমার যশ পদমর্যাদা কিছুই থাকবে না। ভেবে-চিন্তে আমি এক কাজ করলাম, বেনামে একটি ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিলাম। উদ্দেশ্য, সুকুমারীকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তুলব, তার প্রকাশ্য গায়িকা-জীবন শেষ হবে। কিন্তু সুকুমারী তাতে রাজী হল না। শেষ পর্যন্ত স্থির হল সে নিজের বাসাতেই থাকবে এবং গানের ব্যবসা চালাবে, কেবল হপ্তার মধ্যে দু'দিন, শনিবার এবং রবিবার, সে আমার ভাড়া-করা গোপন বাড়িতে এসে থাকবে। আমি সেখানে এমনভাবে যাতায়াত করব যে কেউ জানতে পারবে না।

'গত দশ বছর ধরে এইভাবে চলেছে। আমি শনিবার বিকেলের দিকে অফিসের কাজ সেরে সেখানে চলে যাই, তারপর সোমবার সকালে সেখান থেকে সটান অফিসে যাই। আজও তাই হয়েছিল, বেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটের সময় সেখানে গিয়েছিলাম। তারপর—রাত্রি আটটার সময় টেলিফোন পেয়ে তৎক্ষণাৎ চলে এলাম।' তাঁহার মুখে নীরস ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিল, 'এই আমার অ্যালিবাই।'

ব্যঙ্গের খোঁচা হজম করিয়া এ কে রে বিনীত স্বরে বলিলেন, 'ধন্যবাদ। ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, আর দু'-একটা প্রশ্ন করেই আপনাকে নিষ্কৃতি দেব। ভাড়াটে বাড়িতে চাকর-বাকর কেউ আছে ?'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'না, ইচ্ছে করেই চাকর রাখিনি। প্রত্যেক শনিবার দুপুরবেলা সুকুমারী নিজের বাসা থেকে ভাড়াটে বাসায় চলে আসে, ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখে। আমি বিকেলবেলা যাই। তারপর সোমবারে আমি অফিসে চলে যাবার পর, সে বাড়িতে তালা দিয়ে নিজের বাসায় ফিরে যায়। হপ্তার বাকি দিন বাড়ি বন্ধ থাকে।'

প্রশ্ন : টেলিফোন রেখেছেন কেন ?

উত্তর : নিজের জন্য নয়, সুকুমারীর জন্যে। সে যে-সময় ভাড়াটে বাড়িতে থাকে, সে-সময় নিজের বাসার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায়। কিন্তু প্রাইভেট নম্বর, ডিরেক্টরিতে পাবেন না।

প্রশ্ন : সেক্রেটারিকে নম্বর বলেননি ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : কার জানা সম্ভব ?

উত্তর : কারুর জানা সম্ভব নয়। আমি কাউকে বলিনি, সুকুমারীও কাউকে বলবে না।

প্রশ্ন : তাঁকে আপনি বিশ্বাস করেন ?

উত্তর : করি। আমি তাকে মাসে হাজার টাকা দিই। সে নির্বোধ নয়, নিজের পায়ে কুড়ুল মারবে না।

প্রশ্ন : আজ যখন টেলিফোন পেলেন, তখন আপনি কি করছিলেন ?

উত্তর : কীর্তন শুনছিলাম। সুকুমারী চণ্ডীদাসের পদ গাইছিল।

এ কে রে ব্যোমকেশের পানে চক্ষু ফিরাইলেন ; ব্যোমকেশ নিঃশব্দে মাথা নাড়িল, অর্থাৎ, আর কোন প্রশ্ন নাই। তখন এ কে রে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক। কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। আজ কি আপনি আবার— ?'

'না, ফিরে যাব না, বাড়িতেই থাকব।' সন্তোষবাবুর গম্ভীর চোখে কৌতুকের কটাক্ষ খেলিয়া গেল, তিনি বলিলেন, 'আমার পিছনে গুপ্তচর লাগিয়ে আমার বাসার সন্ধান পাবেন না।'

এ কে রে জিভ কাটিয়া বলিলেন, 'না না, সে কি কথা ! আপনার গুপ্ত বাসা সম্বন্ধে আমার তিলমাত্র কৌতূহল নেই। আপনি যা বললেন, আমাদের তদন্তের পক্ষে তাই যথেষ্ট। কেবল—শ্রীমতী সুকুমারীর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে ভাল হত।'

'তাকে তার বাসার ঠিকানায় পাবেন।' সন্তোষবাবু সুকুমারীর ঠিকানা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'দশটা বাজে। আপনার কাজ বোধহয় এখনো শেষ হয়নি, যতক্ষণ দরকার থাকুন।

ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার পক্ষ থেকে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে থাকবেন তো ?'

'নিশ্চয়' বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি তাহলে বিশ্রাম করি গিয়ে। একটু ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।'

তিনি দৃঢ়পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার শরীরে ক্লান্তির কোন লক্ষণ চোখে পড়িল না। বোধহয় মনের ক্লান্তি। বাড়িতে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর—

সন্তোষবাবু যেভাবে তাঁহার গুপ্তকথা প্রকাশ করিলেন তাহাতে ঢাকঢাক গুড়গুড় নাই, নিজের সম্বন্ধে সাফাই গাহিবার চেষ্টা নাই—জীবনের গূঢ় সত্য কথা যখন বলিতেই হইবে তখন স্পষ্টভাবে বলাই ভাল। তবু তাঁহার নির্মম সত্যবাদিতা আমার মনকে পীড়া না দিয়া পারিল না। তিনি পাকা ব্যবসায়ী এবং ঝানু রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহার চরিত্রে এই কালো দাগটা না থাকিলেই বোধহয় ভাল হইত।

এ কে রে ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন, 'অতঃপর ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, হেনার ঘরটা একবার দেখে যাই।'

'চল।—ছাদে যাবে নাকি ?'

'যাব। এসেছি যখন, যা-যা দ্রষ্টব্য আছে সবই দেখে যাই।'

হল-ঘরের গোল টেবিলের কাছে বসিয়া পুলিসের বাকি কর্মচারীরা নিম্নস্বরে বাক্যালাপ করিতেছিলেন, রবিবর্মা ছাড়া বাড়ির লোক আর কেহ উপস্থিত ছিল না। হেনার ঘর ডাইনিং-রুম হইতে কোনাকুনিভাবে হল-ঘরের অপর প্রান্তে। [প্ল্যান পশ্য]। হেনার ঘরের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত, আলো জ্বলিতেছে। আমরা তিনজনে ঘরে প্রবেশ করিলাম। রবিবর্মা আমাদের পিছন পিছন আসিল।

ঘরটি বেশ বড়। সদরের দিকে ধনুরাকৃতি বড় জানালা, পূর্বদিকের দেয়ালেও একটি সাধারণ জানালা আছে। এই জানালার সামনে টেবিল ও চেয়ার, পাশে বইয়ের শেলফ। ঘরের অন্য পাশে সংকীর্ণ একহারা খাটের উপর বিছানা পাতা ; খাটের নীচে বড় বড় দু'টি সুটকেস দেখা যাইতেছে। উত্তরদিকের দেয়ালের কোণে একটি সরু দরজা সংলগ্ন বাথরুমের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। ঘরে আসবাবের বাহুল্য নাই, তাই ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন দেখাইতেছে। সম্ভবত হেনাও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মেয়ে ছিল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'ঘরের দরজা কি খোলা ছিল ?'

এ কে রে বলিলেন, 'না, তালা লাগানো ছিল। মৃতদেহের হাতে একটা চামড়ার হ্যান্ড-ব্যাগ ছিল, তার মধ্যে চাবির রিঙ পাওয়া গেছে। এই যে।' তিনি পকেট হইতে একটি চাবির গোছা বাহির করিয়া দিলেন।

চাবি হাতে লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হেনা তাহলে ঘরে তালা দিয়ে ছাদে গিয়েছিল।'

এ কে রে বলিলেন, 'তাই তো দেখা যাচ্ছে।'

রবিবর্মা মুখের সামনে মুষ্টি রাখিয়া কাশির মত একটা শব্দ করিল। ব্যোমকেশ তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইলে সে বলিল, 'হেনা দোর খুলে রেখে ঘর থেকে কখনো এক পা বেরুতো না, যখনি বেরুতো দোরে তালা দিয়ে বেরুতো।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই নাকি ? গোড়া থেকেই এই রকম, না, কোন উপলক্ষ হয়েছিল ?'

'গোড়া থেকেই এই রকম।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না, চাবির রিঙ পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'পাঁচটা চাবি রয়েছে দেখছি। একটা তো দোরের তালার চাবি। আর অন্যগুলো ?'

এ কে রে বলিলেন, 'বাকিগুলোর মধ্যে দুটো হচ্ছে সুটকেসের চাবি। অন্য দুটো কোথাকার চাবি জানা গেল না।'

ব্যোমকেশ চাবিগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'একটা চাবিতে নম্বর খোদাই করা

রয়েছে—৭ নম্বর। দেখ তো, এ চাবিটা কোথাও লাগে কি না।'

এ কে রে চাবিটি দেখিয়া বলিলেন, 'না। যে চাবি দুটোর তালা পাওয়া যাচ্ছে না, এটা তারই একটা।'

'টেবিলের দেরাজে গা-তালা নেই?'

'আছে। কিন্তু দেরাজগুলো সব খোলা। চাবি নেই।'

'হুঁ।—কি মনে হয়?'

দু'জনে চোখে চোখে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, শেষে এ কে রে বলিলেন, 'বলা শক্ত। অনেক সময় দেখা যায় তালা হারিয়ে গেছে, কিন্তু চাবিটা রিঙে রয়ে গেছে।'

ব্যোমকেশ রবিবর্মার দিকে চাহিয়া বলিল, 'আপনি কিছু বলতে পারেন?'

রবিবর্মা ঘাড় নাড়িল, 'এ-ঘরের ভিতরের কথা আমি কিছু বলতে পারি না। এই প্রথম ঘরে ঢুকলাম।'

ব্যোমকেশ গলার মধ্যে শব্দ করিল, চাবির গোছা এ কে রে-কে ফেরৎ দিয়া টেবিলের সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

একদিকে দেরাজযুক্ত টেবিল, লাল বনাত দিয়া ঢাকা, তাহার উপর দু'-একটি বই ছাড়া আর কিছু নাই। তারপর চোখে পড়িল লাল বনাতের উপর একটি লাল গোলাপফুল পড়িয়া আছে। ঘরে ফুলদানি নাই, গোলাপফুলটা এমন অনাদৃতভাবে পড়িয়া আছে যে, আশ্চর্য লাগে।

ব্যোমকেশ ফুলটিকে স্পর্শ করিল না, সম্মুখে ঝুঁকিয়া সেটি ভালভাবে দেখিল, তারপর টেবিলের শিয়রে খোলা জানালার দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, 'তাজা ফুল। বাগানে গোলাপফুল আছে?' জানালার বহির্ভাগের দৃশ্য অন্ধকারে দেখা যাইতেছিল না।

রবিবর্মা বলিল, 'আছে।'

ব্যোমকেশ এ কে রে-কে বলিল, 'গোলাপটা দেখে কী মনে হয়? এমনভাবে টেবিলের ওপর পড়ে আছে কেন?'

এ কে রে নীরবে জানালার বাহিরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। হেনা যখন ঘরে ছিল না, সেই সময় কেউ বাগান থেকে ফুলটা তুলে জানালার গরাদের ফাঁকে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়েছে।' আমাদের সকলের চক্ষু রবিবর্মার দিকে ফিরিল, সকলের চোখে একই প্রশ্ন—কে ফেলতে পারে?

রবিবর্মা কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসু চক্ষু এড়াইয়া এদিকে-ওদিকে চাহিতে লাগিল, শেষে বলিল, 'আমি কিছু জানি না।'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া দেরাজগুলি খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল, আমি বইয়ের শেলফের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম।

দু'-সারি বই। প্রথম সারিতে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, সত্যেন দত্তের কাব্যসঞ্চয়ন, নজরুলের সঞ্চিতা এবং আধুনিক লেখকদের রচিত কয়েকটি কথাকাহিনীর পুস্তক। দ্বিতীয় সারিতে অনেকগুলি ইংরেজি উপন্যাসের সুলভ সংস্করণ। হেনা বিদেশী রহস্য-রোমাঞ্চের বইও পড়িত।

'অজিত, দ্যাখো।'

আমি ফিরিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ দেরাজ হইতে একটি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়াছে এবং একদৃষ্টে তাহা দেখিতেছে। কার্ডবোর্ডের উপর আঁটা পোস্টকার্ড সাইজের ছবিতে কেবল একটি রমণীর প্রতিকৃতি! আমি এক নজর দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'হেনার ফটো।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না। ছবিটা কয়েক বছরের পুরনো, দেখছ না হলদে হয়ে গেছে, অথচ মহিলাটির বয়স পঁচিশের কম নয়। হেনা হতে পারে না, বোধহয় হেনার মা। হেনা এত রূপ কোথা থেকে পেয়েছিল বোঝা যাচ্ছে।'

হেনাকে জীবিত অবস্থায় দেখি নাই, মৃতদেহ দেখিয়া রূপ অনুমান করিয়াছিলাম। এখন এই ফটো দেখিয়া মনে হইল, হেনাকে জীবন্ত অবস্থায় দেখিতেছি। শুধু রূপ নয়, অফুরন্ত প্রাণশক্তি

সর্বাঙ্গ দিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে।

ব্যোমকেশ ছবিটা এ কে রে-র হাতে দিয়া বলিল, 'এটা রাখো। সন্তোষবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে ছবিটা হেনার মায়ের কিনা।'

এ কে রে ছবিটি লইয়া চোখ বুলাইলেন, রবিবর্মা গলা বাড়াইয়া দেখিয়া লইল। লোকটির চোখ-মুখ দেখিয়া কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু প্রাণে যথেষ্ট কৌতূহল আছে।

এ কে রে ফটো পকেটে রাখিলেন, বলিলেন, 'আচ্ছা। দেরাজে আর কিছু পেলে?'

'না। খুচরো দু'-চারটে পয়সা আছে; এমন কিছু নেই। রবিবাবু, হেনার নামে চিঠিপত্র আসত কিনা আপনি জানেন?'

রবিবর্মা বলিল, 'চিঠি আসার সময় আমি বাড়িতে থাকি না। নেংটি কিংবা চিংড়ি বলতে পারে।'

আর কিছু না বলিয়া ব্যোমকেশ বইয়ের শেলফের কাছে আসিল, বইগুলির মলাটের উপর একবার চোখ বুলাইয়া সঞ্চয়িতা বইখানি হাতে লইল। মলাট খুলিতেই দেখা গেল, এক টুকরা গোলাপী কাগজ ভাঁজের মধ্যে রহিয়াছে। কাগজের উপর চার ছত্র হাতের লেখা। ব্যোমকেশ কাগজটি দু' আঙুলে তুলিয়া ধরিয়া দেখিতেছে, রবিবর্মা বকের মত সেদিকে গলা বাড়াইল। ব্যোমকেশ কিন্তু তাহাকে লেখাটি পড়িতে দিল না, চট্ করিয়া কাগজ পকেটে পুরিল। রবিবর্মার মুখে ভাবান্তর হইল না বটে, কিন্তু তাহার প্রাণটা যে ঐ লেখাটি পড়িবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছে, তাহা অনুমান করা শক্ত হইল না।

ব্যোমকেশ একে একে অন্য বইগুলি খুলিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল, এ কে রে এবং আমি দুইপাশে দাঁড়াইয়া তাহার কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। আমাদের পিছনে রবিবর্মা অতৃপ্ত প্রেতাত্মার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমাদের পিছনে থাকিয়া সে দেখিতে পাইতেছে না আমরা কি করিতেছি, তাই দুর্নিবার কৌতূহলে ছটফট করিতেছে। এত কৌতূহল কিসের?

উপরের থাকে বাংলা বইগুলিতে আর কিছু পাওয়া গেল না। বইগুলির প্রথম পৃষ্ঠায় পরিচ্ছন্ন মেয়েলি ছাঁদে লেখা আছে—হেনা মল্লিক।

নীচের থাকের ইংরেজি বইগুলিতেও কাগজপত্র কিছু নাই, কিন্তু একটি বিষয়ে ব্যোমকেশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কয়েকটি বইয়ের নাম-পৃষ্ঠায় রবারস্ট্যাম্প দিয়া ঢাকার একটি পুস্তক-বিক্রেতার নাম ছাপা আছে। এ কে রে ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, আমিও ভ্রূ তুলিলাম। কিন্তু ব্যোমকেশ কিছু বলিল না; রবিবর্মার সান্নিধ্যবশতই বোধহয় মুখ খুলিল না।

বই দেখা শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'সুটকেস দুটোতে কি আছে, খোল না একবার দেখি।'

এ কে রে চাবির গোছা বাহির করিয়া সুটকেস দু'টি খুলিলেন। দেখা গেল, তাদের মধ্যে নানা জাতীয় মেয়েলি পোশাক থরে থরে সাজানো রহিয়াছে। শাড়ি-স্কার্ট-ঘাঘরা-ওড়না-কামিজ-পায়জামা প্রভৃতি সর্বজাতীয় পরিচ্ছদ। সবই দামী জিনিস। ব্যোমকেশ সেগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না, কাজের জিনিস কিছু নেই। বাথরুমটা তো তুমি দেখেছ?'

এ কে রে বলিলেন, 'দেখেছি। বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই।'

'আমিও একবার দেখে যাই।' ব্যোমকেশ বাথরুমে প্রবেশ করিল। মিনিট দুই-তিন পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চল, এবার ছাদে যাওয়া যাক।'

ঘরের দরজা হইতে কয়েক পা সামনের দিকে সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। বেশ চওড়া বাহারে সিঁড়ি। ব্যোমকেশ সিঁড়ির নীচের ধাপে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'রবিবাবু, আপনি আর আমাদের সঙ্গে আসবেন না, ছাদ আমরা নিজেরাই দেখে নিতে পারব।' কথাগুলি বলার ভঙ্গীতে এমন একটি দৃঢ়তা ছিল যে, রবিবর্মা আর অগ্রসর হইল না, সিঁড়ির পদমূলে দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা উপরে উঠিয়া গেলাম।

দোতলাকে স্পর্শ করিয়া সিঁড়ি তেতলায় উঠিয়া গিয়াছে, মোড় ঘুরিবার সময় দ্বিতল যতখানি দেখা গেল এক নজরে দেখিয়া লইলাম। হল-ঘরের উপরে অবিকল আর একটি হল-ঘর, সামনের দিকে দুই কোণে দু'টি ঘর। তফাৎ এই যে, নীচের তলায় পিছনের দেয়ালের দরজা ছিল না, দ্বিতলে সারি সারি তিনটি দরজা। অর্থাৎ, নীচের রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর প্রভৃতির উপরে কয়েকটি শয়নকক্ষ, দরজাগুলি উপরের হল-ঘরের সহিত তাহাদের যোগসাধন করিয়াছে।

ত্রিতলে সিঁড়ি যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে একটি বন্ধ দ্বার। এ কে রে ছিটকিনি খুলিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন এবং দ্বারের পাশে একটি সুইচ টিপিয়া ছাদের আলো জ্বালিলেন ; ফ্লাড্ লাইটের আলোয় প্রকাণ্ড ছাদ উদ্ভাসিত হইল।

আমরা তিনজনে ছাদে পদার্পণ করিলাম। ব্যোমকেশ প্রথমেই দরজাটা পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'ভিতরে এবং বাইরে দু'দিক থেকেই দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে দেখছি ; ভিতরে ছিটকিনি বাইরে শিকল। এ কে রে, তুমি যখন ছাদে এসেছিলে তখন কি দরজা বন্ধ ছিল ?'

এ কে রে বলিলেন, 'না, দু'দিক থেকেই খোলা ছিল।'

বৈদ্যুতিক বন্যালোক তো ছিলই, উপরন্তু এতক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচন্দ্র মাথা তুলিয়াছে। আমরা ছাদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইলাম।

ছাদটি প্রকাণ্ড, ইহার উপর সুন্দর একটি টেনিস-কোর্ট তৈরি করা চলে। ছাদ ঘিরিয়া নিরেট গাঁথুনির আলিসা, আলিসার গায়ে বাহির হইতে বাঁশের ডগা উঁচু হইয়া আছে, কেবল পূর্বদিকে ভারা নাই, সম্ভবত সেদিকে মেরামতের কাজ শেষ হইয়াছে। ছাদের বাহিরে কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে বাগানের সীমানায় একসারি দীর্ঘ সিলভার পাইনের গাছ সমব্যবধানে দাঁড়াইয়া বাড়িটিকে যেন প্রহরীর মত ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ছাদ হইতে তাহাদের ঊর্ধ্বাঙ্গ মন্দিরের চূড়ার মত দেখাইতেছে।

ব্যোমকেশ একবার চারিদিকে মুণ্ড ঘুরাইয়া সমগ্র দৃশ্যটা দেখিয়া লইল, তারপর তাহার দৃষ্টি ছাদের অভ্যন্তরে ফিরিয়া আসিল। ছাদে অন্য কিছু নাই, কেবল মধ্যস্থলে একটু পশ্চিমদিকে ঘেঁষিয়া একটি মাদুর পাতা রহিয়াছে এবং তাহার পাশে একজোড়া মেয়েলি চটিজুতা।

একটি চিত্র মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল ; হেনা ছাদে আসিয়া মাদুর পাতিল, চটিজুতা খুলিয়া তাহার উপর বসিল। তারপর— ?

ব্যোমকেশ এই প্রতিমাহীন চিত্রপটের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, খানিকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হেনা কোন্ দিকে পড়েছিল ?'

যেদিকে ভারা বাঁধা নাই সেই দিকে নির্দেশ করিয়া এ কে রে বলিলেন, 'এই দিকে।'

তিনজনে পূর্বদিকের আলিসার কিনারায় গিয়া দাঁড়াইলাম। সামনেই চাঁদ। পঁচিশ হাত দূরে পাইনগাছের সারি মৃদু বাতাসে মর্মরধ্বনি করিতেছে, যেন হেনার অপমৃত্যু সম্বন্ধে হ্রস্বকণ্ঠে জল্পনা করিতেছে। তাহারা যদি মানুষের ভাষায় কথা বলিতে পারিত বোধহয় প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পাইতাম। 'ঐখানে পড়েছিল !' এ কে রে নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন। আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম। পাইনগাছের ছায়ায় বিশেষ কিছু দেখা গেল না। আলিসাটা আমার কোমর পর্যন্ত উঁচু, এক ফুট চওড়া। হেনা আমার চেয়ে দৈর্ঘ্যে ছোটই ছিল নিশ্চয়, সে যদি কোনো কারণে নীচের দিকে উঁকি মারিয়াও থাকে, আলিসা ডিঙাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কম।

ব্যোমকেশও বোধকরি মনে মনে মাপজোক করিতেছিল, এ কে রে'র দিকে ফিরিয়া বলিল, 'হুঁ। আলসের খাড়াই আন্দাজ চার ফুট। হেনার খাড়াই কত ছিল ?'

এ কে রে ব্যোমকেশের মনের কথা বুঝিয়া বলিলেন, 'আন্দাজ পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। কিন্তু তাহলেও অসম্ভব নয়।'

'অসম্ভব বলিনি।' ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে আলিসার ধার দিয়া পরিক্রমণ করিল। ভারাগুলি মাটি হইতে ছাদ পর্যন্ত মই রচনা করিয়াছে, একটু শক্ত-সমর্থ মানুষ সহজেই মই দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতে পারে।

ছাদ পরিদর্শন শেষ করিয়া ব্যোমকেশ ঈষৎ নিরাশ স্বরে বলিল, 'অনেক রাত হয়েছে, আজ এই পর্যন্ত থাক। —হেনার ঘরটা কি সীল করবে?'

এ কে রে বলিলেন, 'সীল করার দরকার দেখি না। ও-ঘরে হেনার মৃত্যুর হয়নি। উপরন্তু আমরা দু'জনেই ঘরটা খানাতল্লাশ করেছি।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না। এ কে রে আলো নিভাইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিলেন, আমরা তাঁহার পিছনে চলিলাম।

নিঃশব্দে নামিতেছি। দ্বিতল পর্যন্ত নামিয়া মোড় ঘুরিবার উপক্রম করিতেছি, পাশের দিক হইতে একটা চাপা তীক্ষ্ণ স্বর কানে আসিল—'তুমি চুপ করে থাকবে, কোনো কথা কইবে না।'

চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি দ্বিতলে হল-ঘরের অন্য প্রান্তে রবিবর্মা ও শ্রীমতী চামেলি মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছেন। রবিবর্মা আমাদের দেখিতে পাইয়া বোধহয় নিঃশব্দে শ্রীমতী চামেলিকে ইশারা করিল, তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তারপর ধারালো চোখে প্রখর অসহিষ্ণুতা ফুটাইয়া তিনি দ্রুতপদে পিছনের একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন।

নীচে নামিয়া আসিয়া ব্যোমকেশ এ কে রে'র দিকে বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'শুনলে?'

এ কে রে একটু ঘাড় নাড়িলেন, বলিলেন, 'চল, পুলিস-ভ্যানে তোমাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাই।'

পরদিন রবিবার সকাল সাতটার সময় ব্যোমকেশ ও আমি সবেমাত্র চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিয়াছি, হুড়মুড় শব্দে নেংটি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশদা, ভীষণ কাণ্ড!'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'ভীষণ কাণ্ড!'

নেংটি বলিল, 'হ্যাঁ। একটা সিগারেট দিন।'

ব্যোমকেশ সিগারেট দিল, নেংটি তাহা ধরাইয়া দুই-তিনটা লম্বা টান দিয়া বলিল, 'কাল রাত্তিরে হেনার ঘরটা কে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।'

আমি বলিলাম, 'অ্যাঁ! বাড়ি পুড়ে গেছে!'

নেংটি বলিল, 'বাড়ি নয়, শুধু হেনার ঘরটা পুড়েছে। খাট-বিছানা, টেবিল-আলমারি কিছু নেই, সব ছাই হয়ে গেছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, শেষে বলিল, 'রাত্তিরে কখন তোমরা জানতে পারলে?'

নেংটি বলিল, 'আমরা রাত্তিরে জানব কোত্থেকে, আমরা তো দোতলায় শুই। রবিবর্মা নীচের তলায় শোয়, সে-ই কিছু জানতে পারেনি। একেবারে সকালবেলায় জানাজানি হল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, বাড়িতে চেঁচামেচি হৈ-হৈ চলছে। আমি সুট করে পালিয়ে এসেছি আপনাকে খবর দিতে।'

'হুঁ। কে ঘরে আগুন দিতে পারে, বাড়ির লোক না বাইরের লোক?'

'তা আমি কি করে বলব? রাত্তিরে নীচের তলার দরজা-জানালা সব বন্ধ থাকে।'

'সকালে যখন দেখলে তখন কি হেনার ঘরের জানালা দুটো খোলা ছিল?'

'দরজা-জানালা সব পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে, খোলা ছিল কি বন্ধ ছিল বোঝবার উপায় নেই। তবে—' বলিয়া নেংটি থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'তবে কি?'

নেংটির সিগারেট আধাআধি পুড়িয়াছিল, বাকি অর্ধেক নিভাইয়া সে সযত্নে পকেটে রাখিল, বলিল, 'সিঁড়ির তলায় এক টিন পেট্রোল রাখা থাকতো, দেখা গেল টিন খালি।'

'তার মানে—' ব্যোমকেশ কথা অসমাপ্ত রাখিয়া চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া গেল।

নেংটি উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'আমি পালাই। মাসিমা যদি জানতে পারে আমি বাড়ি নেই,

রক্ষে থাকবে না।'

ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া বলিল, 'বোসো। তোমাকে দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

নেংটি অনিচ্ছাভরে বসিয়া বলিল, 'আর কি জিজ্ঞেস করবেন, যা জানি সব বলেছি। এবার আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে বের করুন, কে খুন করেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুন করেছে তার কোন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে যাক। যে-সময় হেনা ছাদ থেকে পড়ে যায় সে-সময় তুমি কোথায় ?'

নেংটি বলিল, 'আমি বাড়ির মধ্যে ছিলাম না, সিগারেট খেতে বেরিয়েছিলাম।'

'কি করে জানলে যে, তুমি যখন সিগারেট খেতে বেরিয়েছিলে ঠিক সেই সময় হেনা ছাদ থেকে পড়ে যায় ?'

'শুনুন। সাড়ে পাঁচটার একটু আগে আমি যখন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি, তখন হেনার ঘরের দোর একটু ফাঁক হয়ে ছিল, দেখলাম সে খাটে বসে কাঠি দিয়ে পশমের গেঞ্জি বুনছে। আধঘন্টা পরে যখন ফিরে এলাম, তখন বাড়িতে ভীষণ কাণ্ড, সবেমাত্র হেনার লাশ পাওয়া গেছে।'

'কে লাশ পেয়েছিল ?'

'রবিবর্মা।'

'তুমি যখন বেরুচ্ছিলে তখন হল-ঘরে আর কেউ ছিল ?'

'উদয়দা ছিল, আর কেউ ছিল না।'

'তুমি যখন সিগারেট খেয়ে ফিরে এলে তখন বাড়ির সবাই বাড়িতেই উপস্থিত ছিল ?'

নেংটি একটু ভাবিয়া বলিল, 'মেসোমশাই ছাড়া আর সবাই উপস্থিত ছিল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, তারপর বলিল, 'আর একটা কথা। হেনার চিঠিপত্র আসতো কিনা জানো ?'

নেংটি দৃঢ়স্বরে বলিল, 'আসতো না। সকাল বিকেল যখনই চিঠি আসে, আমি পিওনের হাত থেকে চিঠি নিই। হেনার নামে একটাও চিঠি আজ পর্যন্ত আসেনি।'

'বাইরের কারুর সঙ্গে হেনার কোন যোগাযোগ ছিল না ?'

নেংটি মাথা নাড়িতে গিয়া থামিয়া গেল, তারপর কুঞ্চিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'কী ?'

নেংটি বলিল, 'কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ব্যোমকেশদা। তুচ্ছ কথা বলেই বোধহয় মনে ছিল না—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হোক তুচ্ছ, বলো শুনি।'

নেংটি ধীরে ধীরে ভাবিয়া ভাবিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, 'হেনা আসবার দশ-বারো দিন 'পর থেকেই ব্যাপারটা আরম্ভ হয়। আমাদের রাস্তায় বেশি গাড়ি-মোটরের চলাচল নেই, নির্জন বড়মানুষের পাড়া। একদিন বিকেলবেলা একটা ট্যাক্সি আস্তে আস্তে বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল, তার ভেতরে একটা লোক বসে মাউথ-অর্গান বাজাচ্ছে। মাউথ-অর্গান জানেন তো। চশমার খাপের মত দেখতে, ঠোঁটের ওপর ঘষলে প্যাঁপ্‌পো প্যাঁপ্‌পো করে বাজে—খুব জোর আওয়াজ হয়—'

'জানি। তারপর বলো।'

'ট্যাক্সি চলে গেল, দু'তিন মিনিট পরে আবার উল্টো দিক থেকে মাউথ-অর্গান বাজাতে বাজাতে বাড়ির সামনে দিয়ে গেল। এই ঘটনার দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে হেনা ঘরে তালা লাগিয়ে বেরুলো। আমি প্রথমবার যোগাযোগটা বুঝতে পারিনি—'

'যে লোকটা মাউথ-অর্গান বাজাচ্ছিল তাকে দেখেছিলে ?'

'দেখেছিলাম। কোট-প্যান্ট-পরা একটা লোক।'

'তারপর !'

'তারপর দশ-বারো দিন চুপচাপ, হেনা বাড়ি থেকে বেরুলো না। একদিন আমি দোতলার

হল-ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, দেখলাম, একটা ট্যাক্সি আসছে ; বাড়ির কাছাকাছি আসতেই তার ভেতর থেকে মাউথ-অর্গান বেজে উঠলো, আবার বাড়ি পার হয়েই থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সি ফিরে এল, বাড়ির সামনে আর একবার প্যাঁপ্‌পো প্যাঁপ্‌পো বাজিয়ে চলে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম, কী ব্যাপার, আমাদের বাড়ির সামনেই মাউথ-অর্গান বাজায় কেন ? এমন সময় দেখি, হেনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেদিকে ট্যাক্সি গেছে সেই দিকে চলে গেল। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, কেউ হেনাকে ইশারা করে যায়, অমনি হেনা তার সঙ্গে দেখা করতে বেরোয়।'

'হেনা কখন ফিরে আসতো ?'

'ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে আসতো।'

'কোথায় যায় তুমি জানো ?'

'কি করে জানব ? একবার হেনার পিছু নিয়েছিলাম। বাড়ি থেকে শ'খানেক গজ দূরে রাস্তার ধারে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে ছিল, হেনা টুক করে তাতে উঠে পড়ল, ট্যাক্সি চলে গেল।'

'হুঁ। শেষবার কবে হেনা বেরিয়েছিল ?'

'দশ-বারো দিন আগে।—আচ্ছা ব্যোমকেশদা, আজ তাহলে আমি পালাই, বড্ড দেরি হয়ে গেল। সুবিধে পেলেই আবার আসব।'

'আচ্ছা, এস।'

নেংটি চলিয়া যাইবার পর ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে আমি নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলাম, 'কি বুঝছ ?'

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'মাউথ-অর্গানের ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে, কিন্তু একটা জিনিস বোঝা যায়। হেনা কলকাতা শহরে নেহাৎ একলা ছিল না। যাহোক, হেনার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চয় হওয়া গেল ; অপঘাত মৃত্যু নয়, তাকে কেউ খুন করেছে। এখন প্রশ্ন—মগ্নমৈনাকটি কে ?'

বলিলাম, 'ঘরে যে আগুন লাগিয়েছিল সে-ই নিশ্চয়।'

কথাটা ব্যোমকেশের মনঃপূত হইল না, সে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। ব্যাপারটা বুঝে দেখ। একটা লোক হেনাকে খুন করেছে, তার মোটিভ আমরা জানি না। যৌন-ঈর্ষা হতে পারে, আবার অন্য কিছুও হতে পারে। কিন্তু যে-লোকটা ঘরে আগুন দিয়েছে তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ; হেনার ঘরে এমন একটা মারাত্মক জিনিস আছে যা সে নষ্ট করে ফেলতে চায়। আমরা ঘরটা একবার মোটামুটি রকম তল্লাশ করেছি, কিন্তু মারাত্মক কিছু পাইনি। আবার তল্লাশ করে যদি মারাত্মক বস্তুটি খুঁজে পাই ! অতএব পুড়িয়ে শেষ করে দাও।'

'কী মারাত্মক জিনিস হতে পারে ?'

'হয়তো কাগজ, এক টুকরো কাগজ। বড় জিনিস হলে আমরা খুঁজে পেতাম।'

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, সেই গোলাপী কাগজের টুকরো ! তাতে কি লেখা আছে ?'

ব্যোমকেশ দেরাজ হইতে কাগজের টুকরাটি বাহির করিয়া দিল, বলিল, 'কবিতা। পড়ে দেখ দেখি, কাব্য হয়েছে কি না।'

কবিতা পড়িলাম—

তোমার হাসির ঝিলিকটুকু
ছুরির মত রইল বিঁধে বুকে
বিনা দোষে শাস্তি দিতে
পারে তোমার ঠোঁটদুটি টুক্‌টুকে।

বলিলাম, 'মন্দ নয়, অনেকটা সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার মত। কে লিখেছে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওদের বাড়িতে কবি একজনই আছে—যুগল।'

অপরাহ্ণে এ কে রে স্বয়ং জবানবন্দীর নকল লইয়া আসিলেন।

আজ তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করিলেন, দুই চারিটা মজাদার গল্প বলিলেন, ব্যোমকেশ যে পুলিসে যোগ না দিয়া শূন্যোদরে বন্যমহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতেছে তাহা প্রমাণ করিলেন, সময়োচিত পানাহার গ্রহণ করিলেন ; তারপর কাজের কথায় উপস্থিত হইলেন। জবানবন্দীর ফাইল ব্যোমকেশকে দিয়া বলিলেন, 'এই নাও, পড়ে দেখতে পার। কিন্তু তোমার কোন কাজে লাগবে না।'

ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'কাজে লাগবে না কেন ?'

এ কে রে বলিলেন, 'পুলিস-দপ্তরের মতে হেনার মৃত্যু অপঘাত ছাড়া আর কিছু নয়, তদন্ত চালানো নিরর্থক।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আগুন লাগার খবর পেয়েছ ?'

এ কে রে বলিলেন, 'পেয়েছি। ওটা সমাপতন। ইচ্ছে করে কেউ আগুন লাগিয়েছিল তার কোন প্রমাণ নেই।'

ব্যোমকেশ একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, 'তাহলে সন্তোষবাবু আমাকে যে কাজ দিয়েছিলেন, সেটা গেল। তাঁর পারিবারিক স্বার্থরক্ষার আর দরকার নেই।'

এ কে রে হাসিয়া বলিলেন, 'না। তুমি তাঁকে আশ্বাস দিতে পার পুলিস তাঁর পরিবারের ওপর আর কোনো জুলুম করবে না।—ভাল কথা, আগুন লাগার খবর পেয়ে আমি সন্তোষবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি উপস্থিত ছিলেন। কাল হেনার দেরাজের মধ্যে যে ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়েছিল, সেটা তাঁকে দেখালাম। তিনি বললেন, ওটা হেনার মায়ের ছবি।'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, বলিল, 'ময়না তদন্তে কী পেলে ?'

এ কে রে বলিলেন, 'এ রকম অবস্থায় যা আশা করা যায় তার বেশি কিছু নয়। পাঁজরার একটা হাড় ভেঙ্গে হৃৎপিণ্ডকে ফুটো করে দিয়েছে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে। অন্য কোন জটিলতা নেই।'

'মৃত্যুর সময় ?'

'সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে।'

তারপর এ কে রে দু' একটা হাসি-তামাশার কথা বলিয়া ব্যোমকেশের পিঠ চাপড়াইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কে রে কি খুব বুদ্ধিমান লোক ?'

ব্যোমকেশ আমার পানে চোখ তুলিয়া বলিল, 'ওর বুদ্ধি কারুর চেয়ে কম নয়।'

বলিলাম, 'দোষের মধ্যে পুলিস।'

'হ্যাঁ, দোষের মধ্যে পুলিস।' ব্যোমকেশ জবানবন্দীর ফাইলটা তুলিয়া লইল।

আধঘন্টা পরে জবানবন্দী পাঠ শেষ করিয়া সে ফাইল আমাকে দিল, বলিল, 'বিশেষ কিছু নেই, দেখতে পারো।—আমি একটু ঘুরে আসি।'

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'অনেক দিন দোকানে যাওয়া হয়নি, যাই দেখে আসি প্রভাত কি করছে।'

সে চলিয়া গেল। আমি ফাইল খুলিয়া জবানবন্দী পড়িতে আরম্ভ করিলাম—

রবীন্দ্রনাথ বর্মণ। বয়স ৩৯। সন্তোষ সমাদ্দারের অন্যতম সেক্রেটারি। সন্তোষবাবুর বাড়িতে থাকেন। বেতন ৩৫০ টাকা।

আজ শনিবার। কর্তা অফিস থেকে চলে যাবার পর আমি আন্দাজ সাড়ে তিনটের সময় ফিরে

আসি। হেনা তখন কোথায় ছিল আমি লক্ষ্য করিনি। সম্ভবত নিজের ঘরেই ছিল।

আমি কিছুক্ষণ নিজের ঘরে বিশ্রাম করলাম। সাড়ে চারটের সময় চাকর চা-জলখাবার এনে দিল, আমি খেলাম। তারপর পাঁচটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরুলাম। বাজারে কিছু কেনাকাটা করবার ছিল, সাবান টুথপেস্ট দাড়ি কামাবার ব্লেড অ্যাসপিরিন, এই সব।

আমি যখন বেরুই, তখন হল-ঘরে কেবল একজন মানুষ ছিল—উদয়। তার সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি, সে কিছুই করছিল না, বুকে হাত বেঁধে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। উদয় কলেজে পড়ে বইকি, তবে যখন ইচ্ছে চলে আসে, পড়াশুনোয় মন নেই।

আমি বাজার করে ফিরলাম ছ'টার সময়। তখনো অন্ধকার হয়নি, আমি নিজের ঘরে জিনিসপত্র রেখে পুবদিকের গোলাপ-বাগানে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ বেড়াবার পর হঠাৎ নজরে পড়ল বাড়ির কোলে মানুষের চেহারার মত কি যেন একটা পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি—হেনা।

চেঁচামেচি করে লোক ডাকলাম। চাকরেরা ছুটে এল, যুগল আর উদয়ও এল—হ্যাঁ, ওরা দু'জনেই বাড়িতে ছিল। সবাই মিলে ধরাধরি করে লাশ বাড়িতে নিয়ে এলাম, তারপর পুলিসকে ফোন করলাম। না, কর্তা বাড়িতে ছিলেন না। শনিবার-রবিবার তিনি বাড়িতে থাকেন না। কোথায় থাকেন আমি জানি না।

যুগলচাঁদ সমাদ্দার। বয়স ২০। সন্তোষ সমাদ্দারের পুত্র।

আমি কলেজে পড়ি। আজ দুটোর পর ক্লাস ছিল না, তাই তিনটের সময় বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। আমার ঘর দোতলায়, রবিবর্মার ঘরের ওপরে।

ঘরে এসে একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়েছিলাম, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল একেবারে সাড়ে পাঁচটার সময়ে। তাড়াতাড়ি উঠে নীচে নেমে গেলাম। না, হল-ঘরে কেউ ছিল না। আমি গোলাপ-বাগানে গিয়ে কিছুক্ষণ বেড়ালাম, তারপর ফিরে এসে দোতলায় গেলাম। চিংড়ি আমাকে চা-জলখাবার এনে দিল, আমি খেলাম। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে লেখাপড়া করতে বসলাম।

বাগানে আমি বেশিক্ষণ ছিলাম না, পনেরো-কুড়ি মিনিট ছিলাম। ধরুন, সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌনে ছ'টা পর্যন্ত। না, রবিবর্মাকে বাগানে দেখিনি। বাড়ির পাশে হেনার মৃতদেহ দেখিনি। ছ'টার পর নীচে চেঁচামেচি শুনে আমি নেমে এলাম। ওরা তখন হেনার মৃতদেহ বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসছে।

আমার সঙ্গে হেনার ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কারুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সে কারুর সঙ্গে মিশতো না।

উদয়চাঁদ সমাদ্দার। বয়স ২০। সন্তোষ সমাদ্দারের পুত্র।

আজ আমি কলেজে যাইনি। দুপুরবেলা বিলিয়ার্ড খেলতে ক্লাবে গিয়েছিলাম। ক্লাবের নাম গ্রেট ইস্টার্ন স্পোর্টিং ক্লাব।

সাড়ে চারটের সময় আমি বাড়ি ফিরেছি। দোতলায় হেনার ঘরের ওপর আমার ঘর। আমি নিজের ঘরে গেলাম, কাপড়-চোপড় বদলে নীচের হল-ঘরে নেমে এলাম। কেন নেমে এলাম তার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই। আমার বাড়ি, আমি যখন যেখানে ইচ্ছা থাকি।

প্রশ্ন: আপনি যতক্ষণ হল-ঘরে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে অন্য কাউকে হল-ঘরে দেখেছিলেন ?

উত্তর: রবিবর্মা নিজের ঘরে ছিল, মাঝে মাঝে হল-ঘরে আসছিল। সে আন্দাজ পাঁচটার সময় বেরিয়ে গেল।

প্রশ্ন: আর কেউ ?

উত্তর : নেংটি ছোঁক্ ছোঁক্ করে বেড়াচ্ছিল, আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

প্রশ্ন : হেনা তখন কোথায় ছিল ?

উত্তর : নিজের ঘরে।

প্রশ্ন : আপনি হল-ঘরে থাকতে থাকতেই হেনা ছাদে যাবার জন্যে নিজের ঘর থেকে বেরিয়েছিল ?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : তার হাতে কিছু ছিল ?

উত্তর : একটা ছোট মাদুর ছিল। ভ্যানিটি-ব্যাগ ছিল।

প্রশ্ন : আপনি তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন ?

উত্তর : নো কমেন্ট।

প্রশ্ন : হেনা চলে যাবার পর আপনি হল-ঘরে কতক্ষণ ছিলেন ?

উত্তর : পাঁচ মিনিট।

প্রশ্ন : তারপর কোথায় গেলেন ?

উত্তর : নিজের ঘরে।

প্রশ্ন : হেনার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা ছিল ?

উত্তর : নো কমেন্ট।

শ্রীমতী চামেলি সমাদ্দার। বয়স ৪৪। সন্তোষ সমাদ্দারের স্ত্রী।

ছ'মাস আগে হেনা মল্লিক আমার বাড়িতে এসেছিল। তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ ছিল না, তাকে কখনো দোতলায় উঠতে বলিনি। আমি মুখ দেখে মানুষ চিনতে পারি, হেনা ভাল মেয়ে ছিল না। আমার স্বামী কেন তাকে বাড়িতে এনেছিলেন আমি জানি না। আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, আমি কী করতে পারি। হেনাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়নি, কোন কথাই হয়নি।

আমার দুই ছেলেই ভাল ছেলে, সচ্চরিত্র ছেলে। হেনার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না, উট্‌কো মেয়ের সঙ্গে তারা মেলামেশা করে না।

আজ পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে আমি চিংড়ির চুল বেঁধে দিয়েছিলুম, চিংড়ি আমার চুল বেঁধে দিয়েছিল, তারপর আমি বাথরুমে গা ধুতে গিয়েছিলুম। হেনাকে তেতলার ছাদে যেতে দেখিনি, ছাদের ওপর কোন শব্দ শুনিনি।

শেফালিকা, ওরফে চিংড়ি। বয়স ১৫। সন্তোষবাবুর গৃহে পালিত।

দু'বছর আগে আমাদের মা-বাবা মারা যান। সেই থেকে দাদা আর আমি মাসিমার কাছে আছি।

হেনা যখন এ-বাড়িতে এসেছিল, তখন তাকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। এত সুন্দর মেয়ে আমি দেখিনি। আমি একবার গিয়েছিলুম ভাব করতে, কিন্তু সে আমার মুখের ওপর দোর বন্ধ করে দিল। সেই থেকে আমি আর ওর কাছে যাইনি, মাসিমা মানা করে দিয়েছিলেন। ওকে দু'-একবার মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে ও ভালভাবে কথা বলত। দশ-বারো দিন অন্তর ভাল কাপড়-চোপড় পরে বাইরে যেত। কোথায় যেত জানি না। একলা যেত, আবার ঘন্টাখানেক পরে ফিরে আসত। হ্যাঁ, রোজ সন্ধ্যার সময় হেনা ছাদে যেত, সেখানে একলা কি করত জানি না ; বোধহয় পায়চারি করত, কিংবা মাদুর পেতে বসে থাকত। মাসিমার বিশ্বাস, হেনা ছাদে গিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেত।

আমি স্কুলে পড়ি না, মাসিমা আমাকে স্কুলে পড়তে দেননি। তিনি বলেন, স্কুল-কলেজে

পড়লে মেয়েরা বিগড়ে যায়, সিগারেট খেতে শেখে। আমি মাসিমার কাছে ঘর-কন্নার কাজ শিখেছি।

আজ বিকেলবেলা মাসিমা আমার চুল বেঁধে দিলেন, আমি মাসিমার চুল বেঁধে দিলুম ; তারপর মাসিমা বাথরুমে গেলেন। আমি দাদাদের জলখাবার দিতে গেলুম। যুগলদা নিজের ঘরে ছিলেন, তাঁকে খাবার দিয়ে উদয়দা'র ঘরে গেলুম। উদয়দা ঘরে ছিলেন না ; তাঁর টেবিলে খাবার রেখে আমি চলে এলুম। তারপর আমিও বাথরুমে গা ধুতে গেলুম। দোতলায় পাঁচটা বাথরুম আছে।

না, হেনা কখন ছাদে গিয়েছিল আমি জানতে পারিনি। ছাদের ওপর শব্দ শুনিনি। বাথরুম থেকে বেরুবার পর নীচের তলা থেকে চেঁচামেচি শুনতে পেলুম, জানতে পারলুম হেনা ছাদ থেকে পড়ে মরে গেছে।

নির্মলচন্দ্র দত্ত, ওরফে নেংটি। বয়স ১৭। সন্তোষবাবুর গৃহে পালিত।

চিংড়ি আমার বোন। আমরা মা-বাবার মৃত্যুর পর থেকে মাসিমার কাছে আছি। আমি লেখা পড়া করি না। মেসোমশাই বলেছেন, আমার আঠারো বছর বয়স হলে তিনি তাঁর কোম্পানিতে চাকরি দেবেন।

হেনা দেখতে খুব সুন্দর ছিল, কিন্তু ভারি অহংকারী ছিল, আমার সঙ্গে কথাই বলত না। বাড়িতে কেবল মেসোমশাইয়ের সঙ্গে হেসে কথা বলত, যুগলদা আর উদয়দা'র সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলত। হেনা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। তখন হেনা নিজের ঘরে ছিল। ছ'টার পর ফিরে এসে শুনলাম সে ছাদ থেকে পড়ে মরে গেছে। এর বেশি আমি আর কিছু জানি না।

জবানবন্দী পড়া শেষ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানিলাম। এই কয়জনের মধ্যেই কেহ হেনাকে ছাদ হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল মনে হয় না। উদয় ছেলেটা একটু উদ্ধত, কিন্তু তাহাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। সত্যিই কি কেহ হেনাকে ছাদ হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল ? হয়তো পুলিসের অনুমানই ঠিক, ব্যোমকেশ ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখিতেছে। কিন্তু ঘরে আগুন লাগাও কি আকস্মিক ?

নেংটি একটা লোকের কথা বলিল, হেনা দশ-বারো দিন অন্তর মাউথ-অর্গানের বাজনা শুনিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে যাইত। লোকটা কে ? সে-ই কি কোন অজ্ঞাত কারণে হেনাকে খুন করিয়াছে ? সন্তোষবাবুর তেতলার ছাদটি অবস্থাগতিকে বাহিরের লোকের পক্ষে সহজগম্য হইয়া পড়িয়াছে, ভারার মই বাহিয়া যে কেহ ছাদে উঠিতে পারে ; অর্থাৎ, বাড়ির লোক এবং বাহিরের লোক সকলেরই ছাদে উঠিবার সমান সুবিধা।

সান্ধ্য চায়ের সময় হইলে ব্যোমকেশ ফিরিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দোকানে কী মতলবে গিয়েছিলে ?'

সে চায়ের পেয়ালায় চামচ ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, 'মতলব কিছু ছিল না। মাথার মধ্যে গুমোট জমে উঠেছিল, তাই একটু হাওয়া-বাতাস লাগাতে বেরিয়েছিলাম। দোকানে বিকাশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে মাঝে মাঝে প্রভাতের সঙ্গে আড্ডা দিতে দোকানে আসে।' চায়ে একটি চুমুক দিয়া সে সিগারেট ধরাইল, বলিল, 'বিকাশের সঙ্গে দেখা হল ভালই হল, তাকে কাল বিকেলে আসতে বলেছি।'

'তাকে তোমার কী দরকার ?'

'দরকার হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে সন্তোষবাবুর ওপর। কাল সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তিনি যদি আমায় বরখাস্ত করেন তাহলে আর কিছু করবার নেই।' সে পর্যায়ক্রমে চা ও

সিগারেটের প্রতি মনোনিবেশ করিল। আরো কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া ভাসা-ভাসা উত্তর পাইলাম। তাহার স্বভাব জানি। তাই আর নিষ্ফল প্রশ্ন করিলাম না।

পরদিন ঠিক ন'টার সময় আমরা দুইজনে সন্তোষবাবুর অফিসে উপস্থিত হইলাম। ক্লাইভ স্ট্রীটে প্রকাণ্ড সওদাগরী সৌধ, তাহার দ্বিতলে সন্তোষবাবুর অফিস।

সন্তোষবাবু সবেমাত্র অফিসে আসিয়াছেন, এত্তেলা পাইয়া আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশ করিলাম। টেবিলের উপর কাগজপত্রের ফাইল, দু'টি টেলিফোন, সন্তোষবাবু টেবিলের সামনে একাকী বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার পরিধানে বিলাতি বেশ ; কোট খুলিয়া রাখিয়াছেন ; লিনেনের শার্টের সম্মুখভাগে দামী সিল্কের টাই শোভা পাইতেছে।

সন্তোষবাবু হাত নাড়িয়া আমাদের সম্ভাষণ করিলেন। আমরা টেবিলের পাশে উপবিষ্ট হইলে তিনি ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন, 'কি খবর ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনেছেন বোধহয়, পুলিস সাব্যস্ত করেছে হেনার মৃত্যু সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা।'

সন্তোষবাবু চকিত হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি ! আমি শুনিনি।' তারপর আরামের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'যাক, বাঁচা গেল। মনে একটা অস্বস্তি লেগে ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আমি এখনো নিঃসংশয় হতে পারিনি।'

সন্তোষবাবু একটু বিস্ময়ের সহিত তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'ও—মানে আপনার বিশ্বাস হেনাকে কেউ খুন করেছে ?—কোন সূত্র পেয়েছেন কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রথমত, ঘরে আগুন লাগাটা স্বাভাবিক মনে হয় না।'

সন্তোষবাবু শূন্য পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'তা বটে, ঘরে আগুন লাগাটা আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। আর কিছু ?'

ব্যোমকেশ তখন মাউথ-অর্গানবাদকের কথা বলিল। সন্তোষবাবু গভীর মনোযোগের সহিত শুনিলেন, তারপর বলিলেন, 'হুঁ। কিন্তু আমি যতদূর জানি এখানে হেনার চেনা-পরিচিত কেউ নেই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাকিস্তানের লোক হতে পারে। হয়তো কাজের সূত্রে দশ-বারো দিন অন্তর কলকাতায় আসতো, আর হেনার সঙ্গে দেখা করে যেত।'

এই সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। সন্তোষবাবু টেলিফোন কানে দিয়া শুনিলেন, দু'বার হুঁ হাঁ করিলেন, তারপর যন্ত্র রাখিয়া দিলেন। ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'হতে পারে—হতে পারে। তা, আপনি এখন কি করতে চান ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার যদি অনুমতি থাকে, আমি একবার বাড়ির সকলকে জেরা করে দেখতে পারি।'

সন্তোষবাবু একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'দেখুন ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে আমি আমার পারিবারিক স্বার্থরক্ষার জন্যে নিযুক্ত করেছিলাম। কিন্তু পুলিস যখন বলছে এটা দুর্ঘটনা, তখন আপনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। অবশ্য, আপনার পারিতোষিক আপনি পাবেন—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পারিতোষিকের জন্যে আমি ব্যগ্র নই মিস্টার সমাদ্দার, এবং বেশি কাজ দেখিয়ে বেশি পারিতোষিক আদায় করার মতলবও আমার নেই। আমি শুধু সত্য আবিষ্কার করতে চাই।'

সন্তোষবাবু ঈষৎ অধীরভাবে বলিলেন, 'সত্য আবিষ্কার ! পুলিসের হাঙ্গামা থেকে যখন রেহাই পেয়েছি, তখন নিছক সত্য আবিষ্কারে আমার আগ্রহ নেই—'

আবার টেলিফোন বাজিল। সন্তোষবাবু ফোনে কথা বলা শেষ করিতে না করিতে অন্য ফোনটা বাজিয়া উঠিল। একে একে দুইটি ফোনে কথা বলা শেষ করিয়া তিনি আমাদের পানে

চাহিয়া হাসিলেন। ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'কাজের সময় আপনাকে বিরক্ত করব না। তাহলে—আপনার আগ্রহ নেই ?'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'আগ্রহ নেই, তেমনি আপত্তিও নেই। আপনি বাড়ির সকলকে জেরা করুন।'

'ধন্যবাদ। রবিবর্মা কি অফিসে আছেন ?'

'না, তার শরীর খারাপ, সে আজ অফিসে আসেনি। বাড়িতেই আছে।'

'আচ্ছা। আপনি দয়া করে বাড়িতে জানিয়ে দেবেন আমরা যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।' তিনি টেলিফোন তুলিয়া নম্বর ঘুরাইতে লাগিলেন। আমরা চলিয়া আসিলাম।

সন্তোষবাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম আন্দাজ সাড়ে ন'টার সময়। দেউড়ি দিয়া প্রবেশ করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, আগে বাগানটা দেখে যাই।'

আমরা পূর্বদিকে মোড় ঘুরিলাম। বাড়ির কোণে হেনার ঘরের পোড়া কাচভাঙা জানালা দু'টা গহ্বরের মত উন্মুক্ত হইয়া আছে। গোলাপের বাগানে সিলভার পাইনের ছায়া পড়িয়াছে, অজস্র শ্বেত-রক্ত-পীত ফুল ফুটিয়া আছে। এদিকে ভারা নাই, চুনকাম-করা দেয়াল রৌদ্র প্রতিফলিত করিতেছে। হেনা এই দেয়ালের পদমূলে পড়িয়া মরিয়াছিল, কিন্তু কোথাও কোনো চিহ্ন নাই। হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি, কিন্তু চিহ্ন থাকে না।

বাড়ির পিছন দিকে ভারা লাগানো আছে। মিস্ত্রিরা মেরামতের কাজ আরম্ভ করিয়াছে, দুইজন মজুর মাথায় লোহার কড়া লইয়া ভারা-সংলগ্ন মই দিয়া ওঠা-নামা করিতেছে। মন্থরভাবে কাজ চলিতেছে।

পিছন দিক বেড়িয়া আমরা বাড়ির পশ্চিমদিকে উপস্থিত হইলাম। এখানেও দেয়ালের গায়ে ভারা লাগানো, মিস্ত্রিরা কাজ করিতেছে, মজুর ওঠা-নামা করিতেছে। ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দেখিল, তারপর মই বাহিয়া তর্‌তর্‌ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

তিনতলার আলিসার উপর দিয়া একবার ছাদে উঁকি মারিয়া সে আবার নামিয়া আসিল। আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, 'কি ব্যাপার ! ছাদে কী দেখলে ?'

সে হাসিয়া বলিল, 'ছাদে দর্শনীয় কিছু নেই। দর্শনীয় বস্তু ঐখানে।' বলিয়া বাহিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, খিড়কির ফটক। ব্যোমকেশ সেই দিকে অগ্রসর হইল, আমি চলিলাম। বাগানের এই দিকটাতে আম-লিচু-পেয়ারা-জামরুল প্রভৃতি ফলের গাছ ; আমরা এই ফলের বাগান পার হইয়া বাড়ির বহিঃপ্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলাম।

খিড়কির ফটকটি সঙ্কীর্ণ, লোহার শিক-যুক্ত কপাট আন্দাজ পাঁচ ফুট উঁচু। তাহাতে তালা লাগাইবার ব্যবস্থা থাকিলেও মরিচা-ধরা অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বহুকাল তালা লাগানো হয় নাই। ফটকের বাহিরে একটি সরু গলি গিয়াছে। এই পথ দিয়া বাড়ির চাকর-বাকর যাতায়াত করে।

ব্যোমকেশ আমার দিকে ভ্রূ বাঁকাইয়া বলিল, 'কি বুঝলে ?'

বলিলাম, 'এই বুঝলাম যে, বাইরে থেকে অলক্ষিতে বাগানে প্রবেশ করা যায় এবং বাগান থেকে মই বেয়ে ছাদে উঠে যাওয়াও শক্ত নয়।'

সে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'শাবাশ। —চল, এবার বাড়ির মধ্যে যাওয়া যাক।'

হল-ঘরে নেংটি হেনার পোড়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেই দিকে চাহিয়া ছিল, আমাদের দেখিয়া আগাইয়া আসিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'কি দেখছিলে ?'

নেংটি বলিল, 'কিছু না। আজ সকালে মাসিমা এসে ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়েছেন। কাল থেকে মিস্ত্রি লাগবে। নতুন দোর-জানালা বসানো হবে, ঘরের প্ল্যাস্টার তুলে ফেলে নতুন করে প্ল্যাস্টার লাগানো হবে। ভাগ্যিস আগাগোড়া কংক্রিটের বাড়ি, নইলে সারা বাড়িটাই পুড়ে ছাই হয়ে যেত। সেই সঙ্গে আমরাও।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। বাড়ির সব কোথায় ?'

নেংটি বলিল, 'বাড়িতেই আছে, মেসোমশাই ফোন করেছিলেন। দাদারা কলেজে যায়নি। ডেকে আনব ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আমি প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে দেখা করব। রবিবর্মা কোথায় ?'

'নিজের ঘরে।' বলিয়া নেংটি আঙুল দেখাইল।

'আচ্ছা। তুমি তাহলে দোতলায় গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দাও। আমি রবিবর্মার সঙ্গে দেখা করেই যাচ্ছি।'

নেংটি দ্বিতলে চলিয়া গেল, আমরা রবিবর্মার দ্বারের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াইলাম। দ্বার ভেজানো ছিল, ব্যোমকেশ টোকা দিতেই খুলিয়া গেল। রবিবর্মা বলিল, 'আসুন।' তাহার গায়ে ধূসর রঙের আলোয়ান জড়ানো, শীর্ণ মুখ আরও শুষ্ক দেখাইতেছে—'শরীরটা ভাল নেই, তাই অফিস যাইনি।' বলিয়া কাশি চাপিবার চেষ্টা করিল।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি আয়তনে হেনার ঘরের সমতুল্য। আসবাবও অনুরূপ ; একহারা খাট, টেবিল, চেয়ার, বইয়ের শেল্‌ফ। ঘরটি রবিবর্মা বেশ পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছে।

ব্যোমকেশ রবিবর্মাকে কিছুক্ষণ মনোনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'রবিবাবু, আপনি সত্যিই সন্তোষবাবুর নিভৃত কুঞ্জের ফোন নম্বর জানেন না ?'

রবিবর্মা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আজ্ঞে না, সত্যি জানি না। কর্তা আমাকে জানাননি, তাই আমিও জানবার চেষ্টা করিনি। আমি মাইনের চাকর, আমার কি দরকার বলুন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। সুকুমারীর নিজের বাসার ফোন নম্বর তো আপনার জানা আছে, সেখানেও হেনার মৃত্যুর খবর দেননি ?'

'আজ্ঞে না।'

'সে-সময় অন্য কাউকে ফোন করতে দেখেছিলেন ?'

'আজ্ঞে—গোলমালের মধ্যে সব দিকে নজর ছিল না। মনে হচ্ছে পুলিস আসবার পর নেংটি কাউকে ফোন করেছিল।'

'নেংটি আমাকে ফোন করেছিল। সে যাক।—বলুন দেখি, পরশু রাত্রে যখন হেনার ঘরে আগুন লেগেছিল, আপনি কিছুই জানতে পারেননি ?'

রবিবর্মা কাশিতে লাগিল, তারপর কাশি সংবরণ করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে না, আমি জানতে পারিনি।'

'আশ্চর্য।'

'আজ্ঞে আশ্চর্য নয়, আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছিলাম। আমার মাঝে মাঝে অনিদ্রা হয়, সারা রাত জেগে থাকি। শনিবার ওই সব ব্যাপারের পর ভাবলাম ঘুম আসবে না তাই শোবার সময় তিনটে অ্যাসপিরিনের বড়ি খেয়েছিলাম। তারপর রাত্রে কী হয়েছে কিচ্ছু জানতে পারিনি।'

ব্যোমকেশ এদিক-ওদিক চাহিল। টেবিলের উপর একটা শিশি রাখা ছিল, তুলিয়া দেখিল—অ্যাসপিরিনের শিশি ; প্রায় ভরা অবস্থায় আছে। শিশি রাখিয়া দিয়া সে একথোলো চাবি তুলিয়া লইল। অনেকগুলি চাবি একটি রিংয়ে গ্রথিত, ওজনে ভারী। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এগুলো কোথাকার চাবি ?'

'অফিসের চাবি।' রবিবর্মা চাবির গোছা ব্যোমকেশের হাত হইতে লইয়া নিজের পকেটে রাখিল—'অফিসের বেশির ভাগ দেরাজ-আলমারির চাবি আমার কাছে থাকে।'

ব্যোমকেশ সহসা প্রশ্ন করিল, 'রবিবাবু, আপনার দেশ কোথায় ?'

থতমত খাইয়া রবিবর্মা বলিল, 'দেশ ? কুমিল্লা জেলায়।'

'হেনাকে আগে থাকতে চিনতেন ?'

রবিবর্মার তির্যক চোখে শঙ্কার ছায়া পড়িল, সে কাশির উপক্রম দমন করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে

না।'

'তার বাপ কমল মল্লিককে চিনতেন না ?'

'আজ্ঞে না।'

'হেনার মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না ?'

রবিবর্মা একটু ইতস্তত করিল, গলা বাড়াইয়া একবার হল-ঘরের দিকে উঁকি মারিল, তারপর চুপিচুপি বলিল, 'কাউকে বলবেন না, একটা কথা আমি জানি।'

'কি জানেন বলুন ?'

'সেদিন হেনার ঘরে দেখেছিলাম হেনা উলের জামা বুনছিল। কার জন্যে জামা বুনছিল জানেন ? উদয়ের জন্যে।'

'উদয়ের জন্যে ! আপনি কি করে জানলেন ?'

'একদিন বিকেলবেলা আমি দেখে ফেলেছিলাম। উদয় এক বাণ্ডিল উল এনে হেনাকে দিচ্ছে। হেনা সেই উল দিয়ে সোয়েটার তৈরি করছিল।'

'উদয়ের সঙ্গে তাহলে হেনার ঘনিষ্ঠতা ছিল ?'

রবিবর্মা সশঙ্ক চক্ষে চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আর যুগলের সঙ্গে ?'

'আমি জানি না। ব্যোমকেশবাবু, আমি যে আপনাকে কিছু বলেছি, তা যেন আর কেউ জানতে না পারে। বৌদি জানতে পারলে—'

বৌদি, অর্থাৎ, শ্রীমতী চামেলি। সকলেই তাঁহার ভয়ে আড়ষ্ট। মনে পড়িল, সে-রাত্রে সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় তাঁহার চাপা কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, তুমি চুপ করে থাকবে, কোন কথা বলবে না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার সঙ্গে হেনার ঘনিষ্ঠতা ছিল না ?'

রবিবর্মা চমকিয়া উঠিল, 'আমার সঙ্গে !—আমি সারা জীবন মেয়েলোককে এড়িয়ে চলেছি। ওসব রোগ আমার নেই, ব্যোমকেশবাবু।'

'ভাল। চল অজিত, ওপরে যাওয়া যাক।'

দোতলায় যুগলের ঘরের উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে গিয়া একটি নিভৃত দৃশ্য দেখিয়া ফেলিলাম। যুগল টেবিলের সামনে বসিয়া আছে, হাতে কলম, সম্মুখে খাতা, চিংড়ি চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে ফিসফিস করিয়া কি বলিতেছে। আমাদের দেখিয়া সে ত্রস্তা হরিণীর মত চাহিল, তারপর আমাদের পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

যুগল ঈষৎ লজ্জিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'আসুন।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'আপনাকে দু'তিনটে প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেব, তারপর আপনি যদি কলেজে যেতে চান যেতে পারেন।'

যুগল ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'দেরি হয়ে গেছে, সকালের দিকেই ক্লাস ছিল।' সে টেবিলের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া খাটের পাশে বসিল, 'কি জানতে চান বলুন ?' তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীতে ধীর নম্রতা প্রকাশ পাইল। সে-রাত্রির সেই বজ্রাহত বিভ্রান্তির ভাব আর নাই।

ব্যোমকেশ তাহার পাশে বসিয়া বলিল, 'আপনি কবিতা লেখেন ?'

যুগল অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, ক্ষীণস্বরে বলিল, 'মাঝে মাঝে লিখি।'

ব্যোমকেশ পকেট হইতে এক টুকরা গোলাপী কাগজ লইয়া যুগলের সম্মুখে ধরিল, বলিল, 'দেখুন তো, এটা কি আপনার লেখা ?'

দেখিলাম যুগলের সুশ্রী মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতেছে। সে কাগজের টুকরা লইয়া সংশয়িত চিত্তে নাড়াচাড়া করিতেছে, আমি ইত্যবসরে টেবিলের উপর হইতে খাতা লইয়া চোখ বুলাইলাম। কবিতার খাতা, তাহাতে চতুষ্পদী জাতীয় কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা লেখা রহিয়াছে। সবগুলিই অনুরাগের কবিতা, তার মধ্যে একটি মন্দ লাগিল না—

গোলাপ, তোমারে ধরিনু বুকের মাঝে
বিনিময়ে তুমি কাঁটায় ছিঁড়িলে বুক
রক্ত আমার দরদর ঝরিয়াছে
সেই শোণিমায় রাঙা করে নাও মুখ।

এখানে গোলাপ কে তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না।

ওদিকে যুগল দু'বার গলা খাঁকারি দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, আমারই লেখা।'

ব্যোমকেশ কণ্ঠস্বরে সমবেদনা ভরিয়া বলিল, 'হেনার সঙ্গে আপনার ভালবাসা হয়েছিল।'

যুগল কিয়ৎকাল নতমুখে বসিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল, 'ভালবাসা—কি জানি। হেনা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন একটা নেশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—তারপর এখন—'

ব্যোমকেশ প্রফুল্লস্বরে বলিল, 'নেশা কেটে যাচ্ছে। বেশ বেশ। জানালা দিয়ে গোলাপফুল আপনিই ফেলেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'হেনা তখন ঘরে ছিল না?'

'না।'

'যুগলবাবু, সে-রাত্রে আপনার ভাই উদয়বাবু অভিযোগ করেছিলেন যে, আপনি হেনাকে মেরেছেন। এ অভিযোগের কারণ কি?'

যুগল ধীরে ধীরে বলিল, 'কারণ—ঈর্ষা!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে উদয়বাবুও হেনার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

সেই অতি পুরাতন নিশুম্ভ ও মোহিনীর কাহিনী। ভাগ্যক্রমে কাহিনীর উপসংহার ভিন্নপ্রকার দাঁড়াইয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের দু'জনের মধ্যে হেনা কাকে বেশি পছন্দ করত?'

যুগল ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, 'এখন মনে হচ্ছে হেনা কাউকেই পছন্দ করত না।'

'আপনারা দু'ভাই ছাড়া আর কেউ হেনার প্রতি আসক্ত হয়েছিল? যেমন ধরুন—রবিবর্মা?'

যুগল চকিতে মুখ তুলিল। তাহার মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

সে বলিল, 'রবিবর্মা! কি জানি, বলতে পারি না।'

উদয় নিজের ঘরে বসিয়া টেনিস র‍্যাকেটের তাঁতে তেল লাগাইতেছিল, আমরা দ্বারের কাছে উপস্থিত হইতেই সে ঘন ভ্রুকুর নীচে রূঢ় চক্ষু রাঙাইয়া বলিল, 'আবার কি চাই?'

ব্যোমকেশের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, সে তর্জনী তুলিয়া বলিল, 'তুমি হেনাকে উল এনে দিয়েছিলে তোমার সোয়েটার বুনে দেবার জন্যে!'

উদয় উদ্ধতস্বরে বলিল, 'হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। তাতে কী প্রমাণ হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রমাণ হয় তোমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেদিন সে যখন ছাদে গেল, তখন তুমিও তার পিছন পিছন ছাদে গিয়েছিলে। সেখানে তার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়, তুমি তাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে।'

উদয় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে সভয়ে বলিয়া উঠিল, 'না—না! আমি ছাদে যাইনি। আমি হেনার পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু ছাদে পৌঁছুবার আগেই হেনা দোরে শিকল তুলে দিয়েছিল। আমি—আমি তাকে ঠেলে ফেলে দিইনি—আমি তাকে ভালবাসতাম, সেও আমাকে ভালবাসতো।'

ব্যোমকেশ নিষ্ঠুরস্বরে বলিল, 'হেনা আর যাকেই ভালবাসুক, তোমাকে ভালবাসতো না। সে তোমাকে বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছিল। এস অজিত।'

আমরা হল-ঘরের মধ্যস্থিত গোল টেবিলের কাছে গিয়া বসিলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, উদয় ক্ষণকাল আচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিঃশব্দে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

সামনে ফিরিয়া দেখি পিছনের সারির একটি ঘর হইতে শ্রীমতী চামেলি বাহির হইয়া আসিতেছেন। তিনি বোধ হয় সদ্য স্নান করিয়াছেন, ভিজা চুলের প্রান্ত হইতে এখনো জল ঝরিয়া পড়িতেছে, শাড়ির আঁচলটা কোনমতে মাথাকে আবৃত করিয়াছে, চোখে সন্দিগ্ধ উদ্বেগ। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

শ্রীমতী চামেলি তীব্র অনুচ্চস্বরে ব্যোমকেশকে বলিলেন, 'কী বলছিল উদয় আপনাকে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মারাত্মক কিছু বলেনি, আপনি ভয় পাবেন না। বসুন, আপনার কাছে দু'-একটা কথা জানবার আছে।'

শ্রীমতী চামেলি বসিলেন না, চেয়ারে বসিলে বোধ করি দেহ অশুচি হইয়া যাইবে। অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, 'আপনারা কেন আমাদের উত্ত্যক্ত করছেন আপনারাই জানেন। কি জানতে চান বলুন ?'

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্নালাপ হইল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আপনি আগে সন্ত্রাসবাদীদের দলে ছিলেন ?'

শ্রীমতী চামেলি বলিলেন, 'হ্যাঁ, ছিলাম।'

প্রশ্ন : আপনি অহিংসায় বিশ্বাস করেন না ?

উত্তর : না, করি না।

প্রশ্ন : বর্তমানে স্বামীর সঙ্গে আপনার সদ্ভাব নেই ?

উত্তর : সে-কথা সবাই জানে।

প্রশ্ন : অসদ্ভাবের কারণ কি ?

উত্তর : যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রশ্ন : আপনার সন্দেহ—হেনা আপনার স্বামীর উপপত্নী ছিল ?

উত্তর : হ্যাঁ। আমার স্বামীর চরিত্র ভাল নয়।

এই নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় ব্যোমকেশ যেন ধাক্কা খাইয়া থামিয়া গেল। শেষে অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিল, 'নেংটি এবং চিংড়ি আপনার নিজের বোনপো বোনঝি ?'

শ্রীমতী চামেলি একটু থমকিয়া গেলেন, তাঁহার উত্তরের উগ্রতাও একটু কমিল। তিনি বলিলেন, 'না, ওদের মা আমার ছেলেবেলার সখী ছিল, তার সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছিলুম। রক্তের সম্পর্ক নেই।'

প্রশ্ন : ওরা জানে ?

উত্তর : না, এখনো বলিনি। সময় হলে বলব।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে নমস্কার করিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ। আর আপনাকে উত্ত্যক্ত করব না। চললাম।'

শ্রীমতী চামেলি তীব্রদৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া রহিলেন, আমরা নীচের তলায় নামিয়া আসিলাম।

নেংটি ফটক পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিল। ব্যোমকেশের পানে রহস্যময় কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'কিছু বুঝতে পারলেন ?'

ব্যোমকেশ একটু বিরক্তস্বরে বলিল, 'না। তুমি বুঝতে পেরেছ নাকি ?'

নেংটি বলিল, 'আমার বোঝার কী দরকার। আপনি সত্যান্বেষী, আপনি বুঝবেন।'

ফুটপাথে আসিয়া ব্যোমকেশ ঘড়ি দেখিল—'সাড়ে দশটা। চল, এখনো সময় আছে, শ্রীমতী সুকুমারীকে দর্শন করে যাওয়া যাক।'

শ্রীমতী সুকুমারীর বাসা মধ্য কলিকাতার ভদ্রপল্লীতে, আমাদের বাসা হইতে বেশি দূর নয়। বাড়ির নীচের তলায় দোকানপাট, দ্বিতলে শ্রীমতী সুকুমারীর বাসস্থান।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে মৃদঙ্গ ও খঞ্জনির মৃদু নিক্বণ শুনিতে পাইলাম। সঙ্গে তরল বিগলিত

কণ্ঠস্বর—রাধেশ্যাম, জয় রাধেশ্যাম ! এটা বোধহয় সুকুমারী বৈষ্ণবীর গলা-সাধার সময়।

কড়া নাড়ার উত্তরে একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। থান-পরা গোলগাল চেহারা, চোখে স্টীলের চশমা, মুখখানি জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক। অনুমান করিলাম—সুকুমারীর 'মাসি' এবং বিজনেস ম্যানেজার।

একটি ক্ষুদ্র ঘরে আমাদের বসাইয়া মাসি ভিতরে গেল। আমরা জাজিমপাতা তক্তপোশের কিনারায় বসিলাম। ঘরে অন্য আসবাব নাই, কেবল দেয়ালে গৌর-নিতাইয়ের একটি যুগ্মচিত্র ঝুলিতেছে।

ভিতরের ঘরে যন্ত্রসঙ্গীত বন্ধ হইল। মাসি আসিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গেল। এটি বেশ বড় ঘর, মেঝেয় কার্পেট পাতা। একজন শীর্ণকায় কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব মৃদঙ্গ কোলে লইয়া যামিনী রায়ের ছবির ন্যায় বসিয়া ছিলেন, আমাদের দেখিয়া কঠোর চক্ষে চাহিলেন, তারপর উঠিয়া চলিয়া গেলেন। অদূরে সুকুমারী খঞ্জনি হাতে বসিয়া ছিল, নতশিরে আমাদের প্রণাম করিয়া ললিতকণ্ঠে বলিল, 'আসুন।'

এক একজন মানুষ আছে যাহাদের যৌবনকাল অতীত হইলেও যৌবনের কুহক থাকিয়া যায়। সুকুমারীর বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশের কম নয়, কিন্তু ওই যে ইংরেজিতে যাহাকে যৌন-আবেদন বলে তাহা এখনো তাহার সর্বাঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ; সাদা কথায়, তাহাকে দেখিলে পুরুষের মন অশ্লীল হইয়া ওঠে। উন্নত দীঘল দেহ, মুখখানিতে স্নিগ্ধ সরলতা মাখানো, চোখ দুটি ঈষৎ ঢুলঢুলে। ছলাকলার কোন চেষ্টা নাই, অকপট সহজতাই যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নিবিড় মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া প্রত্যয় হয়, কেবল সুকণ্ঠের জন্যই সে বিখ্যাত কীর্তন-গায়িকা হয় নাই, রূপ-গুণ-চরিত্র মিশিয়া যে সত্তাটি সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই বিদগ্ধজনের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে ; সে যেন মহাজন কবিদের কল্পলোকবাসিনী চিরায়মানা বৈষ্ণবী।

ব্যোমকেশ বলিল, 'সন্তোষবাবু আপনার ঠিকানা দিয়েছিলেন, তাই ভাবলাম—'

সুকুমারী ব্যোমকেশের মুখের উপর মোহভরা চক্ষু রাখিয়া বলিল, 'উনি আপনার কথা ফোনে জানিয়েছেন।' শুধু গানের গলা নয়, তাহার কথা বলার কণ্ঠস্বরও মধুক্ষরা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে হেনার কথা শুনেছেন ?'

সুকুমারী একটু বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

'হেনা নামে একটি মেয়েকে সন্তোষবাবু নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, একথা আপনি আগে থেকেই জানতেন ?'

'হ্যাঁ। বাপ-মা হারা বন্ধুর মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছিলেন আমি জানতাম।'

ব্যোমকেশ একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, 'দেখুন, আপনার সঙ্গে সন্তোষবাবুর দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতার কথা আমি জানি, সুতরাং আমার কাছে সঙ্কোচ করবেন না। সেদিন—অর্থাৎ শনিবার দুপুরবেলা থেকে কি কি হয়েছিল আমায় বলুন।'

সুকুমারী কিছুক্ষণ নতমুখে পায়ের নখ খুঁটিয়া বলিল, 'আমার মনে কোন সঙ্কোচ নেই, বরং গৌরব। কিন্তু ওঁর মান-ইজ্জত আছে, তাই লুকিয়ে রাখতে হয়। সেদিনের কথা শুনতে চান বলছি। ও বাড়িটাকে আমরা ছোট বাড়ি বলি। সেদিন বেলা আন্দাজ দুটোর সময় এখানকার কাজকর্ম সেরে আমি ছোট বাড়িতে গেলুম। পাঁচ দিন বাড়ি বন্ধ থাকে, ঝাড়া মোছা করতে সাড়ে তিনটে বেজে গেল। তারপর উনি এলেন।

'এসে অফিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে স্নান করলেন। ছোট বাড়িতে ওঁর পাঁচ সেট জামা-কাপড় আছে, অনেক ইংরেজি বই আছে। উনি নিজের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বসলেন, আমি জলখাবার তৈরি করতে গেলুম। বাজারের খাবার উনি খান না।

'ছ'টার সময় উনি জলখাবার খেলেন। তারপর গান শুনতে বসলেন। ছোট বাড়িতে সঙ্গতের যন্ত্র কিছু নেই, আমি কেবল খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাই। মনে আছে, সেদিন তিনটে পদ গেয়েছিলাম। একটি চণ্ডীদাসের, একটি গোবিন্দদাসের, আর একটি জগদানন্দর।

'একটি পদ গাইতে অন্তত আধ ঘন্টা সময় লাগে। আমি জগদানন্দর 'মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ' পদটি শেষ করে এনেছি, এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। আমি উঠবার আগেই উনি গিয়ে ফোন ধরলেন। দু'মিনিট পরে ফিরে এসে বললেন, 'আমি এখনি যাচ্ছি, হেনা ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে।'

'তিনি যে-বেশে ছিলেন সেই বেশে বেরিয়ে গেলেন।'

সুকুমারী নীরব হইলে ব্যোমকেশও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'কে টেলিফোন করেছিল আপনি জানেন না ?'

সুকুমারী বলিল, 'না। তারপর আমি এ-বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলাম, কিন্তু এ-বাড়ি থেকে কেউ ফোন করেনি।'

'এ-বাড়িতে কে কে ফোন নম্বর জানে ?'

'কেবল দিদিমণি জানেন, আর কেউ না।'

'দিদিমণি ?'

'আমার অভিভাবিকা, কাজকর্ম দেখেন। তাঁকে ডাকব ?'

'ডাকুন।'

যাহাকে মাসি ভাবিয়াছিলাম তিনিই দিদিমণি; আজকাল বোধহয় উপাধির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সুকুমারীর বাক্য সমর্থন করিলেন। সেদিন তিনি টেলিফোন করেন নাই, এ-বাড়িতে তিনি ও সুকুমারী ছাড়া ছোট বাড়ির টেলিফোন নম্বর আর কেহ জানে না।

দিদিমণি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, 'আপনার সকালবেলাটা নষ্ট হল।'

সুকুমারী হাত জোড় করিয়া বলিল, 'যদি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, একটা গান শুনে যান। আমার তো আর কিছুই নেই।'

সাদা গলায় কেবল খঞ্জনি বাজাইয়া সুকুমারী গান করিল। বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন—মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।

তাহার গান পূর্বে কখনো শুনি নাই, শুনিয়া বিভোর হইয়া গেলাম। কণ্ঠের মাধুর্যে, উচ্চারণের বিশুদ্ধতায়, অনুভবের সুগভীর ব্যঞ্জনায় আমার মনটাকে সে যেন কোন দুর্লভ আনন্দঘন রসলোকে উপনীত করিল। এতক্ষণ তাহার চিত্তচাঞ্চল্যকর কুহকিনী মূর্তিই দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার শুদ্ধশান্ত তদ্গত তাপসী রূপ দেখিলাম।

সেদিন বাসায় ফিরিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল।

স্নানাহার সারিয়া আমি বাহিরের ঘরে আসিয়াছি, ব্যোমকেশ তখনো আঁচাইতেছে, টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গিয়া ফোন তুলিয়া লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে প্রবল বাক্যস্রোত বাহির হইয়া আসিল—'হ্যালো, ব্যোমকেশবাবু, আমি চামেলি সমাদ্দার। দেখুন, আপনি সন্দেহ করেন আমার ছেলেরা হেনাকে খুন করেছে। ভুল—ভুল। আমার ছেলেরা বাপের মত নয়, ওরা সচ্চরিত্র ভাল ছেলে। ওরা কেন হেনাকে খুন করতে যাবে ? আমি বলছি আপনাকে, কেউ হেনাকে খুন করেনি, সে নিজে ছাদ থেকে পড়ে মরেছে। নীচের দিকে উঁকি মেরে দেখছিল, তাল সামলাতে পারেনি।'

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি দম লইবার জন্য থামিলেন, আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, 'দেখুন, আমি ব্যোমকেশ নই, অজিত। ব্যোমকেশকে ডেকে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ হতচকিত নীরবতা, তারপর কট্ করিয়া টেলিফোন কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ব্যোমকেশ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে শ্রীমতী চামেলির কথা বলিলাম। সে সিগারেট ধরাইয়া পায়চারি করিতে করিতে বলিল—'মহিলাটির প্রকৃতি স্নায়ুপ্রধান। আজ আমি তাঁর ছেলেদের যে-সব প্রশ্ন করেছি তা বোধহয় জানতে পেরেছেন, তাই ভয় হয়েছে। পুলিস যে

হাত গুটিয়েছে তা জানেন না, জানলে আমাকে ফোন করতেন না।'

আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, আজ তো সকলকেই নেড়েচেড়ে দেখলে। কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ ?'

সে হাত তুলিয়া বলিল, 'দাঁড়াও, আরো ভাবতে দাও।'

অপরাহ্নে বিকাশ আসিল, সঙ্গে একটি ক্ষীণকায় যুবক। বিকাশের চেহারা বা বাক্‌ভঙ্গীতে কোনো পরিবর্তন নাই ; সে যুবকের দিকে তর্জনি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'এর নাম গুপীকেষ্ট, আমার শাকরেদ। যদি দরকার হয় তাই সঙ্গে এনেছি স্যার।'

এমন লোক আছে যাহাকে একবার দেখিয়া ভোলা যায় না। গুপীকেষ্ট ঠিক তাহার বিপরীত, তাহার চেহারা এতই বৈশিষ্ট্যহীন যে হাজার বার দেখিলেও মনে থাকে না, বহুরূপী গিরগিটির মত বাতাবরণের সঙ্গে বেবাক মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

ব্যোমকেশ গুপীকেষ্টকে পরিদর্শন করিয়া সহাস্যে বলিল, 'বেশ বেশ, বোসো তোমরা। দু'জনকেই দরকার হবে। আরো দু'জন পেলে ভাল হত।'

বিকাশ সোৎসাহে বলিল, 'আরো আছে স্যার। কয়েকটা ছেলেকে টিক্‌টিকি-তালিম দিচ্ছি। যদি পিছনে লাগার কাজ হয়, তারা পারবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, পিছনে লাগার কাজ। চারজন লোকের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে।'

'ব্যস্, ঠিক আছে। বাবুই আর চিচিংকে লাগিয়ে দেব। ছেলেমানুষ হলেও ওরা হুঁশিয়ার আছে।' বিকাশ ও গুপীকেষ্ট তক্তপোশের প্রান্তে বসিল, বিকাশ বলিল, 'এবার সব কথা বলুন স্যার।'

ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে ডাকিয়া চা-জলখাবার হুকুম করিল। তারপর মোটামুটি পরিস্থিতি বিকাশকে বুঝাইয়া দিল ; চারজন লোকের উপর নজর রাখিতে হইবে ; সন্তোষবাবু, রবিবর্মা, যুগল এবং উদয়। তাহারা কোথায় যায়, কাহার সহিত কথা বলে, অগতানুগতিক কিছু করে কিনা। রোজ ব্যোমকেশকে রিপোর্ট দিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু কোনো বিষয়ে খট্‌কা লাগিলে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট দিতে হইবে।

কাজকর্ম বুঝাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল থেকে কাজ শুরু করে দাও। আজ লোকগুলোকে তোমাদের চিনিয়ে দেব। সন্তোষবাবুর অফিস থেকে ফেরার সময় হল। চা খেয়ে নাও, তারপর আমি তোমাদের নিয়ে বেরুব।' বিকাশ বলিল, 'আপনার যাবার কিচ্ছু দরকার নেই স্যার। সন্তোষবাবুর ঠিকানা দিন, আমরা সবাইকে চিনে নেব।'

ব্যোমকেশ ঠিকানা দিল। বিকাশ বলিল, 'এখন বলুন স্যার, কে কার পিছনে লাগবে। আমি কার পিছনে লাগব ? সন্তোষবাবু ?'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'না, তুমি লাগবে রবিবর্মার পিছনে। আর গুপীকেষ্ট লাগবে সন্তোষবাবুর পিছনে। বাকি দু'জন যেমন তেমন হলেই হল।'

'তাই হবে স্যার।'

তাড়াতাড়ি জলযোগ সারিয়া বিকাশ ও গুপীকেষ্ট চলিয়া গেল। আমি বলিলাম, 'সন্তোষবাবুকেও তাহলে তুমি সন্দেহ কর ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি সকলকেই সন্দেহ করি। তুমি যদি সেদিন ওখানে উপস্থিত থাকতে, তাহলে তোমাকেও সন্দেহ করতাম।'

প্রশ্ন করলাম, 'নেংটিকে সন্দেহ কর ?'

সে বলিল, 'নেংটি যদি আমাকে খবর না দিত তাহলে তাকেও সন্দেহ করতাম।'

'আর চিংড়িকে ?'

'চিংড়িকে সন্দেহ করি। বোধহয় লক্ষ্য করেছ, বয়সে ছেলেমানুষ হলেও সে যুগলকে

ভালবাসে। হেনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী, সুতরাং তার মোটিভ আছে। সুযোগও প্রচুর।'

'কোথায় সুযোগ ? যদি উদয়ের কথা বিশ্বাস করা যায়, হেনা ছাদে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিয়েছিল।'

'চিংড়ি আগে থাকতে ছাদে গিয়ে লুকিয়েছিল কিনা কে জানে। এ যুক্তি শ্রীমতী চামেলির বেলাতেও খাটে। তিনি হেনাকে সহ্য করতে পারতেন না, তিনি মনে করতেন হেনার সঙ্গে তাঁর স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক আছে।'

ব্যোমকেশের কথাগুলো কিছুক্ষণ মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি এই কেস সম্বন্ধে কী বুঝেছ আমায় বল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটি কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি—এটা দুর্ঘটনা নয়, খুন। এখন প্রশ্ন, কে খুন করেছে ? একে একে সন্দেহভাজন লোকগুলিকে ধর। প্রথমে ধর সন্তোষবাবু। তিনি মস্ত বড় মানুষ, নামজাদা রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু তাঁর একটি দুর্বলতা আছে। মৃত বন্ধুর অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে তিনি আশ্রয় দিলেন। তাঁর এই সৎকার্যটি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ দয়াদাক্ষিণ্য না হতে পারে। কিন্তু তিনি হেনাকে খুন করবেন কেন ? খুন করার কোন মোটিভ নেই, থাকলেও আমরা জানি না।'

বলিলাম, 'সুকুমারীর ব্যাপার নিয়ে হেনা তাঁকে ব্ল্যাকমেল করছিল এমন হতে পারে না কি ?'

'হেনা পাকিস্তানের মেয়ে, সুকুমারী-ঘটিত ব্যাপার তার জানার কথা নয়। তবু মনে কর সে জানত। তাহলে সন্তোষবাবু তাকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিলেন কেন ? আর ব্ল্যাকমেলে তাঁর ভয়ই বা কিসের ! তাঁর স্ত্রী জানেন তাঁর চরিত্র ভাল নয়, ছেলেরা জানে বাপ শনিবারে-রবিবারে বাড়ি আসে না। রবিবর্মা জানে নেংটি জানে, বাড়ির সবাই জানে, সুতরাং বাইরের লোকও জানে। কিন্তু কারুর কিছু বলবার সাহস নেই, কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারে না।—হেনাকে সন্তোষবাবু ভয় করবেন কেন ?'

'তা বটে। তাছাড়া তাঁর অ্যালিবাই আছে।'

'শুধু তাঁর অ্যালিবাই নয়, সুকুমারীরও। দু'জনে দু'জনের অ্যালিবাই যোগাচ্ছেন। সুকুমারীকেও সন্দেহ থেকে বাদ দেওয়া যায় না, তার সুযোগ যত কমই হোক, মোটিভ যথেষ্ট ছিল। সন্তোষবাবুর কাছ থেকে সে হাজার টাকা মাইনে পায়, হয়তো কিছু ভালবাসাও আছে। হেনাকে যদি সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী মনে করে তাহলে হেনাকে খুন করার মোটিভ তার আছে।'

'তুমি সত্যিই সুকুমারীকে সন্দেহ কর ?'

'সত্যি-মিথ্যের কথা নয়, এ হচ্ছে হিসেবের কড়ি, একটি কানাকড়ি বাদ দেওয়া চলে না।'

'তারপর ?'

'তারপর রবিবর্মা। তার সুযোগ ছিল প্রচুর, কিন্তু মোটিভ নিয়েই গণ্ডগোল। লোকটির প্রকৃতি পাঁকাল মাছের মত, ধরা-ছোঁয়া যায় না, ধরতে গেলেই পিছলে যায়। আমার মনে হয় রবিবর্মা আগে থেকে হেনাকে চিনত। হেনার প্রতি তার আকর্ষণ বিকর্ষণ দুইই ছিল। আকর্ষণ বুঝতে পারি, রবিবর্মা অবিবাহিত, হেনার মত সুন্দরী মেয়ের প্রতি সে আকৃষ্ট হবে এতে আশ্চর্য কিছু নেই। কিন্তু বিকর্ষণ কিসের জন্যে ? হেনা কি তার কোন বিপজ্জনক গুপ্তকথা জানত ? হেনা তাকে প্রণয়-ব্যাপারে প্রশ্রয় দেয়নি তাই আক্রোশ ? তাই কি সে উদয়কে ফাঁসাতে চায় ?'

'উদয়কে ফাঁসাতে চায় ?'

'উদয় হেনাকে উল কিনে দিয়েছিল, হেনা তার জন্যে সোয়েটার বুনছিল—একথা আমাকে বলবার দরকার ছিল না। এ থেকে মনে হয়, সে নিজের ঘাড় থেকে সন্দেহ নামিয়ে উদয়ের ঘাড়ে চাপাতে চায়।'

'হুঁ। তারপর ?'

'তারপর উদয়। গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে, কড়া মেজাজ, কিন্তু হেনার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট

হয়েছিল। হেনা বোধহয় তাকে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি আশকারা দিত, উদয় ভাবত হেনা তাকেই ভালবাসে। তারপর সে জানতে পারল যুগলের সঙ্গে হেনার কবিতা লেখালেখি চলছে, গোলাপফুলের আদান-প্রদান চলছে। ছাদের ওপর এই নিয়ে হেনার সঙ্গে উদয়ের ঝগড়া হল, রাগের মাথায় উদয় হেনাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিল। হয়তো তার খুন করবার ইচ্ছা ছিল না—'

বলিলাম, 'আর যুগল ? তার কী মোটিভ ছিল ?'

সে বলিল, 'একই মোটিভ—যৌন-ঈর্ষা। যুগল শান্তশিষ্ট কবি মানুষ, কিন্তু তার প্রাণের মধ্যে কি রকম দুর্বার আগুন জ্বলে উঠেছিল কে বলতে পারে। সে যদি জানতে পেরে থাকে যে, হেনা উদয়ের জন্যে পশমের জামা বুনছে—'

'কিন্তু সে ছাদে গেল কি করে ? উদয় সিঁড়ি দিয়ে হেনার পিছু পিছু গিয়েছিল।'

'যুগল বাগানে গিয়েছিল, বাগান থেকে গোলাপফুল তুলে জানালা দিয়ে হেনার টেবিলে ফেলে দিয়েছিল। তারপর ভারার মই বেয়ে ছাদে উঠে যাওয়া কি তার পক্ষে খুব শক্ত ?'

'না, শক্ত নয়। কিন্তু গোলাপফুল উপহার দিয়েই তাকে খুন করল ?'

'গোলাপফুলটা হয়তো ভাঁওতা, পুলিসের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা।'

'বুঝলাম। আর কে বাকি রইল ?'

'শ্রীমতী চামেলি এবং চিংড়ি। দু'জনেরই মোটিভ আছে, দু'জনেরই সুযোগ সমান। শ্রীমতী চামেলি যখন বাথরুমে ছিলেন চিংড়ি তখন একলা ছিল, আবার চিংড়ি যখন বাথরুমে ছিল, শ্রীমতী চামেলি তখন একলা ছিলেন।'

আমি বলিলাম, 'তাহলে দাঁড়াল কী ? এই সাতজনের মধ্যে আসল দোষী কে ?'

সে বলিল, 'শুধু সাতজন নয়, আর একটি ছিপে রুস্তম আছেন যিনি মাউথ-অর্গান বাজিয়ে হেনাকে ইশারা দিয়ে যেতেন।'

ঠিক তো, বংশীবদন বনমালীর কথা মনে ছিল না। প্রশ্ন করিলাম, 'ব্যোমকেশ, ও লোকটা কে ?'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'হিন্দু কি মুসলমান বলতে পারি না, কিন্তু পাকিস্তানী লোক সন্দেহ নেই। বোধহয় দু'জনের মধ্যে প্রণয় ছিল, লোকটা পাকিস্তান থেকে হেনাকে বই এনে দিত। প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে কখন কি ঘটে কিছুই বলা যায় না। প্রণয় হয়তো ক্রমশ বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হেনার মন উদয়ের দিকে ঢলেছিল।'

'লোকটা দশ-বারো দিন অন্তর আসত কেন ?'

'হয়তো সে প্লেনে আসত, হয়তো সে প্লেনের একজন অফিসার ; দশ-বারো দিন অন্তর দমদমে নামে, হেনার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে যায়। সবই অবশ্য অনুমান।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে হঠাৎ উঠিয়া পাশের ঘরে গেল, শুনিতে পাইলাম কাহাকে ফোন করিতেছে। দু'-তিন মিনিট পরে ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাকে ?'

সে বলিল, 'নেংটিকে। বংশীধারী লোকটি হেনার মৃত্যুর পর আর এসেছিল কিনা খবর নিচ্ছিলাম। নেংটি বলল, আসেনি।'

'না আসার কি কারণ থাকতে পারে ?'

'হয়তো হেনার মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছে, কিংবা অসুখে পড়েছে, কিংবা মরে গেছে। কত রকম কারণ থাকতে পারে।' হঠাৎ ব্যোমকেশ স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল, অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। দেখিলাম সে আমার দিকে চাহিয়া আছে বটে কিন্তু আমাকে দেখিতেছে না, মনশ্চক্ষু দিয়া অভাবনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছে। তারপর সে চাপা গলায় বলিল, 'অজিত।'

বলিলাম, 'কি হল ?'

সে বলিল, 'যেদিন হেনা মারা যায় সেদিনের কথা মনে আছে ?'

'মনে থাকবে না কেন ? সে তো পরশু !'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দুপুরবেলা তুমি খবরের কাগজ পড়ে শোনালে। একটা পাকিস্তানী প্লেন বানচাল হয়ে বঙ্গোপসাগরে ডুবেছে, মনে আছে ? আমি মৈনাক পর্বতের গল্প বললাম—'

'মনে আছে বৈকি !'

'সেদিনকার খবরের কাগজটা খুঁজে বার করতে পার ?'

'পারি।'

পুরানো খবরের কাগজগুলো একস্থানে জমা করা হইত, মাসের শেষে পুঁটিরাম সেগুলিকে বিক্রয় করিত। আমি সেদিনের কাগজটা খুঁজিয়া আনিয়া ব্যোমকেশকে দিলাম, সে সাগ্রহে কাগজের পাতা উল্টাইয়া বিমান-বিপর্যয়ের বিবরণ দেখিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি দেখছ ?'

সে কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, 'ডাকোটা প্লেন। সিঙ্গাপুর থেকে কায়রো পর্যন্ত দৌড়। অফিসার সবাই মুসলমান, কেবল একজন পাইলট ইংরেজ। যাত্রিদলের মধ্যে সব জাতের লোক ছিল—'

ধীরে ধীরে কাগজ মুড়িয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ শূন্যদৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল।

অতঃপর আমাদের যে কর্মচঞ্চলতা আসিয়াছিল, তাহা যেন দমকা বাতাসের মত অকস্মাৎ শান্ত হইয়া গেল। দু'দিন আর কোনো সাড়াশব্দ নাই। কেবল বিকাশ একবার টেলিফোন করিয়া জানাইল তাহারা শিকারের পিছনে লাগিয়া আছে। সন্তোষবাবু ও রবিবর্মা নিয়মিত অফিস যাইতেছেন ও বাড়ি ফিরিতেছেন ; যুগল ও উদয় কলেজ যাইতেছে ও বাড়ি ফিরিতেছে ; উদয় মাঝে একদিন বিকালবেলা হকি খেলিতে গিয়াছিল। উল্লেখযোগ্য অন্য কোনো খবর নাই।

তৃতীয় দিন, অর্থাৎ, বৃহস্পতিবারে আবার আমাদের জীবনে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়া আসিল, তৈলাভাবে নিবন্ত প্রদীপ আবার ভাস্বর হইয়া উঠিল।

সকালবেলা নেংটি আসিল। তাহার ভাবভঙ্গীতে একটু অস্বস্তির লক্ষণ। ব্যোমকেশ তাহাকে একটি সিগারেট দিয়া বলিল, 'কি খবর ?'

নেংটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না, সিগারেট ধরাইয়া কুঞ্চিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিল। তারপর বলিল, 'ব্যোমকেশদা, আপনি কি উদয়দা'র পিছনে গুপ্তচর লাগিয়েছেন ?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিল, 'কে বলল ?'

'উদয়দা বলল, একটা সিড়িঙ্গে ছোঁড়া তার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'উদয় বুঝি খুব ঘাবড়ে গেছে ?'

'ঘাবড়াবার ছেলে উদয়দা নয়, সে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে ; যেন ভারি গৌরবের কথা। মাসিমা কিন্তু ভয় পেয়েছেন।'

ব্যোমকেশ চকিত হইয়া চাহিল, 'তাই নাকি। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন কেন ?'

নেংটি মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তা জানি না। কাল উদয়দা মাসিমার কাছে বড়াই করছিল, জানো মা, আমার পিছনে পুলিস-গোয়েন্দা লেগেছে। তাই শুনে মাসিমার মুখ শুকিয়ে গেল। একেই তো ছট্‌ফটে মানুষ, সেই থেকে আরো ছট্‌ফটে করে বেড়াচ্ছিলেন। আজ সকালে আমাকে বললেন, তুই ব্যোমকেশবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়, তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'আমার সঙ্গে কথা বলবেন ?'

'হ্যাঁ।—ব্যোমকেশদা, কিছু হদিস পেলেন ?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'কিছু হদিস পেয়েছি।'

নেংটি বিস্ফারিত চক্ষে বলিল, 'পেয়েছেন !'

'বোধহয় পেয়েছি, কিন্তু তা এখনও বলবার মত নয়। চল, তোমার মাসিমা কি বলেন শুনে আসি। ওঠ অজিত।'

সন্তোষবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নীচের তলার হল-ঘরে হৈ-হুল্লোড়

চলিতেছে। চিংড়ি একটা তালপাতার পাখা লইয়া যুগলকে মারিতে ছুটিয়াছে, উদয় চিংড়ির লম্বা বেণী ঘোড়ার রাশের মত ধরিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং বলিতেছে—'হ্যাট ঘোড়া—হ্যাট্ হ্যাট্।' চিংড়ি বলিতেছে, 'কেন আমার খোঁপা খুলে দিলে!' তিনজনেই উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছে এবং ঘরময় ছুটাছুটি করিতেছে। তিনজনের মুখেই খুনসুড়ির উল্লাস।

আমাদের আবির্ভাবে রঙ্গক্রীড়া অর্ধপথে থামিয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য তিনজনে অপ্রতিভভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর চিংড়ি লজ্জিত মুখে সিঁড়ি দিয়া উপরে পলায়ন করিল; যুগল ও উদয় অপেক্ষাকৃত মন্থর পদে তাহার অনুবর্তী হইল।

নেংটি আমাদের বসাইয়া মাসিমাকে খবর দিতে গেল। আমি চুপি চুপি ব্যোমকেশকে বলিলাম, 'ভায়ে ভায়ে ভাব হয়ে গেছে দেখেছ?'

ব্যোমকেশ একটু গম্ভীর হাসিয়া বলিল, 'এর নাম যৌবন।'

নেংটি নামিয়া আসিয়া বলিল, 'মাসিমা আপনাদের ওপরে ডাকছেন।'

দ্বিতলে উঠিলাম, কিন্তু হল-ঘরে কেউ নাই। এই খানিক আগে যাহারা উপরে আসিয়াছিল, তাহারা বোধকরি স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। নেংটি একটি ভেজানো দোরের কপাটে টোকা মারিল। ভিতর হইতে আওয়াজ হইল, 'এস।'

নেংটি দ্বার ঠেলিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গেল।

ঘরটি শয়নকক্ষ হিসাবে বেশ বিস্তৃত; একপাশে জোড়া-খাট ঘরের বিস্তার খর্ব করিতে পারে নাই। খাটটিতে সম্ভবত শ্রীমতী চামেলি চিংড়িকে লইয়া শয়ন করেন। খাট ছাড়া ঘরে ওয়ার্ডরোব, কাপড়ের আলনা, ড্রেসিং-টেবিল, দুইটি আরাম-কেদারা। দেয়ালে একটি লেলিহরসনা মা-কালীর পট। দুইটি বড় বড় জানালা দিয়া বাড়ির পিছন দিকের পাইনের সারি দেখা যাইতেছে।

ঘরে দুইটি স্ত্রীলোক। এক, শ্রীমতী চামেলি; তিনি স্নান করিয়া গরদের শাড়ি পরিয়াছেন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে আধুলির মত একটি সিঁদুরের ফোঁটা, মুখ গম্ভীর, চক্ষে চাপা উত্তেজনার অস্বাভাবিক দীপ্তি। দ্বিতীয়, চিংড়ি। তাহার ক্রীড়া-চপলতা আর নাই। সে জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের পানে চাহিয়া আছে।

শ্রীমতী চামেলি বলিলেন, 'নেংটি, চিংড়ি, তোরা বাইরে যা, আমি এঁদের সঙ্গে কথা কইব।'

চিংড়ির যাইবার ইচ্ছা ছিল না, সে শম্বুকগতিতে জানালা হইতে দ্বারের দিকে পা বাড়াইতেছিল, নেংটি গভীর ভ্রূকুটি করিয়া মস্তক-সঞ্চালনে তাহাকে ইশারা করিল। দু'জনে ঘর হইতে বাহির হইল, নেংটি দ্বার ভেজাইয়া দিল।

শ্রীমতী চামেলি চেয়ার নির্দেশ করিয়া বলিল, 'আপনারা বসুন।' তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী কাটা-কাটা, যেন অত্যন্ত সতর্কভাবে কথা বলিতেছেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি বসুন।'

ঘরে দু'টি মাত্র চেয়ার ছিল, তৃতীয় ব্যক্তিকে বসিতে হইলে খাটের কিনারায় বসিতে হয়। শ্রীমতী চামেলি একবার খাটের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন, 'আমি বসব না, আমার এখনো পুজো হয়নি। আপনারা বসুন।'

চেয়ারে বসিতে বসিতে ভাবিলাম, ইনি একদিন সন্ত্রাসবাদিনী ছিলেন, বন্দুক চালাইতেন; তখন নিশ্চয় শুচিবাই ছিল না। অবস্থাচক্রে মনের কত পরিবর্তনই না হয়।

আমরা উপবিষ্ট হইলে শ্রীমতী চামেলি কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, ধীরে ধীরে গুনিয়া গুনিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। সংসারের সাধারণ কথা, যাহা ব্যোমকেশকে শুনাইবার কোনই সার্থকতা নাই; মনে হইল তিনি ভয় পাইয়াছেন, তাই আসল কথাটা বলিবার আগে খানিকটা ভণিতা করিয়া লইতেছেন।

কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে শুনিয়া ব্যোমকেশ মুখ তুলিল, বলিল, 'দেখুন, আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি এ পরিবারের বন্ধু, সন্তোষবাবু আপনাদের সকলের স্বার্থরক্ষার জন্যে আমাকে নিযুক্ত

করেছেন। হেনার মৃত্যু-সম্বন্ধে আপনার যদি কিছু জানা থাকে, আমাকে খুলে বলতে পারেন।'

শ্রীমতী চামেলি একটু থমকিয়া গেলেন, ব্যোমকেশকে যেন নূতন চক্ষু দিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'আপনি পুলিসের দলের লোক নয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, পুলিসের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কিন্তু—কিন্তু—আপনি জানেন পুলিস আমার ছেলেদের পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছে !'

বুঝিলাম, শ্রীমতী চামেলি জানেন না যে পুলিস এ মামলা হইতে হাত গুটাইয়াছে। সন্তোষবাবুর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ, কে-ই বা তাঁহাকে বলিবে।

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতী চামেলির স্বর তীব্র হইয়া উঠিল, 'এ কি অন্যায় ; আমার ছেলেরা নির্দোষ। তবু তাদের পিছনে গুপ্তচর লাগবে কেন ?'

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, 'তারা নির্দোষ কিনা জানতে চায় বলেই বোধহয় গুপ্তচর লেগেছে।'

'আমি হাজার বার বলেছি আমার ছেলেরা নির্দোষ, তবু তাদের বিশ্বাস হয় না !'

'কিন্তু ওরা নির্দোষ তা আপনিই বা জানলেন কি করে ? দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনি ওদের মা, আপনার পক্ষে ওদের নির্দোষিতায় বিশ্বাস করা স্বাভাবিক। কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে তো তা নয়। তাদের চোখে সবাই সমান।'

শ্রীমতী চামেলির চোখে আভ্যন্তরিক জল্পনার ছায়া পড়িল, তিনি এক পা সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ চাপা সুরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমি জানি হেনা কি করে মরেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

ব্যোমকেশ চমকিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিল—'স্বচক্ষে দেখেছেন !'

'হ্যাঁ।' শ্রীমতী চামেলি এক নিশ্বাসে বলিয়া গেলেন, 'সেদিন চিংড়ি বাথরুমে যাবার পর আমি বাইরে এসে দেখলুম, হেনা তেতলার ছাদে যাচ্ছে। সকলেই জানে আমি হেনাকে সহ্য করতে পারি না, হেনাও আমাকে ভয় করে। আমি ভাবলুম, এই সুযোগে আমিও ছাদে গিয়ে যদি তাকে বেশ দু'-চার কথা শুনিয়ে দিই, তাহলে সে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, আমার ছেলেরা নিরাপদ হবে।'

'তাহলে ছেলেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আপনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন ? যাহোক, তারপর ?'

'আমিও সিঁড়ি বেয়ে তেতলার ছাদে গেলুম। আমাকে দেখেই হেনা ভয় পেয়ে আলসের দিকে ছুটে গিয়ে আলসের গায়ে আছড়ে পড়ল। তারপর তাল সামলাতে না পেরে উলটে নীচে পড়ে গেল। আমাকে দেখে বোধহয় তার ভয় হয়েছিল যে আমি তাকে মারব।'

ব্যোমকেশ তাঁহার পানে নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'এসব কথা আগে বলেননি কেন ?'

শ্রীমতী চামেলি মুখের একটা অধীর ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'বললে কি কেউ বিশ্বাস করত ? উল্টে সন্দেহ করত আমিই হেনাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছি।'

ব্যোমকেশ একবার ঘাড় হেঁট করিয়া আবার মুখ তুলিল, 'তা বটে। আচ্ছা, আপনি যখন সিঁড়ি দিয়ে ছাদে গেলেন তখন উদয়কে দেখেছিলেন ?'

শ্রীমতী চামেলি ঈষৎ শঙ্কিত কণ্ঠে বলিলেন, 'না, উদয় সেখানে ছিল না।'

'কাউকে দেখেননি ?'

'না, কাউকে না।'

'সিঁড়ির দরজা, ছাদে যাবার দরজা, নিশ্চয় খোলা ছিল ?'

'হ্যাঁ, খোলা ছিল।'

'আপনি যখন হেনাকে দেখলেন, তখন সে কী করছিল ?'

'ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল।'

'তার হাতে কিছু ছিল ?'

'লক্ষ্য করিনি।'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'আর বোধহয় আপনার কিছু বলবার নেই। আচ্ছা, তাহলে আসি। পুলিসকে আপনার কথা বলে দেখতে পারেন।'

শ্রীমতী চামেলি শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা চলিয়া আসিলাম।

বাসায় ফিরিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইল।

শ্রীমতী চামেলি ছেলেদের বাঁচাইবার জন্য যে নিপুণ কল্পকথা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যোমকেশকে আরও বিভ্রান্ত ও বিমর্ষ করিয়া তুলিয়াছিল। সে তক্তপোশের উপর লম্বা হইয়া বিক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, 'কিছু হচ্ছে না—কিচ্ছু হচ্ছে না, শুধু ভাঁওতা, শুধু ধাপ্পা। সবাই আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছে।'

আমি বলিলাম, 'তোমারই বা কিসের গরজ, ব্যোমকেশ? পুলিস হাল ছেড়ে দিয়েছে, সন্তোষবাবুরও আগ্রহ নেই। তবে তুমি কেন মিছে খেটে মরছ!'

ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, 'মুশকিল কি হয়েছে জানো? আমি সত্যান্বেষী, সত্যি কথাটা যতক্ষণ না জানতে পারছি, আমার প্রাণে শান্তি নেই। দুত্তোর! এ সময়ে যদি অন্য একটা কাজ হাতে থাকতো তাহলে হয়তো ভুলে থাকতে পারতাম—'

এই সময় সদর দরজার সামনে পোস্টম্যান আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্সিওর-করা রেজিস্ট্রি খাম। প্রেরকের নাম—উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের দপ্তর। কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম—কী ব্যাপার! ব্যোমকেশ খাম খুলিয়া একটি টাইপ-করা চিঠি বাহির করিল। উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের চীফ্ সেক্রেটারি মহাশয় লিখিয়াছেন—

প্রিয় মহাশয়, মান্যবর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের আদেশে এই পত্র লিখিতেছি। আপনি ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার ও বোম্বাই সরকারের পক্ষে যে কাজ করিয়াছেন তাহা আমাদের অবিদিত নহে।

সম্প্রতি উড়িষ্যা সরকারের দপ্তরে কিছু রহস্যময় ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। দপ্তর হইতে মূল্যবান ও অতি গোপনীয় দলিল অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, কিন্তু অপরাধীকে ধরা যাইতেছে না। এ বিষয়ে উড়িষ্যা সরকার আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আপনি অবিলম্বে কটকে আসিয়া তদন্তের ভার গ্রহণ করিলে বাধিত হইব। বিলম্বে রাষ্ট্রের ইষ্টহানির সম্ভাবনা।

আপনি কবে আসিতেছেন তার-যোগে জানাইলে উপকৃত হইব। আপনার রাহা-খরচ ইত্যাদি বাবদ ৫০০ টাকার চেক অত্রসহ পাঠানো হইল।

ধন্যবাদান্তে নিবেদন ইতি।—

ব্যোমকেশ প্রফুল্ল মুখে চিঠি ও চেক আমার হাতে দিল, বলিল, 'সরকারী মহলে আমার খ্যাতি রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি।'

চিঠি পড়িয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম সে দুই হাত পিছন দিকে শৃঙ্খলিত করিয়া পায়চারি করিতেছে। বলিলাম, 'যা চাইছিলে তাই হল। যাবে তো?'

'দেশের কাজ। যাব বৈকি।'

'কবে যাবে?'

সে পদচারণে বিরতি দিয়া বলিল, 'অজিত, তুমি খাওয়া-দাওয়া সেরে চেকটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এস। আর কটকে একটা তার করে দাও, আমরা অবিলম্বে যাচ্ছি।'

প্রশ্ন করিলাম, 'অবিলম্বেটা কবে?'

সে হাসিয়া বলিল, 'আজ কালের মধ্যে।'

সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় বিকাশ আসিল, বলিল, 'খবর আছে স্যার।'

বিকাশ, গুপীকেষ্ট, বাবুই ও চিচিং নামধারী চারিটি যুবক যে ব্যোমকেশের পক্ষ হইতে টিকটিকির কাজ করিতেছে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মনটা অগ্রবর্তী হইয়া কটকের দিকে ছুটিয়াছিল।

তিনজনে ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া তক্তপোশের উপর বসিলাম। বিকাশ বলিল, 'চীনেম্যানটা বড় জ্বালিয়েছে স্যার।'

'চীনেম্যান!'

'ওই যে আপনার রবিবর্মা। নাক-মুখ-চোখ চীনেম্যানের মত। নিশ্চয় লুকিয়ে লুকিয়ে আরসোলা খায়।'

'বিচিত্র নয়। তারপর বল, জ্বালিয়েছে কি ভাবে?'

'ক'দিন ধরে লোকটার পিছনে লেগে আছি, তা একবার কি এদিক-ওদিক যাবে! না, বাড়ি থেকে অফিস, আর অফিস থেকে বাড়ি। হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম স্যার। তারপর আজ—'

'আজ কি করেছে?'

'অন্যদিন পাঁচটার সময় অফিস থেকে বেরোয়, আজ সাড়ে চারটের সময় বেরুলো। বাড়ির দিকে গেল না, বৌবাজারের বাসে উঠল। আমিও উঠলাম। লোকটার মনে পাপ আছে বেশ বোঝা যায়, বারবার পিছু ফিরে চাইছে। আমি ঘাপটি মেরে আছি। শেষে শিয়ালদার কাছাকাছি এসে রবিবর্মা টুক করে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম।

'আপনি লক্ষ্য করেছেন বোধহয় ঐখানে একটা হোটেল আছে—নাম ইন্দো-পাক হোটেল। তিনতলা বাড়ি, কিন্তু একটু ঘুপ্‌সি গোছের। যারা পাকিস্তান থেকে যাওয়া-আসা করে, তারাই বেশির ভাগ এই হোটেলে ওঠে। নীচের তলায় রেস্তরাঁ, মুর্গী-মটন চলছে, ওপরতলায় থাকবার ঘর। রবিবর্মা হোটেলে ঢুকে পড়ল।

'রেস্তরাঁয় হট্টগোল চলছে, রবিবর্মা সেদিকে গেল না। পাশের একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে চুপি চুপি ওপরে উঠে গেল।

'আমিও গেলাম। সিঁড়ি যেখানে দোতলায় গিয়ে তেতলার দিকে মোড় ঘুরেছে, সেখানে সরু গলির মত একটা বারান্দা, তার দু'পাশে সারি সারি ঘরের দোর। মাথার ওপর ধোঁয়াটে একটা বাল্‌ব ঝুলছে। আমি সিঁড়ির মোড় থেকে উঁকি মেরে দেখলাম রবিবর্মা কোণের দিকের একটা ঘরের দরজা চাবি দিয়ে খুলছে। দরজা কিন্তু খুলল না। তখন রবিবর্মা চাবির গোছা থেকে আর একটা চাবি বেছে নিয়ে তালায় পরালো, কিন্তু তবু তালা খুলল না।

'এই সময় তেতলার দিক থেকে সিঁড়ির ওপর পায়ের আওয়াজ হল, দু'-তিনজন ভাড়াটে নেমে আসছে। আমি তখন এমন ভাব দেখালাম যেন আমি দোতলায় থাকি, পকেট থেকে চাবি বার করতে করতে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রবিবর্মা চট্‌ করে চাবির গোছা পকেটে পুরে নীচে নেমে গেল। আমিও তার দরজাটা এক নজরে দেখে নিয়ে তার পিছু নিলাম।

'তারপর রবিবর্মা সটান বাড়ি ফিরে গেল। তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

ব্যোমকেশের চক্ষু কিছুক্ষণ অন্তর্নিমগ্ন হইয়া রহিল।

'ইন্দো-পাক হোটেল—হেনা পাকিস্তানের মেয়ে ছিল—রবিবর্মা—' বিকাশের দিকে চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঘরের নম্বরটা লক্ষ্য করেছিলে?'

বিকাশ বলিল, 'হ্যাঁ স্যার; দোরের মাথায় পেতলের নম্বর মারা ছিল—৭ নম্বর।'

'৭ নম্বর!' ব্যোমকেশের চোখ ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

'হ্যাঁ স্যার, ৭ নম্বর।'

ব্যোমকেশ আবার চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল। আমারও মনে হইল সাত নম্বর কথাটা কোথায় যেন শুনিয়াছি, হঠাৎ স্মরণ করিতে পারিলাম না। বিকাশ চুপি চুপি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, '৭ নম্বরের কোন মাহাত্ম্য আছে নাকি স্যার?'

ব্যোমকেশ চক্ষু খুলিল, বিকাশের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, 'তুমিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কাজের লোক। কিন্তু কাজ এখনো শেষ হয়নি। তুমি ইন্দো-পাক হোটেলে ফিরে যাও, ৭ নম্বর ঘরের সামনে পাহারা দাও। আমরা আধ ঘন্টার মধ্যেই যাচ্ছি।'

'আচ্ছা স্যার।' বিকাশ চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়া ফোন তুলিয়া লইল। সংযোগ স্থাপিত হইলে বলিল, 'এ কে রে? আমি ব্যোমকেশ...একটু দরকার আছে...হেনার চাবির গোছা তোমার কাছে আছে তো?....বেশ বেশ। আমরা এখনি তোমার কাছে যাচ্ছি, চাবির গোছাটা দরকার...সাক্ষাতে বলব...তুমি যদি আমাদের সঙ্গে আসতে পারো তো ভাল হয়...বেশ বেশ, আমরা এখনি যাচ্ছি।'

ফোন রাখিয়া দিয়া সে বলিল, 'চল, আজ রাত্রেই হেনা-রহস্যের সমাধান হবে মনে হচ্ছে।'

এতক্ষণে মনে পড়িল হেনার চাবির গোছায় একটা চাবিতে ৭ নম্বর ছাপ মারা ছিল।

এ কে রে-কে ট্যাক্সিতে তুলিয়া লইয়া আমরা আন্দাজ আটটার সময় ইন্দো-পাক হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পথে একবার মাত্র কথা হইল, এ কে রে বলিলেন, 'আমি কিন্তু এখন পুলিস নই, স্রেফ তোমার বন্ধু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই সই।'

দোতলার সিঁড়ির মুখে বিকাশ রেলিংয়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আমাদের দেখিয়া খাড়া হইল। ব্যোমকেশ চুপি চুপি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাত নম্বর ঘরের খবর কি?'

বিকাশ বলিল, 'ভাল। আর কেউ আসেনি।'

'হোটেলের ম্যানেজার কোথায় থাকে জানো?'

'ঐ ঘরে!' বিকাশ সামনের ঘরের দিকে আঙুল দেখাইল।

ব্যোমকেশ এ কে রে-র দিকে দৃষ্টি ফিরাইল : চোখে চোখে কথা হইল। এ কে রে ঘাড় নাড়িয়া ম্যানেজারের ঘরের বন্ধ দ্বারে টোকা দিলেন।

দ্বার খুলিয়া একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিছনে আলোকিত ঘরটি দেখিতে পাইলাম, টেবিল-চেয়ার দিয়া সাজানো ঘর, ঘরে অন্য কেহ নাই, কেবল টেবিলের ওপর একটি বোতল শোভা পাইতেছে।

এ কে রে বলিলেন, 'আপনি হোটেলের ম্যানেজার?'

ম্যানেজার ঢুলুঢুলু চক্ষে এ কে রে-র পোশাক অবলোকন করিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আসতে আজ্ঞা হোক।' বলিয়া তিনি আভূমি অবনত হইয়া অভিবাদন করিতে গিয়া গোঁত্তা খাইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, এ কে রে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'আমি পুলিসের কাজে আসিনি। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।'

ম্যানেজারের কণ্ঠ হইতে বিগলিত হাসির খিক্‌খিক্ আওয়াজ নির্গত হইল। এ কে রে ঘাড় ফিরাইয়া ব্যোমকেশকে চোখের ইশারা করিলেন, পকেট হইতে হেনার চাবির রিঙ লইয়া তাহার হাতে দিলেন, তারপর ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিলেন। আমরা তিনজন বাহিরে রহিলাম।

ব্যোমকেশ বলিল, 'এবার সাত নম্বর।'

সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে সাত নম্বর ঘর। টিম্‌টিমে বাল্‌বের আলোয় চাবি বাছিয়া লইয়া ব্যোমকেশ তালায় চাবি পরাইল। সঙ্গে সঙ্গে তালা খুলিয়া গেল। চাবিটা যে এই ঘরেরই এবং হেনার এই ঘরে যাতায়াত ছিল তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

ঘর অন্ধকার। ঘরে পদার্পণ করিতে গিয়া মনে হইল একটা কালো হিংস্র জন্তু ঘরের কোণে ওৎ পাতিয়া আছে, আমরা পা বাড়াইলেই ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে। ব্যোমকেশ বলিল, 'দাঁড়াও, দেশলাই বার করি।'

কিন্তু বিকাশ তৎপূর্বেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বারের পাশে হাত্‌ড়াইয়া সুইচ টিপিল। দপ করিয়া ঘরটা আলোকিত হইয়া উঠিল। আমরা ভিতরে গিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিলাম।

ঘরের বদ্ধ বাতাসে সেঁতা-সেঁতা গন্ধ। একটি মাত্র জানালা বন্ধ। ঘরটি প্রায় নিরাভরণ; একদিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটি লোহার খাট নগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, অন্য দেওয়ালে একটি মধ্যমাকৃতি গোদরেজের স্টীলের আলমারি। আর কিছু নাই।

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রথমেই স্টীলের আলমারির দিকে গিয়াছিল, সে চাবির রিঙ হইতে আর

একটি চাবি লইয়া আলমারিতে লাগাইয়া পাক দিতেই কপাট খুলিয়া গেল। বিকাশ ও আমি ব্যোমকেশের পিছন হইতে ঝুঁকিয়া দেখিলাম—

আলমারির তিনটি থাক। নীচের দুটি থাক খালি, উপরের থাকে একটি বই এবং রেক্সিনে বাঁধানো পুস্তকাকার একটি ফাইল রহিয়াছে। পিছন দিকে একটি কৃষ্ণবর্ণ বস্তু অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল, ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া সেটি বাহিরে আনিল। দেখা গেল সেটি একটি ভাঙা মাউথ-অর্গান।

মাউথ-অর্গানটি নাড়িয়া-চাড়িয়া ব্যোমকেশ আবার রাখিয়া দিল। তারপর বইখানি তুলিয়া লইল। জগ্‌জগে বাঁধানো কোয়ার্টো সাইজের বাংলা বই, মলাটে ফারসী লিপির অনুকরণে নাম লেখা আছে—রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম। ব্যোমকেশ পাতা উল্টাইয়া দেখিল উপহার-পৃষ্ঠায় লেখা আছে—শ্রীমতী মীনা 'মাতাহারি' প্রিয়তমাসু। তন্নিম্নে উপহর্তার নাম দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। নামটা একান্ত পরিচিত।

বইখানি আমার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ রেক্সিন-বাঁধানো ফাইলটি হাতে লইল, সন্তর্পণে পাতা খুলিয়া আবার চট্‌ করিয়া বন্ধ করিয়া ফেলিল। যতটুকু দেখিতে পাইলাম, মনে হইল কয়েকটি বাংলা হরফে লেখা চিঠি তাহার মধ্যে রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে।' দেখিলাম, তাহার চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করিতেছে। ঘরের বাহিরে আসিয়া সে দরজায় তালা লাগাইল, বলিল, 'এবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে।'

ম্যানেজারের ঘরে তখন আসর জমিয়া উঠিয়াছে ; নিঃশেষিত বোতলটি টেবিলের উপর গড়াইতেছে। এ কে রে একটি অর্ধ-পূর্ণ পাত্র হাতে লইয়া বসিয়া আছেন, ম্যানেজার হাত-জোড় করিয়া তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন—'আর এক চুমুক স্যার, স্রেফ একটি চুমুক। আমার মাথার দিব্যি !'

আমরা প্রবেশ করিলে ব্যোমকেশের সঙ্গে এ কে রে-র দৃষ্টি বিনিময় হইল, ব্যোমকেশ একটু ঘাড় নাড়িল। এ কে রে উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আজ তাহলে—'

ম্যানেজার গদগদ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'তা কি হয় ! ভদ্র মহো-মহোদয়েরা এসেছেন, এক চুমুক না খেয়ে যেতে পাবেন না। আমি আর এক বোতল ভাঙছি।'

তিনি আলমারির দিকে অগ্রসর হইলেন, ব্যোমকেশ বাধা দিয়া বলিল, 'না না, আজ থাক, আর একদিন হবে। আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, আপনার ৭ নম্বর ঘরে কে থাকে বলুন দেখি ?'

'৭ নম্বর !' ম্যানেজার কিছুক্ষণ চক্ষু মিটিমিটি করিয়া বলিলেন, 'ও ৭ নম্বর। একটি পাকিস্তানী ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছেন। ভারি মজার লোক। মাসে মাসে ভাড়া গোনেন, কিন্তু মাসের মধ্যে বড় জোর তিন দিন আসেন। আধ ঘন্টা থেকেই চলে যান। ভারি মজার লোক।'

'তাঁর সঙ্গে কেউ আসে ?'

ম্যানেজারের চোখে একটু ধূর্ততার ছায়া পড়িল, তিনি বলিলেন, 'একটি পরী আসে।'

'ভদ্রলোকের নাম কি ?'

'নাম !' ম্যানেজার আকাশ-পাতাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'নামটা বিস্মরণ হয়ে গেছে। কিন্তু কুচ পরোয়া নেই, রেজিস্টারে নাম আছে।'

একটি বাঁধানো খাতা খুলিয়া তিনি বলিলেন, 'ঠিক ধরেছি, যাবে কোথায় ? এই যে ভদ্রলোকের নাম—ঢাকা পাকিস্তান ওমর শিরাজি।' তিনি বিজয়োৎফুল্ল নেত্রে চাহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওমর শিরাজি। ধন্যবাদ—অশেষ ধন্যবাদ। আজ চলি, আবার একদিন আসব।'

ম্যানেজারের আর একটি বোতল ভাঙিবার সনির্বন্ধ প্রস্তাব এড়াইয়া আমরা নীচে নামিলাম। ব্যোমকেশ বিকাশের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে। আজ বাড়ি যাও। শীগ্‌গির একদিন এস।'

বিকাশ প্রস্থান করিল। আমরা একটা ট্যাক্সি ধরিয়া এ কে রে-র থানার দিকে চলিলাম, তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া বাসায় ফিরিব।

পথে যাইতে যাইতে এ কে রে বলিলেন, 'ম্যানেজার ভদ্রতার অবতার, একেবারে নাছোড়বান্দা ভদ্রলোক, আমাকে এক পেগ খাইয়ে তবে ছাড়লো। আরো খাওয়াবার তালে ছিল।—যাহোক, তোমার কাজ হল?'

ব্যোমকেশ চাবি তাহাকে ফেরত দিয়া বলিল, 'হল। তুমি কিছু জানতে চাও না?'

এ কে রে দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িলেন, 'না।'

বাসায় ফিরিয়া ব্যোমকেশ প্রথমেই ওমর খৈয়ামের কাব্য ও চিঠির ফাইল সযত্নে দেরাজের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিল। আমি প্রশ্ন করিলাম, 'ওমর খৈয়ামকে তো চিনি, ওমর শিরাজি লোকটি কে?'

পুরনো খবরের কাগজটা টেবিলের ওপরেই ছিল, ব্যোমকেশ তাহার পাতা খুলিয়া আমাকে দেখাইল। পাকিস্তানী বিমান-দুর্ঘটনায় মৃতের তালিকায় নাম রহিয়াছে—ওমর শিরাজি, ন্যাভিগেটর।

রাত্রের আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ব্যোমকেশ চিঠির ফাইল লইয়া বসিল।

পরদিন বেলা ন'টার সময় সন্তোষবাবুর অফিসে উপস্থিত হইলাম।

সন্তোষবাবু সবেমাত্র আসিয়া অফিসে বসিয়াছেন, ব্যোমকেশকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'একি! আপনি এখনো এখানে?'

ব্যোমকেশ পূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনার জন্যে ফাঁদ পাতব ভেবেছিলাম, তা আর দরকার হল না। হ্যাঁ, উড়িষ্যা সরকারের নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছি, কিন্তু এখনো যাওয়া হয়নি। বসতে পারি?' অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সে চেয়ারে বসিল। আমিও বসিলাম।

বেফাঁস কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। সন্তোষবাবুর মুখ ক্ষণকালের জন্য লাল হইয়া উঠিল। তারপর তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, 'উড়িষ্যা সরকার!'

ব্যোমকেশের ঠোঁটে একটু হাসি খেলিয়া গেল, সে বলিল, 'আপনার সুপারিশে উড়িষ্যা সরকার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন; আপনার উদ্দেশ্য তো তাঁরা জানেন না। কিন্তু ও-কথা যাক্। সন্তোষবাবু, হেনা মল্লিককে কে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল আমি জানতে পেরেছি।'

আমি সন্তোষবাবুকে লক্ষ্য করিতেছিলাম, দেখিলাম তাঁহার মুখ পাঙাস হইয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দু'টা সর্পচক্ষুর ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠিতেছে। তিনি যে কিরূপ ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক, কোণঠাসা বন-বিড়ালের মত তাঁহার সম্মুখীন হওয়া যে অতিশয় বিপজ্জনক কাজ, তাহা নিমেষ মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিনি বলিলেন, 'কে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল?'

ব্যোমকেশ সহজ সুরে বলিল, 'আপনি।'

যেন কেহ তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে এমনি স্বরে সন্তোষবাবু বলিলেন, 'প্রমাণ করতে পারেন?'

ব্যোমকেশ শান্তভাবে মাথা নাড়িল, 'না। তবে আপনার মোটিভ আছে তা প্রমাণ করা যায়।'

'তাই নাকি। আমি আপনার নামে মানহানির মোকদ্দমা করে আপনাকে জেলে পাঠাতে পারি তা জানেন?'

'আমার নামে মোকদ্দমা করবার সাহস আপনার নেই, সন্তোষবাবু। আমার কাছে আস্ফালন করেও লাভ নেই। শুনুন, আপনি আমাকে আপনার পারিবারিক স্বার্থরক্ষার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, সে কাজ আমি করেছি। যে কারণেই হোক, পুলিস হেনার মৃত্যুর তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে, আমার ও-বিষয়ে কোন কর্তব্য নেই। কিন্তু সত্য কথা জানবার অধিকার সকলেরই

আছে। আমি সত্য কথা জানতে পেরেছি।'

সন্তোষবাবু কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখের মধ্যে কত প্রকার চিন্তা বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল তাহা নির্ণয় করা যায় না। শেষে তিনি বলিলেন, 'কি সত্য কথা জানতে পেরেছেন আপনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি যা খুঁজেছিলেন, কিন্তু আপনি পাননি, যার জন্যে আপনি ঘরে আগুন দিয়েছিলেন, আমি তাই পেয়েছি। একখানা বই—রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, আর কয়েকটা চিঠি।'

সন্তোষবাবুর রগের শিরা ফুলিয়া উঠিল। তিনি অসহায় বিষাক্ত চোখে চাহিয়া বলিলেন, 'কি চান আপনি? টাকা?'

ব্যোমকেশ শুষ্কস্বরে বলিল, 'আমাকে ঘুষ দিতে পারেন এত টাকা আপনারও নেই, সন্তোষবাবু। আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, দেশদ্রোহিতা করেছেন, তার শাস্তি পেতে হবে।'

সন্তোষবাবু নির্বাক চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার রগের শিরা দপদপ করিতে লাগিল।

'হেনার মা মীনার সঙ্গে আপনার প্রণয় ছিল। দেশ ভাগাভাগির সময় আপনি ঢাকায় যেতেন, মীনার সঙ্গে দেখা করতেন। আপনি জানতেন মীনা বিপক্ষ দলের গুপ্তচর, তা জেনেও আপনি নিজের দলের গুপ্তকথা তাকে বলতেন। শুধু মুখে বলেই নিশ্চিন্ত হননি, চিঠি লিখে নিজের দলের সমস্ত সলা-পরামর্শ তাকে জানাতেন। তার ফলে পদে পদে আমাদের হার হয়েছে, আমাদের প্রাপ্য ভূখণ্ড আমরা হারিয়েছি।

'আপনার চিঠিগুলো মীনা রেখে দিয়েছিল। তারপর হঠাৎ সে মরে গেল, চিঠিগুলো তার মেয়ে হেনার হাতে এল। হেনার একজন দোসর ছিল—ওমর শিরাজি। দু'জনে মিলে ষড়যন্ত্র করল, তারপর হেনা এসে আপনার বুকে চেপে বসে ব্ল্যাকমেল শুরু করল।'

সন্তোষবাবুর চোখ দু'টা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি হঠাৎ হাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এক লাখ টাকা দেব, চিঠিগুলো আমায় ফেরৎ দিন।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষবাবু দাঁড়াইলেন, রক্তাক্ত ভীষণ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'দেবেন না?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, 'কাল থেকে একটি বিশিষ্ট দৈনিক সংবাদপত্রে আপনার চিঠিগুলির ফ্যাক্সিমিলি একে একে ছাপা হবে। প্রস্তুত থাকবেন।'

সন্তোষবাবু দুই চক্ষে অগ্নি বিকীর্ণ করিতে করিতে বসিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ আমাকে ইশারা করিল, আমরা দ্বারের দিকে চলিলাম।

পিছন হইতে ডাক আসিল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

আমরা ফিরিয়া গিয়া সন্তোষবাবুর সামনে দাঁড়াইলাম, তিনি টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া দু'হাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। এক মিনিট পরে তিনি হাত নামাইলেন; দেখিলাম তাঁহার মুখ ভাবলেশহীন। তিনি বলিলেন, 'আমাকে একদিন সময় দেবেন? আজ বিকেল পাঁচটার সময় পার্ক সার্কাস মাঠে আমার বক্তৃতা আছে—'

ব্যোমকেশ তাঁহার মুখের উপর গম্ভীর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরস্বরে বলিল, 'একদিন সময় দিলাম। কাল সকালে সংবাদপত্রে আপনার চিঠি ছাপা হবে না। কিন্তু একটা কথা জানিয়ে রাখি। গুণ্ডা লাগিয়ে আমাকে খুন করালেও কোনো লাভ হবে না, চিঠিগুলির নাগাল আপনি পাবেন না। যথাসময়ে সেগুলি ছাপা হবে।'

'ধন্যবাদ।'

সারাদিন ব্যোমকেশ তক্তপোশে শুইয়া কড়িকাঠ গণনা করিল, কথা বলিল না। বেলা চারটের সময় চা আসিলে উঠিয়া বসিয়া চা পান করিল, তারপর বলিল, 'চল, বেরনো যাক।'

'কোথায় যাবে?'

'সন্তোষবাবুর লেকচার শুনতে।'

সুতরাং বাহির হইলাম। মাথার উপর যাহার খাঁড়া ঝুলিতেছে, সে কিরূপ বক্তৃতা দিবে শুনিবার কৌতূহল বোধকরি স্বাভাবিক।

পার্ক সার্কাসের মাঠে মঞ্চ রচিত হইয়াছে, মঞ্চের উপর এক সারি গণ্যমান্য ব্যক্তি উপবিষ্ট, প্রধান সচিবও আছেন। সম্মুখে বৃহৎ জনতা। রাজনৈতিক কোনো একটা গুরুতর প্রসঙ্গ জনসাধারণের গোচর করার উদ্দেশ্যে এই সভা আহূত হইয়াছে। আমরা জনতার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম।

প্রথমে প্রধানমন্ত্রী উঠিলেন, তিনিই সভাপতি। মাইকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিষয়বস্তুর অবতারণা করিলেন। তারপর একে একে বক্তারা উঠিলেন। সামান্য যুক্তিতর্কের ফোড়ন দিয়া প্রবল হৃদয়াবেগপূর্ণ বক্তৃতা। মুগ্ধ হইয়া বাক্যতরঙ্গে ভাসিয়া চলিলাম।

সর্বশেষে মাইকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন সন্তোষবাবু। তাঁহার মুখের দৃঢ় গাম্ভীর্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সূচনা করিতেছে। ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

লোকটির বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা আছে। উচ্ছ্বাস নাই, ভাবালুতা নাই, কেবল দুর্নিবার যুক্তির দ্বারা তিনি শ্রোতার সমগ্র মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইলেন। ক্রমে তাঁহার ভাষণের ছন্দ দ্রুত হইতে লাগিল, অন্তর্গূঢ় আবেগে কণ্ঠস্বর মৃদঙ্গের ন্যায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তারপর তিনি যখন বক্তৃতার শেষে উদাত্ত কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করিলেন, তখন শ্রোতাদের কণ্ঠ হইতেও স্বতরুৎসারিত জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

ভাষণ শেষ করিয়া সন্তোষবাবু নিজ আসনে গিয়া বসিলেন। আমার দৃষ্টি তাঁহার উপরেই নিবদ্ধ ছিল, দেখিলাম তিনি পকেট হইতে একটি কৌটা বাহির করিয়া কিছু মুখে দিলেন। ভাবিলাম, হয়তো পেনিসিলিনের বড়ি।

ইতিমধ্যে প্রধান সচিব আসিয়া সভা সংবরণের ভাষণ আরম্ভ করিয়াছেন, শ্রোতারা উঠি-উঠি করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ মঞ্চের উপর একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। মুহূর্তে আমার দৃষ্টি সেইদিকে ছুটিয়া গেল ; দেখিলাম সন্তোষবাবু নিজ আসনে এলাইয়া পড়িয়াছেন, আশেপাশে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া দেখিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী ভাষণ থামাইয়া সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। শ্রোতাদের মধ্যে একটা উত্তেজিত গুঞ্জন উঠিল।

পাঁচ মিনিট পরে প্রধানমন্ত্রী মাইকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'মর্মান্তিক দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের প্রিয় সুহৃৎ, দেশের সুসন্তান সন্তোষ সমাদ্দার ইহলোক ত্যাগ করেছেন—'

তিনি ভগ্নস্বরে বলিয়া চলিলেন। ব্যোমকেশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল, বলিল, 'চল। পঞ্চমাঙ্কে যবনিকা পতন হয়েছে।'

পার্কের বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, বলিল, 'চল, হাঁটা যাক।'

পথ অনেকখানি, তবু ট্রামে-বাসে চড়িবার ইচ্ছা হইল না। আমিও সিগারেট ধরাইয়া বলিলাম, 'চল।'

পাশাপাশি চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল—

'সন্তোষবাবু প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি চরিত্রবান ছিলেন না। ইংরেজিতে কথা আছে—নাবিকদের বন্দরে বন্দরে বৌ, সন্তোষবাবুরও ছিল তাই। তিনি কাজের সূত্রে মাদ্রাজ বোম্বাই দিল্লী সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন, আমার বিশ্বাস প্রত্যেক শহরেই তাঁর একটি করে প্রেয়সী ছিল। বুড়ো বয়সেও তাঁর ও-রোগ সারেনি।

'কলকাতাতে যেমন তাঁর ছিল সুকুমারী, ঢাকায় তেমনি ছিল মীনা। মীনা ধর্মে মুসলমানী ছিল। সকল দেশে সকল সভ্য সমাজেই এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক থাকে যারা বাইরে বেশ

সভ্য-ভব্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিলাসিনীর ব্যবসা চালায়। পাশ্চাত্য দেশে ওদের নাম—ডেমি মনডেন। মীনা ছিল ডেমি মনডেন। তার স্বামী ছিল কিনা জানি না, বোধহয় সাক্ষীগোপাল গোছের একজন কেউ ছিল, তার নাম কমল মল্লিক। কমল মল্লিক নামটা হিন্দু নাম, আবার কামাল মল্লিক বললে মুসলমান নাম হয়ে যায়। হেনা মল্লিক নামটাও তাই। মল্লিক পদবী হিন্দুদের মধ্যে আছে, কিন্তু আসলে ওটা মুসলমানী খেতাব।

'মীনার ছবি দেখেছ, সে ছিল অপরূপ সুন্দরী। সমাজের উঁচু মহলে তার প্রসার ছিল। সন্তোষবাবুকেও সে কুহকের নাগপাশে বেঁধে ফেলেছিল, যখনই তিনি ঢাকায় যেতেন মীনার সঙ্গে তাঁর দেখা হত। সে বোধহয় তাঁকে গজল শোনাতো।

'তারপর এল স্বাধীনতা, এল দেশ-ভাগাভাগির যুদ্ধ। সে যে কী নৃশংস যুদ্ধ তা কারুর ভোলবার কথা নয়। এই সময় সন্তোষবাবু আমাদের দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। দুই পক্ষের মধ্যে যখন দূতের প্রয়োজন হল, তখন সন্তোষবাবু আমাদের পক্ষ থেকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হলেন। তিনি বারবার কলকাতা থেকে ঢাকা যাতায়াত করতে লাগলেন। স্বভাবতই মীনার সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হতে লাগল।

'সন্তোষবাবু তখন মীনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তিনি নিজের দলের অতিবড় গুপ্তকথাগুলিও মীনার কাছে প্রকাশ করে ফেলতে লাগলেন। মীনা রঙ্গিণী মেয়ে হলেও নিজের দলের স্বার্থচিন্তা তার মনে ছিল, সে গুপ্ত সংবাদগুলি যথাস্থানে পৌঁছে দিতে লাগল। অবস্থাটা ভেবে দেখ, রাজনৈতিক কূটযুদ্ধ চলছে, ওদের গুপ্ত অভিপ্রায় আমরা কিছুই জানি না, ওরা আমাদের গুপ্ত অভিপ্রায় সমস্ত জানে। ফল অনিবার্য।

'সন্তোষবাবুর তখন এমন মোহমত্ত অবস্থা যে, তিনি মীনাকে কেবল মৌখিক গুপ্তকথা জানিয়ে নিরস্ত হননি, যখন কলকাতায় থাকতেন তখন চিঠি লিখে তাকে গুপ্ত সংবাদ জানাতেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ কী আমি জানি না, সম্ভবত অন্য কোন দেশনেতার প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষা। কিন্তু তিনি যে জেনেশুনে মীনাকে খবর পাঠাতেন, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম বইয়ের উপহার পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছিলেন—মীনা মাতাহারি। তিনি জানতেন মীনা বিপক্ষ দলের গুপ্তচর।

'যাহোক, দেশ-ভাগাভাগির লড়াই একদিন শেষ হল। তারপর কয়েক বছর কেটে গেল। মীনা সন্তোষবাবুর চিঠিগুলি যত্ন করে রেখে দিয়েছিল, নষ্ট করেনি। তার কি মতলব ছিল বলতে পারি না, হয়তো ভেবেছিল কোনদিন সন্তোষবাবু যদি বাঁধন ছেঁড়বার চেষ্টা করেন তখন চিঠিগুলো কাজে লাগবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন মীনা মারা গেল। বোধহয় অ্যাকসিডেন্টেই মারা গিয়েছিল।

'মীনার একটি মেয়ে ছিল—হেনা। মা যখন মারা গেল তখন সে সাবালিকা হয়েছে। সে মায়ের কাগজপত্রের মধ্যে সন্তোষবাবুর চিঠিগুলো খুঁজে পেল। হেনার নিশ্চয় দু'-চারজন উমেদার ছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম ওমর শিরাজি। শিরাজি বিমান কোম্পানিতে কাজ করত, এরোপ্লেনের ন্যাভিগেটর। দেশে দেশে উড়ে বেড়াতো, তার প্লেনের দৌড় সিঙ্গাপুর থেকে কায়রো। দশ-বারো দিন অন্তর তার প্লেন দমদমে নামতো।

'হেনা ওমর শিরাজিকে চিঠির কথা বলল, দু'জনে পরামর্শ করল সন্তোষবাবুকে ব্ল্যাকমেল করবে। তারা কলকাতায় এসে সোজাসুজি তাদের মতলব সন্তোষবাবুকে জানালো। হেনা এসে তাঁর বাড়িতে জাঁকিয়ে বসল। ওরা ভেবে দেখেছিল সন্তোষবাবুর বাড়িই হেনার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। সন্তোষবাবু জাঁতিকলে পড়ে গেলেন। ইচ্ছে থাকলেও হেনাকে খুন করতে পারেন না, তাহলেই ওমর শিরাজি তাঁর গুপ্তকথা ফাঁস করে দেবে। তিনি ব্ল্যাকমেলের টাকা গুণতে লাগলেন।

'মারাত্মক চিঠিগুলো হেনা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সন্তোষবাবু আবিষ্কার করতে পারেননি, তবে সন্দেহ করেছিলেন যে হেনা তাঁর বাড়িতে নিজের ঘরে চিঠিগুলো লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু

নিজের বাড়ি বলেই সেখানে তল্লাশ করবার সুবিধা নেই। হেনা সর্বদা নিজের ঘরে থাকে, কেবল সন্ধ্যেবেলা নমাজ পড়বার জন্যে একবার ছাদে যায়। তাও দোরে তালা লাগিয়ে।

'ওমর শিরাজি ইন্দো-পাক হোটেলে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল। সেই ঘরে ওদের সাক্ষী প্রমাণ যাবতীয় চিঠিপত্র ওরা লুকিয়ে রেখেছিল। বোধহয় ব্যবস্থা ছিল, সন্তোষবাবু হেনাকে হপ্তায় হপ্তায় টাকা দেবেন। কত টাকা দিতেন জানি না, সন্তোষবাবুর ব্যাঙ্কের হিসেব পরীক্ষা করলে জানা যাবে। যাহোক, টাকা নিয়ে হেনা ওমর শিরাজির অপেক্ষা করত। যথাসময়ে শিরাজি এসে মাউথ-অর্গান বাজিয়ে তাকে সঙ্কেত জানাতো, তারপর দু'জনে ইন্দো-পাক হোটেলে যেত। সেখানে হেনা শিরাজিকে টাকা দিত, শিরাজি টাকা নিয়ে পাকিস্তানে চলে যেত। এই ছিল তাদের মোটামুটি কর্মপদ্ধতি।'

বলিলাম, 'ভারতীয় টাকা নিয়ে যেত?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'টাকা নিয়ে যেত, কিংবা সোনা কিনে নিয়ে যেত, কিংবা কলকাতার কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা রেখে যেত। আমার বিশ্বাস টাকা নিয়ে যেত।'

'তারপর বলো।'

'হেনা যে সন্তোষবাবুর অনাথা বন্ধু-কন্যা নয়, সে তাঁর রক্ত-শোষণ করছে, একথা কেবল একজনই সন্দেহ করেছিল। রবিবর্মা। সে সন্তোষবাবুর সেক্রেটারি, তার ওপর ভীষণ ধূর্ত ধড়িবাজ লোক। হেনাকে সে আগে থাকতে চিনত কিনা বলা যায় না, কিন্তু কোন সময় সে হেনার পিছু নিয়ে ইন্দো-পাক হোটেলের সন্ধান পেয়েছিল, বুঝেছিল যে ৭ নম্বর ঘরে মারাত্মক দলিল আছে। সে এক গোছা চাবি যোগাড় করে তাক বুঝে ৭ নম্বর ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু দরজা খুলতে পারেনি। তার বোধহয় মতলব ছিল দলিলগুলো হস্তগত করতে পারলে সে-ই সন্তোষবাবুকে ব্ল্যাকমেল করবে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। হেনার মৃত্যুর পর সে একবার চেষ্টা করেছিল। বিকাশ তার পিছনে লেগেছিল, সে দেখে ফেলল। বিকাশ যদি তাকে ইন্দো-পাক হোটেলের ৭ নম্বর ঘরের সামনে দেখতে না পেত, তাহলে সন্তোষবাবুকে ধরা যেত না।'

আমি বলিলাম, 'একটা কথা। এমন কি হতে পারে না যে, সন্তোষবাবুই রবিবর্মাকে নিযুক্ত করেছিলেন দলিলগুলো উদ্ধার করার জন্যে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। সন্তোষবাবু এর মধ্যে থাকলে ছিঁচকে চোরের মত কাজ করতেন না। ম্যানেজারকে মোটা ঘুষ দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতেন। যাহোক, পরের কথা আগে বলব না। সন্তোষবাবু জাঁতিকলে পড়ে যন্ত্রণা ভোগ করছেন, ছ'-মাস কেটে গেছে, আরো কতদিন চলবে ঠিক নেই, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটল। একদিন সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে সন্তোষবাবু দেখলেন একটি পাকিস্তানী বিমান সমুদ্রে ডুবেছে, মৃতদের মধ্যে নাম পেলেন—ওমর শিরাজি।

'ব্যাস্, সন্তোষবাবু উদ্ধারের পথ দেখতে পেলেন। হেনা খবরের কাগজ পড়ে না, সে এখনো জানতে পারেনি ; সে খবর পাবার আগেই তাকে শেষ করতে হবে। তিনি জানতেন, হেনা রোজ সন্ধ্যেবেলা নমাজ পড়তে ছাদে যায়। বর্তমানে বাড়ি মেরামত হচ্ছে, ভারা বেয়ে বাইরে থেকে ছাদে ওঠা সহজ। তিনি ঠিক করে ফেললেন কী করে হেনাকে মারবেন। এমনভাবে মারবেন যাতে অপঘাত মৃত্যু বলে মনে হয়।

'দিনটা ছিল শনিবার। বিকেলবেলা তিনি সুকুমারীর কাছে গেলেন, সুকুমারীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের অ্যালিবাই তৈরি করলেন। আট-ঘাট বেঁধে কাজ করতে হবে।'

আমি বলিলাম, 'সুকুমারী যে আমাদের কাছে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছিল তা বুঝতে পারিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। সন্তোষবাবুর প্রতি সুকুমারীর প্রাণের টান ছিল, নইলে সে তাঁর জন্যে নিজেকে খুনের মামলায় জড়িয়ে ফেলত না। সন্তোষবাবুর মৃত্যুতে যদি কেউ দুঃখ পায় তো সে সুকুমারী।

'খিড়কির ফটক দিয়ে সন্তোষবাবু নিজের বাড়িতে প্রবেশ করলেন, ভারা বেয়ে ওপরে উঠে

গেলেন। হেনা বোধ হয় তখন মাদুর পেতে পশ্চিমদিকে মুখ করে নমাজ পড়বার উপক্রম করছিল, দেখল সন্তোষবাবু উঠে আসছেন। তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে হেনার দেরি হল না, সে ভয় পেয়ে ছাদের পুবদিকে পালাতে লাগল। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় ? আলসের কাছে আসতেই সন্তোষবাবু পিছন থেকে ছুটে এসে তাকে ধাক্কা দিলেন, সে ছাদ থেকে নীচে পড়ে গেল।

'সন্তোষবাবু ছাদের শিকল খুলে দিয়ে, যেমন এসেছিলেন তেমনি ভারা বেয়ে নেমে গেলেন। শিকল খুলে দেবার কারণ—যদিও কেউ হেনার মৃত্যুকে খুন বলে সন্দেহ করে, তাহলেও আততায়ী কোন্ দিক থেকে ছাদে উঠেছে তা অনিশ্চিত থেকে যাবে।

'সন্তোষবাবু বাড়িতে এসেছিলেন তা কেউ জানল না, তিনি কর্তব্যকর্ম সুসম্পন্ন করে সুকুমারীর কাছে ফিরে গেলেন। কিন্তু একটা কাজ বাকি ছিল।

'চিঠিগুলো নিশ্চয় হেনার ঘরে আছে। পুলিস খুঁজে পায়নি বটে, কিন্তু পরে পেতে পারে। গভীর রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তিনি চুপি চুপি নেমে এসে হেনার ঘর তল্লাশ করলেন। কিন্তু চিঠি খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি পেট্রোল ঢেলে হেনার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলেন। ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সন্তোষবাবুকে টেলিফোন করেছিল কে ?'

সে বলিল, 'কেউ না। ওটা কপোলকল্পিত। নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ফিরে গিয়ে সন্তোষবাবু নিশ্চিন্ত হতে পারেননি, হেনা যদি দৈবাৎ না মরে থাকে ! তাছাড়া চিঠিগুলো হেনার ঘর থেকে সরাতে হবে। তাই তিনি একটি অজ্ঞাত সংবাদদাতা সৃষ্টি করলেন ; সুকুমারীকে টেলিফোন সম্বন্ধে তালিম দিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন।'

'অদ্ভুত অভিনেতা কিন্তু সন্তোষবাবু।'

'হ্যাঁ। অদ্ভুত বক্তা, অদ্ভুত অভিনেতা—এরা সব এক জাতের।'

'আচ্ছা ব্যোমকেশ, সন্তোষবাবু তোমাকে পারিবারিক স্বার্থরক্ষার জন্যে নিযুক্ত করলেন কেন ? গোড়াতেই তোমাকে বিদেয় করলেন না কেন ?'

'নেংটি একটা দুষ্কার্য করে ফেলেছিল, আমাকে ডেকেছিল। আমাকে বিদেয় করে দিলে তাঁর ওপর সকলের সন্দেহ হত, তাই তিনি সাধু সেজে আমাকে তাঁর পারিবারিক স্বার্থরক্ষার জন্যে নিযুক্ত করলেন। পরে অবশ্য ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তি।'

'তুমি কখন ওঁকে সন্দেহ করলে ?'

'ঘরে আগুন লাগার খবর পেয়ে বুঝলাম কোনো দাহ্য পদার্থ পুড়িয়ে দেবার জন্যেই ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। কি রকম দাহ্য পদার্থ ? নিশ্চয় এমন কোনো দাহ্য পদার্থ, যা সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বভাবতই দলিলের কথা মনে আসে। কি রকম দলিল ? যার সাহায্যে ব্ল্যাকমেল করা যায়। তাহলে হেনা কাউকে ব্ল্যাকমেল করছিল ? কাকে ব্ল্যাকমেল করছিল ? যুগল আর উদয়কে বাদ দেওয়া যায় ; বাকি রইল রবিবর্মা এবং সন্তোষবাবু। কিন্তু রবিবর্মা সামান্য লোক, তাকে ব্ল্যাকমেল করে বেশি টাকা আদায় করা যায় না। অপর পক্ষে সন্তোষবাবু বড়লোক, তাঁর পূর্ববঙ্গে নিত্য যাতায়াত, হেনাকে তিনি নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন। পুলিসের শৈথিল্যের পিছনেও হয়তো তাঁর প্রভাব কাজ করছে। আমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে কটকে পাঠানোর চেষ্টার পিছনেও তিনি আছেন। সুতরাং তিনিই সব দিক দিয়ে যোগ্য পাত্র।—ভাল কথা কাল সকালে কটকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে, জানা দরকার তারা এখনো আমাকে চায় কিনা।'

'বেশ। সন্তোষবাবুর চিঠিগুলো কি করবে ?'

'পুড়িয়ে ফেলব। ও চিঠির কাজ শেষ হয়েছে। সন্তোষবাবু প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, তাঁর সুনাম নষ্ট করে কারুর লাভ নেই। মগ্নমৈনাক মগ্নই থাক।'

বাসায় ফিরিয়া দেখি নেংটি বসিয়া আছে। সত্যবতীর নিকট হইতে চা ও সিগারেট সংগ্রহ করিয়া পরম আরামে সেবন করিতেছে। সে সন্তোষবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পায় নাই। ব্যোমকেশকে দেখিয়া ভ্রূ তুলিয়া ব্যগ্রভরে বলিল, "কী, এখনো হেনার খুনীকে ধরতে পারলেন না!'

ব্যোমকেশ বিরক্ত স্বরে বলিল, 'পেরেছি। তুমি এখানে কি করছ?'

নেংটি সচকিত অবিশ্বাসের স্বরে বলিয়া উঠিল, 'পেরেছেন!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। তুমি পেরেছ নাকি!'

নেংটি আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আমি— আমি তো গোড়া থেকেই জানি।'

'গোড়া থেকেই জানো! কি করে জানলে? বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছ? আততায়ীর নাম বল তো শুনি?'

নেংটি স্খলিত স্বরে বলিল, 'মেসোমশাই।'

ব্যোমকেশ ক্ষণকাল অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'তুমি জানো! কি করে জানলে?'

নেংটি দ্রুত বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, 'আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি, ব্যোমকেশদা। আমি বাড়ির পিছন দিকের পাইনগাছে উঠে সিগারেট খাচ্ছিলাম। এমন সময় হেনা ছাদে এল, মাদুরটা পেতে বসতে যাবে, হঠাৎ মেসোমশাই পশ্চিমদিকের ভারা বেয়ে উঠে এলেন। তাঁকে দেখেই হেনা দৌড়ে পুবদিকে গেল, তিনিও তার পিছনে ছুটলেন, তাকে ঠেলা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দিলেন।'

ব্যোমকেশ কঠোর চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'তুমি এতদিন একথা বলনি কেন?'

নেংটি কাতর স্বরে বলিল, 'কি করে বলি, ব্যোমকেশদা। উনি আমাদের অন্নদাতা, ওঁকে পুলিসে ধরিয়ে দেব কি বলে? তবু আপনাকে খবর দিয়েছিলাম, জানতাম, কেউ যদি অপরাধীকে ধরতে পারে তো সে আপনি।'

ব্যোমকেশের মুখ নরম হইল, সে নেংটির কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, 'নেংটি, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। সন্তোষবাবু মারা গেছেন।'

দুষ্টচক্র

ডাক্তার সুরেশ রক্ষিত বলিলেন, 'আপনাকে একবার যেতেই হবে, ব্যোমকেশবাবু। রোগীর যেরকম অবস্থা, আপনি গিয়ে আশ্বাস না দিলে বাঁচানো শক্ত হবে।'

ডাক্তার সুরেশ রক্ষিতের বয়স চল্লিশের আশেপাশে, একটু রোগা শুষ্ক গোছের চেহারা, দামী এবং নূতন বিলাতি পোশাক তাঁহার গায়ে যেন মানায় নাই। কিন্তু ভাবভঙ্গী বেশ চটপটে এবং বুদ্ধিমানের মত। আজ সকালে তিনি ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন এবং এক বিচিত্র প্রস্তাব করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশের রোগী দেখিতে যাইবার ইচ্ছা নাই। সে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে ডাক্তার রক্ষিতের দিকে চাহিয়া বলিল, 'রোগটা কী?'

ডাক্তার বলিলেন, 'প্যারালিসিস— মানে পক্ষাঘাত। প্রায় তিন মাস আগে অ্যাটাক হয়েছিল। প্রথম ধাক্কাটা সামলে গেছেন, কিন্তু রক্তচাপ খুব বেশি। মাথাটা অবশ্য পরিষ্কার আছে। আমাকে পাঠালেন, আপনি যদি দয়া করে একবার আসেন। মনে ভরসা পেলে হয়তো বেঁচে যেতে পারেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি চিকিৎসা করছেন?'

ডাক্তার বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাঁর বাড়ির একতলার ভাড়াটে। এবং গৃহ-চিকিৎসকও। লোকটি মহা ধনী, সুদের কারবার করেন। বিশু পালের নাম হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি নাম বললেন— শিশুপাল?'

ডাক্তার হাসিলেন, 'বিশু পাল। তবে কেউ কেউ শিশুপালও বলে। কেন বলে জানি না, লোকটি সুদখোর মহাজন বটে কিন্তু অর্থ-পিশাচ নয়। বিশেষত গত তিন মাস শয্যাশায়ী থেকে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমি তো আর ডাক্তার নই।'

ডাক্তার কহিলেন, 'তবে আসল কথা বলি। বিশু পালের এক খাতক আছে, নাম অভয় ঘোষাল। লোকটা ভয়ঙ্কর পাজি। বিপদে পড়ে বিশু পালের কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিয়েছিল, এখন আর শোধ দিচ্ছে না। বিশু পাল জোর তাগাদা লাগিয়েছিলেন, তাইতে অভয় ঘোষাল নাকি ভয় দেখিয়েছে, টাকা চাইলে তাঁকে খুন করবে। তারপরই বিশু পালের স্ট্রোক হয়, সেই থেকে তিন মাস বিছানায় পড়ে আছেন। অবশ্য প্রাণের আশঙ্কা নেই, সাবধানে চিকিৎসা করলে হয়তো আবার চলে ফিরে বেড়াতে পারবেন। কিন্তু আসল কথা তা নয়, ওঁর প্রাণে ভয় ঢুকেছে অভয় ঘোষাল ওঁকে খুন করবেই, তিনি যদি টাকা ছেড়েও দেন তবু খুন করবে। —আপনাকে চিকিৎসা করতে হবে না, বিশু পালের ইচ্ছে আপনার কাছে তাঁর হৃদয়-ভার লাঘব করেন; আপনি যদি কিছু উপদেশ দেন তাও তাঁর কাজে লাগতে পারে।'

ব্যোমকেশ একটু বিমনা থাকিয়া বলিল, 'কেউ যদি শিশুপাল বধের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে তাকে ঠেকিয়ে রাখা শিবের অসাধ্য। যাহোক, ভদ্রলোক যখন আমার সঙ্গলাভের জন্যে

এত ব্যাকুল হয়েছেন তখন আমি যাব। ইহলোকেই হোক আর পরলোকেই হোক, মহাজনদের হাতে রাখা ভালো। কি বল, অজিত ?'

আমি বলিলাম, 'তা তো বটেই।'

ডাক্তার রক্ষিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাসিমুখে বলিলেন, 'ধন্যবাদ। এই নিন আমাদের ঠিকানা। কখন আসবেন ?' তিনি একটি কার্ড বাহির করিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিলেন।

ব্যোমকেশ কার্ডটি দেখিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। দেখিলাম বিশু পালের বাসস্থান বেশি দূর নয়, আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা গলির মধ্যে। ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ বিকেলবেলা পাঁচটা নাগাদ যাব।—আচ্ছা, আসুন।'

ডাক্তার প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীকে সান্ত্বনা দেবার কাজ আমার এই প্রথম।'

গলিটি বিসর্পিল ; নানা ভঙ্গীতে আঁকিয়া বাঁকিয়া পার্বত্য নদীর মত চলিয়াছে। দুই পাশে তিনতলা চারতলা বাড়ি। গলি যতই সরু হোক, দেখিয়াছি বাড়ি কখনও ছোট হয় না, আড়ে বাড়িবার জায়গা না পাইয়া দীঘে বাড়ে।

একটি তেতলা বাড়ির দ্বারপার্শ্বে ডাক্তার সুরেশ রক্ষিতের শিলালিপি দেখিয়া বুঝিলাম এই বিশু পালের বাড়ি। ডাক্তার রক্ষিত জানালা দিয়া আমাদের দেখিতে পাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন, বলিলেন, 'আসুন।'

বাড়িটি পুরানো ধরনের ; এক পাশে সুড়ঙ্গের মত সঙ্কীর্ণ বারান্দা ভিতর দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহার এক পাশে দ্বার, অন্য পাশে দু'টি জানালা। দ্বার দিয়া ডাক্তারখানা দেখা যাইতেছে ; তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে একটি ঘর। কিন্তু রোগীর ভিড় নাই। একজন মধ্যবয়স্ক কম্পাউন্ডার দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার রক্ষিত আমাদের ডাক্তারখানায় লইয়া গেলেন না, বলিলেন, 'সিঁড়ি ভাঙতে হবে। বিশুবাবু তিনতলায় থাকেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ তো। আপনি কি এই বাড়িতেই থাকেন ? না কেবলই ডাক্তারখানা ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'তিনটে ঘর আছে। দুটোতে ডাক্তারখানা করেছি, একটাতে থাকি। একলা মানুষ, অসুবিধা হয় না।'

দোতলাতেও তিনটি ঘর। ঘর তিনটিতে অফিস বসিয়াছে। টেবিল চেয়ারের অফিস নয়, মাড়োয়ারীদের মত গদি পাতিয়া অফিস। অনেকগুলি কেরানি বসিয়া কলম পিষিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা কি ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'বিশুবাবুর গদি। মস্ত কারবার, অনেক রাজা-রাজড়ার টিকি বাঁধা আছে ওঁর কাছে।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, বিশু পাল শুধু শিশুপালই নয়, জরাসন্ধও বটে।

তেতলার সিঁড়ির মাথায় একটি গুর্খা রণসাজে সজ্জিত হইয়া গাদা-বন্দুক হস্তে টুলের উপর বসিয়া আছে ; পদশব্দ শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমাদের পানে তির্যক নেত্রপাত করিল। ডাক্তার বলিলেন, 'ঠিক হ্যায়।' তখন গুর্খা স্যালুট করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

বারান্দা দিয়া কয়েক পা যাইবার পর একটি বন্ধ দ্বার। ডাক্তার দ্বারে টোকা দিলেন। ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন আসিল, 'কে ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'আমি ডাক্তার রক্ষিত। দোর খুলুন।'

দরজা একটু ফাঁক হইল। একটি প্রৌঢ়া সধবা মহিলার শীর্ণ মুখ ও আতঙ্কভরা চক্ষু দেখিতে পাইলাম। তিনি একে একে আমাদের তিনজনের মুখ দেখিয়া বোধহয় আশ্বস্ত হইলেন, দ্বার পুরাপুরি খুলিয়া গেল। আমরা একটি ছায়াচ্ছন্ন ঘরে প্রবেশ করিলাম।

পুরুষ কণ্ঠে শব্দ হইল, 'আলোটা জ্বেলে দাও গিন্নি।'

মহিলাটি সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিলেন, তারপর মাথায় আঁচল টানিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

এইবার ঘরটি স্পষ্টভাবে দেখিলাম। মধ্যমাকৃতি ঘর, মাঝখানে একটি খাট। খাটের উপর প্রেতাকৃতি একটি মানুষ গায়ে বালাপোশ জড়াইয়া শুইয়া আছে। খাটের পাশে একটি ছোট টেবিলের উপর ওষুধের শিশি জলের গেলাস প্রভৃতি রাখা আছে। ঘরে অন্যান্য আসবাব যাহা আছে তাহা দেখিয়া নার্সিং হোমে রোগীর কক্ষ স্মরণ হইয়া যায়।

প্রেতাকৃতি লোকটি অবশ্য বিশু পাল। জীর্ণগলিত মুখে নিষ্প্রভ দু'টি চক্ষু মেলিয়া তিনি আমাদের পানে চাহিয়া আছেন। মাথার চুল পাঁশুটে সাদা, সম্মুখের দাঁতের অভাবে অধরোষ্ঠ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছে। বয়স পঞ্চাশ কিম্বা ষাট কিম্বা সত্তর পর্যন্ত হইতে পারে। তিনি স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু এসেছেন? আমার কী সৌভাগ্য। আসতে আজ্ঞা হোক।'

আমরা খাটের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। বিশু পাল কম্পিত হস্ত জোড় করিয়া বলিলেন, 'আপনাদের বড় কষ্ট দিয়েছি। আমারই যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দেখছেন তো আমার অবস্থা—'

ডাক্তার বলিলেন, 'আপনি বেশি কথা বলবেন না।'

বিশু পাল কাতর কণ্ঠে বলিলেন, 'বেশি কথা না বললে চলবে কি করে ডাক্তার? ব্যোমকেশবাবুকে সব কথা বলতে হবে না?'

'তবে যা বলবেন চটপট বলে নিন।' ডাক্তার টেবিল হইতে একটি শিশি লইয়া খানিকটা তরল ঔষধ গেলাসে ঢালিলেন, তাহাতে একটু জল মিশাইয়া বিশু পালের দিকে বাড়াইয়া দিলেন, বলিলেন, 'এই নিন, এটা আগে খেয়ে ফেলুন।'

বিশু পাল রুগ্ন বিরক্তিভরা মুখে ঔষধ গলাধঃকরণ করিলেন।

অতঃপর অপেক্ষাকৃত সহজ স্বরে তিনি বলিলেন, 'ডাক্তার, এঁদের বসবার চেয়ার দাও।'

ডাক্তার দু'টি চেয়ার খাটের পাশে টানিয়া আনিলেন, আমরা বসিলাম। বিশু পাল ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'বেশি কথা বলব না, ডাক্তার রাগ করবে। সাঁটে বলছি। আমার তেজারতি কারবার আছে, নিশ্চয় শুনেছেন। প্রায় পঁচিশ বছরের কারবার, বিশ লক্ষ টাকা খাটছে। অনেক বড় বড় খাতক আছে।

'আমি কখনো জামিন জামানত না রেখে টাকা ধার দিই না। কিন্তু বছর দুই আগে আমার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, তার ফল এখন ভুগছি। বিনা জামিনে ত্রিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলাম।

'অভয় ঘোষালকে আপনি চেনেন না। আমি তার বাপকে চিনতাম, মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন অধর ঘোষাল। অনেক বিষয়-সম্পত্তি করেছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর কিছু কাজ-কারবারও হয়েছিল। তাই তাঁকে চিনতাম; সত্যিকার সজ্জন।

'বছর দশেক আগে অধর ঘোষাল মারা গেলেন, তাঁর একমাত্র ছেলে অভয় ঘোষাল বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে বসল।

'অভয়কে আমি তখনো দেখিনি। বাপ মারা যাবার পর তার সম্বন্ধে দু'-একটা গল্পগুজব কানে আসত। ভাবতাম পৈতৃক সম্পত্তি হাতে পেলে সব ছেলেই গোড়ায় একটু উচ্ছৃঙ্খলতা করে, কালে শুধরে যাবে। এমন তো কতই দেখা যায়।

'আজ থেকে বছর দুই আগের ব্যাপার। অভয় ঘোষালের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছি, হঠাৎ একদিন সে এসে উপস্থিত। তাকে দেখে, তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কার্তিকের মত চেহারা, মুখে মধু ঝরে পড়ছে। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, তার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন, তাই সে বিপদে পড়ে আগে আমার কাছেই এসেছে। বড় বিপদ তার, শত্রুরা তাকে মিথ্যে খুনের মামলায় ফাঁসিয়েছে। কোনো মতে জামিন পেয়ে সে আমার কাছে ছুটে এসেছে, মামলা চালাবার জন্যে তার ত্রিশ হাজার টাকা চাই।

'বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি বিশু পাল বিনা জামানতে শুধু হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নিয়ে তাকে

ত্রিশ হাজার টাকা দিলাম। ছোঁড়া আমাকে গুণ করেছিল, মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল।

'যথাসময়ে আদালতে খুনের মামলা আরম্ভ হল। খবরের কাগজে বয়ান বেরুতে লাগল ; সে এক মহাভারত। এমন দুষ্কর্ম নেই যা অভয় ঘোষাল করেনি, পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি প্রায় সবই উড়িয়ে দিয়েছে। কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে তার হিসেব নেই। একটি বিবাহিতা যুবতীকে ফুসলে নিয়ে এসেছিল, তারপর বছরখানেক পরে তাকে বিষ খাইয়ে খুন করেছে। তাইতে মোকদ্দমা। আমি একদিন এজলাসে দেখতে গিয়েছিলাম ; কাঠগড়ায় অভয় ঘোষাল বসে আছে, যেন কোণ-ঠাসা বন-বেরাল ! দেখলেই ভয় করে। ও বাবা, এ কাকে টাকা ধার দিয়েছি !

'কিন্তু মোকদ্দমা টিকলো না, আইনের ফাঁকিতে অভয় ঘোষাল রেহাই পেয়ে গেল। একেবারে বেকসুর খালাস। তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণ হল না।

'তারপর আরো বছরখানেক কেটে গেল। আমি অভয় ঘোষালের ওপর নজর রেখেছিলাম, খবর পেলাম সে তার বসত-বাড়ি বিক্রি করবার চেষ্টা করছে। এইটে তার শেষ স্থাবর সম্পত্তি, এটা যদি সে বিক্রি করে দেয়, তাহলে তাকে ধরবার আর কিছু থাকবে না, আমার টাকা মারা যাবে।

'টাকার তাগাদা আরম্ভ করলাম। প্রথমে অফিস থেকে চিঠি দিলাম, কোন জবাব নেই। বার তিনেক চিঠি দিয়েও যখন সাড়া পেলাম না, তখন আমি নিজেই একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমরা মহাজনেরা দরকার হলে বেশ আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতে পারি, ভাবলাম মামলা রুজু করবার আগে তাকে কথা শুনিয়ে আসি, তাতে যদি কাজ হয়। সে আজ তিন মাস আগেকার কথা।

'একটা গুর্খাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম তার বাড়িতে। সামনের ঘরে একটা চেয়ারে অভয় ঘোষাল একলা বসে ছিল। আমাকে দেখে সে চেয়ার থেকে উঠল না, কথা কইল না, কেবল আমার মুখের পানে চেয়ে রইল।

'কাজের সময় কাজী কাজ ফুরোলে পাজি। গালাগালি দিতে এসেছিলাম, তার ওপর রাগ হয়ে গেল। আমি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করলাম। তারপর হঠাৎ নজর পড়ল তার চোখের ওপর। ওরে বাবা, সে কী ভয়ঙ্কর চোখ। লোকটা কথা কইছে না, কিন্তু তার চোখ দেখে বোঝা যায় যে সে আমাকে খুন করবে। যে-লোক একবার খুন করে বেঁচে গেছে, তার তো আশকারা বেড়ে গেছে। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল।

'আর সেখানে দাঁড়ালাম না, ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরল, কিছুতেই কাঁপুনি থামে না। তখন ডাক্তারকে ডেকে পাঠালাম। ডাক্তার এসে কোনো মতে ওষুধ দিয়ে কাঁপুনি থামালো। তখনকার মত সামলে গেলাম বটে, কিন্তু শেষ রাত্রির দিকে আবার কাঁপুনি শুরু হল। তখন বড় ডাক্তার ডাকানো হল ; তিনি এসে দেখলেন স্ট্রোক হয়েছে, দুটো পা অসাড় হয়ে গেছে।

'তারপর থেকে বিছানায় পড়ে আছি। কিন্তু প্রাণে শান্তি নেই। ডাক্তারেরা ভরসা দিয়েছেন রোগে মরব না, তবু মৃত্যুভয় যাচ্ছে না। অভয় ঘোষাল আমাকে ছাড়বে না। আমি বাড়ি থেকে বেরুই না, দোরের সামনে গুর্খা বসিয়েছি, তবু ভরসা পাচ্ছি না।— এখন বলুন ব্যোমকেশবাবু, আমার কি উপায় হবে।'

বিবরণ শেষ করিয়া বিশু পাল অর্ধমৃত অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। ডাক্তার একবার তাঁহার কব্জি টিপিয়া নাড়ি দেখিলেন, কিন্তু ঔষধ দিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ব্যোমকেশ গভীর ভ্রূকুটি করিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল।

এই সময় বিশু পালের স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করিলেন। মাথায় আধ-ঘোমটা, দুই হাতে দু'-পেয়ালা চা। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি আমাদের হাতে চায়ের পেয়ালা দিয়া স্বামীর প্রতি ব্যগ্র উৎকণ্ঠার দৃষ্টি হানিয়া প্রস্থান করিলেন। নীরব প্রকৃতির মহিলা, কথাবার্তা বলেন না।

আমরা আবার বসিলাম। দেখিলাম বিশু পাল সপ্রশ্ন নেত্রে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া

আছেন।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় ক্ষুদ্র একটি চুমুক দিয়া বলিল, 'আপনি যথাসাধ্য সাবধান হয়েছেন, আর কি করবার আছে। খাবারের ব্যবস্থা কি রকম ?'

বিশু পাল বলিলেন, 'একটা বামুন ছিল তাকে বিদেয় করে দিয়েছি। গিন্নি রাঁধেন। বাজার থেকে কোনো খাবার আসে না।'

'চাকর-বাকর ?'

'একটা ঝি আর একটা চাকর ছিল, তাদের তাড়িয়েছি। সিঁড়ির মুখে গুর্খা বসিয়েছি। আর কি করব বলুন।'

'ব্যবসার কাজকর্ম চলছে কি করে ?'

'সেরেস্তাদার কাজ চালায়। নেহাৎ দরকার হলে ওপরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে যায়। কিন্তু তাকেও ঘরে ঢুকতে দিই না, দোরের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলে যায়। বাইরের লোক ঘরে আসে কেবল ডাক্তার।'

চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল, 'যা-যা করা দরকার সবই আপনি করেছেন, আর কী করা যেতে পারে ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু সত্যিই কি অভয় ঘোষাল আপনাকে খুন করতে চায় ?'

বিশু পাল উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন, ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ ব্যোমকেশবাবু, আমার অন্তরাত্মা বুঝেছে ও আমাকে খুন করতে চায়। নইলে এত ভয় পাব কেন বলুন! কলকাতা শহর তো মগের মুল্লুক নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে ?'

বিশু পাল বলিলেন, 'সেই তো ভাবনা, এভাবে কতদিন চলবে। তাই তো আপনার শরণ নিয়েছি, ব্যোমকেশবাবু। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভেবে দেখব। যদি কিছু মনে আসে, আপনাকে জানাব। —আচ্ছা, চলি।'

বিশু পাল বলিলেন, 'ডাক্তার।'

ডাক্তার রক্ষিত অমনি পকেট হইতে একটি একশো টাকার নোট বাহির করিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে ধরিলেন। ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'এটা কি ?'

বিশু পাল বিছানা হইতে বলিলেন, 'আপনার মর্যাদা। আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, অনেক সময় নষ্ট করেছি।'

'কিন্তু এ রকম তো কোনো কথা ছিল না।'

'তা হোক। আপনাকে নিতে হবে।'

অনিচ্ছাভরে ব্যোমকেশ টাকা লইল। তারপর ডাক্তার আমাদের নীচে লইয়া চলিলেন।

সিঁড়ির মুখে গুর্খা স্যালুট করিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'এই লোকটা সারাক্ষণ পাহারা দেয় ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'না, ওরা দু'জন আছে। পুরোনো লোক, আগে দোতলায় পাহারা দিত। একজন বেলা দশটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত থাকে, দ্বিতীয় ব্যক্তি রাত্রি দশটা থেকে বেলা আটটা পর্যন্ত পাহারা দেয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সকালে দু'-ঘণ্টা এবং রাত্রে দু'-ঘণ্টা পাহারা থাকে না ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'না, সে-সময় আমি থাকি।'

দ্বিতলে নামিয়া দেখিলাম দপ্তর বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কেরানিরা দ্বারে তালা লাগাইয়া বাড়ি গিয়াছে।

নীচের তলায় নামিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকে দু'-একটা প্রশ্ন করতে চাই, ডাক্তারবাবু।'

'বেশ তো, আসুন আমার ডিসপেন্সারিতে।'

আমরা সামনের ঘরে প্রবেশ করিলাম। এটি রোগীদের ওয়েটিং রুম, নূতন টেবিল চেয়ার বেঞ্চি ইত্যাদিতে সাজানো গোছানো। কম্পাউন্ডার পাশের দিকের একটি বেঞ্চিতে এক হাঁটু তুলিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল, আমাদের দেখিয়া পাশের ঘরে উঠিয়া গেল। ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, 'খাসা ডাক্তারখানা সাজিয়েছেন।'

ডাক্তার শুষ্ক স্বরে বলিলেন, 'সাজিয়ে রাখতে হয় : জানেন তো, ভেক না হলে ভিখ্ মেলে না।'

'কতদিনের প্র্যাকটিস আপনার ?'

'এখানে বছর তিনেক আছি, তার আগে মফঃস্বলে ছিলাম।'

'ভালই চলছে মনে হয়— কেমন ?'

'মন্দ নয়— চলছে টুকটাক করে। দু'-চারটে বাঁধা ঘর আছে। সম্প্রতি পসার কিছু বেড়েছে। বিশুবাবুকে যদি সারিয়ে তুলতে পারি—'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, 'হ্যাঁ।— আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বিশু পালের এই যে মৃত্যুভয়, এটা কি ওঁর মনের রোগ ? না সত্যিই ভয়ের কারণ আছে ?'

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ভয়ের কারণ আছে। অবশ্য যাদের অনেক টাকা তাদের মৃত্যুভয় বেশি হয়। কিন্তু বিশু পালের ভয় অমূলক নয়। অভয় ঘোষাল লোকটা সত্যিকার খুনী। আমি শুনেছি ও গোটা তিনেক খুন করেছে। এমন কি ও নিজের বাপকে বিষ খাইয়েছিল কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই নাকি ! ভারি গুণধর ছেলে তো। এখন মনে পড়ছে বছর দুই আগে ওর মামলার বয়ান খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। ওর ঠিকানা আপনি জানেন নাকি ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'জানি। এই তো কাছেই, বড়জোর মাইলখানেক। যদি দেখা করতে চান ঠিকানা দিচ্ছি।'

এক টুকরা কাগজে ঠিকানা লিখিয়া ডাক্তার ব্যোমকেশকে দিলেন, সে সেটি মুড়িয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিল, 'আর একটা কথা। বিশুবাবুর স্ত্রীর কি কোনো রোগ আছে ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'স্নায়ুর রোগ। স্নায়বিক প্রকৃতির মহিলা, তার ওপর ছেলেপুলে হয়নি—'

'বুঝেছি।— আচ্ছা, চললাম। বিশুবাবু একশো টাকা দিয়ে আমাকে দায়ে ফেলেছেন। তাঁর সমস্যাটা ভেবে দেখব।'

বাহিরে তখন রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'সাড়ে ছ'টা। চল, খুনি আসামী দর্শন করে যাওয়া যাক। বিশু পাল যখন টাকা দিয়েছেন, তখন কিছু তো করা দরকার।'

মোড়ের মাথায় একটা রিক্‌শা পাওয়া গেল, তাহাতে চড়িয়া আমরা উত্তর দিকে চলিলাম। লক্ষ্য করিয়াছি, আমহার্স্ট স্ট্রীটে লোক চলাচল অপেক্ষাকৃত কম ; আশেপাশে সামনে পিছনে যখন জোয়ারের সমুদ্রের মত জনস্রোত ছুটিয়াছে, তখনও আমহার্স্ট স্ট্রীটে লোক চলাচল অপেক্ষাকৃত কম ; আমহার্স্ট স্ট্রীট সমুদ্রের সমান্তরাল সঙ্কীর্ণ খালের মত নিস্তরঙ্গ পড়িয়া আছে।

রাস্তায় উত্তর প্রান্তে আসিয়া একটি নম্বরের সামনে রিক্‌শা থামিল, আমরা নামিলাম। ব্যোমকেশ নম্বর মিলাইয়া বলিল, 'এই বাড়ি।'

বাড়িটি ঠিক ফুটপাথের ধারে নয়, মাঝখানে একটু খোলা জমি আছে, তাহাতে কাঁঠালি চাঁপার ঝাড় বাড়িটিকে রাস্তা হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দ্বিতল বাড়ির উপরতলা অন্ধকার, নীচের একটা জানালা দিয়া পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া ঝিকিমিকি আলো আসিতেছে।

আমরা ছোট ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

সামনের ঘর টেবিল চেয়ার দিয়া সাজানো, যেন অফিস ঘর। একটি লোক চেয়ারে বসিয়া অলসভাবে পেন্সিল দিয়া কাগজের উপর হিজিবিজি কাটিতেছে। আমরা দ্বারের কাছে আসিলে

সে চোখ তুলিয়া চাহিল।

সুপুরুষ বটে। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, টক্‌টকে রঙ, কোঁকড়া চুলের মাঝখানে সিঁথি, নাক চোখ যেন তুলি দিয়া আঁকা। আমিও বিশু পালের মত মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

ব্যোমকেশ দ্বারের নিকট হইতে বলিল, 'আসতে পারি? আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী, ইনি অজিত বন্দ্যো।'

অভয় ঘোষালের চোখের দৃষ্টি সতর্ক। তারপর সে অধর প্রান্তে একটি মুকুলিত হাসি ফুটাইয়া বলিল, 'সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী! কী সৌভাগ্য। আসুন।'

আমরা গিয়া অভয় ঘোষালের মুখোমুখি বসিলাম। সে পেন্সিল নামাইয়া রাখিয়া বলিল, 'কি ব্যাপার বলুন দেখি। সম্প্রতি কোনো কু-কার্য করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'আপনাকে দেখতে এলাম।'

অভয় ঘোষাল বলিল, 'ধন্যবাদ! আমি তাহলে একটি দর্শনীয় জীব। আপনি নিজের ইচ্ছেয় এসেছেন, না কেউ পাঠিয়েছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাঠায়নি কেউ। কিন্তু মহাজন বিশু পাল তাঁর দুঃখের কথা আমাকে শোনালেন, তাই ভাবলাম আপনাকে দর্শন করে যাই।'

'ও— শিশুপাল।' অভয় ঘোষাল ক্ষণেক থামিয়া বলিল, 'আপনাকে কেউ পাঠিয়েছে বুঝেছিলাম, কিন্তু শিশুপালের কথা মনে আসেনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'জানেন বোধ হয়, বিশু পালের পক্ষাঘাত হয়েছে।'

অভয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, 'তাই নাকি; আমি জানতাম না। মাস তিনেক আগে শিশুপাল আমার বাড়িতে এসেছিল, আমাকে চৌদ্দ-পুরুষান্ত করে গেল। ভগবান আছেন।' তাহার মুখে বা কণ্ঠস্বরে কোনো উষ্মা প্রকাশ পাইল না। পেন্সিলটা তুলিয়া লইয়া সে আবার কাগজে হিজিবিজি কাটিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখান থেকে ফিরে গিয়েই তাঁর স্ট্রোক হয়েছিল। সেই থেকে তিনি নিজের বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন। অবশ্য পক্ষাঘাতই তাঁর বাড়িতে আবদ্ধ থাকার একমাত্র কারণ নয়। আপনার ভয়ে তিনি বাড়ি থেকে বের হন না।'

'আমার ভয়ে— বলেন কি! আমি খাতক, সে মহাজন, আমারই তার ভয়ে লুকিয়ে থাকার কথা।' অভয় ঘোষাল ভ্রূ তুলিয়া পরম বিস্ময়ভরে কথাগুলি বলিল, কিন্তু তাহার অধর-প্রান্তে হাসি লাগিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাঁর ভয় হয়েছে আপনি তাঁকে খুন করবেন।'

'এই দেখুন। যত দোষ নন্দ ঘোষ! আমি একটিবার খুনের মামলায় ফেঁসে গিয়েছিলাম, অমনি সবাই ভেবে নিলে আমি খুনী আসামী। আমি যে বেকসুর খালাস পেয়েছি সেটা কেউ ভাবল না।' অভয় ঘোষাল একটু থামিয়া অপেক্ষাকৃত মন্থর কণ্ঠে বলিল, 'তবে একটা কথা সত্যি। আমার কোষ্ঠীর ফল— যারা আমার শত্রুতা করে তারা বেশি দিন বাঁচে না। — উঠছেন নাকি?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'হ্যাঁ। আপনাকে দেখতে এসেছিলাম, দেখা হয়েছে। এবার যাওয়া যাক। —একটা কথা বলে যাই। বিশু পালের যদি অপঘাতে মৃত্যু হয় আমি খুব দুঃখিত হব। এবং আপনিও শেষ পর্যন্ত দুঃখিত হবেন।'

অভয় ঘোষালের মুখে হঠাৎ পরিবর্তন হইল। মুখের হাসি মুছিয়া গিয়া চোখে একটা নৃশংস হিংস্রতা ফুটিয়া উঠিল। সে নির্নিমেষ সর্প-চক্ষু মেলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল।

আমার বুকের একটা স্পন্দন থামিয়া গিয়া আবার সবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। এই দৃষ্টি বিশু পালকে ভয়ে দিশাহারা করিয়াছিল। চোখের দৃষ্টিতে মৃত্যুর শপথ এত স্পষ্টভাবে আর কাহারো চোখে দেখি নাই।

ব্যোমকেশ তাহার প্রতি একটি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'চল অজিত।'

ফুটপাথে পৌঁছিয়া দেখিলাম, রাস্তায় পরপারে একটা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া আছে। ড্রাইভারকে ডাকিবার জন্য হাত তুলিয়াছি, ট্যাক্সিটা চলিতে আরম্ভ করিল, দ্রুত বেগ সংগ্রহ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি ব্যোমকেশের পানে চাহিলাম। সে বিলীয়মান ট্যাক্সির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'ভেতরে কেউ ছিল?'

বলিলাম, 'দেখিনি। ড্রাইভারটা কিন্তু আমাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল, তাই ভেবেছিলাম খালি ট্যাক্সি। হয়তো পিছনের সিটে কেউ ছিল।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ চলিতে আরম্ভ করিল, 'কেউ বোধ হয় আমাদের পিছু নিয়েছিল।'

'কে পিছু নিতে পারে?'

'ডাক্তার রক্ষিত ছাড়া আর তো কেউ জানে না যে আমরা এখানে এসেছি।'

'কিন্তু কেন? কী উদ্দেশ্য?'

'তা জানি না। অবশ্য সমাপতনও হতে পারে। ট্যাক্সিতে আমাদের অজানা আরোহী ছিল, কোনো কারণে ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল, তারপর চলে গেল।'

রাত্রি সাড়ে সাতটা। আমরা পদব্রজে বাসার দিকে চলিলাম। মনে কিন্তু একটা ধোঁকা লাগিয়া রহিল।

পরদিন সকালে খবরের কাগজ খুলিয়াই বলিয়া উঠিলাম, 'ওহে—!'

ব্যোমকেশ চকিতে আমার দিকে ঘাড় ফিরাইল, 'কী! বিশু পাল খুন হয়েছে?'

বলিলাম, 'বিশু পাল নয়—অভয় ঘোষাল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বোকার মত আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর কাগজখানা আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

সংবাদপত্রের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত। গত রাত্রে আমহার্স্ট স্ট্রীট নিবাসী অভয় ঘোষাল নামক এক ধনী ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় শয্যায় খুন হইয়াছেন। পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছে; কে খুন করিয়াছে তাহা এখনো জানা যায় নাই। দুই বৎসর পূর্বে অভয় ঘোষাল খুনের অভিযোগে আসামী হইয়া বেকসুর খালাস হইয়াছিলেন।—

মনটা অন্য প্রকার সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত ছিল, তাই অনেকক্ষণ বিমূঢ় রহিলাম। কাল রাত্রি সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আমরা তাহাকে দেখিয়াছি, সে হাসিমুখে পরম স্বচ্ছন্দভাবে ব্যোমকেশের সহিত প্রচ্ছন্ন বাক্‌যুদ্ধ করিয়াছে। তারপর কী হইল? সে ব্যঙ্গভরে বলিয়াছিল, তাহার অনেক 'বন্ধু' আছে। ট্যাক্সিতে তবে কি তাহার 'বন্ধু' ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, আমরা চলিয়া যাইবার পর ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে খুন করিয়াছে? কিম্বা ট্যাক্সির লোকটি ডাক্তার রক্ষিত? কিন্তু ডাক্তার রক্ষিত তাহাকে খুন করিতে যাইবে কেন?

বেশি জল্পনা-কল্পনা করিবার আগেই দারোগা রমাপতিবাবু উপস্থিত হইলেন।

রমাপতিবাবুর সহিত কর্ম সম্পর্কে আমাদের ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও অল্প পরিচয় ছিল। কাজের লোক বলিয়া পুলিস বিভাগে তাঁহার সুনাম আছে। আমাদেরই সমবয়স্ক ব্যক্তি; মজবুত চেহারা, অমায়িক বাচনভঙ্গী, চোখের দৃষ্টি মর্মভেদী।

ব্যোমকেশ সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইল, বলিল, 'কাগজে দেখলাম আপনার এলাকায় অভয় ঘোষাল খুন হয়েছে।'

রমাপতিবাবু চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'আপনি অভয় ঘোষালকে চিনতেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চিনতাম না, কাল সন্ধ্যেবেলা পরিচয় হয়েছিল। আমরা তার বাড়িতে গিয়েছিলাম তার সঙ্গে দেখা করতে?'

'তাই নাকি! দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন?'

ব্যোমকেশ সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আগে আপনি খবর বলুন, তারপর আমি বলব।'

রমাপতিবাবু ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আমিই আগে বলছি। অভয় ঘোষালের ওপর অনেক দিন থেকে পুলিসের নজর ছিল। লোকটা ভদ্রতার মুখোশ পরে বেড়াতো, কিন্তু এত বড় শয়তান খুব কম দেখা যায়। কত ভদ্রঘরের মেয়ের সর্বনাশ করেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। নিজের একটা স্ত্রী ছিল, হঠাৎ তার অপঘাত মৃত্যু হয়। তারপর এক ভদ্রলোকের স্ত্রীকে নিয়ে উধাও হয়েছিল ; ভদ্রলোক স্ত্রীকে ডিভোর্স করেন। তখন স্ত্রীলোকটি বোধ হয় অভয়কে বিয়ে করার জন্যে বায়না ধরেছিল, অভয় তাকে বিষ খাইয়ে মারে।

'অভয় ঘোষালকে পুলিস অ্যারেস্ট করল, মামলা কোর্টে উঠল। কিন্তু মামলা টিকল না, অভয়ের অপরাধ পাকাপাকি প্রমাণ হল না। ৩০২ ধারার মামলা, হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার, অভয় ঘোষাল ছাড়া পেয়ে গেল।

'এই হল অভয় ঘোষালের ইতিহাস। কলকাতা শহরেই অন্তত দশজন লোক আছে যারা তাকে খুন করতে পারলে খুশি হয়।

'কাল রাত্রে আন্দাজ বারোটার সময় অভয়ের বাড়ির চাকরানী থানায় এসে খবর দেয় যে অভয় খুন হয়েছে। আমি তখন থানায় ছিলাম না, খবর পেয়ে তদন্ত করতে গেলাম। অভয় ঘোষালের আর্থিক অবস্থা এখন পড়ে গেছে : বাড়িতে একলা থাকে, কেবল একটা কম-বয়সী চাকরানী দেখাশোনা করে। এই চাকরানীটাই থানায় খবর দিতে এসেছিল।

'গিয়ে দেখলাম অভয় দোতলার ঘরে বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে আছে, তার পিঠের বাঁ দিকে গুনছুঁচের মত একটা শলা বিঁধে আছে। চাকরানীকে সওয়াল করে জানা গেল যে অভয় রাত্রি ন'টার সময় খাওয়া-দাওয়া করে শুতে গিয়েছিল ; চাকরানী বাড়ির কাজকর্ম সেরে, নিজে খেয়ে, দোর জানলা বন্ধ করে অভয়ের ঘরে গিয়ে দেখল ইতিমধ্যে কেউ এসে অভয়কে খুন করে রেখে গেছে।

'আমরা চাকরানীটাকে আটক করে রেখেছি, কিন্তু সে বোধ হয় খুন করেনি। কে খুন করেছে তাও জানা যাচ্ছে না। অভয়ের সঙ্গে যাদের শত্রুতা ছিল— মামলায় যারা অভয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল— তাদের সকলের অ্যালিবাই যাচাই করে দেখেছি, তারা কেউ নয় বলেই মনে হয়।

'এই হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি ! এখন আপনি কি জানেন বলুন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি যে কিছু জানি তা আপনি জানলেন কি করে ?'

রামপতিবাবু পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া ব্যোমকেশের দিকে বাড়াইয়া দিলেন, 'এই কাগজের টুকরোটা নীচের তলায় অভয়ের বসবার ঘরে টেবিলের ওপর রাখা ছিল।'

গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া হিজিবিজি কাটা, তারপর লেখা আছে— ব্যোমকেশ বক্সী—শিশুপাল—। মনে পড়িয়া গেল কাল রাত্রে অভয় ঘোষাল আমাদের সামনে বসিয়া হিজিবিজি কাটিতেছিল।

রমাপতিবাবু বলিলেন, 'আপনার নাম দেখে মনে হল আপনি হয়তো কিছু জানেন। তাই এলাম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক। এবার আমি যা জানি শুনুন।'

ব্যোমকেশ কাল সকালে ডাক্তার রক্ষিতের আগমন হইতে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল। রমাপতিবাবু গাঢ় মনোযোগ দিয়া শুনিলেন ; ব্যোমকেশ কাহিনী শেষ করিলে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত মুখে বলিলেন, 'সন্দেহজনক বটে। কিন্তু বিশু পালের কোনো মোটিভ পাচ্ছি না। তার ওপর লোকটা পঙ্গু। — আপনার কি মনে হয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। ক'টার সময় মৃত্যু হয়েছে জানেন কি ?'

'পুলিস সার্জন বলছেন, রাত্রি ন'টার পর এবং বারোটার আগে।'

'হুঁ'—ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'আমার মনে হয়, বিশু পাল সত্যি পঙ্গু কিনা ভাল

করে যাচাই করে দেখা উচিত।'

রমাপতিবাবু বলিলেন, 'তা বটে। আর কাউকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন বিশু পালকেই নেড়েচেড়ে দেখা যাক। আপনার ফোন আছে, আমাকে একবার ব্যবহার করতে দেবেন ?'

'নিশ্চয়। আসুন।' ব্যোমকেশ তাঁহাকে পাশের ঘরে লইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রমাপতিবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'পুলিস সার্জনকে বিশু পালের বাড়িতে যেতে বললাম। আমিও যাচ্ছি। আপনারা আসবেন ?'

'বেশ তো, চলুন না।'

আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া রমাপতিবাবুর সঙ্গে বাহির হইলাম।

বিশু পালের বাড়ির সামনে ঈষৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পুলিস সার্জন বাড়ির দ্বারের কাছে পুলিসের ছাপ-মারা গাড়িতে বসিয়া আছেন, রাস্তায় ভিড় জমিয়াছে। ডাক্তার রক্ষিত দ্বারের কাছে উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা উপস্থিত হইলে সার্জন সুশীলবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন। ডাক্তার রক্ষিত আমাদের দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু! কী হয়েছে ?'

ব্যোমকেশ দুই পক্ষের পরিচয় করাইয়া দিল। রমাপতিবাবু ডাক্তার রক্ষিতকে বলিলেন, 'পুলিসের ডাক্তার বিশু পালকে পরীক্ষা করে দেখতে চান। আপনার আপত্তি আছে ?'

ডাক্তার রক্ষিত ক্ষণেক অবাক হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'আপত্তি! বিন্দুমাত্র না। কিন্তু কেন ? কি হয়েছে ?'

রমাপতিবাবু বলিলেন, 'অভয় ঘোষাল নামে এক ব্যক্তিকে কাল রাত্রে কেউ খুন করেছে!'

ডাক্তার রক্ষিত প্রতিধ্বনি করিলেন, 'অভয় ঘোষালকে খুন করেছে! ও— বুঝেছি, আপনাদের সন্দেহ বিশুবাবু অভয় ঘোষালকে খুন করেছেন।' তাঁর মুখে একটু শুষ্ক হাসি দেখা দিল— 'অর্থাৎ বিশুবাবুর পক্ষাঘাত সত্যিকার পক্ষাঘাত নয়, ভান মাত্র। বেশ তো আসুন, পরীক্ষা করে দেখুন!'

আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিলাম।

দ্বিতলে সেরেস্তা বসিয়াছে। ত্রিতলে সিঁড়ির মুখে গুর্খা সমাসীন। তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া ডাক্তার রক্ষিত বন্ধ দরজায় টোকা দিলেন। দরজা অল্প খুলিয়া বিশু পালের স্ত্রী ভয়ার্ত চোখে চাহিলেন। সমস্ত প্রক্রিয়াই কাল সন্ধ্যার মত।

বিশু পালের স্ত্রী পাশের ঘরে চলিয়া গেলেই, আমরা পাঁচজন ঘরে প্রবেশ করিলাম। ডাক্তার রক্ষিত আলো জ্বালিয়া দিলেন।

বিছানায় বিশু পাল বালাপোশ জড়াইয়া শুইয়া আছেন, কলহশীর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠলেন, 'কী চাই! ডাক্তার, এত লোক কেন ?'

ডাক্তার রক্ষিত তাঁহার শয্যাপার্শ্বে নত হইয়া বলিলেন, 'পুলিসের পক্ষ থেকে ডাক্তার এসেছেন, আপনাকে পরীক্ষা করতে চান।'

বিশু পালের কণ্ঠস্বর আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, 'কেন ? পুলিসের ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করতে চায় কেন ?'

ডাক্তার রক্ষিত ধীর স্বরে কহিলেন, 'অভয় ঘোষাল খুন হয়েছে, তাই—'

বিশু পালের ঊর্ধ্বাঙ্গ ধড়ফড় করিয়া উঠিল, 'কে খুন হয়েছে! কী বললে তুমি ডাক্তার ?'

ডাক্তার আবার বলিলেন, 'অভয় ঘোষাল খুন হয়েছে।'

বিশু পালের মুখে পরিত্রাণের আলো ক্ষণেক ফুটিয়া উঠিয়াই মুখ আবার অন্ধকার হইয়া গেল; তিনি স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'অভয় ঘোষাল খুন হয়েছে! কিন্তু— আমি যে তাকে ত্রিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছি, সুদে-আসলে তেত্রিশ হাজার দাঁড়িয়েছে। আমার টাকার কি হবে ?'

ডাক্তার নীরস কণ্ঠে বলিলেন, 'টাকার কথা পরে ভাববেন। এখন এঁরা এসেছেন যাচাই করতে সত্যিসত্যি আপনার পক্ষাঘাত হয়েছে কিনা।'

'তার মানে ?' বিশু পাল তীব্র চক্ষু ফিরাইয়া আমাদের পানে চাহিলেন।

রমাপতিবাবু খাটের ধারে আগাইয়া গেলেন, শান্তভাবে বলিলেন, 'দেখুন, আমাদের কোনো মতলব নেই। আমাদের ডাক্তার কেবল আপনাকে পরীক্ষা করে দেখতে চান। আপনার আপত্তি আছে কি ?'

'আপত্তি! কিসের আপত্তি! পুলিসের ডাক্তার আমার রোগ সারিয়ে দিতে পারবে ?'

সুশীলবাবু বলিলেন, 'তা—চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

আরো কিছুক্ষণ সওয়াল জবাবের পর বিশু পাল রাজী হইলেন। সুশীলবাবু তাঁহার অঙ্গ হইতে বালাপোশ সরাইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বিশু পালের পা দু'টি পক্ষাঘাতে অবশ, ঊর্ধ্বাঙ্গ সচল আছে। সুশীলবাবু পায়ে ছুঁচ ফুটাইয়া দেখিলেন, কোনো সাড়া পাইলেন না। তারপর আরো অনেকভাবে পরীক্ষা করিলেন; নাড়ি দেখিলেন, রক্ত-চাপ পরীক্ষা করিলেন, ডাক্তার রক্ষিতকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিলেন। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিশু পালের গায়ে বালাপোশ মুড়িয়া দিলেন।

তাঁহার পরীক্ষাকালে এক সময় আমার দৃষ্টি অন্দরের দিকে সঞ্চালিত হইয়াছিল। দেখিলাম বিশুবাবুর স্ত্রী দরজা একটু ফাঁক করিয়া নিষ্পলক চোখে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার উদ্বেগ যেন স্বাভাবিক উদ্বেগ নয়, একটা বিকৃত ভয়ার্ত উত্তেজনা—

সুশীলবাবু বলিলেন, 'দেখা হয়েছে। চলুন, যাওয়া যাক।'

আমরা দ্বারের দিকে ফিরিলাম। পিছন হইতে বিশু পালের গলা আসিল, 'কেমন দেখলেন ? সারবে রোগ ?'

সুশীলবাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিলেন, 'সারতে পারে। আপনার ডাক্তারবাবু ভালই চিকিৎসা করছেন। — আচ্ছা, নমস্কার।'

পুলিসের গাড়িতে বাসায় ফিরিবার পথে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহলে রোগটা যথার্থ, অভিনয় নয়!'

সুশীলবাবু বলিলেন, 'না, অভিনয় নয়।'

সেদিন সারা দুপুর ব্যোমকেশ উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া তক্তপোশে পড়িয়া রহিল এবং অসংখ্য সিগারেট ধ্বংস করিল। অপরাহ্ণে যখন চা আসিল, তখনো সে উঠিল না দেখিয়া আমি বলিলাম, 'পুলিস তো তোমাকে অভয় ঘোষালের খুনের তদন্ত করতে ডাকেনি, তবে তোমার এত ভাবনা কিসের ?'

সে বলিল, 'ভাবনা নয়, অজিত, বিবেকের দংশন।'

তারপর সে হঠাৎ উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। শুনিলাম কাহাকে ফোন করিতেছে। মিনিট কয়েক পরে যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিলাম তাহার মুখ একটু প্রফুল্ল হইয়াছে।

'কাকে ফোন করলে ?'

'ডাক্তার অসীম সেনকে।'

ডাক্তার অসীম সেনের সঙ্গে 'খুঁজি খুঁজি নারি' ব্যাপারে আমাদের পরিচয় হইয়াছিল।

ব্যোমকেশ এক চুমুকে কবোষ্ণ চা গলাধঃধরণ করিয়া বলিল, 'চল, বেরুনো যাক।'

'কোথায় ?'

'বিশু পালের বাড়ি।'

বিশু পালের বাড়িতে কেরানিরা দিনের কাজ শেষ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে। ডাক্তার রক্ষিত রোগী দেখার ঘরে টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া সিগারেট টানিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া ত্বরিতে পা নামাইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার রোগী কেউ নেই দেখছি। একবার ওপরে চলুন, আপনার সামনে বিশুবাবুকে দুটো কথা বলব।'

ডাক্তার প্রসন্ন নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া আমাদের উপরে লইয়া চলিলেন।

গুর্খা অন্তর্হিত হইয়াছে, বিশুবাবুর ঘরের দ্বার খোলা। আমরা প্রবেশ করিলাম। আজ আর আলো জ্বালিবার প্রয়োজন হইল না, খোলা জানালা দিয়া পর্যাপ্ত আলো আসিতেছে। বিশু পালের অপঘাত-মৃত্যুভয় কাটিয়াছে।

তিনি পিঠের নীচে কয়েকটা বালিশ দিয়া শয্যায় অর্ধশয়ান ছিলেন, আমাদের পদশব্দে চকিতে ঘাড় ফিরাইলেন।

ব্যোমকেশ শয্যার পাশে গিয়া কিছুক্ষণ বিশু পালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'খুব খেলা দেখালেন আপনি!'

বিশু পালের চক্ষু দু'টি প্যাঁচার চোখের মত ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল। ব্যোমকেশ দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'ডাক্তারকে দলে টেনেছিলেন, তার কারণ ডাক্তার না হলে আপনার কার্যসিদ্ধি হত না। কিন্তু আমাকে দলে টানলেন কেন? আমি আপনার পক্ষে সাক্ষী দেব এই জন্যে?'

ডাক্তার এতক্ষণ আমাদের পিছনে ছিলেন, এখন লাফাইয়া সামনে আসিলেন, উগ্র কণ্ঠে বলিলেন, 'এসব কী বলছেন আপনি! আমার নামে কী বদনাম দিচ্ছেন!'

খোঁচা খাওয়া বাঘের মত ব্যোমকেশ তাঁহার দিকে ফিরিল, 'ডাক্তার, প্রোকেন নামে কোনো ওষুধের নাম শুনেছ?'

ডাক্তার ফুটা বেলুনের মত চুপসিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ আরো কিছুক্ষণ তাঁহার পানে আরক্ত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বিশু পালের দিকে ফিরিল, পকেট হইতে একশো টাকার নোট বাহির করিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'এই নিন আপনার টাকা। আমি আপনাদের দু'জনকে ফাঁসিকাঠে তুলতে পারি, এই কথাটা ভুলে যাবেন না। আপনাকে দু'-দিন হাজতে রাখলেই পক্ষাঘাতের প্রকৃত স্বরূপ বেরিয়ে পড়বে।'

বিশু পাল প্রায় কাঁদিয়া উঠিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, দয়া করুন। আমি যা করেছি প্রাণের দায়ে করেছি, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে করেছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এক শর্তে দয়া করতে পারি। আপনাকে এক লক্ষ টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করতে হবে। রাজী আছেন?'

বিশু পাল শীর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, 'এক লক্ষ টাকা!'

'হ্যাঁ, এক লক্ষ টাকা, এক পয়সা কম নয়। কাল সকালে আপনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এক লক্ষ টাকা জমা দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। যদি টাকা না দেন—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, দেবো এক লক্ষ টাকা।'

'মনে থাকে যেন। কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রসিদ দেখার জন্য অপেক্ষা করব। —চল অজিত।'

বাড়িতে ফিরিয়া আর এক দফা চা পান করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম, প্রতিরক্ষা তহবিলে এক লক্ষ টাকা চাঁদা খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু ব্যোমকেশ দু'টা খুনীকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিল কেন? ব্যোমকেশ বোধ হয় আমার মুখ দেখিয়া মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল; বলিল, 'বিশু পালকে ছেড়ে না দিয়ে উপায় ছিল না। মোকদ্দমা কোর্টে উঠলেও সে ছাড়া পেয়ে যেতো। হত্যার মোটিভ কেউ বিশ্বাস করত না।'

বলিলাম, 'কিন্তু মোটিভটা তো খাঁটি?'

'বিশু পালের দিক থেকে খাঁটি, সে সত্যিই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অভয় ঘোষালকে খুন করেছিল। কিন্তু জুরী বিশ্বাস করত না, হেসে উড়িয়ে দিত।'

'আচ্ছা, একটা কথা বলো। আত্মরক্ষার জন্যে নরহত্যা করলে দোষ নেই আইনে একথা বলে,

কেমন ? তাহলে বিশু পাল অভয় ঘোষালকে খুন করে কী দোষ করেছে ?'

'আত্মরক্ষার জন্যে নরহত্যার অধিকার মানুষের আছে, কিন্তু তিন মাস ধরে ষড়যন্ত্র করে নরহত্যা করলে আইন তা স্বীকার করবে না। বিশু পাল তা জানত বলেই এত সাবধানে আট-ঘাট বেঁধে কাজে নেমেছিল।'

'ব্যাপার বুঝলাম। তবু তুমি সব কথা পরিষ্কার করে বলো।'

ব্যোমকেশ তখন বলিতে আরম্ভ করিল—

'অভয় ঘোষালকে কাল আমরা দেখেছিলাম। মুখে হাসি লেগে আছে, কিন্তু চোখে জল্লাদের নিষ্ঠুরতা। লোকটা সত্যিকার খুনী। ওর সম্বন্ধে আমরা যা শুনেছি তা একবর্ণ মিথ্যে নয়।

'বিশু পাল মিষ্টি কথায় ভুলে অভয় ঘোষালকে ত্রিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিল। তারপর যখন ধার শোধ করার পালা এল, তখন আর অভয় ঘোষালের দেখা নেই। কে কার টাকা ধারে !

'বিশু পাল তখনো অভয় ঘোষালকে পুরোপুরি চিনত না, সে একদিন তার বাড়িতে গিয়ে তার চৌদ্দ-পুরুষান্ত করল। অভয় ঘোষাল একটি কথা বলল না, কেবল তার পানে চেয়ে রইল। সেই চাউনি দেখে বিশু পাল ভয় পেয়ে গেল। সে বুঝতে পারল অভয় ঘোষাল কী ধাতুর লোক ; সে আগেও খুন করেছে, এবার তাকে খুন করবে।

'বিশু পালও কম নয়। সে যখন পাকাপাকি বুঝলো যে অভয় ঘোষাল তাকে খুন না করে ছাড়বে না, তখন সে ঠিক করল অভয় ঘোষালকে সে আগে খুন করবে। তার টাকা মারা যাবার ভয় নেই, কারণ অভয় ঘোষালের একটা বাড়ি আছে, সেটা ক্রোক করে টাকা আদায় করা যাবে।

'খুন করার ব্যাপারে বিশু পালের একটা সুবিধা ছিল। সে জানত যে অভয় ঘোষাল তাকে খুন করতে চায়, কিন্তু বিশু পাল যে অভয় ঘোষালকে খুন করতে চায়, একথা অভয় ঘোষাল জানত না। তাই সে সাবধান হয়নি।

'বিশু পালের বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ হল। সিঁড়ির মুখে গুর্খা মোতায়েন হল। তারপর বিশু পাল প্ল্যান ঠিক করতে বসল।

'নীচের তলার ভাড়াটে ডাক্তার সুরেশ রক্ষিত। বেশ বোঝা যায় তার প্র্যাকটিস নেই। সে বাড়িভাড়া দিতে পারে না, তাই বিশু পালের খাতক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশু পাল তাকে ডেকে নিজের প্ল্যান বলল। ডাক্তারের গলায় ফাঁস, সে রাজী হল।

'বিশু পাল নতুন আসবাব কিনে ডাক্তারের ডিসপেন্সারি সাজিয়ে দিল, যাতে মনে হয় ডাক্তার হেঁজিপেঁজি ডাক্তার নয়, তার বেশ পসার আছে। তারপর বিশু পালের পক্ষাঘাত হল।

'আজকাল ডাক্তারি শাস্ত্রের অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে অপারেশনের জন্যে রুগীকে অজ্ঞান করতে হলে ক্লোরোফর্ম দিতে হতো, এখন আর তা দরকার হয় না। প্রোকেন জাতীয় এক রকম ওষুধ বেরিয়েছে, মেরুদণ্ডের স্থান-বিশেষে ইনজেকশন দিলে শরীরের স্থান-বিশেষ অসাড় হয়ে যায় ; তখন শরীরের সেই অংশে স্বচ্ছন্দে অপারেশন করা যায়, রোগী ব্যথা অনুভব করে না।

'ডাক্তার রক্ষিত তাই করল, বিশু পালের পা দুটো অসাড় হয়ে গেল। তখন একজন নামকরা বড় ডাক্তারকে ডাকা হল ; তিনি দেখলেন পক্ষাঘাত, সেই রকম ব্যবস্থা করে গেলেন।

'প্রোকেন জাতীয় ওষুধের ফল পাঁচ-ছয় ঘণ্টা থাকে। তারপর আর থাকে না। কিন্তু সে খবর বাইরের লোক জানে না, কেবল বিশু পালের স্ত্রী আর ডাক্তার জানে। কেরানিরা দোতলায় আসে, তারা জানতে পারে মালিকের পক্ষাঘাত হয়েছে। সেরেস্তাদার ঘরে ঢুকতে পায় না, দোরের কাছ থেকে দেখে যায় মালিক বিছানায় পড়ে আছে। কারুর অবিশ্বাস হয় না, অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই।

'কিন্তু বিশু পাল ঝানু লোক, সে কাঁচা কাজ করবে না। নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত সাক্ষী চাই ; এমন সাক্ষী চাই যাদের কথা কেউ অবিশ্বাস করবে না। কাল সকালে সে ডাক্তারকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালো। আমি যেতে রাজী হলাম। ডাক্তার ফিরে গিয়ে বেলা একটা আন্দাজ বিশু পালের শিরদাঁড়ায় প্রোকেন ইনজেকশন দিল।

'আমরা পাঁচটার সময় গিয়ে দেখলাম বিশু পাল শয্যাশায়ী, উত্থানশক্তি রহিত। সে তার দুঃখের কথা আমাকে শোনালো, তারপর একশো টাকা দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করল। তার মতলব ঠিক করা ছিল, কাল রাত্রেই অভয়কে খুন করবে।

'আমি অভয়ের ঠিকানা নিয়েছি সে খবর ডাক্তার বিশু পালকে জানালো। বিশু পালের ভাবনা হল, আমরা যদি বেশি রাত পর্যন্ত অভয় ঘোষালের বাড়িতে থাকি, তাহলে তার প্ল্যান ভেস্তে যাবে। সে ডাক্তারকে পাঠালো আমাদের ওপর নজর রাখতে ; ডাক্তার ট্যাক্সিতে অভয় ঘোষালের বাড়ির সামনে এসে অপেক্ষা করতে লাগল, তারপর আমরা যখন অভয়ের বাড়ি থেকে বেরুলাম তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। লাইন ক্লিয়ার !

'সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ বিশু পালের শরীরের জড়ত্ব কেটে গেল, সে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

'রাত্রি আটটার সময় একটা গুর্খা চলে যায়, দ্বিতীয় গুর্খা আসে দশটার সময়। বিশু পাল আন্দাজ ন'টার সময় বাড়ি থেকে বেরুলো, বোধ হয় র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বেরিয়েছিল, হাতে ছিল গুনছুঁচের মত একটা অস্ত্র। গত তিন মাসে সে অভয় ঘোষালের চাল-চলন সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে রেখেছিল। বাড়িতে একটা ঝি ছাড়া আর কেউ থাকে না ; অভয় ঘোষাল ন'টার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যায় ; সদর দরজা ভেজানো থাকে, চাকরানী বোধ হয় দশটার পর রান্নাঘরের কাজকর্ম সেরে সদর দরজা বন্ধ করে।

'সুতরাং বিশু পালের কোনই অসুবিধা হল না। অভয় ঘোষালকে খুন করে সে দশটার আগেই নিজের বাড়িতে ফিরে এল ; কেউ জানতে পারল না। যদি কেউ তাকে দেখে ফেলত তাহলেও বিশু পালের অ্যালিবাই ভাঙা শক্ত হতো। যে লোক তিন মাস পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী সে খুন করতে যাবে কি করে ? খুন করার মোটিভ কোথায় ?

'আজ ভোরবেলা বিশু পাল আর একটা ইনজেকশন নিল। সাবধানের মার নেই। তারপর পুলিস-ডাক্তারকে নিয়ে আমরা গেলাম। পুলিস-ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন পক্ষাঘাতই বটে।

'আমার মনটা গোড়া থেকেই খুঁৎখুঁৎ করছিল। একটা সুদখোর মহাজন কেবল আমাকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাবার জন্য একশো টাকা খরচ করবে ? ওইখানেই বিশু পাল একটু ভুল করে ফেলেছিল। তারপর আজ সকালে যখন কাগজে অভয় ঘোষালের মৃত্যু-সংবাদ পড়লাম, তখন আর সন্দেহ রইল না যে বিশু পালই অভয় ঘোষালের মৃত্যু ঘটিয়েছে। কিন্তু কী করে ?

'তিনজন লোক আছে : বিশু পাল নিজে, তার স্ত্রী এবং ডাক্তার রক্ষিত। ডাক্তার রক্ষিত খুবই প্যাঁচে পড়েছে, সে বিশু পালকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু নিজের হাতে খুন করবে কি ? বিশ্বাস হয় না। বিশু পালের স্ত্রী মেয়েমানুষ, স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে সে অভয় ঘোষালকে হাতের কাছে পেলে বিষ খাওয়াতে পারে কিন্তু অত দূরে গিয়ে ছুরি চালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। ছুরি মেয়েমানুষের অস্ত্র নয়। বাকি রইল বিশু পাল। কিন্তু সে তো পক্ষাঘাতে পঙ্গু—

'গুর্খা দুটোকে গোড়াতেই বাদ দিয়েছি। প্রাণীহত্যায় তাদের অরুচি নেই, তারা কুক্রি চালাতেও জানে। কিন্তু বিশু পাল নিজের গুর্খা দারোয়ানকে দিয়ে খুন করাবে এত কাঁচা ছেলে সে নয়। গুর্খাদের মাথায় প্যাঁচালো বুদ্ধি নেই, তারা সরল এবং গোঁয়ার। ধরা পড়লেই সত্যি কথা বলে ফেলবে।

'তবে ?

'হঠাৎ আসল কারসাজিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ডাক্তারি শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলে অনেক আগেই বুঝতে পারতাম। বিশু পালের পক্ষাঘাত সত্যিকারের পক্ষাঘাত নয়, পক্ষাঘাতের অস্থায়ী বিকল্প, ডাক্তারি প্রক্রিয়ার দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।

'ডাক্তার অসীম সেনকে ফোন করলাম। তিনি প্রবীণ ডাক্তার, এক কথায় বুঝিয়ে দিলেন।

'আমার দুঃখ এই যে বিশু পালের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার রক্ষিতও ছাড়া পেয়ে গেল। ডাক্তার হয়ে সে যে-কাজ করেছে, তার ক্ষমা নেই।— যাহোক, প্রতিরক্ষা তহবিলে এক লক্ষ টাকাই বা মন্দ কি ?'

হেঁয়ালির ছন্দ

১

ব্যোমকেশ সরকারী কাজে কটকে গিয়াছিল, আমিও সঙ্গে ছিলাম। দু'চার দিন সেখানে কাটাইবার পর দেখা গেল, এ দু'চার দিনের কাজ নয়, সরকারী দপ্তরের পর্বতপ্রমাণ দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটিয়া সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে সময় লাগিবে। তখন ব্যোমকেশ কটকে থাকিয়া গেল, আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। বাড়িতে একজন পুরুষ না থাকিলে বাঙালী গৃহস্থের সংসার চলে কি করিয়া।

কলিকাতায় আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছি। ব্যোমকেশ নাই, নিজেকে একটু অসহায় মনে হইতেছে। শীত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, বেলা ছোট হইতেছে ; তবু সময় কাটিতে চায় না। মাঝে মাঝে দোকানে যাই, প্রভাতের কাজকর্ম দেখি, নূতন পাণ্ডুলিপি আসিলে পড়ি। কিন্তু তবু দিনের অনেকখানি সময় শূন্য পড়িয়া থাকে।

তারপর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা কাটাইবার একটা সুযোগ জুটিয়া গেল।

আমাদের বাসাবাড়িটা তিনতলা। উপরতলায় গোটা পাঁচেক ঘর লইয়া আমরা থাকি, মাঝের তলার ঘরগুলিতে দশ-বারো জন চাকুরে ভদ্রলোক মেস করিয়া আছেন। নীচের তলায় ম্যানেজারের অফিস, ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, কেবল কোণের একটি ঘরে এক ভদ্রলোক থাকেন। এঁদের সকলের সঙ্গেই আমাদের মুখ চেনাচিনি আছে, কিন্তু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই।

সেদিন সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া একটা মাসিকপত্র লইয়া বসিয়াছি, দ্বারে টোকা পড়িল। দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বিনীত হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে আগে দু'একবার বাসাবাড়ির দ্বিতলে দেখিয়াছি, কিছুদিন হইল মেসে বাসা লইয়াছেন। দ্বিতলের এক কোণে সেরা ঘরটি ভাড়া লইয়া একাকী বাস করিতেছেন। একটু শৌখিন গোছের লোক, সিল্কের চুড়িদার পাঞ্জাবির উপর গরম জবাহর-কুর্তা, মাথার চুল পাকার চেয়ে কাঁচাই বেশি। ফিট্‌ফাট্ চেহারা।

যুক্তকরে নমস্কার করিয়া বলিলেন 'মাপ করবেন, আমার নাম ভূপেশ চট্টোপাধ্যায়, দোতলায় থাকি।'

বলিলাম, 'আপনাকে কয়েকবার দেখেছি। নাম জানতাম না। আসুন।'

ঘরে আনিয়া বসাইলাম। তিনি বলিলেন, 'মাস দেড়েক হল কলকাতায় এসেছি, বীমা কোম্পানিতে কাজ করি, কখন কোথায় আছি কিছু ঠিক নেই। হয়তো কালই অন্য কোথাও বদলি করে দেবে।'

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বলিলাম, 'আপনি বীমা কোম্পানির লোক! কিন্তু আমি তো কখনো জীবনবীমা করাইনি, করাবার পরিকল্পনাও নেই।'

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'না না, আমি সেজন্যে আসিনি। আমি বীমা কোম্পানির অফিসে কাজ করি বটে, কিন্তু দালাল নই। আমি এসেছিলাম—' একটু অপ্রস্তুতভাবে থামিয়া বলিলেন, 'আমার ব্রিজ খেলার নেশা আছে। এখানে এসে অবধি খেলতে পাইনি, পেট ফুলছে। অতি কষ্টে দু'টি

ভদ্রলোককে যোগাড় করেছি। তাঁরা দোতলায় তিন নম্বর ঘরে থাকেন। কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তিকে পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকদিন কাটথ্রোট্ ব্রিজ খেলে কাটালাম, কিন্তু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে। আজ ভাবলাম দেখি যদি অজিতবাবুর ব্রিজ খেলার শখ থাকে।'

এক সময় ব্রিজ খেলার শখ ছিল। শখ নয়, প্রচণ্ড নেশা। অনেকদিন খেলি নাই, নেশা মরিয়া গিয়াছে। তবু মনে হইল সঙ্গিহীনভাবে নীরস পত্রিকা পড়িয়া সন্ধ্যা কাটানোর চেয়ে বরং ব্রিজ ভাল।

বলিলাম, 'বেশ তো, বেশ তো। আমার অবশ্য অভ্যেস ছেড়ে গেছে, তবু— মন্দ কি।'

ভূপেশবাবু ত্বরিতে উঠিয়া বলিলেন, 'তাহলে চলুন, আমার ঘরে ব্যবস্থা করে রেখেছি। মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

বলিলাম, 'আপনি এগোন, আমি চা খেয়েই যাচ্ছি।'

তিনি বলিলেন, 'না না, আমার ঘরেই চা খাবেন। —চলুন।'

তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া হাসি পাইল। এক কালে আমারও এমনি আগ্রহ ছিল, সন্ধ্যার সময় ব্রিজ না খেলিলে মনে হইত দিনটা বৃথা গেল।

উঠিয়া পড়িলাম। সত্যবতীকে জানাইয়া ভূপেশবাবুর সঙ্গে নীচে নামিয়া চলিলাম।

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দ্বিতলের প্রথম ঘরটি ভূপেশবাবুর। নিজের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া তিনি হাঁক দিলেন, 'রামবাবু, বনমালীবাবু, আপনারা আসুন। অজিতবাবুকে পাক্‌ড়েছি।'

বারান্দার মধ্যস্থিত তিন নম্বর ঘরের দ্বার হইতে দু'টি মুণ্ড উঁকি মারিল, তারপর 'আসছি' বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ভূপেশবাবু আমাকে লইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আলো জ্বালিয়া দিলেন।

ভূপেশবাবুর ঘরটি বেশ সুপরিসর। বাহিরের দিকের দুই দেয়ালে দু'টি গরাদযুক্ত জানালা। ঘরের এক পাশে তক্তপোশের উপর সুজ্‌নি-ঢাকা বিছানা, অন্য পাশে খালি আলমারির মাথায় ঝক্‌ঝকে স্টোভ, চায়ের সরঞ্জাম ইত্যাদি। ঘরের মাঝখানে একটি নীচু টেবিল ঘিরিয়া চারখানি চেয়ার, স্পষ্টই বোঝা যায় তাস খেলিবার টেবিল। তা ছাড়া ঘরে ড্রেসিং টেবিল, কাপড় রাখার দেরাজ প্রভৃতি যে-কয়টি ছোটখাটো আসবাব আছে সমস্তই সুরুচির পরিচায়ক। ভূপেশবাবুর রুচি একটু বিলাত-ঘেঁষা।

ভূপেশবাবু আমাকে চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, 'চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই, পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে যাবে।'

তিনি স্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইলেন। ইতিমধ্যে রামবাবু ও বনমালীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পূর্বে পরিচয় থাকিলেও ভূপেশবাবু আর একবার পরিচয় করাইয়া দিলেন, 'ইনি রামচন্দ্র রায়, আর ইনি বনমালী চন্দ। দু'জনে একই ঘরে থাকেন এবং একই ব্যাঙ্কে কাজ করেন।'

আমি লক্ষ্য করিলাম, আরো ঐক্য আছে ; একসঙ্গে দু'জনকে কখনো দেখি নাই বলিয়াই বোধ হয় লক্ষ্য করি নাই। দু'জনেরই বয়স পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে, দু'জনেরই মোটাসোটা মাঝারি দৈর্ঘ্যের চেহারা, দু'জনেরই মুখের ছাঁচ একরকম ; মোটা নাক, বিরল ভুরু, চওড়া চিবুক। সাদৃশ্যটা স্পষ্টই বংশগত। আমার লোভ হইল ইহাদের চমক লাগাইয়া দিই। হাজার হোক, আমি ব্যোমকেশের বন্ধু।

বলিলাম, 'আপনারা কি মাসতুত ভাই ?'

দু'জনে চমকিয়া চাহিলেন ; রামবাবু ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন, 'না। আমি বৈদ্য, বনমালীবাবু কায়স্থ।'

অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। আমতা আমতা করিয়া কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিতেছি, ভূপেশবাবু এক প্লেট শিঙাড়া আনিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। তারপর চা আসিল। তাড়াতাড়ি চা-পর্ব শেষ করিয়া আমরা খেলিতে বসিলাম। মাসতুত ভাই-এর প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া

গেল।

খেলিতে বসিয়া দেখিলাম এতদিন পরেও ব্রিজ খেলা ভুলি নাই ; খেলার এবং ডাকের কলাকৌশল সবই আয়ত্তের মধ্যে আছে। সামান্য বাজি রাখিয়া খেলা, খেলার শেষে বড়জোর চার আনা লাভ লোকসান থাকে। কিন্তু এই বাজিটুকু না থাকিলে খেলার রস জমে না।

প্রথম রাবারে আমি ও রামবাবু জুড়িদার হইলাম। রামবাবু একটি মোটা চুরুট ধরাইলেন ; ভূপেশবাবু ও আমি সিগারেট জ্বালিলাম, বনমালীবাবু কেবল সুপুরি-লবঙ্গ মুখে দিলেন।

তারপর খেলা চলিতে লাগিল। একটা রাবার শেষ হইলে তাস কাটিয়া জুড়িদার বদল করিয়া আবার খেলা চলিল। এঁরা তিনজনেই ভাল খেলোয়াড় ; কথাবার্তা বেশি হইতেছে না, সকলের মনই খেলায় মগ্ন। কেবল সিগারেট ও সিগারের আগুন অনির্বাণ জ্বলিতেছে। ভূপেশবাবু এক সময় উঠিয়া গিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে আসিয়া বসিলেন।

খেলা শেষ হইল তখন রাত্রি ন'টা বাজিয়া গিয়াছে, মেসের চাকর দু'বার খাওয়ার তাগাদা দিয়া গিয়াছে। হারজিতের অঙ্ক কষিয়া দেখা গেল, আমি দুই আনা জিতিয়াছি। মহানন্দে জিতের পয়সা পকেটস্থ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। ভূপেশবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, 'কাল আবার বসবেন তো ?'

বলিলাম, 'বসব।'

উপরে আসিয়া সত্যবতীর কাছে একটু বকুনি খাইলাম। শীত ঋতুতে রাত্রি সওয়া ন'টা কম নয়। কিন্তু অনেকদিন পরে ব্রিজ খেলিয়া মনটা ভরাট ছিল, সত্যবতীর বকুনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম।

অতঃপর প্রত্যহ আমাদের তাসের আড্ডা বসিতে লাগিল ; ঘরে সন্ধ্যাবাতি জ্বালার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সভা বসে, রাত্রি ন'টা পর্যন্ত চলে। পাঁচ-ছয় দিনে এই তিনটি মানুষ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিল। ভূপেশবাবু সহৃদয় মিষ্টভাষী অতিথিবৎসল, ব্রিজ খেলার প্রতি গাঢ় অনুরাগ। রামবাবু একটু গম্ভীর প্রকৃতির ; বেশি কথা বলেন না, কেহ খেলায় ভুল করিলে তর্ক করেন না। বনমালীবাবু রামবাবুকে অতিশয় শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার অনুকরণে ভারিক্কি হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। দু'জনেই অল্পভাষী ; তাস খেলার প্রতি গভীর আসক্তি। দু'জনেরই কথায় সামান্য পূর্ববঙ্গের টান আছে।

ছয় দিন আনন্দে তাস খেলিতেছি, আমাদের আড্ডা একটি চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় নীচের তলায় একটি মারাত্মক ব্যাপার ঘটিয়া আমাদের সভাটিকে টলমল করিয়া দিল। নীচের তলার একমাত্র বাসিন্দা নটবর নস্কর হঠাৎ খুন হইলেন। তাঁহার সহিত অবশ্য আমাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু মাঝগঙ্গা দিয়া জাহাজ যাইলে তাহার ঢেউ তীরে আসিয়া লাগে।

সেদিন সাড়ে ছ'টার সময় একটি র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া আমি আড্ডায় যাইবার জন্য বাহির হইলাম। আমার একটু দেরি হইয়া গিয়াছে, তাই সিঁড়ি দিয়া চটি ফটফট্ করিয়া তাড়াতাড়ি নামিতেছি। শেষের ধাপে পৌঁছিয়াছি এমন সময় দুম্ করিয়া একটি শব্দ শুনিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। শব্দটা কোথা হইতে আসিল ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। রাস্তায় হয়তো মোটর ব্যাক-ফায়ার করিয়াছে, কিন্তু বেশ জোর আওয়াজ। রাস্তা হইতে এত জোর আওয়াজ আসিবে না।

ক্ষণকাল থামিয়া আমি আবার নামিয়া ভূপেশবাবুর ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরে আলো জ্বলিতেছে, দেখিলাম ভূপেশবাবু পাশের দিকের জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে কিছু দেখিতেছেন, রামবাবু ও বনমালীবাবু তাঁহার পিছন হইতে জানালা দিয়া উঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি যখন প্রবেশ করিলাম, তখন ভূপেশবাবু উত্তেজিত স্বরে বলিতেছেন, 'ঐ—ঐ—গলি থেকে বেরিয়ে গেল, দেখতে পেলেন ? গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান—'

আমি পিছন হইতে বলিলাম, 'কি ব্যাপার ?'

সকলে ভিতর দিকে ফিরিলেন। ভূপেশবাবু বলিলেন, 'আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন ? এই জানালার নীচের গলি থেকে এল। সবেমাত্র জানালাটি খুলেছি অমনি নীচে দুম্ করে শব্দ। গলা বাড়িয়ে দেখলাম একটা লোক তাড়াতাড়ি গলি থেকে বেরিয়ে গেল।'

আমাদের বাসাবাড়িটি সদর রাস্তার উপর। বাড়ির পাশ দিয়া একটি ইট-বাঁধানো সরু কানা গলি বাড়ির খিড়কির সহিত সদর রাস্তার যোগসাধন করিয়াছে ; বাসার চাকর-বাকর সেই পথে যাতায়াত করে। আমার একটু খটকা লাগিল। বলিলাম, 'এই ঘরের নীচের ঘরে এক ভদ্রলোক থাকেন। তাঁর ঘর থেকে শব্দটা আসেনি তো ?'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'কি জানি। আমার ঘরের নীচে এক ভদ্রলোক থাকেন বটে, কিন্তু তাঁর নাম জানি না।'

রামবাবু ও বনমালীবাবু মুখ তাকাতাকি করিলেন, তারপর রামবাবু গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'নীচের ঘরে থাকেন নটবর নস্কর।'

বলিলাম, 'চলুন। তিনি যদি ঘরে থাকেন, বলতে পারবেন কিসের আওয়াজ।'

ওঁদের তিনজনের বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কিন্তু আমি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের বন্ধু, আমি শব্দের মূল অনুসন্ধান না করিয়া ছাড়িব কেন ? বলিলাম, 'চলুন, চলুন, একবারটি দেখে এসেই খেলায় বসা যাবে। শব্দটি যদি স্বাভাবিক শব্দ হতো তাহলে কথা ছিল না, কিন্তু গলি দিয়ে একটা লোক এসে যদি নটবরবাবুর ঘরে চীনে-পট্‌কা ছুঁড়ে থাকে তাহলেও তো খোঁজ নেওয়া দরকার।'

অনিচ্ছাভরে তিনজন আমার সঙ্গে চলিলেন।

নীচের তলায় ম্যানেজার শিবকালীবাবুর অফিসে তালা ঝুলিতেছে, স্টোর-রুমের দ্বারও বন্ধ। ভোজনকক্ষটি খোলা আছে, কারণ সেখানে কয়েকটি কাঠের পিঁড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই। কেবল নটবরবাবুর দরজা ভেজানো রহিয়াছে, বাহিরে তালা লাগানো নাই। সুতরাং তিনি ঘরেই আছেন এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না। আমি ডাক দিলাম, 'নটবরবাবু !'

সাড়া নাই। আর একবার অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়াও যখন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন আমি আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিলাম। দরজা একটু ফাঁক হইল।

ঘর অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না ; কিন্তু একটা মৃদু গন্ধ নাকে আসিল। বারুদের গন্ধ ! আমরা সচকিত দৃষ্টি বিনিময় করিলাম।

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'দোরের পাশে নিশ্চয় আলোর সুইচ আছে। দাঁড়ান, আমি আলো জ্বালছি।'

তিনি আমাকে সরাইয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিলেন, তারপর হাত বাড়াইয়া সুইচ খুঁজিতে লাগিলেন। কট্ করিয়া শব্দ হইল, আলো জ্বলিয়া উঠিল।

মাথার উপর বিদ্যুতের নির্মম আলোকে প্রথম যে বস্তুটি চোখে পড়িল তাহা নটবরবাবুর মৃতদেহ। তিনি ঘরের মাঝখানে হাত-পা ছড়াইয়া চিত হইয়া পড়িয়া আছেন ; পরিধানে সাদা সোয়েটার ও ধুতি। সোয়েটারের বুকের নিকট হইতে গাঢ় রক্ত গড়াইয়া পড়িয়াছে। নটবর নস্কর জীবিত অবস্থাতেও খুব সুদর্শন পুরুষ ছিলেন না, দোহারা পেটমোটা গোছের শরীর, হাম্‌দো মুখে গভীর বসন্তের দাগ, কিন্তু মৃত্যুতে তাঁহার মুখখানা আরো বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। সে বীভৎসতার বর্ণনা দিব না। মৃত্যুভয় যে কিরূপ কুৎসিত আবেগ তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বোঝা যায়।

কিছুক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিবার পর রামবাবু গলার মধ্যে হেঁচকি তোলার মত শব্দ করিলেন। দেখিলাম তিনি মোহাবিষ্ট অবিশ্বাস-ভরা চোখে মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া আছেন। বনমালীবাবু হঠাৎ তাঁহার একটা হাত খামচাইয়া ধরিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, 'দাদা, নটবর নস্কর মরে গেছে !' তাঁহার অভিব্যক্তি দুঃখের কিংবা বিস্ময়ের কিংবা আনন্দের ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

ভূপেশবাবু শুষ্কমুখে বলিলেন, 'মরে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। বন্দুকের গুলিতে মরেছে !— ঐ যে। ঐ যে। জানালার ওপর দেখতে পাচ্ছেন ?'

গরাদ-যুক্ত জানালা খোলা রহিয়াছে, তাহার পৈঁঠার উপর একটি পিস্তল। চিত্রটি স্পষ্ট হইয়া উঠিল : জানালার বাহিরের গলিতে দাঁড়াইয়া আততায়ী নটবর নস্করকে গুলি করিল, তারপর পিস্তলটি জানালার পৈঁঠার উপর রাখিয়া প্রস্থান করিল।

এই সময় পিছন দিকে দ্রুত পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। মেসের ম্যানেজার শিবকালী চক্রবর্তী আসিতেছেন। তাঁহার চিমড়ে চেহারা, গতি অকারণে ক্ষিপ্র, চোখের দৃষ্টি অকারণে ব্যাকুল ; কথা বলিবার সময় একই কথা একাধিকবার উচ্চারণ না করিয়া শান্তি পান না। তিনি আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'আপনারা এখানে ? এখানে ? কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?'

'নিজের চোখেই দেখুন'—আমরা দ্বারের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলাম। শিবকালীবাবু রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠিলেন, 'অ্যাঁ! এ কি—এ কি। নটবর নস্কর মারা গেছেন। রক্ত, রক্ত ! কি করে মারা গেলেন ?'

জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলাম, 'ঐদিকে দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

পিস্তল দেখিয়া শিবকালীবাবু আবার ত্রাসোক্তি করিলেন, 'অ্যাঁ— পিস্তল— পিস্তল। পিস্তলের গুলিতে নটবরবাবু খুন হয়েছেন ! কে খুন করেছে— কখন খুন করেছে ?'

বলিলাম, 'কে খুন করেছে জানি না, কিন্তু কখন খুন করেছে বলতে পারি। মিনিট পাঁচেক আগে।'

সংক্ষেপে পরিস্থিতি বুঝাইয়া দিলাম। তিনি ব্যাকুল নেত্রে মৃতদেহের পানে চাহিয়া রহিলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, হঠাৎ চোখে পড়িল, শিবকালীবাবুর গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান। বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। বুকের ধড়্ফড়ানি দমন করিয়া বলিলাম, 'আপনি কি বাসায় ছিলেন না ? বেরিয়েছিলেন ?'

তিনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিলেন, 'অ্যাঁ— আমি কাজে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু—কিন্তু—এখন উপায় ? কর্তব্য কী—কর্তব্য ?'

বলিলাম, 'প্রথম কর্তব্য পুলিসকে খবর দেওয়া।'

শিবকালীবাবু বলিলেন, 'তাই তো, তাই তো। ঠিক কথা— ঠিক কথা ! কিন্তু আমার তো টেলিফোন নেই। অজিতবাবু, আপনাদের টেলিফোন আছে, আপনি যদি—'

আমি বলিলাম, 'এখনি পুলিসকে টেলিফোন করছি।— আপনারা কিন্তু ঘরে ঢুকবেন না, যতক্ষণ না পুলিস আসে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকুন।'

আমি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিলাম। ঘরে প্রবেশ করিতে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব চোখে পড়িল। আমার গায়েও বাদামী রঙের আলোয়ান।

আমাদের পাড়ার তৎকালীন দারোগা প্রণব গুহ মহাশয়ের সহিত আমাদের পরিচয় ছিল। কর্মপটু বয়স্থ লোক, কিন্তু ব্যোমকেশের প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। অবশ্য তাঁহার প্রসন্নতা কোনো প্রকার বাক্-পারুষ্য বা রূঢ়তার মাধ্যমে প্রকাশ পাইত না, ব্যোমকেশকে তিনি অতিরিক্ত সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক কথা বলিয়া কথার শেষে অনুচ্চস্বরে একটু হাসিতেন। বোধ হয় দুইজনের মনের ধাতুগত বিরোধ ছিল ; তা ছাড়া সরকারী কার্যকলাপে বে-সরকারী স্থূল হস্তাবলেপ প্রণববাবু পছন্দ করিতেন না।

টেলিফোনে আমার বার্তা শুনিয়া তিনি ব্যঙ্গভরে বলিলেন, 'বলেন কি ! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, সর্ষের মধ্যে ভূত ! তা ব্যোমকেশবাবু যখন রয়েছেন তখন আমাকে আর কী দরকার ? তিনিই তদন্ত করুন।'

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'ব্যোমকেশ কলকাতায় নেই, থাকলে অবশ্য করত।'

প্রণব দারোগা বলিলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি যাচ্ছি।' খিক্ খিক্ হাস্য করিয়া তিনি ফোন রাখিয়া দিলেন। আমি আবার নীচের তলায় নামিয়া গেলাম।

আধ ঘণ্টা পরে প্রণববাবু দলবল লইয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়া খিক্ খিক্ হাসিলেন, তারপর গম্ভীর হইয়া লাশ তদারক করিলেন। জানালা হইতে পিস্তলটি রুমালে জড়াইয়া সন্তর্পণে

পকেটে রাখিলেন। অবশেষে লাশ চালান দিয়া ঘরের একটি মাত্র চেয়ারে বসিয়া বাসার সকলকে জেরা আরম্ভ করিলেন।

আমি যাহা জানিতাম বলিলাম। বাকি সকলের বয়ান সংক্ষেপে লিখিতেছি—

ম্যানেজার শিবকালীবাবু ব্রহ্মচারী ব্রতধারী পুরুষ, অর্থাৎ অবিবাহিত। পঁচিশ বছর ধরিয়া মেস চালাইতেছেন, এই মেসই তাঁহার স্ত্রী-পুত্র পরিবার।...নটবর নস্কর প্রায় তিন বছর পূর্বে নীচের তলার এই ঘরটিতে বাসা বাঁধিয়াছিলেন, তদবধি এখানেই ছিলেন। তাঁহার বয়স অনুমান পঞ্চাশ, কাহারো সহিত বেশি মেলামেশা ছিল না। রামবাবু এবং বনমালীবাবু কালেভদ্রে তাঁহার ঘরে আসিতেন। শিবকালীবাবুর সহিত নটবর নস্করের অপ্রীতি ছিল না, কারণ নটবর প্রতি মাসের পয়লা তারিখে মেসের পাওনা চুকাইয়া দিতেন। ...শিবকালীবাবু আজ বিকালে খবর পাইয়াছিলেন যে, কোনো এক গুদামে সস্তায় আলু পাওয়া যাইতেছে, তাই তিনি আলু কিনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু আলু পূর্বেই বিক্রি হইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ভূপেশবাবু বীমা কোম্পানিতে চাকরি করেন, মাস দেড়েক হইল বদলি হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। বয়স পঁয়তাল্লিশ, বিপত্নীক, নিঃসন্তান। গৃহ বলিতে কিছু নাই, কর্মসূত্রে ভারতের যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাস খেলায় দল বাঁধা এবং আজ সন্ধ্যার ঘটনা ভূপেশবাবু যথাযথ বর্ণনা করিলেন, বাদামী আলোয়ান গায়ে লোকটারও উল্লেখ করিলেন। লোকটার মুখ তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই, অপসরণশীল মানুষের মুখ পিছন হইতে দেখা যায় না ; ভবিষ্যতে তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবেন এমন সম্ভাবনা কম।

রামচন্দ্র রায় ও বনমালী চন্দের এজাহার প্রায় একই প্রকার। লক্ষ্য করিলাম, রামবাবু ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিলেও বনমালীবাবু একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা পূর্বে ঢাকায় ছিলেন, একসঙ্গে একটি বিলাতি কোম্পানিতে চাকরি করিতেন। দেশ বিভাগের হাঙ্গামায় তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবার সকলেই নিহত হয়, তাঁহারা অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসেন। রামবাবুর বয়স আটচল্লিশ, বনমালীবাবুর পঁয়তাল্লিশ। তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া এই মেসে আছেন এবং একটি ব্যাঙ্কে কাজ করিতেছেন। এইভাবে তিন বছর কাটিয়াছে।

তাঁহাদের ব্রিজ খেলার শখ আছে, কিন্তু কলিকাতায় আসার পর খেলার সুযোগ হয় নাই। কয়েকদিন আগে ভূপেশবাবু নিজের ঘরে ব্রিজ খেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; সেই অবধি বেশ আনন্দে সন্ধ্যা কাটিতেছিল। তারপর আজ তাঁহারা ভূপেশবাবুর ঘরে পদার্পণ করিবার পাঁচ মিনিট পরে হঠাৎ গলির মধ্যে দুম্ করিয়া আওয়াজ হইল। ...নটবরবাবুর সহিত তাঁহাদের ঢাকায় আলাপ ছিল ; সামান্য আলাপ, বেশি ঘনিষ্ঠতা নয়। নটবরবাবু ঢাকায় নানাপ্রকার দালালির কাজ করিতেন। এখানে একই মেসে থাকার জন্য তাঁহাদের মাঝে-মধ্যে দেখাশোনা হইত ; রামবাবু ও বনমালীবাবু এই ঘরে আসিয়া গল্পসল্প করিতেন। নটবরবাবুর অন্য কোন বন্ধুবান্ধব আছে কিনা তাঁহারা জানেন না। ...বাদামী আলোয়ান গায়ে লোকটাকে তাঁহারা গলির মোড়ে সন্ধ্যার আবছায়া আলোয় পলকের জন্য দেখিয়াছিলেন, আবার দেখিলে চিনিতে পারিবেন না।

মেসে অন্য যাঁহারা থাকেন তাঁহারা কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। দ্বিতলের অন্য প্রান্তে একটি ঘরে পাশার আড্ডা বসিয়াছিল ; চারজন খেলুড়ে এবং আরো গুটিচারেক দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; তাঁহারা বন্দুকের শব্দ শুনিতে পান নাই। মেসের কাহারো সঙ্গে নটবরবাবুর সামান্য মুখ চেনাচেনি ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক ছিল না।

কেবল মেসের ভৃত্য হরিপদ একটা কথা বলিল যাহা অবান্তর হইতে পারে আবার অর্থপূর্ণ হইতে পারে। সন্ধ্যা ছয়টার সময় দ্বিতলের সুরেনবাবু হরিপদকে পাঠাইয়াছিলেন মোড়ের হোটেল হইতে আলুর চপ্ কিনিয়া আনিতে। চপ্ কিনিয়া খিড়কির পথে ফিরিবার সময় হরিপদ শুনিতে পাইয়াছিল, নটবরবাবুর ঘরে কেহ আসিয়াছে এবং মৃদুগুঞ্জনে কথা বলিতেছে। নটবরবাবুর দরজা ভেজানো ছিল বলিয়া ঘরের ভিতর কে আছে হরিপদ দেখিতে পায় নাই ; গলার স্বরও চিনিতে

পারে নাই। নটবরবাবুর ঘরে কেহ বড় একটা আসে না, তাই হরিপদ বিশেষ করিয়া ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। সময় সম্বন্ধে সে স্পষ্টভাবে কিছু বলিতে পারিল না, তবে সুরেনবাবু স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, তিনি সন্ধ্যা ছ'টার সময় চপ্ আনিতে দিয়াছিলেন।

অর্থাৎ মৃত্যুর আধ ঘণ্টা আগে নটবরবাবুর ঘরে লোক আসিয়াছিল। মেসের কেহ নয়, কারণ কেহই স্বীকার করিল না যে, সে নটবরবাবুর ঘরে গিয়াছিল। সুতরাং বাহিরের লোক। হয়তো বাদামী আলোয়ান গায়ে লোকটা। কিংবা অন্য কেহ ; হরিপদর এজেহার হইতে কিছুই ধরা-ছোঁয়া যায় না।

সকলের এজেহার লিখিত হইবার পর প্রণব দারোগা বলিলেন, 'আপনারা এখন যেতে পারেন, আমরা ঘর খানাতল্লাশ করব। হ্যাঁ, অজিতবাবু এবং শিবকালীবাবুকে জানিয়ে দিচ্ছি, যতদিন খুনের কিনারা না হয়, ততদিন আপনারা আমার অনুমতি না নিয়ে কলকাতার বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না।'

অবাক হইয়া বলিলাম, 'তার মানে?'

প্রণব দারোগা বলিলেন, 'তার মানে, আপনার এবং শিবকালীবাবুর গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান রয়েছে। খিক্ খিক্।—আচ্ছা, আসুন।'

তিনি আমাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমরা যে যার কোটরে ফিরিয়া আসিলাম। তাস খেলার কথা মনেই রহিল না।

পরের দিনটা নিষ্ক্রিয় বৈচিত্র্যহীনভাবে কাটিয়া গেল। পুলিসের দিক হইতে সাড়াশব্দ নাই। প্রণব দারোগা গত রাত্রে নটবরবাবুর ঘর খানাতল্লাশ করিয়া দ্বারে তালা লাগাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিছু কাগজপত্র লইয়া গিয়াছেন। লোকটি আমাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ; কিন্তু এমন মিষ্টভাবে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন যে, কিছু বলিবার থাকে না। তিনি জানেন আমার অকাট্য অ্যালিবাই আছে, তবু তুচ্ছ ছুতা করিয়া আমার উপর কলিকাতা ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া গেলেন। আমি ব্যোমকেশের বন্ধু, তাই আমাকে উত্ত্যক্ত করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

সকালবেলা মেসের বাবুরা নিজ নিজ অফিসে চলিয়া গেলেন। কাহারো মনে কোনো বিকার নাই। নটবর নস্কর নামক যে মানুষটি তিন বছর মেসে ছিলেন, তিনি যে বন্দুকের গুলিতে মারা গিয়াছেন সেজন্য কাহারো আক্ষেপ নাই। "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে"—সকলেরই এইরূপ একটি পারমার্থিক মনোভাব।

সন্ধ্যাবেলা ভূপেশবাবুর ঘরে গেলাম। রামবাবু ও বনমালীবাবুও উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেরই একটু নিস্তেজ অবস্থা। খেলার কথা আজ কেহ উল্লেখ করিল না। চা পান করিতে করিতে মনমরাভাবে নটবর নস্করের মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং পুলিসের অকর্মণ্যতার নিন্দা করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে একটা আইডিয়া মাথায় আসিল। প্রণব দারোগা যত কর্মকুশলই হোন তাঁহার দ্বারা নটবরবাবুর খুনের কিনারা হইবে না। ব্যোমকেশ এখানে নাই ; তাসের আড্ডা ম্রিয়মাণ, এ অবস্থায় নিষ্কর্মার মত বসিয়া না থাকিয়া আমি যদি ঘটনাটি লিখিয়া রাখি তাহা হইলে মন্দ হয় না। আমারো কিছু করা হইবে এবং ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিয়া আমার লেখা পড়িলে হয়তো খুনের একটা হেস্তনেস্ত করিতে পারিবে।

রাত্রেই লিখিতে বসিয়া গেলাম। ব্যোমকেশ যাহাতে খুঁত ধরিবার সুযোগ না পায় এমনিভাবে ঘটনার ভূমিকা হইতে আরম্ভ করিয়া আমার দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্ত খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করিলাম। লেখা শেষ হইল পরদিন অপরাহ্ণে।

লেখা শেষ হইল বটে কিন্তু কাহিনীটি শেষ হইল না। কবে কোথায় গিয়া নটবরবাবুর হত্যা কাহিনী শেষ হইবে কে জানে। হয়তো হত্যাকারীর নাম চিরদিন অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। একটু অপরিতৃপ্ত মন লইয়া সবেমাত্র সিগারেট ধরাইয়াছি এমন সময় সুটকেশ হাতে গুটিগুটি ব্যোমকেশ প্রবেশ করিল।

আমি লাফাইয়া উঠিলাম, 'আরে ! তুমি ফিরে এসেছ ! কাজ শেষ হয়ে গেল ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাজ এখনো আরম্ভই হয়নি। সরকারের দুই দপ্তরে ঝগড়া বেধে গেছে। আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি। দেখে শুনে আমি চলে এলাম। ওদের কামড়া-কামড়ি থামলে আবার যাব।'

সত্যবতী ভিতর হইতে ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিল, আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে ছুটিয়া আসিল। তাহাদের দাম্পত্য জীবন নূতন নয়, কিন্তু এখনো ব্যোমকেশকে অপ্রত্যাশিতভাবে কাছে পাইলে সত্যবতীর চোখে আনন্দবিহ্বল জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে।

দাম্পত্য পুনর্মিলনের পালা শেষ হইলে আমি নটবর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম এবং লেখাটি পড়িতে দিলাম। ব্যোমকেশ চায়ে চুমুক দিতে দিতে পড়িল।

সন্ধ্যা ছ'টা বাজিলে সে লেখাটা আমাকে ফেরত দিয়া বলিল, 'প্রণব দারোগা তোমাকে শহরবন্দী করে রেখেছে। লোকটা যে আমাদের কী চোখেই দেখেছে ! কাল তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। চল, আজ ভূপেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

বুঝিলাম ব্যোমকেশ আকৃষ্ট হইয়াছে। খুশি হইয়া বলিলাম, 'চল। রামবাবু আর বনমালীবাবুর সঙ্গেও দেখা হতে পারে।'

দ্বিতলে ভূপেশবাবুর ঘরে ব্যোমকেশকে লইয়া গেলাম। আমার অনুমান মিথ্যা নয়, রামবাবু ও বনমালীবাবু উপস্থিত আছেন। পরিচয় করাইয়া দিতে হইল না, সকলেই ব্যোমকেশের চেহারার সঙ্গে পরিচিত। ভূপেশবাবু সমাদরের সহিত ব্যোমকেশকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং চায়ের জল চড়াইলেন। রামবাবুর গাম্ভীর্য অটল রহিল, কিন্তু বনমালীবাবুর চোখে ত্রস্ত সতর্কতা উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ একটি চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিল, 'আমারও এক সময় ব্রিজের নেশা ছিল। তারপর অজিত দাবা খেলতে শিখিয়েছিল। কিন্তু এখন আর খেলাধুলো ভাল লাগে না।'

ভূপেশবাবু স্টোভের উপর ফুটন্ত জলে চায়ের পাতা ছাড়িতে ছাড়িতে তাহার দিকে ঘাড় ফিরাইলেন, হাসিমুখে বলিলেন, 'এখন শুধু পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা।'

ভূপেশবাবুর মুখে রবীন্দ্র কাব্য শুনিয়া একটু চমকিত হইলাম। তিনি বীমার অফিসে চাকরি করেন আবার কাব্যচর্চাও করেন !

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল, 'ঠিক বলেছেন। মৃত্যুর সঙ্গে সারা জীবন খেলা করে করে এমন অবস্থা হয়েছে যে হালকা খেলায় আর মন বসে না।'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'আপনার কথা স্বতন্ত্র। আমিও মৃত্যু নিয়ে কারবার করি, বীমার কাজ মৃত্যুর ব্যবসা ছাড়া আর কী বলুন ? কিন্তু আমার এখনো ব্রিজ খেলতে ভাল লাগে।'

ব্যোমকেশ ভূপেশবাবুর সঙ্গে কথা বলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু রামবাবু এবং বনমালীবাবুর দিকেই ঘোরাফেরা করিতেছিল। তাঁহারা নির্বাক বসিয়াছিলেন এই ধরনের হাল্কা অথচ মার্জিত-রুচি বাক্যালাপের সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা নাই।

ভূপেশবাবু চায়ের পেয়ালা এবং ক্রিমকেকার আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। ব্যোমকেশ যেন চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'আপনিও স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ। ব্রিজ খেলা বুদ্ধির খেলা, যাদের বুদ্ধি আছে তারা স্বভাবতই এই খেলার দিকে আকৃষ্ট হয়। কেউ কেউ জীবন-যন্ত্রণা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি পাবার আশায় তাস খেলতে বসে। আমি অনেক দিন আগে একজনকে জানতাম, সে পুত্রশোক ভোলবার জন্যে ব্রিজ খেলত।'

তিনজনের চক্ষু যেন যন্ত্রচালিতবৎ ব্যোমকেশের দিকে ফিরিল। কেহ কোনো কথা বলিলেন না, কেবল বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া রহিলেন। ঘরের মধ্যে একটি গুরুভার নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল।

নীরবে চা-পান সম্পন্ন হইল। তারপর ব্যোমকেশ রুমালে মুখ মুছিয়া সহজ সুরে নীরবতা ভঙ্গ করিল, 'আমি কটকে গিয়েছিলাম, আজই বিকেলবেলা ফিরেছি। ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অজিত

আমাকে নটবর নস্করের মৃত্যুর খবর জানালো। নটবরবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, কিন্তু তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে কৌতূহল হল। নিজের দোরগোড়ায় হত্যাকাণ্ড বড় একটা দেখা যায় না। তাই ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'ভাগ্যিস হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছিল তাই আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আমি কিন্তু নটবর নস্কর সম্বন্ধে কিছু জানি না, জীবিত অবস্থায় তাকে চোখেও দেখিনি। রামবাবু আর বনমালীবাবুর সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল।'

ব্যোমকেশ রামবাবুর পানে তাকাইল। রামবাবুর গাম্ভীর্যের উপর যেন ঈষৎ শঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে। তিনি উস্‌খুস্‌ করিলেন, একবার গলা ঝাড়া দিয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিয়া আবার মুখ বন্ধ করিলেন। ব্যোমকেশ তখন বনমালীবাবুর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল, 'নটবরবাবু কেমন লোক ছিলেন আপনি নিশ্চয় জানেন?'

বনমালীবাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ—তা—লোক মন্দ নয়— বেশ ভালই লোক ছিলেন—তবে—'

এতক্ষণে রামবাবু বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইলেন, তিনি বনমালীবাবুর অসমাপ্ত কথার মাঝখানে বলিলেন, 'দেখুন, নটবরবাবুর সঙ্গে আমাদের মোটেই ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবে যখন ঢাকায় ছিলাম তখন নটবরবাবু পাশের বাড়িতে থাকতেন, তাই সামান্য মুখ চেনাচেনি ছিল। ওঁর চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কতদিন আগে আপনারা ঢাকায় ছিলেন?'

রামবাবু ঢোক গিলিয়া বলিলেন, 'পাঁচ-ছয় বছর আগে। তারপর দেশ ভাগাভাগির দাঙ্গা শুরু হল, আমরা পশ্চিমবঙ্গে চলে এলাম।'

ব্যোমকেশ বনমালীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঢাকায় আপনারা দু'জনে একই অফিসে চাকরি করতেন বুঝি?'

বনমালীবাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। গডফ্রে ব্রাউন কোম্পানির নাম শুনেছেন, মস্ত বিলিতি কোম্পানি। আমরা সেখানেই—'

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই রামবাবু সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'বনমালী! আজ সাতটার সময় নারায়ণবাবুর বাসায় যেতে হবে মনে আছে?— আচ্ছা, আজ আমরা উঠি।'

বনমালীকে সঙ্গে লইয়া রামবাবু দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্যোমকেশ ঘাড় ফিরাইয়া তাঁহাদের নিষ্ক্রমণ ক্রিয়া দেখিল।

ভূপেশবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার প্রশ্নগুলি শুনতে খুবই নিরীহ, কিন্তু রামবাবুর আঁতে ঘা লেগেছে।'

ব্যোমকেশ ভালমানুষের মত বলিল, 'কেন আঁতে ঘা লাগল বুঝতে পারলাম না। আপনি কিছু জানেন?'

ভূপেশবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'কিছুই জানি না। দাঙ্গার সময় আমি অবশ্য ঢাকায় ছিলাম, কিন্তু ওঁদের সঙ্গে তখন পরিচয় ছিল না। ওঁদের অতীত সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।'

'দাঙ্গার সময় আপনিও ঢাকায় ছিলেন?'

'হ্যাঁ। দাঙ্গার বছরখানেক আগে ঢাকায় বদলি হয়েছিলাম, দেশ ভাগ হবার পর ফিরে আসি।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল। ভূপেশবাবু কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি যে গল্প বললেন, পুত্রশোক ভোলবার জন্যে একজন ব্রিজ খেলত, সেটা কি সত্যি গল্প?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, সত্যি গল্প। অনেক দিন আগের কথা আমি তখন কলেজে পড়তাম। কেন বলুন দেখি?'

ভূপেশবাবু উত্তর দিলেন না, উঠিয়া গিয়া দেরাজ হইতে একটি ফটোগ্রাফ আনিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিলেন। একটি নয়-দশ বছরের ছেলের ছবি; কৈশোরের লাবণ্যে মুখখানি টুলটুল

করিতেছে। ভূপেশবাবু অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'আমার ছেলে !'

ছবি হইতে ভূপেশবাবুর মুখের পানে উৎকণ্ঠিত চক্ষু তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ছেলে—'

ভূপেশবাবু ঘাড় নাড়িলেন, 'মারা গেছে। ঢাকায় যেদিন দাঙ্গা শুরু হয় সেদিন স্কুলে গিয়েছিল, স্কুল থেকে আর ফিরে এল না।'

দুর্বহ মৌন ভঙ্গ করিয়া ব্যোমকেশ অর্ধোচ্চারিত প্রশ্ন করিল, 'আপনার স্ত্রী— ?'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'সেও মারা গেছে। হার্ট দুর্বল ছিল, পুত্রশোক সইতে পারল না। আমি মরলাম না, ভুলতেও পারলাম না। পাঁচ ছয় বছর কেটে গেছে, এতদিনে ভুলে যাবার কথা। কিন্তু কাজ করি, তাস খেলি, হেসে খেলে বেড়াই, তবু ভুলতে পারি না। ব্যোমকেশবাবু, শোকের স্মৃতি মুছে ফেলবার কি কোনো ওষুধ আছে ?'

ব্যোমকেশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'একমাত্র ওষুধ মহাকাল।'

২

পরদিন সকালে চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামীকে দর্শন করে আসা যাক।'

কাল রাত্রে ভূপেশবাবুর জীবনের ট্র্যাজেডি শুনিয়া মনটা ছায়াচ্ছন্ন হইয়া ছিল, প্রণব দারোগার সম্মুখীন হইতে হইবে শুনিয়া আরো দমিয়া গেলাম। বলিলাম, 'প্রণবানন্দ বাবাজিকে দর্শন করা কি একান্ত দরকার ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিসের সন্দেহ থেকে যদি মুক্ত হতে না চাও তাহলে দরকার নেই।'

'চল।'

সাড়ে ন'টার সময় সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে নামিয়া দেখিলাম ভূপেশবাবুর দ্বারে তালা লাগানো। তিনি নিশ্চয় অফিসে গিয়াছেন। তিন নম্বর ঘর হইতে রামবাবু ও বনমালীবাবু ধড়াচূড়া পরিয়া বাহির হইতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ আমার পানে চোখ বাঁকাইয়া হাসিল।

নীচের তলায় শিবকালীবাবু অফিসে বসিয়া হিসাব দেখিতেছিলেন, ব্যোমকেশকে দেখিতে পাইয়া লাফাইয়া দ্বারের কাছে আসিলেন, ব্যাকুল চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু ! কটক থেকে কবে এলেন— কখন এলেন ? নটবর নস্করের কথা শুনেছেন তো ! কি মুশকিল দেখুন দেখি, পুলিস আমাকে ধরে টানাটানি করছে— নাহক টানাটানি করছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুধু আপনাকে নয়, অজিতকে নিয়েও টানাটানি করছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো। বাদামী র‍্যাপার ! মানে হয় না— মানে হয় না।— আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।'

'দেখি চেষ্টা করে।'

রাস্তায় নামিয়া ব্যোমকেশ থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'এস, গলিটা দেখে যাই।'

'গলিটা' মানে আমাদের বাসার পাশের গলি, যে গলি দিয়া বাদামী আলোয়ান গায়ে লোকটা নটবরবাবুকে গুলি করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গলি, দুইজন মানুষ পাশাপাশি হাঁটিতে পারে না। আমরা আগে পিছে গলিতে প্রবেশ করিলাম ; ব্যোমকেশ ইট-বাঁধানো মেঝের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। তাহার মনে কী আছে জানি না, কিন্তু তিন দিন পরে গলির মধ্যে হত্যাকারীর কোনো নিশানা পাওয়া যাইবে ইহা আশা করাও দুরাশা।

নটবরবাবুর ঘরের জানালা বন্ধ। ব্যোমকেশ সেইখানে গিয়া ইট-বাঁধানো জমির উপর সন্ধানী চক্ষু বুলাইতে লাগিল। জানালাটি গলি হইতে চার ফুট উঁচুতে অবস্থিত, কপাট খোলা থাকিলে গলিতে দাঁড়াইয়া স্বচ্ছন্দে ঘরের মধ্যে গুলি চালানো যায়।

'ওটা কিসের দাগ ?'

ব্যোমকেশের অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, ঠিক জানালার নীচে ইট-বাঁধানো মেঝের উপর পাঁশুটে রঙের একটা দাগ রহিয়াছে ; তিন ইঞ্চি ব্যাসের নক্ষত্রাকার একটা দাগ। গলিতে মাঝে মাঝে ঝাঁট পড়ে, কিন্তু সম্মার্জনীর তাড়না সত্ত্বেও দাগটা মুছিয়া যায় নাই। দুই তিন দিনের পুরানো দাগ মনে হয়।

বলিলাম, 'কিসের দাগ ?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, হঠাৎ গলির মধ্যে ডন ফেলার ভঙ্গীতে লম্বা হইয়া দাগের উপর নাসিকা স্থাপন করিল। বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'ওকি ! মাটিতে নাক ঘষছ কেন ?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'নাক ঘষিনি। শুঁকছিলাম।'

'শুঁকছিলে ! কেমন গন্ধ ?'

'যদি জানতে চাও তুমিও শুঁকে দেখতে পার।'

'আমার দরকার নেই।'

'তাহলে চল থানায়।'

গলি হইতে বাহির হইয়া থানার দিকে চলিলাম। দু'একবার ব্যোমকেশের মুখের পানে অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু রাস্তার গন্ধ শুঁকিয়া সে কিছু পাইয়াছে কিনা বোঝা গেল না।

থানায় প্রণব দারোগা ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চেহারা মোটের উপর ভালোই, দোহারা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ শরীর ; দোষের মধ্যে শরীরের খাড়াই মাত্র পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি।

ব্যোমকেশকে দেখিয়া তাঁহার চোখে প্রথমে বিস্ময়, তারপর ছদ্মবিনয় ভাব ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু ! সকালে উঠেই আপনার মুখ দেখলাম— কী সৌভাগ্য। খিক্ খিক্।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার সৌভাগ্যও কম নয়। সকালবেলা বেঁটে মানুষ দেখলে কী ফল হয় তা শাস্ত্রেই লেখা আছে— রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।'

প্রণব দারোগা থতমত খাইয়া গেলেন। ব্যোমকেশ চিরদিন প্রণব দারোগার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার মেজাজ অন্য রকম। প্রণববাবু প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'আমার চেহারা আকাশ পিদ্দিমের মত নয় তা স্বীকার করি।'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'স্বীকার না করে উপায় নেই। আকাশ পিদ্দিমের মাথায় আলো জ্বলে ; ঐখানেই আপনার সঙ্গে তফাত।'

প্রণববাবুর মুখ কালো হইয়া উঠিল, তিনি চেষ্টাকৃত কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, 'কি করব বলুন, সকলের মাথায় তো গ্যাস-লাইট জ্বলে না। — কিছু দরকার আছে কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে বইকি। প্রথমত, অজিত যে ফেরারী হয়নি তার প্রমাণস্বরূপ ওকে ধরে এনেছি। আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আমি ওর ওপর নজর রেখেছি, আমার দৃষ্টি এড়িয়ে ও পালাতে পারবে না।'

প্রণববাবু অপ্রস্তুতভাবে হাসিবার চেষ্টা করিলেন। ব্যোমকেশ নির্দয়ভাবে বলিয়া চলিল, 'আপনি অজিতকে শহরবন্দী করে রেখেছেন একথা শুনলে কমিশনার সাহেব কি বলবেন আমি জানি না, কিন্তু জানবার আগ্রহ আছে। দেশে আইন আদালত আছে, জনসাধারণের স্বাধীনতার ওপর অকারণ হস্তক্ষেপ করলে পুলিস কর্মচারীরও সাজা হতে পারে। যাহোক, এসব পরের কথা। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, নটবর নস্করের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি কোনো সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন কিনা।'

প্রণববাবু এই প্রশ্নের রূঢ় উত্তর দিবেন কিনা চিন্তা করিলেন। কিন্তু ব্যোমকেশকে তাহার বর্তমান মানসিক অবস্থায় ঘাঁটানো উচিত হইবে না বুঝিয়া তিনি ধীরস্বরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, এই কলকাতা শহরের জনসংখ্যা কত আপনার জানা আছে কি ?'

ব্যোমকেশ তাচ্ছিল্যভারে বলিল, 'কখনো গুনে দেখিনি, লাখ পঞ্চাশেক হবে।'

প্রণববাবু বলিলেন, 'ধরুন পঞ্চাশ লাখ। এই অর্ধকোটি মানুষের মধ্যে থেকে বাদামী আলোয়ান গায়ে একটি লোককে ধরা কি সহজ ? আপনি পারেন ?'

'সব খবর পেলে হয়তো পারি।'

'বাইরের লোককে সব খবর জানানো যদিও আমাদের রীতি বিরুদ্ধ, তবু যতটুকু জানি আপনাকে বলতে পারি।'

'বেশ, বলুন। নটবর নস্করের আত্মীয়-স্বজনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেছে ?'

'না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি।'

'ময়না তদন্তের ফলাফল কি রকম ?'

'বুকের হাড় ফুটো করে গুলি হৃদ্‌যন্ত্রে ঢুকেছে। পিস্তলের সঙ্গে গুলি মিলিয়ে দেখা গেছে, গুলি ওই পিস্তল থেকেই বেরিয়েছে।'

'আর কিছু ?'

'শরীর সুস্থই ছিল, কিন্তু চোখে ছানি পড়বার উপক্রম হয়েছিল।'

'পিস্তলের মালিক কে ?'

'মার্কিন ফৌজি পিস্তল, কালোবাজারে কিনতে পাওয়া যায়। মালিকের নাম জানার উপায় নেই।'

'ঘর তল্লাশ করে কিছু পেয়েছেন ?'

'দরকারী জিনিস যা পেয়েছি তা ওই টেবিলের ওপর আছে। একটা ডায়েরি, গোটা পাঁচেক টাকা, ব্যাঙ্কের পাস-বুক, আর একটা আদালতের রায়ের বাজাপ্তা নকল। আপনি ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন।'

ঘরের কোণে একটা টেবিল ছিল, ব্যোমকেশ উঠিয়া সেইদিকে গেল, আমি গেলাম না। প্রণব দারোগা লোক ভাল নয়, তিনি যদি আপত্তি করেন একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। বসিয়া বসিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ ব্যাঙ্কের খাতা পরীক্ষা করিল, ডায়েরির পাতা উল্টাইল, স্ট্যাম্প কাগজে লেখা আদালতী দলিল মন দিয়া পড়িল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'দেখা হয়েছে।'

প্রণব দারোগার দুষ্টবুদ্ধি এতক্ষণে আবার চাড়া দিয়াছে, তিনি মিটিমিটি চাহিয়া বলিলেন, 'আমি যা-যা দেখেছি আপনিও তাই দেখলেন। আসামীর নাম-ধাম সব জানতে পেরে গেছেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, পেরেছি।'

ভ্রূ আকাশে তুলিয়া প্রণববাবু বলিলেন, 'বলেন কি ! এরি মধ্যে ! আপনার তো ভারি বুদ্ধি ! তা দয়া করে আসামীর নামটা আমায় বলুন, আমি তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলি !'

ব্যোমকেশ চোয়াল শক্ত করিয়া বলিল, 'আসামীর নাম আপনাকে বলব না দারোগাবাবু ; ওটা আমার নিজস্ব আবিষ্কার। আপনি এই কাজের জন্যে মাইনে খান, আপনাকে নিজে থেকে খুঁজে বার করতে হবে। তবে একটু সাহায্য করতে পারি। মেসের পাশের গলিটা খুঁজে দেখবেন।'

'সেখানে আসামী তার পদচিহ্ন রেখে গেছে নাকি ! খিক্ খিক্।'

'না, পদচিহ্নের চেয়েও গুরুতর চিহ্ন রেখে গেছে। —আর একটা কথা জানিয়ে যাই। দু'চার দিনের মধ্যেই আমি অজিতকে নিয়ে কটকে চলে যাব। আপনার যদি সাহস থাকে তাকে আটকে রাখুন। —চল অজিত।'

থানা হইতে বাহির হইয়া আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, 'কে আসামী, ধরতে পেরেছ ?'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'থানায় আসার আগেই জানতে পেরেছি, কিন্তু প্রণব দারোগা একটা ইয়ে। বুদ্ধি নেই তা নয়, বিপরীত বুদ্ধি। ও কোনো কালে নটবর নস্করের খুনীকে ধরতে পারবে না।'

প্রশ্ন করিলাম, 'নটবর নস্করের খুনী কে ? চেনা লোক ?'

'পরে বলব। আপাতত এইটুকু জেনে রাখো যে, নটবর নস্করের পেশা ছিল ব্ল্যাকমেল করা। তুমি বাসায় ফিরে যাও, আমি অফিস-পাড়ায় যাচ্ছি। কলকাতাতেও গডফ্রে ব্রাউনের প্রকাণ্ড ব্যবসা আছে, তাদের অফিসে কিছু খোঁজ-খবর পাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, আমার ফিরতে দেরি হবে।' হাত নাড়িয়া সে চলিয়া গেল।

আমি একাকী বাসায় ফিরিলাম। ব্যোমকেশ ফিরিল বেলা তখন দেড়টা।

স্নানাহারের পর সে বলিল, 'একটা কাজ করতে হবে ; বিকেলবেলা তুমি গিয়ে রামবাবুকে, বনমালীবাবুকে এবং ভূপেশবাবুকে চায়ের নেমন্তন্ন করে আসবে। সন্ধ্যের পর এই ঘরে সভা বসবে।'

'তথাস্তু। কিন্তু ব্যাপার কি ! গডফ্রে ব্রাউনের অফিসে গিয়েছিলে কেন ?'

'থানায় নটবর নস্করের জিনিসগুলোর মধ্যে একটা আদালতের রায় ছিল। সেটা পড়ে দেখলাম রাসবিহারী বিশ্বাস এবং বনবিহারী বিশ্বাস নামে দুই ভাই গডফ্রে ব্রাউন কোম্পানির ঢাকা ব্রাঞ্চে যথাক্রমে খাজাঞ্চী ও তস্য সহকারী ছিল। সাত বছর আগে তারা অফিসের টাকা চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। মামলা হয় এবং বনবিহারীর দু'বছর ও রাসবিহারীর তিন বছর জেল হয়। সেই মোকদ্দমার রায় নটবর নস্কর যোগাড় করেছিল। তারপর তার ডায়েরি খুলে দেখলাম, প্রতি মাসে সে রাসবিহারী ও বনবিহারী বিশ্বাসের কাছ থেকে আশি টাকা পায়। গডফ্রে ব্রাউনের অফিসে গিয়ে চুরি-ঘটিত মামলার কথা যাচাই করে এলাম। সত্যি ঘটনা। সন্দেহ রইল না, নটবর তাদের ব্ল্যাকমেল করছিল।'

'কিন্তু—রাসবিহারী বনবিহারী— এরা কারা ? এদের কোথায় খুঁজে পাবে ?'

'বেশি দূর খুঁজতে হবে না, এই মেসের তিন নম্বর ঘরে তাঁদের পাওয়া যাবে।'

'অ্যাঁ ! রামবাবু আর বনমালীবাবু !'

'হ্যাঁ। তুমি কাছাকাছি আন্দাজ করেছিলে। ওরা মাসতুত ভাই নয়, সাক্ষাৎ সহোদর ভাই। তবে যদি চোরে চোরে মাসতুত ভাই এই প্রবাদ-বাক্যের মর্যাদা রাখতে চাও তাহলে মাসতুত ভাই বলতে পার।'

'কিন্তু— কিন্তু—এরা তো নটবর নস্করকে খুন করতে পারে না। নটবর যখন খুন হয় তখন তো ওরা—'

হাত তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ধৈর্য ধারণ কর। আগাগোড়া কাহিনী আজ চায়ের সময় শুনতে পাবে।'

মাড়োয়ারীর দোকানের রকমারি ভাজাভুজি ও চা দিয়া অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথমে দেখা দিলেন ভূপেশবাবু। ধুতি পাঞ্জাবির উপর কাঁধে পাট-করা ধূসর রঙের শাল, মুখে উৎসুক হাসি। বলিলেন, 'ব্রিজ খেলার ব্যবস্থা আছে নাকি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনারা যদি খেলতে চান ব্যবস্থা করা যাবে।'

কিছুক্ষণ পরে রামবাবু ও বনমালীবাবু আসিলেন। গায়ে গলাবন্ধ কোট, চোখে সতর্ক দৃষ্টি। ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন আসুন।'

পানাহারের সঙ্গে ব্যোমকেশ সরস বাক্যালাপ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করিলাম, রামবাবু ও বনমালীবাবুর আড়ষ্ট ভাব শিথিল হইয়াছে। তাঁহারা সহজভাবে কথাবার্তায় যোগ দিতেছেন।

মিনিট কুড়ি পরে জলযোগ সমাপ্ত করিয়া রামবাবু চুরুট ধরাইলেন ; ব্যোমকেশ ভূপেশবাবুকে সিগারেট দিয়া সিগারেটের টিন বনমালীবাবুর সামনে ধরিল, 'আপনি একটা নিন, বনবিহারীবাবু।'

বনমালীবাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে, আমি সিগারেট খাই না—' বলিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেলেন— 'আজ্ঞে—আমার নাম—'

'আপনাদের দুই ভায়েরই প্রকৃত নাম আমি জানি—রাসবিহারী এবং বনবিহারী বিশ্বাস।'—ব্যোমকেশ নিজের চেয়ারে গিয়া বসিল, 'নটবর নস্কর আপনাদের ব্ল্যাকমেল

করছিল। আপনারা মাসে মাসে তাকে আশি টাকা দিচ্ছিলেন—'

রাসবিহারী ও বনবিহারী দারুমূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ নিজে সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, 'নটবর নস্কর লোকটা ছিল অতি বড় শয়তান। যখন ঢাকায় ছিল তখন প্রকাশ্যে দালালির কাজ করত, আর সুবিধা পেলে ব্ল্যাকমেলের ব্যবসা চালাত। আপনারা দুই ভাই যখন জেলে গেলেন তখন সে ভবিষ্যতের কথা ভেবে আদালতের রায়ের নকল যোগাড় করে রাখল। মতলব, আপনারা জেল থেকে বেরিয়ে আবার যখন চাকরি-বাকরি করবেন তখন আপনাদের রক্ত শোষণ করবে।

'তারপর একদিন দেশ ভাগাভাগি হয়ে গেল। ঢাকায় নটবরের ব্যবসা আর চলল না, সে কলকাতায় পালিয়ে এল। কিন্তু এখানে তার জানা-শোনা লোকের সংখ্যা কম, বৈধ এবং অবৈধ কোনো রকম ব্যবসারই সুবিধে নেই, ব্ল্যাকমেল করার উপযুক্ত পাত্র নেই। তার ব্যবসায় ভাঁটা পড়ল। এই মেসে এসে একটা ঘর নিয়ে সে রইল ; সামান্য যা টাকা সঙ্গে আনতে পেরেছিল তাই দিয়ে জীবন নির্বাহ করতে লাগল।

'এখানে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন সে আপনাদের দেখল এবং চিনতে পারল। আপনারা এই মেসেই থাকেন। খোঁজখবর নিয়ে সে জানতে পারল যে আপনারা ছদ্মনামে এক ব্যাঙ্কে চাকরি করছেন। নটবর নস্কর রোজগারের একটা রাস্তা পেয়ে গেল। ভগবান যেন আপনাদের হাত-পা বেঁধে তার হাতে সঁপে দিলেন।

'নটবর আপনাদের বলল, টাকা দাও, নইলে ব্যাঙ্কে তোমাদের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে দেব। আপনারা নিরুপায় হয়ে মাসে মাসে টাকা গুনতে লাগলেন। টাকা অবশ্য বেশি নয়, মাসে আশি টাকা। কিন্তু নটবরের পক্ষে তাই বা মন্দ কি। অন্তত মেসের খরচটা উঠে আসে।

'এইভাবে চলছিল। আপনাদের প্রাণে সুখ নেই, কিন্তু নটবরের হাত ছাড়ানোর উপায়ও নেই। একমাত্র উপায়, যদি নটবরের মৃত্যু হয়।'

ব্যোমকেশ থামিল। রুদ্ধশ্বাস নীরবতা ভাঙিয়া বনবিহারী হাউমাউ করিয়া উঠিলেন, 'দোহাই ব্যোমকেশবাবু, আমরা নটবর নস্করকে মারিনি। নটবর যখন মরে তখন আমরা ভূপেশবাবুর ঘরে ছিলাম।'

'তা বটে!' ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়ে ঊর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়িল, অবহেলাভরে বলিল, 'কে নটবরকে খুন করেছে তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই। মাথা-ব্যথা পুলিসের। কিন্তু আপনারা ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। ব্যাঙ্কে যদি কোনো দিন টাকার গরমিল হয় তখন আমাকে আপনাদের আসল পরিচয় প্রকাশ করতে হবে।'

এবার রামবাবু ওরফে রাসবিহারীবাবু কথা বলিলেন, 'ব্যাঙ্কের টাকার গরমিল হবে না। আমরা একবার যে-ভুল করেছি দ্বিতীয়বার সে-ভুল করব না।'

'ভাল কথা। তাহলে আমি আর অজিত নীরব থাকব।' ব্যোমকেশ ভূপেশবাবুর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনি ?'

ভূপেশবাবুর মুখে বিচিত্র হাসি খেলিয়া গেল, তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'আমিও নীরব। আমার মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুবে না।'

অতঃপর ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর রামবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 'আপনাদের দয়া জীবনে ভুলব না। আচ্ছা, আজ আমরা যাই, আমার শরীর একটু অসুস্থ বোধ হচ্ছে।'

'আসুন।' ব্যোমকেশ তাঁহাদের দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া দিল, তারপর দ্বার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

ভূপেশবাবু ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন দেখিলাম। ব্যোমকেশও প্রত্যুত্তরে হাসিল। ভূপেশবাবু বলিলেন, 'রামবাবু আর বনমালীবাবুর সঙ্গে নটবর নস্করের অবৈধ যোগাযোগ আছে আমি জানতাম না, ব্যোমকেশবাবু। ওটা সমাপতন। আপনি বোধ হয় সবই বুঝতে

পেরেছেন— কেমন ?'

ব্যোমকেশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'সব বুঝতে পারিনি, তবে মোট কথা বুঝেছি।'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'আপনি তাহলে গল্পটা বলুন। আমার যদি কিছু বলবার থাকে আমি পরে বলব।'

ব্যোমকেশ ভূপেশবাবুকে একটি সিগারেট দিল, নিজে একটি ধরাইয়া আমার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল, 'তুমি নটবরের মৃত্যুর একটা বিবরণ লিখেছ। সেটা পড়ে আমার খট্‌কা লাগল। পিস্তলের আওয়াজ এত জোরে হয় না ; এ যেন ছর্‌রা বন্দুকের আওয়াজ, কিম্বা বোমা ফাটার আওয়াজ। অথচ নটবর মরেছে পিস্তলের গুলিতে।

'রামবাবু এবং বনমালীবাবুর মধ্যে চেহারার সাদৃশ্য তুমি লক্ষ্য করেছিলে। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখলাম তাঁরা কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন। নটবরের ঘরে তাঁদের যাতায়াত ছিল, সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে আমার মনে কৌতূহল হল।

'কিন্তু যখন বন্দুকের আওয়াজ হয় তখন ওঁরা দোতলায় ভূপেশবাবুর ঘরে ছিলেন। ভূপেশবাবুর ঘরের পরিস্থিতি অতিশয় নিরুদ্বেগ ও স্বাভাবিক। তিনি নিজের ঘরে আছেন, ছ'টা বেজে পঁচিশ মিনিটে রাসবিহারী ও বনবিহারী তাস খেলতে এলেন। কিন্তু অজিত না আসা পর্যন্ত তাস খেলা আরম্ভ হচ্ছে না। দু'মিনিট পরে সিঁড়িতে অজিতের ফট্‌ফট্‌ চটির শব্দ শোনা গেল। ভূপেশবাবু উঠে গিয়ে গলির দিকের জানলা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গলিতে দুম্‌ করে শব্দ হল। রাসবিহারী ও বনবিহারী জানালার কাছে গেলেন। ভূপেশবাবু বলে উঠলেন, 'ঐ—ঐ—গলি থেকে বেরিয়ে গেল, দেখতে পেলেন ? গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান— ?'

'গলির মুখের কাছে সদর রাস্তা দিয়ে লোক যাতায়াত করছিল, রাসবিহারী ও বনবিহারী তাদেরই একজনকে দেখে ভাবলেন সে গলি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের সন্দেহ রইল না যে, ভূপেশবাবু ঠিক কথাই বলছেন। তাঁদের বিশ্বাস হল যে, তাঁরাও লোকটাকে গলি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। এই ধরনের ভ্রান্তি চেষ্টা করলে সৃষ্টি করা যায়।

'পরে নটবরের ঘরের জানলার ওপর পিস্তলটা পাওয়া গেল। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আততায়ী পিস্তলটা ফেলে গেল কেন ? অস্ত্র ফেলে যাওয়ার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। আমার সন্দেহ হল এই সহজ স্বাভাবিক পরিস্থিতির আড়ালে মস্ত একটা ধাপ্পাবাজি রয়েছে।

'মেসের চাকর হরিপদ সন্ধ্যে ছ'টার সময় শুনেছিল নটবরের ঘরে লোক আছে। যদি সেই লোকটাই নটবরকে খুন করে থাকে ? এবং নিজের অ্যালিবাই তৈরি করার জন্যে মৃত্যুর সময়টা এগিয়ে এনে থাকে ? পনেরো কুড়ি মিনিটের তফাত ময়না তদন্তে ধরা পড়ে না।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, খুন যে-ই করুক, সে বাইরের লোক নয়, মেসের লোক। কিন্তু লোকটা কে ? শিবকালীবাবু ? রাসবিহারী-বনবিহারী ? কিম্বা অন্য কেউ। কার মোটিভ আছে জানি না, কিন্তু সুযোগ আছে একমাত্র শিবকালীবাবুর। অন্য সকলের অকাট্য অ্যালিবাই আছে।

'মনটা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে রইল, কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না। লক্ষ্য করেছিলাম যে, ভূপেশবাবুর ঘরের নীচে নটবরের ঘর এবং গলির দিকে ভূপেশেবাবুর জানলার নীচে নটবরের জানলা। কিন্তু পটকার কথা একেবারেই মনে আসেনি। হ্যাঁ, পটকা। যে পটকা আছাড় মারলে কিম্বা উঁচু থেকে শক্ত মেঝের উপর ফেললে আওয়াজ হয় সেই পটকা।

'আজ সকালে থানায় যাচ্ছিলাম, যদি থানায় গিয়ে কিছু নতুন খবর পাই এই আশায়। বেরুবার সময় মনে হল, দেখি তো গলির মধ্যে নটবরের জানলার কাছে কোনো চিহ্ন পাই কিনা।

'চিহ্ন পেলাম। ঠিক নটবরের জানলার নীচে ইট-বাঁধানো মেঝের ওপর পটকা ফাটার পাঁশুটে দাগ। শুঁকে দেখলাম অল্প বারুদের গন্ধও রয়েছে। আর সন্দেহ রইল না। চমৎকার একটি অ্যালিবাই সাজানো হয়েছে। কে অ্যালিবাই সাজিয়েছে ? ভূপেশবাবু ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কারণ তিনিই জানলা খুলেছিলেন। রাসবিহারী এবং বনবিহারী জানলার কাছে এসেছিলেন আওয়াজ হওয়ার পরে।

'সেদিন সন্ধে ছ'টার সময় ভূপেশবাবু অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে গিয়েছিলেন। পিস্তল আগে থাকতেই যোগাড় করা ছিল, তিনি নটবরের ঘরে ঢুকে নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে গুলি করলেন। গলির দিকের জানলা খুলে দিয়ে সেখানে পিস্তল রেখে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। ভাগ্যক্রমে কেউ তাঁর যাতায়াত দেখতে পেল না। কিন্তু যদি কেউ দেখে ফেলে থাকে তাই অ্যালিবাই দরকার। তিনি নিজের ঘরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দশ মিনিট পরে রাসবিহারী ও বনবিহারী তাস খেলতে এলেন। কিন্তু অজিত তখনো আসেনি, তাই তিনজনে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'তারপর ভূপেশবাবু সিঁড়িতে অজিতের চটির ফট্‌ফট্‌ শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি তৈরি ছিলেন, তাঁর মুঠোর মধ্যে ছিল একটি মার্বেলের মত পটকা। ঘরের বন্ধ হাওয়ার অজুহাতে তিনি গলির দিকের জানলা খুলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুঠি থেকে পটকাটি জানলার বাইরে ফেলে দিলেন। নীচে দুম্‌ করে শব্দ হল। রাসবিহারী ও বনবিহারী ছুটে জানলার কাছে গেলেন ; ভূপেশবাবু তাঁদের বাদামী আলোয়ান গায়ে কাল্পনিক আততায়ী দেখালেন।

'তারপর ভূপেশবাবুকে আর কিছু করতে হল না ; স্বাভাবিক নিয়মে যথাসময়ে লাশ আবিষ্কৃত হল। পুলিস এল, লাশ নিয়ে চলে গেল। যবনিকা পতন।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। ভূপেশবাবু এতক্ষণ নিবাত নিষ্কম্প বসিয়া শুনিতেছিলেন, এখনো তিনি নিশ্চল বসিয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহার পানে ভ্রূ বাঁকাইয়া বলিল, 'কোথাও ভুল পেলেন কি ?'

ভূপেশবাবু এবার নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন, স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না, ভুল পাইনি। ভুল আমিই করেছিলাম, ব্যোমকেশবাবু। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন তা ভাবিনি। ভেবেছিলাম আপনি ফিরে আসতে আসতে নটবরের মামলা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, বলিল, 'দুটো প্রশ্নের উত্তর পাইনি। এক, আপনার মোটিভ কি। দুই, পিস্তলের আওয়াজ চাপা দিলেন কেমন করে। বন্ধ ঘরের মধ্যে পিস্তল ছুঁড়লেও আওয়াজ বাইরে যাবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আপনি কি কোনো সতর্কতাই অবলম্বন করেননি ?'

'দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আগে দিচ্ছি'— ভূপেশবাবু কাঁধ হইতে পাট-করা শাল লইয়া দুই হাতে আমাদের সামনে মেলিয়া ধরিলেন ; দেখিলাম নূতন শালের গায়ে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, 'এই শাল গায়ে জড়িয়ে নটবরের ঘরে গিয়েছিলাম, শালের ভিতর হাতে পিস্তল ছিল। নটবরকে শালের ভিতর থেকে গুলি করেছিলাম ; গুলির আওয়াজ শালের মধ্যেই চাপা পড়েছিল, বাইরে যেতে পারেনি।'

ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'আর প্রথম প্রশ্নের উত্তর ? আমি কতকটা আন্দাজ করেছি ; কাল আপনি ছেলের ফটো দেখিয়েছিলেন। যাহোক, আপনি বলুন।'

ভূপেশবাবুর কপালের শিরা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি সংযত স্বরেই বলিলেন, 'ছেলের ফটো দেখিয়েছিলাম, কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনি সত্য আবিষ্কার করবেন। তাই আগে থেকে নিজের সাফাই গেয়ে রেখেছিলাম। ঢাকায় যেদিন দাঙ্গা বাধে সেদিন নটবর আমার ছেলেকে স্কুল থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যের পর সে আমার বাসায় এসে বলল, দশ হাজার টাকা পেলে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারে। নগদ দশ হাজার টাকা আমার কাছে ছিল না ; যা ছিল সব দিলাম, আমার স্ত্রী গায়ের সমস্ত গয়না খুলে দিলেন। নটবর সব নিয়ে চলে গেল, কিন্তু আমি ছেলেকে ফিরে পেলাম না। নটবরের দেখাও আর পেলাম না। তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে, আমি স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে কলকাতায় চলে এসেছি, হঠাৎ একদিন রাস্তায় নটবরকে দেখতে পেলাম। তারপর—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। আর বলবার প্রয়োজন নেই, ভূপেশবাবু।'

ভূপেশবাবু কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া শেষে বলিলেন, 'এখন আমার সম্বন্ধে আপনি কি করতে চান ?'

ব্যোমকেশ উর্ধ্বদিকে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র কোথায় যেন একবার বলেছিলেন, 'দাঁড় কাক মারলে ফাঁসি হয় না।' আমার বিশ্বাস শকুনি মারলেও ফাঁসি হওয়া উচিত নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

রুম নম্বর দুই

নিরুপমা হোটেলের ম্যানেজার হরিশচন্দ্র হোড় ঘুম ভেঙেই ঘড়ি দেখলেন— সাড়ে ছ'টা। তিনি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন। ইঃ, আজ বেজায় দেরি হয়ে গেছে। তিনি ডাকলেন, 'গুণধর !'

তকমা-উর্দি পরা সর্দার খানসামা গুণধর এসে দাঁড়াল। শীর্ণকান্তি অত্যন্ত কর্মকুশল চৌকশ লোক, হোটেলের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির প্রতি নজর আছে। হরিশচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেড-টি দেওয়া হয়েছে ?'

গুণধর বলল, 'আজ্ঞে। তেতলার সবাই চা নিয়েছেন, কেবল দোতলার দু'নম্বর ঘরে টোকা দিয়ে সাড়া পেলাম না।'

হরিশচন্দ্র বললেন, 'দোতলার দু'নম্বর— রাজকুমারবাবু। পনেরো মিনিট পরে আবার টোকা দিও। —বাজারে কে গেছে ?'

'জেনারেলকে নিয়ে সরকার মশায় গেছেন।'

'বেশ। আমার চা নিয়ে এস।' হরিশচন্দ্র উঠে কক্ষ-সংলগ্ন বাথরুমে প্রবেশ করলেন।

রাসবিহারী অ্যাভেন্যু ও গড়িয়াহাটার চৌমাথা থেকে অনতিদূরে নিরুপমা হোটেল। দেশী হোটেল হলেও তার ভাবভঙ্গী একটু বিলিতি-ঘেঁষা। চাকরেরা খানসামার মত তকমা-উর্দি পরে, সদর দরজার সামনে সকাল বিকেল জেনারেলের মত সাজপোশাক পরা দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে এবং যোগ্য ব্যক্তিকে সেলাম করে। তিনতলা বাড়ির প্রত্যেক তলায় আটখানি ঘর। নীচের তলায় ম্যানেজারের দু'টি ঘর, বাসকক্ষ ও অফিস ; টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজানো ডাইনিং রুম ; রান্নাঘর, বাবুর্চিখানা, চাকরদের ঘর, স্টোর-রুম ইত্যাদি। হোটেলে দেশী ও বিলিতি দু'রকম খাদ্যই পাওয়া যায়, যার যেমন ইচ্ছা খেতে পারেন। হোটেলে থাকার মাশুল বিলিতি হোটেলের চেয়ে কম, কিন্তু সাধারণ দেশী হোটেলের চেয়ে বেশি। ছোট হোটেল, তাই অধিকাংশ সময়ই পূর্ণ থাকে, উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অতিথি এখানে আসেন।

আধঘণ্টা পরে হরিশচন্দ্র বাথরুম থেকে বিলিতি পোশাক পরে বেরুলেন। দোহারা আকৃতির লোক, তাই কোট-প্যান্ট পরলে বেশ মানায় ; বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, চোখের দৃষ্টিতে অভিজ্ঞতা এবং সংসারবুদ্ধি পরিস্ফুট।

টেবিলের ওপর চা এবং প্রাতরাশ সাজিয়ে গুণধর দাঁড়িয়ে ছিল, হরিশচন্দ্র খেতে বসলেন। চা টোস্ট মাখন ও দুটি অর্ধ-সিদ্ধ ডিম। আহারের সময় হরিশচন্দ্র কথা বলেন না, পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রাতরাশ শেষ করে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'রাজকুমারবাবুর খবর আর নিয়েছিলে ?'

গুণধর বলল, 'আজ্ঞে, এবারও সাড়া পাওয়া গেল না।'

হরিশচন্দ্র ভ্রূকুটি করলেন। তারপর উঠে অফিস-ঘরে গেলেন। দেরাজ থেকে চাবির গোছা নিয়ে পকেটে ফেললেন, 'চল, দেখি।'

ফাল্গুন মাস হলেও সাতটার সময় বেলা চড়েছে ; কলতলায়, রান্নাঘরে, ডাইনিং রুমে ঝি-চাকরের কর্মতৎপরতা। আটটার সময় অতিথিদের ব্রেক-ফাস্ট দিতে হবে।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে হরিশচন্দ্র পশ্চাদ্বর্তী গুণধরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাত্তিরে রাজকুমারবাবু ঘরে ছিলেন তো ?'

গুণধর বলল, 'আজ্ঞে, ছিলেন। রাত্রি পৌনে ন'টার সময় আমি নিজের হাতে তাঁকে ডিনার পৌঁছে দিয়েছি।'

'রাত্তিরে সদর দরজা কখন বন্ধ হয়েছিল ?'

'আপনি ফিরলেন এগারোটার সময়, তারপর আমি সদর বন্ধ করেছি।'

দোতলায় এক সারিতে আটটি ঘর, সামনে টানা বারান্দা। সিঁড়ির মুখেই ঘরের নম্বর আরম্ভ হয়েছে। সব দরজা ভেজানো। হরিশচন্দ্র দু'নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে একটু কড়াভাবে টোকা দিলেন।

কেউ সাড়া দিল না। হরিশচন্দ্র তখন ডাক দিলেন, 'রাজকুমারবাবু !'

এবারেও সাড়া এল না। হরিশচন্দ্র আরো গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'রাজকুমারবাবু !' তবু সাড়া নেই। হরিশচন্দ্র তখন দোরের হ্যান্ডেল ঘোরালেন, কিন্তু হ্যান্ডেল ঘুরল না। দোরে ইয়েল্ তালা লাগানো, চাবি না ঘোরালে বাইরে থেকে দোর খুলবে না।

হরিশচন্দ্র পকেট থেকে চাবির গোছা বার করলেন। এই সময় দু'নম্বর ঘরের দু'দিক থেকে দরজা খুলে দু'টি মুণ্ড উঁকি মারল। এক নম্বর থেকে যিনি উঁকি মারলেন তিনি একটি বর্ষীয়সী মহিলা। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে ?' তিন নম্বর ঘর থেকে গলা বাড়িয়েছিলেন মধ্যবয়স্ক একটি পুরুষ ; বললেন, 'ম্যানেজারবাবু, আমার জ্বর হয়েছে, শীগ্‌গির একজন ডাক্তার ডেকে পাঠান।'

মহিলাটি বেরিয়ে এলেন, বললেন, 'আমি ডাক্তার।' তিনি হরিশচন্দ্রকে পেরিয়ে তিন নম্বর ঘরের সামনে গেলেন। তিন নম্বরের অধিবাসী শচীতোষ সান্যাল আরক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করে একবার ডাক্তারের পানে তাকালেন, তারপর দরজা থেকে সরে গিয়ে বললেন, 'আসুন।'

হরিশচন্দ্র গোছা থেকে চাবি বেছে নিয়ে তালায় পরালেন, দরজা একটু ফাঁক করে ভিতরে দেখলেন ; কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর দরজা টেনে আবার বন্ধ করে দিলেন।

বারান্দায় কেউ নেই। হরিশচন্দ্র এদিক ওদিক তাকিয়ে খাটো গলায় গুণধরকে বললেন, 'গুণধর, তুমি এখানে থাকো, কোথাও যেও না। আমি এখনি আসছি।' তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা উত্তেজনায় শীৎকারের মত শোনাল।

তিনি পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেলেন। তিন নম্বর ঘরে মহিলা ডাক্তার শোভনা রায় রোগী শচীতোষ সান্যালকে বিছানায় শুইয়ে তাঁর টেম্পারেচার নিলেন, নাড়ি দেখলেন, জিভ পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'কিছু নয়, সামান্য ঠাণ্ডা লেগেছে। দুটো অ্যাস্‌পিরিনের বড়ি খেয়ে শুয়ে থাকুন।'

শচীতোষ বললেন, 'জ্বর কত ?'

'নাইন্‌টি-নাইন।'

'গায়ে যে ভীষণ ব্যথা !'

'ও কিছু নয়। দো-রসার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যায়। আমি অ্যাস্‌পিরিনের বড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনার ফি কত ?'

'ফি দিতে হবে না।'

তিন নম্বর থেকে বেরিয়ে শোভনা রায় দেখলেন, গুণধর দু'নম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ঘরে কী হয়েছে ?'

গুণধর কেবল মাথা নাড়ল। শোভনা রায় আর কোনো প্রশ্ন না করে নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন।

নীচে হরিশচন্দ্র তখন নিজের অফিস-ঘর থেকে পুলিসকে ফোন করছেন, 'শীগ্‌গির আসুন, খুন

হয়েছে— !'

গত রাত্রে ইন্সপেক্টর রাখাল সরকারের বাড়িতে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের নেমন্তন্ন ছিল। সরকার মশায় দক্ষিণ কলকাতার একটি থানার অধিকারী থানাদার। ব্যোমকেশরা যখন কেয়াতলায় জমি কিনে বাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করেছিল তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ; পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হলো। সরকার মশায় পুলিস হলেও অত্যন্ত মিশুক এবং সহৃদয় ব্যক্তি ; বয়সে ব্যোমকেশের চেয়ে কিছু ছোট, তাই বন্ধুত্বের সঙ্গে অনেকখানি সম্ভ্রম মেশানো ছিল।

ব্যোমকেশের সঙ্গে অজিতও এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে। গল্পসল্প চলল অনেক রাত পর্যন্ত। রাত বাড়ল কিন্তু গল্প শেষ হলো না। খাওয়া-দাওয়ার পর অজিত উঠি-উঠি করছে দেখে রাখালবাবু বললেন, 'ব্যোমকেশদা, আপনি আজ রাতটা না হয় এখানেই থেকে যান। কাল সকালে একেবারে বাড়ির কাজ তদারক করে বাসায় ফিরবেন।'

ব্যোমকেশ বলল, 'মন্দ কথা নয়। অজিত, তুমি আজ ফিরে যাও, আমি কাল কাজকর্ম দেখে ফিরব।'

অজিত চলে গেল। কলকাতা শহরে এপাড়া থেকে ওপাড়া যাওয়া বিদেশ-যাত্রার সমান।

পরদিন সকাল পৌনে আটটার সময় ব্যোমকেশ চা-জলখাবার খেয়ে বেরুবার উপক্রম করছে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রাখালবাবু ফোন ধরে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে শুনলেন : দু'একটা কথা বললেন, তারপর ফোন রেখে দিয়ে ব্যোমকেশকে বললেন, 'থানা থেকে বলছিল। আমার এলাকায় একটা হোটেলে খুন হয়েছে। বেশ রহস্যময় ব্যাপার মনে হচ্ছে। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে ?'

ব্যোমকেশ বলল, 'রহস্যময় খুন ! নিশ্চয় যাব।'

ইন্সপেক্টর রাখাল সরকার ব্যোমকেশকে নিয়ে যখন নিরুপমা হোটেলে পৌঁছুলেন তখন থানা থেকে দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে হোটেল দখল করেছে। সদর দরজায় একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলের লোককে হোটেলে রাখা হয়েছে, বাইরের লোককে বাইরে।

রাখালবাবু হরিশচন্দ্রের অফিসে প্রবেশ করে দেখলেন, পুলিসের ডাক্তার কালো ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। রাখালবাবু বললেন, 'এই যে ডাক্তার এসে গেছেন দেখছি— আপনি হোটেলের ম্যানেজার ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনিই লাশ আবিষ্কার করেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

ইন্সপেক্টর সরকার এবং ব্যোমকেশ বক্সী পাশাপাশি চেয়ারে বসলেন, রাখালবাবু বললেন, 'বেশ। আপনি কী জানেন সংক্ষেপে বলুন।'

আজ সকাল থেকে যা যা ঘটেছিল হরিশচন্দ্র বললেন। শুনে রাখালবাবু ব্যোমকেশের দিকে তাকালেন, ব্যোমকেশ একটু ঘাড় নাড়ল। রাখালবাবু তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি ঠিক কাজ করেছেন। চলুন ডাক্তার, এবার লাশ পরিদর্শন করা যাক।'

হরিশচন্দ্র আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চললেন ; তাঁর পিছনে রাখালবাবু, ব্যোমকেশ ও ডাক্তার।

দোতলায় দু'নম্বর ঘরের সামনে গুণধরের বদলে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। হরিশচন্দ্র চাবি দিয়ে ঘর খুলে দিলেন। তখন ঘরের ভিতরটি দেখা গেল।

ঠিক দরজার সামনে মেঝের ওপর একটি পুরুষের মৃতদেহ ডানদিকে কাত হয়ে পড়ে আছে ;

পরনে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি। মুখখানা দেখে চমকে উঠতে হয়; কেউ যেন ধারালো ছুরি দিয়ে মুখখানাকে ফালা-ফালা করে কেটেছে, তারপর অত্যন্ত অযত্নভরে আবার জোড়া দিয়েছে। কাটা দাগগুলো তাজা নয়, অনেকদিনের পুরনো; শুকনো ক্ষতের দাগ মুখখানাকে কদাকার করে দিয়েছে।

মৃত্যুর কারণ কিন্তু অন্যত্র। গেঞ্জির বুকের ওপর খানিকটা রক্ত শুকিয়ে আছে।

দোরের কাছ থেকে কিছুক্ষণ মৃতদেহ পরিদর্শন করে রাখালবাবু বললেন, 'ডাক্তার, আপনি আগে লাশ পরীক্ষা করুন। আপনার কাজ হয়ে গেলে আমরা ঘরে ঢুকব।'

ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করলেন, বাকি তিনজন লাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যোমকেশ একবার আড়চোখে হরিশচন্দ্রের মুখের পানে তাকালো, কিন্তু সেখানে ভয়ার্তি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

'কী ব্যাপার বলুন দেখি? আমাকে এখনি বেরুতে হবে, কিন্তু পুলিস বেরুতে দিচ্ছে না। এর মানে কি!' মহিলা কণ্ঠের উষ্ণ স্বর শুনে তিনজনে পিছু ফিরে তাকালেন। একটি মহিলা ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?'

হরিশচন্দ্র পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি এক নম্বর ঘরে থাকেন, ডক্টর মিসেস্ শোভনা রায়।'

রাখালবাবু মিনতির সুরে বললেন, 'দেখুন, এই ঘরে কাল রাত্রে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। এ হোটেলে যাঁরা আছেন সকলকেই আমাদের জেরা করতে হবে। জেরা করার আগে কাউকে বাইরে যেতে দিতে পারি না। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সকলের আগে আমি আপনাকে জেরা করে ছেড়ে দেব।'

মহিলাটির মুখের ভাব বদলে গেল, তিনি শঙ্কিত চক্ষে চেয়ে বললেন, 'খুন হয়েছে! আমার পাশের ঘরে খুন হয়েছে! কখন? কে খুন করেছে?'

ইন্সপেক্টর মাথা নেড়ে বললেন, 'তা এখনো জানা যায়নি। আপনি নিজের ঘরে গিয়ে বসুন, আমরা এখনি আসছি।'

মহিলাটি একটু ইতস্তত করলেন, একবার দু'নম্বর ঘরের দিকে উঁকি মারলেন, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে সাব-ইন্সপেক্টর দু'জন উপস্থিত হয়েছিল, রাখালবাবু তাদের বললেন, 'তোমরা একজন তেতলায় এবং একজন দোতলায় যত অতিথি আছেন সকলের নাম-ধাম ঠিকানা নিয়ে নাও, কাল রাত্রে কে কোথায় ছিল খবর নাও। কেবল এক নম্বর আর তিন নম্বর ঘরে তোমাদের যাবার দরকার নেই, ওঁদের আমি জেরা করব।'

সাব-ইন্সপেক্টর দু'জন চলে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'এবার লাশ সরাতে পারেন।'

রাখালবাবু বললেন, 'কি দেখলেন?'

ডাক্তার উত্তর দিলেন, 'ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে; ছুরি কিংবা ওই রকম কোনো সরু ধারালো অস্ত্র। পাঁজরার ফাঁক দিয়ে একেবারে হৃদ্‌যন্ত্রে প্রবেশ করেছে। এ পেশাদার খুনীর কাজ: ওই একটি বই ক্ষতচিহ্ন নেই, প্রথম মারেই মর্মস্থানে পৌঁচেছে।'

'হুঁ। মৃত্যুর সময়?'

'অটপ্সি না করে নিশ্চয়ভাবে বলা শক্ত, সম্ভবত কাল রাত্রি ন'টা থেকে বারোটার মধ্যে।'

ব্যোমকেশ বলল, 'মুখের দাগগুলো কতদিনের পুরনো?'

'দশ বারো বছরের কম নয়।'

'বয়স কত হবে? মুখ দেখে তো বোঝা যায় না।'

'চল্লিশের আশেপাশে— আচ্ছা, এখন আমি চলি। তাড়াতাড়ি লাশ পাঠিয়ে দেবেন, আজই কাটবো। কাল রিপোর্ট পাবেন।' ডাক্তার চলে গেলেন।

রাখালবাবু হরিশচন্দ্রকে বললেন, 'আপনি নিজের কাজে যান। অফিসেই থাকবেন। এ ঘরের

চাবিটা আমায় দিন।'

আধঘণ্টা পরে লাশ চালান করে দিয়ে রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন। অর্থাৎ—অতঃ কিম্ ?

ব্যোমকেশ এক নম্বর ঘরের দিকে আঙুল দেখালো, 'মহিলাটির সওয়াল-জবাব আগে সেরে নিন। মহিলা এবং ডাক্তারের অধিকার আগে।'

'ঠিক ঠিক। ওঁকে ছেড়ে দিয়ে তারপর এ ঘরটা দেখা যাবে।' রাখালবাবু দু'নম্বরের দোরে চাবি দিয়ে বললেন, 'আসুন।'

এক নম্বরের দোরে টোকা দিতেই দোর খুলে গেল। মহিলাটির মুখ অপ্রসন্ন। তাঁর বেঁটে নিরেট গোছের শরীরটি আঁটসাঁট পোশাকের মধ্যে যেন অধীরতায় ফেটে পড়বার উপক্রম করছে। তিনি বললেন, 'যত শীগ্‌গির পারেন আমাকে ছেড়ে দিন দারোগাবাবু। আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে।'

'দু'চারটে প্রশ্ন করেই আপনাকে ছেড়ে দেব।' রাখালবাবু খাতা পেন্সিল বার করে প্রশ্ন আরম্ভ করলেন, 'আপনার পুরো নাম ?'

'মিসেস্ শোভনা রায়।'

'বয়স ?'

'উনপঞ্চাশ।'

'স্বামীর নাম ?'

'স্বর্গীয় রামরতন রায়।'

'আপনি ডাক্তার। কোথায় ডাক্তারি করেন ?'

'বহরমপুরে।'

'কলকাতায় এসেছেন কেন ?'

'আমি গাইনকোলজিস্ট, প্রধানত স্ত্রী-রোগের চিকিৎসা করি। সেবা সদনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, মাঝে মাঝে আসি।'

'কলকাতায় আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই ?'

'আমার কোথাও কেউ নেই।'

'ছেলেপুলে ?'

'না। একটা মেয়ে ছিল, অনেকদিন মরে গেছে।'

মিসেস্ রায়ের মুখ ক্ষণেকের জন্য কঠিন হয়ে উঠল, তারপর আবার স্বাভাবিক হলো। মহিলাটির মুখখানি সুশ্রী নয়, কঠিন হলে আরো কুশ্রী দেখায়।

'কলকাতায় যখন আসেন এখানেই ওঠেন ?'

'হ্যাঁ। এখানে উঠলে সুবিধে হয়।'

'এবার কবে এসেছেন ?'

'পরশু।'

'কাল রাত্রে পাশের ঘরে রাজকুমার বসু নামে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। তাঁকে আপনি চিনতেন ?'

'না, কখনো নাম শুনিনি।'

'আগে কখনো দেখেননি ? পাশাপাশি ঘরে ছিলেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'না। ও মুখ দেখলে মনে থাকত।'

'কাল রাত্রি আটটার পর আপনি কোথায় ছিলেন ?'

'আটটার সময় আমি সেবা সদন থেকে ফিরে আসি। ঘরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে নীচে ডাইনিং রুমে খেতে গেলুম। ন'টার আগেই ঘরে ফিরে এলুম। তারপর আর ঘর

থেকে বেরোইনি।'

'রাত্রে কিছু জানতে পেরেছিলেন ?'

'আমি সওয়া ন'টার সময় শুয়ে পড়েছিলুম ; কিন্তু বার বার ঘুমের বিঘ্ন হচ্ছিল। পাশের ঘরের শব্দে চটকা ভেঙে যাচ্ছিল।'

'পাশের ঘরে শব্দ হচ্ছিল ?'

'ঘরে শব্দ হচ্ছিল কিনা শুনতে পাইনি। কিন্তু ঘরের দরজা বার বার খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল।'

'রাত্রি তখন কত ?'

'ঘড়ি দেখিনি। আন্দাজ সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে।'

'আপনি কিছু করলেন ?'

'কী করব ! হোটেলে অনেক অবিবেচক লোক আসে, তারা পরের সুবিধা অসুবিধা বোঝে না।'

'আজ সকালে কখন জানতে পারলেন ?'

'খুন হয়েছে আপনার কাছে জানলাম। ভোরবেলা চাকর বেড্-টি দিয়ে গেল। তারপর আমি তৈরি হয়ে বেরুতে যাচ্ছি, নীচে ব্রেক-ফাস্ট খেয়ে কাজে যাব, এমন সময় পাশের ঘরে দোর-ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি শুনতে পেলুম। বেরিয়ে দেখলুম ম্যানেজার ; জিজ্ঞেস করলুম কী হয়েছে, সে কিছু বলল না। তারপর তিন নম্বর ঘরে গেলাম—'

'তিন নম্বর ঘরে গেলেন কেন ?'

'তিন নম্বরের ভদ্রলোকটির শরীর খারাপ হয়েছে, ডাক্তার খুঁজছিলেন। তাই তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম।'

'তাকে আগে থাকতে চিনতেন বুঝি ?'

'দেখেছি। কিন্তু চেনা-পরিচয় কিছু ছিল না। তাঁর নামও জানি না।

'ও—কি হয়েছে ভদ্রলোকের ?'

'ঠাণ্ডা লেগে সামান্য জ্বর হয়েছে।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন, ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে জানাল আর কোনো প্রশ্ন নেই। রাখালবাবু শোভনা রায়কে বললেন, 'আপাতত আর কোনো প্রশ্ন নেই, আপনি কাজে যেতে পারেন। কিন্তু আমাদের না জানিয়ে কলকাতা ছাড়বেন না।'

শোভনা রায়ের মুখ বিরক্ত হয়ে উঠল। তিনি উত্তর না দিয়ে ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়ালেন।

দু'নম্বর ঘরের দরজা খুলতে খুলতে রাখালবাবু বললেন, 'মহিলাটির মেজাজ একটু কড়া। ভয় পাননি ; বোধহয় পুলিসের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচয় আছে। ডাক্তার তো। — যাহোক, আসুন দেখা যাক ঘরের মধ্যে আততায়ী কোনো চিহ্ন রেখে গেছে কিনা। — কনস্টেবল হাজরা, তুমি নীচে গিয়ে হেড-অফিসে ফোন করো— যেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টদের পাঠানো হয়।'

কনস্টেবল স্যালুট করে চলে গেল। রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দোর ভেজিয়ে দিলেন।

ঘরটি আয়তনে দশ ফুট বাই বারো ফুট। একটি একহারা লোহার খাট ; ছোট টেবিল এবং চেয়ার, দেয়ালে আয়না লাগানো। তার পাশে কাপড় রাখার আলনা ; মাথার ওপর ফ্যান। দু'জনে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

রাখালবাবু বললেন, 'বিছানাটা দেখেছেন ?'

'দেখেছি। বিছানা এবং আলনা— দুইই দ্রষ্টব্য।'

বিছানা দেখে মনে হয় কাল রাত্রে রাজকুমার বসু বিছানায় শুয়েছিল ; চাদর একটু কুঁচকে আছে, বালিশের ওপর মাথার দাগ। আলনায় একটি কোঁচানো ধুতি ও পাঞ্জাবি টাঙানো রয়েছে।

রাখালবাবু বললেন, 'হুঁ। কি মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে কাল রাত্রে রাজকুমার বসু কাপড় পাঞ্জাবি ছেড়ে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে শুয়েছিল। তারপর একসময় দোরে টোকা পড়ল। রাজকুমার বিছানা থেকে উঠে যেই দোর খুলল আততায়ী অমনি বাইরে থেকে তার বুকে ছুরি মারল। রাজকুমার পড়ে গেল। আর উঠল না। আততায়ী দরজা টেনে বন্ধ করে চলে গেল। আমার বিশ্বাস আততায়ী ঘরে ঢোকেনি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট রাজকুমার ছাড়া আর কারুর আঙুলের ছাপ ঘরের মধ্যে পাবে না। দোরের হাতলে আততায়ীর আঙুলের ছাপ হয়তো ছিল, কিন্তু এখন আর পাওয়া যাবে না। তার ওপর আরো অনেক আঙুলের ছাপ পড়েছে।'

রাখালবাবু বললেন, 'তা বটে। তবু অধিকন্তু ন দোষায়। আসুন, ঘরটা তল্লাশ করে দেখা যাক।'

ব্যোমকেশ বলল, 'আপনি তল্লাশ করুন। আমি কোনো জিনিসে হাত দেব না, তাতে আঙুলের ছাপ বেড়ে যাবে।'

'বেশ, আপনি তাহলে দাঁড়িয়ে তদারক করুন।'

রাখালবাবু বিধিবদ্ধভাবে তল্লাশ আরম্ভ করলেন। টেবিলের দেরাজ, পাঞ্জাবির পকেট, বিছানার তোশকের নীচে, সর্বত্র অনুসন্ধান করলেন কিন্তু কিছু পেলেন না। অবশেষে খাটের তলা থেকে তিনি একটা সুটকেস টেনে বার করলেন। মৃতের এই একটিমাত্র মাল ঘরে আছে, আর কিছু নেই।

সুটকেসের গায়ে চাবি লাগানো ছিল, রাখালবাবু ডালা তুললেন। দেখা গেল, দু'সেট জামাকাপড় রয়েছে। কাপড়ের নীচে এক গোছা দশ টাকার নোট, আর একটি ডায়েরির আকারের ছোট বাঁধানো খাতা।

খাতাটি সরিয়ে রেখে রাখালবাবু প্রথমে দশ টাকার নোটগুলি গুনলেন; একশো কুড়িখানা নোট, অর্থাৎ ঠিক ১২০০্ টাকা। তিনি নোটগুলি নিজের পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, 'দেখা যাচ্ছে, যে খুন করেছে তার টাকার লোভ নেই।' তিনি খাতাটি তুলে নিলেন।

খাতার নামপৃষ্ঠায় নাম লেখা রয়েছে— সুকান্ত সোম। রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন। ব্যোমকেশ বলল, 'রাজকুমার নামটা তাহলে মেকি। কিন্তু— সুকান্ত সোম! যেন কোথায় শুনেছি, মাথার মধ্যে একটা ঘণ্টি বাজছে। আপনি শোনেননি?'

'মনে পড়ছে না।' রাখালবাবু খাতার পাতা ওলটাতে লাগলেন। প্রত্যেক পাতার মাথায় একটি শহরের নাম, যেমন—কাশী কলকাতা কটক। শহরের নীচে কয়েকটি নাম ও ঠিকানা, সম্ভবস্থলে টেলিফোন নম্বর। কলকাতার পাতায় চারটি নাম লেখা আছে, প্রায় প্রত্যেক নামের পাশে একটি টাকার অঙ্ক। যথা—

মোহনলাল কুণ্ডু
১১৭ডি, পানাপুকুর লেন
শ্যামাকান্ত লাহিড়ী ৫০০্
৩০/১, লেক কলোনী
জগবন্ধু পাত্র ৪০০্
৫৬, রাম ভাদুড়ী লেন
লতিকা চৌধুরী ৩০০্
১৭, গান্ধী পার্ক

খাতাখানা ব্যোমকেশের হাতে দিয়ে রাখালবাবু বললেন, 'দেখুন যদি কিছু হদিস পান।'

ব্যোমকেশ খাতাখানা মন দিয়ে পরীক্ষা করে বলল, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে লোকটার পেশা ছিল ব্ল্যাকমেল করা।'

'অন্য পেশা কি সম্ভব নয় ? যেমন ধরুন, বীমার দালাল।'

'অসম্ভব বলছি না। কিন্তু বীমার দালালকে কেউ খুন করে না। তারা ছদ্মনামেও ঘুরে বেড়ায় না।'

'তাহলে আপনি মনে করেন, রাজকুমার বসু যাদের ব্ল্যাকমেল করছিল তাদের মধ্যে কেউ তাকে খুন করেছে ?'

'কলকাতার ফিরিস্তিতে যাদের নাম আছে তাদের সওয়াল করলে কতকটা আন্দাজ করা যাবে। — চলুন, এবার তিন নম্বর মক্কেলের সঙ্গে দেখা করা যাক।'

'চলুন।'

তিন নম্বর ঘরে শচীতোষ সান্যাল বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে ছিলেন, পদশব্দ শুনে ঘাড় তুললেন। বললেন, 'কে ?'

রাখালবাবু সংক্ষেপে বললেন, 'পুলিস।'

শচীতোষবাবু উঠে বসলেন, চক্ষু গোল করে বললেন, 'পুলিস! কী চাই ?'

রাখালবাবু বললেন, 'আপনাকে দু'চারটে প্রশ্ন করতে চাই। জানেন বোধহয় পাশের দু'নম্বর ঘরে খুন হয়েছে।'

শচীতোষবাবু মুহূর্তকাল নির্বাক থেকে আঁৎকে উঠলেন, 'খুন হয়েছে! কে খুন হয়েছে ?'

তিন নম্বর ঘরটি আয়তনে এবং আসবাবপত্রে অন্য দু'টি ঘরের অনুরূপ। রাখালবাবু বিছানার ধারে বসলেন। ব্যোমকেশ চেয়ারে বসল। রাখালবাবু বললেন, 'দু' নম্বরে যিনি ছিলেন কাল রাত্রে তিনি খুন হয়েছেন, তাঁর নাম রাজকুমার বসু। আপনি তাঁকে চিনতেন নাকি ?'

'রাজকুমার বোস—না, চিনতাম না। কে খুন করেছে ?'

'তা এখন জানা যায়নি। আপনার নাম কি ?'

'শচীতোষ সান্যাল।'

'নিবাস ?'

'ভাগলপুর। — আমার শরীর খারাপ, ডাক্তার শুয়ে থাকতে বলেছে।'

'কোন ডাক্তার ?'

'মেয়ে ডাক্তার। ঠাণ্ডা লেগেছে, অ্যাস্‌পিরিনের বড়ি খেয়ে শুয়ে থাকতে বলল। আচ্ছা, মেয়েরা কি ভাল ডাক্তার হয় ?'

'হতে বাধা নেই। ঠাণ্ডা লাগালেন কি করে ?'

'কাল সন্ধ্যের পর বেরিয়েছিলাম। গায়ে আলোয়ান ছিল না, ঠাণ্ডা লেগে গেছে।'

'রাত্তিরে ঘর থেকে বেরোননি ?'

'না। ন'টার সময় ডাইনিং রুম থেকে খেয়ে এসে ঘরে ঢুকেছিলাম, আর বেরোইনি।'

'ও কথা থাক। আপনি কবে কলকাতায় এসেছেন ?'

'তিন দিন হলো। আজ ফিরে যাবার কথা, কিন্তু—'

'আপনি কলকাতায় এসেছেন কেন ?'

'আমার ঘিয়ের ব্যবসা আছে, গাঙ্গুরামকে ঘি যোগান দিই। তাই মাঝে মাঝে আসতে হয়। আচ্ছা, ঠাণ্ডা লাগা থেকে তো নিউমোনিয়া হতে পারে!'

'তা পারে, কিন্তু আপনার হবে না। আপনি বেশ তাগড়া আছেন। —বয়স কত ?'

'বিয়াল্লিশ। দেখতে তাগড়া বটে, কিন্তু আমার শরীর ভারি পল্‌কা, একটুতেই রোগে ধরে। বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে ; কিছু খেলে রোগ বেড়ে যাবে না তো ?'

'গরম দুধ আর পাঁউরুটি খান। — রাজকুমার বোসকে তাহলে চিনতেন না ?'

'না, কখনো নাম শুনিনি।'

ব্যোমকেশ বলল, 'সুকান্ত নামটা কখনো শুনেছেন ?'

শচীতোষ বললেন, 'সুকান্ত ? না। আমার শালার নাম ছিল শ্রীকান্তকুমার লাহিড়ী, মারা

গেছে।'

রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন, 'কাল রাত্রে আপনি পাশের ঘরে কোনো শব্দ শুনেছিলেন ?'

'শব্দ ? নাঃ। খেয়ে এসেই শুয়েছি, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি। বউ বলে, আমি একবার ঘুমোলে ডাকাত পড়লেও ঘুম ভাঙে না। পাশের ঘরের লোকটাকে কী দিয়ে খুন করেছে ? বন্দুক দিয়ে ?'

'না, ছুরি দিয়ে।' রাখালবাবু উঠে পড়লেন, 'আপনি পুলিসকে খবর না দিয়ে কলকাতা ছেড়ে যাবেন না। চলুন ব্যোমকেশদা।'

নীচে অফিস-ঘরে হরিশচন্দ্র জবুথবুভাবে বসেছিলেন, ব্যোমকেশদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন, কুণ্ঠিত প্রশ্ন করলেন, 'কী হলো ?'

রাখালবাবু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, 'এবার আপনাদের, অর্থাৎ হোটেলের স্টাফের এজেহার নেব। আপনাকে দিয়েই আরম্ভ করি। বসুন।'

তিনজনে বসলেন। রাখালবাবু সওয়াল-জবাব আরম্ভ করলেন, 'আপনার পুরো নাম ?'

'হরিশচন্দ্র হোড়।'

'আপনি হোটেলের ম্যানেজার। এখানেই থাকেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন আছেন ?'

'আট বছর।'

'মৃত রাজকুমার বোস সম্বন্ধে কী জানেন বলুন।'

হরিশচন্দ্র মোটা খাতা বার করে খুললেন, 'রাজকুমার বসু, ঠিকানা আদমপুর, পাটনা। গত পাঁচ বছর ধরে তিনি বছরে দু'বার এখানে আসতেন, দু' তিনদিন থাকতেন। হোটেল থেকে বেরুতেন না, এই অফিসে এসে তিন-চারজন বন্ধুকে টেলিফোন করতেন। তাঁরা এসে সন্ধ্যের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

'এবার তিনি কবে এসেছিলেন ?'

'পরশু।'

'টেলিফোন করেছিলেন ?'

'পরশু রাত্রে এলেন, সে-রাত্রে টেলিফোন করেননি। কাল সকালে করেছিলেন।'

'রাজকুমারবাবু যখন আসতেন ওই দু' নম্বর ঘরেই থাকতেন ?'

'না, যখন যে-ঘর খালি থাকত সেই ঘরে থাকতেন।'

'রাজকুমারবাবু কি কাজ করতেন আপনি জানেন ?'

'আজ্ঞে না।'

'আপনি কাল রাত্রে নিশ্চয় হোটেলেই ছিলেন ?'

'আজ্ঞে—' হরিশচন্দ্র একটু ইতস্তত করে বললেন, 'ঘণ্টা দুয়ের জন্যে একবার বেরিয়েছিলাম। আমি হোটেলে থাকি বটে, কিন্তু আমার পরিবার বাইরে ভাড়া বাড়িতে থাকে ; মাঝে মাঝে তাদের দেখতে যাই। কাল রাত্রে অতিথিরা খেতে বসবার পর আমি বেরিয়েছিলাম, তারপর এগারোটা নাগাদ ফিরে আসি।'

'আপনার অবর্তমানে হোটেলের ইন্-চার্জ থাকে কে ?'

'সর্দার খানসামা গুণধর গুঁই।'

'গুণধরকে একবার ডাকুন।'

গুণধরকে ডাকা হলো, সে এসে দাঁড়াল। আবার প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হলো।

'রাজকুমার বোস— যিনি খুন হয়েছেন— তাঁর সম্বন্ধে তুমি কী জান ?'

'আজ্ঞে, বেশি কিছু জানি না। তিনি মাঝে মাঝে আসতেন, দু' তিনদিন থেকে চলে যেতেন।'

'তোমার সঙ্গে তাঁর কোনো কথাবার্তা হতো না ?'

'আজ্ঞে, খুব কম। ফাই-ফরমাস করতেন, তার বেশি নয়।'

'তাঁর দেখাশোনা করত কে ?'

'আজ্ঞে, আমি করতাম। সকালে বেড়-টি নিয়ে যেতাম, তারপর ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার সব আমিই পৌঁছে দিতাম। দোতলায় যাঁরা থাকেন আমিই তাঁদের দেখাশোনা করি। তেতলায় দেখাশোনা করে—'

'ও—তাহলে রাজকুমারবাবু ডাইনিং রুমে খেতে নামতেন না !'

'আজ্ঞে না।'

'কাল তুমি তাঁকে শেষবার কখন দেখেছ ?'

'রাত্রি পৌনে ন'টার সময় তাঁকে ডিনার দিতে গেছলাম, তারপর ন'টার সময় এঁটো বাসন-কোসন আনতে গেছলাম। তখন তিনি বেঁচে ছিলেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু তিনি ডাইনিং রুমে যেতেন না কেন বলতে পার ?'

'তা—জানি না হুজুর। তবে— বোধহয়— তাঁর মুখখানা কাটাকুটি হয়ে বড় ইয়ে হয়ে গিয়েছিল—তাই তিনি সহজে লোকের সামনে বেরুতেন না।'

'তা হতে পারে। কিন্তু তাঁর কাছে লোক আসত ?'

'তা আসত হুজুর।'

'কাল কে কে এসেছিল তুমি জান ?'

'আমি জানি না, জেনারেল সিং বলতে পারে।'

'জেনারেল সিং !'

'আজ্ঞে, আমাদের দারোয়ান। তার নাম রামপিরিত সিং, সবাই তাকে জেনারেল সিং বলে ডাকে।'

'ডাকো জেনারেল সিংকে।'

ভোজপুরী জোয়ান রামপিরিত সিং এসে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে স্যালুট করল। আখাম্বা চেহারা, জাঁদরেল পোশাক, ইয়া গোঁফ। রাখালবাবু তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, 'হ্যাঁ, জেনারেল বটে। তুমি হোটেলের সদরে পাহারা দাও ?'

রামপিরিত বলল, 'জি। সকালে ন'টা থেকে বারোটা, বিকেলে পাঁচটা থেকে দশটা আমার ডিউটি।'

'হোটেলে যারা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে আসে তাদের নাম-ধাম তুমি লিখে রাখ ?'

'জি না, সে-রকম হুকুম নেই। যারা ভাল সাজ-পোশাক পরে আসে তাদের স্যালুট করি, যারা অতিথির রুম নম্বর জানতে চায় তাদের রুম নম্বর বলি।'

'কাউকে আটকাও না ?'

'জি, ভাল জামা-কাপড় পরা থাকলে আটকাই না।'

'আর যদি ছেঁড়া জামা-কাপড় হয় ?'

'তখন কটমট করে তাকাই।'

'শাবাশ ! এবার বল দেখি, কাল সন্ধ্যের পর দোতলার দু'নম্বর ঘরের বাবুর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল ?'

'জি, এসেছিল। দু'জন মরদ আর একজন ঔরৎ। রাত্রি সওয়া ন'টার সময় এলেন ঔরৎ, তিনি ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে দোতলায় গেলেন ; পাঁচ মিনিট পরে তিনি চলে গেলেন।'

'তাঁর বয়স কত ?'

'বিশ-পঁচিশ হবে হুজুর। গোরী, পাতলা লম্বা চেহারা, চোখে চশমা ছিল।'

'বেশ। তারপর ?'

'তারপর সাড়ে ন'টার সময় এলেন এক মরদ। তিনি ঘরের নম্বর নিয়ে ওপরে গেলেন, পাঁচ মিনিট পরে ফিরে চলে গেলেন। এর চেহারা দুবলা, মুছ-দাড়ি আছে থোড়া থোড়া।'

'তারপর ?'

'পৌনে দশটার সময় আর একজন মরদ এলেন। মোটা-তাজা শরীর, খাঁটি বাঙ্গালী বাবু। তিনিও ওপরে গিয়ে পাঁচ মিনিট ছিলেন। তারপর আমার ডিউটির মধ্যে আর কেউ আসেনি হুজুর।'

জেনারেল রামপিরিত সিং-এর চেহারা যত স্থূলই হোক, স্মৃতিশক্তি যে খুব তীক্ষ্ণ তাতে সন্দেহ নেই। রাখালবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা। তুমি এখন আরাম কর গিয়ে।'

জেনারেল জোড়া পায়ে স্যালুট করে চলে গেল।

রাখালবাবু পকেট থেকে ১২০০ ্টাকার নোট বার করে হরিশচন্দ্রের হাতে দিলেন, বললেন, 'আপাতত এ টাকাটা আপনার কাছে রাখুন, মৃতের সুটকেসে পাওয়া গেছে। টাকার জন্যে একটা রসিদ দিন।'

ঘরে একটি লোহার সিন্দুক ছিল, হরিশচন্দ্র নোটগুলি সিন্দুকে রেখে রসিদ লিখে দিলেন। ব্যোমকেশ ভুরু কুঁচকে বসে রইল।

ইতিমধ্যে সাব-ইন্সপেক্টর দু'জন নেমে এসে দাঁড়িয়েছিল, রাখালবাবু তাদের প্রশ্ন করলেন, 'কি হলো ?'

একটি সাব-ইন্সপেক্টর বলল, 'আমি তেতলায় গিয়েছিলাম। সকলের নাম-ধাম লিখে নিয়েছি। সকলেই বলল, ন'টার পর ডিনার খেয়ে তারা ঘরে ফিরে এসেছিল, আর ঘর থেকে বেরোয়নি।'

'তাদের কথা সত্যি কিনা যাচাই করেছিলে ?'

'কি করে যাচাই করব ? প্রত্যেকের আলাদা ঘর। তবে একটা প্রমাণ আছে, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হলে একটা চাকর তেতলার সিঁড়ির সামনে শোয় ; তাকে ডিঙিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামা সম্ভব নয়। আমি চাকরটাকে জিজ্ঞেস করেছি, সে বলল, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সে শুতে গিয়েছিল, তারপর আর কেউ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামেনি।'

'বেশ। —আর তুমি ?'

দ্বিতীয় সাব-ইন্সপেক্টর বলল, 'দোতলাতেও একই অবস্থা। সকলের নাম-ঠিকানা লিখে নিয়েছি। দোতলার সিঁড়ির মুখে যে-চাকরটা শোয় সে বলল, পৌনে এগারোটার সময় সে শুতে গিয়েছিল, তারপর আর কেউ ঘর থেকে বেরোয়নি।'

রাখালবাবু ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাত্তিরে চাকর সিঁড়ির মুখে শোয় কেন ?'

ম্যানেজার বললেন, 'রাত্রে যদি কোনো অতিথির কিছু দরকার হয়, তাই এই ব্যবস্থা।'

'বুঝলাম।'— রাখালবাবু ঘড়ি দেখলেন, বারোটা বেজে গেছে। তিনি ব্যোমকেশকে বললেন, 'এখানকার কাজ আপাতত এই পর্যন্ত। চলুন এবার বেরিয়ে পড়া যাক, রাস্তায় কোথাও খেয়ে নেওয়া যাবে। ভাগ্যক্রমে চারজন মক্কেলের বাড়ি কাছাকাছির মধ্যেই, বেশি ঘোরাঘুরি করতে হবে না। আপনার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল—'

ব্যোমকেশ বলল, 'কোনো ক্ষতি নেই, আমি অজিতকে টেলিফোন করে দিচ্ছি।'

সে টেলিফোন তুলে নিল। হরিশচন্দ্র বললেন, 'যদি আপত্তি না থাকে এখানেই আপনাদের সকলের আহারের ব্যবস্থা করেছি।'

রাখালবাবু হেসে বললেন, 'খুব ভাল কথা।'

নিরুপমা হোটেলের রান্না ভাল।

মধ্যাহ্ন ভোজন দেশী ও বিলাতি মতে সমাধা করে পুলিসের দল ডাইনিং রুম থেকে বেরুলেন, সঙ্গে ব্যোমকেশ। রাখালবাবু দ্বিতীয় সাব-ইন্সপেক্টরকে বললেন, 'দত্ত, তুমি এখানে থাকো। এই

নাও, দু' নম্বর ঘরের চাবি। ফিঙ্গারপ্রিন্টের দল এখনি আসবে, তাদের ঘর খুলে দিও। আমি ঘোষকে নিয়ে বেরুচ্ছি। আসুন ব্যোমকেশদা।'

তিনজনে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাখালবাবু পকেট থেকে খাতা বার করে বললেন, 'এ সময় কাউকে বাড়িতে পাব কিনা বলা যায় না। যাহোক, চলুন আগে জগবন্ধু পাত্রকে দেখা যাক। লোকটিকে ওড্র-কুলোদ্ভব মনে হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলল, 'হুঁ।'

একটা ট্যাক্সি ধরে তিনজনে উঠে বসলেন, ট্যাক্সি জগবন্ধু পাত্রের ঠিকানা লক্ষ্য করে ছুটল। রাখালবাবু বললেন, 'ব্যোমকেশদা, আজ আপনি এমন চুপচাপ কেন ? কিছু বলছেন না !'

ব্যোমকেশ বলল, 'এখন কেবল শুনে যাচ্ছি, বলা-কওয়ার সময় এখনো আসেনি। — সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।'

জগবন্ধু থাকেন একটি তেতলা বাড়ির নীচের ফ্ল্যাটে। রাখালবাবু কড়া নাড়লেন, একটি লোক দোর খুলে দাঁড়াল। ছাঁটা দাড়ি, কোল-কুঁজো ধরনের চেহারা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ। রাখালবাবু বললেন, 'আপনার নাম জগবন্ধু পাত্র ?'

'হ্যাঁ।' জগবন্ধু পুলিসের ইউনিফর্ম দেখে একটু সচকিত হয়ে বললেন, 'কি দরকার ?'

'নিরুপমা হোটেলে রাজকুমার বসু নামে এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন—'

জগবন্ধু পাত্রের মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটে উঠল, তিনি বলে উঠলেন, 'রাজকুমার খুন হয়েছে !'

'হ্যাঁ। আপনাকে দু' একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'আসুন।' জগবন্ধু পাত্র একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের বসালেন, 'বসুন, আমি এখনি আসছি।'

তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন।

বসবার ঘরটি ছোট এবং নিরাভরণ ; একটি টেবিল ও তিনটি চেয়ার আছে ; টেবিলের ওপর টেলিফোন। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরিয়ে ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল, কিন্তু কোথাও গৃহস্বামীর চরিত্রের কোনো পরিচয় পেল না।

পাঁচ মিনিট কাটল, দশ মিনিট কাটল, জগবন্ধু পাত্রের দেখা নেই। রাখালবাবু তখন গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'জগবন্ধুবাবু !' কিন্তু উত্তর এল না।

ব্যোমকেশ মুখ টিপে হাসল, বলল, 'মনে হচ্ছে জগবন্ধু পাত্র গৃহত্যাগ করেছেন।'

রাখালবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'পালিয়েছে ! এসো ঘোষ, বাড়ির ভেতরটা দেখা যাক। আসুন ব্যোমকেশদা।'

ব্যোমকেশ কিন্তু গেল না ; ঘোষকে নিয়ে রাখালবাবু ভিতরে গেলেন। দেখলেন, কেউ নেই, খিড়কির দোর খোলা।

রাখালবাবু ফিরে এসে বললেন, 'পাখি উড়েছে।'

ব্যোমকেশ ইতিমধ্যে টেবিলের দেরাজ খুলে একটা বাঁধানো খাতা বার করেছিল, তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'লোকটা বোধহয় ঘোড়দৌড়ের টাউট্ ছিল।'

'তাই নাকি ! কিন্তু পালাল কেন ?'

'নিশ্চয় গুরুতর গলদ আছে। শুধু ঘোড়দৌড় হলে পালাত না।'

রাখালবাবু থানায় ফোন করলেন। পলাতকের বর্ণনা দিলেন, আরো লোক ডেকে পাঠালেন। তারপর ফোন নামিয়ে বললেন, 'ঘোষ, তুমি এখানে থাকো, আমরা অন্য কাজে যাচ্ছি। এখনি থানা থেকে আরো লোক এসে পড়বে। বাড়ি তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করো। আঙুলের ছাপ নিশ্চয় পাবে ; ততক্ষণাৎ হেড্ অফিসে পাঠিয়ে দেবে। লোকটা বোধহয় দাগী আসামী।'

জগবন্ধু পাত্রের বাসা থেকে বেরিয়ে রাখালবাবু ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি মনে হয় ? জগবন্ধু পাত্রই আমাদের আসামী ?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বলা যায় না। লোকটা রাজকুমারের মৃত্যু-সংবাদ

শুনে চমকে উঠেছিল। তবে অভিনয় হতে পারে।'

অতঃপর মোহনলাল কুণ্ডুর বাসায় গিয়ে জানা গেল, কুণ্ডু মশাই কলকাতায় নেই। সস্ত্রীক কাশী গিয়েছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

সেখান থেকে তাঁরা শ্যামাকান্ত লাহিড়ীর বাড়ি গেলেন। কিন্তু এখানেও নিরাশ হতে হলো। শ্যামাকান্ত বাড়ি নেই, অফিসে গেছেন! শ্যামাকান্ত পোর্ট কমিশনারের অফিসে বড় চাকরি করেন এইটুকুই শুধু জানা গেল। সন্ধ্যের আগে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

রাখালবাবু নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাকি রইলেন শুধু লতিকা চৌধুরী। ইনি যখন মহিলা তখন আশা করা যায় দুপুরবেলা এঁকে বাসায় পাওয়া যাবে।'

শ্রীমতী চৌধুরী স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকেন, ফ্ল্যাট নয়। ছোটখাটো বাড়িটি, বেশ পরিচ্ছন্ন, সামনে একফালি ফুলের বাগান। ঘণ্টি বাজাতেই একটি চশমা-পরা মহিলা দোর খুলে বললেন, 'কাকে চাই? কর্তা বাড়ি নেই।' তারপরই তাঁর চকিত দৃষ্টি পড়ল রাখালবাবুর ইউনিফর্মের ওপর।

জেনারেল রামপিরিত যে বর্ণনা দিয়েছিল, মহিলাটির সঙ্গে তার মিল আছে। তবে বয়স বিশ-পঁচিশ নয়, আরো বেশি। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সেও কিন্তু ছিমছাম গড়ন এবং সুশ্রী মুখ থেকে যৌবনের রেশ সম্পূর্ণ মুছে যায়নি।

রাখালবাবু বললেন, 'আপনার নাম শ্রীমতী লতিকা চৌধুরী?'

শ্রীমতী চৌধুরীর ঠোঁট হঠাৎ আলগা হয়ে গেল, তিনি স্খলিতস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ। কি দরকার?'

রাখালবাবু বললেন, 'আপনাকে দু'-চারটে প্রশ্ন করতে চাই। আমি পুলিসের লোক।'

শঙ্কা-শীর্ণ মুখে মিসেস চৌধুরী বললেন, 'আসুন।'

বসবার ঘরটি পরিপাটিভাবে সাজানো; নীচু চেয়ার, সোফা, সেন্টার পিস্। দেয়ালে একটি মধ্যবয়স্ক পুরুষের আবক্ষ ফটোগ্রাফ টাঙানো রয়েছে; মুখখানা কঠোর, চোখের নির্মম দৃষ্টি দর্শককে সর্বত্র অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে; এ ঘরে থাকলে ওই সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু পাশাপাশি সোফায় বসলেন; শ্রীমতী চৌধুরী একটি চেয়ারের কিনারায় বসে ভয়ার্ত চোখে তাঁদের পানে চাইলেন।

'আপনার স্বামীর নাম কি?'

'তারাকুমার চৌধুরী।'

'কি কাজ করেন?'

'ইঞ্জিনীয়র। রেলের ইঞ্জিনীয়র।'

'ছেলেপুলে?'

'নেই। আমরা নিঃসন্তান।'

'কাল রাত্রি সওয়া ন'টার সময় আপনি নিরুপমা হোটেলে গিয়েছিলেন?'

শ্রীমতী চৌধুরীর চোখ দু'টি চশমার ভেতরে বিস্ফারিত হলো, 'আমি! না না, আমি তো সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম।'

'হোটেলের দরোয়ান আপনাকে কাল দেখেছে, সে আপনাকে সনাক্ত করতে পারবে।'

শ্রীমতী চৌধুরীর মুখ শুকিয়ে গেল, তিনি ঠোঁট চেটে বললেন, 'কিন্তু আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম— আলেয়া সিনেমাতে। টিকিটের প্রতিপত্র দেখাতে পারি।'

'আপনি সিনেমার টিকিট কিনেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ছবি শেষ হবার আগেই নিরুপমা হোটেলে গিয়েছিলেন, রাজকুমার বোসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।'

রাজকুমারের নাম শুনে শ্রীমতী চৌধুরীর মুখ মড়ার মত হয়ে গেল। তাঁর ঠোঁট দুটো অস্ফুটভাবে নড়তে লাগল, 'রাজকুমার বসু— তাকে তো আমি চিনি না—'

ব্যোমকেশ বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করল, 'সুকান্ত সোমকে চেনেন?'

শ্রীমতী চৌধুরী জালবদ্ধা হরিণীর মত ব্যোমকেশের পানে চাইলেন, তারপর দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন।

ব্যোমকেশ নরম সুরে বলল, 'আমরা জানি, রাজকুমার বোস আর সুকান্ত সোম একই ব্যক্তি। সে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছিল। কাল রাত্রি সওয়া ন'টার সময় সিনেমা-ফেরত আপনি তাকে টাকা দিতে গিয়েছিলেন। এখন বাকি কথা সব বলুন, আপনার কোনো ভয় নেই।'

শ্রীমতী চৌধুরী কিছুক্ষণ ফোঁপালেন, তারপর চোখ মুছে মুখ তুললেন, ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, 'বলছি। কেন জানতে চান আপনারাই জানেন, কিন্তু দোহাই আপনাদের, আমার স্বামী যেন কিছু জানতে না পারেন।'

ব্যোমকেশ দেয়ালের ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ইনি আপনার স্বামী ?'

'হ্যাঁ।'

'কড়া প্রকৃতির লোক মনে হয়। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আমরা কাউকে কিছু বলব না।'

তারপর মিসেস চৌধুরী লজ্জানত চোখে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে যে কাহিনী বললেন তার সারাংশ এই :

বারো-তেরো বছর আগে শ্রীমতী চৌধুরী যখন কুমারী ছিলেন তখন তাঁর প্রকৃতি ছিল অন্য রকম, তিনি নিজেকে সংস্কারমুক্তা অতি-আধুনিকা মনে করতেন। বাপের বাড়িতে টাকা ছিল বেশি, শাসন ছিল কম। লতিকা চক্রবর্তী বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে হৈ হৈ করে, সিনেমা-থিয়েটার দেখে সময় কাটাতেন।

সে-সময় চিত্র-জগতে সুকান্ত সোম নামে একজন হীরো ছিল, যেমন তার চেহারা তেমনি অভিনয়। লতিকা চক্রবর্তী তার প্রেমে পড়ে গেলেন, সাধারণ প্রেম নয়, একেবারে বাঁধন-ছেঁড়া প্রেম। তিনি সুকান্তকুমারকে প্রবল অনুরাগপূর্ণ চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা হতে লাগল।

লতিকা সুকান্তকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলেন, কিন্তু একদিন জানতে পারলেন, সুকান্তর ঘরে একটি স্ত্রী আছে। তাঁর প্রেমে ভাটা পড়ল। তাঁর বাবা বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

তারপর দু'বছর কাটল। লতিকা দেবীর স্বামী লোকটি অতিশয় সজ্জন। কিন্তু যৌন শিথিলতা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত কড়া। বিয়ের পর লতিকা চৌধুরীর রোমাঞ্চের নেশা ছুটে গিয়েছিল, স্বামীকে তিনি প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। সন্তানাদি না হলেও তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়ে উঠেছিল।

একদিন কাগজে ভয়ঙ্কর খবর বেরুল, সুকান্ত নিজের স্ত্রীকে খুন করেছে। কেস আদালতে উঠল। আসামী অবশ্য খালাস পেয়ে গেল, কারণ সে আত্মরক্ষার্থে খুন করেছে ; স্ত্রী ছুরি নিয়ে তাকে আক্রমণ করেছিল, তার মুখ এবং সর্বাঙ্গে কেটে ফালা-ফালা করে দিয়েছিল, সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে স্ত্রীকে গলা টিপে মেরেছে। যতদিন মোকদ্দমা চলেছিল ততদিন লতিকা দেবী ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিলেন, পাছে কোনো সূত্রে তাঁর নামটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু সাক্ষী বা আসামী কেউ তাঁর নাম করল না ; তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

অতঃপর দু'-তিন বছর নিরুপদ্রবে কেটে গেল।

সুকান্তর সিনেমার কাজ শেষ হয়েছিল ; ও রকম একটা মুখ নিয়ে সিনেমার হীরো সাজা যায় না। সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিল। হঠাৎ একদিন সুকান্ত তার বীভৎস মুখ নিয়ে লতিকা দেবীর সঙ্গে দেখা করল, বলল, 'আমার টাকার দরকার, তোমাকে দিতে হবে। বেশি নয়, ছ' মাস অন্তর তিন শো টাকা ; তোমার পক্ষে অতি সামান্য। যদি না দাও, তুমি আমাকে যে-সব চিঠি লিখেছিলে সেগুলি তোমার স্বামীকে দেখাব।'

সেই থেকে শ্রীমতী চৌধুরী ছ' মাস অন্তর তিন শো টাকা গুনছেন। ছ' মাসে তিন শো টাকা

তাঁর গায়ে লাগে না, কিন্তু সদাই ভয়, পাছে স্বামী জানতে পারেন।

কাল রাত্রে তিনি টাকা দিতে নিরুপমা হোটেলে গিয়েছিলেন, দু'নম্বর ঘরের দোরের বাইরে থেকে সুকান্ত সোমকে টাকা দিয়ে চলে এসেছিলেন। আর কিছু জানেন না।

শ্রীমতীর কাহিনী শেষ হলে শ্রোতা দু'জন কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। তারপর ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আচ্ছা, আজ আমরা যাই। একটা সুখবর দিয়ে যাই, কাল রাত্রি সওয়া ন'টা থেকে এগারোটার মধ্যে সুকান্ত সোম ওরফে রাজকুমার বোস খুন হয়েছে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'জনে ফুটপাথে এসে দাঁড়ালেন। রাখালবাবু বললেন, 'শ্রীমতীর আত্মকথা তো শুনলাম। কিন্তু খুনের হদিস পাওয়া গেল না।'

ব্যোমকেশ বলল, 'একেবারে কিছুই পাওয়া যায়নি এমন কথা বলা যায় না। আজ যতগুলি লোকের এজেহার শুনেছি তাদের মধ্যে একজন একটা বেফাঁস কথা বলেছে। কিন্তু কে বলেছে মনে করতে পারছি না।'

'কী বেফাঁস কথা?'

'সেইটেই মনে আসছে না। অনেক কথার মধ্যে ওই কথাটা মগ্নচৈতন্যে ডুব মেরেছে।'

রাখালবাবু ঘড়ি দেখলেন, প্রায় তিনটে বাজে। বললেন, 'আমি এখন থানায় ফিরব। আপনি?'

'আমি একবার নতুন বাড়ির কাজকর্ম তদারক করে বাসায় ফিরব। কাল সকালে আবার দেখা হবে। ইতিমধ্যে যদি নতুন খবর কিছু পান, দয়া করে টেলিফোন করবেন।'

পাঁচটার পর বাসায় ফিরে ব্যোমকেশ এক পেয়ালা চা খেল, তারপর সিগারেট ধরিয়ে তক্তপোশের ওপর লম্বা হলো। অজিত বাড়ি নেই, সাড়ে চারটের সময় দোকানে গেছে। ব্যোমকেশ একলা একলা চোখ বুজে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

সাড়ে ছ'টার সময় সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। সত্যবতী কী একটা কাজে ঘরে এসেছিল, চমকে উঠে বলল, 'কি হলো?'

ব্যোমকেশ উদ্ভাসিত মুখে বলল, 'মনে পড়েছে!'

'কী মনে পড়ল?'

'কাছে এসো, কানে কানে বলছি।'

কানে কানে কথা শুনে সত্যবতী হাসিমুখে ব্যোমকেশের বাহুতে একটি ছোট্ট চড় মারল। ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে একবার বেরুতে হবে।'

'আবার বেরুবে। কোথায় যাবে?'

''কালকেতু' খবরের কাগজের অফিসে। দশ বছরের পুরনো কাগজের ফাইল দেখতে হবে।'

'ফিরতে নিশ্চয় রাত করবে। জলখাবার খেয়ে যাও।'

'দরকার নেই। পেটে নিরুপমা হোটেলের গদ আছে।'

পরদিন সকালবেলা ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে টেলিফোন করল, 'তাজা খবর কিছু আছে নাকি?'

রাখালবাবু বললেন, 'সাড়া-জাগানো কোনো খবর নেই। লাশ পরীক্ষা করে অপ্রত্যাশিত কোনো খবর পাওয়া যায়নি; মৃত্যুর সময় ডিনারের আন্দাজ দেড় ঘণ্টা পরে। দু'নম্বর ঘরে রাজকুমার আর গুণধরের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।— শ্যামাকান্ত লাহিড়ীর বাসায় আবার গিয়েছিলাম; সে পরিষ্কার অস্বীকার করল, বলল, নিরুপমা হোটেলে যায়নি। জেনারেল রামপিরিত কিন্তু তাকে সনাক্ত করেছে। শ্যামাকান্তকে অ্যারেস্ট করিনি, কিন্তু তার পেছনে লেজুড় লাগিয়েছি।'

'তারপর?'

'জগবন্ধু পাত্রের আসল নাম জানা গিয়েছে— ভগবান মহান্তি। দাগী আসামী; মেদিনীপুরে

একটা স্ত্রীলোককে খুন করে চৌদ্দ বছর জেলে গিয়েছিল, তারপর জেল ভেঙে পালায়। কলকাতায় এসে ছদ্মনামে ঘোড়দৌড়ের দালালি করছিল।'

'আর কিছু?'

'লতিকা দেবীর স্বামী তারাকুমার চৌধুরী সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম তিনি সে-রাত্রে এগারোটার পর বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু এতক্ষণ কোথায় ছিলেন জানা যাচ্ছে না।'

'জানার দরকার নেই। হোটেলের খবর কি?'

'হোটেলের অতিথিরা বড় অস্থির হয়ে উঠেছেন। ভাবছি আজ বিকেলবেলা তাদের ছেড়ে দেব।— আপনি কিছু পেলেন?'

'পেয়েছি। আমি এখনি নিরুপমা হোটেলে যাচ্ছি। আপনিও আসুন।'

এক নম্বর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাখালবাবু ও ব্যোমকেশের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। রাখালবাবু দোরে টোকা দিলেন।

দোর খুলে গেল। মিসেস্ শোভনা রায় রাখালবাবুকে দেখে জ্বলে উঠলেন, 'এই যে। আপনি আর কতদিন আমাকে আটকে রাখবেন। আমার মত একজন ডাক্তারকে এমনভাবে আটকে রাখা আইনবিরুদ্ধ তা জানেন কি?'

রাখালবাবু বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে আপনার যদি কোনো নালিশ থাকে আদালত আছে। আপাতত আপনাকে আমরা দু'-চারটে কথা বলতে চাই।'

দু'জনে ঘরে প্রবেশ করলেন, ব্যোমকেশ চেয়ারে বসে বলল, 'আপনাকে একটা গল্প শোনাতে চাই, মিসেস্ রায়।'

মিসেস্ রায় আবার জ্বলে উঠলেন, রূঢ়কণ্ঠে বললেন, 'আপনি আবার কে! ঠাট্টা করছেন নাকি?'

রাখালবাবু বললেন, 'ইনি ব্যোমকেশ বক্সী। নাম শুনে থাকবেন।'

ব্যোমকেশ বলল, 'ঠাট্টা করছি না, মোটেই ঠাট্টা করছি না। আপনি বসুন।'

ব্যোমকেশের নাম শুনে মিসেস্ রায় থতিয়ে গিয়েছিলেন, খাটের ধারে বসলেন। রুক্ষ স্বর যথাসম্ভব নরম করে বললেন, 'কি বলবেন বলুন। আমি কিন্তু আজই বহরমপুর ফিরে যাব।'

ব্যোমকেশ বলল, 'সেটা ভবিষ্যতের কথা।— গল্পটি খবরের কাগজে পড়লাম, সংক্ষেপে শোনাচ্ছি। —সুকান্ত সোম একজন সিনেমা আর্টিস্ট ছিল—'

মিসেস্ রায়ের শরীর শক্ত হয়ে উঠল, তিনি অপলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চেয়ে রইলেন। ব্যোমকেশ শুষ্ক স্বরে বলল, 'চেনেন দেখছি। চেনবারই কথা, সে আপনার জামাই ছিল।—সুকান্ত সোম সিনেমা করে খুব নাম করেছিল। আপনি তখন বর্ধমানে প্র্যাকটিস করতেন। বিধবা মানুষ, সংসারে কেবল একটি মেয়ে। বর্ধমানে সুকান্তের যাওয়া-আসা ছিল। সে একদিন আপনার মেয়েটিকে ভুলিয়ে নিয়ে ইলোপ করল। সুকান্ত আপনার মেয়েকে লোভ দেখিয়েছিল তাকে সিনেমার হিরোইন করবে। আপনি সুকান্তকে পছন্দ করতেন না, তাই ইলোপমেন্ট।

'একসঙ্গে কিছু দিন বাস করবার পর দু'জনের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ল; দু'জনেরই মিলিটারি মেজাজ। ঝগড়া আরম্ভ হলো। ঝগড়ার প্রধান কারণ, সুকান্ত আপনার মেয়েকে হিরোইন বানাতে পারেনি। একদিন ঝগড়া চরমে উঠল, আপনার মেয়ে ছুরি দিয়ে সুকান্তর মুখ কেটে ফালা-ফালা করে দিল। সুকান্ত নিজের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে আপনার মেয়েকে গলা টিপে খুন করল।

'খুনের আসামী সুকান্ত তিন মাস পুলিসের হাসপাতালে রইল। সেখান থেকে তাকে যখন বিচারের জন্যে আদালতে হাজির করা হলো তখন তার বীভৎস মুখ দেখে জজ সাহেব পর্যন্ত চমকে গেলেন। জেলের হাসপাতালে প্লাস্টিক সার্জারির ব্যবস্থা নেই; সুকান্তর মুখের ঘা

শুকিয়েছে বটে, কিন্তু সিনেমার হিরোর পার্ট করার মত মুখ আর নেই।

'বিচার হলো। আপনি সুকান্তর বিরুদ্ধে সাক্ষী ছিলেন, মিসেস্ রায়। কিন্তু তাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারলেন না। তার হাতে অস্ত্র ছিল না, আপনার মেয়ের হাতে অস্ত্র ছিল ; আত্মরক্ষার অজুহাতে সুকান্ত ছাড়া পেয়ে গেল।'—

মিসেস্ শোভনা রায় আগুন-ভরা চোখে বললেন, 'মিছে কথা। ও আগে আমার মেয়েকে গলা টিপে মেরেছিল, তারপর নিজে নিজের মুখ ছুরি দিয়ে কেটেছিল।'

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল, 'কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুকান্ত সিনেমা আর্টিস্ট, সে কখনো নিজের মুখে ছুরি মেরে নিজের আখের নষ্ট করত না ; নিজের গায়ে ছুরি মারত। যাহোক, সুকান্ত খুনের দায় থেকে রেহাই পেল বটে, কিন্তু তার সিনেমা-জীবন শেষ হয়ে গেল। সৎপথে থেকে অন্য কোনো উপায়ে জীবিকা অর্জনের রাস্তা সে জানত না, সে কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে পাটনায় বাসা বাঁধল এবং ব্ল্যাকমেলের ব্যবসা শুরু করল। গত দশ বছরে কলকাতায় কটকে কাশীতে দিল্লীতে তার অনেক খদ্দের জুটেছে। কারুর ওপর সে অযথা উৎপীড়ন করে না, ছ' মাস অন্তর এসে বাঁধা-বরাদ্দ আদায় তসিল করে। এই তার জীবিকা।

'সুকান্ত যখন আদায় তসিলের জন্যে কলকাতায় আসত তখন এই নিরুপমা হোটেলেই থাকত। আপনি ইতিমধ্যে বর্ধমানের বাস তুলে দিয়ে বহরমপুরে গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন, আপনিও মাঝে-মধ্যে এসে এই হোটেলে থাকেন। কিন্তু ঠিক একই সময়ে দু'জনের আসা আগে ঘটেনি, আপনি সুকান্তকে এখানে দেখেননি।

'দৈবক্রমে এবার আপনি তাকে দেখতে পেলেন, সে আপনার পাশের ঘরেই উঠেছে। সে বোধ হয় আপনাকে দেখতে পায়নি। পেলে সাবধান হতো। আপনি তাকে পেলে খুন করবেন এই ধরনের একটা ইচ্ছে আপনার মনে ছিল, কিন্তু দশ বছর সে-আগুন ছাই-চাপা পড়েছিল। এখন সুকান্তকে হাতের কাছে পেয়ে ছাই-চাপা আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। আপনার মেয়েকে যে খুন করেছে তাকে আপনি বেঁচে থাকতে দেবেন না। আপনার মেয়ে বোধ হয় আপনার কাছ থেকেই তার উগ্র হিংস্র প্রকৃতি পেয়েছিল।

'সে-রাত্রে ডিনার খেয়ে এসে আপনি নিজের ঘরে অপেক্ষা করে রইলেন। কিভাবে তাকে খুন করবেন তার প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছেন ; এখন শুধু শুভমুহূর্তের অপেক্ষা।

'সওয়া ন'টা থেকে সুকান্তর ঘরে লোক আসতে শুরু করল। আপনি নিজের ঘরে ওত পেতে আছেন। দশটার সময় লোক আসা বন্ধ হলো। আপনি অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরুলেন। দোতলার অন্য অতিথিরা দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে, যে-চাকরটা সিঁড়ির সামনে শোয় সে এখনো আসেনি। এই সুযোগ।

'আপনি দু' নম্বর দোরে টোকা দিলেন। সুকান্ত তখন শুয়ে পড়েছিল, সে উঠে দোর খুলল ; আপনি সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে অস্ত্রটা ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর দোর টেনে বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। আপনার সঙ্গে যে রাজকুমার বোসের সম্বন্ধ আছে তা কেউ জানে না, আপনাকে কে সন্দেহ করতে পারে। বরং রাত্রে যারা রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সন্দেহ পড়বে তাদের ওপর।

'আপনি একটি ছোট্ট ভুল করেছিলেন। ইন্সপেক্টর যখন আপনাকে জেরা করেন তখন আপনি বলেছিলেন, রাজকুমারকে আপনি আগে কখনো দেখেননি ; তার পরেই বললেন, ও মুখ দেখলে মনে থাকত। রাজকুমারের মুখ যে মনে রাখার মত তা আপনি জানলেন কি করে ? ঘরের দিকে একবার উঁকি মেরেছিলেন বটে, কিন্তু তখন আমরা তিনজন দোরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, রাজকুমারের মুখ আপনি দেখতে পাননি। এই বেফাঁস কথাটা যদি আপনি না বলতেন তাহলে দশ বছরের পুরনো খবরের কাগজের ফাইল দেখার কথা আমার মনে আসত না।'

এই পর্যন্ত বলে ব্যোমকেশ চুপ করল। মিসেস্ রায় কামারের হাপরের গনগনে আগুনের মত জ্বলতে লাগলেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'সব মিছে কথা। সুকান্ত আমার মেয়েকে

খুন করেছিল, কিন্তু আমি তাকে খুন করিনি। কি দিয়ে খুন করব ? আমার কাছে কি ছোরা-ছুরি আছে ?'

ব্যোমকেশ তাঁর ডাক্তারি ব্যাগের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আছে। ওই ব্যাগের মধ্যে আছে।'

মিসেস্ রায়ের চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেল।

'না, নেই। এই দেখুন—' ব্যাগ খুলে ক্ষিপ্র হস্তে তার ভিতর থেকে তিনি একটি কাঁচি বার করলেন। লম্বা লিকলিকে সার্জিকাল কাঁচি, তার দুটো ফলা আলাদা করা যায়। মিসেস্ রায় কাঁচির একটা ফলা খুলে নিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু রাখালবাবু প্রস্তুত ছিলেন, তিনি বিদ্যুৎবেগে মিসেস্ রায়ের মণিবন্ধ চেপে ধরলেন। মিসেস্ রায় উন্মত্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, 'ছেড়ে দাও— ছেড়ে দাও—'

ব্যোমকেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, অস্ত্রটাও পাওয়া গেছে। ওটা না পেলে মুশকিল হতো।'

ছলনার ছন্দ

টেলিফোন তুলে নিয়ে ব্যোমকেশ বলল— 'হ্যালো !'

ইন্সপেক্টর রাখালবাবুর গলা শোনা গেল— 'ব্যোমকেশদা, আমি রাখাল। নেতাজী হাসপাতাল থেকে কথা বলছি। একবার আসবেন ?'

'কি ব্যাপার ?'

'খুনের চেষ্টা। একটা লোককে কেউ গুলি করে মারবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মারতে পারেনি। আহত লোকটাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। সে এক বিচিত্র গল্প বলছে।'

'তাই নাকি ? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

কেয়াতলায় ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে নেতাজী হাসপাতাল বেশি দূর নয়। আধ ঘণ্টা পরে বিকেল আন্দাজ পাঁচটার সময় ব্যোমকেশ সেখানে পৌঁছে দেখল, এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনে দারোগা রাখাল সরকার দাঁড়িয়ে আছেন।

এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি আরো কিছু তথ্য উদ্‌ঘাটন করলেন। আহত লোকটির নাম গঙ্গাপদ চৌধুরী, ভদ্রশ্রেণীর লোক। ফ্রেজার রোড থেকে একটা ছোট রাস্তা বেরিয়েছে, সেই রাস্তায় একটা বাড়ির দোতলার ঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। বাড়ির ঠিকে চাকর বেলা তিনটের সময় কাজ করতে এসে গঙ্গাপদকে আবিষ্কার করে। তারপর হাসপাতাল পুলিস ইত্যাদি। গঙ্গাপদর জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু প্রচুর রক্তপাতের ফলে এখনো ভারি দুর্বল।

গঙ্গাপদ আজ বিকেলবেলা তার দোতলার ঘরে রাস্তার দিকে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ সামনের দিক থেকে বন্দুকের গুলি এসে তার চুলের মধ্যে দিয়ে লাঙল চষে চলে যায়। খুলির ওপর গভীর টানা দাগ পড়েছে, কিন্তু গুলি খুলি ফুটো করে ভিতরে ঢুকতে পারেনি, হাড়ের ওপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেছে।

বন্দুকের গুলিটা ঘরের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে, দেখে মনে হলো পিস্তল কিংবা রিভলবারের গুলি। পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছে।

এবার চলুন গঙ্গাপদর বয়ান শুনবেন। তাকে খানিকটা রক্ত দেওয়া হয়েছে, এতক্ষণে সে বোধ হয় বেশ চনমনে হয়েছে।

গঙ্গাপদ চৌধুরী একটি ছোট ঘরে সঙ্কীর্ণ লোহার খাটের ওপর শুয়ে ছিল। মাথার ওপর পাগড়ির মত ব্যান্ডেজ, তার নীচে শীর্ণ লম্বাটে ধরনের একটি মুখ। মুখের রঙ বোধ করি রক্তপাতের ফলে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। ভাবভঙ্গীতে ভালমানুষীর ছাপ।

ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু খাটের দু'পাশে চেয়ার টেনে বসলেন। গঙ্গাপদ একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকাল ; তার পাংশু অধরে একটুখানি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। লোকটি মৃত্যুর সিংদরজা থেকে ফিরে এসেছে, কিন্তু তার মুখে চোখে ত্রাসের কোনো চিহ্ন নেই।

রাখালবাবু বললেন— 'এঁর নাম ব্যোমকেশ বক্সী। ইনি আপনার গল্প শুনতে এসেছেন।'

গঙ্গাপদর চক্ষু হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল, সে ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করলে ব্যোমকেশ তার বুকে হাত রেখে আবার শুইয়ে দিল, বলল— 'উঠবেন না, শুয়ে থাকুন।'

গঙ্গাপদ বুকের ওপর দু'হাত জোড় করে সংহত সুরে বলল— 'আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশবাবু ! কী সৌভাগ্য। আমার কলকাতা আসা সার্থক হলো।'

রাখালবাবু বললেন— 'আপনি যদি শরীরে যথেষ্ট বল পেয়ে থাকেন তাহলে ব্যোমকেশবাবুকে আপনার গল্প শোনান। আর যদি এখনো দুর্বল মনে হয় তাহলে থাক, আমরা পরে আবার আসব।'

গঙ্গাপদ বলল— 'না না, আমার আর কোনো দুর্বলতা নেই। খুব খানিকটা রক্ত নাড়ির মধ্যে ঠুসে দিয়েছে কিনা।' বলে হেসে উঠল।

'তাহলে বলুন।'

খাটের পাশে টিপাইয়ের ওপর এক গ্লাস জল রাখা ছিল, গঙ্গাপদ বালিশের ওপর উঁচু হয়ে শুয়ে এক চুমুক জল খেলো, তারপর হাসি-হাসি মুখে গল্প বলতে আরম্ভ করল :

আমার নাম কিন্তু গঙ্গাপদ চৌধুরী নয়, অশোক মাইতি। কলকাতায় এসে আমি কেমন করে গঙ্গাপদ চৌধুরী বনে গেলাম সে ভারি মজার গল্প। বলি শুনুন।

আমার বাড়ি মীরাটে। সিপাহী যুদ্ধেরও আগে আমার পূর্বপুরুষ মীরাটে গিয়ে বাসা বেঁধেছিলেন। সেই থেকে আমরা মীরাটের বাসিন্দা, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক খুব বেশি নেই।

আমি মীরাটে সামান্য চাকরি করি। বাড়িতে বিধবা মা আছেন ; আর একটি আইবুড়ো বোন। আমি বিয়ে করেছিলাম কিন্তু বছর পাঁচেক আগে বিপত্নীক হয়েছি। আর বিয়ে করিনি। বোনটাকে পাত্রস্থ না করা পর্যন্ত—

কিন্তু সে যাক। অফিসে এক মাস ছুটি পাওনা হয়েছিল, ভাবলাম কলকাতা বেড়িয়ে আসি। কলকাতায় আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই ; আমি ছেলেবেলায় একবার কলকাতায় এসেছিলাম, তারপর আর আসিনি। ভাবলাম স্বদেশ দেখাও হবে, আর সেই সঙ্গে বোনটার জন্যে যদি একটি পাত্র পাই—

হাওড়ায় এসে নামলাম। মীরাট থেকে এক হিন্দুস্থানী ধর্মশালার ঠিকানা এনেছিলাম, ঠিক ছিল সেখানেই উঠব। ট্রেন থেকে নেমে ফটকের দিকে চলেছি, দেখি একটা দাড়িওয়ালা লোক আমার পাশে পাশে চলেছে, আর ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে আমার পানে তাকাচ্ছে। একবার মনে হলো কিছু বলবে, কিন্তু মুখ খুলে কিছু না বলে আবার মুখ বন্ধ করল। আমি ভাবলাম, এ আবার কে ? হয়তো হোটেলের দালাল।

ধর্মশালায় পৌঁছে কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেলাম। সেখানে একটি কুঠুরিও খালি নেই, সব ভর্তি, এখন হোটেলে যেতে হয় ; কিন্তু হোটেলে অনেক খরচ, অত খরচ আমার পোষাবে না। কি করব ভাবছি, এমন সময় সেই দাড়িওয়ালা লোকটি এসে উপস্থিত। চোখে নীল চশমা লাগিয়েছে। বলল— 'জায়গা পেলেন না ?'

বললাম—'না। আপনি কে ?'

সে বলল— 'আমার নাম গঙ্গাপদ চৌধুরী। আপনি কোথা থেকে আসছেন ?'

বললাম— 'মীরাট থেকে। আমার নাম অশোক মাইতি। আপনি কি হোটেলের এজেন্ট ?'

সে বলল— 'না। হাওড়া স্টেশনে আপনাকে দেখেছিলাম, দেখেই চমক লেগেছিল। কেন চমক লেগেছিল সে কথা পরে বলছি। এখন বলুন দেখি, কলকাতায় কি আপনার থাকবার জায়গা নেই ?'

বললাম— 'থাকলে কি ধর্মশালায় আসি ? কিন্তু এখানেও দেখছি জায়গা নেই। হোটেলের খরচ দিতে পারব না। তাই ভাবছি কী করি।'

গঙ্গাপদ বলল— 'দেখুন, আমার একটা প্রস্তাব আছে। কলকাতায় আমি থাকি, দক্ষিণ কলকাতায় আমার বাসা আছে। আমি মাসখানেকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, বাসাটা খালি পড়ে

থাকবে। তা আপনি যদি আমার বাসায় থাকেন আপনারও সুবিধে আমারও সুবিধে। আমার একটা ঠিকে চাকর আছে, সে আপনার দেখাশোনা করবে, কোনো কষ্ট হবে না।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম— 'আমার মত একজন অচেনা লোকের হাতে আপনি বাসা ছেড়ে দেবেন!'

গঙ্গাপদ একটু হেসে বলল— 'তাহলে চমক লাগার কথাটা বলি। স্টেশনে আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল আপনি আমার ভাই দুর্গাপদ। তারপর ভুল বুঝতে পারলাম। দুর্গাপদ দু' বছর আগে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, বোধ হয় সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে তার চেহারার খুব মিল আছে। তাই—মানে—আপনার প্রতি আমার একটু—ইয়ে—। আপনি যদি আমার বাসায় থাকেন আমি খুব নিশ্চিন্ত হব।'

আমার ভাগ্যে এমন যোগাযোগ ঘটবে স্বপ্নেও ভাবিনি। খুশি হয়ে রাজী হয়ে গেলাম।

গঙ্গাপদ আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে তার বাসায় নিয়ে গেল। ছোট রাস্তায় ছোট বাড়ির দোতলায় একটি মাঝারি গোছের ঘর, ঘরে তক্তপোশের ওপর বিছানা, দেয়ালে আলমারি, দু' একটা বাক্স সুটকেস। আর কিছু নেই।

হিন্দুস্থানী চাকরটা উপস্থিত ছিল। তার নাম রামচতুর। গঙ্গাপদ তাকে পয়সা দিল দোকান থেকে চা জলখাবার আনতে। সে চলে গেলে গঙ্গাপদ রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দিয়ে তক্তপোশে এসে বসল, বলল— 'বসুন, আপনার সঙ্গে আরো কিছু কথা আছে।'

আমিও তক্তপোশে বসলাম। গঙ্গাপদ বলল— 'আমার বাড়িওয়ালা কাশীপুরে থাকে, লোকটা ভাল নয়। সে যদি জানতে পারে আমি অন্য কাউকে ঘরে বসিয়ে একমাসের জন্য বাইরে গেছি তাহলে হাঙ্গামা বাধাতে পারে। তাই আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। যদি কেউ আপনার নাম জিজ্ঞেস করে, আপনি বলবেন— গঙ্গাপদ চৌধুরী। লোকে ভাববে আমি দাড়ি কামিয়ে ফেলেছি।'

শুনে আমার খুব মজা লাগল, বললাম— 'বেশ তো, এ আর বেশি কথা কি!'

তারপর রামচতুর চা জলখাবার নিয়ে এল। গঙ্গাপদ আমাকে জলযোগ করিয়ে উঠে পড়ল, বলল— 'আচ্ছা, এবার তাহলে আমি চলি। আমার জিনিসপত্র ঘরে রইল। নিশ্চিন্ত মনে বাস করুন। নমস্কার।'

দোর পর্যন্ত গিয়ে গঙ্গাপদ ফিরে এল, বলল— 'একটা কথা বলা হয়নি। যখন ঘরে থাকবেন, মাঝে মাঝে জানলা খুলে রাস্তার দিকে তাকাবেন ; লক্ষ্য করবেন রাস্তা দিয়ে লাল কোট পরা কোনো লোক যায় কিনা। যদি দেখতে পান, তারিখ আর সময়টা লিখে রাখবেন। কেমন?'

'আচ্ছা।'

গঙ্গাপদ চলে গেল। আমার সন্দেহ হলো তার মাথায় ছিট আছে। কিন্তু থাকুক ছিট, লোকটা ভাল। আমি বেশ আরামে রইলাম। রামচতুর আমার সেবা করে। আমি সকাল বিকেল এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই, দুপুরে আর রাত্রে ঘরে থাকি। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, রাস্তা দিয়ে লাল কোট পরা কেউ যাচ্ছে কিনা। লাল কোট পরে কলকাতার রাস্তায় কেউ ঘুরে বেড়াবে এ যেন ভাবাই যায় না। তবু গঙ্গাপদ যখন বলেছে, হবেও বা।

হপ্তাখানেক বেশ আরামে কেটে গেল।

আজ সকালে খবরের কাগজের অফিসে গেছলাম বোনের পাত্র সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞাপন দিতে। ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে তক্তপোশে শুলাম। রামচতুর চলে গেল।

ঘুম ভাঙল আন্দাজ পৌনে তিনটের সময়। বিছানা থেকে উঠে জানলা খুলে দিলাম। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছি, হঠাৎ মাথাটা ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল, উল্‌টে মেঝের ওপর পড়ে গেলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই, অসহ্য যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

হাসপাতালে জ্ঞান হলো। মাথায় পাগড়ি বেঁধে শুয়ে আছি। কে নাকি আমার মাথা লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়েছিল, বন্দুকের গুলি আমার খুলির ওপর আঁচড় কেটে চলে গেছে।— 'কী

ব্যাপার বলুন দেখি ব্যোমকেশবাবু ?'

'সেটা বুঝতে সময় লাগবে। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।' ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ রাখালবাবু ব্যোমকেশের বাড়িতে এলেন। ব্যোমকেশ তার অফিস ঘরে বসে অলসভাবে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ছিল, রাখালবাবুকে একটি সিগারেট দিয়ে বলল— 'নতুন খবর কিছু আছে নাকি ?'

রাখালবাবু সিগারেট ধরিয়ে বললেন— 'রামচতুর পালিয়েছে।'

'রামচতুর ! ও—সেই চাকরটা।'

'হ্যাঁ। কাল বিকেলবেলা পুলিসকে খবর দিয়ে সেই যে গা-ঢাকা দিয়েছে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সত্যিই রাম-চতুর। পুলিসের হাঙ্গামায় থাকতে চায় না। এতক্ষণ বোধ হয় বেহার প্রদেশে ফিরে গিয়ে ভুট্টা পুড়িয়ে খাচ্ছে। আর কিছু ?'

'বাড়িওয়ালাকে কাশীপুর থেকে খুঁজে বার করেছি। আজ সকালে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। অশোক মাইতিকে দেখে বলল, এই গঙ্গাপদ চৌধুরী ; তারপর গলার আওয়াজ শুনে বলল, না গঙ্গাপদ নয়, কিন্তু চেহারার খুব মিল আছে।'

এই পর্যন্ত শুনে ব্যোমকেশ বলল— 'গঙ্গাপদ চৌধুরীর সঙ্গে অশোক মাইতির চেহারার মিল আছে ?'

রাখালবাবু বললেন— 'হ্যাঁ, গঙ্গাপদ বলেছিল তার ভায়ের সঙ্গে মিল আছে, গঙ্গাপদ এবং তার ভায়ের চেহারা যদি এক রকম হয়—'

'গঙ্গাপদর দাড়িটা মেকি মনে হচ্ছে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অশোক মাইতিকে এনে নিজের বাসায় তুলল কেন ? নিজের নামটাই বা তাকে দান করল কেন ? আসল কারণটা কী ?'

ব্যোমকেশ কি-একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর অলস কণ্ঠে বলল— 'চিন্তার কথা বটে। আসল গঙ্গাপদ বোধ করি এখনো নিরুদ্দেশ।'

'হ্যাঁ। তার ঘরের আলমারি থেকে কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় সে কলকাতায় এক লোহার কারখানায় কাজ করে, সম্প্রতি একমাসের ছুটি নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।'

'গুলিটা কোথা থেকে এসেছিল জানা গেছে ?'

'সামনের বাড়ি থেকে। রাস্তার ওপারে একটা পোড়ো বাড়ি কিছুদিন থেকে খালি পড়ে আছে, তার দোতলার জানলা থেকে কেউ গুলি ছুঁড়েছিল। পোড়ো বাড়ির ঘরের মধ্যে কয়েকটা তাজা আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, কিন্তু কার আঙুলের ছাপ তা সনাক্ত করার উপায় নেই।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ সংবাদগুলিকে একত্র করে মনের মধ্যে রোমন্থন করল, তারপর বলল— 'রহস্যটা কিছু পরিষ্কার হলো ?'

রাখালবাবু সিগারেটে দুটো লম্বা টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশ-ট্রের ওপর নিবিয়ে দিলেন, আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে বলতে আরম্ভ করলেন— 'গঙ্গাপদ চৌধুরীর দাড়ি যে নকল দাড়ি তার একটা জোরালো প্রমাণ, তার বাড়িওয়ালা তার মুখে কখনো দাড়ি-গোঁফ দেখেনি ; আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, গঙ্গাপদ ছদ্মবেশে বেড়ায় কেন। একটা কারণ এই হতে পারে যে, সে ছদ্মবেশে কোনো গুরুতর অপরাধ করতে চায়। তারপর একদিন হাওড়া স্টেশনে সে অশোক মাইতিকে দেখতে পায়, নিজের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে তাকে ভুলিয়ে নিজের বাসায় এনে বসায়, তারপর নিজে গা-ঢাকা দেয়। হয়তো সে নিজেই সামনের বাড়ি থেকে অশোককে খুন করার চেষ্টা করেছিল, যাতে লোকে মনে করে যে, গঙ্গাপদই মরেছে। হয়তো এইভাবে সে জীবনবীমার টাকা সংগ্রহ করতে চেয়েছিল। যাই হোক, এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, তার

পরিচয় এবং বর্তমান ঠিকানা আমরা জানি না ; সে অশোক মাইতিকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল কিনা তা নিশ্চয়ভাবে জানি না, কারণ তার কাগজপত্রের মধ্যে জীবনবীমার পলিসি পাওয়া যায়নি। এখন কর্তব্য কি ?'

ব্যোমকেশ একটু ভেবে বলল— 'মীরাটে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে ?'

রাখালবাবু বললেন— 'অশোক মাইতিকে দিয়ে মীরাটে তার মা'র নামে টেলিগ্রাম করিয়েছি। এখনো জবাব আসেনি। কেন, আপনি কি অশোক মাইতিকে সন্দেহ করেন ?'

'অশোক মাইতিকে বড় বেশি ভাল মানুষ বলে মনে হয়। সে হয়তো সত্যি কথাই বলছে, কিন্তু তার কোনো সমর্থন নেই। রামচতুর সমর্থন করতে পারত, কিন্তু সে পালিয়েছে। —যাক, গঙ্গাপদ কোথায় কাজ করে ?'

'কলকাতার উপকণ্ঠে একটা লোহার কারখানা আছে সেইখানে।' রাখালবাবু পকেট থেকে নোটবুক বার করে পড়লেন— 'Scrap Iron & Steel Factory Ltd.'

'সেখানে খোঁজ নিলে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।'

'সেখানে যাব বলেই বেরিয়েছি। আপনি আসবেন সঙ্গে ?'

'যাব। বাড়িতে বেকার বসে থাকার চেয়ে ঘুরে বেড়ালে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।'

কলকাতার দক্ষিণ সীমানার বাইরে বিঘে দুই জমির ওপর লোহার কারখানা। জমির এধারে ওধারে কয়েকটা করোগেট টিনের উঁচু ছাউনি, তাদের ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে স্তূপীকৃত জং-ধরা ঝুনো পুরনো লোহা। চারিদিকে কর্মীদের তৎপরতা দেখে মনে হয় কারখানার কাজ চালু আছে। ফটকের পাশে একটি ছোট পাকা বাড়ি, এটি কোম্পানির অফিস।

ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু যখন কারখানায় পৌঁছুলেন তখন কারখানার ম্যানেজার রতনলাল কাপড়িয়া অফিস ঘরে ছিলেন। রতনলাল মাড়োয়ারী হলেও তিন পুরুষ ধরে বাংলাদেশে আছেন, প্রায় বাঙালী হয়ে গেছেন ; পরিষ্কার বাংলা বলেন। দু'জনকে সামনে বসিয়ে পান সিগারেট দিলেন, বললেন— 'হুকুম করুন।'

রাখালবাবু একবার ব্যোমকেশের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন আরম্ভ করলেন, ব্যোমকেশ চুপ করে বসে শুনতে লাগল। —

'গঙ্গাপদ চৌধুরী এখানে কাজ করে ?'

'হ্যাঁ। উপস্থিত ছুটিতে আছে।'

'সে কী কাজ করে ?'

'ইলেকট্রিক ফার্নেসের মেল্টার।'

'সে কাকে বলে ?'

'আজকাল ইলেকট্রিক আগুনে লোহা গলানো হয়। যে লোক এই কাজ জানে তাকে মেল্টার বলে। গঙ্গাপদ আমার সর্দার মেল্টার। সে ছুটিতে গেছে বলে আমার একটু অসুবিধে হয়েছে। তার অ্যাসিস্টেন্ট দু'জন আছে বটে, কোনো মতে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। আমাদের দেশে ভাল মেল্টার বেশি নেই, যে দু'চারজন আছে, গঙ্গাপদ তাদের একজন।'

'তাই নাকি ! সে ছুটি নিল কেন ?'

'তার একমাস ছুটি পাওনা হয়েছিল। মনে হচ্ছে যেন বলেছিল ভারত ভ্রমণে যাবে ; আজকাল সব স্পেশাল ট্রেন হয়েছে সারা দেশ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।'

'হ্যাঁ। ওর আত্মীয়স্বজন কেউ আছে ?'

'বোধ হয় না। একলা থাকত।'

'ওর স্বভাব-চরিত্র কেমন ?'

'খুব কাজের লোক। বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। হুঁশিয়ার।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন। ব্যোমকেশ যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল, একটু সজাগ

হয়ে বলল— 'গঙ্গাপদর কোনো শত্রু আছে কিনা আপনি জানেন ?'

রতনলাল ভুরু তুললেন—'শত্রু ! কই, গঙ্গাপদর শত্রু আছে এমন কথা তো কখনো শুনিনি—ওঃ !'

তিনি হঠাৎ হেসে উঠলেন— 'একজনের সঙ্গে গঙ্গাপদর শত্রুতা হয়েছিল, সে এখন জেলে।'

'তিনি কে ?'

'তার নাম নরেশ মণ্ডল। তিন বছর আমার সর্দার মেস্টার ছিল, গঙ্গাপদ ছিল তার অ্যাসিস্টেন্ট। দু'জনের মধ্যে খিটিমিটি লেগে থাকত। নরেশ ছিল রাগী, আর গঙ্গাপদ মিটিমিটে বজ্জাত। কিন্তু দু'জনেই সমান কাজের লোক। আমি মজা দেখতাম। তারপর হঠাৎ একদিন নরেশ একজনকে খুন করে বসল। গঙ্গাপদ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল। নরেশের জেল হয়ে গেল।'

'খুনের জন্যে জেল ! কতদিনের মেয়াদ জানেন ?'

'ঠিক জানি না। চার পাঁচ বছর হবে। নরেশ জেলে যাবার পর গঙ্গাপদ সর্দার মেস্টার হয়ে বসল।' বলে রতনলাল হো হো শব্দে হাসলেন।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল— 'আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি, এবার উঠি। একটা কথা— গঙ্গাপদকে আপনি শেষবার দেখেছেন কবে ?'

'দিন বারো-চোদ্দ আগে।'

'তখন তার মুখে দাড়ি ছিল ?'

'দাড়ি ! গঙ্গাপদর কস্মিনকালেও দাড়ি ছিল না।'

'ধন্যবাদ।'

রাস্তায় বেরিয়ে রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন— 'অতঃপর ?'

ব্যোমকেশ বলল— 'অতঃপর অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো ছাড়া আর তো কোনো রাস্তা দেখছি না। — এক কাজ করা যেতে পারে। চার পাঁচ বছর আগে নরেশ মণ্ডল খুন করে জেলে গিয়েছিল ; তার বিচারের দলিলপত্র আদালতের দপ্তর থেকে তুমি নিশ্চয় যোগাড় করতে পারবে। অন্তত হাকিমের রায়টা যোগাড় কর। সেটা পড়ে দেখলে হয়তো কিছু হদিস পাওয়া যাবে।'

রাখালবাবু বললেন— 'বেশ, রায় যোগাড় করব। নেই কাজ তো খই ভাজ। কাল সকালে আপনি খবর পাবেন।'

ব্যোমকেশরা প্রায় মাস ছয়েক হলো কেয়াতলার নতুন বাড়িতে এসেছে। বাড়িটি ছোট, কিন্তু দোতলা। নীচে তিনটি ঘর, ওপরে দুটি। সত্যবতী এই বাড়িটি নিয়ে সারাক্ষণ যেন পুতুল খেলা করছে। আনন্দের শেষ নেই ; এটা সাজাচ্ছে, ওটা গোছাচ্ছে, নিজের হাতে ঝাঁট দিচ্ছে, ঝাড়-পোঁছ করছে। ব্যোমকেশ কিন্তু নির্বিকার, শালগ্রামের শোয়া-বসা বোঝা যায় না।

পরদিন বিকেলবেলায় ব্যোমকেশ তার বসবার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল, দেখছিল লাল কোট পরা কোনো লোক চোখে পড়ে কি না। কয়েকটি লাল শাড়ি পরা মহিলা গেলেন, দু' একটি লাল ফ্রক পরা খোকাখুকিকেও দেখা গেল, কিন্তু লাল কোট পরা বয়স্থ পুরুষ একটিও দৃষ্টিগোচর হলো না। অনুমান হয় আজকাল লাল কোট পরে কোনো পুরুষ কলকাতার রাস্তায় বেরোয় না।

এই সময় টেলিফোন বাজল। রাখালবাবু বললেন— 'ব্যোমকেশদা, মামলার রায় পেয়েছি। পড়ে দেখলাম আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন কিছু নেই। পিওনের হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি পড়ে দেখুন।'

আধ ঘন্টা পরে থানা থেকে কনস্টেবল এসে রায় দিয়ে গেল। আলিপুর আদালতের জজ সাহেবের রায়, কড়া সরকারী কাগজে বাজাপ্তা নকল। পনেরো-ষোল পৃষ্ঠা। ব্যোমকেশ

সিগারেট ধরিয়ে পড়তে বসল।

রায়ের আরম্ভে জজ সাহেব ঘটনার বয়ান করেছেন। তারপর সাক্ষী-সাবুদের আলোচনা করে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন। রায়ের সারাংশ এই :

'আসামী নরেশ মণ্ডল, বয়স ৩৯। Scrap Iron & Steel Factory Ltd. নামক লোহার কারখানায় কাজ করে। অপরাধ— রাস্তায় একজন ভিক্ষুককে খুন করিয়াছে। পিনাল কাডের ৩০৪/৩২৩ ধারা অনুযায়ী দায়রা সোপর্দ হইয়াছে।

'প্রধান সাক্ষী গঙ্গাপদ চৌধুরী এবং অন্যান্য সাক্ষীর এজাহার হইতে জানা যায় যে, আসামী অত্যন্ত বদরাগী ও কলহপ্রিয়। ঘটনার দিন বিকাল আন্দাজ পাঁচটার সময় আসামী নরেশ মণ্ডল ও সাক্ষী গঙ্গাপদ চৌধুরী একসঙ্গে কর্মস্থল হইতে বাসায় ফিরিতেছিল। দু'জনে পূর্বোক্ত লোহার কারখানায় কাজ করে, গঙ্গাপদ চৌধুরী নরেশ মণ্ডলের সহকারী।

'পথ চলিতে চলিতে বাজারের ভিতর দিয়া যাইবার সময় নরেশ সামান্য কারণে গঙ্গাপদর সঙ্গে ঝগড়া জুড়িয়া দিল ; তখন গঙ্গাপদ তাহার সঙ্গে সঙ্গে না গিয়া পিছাইয়া গেল ; নরেশ আগে আগে চলিতে লাগিল, গঙ্গাপদ তাহার বিশ গজ পিছনে রহিল।

'এই সময় একটা কোট-প্যান্ট পরা মাদ্রাজী ভিক্ষুক নরেশের পিছনে লাগিল, ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে নরেশের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভিক্ষুকটার চেহারা জীর্ণ-শীর্ণ, কিন্তু সে ইংরাজিতে কথা বলে। বাজারে অনেকেই তাহাকে চিনিত।

'গঙ্গাপদ তাহাদের পিছনে যাইতে যাইতে দেখিল, নরেশ ক্রুদ্ধভাবে হাত নাড়িয়া তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভিক্ষুক তাহার সঙ্গ ছাড়িতেছে না। তারপর হঠাৎ নরেশ পাশের দিকে ফিরিয়া ভিক্ষুকের গালে সজোরে একটা চড় মারিল। ভিক্ষুক রাস্তার উপর পড়িয়া গেল। নরেশ আর সেখানে দাঁড়াইল না, গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল।

'গঙ্গাপদ বিশ গজ পিছন হইতে সবই দেখিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিল ভিক্ষুক অনড় পড়িয়া আছে ; তারপর তাহার নাড়ি টিপিয়া দেখিল সে মরিয়া গিয়াছে। ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় তাহার প্রাণশক্তি বেশি ছিল না, অল্প আঘাতেই মৃত্যু হইয়াছে।

'ইতিমধ্যে আরও অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নরেশকে চড় মারিতে দেখিয়াছিল। তাহারা পুলিসে খবর দিল। পুলিস নরেশের বাসায় গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল।

'পুলিসের পক্ষে এই মামলায় যাহারা সাক্ষী দিয়াছে তাহারা সকলেই নিরপেক্ষ, কেবল গঙ্গাপদ ছাড়া। আসামী অপরাধ অস্বীকার করিয়াছে ; তাহার বক্তব্য— গঙ্গাপদ তাহার শত্রু, তাহাকে সরাইয়া কর্মক্ষেত্রে তাহার স্থান অধিকার করিতে চায় ; তাই সে মিথ্যা মামলা সাজাইয়া তাহাকে ফাঁসাইয়াছে।

'এ কথা সত্য যে সাক্ষী গঙ্গাপদ নিঃস্বার্থ ব্যক্তি নয় ; কিন্তু অন্য সাক্ষীদের সঙ্গে তাহার এজাহার মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গঙ্গাপদর সাক্ষ্য মিথ্যা নয়।

'এ অবস্থায় আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য ৩০৪ ধারা অনুসারে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ধার্য হইল।'

ব্যোমকেশের রায় পড়া যখন শেষ হলো তখন সন্ধ্যা নেমেছে, ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ অন্ধকারে চুপ করে বসে রইল, তারপর আলো জ্বেলে টেলিফোন তুলে নিল—

'রাখাল ! রায় পড়লাম।'

'কিচ্ছু পেলেন ?'

'একটা রাগী মানুষের চরিত্র পেলাম।'

'তাহলে রায় পড়ে কোনো লাভ হলো না ?'

'বলা যায় না।— যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার লুকানো

রতন।'

'তা বটে।'

'ভাল কথা, পোড়ো বাড়িতে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল তার ফটো নেওয়া হয়েছে ?'

'হয়েছে।'

'গঙ্গাপদ চৌধুরীর পাত্তা পাওয়া যায়নি ?'

'না। ভারত ভ্রমণের যত স্পেশাল ট্রেন আছে তাদের অফিসে খোঁজ নিয়েছিলাম কিন্তু গঙ্গাপদ চৌধুরী নামে কোনো যাত্রীর নাম নেই।'

'হুঁ। হয়তো ছদ্মনামে গিয়েছে।'

'কিংবা যায়নি। কলকাতাতেই কোথাও লুকিয়ে বসে আছে।'

'তাও হতে পারে। আর কোনো নতুন খবর আছে ?'

'এইমাত্র মীরাট থেকে 'তার' এসেছে। অশোক মাইতি খাঁটি মীরাটের লোক। ওখানে কোনো জাল-জুচ্চুরি নেই।'

'ভাল ; আর কিছু।'

'নতুন খবর আর কিছু নেই। এখন কর্তব্য কি বলুন !'

'কর্তব্য কিচ্ছু ভেবে পাচ্ছি না। একটা কথা। নরেশের জেলের মেয়াদ এতদিনে ফুরিয়ে আসার কথা, সে জেল থেকে বেরিয়েছে কিনা খবর নিতে পার ?'

'পারি। কাল সকালে খবর পাবেন।'

পরদিন বেলা ন'টার সময় রাখালবাবু ব্যোমকেশের কাছে এলেন। মুখ গম্ভীর। বললেন—'ব্যাপার গুরুতর। দেড়মাস আগে নরেশ মণ্ডল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। জেলে ভাল ছেলে সেজে ছিল তাই কিছু দিনের রেয়াত পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলল— 'হুঁ। জেল থেকে বেরিয়ে সে কোথায় গেছে সন্ধান পেয়েছ ?'

'তার পুরোনো বাসায় যায়নি। কারখানাতেও যায়নি, কাল রতনলাল কাপড়িয়ার মুখে তা জানতে পেরেছি। সুতরাং সে ডুব মেরেছে।'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করে থেকে বলল— 'ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হচ্ছে। নরেশের মনে যদি পাপ না থাকবে তাহলে সে ডুব মারবে কেন ? সে রতনলালের কাছে গিয়ে চাকরিটা আবার ফিরে পাবার চেষ্টা করত।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'গল্পটা এখন কালানুক্রমে সাজানো যেতে পারে। —নরেশ মণ্ডল রাগী এবং ঝগড়াটে, গঙ্গাপদ মিটমিটে শয়তান। দু'জনে এক কারখানায় কাজ করত ; দু'জনের মধ্যে খিটিমিটি লেগেই থাকত। গঙ্গাপদর মতলব নরেশকে সরিয়ে নিজে তার জায়গায় বসবে। কিন্তু নরেশকে সরানো সহজ নয়, সে কাজের লোক।

'হঠাৎ গঙ্গাপদ সুযোগ পেয়ে গেল। নরেশ রাস্তায় একটা ভিখিরিকে চড় মেরে শেষ করে দিল। আর যায় কোথায় ! গঙ্গাপদ নরেশকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল।

'নরেশের কিন্তু ফাঁসি হলো না। সে দোষী সাব্যস্ত হলেও তার তিন বছর কারাদণ্ড হলো। গঙ্গাপদর পক্ষে একটা মন্দের ভাল, সে কারখানায় সর্দার মেস্টার হয়ে বসল। নরেশ জেলে গেল।

'নরেশ লোকটা শুধু বদমেজাজী নয়, সে মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখে। জেলে যাবার সময় সে বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেছিল, গঙ্গাপদকে খুন করে প্রতিহিংসা সাধন করবে। তিন বছর ধরে সে এই প্রতিহিংসার আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে।

'গঙ্গাপদ জানত নরেশের তিন বছরের জেল হয়েছে, সে তক্কেতক্কে ছিল। তাই নরেশ যখন মেয়াদ ফুরবার আগেই জেল থেকে বেরুল, গঙ্গাপদ জানতে পারল। তার প্রাণে ভয় ঢুকল।

হয়তো সে দেখেছিল নরেশ তার বাসার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা সামনের পোড়ো বাড়ি থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। গঙ্গাপদ ঠিক করল কিছুদিনের জন্যে বাসা থেকে উধাও হবে।

'সে কারখানা থেকে একমাসের ছুটি নিল এবং একটা দাড়ি যোগাড় করে তাই পরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যাতে নরেশ তাকে দেখলেও চিনতে না পারে। গঙ্গাপদ বোধহয় সত্যিই ভারত ভ্রমণে যাবার মতলব করেছিল, তারপর হঠাৎ একদিন হাওড়া স্টেশনে অশোক মাইতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে দেখল অশোক মাইতির চেহারা অনেকটা তার নিজের মত।

'গঙ্গাপদ লোকটা মহা ধূর্ত। তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, অশোক মাইতিকে যদি কোনোমতে নিজের বাসায় এনে তুলতে পারে তাহলে নরেশ ভুল করে তাকেই খুন করবে এবং ভাববে, গঙ্গাপদকে খুন করেছে। গঙ্গাপদ নিরাপদ হবে, তাকে আর প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না। চাকরিটা অবশ্য যাবে ; কিন্তু প্রাণ আগে, না চাকরি আগে ? গঙ্গাপদ নিশ্চয় বুঝেছিল যে, নরেশ তাকে সামনের জানলা থেকে গুলি করে মারবে।

'এবার নরেশের দিকটা ভেবে দেখা যাক। নরেশ জেল থেকে বেরিয়ে একটা পিস্তল যোগাড় করেছিল। পুরোনো বাসায় ফিরে যাবার কোনো মানে হয় না, সে অন্য কোথাও আড্ডা গেড়েছিল এবং গঙ্গাপদর বাসার সামনে পোড়ো বাড়িটায় যাতায়াত করেছিল। তার বোধ হয় মতলব ছিল গঙ্গাপদ কখনো তার জানলা খুলে দাঁড়ালে সে রাস্তার ওপার থেকে তাকে গুলি করে মারবে, তারপর কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। গঙ্গাপদ খুন হবার পর কলকাতা শহর আর তার পক্ষে নিরাপদ নয়, পুলিস তাকে সন্দেহ করতে পারে।

'যাহোক, গঙ্গাপদ অশোক মাইতিকে নিজের বাসায় বসিয়ে লোপাট হলো। অশোক মাইতিকে উপদেশ দিয়ে গেল, সে যেন মাঝে মাঝে জানলা খুলে লক্ষ্য করে, রাস্তা দিয়ে লাল কোট পরা কেউ যায় কি না। লাল কোট পরা মানুষটা নিছক কল্পনা ; আসল উদ্দেশ্য অশোক মাইতি জানলা খুলে দাঁড়াবে এবং নরেশ সামনের জানলা থেকে তাকে গুলি করবে।

'সবই ঠিক হয়েছিল কিন্তু একটা চুক হয়ে গেল ; অশোক মাইতি আহত হলো, মরল না। সে পুলিসকে সব ঘটনা বলল। এখন গঙ্গাপদ আর নরেশ দু'জনের অবস্থাই সমান, ওরা কেউ আর আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। খবরের কাগজে সংবাদ ছাপা হয়েছে, দু'জনকেই পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'নরেশ অবশ্য আইনত অপরাধী, সে খুন করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গঙ্গাপদ লোকটা মহা পাষণ্ড ; জেনেশুনে সে একজন নিরীহ লোককে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু সে যদি ধরাও পড়ে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে কি না সন্দেহ।'

ব্যোমকেশ চুপ করল। রাখালবাবুও নীরবে কিছুক্ষণ টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁকজোক কেটে বললেন— 'তা যেন হলো। কিন্তু যাকে আইনত শাস্তি দেওয়া যাবে তাকে ধরবার উপায় কি বলুন !'

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ব্যোমকেশ বলল— 'একমাত্র উপায় —বিজ্ঞাপন।'

'বিজ্ঞাপন !'

'হ্যাঁ। —পুকুরে ছিপ ফেলে বসে থাকা। মাছ যদি টোপ গেলে তবেই তাকে ধরা যাবে।'

তিন দিন পরে কলকাতার দুইটি প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বেরুল :

বম্বে স্টীল ফাউন্ড্রি লিমিটেড—

আমাদের বম্বের কারখানার জন্য অভিজ্ঞ ইলেকট্রিক মেস্টার চাই।

বেতন— ৭০০-২৫-১০০০ ।

প্রশংসাপত্র সহ দেখা করুন।

গড়িয়াহাট বাজারের কাছে রাস্তার উপর একটি ঘর, তার মাথার উপর সাইনবোর্ড ঝুলছে—

বম্বে স্টীল ফাউন্ড্রি লিমিটেড (ব্রাঞ্চ অফিস)।

ঘরের মধ্যে একটি টেবিলের সামনে রাখালবাবু বসে আছেন, তাঁর পরিধানে সাদা কাপড়চোপড়। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে নথিপত্র দেখছেন। অদূরে অন্য একটি ছোট টেবিলে ব্যোমকেশ টাইপরাইটার নিয়ে বসেছে। ঘরের দোরের কাছে তকমা-আঁটা একজন বেয়ারা। আর যারা আছে তারা প্রচ্ছন্নভাবে এদিকে ওদিকে আছে, তাদের দেখা যায় না।

প্রথম দিন ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস ঘরে বসে রইলেন, কোনো চাকরি-প্রার্থী দেখা করতে এল না। পাঁচটার সময় ঘরের দোরে তালা লাগাতে লাগাতে রাখালবাবু বললেন— 'বিজ্ঞাপন চালিয়ে যেতে হবে।'

পরদিন একটা লোক দেখা করতে এল। রোগা-পটকা লোক, এক চড়ে মানুষ মেরে ফেলবে এমন চেহারা নয়। তার প্রশংসাপত্র দেখে জানা গেল, তার নাম প্রফুল্ল দে, সে একজন ইলেকট্রিকের মিস্ত্রী। ইলেকট্রিক মেল্টারের কাজ সে কখনো করেনি বটে, কিন্তু সুযোগ পেলে চেষ্টা করতে রাজী আছে। রাখালবাবু তার নাম-ধাম লিখে নিয়ে মিষ্টি কথায় বিদায় দিলেন।

তৃতীয় দিন তৃতীয় প্রহরে একটি লোক দেখা করতে এল। তাকে দেখেই রাখালবাবুর শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে উঠল। মজবুত হাড়-চওড়া শরীর, গায়ের রং কালো, চোখের কোণে একটু রক্তিমাভা ; গায়ে খাকি কোট, মাথায় চুল ক্রু-কাট করে ছাঁটা। সে সতর্কভাবে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে ঘরে ঢুকল। রাখালবাবুর টেবিলের সামনে দঁড়িয়ে ধরা-ধরা গলায় বলল— 'বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি।'

'বসুন।'

লোকটি সন্তর্পণে সামনের চেয়ারে বসল, একবার ব্যোমকেশের দিকে তীক্ষ্ণ সতর্ক চোখ ফেরাল। রাখালবাবু সহজ সুরে বললেন— 'ইলেকট্রিক মেল্টারের কাজের জন্য এসেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'সার্টিফিকেট এনেছেন ?'

লোকটি খানিক চুপ করে থেকে বলল— 'আমার সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। তিন বছর অসুখে ভুগেছি, কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তারপর— সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছি।'

'আগে কোথায় কাজ করতেন ?'

'নাগপুরে একটা আয়রন ফাউন্ড্রি আছে, সেখানে কাজ করতাম। —দেখুন, আমি সত্যিই ইলেকট্রিক মেল্টারের কাজ জানি। বিশ্বাস না হয় আমি নিজের খরচে বম্বে গিয়ে তা প্রমাণ করে দিতে পারি।'

রাখালবাবু লোকটিকে ভাল করে দেখলেন, তারপর বললেন— 'সে কথা মন্দ নয়। কিন্তু আমাদের এটা ব্রাঞ্চ অফিস, সবেমাত্র খোলা হয়েছে। আমি নিজের দায়িত্বে কিছু করতে পারি না। তবে এক কাজ করা যেতে পারে। আমি আজ বম্বেতে হেড অফিসে 'তার' করব, কাল বিকেল নাগাদ উত্তর পাব। আপনি কাল এই সময়ে যদি আসেন—'

'আসব, নিশ্চয় আসব।' লোকটি উঠে দাঁড়াল।

রাখালবাবু ব্যোমকেশের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'বক্সী, ভদ্রলোকের নাম আর ঠিকানা লিখে নাও।'

ব্যোমকেশ বলল— 'আজ্ঞে।'

নাম আর ঠিকানা দিতে হবে শুনে লোকটি একটু থতিয়ে গেল, তারপর বলল— 'আমার নাম নৃসিংহ মল্লিক। ঠিকানা ১৭ নম্বর কুঞ্জ মিস্ত্রী লেন।'

ব্যোমকেশ নাম ঠিকানা লিখে নিল। ইতিমধ্যে রাখালবাবু টেবিলের তলায় একটি গুপ্ত বোতাম টিপেছিলেন, বাইরে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে খবর গিয়েছিল যে, ঘর থেকে যে ব্যক্তি বেরুবে তাকে অনুসরণ করতে হবে। রাখালবাবু নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন যে, এই ব্যক্তিই নরেশ মণ্ডল। কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করার আগে তার বাসার ঠিকানা পাকাভাবে জানা দরকার। সেখানে

বন্দুক পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু কিছুই প্রয়োজন হলো না।

নরেশ দোরের দিকে পা বাড়িয়েছে এমন সময় আর একটি লোক ঘরে প্রবেশ করল। নবাগতকে চিনতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না, একেবারে অশোক মাইতির যমজ ভাই। সুতরাং গঙ্গাপদ চৌধুরী। আজ আর তার মুখে দাড়ি নেই।

গঙ্গাপদ নরেশকে দেখার আগেই নরেশ গঙ্গাপদকে দেখেছিল ; বাঘের মত চাপা গর্জন তার গলা থেকে বেরিয়ে এল, তারপর সে গঙ্গাপদর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। দু'হাতে তার গলা টিপে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলতে লাগল— 'পেয়েছি তোকে ! শালা— শূয়ার কা বাচ্চা— আর যাবি কোথায় !'

রাখালবাবু দ্রুত পকেট থেকে বাঁশি বার করে বাজালেন। আরদালি এবং আর যেসব পুলিসের লোক আনাচে-কানাচে ছিল তারা ছুটে এল। গলা টিপুনি খেয়ে গঙ্গাপদর তখন জিভ বেরিয়ে পড়েছে। সকলে মিলে টানাটানি করে নরেশ আর গঙ্গাপদকে আলাদা করল। রাখালবাবু নরেশের হাতে হাতকড়া পরালেন। বললেন— 'নরেশ মণ্ডল, গঙ্গাপদ চৌধুরীকে খুনের চেষ্টার অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো।'

নরেশ মণ্ডল রাখালবাবুর কথা শুনতেই পেল না, গঙ্গাপদর পানে আরক্ত চক্ষু মেলে গজরাতে লাগল— 'হারামজাদা বেইমান, তোর বুক চিরে রক্ত পান করব—'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ বসেছিল, চেয়ার ছেড়ে ওঠেনি।' সে এখন টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ধরাল।

রাখালবাবু তাঁর একজন সহকর্মীকে বললেন— 'ধীরেন, এই নাও নরেশ মণ্ডলের ঠিকানা। ওর ঘর খানাতল্লাশ কর। সম্ভবত একটা রিভলবার কিংবা পিস্তল পাবে।— আমরা এদের দু'জনকে লক-আপ-এ নিয়ে যাচ্ছি।'

গঙ্গাপদ মেঝেয় বসে গলায় হাত বুলোচ্ছিল, চমকে উঠে বলল— 'আমাকে লক-আপ-এ রাখবেন। আমি কী অপরাধ করেছি ?'

রাখালবাবু বললেন— 'তুমি অশোক মাইতিকে খুন করাবার চেষ্টা করেছিলে। তোমার অপরাধ পিনাল কোডের কোন দফায় পড়ে পাবলিক প্রসিকিউটার তা স্থির করবেন। ওঠো এখন।'

সন্ধ্যের পর ব্যোমকেশের বসবার ঘরে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে রাখালবাবু বললেন— 'আচ্ছা ব্যোমকেশদা, নরেশ মণ্ডল আর গঙ্গাপদ চৌধুরী— দু'জনেই চাকরির খোঁজে আসবে আপনি আশা করেছিলেন ?'

ব্যোমকেশ বলল— 'আশা করিনি, তবে সম্ভাবনাটা মনের মধ্যে ছিল। কিন্তু ওরা যে একই সময়ে এসে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ শুরু করে দেবে তা কল্পনা করিনি। ভালই হলো, একই ছিপে জোড়ামাছ উঠল।— নরেশ মণ্ডলের ঘরখানা তল্লাশ করে কী পেলে ?'

'পিস্তল পাওয়া গেছে। ওর বিরুদ্ধে মামলা পাকা হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক গঙ্গাপদকে পাকড়ানো যায় কি না। তাকে হাজতে রেখেছি, আর কিছু না হোক, কয়েকদিন হাজত-বাস করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক।'

'হুঁ। অশোক মাইতির খবর কি ?'

'সে এখনো হাসপাতাল থেকে বেরোয়নি। বেরুলেও তাকে এখন কলকাতায় থাকতে হবে। সে আমাদের প্রধান সাক্ষী।

ব্যোমকেশ হঠাৎ হেসে উঠল, বলল— 'কথায় বলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। অশোক মাইতি খুব বেঁচে গেছে। ও না বাঁচলে এমন রহস্যটা রহস্যই থেকে যেত।'

শজারুর কাঁটা

উপক্রম

ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল মাস তিনেক আগে এবং কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলেই আবদ্ধ হয়ে ছিল।

গোল পার্কের আড়-পার একটা রাস্তার কোণের ওপর একটি অস্থায়ী চায়ের দোকান। দিনের আলো ফোটবার আগেই সেখানে চা তৈরি হয়ে যায়। মাটির ভাঁড়ে গরম চা। সঙ্গে বিস্কুটও পাওয়া যায়। এই দোকানের অধিকাংশ খদ্দের ট্যাক্সি ড্রাইভার, বাস কন্ডাক্টার ইত্যাদি। যাদের খুব সকালে কাজে বেরুতে হয় তারা এই দোকানের পৃষ্ঠপোষক।

বুড়ো ভিখিরি ফাগুরাম ছিল এই দোকানের খদ্দের। সে রাত্রে ফুটপাথের একটা ঘোঁজের মধ্যে শুয়ে থাকত, ভোর হতে না হতে দোকান থেকে এক ভাঁড় চা আর দু'টি বিস্কুট কিনে তার ভিক্ষাস্থানে গিয়ে বসত। ফাগুরামের বয়স অনেক, উপরন্তু সে বিকলাঙ্গ, তাই দিনান্তে সে এক টাকার বেশি রোজগার করত।

সেদিন ফাল্গুন মাসের প্রত্যূষে আকাশ থকে তখনো কুয়াশার ঘোর কাটেনি, ফাগুরাম দোকান থেকে চায়ের ভাঁড় আর বিস্কুট নিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসল। চায়ের দোকানে লোক থাকলেও রাস্তায় তখনো লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি।

ফাগুরামের অভ্যাস, সে রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে খায়। সে এক চুমুক চা খেয়ে বিস্কুটে একটি ছোট্ট কামড় দিয়েছে, তার মনে হল পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। সে পিছন দিকে ঘাড় ফেরালো, কিন্তু স্পষ্টভাবে কিছু দেখবার আগেই সে পিঠের দিকে কাঁটা ফোটার মত তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল। অর্ধভুক্ত বিস্কুট তার হাত থেকে পড়ে গেল। তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

ভিক্ষুক ফাগুরামের অপমৃত্যুতে বিশেষ হইচই হল না। দিনের আলো ফুটলে তার মৃতদেহটা পথচারীদের চোখে পড়ল, তারা মৃতদেহকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তারপর লাশ স্থানান্তরিত হল। খবরের কাগজের এক কোণে খবরটা বেরুল বটে, কিন্তু সেটা মারণাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্যে। ভিক্ষুকের পিঠের দিক থেকে একটা ছয় ইঞ্চি লম্বা শজারুর কাঁটা তার হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংবাদপত্রে যারা খবরটা পড়ল তারা এই নিয়ে একটু আলোচনা করল। ভিক্ষুককে কে খুন করতে পারে? হয়তো অন্য কোনো ভিক্ষুক খুন করেছে। কিন্তু শজারুর কাঁটা কেন? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর নেই। পুলিস এ ব্যাপার নিয়ে বেশি দিন মাথা ঘামাল না।

মাসখানেক পরে কিন্তু ভিক্ষুকের অপমৃত্যুর কথাটা আবার সকলের মনে পড়ে গেল। আবার শজারুর কাঁটা। রাত্রে রবীন্দ্র সরোবরের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে একজন মুটে-মজুর শ্রেণীর লোক ঘুমোচ্ছিল, আততায়ী কখন এসে নিঃশব্দে তার বুকের বাঁ দিকে শজারুর কাঁটা বিঁধে দিয়ে চলে গেছে। সকালবেলা যখন লাশ আবিষ্কৃত হল তখন মৃতদেহ শক্ত হয়ে গেছে। মৃতের পরিচয় তখনো জানা যায়নি।

এবার সংবাদপত্রের সামনের দিকেই খবরটা বেরুল এবং বেশ একটু সাড়া জাগিয়ে তুলল। ছোরাছুরির বদলে শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করার মানে কি! খুনী কি পাগল? ক্রমে মৃত ব্যক্তির

পরিচয় বেরুল, তার নাম মঙ্গলরাম ; সে সামান্য একজন মজুর, তার থাকবার জায়গা ছিল না, তাই যখন যেখানে সুবিধা হত সেখানে রাত কাটাত। তার শত্রু কেউ ছিল না, অন্তত খুন করতে পারে এমন শত্রু ছিল না। পুলিস দু'-চার দিন তল্লাশ করে হাল ছেড়ে দিল।

তৃতীয় দিনের ঘটনাটা হল আরো দু' হপ্তা পরে। গরম পড়ে গেছে, দিন বাড়ছে, রাত কমছে।

গুণময় দাসের জীবনে সুখ ছিল না। তাঁর একটি ছোট মনিহারীর দোকান আছে, একটি ছোট পৈতৃক বাস্তুভিটা আছে আর আছে একটি প্রচণ্ড দজ্জাল বউ। তার চল্লিশ বছর বয়সেও ছেলেপুলে হয়নি, হবার আশাও নেই। তাই রসের অভাবে তাঁর জীবনটা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গিয়েছিল। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে মদ ধরেছিলেন। জীবন যখন শুকায়ে যায় তখন ওই বস্তুটি নাকি করুণাধারায় নেমে আসে।

রাত্রি আটটার সময় গুণময়বাবু দোকান বন্ধ করে বাড়ির অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে তাঁর প্রাণে কোনো উৎসাহ ছিল না, বরং বাড়ি ফিরে গিয়ে আজ তিনি স্ত্রীর কোন্ প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখবেন এই চিন্তায় তাঁর পদক্ষেপ মন্থর হয়ে আসছিল। তারপর সামনেই যখন মদের দোকানের দরজা খোলা পাওয়া গেল তখন সুট করে সেখানে ঢুকে পড়লেন।

এক ঘণ্টা পরে দোকান থেকে বেরিয়ে তিনি আবার গড়িয়ার দিকে চললেন ; ওই দিকেই তাঁর বাড়ি। যেতে যেতে তাঁর পা একটু টলতে লাগল, তিনি বুঝলেন আজ মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেছে। স্ত্রী যদি বুঝতে পারে, যদি মুখে গন্ধ পায়—

আরো কিছু দূর যাবার পর রবীন্দ্র সরোবরের রেলিং আরম্ভ হল রাস্তার ডান পাশে। পথে লোকজন বেশি নেই, লেকের অন্ধকার এবং রাস্তায় আলো মিলে একটা অস্পষ্ট কুজ্‌ঝটিকার সৃষ্টি করেছে।

গুণময়বাবু রাস্তার একটা নিরিবিলি অংশে এসে লেকের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন, রেলিং-এ হাত রেখে প্যাঁচার মত চক্ষু মেলে ভিতরের দিকে চেয়ে রইলেন।

একটি লোক গুণময়বাবুর কুড়ি-পঁচিশ হাত পিছনে আসছিল ; সে গুণময়বাবুর পদসঞ্চারের টলমল ভাব লক্ষ্য করেছিল। তাই তিনি যখন রেলিং ধরে দাঁড়ালেন তখন সেও বিশ-পঁচিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁকে নিরীক্ষণ করে অলস পদে তাঁর দিকে অগ্রসর হল।

লোকটি যখন গুণময়বাবুর পিছনে এসে দাঁড়াল তখনো তিনি কিছু জানতে পারলেন না। লোকটি এদিক ওদিক চেয়ে দেখল লোক নেই। সে পকেট থেকে শলাকার মত একটি অস্ত্র বার করল, অস্ত্রটিকে আঙুল দিয়ে শক্ত করে ধরে গুণময়বাবুর পিঠের বাঁ দিকে পাঁজরার হাড়ের ফাঁক দিয়ে গভীরভাবে বিঁধিয়ে দিল। গুণময়বাবুর গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি ছিল, শলাকা সটান তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করল।

গুণময়বাবু পলকের জন্যে বুকে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করলেন, তারপর তাঁর সমস্ত অনুভূতি অসাড় হয়ে গেল।

অতঃপর খবরের কাগজে তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হল। একটা বেহেড পাগল শজারুর কাঁটা নিয়ে শহরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু অকর্মণ্য পুলিস তাকে ধরতে পারছে না, এই আক্ষেপের উষ্মা কলকাতার অধিবাসীদের, বিশেষত দক্ষিণ দিকের অধিবাসীদের গরম করে তুলল। বৈঠকে বৈঠকে উত্তেজিত জল্পনা চলতে লাগল। সন্ধ্যার পর পার্কের জনসমাগম প্রায় শূন্যের কোঠাতে গিয়ে দাঁড়াল।

এইভাবে দিন দশ-বারো কাটল। বলা বাহুল্য, আততায়ী ধরা পড়েনি, কিন্তু উত্তেজনার আগুন স্তিমিত হয়ে এসেছে। একদিন ব্যোমকেশের কেয়াতলার বাড়িতে রাত্রি সাড়ে ন'টার পর ইন্সপেক্টর রাখালবাবু এসেছিলেন, অজিতও উপস্থিত ছিল ; স্বভাবতই শজারুর কাঁটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

অজিত বলল —'কিন্তু এত অস্ত্রশস্ত্র থাকতে শজারুর কাঁটা কেন ?'

রাখালবাবু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আড়চোখে ব্যোমকেশের পানে তাকালেন ; ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলল—'সম্ভবত আততায়ীর পোষা শজারু আছে। বিনামূল্যে কাঁটা পায় তাই ছোরাছুরির দরকার হয় না।'

অজিত বলল—'বাজে কথা বলো না। নিশ্চয় কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আচ্ছা রাখালবাবু, এই যে তিন-তিনটে খুন হয়ে গেল, আসামী তিনজন কি একজন সেটা বুঝতে পেরেছেন ?'

রাখালবাবু বললেন—'একজন বলেই তো মনে হয়।'

ব্যোমকেশ বলল—'তিনজন হতেও বাধা নেই। মনে কর, প্রথমে একজন হত্যাকারী ভিখিরিকে শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করল। তাই দেখে আর একজন হত্যাকারীর মাথায় আইডিয়া খেলে গেল, সে একজন ঘুমন্ত মজুরকে কাঁটা দিয়ে খুন করল। তারপর—'

'আর বলতে হবে না, বুঝেছি। তিন নম্বর হত্যাকারী তাই দেখে একজন দোকানদারকে খুন করল।'

ব্যোমকেশ বলল—'সম্ভব। কিন্তু যা সম্ভব তাই ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। তার চেয়ে ঢের বেশি ইঙ্গিতপূর্ণ কথা হচ্ছে, যারা খুন হয়েছে তাদের মধ্যে একজন ভিখিরি, একজন মজুর এবং একজন দোকানদার।'

'এর মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ কী আছে, আমার বুদ্ধির অগম্য। তোমরা গল্প কর, আমি শুতে চললাম।' অজিত উঠে গেল। তার আর রহস্য-রোমাঞ্চের দিকে ঝোঁক নেই।

রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে চেয়ে মৃদু হাসলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন—'সত্যিই কি পাগলের কাজ ? নইলে তিনজন বিভিন্ন স্তরের লোককে খুন করবে কেন ? কিন্তু পাগল হলে কি সহজে ধরা যেত না ?'

ব্যোমকেশ বলল—'পাগল হলেই ন্যালাক্ষ্যাপা হয় না। অনেক পাগল আছে যারা এমন ধূর্ত যে তাদের পাগল বলে চেনাই যায় না।'

রাখালবাবু বললেন—'তা সত্যি। ব্যোমকেশদা, আপনি যতই থিওরি তৈরি করুন, আপনার অন্তরের বিশ্বাস একটা লোকই তিনটে খুন করেছে। আমারও তাই বিশ্বাস। এখন বলুন দেখি, যে লোকটা খুন করেছে সে পাগল—এই কি আপনার অন্তরের বিশ্বাস ?'

ব্যোমকেশ দ্বিধাভরে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর কি একটা বলবার জন্যে মুখ তুলেছে এমন সময় দ্রুতচ্ছন্দে টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যোমকেশ টেলিফোন তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ শুনল, তারপর রাখালবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'তোমার কল্।'

ফোন হাতে নিয়ে রাখালবাবু বললেন—'হ্যালো—' তারপর অপর পক্ষের কথা শুনতে শুনতে তাঁর মুখের ভাব বদলে যেতে লাগল। শেষে—'আচ্ছা, আমি আসছি' বলে তিনি আস্তে আস্তে ফোন রেখে দিলেন, বললেন—'আবার শজারুর কাঁটা। এই নিয়ে চার বার হল। এবার উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোক। কিন্তু আশ্চর্য! ভদ্রলোক মারা যাননি। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

ব্যোমকেশ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল—'মারা যাননি ?'

রাখালবাবু বললেন—'না। কি যেন একটা রহস্য আছে। আমি চলি। আসবেন নাকি ?'

ব্যোমকেশ বলল—'অবশ্য।'

কাহিনী

দক্ষিণ কলকাতার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নতুন রাস্তার ওপর একটি ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। খোলা জায়গায় এখানে ওখানে

কয়েকটা অনাদৃত ফুলের গাছ।

বাড়িটি কিন্তু অনাদৃত নয়। বাড়ির বহিরঙ্গ যেমন ফিকে নীল রঙে রঞ্জিত এবং সুশ্রী, ভিতরটিও তেমনি পরিচ্ছন্ন ছিমছাম। নীচের তলায় একটি বসবার ঘর ; তার সঙ্গে খাবার ঘর, রান্নাঘর এবং চাকরের ঘর। দোতলায় তেমনি একটি অন্তরঙ্গ বসবার ঘর এবং দু'টি শয়নকক্ষ। বছর চার-পাঁচ আগে যিনি এই বাড়িটি প্রৌঢ় বয়সে তৈরি করিয়েছিলেন তিনি এখন গতাসু, তাঁর একমাত্র পুত্র দেবাশিস এখন সস্ত্রীক এই বাড়িতে বাস করে।

একদিন চৈত্রের অপরাহ্ণে দোতলার বসবার ঘরে দীপা একলা বসে রেডিও শুনছিল। দীপা দেবাশিসের বউ ; মাত্র দু'মাস তাদের বিয়ে হয়েছে। দীপা একটি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ছিল। ঘরে আসবাব বেশি নেই ; একটি নীচু টেবিল ঘিরে কয়েকটি আরাম-কেদারা ; দেয়াল ঘেঁষে একটি তক্তপোশ, তার ওপর ফরাশ ও মোটা তাকিয়া। এ ছাড়া ঘরে আছে রেডিওগ্রাম এবং এক কোণে টেলিফোন।

রেডিওগ্রামের ঢাকনির ভিতর থেকে গানের মৃদু গুঞ্জন আসছিল। ঘরটি ছায়াচ্ছন্ন, দোর জানলা ভেজানো। দীপা চেয়ারের পিঠে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে ছিল। বাড়িতে একলা তার সারা দুপুর এমনিভাবেই কাটে।

দীপার এই আলস্যশিথিল চেহারাটি দেখতে ভাল লাগে। তার রঙ ফর্সাই বলা যায়, মুখের গড়ন ভাল ; কিন্তু ভ্রূর ঋজু রেখা এবং চিবুকের দৃঢ়তা মুখে একটা অপ্রত্যাশিত বলিষ্ঠতা এনে দিয়েছে, মনে হয় এ মেয়ে সহজ নয়, সামান্য নয়।

দেয়ালের ঘড়িতে ঠুং ঠুং করে পাঁচটা বাজল। দীপার চোখ দু'টি অমনি খুলে গেল ; সে ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে রেডিও বন্ধ করে দিল, তারপর উঠে বাইরের দরজার দিকে চলল। দরজা খুলতেই সামনে সিঁড়ি নেমে গেছে। দীপা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে ডাকল—'নকুল।'

নকুল বাড়ির একমাত্র চাকর এবং পাচক, সাবেক কাল থেকে আছে। সে একতলার খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঁচু দিকে চেয়ে বলল—'হ্যাঁ বউদি, দাদাবাবুর জলখাবার তৈরি আছে।'

দীপা তখন গায়ের শিথিল কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁচেছে এমন সময় কিড়িং কিড়িং শব্দে সদর দরজার ঘণ্টি বেজে উঠল।

দীপা গিয়ে দোর খুলে দিল। কোট-প্যান্ট পরা দেবাশিস প্রবেশ করল। দু'জনে দু'জনের মুখের পানে তাকাল কিন্তু তাদের মুখে হাসি ফুটল না। এদের জীবনে হাসি সুলভ নয়। দীপা নিরুৎসুক সুরে বলল—'জলখাবার তৈরি আছে।'

দেবাশিস কণ্ঠস্বরে শিষ্টতার প্রলেপ মাখিয়ে বলল—'বেশ, বেশ, আমি জামাকাপড় বদলে এখনই আসছি।'

সে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দীপা মন্থর পদে খাবার ঘরে গিয়ে টেবিলের এক পাশে বসল।

লম্বাটে ধরনের খাবার টেবিল ; চারজনের মত জায়গা, গাদাগাদি করে ছ'জন বসা চলে। দীপা এক প্রান্তে বসে দেখতে লাগল, নকুল দু'টি প্লেটে খাবার সাজাচ্ছে ; লুচিভাজা, আলুর দম, বাড়িতে তৈরি সন্দেশ। নকুল মানুষটি বেঁটে-খাটো, মাথার চুল পেকেছে, কিন্তু শরীর বেশ নিটোল। বেশি কথা কয় না, কিন্তু চোখ দু'টি সতর্ক এবং জিজ্ঞাসু। দীপা তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—নকুল নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। তবু নকুলের সামনে ধোঁকার টাটি খাড়া রাখতে হয়। শুধু নকুল কেন, পৃথিবীসুদ্ধ লোকের সামনে। বিচিত্র তাদের বিবাহিত জীবন।

ধুতি পাঞ্জাবি পরে দেবাশিস নেমে এল। একহারা দীঘল চেহারা, ফর্সা সুশ্রী মুখ ; বয়স সাতাশ কি আটাশ। সে টেবিলের অন্য প্রান্তে এসে বসতেই নকুল খাবারের প্লেট এনে তার সামনে রাখল, দীপার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল—'তোমাকেও দেব নাকি বউদি ?'

দীপা মাথা নেড়ে বলল—'না, আমি পরে খাব।' দেবাশিসের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া এখনো তার অভ্যাস হয়নি ; তার বাপের বাড়িতে অন্য রকম রেওয়াজ, পুরুষদের খাওয়া শেষ হলে তবে মেয়েরা খেতে বসে। দীপা সহজে অভ্যাস ছাড়তে পারে না ; তবু রাত্রির আহারটা দু'জনে টেবিলের দু' প্রান্তে বসে সম্পন্ন করে। নইলে নকুলের চোখেও বড় বিসদৃশ দেখাবে।

কিছুক্ষণ কোনো কথাবার্তা নেই ; দেবাশিস একমনে লুচি, আলুর দম খাচ্ছে ; দীপা যা-হোক একটা কোনো কথা বলতে চাইছে কিন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। পিছন থেকে নকুলের সতর্ক চক্ষু তাদের লক্ষ্য করছে।

শেষ পর্যন্ত দেবাশিসই প্রথম কথা কইল, সোজা হয়ে বসে দীপার পানে চেয়ে একটু হেসে বলল—'আজ একটা নতুন ক্রিম তৈরি করেছি।'

দেবাশিসের কাজকর্ম সম্বন্ধে দীপা কখনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনি কিন্তু এখন সে আগ্রহ দেখিয়ে বলল—'তাই নাকি ? কিসের ক্রিম ?'

দেবাশিস বলল—'মুখে মাখার ক্রিম।'

'ও মা, সত্যি ? কেমন গন্ধ ?'

'তা আমি কি করে বলব। যারা মাখবে তারা বলতে পারবে।'

'তা বাড়িতে একটু যদি আনো, আমি মেখে দেখতে পারি।'

দেবাশিস হাসিমুখে মাথা নাড়ল—'তোমার এখন মাখা চলবে না, অন্য লোকের মুখে মাখিয়ে দেখতে হবে মুখে ঘা বেরোয় কিনা। পরীক্ষা না করে বলা যায় না।'

'কার মুখে মাখিয়ে পরীক্ষা করবে ?'

'ফ্যাক্টরির দারোয়ান ফৌজদার সিং-এর মুখে মাখিয়ে দেখব। তার গালের চামড়া হাতির চামড়ার মত।'

দীপার মুখে হাসি ফুটল ; সে যে নকুলের সামনে অভিনয় করছে তা ক্ষণকালের জন্যে বিস্মরণ হয়েছিল, দেবাশিসের মুখের হাসি তার মুখে সংক্রামিত হয়েছিল।

আহার শেষ করে দেবাশিস উঠল। দু'জনে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির নীচে এসে দাঁড়াল। দেবাশিস হঠাৎ আগ্রহভরে বলল—'দীপা, আজ উৎপলা সিনেমাতে একটা ভাল ছবি দেখাচ্ছে। দেখতে যাবে ?'

দেবাশিস আগে কখনো দীপাকে সিনেমায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেনি ; দীপার শরীরের ভিতর দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ বয়ে গেল। তারপরই তার মন শক্ত হয়ে উঠল। সে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল—'না, আমি যাব না।'

দেবাশিসের মুখ ম্লান হয়ে গেল, তারপর গম্ভীর হয়ে উঠল। সে কিছুক্ষণ দীপার পানে চেয়ে থেকে বলল—'ভয় নেই, সিনেমা-ঘরের অন্ধকারে আমি তোমার গায়ে হাত দেব না।'

আবার দীপার শরীর কেঁপে উঠল, কিন্তু সে আরো শক্ত হয়ে বলল—'না, সিনেমা আমার ভাল লাগে না।' এই বলে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। দেবাশিস ওপর দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল—'আমি নৃপতিদার বাড়িতে যাচ্ছি, ফিরতে সাড়ে আটটা হবে।'

সদর দরজা খুলে দেবাশিস বাইরে এল, দোরের সামনে তার ফিয়েট গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ; কাজ থেকে ফিরে এসে সে গাড়িটা দোরের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ভেবেছিল, সিনেমা দেখতে যাবার প্রস্তাব করলে দীপা অমত করবে না। তার মন সহজে তিক্ত হয় না, আজ কিন্তু তার মন তিক্ত হয়ে উঠল। এতটুকু বিশ্বাস দীপা তাকে করতে পারে না। এই দু' মাস দীপা তার বাড়িতে আছে, কোনো দিন কোনো ছুতোয় সে দীপার গায়ে হাত দেয়নি, নিজের দাম্পত্য অধিকার জারি করেনি। তবে আজ দীপা তাকে এমনভাবে অপমান করল কেন ?

দেবাশিস গাড়ির চালকের আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল। বাড়ির পিছন দিকে গাড়ি রাখার ঘর, সেখানে গাড়ি রেখে সে পায়ে হেঁটে বেরুল। নৃপতি লাহার বাড়ি পাঁচ মিনিটের রাস্তা। নৃপতির বৈঠকখানায় রোজ সন্ধ্যার পর আড্ডা বসে, দেবাশিস প্রায়ই সেখানে যায়।

দীপা ওপর এসে আবার আরাম-কেদারায় এলিয়ে পড়ল। তার মনের মধ্যে দশদিক তোলপাড় করে ঝড় বইছে, সারা গায়ে অসহ্য ছট্‌ফটানি। অভ্যাসবশেই সে হাত বাড়িয়ে রেডিওগ্রাম চালিয়ে দিল ; কোনো একটি মহিলা ইনিয়ে-বিনিয়ে আধুনিক গান গাইছেন। কিছুক্ষণ শোনার পর সে রেডিও বন্ধ করে দিয়ে চোখ বুজে চুপ করে রইল। কিন্তু বুকের মধ্যে ঝড়ের আফ্‌সানি কমল না। তখন সে উঠে অশান্তভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল, অস্ফুট স্বরে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল—'এভাবে আর কত দিন চলবে ?'

দীপা যদি হাল্‌কা চরিত্রের মেয়ে হত, তাহলে তার জীবনে বোধ হয় কোনো ঝড়-ঝাপটাই আসত না।

দীপা বনেদী বংশের মেয়ে। একসময় খুব বোল্‌বোলাও ছিল, তালুক-মুলুক ছিল, এখন অনেক কমে গেছে ; তবু মরা হাতি লাখ টাকা। বোল্‌বোলাও কমলেও বংশের মর্যাদাবোধ আর গোঁড়ামি তিলমাত্র কমেনি। দীপার ঠাকুরদা উদয়মাধব মুখুজ্জে এখনো বেঁচে আছেন, তিনিই সংসারের কর্তা। এক সময় একটি বিখ্যাত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, হঠাৎ পঙ্গু হয়ে পড়ার ফলে অবসর নিতে হয়েছে। বাড়িতেই থাকেন এবং নিজের শয়নকক্ষ থেকে প্রচণ্ড দাপটে বাড়ি শাসন করেন।

ঠাকুরদা ছাড়া বাড়িতে আছেন দীপার বাবা-মা এবং দাদা। বাবা নীলমাধব বয়স্ক লোক, কলেজে অধ্যাপনা করেন। মা গোবেচারি ভালমানুষ, কারুর কথায় থাকেন না, নীরবে সংসারের কাজ করে যান। দাদা বিজয়মাধব দীপার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়, সে সংস্কৃত ভাষায় এম-এ পাস করে কলেজে অধ্যাপনার কাজে ঢোকবার চেষ্টা করছে। দীপার বাবা এবং দাদা দু'জনেই তেজস্বী পুরুষ। কিন্তু তাঁরা বাড়িতে উদয়মাধবের হুকুম বেদবাক্য মনে করেন এবং বাইরে বংশ-গৌরবের ধ্বজা তুলে বেড়ান। বংশটা একাধারে সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত এবং প্রাচীনপন্থী।

এই বংশের একমাত্র মেয়ে দীপা। তাকে মেয়ে-স্কুল থেকে সীনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাস করানো হয়েছিল। তারপর তার পড়াশুনো বন্ধ হল ; তার জন্যে পালটি ঘরের ভাল পাত্র খোঁজা আরম্ভ হল। কালধর্মে তাকে পর্দার মধ্যে আবদ্ধ রাখা গেল না বটে, কিন্তু একলা বাইরে যাবার হুকুম নেই। বাইরে যেতে হলে বাপ কিংবা ভাই সঙ্গে থাকবে।

দীপা বাড়িতেই থাকে, গৃহকর্মে রান্নাঘরে মাকে সাহায্য করে ; অবসর সময়ে গল্প উপন্যাস পড়ে, রেডিওতে গান শোনে। কিন্তু মন তার বিদ্রোহে ভরা। তার মনের একটা স্বাধীন সত্তা আছে, নিজস্ব মতামত আছে ; সে মুখ বুজে বাড়ির শাসন সহ্য করে বটে, কিন্তু তার মনে সুখ নেই। মেয়ে হয়ে বাংলা দেশে জন্মেছে বলে কি তার কোনো স্বাধীনতা নেই ! অন্য দেশের মেয়েদের তো আছে।

ঠাকুরদা উদয়মাধব, পঙ্গুতার জন্যেই বোধ হয়, বাড়িতে বন্ধুসমাগম পছন্দ করতেন, লোকজনকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। একটা কোনো উপলক্ষ পেলেই নিজের প্রবীণ বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতেন ; নীলমাধব এবং বিজয়মাধবের বন্ধুরাও নিমন্ত্রিত হতেন। বৃদ্ধেরা তিনতলায় সমবেত হতেন, প্রৌঢ় অধ্যাপকেরা বসতেন দোতলায় এবং একতলায় বৈঠকখানায় বসে ছেলে-ছোকরার দল গানবাজনা হইহুল্লোড় করত। মাসে দু'মাসে এইরকম অনুষ্ঠান লেগেই থাকত।

দীপা অতিথিদের সকলের সামনে বেরুত, কোনো বারণ ছিল না। ঠাকুরদার বন্ধুরা নাতনী সম্পর্কে তার সঙ্গে সেকেলে রসিকতা করতেন, বাপের বন্ধুরা তাকে স্নেহ করতেন, আর দাদার বন্ধুরা তাকে নিজেদের সমান মর্যাদা দিত, মেয়ে বলে অবহেলা করত না। সে প্রয়োজন হলে তাদের সঙ্গে দু'টি-চারটি কথাও বলত। তাদের মধ্যে যখন গানবাজনা হত তখন সে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে শুনত। এইসব ক্রিয়াকর্মে তার মন ভারি উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদিও বাইরে তার বিকাশ খুব অল্পই চোখে পড়ত। দীপা ভারি চাপা প্রকৃতির মেয়ে।

এইভাবে চলছিল, তারপর একদিন দীপার মানসলোকে একটি ব্যাপার ঘটল, নবযৌবনের

স্বভাবধর্মে সে প্রেমে পড়ল। যার সঙ্গে প্রেমে পড়ল সেও তার অনুরাগী। কিন্তু মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, প্রেমিকের জাত আলাদা।

দুপুরবেলা যখন বাড়ি নিষুতি হয়ে যায় তখন দীপা নীচের বসবার ঘরে দোর ভেজিয়ে দিয়ে টেলিফোনের সামনে বসে, চোখে প্রতীক্ষা নিয়ে বসে থাকে। টেলিফোন বাজলেই সে যন্ত্র তুলে নেয়। সাবধানে দু'টি-চারটি কথা হয়, তারপর সে টেলিফোন রেখে দেয়। কেউ জানতে পারে না।

সন্ধ্যেবেলা দীপা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে ; সামনের ফুটপাথ দিয়ে তার প্রেমিক চলে যায়, তার পানে চাইতে চাইতে যায়। এইভাবে তাদের দেখা হয়। কিন্তু কাছে এসে দেখা করার সুযোগ নেই, সকলে জানতে পারবে।

এদিকে দীপার জন্যে পাত্রের সন্ধান শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু পালটি ঘর যদি পাওয়া যায় তো পাত্র পছন্দ হয় না, পাত্র যদি পছন্দ হয় তো ঠিকুজি কোষ্ঠীর মিল হয় না। বিয়ের কথা মোটেই এগুচ্ছে না।

পৌষ মাসের শেষের দিকে একদিন দুপুরবেলা দীপা টেলিফোনে তার প্রেমিকের সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করল, তারপর কোমরে আঁচল জড়িয়ে তেতলায় ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

দীপা সাহসিনী মেয়ে, কিন্তু তার সাহসের সঙ্গে খানিকটা একগুঁয়েমি মেশানো আছে। ঠাকুরদার সঙ্গে তার সম্বন্ধ বড় বিচিত্র ; সে ঠাকুরদাকে যত ভালবাসে, বাড়িতে আর কাউকে এত ভালবাসে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ঠাকুরদাকে ভয়ও করে। তিনি তার কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হবেন এ কথা ভাবতেই সে ভয়ে কাঁটা হয়ে যায়। তাই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে তার উরু আর হাঁটু অল্প কাঁপতে লাগল।

উদয়মাধব মুখুজ্জে একদিন বুড়ো বয়সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যান, তাঁর মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত লাগে। এই আঘাতের ফলে তাঁর নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যায়, চলে ফিরে বেড়াবার ক্ষমতা আর থাকে না। এ ছাড়া তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভালই। দোহারা গড়নের শরীর, মুখের চওড়া চোয়ালে প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ। সত্তর বছর বয়সেও মানসিক শক্তি বিন্দুমাত্র কমেনি। যে দাপট নিয়ে তিনি কলেজের অধ্যক্ষতা করতেন সেই দাপট পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। তাঁর চিরদিনের অভ্যাস হুঙ্কার দিয়ে কথা বলা। এখনো তিনি হুঙ্কার দিয়েই কথা বলেন।

দীপা তেতলায় দাদুর ঘরে ঢুকে দেখল তিনি বিছানায় আধ-শোয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। তিনি প্রত্যহ দু'টি খবরের কাগজ পড়েন ; সকালবেলা ইংরেজি কাগজ আর দুপুরে দিবানিদ্রার পর বাংলা।

দীপাকে দেখে উদয়মাধব কাগজ নামালেন, হুঙ্কার দিয়ে বললেন—'এই যে দীপঙ্করী। আজকাল তোমাকে দেখতে পাই না কেন ? কোথায় থাকো ?'

দীপার নাম শুধুই দীপা, কিন্তু উদয়মাধব তাকে দীপঙ্করী বলেন। ঠাকুরদার চিরপরিচিত সম্ভাষণ শুনে তার ভয় অনেকটা কমল, সে খাটের পায়ের দিকে বসে বলল—'আজ সকালেই তো দেখেছেন দাদু। আমি আপনার চা আর ওষুধ নিয়ে এলুম না ?'

উদয়মাধব বললেন—'ওহো, তাই নাকি ! আমি লক্ষ্য করিনি। তা এখন কী মতলব ?'

দীপা হঠাৎ উত্তর দিতে পারল না, মাথা হেঁট করে বসে রইল। যে কথা বলতে এসেছে তা সহজে বলা যায় না।

উদয়মাধব কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে অপেক্ষা করলেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ হুঙ্কার ছাড়লেন—'কী হয়েছে ?'

দীপা তার মনের সমস্ত সাহস একত্র করে দাদুর দিকে ফিরল, তাঁর চোখে চোখ রেখে ধীরস্বরে বলল—'দাদু, আমি একজনকে বিয়ে করতে চাই, কিন্তু তার জাত আলাদা। আপনার আপত্তি

আছে ?'

উদয়মাধব ক্ষণেকের জন্যে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, তারপর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে হুঙ্কার দিলেন—'কি বললে, একজনকে বিয়ে করতে চাও ! এসব আজকাল হচ্ছে কি ? নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করবে ! তুমি কি ম্লেচ্ছ বংশের মেয়ে ?'

দীপা নতমুখে চুপ করে বসে রইল। উদয়মাধব হুঙ্কারের পর হুঙ্কার দিয়ে বক্তৃতা চালাতে লাগলেন। একটানা হুঙ্কার শুনে নীচে থেকে দীপার মা আর দাদা বিজয়মাধব ছুটে এল, দু'-একটা ঝি-চাকরও দোরের কাছ থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল। দীপা কাঠ হয়ে বসে রইল।

আধ ঘণ্টা পরে লেকচার শেষ করে উদয়মাধব বললেন—'আর যেন কোনো দিন তোমার মুখে এ কথা শুনতে না পাই। তুমি এ বংশের মেয়ে, আমার নাতনী, আমি দেখেশুনে যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব তাকেই তুমি বিয়ে করবে। যাও।'

দীপা নীচে নেমে এল ; বিজয়ও তার সঙ্গে সঙ্গে এল। দীপা নিজের শোবার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, বিজয় কটমট তাকিয়ে কড়া সুরে বলল—'এই শোন্। কাকে বিয়ে করতে চাস্ ?'

জ্বলজ্বলে চোখে দীপা ফিরে দাঁড়াল, তীব্র চাপা স্বরে বলল—'বলব না। মরে গেলেও বলব না।' এই বলে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দোর বন্ধ করে দিল।

অতঃপর দীপা বাড়িতে প্রায় নজরবন্দী হয়ে রইল। আগে যদি-বা দু'-একবার নিজের সখীদের কাছে যাবার জন্য বাড়ির বাইরে যেতে পেত, এখন আর তাও নয়। সর্বদা বাড়ির সবাই যেন শতচক্ষু হয়ে তার ওপর নজর রেখেছে। কেবল দুপুরবেলা ঘণ্টাখানেকের জন্যে সে দৃষ্টিবন্ধন থেকে মুক্তি পায়। তার মা নিজের ঘরে গিয়ে একটু চোখ বোজেন, তার দাদা বিজয় কাজের তদ্‌বিরে বেরোয়। বাবা নীলমাধব দশটার আগেই কলেজে চলে যান, ঠাকুরদা তেতলায় নিজের ঘরে আবদ্ধ থাকেন। সুতরাং দীপাকে কেউ আগলাতে পারে না। দীপাও বিদ্রোহের কোনো লক্ষণ প্রকাশ করে না।

বস্তুত বাড়ির লোকের ধারণা হয়েছিল, পিতামহের লেকচার শুনে দীপার দিব্যজ্ঞান হয়েছে, সে আর কোনো গোলমাল করবে না। দুপুরবেলা যে টেলিফোন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তা কেউ জানে না।

তারপর একদিন—

ঘটনাচক্রে বিজয় দুপুরবেলা সকাল সকাল বাড়ি ফিরছিল। সে আজ যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তার দেখা পায়নি, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে সে দেখতে পেল, দীপা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বালিগঞ্জ রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। বিজয়ের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। একলা দীপা কোথায় যাচ্ছে ! দীপার বান্ধবী শুভ্রার বাড়িতে ? কিন্তু শুভ্রার বাড়ি তো এদিকে নয়, ঠিক উল্টো দিকে ; অন্য কোনো বান্ধবীও এদিকে থাকে না। বিজয় সজোরে পা চালিয়ে দীপাকে ধরবার উদ্দেশ্যে চলল।

'এই, কোথায় যাচ্ছিস ?'

তীরবিদ্ধের মত দীপা ফিরে দাঁড়াল। সামনেই দাদা। বিজয় কড়া সুরে বলল—'একলা কোথায় যাচ্ছিস ?'

দীপার মুখে কথা নেই ; সে একবার ঢোক গিলল। বিজয় গলা আরো চড়িয়ে বলল—'কার হুকুমে একলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস ? চল, ফিরে চল !'

এবার দীপার মুখ থেকে কথা বেরল—'যাব না।'

রাস্তায় বেশি লোক চলাচল ছিল না, যারা ছিল তারা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে লাগল। দীপা দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিজয় বলল—'ভাল কথায় যাবি, না চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাব ?'

দীপার বুক ফেটে কান্না এল। রাস্তার মাঝখানে এ কি কেলেঙ্কারি ! এখনি হয়তো চেনা লোক কেউ দেখতে পাবে। দীপা কোনো মতে দুরন্ত কান্না চেপে বঁড়শির মাছের মত বাড়ির দিকে ফিরে চলল।

বিজয় বাড়িতে ঢুকে 'মা মা' বলে দু'বার ডাক দিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল ; দীপা আর দাঁড়াল না, দোতলায় উঠে নিজের ঘরে দোর বন্ধ করল।

বিজয় বসবার ঘরে ঢুকতেই তার নজরে পড়ল টেলিফোন যন্ত্রের নীচে এক টুকরো সাদা কাগজ চাপা রয়েছে। কাছে গিয়ে কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে পড়ল, তাতে লেখা রয়েছে—'আমি যাকে বিয়ে করতে চাই তার সঙ্গে চলে যাচ্ছি। তোমরা আমার খোঁজ করো না। —দীপা।'

এতটা বিজয়ও ভাবতে পারেনি। সে চিঠি নিয়ে সটান ঠাকুরদার কাছে গেল। বাবা-মাও জানতে পারলেন। কিন্তু ঝি-চাকরের কাছে কথাটা লুকিয়ে রাখতে হল। উদয়মাধব গুম হয়ে রইলেন, হুঙ্কার দিয়ে বক্তৃতা করলেন না। ভিতরে ভিতরে দীপার ওপর পীড়ন চলতে লাগল—যার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিল, সে কে ? নাম কি ? দীপা কিন্তু মুখ টিপে রইল, নাম বলল না।

নিভৃত পারিবারিক মন্ত্রণায় স্থির হল, সর্বাগ্রে দীপার বিয়ে দেওয়া দরকার ; যেখান থেকে হোক পালটি ঘরের সৎ পাত্র চাই। আর দেরি নয়।

বাড়ির মধ্যে সকলের চেয়ে বিজয়ের দুশ্চিন্তা বেশি। তার স্বভাব একটু তীব্র গোছের। তার বোন কোনো অজানা লোকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল এ লজ্জা যেন তারই সবচেয়ে মর্মান্তিক। সে উঠে পড়ে লেগে গেল পাত্র খুঁজতে।

পাড়ার নৃপতি লাহার বাড়িতে কয়েকটি যুবকের আড্ডা বসত, আগে বলা হয়েছে। বিজয় এই আড্ডায় আসত, এখানে অন্য যারা আসত তাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল, নৃপতি লাহার সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল।

নৃপতি লাহারা সাত পুরুষে বড়মানুষ, কিন্তু বর্তমানে সে ছাড়া বংশে আর কেউ নেই। তার বয়স এখন আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বছর, নিঃসন্তান অবস্থায় বিপত্নীক হবার পর আর বিয়ে করেনি। সে উচ্চশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, সারা দিন লেখাপড়া নিয়ে থাকে, সন্ধ্যের পর আড্ডা জমায়।

বিজয়মাধব একদিন বিকেলবেলা নৃপতির কাছে এল। তখনো আড্ডা জমার সময় হয়নি, নৃপতি বাড়ির নীচের তলার বৈঠকখানায় বসে একখানা বই পড়ছিল। এই ঘরটিতেই রোজ আড্ডা বসে।

ঘরটি প্রকাণ্ড, সভাঘরের মত। সাবেক কালে এই ঘরে বাবুদের নাচগানের মুজ্‌রো বসত, একালে ঘরটি সোফা চেয়ার প্রভৃতি দিয়ে সাজিয়ে ড্রয়িংরুমে পরিণত করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালের গদি-মোড়া তক্তপোশ এখনো আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। তা ছাড়া টেবিল-হারমোনিয়াম আছে, পিয়ানো আছে, রেডিওগ্রাম আছে। আর আছে তাস পাশা ক্যারাম প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম।

বিজয় ঘরে ঢুকে দেখল নৃপতি একলা আছে, বলল—'নৃপতিদা, তোমার সঙ্গে আড়ালে একটা পরামর্শ আছে, তাই আগেভাগে এলাম।'

নৃপতি বই মুড়ে বিজয়কে একটু ভাল করে দেখল, তারপর সোফায় নিজের পাশে হাত চাপড়ে বলল—'এস, বসো।'

বিজয় তার পাশে বসে কথা বলতে ইতস্তত করছে দেখে নৃপতি বলল—'কিসের পরামর্শ ?'

বিজয় তখন বলল—'নৃপতিদা, দীপার জন্যে পাত্র খোঁজা হচ্ছে কিন্তু মনের মত পাত্র কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি তো অনেক খবর রাখো। একটা ভাল পাত্রের সন্ধান দাও না।'

নৃপতি হাত বাড়িয়ে নিকটস্থ টেবিল থেকে সিগারেটের টিন নিল, একটি সিগারেট ঠোঁটে ধরে বলল—'হুঁ। দীপার এখন বয়স কত ?'

'সতেরো। আমাদের বংশে—'

নৃপতি দেশলাই জ্বালাবার উপক্রম করে বলল—'তোমাদের বংশের কথা জানি। গৌরীদান

করতে পারলেই ভাল হয়। তা কি রকম পাত্র চাও ? বিদ্বান হবে, পয়সাকড়ি থাকবে, চেহারা ভালো হবে, এই তো ?'

বিজয় বলল—'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আসল কথাটাই বললে না। পালটি ঘর হওয়া চাই।'

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নৃপতির ঠোঁটের কোণে একটু ব্যঙ্গহাসি খেলে গেল। সে বলল—'তাও তো বটে। বংশের ধারা বজায় রাখতে হবে বইকি। তা তোমরা হলে গিয়ে মুখুজ্জে, সুতরাং চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে গাঙ্গুলি কিংবা ঘোষাল চাই। বারেন্দ্র চলবে না ?'

'না, নৃপতিদা, জানোই তো আমরা আজ পর্যন্ত সাবেক চাল বজায় রেখে চলেছি।'

'জানি বইকি। তোমরা হচ্ছ আরশোলা গোষ্ঠীর জীব।'

'আরশোলা গোষ্ঠীর জীব মানে ?'

'আরশোলা অতি প্রাচীন জীব, কোটি কোটি বছর আগে জন্মেছিল ; তারপর জীবজগতে অনেক বিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আরশোলা আরশোলাই রয়ে গেছে। তাই আজকাল আর তাদের বেশি কদর নেই।'

'সে যাই বল, বর্ণাশ্রম ধর্ম আমি মেনে চলি। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, চাতুর্বর্ণ্যং—'

নৃপতি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ; সিগারেট টানতে টানতে সে বোধ করি মনে মনে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করছিল। সিগারেট শেষ করে সে বলল—'একটি ছেলে আছে, কিন্তু তোমাদের পালটি ঘর কিনা খোঁজ নিতে হবে। তুমি আজ বাড়ি যাও, কাল খবর পাবে।'

'আচ্ছা', বলে বিজয় চলে গেল।

নৃপতি কব্জির ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বেজেছে। সিগারেটের টিন পকেটে নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তার গন্তব্যস্থল বেশি দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

দেবাশিসের সদর দরজার ঘন্টি টিপতেই নকুল এসে দোর খুলল। নৃপতি বলল—'দেবাশিসবাবু আছেন ?'

নকুল বলল—'আজ্ঞে, তিনি এইমাত্র ফেক্টারি থেকে বাড়ি ফিরেছেন—'

এই সময় দেখা গেল দেবাশিস সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সে সদর দোরের কাছে এলে নৃপতি একটু হেসে বলল—'আমাকে আপনি চিনবেন না, আপনার বাবা শুভাশিসবাবুর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। আমার নাম নৃপতি লাহা।'

দেবাশিসের মুখেও হাসি ফুটল—'আপনাকে চিনি না বটে, কিন্তু নাম জানি। আপনার বাড়িও দেখেছি। আসুন।' সে নৃপতিকে বসবার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে থমকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—'বসবার ঘরে না গিয়ে চলুন খাবার ঘরে যাই। চায়ের সময় হয়েছে।'

নৃপতি বলল—'বেশ তো।'

দু'জনে খাবার ঘরে গিয়ে টেবিলে বসল। দেবাশিস বলল—'নকুল, আমাদের চা জলখাবার দাও।'

নৃপতি বলল—'আমার চা হলেই চলবে।'

খেতে খেতে দু'জনের কথা হতে লাগল। বছর ছয়-সাত আগে দেবাশিসের বাবার সঙ্গে নৃপতির পরিচয় হয়েছিল ; দেবাশিস তখন কলকাতায় থাকত না, দিল্লীতে পড়াশুনো করতে গিয়েছিল। শুভাশিসবাবু একদিন নৃপতির বাড়ির সামনে ফুটপাথের ওপর পা পিছলে পড়ে যান, নৃপতি তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফার্স্ট এড় দিয়েছিল। তারপর শুভাশিসবাবু তাঁর ফ্যাক্টরিতে তৈরি প্রচুর কেশতৈল সাবান কোল্ড ক্রিম প্রভৃতি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তার বাড়িতে এসে তত্ত্ব-তল্লাশ নিতেন। বছর দুই পরে তিনি যখন মারা গেলেন তখন নৃপতি খবর পেল না, একেবারে খবর পেল মাস তিনেক পরে। এমনি কলকাতা শহর। শুভাশিসবাবুর মৃত্যু-সংবাদ নৃপতিকে জানাবে এমন লোক কেউ ছিল না।

দেবাশিস দিল্লীতে তার বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে কলেজে পড়াশুনো করছিল। বাল্যকালেই তার মা মারা গিয়েছিলেন। বাবার বন্ধুটি ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা

বিজ্ঞান-অধ্যাপক। দেবাশিস এম. এস-সি. পাস করে দিল্লী থেকে চলে এল। তার মাসখানেক পরেই তার বাবা মারা গেলেন।

নৃপতি প্রশ্ন করল—'আপনার বাড়িতে আর কে আছে?'

দেবাশিস বলল—'আর কেউ নেই, আমি একা। কিংবা আমি আর নকুল বলতে পারেন। নকুল এ বাড়িতে আমি জন্মাবার আগে থেকে আছে।'

'বিয়ে করেননি?'

'আমি লেখাপড়া শেষ করে ফিরে আসার পরই বাবা মারা গেলেন, তারপর আর হয়ে ওঠেনি।'

'হুঁ। ভাল কথা, আপনার উপাধি যখন ভট্ট তখন নিশ্চয় ব্রাহ্মণ। গোত্র জানা আছে কি?'

'যখন পইতে হয় শুনেছিলাম শাণ্ডিল্য গোত্র। বাঁড়ুজ্জে।'

'বাঃ, বেশ। আচ্ছা, আমি যদি ঘটকালি করি, আপনার আপত্তি হবে কি?'

দেবাশিস মুখে টিপে একটু হাসল, উত্তর দিল না। নকুল এতক্ষণ ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল, এখন এগিয়ে এসে বলল—'হ্যাঁ বাবু, আপনি করুন। ঘরে একটি বউ দরকার। আমি বুড়ো মানুষ আর কত দিন সংসার চালাব।'

'তাই হবে।' নৃপতি চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল।—'আজ চলি। আমার বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা আড্ডা বসে, পাড়ার ছেলেরা আসে। আপনিও আসেন না কেন?'

'আচ্ছা, যাব।'

'আজই চলুন না!'

দেবাশিস একটু ইতস্তত করে বলল—'আজই? বেশ, চলুন।'

দু'জনে বেরুল। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নৃপতির বাড়ির সামনে এসে তারা শুনতে পেল বৈঠকখানায় কেউ লঘু আঙুলের স্পর্শে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

বৈঠকখানা ঘরে তিনটে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। কেবল একটি মানুষ ঘরে আছে, দেয়াল-ঘেঁষা পিয়ানোর সামনে বসে আপন মনে বাজিয়ে চলেছে।

নৃপতি দেবাশিসকে নিয়ে ঘরে ঢুকল, বলল—'ওহে প্রবাল, দ্যাখো, আমাদের আড্ডায় একটি নতুন সভ্য পাওয়া গেছে। এঁর নাম দেবাশিস ভট্ট।'

প্রবাল নামধারী যুবক পিয়ানো থেকে উঠে এল। নিরুৎসুক স্বরে বলল—'পরিচয় দেবার দরকার নেই।'

নৃপতি বলল—'আগে থাকতেই পরিচয় আছে নাকি?'

প্রবাল বলল—'সামান্য। গরীবের সঙ্গে বড়মানুষের যতটুকু পরিচয় থাকা সম্ভব ততটুকুই।'

প্রবাল আবার পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসল। টুং টাং করে একটা সুর বাজাতে লাগল। তার ভাবভঙ্গী দেখে বেশ বোঝা যায় দেবাশিসকে দেখে খুশি হয়নি। সে বয়সে দেবাশিসের চেয়ে দু'এক বছরের বড়, মাঝারি দৈর্ঘ্যের বলিষ্ঠ চেহারা, মুখের গড়নে বৈশিষ্ট্য না থাকলেও জৈব আকর্ষণ আছে; চোখের দৃষ্টি অপ্রসন্ন। কিন্তু তার চেহারা যেমনই হোক সে ইতিমধ্যে গায়ক হিসেবে বেশ নাম করেছে। তার কয়েকটা গ্রামোফোন রেকর্ড খুব জনপ্রিয় হয়েছে; রেডিও থেকেও মাঝে মাঝে ডাক পায়।

প্রবালের সঙ্গে দেবাশিসের অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। এক সময় তারা একসঙ্গে স্কুলে পড়ত, ভাবসাব ছিল; তারপর দেবাশিস স্কুল থেকে পাস করে দিল্লীতে পড়তে চলে গেল। কয়েক বছর পরে এই প্রথম দেখা। এই কয় বছরের মধ্যে দেবাশিসের বাবা 'প্রজাপতি প্রসাধন' নামে শৌখিন টয়লেট্ দ্রব্যের কারখানা খুলে বড়মানুষ হয়েছেন। আর প্রবালের বাবা হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা যাওয়ার ফলে তাদের সম্পন্ন অবস্থার খুবই অধোগতি হয়েছে। প্রবাল গান গেয়ে কোনো মতে টিকে আছে।

প্রবালের কথা বলার ভঙ্গীতে দেবাশিস বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, নৃপতি তাকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে সোফায় পাশাপাশি বসে গল্প করতে লাগল। বলল—'আমার আড্ডায় পাঁচ-ছয়জন আসে। কিন্তু সবাই রোজ আসে না। আজ আরো দু'-তিনজন আসবে।'

নৃপতি দেবাশিসের সামনে সিগারেটের টিন খুলে ধরল, দেবাশিস মাথা নেড়ে বলল—'ধন্যবাদ। আমি খাই না।'

নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে নৃপতি খাটো গলায় বলল—'প্রবাল গুপ্ত গাইয়ে-বাজিয়ে লোক, একটু বেশি সেন্‌সিটিভ্‌, আপনি কিছু মনে করবেন না। ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এই সময় বাইরে থেকে একটি যুবক সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সিল্কের লম্বা প্যান্ট ও বুশ্‌-কোট পরা সুগঠিত সুদর্শন চেহারা, ধারালো মুখে আভিজাত্যের ছাপ, বেশ দৃঢ় চরিত্রের ছেলে বলে মনে হয়, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। তাকে দেখে নৃপতি বলল—'এই যে কপিল। এস পরিচয় করিয়ে দিই। কপিল বোস—দেবাশিস ভট্ট।'

নমস্কার প্রতিনমস্কারের পর কপিল বলল—'নৃপতিদা, তোমার টেলিফোন একবার ব্যবহার করব। রাস্তায় আসতে আসতে একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

কপিল পাশের ঘরে চলে গেলে নৃপতি বলল—'কপিল ছেলেটা ভাল, বাপ অগাধ বড়মানুষ, কিন্তু ওর কোনো বদ্‌খেয়াল নেই। লেখাপড়া শিখেছে, টেনিস বিলিয়ার্ড খেলে দিন কাটায়, রাত্তিরে দূরবীন লাগিয়ে আকাশের তারা গোনে। কেবল একটি দোষ, বিয়ে করতে চায় না।'

প্রবাল হঠাৎ পিয়ানো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নৃপতির দিকে তাকিয়ে বলল—'আজ চললাম নৃপতিদা।' দেবাশিসকে সে লক্ষ্যই করল না।

নৃপতি বলল—'চললে? এত সকাল সকাল? রেডিওতে গাইতে হবে বুঝি? কাগজে যেন দেখেছিলাম আজ রাত্রে তোমার প্রোগ্রাম আছে।'

প্রবাল বলল—'প্রোগ্রাম আছে। কিন্তু গান আগেই রেকর্ড হয়ে গেছে, আমাকে স্টুডিও যেতে হবে না। আমি বাসায় যাচ্ছি।'

নৃপতি বলল—'বাসায় যাচ্ছ। তোমার বউ-এর খবর ভাল তো?'

প্রবাল উদাস স্বরে বলল—'তোমাদের বলিনি নৃপতিদা, বউ মাসখানেক আগে মারা গেছে। হার্টের রোগ নিয়ে জন্মেছিল; ডাক্তারেরা বলে বারো-চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে অপারেশন না করালে এ রোগে কেউ একুশ-বাইশ বছরের বেশি বাঁচে না। আমার শ্বশুর রোগ লুকিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। —আচ্ছা, চললাম।'

নৃপতি ও দেবাশিস স্তব্ধ হয়ে রইল। স্ত্রী মারা গেছে অথচ আড্ডার কাউকে কিছু বলেনি; আপন মনে পিয়ানো বাজায় আর চলে যায়। নৃপতি জানত প্রবালের স্ত্রীর মরণান্তক রোগ, কিন্তু খবর শুনে হঠাৎ তার মুখে কথা যোগালো না।

এই সময় কপিল পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে তাদের কাছে দাঁড়াল। সে প্রবালের কথাগুলো শুনতে পায়নি, তার দিকে তাকিয়ে বলল—'বেশ তো পিয়ানো বাজাচ্ছিলে, চললে নাকি? একটা গান শোনাও না।'

প্রবাল তীব্র বিদ্বেষভরা চোখে তার পানে চেয়ে রুদ্ধস্বরে বলল—'আমার গান বিনা পয়সায় শোনা যায় না। পয়সা খরচ করতে হয়।'

কপিল এরকম কড়া জবাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, সে একটু হক্‌চকিয়ে গেল। তারপর সামলে নিয়ে হেসে উঠল। বলল—'পয়সা খরচ করেই যদি গান শুনতে হয় তাহলে তোমার গান শুনব কেন? তোমার চেয়ে অনেক ভাল গাইয়ে আছে।'

প্রবাল আর দাঁড়াল না, হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কপিল একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল, নৃপতি অপ্রতিভ মুখে বলল—'আজ প্রবালের মেজাজটা ভাল নেই।'

কপিল বলল—'প্রবালের মেজাজ সর্বদাই সপ্তমে চড়ে থাকে। ধাতুগত বিকার।'

'ওর স্ত্রী মারা গেছে।'

কপিল চকিত হয়ে বলল—'তাই নাকি। আমি জানতাম না। ছি ছি, অসভ্যতা করে ফেলেছি।'

নৃপতি বলল—'যাক গে। তুমি কেমন আছ বলো। কয়েকদিন তোমাকে দেখিনি।'

কপিল বলল—'প্ল্যান করেছিলাম বাঙ্গালোরে বেড়াতে যাব, কিন্তু প্ল্যান ভেস্তে গেল।'

'ভেস্তে গেল কেন ?'

'আমার সঙ্গে যার যাবার কথা ছিল সে যেতে পারল না। একলা বেড়িয়ে সুখ নেই।'

'তা বটে। কিন্তু তুমি বিয়ে করছ না কেন ? বিয়ে করলে তো একটি চিরস্থায়ী সহযাত্রী পাবে।'

কপিল হেসে উঠল, থিয়েটারী কায়দায় বাহু প্রসারিত করে বলল—'কবি বলেছেন, হব না তাপস নিশ্চয় যদি না মেলে তপস্বিনী। আমিও কবির দলে।'

নৃপতি বলল—'কিন্তু শুনেছি তোমার বাবা তপস্বিনী জোটাবার ত্রুটি করেননি, গোটা পঞ্চাশেক সুন্দরী তপস্বিনী দেখেছেন। একটিও তোমার পছন্দ হল না ?'

কপিল একটু গম্ভীর হয়ে বলল—'সুন্দরী মেয়ে অনেক আছে নৃপতিদা, কিন্তু শুধু সুন্দরী হলেই তো চলে না। আমি এমন বউ চাই যার মন হবে আমার মনের সমান্তরাল, অর্থাৎ সমানধর্মা।—কথাটা বুঝেছেন ?'

'বুঝেছি। তুমি হুঁশিয়ার লোক। তা নিজে পছন্দ করে বিয়ে কর না কেন ? তোমার বাবা নিশ্চয় অমত করবেন না।'

কপিল হেসে বলল—'সেই চেষ্টাতেই আছি।'

তারপর সাধারণভাবে কথা হতে লাগল। দেবাশিস এতক্ষণ কেবল নিশ্চেষ্ট শ্রোতা ছিল, এখন সেও কথাবার্তায় যোগ দিল। দেবাশিসের পূর্ণতর পরিচয় শুনে কপিল বলল—'আরে তাই নাকি! আপনিই প্রজাপতি প্রসাধন প্রডাক্টস্ ? আমরা যে বাড়িসুদ্ধ আপনার তেল সাবান স্নো ক্রিম ব্যবহার করি। তা অ্যাদ্দিন আপনি ছিলেন কোথায় ?'

দেবাশিস বলল—'এখানেই ছিলাম, কিন্তু নৃপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ ছিল না।'

আরো খানিকক্ষণ গল্পসল্প হল। চাকর এসে ছোট ছোট পেয়ালায় কফি দিয়ে গেল। ক্রমে আটটা বাজল। নৃপতি বলল—'আজ বোধ হয় আর কেউ আসবে না।'

দেবাশিস বলল—'আজ উঠি।'

কপিল বলল—'এরি মধ্যে! আমাদের আড্ডা ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চলে।'

দেবাশিস হেসে বলল—'আবার আসব।'

নৃপতি জিজ্ঞেস করল—'কাল আসতে পারবেন ?'

দেবাশিস বলল—'আচ্ছা, কাল আসব।'—

পরদিন দেবাশিস একটু দেরি করে এল। ইচ্ছে ছিল সাড়ে আটটা ন'টা পর্যন্ত থেকে গল্পগুজব করবে। বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা একলা বিজ্ঞানের বই আর সাময়িক পত্র পড়ে কাটে, এখানে নতুন লোকের সঙ্গ পাওয়া যাবে। প্রবালের অসামাজিক ব্যবহার সত্ত্বেও নৃপতির আড্ডাটি তার ভাল লেগে গিয়েছিল।

সাড়ে ছ'টার সময় নৃপতির বৈঠকখানায় গিয়ে দেবাশিস দেখল প্রবাল পিয়ানোর সামনে বসে চাবির ওপর আঙুল বুলোচ্ছে, কপিল এবং আর একটি ছেলে তক্তপোশের পাশে বসে পাঞ্জা লড়ছে; নৃপতি এবং অন্য একটি যুবক পাশাপাশি বসে গল্প করছে। নৃপতি তাকে হাত তুলে ডাকল।

দেবাশিস কাছে গেলে নৃপতি বলল—'বসুন এখানে। পরিচয় করিয়ে দিই। দেবাশিস ভট্ট—বিজয়মাধব মুখুজ্জে। বিজয় হচ্ছে অধ্যাপক বংশের ছেলে, সম্প্রতি সংস্কৃতে এম.এ. পাস

করে অধ্যাপনার কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে।' দেবাশিসের পূর্ণ পরিচয় নৃপতি আগেই বিজয়কে দিয়েছিল, আর পুনরাবৃত্তি করল না।

বিজয় উৎসুক চোখে দেবাশিসকে দেখতে লাগল। নৃপতি তাদের মাঝখান থেকে উঠে পড়ল, বলল—'তোমরা গল্প কর, আমি আসছি।'

বিজয় দেবাশিসের দিকে একটু ঘেঁষে বসল। বলল—'এক পাড়াতে থাকি, অ্যাদ্দিন আলাপ-পরিচয় হয়নি, কি আশ্চর্য বলুন দেখি।' চেহারা দেখেই দেবাশিসকে তার পছন্দ হয়েছিল; দীপার উপযুক্ত বর।

যদিও কলকাতা শহরে পাশাপাশি বাস করেও আলাপ-পরিচয় না হওয়াতে আশ্চর্য কিছু নেই, তবু দেবাশিস হাসিমুখে বলল—'আশ্চর্য বইকি।'

ওদিকে কপিল আর অন্য ছেলেটির পাঞ্জা লড়া শেষ হয়েছিল, নৃপতি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—'কি হে খড়্গ বাহাদুর, তোমার দেশে যাবার কথা ছিল না?

খড়্গ বাহাদুর প্রফুল্ল স্বরে বলল—'কথা তো ছিল নৃপতিদা, কিন্তু যাওয়া হল না।'

খড়্গ বাহাদুর নেপালী যুবক। তার মা বাঙালী। তাই তার মাতৃভাষাও বাংলা। চমৎকার চেহারা, যেমন পীতাভ সোনালী রঙ তেমনি লম্বা ছিপছিপে গড়ন। তার মুখে চোখে মঙ্গোলীয় রক্তের ছাপ এত অল্প যে ধরা যায় না। বর্তমানে সে বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়; পায়ের কাছে বল পেলে সে যাদুকর বনে যায়। কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা ফুটবল ক্লাবের সে খেলোয়াড়। তার খেলা দেখবার জন্যে লক্ষ লক্ষ দর্শক মাঠে জমা হয়। কিন্তু তার চরিত্রে বিন্দুমাত্র চালিয়াতি নেই। উচ্চবংশের ছিলে, কিন্তু ভারি বিনয়ী। বয়স তেইশ কি চব্বিশ।

নৃপতি বলল—'কেন, যাওয়া হল না কেন?'

খড়্গ বাহাদুর বলল—'কাঠমাণ্ডুতে বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়েছিল, হঠাৎ তার পেলাম কীসব গণ্ডগোল হয়েছে, বিয়ে পেছিয়ে গেছে।'

নৃপতি বলল—'তার মানে এক বছরের ধাক্কা। ফুটবল সীজন এসে পড়ল, এরপর তুমি তো আর নেপালে গিয়ে বসে থাকতে পারবে না।'

খড়্গ বাহাদুর চোখে কৌতুক এবং মুখে বিষণ্ণতা নিয়ে মাথা নাড়ল।

চাকর বড় একটি ট্রে'র ওপর কয়েক পেয়ালা কফি নিয়ে এল, সকলেই এক এক পেয়ালা তুলে নিল। এই সময় সদর দরজার কাছ থেকে আওয়াজ এল—'ওহে, আমিও আছি, আমার জন্যে এক পেয়ালা রেখো।'

একটি যুবক প্রবেশ করল। রজতগৌর বর্ণ, মুখের ছাঁচ কেষ্টনগরের পুতুলকেও হার মানায়; চোখ দু'টি উজ্জ্বল, ক্ষৌরিত মুখে একটা হাসি লেগে আছে। বয়স সাতাশ-আটাশ।

নৃপতি বলল—'এস সুজন।'

সুজন মিত্র একজন উদীয়মান চিত্রনক্ষত্র; দু' তিনখানা ছবি করেই বেশ নাম করেছে। যেমন গম্ভীর ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, তেমনি হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতাও আছে। সবচেয়ে বড় কথা, হঠাৎ খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেও তার মেজাজ বিগড়ে যায়নি। নিজের কথা সাত কাহন করে বলতে সে ভালবাসে না। বস্তুত তার সম্বন্ধে কেউ বড় কিছু জানে না। স্ত্রীজাতির প্রতি তার আসক্তির কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। এমন কি সে বিবাহিত কি অবিবাহিত তাই কেউ জানে না। দক্ষিণ কলকাতার একান্তে একটি ছোট বাড়িতে একলা থাকে, বেশির ভাগ সময়ই হোটেলে খায়। অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং অপ্রকট তার জীবন।

সুজন ট্রে থেকে টপ্ করে একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে বলল—'ঠিক সময়ে এসেছি, আর একটু হলে ফাঁকি পড়তাম।'

কফিতে একটি চুমুক দিয়ে সে তার উজ্জ্বল অভিনেতার চোখ দু'টি ঘরের চারিদিকে ফেরাল, তারপর দেবাশিসকে দেখে হ্রস্ব কণ্ঠে বলল—'নৃপতিদা, নতুন অতিথির সমাগম হয়েছে দেখছি!'

নৃপতি বলল—'হ্যাঁ, এস তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। খড়্গা, তুমিও এস।'

পরিচয় বিনিময়ের পর সুজন মিটিমিটি হেসে বলল—'দেবাশিসবাবু, এখন বলুন দেখি আপনি ফুটবল খেলা দেখতে ভালবাসেন, না সিনেমা দেখতে ভালবাসেন?'

দেবাশিস বলল—'দুই-ই ভালবাসি। খেলার মাঠে এবং রূপালী পর্দায় আপনাদের দু'জনকে অনেকবার দেখেছি।'

তারপর সকলে মিলে খানিকক্ষণ হাসিগল্প চালাল। প্রবাল কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দিল না, নিজের মনে টুং টাং করে পিয়ানো বাজিয়ে চলল।

রাত আন্দাজ ন'টার সময় সভা ভঙ্গ হল। দেবাশিস বেশ প্রফুল্ল মনে বাড়ি ফিরে এল।

এইভাবে কয়েকদিন কাটাবার পর এক রবিবার সকালবেলা বিজয়, তার বাবা নীলমাধব এবং নৃপতি দেবাশিসের বাড়িতে দেখা করতে এল। দেবাশিস তাদের খাতির করে নীচের তলায় বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো এবং নকুলকে চায়ের হুকুম দিল।

নীলমাধব মুখুজ্জে অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি আগে বিজয়ের মুখে দেবাশিস সম্বন্ধে সব কথা শুনেছিলেন এবং তত্ত্ব-তল্লাশও নিয়েছিলেন। পাত্রটিকে সৎপাত্র মনে হওয়ায় তিনি এখন স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন। তিনি দেবাশিসকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করলেন এবং নৃপতির দিকে ঘাড় নেড়ে সন্তোষ জ্ঞাপন করলেন।

ইতিমধ্যে চা এসে পড়েছে। নৃপতি চা খেতে খেতে নিপুণভাবে বিয়ের প্রস্তাব তুলল। নৃপতির ঘটকালির দিকে বিশেষ দক্ষতা আছে।

আধ ঘন্টার মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেল। দেবাশিসের ঠিকুজি কোষ্ঠী ছিল না তাই জ্যোতিষের যোটক বাদ দিতে হল। নৃপতি বলল—'দেবাশিস, দীপাকে তোমার অপছন্দ হবে না জানি, তবু একবার দেখা দরকার। আজ বিকেলে আমি এসে তোমাকে এঁদের বাড়িতে নিয়ে যাব। কেমন?'

দেবাশিস সম্মত হল। বলা বাহুল্য, এই ক'দিনে নৃপতি ও দেবাশিসের ঘনিষ্ঠতা 'তুমি' ও 'নৃপতিদার' পর্যায়ে নেমেছে।

সেদিন অপরাহ্ণে নৃপতি এসে দেবাশিসকে দীপাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। বৈঠকখানা ঘরে আসর হয়েছিল; আড়ম্বর কিছু নয়, টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে এক গুচ্ছ ফুল, তক্তপোশের ওপর মখমলের আস্তরণ এবং মোটা তাকিয়া। বিজয় তাদের নিয়ে গিয়ে ঘরে বসালো, তারপর নীলমাধব এসে দেবাশিসকে তেতলার ঘরে নিয়ে গেলেন। উদয়মাধব তার সঙ্গে দু'চারটে কথা বললেন; তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল ভাবী নাতজামাই দেখে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

তারপর নীলমাধব দেবাশিসকে নিয়ে আবার নীচে নেমে এলেন। পাঁচ মিনিট পরে বিজয় গিয়ে দীপাকে নিয়ে এল, দীপা এসে টেবিলের কাছে দাঁড়াল। পরনে আটপৌরে শাড়ি ব্লাউজ, কানে ছোট ছোট দু'টি সোনার আংটি, গলায় সরু হার, হাতে তিনগাছি করে চুড়ি। কনে দেখানো উপলক্ষে তাকে সাজগোজ করানো হয়নি, কিংবা সে নিজেই সাজগোজ করেনি। তার সারা দেহে প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ। একবার সে পলকের জন্য চোখ তুলে দেবাশিসের দিকে চেয়ে আবার চোখ নীচু করল। ভ্রূর ঋজু রেখার নীচে চোখের দৃষ্টি খর।

দেবাশিসের কিন্তু দীপাকে খুব ভালো লেগে গেল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা শূন্য বললেই হয়, তবু দীপাকে দেখে তার মনে মাধুর্যের সঞ্চার হল, মনে হল একে স্ত্রীরূপে পেলে সে সুখী হবে।

দু'মিনিট পরে বিজয় বলল—'দীপা, তুমি এবারে যাও। দেখা হয়েছে।'

দীপা চলে গেল। তারপর মিষ্টিমুখ করে দেবাশিস সলজ্জ সম্মতি জানাল।

দু'হপ্তার মধ্যে সব ঠিকঠাক, বিয়ে হয়ে গেল। এই দু'হপ্তার মধ্যে দীপা যে তার প্রেমিকের সঙ্গে চুপিচুপি টেলিফোন মারফত বাক্যালাপ করেছে সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও কেউ তা জানতে পারল না।

বিয়ের রাত্রে কনের বাড়িতে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে নৃপতির বাড়ির আড্ডাধারীরাও এল, কারণ তারা বিজয়ের বন্ধু। আবার বউভাতের রাত্রে যারা দেবাশিসের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে এল তাদের মধ্যে প্রজাপতি ফ্যাক্টরির সহাকারীদের সঙ্গে নৃপতির দলও এল, কারণ তারা দেবাশিসের বন্ধু। যাকে বলে, বরের ঘরের মাসি কনের ঘরের পিসি।

দেবাশিসের বাড়িতে স্ত্রীলোক নেই, দীপার কয়েকটি প্রতিবেশিনী সখী এসে ফুলশয্যা সাজিয়ে দিয়ে গেল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ চলল। নৃপতির দলই আসর জমিয়ে রাখল। সুজন শুধুই চিত্রাভিনেতা নয়, সে নানারকম ম্যাজিক দেখাল। প্রবাল আজ আর কোনো অশিষ্টতা করল না; নিজে থেকেই গান গেয়ে শোনাল। সকলেই নববধূকে নানা রকম উপহার দিল। নৃপতি দিল সোনার রিস্টওয়াচ, কপিল দিল দামী একটা ঝরনা কলম, খড়্গ বাহাদুর দিল নেপালে তৈরি ঝকঝকে ধারালো কুক্‌রি ছোরা, প্রবাল দিল তার নিজের গাওয়া কয়েকটা গানের রেকর্ড, সুজন দিল একটি রূপোর সরস্বতী মূর্তি। দেবাশিসের ফ্যাক্টরির বন্ধুরাও যথাযোগ্য উপহার দিলেন।

বউভাতের উৎসব শেষে অতিথির দল যখন বিদায় নিল তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। বাড়ির নীচের তলায় রইল ভৃত্য নকুল, আর দোতলায় দেবাশিস এবং দীপা। প্রথম মিলন রাত্রি।

শেষ অতিথিকে বিদায় দিয়ে দেবাশিস ওপরতলায় গিয়ে দেখল, সব ঘরে বড় বড় আলো জ্বলছে; বসবার ঘরের একটা চেয়ারে দীপা শক্ত হয়ে বসে আছে। দেবাশিস তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেবাশিসের স্বভাব, যা সম্ভাব্য তাই তার মন স্বীকার করে নেয়, বিলক্ষণতার দিকে সহজে তার দৃষ্টি পড়ে না। সে দীপার দিকে দু' হাত বাড়িয়ে স্নিগ্ধ হেসে বলল—'এস।'

দীপা চকিতে একবার চোখ তুলল; তার চোখে ভয়ের ছায়া। দেবাশিস ভাবল, কুমারী মনের স্বাভাবিক লজ্জা। সে দীপার পাশের চেয়ারে বসে তার হাতের ওপর হাত রাখল, বলল—'বারোটা বেজে গেছে, আর কতক্ষণ বসে থাকবে। চল, শোবার সময় হল।'

দীপা হাত সরিয়ে নিল। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, তবু যা বলবার তা বলতে হবে, আর দেরি করা চলবে না। সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—'আমি—আমি আলাদা শোব।'

দেবাশিসের মনে কৌতুকের সঙ্গে একটু বিস্ময় মিশল। কথাগুলো যেন একটু বেসুরো, ঠিক লজ্জার মত নয়। তবু সে হাসিমুখেই বলল—'তুমি আলাদা শুলে ফুলশয্যা হবে কি করে?'

দীপার শরীর কেঁপে উঠল; সে শরীরের সমস্ত স্নায়ু পেশী শক্ত করে বলল— 'না— না— আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আমি—'

এবার দেবাশিসের মন থেকে কৌতুকের ভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ স্থির চোখে দীপার পানে চেয়ে থেকে বলল—'কি কথা বলতে চাও?'

দীপার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল, সে কোনোমতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি অন্য একজনকে ভালবাসি।'

কথাটার ভাবার্থ দেবাশিসের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল, তারপর তার মনে যে দীপ জ্বলেছিল, তা আস্তে আস্তে নিবে গেল; তার মনে হল, ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোটাও যেন কমে কমে পিদ্দিমির চেয়েও নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সে দীপার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শুষ্ক প্রশ্ন করল—'তবে আমাকে বিয়ে করলে কেন?'

দীপা ঘাড় গুঁজে বসে রইল, কেবল তার অন্তরের ব্যাকুলতা কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত হল—'আমি দোষ করেছি, কিন্তু আমার উপায় ছিল না। বাড়ির লোক জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছে।'

'যাকে ভালবাস তাকে বিয়ে করলেই পারতে!'

'জাত আলাদা, তাই—'

'জাত!' একটা কঠিন হাসি দেবাশিসের মনের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে স্থির হল—'তা এখন কি করা যেতে পারে?'

দীপা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্র মিনতির কণ্ঠে বলল—'আমাকে আপনার বাড়িতে থাকতে দিন, আমি আপনাকে বিরক্ত করব না, আপনার সামনে আসব না—' তার গলা কান্নায় বুজে এল।

ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে দেবাশিস নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালাল, বলল—'এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। সব কথা ভেবে দেখতে হবে। তুমি যাও, শোও গিয়ে।' সে ফুল দিয়ে সাজানো শয়নঘরের দিকে আঙুল দেখাল—'আমি অন্য কোথাও শোব।'

দীপা আর দাঁড়াল না, দ্রুত ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তার চুলে তখনো ফুলের মালা জড়ানো, গলায় হাতে ফুলের গয়না। সেই অবস্থাতেই সে ফুল-ঢাকা বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এত সহজে পরিত্রাণ পাবে তা সে আশা করেনি।

দোতলায় আর একটি শয়নকক্ষ ছিল, দেবাশিসের বাবা যে ঘরে শুতেন; নকুল সে ঘরও পরিষ্কার করেছিল, খাটের ওপর বিছানা পেতে সুজনি ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। বিয়ের শুভদিনে বাড়িতে কোথাও সে অপরিচ্ছন্নতা রাখেনি। দেবাশিস দীর্ঘকাল অব্যবহৃত এই ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ খাটের পাশে বসে রইল। মথাটা গরম হয়ে উঠেছে, সে কক্ষসংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে কল খুলে মাথাটা কলের তলায় রাখল। তারপর ভিজে মাথায় ফিরে এসে আলো নিভিয়ে বিছানার সুজনির ওপরেই শুয়ে পড়ল।

রেল গাড়ি প্রচণ্ড বেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ যখন লাইনের বাইরে লাফিয়ে পড়ে তখন কাউকে নোটিস দেয় না; দেবাশিসের জীবনে তেমনি আজ এই মহাদুর্যোগ এসেছে অপ্রত্যাশিতভাবে; দু' মিনিট আগেও এই দুর্যোগের কোনো আভাস সে পায়নি। কিন্তু আত্মহারা হয়ে বিপথে কুপথে ছুটোছুটি করলে চলবে না, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবে-চিন্তে সুবুদ্ধির পথ বেছে নিতে হবে।

দেবাশিস জটিল চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। সে শান্ত ধীর প্রকৃতির মানুষ, অন্য কেউ হলে আজ রাত্রেই একটা কাণ্ড করে বসত।

দীপা অন্য একজনকে ভালবাসে, এইটেই হচ্ছে মূল কথা। দীপা কাকে ভালবাসে, সে লোকটা কে, তা জানবার আগ্রহ দেবাশিসের নেই; সে যেই হোক না কেন, দীপা তাকে ভালবাসে। তবু দীপা পারিবারিক চাপে পড়ে দেবাশিসকে বিয়ে করেছে। কিন্তু এই বিয়েকে সে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কে পরিণত করতে চায় না।...প্রেমাস্পদের সঙ্গে দীপার ঘনিষ্ঠতা কত দূর অগ্রসর হয়েছিল? জল্পনা নিষ্ফল।

দীপার বাড়ির সকলেই অবশ্য দীপার অসবর্ণ প্রণয়ের কথা জানে, বিজয়মাধব জানে। জেনে-শুনে তারা এই কাজ করেছে। হয়তো ভেবেছে, বিয়ের পর দীপা ক্রমে তার প্রণয়ীকে ভুলে যাবে। কিন্তু দীপা ভুলবে বলে মনে হয় না, প্রণয়ীর প্রতি তার একনিষ্ঠা আছে।...নৃপতি কি জানে? বোধ হয় জানে না, জানলে দেবাশিসের এমন অনিষ্ট করত না; নৃপতিকে সজ্জন বলেই মনে হয়।...কিন্তু যা হবার তা তো হয়েছে, এখন এই জট ছাড়াবার উপায় কি? ডিভোর্স?

একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল। এতক্ষণ পরে দেবাশিস লক্ষ্য করল, বসবার ঘরে তীব্র শক্তির আলোটা জ্বলেই চলেছে। সে উঠে আলোটা নেবাতে গেল। দীপার ঘরের দরজা বন্ধ; দরজার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে একটু থেমে কান পেতে শুনল, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে কোনো শব্দ এল না; দীপা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বসবার ঘরের আলো নিবিয়ে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল।

ঝাঁ ঝাঁ রাত্রি। কলকাতা শহর নিঝুম হয়ে আছে। দূরে একটা রেলের ইঞ্জিন একটানা বাঁশী বাজাতে বাজাতে আরো দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল। দেবাশিস অন্ধকারে চোখ মেলে শুধু ভাবছে—

তিনটে বেজে গেল। দেবাশিসের মনে হল, নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে এক বিন্দু জোনাকি-আলো জ্বলছে আর নিবছে...একটা অর্ধ-পরিণত সংকল্প...তার বেশি আজ রাত্রে আর কিছু সম্ভব নয়...

দেবাশিস আবার বাথরুমে গিয়ে মাথায় জল ঢালল, তারপর ফিরে এসে বিছানায় শোবার

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারল না, শরীরের ক্লান্তি কেটে যাবার পর ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। সে মুখ ধুয়ে নীচে নেমে গেল। নকুল তখনো ওঠেনি, কাল রাত্রের খাটাখাটুনির পর আজ বোধ হয় একটু বেশি ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবাশিস নিঃশব্দে সদর দরজা খুলে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। শুকনো বাগানে ফুল নেই, কিন্তু ভোরের বাতাসটি বেশ মিঠে। সে সদর দরজা থেকে ফটক পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল।

একটু একটু করে দিনের আলো ফুটছে, কিন্তু এ রাস্তায় এখনো লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি। দেবাশিস পায়চারি করতে করতে এক সময় ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল। বন্ধ ফটকের উপর কনুই রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল, বাঁ দিক থেকে একজন লোক হন্‌হন্‌ করে আসছে। কাছে এলে সে চিনতে পারল—বিজয়মাধব।

বিজয়মাধবের সঙ্গে এই কয় দিনে দেবাশিসের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, উপরন্তু সে এখন তার শ্যালক। কিন্তু বিজয়কে আসতে দেখে তার মনটা গরম হয়ে উঠল। তাই বিজয় যখন মুখে হাসি ফুটিয়ে ফটকের ওপারে এসে দাঁড়াল তখন দেবাশিসের মুখে সে হাসির প্রতিবিম্ব পড়ল না, সে গম্ভীর চোখে বিজয়ের পানে চেয়ে বলল—'আবার কি জন্যে এসেছেন ? কর্তব্যকর্ম কি এখনো শেষ হয়নি ?'

বিজয়ের হাসি মিলিয়ে গেল, সে থতমত খেয়ে বলে উঠল—'দীপা কিছু বলেছে নাকি ?'

দেবাশিস নীরস কণ্ঠে বল—'সবই বলেছে। সে অন্তত আমায় ঠকায়নি।'

বিজয় কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত চেয়ে থেকে হঠাৎ ফটক খুলে ভিতরে এল, তারপর দেবাশিসের হাত চেপে ধরে ব্যগ্র মিনতির স্বরে বলল—'ভাই দেবাশিস, তুমি দীপার স্বামী, তুমি আমার পরমাত্মীয়, আমার ছোট ভাইয়ের সমান। আমি একটা কথা বলব, শুনবে ?'

'কি বলবেন বলুন।'

'দীপা একেবারে ছেলেমানুষ, সবে সতেরো পেরিয়ে আঠারোয় পা দিয়েছে, ওর মনে কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছু নেই। ওইটুকু মেয়ের বুদ্ধিই বা কতখানি ? তুমি ভাই ওর কথায় কান দিও না। দু'চার দিন ঘর করলেই আগের কথা সব ভুলে যাবে। কম বয়সের একটা খেয়াল বই তো নয় ?'

'ওর কথা শুনে তা তো মনে হয় না।'

'মেয়েমানুষের কথার কি কোনো দাম আছে ? ওরা আধুনিক কায়দায় বড় বড় কথা বলে, ভিতরে কিন্তু ফক্কিকার। দীপা স্কুলে পড়েছে, স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে মিশে পাকামি শিখেছে। ওর মনটা ভাবপ্রবণ ; সিনেমা-থিয়েটার নাচগানের দিকে টান আছে, যদিও আমরা তাকে কোনোদিন আশকারা দিইনি। আমি জোর গলায় বলছি, আমাদের বংশের মেয়ে কখনো বিপথে কুপথে যাবে না।'

দেবাশিস শান্ত গলায় বলল—'আপনার ভয় নেই, এ নিয়ে আমি ঝোঁকের মাথায় কোনো কেলেঙ্কারি কাণ্ড করব না, যা করবার ভেবে-চিন্তে করব। এ কথা বাড়ির বাইরে আর কেউ জানে ?'

'না।' বিজয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাড়ির দোরের কাছে নকুলকে দেখা গেল। নকুল এগিয়ে এসে বলল—'দাদাবাবু, চা তৈরি হয়েছে।'

বিজয় খাটো গলায় তাড়াতাড়ি বলল—'আচ্ছা ভাই, আজ আমি যাই। শীগ্‌গির আবার আসব।' বলে সে দ্রুতপদে চলে গেল।

দেবাশিস বাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল—'নকুল, তুই আমাদের চা ওপরের ঘরে দিয়ে আয়।'

নকুল মুচকি হেসে বলল—'তাই দিয়েছি দাদাবাবু !'

দেবাশিস দোতলায় উঠে গেল। দেখল, বসবার ঘরে নীচু টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম

সাজানো রয়েছে আর দীপা তক্তপোশের পাশে চুপটি করে বসে আছে—কাল রাত্রে যেমন বসে ছিল। অবশ্য কাল রাত্রের বাসি জামাকাপড়, ফুলের গয়না আর নেই, তার বদলে পাট-ভাঙ্গা শাড়ি ব্লাউজ। দেবাশিস আসতেই দীপা একটু আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল।

দেবাশিস দোর বন্ধ করে দিয়ে দোরের সামনে ফিরে দাঁড়িয়ে দীপার পানে তাকাল। খোলা জানালা দিয়ে সকালের নরম আলো দীপার ওপর পড়েছে। বিজয় যা বলেছিল তা মিথ্যে নয়, দীপার ছিপছিপে শরীরে কৌমার্যের কোমলতা এখনো লেগে আছে, ভারি ছেলেমানুষ মনে হয়। কিন্তু তার মুখে পরিণত মনের দৃঢ়তা, মুখের লাবণ্য যেন দৃঢ়তার উপাদানে তৈরি।

দেবাশিস কাছে এসে চায়ের সরঞ্জামের দিকে দৃষ্টি নামালো ; টি-পটে চা, দু'টি পেয়ালা, গরম দুধ, চিনির কিউব, প্লেটে স্তূপীকৃত টোস্ট, মাখনের পাত্রে মাখন, অন্য একটি পাত্রে মার্মালেড্ এবং চারটি সিদ্ধ ডিম। নকুল দু'জনের জন্য প্রচুর প্রাতরাশ করেছে, একলা দেবাশিসের জন্য এত করে না।

দেবাশিস দীপার দিকে চোখ তুলে সহজ গলায় বলল—'তুমি চা ঢালবে ?'

দীপাদের বাড়িতে সাবেক রেওয়াজ, পেয়ালায় চা ঢালা হয়ে সকলের কাছে যায় ; প্রাতরাশ খাওয়ার কোনো বিধিবদ্ধ রীতি নেই। সে একটু ইতস্তত করল। তাই দেখে দেবাশিস বলল—'আচ্ছা, আমিই চা ঢালছি।'

দু'টি পেয়ালায় চা ঢেলে সে একটি পেয়ালা দীপার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে, চা খেতে খেতে কথা হবে।'

দীপা সঙ্কুচিতভাবে চেয়ারে বসল। তার সঙ্কোচ মনের জড়ত্ব নয়, অপরিচিত এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্কোচ। তার জীবনে অভাবনীয় ওলটপালট আরম্ভ হয়েছে।

দেবাশিস নিজের চায়ে একটি ছোট চুমুক দিয়ে পেয়ালা নামিয়ে রাখল, বলল—'তোমার দাদা বিজয়মাধব আজ ভোর হতে না হতে এসেছিল।'

দীপা চকিত চোখ তুলে আবার চোখ নত করল। দেবাশিস এক টুকরো টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল—'তার কথা শুনে মনে হল তোমার গুপ্তকথা বাড়ির সবাই জানে। বাইরের কেউ জানে নাকি ?'

দীপা মাথায় একটা ঝাঁকনি দিয়ে বলল—'না—না—।' আর কোনো কথা তার শুকনো গলা দিয়ে বেরুল না।

দেবাশিস বলল—'তা সে যাই হোক, সব কথা বিবেচনা করা দরকার। একটা ব্যাপার ঘটেছে, আমার জীবনে হঠাৎ একটা বেয়াড়া সমস্যা এসে হাজির হয়েছে। যথাসাধ্য কেলেঙ্কারি বাঁচিয়ে তার নিষ্পত্তি করতে হবে। আমার কথা বুঝতে পারছ ?'

দীপা ঘাড় নাড়ল, অস্ফুট স্বরে বলল—'পারছি।' সে কিন্তু দেবাশিসের ধরনধারন কিছুই বুঝতে পারছে না। এরকম অবস্থায় মানুষ কি এমনিভাবে কথা বলে ?

দেবাশিস টোস্টে কামড় দিয়ে বলল—'তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

দীপা তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিল, কিন্তু হাতের পেয়ালা হাতেই রইল, ঠোঁট পর্যন্ত উঠল না।

দেবাশিস শান্তভাবে বলল—'সমস্যার সোজাসুজি নিষ্পত্তি আছে—ডিভোর্স।'

দীপার হাতের পেয়ালা কেঁপে উঠল। আর একটু হলেই পড়ে যেত। সে সামলে নিয়ে রুদ্ধস্বরে বলল—'না।'

দেবাশিস ভুরু তুলে বলল—'না কেন ? তোমার বাড়ির লোক ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে না দিয়ে অন্যায় করেছেন, সে অন্যায় সংশোধন করা উচিত।'

দীপা নত চোখে বলল—'আমার দাদু—তিনি তাহলে বাঁচবেন না।'

দেবাশিস কিছুক্ষণ কথা কইল না, কতকটা যেন অন্যমনস্কভাবে দীপার পানে চেয়ে রইল। তারপর নিজের ঈষদুষ্ণ পেয়ালাটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ করে আবার রেখে দিল।

উদয়মাধবকে দেবাশিসকে দেখেছে, বৃদ্ধের চারিত্রিক প্রবলতা অনুভব করেছে, নাতনী ডিভোর্স-কোর্টে গিয়েছে শুনলে তিনি হয়তো আত্মহত্যা করবেন না, কিন্তু নাতনীকে খুন করতে পারেন।

'ডিভোর্স যদি সম্ভব না হয় তাহলে দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে—তুমি বাপের বাড়ি ফিরে যাও. সেখানে যেমন ছিলে তেমনি থাকো।'

'না, ওরা আবার আমায় ফেরত পাঠিয়ে দেবে। মাঝ থেকে জানাজানি হবে।'

'তাহলে তৃতীয় পন্থা হচ্ছে এখানেই থাকা। আলাদাই থাকবে, আমি তোমার কাছে যাব না। কিন্তু আমারও তো লোকলজ্জা আছে। বাইরের লোকের কাছে ভণ্ডামি করতে হবে। তুমি পারবে?'

দীপা ঘাড় নেড়ে জানাল, সে পারবে।

দেবাশিস বলল—'বাড়ির চাকরও বাইরের লোক। তার সামনেও ধোঁকার টাটি খাড়া রাখতে হবে।'

দীপা আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

দেবাশিস নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল—'বেশ। কিন্তু এভাবে কত দিন চলবে?'

দীপা চুপ করে রইল, এ প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই জানে না। দেবাশিস আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা খুবই অল্প ; কিন্তু তার মনে হল, এরা বড় স্বার্থপর, নিজের স্বার্থই বোঝে, আর কারুর কথা ভাবে না।

কাল দেবাশিস ভেবেছিল, এখন দু'তিন দিন সে ফ্যাক্টরিতে যাবে না, সারা দিন বাড়িতে থেকে বউয়ের সঙ্গে ভাব করবে। কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। সে খানিকক্ষণ বিমনাভাবে ঘুরে বেড়ালো, কাল রাত্রে যে বিছানায় শুয়েছিল সেটা ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে রাখল, নকুল না সন্দেহ করে যে, তারা আলাদা শুয়েছে। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে বলল—'নকুল, আমার খাবার তৈরি কর, আমি ন'টার সময় ফ্যাক্টরি যাব।'

স্নান করতে গিয়ে দেবাশিসের একটা কথা মনে এল। সে দেখল, দীপা তখনো বসবার ঘরে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, সে তার কাছে গিয়ে বলল—'নকুলের চোখে যদি ধুলো দিতে হয় তাহলে তোমার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে আমাকে স্নান করতে হবে। অন্য বাথরুমে আমার ভিজে কাপড় দেখলে নকুলের মনে সন্দেহ হবে। আমি তোমার বাথরুমে স্নান করতে পারি?'

দীপার মনে হল দেবাশিস তাকে ব্যঙ্গ করছে। সে চোখ তুলে চাইল, কিন্তু দেবাশিসের মুখে ব্যঙ্গবিদ্রূপের চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না। সে তখন একটু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

দেবাশিস স্নানাহার করে ন'টার সময় কাজে চলে গেল।

অতঃপর সংসারের সব ভার পড়ল নকুলের ওপর। নতুন বউকে বাড়ির কাজকর্ম শেখাতে হবে, বউয়ের খাওয়া-দাওয়ার ওপর নজর রাখতে হবে। বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই ; সাময়িকভাবে নকুল হয়ে উঠল বাড়ির গিন্নী।

দুপুরবেলা দীপাকে ভাত খাইয়ে নকুল ওপরে পাঠিয়ে দিল, বলল—'যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও গিয়ে।'

কিন্তু দীপার দিনের বেলা ঘুমোনো অভ্যেস নেই। সে ঘুরে ঘুরে ওপরতলাটা দেখতে লাগল...এই ঘরে কাল রাত্রে দেবাশিস শুয়েছিল...নকুল যেন জানতে না পারে, সে ওপরে আসবার আগেই রোজ বিছানা ঝেড়ে ঠিকঠাক করে রাখতে হবে...বাড়ির পাশের ব্যাল্‌কনি থেকে বাগানটা দেখা যায়। বাগানের ছিরি নেই, যেন কত কাল কেউ বাগানের দিকে তাকায়নি। দেবাশিসের বাগানের শখ নেই। দীপার খুব বাগানের শখ আছে। সে বাপের বাড়ির খোলা ছাদে টবের বাগান করেছিল।

ঘণ্টাখানেক ঘুরে ফিরে সে বসবার ঘরে এল। রেডিওগ্রামের ওপর নজর পড়ল। দীপা রেডিও শুনতে ভালবাসে...বাপের বাড়িতে তার একটি ট্রান্‌জিস্টার ছিল, সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে

গান শুনত, ফুটবলের কমেন্টারি শুনত, নাট্যাভিনয় শুনত। ট্রান্‌জিস্টারটা আনা হয়নি। তার অনেক নিজস্ব জিনিস বাপের বাড়িতে পড়ে আছে।

দীপা রেডিওগ্রামের কপাট সরিয়ে কলকব্জা নাড়াচাড়া করতে করতে গানের সুর বেজে উঠল। দুপুরবেলার শান্ত ত্বরাহীন প্রোগ্রাম। সে রেডিওর পাশে একটা গদি-মোড়া আরাম-চেয়ারে বসে শুনতে লাগল।

কাল রাত্রে দীপা অল্পই ঘুমিয়েছে, যেটুকু ঘুমিয়েছে তাও যেন আড়ষ্ট হয়ে। এখন রেডিওর মৃদু গুঞ্জন শুনতে শুনতে তার চোখ বুজে এল।

হঠাৎ তার চমক ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। সে চোখ মেলে দেখল, ঘরের কোণে ছোট টেবিলের ওপর টেলিফোন বাজছে। দীপা রেডিও বন্ধ করে দিল। নিশ্চয় দেবাশিসের টেলিফোন। একটু ইতস্তত করে সে উঠে গিয়ে ফোন তুলে নিল।

'হ্যালো।'

অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ এল—'দীপা, আমার গলা চিনতে পারছ ?'

দীপার বুক ধড়ফড় করে উঠল, সে অবরুদ্ধ স্বরে বলল—'পারছি।'

'ঘরে কেউ আছে ?'

'না, আমি একা।'

'বেশ। তোমার স্বামীকে বলেছ ?'

'বলেছি।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কিছু না।'

'রাত্রে তোমাকে বিরক্ত করেনি ?'

'না।'

'তুমি একলা শুয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। এইভাবে চালিয়ে যাও।'

'কত দিন ?'

'একটু সময় লাগবে। তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। শপথ মনে আছে তো ?'

'শপথ !'

'শপথ করেছ, আমার নাম কাউকে বলবে না। মা কালীর নামে শপথ করেছ, মনে আছে ?'

'আছে।'

'তোমার স্বামী হয়তো নাম জানবার জন্যে পীড়ন করতে পারে।'

'নাম জানতে চাননি। চাইলেও আমি বলব না।'

'বেশ। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে ফোন করব। দুপুরবেলা তোমার স্বামী যখন বাড়িতে থাকবে না তখন ফোন করব।'

'আচ্ছা।'

সে ফোন রেখে দিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল। মনে হল তার শরীরের সমস্ত জোর ফুরিয়ে গেছে।

বিকেল পাঁচটার সময় দেবাশিস ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এল। নকুল দোর খুলে দিল। দীপা ওপর থেকে ঘন্টির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, সে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

দেবাশিস ওপরে উঠে এসে দেখল, দীপা নীরব রেডিওগ্রামের সামনে বসে আছে। সে ঢুকতেই দীপা চকিতে একবার তার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল। দেবাশিস দ্বিধামন্থর পায়ে তার সামনে এল। কারুর মুখে কথা নেই। কিন্তু শুধু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা কতক্ষণ চলে ! শেষে

দেবাশিস বলল—'নকুল তোমার দেখাশুনো করেছিল তো ?'

দীপা ঘাড় নেড়ে বলল—'হ্যাঁ।'

দেবাশিস প্রশ্ন করল—'চা খেয়েছ ?'

দীপা মাথা নাড়ল—'না।'

অতঃপর আর কি বলা যেতে পারে, দেবাশিস ভেবে পেল না। ওদিকে দীপা প্রাণপণে চেষ্টা করছে সহজভাবে যা হোক একটা কিছু বলতে। কিন্তু কী বলবে ? বক্তব্য কী আছে ? শেষ পর্যন্ত একটা কথা মনে এল, সে ঘাড় তুলে বলল—'আপনি দুপুরবেলা কোথায় খাওয়া-দাওয়া করেন ?'

দেবাশিস বলল—'আমার ফ্যাক্টরিতে খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা আছে। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে সকলেই দুপুরবেলা ক্যান্‌টিনে খায়। আমিও খাই।'

দীপা শুধু বলল—'ও।'

দেবাশিস বলল—'আচ্ছা, আমি কাপড়-চোপড় বদলে নিই, তারপর নীচে গিয়ে চা খাওয়া যাবে।'

সংশয়স্খলিত স্বরে দীপা বলল—'আচ্ছা।'

দেবাশিস দীপার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল—'আমি তাহলে তোমার বাথরুমই ব্যবহার করছি।'

দোর পর্যন্ত গিয়ে দেবাশিস থমকে দাঁড়াল, তারপর আস্তে আস্তে দীপার সামনে ফিরে এসে গলা খাটো করে বলল—'একটা কথা। তুমি আমাকে 'আপনি' বললে ভাল শোনায় না। অবশ্য আড়ালে তা বলতে পার, কিন্তু নকুল কিংবা অন্য কারুর সামনে 'তুমি' বলাই স্বাভাবিক। নইলে ওদের খট্‌কা লাগতে পারে।'

দীপা মুখ নীচু করে নীরব রইল।

দেবাশিস প্রশ্ন করল—'কি বলো ?'

দীপা অনিচ্ছাভরা ক্ষীণ স্বরে বলল—'আচ্ছা।'

দেবাশিস বাথরুমে চলে গেল। দীপা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, প্রকাশ্যে 'তুমি' বলা এবং আড়ালে 'আপনি' বলা কি খুব সহজ কাজ ? রঙ্গালয়ের নটনটীরা বোধহয় পারে। তার মনে হল সে আস্তে আস্তে অতলস্পর্শ চোরাবালির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে।

দশ মিনিট পরে দেবাশিস পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এল, বলল—'চল, নীচে যাই।'

দেবাশিসের পিছু পিছু দীপা নীচে নেমে গেল, দু'জনে টেবিলের দু'প্রান্তে বসল। নকুল তাদের সামনে রেকাবি-ভরা লুচি তরকারি রাখল। দেবাশিস খেতে আরম্ভ করল কিন্তু দীপা হাত গুটিয়ে বসে রইল।

নকুল জিজ্ঞেস করল—'দাদাবাবু, ডিম ভেজে দেব ?'

দেবাশিস দীপার পানে চাইল। দীপা একটু মাথা নাড়ল ; বাপের বাড়িতে তার ডিম খাওয়া বারণ ছিল। আইবুড়ো মেয়েদের ডিম খেতে নেই।

দেবাশিস বলল—'থাক, দরকার নেই।'

চায়ের পেয়ালা টেবিলে রাখতে এসে নকুল বলল—'ও কি বউদি, তুমি খাচ্ছ না ?'

দীপা মাথা হেঁট করল, তারপর কাতর দৃষ্টিতে দেবাশিসের পানে তাকাল। দেবাশিস বুঝতে পারল দীপার সংকোচের কারণ কি। সে একটু হেসে বলল—'নকুল, ওর বোধহয় পুরুষের সামনে খাওয়া অভ্যেস নেই।'

দেবাশিস তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর নকুল দীপার কাছে এসে বলল—'বউদি, এ সংসারে মেয়ে-পুরুষ সবাই একসঙ্গে খায়, কর্তাবাবুর আমল থেকে এই রেওয়াজ দেখে আসছি। তুমি যখন এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছ তখন তোমাকেও তো

এ বাড়ির রেওয়াজ মেনে চলতে হবে। ভাবনা নেই, আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে। নাও, খেতে আরম্ভ কর। তোমার বাপের বাড়িতে কি ডিমের চলন নেই ?'

দীপা বলল—'পুরুষেরা হাঁসের ডিম খান। মুরগির ডিমের চলন নেই।'

নকুল বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল—'হাঁসের ডিমও যা মুরগির ডিমও তাই, সব ডিমই সমান।'

দীপা নকুলের তদারকিতে চা-জলখাবার খেয়ে ঘরের বাইরে এসে দেখল, দেবাশিস সিঁড়ির হাতলের ওপর কনুই রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দীপাকে দেখে সে বলল—'বেড়াতে যাবে ? সারা দিন তো বাড়িতে বন্ধ আছ, চল না মোটরে খানিক বেড়িয়ে আসবে।'

অভিনয় চলছে চলুক, কিন্তু কোথাও একটা সীমারেখা টানা দরকার। দীপা সোজা দৃষ্টিতে দেবাশিসের পানে চেয়ে দৃঢ় স্বরে বলল—'না।'

দেবাশিসের মুখ দেখে মনে হল না যে সে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে, সে সহজভাবে বলল—'আচ্ছা, আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি। বেশিদূর নয়, নৃপতিদার আড্ডা পর্যন্ত।'

সে বেরিয়ে পড়ল। অর্ধেক পথ গিয়েছে, দেখল কপিল বোস পায়ে হেঁটে তার দিকেই আসছে। কপিলের একটি ছোট মোটর আছে, বেশির ভাগ তাতেই সে ঘুরে বেড়ায়। মুখোমুখি হলে দেবাশিস বলল—'এদিকে কোথায় চলেছেন ?'

কপিল একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল—'আপনার দিকেই যাচ্ছিলাম।'

মনে মনে বিস্মিত হলেও দেবাশিস মুখে বলল—'আমার দিকে ? তা—চলুন, ফেরা যাক।'

কপিল তাড়াতাড়ি বলল—'না না, তার দরকার নেই। আপনি আড্ডায় যাচ্ছেন তো ? চলুন, আমারও শেষ গন্তব্যস্থান সেখানেই। আপনার কাছে যাচ্ছিলাম একটা জিনিসের খোঁজে।'

দু'জনে নৃপতির বাড়ির দিকে চলল। দেবাশিস জিজ্ঞেস করল—'কিসের খোঁজে ?'

কপিল দ্বিধাভরে বলল—'আমার সিগারেট-কেস্‌টা আজ সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। যতদূর মনে পড়ে কাল বিকেল পর্যন্ত ছিল ; তারপর আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার সিগারেটই খেয়েছি, আমার পকেটে সিগারেট-কেস্ আছে কিনা খেয়াল করিনি। আজ সকালবেলা দেখি নেই। বাড়িতে খুঁজলাম, পাওয়া গেল না। তা ভাবলাম, খোঁজ নিয়ে আসি আপনার বাড়িতেই পকেট থেকে পড়ে গেছে কিনা।'

দেবাশিস বলল—'আমার বাড়িতে যদি পড়ে থাকে এবং কেউ তুলে না নিয়ে থাকে তাহলে নকুল নিশ্চয় সরিয়ে রেখেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করব। কিসের সিগারেট-কেস্—সোনার ?'

কপিল তাড়াতাড়ি বলল—'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ভাববেন না, আমি প্রায়ই জিনিস হারিয়ে ফেলি, তবে বেশির ভাগ সময়েই পাওয়া যায়। হয়তো বাড়িতেই আছে, কিংবা নৃপতিদার আড্ডায়।'

নৃপতির আড্ডাঘরে তখন আলো জ্বলছে ; ঘরে কেবল নৃপতি আর প্রবাল বসে গল্প করছে। এরা ঘরে ঢুকলে নৃপতি সমাদরের সুরে বলে উঠল—'আরে, এস এস।'

দু'জনে নৃপতির কাছে বসল। নৃপতি দেবাশিসকে নিবিষ্ট চোখে দেখতে দেখতে চাপা কৌতুকের সুরে বলল—'আমি তো ভেবেছিলাম, এখন কিছু দিন তুমি বাড়ি থেকে বেরুবেই না। যাহোক, দাম্পত্য-জীবন কেমন লাগছে ?'

প্রশ্নের জন্যে দেবাশিস তৈরি ছিল না, একটু দম নিয়ে মুখে সলজ্জ হাসি এনে বলল—'মন্দ কি, ভালই লাগছে।'

প্রবালের গলার মধ্যে হাসির মত একটা শব্দ হল, সে বলল—'প্রথম প্রথম ভালই লাগে। তারপর—' সে উঠে গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসল, টুং টাং শব্দে একটা বিষাদের সুর বাজতে লাগল।

কপিল ভ্রূকুটি করে কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে রইল, তারপর বিস্বাদসূচক মুখভঙ্গী করে

দেবাশিসকে বলল—'এক জাতের লোক আছে তারা শুধু চাঁদের কলঙ্কই দেখে, চাঁদ দেখতে পায় না। নৃপতিদা, একটা সিগারেট দিন, আমার সিগারেট-কেস্‌টা হারিয়ে ফেলেছি।'

কপিল সিগারেট ধরিয়েছে এমন সময় চিত্রনক্ষত্র সুজন মিত্র প্রবেশ করল। বোধহয় সোজা ফিল্ম স্টুডিও থেকে আসছে, পরনে করডুরয়ের লম্বা প্যান্ট এবং টক্‌টকে লাল রঙের সিল্কের শার্ট। দেবাশিসকে দেখে চোখ বড় করে কৌতুকের ভঙ্গীতে হাসল, তারপর বলল—'নৃপতিদা, আজ কাগজে খবর দেখেছেন ?'

সকলেই উৎসুক চোখে তার পানে চাইল, প্রবালের পিয়ানো বন্ধ হল। নৃপতি বলল—'কি খবর ? কাগজ অবশ্য পড়েছি, কিন্তু গুরুতর কোনো খবর দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

সুজন পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলল—'গুরুতর খবর না হতে পারে কিন্তু ঘরোয়া খবর। আমাদের পাড়ার খবর। খবরের কাগজের এক কোণে ছোট্ট একটি খবর। গোল পার্কের কাছে কাল ভোরবেলা একজন ভিখিরি মারা গেছে।' এই বলে সুজন নাটকীয় ভঙ্গীতে চুপ করল। সবাই অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইল।

সুজন তখন আবার আরম্ভ করল—'ভাবছেন, একটা ভিখিরির মৃত্যু এমন কী চাঞ্চল্যকর খবর। কিন্তু ভিখিরির মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, কোনো অজ্ঞাত ঘাতক তাকে খুন করেছে। এবং তার চেয়েও বিস্ময়কর খবর, অজ্ঞাত আততায়ী ভিখিরির পিঠের দিক থেকে তার বুকের মধ্যে একটা শজারুর কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে বধ করেছে।'

সুজনের বক্তৃতার মাঝখানে প্রবালও পিয়ানো থেকে উঠে কাছে এসে বসেছিল। শ্রোতারা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। শেষে নৃপতি বলল—'ছোট খবর বলেই বোধহয় চোখে পড়েনি। তোমরা কেউ পড়েছ ?'

কেউ পড়েনি। দেবাশিস এবং প্রবাল খবরের কাগজ পড়ে না। নতুন খবরের প্রতি তাদের আসক্তি নেই। কপিল কেবল খেলাধুলোর পাতাটা পড়ে।

প্রবাল বলল—'শজারুর কাঁটা কি মানুষের শরীরে বিঁধিয়ে দেওয়া যায়—ভেঙে যাবে না ?'

নৃপতি পণ্ডিত ব্যক্তি, সে বলল—'না, ভাঙবে না। নরম কাঁটা হলে দুমড়ে যেতে পারে কিন্তু ভাঙবে না। শক্ত কাঁটা লোহার শলার মত সটান মাংসের মধ্যে ঢুকে যাবে।'

প্রবাল জিজ্ঞেস করল—'শজারুর কাঁটা কোথায় পাওয়া যায় ? বাজারে বিক্রি হয় নাকি ?'

নৃপতি বলল—'সব জায়গায় পাওয়া যায় না। শুনেছি নিউ মার্কেটে দু'একটা দোকানে পাওয়া যায়। তাছাড়া বেদেরা গড়ের মাঠে বিক্রি করতে আসে।'

দেবাশিস বলল—'কিন্তু ছোরাছুরি থাকতে শজারুর কাঁটা দিয়ে মানুষ খুন করবার মানে কি ?'

কেউ সদুত্তর দিতে পারল না। কপিল নতুন প্রশ্ন করল—'কিন্তু ভিখিরিকে কে খুন করবে ? কেন খুন করবে ?'

নৃপতি একটু ভেবে বলল—'ভিখিরিদের মধ্যেও কৃপণ ও সঞ্চয়ী লোক থাকে। এমন শোনা গেছে, ভিখিরি মারা যাবার পর তার কাঁথা-কানির ভেতর থেকে দু'শো চারশো টাকা বেরিয়েছে। এই লোকটিও হয়তো সঞ্চয়ী ছিল, তার টাকার লোভে কেউ তাকে খুন করেছে।'

কপিল বলল—'আমার মনে হয় এ একটা উন্মাদ পাগলের কাজ। নইলে শজারুর কাঁটার কোনো মানে হয় না।'

সুজন বলল—'তা বটে, প্রকৃতিস্থ মানুষ শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করবে কেন ? প্রবাল, তোমার কি মনে হয় ?'

প্রবাল অবহেলাভরে বলল—'যে-ই খুন করুক সে সাধু ব্যক্তি, ভিখিরি মেরে সমাজের উপকার করেছে। যারা কাজ করে না তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।' সে উঠে গিয়ে আবার পিয়ানোর সামনে বসল।

তারপর খড়্গা বাহাদুর এল। তার আজ মাঠে খেলা ছিল ; সে খেলার কথা তুলল, আলোচনার প্রসঙ্গ বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত হল। কিছুক্ষণ পরে কফি এল। কফি খেয়ে আরো

কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর দেবাশিস বাড়ি ফিরল।

দেবাশিসের জীবনযাত্রা বিয়ের আগে যেমন ছিল বিয়ের পরেও প্রায় তেমনি রয়ে গেল। বাড়িতে একজন লোক বেড়েছে এই যা। কেবল নকুল এবং বাইরের অন্যান্যদের সামনে ভণ্ডামি করতে হয়। দেবাশিসের ভাল লাগে না।

আড়ালে দীপার সঙ্গে দেবাশিসের সম্পর্ক বড় বিচিত্র। ঘনিষ্ঠতা না করে যতটা সহজভাবে একসঙ্গে বাস করা যায় দু'জনে সেই চেষ্টা করছে। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। দীপার মনের নিভৃত আতঙ্ক তার চোখের চাউনিতে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দেবাশিসের মন অশান্ত ; সে জানে দীপা অন্যকে ভালবাসে, তবু দীপা তার মনকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করছে। বিজয় বলেছিল, দীপা ছেলেমানুষ, দু'চার দিন স্বামীর ঘর করলেই আগের কথা ভুলে যাবে। কিন্তু দীপার ভাবভঙ্গী দেখে তা মনে হয় না। দীপা আর যাই হোক, তার মন চঞ্চল নয়।

এইরকম শঙ্কা-দ্বিধার মধ্য দিয়ে কিছুদিন কেটে যায়। একদিন বিকেলবেলা ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসে দেবাশিস দীপাকে বলল—'একটা কথা আছে। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে তাদের ইচ্ছে, তুমি একদিন ফ্যাক্টরিতে যাও, ওরা তোমাকে পার্টি দিতে চায়। যাবে ?'

দীপার মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, এ আবার কি নতুন ঝঞ্ঝাট ? সে একটু চুপ করে থেকে বলল—'না গেলেই কি নয় ?'

দেবাশিস বলল—'তুমি যদি না যেতে চাও আমি জোর করতে পারি না। তবে না গেলে খারাপ দেখায়।'

শুক্‌নো মুখে দীপা বলল—'তাহলে যাব।'

দু'তিন দিন পরে দেবাশিস একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরল, তারপর কোট প্যান্ট ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরে দীপাকে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে ফিরে গেল।

প্রজাপতি প্রসাধন ফ্যাক্টরির কারখানাটি ব্যারাকের মত লম্বা, তাতে অসংখ্য ঘর, দু' পাশে চওড়া বারান্দা। বাড়ির চার ধারে অনেকখানি খোলা জমিও আছে। কেমিস্ট এবং কর্মী মিলিয়ে আন্দাজ ষাটজন লোক এখানে কাজ করে। ফ্যাক্টরি হিসাবে বড় প্রতিষ্ঠান বলা যায় না ; কিন্তু এখান থেকে যে শিল্পদ্রব্য তৈরি হয়ে বেরোয় তার চাহিদা সর্বত্র।

আজ ফ্যাক্টরির পুরোভূমিতে একটি ছোট মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। দেবাশিসের মোটর মণ্ডপের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ফ্যাক্টরির প্রবীণ কেমিস্ট ডক্টর রামপ্রসাদ দত্ত এসে দীপাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলেন। ডক্টর দত্তর পিছনে আরো কয়েকজন কর্মী ছিল, সকলে হাসিমুখে দীপাকে অভ্যর্থনা করল।

ডক্টর দত্ত দীপাকে বললেন—'চল, আগে তোমাকে তোমার ফ্যাক্টরি দেখাই।'

ডক্টর দত্ত বয়সে দীপার পিতৃতুল্য, তাঁর সস্নেহ ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে দীপার মনের আড়ষ্টতা অনেকটা কেটে গেল। দেবাশিস তাদের সঙ্গে গেল না ; সে জানতো, সে সঙ্গে না থাকলে দীপা বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।

ফ্যাক্টরির কাজের বেলা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবু কয়েকটা ঘরে কয়েকজন লোক তখনো কাজ করছে। কোথাও সারি সারি জালার মত কাচের পাত্রে কেশতৈল রাখা রয়েছে, কোনো ঘরে স্নো ক্রিম, কোনো ঘরে ল্যাভেন্ডার অডিকলোন প্রভৃতি নানা জাতের তরল গন্ধদ্রব্য। সব মিশিয়ে একটি চমৎকার সুগন্ধে বাড়ি ম-ম করছে।

ডক্টর দত্ত ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে নিজের অজ্ঞাতসারেই দীপার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। এটা কি, ওটা কেমন করে তৈরি হয়, ক্রিম স্নো ইত্যাদিতে কি কি উপকরণ লাগে এইসব প্রশ্নের উত্তর শুনতে শুনতে সে যেন একটা নতুন রাজ্যে প্রবেশ করল। নতুন তথ্য আবিষ্কারের একটা উত্তেজনা আছে, কৌতূহলী মন সহজেই মেতে ওঠে।

ফ্যাক্টরি পরিদর্শন শেষ করে ডক্টর দত্ত দীপাকে মণ্ডপে নিয়ে গেলেন। মণ্ডপের একপাশে

অনুচ্চ মঞ্চ, তার ওপর কয়েকটি চেয়ার ; মঞ্চের সামনে দর্শকদের চেয়ারের সারি। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে সকলেই মণ্ডপে উপস্থিত। ডক্টর দত্ত দীপাকে মঞ্চের ওপর একটি চেয়ারে বসালেন, দেবাশিস তার পাশে বসল। ফাংশন আরম্ভ হল।

ফ্যাক্টরির কর্মীরা শুধু কাজই করে না, তাদের মধ্যে শিল্পী রসিক গুণিজনও আছে। একটি কোট-প্যান্ট পরা ছোকরা প্রেক্ষাভূমি থেকে উঠে এসে রবীন্দ্রনাথের গান ধরল—তোমরা সবাই ভাল, আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো। ছোকরার গলা ভাল ; গান শুনতে শুনতে শ্রোতাদের দন্ত বিকশিত হয়ে রইল। দীপার মুখেও একটি অরুণাভ হাসি আনাগোনা করতে লাগল। সে একবার আড়চোখে দেবাশিসের পানে তাকাল ; দেখল, তার ঠোঁটে লোক-দেখানো নকল হাসি। দীপা এখন দেবাশিসের হাসি দেখে বুঝতে পারে আসল হাসি কি নকল হাসি। তার মন হোঁচট খেয়ে শক্ত হয়ে বসল।

গানের পালা শেষ হলে আর একটি যুবক এসে গম্ভীর মুখে একটি হাসির গল্প শোনাল। সকলে খুব খানিকটা হাসল। তারপর ডক্টর দত্ত উঠে ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিলেন। চা কেক্ দিয়ে সভা শেষ হল।

দেবাশিস দীপাকে নিয়ে নিজের মোটরের কাছে এসে দেখল, মোটরের পিছনের সীট একরাশ গোলাপফুল এবং আরো অনেক উপহারদ্রব্যে ভরা। দেবাশিস স্নিগ্ধকণ্ঠে সকলকে ধন্যবাদ দিল, তারপর দীপাকে পাশে বসিয়ে মোটর চালিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যে তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সাবধানে গাড়ি চালাতে চালাতে দেবাশিস বলল—'কেমন লাগল ?'

পাশের আলো-আঁধারি থেকে দীপা বলল—'ভাল।'

গাড়ির দু'পাশের ফুটপাথ দিয়ে স্রোতের মত লোক চলেছে, তারা যেন অন্য জগতের মানুষ। গাড়ি চলতে চলতে কখনো চৌমাথার সামনে থামছে, আবার চলছে ; এদিক ওদিক মোড় ঘুরে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে।

'ডক্টর দত্তকে কেমন মনে হল ?'

এবার দীপার মনে একটু আলো ফুটল—'খুব ভালো লোক, এত চমৎকার কথা বলেন। উনি কি অনেক দিন এখানে, মানে ফ্যাক্টরিতে আছেন ?'

দেবাশিস বলল—'বাবা যখন ফ্যাক্টরি পত্তন করেন তখন থেকে উনি আছেন। আমি ফ্যাক্টরির মালিক বটে, কিন্তু উনিই কর্তা।'

গাড়ির অভ্যন্তর গোলাপের গন্ধে পূর্ণ হয়ে আছে। দীপা দীর্ঘ আঘ্রাণ নিয়ে বলল—'ফ্যাক্টরির অন্য সব লোকেরাও ভাল।'

দেবাশিস মনে মনে ভাবল, ফ্যাক্টরির সবাই ভাল, কেবল মালিক ছাড়া। মুখে বলল—'ওরা সবাই আমাকে ভালবাসে।' একটু থেমে বলল—'ফ্যাক্টরি থেকে বার্ষিক যে লাভ হয় তার থেকে আমি নিজের জন্যে বারো হাজারা টাকা রেখে বাকি সব টাকা কর্মীদের মধ্যে মাইনের অনুপাতে ভাগ করে দিই।'

'ও—' দীপার মনে একটা কৌতূহল উকি মারল, সে একবার একটু দ্বিধা করে শেষে প্রশ্ন করল—'ফ্যাক্টরি থেকে কত লাভ হয় ?'

দেবাশিস উৎসুকভাবে একবার দীপার পানে চাইল, তারপর বলল—'খরচ-খরচা বাদ দিয়ে ইন্‌কাম ট্যাক্স শোধ করে এ বছর আন্দাজ দেড় লাখ টাকা বেঁচেছে। আশা হচ্ছে, আসছে বছর আরো বেশি লাভ হবে।'

আর কোনো কথা হবার আগেই মোটর বাড়ির ফটকে প্রবেশ করল। বাড়ির সদরে মোটর দাঁড় করিয়ে দেবাশিস বলল—'গোলাপফুলগুলোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।'

দীপা বলল—'আমি করছি।'

নকুল এসে দাঁড়িয়েছিল, দীপা তাকে প্রশ্ন করল—'নকুল, বাড়িতে ফুলদানি আছে ?'

নকুল বলল—'আছে বইকি বউদি, ওপরের বসবার ঘরে দেয়াল-আলমারিতে আছে। চাবি তো তোমারই কাছে।'

'আচ্ছা। আমি ওপরে যাচ্ছি, তুমি গাড়ি থেকে ফুল আর যা যা আছে নিয়ে এস।' দীপা ওপরে চলে গেল।

ওপরের বসবার ঘরে কাবার্ডে অনেক শৌখিন বাসন-কোসন ছিল, তার মধ্যে কয়েকটা রূপোর ফুলদানি। কিন্তু বহুকাল অব্যবহারে রূপোর গায়ে কলঙ্ক ধরেছে। দীপা ফুলদানিগুলোকে বের করে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর নকুল এক বোঝা গোলাপ নিয়ে উপস্থিত হলে তাকে প্রশ্ন করল—'নকুল, ব্রাসো আছে ?'

নকুল বলল—'বাসন পরিষ্কার করার মলম ? না বউদি, ছিল, শেষ হয়ে গেছে। কে আর রূপোর বাসন মাজাঘষা করছে ! আমি তেঁতুল দিয়েই কাজ চালিয়ে নিই।'

দীপা বলল—'তেঁতুল হলেও চলবে। এখন চল, ফুলগুলোকে বাথরুমের টবে রেখে ফুলদানি পরিষ্কার করতে হবে।'

দীপার শয়নঘরের সংলগ্ন বাথরুমে জলভরা টবে লম্বা ডাঁটিসুদ্ধ গোলাপ ফুলগুলোকে আপাতত রেখে দীপা তেঁতুল দিয়ে ফুলদানি সাফ করতে বসল। এতদিন পরে সে একটা কাজ পেয়েছে যাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও ভুলে থাকা যায়।

দেবাশিস একবার নিঃশব্দে ওপরে এসে দেখল, দীপা ভারি ব্যস্ত। আঁচলটা গাছ্-কোমর করে জড়িয়েছে, মাথার চুল একটু এলোমেলো হয়েছে ; ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। দেবাশিস দোরের কাছে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট চোখে দেখল, কিন্তু দীপা তাকে লক্ষ্যই করল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেবাশিস আস্তে আস্তে নীচে নামল, তারপর নৃপতির বাড়িতে চলে গেল।

কিন্তু আজ আর তার আড্ডায় মন বসল না। ঘন্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। ওপরের বসবার ঘরে দীপা রেডিও চালিয়ে বসে ছিল, দেবাশিসকে দেখে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে রেডিও নিবিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল—'ফুলগুলোকে ফুলদানিতে সাজিয়ে ঘরে ঘরে রেখেছি। দেখবে ?'

দেবাশিসের মনের ভিতর দিয়ে বিস্ময়ানন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল। দীপা এতদিন তাকে প্রকাশ্যে 'তুমি' এবং জনান্তিকে 'আপনি' বলেছে, আজ হঠাৎ নিজের অজান্তে জনান্তিকেও 'তুমি' বলে ফেলেছে।

দেবাশিস মুচকি হেসে বলল—'চল, দেখি।'

দীপা তার হাসি লক্ষ্য করল ; হাসিটা যেন গোপন অর্থবহ। সে কিছু বুঝতে পারল না, বলল—'এস।'

নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে আলো জ্বেলে দীপা দেবাশিসের মুখের পানে চাইল ; দেবাশিস দেখল, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে ঝক্‌ঝকে রূপোর ফুলদানিতে দীর্ঘবৃন্ত একগুচ্ছ গোলাপ শোভা পাচ্ছে। লাল, গোলাপী এবং সাদা, তিন রঙের গোলাপ, তার সঙ্গে মেডেন হেয়ার ফার্নের জালিদার পাতা।

ফুলদানিতে ফুল সাজানোর কলাকৌশল আছে, যেমন-তেমন করে সাজালেই হয় না। দেবাশিস খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে উঠল—'বাঃ, ভারি চমৎকার সাজিয়েছ ! মনে হচ্ছে যেন ফুলের ফোয়ারা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে বসবার ঘরে এসে দেবাশিসের নজর পড়ল রেডিওগ্রামের ওপরে একটা ফুলদানিতে গোলাপ সাজানো রয়েছে। এর সাজ অন্য রকম ; চরকি ফুলঝুরির মত ফুলগুলি গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে দেবাশিস বলল—'এটাও ভারি সুন্দর। আগে চোখে পড়েনি।'

এই সময় নকুল নীচে থেকে হাঁক দিল—'বউদিদি, তোমরা এস। ভাত বেড়েছি।'

দু'জনে নীচে নেমে গেল। রান্নাঘরের টেবিলেও গোলাপগুচ্ছ। দেবাশিস দীপার পানে

প্রশংসাপূর্ণ চোখে চেয়ে একটু হাসল।

সে-রাত্রে নিজের ঘরে শুতে গিয়ে দেবাশিস দেখল, তার ড্রেসিং টেবিলের ওপরেও গোলাপের ফোয়ারা। দীপা তার ঘরে ফুল রাখতে ভোলেনি। দেবাশিসের মন মাধুর্যপূর্ণ হয়ে উঠল।

দীপা নিজের ঘরে গিয়ে নৈশদীপ জ্বেলে শুয়েছিল। কিন্তু ঘুম সহজে এল না। মনের মধ্যে একটি আলোর চারপাশে বাদলা পোকার মত অনেকগুলো ছোট ছোট চিন্তার টুকরো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলোটি স্নিগ্ধ তৃপ্তির আলো। আজকের দিনটা যেন গোলাপ-জলের ছড়া দিয়ে এসেছিল...ফ্যাক্টরিতে অনুষ্ঠান...ডক্টর দত্ত...সভামণ্ডপে গান...তোমরা সবাই ভাল...ফ্যাক্টরির সবাই যেন প্রাণপণে চেষ্টা করেছে তাকে খুশি করতে...রাশি রাশি গোলাপফুল...ঘরে সাজিয়ে রাখতে কী ভালই লাগে...দেবাশিসের ভাল লেগেছে...সে অমন মুখ টিপে হাসল কেন ?...যেন হাসির আড়ালে কিছু মানে ছিল—ওঃ !

শুয়ে শুয়ে দীপার মুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। সে মনের ভুলে দেবাশিসকে আড়ালে 'তুমি' বলে ফেলেছিল, তখন বুঝতে পারেনি। দেবাশিস তাই শুনে হেসেছিল।

দীপা বিছানা থেকে উঠে খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে রাস্তা চলে গেছে ; রাস্তার ওপারের তিন চারটে বাড়ির সদর এই জানলা থেকে দেখা যায়। বাড়িগুলির আলো নিবে গেছে। রাস্তায় দু'সারি আলো নিষ্পলক জ্বলছে। রাস্তা দিয়ে দু'একটি লোক কদাচিৎ চলে যাচ্ছে, পঁচিশ গজ দূর থেকে তাদের জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। আধ-ঘুমন্ত রাত্রি।

ভণ্ডামি করা, মিথ্যে অভিনয় করে মানুষকে ঠকানো, এসব দীপার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবু ঘটনাচক্রে সে দেবাশিসের সঙ্গে লোক ঠকানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে খানিকটা মানসিক ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য। সেজন্য দেবাশিসের কোনো দোষ নেই ; সে স্বভাব-ভদ্রলোক, তার প্রকৃতি মধুর। কিন্তু সান্নিধ্য যতই ঘনিষ্ঠ হোক, দীপা তাকে ভালবাসে না, অন্য একজনকে ভালবাসে। কতকগুলো অভাবনীয় ঘটনা-সমাবেশের ফলে দীপা আর দেবাশিস একত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ অবস্থায় দীপা যদি দেবাশিসের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধে বাস করে তাতে দোষ কি ? তাকে আড়ালে 'তুমি' বললে অন্যায় হবে কেন ? কাউকে 'তুমি' বললেই কি তার সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ বোঝায় ?

মনের অস্বস্তি অনেকটা কমলো। সে আবার গিয়ে বিছানায় শুল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। সে লক্ষ্য করেনি যে, যতক্ষণ সে জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল ততক্ষণ একটি লোক রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টে ঠেস দয়ে একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে ছিল। লক্ষ্য করলে এত সহজে ঘুম আসত না।

পরদিন সকালবেলা ওপরের বসবার ঘরে চা খেতে খেতে দেবাশিস বলল—'তুমি সারাদিন একলা থাকো, সময় কাটে কি করে ?'

দীপা চুপ করে রইল। সময় কাটবার তাই কাটে, সময়ের যদি দাঁড়িয়ে পড়বার উপায় থাকত তাহলে বোধহয় দীপার সময় দাঁড়িয়েই পড়ত।

দেবাশিস বলল—'তোমার বই পড়ার শখ নেই ; বাড়িতে কিছু বই আছে কিন্তু সেগুলো বিজ্ঞানের বই। তুমি যদি চাও বইয়ের দোকান থেকে গল্প-উপন্যাসের বই এনে দিতে পারি। মাসিক সাপ্তাহিক কাগজের গ্রাহক হওয়া যায়।'

দীপা এবারও চুপ করে রইল। বই পড়তে সে ভালবাসে, ভাল লেখকের ভাল গল্প-উপন্যাস পেলে পড়ে, কিন্তু বই মুখে দিয়ে তো সারা দিন-রাত কাটে না।

'কিংবা তোমাকে বইয়ের দোকানে নিয়ে যেতে পারি, তুমি নিজের পছন্দ মত বই কিনো।'

দীপা সংশয় জড়িত স্বরে বলল—'আচ্ছা।'

দেবাশিস বুঝল, বই সম্বন্ধে দীপার বেশি আগ্রহ নেই। তখন সে বলল—'তোমার বান্ধবীদের বাড়িতে ডাকো না কেন ? তাদের সঙ্গে গল্প করেও দু'দণ্ড সময় কাটবে।'

দীপা বলল—'আচ্ছা, ডাকব।'

চা শেষ করে দেবাশিস জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে অনাদৃত বাগানের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঘরের দিকে ফিরে বলল—'তুমি ফুল ভালবাস। বাগান করার শখ আছে কি ?'

'আছে।' দীপা সাগ্রহে উঠে দাঁড়াল, এক পা এক পা করে দেবাশিসের কাছে এসে বলল—'বাপের বাড়িতে ছাদের ওপর বাগান করেছিলুম, টবের বাগান।'

দেবাশিস হেসে বলল—'ব্যস্, তবে আর কি, এখানে মাটিতে বাগান কর। বাবা মারা যাবার পর বাগানের যত্ন নেওয়া হয়নি। আমি আজই ব্যবস্থা করছি। আগে একটা মালী দরকার, তুমি একলা পারবে না।'

পরদিন মালী এল, গাড়ি গাড়ি সার এল, কোদাল খন্তা খুরপি গাছকাটা কাঁচি এল, নার্সারি থেকে মৌসুমী ফুলের বীজ, গোলাপের কলম, বারোমেসে গাছের চারা এল, ছোট ছোট সুপুরিগাছ এল। মহা আড়ম্বরে দীপার জীবনের উদ্যান পর্ব আরম্ভ হয়ে গেল।

তারপর কয়েকদিন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কাটল। প্রৌঢ় মালী পদ্মলোচন অতিশয় বিজ্ঞ ব্যক্তি, তার সঙ্গে পরামর্শ করে কোথায় মৌসুমী ফুলের বীজ পোঁতা হবে, কোথায় গোলাপের কলম বসবে, কীভাবে সুপুরি আর ঝাউ-এর সারি বসিয়ে বীথিপথ তৈরি হবে, দীপা তারই প্ল্যান করছে। ঘুমে জাগরণে বাগান ছাড়া তার অন্য চিন্তা নেই।

দেবাশিস নির্লিপ্তভাবে সব লক্ষ্য করে, কিন্তু দীপার কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করে না, এমন কি তাকে বাগান সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেও যায় না। দীপা যা করছে করুক, তার যাতে মন ভাল থাকে তাই ভাল।

দিন কাটছে।

একদিন দুপুরবেলা দীপা রেডিওর মৃদু গুঞ্জন শুনতে শুনতে ভাবছিল, অরোকোরিয়া পাইন-এর চারাটি বাগানের কোন জায়গায় বসালে ভাল হয়, এমন সময় ঘরের কোণে টেলিফোন বেজে উঠল। দীপা চকিতে সেই দিকে চাইল, তারপরে উঠে গিয়ে ফোন তুলে নিল—'হ্যালো'।

টেলিফোনে আওয়াজ এল—'আমি। গলা চিনতে পারছ ?'

দীপার বুকের মধ্যে দু'বার ধক্ ধক্ করে উঠল। সে যেন ধাক্কা খেয়ে স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এল। একটু দম নিয়ে একটু হাঁপিয়ে বলল—'হ্যাঁ।'

'খবর সব ভাল ?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো গোলমাল হয়নি ?'

'না।'

'তোমার স্বামী মানুষটা কেমন ?'

'মন্দ মানুষ নয় !'

'তোমার ওপর জোর-জুলুম করছে না ?'

'না।'

'একেবারেই না ?'

'না।'

'হুঁ। আরো কিছুদিন এইভাবে চালাতে হবে।'

'আর কত দিন ?'

'সময়ে জানতে পারবে। আচ্ছা।'

ফোন রেখে দিয়ে দীপা আবার আরাম-চেয়ারে এসে বসল, পিছনে মাথা হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইল। রেডিওর মৃদু গুঞ্জন চলছে। দু'মিনিট আগে দীপা বাগানের কথা ভাবছিল, এখন

মনে হল বাগানটা বহু দূরে চলে গেছে।

বিকেলবেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটের সময় নীচে সদর দোরের ঘন্টি বেজে উঠল। দীপা চোখ খুলে উঠে বসল। কেউ এসেছে। দেবাশিস কি আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এল ? কিন্তু আজ তো শনিবার নয়—

দীপা উঠে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াল। নকুল দোর খুলছে। তারপরই মেয়েলি গলা শোনা গেল—'আমি দীপার বন্ধু , সে বাড়িতে আছে তো ?'

নকুল উত্তর দেবার আগেই দীপা ওপর থেকে ডাকল—'শুভ্রা, আয়, ওপরে চলে আয়।'

শুভ্রা ওপরে এসে সিঁড়ির মাথায় দীপাকে জড়িয়ে ধরল, বলল—'সেই ফুলশয্যের রাত্রে তোকে সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম। তারপর আসিনি, তোকে হনিমুন করবার সময় দিলুম। আজ ভাবলুম, দীপা আর কনে-বউ নেই, এত দিনে পাকা গিন্নী হয়েছে, যাই দেখে আসি। হ্যাঁ ভাই, তোর বর বাড়িতে নেই তো ?'

'না। আয়, ঘরে আয়।'

শুভ্রা মেয়েটি দীপার চেয়ে বছর দেড়েকের বড়, বছরখানেক আগে বিয়ে হয়েছে। তার চেহারা গোলগাল, প্রকৃতি রঙ্গপ্রিয়, গান গাইতে পারে। প্রকৃতি বিপরীত বলেই হয়তো দীপার সঙ্গে তার মনের সান্নিধ্য বেশি।

বসবার ঘরে গিয়ে তারা পশ্চিমের খোলা জানলার সামনে দাঁড়াল। শুভ্রা দীপাকে ভাল করে দেখে নিয়ে মৃদু হাসল, বলল—'বিয়ের জল গায়ে লাগেনি, বিয়ের আগে যেমন ছিলি এখনো তেমনি আছিস। কিন্তু গায়ে গয়না নেই কেন ? হাতে দু'গাছি চুড়ি, কানে ফুল আর গলায় সরু হার ; কনে-বউকে কি এতে মানায়।'

দীপা চোখ নামাল, তারপর আবার চোখ তুলে বলল—'তুই তো এখনই বললি আমি আর কনে-বউ নই।'

শুভ্রা বলল—'গয়না পরার জন্য তুই এখনও কনে-বউ। কিন্তু আসল কথাটা কী ? 'আভরণ সৌতিনি মান' ?'

'সে আবার কি !'

'তা জানিস না ! কবি গোবিন্দদাস বলেছেন, সময়বিশেষে গয়না সতীন হয়ে দাঁড়ায়।' এই বলে দীপার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গাইল—

'সখি, কি ফল বেশ বনান
কানু পরশমণি পরশক বাধন
আভরণ সৌতিনি মান।'

দীপার মুখের ওপর যেন এক মুঠো আবির ছড়িয়ে পড়ল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—'যাঃ, তুই বড় ফাজিল।'

শুভ্রা খিলখিল করে হেসে বলল—'তুইও এবার ফাজিল হয়ে যাবি, আর গাম্ভীর্য চলবে না। বিয়ে হলেই মেয়েরা ফাজিল হয়ে যায়।'

দীপা কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। কিন্তু যেমন করে হোক সত্যি কথা লুকিয়ে রাখতে হবে, মিথ্যে কথা বলে শুভ্রার চোখে ধুলো দিতে হবে। শুভ্রা যেন জানতে না পারে।

দীপা আকাশ-পাতাল ভাবছে শুভ্রার ঠাট্টার কি উত্তর দেবে, এমন সময় দোরের কাছে থেকে নকুলের গলা এল—'বউদি, চা জলখাবার আনি ?'

দীপা যেন বেঁচে গেল। বলল—'হ্যাঁ নকুল, নিয়ে এস।'

নকুল নেমে গেল। দীপা বলল—'আয় ভাই, বসি। তারপর হিমানী সুপ্রিয়া কেমন আছে বল। মনে হচ্ছে যেন কতদিন তাদের দেখিনি !'

শুভ্রা চেয়ারে বসে বলল—'হিমানী সুপ্রিয়ার কথা পরে বলব, আগে তুই নিজের কথা বল। বরের সঙ্গে কেমন ভাব হল ?'

দীপা ঘাড় হেঁট করে অর্ধস্ফুট স্বরে বলল—'ভাল।'

শুভ্রা বলল—'তোর বরটি ভাই দেখতে বেশ। কিন্তু দেখতে ভাল হলেই মানুষ ভাল হয় না। মানুষটি কেমন?'

দীপা বলল—'ভাল।'

শুভ্রা বিরক্ত হয়ে বলল—'ভাল আর ভাল, কেবল এক কথা! তুই কি কোনো দিন মন খুলে কিছু বলবি না?'

'বললুম তো, আর কি বলব?'

'এইটুকু বললেই বলা হল? আমার যখন বিয়ে হয়েছিল আমি ছুটে ছুটে আসতুম তোর কাছে, সব কথা না বললে প্রাণ ঠাণ্ডা হত না। আর তুই মুখ সেলাই করে বসে আছিস। গা জ্বলে যায়।'

দীপা তার হাত ধরে মিনতির স্বরে বলল—'রাগ করিসনি ভাই! জানিস তো, আমি কথা বলতে গেলেই গলায় কথা আটকে যায়। মনে মনে বুঝে নে না। সবই তো জানিস।'

শুভ্রা বলল—'সবায়ের কি এক রকম হয়? তাই জানতে ইচ্ছে করে। যাক গে, তুই যখন বলবি না তখন মনে মনেই বুঝে নেব। আচ্ছা, আজ উঠি, তোর বিয়ে পুরনো হোক তখন আবার একদিন আসব।'

দীপা কিন্তু শক্ত করে তার হাত ধরে রইল, বলল—'না, তুই রাগ করে চলে যেতে পাবি না।'

শুভ্রার রাগ অমনি পড়ে গেল, সে হেসে বলল—'তুই হদ্দ করলি। বরের কাছেও যদি এমনি মুখ বুজে থাকিস বর ভুল বুঝবে। ওরা ভুল-বোঝা মানুষ।'

নকুল চায়ের ট্রে নিয়ে এল, সঙ্গে স্তূপাকৃতি প্যাসট্রি। দীপা চা ঢেলে শুভ্রাকে দিল, নিজে নিল; দু'জনে চা আর প্যাসট্রি খেতে খেতে সাধারণভাবে গল্প করতে লাগল। শাড়ি ব্লাউজ, গয়নার নতুন ফ্যাশন, সেন্ট স্নো পাউডার-এর দুর্মূল্যতা, এই সব নিয়ে গল্প। শুভ্রাই বেশি কথা বলল, দীপা সায় উত্তর দিল।

আধ ঘণ্টা পরে চা খাওয়া শেষ হলে নকুল এসে ট্রে তুলে নিয়ে গেল, দীপা তখন বলল—'শুভ্রা, তুই এবার একটা গান গা, অনেক দিন তোর গান শুনিনি।'

শুভ্রা বলল—'কেন, এই তো কানে কানে গান শুনলি। আর কী শুনবি? মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি, সখি জাগো?'

'না না, ওসব নয়। আধুনিক গান।'

'আধুনিক গানের কথায় মনে পড়ল, পরশু গ্রামোফোনের দোকানে গিয়েছিলুম, প্রবাল গুপ্তর একটা নতুন রেকর্ড শুনলাম। ভারি সুন্দর গেয়েছে। রেকর্ডখানা কিনেছি। তুই শুনেছিস?'

দীপা অলসভাবে বলল—'শুনেছি। রেডিওতে প্রায়ই বাজায়। সিনেমার গানের কোনো নতুন রেকর্ড বেরিয়েছে নাকি?'

শুভ্রা বলল—'শুনিনি। কিন্তু একটা নতুন ছবি বেরিয়েছে, 'দীপ্তি' সিনেমায় দেখাচ্ছে; ছবিটা নাকি খুব ভাল হয়েছে। সুজন হিরো, জোনাকি রায় হিরোইন।'

দীপা একটু নড়েচড়ে বসল, কিছু বলল না। শুভ্রা বলল—'দীপা, ঘরে বসে কি করবি, চল ছবি দেখে আসি। আমার সঙ্গে যদি ছবি দেখতে যাস, তোর বর নিশ্চয় রাগ করবে না।' কব্জির ঘড়ি দেখে বলল—'সওয়া চারটে বেজেছে। তোর বর কাজ থেকে ফেরে কখন?'

'পাঁচটার সময়।'

'তবে তো ঠিকই হয়েছে। তুই সেজেগুজে তৈরি হতে হতে তোর বর এসে পড়বে, তখন তাকে জানিয়ে আমরা ছবি দেখতে চলে যাব। আর তোর বর যদি সঙ্গে যেতে চায় তাহলে তো আরো ভাল।'

দীপার ইচ্ছে হল শুভ্রার সঙ্গে ছবি দেখতে যায়। দেবাশিস কোনো আপত্তি তুলবে না তাও সে জানে। তবু তার মনের একটা অংশ তার ইচ্ছাকে পিছন থেকে টেনে ধরে রইল, তাকে যেতে

দেবে না। সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল—'আজ থাক ভাই, আর একদিন যাব।'

শুভ্রা আরো কিছুক্ষণ পীড়াপীড়ি করল, কিন্তু দীপা রাজী হল না। শুভ্রা তখন বলল—'বুঝেছি, তুই বর-হ্যাংলা হয়েছিস, বরকে ছেড়ে নড়তে পারিস না। বিয়ের পর কিছু দিন আমারও হয়েছিল।' সে নিজের বর-হ্যাংলামির গল্প বলতে লাগল। তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল—'পাঁচটা বাজে, আমি পালাই, এখনই তোর বর এসে পড়বে। আমি থাকলে তোদের অসুবিধে হবে। আবার একদিন আসব।' শুভ্রা হাসতে হাসতে চলে গেল।

তাকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দীপা ভাবতে লাগল, কি আশ্চর্য, মনের কথা মুখ ফুটে না বললে কি কেউ বুঝতে পারে না! সবাই ভাবে, যা গতানুগতিক তাই সত্যি!

তারপর দিন কাটছে।

একদিন বেশ গরম পড়েছে। গুমোট গরম, বাতাস নেই; তাই মনে হয় শীগ্‌গিরই ঝড়-বৃষ্টি নামবে। দেবাশিস বিকেলবেলা ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসে দেখল, দীপা আর পদ্মলোচন দড়ি ধরে বাগান মাপজোক করছে। দেবাশিসকে দেখে দীপা দড়ি ফেলে তাড়াতাড়ি তার গাড়ির কাছে এল, বেশ উত্তেজিতভাবে বলল—'ঈস্টার লিলিতে কুঁড়ি ধরেছে। দেখবে?'

দেবাশিস গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল—'তাই নাকি! কোথায় ঈস্টার লিলি?'

'এস, দেখাচ্ছি।'

বাগানের এক ধারে দীপা আঙুল দেখাল। দেবাশিস দেখল, ভূমিলগ্ন ঝাড়ের মাঝখান থেকে ধ্বজার মত ডাঁটি বেরিয়েছে, তার মাথায় তিন-চারটি কুঁড়ির পতাকা। স্নিগ্ধ হেসে দেবাশিস দীপার পানে চাইল—'তোমার বাগানের প্রথম ফুল।'

হাসতে গিয়ে দীপা থেমে গেল। 'তোমার বাগানের—', বাগান কি দীপার? হঠাৎ তার মনটা বিকল হয়ে গেল, প্রথম মুকুলোদ্‌গম দেখে যে আনন্দ হয়েছিল তা নিবে গেল।

সন্ধ্যের পর নৃপতির আড্ডায় গিয়ে দেবাশিস দেখল আড্ডাধারীরা প্রায় সকলেই উপস্থিত, বেশ উত্তেজিতভাবে আলোচনা চলছে। তাকে দেখে সকলে কলরব করে উঠল—'ওহে, শুনেছ?'

সুজন থিয়েটারী পোজ দিয়ে বলল—'আবার শজারুর কাঁটা!'

নৃপতি বলল—'এস, বলছি। তুমি কাগজ পড় না, তাই জান না। মাসখানেক আগে একটা ভিখিরিকে কেউ শজারুর কাঁটা ফুটিয়ে মেরেছিল মনে আছে?'

দেবাশিস বলল—'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'পরশু রাত্রে একটা মজুর লেকের ধারে বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার হৃদ্‌যন্ত্রে শজারুর কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়ে কেউ তাকে খুন করেছে।'

দেবাশিস বলল—'কে খুন করেছে, জানা যায়নি?'

নৃপতি একটু হেসে বলল—'না, পুলিস তদন্ত করছে।'

কপিল বলল—'পুলিস অনন্তকাল ধরে তদন্ত করলেও আসামী ধরা পড়বে না। অবশ্য স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ভিখিরি এবং মজুরের হত্যাকারী একই লোক। এ ছাড়া আর কেউ কিছু বুঝতে পেরেছ কি?'

খড়্গ বাহাদুর বলল—'দুটো খুনই আমাদের পাড়ায় হয়েছে, সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে হত্যাকারী আমাদের পাড়ার লোক।'

নৃপতি বলল—'তা নাও হতে পারে। হত্যাকারী হয়তো টালার লোক।'

এই সময় কফি এল। প্রবাল এতক্ষণ পিয়ানোর সামনে মুখ গোমড়া করে বসে ছিল, আলোচনার হল্লায় বাজাতে পারছিল না; এখন উঠে এসে এক পেয়ালা কফি তুলে নিল। কপিল তাকে প্রশ্ন করল—'কি হে মিঞা তানসেন, তোমার কি মনে হয়?'

প্রবাল কফির পেয়ালায় একবার ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল—'আমার মনে হয় হত্যাকারী উন্মাদ এবং তোমরাও বদ্ধ পাগল।'

সবাই হইচই করে উঠল—'আমরা পাগল কেন ?'

প্রবাল বলল—'তোমরা হয় পাগল নয় ভণ্ড। একটা কুলিকে যদি কেউ খুন করে থাকে তোমাদের এত মাথাব্যথা কিসের ? কুলির শোকে তোমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে এই কথা বোঝাতে চাও ?'

অতঃপর তর্ক উদ্দাম এবং উত্তাল হয়ে উঠল।

দেবাশিস তর্কাতর্কি বাগযুদ্ধ ভালবাসে না। সে কফি শেষ করে চুপিচুপি পালাবার চেষ্টায় ছিল, নৃপতি তা লক্ষ্য করে বলল—'কি হে দেবাশিস, চললে নাকি ?'

দেবাশিস বলল—'হ্যাঁ, আজ যাই নৃপতিদা।'

'নৃপতি বলল—'আচ্ছা, এস। সাবধানে পথ চলবে। দক্ষিণ কলকাতার পথেঘাটে এখন দলে দলে পাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

এক ধমক হাসির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দেবাশিস বেরিয়ে এল। সে দু'চার পা চলেছে, এমন সময় শুনতে পেল দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে গোঁ গোঁ মড়মড় আওয়াজ আসছে। চকিতে আকাশের দিকে চোখ তুলে সে দেখল মেঘ ছুটে আসছে ; গুমোট ফেটে ঝড় বেরিয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে একঝাঁক জেট বিমানের মত ঝড় এসে পড়ল ; বাতাসের প্রচণ্ড দাপটে চারদিক এলোমেলো হয়ে গেল।

দেবাশিস হাওয়ার ধাক্কায় টাল খেতে খেতে একবার ভাবল, ফিরে যাই, নৃপতিদার বাড়ি বরং কাছে ; তারপর ভাবল, ঝড় যখন উঠেছে তখন নিশ্চয় বৃষ্টি নামবে, কতক্ষণ ঝড়-বৃষ্টি চলবে ঠিক নেই ; সুতরাং বাড়ির দিকে যাওয়াই ভাল, হয়তো বৃষ্টি নামার আগেই বাড়ি পৌঁছে যাব।

দেবাশিস ঝড়ের প্রতিকূলে মাথা ঝুঁকিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু বেশি দূর চলতে হল না, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল ; বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা তার সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিল।

বাড়িতে ফিরে দেবাশিস সটান ওপরে চলে গেল। দীপা নিজের ঘরে ছিল, বন্ধ জানলার কাচের ভিতর দিয়ে বৃষ্টি দেখছিল ; দেবাশিস জোরে টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই সে ফিরে দাঁড়িয়ে দেবাশিসের সিক্ত মূর্তি দেখে সশঙ্ক নিশ্বাস টেনে চক্ষু বিস্ফারিত করল। দেবাশিস লজ্জিতভাবে 'ভিজে গেছি' বলে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

দশ মিনিট পরে শুকনো জামাকাপড় পরে সে বেরিয়ে এল, তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে দেখল, দীপা যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল—'নৃপতিবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আর ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। চল, খাবার সময় হয়েছে।'

পরদিন সকালে গায়ে দারুণ ব্যথা নিয়ে দেবাশিস ঘুম থেকে উঠল। বৃষ্টিতে ভেজার ফল, সন্দেহ নেই ; হয়তো ইনফ্লুয়েঞ্জায় দাঁড়াবে। দেবাশিস ভাবল আজ আর কাজে যাবে না। কিন্তু সারা দিন বাড়িতে থাকলে বার বার দীপার সংস্পর্শে আসতে হবে, নিরর্থক কথা বলতে হবে ; সে লক্ষ্য করেছে রবিবারে দীপা যেন শঙ্কিত আড়ষ্ট হয়ে থাকে। কী দরকার ? সে গায়ের ব্যথার কথা কাউকে বলল না, যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করে ফ্যাক্টরি চলে গেল।

বিকেলবেলা সে গায়ে জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল। জলখাবার খেতে বসে সে নকুলকে বলল—'নকুল, আমার একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, রাত্তিরে ভাত খাবো না।'

নকুল বলল—'কাল রাত্তিরে যা ভেজাটা ভিজেছ, ঠাণ্ডা তো লাগবেই। তা ডাক্তারবাবুকে খবর দেব ?'

দেবাশিস বলল—'আরে না না, তেমন কিছু নয়। গোটা দুই অ্যাসপিরিন্ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

রাত্রে সে খেতে নামল না। খাবার সময় হলে দীপা নীচে গিয়ে নকুলকে বলল—'নকুল, ওর খাবার তৈরি হয়ে থাকে তো আমাকে দাও, আমি নিয়ে যাই।'

নকুল একটা ট্রে-র উপর সুপের বাটি, টোস্ট এবং স্যালাড সাজিয়ে রাখছিল, বলল—'সে কি বউদি, তুমি দাদাবাবুর খাবার নিয়ে যাবে ! আমি তাহলে রয়েছি কি কত্তে ? নাও, চল।'

ট্রে নিয়ে নকুল আগে আগে চলল, তার পিছনে দীপা। দীপার মন ধুকপুক করছে। ওপরে উঠে নকুল যখন দীপার ঘরের দিকে চলল, সে তখন ক্ষীণ কুণ্ঠিত স্বরে বলল—'ওদিকে নয় নকুল, এই ঘরে।'

নকুল ফিরে দাঁড়িয়ে দীপার পানে তীক্ষ্ণ চোখে চাইল, তারপর অন্য ঘরে গিয়ে দেখল দেবাশিস বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে। নকুল খাটের পাশে গিয়ে সন্দেহভরা গলায় বলল—'তুমি এ ঘরে শুয়েছ যে, দাদাবাবু!'

দেবাশিস কৈফিয়ত তৈরি করে রেখেছিল, বিছানায় উঠে বসে বলল—'কি জানি, হয়তো ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরেছে তাই আলাদা শুয়েছি। ছোঁয়াচে রোগ, শেষে দীপাকেও ধরবে।'

সন্তোষজনক কৈফিয়ত। দীপা নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। নকুলও আর কিছু বলল না, কিন্তু তার চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে রইল। সে যেন বুঝেছে, যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি হচ্ছে না, কোথাও একটু গলদ রয়েছে।

ঘণ্টা তিনেক পরে দীপা নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, দোরে ঠুক্‌ঠুক্ শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম-চোখে উঠে দোর খুলেই সে প্রায় আঁতকে উঠল। দেবাশিস বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার শরীর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—'বুকে দারুণ ব্যথা, জ্বরও বেড়েছে...ডাক্তারকে খবর দিতে হবে।' এই বলে সে টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

আকস্মিক বিপৎপাত মানুষের মন ক্ষণকালের জন্য অসাড় হয়ে যায়। তারপর সংবিৎ ফিরে আসে। দীপা স্বস্থ হয়ে ভাবল, ডাক্তার ডাকতে হবে ; কিন্তু এ বাড়ির বাঁধা ডাক্তার কে তা সে জানে না, তাঁকে ডাকতে হলে নকুলকে পাঠাতে হবে ; তাতে অনেক দেরি হবে। তার চেয়ে যদি সেনকাকাকে ডাকা যায়—

দীপা ডাক্তার সুহৃৎ সেনকে টেলিফোন করল। ডাক্তার সেন দীপার বাপের বাড়ির পারিবারিক ডাক্তার।

একটি নিদ্রালু স্বর শোনা গেল—'হ্যালো।'

দীপা বলল—'সেনকাকা! আমি দীপা।'

'দীপা! কী ব্যাপার?'

'আমি—আমার—' দীপা ঢোক গিলল—'আমার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এখনই ডাক্তার চাই। আমি জানি না এঁদের ডাক্তার কে, তাই আপনাকে ডাকছি। আপনি এক্ষুনি আসুন সেনকাকা।'

'এক্ষুনি যাচ্ছি। কিন্তু অসুখের লক্ষণ কি?'

'বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছিল—তারপর—'

'আচ্ছা, আমি আসছি।'

'বাড়ি চিনে আসতে পারবেন তো?'

'খুব পারব! এই তো সেদিন তোমার বউভাতের নেমন্তন্ন খেয়েছি।'

মিনিট কুড়ির মধ্যে ডাক্তার সেন এলেন, ওপরে গিয়ে দেবাশিসের পরীক্ষা শুরু করলেন। দীপা দোরের চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

প্রথমে কয়েকটা প্রশ্ন করে ডাক্তার রোগীর নাড়ি দেখলেন, টেম্পারেচার নিলেন, তারপর স্টেথস্কোপ কানে লাগিয়ে বুক পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা করতে করতে তাঁর চোখ হঠাৎ বিস্ফারিত হল, তিনি বলে উঠলেন—'এ কি!'

দেবাশিস ক্লিষ্ট স্বরে বলল—'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আমার সবই উল্টো।'

দীপা সচকিত হয়ে উঠল, কিন্তু দেবাশিস আর কিছু বলল না। ডাক্তার কেবল ঘাড় নাড়লেন।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার বললেন—'বুকে বেশ সর্দি জমেছে। আমি ইঞ্জেকশন দিচ্ছি, তাতেই কাজ হবে। আবার কাল সকালে আমি আসব, যদি দরকার মনে হয় তখন রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ করা যাবে।'

ইঞ্জেকশন দিয়ে দেবাশিসের মাথায় হাত বুলিয়ে ডাক্তার সস্নেহে বললেন—'ভয়ের কিছু নেই, দু' চার দিনের মধ্যেই সেরে উঠবে। আচ্ছা, আজ ঘুমিয়ে পড় বাবাজি, কাল ন'টার সময় আবার আমি আসব। তোমার বাড়ির ডাক্তারকেও খবর দিও।'

ডাক্তার ঘর থেকে বেরুলেন, দীপা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ডাক্তার সেন দীপাকে বললেন—'একটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম—'

'কি দেখলেন ?'

ডাক্তার যা দেখেছেন দীপাকে বললেন।

দিন দশেকের মধ্যে দেবাশিস আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। এই দশটা দিন অসুখের সময় হলেও দেবাশিসের পক্ষে বড় সুখের সময়। দীপা ঘুরে ফিরে তার কাছে আসে, খাটের কিনারায় বসে তার সঙ্গে কথা বলে ; তার খাবার সময় হলে নীচে গিয়ে নিজের হাতে খাবার নিয়ে আসে, নকুলকে আনতে দেয় না। রাত্রে ঘুম থেকে উঠে চুপিচুপি এসে তাকে দেখে যায় ; আধ-জাগা আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় দেবাশিস জানতে পারে।

একদিন, দেবাশিস তখন বেশ সেরে উঠেছে, বিকেলবেলা পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে বিছানায় আধ-বসা হয়ে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে, দীপা দুধ-কোকোর পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। দেবাশিস হেসে তার হাত থেকে পেয়ালা নিল, দীপা খাটের পায়ের দিকে গিয়ে বসল। বলল—'দাদা ফোন করেছিল, সন্ধ্যের পর আসবে।'

দেবাশিস উত্তর দিল না, কোকোর কাপে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে দীপার পানে চেয়ে রইল। বলা বাহুল্য, গত দশ দিনে দীপার বাপের বাড়ি থেকে রোজই কেউ না কেউ এসে তত্ত্ব-তল্লাশ নিয়ে গেছে। দীপার মা গোড়ার দিকে দু' রাত্রি এসে এখানে ছিলেন। কিন্তু দীপা তার মা'র এখানে থাকা মনে মনে পছন্দ করেনি।

দেবাশিস কাপে চুমুক দিচ্ছে আর চেয়ে আছে, দীপা একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একটা কিছু বলবার জন্যে সে বলল—'বাগানে বোধ হয় আরো কিছু ক্রোটন দরকার হবে।'

এবারও দেবাশিস তার কথায় কান দিল না। খিন্ন-মধুর স্বরে বলল—'দীপা, তুমি আমাকে ভালবাস না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।'

নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাতের মত অপ্রত্যাশিত কথা। দীপার মুখ রাঙা হয়ে উঠল, তারপরই ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে দোরের দিকে পা বাড়িয়ে স্খলিত স্বরে বলল—'বোধ হয় মালী এসেছে, যাই, দেখি সে কি করছে।'

পিছন থেকে দেবাশিস ডাকল—'দীপা, শোনো।'

দীপা দুরুদুরু বুকে ফিরে এসে দাঁড়াল। দেবাশিসের মুখের সেই খিন্ন-করুণ ভাব আর নেই, সে খালি পেয়ালা দীপাকে দিয়ে সহজ সুরে বল—'আমার কয়েকজন বন্ধুকে চায়ের নেমন্তন্ন করতে চাই। চার-পাঁচ জনের বেশি নয়।'

দীপা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলল—'কবে ?'

'তাড়া নেই। আজ রবিবার, ধরো আসছে রবিবারে যদি করা যায় ?'

'আচ্ছা।'

'বাজারের খাবার কিন্তু একটুও থাকবে না। সব খাবার তুমি আর নকুল তৈরি করবে।'

'আচ্ছা।'

তারপর দিন কাটছে। দেবাশিস আবার ফ্যাক্টরি যেতে আরম্ভ করল। শনিবার সন্ধ্যায় নৃপতির আড্ডায় গেল। অনেক দিন পরে তাকে দেখে সবাই খুশি। এমন কি প্রবাল পিয়ানোয়

বসে একটা হাল্কা হাসির গৎ বাজাতে লাগল। নৃপতি বলল—'একটু রোগা হয়ে গেছ।'

খড়্গ বাহাদুর বলল—'ভাই দেবু, ঠেসে শিককাবাব খাও, দু' দিনে ইয়া লাশ হয়ে যাবে '

কপিল বলল—'খড়্গা, তুই থাম ! তুই তো দিনে দেড় কিলো শিককাবাব খাস, তবে গায়ে গত্তি লাগে না কেন ?'

খড়্গা বলল—'আমি যে ফুটবল খেলি, যারা ফুটবল খেলে তারা কখনো মোটা হয় না। মোটা ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছিস ?'

সুজন বলল—'কুস্তিগীর পালোয়ানেরা কিন্তু মোটা হয়। শুনেছি তারা হরদম পেস্তা আর বেদানার রস খায়।'

এই সময় বিজয়মাধব এল। দেবাশিসকে দেখে তার কাছে এসে বলল—'অসুখের পর এই প্রথম এলে, না ?'

দেবাশিস বলল—'হ্যাঁ।'

'এখন তাহলে একেবারে ঠিক হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

দেবাশিসের কাছে কথা বলার বিশেষ উৎসাহ না পেয়ে বিজয় বিরস মুখে তক্তপোশের ধারে গিয়ে বসল। দেবাশিস তখন সকলের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল—'তোমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছি। কাল রবিবার সাড়ে পাঁচটার পর যখন ইচ্ছে আসবে। কেমন, কারুর অসুবিধে নেই তো ?'

কারুর অসুবিধে নেই। সবাই সানন্দে রাজী। কেবল খড়্গ বাহাদুর বলল—'কাল আমার খেলা আছে। তবু আমি যত শীগ্‌গির পারি যাব। চায়ের সঙ্গে শিককাবাব খাওয়াবে তো ?'

কপিল বলল—'তুই জ্বালালি। চায়ের সঙ্গে কেউ শিককাবাব খায় ? শিককাবাবের অনুপান হচ্ছে বোতল।'

দেবাশিস প্রবালের দিকে চেয়ে বলল—'তুমি আসবে তো ?'

প্রবাল বলল—'যাব। বড়মানুষের বাড়িতে নেমন্তন্ন আমি কখনো উপেক্ষা করি না। কিন্তু উপলক্ষটা কি ? রোগমুক্তির উৎসব ?'

দেবাশিস বলল—'আমার বউয়ের হাতের তৈরি খাবার তোমাদের খাওয়াব। বিজয়, তুমিও এস।'

'যাব।'

পরদিন সন্ধ্যেবেলা দেবাশিসের বাড়িতে অতিথিরা একে একে এসে উপস্থিত হল। এমন কি খড়্গ বাহাদুরও ঠিক সময়ে এল, বলল—'খেলা হল না, ওয়াক্‌ওভার পেয়ে গেলাম।'

নীচের তলার বসবার ঘরে আড্ডা জমল। সকলে উপস্থিত হলে দেবাশিস এক ফাঁকে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, দীপা খাবারের প্লেট সাজাচ্ছে আর নকুল দুটো বড় বড় টি-পটে চা তৈরি করছে। দেবাশিস দীপাকে বলল—'ওরা সবাই এসে গেছে। দশ মিনিট পরে চা জলখাবার নিয়ে তুমি আর নকুল যেও।'

'আচ্ছা।' দীপা জানত না কারা নিমন্ত্রিত হয়েছে, তার মনে কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। অস্পষ্টভাবে ভেবেছিল, হয়তো ফ্যাক্টরির সহকর্মী বন্ধু।

বসবার ঘরে আলোচনা শুরু হয়েছে, আজকের কাগজে নতুন শজারুর কাঁটা হত্যার খবর বেরিয়েছে তাই নিয়ে। এবার শিকার হয়েছে এক দোকানদার, গুণময় দাস। এবারও অকুস্থল দক্ষিণ কলকাতা।

আলোচনায় নতুনত্ব বিশেষ নেই। হত্যাকারী হয় পাগল, নয় পাকিস্তানী, নয় চীনেম্যান। সুজন বলল—'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ ? প্রথমে ভিখিরি, তারপর মজুর, তারপর দোকানদার। হত্যাকারী স্তরে স্তরে উঁচু দিকে উঠছে। এর পরের বারে কে শিকার হবে ভাবতে

পার ?'

প্রবাল গলার মধ্যে অবজ্ঞাসূচক শব্দ করল। কপিল বলল—'সম্ভবত নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়।'

খড়্গ বাহাদুর বলল—'কিংবা নামজাদা সিনেমা অ্যাক্টর।'

সুজন বলল—'কিংবা নাম-করা গাইয়ে।'

প্রবাল বলল—'নাম-করা লোককেই মারবে এমন কী কথা আছে ? পয়সাওয়ালা লোককেও মারতে পারে। যেমন নৃপতিদা কিংবা কপিল কিংবা—'

এই সময় দীপা খাবারের ট্রে হাতে দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রবালের কথা শেষ হল না, সবাই হাসিমুখে উঠে দীপাকে মহিলার সম্মান দেখাল। দীপা একবার ত্রাস-বিস্ফারিত চোখ সকলের দিকে ফেরাল, তার মুখ সাদা হয়ে গেল। প্রবল চেষ্টায় সে নিজের দেহটাকে সামনে চালিত করে টেবিলের ওপর খাবারের ট্রে রাখল।

কপিল মৃদু ঠাট্টার সুরে বলল—'নমস্কার, মিসেস ভট্ট।'

দীপা বোধ হয় শুনতে পেল না, সে ট্রে রেখেই পিছু ফিরল। তার পিছনে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে নকুল ছিল, তাকে পাশ কাটিয়ে দীপা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেবাশিস অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সে আশা করেছিল, দীপা সকলকে চা ঢেলে দেবে, সকলেই বিয়ের আগে থেকে পরিচিত, তাদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলবে, তাদের খাওয়ার তদারক করবে। কিন্তু দীপা কিছুই করল না। দেবাশিস নিজেই সকলকে চা ঢেলে দিল। ট্রে'র ওপর থেকে খাবারের প্লেট নামিয়ে তাদের সামনে রাখল। দীপা আজ নকুলের সাহায্যে অনেক রকম খাবার তৈরি করেছিল : চিংড়ি মাছের কাটলেট, হিঙের কচুরি, ডালের ঝালবড়া, রাঙালুর পুলি, জমাট ক্ষীরের বরফি ইত্যাদি। অতিথিরা খেতে খেতে আবার তর্কবিতর্কে মশগুল হয়ে উঠল। দীপার ব্যবহারে সামান্য অস্বাভাবিকতা কেউ লক্ষ্যও করল কিনা বলা যায় না।

আলোচনা যখন বেশ জমে উঠেছে তখন দেবাশিস অতিথিদের দৃষ্টি এড়িয়ে রান্নাঘরে গেল। দেখল, দীপা টেবিলের ওপর কনুই রেখে আঙুল দিয়ে দুই রগ টিপে বসে আছে। দেবাশিস তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে হতাশ চোখ তুলে বলল—'বড্ড মাথা ধরেছে।'

দেবাশিসের মন মুহূর্তমধ্যে হাল্কা হয়ে গেল। সে সহানুভূতির সুরে বলল—'ও—আগুনের তাতে মাথা ধরেছে। তুমি আর এখানে থেকো না, নিজের ঘরে চলে যাও, মাথায় অডিকলোন দিয়ে শুয়ে থাকো গিয়ে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মাথাধরা সেরে যাবে।'

দীপা উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে বলল—'আচ্ছা।'

দেবাশিস বসবার ঘরে ফিরে গিয়ে বলল—'দীপার খুব মাথা ধরেছে। আমি তাকে মাথায় অডিকোলন দিয়ে শুয়ে থাকতে বলেছি। আজ সারা দুপুর উনুনের সামনে বসে খাবার তৈরি করেছে।'

সকলেই সহানুভূতিসূচক শব্দ উচ্চারণ করল। বিজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'আমি যাই, দীপাকে একবার দেখে আসি।'

দেবাশিস বলল—'যাও-না, সোজা ওপরে চলে যাও।'

বিজয় দোতলায় গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দীপার শোবার ঘরের দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দীপা চোখ বুজে শুয়ে ছিল, সাড়া পেয়ে ঘাড় তুলে বিজয়কে দেখল, তারপর আবার বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজল।

বিজয় খাটের পাশে এসে দাঁড়াল, কটমট করে দীপার পানে চেয়ে থেকে চাপা তর্জনে বলল—'আমার সঙ্গে চালাকি করিসনে, তোর মাথাধরার কারণ আমি বুঝেছি।'

দীপা উত্তর দিল না, চোখ বুজে পড়ে রইল।

বিজয় তর্জনী তুলে বলল—'আজ যারা এসেছে তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে তোর ইয়ে—।'

দীপার কাছ থেকে সাড়াশব্দ নেই।

'তার নাম কি, বল।'

দীপার মুখে কথা নেই, সে যেন কালা হয়ে গেছে।

'বলবি না?'

এইবার দীপা ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বসল, তীব্র দৃষ্টিতে বিজয়ের পানে চেয়ে বলল—'না, বলব না।' এই বলে সে বিজয়ের দিকে পিছন ফিরে আবার শুয়ে পড়ল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিজয় বলল—'বলবিনে! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। যেদিন ধরব তাকে, চৌ-রাস্তার ওপর টেনে এনে জুতোপেটা করব।'

বিজয় নীচে নেমে গেল। ভাই-বোনের ঝগড়ার মূলে যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন হাস্যকর হয়ে দাঁড়াল—

তারপর আবার দিন কাটছে।

প্রত্যেক মানুষের দুটো চরিত্র থাকে; একটা তার দিনের বেলার চরিত্র, অন্যটা রাত্রির। বেরালের চোখের মত: দিনে একরকম, রাত্রে অন্যরকম।

এই কাহিনীতে যে ক'টি চরিত্র আছে তাদের মধ্যে পাঁচজনের নৈশ জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। হয়তো অপ্রত্যাশিত নতুন তথ্য জানা যাবে।

একটি রাত্রির কথা:

সাড়ে দশটা বেজে গেছে। নৃপতি নৈশাহার শেষ করে নিজের শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল। জোড়া-খাটের ওপর চওড়া বিছানা; তার বিবাহিত জীবনের খাট-বিছানা। এখন সে একাই শোয়। শুয়ে বই পড়ে, বই পড়তে পড়তে ঘুম এলে বই বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দেয়।

আজ কিন্তু বই পড়তে পড়তে তার মন ছটফট করছে, পড়ায় মন বসছে না। প্রায় আধ ঘণ্টা বইয়ে মন বসাবার বৃথা চেষ্টা করে সে উঠে পড়ল, আলো নিবিয়ে জানলার নীচে আরাম-চেয়ারে এসে বসল। আকাশে চাঁদ আছে, বাইরে জ্যোৎস্নার প্লাবন। সে সিগারেট ধরাল।

আজ কোন্ তিথি? পূর্ণিমা নাকি? হপ্তা দুই আগে নৃপতি যখন গভীর রাত্রে বেরিয়েছিল তখন কৃষ্ণপক্ষ ছিল, বোধ হয় অমাবস্যা। মানুষের মনের সঙ্গে তিথির কি কোনো সম্পর্ক আছে? একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বাতের ব্যথা বাড়ে, একথা আধুনিক ডাক্তারেরাও স্বীকার করেন। নৃপতি গলার মধ্যে মৃদু হাসল। বাতের ব্যথাই বটে।

'বাবু!'

নৃপতির খাস চাকর দীননাথ তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। নৃপতি পাশের দিকে ঘাড় ফেরাল। দিনু বলল—'আপনার ঘুম আসছে না, এক কাপ ওভালটিন তৈরি করে দেব?'

নৃপতি একটু ভেবে বলল—'না, থাক। আমি বেরুব, তুই শেষ রাত্রে দোর খুলে রাখিস।'

'আচ্ছা, বাবু।'

দিনু প্রভুভক্ত চাকর; সে জানে নৃপতি মাঝে মাঝে নিশাভিসারে বেরোয়, কিন্তু কাউকে বলে না। বাড়ির অন্য চাকর-বাকর ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না।

দিনু চলে যাবার পর নৃপতি উঠে আলো জ্বালল, ওয়ার্ডরোব থেকে এক সেট ধূসর রঙের বিলিতি পোশাক বের করে পরল, পায়ে রবার-সোল জুতো পরল; স্টিলের কাবার্ড থেকে একটা চশমার খাপের মত লম্বাটে পার্স নিয়ে বুকপকেটের ভিতর দিকে রাখল। তারপর ছ'ফুট লম্বা আয়নায় নিজের চেহারা একবার দেখে নিয়ে আলো নিবিয়ে দিল। বাড়ির পিছন দিকে চাকরদের যাতায়াতের জন্যে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল।

নৃপতি কোথায় যায়? সে বিপত্নীক, তার কি কোনো গুপ্ত প্রণয়িনী আছে?

আর একটি রাত্রির কথা:

গোল পার্ক থেকে যে ক'টা সরু রাস্তা বেরিয়েছে তারই একটা দিয়ে কিছুদূর গেলে একটা

পুরনো দোতলা বাড়ি চোখে পড়ে ; এই বাড়ির একতলায় গোটা তিনেক ঘর নিয়ে প্রবাল গুপ্ত থাকে। পুরনো বাড়ির পুরনো ভাড়াটে ; ভাড়া কম দিতে হয়।

বাসাটি মন্দ নয়। কিন্তু প্রবালের প্রকৃতি একটু অগোছালো, তাই তার স্ত্রী মারা যাবার পর বাসাটি শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। সদরের বসবার ঘরে মেঝের ওপর শতরঞ্চি পাতা। দেয়াল ঘেঁষে এক জোড়া বাঁয়াতবলা, হারমোনিয়াম এবং তাল রাখার একটা ছোট যন্ত্র। প্রবাল যে সঙ্গীতশিল্পী, বাসায় এ ছাড়া তার অন্য কোনো নিদর্শন নেই।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় প্রবাল সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিল। আজ সে নৃপতির আড্ডায় যায়নি। একটা গানে সুর লাগিয়ে তৈরি করছিল, আসছে হপ্তায় দমদমে গিয়ে সেটা রেকর্ড করতে হবে। সে নিজেই গানে সুর দেয় ; আজ গানটাকে ঠিক রেকর্ডের মাপে তৈরি করছিল। তিন মিনিট কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যে গান গেয়ে শেষ করতে হবে।

তালের যন্ত্রটাতে দম দিয়ে সে চালু করে দিল, যন্ত্রটা ঘড়ির দোলকের মত কট্‌কট্‌ শব্দ করে দুলতে লাগল। প্রবাল পকেট থেকে স্টপ্‌-ওয়াচ বের করে হারমোনিয়ামের ওপর রাখল, তারপর স্টপ্‌-ওয়াচের মাথা টিপে চালিয়ে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে গাইতে আরম্ভ করল, তার আঙুল খুব লঘু স্পর্শে হারমোনিয়ামের চাবির ওপর খেলে বেড়াতে লাগল।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্টপ্‌-ওয়াচ বন্ধ করল, দেখল তিন মিনিট একত্রিশ সেকেন্ড হয়েছে। সে তখন তালের যন্ত্রটাকে চাবি ঘুরিয়ে একটু দ্রুত করে দিয়ে আবার স্টপ্‌-ওয়াচ ধরে গাইতে শুরু করল।

এইভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা চলল। নিঃসঙ্গ গায়ক আপন মনে গেয়ে চলেছে।

দোরে খট্‌খট্‌ করে টোকা পড়ল। প্রবাল উঠে গিয়ে দোর খুলে দিল ; একটা চাকর এক থালা অন্ন-ব্যঞ্জন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবালের বাসায় রান্নাবান্নার কোনো ব্যবস্থা নেই ; কাছেই একটা হোটেল আছে, সেখান থেকে দু' বেলা তার খাবার দিয়ে যায়।

চাকরটা শতরঞ্চির এক কোণে থালা রেখে চলে গেল। প্রবাল দোর বন্ধ করে সেখানেই খেতে বসল। এমনিভাবে সে যেন দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে। হয়তো দূর ভবিষ্যতের ওপর দৃষ্টি রেখে সে চলেছে, তাই বর্তমান সম্বন্ধে তার মন সম্পূর্ণ উদাসীন।

নৈশাহার শেষ করে প্রবাল বাসায় তালা লাগিয়ে বেরুল। মোড়ের মাথায় একটা পানের দোকান আছে, সেখানে গিয়ে পান কিনে মুখে দিল, একটা গোল্ড ফ্লেক সিগারেট ধরাল। প্রবাল নিজের কাছে সিগারেট রাখে না, পাছে বেশি খাওয়া হয়ে যায় ; প্রত্যহ রাত্রে দোকান থেকে একটি সিগারেট কিনে খায়। যারা পেশাদার গাইয়ে, গলা সম্বন্ধে তাদের সতর্কতার অন্ত নেই। বেশি ধূমপান করলে নাকি গলা খারাপ হয়ে যায়।

পানের দোকানে একটি ছোট্ট ট্রানজিস্টার গুনগুন করে গান গেয়ে চলেছে। প্রবাল শুনল, তারই গাওয়া একটি গানের রেকর্ড বাজছে। সে ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ নিজের গাওয়া গান শুনল, তারপর সিগারেট টানতে টানতে এগিয়ে চলল।

সাদার্ন অ্যাভেন্যু তখন জনবিরল হয়ে এসেছে। প্রবাল রবীন্দ্র সরোবরের রেলিং-এর ধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলল। তার মগজের মধ্যে কখনও গানের কলি গুঞ্জন তুলছে...প্রেমের সাগর দুলে দুলে ওঠে সখি...। কখনও একটা ক্রুদ্ধ ভোমরা ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে...দুনিয়ায় যার টাকা নেই সে কিসের লোভে বেঁচে থাকে ?...

রবীন্দ্র সরোবরের রেলিং অনেক দূর এসে যেখানে পুব দিকে মোড় ঘুরেছে তার কাছাকাছি একটা খিড়কির ফটক আছে। প্রবাল সেই ফটক দিয়ে লেকের বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করল।

ঝিলিমিলি আবছা আলোয় কিছুদূর যাবার পর একটা গাছের তলায় শূন্য বেঞ্চি চোখে পড়ল। প্রবাল বেঞ্চিতে গিয়ে বসল, তরাপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তার গলার মধ্যে অবরুদ্ধ হাসির মত শব্দ হল।...

সেরাত্রে প্রবাল যখন বাসায় ফিরল তখন বারোটা বাজতে বেশি দেরি নেই। কলকাতা শহরের চোখ তন্দ্রায় ঢুলুঢুলু।

আর একটি রাত্রির কথা :

খড়্গা বাহাদুর আজ আড্ডায় যায়নি ; তার কারণ তার বাড়িতেই আজ আড্ডা বসবে। অবশ্য অন্যরকম আড্ডা ; অতিথিরাও অন্য। এইরকম আড্ডা মাসে দু' তিন বার বসে।

খড়্গা বাহাদুর একটি ছোট ফ্ল্যাটে থাকে। ছোট হলেও ফ্ল্যাটটি তার পক্ষে যথেষ্ট। সে একলা থাকে, সঙ্গী একমাত্র স্বদেশী সেবক রতন সিং। রতন সিং একাধারে তার ভৃত্য এবং পাচক, ভাল শিককাবাব তৈরি করতে পারে।

সামনের ঘরটি পরিপাটিভাবে সাজানো, দেখলেই বোঝা যায় অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি। মাঝখানে একটি তাস খেলার টেবিল ঘিরে গোটা চারেক গদি-মোড়া চেয়ার, মাথার ওপর একশো ওয়াটের দুটো বাল্‌ব জ্বলছে। এই টেবিলের সামনে একলা বসে খড়্গা বাহাদুর এক প্যাক্ তাস নিয়ে ভাঁজছিল। আরো দুটো নতুন তাসের সীল-করা প্যাক্ পাশে রাখা রয়েছে। খড়্গা বাহাদুর অলসভাবে তাস ভাঁজছিল, কিন্তু তার মুখের ভাব কড়া এবং রুক্ষ। নৃপতির আড্ডায় তার যেমন হাসিখুশি মিশুক ভাব দেখা যায়, বাড়িতে ঠিক তেমন নয়। বাড়িতে সে প্রভু। মধ্যযুগীয় প্রভু।

পৌনে আটটা বাজলে খড়্গা বাহাদুর ডাকল—'রতন সিং!'

রতন সিং রান্নাঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়াল। বেঁটেখাটো মানুষ, খাঁটি নেপালী চেহারা ; ভাবলেশহীন তির্যক চোখে চেয়ে বলল—'জি।'

খড়্গা বাহাদুর বলল—'আটটার পরেই অতিথিরা আসবে। শিককাবাব কত দূর?'

রতন সিং বলল—'জি, আধা তৈরি হয়েছে, আধা তৈরি হচ্ছে।'

খড়্গা বলল—'তিনজন অতিথি আসবে। তারা সকলে এলে প্রথম দফা শিককাবাব দিয়ে যাবে, এক ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় দফা দেবে। যাও।'

রতন সিং-এর মুখ দেখে নিঃসংশয়ে কিছু বোঝা যায় না ; তবু সন্দেহ হয়, মালিকের অতিথিদের সে পছন্দ করে না। সে রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে আবার শিককাবাব রচনায় মন দিল। মালিক যা করেন তাই অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হয়, কিন্তু জুয়া খেলে টাকা ওড়ানো ভাল কাজ নয়। দেশ থেকে প্রতিমাসে এক হাজার টাকা আসে, অথচ মাসের শেষে এক পয়সাও বাঁচে না।

বাইরের ঘরে তাস ভাঁজতে ভাঁজতে খড়্গা বাহাদুর ভাবছিল—আজ যদি হেরে যাই, রক্তদর্শন করব।

গত কয়েকবার সে ক্রমাগত হেরে আসছে।

আটটার সময় একে একে তিনটি অতিথি এল। তিনজনেই যুবক, সাজপোশাক দেখে বোঝা যায়, তিনজনেই বড়মানুষের ছেলে। একজন সিন্ধী, দ্বিতীয়টি পাঞ্জাবী, তৃতীয়টি পার্সী।

সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণের পর সকলে টেবিল ঘিরে বসল। রতন সিং চারটি প্লেটে প্রায় সেরখানেক শিককাবাব এনে রাখল ; সঙ্গে রাই-বাটা এবং ছুরি-কাঁটা।

কথাবার্তা বেশি হল না, চারজন প্লেট টেনে নিয়ে ছুরি-কাঁটার সাহায্যে খেতে আরম্ভ করল। রতন সিং-এর শিককাবাব অতি উপাদেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারটি প্লেট শূন্য হয়ে গেল। সকলে রুমালে মুখ মুছে সিগারেট ধরাল। পার্সী যুবকও সিগারেট খায়, আধুনিক যুবকেরা ধর্মের নিষেধ মানে না।

তারপর সাড়ে আটটার সময় তাসের নতুন প্যাক্ খুলে খেলা আরম্ভ হল। তিন তাসের খেলা, জোকার নেই। নিম্নতম বাজি পাঁচ টাকা, ঊর্ধ্বতম বাজি কুড়ি টাকা।

চারজনই পাকা খেলোয়াড়। কিন্তু রানিং ফ্লাশ্ খেলায় ক্রীড়ানৈপুণ্যের বিশেষ অবকাশ নেই, ভাগ্যই বলবান। কদাচিৎ ব্লাফ্ দিয়ে দু'এক দান জেতা যায়। আসলে হাতের জোরের ওপরেই

খেলার হার-জিত।

সাড়ে দশটার সময় আর এক দফা শিককাবাব এল। এবার মাত্রা কিছু কম। সঙ্গে কফি। পনেরো মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ করে আবার নতুন তাসের প্যাক্ খুলে খেলা আরম্ভ হল।

খেলা শেষ হল রাত্রি সাড়ে বারোটার সময়। হিসেবনিকেশ করে দেখা গেল, অতিথিরা তিনজনেই জিতেছে, খড়্গ বাহাদুর হেরেছে প্রায় সাত শো টাকা!

অতিথিরা হাসিমুখে সহানুভূতি জানিয়ে চলে গেল। খড়্গ বাহাদুর অন্ধকার মুখে অনেকক্ষণ একলা টেবিলের সামনে বসে রইল, তারপর হঠাৎ উঠে শোবার ঘরে গেল। বেশ পরিবর্তন করে মাথায় একটা কাউ-বয় টুপি পরে বেরিয়ে এল। রতন সিংকে বলল—'আমি বেরুচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি, তুমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জেগে থাকবে।'

রতন সিং বলল—'জি।'

খড়্গ বাহাদুর বেরিয়ে গেল। রতন সিং-এর মঙ্গোলীয় মুখ নির্বিকার রইল বটে, কিন্তু তার ছোট ছোট চোখ দু'টি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মালিক আজও হেরেছেন। তাস খেলায় হেরে মালিক কোথায় যান? ফিরে আসেন সেই শেষ রাত্রে। কখনও আটটার আগেই বেরিয়ে যান, ফিরতে রাত হয়। কোথায় থাকেন? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান? কিংবা—

আর একটি রাত্রির কথা :

কপিলের বাড়িতে নৈশ আহার শেষ হয়েছিল। কর্তা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, কপিলের ছোট দুই ভাইবোনও নিজের নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। ড্রয়িংরুমে এসে বসেছিল কপিল, তার দাদা আর বউদিদি এবং তার দিদি ও জামাইবাবু। কর্তা বিপত্নীক, পুত্রবধূই বাড়ির গিন্নি। মেয়ে-জামাই দার্জিলিঙে থাকে, জামাইয়ের চায়ের বাগান আছে; আজ সকালে কয়েক দিনের জন্যে তারা কলকাতায় এসেছে।

কপিলদের বাড়িটা তিনতলা। নীচের তলায় একটা বড় ব্যাঙ্কের শাখা, উপরের দু'টি তলায় কপিলেরা থাকে। সবার উপরে প্রশস্ত খোলা ছাদ।

ড্রয়িংরুমে যাঁরা সমবেত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কপিলের দাদা গৌতমদেব বয়সে বড়। পৈতৃক সলিসিটার অফিসের তিনি এখন কর্তা। অত্যন্ত নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক; বাড়িতে কারুর সাতে-পাঁচে থাকেন না। তাঁর স্ত্রী রমলার প্রকৃতি কিন্তু অন্যরকম। তার বয়স ত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু সে বুদ্ধিমতী, গৃহকর্মে নিপুণা, সংসারের কোনো ব্যাপারেই নির্লিপ্ত নয়। উপরন্তু তার বুদ্ধিতে একটু অম্লরস মেশানো আছে, যার ফলে সকলেই তার কাছে একটু সতর্ক হয়ে থাকে।

কপিলের দিদি অশোকার বয়সও আন্দাজ ত্রিশ। তার সাত বছরের একটিমাত্র ছেলে স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকে। অশোকার চরিত্র সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে বড়মানুষের মেয়ে, বড়মানুষের বউ। পৃথিবীর অধিকাংশ জীবকেই সে করুণার চক্ষে দেখে, কারুর সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলে না। তার স্বামী শৈলেনবাবু কিন্তু মজলিসী লোক; আসর জমিয়ে গল্প করতে ভালবাসেন, তর্ক করার দিকে ঝোঁক আছে এবং সুযোগ পেলে অযাচিত উপদেশও দিয়ে থাকেন।

তিনি প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত একটি পাইপের মুণ্ড মুঠিতে ধরে ধূমপান করছেন। গৌতমদেব একটি মোটা সিগারেট ধরিয়েছেন। কপিলের নাকে তামাকের সুগন্ধ ধোঁয়া আসছে; কিন্তু সে গুরুজনদের সামনে ধূমপান করে না, তাই নীরবে বসে উস্‌খুস্ করছে। বাড়ির নিয়ম, নৈশাহারের পর সকলে অন্তত পনেরো মিনিটের জন্যে একত্র হবে। আগে কর্তাও এসে বসতেন; এখন তাঁর বয়স বেড়েছে, খাওয়ার পরই শুয়ে পড়েন। বাড়ির অন্য সকলের জন্য কিন্তু নিয়ম জারি আছে।

জামাই শৈলেনবাবু পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কপিলকে নিরীক্ষণ করছিলেন, গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলেন—'কপিল, তুমি কি নাম-মাহাত্ম্যে সাধু-সন্নিসি হয়ে যাবার

মতলব করেছ ?'

কপিল সমান গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দিল—'আপাতত সে রকম কোনো মতলব নেই।'

শৈলেনবাবু বললেন—'তবে বিয়ে করছ না কেন ? সংসার-ধর্ম করতে গেলে বিয়ে করা দরকার। তোমার বিয়ে করার উপযোগী বুদ্ধি না থাকতে পারে কিন্তু বয়স তো হয়েছে।'

কপিল ভ্রূ একটু তুলে বলল—'বিয়ে করার জন্যে কি খুব বেশি বুদ্ধি দরকার ?'

রমলা হেসে উঠল। কপিল ও শৈলেনবাবুর মধ্যে গাম্ভীর্য-ঢাকা গূঢ় পরিহাসের সঙ্গে বাড়ির সকলেই পরিচিত। রমলা বলল—'বিয়ে করার জন্যে যদি বেশি বুদ্ধির দরকার হত তাহলে বাংলাদেশে কারুর বিয়ে হত না। আসলে ঠিক উল্টো। ঠাকুরপোর বড্ড বেশি বুদ্ধি, তাই বিয়ে হচ্ছে না।'

'তাই নাকি !' শৈলেনবাবু অবিশ্বাস-ভরা চক্ষু বিস্ফারিত করে কপিলের পানে চাইলেন—'এত বুদ্ধি কপিলের ! কিন্তু আর একটু পরিষ্কার করে না বললে কথাটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।'

রমলা বলল—'ওকেই জিজ্ঞেস করুন না। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই, তবু ও বিয়ে করে না কেন ?'

শৈলেনবাবু প্রতিধ্বনি করলেন—'কেন ?'

কপিল পকেটে হাত দিল, সিগারেটের কেস হাতে ঠেকল, কেসটা অজ্ঞাতসারে বার করে আবার সে পকেটে রেখে দিল।

গৌতমদেব উঠে পড়লেন—'আমি উঠলাম, কাল ভোরেই আবার আমাকে—' কথা অসমাপ্ত রেখে তিনি প্রস্থান করলেন। নিজের উপস্থিতি দ্বারা কারুর অসুবিধা ঘটাতে তিনি চান না।

কপিল জামাইবাবুকে লক্ষ্য করে বলল—'বিয়ে করা একটা সিরিয়াস কাজ এ কথা আপনি মানেন ?'

শৈলেনবাবু নিজের গৃহিণীর প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করে বললেন—'মানি বইকি। খুব সিরিয়াস কাজ।'

অশোকা সূক্ষ্ম হাস্যরস বোঝে না, কিন্তু খোঁচা দিয়ে কথা বললে যত সূক্ষ্ম খোঁচাই হোক ঠিক বুঝতে পারে। সে স্বামীর দিকে বিরক্তিসূচক কটাক্ষ হেনে বলল—"আমি শুতে চললুম। বাজে কথার কচকচি শুনতে ভাল লাগে না।'

অশোকা চলে যাবার পর কপিল পকেট থেকে সিগারেট বার করে রমলাকে বলল—'বউদি, সিগারেট খেতে পারি ?'

রমলা বলল—'আহা, ন্যাকামি দেখে বাঁচি না। আমার সামনে যেন সিগারেট খাও না !'

কপিল বলল—'খাই, কিন্তু অনুমতি নিয়ে খাই।'

রমলা বলল—'আচ্ছা, অনুমতি দিলুম, খাও।'

কপিল সিগারেট ধরাল। তারপর শালা-ভগিনীপতির তর্ক আবার আরম্ভ হয়ে গেল। রমলা ঠোঁটের কোণে কৌতুক-হাসি নিয়ে শুনতে লাগল।

কপিল বলল—'বিয়ে করা যখন সিরিয়াস ব্যাপার তখন খুব বিবেচনা করে বিয়ে করা উচিত।'

শৈলেনবাবু বললেন—'অবশ্য, অবশ্য। কিন্তু কী বিবেচনা করবে ?'

'বিবেচনা করতে হবে, আমি কি চাই।'

'কী চাও তুমি ? রূপ ? গুণ ? বিদ্যা ? বুদ্ধি ?'

'রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি থাকে ভাল, না থাকলেও আপত্তি নেই। আসলে চাই—মনের মিল।'

'হুঁ, মনের মিল। কিন্তু বিয়ে না হলে বুঝবে কি করে মনের মিল হবে কিনা।'

'ওইখানেই তো সমস্যা। তবে আজকাল স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে মেয়েদের মন বুঝতে বেশি দেরি হয় না।'

রমলা বলল—'তুমি তাহলে মেয়েদের মন বুঝে নিয়েছ ?'

কপিল বলল—'তা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু বুঝলেই যে পছন্দ হবে তার কোনো মানে নেই।'

রমলা বলল—'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

শৈলেনবাবু বললেন—'তাহলে যতদিন মনের মত মন না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন অনুসন্ধান চলবে ?'

কপিল মুচকি হাসল, উত্তর দিল না।

শৈলেনবাবু সন্দিগ্ধস্বরে বললেন—'আসল কথাটা কি ? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ না তো ?'

'তার মানে ?'

'মানে কোনো সধবা কিংবা বিধবা যুবতীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়নি তো ?'

কপিল চকিত চোখে চাইল, তারপর উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, বলল—'বউদি, জামাইবাবুর মাথা গরম হয়েছে। ঠাণ্ডা দেশ থেকে গরম দেশে এসেছেন, হবারই কথা। তুমি ওঁর জন্যে আইস্-ব্যাগের ব্যবস্থা কর, আমি শুতে চললাম।'

হাসি-মস্করার মধ্যে রাত্রির মত সভা ভঙ্গ হল। কপিল নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করল।

কপিলের ঘরটি বেশ বড়, লম্বাটে ধরনের। এক পাশে খাট-বিছানা, অন্য পাশে টেবিল-চেয়ার। কাচে ঢাকা টেবিলের ওপর কাচের নীচে আকাশের একটি মানচিত্র ; নীল জমির ওপর সাদা নক্ষত্রপুঞ্জ ফুটে আছে। কপিল রাত্রিবাস পরল, ঢিলা পা-জামা আর হাত-কাটা ফতুয়া। তারপর একটা বই নিয়ে টেবিলের সামনে পড়তে বসল।

ইংরেজি গণিত জ্যোতিষের বই, লেখকের নাম ফ্রেড্ হয়েল। পড়তে পড়তে কপিল ঘড়ি দেখছে, আবার পড়ছে। বিশ্ব-রহস্য উদ্‌ঘাটক জ্যোতিষগ্রন্থের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ; কিন্তু আজ তার মন ঠিক বইয়ের মধ্যে নেই, যেন সে সময় কাটাবার জন্যেই বই পড়ছে।

কব্জির ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজল। কপিল বই বন্ধ করে উঠল, দেয়ালের একটা আলমারির কপাট খুলে একটি দূরবীন যন্ত্র বার করল। যন্ত্রটি আকারে দীর্ঘ নয়, কিন্তু তিন পায়ার ওপর ক্যামেরার মত দাঁড় করানো যায়, আবার ইচ্ছামত পায়া গুটিয়ে নেওয়া যায়। কপিল দূরবীনটি বগলে নিয়ে ঘরের আলো নেবালো, তারপর সন্তর্পণে বাইরে এল।

ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গেলেই ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। কপিল পা টিপে টিপে সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত গিয়েছে এমন সময় সামনের একটা দরজা খুলে রমলা বেরিয়ে এল। তার মুখে খরশান ব্যঙ্গের হাসি। কপিল তাকে দেখে থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রমলা বলল—'কী ঠাকুরপো, এত রাত্রে দূরবীন নিয়ে কোথায় চলেছ ?'

কপিল চাপা গলায় বলল—'আস্তে বউদি, বাবার ঘুম ভেঙে যাবে।'

রমলা গলা নীচু করল—'তোমার মতলব ভাল ঠেকছে না ঠাকুরপো।'

কপিল বলল—'কি মুশকিল। আমি তো প্রায়ই আকাশের তারা দেখবার জন্যে ছাদে উঠি। তুমি জান না ?'

রমলা বলল—'জানি। কিন্তু সে তো সন্ধ্যের পর। আজ রাত দুপুরে কোন্ তারা দেখবে বলে ছাদে উঠছ ?'

কপিল বলল—'আজ রাত্রি পৌনে বারোটার সময় মঙ্গলগ্রহ ঠিক মাথার ওপর উঠবে। মঙ্গলগ্রহ এখন পৃথিবীর খুব কাছে এসেছে, তাই তাকে ভাল করে দেখবার জন্যে ছাদে যাচ্ছি।'

রমলা মুখ গম্ভীর করে বলল—'হুঁ, মঙ্গলগ্রহ। কোন্ গ্রহ-তারা তোমার ঘাড়ে চেপেছে তুমিই জান। কিন্তু একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমাদের বাড়ির চার পাশে যাদের বাড়ি তারা গরমের সময় জানলা খুলে শুয়েছে, তুমি যেন তাদের জানলা দিয়ে গ্রহ-তারা দেখতে যেও না।'

কপিল মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে হাসল, বলল—'বউদি, তোমার মনটা ভারি সন্দিগ্ধ। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি এত রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোওনি কেন ?'

রমলা বলল—'তোমার দাদা বিছানায় শুয়ে আইনের বই পড়ছেন, হঠাৎ তাঁর কফি খাবার শখ হল। তাই কফি তৈরি করতে চলেছি। তুমি খাবে ?'

'আমার সময় নেই।' কপিল চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

হয়তো মঙ্গলগ্রহই দেখবে।

আর একটি রাত্রির কথা :

সিনেমার শিল্পক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা সাধারণত দল বেঁধে থাকে, নিজেদের শিল্পীগোষ্ঠী নিয়ে একটা সমাজ তৈরি করে নিয়েছে, বাইরের লোকের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখে না। সুজন মিত্র কিন্তু দলে থেকেও ঠিক দলের পাখি নয়। যতক্ষণ সে স্টুডিওর সীমানার মধ্যে থাকে ততক্ষণ সকল শ্রেণীর সহকর্মী ও সহকর্মিণীর সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে। তরুণী অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই এই সুদর্শন নবোদিত অভিনেতাটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সুজন কারুর কাছে ধরা দেয়নি। পাঁকাল মাছের মত হাত পিছলে বেরিয়ে যাবার কৌশল তার জানা ছিল।

সিনেমার গণ্ডীর বাইরে তার প্রধান বন্ধুগোষ্ঠী ছিল নৃপতির আড্ডার ছেলেরা ; এখানে এসে সে যেন সমভূমিতে পদার্পণ করত। তার বংশপরিচয় কেউ জানে না, তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী কেউ আছে কিনা সে পরিচয়ও কেউ কোনো দিন পায়নি, কিন্তু তার বন্ধু-নির্বাচন থেকে অনুমান করা যায় যে তার বংশপরিচয় যেমনই হোক, সে নিজে উচ্চ-মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষিত মার্জিত চরিত্রের মানুষ।

একদিন স্টুডিওতে তার শুটিং ছিল, কাজ শেষ হতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে মুখের রঙ পরিষ্কার করে বেরুতে আরো ঘণ্টাখানেক কাটল। সুজনের একটি ছোট মোটর আছে, তাইতে চড়ে সে যখন স্টুডিও থেকে বেরুল তখন রাত্রি হয়ে গেছে।

মাইল দেড়েক চলবার পর মোটর একটি হোটেলের সামনে এসে থামল। সুজন হোটেলেই খায়। তার বাসায় রান্নার আয়োজন নেই। কিন্তু রোজ একই হোটেলে খায় না। যখন যা খাবার ইচ্ছে হয় তখন সেই রকম হোটেলে যায়, কখনো বা মিষ্টান্নের দোকানে গিয়ে দই-সন্দেশ খেয়ে পেট ভরায়। যেদিন শুটিং থাকে সেদিন দুপুরে স্টুডিওর ক্যান্টিনে খায়।

হোটেলের পাশে গাড়ি পার্ক করে সে যখন হোটেলে ঢুকল তখন তার নাকের নীচে একজোড়া শৌখিন গোঁফ শোভা পাচ্ছে। গোঁফ জোড়া অকৃত্রিম নয়, সুজন কোনো প্রকাশ্য স্থানে গেলেই মুখে গোঁফ লাগিয়ে ছদ্মবেশ পরিধান করে। তার মুখখানা সিনেমার প্রসাদে জনসাধারণের খুবই পরিচিত, তাকে সশরীরে দেখলে সিনেমা-পাগল লোকেরা বিরক্ত করবে এই আশঙ্কাতেই হয়তো সে গোঁফের আড়ালে স্বরূপ লুকিয়ে রাখে।

হোটেলে আহার শেষ করে সুজন মোটর চালিয়ে নিজের বাসার দিকে চলল। বাসাটি পাড়ার এক প্রান্তে একটি সরু রাস্তার ওপর ; ছোট বাড়ি কিন্তু গাড়ি রাখার আস্তাবল আছে।

গ্যারাজে গাড়ি রেখে সুজন চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকল, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল। একসঙ্গে গোটা তিনেক দ্যুতিমান বাল্‌ব জ্বলে উঠল।

চৌকশ ঘরটি বেশ বড়। তাতে খাট-বিছানা আছে, টেবিল-চেয়ার আলমারি আছে, এমন কি স্টোভ, চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতিও আছে। মনে হয়, সুজন এই একটি ঘরের মধ্যে তার একক জীবনযাত্রার সমস্ত উপকরণ সঞ্চয় করে রেখেছে।

একটি লম্বা আরাম-কেদারায় অঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে সে পকেট থেকে সিগারেট বার করল, সিগারেট ধরিয়ে পিছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল একটা বাল্‌বের দিকে দৃষ্টি রেখে মৃদ-মন্দ টান দিতে লাগল। এখন আর তার মুখে গোঁফ নেই, নগ্ন মুখখানা ছুরির মত ধারাল।

সিগারেট শেষ করে সুজন কব্জির ঘড়ি দেখল—ন'টা বেজে কুড়ি মিনিট। সে উঠে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ; সাড়ে ছ'ফুট উঁচু আয়নায় তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজের দেহ মুখ পরীক্ষা করল ; একবার হাসল, একবার ভ্রূকুটি করল, তারপর আড়মোড়া ভেঙে আলমারির কাছে গেল।

আলমারি থেকে সে দু'টি জিনিস বার করল ; একটি হুইস্কির বোতল এবং বড় চৌকো

আকারের একটি পুরু লাল কাগজের খাম। প্রথমে সে গেলাসে ছোট পেগ মাপের হুইস্কি ঢেলে তাতে জল মেশালো, তারপর গেলাস আর খাম নিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল। গেলাসে ছোট একটি চুমুক দিয়ে চেয়ারের হাতার ওপর রেখে আগ্‌ফা'র খাম থেকে একটি ফটো বার করল।

ক্যাবিনেট আয়তনের ফটো, একটি যুবতীর আ-কটি প্রতিকৃতি, যুবতী হাসি-হাসি মুখে দর্শকের পানে চেয়ে আছে। মনে হয়, সে সিনেমার অভিনেত্রী নয়, মুখে বা দেহভঙ্গীতে কৃত্রিমতা নেই। কিন্তু সে কুমারী কি বিবাহিতা, ফটো থেকে বোঝা যায় না।

সুজন থেকে থেকে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ছবিটি দেখতে লাগল। চোখে তার প্রগাঢ় তন্ময়তা, পলকের তরেও ছবি থেকে চোখ সরাতে পারছে না। এক ঘণ্টা কেটে গেল, গেলাসের পানীয় নিঃশেষ হল ; কিন্তু সুজনের চিত্রদর্শন-পিপাসা মিটল না। সে ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে আবার সিগারেট ধরাল। তার ঠোঁট নড়তে লাগল, যেন চুপি চুপি ছবির সঙ্গে কথা কইছে। তারপর ছবিটি নিজের গালের ওপর চেপে ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

পৌনে এগারোটার সময় সে ছবিটি আবার খামে পুরে আলমারিতে তুলে রাখল, আয়নার সামনে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আলো নিবিয়ে আবার বাড়ি থেকে বেরুল। মোটর নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা দক্ষিণ কলকাতার নগরগুঞ্জনক্লান্ত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে শেষে রবীন্দ্র সরোবরের ঘেরার মধ্যে রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর গাড়ি দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে যখন নামল, দেখা গেল নকল গোঁফ তার নাকের নীচে ফিরে এসেছে। গাড়ি লক করে সে লেক থেকে বেরুল, বড় রাস্তা পার হয়ে একটা সরু রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল।

রাস্তার দু' পাশে বাড়ির আলো নিবে গেছে। সুজন একটি ল্যাম্প-পোস্টের নীচে এসে দাঁড়াল। রাস্তার ওপারে একটা বাড়ি, তার দোতলার একটা জানলা দিয়ে নৈশদীপের অস্ফুট আলো আসছে। সুজন সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ল্যাম্প-পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে রইল। ল্যাম্প-পোস্টের নীচে দাঁড়ালে মাথার ওপর আলো পড়ে, মানুষটাকে দেখা যায় বটে, কিন্তু মুখ চেনা যায় না।

কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও জানলায় কাউকে দেখা গেল না। সুজন যাকে চোখের দেখা দেখতে চায় সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা অন্য একজনের বাহুবন্ধনের মধ্যে শুয়ে জেগে আছে।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্। সুজন আগুনের হলকার মত তপ্ত নিশ্বাস ফেলল, তারপর ফিরে চলল।

আর একটি রাত্রির কথা :

দেবাশিস আর দীপা একসঙ্গে টেবিলে বসে রাত্রির আহার সম্পন্ন করল। নকুলকে শুনিয়ে দীপা বাগানের কথা বলল ; মালী পদ্মলোচন বুগেনভিলিয়া লতাকে বাইগনবিল্লি বলে শুনে দেবাশিস খানিকটা হাসল, তারপর ফ্যাক্টরির একটা মজার ঘটনা বলল। বাইরের ঠাট বজায় রইল। খাওয়া শেষ হলে দু'জনে ওপরে গিয়ে নিজের নিজের ঘরে ঢুকল। তৃতীয় ব্যক্তির সামনে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করতে তারা বেশ অভ্যস্ত হয়েছে ; কিন্তু যখন তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকে না, যখন অভিনয় করার দরকার নেই, তখনই বিপদ।

দীপা ঘরে গিয়ে নৈশদীপ জ্বেলে খানিকক্ষণ খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আজ বাইরে হাওয়া নেই, গ্রীষ্মের রাত্রি যেন নিশ্বাস রোধ করে আছে। দীপা পাখা চালিয়ে দিয়ে ব্লাউজ খুলে শুয়ে পড়ল। ঘুম কখন আসবে তার ঠিক নেই কিন্তু যথাসময়ে বিছানায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর তো কোনো কাজও নেই। শুয়ে শুয়ে সে মাথার মধ্যে দেবাশিসের একটা কথা প্রতিধ্বনির মত শুনতে লাগল—দীপা, তুমি আমাকে ভালবাস না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

দেবাশিস নিজের ঘরে খাটের পাশে পড়ার আলো জ্বেলে একখানা ইংরেজি বিজ্ঞানের বই নিয়ে শুয়েছিল। তার গায়ে জামা নেই, পাখাটা ছাদ থেকে বনবন করে ঘুরছে। দেবাশিস বইয়ে মন

বসাতে পারছিল না, মনটা যেন তপ্ত বাষ্প হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মাথায় ঠাণ্ডা জল থাবড়ে দিয়েও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না। আধ ঘণ্টা পরে সে বই রেখে আলো নিবিয়ে দিল। উজ্জ্বল আলোটাই যেন ঘরের বাতাসকে আরো গরম করে তুলেছে।

অন্ধকার ঘরে দেবাশিস চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে আছে। পাখার হাওয়া সত্ত্বেও বিছানাটা যেন রুটি-সেঁকা তাওয়ার মত তপ্ত। এ-পাশ ও-পাশ করেও নিষ্কৃতি নেই, বালিশের ওপর মাথাটা গরম হয়ে উঠছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনও গরম হচ্ছে, কিন্তু সেটা অগোচরে। শেষে হঠাৎ গভীর রাত্রে এই মানসিক উষ্মা মাটি ফুঁড়ে আগ্নেয়গিরির মত উৎসারিত হল। দেবাশিস ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে চাপা গর্জনে বলল—'God damn it, she is my wife!'

অন্ধকারে দেবাশিস কিছুক্ষণ স্নায়ুপেশী শক্ত করে বসে রইল, তারপর বিছানা থেকে নেমে ঘর থেকে বেরুল। বসবার ঘরের আলো জ্বালতেই সুইচে কটাস করে শব্দ হল, মনে হল ঘরটা যেন চমকে উঠল। দেবাশিসও একটু চমকালো, হঠাৎ জ্বলে-ওঠা আলোর দীপ্তি চোখে আঘাত করল। সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে দীপার বন্ধ দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দরজায় খিল দেওয়া কি শুধুই ভেজানো, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। হয়তো একটু ঠেললেই খুলে যাবে। দীপা নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবাশিস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজায় টোকা দেবার জন্যে হাত তুলল, ঘুমন্ত দীপার ঘরে অনাহূত দোর ঠেলে প্রবেশ করতে পারল না। তারপর টোকা দিতেও পারল না, তার উদ্যত হাত নেমে পড়ল। 'কাপুরুষ!' মনের গভীরে নিজেকে কঠোর ধিক্কার দিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

দীপা তখনো ঘুমোয়নি, জেগেই ছিল। কিন্তু সে কিছু জানতে পারল না।

দেবাশিস আর দীপার বিয়ের পর দু'মাস কেটে গেল। যেদিনের ঘটনা নিয়ে কাহিনী আরম্ভ হয়েছিল, সেই যেদিন দেবাশিস ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসে দীপাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু দীপা যায়নি, দীর্ঘ পশ্চাদ্দৃষ্টির পর আমরা সেইখানে ফিরে এলাম।

দেবাশিস পায়ে হেঁটে নৃপতির বাড়ির দিকে যেতে যেতে মাঝ-রাস্তায় থমকে দাঁড়াল। তার মনটা তিক্ত হয়েই ছিল, এখন নৃপতির বাড়িতে গিয়ে হালকা ঠাট্টা-তামাশা উদ্দেশ্যহীন গল্পগুজব করতে হবে, প্রবালের পিয়ানো বাজনা শুনতে হবে ভাবতেই তার মন বিমুখ হয়ে উঠল। অনেক দিন পড়াশুনো করা হয়নি, অথচ তার যে কাজ তাতে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে পৃথিবীর কোথায় কি কাজ হচ্ছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। তার কাছে কয়েকটা বিলিতি বিজ্ঞান-পত্রিকা নিয়মিত আসে, কিন্তু গত দু'মাস তাদের মোড়ক পর্যন্ত খোলা হয়নি। দেবাশিস আবার বাড়ি ফিরে চলল। আজ আর আড্ডা নয়, আগের মত সন্ধ্যেটা পড়াশুনো করেই কাটাবে।

দীপা রেডিও চালিয়ে দিয়ে চোখ বুজে আরাম-চেয়ারে বসে ছিল, দেবাশিসকে ফিরে আসতে দেখে রেডিও বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল, উদ্বিগ্ন প্রশ্নভরা চোখে তার পানে চাইল। দেবাশিস যথাসম্ভব সহজ গলায় বলল—'ফিরে এলাম। অনেক দিন পড়াশুনো হয়নি, আজ একটু পড়ব।'

টেলিফোন টেবিলের নীচের থাকে বিলিতি পত্রিকাগুলো জমা হয়েছিল দেবাশিস সেগুলো নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল ; সেখানে পত্রিকার মোড়ক খুলে তারিখ অনুযায়ী সাজাল, তারপর বিছানায় শুয়ে পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

ওঘরে দীপা আস্তে আস্তে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা দ্রুত নিবিড় হয়ে আসছে। পদ্মলোচন বাগানে জল দিচ্ছে। আজ দীপা বাগানে যায়নি। বিকেলবেলা সে সিনেমায় যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর দেবাশিস আহত লাঞ্ছিত মুখে চলে গেল, দীপার

মনটাও কেমন একরকম হয়ে গেল। যত দিন যাচ্ছে তার জীবনটা এমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে যে, মনে হয় কোনো দিনই এ জট ছাড়ানো যাবে না। মনের মধ্যে একটা নতুন সমস্যা জন্ম নিয়েছে, তার কোনো সমাধান নেই।

বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে, পদ্মলোচন বাগানের কাজ শেষ করে চলে গেল। দীপা তখন জানলা থেকে ফিরে নিঃশব্দে দেবাশিসের ঘরের দিকে গেল। দেবাশিস তখন আলো জ্বেলেছে, বিছানায় বালিশ ঠেসান দিয়ে পড়ায় নিমগ্ন। দীপা কিছুক্ষণ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল ; কিন্তু দেবাশিস তাকে দেখতে পেল না। দীপা তখন একেবারে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেবাশিস চমকে চোখ তুলল।

দীপা বলল—'চা খাবে ?'

দেবাশিস একটু হাসল। দীপা বিকেলবেলার রূঢ়তার জন্যে অনুতপ্ত হয়েছে। সে বলল—'তুমি যদি খাও আমিও খাব।'

'এক্ষুনি আনছি।' দীপা হরিণীর মত ছুটে চলে গেল। দেবাশিস কিছুক্ষণ দোরের দিকে চেয়ে থেকে আবার পড়ায় মন দিল।

দীপা রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, নকুল রান্না চড়িয়েছে। সে বলল—'নকুল, তুমি সরো, আমি চা তৈরি করব।

নকুল বলল—'চা তৈরি করবে ? দাদাবাবু খাবেন বুঝি ? তা তুমি কেন করবে বউদি, আমি করে দিচ্ছি।'

'না, আমি করব। তুমি সরো।'

নকুল মনে মনে খুশি হল—'আচ্ছা বউদি, তুমিই কর।'

নকুলের ছায়াচ্ছন্ন মন অনেকটা পরিষ্কার হল। এই দু'মাস দেখেশুনে তার ধারণা জন্মেছিল, গোড়াতে কোনো কারণে এদের মনের মিল হয়নি, এখন আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসছে। ঘি আর আগুন একসঙ্গে কত দিন ঠাণ্ডা থাকবে !

দীপা চা তৈরি করে ট্রে-র ওপর টি-পট, দু'টি পেয়ালা প্রভৃতি বসিয়ে ওপরে উঠে গেল, বসবার ঘরে ট্রে রেখে দেবাশিসের দোরের কাছে এসে বলল—'চা এনেছি।'

দেবাশিস তৎক্ষণাৎ উঠে এসে চায়ের টেবিলে বসল। দীপা চা পেয়ালায় ঢেলে একটি পেয়ালা দেবাশিসের দিকে এগিয়ে দিল, নিজের পেয়ালাটি হাতে তুলতে গিয়ে খানিকটা চা চলকে পিরিচে পড়ল।

আজ দেবাশিস হঠাৎ ফিরে আসার পর দীপার শরীরটাও যেন শাসনের বাইরে চলে গেছে। থেকে থেকে বুকের মধ্যে আনচান করে উঠছে, মাথার মধ্যে যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কান্নায় গলা বুজে আসছে। সে কাঁদুনে মেয়ে নয়, এত দিনের দীর্ঘ পরীক্ষায় সে পরম দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে আজ তার এ কী হল ?

এক চুমুক চা খেয়ে দেবাশিস বলল—'আঃ ! খাসা চা হয়েছে। কে করল—নকুল ?'

'না—আমি।' দীপার গলাটা কেঁপে গেল, মনে হল শরীরের অস্থিমাংস নরম হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে বসে পড়ল।

দেবাশিস আর কিছু বলল না, কেবল একটু প্রশংসাসূচক হাসল। দীপা দু' চুমুক চা খেয়ে নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নিল, তারপর যেন গুনে গুনে কথা বলছে এমনিভাবে বলল—'কাল তুমি আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে ?'

দেবাশিস চকিত চোখে তার পানে চাইল, ক্ষণেক নীরব থেকে বলল—'তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে, আমার মন রাখার জন্যে সিনেমা দেখার দরকার নেই।'

'না, আমি দেখতে চাই।'

চায়ের পেয়ালা শেষ করে দেবাশিস উঠে দাঁড়াল—'বেশ, তাহলে নিয়ে যাব।'

দেবাশিস নিজের ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে এমন সময় ঘরের কোণে টেলিফোন

বাজল।

দীপার বুক আশঙ্কায় ধক্‌ধক্ করে উঠল। কার টেলিফোন!

দেবাশিস গিয়ে টেলিফোন ধরল—'হ্যালো।'

অন্য দিক থেকে কে কথা বলছে, কী কথা বলছে, দীপা শুনতে পেল না, কেবল দেবাশিসের কথা একাগ্র হয়ে শুনতে লাগল, 'ও...কী খবর?...না, আজ বাড়িতেই আছি...না, শরীর ভাল আছে...এখন?...ও বুঝেছি, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি...না না, কষ্ট কিসের...আচ্ছা—'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে দেবাশিস কব্জির ঘড়ির দিকে তাকালো, আটটা বেজে গেছে। 'আমাকে একবার বেরুতে হবে। হেঁটেই যাব। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।'

সে বেরিয়ে গেল। দীপা কোনো প্রশ্ন করল না; সে জানতে পারল না, দেবাশিস কোথায় যাচ্ছে। একলা বসে বসে ভাবতে লাগল, কে দেবাশিসকে টেলিফোন করেছিল?

দেবাশিস আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরল না। তারপর আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। নকুল নীচে থেকে এসে বলল—'হ্যাঁ বউদি, দাদাবাবু কোথায় গেল? কখন ফিরবে?'

দীপা বলল—'তা তো জানি না নকুল। কোথায় গেছেন বলে যাননি, শুধু বললেন আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরবেন।'

নকুল বলল—'আধ ঘণ্টা তো কখন কেটে গেছে। খাবার সময় হল। কখনো তো এমন দেরি করে না।' নকুল চিন্তিতভাবে বিজ্‌বিজ্ করতে করতে নীচে নেমে গেল।

একজনের উদ্বেগ অন্যের মনে সঞ্চারিত হয়। দীপার মনও উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল; নানারকম বাস্তব-অবাস্তব সম্ভাবনা তার মাথার মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

ন'টা বেজে পাঁচ মিনিটে টেলিফোন বেজে উঠতেই দীপা চমকে উঠে দাঁড়াল, ভয়ে ভয়ে গিয়ে টেলিফোন তুলে কানে ধরল, ক্ষীণস্বরে বলল—'হ্যালো।'

অপর প্রান্ত থেকে স্বর এল—'আমি। গলা শুনে চিনতে পারছ?'

দীপার গলার আওয়াজ আরো ক্ষীণ হয়ে গেল—'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী বাড়িতে আছে?'

'না।'

'খবর সব ভাল?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী কোনো গোলমাল করেনি?'

'না।'

'তুমি যেমন ছিলে তেমনি আছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম কাউকে বলনি?'

'না।'

'মা কালীর নামে দিব্যি করেছ, মনে আছে?'

'আছে।'

'আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। সাবধানে থেকো। আবার টেলিফোন করব।'

দীপার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না, সে টেলিফোন রেখে আবার এসে বসল; মনে হল, তার দেহের সমস্ত প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেছে। দু'হাতে মুখ ঢোকে সে চেয়ারে পড়ে রইল।

সাড়ে ন'টার সময় নকুল আবার এসে বলল—'বউদি, দাদাবাবু এখনো এল না, আমার ভাল ঠেকছে না—'

এই সময় তৃতীয় বার টেলিফোন বাজল। দীপার মুখ সাদা হয়ে গেল; সে সমস্ত শরীর শক্ত করে উঠে গিয়ে ফোন ধরল। মেয়েলী গলার আওয়াজ শুনল—'হ্যালো, এটা কি দেবাশিস

ভট্টের বাড়ি ?'

দীপার বুক ধড়ফড় করে উঠল, সে কোনো মতে উচ্চারণ করল—'হ্যাঁ।'

'আপনি কি তাঁর স্ত্রী ?'

'হ্যাঁ।'

'দেখুন, আমি হাসপাতাল থেকে বলছি। আপনি একবার আসতে পারবেন ?'

'কেন ? কী হয়েছে ?'

'ইয়ে—আপনার স্বামীর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। আপনি চট্ করে আসুন।'

দীপার মুখ থেকে বুক-ফাটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল—'বেঁচে আছেন ?'

'হ্যাঁ। এই কিছুক্ষণ আগে জ্ঞান হয়েছে।'

'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। কোন্ হাসপাতাল ?'

'রাসবিহারী হাসপাতাল, এমারজেন্সি ওয়ার্ড।'

ফোন রেখে দিয়ে দীপা ফিরল ; দেখল, নকুল তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নকুল ব্যাকুল চোখে চেয়ে বলল—'বউদি ?'

নকুলের শঙ্কা-বিবশ মুখ দেখে দীপা হঠাৎ নিজের হৃদয়টাও দেখতে পেল। আজকের দীপা আর দু' মাস আগের দীপা নেই, সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। তার মাথাটা একবার ঘুরে উঠল। তারপর সে দৃঢ়ভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—'তোমার দাদাবাবুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।'

নকুল আস্তে আস্তে মেঝের ওপর বসে পড়ল। দীপা বলল—'না নকুল, এ সময় ভেঙে পড়লে চলবে না। চল, এক্ষুনি হাসপাতালে যেতে হবে।'

দীপা নকুলকে হাতে ধরে টেনে দাঁড় করালো।

অনুক্রম

ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু যখন হাসপাতালে পৌঁছুলেন তখন রাত্রি দশটা। হাসপাতালের দরদালানে লোক কমে গেছে। এক পাশে এক বেঞ্চিতে একটি যুবতী শরীর শক্ত করে বসে আছে, তার পায়ের কাছে জবুথবু হয়ে বসে আছে একটি বুড়ো চাকর। যুবতীর চোখে বিভীষিকাময় সম্ভাবনার আতঙ্ক।

একটি নার্স ব্যোমকেশকে দেখে এগিয়ে এল। রাখালবাবু বললেন—'থানা থেকে আসছি।'

'আসুন।' নার্স তাঁদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে বসাল। বলল—'একটু বসুন, ডাক্তার গুপ্ত আপনাদেরই জন্য অপেক্ষা করছেন।'

নার্স চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে ডাক্তার গুপ্ত এলেন। মধ্যবয়স্ক মধ্যমাকৃতি মানুষ, বিশ বছর ধরে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেও ক্লান্ত হননি, বরং প্রাণশক্তি আরো বেড়েছে। রাখালবাবু নিজের এবং ব্যোমকেশের পরিচয় দিলে ডাক্তার হেসে বললেন—'আরে মশাই, আজ দেখছি অসাধারণ ঘটনা ঘটার দিন। ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গেও পরিচয় হল। বসুন, বসুন।'

তিনজন বসলেন। রাখালবাবু বললেন—'ব্যাপার কি বলুন দেখি।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন—'আরে মশাই, আশ্চর্য ব্যাপার, অভাবনীয় ব্যাপার। আমি বিশ বছর ডাক্তারি করছি, এমন প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার দেখিনি। অবশ্য ডাক্তারি কেতাবে দু'-চারটে উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু স্বচক্ষে দেখা—কোটিকে গুটিক মিলে।'

ব্যোমকেশ হেসে বলল—'রহস্য নিয়েই আমার কারবার, আপনি আমাকেও অবাক করে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, একটা মনের মত রহস্য এতদিনে পাওয়া গেছে। আপনি গোড়া থেকে

সব কথা বলুন।'

ডাক্তার বললেন—'বেশ, তাই বলছি। আজ রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তিনটি ছোকরা একজন অজ্ঞান লোককে ট্যাক্সিতে নিয়ে এখানে এল। তারা রবীন্দ্র সরোবরে বেড়াতে গিয়েছিল, দেখল একটা গাছের তলায় বেঞ্চির পাশে মানুষ পড়ে আছে। দেশলাই জ্বেলে মানুষটাকে দেখল, তার পিঠের বাঁ দিকে শজারুর কাঁটা বিঁধে আছে। লোকটা কিন্তু মরেনি, অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ওদের মধ্যে একজন লোকটিকে চিনতে পারল, তাদের ফ্যাক্টরির মালিক দেবাশিস ভট্ট। তখন তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে এল।

'ছোকরাকে টেবিলে শুইয়ে পরীক্ষা করলাম। শজারুর কাঁটা দিয়ে হত্যা করার কথা সবাই জানে ; আমি ভাবলাম এ ক্ষেত্রে কাঁটা বোধ হয় হার্ট পর্যন্ত পৌঁছয়নি। কিন্তু হার্ট পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি—অবাক কাণ্ড। হার্ট নেই ! তারপর বুকের ডান দিকে হার্ট খুঁজে পেলাম। প্রকৃতির খেয়ালে ছোকরা ডান দিকে হার্ট নিয়ে জন্মেছে।

'শজারুর কাঁটা হার্টকে বিঁধতে পারেনি বটে, কিন্তু বাঁ দিকের ফুসফুসে বিঁধেছে। সেটাও কম সিরিয়াস নয়। যতক্ষণ কাঁটা বিঁধে আছে, ততক্ষণ রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে না, কিন্তু কাঁটা বার করলেই ফুসফুসের মধ্যে রক্তপাত হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

'যাহোক, খুব সাবধানে পিঠ থেকে কাঁটা বার করলাম। ছ' ইঞ্চি লম্বা কাঁটা, তার দু'ইঞ্চি বাইরে বেরিয়ে ছিল, বাকিটা সোজা ফুসফুসের মধ্যে ঢুকেছিল। এই দেখুন সেই কাঁটা।'

ডাক্তার পকেট থেকে একটি শজারুর কাঁটা বার করে ব্যোমকেশের হাতে দিলেন। শজারুর কাঁটা অনেকেই দেখেছেন, সবিস্তারে বর্ণনার প্রয়োজন নেই। এই কাঁটাটি নরুনের মত সরু, কাচের কাঠির মত অনমনীয় এবং ডাক্তারি শল্যের মত তীক্ষ্ণাগ্র। মারাত্মক অস্ত্রটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ব্যোমকেশ রাখালবাবুর হাতে দিল, বলল—'তারপর বলুন।'

ডাক্তার বললেন—'কাঁটা বার করলাম। ছোকরার বরাত ভাল ফুসফুসের মধ্যে রক্তপাত হল না। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হল, নিজের ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে স্ত্রীর কাছে খবর পাঠাতে বলল। তারপর তাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ালাম। ওর স্ত্রী যখন এল তখন ও ঘুমুচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলল—'বাইরে একটি মেয়ে বসে আছে, সেই কি— ?'

ডাক্তার বললেন—'হ্যাঁ, দেবাশিসের স্ত্রী। ও স্বামীর কাছে থাকতে চায়, কিন্তু এখন তো তা সম্ভব নয়। ওকে বললাম, বাড়ি ফিরে যাও ; কিন্তু ও যাবে না।'

'ওকে স্বামীর কাছে যেতে দেওয়া হয়েছিল ?'

'একবার ঘরে গিয়ে স্বামীকে দেখে এসেছে। আমরা আশ্বাস দিয়েছি, আশঙ্কার বিশেষ কারণ নেই, তুমি বাড়ি যাও, কাল সকালে আবার এস। কিন্তু ও কিছুতেই যাবে না।'

ব্যোমকেশ উঠবার উপক্রম করে বলল—'আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।'

ডাক্তার বললেন—'বেশ তো, দেখুন না। কিন্তু একটা কথা। ওর স্বামীকে কেউ খুন করবার চেষ্টা করেছিল একথা ওকে বলা হয়নি, বলা হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টে বুকে চোট লেগেছে। আপনারাও তাই বলবেন। মেয়েটি এমনিতেই শক্ পেয়েছে, ওকথা শুনলে আরো বেশি শক্ পাবে।'

'না, বলব না।'

রাখালবাবু বললেন—'শজারুর কাঁটা আমি রাখলাম। এই নিয়ে চারটে হল।'

দীপা বেঞ্চির ওপর ঠিক আগের মতই সোজা হয়ে বসে ছিল, ব্যোমকেশ আর রাখালবাবু তার কাছে যেতেই সে উঠে দাঁড়াল। রাখালবাবু বললেন—'আমি পুলিসের লোক। ইনি শ্রীব্যোমকেশ বক্সী।'

ব্যোমকেশের নাম দীপার মনে কোনো দাগ কাটল না। তার শঙ্কাভরা চোখ একবার এর মুখে একবার ওর মুখে যাতায়াত করতে লাগল।

ব্যোমকেশ নরম সুরে বলল—'আপনি ভয় পাবেন না। আপনার স্বামীর গুরুতর আঘাত

লেগেছিল বটে, কিন্তু জীবনের আশঙ্কা আর নেই।'

দীপা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বোধ করি নিজেকে সংযত করল। তারপর ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল—'আমাকে ওঘরে থাকতে দিচ্ছে না কেন ?'

ব্যোমকেশ বলল—'দেখুন, আপনার স্বামীকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, এ সময় আপনি তাঁর কাছে থেকে কী করবেন ? তার চেয়ে—'

দীপা বলল—'না, আমাকে যদি ওঁর কাছে থাকতে না দেওয়া হয়, আমি সারা রাত্রি এখানে বসে থাকব।'

ব্যোমকেশ বলল—'কিন্তু রুগীর ঘরে ডাক্তার আর নার্স ছাড়া এসময় অন্য কারুর থাকা নিষেধ।'

দীপা বলল—'আমি কিছু করব না, খাটের একপাশে চুপটি করে বসে থাকব।'

ব্যোমকেশ আরো কিছুক্ষণ দীপাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে টলাতে পারল না। তখন সে মাথা চুলকে বলল—'আচ্ছা, ডাক্তারবাবুকে বলে দেখি। দেবাশিসবাবুর কি অন্য কোনো আত্মীয় এখানে নেই ?'

'না, ওঁর অন্য কোনো আত্মীয় নেই।'

'আপনার নিশ্চয় আত্মীয়স্বজন আছেন। তাঁরা কোথায় থাকেন, তাঁদের খবর দেওয়া হয়েছে ?'

দীপা বলল—'তাঁরা কাছেই থাকেন, কিন্তু তাঁদের খবর দিতে ভুল হয়ে গেছে।'

ব্যোমকেশ বলল—'ঠিকানা দিন, আমরা তাঁদের খবর দিচ্ছি।'

দীপা ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিল। ব্যোমকেশ তখন ডাক্তার গুপ্তর কাছে ফিরে গিয়ে বলল—'ডাক্তারবাবু, বউটিকে স্বামীর কাছে থাকতে দিন। ও বুদ্ধিমতী বলেই মনে হল, কিন্তু বড় ভয় পেয়েছে।'

ডাক্তারবাবু দু' একবার আপত্তি করলেন, স্ত্রীজাতি বড় ভাবপ্রবণ, আবেগের বশে যদি স্বামীকে আঁকড়ে ধরে, ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হলেন। ব্যোমকেশ দীপাকে ডেকে এনে যে ঘরে দেবাশিস ছিল সেই ঘরে নিয়ে গেল। দীপা পা টিপে টিপে গিয়ে খাটের পাশে দাঁড়াল, সামনের দিকে ঝুঁকে ব্যগ্র চোখে দেবাশিসের মুখ দেখল। দেবাশিস পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, তার মুখের ভাব শান্ত প্রসন্ন। দীপা তার মুখের ওপর চোখ রেখে অতি সন্তর্পণে খাটের পাশে বসল। একজন নার্সও সঙ্গে এসেছিল, সে ঠোঁটে আঙুল রেখে দীপাকে সতর্ক করে দিল।

রাত্রি এগারোটার সময় হাসপাতাল থেকে বেরুবার পথে রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে চাইলেন—'বউটির বাপের বাড়িতে টেলিফোন করতে হবে।'

ব্যোমকেশ বলল—'না, সশরীরে সেখানে উপস্থিত হওয়া দরকার। আজ রাত্রে তোমার বিশ্রাম নেই।'

রাখালবাবু বললেন—'আমি বিশ্রামের জন্যে ব্যস্ত নই।'

পুলিসের গাড়িতে দীপার বাপের বাড়িতে পৌঁছুতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। রাস্তা নিরালা, বাড়ির সদর দোর বন্ধ। রাখালবাবু সজোরে কড়া নাড়লেন।

কিছুক্ষণ পরে বিজয় ঘুম-চোখে দরজা একটু ফাঁক করে বলল—'কে ? কি চাই ?'

রাখালবাবু বলল—'ভয় নেই, দোর খুলুন। আমরা পুলিসের লোক।'

ইতিমধ্যে নীলমাধব উপস্থিত হয়েছেন। বিজয় দোর খুলে দিল, রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ভিতরে এসে প্রশ্ন করলেন—'দেবাশিস ভট্ট আপনাদের কে ?'

নীলমাধব বললেন—'আমার জামাই। কি হয়েছে ?'

রাখালবাবু বললেন—'একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আপনার জামাই বুকে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আছেন। আপনার মেয়েও খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছেন।'

নীলমাধব বললেন—'অ্যাঁ ! কোন্ হাসপাতালে ?'

'রাসবিহারী হাসপাতালে। ভয় পাবেন না আঘাত গুরুতর হলেও জীবনের আশঙ্কা নেই।'

'আমরা এখনি যাচ্ছি। বিজয়, তুমি এদের বসাও, আমি তোমার মাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

তিনি ছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। ব্যোমকেশ বিজয়কে প্রশ্ন করল—'দেবাশিসবাবু আপনার ভগিনীপতি ?'

'হ্যাঁ। আমিও হাসপাতালে যাব।'

'না আপনার সঙ্গে আমাদের একটু আলোচনা আছে।'

খানিক পরে নীলমাধব আধ-ঘোমটা টানা স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। রাখালবাবু বললেন—'আপনারা পুলিসের গাড়িতেই যান। গাড়ি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। ততক্ষণ আমরা এখানেই আছি।'

তাঁদের রওনা করে দিয়ে তিনজনে বৈঠকখানায় এসে বসলেন। ব্যোমকেশ বিজয়কে প্রশ্ন করল—'আপনার বোনের কত দিন বিয়ে হয়েছে ?'

বিজয় বলল—'দু'মাসের কিছু বেশি।'

'আপনার ভগিনীপতি কি কাজ করেন ?'

বিজয় 'প্রজাপতি প্রসাধন ফ্যাক্টরি'র কথা বলল।

'তাঁর আত্মীয়স্বজন কেউ নেই ?'

'যতদূর জানি, কেউ নেই !'

'বন্ধুবান্ধব ?'

'অন্য বন্ধুবান্ধবের কথা জানি না, কিন্তু নৃপতিদার আড্ডায় যারা যায় তাদের সঙ্গে দেবাশিসের ঘনিষ্ঠতা আছে।' নৃপতি লাহার আড্ডার পরিচয় দিয়ে বিজয় বলল—'কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন ?'

ব্যোমকেশ একবার রাখালবাবুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে বলল—'আপনাকে বলছি, আপনি উপস্থিত অন্য কাউকে বলবেন না, দেবাশিসবাবুকে কেউ খুন করবার চেষ্টা করেছিল।'

বিজয়ের চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল, সে উত্তেজিত হয়ে বলল—'আমি জানতাম।'

ব্যোমকেশের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল—'কী জানতেন ?'

'জানতাম যে, এই ঘটবে।'

'জানতেন এই ঘটবে ! কী জানতেন সব কথা বলুন।'

উত্তেজনার ঝোঁকে কথাটা বলে ফেলেই বিজয় থমকে গেল। আর কিছু বলতে চায় না, এ-কথা সে-কথা বলে আসল কথাটা চাপা দিতে চায়। ব্যোমকেশ তখন গম্ভীরভাবে বলল—'দেখুন, দেবাশিসবাবুর শত্রু তাঁকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল, দৈবক্রমে তাঁর প্রাণ বেঁচে গেছে। আপনি যদি আসামীকে আড়াল করবার চেষ্টা করেন তাহলে সে আবার চেষ্টা করবে। আপনি কি চান, আপনার বোন বিধবা হন ?'

তখন বিজয় বলল—'আমি যা জানি বলছি। কিন্তু কে আসামী, আমি জানি না।'

বিজয় দীপার প্রেম কাহিনী শোনাল। শুনে ব্যোমকেশ একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল—'মনে হয়, আপনার বোনের ছেলেমানুষী ভালবাসার নেশা কেটে গেছে। আচ্ছা, আজ আমরা উঠলাম। কাল বিকেলবেলা আমরা নৃপতিবাবুর বাড়িতে যাব। আপনিও উপস্থিত থাকবেন।'

ইতিমধ্যে পুলিসের গাড়ি ফিরে এসেছিল। ব্যোমকেশ গাড়িতে উঠে রাখালবাবুকে বলল—'আজ এই পর্যন্ত। কাল সকালে আবার হাসপাতালে যাব।'

হাসপাতালে রাত্রি আড়াইটের সময় দেবাশিসের ঘুম ভাঙল। চোখ চেয়ে দেখল, একটি মুখ তার মুখের পানে ঝুঁকে অপলক চেয়ে আছে। ভারি মিষ্টি মুখখানি। দেবাশিস আস্তে আস্তে বলল—'দীপা, কখন এলে ?'

দীপা উত্তর দিতে পারল না, দেবাশিসের কপালে কপাল রেখে চুপ করে রইল।

'দীপা।'

'উঁ।'

'ক্ষিদে পেয়েছে।'

দীপা ত্বরিত মাথা তুলল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, নার্স ঘরে প্রবেশ করেছে। নার্স ইতিপূর্বে আরো কয়েকবার ঘরে এসে রুগীকে দেখে গেছে। বলল—'কি খবর? ঘুম ভেঙেছে?'

দীপা বলল—'হ্যাঁ। বলছেন, ক্ষিদে পেয়েছে।'

নার্স হেসে বলল—'বেশ। আমি ওভালটিন তৈরি করে রেখেছি, এখনি আনছি। আগে একবার নাড়িটা দেখি।' নাড়ি দেখে নার্স বলল—'চমৎকার। আমি এই এলুম বলে।'

নার্সের সঙ্গে সঙ্গে দীপা দোর পর্যন্ত গেল। নকুল তখনো দোরের পাশে বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। বলল—'বউদি, দাদাবাবু খেতে চাইছে?'

দীপা বলল—'হ্যাঁ।'

'জয় জগদীশ্বর! তাহলে আর ভয় নেই। বউদি, তুমিও তো কিছু খাওনি। তোমার ক্ষিদে পায়নি?'

দীপা একটু চুপ করে থেকে বলল—'পেয়েছে। নকুল, তুমি বাড়ি যাও। নিজে খেয়ো, আর আমার জন্যে কিছু নিয়ে এস।'

'আচ্ছা বউদি।'

নকুল চলে গেল। নার্স ফীডিং কাপে ওভালটিন এনে দেবাশিসকে খাওয়াল। তারপর দেবাশিস তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে দীপার একটি হাত মুঠির মধ্যে নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হলে দীপার মা বাবা বিজয় সকলে আবার এলেন। দেবাশিস তখন ঘুমোচ্ছে। দীপার মা দীপাকে বললেন—'দীপা, আমরা এখানে আছি, তুই বাড়ি যা, সেখানে স্নান করে একটু কিছু মুখে দিয়ে আবার আসিস।'

দীপা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলল—'না। নকুল আমার জন্যে খাবার এনেছিল, আমি খেয়েছি।'

বেলা আন্দাজ দশটার সময় ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু হাসপাতালে এলেন। ডাক্তার গুপ্ত একগাল হেসে বললেন—'ভাল খবর। ছোকরা এ যাত্রা বেঁচে গেল। সকালে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তবু এখনো অন্তত দু'তিন দিন হাসপাতালে থাকতে হবে।'

রাখালবাবু বললেন—'ভাল। আমরা তাহলে তার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

ডাক্তার বললেন—'পারেন। কিন্তু দশ মিনিটের বেশি নয়।'

ব্যোমকেশ বলল—'আপাতত দশ মিনিটই যথেষ্ট।'

দেবাশিস তখন পাশ ফিরে বিছানায় শুয়ে ছিল, আর দীপা তার মুখের কাছে ঝুঁকে চুপি চুপি কথা বলছিল। ব্যোমকেশ আর রাখালবাবুকে আসতে দেখে লজ্জিতভাবে উঠে দাঁড়াল।

ব্যোমকেশ স্মিতমুখে দীপাকে বলল—'আপনি কাল থেকে এখানে আছেন, এবার অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে যেতে হবে। আমরা ততক্ষণ দেবাশিসবাবুর কাছে আছি।'

দেবাশিস ক্ষীণকণ্ঠে বলল—'আমিও তো সেই কথাই বলছি।'

দীপা একটু ইতস্তত করল, তারপর অনিচ্ছাভরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলে গেল—'আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসব।'

ব্যোমকেশ আর রাখালবাবু তখন দেবাশিসের সামনে চেয়ার টেনে বসলেন, রাখালবাবু নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন—'আমরা আপনাকে দু'চারটি প্রশ্ন করব।'

দেবাশিস বলল—'বেশ তো, করুন।'

অতঃপর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হল।

'আপনি কাল সন্ধ্যের পর লেকে বেড়াতে গিয়েছিলেন?'

'ঠিক বেড়াতে যাইনি, তবে গিয়েছিলাম।'

'কেন গিয়েছিলেন ?'

'একজন বন্ধু টেলিফোন করে ডেকেছিল।'

'কে বন্ধু ? নাম কি ?'

'খড়্গ বাহাদুর।'

'খড়্গ বাহাদুর ! নেপালী নাকি ?'

'হ্যাঁ। নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়।'

'ও সেই ! তা লেকের ধারে ডেকেছিল কেন ?'

'ব্যক্তিগত কারণ। যদি না বললে চলে—'

'চলবে না। বলুন।'

'ওর কিছু টাকার দরকার হয়েছিল, তাই আমার কাছে ধার চাইবার জন্য ডেকেছিল।'

'আপনার বাড়িতে আসেনি কেন ?'

'তা জানি না। বোধ হয় বাড়িতে আসতে সঙ্কোচ হয়েছিল, যদি কেউ জানতে পারে।'

'হুঁ। কত টাকা চেয়েছিল ?'

'এক হাজার।'

'আপনি টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন ?'

'না না, খড়্গ টেলিফোনে টাকার কথা বলেনি। শুধু বলেছিল জরুরী দরকার আছে।'

'তারপর ?'

'গিয়ে দেখলাম, সে বড় ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ; দু'জনে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। খড়্গ টাকার কথা বলল ; আমি রাজী হলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর খড়্গ চলে গেল, তার অন্য একজনের সঙ্গে দেখা করবার ছিল। আমি একলা বসে রইলাম। হঠাৎ পিঠে দারুণ যন্ত্রণা হল। তারপর আর মনে নেই।'

'পিছন দিকে কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন ?'

'না।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল—'আপনার হৃৎপিণ্ড যে শরীরের ডান দিকে একথা আপনার স্ত্রী নিশ্চয় জানেন ?'

দেবাশিস চোখ বুজে একটু চুপ করে রইল, শেষে বলল—'না, ও বোধহয় জানে না।'

'আপনার বন্ধুরা জানেন ?'

'না, আমার বন্ধু বড় কেউ নেই, সহকর্মী আছে। সম্প্রতি মাস দুয়েক থেকে আমি নৃপতিদার বাড়িতে যাই, সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে।'

'নৃপতিবাবুর বাড়ির বন্ধুরা কেউ জানে ?'

'না।'

'কেউ জানে না ?'

'বাবা জানতেন আর ডাক্তারবাবুরা জানেন।'

'এমন কেউ আছে আপনার মৃত্যুতে যার লাভ হবে ?'

'কেউ না।'

'আচ্ছা, আজ আর আপনাকে বেশি প্রশ্ন করব না। আপনি সেরে উঠুন, তারপর যদি দরকার হয় তখন দেখা যাবে।'

সন্ধ্যের পর নৃপতির ঘরে আড্ডাধারীরা সকলেই উপস্থিত হয়েছিল। বিজয়ও ছিল। সকলের মুখেই উদ্বেগের গাম্ভীর্য। আজ প্রবাল পিয়ানো বাজাচ্ছে না, তক্তপোশের ওপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। বিজয়ের মুখে দেবাশিসের কথা শোনার পর সকলেই মুহ্যমান। খবরের কাগজের দুঃসংবাদ হঠাৎ নিজের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রবাল মুখ তুলে প্রশ্ন করল—'ব্যোমকেশ বক্সী কে ?'

কপিল মুখের একটা ব্যঙ্গ-বঙ্কিম ভঙ্গী করল। বিজয় উত্তর দেবার জন্যে মুখ খুলল কিন্তু উওর দেবার দরকার হল না, সদর দরজার বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু প্রবেশ করলেন।

সকলে উঠে দাঁড়াল। নৃপতি এগিয়ে গিয়ে বলল—'আসুন, আমরা আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। আমার নাম নৃপতি লাহা। এঁরা—' নৃপতি একে একে কপিল, প্রবাল, সুজন ও খড়্গ বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, তারপর চেয়ারে বসিয়ে সিগারেট দিল—'বিজয়ের মুখে আমরা সবই শুনেছি।'

ব্যোমকেশ একটু ভর্ৎসনার চোখে বিজয়ের পানে চাইল, বিজয় কুণ্ঠিতভাবে বলল—'হ্যাঁ ব্যোমকেশবাবু, এরা ছাড়ল না, শজারুর কাঁটার কথা এদের বলেছি।'

খড়্গ বাহাদুর বলল—'আচ্ছা ব্যোমকেশবাবু, এই যে শজারুর কাঁটা নিয়ে ব্যাপার, এটা কী ? আপনার কি মনে হয় এসব একটা পাগলের কাজ ?'

ব্যোমকেশ বলল—'পাগলের কাজ হতে পারে, আবার পাগল সাজার চেষ্টাও হতে পারে।'

সুজন বলল—'সেটা কি রকম ?'

ব্যোমকেশ বলল—'পাগল সাজলে অনেক সময় খুনের দায়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বড় জোর পাগলা গারদে বন্ধ করে রাখে, ফাঁসি হয় না, এই আর কি। আপনারা দেবাশিসবাবুর বন্ধু, তাঁর জীবন সম্বন্ধে নিশ্চয় অনেক কিছু জানেন।'

নৃপতি বলল—'দেবাশিসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশি দিনের নয়। আমাদের মধ্যে কেবল প্রবাল তাকে আগে থেকে চিনত।' বলে প্রবালের দিকে আঙুল দেখাল।

ব্যোমকেশ প্রবালের দিকে চাইল। প্রবাল গলা পরিষ্কার করে বলল—'স্কুলে দেবাশিসের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছিলাম। তার সঙ্গে পরিচয় ছিল কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল না।'

'বন্ধুত্ব ছিল না !'

'বন্ধুত্ব ছিল না, অসদ্‌ভাবও ছিল না। তারপর ও পাস করে দিল্লী চলে গেল, অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। মাস দু'-এক আগে এই ঘরে তাকে আবার দেখলাম।'

'ও'—ব্যোমকেশ সিগারেটে দু'তিনটে টান দিয়ে খড়্গ বাহাদুরের দিকে চোখ ফেরাল। বলল—'কাল রাত্রে আন্দাজ আটটার সময় আপনি দেবাশিসবাবুকে টেলিফোন করেছিলেন ?'

খড়্গ বাহাদুর বোধহয় প্রশ্নটা প্রতীক্ষা করছিল, সংযত স্বরে বলল—'হ্যাঁ।'

'কোথা থেকে টেলিফোন করেছিলেন ?'

'এখান থেকে। নৃপতিদার টেলিফোন আছে। আমার সকলেই দরকার হলে ব্যবহার করি। কাল আমরা সকলেই এখানে ছিলাম, দেবাশিস ছাড়া। তার আশায় অনেকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করলাম। কিন্তু সে যখন এল না তখন তাকে টেলিফোন করেছিলাম।'

'তারপর লেকে দেখা হয়েছিল। এখন একটা কথা বলুন দেখি, আপনি যখন দেবাশিসবাবুকে ছেড়ে চলে আসেন তখন আশেপাশে কাউকে দেখেছিলেন ?'

'দেখে থাকলেও লক্ষ্য করিনি। আমরা একটা গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসেছিলাম। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, লোকজন বেশি ছিল না।'

ব্যোমকেশ তখন নৃপতিকে বলল—'আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। আমরা আপনাদের পৃথকভাবে প্রশ্ন করতে চাই। আমরা একটা ঘরে গিয়ে বসব, আর আপনারা একে একে আসবেন। ছোট একটা ঘর পাওয়া যাবে কি ?'

নৃপতি বলল—'পাশেই ছোট ঘর আছে, আসুন দেখাচ্ছি।'

পরদা-ঢাকা দরজা দিয়ে নৃপতি তাদের পাশের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটি ছোট, কয়েকটি চেয়ারের মাঝখানে একটি গোল টেবিল, টেবিলের ওপর টেলিফোন যন্ত্র।

ব্যোমকেশ বলল—'এই তো ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম। রাখাল, তুমি সভাপতির আসন

অলঙ্কৃত কর। নৃপতিবাবু, আপনি বাকি সকলকে বসতে বলে আসুন। আগে আপনার জেরা শেষ করে একে একে ওঁদের ডাকব।'

ছোট্ট ঘরটিতে এজলাস বসল। প্রশ্নোত্তর চলল। চাকর কফি দিয়ে গেল। একে একে সকলে সাক্ষী দিল। সকলের শেষে এল বিজয়। ব্যোমকেশ তাকে বলল, 'বিজয়বাবু, আপনার বোনের আইবুড়ো বেলার বই-খাতা জিনিসপত্র নিশ্চয় এখনো আপনাদের বাড়িতে আছে ? বেশ। কাল আমরা যাব, একটু নেড়েচেড়ে দেখব যদি দরকারী কিছু পাওয়া যায়।'

বিজয় বলল, 'আচ্ছা।'

অতঃপর সভা ভঙ্গ হল। দশটা বাজতে তখন বেশি দেরি নেই।

পরদিন সকাল আটটার সময় বিজয় নিজেদের বাড়িতে অপেক্ষা করছিল, ব্যোমকেশ আর রাখালবাবু আসতেই তাঁদের দোতলায় দীপার ঘরে নিয়ে গেল। বলল—'এইটে দীপার ঘর। এই ঘরেই তার যা কিছু আছে, বিশেষ কিছু নিয়ে যায়নি।'

বেশ বড় ঘর। জানলার পাশে খাট বিছানা, অন্য পাশে টেবিল চেয়ার বই-এর আলমারি। পিছনের দেয়ালে একটি এস্রাজ ঝুলছে। টেবিলের মাঝখানে ছোট্ট একটি জাপানী ট্রান্‌জিস্টার রাখা আছে। ব্যোমকেশ ঘরের চারদিকে একবার সন্ধানী চোখ ফিরিয়ে বলল—'দীপা দেবীর দেখছি গানবাজনার শখ আছে।'

বিজয় বলল—'হ্যাঁ, একটু-আধটু এস্রাজ বাজাতেও জানে। নিজের চেষ্টাতে শিখেছে।'

'লেখাপড়া কত দূর শিখেছেন ?'

'স্কুলের পড়া শেষ পর্যন্ত পড়েছে। কলেজে দেওয়া হয়নি।'

'আপনার বাবা বাড়িতে আছেন ?'

'না। বাবা মা হাসপাতালে গেছেন।'

'দেবাশিসবাবু ভাল আছেন। আমি টেলিফোনে খবর নিয়েছিলাম। বোধহয় দু'-তিন দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে।'

'হ্যাঁ। আপনারা চা খাবেন ?'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল—'আপত্তি কি ? একবার হয়েছে, কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়।'

'আচ্ছা, আমি চা নিয়ে আসছি, আপনারা দেখুন। বই-এর আলমারির চাবি খুলে দিয়েছি। খাটের তলায় দুটো ট্রাঙ্ক আছে, তার চাবিও খোলা।'

বিজয় বেরিয়ে যাবার পর ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে বলল—'ঘরে তল্লাশ করার মত বিশেষ কিছু নেই দেখছি। আমি বই-এর আলমারিটা দেখি, তুমি ততক্ষণ ট্রাঙ্ক দুটো হাঁটকাও।'

রাখালবাবু খাটের তলা থেকে ট্রাঙ্ক দুটো টেনে বার করলেন, ব্যোমকেশ আলমারি খুলে বই দেখতে লাগল। বইগুলি বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো ; প্রথম সারিতে কবিতা আর গানের বই : সঞ্চয়িতা গীতবিতান দ্বিজেন্দ্রগীতি নজরুলগীতিকা প্রভৃতি। দ্বিতীয় থাকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কয়েক ভল্যুম গ্রন্থাবলী। নীচের থাকে স্কুল-পাঠ্য বই। দীপা স্কুলে পড়ার সময় যে বইগুলি পড়েছিল সেগুলি যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে।

ব্যোমকেশ বইগুলি একে একে খুলে দেখল, কিন্তু কোথাও এমন কিছু পেল না যা থেকে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আধুনিক কোনো লেখকের বই আলমারিতে নেই, এমন কি শরৎচন্দ্রের বইও না : এ থেকে পারিবারিক গোঁড়ামির পরিচয় পাওয়া যায়, দীপার মানসিক প্রবণতার কোনো ইশারা তাতে নেই।

'ব্যোমকেশদা, একবার এদিকে আসুন।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি একটা খোলা ট্রাঙ্কের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, সামনে মেয়েলী জামাকাপড়ের স্তূপ, হাতে পোস্টকার্ড আয়তনের একটি সুদৃশ্য

বাঁধানো খাতা। খাতাটি ব্যোমকেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে রাখালবাবু বললেন—'কাপড়-চোপড়ের তলায় ছিল। পড়ে দেখুন।'

অটোগ্রাফের খাতা। বেশির ভাগ পাতাই খালি, সামনের কয়েকটি পাতায় উদয়মাধব প্রভৃতি বাড়ির কয়েকজনের হস্তাক্ষর, দু'-একটি মেয়েলী কাঁচা হাতের নাম দস্তখত। তারপর একটি পাতায় একজনের স্বাক্ষরের ওপর একটি কবিতার ভগ্নাংশ—তোমার চোখের বিজলী-উজল আলোকে, পরাণে আমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে।—তারপর আর সব পৃষ্ঠা শূন্য।

অটোগ্রাফের খাতাটি যে দীপার তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, মলাটের ওপরেই তার নাম লেখা রয়েছে।

যিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা একটু মোচড় দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন তাঁর নামটি অপরিচিত নয়, তিনি বিশেষ একটি আড্ডার নিয়মিত সভ্য।

ব্যোমকেশ খাটো গলায় বলল—'হুঁ! আমাদের সন্দেহ তাহলে মিথ্যে নয়।'

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ব্যোমকেশ চট্‌ করে অটোগ্রাফের খাতাটি পকেটে পুরে রাখালবাবুকে চোখের ইশারা করল।

বিজয় দু'হাতে দু' পেয়ালা চা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল, বলল—'আসুন। কিছু পেলেন?'

রাখালবাবু কেবল গলার মধ্যে শব্দ করলেন, ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল—'সত্যান্বেষণের পথ বড় দুর্গম। কোথায় কোন কানা গলির মধ্যে সত্য লুকিয়ে আছে, কে বলতে পারে! যাহোক, নিরাশ হবেন না, দু'-চার দিনের মধ্যেই আসামী ধরা পড়বে।'

তারপর দু'জনে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় যেতে যেতে রাখালবাবু বললেন—'তাহলে এখন বাকি রইল শুধু আসামীকে গ্রেপ্তার করা। অবশ্য পাকা রকম সাক্ষীসাবুদ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে পাকড়ানো যাবে না।'

ব্যোমকেশ বলল—'না, তাকে পাকড়াবার একটা ফন্দি বার করতে হবে। কিন্তু তার আগে নিঃসংশয়ভাবে জানা দরকার, দেবাশিসের স্ত্রী এ ব্যাপারে কতখানি লিপ্ত আছে।'

হাসপাতালে ডাক্তার গুপ্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। একটি নিভৃত ঘরে দীপার সঙ্গে ব্যোমকেশ ও রাখালবাবুর কথা হল। ব্যোমকেশ বলল—'আমরা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। কেন প্রশ্ন করতে চাই এখন জানতে চাইবেন না, পরে আপনিই জানতে পারবেন।'

দীপা সহজভাবে বলল—'কি জানতে চান, বলুন।' তার মুখে আতঙ্কের ভাব আর নেই, সে তার স্বাভাবিক সাহস অনেকটা ফিরে পেয়েছে।

সওয়াল জবাব আরম্ভ হল। রাখালবাবু অচঞ্চল চোখে দীপার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

ব্যোমকেশ বলল—'নৃপতি লাহা নামে একটি ভদ্রলোকের বাড়িতে যাঁদের নিয়মিত আড্ডা বসে তাঁদের আপনি চেনেন?'

দীপার চোখের দৃষ্টি সতর্ক হল, সে বলল—'হ্যাঁ, চিনি। ওঁরা সবাই আমার দাদার বন্ধু।'

'ওঁরা আপনার বাপের বাড়িতে যাতায়াত করেন?'

'বাড়িতে কাজকর্ম থাকলে আসেন।'

'এঁদের নাম নৃপতি লাহা, সুজন মিত্র, কপিল বসু প্রবাল গুপ্ত, খড়্গা বাহাদুর। এঁদের ছাড়া আর কাউকে চেনেন?'

'না, কেবল এঁদেরই চিনি।'

'আচ্ছা, নৃপতি লাহা বিপত্নীক আপনি জানেন?'

'...যেন শুনেছিলাম।'

'এঁদের মধ্যে আর কারুর বিয়ে হয়েছে কিনা জানেন?'

'বোধহয়...আর কারুর বিয়ে হয়নি।'

'প্রবাল গুপ্ত কি বিবাহিত ?'
'ঠিক জানি না...বোধ হয় বিবাহিত নয়।'
'প্রবাল গুপ্ত বিবাহিত...সম্প্রতি স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে।'
'...আমি জানতাম না।'
'যাক। কপিল বসু লোকটিকে আপনার কেমন লাগে ?'
'ভালই তো।'
'ওর সম্বন্ধে কোনো কুৎসা শুনেছেন ?'
'না।'
'আর সুজন মিত্র ? সে সিনেমার আর্টিস্ট, তার সম্বন্ধে কিছু শোনেননি ?'
'না, ও-সব আমি কিছু শুনিনি।'
'আপনি সিনেমা দেখতে ভালবাসেন ?'
'হ্যাঁ।'
'সুজন মিত্রের অভিনয় কেমন লাগে ?'
'খুব ভাল।'
'উনি কেমন লোক ?'
'দাদার বন্ধু, ভালই হবেন। দাদা মন্দ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন না।'
'তা বটে। আপনি ফুটবল খেলা দেখেছেন ?'
'ছেলেবেলায় দেখেছি, যখন স্কুলে পড়তুম।'
'খড়্গ বাহাদুরের খেলা দেখেছেন ?'
'না...রেডিওতে খেলার কমেন্টারি শুনেছি।'
'এবার শেষ প্রশ্ন। —আপনার স্বামীর হৃদ্‌যন্ত্র বুকের ডান দিকে আপনি জানেন ?'
'জানি।'
ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলে চাইল—'জানেন ?'
'হ্যাঁ, কিছুদিন আগে দুপুর রাত্রে আমার স্বামীর কম্প দিয়ে জ্বর এসেছিল। আমাকে ডাক্তার ডাকতে বললেন। আমি জানতুম না ওঁদের পারিবারিক ডাক্তার কে, তাই আমার বাপের বাড়ির ডাক্তারকে ফোন করলাম। সেনকাকা এসে ওঁকে পরীক্ষা করলেন, তারপর যাবার সময় আমাকে আড়ালে বলে গেলেন যে, ওঁর হৃদ্‌যন্ত্র উল্টো দিকে। এরকম নাকি খুব বেশি দেখা যায় না।'
প্রকাণ্ড হাঁফ-ছাড়া নিশ্বাস ফেলে ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল, বলল—'আমার বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। আর কিছু জানবার নেই, আপনি স্বামীর কাছে যান। —চলো রাখাল।'
হাসপাতালের বাইরে এসে ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে প্রশ্ন করল—'কি দেখলে ? কি বুঝলে ?'
রাখালবাবু বললেন—'কোনো ভুল নেই, মেয়েটি নির্দোষ। প্রতিক্রিয়া যখন যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, ঠিক তেমনটি পাওয়া গেছে। এখন কিং কর্তব্য ?'
ব্যোমকেশ বলল— 'এখন তুমি থানায় যাও, আমি বাড়ি যাই। ভাল কথা, একটা বুলেট-প্রুফ গেঞ্জি যোগাড় করতে পার ?'
'পারি। কী হবে ?'
'একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। আজ রাত্রে গেঞ্জি নিয়ে আমার বাড়িতে এস, তখন বলব।'

সন্ধ্যের পর ব্যোমকেশ একা নৃপতির আড্ডায় গেল। সকলেই উপস্থিত ছিল, ব্যোমকেশকে ছেঁকে ধরল। নৃপতি তার সামনে সিগারেটের কৌটো খুলে ধরে বলল—'খবর নিয়েছি দু'-এক দিনের মধ্যেই দেবাশিসকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। ওর বিপন্মুক্তি উপলক্ষে আমি পার্টি দেব, আপনাকে আসতে হবে।'

ব্যোমকেশ বলল—'নিশ্চয় আসব।'

কপিল ব্যোমকেশের গা ঘেঁষে বসে আবদারের সুরে বলল—'আপনার সত্যান্বেষণ কত দূর অগ্রসর হল, বলুন না ব্যোমকেশবাবু।'

ব্যোমকেশ হেসে বলল—'দিল্লী দূরস্ত। শজারুর কাঁটার ওস্তাদটি কে তা এখনো জানা যায়নি। তবে একটা থিওরি খাড়া করেছি।'

সুজন গলা বাড়িয়ে বলল—'কি রকম থিওরি?'

ব্যোমকেশ সিগারেটে কয়েকটা ধীর মন্থর টান দিয়ে বলতে আরম্ভ করল—'ব্যাপারটা হচ্ছে এই। কোনো একজন অজ্ঞাত লোক শজারুর কাঁটা দিয়ে প্রথমে একটা ভিখিরিকে খুন করল, তারপর এক মজুরকে খুন করল, তারপর আবার খুন করল এক দোকানদারকে। এবং সর্বশেষে দেবাশিসবাবুকে খুন করবার চেষ্টা করল। চার বারই অস্ত্র হচ্ছে শজারুর কাঁটা। অর্থাৎ হত্যাকারী জানাতে চায় যে চারটি হত্যাকার্য একই লোকের কাজ।

'এখন হত্যাকারী যদি পাগল হয় তাহলে কিছুই করবার নেই। পাগল অনেক রকম হয়; এক ধরনের পাগল আছে যাদের পাগল বলে চেনা যায় না; তারা অত্যন্ত ধূর্ত, তাদের খুন করার কোনো যুক্তিসঙ্গত মোটিভ থাকে না। এই ধরনের পাগলকে ধরা বড় কঠিন।

'কিন্তু যদি পাগল না হয়? যদি পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে কেউ পাগল সেজে শজারুর কাঁটার ফন্দি বার করে থাকে? মনে করুন, দেবাশিসবাবুর এমন কোনো গুপ্ত শত্রু আছে যে তাঁকে খুন করতে চায়। সরাসরি খুন করলে ধরা পড়ার ভয় বেশি, তাই সে ভিখিরি খুন করে কাজ আরম্ভ করল; তারপর মজুর, তারপর দোকানদার, তারপর দেবাশিসবাবু। স্বভাবতই মনে হবে দেবাশিসবাবু হত্যাকারীর প্রধান লক্ষ্য নয়, একটা বিকৃতমস্তিষ্ক লোক যখন যাকে সুবিধে পাচ্ছে খুন করে যাচ্ছে। হত্যাকারী যে দেবাশিসবাবুকেই খুন করবার জন্যে এত ভণিতা করেছে তা কেউ বুঝতে পারবে না।—এই আমার থিওরি।'

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর নৃপতি বলল—'কিন্তু মনে করুন এর পর আবার একটা খুন হল শজারুর কাঁটা দিয়ে! তখন তো বলা চলবে না যে দেবাশিসই হত্যাকারীর আসল লক্ষ্য।'

ব্যোমকেশ বলল—'না। তখন আবার নতুন রাস্তা ধরতে হবে।'

কপিল বলল—'খুনীকে কি ধরা যাবে?'

ব্যোমকেশ বলল—'চেষ্টার ত্রুটি হবে না।'

এমন সময় কফি এল। প্রবাল উঠে গিয়ে পিয়ানোতে মৃদু টুং-টাং আরম্ভ করল। ব্যোমকেশ কফি শেষ করে আরো কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে বাড়ি ফিরে চলল।

ব্যোমকেশ বাড়ি ফিরে আসার কয়েক মিনিট পরে রাত্রি পৌনে ন'টার সময় রাখালবাবু এলেন। তাঁর হাতে একটি মোড়ক। ব্যোমকেশ বলল—'এনেছ?'

রাখালবাবু মোড়ক খুলে দেখালেন; ব্রোকেডের মত কাপড় দিয়ে তৈরি একটি ফতুয়া, কিন্তু সোনালী বা রূপালী জরির ব্রোকেড নয়, স্টীলের জরি দিয়ে তৈরি ঘন-পিনদ্ধ লৌহ-জালিক। জামার ভিতরে পরলে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু এই কঠিন বর্ম ভেদ করা ছোরাছুরি তো দূরের কথা, পিস্তল রিভলবারেরও অসাধ্য।

ব্যোমকেশ জামাটি নিয়ে নেড়েচেড়ে পাশে রাখল, বলল—'আমার গায়ে ঠিক হবে। এখন আর একটা কথা বলি; আমাদের শজারুর পিছনে লেজুড় লাগাবার ব্যবস্থা করেছ?'

রাখালবাবু বললেন—'সব ব্যবস্থা হয়েছে। আজ রাত্রি সাতটা থেকে লেজুড় লেগেছে, এক লহমার জন্যে তাকে চোখের আড়াল করা হবে না। দিনের বেলাও তার পিছনে লেজুড় থাকবে।'

ব্যোমকেশ বলল—'বেশ। এখন এস পরামর্শ করি। আমি পুকুরে চার ফেলে এসেছি—'

খাটো গলায় দু'জনের মধ্যে অনেকক্ষণ পরামর্শ হল। তারপর সাড়ে ন'টা বাজলে রাখালবাবু ওঠবার উপক্রম করছেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

ব্যোমকেশ ফোন তুলে নিয়ে বলল—'হ্যালো।'

অপর প্রান্ত থেকে চেনা গলা শোনা গেল—'ব্যোমকেশবাবু ? আপনি একলা আছেন ?'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর দিকে সঙ্কেত-ভরা দৃষ্টিপাত করে বলল—'হ্যাঁ, একলা আছি। আপনি—'

'গলা শুনে চিনতে পারছেন না ?'

'না। আপনার নাম ?'

'যখন গলা চিনতে পারেননি তখন নাম না জানলেও চলবে। আজ সন্ধ্যের পর আপনি যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে আমি ছিলাম। একটা গোপন খবর আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সকলের সামনে বলতে পারলাম না।'

'গোপন খবর ! শজারুর কাঁটা সম্বন্ধে ?'

'হ্যাঁ। আপনি যদি আজ রবীন্দ্র সরোবরের বড় ফটকের কাছে আসেন আপনাকে বলতে পারি।'

'বেশ তো, বেশ তো। কখন আসব বলুন।'

'যত শীগ্‌গির সম্ভব। আমি অপেক্ষা করব। একলা আসবেন কিন্তু। অন্য কারুর সামনে আমি কিছু বলব না।'

'বেশ। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরুচ্ছি।'

টেলিফোন রেখে ব্যোমকেশ যখন রাখালবাবুর দিকে তাকাল তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। পাঞ্জাবির বোতাম খুলতে খুলতে সে বলল, 'টোপ ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মাছ টোপ গিলেছে। এত শীগ্‌গির ওষুধ ধরবে ভাবিনি। রাখাল, তুমি—'

ব্যোমকেশ পাঞ্জাবি খুলে ফেলল, রাখালবাবু তাকে বুলেট-প্রুফ ফতুয়া পরাতে পরাতে বললেন—'আমার জন্যে ভাববেন না, আমি ঠিক যথাস্থানে থাকব। শজারুর পিছনে লেজুড় আছে, তিনজনে মিলে শজারুকে কাবু করা শক্ত হবে না।'

'বেশ।' ব্যোমকেশ ফতুয়ার ওপর আবার পাঞ্জাবি পরল, তারপর রাখালবাবুর দিকে একবার অর্থপূর্ণ ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল। রাখালবাবু কব্জিতে ঘড়ি দেখলেন, দশটা বাজতে কুড়ি মিনিট। তিনিও বেরিয়ে পড়লেন। প্রচ্ছন্নভাবে যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে হবে।

রবীন্দ্র সরোবরের সদর ফটকের সামনে লোক চলাচল নেই ; কদাচিৎ একটা বাস কিংবা মোটর হুস করে সাদার্ন অ্যাভেন্যু দিয়ে চলে যাচ্ছে।

ব্যোমকেশ দ্রুতপদে সাদার্ন অ্যাভেন্যু রাস্তা পেরিয়ে ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ; এদিক-ওদিক তাকাল কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। রবীন্দ্র সরোবরের ভিতরে আলো-আঁধারিতে জনমানব চোখে পড়ে না।

ব্যোমকেশ ফটকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত করল, তারপর ভিতর দিকে অগ্রসর হল। দু'-চার পা এগিয়েছে, একটি লোক অদূরের গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল, হাত তুলে ব্যোমকেশকে ইশারা করে ডাকল। ব্যোমকেশ তার কাছে গেল, লোকটি বলল, 'চলুন, ওই বেঞ্চিতে বসা যাক।'

জলের ধারে গাছের তলায় বেঞ্চি পাতা। ব্যোমকেশ গিয়ে বেঞ্চিতে ডানদিকের কিনারায় বসল। চারিদিকের ঝিকিমিকি আলোতে অস্পষ্টভাবে মুখ দেখা যায়, তার বেশি নয়। ব্যোমকেশ বলল—'এবার বলুন, আপনি কি জানেন।'

লোকটি বলল—'বলছি। দেখুন, যার কথা বলতে চাই সে আমার ঘনিষ্ঠ লোক, তাই বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। সিগারেট আছে ?'

ব্যোমকেশ সিগারেটের প্যাকেট বার করে দিল ; লোকটি সিগারেট নিয়ে প্যাকেট ব্যোমকেশকে ফেরত দিল, নিজের পকেট থেকে বোধকরি দেশলাই বার করতে করতে হঠাৎ বলে উঠল—'দেখুন, দেখুন কে আসছে !' তার দৃষ্টি ব্যোমকেশকে পেরিয়ে পাশের দিকে প্রসারিত, যেন ব্যোমকেশের দিক থেকে কেউ আসছে।

ব্যোমকেশ সেই দিকে ঘুরে বসল। সে প্রস্তুত ছিল, অনুভব করল তার পিঠের বাঁ দিকে বুলেট-প্রুফ আবরণের ওপর চাপ পড়ছে। ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে পিছু ফিরল। লোকটি তার পিঠে শজারুর কাঁটা বিঁধিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল, পলকের জন্যে হতবুদ্ধির মত চাইল, তারপর দ্রুত উঠে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যোমকেশের বজ্রমুষ্টি লোহার মুগুরের মত তার চোয়ালে লেগে তাকে ধরাশায়ী করল।

ইতিমধ্যে আরো দু'টি মানুষ আলাদিনের জিনের মত আবির্ভূত হয়েছিল, তারা ধরাশায়ী লোকটির দু'হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল। রাখালবাবু তার হাত থেকে শজারুর কাঁটা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন—'প্রবাল গুপ্ত, তুমি তিনজনকে খুন করেছ এবং দু'জনকে খুন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছ। চল, এবার থানায় যেতে হবে।'

হপ্তা দুই পরে একদিন মেঘাচ্ছন্ন সকালবেলা ব্যোমকেশের বসবার ঘরে পারিবারিক চায়ের আসর বসেছিল। অজিত ছিল, সত্যবতীও ছিল। গত রাত্রি থেকে বর্ষণ আরম্ভ হয়েছে, মাঝে মাঝে থামছে, আবার আরম্ভ হচ্ছে। গ্রীষ্মের রক্তিম ক্রোধ স্নেহে বিগলিত হয়ে গেছে।

অজিত বলল—'এমন একটা গাইয়ে লোককে তুমি পুলিসে ধরিয়ে দিলে ! লোকটা বড় ভাল গায়। —সত্যিই এতগুলো খুন করেছে ?'

সত্যবতী বলল—'লোকটা নিশ্চয় পাগল।'

ব্যোমকেশ বলল—'প্রবাল গুপ্ত পাগল নয় ; কিন্তু একেবারে প্রকৃতিস্থ মানুষও নয়। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিল, হঠাৎ দৈব-দুর্বিপাকে গরীব হয়ে গেল ; দারিদ্র্যের তিক্ত রসে ওর মনটা বিষিয়ে উঠল। ওর চরিত্রে ষড়রিপুর মধ্যে দুটো বলবান—লোভ আর ঈর্ষা। দারিদ্র্যের আবহাওয়ায় এই দুটো রিপু তাকে প্রকৃতিস্থ থাকতে দেয়নি।'

সত্যবতী বলল—'সব কথা পরিষ্কার করে বল। তুমি বুঝলে কি করে যে প্রবাল গুপ্তই আসামী ?'

ব্যোমকেশ পেয়ালায় দ্বিতীয়বার চা ঢেলে সিগারেট ধরাল। আস্তে-আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে অলস কণ্ঠে বলতে শুরু করল—

'এই রহস্যের চাবি হচ্ছে শজারুর কাঁটা।

আততায়ী যদি পাগল হয় তাহলে আমরা অসহায়, বুদ্ধির দ্বারা তাকে ধরা যাবে না। কিন্তু যদি পাগল না হয় তখন ভেবে দেখতে হবে, সে ছোরা-ছুরি ছেড়ে শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করে কেন ? নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে। কী সেই উদ্দেশ্য ?

দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকবার আততায়ী শজারুর কাঁটা মৃতদেহে বিঁধে রেখে দিয়ে যায়, অর্থাৎ সে জানাতে চায় যে, এই খুনগুলো একই লোকের কাজ। যে ভিখিরিকে খুন করেছে, সে-ই মজুরকে খুন করেছে এবং দোকানদারকেও খুন করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে—কেন ?

আমার কাছে এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—ভিখিরি থেকে দোকানদার পর্যন্ত কেউ হত্যাকারীর আসল লক্ষ্য নয়, আসল লক্ষ্য অন্য লোক। কেবল পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে হত্যাকারী এলোপাথাড়ি তিনটে খুন করেছে, যাতে পুলিস কোনো মোটিভ খুঁজে না পায়।

তারপর চেষ্টা হল শজারুর কাঁটা দিয়ে দেবাশিসকে খুন করবার। দেবাশিস দৈব কৃপায় বেঁচে গেল, কিন্তু আততায়ী কে তা জানা গেল না।

আমার সত্যান্বেষণ আরম্ভ হল এইখান থেকে। দেবাশিসই যে হত্যাকারীর চরম লক্ষ্য তা এখনো নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু মনে হয় তার ওপরে আর কেউ নেই। ভিখিরি থেকে

শিল্পপতি, তার চেয়ে উঁচুতে আর কেউ না থাকাই সম্ভব। যাহোক, তদারক করে দেখা যেতে পারে।

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল, নৃপতির আড্ডায় যারা যাতায়াত করে তারা ছাড়া আর কারুর সঙ্গে দেবাশিসের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই ; ফ্যাক্টরির লোকেরা তাকে ভালবাসে, ফ্যাক্টরিতে আজ পর্যন্ত একবারও স্ট্রাইক হয়নি। আর একটা তথ্য জানা গেল, বিয়ের আগে দীপা একজনের প্রেমে পড়েছিল, তার সঙ্গে পালাতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তারপরে দেবাশিসের সঙ্গে দীপার বিয়ে হয়।

দীপার গুপ্ত প্রণয়ী কে ছিল দীপা ছাড়া কেউ তা জানে না। কে হতে পারে ? দীপার বাপের বাড়িতে গোঁড়া সাবেকী চাল, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশার অধিকার দীপার নেই, কেবল দাদার বন্ধুরা যখন বাড়িতে আসে তখন তাদের সঙ্গে সামান্য মেলামেশার সুযোগ পায়। সুতরাং তার প্রেমিক সম্ভবত তার দাদারই এক বন্ধু, অর্থাৎ নৃপতি কিংবা তার আড্ডার একজন।

এই সঙ্গে একটা মোটিভও পাওয়া যাচ্ছে। দীপার ব্যর্থ প্রেমিক তার স্বামীকে খুন করবার চেষ্টা করতে পারে যদি সে নৃশংস এবং বিবেকহীন হয়। যে-লোক শজারুর কাঁটা দিয়ে তিনটে খুন করেছে সে যে নৃশংস এবং বিবেকহীন তা বলাই বাহুল্য। নৃপতির আড্ডায় যারা আসত তাদের সঙ্গে দেবাশিসের আলাপ মাত্র দু'মাসের। কেবল একজনের সঙ্গে তার স্কুল থেকে চেনাশোনা ছিল, সে প্রবাল গুপ্ত। চেনাশোনা ছিল কিন্তু সম্প্রীতি ছিল না। প্রবাল গুপ্ত যদি দীপার প্রেমাস্পদ হয়—

বাকি ক'জনকেও আমি নেড়েচেড়ে দেখেছি। নৃপতির একটি স্ত্রীলোক আছে, তার কাছে সে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে অভিসারে যায়। সুজন মিত্র ব্যর্থ প্রেমিক, সে যাকে ভালবাসে বছরখানেক আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে। খড়্গা বাহাদুর এবং কপিলের জীবনে নারী-ঘটিত কোনো জটিলতা নেই। খড়্গা বাহাদুর শুধু ফুটবলই খেলে না, জুয়াও খেলে। কপিল আদর্শবাদী ছেলে, পৃথিবীর চেয়ে আকাশেই তার মন বেশি বিচরণ করে।

কিন্তু আর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দরকার নেই, সাঁটে বলছি। দীপার বাপের বাড়িতে তার ঘর তল্লাশ করে পাওয়া গেল একটি অটোগ্রাফের খাতা ; তাতে নৃপতির আড্ডার কেবল একটি লোকের হস্তাক্ষর আছে, সে প্রবাল গুপ্ত। প্রবাল লিখেছে—তোমার চোখের বিজলি-উজ্জ্বল আলোকে, পরাণে আমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে। তার কথায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। আরো জানা গেল দীপা গান ভালবাসে, কিন্তু প্রবাল যে বিবাহিত তা সে জানে না। সুতরাং কে গানের ফাঁদ পেতে দীপাকে ধরেছে তা জানতে বাকি রইল না।

তারপর আর একটি কথা লক্ষ্য করতে হবে। যেদিন ভোরবেলা ভিখিরিকে শজারুর কাঁটা দিয়ে মারা হয় সেইদিন রাত্রে দীপার ফুলশয্যা। সমাপতনটা আকস্মিক নয়।

এবার প্রবালের দিক থেকে গল্পটা শোন।

যারা জন্মাবধি গরীব, দারিদ্র্যে তাদের লজ্জা নেই ; কিন্তু যারা একদিন বড়মানুষ ছিল, পরে গরীব হয়ে গেছে, তাদের মনঃক্লেশ বড় দুঃসহ। প্রবালের হয়েছিল সেই অবস্থা। বাপ মারা যাবার পর সে অভাবের দারুণ দুঃখ ভোগ করেছিল, তার লোভী ঈর্ষালু প্রকৃতি দারিদ্র্যের চাপে বিকৃত হয়ে চতুর্গুণ লোভী এবং ঈর্ষালু হয়ে উঠেছিল। গান গেয়ে সে মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু তার প্রাণে সুখ ছিল না। একটা রুগ্ন মরণাপন্ন মেয়েকে বিয়ে করার ফলে তার জীবন আরো দুর্বহ হয়ে উঠেছিল।

কিছুদিন আগে ওর বউ মারা গেল। বউ মরার আগে থাকতেই বোধহয় ও দীপার জন্যে ফাঁদ পেতেছিল ; ও ভেবেছিল বড় ঘরের একমাত্র মেয়েকে যদি বিয়ে করতে পারে, ওর অবস্থা আপনা থেকেই শুধরে যাবে। দীপার চরিত্র যতই দৃঢ় হোক, সে গানের মোহে প্রবালের দিকে আকৃষ্ট

হল। মুখোমুখি দেখাসাক্ষাতের সুযোগ বেশি ছিল না। টেলিফোনে তাদের যোগাযোগ চলতে লাগল।

পালিয়ে গিয়ে দীপাকে বিয়ে করার মতলব প্রবালের গোড়া থেকেই ছিল ; দীপা যে ঠাকুরদার অনুমতি চাইতে গিয়েছিল সেটা নিতান্তই লোক-দেখানো ব্যাপার। প্রবাল জানত বুড়ো রাজী হবে না। কিন্তু পালিয়ে গিয়ে একবার বিয়েটা হয়ে গেলে আর ভয় নেই, দীপাকে তার বাপ-ঠাকুরদা ফেলতে পারবে না।

দীপা বাড়ি থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি দেবাশিসের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হল।

প্রবালের মনের অবস্থাটা ভেবে দেখ। অন্য কারুর সঙ্গে দীপার বিয়ে হলে সে বোধহয় এমন ক্ষেপে উঠত না। কিন্তু দেবাশিস! হিংসেয় রাগে তার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলতে লাগল।

বিয়ের সম্বন্ধ যখন স্থির হয়ে গেল তখন সে ঠিক করল দেবাশিসকে খুন করে তার বিধবাকে বিয়ে করবে। দীপা তখন স্বাধীন হবে, বাপের বাড়ির শাসন আর থাকবে না। দীপাকে বিয়ে করলে দেবাশিসের সম্পত্তি তার হাতে থাকবে। একসঙ্গে রাজকন্যে এবং রাজত্ব। দেবাশিসের আর কেউ নেই প্রবাল তা জানত।

কিন্তু প্রথমেই দেবাশিসকে খুন করা চলবে না। তাহলে সে যখন দীপাকে বিয়ে করবে তখন সকলের সন্দেহ তার ওপর পড়বে। ক্রূর এবং নৃশংস প্রকৃতির প্রবাল এমন এক ফন্দি বার করল যে, কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারবে না। শজারুর কাঁটার নাটকীয় খেলা আরম্ভ হল। তিনটে মানুষ বেঘোরে প্রাণ দিল।

যাহোক, প্রবাল দেবাশিসকে মারবার সুযোগ খুঁজছে। আমার বিশ্বাস সে সর্বদাই একটা শজারুর কাঁটা পকেটে নিয়ে বেড়াত ; কখন সুযোগ এসে যায় বলা যায় না। একদিন হঠাৎ সুযোগ এসে গেল।

নৃপতির আড্ডাঘরের পাশের ঘরে টেলিফোন আছে। দোরের পাশে পিয়ানো, প্রবাল সেখানে বসে ছিল ; শুনতে পেল খড়্গা বাহাদুর দেবাশিসকে টেলিফোন করছে, জানতে পারল ওরা রবীন্দ্র সরোবরের এক জায়গায় দেখা করবে। প্রবাল দেখল এই সুযোগ। শজারুর কাঁটা তার পকেটেই ছিল, সে যথাস্থানে গিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। তারপর—

প্রবাল জানত না যে প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় খামখেয়ালির ফলে দেবাশিসের হৃৎপিণ্ডটা বুকের ডান পাশে আছে। দীপা অবশ্য জানত। কিন্তু প্রবাল যে দেবাশিসকে খুন করে তাকে হস্তগত করার মতলব করেছে তা সে বুঝতে পারেনি। হাজার হোক মেয়েমানুষের বুদ্ধি ; বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'কখনো অর্ধেক বৈ পুরা দেখিলাম না।'

এই হল গল্প। আর কিছু জানবার আছে ?'

অজিত প্রশ্ন করল—'তোমাকে মারতে গিয়েছিল কেন ?'

ব্যোমকেশ বলল—'আমি সেদিন ওদের আড্ডায় গিয়ে বলে এসেছিলাম যে শজারুর কাঁটা দিয়ে যদি আর খুন না হয়, তাহলে বুঝতে হবে দেবাশিসই আততায়ীর প্রধান লক্ষ্য। তাই প্রবাল ঠিক করল আমাকে খুন করেই প্রমাণ করবে যে, দেবাশিস আততায়ীর প্রধান লক্ষ্য নয় ; সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। আমি যে তাকে ধরবার জন্যেই ফাঁদ পেতেছিলাম তা সে বুঝতে পারেনি।'

সত্যবতী গভীর নিশ্বাস ফেলে বলল—'বাব্বা! কী রাক্কুসে মানুষ! দীপার কিন্তু কোনো দোষ নেই। একটা সহজ স্বাভাবিক মেয়েকে খাঁচার পাখির মত বন্ধ করে রাখলে সে উড়ে পালাবার চেষ্টা করবে না ?'

খুট খুট করে সদর দরজায় টোকা পড়ল। ব্যোমকেশ উঠে গিয়ে দোর খুলল—'আরে দেবাশিসবাবু যে! আসুন আসুন।'

দেবাশিস সঙ্কুচিতভাবে ঘরে প্রবেশ করল। সত্যবতী উঠে দাঁড়িয়েছিল, দেবাশিসের নাম

শুনে পরম আগ্রহে তার পানে চাইল। দেবাশিসের চেহারা আবার আগের মত হয়েছে, দেখলে মনে হয় না সে সম্প্রতি যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছে। সে হাত জোড় করে বলল—'আজ রাত্রে আমার বাড়িতে সামান্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছি, আপনাদের সকলকে যেতে হবে।'

ব্যোমকেশ বলল—'বেশ, বেশ। বসুন। তা উপলক্ষটা কী?'

দেবাশিস রুদ্ধ কণ্ঠে বলল—'ব্যোমকেশদা, আজ আমাদের সত্যিকার ফুলশয্যা। দীপাকে আমার সঙ্গে আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে লজ্জায় আধমরা হয়ে আছে, এল না। বউদি, আপনি নিশ্চয় আসবেন, নইলে দীপার লজ্জা ভাঙবে না।'

বেণীসংহার

এক

সকালবেলা ব্যোমকেশ তার কেয়াতলার বাড়িতে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল। শীতের সকাল, বেলা আন্দাজ আটটা। অজিত ইতিমধ্যেই তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে, একজন প্রখ্যাত লেখকের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে হবে। লেখক মহাশয় একটি নতুন বই দেবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন, কিন্তু প্রখ্যাত লেখকদের অনেক উমেদার, বইটা আগেভাগে হস্তগত করা দরকার।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি শেষ করে ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা তুলে নিল। পেয়ালার অবশিষ্ট চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, সে এক চুমুকে পেয়ালা নিঃশেষ করে আবার কাগজ তুলে নিল। এবার খবর পড়তে হবে।

আজকাল খবরের কাগজ পড়লেই বোঝা যায় পৃথিবীর অবস্থা প্রকৃতিস্থ নয়। ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি তো আছেই, তা ছাড়া মানুষগুলোও যেন ক্ষেপে গেছে। যুদ্ধ বিপ্লব অন্তর্বিবাদ ধর্মঘট ঘেরাও বোমা কাঁদানে গ্যাস লাঠালাঠি। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে বলেই বোধহয় কারুর প্রাণে শান্তি নেই। যেখানে এত গাদাগাদি ঠাসাঠাসি সেখানে শান্তি কোথা থেকে আসবে?

কাগজের পাতা ওল্টাতে হলো না। প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখা গেল এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। পরশু রাত্রে খুন হয়েছে, কাল সকালে জানাজানি হয়, আজ কাগজে বেরিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার ঘটনা, ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়; সদর রাস্তায় বেরিয়ে দক্ষিণে কিছু দূর গেলেই তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়িটা চোখে পড়ে, তার কপালের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা—বেণীমাধব। ব্যোমকেশ অনেকবার বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে কিন্তু বাড়ির অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ ছিল না। কাগজ থেকে জানা গেল বাড়ির মালিক বৃদ্ধ বেণীমাধব চক্রবর্তী এবং তাঁর দেহরক্ষীকে কেউ নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট মনে হত্যার বিবরণ পড়ল, তারপর অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাল। পরশু রাত্রে পাড়াতে এমন একটা লোমহর্ষণ খুন হয়ে গেছে, অথচ সে খবর পায়নি। রাখাল এই এলাকার দারোগা, সে নিশ্চয় তদন্তের ভার নিয়েছে; কিন্তু ব্যোমকেশকে কিছু জানায়নি। হয়তো সোজাসুজি ব্যাপার, রহস্য বা জটিলতা কিছু নেই, তাই রাখাল আসেনি। আজকাল জটিল রহস্যও বড়ই দুর্লভ হয়ে পড়েছে—

টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যোমকেশ হাত বাড়িয়ে ফোন কানের কাছে ধরতেই ওপার থেকে আওয়াজ এল—'ব্যোমকেশদা? আমি রাখাল। আজকের কাগজ পড়েছেন?'

ব্যোমকেশ বলল—'পড়েছি। বেণীসংহার?'

'কি বললেন—বেণীসংহার? ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, বেণীসংহারই বটে, তার সঙ্গে মেঘরাজ বধ। আমি অকুস্থল থেকে কথা বলছি।'

'কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার একটু প্যাঁচালো ঠেকছে। কাল সকাল থেকে তদন্ত শুরু করেছি। এখনো কোনো

হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন?'

'না।'

'তাহলে একবারটি এদিকে আসবেন? আপনার বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা। বাড়ির নাম বেণীমাধব।'

'জানি।'

'কখন আসছেন?'

'অবিলম্বে।'

দুই

বেণীমাধব চক্রবর্তী সরকারি সামরিক বিভাগে কন্ট্রাক্টরি কাজ করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় সদর রাস্তার ওপর তাঁর প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটা সেই অর্থের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন।

বেণীমাধব সতর্কবুদ্ধির মানুষ ছিলেন। দীর্ঘকাল ঠিকেদারি করার ফলে মনুষ্য জাতির সততায় তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্যে তাঁর হৃদয়ধর্ম সংকুচিত হয়নি। সংসারের এবং সেইসঙ্গে নিজের দোষত্রুটি তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন।

বেণীমাধবের পোষ্য বেশি ছিল না। যৌবন উত্তীর্ণ হবার পরই তিনি বিপত্নীক হয়েছিলেন; পত্নী রেখে যান একটি পুত্র ও একটি কন্যা। তারা বড় হলে বেণীমাধব তাদের বিয়ে দিলেন। ছেলে অজয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি আস্ত অকর্মার ধাড়ি; ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টা করে বাপের কিছু টাকা নষ্ট করে পিতৃস্কন্ধে আরোহণ করেছিল; বেণীমাধব আর তাকে কাজে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করেননি। তিনি বেশির ভাগ সময় বাইরে বাইরে থাকতেন, বাড়ির দ্বিতলে অজয় বাস করত তার স্ত্রী আরতি এবং পুত্রকন্যা মকরন্দ ও লাবণিকে নিয়ে। বেণীমাধব তার সংসারের খরচ দিতেন।

মেয়ের বিয়ে বেণীমাধব ভালই দিয়েছিলেন; জামাই গঙ্গাধরের পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু বড়মানুষ শ্বশুর পেয়ে তার মেজাজ চড়ে গেল, সে রেস খেলে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিল। মেয়ে গায়ত্রী বাপের কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বেণীমাধব মেয়ে জামাই এবং দৌহিত্রী ঝিল্লীকে নিজের বাড়িতে তুললেন; ছেলেকে যেমন মাসহারা দিচ্ছেন মেয়ের জন্যেও তেমনি মাসহারা বরাদ্দ হলো।

বেণীমাধবের বাড়িটা তিনতলা, আগেই বলেছি। তেতলায় মাত্র তিনটি ঘর, বাকি জায়গায় বিস্তীর্ণ ছাদ। এই তেতলাটা বেণীমাধব নিজের জন্যে রেখেছিলেন, তিনি না থাকলে তেতলা তালাবন্ধ থাকত। দোতলায় আটটি ঘর, সামনে টানা বারান্দা; এই তলায় বেণীমাধব তাঁর ছেলে অজয় ও মেয়ে গায়ত্রীকে পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাদের হাঁড়ি হেঁশেল অবশ্য আলাদা। দুই সংসারে মনের মিল ছিল না; কিন্তু প্রকাশ্যে ঝগড়া করবার সাহসও কারুর ছিল না। ছেলেমেয়ের প্রতি বেণীমাধবের স্নেহ ছিল; কিন্তু তিনি রাশভারী লোক ছিলেন, কড়া হতে জানতেন।

নীচের তলায় প্রকাণ্ড একটা হলঘর বিলিতি আসবাব দিয়ে ড্রয়িং-রুমের মত সাজানো; মাঝখানে নীচু গোল টেবিল, তাকে ঘিরে দুটো সোফা এবং গোটা কয়েক গদি-মোড়া ভারী চেয়ার, তাছাড়া আরো কয়েকটি কেঠো চেয়ার দেওয়ালের গায়ে সারি দিয়ে রাখা। কিন্তু ঘরটি বড় একটা ব্যবহার হয় না, কদাচিৎ কেউ দেখা করতে এলে অতিথিকে বসানো হয়। বাকি পাঁচখানা ঘর আগন্তুক অভ্যাগতদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকলেও অধিকাংশ সময় তালাবন্ধ থাকত।

কিন্তু বেশি দিন তালাবন্ধ রইল না। বেণীমাধবের দুই মামাতো ছোট বোন ছিল, বহুদিন মারা

গেছে ; তাদের দুই ছেলে সনৎ গাঙ্গুলি ও নিখিল হালদার—পরস্পর মাসতুতো ভাই—কলকাতায় চাকরি করত ; তাদের ভাল বাসা ছিল না, তাই বেণীমাধব তাদের নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন। নীচের দু'টি ঘর নিয়ে তারা রইল।

দেখা যাচ্ছে, বেণীমাধবের ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী এবং দুই ভাগনে মিলে সাতজন পোষ্য। বাড়িতে চাকর নেই, দুটো দাসী দিনের বেলা কাজ করে দিয়ে সন্ধ্যের সময় চলে যায়।

নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন পরিবেশ। শালা-ভগিনীপতির বয়স প্রায় সমান, তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ ; কিন্তু তাদের মধ্যে মানসিক ঘনিষ্ঠতা নেই, দু'জনের আকৃতি প্রকৃতি দু'রকম। অজয় সুশ্রী ও শৌখিন গোছের মানুষ, গিলে-করা ধুতি-পাঞ্জাবি ও পালিশ-করা পাম্প-শু ছাড়া সে বাড়ির বার হয় না। রোজ সকালে গড়িয়াহাটে বাজার করতে যাওয়াতে তার ঘোর আপত্তি, অধিকাংশ দিন তার স্ত্রী আরতিই বাজারে যায়। অজয় সন্ধ্যের পর ক্লাবে যায় ; শখের থিয়েটারের প্রতি তার গাঢ় অনুরাগ। অভিনয় ভালই লাগে। ক্লাবটা শখের থিয়েটারেরই ক্লাব, প্রতি বছর তারা চার-পাঁচখানা নাটক অভিনয় করে।

গঙ্গাধরের চেহারাটা কাপালিক ধরনের ; মুখে এবং দেহে মাংস কম, হাড় বেশি। চোখের দৃষ্টি খর। নিজের বিষয়সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে শ্বশুরের স্কন্ধে আরোহণ করার পর সে অত্যন্ত গম্ভীর এবং মিতভাষী হয়ে উঠেছে। সারা দিন বাড়ি থেকে বেরোয় না, সন্ধ্যের পর লাঠি হাতে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। ঘন্টা দেড়েক পরে যখন ফিরে আসে তখন তার মুখ থেকে ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বের হয়।

ননদ-ভাজের মধ্যে প্রকাশ্যত সদ্ভাব ছিল, যাওয়া-আসা গল্পগুজবও চলত ; কিন্তু সুবিধে পেলে কেউ কাউকে চিমটি কাটতে ছাড়ত না। গায়ত্রী হয়তো পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে বলল—'বৌদি, আজ কি রান্নাবান্না করলে ?'

আরতি রান্নার ফর্দ দিয়ে বলত—'তুমি কি রাঁধলে ভাই ?'

গায়ত্রী বলল—'রান্না আর হলো কই। ভাতের ফ্যান গেলে মাংস চড়াতে গিয়ে দেখি গরম মশলা নেই ! জানো তো তোমার নন্দাই শাক-ভাত খেতে পারেন না। ওঁর মাছ না হলেও চলে কিন্তু রোজ মাংস চাই। তাই খোঁজ নিতে এলুম তোমার ভাঁড়ারে গরম মশলা আছে কিনা। নইলে আবার ঝিকে বাজারে পাঠাতে হবে।'

আরতি বলল—'আছে বৈকি, এই যে দিচ্ছি।'

গরম মশলা এনে দিয়ে আরতি হাসি-হাসি মুখে বলল—'নন্দাই মাংস ভালবাসেন তাতে দোষ নেই, কিন্তু ভাই, ও জিনিসটা না খেলেই পারেন।'

গায়ত্রীর দৃষ্টি অমনি কড়া হয়ে উঠল—'কোন্ জিনিস ?'

আরতি ভালমানুষের মত মুখ করে বলল—'তোমার দাদা বলছিলেন সেদিন সন্ধ্যের পর নন্দাই-এর মুখোমুখি দেখা হয়েছিল, তা নন্দাই-এর মুখ থেকে ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুল। নন্দাই-এর বোধহয় পুরনো অভ্যেস, ছাড়তে পারেন না, কিন্তু কথাটা যদি বাবার কানে ওঠে—'

গায়ত্রীর কঠিন দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠল, সে মুখে একটা বাঁকা হাসি টেনে এনে বলল—'বাবার কানে যদি কথা ওঠে তাহলে তোমরাই তুলবে বৌদি। কিন্তু সেটা কি ভাল হবে ? তোমার মেয়ের জন্য নাচের মাস্টার রেখেছ তাতে দোষ নেই কিন্তু লাবণি রাত দুপুর পর্যন্ত মাস্টারের সঙ্গে সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরে সেটা কি ভাল ? লাবণি কচি খুকি নয়, যদি একটা কেলেঙ্কারি করে বসে তাতে কি বাবা খুশি হবেন ?' গায়ত্রী আঁচল ঘুরিয়ে চলে গেল।

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

লাবণি মেয়েটি দেখতে ভাল ; ছিপছিপে লম্বা গড়ন, নাচের উপযোগী চেহারা। একটু চপল প্রকৃতি, লেখাপড়া স্কুলের সীমানা পার হবার আগেই শেষ হয়েছে ; নৃত্যকলার প্রতি তার দুরন্ত অনুরাগ। অজয় মেয়ের মনের প্রবণতা দেখে তার জন্যে নাচের মাস্টার রেখেছিল। মাস্টারটি বয়সে তরুণ, সম্পন্ন ঘরের ছেলে, নাম পরাগ লাহা ; হপ্তায় দু'দিন লাবণিকে নাচ শেখাতে

আসত। বাপ-মায়ের চোখের সামনে লাবণি নাচের মহলা দিত। কদাচিৎ পরাগ বলত—'একটা নাচ-গানের বিলিতি ছবি এসেছে, দুটো টিকিট কিনেছি রাত্রির শো'তে। লাবণিকে নিয়ে যাব ? ছবিটা দেখলে ও অনেক শিখতে পারবে।'

গোড়ার দিকে আরতি রাজী হতো না। পরাগ বলত—'থাক, আমি অন্য কোনো ছাত্রীকে নিয়ে যাব।'

ক্রমে আপত্তি শিথিল হয়ে আসে, লাবণি পরাগের সঙ্গে ছবি দেখতে যায় ; দুপুর রাত্রে পরাগ লাবণিকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

কালধর্মে সবই গা-সওয়া হয়ে যায়।

লাবণির দাদা মকরন্দ কলেজে পড়ে। কিন্তু পড়া নামমাত্র ; কলেজে নাম লেখানো আছে এই পর্যন্ত। তার মনের দিগন্ত জুড়ে আছে রাজনৈতিক দলাদলি, দলগত প্রয়োজনে যদি কলেজে যাওয়া প্রয়োজন হয় তবেই কলেজে যায়। তার চেহারা ভাল, কিন্তু মুখে চোখে একটা উগ্র ক্ষুধিত অসন্তোষ। সে বাড়িতে বেশি থাকে না ; বাড়ির সঙ্গে কেবল খাওয়া আর শোয়ার সম্পর্ক। মাঝে মাঝে আরতির সংসার-খরচের টাকা অদৃশ্য হয় ; আরতি বুঝতে পারে কে টাকা নিয়েছে, কিন্তু অশান্তির ভয়ে চুপ করে থাকে। মকরন্দ তার থিয়েটার-বিলাসী বাপকে বিদ্বেষ করে, অজয়ও ছেলের চালচলন পছন্দ করে না ; দু'জনে পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। মকরন্দ যেন তার বাপ-মায়ের সংসারে অবাঞ্ছিত অতিথি।

পাশের ফ্ল্যাটে সংসার ছোট ; কেবল একটি মেয়ে ঝিল্লী। ঝিল্লী লাবণির সমবয়সী, লাবণির মত সুন্দরী নয়, কিন্তু পড়াশোনায় ভাল। চাপা প্রকৃতির মেয়ে, কলেজে ভর্তি হয়েছে, নিয়মিত কলেজে যায়, লেখাপড়া করে, অবসর পেলে মাকে সংসারের কাজে সাহায্য করে। তার শান্ত মুখ দেখে মনের খবর পাওয়া যায় না।

এই গেল দোতলার মোটামুটি খবর।

নীচের তলার দু'টি ঘরে সনৎ আর নিখিল থাকে। সনতের বয়স ত্রিশের ওপর, নিখিলের ত্রিশের নীচে। চেহারার দিক থেকে দু'জনকেই সুপুরুষ বলা চলে। কিন্তু চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। সনৎ সংবৃতচিত্ত ও মিতবাক্, বিবেচনা না করে কথা বলে না। নিখিলের মুখে খৈ ফোটে, সে চটুল ও রঙ্গপ্রিয়। দু'জনেই সাংবাদিকের কাজ করে। সনৎ প্রেস-ফটোগ্রাফার। নিখিল খবরের কাগজের সংবাদ সম্পাদন বিভাগে নিম্নতর নিউজ এডিটর-এর কাজ করে। সে নিশাচর প্রাণী।—দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন, দেবতা জাগিলে মোদের রাতি। ঋষ্যশৃঙ্গকে যারা প্রলুব্ধ করেছিল তাদেরই সমগোত্রীয়।

এরা কেউ বিয়ে করেনি। নিখিলের বিয়ে না করার কারণ, সে যা উপার্জন করে তাতে সংসার পাতা চলে না ; কিন্তু সনতের সেরকম কোনো কারণ নেই। সে ভাল উপার্জন করে ; মাতুলগৃহে তার বাস করার কারণ অর্থাভাব নয়, ভাল বাসার অভাব। তার বিবাহে অরুচির মূল অনুসন্ধান করতে হলে তার একটি গোপনীয় অ্যালবামের শরণ নিতে হয়। অ্যালবামে অনেকগুলি কুহকিনী যুবতীর সরস ফটো আছে। ফটোগুলি দেখে সন্দেহ করা যেতে পারে যে, সনৎ অবিবাহিত হলেও ব্রহ্মচারী নয়। কিন্তু সে অত্যন্ত সাবধানী লোক। সে যদি বিবাহের বদলে মধুকরবৃত্তি অবলম্বন করে থাকে, তাহলে তা সকলের অজান্তে।

এই সাতটি মানুষ বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা। বেণীমাধব ন'মাসে ছ'মাসে আসেন, দু'দিন থেকে আবার দিল্লী চলে যান। দিল্লীই তাঁর কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু।

হঠাৎ সাতষট্টি বছর বয়সে বেণীমাধবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হলো। তাঁর শরীর বেশ ভালই ছিল। অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় ভৃত্য এবং দীর্ঘদিনের অনুচর রামভজনের মৃত্যুর পর তিনি আর বেশি দিন খাড়া থাকতে পারলেন না। তিন মাসের মধ্যে তিনি ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন। তাঁর টাকার দরকার ছিল না, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কাজের ঝোঁকেই কাজ করে যাচ্ছিলেন। এখন দিল্লীর অফিস তুলে দিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। সঙ্গে এল নতুন

চাকর মেঘরাজ।

রামভজনের মৃত্যুর পর বেণীমাধব মেঘরাজকে খাস চাকর রেখেছিলেন। মেঘরাজ ভারতীয় সেনাদলের একজন সিপাহী ছিল ; চীন-ভারত যুদ্ধে আহত হয়ে তার একটা পা হাঁটু পর্যন্ত কাটা যায়। ভারতীয় সেনাবিভাগের পক্ষ থেকে তাকে কৃত্রিম পা দেওয়া হয়েছিল এবং সামান্য পেনসন দিয়ে বিদায় করা হয়েছিল। সে বেণীমাধবের দিল্লীর অফিসে দরোয়ানের কাজ পেয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছিল ; রামভজনের মৃত্যুর পর বেণীমাধব তাকে খাস চাকরের কাজ দিলেন। মেঘরাজ অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং কড়া প্রকৃতির মানুষ ; সে বেণীমাধবের একক সংসারের সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিল ; তাঁর দাড়ি কামানো থেকে জুতো বুরুশ পর্যন্ত সব কাজ করে। তার বয়স আন্দাজ চল্লিশ ; বলিষ্ঠ চেহারা। কৃত্রিম পায়ের জন্য একটু খুঁড়িয়ে চলে।

যাহোক, বেণীমাধব এসে কলকাতার বাড়িতে অধিষ্ঠিত হলেন। তেতলার অংশে নিত্য ব্যবহারের সব ব্যবস্থাই ছিল, কেবল ফ্রিজ আর টেলিফোন ছিল না। দু'চার দিনের মধ্যে ফ্রিজ এবং টেলিফোনের সংযোগ স্থাপিত হলো। ইতিমধ্যে মেয়ে গায়ত্রী এসে আবদার ধরেছিল—'বাবা, এবার আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা করব। আগে তুমি যখনই আসতে দাদার কাছে খেতে। আমরা কি কেউ নই ?'

বেণীমাধব বলেছিলেন—'আমি তো একলা নই, মেঘরাজ আছে।'

'মেঘরাজ বুঝি নতুন চাকরের নাম ? আহা, বুড়ো রামভজন মরে গেল। তা মেঘরাজকেও আমি খাওয়াব।'

বেণীমাধব বিবেচনা করে বললেন—'বেশ, কিন্তু তাতে তোমার খরচ বাড়বে। আমি তোমার মাসিক বরাদ্দ আরো দেড়শো টাকা বাড়িয়ে দিলাম।'

গায়ত্রী হেসে বলল—'সে তোমার যেমন ইচ্ছে।' তার বোধহয় মনে মনে এই মতলবই ছিল ; সে মাসে সাড়ে সাতশো টাকা পেত, এখন ন'শো টাকায় দাঁড়াল।

কলকাতায় এসেই বেণীমাধব তার পুরনো বন্ধু ডাক্তার অবিনাশ সেনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ডাক্তার অবিনাশ সেন নামকরা ডাক্তার, বয়সে বেণীমাধবের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। তিনি একদিন বেণীমাধবকে নিজের ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন ; এক্স-রে, ই সি জি প্রভৃতি যান্ত্রিক পরীক্ষা হলো। তারপর ডাক্তার সেন বললেন—'দেখুন, আপনার শরীরে সিরিয়াস কোনো ব্যাধি নেই, যা হয়েছে তা হলো বার্ধক্যের স্বাভাবিক সর্বাঙ্গীন অবক্ষয়। আমি আপনাকে ওষুধ-বিষুধ কিছু দেব না, কেবল শরীরের গ্রন্থিগুলোকে তাজা রাখবার জন্যে মাসে একটা করে ইনজেকশন দেব। আসলে আপনি বয়সের তুলনায় বড় বেশি পরিশ্রম করেছিলেন। এখন থেকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম ; বই পড়ুন, রেডিও শুনুন, রোজ বিকেলে একটু বেড়ান। এখনো অনেক দিন বাঁচবেন।'

বেণীমাধব ইনজেকশন নিয়ে সানন্দে বাড়ি ফিরে এলেন।

তারপর দিন কাটতে লাগল। গায়ত্রী নিজের হাতে থালা সাজিয়ে এনে বাপকে খাইয়ে যায়। অন্য সকলে আসা-যাওয়া করে। মকরন্দ বড় একটা আসে না, এলেও দু' মিনিট থেকে চলে যায়। নাতনীরা থাকে, বেণীমাধবের সঙ্গে গল্প করে। ঝিল্লী পড়াশুনায় ভালো জেনে বৃদ্ধ সুখী হন ; লাবণি নাচ শিখছে শুনেও তিনি অপ্রীত হন না। তিনি বয়সে প্রবীণ হলেও প্রাচীনপন্থী নন। সব মেয়েই যখন নাচছে তখন তাঁর নাতনী নাচবে না কেন ?

দিন কুড়ি-পঁচিশ কাটবার পর হঠাৎ একদিন বেণীমাধবের শরীর খারাপ হলো ; উদরাময়, পেটের যন্ত্রণা। ডাক্তার সেন এলেন, পরীক্ষা করে বললেন—'খাওয়ার অত্যাচার হয়েছে, খাওয়া সম্বন্ধে ধরা-বাঁধার মধ্যে থাকতে হবে।'

বাড়ির সকলেই উপস্থিত ছিল। গায়ত্রী শুকনো মুখে বলল—'কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি তো বাবাকে এমন কিছু খেতে দিইনি যাতে ওঁর শরীর খারাপ হতে পারে।'

ডাক্তার কোনো কথা বললেন না, ওষুধের প্রেসক্রিপশন ও পথ্যের নির্দেশ দিয়ে উঠে

দাঁড়ালেন—'কেমন থাকেন আমি টেলিফোন করে খবর নেব।'

ডাক্তার চলে যাবার পর বেণীমাধব আরতির পানে চেয়ে বললেন—'বৌমা, আমার পথ্য তৈরি করার ভার তোমার ওপর রইল।'

আরতি বিজয়োল্লাস চেপে বলল—'হ্যাঁ বাবা।'

তিন চার দিনের মধ্যে বেণীমাধব সেরে উঠলেন, তাঁর পেট ধাতস্থ হলো। পথ্য ছেড়ে তিনি স্বাভাবিক খাদ্য খেতে লাগলেন। আরতিই তাঁর জন্যে রান্না করে চলল।

কিন্তু বেণীমাধবের মন শান্ত নয়। চিরদিন নানা লোকের সঙ্গে নানা কাজে দিন কাটিয়েছেন, এখন তাঁর জীবন বৈচিত্র্যহীন। সকালে মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দেয়, তিনি স্নানাদি করে চা খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসেন। তাতে ঘন্টাখানেক কাটে। তারপর রেডিও চালিয়ে খানিকক্ষণ গান শোনেন। গান বেশিক্ষণ ভাল লাগে না, রেডিও বন্ধ করে বই এবং সাময়িক পত্রিকার পাতা ওলটান।

একদিন কলকাতার পুরনো বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যায়। টেলিফোন ডিরেক্টরি খুঁজে তাঁদের নাম বার করেন, টেলিফোন করে কাউকে পান না কাউকে পান; কিছুক্ষণ পুরনো কালের গল্প হয়। এগারোটার পর আরতি ভাতের থালা নিয়ে আসে। আহারের পর তিনি ঘন্টাখানেক বিছানায় শুয়ে দিবানিদ্রায় কাটান।

বিকেলবেলা ঝিল্লী কিংবা লাবণি আসে, তাদের সঙ্গে খানিক গল্প করেন। লাবণিকে বলেন—'কেমন নাচতে শিখেছিস দেখা।'

লাবণি বলে—'আমি এখনো ভাল শিখিনি দাদু, ভাল শিখলে তোমাকে দেখাব।'

বেণীমাধব বলেন—'তোর মাস্টার ভাল শেখাতে পারে?'

লাবণি গদ্‌গদ্ হয়ে বলে—'খু-ব ভাল শেখাতে পারেন। এত ভাল যে—' লজ্জা পেয়ে সে অর্ধপথে থেমে যায়।

বেণীমাধব প্রশ্ন করলেন—'কত বয়স মাস্টারের?'

'তা কি জানি! হবে ছাব্বিশ সাতাশ। যাই, মা ডাকছে।' লাবণি তাড়াতাড়ি চলে যায়।

সূর্যাস্তের পর বেণীমাধব খোলা ছাদে অনেকক্ষণ পায়চারি করেন। ইচ্ছে হয় রবীন্দ্র সরোবরে গিয়ে লোকজনের মধ্যে খানিক বেড়িয়ে আসেন; কিন্তু তিনতলা সিঁড়ি ভাঙা তাঁর পক্ষে কষ্টকর, তাই ছাদে বেড়িয়েই তাঁর ব্যায়াম সম্পন্ন হয়।

রাত্রি ন'টার সময় আহার সমাপন করে তিনি শয়ন করেন। এই তাঁর দিনচর্যা। মেঘরাজ হামেহাল তাঁর কাছে হাজির থাকে; কখনো ঘরের মধ্যে কখনো দোরের বাইরে। তিনি শয়ন করলে মেঘরাজ নীচে গিয়ে আহার সেরে আসে; বেণীমাধবের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার বাইরে আগড় হয়ে বিছানা পেতে শোয়।

এইভাবে দিন কাটছে। একদিন এক অধ্যাপক বন্ধুকে টেলিফোন করে বেণীমাধবের মুখ গম্ভীর হলো। টেলিফোন রেখে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর মেঘরাজকে ডেকে বললেন—'তুমি নীচে গিয়ে মকরন্দকে ডেকে আনো।'

কয়েক মিনিট পরে মকরন্দ এসে দাঁড়াল। চাকরের মুখে তলব পেয়ে সে খুশি হয়নি, অপ্রসন্ন মুখে প্রশ্ন নিয়ে পিতামহের মুখের পানে চাইল। বেণীমাধব কিছুক্ষণ তার উষ্কখুষ্ক চেহারার পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কলেজে ঢুকেছ, লেখপড়া কেমন হচ্ছে?'

মকরন্দর মুখ ভ্রূকুটি-গভীর হলো—'হচ্ছে এক রকম।'

বেণীমাধব বললেন—'শুনলাম তুমি ক্লাসে যাও না, দল পাকিয়ে পলিটিক্স করে বেড়াও, এ কথা সত্যি?'

উদ্ধত স্বরে মকরন্দ বলল—'কে বলেছে?'

বেণীমাধব কড়া সুরে বললেন—'কে বলেছে সে কথায় তোমার দরকার নেই। কথাটা সত্যি কিনা?'

'হ্যাঁ সত্যি।' মকরন্দ চোখ লাল করে ঠাকুরদার পানে চেয়ে রইল।

'বটে!' বেণীমাধবের চোখেও রাগের ফুলকি ছিটকে পড়ল—'তুমি বেয়াদবি করতে শিখেছ।—মেঘরাজ!'

মেঘরাজ দোরের বাইরে ছিল, ঘরে ঢুকল। বেণীমাধব আঙুল দেখিয়ে বললেন—'এই ছোঁড়ার কান ধরে গালে একটা থাবড়া মারো, তারপর ঘাড় ধরে বার করে দাও।'

মেঘরাজ সিপাহী ছিল, সে হুকুমের চাকর। যথারীতি মকরন্দর কান ধরে গালে চড় মারল। মকরন্দর মনে যতই ধৃষ্টতা থাক, মেঘরাজের সঙ্গে হাতাহাতি করবার সাহস বা দৈহিক শক্তি তার নেই, সে ধাক্কা খেতে খেতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথাটা আর চাপা রইল না। অজয় আর আরতি ছুটে এসে বেণীমাধবের কাছে ক্ষমা চাইল। বেণীমাধব গম্ভীর হয়ে রইলেন, শেষে বললেন—'বংশে একটা মাত্র ছেলে, সে বেল্লিক বেয়াদব হয়ে উঠেছে। দোষ তোমাদের, তোমারা ছেলে শাসন করতে জানো না।'

ব্যাপারটা আর বেশিদূর গড়াল না।

তারপর একদিন বিকেলবেলা সনৎ এল মামার সঙ্গে দেখা করতে। সনৎ আর নিখিল মাঝে মাঝে এসে মামার কাছে বসে, সসম্ভ্রমে মামার কুশল প্রশ্ন করে চলে যায়। আজ সনৎ তার ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, বলল—'মামা, আপনার একটা ছবি তুলব।'

বেণীমাধব হেসে বললেন—'আমি বুড়ো মানুষ, আমার ছবি তুলে কি হবে!'

সনৎ বলল—'আমার অ্যালবামে রাখব।'

'কিন্তু এখন আলো কমে গেছে, এ আলোতে ছবি তোলা যাবে?'

'যাবে। আমি ফ্ল্যাশ বাল্‌ব এনেছি।'

'বেশ, তোলো।' বেণীমাধব একটি হেলান দেওয়া চেয়ারে বসলেন।

সনৎ ছবি তোলার উপক্রম করছে এমন সময় নিখিল এসে দাঁড়াল। সনৎ এদিক ওদিক ঘুরে শেষে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি তুলল; বাল্‌বটা একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল। নিখিল বলল—'সনৎদা, ছবি তৈরি হলে আমাকে একখানা দিও, আমি কাগজে ছাপব। মামা কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন, কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে আছেন, খবরটা প্রকাশ করা দরকার।'

বেণীমাধব মনে মনে ভাগনেদের ওপর খুশি হলেন।

পরদিন সনৎ ছবি এনে বেণীমাধবকে দেখাল। ছবিটি ভাল হয়েছে; বেণীমাধবের জরাক্রান্ত মুখ শিল্পীর নৈপুণ্যে শান্ত কোমল ভাব ধারণ করেছে। সনৎ যে কৌশলী শিল্পী তাতে সন্দেহ নেই।

বেণীমাধব বললেন—'বেশ হয়েছে। এটাকে বাঁধিয়ে কোথাও টাঙিয়ে রাখলেই হবে।'

সনৎ বলল—'আমি এন্‌লার্জ করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে এনে দেব। নিখিলকে এক কপি দিয়েছি, সে কাগজে ছাপবে।'

অতঃপর বেণীমাধবের কর্মহীন মন্থর দিনগুলি কাটছে। সনৎ বড় ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। কাগজে তাঁর ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় বেরিয়েছে। এরকম অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে মানুষ শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা লাভ করে। কিন্তু বেণীমাধবের মনে শান্তি স্বচ্ছন্দতা আসছে না। ছেলে ও মেয়ের পরিবারের সঙ্গে একটানা সান্নিধ্য তিনি উপভোগ করতে পারছেন না। পারিবারিক জীবনের স্বাদ ভুলে গিয়ে যাঁরা দীর্ঘকাল একলা পথে চলেছে তাঁদের বোধহয় এমনিই হয়।

ওদিকে ছেলে এবং মেয়ের পরিবারেও সুখ নেই। গায়ত্রীর মেজাজ সর্বদাই তিরিক্ষি হয়ে থাকে। গঙ্গাধর সারা দিন বসে একা একা তাস খেলে, সলিটেয়ার খেলা; সন্ধ্যের সময় চুপি চুপি বেরিয়ে যায়, আবার বেশি রাত্রি হবার আগেই ফিরে আসে। অজয় ক্লাবে গিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আড্ডা জমাত কিংবা রিহার্সেল দিত; এটা ছিল তার জীবনের প্রধান বিলাস। এখন তাকে রাত্রি ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হয়, কারণ কর্তার হুকুম—ন'টার পর সদর দরজা খোলা থাকবে

না। ন'টার পর বাড়ি ফিরে দোর ঠেলাঠেলি করলে তেতলায় শব্দ যাবে, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। সকলেরই একটা চোখ এবং একটা কান তেতলার দিকে সতর্ক হয়ে থাকে। আরতি যদিও সর্বদাই শ্বশুরকে খুশি করবার চেষ্টা করছে, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

নিশ্চিন্ত আছে কেবল দোতলায় দু'টি মেয়ে, লাবণি আর ঝিল্লী, এবং নীচের তলায় সনৎ ও নিখিল। ঝিল্লী আর লাবণির বয়স মাত্র আঠারো, বিষয়বুদ্ধি এখানো পরিপক্ক হয়নি। সনৎ আর নিখিলের বেলায় পরিস্থিতি অন্যরকম ; মামা তাদের বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তারা মামার কাছে অর্থ-প্রত্যাশী নয়। সনতের গোপন নৈশাভিসারের কথা বেণীমাধব জানতে পারবেন এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। নিখিলের ওসব দোষ নেই, উপরন্তু কয়েক মাস থেকে সে এক নতুন ব্যাপারে মশগুল হয়ে আছে।

বেণীমাধব কলকাতায় এসে বসবার আগে একদিন নিখিল হঠাৎ ডাকে একটা চিঠি পেল, খামের চিঠি। তাকে চিঠি লেখবার লোক কেউ নেই, সে একটু আশ্চর্য হয়ে চিঠি খুলল। এক পাতা কাগজের ওর দু'ছত্র লেখা আছে—

আমি একটি মেয়ে। তোমাকে ভালবাসি।—

চিঠির নীচে লেখিকার নাম নেই।

নিখিল কিছুক্ষণ বোকার মত চেয়ে রইল। তারপর তার মুখে গদ্‌গদ হাসি ফুটে উঠল। একটা মেয়ে তাকে ভালবাসে! বা রে! ভারি মজা তো!

কিন্তু কে মেয়েটা?

নিখিল খামের ওপর পোস্ট অফিসের সীলমোহর পরীক্ষা করল ; সীলমোহরের ছাপ জেবড়ে গেছে, তবু কলকাতায় চিঠি ডাকে দেওয়া হয়েছে এটুকু বোঝা যায়। কলকাতার মেয়ে। কে হতে পারে? চিঠিই বা লিখল কেন? ভালবাসা জানাবার আরো তো অনেক সোজা উপায় আছে। মুখে বলতে লজ্জা হয়েছে তাই চিঠি! কিন্তু নিজের নাম লেখেনি কেন?

নিখিল অনেক মেয়েকে চেনে। তার অফিসেই তো গোটা দশেক আইবুড়ো মেয়ে কাজ করে। তাছাড়া বন্ধুবান্ধবের বোনেরা আছে। মেয়েরা তার চটুল রঙ্গপ্রিয় স্বভাবের জন্যে তার প্রতি অনুরক্ত, তাকে দেখলেই তাদের মুখে হাসি ফোটে। কিন্তু কেউ তাকে চুপিচুপি ভালবাসে বলেও তো মনে হয় না। আর এত লজ্জাবতীও কেউ নয়।

হাতে চিঠি নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল এইসব ভাবছে এমন সময় পিছন দিক থেকে লাবণির গলা শুনতে পেল—'কি নিখিল কাকা, কার চিঠি পড়ছ?'

নিখিল ফিরে দাঁড়াল। ঝিল্লী আর লাবণি কখন দোতলা থেকে নেমে এসেছে ; তাদের হাতে কয়েকখানা বই। তারা একসঙ্গে লাইব্রেরিতে যায় বই বদল করতে।

নিখিল হাত উঁচুতে তুলে নাড়তে নাড়তে বলল—'কার চিঠি! একটি যুবতী আমাকে চিঠি লিখেছে।' বলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

লাবণি বলল—'যুবতী লিখেছে! কী লিখেছে!'

নিখিল বলল—'হুঁ হুঁ, দারুণ ব্যাপার, গুরুতর ব্যাপার। লিখেছে সে আমাকে ভালবাসে।'

লাবণি আর ঝিল্লী অবাক হয়ে পরস্পরের পানে তাকাল, তারপর হেসে উঠল। লাবণি বলল—'কেন গুল মারছ নিখিল কাকা। তোমাকে আবার কোন্‌ যুবতী ভালবাসবে?'

নিখিল চোখ পাকিয়ে বলল—'কেন, আমাকে কোনো যুবতী ভালবাসতে পারে না! দেখেছিস আমার চেহারাখানা।'

'দেখেছি। এখন বলো কার চিঠি।'

'বললাম না যুবতীর চিঠি!'

ঝিল্লী প্রশ্ন করল—'যুবতীর নাম কি?'

নিখিল মাথা চুল্‌কে বলল—'নাম! জানি না। চিঠিতে নাম নেই।'

ঝিল্লী আর লাবণি আবার হেসে উঠল। লাবণি বলল—'তোমার একটা কথাও আমরা বিশ্বাস

করি না। নিশ্চয় পাওনাদারের চিঠি।'

'পাওনাদারের চিঠি! তবে এই দ্যাখ।' নিখিল চিঠিখানা তাদের নাকের সামনে ধরল।

দু'জনে চিঠি পড়ল। লাবণি বলল—'হুঁ। কিন্তু চিঠি পড়েও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, একটা মেয়ে তোমাকে প্রেম নিবেদন করেছে। আমার মনে হয় কেউ তোমার ঠ্যাং ধরে টেনেছে, মানে লেগ-পুলিং।'

নিখিল একটু গরম হয়ে বলল—'যা যা, তোরা এসব কী বুঝবি! এসব গভীর ব্যাপার। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, শুনেছিস কখনো?'

'শুনেছি।' ঝিল্লী আর লাবণি মুখ টিপে হাসতে হাসতে চলে গেল।

এর পর থেকে যখনি কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় নিখিল উৎসুক চোখে তার পানে তাকায় কিন্তু কোনো সাড়া পায় না। তার মন আরো ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কে মেয়েটা? নিশ্চয় তার পরিচিত। তবে এমন লুকোচুরি খেলছে কেন?

মাসখানেক পরে দ্বিতীয় চিঠি এল। এবার একটু বড়—

আমি একটি মেয়ে। তোমাকে ভালবাসি। আমাকে চিনতে পারলে না?

চিঠি পেয়ে নিখিলের মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। লাবণি আর ঝিল্লী হাতের কাছে নেই, কিন্তু কাউকে না বলেও থাকা যায় না, তাই সে ঝোঁকের মাথায় সনতের ঘরে গেল।

সনতের ঘরটি বেশ বড়; এই একটি ঘরের মধ্যে তার একক জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঞ্চিত আছে। এক পাশে খাটের ওপর পুরু গদির বিছানা পাতা; খাটের শিথানের কাঠের ওপর বিচিত্র জাফ্‌রির কারুকার্য। ঘরের অন্য পাশে জানালার সামনে দেরাজযুক্ত টেবিল, তার ওপর ফটোগ্রাফির নানা সরঞ্জাম সাজানো; তিনটি হাতে-তোলা ক্যামেরা, তার মধ্যে একটি সিনে-ক্যামেরা। ঘরে একটি আয়নার কবাটযুক্ত আলমারিও আছে। ঘরটি ছিমছাম ফিটফাট, দেখে বোঝা যায় সনৎ গোছালো এবং শৌখিন মানুষ।

নিখিল যখন ঘরে ঢুকল তখন সনৎ টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে একটা ক্যামেরার যন্ত্রপাতি খুলে পরীক্ষা করছিল, চোখ তুলে চেয়ে আবার কাজে মন দিল। নিখিল গম্ভীর মুখে বলল—'সনৎদা, গুরুতর ব্যাপার।'

সনৎ একবার চকিতে চোখ তুলল, বলল—'তোমার জীবনে গুরুতর ব্যাপার কী ঘটতে পারে! আমাশা হয়েছে?'

নিখিল বলল—'আমাশা নয়, একটা মেয়ে আমার প্রেমে পড়েছে।'

এবার সনৎ বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। শেষে বলল—'আমাশা নয়, দেখছি তোমার মাথার ব্যারাম হয়েছে। বাংলা দেশে এমন মেয়ে নেই যে তোমার প্রেমে পড়বে।'

নিখিল বলল—'বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ চিঠি। মাসখানেক আগে আর একটা পেয়েছি।'

চিঠি নিয়ে সনৎ একবার চোখ বুলিয়ে ফেরত দিল, প্রশ্ন করল—'মেয়েটাকে চেনো না?'

'না, সেই তো হয়েছে মুশকিল।'

সনৎ একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল—'বুঝেছি। তোমার চেনা-শোনার মধ্যে কোনো কালো কুচ্ছিত মেয়ে আছে?'

নিখিল হেসে বলল—'বেশির ভাগই কালো কুচ্ছিত সনৎদা।'

সনৎ বলল—'তাহলে ওই কালো কুচ্ছিত মেয়েদের মধ্যেই একজন বেনামী চিঠি লিখে রহস্য সৃষ্টি করছে। তোমাকে তাতাবার চেষ্টা করছে। তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে ওদের এড়িয়ে চলবে।'

কিন্তু এড়িয়ে চলার ক্ষমতা নিখিলের নেই। তাছাড়া কালো কুচ্ছিত মেয়ের প্রতি তার বিরাগ নেই। তার বিশ্বাস কালো কুচ্ছিত মেয়েরা ভালো বৌ হয়। সে চতুর্গুণ আগ্রহে অনামা প্রেমিকাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

তারপর বেণীমাধব এলেন, বাড়ির আবহাওয়া বদলে গেল। কিন্তু নিখিলের কাছে নিয়মিত

চিঠি আসতে লাগল। তৃতীয় চিঠিতে লেখা হয়েছে—

আমি তোমাকে ভালবাসি। আমাকে চিনতে পারলে না ? আমি কিন্তু সুন্দর মেয়ে নই।

নিখিল ভাবল, সনৎদা ঠিক ধরেছে। কিন্তু সে দমল না। তার জীবনে এক অভাবিত রোমান্স এসেছে ; একে তুচ্ছ করার সাধ্য তার নেই।

ওদিকে বেণীমাধব হপ্তা তিনেক পুত্রবধূর হাতের রান্না খেয়ে বেশ ভালই রইলেন। তারপর একদা গভীর রাত্রে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল ; পেটে দারুণ যন্ত্রণা। যাতনায় ছটফট করতে করতে মেঘরাজকে ডাকলেন। বেণীমাধব দু'হাতে পেট চেপে ধরে বসেছিলেন, বললেন—'মেঘরাজ, শীগ্‌গির ডাক্তার সেনকে ফোন করো, বলো আমি পেটের যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, এখনি যেন আসেন।'

মেঘরাজ ফোন করল, আধ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার সেন এলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। পেটের প্রদাহ কিন্তু সহজে উপশম হলো না ; রাত্রি পাঁচটা পর্যন্ত ধস্তাধস্তির পর ব্যথা শান্ত হলো। বেণীমাধব নির্জীব দেহে বিছানায় শুয়ে বিস্ফারিত চোখে ডাক্তারের পানে চাইলেন—'ডাক্তার, কেন এমন হলো বলতে পার ?'

ডাক্তার গম্ভীর মুখে ক্ষণেক চুপ মেরে রইলেন, তারপর অনিচ্ছাভরে বললেন—'নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। অ্যালারজি হতে পারে, শূল ব্যথা হতে পারে, কিংবা—'

'কিংবা— ?'

'কিংবা বিষের ক্রিয়া।—আমি বলি কি, আপনি কিছুদিন আমার নার্সিং হোমে থাকবেন চলুন। চিকিৎসা পথ্য দুইই হবে।'

বেণীমাধবের কিন্তু নার্সিং হোমে বিশ্বাস নেই ; তাঁর ধারণা যারা একবার নার্সিং হোমে ঢুকেছে তারা আর ফিরে আসে না। তিনি যথাসম্ভব দৃঢ়স্বরে বললেন—'না ডাক্তার, আমি বাড়িতেই থাকব।'

ডাক্তার উঠলেন—'আচ্ছা, এখন চলি। যদি আবার কোনো গণ্ডগোল হয় তৎক্ষণাৎ খবর দেবেন। কাল আর পরশু স্রেফ দই খেয়ে থাকবেন।'

মেঘরাজ ডাক্তারের সঙ্গে নীচে পর্যন্ত গিয়ে সদর দরজা খুলে দিল, ডাক্তার চলে গেলেন। মেঘরাজ দরজা বন্ধ করে আবার ওপরে উঠে এল। বাড়ির অন্য মানুষগুলো তখনো ঘুমোচ্ছে, ডাক্তারের আসা-যাওয়া জানতে পারল না।

বিছানায় শুয়ে বেণীমাধব তখন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চিন্তা করছিলেন। দুরূহ দুর্গম চিন্তা। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতি। একবার নয়, দু'-দু'বার এই ব্যাপার হলো....ছেলে আর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে আমি কবে মরব....আমি মরছি না দেখে অধীর হয়ে উঠেছে! কিন্তু ছেলে মেয়ে জামাই পুত্রবধূ এমন কাজ করতে পারে ? কেন করবে না, সংসারে টাকাই খাঁটি জিনিস, আর যা-কিছু সব ভুয়ো। ডাক্তারের মনেও সন্দেহ ঢুকেছে...

সকাল সাতটার সময় বেণীমাধব বিছানায় উঠে বসলেন, মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিল। তারপর তিনি তার হাতে টাকা দিয়ে বললেন—'যাও, বাজার থেকে দই কিনে নিয়ে এসো। এক সের ভাল দই।'

টাকা নিয়ে মেঘরাজ চলে গেল। সে সৈনিক, হুকুম তামিল করে, কথা বলে না। তার মুখ দেখেও কিছু বোঝা যায় না।

সাড়ে সাতটার সময় আরতি এল, তার সঙ্গে ঝি ট্রে'র ওপর চা ও প্রাতরাশ নিয়ে এসেছে। ঘরে ঢুকেই আরতি চমকে উঠল ; বেণীমাধব বিছানায় বসে একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে আছেন। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—'বাবা—'

বেণীমাধব ধীর স্বরে বললেন—'বৌমা, খাবার ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আজ থেকে আমার খাবার ব্যবস্থা আমি নিজেই করব।'

আরতির মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল—'কেন বাবা ?'

বেণীমাধব গত রাত্রির ঘটনা বললেন। আরতি শুনে মুখ কালি করে চলে গেল।

কথাটা ঝিয়ের মুখে অচিরাৎ প্রচারিত হলো। শুনে গায়ত্রী ছুটতে ছুটতে বাপের কাছে এল—'বাবা, বৌদির রান্না তোমার সহ্য হবে না আমি জানতুম। আজ থেকে আমি আবার রাঁধব।'

বেণীমাধব মেয়েকে আপাদমস্তক দেখে কড়া সুরে বললেন—'না—'

বেলা তিনটের সময় তিনি কর্তব্য স্থির করে বিছানায় উঠে বসে ডাকলেন—'মেঘরাজ!'

মেঘরাজ এসে দাঁড়াল—'জি।'

বেণীমাধব প্রশ্ন করলেন—'তোমার বৌ আছে?'

মেঘরাজ ভ্রূ তুলে খানিক চেয়ে রইল, যেন প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করছে—'জি, আছে।'

'ছেলেপুলে?'

'জি, না।'

'স্ত্রী নিশ্চয় রসুই করতে জানে?'

'জি, জানে।'

'বেশ। এখন আমার প্রস্তাব শোনো। তুমি দেশে গিয়ে তোমার ঔরৎকে নিয়ে এসো। নীচের তলায় খালি ঘর আছে, তার একটাতে তোমরা থাকবে। তোমার ঔরৎ আমার রসুই করবে। আমি তোমার মাইনে ডবল্ করে দিলাম। তুমি কাল সকালে প্লেনে দিল্লী চলে যাও, বৌকে নিয়ে যত শীগ্‌গির পার ফিরে আসবে; প্লেনের ভাড়া ইত্যাদি সব খরচ আমি দেবো। কেমন?'

'জি।'

'বেশ; নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু তুমি যতদিন ফিরে না আসছ ততদিনের জন্যে আমার রসদ দরকার। এই নাও টাকা, বাজারে গিয়ে আরো সের দুই দই, কড়া পাকের সন্দেশ, গোটা দুই বড় পাঁউরুটি, মাখন, মারমালেড, টিনের দুধ, আঙুর, আপেল—এই সব কিনে নিয়ে এসো, ফ্রিজে থাকবে। তুমি বাজারে যাও, আমি ইতিমধ্যে টেলিফোনে তোমার এয়ার-টিকিটের ব্যবস্থা করছি।'—

পরদিন মেঘরাজ চলে গেল। বেণীমাধব একলা রইলেন। দই এবং অন্যান্য সাত্ত্বিক আহারের ফলে দু'-তিন দিনের মধ্যেই তাঁর পেট সুস্থ হলো। তিনি অবসর বিনোদনের জন্য ডাক্তার সেন ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে টেলিফোনে গল্প করেন। ঘরের মধ্যে কারুর যাওয়া-আসা নেই। দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে।

চতুর্থ দিন মেঘরাজ ফিরে এল। সঙ্গে বৌ।

বৌ-এর পরনে রঙিন শাড়ি, মুখে ঘোমটা। মেঘরাজ বেণীমাধবের ঘরে গিয়ে বৌ-এর মুখ থেকে ঘোমটা সরিয়ে দিল। বেণীমাধব দেখলেন, একটি মিষ্টি হাসি-হাসি মুখ। রঙ ময়লা, কাজল-পরা চোখে যৌবনের মাদকতা। মেঘরাজের অনুপাতে বয়স অনেক কম, কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। বৌ দু'হাত দিয়ে বেণীমাধবের পা ছুঁয়ে নিজের মাথায় ঠেকাল।

বেণীমাধব প্রসন্ন হয়ে বললেন—'বেশ বেশ। কি নাম তোমার?'

বৌ বলল—'মেদিনী।'

অতঃপর বেণীমাধবের স্বাধীন সংসারযাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। নীচের তলায় কোণের একটা ঘরে মেঘরাজ ও মেদিনীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হলো। তেতলায় একটা ঘর রান্নাঘরে পরিণত হয়েছে, বাসন-কোসন এসেছে; সকালবেলা মেদিনী নীচের ঘর থেকে ওপরে উঠে এসে বেণীমাধবের চা টোস্ট তৈরি করে দেয়। ইতিমধ্যে মেঘরাজ গড়িয়াহাট থেকে বাজার করে আনে। রান্না আরম্ভ হয়; তিনজনের রান্না। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে মেদিনী নীচে নিজের ঘরে চলে যায়, মেঘরাজ

ওপরে পাহারায় থাকে। বিকেলবেলা থেকে আবার চা ও রান্নার পর্ব আরম্ভ হয় ; রাত্রি আটটার সময় সকলের নৈশাহার শেষ হলে মেদিনী রাত্রির মত নীচে চলে যায় ; বেণীমাধব তুষ্ট মনে শয্যা আশ্রয় করেন, মেঘরাজ দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার সামনে নিজের বিছানা পাতে।

এই হলো তাদের দিনচর্যা।

মেদিনীর দুপুরবেলা কোনো কাজ নেই, সেই অবসরে সে বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট ; বিশেষত পুরুষেরা। তার আচরণে শালীনতা আছে সংকোচ নেই ; তার কথায় সরসতা আছে প্রগল্‌ভতা নেই। সকলেই তার কাছে স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে। সে আসার পর থেকে বাড়িতে যেন নতুন সজীবতা দেখা দিয়েছে। গায়ত্রী এবং আরতির মন আগে থাকতে মেদিনীর প্রতি বিমুখ ছিল, কিন্তু ক্রমশ তাদের বিমুখতা অনেকটা দূর হয়েছে। কেবল মকরন্দ মেদিনীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ; মেদিনীর যখন অবসর মকরন্দ তখন বাড়িতে থাকে না।

বাড়িতে আস্তে আস্তে সহজ ভাব ফিরে এল। বেণীমাধব এখন নিজেকে অনেকটা নিরাপদ বোধ করছেন। তবু তাঁর মনের ওপর যে ধাক্কা লেগেছে তার জের এখনো কাটেনি। গভীর রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবেন—আমার নিজের ছেলে নিজের মেয়ে আমার মৃত্যু কামনা করে। এ কি সম্ভব, না আমার অলীক সন্দেহ ? অনেকক্ষণ জেগে থেকে তিনি নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে ওঠেন, নিঃশব্দে ভেজানো দরজা একটু ফাঁক করে দেখেন, বাইরে মেঘরাজ দরজা আগলে ঘুমোচ্ছে। আশ্বস্ত মনে তিনি বিছানায় ফিরে যান।

মেদিনী আসার পর আর একটা সুবিধা হয়েছে। কলকাতার রেওয়াজ অনুযায়ী সদর দরজা সব সময়েই বন্ধ থাকে, কেবল যাতায়াতের সময় খোলা হয়। আগে বাইরে থেকে কেউ এলে দোর-ঠেলাঠেলি হাঁকাহাঁকি করতে হতো, এখন তা করতে হয় না। মেদিনীর ঘর সদর দরজার ঠিক পাশেই, রাত্রিবেলা বাইরে থেকে কেউ দরজায় টোকা দিলেই মেদিনী এসে দরজা খুলে দেয়।

মহাকবি কালিদাস লিখেছেন—হ্রদের প্রসন্ন উপরিভাগ দেখে বোঝা যায় না তার গভীর তলদেশে হিংস্র জলজন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মাসখানেক কাটল। ইতিমধ্যে বাড়িতে ছোটখাটো কয়েকটা ঘটনা ঘটেছিল যা উল্লেখযোগ্য—

নিখিল আবার অদৃশ্য নায়িকার চিঠি পেয়েছে—আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি হাসতে জানো, হাসাতে জানো। আমাদের বাড়িতে কেউ হাসে না। তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?

চিঠি পেয়ে নিখিল আহ্লাদে প্রায় দড়ি-ছেঁড়া হয়ে উঠল ; চিঠি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নিজের ঘরে পাগলের মত দাপাদাপি করল, তারপর সনতের ঘরে গেল। নিখিলের ঘরটা আকারে-প্রকারে সনতের অনুরূপ, কিন্তু অত্যন্ত অগোছালো। তক্তপোশের ওপর বিছানাটা তাল পাকিয়ে আছে, টেবিলের ওপর ধুলোর পুরু প্রলেপ। দেখে বোঝা যায়—এ ঘরে গৃহিণীর করস্পর্শের প্রয়োজন আছে।

সনৎ তখন ক্যামেরা নিয়ে বেরুচ্ছিল। নিখিল বলল—'এ কি সনৎদা, সজ্জিত-গুজ্জিত হয়ে চলেছ কোথায় ?'

সনৎ বলল—'গ্র্যান্ড হোটেলে পার্টি আছে। হাতে ওটা কি ?'

নিখিল চিঠি তুলে ধরে বলল—'আবার চিঠি পেয়েছি, পড়ে দেখ। এ মেয়ে কালো কুচ্ছিত হোক, কানা খোঁড়া হোক, একেই আমি বিয়ে করব।'

সনৎ চিঠি পড়ে বলল—'হুঁ, কানা-খোঁড়াই মনে হচ্ছে। তা বিয়ে করতে চাও কর না, কে তোমাকে আটকাচ্ছে। কিন্তু তার আগে মেয়েটাকে খুঁজে বার করতে হবে তো !'

সনৎ নিজের ঘরে তালা বন্ধ করল। মেঘরাজের ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখল মেদিনী ঘরে রয়েছে। সনৎ একবার দাঁড়িয়ে বলল—'মেদিনী, আজ আমার ফিরতে দেরি হবে। একটা পার্টিতে ফটো তুলতে যাব, কখন ফিরব ঠিক নেই। আমি দোরে টোকা দিলে দোর খুলে

দিও।'

মেদিনী নিজের দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এখন বাংলা ভাষা বেশ বুঝতে পারে, কিন্তু বলতে পারে না। চোখ নীচু করে সে নম্রস্বরে বলল—'জি।'

সনৎ বেরিয়ে যাওয়ার পর নিখিল মেদিনীর কাছে এসে দাঁড়াল, বলল—'মেদিনী, তুম জানতা হ্যায়, একঠো লেড়কি হামকো ভালবাসামে গির গিয়া। হাম উসকে শাদি করেগা।'

মেদিনীর চোখে কৌতুক নেচে উঠল, সে আঁচল দিয়ে হাসি চাপা দিতে দিতে দোর ভেজিয়ে দিল।

মেদিনী আসার পর থেকে গঙ্গাধরের চিত্ত চঞ্চল হয়েছে। বয়সটা খারাপ; যৌবন বিদায় নেবার আগে মরণ-কামড় দিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গাধর যখন বিকেলবেলা বাইরে যায় তখন মেদিনীর দোরের দিকে তাকাতে তাকাতে যায়, কদাচ মেদিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হলে চোখ সরিয়ে নেয় না, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে; মেদিনী চৌকাঠে ঠেস দিয়ে চোখ নীচু করে তার দৃষ্টিপ্রসাদ গ্রহণ করে। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টিতে সে অভ্যস্ত।

অজয়ের ভাবভঙ্গী একটু অন্যরকম। সে যেন মেদিনীকে দেখে বাৎসল্য স্নেহ অনুভব করে; তার সঙ্গে পাটিচাটি গল্প করে, তার দেশের খবর নেয়। মেদিনী সরলভাবে কথা বলে, মনে মনে হাসে।

মকরন্দ প্রথমদিকে কিছুদিন মেদিনীকে দেখেনি। একবার তিন-চারদিন সে বাড়ি ফিরল না; জানা গেল পুলিস ভ্যান লক্ষ্য করে ইঁট ছোঁড়ার জন্যে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। চতুর্থ দিন সে মুক্তি পেয়ে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় এসে বাড়ির সদর দরজায় ধাক্কা দিল। মেদিনী গিয়ে দোর খুলল। মকরন্দর চেহারা শুকনো, জামা ছেঁড়া, চুল উষ্কখুষ্ক; সে তীব্র দৃষ্টিতে মেদিনীর পানে চেয়ে রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল—'তুমি কে?'

'আমি মেদিনী।'

'অ—মেঘরাজের বৌ।' কুটিলভাবে মুখ বিকৃত করে সে মেদিনীকে আপাদমস্তক দেখল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল। মেদিনী জানত মকরন্দ কে, সে মুখ টিপে হেসে নিজের ঘরে ফিরে গেল।—

তিন মাস কেটে যাবার পরও যখন বেণীমাধবের পেটের আর কোনো গণ্ডগোল হলো না তখন তিনি নিঃসংশয়ে বুঝলেন তাঁর পেটের কোনো দোষ নেই, হজম করার শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। পুত্রবধূ এবং মেয়ের প্রতি তাঁর সন্দেহ নিশ্চয়তায় পরিণত হলো। তারপর একদা গভীর রাত্রে বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কে যেন ছুরি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তার গলা কাটছে।

তারপর তিনি আর ঘুমোতে পারলেন না। বাকি রাত্রিটা চিন্তা করে কাটালেন। মৃত্যুভয়ে জড়িত ঐহিক চিন্তা।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় তিনি তাঁর সলিসিটারকে টেলিফোন করলেন—'সুধাংশুবাবু, আমি উইল করতে চাই। বেশি নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, আপনি একবার আসবেন?'

বেণীমাধব পুরনো মক্কেল, মালদার লোক। সুধাংশুবাবু বললেন—'বিকেলবেলা যাব।'

বিকেলবেলা সুধাংশুবাবু এলেন। দোর বন্ধ করে দু'জনে প্রায় দেড় ঘন্টা উইলের শর্তাদি আলোচনা করলেন; সুধাংশুবাবু অনেক নোট করলেন। শেষে বললেন—'পরশু আমি উইল তৈরি করে নিয়ে আসব, আপনি উইল পড়ে দস্তখত করে দেবেন। দু'জন সাক্ষীও আমি সঙ্গে আনব।'—

সন্ধ্যের পর সনৎ আর নিখিল বেণীমাধবের কাছে এসে বসল, কুশল প্রশ্ন করল। মেদিনী পাশের ঘরে রান্না করছিল; বেণীমাধব ভাগনেদের চা ও আলুভাজা খাওয়ালেন।

ওরা চলে যাবার পর বেণীমাধব মেঘরাজকে ডেকে বললেন—'দোতলা থেকে সকলকে ডেকে নিয়ে এসো।'

দোতলায় মকরন্দ ছাড়া আর সকলেই ছিল, সমন পেয়ে ছুটে এল। ঝিল্লী আর লাবণিও এল। বেণীমাধব খাটের ধারে বসেছিলেন, দুই নাতনীকে ডেকে নিজের দু' পাশে বসালেন, তারপর ছেলে-বৌ মেয়ে-জামাই-এর পানে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—'আমি উইল করতে দিয়েছি। উইলের ব্যবস্থা আগে থাকতে তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই।'

সকলে সশঙ্ক মুখে চেয়ে রইল। বেণীমাধব ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—'আমার মৃত্যুর পর আমার নগদ সম্পত্তি তোমরা হাতে পাবে না। অ্যানুইটির ব্যবস্থা করেছি ; তোমরা এখন যেমন মাসহারা পাচ্ছ তেমনি পাবে। কোনো অবস্থাতেই যাতে তোমাদের অর্থকষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে মাসহারার টাকার অঙ্ক ধার্য করেছি। বাড়িটা যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন সমান ভাগ করে ভোগ করবে, বিক্রি করতে পারবে না।'

চারজনে মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে রইল। বেণীমাধব দুই নাতনীর কাঁধে হাত রেখে বললেন—'ঝিল্লী আর লাবণির জন্যে আমি আগে থেকেই মেয়াদী বীমা করে রেখেছি, একুশ বছর বয়স পূর্ণ হলে ওরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে। তাছাড়া আমি ঠিক করেছি ওদের বিয়ে দিয়ে যাব। তোমাদের মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না। লাবণির জন্যে একটি ভাল পাত্র আছে ; ছেলেটি মিলিটারিতে লেফটেনেন্ট। ঝিল্লীর জন্যে মনের মত পাত্র এখনো পাইনি, পেলেই একসঙ্গে দু'জনের বিয়ে দেব।' তাঁর মুখে একটু প্রসন্নতার ভাব এসেছিল, আবার তা মুছে গেল ; তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন—'মকরন্দকেও আলাদা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে বড় অসভ্য বেয়াদব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে কিছু দেব না।'

বেণীমাধব চুপ করলেন, তাঁর শ্রোতারাও চুপ করে রইল ; কারুর মুখে কথা নেই। শেষে গঙ্গাধর একটু কেশে অস্পষ্টভাবে বলল—'আপনার সম্পত্তি আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন, আমাদের বলবার কিছু নেই। তবে টাকার দর আজ এক রকম কাল এক রকম—'

গায়ত্রী স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে ভারী গলায় বলল—'বাবা, তুমি যা দেবে তাই মাথা পেতে নেব। উইল কি সই হয়ে গেছে ?'

বেণীমাধব কারুর দিকে তাকালেন না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—'উকিলকে উইল তৈরি করতে দিয়েছি, কাল পরশু সই দস্তখত হবে। হ্যাঁ, একটা শর্তের কথা তোমাদের বলা হয়নি। উইলের শর্ত থাকবে, যদি আমার অপঘাত মৃত্যু হয় তাহলে তোমরা কেউ আমার এক পয়সা পাবে না, সব সম্পত্তি পাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।'

এই কথা শুনে সকলে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি হলো। যথাসময়ে বেণীমাধব নৈশাহার সম্পন্ন করে শয্যা নিলেন। মেঘরাজ ও মেদিনী পাশের ঘরে খাওয়াদাওয়া করল ; মেঘরাজ সামনের দরজা ভেজিয়ে দরজা আগলে বিছানা পাতল, মেদিনী নিজের ঘরে গেল।

ওদিকে দোতলায় থমথমে ভাব। লাবণির নাচের মাস্টার এসেছিল, কিন্তু বাড়িতে কারুর নাচের প্রতি রুচি নেই। পরাগ আর লাবণি আড়ালে কথা বলল, তারপর চুপিচুপি নিঃশব্দে সিনেমা দেখতে চলে গেল। কেউ তাদের যাওয়া লক্ষ্য করল কিনা সন্দেহ।

নিখিল সন্ধ্যের পরই কাজে চলে গিয়েছিল ; সে নিশাচর মানুষ, সারা রাত কাজ করে, সকালবেলা ফিরে আসে।

রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় সনৎ ক্যামেরা নিয়ে বেরুল, মেদিনীর দোরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—'মেদিনী, আমি বর্ধমানে যাচ্ছি, কাল সকালে সেখানে একটা নাচগানের মজলিশ আছে। কাল বিকেলের দিকে কোনো সময় ফিরব। আমার জন্যে আজ রাত্রে তোমাকে দোর খুলতে হবে না।' বলে একটু হাসল।

মেদিনী ক্ষণকাল তার চোখে চোখ রেখে বলল—'জি।'

সনৎ চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে মকরন্দ এল, মেদিনীকে কড়া সুরে

বলল—'দোর বন্ধ করে দাও। রাত্রে কেউ যদি বাইরে থেকে এসে আমার খোঁজ করে, বলবে আমি বাড়ি নেই।' উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ওপরে চলে গেল। মেদিনী সদর দরজায় খিল লাগাল।

তারপর বাড়ির ওপর রাত্রির রহস্যময় যবনিকা নেমে এল।

পরদিন ভোরবেলা মেদিনী সদর দরজা খুলতে গিয়ে দেখল, কবাট ভেজানো আছে কিন্তু খিল খোলা। সে ভুরু কুঁচকে একটু ভাবল, তারপর কবাট একটু ফাঁক করল ; বাইরে নিখিলকে দেখা গেল, সে কাজ শেষ করে ফিরছে। মেদিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে হেসে বলল—'তোমরা কাম শুরু হুয়া হামারা কাম শেষ হুয়া। এবার খুব ঘুমায়গা।'

নিখিল নিজের ঘরে চলে গেল। মেদিনী দরজা ফাঁক করে রাখল, কারণ দোতলায় ঝি কাজ করতে আসবে। তারপর সে কর্তার চা তৈরি করার জন্যে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় চলল।

মিনিটখানেক কাটতে না কাটতে তিনতলা থেকে স্ত্রীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ এল, তারপর ধপ করে শব্দ। নিখিল তার ঘরে গায়ের জামা খুলে গেঞ্জি খোলবার উপক্রম করছিল, তীব্র চীৎকার শুনে সেই অবস্থাতেই ওপরে ছুটল। দোতলা থেকেও সকলে বেরিয়ে এসেছিল, সকলে প্রায় একসঙ্গে তেতলায় গিয়ে পৌঁছল। তারপর বেণীমাধবের দোরের সামনে ভয়াবহ দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেঘরাজ বিছানার ওপর ঊর্ধ্বমুখে পড়ে আছে, তার গলা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত কাটা ; বালিশ এবং বিছানার ওপর পুরু হয়ে রক্ত জমেছে। মেদিনী তার পায়ের দিকে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ কারুর মুখ দিয়ে কথা সরল না, তারপর নিখিল চেঁচিয়ে উঠল—'মামা—মামা বেঁচে আছেন তো ?'

গায়ত্রী, আরতি এবং ঝিল্লী কেঁদে উঠল, অজয় এবং গঙ্গাধর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ; কারুর যেন নড়বার শক্তি নেই। নিখিল তখন মেঘরাজকে ডিঙিয়ে বন্ধ দোরে ঠেলা দিল। দোর খুলে গেল ; খোলা দোর দিয়ে দেখা গেল, বেণীমাধব খাটের ওপর শুয়ে আছেন, তাঁর গলায় নীচে গাঢ় রক্তের চাপ জমা হয়ে আছে। মেঘরাজকে যেভাবে যে-অস্ত্র দিয়ে গলা কাটা হয়েছে বেণীমাধবকে ঠিক সেইভাবে সেই অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

কান্নার একটা কলরোল উঠল। নিখিল ক্ষণিকের জন্য জড়বৎ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিল। প্রথমে নিজের সংবাদপত্রের অপিসে ফোন করল, তারপর থানায়।

তিন

ব্যোমকেশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল, সদর দরজায় পুলিস পাহারা। কনস্টেবল ব্যোমকেশকে দেখে স্যালুট করল, বলল—'ইন্সপেক্টর সাহেব নীচের তলায় বসবার ঘরে আছেন।'

প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে ইন্সপেক্টর রাখাল সরকার এবং দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর উপস্থিত ছিলেন ; মধ্য টেবিল ঘিরে একটা ফাইল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ব্যোমকেশ প্রবেশ করতেই রাখালবাবু তার কাছে এসে দাঁড়ালেন, করুণ হেসে বললেন—'জড়িয়ে পড়েছি ব্যোমকেশদা। বেণীসংহার নামটা আপনি ঠিকই দিয়েছেন। বেণীসংহার শব্দের আসল মানে শুনেছি খোঁপা বাঁধা ; মেয়েরা প্রথমে চুলের বিনুনি করে, তারপর বিনুনি জড়িয়ে খোঁপা বাঁধে। এ ব্যাপারও অনেকটা সেই রকম ; এমন জটিল কুটিল তার বাঁধুনি যে বেণীসংহার উন্মোচন করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুনের মোটিভ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সন্দেহভাজন লোকের সংখ্যাও পাঁচজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; তবু ঠিক কোন্ লোকটি এ কাজ করেছে তা ধরা যাচ্ছে না।'

'এসো, বসা যাক।' দু'জনে দুটো চেয়ারে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসলেন—'এবার বলো।'

রাখালবাবু কাল থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা ব্যোমকেশকে শোনালেন, প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়েও কয়েকটি তথ্য প্রকাশ পেল। ব্যোমকেশ বলল—'মোটিভ কি?'

'বুড়োর অগাধ টাকা। ছেলে এবং মেয়েকে মাসহারা দিত, কিন্তু তাতে তাদের মন উঠত না। ডাক্তার অবিনাশ সেন সন্দেহ করেন, মেয়ে এবং পুত্রবধূ বিষাক্ত খাবার খাইয়ে বুড়োকে মারবার চেষ্টা করছিল। তা যদি হয় তাহলে ছেলে এবং জামাইয়ের মধ্যে ষড় আছে। যা দিনকাল পড়েছে কিছুই অসম্ভব নয়।'

'মেঘরাজকে মারবার উদ্দেশ্য কি?'

'মেঘরাজ রাত্রে বেণীমাধবের দোরের সামনে বিছানা পেতে শুতো। দোর ভেজানো থাকত, যাতে বেণীমাধব ডাকলেই সে ঘরে ঢুকতে পারে। সুতরাং তাকে বধ না করে ঘরে ঢোকা যায় না। তাকে ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকতে গেলে সে জেগে উঠবে। তাই তাকে আগে মারা দরকার হয়েছিল।'

'মারণাস্ত্রটা পাওয়া যায়নি?'

'না। তবে ময়না তদন্ত থেকে জানা গেছে যে, অস্ত্রটা খুব ধারালো ছিল। একই অস্ত্র দিয়ে দু'জনকে মেরেছে। অস্ত্রের এক টানে গলা দু ফাঁক হয়ে গেছে।'

'হত্যার সময়টা জানা গেছে?'

'স্থূলভাবে রাত্রি বারোটা থেকে তিনটের মধ্যে।'

'হুঁ। সন্দেহভাজন পাঁচজন কারা?'

'অজয় ও তার স্ত্রী আরতি, গায়ত্রী ও তার স্বামী গঙ্গাধর। এবং অজয়ের ছেলে মকরন্দ। মকরন্দকে মেঘরাজ একদিন বেণীমাধবের হুকুমে চড় মেরেছিল। ঝিল্লীকে বাদ দেওয়া যায়, সে ছেলেমানুষ, তার কোনো মোটিভ নেই।'

'মকরন্দ ছেলেটা করে কি?'

'পলিটিক্সের হুজুগ করে। কলেজে নাম লেখানো আছে, এই পর্যন্ত। সে-রাত্রে আন্দাজ ন'টার সময় বাড়িতে এসেছিল, তারপর রাত্রেই কখন বেরিয়ে গেছে কেউ জানে না। সেই যে পালিয়েছে আর ফিরে আসেনি। তার নামে হুলিয়া জারি করেছি।'

'বাড়িতে এখন কে কে আছে?'

'অজয় আরতি গঙ্গাধর গায়ত্রী ঝিল্লী নিখিল রায় সনৎ গাঙ্গুলী আর মেঘরাজের বিধবা মেদিনী। অজয়ের মেয়ে লাবণি সে-রাত্রে তার নাচের মাস্টারের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। নিখিল আর সনৎ রাত্রে কাজে বেরিয়েছিল, তারা পরদিন ফিরে এসেছে। যারা বাড়িতে আছে তাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।'

'সকলের আঙুলের ছাপ নিয়েছ নিশ্চয়।'

'তা নিয়েছি।'

'খানাতল্লাশ করে কিছু পেলে?'

'সন্দেহজনক কিছু পাইনি।'

'বেশ; এবার জবানবন্দীর নথিটা দেখি।'

'এই যে।' রাখালবাবু টেবিল থেকে ফাইল তুলে নিয়ে ব্যোমকেশকে দিলেন। এই সময় সদর দরজায় কনস্টেবল এসে জানাল যে, সলিসিটার সুধাংশু বাগচী নামে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান। রাখালবাবু বললেন—'নিয়ে এসো।'

সুধাংশুবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন, হাতে পাট করা খবরের কাগজ। রাখালবাবুর পানে চেয়ে বললেন—'আমি বেণীমাধববাবুর সলিসিটার। আজ খবরের কাগজ খুলেই দেখলাম—'

'বসুন।'

সুধাংশুবাবু একটি চেয়ারে বসলেন। রাখালবাবু তাঁর সামনে দাঁড়ালেন, ব্যোমকেশও এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন—'বেণীমাধববাবুর সঙ্গে কবে আপনার শেষ দেখা হয়েছিল ?'

সুধাংশুবাবু বললেন—'পরশু। আমরা অনেকদিন ধরে তাঁর বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশোনা করে আসছি। পরশু তিনি আমাকে ফোন করে জানালেন যে, তিনি উইল করতে চান। আমি বিকেলবেলা এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উইলে কি কি শর্ত থাকবে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। আমি উইল তৈরি করে আজ তাঁকে দলিল দেখিয়ে সহি-দস্তখত করিয়ে নেব বলে সব ঠিক করে রেখেছিলাম, তারপর আজ সকালে কাগজ খুলে এই সংবাদ পেলাম।'

রাখালবাবু চকিতে একবার ব্যোমকেশের পানে চেয়ে বললেন—'উইলে কি কি শর্ত আছে আমাদের বলতে বাধা আছে কি ?'

সুধাংশুবাবু বললেন—'অন্য সময় বাধা নিশ্চয় থাকত, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বাধা নেই। বরং আপনাদের সুবিধা হতে পারে।'

তিনি উইলের শর্তগুলি শোনালেন ; অপঘাতে মৃত্যু হলে সমস্ত সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাবে সে কথাও উল্লেখ করলেন।

বেলা এগারটা নাগাদ তিনি উঠলেন, বলে গেলেন—'যদি আমার কাছ থেকে আরো কিছু জানতে চান কিংবা উইল পড়ে দেখতে চান, আমার অফিসে খবর দেবেন।'

তিনি চলে যাবার পর রাখালবাবু বললেন—'মোটিভ আরো পাকা হলো। বুড়োকে আর দু'দিন বাঁচতে দিলেই এত বড় সম্পত্তিটা বেহাত হয়ে যেত।'

ব্যোমকেশ বলল—'হুঁ। আমি এবার উঠব। কিন্তু আগে বেণীমাধবের ঘরটা দেখে যেতে চাই।'

'চলুন।'

দোতলার সিঁড়ির মাথায় একজন কনস্টেবল। তেতলায় বেণীমাধবের দরজায় তালা লাগানো, উপরন্তু একজন কনস্টেবল টুলে বসে পাহারা দিচ্ছে। মেঘরাজের রক্তাক্ত বিছানা পরীক্ষার জন্য স্থানান্তরিত হয়েছে।

রাখালবাবু পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন, দু'জনে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝখানে খাটের ওপর বিছানা নেই, আর সব যেমন ছিল তেমনি আছে। ব্যোমকেশ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে চোখ ফেরাল, তারপর অস্ফুট স্বরে বলল—'তোমরা অবশ্য সবই দেখেছ, তবু—'

রাখালবাবু ঘাড় নাড়লেন—'অধিকন্তু ন দোষায়।'

'লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় ছিল ?'

'লোহার সিন্দুকের গায়ে লাগানো ছিল। সিন্দুকের মধ্যে তিনখানা একশো টাকার নোট ছিল, পাঁচ টাকা দশ টাকার নোট বা খুচরো টাকা পয়সা একটাও ছিল না। মনে হয় খুনী সিন্দুক খুলে টাকা পয়সা নিয়েছে কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে নম্বরী নোট নেয়নি।'

'হুঁ। সিন্দুকে আর কী ছিল ?'

'কিছু দলিলপত্র, কিছু রসিদ, ব্যাঙ্কের খাতা ও চেকবুক। দুটো ব্যাঙ্কে টাকা আছে, সাকুল্যে প্রায় চল্লিশ হাজার। তাছাড়া শেয়ার সার্টিফিকেট ও fixed deposit আছে আন্দাজ এগারো লাখ টাকার। মালদার লোক ছিলেন। ছেলে আর মেয়েকে সাড়ে সাত শো টাকা হিসেবে মাসহারা দিতেন। তাঁর নিজের খরচ ছিল সাত শো টাকা, মেঘরাজকে মাইনে দিতেন আড়াই শো টাকা। চেকবুকের counter foil থেকে এইসব খবর জানা যায়।'

'সিন্দুকের ভিতরে কি বাইরে বেণীমাধব ছাড়া অন্য কারুর আঙুলের ছাপ আছে ?'

'কারুর আঙুলের ছাপ নেই, একেবারে লেপা-পোঁছা।'

'হুঁ, আততায়ী লোকটি হুঁশিয়ার।' ব্যোমকেশ সিন্দুক খুলল না, ফ্রিজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—'ফ্রিজে কারুর আঙুলের ছাপ ছিল ?'

'ছিল। বেণীমাধব, মেঘরাজ এবং মেদিনী—তিনজনের আঙুলের ছাপ ছিল। আর কারুর

ছাপ পাওয়া যায়নি।'

হাতল ধরে ব্যোমকেশ ফ্রিজ খুলল, ভিতরে আলো জ্বলে উঠল ; ফ্রিজ চালু আছে। ভিতরে নানা জাতের ফলমূল। সারি সারি ডিম, মাছ, মাংস, দুধের বোতল রয়েছে। ব্যোমকেশ আবার দোর বন্ধ করে দিল।

ঘরের পিছন দিকের দেয়ালে একটা লম্বা ধরনের আয়না টাঙানো ছিল, তার নীচে তাকের ওপর চিরুনী বুরুশ চুলের তেল ও দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। দাড়ি কামাবার সরঞ্জামের বিশেষত্ব এই যে, ক্ষুরটি সেফ্‌টি রেজর নয়, সাবেক কালের ভাঁজ-করা লম্বা ক্ষুর। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে খাপসুদ্ধ ক্ষুর তুলে নিয়ে বলল—'ক্ষুরটা বের করে দেখেছ নাকি ?'

রাখালবাবু চক্ষু একটু বিস্ফারিত করলেন, বললেন—'না। বেণীমাধব নিজের হাতে দাড়ি কামাতেন না, মেঘরাজ রোজ সকালে দাড়ি কামিয়ে দিত।'

ব্যোমকেশ সাবধানে ক্ষুরটি খাপ থেকে বের করে দু' আঙুলে ধরে জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে উল্‌টে-পাল্‌টে দেখতে লাগল। তারপর বিস্মিত স্বরে বলল—'আশ্চর্য !'

ব্যোমকেশ ক্ষুরটি তাঁর হাতে দিয়ে বলল—'দেখ, কোথাও আঙুলের ছাপ নেই।'

ক্ষুর নিয়ে রাখালবাবু পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করলেন, তারপর ক্ষুর ব্যোমকেশকে ফেরত দিয়ে তার মুখের পানে চাইলেন ; দু'জনের চোখ বেশ কিছুক্ষণ পরস্পর আবদ্ধ হয়ে রইল। তারপর ব্যোমকেশ ক্ষুরটি খাপের মধ্যে পুরে নিজের পকেটে রাখল, বলল—'এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কি করবেন ?'

'দাড়ি কামাব।'

তেতলার অন্য ঘর দু'টিতে দর্শনীয় কিছু ছিল না। তবু ব্যোমকেশ ঘর দু'টিতে ঘুরে ফিরে দেখল ; তারপর নীচের তলায় নেমে এসে রাখালবাবুকে বলল—'আমি এখন চললাম। বিকেলবেলা আবার আসব। জবানবন্দীর ফাইলটা দাও, বাড়ি গিয়ে পড়ব।'

রাখালবাবু বললেন—'আমাকে একবার থানায় যেতে হবে, চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই। কি রকম মনে হচ্ছে ?'

ব্যোমকেশ মুচকি হেসে বলল—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—'

রাখালবাবু জবানবন্দীর ফাইল ব্যোমকেশকে দিলেন, তাকে নিয়ে পুলিস ভ্যানে চলে গেলেন। দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর, এবং কয়েকজন নিম্নতর কর্মচারী বাড়িতে মোতায়েন রইল।

বিকেল তিনটের সময় ব্যোমকেশ ফিরে এল। রাখালবাবু আগেই ফিরেছিলেন, তাঁকে ক্ষুর আর জবানবন্দীর নথি ফেরত দিয়ে ব্যোমকেশ একটা চেয়ারে বসল। রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন—'কেমন দাড়ি কামালেন ?'

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল—'ভাল নয়।'

'আর জবানবন্দী ?'

'মেদিনীর জবানবন্দী সবচেয়ে তথ্যপূর্ণ। তাকে আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'বেশ তো, তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। সে নিজের ঘরেই আছে।'

কিন্তু মেদিনীকে ডেকে পাঠাবার আগেই দু'জন সাদা পোশাকের পুলিস কর্মচারী মকরন্দকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। মকরন্দর কাপড়-জামা ছিঁড়ে গেছে, গায়ে মুখে ধুলোবালি, চোখ জবাফুলের মত লাল। বেশ বোঝা যায় সে স্বেচ্ছায় বিনা যুদ্ধে পুলিসের হাতে ধরা দেয়নি। একজন সাদা পুলিস বলল—'মকরন্দ চক্রবর্তীকে ধরেছি স্যার।'

রাখালবাবু মকরন্দর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন—'ইনিই মকরন্দ চক্রবর্তী ! কোথায় ধরলে ?'

'ঘোড়দৌড়ের মাঠে। রেস খেলছিল স্যার। পকেটে অনেক টাকা ছিল। এই যে।'

এক তাড়া পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নোট। রাখালবাবু গুনে দেখলেন, পৌনে দু' শো টাকা। তিনি মকরন্দকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলেন—'তোমার নাম মকরন্দ চক্রবর্তী ?'

মকরন্দ রক্তরাঙা চোখে চেয়ে রইল, উত্তর দিল না। রাখালবাবু আবার প্রশ্ন করলেন—'তুমি পৌনে দু' শো টাকা কোথায় পেলে ?'

উদ্ধত উত্তর হলো—'বলব না।'

'যে-রাত্রে তোমার ঠাকুরদা খুন হন সে-রাত্রে ন'টার সময় তুমি বাড়ি এসেছিলে, তারপর শেষরাত্রে চুপিচুপি দোর খুলে বেরিয়ে গিয়েছিলে—'

'মিছে কথা। মেদিনী মিছে কথা বলেছে।'

'মেদিনী বলেছে জানলে কি করে ?'

মকরন্দ অধর দংশন করল, উত্তর দিল না। রাখালবাবু আবার প্রশ্ন করলেন—'কত রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে ?'

'বলব না।'

'তারপর আর বাড়ি ফিরে আসনি কেন ?'

'বলব না।'

রাখালবাবু তার খুব কাছে এসে বললেন—'একদিন বেণীমাধববাবুর হুকুমে মেঘরাজ তোমার কান ধরে গালে চড় মেরেছিল, গলাধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল।'

'মিছে কথা।'

'বাড়িসুদ্ধ লোক মিছে কথা বলছে ?'

'হ্যাঁ।'

রাখালবাবু ফিরে এসে ব্যোমকেশের পাশে বসলেন, গলা খাটো করে বললেন—'এটাকে নিয়ে কী করা যায় বলুন দেখি ?'

ব্যোমকেশও নীচু গলায় বলল—'যুগধর্মের নমুনা। ওকে বাড়িতেই আটক রাখ।'

'তাই করি।' রাখালবাবু উঠে গিয়ে মকরন্দকে কড়া সুড়ে বললেন—'যাও, দোতলায় নিজের ঘরে থাকো গিয়ে। বাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা কোরো না, চেষ্টা করলে হাজতে গিয়ে লাপ্‌সি খেতে হবে। যাও।'

সাদা পোশাকের পুলিস দু'জন মকরন্দকে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। রাখালবাবু বললেন—'মেদিনীকে ডেকে পাঠাই ?'

ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'না, চল আমরাই তার ঘরে যাই। এখানে অনেক বাধাবিঘ্ন।'

মেদিনীর দোরে টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল মেদিনী মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ব্যোমকেশ ও রাখালবাবুকে দেখে সে উঠে বসল। তার পরনে ধূসর রঙের একটা শাড়ি, কপালে সিঁদুর নেই, হাতে গলায় কানে গয়না নেই। মুখের ভাব একটু ফুলো ফুলো ; শোকের চিহ্ন এখনো মুখ থেকে মুছে যায়নি, কিন্তু শোকের অধীরতা দূর হয়েছে। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্নভরা চোখে দু'জনের পানে চাইল।

রাখালবাবু সদয় কণ্ঠে বললেন—'মেদিনী, ইনি আমার বন্ধু। আমি তোমাকে যেসব প্রশ্ন করেছি তার ওপর ইনি আরো দু'-চারটে সওয়াল করতে চান।'

মেদিনী ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলল—'জি।'

ব্যোমকেশ একদৃষ্টে মেদিনীর মুখের পানে চেয়ে ছিল, আরো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'কতদিন আগে মেঘরাজের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল ?'

মেদিনী অস্ফুট কণ্ঠে বলল—'পাঁচ বছর আগে।'

'তুমিই তার প্রথম স্ত্রী ?'

'জি, না। আগে একজন ছিল, সে মারা গেছে।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে চাইল। ঘরে ফার্নিচারের মধ্যে একটা তক্তপোশ, একটা কাঠের আলমারি এবং একটা খাড়া আলনা। তক্তপোশের তলায় গোটা দুই বড় তোরঙ্গ দেখা

যাচ্ছে। বাইরের দিকের জানালার পাটার ওপর একটা কাঠের চ্যাপটা বাক্স। পশ্চিমা মেয়েরা প্রসাধনের জন্যে এই ধরনের বাক্স ব্যবহার করে ; বাক্সের মধ্যে সিঁদুর কৌটো চিরুনী তেল কাজল প্রভৃতি থাকে, ডালা খুললে ডালার গায়ে আয়না বেরিয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে নিতান্ত মামুলি পরিবেশ।

ব্যোমকেশ এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করল—'বাড়ির সকলকেই তুমি চেন। কে কেমন মানুষ বলতে পার ?'

মেদিনী একটু চুপ করে থেকে হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল—'বুঢ়া বাবা বড় ভাল আদমি ছিলেন, দিলদার লোক ছিলেন। তাঁর ছেলে আর দামাদও ভাল লোক। মেয়ে আর পুতহু আমাকে পছন্দ করেন না। ঝিল্লী দিদি আর লাবণি দিদি ভারি ভাল মেয়ে।'

'আর মকরন্দ ?'

মেদিনী চকিতে চোখ তুলেই আবার নীচু করল—'উনি আমাকে দেখতে পারেন না। ভারি কড়া জবান।'

'মেঘরাজ তাকে চড় মেরেছিল তুমি জানো ?'

'জি হাঁ, আমি তখন পাশের ঘরে ছিলুম।'

'নিখিল আর সনৎ ?'

'নিখিলবাবু মজাদার লোক, খুব ঠাট্টা তামাসা করেন। আর সনৎবাবু গম্ভীর মেজাজের মানুষ। কিন্তু দু'জনেই খুব ভদ্র।'

'আচ্ছা, ওকথা থাক। মেঘরাজ সৈন্যদলের সিপাহী ছিল, তার সিপাহী-জীবন সংক্রান্ত কাগজপত্র নিশ্চয় তোমার কাছে আছে ?'

'জি আছে, তার বাক্সের মধ্যে আছে।'

'আমি একবার কাগজপত্রগুলো দেখতে চাই।'

'এই যে বার করে দিচ্ছি।'

সে গিয়ে তক্তপোশের তলা থেকে একটা ট্রাঙ্ক টেনে বার করল, আঁচল থেকে চাবি নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ট্রাঙ্ক খুলতে লাগল। ব্যোমকেশ ইতিমধ্যে ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানলার ওপর প্রসাধনের বাক্সটা রাখা আছে। ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করে বাক্সের ডালা তুলল। বাক্সের মধ্যে মেয়েলি প্রসাধনের দ্রব্য ও টুকিটুকি ; আয়নার এক কোণে মেদিনীর একটি ছবি আঁটা রয়েছে। পোস্টকার্ড আধখানা করলে যত বড় হয় তত বড় ছবি ; মেদিনী খাটের ধারে বসে রয়েছে। নিতান্তই ঘরোয়া ছবি, মেদিনীর মুখের প্রাণখোলা হাসিটি ব্যোমকেশের গায়ে কাঁটার মত বিঁধল। মেদিনীর বর্তমান চেহারা দেখে ভাবা যায় না সে এমনভাবে হাসতে পারে। ব্যোমকেশ নিঃশব্দে বাক্স বন্ধ করল।

মেদিনী ট্রাঙ্ক থেকে কাগজপত্র নিয়ে যখন ফিরে এল তখন ব্যোমকেশ রাখালবাবুর কাছে ফিরে এসে নিম্নস্বরে কথা বলছে, মেদিনীর হাত থেকে কাগজপত্র নিয়ে সে মন দিয়ে পড়ল। রাখালবাবুও সঙ্গে সঙ্গে পড়লেন। তারপর কাগজ মেদিনীকে ফেরত দিয়ে ব্যোমকেশ মেদিনীকে বলল—'এগুলো যত্ন করে রেখে দাও, হয়তো পরে দরকার হবে। চল রাখাল।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাখালবাবু ব্যোমকেশের দিকে চোখ বেঁকিয়ে তাকালেন—'কি মনে হলো ?'

ব্যোমকেশ বলল—'খুব ভাল। এবার বাড়ির বাকি লোকগুলিকেও একে একে দেখতে চাই। সবাই বাড়িতে আছে তো ?'

'সবাই আছে, কেবল অজয়ের মেয়ে লাবণি ছাড়া। যে-রাত্রে খুন হয়, লাবণি সেদিন সন্ধ্যের সময় তার নাচের মাস্টারের সঙ্গে পালিয়েছে, এখনো তার সন্ধান পাইনি। অন্য যারা আছে তাদের মধ্যে আগে কাকে দেখতে চান ?'

'আমার কোনো পক্ষপাত নেই। নীচের তলা থেকেই আরম্ভ করা যাক।'

নিখিলের দোরে রাখালবাবু টোকা দিলেন, নিখিল এসে দোর খুলে দাঁড়াল। তার গালে সাবানের ফেনা, হাতে সেফ্‌টি রেজর ; সে ফেনায়িত হাসি হাসল—'আসুন দারোগাবাবু।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, প্রশ্ন করলেন—'বিকেলবেলা দাড়ি কামাচ্ছেন ?'

নিখিল বলল—'আমি নিশাচর কিনা তাই বিকেলবেলা দাড়ি কামাই। যারা দিনের বেলা কাজ করে তারা সকালবেলা দাড়ি কামায়।' তারপর সে ব্যগ্রস্বরে বলল—'দারোগাবাবু, এক ঘন্টার জন্য আমাকে ছেড়ে দিন, একবারটি অফিস ঘুরে আসি। মাইরি বলছি পালাব না। বিশ্বাস না হয় দু'জন পেয়াদা আমার সঙ্গে দিন।'

রাখালবাবু হেসে বললেন—'অফিসে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন ? বেশ তো আছেন।'

নিখিল বলল—'না দারোগাবাবু, বেশ নেই। কাজের নেশা আমাকে অফিসের দিকে টানছে, রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া আবার কি ?'

নিখিল একটু সলজ্জভাবে বলল—'অফিসে অনেকগুলো আইবুড়ো মেয়ে কাজ করে, তাদের মধ্যে একটাকে আমি খুঁজছি, পেলেই তাকে বিয়ে করব।'

'ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে।'

'ঠেকবেই তো। ঘোর রহস্যময় ব্যাপার।'

'ঘোর রহস্যময় যদি হয় তাহলে এঁর শরণাপন্ন হোন। ইনিই হলেন শ্রীব্যোমকেশ বক্সী।'

নিখিলের গালে সাবানের ফেনা শুকিয়ে ঝরে ঝরে পড়ছিল, সে প্রকাণ্ড হাঁ করে ব্যোমকেশের পানে তাকাল—'অ্যাঁ, আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী ! এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি।' সেফ্‌টি রেজরসুদ্ধ হাত জোড় করে বলল—'আমার রহস্যটা আপনাকে ভেদ করতেই হবে ব্যোমকেশবাবু। নইলে আমার প্রাণের আশা নেই।'

'সব কথা খুলে বলুন।'

নিখিল তড়বড় করে এক নিশ্বাসে তার রহস্য শোনাল। শুনে ব্যোমকেশ বলল—'চিঠিগুলো দেখি।'

নিখিল বিছানার কাছে গিয়ে বালিশের তলা থেকে কয়েকখানা খাম এনে ব্যোমকেশকে দিল। ব্যোমকেশ খামগুলি খুলে একে একে চিঠি বার করে পড়ল, তারপর আবার খামের মধ্যে পুরে নিজের পকেটে রাখল—'এগুলো আমি রাখলাম। দেখি যদি সন্ধান পাই। আপনি আপাতত এই বাড়িতেই থাকুন, আমি আপনার অফিসে খোঁজখবর নেব।—ভাল কথা, আপনার বর্ষাতি আছে ?'

'বর্ষাতি—ওয়াটারপ্রুফ ? আছে একটা। কেন বলুন তো ?'

'দেখি একবার।'

নিখিল সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে একটা পুরনো খাকি রঙের বর্ষাতি নিয়ে এল। ব্যোমকেশ সেটা রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'এটাও আমরা নিয়ে চললাম। এটা আপনি শেষবার কবে ব্যবহার করেছেন ?'

নিখিল কিছুই বুঝতে পারেনি এমনিভাবে মাথা চুলকে বলল—'গত বর্ষাকালে, মানে পাঁচ ছয় মাস আগে। আপনি যে ভেলকি লাগিয়ে দিলেন, ওয়াটারপ্রুফ থেকে আমার—মানে মেয়েটার ঠিকানা বার করবেন নাকি ?'

ব্যোমকেশ কেবল মুখ টিপে হাসল, বলল—'আপনি দেখছি সেফ্‌টি রেজর দিয়ে দাড়ি কামান।'

'তবে কি দিয়ে দাড়ি কামাব ?'

'ঠিক কথা। আপনি যখন দাড়ি কামাতে আরম্ভ করেছেন তখন সাবেক ক্ষুরের রেওয়াজ উঠে গেছে।—আচ্ছা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে বক্র কটাক্ষপাত করল। রাখালবাবু অপ্রতিভভাবে বললেন—'খেয়াল হয়নি। হওয়া উচিত ছিল। যে-লোক ছুরি কিংবা ক্ষুর দিয়ে গলা কাটতে যাচ্ছে, সে জানে গলা কাটলে চারদিকে রক্ত উথলে পড়বে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। তার নিজের গায়েও রক্ত লাগবে। তাই সে বর্ষাতি কিংবা ওই রকম একটা কিছু গায়ে দিয়ে খুন করতে যাবে, যাতে সহজে রক্ত ধুয়ে ফেলা যায়।'

এই সময় সদর দোরের কনস্টেবল এসে একখানা পোস্টকার্ড রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'পিওন দিয়ে গেল।'

রাখালবাবু নির্দ্বিধায় পোস্টকার্ড পড়লেন। অজয় চক্রবর্তীর নামে চিঠি, তারিখ আজ সকালের, ঠিকানা টালিগঞ্জ। চিঠিতে কয়েক ছত্র লেখা আছে—

শ্রীচরণেষু মা,

কাল রাত্তিরে আমাদের বিয়ে হয়েছে। তোমরা রাগ কোরো না। আমার শ্বশুর শাশুড়ি খুব ভালো লোক। পরশু রাত্রে আমি শাশুড়ির কাছে শুয়েছিলাম। দাদু অন্য একজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিলেন তাই আমরা লুকিয়ে বিয়ে করেছি।

প্রণতা
লাবণি

চিঠিতে চোখ বুলিয়ে রাখালবাবু ব্যোমকেশের হাতে চিঠি দিলেন, ব্যোমকেশ সেটা পড়ে ফেরত দিল। বলল—'বোধহয় ঠাকুরদার মৃত্যু-সংবাদ পায়নি। যাক, বিয়ে করেছে ভালই করেছে, নইলে—'

চিঠি পকেটে রেখে রাখালবাবু একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে ডাকলেন—'এই বর্ষাতিটা রাখো। আরো বোধহয় জুটবে ; সবগুলো জড় হলে পরীক্ষার জন্যে পাঠাতে হবে। এটাতে টিকিট সেঁটে রাখ—নিখিল হালদার।'

তারপর তিনি সনতের দোরে টোকা দিলেন। সনৎ এসে দোর খুলল ; তার হাতে একটা ইংরেজি রহস্য উপন্যাস পাতা ওলটানো অবস্থায় রয়েছে। রাখালবাবুকে দেখে বলল—'ইন্সপেক্টরবাবু, আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, এক টিন আনিয়ে দেবেন? গোল্ড ফ্লেক।'

'নিশ্চয়। টাকা দিন আনিয়ে দিচ্ছি।'

সনৎ একটা দশ টাকার নোট পকেট থেকে বার করে দিল। রাখালবাবু টাকা সাব-ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে বললেন—'এক টিন গোল্ড ফ্লেক সিগারেট সামনের দোকান থেকে আনিয়ে দাও।'

তিনি ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। সনৎ বলল—'আর কতদিন ঘরে বন্ধ করে রাখবেন? কাজকর্ম আটকে রয়েছে। তা ছাড়া মামা মারা যাবার পর তাঁর উত্তরাধিকারী এখানে আর থাকতে দেবে না, মাথা গোঁজবার একটা জায়গা খুঁজতে হবে তো।'

'থাকতে দেবে না কি করে জানলেন?'

'আজ দুপুরবেলা গায়ত্রীর স্বামী গঙ্গাধর এসেছিল, বলল—এবার পাতাতাড়ি গোটাতে হবে।'

'তাই নাকি!—বেশি দিন আপনাদের কষ্ট দেব না, দু'এক দিনের মধ্যে ছাড়া পাবেন। ইনি ব্যোমকেশ বক্সী, প্রখ্যাত সত্যান্বেষী।'

সনৎ নির্লিপ্ত চোখে ব্যোমকেশের পানে চাইল, নীরস স্বরে বলল—'নাম শুনেছি, বই পড়িনি। বাংলা রহস্য কাহিনী আমি পড়ি না।—বসুন।'

ব্যোমকেশের চোখ ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে অলসভাবে বলল—'আপনার বর্ষাতি আছে?'

সনৎ ভ্রূ তুলে একটু বিস্ময় প্রকাশ করল—'আছে। এটা বর্ষাকাল নয় তাই তুলে রেখেছি। দেখতে চান?'

'হ্যাঁ।'

সনৎ আলমারি খুলে একটা প্ল্যাস্টিকের মোড়ক বার করল। মোড়কের মধ্যে একটি শৌখিন স্বচ্ছ বর্ষাতি পাট করা রয়েছে। রাখালবাবু সেটি নিয়ে মোড়ক থেকে বার করলেন, তারপর লম্বা করে ঝুলিয়ে দেখলেন। দামী বর্ষাতি, প্রায় নতুন। তিনি সেটিকে পাট করে আবার মোড়কের মধ্যে রেখে বললেন—'এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, দু' দিন পরে ফেরত পাবেন। রসিদ দিচ্ছি।'

সনৎ অপ্রসন্ন উদাস কণ্ঠে বলল—'রসিদ কি হবে! আপনাদেরই রাজত্ব, যা ইচ্ছে করুন।'

ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করল—'আপনার জবানবন্দীতে দেখলাম যে-রাত্রে বেণীমাধববাবু খুন হন সে-রাত্রে আপনি বর্ধমানে গিয়েছিলেন। কোন ট্রেনে গিয়েছিলেন?'

সনৎ বলল—'রাত্রি সাড়ে দশটার ট্রেনে।'

'পরদিন ভোরের ট্রেনে না গিয়ে রাত্রির ট্রেনে গেলেন কেন?'

'ভোরের ট্রেনে গেলে ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারতাম না। সকালবেলা মজলিশ ছিল।'

'বর্ধমানে আপনার কোনো আস্তানা আছে?'

'না, স্টেশনের বেঞ্চিতে বসে রাত কাটিয়েছি।'

'চায়ের স্টলে গিয়ে চা খেয়েছিলেন নিশ্চয়?'

'চা আমি খাই না।'

'তাহলে আপনি যে সাড়ে দশটার গাড়িতে বর্ধমান গিয়েছিলেন তার কোনো সাক্ষী-সাবুদ নেই?'

সনতের ভুরু আবার উঁচু হলো—'সাক্ষী-সাবুদের কী দরকার? আপনাদের কি সন্দেহ আমি মামাকে খুন করেছি?'

ব্যোমকেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—'তা নয়। কিন্তু সকলের সম্বন্ধেই আমাদের নিঃসংশয় হওয়া দরকার।'

সনৎ শুকনো গলায় বলল—'মামাকে খুন করে যাদের লাভ আছে তাদের অ্যালিবাই খুঁজুন গিয়ে। তাতে কাজ হবে।'

'তা বটে। চল রাখাল, এবার দোতলায় যাওয়া যাক।'

প্রথমে ড্রয়িংরুমে গিয়ে রাখালবাবু সনতের বর্ষাতি সাব-ইন্সপেক্টরকে সমর্পণ করে বললেন—'টিকিট মারো—সনৎ গাঙ্গুলি।' তারপর ব্যোমকেশকে নিয়ে দোতলায় উঠলেন।

অজয় সামনের ঘরে বসে সায়াহ্নিক চা জলখাবার খাচ্ছিল, সশঙ্ক মুখে উঠে দাঁড়াল। তার মুক্তকচ্ছ অশৌচের বেশ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। রাখালবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—'আপনার একখানা চিঠি এসেছে।' তিনি পোস্টকার্ড পকেট থেকে নিয়ে অজয়কে দিলেন।

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট চোখে অজয়ের পানে চেয়ে ছিল; সে দেখল চিঠি পড়তে পড়তে অজয়ের মুখের ওপর দিয়ে দ্রুত পরম্পরায় বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি খেলে গেল: আশঙ্কা—বিস্ময়—স্বস্তি—উৎফুল্লতা। তার মধ্যে স্বস্তির আরামই বেশি। অজয়ের মত প্রকৃতির লোকের পক্ষে এটাই বোধহয় স্বাভাবিক; বিনা খরচে বিনা ঝঞ্ঝাটে যদি মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় তাহলে আনন্দ হবারই কথা।

কিন্তু সে যখন মুখ তুলল তখন তার মুখে একটি বিষণ্ণ করুণ ভাব, তাতে রঙ্গমঞ্চের আভাস পাওয়া যায়। সে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল—'মেয়ে! দারোগাবাবু, আমার একমাত্র মেয়ে পালিয়ে গিয়ে একজনকে বিয়ে করেছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড় নিষ্ঠুর, বড় স্বার্থপর, তারা বাপ-মায়ের কথা ভাবে না। যাক, যা করেছে ভালই করেছে। তবু যদি জাতের মধ্যে বিয়ে করত। যাক, ভাল হলেই ভাল।' সে আবার নাটকীয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রাখালবাবু বোধকরি অভিনয়ের পালা শেষ করার জন্যেই বললেন—'ইনি ব্যোমকেশ বক্সী। বোধহয় নাম শুনেছেন।'

অজয় তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে রইল; তার ভাবভঙ্গীতে ভয়

কিংবা বিস্ময় কিংবা আনন্দ কোনটা প্রকাশিত হলো ঠিক বোঝা গেল না। তারপর সে গদ্‌গদ স্বরে বলে উঠল—'নাম শুনিনি! বলেন কি আপনি, নাম শুনিনি! আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার। ব্যোমকেশবাবু এসেছেন, এবার বাবার মৃত্যু রহস্যের একটা কিনারা হবে।' সে অন্দরের দরজার দিকে ফিরে গলা চড়িয়ে বলল—'ওগো শুনছ, শীগ্‌গির দু' পেয়ালা চা নিয়ে এসো।—বসুন বসুন, আমি নিজেই দেখছি।' সে দ্রুত অন্দরের দিকে অন্তর্হিত হলো।

সমাদরের আতিশয্য দেখে ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে মুখ টিপে হাসল; দু'জনে পাশাপাশি চেয়ারে উপবিষ্ট হলেন।

কিছুক্ষণ পরে অজয় ফিরে এল, তার পিছনে মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়ে আরতি; আরতির হাতে থালার ওপর দু' পেয়ালা চা এবং বিস্কুট। তার মুখ ভয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে, সে থালাটি ব্যোমকেশের সামনে রেখেই ফিরে যাচ্ছিল, অজয় বলল,—'ওকি, চলে যাচ্ছ কেন? ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে কথা কও।'

আরতি থমকে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশের দিকে ফিরল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ব্যোমকেশ তার অবস্থা লক্ষ্য করে সদয় কণ্ঠে বলল—'না না, উনি কাজকর্ম করুন গিয়ে, ওঁকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।'

আরতি চলে গেল। অজয় আমতা-আমতা করে বলল—'আমার স্ত্রী বড় লাজুক, কিন্তু আমরা দু'জনেই আপনার ভক্ত—' অজয় আরো অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল, ব্যোমকেশ বাধা দিয়ে বলল—'আপনার ছেলে মকরন্দ বাড়িতেই আছে তো?'

অজয় চকিত হয়ে বলল—'আছে বৈকি। তাকে ডাকব?'

ব্যোমকেশ বলল—'ডাকবার বোধহয় দরকার হবে না। সে কলেজে পড়ে, বর্ষাকালে নিশ্চয় তার বর্ষাতি দরকার হয়। তার বর্ষাতিটা একবার দেখতে চাই।'

অজয় একটু চিন্তা করে বলল—'বছর দেড়েক আগে তাকে একটা ওয়াটারপ্রুফ কিনে দিয়েছিলাম। আছে নিশ্চয়, আমি দেখছি।'

অজয় অন্দরের দিকে চলে গেল। ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে অজয় ফিরে এসে বিমর্ষ মুখে বলল—'ওয়াটারপ্রুফটা খুঁজে পেলাম না। মকরন্দকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বলল—জানি না।'

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা রেখে মুখ মুছতে মুছতে বলল—'আপনার নিজের ওয়াটারপ্রুফ আছে?'

'আছে। এনে দেব?'

'আপনার স্ত্রীর এবং মেয়ের ওয়াটারপ্রুফ?'

'মেয়েদের জন্যে একটাই মেয়েলি ওয়াটারপ্রুফ আছে।'

'দয়া করে ও দুটো এনে দিন, আমরা নিয়ে যাব। দু'চার দিনের মধ্যেই ফেরত পাবেন।'

'নিয়ে যাবেন, বেশ তো, তা এনে দিচ্ছি।'

অজয় অন্দরে গিয়ে দু'হাতে দুটি ওয়াটারপ্রুফ ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এল। রাখালবাবু সে দুটি পাট করে বগলে নিলেন, বললেন—'আচ্ছা, আজ উঠি। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ।'

অজয় কাঁচুমাচু হয়ে ব্যোমকেশকে বলল—'চললেন? একটা অনুরোধ ছিল সাহস করে বলতে পারছি না—'

'কি অনুরোধ?'

'আপনার একটা ফটো তুলব। আমার ক্যামেরা আছে, যদি অনুমতি করেন একটা তুলে নিই। আপনার ছবি এনলার্জ করে ঘরে টাঙিয়ে রাখব।'

ব্যোমকেশ হেসে উঠল—'ফটো তুলবেন! তা—আপত্তি কি। আমার ছবি এনলার্জ করে ঘরে টাঙিয়ে রাখার আগ্রহ আজ পর্যন্ত কারো দেখা যায়নি।'

অজয় দ্রুত গিয়ে ক্যামেরা নিয়ে এল। সাধারণ বক্স-ক্যামেরা। সে বললে—'এখনো যথেষ্ট

আলো আছে। আপনি জানালার কাছে দাঁড়ান, আমি ছবি তুলে নিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ জানলার পাশে পড়ন্ত আলোয় দাঁড়াল। ক্যামেরায় ক্লিক করে শব্দ হলো।

'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ!' শুনতে শুনতে ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বাইরে এসে দু'জনের কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথা হলো ; তারপর ব্যোমকেশ বর্ষাতি দুটো নিয়ে নীচে নেমে গেল, রাখালবাবু তেতলায় উঠে গেলেন। ওপরে কনস্টেবল টুলের ওপর বসেছিল, উঠে দাঁড়াল।

চাবি দিয়ে ঘরের দোর খুলে রাখালবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন, কয়েকবার এদিক ওদিক ঘুরলেন। তারপর দোরের বাইরে ফিরে এসে দেখলেন, মেদিনী ক্লান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন—'মেদিনী, তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি তাই ডেকেছি।'

মেদিনী ব্যায়ত বিহ্বল চোখে চাইল, তারপর চোখের ওপর আঁচল চাপা দিল। রাখালবাবু বললেন—'বলো দেখি সেদিন সকালে তুমি যখন তোমার স্বামীর মৃতদেহ প্রথম দেখলে তখন সে কি চিৎ হয়ে শুয়েছিল?'

অবরুদ্ধ উত্তর এল—'জি, হাঁ।'

রাখালবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—'আচ্ছা আচ্ছা, ও কথা থাক। এবার একবার ঘরের মধ্যে এসো।'

মেদিনী চোখের জল মুছে থমথমে মুখ নিয়ে ঘরের মধ্যে এল। রাখালবাবু চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে বললেন—'ঘরটা ভাল করে দেখ। তুমি আগে অনেকবার দেখেছ। কোথাও কোনো তফাত বুঝতে পারছ?'

মেদিনী বলল—'খাটের ওপর বিছানা নেই।'

'তাছাড়া আর কিছু?'

মেদিনী চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মাথা নাড়ল—'আর কোনো তফাত বুঝতে পারছি না।'

'হুঁ। আচ্ছা হয়েছে, এবার নীচে চল।'

মেদিনীকে নিয়ে রাখালবাবু নীচে নেমে গেলেন। মেদিনী নিজের ঘরে চলে গেল। রাখালবাবু ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করে দেখলেন ব্যোমকেশ একটা চেয়ারে অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানছে। দু'জনের চোখাচোখি হলো। ব্যোমকেশ বাঁকা হেসে ঊর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর খাড়া হয়ে বসে বলল—'শুভকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। রাখাল, এবার আমি বাড়ি ফিরব। তোমার কতদূর?'

রাখাল বললেন—'গঙ্গাধর ঘোষালকে দর্শন করবেন না?'

'ওহো তাই তো, গঙ্গাধরকে দর্শন করা হলো না। আজ থাক, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তিনি হয়তো ভূমানন্দে আছেন। কাল সকালে তাঁকে দর্শন করা যাবে।' ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে নিখিলের চিঠিগুলি নিয়ে রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'এগুলোতে মেয়েলি আঙুলের ছাপ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখো। আজ চলি।'

'চলুন, আমিও যাই। বর্ষাতিগুলো পরীক্ষা করতে হবে।'

পরদিন বেলা ন'টার সময় ব্যোমকেশ বেণীমাধবের বাড়িতে গিয়ে দেখল, রাখালবাবু সদর বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল এবং সনতের সঙ্গে কথা বলছেন। ব্যোমকেশ যেতেই তিনি বললেন—'শুনেছেন ব্যোমকেশদা, মেদিনীর ঘর থেকে একটা বাক্স চুরি গেছে, টয়লেটের বাক্স।'

ব্যোমকেশ ভুরু উঁচু করে বলল—'টয়লেট-বক্স। সে কি, কি করে চুরি গেল?'

'তা ঠিক বলতে পারছি না। তবে কাল সন্ধ্যেবেলা মেদিনীকে আমি তেতলায় ডেকেছিলাম,

ওর ঘর খোলা ছিল, সেই সময় হয়তো কেউ সরিয়েছে। তাই এঁদের জিজ্ঞেস করছিলাম এঁরা কিছু জানেন কিনা।'

সনৎ বলল—'আমি কি করে জানব বলুন। মেদিনীর ঘরের মধ্যে কখনো পদার্পণ করিনি, কোথায় কী আছে কোত্থেকে জানব?'

নিখিল বলল—'দোহাই দারোগাবাবু, আমি টয়লেট-বক্স চুরি করিনি। আমার ঘরে চুল বেঁধে টিপ পরার মানুষ নেই।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে প্রশ্ন করল—'মকরন্দকে জেরা করেছিলে?'

'করেছিলাম। তাদের ফ্ল্যাট আবার খানাতল্লাশ করেছিলাম, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।'

'এঁদের ঘর?'

'এইবার করব।' রাখালবাবু একজন জমাদারকে এবং সাব-ইন্সপেক্টরদের ডেকে বললেন—'তোমরা এঁদের ঘর দুটো আবার ভাল করে খানাতল্লাশ কর, মেদিনীর চুল বাঁধার বাক্সটা পাও কিনা দেখ। আমরা দোতলায় গঙ্গাধরবাবুর ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।'

সনৎ অপ্রসন্ন মুখে বলল—'করুন করুন, যত ইচ্ছে খানাতল্লাশ করুন, কিন্তু আমার দামী ক্যামেরাগুলো ভাঙবেন না।'

ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

দোতলায় উঠে তাঁরা দেখলেন বারান্দার অপর প্রান্তে গঙ্গাধরের ফ্ল্যাটে সদর দরজা খুলে তার মেয়ে ঝিল্লী বেরিয়ে এল, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দু'পা এসে তাদের দেখে সংকুচিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাখালবাবু তার কাছে এসে ব্যোমকেশকে বললেন—'এর নাম ঝিল্লী, গঙ্গাধরবাবুর মেয়ে।—তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

ঝিল্লী সলজ্জ অস্ফুটস্বরে বলল—'মামীমা ডেকে পাঠিয়েছেন।'

ব্যোমকেশ ঝিল্লীর সংকোচনম্র কমনীয় মুখের পানে চেয়ে হাসল—'আমাদের দেখে এত লজ্জা কিসের? আমরা বাঘ-ভাল্লুক নয়, কামড়ে দেব না।'

ঝিল্লী একটু হেসে চোখ তুলল। ব্যোমকেশ দেখল চোখ দুটি সুন্দর এবং বুদ্ধিদীপ্ত। রাখালবাবু পরিচয় দিলেন—'ইনিই ব্যোমকেশ বক্সী।'

ঝিল্লীর চোখে উৎসুক আলো ফুটে উঠল, তারপর আস্তে আস্তে তার মুখের ওপর অরুণাভা ছড়িয়ে পড়ল। সে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছে দেখে ব্যোমকেশ বলল—'ঝিল্লী, একটু দাঁড়াও, তোমার কাছে কিছু জানবার আছে।'

ঝিল্লী দাঁড়াল, কিন্তু ব্যোমকেশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রইল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল—'লাবণির সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল?'

একটু দ্বিধার পর ঝিল্লী ঘাড় নাড়ল।

'সে তোমাকে নিজের মনের কথা বলত, তুমি তাকে নিজের মনের কথা বলতে। কেমন?'

ঝিল্লী উত্তর দিল না, সতর্কভাবে অপেক্ষা করে রইল।

'লাবণি নিশ্চয় তোমাকে বলেছিল সে তার নাচের মাস্টার পরাগ লাহাকে ভালবাসে।'

ঝিল্লী ঘাড় নীচু করে অস্ফুটস্বরে বলল—'বলেছিল।'

'সে পালিয়ে গিয়ে পরাগকে বিয়ে করবে বলেছিল?'

ঝিল্লী উৎফুল্ল চোখ তুলল—'লাবণি ওকে বিয়ে করেছে!'

'হ্যাঁ। তুমি দেখছি জানতে না।'

'না।'

'কিন্তু জানতে পেরে খুব খুশি হয়েছ।'

ঝিল্লী হেসে ফেলল।

ঝিল্লীকে ছেড়ে গঙ্গাধরের দোরের দিকে যেতে যেতে রাখালবাবু খাটো গলায় বললেন—'আপনার মন বিচিত্র কুটিল পথে চলেছে, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসল। রাখালবাবু গঙ্গাধরের দোরে টোকা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে কড়া আওয়াজ এল—'কে ? ভেতরে এসো।'

দু'জনে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝখানে গোল টেবিল, তার সামনে চেয়ারে বসে গঙ্গাধর তাস নিয়ে সলিটেয়ার খেলছিল, রাখালবাবুর দিকে বিরক্ত চোখে চেয়ে বলল—'আবার কি চাই ?'

গঙ্গাধরের ভাবভঙ্গী এখন অন্যরকম। নিজের টাকাকড়ি উড়িয়ে শ্বশুরের গলগ্রহ হবার পর সে কচ্ছপের মত হাত-পা গুটিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু শ্বশুরের মৃত্যুর পর হালের আইন অনুযায়ী সে অর্ধেক রাজত্ব পাবে এই অনিবার্য সম্ভাবনার ফলে সে আবার নিজ মূর্তি ধারণ করেছে, তার আচার-আচরণে বনেদী বড় মানুষের মজ্জাগত আত্মম্ভরিতা আবার ফুটে উঠেছে।

তার কথা বলার ভঙ্গীতে ব্যোমকেশের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল, তারপর রাখালবাবু যখন বললেন—'ইনি আমার সহকারী শ্রীব্যোমকেশ বক্সী' তখন গঙ্গাধর উদ্ধতকণ্ঠে বলে উঠল—'তাতে কী হয়েছে ? So what?'

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল, সে গঙ্গাধরের মুখোমুখি চেয়ারে বসে বলল—'আপনার নাম গঙ্গাধর ঘোষাল, কয়েক বছর আগে আপনি রেস-কোর্সের এক জকিকে ঘুষ খাওয়াবার চেষ্টা করার জন্যে আইনের হাতে পড়েছিলেন ?'

গঙ্গাধর আরক্ত চোখে গর্জে উঠল—'তাতে আপনার কি ?'

ব্যোমকেশ আঙুল তুলে বলল—'আপনি দাগী আসামী, আপনাকে খুনের সন্দেহে গ্রেপ্তার করা যায়। আপনার শ্বশুর উইল দস্তখত করার আগে রাত্রে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। কে তাঁকে খুন করেছে ?'

বেগবান ঘোড়া হোঁচট লেগে যেন ডিগবাজি খেয়ে পড়ল। গঙ্গাধরের দম্ভস্ফীত মুখ তুবড়ে গেল, সে ভীতস্বরে বলল—'আমি কি জানি ! আমি কি জানি !'

ব্যোমকেশ এবার একটু ঠাণ্ডা হলো, বলল—'বেণীমাধববাবুকে খুন করার স্বার্থ আপনারও আছে, অজয়বাবুরও আছে ; কিন্তু আপনি জামাতা, দশম গ্রহ।'

উত্তরে গঙ্গাধর দু'বার কথা বলবার জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ব্যোমকেশ তখন সহজ সুরে বলল—'আপনার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, বেশি তেজ দেখাবেন না।'

এই সময় গায়ত্রী ভিতর দিক থেকে ঘরে প্রবেশ করল। আঁচলটা কোমরে জড়ানো, চোখে তীব্র দৃষ্টি, যুদ্ধং দেহি ভাব। সে একটা চেয়ারে বসে ব্যোমকেশকে কড়া সুরে বলল—'কি জানতে চান আমাকে বলুন।'

ব্যোমকেশ গায়ত্রীকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল—'আপনি বেণীমাধববাবুর মেয়ে গায়ত্রী দেবী। আপনাকেও কিছু প্রশ্ন আছে।—আপনার বাবা উইল সই করবার আগেই কেউ তাঁকে খুন করেছে। কিন্তু তাঁর আগের কোনো উইল আছে কিনা আপনি জানেন ?'

এতক্ষণে গঙ্গাধর কতকটা ধাতস্থ হয়েছে, সে বলে উঠল—'আমার শ্বশুর ইনটেস্‌টেট্‌ মারা গেছেন।'

গায়ত্রী অমনি ধমক দিয়ে উঠল—'তুমি চুপ করো।—আমার বাবার অন্য কোনো উইল নেই। তিনি যা রেখে গেছেন নতুন আইনের জোরে তার অর্ধেক আমি পাব।'

'বেণীমাধববাবু বিষয়ী লোক ছিলেন, এই বয়স পর্যন্ত তিনি উইল করেননি এ কি সম্ভব ? হয়তো পুরনো উইল বেরুবে, যাতে তিনি অন্য কাউকে যথাসর্বস্ব দিয়ে গেছেন। হয়তো আপনার জন্য মাসহারা বরাদ্দ করে বাকি সব টাকা অজয়বাবুকে দিয়ে গেছেন।'

ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে গায়ত্রী প্রায় চীৎকার করে উঠল—'না না না, বাবা কখনো আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তিনি দাদার চেয়ে আমাকে ঢের বেশি ভালবাসতেন।'

'বসুন বসুন। আমি বলছি না যে, বেণীমাধববাবুর অন্য উইল আছেই। কিন্তু তিনি

ভাগনেদেরও ভালবাসতেন, বাড়িতে এনে রেখেছিলেন ; তাদের কি কিছুই দিয়ে যাননি ?'

গায়ত্রী আবার চেয়ারে বসে বলল—'ওরা বাবার আসল ভাগনে নয়, মাসতুত বোনের ছেলে। সনতের বাপ দুশ্চরিত্র ছিল, স্ত্রীকে খুন করে ফাঁসি যায় ; নিখিলের বাপ সার্কাসের পেশাদার ক্লাউন ছিল। ওদের কেন বাবা টাকা দিয়ে যাবেন ?'

'আচ্ছা, ও কথা যাক। বলুন দেখি আপনার বাড়িতে ক'টা বর্ষাতি আছে।'

গায়ত্রী হঠাৎ যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'দুটো আছে। একটা ওঁর, একটা ঝিল্লীর।'

'ও দুটো বার করে দিন, আমরা নিয়ে যাব।'

'নিয়ে যাবেন ! কেন ?'

'দরকার আছে। দু'চার দিন পরে ফেরত পাবেন।'

গায়ত্রী আবার কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ উঠে চলে গেল, বলল—'কি দরকার জানি না। এনে দিচ্ছি।'

নীচে নেমে এসে রাখালবাবু ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করলেন—'এবার ?'

ব্যোমকেশ বলল—'চল আমার বাড়ি। নিভৃতে পরামর্শ করা যাক। একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।'

'চলুন।'

বাড়িতে এসে ব্যোমকেশ চায়ের ফরমাস দিল। সত্যবতী চা এবং আলুর চপ রেখে গেল। অতঃপর পানাহার এবং সিগারেট সহযোগে পরামর্শ শুরু হলো।

এক ঘন্টা পরে রাখালবাবু বললেন—'বেশ, এই কথা রইল। পুলিস ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনার রাহা খরচ ইত্যাদি দেওয়া হবে, আমি তার ব্যবস্থা করব। আজ বিকেলে পাকা খবর পাবেন।'

রাখালবাবু চলে যাবার পর সত্যবতী ঘরে ঢুকল, ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসুক স্বরে বলল—'হ্যাঁ গা, কী তোমাদের এত ষড়যন্ত্র হচ্ছে ?'

ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে আলস্য ভাঙল।—'আমাকে বোধহয় কয়েক দিনের জন্যে বাইরে যেতে হবে।'

'কোথায় যাবে ?'

'তা কি জানি !'

'তুমি জানো না তা কি কখনো হয়। নিশ্চয় জানো।'

ব্যোমকেশ সত্যবতীর কাঁধে হাত রেখে মৃদু হেসে বলল—'বেশ, জানি কিন্তু বলব না।'

সত্যবতী রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বিকেল চারটের সময় রাখালবাবুর ফোন এল—'সব ঠিক। আপনি একটা সুটকেস নিয়ে সটান থানায় চলে আসুন।'

ব্যোমকেশের অনুপস্থিতিকালে বেণীমাধবের বাড়ির কর্মসূচী আগের মতই বলবৎ রইল। কারুর বাইরে যাবার হুকুম নেই। একজন সাব-ইন্সপেক্টর, একজন জমাদার এবং চারজন কনস্টেবল হামেহাল মোতায়েন রইল। রাখালবাবু দু'বেলা এসে পরিদর্শন করে যেতে লাগলেন। বেণীমাধবের মৃত্যু সম্বন্ধে নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হলো না। মেদিনীর সাজের বাক্সটা অদৃশ্য হয়েছিল, অদৃশ্যই রয়ে গেল।

একদিন লাবণি তার স্বামীকে নিয়ে বাপ-মা'র সঙ্গে দেখা করতে এল। রাখালবাবু তাদের দেখা করতে দিলেন। বন্ধ দরজার অন্তরালে অজয়-পরিবার কীভাবে মেয়ে-জামাইয়ের সংবর্ধনা করল তা জানা গেল না। লাবণিরা যখন বেরিয়ে এল তখন লাবণির মুখে হাসি চোখে জল। বারান্দায় ঝিল্লীর সঙ্গে লাবণির দেখা হলো ; দুই বোন পরস্পর গলা জড়িয়ে চুমু খেল, তারপর

হাত ধরাধরি করে নীচে নেমে এল। নীচের বারান্দায় নিখিল ছিল, সে নব দম্পতিকে দেখে হো হো করে হেসে বলল—'এই যে পলাতক আর পলাতকা ! দু'জনে মিলে খুব নাচছ তো ?'

পরাগ কপট বিষণ্ণতায় ম্রিয়মাণ মুখভঙ্গী করে বলল—'দু'জনে মিলে নাচা আর হচ্ছে কই ? এখন আমি নাচছি, লাবণি নাচাচ্ছে।'

লাবণিরা চলে যাবার পর নিখিল ঝিল্লীকে বলল—'কী, তুমি আর দেরি করছ কেন ? একজন তো নাচিয়েকে নিয়ে কেটে পড়ল, এবার তুমি একটা গাইয়েকে নিয়ে কেটে পড়।'

ঝিল্লী ভুরু বেঁকিয়ে নিখিলের পানে তাকাল—'আমি কেটে পড়ব না। কিন্তু তোমার খবর কি ? যে তোমাকে চিঠি লেখে তাকে ধরতে পারলে ?'

নিখিল বলল—'ধরিনি এখনো কিন্তু আর বেশি দেরি নেই। ব্যোমকেশবাবু বলেছেন শীগ্‌গির ধরে দেবেন। যেই ধরব অমনি পটাস করে বিয়ে করে ফেলব। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' মুচকি হেসে ঝিল্লী ওপরে চলে গেল।

পাঁচ দিন পরে ব্যোমকেশ ফিরে এল, তার সঙ্গে একটি মানুষ। নিম্নশ্রেণীর পশ্চিমা যুবক। ব্যোমকেশ যুবককে নিয়ে সোজা থানায় উপস্থিত হলো, রাখালবাবুর সঙ্গে কথা বলল। তারপর যুবককে রাখালবাবুর জিম্মায় রেখে বাড়ি গেল। রাখালবাবুকে বলে গেল—'আজ বিকেল চারটের সময় বেণীমাধবের ড্রয়িংরুমে থিয়েটার বসবে, তুমি হবে তার স্টেজ ম্যানেজার।'

বিকেল চারটের সময় ব্যোমকেশ বেণীমাধবের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখল, ড্রয়িংরুমে বাড়ির ন'জন লোক উপস্থিত আছে ; অজয় আরতি মকরন্দ একটা সোফায় বসেছে, অন্য সোফায় বসেছে গঙ্গাধর গায়ত্রী আর ঝিল্লী। সনৎ আর নিখিল দুটো চেয়ারে দূরে দূরে বসেছে ; আর মেদিনী মেঝের ওপর দেয়ালে ঠেস দিয়ে উদাসভাবে বসে আছে। সকলের মুখেই বিরক্তি ও অবসাদের ব্যঞ্জনা। ড্রয়িংরুমের দোরে ও বারান্দায় পুলিস গিজগিজ করছে। রাখালবাবু একটা ছোট সুটকেস হাতে নিয়ে অধীরভাবে বারান্দায় পায়চারি করছেন।

ব্যোমকেশ পৌঁছুতেই রাখালবাবু তাকে বললেন—'সব তৈরি, এবার তবে আরম্ভ করা যাক।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল—'হিম্মৎলাল ?'

রাখালবাবু বললেন—'তাকে লুকিয়ে রেখেছি। যথাসময়ে সে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে।'

'বেশ, এসো তাহলে। তোমার হাতে ওটা— ? ও বুঝেছি।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলেন। সকলে নড়েচড়ে বসল, মকরন্দর মুখের ভ্রূকুটি গভীরতর হলো। রাখালবাবু মাঝখানের নীচু টেবিলটাকে এক পাশে টেনে এনে দুটো হাল্কা চেয়ার তার সামনে রাখলেন ; হাতের সুটকেস টেবিলের ওপর রেখে ব্যোমকেশকে বললেন—'বসুন।' নিজে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে একবার সকলের মুখের দিকে তাকাল, বলল—'আপনারা শুনে সুখী হবেন বেণীমাধববাবুর হত্যাকারী কে তা আমরা জানতে পেরেছি, আততায়ীর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণও পেয়েছি। আসামী এই ঘরেই আছে, এখনি তার পরিচয় পাবেন।'

সকলে সন্দেহভরা চোখে পরস্পর তাকাতে লাগল ; বেশি দৃষ্টি পড়ল গঙ্গাধরের ওপর। ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে বলে চলল—'আমরা গোড়াতেই একটা ভুল করেছিলাম, ভেবেছিলাম বেণীমাধববাবুই আসামীর প্রধান লক্ষ্য। ভুলটা অস্বাভাবিক নয় ; বেণীমাধববাবু বড় মানুষ ছিলেন, তিনি এমন উইল করতে যাচ্ছিলেন যাতে তাঁর উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা ছিল ; মেঘরাজ ছিল বেণীমাধবের দ্বাররক্ষী, বেণীমাধবকে যে ব্যক্তি মারতে চায় সে মেঘরাজকে না মেরে ঘরে ঢুকতে পারবে না তাই তাকে মেরেছে। মেঘরাজের মত লোক যে হত্যাকারীর প্রধান লক্ষ্য হতে পারে তা ভাবাই যায় না।

'আমি একদিন বেণীমাধববাবুর ঘরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম তাঁর ক্ষুর রয়েছে ; সাবেক কালের লম্বা ক্ষুর, যে-ক্ষুর দিয়ে মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিত। ক্ষুরটা খাপ থেকে

বের করে পরীক্ষা করলাম, তাতে কোথাও একটিও আঙুলের ছাপ নেই ; কে যেন খুব সাবধানে ক্ষুরটি মুছে খাপের মধ্যে রেখেছে। কিন্তু কেন ? স্বাভাবিক অবস্থায় অন্তত মেঘরাজের আঙুলের ছাপ তাতে থাকা উচিত।

'সন্দেহ হলো। সেই ক্ষুর দিয়ে আমি নিজে দাড়ি কামাতে গিয়ে দেখলাম ক্ষুর একেবারে ভোঁতা, তা দিয়ে দাড়ি কামানো দূরের কথা, পেন্সিল কাটাও যায় না। তখন আর সন্দেহ রইল না যে, এই ক্ষুর দিয়েই দু'জন লোকের গলা কাটা হয়েছে এবং তার ফলেই ক্ষুরটি ভোঁতা হয়ে গেছে। ডাক্তারি পরীক্ষাতেও প্রমাণ হলো যে, ওই ক্ষুর দিয়েই দু'জনের গলা কাটা হয়েছিল।

'কিন্তু ক্ষুর ছিল ঘরের মধ্যে, আসামী এসেছিল বাইরে থেকে ; ঘরে ঢোকবার আগেই সে ক্ষুর পেল কোথা থেকে ? নিশ্চয় কেউ ক্ষুরটি আগেই ঘর থেকে সরিয়েছিল।

'কে সরাতে পারে ? সেদিন সকালে মেঘরাজ ওই ক্ষুর দিয়ে বেণীমাধবের দাড়ি কামিয়ে দিয়েছিল ; তারপর সারা দিনে তাঁর ঘরে যারা এসেছিল তারা কেউ ক্ষুরের কাছে যায়নি। ও ঘরে নিত্য আসে যায় কেবল দু'জন : মেঘরাজ ও মেদিনী। মেঘরাজ নিজের গলা কাটবার জন্যে ক্ষুর চুরি করবে না। তাহলে বাকি রইল কে ?'

সকলের দৃষ্টি মেদিনীর ওপর গিয়ে পড়ল। মেদিনী দেয়ালে ঠেস দিয়ে আগের মতই বসে আছে, মাথার ওপরকার আঁচলটা দু' হাতে একটু তুলে ধরে নির্নিমেষ চোখে ব্যোমকেশের পানে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ সনৎ কথা বলল—'একটা কথা বুঝতে পারছি না। হত্যাকারী মামার ক্ষুর দিয়ে গলা কাটতে গেল কেন ? অন্য অস্ত্র কি ছিল না ?'

ব্যোমকেশ বলল—'আসামী লোকটা ভারি ধূর্ত। সে জানে যে-অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় সে-অস্ত্রকে বেবাক লোপাট করে দেওয়া সহজ নয়। তাই সে মতলব করেছিল, বেণীমাধবের ক্ষুর দিয়ে গলা কাটবার পর ক্ষুরটি ভাল করে মুছে যথাস্থানে রেখে দেবে, ওই ক্ষুর দিয়ে যে খুন হয়েছে একথা কারুর মনেই আসবে না, পুলিস অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবে। বুঝতে পেরেছেন ?'

'পেরেছি। এবার আপনার বক্তৃতা শেষ করুন।'

ব্যোমকেশ আবার নির্লিপ্ত স্বরে বলতে আরম্ভ করল—'মেদিনী ছোট ঘরের মেয়ে, কিন্তু পুরুষের চোখ দিয়ে যারা ওর পানে তাকিয়েছে তারাই জানে কী প্রচণ্ড ওর দেহের চৌম্বক শক্তি। সে সুচরিত্রা মেয়ে কিনা তা আমরা জানি না। যদি কুচরিত্রা হয় তাহলে মনে রাখতে হবে যে, মেঘরাজ ও বৃদ্ধ বেণীমাধব ছাড়া বাড়িতে আরো পাঁচজন সমর্থ পুরুষ আছে। স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ আসক্তির ফলে অসংখ্য ট্র্যাজেডি ঘটেছে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

'আমরা মেদিনীর ঘরে গিয়ে তাকে জেরা করেছিলাম ; মেঘরাজের সৈনিক জীবনের দলিলপত্র থেকে তার দিল্লীর ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। তারপর একটা অপ্রত্যাশিত জিনিস পেলাম। মেদিনীর একটি চুল-বাঁধার কাঠের বাক্স ছিল, তার ডালা খুলে দেখলাম আয়নার ওপর একটা ফটো আঁটা রয়েছে। মেদিনীর ফটো, সাম্প্রতিক ছবি। সে খাটের ধারে বসে হাসছে। আমি আবার বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিলাম, মেদিনী কিছু জানতে পারল না। পরদিন শুনলাম বাক্সটা চুরি গিয়েছে।' ব্যোমকেশ ঘাড় তুলে রাখালবাবুর পানে চাইল।

রাখালবাবু টেবিলের ওপরে সুটকেসটা খুলতে খুলতে অবিচলিত মুখে বললেন—'চুরি গিয়েছিল, আমরা খুঁজে বার করেছি।' তিনি সুটকেস থেকে প্রসাধনের বাক্সটা বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

ব্যোমকেশ বলল—'ছবিটা আছে নিশ্চয়।'

রাখালবাবু ডালা খুলে বললেন—'আছে।' কে চুরি করেছিল, কোথায় পাওয়া গেল এ সম্বন্ধে তিনি নীরব রইলেন। মনে হয়—চুরির ব্যাপারটা নিছক ধোঁকার টাটি।

ব্যোমকেশ বলল—'বেশ। তারপর আমরা বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে একে একে দেখা করলাম। বাড়িতে যতগুলো বর্ষাতি ছিল সংগ্রহ করলাম ; কেবল মকরন্দর বর্ষাতি পাওয়া গেল

না। মকরন্দ সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা দরকার—বেণীমাধবের হুকুমে মেঘরাজ তার গালে চড় মেরেছিল ; অর্থাৎ দু'জনেরই ওপর তার গভীর আক্রোশ। সে-রাত্রে ন'টার সময় সে বাড়িতে এসেছিল, তারপর গভীর রাত্রে কখন চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কেউ জানে না। সে যখন রেস-কোর্সে ধরা পড়ল তখন তার পকেটে পৌনে দুশো টাকা ছিল। কোথা থেকে সে এত টাকা পেল তা বলতে চায় না।

'যাহোক, বর্ষাতি কেন সংগ্রহ করলাম সেই কথা বলি। যারা মতলব এঁটে ঘুমন্ত লোকের গলা কাটতে যায় তারা জানে এই উপায়ে নিঃশব্দে খুন করা যায় বটে, কিন্তু আততায়ীর নিজের কাপড়-চোপড়ে প্রচুর রক্ত লাগার সম্ভাবনা। কাপড়-চোপড়ে রক্ত লাগলে সহজে ধোয়া যায় না, রক্তের দাগ থেকে যায়। তাই পাশ্চাত্ত্য দেশে খুন করবার সময় খুনী গায়ে বর্ষাতি চড়িয়ে নেয় ; বর্ষাতির তেলা গায়ে যেটুকু রক্ত লাগে তা সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়। পাশ্চাত্ত্য রহস্য রোমাঞ্চের বই যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই একথা জানেন। আমরা বর্ষাতিগুলোকে মালিকের নামের টিকিট মেরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দিলাম।

'তারপর আমি গেলাম দিল্লী। এতক্ষণে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আসামী কে, কিন্তু আরো পাকা প্রমাণের দরকার ছিল। দিল্লীতে গিয়ে যে-বস্তিতে মেঘরাজ থাকত, সেখানে খোঁজখবর নিতেই অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল। মেদিনী মেঘরাজের স্ত্রী নয়। মেঘরাজ বিপত্নীক ছিল ; বেণীমাধব যখন তাকে বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে এসো, তখন সে দিল্লী গিয়ে মেদিনীকে স্ত্রী সাজিয়ে নিয়ে এল। মেদিনীর স্বামী আছে, কিন্তু তার চরিত্র ভাল নয় ; মেঘরাজের সঙ্গে আগে থাকতেই তার ঘনিষ্ঠতা ছিল ; সে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এল। বুঝে দেখুন মেদিনী কি রকম মেয়েমানুষ।'

মেদিনীর চোখ আতঙ্কে ভরে উঠেছিল, সে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল—'না না, ঝুট বাত।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে চোখ তুলল, তিনি দোরের দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন—'হিম্মৎলাল!'

যে পশ্চিমা যুবককে ব্যোমকেশ দিল্লী থেকে সঙ্গে এনেছিল সে ঘরে প্রবেশ করল ; চুড়িদার পায়জামা ও শেরোয়ানি পরা ক্ষীণকায় যুবক। ব্যোমকেশ তার দিকে আঙুল দেখিয়ে মেদিনীকে জিজ্ঞেস করল—'একে চিনতে পার ?'

মেদিনী তড়িৎপৃষ্টের মত উঠে দাঁড়িয়েছিল, ভয়ার্ত চোখে হিম্মৎলালের দিকে একবার চেয়ে আবার মাটিতে আছড়ে পড়ল, মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

'হিম্মৎলাল, মেদিনী তোমার কে ?'

'জি, মেদিনী আমার বিয়াহী ঔরৎ, আমাকে ছেড়ে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল।'

'আচ্ছা, তুমি এখন বাইরে যাও।'

হিম্মৎলাল মেদিনীর পানে বিষদৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল—'দেখা যাচ্ছে মেদিনীই যত নষ্টের গোড়া। সে স্বামীকে ছেড়ে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল, তারপর এখানে এসে আর একজন উচ্চতর বর্গের মানুষকে তার মোহময় কুহকজালে জড়িয়ে ফেলল। কিন্তু মেঘরাজ কড়া প্রকৃতির লোক, সে জানতে পারলে মেদিনীর উচ্চাশা ধূলিসাৎ হবে ; তাই তাকে সরানো দরকার হয়ে পড়ল। কিন্তু একলা মেঘরাজকে খুন করলে ধরা পড়ার ভয় আছে, তাই মেঘরাজের সঙ্গে বেণীমাধবকেও খুন করে পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বেণীমাধবের সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েদের বিরোধ যে বেশ ঘনিয়ে উঠেছে তা মেদিনীর অজানা ছিল না।

'কিন্তু সত্যিই কি মেদিনী নিজের হাতে দু'জনের গলা কেটেছে ? ছোরা ছুরি ক্ষুর মেয়েদের অস্ত্র নয়, মেয়েদের অস্ত্র বিষ ; বিষ খাওয়াবার সুযোগ থাকলে তারা ছোরা ছুরি ব্যবহার করে না। মেদিনীর বিষ খাওয়াবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, সে বেণীমাধব ও মেঘরাজের খাবার নিজের হাতে রান্না করত।

'দেখা যাক, মেদিনীর সহকারী কে ?—মেদিনী, তোমার চুল বাঁধার বাক্সে আয়নার গায়ে একটা ফটো লাগানো আছে। কে ফটো তুলেছিল ?'

মেদিনী উত্তর দিল না, মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। ব্যোমকেশ তখন সনতের দিকে ফিরে বলল—'সনৎবাবু, আপনি ফটোগ্রাফির বিশেষজ্ঞ, দেখুন তো একবার ছবিটা।'

সনৎ ব্যোমকেশের পানে সন্দেহভরা ভ্রূকুটি করল, তারপর অনিচ্ছাভরে উঠে এল। রাখালবাবু বাক্সের ডালা খুলে ধরলেন। সনৎ সামনে ঝুঁকে ছবিটা দেখল ; তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। সে অবরুদ্ধ স্বরে বলল—'মেদিনীর ছবি।'

ব্যোমকেশ বলল—'কে ছবি তুলেছে বলতে পারেন ?'

'তা কি করে বলব !'

'ভাল করে দেখুন। মেদিনীকে খাটে বসিয়ে ছবি তোলা হয়েছে, মেদিনীর পেছনে খাটের মাথায় কারুকার্য দেখা যাচ্ছে। কার খাট চিনতে পারছেন না ?'

সনতের চোখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'কি বলতে চান আপনি ?'

ব্যোমকেশ বলল—'আপনি নিজের ঘরে রাত্তির বেলা ফ্ল্যাশ-লাইট দিয়ে মেদিনীর ছবি তুলেছিলেন। আপনি মেদিনীর গুপ্ত-প্রণয়ী। মেঘরাজ যখন বেণীমাধবের দোরের সামনে শুয়ে ঘুমোত তখন মেদিনী আপনার ঘরে যেত।'

সনৎ কিছুক্ষণ জবাফুলের মত লাল চোখে চেয়ে রইল, শেষে বিকৃত গলায় বলল—'তাতে কি প্রমাণ হয় আমি মামকে খুন করেছি ?'

'সনৎবাবু, আপনি মেদিনীর মোহে পড়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়েছিলেন, মেঘরাজকে খুন করে মেদিনীর ওপর একাধিপত্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আপনার বোধহয় প্ল্যান ছিল খুনের মামলা মিটে গেলে মেদিনীকে নিয়ে অন্য কোথাও বাসা বাঁধবেন।'

'আমি খুন করিনি।'

'আপনার দেহে খুনীর রক্ত আছে, আপনার বাবা আপনার মাকে খুন করে ফাঁসি গিয়েছিলেন।'

'আমি খুন করিনি। খুন করেছে—ওই মেদিনী।'

মেদিনী ধড়মড়িয়ে হাঁটুর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল—'নেহি নেহি নেহি—'

ব্যোমকেশ বলল—'ঠিক কথা। মেদিনী নিজের হাতে খুন করেনি। খুন করেছেন আপনি।'

'প্রমাণ আছে ?'

'ছোট্ট একটা প্রমাণ আছে। খুন করার পর আপনি বর্ষাতিটাকে খুব ভাল করেই ধুয়েছিলেন, কিন্তু পকেটের মধ্যে কয়েক ফোঁটা রক্ত রয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রক্তটা বেণীমাধববাবুর ব্লাড-গ্রুপের রক্ত।'

মেদিনী বলে উঠল—'হাঁ হাঁ, সনৎবাবু খুন করেছে, আমি কিছু জানি না, আমি বে-কসুর।'

হঠাৎ সনৎ বুনো মোষের মত ঘাড় নীচু করে চাপা গর্জন করতে করতে মেদিনীর দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর ইতিমধ্যে সনতের দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা সনতকে ধরে ফেললেন। রাখালবাবু তার হাতে হাতকড়া পরালেন। সনতের ক্ষিপ্র উন্মত্ততা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দুই প্রহরীর মাঝখানে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেদিনী আবার বলে উঠল—'আমি কিছু জানি না, আমি বে-কসুর।'

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল—'না মেদিনী, তুমি বে-কসুর নও। বেণীমাধববাবুর ক্ষুর চুরি করে তুমিই সনৎবাবুকে দিয়েছিলে। তারপর সে যখন গভীর রাত্রে ফিরে এসে সদর দোরে টোকা দিয়েছিল তখন তুমি দোর খুলে তাকে ভিতরে এনেছিলে ; সে কাজ সেরে চলে যাবার পর তুমি দোর বন্ধ করে দিয়েছিলে। তোমরা দু'জন সমান অপরাধী।'

মেদিনী আবার মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। আসামী দু'জনকে চালান করে দিয়ে রাখালবাবু বাড়ির ওপর থেকে অবরোধ তুলে নিয়েছেন। বাইরে ঘনায়মান সন্ধ্যা। রাখালবাবু সনতের ঘরে গিয়ে তার আলমারি খুলে অ্যালবামের সারি থেকে একটি একটি অ্যালবাম খুলে পাতা উল্টে দেখছিলেন। ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

রাখালবাবু অবশেষে একটি অ্যালবাম হাতে নিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন, নিবিষ্ট মনে অ্যালবামের ছবিগুলি দেখতে লাগলেন। প্রতি পৃষ্ঠায় একটি শিথিলবসনা তরুণীর ছবি। শিকারী যেমন বাঘ শিকার করে তার চামড়া দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে, সনৎ যেন প্রকারান্তরে তাই করেছে।

অ্যালবাম শেষ করে রাখালবাবু একটি নিশ্বাস ফেললেন, সিগারেট ধরিয়ে বললেন—'সনৎ গাঙ্গুলির রক্তে পাগলামির বীজ অছে, কিন্তু সে যে একটি রসিক চূড়ামণি তাতে সন্দেহ নেই।'

ব্যোমকেশ কাছে এসে অ্যালবামের পাতা উলটে দেখল, তারপর বলল—'শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলেছেন, নারী নরকের দ্বার। সনৎ নরকের অনেকগুলো দ্বার খুলেছিল, তাই শেষ পর্যন্ত তার নরক-প্রবেশ অনিবার্য হয়ে পড়ল।'

'কিন্তু সনৎ মেদিনীর মত মেয়ের জন্য এমন ভয়ঙ্কর কাজ করল ভাবতে আশ্চর্য লাগে।'

'রাখাল, মেদিনীর মত মেয়েকে তুচ্ছজ্ঞান কোরো না। যুগে যুগে এই জাতের মেয়েরা জন্মগ্রহণ করেছে—কখনো ধনীর ঘরে কখনো দরিদ্রের ঘরে—পুরুষের সর্বনাশ করার জন্যে। দ্রৌপদী এই জাতের মহিলা ছিলেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলে আছে দ্রৌপদী। ইলিয়ডের হেলেনও তাই। এ যুগেও এই জাতের মেয়ের অভাব নেই। ওরা সকলেই যে চরিত্রহীনা তা নয়, কিন্তু ওদের এমন একটা কিছু আছে যা পুরুষকে—বিশেষত সনতের মত দুশ্চরিত্র পুরুষকে—ক্ষেপিয়ে দিতে পারে, কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ত করে তুলতে পারে। জ্যেষ্ঠ আলেকজান্ডার দুমা একটা বড় দামী কথা বলেছিলেন—cherchez la femme: যেখানে এই ধরনের ব্যাপার ঘটে সেখানে মেয়েমানুষ খুঁজবে, মূলে মেয়েমানুষ আছে।'

'তা বটে।' রাখালবাবু উঠলেন—'দেখা যাচ্ছে বেণীমাধবের মেয়ে এবং পুত্রবধূ তাঁকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেনি, বৃদ্ধের জীর্ণ পাকযন্ত্রই দায়ী।—চলুন, এবার যাওয়া যাক। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এক পেয়ালা গরম চায়ের জন্যে প্রাণ কাঁদছে।'

'চল আমার বাড়িতে, তরিবৎ করে চা খাওয়া যাবে।'

'উত্তম প্রস্তাব।'

ঘরের বাইরে এসে রাখালবাবু দোরে তালা লাগালেন, তারপর সদর দরজার দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন ঝিল্লী সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, তার পিছনে প্রকাণ্ড ট্রে'র ওপর চায়ের সরঞ্জাম এবং কচুরি-নিমকির প্লেট নিয়ে দাসী আসছে। ব্যোমকেশ বলল—'রাখাল, তোমার প্রাণের কান্না ভগবান শুনতে পেয়েছেন। চল, ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসা যাক।'

রাখালবাবু সাবধানী লোক, বললেন—'দাঁড়ান, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

ঝিল্লী তাদের কাছে এসে সলজ্জ স্বরে বলল—'মা আপনাদের জন্যে চা জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন।'

'দেখলে তো ?' সকলে ড্রয়িংরুমে গেল। ঝি টেবিলের ওপর ট্রে রেখে চলে গেল ; ঝিল্লীও তার অনুগমন করছিল, ব্যোমকেশ বলল—'ঝিল্লী, আমরা বড় ক্লান্ত ; তুমি আমাদের চা ঢেলে দাও, আমরা বসে বসে খাই।'

ঝিল্লী ফিরে এসে টি-পট থেকে তাদের চা ঢেলে দিল, জলখাবারের প্লেট তাদের সামনে রাখল। ব্যোমকেশ অর্ধমুদিত চোখে কচুরি চিবোতে চিবোতে দেখল, ঝিল্লী গুটি গুটি দোরের দিকে যাচ্ছে।

'ঝিল্লী, শোনো, চলে যেও না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ঝিল্লী থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর আস্তে আস্তে ফিরে এসে ব্যোমকেশের পাশে দাঁড়াল। ব্যোমকেশ সংকেতভরা চোখে রাখালবাবুর পানে তাকাল ; রাখালবাবু অলসভাবে

চায়ের পেয়ালা শেষ করে একটি গানের কলি গুঞ্জন করতে করতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

ঝিল্লী ব্যোমকেশের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তার যে বুক ঢিবঢিব করছে তা তার মুখ দেখে বোঝা যায় না। ব্যোমকেশ খাটো গলায় একটু হাসল, বলল—'সম্পর্কে নিখিল তোমার মামা হয় বটে, কিন্তু অনেক দূরের সম্পর্ক। আইনত বিয়ে আটকায় না।'

ঘরের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দেখা গেল না—ঝিল্লীর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। তারপর তার ক্ষীণস্বর শোনা গেল—'কি করে জানলেন ?'

ব্যোমকেশ বলল—'বোকা মেয়ে! সবগুলো চিঠিতেই তোমার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।—আচ্ছা, তুমি এখন কোণের চেয়ারে গিয়ে বোসো। আরো কথা আছে।'

ঝিল্লী নেংটি ইঁদুরের মত ঘরের অন্ধকার কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরে যেন ব্যোমকেশ ছাড়া আর কেউ নেই।

বাইরে দু'জোড়া জুতোর শব্দ শোনা গেল। রাখালবাবু নিখিলকে নিয়ে ফিরে এলেন।

'রাখাল, আলোটা জ্বেলে দাও।'

দোরের পাশে সুইচ। রাখালবাবু সুইচ টিপলেন, কয়েকটা উজ্জ্বল বাল্‌ব জ্বলে উঠল। নিখিল কোনোদিকে না তাকিয়ে ব্যোমকেশের পাশে গিয়ে বসল, অনুরাগপূর্ণ চোখে তার পানে চেয়ে বলল—'ব্যোমকেশদা, আপনি ভেলকি জানেন। সনৎদা আমার মাসতুত ভাই, তাকে সারা জীবন দেখছি, কিন্তু সে যে এমন মানুষ তা ভাবতেও পারিনি।'

ব্যোমকেশ বলল—'নিখিল, মুখ দেখে যদি মানুষের মনের কথা জানা যেত, তাহলে আইন, আদালত, পুলিস, সত্যান্বেষী কিছুই দরকার হতো না ; তুমিও মুখ দেখেই বুঝতে পারতে কোন্ মেয়েটি তোমাকে বেনামী চিঠি লেখে।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' নিখিল ব্যোমকেশের আর একটু কাছে ঘেঁষে বসল, ষড়যন্ত্রকারীর মত ফিসফিস করে বলল—'আপনি কিছু বুঝতে পেরেছেন নাকি ?'

ব্যোমকেশ হাসল—'আগে তুমি বলো দেখি মেয়েটির সন্ধান যদি পাওয়া যায় তুমি কি করবে ?'

নিখিলের চোখ উদ্দীপনায় জ্বলজ্বল করে উঠল—'কী করব ? বিয়ে করব। কানা হোক, খোঁড়া হোক, কাফ্রি হোক, হাবসি হোক, তাকে বিয়ে করব।'

ব্যোমকেশ বলল—'তাহলে সন্ধান পাওয়া গেছে।—ঝিল্লী, এদিকে এসো।'

নিখিল চকিত হয়ে দোরের দিকে চাইল। ওদিকে ঘরের কোণে ঝিল্লীর সাড়াশব্দ নেই, সে চেয়ারের পিছনে লুকিয়েছে। নিখিল ব্যোমকেশের দিকে ফিরে উত্তেজিত স্বরে বলল—'কাকে ডাকলেন ?'

'এই যে দেখাচ্ছি—' ব্যোমকেশ উঠে গিয়ে ঝিল্লীর হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল, তাকে হাত ধরে নিখিলের কাছে এনে বলল—'এই নাও তোমার ঝিঁঝিঁ পোকা! ঝিঁঝিঁ পোকাকে চোখে দেখা যায় না, কেবল ঝংকার শোনা যায়। আমরা কিন্তু ধরেছি।'

নিখিলের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম করল। সে দু' হাত তুলে চীৎকার করল—'অ্যাঁ! ঝিল্লী—ঝিল্লী আমাকে চিঠি লেখে! ঝিল্লী আমাকে ভালবাসে! কিন্তু—কিন্তু ও যে আমার ভাগনী!'

ব্যোমকেশ হেসে বলল—'ভয় নেই, ভয় নেই। ঝিল্লী ভারি সেয়ানা মেয়ে, অপাত্রে হৃদয় সমর্পণ করেনি। তোমাদের যা সম্পর্কে তাতে বিয়ে আটকায় না।'

ঝিল্লীর মুখ অবনত, ঠোঁটের কোণে ভীরু হাসির যাতায়াত। নিখিলের মুখে ক্রমে ক্রমে একটি প্রকাণ্ড হাসি ফুটে উঠল, সে বলল—'উঃ, কী সাংঘাতিক আজকালকার মেয়ে দেখেছেন ব্যোমকেশদা, আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছিল। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। বিয়েটা হয়ে যাক—'

এই সময় দোরের সামনে গঙ্গাধরকে দেখা গেল। লাঠি হাতে সে বোধহয় সায়াহ্নিক নিত্যকর্ম

করতে বেরুচ্ছিল। ঘরের মধ্যে গলার আওয়াজ শুনে ঘরে ঢুকেছে। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মেজাজ আবার সপ্তমে চড়ে গিয়েছে, সে রাখালবাবুকে লক্ষ্য করে কড়া সুরে বলল—'এখানে আপনার কাজ শেষ হয়েছে, এখনো এখানে রয়েছেন কেন ?' রাখালবাবু উত্তর দেবার আগেই তার চোখ পড়ল ঝিল্লীর ওপর, অমনি ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করে সে বলল—'ঝিল্লী ! তুই এখানে পুরুষদের মধ্যে কি করছিস ?'

বাপকে দেখে ঝিল্লী একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, এখন চমকে উঠে ব্যোমকেশের পিছনে লুকোবার চেষ্টা করল। গঙ্গাধর বলল—'ধিঙ্গি মেয়ে ! পুরুষ-ঘেঁষা স্বভাব হয়েছে। চাবকে লাল করে দেব।'

নিখিল হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল, এক লাফে গঙ্গাধরের সামনে গিয়ে বলল—'মুখ সামলে কথা বলুন। ঝিল্লীকে আমি বিয়ে করব।'

গঙ্গাধর প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল, তারপর তারস্বরে চিক্কুর ছাড়ল—'কী, আমার মেয়েকে বিয়ে করবি তুই, হতভাগা ছাপাখানার ভূত ! ঠেঙিয়ে তোর হাড় ভেঙে দেব না !' সে লাঠি আস্ফালন করতে লাগল।

এইবার গায়ত্রী ঘরে ঢুকল, উগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে বলল—'কি হয়েছে, এত চেঁচামেচি কিসের ?'

গঙ্গাধর কর্ণপাত করল না, চেঁচিয়ে বলল—'বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। ছোট মুখে বড় কথা। আমার মেয়েকে তুই বিয়ে করবি !'

ঝিল্লী ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল, কানে কানে বলল—'মা, তুমি যদি অমত কর আমি বিষ খেয়ে মরব।' চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ঝিল্লীর মুখে কথা ফুটেছে।

গায়ত্রী একবার নিখিলকে ভাল করে দেখল, যেন আগে কখনো দেখেনি। নিখিল গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিল। বলল—'দিদি, ঝিল্লীকে আমি—মানে আমাকে ঝিল্লী বিয়ে করতে চায়। ব্যোমকেশদা বলেছেন সম্পর্কে বাধে না।'

গায়ত্রী ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করল—'সত্যি সম্পর্কে বাধে না ?'

ব্যোমকেশ বলল—'না, ওরা first cousin নয়, সম্পর্কে বাধে না।'

গঙ্গাধর আরো গলা চড়িয়ে চীৎকার করল—'শুনতে চাই না, কোনো কথা শুনতে চাই না। বেরিয়ে যাও তোমরা আমার বাড়ি থেকে, এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও—'

গায়ত্রী ধমক দিয়ে উঠল—'থামো তুমি। বাড়ি তোমার নয়, বাড়ি আমার। আমি সুধাংশুবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি ; বাবা উইল করার আগেই মারা গেছেন, আইনত তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক আমার, এ বাড়িরও অর্ধেক আমার। —তুমি বাইরে যেখানে যাচ্ছিলে যাও না। যা করার আমি করব।'

গঙ্গাধর পিন ফোটানো খেলনার বেলুনের মত চুপসে গেল, তারপর ঘাড় হেঁট করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।

গায়ত্রী ঝিল্লীর বাহুবন্ধন থেকে গলা ছাড়িয়ে তার হাত ধরে সোফায় বসল, নিখিলের দিকে চেয়ে হাকিমের মত হুকুম করল—'কি কাণ্ড তোমরা বাধিয়েছ এবার বলো শুনি।'

নিখিল বলল—'আমি কিছু জানি না দিদি, ওই ওকে জিজ্ঞেস করো। ব্যোমকেশদা, চিঠিগুলো কোথায় ?'

ব্যোমকেশ পকেট থেকে চিঠি বের করে দিয়ে বলল—'রাখাল, চল এবার আমাদের যাবার সময় হয়েছে। গায়ত্রী দেবী, চায়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নিখিল, তুমি যে বৌ পেলে অনেক ভাগ্যে এমন বৌ পাওয়া যায়। ঝিল্লী, তুমিও কম সৌভাগ্যবতী নও। জীবনে যে-জিনিস সবচেয়ে দুর্লভ, সেই দুর্লভ হাসি তুমি পেলে। তোমাদের জীবনে হাসির ঢেউ খেলতে থাকুক। —এসো রাখাল।'

লোহার বিস্কুট

কমলবাবু বললেন, 'আমি পাড়াতেই থাকি, হিন্দুস্থান পার্কের কিনারায়। আপনাকে অনেকবার দেখেছি, আলাপ করবার ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু সাহস হয়নি। আজ একটা সূত্র পেয়েছি, তাই ভাবলাম এই ছুতোয় আলাপটা করে নিই। আমার জীবনে একটি ছোট্ট সমস্যা এসেছে—'

'সমস্যা!' ব্যোমকেশ সিগারেটের কৌটো এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বলুন বলুন, অনেকদিন ও বস্তুর মুখদর্শন করিনি।'

গ্রীষ্মের একটি রবিবার সকালে ব্যোমকেশের কেয়াতলার বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। কমলবাবুর চেহারাটি নাড়ুগোপালের মত, কিন্তু মুখের ভাব চটপটে বুদ্ধিসমৃদ্ধ। তিনি হাসিমুখে একটি সিগারেট নিয়ে ধরালেন, তারপর গল্প আরম্ভ করলেন, 'আমার নাম কমলকৃষ্ণ দাস, কাছেই ভারত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শাখা আছে, আমি সেখানকার ক্যাশিয়ার। বছর দেড়েক আগে পুরুলিয়া থেকে বদলি হয়ে এখানে এসেছি।

'কলকাতায় এসেই মুশকিলে পড়ে গেলাম; কোথাও বাসা খুঁজে পাই না। শেষ পর্যন্ত একটি লোক তার বাড়ির নীচের তলায় একটি ঘর ছেড়ে দিল। ফ্যামিলি আনা হল না, স্ত্রী আর মেয়েকে পুরুলিয়ায় রেখে একলা বাসায় উঠলাম।

'বাড়িওয়ালার নাম অক্ষয় মণ্ডল। বাড়িটি দোতলা; নিচের তলায় দু'টি ঘর, ওপরে দু'টি; যাতায়াতের রাস্তা আলাদা। অক্ষয় মণ্ডল দোতলায় একলা থাকে, কিন্তু তার কাছে লোকজনের যাতায়াত আছে। মিষ্টভাষী লোক, কিন্তু কী কাজ করে বুঝতে পারলাম না। মাঝে মাঝে আমার ঘরে এসে গল্পসল্প করত, কিন্তু আমাকে কোনদিন দোতলায় ডাকত না। পড়শীদের সঙ্গেও যাতায়াত ছিল না। আমাদের ব্যাঙ্কে ওর একটা চালু খাতা ছিল।

'যাহোক, এইভাবে মাস তিনেক কাটার পর একদিন একটা ছুটির দিনে আমার অফিসের একজন সহকর্মী বন্ধুর বাড়িতে রাত্রে নেমন্তন্ন ছিল। ফিরতে রাত হয়ে গেল। বাসায় ফিরে দেখি অক্ষয় মণ্ডল দোতলা থেকে নেমে এসে সিঁড়ির দরজায় তালা লাগাচ্ছে, তার পায়ের দু'পাশে দু'টি সুটকেশ। বললাম, "একি, এত রাত্রে কোথায় চললেন?"

'আমায় দেখে অক্ষয় মণ্ডল কেমন হকচকিয়ে গেল; তারপর সুটকেশ দুটো দু'হাতে নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, একটু গাঢ় গলায় বলল, "কমলবাবু, আমাকে হঠাৎ বাইরে যেতে হচ্ছে। কবে ফিরব কিছু ঠিক নেই।"

'দেখলাম তার চোখ দুটো লাল হয়ে রয়েছে। বললাম, "সে কি, কোথায় যাচ্ছেন?"

'তার মুখে হাসির মত একটা ভাব ফুটে উঠল। সে বলল, "অনেক দূর। আচ্ছা, চলি।"

'আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়াল, তারপর ফিরে এসে বলল, "কমলবাবু, আপনি সজ্জন, ব্যাঙ্কে চাকরি করেন; আপনাকে একটা কথা বলে যাই। সাত দিনের মধ্যে আমি যদি না ফিরে আসি, আপনি আমার পুরো বাড়িটা দখল করবেন। আপনাদের ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্ট আছে, মাসে মাসে দেড়শো টাকা ভাড়া আমার খাতায় জমা দেবেন। —আচ্ছা।"

'অক্ষয় মণ্ডল চলে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বিস্ময়ের চটকা ভেঙে খেয়াল হল, অক্ষয় মণ্ডল তার দোরের চাবি আমাকে দিয়ে যায়নি।

'সে যাহোক, আস্ত বাড়িটা পাওয়া যেতে পারে এই আশায় মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মনে হল অক্ষয় মণ্ডল অগস্ত্য যাত্রা করেছে, আর শীগ্‌গির ফিরবে না।

'পরদিন সকালে স্ত্রীকে চিঠি লিখে দিলাম—সংসার গুটিয়ে তৈরি থাকো, বাসা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

'আশায় আশায় দুটো দিন কেটে গেল। তিন দিনের দিন গন্ধ বেরুতে আরম্ভ করল। বিকট গন্ধ, মড়া-পচা গন্ধ। গরমের দিনে মাছ মাংস পচে গিয়ে যে-রকম গন্ধ বেরোয় সেই রকম গন্ধ আসছে।

'সন্দেহ হল, পুলিসে খবর দিলাম। পুলিস এসে তালা ভেঙে ওপরে উঠল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। গিয়ে দেখি বীভৎস কাণ্ড। ঘরের মেঝের ওপর একটা মড়া হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, তার কপালে একটা ফুটো। সে-রাত্রে আমি যখন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম, সেই সময় অক্ষয় মণ্ডল লোকটাকে গুলি করেছে, তারপর দামী জিনিসপত্র টাকাকড়ি সুটকেশে পুরে নিয়ে কেটে পড়েছে।

'দেখতে দেখতে একপাল পুলিস এসে বাড়ি ঘিরে ফেলল। লাশ ময়না তদন্তের জন্যে পাঠানো হল। দারোগাবাবু আমাকে জেরা করলেন। তারপর খানাতল্লাশ আরম্ভ হল। নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসেবে পাড়ার একটি ভদ্রলোক এবং আমি সঙ্গে রইলাম।

'খানাতল্লাশে কিন্তু বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। কেবল একটা দেরাজের মধ্যে কয়েকটা লোহার পাত দিয়ে তৈরি কৌটোর মত জিনিস পাওয়া গেল ; সিগারেটের প্যাকেটে রূপোলি তবকের মধ্যে যেমন সিগারেট মোড়া থাকে, অনেকটা সেই রকম লম্বাটে ধরনের তবক, খুব পাতলা লোহা দিয়ে তৈরি, কিন্তু তার অভ্যন্তর ভাগ শূন্য। দারোগাবাবু সেগুলো নিয়ে চিন্তিতভাবে নাড়াচাড়া করলেন, কিন্তু হালকা লোহার মোড়ক কোন্ কাজে লাগে বোঝা গেল না।

'যাহোক, সেদিনকার মত তদন্ত শেষ হল, পুলিস চলে গেল। আমার মনে কিন্তু অস্বস্তি লেগে রইল। তিন-চার দিন পরে থানায় গেলাম। সেখানে গিয়ে খবর পেলাম মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা গেছে ; আঙুলের ছাপ ও অন্যান্য দৈহিক চিহ্ন থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে মৃত ব্যক্তির নাম হরিহর সিং ; দাগী আসামী ছিল, মাদকদ্রব্য এবং সোনা-রূপোর চোরাকারবার করত। অক্ষয় মণ্ডলের সঙ্গে কোন্ সূত্রে তার যাতায়াত ছিল, তা জানা যায়নি। অক্ষয় মণ্ডলের নামে হুলিয়া জারী হয়েছে ; কিন্তু সে এখনো ধরা পড়েনি, কর্পূরের মত উবে গেছে।

'থানা থেকে ফেরার সময় ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম, "পুরো বাড়িটা তাহলে আমি দখল করতে পারি ?"

'দারোগাবাবু বললেন, "স্বচ্ছন্দে। আসামী যখন ফেরার হবার আগে আপনাকে তার বাড়ির হেপাজতে রেখে গেছে, তখন আপনি থাকবেন বৈকি। তবে একটা কথা, যদি আসামীর সাড়াশব্দ পান, তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দেবেন।"

'তারপর প্রায় বছরখানেক ভারি আরামে কেটেছে। স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে এলাম, সারা বাড়িটা দখল করে দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে বাস করছি। বাড়ির ভাড়া মাসে মাসে অক্ষয় মণ্ডলের খাতায় জমা করে দিই। তার টেবিল চেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করি বটে কিন্তু আলমারি বাক্স কাবার্ডে হাত দিই না, পুলিস খানাতল্লাশ করার পর যেমনটি ছিল তেমনি আছে।

'হঠাৎ মাস দুই আগে এক ফ্যাসাদ উপস্থিত হল। সকালবেলা নীচের ঘরে বসে কাগজ পড়ছি, একজন অপরিচিত লোক এল, তার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক। ভদ্রশ্রেণীর মধ্যবয়স্ক পুরুষ, স্ত্রীলোকটি সধবা। পুরুষ স্ত্রীলোকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এ হচ্ছে অক্ষয় মণ্ডলের স্ত্রী, আমি ওর বড় ভাই। এতদিন আমি ওকে পুষেছি, কিন্তু আর আমার পোষবার ক্ষমতা নেই।

এবার ও স্বামীর বাড়িতে থাকবে। আপনাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।”

‘মাথায় বজ্রাঘাত। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। তারপর বুদ্ধি গজালো, বললাম, “অক্ষয়বাবুর স্ত্রী আছেন, তা কোনদিন শুনিনি। যদি আপনাদের কথা সত্যি হয়, আপনি আদালতে গিয়ে নিজের দাবি প্রমাণ করুন, তারপর দেখা যাবে।”

‘কিছুক্ষণ বকাবকি কথা-কাটাকাটির পর তারা চলে গেল। আমার সন্দেহ হল এরা দাগাবাজ জোচ্চোর, ছলছুতো করে বাড়িটা দখল করে বসতে চায়। আজকাল বাসাবাড়ির যে রকম ভাড়া দাঁড়িয়েছে, ফোকটে বাসা পেলে কে ছাড়ে!

‘থানায় গিয়ে খবরটা জানিয়ে এলাম। দারোগাবাবু বললেন, “অক্ষয় মণ্ডলের স্ত্রী আছে কিনা আমাদের জানা নেই। যাহোক, আবার যদি আসে, ছলছুতো করে থানায় নিয়ে আসবেন। আমরাও বাড়ির ওপর নজর রাখব।”

‘আমার পিস্তল আছে, তাছাড়া একটা কুকুর পুষেছি। হিংস্র পাহাড়ী কুকুর, নাম ভুটো; আমার হাতে ছাড়া কারুর হাতে খায় না। আমি ব্যাঙ্কে যাবার সময় তার শেকল খুলে দিই, রাত্তিরে তাকে ছেড়ে দিই, সে বাড়ি পাহারা দেয়। ভুটো ছাড়া থাকতে বাড়িতে চোর-ছ্যাঁচড় ঢোকার ভয় নেই, ভুটো তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। তবু এই ঘটনার পর মনে একটা অস্বস্তি লেগে রইল। অক্ষয় মণ্ডল লোক ভাল নয়, হয়তো নিজে আড়ালে থেকে কোনো কুটিল খেলা খেলছে।

‘দিন দশেক পরে একখানা বেনামী চিঠি পেলাম, “পাড়া ছেড়ে চলে যাও, নইলে বিপদে পড়বে।”—পাড়া মানেই বাড়ি। থানায় গিয়ে চিঠি দেখালাম। দারোগাবাবু বললেন, “চেপে বসে থাকুন, নড়বেন না। আপনার বাসার ওপর পাহারা বাড়িয়ে দিচ্ছি।”

‘তারপর থেকে এই দেড় মাস আর কেউ আসেনি, উড়ো চিঠিও পাঠায়নি। এখন বেশ নিরাপদ বোধ করছি। কিন্তু একটি সমস্যার উদয় হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যেই আপনার কাছে আসা। দারোগাবাবুর কাছে যেতে পারতাম, কিন্তু তিনি হয়তো এমন উপদেশ দিতেন যা আমাদের পছন্দ হত না।

‘ব্যাপারটা এই : ব্যাঙ্ক থেকে আমার এক মাসের ছুটি পাওনা হয়েছে। আমার স্ত্রীর অনেক দিন থেকে তীর্থে যাবার ইচ্ছে। হরিদ্বার, হৃষিকেশ এইসব। ব্যাঙ্কের একটি সহকর্মীও আমার সঙ্গেই ছুটি নিয়ে কুণ্ডু স্পেশালে বেড়াতে বেরুচ্ছেন, আমাকেও তিনি সঙ্গে যাবার জন্যে চাপাচাপি করছেন। দল বেঁধে গেলে অনেক সুবিধে হয়। আমার স্ত্রী খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। আমার উৎসাহও কম নয়। কিন্তু—

‘যেতে হলে বাড়িতে তালা বন্ধ করে যেতে হবে। ভুটোকেও মাসখানেকের জন্যে একটা কেনেলে ভর্তি করে দিতে হবে। বাড়ি অরক্ষিত থাকবে। মনে করুন, এই ফাঁকে অক্ষয় মণ্ডলের বৌ—মানে, ওই স্ত্রীলোকটা যদি তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে বাড়ি দখল করে বসে, তখন আমি কি করব? অক্ষয় মণ্ডলের মৌখিক অনুমতি ছাড়া আমার তো কোনো হক নেই। তবে আমি দখলে আছি, আমাকে বেদখল করতে হলে ওদের আদালতে যেতে হবে। কিন্তু ওরা যদি দখল নিয়ে বসে, তখন আমি কোথায় যাব?

‘এই আমার সমস্যা। নিতান্তই ঘরোয়া সমস্যা। আপনার নিরীক্ষার উপযুক্ত নয়। তবু রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই হবে, এই মতলবে আপনার কাছে এসেছি। এখন বলুন, বাড়িখানি রেখে আমাদের তীর্থযাত্রা করা উচিত হবে কিনা!’

ব্যোমকেশ খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে রইল, শেষে বলল, ‘আপনাদের তীর্থযাত্রায় বাধা দিলে পাপ হবে, আবার বাড়ি বেহাত হয়ে যাওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। আপনার জানাশোনার মধ্যে এমন মজবুত লোক কি কেউ নেই, যাকে বাড়িতে বসিয়ে তীর্থযাত্রা করতে পারেন?’

‘কই, সে রকম কাউকে দেখছি না। সকলেরই বাসা আছে। যাদের নেই তাদের বসাতে সাহস হয় না, শেষে খাল কেটে কুমীর আনব!’

'তাহলে চলুন, আপনার বাসাটা দেখে আসি।' ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল।

কমলবাবু উৎফুল্ল চোখে চাইলেন, 'যাবেন! কী সৌভাগ্য! চলুন চলুন, বেশি দূর নয়—'

'একটু বসুন। বেশি দূর না হলেও রোদ বেশ কড়া। একটা ছাতা নিয়ে আসি।'

ব্যোমকেশ ভিতরে গিয়ে ছাতা নিয়ে এল। ছাতাটি ব্যোমকেশের প্রিয় ছাতা; অতিশয় জীর্ণ, লোহার বাঁট এবং কামানিতে মরচে ধরেছে, কাপড় বিবর্ণ এবং বহু ছিদ্রযুক্ত। এই ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় বেরুলে নিজে অদৃশ্য থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তির অনুসরণ করা যায়; ফুটো দিয়ে বাইরের লোককে দেখা যায়, কিন্তু বাইরের লোক ছাতাধারীর মুখ দেখতে পায় না। সত্যান্বেষীর উপযুক্ত ছাতা।

'চলুন।'

কমলবাবুর বাসা ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। মাঝে মাঝে এ পথ দিয়ে যাবার সময় বাড়িটি ব্যোমকেশের চোখে পড়েছে; ছোট দোতলা বাড়ি; কিন্তু একটি বিশেষত্বের জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সমস্ত ছাদ লোহার ডাণ্ডা-ছত্রী দিয়ে ঢাকা, যেন প্রকাণ্ড একটা লোহার খাঁচা। বাইরে থেকে কোনো মতেই ছাদে ওঠা সম্ভব নয়।

'আসুন।'

ছাতা মুড়ে ব্যোমকেশ বাড়িতে ঢুকল। কমলবাবু প্রথমে তাকে নীচের তলার বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি শতরঞ্জি-ঢাকা তক্তপোশ ও দু'টি ক্যাম্বিসের চেয়ার ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে চোখ ফেরাল। সে যেন একটা সূত্র খুঁজছে, কিন্তু এই নগ্নপ্রায় ঘরে কোনো অঙ্গুলিনির্দেশ পাওয়া গেল না। সে বলল, 'নীচের তলায় আর একটা ঘর আছে, না?'

'আছে। ঘরটা অক্ষয় মণ্ডলের আমলে ব্যবহার হত না, আমি ওটাকে রান্নাঘর করেছি। দেখবেন?'

'দরকার নেই। আপনার স্ত্রী বোধ হয় এখন রান্নাবান্না করছেন। চলুন, ওপরতলাটা দেখা যাক।'

'চলুন।'

ঘরের লাগাও একটা সরু বারান্দার শেষে ওপরে ওঠার সিঁড়ি, সিঁড়ির মাথায় দরজা। দরজার মাথায় ওপরকার দেয়ালে ঘোড়ার ক্ষুরের নালের মত লোহার একটা জিনিস তিনটে পেরেকের মাঝখানে আটকানো রয়েছে। ব্যোমকেশ সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ছাতা তুলে সেই দিকে নির্দেশ করে বলল, 'ওটা কি?'

'ওটা ঘোড়ার নাল। বিলিতি কুসংস্কার অনুযায়ী দোরের মাথায় ঘোড়ার নাল টাঙিয়ে রাখলে নাকি অনেক টাকা হয়।'

ব্যোমকেশের ছাতার ডগা ঘোড়ার নালে আটকে গিয়েছিল, সে টেনে সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এটা কি আপনি লাগিয়েছেন নাকি?'

'না, অক্ষয় মণ্ডলের আমল থেকে আছে।'

ব্যোমকেশ ঘোড়ার নালের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কমলবাবু ডাকলেন, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরের ভিতর কমলবাবুর দশ বছরের মেয়ে মেঝেয় মাদুর পেতে বসে লেখাপড়া করছিল, তার কাছে মাদুরের বাইরে একটা ভীষণদর্শন কুকুর থাবা পেতে বসেছিল, ব্যোমকেশের পানে মণিহীন নীলাভ চোখ তুলে চাইল। কমলবাবু বললেন, 'খুকু, যাও তোমার মাকে চা তৈরি করতে বল, আর কিছু ভাজাভুজি।'

ব্যোমকেশ একটু আপত্তি করল, কিন্তু কমলবাবু শুনলেন না। খুকু নীচে চলে গেল, ভুটো সঙ্গে সঙ্গে গেল।

অতঃপর ব্যোমকেশ ঘরটি চক্ষু দিয়ে সমীক্ষা করল। বলল, 'এ ঘরে অক্ষয় মণ্ডলের কোনো আসবাবপত্র আছে ?'

কমলবাবু বললেন, 'ছিল, আমি পাশের ঘরে নিয়ে গেছি। খাট এবং দেরাজওয়ালা টেবিল। এই যে।'

পাশের ঘরটি অপেক্ষাকৃত বড় ; জানলার দিকে খাট, অন্য কোণে টেবিল। ব্যোমকেশ টেবিলের কাছে গিয়ে বলল, 'সেই যে পুলিসের খানাতল্লাশে লোহার মোড়ক পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো কি পুলিস নিয়ে গিয়েছে ?'

'একটা মোড়ক পুলিস নিয়ে গিয়েছিল, বাকিগুলো দেরাজে আছে।' কমলবাবু নীচের দিকের একটা দেরাজ খুলে বললেন, 'এই যে !'

দেরাজের পিছন দিকে কয়েকটা মোড়ক পড়ে ছিল, ব্যোমকেশ একটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখল। আকৃতি-প্রকৃতি সিগারেট প্যাকেটের অভ্যন্তরস্থ তবকের মতই বটে। সেটা রেখে দিয়ে সে হাসিমুখে বলল, 'ভারি মজার জিনিস তো ! এর ভেতর গোটা দুই বিস্কুট রেখে সুতো দিয়ে বেঁধে দিলে নিশ্চিন্দি। চলুন, এবার ছাদটা দেখে আসা যাক।'

'ছাদে কিন্তু কিছু নেই !'

'তা হোক। শূন্যতাই হয়তো অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।'

'তাহলে আসুন।'

ছাদে সত্যিই কিছু নেই। লোহার ঘেরাটোপ ঢাকা ছাদটা বাঘের শূন্য খাঁচার মত দাঁড়িয়ে আছে। এক কোণে উঁচু পাদপীঠের ওপর লাল রঙের লোহার চৌবাচ্চা ; এই চৌবাচ্চা থেকে বাড়িতে কলের জল সরবরাহ হয়। ব্যোমকেশ ছাদের চারিদিক সম্বিৎসুভাবে পরিক্রমণ করে বলল, 'ছাদটা আপনারা ব্যবহার করেন না ?'

কমলবাবু বললেন, 'বেশি গরম পড়লে ছাদে এসে শুই। বেশ নিরাপদ জায়গা, চোর ঢুকবে সে উপায় নেই।'

'হুঁ। চলুন, আমার দেখা শেষ হয়েছে।'

নীচে নেমে এলে পর খুকু এসে বলল, 'বাবা, বসবার ঘরে চা দিয়েছি।'

নীচের তলার ঘরে পাঁপড় ভাজা ও গরম বেগুনি সহযোগে চা পান করতে করতে ব্যোমকেশ বলল, 'থানার যে দারোগাবাবুর কাছে আপনার যাওয়া-আসা, তাঁর নাম কি ?'

কমলবাবু বললেন, 'তাঁর নাম রাখাল সরকার।'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসল। চা শেষ করে সে ছাতা নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি।'

কমলবাবু বললেন, 'কিন্তু আমাদের তীর্থযাত্রার কি হবে, যাওয়া উচিত হবে কি না, কিছু বললেন না তো।'

'নিশ্চয় তীর্থযাত্রা করবেন। কবে থেকে আপনার ছুটি ?'

'সামনের শনিবার থেকে।'

'তাহলে আর দেরি করবেন না, টিকিট কিনে ফেলুন। কোনো ভয় নেই, আপনার বাসা বেদখল হবে না, আমি জামিন রইলাম। —আচ্ছা, চলি।'

'অ্যাঁ—তাই নাকি ! ধন্যবাদ ব্যোমকেশবাবু। চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ব্যোমকেশ বলল, 'তার দরকার নেই, আমি এখন থানায় যাব। রাখালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে হবে।'

শনিবার সকালবেলা কমলবাবুর বাসা থেকে পুলিসের পাহারা তুলে নেওয়া হল। কমলবাবু ভুটোকে একটা কেনেলে রেখে এলেন। পুলিস ছাড়াও অন্য একটি পক্ষ বাসার ওপর নজর রেখেছিল, তারা সব লক্ষ্য করল।

বিকেলবেলা কমলবাবু তাঁর স্ত্রী মেয়ে এবং পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বাসায় চাবি দিয়ে চলে গেলেন, যাবার পথে থানায় রাখালবাবুকে চাবি দিয়ে বলে গেলেন, 'খিড়কির দোর ভেজিয়ে রেখে এসেছি। এখন আমার বরাত আর আপনাদের হাতযশ।'

সারা দিন বাড়িটা শূন্য পড়ে রইল।

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু কমলবাবুর বাসার দিকে গেলেন। দু'জনের পকেটেই পিস্তল এবং বৈদ্যুতিক টর্চ।

সরজমিন আগে থাকতেই দেখা ছিল, পাশের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে দু'জনে কমলবাবুর খিড়কি দিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন, খিড়কির দরজা বন্ধ করে দিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন। কান পেতে শুনলেন, বাড়ি নিস্তব্ধ।

রাখালবাবু পলকের জন্য দোরের মাথায় টর্চের আলো ফেলে দেখলেন, ঘোড়ার ক্ষুর যথাস্থানে আছে। তিনি তখন ফিসফিস করে বললেন, 'চলুন, ছাদে গিয়ে অপেক্ষা করলেই বোধহয় ভাল হবে।'

ব্যোমকেশ তাঁর কানে কানে বলল, 'না। আমি ছাদে যাচ্ছি, তুমি এই ঘরে লুকিয়ে থাকো। দু'জনেই ছাদে গেলে ছাদের দোর এদিক থেকে বন্ধ করা যাবে না, আসামীর সন্দেহ হবে।'

'বেশ, আপনি ছাদে গিয়ে লুকিয়ে থাকুন, আমি দোর বন্ধ করে দিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ ছাদে উঠে গেল, রাখালবাবু দরজায় হুড়কো লাগিয়ে নেমে এলেন। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ঠিক নেই, এমন কি আসামী আজ নাও আসতে পারে। তিনি দোতলার ঘরের ভিতর ঢুকে দোরের পাশে লুকিয়ে রইলেন।

ছাদের ওপর ব্যোমকেশ এদিক ওদিক ঘুরে জলের চৌবাচ্চা থেকে দূরের একটা আল্‌সের পাশে গিয়ে বসল। আকাশে চাঁদ নেই, কেবল তারাগুলো ঝিকমিক করছে। ব্যোমকেশ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বনের মধ্যে ছাগল বা বাছুর বেঁধে মাচার ওপর বসে বাঘের প্রতীক্ষা করার মত। রাত্রি দুটো বাজতে যখন আর দেরি নেই, তখন রাখালবাবুর মন বদ্ধ ঘরের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল : আজ আর শিকার আসবে না। ঠিক এই সময় তিনি দোরের বাইরে মৃদু শব্দ শুনতে পেলেন ; মুহূর্তে তাঁর স্নায়ুপেশী শক্ত হয়ে উঠল। তিনি নিঃশব্দে পকেট থেকে পিস্তল বার করলেন।

যে মানুষটি নিঃসাড়ে বাড়িতে প্রবেশ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসেছিল, তার বাঁ হাতে ছিল একটি ক্যাম্বিসের থলি, আর ডান হাতে ছিল লোহা-বাঁধানো একটি ছড়ি। ছড়ির গায়ে তিন হাত লম্বা মুগার সুতো জড়ানো, মাছ-ধরা ছিপের গায়ে যেমন সুতো জড়ানো থাকে সেই রকম।

লোকটি দোরের মাথার দিকে লাঠি বাড়িয়ে ঘোড়ার ক্ষুরটি নামিয়ে আনল, তারপর মুগার সুতোর ডগায় সেটি বেঁধে নিয়ে তেতলার সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল। দু'টি মানুষ যে বাড়ির দু' জায়গায় ওৎ পেতে আছে, তা সে জানতে পারল না।

ছাদের দরজায় একটু শব্দ শুনে ব্যোমকেশ সতর্ক হয়ে বসল। নক্ষত্র আলোয় একটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল, সোজা ট্যাঙ্কের কাছে গিয়ে আল্‌সের ওপর উঠে ট্যাঙ্কের মাথায় চড়ল। ধাতব শব্দ শোনা গেল। সে ট্যাঙ্কের ঢাকনি খুলে সরিয়ে রাখল, তারপর লাঠির আগায় সুতো-বাঁধা ঘোড়ার নাল জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।

লোকটা যেন আবছা অন্ধকারে বসে ছিপ ফেলে চুনো মাছ ধরছে। ছিপ ডোবাচ্ছে আর তুলছে। মাছগুলি ব্যাগের মধ্যে পুরে আবার ছিপ ফেলছে।

কুড়ি মিনিট পরে লোকটি মাছ ধরা শেষ করে ট্যাঙ্ক থেকে নামল। এক হাতে ব্যাগ অন্য হাতে ছিপ নিয়ে যেই পা বাড়িয়েছে, অমনি তার মুখের ওপর দপ করে টর্চ জ্বলে উঠল, ব্যোমকেশের ব্যঙ্গ-স্বর শোনা গেল, 'অক্ষয় মণ্ডল, কেমন মাছ ধরলে?'

অক্ষয় মণ্ডলের পরনে খাকি প্যান্ট ও হাফ-সার্ট, কালো মুস্কো চেহারা। সে বিস্ফারিত চোখে

চেয়ে আস্তে আস্তে থলিটি নামিয়ে রেখে ক্ষিপ্রবেগে পকেটে হাত দিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমকেশের টর্চ গদার মত তার চোয়ালে লাগল, অক্ষয় মণ্ডল ছাদের ওপর চিতিয়ে পড়ল।

রাখালবাবু নীচে থেকে উঠে এসেছিলেন, তিনি অক্ষয় মণ্ডলের বুকের ওপর বসে বললেন, 'ব্যোমকেশদা, এর পকেটে পিস্তল আছে, বের করে নিন।'

ব্যোমকেশ অক্ষয় মণ্ডলের পকেট থেকে পিস্তল বার করে নিজের পকেটে রাখল। রাখালবাবু আসামীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে বললেন, 'অক্ষয় মণ্ডল, হরিহর সিংকে খুন করার অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।'

ব্যোমকেশ অক্ষয় মণ্ডলের থলি থেকে কয়েকটা ভিজে লোহার প্যাকেট বার করে তার ওপর টর্চের আলো ফেলল। 'বাঃ! এই যে, যা ভেবেছিলাম তাই। লোহার মোড়কের মধ্যে চকচকে বিদেশী সোনার বিস্কুট।'

পরদিন সকালবেলা সত্যবতী ব্যোমকেশকে বলল, 'ভাল চাও তো বল, কোথায় রাত কাটালে?'

ব্যোমকেশ কাতর স্বরে বলল, 'দোহাই ধর্মাবতার, রাখাল সাক্ষী—আমি কোনো কুকার্য করিনি।'

'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। গল্পটা বলবে?'

'বলব, বলব। কিন্তু আগে আর এক পেয়ালা চা দিতে হবে। এক পেয়ালা চা খেয়ে রাত জাগার গ্লানি কাটেনি।'

সত্যবতী আর এক পেয়ালা কড়া চা এনে ব্যোমকেশের সামনের চেয়ারে বসল, 'এবার বল, টর্চটা ভাঙলে কি করে? মারামারি করেছিলে?'

ব্যোমকেশ বলল, 'মারামারি নয়, শুধু মারা।' চায়ে একটি চুমুক দিয়ে সে বলতে আরম্ভ করল:

'অক্ষয় মণ্ডল সোনার চোরাকারবার করে অনেক টাকা করেছিল। নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ভদ্র পাড়ায় একটি বাড়ি করেছিল, বাড়ির ছাদ লোহার ডাণ্ডা-ছত্রী দিয়ে এমনভাবে মুড়ে রেখেছিল যে ওদিক দিয়ে বাড়িতে চোর ঢোকার উপায় ছিল না। ছাদটাকে নিরাপদ করা তার বিশেষ দরকার ছিল।

'অক্ষয় মণ্ডলের পেশা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যেসব চোরাই সোনা আসে তাই সংগ্রহ করা এবং সুযোগ মত বাজারে ছাড়া। সে বাড়িতেই সোনা রাখত, কিন্তু লোহার সিন্দুকে নয়। সোনা লুকিয়ে রাখার এক বিচিত্র কৌশল সে বার করেছিল।

'অক্ষয় মণ্ডল বাড়িতে একলা থাকত; তার স্ত্রী আছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি। সে পাড়ার লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করত না, কিন্তু পাছে পড়শীরা কিছু সন্দেহ করে, তাই কমল দাস নামে একটি ভদ্রলোককে নীচের তলায় একটি ঘর ভাড়া দিয়েছিল। বাজারে সোনা ছাড়বার জন্যে সে কয়েকজন লোক রেখেছিল, তাদের মধ্যে একজনের নাম হরিহর সিং।

'হরিহর সিং বোধহয় অক্ষয় মণ্ডলকে ফাঁকি দিচ্ছিল। একদিন দু'জনের ঝগড়া হল, রাগের মাথায় অক্ষয় মণ্ডল হরিহর সিংকে খুন করল। তারপর মাথা ঠাণ্ডা হলে তার ভাবনা হল, মড়াটা নিয়ে সে কি করবে। একলা মানুষ, ভদ্র পাড়া থেকে মড়া পাচার করা সহজ নয়। সে স্থির করল, মড়া থাক, বাড়িতে যা সোনা আছে, তাই নিয়ে সে নিজে ডুব মারবে।

'কিন্তু সব সোনা সে নিয়ে যেতে পারল না। সোনা ধাতুটা বিলক্ষণ ভারি, লোহার চেয়েও ভারি। তোমরা স্ত্রী-জাতি সারা গায়ে সোনার গয়না বয়ে বেড়াও, কিন্তু সোনার ভার কত বুঝতে পারো না। দশ হাত কাপড়ে কাছা নেই।'

সত্যবতী বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তারপর বল।'

'অক্ষয় মণ্ডল ডুব মারবার কয়েক দিন পরে লাশ বেরুল; পুলিস এল, কিন্তু খুনের কিনারা হল

না। অক্ষয় মণ্ডল খুন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে নিরুদ্দেশ। কমলবাবু সারা বাড়িটা দখল করে বসলেন।

'অক্ষয় মণ্ডল নিশ্চয় কলকাতাতেই কোথাও লুকিয়ে ছিল, কয়েক মাস চুপচাপ রইল। কিন্তু বাড়িতে যে-সোনা লুকোনো আছে—যেগুলো সে সরাতে পারেনি, সেগুলো উদ্ধার করতে হবে। কাজটি সহজ নয়। কমলবাবুর স্ত্রী এবং মেয়ে সর্বদা বাড়িতে থাকে, তাছাড়া একটি ভয়ঙ্কর হিংস্র কুকুর আছে। অক্ষয় মণ্ডল ভেবে-চিন্তে এক ফন্দি বার করল।

'একটি স্ত্রীলোককে বউ সাজিয়ে এবং একটা পেটোয়া লোককে তার ভাই সাজিয়ে অক্ষয় মণ্ডল কমলবাবুর কাছে পাঠাল। বউকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। অক্ষয় মণ্ডল ফেরারী খুনী হতে পারে, কিন্তু তার বউ তো কোনো অপরাধ করেনি। কমলবাবু কিন্তু শুনলেন না, তাদের হাঁকিয়ে দিলেন। অক্ষয় মণ্ডল তখন বেনামী চিঠি লিখে ভয় দেখাল, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। কমলবাবু নড়লেন না।

'অক্ষয় মণ্ডল তখন অন্য রাস্তা ধরল।

'আমার বিশ্বাস ব্যাঙ্কের যে সহকর্মীটি কমলবাবুকে তীর্থে যাবার জন্যে ভজাচ্ছিলেন, তার সঙ্গে অক্ষয় মণ্ডলের যোগাযোগ আছে। দু'-চার দিনের জন্যেও যদি কমলবাবুকে সপরিবারে বাড়ি থেকে তফাৎ করা যায়, তাহলেই অক্ষয় মণ্ডলের কার্যসিদ্ধি। কাজটা সে বেশ গুছিয়ে এনেছিল, কিন্তু একটা কারণে কমলবাবুর মনে খটকা লাগল ; বাড়ি যদি বেদখল হয়ে যায়! তিনি আমার কাছে পরামর্শ নিতে এলেন।

'তার গল্প শুনে আমার সন্দেহ হল বাড়িটার ওপর, আমি বাড়ি দেখতে গেলাম। দেখাই যাক না। অকুস্থলে গেলে অনেক ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'গেলাম বাড়িতে। কড়া রোদ ছিল, তাই ছাতা নিয়ে গিয়েছিলাম। দোতলায় উঠে দেখলাম, দোরের মাথায় ঘোড়ার নাল তিনটে পেরেকের মাঝখানে আলগাভাবে আটকানো রয়েছে। ঘোড়ার নালটা এক নজর দেখলে ঘোড়ার নাল বলেই মনে হয় বটে, কিন্তু ঠিক যেন ঘোড়ার নাল নয়। আমি ছাতাটা সেইদিকে বাড়িয়ে দিলাম, অমনি ছাতাটা আপনা থেকেই গিয়ে ঘোড়ার নালে জুড়ে গেল।

'বুঝলাম, ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম, ঘোড়ার নাল নয়, একটি বেশ শক্তিমান চুম্বক—ছাতার লোহার বাঁট পেয়ে টেনে নিয়েছে। প্রশ্ন করে জানলাম চুম্বকটা অক্ষয় মণ্ডলের। মাথার মধ্যে চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল—কেন? অক্ষয় মণ্ডল চুম্বক নিয়ে কি করে? দোরের মাথায় টাঙিয়েই বা রেখেছে কেন, যাতে মনে হয় ওটা ঘোড়ার নাল? মনে পড়ে গেল, পুলিসের খানাতল্লাশে দেরাজের মধ্যে কয়েকটি লোহার মোড়ক পাওয়া গিয়েছিল। রহস্যটা ক্রমশ পরিষ্কার হতে লাগল।

'তারপর যখন ঘেরাটোপ লাগানো ছাদে গিয়ে জলের ট্যাঙ্ক দেখলাম, তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। চুম্বক যত জোরালোই হোক, সোনাকে টানবার ক্ষমতা তার নেই। তাই সে সোনার বিস্কুট লোহার প্যাকেটে মুড়ে ট্যাঙ্কের জলে ফেলে দেয়। তারপর যেমন যেমন দরকার হয়, ট্যাঙ্কে চুম্বকের ছিপ ফেলে জল থেকে তুলে আনে। হরিহর সিংকে খুন করে পালাবার সময় সে সমস্ত সোনা নিয়ে যেতে পারেনি। এখন বাকি সোনা উদ্ধার করতে চায়। পালাবার সময় সে ভাবেনি যে ব্যাপারটা পরে এত জটিল হয়ে উঠবে।

'যাহোক, সোনার সন্ধান পেলাম ; সমুদ্রের তলায় শুক্তির মধ্যে যেমন মুক্তো থাকে, ট্যাঙ্কের তলায় তেমনি লোহার পাতে মোড়া সোনা আছে। কিন্তু কেবল সোনা উদ্ধার করলেই তো চলবে না, খুনী আসামীকে ধরতে হবে। আমি কমলবাবুকে বললাম, আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করুন। তারপর রাখালের সঙ্গে পরামর্শ করে ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা করলাম।

'কাল সকালে কমলবাবুরা তীর্থযাত্রা করলেন। বাড়ির ওপর অক্ষয় মণ্ডল নজর রেখেছিল, সে জানতে পারল, রাস্তা সাফ।

'কাল সন্ধ্যের পর রাখাল আর আমি বাড়িতে গিয়ে আড্ডা গাড়লাম। কালই যে অক্ষয় মণ্ডল আসবে এতটা আশা করিনি, তবু পাহারা দিতে হবে। বলা তো যায় না। রাত্রি দুটোর সময় শিকার ফাঁদে পা দিল। তারপর আর কি! টর্চের একটি ঘায়ে ধরাশায়ী।'

সত্যবতী ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কত সোনা পাওয়া গেল?'

সিগারেট ধরিয়ে ব্যোমকেশ বলল, 'সাতান্নটি লোহার মোড়ক, প্রত্যেকটি মোড়কের মধ্যে দু'টি করে সোনার বিস্কুট, প্রত্যেকটি বিস্কুটের ওজন পঞ্চাশ গ্রাম। কত দাম হয় হিসেব করে দেখ।'

সত্যবতী কেবল একটি নিশ্বাস ফেলল।

বিশুপাল বধ

১

কালীচরণ দাসকে পাড়ার লোকে আড়ালে শালীচরণ দাস বলে উল্লেখ করত। শুধু হাস্যরস সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য গভীরতর। নামের আদ্যাক্ষর বদল করে কোনো রসিক ব্যক্তি কালীচরণ দাসের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন। আমরা এই কাহিনীতে তাকে শালীচরণ দাস বলেই উল্লেখ করব।

চৌদ্দ বছর আগে শালীচরণ কলকাতার দক্ষিণাংশে বাস করত এবং সামান্য কাজকর্ম করত। বাড়িটি ছোট হলেও দোতলা, শালীচরণ ওপরতলাটা একজনকে ভাড়া দিয়েছিল, নীচের তলায় নিজে সস্ত্রীক থাকত। তার স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা। সংসারে আর কেউ ছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন বৌ মরে গেল।

কিন্তু সংসার করতে হলে ঘরে একটি স্ত্রীলোক দরকার। শালীচরণের বয়স তখন ত্রিশ বছর, কিন্তু সে আর বিয়ে করল না ; ভেবে-চিন্তে একটি বিধবা এবং অনাথা শালীকে এনে ঘরে বসাল। দূর সম্পর্কের শালী, নাম মালতী, বয়স কম, মাঝারি রকমের সুন্দরী, স্বভাব একটু চপল-চটুল ; কিন্তু সংসারের কাজকর্মে নিপুণা।

মাসখানেক যেতে না যেতেই পাড়ায় কানাঘুষো আরম্ভ হয়ে গেল। শালীচরণের বৌ যতদিন বেঁচে ছিল নিজে গড়িয়াহাটে গিয়ে বাজার করত, পাড়াপড়শীর বাড়িতে যাতায়াত করত, কিন্তু শালী করে না কেন ? শালীচরণ শালীকে ঘরের বাইরে যেতে দেয় না, নিজে বাজার করে কেন ? বৌ-এর চেয়ে শালীর আদর কখন বেশি হয় ?

তার ওপর শালীচরণের বাড়ির দোতলায় যে ভাড়াটে ছিল তাদের বাড়ির মেয়েরা একটা নতুন খবর বিতরণ করল। নীচের তলায় তাদের যাতায়াত ছিল। তারা বলল, শালী যখন প্রথম আসে তখন দুটো ঘরে দুটো আলাদা খাট বিছানা ছিল, এখন কেবল একটা ঘরে একটা বিছানা। ব্যাস্‌, আর যায় কোথায় ! কালীচরণ দাস শালীচরণ দাসে পরিণত হল।

কিন্তু অপবাদ যে ভিত্তিহীন নয় তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হল মাস ছয়েক পরে। শালীচরণের বাড়ির পাশের বাড়িতে একটা মেস ছিল, সেখানে বিশ্বনাথ পাল নামে এক যুবক থাকত। তার চেহারা যেমন বলবান তেমনি লাবণ্যময়, শালীচরণের মত বৈশিষ্ট্যহীন নয়। বিশ্বনাথ পাল ভাল অভিনয় করত, যাত্রা এবং সখের থিয়েটার দলে যোগ দিয়েছিল। তার সঙ্গে শালীচরণের শালীর নাম সংযুক্ত হয়ে নতুন করে কানাঘুষো আরম্ভ হল। দুপুরবেলা পুরুষেরা যখন কাজে বেরিয়ে যায় এবং মেয়েরা খাওয়া-দাওয়ার পর দিবানিদ্রায় নিমগ্ন হয় তখন নাকি বিশ্বনাথ পাল খিড়কির দোর দিয়ে শালীচরণের বাড়িতে যায়। এইভাবে কিছুদিন দিবাভিসার চলল। শালীচরণের বোধহয় সন্দেহ হয়েছিল, কিম্বা পাড়ার চ্যাংড়া ছোঁড়ারা হয়তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ ইশারা করেছিল। সে একদিন দুপুরবেলা আচমকা খিড়কি দিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

অতঃপর যে দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হল তা উহ্য রাখাই ভাল। মোট কথা আদিরস ও রুদ্ররস মিলে নাইট্রোগ্লিসারিনের মত বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে পরিণত হল। শালীচরণ মেঘগর্জনের মত শব্দ করে অপরাধীদের আক্রমণ করল। কিন্তু বিশ্বনাথ পালের শরীরে অনেক বেশি শক্তি থাকা

সত্ত্বেও তার মনে পাপ ছিল, সে পদাহত পথ-কুকুরের মত পালিয়ে গেল। বাকি রইল শুধু মালতী। শালীচরণ তখন বিকট চীৎকার করে মালতীর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরল।

হুড়োহুড়ি চেঁচামেচিতে দোতলা থেকে লোক ছুটে এল, অল্পবয়স্ক বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক। দৃশ্য দেখে তারা চীৎকার করে রাস্তার লোক ডাকল। রাস্তা থেকে দু'চার জন লোক এসে অতি কষ্টে শালীচরণের হাত থেকে মালতীর গলা ছাড়ালো। কিন্তু মালতী তখন দম বন্ধ হয়ে মরে গেছে।...

আদালতে শালীচরণের বিচার হল। সে অপরাধ অস্বীকার করল না। শালীর সঙ্গে অবৈধ সহবাসের অভিযোগও মেনে নিল। হাকিম বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, মানুষের হৃদয়ের খবর রাখতেন। শালীচরণের ফাঁসি হল না, গুরুতর আকস্মিক প্ররোচনা বিধায় চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড হল।

শান্তভাবে শালীচরণ জেলে গেল। জেলে যাবার আগে ব্যবস্থা করে গেল : তার বাড়ির দোতলার ভাড়া সলিসিটার আদায় করে ব্যাঙ্কে রাখবেন ; একতলা বন্ধ থাকবে। শালীচরণের বিষয়সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর আর কিছু ছিল না।

বিশ্বনাথ পাল সেই যে পালিয়েছিল, কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে রইল। শালীচরণ জেলে চলে যাবার পর সে আবার আত্মপ্রকাশ করল। তার চেহারা ভাল, উপরন্তু যথেষ্ট অভিনয় নৈপুণ্য থাকায় সে অল্পকালের মধ্যেই চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের নামজাদা অভিনেতা হয়ে দাঁড়াল। চিত্রপটের চেয়ে রঙ্গালয়ের দিকেই তার ঝোঁক বেশি ; সে দল গঠন করে একটি রঙ্গমঞ্চের অধিকারী হয়ে বসল।

ওদিকে শালীচরণ জেল খাটছিল, যথাকালে মেয়াদ পূর্ণ হলে মুক্তি পেয়ে বেরুল। জেলখানায় সুবোধ বালক হয়ে থাকলে কিছু রেয়াৎ পাওয়া যায়। শালীচরণ চৌদ্দ বছর পূর্ণ হবার আগেই বেরুল। এই কয় বছরে তার বয়স যেমন বেড়েছে তেমনি চেহারারও পরিবর্তন ঘটেছে ; আগে সে ছিল রোগা-পট্‌কা, এখন বেশ চাকন-চিকন হয়েছে। সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছে তার মনে। মুক্তি পেয়েই সে সটান নবদ্বীপে চলে গেল, সেখান মাথা মুড়িয়ে কণ্ঠি ধারণা করে মালা জপ করতে করতে বাড়ি এল।

ইতিমধ্যে পাড়ার পুরোনো বাসিন্দারা অনেকে পাড়া ছেড়ে চলে গেছে, দোতলার ভাড়াটেও বদল হয়েছে, তাই শালীচরণ জেল থেকে ফেরার পর বিশেষ হৈ চৈ হল না। সেও কারুর সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করল না। একলা থাকে, স্বপাক নিরামিষ খায় আর মালা জপ করে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের পর বেড়াতে বেরোয়। তার অর্থ উপার্জনের দরকার নেই। বারো বছর ধরে যে বাড়িভাড়া জমেছে তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। উপরন্তু মাসে মাসে দোতলা থেকে ভাড়া আসে।

২

একটা শনিবার বিকেলে ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সত্যবতী দাদার কাছে গিয়েছে, অজিত নিরুদ্দেশ, আমার হাতে কাজ নেই, তাই নিরুপায় হয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।'

প্রতুলবাবু বললেন, 'শ্রীমতী সত্যবতীর দাদার কাছে যাওয়া বুঝলাম, মেয়েদের মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যাওয়ার বাসনা দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু অজিতবাবু নিরুদ্দেশ হলেন কেন?'

ব্যোমকেশ একটু বিমনাভাবে বলল, 'কি জানি। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি ভোর হতে না হতে অজিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে রাত ন'টার পর। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না, মিটিমিটি হাসে।'

'প্রেমে পড়েননি তো?'

'অজিতের হৃদয়ে প্রেম নেই, আছে কেবল অর্থলিপ্সা। তাছাড়া প্রেমে পড়ার বয়স পেরিয়ে গেছে।'

'তা বটে। চলুন, তাহলে থিয়েটার দেখে আসি।

'থিয়েটার ?'

'হ্যাঁ। কয়েক মাস থেকে একটা নতুন নাটক চলছে। বিশু পালের দল করছে। খুব ভাল রিপোর্ট পাচ্ছি। চলুন না, দেখে আসা যাক।'

'মন্দ কথা নয়। বোধহয় ত্রিশ বছর থিয়েটার দেখিনি। নাটকের নাম কি ?'

'কীচক বধ।'

'অ্যাঁ—পৌরাণিক নাটক !'

'না না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। নামটা কীচক বধ বটে কিন্তু পরিস্থিতি আধুনিক ; একজন নবীন নাট্যকার লিখেছেন। বর্তমান যুগেও যে কীচকের অভাব নেই, বরং এ যুগের কীচকেরা সে-যুগের কীচকের কান কেটে নিতে পারে এই হচ্ছে প্রতিভাবান নাট্যকারের প্রতিপাদ্য। স্বয়ং বিশু পাল কীচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।'

'বিশু পাল কে ?'

'নটকেশরী বিশু পালের নাম জানেন না ! দুর্ধর্ষ অ্যাক্টর। চলুন চলুন, দেখে আসবেন।'

'নিতান্তই যদি আপনার রোখ চেপে থাকে—চলুন। নেই কাজ তো খই ভাজ।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে টেলিফোনে দুটো সিট রিজার্ভ করে আসি।' প্রতুলবাবু পাশের ঘরে গেলেন।

ব্যোমকেশ কেয়াতলার বাড়িতে আসার পর প্রতুলবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দু'জনেই বুদ্ধিজীবী ; উপরন্তু প্রতুলবাবু হৃদয়বান পুরুষ, সত্যবতীকে একটি মোটর কিনিয়ে দেবার জন্যে ব্যোমকেশের পিছনে লেগেছিলেন। সত্যবতীর বয়স বাড়ছে, এখন তার পক্ষে পায়ে হেঁটে বাজার করা কিম্বা সিনেমা দেখতে যাওয়া কষ্টকর, এই সব যুক্তি দেখিয়ে তিনি ব্যোমকেশের মন গলাবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে তিনি সত্যবতীর হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন কিন্তু ব্যোমকেশকে বিগলিত করতে পারেননি। ব্যোমকেশের আপত্তি, মোটর কেনার টাকা না হয় কষ্টেসৃষ্টে যোগাড় করা যায়, ছয় সাত হাজার টাকায় একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তারপর ? গাড়ি চালাবে কে ? একটা ড্রাইভার রাখতে গেলে মাসে দেড়শো দু'শো টাকা খরচ। ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে বেশি বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মাথায় চুল নেই লম্বা দাড়ি অত্যন্ত অশোভন।

'সিট পাওয়া গেছে। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।' প্রতুলবাবু নিজের মোটরে ব্যোমকেশকে নিয়ে যাত্রা করলেন। অনেক দূর যেতে হবে, শহরের অন্য প্রান্তে। প্রতুলবাবু প্রচণ্ড পণ্ডিত হলে কি হয়, সেই সঙ্গে প্রগাঢ় থিয়েটার প্রেমিক।

এঁরা যখন রঙ্গালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন সেই সময় কলেজ স্কোয়ারের এক কোণে গাছের তলায় একটি ভদ্রশ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে কারুর প্রতীক্ষা করছিল। তার হাতে একটি ছোট ব্যাগ, ব্যাগের মধ্যে এক সেট জামা-কাপড়। লোকটি অধীরভাবে ঘন ঘন কব্জির ঘড়ি দেখছিল। যদিও এ পাড়ায় তার চেনা লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা কম, তবু লোকটি রুমাল দিয়ে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। এই সময় এখানে ছাত্রদের ভীড় হয়, ছাত্ররা জলভ্রমির মত পুকুরের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, তন্ময় হয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। তবু বলা যায় না, পরিচিত কোনো ছাত্র তাকে দেখে চিনে ফেলতে পারে।

গলা খাঁকারির শব্দে চমকে উঠে লোকটি ঘাড় ফেরাল, দেখল অলক্ষিতে কখন একটা লোক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে অজস্র দাড়ি গোঁফ, হাতে একটা মোটা লাঠি। লোকটি বলল, 'এনেছি।'

প্রথম ব্যক্তি বলল, 'কোথায় ?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি পাশের পকেট থেকে একটি রুমালের মত ন্যাকড়া বার করল। ন্যাকড়ার এক কোণে গিঁট বাঁধা, যেন সুপুরির মত একটা কিছু বাঁধা রয়েছে। প্রথম ব্যক্তি সেটি ভালভাবে দেখে বলল, 'এতে কাজ হবে ?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, 'হবে। খুব পাতলা কাচের অ্যাম্‌পুল। একটু ঠোকা পেলেই ফেটে যাবে।'

আর কোনো কথা হল না। প্রথম ব্যক্তি ব্যাগ থেকে কয়েকটা নোট বার করে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি টাকা পকেটে রেখে অ্যাম্‌পুলটি ভাল করে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে প্রথম ব্যক্তিকে দিল। প্রথম ব্যক্তি সেটি সযত্নে জামা-কাপড়ের মধ্যে রেখে দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির পানে চাইল। দ্বিতীয় ব্যক্তির ঝাঁকড়া গোঁফের আড়াল থেকে এক ঝলক হাসি বেরিয়ে এল। সে বলল, 'শুভমস্তু।'

তারপর দু'জনে ভিন্ন দিকে চলে গেল।

প্রতুলবাবু ব্যোমকেশকে পাশে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহের প্রথম সারিতে বসেছিলেন। আশেপাশে কয়েকটি সিট খালি ছিল, কিন্তু পিছন দিক একেবারে ভরাট।

সাহেববেশী একটি লোক সামনের সারিতে এসে বসল। তার হাতে একটি ব্যাগ। বসবার পর সে দেখতে পেল পাশেই প্রতুলবাবু ; অপ্রস্তুতভাবে একটু হেসে বলল, 'কেমন আছেন ?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'ভাল। আপনি কেমন ?'

দু' এক মিনিট শিষ্টতা বিনিময়ের পর লোকটি উঠে পড়ল, বলল, 'যাই। এদিকে একটা কেসে এসেছিলাম, ভাবলাম দাদাকে দেখে যাই। —আচ্ছা।'

লোকটি ব্যাগ হাতে চলে যাবার পর প্রতুলবাবু বললেন, 'বিশু পালের ছোট ভাই। ডাক্তারি করে।'

ব্যোমকেশ বলল, 'কিন্তু পসার ভাল নয়।'

'না, কষ্টেসৃষ্টে চালায়। কি করে বুঝলেন ?'

'ভাবভঙ্গী পোশাক পরিচ্ছদ দেখে বোঝা যায়।'

ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় পর্দা উঠল, নাটক আরম্ভ হল। সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চলবে। মাত্র তিনটি অঙ্ক।

গল্পটি মহাভারতের বিরাট পর্ব থেকে অপহৃত হলেও একেবারে মাছিমারা অনুকরণ নয়, যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। বস্তুত নাটকের শেষ অঙ্কে ঠিক উল্টো ব্যাপার ঘটেছে, অর্থাৎ বর্তমান কালের কীচক বর্তমান কালের ভীমকে বধ করে দ্রৌপদীকে দখল করেছে। নাটকের চরিত্রগুলির অবশ্য আধুনিক নাম আছে, পাঠকের সুবিধার জন্যে পৌরাণিক নামই রাখা হল।

নাটকের অভিনয় হয়েছে উৎকৃষ্ট। ক্রূর নায়ক কীচকের ভূমিকায় বিশু পালের অভিনয় অতুলনীয়। দ্রৌপদীর চরিত্রে সুলোচনা নাম্নী যশস্বিনী অভিনেত্রী চমৎকার অভিনয় করেছে ; তাছাড়া ভীম অর্জুন সুদেষ্ণা উত্তরা প্রভৃতির চরিত্রও ভাল অভিনীত হয়েছে। সব মিলিয়ে এই নাটকটিতে চিরন্তন মনুষ্য সমাজের বিচিত্র আলেখ্য যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মোপদেশ বা নীতিকথা শোনাবার চেষ্টা নেই।

প্রতুলবাবু পরমানন্দে থিয়েটার দেখছেন, ব্যোমকেশও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। নাটক ক্রমশ তৃতীয় অঙ্কে এসে পৌঁছল। এবার চরম পরিণতি।

শেষ দৃশ্যটি হচ্ছে একটি শয়নকক্ষ। কক্ষে আসবাব কিছু নেই, কেবল একটি পালঙ্ক। এটি দ্রৌপদীর শয়নকক্ষ। ভীম পালঙ্কের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, কীচক আসবে।

ইতিপূর্বে ভীমের সঙ্গে দ্রৌপদীর পরামর্শ হয়েছে, দ্রৌপদী কীচককে তার ঘরে ডেকেছে। ভীম দ্রৌপদীর বদলে বিছানায় শুয়ে আছে, কীচক এলেই ক্যাঁক করে ধরবে।

নাটকের পরিসমাপ্তি এই রকম : ভীমের সঙ্গে কীচকের মল্লযুদ্ধ হবে ; কীচক পরাজিত হয়ে মৃত্যুর ভান করে পালঙ্কের পায়ের কাছে পড়ে যাবে, ভীম তখন দ্রৌপদীকে ডাকতে যাবে। মিনিটখানেকের জন্যে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে। তারপর অস্পষ্ট সবুজ আলো জ্বলবে। আস্তে আস্তে আলো উজ্জ্বল হবে। দ্রৌপদীকে নিয়ে ভীম ফিরে আসবে ; কীচক ছুরি নিয়ে পিছন থেকে ভীমকে আক্রমণ করবে। ছুরিকাহত ভীম মরে যাবে। কীচক তখন পৈশাচিক হাস্য করতে করতে দ্রৌপদীকে পালঙ্কের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। যবনিকা।

এবার দৃশ্যের আরম্ভের দিকে ফিরে যাওয়া যাক। ভীম পালঙ্কে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে ; ঘরের আলো খুব উজ্জ্বল নয়, তবে অন্ধকারও নয়। কীচক পা টিপে টিপে প্রবেশ করল, পা টিপে টিপে পালঙ্কের কাছে গেল। তারপর এক ঝটকায় চাদর সরিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

যিনি ভীম সেজেছেন তাঁর বপুটিও কম নয়, শালপ্রাংশু মহাভুজ। কীচক পরম কমনীয়া যুবতীর পরিবর্তে এই ষণ্ডামার্কা পালোয়ানকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল, সেই ফাঁকে ভীম দাঁত কড়মড় করে তাকে আক্রমণ করল। কীচকের পকেটে ছুরি ছিল (পরস্ত্রী লোলুপ লম্পটেরা নিরস্ত্রভাবে অভিসারে যায় না) কিন্তু সে তা বের করবার অবকাশ পেল না। দু'জনে ঘোর মল্লযুদ্ধ বেধে গেল।

স্টেজের ওপর এই মরণান্তক কুস্তি সত্যিই প্রেক্ষণীয় দৃশ্য। মনে হয় না এটা অভিনয়। যেন দুটো ক্ষ্যাপা মোষ শিং-এ শিং আটকে যুদ্ধ করছে ; একবার এ ওকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, একবার ও একে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। লোমহর্ষণ লড়াই। শুধু এই লড়াই দেখবার জন্যেই অনেক দর্শক আসে।

শেষ পর্যন্ত কীচকের পরাজয় হল, ভীম তাকে পালঙ্কের পাশে মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসে তার গলা টিপতে শুরু করল। কীচকের হাত-পা এলিয়ে পড়ল, জিভ বেরিয়ে এল, তারপর সে মরে গেল।

ভীম তার বুক থেকে নেমে চোখ পাকিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলল, ঘাড় চুলকে ভাবল, শেষে স্টেজ থেকে বেরিয়ে দ্রৌপদীকে খবর দিতে গেল।

ভীম নিষ্ক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেজ ও প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হয়ে গেল। এই নাটকে আলোর কৌশলে গল্পের নাটকীয়তা বাড়িয়ে দেবার নৈপুণ্য ভারি চমকপ্রদ। শেষ অঙ্কের চরম মুহূর্তে আলো সম্পূর্ণ নিভিয়ে দিয়ে পরিচালক বিশু পাল দর্শকের মনে উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিটখানেক পরে দপ্ করে আবার সব আলো জ্বলে উঠল। দেখা গেল কীচক পূর্ববৎ খাটের খুরোর কাছে পড়ে আছে।

দ্রৌপদীকে নিয়ে ভীম প্রবেশ করল। ভীমের ভাবভঙ্গীতে উদ্ধত বিজয়োল্লাস, দ্রৌপদীর মুখে উদ্বেগ। তাদের মধ্যে হ্রস্বকণ্ঠে যে সংলাপ হল তা সংক্ষেপে এই রকম—

দ্রৌপদী : এখন মড়া নিয়ে কী করবে ?

ভীম : কিছু ভেবো না, শেষ রাত্রে মড়া রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসব।

নাটকের নির্দেশ, এই সময় কীচক মাটি থেকে চুপি চুপি উঠে ভীমের পিঠে ছুরি মারবে। কিন্তু কীচক যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে রইল, নড়ন চড়ন নেই। ছুরি মারার শুভলগ্ন অতিক্রম হয়ে যাবার পর ভীম উস্‌খুস্ করতে লাগল, দু'চারটে সংলাপ বানিয়ে বলল, কিন্তু কোনো ফল হল না। ভয়ানক সত্য আবিষ্কার করল প্রথমে দ্রৌপদী। শঙ্কিত মুখে কীচকের কাছে গিয়ে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠল, 'অ্যাঁ—একি ! একি— !'

কীচক অর্থাৎ বিশু পাল সত্যি সত্যিই মরে গেছে।

৩

নাটক শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে যবনিকা পড়ে গেল। যেসব দর্শকেরা আগে নাটক দেখেছিল তারা বিস্মিত হল, যারা দেখেনি তারা ভাবল এ আবার কি! কিন্তু কেউ কোনো গোলমাল না করে যে যার বাড়ি চলে গেল।

থিয়েটারের অন্দর মহলে তখন কয়েকজন মানুষ স্টেজের ওপর, কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। কেবল দ্রৌপদী অর্থাৎ সুলোচনা নাম্নী অভিনেত্রী মূর্ছিত হয়ে কীচকের পায়ের কাছে পড়ে ছিল। দারোয়ান প্রভুনারায়ণ সিং দরজা ছেড়ে স্টেজের উইংসে দাঁড়িয়ে অনিমেষ চোখে মৃত কীচকের পানে চেয়ে ছিল।

স্টেজের দরজা অরক্ষিত পেয়ে ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুকে নিয়ে ঢুকে পড়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়, গুরুতর কিছু ঘটেছে সন্দেহ নেই ; সুতরাং অনুসন্ধান দরকার।

স্টেজ থেকে তীব্র আলো আসছে। একটি লোক ব্যাগ হাতে বেরিয়ে দোরের দিকে যাচ্ছিল, প্রতুলবাবু তাকে থামিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে, ডাক্তার পাল ?'

অমল পাল, যে প্লে আরম্ভ হবার আগে তাদের পাশে গিয়ে বসেছিল, উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলল, 'দাদা নেই, দাদা মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন ? কী হয়েছিল ?'

'জানি না, বুঝতে পারছি না। আমি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছি।' অমল পাল দোরের দিকে পা বাড়াল।

এবার ব্যোমকেশ কথা কইল, 'কিন্তু—আপনি বাইরে যাচ্ছেন কেন ? যতদূর জানি এখানে টেলিফোন আছে।'

অমল পাল থমকে ব্যোমকেশের পানে চাইল, ধন্ধলাগাভাবে বলল, 'টেলিফোন! হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বটে অফিস ঘরে—'

এই সময় দারোয়ান প্রভুনারায়ণ সিং এসে দাঁড়াল। লম্বা চওড়া মধ্যবয়স্ক লোক, থিয়েটারের পিছন দিকে কয়েকটা কুঠুরিতে সপরিবারে থাকে আর থিয়েটার বাড়ি পাহারা দেয়। সে অমল পালের পানে চেয়ে ভারী গলায় বলল, 'সাব, মালিক তো গুজর গয়ে। আব্ ক্যা করনা হ্যায় ?'

অমল পাল একটা ঢোক গিলে প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস দমন করল, কোনো উত্তর না দিয়ে টেলিফোনের উদ্দেশ্যে অফিস ঘরের দিকে চলে গেল। প্রভু সিং ব্যোমকেশের পানে চাইল, ব্যোমকেশ বলল, 'তুমি দারোয়ান ? বেশ, দোরে পাহারা দাও। পুলিস যতক্ষণ না আসে কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে দিও না।'

প্রভু সিং চলে গেল। সে সচ্চরিত্র প্রভুভক্ত লোক ; তার সংসারে স্ত্রী আর একটি বিধবা বোন ছাড়া আর কেউ নেই। বস্তুত থিয়েটারই তার সংসার। বিশেষত অভিনেত্রী জাতীয়া স্ত্রীলোকদের সে একটু বেশি স্নেহ করে। এই তার চরিত্রের একটি দুর্বলতা ; কিন্তু নিঃস্বার্থ দুর্বলতা।

ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবু যখন মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন তখন তিনজন পুরুষ দ্রৌপদীকে অর্থাৎ অভিনেত্রী সুলোচনাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গ্রীনরুমে যাচ্ছে। তারা চলে গেলে স্টেজে রয়ে গেল দু'টি লোক : একটি ছেলেমানুষ গোছের মেয়ে, সে উত্তরার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল ; সে পালঙ্কের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে বিভীষিকা-ভরা চোখে মৃত বিশু পালের মুখের পানে চেয়ে ছিল। সে এখনো উত্তরার সাজ-পোশাক পরে আছে, তার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা দেখে মনে হয় সে আগে কখনো অপঘাত মৃত্যু দেখেনি। তার নাম মালবিকা।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যুবাপুরুষ, সে পালঙ্কের শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল এবং ক্রমান্বয়ে একবার মৃতের মুখের দিকে একবার মেয়েটির মুখের পানে চোখ ফেরাচ্ছিল। তার খেলোয়াড়ের মত দৃঢ় সাবলীল শরীর এবং সংযত নিরুদ্বেগ ভাব দেখে মনে হয় না যে সে এই থিয়েটারের

আলোকশিল্পী। তার নাম মণীশ, বয়স আন্দাজ ত্রিশ।

ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবু স্টেজে প্রবেশ করে পালঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মৃতের মুখে তীব্র আলো পড়েছে। মুখে মৃত্যুযন্ত্রণার ভান সত্যিকার মৃত্যুযন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। কিম্বা—

'মুখের কাছে ওটা কী?' প্রতুলবাবু মৃতের মুখের দিকে আঙুল দেখিয়ে খাটো গলায় প্রশ্ন করলেন।

ব্যোমকেশ সামনের দিকে ঝুঁকে দেখল, রুমালের মত এক টুক্‌রো কাপড় বিশু পালের চোয়ালের কাছে পড়ে আছে। সে বলল, 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রুমাল নয়। যখন লড়াই হচ্ছিল তখন ওটা চোখে পড়েনি।'

'আমারও না।'

ব্যোমকেশ সোজা হয়ে বলল, 'কোনো গন্ধ পাচ্ছেন?'

'গন্ধ?' প্রতুলবাবু দু'বার আঘ্রাণ নিয়ে বললেন, 'সেন্ট-পাউডার, ম্যাক্‌সফ্যাক্‌টর, সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ। আর তো কিছু পাচ্ছি না।'

'পাচ্ছেন না? এইদিকে ঝুঁকে একটু শুঁকে দেখুন তো।' ব্যোমকেশ মৃতদেহের দিকে আঙুল দেখাল।

প্রতুলবাবু সামনে ঝুঁকে কয়েকবার নিশ্বাস নিলেন, তারপর খাড়া হয়ে ব্যোমকেশের সঙ্গে মুখোমুখি হলেন, ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন। বাদাম তেলের ক্ষীণ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে—'

যারা সুলোচনাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তারা ফিরে এল। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে ব্রজদুলাল, অর্থাৎ ভীম; দ্বিতীয় ব্যক্তিটি থিয়েটারের প্রমপ্‌টার, নাম কালীকিঙ্কর; তৃতীয় ব্যক্তির নাম দাশরথি, সে কমিক অভিনেতা, নাটকে বিরাটরাজার পার্ট করেছে।

তিনজনে অস্বস্তিপূর্ণভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল; মাঝে মাঝে মৃতদেহের পানে তাকাচ্ছে। এ অবস্থায় কি করা উচিত বুঝতে পারছে না। ভীমের হাতে তার ব্যাগ ছিল (পরে দেখা গেল অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলেই বাড়তি কাপড়-চোপড় এবং প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে অভিনয় করতে আসে)। ভীম ব্যাগটি স্টেজের ওপর রেখে নিজে সেখানে বসল; ব্যাগ খুলে আস্ত একটা হুইস্কির বোতল ও গেলাস বার করল, একবার সকলের দিকে চোখ তুলে গভীর স্বরে বলল, 'কেউ খাবে?'

কেউ সাড়া দিল না। ভীম তখন গেলাসে খানিকটা মদ ঢেলে মালবিকার পানে চাইল। মালবিকার মুখ পাংশু, মনে হয় যেন তার শরীর অল্প অল্প টল্‌ছে। স্নায়ুর অবসাদ এসেছে, এখনি হয়তো মূর্ছিত হয়ে পড়বে। ভীম মণীশকে বলল, 'মণীশ, মালবিকার অবস্থা ভাল নয়, এই নাও, একটু জল মিশিয়ে খাইয়ে দাও। নইলে ও যদি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে, নতুন ঝামেলা শুরু হবে—'

মণীশ তার হাত থেকে গেলাস নিয়ে বলল, 'সুলোচনাদিদির জ্ঞান হয়েছে?'

ভীম বলল, 'এখনো হয়নি। নন্দিতাকে বসিয়ে এসেছি। মণীশ, তুমি মালবিকাকে ওঘরে নিয়ে যাও। ওষুধটা জল মিশিয়ে খাইয়ে দিও, তারপর খানিকক্ষণ শুইয়ে রেখো। দশ মিনিট শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

মণীশ এক হাতে মালবিকার পিঠ জড়িয়ে অন্য হাতে হুইস্কির গেলাস নিয়ে গ্রীনরুমের দিকে চলে গেল। ভীম তখন নিজের পুরুষ্টু গোঁফজোড়া ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে হুইস্কির বোতলের গলায় ঠোঁট জুড়ে চুমুক মারল।

আমাদের দেশের যাত্রা থিয়েটারে ভীমের ইয়া গোঁফ ও গালপাট্টা দেখা যায়; যদিও মহাভারতে বেদব্যাস ভীমকে তুবর বলেছেন। অর্থাৎ ভীম মাকুন্দ ছিল। অবশ্য বর্তমান নাটকে ভীম মাকুন্দ না হলেও ক্ষতি নেই; এ-ভীম সে-ভীম নয়, তার অবচীন বিকৃত ছায়ামাত্র।

লম্বা এক চুমুকে প্রায় আধাআধি বোতল শেষ করে ভীম বোতল নামিয়ে রাখল, প্যাঁচার মত

মুখ করে কিছুক্ষণ বোতলের পানে চেয়ে রইল। তার গোঁফ-বর্জিত মুখখানা অন্য রকম দেখাচ্ছে, ন্যাড়া হাড়গিলের মত। সে কতকটা নিজের মনেই বলল, 'ভীম-কীচকের লড়াই-এর পর আমার রোজই এক গেলাস দরকার হয়, নইলে গায়ের ব্যথা মরে না। আজ এক বোতলেও শানাবে না।'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল, শুনছিল। এখন শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল, 'বিশু পাল মদ খেতেন?'

ভীম তার পানে আরক্ত চোখ তুলে চাইল, তারপর মৃতদেহের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে বলল, 'না। ওর দরকার হত না। লোহার শরীর ছিল। কিসে যে মারা গেল—। ডাক্তার অমলকে দেখেছিলাম, সে কোথায় গেল?'

ব্যোমকেশ বলল, 'তিনি পুলিসকে টেলিফোন করতে অফিসে গেছেন। পুলিস এখনি এসে পড়বে। তার আগে আমি আপনাদের দু' একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

ভীম বোতলে আর এক চুমুক দিয়ে বলল, 'করুন প্রশ্ন। আপনি কে জানি না, কিন্তু প্রশ্ন করার হক সকলেরই আছে।'

প্রতুলবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী। থিয়েটার দেখতে এসেছিলাম একসঙ্গে, তারপর এই দুর্ঘটনা।'

ভীমের চোখের দৃষ্টি একটু সতর্ক হল, অন্য দু'জন ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। ব্যোমকেশ বলল, 'আজ আপনারা এখানে ক'জন উপস্থিত আছেন?'

ভীম বলল, 'শেষ দৃশ্য অভিনয় হচ্ছিল। সাধাণরত শেষ দৃশ্যে যাদের কাজ নেই তারা বাড়ি চলে যায়। আজ বিশু সুলোচনা আর আমি ছিলাম। আর কারা ছিল না ছিল খবর রাখি না।'

কমিক অভিনেতা দাশরথি বলল, 'আমি আর আমার স্ত্রী নন্দিতা ছিলাম।'

ব্যোমকেশ সপ্রশ্ন নেত্রে চাইল। দাশরথির এখন কমিক ভাব নেই, চোখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। সে ইতস্তত করে বলল, 'বিশুবাবুর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল, তাই নাটক শেষ হবার অপেক্ষায় ছিলাম। তৃতীয় অঙ্কে আমার প্রবেশ নেই।'

'আর কেউ ছিল?'

'আর মালবিকা ছিল। টেক্‌নিশিয়ানদের মধ্যে মণীশ আর তার সহকারী কাঞ্চনজঙ্ঘা ছিল—'

'কাঞ্চনজঙ্ঘা!'

'তার নাম কাঞ্চন সিংহ, সবাই কাঞ্চনজঙ্ঘা বলে।'

'ও, তিনি কোথায়?'

দাশরথি এদিক ওদিক চেয়ে বলল, 'দেখছি না। কোথাও পড়ে ঘুম দিচ্ছে বোধহয়।'

'আর কেউ?'

এতক্ষণে তৃতীয় ব্যক্তি কথা বলল, 'আর আমি ছিলাম। আমি প্রমপ্‌টার, শেষ পর্যন্ত নিজের জায়গায় ছিলাম।'

'আপনার জায়গা কোথায়?'

প্রমপ্‌টার কালীকিঙ্কর দাস আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যে উইংসের খাঁজের মধ্যে টুল পাতা রয়েছে, ঐখানে।'

স্টেজের ওপর যে ঘরের সেট তৈরি হয়েছিল তার প্রবেশদ্বার মাত্র দু'টি : একটি পিছনের দেয়ালে, অন্যটি বাঁ পাশে ; কিন্তু প্রসিনিয়ামের দু'পাশে থেকে এবং আরো কয়েকটি উইংসের প্রচ্ছন্ন পথে যাতায়াত করা যায়। প্রমপ্‌টার যেখানে দাঁড়ায় সেখানে যাওয়া আসার সঙ্কীর্ণ পথ আছে ; বিপরীত দিকে আলোর কলকব্জা ও সুইচ বোর্ড যেখানে দেয়ালের সারা গায়ে বিছিয়ে আছে সেদিক থেকে স্টেজে প্রবেশের সোজা রাস্তা। আলোকশিল্পীকে সর্বদা স্টেজের ওপর চোখ রাখতে হয়, মাঝখানে আড়াল থাকলে চলে না।

এই সময় পিছনের দরজা দিয়ে মণীশ মালবিকার বাহু ধরে স্টেজে প্রবেশ করল। মালবিকার

ফ্যাকাসে মুখে একটু সজীবতা ফিরে এসেছে। ওরা মৃতদেহের দিকে চোখ ফেরাল না। মণীশ বলল, 'ব্রজদুলালদা, এই নিন আপনার গেলাস। মালবিকা এখন অনেকটা সামলেছে, ওকে এবার বাড়ি নিয়ে যাই ?'

ভীম বলল, 'এখনি যাবে কোথায় ! এখনো পুলিস আসেনি।'

মণীশ সপ্রশ্ন চোখে ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবুর পানে চাইল। ব্যোমকেশ মাথা নাড়ল, 'আমরা পুলিস নই। কিন্তু আপনাকে তো অভিনয় করতে দেখিনি—'

ভীম বলল, 'ও অভিনয় করে না। ও আমাদের আলোকশিল্পী। মণীশ ভদ্র'র নাম শুনেছেন নিশ্চয়—বিখ্যাত সাঁতারু।'

মণীশ বলল, 'আপনিও কম বিখ্যাত নন, ব্রজদুলালদা। এক সময় ভারতবর্ষের চ্যাম্পিয়ন মিড্‌ল-ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন।'

ভীম গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলল, 'সে-সব দিন গেছে ভায়া। বোসো বোসো, আজ রাত দুপুরের আগে কেউ ছাড়া পাচ্ছে না।'

মণীশ বলল, 'কিন্তু কেন ? পুলিস আসবে কেন ? বিশুবাবুর মৃত্যু কি স্বাভাবিক মৃত্যু নয় ? আমার তো মনে হয় ওঁর হার্ট ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়েছিল, লড়াই-এর ধকল সহ্য করতে পারেননি, হার্ট ফেল করে গেছে।'

ভীম বলল, 'যদি তাই হয় তবু পুলিস তদন্ত করবে।'

মণীশ আর মালবিকা পাশাপাশি স্টেজের ওপর বসল। কিছুক্ষণ কোনো কথা হল না। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ঠিক নেই ; কমিক অভিনেতা দাশরথি ওরফে বিরাটরাজ পকেট থেকে সিগারেট বার করে মৃতদেহের পানে কটাক্ষপাত করে সিগারেট আবার পকেটে পুরল।

ব্যোমকেশ বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা। মণীশবাবু এবং শ্রীমতী মালবিকা হলেন স্বামী-স্ত্রী—কেমন ? ওঁরা একসঙ্গে এই থিয়েটারে কাজ করেন। এই রকম স্বামী-স্ত্রী এ থিয়েটারে আরো আছেন নাকি ?'

ভীম গেলাসে এক চুমুক দিয়ে বলল, 'দেখুন, আমাদের এই থিয়েটার হচ্ছে একটি ঘরোয়া কারবার। যারা এখানে কাজ করে, মেয়ে-মদ্দ কাজ করে। যেমন মণীশ আর মালবিকা, বিশু আর সুলোচনা, দাশরথি আর নন্দিতা। আমি অ্যাকটিং করি, আমার স্ত্রী শান্তি মিউজিক মাস্টার—গানে সুর বসায়। শান্তির কাজ শেষ হয়েছে, সে রোজ আসে না। আজ আসেনি। এমনি ব্যবস্থা। ছুট্‌ লোক বড় কেউ নেই।'

ব্যোমকেশ বলল, 'বুঝলাম। এখন বলুন দেখি, বিশুবাবু মানুষটি কেমন ছিলেন ?'

ভীম মদের গেলাস মুখে তুলল। দাশরথি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'সাধু ব্যক্তি ছিলেন। উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি যেমন অগাধ টাকা রোজগার করতেন তেমনি দু'হাতে টাকা খরচ করতেন। মণীশকে নতুন মোটর কিনে দিয়েছিলেন, আমাদের সকলের নামে লাইফ্‌-ইনসিওর করেছিলেন। নিজে প্রিমিয়াম দিতেন। এ রকম মানুষ পৃথিবীতে ক'টা পাওয়া যায় ?'

ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলল, 'তাহলে বিশুবাবুর মৃত্যুতে আপনাদের সকলেরই লাভ হয়েছে।' একথার উত্তরে হঠাৎ কেউ কিছু বলতে পারল না, মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শেষে ভীম বলল, 'তা বটে। বিশু নিজের নামে জীবনবীমা করেছিল, কিন্তু উত্তরাধিকারী করেছিল আমাদের। তার মৃত্যুতে বীমার টাকা আমরাই পাব। কিন্তু সামান্য ক'টা টাকার জন্যে বিশুকে খুন করবে এমন পাষণ্ড এখানে কেউ নেই।'

'তাহলে বিশুবাবুর শত্রু কেউ ছিল না ?'

কেউ উত্তর দেবার আগেই বাঁ দিকের দোর দিয়ে ডাক্তার অমল পাল প্রবেশ করল। তার পিছনে একটি হিপি-জাতীয় ছোকরা। মাথার চুলে কপাল ঢাকা, দাড়ি গোঁফে মুখের বাকি অংশ সমাচ্ছন্ন ; আসলে মুখখানা কেমন বাইরে থেকে আন্দাজ করা যায় না। সে মৃতদেহের দিকে

একটি বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ করে চুপিচুপি মণীশদের পাশে গিয়ে বসল।

দাশরথি বলল, 'এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা ! কোথায় ছিলে হে তুমি ?'

কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন শুনতে পায়নি এমনিভাবে মণীশকে খাটো গলায় বলল, 'ভীষণ মাথা ধরেছিল, মণীশদা। থার্ড অ্যাক্টে আমার বিশেষ কাজ নেই, তাই সিন্ ওঠার পর আমি কলঘরে গিয়ে মাথায় খুব খানিকটা জল ঢাললাম। তারপর অফিস ঘরে গিয়ে পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে টেবিলে মাথা রেখে একটু চোখ বুজেছিলাম। অফিসে কেউ ছিল না, তাই বোধহয় একটু ঝিম্‌কিনি এসে গিয়েছিল—'

মণীশ বিরক্ত চোখে তার পানে চাইল। দাশরথি বলল, 'এত কাণ্ড হয়ে গেল কিছুই জানতে পারলে না।'

এবারও কাঞ্চনজঙ্ঘা কোনো কথায় কর্ণপাত না করে মণীশের কাছে আরো খাটো গলায় বোধকরি নিজের কার্যকলাপের কৈফিয়ৎ দিতে লাগল।

ব্যোমকেশ হঠাৎ গলা চড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করল, 'আপনার জন্যে বিশুবাবু কত টাকার বীমা করে গেছেন ?'

কাঞ্চনজঙ্ঘা চকিতভাবে মুখ তুলল, 'আমাকে বলছেন ? বীমা ! কই, আমার জন্যে তো বিশুবাবু জীবনবীমা করেননি।'

ব্যোমকেশ বলল, 'করেননি ? তবে যে শুনলাম—'

ভীম বলল, 'ওর চাকরির এক বছর পূর্ণ হয়নি, প্রোবেশনে কাজ করছে, কাঁচা চাকরি—তাই—'

কাছেই প্রতুলবাবু ও অমল পাল দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে কথা বলছিলেন, ব্যোমকেশ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আর কোনো প্রশ্ন না করে সেইদিকে ফিরল। অমল পাল অস্বস্তিভরা গলায় বলছিল, 'দাদার সঙ্গে সুলোচনার ঠিক—মানে—ওরা অনেকদিন স্বামী-স্ত্রীর মতই ছিল—'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল, 'বিশুবাবু বিয়ে করেননি ?'

'করেছিলেন বিয়ে। কিন্তু অল্পকাল পরেই বৌদি মারা যান। সে আজ দশ বারো বছরের কথা। ছেলেপুলে নেই।'

স্টেজের দোরের বাইরে মোটর হর্ন শোনা গেল। একটা পুলিস ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে। আট দশজন পোষাকী পুলিস ভ্যান থেকে নেমে প্রভু সিং-এর সঙ্গে কথা বলল। তারপর পিল্‌পিল্ করে স্টেজে ঢুকল। একজন অফিসার ব্যোমকেশদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি ইন্সপেক্টর মাধব মিত্র, থানা থেকে আসছি। কে টেলিফোন করেছিলেন ?'

'আমি—ডক্টর অমল পাল। আমার দাদা—'

'কি ব্যাপার সংক্ষেপে বলুন।'

অমল পাল স্খলিত স্বরে আজকের ঘটনা বলতে আরম্ভ করলেন, ইন্সপেক্টর মাধব মিত্র ঘাড় একটু কাত করে শুনতে শুনতে স্টেজের চারিদিকে চোখ ফেরাতে লাগলেন ; মৃতদেহ থেকে প্রত্যেক মানুষটি তাঁর দৃষ্টি প্রসাদে অভিষিক্ত হল। বিশেষত তাঁর অনুসন্ধিৎসু চক্ষু প্রতুলবাবু ও ব্যোমকেশের পাশে বারবার ফিরে আসতে লাগল। মাধব মিত্রের চেহারা ভাল, মুণ্ডিত মুখে চাতুর্য ও সতর্কতার আভাস পাওয়া যায় ; তিনি কেবলমাত্র তাঁর উপস্থিতির দ্বারা যেন সমস্ত দায়িত্বের ভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন।

ডাক্তার পালের বিবৃতি শেষ হলে ইন্সপেক্টর বললেন, 'মৃতদেহ সরানো হয়নি ?'

ব্যোমকেশ বলল, 'না। কাউকে কিছুতে হাত দিতে দেওয়া হয়নি। যাঁরা ঘটনাকালে মঞ্চে ছিলেন তাঁরাও সকলেই উপস্থিত আছেন।'

ইন্সপেক্টর ব্যোমকেশের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা— ?' তিনি বোধহয় অনুভব করেছিলেন যে এঁরা দু'জন থিয়েটার সম্পর্কিত লোক নন।

প্রতুলবাবু ব্যোমকেশের পরিচয় দিলেন, সহজাত বিনয়বশত নিজের পরিচয় উহ্য রাখলেন।

মাধব মিত্রের মুখ এতক্ষণ হাস্যহীন ছিল, এখন ধীরে ধীরে তাঁর অধর-প্রান্তে একটু মোলায়েম হাসি দেখা দিল। তিনি বললেন, 'আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী! আপনার যে থিয়েটার দেখার শখ আছে তা জানতাম না।'

ব্যোমকেশ বলল, 'আর বলেন কেন, পণ্ডিত ব্যক্তির পাল্লায় পড়ে এই বিপত্তি। ইনি হলেন—'

ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর পরিচয় দিল। তারপর বলল, 'মাধববাবু, আমরা মৃতদেহের কাছে একটা গন্ধ পেয়েছি। এই বেলা আপনি সেটা শুঁকে নিলে ভাল হয়। গন্ধটা বোধহয় স্থায়ী গন্ধ নয়।'

মাধববাবু ত্বরিতে ফিরে মৃতদেহের কাছে গেলেন, একবার তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পাশে নতজানু হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে মৃতের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলেন।

'বিশ্বাস, শীগ্‌গির ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।'—মাধব মিত্র উঠে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশের দিকে ফিরলেন। তরুণ সাব-ইন্সপেক্টর বিশ্বাস প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বাইরে চলে গেল। পুলিসের ডাক্তার পুলিস ভ্যানে অপেক্ষা করছিলেন।

'আপনারা ঠিক ধরেছেন, গন্ধটা সন্দেহজনক।—এই যে ডাক্তার, একবার এদিকে আসুন তো—'

ব্যাগ হাতে প্রৌঢ় ডাক্তার মৃতের কাছে গেলেন, মাধববাবু ক্ষিপ্রস্বরে তাঁকে ব্যাপার বুঝিয়ে দিলেন।

পাঁচ মিনিট পরে শব পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন।

'খুব ক্ষীণ গন্ধ, কিন্তু সায়ানাইড সন্দেহ নেই। এখনি মর্গে নিয়ে গিয়ে অটপ্সি করতে হবে, নইলে সায়ানাইডের সব লক্ষণই লুপ্ত হয়ে যাবে।'

'সায়ানাইড কি করে প্রয়োগ করা হল, ডাক্তার?'

ডাক্তার মৃতের কাছ থেকে ন্যাক্‌ড়ার ফালিটা তুলে ধরে বললেন, 'এই কাপড়ের এক কোণে গিঁট বাঁধা রয়েছে দেখছেন? ওর মধ্যে কাচের একটা অ্যাম্‌পুল ছিল, তার মধ্যে তরল সায়ানাইড ছিল। যখন স্টেজ অন্ধকার হয়ে যায় সেই সময় আততায়ী স্টেজে ঢুকে ন্যাক্‌ড়ার খুঁট ধরে মাটিতে আছাড় মারে, অ্যাম্‌পুল ভেঙ্গে যায়। তারপর—বুঝেছেন? হায়ড্রোসায়ানিক অ্যাসিড খুব ভোলাটাইল—মানে—'

'বুঝেছি'—মাধব মিত্র হাত নেড়ে পরিচরদের হুকুম দিলেন। তারা কীচকের মরদেহ ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেল। ডাক্তার ন্যাক্‌ড়ার ফালি ব্যাগে পুরে কীচকের অনুগামী হলেন।

অমল পালের গলার মধ্যে একটা চাপা শব্দ হল, যেন সে প্রবল কান্নার বেগ রোধ করবার চেষ্টা করছে।

মাধব মিত্র একবার চারিদিকে তাকালেন, ভীম প্রমুখ কয়েকটি লোক স্টেজের মধ্যে প্রস্তর পুত্তলিকার মত বসে আছে। ভীমের বোতল ব্যাগের মধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। মালবিকার চোখে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি। মাধব মিত্র ব্যোমকেশের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আজ বোধহয় এজাহার নিতে রাত কাবার হয়ে যাবে। আপনাদের অতক্ষণ আটকে রাখব না। কী দেখেছেন বলুন।'

ব্যোমকেশ বলল, 'দেখলাম আর কই। যা কিছু ঘটেছে অন্ধকারে ঘটেছে।'

প্রতুলবাবু বললেন, 'যেমন তেমন অন্ধকার নয়, সূচীভেদ্য অন্ধকার। আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ ছিলাম।'

মাধববাবু নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে আপনাদের আট্‌কে রেখে লাভ নেই। আজ আসুন তবে। যদি কোনো দরকারী কথা মনে পড়ে দয়া করে আমাকে স্মরণ করবেন। আচ্ছা, নমস্কার।'

ব্যোমকেশের ইচ্ছে ছিল আরো কিছুক্ষণ থেকে পরিস্থিতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে, কিন্তু এ রকম বিদায় সম্ভাষণের পর আর থাকা যায় না। দু'জনে দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হলেন। ব্যোমকেশ যেতে যেতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ইন্সপেক্টর অমল পালের সঙ্গে কথা

কইছেন।

দোরের কাছে প্রভু সিং দাঁড়িয়েছিল। ব্যোমকেশ লক্ষ্য করল, দোরের বাইরে থেকে একটি মেয়ে ব্যগ্র চক্ষে স্টেজের দিকে উঁকি মারছে। যুবতী মেয়ে, মুখশ্রী ভাল, শাড়ি পরার ভঙ্গী ঠিক বাঙালী মেয়ের মত নয়। ব্যোমকেশদের আসতে দেখে সে সুট্ করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যোমকেশ প্রভু সিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'ও মেয়েটি কে ?'

প্রভু সিং একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, 'জ্বি—ও আমার ছোট বোন সোমরিয়া। আমার কাছেই থাকে, থিয়েটারের কাজকর্ম করে, ঝাঁটপাট ঝাড়পোঁছ—এই সব। মালিক ওকে খুব স্নেহ করতেন—'

'হুঁ, সধবা মেয়ে মনে হল। তোমার কাছে থাকে কেন ?'

প্রভু সিং বিব্রত হয়ে বলল, 'জ্বি, ওর মরদের সঙ্গে বনিবনাও নেই, তাই আমি নিজের কাছে এনে রেখেছি।'

'তোমার সংসারে আর কেউ আছে ?'

'জ্বি, ঔরৎ আছে, বাচ্চা মেয়ে আছে। থিয়েটারের হাতার মধ্যেই আমরা থাকি।'

প্রতুলবাবুর মোটর রাস্তার ধারে পার্ক করা ছিল। সেইদিকে যেতে যেতে ব্যোমকেশ দেখল থিয়েটারের হাতার মধ্যে পুলিসের ভ্যান ছাড়াও আরো দু'টি মোটর দাঁড়িয়ে আছে। একটি সম্ভবত বিশু পালের গাড়ি, আকারে বেশ বড় বিলিতি গাড়ি, খুব নতুন নয় ; অন্য গাড়িটি কার অনুমান করা শক্ত। ভীমের হতে পারে, যদি ভীমের গাড়ি থাকে ; অমল পাল ডাক্তার, তার গাড়ি হতে পারে ; কিম্বা মণীশ ভদ্র'র হতে পারে। বিশু পাল মণীশকে গাড়ি কিনে দিয়েছিল—

এই সব চিন্তার মধ্যে ব্যোমকেশ অনুভব করল সে প্রতুলবাবুর গাড়িতে চড়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলেছে। সে অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে, পাশের অন্ধকার থেকে প্রতুলবাবু বললেন, 'আমি অন্ধকারের মধ্যে স্টেজের ওপর কিছু দেখিনি সত্য, কিন্তু মনে হয় কিছু শুনেছি।'

'কি শুনেছেন ?' ব্যোমকেশ তাঁর দিকে ঘাড় ফেরাল।

'একটা মিহি শব্দ।'

'কি রকম মিহি শব্দ ?'

'ঠিক বর্ণনা করে বোঝানো শক্ত। এই ধরুন মেয়েরা হাত ঝাড়লে যেমন চুড়ির আওয়াজ হয়, সেই রকম।'

'কাচের চুড়ি, না সোনার চুড়ি ?'

'তা বলতে পারি না। আপনি কিছু শুনতে পাননি ?'

'আমার কান ওদিকে ছিল না।'

পথে আর কোনো কথা হল না।

৪

পরদিন সকাল আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় ব্যোমকেশ বসবার ঘরে খবরের কাগজটা মুখের সামনে উঁচু করে ধরে গত রাত্রের থিয়েটারের খুনের বিবরণ পড়ছিল। সত্যবতী সকালে বাড়ি ফিরেছে, ব্যোমকেশকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে গড়িয়াহাটে বাজার করতে গেছে, ফিরে এসে ব্যোমকেশকে আর এক পেয়ালা চা ও প্রাতরাশ দেবে। বাড়িতে কেবল অজিত আছে।

অন্দরের দিকের দরজা থেকে অজিত উঁকি মারল, দেখল ব্যোমকেশ মুখের সামনে কাগজের পর্দা তুলে দিয়ে খবর পড়ছে। অজিত নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে গুটি গুটি সদর দোরের দিকে অগ্রসর হল। সে প্রায় দোর পর্যন্ত পৌঁচেছে পিছন থেকে শব্দ হল, 'সাত সকালে চলেছ কোথায় ?'

ধরা পড়ে গিয়ে অজিত দাঁড়াল, ভারিক্কিভাবে বলল, 'দরকারী কাজে বেরুচ্ছি, টুকে দিলে তো ?'

ব্যোমকেশ কাগজ নামিয়ে বলল, 'বই-এর দোকানের কাজ ?'

গাম্ভীর্য বর্জন করে অজিত মুখ টিপে হাসল।

ব্যোমকেশ বলল, 'তোমার কার্য-কলাপ গতিবিধি ক্রমেই সন্দেহজনক হয়ে উঠছে। বিকাশকে ডেকে তোমার পিছনে টিকটিকি লাগাতে হবে দেখছি।'

'সাত দিন ধৈর্য ধরে থাকো, তারপর আমি নিজেই সব বলব।' অজিত বেরিয়ে গেল।

ব্যোমকেশ আবার কাগজ তুলে নিল। থিয়েটারে পুলিস প্রায় দেড়টা পর্যন্ত ছিল, থিয়েটারের আগাপাস্তলা তন্ন তন্ন করেছে; থিয়েটার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় স্ত্রী পুরুষের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে। কেবল খ্যাতনামা অভিনেত্রী সুলোচনা শোকাভিভূত থাকার জন্য এজ্‌াহার দিতে পারেননি। লাশ রাত্রেই ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল, লাশ-পরীক্ষক ডাক্তার বলেন, মৃতের শ্বাসনালী ও ফুস্‌ফুসের মধ্যে সাইনোজেন গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে, ওই ভয়ঙ্কর বিষই মৃত্যুর কারণ। মামলার পুলিস ইন-চার্জ ইন্সপেক্টর মাধব মিত্র মনে করেন, বিশু পালের মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, কেউ তাকে খুন করেছে। কিন্তু চিন্তার কারণ নেই, পুলিস তৎপর আছে, শীঘ্রই আসামী ধরা পড়বে। ওকুস্থলে অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহে ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবু উপস্থিত ছিলেন কাগজে সে কথারও উল্লেখ আছে।

বাইরে সত্যবতীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সে বাজার করে ফিরেছে। তার পিছনে প্রতুলবাবু দু'হাতে দু'টি পরিপুষ্ট থলে নিয়ে আসছেন, মুখে একটু অপ্রতিভ হাসি। সত্যবতী ঘরে ঢুকে বলল, 'ওগো, দ্যাখো কে এসেছেন। উনিও গড়িয়াহাটে বাজার করতে গিয়েছিলেন—ধরে নিয়ে এলুম।'

ব্যোমকেশ হেসে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'বাঃ, বেশ।—সত্যবতী ঝাঁকামুটের কাজটা আপনাকে দিয়েই করিয়ে নিয়েছে দেখছি।'

'যাঃ, তা কেন ? উনি নিজেই আমার হাত থেকে থলি কেড়ে নিলেন।—আপনারা বসে গল্প করুন, আমি চা তৈরি করে আনছি।' নিজের থলি প্রতুলবাবুর হাত থেকে নিয়ে সত্যবতী ভেতরে চলে গেল।

প্রতুলবাবু নিজের থলিটি নামিয়ে রেখে ব্যোমকেশের সামনের চেয়ারে বসলেন, বললেন, 'কাগজে কালকের কীচক বধের খবর পড়ছেন দেখছি। আমিও পড়েছি।—আচ্ছা, কাল থিয়েটার থেকে ফিরতে ফিরতে আপনাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে ?'

'কি কথা, চুড়ির ঝনাৎকার ?'

'হ্যাঁ, কাল থেকে চিন্তাটা মনের পিছনে লেগে আছে, পুলিসকে একথা জানানো উচিত কিনা।'

ব্যোমকেশ একটু নীরব থেকে প্রশ্ন করল, 'ঝনাৎকার শব্দ স্টেজ থেকে এসেছিল এ বিষয়ে আপনি ষোল আনা নিঃসংশয় ?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'দেখুন, অন্ধকারে বসে থাকলে কোন্ দিক থেকে আওয়াজ আসছে সব সময় ধরা যায় না। তবু, স্টেজ থেকে যে আওয়াজটা এসেছিল এ বিষয়ে আমি বারো আনা নিঃসংশয়।'

'তাহলে পুলিসকে বলা উচিত। ওরা যদি তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—'

এই সময় সদর দোরের কাছ থেকে আওয়াজ এল, 'আসতে পারি ?'

ব্যোমকেশ মুখ তুলে বলল, 'এস এস, রাখাল। তোমাদের কথাই হচ্ছিল।'

ইন্সপেক্টর রাখাল সরকার প্রবেশ করলেন, হেসে বললেন, 'দু'জন আসামীই উপস্থিত আছেন দেখছি।'

ব্যোমকেশ বলল, 'বসো। তোমার কি কাজকর্ম নেই, সকালবেলাই থানা ছেড়ে বেরিয়েছ যে।'

রাখালবাবু বললেন, 'কাজকর্ম ঢিমে। কাগজে আপনাদের দু'জনের নাম দেখলাম। আপনারা আমার এলাকার লোক, তাই ভাবলাম তদারক করে আসি।'

সত্যবতী ট্রে'র ওপর দু' পেয়ালা চা ও রাশীকৃত চিঁড়ে ভাজা নিয়ে এল। রাখালবাবু বললেন, 'বৌদি, আমিও আছি। আর এক পেয়ালা চাই।'

আর এক পেয়ালা চা এল। তিনজনে চায়ের অনুপান সহযোগে চিঁড়ে ভাজা খেতে খেতে গত রাত্রির থিয়েটারী হত্যাকাণ্ডের আলোচনা করতে লাগলেন।

চিঁড়ে ভাজা নিঃশেষ হলে রাখালবাবু চায়ের পেয়ালায় অন্তিম চুমুক দিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'ব্যোমকেশদা, এ পাড়ায় শালীচরণ দাস নামে কাউকে চেনেন ?'

ব্যোমকেশ বলল, 'শালীচরণ দাস ! নামের একটা মহিমা আছে বটে কিন্তু আমি চিনি না। কে তিনি ?'

রাখালবাবু বললেন, 'বছর বারো আগে আমি এই থানাতেই সাব-ইন্সপেক্টর ছিলাম। তখন শালীচরণকে নিয়ে বেশ কিছুদিন হৈ চৈ চলেছিল।'

'হৈ চৈ কিসের ? কী করেছিলেন তিনি ?'

'শালীকে খুন করেছিল।'

'শালীচরণ শালীকে খুন করেছিল !'

'এবং বিশু পালের সঙ্গে এই ঘটনার কিছু যোগাযোগ আছে।'

'তাই নাকি ! বল বল, শুনি।—প্রতুলবাবু, আপনার গল্প শুনতে আপত্তি নেই তো ?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'গল্প শুনতে কার আপত্তি হতে পারে ? আমি এ পাড়ার পুরনো বাসিন্দা, শালীচরণ নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আজ রবিবার, ভেবেছিলাম সকালবেলা একটু লেখাপড়া করব। তা গল্পই শোনা যাক।'

অতঃপর রাখালবাবু শালীচরণের অতীত কাহিনী বললেন। গল্প শুনে ব্যোমকেশ বলল, 'শালীচরণ এখন কোথায় ? জেল থেকে বেরিয়েছে ?'

রাখালবাবু বললেন, 'মাসখানেক হল। জেলখাটা কয়েদীদের খবরাখবর আমাদের রাখতে হয়—'

'কোথায় আছে ?'

'নিজের বাড়ির একতলায় উঠেছিল। আজ কোথায় আছে জানি না। খোঁজ নিতে পারি।'

ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলল, 'আজ ছুটির দিন, একটু সত্যান্বেষণে বেরুলে কেমন হয় ? শালীচরণ আমার মনোহরণ করেছে। যাবেন তার বাড়িতে তত্ত্ব-তল্লাশ নিতে ?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'বেশ তো, চলুন না। আমি কখনো খুনী আসামী দেখিনি, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। উঠুন তাহলে। আমার গাড়ি রয়েছে, তাতেই যাওয়া যাক।'

তিনজনে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। রাখালবাবু ড্রাইভারকে পথ নির্দেশ করার জন্যে সামনের সিটে বসলেন।

যেতে যেতে ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, রাখাল, মাধব মিত্তিরকে তুমি চেন ?'

রাখালবাবু ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'চিনি। ওঁর সঙ্গে কিছুদিন একসঙ্গে কাজ করেছি।'

'লোকটি কেমন বল তো ?'

রাখালবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'খুব হুঁশিয়ার কাজের লোক, আর ভারি মুখমিষ্টি। কিন্তু নিজের এলাকায় কাউকে নাক গলাতে দেন না।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর পানে চেয়ে একটু হাসল।

পাঁচ মিনিট পরে রাখালবাবুর নির্দেশ অনুসরণ করে মোটর একটি বাড়ির সামনে থামল। অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তার ওপর ছোট দোতলা বাড়ি ; বাড়ির গায়ে জীর্ণতার ছাপ পড়েছে। তিনজনে মোটর থেকে অবতীর্ণ হয়ে বাড়ির সদরে এসে দেখলেন দরজায় তালা ঝুলছে।

তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। বাড়িতে তালা লাগিয়ে শালীচরণ কোথায় গেল? বাজারে?

সদর দোরের মাথায় দোতলায় একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনি ছিল, এক ভদ্রলোক সেখান থেকে নীচে উঁকি মারলেন, 'কাকে চান?'

নীচে তিনজন উর্ধ্বমুখ হলেন। রাখালবাবু বললেন, 'শালী—মানে কালীচরণ দাস আছেন?'

ত্রিশঙ্কুর মত ভদ্রলোক বললেন, 'না, তিনি বাইরে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন?'

'দাঁড়ান, আমি আসছি।' ত্রিশঙ্কু ব্যালকনি থেকে অদৃশ্য হলেন।

অল্পক্ষণ পরে বাড়ির পাশের দিক থেকে ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। মধ্যবয়স্ক লোক, কিন্তু ভাবভঙ্গীতে চটুলতার আভাস বয়সের অনুকূল নয়। বললেন, 'আমি কালীচরণবাবুর ভাড়াটে। ওপরতলায় থাকি। আপনারা কি তাঁর বন্ধু?'

ব্যোমকেশ হেসে বলল, 'অন্তত শত্রু নয়; দর্শনার্থী বলতে পারেন। তিনি কোথায়?'

ভদ্রলোক হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'তিনি বোষ্টুমীকে নিয়ে বৃন্দাবন গেছেন।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলে বলল, 'বৃন্দাবন! বোষ্টমী!'

ভদ্রলোকের মুখের হাসি আর একটু প্রকট হল, 'আজ্ঞে। আমার বাসায় একটি কমবয়সী ঝি কাজ করত, দেখতে শুনতে ভাল, বোধহয় বিধবা। কাজকর্ম ভালই করছিল, তারপর কালীচরণবাবু জেল থেকে ফিরে এলেন। একলা মানুষ হলেও তাঁর একজন ঝি দরকার, চপলা—মানে আমার ঝি তাঁর কাজও করতে লাগল। কিছুদিন যেতে না যেতেই চপলা আমার কাজ ছেড়ে দিল, কেবল কালীচরণবাবুর কাজ করে। তারপর দেখলাম চপলা গলায় কণ্ঠি পরে বৈষ্ণবী হয়েছে। ক্রমে সন্ধ্যার পর নীচের তলা থেকে খঞ্জনির আওয়াজ আসে; যুগল-কণ্ঠে গান শোনা যায়—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—

'দিন দশেক আগে একদিন সন্ধ্যেবেলা কালীচরণবাবু এক থালা মালপো আর পরমান্ন নিয়ে দোতলায় এলেন, সলজ্জভাবে জানালেন চপলা বোষ্টুমীকে তিনি কণ্ঠি-বদল করে বিয়ে করেছেন।'

নিঃশব্দ হাসিতে ভদ্রলোকের মুখ ভরে গেল।

ব্যোমকেশ চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে বলল, 'তাই তো। কবে বাইরে গেলেন?'

'কাল সকালে।'

'সকালে?'

'আজ্ঞে। ভোরবেলা ওপরতলায় এসে আমাকে নীচের তলার চাবি দিয়ে বললেন, আমরা বৃন্দাবন যাচ্ছি বেলা দশটার ট্রেনে, হপ্তা দুই পরে ফিরব। এই বলে বোষ্টুমীকে ট্যাক্সিতে তুলে চলে গেলেন। বৃন্দাবনে নাকি কোন্ আখড়ায় মোচ্ছব আছে।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল, প্রতুলবাবু বললেন, 'এটা বোধহয় বৈষ্ণবীয় হনিমুন।'

তারপর রসিক ভদ্রলোকটিকে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে তিনজনে গাড়িতে এসে উঠলেন। প্রতুলবাবু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'খুনী আসামী দেখা আমার ভাগ্যে নেই।'

পাঁচ-ছয় দিন বিশুপাল বধ সম্বন্ধে আর কোনো নতুন খবর পাওয়া গেল না; সংবাদপত্রে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠা ছেড়ে অন্দরমহলে গা-ঢাকা দিয়েছে। মাধব মিত্রের সাড়াশব্দ নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হয় তিনি মামলার কোনো কিনারা করতে পারেননি, আসামী এখনো অজ্ঞাত।

ব্যোমকেশের হাতে অন্য কোনো কাজ ছিল না, তাই তার মনটা থিয়েটারী হত্যার দিকে পড়ে থাকত। শনিবার বিকেলবেলা সে প্রতুলবাবুকে ফোন করবে মনস্থ করেছে এমন সময় ফোন বেজে উঠল। স্বয়ং প্রতুলবাবু ফোন করছেন। তিনি বললেন, 'এইমাত্র ইন্সপেক্টর মাধব মিত্রের

পরোয়ানা এসেছে। তিনি আমার বাসায় আসছেন। আপনাকেও হাজির থাকতে হবে। বোধহয় হালে পানি পাচ্ছেন না।'

ব্যোমকেশ বলল, 'হুঁ। আপনি তাকে কঙ্কণ ঝনাৎকারের কথা বলেছেন নাকি ?'

'না। তিনি এলে বলব।'

'আর শালীচরণ দাসের রোমান্স ?'

'না, দরকার বোধ করেন আপনি বলবেন।'

'আচ্ছা, আমি এখনি বেরুচ্ছি।'

'গাড়ি পাঠাব ?'

'না না, দরকার নেই। দশ মিনিটের তো রাস্তা।'

'গাড়ি থাকলে দু' মিনিটে আসা যেত।'

ব্যোমকেশ হেসে বলল, 'হুঁ। বুঝেছি আপনার ইঙ্গিত।'

পনেরো মিনিট পরে ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর বাড়িতে দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসতে না বসতেই মাধব মিত্র উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে চামড়ার মোটা ফাইল। টেবিলের ওপর ফাইল রেখে তিনি বিনীত হাস্য করলেন, 'বিরক্ত করতে এলাম। ভেবেছিলাম আপনাদের কষ্ট দেব না, কিন্তু গরজ বড় বালাই। আপনারা সে-রাত্রে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ; যদিও চোখে কিছু দেখেননি, তবু আপনাদের উপস্থিতিই আমার কাছে মূল্যবান। আপনারা জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি, পরম পণ্ডিত। আপনাদের মানসিক সহযোগিতা পেলেই আমরা কৃতার্থ হয়ে যাব।'

লোকটির মিষ্টি কথা বলবার ক্ষমতা আছে বটে। কিন্তু ব্যোমকেশও হার মানবার পাত্র নয়। সে বলল, 'সে কি কথা ! পুলিসকে সাহায্য করা তো প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। তাছাড়া আপনি যে রকম মিষ্টভাষী সজ্জন ব্যক্তি আপনাকে সাহায্য করা তো গৌরবের কথা। আমরা কি করতে পারি বলুন। সে-রাত্রে থিয়েটার থেকে চলে আসার পর কী ঘটেছিল আমরা কিছুই জানি না ; খবরের কাগজে যা পড়েছি তা ধর্তব্য নয়। এইটুকু শুধু জানি যে অজ্ঞাত আসামী এখনো সনাক্ত হয়নি।'

প্রতুলবাবু ইতিমধ্যে চা ফরমাস করেছিলেন, সঙ্গে এক প্লেট প্যাস্ট্রি। মাধববাবু এক চুমুক চা খেয়ে প্যাস্ট্রিতে কামড় দিলেন, চিবোতে চিবোতে বললেন, 'না, সনাক্ত হয়নি। তবে জাল খানিকটা গুটিয়ে এনেছি। ঘটনাকালে যে দশজন মঞ্চে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে ছাঁটাই করে গুটি তিনেক লোককে দাঁড় করানো গেছে। মুশকিল কি হয়েছে জানেন, ওদের সকলেরই একটা না একটা মোটিভ আছে। তাহলে গোড়া থেকে বলি শুনুন—

'আপনারা চলে আসবার পর থিয়েটারের মঞ্চ গ্রীনরুম অডিটোরিয়াম, তারপর হাতার মধ্যে প্রভুনারায়ণের কোয়ার্টার—সব খানাতল্লাশ করলাম ; স্টেজের দোরের কাছে দুটো মোটর ছিল—একটা বিশু পালের, দ্বিতীয়টা মণীশ ভদ্র'র—সে দুটোও খুঁজে দেখলাম, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। আর্টিস্টরা সবাই ব্যাগ হাতে করে অভিনয় করতে আসে, তাদের ব্যাগের মধ্যেও সাধারণ কাপড়-চোপড় পাউডার লিপস্টিক ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। কেবল মালবিকার ব্যাগে একটা নরুনের মত ধারালো ছুরি আর ব্রজদুলালের ব্যাগে এক বোতল হুইস্কি পাওয়া গেল। তারপর নিষ্ফল বডি সার্চ।'

মাধব মিত্র চায়ের পেয়ালা শেষ করে রুমালে মুখ মুছলেন, বললেন, 'অতঃপর সাক্ষীদের জবানবন্দী নিতে শুরু করলাম। প্রথমে বিশু পালের ভাই অমল পাল—'

ব্যোমকেশ হাত তুলে বলল, 'জবানবন্দী মুখে বলতে গেলে অনেক কথা বাদ পড়ে যাবে। তার চেয়ে যদি জবানবন্দীর নথি আপনার কাছে থাকে—'

মাধববাবু ফাইলের ওপর হাত রেখে একটু দ্বিধাভরে বললেন, 'আছে। একটা কপি সর্বদাই সঙ্গে থাকে। কিন্তু—মুশকিল কি জানেন, ফাইল হাতছাড়া করার নিয়ম নেই। যাহোক, এক কাজ করা যেতে পারে, আমি বসছি, আপনি ফাইলে চোখ বুলিয়ে নিন। আপনার পড়াও হবে,

নিয়ম রক্ষেও হবে। কি বলেন ?'

ব্যোমকেশ নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'দেখুন, আমার কোনো আগ্রহ নেই। আপনার যদি আগ্রহ থাকে তবেই জবানবন্দী পড়ব !'

মাধববাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না না, সে কি কথা ! আমার আগ্রহ আছে বলেই না আপনার কাছে এসেছি।' তিনি ফাইল থেকে টাইপ করা ফুলস্ক্যাপ কাগজের একটা নথি বার করে ব্যোমকেশের দিকে এগিয়ে দিলেন, 'এই নিন। আপনি পড়ুন, আমি না হয় ততক্ষণ প্রতুলবাবুর সঙ্গে পাশের ঘরে বসে গল্প করি।'

ব্যোমকেশ নথি টেনে নিয়ে বলল, 'মন্দ কথা নয়। প্রতুলবাবু আপনাকে কিছু নতুন খবর দিতে পারবেন। আমিও একটা খবর দেব। আগে জবানবন্দী পড়ি। ডাক্তারের ময়না তদন্তের রিপোর্ট নথিতে আছে নাকি ?'

'আছে। তিনি ডাক্তারি পরিভাষার কচ্‌কচি রিপোর্টে যথাসম্ভব সরল করে দিয়েছেন।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরিয়ে জবানবন্দীর নথির পাতা খুলে পড়তে আরম্ভ করল।

থিয়েটারের অফিস ঘরে বসে মাধব মিত্র একের পর এক সাক্ষী ডেকে তাদের এজাহার নিয়েছিলেন। একজনের এজাহার নেবার সময় অন্য কোনো সাক্ষী উপস্থিত ছিল না।

অমল পাল। বয়স—৩৯। জীবিকা—ডাক্তারি। ঠিকানা—* * গোলাম মহম্মদ রোড, দক্ষিণ কলিকাতা।

মৃত বিশ্বনাথ পাল আমার দাদা ছিলেন। আমরা দুই ভাই ; আমি কনিষ্ঠ। দাদা আমার পড়ার খরচ দিয়ে ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন। আমি দক্ষিণ কলকাতায় প্র্যাক্‌টিস করি, দাদা থিয়েটারের কাছে থাকার জন্যে শ্যামবাজারে থাকতেন। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ছিলেন। শ্যামবাজারের বাসায় অভিনেত্রী সুলোচনা তাঁর সঙ্গে থাকত। আমার সুযোগ হলে আমি থিয়েটারে এসে কিম্বা শ্যামবাজারের বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। তাঁর সঙ্গে আমার পরিপূর্ণ সদ্ভাব ছিল, তিলমাত্র মনোমালিন্য কোনো দিন হয়নি।

দাদা উদার চরিত্রের মানুষ ছিলেন, পরোপকারী ছিলেন। তিনি পনেরো হাজার টাকার লাইফ ইন্‌সিওর করে আমাকে তার ওয়ারিশ করেছিলেন। শুনেছি থিয়েটারের আরো অনেক লোককে লাইফ ইন্‌সিওরের ওয়ারিশ করেছিলেন। কাউকে দশ হাজার, কাউকে পাঁচ হাজার। তিনি অজস্র টাকা রোজগার করতেন, কোনো বদ্‌খেয়াল ছিল না ; যাদের ভালবাসতেন তাদের দু'হাত ভরে দিতেন।

নৈতিক চরিত্র ? তিনি আমার গুরুজন ছিলেন, তাঁর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। সুলোচনার সঙ্গে ওঁর বিবাহিত সম্বন্ধ না থাকলেও ওঁরা স্বামী-স্ত্রীর মতই থাকতেন।

দাদার শত্রু ? শত্রু কেউ ছিল বলে তো মনে হয় না। সকলেই তাঁর অনুগৃহীত, শত্রুতা কে করবে ?

আমি আজ এ পাড়ায় একটা 'কল'এ এসেছিলাম, ভাবলাম দাদার সঙ্গে দুটো কথা বলে যাই ; তাই থিয়েটারে এসেছিলাম। আমার ডাক্তারি প্র্যাক্‌টিস মোটের ওপর মন্দ নয়। আমি বিবাহিত ; তিনটি মেয়ে দু'টি ছেলে।

আজ নাটক শেষ হবার ঠিক আগে যখন এক মিনিটের জন্যে আলো নিভিয়ে দেওয়া হল তখন আমি স্টেজের পিছন দিকে একটা টুলের ওপর বসে সিগারেট টানছিলাম। তখন কে কোথায় ছিল, নিজের জায়গা থেকে নড়েছিল কিনা আমি লক্ষ্য করিনি। আলো জ্বলার পরে আবার অভিনয় আরম্ভ হল, কিছুক্ষণ পরে চীৎকার কান্না হৈ হৈ, ড্রপসিন পড়ে গেল। তখন আমি স্টেজে এসে দেখলাম—

আমি ডাক্তার, কিন্তু দাদার মৃত্যুর কারণ আমি বুঝতে পারিনি। এত অল্প সময়ের মধ্যে

মৃত্যু—হার্ট ফেলিওর হতে পারে। কিন্তু দাদার হার্ট দুর্বল ছিল না, কয়েক দিন আগে আমি পরীক্ষা করেছি। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ পোস্ট-মর্টেমে জানা যাবে। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত, এখনো ঠিক ধারণা করতে পারছি না।

দাদা যদি উইল করে গিয়ে থাকেন তাহলে কে তাঁর উত্তরাধিকারী আমি জানি না, সলিসিটার সিংহ-রায়ের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা যাবে। যদি উইল না থাকে তাহলে সম্ভবত আমিই তাঁর উত্তরাধিকারী। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কী আছে আমি জানি না।

ব্রজদুলাল ঘোষ। বয়স—৪২। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। ঠিকানা—* * শ্যামপুকুর লেন।

ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি সুলোচনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে এখনো সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়নি। আপনি আগে আমাকে প্রশ্ন করুন। আমার এজাহার শেষ হলে সুলোচনা আসবে।

প্রশ্ন : আপনি এই নাটকে ভীমের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ?

উত্তর : হ্যাঁ। বিশু যতগুলি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল সব নাটকেই আমি অভিনয় করেছি।

প্রশ্ন : কতদিন তাঁর সঙ্গে আছেন ?

উত্তর : তা প্রায় দশ বছর। বিশু যখন নিজের দল তৈরি করে আসরে নামল তখন থেকে আমি ওর সঙ্গে আছি।

প্রশ্ন : আপনার মত আর কেউ গোড়া থেকে আছে ?

উত্তর : গোড়া থেকে—। আছে। কমিক অভিনেতা দাশরথি চক্কোত্তি আর তার বৌ নন্দিতা। অন্য যারা ছিল তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন : আপনাদের কারুর সঙ্গে বিশু পালের অসদ্ভাব ছিল ?

উত্তর : দেখুন, কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস করা যায় না। কার মনে কি আছে জানি না, কিন্তু বাইরে কোনো অসদ্ভাব ছিল না। বিশু ছিল দিলদরিয়া মেজাজের লোক, দলের লোককে সে ঘরের লোক বলে মনে করত। এমন অমায়িক চরিত্র দেখা যায় না।

প্রশ্ন : বিশু পালের চরিত্রে কোনো দোষ ছিল না ?

উত্তর : একটু আধটু দোষ কার না থাকে ? ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড়। বিশু মরে গেছে, কিন্তু আমি গলা ছেড়ে বলতে পারি সে উঁচু মেজাজের সজ্জন ব্যক্তি ছিল। যারা তার দলে কাজ করেছে তারা সপরিবারে কাজ করেছে। সমস্ত থিয়েটারটাই একটা পারিবারিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন আমাদের সকলের এজমালি থিয়েটার। এখন সে মরে গেছে, এরপর কী হবে জানি না।

প্রশ্ন : আচ্ছা, এবার আপনার ঘরের কথা কিছু জিজ্ঞেস করি। আপনার পরিবারে কে কে আছে ?

উত্তর : বুড়ি পিসি আছেন। আমার স্ত্রী শান্তি আছে আর একটি মেয়ে আছে। মেয়ে স্কুলে পড়ে। শান্তি আমাদের থিয়েটারে গান-বাজনা শেখায়।

প্রশ্ন : তিনি আজ আসেননি ?

উত্তর : না। নতুন নাটকের যখন মহড়া আরম্ভ হয় তখন সে আসে, নাচ-গান শেখায় ; নাটক একবার চালু হলে তার কাজ থাকে না, তখন আর বড় একটা আসে না। বাড়িতে একটা নাচ-গানের কোচিং ক্লাস খুলেছে, তাইতে শেখায়।

প্রশ্ন : আপনি থিয়েটারে যোগ দেবার আগে কোনো কাজ করতেন কি ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি মুষ্টিযোদ্ধা ছিলাম। একবার ভারতের মিড্‌ল-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলাম। একটি জিম্‌নেসিয়ামে বক্সিং শেখাতাম। কিন্তু থিয়েটারের শখ বরাবরই ছিল, একটা সুযোগ পেয়ে চলে এলাম।

প্রশ্ন : আজ স্টেজের ওপর বিশু পালের সঙ্গে আপনার মল্লযুদ্ধ হয়েছিল ; তখন আপনি বিশু পালের শরীরে কোনো দুর্বলতা লক্ষ্য করেছিলেন ?

উত্তর : না। ঠিক অন্য দিনের মত।

প্রশ্ন : কখন জানতে পারলেন বিশু পালের মৃত্যু হয়েছে ?

উত্তর : আমি জানতে পারিনি। লাইট অফ্ হয়ে যাবার পর আমি আর সুলোচনা পিছন দিকের দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আলো জ্বললে স্টেজে এসে অ্যাক্‌টিং আরম্ভ করলাম। এই সময় বিশুর মাটি থেকে উঠে আমার পিঠে ছুরি মারবার কথা ; কিন্তু বিশু উঠল না। তারপরই সুলোচনা চীৎকার করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন আমি বুঝতে পারলাম।

প্রশ্ন : এর বেশি আপনি কিছু জানেন না ? আচ্ছা, আজ আপনি বাড়ি যান। যদি নতুন কিছু মনে পড়ে জানাবেন।

সুলোচনা। বয়স—৩৫। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। ঠিকানা—* * শ্যামবাজার, উত্তর কলিকাতা।

সুলোচনা মুখের রঙ অনেকটা পরিষ্কার করেছে, তবু কানে ও গলায় কিছু পেন্ট লেগে আছে। তার গায়ের রঙ ফরসা, শরীরের গড়ন ভাল ; কিন্তু আকস্মিক বিপর্যয়ে একেবারে যেন ভেঙে পড়েছে। অফিস ঘরে এসে মাধব মিত্রের সামনের চেয়ারে সে বসে পড়ল, আর্তস্বরে নিজেই প্রথমে প্রশ্ন করল, 'কে একাজ করল, দারোগাবাবু ?'

উত্তরে দারোগা প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ কাজ ?'

সুলোচনার চোখ দারোগার মুখের ওপর স্থির হল, গলার স্বরে তীক্ষ্ণতা এল। সে বলল, 'আপনি জানেন না কোন্ কাজ ? ওঁর শরীরে কোনো রোগ ছিল না, ওঁর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। কেউ ওঁকে খুন করেছে।'

প্রশ্ন : এ বিষয়ে এখনো ডাক্তারের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি, তবে আপনার অনুমান সত্যিও হতে পারে। যদি সত্যি হয়, কে খুন করেছে আপনি বলতে পারেন ?

উত্তর : তা কি করে বলব। কিন্তু ওঁর কোনো শত্রু ছিল না।

প্রশ্ন : শত্রু না থাকলেও বিশু পালের মৃত্যুতে অনেকের লাভ ছিল। যাদের উদ্দেশ্যে উনি লাইফ ইন্‌সিওর করেছিলেন তাঁর মৃত্যুতে তাদের সকলেরই লাভ। নয় কি ?

উত্তর : তা সত্যি কিন্তু এমন কে আছে কয়েকটা টাকার জন্যে চিরজীবনের উপকারী বন্ধুকে খুন করবে !

প্রশ্ন : আপনি কাউকে সন্দেহ করেন না ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : বাইরের কেউ হতে পারে না ?

উত্তর : বাইরের লোক ! তা জানি না। তিনি থিয়েটারের বাইরের অনেক লোককে চিনতেন, কার মনে কী আছে কেমন করে জানব ?

প্রশ্ন : আচ্ছা যাক। আপনার সঙ্গে বিশুবাবুর কতদিনের পরিচয় ?

উত্তর : প্রায় পাঁচ বছর।

প্রশ্ন : কোথায় পরিচয় হয়েছিল ? কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ?

উত্তর : এই থিয়েটারে পরিচয় হয়েছিল। ব্রজদুলালবাবু আগে থাকতে আমাকে চিনতেন, তিনিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : আগেও থিয়েটার করতেন নাকি ?

উত্তর : নিয়মিত নয়, মাঝে মাঝে করতাম।

প্রশ্ন : আপনার পারিবারিক পরিস্থিতি কিছু জানতে চাই।

উত্তর : মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছিলুম। থিয়েটারের দিকে ঝোঁক ছিল। সুযোগ পেয়ে চলে এলুম।

প্রশ্ন : এ থিয়েটারে আসার পর থেকে বিশুবাবুর সঙ্গে আছেন ?

উত্তর : হ্যাঁ। বিয়ে হয়নি, কিন্তু উনিই আমার স্বামী।

প্রশ্ন : বাপের বাড়ির সঙ্গে আর আপনার কোনো সম্বন্ধ নেই ?

উত্তর : না। আমার মা বাবা নেই, দাদা খবর রাখেন না।

প্রশ্ন : ডাক্তার অমল পালের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ?

উত্তর : ভাল। সে তার দাদাকে শ্রদ্ধা করত। বাড়িতে বড় একটা আসত না, দরকার হলে এখানে এসে দাদার সঙ্গে দেখা করত।

প্রশ্ন : কিসের দরকার—টাকার ?

উত্তর : হ্যাঁ। বেশির ভাগই টাকা। ওর ডাক্তারি ভাল চলে না। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে—

প্রশ্ন : বিশু পালের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এখন কে পাবে আপনি জানেন ?

উত্তর : যতদূর জানি উনি উইল করে যাননি। স্থাবর সম্পত্তির কথাও কখনো শুনিনি। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে, আর মোটর গাড়িটা আছে। ব্যাঙ্কের টাকা কে পাবে তা জানি না, তবে গাড়িটা আমার নামে আছে, সম্ভবত আমার নামেই থাকবে।

প্রশ্ন : এবার শেষ প্রশ্ন। আজ অভিনয়ের সময় কিছু দেখেছেন কিম্বা শুনেছেন কি যা আমাদের কাজে লাগতে পারে ?

সুলোচনা একটু চিন্তা করে বলল, 'সন্দেহজনক কিছু নয়, তবে সোমরিয়াকে উইংসের বাইরে এক কোণে লুকিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। সে মাঝে মাঝে ভিতরে এসে থিয়েটার দেখে।'

প্রশ্ন : সোমরিয়া কে ?

উত্তর : দারোয়ান প্রভু সিং-এর বোন।

ইন্সপেক্টর : আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত।

মণীশ ভদ্র। বয়স—২৯। জীবিকা—থিয়েটারের আলোকযন্ত্র পরিচালনা। ঠিকানা * * আমহার্স্ট স্ট্রীট।

মণীশ ঘরে ঢুকে একবার কব্জির ঘড়ির দিকে তাকালো। রেডিয়াম লাগানো ঘড়ি, অন্ধকারেও সময় দেখা যায়। সে চেয়ারে বসে বলল, 'পৌনে এগারটা। দারোগাবাবু, বড্ড রাত হয়ে গেছে, একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন ? হোটেল সব বন্ধ হয়ে গেছে, আজ আর বোধহয় কিছু জুটবে না—'

মাধববাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার এজাহার পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না।'

মণীশ বলল, 'আমি একলা নয়, বৌও আছে।—দু'জনের এজাহার একসঙ্গে নিলে হয় না ?'

মাধববাবু বললেন, 'না, তা হয় না। আপনারা দু'জন দু' জায়গায় ছিলেন।—আচ্ছা, বলুন দেখি, আলো নেভাবার পর আপনি কী করলেন ?'

উত্তর : সুইচের ওপর হাত রেখে ঘড়ির পানে তাকিয়ে রইলাম, পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পরে সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম।

প্রশ্ন : আপনার বোর্ডে অনেকগুলি সুইচ, কোনটা কোথাকার সুইচ সব আপনার নখদর্পণে ?

উত্তর : হ্যাঁ, তবু সাবধান থাকা ভাল, তাই এই দৃশ্যে সুইচে হাত রাখি।

প্রশ্ন : ঠিক পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড কেন ?

উত্তর : বিশুবাবু সময় ধার্য করে দিয়েছিলেন, পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড হাউস অন্ধকার থাকবে।

প্রশ্ন : আপনার একজন সহকারী আছে না ?

উত্তর : আছে। কাঞ্চন সিংহ। সে আমার সঙ্গে সুইচ বোর্ডে ছিল না। তার মাথা ধরেছিল—

প্রশ্ন : তার প্রায়ই মাথা ধরে ?

মণীশ চুপ করে রইল।

প্রশ্ন : সে কোথায় ছিল আপনি জানেন ?

উত্তর : পরে শুনেছি সে অফিস ঘরে ঘুমোচ্ছিল।

প্রশ্ন : কার মুখে শুনলেন ?

উত্তর : তার নিজের মুখে।

প্রশ্ন : ও। বিশুবাবুর সঙ্গে আপনি কতদিন কাজ করছেন ?

উত্তর : প্রায় চার বছর।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রীও ?

উত্তর : না, তখন আমার বিয়ে হয়নি। মালবিকা থিয়েটারে যোগ দিয়েছে বছরখানেক, এই নাটক ধরবার পর থেকে। বিশুবাবু উত্তরার পার্ট করার জন্যে কমবয়সী মেয়ে খুঁজছিলেন : শেষ পর্যন্ত মালবিকাকে রাখেন।

প্রশ্ন : আপনার নামে বিশুবাবু জীবনবীমা করেননি ?

উত্তর : না। আমি বলেছিলাম জীবনবীমা চাই না, মাইনে বাড়িয়ে দিন। তা তিনি জীবনবীমাও করলেন না, মাইনেও বাড়ালেন না। সাতশো টাকা ছিল, সাতশো টাকাই রইল।

প্রশ্ন : তার বদলে বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি কিনে দিলেন ?

উত্তর : গাড়ির একটা ইতিহাস আছে। বিশুবাবু যখন মাইনে বাড়িয়ে দিলেন না তখন আমি বাইরে কাজ খুঁজতে লাগলাম। এই নাটক আরম্ভ হবার কয়েকদিন আগে আমি মাদ্রাজ থেকে একটা ভাল অফার পেলাম। একটা বিখ্যাত সিনেমা কোম্পানি আলোকশিল্পী চায় ; মাইনে দেড় হাজার, তাছাড়া বাড়িভাড়া ইত্যাদি। বিশুবাবুকে গিয়ে চিঠি দেখালাম। তিনি বে-কায়দায় পড়ে গেলেন, কিন্তু তবু নিজের জিদ ছাড়লেন না। আমাকে গাড়ি কিনে দিলেন। আর মালবিকাকে যে একশো টাকা হাতখরচ হিসেবে দিতেন তা বাড়িয়ে দু'শো টাকা করে দিলেন। তখন আমি মাদ্রাজের অফারটা ছেড়ে দিলাম। দেশ ছেড়ে কে বিদেশে যেতে চায় ?

দারোগাবাবু বললেন, 'তা বটে। তাহলে আপনি বিশু পালের মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো হদিস দিতে পারেন না ? আচ্ছা, এবার তাহলে আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন।'

মালবিকা ভদ্র। বয়স—২০। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। ঠিকানা * * আমহার্স্ট স্ট্রীট।

নোট : বিশু পালের আকস্মিক মৃত্যুতে সাক্ষী প্রথমটা খুব শক্ খেয়েছিল, এখন সুস্থ হয়েছে। বয়স কম, দেখতেও সুন্দরী ; কিন্তু চোখের ঋজু দৃষ্টি ও চিবুকের মজবুত গড়ন থেকে চরিত্রের দৃঢ়তা অনুমান করা যায়।

প্রশ্ন : নাটকে আপনি উত্তরার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নাট'কর শেষ দৃশ্য পর্যন্ত আপনার অভিনয় আছে ?

উত্তরা : না। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে আমার অভিনয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার স্বামীকে থাকতে হয়, তাই আমিও থাকি।

প্রশ্ন : আজ যখন শেষ অঙ্কে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন ?

উত্তর : সাধারণ অভিনেত্রী মেয়েদের জন্যে একটা আলাদা সাজঘর আছে। আমি সেই সাজঘরে গায়ের মুখের রঙ সবেমাত্র তুলতে আরম্ভ করেছিলুম।

প্রশ্ন : সেখানে আর কেউ ছিল ?

উত্তর : লক্ষ্য করিনি। একবার বোধহয় নন্দিতাদিদি ঘরে এসেছিল।

প্রশ্ন : আপনি কবে থেকে অভিনয় করছেন ?

উত্তর : এই নাটকের আরম্ভ থেকে। প্রায় বছর ঘুরতে চলল।

প্রশ্ন : অভিনয়ের দিকে আপনার ঝোঁক আছে।

উত্তর : খুব বেশি নয়। আমার স্বামী চেয়েছিলেন, কিছু টাকাও আসছিল, তাই থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলুম।

প্রশ্ন : আপনি বোম্বাই কিম্বা মাদ্রাজে গিয়ে সিনেমায় অভিনয় করলে অনেক টাকা উপার্জন

করতে পারতেন। করেননি কেন?

উত্তর : বাংলা দেশের বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া আমি গেরস্থ ঘরের মেয়ে, ঘরকন্না করতেই ভালবাসি। আমার মা সহমৃতা হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : সহমৃতা! আজকালকার দিনে— !

উত্তর : বাবা মারা যাবার এক ঘন্টা পরে মা হার্টফেল করে মারা যান।

প্রশ্ন : ও—বুঝেছি। আচ্ছা, বিশু পাল কেমন লোক ছিলেন?

উত্তর : খুব মিশুকে লোক ছিলেন। দরাজ হাত ছিল। সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন।

প্রশ্ন : মেয়েদের সঙ্গেও?

উত্তর : হ্যাঁ। কিন্তু কখনো কোনো রকম বেচাল দেখিনি।

ইন্সপেক্টর : আচ্ছা, এবার আপনি বাড়ি যান।

কাঞ্চন সিংহ। বয়স—২৬। জীবিকা—থিয়েটারের আলোকশিল্পীর সহকারী। ঠিকানা—মানিকতলা স্ট্রীটের একটি মেস।

নোট : লোকটির ভাবভঙ্গী একটু খ্যাপাটে গোছের; মাঝে মাঝে আবোল তাবোল এলোমেলো কথা বলে। কতখানি খাঁটি কতখানি অভিনয় বলা যায় না।

প্রশ্ন : আপনি হিপি, না বিট্‌লে, না অবধূত?

উত্তর : আজ্ঞে, আমি বাঙালী।

প্রশ্ন : আপনার সাজপোশাক বাঙালীর মত নয়। দাড়ি গোঁফও প্রচুর। কোনো কারণ আছে কি?

উত্তর : আমার ভাল লাগে। তাছাড়া থিয়েটার করার সময় পরচুলো পরতে হয় না।

প্রশ্ন : আপনি এখানে আসার আগে কী কাজ করতেন?

উত্তর : বাউণ্ডুলে ছিলাম। বাপ কিছু টাকা রেখে গিয়েছিল, মেসে থাকতাম আর শখের থিয়েটার করতাম।

প্রশ্ন : তাহলে চাকরিতে ঢুকলেন কেন?

উত্তর : বাপের পয়সায় শাক-চচ্চড়ি খাওয়া চলে, রসগোল্লা খাওয়া চলে না।

প্রশ্ন : তাহলে রসগোল্লা খাওয়ার জন্যেই চাকরিতে ঢুকেছিলেন?

উত্তর : শুধু রসগোল্লা নয়, অন্য মতলবও ছিল। জানেন, আমি খুব ভাল অ্যাক্ট করতে পারি। শিবাজির পার্ট, ঔরঙ্গজেবের পার্ট প্লে করেছি। বিশুবাবু আমার চেহারা দেখে চাকরিতে নিলেন, কিন্তু কাজ দিলেন আলো জ্বালা আর আলো নেভানোর। যদি অভিনয় করতে দিতেন, আগুন ছুটিয়ে দিতাম।

প্রশ্ন : তা বটে। এখন বলুন দেখি, আলো নেভানোর সময় আপনি সুইচের কাছে ছিলেন না কেন?

উত্তর : আলো নেভানোর সময় সুইচবোর্ডে একজন লোকেরই দরকার হয়। মণীশদা ছিলেন, তাই আমি—

প্রশ্ন : কোথায় ছিলেন?

উত্তর : মাথা ধরেছিল, তাই আমি অফিস ঘরে গিয়ে টেবিলে মাথা রেখে একটু বসে ছিলাম।

প্রশ্ন : স্টেজের ওপর খুন হল। অসময়ে প্লে বন্ধ হয়ে গেল, এসব কিছুই জানতে পারেননি?

উত্তর : এঁ—একটু ঝিমকিনি এসে গিয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি নেশাভাঙ করেন?

উত্তর : নেশাভাঙ! নাঃ, পয়সা কোথায় পাব!

প্রশ্ন : কোন্ নেশা করেন?

উত্তর : এঁ—নেশা করি না—মাঝে মাঝে ভাঙ খাই। মানে—

প্রশ্ন : মানে মারিওয়ানা সিগারেট খান। কে যোগান দেয় ? পান কোথায় ?

উত্তর : যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। ঠেলাগাড়িতে পানের দোকানে। আপনার চাই ?

ইন্সপেক্টর : আপনি এখন যেতে পারেন। মেস ছেড়ে কোথাও যাবেন না। কলকাতাতেই থাকবেন।

দাশরথি চক্রবর্তী। বয়স—৪৫। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। ঠিকানা—বেহালা।

ভাল মানুষের মত ভাবভঙ্গী, কিন্তু কথা বলার ধরন সোজা নয়। সরলভাবে চোখ মিট্‌মিট্ করে তাকায়, কিন্তু চোখের গভীরে প্রচ্ছন্ন দুষ্টতার ইঙ্গিত। লোকটি কমিক অ্যাক্টর, খোঁচা দিয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু খোঁচা বুঝতে একটু সময় লাগে।

প্রশ্ন : আপনি গোড়া থেকে বিশুবাবুর সঙ্গে ছিলেন ?

উত্তর : ছিলাম। বিশুর সঙ্গে যথেষ্ট সদ্ভাবও ছিল। তাই বুঝতে পারছি না যাবার সময় সে আমাকে এমনভাবে দয়ে মজিয়ে গেল কেন ?

প্রশ্ন : সেটা কি রকম ?

উত্তর : ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছে। এত রাত্রে যদি ট্যাক্সি না পাই, পেটে কিল মেরে এখানেই শুয়ে থাকতে হবে।

ইন্সপেক্টর : আপনি বেহালায় থাকেন তো ? কিছু ভাববেন না, আমি পুলিস ভ্যানে আপনাকে আর আপনার স্ত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

দাশরথি : ধন্যবাদ। এবার যত ইচ্ছে হয় প্রশ্ন করুন।

প্রশ্ন : বিশু পালের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল ?

উত্তর : কারুর সঙ্গে আমার অসদ্ভাব নেই। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না।

প্রশ্ন : বিশু পালের কোনো শত্রু ছিল ?

উত্তর : শত্রুর কথা শুনিনি। তবে কি জানেন, যেখানে মেয়েমানুষ সেখানেই গণ্ডগোল।

প্রশ্ন : তার মানে ? সুলোচনার কথা বলছেন ?

উত্তর : (ক্ষণেক নীরব থাকার পর) সুলোচনা খুব ভাল অভিনয় করে, কিন্তু সে খানদানি অ্যাক্‌ট্রেস নয়, গেরস্তঘরের মেয়ে। ব্রজদুলাল প্রথম ওকে—মানে—থিয়েটারে নিয়ে আসে। তারপর বিশুর সঙ্গে সুলোচনার জোটপাট হয়ে গেল—

প্রশ্ন : ও—বুঝেছি। তা নিয়ে বিশুবাবুর সঙ্গে ব্রজদুলালবাবুর কোনো মনোমালিন্য হয়নি ?

উত্তর : অমন হেরফের হামেশাই হয়ে থাকে, কেউ গায়ে মাখে না। কে যাবে কেউটে সাপের লেজ মাড়াতে।

প্রশ্ন : হুঁ। অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিশু পালের ঘনিষ্ঠতা ছিল ?

উত্তর : তা কি করে জানব। কেউ তো ঢাক পিটিয়ে এসব কাজ করে না। অবশ্য থিয়েটারে নানা রকম মেয়ের যাতায়াত আছে, কোন্ অ্যাক্‌টরের কখন কোন্ মেয়ের ওপর নজর পড়বে কে বলতে পারে। এই যে দারোয়ান প্রভুনারায়ণের একটা বোন আছে—সোমরিয়া, উচক্কা বয়স, রূপও আছে। সে থিয়েটারে চাকরানীর কাজ করে ; কারুর নজর এড়িয়ে চলা তার স্বভাব নয়। বিশুও সকাল বিকেল নিয়ম করে থিয়েটার তদারক করতে আসত—

প্রশ্ন : অর্থাৎ, সোমরিয়ার সঙ্গে বিশু পালের— ?

উত্তর : ভগবান জানেন। তবে সুযোগ সুবিধে সবই ছিল।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ওকথা যাক।—বিশু পালের সঙ্গে বাইরের কোনো লোকের শত্রুতা ছিল ?

উত্তর : এক থিয়েটারের অধিকারীর সঙ্গে অন্য থিয়েটারের অধিকারীর রেষারেষি থাকে। বিশুর থিয়েটার খুব ভাল চলছিল, অনেকের চোখ টাটিয়েছিল। একে যদি শত্রুতা বলেন, বলতে

পারেন।

প্রশ্ন : এবার নিজের কথা বলুন।

উত্তর : নিজের কথা আর কি বলব ? ছেলেবেলা থেকে থিয়েটারে ঢুকেছি, অনেক ঘাটের জল খেয়েছি। স্ত্রীকে নিয়ে বেহালায় থাকি, ছেলেপুলে নেই। বেশি উচ্চাশাও নেই। যেমনভাবে দিন কাটছিল তেমনিভাবে কেটে গেলেই খুশি থাকতাম। কিন্তু বিশু মরে গেল, ওর দল টিকবে কিনা কে জানে। হয়তো ভেঙে যাবে, তখন আবার অন্য দলে গিয়ে ভিড়তে হবে।

প্রশ্ন : আজ দ্বিতীয় অঙ্কে আপনার আর আপনার স্ত্রীর অভিনয় শেষ হয়ে গিয়েছিল, বাড়ি যাননি কেন ?

উত্তর : দ্বিতীয় অঙ্কের পর বাড়ি যাব বলে বেরুচ্ছি, বিশু বলল, 'একটু থেকে যাও, তোমার সঙ্গে কথা আছে। নাটক শেষ হলে বলব।'

প্রশ্ন : কি কথা ?

উত্তর : তা জানি না, বিশু বলেনি।

প্রশ্ন : সেখানে অন্য কেউ উপস্থিত ছিল ?

উত্তর : না, আমরা একলা ছিলাম। বিশুর ড্রেসিংরুমে কথা হয়েছিল।

ইন্সপেক্টর : হুঁ। আজ এই পর্যন্ত। আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন।

নন্দিতা চক্রবর্তী। বয়স—৪৪। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। ঠিকানা—বেহালা।

নোট : মহিষমর্দিনী চেহারা, দাশরথির চেয়ে মুঠিখানেক মাথায় উঁচু। লালচে চোখ, বড় বড় দাঁত, কিন্তু গলার স্বর মিষ্টি। আচরণ শিষ্ট ও শালীন।

প্রশ্ন : আপনার স্বামী নামকরা কমিক অ্যাক্টর, আপনিও কি কমিক অ্যাক্টিং করেন ?

উত্তর : ও মা, অ্যাক্টিং-এর আমি কি জানি। আগে আমি থিয়েটারের পোশাক আশাকের ইন-চার্জ ছিলুম। একদিন বিশুবাবু আমাকে একটা ছোট পার্টে নামিয়ে দিলেন। সেই থেকে (হেসে) আমার চেহারার মানানসই পার্ট থাকলে আমি করি।

প্রশ্ন : বিশুবাবু কেমন লোক ছিলেন ?

উত্তর : দিল্‌দরিয়া লোক ছিলেন। টাকা তাঁর হাতের ময়লা ছিল, যেমন রোজগার করতেন তেমনি খরচ করতেন। কিন্তু মদ খেতেন না, বদ্‌খেয়ালি ছিল না।

প্রশ্ন : প্রভুনারায়ণের বোনের সঙ্গে কিছু ছিল ?

উত্তর : ওসব বাজে গুজব, আমি বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন : সুলোচনা কেমন মানুষ ?

উত্তর : (একটু থেমে) সুলোচনা ভাল অভিনয় করে, মেয়েও ভাল, কিন্তু মনের কথা কাউকে বলে না। ভারি চাপা প্রকৃতির মেয়ে।

প্রশ্ন : আর মালবিকা ?

উত্তর : মালবিকা ছেলেমানুষ, কিন্তু মনে ছুঁই-ছুঁৎ আছে। ভালভাবে কারুর সঙ্গে মেশে না, একটু দূরত্ব রেখে চলে। তবে মেয়ে ভাল।

প্রশ্ন : আর ওর স্বামী ?

উত্তর : মণীশ ? একটু গম্ভীর প্রকৃতি, কিন্তু ভাল ছেলে। আর ওর কাজের তুলনা নেই, আলো ফেলে নাটকের চেহারা বদলে দিতে পারে। আগে সাঁতারু ছিল, কিন্তু সাঁতারে তো পয়সা নেই, তাই থিয়েটারে ঢুকেছে।

প্রশ্ন : আর ব্রজদুলালবাবু ?

উত্তর : মদ-টদ খান বটে কিন্তু ভারি বিজ্ঞ লোক। এক সময় মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, এখনো গায়ে অসুরের শক্তি। ওঁর স্ত্রী শান্তিও ভারি গুণের মেয়ে ; নাচতে জানে, গাইতে জানে, গানে সুর দিতে জানে। এখানকার মিউজিক্‌ মাস্টার।

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রীতে সদ্ভাব আছে ?

উত্তর : তা আছে বই কি। তবে যে-যার নিজের কাজে থাকে, কেউ কারুর বড় একটা খবর রাখে না।

প্রশ্ন : আজ যখন আলো নেভানো হয় আপনি কোথায় ছিলেন ?

উত্তর : আমার স্বামী আর আমি স্টেজের পিছন দিকে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলুম।

ইন্সপেক্টর একজন জমাদারকে ডেকে বললেন, 'ইনি বেহালায় থাকেন। এঁকে আর এঁর স্বামীকে পুলিসের গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দাও।'

কালীকিঙ্কর দাস। বয়স—৪০। জীবিকা—থিয়েটারের প্রমপ্‌টার। ঠিকানা * * কৈলাস বোস লেন।

অসমাপ্ত

পরিশিষ্ট : ১

ব্যো ম কে শ ও স ত্য ব তী র প্র স্থা ন

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

সকালবেলা, সাড়ে সাতটা বেজেছে। সত্যবতী কেয়াতলা থেকে রিক্সা করে গড়িয়াহাট মার্কেটে যাচ্ছিল, এমন সময় মোড়ের মাথায় খবরের কাগজের স্টলে চোখ পড়ল। একটা কাগজ কিনে পাতা ওল্টাতেই দেখে বড় হরফে একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে—শরদিন্দু অম্‌নিবাসের শেষ খণ্ড শিগগির বের হবে। পাঠক-পাঠিকাদের প্রকাশক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তাঁরা এতদিন এই গ্রন্থাবলীকে যথেষ্ট সমাদর করেছেন। সত্যবতীর মনে হল যাক এতদিনে কাজটা শেষ হল। প্রথমে যতটা তাড়াতাড়ি হচ্ছিল শেষের দিকে অতটা নয় ; পনের বছর লেগেছে। তাহলেও একটা কাজ শেষ হল তো। বেচারি শরদিন্দুবাবু। জীবনের একটা বড় অংশ ব্যোমকেশ-সত্যবতীর জন্য তিনি ব্যয় করেছেন। ভদ্রলোক একটা গাড়ি দেবেন বলেছিলেন সেকথা রাখতে পারেননি। মারা গেলে আর কি করা যাবে ? সেই যে কে যেন এক অধ্যাপকের সঙ্গে হাতিবাগানে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন সেখানে অভিনেতা একজন খুন হয়ে গেল ; তারপর তো পুলিসের হাঙ্গামা। আগে থেকেই তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। থিয়েটারের হুজ্জুতি না উঠলে তিনি হয়ত আরও কিছুদিন ভাল থাকতেন। এই ভাবতে ভাবতে সত্যবতীর চোখ ছলছল করে উঠল। রিক্সা এর মধ্যে গড়িয়াহাট বাজারে এসে গিয়েছিল। সত্যবতী দুটি ব্যাগ হাতে করে নামল। অন্যদিন সত্যবতী খুব উৎসাহে বাজার করে। আজ তার সেরকম উৎসাহ ছিল না ; বাজার করতে করতে শরদিন্দুবাবুর কথা মনে পড়ায় কিরকম অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। আলু, বেগুন, ঝিঙে, পটল, লঙ্কা, থোড়, উচ্ছে সে তো বাঁধাই আছে তার জন্য ভাবতে হবে না। চিংড়িমাছও কিনল। ভীষণ দাম, তা হোক। ব্যোমকেশ লাউচিংড়ি খেতে চেয়েছে। অন্যদিকে চোখ পড়ল, দেখল একটু দূরে একটা ঝুড়িতে অনেক ইলিশ মাছ রয়েছে। রোজ বাজারে 'মুখপোড়া ইলিশ' উঠছিল আজ তার বদলে ভাল জাতের নধর ইলিশ মাছ। একটা প্রায় এক কিলো ওজনের ইলিশ মাছ কিনল। দুজন প্রাণীর জন্য একটু বেশি হল, তা হোক্‌গে, ফ্রিজে রেখে দিলে চলবে। লাউ কিনতে ভুলে গেল। একবার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলে পুঁটিরাম যা হয় করবে কিন্তু লাউচিংড়ি আর হবে না ; ব্যোমকেশের কপালে নেই। ফিরতি রিক্সায় উঠে একবার ভাবল ফিরে গিয়ে একটা লাউ কিনে আনে কিন্তু বেশ গরম পড়ে গিয়েছে। মনে হল আবার এতটা পথ ফিরে যাব ? লাউ না হলে এমন কি ক্ষতি হবে ?

কেয়াতলায় বাড়িতে পৌঁছে দোতলায় উঠে দরজায় বেল টিপল। কেবল দুজনের জন্য পুরো বাড়ি রাখবার কোন মানে হয় না তাই ব্যোমকেশ একতলাটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। সত্যবতী প্রথমটা একটু আপত্তি করেছিল কে না কে এসে উঠবে কিন্তু ব্যোমকেশ সে কথা শোনেনি। যাই হোক ভাড়াটেদের সঙ্গে কোন গোলমাল হয়নি ; তারা বেশ ভদ্র। আর ব্যোমকেশের বিষয়ে লেখা-টেখা পড়ে তার উপরে ভক্তিও হয়েছে। বেল টিপতে না টিপতে পুঁটিরাম দরজা খুলে বাজারের থলিদুটো ভিতরে নিয়ে গেল। স্নানের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যবতী বলল, 'এই শুনছ।' বলতে দোষ নেই সত্যবতীরও একটু বয়স হয়েছে। আগেকার দিনের মত আর তন্বী নেই। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বলল, 'এই শুনছ।'

স্নানের ঘরের দরজায় ছিটকিনিতে একটু আওয়াজ হল। দরজা খুলে ব্যোমকেশ বেরিয়ে এল। তার দাড়ি কামানো হয়ে গিয়েছে, ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছিল, বলল, 'এত চেঁচাচ্ছ কেন? হয়েছে কি? গরমে একেবারে ঘেমে নেয়ে গিয়েছ যে। দেখছ ন'টা বাজেনি এখনও, কিরকম গরম পড়েছে।' সত্যবতী বলল, 'সাধে কি চেঁচাচ্ছি। আমি আজকাল কিছু বললেই তোমার চেঁচানি মনে হয়। খবরের কাগজটা দেখ তাহলেই বুঝবে চেঁচালেও কোন দোষ হত না।' ব্যোমকেশ কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি। ভাবতেও খারাপ লাগছে। এখনও তো অনেক কিছু করবার বাকি ছিল। শার্লক হোম্স মরে গিয়েও কি ফিরে আসেনি। তাছাড়া তার 'কেসবুকে'র কথা তো সবাই জানে। ব্যোমকেশেরও একটা 'কেসবুক' বের হতে পারত।' সত্যবতী বলল, 'তুমি যেমন আলসে, বাড়ি থেকে বের হতে বললেই তোমার প্রাণ বেরিয়ে যায়, তোমার আবার 'কেসবুক'।' ব্যোমকেশ বলল, 'ঐ তো তোমার দোষ, চট করে রেগে যাও। আমার কত কথা তো লেখাই হয়নি। শেষের দিকে শরদিন্দুবাবু আবার ইতিহাসের গল্প-টল্প নিয়ে মেতেছিলেন কিনা। সেগুলো সিনেমা হয়েছে। খুব যে ভাল ছবি হয়েছে বলব না।' সত্যবতী একটু চটে গিয়ে বলল, 'ভাল খারাপের তুমি কি বুঝবে বল। তুমি এক ঠ্যাঙাড়েদের কথা বুঝতে পার।' এমন সময় পুঁটিরাম ঘরে ঢুকে বলল, 'মা, লাউ কোথায়? বাবুর জন্য লাউচিংড়ি হবে বলেছিলেন।' সত্যবতী একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'এই যাঃ ভুলে গেছি। না ঠিক ভুলিনি ; ফেরার পথে মনে পড়ল। তখন এত রোদ্দুর উঠে গিয়েছে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না। ভাবলাম পুঁটিরাম আছে যা হোক্ করে নেবে। পুঁটিরাম, তুমি বাবা একবার বাজারে যাবে?' পুঁটিরাম বলল, 'আপনাদের চা করে দিয়ে যাচ্ছি।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পুঁটিরাম চলে যেতেই ব্যোমকেশ কট্‌মট্ করে সত্যবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'না ও যাবে না।' সত্যবতী বলল, 'কেন গেলে কি হয়? রাস্তায় বেরোলে তোমার চাকরের গায়ে ফোস্কা পড়বে?' ব্যোমকেশ বলল, 'সত্যবতী, তুমি তো এরকম ছিলে না। তোমার মন ভারি কোমল ছিল। দোষের মধ্যে তুমি খুব কাঁদতে। তোমার রং কালো বটে তবে তোমার বড় বড় চোখে বেশ মানাত।' সত্যবতী বলল, 'ওসব ছেঁদো কথা রাখ। এখন কি করা যায় বল। তোমার গল্প তুমি নিজে একবার চেষ্টা করে দেখবে?' ব্যোমকেশ বলল, 'ও আমাকে দিয়ে হবে না। গল্প লেখা ডাকাত ধরার চেয়েও শক্ত।' সত্যবতী বলল, 'আমাকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা কোর না। আমি কি জানি না তোমার কী বুদ্ধি? সেই যে চীনে পাড়ার মেসে মেঝেতে কান পেতে নীচের ঘরের কথাবার্তা একটু একটু শুনেছিলে তাতে কতবড় একটা চোরাকারবারীর দল ধরা পড়ে গেল। তখন থেকে তো অজিতের সঙ্গে ভাব তোমার। বলতে বটে 'সত্যান্বেষী' কিন্তু কে তোমাকে চিনত? অজিত এখন কোথায় আছে কে জানে? শুনলাম দূরে কোথায় ব্যবসা করছে। গাড়িও কিনেছে নিশ্চয়।' ব্যোমকেশ উত্তর দিল না। সত্যবতী আবার বলল, 'সেই যে আর একবার তুমি একটি মেয়ের নীল চোখ দেখে আসল কথাটা বুঝে ফেললে। তখন অবশ্য তোমার বেশ নাম হয়েছে।' ব্যোমকেশ আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বোধহয় অজিতের কথা তারও মনে পড়ছিল। খানিকক্ষণ পরে বলল, 'সত্যবতী, যদি রাগ না কর তো একটা কথা বলি।' সত্যবতী অনেকদিন ব্যোমকেশের এরকম গলা শোনেনি। সে বলল, 'কিছু বলবে তো, দাঁড়াও, লাউয়ের পয়সা দিয়ে আসি।' এই বলে উঠে গেল। দু মিনিট পরে ফিরে এসে বলল, 'কি বলছিলে এইবার বল।' ব্যোমকেশ বলল, 'কিছুদিন থেকে আমিও ভাবছি কি করা যায়। এদিকে কাজকর্ম তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। অভিনয়ের সময় exit লাইন ভুলে গেলেই বিপদ। রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজেকেই কেমন বোকা বোকা মনে হয়।' সত্যবতী বলল, 'সে কি গো, এখনি exit লাইন কি? আমার তো নানারকম প্ল্যান আছে। তিনটে বড় টব এনে রেখেছি বৃষ্টি পড়লেই তাতে দুটো কাঞ্চন আর বোগেনভিলিয়া লাগিয়ে দেব। সেগুলো তো বড় হবার আগে আমি কোথাও চলে যাবার কথা ভাবতেই পারছি না।' ব্যোমকেশ বলল, 'ঐ তো মেয়েদের দোষ, সবজায়গায় সংসার পেতে বসে আছ। আমার ঠাকুমা বাড়ির গাছের মোচা, গোরুর দুধ আর রান্নাঘরের চালে লাউয়ের ডগা এইসবের মায়ায়

এমন জড়িয়েছিলেন যে তাঁর শ্রীক্ষেত্র যাওয়া হল না। যাদের সঙ্গে পুরী যাবার কথা ছিল তারা ডাকতে এসে হতাশ হয়ে বকতে বকতে চলে গেল। তোমারও তো সেই দশা হয়েছে দেখছি।' সত্যবতী বলল, 'তুমি কি করে বলছ দুই একরকম। পুরী গেলে তো ফিরবার পথ আছে কিন্তু তুমি যা বলছ তাতে ফিরবার কোন পথ নেই। এখানেই বা এমন কি মন্দ আছি।' ব্যোমাকেশ বলল, 'আহা, তুমি বুঝছ না। চিরকাল তো এমন থাকবে না। মানুষ সাজতে গেলেই বয়স বলে একটা জিনিস আছে তো। এই আমাকেই দেখ ছুটতে গেলেই হাঁপ ধরে। পিছনে পিছনে ছুটবে এমন 'মোরিয়েটি' আমার কেউ নেই কিন্তু তার পিছনে ছুটছি এমন ভাবতেও আমার হাঁপ ধরে। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার অসুবিধেও অনেক। বাজার তো দিন দিন চড়ছে। তবু দেখ আমাদের দুজনের কি এমন খরচ লাগে। অবিশ্যি পুঁটিরামকেও ধরবে আমাদের সঙ্গে। নীচেটা তো ভাড়া দিয়ে দিয়েছি, বই থেকেও আসছে কিছু। তাছাড়া এমন ডিটেকটিভ আছেন যাঁরা ঘর থেকেই বের হন না। ঘরে বসেই সব সমস্যা সমাধান করেন। আসল কথা আর আমার ভাল লাগছে না।' এইসময় পুঁটিরাম ঘরে ঢুকে বলল, 'মা, অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমার রান্না হয়ে এল। বাবু এবার স্নান করে নিলে ভাল হত।' সত্যবতীর তো সকালেই স্নান করা অভ্যাস। অন্যদিন হলে ব্যোমকেশের এইসময় স্নান হয়ে যেত কিন্তু আজ সত্যবতীর সঙ্গে কথাবার্তায় দেরি হয়ে গেল। তাছাড়া কিছুদিন হল ব্যোমকেশেরও কিরকম 'শিথিল স্বভাব' হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'আমি স্নান করে নিচ্ছি।' এই বলে তোয়ালে কাঁধে ফেলে স্নানের ঘরে ঢুকল।

বেলা প্রায় বারোটা বাজতে চলেছে। ইতিমধ্যে দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী খেতে বসেছে। খাবার টেবিলটি ছোট তবে চারজন বসতে পারে। টেবিলের উপরে ভাত, মুগের ডাল, ইলিশ মাছের ডিমের ভাজা, লাউচিংড়ি, ইলিশ মাছের ঝোল। একটি বড় পাত্রে বাড়িতে পাতা দই। রাত্রে শুতে যাবার আগে সত্যবতী পেতে রেখেছিল। এটা তার বহুদিনের পুরনো অভ্যাস। ব্যোমকেশ খাবার সময় একটু দই খেতে ভালবাসে। খাবার সময় বিশেষ কথাবার্তা হল না। একই কথা বারে বারে মনে হতে লাগল। ব্যোমকেশ শেষ পর্যন্ত না থাকতে পেরে বলল, 'একেবারে 'ফেড-আপ' হয়ে গেছি। অজিত ট্যাক্সির কারবার করলে তার ওখানে অন্তত ট্যাক্সি চালাবার কাজ পাওয়া যেত।' সত্যবতী শুধু বলল, 'বাজে বোকো না।' ব্যোমকেশ খবরের কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল কিন্তু কথা আর জমল না। এমন সময় পুঁটিরাম ঘরে ঢুকে বলল, 'মা, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, দেশের লোক এসেছে। বিকেলে চা ক'টার আনব ?' সত্যবতী বলল, 'যা গরম চা খেতে ইচ্ছে করছে না। যাক্ পাঁচটার সময় সময় নিয়ে এস ; তার আগে দরকার নেই।' আরও আধঘন্টা কেটে গিয়েছে। এমন সময় নীচ থেকে কে 'ব্যোমকেশ বাড়ি আছ' বলে হাঁক দিল। সত্যবতী বলল, 'কে চেঁচাচ্ছে দেখ। বেল টিপছে না কেন ?' ব্যোমকেশ বলল, 'লোডশেডিং তো আরম্ভ হয়ে গেছে ঘণ্টাখানেক আগে তা খেয়াল করনি। এই হচ্ছে শহর। মাছ ছোঁবার উপায় নেই এত দর। লোডশেডিং দিনে তিনবার করে হচ্ছে। দোতলায় জল তুলবার জন্য যে পাম্প চালাব তার উপায় নেই।' এই বলে নীচে গিয়ে দরজা খুলল। দুমিনিট পরে ব্যোমকেশ যাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে সত্যবতী যেমন খুশি তেমন অবাক। সত্যবতী বলল, 'অজিত, আজ সকালেই তোমার কথা হচ্ছিল। কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কোথায় আছ, কি করছ কিছুই জানি না।' অজিত বলল, 'সব কথা হবে ধীরে ধীরে। তোমরা কি করছ সে কথাও তো আমার জানা দরকার। এখন এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও তো। কি গরম !' সত্যবতী বলল, 'জল দিচ্ছি, ঘোল করে দেব ? কিন্তু খুব ঠাণ্ডা হবে না। দেখছ না কারেন্ট নেই।' এই বলতে বলতেই পাখা ঘুরতে আরম্ভ করল। ব্যোমকেশ বলল, 'দেখেছ অজিতের কি ক্ষমতা। ওর এত ক্ষমতা যখন আমরা একসঙ্গে ছিলাম টের পাইনি।' অজিত বলল, 'এখানে থাকতে ক্ষমতা দেখবে কি করে ? তুমিই তো সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখতে, আমাকেও। তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। দেখ ব্যোমকেশ, যা ঘটে তা মঙ্গলের জন্যই ঘটে। আমি জানি তুমি একথা বিশ্বাস করবে না ; তাহলে আমার কথা শোন। বইয়ের ব্যবসা তো চলল না অর্থাৎ চালাতে পারলাম না। সে কি আমার

কাজ ! কোথায় কার কাছে একটু সস্তায় কাগজ পাওয়া যায় তার পিছনে ঘোরাঘুরি, দপ্তরীকে তোয়াজ করা। বই ছাপা হলেও ঘুম হত না যদি দপ্তরীর বাড়ি আগুন লেগে যায়, সব ফর্মা পুড়ে যাবে। লেখকদের কথা আর বোলো না। যাদের কিছু নামডাক হয়েছে তাদের কি রোয়াব। বলে তিন হাজার টাকা দিয়ে যাও আগে, ভেবে দেখছি তোমাকে কি দেব। কিংবা তিন ফর্মার ম্যাটার ছুঁইয়ে দিয়ে বলে এইটে প্রেসে পাঠিয়ে দিন, তারপর যেমন লিখব এসে নিয়ে যাবেন। কিছু পুরনো বইয়ের যার কপিরাইট নেই কিন্তু বাজার আছে তাই ছাপতে গেলুম। দেখি সব প্রকাশক একই কথা ভেবে রেখেছে কাজেই দাঁড়াব কোথায়। তোমাদের সঙ্গে তখন দেখাসাক্ষাৎ হয় না। এক গুজরাটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। সে বলল, 'অজিতবাবু, আপনি যা করছেন ওতে কোন নাফা নেই।' আমি চোখ বুজে তার সঙ্গে নেমে পড়লাম ; ফল কিছু খারাপ হয়নি বুঝতেই পারছ।' ব্যোমকেশ বলল, 'কিসের ব্যবসা ?' অজিত বলল, 'বলছি। ব্যবসা তো একটা নয়। রাজনন্দনগাঁও বলে একটা রেল স্টেশন আছে জান। ইদানীং তো তুমি প্লেন ছাড়া নড়তে না। সেকালে যখন ট্রেনে চড়তে তখন বোম্বাই যেতে দেখেছ নিশ্চয় কলকাতা থেকে ন'শ কিলোমিটার দূরে। সেখানে আমার ইটের কারবার—ইটের ভাঁটা আর তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক। সেখান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে আমার আর একটা ব্যবসা আছে কাগজ তৈরি করবার মিল। সেখানে এখনও প্রোডাক্সন আরম্ভ হয়নি। বইয়ের ব্যবসা যখন শুরু করেছিলাম তখন কাগজওলারা তো আমাকে বিলক্ষণ ঘুরিয়েছে। ভাবলাম আমি একবার দেখি ঘোরাতে কেমন লাগে। জায়গাটার নাম 'তিনসোনা'। ছোট ছোট তিনটে পাহাড় আছে, ঝরণা, রাত্রে মাঝে মাঝে নেকড়ে বের হয়। জায়গাটা খুব সুন্দর। সত্যবতীর ভাল লাগবে। আমি বলছি কি তোমরা আমার সঙ্গে চল। দুটো জায়গাই দেখ, যে জায়গাটা পছন্দ হবে সেইখানে থেকে যাবে।' সত্যবতী বলল, 'আমার তো ভাল লাগছে, শুনেই যেতে ইচ্ছে করছে।' অজিত বাধা দিয়ে বলল, 'সে আমি বুঝতে পেরেছি।' ব্যোমকেশ বলল, 'আমি ওখানে গেলে তোমার এমন কি কাজে লাগব ?' অজিত বলল, 'সেকথা বোল না। আমার পাঁচ বছর ব্যবসা করে অনেক জ্ঞান হয়েছে। তুমি যদি স্পেশাল অফিসার হয়ে যেতে বা ম্যানেজার হয়ে যেতে তাহলে লোকে ভাববে তুমি একজন ইট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অথবা কাগজের মিলের সঙ্গে তোমার অনেকদিনের সম্পর্ক। আর যদি ডিরেক্টর হয়ে যাও তাহলে এসব কথা উঠবেই না। আর ব্যোমকেশ বক্সীকে ওখানে চিনে ফেললে অসুবিধে হবে ভাবছ ? ব্যোমকেশ, তুমি হয়ত রাগ করবে কিন্তু কলকাতা ও দিল্লীর বাইরে কে তোমাকে চিনবে ? দরকার হয় তো ওখানে গিয়ে একটু গোঁফ রাখতে পার।' সত্যবতী বলল, 'গোঁফ, রামঃ। তাহলে আর গিয়ে কাজ নেই।' অজিত খুব তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, গোঁফের দরকার নেই। সব কিছুই তো বদলে যায়। আমাকে দেখছ না আমি কিরকম বদলে গেছি।' সত্যবতী অনেকক্ষণ থেকে ঠাহর করে অজিতকে লক্ষ্য করছিল, দেখছিল অজিত কিরকম বদলে গিয়েছে। অজিতের গায়ে মাংস লেগেছে। জায়গাটার আবহাওয়া নিশ্চয় ভাল। পোশাকও বদলেছে। আগে তো ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া কিছু পরত না। এখন দামী কাপড়ের ট্রাউজার ও শার্ট। অজিত আবার বলল, 'শোরগোল করে কাজ নেই। সঙ্গে গাড়ি আছে, গাড়ির ভিতরে আমার স্যুটকেস আছে, চল বেরিয়ে পড়ি। আমি তো আজকেই যাব বলেই বেরিয়েছিলাম। একটু ঘুরে যাব, রাজনন্দনগাঁও যেতে দু'একদিন দেরি হবে। দেরি হলে তোমাদের এমন কি অসুবিধে ? পুঁটিরাম কি বাড়িতে আছে ?' সত্যবতী বলল, 'না, কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। পাঁচটায় চা নিয়ে আসবে।' অজিত বলল, 'তাহলে চল, তাড়াতাড়ি চলে যাই। পনের মিনিট সময়।' সত্যবতী বলল, 'দাঁড়াও, একটু গোছগাছ করতে হবে না।' অজিত বলল, 'গোছগাছ আবার কি ? এমনভাবে যাব যাতে বুঝতে পারবে না আমরা চলে গেছি। সেই তো মজা। আমি বলি কি ব্যোমকেশ, কয়েকটা ট্রাউজার আর বুশশার্ট করেছিলে তার একটা পরে নাও, বাকিগুলো সঙ্গে নিয়ে নাও। সত্যবতী, তুমি একটা হাল্কা শাড়ি পরে নাও আর সচরাচর যেসব শাড়ি পর না তার মধ্যে থেকে চার পাঁচটা নিয়ে নাও। তোমরা কেউ বাইরে যাবার জুতো পর না। বাড়ির চটি পরে চল।' ব্যোমকেশ বলল, 'কিছু টাকা নেওয়া

দরকার। বাড়িতে তো মোটে শ' চারেক টাকা আছে। এখন তো ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার সময় হয়ে এল। চারশ টাকা থেকে আবার পুঁটিরামের জন্য কিছু রেখে যাব তা নাহলে ও খাবে কি ?' সত্যবতী বলল, 'এই তোমার বুদ্ধি ! ভুলে গেলে গড়িয়াহাট রোডের কাছে যে ব্যাঙ্ক আছে তাতে তোমার আমার জয়েন্ট একাউন্ট আছে। সেটা তো বিকেলে খোলে। তাতে তো বিশেষ হাত দেওয়া হয় না, কয়েক হাজার জমেছে। সেটা তুলে নিলেই হবে। এ ব্যাঙ্কের টাকা যেমন আছে থাক। তুমি বরং ব্যাঙ্ক দুটোর চেক্ বই নিয়ে চল।' চারটে বাজবার কিছু আগে অজিতের গাড়ি সত্যবতী ব্যোমকেশকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তাদের জামাকাপড় খবরের কাগজে জড়ানো। গাড়ির বুটে অজিতের স্যুটকেসের পাশে প্যাকেটটা পড়ে রইল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে তারা প্রথমে ব্যাঙ্কে গেল। ব্যোমকেশ গাড়ি থেকে নামল না। সত্যবতী আর অজিত গিয়ে টাকাটা তুলে আনল। তখন ভিড় ছিল না, বারো-তের মিনিটের মধ্যে কাজ হয়ে গেল। সাত হাজার টাকা তুলে নিল ; আরও কিছু পড়ে রইল। ব্যোমকেশ বলল, 'সবটা না তুলে ভালই করেছ।' গাড়ি সেখান থেকে প্রথমে মার্কেটের কাছে গেল। গাড়ি একজায়গায় পার্ক করে অজিত সত্যবতীকে বলল, 'কয়েকটি শাড়ি, বাইরে বেরোবার চটি এবং অন্যান্য টুকিটাকি যা লাগবার কিনে নাও। আমি ততক্ষণ ব্যোমকেশের জুতো কিনছি।' সত্যবতী জিনিস কিনে এসে দেখল অজিতের সওদা শেষ হয়ে গেছে। শুধু ব্যোমকেশের জুতোই কেনেনি, দুটো ফ্ল্যাস্কও কিনেছে। একটায় ঠাণ্ডা জল ভর্তি আর একটায় চা। তাছাড়া এক বাক্স ভর্তি চিকেন স্যান্ডউইচ, ছ'টা ন্যাংড়া আম আর একটা সস্তা দামের স্যুটকেস। অজিত বলল, 'সব তো হয়ে গেল, কেনাকাটার আর কিছু বাকি নেই। চল এবার বেরিয়ে পড়ি।' সত্যবতী বলল, 'দুর্গা, দুর্গা।' রোদ পড়বার আগেই তাদের গাড়ি হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে গেল। ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক। অজিত তাকে বলল, 'কি হে সত্যান্বেষী, 'রিটার্ন অফ শার্লক হোম্‌স'-এর কথা মনে পড়ছে।' ব্যোমকেশ উত্তর দিল না। একটা আনকোরা সিগারেটের বাক্স বার করে একটা সিগারেট ধরাল। তার সিগারেটের বাক্সটা বাড়িতে ফেলে এসেছিল।

সবে পাঁচটা বেজেছে। পুঁটিরাম আধঘণ্টা আগে বাড়ি ফিরেছে। তার হাতে একটা ছোট ট্রে। তাতে টি পট, দুটি পেয়ালা আর একটা প্লেটে কয়েকটা নারকেল নাড়ু। বসবার ঘরে ঢুকে দেখল কেউ নেই। পুঁটিরাম শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে বলল, 'মা, চা এনেছি।' কোন উত্তর পেল না। দরজায় টোকা দিয়ে আবার বলল, 'চা এনেছি মা।' তারপর টেবিলের উপর চায়ের ট্রেটা রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কুড়ি মিনিট পরে এসে দেখল ট্রে সেইরকমই রয়েছে। শোবার ঘরের দরজার সামনে একটু চেঁচামেচি করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে দেখল কেউ নেই। দুপুরে কেউ সেখানে শুয়েছে বলে মনে হল না। পুঁটিরাম ভাবল ব্যাপারখানা কি ! এরকমভাবে তো কেউ কখনও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়নি। আরও কিছুক্ষণ পুঁটিরাম চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল কিন্তু কেউ ফিরে এল না। পুঁটিরাম ভাবল বাবুর প্রকাশকদের সঙ্গে দেখা করা যাক। তাদের যদি বাবু কিছু বলে গিয়ে থাকেন। দেরাজ খুলে দেখল একটা খামে কয়েকটা দশ টাকার নোট ও কিছু খুচরো রাখা আছে। তার থেকে পুঁটিরাম একটা দশ টাকার নোট ও কিছু খুচরো তুলে নিল। যাওয়া আসার খরচ আছে তো। এমন সময় দেখল ড্রয়ারের ভিতরে আর একটা জিনিস রয়েছে। প্রথমে চোখ সরিয়ে নিল। লোভ থেকে দূরে থাকাই ভাল। এক মিনিট পরে হাত ঢুকিয়ে বাক্সটা বার করে আনল। দশটা সিগারেটের মধ্যে তিনটে শুধু খরচ হয়েছে, সাতটা তখনও বাকি। পুঁটিরাম একটা সিগারেট সন্তর্পণে তুলে নিয়ে বাক্সটা ঠিক জায়গায় রেখে দিল। তারপর আধময়লা ফতুয়ার উপর ধোপদুরস্ত শার্ট গায়ে দিয়ে চটি ফট্‌ফট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। দরজায় তালা লাগাল। ব্যোমকেশ ফিরে এলেও কোন অসুবিধে নেই, তার কাছে তো ডুপ্লিকেট চাবি থাকেই। সিগারেটটা রাস্তায় বেরিয়ে তবেই ধরাবে। একটু পা চালিয়ে চলতে হবে, এরপর কলেজ স্ট্রীটের বাসে উঠতে গেলে ভিড়ের ধাক্কা খেতে হবে।

এই রচনাটি পূর্বে শরদিন্দু অমনিবাস দ্বাদশ খণ্ডের ভূমিকা হিসাবে মুদ্রিত হয়েছিল।

পরিশিষ্ট : ২

ব্যো ম কে শে র স ঙ্গে সা ক্ষা ৎ কা র

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আমি এইমাত্র ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা করে এলাম। হ্যাঁ, ব্যোমকেশ বক্সী, সত্যান্বেষী এবং সত্যবতী-পতি। ব্যোমকেশ যাঁকে আপনারা সকলেই চেনেন এবং কেউ দেখেননি—সেই ব্যোমকেশ।

ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ভক্তকে ধরতে হয়, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁর পি-একে আগে ধরা চাই। অশরীরী আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার—তাও দরকার মিডিয়ামের। তেমনি গল্প উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে মূলাকাৎ করতে গেলে খোদ তার স্রষ্টাকে ধরতে হবে।

আমি তাই ধরলাম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ব্যোমকেশের দেখা পেয়ে গেলাম।

ব্যোমকেশকে আমি দেখেছিলাম একটি বাংলা ছবিতে। শরদিন্দুবাবুকে বলতেই তিনি বললেন, আরে দূর ওই ব্যোমকেশ নাকি ? ব্যোমকেশ কস্মিনকালে চোখে চশমা পরেনি, আর সে হচ্ছে বক্সী, কায়স্থর সন্তান, সে আবার বাঁড়ুজ্যে হল কবে ? তা বাদে ব্যোমকেশের নাক হল ধারালো, বেশ লম্বা, নাতিস্থূল চেহারা।

বাধা দিয়ে বললাম, এমন চেহারা কোথাও দেখেছেন, না অর্ধেক মানব আর অর্ধেক কল্পনা ?

—কল্পনা ঠিক নয়। শরদিন্দুবাবু বললেন, বলতে পারেন সেলফ প্রজেকশান। নিজেরই আত্মকৃতি।

আমি এবার তাকালাম শরদিন্দুবাবুর দিকে—হ্যাঁ, এই তো সত্যিকারের ব্যোমকেশ। লম্বা নাতিস্থূল চেহারা। ইস্পাতের ফলার মত ধারালো নাক। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। বয়স হয়েছে। তবু এখনও ঋজু।

—ব্যোমকেশ কি আপনারই বয়সী ?

—না। আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। তার বয়স এখন ষাট। বেণীসংহারে তার বয়স এই ষাট বছরই। আমি শিল্পীকে নির্দেশ দিয়েছি ব্যোমকেশকে যখন আঁকবেন মনে রাখবেন তার বয়স এখন ষাট।

—ব্যোমকেশ কাহিনী কীভাবে আপনার মাথায় এল ?

—সে এক ইতিহাস। ষোল-সতের বছর বয়স থেকে ডিটেকটিভ গল্প পড়তে শুরু করি। আগাথা ক্রিস্টি ও কোনান ডয়েলের আমি দারুণ ভক্ত ছিলাম। তবে নিজে লিখব কোনদিন ভাবিনি। ১৯২৯ সালে যখন লিখতে শুরু করলাম তখন মনে হল এত ডিটেকটিভ বই পড়েছি, টেকনিকটা আয়ত্ত হয়েছে। এবার নিজে গোয়েন্দা কাহিনী লিখলে কেমন হয়। ১৯৩৩ সালে প্রথম গোয়েন্দা গল্পে হাত দিলাম। তখন থেকেই ব্যোমকেশের সঙ্গে পরিচয়।

—ব্যোমকেশ যে বক্সী হলেন তা কি নামের অনুপ্রাসের সুবিধার জন্য ?

—তা ঠিক নয়। তবে চেয়েছিলাম ব্যোমকেশ নিজে যেমন অসাধারণ, নামটির মধ্যে তেমনি যেন অসাধারণত্ব থাকে। অনেক নাম মনে এসেছিল। কোনটিই আর পছন্দ হয় না। শেষে ব্যোমকেশ বক্সী পছন্দ হল। নায়কের নামটিও ব্যক্তিত্বপূর্ণ হওয়া চাই। ধরুন, শার্লক হোমস না

হয়ে যদি হত ডেভিড হোমস, তাহলে কি অমন ব্যক্তিত্ব আসত ? নায়কের একটা 'ক্যাচি' নাম দেওয়া আমাদের লেখকদের পুরনো ট্রিক।

—ব্যোমকেশকে ব্রাহ্মণ না করে কায়স্থ করলেন কেন ?

হাসতে হাসতে শরদিন্দুবাবু বললেন, আমার ধারণা কায়স্থরা ব্রাহ্মণদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে।

—ব্যোমকেশের সহকারী অজিতকে পেলেন কোথায় ?

—অজিত সিনথিটিক চরিত্র। আমার বাল্যবন্ধু অজিত সেনের নামে নাম।

—ব্যোমকেশ গোয়েন্দাগিরি শিখল কোথা থেকে ? তার কি কোন ট্রেনিং ছিল ?

—না। স্রেফ ইনটিউশন। ব্যোমকেশ অঙ্কে খুব দড়। তার বাবাও ছিলেন বড় ম্যাথামেটিসিয়ান। মা বৈষ্ণব বংশের মেয়ে। এই দুয়ের সংমিশ্রণে ব্যোমকেশের বুদ্ধি খুব দৃঢ় হয়েছে। এই বুদ্ধি দিয়েই সে জটিল রহস্যের জট ছাড়ায়।

—অন্যান্য বাঙালী গোয়েন্দার মত ব্যোমকেশকে তো গুলি চালাতে দেখি না। ব্যোমকেশ কাহিনীতে ভায়োলেন্ট অ্যাকশন নেই বললেই চলে। এর কারণটা কি ?

—আমার মেজাজের সঙ্গে গুলি গোলা খাপ খায় না। তাছাড়া গোয়েন্দা কাহিনীকে আমি ইনটেলেকচুয়াল লেভেলে রেখে দিতে চাই। ওগুলি নিছক গোয়েন্দা কাহিনী নয়। প্রতিটি কাহিনীকে আপনি শুধু সামাজিক উপন্যাস হিসাবেও পড়তে পারেন। কাহিনীর মধ্যে আমি পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। মানুষের সহজ সাধারণ জীবনে কতগুলি সমস্যা অতর্কিতে দেখা দেয়—ব্যোমকেশ তারই সমাধান করে। কখনও কখনও সামাজিক সমস্যাও এর মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'চোরাবালি' গল্পে আছে বিধবার পদস্খলন। একটি কথা, জীবনকে এড়িয়ে কোনদিন গোয়েন্দা গল্প লেখার চেষ্টা করিনি।

—ব্যোমকেশবাবু এখন কোথায় আছেন ?

—আগে হ্যারিসন রোডে ছিলেন। এখন কেয়াতলাতে বাড়ি করে সেখানে আছেন।

—কেয়াতলাতে বাড়ি করলেন কেন ? নিউ আলিপুর কিংবা যোধপুর পার্ক তো আরও খানদানি জায়গা ?

শরদিন্দুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, কেয়াতলাতে যে আমি কিছুদিন ছিলাম। বেশ পরিচিত জায়গা। ব্যোমকেশকেও তাই এখানে এনে ফেললাম।

তাছাড়া ব্যোমকেশের বাড়ি করারও একটা ইতিহাস আছে।

আমার বন্ধু প্রতুল গুপ্ত প্রায়ই আমাকে তাগাদা দিতেন, সত্যবতীকে একটা বাড়ি তৈরি করে দিতেই হবে। ওঁর অনুরোধেই ব্যোমকেশের বাড়ি হল। এখন আবার প্রতুলবাবু ধরেছেন, সত্যবতীকে একখানা গাড়ি কিনে দিতে হবে। গাড়ি না হলে সত্যবতী গড়িয়াহাটে বাজারে যাবে কী করে ? আমি বলেছি, হেঁটে যাবে। ব্যোমকেশ গাড়ি কেনার টাকা পাবে কোথায় ? আমি কিছুতেই রাজী হচ্ছি না। প্রতুলবাবুও চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন।

—ব্যোমকেশবাবু কি গোয়েন্দাগিরি থেকে রিটায়ার করবেন ?

—ব্যোমকেশের দশম গল্পে সত্যবতীর সঙ্গে তার বিয়ে হল। আমি ভাবলাম বিয়ে হলে বাঙালীর ছেলের আর পদার্থ থাকে না, তাই ব্যোমকেশকে তখনই রিটায়ার করিয়ে দিয়েছিলাম। ষোল বছর আর লিখিনি। তারপর কলকাতায় এসেছিলাম কিছুদিন। সে সময় অনেকে আমাকে ধরলেন আবার লিখুন। যখন দেখলাম, আজকালকার ছেলেমেয়েরা চায় তখন আবার লিখতে আরম্ভ করলাম।

—ব্যোমকেশবাবু বিয়ে করলেন কেন ? ওঁর মত ক্যারেক্টরের লোকের তো ঠিক সংসারী হওয়া সাজে না।

—কী আর করবে—বেচারা প্রেমে পড়ে গেল।

—ওঁর সন্তানাদি কি ?

—এক ছেলে। একবার একটি বইয়ে তার উল্লেখ আছে। ছেলেকে সাধারণত আমি সামনে

আনিনি।

—ব্যোমকেশ সত্যবতীর জীবনে দাম্পত্য কলহ আছে ?

—তা আর নেই। অদ্বিতীয় গল্প তো এই দাম্পত্য কলহ দিয়েই শুরু।

—অন্য কোন সমস্যা আছে ?

—থাকলেও সেটা আনিনি।

—কিছু মনে করবেন না, যদিও ব্যক্তিগত প্রশ্ন, ব্যোমকেশবাবুর এখন প্রাপ্তিযোগ কেমন ?

—ব্যোমকেশ ও অজিত মিলে একটি পাবলিশিং ফার্ম খুলেছে। অজিতই ফার্মটি দেখাশোনা করে। তা থেকে ওদের বেশ আয় হচ্ছে।

শরদিন্দুবাবু বললেন, এইবার ব্যোমকেশকে একটু ছুটি দিন। অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। কি খাবেন বলুন কফি না চা ?

আমি বললাম, না, এইমাত্র চা খেয়ে আসছি।

—তাহলে কফিই হোক। তারপর কফি আসতে দেরি দেখে নিজেই ভেতরে ঢুকে দু-কাপ কফি হাতে করে ঢুকলেন। একটা চিনি ছাড়া। সেটি নিজের জন্য।

কফি খেতে খেতে ব্যক্তিগত কথা। নিজের জীবনের কথা। আধুনিক সাহিত্যের কথা। সেসব আলোচনা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক এখানে। ঘুরে ফিরে সেই ব্যোমকেশেই এসে পড়লাম আবার। জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যোমকেশ চরিত্র কি আপনাকে কখনও হন্ট করে ?

—সব চরিত্রই লেখককে হন্ট করে। লেখক যাকে জীবন দিয়ে গড়েছেন, যত্ন করে এঁকেছেন, সব চরিত্রই এসে তাঁকে নাড়া দেয়। ৩১টা গল্প লিখেছি ব্যোমকেশকে নিয়ে। এক-একটা গল্পের কথা ভেবেছি। কীভাবে এগুবো, যখন বুঝতে পারছি না, তখন ব্যোমকেশ এসে আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। এটা কোন ভৌতিক ব্যাপার নয়, সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। যারা একই চরিত্র নিয়ে অনেক গল্প লেখে, তাদের এমন হয়।

—ব্যোমকেশ গল্পের প্লট কীভাবে সংগ্রহ করেন ?

—অনেক ভেবে। খবরের কাগজ থেকে পাই। ইংরাজী গল্প থেকেও আইডিয়া পাই। তারপর তা নিয়ে ভাবতে থাকি। তারপর গল্পের প্রথম লাইন মাথায় এসে গেলে তখন লিখতে বসি।

—ব্যোমকেশবাবুর শরীর এখন কেমন ?

—ষাট বছর বয়সেও দৈহিক ও মস্তিষ্কের দিক থেকে কোন অবক্ষয় তার হয়নি। তবে সে এখন নিজে বেশি কিছু করে না। তার সহকারীরাই কাজকর্ম করে। ব্যোমকেশ শুধু নির্দেশ দেয়।

এবার আমি বলি, ব্যোমকেশবাবুকে কবে ছুটি দেবেন ?

শরদিন্দুবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন, আমি তো এখনই ছুটি দিতে চাই। বার বার ভাবি ব্যোমকেশের ষাট বছর বয়স হয়ে গেল। এবার ওকে ছুটি দেওয়া উচিত। কিন্তু তখনই দেশসুদ্ধ পাঠকের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আবার ভাবি এদের নিরাশ করব ?

একদিকে সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি মায়া, অন্যদিকে পাঠকের দাবি—এই দুয়ের টানাপোড়েনে ব্যোমকেশের স্রষ্টা আজ দ্বিধাগ্রস্ত।

তারপর বললেন, এক সময়ে হঠাৎ ছেড়ে দেব। পাঠকরা চাইলেও ব্যোমকেশের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে তো। সে আর কত পারবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ কার্তিক, ১৩৭৫-তে প্রকাশিত এই রচনাটি শরদিন্দু অমনিবাস দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

ব্যো ম কে শে র ক থা

রচনাকাল অনুসারে ব্যোমকেশ সিরিজের প্রথম গল্প 'পথের কাঁটা' (৭ই আষাঢ় ১৩৩৯)। তারপর 'সীমন্ত-হীরা' (৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৯)। 'এই দু'টি গল্প লেখার পর', শরদিন্দুবাবুর নিজের কথায়, 'ব্যোমকেশকে নিয়ে একটি সিরিজ লেখার কথা মনে হয়। তখন 'সত্যান্বেষী' গল্পে (২৪শে মাঘ ১৩৩৯) ব্যোমকেশ চরিত্রটিকে এসট্যাবলিস করি। পাঠকদের সুবিধার জন্য অবশ্য 'সত্যান্বেষী'কেই ব্যোমকেশের প্রথম গল্প বলে ধরা হয়।' এজন্য 'সত্যান্বেষী' গল্পটিকে বর্তমান সঙ্কলনের প্রথমে দেওয়া হয়েছে। বাকি গল্পগুলি রচনাক্রম অনুসারে সন্নিবেশিত।

প্রথম তিনটি গল্প মাসিক বসুমতীতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৩৩৯ সন থেকে ১৩৪৩ সন পর্যন্ত ব্যোমকেশকে নিয়ে দশটি গল্প লেখার পর দীর্ঘকাল শরদিন্দুবাবু সত্যান্বেষীর কথা ভাবেননি। পাঠকদের আর হয়তো ব্যোমকেশকে ভাল লাগবে না, এই ভেবে ব্যোমকেশকে তিনি গোয়েন্দাগিরি থেকে অব্যাহতি দেন। এর পর প্রায় পনের বছর কেটে গেছে। এই সময় তিনি বোম্বাই থেকে কলকাতায় আসেন। পরিমল গোস্বামীর বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে অভিযোগ করেন—কেন আপনি ব্যোমকেশকে নিয়ে আর লিখছেন না? একথা শুনে তাঁর মনে হয় এখনকার ছেলেমেয়েরা তাহলে ব্যোমকেশকে চায়। প্রধানত এই তরুণ পাঠকদের অনুরোধেই শরদিন্দবাবু আবার ডিটেকটিভ গল্পে হাত দেন; দীর্ঘ বিরতির পর ১৩৫৮ সনের ৮ই পৌষ 'চিত্রচোর' গল্পটি লেখেন। সেই থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্যোমকেশ ছিলেন তাঁর সঙ্গী। গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে ব্যোমকেশ সিরিজে মোট ৩২টি কাহিনী তিনি রচনা করেছেন।

মৃত্যুর (২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০) মাস ছয়েক পূর্বে শরদিন্দুবাবু আর একটি ব্যোমকেশের গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। কাহিনীর নাম বিশুপাল বধ। এই কাহিনীটি অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

রচনা-সমাপ্তিকাল অনুসারে ব্যোমকেশ গল্প-কাহিনীর তালিকা মুদ্রিত হল; এই তারিখগুলি গ্রন্থকারের ডায়েরি থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.	পথের কাঁটা	৭	আষাঢ়	১৩৩৯
২.	সীমন্ত-হীরা	৩	অগ্রহায়ণ	১৩৩৯
৩.	সত্যান্বেষী	২৪	মাঘ	১৩৩৯
৪.	মাকড়সার রস	১৫	বৈশাখ	১৩৪০
৫.	অর্থমনর্থম্	৬	অগ্রহায়ণ	১৩৪০
৬.	চোরাবালি	১২	শ্রাবণ	১৩৪১
৭.	অগ্নিবাণ	৫	বৈশাখ	১৩৪২
৮.	উপসংহার	১২	অগ্রহায়ণ	১৩৪২
৯.	রক্তমুখী নীলা	২৪	ভাদ্র	১৩৪৩
১০.	ব্যোমকেশ ও বরদা	১৩	কার্তিক	১৩৪৩
১১.	চিত্রচোর	৮	পৌষ	১৩৫৮
১২.	দুর্গরহস্য	২০	জ্যৈষ্ঠ	১৩৫৯
১৩.	চিড়িয়াখানা	২০	জুলাই	১৯৫৩
১৪.	আদিম রিপু	৮	জানুয়ারি	১৯৫৫
১৫.	বহ্নি-পতঙ্গ	১৫	ফেব্রুয়ারি	১৯৫৬
১৬.	রক্তের দাগ	২৪	আষাঢ়	১৩৬৩
১৭.	মণিমন্ডন	১৮	মাঘ	১৩৬৫
১৮.	অমৃতের মৃত্যু	৬	জ্যৈষ্ঠ	১৩৬৬
১৯.	শৈলরহস্য	২০	আষাঢ়	১৩৬৬
২০.	অচিন পাখি	১৩	বৈশাখ	১৩৬৭
২১.	কহেন কবি কালিদাস		বৈশাখ	১৩৬৮
২২.	অদৃশ্য ত্রিকোণ	১	ভাদ্র	১৩৬৮
২৩.	খুঁজি খুঁজি নারি	২১	ভাদ্র	১৩৬৮
২৪.	অদ্বিতীয়	২	ফাল্গুন	১৩৬৮
২৫.	মগ্নমৈনাক	২৮	ফেব্রুয়ারি	১৯৬৩
২৬.	দুষ্টচক্র	১	জুলাই	১৯৬৩
২৭.	হেঁয়ালির ছন্দ	২৩	জানুয়ারি	১৯৬৪
২৮.	রুম নম্বর দুই	১৩	জুলাই	১৯৬৪
২৯.	ছলনার ছন্দ	১৬	নভেম্বর	১৯৬৫
৩০.	শজারুর কাঁটা	১৫	মার্চ	১৯৬৭
৩১.	বেণীসংহার	১৫	মে	১৯৬৮
৩২.	লোহার বিস্কুট	৫	মে	১৯৬৯
৩৩.	বিশুপাল বধ		জুলাই	১৯৭০

ব্যোমকেশ-চরিত্র-সংবলিত গ্রন্থ

ব্যোমকেশের কাহিনীগুলি যেসব গ্রন্থে প্রথম সন্নিবেশিত হয় তাদের পরিচয় এখানে দেওয়া হল। সব গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি ; গ্রন্থের যে সংস্করণ পাওয়া গেছে তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কতকগুলি গল্প পরে অন্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় ; তাও যথাসাধ্য নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যোমকেশের ডায়েরী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ কাল মুদ্রিত নেই। পৃ [৬]+১৮১। মূল্য দেড় টাকা।

প্রথম প্রকাশ—১৩৪০। প্রকাশক পি সি সরকার এন্ড কোং।

উৎসর্গ ॥ মানু ও মিহির।

সূচী ॥ সত্যান্বেষী ; পথের কাঁটা ; সীমন্ত-হীরা ; মাকড়সার রস।

"অনেকে জানিতে চাহেন আমার এ গল্পগুলি কোনো বিদেশী গল্পের নকল কি না। সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে এগুলি আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা।

"ডিটেকটিভ গল্প সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে—যেন উহা অন্ত্যজ শ্রেণীর সাহিত্য। আমি তাহা মনে করি না। Edgar Allan Poe, Conan Doyle. G. K. Chesterton যাহা লিখিতে পারেন, তাহা লিখিতে অন্তত আমার লজ্জা নাই।"—ভূমিকা

এই চারটি গল্প পরে 'ব্যোমকেশের ছ'টি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'মাকড়সার রস' গল্পটি শ্রেষ্ঠ গল্পেও যুক্ত।

ব্যোমকেশের কাহিনী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৬০। পৃ [২]+১৩৬। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

প্রথম প্রকাশ—১৩৪০।

সূচী ॥ চোরাবালি ; অর্থমনর্থম্।

এই দুইটি গল্প পরে 'ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ব্যোমকেশের গল্প। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪। পৃ [৪]+২৩৮। মূল্য দুই টাকা।

তৃতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ ১৩৬১।

সূচী ॥ রক্তমুখী নীলা ; অগ্নিবাণ ; উপসংহার ; ব্যোমকেশ ও বরদা।

"এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রই কাল্পনিক।"—ভূমিকা

'অগ্নিবাণ' গল্পটি শ্রেষ্ঠ গল্পেও যুক্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকা বাদ দেওয়া হয়।

দুর্গরহস্য। বাক-সাহিত্য। তৃতীয় প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭১। পৃ [৪]+২০০। মূল্য পাঁচ টাকা।

প্রথম প্রকাশ—পৌষ ১৩৫৯।

উৎসর্গ ॥ আধুনিক কালের যে সকল তরুণ-তরুণীর নির্বন্ধে সতেরো বছর পরে আবার ব্যোমকেশের গল্প লিখলাম, বইখানি তাহাদের হাতেই উৎসর্গ করা হল।

সূচী ॥ চিত্রচোর ; দুর্গরহস্য।

চিড়িয়াখানা। বেঙ্গল পাবলিশার্স। প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬০। পৃ [৪]+১৫৬। মূল্য আড়াই টাকা।

নিউ এজ (তৃতীয়) সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৬৬, আগস্ট ১৯৫৯।

আদিম রিপু। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬২। পৃ [২]+১৭৮। মূল্য তিন টাকা।

গ্রন্থ প্রকাশ সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৭৩।

বহ্নি-পতঙ্গ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৬৩। পৃ [৪]+২১৬। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

দ্বিতীয় প্রকাশ—ফাল্গুন ১৩৬৮।

সূচী ॥ বহ্নি-পতঙ্গ ; রক্তের দাগ।

'বহ্নি-পতঙ্গ' গল্পটি শ্রীমতী শীলা গঙ্গোপাধ্যায় তিনি অঙ্কের নাটকে রূপান্তরিত করেন। শ্রীগুরু লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ, রাসপূর্ণিমা ১৩৬৪। পৃ [২]+১২০। মূল্য দুই টাকা।

সসেমিরা। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ, ৭ই চৈত্র ১৮৮১ শকাব্দ [১৩৬৬ সন]। পৃ [৪]+১৪৩। মূল্য তিন টাকা।

তৃতীয় মুদ্রণ—বৈশাখ ১৮৮৮ শকাব্দ।

সূচী ॥ মণিমণ্ডন ; অমৃতের মৃত্যু ; শৈলরহস্য।

কহেন কবি কালিদাস। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৭৪। পৃ [৪]+১৩৬। মূল্য তিন টাকা।

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৬৮।

সূচী ॥ কহেন কবি কালিদাস ; অচিন পাখি।

মুখবন্ধে উদ্ধৃতি :

কহেন কবি কালিদাস হেঁয়ালির ছন্দ,
জান্‌লা দিয়ে ঘর পালালো গেরস্ত রইল বন্ধ।

—প্রচলিত ছড়া।

ব্যোমকেশের ছ'টি। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। প্রথম সংস্করণ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৪ শকাব্দ [১৩৬৯ সন]। পৃ [৬]+২২৭। মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

উৎসর্গ ॥ মানু ও মিহির।

সূচী ॥ সত্যান্বেষী ; পথের কাঁটা ; সীমন্ত-হীরা ; মাকড়সার রস ; খুঁজি খুঁজি নারি ; অদৃশ্য ত্রিকোণ।

"মাছের মুড়ার সহিত ল্যাজা জুড়িয়া দিলে আস্ত মাছটা পাওয়া যায়। ব্যোমকেশের গোড়ার চারটি গল্পের সহিত শেষের দুইটি গল্প এই গ্রন্থে সংযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা মাছের মুড়া ভালবাসেন তাঁহারা এই বইটি পড়িয়া আনন্দ পাইতে পারেন ; এবং ল্যাজার প্রতি যাঁহাদের আসক্তি আছে ভরসা করি তাঁহারাও নিরাশ হইবেন না।"—ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথম চারটি গল্প পূর্বে 'ব্যোমকেশের ডায়েরী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন। করুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৯। পৃ [৪]+১৫২। মূল্য চার টাকা।

প্রথম আনন্দ সংস্করণ—সেপ্টেম্বর ১৯৬৮।

সূচী ॥ চোরাবালি ; অর্থমনর্থম ; অদ্বিতীয়।

"প্রবীণের সঙ্গে নবীনের সংযোগ সর্বদাই বাঞ্ছনীয় মনে করি। তাতে প্রবীণের গায়ে লাগে যৌবনের স্পর্শ, আর নবীনের বুদ্ধিতে লাগে বিজ্ঞতার ছোঁয়াচ। এই বইখানিতে দুটি প্রবীণ এবং একটি নবীন ব্যোমকেশের কথা সংযুক্ত হয়েছে। ব্যোমকেশকে যাঁরা ভালবাসেন আশা করি এই যোগাযোগ তাঁদের আনুকূল্য লাভ করবে।"—ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথম দু'টি গল্প পূর্বে 'ব্যোমকেশের কাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আনন্দ সংস্করণে লেখক 'অর্থমনর্থম' গল্পটিতে উইল তৈরি প্রসঙ্গে সামান্য পরিবর্তন করেছিলেন। এই পরিমার্জিত পাঠই শরদিন্দু অম্‌নিবাস—প্রথম খণ্ডে গৃহীত হয়েছে।

মগ্নমৈনাক। মিত্র ও ঘোষ। প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭০। পৃ [২]+১৬১।

মূল্য সাড়ে চার টাকা।

তৃতীয় মুদ্রণ—বৈশাখ ১৩৭২।

সূচী ॥ মগ্নমৈনাক ; দুষ্টচক্র ; হেঁয়ালির ছন্দ।

শজারুর কাঁটা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ, ১৪ই আষাঢ় ১৩৭৪। পৃ [৬]+১৩৬। মূল্য চার টাকা।

উৎসর্গ ॥ কীর্তিমান তরুণ লেখক শ্রীমণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় স্নেহাস্পদেষু।

[ভূমিকা] : 'এই কাহিনীতে ব্যোমকেশ আছে, রহস্য আছে, খুন-জখম আছে, রহস্যভেদ আছে, তবু এটা রহস্য-কাহিনী কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। পাঠক-পাঠিকা বিচার করবেন।'

শজারুর কাঁটার হিন্দী অনুবাদ মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ—১৯৬৯। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বেণীসংহার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ [১৩৭৫]। পৃ [৪]+১৪০। মূল্য চার টাকা।

সূচী ॥ ছলনার ছন্দ ; রুম নম্বর দুই ; বেণীসংহার।

[ভূমিকা] : "অজিতকে দিয়ে ব্যোমকেশের গল্প লেখানো আর চলছে না। একে তো ভাষা সেকেলে হয়ে গেছে, এখনো চলতি ভাষা আয়ত্ত করতে পারেনি, এই আধুনিক যুগেও 'করিতেছি' 'খাইতেছি' লেখে। উপরন্তু তার সময়ও নেই। পুস্তক প্রকাশকের কাজে যে-লেখকেরা মাথা গলিয়েছেন তাঁরা জানেন, একবার মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ পেলে মা-সরস্বতীর দিকে আর নজর থাকে না। তাছাড়া সম্প্রতি অজিত আর ব্যোমকেশ মিলে দক্ষিণ কলকাতায় জমি কিনেছে, নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে ; শীগ্‌গিরই তারা পুরনো বাসা ছেড়ে কেয়াতলায় চলে যাবে। অজিত একদিকে বইয়ের দোকান চালাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ি তৈরির তদারক করছে ; গল্প লেখার সময় কোথায় ?

"দেখেশুনে অজিতকে নিষ্কৃতি দিলাম। এখন থেকে আমিই যা পারি লিখব।"

শরদিন্দু অম্‌নিবাস। প্রথম খণ্ড : ব্যোমকেশ। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৭৭, অগাস্ট ১৯৭০। পৃ [৮]+৪৭০। মূল্য কুড়ি টাকা।

ত্রয়োত্রিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪০১। পৃ [১২]+৪০৬। মূল্য পঁয়ষট্টি টাকা।

সূচী ॥ সত্যান্বেষী ; পথের কাঁটা ; সীমন্ত-হীরা ; মাকড়সার রস ; অর্থমনর্থম্ ; চোরাবালি ; অগ্নিবাণ ; উপসংহার ; রক্তমুখী নীলা ; ব্যোমকেশ ও বরদা ; চিত্রচোর ; দুর্গরহস্য ; চিড়িয়াখানা।

ভূমিকা : শ্রীসুকুমার সেন লিখিত 'ব্যোমকেশ-উপন্যাস'।

শরদিন্দু অম্‌নিবাস। দ্বিতীয় খণ্ড : ব্যোমকেশ। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৭৮, অগাস্ট ১৯৭১। পৃ [৪]+৭+[১]+৬৮৮। মূল্য কুড়ি টাকা।

দ্বাবিংশ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০০। পৃ [৮]+৮+৬২৯। মূল্য পঁচাত্তর টাকা।

সূচী ॥ আদিম রিপু ; বহ্নি-পতঙ্গ ; রক্তের দাগ ; মণিমণ্ডন ; অমৃতের মৃত্যু ; শৈলরহস্য ; অচিন পাখি ; কহেন কবি কালিদাস ; অদৃশ্য ত্রিকোণ ; খুঁজি খুঁজি নারি ; অদ্বিতীয় ; মগ্নমৈনাক ; দুষ্টচক্র ; হেঁয়ালির ছন্দ ; রুম নম্বর দুই ; ছলনার ছন্দ ; শজারুর কাঁটা ; বেণীসংহার ; লোহার বিস্কুট ; বিশুপাল বধ ; পরিশিষ্ট : জীবনকথা ; ব্যোমকেশের কথা ; ব্যোমকেশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

ভূমিকা : শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'ব্যোমকেশ, সত্যবতী, সত্যবতীর গাড়ি'।

পরিশিষ্ট অংশে শোভন বসুর লেখা 'জীবনকথা', 'গ্রন্থসূচী' ও 'ব্যোমকেশের কথা' এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ব্যোমকেশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার' রচনাগুলি যুক্ত।

'লোহার বিস্কুট' গল্পটি লেখকের জীবদ্দশায় কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
অসমাপ্ত 'বিশুপাল বধ' গল্পটি সরাসরি এই গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত হয়।

শরদিন্দু অম্নিবাস দ্বাদশ খণ্ডে প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের লেখা ভূমিকা 'ব্যোমকেশ ও সত্যবতীর প্রস্থান' রচনাটি 'ব্যোমকেশ সমগ্র' গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টেও যুক্ত হল।

পরিশেষে বলা যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষপূর্তিতে ১৯৯৯ সালে Penguin Books India শ্রীমতী শ্রীজাতা গুহ কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত সাতটি ব্যোমকেশ কাহিনীর সঙ্কলন 'Picture Imperfect and other Byomkesh Bakshi Mysteries' নামে প্রকাশ করেছেন। অনূদিত গল্পগুলির শিরোনাম: The Inquisitor (সত্যান্বেষী), The Gramophone Pin Mystery (পথের কাঁটা), The Venom of Tarantula (মাকড়সার রস), Where There's a Will (অর্থমনর্থম), Calamity Strikes (অগ্নিবাণ), An Encore for Byomkesh (উপসংহার) এবং Picture Inperfect (চিত্রচোর)।

১১ আশ্বিন ১৪০৭ শোভন বসু